"লক্ষ্মীত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

বঙ্গশ্রী

মাঘ—১৩৪৪

৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম খণ্ড—১ম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

[শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক লিখিত]

শিল্পতত্ত্ব ও অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমার চ্যাটার্জ্জী

বাঙ্গালাদেশে যাঁহারা নিজদিগকে শিক্ষিত বলিয়া প্রচার করিবার জন্ত প্রকারান্তরে ব্যাকুল এবং যাঁহারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে সংশ্লিষ্ট, তাঁহাদের সংখ্যা সমগ্র অধিবাসীর তুলনায় অতীব নগণ্য হইলেও তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করা চলে না। কারণ, যাঁহারা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, তাঁহারাই বাস্তবিক-পক্ষে আধুনিক কালে সমগ্র মনুষ্যসমাজকে শিক্ষা বিতরণ করিবার মুখে প্রায়শঃ কুশিক্ষা প্রদান করিয়া মানুষের হৃদয়ে দাবদাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া থাকেন এবং তজ্জন্ত তাঁহাদের দ্বারা মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বাধিক মাত্রায় সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়া থাকে।

ডাঃ সুনীতিকুমার চ্যাটার্জ্জী উপরোক্ত শ্রেণীর একজন মানুষ এবং আমরা যতদূর শুনিয়াছি, তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগের অন্যতম অধ্যাপক। তিনি আমাদের সাপ্তাহিক বঙ্গশ্রীর কোন কোন পাঠকের নিকট অপরিচিত হইলেও হইতে পারেন বটে, কিন্তু আমাদের মাসিক বঙ্গশ্রীর পাঠকবর্গের নিকট অপরিচিত নহেন, কারণ আমরা একাধিকবার আমাদের মাসিক বঙ্গশ্রীতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শব্দতত্ত্ব-বিভাগে কিরূপ ভাবের শিক্ষাপ্রদান করা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে, তাহা বুঝাইবার জন্ত উপরোক্ত অধ্যাপকটির কথাবার্ত্তার সমালোচনা করিয়াছি।

গত প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের কলাবিভাগের সভাপতিরূপে উপরোক্ত ডাঃ চ্যাটার্জ্জী মহাশয় শিল্প সম্বন্ধে একটি সুবৃহৎ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। ঐ বক্তৃতাটি আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৪টি কলাম অলঙ্কৃত করিয়াছে।

ডাঃ চ্যাটার্জ্জী মহাশয়ের বক্তৃতায় কোন্ শ্রেণীর পদার্থ বিতরিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলে একদিকে যেরূপ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদ কোন্ শ্রেণীর জ্ঞানবান্ মানুষের দ্বারা অলঙ্কৃত করা হইয়া থাকে, তাহার নমুনা পাওয়া যাইবে, অন্তদিকে আবার বাংলাদেশের সমধিক প্রচারিত সংবাদপত্র কোন্ শ্রেণীর বস্তুর দ্বারা বোঝাই করা হয়, তাহাও বুঝা যাইবে।

যাঁহার কোন কার্য্য প্রকৃত জনসমাজের সঙ্গে বিন্দুমাত্র সংশ্লিষ্ট নহে এবং তদনুসারে যাঁহাকে প্রকৃত জনসমাজের প্রয়োজনে নগণ্য বলিয়া উপেক্ষা করা যাইতে পারে, তাঁহার বক্তৃতাকালের কথাবার্ত্তা আমাদের সম্পাদকীয় স্তম্ভের সমালোচনার বিষয় কেন হইতে চলিয়াছে, তাহা আপাতদৃষ্টিতে আশ্চর্য্যজনক হইতে পারে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ববিভাগের

অধ্যাপকের কার্য্য নগণ্য বলিয়া উপেক্ষার যোগ্য হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, যখন অর্থাভাবে ও অন্নাভাবে জনসমাজের স্বাবলম্বী অস্তিত্ব পর্য্যন্ত টলটলায়মান হইয়া পড়ে, তখন ঐ জনসমাজকে রক্ষা করিবার সূত্র আবিষ্কার করিতে হইলে প্রকৃত ভাষাতত্ত্ব ও প্রকৃত শিল্পতত্ত্ব জনসমাজের একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে এবং তৎসম্বন্ধীয় কোন আবোলতাবোল প্রলাপ কোনক্রমেই উপেক্ষার যোগ্য নহে।

অর্থাভাবে ও অন্নাভাবে জনসমাজের স্বাবলম্বী অস্তিত্ব পর্য্যন্ত যখন টলটলায়মান হয়, তখন জনসমাজকে ঐ অবস্থা হইতে রক্ষা করিতে হইলে একদিকে যে সংগঠনের দ্বারা সমগ্র জনসমাজের অন্ন ও অর্থের প্রাচুর্য্য সংঘটিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থার যেরূপ প্রয়োজন হইয়া থাকে, অন্যদিকে আবার ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক মানুষ যাহাতে প্রভূত পরিমাণে প্রকৃত ভাবে শক্তিসম্পন্ন হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থাও একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে।

মানুষের প্রকৃত শক্তির অভিব্যক্তি কোথায়, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ব্যবহারের কার্য্যে মানুষের মনুষ্যত্ব প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং ঐ পাঁচটি কার্য্যে মানুষ যত অধিক নিপুণতা লাভ করিতে সক্ষম হয়, ততই শক্তিমান্ বলিয়া আখ্যা লাভ করে। ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইবে যে, ঐ পাঁচটি শক্তির মূল, শব্দ-শক্তির ব্যবহারে নিহিত রহিয়াছে, কারণ শব্দ ব্যবহারের শক্তি হইতে স্পর্শ, স্পর্শ ব্যবহারের শক্তি হইতে রূপ, রূপ ব্যবহারের শক্তি হইতে রস এবং রস ব্যবহারের শক্তি হইতে গন্ধ ব্যবহারের শক্তির উন্মেষ হইয়া থাকে। কাযেই, প্রকৃতভাবে শক্তিমান্ হইতে হইলে যে শব্দতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

কোন্ উপায়ে শব্দতত্ত্বে নিপুণতা লাভ করিতে পারা যায়, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উহাতে নিপুণতা লাভ করিয়া প্রকৃতভাবে শক্তিমান্ হইতে হইলে মন্ত্রতত্ত্ব (অর্থাৎ শব্দের স্পর্শ বা feel ও রূপ বা photo লইবার তত্ত্ব), শিল্পতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বে পারদর্শী হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়, কারণ প্রকৃত শিল্পতত্ত্ব, মন্ত্রতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব ভাষাতত্ত্ব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

এই হিসাবে জনসমাজে যখন ব্যাপকভাবে অন্নাভাব ও অর্থাভাব দেখা দেয়, তখন মানুষের মধ্যে যে প্রকৃত শক্তির অনটন আরম্ভ হইয়াছে এবং তখন যে প্রকৃত শিল্পতত্ত্ব, মন্ত্রতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব মনুষ্যসমাজ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে,—এই অবস্থায় জনসমাজের প্রকৃত শক্তি যাহাতে পুনর্লাভ করা সম্ভব হয়, তাহা করিতে হইলে যে ঐ চারিটি তত্ত্বের পুনরুদ্ধার করিবার সাধনার প্রয়োজন হয় এবং তদনুসারে তৎসম্বন্ধীয় কোন আবোলতাবোল প্রলাপ যে, কোন জনসমাজসেবী সমালোচনা-পত্রিকা উপেক্ষার যোগ্য হইতে পারে না, তাহা অস্বীকার করা চলে না।

অধ্যাপক চ্যাটার্জ্জীর সুবৃহৎ বক্তৃতাটিতে শিল্প সম্বন্ধে অনেক কথা স্থান পাইয়াছে বটে, কিন্তু শিল্প যে কাহাকে বলে, তাহা ঐ বক্তৃতার কুত্রাপি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

অধ্যাপক ডাঃ চ্যাটার্জ্জী যে শিল্পতত্ত্ববিদ্ নহেন, পরন্তু তিনি যে ভাষাতত্ত্ববিদ্, তাহা তাঁহার বক্তৃতার প্রারম্ভে শ্রোতৃবর্গকে শুনাইয়া দিয়া মূল বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছেন।

তাঁহার বক্তৃতাটী মুখ্যতঃ দুই ভাগে বিভক্ত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

প্রথম ভাগটীকে 'বৈবিক' ভাষায় শিল্পতত্ত্ব-সম্বন্ধী দর্শন, আর দ্বিতীয় ভাগটীকে শিল্পতত্ত্বের ইতিহাস বলা যাইতে পারে।

অবশ্য, 'বৈবিক' ভাষানুসারে এই বক্তৃতায় শিল্পতত্ত্বের দর্শন ও ইতিহাস আছে বলিয়া বলা যাইতে পারে, কারণ 'বৈবিক' ভাষার অনেক শব্দই অর্থহীন অথবা ভাষা-বিজ্ঞানসম্মত অর্থের বিরুদ্ধ অর্থে প্রচলিত। ভাষা-বিজ্ঞানানুসারে 'দর্শন' ও 'ইতিহাস', এই দুইটী পদের অর্থে যাহা বুঝা যায়, তাহা স্মরণ করিলে অধ্যাপক চ্যাটার্জ্জী (অবশ্য, প্রত্যক্ষভাবে মানুষ-মারা ডাক্তার না হইলেও পরোক্ষভাবে তথাকথিত ভাষাবিজ্ঞানের মারফৎ ছাত্রগণের মস্তিষ্ক নষ্ট করিবার ডাক্তার বটে) চ্যাটার্জ্জীর বক্তৃতায়

কোন অংশেই কোন দর্শন অথবা ইতিহাস আছে বলিয়া মনে করা যায় না।

৯। সমগ্র বক্তৃতাটীতে কতকগুলি কথার ও বাক্যের চটক দেখা যায় বটে, কিন্তু একদিকে যেরূপ ঐ বাক্যগুলির পরস্পরের কোন সম্বন্ধ (interlink) খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, অন্যদিকে আবার অনেক কথারই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সম্বন্ধে বক্তার যে কোন কাণ্ডজ্ঞান আছে, তাহার কোন প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

১০। সমগ্র বক্তৃতাটীতে যে সমস্ত কথার খিচুড়ী দেখা যায়, তাহা লক্ষ্য করিলে বলিতে হয় যে, বক্তা কি শব্দ-তত্ত্ব, অথবা কি শিল্প-তত্ত্ব, ইহার কোনটীরই আসলভাগে বিন্দুমাত্রও প্রবেশলাভ করিতে পারেন নাই এবং ঐ প্রবেশের সৌভাগ্য তাঁহার হয় নাই, অথচ তিনি ভাষা-তত্ত্ববিদ্ বলিয়া প্রচারিত হইতে চাহেন বলিয়া এতাদৃশভাবে শ্রোতৃবর্গকে প্রতারিত করিতে তিনি সঙ্কোচ বোধ করেন নাই।

আমাদের উপরোক্ত কথা যে যুক্তিসঙ্গত, তাহা প্রতিপন্ন করিতে হইলে সর্বাগ্রে শিল্প কাহাকে বলে, তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে এবং তাহার পর, ডাঃ চ্যাটার্জ্জী শিল্প সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহা যে অর্থহীন ও অলীক, তাহা পাঠকবর্গকে দেখাইয়া দিতে হইবে।

এইখানে আমরা পাঠকবর্গকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, ভাষাবিজ্ঞান অনুসারে শিল্প-তত্ত্ব বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাতে প্রবেশ করা অতীব দুরূহ। আমাদের এই প্রবন্ধে শিল্প-তত্ত্ব ও ভাষা-তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইবে, তাহার প্রত্যেক কথাটি ভারতীয় ঋষির কথা এবং প্রয়োজন হইলে কোন্ গ্রন্থ হইতে লওয়া হইতেছে, তাহা দেখান যাইতে পারে।

এই কথাগুলি আপাতদৃষ্টিতে দুরূহ হইলেও, ইহার কোনটীই প্রত্যক্ষের অযোগ্য নহে। আমরা অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গকে একটু কষ্ট হইলেও এই প্রবন্ধের আদ্যোপান্ত পড়িতে অনুরোধ করি।

শিল্প কাহাকে বলে, অথবা শিল্পের সংজ্ঞা লইয়া বর্ত্তমানে যাঁহারা ভাবুক বলিয়া মনুষ্যসমাজে খ্যাতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেক মতভেদ দেখা যায় বটে, কিন্তু শিল্প শব্দটীর মধ্যে যে যে "ধ্বনি" নিহিত রহিয়াছে, সেই সেই ধ্বনির স্বভাব লক্ষ্য করিতে পারিলে অতি সহজেই শিল্পের নিরূপণ নির্দ্ধারিত হইতে পারে এবং তখন আর তৎসম্বন্ধে মতভেদ উত্থাপিত হইতে পারে না।

পাশ্চাত্ত্য দেশে ভাষাতত্ত্ব নামে যে অদ্ভুত খিচুড়ী আধুনিক সমাজে স্থান পাইয়াছে, তাহার কথানুসারে মনে হয় বটে যে, প্রত্যেক পদের একাধিক অর্থ সম্ভবযোগ্য এবং ইচ্ছানুরূপ যে কোন অর্থে (conventional meaningএ) প্রত্যেক পদটী ব্যবহৃত হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত ভাষা-বিজ্ঞানে প্রবেশ লাভ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, মানুষ তাহার কথাবার্ত্তায় যে সমস্ত পদ প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহার প্রত্যেকটি একটি মূলাংশ (অর্থাৎ আখ্যাত অথবা নাম, অথবা উপসর্গ, অথবা নিপাত) এবং প্রত্যয়াংশের সংযোগে গঠিত।

মূলাংশের অন্তরে যে যে মৌলিকধ্বনি বিদ্যমান থাকে, উহার প্রত্যেক মৌলিক ধ্বনিটী স্বভাবতঃ এক একটী স্বতন্ত্র অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং ঐ অন্তর্নিহিত বিভিন্ন মৌলিক ধ্বনি যে যে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহার সমন্বয়ে ঐ মূলাংশের যে অর্থ হইয়া থাকে, ঐ অর্থ ঐ পদটীর ভাষাবিজ্ঞানসম্মত স্বাভাবিক মুখ্যার্থ।

এইরূপে মৌলিক ধ্বনির অর্থের সহায়তায় প্রত্যেক পদের মূলাংশের অর্থ যেরূপ স্থিরীকৃত হইতে পারে, সেইরূপ প্রত্যেক প্রত্যয়াংশের অর্থও নিষ্পন্ন হয়। অন্তর্নিহিত ধ্বনির সহায়তায় মূলাংশের যে মুখ্যার্থ ও প্রত্যয়াংশের যে অর্থ নিষ্পন্ন হয়, তাহার মিলনে সম্পূর্ণ পদটীর অর্থ নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। এতাদৃশভাবে পদান্তর্গত মৌলিক ধ্বনির অর্থের সহায়তায় পদের যে অর্থ নিষ্পন্ন হয়, তাহা কখনও একাধিক হয় না। এতাদৃশ অর্থই ঐ পদের স্বভাবসম্মত অর্থ। পদের স্বাভাবিক অর্থ-নির্ণয়ের এতাদৃশ প্রণালী যে কেবলমাত্র ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার পক্ষে প্রয়োগযোগ্য, তাহা নহে; ইংরাজী, জার্ম্মানী, ফরাসী, আরবী, হিব্রু প্রভৃতি যে কোন ভাষার পক্ষে, ঐ প্রণালী প্রয়োগ করিলে বিভিন্ন-ভাষাভাষীর কথাবার্ত্তার মনোভাব যথাযথভাবে নিখুঁত প্রকারে বুঝিয়া লওয়া সম্ভব হইতে পারে।

ভাষা-বিজ্ঞানানুসারে 'মৌলিক' ধ্বনি বলিতে বুঝিতে হয় "অ"-কারাদি একবিংশতি স্বর এবং "ক"-কারাদি অষ্টাত্রিংশটী ব্যঞ্জন ও অযোগবাহী বর্ণ। অ-কারাদি স্বর এবং ক-কারাদি ব্যঞ্জন ও অযোগবাহী বর্ণ যে কেবলমাত্র সংস্কৃত, বাংলা অথবা হিন্দীতেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা নহে, লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, জগতে এমন কোন ভাষা নাই, যাহাতে অ-কারাদি স্বরের ও ক-কারাদি ব্যঞ্জনের ধ্বনি ব্যবহার হয় না। ওয়াটার (water), অ্যাকোয়া (aqua) ও "পানি"—ইহার প্রত্যেকটীতেই মূলতঃ অ-কারাদি স্বর ও ক-কারাদি ব্যঞ্জনের ধ্বনি শুনা যাইবে।

অনেকে মনে করেন যে, অ-কার, অথবা ই-কার, অথবা ক-কার প্রভৃতি মৌলিক ধ্বনির কোন অর্থ নাই। যাঁহারা ইহা মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। অ-কারাদি মৌলিক ধ্বনির যে অর্থ আছে, তাহা যে কোন খেচর পক্ষী, অথবা ভূচর পশু, অথবা জলচর মৎস্যের ভাষার দিকে লক্ষ্য করিলে প্রতীয়মান হইবে। জলচর মৎস্যের যে ভাষা আছে, তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ প্রায়শঃ উপলব্ধি করিতে পারেন না বটে, কিন্তু খেচর পক্ষী ও ভূচর জন্তুর যে ভাষা আছে, তাহা তাঁহারাও স্বীকার করিয়া থাকেন। উহারা তাহাদের কথাবার্ত্তায় যে, কোন সমাসযুক্ত অথবা প্রত্যয়ান্ত পদ ব্যবহার করে না, পরন্তু কেবলমাত্র স্বর ও ব্যঞ্জনমিশ্রিত কতকগুলি মৌলিক ধ্বনির ব্যবহার করিয়া থাকে এবং ঐ মৌলিক ধ্বনির সাহায্যে পরস্পরের মনোভাব বুঝিয়া লয়, তাহা তাহাদিগের শব্দ ও চালচলনের দিকে লক্ষ্য করিলে অতি সহজেই প্রতীয়মান হইতে পারে। যদি ঐ মৌলিক ধ্বনিসমূহের কোন স্বাভাবিক অর্থ বিদ্যমান না থাকিত, তাহা হইলে পশু ও পক্ষীদিগের পক্ষে উহার সহায়তায় পরস্পরের মনোভাব বুঝিয়া লওয়া সম্ভব হইত কি ?

ঋক্, সাম এবং যজুঃ, এই তিনটী বেদে যথাযথভাবে প্রবেশ করিতে পারিলে প্রত্যেক মৌলিক ধ্বনিটীর যে বিশেষ বিশেষ অর্থ আছে, তাহা যেরূপ সহজেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়, সেইরূপ আবার কোন্ ধ্বনিটীর স্বাভাবিক অর্থ যে কি, তাহাও প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়।

সংস্কৃত ভাষায় ঋষিগণ (তথাকথিত আচার্য্য অথবা পণ্ডিতগণ নহেন) ভাষা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে সমস্ত গ্রন্থ লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের একাধিক গ্রন্থে উপরোক্ত সত্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাঁহাদের মতে ১২৩ যে একশত তেইশ, তৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে যেরূপ ঐ পূর্ণসংখ্যাটি সর্ব্বসমেত কয়টি সংখ্যার দ্বারা গঠিত এবং উহার অন্তর্নিহিত এক, দুই, তিন সংখ্যার প্রত্যেক সংখ্যাটির দিকে লক্ষ্য করিতে হয় এবং তাহা না করিয়া আর কোন উপায়ে ঐ সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নহে, সেইরূপ মানুষ তাহার কথাবার্ত্তায় যে সমস্ত পদের ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহার স্বাভাবিক অর্থ কি, তাহা সঠিক ভাবে নির্দ্ধারিত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ঐ পদের মূলাংশ ও প্রত্যয়াংশ কতখানি, তাহা স্থির করিয়া লইয়া অন্তর্নিহিত প্রত্যেক মূলধ্বনির অর্থের সাহায্য লইতে হয় এবং তাহা না লইয়া অন্য কোন উপায়ে উহার স্বাভাবিক অর্থ সঠিক ভাবে স্থির করা সম্ভব হয় না।

> যথাদ্যসংখ্যাগ্রহণমুপায়ঃ প্রতিপত্তয়ে।
> সংখ্যান্তরাণাং ভেদেঽপি তথা শব্দান্তরশ্রুতিঃ॥
>
> বাক্যপদীয়, প্রথম কাণ্ড, ৮৮ শ্লোক।

মানুষের কথাবার্ত্তায় যে-সমস্ত পদ ব্যবহৃত হয়, তাহার প্রত্যেকটির যে এক একটি স্বাভাবিক অর্থ বিদ্যমান আছে, তাহা আধুনিক পাশ্চাত্ত্য ভাষা-বিজ্ঞানে প্রায়শঃ স্পষ্ট ভাবে স্বীকৃত হয় নাই। প্রত্যেক পদের যে স্বাভাবিক অর্থ বিদ্যমান আছে, তাহা বর্ত্তমান পাশ্চাত্ত্য ভাষা-বিজ্ঞানের লেখকগণ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই বলিয়াই প্রত্যেক ভাষায় প্রায় প্রত্যেক পদটী একাধিক অর্থে এবং এমন কি সময় সময় সম্পূর্ণ বিরুদ্ধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্বভাবতঃ প্রত্যেক পদের যে এক একটি স্বাভাবিক অর্থ বিদ্যমান আছে, তাহা আধুনিক তথাকথিত পাশ্চাত্ত্য ভাষা-বিজ্ঞানের লেখকগণ স্বীকার করেন নাই বটে, কিন্তু উহা যে আছে তাহা, জন্মাবধি কিরূপভাবে স্বভাবতঃ অন্য কাহারও বিনা সাহায্যে শিশুগণ ভাষাবোধ ও ভাষা-ব্যবহারে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য করিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে। মা ও মাদারে যে মা, বাপ ও ফাদার যে বাবা, জল ও ওয়াটার যে জল, তাহা শিশুগণকে কাহারও শিখাইয়া

দিতে হয় না। তাহারা উহা স্বভাবতঃ শিখিতে সক্ষম হয়। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে, বস্তুতঃ পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত শিশুগণ যে সমস্ত শব্দ শিক্ষা করিয়া থাকে, সেই সমস্ত শব্দ প্রায়শঃ একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয় না এবং ঐ সমস্ত শব্দ ও তাহার অর্থ শিশুগণ স্বভাব হইতে প্রায়শঃ অপরের বিনা সাহায্যে শিক্ষা করে। শিশুদিগের ভাষাবোধের তত্ত্ব সম্বন্ধে লক্ষ্য করিলে আরও দেখা যাইবে যে, পঞ্চবর্ষের মধ্যে শিশু যত-সংখ্যক শব্দ সর্ব্ববাদি-সম্মত অর্থে পরিজ্ঞাত হইতে সক্ষম হয়, পরবর্ত্তী সুদীর্ঘ জীবনে তাহার শতাংশের একাংশসংখ্যক শব্দও সর্ব্ববাদি-সম্মত অর্থে জানিয়া উঠার সৌভাগ্য তাহার হয় না।

কাযেই, মানুষের ব্যবহৃত প্রত্যেক পদের যে এক একটি স্বাভাবিক অর্থ আছে এবং ঐ স্বাভাবিক অর্থ যে প্রায়শঃ সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়া থাকে অর্থাৎ ঐ অর্থ লইয়া যে কোন মতভেদ হয় না, তৎসম্বন্ধে যুক্তিসঙ্গত ভাবে অস্বীকার করা যায় না। হাওয়া, জল, মা, বাবা, ভাত, রুটী, আগুন, ঘর, দুয়ার প্রভৃতি যে সমস্ত শব্দ শিশুগণ স্বভাববশে পঞ্চবর্ষের মধ্যেই শিক্ষা করিতে সক্ষম হয়, তাহার অর্থ অথবা সংজ্ঞা লইয়া কোন মতভেদ কোন ভাষায় বিদ্যমান আছে কি?

কোন তথাকথিত পণ্ডিত-সঙ্ঘ অথবা কোন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রদত্ত উপাধিবলে নিজেকে পণ্ডিত মনে করিয়া ভাসমান ভাবে চিন্তা না করিয়া একটু ডুবাইয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক পদের স্বাভাবিক অর্থ কি এবং তাহা কিরূপ ভাবে নির্দ্ধারিত করিতে হয়, তাহা স্থির করা ভাষাতত্ত্বের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, কারণ মানুষ তাহার কথাবার্ত্তায় সাধারণতঃ একটি মাত্র অর্থে এক একটি পদ এবং বাক্য ব্যবহার করিয়া থাকে। সেই একটি মাত্র অর্থটী যে কি, তাহা স্থির করিতে না পারিলে একদিকে যেরূপ ভাষা-তত্ত্বপরিজ্ঞান নিষ্ফল হইয়া যায়, অন্যদিকে আবার প্রত্যেক পদের স্বাভাবিক অর্থ কি, তাহা ঠিক ঠিক ভাবে জানা না থাকিলে বাক্যের অথবা পদের ঠিক ঠিক অর্থটী যে কি, তাহাও স্থির করা সম্ভব হয় না।

এই হিসাবে আধুনিক পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্বকে প্রকৃত ভাষাতত্ত্ব বলিয়া অভিহিত করা যায় না এবং যুক্তিসঙ্গত ভাবে তাহার নিষ্ফলতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হয়।

সংস্কৃত ভাষায় যে কোন্‌শ্রেণীর ভাষাতত্ত্ব আছে, তাহা আজ-কালকার তথাকথিত মহামহোপাধ্যায় (savants)-গণ প্রায়শঃ বিদিত নহেন বটে, কিন্তু বেদাঙ্গের অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠ, শিক্ষা, কল্প ও নিরুক্তে প্রবেশ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, কি করিয়া বিভিন্নভাষাভাষী মানুষের কথাবার্ত্তার প্রত্যেক পদের স্বাভাবিক অর্থ নির্দ্ধারণ করিতে হয়, তাহার চিন্তা লইয়াই সংস্কৃত-ব্যাকরণের প্রারম্ভ। "সিদ্ধে শব্দার্থ-সম্বন্ধে লোকতঃ, লোকতোঽর্থপ্রযুক্তে শব্দ-প্রয়োগে শাস্ত্রেণ ধর্ম-নিয়মঃ"—কাত্যায়নের এই বাক্যটি যথাযথ অর্থে বুঝিতে পারিলে আমাদের উপরোক্ত উক্তির সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে।

অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, পদের স্বাভাবিক অর্থ উদ্ধার করিবার পন্থা যে কেবল মাত্র সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বেদাঙ্গেই লিপিবদ্ধ আছে তাহা নহে; ঐ পন্থা প্রাচীন আরবী ভাষায় লিখিত কোরাণে ও প্রাচীন হিব্রু ভাষায় লিখিত বাইবেলেও যে লিপিবদ্ধ আছে, তাহা অনুমান করিবার কারণ আছে। প্রকৃত ভাবে ভাষার অনবগতির জন্য আধুনিক তথাকথিত মহামহোপাধ্যায় (savants) পণ্ডিতগণ যেরূপ বেদাঙ্গ হইতে উপরোক্ত বিষয়ের মর্ম্মোদ্ধার করিতে অপারগ, মৌলভী ও পাদ্রীগণও ঠিক একই কারণে কোরাণ ও বাইবেল হইতে উহা উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন।

এক্ষণে ঋষিগণ-প্রণীত ভাষাতত্ত্ব অনুসারে শিল্প বলিতে কি বুঝিতে হইবে, তাহা পাঠকবর্গকে শুনাইবার চেষ্টা করিব।

"শিল্প", এই পদটীর মুখ্যাংশ "শিল্" ও প্রত্যয়াংশ "পক্"।

ঋষিগণ-প্রণীত পদের অর্থোদ্ধার করিবার পদ্ধতি অনুসারে "শিল্প" বলিতে বুঝিতে হইবে সেই প্রকরণ (কোন গুণ অথবা দ্রব্য নহে), যে প্রকরণের সাহায্যে কি প্রকারে মৌলিক সত্তাবস্থা হইতে বিভিন্ন বিকাশ সাধিত হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় এবং ঐ বিকাশ অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হয়।

শিল্প, এই পদটার শব্দানুগ স্বাভাবিক অর্থ কি, তাহা সোজা বাংলায় বলিতে হইলে বলিতে হইবে, কি প্রকারে মৌলিক সত্ত্বাবস্থা হইতে বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন বিকাশ সাধিত হইতেছে, তাহা যে যে প্রকরণের দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারা যায় এবং যে যে প্রকরণের দ্বারা ঐ বিভিন্ন বিকাশ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারা যায়, সেই সেই প্রকরণের নাম "শিল্প"

পাশ্চাত্ত্য দেশের বিভিন্ন ভাষায় 'শিল্প' শব্দটির প্রতিশব্দ আরস্ (ars), আর্টিস্ (artis), আর্ট (art), ইণ্ড (industria), ইণ্ডাষ্ট্রী (industry) ইত্যাদি।

অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, 'শিল্প' পদটির অন্তর্নিহিত ধ্বনির অনুগ স্বাভাবিক অর্থ যাহা হয়, 'আরস্' (ars) প্রভৃতি উপরোক্ত প্রত্যেক প্রতিশব্দের অন্তর্নিহিত ধ্বনির অনুগ স্বাভাবিক অর্থও ঠিক ঠিক তাহাই।

উপরে 'শিল্প' শব্দের যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, তাহা যে সহজবোধ্য নহে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। উহা বিশদ ভাবে বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ মৌলিক সত্ত্বাবস্থা কাহাকে বলে, দ্বিতীয়তঃ সত্ত্বাবস্থা হইতে বিভিন্ন বিকাশ সাধিত হয় কি প্রকারে, তৃতীয়তঃ বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন বিকাশ ক্ষুণ্ণ হয় কেন, চতুর্থতঃ কোন্ প্রকরণের সাহায্যে বিভিন্ন বিকাশ অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হয়, পঞ্চমতঃ কোন একটা সত্ত্বাবস্থা হইতে যে মানুষের বিভিন্ন বিকাশ সাধিত হইতেছে, তাহা সাধারণতঃ মানুষ উপলব্ধি করিতে পারে না কেন এবং ষষ্ঠতঃ কোন্ প্রকরণের সাহায্যে একটা সত্ত্বাবস্থা হইতে যে মানুষের বিভিন্ন বিকাশ সাধিত হইতেছে, তাহা নিজ দেহাভ্যন্তরে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হইতে পারে, তাহার আলোচনা করিতে হইবে।

উপরোক্ত ছয়টি বিষয় অতীব বিস্তৃত। উহা অথর্ব-বেদের অন্যতম মুখ্য কথা। এই সন্দর্ভে উহা সম্যক্ ভাবে আলোচনা করা সম্ভব নহে।

যাঁহারা 'শিল্প' সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে অধ্যয়ন করিতে উৎসুক, আমরা তাঁহাদিগকে প্রথমতঃ বেদাঙ্গ (আচার্য্য শ্রেণীর পণ্ডিত-প্রণীত সিদ্ধান্ত-কৌমুদী, অথবা কলাপাদি অথবা কৌমুদী-শ্রেণীর ব্যাকরণ নহে) অধ্যয়ন করিয়া সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশ লাভ করিবার জন্য যত্নবান্ হইতে অনুরোধ করি তখন তাঁহাদিগের পক্ষে ঋষিপ্রণীত যে-কোন গ্রন্থে কোন ভাষ্য অথবা টীকার বিনা সাহায্যে অনায়াসে প্রবেশ লাভ করা সম্ভব হইবে।

অথর্ববেদ ছাড়া শিল্প সম্বন্ধে আরও চারিখানি নির্ভর-যোগ্য প্রাচীন গ্রন্থ আমাদের নজরে পড়িয়াছে। এই চারিখানি গ্রন্থের নাম—(১) কাশ্যপ-শিল্প, (২) শিল্পরত্ন, (৩) সম্-গীত-সময়-সার, এবং (৪) সম্-গীত-রত্নাকর এই চারিখানি গ্রন্থ যে কাহার প্রণীত, তাহা সঠিকভাবে বলা যায় না বটে, কিন্তু ভাষা ও লেখার ভঙ্গী দেখিলে, উহার প্রত্যেকখানি যে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থের প্রায় সম-সাময়িক এবং উহা যে কোন সত্যদ্রষ্টা ঋষির কোন না কোন সাক্ষাৎ ছাত্রের দ্বারা লিখিত, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

যাঁহারা প্রকৃত সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়া শিল্প সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে পরিজ্ঞাত হইতে উৎসুক, তাঁহাদিগকে আমরা অথর্ববেদ ছাড়া উপরোক্ত চারিখানি গ্রন্থও অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করি।

'শিল্প'-শব্দটির সংজ্ঞা বিশদভাবে বুঝিতে হইলে যে ছয়টি বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়ার প্রয়োজন হয়, আমরা সংক্ষিপ্তভাবে এক্ষণে তাহার আলোচনা করিব।

মৌলিক সত্ত্বাবস্থা কাহাকে বলে, তাহা সম্যক্ ভাবে বুঝিতে হইলে অথর্ববেদ হইতে সৃষ্টিপ্রকরণ পরিজ্ঞাত হইয়া ঋক্, সাম, যজুর সহায়তায় নিজ শরীরাভ্যন্তরে অথর্ব-বেদের কথাগুলির সত্যতা প্রত্যক্ষ করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। উহা সকলের পক্ষে সম্ভবযোগ্য নহে বলিয়া ঋষিগণ সংক্ষিপ্তভাবে ঐ বিস্তৃত সৃষ্টিপ্রকরণ মনু-সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে বিবৃত করিয়াছেন। বিশেষ ভাবে মনু-সংহিতার প্রথম অধ্যায়ের ৫ম শ্লোক হইতে ১৩শ শ্লোক পর্য্যন্ত আমরা পাঠকদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

জীব ও জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সম্বন্ধে ঋষিগণ যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা অনুধাবন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, জগতের মূল কারণ "ব্যোম" এবং এই "ব্যোম" হইতে যাহা কিছু প্রতিনিয়ত সৃষ্টি হইতেছে, তাহার প্রত্যেকটির তিনটি অবস্থা আছে। ঐ তিনটি

অবস্থার একটি বুদ্ধিগ্রাহ্য, অপরটি অতীন্দ্রিয় অথবা মনোগ্রাহ্য এবং তৃতীয়টি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। বস্তুর বুদ্ধিগ্রাহ্য অবস্থার নাম ত্ত-অবস্থা, অতীন্দ্রিয়-গ্রাহ্যাবস্থার নাম অব্যক্তাবস্থা এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থার নাম ব্যক্তাবস্থা। "ব্যোম" হইতে কি প্রকারে উপরোক্ত তিনটি অবস্থার উৎপত্তি হইয়া অবশেষে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যাবস্থায় গ্রহ, উপগ্রহ, তারা এবং বিভিন্ন জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, প্রথমতঃ "ব্যোম" হইতে বায়ু-বীজ, তাহার পর অম্বু-বীজ এবং তাহার পর বহ্নি-বীজের উৎপত্তি হয়। বুদ্ধিগ্রাহ্যাবস্থায় বহ্নির বীজ পর্য্যন্ত উৎপন্ন হইবার পর ব্রহ্মরূপের উদ্ভব হয় এবং তাহার পর ক্রমে ক্রমে ঈশ্বর-রূপের আবির্ভাব হয়।

ঈশ্বর-রূপের আবির্ভাব হইবার পর ক্রমে ক্রমে অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যাবস্থায় বহ্নি, অম্বু এবং বায়ুর উৎপত্তি হইয়া থাকে। অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যাবস্থায় বহ্নি, অম্বু এবং বায়ুর উৎপত্তি হইবার পর ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যাবস্থায় ঐ বহ্নি, অম্বু এবং বায়ুর উৎপত্তি হয় এবং তখন মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত ও চর্ম্মের উদ্ভব হইয়া থাকে। "হং যং বং লং রং", এই সূত্রটীর অর্থ বুঝিতে পারিলে আমাদের উপরোক্ত উক্তির সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে।

জগতে গ্রহ, উপগ্রহ, তারা ও বিভিন্ন জীব প্রভৃতি যাহা কিছু প্রতিনিয়ত আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তাহার কোনটী বা কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বায়ু, অম্বু ও বহ্নির সমষ্টি, কোনটী বা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বায়ু, অম্বু, বহ্নি ও মেদের সমষ্টি, কোনটী বা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বায়ু, অম্বু, বহ্নি, মেদ ও অস্থির সমষ্টি ইত্যাদি। উপরোক্ত সমন্বয়ের বিভিন্নতানুসারে জীবকে বিভিন্ন আখ্যা অথবা নাম দেওয়া হইয়া থাকে। বিভিন্ন জীবের ঐ বিভিন্ন নামগুলিও স্বভাবজ।* অর্থাৎ শব্দের স্বভাব অনুধাবন না করিয়া ইচ্ছানুরূপ যে কোন নামে যে কোন জীবকে আখ্যাত করা যায় না।

জীব ও জগতের সৃষ্টিপ্রকরণের এই অংশ বোঝা থাকিলে দেখা যাইবে যে, জীব ও জগতের মূল সত্ত্বার নাম ব্যোম এবং তাহা হইতে বায়ু-বীজ, অম্বু-বীজ, বহ্নি-বীজ, ব্রহ্ম-রূপ, ঈশ্বর-রূপ, অতীন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বহ্নি, অতীন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অম্বু এবং অতীন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বায়ু পর্য্যন্ত যাহা কিছু সৃষ্টি হইতেছে, তাহার প্রত্যেকটীকেই জীবের "সত্ত্বা" বলা যাইতে পারে। ভাষাতত্ত্বের মর্ম্মানুসারে জীবের যে অংশ সর্ব্বদা, অর্থাৎ তাহার বিনাশের পরেও বিদ্যমান থাকে, তাহার নাম জীবের "সত্ত্বা"। জীব ও জগতের "সত্ত্বা" কাহাকে বলে, তাহা যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলে, সাত্ত্বিক অবস্থা কাহাকে বলে, তাহা বুঝা কঠিন হয় না।

মূল-সত্ত্বা অর্থাৎ ব্যোম যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বহ্নির অবস্থায় উপনীত না হয়,ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি সাত্ত্বিক অবস্থায় বিদ্যমান থাকেন ; অথবা, জীব-শরীরাভ্যন্তরস্থ যাহা যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, পরন্তু অতীন্দ্রিয় ও বুদ্ধিগ্রাহ্য, তাহাই তাহার সত্ত্বাবস্থা।

মরণের পর জীবনের কি থাকে, তাহা বুঝিতে হইলে জীবের সত্ত্বাবস্থাটি বুঝিবার প্রয়োজন হয় এবং যিনি ঐ সত্ত্বাবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে অমর হওয়া সম্ভব হয়। আমাদের এই কথা হয়ত ডাঃ চাটার্জ্জীর শ্রেণীর মানুষ না বুঝিতে পারিয়া আজগুবি অথবা utopia বলিয়া মনে করিবেন, কিন্তু এই অমরত্ব যে আজগুবি নহে, পরন্তু ইহার মধ্যে যে অতীব বাস্তব সত্য আছে, তাহা অদূরভবিষ্যতে মানুষ প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে।

বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন বিকাশ ক্ষুণ্ণ হয় কেন অর্থাৎ যাহা এক সময়ে যৌবনের দীপ্তিতে উল্লসিত ছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে জরাগ্রস্ত এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয় কেন এবং উহা অক্ষুণ্ণ রাখিবার পন্থা কি, তদ্বিষয়ক অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, ঐ ক্ষুণ্ণতার কারণ মুখ্যতঃ তিনটি ; যথা, কাল, অবস্থান এবং 'কর্ম্ম'।

পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহের ঘূর্ণায়ন বশতঃ পরস্পরের মধ্যের দূরত্ব ও অবস্থানের যে প্রভেদের উদ্ভব হয়, তাহার জন্য পৃথিবী-মধ্যস্থিত বিভিন্ন ভূতের ও বিভিন্ন

---

* সর্ব্বেষাস্তু স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্,
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্-সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে।
মনু, ১ম অধ্যায়, ২১ শ্লোক।

জীবের উপাদানে বিভিন্ন তারতম্যের যে-কারণ ঘটিয়া থাকে, সেই কারণের নাম কাল (time)। কালবশতঃ যথাসময়ে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিকাশের যে-ক্ষুণ্ণতা ঘটিয়া থাকে, তাহা দুর্লঙ্ঘ্য।

অবস্থান অথবা স্থান (space) কাহাকে বলে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহের ঘূর্ণয়ন বশতঃ প্রতিক্ষণে উপরোক্ত পৃথিবী, গ্রহ ও উপগ্রহগণের পরস্পরের মধ্যের দূরত্ব ও অবস্থানের প্রভেদের জন্য গ্রহ ও উপগ্রহগণ সম্বন্ধে পৃথিবীস্থিত প্রত্যেক জীবের অবস্থানের তারতম্য প্রতি-নিয়ত ঘটিতেছে। এই অবস্থানের তারতম্যের নাম দিক্ (direction) এবং ঐ দিকের আয়তনের নাম স্থান (space)। দিক্ ও স্থানের সংজ্ঞা নিখুঁতভাবে আলোচনা করিতে হইলে আমাদিগকে অনেক কথা বলিতে হইবে। তাহা এই প্রবন্ধে করা সম্ভব নহে।

মোটের উপর জীবের জন্ম-সময়ে গ্রহ ও উপগ্রহ সম্বন্ধে পৃথিবীর যে অবস্থান বিদ্যমান থাকে, সেই অবস্থানানুসারে, কোন জীব বা উন্মুক্ত প্রকৃতিতে থাকিলে, কোন জীব বা বদ্ধ প্রকৃতিতে থাকিলে, কোন জীব বা ঠাণ্ডায় থাকিলে, কোন জীব বা গরমে থাকিলে সুস্থ ও সবল থাকে। যে জীবকে যে স্থানে যে ভাবে রাখিলে তাহার সুস্থ থাকা সম্ভব, তাহাকে সেই স্থানে, সেই ভাবে না রাখিয়া অন্য কোন বিরুদ্ধ ভাবে রাখিলে তাহার বিকাশের যে ক্ষুণ্ণতা অবশ্যম্ভাবী হয়, তাহার কারণকে জীবের অবস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। অবস্থানের জন্য জীবের বিকাশে যাহাতে কোন ক্ষুণ্ণতার উদ্ভব না হয়, তাহা করিতে হইলে যে স্থানে ও যে ভাবে থাকিলে বিভিন্ন জীবের স্বাস্থ্য অনিন্দনীয় থাকিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয়। ইহারই জন্য বিভিন্ন মানুষের উপাদানানুসারে বিভিন্ন প্রকারের আবাসস্থান, গৃহ, আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যের বস্তু মানুষের বিকাশের ক্ষুণ্ণতা প্রতিহত করিবার পক্ষে প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে।

'করম্' এই পদটির সংজ্ঞা কি, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, মানুষ তাহার স্বভাববশে তাহার ইন্দ্রিয় ও শরীরের দ্বারা অপরের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যভাবে যাহা কিছু করে, তাহার নাম মানুষের 'করম্' (প্রচলিত ভাষায় কর্ম্ম্)। মন ও বুদ্ধি দ্বারা যাহা কিছু করা হয়, তাহাকে ভাষা-বিজ্ঞানানুসারে কর্ম্ম্ বলা চলে না, পরন্তু মনের কার্য্যকে ধ্যান অথবা মনন অথবা চিন্তা এবং বুদ্ধির কার্য্যকে জ্ঞান অথবা জানিবার কার্য্য অথবা বিবেচনা বলা হইয়া থাকে।

স্বভাববশে ইন্দ্রিয় ও শরীরের দ্বারা অপরের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যভাবে মানুষ কোন্ কোন্ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন প্রভৃতি কার্য্য মানুষের কর্ম্ম্, এবং এই সমস্ত কার্য্য সতর্ক হইয়া করিতে না পারিলে উহা দ্বারা মানুষের বিকাশের ক্ষুণ্ণতা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে।

কোন্ কোন্ প্রকরণের দ্বারা কর্ম্মসম্ভূত ক্ষুণ্ণতা প্রতিহত করা সম্ভব হয়, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, মানুষের অন্তরে কোন্ কোন্ কারণে আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনের আবেশ উৎপত্তি লাভ করিয়া থাকে, তাহা যে যে প্রকরণের দ্বারা উপলব্ধি করা সম্ভব হয়, সেই সেই প্রকরণের দ্বারা ঐ ক্ষুণ্ণতার হাত হইতে আত্মরক্ষা করা সম্ভবযোগ্য হয়।

মানুষের অন্তরে যে আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনের আবেশের উদ্ভব হয়, তাহার প্রত্যেকটীর কারণ কোন্ কোন্ প্রকরণের দ্বারা শরীরাভ্যন্তরে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব-যোগ্য হইতে পারে, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উহার আনুষঙ্গিক উপায় অনেক বটে, কিন্তু মুখ্য উপায় মাত্র একটি, যথা বিশেষ বিশেষ মন্ত্রের সম্-গীত।

ভারতীয় ঋষির এই সম্-গীত আর প্রচলিত সঙ্গীতের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য বিদ্যমান আছে বটে, কিন্তু উহা সর্ব্বতোভাবে সমান নহে। যাঁহারা নিরুক্ত নামক বেদাঙ্গের "সম্-আম্-নায়, সম্-আম্-নাত", এই বাক্যটির অর্থ সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহারা সম্-গীত বলিতে কি বুঝায় তাহাও যথাযথভাবে বুঝিতে পারিবেন। যাহা হইতে সাম-গীতির উৎপত্তি হয়, সেই সম্-গীত যে কি অব্যক্ত প্রকরণ, তাহা চেষ্টা করিলে নিজে

নিজের পক্ষে বুঝা সম্ভবযোগ্য বটে, কিন্তু তাহা অপর কাহাকেও বুঝান যাইতে পারে বলিয়া মনে হয় না।

সম্‌-গীতের দ্বারা নিজেকে মুগ্ধ করিবার প্রযত্ন বিদ্যমান থাকে বটে, কিন্তু তাহাতে শ্রোতাকে মুগ্ধ করিবার কোন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় না। সম্‌গীত ও সঙ্গীত, এই উভয়ই ধ্বনিপ্রসূত বটে, কিন্তু সম্‌-গীত সম্পূর্ণভাবে অন্তরের কার্য্য আর সঙ্গীতে অন্তর এবং বাহির, এই দুইয়ের কার্য্যই বিদ্যমান থাকে। সম্‌-গীত সাত্ত্বিক বিষয় লইয়া, আর সঙ্গীত রাজসিক ভাবে প্রণোদিত।

সম্‌-গীতের প্রথম স্তরে উপনীত হইতে পারিলেই জিহ্বার মূল কোথায়, কোন্ স্থানের নাম উরঃ আর কোন্ স্থানের নাম কণ্ঠ, ইত্যাদি বিষয় একটির পর একটি করিয়া সঠিকভাবে অনুভব করিয়া অন্তরের সর্ব্বস্থল স্ফটিকের মত স্বচ্ছভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়, আর সঙ্গীতে প্রমত্ত হইলে অন্তরের যাহা কিছু তাহার প্রকৃত স্বভাব বিস্মৃত হইয়া তাহারই নৈকৃতিকভাবে বাহ্যিক ধ্বনিতে আবিষ্ট হইয়া পড়িতে হয়।

সম্‌-গীত ও সঙ্গীতের মধ্যে প্রভেদ কোথায়, তাহা সংক্ষেপে বলিতে হইলে বলিতে হয় যে, সম্‌-গীতের সাহায্যে মানুষ তাহার আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন প্রভৃতি ক্রমাবেশ সংযত করিয়া বিকাশের ক্ষুদ্রতা হ্রাস করিতে সক্ষম হয়, আর সঙ্গীতের ফলে আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনের আবেশ বৃদ্ধি পাইয়া মানুষের বিকাশের ক্ষুদ্রতা বৃদ্ধি করিয়া তুলে।

কোন একটা সত্ত্বাবস্থা হইতে যে মানুষের বিভিন্ন বিকাশ সাধিত হইতেছে, তাহা সাধারণতঃ মানুষ উপলব্ধি করিতে পারে না কেন, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রধান কারণ, মানুষের রাগ ও দ্বেষ-মূলক কার্য্য সমূহ। যখন কাহারও কোনরূপ প্রেমে মানুষ নিপতিত হইয়া থাকে, তখন তাহার রাগ উপস্থিত হইয়াছে এবং যখন কোন পাপকার্য্য অথবা পাপী মানুষের প্রতি পাপ ও পাপী বলিয়া বিরুদ্ধাচারী হয়, তখন বিদ্বেষ উপস্থিত হইয়াছে, উহা বুঝিতে হইবে। মানবাবয়ব এতাদৃশ-ভাবে গঠিত যে, মানুষের মনে কোনরূপ ভাব-প্রবণতার উদ্ভব হইলে তাহার পক্ষে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। খৃষ্টদেব ও নবী মহম্মদের দোহাই দিয়া খৃষ্টান পাদ্রীগণ ও মুসলমান মৌলবীগণের মধ্যে কেহ কেহ ভাব-প্রেম ও পাপ বিদ্বেষের উপদেশ প্রদান করেন বটে, কিন্তু বাইবেল ও কোরাণের মূলভাগে কুত্রাপি এবংবিধ প্রেমের এবং দ্বেষের উপদেশ পাওয়া যাইবে না।

নিজ দেহাভ্যন্তরে কোথায় কি ঘটিতেছে, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে তৎসম্বন্ধে সর্ব্বদা সজাগ থাকিতে হইবে এবং তজ্জন্য সর্ব্ববিধ রকমের প্রেম ও বিদ্বেষ বিসর্জ্জিত করিয়া কোনরূপ প্রেম ও বিদ্বেষের ভাব উপস্থিত হইলে কেন এতাদৃশ ভাব উপস্থিত হইতেছে, নানা রকমে তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

ঐ সন্ধানে প্রবৃত্ত না হইয়া মানুষ সর্ব্বদাই কোন না কোন রকমের রাগ ও দ্বেষে আবদ্ধ থাকে বলিয়া, মানুষের সর্ব্ববিধ বিকাশের মূলে যে একটা সত্ত্বাবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা সে উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইয়া পড়ে।

একটা সত্ত্বাবস্থা হইতে যে মানুষের বিভিন্ন বিকাশ সাধিত হইতেছে, তাহা কোন্ কোন্ প্রকরণের সাহায্যে নিজ দেহাভ্যন্তরে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হইতে পারে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, মানুষের মূল তাহার সত্ত্বা এবং তাহার বিকাশের স্তর তিনটি; যথা বুদ্ধিগ্রাহ্যাবস্থা, অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যাবস্থা এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যাবস্থা।

মূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যাবস্থা হইতে যে মানুষের বিভিন্ন রকমের অবস্থার উদ্ভব হইতেছে, তাহা ইন্দ্রিয়সমূহের সজাগতা থাকিলেই উপলব্ধি করা সম্ভব হয় বটে, কিন্তু ঐ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যাবস্থার মূলে যে একটা অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যাবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা একমাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। কি করিলে ঐ সত্তা উপলব্ধি করা সম্ভব হয়, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উহার একমাত্র উপায় সম্‌-গীত। এইরূপে সম্‌-গীতের সাহায্যে মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যাবস্থার মূলে যে অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যাবস্থা বিদ্যমান আছে, তাহা প্রত্যক্ষ করা সম্ভবযোগ্য হয় বটে, কিন্তু ঐ অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যাবস্থার মূলে যে একটা বুদ্ধি-গ্রাহ্যাবস্থা বিদ্যমান আছে, তাহা কেবলমাত্র সম্‌-গীতের সাহায্যে উপলব্ধি করা যায় না। ঐ বুদ্ধিগ্রাহ্যাবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে হইলে কোন্ কোন্ প্রকরণের প্রয়োজন

তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উহার জন্য প্রয়োজন কতকগুলি চিত্র ও নৃত্যবিশেষের।

যাহা বুদ্ধিগ্রাহ্য, তাহা যে কোন ইন্দ্রিয়ের অথবা অতীন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না, ইহা বলাই বাহুল্য। এক্ষণে প্রশ্ন হইবে, যাহা ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না, তাহা আবার প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে কিরূপে। ইহারই জন্য আত্মতত্ত্বের যতদূর পর্য্যন্ত অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার পর ঐ অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে কিরূপে, তাহা অনুমান করিয়া চিত্রিত করিবার প্রয়োজন হয় এবং উপরোক্ত চিত্রাঙ্কিত অনুমান বাস্তবতঃ সম্ভবযোগ্য কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য, যে নৃত্যের ফলে শরীরস্থ অণু ও পরমাণুর মুক্ত পরিস্ফুট হইয়া তাহা বোধগম্য হইতে পারে, এমন কতিপয় নৃত্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

সাধারণ চিত্র ও নৃত্য যেরূপ মানুষকে সৌন্দর্য্যানুভূতির নামে প্রায়শঃ মোহমুগ্ধ করিয়া আত্মবিস্মৃত করিয়া তুলে, উপরোক্ত চিত্র ও নৃত্যে তাদৃশ মোহমুগ্ধতা ঘটিবার আশঙ্কা থাকে না। পরন্তু, ঐ চিত্রে ও নৃত্যে আত্মা সম্বন্ধে জাগরণের উদ্ভব হয়। এতাদৃশ আত্মজাগরণকর চিত্র ও নৃত্যের কথা বর্ত্তমানে আজগুবি বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু এখনও বিভিন্ন তন্ত্রে উপরোক্ত চিত্র ও নৃত্যের কথা দেখা যাইবে এবং সাধনানিরত হইলে উহার প্রয়োজনীয়তা প্রত্যক্ষ করা সম্ভবযোগ্য হইবে।

সংস্কৃত ভাষায় এতাদৃশ চিত্রকে পট অথবা প্রতিমা এবং ঐ নৃত্যকে শিব-নৃত্য বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে।

এইরূপ ভাবে মৌলিক সত্ত্বাবস্থা কাহাকে বলে এবং সত্ত্বাবস্থা হইতে বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন বিকাশ সাধিত হয় কি প্রকারে ইত্যাদি ছয়টি বিষয় বুঝিয়া লইতে পারিলে, কোন্ কোন্ প্রকরণ বস্তুতঃ পক্ষে শিল্প তাহা বুঝা সহজসাধ্য হয়।

স্মরণ করিতে হইবে যে, কি প্রকারে মৌলিক সত্ত্বাবস্থা হইতে বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন বিকাশ সাধিত হইতেছে, তাহা যে যে প্রকরণের দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারা যায় এবং যে যে প্রকরণের দ্বারা ঐ বিভিন্ন বিকাশ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারা যায়, সেই সেই প্রকরণের নাম শিল্প।

এক্ষণে যদি প্রশ্ন করা যায় যে, কোন্ কোন্ প্রকরণের দ্বারা কোন একটি মৌলিক সত্ত্বাবস্থা হইতে যে বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন বিকাশ সাধিত হইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ করা এবং ঐ ঐ বিকাশ অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হয়, তাহা হইলে তদুত্তরে, উপরে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে বলিতে হইবে যে, চিত্রাঙ্কন, নৃত্য, সম্-গীত, গৃহ-নির্ম্মাণ এবং যথোপযুক্ত আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যের উৎপাদনের দ্বারা উহা সম্ভবযোগ্য হয়।

অতএব, শিল্প এই পদটীর অন্তর্নিহিত ধ্বনি অনুসারে উহার যে স্বাভাবিক অর্থ বিদ্যমান আছে, তদনুসারে শিল্প বলিতে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত প্রকরণ কয়টিকে বুঝিতে হইবে :—

(১) চিত্রাঙ্কন,
(২) নৃত্য,
(৩) সম্-গীত,
(৪) গৃহ-নির্ম্মাণ,
(৫) যথোপযুক্ত আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যের উৎপাদন।

ইহার মধ্যে প্রথম দুইটি প্রকরণ জীবের অন্তর্নিহিত বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয় লইয়া, তৃতীয়টী অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় লইয়া এবং চতুর্থ ও পঞ্চমটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় লইয়া।

এখনও প্রায় প্রত্যেক প্রচলিত ভাষায় উপরোক্ত ঐ পাঁচটী প্রকরণকেই শিল্প বলা হইয়া থাকে। এখনও ঐ পাঁচটি প্রকরণকেই শিল্প বলা হইয়া থাকে বটে, কিন্তু শিল্প-সম্বন্ধীয় মৌলিক ধারণা হইতে বর্ত্তমান ধারণা অনেক পরিমাণে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে।

শিল্পের মৌলিক অথবা স্বাভাবিক সংজ্ঞানুসারে যে, চিত্রাঙ্কনে অথবা যে-নৃত্যে অথবা যে-সম্-গীতে আত্মানুভূতির সহায়তা সম্পাদিত না হইয়া কোনরূপ মোহের উদ্ভব হইতে পারে, তাহাকে শিল্প বলা চলে না, আর আধুনিক প্রচলিত ভাষায় যে চিত্রাঙ্কন, অথবা নৃত্য, অথবা সঙ্গীতকে শিল্প বলা হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা আত্মানুভূতির সহায়তা হওয়া তো দূরের কথা, তদ্দ্বারা সম্পূর্ণভাবে

আত্মবিস্মৃতি, মোহমুগ্ধতা এবং রাগ-দ্বেষের আবিষ্টতা ঘটিয়া থাকে।

সেইরূপ আবার যে গৃহ-নির্ম্মাণ অথবা আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য উৎপাদনের প্রণালীকে মৌলিক অর্থানুসারে "শিল্প" বলিয়া আখ্যাত করা চলিতে পারে, সেই প্রণালী অনুসারে নির্ম্মিত গৃহে বসবাস করিলে অথবা আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য ব্যবহার করিলে রোগ-যন্ত্রণা, অথবা অকালবার্দ্ধক্য, অথবা অকালমৃত্যুর জন্য বিব্রত হইতে হয় না—আর আধুনিক প্রণালীতে নির্ম্মিত গৃহ, আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যই যে মানুষের অধিকাংশ রোগ-যন্ত্রণা, অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যুর কারণ, তাহা একটু তলাইয়া চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা সম্ভব হইবে।

অতীত ও বর্ত্তমান শিল্পের মধ্যে পার্থক্য কোথায়, তাহা সংক্ষিপ্ত ভাবে বলিতে হইলে বলিতে হইবে যে, মৌলিক অর্থানুসারে শিল্প বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাতে উহা মানুষের আরাধ্য, আর বর্ত্তমান কালে যে সমস্ত প্রকরণকে মানুষ শিল্প বলিয়া আখ্যাত করিয়া থাকে তাহাতে উহা বর্জ্জনের যোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। একদিন ছিল, যখন প্রকৃত শিল্পের জন্য প্রত্যেক দেশের মানবসমাজকে যথেষ্ট প্রয়াস-সাধ্য সাধনায় নিরত হইতে হইত এবং তাহার ফলে মানুষ নিজেকে অক্ষয় ও অমর করিয়া তুলিতে পারিত, আর অধুনা তথাকথিত শিল্পের ফলে মোহ-মুগ্ধ হইয়া মানুষ মানুষকে নানারূপে প্রতারিত করে এবং নানারকমের দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে বাধ্য হয়। প্রকৃত শিল্প, যাঁহারা প্রকৃত পক্ষে মনুষ্যনামের যোগ্য, তাঁহাদিগের পক্ষে, দেবগৃহে আরাধ্য, আর আধুনিক তথাকথিত শিল্প প্রায়শঃ চরিত্রহীন নরনারীর পক্ষে কুলটা-গৃহে অথবা নিন্দনীয় আসরে উপভোগ্য। প্রকৃত শিল্প আত্মোদ্বোধক ও আত্মরক্ষক। আর, এক্ষণে শিল্প বলিয়া যাহা চলিতেছে, তাহার বৈপরীত্যের জন্য, উহাকে 'অশিল্প' বলিয়া আখ্যাত করিতে হয়।

যাঁহারা ভাষাতত্ত্বের 'প্রত্যক্ষবৃত্তি', 'পরোক্ষবৃত্তি' এবং 'অতিপরোক্ষবৃত্তি', অথবা 'উক্ত ক্রিয়া', 'অন্তর্লীন ক্রিয়া' এবং 'অবিজ্ঞাত ক্রিয়া', অথবা 'নিগমনিত্যর', 'নিগন্তব' এবং 'নিঘণ্টব, এই নয়টি পদের সহিত পরিচিত হইতে পারিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়ভেদে শিল্পকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

যে সমস্ত শিল্প ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়-সম্বন্ধীয়, অর্থাৎ গৃহ-নির্ম্মাণ, আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য উৎপাদন-সম্বন্ধীয় শিল্পকে সংস্কৃত ভাষায় 'নৈগম' শিল্প বলা হইয়া থাকে।

যে সমস্ত শিল্প অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়-সম্বন্ধীয়, অর্থাৎ সম্‌গীতকে 'নৈগন্তব' শিল্প বলা হইয়া থাকে।

যাহা বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়-সম্বন্ধীয়, অর্থাৎ চিত্রাঙ্কন ও নৃত্যকে 'নৈঘণ্টব' শিল্প বলা হইয়া থাকে।

সংস্কৃত ভাষায় ঋষি-প্রণীত গ্রন্থে শিল্প-সম্বন্ধীয় বহু প্রয়োজনীয় কথা পাওয়া যায়। তাহা সমস্ত লিপিবদ্ধ করা এ স্থানে সম্ভবযোগ্য নহে।

শিল্প সম্বন্ধে আমরা এখানে যাহা যাহা বলিলাম, তাহা হইতে কোন্ কোন্ প্রকরণকে কেন শিল্প বলিতে হইবে, তাহা বুঝা যাইবে।

এক্ষণে দেখা যাউক, ডাঃ চ্যাটার্জ্জী মহাশয় ঐ সম্বন্ধে কি কি বলিয়াছেন—

ডাঃ চ্যাটার্জ্জী মহাশয় ঐ সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কথাগুলি উল্লেখযোগ্য :—

(১) ভাষাতত্ত্ব এই বিদ্যা বা বিজ্ঞানের সহিত সুকুমার শিল্প বা কলার কোন সংযোগ বাহ্যতঃ দৃষ্ট হয় না; ভাষা বিজ্ঞান ও শিল্পকলা, আপাতদৃষ্টিতে ইহাদের পরস্পর-বিরোধী বলিয়া মনে হয়।

(২) বাহিরের পরিদৃশ্যমান বস্তুজগৎ এবং ভিতরের অদৃশ্য মনোজগৎ ও আধ্যাত্মিক জগৎ, এই দুয়ে মিলিয়া মানুষকে যখন একাধারে রূপের অনুকৃতি এবং রূপের মাধ্যমে অরূপের অভিব্যক্তির জন্য উদ্বুদ্ধ করে, তখন হয় শিল্পসৃষ্টি। পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং আধ্যাত্মিক বা আধিমানসিক জগৎ ইহাদের বিরোধ কল্পনা করিলে, রূপ-শিল্পের সৃষ্টি সম্ভবপর হয় না।

(৩) কেবল অনুকৃতিতে শিল্প হইতে পারে না এবং ভৌতিক জগতের আধারে বিদ্যমান চক্ষুরিন্দ্রিয়-

গ্রাহ্য প্রতীককে আশ্রয় না করিলে আধ্যাত্মিক বস্তুর শিল্পময় প্রকাশও অসম্ভব।

(৪) অনুকৃতি এবং অভিব্যক্তি, এই দুইটি শিল্পের মৌলিক বা মুখ্য প্রেরণা।

(৫) শিল্পের প্রকাশভঙ্গী নানা রকমের; কিন্তু ইহার মূল প্রাণবস্তু এক এবং দেশকালাতীত।

(৬) সৌন্দর্য্যবোধ দ্বারা উদ্বোধিত অপার্থিব সত্তার অনুভূতি, অথবা অনুভূতির আভাস—সুসভ্য জনসমাজে এখন ইহাই হইতেছে শিল্পের চরম উদ্দেশ্য।

আনন্দবাজার পত্রিকার চতুর্দ্দশ কালাম-ব্যাপী ডাঃ চ্যাটার্জ্জীর সমগ্র বক্তৃতায় শিল্পের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে যে যে কথা প্রকাশ পাইয়াছে, তন্মধ্যে উপরোক্ত ছয়টি কথা আমাদের মতে সর্ব্বপ্রথম মনোযোগের যোগ্য। উহা মনোযোগের যোগ্য বটে, কিন্তু উহা বোঝা অথবা উপলব্ধির যোগ্য কি না, তাহা আমরা পাঠকদিগকে বিচার করিতে অনুরোধ করি। আমরা এতদিন জানিতাম যে, প্রত্যক্ষ-যোগ্য মনের ভাব ব্যক্ত করিবার জন্ম ভাষা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু, ডাঃ চ্যাটার্জ্জীর বক্তৃতা পড়িয়া আমাদের মনে হইতেছে যে, যাহা প্রত্যক্ষের যোগ্য নহে, পরন্তু যাহা আলেয়ার আলো ও অব্যক্ত, তাহারও রূপ কল্পনা করা সম্ভব হইতে পারে এবং ডাঃ চ্যাটার্জ্জীর মত পণ্ডিতের হাতে পড়িলে তাহারও ব্যক্তিত্ব লাভ করিবার সৌভাগ্য উপস্থিত হয়।

উপরোক্ত ছয়টি উক্তির দ্বিতীয় উক্তিতে ডাঃ চ্যাটার্জ্জী যাহা বলিতেছেন, তাহা হইতে বুঝিতে হয়, বাহিরের পরিদৃশ্যমান বস্তুজগৎ এবং ভিতরের অদৃশ্য মনোজগৎ ও আধ্যাত্মিক জগৎ, এই দুয়ের মিলন সম্ভবযোগ্য।

অব্যক্ত আত্মা এবং ব্যক্ত জগৎ, এই দুইটি বিষয় সম্বন্ধে ভারতীয় ঋষিগণ যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝিতে হয় যে, অব্যক্ত আত্মা হইতে ব্যক্ত জগতের সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু যখনই ব্যক্ত জগৎ প্রকট হয়, তখনই অব্যক্ত জগৎ অপ্রকট হইয়া পড়ে। এতৎসম্বন্ধে কোনও রূপ প্রত্যক্ষানুভূতির জন্ম প্রযত্নশীল হইলেও সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের কথার সত্যতাই সর্ব্বপ্রথমে নজরে পড়িবে। আত্মা অথবা আধ্যাত্মিকতার সন্ধানে যাঁহারা ব্রতী হন, তাঁহাদিগকে যে পরিদৃশ্যমান বস্তুজগৎ হইতে অনেকাংশেই দূরে থাকিতে হয়, ইহাও সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য। এতদনুসারে বাহিরের পরিদৃশ্যমান বস্তুজগৎ ও আধ্যাত্মিক জগতের কোন বাস্তব মিলন যেরূপ সম্ভবযোগ্য নয়, সেইরূপ উহাদের কাল্পনিক মিলনও যে সোনার পাথরের বাটীর মত, তাহা অস্বীকার করা যায় না। অথচ, ডাঃ চ্যাটার্জ্জী যে শিল্পসৃষ্টির কথা তাঁহার বক্তৃতায় বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার মূল হইতেছে ঐ দুয়ের মিলন। কাযেই, ডাঃ চ্যাটার্জ্জীর তথাকথিত শিল্প যে সম্পূর্ণভাবে রূপশূন্য আলেয়ার আলো, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

উপরোক্ত দ্বিতীয় উক্তির শেষ ভাগে তিনি বলিতে-ছেন যে, পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং আধ্যাত্মিক বা আধি মানসিক জগৎ, ইহাদের বিরোধ কল্পনা করিলে রূপশিল্পের সৃষ্টি হওয়া সম্ভবপর হয় না। অর্থাৎ, যাহা বাস্তবতঃ পরস্পর-বিরোধী, তাহার বিরোধিতা বিস্মৃত না হইলে ডাঃ চ্যাটার্জ্জীর রূপশিল্প মানুষের পক্ষে বুঝিয়া উঠা সম্ভব-পর হইবে না। সোজা কথায় বলিলে বলিতে হইবে যে, যদিও বাস্তব জগতে মনুষ্য ও গোজাতির মস্তিষ্কের মধ্যে অনেকগুলি পার্থক্য দেখা যায়, তথাপি ডাঃ চ্যাটার্জ্জীর রূপশিল্প বুঝিতে হইলে মানুষের মস্তিষ্ক যে গরুর মস্তিষ্কের অসমতুল্য তাহা বিস্মৃত হইয়া উহার সমতুল্যতা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

ডাঃ চ্যাটার্জ্জী তাঁহার তৃতীয় উক্তিতে যাহা বলিয়া-ছেন, তাহা হইতে বুঝিতে হয়, কেবল অনুকৃতিতে শিল্প হইতে পারে না বটে, কিন্তু প্রতীকবিশেষকে আশ্রয় করিলে শিল্পময় প্রকাশ সম্ভব হয়। আমরা তাঁহার অনুকৃতি ও প্রতীক, এই দুইটি শব্দের মধ্যে যে কি পার্থক্য, তাহা বিদিত নহি। ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিত মহাশয় ভাষা-তত্ত্বের সাহায্যে আমাদিগকে ঐ পার্থক্য বুঝাইয়া দিতে পারিবেন কি?

আমাদের মতে ডাঃ চ্যাটার্জ্জী মহাশয় শিল্পের বাস্তব রূপ কি, তাহা অঙ্কিত না করিয়া, শিল্পের সংজ্ঞা কি, তাহা তাঁহার শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইতে চেষ্টা না করিয়া, যাহা কিছু

মনে আসিয়াছে, তাহাই শিল্পের উপর আরোপ করিয়াছেন। বস্তুতপক্ষে প্রকৃত শিল্প সম্বন্ধে তাঁহার কোন ধারণা নাই, অথচ তিনি তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞ বলিয়া নিজেকে জাহির করিবার প্রয়াসী, ইহার জন্ত তাঁহার এইরূপ ভিত্তিহীন কথা বলা সম্ভবযোগ্য হইয়াছে। আমাদের অভিমত যে অসত্য অথবা অযৌক্তিক, তাহা ডাঃ চ্যাটার্জ্জী প্রমাণ করিতে পারিবেন কি?

ষষ্ঠ উক্তিতে ডাঃ চ্যাটার্জ্জী যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝিতে হয়, সৌন্দর্য্যবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইলে অপার্থিব সত্তার অনুভূতি অথবা অনুভূতির অভাবের উদ্ভব হইয়া থাকে।

বাস্তব জগৎ লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, ডাঃ চ্যাটার্জ্জীর উপরোক্ত কথাটিও অবাস্তব। কোনও একটি জিনিষ যখন সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তখন উহার সৌন্দর্য্যের দ্বারা কোনও রূপে উদ্বুদ্ধ না হইয়া ঐ সৌন্দর্য্যের কারণ কি, অর্থাৎ সৌন্দর্য্যের কারণের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইলে ঐ সৌন্দর্য্যের মূল কোথায়, তৎসম্বন্ধে পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভবযোগ্য বটে, কিন্তু সৌন্দর্য্যবোধের দ্বারা উদ্বোধিত হইলে কোনও জ্ঞান অথবা অনুভূতি লাভ করা ত' দূরের কথা—ঐ সৌন্দর্য্য লাভ করা অথবা ঐ বস্তু লাভ করার জন্তই মানুষ মোহমুগ্ধ হইয়া পড়ে।

ডাঃ চ্যাটার্জ্জী, তাঁহার বক্তৃতার সর্ব্বপ্রথমে যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝিতে হয় যে, ভাষাতত্ত্ব ও শিল্পতত্ত্বের মধ্যে কোনও সংযোগ বাস্তবতঃ দৃষ্ট হয় না। পরন্তু, উহারা পরস্পর-বিরোধী।

ডাঃ চ্যাটার্জ্জীর উপরোক্ত কথাটি লক্ষ্য করিলে বলিতে হইবে যে, কি ভাষাতত্ত্ব, কি শিল্পতত্ত্ব, এই দুইটির কোনটির "ক-খ"তেই তিনি প্রবেশ করিতে পারেন নাই। পার্শ্বদেব-বিরচিত সঙ্গীত-সময়সার অধ্যয়ন করিলে তিনি দেখিতে পাইবেন যে,সঙ্গীতের মূল যে নাদ, ভাষার মূলও সেই নাদ। অর্থাৎ নাদ হইতে যেরূপ সঙ্গীতের উদ্ভব হইয়া থাকে, সেইরূপ উহা হইতেই শব্দশক্তিরও উৎপত্তি হয়। অতিসূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম, পুষ্ট, অপুষ্ট, ও কৃত্রিম, এই পঞ্চবিধ নাদ এবং কাবুল, বম্বল, নারাট ও মিশ্র, এই চতুর্ব্বিধ ধ্বনি এবং অনিবদ্ধ, ও নিবদ্ধ, এই দ্বিবিধ গীত কি বস্তু, তাহা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিলেও এক নাদ হইতেই যে ধ্বনি ও গীতের উদ্ভব হইয়া থাকে, তাহা উপলব্ধি করা যায়। সঙ্গীত যে অন্যতম সুকুমার শিল্প এবং সঙ্গীত-বিদ্যা যে অন্যতম কলা, তাহা প্রচলিত ভাষা অনুসারে অস্বীকার করা যায় না। কাযেই, ভাষাতত্ত্ব ও সুকুমার শিল্প যে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, তাহা কর্ণযুক্ত হইলে স্বীকার করিতেই হইবে। আমাদের কি বুঝিতে হইবে যে, ডাঃ চ্যাটার্জ্জী তাঁহার কলা-জ্ঞানের অত্যাচারে দ্বি-কর্ণহীন হইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছেন?

ডাঃ চ্যাটার্জ্জীর ভাষাতত্ত্বের জ্ঞান যে অগাধ, তাহা তাঁহার বক্তৃতায় তিনি যে কয়টি ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেই কয়টি ব্যুৎপত্তিগত অর্থের দিকে নজর করিলেও পরিস্ফুট হইবে। তাঁহার বক্তৃতা অনুসারে "সাহিত্য" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—সংযোগ, সত্তা বা সংসর্গ; "শ্রী" শব্দের প্রধান ও প্রাচীনতম অর্থ—নেত্রের সাহায্যে দর্শনীয় দ্যুতিমান্ সৌন্দর্য্য; "কল্যাণ" শব্দের প্রাথমিক অর্থ সুন্দর; চিৎশক্তির দ্বারা যাহা গ্রহণ করা যায় তাহাই চিত্র। আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি—সাহিত্য, শ্রী, কল্যাণ ও চিত্র, এই চারিটি পদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বলিয়া যাহা তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা যে ঐ ঐ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, ইহা কি তিনি ঐ ঐ শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয়ভাগ বিশ্লেষণ করিয়া প্রমাণিত করিতে সক্ষম হইবেন? আমাদের কি বুঝিতে হইবে যে, শব্দের ব্যুৎপত্তি বলিতে কি বুঝায়, তাহা পর্য্যন্ত তিনি বুঝিতে অক্ষম?

ডাঃ চ্যাটার্জ্জী তাঁহার বক্তৃতায় যে সমস্ত মন্ত্র ও শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই সমস্ত মন্ত্র ও শ্লোকের যে ব্যাখ্যা তিনি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে বিদ্যা-বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতারণার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হইবে।

ঐ সমস্ত মন্ত্র ও শ্লোক যেরূপ ভাবে তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে আপাতদৃষ্টিতে তিনি একজন সংস্কৃত পণ্ডিত বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু তিনি যে প্রচলিত সংস্কৃত ভাষায় পর্য্যন্ত সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ, তাহা ঐ সমস্ত শ্লোকের অনুবাদে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশ্লেষণ করিলেই প্রতিভাত হইবে।

আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি যে সংস্কৃত জানেন না, তাহা কি তিনি অস্বীকার করিতে পারেন? তাহা যদি তিনি অস্বীকার করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি সংস্কৃত না জানিয়াও বক্তৃতায় সঙ্গত ও অসঙ্গতভাবে সংস্কৃত শ্লোক ও মন্ত্রের উচ্চারণ করেন কেন? ইহা কি সংস্কৃত না জানিয়া সংস্কৃত জানিবার ভাণ করার সমতুল্য নহে? ইহাকে কি বিদ্যা-বিষয়ে প্রতারণার নিদর্শন বলিয়া মনে করা কোনরূপ অসঙ্গত হইবে?

ডাঃ চ্যাটার্জ্জী যে সংস্কৃত জানেন না, তাহা যদি তিনি অস্বীকার করেন, তাহা হইলে প্রয়োজন হইলে তাঁহার অনুবাদ হইতে আমরা তাঁহার অজ্ঞানতা প্রতিপন্ন করিতে পারিব।

আমরা এখনও ডাঃ চ্যাটার্জ্জীকে তাঁহার বিভিন্ন ভাণ ও অভিনয় পরিত্যাগ করিয়া কোন উপযুক্ত অধ্যাপকের নিকট প্রকৃত ছাত্রের মত পাঠ লইতে অনুরোধ করিতেছি।

উপসংহারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে তাঁহাদের ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপকের জ্ঞান সম্বন্ধে পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি।

এবংবিধ ব্যক্তিকে ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপকের পদে অথবা কলা-শাখার সভাপতি-পদে বরণ করায় একদিকে যেরূপ ভাষাতত্ত্বের ও কলাবিদ্যার অপমান করা হইয়াছে, অন্য দিকে আবার সমগ্র বাঙ্গালী জাতির মধ্যে যে বিভিন্ন বিদ্যার আলোচনা নিতান্ত হীন দশায় উপনীত হইয়াছে, তাহার সাক্ষ্য প্রদান করা হইয়াছে—ইহা আমাদের অভিমত। বাঙ্গালী যতদিন পর্য্যন্ত উপরোক্ত কঠোর ও অপ্রিয় সত্যটুকু না বুঝিতে পারিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার দুর্দ্দশা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। ভবিষ্যৎ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

ইণ্ডিয়ান কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বোম্বাই অধিবেশন ও হিন্দু-মুসলমানের একতা

বোম্বাই সহরে সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির একটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহা পাঠকগণ বিদিত আছেন। হিন্দু-মুসলমানগণের কলহ তিরোহিত হইয়া যাহাতে তাহাদের মধ্যে একতা স্থাপিত হয়, তাহাই ছিল ঐ অধিবেশনের অন্যতম প্রধান আলোচ্য।

কংগ্রেস-কর্ত্তৃপক্ষগণের এই ঐক্যবন্ধনের প্রযত্ন সাফল্য লাভ করিবে অথবা বিফল হইবে, তৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে কোন্ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া এবং কি উপায়ে কংগ্রেস-কর্ত্তৃপক্ষগণ ঐ একতা-স্থাপনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহার সন্ধান করিতে হইবে।

কোন্ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া কংগ্রেস-কর্ত্তৃপক্ষগণ হিন্দু-মুসলমানগণের এই একতা-স্থাপনে ব্রতী হইয়াছেন, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, ভারতীয় কংগ্রেসের এই ঐক্যবন্ধনের প্রধান উদ্দেশ্য ব্রিটিশার-গণের ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ক্ষমতার খর্ব্বতা সাধন করিয়া ভারতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা। কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষগণের ভাষানুসারে ভারত-বর্ষের স্বাধীনতা লাভ করাই তাঁহাদের সমগ্র রাজনৈতিক সাধনার প্রধান উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, কংগ্রেস-মনোবৃত্তি অনুসারে, কংগ্রেস-কর্ত্তৃপক্ষগণের রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভ করাকেই পরোক্ষ-ভাবে ভারতীয় স্বাধীনতা লাভ করা বলা হইয়া থাকে।

কংগ্রেস যদি আধা-দেশী ও আধা-বিদেশী মানুষের দ্বারা পরিচালিত না হইয়া সর্ব্বতোভাবে খাটী ভারতীয় ভাবাপন্ন সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ-সাধনা-তৎপর মানু-ষের দ্বারা পরিচালিত হইত, তাহা হইলে ভারতীয় কংগ্রে-সের রাজনৈতিক প্রাধান্যকেই ভারতীয় স্বাধীনতা বলিয়া আখ্যাত করা যুক্তিযুক্ত হইত বটে, কিন্তু বর্ত্তমানের ভার-তীয় কংগ্রেস যে-শ্রেণীর ভাবসঙ্কর মানুষের দ্বারা পরি-চালিত হইতেছে, তাহাতে ভারতীয় কংগ্রেসের প্রাধান্যকে ভারতীয় স্বাধীনতা বলা যাইতে পারে না এবং দেশের মধ্যে বর্ত্তমানে ভারতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রাধান্য ঘটিলে ভারতীয় জনসাধারণের কোন উপকার সাধিত

হওয়া তো দূরের কথা, পূর্ব্ব-গবর্ণমেণ্টের তুলনায় জন-সাধারণের অধিকতর অপকার সাধিত হইবে এবং জন-সাধারণের অর্থাভাব, পরমুখাপেক্ষিতা, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, ইহা আমাদের অভিমত। আমাদের এই উক্তিতে হয়ত কেহ কেহ আমাদিগকে কংগ্রেস-বিদ্বেষী মনে করিয়া উপহাস করিবেন, কিন্তু আমাদের উক্তি যে বর্ণে বর্ণে সত্য, অদূরভবিষ্যৎ তাহার সমুজ্জ্বল সাক্ষ্য প্রদান করিবে। ভারতবর্ষ যে অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, তাহাতে প্রকৃত কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা সম্ভবযোগ্য করিতে না পারিলে ভারতীয় জনসাধারণকে তাহাদের আর্থিক দুর্দ্দৈব হইতে রক্ষা করা কোন ক্রমেই সম্ভবযোগ্য নহে, ইহা যেরূপ আমাদের অভিমত, সেইরূপ আবার বর্ত্তমান কংগ্রেসের দ্বারা জনসাধারণের অপকার ছাড়া কোনরূপ উপকার হওয়া সম্ভব নহে, ইহাও আমাদের অভিমত। বর্ত্তমান কংগ্রেসকে যে প্রকৃত কংগ্রেস বলা যায় না, তাহা আমরা একাধিকবার দেখাইয়াছি এবং কি করিলে ভারতে প্রকৃত কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা সাধিত হইতে পারে, তাহার আলোচনা আমরা "ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমস্তা ও তাহা পূরণের উপায়"*-শীর্ষক প্রবন্ধে করিয়াছি। বর্ত্তমান কংগ্রেসের দ্বারা ভারতীয় জনসাধারণের উপকার অপেক্ষা অপকারের আশঙ্কা অধিক বলিয়া আমরা কেন মনে করি, তাহার উত্তরে আমরা বলিব যে, যে-শ্রেণীর অর্থ-নৈতিক জ্ঞানে ও চরিত্রবলে জন-সাধারণের প্রকৃত আর্থিক উন্নতি গঠিত হইতে পারে, সেই অর্থ-নৈতিক জ্ঞান ও চরিত্রবল মিঃ গান্ধী প্রভৃতি কংগ্রেসের বর্ত্তমান নেতাগণের ও বিশেষজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিক-নামধারী তাঁহাদের তোষমোদকারী মো-সাহেব-গণের নাই এবং অদূরভবিষ্যতে তাঁহারা যাহাতে সতর্ক হন, তাহার ব্যবস্থা সাধিত না হইলে আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে এই কংগ্রেসের জন্যই ভারতবর্ষে অভূতপূর্ব্ব রকমের রক্তারক্তি দেখা দিবার আশঙ্কা আছে। ভবিষ্যৎ দেখিবার মত কর্ণ ও নয়ন থাকিলে বিভিন্ন প্রদেশের কিষাণগণের চালচলনে উপরোক্ত অসন্তোষ-বহ্নির বীজ এখনই দেখা সম্ভবযোগ্য হইবে।

উপরোক্ত ভাবে দেখিলে, যে উদ্দেশ্য লইয়া কংগ্রেস-কর্ত্তৃপক্ষগণ হিন্দু-মুসলমানের একতা-স্থাপনের চেষ্টায় ব্রতী হইয়াছেন, তাহা যেরূপ একদেশদর্শী, সেইরূপ তাঁহারা যে পন্থায় ঐ ঐক্যস্থাপনের উদ্যোগী হইয়াছেন, তাহাও অসমীচীন।

কোন্ উপায়ে কীদৃশ ঐক্যস্থাপনের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে, তাহার বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, কংগ্রেসের পণ্ডিতগণ যে ঐক্যস্থাপনের চেষ্টায় প্রযত্নশীল হইয়াছেন, তাহা মৌখিক ঐক্য এবং তাঁহারা যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার নাম চুক্তি। এই পণ্ডিতগণকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রকৃত একতা মন ও প্রাণের জিনিষ এবং তাহা প্রকৃত ভাবে কোন চুক্তির দ্বারা সাধিত হইতে পারে না। তাঁহাদিগকে আরও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্যে মনের প্রকৃত একতা স্থাপন করিয়া প্রকৃত ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা সাধিত করিতে হইলে, হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্যে বিরোধের প্রকৃত কারণ কি, সর্ব্বাগ্রে তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

আমাদের মতে যতদিন পর্য্যন্ত, বৃটিশারগণের রাজনৈতিক ক্ষমতার খর্ব্বতা সাধন করিয়া অথবা তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষ হইতে দূরীভূত করিয়া, ভারতীয় স্বাধীনতার নামে বর্ত্তমান কংগ্রেস-কর্ত্তৃপক্ষগণের রাজনৈতিক আধিপত্য লাভের চেষ্টা চলিতে থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত দেশের জন-সাধারণের মধ্যে প্রকৃত একতা স্থাপিত হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভবযোগ্য হইবে না।

ভারতীয় স্বাধীনতার নামে বর্ত্তমান কংগ্রেস-কর্ত্তৃপক্ষগণের রাজনৈতিক আধিপত্য লাভ করিবার চেষ্টা চলিতে থাকিলে তথাকথিত শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্যে একটা মৌখিক একতা স্থাপিত হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে তথাকথিত ঐ শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমান মানুষগুলিকে প্রকৃত হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণের

* বঙ্গশ্রীর ১৩৪১ সনের অগ্রহায়ণ মাস হইতে ১৩৪৩ সনের মাঘ সংখ্যা পর্য্যন্ত কয়েক সংখ্যায় প্রকাশিত।

অধিকতর বিদ্বেষের পাত্র হইতে হইবে এবং তখনই আমাদের পূর্ব্বাশঙ্কিত অগ্নি প্রজ্বলিত হইবার অধিকতর সম্ভাবনা ঘটিবে। এই অগ্নিতে ঐ জনসাধারণ কথঞ্চিৎ পরিমাণে বিনষ্ট হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহারা তাহাদিগের সংখ্যাধিক্যবশে প্রায়শঃ নিজদিগকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে। সর্ব্বাপেক্ষা বিনাশপ্রাপ্ত হইবে আমাদের ঐ তথাকথিত শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমান যুবকগণ, চাকুরীজীবী হিন্দু ও মুসলমান মধ্যবিত্ত মানুষগুলি এবং জোতদার ও জমিদার শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানগণ। আমরা আমাদিগের যুবকবন্ধুগণকে এখনও সতর্ক হইতে অনুরোধ করি, কারণ যাহাতে ঐ রাষ্ট্রনৈতিক তথাকথিত savant-গণ তাঁহাদিগের তাণ্ডব-নৃত্য হইতে বিরত হন, তাহার প্রধান পন্থা যুবকগণের হস্তেই ন্যস্ত রহিয়াছে।

যাহাতে উপরোক্ত অগ্নি প্রজ্বলিত না হয়, তাহা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তথাকথিত রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার আন্দোলন পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং তাহার পর জনসাধারণের প্রত্যেকে যাহাতে পরমুখাপেক্ষী না হইয়া স্বাবলম্বনে, স্বাচ্ছন্দ্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থায় অর্থাৎ আর্থিক স্বাধীনতার আন্দোলনে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত দেশবাসীর পক্ষে কায়মনোবাক্যে তথাকথিত রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার আন্দোলন পরিত্যাগ করা সম্ভবযোগ্য না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত মৌখিকভাবে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথা হাওয়ায় উড়িতে পারে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত অর্থনৈতিক স্বাধীনতার আন্দোলন দেখা দিবে না।

প্রকৃত অর্থনৈতিক স্বাধীনতার আন্দোলন দেশের মধ্যে যাহাতে আরম্ভ হয়, তাহা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ইংরাজ, ফরাসী, হিন্দু, খৃষ্টান ও মুসলমান-নির্ব্বিশেষে মানব-প্রেমিক হইতে হইবে এবং তাহার পর ডক্টর মেঘনাদ সাহা শ্রেণীর বই-পড়া নফরতা-উপজীবী তথাকথিত বৈজ্ঞানিকগণের তথাকথিত বৈজ্ঞানিক মতবাদ পদদলিত করিতে হইবে।

মনে রাখিতে হইবে, এই বই-পড়া বৈজ্ঞানিকগণ মানুষের জীবিকানির্ব্বাহের জন্য যে সমস্ত তথাকথিত বৈজ্ঞানিক উপায়ের কথা আওড়াইয়া থাকেন, তাহাতে তথাকথিত বিশেষজ্ঞগণের মুখাপেক্ষী হওয়া অবশ্যম্ভাবী এবং তদ্দ্বারা জনসাধারণের পক্ষে প্রকৃত আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করা কদাচ সম্ভবযোগ্য নহে। ইঁহারা রাশিয়া প্রভৃতি কতকগুলি দেশের অর্থ-নৈতিক উন্নতির কথা কপ্‌চাইয়া থাকেন বটে, কিন্তু রাশিয়া প্রভৃতি যে কোন পাশ্চাত্য দেশে জনসাধারণের অর্থ-নৈতিক স্বাধীনতা ও আর্থিক প্রাচুর্য্য যে ক্রমশঃ শিথিল হইয়া যাইতেছে, তাহা বুঝিতে হইলে যে কাণ্ডজ্ঞানের প্রয়োজন, তাহা পর্য্যন্ত উহাঁদের নাই। পরের মাথায় কাঁঠাল না ভাঙ্গিয়া, মাসিক ফি অথবা বেতনে পরের নফরগিরী না করিয়া যাঁহারা কদাচিৎ জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম, সেই তথাকথিত বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিকগণই যে আমাদের জনসাধারণের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন, তাহা কায়মনোবাক্যে বুঝিয়া লইবার পর তথাকথিত বই-পড়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকের কোন সহায়তা না লইয়া যাহাতে নদীগুলি তাহাদের বালুকাস্তর পর্য্যন্ত খনন করা এবং দেশের বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্যের মধ্যে যাহাতে সমতা (parity) স্থাপিত হয়, তাহার আয়োজন করিতে হইবে।

সমগ্র দেশে প্রত্যেক নদীটিতে যাহাতে তাহার বালুকাস্তর পর্য্যন্ত সারা বৎসর জল থাকে এবং জনসাধারণের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্যের মধ্যে যাহাতে সমতা (parity) বিদ্যমান থাকে, তাহা করিতে পারিলে, একদিকে যেরূপে প্রতি বিঘায় উৎপন্ন শস্যের হার বৃদ্ধি পাইয়া, কৃষির লাভযোগ্যতা বৃদ্ধি পাইবে, অন্যদিকে আবার দ্রব্যের মূল্যের হ্রাসের জন্য জনসাধারণের কোন শ্রেণীর মানুষেরই বিব্রত হইতে হইবে না। তখন জনসাধারণের প্রত্যেকের পক্ষে কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া, কাহারও নফরগিরী না করিয়া প্রাচুর্য্যের সহিত জীবিকানির্ব্বাহ করা সম্ভব হইবে।

যতদিন পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভিন্ন চাকুরী লইয়া যে কাড়াকাড়ি চলিতে থাকিবে এবং তজ্জন্য যে মানসিক রেষারেষির উদ্ভব হইবে, তাহা কোন চুক্তির দ্বারা নিবারিত হওয়া সম্ভবযোগ্য হইবে কি ?

বর্ত্তমান বিজ্ঞান ও ভারতীয় বিজ্ঞানসভার রজত-জুবিলী

ভারত বিজ্ঞান-সভা (Indian Science Association) তাহার কার্য্যকালের পঞ্চবিংশতি বৎসর অতিক্রম করিয়াছে এবং তদুপলক্ষে কলিকাতা সহরে যে সিলভার জুবিলী (Silver Jubilee) নামক একটি উৎসব সংঘটিত হইয়াছে, তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন। এই সিলভার জুবিলীতে বিলাতী বিজ্ঞান-সভার (British Science Association) অনেক প্রখ্যাতনামা সভ্য উপস্থিত হইয়াছিলেন।

যাঁহারা এতাদৃশ "সিলভার জুবিলী"র উদ্যোক্তা, তাঁহারা আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত যুবক-বৃন্দ ও তথাকথিত অশিক্ষিত জনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন অথবা নিন্দাভাজন হইবার উপযোগী, ইহাই আমাদের বর্ত্তমান সন্দর্ভের আলোচ্য।

যে কোন উৎসবে শিক্ষাসেবী বহুজনসমাগম হইয়া থাকে, সেই উৎসব একমাত্র তাহার জনসমাগমতার জন্যই যে প্রশংসনীয়, ইহা বলা বাহুল্য, কারণ যাঁহারা শিক্ষা অথবা জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপাসক, কোন স্থানে তাঁহাদের মিলন সম্ভব হইলে তথায় অনেক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথার আলোচনা অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা শিক্ষিত যুবক-বৃন্দ ও অশিক্ষিত জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ-ভাবে সুশিক্ষার সহায়তা ঘটিয়া থাকে।

উপরোক্ত ভাবে দেখিলে ভারতীয় বিজ্ঞান-সভার সিলভার জুবিলী দ্বারা আমাদের কিছু উপকার হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে বটে এবং তজ্জন্য যাঁহারা উহার উদ্যোক্তা, তাঁহারা আমাদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন বটে, কিন্তু এতৎসম্বন্ধে একটু তলাইয়া চিন্তা করিলে প্রকৃত সত্য যে সম্পূর্ণ অন্য রকমের, তাহা বুঝা যাইবে।

বর্ত্তমানে যাহা বিজ্ঞান বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা যদি প্রকৃত পক্ষে বিজ্ঞান হইত, তাহা হইলে ঐ বিজ্ঞানের আলোচনা এবং বৈজ্ঞানিকের মিলনোৎসব যে সর্ব্বতোভাবে সমগ্র মানব-সমাজে পবিত্রতার উদ্দীপক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু, এতৎসম্বন্ধে গভীরভাবে অনুসন্ধান করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, তথাকথিত বর্ত্তমান বিজ্ঞানকে একদিকে যেরূপ খাঁটি বিজ্ঞান বলা চলে না, অন্যদিকে আবার খাঁটি বিজ্ঞানের সহায়তায় মনুষ্য-সমাজের যে দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব, তথাকথিত বর্ত্তমান বিজ্ঞান মনুষ্য-সমাজকে ঠিক তাহার বিপরীত দিকে লইয়া চলিতেছে।

বর্ত্তমান বিজ্ঞান অথবা সায়েন্স্‌কে খাঁটি বিজ্ঞান অথবা সায়েন্স্ বলা চলে না কেন, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে বসিলে সর্ব্বাগ্রে শব্দের সংজ্ঞা নির্ণয় করিবার পদ্ধতি স্থির করিতে হয়, তাহার পর "বিজ্ঞান" শব্দের প্রকৃত সংজ্ঞা কি, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হয়। শব্দের সংজ্ঞা নির্ণয় করিবার পদ্ধতি কি, তাহা স্থির করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, মানুষ তাহার কথাবার্ত্তায় যে সমস্ত পদ ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহার অন্তরস্থিত ধ্বনি অনুসারে সেই সমস্ত পদের প্রত্যেকটির এক একটি স্বাভাবিক অর্থ বিদ্যমান আছে। কোন্ পদের স্বাভাবিক অর্থ কি, তাহা যে বিদ্যার দ্বারা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহার নাম "ভাষাতত্ত্ব"। এতৎসম্বন্ধে আমরা "শিল্পতত্ত্ব ও অধ্যাপক ডক্টর সুনীতি-কুমার চ্যাটার্জ্জী"-শীর্ষক প্রবন্ধে অনেক কথা বলিয়াছি। অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণকে আমরা ঐ প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

ভাষাতত্ত্বে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, কোন পদ অথবা শব্দ যথেচ্ছ যে কোন অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে না। আধুনিক তথাকথিত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ শব্দের অর্থ অথবা সংজ্ঞা সম্বন্ধে উপরোক্ত চিরন্তন সত্যটুকু উপলব্ধি করিতে পারেন নাই এবং তাঁহারা প্রায় প্রত্যেক শব্দটিকেই তাঁহাদের খেয়াল অনুসারে যে কোন অর্থে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার ফলে প্রায় প্রত্যেক শব্দটির সংজ্ঞা লইয়া বিবিধ রকমের মতভেদের উদ্ভব হইতেছে।

উপরোক্ত ভাষাতত্ত্বানুসারে "বিজ্ঞান" শব্দের মর্ম্মার্থ— পরিদৃশ্যমান ব্যক্ত জগতের ও তৎসংশ্লিষ্ট জীবের অভিব্যক্তি, অর্থাৎ সৃষ্টি, বিভিন্ন স্থিতি ও বিভিন্ন বিনাশ কিরূপ ভাবে এবং কেন সম্ভবযোগ্য হইতেছে, তাহা পরিজ্ঞাত হইবার বিদ্যা।

বিজ্ঞান শব্দের মর্ম্মার্থ স্পষ্ট রকমে উপলব্ধি করিতে হইলে জ্ঞান শব্দের মর্ম্মার্থ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা অর্জ্জন

করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে, কারণ জ্ঞান বলিতে কি বুঝায়, তাহা উপলব্ধি করিতে না পারিলে সঠিক ভাবে কোন বিষয়ের জ্ঞানই লাভ করা সম্ভবযোগ্য হয় না। ভাষাতত্ত্বানুসারে জ্ঞান শব্দটির মর্ম্মার্থ—যে কারণে পরিদৃশ্যমান ব্যক্ত জগতের ও তৎসংশ্লিষ্ট জীবনের অভিব্যক্তি, অর্থাৎ সৃষ্টি, বিভিন্ন স্থিতি ও বিভিন্ন বিনাশ সাধিত হইতেছে, সেই কারণের উৎপত্তি কিরূপ ভাবে এবং কেন সম্ভবযোগ্য হইতেছে, তাহা পরিজ্ঞাত হইবার বিদ্যা।

"জ্ঞান" ও "বিজ্ঞান", এই দুইটি শব্দের মর্ম্মার্থ সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট ধারণা লাভ করিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে, এই দুনিয়ার গ্রহ, উপগ্রহ, তারা প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডল, মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি জীব ও স্থাবর জঙ্গমাদি যাহা কিছু দেখা যায়, তাহার প্রত্যেকটির তিনটি অবস্থা আছে।

ঐ তিনটি অবস্থার প্রথম অবস্থাটি কেবলমাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য, দ্বিতীয় অবস্থাটি মন অথবা অতীন্দ্রিয়-গ্রাহ্য এবং তৃতীয় অবস্থাটি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য। সংস্কৃত ভাষায় প্রথম অবস্থাটিকে জ্ঞ-অবস্থা, দ্বিতীয়টিকে অ-ব্যক্ত অবস্থা এবং তৃতীয়টিকে ব্যক্ত অবস্থা বলা হইয়া থাকে। এই দুনিয়ার বালুকণাটি হইতে সুবৃহৎ গ্রহটি পর্য্যন্ত প্রত্যেক বস্তুটির উপরোক্ত তিনটি অবস্থা বিদ্যমান আছে এবং কেন ও কিরূপভাবে ঐ তিনটি অবস্থার উৎপত্তি হইতেছে তাহা উপলব্ধি করিতে না পারিলে দুনিয়ার কোন বস্তু সম্বন্ধে কিছুই সম্যক্ ও নির্ভুল ভাবে বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয় না, পরন্তু তৎসম্বন্ধে মূর্খত্ব বিদ্যমান থাকিয়া যায়।

দুনিয়ার প্রত্যেক বস্তুর উপরোক্ত বুদ্ধি-গ্রাহ্য অথবা জ্ঞ-অবস্থার উৎপত্তি হইতেছে কিরূপে এবং কেন, তাহা যে প্রকরণ অথবা বিদ্যার দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা যায় সেই প্রকরণ অথবা বিদ্যার নাম 'জ্ঞান'। আর যে প্রকরণ অথবা বিদ্যার দ্বারা উপরোক্ত বুদ্ধি-গ্রাহ্য অথবা জ্ঞ-অবস্থা হইতে ক্রমে ক্রমে অতীন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অথবা অ-ব্যক্ত অবস্থার এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অথবা ব্যক্ত অবস্থার উৎপত্তি হওয়া সম্ভব হয় কি প্রকারে এবং কেন, তাহা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা যায়, সেই প্রকরণ অথবা বিদ্যার নাম "বিজ্ঞান"।

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উপরোক্ত স্বাভাবিক সংজ্ঞা স্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রবেশ লাভ করিতে পারিলে দুনিয়ার যে কোন বস্তু সম্বন্ধে যত কিছু "কেন" প্রশ্নের উদ্ভব হইতে পারে, তাহার প্রত্যেক "কেন"টীর মীমাংসা করা সম্ভব হয়; এবং যে বিদ্যার দ্বারা কোন বস্তুসম্বন্ধীয় প্রত্যেক রকমের "কেন" প্রশ্নসমূহের মীমাংসা করা সম্ভব হয়, সেই বিদ্যাকে "জ্ঞান" ও "বিজ্ঞান" বলিয়া যুক্তিসঙ্গত ভাবে আখ্যাত করা যায়। এই হিসাবে, কোন বস্তুসম্বন্ধীয় কোন রকমের "কেন" প্রশ্ন যে বিদ্যার দ্বারা মীমাংসা করা সম্ভব হয় না, তাহাকে বিজ্ঞান বলা চলে না। সাধারণ বুদ্ধির (common senseএর) দ্বারা চিন্তা করিলেও দেখা যাইবে যে, কোন বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞান অথবা বিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে তৎসম্বন্ধীয় যত কিছু "কেন" উত্থাপিত হইতে পারে, তাহার মীমাংসা পরিজ্ঞাত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়।

এক্ষণে দেখা যাউক যে, বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সহায়তায় কোন বিষয়ক সর্ব্ববিধ "কেন" প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া সম্ভব কি না।

অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সহায়তায় কোন বিষয়-সম্বন্ধীয় সর্ব্ববিধ "কেন" প্রশ্নের মীমাংসা সম্ভব হওয়া ত দূরের কথা, কোন বিষয় কোন "কেন" প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া বিজ্ঞানের দায়িত্বান্তর্গত নহে বলিয়া বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিকগণ ঘোষণা করিতেছেন এবং তাঁহাদের ঐ বিজ্ঞানের সহায়তায় কোন বস্তু-সম্বন্ধীয় প্রশ্নসমূহ সম্যক্ ভাবে মীমাংসা করা সম্ভব হয় না। কাযেই, যুক্তি অনুসরণ করিলে স্বীকার করিতে হইবে যে, ভাষাতত্ত্বানুসারে 'বিজ্ঞান' এই শব্দটীর অন্তর্নিহিত ধ্বনির অনুগমন করিলে উহার যে স্বাভাবিক অর্থ হয়, তদনুসারে বর্ত্তমান বিজ্ঞানকে প্রকৃত ভাবে বিজ্ঞান বলা চলে না। "কাণা ছেলেকে পদ্মলোচন" বলিয়া আখ্যাত করিলে যেরূপ অলীকতার সাক্ষ্য দেওয়া হয়, বর্ত্তমান বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলাও তদনুরূপ।

শুধু যে শব্দানুগ স্বাভাবিক অর্থের দিকে নজর করিলে বর্ত্তমান বিজ্ঞানকে প্রকৃত বিজ্ঞান বলিয়া আখ্যাত করা চলে না তাহা নহে, ব্যাবহারিক জীবনে বিজ্ঞানের প্রয়ো-

জনীয়তা কি, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলেও ঐ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়।

প্রধানতঃ আহার্য্য, পরিধেয়, বাসস্থান, বিভিন্ন রকমের আসবাব, শিক্ষা, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ও ব্যাধির চিকিৎসা লইয়া মানুষের ব্যাবহারিক জীবন।

কেন, কিরূপ ভাবে, কোন্ কোন্ পদার্থ মানুষের আহার্য্য হওয়া উচিত এবং কিরূপ ভাবে জীবনকে নিয়মিত করিলে আহার্য্যরূপে যাহা বর্জ্জনীয়, তাহার ব্যবহার হইতে বিরত হইয়া কেবলমাত্র আহার্য্য বস্তুর আহারেই মানুষ নিরত থাকিতে পারে, তাহার তত্ত্বজ্ঞান লাভ করাই যে আহার্য্য-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য, তৎসম্বন্ধে কোন মতভেদ থাকিতে পারে না। আহার্য্য-সম্বন্ধীয় এতাদৃশ বিজ্ঞান যথাযথভাবে বিদ্যমান থাকিলে মনুষ্যসমাজে আহার-জনিত সর্ব্ববিধ ব্যাধির ক্রমিক বিলুপ্তি যে অনিবার্য্য হয়, তাহা একটু তলাইয়া চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে। কোন্ কোন্ পদার্থ, কিরূপ ভাবে, কেন মানুষের আহার্য্য হওয়া উচিত তাহা নিখুঁত ভাবে পরিজ্ঞাত হইতে হইলে একদিকে যেরূপ মানুষের প্রত্যেক অবস্থাটি সম্যক্ ভাবে প্রত্যক্ষ করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে, সেইরূপ আবার আহার্য্য বলিয়া দুনিয়ায় যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায় এবং শুনা যায়, তাহার প্রত্যেকটির প্রত্যেক অবস্থাটিও যে সম্যক্ ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া উপলব্ধি করিতে হয়, তাহাও সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে।

সাধারণতঃ মানুষের অসুস্থতা হয় কেন, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া মনুষ্যজাতির অসুস্থতার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, আহার-জনিত অসুস্থতা মনুষ্যজাতির মধ্যে অন্ততঃ একদিন উল্লেখযোগ্য ভাবে বিলুপ্ত হইয়াছিল, আর আজকাল মনুষ্যজগতের প্রায় প্রত্যেকেই আহারজনিত অসুস্থতায় জর্জ্জরিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন অবস্থা সম্যক্ ভাবে প্রত্যক্ষ করিবার জ্ঞান কোন্ সময়ে কতটুকু বিদ্যমান ছিল, তাহার ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, ঐ জ্ঞান কেবলমাত্র বেদ, বাইবেল এবং কোরাণ যথাযথ ভাবে বুঝিতে পারিলে সম্যক্ ভাবে তন্মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ঐরূপ ভাবের সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিবার পদ্ধতি-সম্বন্ধীয় কোন নির্দ্দেশ ত' দূরের কথা, ঐরূপ একটা সম্যক্ ভাবের জ্ঞান মানুষের পক্ষে লাভ করা যে সম্ভব-যোগ্য হইতে পারে, তাহার কথা পর্য্যন্ত বর্ত্তমান তথা-কথিত কোন বিজ্ঞানের কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যাইবে না।

আহার্য্য-সম্বন্ধীয় বর্ত্তমান বিজ্ঞানের অবস্থা কি, তৎ-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, কোন্ কোন্ পদার্থ মানুষের আহার্য্য হওয়া উচিত তৎসম্বন্ধে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে বটে এবং তদনুসারে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক কোন কোন পদার্থকে গ্রহণীয় এবং কোন কোন পদার্থকে বর্জ্জনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কেন যে ঐ ঐ পদার্থ আহার্য্যরূপে গ্রহণীয় অথবা বর্জ্জনীয়, তৎসম্বন্ধীয় কোন চূড়ান্ত মীমাংসা তাঁহারা করিতে সক্ষম হইতেছেন না। কতকগুলি খাদ্য ব্যবহারের কতিপয় ফলাফল দেখিয়া তাহারা কোন খাদ্যটিকে বা বর্জ্জনীয় এবং কোন-টিকে বা গ্রহণীয় বলিয়া ঘোষিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু যে খাদ্যটি ক্ষেত্র ও অবস্থাবিশেষে উপকারী বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহাই যে আবার অন্যক্ষেত্রে ও অন্যাবস্থায় অপকারী হইতে পারে, তাহা তাঁহারা দেখিতে সক্ষম হইতেছেন না।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকের এই অক্ষমতার জন্য যেরূপ তথাকথিত বিজ্ঞানের কিচিরমিচির বৃদ্ধি পাইতেছে বটে, কিন্তু আহারজনিত ব্যাধিও মানুষের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, অর্থাৎ অস্ত্রোপচার সুসিদ্ধ হইতেছে বটে, কিন্তু মানুষটি দেহত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে।

উপরোক্ত ভাবে চিন্তা করিলে একদিকে যেরূপ মানুষের প্রয়োজন-সাধন হিসাবে আহার্য্য-সম্বন্ধীয় বর্ত্তমান বিজ্ঞান যে নিষ্ফল হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না, সেইরূপ আবার উহাকে যে প্রকৃত ভাবে বিজ্ঞান বলা চলে না, তাহাও স্বীকার করিতে হয়।

শুধু যে আহার্য্য সম্বন্ধে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের এই অবস্থা তাহা নহে, মানুষের ব্যাবহারিক জীবনে যাহা কিছু ব্যবহৃত

হয়, তাহার প্রত্যেকটির বিজ্ঞানই উপরোক্ত ভাবের নৈরাশ্যজনক অবস্থায় উপনীত হইয়াছে।

মানুষ তাহার জুতা, জামা, বিভিন্ন ধাতু ও মণি-মাণিক্যের অলঙ্কার, কোট, পেণ্টুলান, বস্ত্র প্রভৃতি পরিধেয়ের নমুনা ক্রমেই বাড়াইয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহার কোন্‌টিতে তাহার শরীর, মন ও বুদ্ধির উপর কিরূপ ফল প্রসব করিতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইতেছে না এবং ইহারই জন্ত যাহা মানুষ তাহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার মানসে আঁকড়াইয়া ধরিতেছে, বস্তুতঃ তাহাই তাহার সৌন্দর্য্য ও পরমায়ুর নাশ সাধন করিয়া দিতেছে। চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, যাঁহারা তথাকথিত বর্ত্তমান বিজ্ঞানজাত পরিধেয়সমূহ যত অধিক ব্যবহার করিতেছেন, তাঁহাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ক্রমিক অবসান তত অধিক পরিমাণে ঘটিতেছে এবং তাঁহাদের তুলনায় যাঁহারা প্রাচীন "অসভ্য" ভাবে বেশভূষা সাধন করিয়া থাকেন, সেই তথাকথিত "অসভ্য" চাষাভূষাগণ এখনও অপেক্ষাকৃত ভাল স্বাস্থ্য বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়া থাকেন।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক ধরণে নির্ম্মিত বাসস্থান ও আসবাবের দিকে লক্ষ্য করিলেও দেখা যাইবে যে, এক্ষণে নানা রকমের সুন্দর সুন্দর গৃহ ও আসবাব নির্ম্মিত ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে বটে এবং উহা দেখিতে ও ব্যবহারে খুবই সুন্দর ও সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচিত হয় বটে, কিন্তু যাঁহারা উহার প্রচলন এখনও সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা শরীর ও মন, এই উভয় সম্বন্ধে যেরূপ স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে এখনও সক্ষম, কি মন অথবা কি শরীর, এই উভয় সম্বন্ধেই আধুনিক বিজ্ঞানসেবী মানুষগণ প্রায়শঃ তাদৃশ স্বাস্থ্য বজায় রাখিতে সক্ষম হন না।

শিক্ষা সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। আধুনিক জগতে নানা রকম বৈজ্ঞানিক ধরণের শিক্ষা আবিষ্কৃত হইতেছে বটে, এবং ঐ শিক্ষা সমাজের সর্ব্ব স্তরের মানুষের মধ্যে যাহাতে বিস্তৃতি লাভ করে, তাহার জন্ত সর্ব্বদাই হৈ চৈ চলিতেছে বটে, কিন্তু অবহিত হইলে দেখা যাইবে যে, যাহারা তথাকথিত অশিক্ষিত, তাহারা এখনও কতকাংশে কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া, কাহারও নফরগিরী না করিয়া, কৃষি ও শকট-চালনা, মোটর-চালনা দোকানদারী প্রভৃতি স্বাধীন ব্যবসায়ের দ্বারা কথঞ্চিৎ পরিমাণে স্ব স্ব জীবিকার্জ্জন করিতে সক্ষম হন বটে, কিন্তু যাঁহারা তথাকথিত শিক্ষিত, তাঁহারা জজিয়তী হউক, অথবা কেরাণিগিরী হউক, একটা না একটা চাকুরী না পাইলে এক বেলার অন্নও জুটাইতে সক্ষম হন না। সততা, সন্তুষ্টি, শান্তি ও সুস্থতার দিকে লক্ষ্য করিলেও দেখা যাইবে যে, তথাকথিত অশিক্ষিতগণের মধ্যে যাদৃশ সততা, সন্তুষ্টি, শান্তি ও স্বাস্থ্য এখনও বিদ্যমান, উহা তাদৃশ পরিমাণে তথাকথিত আধুনিক শিক্ষিতগণের মধ্যে বিদ্যমান থাকে না।

তথাকথিত অবৈজ্ঞানিক অতীত কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের সহিত তথাকথিত বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের তুলনা করিলেও একই রকমের নৈরাশ্যজনক অবস্থা পরিদৃষ্ট হয়।

একদিন ছিল, যখন সাধারণতঃ কোনরূপ সার ব্যবহার না করিয়া, কোনরূপ বৈজ্ঞানিক সেচ-ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ না করিয়া মানুষ অনায়াসে কৃষিকার্য্য করিতে পারিত এবং তদ্দ্বারা কাহারও নফরগিরী না করিয়া স্বাধীন ভাবে কৃষকগণ আত্মীয়-স্বজন ও অতিথি লইয়া বিবিধ রকমের উৎসবের সহিত দিন যাপন করিতে পারিত। তখন কৃষিজাত দ্রব্য দেখিতে যেরূপই হউক না, তদ্দ্বারা মানুষের স্বাস্থ্যের অপচয় হওয়া সম্ভবযোগ্য হইত না।

আর, এখন মানুষের কৃষিকার্য্যে নানা রকম বৈজ্ঞানিক আসবাব, বৈজ্ঞানিক সার এবং বৈজ্ঞানিক সেচ-পদ্ধতি ব্যবহৃত হইতেছে বটে এবং তথাকথিত বৈজ্ঞানিক কৃষিজাত ফসল দেখিতেও অপেক্ষাকৃত সুন্দর হইতেছে বটে, কিন্তু একদিকে যেরূপ কৃষকগণের পক্ষে কৃষি দ্বারা স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করা অসম্ভবপর হইয়া পড়িতেছে, অন্তদিকে আবার কৃষিজাত দ্রব্য হইতে নানারূপ অস্বাস্থ্যেরও উদ্ভব হইতেছে।

শিল্পক্ষেত্রেও নানা রকমের যন্ত্রবিজ্ঞান প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছে বটে, কিন্তু যখন ঐ বৈজ্ঞানিকতার রাজত্ব আরম্ভ হয় নাই, তখন কুটীর-শিল্পিগণের পক্ষে ৭০।৮০ বৎসর পর্য্যন্ত সুস্থ শরীরে কার্য্য করা সম্ভবযোগ্য ছিল,

আর আধুনিক বৈজ্ঞানিকতার রাজত্বে যন্ত্রশিল্পিগণকে প্রায়শঃ ৩০।৩৫ বৎসরের মধ্যেই অসুস্থ ও অপটু হইয়া পড়িতে বাধ্য হইতে হইতেছে। শুধু যে তাহারা অপটু হইয়া পড়িতেছে তাহা নহে, তথাকথিত অবৈজ্ঞানিক কুটীরশিল্পের দ্বারা শিল্পিগণ স্বাধীনভাবে পুরুষানুক্রমে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিত, আর আধুনিক তথাকথিত বৈজ্ঞানিক যন্ত্র-শিল্পের রাজত্বে শিল্পিগণকে প্রায়শঃ নফর-গিরী করিতে হইতেছে এবং তাহা করিয়াও তাহারা পুরুষানুক্রমে জীবন যাপন করা ত' দূরের কথা, স্ব স্ব জী যথাবিহিত ভাবে যাপন করিতে সক্ষম হইতেছে না।

বাণিজ্যক্ষেত্রেও নানারকমের তথাকথিত বৈজ্ঞানিক যান-বাহন, বৈজ্ঞানিক হিসাব-রক্ষণ ও হিসাব-পরীক্ষা, বৈজ্ঞানিক মুদ্রা-প্রচলন প্রভৃতি দেখা দিয়াছে বটে, কিন্তু যখন এতাদৃশ বৈজ্ঞানিকতা বাণিজ্যবিষয়ে স্থান পায় নাই, তখন মানুষের পক্ষে বাণিজ্যের দ্বারা পুরুষানুক্রমে ঐশ্বর্য্য-শালী হইয়া জীবন যাপন করা সম্ভবযোগ্য ছিল বটে, কিন্তু এখন আর তাহা সম্ভবযোগ্য হয় না। এক পুরুষের মধ্যেই আজকালকার বণিক্‌গণকে কখনও বা রাজার ভূমিকা অভিনয় করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যেই আবার কখনও বা জুয়াচোরের মত লুকাইয়া লুকাইয়া, কখনও বা ভিখারীর মত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়।

তথাকথিত আধুনিক বৈজ্ঞানিক বাণিজ্যের আমলে কেবল মাত্র বণিক্‌গণকেই যে এতাদৃশ শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইতে হইয়াছে, তাহা নহে, ক্রেতাগণের পক্ষেও আজকাল প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাশাস্ত্রের আমলে মানুষের ব্যাধি, অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু যে ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা যে কোন দেশের গত পঞ্চদশ বৎসরের স্বাস্থ্য-বিবরণী পাঠ করিলে প্রতীয়মান হইবে।

কাযেই বলা যাইতে পারে যে, শব্দানুগ স্বাভাবিক অর্থের দিকে নজর করিলে বর্ত্তমান বিজ্ঞানকে যেরূপ প্রকৃত বিজ্ঞান বলিয়া আখ্যাত করা চলে না, সেইরূপ আবার ব্যাবহারিক জীবনে বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য করিলেও বর্ত্তমান বিজ্ঞানকে নিন্দনীয় বলিয়া-বর্জ্জন করিবার জন্ম প্রযত্নশীল হইতে হয়। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে, প্রকৃত বিজ্ঞান কোন অবস্থাতেই মানুষের বিন্দুমাত্রও অপকারক হইতে পারে না এবং যাহা মানুষের ব্যবহারে মানুষের পক্ষে কিঞ্চিন্মাত্রও অপকারক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা নামে বিজ্ঞান হইলেও প্রকৃত পক্ষে তাহাকে "বিজ্ঞান" বলিয়া মনে করা চলে না।

একণে প্রশ্ন হইবে যে, বর্ত্তমান বিজ্ঞানকে যদি যুক্তি-সঙ্গতভাবে প্রকৃত বিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত করা না চলে, তাহা হইলে উহাকে কি বলিয়া আখ্যাত করিতে হইবে?

বর্ত্তমান বিজ্ঞানকে যুক্তিসঙ্গত ভাবে কোন্ নামে অভিহিত করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইতে হইলে প্রথমতঃ বর্ত্তমান বিজ্ঞানের গৌরবাত্মক ভিত্তি কি কি ও তাহার সদসৎ স্বরূপই বা কি কি এবং দ্বিতীয়তঃ মানব-জাতির কোন্ অবস্থায় বর্ত্তমান বিজ্ঞানের উদ্ভব হইয়াছে, তাহার সন্ধান করিতে হইবে।

কি লইয়া বর্ত্তমান বিজ্ঞানের গৌরবাত্মক মূল ভিত্তি, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, যতদিন পর্য্যন্ত ষ্টীম্ এঞ্জিনের আবিষ্কার হয় নাই, ততদিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান বিজ্ঞান মানব-সমাজে কোনরূপ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিতে পারে নাই; এবং যে দিন হইতে ষ্টীম এঞ্জিনের আবিষ্কারের ফলে নানা রকমের দ্রুত যান-বাহন নির্ম্মাণ করা সম্ভব হইয়াছে, সেই দিন হইতে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের বিজয়-গৌরবের সূচনা হইয়াছে। ষ্টীম এঞ্জিনের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে যে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের বিজয়-গৌরব সূচিত হইয়াছে, তাহা মানিয়া লইলে, ষ্টীমের ব্যবহার অথবা কয়লার সহায়তায় জল হইতে বাষ্পীয় শক্তির আবিষ্কারকেই বর্ত্তমান বিজ্ঞানের গৌরবাত্মক মূল ভিত্তি বলিয়া আখ্যাত করিতে হইবে।

কোন্ অবস্থায় অথবা কাহার সাধনায় এই আবিষ্কার সম্ভবযোগ্য হইল এবং কেনই বা কয়েক শত বৎসর আগে তাদৃশ আবিষ্কারের সাধনায় মানুষের প্রবৃত্তির উদ্রেক হয় নাই, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, মুখ্যতঃ কাহারও সাধনার ফলে কয়লার সহায়তায় জল হইতে বাষ্পীয় শক্তির আবিষ্কার সম্ভবযোগ্য হয় নাই, পরন্তু তাৎকালিক প্রকৃতির কোন কার্য্যফলে জল হইতে

এবংবিধ বাষ্পশক্তির উদ্গম সম্ভবযোগ্য হইয়াছে এবং তাহা হঠাৎ কোন কোন মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইবে যে, কয়লার সহায়তায় জল হইতে যে বাষ্পোদ্গম হয়, তাহাকে যে প্রচণ্ড শক্তিরূপে পরিণত করা সম্ভব, ইহা যেদিন হইতে মানুষ জানিতে পারিয়াছে, সেইদিন হইতে নানারূপে ঐ বাষ্পোদ্গমকে শক্তিরূপে পরিণত করিয়া ঐ শক্তিকে নানারকম ব্যবহারে লাগাইতে আরম্ভ করিয়াছে বটে, কিন্তু কেন যে জল হইতে এবংবিধ প্রচণ্ড শক্তি-সম্পন্ন বাষ্পোদ্গম সম্ভবযোগ্য হইতেছে, কেন যে জল ব্যতীত বায়ু অথবা মৃত্তিকা অথবা অন্ত কোন বস্তু হইতে কয়লার সাহায্যে এবংবিধ প্রচণ্ড শক্তি-সম্পন্ন বাষ্পোদ্গম সম্ভবযোগ্য হয় না, যে জল হইতে প্রচণ্ড শক্তি-সম্পন্ন বাষ্পোদ্গম একদিন সম্ভবযোগ্য হইয়াছে তাহা তৎকালের একশতবর্ষ আগে সম্ভবযোগ্য হয় নাই কেন, এতাদৃশ বিষয়ের সঠিক মীমাংসায় মানুষ অদ্যাবধি উপনীত হইতে পারে নাই।

শুধু যে বৈজ্ঞানিকগণের পক্ষে উপরোক্ত "কেন"গুলির মীমাংসায় উপনীত হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় নাই তাহা নহে, উপরোক্ত বাষ্পীয়শক্তি মানুষের নানারূপ ব্যবহারে লাগান হইতেছে বটে, কিন্তু যে সমস্ত ব্যবহারে উহা লাগান হইতেছে, সেই সমস্ত ব্যবহার মানুষের পক্ষে কল্যাণপ্রদ অথবা অকল্যাণপ্রদ, তাঁহা পর্য্যন্ত যথাযথ পরীক্ষা করিবার কোন ব্যবস্থা অদ্যাবধি গৃহীত হয় নাই।

যে যে বস্তু হইতে বাষ্পীয়শক্তি যেরূপভাবে গত দেড় শত বৎসর হইতে উদ্ভব করা সম্ভবযোগ্য হইতেছে, তাহা উহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালে কেন সম্ভবযোগ্য হয় নাই—এই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, বাষ্পীয় শক্তি একমাত্র প্রকৃতি ছাড়া আর কাহারও ইচ্ছাপ্রসূত নহে।

কাযেই দেখা যাইতেছে, বর্ত্তমান বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি যে বাষ্পীয় শক্তি, তাহা কোন মানুষের সাধনাপ্রসূত নহে, পরন্তু উহা প্রকৃতিপ্রসূত এবং এইরূপভাবে যে শক্তি উৎপন্ন হওয়া সম্ভব, তাহা হঠাৎ মানুষের নজরে পড়িয়া গিয়াছে ও মানুষ তাহা তাহার ব্যবহারে লাগাইতে আরম্ভ করিয়াছে। ঐ বাষ্পীয় শক্তি মানুষ তাহার ব্যবহারে লাগাইতে আরম্ভ করিয়াছে বটে, কিন্তু যে সমস্ত ব্যবহারে ঐ শক্তি ব্যবহৃত হইতেছে—সেই সমস্ত ব্যবহার মানুষের পক্ষে কল্যাণপ্রদ অথবা অকল্যাণপ্রদ, তাহা যেরূপ একদিকে পরীক্ষিত হয় নাই, অন্যদিকে আবার মূলতঃ ঐ শক্তি কোথা হইতে কিরূপভাবে ব্যক্ত হইতেছে এবং ইহার সর্ব্বশেষ পরিণতিই বা কি ও কোথায়, তাহাও মানুষ বিদিত হইতে পারে নাই।

এক কথায়, যাহা লইয়া বর্ত্তমান বিজ্ঞানের ভিত্তি, তাহা একে ত' মানুষের ইচ্ছা-প্রসূত নহে, তাহার পর আবার উহার আদি ও অন্ত মানুষ এখনও পর্য্যন্ত সঠিকভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারে নাই। উহার মাঝখানের কয়েকটি ব্যবহার মানুষ করিতে সক্ষম হইতেছে বটে, কিন্তু ঐ ব্যবহারগুলি মানুষের কল্যাণপ্রদ অথবা অকল্যাণপ্রদ, তাহা পরীক্ষা করিবার সক্ষমতা পর্য্যন্ত মানুষ লাভ করিতে পারে নাই।

ঐ বাষ্পীয় শক্তি যদি প্রকৃতিজাত না হইয়া মানুষের পক্ষে যে কোন বস্তু হইতে যে কোন অবস্থায় উহার উদ্ভব করা সম্ভব হইত এবং উহার আদি ও অন্ত যদি মানুষ প্রত্যক্ষ করিতে পারিত, তাহা হইলে উহাকে বিজ্ঞানপ্রসূত বলা যাইতে পারিত বটে, কিন্তু যখন পরিষ্কার দেখা যাইতেছে, মানুষ উহার কয়েকটী ব্যবহার শিখিতে পারিয়াছে বটে, কিন্তু ঐ ব্যবহারগুলি মানুষের কল্যাণপ্রদ অথবা অকল্যাণপ্রদ, তাহা পরীক্ষা করিতে হয় কি করিয়া, তৎসম্বন্ধে মানুষ এখনও শিখিতে পারে নাই এবং উহার আদি ও অন্ত কোথায়, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়াও মানুষের পক্ষে সম্ভবযোগ্য হয় নাই, তখন উহা যে অবিজ্ঞানপ্রসূত, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

এইরূপভাবে দেখিলে দেখা যাইবে যে, উহা যে কেবল অবিজ্ঞানপ্রসূত তাহা নহে; বাষ্পীয় শক্তি মানুষের কল্যাণপ্রদ ব্যবহারে লাগান যাইতে পারিত বটে, কিন্তু অধুনা বাষ্পীয় শক্তির যে কয়টি ব্যবহার মানুষ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার প্রায় প্রত্যেকটি মানুষের আর্থিক ও স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় জীবনে অনিষ্ট সাধন করিতেছে।

শুধু যে বাষ্পীয় শক্তি সম্বন্ধেই এই কথা প্রযোজ্য তাহা

নহে, বিদ্যুৎশক্তি প্রভৃতির প্রত্যেকটি সম্বন্ধেই ঐ একই কথা বলা যাইতে পারে।

বাষ্পীয় শক্তি প্রভৃতির প্রকৃত আদি ও অন্ত কোথায়, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া সাফল্য লাভ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, যাদৃশ ভাবে উহার উদ্ভব করা মানুষের পক্ষে আধুনিক কালে সম্ভবযোগ্য হইতেছে, তাহা সর্ব্বকালে সম্ভবযোগ্য হয় না। সূর্য্য ও পৃথিবীর পরস্পরের মধ্যে অবস্থানভেদে উহার সম্ভাব্যতা ও অসম্ভাব্যতা ঘটিয়া থাকে এবং যখন ঈদৃশ শক্তির উদ্ভব সম্ভবযোগ্য হয়, তখন প্রকৃত বিজ্ঞান-পন্থী হইলে মানুষের পক্ষে মনুষ্যসমাজের সর্ব্বাধিক কল্যাণ সাধন করাও সম্ভবযোগ্য হইয়া থাকে। সূর্য্য ও পৃথিবীর পরস্পরের অবস্থানবিশেষের ফলে তৎকালে প্রকৃত বিজ্ঞানপন্থী হইলে একদিকে যেরূপ মানুষের পক্ষে মনুষ্য-সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কল্যাণ সাধন করা সম্ভবযোগ্য হয়,সেইরূপ আবার প্রকৃত বিজ্ঞান-পন্থী না হইয়া তৎসম্বন্ধে অভিমানগ্রস্ত হইলে অবিজ্ঞানের ফলে মানুষের কল্যাণের নামে উপরোক্ত বাষ্পীয় শক্তি প্রভৃতির দ্বারা মনুষ্যসমাজের প্রকৃত অহিত সাধিত হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান কালে আমাদের হইতেছেও তাহাই। প্রকৃত বিজ্ঞানপন্থী না হইয়াও মানুষ নিজদিগকে বিজ্ঞানপন্থী বলিয়া মনে করিতেছে এবং এতাদৃশ অভিমান ও অবি-জ্ঞানের মিলনে যাহা ঘটিতেছে, তাহাতে আপাতদৃষ্টিতে চমৎকৃত হইতে হয় বটে, কিন্তু তলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রত্যেকটি মনুষ্যসমাজের বর্ত্তমান অর্থ, স্বাস্থ্য ও শান্তি-সম্বন্ধীয় দুর্দ্দশার মূল কারণ।

প্রধানতঃ রেল, ষ্টীমার, মোটরকার, এরোপ্লেন, বেতারবার্ত্তা, যন্ত্রশিল্প প্রভৃতি দেখিলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রত্যেকটিই পরোক্ষ ভাবে মানুষের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার মূল কারণ। এক্ষণে মানুষ যে অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, তাহাতে বর্ত্তমান দুর্দ্দশা হইতে রক্ষা পাইতে হইলে আরও কিছু দিনের জন্য ঐ রেল, ষ্টীমার প্রভৃতির প্রয়ো-জনীয়তা বিদ্যমান থাকিবে বটে, কিন্তু বর্ত্তমান তথাকথিত বৈজ্ঞানিক যাহা কিছু করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহার প্রত্যেকটীর উচ্ছেদ অবশেষে সাধন না করিতে পারিলে মানুষ তাহার বিপদ্ হইতে যে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা পাইবে না, ইহা অদূরভবিষ্যতে মানুষ বুঝিতে পারিবে বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে।

কাযেই, যাহা বর্ত্তমানে বিজ্ঞান বলিয়া মনুষ্যসমাজে স্থান পাইয়াছে, অথচ যাহা বস্তুতঃ অভিমান ও অজ্ঞানের মিলন হইতে প্রসূত, তাহাকে যুক্তিসঙ্গত ভাবে আমাদের মতে কুজ্ঞান বলিয়া আখ্যাত করিতে হইবে।

বর্ত্তমানে যাহা বিজ্ঞান বলিয়া চলিতেছে, তাহা বস্তুতঃ পক্ষে যদি বিজ্ঞান না হইয়া কুজ্ঞান হয়, পরন্তু সূর্য্য ও পৃথিবীর পরস্পরের অবস্থাবিশেষের জন্য যদি বর্ত্তমান কালে প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাক্ষাৎ লাভ করা সম্ভব-যোগ্য হয়, তাহা হইলে তাহা হইতেছে না কেন, তদ্বিষয়ে এক্ষণে প্রশ্ন করা যাইতে পারে।

অথর্ব্ববেদ, বাইবেল ও কোরাণে যথাযথভাবে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে এই প্রশ্নের উত্তর মোটামুটী ভাবে পাওয়া যাইবে। এতৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষযোগ্য বিস্তৃত উত্তর লাভ করিতে হইলে যজুর্ব্বেদের কতকগুলি অভ্যাসে অভ্যস্ত হইতে হয়। যে কালে যাহা হওয়া সম্ভব, তাহা হয় না কেন, যে জীবের যাদৃশ গুণ-সম্পন্ন হওয়া সম্ভব, সেই জীব তাদৃশ গুণসম্পন্ন না হইয়া অন্যরূপ হয় কেন, ইহা জানিতে হইলে প্রকৃতির মধ্যে বিকৃতির উদ্ভব হয় কেন, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হয়। এতৎসম্বন্ধীয় মূল কথাও যজুর্ব্বেদে ও অথর্ব্ববেদে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা সাধারণ মানুষের (অথবা বদ্ধ মানুষের) পক্ষে বুঝিয়া উঠা সম্ভব নহে। প্রকৃতি ও বিকৃতি-সম্বন্ধীয় কথাগুলি যাহাতে সাধারণ মানুষ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে, তাহা পূর্ব্বমীমাংসায় বিবৃত হইয়াছে। ঐ কথাগুলি অতীব বিস্তৃত এবং তাহা এখানে সম্যক্ ভাবে লিপিবদ্ধ করা সম্ভবযোগ্য নহে।

সংক্ষেপতঃ বলিতে বলিতে হয় যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান অন্তরের জিনিষ। বাহিরের কার্য্য দেখিয়া উহার আরম্ভ হয় বটে, কিন্তু উহার সমাপ্তিসাধন করিতে হইলে বাহির হইতে দূরে থাকিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। বাহিরের কোন কার্য্য দেখিয়া তৎসম্বন্ধে অন্তরে চিন্তার আরম্ভ হইলে যেরূপ ঐ বিষয়ক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূচনা আরম্ভ হয়, সেইরূপ আবার অন্তরের চিন্তা আরম্ভ না হইয়া কোন বিষয়ের বাহ্যরূপ সম্বন্ধে প্রতিনিয়ত আলোচনা

চলিতে থাকিলে তদ্বিষয়ে হৈ চৈ চলিতে থাকে বটে, কিন্তু ঐ বিষয়ক বিজ্ঞান পরিজ্ঞাত হওয়া অসম্ভবযোগ্য হইয়া পড়ে। বাহ্যকে দেখিয়া তদ্বিষয়ক রাগ ও দ্বেষে আকৃষ্ট না হইয়া তৎসম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবে অন্তরে চিন্তা করা প্রকৃতির কার্য্য, আর বাহ্যকে দেখিয়া তৎসম্বন্ধে সর্ব্বতোভাবে অন্তরে চিন্তা না করিয়া আংশিক ভাবে তাহার বুদ্ধি লইয়া তদ্বিষয়ক রাগ ও দ্বেষে আকৃষ্ট হওয়া বিকৃতির কার্য্য। বর্ত্তমান তথাকথিত বৈজ্ঞানিকগণ ভ্রান্ত ভাবে এই বিকৃতির মধ্যে রত হইয়াছেন বলিয়াই তাঁহাদের অনেকেরও কার্য্যের অন্তরে মনুষ্যসমাজের কল্যাণ-কামনা আত্মপ্রকাশ করিলেও তাঁহাদের দ্বারা মনুষ্যসমাজের প্রকৃত কোন হিত সাধিত না হইয়া বরং পক্ষে সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে।

বর্ত্তমান বিজ্ঞান যে আমূলভাবে বিপথগামী হইয়াছে, তাহা ইউরোপীয় ভাবুকগণের কেহ কেহ আংশিক ভাবে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের কেহ যে ইহা কিঞ্চিন্মাত্র পরিমাণেও প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারেন, তাহার কোন চিহ্ন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

প্রকৃত পক্ষে কুজ্ঞান হইয়াও যাহা বিজ্ঞানের নামে চলিতেছে, তাহার গতি ফিরাইয়া প্রকৃত বিজ্ঞানের সন্ধান পাইতে হইলে একদিকে যেরূপ কোন্ উপায়ে চক্ষু-কর্ণ প্রভৃতি প্রসারিত করিয়া সম্যক্ ভাবে জগতের প্রত্যেক বস্তুটিকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিতে হয় ও সেই উপায় শিক্ষা করিতে হইলে অন্যদিকে আবার কি করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা চক্ষু ও কর্ণ মুদ্রিত করিয়া জগতের প্রত্যেক বস্তুটিকে বুদ্ধিগ্রাহ্য করিতে হয়, তাহাও অধ্যয়ন করিতে হইবে। ইহা করিতে হইলে একদিকে যেরূপ পুরুষ ও স্ত্রীলোক মিলিয়া নাচানাচি অথবা ঘটাঘটি বর্জ্জন করিতে হইবে, অন্যদিকে আবার নিজকে সম্পূর্ণ ভাবে লুক্কায়িত রাখিয়া কঠোরতার মধ্যে স্নিগ্ধতা কোথায়, তাহার স্পর্শের সন্ধানে ব্যাপৃত হইতে হইবে। প্রয়োজন হইলে এতৎসম্বন্ধে আমরা পুনরায় অনেক কথা বলিব।

ভারতীয় বিজ্ঞান-সভার রজত জুবিলী প্রশংসার যোগ্য অথবা নিন্দার যোগ্য হইয়াছে, তাহা এক্ষণে পাঠকগণ চিন্তা করুন।

বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ও স্বরূপ

...বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, মানুষের 'অর্থ'-সিদ্ধি করা। অর্থ বলিতে বুঝায় সেই বস্তু যাহা মানুষ তাহার জীবন ধারণ করিবার জন্য চাহিয়া থাকে। "অর্থ-সিদ্ধি" বলিতে বুঝায় সেই বার্ত্তা এবং জ্ঞান, যাহার সহায়তায় মানুষ তাহার জীবন ধারণ করিবার জন্য যাহা যাহা চাহিয়া থাকে, তাহার প্রত্যেকটি পাইতে পারে।

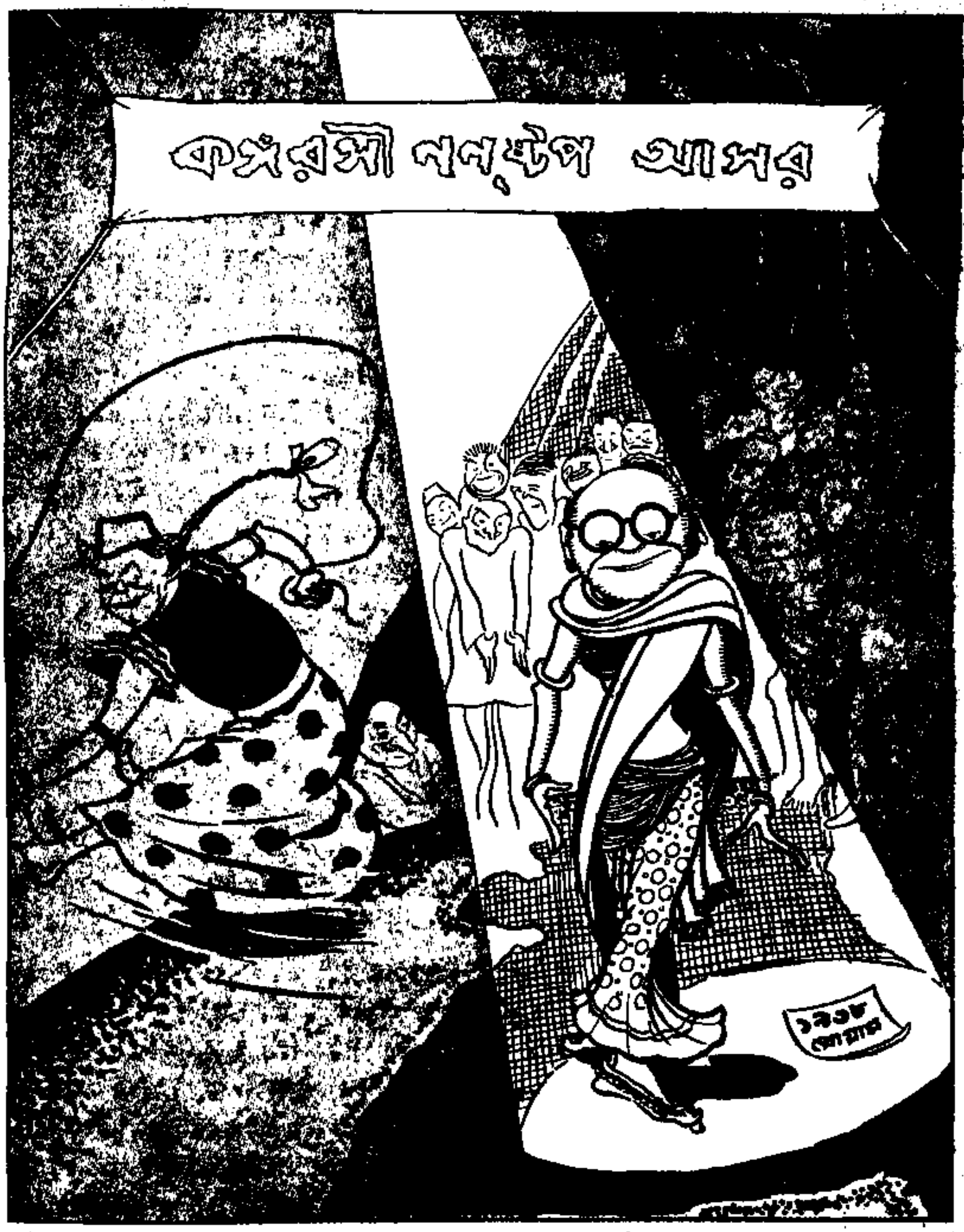
মানুষ তাহার জীবন ধারণ করিবার জন্য যাহা যাহা চাহিয়া থাকে, উহা যাহাতে সে পাইতে পারে, তাহা শিখান অথবা তাহার ব্যবস্থা করা কোন বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হইলে, সেই বিজ্ঞান যে প্রত্যেক মানুষের একান্ত প্রয়োজনীয় হয়, ইহা বলাই বাহুল্য। কাজেই ভারতীয় ঋষির বিজ্ঞান মানুষের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু বলা যাইতে পারে।

মানুষ কি কি চাহিয়া থাকে এবং তাহার মধ্যে কোন্টী তাহার উপকারী ও কোন্টী অপকারী, ইহা বুঝাইবার জন্য ভারতীয় ঋষিগণ তাঁহাদের বিবিধ গ্রন্থে বিবিধ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন।...

কোন্ বিজ্ঞান প্রকৃত অথবা বিকৃত তাহা বুঝিবার নাম বিজ্ঞানের "স্বরূপ" দেখা। যে বিজ্ঞানের ফলে মানুষের সর্ব্বপ্রকারের অর্থ-সিদ্ধি হয়, তাহাকে বিজ্ঞানের সংজ্ঞানুসারে প্রকৃত বিজ্ঞান বলিতে হইবে, আর যাহার ফলে মানুষ বিভ্রান্ত হইয়া নানা-প্রকারের দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে আরম্ভ করে, তাহাকে বিকৃত বিজ্ঞান অথবা কুজ্ঞান বলিতে হইবে।

ভারতীয় ঋষির বিজ্ঞানের ফলে এক সময়ে সমগ্র জগতের সমস্ত মানুষের অর্থসিদ্ধি সাধিত হইয়াছিল।...

"আর জ্বল জ্বল না……"



…হ্যালো এভ্রিবডি, বঁ-জুর।… অল্ ইণ্ডিয়া কংগ্রেস স্পিকিং…জওহরলালের স্কিপিং নৈপুণ্য এবার থামল। এইবারে আপনারা সুভাষ-চন্দ্রিকার চক্র-নৃত্য দেখবেন। জওহরলাল যেমন এতদিন স্কিপিং-এর সঙ্গে স্কেটিং-বিদ্যার সংযোগ আপনাদের দেখিয়েছেন, ইনিও তেমনই নূপুর ও চপ্পলের সমন্বয় ঘটিয়ে তাঁর চরণযুগলকে আপনাদের মনে আসন করবেন…'

(সংবাদ : কংগ্রেসের আগামী হরিপুর অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র আগামীর কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট মনোনীত)।

বড়দিনের অর্কেষ্ট্রা



চৈত্র মাসে যেমন চড়কোৎসব, বড়দিনের ছুটিতে তেমনই সম্মেলনোৎসব। কত যে সম্মেলন বসে, তাহার ইয়ত্তা নাই এবং প্রত্যেক সম্মেলন প্রাণপণে ঢাক-ঢোল, মৃদঙ্গ, কাঁসর, বাঁয়া-তবলা, শিঙা, বেহালা, কেনেস্তারা প্রভৃতি বাজাইয়া নিজেদের প্রচার করিতে চাহিয়া এমন বীভৎস শব্দের সৃষ্টি করে যে, দেশের লোক দুই হাতে কাণ চাপিয়া ধরিয়াও রেহাই পায় না—তাহাদের মাথার মধ্যে ভোঁ ভোঁ করিতে থাকে......

[illegible] দেশবাসীর কেবল এইটুকু লাভ, অধিক [illegible] কে করিবে?

লোকবৃদ্ধি আলোচনা

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ

কিছুদিন ধরে আমাদের দেশের কয়েকজন মনীষী ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা সম্বন্ধে একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করছেন। ধনবিজ্ঞানসেবী বা সমাজতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা পিপীলিকা-শ্রেণীর মত সংখ্যাগুলোকে সাজিয়ে যখন একটা মতবাদ জোরসে প্রচার করেন, তখন জনসাধারণে বিনা-প্রশ্নে প্রায়ই সেটা মেনে নেয়। তাই লোকবৃদ্ধির আতঙ্কও সংবাদপত্রওলাদের দয়ায় ব্যাপকতা লাভ করেছে। এ বিষয়ে পূর্ব্বে "বঙ্গশ্রী"* পত্রিকায় কিছু আলোচনা করেছি; বোঝাতে চেয়েছি যে, আপাত-দৃষ্টিতে ভারতের তথাকথিত লোকবৃদ্ধি যতটা ভয়ের কারণ বলে মনে হচ্ছে, ততখানি উদ্বেগের কারণ নেই। পরিপূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত ভাবে আলোচনা করলে, হয় ত দেখব যে, প্রশ্নটা ঠিক উল্টো দাঁড়িয়েছে। লোকবল সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে, কি ভাবে আলোচনা করা বিজ্ঞানসম্মত, তাই এই প্রবন্ধে নির্দ্দেশ করতে চেষ্টা করব।

পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে আমি সংখ্যা-তালিকা দিয়ে দেখিয়েছিলুম যে, বিগত পঞ্চাশ বছরে সভ্য দেশসমূহে লোকবল যে হারে বেড়েছে, ভারতের লোকবল সে তুলনায় বেশী বাড়ে-নি। আজ ইংল্যাণ্ড-ওয়েল্‌সে লোকবল-ক্ষয়ের আতঙ্ক ঢুকেছে, তাই সে বিষয়ে নানা গবেষণা হচ্ছে; তবু ১৮০১ থেকে ১৯৩১-এর মধ্যে ঐ দেশে শতকরা ৩৫০ লোক বেড়েছে এবং প্রত্যেক সেন্সাস গ্রহণের সময়ও দেখা যাচ্ছে, কয়েক পার্সেণ্ট বাড়তি রয়েই যাচ্ছে। জার্ম্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশগুলি সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। তবু তারা লোকক্ষয় আশঙ্কা করে কেন? আর ঐ একই হিসাবে ভারতের লোকবৃদ্ধি দেখে আমরা আতঙ্কিত হই কেন?

প্রতি বৎসর যতগুলি সন্তান জন্মে, তা থেকে যদি প্রতি বৎসরের মৃত্যু-সংখ্যাটা বাদ দিই, তা হলেই প্রতি বৎসরের "স্বাভাবিক বৃদ্ধি" (natural growth) পাব। সেন্সাস রিপোর্টে দশ বৎসর অন্তর যে লোকবৃদ্ধির হার দেওয়া থাকে, 'স্বাভাবিক বৃদ্ধি'র সঙ্গে প্রায়ই তার যোগ থাকে না। বিহার অঞ্চল থেকে প্রতি বৎসর যে পরিমাণ লোক বাঙ্গালা দেশে চা-বাগানে, কি কয়লার খনিতে কাজ করতে আসে, তাতে 'স্বাভাবিক বৃদ্ধি'র সঙ্গে সেন্সাসানুযায়ী বৃদ্ধির ব্যত্যয় থাকাই স্বাভাবিক। তাই, শুধু সেন্সাসের সময় লোক বেড়েছে কি কমেছে দেখে কোন একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ঠিক নয়—তাতে ভুল সিদ্ধান্ত করাই সম্ভব।

গত কয়েক বৎসরে দেখা যাচ্ছে, অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও মৃত্যু-হার কমে আসছে। ১৯০১—১০ দশকে ভারতের মৃত্যু-হার ছিল হাজার-করা ৪৩; সেটাই ১৯২৬—৩০ পঞ্চ-বর্ষে হয়েছে ২৫। এই ভাবে মৃত্যু-হার কমার অর্থ এই দাঁড়িয়েছে যে, যত শিশু জন্মাচ্ছে, পূর্ব্বের তুলনায় তাদের অনেকগুলিই শৈশবের সঙ্কট কাটিয়ে জনক-জননী হয়ে উঠছে। সুতরাং মৃত্যু-হার কমে যাওয়ার অর্থ এই যে, পরমায়ু-কাল (expectation of life) বেড়ে যাওয়ার দরুণ লোক-সংখ্যা বাড়ে ও ভবিষ্যৎ জননীর সংখ্যাও বাড়ে। মৃত্যু-হার ক্রমশঃ আরও কমবে বলেই মনে হচ্ছে; কিন্তু ভবিষ্যতে লোকবল কি দাঁড়াবে সেটা স্থির করতে গেলে মৃত্যুর বহর দেখলেই হয় না, দেখতে হয় জন-সংখ্যার মধ্যে কোন্ বয়সের কত লোক আছে। কেন না বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা মৃত্যু-হার যতই কমিয়ে আনি না কেন, জন-সংখ্যার অধিকাংশই যদি প্রবীণ-বৃদ্ধের পর্য্যায়ে পড়ে, তা হলে, তবু মৃত্যু-হার অধিকই হবে। অতএব শুধু মৃত্যু-হার কমছে দেখে ভাবা উচিত নয় যে জন-সংখ্যা বাড়বে, এমন কি একই থাকবে।

আজকাল পশ্চিম দেশগুলির মত আমাদের দেশেও জন্ম-হার ক্রমশঃ কমে আসছে—বিশেষ করে গত কয় বৎসরে যেন বিশেষভাবে তাই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যে পর্য্যন্ত জন্ম-হার ক্রমশঃ বাড়ছিল বা অব্যাহত ছিল, সে

* ১৩৪০ সনের চৈত্র সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

পর্য্যন্ত লোক-বল প্রধানতঃ নির্ভর করত মৃত্যু-হারের উপর। কিন্তু এখন পূর্ব্বের তুলনায় মৃত্যু-হার অনেক কমে গেছে এবং আরও কমবে; তাই লোক-বলের প্রকৃতি নির্ভর করে জন্ম-সংখ্যার উপর।

কিন্তু শুধু জন্ম-হার দেখলেও বোঝা যায় না। সেন্সাসে যে জন্ম হার দেওয়া হয়, তাতে বলা হয় ১০০০ প্রতি কত সন্তান জন্মেছে। এ রকম একটা হিসাব দেখে একেবারে ভুল সিদ্ধান্ত করা কিছু বিচিত্র নয়। ১৫ থেকে ৫০-এর ভিতর বয়স যাদের, একমাত্র তারাই সন্তানের জন্ম দিতে পারে; অথচ এক বৎসরে সমগ্র জন-সংখ্যার যে-সংখ্যক সন্তান জন্মে, তারই নির্দ্দেশ থাকে জন্ম-হারে (birth rate relates the annual number of births to the total population)—যে জন-সংখ্যার অনেকেই সন্তানের জনক-জননী হওয়ার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। ফলে এই জন্ম-হার দেখে সন্তানবতী হবার উপযুক্ত নারী কি পরিমাণে সন্তানের জননী সত্যই হচ্ছে বোঝার উপায় নেই। উদাহরণ স্বরূপ ডক্টর কুচিন্স্কি দেখিয়েছেন যে, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে কোলর‍্যাডো ষ্টেটের এমনি অবস্থা ছিল যে, যদি ১৫ থেকে ৫০ বৎসর বয়স্ক নারীদের প্রত্যেকের এক জন বাদ আর এক জনের (every second female) সন্তান হত, তা হলেও সেই বৎসরের জন্ম-হার দাঁড়াত মাত্র হাজার-করা ১৬, কারণ সমগ্র জন-সংখ্যার তুলনায় ১৫ থেকে ৫০ বৎসরের নারীর সংখ্যা ছিল মাত্র শতকরা ৩·২। বিভিন্ন বৎসরে, জন-দলের মধ্যে বয়স ও যৌন-গত পার্থক্যের তারতম্য হয় বলে (অর্থাৎ age and sex composition of the population varies) দুইটি বিভিন্ন বৎসরের জন্ম-হারের তুলনা করাও চলে না। তাই লোক-বল আলোচনায় প্রজনন-হারের (fertility rate) উপরই লক্ষ্য দেওয়া আবশ্যক. আবার শুধু প্রজনন-হার দেখলেও খুব সন্তোষজনক সিদ্ধান্ত করা যায় না। সন্তান-সম্ভাবনা-সম্পন্ন নারীদের বয়সের উপরও সন্তানের জন্ম-সংখ্যা নির্ভর করে। সাধারণ ভাবে বলা যায় যে, ২০ থেকে ৩৫ বৎসর বয়সের নারীসংখ্যা যদি বেশী থাকে, তা হলে অধিকতর পরিমাণে সন্তান জন্মাবে। তা ছাড়া বিবাহের পরিমাণের উপরও নজর দেওয়া চাই। উদাহরণ স্বরূপ ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের কথা ধরা যাক্। সন্তান-সম্ভাবনাবিশিষ্ট নারীর (potentially fertile woman) প্রজনন-শক্তি ফরাসীদের মধ্যে ইংরাজদের চেয়ে কম; কিন্তু ফরাসী নারীরা ইংরাজ রমণীদের চেয়ে সহজেই অধিকতর সংখ্যায় বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ফলে ইংরাজদের তুলনায় ফরাসীরা বেশী লোকশালী হয়ে উঠছে। সব চেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে ১৫ হতে ৫০ পর্য্যন্ত প্রত্যেক বৎসরের নারীর প্রজনন-হার যোগ করা (to add the specific fertility rates)। এই হিসাব অনুসারে জানা যাবে যে, কোন একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে, প্রসবক্ষম বয়সের মধ্যে এক জন নারীর কতগুলি সন্তান জন্মাতে পারে (the number of children who would be born to a woman passing through the complete child-bearing period at any given time)। এই ভাবে হিসাব করলে এজ্-কম্পোজিশন বা বিবাহের সংখ্যার প্রতি নজর দেওয়ার আর আবশ্যক হবে না। আমাদের দেশে কোন হিসাব এই ধরণে গ্রহণ করা হয়েছে বলে আমরা জানি না।

কিন্তু এই প্রজনন-শক্তি জানার প্রয়োজন কেন? এর উত্তরে বলা যায় যে, তবেই আমরা বুঝতে পারব, ভবিষ্যতে লোকবল বাড়বে না কমবে। সেন্সাস রিপোর্টে প্রতি দশ বৎসর অন্তর যে হিসাব দেওয়া হয়, তাতে দেখতে পাই যে, প্রতি দশকেই একটা বৃদ্ধি, তা বেশীই হক বা কমই হক, লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু এই বৃদ্ধির হার লক্ষ্য করে বলতে পারি না যে, ভবিষ্যতে লোকসংখ্যা এই ভাবেই বাড়বে, না, কমবে। অথচ আমাদের জানার প্রয়োজন ঠিক এটারই। 'স্বাভাবিক বৃদ্ধি' দেখেও সেটা বলা যায় না। ধর, একটা বৎসরে জন্ম সংখ্যা মোট ৭০,০০,০০০ এবং ঐ বৎসরের মোট মৃত্যু-সংখ্যা ২০,০০,০০০; তা হলে বৎসর-শেষে মোট ৫০ লক্ষ লোক বাড়বে, কিন্তু এ দেশে এটা বোঝা যায় না যে, এই বাড়তিটা কতদিন চলবে বা কি ভাবে চলবে। হয় ত দেখা যাবে যে, একটা বৎসরে বাড়তির বদলে ঘাটতি হয়েছে এবং তার ফলে মোট জন-সংখ্যার পরিমাণ কিছু কমে গেছে, কিন্তু, তবু এমন হতে পারে যে, মৃত্যু-হার ও প্রজনন-হারের

কোন ব্যত্যয় হয় নি বলে ভবিষ্যতে মোট লোকসংখ্যা বেড়েই যাবে। ঐ বিশেষ বৎসরে ঘাটতি হবার কারণ এ হতে পারে যে, সেই সময়ে সন্তান-প্রজনন-শক্তি-সম্পন্ন নারীর সংখ্যা (women in the child-bearing age group) অতি অল্পই ছিল বা হয় ত সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে বুড়োদের সংখ্যাই ছিল বেশী। উপরে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে কোলর্যাডো ষ্টেটের যে অবস্থার কথা বলেছি, তা স্মরণ করলেই, এ যুক্তি বোঝা সহজ হবে। আর দ্বিতীয়তঃ, জন-বলের মধ্যে বুড়োর সংখ্যাই যদি প্রবল হয়, তা হলে মৃত্যুর সংখ্যাও অতিশয় হওয়া আশ্চর্য্য নয়; কিন্তু এই অতি-বৃদ্ধের দল নিঃশেষিত হয়ে গেলে মৃত্যু-হারও কমবে এবং জন-সংখ্যাও বাড়বে। পক্ষান্তরে যদি একটা দেশে জন্মের সংখ্যা বৎসরের পর বৎসর মৃত্যু-সংখ্যাকে অতিক্রম করে যায়, তবু মোট জনসংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়। কথাটা একটু ধাঁধার মত ঠেকছে। একটু বুঝিয়ে বলি। ধর, সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে ১৫ থেকে ৪৫ বৎসরের নারীর সংখ্যাই বেশী। বৃদ্ধের সংখ্যা কম বলে মৃত্যুর সংখ্যাও কম। কিন্তু যদি এই সন্তান-প্রজনন-শক্তিসম্পন্না নারীরা যথেষ্ট পরিমাণে সন্তান প্রসব না করেন, তা হলে ৪৫ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হলে তাঁরাই বুড়ী বলে পরিগণিত হবেন, ফলে সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে বুড়োদের সংখ্যাই হবে বেশী। সুতরাং প্রজনন-হার ও মৃত্যু-হার যদি একই থাকে, তবে অল্পকালের মধ্যে এমন একটা সময় আসবে, যখন মৃত্যু-সংখ্যাই জন্ম-সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যাবে এবং লোকবল হ্রাস পেতে থাকবে।

সেন্সাসে জন্ম-মৃত্যুর যে হার দেওয়া হয়, তা দেখে এ কথা বোঝা যায় না। এবং লোকবল আলোচনায় সেন্সাসের উপর নির্ভর করা কতটা অসন্তোষজনক, তা ইংল্যাণ্ড সম্বন্ধে স্তর জি.এচ. নিব্‌সের হিসাব প্রত্যক্ষ করলে বোঝা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংল্যাণ্ডের লোক-বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১; সেই হার অনুসারে ৭০ বৎসরে ইংলণ্ডের লোকসংখ্যা দ্বিগুণ হবার কথা। গত বিশ বৎসরে ইংল্যাণ্ডের বৃদ্ধি-হার দাঁড়িয়েছে শতকরা ০'৫; এই হারে লোকসংখ্যা বেড়ে গেলে ১৪০ বৎসর পরে ইংলণ্ডের লোকসংখ্যা-হ্রাস দ্বিগুণিত হবে। প্রকৃত-পক্ষে ইংলণ্ডের লোকসংখ্যা হ্রাস পাওয়াই আশঙ্কা করা যাচ্ছে।

ভবিষ্যতে লোকবল বেড়েই যাবে না কমে যাবে, তা আঁচ করবার একটা সোজা উপায় হচ্ছে "লোকবল পিরামিড" বা "পপুলেশন পিরামিড" পরীক্ষা করে দেখা। একটা সময়ের লোকসংখ্যার মধ্যে বিভিন্ন বয়সের পুরুষ ও নারীর সংখ্যার নির্দ্দেশ এই পিরামিডে পাই।

	০—১৫ বয়স	১৫—৩০ বয়স	৩০—৪৫ বয়স
ভারতবর্ষ	(১)	(২)	(৩)
১৯১১—	১২ কোটি—	৮'১ কোটি—	৬'৪ কোটি
১৯৩১—	১৩'৯ „ —	১১'৫ „ —	৬'৭ „
ইংল্যাণ্ড-ওয়েলস্			
১৯১১—	১১১ লক্ষ—	৯৫ লক্ষ—	৭৬ লক্ষ
১৯৩১—	৯৫ „ —	১০৩ „ —	৮৫

১৯১১ খৃষ্টাব্দে ছেলে-মেয়ের সংখ্যা দেখে বোঝা যায় যে, পনর বৎসর পরে, (১)-নং গ্রুপ (২)-নং গ্রুপকে 'রিপ্লেস' করতে পারবে; তেমনি (২)-নং গ্রুপও (৩)-নং গ্রুপকে রিপ্লেস করতে সক্ষম হবে। কিন্তু ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ব্যাপারটা একটু বিভিন্ন আকার নিয়েছে। দেখা যাচ্ছে, (২)-নং গ্রুপ অনায়াসেই (৩)-নং গ্রুপের স্থান দখল করতে পারে। ভারতবর্ষের বেলায় ১৩'৯ কোটি ১১'৫ কোটির স্থান পূর্ণ-করতে পারলেও ১৯১১ খৃষ্টাব্দে যে তফাৎটা লক্ষ্য করা গিয়েছিল তা নেই; সুতরাং ভবিষ্যৎ খুব আশাজনক নয়। আর ইংল্যাণ্ডের বেলায় স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, ৯৫ লক্ষ কখনও ১০৩ লক্ষের স্থান পূরণ করতে পারে না।

লোক-বলের গতি-পরিণতি পর্য্যবেক্ষণ করবার এই স্থূল পদ্ধতিকে বিজ্ঞান-সম্মত বিশিষ্ট রূপ দিয়েছেন ডক্টর কুচিন্‌স্কি। ভাইট্যাল ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্ বা জন্ম-মৃত্যু-তালিকা যদি নির্ভুলভাবে পাওয়া যায়, তা হলে কুচিন্‌স্কির মতানুযায়ী ইণ্ডেক্স তৈরী করা সহজ হয়ে পড়ে। আমাদের দেশে এইটারই অভাব রয়ে গেছে। ১৫ হতে ৫০ বৎসরের নারীরাই বংশ-পরম্পরায় লোকবল অব্যাহত রাখে ত্রিশ বৎসর পরে, ১৫ থেকে ৫০-এর মধ্যে আজ যাদের বয়স, তারা বুড়ী বলে পরিগণিত হবে বা অনুর্ব্বর হয়ে পড়বে। সুতরাং আমাদের প্রথম দেখা দরকার, কতগুলি নারী এই

সন্তান-প্রজনন-শক্তিবিশিষ্ট নারীদের স্থান পূরণ করবে। অতএব জানা আবশ্যক যে, আজ যারা সন্তান-প্রজনন-শক্তি-বিশিষ্ট, তাদের প্রত্যেকের ক'টি করে মোট মেয়ে-সন্তান জন্মাবে। দ্বিতীয়তঃ, এইসব মেয়ে-সন্তানদের অনেকেই আবার মারা যাবে বলে, জানা দরকার যে, যে-সব মেয়ে-সন্তান জন্মাল, তাদের মধ্যে কত ভাগ সন্তান-প্রজনন-শক্তি সম্পন্ন হয়ে বেঁচে থাকবে (survive long enough to pass through the child-bearing period)। লাইফ-টেবল দেখে এটা জানা যায়। এক-একটা সময়ের মৃত্যু-হার নিয়ে লাইফ-টেবল তৈরী হয়; এতে দেখান হয়, নবজাত সন্তানের কত অংশ বিভিন্ন বয়সে বেঁচে থাকে (what proportion of newly born children survives at each year of age)। ছেলেদের ও মেয়েদের মৃত্যুহার বিভিন্ন বলে মেয়েদের লাইফ-টেবলই আমাদের ব্যবহার করতে হবে। হাজারটা মেয়ে যদি আজ জন্মায়, তা হলে হাজার জনই কিছু ৫০ বছর বয়স পর্য্যন্ত বাঁচবে না, বেশ কিছু কম হবে; লাইফ-টেবল বলে দেবে কত বাঁচবে।

প্রজনন-শক্তি ও বেঁচে থাকার শক্তি—এই দুই বস্তুকে মিলিয়ে পাওয়া যায় নেট্ রিপ্রডাক্শান্ রেট (by combining the two facts of fertility and survival we obtain the net reproduction-rate); এবং নেট্ রিপ্রোডাক্শান্-রেট ১'০ হলে বুঝতে হবে যে, প্রজনন-হার ও মৃত্যু-হারের যদি কোন তারতম্য না হয়, তা হলে এ কালের প্রত্যেক সন্তান-প্রজনন-শক্তি-সম্পন্ন নারীর স্থান পরবর্ত্তীকালে ঠিক পূরণ হবে (each woman is just replacing herself in the next generation)। রেট যদি ১'০-এর অধিক হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, লোক-সংখ্যা বেড়েই যাবে, অবশ্য যদি ইতিমধ্যে মৃত্যুহার ও প্রজনন-হারের কিছু ব্যতিক্রম না হয়ে থাকে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, লোকবল সম্বন্ধে জোর করে কোন ভবিষ্য-দ্বাণী করা বিপজ্জনক, কেন না ইতিমধ্যে প্রজনন-শক্তি ও মৃত্যুহারের পরিবর্ত্তন হওয়া কিছু বিচিত্র নয় এবং তা হলে ভবিষ্যৎ বাণীই ভুল হবে। অতএব ভবিষ্যৎ লোকবলের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত করতে হলে প্রজনন-শক্তি ও মৃত্যুহার সম্বন্ধে একটা assumption করে নিতে হবে। 'ক্ষয়িষ্ণু ইংল্যাণ্ড' বলে যে কথা উঠেছে, তা অধ্যাপক বাউলি, ডক্টর লেবোর্ণ, ডক্টর ইনিড চার্লস প্রভৃতি এইভাবেই হিসাব করে দেখিয়েছেন। এইভাবে লোকবল সম্বন্ধে আলোচনা করে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হবার চেষ্টা আমাদের দেশে হয়েছে বলে জানা নেই এবং সে-রকম না করে লোকবৃদ্ধির আতঙ্ক সৃষ্টি করা কোনমতেই বিজ্ঞান-সম্মত নয়।

লোকবলের আলোচনায় 'নেট্ রিপ্রোডাক্শন্-রেট' ইণ্ডেক্সের আমদানী করেছেন ডক্টর কুচিনস্কি। জার্ম্মানরা একটু বিভিন্ন ধরণের ইণ্ডেক্স ব্যবহার করেন। জার্ম্মান ষ্টাটিস্টিক্যাল অফিসের ডিরেক্টর ডক্টর বুর্গডোর্ফার (Burgdorfer) এই ইণ্ডেক্স প্রচলিত করেন। নবজাত মেয়ে-সন্তানের 'রিপ্লেসমেণ্ট কোইফিসিয়েণ্ট' ডক্টর কুচিনস্কির ইণ্ডেক্স থেকে পাই। একটা বিশেষ লোক-সংখ্যা পরিপূরণের (replacement) কথা এতে থাকে না, যদিও রেট্ যদি সর্ব্বসময়েই ১'০ থাকে, তা হলে লোকসংখ্যা বাড়েও না বা কমে না। পক্ষান্তরে ডক্টর বুর্গডোর্ফার প্রজনন-শক্তির দিকে লক্ষ্য না দিয়ে মৃত্যুহার দিয়ে আলোচনা সুরু করেন। তাঁর ইণ্ডেক্স দু'রকম কাজে লাগে—(১) মৃত্যুহার যদি একই রকম থাকে, তবে সন্তান-প্রজনন-শক্তি-বিশিষ্ট নারী-সংখ্যা অব্যাহত রাখতে হলে বৎসরে কতগুলি জীবিত সন্তান আবশ্যক, (২) একটা মোট জনসংখ্যাকে (total population) অব্যাহত রাখতে হলে কতগুলি জীবিত সন্তান আবশ্যক – জানা যায়। (১) ও (২)-এর তফাৎটা বিশেষ মনে রাখবার মত। একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাই। ১৯২৭-এর মাঝামাঝি জার্ম্মানীতে ১৫ থেকে ৪৪ বৎসরের নারীর সংখ্যা ছিল ১৬৪ লক্ষ, আর মোট লোক-সংখ্যা ৬৩২'৫২ লক্ষ। (ক) ১৯২৪-২৬-এ যে মৃত্যুহার, সেই হার ধরে হিসাব করলে দেখা যায় যে, ১৬৪ লক্ষ নারীর সংখ্যা অব্যাহত রাখতে গেলে মোট লোকসংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ৭৮০ লক্ষ। (খ) কিন্তু ঐ মৃত্যুহার ধরে মোট লোক-সংখ্যা (৬৩২'৫২ লক্ষ) অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজন হবে ১৩৩ লক্ষ সন্তান-প্রজনন-শক্তি-বিশিষ্ট নারীর,

কেন না ১৯২৪-২৬-এর ৬৩২'৫২ মোট লোকসংখ্যার লাইফ-টেবলে ঐ সংখ্যাই পাওয়া যায়। (ক)-র বেলায় প্রয়োজন হবে বার্ষিক ১৩'৬৬ লক্ষ জীবিত-জন্মের (live births) সংখ্যা; আর (খ)-র বেলায় দরকার হবে বার্ষিক মাত্র ১১ লক্ষ জীবিত সন্তানের জন্ম। ডক্টর কুচিন্স্কির ইণ্ডেক্সের সঙ্গে ডক্টর বুর্গডোর্ফারের প্রথম ইণ্ডেক্সেরই কিছু তুলনা চলে।

ডক্টর কুচিন্স্কির ইণ্ডেক্স ডক্টর বুর্গডোর্ফারের ইণ্ডেক্সের চেয়ে কিঞ্চিৎ জটিল। বুর্গডোর্ফারের ইণ্ডেক্সের জন্য জানা আবশ্যক হয়, সন্তান-প্রজনন-শক্তি-বিশিষ্ট নারীর সংখ্যা ও প্রকৃত মৃত্যুহার (true death-rate)। প্রকৃত মৃত্যুহার নির্দ্ধারণ করতে হয়, লাইফ-টেবল্ দেখে অর্থাৎ গড় পরমায়ু-কাল দেখে (average expectation of life)। যথা, ১৯২৪-২৬এ জন্মের সময় পরমায়ু-সম্ভাবনা (expectation of life) ছিল ৫৭'৪ বৎসর (জার্ম্মানীতে); অতএব প্রকৃত মৃত্যুহার ছিল $\frac{১০০০\times১}{৫৭'৪}$ বা ১৭'৪ হাজার প্রতি। একটা নির্দ্দিষ্ট অনড় লোকসংখ্যাকে (stationary population) অব্যাহত রাখতে গেলে জন্মহারও একই রকম থাকা আবশ্যক; সুতরাং বার্ষিক জন্ম-সংখ্যাও সোজাসুজি হিসাব করা চলে। বুর্গডোর্ফারের ইণ্ডেক্স কুচিন্স্কির ইণ্ডেক্সের চেয়ে কিছু স্থূল (crude) হলেও, এর সুবিধা এই যে, এর সাহায্যে সহজেই (১) মোট লোকসংখ্যার, বা (২) সন্তান-প্রজনন-শক্তি-সম্পন্ন নারীর সংখ্যার 'রিপ্লেসমেণ্ট কোইফিসেণ্ট' নির্দ্ধারণ করা যায়। ভারতের মত যে-সব দেশের ভাইট্যাল্ ষ্ট্যাটিসটিক্স সুসম্পূর্ণ নয় এবং তাই নেট রিপ্রোডাক্শন্-রেট হিসাব করা সম্ভব বা সহজ নয়, সেই সব দেশে লোকবল আলোচনায় বুর্গডোর্ফারের ইণ্ডেক্স বেশ কাজে লাগান যায়। কুচিন্স্কি ও বুর্গডোর্ফারের ইণ্ডেক্স তৈরীর পদ্ধতি বিভিন্ন হলেও দুটীর ফলই এক। এই দুইটীর কোন পদ্ধতিই অনুসরণ না করে লোকবল সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা অবিবেচনার কাজ।

কুচিন্স্কি বা বুর্গডোর্ফারের প্রবর্ত্তিত পদ্ধতিতে আলোচনা করে যদি দেখা যায় যে, এ দেশের আতঙ্কগ্রস্তাদের কথাই ঠিক, অর্থাৎ ভারতের লোকবল বাড়তিরই মুখে, তা হলেও জন্ম-শাসন আন্দোলন চালিয়ে জন্ম-সংখ্যা ব্যাহত করা যুক্তিসঙ্গত কি না, সেটাও বিশেষ করে ভেবে দেখা দরকার। যে-হেতু প্রজনন-হার একবার কমিয়ে পরে আবার বাড়িয়ে তোলা সম্ভব কি না সন্দেহ আছে, অন্ততঃ, পাশ্চাত্ত্য দেশের অভিজ্ঞতা তাই। ১৯২১ সালে ইতালীর নেট রিপ্রডাক্শান-রেট ছিল ১'৪ (কুচিন্স্কি); অতএব লোকবল ছিল বাড়তির মুখেই। বুর্গডোর্ফারের ইণ্ডেক্স প্রয়োগ করলে দেখা যায় যে, ১৯২১ সালের মৃত্যুহার ধরে ৭৫৯,৪৮০ জীবিত সন্তান বৎসরে জন্মালেই মোট লোক-সংখ্যা অব্যাহত থাকে; আর প্রজনন-শক্তি-সম্পন্ন নারীর সংখ্যা অব্যাহত রাখতে ৮,১৮,০০০ জীবিত সন্তান জন্মান প্রয়োজন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ১৯২১ সালে ১,১৬৩,২১৩ সংখ্যক জীবিত সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছিল; অতএব প্রথম হিসাব অনুসারে ৫৩% ও দ্বিতীয় হিসাব অনুসারে ৪২% বেশী সন্তান জন্মেছিল। এই হিসাব দেখলে বোঝা যায় যে, মৃত্যু-হার ও প্রজনন-হার ১৯১১-র অনুরূপ থাকলে ইতালীর পক্ষে ১৯২১ সালে লোকক্ষয় হবার কোন রকম ভয় ছিল না। কিন্তু বিবাহ-সংখ্যা ও জন্ম-হার কমে যাচ্ছিল দেখে মুসোলিনী ভবিষ্যতের কথা ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে যে মুসোলিনী জন্মশাসন আন্দোলন চালানর একজন বড় রকম পাণ্ডা ছিলেন; সেই মুসোলিনীই ২৬শে মে'১৯২৭ বলেন—"পাঁচ বৎসর ধরে আমরা বলে এসেছি যে, ইতালীর জনবল নদীর মত দুকুল ছাপিয়ে যাচ্ছে। তা সত্য নয়। ইতালীয় জাতি বাড়ছে না, ক্ষয় পাচ্ছে এখনও ইতালীয় জাতির বার্ষিক ৫ লক্ষ বেশী সন্তান জন্মে। কিন্তু তবু এই বাড়তির পরিমাণ গত মহাযুদ্ধের সময়ের অনুরূপ নয়।"

শুধু ইতালীই নয়, জার্ম্মানী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশও লোকবল বাড়াবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে এবং তার জন্য নানা উপায়ও অবলম্বন করা হচ্ছে। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য কি সফল হচ্ছে? একটু আলোচনা করে দেখা যাক। ইতালীর কথাই ধরা যাক। সন্তানসংখ্যা বাড়াবার দুরকম উপায় গ্রহণ করা হয়: (১) দমননীতি-মূলক আইন—উদ্দেশ্য অবিবাহিত থাকার ইচ্ছা ও সন্তানের জন্ম না দেবার ইচ্ছা দমন (repressive laws aimed at

discouraging celibacy and childlessness), (২) পজিটিভ আইন—উদ্দেশ্য, এমন পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের সৃষ্টি করা, যাতে লোকে বৃহৎ পরিবার পছন্দ করে (positive laws intended to create a general environment favourable to the raising of large families)। (১)-নং উদ্দেশ্যসাধনের জন্য 'অবিবাহিত কর' (bachelor-tax), জন্মশাসন সম্বন্ধে আইন, গর্ভ-নষ্ট রোধ (abortion) প্রভৃতি ব্যবস্থা করা হয়, (২)-নং উদ্দেশ্যসাধনের জন্য পারিবারিক সাহায্য, গ্রামাঞ্চলের উন্নতি প্রভৃতি ব্যবস্থা করা হয়। এত বিধি-ব্যবস্থা সত্বেও বিবাহ-সংখ্যা বাড়ে নি। ১৯২১ থেকে ১৯৩২ পর্য্যন্ত বিবাহ-হার কমেই এসেছে, তারপরে কিছু উন্নতি লক্ষ্য করা যায়।

হাজার-করা বিবাহ হার (ইতালী) :—

১৯২১	১১·০
১৯২২	৯·৩
১৯২৩	৮·৭
১৯২৪	৭·৯
১৯২৫	৭·৬
১৯২৬	৭·৫
১৯২৭	৭·৩
১৯২৮	৭·১
১৯২৯	৭·১
১৯৩০	৭·৪
১৯৩১	৬·৭
১৯৩২	৬·৪
১৯৩৩	৬·৯

১৯০৬—১০-এ বিবাহ-হার ছিল গড়ে ৭·৯ হাজার-করা; আর ১৯২৬—৩০-এ তাই দাঁড়ায় ৭·৩; তাই আবার ১৯৩১ ও ১৯৩২-এ দাঁড়ায় ৬·৭ ও ৬·৪। ১৯৩৩ ও ১৯৩৪-এ কিছু উন্নতি লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু সেটা কতটা সরকারী বিধি-বিধানের জন্য, আর কতটাই বা সার্ব্বজনিক আর্থিক উন্নতির জন্য তা বলা শক্ত।

অধিকন্তু জন্ম-হারও যে বেড়েছে, তাও বলা যায় না। ...২২ খৃঃ জন্ম-হার কমে আসতেই দেখা যাচ্ছে। অবশ্য ... জন্ম-হার দেখে কিছু বোঝবার উপায় নেই; কিন্তু ...লী এ বিষয়ে এতই কম সংবাদ দেয় যে, তা থেকে নির্ভুল প্রজনন-শক্তি নির্দ্ধারণ করা চলে না। অধ্যাপক মোরতারা (Mortara) প্রজনন-শক্তি সম্বন্ধে হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, ইতালীর সর্ব্বত্রই ১৯২১—৫ ও ১৯৩০-এর মধ্যে প্রজনন-হার হ্রাস পেয়েছে। বিগত দশ বৎসরের অভিজ্ঞতা দেখে বলা যায় যে, জন-সংখ্যা একবার কমতে থাকলে 'বাড়ুক' বললেই বাড়ে না, অন্ততঃ ইতালী সেই সাক্ষ্য দেয়।

জার্ম্মান গবর্ণমেণ্ট ১৯৩৩-এর জুলাই মাসে বিবাহ, তথা সন্তান-সংখ্যা বাড়াবার জন্য বিবাহ-ঋণ আইন পাশ করেন এবং তারপরই বিবাহের পরিমাণ ও সন্তান-সংখ্যা দুইই বেড়ে যায়। ১৯৩৫-এর আন্তর্জ্জাতিক লোক-বিজ্ঞান বৈঠকে (International Population Conference) ডক্টর বুর্গডোর্ফার্ বলেন—"বিশেষ করে বিবাহ-ঋণ দানই বিবাহ ও সন্তান সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছে" ('in particular, the granting of marriage loans has stimulated the marriage and birth rates')। লোক-সংখ্যা-বৃদ্ধির ৬০% ডক্টর বুর্গডোর্ফারের মতে বিবাহ-ঋণের জন্য সম্ভব হয়েছে। অবশ্য এ কথা সত্য যে, যারা ঋণ পেয়েছিল, তারা ১৯৩৩-এর আগষ্ট মাস থেকে ১৯৩৫-এর এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত ১৮২,৩৫৫ সন্তানের জন্ম দিয়েছে; কিন্তু এ কথা জানার কোন উপায় নেই যে, যদি এরা ঋণ না পেত, তা হলে কতগুলি সন্তান জন্মাত। দ্বিতীয়তঃ, এও জানবার উপায় নেই যে, একমাত্র এই ঋণ পাওয়ার জন্যই কতগুলি বিবাহ হয়েছিল এবং তা নইলে বিয়ে হত না। এখানে আর একটি বিষয় স্মরণ রাখা দরকার। আর্থিক মন্দার জন্য ১৯৩০—৩২-এ বিবাহের সংখ্যা কমে গেছল—অনেকেই বিবাহ স্থগিত রেখেছিল এবং স্থগিত রাখার অর্থ একবারে না বিয়ে করা নয় (postponement does not mean putting off for ever)। সুতরাং ঋণ না পেলেও আর্থিক উন্নতির জন্য হয় ত অনেকেই বিয়ে করত। সুতরাং ১৯৩৩ ও ১৯৩৪-এ যে বিবাহ-সংখ্যা বেড়ে গেছে, তার হেতু একমাত্র বা প্রধানতঃ বিবাহ-ঋণ নয়; বুর্গডোর্ফারের কথা নির্ব্বিচারে মেনে নেওয়া যায় না।

অধিকন্তু, উর্টেম্বার্গে (Wurttemberg) ডক্টর গ্রিস্‌মিয়ার (Griesmeier) যে পরীক্ষা করেছেন, তাতেও

দেখিয়েছেন যে, ১৯৩৪ ও ১৯৩৫-এ যে জন্ম-সংখ্যা-বাড়তি লক্ষ্য করা যায়, তা সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই একই প্রকার দেখা যায়, যারা বিবাহ-ঋণ গ্রহণ করেছিল, একমাত্র তাদেরই মধ্যে নিবদ্ধ নয়। গ্রিসমিয়ারের মতে উর্টেমবার্গে যা লক্ষ্য করা গেছে, সমগ্র জার্ম্মানীতেই তা দেখা যাবে। অতএব রাষ্ট্রিক পরিবর্ত্তনের ফলে জার্ম্মাণ নর-নারী কতখানি বিবাহ সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছে, বলা শক্ত। বরং মনে হয়, ১৯৩৪-এর বাড়তি জন্মহারটা ক্ষণ-স্থায়ী। ১৯৩৫-এর যে হিসাব পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে, বৎসরের গোড়া থেকেই বিবাহের সংখ্যা কমতে সুরু হয়েছে এবং প্রধান প্রধান সহরের হিসাব থেকে দেখা যায় যে, সেপ্টেম্বর মাস থেকেই জন্ম-সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। এটা কিছু অনুকূল প্রমাণ নয়।

জনবল-বৃদ্ধির জন্য ফ্রান্স-বেলজিয়ামে পারিবারিক ভাতার উপরই জোর দেওয়া হয়েছে। এবং তাতে যে খুব সুফল পাওয়া গেছে, তার কোন বিশেষ প্রমাণ নেই। তবু ফরাসী ও বেলজিয়ানরা বিশ্বাস করে যে, পারিবারিক ভাতা দেওয়ার ফলে জন্মহার বেড়ে যাবে। Bonvoisin of the 'Comite' Centrale des Allocations Familiales', M. B. Boverat of the 'Alliance Nationale', Le R. P. Val, Fallon প্রভৃতি এই মত পোষণ করেন; তবে M. Huber তা মানেন না।

শুধু যুক্তির দিক্ দিয়ে দেখতে গেলেও মনে হয়, পারিবারিক ভাতার জন্মহার বাড়াবার ক্ষমতা নেই। যদি আমরা ধরে নিই যে, লোকে এখন যা মজুরী পায়, তা স্বামী-স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ঠিক উপযোগী, তা হলে সন্তান-পালনের জন্য কত বেশী আবশ্যক হবে? পাশ্চাত্য সভ্যজাতির পরিমাপটা পাশ্চাত্য আদর্শেই হওয়া দরকার; তাই ইংল্যাণ্ডের ষ্ট্যাণ্ডার্ডে হিসাব করলে ২।৩ বছরের একটী ছেলের জন্য অতিরিক্ত ২২%, ২টী সন্তানের ও ১টী শিশুর জন্য অতিরিক্ত ৬১%, এবং ৪টী সন্তান ও ১টী শিশুর জন্য অতিরিক্ত ১২০% আয় দরকার (হিসাবটী পাশ্চাত্য মনীষীর)। কিন্তু ফ্রান্স-বেলজিয়ামের স [illegible] এর চেয়ে ঢের কম। সুতরাং পারিবারিক ভাতা পেলেও যদি সন্তান পালন করতে হয়, তা হলে জীবনযাত্রার ধারাকে অনেকখানি খাটো করে আনতে হয়। তা হলে কি করে বলা যায় যে, পারিবারিক ভাতা জন্মহার বাড়িয়ে দেবে? সন্তান-প্রজননের বাধা কিছু পরিমাণে পারিবারিক ভাতা অপসরণ করে বটে, কিন্তু তা বলে তা অতিরিক্ত ব্যয়টা নির্ব্বাহ করে না। দ্বিতীয়তঃ, একই ভাতা সব সময়ে সমান কাজের হয় না। যেমন সমগ্র দেশটার মধ্যে সব অঞ্চলেই 'কষ্ট অফ লিভিং' বা জীবনধারণের খরচা সমান নয়, তাই এক ভাতা সর্ব্বত্র সমান ফলপ্রসূ হয় না।

উপরের আলোচনা থেকে দেখলুম যে, লোকবল একবার হ্রাস পেলে তাকে বাড়ান কতদূর দুঃসাধ্য। প্রগতিপ্রবণ পশ্চিমা দেশগুলিতেই যদি এই অভিজ্ঞতা, তা হলে আমাদের দশা কি হবে?

যে যুগে আমরা বাস করছি, যে ভাবে সমাজ চলেছে, তাতে জন্মহার আপনিই কমে আসবে। জন্মশাসন-সংক্রান্ত দ্রব্য যে ভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে যে, আমরা চাই বা না চাই, জন্মশাসন আমাদের জীবন প্রভাবান্বিত করবেই। সে স্থলে আবার তাকে শাঁখ-ঘণ্টা বাজিয়ে বরণ করে ঘরে তোলার প্রয়োজন কি? আর্থিক দুর্গতির জন্য আজ ঘরে ঘরে অবিবাহিতা কন্যা, বেকার ছেলে···এই সব লোকবৃদ্ধির সহায়ক নয় নিশ্চয়ই। সব পিতামাতাই ambitious হয়েছে, নিজের চেয়ে ভালভাবে পুত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে; পরিবার বড় হলে পিতা-মাতার আশা শূন্যে মিলিয়া যাবে। পারিপার্শ্বিক ঘটনাও পরিবারটী ক্ষুদ্র করবার ইঙ্গিত করছে। সহর অঞ্চলে আজকাল ছোটবাড়ী বা দুই তিন খানা কামরাযুক্ত ফ্ল্যাটের চলন হয়েছে; বড় পরিবার হলে এ সবে থাকা চলে না। এমনিভাবে যে দিকেই দৃষ্টি দিই না কেন, দেখব যে সব দিক থেকেই পরিবারকে ক্ষুদ্র করে আনার ইঙ্গিত পাচ্ছি। এ ক্ষেত্রে আবার যেচে বিপদ ডেকে আনা কেন?

ষ্টকহলম্ ও উপ্‌সালা

—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

বেলা এগারটার সময় ওসলো ছাড়িয়া সন্ধ্যা সাড়ে আটটায় ষ্টকহলম্ পৌছিলাম। সুইডেনের এই দক্ষিণ অংশ সমতল, দ্রষ্টব্য পথে একটা লেক ছাড়া আর কিছু নাই। ট্রেন ইলেকট্রিকে চলে। কোপেনহেগেন হইতে ওসলো যাইতে সুইডেনের দুইটা বড় সহরের উপর দিয়া গিয়াছিলাম, একটা ক্রোন্‌বোর্গ প্রাসাদের ওপারে হেল্‌সিঙ্গোর সহর, দ্বিতীয়টা গ্যোটেবোর্গ। গ্রাম্য দৃশ্য সুইডেনে বেশ সুন্দর। দেশের অবস্থা খুবই ভাল, ইউরোপের সর্ব্বোত্তম। বেকার সমস্যা এখানে নাই, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রচুর। ইদানীং যুদ্ধের মাল-মশলা বিক্রয় করিয়া সুইডেন খুবই ধনবান।

দুপুরে রেস্তর্ঁা-কারে লাঞ্চ খাইতে গেলাম। টেবিলে যে লোকটি বসিয়া ছিলেন, তিনি খানিক পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি জার্মান বলেন?" তারপর দুইটা বিয়ার হুকুম করিয়া যোগদান করিতে বলিলেন। লোকটির একটু ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া ভাব, খানিক পরে আবার একটা ওয়াইন অর্ডার করিয়া খাইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে একটি বিশাল-দেহ ভদ্রলোক একটি ছোট মেয়েকে সঙ্গে লইয়া এ টেবিলে বসিলেন। আসন গ্রহণ করিয়াই ভদ্রলোক কর প্রসারণ করিয়া নিজ নাম বলিয়া পরিচয় দিলেন, মেয়েটিকেও পরিচয় করাইয়া দিলেন, এটি তাঁহার কন্যা। ভদ্রলোক পাদ্রী। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে বিদেশীয় ভ্রাতঃ! কোথা হইতে আপনি আসিতেছেন?" পরিচয় শুনিয়া বলিলেন, শ্রীযুক্ত লক্ষীশ্বর সিংহের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল। লক্ষীশ্বর বাবু আমার বন্ধু-স্থানীয় শুনিয়া ইনি আরও আলাপ ঘনীভূত করিলেন। লক্ষীশ্বর বাবু সুইডেনে অনেক দিন ছিলেন, ইউরোপের এস্‌পারান্টো মহলে সবাই তাঁর নাম জানে। পাদ্রী আলাপ করিতে লাগিলেন; আমাকে কিছু প্রশ্ন করিতে হইলে আরম্ভ করিতেন "হে দূর দেশীয় ভ্রাতঃ!" অথবা "হে ভারতীয় ভ্রাতঃ!" বলিয়া। পাদ্রীর সঙ্গে আলাপ হইতেছে, আর মধ্যে মধ্যে সামনের ভ্যাবারাম লোকটি বিজড়িত স্বরে আমাকে, পাদ্রীকে বা নিজের মনে কি বিড়বিড় করিয়া বলিতেছে, একবার উঠিয়া পাদ্রীর সঙ্গে করমর্দ্দন করে, আবার উঠিয়া মেয়েটির সঙ্গে করমর্দ্দন করে। ব্যাপার দেখিয়া অদ্ভুত ঠেকিল, পাদ্রীর দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিলাম, পাদ্রী নীচু গলায় বলিলেন, উহাকে উনি চেনেন না, রেস্তর্ঁা-কারেই প্রথম আলাপ। মনে হইল, লোকটার মাথা খারাপ। ইতিমধ্যে ওয়েটার বিল আনিল, লোকটার বোধ হয় বিল চুকাইতে পয়সা কম পড়িল, পরে কণ্ডাক্টর আসিয়া টিকিট দেখিতে চাহিল ও উভয় পক্ষের কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাহাতেও কি একটা গলতি হইয়াছে মনে হইল। রেস্তর্ঁা-কার ছাড়িয়া কামরায় আসিয়া বসিলাম। পাদ্রী বলিলেন, লোকটির বাপকে তিনি চেনেন, লোকটি পাগল নয়, মদের ঝোঁকে ও রূপ করিতেছে।

খানিক আলাপের পর পাদ্রী বলিলেন, তাঁহার বড় পিপাসা হইয়াছে, কিছু পান করিবেন ও আমি সঙ্গে গেলে সুখী হইবেন। আমাকে লইয়া দু'বার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দেখা গেল রেস্তর্ঁা-কারে জায়গা নাই। কামরায় ফিরিয়া আসিয়া বসা গেল, পাদ্রী গল্প চালাইতে লাগিলেন। গাড়ীতে দুইটি বয়স্ক মার্কিন ভদ্রোলোক ও একটি বুড়ী মার্কিন মহিলা ছিলেন। হঠাৎ মার্কিনদ্বয়ের খেয়াল হইল যে, গাড়ীটা যে দিকে চলিতেছিল, এখন তার উল্টা দিকে চলিতেছে। পাদ্রীকে তাঁরা ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, গাড়ী এতক্ষণ এক দিকে যাইতেছিল, পাদ্রী ওঠার পর হইতে গাড়ী আবার উল্টা দিকে ফিরিয়া চলিতেছে! আমি তঁহাদের ব্যাপার বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম যে, ওটা এ দেশে প্রায়ই হয়; গাড়ী কোন বড় ষ্টেশনে ঢুকিয়া ছাড়ার সময় ষ্টেশন ভেদ করিয়া বাহির না হইয়া উল্টা দিকে চলিয়া ষ্টেশনের বাহির হয়। এটা হয়, যে-সব বড় ষ্টেশনে লাইন শেষ হইয়া গিয়াছে সেখানে, অথবা যেখানে গাড়ী কোন ষ্টেশনের পর দিক্ পরিবর্ত্তন করিয়াছে, সেখানে। আমি এটা এ দেশে বহু স্থানে দেখিয়াছি। প্রথম অভিজ্ঞতা হইয়াছিল হাম্বুর্গে। সহর রেলের ছটা ষ্টেশন দূরে থাকিতেন

প্রোফেসর শূব্রিং, যে দিন তাঁর বাসায় প্রথম যাই, তিনি আগেই বলিয়া দিয়াছিলেন যে, চারটা ষ্টেশনের পর একটা বড় ষ্টেশন, সেখানে থামিবার পর গাড়ী উল্টাদিকে চলিবে, আমি যেন ভুল গাড়ীতে চড়িয়াছি মনে করিয়া চলন্ত গাড়ী হইতে লাফাইয়া না পড়ি! এটা বিশেষ করিয়া হয় ইলেকট্রিক ট্রেন যেখানে আছে, কারণ এই জাতীয় গাড়ীর প্রায়ই উভয়দিকে ইঞ্জিন থাকে এবং সহজেই সামনে পিছনে চলিতে পারে। মার্কিন ভদ্রলোকরা আমার কথায় বিশ্বাস করিলেন না, ঘণ্টা দুয়েক পর ম্যাপ-ট্যাপ দেখিয়া আসিয়া বলিয়া গেলেন, আমি ঠিক কথাই বলিয়াছিলাম। যাহোক, এঁরা পাদ্রীর পিছনে লাগিলেন! তৃষ্ণার্ত্ত পাদ্রী ইতিমধ্যে রেস্তরাঁ-কার হইতে এক বোতল কোনিয়াক পকেটে ভরিয়া আনিয়াছেন, এক হাতে সোডার বোতল ও অন্য হাতে গেলাস। মার্কিনরা এঁকে তৃষ্ণা দূর করিতে বলিলেন, পাদ্রী বলিলেন, "কি করি, দেখুন, গাড়ীতে ভদ্রমহিলা রহিয়াছেন, তাঁহার সামনে পান করিলে এটিকেট ভঙ্গ হইবে!" মার্কিনরা ও মহিলাটিও পাদ্রীকে অভয়দান করিলেন। পাদ্রী তখন মহিলার কাছে "হে মহিলে!" প্রভৃতি সম্বোধনে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বোতল ও গেলাস টেবিলে রাখিলেন। মার্কিনরা পাদ্রীকে ক্ষেপাইবার জন্য দেশের সমাজের অনেক আলোচনা আরম্ভ করিলেন। ষ্টকহলমে আমোদ-প্রমোদের কি ব্যবস্থা আছে জিজ্ঞাসা করিলেন। পাদ্রী বলিলেন, "ষ্টকহলমে আর কি আমোদ, স্ফুর্ত্তির জায়গা তো কোপেনহেগেন!" উঁহারা ধরিলেন, "বলুন, কোপেনহেগেনে কি কি আমোদ আছে?" পাদ্রী একটু আরক্ত করিয়া সামলাইয়া বলিলেন, "সব কথা আমার বলা উচিত না, দেখুন, হাজার হইলেও আমি একজন মিনিষ্টার অব দি গস্‌পেল!" মার্কিনরা আমার সঙ্গেও একটু রঙ্গ আরম্ভ করিবার চেষ্টা করিলেন, ভারতীয় বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিলেন। আমি কিছু চোখা চোখা ইংরেজি ঝাড়ায় তাঁহারা প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া নিজেদের মধ্যে আবার অন্য আলাপ করিতে লাগিলেন। পাদ্রীর মুখে শুনিলাম এখানকার ধর্ম্মযাজকরা সবাই শিক্ষিত লোক, ইউনিভার্সিটিতে পড়াশুনা করিয়া তবে পাদ্রী হন, তাঁহারা সবাই র‍্যাশনালিষ্ট। বাইবেলের গোঁড়ামি বিশ্বাস করেন না। পাদ্রী এখানকার এম-এ পাশ,



আকাশ হইতে ষ্টকহলমের দৃশ্য

জার্ম্মানী ও আমেরিকায়ও পড়িয়াছেন। তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম্মের দুঃখবাদ সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত করিলেন, আমি তাহার প্রত্যুত্তর দিলে বাগ মানিলেন না, ইউরোপীয় সমালোচনার ধারায় তর্ক তুলিলেন। আমি বলিলাম যে, আমি জাতিতে ভারতীয় এবং বৌদ্ধ মত সম্বন্ধে কিছু আলোচনাও করিয়াছি, তা ছাড়া আমি জার্ম্মান ডক্টর, ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক আলোচনা-পদ্ধতিরও বিশেষ খোঁজ রাখি। পাদ্রী তাহার পর আর বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে মাথা-ঘামান

বাদ দিলেন। এ দেশের পানদোষ হইতে পাদ্রীরাও মুক্ত নহেন। গল্প আছে, এক পাদ্রী রবিবারে গির্জ্জার উপাসনা প্রপরিচালনা করিতেছিলেন। নেশাটা এতই করিয়াছিলেন যে, উপাসনার অন্যান্য অঙ্গের পর যখন হাঁটু গাড়িয়া টেবিলের উপর হাতে মাথা রাখিয়া প্রার্থনার সময় আসিল, তখন মণ্ডলী অনেকক্ষণ ঐ ভাবে পড়িয়া থাকার পরও পাদ্রীর মুখে বাক্য-নিঃসরণ শুনা গেল না। রকম দেখিয়া গির্জ্জার ঘণ্টাবাদক কাজের অছিলায় পাদ্রীর পাশে গিয়া



ইকহলমের টাউন-হল

তাঁর কানে কানে বলিলেন, "কৈ, কিছু বলুন!" পাদ্রী ভাবঘোরে কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "আমি বলিতেছি পাস্!" (পাদ্রী নেশার ঘোরে মনে করিয়াছিলেন, তাস খেলিতে বসিয়াছেন!)

পাদ্রী আত্মীয়তা করিলেন খুব। পরে আবার সুইডেনে আসিলে তাঁহার সহরে তাঁহার বাড়ীতে কিছুদিন থাকবার নিমন্ত্রণ করিলেন। ইকহলমে পৌঁছিয়া তাঁহার পরিচিত একটি বোর্ডিং-হাউসে (এ দেশে ইহাকে পেন্‌জিওন বলে) ঘর ঠিক করিয়া দিলেন। পেন্‌জিওনের ল্যাণ্ডলেডি সুইডিশ ছাড়া অন্য ভাষা জানে না। পরদিন সকালে ব্রেকফাষ্টে কি খাইব বুঝাইতে পারিলাম না। সকালে পাদ্রী টেলিফোন করিলেন, তিনি তাঁহার মেয়েটিকে এরোপ্লেনে সহর দেখাইবেন, আমিও যদি আসি, তবে বড় আনন্দিত হইবেন। আমি সম্মত হইয়া পাদ্রীকে বলিলাম, আমার ল্যাণ্ডলেডিকে টেলিফোনে ডাকিতেছি, তিনি যেন ল্যাণ্ডলেডিকে বুঝাইয়া দেন ব্রেকফাষ্টে আমার কি চাই! এইভাবে বিপদ উদ্ধার হইল। ব্রেকফাষ্ট যখন আসিল, দেখিলাম চিনির পাত্রটা ভুলিয়া গিয়াছে, দাসীকে ডাকিয়া কফি ও দুধের পাত্রের চারিপাশে আঙুল বুলাইয়া তারপর ট্রের একটা খালি জায়গায় ঐ ভাবে ক্ষুদ্রতর বৃত্তে আঙুল ঘুরাইয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিলাম, দাসী বুঝিল অনুপস্থিত চিনির পাত্রের ইঙ্গিত হইতেছে! ভাষা না জানিলেও ইটালি ও ফ্রান্সেও দেখিয়াছি, ইঙ্গিতে ও ভাবভঙ্গীতে সব প্রয়োজন সমাধা করা যায়।

সহর হইতে বাসে করিয়া এয়ারোড্রোমে গিয়া এরোপ্লেনে চড়িলাম। এই জীবনে প্রথম বায়ু-বিহার, কিন্তু এমন অদ্ভুত কিছুই মনে হইল না। ইঞ্জিনের শব্দ ও একটু দোলানি ছাড়া আর কিছুই নূতন মনে হয় না। জানালা দিয়া নীচে সহরের বাড়ীঘর ও চারিপাশে সাগরের জল দেখা গেল। মজা লাগে উপর হইতে ভূপৃষ্ঠে এরোপ্লেনটির গতিমান ছায়াটিকে দেখিয়া।

ইকহলম সহরটিরও চারিপাশে সমুদ্র, সহরের মধ্যেও অনেক জায়গায় সাগর প্রবেশ করিয়াছে, সহরের গায়েই বড় বড় জাহাজ দাঁড়াইয়া। বেশ পরিষ্কার সুন্দর সহর। আকারে তেমন বৃহৎ নয়, কিন্তু বেশ পরিপাটি। বাড়ীগুলিও এখানকার অতি প্রকাণ্ড নয়, কিন্তু গাঁথুনিতে একটা দৃঢ়তার

ব্যঞ্জনা আছে। সাগর-শাখার পাড়ের টাউনহল এখানকার প্রধান স্থাপত্য। রাজপ্রাসাদ, পার্লামেণ্ট প্রভৃতি বাড়ী-গুলিও মন্দ নয়। একটি সংবাদ-সঙ্ঘের সম্পাদকের নামে পরিচয়-পত্র ছিল, তিনি সাগরতীরের একটা স্কাই-স্ক্রেপার বাড়ীর উপরতলার রেস্তর্াঁতে লাঞ্চে লইয়া চলিলেন। এ দেশের সংবাদ অনেক শুনিলাম। আলাপের পর সম্পাদক একটু পানপ্রস্তাব করিলেন। ওস্লোর কথা স্মরণ করিয়া আমার একটু ভয় হইল, নির্ব্বিকার মনে শরীরের উপর অ্যাল্কহলের ক্রিয়া আবার পরখ করিতে সাহস হইল না, বলিলাম, "দেখুন, আমি পান-বিরোধী নই, কেহ সাহচর্য্য চাহিলে তাহাতে আপত্তি করি না, কিন্তু বাস্তবিক উহাতে আমার বিশেষ আকাঙ্ক্ষা হয় না।" ভদ্রলোক একটু হতাশ হইলেন, বলিলেন, "ভাবিয়াছিলাম আপনাকে লইয়া একটু অ্যালকহলের আমোদ করিব।"

বার্লিনের সহপাঠী একটি সুইডিশ যুবক এখানকার ওপন্-এয়ার চিড়িয়া-খানা ও মিউজিয়ম দেখাইলেন। শীল, ওয়ালরাস, বল্গা-হরিণ, মেরু-ভালুক প্রভৃতি জানোয়ার দেখিলাম। মিউ-জিয়মে সেকেলে কাঠের গ্রাম্য বাড়ী অনেকগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা হইয়াছে, ইহার ভিতরে সেকেলে বাসনপত্র, আসনচৌকি প্রভৃতিও ঠিক পূর্ব্বের মত দেখান হইয়াছে, সেকেলে গ্রাম্য জীবনযাত্রার বেশ ছবি ফুটিয়া উঠে। বাড়ীগুলি প্রাণহীন অবস্থায় দেখান হয় নাই, একদল নগরবাসীকে সেকেলে গ্রাম্য পোষাক পরাইয়া এই বাড়ীর অঙ্গস্বরূপ দেখান হয়, ইহারা স্বাভাবিকভাবে এই বাড়ীগুলির ভিতর-বাহির আনাগোনা করে, বারান্দায় বসিয়া সেকালের যন্ত্রে বাজনা বাজায়। এখান হইতে গিয়া সাগরতীরের একটি পাহাড়ের উপরে সেকেলে ভাবে সজ্জিত রেস্তর্াঁয় আহার করিলাম। ষ্টক-হলমের লাইব্রেরি, মিউজিয়ম প্রভৃতি ছাড়া এখানকার নোবেল-প্রতিষ্ঠানের বাড়ীটিও দেখিলাম।

একদিন ট্রেনে করিয়া ষ্টকহলমের ৪০ মাইল দূরে ছোট সহর পুরাতন উপসালা ইউনিভার্সিটি দেখিয়া আসিলাম। বেশ লাগিল এখানে। ক্ষুদ্র সহরের ছোট বাড়ীঘর, একটা বড় গির্জ্জা, টিলার উপর ইউনিভারসিটির পুরাতন রাজপ্রাসাদ প্রভৃতি। ছাত্রেরা এখানে সুইডেনের যে প্রদেশ হইতে আসে, তদনুসারে ভিন্ন ভিন্ন



ষ্টকহলমের রাজবাড়ী।

সমিতিতে বিভক্ত হয়। লাইব্রেরীও খুব বড় এখানকার। বার্লিনের একটি সহপাঠীর সহিতও এখানে দৈবাৎ দেখা হইয়া গেল। একটি যুবক ষ্টেশনে পরিচিতের মত সম্বোধন করিল, বলিল, হাম্বুর্গে আমাকে দেখিয়াছে, এখানে ৫ কালীন ভাষা-কোর্সে জার্ম্মান ছাত্রদের দলপতি হইয়া আসিয়াছে। ষ্টেশনে আসিয়াছিল তাহার একটি লিথু-নিয়ান বান্ধবীকে আগাইতে, বান্ধবী না আসায় আমাকে সহর দেখাইয়া দুধের সাধ বেচারার ঘোলে মিটাইতে হইল

সে বৈকালটা। বার্লিনের সহপাঠীটির সঙ্গে ছাত্রদের আহারস্থানে খাইয়া একটা কাফে ঘুরিয়া ষ্টকহলমে ফিরিলাম রাত্রে।

উপসালার সংস্কৃতাধ্যাপক ছিলেন শার্‌পাঁচিয়ে (Charpentier)। এখন মৃত। ইঁহার স্থানে এখন আছেন অধ্যাপক স্মিট্। ইঁহার সঙ্গে ষ্টকহলমে ফিরিয়া দেখা হইল। প্রোফেসার ষ্টকহলমের বাহিরে বাস করেন, টেলিফোন করায় জানাইলেন, পরদিন সকালে দশটায় আমার বাসায় আসিয়া দেখা করিবেন।

পরদিন ঠিক সময়ে প্রোফেসার সোৎসাহে উপস্থিত হইলেন। দরজায় ঢুকিয়াই বলিলেন, "আপনি আমার গুরু ল্যুডার্সের কাছে পড়িয়াছেন, আমার ছাত্রও আপনার



সুইডেনের গ্রাম্যপথে ছুটির দিন

বন্ধু, আপনি আমার কাছে শুভাগত।" বাড়ী হইতে বাহির হইয়া রয়েল লাইব্রেরী ও নোবেল-ফাউণ্ডেশনের সামনের পার্কটিতে বসা গেল। প্রোফেসার অনর্গল গল্প করিয়া যাইতে লাগিলেন, যত ভারততাত্ত্বিক পণ্ডিতদের কথা, ভারততত্ত্ব-ঘটিত বহু সমস্যার কথা, অনেক আধা-পণ্ডিতদের ভুল-চুক ইত্যাদি। ইনি অনেকদিন প্যারিসে ছিলেন, সেখানে সিলভ্যাঁ লেভির চক্রে বহু পণ্ডিত ও অনেক ভারতীয়দের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। প্রোফেসার স্মিট বই প্রকাশ করিয়াছিলেন অল্পই, কিন্তু অতি প্রখর-বুদ্ধি পণ্ডিত। প্যারিসে শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী, শহীদুল্লা প্রভৃতির সঙ্গে আলাপের কথা, ল্যুডার্স, লেভি প্রভৃতির পাণ্ডিত্যের ও বৈশিষ্ট্যের কথা, অন্যান্য ফরাসি ও ইংরেজ ভারততাত্ত্বিকদের কত যে গল্প করিলেন তার ইয়ত্তা নাই। পার্ক হইতে বাসা হইয়া ষ্টিমারে দেড়ঘণ্টা সাগরের মধ্য দিয়া প্রোফেসারের বাসায় লাঞ্চে গেলাম। ঠিক সন্ধ্যা ছয়টার সময় প্রোফেসার আবার আমাকে আমার বাসার দরজায় পৌঁছিয়া দিয়া-গেলেন। দশটা হইতে ছটা এই আট ঘণ্টা প্রোফেসার সমানে বকিয়াছেন, আমার কাছে হুঁ-হাঁ ছাড়া অন্য কিছুর অপেক্ষা রাখেন নাই। বাড়ীতে পত্নী ছিলেন ও ষ্টিমারে আমাদের সঙ্গেই আসিলেন পত্নীর একটি বান্ধবী, কাহাকেও কিন্তু প্রোফেসার দু'মিনিটের বেশী কথা বলিবার অবকাশ দেন নাই। এত দিনে যথার্থ একটি প্রোফেসারের (এ দেশে প্রোফেসার মানে আধ-পাগল!) পাল্লায় পড়িলাম। পার্ক হইতে উঠিয়া আমার বাসায় আসিয়া সাগরতীরে যাইবার সময় আমার মনে পড়িল প্রোফেসারের সঙ্গে ওভারকোট ছিল। সেটা পাওয়া গেল না, আমি বলিলাম, পার্ক হইতে তিনি তাহা আমার বাসায় আনেন নাই, এ কথা আমার বেশ স্মরণ আছে। খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, প্রোফেসার ল্যাণ্ডলেডিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাসার বাহির হইয়া, রাস্তার এদিক ওদিক ও হাতের ব্রীফব্যাগের মধ্যেও ওভারকোট খুঁজিলেন।

যত গল্প ইনি করিলেন, তাহা লিখিলে একখানা বড় বই হয়। অনেক মজার কথাও বলিলেন। প্যারিসের একটি ভারতীয়ের গল্প বলিলেন, এই ভদ্রলোকের ফরাসি শিখিবার জন্য সিলভ্যাঁ লেভি তাঁহার একটি ছাত্রীকে ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন। কিছুদিন পড়াশুনার পর ভদ্রলোক একদিন হঠাৎ ছাত্রীকে বলিলেন, "গভীর রাত্রি, ঘরে মাত্র আমরা দুইজন যুবক-যুবতী একা, যে কোনও মুহূর্ত্তে আমরা ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া যাইতে পারি। কিন্তু না, আমার ভয় নাই, ঘরে আরও একজন তৃতীয় ব্যক্তি আছেন, আমার ভগবান আমাকে দেখিতেছেন।"

ফরাসি মেয়ে তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, "কোন উঁর

নাই, আপনি নির্ভয়ে থাকুন। মনে রাখিবেন ঘরে চতুর্থও একজন আছেন, আমার ভগবানও আমাকে রক্ষা করিতে পারিবেন!" এইরূপ বহুসংখ্যক ভগবানের উপস্থিতিতে ধর্ম্মহানির ভয় হইতে নিবারিত হইয়া ভদ্রলোক অতঃপর শান্তচিত্তে লেখাপড়া করিতে পারিয়াছিলেন।

একটি পাঞ্জাবী মুসলমান রুশিয়া ঘুরিয়া প্যারিসে আসিয়া ছিলেন, তিনি গল্প করিলেন, তিনি স্বদেশীয় আরও অনেকের সঙ্গে রুশিয়ায় থাকিয়া ভারতে বিদ্রোহ ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশকে পীড়িত হইয়া হাসপাতালে যাইতে হইল। প্রোফেসার জিজ্ঞাসা করিলেন, কি রোগে তাঁহারা ভুগিতেছিলেন। মুসলমানটি বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রোগের নাম করিয়া নিজের কথা বলিলেন যে, তাঁহাকে ডাক্তার পাঠাইয়াছিলেন পাগলা-গারদে!

ফিরিবার সময়ে জলপথে ষ্টীমারে না আসিয়া স্থলপথে বাসে করিয়া সহরে ফিরিলাম। আমি একাই যাইতে পারিব বলা সত্ত্বেও প্রোফেসার আমাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতে চাহিলেন, বলিলেন, সহরে তাঁর কাজ আছে। বাড়ী হইতে বাসের ষ্টেশনে যাইতে বহুলোক পথে প্রোফেসারকে অভিবাদন করিল এবং প্রোফেসারও প্রত্যাভিবাদন করিলেন, "এদের সবাইকে আমি যে চিনি তা নয়, যদিও আমাকে এরা সবাই চেনে বলিয়া মনে হয়, যেমন চিড়িয়াখানার বাঁদরটাকে সবাই জানে, বাঁদর নিজে কাহাকেও চেনে না!" এইরূপ কত গল্প কত হাস্য-পরিহাস যে প্রোফেসার করিলেন তার গণনা নাই। এ দিনটার মত এত হাসি নাই আর কোন প্রোফেসারের সঙ্গসুখে।



সুইডেন মেয়েদের ব্যায়াম নৃত্য

কোপেনহেগেন-প্রসঙ্গে বুড়া প্রোফেসার ভিলেস আণ্ডারসেনের কথা বলিয়াছি; আণ্ডারসেন গ্রীষ্মের ছুটিতে এখানে অধ্যাপক স্মিটের বাড়ীর কাছে একটা পেন্‌সিওনে আছেন। একটি নূতন বড় পালি-অভিধান বানাইতেছেন আণ্ডারসেন ও স্মিট তাঁহাকে সাহায্য করিতে-ছেন। রোজ দুজনে একত্র বসিয়া কাজ করেন, অভিধান প্রকাশের অর্থভার বহিতেছেন ডেনিশ গবর্ণমেন্ট। স্মিট্ তাঁহার লাইব্রেরিতে দেখাইলেন তাঁহাদের কাজের সরঞ্জাম, ইহার এক পাশে দেখাইলেন বুড়া আণ্ডারসেনের বিভিন্ন আকারের গোটা পাঁচ-ছয় পাইপ। স্মিট্ বলিলেন, এই-গুলিই আণ্ডারসেনের পাইপের সব নয়, নিজের ঘরে আরও অনেকগুলা লম্বা লম্বা পাইপ আছে। গত দিনের কাজ রাত্রে আবার দেখিয়া যদি তাঁহার সন্তোষ হয়, তবে পরের দিন কাজে আসেন একটা লম্বা পাইপ ধরাইয়া, আর কাজ মনোমত না হইলে আসেন ছোট একটা পাইপ ফুঁকিতে ফুঁকিতে।

আণ্ডারসেনের বাসায় যাইয়া দেখা করিলাম বুড়া পণ্ডিতের সঙ্গে। কানে বড়ই কম শুনেন, চেহারা একটা বেঁটে মোটা কুমড়ার মত, বাগানে একা বসিয়া মোটা একটা সিগার টানিতেছেন। জানিতেন না যে আমি আসিব। বড়ই খুশী হইলেন আমাকে দেখিয়া (আমি আসিব জানিলে বোধ হয় হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বা পাইপটা

ধরাইয়া অপেক্ষা করিতেন।) নাম জিজ্ঞাসা করিলেন ও স্মিটকে বলিলেন, "অমূল্য" শব্দটা অভিধানে ধরা হইয়াছে তো! পালোয়ান দেখিলে বালকেরও ইচ্ছা হয় বাহ্বাস্ফোটন করিতে; এত বড় প্রবীণ পালি পণ্ডিতের সামনে বসিয়া বুদ্ধদেব সম্বন্ধে একটু যে লিখিয়াছি, তা বলিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। আণ্ডারসেন জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ভাষায় লিখিয়াছি? আমি বলিলাম বাংলায়। বুড়া চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন, আমি ভাবিলাম বুঝি বলিবেন "ভারি তোমার মাথা লিখিয়াছ!" খানিক পরে বিরস বদনে বলিলেন, "ও ভাষা তো আমি জানি না, দুঃখের বিষয় তোমার লেখা পড়িতে পারিব না।"

বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া স্মিট বলিলেন, পার্কে গিয়া দেখিবেন তাঁর ওভারকোটটা আছে কি না, নয় ত পুলিশকে জানাইবেন। বাগানে যদি ওভারকোট ফেলিয়া আসিয়া থাকেন, তবে নিশ্চয় কেহ উহা পুলিশের হাতে গচ্ছিত করিবে। অভাব ও দৈন্য নাই বলিয়া এ দেশে চোর ও ঠকের কারবার নাই। জার্মানিতে দেখিতাম ছাত্র-মহলে প্রায়ই ওভারকোট চুরি হইত। প্রোফেসার আরও জানাইলেন, ওভারকোটের খোঁজের জন্যই আমার সঙ্গে এ পর্য্যন্ত আসিলেন, ওভারকোট হারাইয়াছেন বলিলে স্ত্রী রাগ করিবেন, তাই কাজের অছিলা করিয়া আসিয়াছেন।

প্রোফেসারের বাড়ীতে লাঞ্চের মাঝখানে ষ্টকহলম্ হইতে টেলিফোন আসিল, একটা বড় খবরের কাগজ ইনটারভিউ করিতে চাহেন। দেওয়া গেল টেলিফোনেই এক ইণ্টারভিউ। ইণ্টারভিউ-এর পর সম্পাদক জানিতে চাহিলেন কটা আন্দাজ সহরে ফিরিব। বাড়ী ফিরিয়া দেখিলাম কাগজের ফটোগ্রাফার অপেক্ষা করিতেছে।

সুইডেনের মত সমৃদ্ধ অবস্থা এখন ইউরোপের আর কোনও দেশের নয়। লোকগুলিকে দেখিয়া মনে হয় পূর্ণ পরিতোষের সীমায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। কোন অভাব, কোন দুশ্চিন্তা নাই। অর্থোপার্জ্জন আছে, কাজ আছে; তারপর রোগপীড়া বা ভবিষ্যতের পূর্ণ সংস্থান আছে। ইহভবের কোন অভাব এদের নাই। তবুও একজন সুইডিশ সাংবাদিক বলিলেন, "আমেরিকানরা সুইডেন দেখিয়াই বলে, 'Sweden has solved all modern problems', কিন্তু এ কথা ঠিক নয়!"

কথা কও

—শ্রীসুশীল জানা

বৈশাখী সন্ধ্যায়—মূরছায় ঝিম্ ঝিম মূরছায়—
ঘর-ফেরা সন্ধ্যায় কোন্ ঘরে ছুটে যেতে মন চায়!
দূরদেশী স্বপ্নের নিরজন স্বপ্নের সুর সই
ডাক দিল আজ দূর বেদনায়।
চির-বিরহিণী মোর কথা কও কথা কও
আরেকে বারেকে সখি আজি ঘন ঘুম-ঘন সন্ধ্যায়।

দূরে বনে ডাহুকীর ডাক নাই হু-হু করা ডাক নাই,
ভিনদেশী তরণীর দূরাগত ঘর-ফেরা সুর পাই।
বিরহী সে রাখালের বাঁশরীতে মাঠভরা নাই ডাক—
হাহা করা হাতছানি নাই নাই।
কে তরণী বেয়ে যায়—চঞ্চল বৈঠায়
ঝলকি ঝলকি কহে ঘুম-ভাঙা সাঁঝে, ওগো যাই যাই।

মৌনা লতাটি মোর—কথা কও মিতা মোর কথা কও,
কাছে এসে পাশে বসে চোখে চোখ দিয়ে কেন দূরে রও!
ভাষাহারা ভাষা চোখে—অঞ্জনমাখা চোখে গুণ্ঠন,
কেন চির-জিজ্ঞাসা বুকে বও!
ওগো মোর বাণীহীন রাত্রির ছায়া-মায়া
আমি কি তোমার নই! প্রিয় কি তোমার নাই—কথা কও!

কথা কও বিরহিণী, তুমি কি রহিবে চির-উদাসীন!
বাজাইবে থম্-থমে ক্ষণগুলি সুরু দিয়া তীক বীণ?
মোর সমাধির পরে জেগে রবে লাজানতা লতা মোর,
ঢেকে রবে বুক দিয়ে চিরদিন!
সেদিনও শুধাবে তুমি ভাষাহারা আঁখি তুলে, তারপর?
একটি কথাও তুমি মুখ ফুটে বলিবে না কোন দিন।

নিরুপমার বাড়ি

—শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

জমীর দর পড়তে লাগল। দেখতে দেখতে সহরের মধ্যে যে সব দামী জমী দরের জন্য এতদিন পড়ে ছিল, এখন তাদের দর পড়ে যাওয়ায় সব প্রায় বিক্রী হতে চলল। আর সেই সব জায়গায় বড় বড় ইমারত গড়ে উঠে সহরের সহরে সৌন্দর্য্য ও কলেবর দুই-ই বৃদ্ধি হতে লাগল।

এবার নিরুপমা ধরেছে বাড়ী করতেই হবে। এ তার অনেক দিনের সাধ। নিজেদের একখানি বাড়ী। ঝক-ঝকে তকতকে। ছোটর মধ্যেই হক না—তবু তা হবে স্থাপত্য-পরিকল্পনায়—একটি ফুলের মতন।

জগদীশ বাবু অনেক দিন আগে স্ত্রীকে এই ধরণের একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। শোকের গুরুভারাচ্ছন্ন আবহাওয়াকে খেয়ালের চমকপ্রদ এক অভিনবত্বে হালকা করে দেবার ইচ্ছায় (কারণ সেই সময় তাঁদের একমাত্র সন্তান যকৃৎ-রোগে অনেকদিন ভুগে মারা যায়) নিজেদের একটি বাড়ী তৈরী করবার ইচ্ছা স্ত্রীর নিকট জ্ঞাপন করেন। তারপর নানা কারণে তা ঘটে ওঠে নি। প্রথমতঃ, অর্থের অভাব। তার পর যদি বা অর্থের সংস্থান হল, দ্বিতীয় কারণ এল, সময়ের অভাব। তিনি চাকুরী-জীবী এবং এই সব ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করবার মত তাঁর সংসারে আর কেউ ছিল না। কাজেই এতদিন পর্য্যন্ত জগদীশ বাবুর প্রতিশ্রুতি ও নিরুপমার সাধ পূরণ হবার সুযোগ-লাভ ঘটে নি।

কিন্তু এবার নিরুপমা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বাড়ী তৈরী করতেই হবে।

জগদীশ বাবুর সেই ছেলেটী মারা যাবার পর আর তাঁদের কোন সন্তানাদি হয় নি। বাড়ীতে স্বামী আর স্ত্রী, কাজেই এখনও পর্য্যন্ত পরস্পরের মধ্যে আব্দার, মান-অভিমানের খেলা আজও শেষ হয়ে যায় নি। তার ওপর নিরুপমার চোখ—সে চোখ টানা-টানা কি ভাসা-ভাসা, তা নিয়ে আলোচনা করব না, কিন্তু সেই চোখের দৃষ্টি-ভঙ্গিমার ইতরবিশেষে জগদীশ বাবুর এই পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সেও নানা অঘটন ঘটে গেছে।

অতএব জগদীশ বাবুর বাগ্‌দান হয়ে গেল - এবার বাড়ী তৈরী হবে।

এই সম্মতি লাভ করে কয়েক বছর আগে নিরুপমা কি করত বলা যায় না, কিন্তু এখন মধুর, অত্যন্ত মধুর করে হেসে, —যেন, 'এ আমি জানতাম, তুমি এ কথা ঠেলবে না—ঠেলতে পার না'—এই রকমের এক দ্রবণকারী দৃষ্টি দ্বারা জগদীশ বাবুকে বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত করে, জয়-গর্ব্বের সঙ্গে রমণী-ললামতার তরঙ্গ তুলে নিরুপমা বোধ করি কি একটা কাজের জন্য ঘর ছেড়ে চলে গেল আর জগদীশ বাবু আদুরে ছেলের মত আহ্লাদে নিজের মধ্যে মগন হয়ে উঠতে লাগলেন।

অবশেষে জমী দেখা হল, পছন্দ হল এবং পরিশেষে তা কেনাও হল। এ দিকে নিরুপমার হল স্বপ্নের সুরু। কেমন হবে তাদের বাড়ী। কখানা হবে তার ঘর। কেমন করে সাজাতে ও গোছাতে হবে। সামনে দোতলায় ছোট একটি বারান্দা। তার চারিদিকে ফুলের টব। সন্ধ্যাবেলা গরমের দিনে নিরুপমা সেইখানে শীতল-পাটি পেতে বসবে। দক্ষিণের হাওয়া ঝির-ঝির করে বইতে থাকবে। এটা তার চাই-ই। এ না হলে তার চলবে না।

ইতিমধ্যে বাড়ী আরম্ভ হল। বাড়ীর যে দিন ভিত্তি-স্থাপন হয়, নিরুপমা ধরে বসল, আজ সে তার কয়েকজন নির্ব্বাচিত বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে প্রথম মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হিসাবে নিমন্ত্রণ করবে। জগদীশ বাবু আপত্তি করলেন না। যদিও তাঁর ইচ্ছা ছিল, গৃহ-প্রবেশের দিন আমন্ত্রিতের সংখ্যা আর একটু বাড়ি অনুষ্ঠানটিকে বেশ একটু জমকাল করে এক খরচাতেই নিষ্পন্ন করবেন। কারণ খরচপত্রকে একদম উপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত নয়। বিশেষতঃ খরচের এই ত মাত্র আ

হল। আর পুঁজিও তাঁর এমন কিছু নয়। বরং তাঁর উচিত ছিল আরও কিছুদিন অপেক্ষা করা। তবে নেহাত নিরুপমা ধরেছে।

আহা! ওর অনেক দিনের সাধ। আর কেই বা তার আছে। স্বামী আর স্ত্রী। চলে যাবে একরকম করে।

বর্ত্তমানে যেখানে তাঁদের বাস, সেখান থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে তাঁদের নূতন বাড়ী হচ্ছে।

রাত্রে নিরুপমার ঘুম আসছিল না। আনন্দের উত্তেজনায় সে বসে ছিল। বাড়ীর ভিত্তি-স্থাপনের দিন সেই যে একবার গিয়েছিল, তার পর এতদিন চলে গেছে, আর একবারও যায় নি। এতদিন নিশ্চয় কাজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। কতদূর এগিয়ে গেছে দেখতে বড় ইচ্ছা করে। জগদীশ বাবুকে এক ঠেলা দিয়ে নিরুপমা জিজ্ঞেস করলে—হাঁ গা বাড়ী কতদূর হল?

জগদীশ বাবুর বোধ হয় ঘুম পেয়েছিল। তন্দ্রা-বিজড়িত স্বরে বললেন—হচ্ছে বৈ কি। অনেকটা হয়েছে।

নিরুপমার পক্ষে কৌতূহল রোধ করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। ঘুমন্ত জগদীশ বাবুর একটা হাত হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বললে,—বল কাল আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে দেখাতে?

দ্রবীভূত জগদীশ বাবু নিরুপমার হাতে একটু চাপ দিয়ে বললেন—বেশ ত, যেও।

বাড়ী দেখে নিরুপমা তেমন খুসি হল না। বাড়ীর সামনে ওঠবার সিঁড়িগুলি ও তৎসংলগ্ন রোয়াকটা নিরুপমা চেয়েছিল সাদা পাথরের হবে। কিন্তু তা হয় নি। তারপর সেই দোতলার বারান্দা—যার চারিদিকে থাকবে ফুলের টব, আর যেখানে সন্ধ্যাবেলা ঝির-ঝির করে বইতে থাকবে দক্ষিণের হাওয়া—নিরুপমার একান্ত ইচ্ছা ছিল সেখানটাও মার্বেল পাথরের হবে। জগদীশ বাবু ব্যয়-সঙ্কোচ করতে গিয়ে তাও করেন নি। তারপর মা গো! কি সব ছোট ছোট দরজা জানালা! কাঠগুলোও তেমন দামী নয়। তার কত সাধ ছিল জাফরী-কাটা জানালায় আস্তে আস্তে কাঁচের পাল্লা দেওয়া হবে। মেঝেগুলো অন্ততঃ মোজাইক হওয়া চাই-ই। বাড়ী যখন হচ্ছে, অন্তত ভদ্রতাসঙ্গত হোক।

নিরুপমা জিদ ধরল, না, ওসব না হলে চলবে না।

জগদীশ বাবু বললেন—তা এখন আর কি করে হয়। সব অর্ডার দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া অনেক জিনিস আবার তৈরীও হয়ে গেছে। এতে খরচও যে পড়ে যাবে বিস্তর। বরঞ্চ অবস্থার সাশ্রয় হলে পরে না হয় করা যাবে।

কিন্তু নিরুপমা তা বুঝবে না। তার মনে তার সই "তুলসীপাতা"র নূতন বাড়ীটির ছবি ভেসে উঠল। কি সুন্দর বাড়ী। যেন ছবির মত। গেলে দুদণ্ড বসতে ইচ্ছা করে।

নিরুপমা জিদ ধরল, না, এখনই সব করতে হবে। খরচ একবার যখন হতে আরম্ভ হয়েছে, তখন এক সঙ্গেই করা হোক, নইলে আর কখনোই এসব করা হয়ে উঠবে না। তা ছাড়া কি-ই বা এমন বেশী লাগবে। যদি বা লাগেই এমন কিছু, যখন এতই হচ্ছে তখন আর ঐ সামান্যের জন্য আটকে থাকবে কেন। বাড়ী তো তাদেরই। দশখানা বা বিশখানা নয়—ঐ একখানা বাড়ী। তাও যদি একটু মনের মত না হয়—লাভ কি বাড়ী করে। যদি বল মাথা গোঁজবার জন্য, সে তো টোং বেঁধেও চলে।

এর পর জগদীশ বাবুর আর কিছু বলবার নেই। সত্যিই তো, যদি ভাল করে করবার সঙ্গতি তাঁর না ছিল, তবে এ কাজে তিনি অগ্রসর হলেন কেন? স্ত্রীকে খুসী করতে? এ সব না করলে স্ত্রী তো খুসী হবে না। কিন্তু কথা হচ্ছে হিসেবের বিল নিয়ে। তবে যখন এতই হল, নয় দু' পাঁচশ ধার হবে। পরে এক সময় শোধ করে দেবেন।

হলও তাই। পুনরায় মিস্ত্রী এল, নূতন করে দরজা জানালার মাপ নেওয়া হল, দেওয়াল গাঁথা হল, ভাঙ্গা হল এবং সামনের রোয়াক ও ওপরের বারান্দা ইঁটের পরিবর্ত্তে শুভ্র স্নিগ্ধ মর্ম্মর-মণ্ডিত হয়ে ঝকঝক করে উঠল।

এই ব্যাপারে জগদীশ বাবুর কিছু ধার হল। তাঁর এক বন্ধু এই টাকাটা ধার দিলেন। জগদীশ বাবু কি

জানি কেন ঘটনাটি নিরুপমার কাছে লুকিয়ে গেলেন।

বোধ হয় তাঁর পৌরুষের হানিকর বলে।

দেখতে দেখতে বাড়ী তৈরী হয়ে গেল। নিরুপমার উৎসাহের আর অন্ত নাই। কবে সে তাদের সেই ছোট্ট বাড়ীতে—সোনার বাড়ীতে গিয়ে উঠবে।

অবশেষে এল গৃহপ্রবেশের দিন। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় জগদীশ বাবুর বেশ একটু মোটা রকমের খরচ হয়ে গেল। কিন্তু তখন আর সেদিকে তাকাবার সময় নেই। বাড়ী তাঁর—তারই উপযুক্ত সম্মানও তাঁর। এখন তাঁকে এই বাড়ীর মালিকের মতই থাকতে হবে। নিরুপমার আদেশ এল—বাড়ী ত যাচ্ছি, কিন্তু বাড়ীর আসবাব-পত্র কৈ? এই সব পচা, পুরনো, তিন-কাল-গিয়ে-এক-কালে-ঠেকা টেবিল, চেয়ার নিয়ে ও-বাড়ীতে গিয়ে আমি উঠতে পারব না, সে তোমায় আগেই বলে রাখছি। তার চেয়ে বরং আমি এইখানেই পড়ে থাকব।

নূতন বাড়ীতে নূতন আসবাব-পত্র না হলে মানাবে কেন? খরচের নেশা সব নেশার চেয়ে সংঘাতিক। একবার গড়াতে আরম্ভ করলে ভাঁড় মধুহীন না হওয়া পর্য্যন্ত তার আর শেষ হয় না। জগদীশ বাবু পুনরায় বন্ধুটির বাড়ীতে গেলেন এবং আরও কিছু ধার করলেন।

যথাসময়ে আসবাব-পত্র এল। নিরুপমারও লেগে গেল বাড়ী গোছাবার ধুম। সে এক দারুণ উত্তেজনা। সেই উত্তেজনার স্রোতে তৃণখণ্ডের মত জগদীশ বাবু ভেসে গেলেন। বাড়ীতে জমা হতে লাগল, জিনিসপত্রের স্তূপ। ছবিতে, আলমারীতে, টেবিলে, চেয়ারে, বিছানায়, বাক্সে সে বাড়ী রীতিমত এক দোকান হয়ে উঠল। নিরুপমার হাঁফ ফেলবার সময় নেই। তার উত্তেজনার শেষ নেই। এক বস্তু থেকে আর বস্তুতে তার মন ফড়িংএর মত লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে লাগল। কিন্তু মুস্কিলে পড়লেন জগদীশ বাবু, তাঁর ক্রমশূন্যমান তহবিল নিয়ে। সেই লম্ফমান গতির সঙ্গে পা ফেলতে গিয়ে তিনি প্রতিবারেই হোঁচট খেতে লাগলেন, কিন্তু নিবারণ করতে পারলেন না।

মাতৃত্বের মধ্যে যে প্রাণশক্তি রূপান্তরিত হয় নি, তার এই বিপুল, উদ্দেশ্যহীন উন্মত্ত প্রবাহের সম্মুখে বিস্মিত, মুগ্ধ জগদীশ বাবু নীরবে চেয়ে রইলেন।

আজকাল নিরুপমাকে যেন ছেলেমানুষের মত দেখায়। যতই দিন যাচ্ছে, ততই যেন নিরুপমার বয়স কমে আসছে। তার স্বাস্থ্য যেন ঝরে পড়ছে। সে সুন্দরীই ছিল। কিন্তু এখন যেন সেই সৌন্দর্য্য বয়সোচিত নিটোলত্বে বা নিবিড়ত্বে না গিয়ে কেমন এক বালিকা-সুলভ চপলত্বে এসে উৎসারিত হয়ে পড়েছে।

তার কারণ নিরুপমা যেন পুনরায় তার বালিকা-মনের আনন্দকে ফিরে পেয়েছে। এ যেন তার সেই ছোট বেলার পুতুল-খেলার ঘর—কেবল আরও বড়, আরও ব্যাপক। এই ঘর, এই বাড়ী, এই সব আসবাব-পত্র সেই রকমই অভিনিবেশ ও দায়িত্বহীন খুসীর খেয়ালে সে ঝাড়ে, মোছে ও সাজায়, যেমন সে ছেলেবেলায় তার ছোট খেলাঘরে করত। তফাৎ শুধু তখনকার সে খেলার সাক্ষী ছিল মুগ্ধ পিতা-মাতা, আর এখন মুগ্ধ জগদীশ বাবু।

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ থাকলেও নিরুপমার তৃপ্তির খাদ্য প্রায় সমভাবেই আহৃত হতে লাগল।

ইতিমধ্যে জগদীশ বাবুকে আরও কিছু টাকা তাঁর সেই বন্ধুর কাছ থেকে নিতে হয়েছে। বাড়ীর সামনের জমিটা ঐ ভাবে ফেলে রাখা উচিত নয়। বাড়ীর সৌন্দর্য্যই হল বাগান। অতএব জমীটাকে একটা ছোটখাট বাগানে পরিণত করা হোক, নিরুপমা একদিন এই রকম ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু বাগান করবে কে? পুনরায় তর্ক-বিতর্কের সুরু হল এবং শেষে ঠিক হল এক জন মালী নিযুক্ত করা হবে। সে জমীতে ফল ও ফুল দুই-ই চাষ করবে। সেই ফুল ও ফল তাদের দরকার মত কিছু রেখে দিয়ে বাকীটা বেচে দেওয়া হবে। জমীরই আয় থেকে চাষের ও মালীর খরচের বন্দোবস্ত করা হবে। তবে, প্রথমটা অবশ্য জগদীশ বাবুকে কিছু টাকা ফেলতে হবে, যে টাকাটা তিনি পরে আস্তে আস্তে তুলে নেবেন।

অতএব তিনি পুনরায় কিছু ধার করলেন। পরে মালী এল, ফুলের চাষ হল, শাক-সব্জীর ক্ষেত হল, কিন্তু জমীর আয় কিছু হল না। যা শাকসব্জী হল, তার কিছুটা গেল জগদীশ বাবুর রান্না-ঘরে, কিছুটা বিতরিত হল পাড়ার

প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে, কিছুটা গেল মালী ও মালীর বন্ধু-বান্ধবের কপালে এবং অল্প কিছুটা বিক্রিও হল, কিন্তু তার হিসাব মালী ছাড়া আর কেউ জানল না।

জগদীশ বাবু প্রথম থেকেই ধারের কথা স্ত্রীর কাছে গোপন রেখেছিলেন। প্রথমটা অল্প ধার করেছিলেন। ভেবেছিলেন যেমন লুকিয়ে ধার করলেন, সেই রকম লুকিয়েই শোধ দেবেন, ধারের হীনতা নিয়ে স্ত্রীর সামনে দাঁড়াবেন না।

তা ছাড়া তাঁদের আনন্দের, সুখের, গর্ব্বের এই নবলব্ধ বর্ণচ্ছটাকে এই স্বীকারোক্তির গ্লানিতে কেমন করে তিনি মসীলিপ্ত করে দেবেন? নিরুপমার আনন্দোজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে তা তিনি কিছুতেই পেরে উঠতেন না। এ ছাড়াও, আর একটা অনুভূতির আবিলতা প্রায় নেশার মত তাঁকে গ্রাস করতে বসেছিল। এ তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে এক নব-স্থাপিত সম্বন্ধ। এতদিন পরে নিরুপমা সত্যিই যেন তাঁর হাত ধরে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। কোমলতার প্রবণতায়, আন্তরিকতায় সে যেন নূতন করে জগদীশ বাবুর কাছে ধরা দিয়েছে। অকস্মাৎ তাঁর গতানুগতিক জীবনে কোথায় যেন ছেদ পড়েছে; আর সেই সঙ্গে অন্য এক দ্বার-পথ মুক্ত হয়ে জোয়ারের মত এক নব প্রাণ-স্পন্দন সঞ্চারিত হচ্ছে।

আর সেই প্রাণ-স্পন্দনের অধিষ্ঠাত্রী হল নিরুপমা।

এই বাড়ী এবং এই বাড়ীর সম্পর্কিত যা কিছু, সে সমস্তকে কেন্দ্র করে—বার বৎসর বিবাহিত জীবন যাপন করার পর—আবার যেন তাঁরা এক নব মিলন-সূত্রে গ্রথিত হতে চললেন।

অন্তঃপুর জগদীশ বাবুকে প্রায় গ্রাস করে ফেলেছে। বেগতিক দেখে বন্ধু-বান্ধব একে একে বিদায় নিয়েছে। জগদীশ বাবু এখন প্রতীক্ষায় থাকেন কখন সন্ধ্যা হবে; কখন তিনি নিরুপমার সঙ্গ পাবেন।

সেই দোতলার বারান্দায়, গা ধুয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে (আজকাল নিরুপমা পোষাক-পরিচ্ছদে অত্যন্ত মনোনিবেশ করেছে) সিঁদুরের টীপটি পরে, পান খেয়ে ঠোঁট দুটি লাল করে নিরুপমা বসে আছে। কর্ম্মহীন, দায়িত্বহীন অলসতার মৃদু ভারে সমস্ত শরীরে শিথিলতার কেমন এক ঢলঢলে লাবণ্য ছড়িয়ে পড়েছে। সে লাবণ্যে মানুষ আকৃষ্ট হয়, স্পর্শে আনন্দ লাভ করে। সে লাবণ্যের অন্যায়কে মানুষ ক্ষমা করে না কিন্তু মেনে নেয়; তাকে তিরস্কার করতে মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

এই আবর্ত্তে পড়ে যখন জগদীশ বাবু হাবুডুবু খাচ্ছিলেন, তখন তাঁর সেই বন্ধু একদিন তাঁকে ডেকে বললেন—দেখুন, আমার জন্যে নয়, তবে ছেলেরা এখন বড় হয়েছে আর বিষয়-কর্ম্মও তারাই আস্তে আস্তে বুঝে নিচ্ছে। টাকাটার —অবশ্য কিছু মনে করবেন না—এখন বড় দরকার। আর তা ছাড়া পরিশোধ করবার সময়ও প্রায় হতে চলল। এখন কি তারা শুনবে? জগদীশ বাবু শুনে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন—সত্যিই ত।

ঠিক হল এক মাসের মধ্যে তিনি টাকাটা দিয়ে দেবেন। চিন্তিত হয়ে জগদীশ বাবু বাড়ী ফিরলেন। কিন্তু টাকা কোথায়? এক মাস অবশ্য সময় আছে। কিন্তু এক মাসের মধ্যে টাকাটা জোটাবেন কোথা থেকে! প্রথমে মনে করলেন—নিরুপমাকে বলবেন। কিন্তু পর-মুহূর্ত্তে অতিশয় লজ্জিত হয়ে পড়লেন। এতদিন পরে কেমন করে তিনি বলবেন! আর তা ছাড়া কি-ই-বা তিনি বলবেন। তাকে বলতে হলে অন্তত এই কথা তাকে বলতে হবে—এই যে বাড়ী-ঘর-দুয়োর; এই যে তোমার এত সাধের বাগান; এই মার্ব্বেল পাথরের বারান্দা, যা তুমি এতদিন ধরে তোমার বলে জেনে এসেছ, এ সব তোমার নয়। পরের ঐশ্বর্য্যে, প্রায় চুরি করে এ সব তৈরী হয়েছে। এই যে কূলে কূলে ছাপিয়ে তাদের বর্ত্তমান সম্বন্ধ উপ্‌ছে উপ্‌ছে পড়ছে, এর পেছনে রয়ে গেছে ফাঁকি। তিনি নিরুপমাকে ঠকিয়েছেন। পরের ঐশ্বর্য্য, পরের বিত্ত দেখিয়ে (অনেকটা সেই রকমই দেখায়) তিনি তার ভালবাসা আদায় করেছেন। তিনি তার ক্ষমতাকে গোপন করেছেন। তা ছাড়া তাকে জানিয়ে কোন লাভও নেই। কি করবে সে জেনে! লাভের মধ্যে সে পাবে আঘাত, মনো-ভঙ্গ-জনিত দুঃখ। না, স্ত্রীকে তিনি কিছুই জানাবেন না।

দেখতে দেখতে মাস কেটে গেল। টাকার যোগাড় কিছুই হল না। ধার করা ছাড়া কোন উপায় নেই।

শেষে এক বন্ধু পরামর্শ দিল। বাড়ী বন্ধক রেখে টাকা নাও। বন্ধক রাখলে কিছু বেশী টাকা পাবে। সেই টাকায় আগেকার ধার শোধ গিয়েও তোমার হাতে কিছু থাকবে। তখন তাই নিয়ে কিছু একটা ব্যবসা করে হাতে কিছু টাকা জমিয়ে ফেল। পরে বন্ধকী বাড়ী খালাস করে নিও।

আর কোন উপায় ছিল না। অতএব জগদীশ বাবুকে এতেই সম্মতি দিতে হল। কিন্তু গোলযোগ গেল না। বাড়ীটা তিনি নিরুপমার নামে করে দিয়েছিলেন। এখন ত নিরুপমাকে সমস্ত ব্যাপার খুলে বলতেই হবে। নিরুপমা যদি রাজী না হয়। যদি সে কাঁদা-কাটা করে! কিন্তু উপায়ই বা কি?

সেইদিন রাত্রে জগদীশ বাবু স্ত্রীকে সমস্ত খুলে বললেন। সমস্ত শুনে নিরুপমা বললে—এতদিন এ সব কথা জানাও নি কেন? তোমার নিজের কাছে টাকা নেই, অথচ ধার করে এ সব করবার বোকামি তোমাদের কেমন করে হয় তা তোমরাই জান। প্রথমেই যদি সব আমায় খুলে বল, তবে কি এই সবের মধ্যে তোমায় যেতে দিই।

জগদীশ বাবু এ রকম জবাব স্ত্রীর কাছে প্রত্যাশা করেন নি। নিরুপমার উপদেশ ও অনেকটা এই রকম নির্লিপ্ত ব্যবহারে তিনি যেন একটু ক্ষুব্ধ হলেন। দোষটা যেন সম্পূর্ণরূপে তাঁর। নিরুপমা কি এর জন্য একটুও দায়ী নয়? তিনি সব করেছেন সত্য, কিন্তু সে ত নিরুপমারই জন্য।

তাই খানিকটা ক্ষীণ কণ্ঠে জগদীশ বাবু উত্তর দিলেন, কিন্তু এ সব ত তোমারই জন্যে করেছি। তুমিই ত চেয়েছিলে এ সব। উত্তরটা জগদীশ বাবুর বয়সোচিত হল না। যদিও তিনি বলতে চেয়েছিলেন, তাঁর অন্তরের এক গভীরতম কথাকে। প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন অভিমান-অনুরাগে অন্তর্লীন গোপন অনুযোগটিকে।

নিরুপমা কিন্তু এক মুহূর্ত্তে বর্ষিয়সী হয়ে বাস্তবে এসে দাঁড়িয়েছে। তাই জগদীশ বাবুর গলার স্বরকে উপেক্ষা করতে তার বাধল না।

উত্তর এল—আমি চেয়েছিলাম সত্যি, কিন্তু আমি কি তোমায় ধার করে করতে বলেছিলাম?

জগদীশ বাবুর যেটুকু স্বপ্ন বাকি ছিল, তাও ধূলিসাৎ হল।

* * *

তার পর পাঁচ বৎসর কেটে গেছে। জগদীশ বাবু বাড়ী বন্ধক রেখে পূর্ব্ব-দেনা পরিশোধ করেছেন। এখন প্রাণপণ পরিশ্রম করছেন, বর্ত্তমান ঋণ পরিশোধ করতে। নিরুপমা একে একে ঠাকুর, ঝি, চাকর সব ছাড়িয়ে দিয়ে একা সংসারের সমস্ত কাজ করে চলেছে। জগদীশ বাবু অনেক অনুযোগ ও অনুরোধ করেছিলেন, অন্ততঃ একটি ঝি রাখবার জন্য। নিরুপমা কিন্তু তা শোনে নি। প্রত্যেকটী পয়সা এখন তার কাছে এক এক ফোঁটা রক্তের মত। যক্ষীর মত সেই পয়সা সে বাঁচিয়ে চলেছে। নিজেকে পাত করে সে সংসারের সাশ্রয় করবেই। নিরুপমাকে দেখলে এখন আর চেনাই যায় না। পরিশ্রমে তার শরীর অনেক ক্ষয়ে গেছে। বর্ণের সে লালিত্য নেই; শরীরের সে যত্ন নেই; শুষ্যমান প্রদীপের মত সে কোন রকমে জ্বলে চলেছে।

জগদীশ বাবু এখন অধিকাংশ সময় বাইরেই কাটান এবং অনেক রাত্রে বাড়ী ফেরেন।

কোন দিন এক আধটা কথা নিরুপমার সঙ্গে হয়, কোন দিন তাও হয় না। এতে কেউ দুঃখিত বা অভাব বোধ করে না। সংসারের এখন বাহুল্য বলতে কিছুই নেই। প্রত্যেকেরই নিজের নিজের ভাববার বা করবার যথেষ্ট রয়েছে।

পাঁচ বৎসর কেটেছে। আরও পাঁচ বৎসর এমনি ভাবে কাটাতে পারলে, এই ঋণ তাদের শোধ হবে।

পাঁচ বৎসর—কাজের অবসরে কথাটা মনে করতে জগদীশ বাবুর শরীরটা কেমন ঝিমিয়ে পড়ে, আর অন্তঃপুরের অন্তরালে নিঃশ্বাস ফেলে নিরুপমা ভাবে—আর এখন চোখ দুটো বুঁজলেই বাঁচি!

বিচিত্র জগৎ

সুইডেনের পল্লীপ্রান্ত

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

জনৈক মার্কিন লেখিকার পূর্ব্বপুরুষগণ সুইডেনে বাস করিতেন। ইনি নিজেও বাল্যকালে কিছুদিন সুইডেনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে নিউইয়র্ক-বাসিনী হওয়া সত্ত্বেও স্মৃতির টানে মাঝে মাঝে সুইডেনে কিছুকাল কাটাইয়া থাকেন। ইঁহার লিখিত বিবরণ পড়িলে সুইডেনের পল্লীপ্রান্ত সম্বন্ধে আমরা এমন অনেক কথা জানিতে পারি, যাহা সাধারণ ভ্রমণকারীদের চোখে পড়ে না। নিম্নে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

সুইডেনের পল্লী-অঞ্চলের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক যে ধরণের রক্ষণশীল ও দেশের পুরাকালীন বা বংশানুগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে যত্নবান, এমন পৃথিবীর আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ।

এঁদের জানা খুব সহজ নয়। বিশেষ করে পল্লীবাসী ভদ্রলোক যাঁরা, তাঁরা বাইরের লোকের সঙ্গে মেলামেশা বড় একটা করেন না—গ্রাম ছেড়ে বড় কোথাও যান না, নিজের গ্রামে নিজের জমিদারীতে বাস করেন। কাজেই বিদেশী ভ্রমণকারিগণ এঁদের ভেবে থাকেন গর্ব্বিত ও অসামাজিক। আসলে কিন্তু এঁরা তা নন, শুধু খানিকটা আনাড়িপনা ও নিজেকে গোপন করে রাখবার প্রবৃত্তি থেকে এটা হয়েছে। এখানে ইংরেজের সঙ্গে ওঁদের মিল আছে।

আমি জাতিতে সুইডিশ এবং আমার বাল্যকাল সুইডেনে কেটেছে। তারপর আমি আজ বাইশ বছর আমেরিকায় আছি—সুতরাং আমার পক্ষে উভয় দেশের সামাজিক জীবন সম্বন্ধে পার্থক্য লক্ষ্য করার যথেষ্ট অবকাশ ঘটেছে। আমার মনে হয়, সুইডেনের গৃহ ও গার্হস্থ্য-জীবন পৃথিবীর মধ্যে আদর্শ স্বরূপ—বহু শতাব্দীর ঘাত-প্রতিঘাত ও শিক্ষা-দীক্ষায় এদের মধ্যে এমন একটা মধুর গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের সৃষ্টি হয়েছে—বিশেষ করে সুইডেনের পল্লীগ্রামের বনেদী ভদ্রলোকদের গৃহে—যা পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় কি না সন্দেহ।

গত শীতকালে ন' বছর পরে আমি আবার দেশে ফিরেছিলাম এবং পাঁচ মাস সেখানে ছিলাম। সে সময় অনেক পুরাণো জায়গা আবার দেখে বেড়িয়েছি, বাল্যকালের অনেক পরিচিত বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আবার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে।

এবার অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল সুইডেনে থেকে বুঝতে পেরেছি যে, বিগত মহাযুদ্ধ যদিও সুইডেনকে স্পর্শ করে নি, কিন্তু তার পরবর্ত্তী অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত সুইডেনকেও বেজায় ধাক্কা দিয়েছে।

তবুও এখনও এমন সব বনেদী বংশ আছে, যারা পূর্ব্বের মর্য্যাদা ও বনেদী চাল কিছু কিছু বজায় রাখতে সমর্থ। সুইডেনের ভূমি-বন্দোবস্তের স্থায়িত্ব অনেকটা এর জন্য দায়ী।

কিন্তু বড় বড় জমিদারের অবস্থা সুইডেনে একেবারেই ভাল নয়—প্রত্যেক মাসেই এদের জমি বা বাড়ী নীলামের ইস্তাহারে উঠছে। অনেক সময় জমিদারেরা পৈতৃক প্রাসাদ আঁকড়ে পড়ে আছে এই জন্য যে, ছেড়ে গেলে তাদের অনুচরেরা মহাকষ্টে পড়বে। এক এক জমিদারের বহু অনুচর, তারা কোথায় দাঁড়াবে, আজ যদি মনিব তাদের ফেলে চলে যায়?

সব দেশেই যে সমস্যা, সুইডেনেও সে সমস্যা প্রবল। অর্থাৎ কৃষিকার্য্য আর তেমন লাভজনক নেই। শিল্পের সঙ্গে কৃষি সংগ্রাম করে পেরে উঠছে না। গবর্ণমেণ্ট থেকে অবশ্য যথেষ্ট চেষ্টা চলছে কৃষি-কার্য্যকে পুনরায় লাভবান করাবার, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত বিশেষ কোন ফল দেখা যায় নি।

বাইরে থেকে কয়লা আমদানী বন্ধ করার জন্য সুইডেনে আন্দোলন চলছে যে, গৃহস্থের বাড়ীতে ও সমস্ত সরকারী অফিসে, স্কুল-কলেজে সুইডেনে উৎপন্ন কাঠ পোড়াতে হবে।

আমার কাছে ল্যাকো-কাস্‌ল্‌ সুইডেনের প্রাচীন বৈশিষ্ট্য ও আভিজাত্যের প্রতীক। এই সুবৃহৎ প্রাচীন প্রাসাদ ভানের্ণ হ্রদের এক দ্বীপে অবস্থিত।

আমার শৈশব ও বাল্যদিনের মধুর স্মৃতির সঙ্গে ল্যাকো-কাস্‌ল্‌ জড়িত। আমার একজন পূর্ব্বপুরুষ ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে

যাতায়াতের পথগুলি আমাদের শিশুমনে এক অপূর্ব্ব ভয় ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করত।

একটি ঘর বিশেষ করে আমাদের বড় কৌতূহলের বস্তু ছিল।

এখানে ম্যাগ্‌নাস গেব্রিয়েলের মাতা সুন্দরী এবা ব্রাহী বাস করতেন। বিখ্যাত বীর গষ্টেভাস্‌ এডলফাসের যৌবনকালে ইনি ছিলেন তাঁর প্রণয়িনী।

আমরা কখন কখন প্রাসাদের পরিত্যক্ত ও বনাকীর্ণ



উপসালা : চারি শতাব্দীর প্রাচীন প্রাসাদ। কুইন ক্রিশ্চনা এইখানে সিংহাসন পরিত্যাগ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য উপসালা বিখ্যাত।

রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে বীরত্ব-প্রদর্শনের পুরস্কার স্বরূপ এই প্রাসাদ রাজার নিকট পুরস্কার পেয়েছিলেন এবং তাঁর বংশধরেরা বহুদিন এখানেই বাস করেছিলেন।

তখন প্রাসাদটি ছিল বাসের অযোগ্য ও ভগ্ন অবস্থায়। আমার সেই পূর্ব্বপুরুষ আমার পিতামহের ভ্রাতা—এখান থেকে কিছুদূরে আর একটা বাড়ীতে বাস করে এটাকে মেরামত করে বাসযোগ্য করে তোলেন। মনে পড়ে, এই প্রাসাদের ২৫০টি কামরা, গুপ্ত কারাকক্ষ ও অন্ধকার

উদ্যানে কোন গাছতলায় বসে অতীত দিনের কথা ভাবতাম—বাল্যের সে সব কত মধুর স্বপ্ন!

এখন এই প্রাসাদ আর আমাদের হাতে নেই—গবর্ণমেণ্ট থেকে এটাকে কিনে নিয়ে মেরামত করা হয়েছে। প্রাচীন দিনের নিদর্শন হিসেবে একে সযত্নে রক্ষা করা হচ্ছে।

ল্যাকো-কাস্‌ল্‌ একটা সুদৃঢ় দুর্গের মত। তখনকার দিনে জীবনযাত্রা ছিল গুরুত্বপূর্ণ ও সঙ্গীন, মানুষকে সর্ব্বদা

যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত থাকতে হত। জানালাগুলো এমন ভাবে তৈরী, যেন তা থেকে তীর ছোঁড়া যায়।

তারপর দুর্দ্দিন কেটে গেলে এই সব দুর্গ-প্রাসাদকে বাসোপযোগী করা হল—নতুন নতুন ঘর তৈরী করা হল।



স্কিয়োনের ভাইভিলেসিঙ্গের প্রাচীন প্রাসাদ-দুর্গ

এই সব প্রাচীন প্রাসাদ-দুর্গের মধ্যে স্কায়হোল্ট, ভিটস্কোভ্‌লি ও টরুপ স্মবিখ্যাত। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে নতুন ধরণে রেনেসাঁস-যুগের স্থাপত্য-রীতি অনুযায়ী গঠিত এই সব প্রাসাদ সুইডেনের গৌরব-স্বরূপ।

টরুপ প্রাসাদের বর্ত্তমান অধিকারিণী ব্যারনেস্ হেন্‌রিয়েট্ কোয়েট্। এঁর সঙ্গে বর্ত্তমান রাজপরিবারের সকলের সঙ্গেই খুব সখ্য আছে। তাঁর প্রাসাদে বড় বড় সাহিত্যিক ও শিল্পীদের সর্ব্বদা সমাগম হয়। গণ্য মান্য নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত বিখ্যাত সাহিত্যিক বা বৈজ্ঞানিক যখন সুইডেন বেড়াতে আসেন, তখন টরুপ-প্রাসাদে তাঁদের আমন্ত্রণ হয়ে থাকে। ব্যারনেস্ কোয়েট সর্ব্বদা উচ্চপ্রতিভাশালী ব্যক্তিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতে ভাল বাসেন।

ব্যারনেসের রুচি শুধু একদিকেই আবদ্ধ নয়।

টরুপ প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানে তিনি অনেক নতুন ধরণের গাছ ও ফুল-ফলের আমদানী করেছেন। তাঁর ভৈষজ্য-উদ্যান দেখতে বিদেশ থেকে উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ ব্যক্তিরা আসেন। নানা দেশের দুর্ল্লভ ভেষজ লতাপাতা এখানে সযত্নে রোপণ করা ও লালন-পালন করা হয়েছে—বিশ্ববিখ্যাত লেখিকা সেলমা লাগেরলফ কতবার এসেছেন টরুপ-প্রাসাদের ভৈষজ্য-উদ্যান দেখতে।

আমার মাসীমার পল্লীপ্রাসাদ ওডেন্‌স্‌ভিহল্‌সে গত শরৎ-কালে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়েছিলাম। সেখানকার জীবনযাপনের প্রণালী বর্ণনা করলেই সুইডেনের পল্লীবাসী বনেদী ভদ্রপরিবারের জীবন কি ভাবে কাটে মোটামুটি বলা হবে।

উপরোক্ত গ্রামে মাসীমার বিস্তৃত জমিদারী আছে। সেখানকার সব কাজকর্ম্ম এখনও প্রাচীন রীতি অনুযায়ী নিষ্পন্ন হয়। তাঁর জমিদারীতে এখনও কোনো কমুনিষ্ট প্রবেশ করে নি, তাঁর পরলোকগত স্বামী যে ভাবে জমিদারী চালাতেন, এখনও সেই পদ্ধতিতেই জমিদারী চালান হয়।



টরুপ প্রাসাদ দুর্গের অধিকারিণী ব্যারনেস হেনরিয়েট্ কোয়েট্ (বামে) তাহার বিখ্যাত লেখিকা বান্ধবী সেলমা লাগেরলফকে (ডাহিনে) টরুপ প্রাসাদ-দুর্গের ভেষজ উদ্যান দেখাইতেছেন।

প্রজা ও মজুরেরা তাঁর জমিদারীতে বেশ সুখে ও শান্তিতেই বাস করে।

এঁদের জমিদারীতে নিয়ম আছে, মজুরেরা যতদিন কাজ

করতে পারে, ততদিন জমিদারীর কাজ-কর্ম্ম করে, তাদের বাসের জন্য জমিদার ছোট ছোট কাঠের ঘর তৈরী করে দিয়েছেন। এরা স্ত্রীপুত্র নিয়ে এই সব ঘরে বাস করে। কিন্তু বৃদ্ধ ও অশক্ত হয়ে পড়লে তাদের দান-সত্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

এই দান-সত্র জমিদারের খরচেই চলে। বৃদ্ধ ও অশক্ত মজুরেরা জমিদারী থেকে ভাতা পায়।

কিন্তু ওরা হঠাৎ তাদের ঘর-বাড়ী ছেড়ে দান-সত্রে আশ্রয় নিতে চায় না—যতদিন একেবারে অশক্ত না হয়ে

বনের গাছ কেটে কেটে বিক্রী করা হয়—জমিদারীর প্রধান আয়ই কাঠ-বিক্রীর। এখন বোঝা যাবে, বৃদ্ধ মজুরদের শেষ বয়স পর্য্যন্ত চাকুরীতে রেখে দিলে জমিদারীর কত ক্ষতি এবং জমিদারকে কতটা ক্ষতি বহন করতে, হয় এদের রেখে দিতে গিয়ে। তরুণবয়স্ক মজুরেরা এদের দ্বিগুণ কাজ করে, বড় বড় গাছ কাটার মত পরিশ্রম-সাধ্য কাজ বৃদ্ধ মজুরদের দিয়ে ভাল হয় কি?

তবুও তাদের রাখতে হয়, কারণ সুইডেনের জমিদারদের তাই নিয়ম।



সিলজান হ্রদ (প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ)। এই অপূর্ব্ব সুন্দর হ্রদটিকে 'ডালার্নার আঁখি' নাম দেওয়া হইয়াছে। বনের কাঠ কাটিয়া ভেলা বাঁধিয়া হ্রদে এবং নদীপথে ভাসাইয়া কাঠের কারখানায় লইয়া যাওয়া হয়। হ্রদের বুকে স্তূপীকৃত কাঠের ভাসমান ভেলা দেখা যাইতেছে।

পড়ে, ততদিন কাজ করে। সুইডেনের কৃষক ও মজুর শ্রেণীর লোকে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বড় ভক্ত, ওদের কুটিরগুলি প্রায়ই বন ও হ্রদের ধারে, শান্ত ও নির্জ্জন স্থানে। প্রত্যেক গৃহের সামনে ছোট ছোট বাগান, বাগানে ফলমূল ও শাকসব্জীর চাষ আছে, নানা ধরণের সুখ আছে, সে হিসাবে ওদের জীবন খুবই সুখের।

সাধে কি ওরা ওদের কুটির ছেড়ে যেতে চায় না?

মাসীমার জমিদারীতে বার হাজার একর জমিতে বন আছে।

এই বার হাজার একর জমির বন খুব ভাল অবস্থায় রক্ষিত হয়ে আসছে। বন-বিভাগের বোর্ডের আইন আছে, একটা গাছ কাটলেই তার জায়গায় নতুন গাছ একটা লাগাতে হবে।

এই বন-বিভাগের বোর্ডের সুদক্ষ পরিচালনার ফলে আজ সুইডেনের অরণ্যের অবস্থা যথেষ্ট উন্নত। সমগ্র দেশের জমির শতকরা ষাট ভাগে শুধু বন, সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় পাঁচ লক্ষ আশী হাজার একর বন।

আমার মাসীমা যে শুধু বন সুরক্ষিত রেখেছেন তা নয়,

তাঁর ফলের বাগান, শূকর ও মুরগীর চাষ সমগ্র জেলার দৃষ্টান্ত-স্থল। এ সব ছাড়া তিনি বিদেশে ডিম চালান দেবার একটা সমিতিও স্থাপন করেছেন।



[illegible] দের কালেচিত্রা প্রাসাদ-দুর্গে কুইন ক্রিস্টিনার শয়নকক্ষ। [illegible] এখনও অবিকল সেইরূপ রক্ষিত হইয়াছে।

[illegible] মাসীমার জমিদারীতে মাখন ও পনীর যথেষ্ট [illegible] হত, কিন্তু আজকাল ব্যক্তিগত ভাবে জমিদারদের মাখন ও পনীরের ব্যবসায় করা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন [illegible] জমিদার মিলে একটা সমবায় মাখন ও পনীরের কারখানা স্থাপন করেছেন এবং একুশ মাইল [illegible] প্রতিদিন কারখানার উৎপন্ন দ্রব্য চালান দেবার ব্যবস্থা করেছেন।

[illegible] অবস্থা বর্তমানে খুব ভাল।

[illegible] একটা অদ্ভুত জিনিষ এখানে লক্ষ্য করেছি, [illegible] বাড়ী যদিও রাস্তার ধারে; তবু বাড়ীর সদর দরজা রাত্রে কখনও বন্ধ করা হয় না।

সুইডেনের পল্লীপ্রান্তে সকলেই নিজেদের অত্যন্ত নিরাপদ মনে করে চোর-ডাকাতের সম্বন্ধে। এমন কি, এ ভাব ওখানে অবস্থান-কালে আমার মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছিল। সদর রাস্তার ধারের বাড়ীর একতালায় আমি জানালা খুলে রাত্রে শুয়েছি, খুব নির্জ্জন বাড়ী যেখানে, সেখানেও ভয় করে নি।

একটা বাড়ীতে লক্ষ্য করেছিলাম বাড়ীর উনিশ বছর বয়সের তরুণী মেয়ে অতিথিদের জন্ম নির্দিষ্ট অংশের ঘরে একা রাত্রে আছে। অবশ্য যখন বাড়ীতে অতিথি থাকে না সে সময়ে। সে ঘর আবার এমন যে, ভৃত্যদের আহ্বান করবার ঘণ্টা পর্য্যন্ত সেখানে নেই।

এই বাড়ী বড় একটা সহর থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে, সেই সময় ওই সহরের বেকার-সমস্যা প্রবল হওয়াতে প্রায়ই দাঙ্গাহাঙ্গামার কথা শোনা যেত।

তার ভয় করে কি না এ কথা জিজ্ঞেস করলে মেয়েটী হেসে বলত—তাদের বাড়ীতে রোগের ভয় আর চোরের ভয়, এই দুটো কার নেই। মিথ্যা ভয়ের দরুণ সে তার সুন্দর নির্জ্জন কক্ষ ত্যাগ করতে কখনই প্রস্তুত নয়।

আমার মাসীমার বাড়ীর কথাই আবার তোলা যাক্।

অধিকাংশ পল্লী-প্রাসাদের মত মাসীমার বাড়ীতেও অষ্টাদশ শতাব্দীর ছায়া এখনও সম্যক্ অপসারিত হয় নি।



৩০০ বৎসরের পুরাতন রৌপ্যনির্ম্মিত পানপাত্র। আকেসো প্রাসাদ-দুর্গের অধিকারী প্রাচীন পরিবারের সর্ব্বকনিষ্ঠ মেয়েটি পানপাত্রটিকে ধরিয়া আছে।

মাসীমাদের বাড়ীতে নীচের তলায় অতিথিদের থাকবার ঘর ও ভোজন-কক্ষ। ভোজন-কক্ষের দেওয়ালে লাল

গালার কারুকার্য্য। চিত্রোপশোভিত প্যানেল ও দামী চীনাবাসনে সাজান আলমারী সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। বাল্যকালে দেখেছি, এক এক সময় ভোজন-কক্ষের টেবিলে ষাটজন লোক এক সঙ্গে বসে খেত। এখন পৃথিবীব্যাপী আর্থিক দুরবস্থার দরুণ অন্যান্য গৃহের মত মাসীমার বাড়ীর আতিথেয়তাও অনেক হ্রাস পেয়েছে।

ভোজন-কক্ষের পাশেই পারিবারিক গ্রন্থাগার। সান্ধ্য ভোজের পরে সকলে এখানে বসে আগুন পোহায় ও গল্প-গুজব করে। এখানে যে শুধু বহু চমৎকার বাঁধান প্রাচীন পুস্তক আছে তাই নয়, অনেকগুলি আসল চিপেন্‌ডেল চেয়ারও আছে।

দোতলায় অনেকগুলি বড় বড় বসবার ঘর। সব ঘরগুলির দেওয়াল সুন্দর ভাবে চিত্রিত, নীচটা বেশ কারুকার্য্য-খোদিত ওক কাঠের তক্তা দিয়ে বাঁধান। পূর্ব্ব-পুরুষদের বড় বড় ছবি দেওয়ালের সর্ব্বত্র টাঙান, অনেক সময় এই সব ছবি দেওয়ালের গায়েই আঁকা। ঘরের মেঝে পার্থন কাঠের। সর্ব্বদা গরম জল ও সাবান দিয়ে ঐ কাঠের মেজে ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখা হয়।

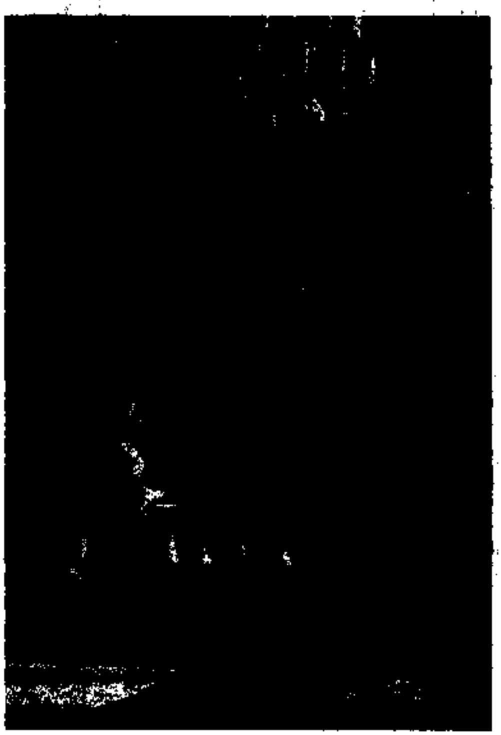
এ সব সেকেল ধরণের প্রাসাদে মোটর-গাড়ী বা বিদ্যুতের আলো নেই; তাদের বদলে আছে ঘোড়ার গাড়ী ও প্যারাফিনের ল্যাম্প ও মোমবাতির বড় বড় ঝাড়। অগ্নিকুণ্ড সুইডেনের পারিবারিক জীবনের একটা বড় অঙ্গ। যে যে-ধরণের বাড়ীতেই বাস করুক না কেন, সহরে প্রাসাদোপম ফ্ল্যাটে বা পল্লী প্রাসাদে বা সাধারণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ী বা মজুরের কুটিরে শীতের সন্ধ্যায় সকলেই অগ্নিস্থানের চারিপাশে বসে গল্প-গুজব করবে।

মাসীমা আমাকে তাঁর টেবিল-ঢাকা চাদর, রুমাল, জানালার পর্দ্দা, বিছানার চাদর প্রভৃতি যেখানে রক্ষিত হয়, সে আলমারিগুলি দেখালেন। প্রত্যেক আলমারিতে তাকে তাকে সাজানো ধোয়া, ধব-ধবে, পাট-করা রাশি রাশি ল্যাভেণ্ডার-গন্ধী সাদা কাপড়।

প্রত্যেক কাপড়ের থাকে কাঠের তক্তায় নানা লোকের নাম লেখা। প্রধানতঃ মেয়েদের নাম। জিজ্ঞেস করলাম—এ নাম কিসের?

মাসীমা বললেন, যাঁদের কাছ থেকে ঐ সব কাপড়ের শিল্প-কার্য্যের প্যাটার্ণ নেওয়া হয়েছে, বা যাঁদের বিখ্যাত প্যাটার্ণের নকলে ওগুলো তৈরী, তাঁদের নাম লেখা। ওঁদের মধ্যে অনেকে হয় তো এখন আর বেঁচে নেই, কেউ কেউ বহুদিন আগে মারা গিয়েছেন। এ সব নাম কাপড়ের সঙ্গে আজকাল এমন ধারা জড়িয়ে গিয়েছে যে, তাঁদের নাম আর কাপড়ের নাম এক হয়ে গিয়েছে। যেমন হয় তো দাসীকে আদেশ করা হয় চায়ের টেবিলে এ বেলা কাউণ্টেস্ রুডেন্‌স-লিডহলস পেতে দিও। বোল্ড পেতে দিও। রবিবারের সান্ধ্য ভোজের সময় মিসেস লিডহলস পেতে দিও।

খুব ভাল ভাল রেশমের কাপড় রয়েছে, পুরোণো ধরণের ডিজাইন আঁকা। একটা তাকে আমি দেখলাম কাঠের তক্তায় লেখা আছে 'ইকহল্‌ম'। মাসীমা অপ্রতিভ মুখে বললেন—ওগুলো দেখো না, ওগুলো বাজারে কেনা জিনিস।



সুইডেনের বৃহত্তম গির্জ্জার অভ্যন্তর। দুই শতাব্দীরও পূর্ব্বে রুশিয়ায় বন্দী সুইডিশ সৈন্যগণ মুক্তিলাভের পর এই গির্জ্জাটি প্রস্তুত করে। গির্জ্জায় ৫০০০ লোকের স্থান হয়।

যেন তাঁর কৃত প্রকাণ্ড এক অপরাধের কাজ আমি হঠাৎ ধরে ফেলেছি, মাসীমার মুখে এমন ধারা ভাব সুপরিস্ফুট!

কিছুদিন আগে মাসীমা একটা কথা আমায় বলেছিলেন, সে কথাটার অর্থ এখন ভালই বুঝলাম। বলেছিলেন যে, আগেকার চালে আর সংসার চালান যায় না, অর্থের বড়ই টানাটানি, নানা দিক থেকে খরচ কমাতে হচ্ছে, নইলে চলে না। ইকহল্‌ম থেকে বাজারের কাপড় কিনে আনা সেই খরচ কমানরই একটা অঙ্গ।

মাসীমার বাড়ীতে আগে এগার জন দাসী ছিল, এখন মাত্র দু'জন রাখা হয়েছে। আমার মনে হল দু'জন দাসীই তো এ বাড়ীর পক্ষে যথেষ্ট। মাসীমা বললেন—তা কখনো হয়? কাজ কত? এখন অবশ্য চলে, কিন্তু বড়দিনের সময় বাড়ীতে কত অতিথি আসবে, তখন কাজের কত অসুবিধে হবে।

সত্যই আমার মনে হল, কাজ অনেক এ সব বাড়ীতে। শরৎ কালে জানালা-দরজা, ঘরের মেঝে সব পরিষ্কার করতে হয়, জ্যাম তৈরী করতে হয় এক বছরের উপযোগী, মাংস কেটে নুন দিয়ে রেখে দিতে হয়, গেরস্থালির কত কাজ!



এরিকসবার্গ প্রাসাদ-দুর্গের খানাগার: ইতালীয় কারুকার্য্য ও খোদিত মূর্ত্তি দ্বারা সুশোভিত।

এ ছাড়া মাসীমার সমস্ত কাপড় ও আটশ খানা বিছানার চাদর বছরে দুবার ধুয়ে রাখতে হবে, ব্যবহৃত না হলেও ধুয়ে রাখতে হবে, নইলে হলদে হয়ে যেতে পারে।

বাড়ীতে চারখানা তাঁত আছে, তাতে ঘরের প্রয়োজনীয় পর্দা, টেবিল-ঢাকনি, কার্পেট, তোয়ালে, বিছানার চাদর ইত্যাদি বোনা হয়। এ সব কাজ কি মাত্র দু'জন দাসীকে দিয়ে হয়? আমি মাসীমাকে বললাম, কেন মাসীমা, খরচ যখন কমান হচ্ছে, তখন সব দিক থেকেই কমান উচিত। এত জিনিষ প্রতি বছর বোনার কি দরকার? এত তো কি বছর লাগে না?

মাসীমা বললেন, তা হয় না। কাপড়ের সংখ্যা শুধু যে বজায় রেখে যেতে হবে তাই নয়, তাদের না বাড়ালে ছেলে-পুলেরা এর পরে তাদের মাকে কি বলবে? এরা মনে মনে দুঃখ করলে কি আমার তা সইবে? বাড়ীর গৃহিণী হিসেবে আমার কর্ত্তব্য হচ্ছে, সংসারের জিনিস বাড়িয়ে যাওয়া।

কিন্তু শুধু সংসারের কাপড়-চোপড়ের দিক থেকেই নয়, আমার মাসীমা খুব সঙ্গীত-প্রিয়। দেশের মধ্যে সঙ্গীতের পুরাতন ধারা বজায় রাখবার দিকে তাঁর খুব ঝোঁক। মাসীমার বাবা ওয়েনারবার্গ ভাল গায়ক ও সুরস্রষ্টা ছিলেন। মাসীমাও নিজে একজন সুগায়িকা, তাঁর সন্তানদের মধ্যে দুটীকে উচ্চ সঙ্গীত-কলেজে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল।

ছোট ছেলেটী এরই মধ্যে পিয়ানো বাজনায় বেশ নাম করেছে।

তার বড় সন্তানটী মেয়ে। সে বেশ ভাল গাইতে পারে, কিন্তু ওদের বড় ভাই, মাসীমার বড় ছেলে, যে এই বিস্তৃত জমিদারীর তত্ত্বাবধান করছিল—হঠাৎ মারা যায়। এর পরে ছেলে মেয়ে দুটীকে আর সঙ্গীত-কলেজে রাখার সুবিধা হল না। ছেলেটী এখন জমিদারীর হিসেব-পত্র দেখাশোনা করে, মেয়েটীও ভাইকে সাহায্য করে। এখন তাদের সর্ব্বদা ঝাঁক-জোক নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়।

কিন্তু সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরে অগ্নিকুণ্ডের ধারে যখন বসে, তখন ছেলেটী বাড়ীর বড় পিয়ানো বাজায়। ওর বোন্ গান গায়, ওদের মাও সেই সঙ্গে যোগ দেন। এদের বাড়ীর পিয়ানোতে তখন যে সুর বাজে, তা খুব উঁচুদরের সুর।

আমার আর এক মাসীমা এই বাড়ীতেই থাকেন। তাঁর বয়স ৭৬ বছর, রেশমের মত নরম সাদা চুল মাথায়, মুখের ভাবে করুণা ও সারল্য মাখা। তিনি একজন নাম-করা লেখিকা। সন্ধ্যাবেলা গান শুনতে শুনতে ড্রইংরুমে বসে তিনি তাঁর নতুন উপন্যাসের প্লট ভাবেন, নয় তো তাঁর বইয়ের প্রুফ্ দেখেন।

বড়দিনের সময় বিরাট উৎসব হয় মাসীমার বাড়ীতে।

জমীদারীর সমস্ত লোকজন, মজুর, কর্ম্মচারী সে দিন ডিনারে নিমন্ত্রিত হয়, কয়েকদিন আগে থেকে বাড়ীর গৃহিণী পাচকেরা ব্যস্ত থাকে মিষ্টি রুটি, কেক্, ও নানা রকম মিষ্টান্ন প্রস্তুত করতে। ঘর-দোর ঝাড়তে পুঁছতে হয়, ফুল দিয়ে সাজাতে হয়, বড় 'ক্রিস্‌মাস ট্রি' তৈরী করে তাকে খাদ্য-দ্রব্যসম্ভারে ও ফুল, পাতা, বাতি দিয়ে সাজাতে হয়। জমিদারীর সমস্ত ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে হয়, উপঢৌকন দিতে হয়।

সে এক বিরাট ব্যাপার।

মুর্শিদাবাদ বিবরণী

শিক্ষার কথা

দেশ যখন সমৃদ্ধ থাকে, তখন মানুষের মানসিক শক্তিও নানাপ্রকারে উদ্বুদ্ধ হয় এবং তাহার ফলে জ্ঞানার্জ্জনও বেশ ভাল ভাবেই চলিতে থাকে। রেশমের কৃপায় একদিন মুর্শিদাবাদ প্রদেশ সমৃদ্ধ ছিল, তখন জ্ঞানের চর্চ্চাও মুর্শিদাবাদে কিছু কিছু হইয়াছিল।

শিক্ষার কথা বলিতে গেলে প্রথমেই আমাদের মহুলা-গ্রামের উল্লেখ করিতে হয়। এই গ্রাম প্রাচীন, বৈষ্ণবগ্রন্থ 'ভ ক্তি র ত্না ক রে' ইহার নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্য শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী এইস্থানে বাস করিতেন। তখন এই স্থান বৈষ্ণবদিগের একটি আড্ডা ছিল। পরে তিনি এ স্থান ত্যাগ করিয়া বোরাকুলী নামক স্থানে বাস করেন। এই সময় মহুলাগ্রামে সংস্কৃত শাস্ত্রের চর্চ্চা বহুল পরিমাণে হইত ও অনেকগুলি টোলও সেখানে ছিল। ন্যায় ও জ্যোতিষের চর্চ্চা এখানে ভাল ভাবেই হইত। বাংলাদেশের গুপ্তপ্রেস প্রভৃতি প্রচলিত পঞ্জিকাসমূহ রামচন্দ্র শর্ম্মা বিরচিত 'দি ন কৌ মু দী খ ণ্ড ন' এবং রাঘবানন্দ শর্ম্মা রচিত 'সি দ্ধা ন্ত র হ স্য' ও 'দি ন চ ন্দ্রি কা' অনুসারে গণিত হয়। ইহার মধ্যে রাঘবানন্দ শর্ম্মা এই মহুলার অধিবাসী ছিলেন। মহুলা হইতে একখানি হস্তলিখিত পঞ্জিকাও অনেকদিন যাবৎ বাহির হইত।

বর্ত্তমানে সে মহুলা আর নাই—গঙ্গার গর্ভে লীন হইয়াছে এবং তাহার ধ্বংসস্তূপ হইতে আশে-পাশে কয়েকখানি গ্রামের সৃষ্টি হইয়াছে। বর্ত্তমানে এখানে মাত্র ন্যায়শাস্ত্রের দুইজন পণ্ডিত আছেন।

মধ্যযুগে মুর্শিদাবাদে যাহা কিছু গ্রন্থাদি রচিত হইয়াছিল, সে সবই বৈষ্ণব-গ্রন্থ। অন্য পরিচ্ছেদে তাহা বর্ণিত হইবে।

ইংরাজ আমলে যাঁহারা বাগ্দেবীর সাধনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহোদয়ের নাম প্রসিদ্ধ। ইনি কান্দীর অধিবাসী ছিলেন। জ্ঞান বিজ্ঞান বিষয়ে বঙ্গভাষায় ইঁহার অবদান ইঁহাকে অমর করিয়াছে।

বহরমপুর-নিবাসী ভূম্যধিকারী রামদাস সেন মহাশয়ও স্ব-গৃহে সুন্দর একটি পাঠাগার স্থাপন করিয়া ঐতিহাসিক গ্রন্থ অনেকগুলি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ত্রিবেদী মহাশয় পি. আর. এস. বৃত্তিধারী ছিলেন। ঐ বৃত্তি এ জেলা হইতে আরও দুই ব্যক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহারা পি. এইচ. ডি. উপাধিধারীও বটেন। ইঁহাদের নাম ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়। কিন্তু ইঁহারা মুর্শিদাবাদের পুত্র নহেন—পোষ্যপুত্র মাত্র।

বর্ত্তমানে যাঁহারা বঙ্গভাষার সেবায় নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের মধ্যে দুই ব্যক্তির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ—ইনি কুচবিহার কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ। ইনি বঙ্গসাহিত্যের ভিতর দিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও বৈষ্ণব সাধনার আলোচনা করিয়া থাকেন—আর দ্বিতীয় ব্যক্তি হইতেছেন শ্রীযুক্ত কুমার ধীরেন্দ্র নারায়ণ রায়। ইনি লালগোলার বিখ্যাত দানশৌণ্ড মহারাজা শ্রীযুক্ত রাও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের পৌত্র।

বঙ্গসাহিত্যের একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ "উ দ্ ভ্রা ন্ত প্রে ম।" ইহার লেখক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও খাগড়ার অধিবাসী ছিলেন। কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুরও সাহিত্য সেবা করেন। উক্ত স্থানের শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের কবিতাসমূহও সমাদৃত হইয়াছে।

বর্ত্তমানে মুর্শিদাবাদে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ, ২৮টী উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় এবং ছয়টী চতুষ্পাঠী আছে। পাঠাগার প্রায় ২০।২১টী আছে—তন্মধ্যে কাশিমবাজার মহারাজা বাহাদুরের লাইব্রেরী, ডাঃ রামদাস সেন মহাশয়ের পারিবারিক লাইব্রেরী, জেমোর রামেন্দ্রসুন্দর

ত্রিবেদী মহাশয়ের পারিবারিক লাইব্রেরী এবং লালগোলা মহারাজ লাইব্রেরী প্রসিদ্ধ।

কতকগুলি লাইব্রেরী ক্লাবের সঙ্গে সংযুক্ত। এই সব স্থানে বিবিধ প্রকার আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাও আছে।

এই জেলার কান্দী মহকুমার অন্তর্গত কান্দী, জেমো, পাঁচথুপী প্রভৃতি স্থানে অনেক সংস্কৃত ও ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তির বাস। সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা-লেখক বিধুভূষণ গোস্বামী এবং সংস্কৃত গ ণ দ র্প ণ প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা রামতারণ শিরোমণি এই অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন।

এই জেলার মহিলাবৃন্দের মধ্যে শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী মহাশয়ার নাম বঙ্গ-সাহিত্যে প্রসিদ্ধ।

অতঃপর সংবাদপত্রের কথা। মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ইং ১৮৪০ অব্দে। উক্ত পত্রিকা "মুর্শিদাবাদ সংবাদ-পত্রী" নামে প্রসিদ্ধ ছিল। তদবধি এ জেলায় অনেক মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়াছে। ঐ মাসিক পত্রিকা-সমূহের মধ্যে তিনখানি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল—(১) 'ঐতিহাসিক চিত্র'। ইহা প্রথমে একবার প্রকাশিত হইয়া বন্ধ হইয়া যায়, পরে আবার কিছু দিন প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম বারে অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় এবং দ্বিতীয় বারে নিখিলনাথ রায় মহাশয় ইহার সম্পাদক ছিলেন। (২) 'উপাসনা'। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইহার প্রতিষ্ঠাতা। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের ব্যয়ে ইহা প্রকাশিত হইত। ইহা পরে কলিকাতায় উঠিয়া যায়। (৩) 'শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক'। ইহা একখানি বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় পত্রিকা। ইহাও স্বর্গীয় মহারাজা বাহাদুরের ব্যয়েই প্রকাশিত হইত। ইহা পরে কলিকাতা হইতেও কয়েক বৎসর প্রকাশিত হইয়াছিল। সাপ্তাহিক পত্রগুলির মধ্যে ৩ খানি এখনও জীবিত আছে। তাহার মধ্যে বহরমপুর, সৈদাবাদ হইতে প্রকাশিত "মুর্শিদাবাদ-হিতৈষী" পত্রিকাই প্রধান। প্রবীণ মোক্তার শ্রীযুক্ত বনোয়ারীলাল গোস্বামী মহাশয় ইহার সম্পাদক।

নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে গেলে বলিতে হইবে যে, মুর্শিদাবাদ এখনও অন্যান্য জেলার তুলনায় শিক্ষায় অনগ্রসর (backward)। কিন্তু এ কথাও সত্য, যে-শিক্ষায় কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যকে দূরে রাখিয়া বঙ্গীয় যুবককে চাকুরীগত-প্রাণ করিয়াছে, সেই শিক্ষার বিস্তার এখানে কম থাকায় চাকুরীজীবীর সংখ্যাও এখানে কম। এটাও একটা ভাবিবার কথা।

বালিকাদের শিক্ষার জন্য বহরমপুরে একটি হাই-স্কুল, একটি এম ই স্কুল ও একটি মহাকালী পাঠশালা আছে। স্থানে স্থানে উচ্চ-প্রাথমিক বা নিম্ন-প্রাথমিক বিদ্যালয়ও বালিকাদের শিক্ষার জন্য রহিয়াছে। মুসলমান বালকবৃন্দের শিক্ষার জন্য মুর্শিদাবাদে একটি মাদ্রাসা, ভাবদা গ্রামে একটি মাদ্রাসা হাই-স্কুল এবং স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাদ্রাসা ও মক্তব আছে। উক্ত ভাবদা গ্রামের পার্শ্ববর্তী সারগাছী নামক গ্রামে রেলওয়ে ষ্টেশনের পার্শ্বে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত একটি অনাথ-আশ্রম আছে। ঐ স্থানে বালকদিগকে লেখা-পড়া ও কৃষি-শিল্প বিষয়ক শিক্ষা দেওয়া হয়।

বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা ও অন্যান্য বিবরণী

বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ও বৈষ্ণব-সাহিত্যের সঙ্গে মুর্শিদাবাদের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সমৃদ্ধির দিনে বৈষ্ণব-আন্দোলন মুর্শিদাবাদের অঙ্গে অনেকখানি পুষ্টি লাভ করিয়াছিল। নবদ্বীপ বৈষ্ণবের 'বেথলেহেম' আর মুর্শিদাবাদ তাহার 'রোম'। দ্বিতীয়বার যে ধর্ম্মান্দোলন হইয়াছিল, যাহার নেতৃত্ব করিয়াছেলেন শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীশ্যামানন্দ—তাহার কেন্দ্রস্থল ছিল মুর্শিদাবাদ। মুর্শিদাবাদেরই মালিহাটী, দক্ষিণখণ্ড প্রভৃতি স্থানে শ্রীনিবাস আচার্য্যের বংশধরগণ বসতি স্থাপন করেন এবং মালিহাটীর অধিবাসী আচার্য্য-বংশধর রাধামোহন নবাব মীরজাফরের দরবারে পশ্চিমদেশীয় পণ্ডিতগণকে বিচারে পরাস্ত করিয়া বাঙ্গালীর মান রক্ষা করেন। বহরমপুর নগরের অপর পারে আচার্য্য-দুহিতা হেমলতা ঠাকুরাণীর আবাস ছিল এবং ঐ স্থান হইতেই ক র্ণা ন ন্দ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ভ ক্তি র ত্না ক রে'-র লেখক নরহরি ঠাকুরও মুর্শিদাবাদেরই অধিবাসী ছিলেন। এই জেলারই গাম্ভীলা (বর্ত্তমান জিয়াগঞ্জ) গ্রামে গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী বাস করিতেন এবং তাঁহারই গৃহ হইতে তাঁহার গুরু শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় মহোৎসাহে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদেরই অন্তর্গত কাঞ্চনগড়িয়ায়

দ্বিজ হরিদাস গোস্বামে, হরেরাম চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার ভ্রাতা এবং তেলিয়া বুধরী গ্রামে গোবিন্দ কবিরাজ বাস করিতেন। ইঁহাদের দ্বারা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল।

বহরমপুর সহরের অন্তর্গত সৈদাবাদই ছিল বৈষ্ণব-সাধনার কেন্দ্র। এই সৈদাবাদেই শ্রীশ্রীমোহনরায় বিগ্রহ অবস্থিত—যাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া প্রখ্যাতনামা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বিবিধ গ্রন্থরাজি প্রণয়ন করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। মণিপুরের রাজারা ঐ বিগ্রহের সেবাইতের শিষ্য। সৈদাবাদেরই উপকণ্ঠে মহারাজা নন্দকুমারের বাস-ভবন। তিনি প্রাগুক্ত রাধামোহন ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য ছিলেন এবং গুরুর নিকট হইতে সপারিষদ শ্রীচৈতন্যদেবের তৈল-চিত্র প্রাপ্ত হন। মহিমাপুরের জগৎশেঠেরাও পরে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত হন। নবাবগণের মতিঝিলের অনতিদূরে কুমারপুর গ্রামে রূপনারায়ণ গোস্বামী মহাশয় শ্রীশ্রীরাধামাধব বিগ্রহের সেবা করিতেন। তাঁহারই আমলে নবাব নওয়াজেস মহম্মদ প্রদত্ত খানা বিগ্রহের সম্মুখে যূঁইফুলে পরিণত হইয়াছিল। কুমারপুরের স্নানযাত্রা প্রসিদ্ধ। খাগড়ার পূর্ব্বদিগাংশে প্রসিদ্ধ সাধক গোকুলদাস বাবাজী বাস করিতেন। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মহাশয়ও পরে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এবং অনেকগুলি বিগ্রহের সেবা স্থাপনা করেন। তাঁহারই পৌত্র বৈষ্ণব-জগতে সুপ্রসিদ্ধ লালাবাবু। সৈদাবাদই ইঁহাদের গুরুস্থান। পরবর্ত্তীকালে কাশিমবাজারের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কয়েকবার বৈষ্ণব-সম্মেলন করাইয়াছিলেন। তিনি বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা 'শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক' স্বীয় ব্যয়ে প্রকাশ করাইতেন। প্রাচীন বৈষ্ণব-গ্রন্থসমূহ প্রকাশ করিবার জন্য তিনি রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ মহাশয়কে সম্পাদক নিযুক্ত করেন। তাঁহাদের যত্নে অনেক অমূল্য বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

বহরমপুর-নিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রাধারমণ বিস্তারত্ন মহোদয়ও স্বীয় রাধারমণ যন্ত্রে বহু বৈষ্ণব-গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থরাজি ভারতের বাহিরেও সমাদৃত হইয়াছে। তিনি 'শ্রী ম দ্ভা গ ব ত' গ্রন্থ বাংলাদেশের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে প্রকাশ করেন এবং ব্যয়-নির্ব্বাহ নিমিত্ত মহামান্য ত্রিপুরাধিপের নিকট একলক্ষ টাকা সাহায্যপ্রাপ্ত হন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্শ্বচর শ্রীল গদাধর গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীনয়নানন্দ মিশ্রের বংশধরেরা এই জেলার ভরতপুর গ্রামের অধিবাসী এবং অভিরাম ঠাকুরের বংশধরগণের কেহ কেহ এই জেলায় বসতি স্থাপনা করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত আরও অনেক বৈষ্ণব মহাত্মা এই জেলার অঙ্কে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তন্তুবায়-বংশীয় নিত্যানন্দ দাস ১৭৫১ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে দিল্লীর বাদসাহ দ্বিতীয় শাহ আলমের অমাত্যের পদ লাভ করিয়া "দানেশনন্দ আঞ্জম উদ্দৌল্লা কেফায়েৎ জঙ্গ হপ্ত হাজারী বাহাদুর" পদবীতে ভূষিত হন। তিনি এই জেলায় স্বীয় অভীষ্ট দেবতা শ্রীশ্রীবনয়ারী জীউর নামে বনয়ারীবাদ গ্রাম স্থাপন করেন এবং শ্রীবৃন্দাবনের অনুকরণে তাহাতে বিবিধ পুষ্পোদ্যান ও সরোবর রচনা করেন। কতকগুলি উৎসবেরও তিনি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাহার কতকগুলি এখনও তাঁহার প্রপৌত্র কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈষ্ণব মহাত্মাবর্গের বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়া শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মুরারিলাল অধিকারী মহাশয় 'বৈ ষ্ণ ব দি গ্-দ র্শ নী নামক এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তিনি এই জেলারই অধিবাসী এবং গবর্ণমেণ্টের পুলিশ-বিভাগে তিনি উচ্চ পদে সমারূঢ় আছেন।

প্রাচীন ধর্ম্মোন্মাদনা বর্ত্তমানে না থাকিলেও বৈষ্ণব-ধর্ম্মের স্রোত এ জেলা হইতে একেবারে চলিয়া যায় নাই। এখনও বহরমপুর সহরে বৈষ্ণব-সভা রহিয়াছে এবং শ্রীযুক্ত আশুতোষ হাটী এম-এ (ট্রিপল), এফ-আর-জি-এস, শ্রীযুক্ত নীলমণি দাস মহান্তঃ ব্যাকরণ-পুরাণ-ভক্তিতীর্থ, শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু এবং অনারেবল্ মহারাজা শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর প্রভৃতির চেষ্টায় সহরে শাস্ত্রপাঠ ও ধর্ম্মচর্চ্চা হইয়া থাকে। বিগত ১৩৪৩ সালে উঁহাদের চেষ্টায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী-পাদের স্মৃতি-উৎসব মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ উৎসবে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহোদয়ের দুহিতা শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী কীর্ত্তন গান করিয়াছিলেন।

কীর্ত্তন গানও এ জেলার প্রসিদ্ধ। রসিকদাস,

শ্রীঅবধূত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া এই জেলায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

কীর্ত্তন ছাড়া অন্যান্য সঙ্গীতের চর্চ্চাও এ জেলায় রহিয়াছে। যন্ত্র সঙ্গীত ও কণ্ঠ-সঙ্গীত উভয়েরই ওস্তাদ এ জেলায় মিলে। বিষ্ণুপুর-নিবাসী রাধিকানাথ গোস্বামী মহাশয় এ জেলাতেই অবস্থিতি করিতেন। প্রসিদ্ধ পাখোয়াজী রাধিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তবলা-বাদক শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত সান্যাল, সেতারী শ্রীগিরিজাকান্ত চক্রবর্ত্তী, গায়ক উমাপদ ভট্টাচার্য্য এবং ওস্তাদ মস্তসাহেব এই জেলারই অধিবাসী।

বর্ত্তমান যুগের প্রসিদ্ধ ক্রীড়কগণের মধ্যে এ জেলার শ্রীকরুণা ভট্টাচার্য্য (কে. ভট্টাচার্য্য) মহাশয় খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

এ জেলার শিকারীগণের মধ্যে রাজা আশুতোষ নাথ রায়, মহারাজা বাহাদুর ও তদীয় পৌত্র কুমার ধীরেন্দ্র নারায়ণ রায় মহাশয়ের নাম প্রসিদ্ধ।

এই জেলার মধ্যে একমাত্র বহরমপুর কাদাই নিবাসী শ্রীরায় শিরোমণি মহাশয়ই "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

এ জেলায় অনেকগুলি আখড়া আছে—তন্মধ্যে নশীপুরের বড় আখড়া ও ছোট আখড়া, সাধকবাগের আখড়া, বহরমপুরের জগন্নাথের আখড়া, গোপালের আখড়া, নৃসিংহ দেবের আখড়া, গিরিধারীর আখড়া, গোপীনাথের আখড়া, শ্যামদাসের আখড়া এবং পাচথুপীর এক মাইল উত্তর-পশ্চিমে কেশের পাহাড় নামক স্থানের গোপালজীর আখড়াই সমধিক প্রসিদ্ধ।

কয়েকটি আখড়া এক একটি জমিদারীর মালিক। শ্রীশ্রীনৃসিংহ দেবের আখড়ায় একটি সংস্কৃত চতুষ্পাঠী রহিয়াছে, তাহাতে কয়েকটি শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হয় এবং ঐ আখড়ায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন প্রভৃতিও হইয়া থাকে। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর জন্মতিথি বহরমপুরে প্রতিবারই সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

হিন্দুর বিবিধ পূজা বহরমপুরে হয় এবং তদুপলক্ষে সময়ে সময়ে মেলাও বসিয়া থাকে। এ সহরে অনেকগুলি দেবমন্দির আছে। তন্মধ্যে গোপেন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের মন্দির ও প্রতাপ সাহা মহাশয়ের মন্দির প্রসিদ্ধ। এখানে কাশিমবাজার মহারাজার ঠাকুর-বাড়ী, কুঞ্জঘাটার রাজার ঠাকুর-বাড়ী, দয়াময়ী কালীবাড়ী, কৃপাময়ী কালীবাড়ী, জয়কালী-বাড়ী, ব্যাসপুরের শিব-মন্দির, বালকনাথের মন্দির, ও কিরীটপুরে অবস্থিত ভীমেশ্বর শিবমন্দির প্রসিদ্ধ।

জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জে অনেক জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির বাস; সেখানে অনেক সুন্দর সুন্দর জৈন-মন্দির আছে। আজিমগঞ্জের রাজা বিজয়সিংহের উদ্যান ও নশীপুরের সন্নিকটে অবস্থিত কাঠগোলার বাগান ও জৈন-মন্দির এবং বাপী দ্রষ্টব্য বস্তু। কাশিমবাজারে একটি জৈন-মন্দির আছে, উহার নাম নেমিনাথের মন্দির, বর্ত্তমানে উহা পরিত্যক্ত।

আজিমগঞ্জের প্রায় এক মাইল উত্তরে বড়নগর অবস্থিত। এখানে প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভবানীর প্রতিষ্ঠিত দেব-মন্দিরগুলির সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। অনেকগুলি দেব-মন্দির এখানে আছে।

কান্দী সহরে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের দেবালয়ও বড় সুন্দর। এখানে ভোগরাগ ও অর্চ্চনার সুন্দর ব্যবস্থা আছে।

বনয়ারীবাদে শ্রীশ্রীবনয়ারী জীউর মন্দির দেখিবার জিনিষ। এখানেও পূজার্চ্চনা প্রভৃতি সুন্দর ভাবেই হইয়া থাকে। এই গ্রামেরই সন্নিকটে অবস্থিত ষড়ভুজা শিলাময়ী চর্চ্চিকা দেবী প্রসিদ্ধ। জিয়াগঞ্জের গোবিন্দজীর বাড়ী ও তেঁতুলিয়া গ্রামের শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বাড়ীও এ জেলায় বিশেষ পরিচিত। এই জেলার অন্তর্গত মারগ্রাম রেশম-শিল্পের অন্যতম কেন্দ্র। এখানে ভক্তমাল-বর্ণিত জীবনের বংশধরগণ বাস করেন। এখানকার রাধা-গোপীনাথ বিগ্রহ, রাধাকুণ্ড, সনাতন সাগর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

এই প্রসঙ্গে আর একটি স্থানের নাম উল্লেখযোগ্য, উহা গয়সাবাদ বদরীহাট। ইহা আজিমগঞ্জ হইতে প্রায় আড়াই ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এই স্থান বৌদ্ধযুগে অতীব সমৃদ্ধ ছিল। ইষ্টকখণ্ড ও মৃৎপাত্র প্রভৃতি অনেক প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ইহার সন্নিকটে একটি হিন্দু-মন্দির ও কিছু দূরে একটি জৈন-মন্দির আছে।

গোকর্ণ নামক স্থানও এককালে প্রসিদ্ধ ছিল। ইহা কান্দী মহকুমার অন্তর্গত। এই স্থানে পূর্ব্বে এক রাজার রাজধানী ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। এখানে ব্রাহ্মণ জমিদারগণের কুলদেবতা সিংহবাহিনী মূর্ত্তি অর্চ্চিত হইয়া থাকে। ইহার অনতিদূরে শ্রীনৃসিংহ দেবের মূর্ত্তিও এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ।

কান্দী সহরের প্রায় দেড় ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ক্ষেপা কৃষ্ণদাস বাবাজীর সমাধি-প্রাঙ্গনও এ দেশে প্রখ্যাত। তথায় প্রতি বৈশাখী সংক্রান্তিতে অষ্টপ্রহর হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন হয়

উল্লেখযোগ্য স্থান, বস্তু ও ব্যক্তি

মুর্শিদাবাদের প্রাচীন বৌদ্ধ পীঠস্থানগুলির ও হিন্দু-দেবালয়গুলির কথা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এবার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বস্তুর বিবরণ দিয়া এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি করিব।

এ জেলার প্রধান নগর বহরমপুর। এখানে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ আছে, উহা গঙ্গার ধারে অবস্থিত। কলেজে রামদাস সেন মহাশয়ের আবক্ষ মূর্ত্তি (bust) রহিয়াছে। কলেজের অনতিদূরে প্রাচীন পাগলা-গারদ। এক্ষণে সেখানে বন্দীশালা অবস্থিত। তাহার কিয়দ্দূরে বহরমপুরের ব্যারাক-গুলি রহিয়াছে। ব্যারাকগুলিতে পূর্ব্বে সৈন্যদল বাস করিত এবং উহারই চত্বরে সিপাহী-বিদ্রোহ সংঘটিত হইয়াছিল। উহা হইতে অনেকটা দূরে গোরাবাজার অঞ্চলে স্থানীয় লণ্ডন মিশনের পাদ্রী সাহেবের কুঠী অবস্থিত। উহার মধ্যে একটি স্থান "সতীদাহের স্থল" বলিয়া সমাদৃত হয়। সহরের পূর্ব্ব-দক্ষিণ ভাগে রেলওয়ে ষ্টেশন। উহারই পার্শ্বে রেশম-ক্ষেত্র অবস্থিত। তাহার আশে পাশে অনেকগুলি সমাধি রহিয়াছে। সেগুলি ব্রহ্মরাজবংশীয়গণের সমাধি। ১৮৮৬ অব্দে তৃতীয় ব্রহ্মযুদ্ধের পর হতভাগ্য নৃপতি থিবো কিছুদিন এখানে সপরিবারে বন্দীভাবে জীবন যাপন করেন। পরে তাঁহাকে বোম্বাই প্রদেশে নির্ব্বাসিত করা হয়। তাঁহার স্বগণের মধ্যে যাঁহারা বহরমপুরে মৃত্যুমুখে পতিত হন, ঐগুলি তাঁহাদেরই সমাধি। সহরের উত্তর প্রান্তে মহারাজ নন্দকুমারের গৃহ অবস্থিত। উহারই পূর্ব্বদিকে খেতাখাঁর বাজার ও কালিকাপুর। পূর্ব্বোক্ত স্থানে ১৭৫৮ অব্দে নির্ম্মিত একটি আর্ম্মেনিয়ান গির্জ্জা অবস্থিত। উহারা গ্রীক চার্চ্চ সম্প্রদায়ভুক্ত, আর কালিকাপুরে ওলন্দাজগণের একটি সুন্দর সমাধি-ক্ষেত্র রহিয়াছে। মধ্যে খানিকটা স্থান জঙ্গলে পরিপূর্ণ, উহার মধ্যে স্থানে স্থানে কয়েকটি শিবমন্দির ও কয়েকটি ভগ্ন মসজিদ দৃষ্ট হয়। ঐ মন্দিরগুলির পার্শ্বেই রহিয়াছে দয়াময়ী কালীবাড়ী। উহা কৃষ্ণেন্দ্র হোতা কর্ত্তৃক ১৭৫৯ অব্দে নির্ম্মিত। খাগড়া হইতে কাশিমবাজার যাইবার পথে একটি সাঁকো ও বিষ্ণুপুর কালীবাড়ীও তিনি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ সাঁকো অদ্যাপি হোতার সাঁকো নামে পরিচিত। কালিকাপুরের পরেই কাশিমবাজার রেলওয়ে ষ্টেশন ও তাহার পার্শ্বে ১৮১১ অব্দে কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন প্রতিষ্ঠিত ব্যাসপুরের শিবমন্দির অবস্থিত, তাহার পূর্ব্বে কুমার কমলারঞ্জন রায় বাহাদুরের প্রাসাদ ও তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বিখ্যাত কোম্পানী-বাগান, যেখানে ইংরাজগণের কুঠী ছিল এবং যাহা নবাব সিরাজউদ্দৌলার সৈন্যাধ্যক্ষ জমাদার উমর বেগ দখল করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে উহা মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সম্পত্তি, তাঁহার প্রাসাদ ঐ স্থানের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে অবস্থিত। বাগানের পার্শ্বেই ইংরাজদিগের সমাধি-ক্ষেত্র, যেখানে ওয়ারেণ হেষ্টিংস সাহেবের পত্নী ও দুহিতা চির-নিদ্রায় নিদ্রিতা। উহার কিছু পূর্ব্বে জঙ্গলের মধ্যে নেমিনাথের মন্দির রহিয়াছে। উহা একটি পরিত্যক্ত জৈন-মন্দির। তাহারই অদূর কাটীগঙ্গা এবং জাহাজ-ঘাটা অবস্থিত। কাটী-গঙ্গাই আগে গঙ্গার মূলস্রোত ছিল এবং ঐ জাহাজ-ঘাটাতেই বাণিজ্য-পোতসমূহ নঙ্গর করিত। এ পর্য্যন্ত গেল পূর্ব্ব সীমার কথা।

সহরের উত্তর সীমান্তে ফরাসডাঙ্গা ও আমানীগঞ্জের মাঠ অবস্থিত। ফরাসডাঙ্গায় পূর্ব্বে ফরাসীদিগের কুঠী ছিল। সুপ্রসিদ্ধ ডুপ্লেও (Dupleix) কিছুদিন এখানে বাস করিয়াছিলেন। আমানীগঞ্জের মাঠে হিন্দুদের শ্মশান ঘাট ও মুসলমানদিগের কবরসমূহ রহিয়াছে। ইহাই হইল মোটামুটি বহরমপুরের বিবরণ। বহরমপুরের প্রায় ৩ মাইল উত্তরে প্রাচীন মুর্শিদাবাদ সহর অবস্থিত। উহা লালবাগ, মুর্শিদাবাদ, সাহানগর, জাফরাগঞ্জ প্রভৃতি অংশে বিভক্ত, লালবাগ ইহার দক্ষিণ সীমা এবং উহা হইতে বহরমপুরের উত্তর সীমায় ৩ মাইল ব্যবধান। মধ্য স্থলে ৩টী দ্রষ্টব্য আছে।

(১) কারবালা—ইহা বহরমপুর-লালবাগ পথের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত, এখানে মহরম উৎসব হইয়া থাকে। (২) মতিঝিল—ঐ মসজিদের পূর্ব্বপার্শ্বে অবস্থিত। ইহা একটি অশ্বক্ষুরাকৃতি বৃহৎ জলাশয়। উহার পার্শ্ব দিয়া রেলওয়ে লাইন গিয়াছে। মতিঝিলে প্রাসাদ ও মসজিদ রহিয়াছে। ঐ মসজিদের সন্নিকটে নবাব নওয়াজেস মহম্মদ ও তাঁহার পোষ্যপুত্র এক্রাম-উদ্দৌলার সমাধি রহিয়াছে। ইহারই সন্নিকটে কুমারপুরে রাধা-গোবিন্দ বিগ্রহ রহিয়াছেন। (৩) কারবালার পশ্চিম সীমান্তে ভাগীরথী নদী। তাহার অপর পারে সুপ্রসিদ্ধ খোস বাগের সমাধি-ভবন রহিয়াছে। এখানে নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ, নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও তৎপ্রণয়িনী লুৎফ-উন্নেসা প্রভৃতির সমাধি রহিয়াছে।

বহরমপুর-লালবাগ পথের মধ্যস্থলে একটী সেতু রহিয়াছে, উহার নাম কার্জ্জন সেতু। উহারই পূর্ব্বপার্শ্বে সন্ন্যাসীভাঙ্গা নামক গ্রাম, যেখানে নবাবী আমলে সুপ্রসিদ্ধ চয়েন রায় বাস করিতেন। ঐ সেতুর অনতিদূরে জলের কলের কারখানা (water works) রহিয়াছে।

লালবাগ মুর্শিদাবাদ সহরের উত্তরাংশ। উহা একটি মহকুমা (sub division)। এখানে কোর্ট, নবাবের আস্তাবল, ব্রাহ্মমন্দির প্রভৃতি রহিয়াছে। লালবাগের উত্তরে চক বা মুর্শিদাবাদ, এইখানে নবাব বাহাদুরের প্রাসাদ অবস্থিত। নবাব বাহাদুরের পরিজনবর্গ যেখানে অবস্থান করেন, সেই প্রাসাদটি শ্বেতবর্ণ। হাজার-দুয়ারী নামক প্রাসাদটি পীতবর্ণ, ইহা ১৮৩৭ সালে নবাব হুমায়ুনজার সময়ে নির্ম্মিত। ইহাতে অনেক দ্রষ্টব্য আছে। পাশ লইয়া এই প্রাসাদ দেখিতে হয়। প্রাসাদের সম্মুখে একটি কামান রহিয়াছে, তাহার সামনে ইমামবাড়া, প্রাসাদের অগ্রভাগে কয়েকটি গেটও রহিয়াছে। ইমামবাড়ার পার্শ্বে আর একটি কামান আছে। উহা প্রত্যহ দাগা হয়। প্রাসাদ ও ইমামবাড়া গঙ্গার উপরেই অবস্থিত। ইমামবাড়ার সম্মুখে একটি ক্লক-টাওয়ার রহিয়াছে। অপর পারে রোশনীবাগ ও ফর্হাবাগ। রোশনীবাগে নবাব সুজাউদ্দীনের সমাধি রহিয়াছে, ফর্হাবাগে একটি পুষ্করিণী রহিয়াছে, বাকী সব ধ্বংসপ্রায়।

প্রাসাদ হইতে পূর্ব্বদিকে রেলওয়ে ষ্টেশন। উহার পার্শ্বে নবাব সরফরাজ খাঁর সমাধি বিদ্যমান। তাহার পূর্ব্বদিকে বিরাটকায় কাটরার মসজিদ, উহার সিঁড়ির নীচে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর কবর রহিয়াছে। উহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে বনের মধ্যে জম-জমা নামক কামান অবস্থিত। উহারই সান্নিধ্যে একটি মসজিদ ও ইমামবাড়া অবস্থিত। উহা কদম সরিফ নামে পরিচিত, কিয়দ্দূরে কুলোরিয়া মসজিদ রহিয়াছে। নবাব প্রাসাদের দক্ষিণ-পশ্চিমে মীরজাফর-পত্নী মণিবেগম প্রতিষ্ঠিত চক-মসজিদ রহিয়াছে। কাটরা মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে মবারক-মঞ্জিল নামক বাগান-বাড়ী এবং নবাব-প্রাসাদের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে মহম্মদ রেজাখাঁর বাস-স্থান নিষাদবাগ অবস্থিত।

নবাব-প্রাসাদ ছাড়াইয়া কিছুদূর উত্তরে গেলে জাফর-গঞ্জের প্রাসাদ দৃষ্ট হয়। এখানে মীরজাফরের জ্যেষ্ঠ পুত্র মীরণের বংশধরগণ বাস করেন। এই প্রাসাদেই নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা নিহত হইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বদিকে মীরজাফর ও তাঁহার বংশধরগণের সমাধি-ক্ষেত্র রহিয়াছে। জাফরাগঞ্জের উত্তরে মহিমাপুর নামক স্থানে জগৎশেঠের বংশধরগণ বাস করেন। তাহার উত্তরে নশীপুর। এখানে নশীপুর রাজবাটি, বড় আখড়া, ছোট আখড়া এবং কাঠ-গোলার বাগান রহিয়াছে। দেবীসিংহের বংশধরগণই নশীপুর রাজবাটীর অধিকারী। নশীপুরের উত্তরে কিছু ব্যবধানে জিয়াগঞ্জ ও অপর পারে আজিমগঞ্জ অবস্থিত। এখানে জৈনদিগের অনেক সুরম্য অট্টালিকা ও মন্দির রহিয়াছে। আজিমগঞ্জের কিছুদূরে বড় নগরে রাণী ভবানীর সুশোভন মন্দিররাজি বিরাজমান এবং তাহার পূর্ব্বপারে সাধকবাগের প্রসিদ্ধ আখড়া অবস্থিত। বড় নগর বহুদিন যাবৎ শাস্ত্রচর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এখানেই প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক পূর্ণানন্দ বাস করিতেন।

মুর্শিদাবাদ নগরীর কিছু পশ্চিমাংশে গঙ্গার অপর পারে ডাহাপাড়া গ্রাম বিদ্যমান। এই গ্রাম মুসলমান আমলে খুবই সমৃদ্ধ ছিল। এ-স্থানের সন্নিকটে শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু আবির্ভূত হইয়াছিলেন। গাজিপুরের প্রসিদ্ধ সাধু পওহারী বাবাও এখানে পদধূলি দান করিয়াছিলেন। কিছুকাল পূর্ব্বে এই স্থানে বারেন্দ্র শ্রেণীর একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার নাম ছিল সারদানন্দ ভট্টাচার্য্য। ইহার কিছু পশ্চিমে কিরীট-কণা গ্রামে শ্রীশ্রীদেবী কিরীটেশ্বরী বিরাজমান। ইহা তীর্থস্থান।

প্রায় ৪০।৪৫ বৎসর পূর্ব্বে আর একজন সাধু জিয়াগঞ্জে বাস করিতেন। ইনি খাকী বাবা নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু মহাশয় স্ব-সম্পাদিত পাতঞ্জল-দর্শনে ইঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

জিয়াগঞ্জ ছাড়াইয়া কিছু দূরে ভগবানগোলা। এখানে একটি থানা আছে। ইহা একটি বাণিজ্য-প্রধান স্থান। পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ নগরী ভগবানগোলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহারই অনতিদূরে "তেলিয়া বুধুরী" নামক বৈষ্ণব পাট অবস্থিত। ভগবানগোলার দুই ক্রোশ উত্তরে পদ্মাতীরে লালগোলা অবস্থিত। ইহাই এ জেলার উত্তর সীমা। এখানে আসিয়া ই. বি. রেলের মুর্শিদাবাদ-শাখা শেষ হইয়াছে। এখানে ষ্টীমার ষ্টেশনও আছে। অপর পারে আবার গোদাগাড়ী-কাটিহার লাইন আরম্ভ হইয়াছে। লালগোলায় দাতব্য ঔষধালয়, হাইস্কুল, লাইব্রেরী, থানা ও সংস্কৃত চতুষ্পাঠী রহিয়াছে। এখানেই দানশৌণ্ড প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী মহারাজা রাও যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুরের বাস স্থান। তাঁহার প্রাসাদ ও গেষ্ট-হাউস (অতিথি-ভবন) বড়ই সুদৃশ্য।

এখান হইতে কিছুদূর ব্যবধানে "দেওয়ান সরিফ" অবস্থিত। এ স্থানে প্রস্তর দিয়া চতুর্দ্দিকে বাঁধান একটি সুন্দর পুষ্করিণী আছে।

বহরমপুর নগরী হইতে জেলার উত্তর দিকের কিছু বিবরণ দেওয়া গেল। এইবার দক্ষিণ দিকের কথা কিছু বলা যাইতেছে। বহরমপুরের কিছু দক্ষিণে প্রসিদ্ধ মনকরার মাঠ, যেখানে মহারাষ্ট্র-সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত নিহত হইয়াছিলেন। তাহার অনতিদূরে সারগাছী অনাথাশ্রম, মহুলা, ও ভাবদা গ্রাম অবস্থিত। ভাবদায় একজন ধনশালী মুসলমান জমীদারের বাস। ভাবদার দুই ক্রোশ দক্ষিণে বেলডাঙ্গা গ্রাম রহিয়াছে। এখানে হাইস্কুল, বাজার, থানা ও দাতব্য চিকিৎসালয় রহিয়াছে। এখানকার হাট খুবই প্রসিদ্ধ। এখানে সম্প্রতি একটি চিনির কল স্থাপিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ সাধক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ তপস্বী মহাশয়ের একটি আশ্রম ও চতুষ্পাঠীও এখানে আছে। এখানকার মনোহরা-সন্দেশ প্রসিদ্ধ। বেলডাঙ্গার পশ্চিমে কুমারপুরে রেশম-ক্ষেত্র রহিয়াছে। বেলডাঙ্গার দক্ষিণে রেজিনগর রেলওয়ে ষ্টেশন। তাহার অনতিদূরে নবাব সিরাজউদ্দৌলার সেনাপতি মীর মদনের সমাধি অবস্থিত। তাহার কিছুদূর ব্যবধানে পলাশীর রণক্ষেত্র এবং নদীয়া জেলার সীমা আরম্ভ। এখানেও একটি চিনির কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বহরমপুরের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত চুনাখালী ও মাদাপুর প্রসিদ্ধ স্থান। মাদাপুরে পূর্ব্বে কারাগার ছিল। তাহার পূর্ব্বের স্থানসমূহের মধ্যে দৌলতাবাদ, ইসলামপুর চক, ভগীরথপুর, ডোমকল আজিমগঞ্জ এবং জলঙ্গী প্রসিদ্ধ স্থান। গঙ্গানদীর পশ্চিমাংশের স্থানসমূহের মধ্যে শক্তিপুর প্রসিদ্ধ। ইহার অনতিদূরে বৌদ্ধ পীঠ বজ্রাসন ও শ্রীশ্রীকপিলনাথের মন্দির অবস্থিত। ঠিক ইহার পূর্ব্ব পারে পিলখানা গ্রাম রহিয়াছে। এ স্থানে পূর্ব্বে নবাবের হাতীশালা ছিল। কিছু দূর ব্যবধানে স্থিত বনগ্রাম ও দক্ষিণখণ্ডও প্রসিদ্ধ স্থান। গঙ্গার পশ্চিম পারে এ জেলার আর একটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে, উহার নাম একআনা চাঁদ-পাড়া। কথিত আছে, বঙ্গেশ্বর হুসেন শাহ বাল্যকালে এই গ্রাম-নিবাসী সুবুদ্ধি রায়ের বাড়ীতে রাখালী করিতেন। পরে বঙ্গের সিংহাসন লাভ করিয়া এই গ্রাম এক আনা করে স্বীয় পূর্ব্ব প্রভুকে বন্দোবস্ত করেন। সে জন্য এ গ্রাম অদ্যাপি উক্ত নামে আখ্যাত। এতদ্ব্যতীত সাগরদীঘি, নিমতিতা, কাঞ্চনতলা, সুতী, ধুলিয়ান প্রভৃতি স্থানগুলিও প্রসিদ্ধ। ধুলিয়ানেরই কিছুদূর ব্যবধানে ছাপমাটীর মোহনা, যেখানে ভাগীরথী গঙ্গা হইতে পৃথক্ হইয়াছে। গিরিয়া ও সেরপুর আড়াই নামক রণক্ষেত্রদ্বয়ও এ দিকে অবস্থিত।

কান্দী সহরের সন্নিকটে জেমুয়া ও বাসডাঙ্গা নামক দুইটি স্থানে দুইটি রাজবংশের বসতি স্থান। সম্প্রতি কান্দীর রাজা বীরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের প্রদত্ত লক্ষ টাকার সাহায্যে কান্দী সহরে একটি কলেজ স্থাপনের আয়োজন চলিতেছে।

জঙ্গীপুর সহর গঙ্গার দুই পারেই অবস্থিত। এক পারের নাম জঙ্গীপুর ও অপর পারের নাম রঘুনাথগঞ্জ, ইহার এলেকায় অবস্থিত গণকর মীর্জ্জাপুর রেশমী শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। এ জেলার প্রসিদ্ধ ব্যক্তিসমূহের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বহরমপুরের রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেন বরাট ও কাশীমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ী এবং রাজীব লোচন রায় (দেওয়ান) এবং রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুরের নাম এ অঞ্চলে খুবই প্রসিদ্ধ।

নলহাটি গ্রামের দুর্গানাথ সরকার এম. এ. দাসপুর নিবাসী সাতকড়ি অধিকারী, এম. এ ও সোমপাড়া নিবাসী কালীপ্রসন্ন চট্টরাজ এম. এ মহোদয়গণ প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ছিলেন। কান্দী মহকুমার টগরা গ্রামের শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং জঙ্গীপুর মহকুমার শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এবং সৈদাবাদের অধিবাসী শ্রীযুক্ত রামদাস খাঁ মহাশয়ও প্রসিদ্ধ অধ্যাপক রূপে পরিচিত।

বহরমপুরের রাম শরণ বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নাম সংস্কৃতাধ্যায়িবর্গের নিকট এক কালে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। প্রসিদ্ধ ধাত্রীবিদ্যা বিশারদ শ্রীযুক্ত বামনদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও এই জেলারই অধিবাসী।

এই জেলার আর একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি গঙ্গাধর কবিরাজ। আয়ুর্ব্বেদ-জগতে ইঁহার নাম ধন্বন্তরীর ন্যায় পূজিত।

জীবন-চিত্র

—শ্রীবিজনবালা দেবী

অমূল্য শাড়ী

বিশ্বকর্ম্মা ডাকেন, 'নীহার!—'

নীহার জবাব দেয়, 'আজ্ঞে যাই।'

দরজার কাছে নীহার দাঁড়াইয়া বলে, 'কেন?'

'আঁ্যা, আমার মুখ ধোয়ার জল দিয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা—যে জামাগুলো ইস্ত্রী করতে দিয়েছিলে—'

'সব দিয়েছে।'

'আহি—অহি কোথায়?'

'ওঠেন নি—'

'ওঠে নি? এত বেলা অবধি শুয়ে থাকে বলেই ঐ দশা। যেন আমকাঠের তক্তা—'

সুরুচি বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে উঠিতে বলেন, 'সকালবেলাই ওদের রূপ বর্ণনা আরম্ভ করলে কেন? তোমার যা স্বাস্থ্য! তাই আবার গরব কর!'

বিশ্বকর্ম্মা চক্ষু অর্দ্ধনিমিলিত করিয়া কপাল টানিয়া বলিলেন, 'আমার স্বাস্থ্য খারাপ বলতে চাও তুমি?'

'নিশ্চয় চাই। এখানে ব্যথা ওখানে ব্যথা—মাথা ধরাটি প্রায় রোজই আছে—দু'চামচে ভাত খেতে পার না—তোমার নিজের দশা তুমি টের পাও না? অষ্টপ্রহর ওষুধ আনা হচ্ছেই!'

'এটা জায়গার দোষ—এখানে বাতের ব্যামো খুব বেশী।'

কলেজের অভ্যাসটি বিশ্বকর্ম্মার এখনও যায় নাই। সকালে উঠিয়া একটু একসারসাইজ করেন। তারপরে প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া স্নো-ক্রীম-পাউডার একটার পর একটা মাখেন। মাথায় একবার চিরুণী, একবার ব্রাশ পড়িতে থাকে। গামছার পর কোমল তোয়ালে -তারপর পুরানো নরম ধোয়া বস্ত্রখণ্ডে অঙ্গমার্জ্জনা। গেঞ্জি বা ফতুয়া গায়ে দেওয়া, আর একবার আয়নায় মুখ দেখা, চুলের অবস্থা ইত্যাদি পর্য্যবেক্ষণ।

প্রকৃতি বুঝিয়া বাড়ীর লোকও তৈরী হইয়াছে। ঠাকুর প্রাতরাশ আনিয়া টেবিলে সাজাইয়া দেয়।

'আঃ, এ কি, আমায় মেরে ফেলবে তুমি—তোমার মতলব কি? ওগো—সব নিয়ে যেতে বল—আমার খিদে নেই।'

আজকাল সুরুচি আর পীড়াপিড়ি করেন না। দুপুর দুটা আড়াইটার সময় অফিসে টিফিন যায়। ইচ্ছামত টিফিন-ক্যারিয়ার সাজাইয়া দেন।

দু'মিনিটে আহার শেষ, মাছের টুকু ভিন্ন আর কিছুতে হাত পড়ে নাই।

নীহার বিশ্বকর্ম্মার সান্নিধ্য ছাড়িয়া এক পা কোথাও যায় না। পানের ডিবা খুলিয়া সামনে ধরে, সিগারেটটি হাতে দিয়া দেশলাই জ্বালিয়া ধরাইয়া দেয়। জামায় বোতাম পরায়, জুতা ঠিক করে, আর মুহুর্মুহু মোজা হইতে টাই পর্য্যন্ত ধোপা-বাড়ী ধুইতে ও ইস্ত্রী করিতে পাঠায়।

বিশ্বকর্ম্মা অসাধারণ অন্যমনস্ক। নীহার অসাধারণ সতর্ক।

বাবু বলিলে নীহার অনায়াসে সব কাজ করিতে পারে। বিশ্বকর্ম্মার অন্যমনস্কতায় একদিন বড় মজা হইয়াছিল। নগেনবাবু, বিশ্বকর্ম্মা ও আরও কয়েকজন আসিতেছেন—বিশ্বকর্ম্মার বাড়ীর সামনে বসিয়া গল্প-গুজব করিবেন। সন্ধ্যার পরে গান-বাজনা হইবে। নগেনবাবু ও বিশ্বকর্ম্মার বাড়ী পাশাপাশি এবং একই রকম দেখিতে। নগেনবাবুর বাড়ীর সামনে আসিয়া সুরুচিকে সংবাদ দিবার জন্য বিশ্বকর্ম্মা ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলেন। পিছনে সকলে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন—কেহ নিষেধ করিলেন না। বিশ্বকর্ম্মা বরাবর ভিতরে গিয়াছেন—বারান্দায় নগেনবাবুর স্ত্রী খোলা মাথায় ছেলেকে দুধ খাওয়াইতেছিলেন—তিনি তো এক-হাত ঘোমটা টানিয়া পালাইলেন।—দারুণ অপ্রস্তুত বিশ্বকর্ম্মা ফিরিয়া আসিতে একটা হাসির রোল পড়িয়া গেল।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'আপনারা বললেন না কেন?'

নগেনবাবু বলিলেন,' আপনি নিঃসন্দেহ ফিরে আসবেন জানি, তাই মজা দেখা গেল—'

কথাটার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া আবার হাসি উঠিল।

সুরুচি ও বিশ্বকর্ম্মার ভ্রাতৃবধূ একই রকম শাড়ী পরিলে বিশ্বকর্ম্মা প্রভেদ বুঝিতে পারিতেন না। দেশের বাড়ীতে গুরুজনের আধিক্য—বধূরা স্বল্পাবগুণ্ঠনযুক্তা। সর্ব্বদা মুখ দেখা যাইত না। বিশ্বকর্ম্মা ধাঁধাঁর পড়িতেন। হয়তো আগের বার সুরুচি পরিবেশন করিয়া গেলেন—বিশ্বকর্ম্মা বৌদি ভাবিয়া বলিলেন, 'আমায় আর একটু ঝোল দিয়ে যান।'

পরের বার বৌদি আসিলেন, সুরুচি মনে করিয়া বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'থাক্, আর দিও না।'

সে দিন বৌ-মা সম্পর্কিতা একজন একই রকম শাড়ী পরিয়াছেন। বাড়ীতে পূজা—বহু জন-সমাগম হইয়াছে। বিশ্বকর্ম্মা অন্দরে আসিয়া বলিলেন, 'দিদি, আমায় এক গ্লাস জল দিতে বল—'

দিদি ডাকিলেন, 'ছোট বৌ এক গ্লাস দিয়ে এস—'

সুরুচি স্নানে যাইবার জন্য তেল মাখিয়াছেন। বৌমা বলিলেন, 'আমি দিয়ে আসি।'

চারিদিকে লোক, বৌমা মাথায় কাপড় টানিয়া জল আনিয়া বিশ্বকর্ম্মার কাছে বারান্দার কিনারায় রাখিলেন। বিশ্বকর্ম্মা এদিক ওদিক চাহিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন, 'বাড়ীতে এসে যে দেখাই পাইনে—'

বৌমা তো দ্রুতপদে প্রস্থান!—বিশ্বকর্ম্মাও বাহিরে গেলেন। পরে সুরুচির সঙ্গে দেখা হইলে সুরুচি বলিলেন, 'তোমার হয়েছে কি? মানুষ চিনতে পার না? বৌমাকে কি বলেছ?'

বিশ্বকর্ম্মা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, 'কি বলেছি?'

'বৌমা আমায় ঘাটে গিয়ে বললে—বেচারী লজ্জায় বাঁচে না—হেসেও বাঁচে না। বলে কাকা বুঝতে পারেন নি—আপনি মনে করেছেন।'

'কখন? কি বলছ তুমি?'

'বৌমা তোমায় জল দিতে গেলে—'

'সর্ব্বনাশ—তাই না কি?- আমিও একটু অবাক হয়ে গেলাম যে, তুমি কথা না বলে চলে গেলে—ছি—ছি—ছি! বৌমা কি ভাববেন?'

'ভাববে আর কি? তোমায় জানে সবাই।'

'দোষ তোমাদের—' অনেক ভাবিয়া বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'আর তোমরা এক রকম কাপড় পর না।' সেই হইতে বাড়ীতে এক রকম শাড়ী পরা নিষেধ।

বিশ্বকর্ম্মা নূতন জায়গায় বদলী হইয়া আসিয়াছেন। নীহার দেখিয়া শুনিয়া ভাল ঠাকুর রাখিয়াছে। গোছ-গাছ হইয়া বসিবার পর সুরুচি একদিন শুনিলেন, ঠাকুর রোজই মাহিনা ঠিক করিয়া দিতে বলে।

ঠাকুর মাহিনা চায় অত্যন্ত বেশী। সুরুচি বলিলেন, 'অসম্ভব।'

নীহার বলিলেন, 'থাক না মা, কত টাকা কত দিকে খরচ হচ্ছে—বাবু খারাপ খেতে পারেন না। এই ঠাকুরই থাক।'

সুরুচি বলিলেন, 'তবে থাক।'

দুপুর বেলা বিশ্বকর্ম্মা অফিসে যাইবার পরে হঠাৎ রান্নাঘর হইতে বিষম গোলযোগ উঠিল। সুরুচি ব্যস্ত হইয়া ডাকিয়া বলিলেন, 'কি হল তোমাদের?'

নীহারের গলা অসাধারণ। সে প্রাণপণে চেঁচাইতেছে, '—চলে যাও—এখুনি চলে যাও তুমি— ওঃ ভারি ঠাকুর। তোমার মত ঢের মিলবে!—'

ডাকাডাকিতে শেষে কাছে আসিয়া বলিল, 'দেখুন না, মাইনে যা চায় তাই স্বীকার। আবার বলছে, কাপড়, জামা, গামছা, ক'খানা করে দেবেন তা বলুন—আর সন্ধ্যার আগে উনি আসতে পারবেন না—এই দু'টো মেনে নিতে হবে!'

সুরুচি হাসিয়া বলিলেন, 'সে না হয় হল—কিন্তু তুমি এত সম্মান করতে—বলতে খুব ভাল নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, 'ঠাকুরমশাই' 'আপনি' ভিন্ন কথা কইতে না—এক কথায় সব গেল?'

'যাক্ গে—চুলোয় যাক্।'

ঠাকুর বিদায় হইল। বিশ্বকর্ম্মা বৈকালে আসিয়া

শুনিয়া বলিলেন, 'ব্যাটা এগ্রিমেণ্ট চায়! কিছু আক্কেল দিয়ে দিতে পারলি না?'

সুরুচি বলিলেন, 'বামুনের ছেলেকে আবার আক্কেল কি দেবে? তোমার পছন্দ না হয়, না রাখবে। বেশী মাইনের কাজ যেখানে পাবে সেখানে যাবে বই কি? গরীব খেটে খেতে এসেছে—লাভ দেখবে না?'

বিশ্বকর্ম্মা প্রায়ই তীব্র শিরঃ-পীড়া ভোগ করেন। অ্যাস্পিরিন খাওয়া অভ্যাস। সুরুচি বলেন, 'ওসব তীব্র ওষুধ খেয়ে জোর করে মাথা ছাড়াতে নেই—শরীর খুব দুর্ব্বল হয়ে পড়ে।'

বিশ্বকর্ম্মা বলেন, 'তাই বলে কি যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে?'

অফিসে যাবার সময় বিশ্বকর্ম্মা ঔষধ সঙ্গে লইয়া গেলেন।

বৈকালে সুরুচি নীচে কাজ-কর্ম্মের ব্যবস্থা করিতে-ছিলেন, সন্ধ্যা জ্বালিবার জন্য উপরে গিয়া দেখেন বারান্দায় নিঃশব্দে বিশ্বকর্ম্মা চেয়ারে শুইয়া আছেন।

লাইট জ্বালিয়া সুরুচি বলিলেন, 'এ কি? কখন এলে? আমি আরও ভাবছি কোথাও গেছ, এমন করে পড়ে রয়েছ যে?'

শিথিল মৃদুস্বরে বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'শরীর ভারি অবসন্ন বোধ করছি।'

'তা করবে না? বয়স বাড়ছে বই কমছে না, বারণ করলে শুনবে না। আর খেয়ো না ওসব। হাত মুখ ধোও।'

বিশ্বকর্ম্মা অতি ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, 'আমার অজ্ঞান-অজ্ঞান উপস্থিত।'

ভয়ে ভয়ে সুরুচি বিশ্বকর্ম্মার আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন—নাড়ী টিপিয়া গায়ে হাত দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিলেন, শেষে বলিলেন, 'ডাক্তার ডাকব? ডাকতে পাঠাই?'

'না—টাকা-পয়সা যা আছে তোমার অসুবিধা হবে না।'

'যাও—সব তোমার চালাকি!—এত যার শরীর খারাপ সে বুঝি পাঁচটা পর্য্যন্ত অফিসে থাকে? সব তোমার মিথ্যা কথা।'

'মিথ্যা নয়—মিথ্যা নয়!'

'না মিথ্যা নয়! ও রকম করবে তো আমি চললাম।'

বিশ্বকর্ম্মা সুরুচির হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, 'বেশ আর বলব না।'

'তবে চালাকি?'

'না, আমার শরীর সত্যি বড় খারাপ হয়েছে।'

—'খাও অ্যাস্পিরিন? কুলের পাতায় চুণ দিয়ে লাগালে মাথা ধরা সারে, কুসুই বেঁধে রাখলে সারে, তা নয়, খাবে ঐ কড়া ওষুধ—এত কি ঔষধ-ভক্ত তুমি!'

এ অভ্যাস বিশ্বকর্ম্মার আছে। এবার বেশী কাজের চাপ, কি বেশী ধূম্রপান, যে জন্যই হোক, মাথা খুব ভার, দেহ দুর্ব্বল, চলিতে ফিরিতে কষ্ট,—নানা উপসর্গ দেখা দিল। অনেকেই ব্লাড-প্রেসার সন্দেহ করিয়া চিকিৎসার পরামর্শ দিলেন। সুরুচি প্রতিদিন তাগাদা দেন। শেষে একদিন রবিবার সকাল বেলা পোষাক পরিয়া বাহির হইয়া ঘণ্টা দুই পরে ফিরিয়া একেবারে শয্যাশায়ী! উদ্বিগ্ন সুরুচির আতঙ্কের সীমা রহিল না, বলিলেন, 'কি বললে ডাক্তার?'

'বললে, এই মুহূর্ত্তে ছুটী নিন্। যে কোন সময় প্রাণটি চলে যেতে পারে।'

সুরুচি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'ছুটির দরখাস্ত করেছ?'

—'করব।'

'বাড়ী নয়—রাঁচী কি বৈদ্যনাথ চল। জিনিষপত্র সব বাড়ী পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'কিন্তু ছোড়দার চিঠির কথাটা ভাবলে না? সুবর্ণ বাড়ী বসে থেকে মূর্খ হয়ে যাচ্ছে, তাকে আনতে হবে।'

'আর কারও কথা ভেবে কাজ নেই, এখন নিজের কথা ভাব।'

'নিজের তো শেষ, আর ভাববার কিছু নেই।'

খানিক পরে বিশ্বকর্ম্মা ধীরে ধীরে বলিতেছেন, 'সব দিছে—'

চকিত হইয়া সুরুচি বলিলেন, 'কি?'

'সব মিথ্যা—'

'ডাক্তারের কাছে যাও নি ?'

'গিয়েছিলাম—'

'কি বলেছেন ?'

'বলেছেন—ব্লাড-প্রেসার তো নয়ই। বরং যতটুকু চাপ থাকা দরকার তা নেই।'

'আচ্ছা, এমন নির্জ্জলা মিথ্যা কি করে বলতে পার বল দেখি ? ছি, ভারি যাচ্ছেতাই তুমি,—আমি ঠিক বিশ্বাস করেছিলাম।—যাও আর তোমার কোন কথা শুনব না।'

'একটু মজা দেখলাম—দেখি তুমি কি কর।'

'করব কি ?—অদৃষ্টে যা আছে হবে।'

'ঈস্—ভাল ভাল রঙীন শাড়ী পরা বন্ধ!—এক বেলা মাছ না হলে চলে না,—খেতে পার না—মজা বুঝবে তখন। তোমাকে একটু শিক্ষা দেবার জন্যেই আমার মরতে ইচ্ছে হয় এক একবার—মরে যে আর ফিরে আসা যায় না, নইলে দেখতাম। তুমি আমার সঙ্গে যা দুর্ব্যবহার কর।'

'আমি দুর্ব্যবহার করি ?'

'কর না ? এক কথায় সাত কথা শুনিয়ে দাও—ঝকার, গঞ্জনা লেগেই আছে। আমি কোন জিনিষ এনে দিলে তা পছন্দ হয় না, আমি যা বলি তার উল্টো করবে—এই সব নানান কারণে বাঁচবার ইচ্ছে নেই—' বিশ্বকর্ম্মা মুখ নিতান্ত বিরস করিলেন।

'বেশ গো বেশ,—যা বললে ভাল। কর্ত্তার কাজে দোষ নেই, সমস্ত দিন তোমার প্রতাপে সব জড়সড়। একটি জিনিষ চেয়ে এক মিনিট দেরি হলে মাথা কাটা—স্নানের পর এক সেকেণ্ড দেরী হলে ব্রহ্ম-হত্যা হয়। বাইরে বেশ থাক, বাড়ীতে এলেই রুদ্রমূর্ত্তি!—আজ ন'টায় বলছ খাবার চাই,—কাল রাত এগারটায় চাইবে। ঠাণ্ডা হলেও খাবে না—খুব গরমও না। বল দেখি কি করি ? তোমার মতন খাম-খেয়ালী মানুষের রুটীন বেঁধে দেওয়া উচিত। এই সময় এই চাই—তাতে যদি ক্রটি হয় আমাদের দোষ। তা নয় এমন ধারা করলে কি চলে ? কৌটা খুলবে সিগারেট বার করবে তবে দেবে—দে—বললে তো সেই সেকেণ্ডেই হাতে চাই। নইলে গর্জ্জন।—সর্ব্বক্ষণ ওরা কান খাড়া করে থাকে। তবু ক্রটী, এমন ভয়ে ভয়ে বাস করা চলে ?'

'তোমার ভয় ? তোমার দাপটে সব শুদ্ধ অস্থির!—তুমি একটি সিংহিনী—কেবল আমি বলহীন—সবাই জানে সবাই তোমার গুণগ্রাম টের পেয়েছে।'

'কারা কারা টের পেয়েছে ?'

'তাদের নাম বলব কি তাদের দফা রফা করতে ? এখনই আমার এই দুর্দ্দশা—এর পর বৃদ্ধ বয়সে তোমার হাতে আমার যা হবে, তা স্পষ্ট বুঝতে পারছি।'

'তা বেশ করেছ, এখন ওঠ, স্নান-টান কর।'

'করি—নীহার!—'

নীহার ঘরেই ঠুকঠাক করিতেছে।

বিশ্বকর্ম্মা প্রায়ই বলেন, 'আমার সন্ন্যাস-যোগ আছে, কোন্ দিন চাকরী ছেড়ে বেরিয়ে পড়ব দেখো।'

সুরুচি বলেন, 'তা হলে একটি ধোবা একটি নাপিত আর একটি দরজী সঙ্গে নিও।'

'ও সব কি হবে ?'

'মন ভাল থাকলে ভগবানের নাম হবে। চুলের পরিপাটি, পোষাকের কাট, ভাল ধোপ ইস্ত্রী এ সব না হলে তোমার মন ভাল থাকে না।—'

তমলুক হইতে বদলী হইবার সময় জিনিষপত্র প্যাক হইতেছে, নিঃশব্দে একটি গুপ্তচর সুরুচিকে বলিল, বাড়ী-ওয়ালার একখানা বঁটি ও একটি তালা রান্নাঘরের দরজায় ছিল, নীহার সে দুটিও জিনিষের সঙ্গে দিয়াছে।

সুরুচি বলিলেন, 'ছি ছি নীহার, এমন কাজ কর না, পরের জিনিষ নিতে আছে ? তোমাদের অভাব কিসের ? আর অভাব হলেই কি অন্যেরটা নিতে হবে ? রাখ সে দুটো যেখানে ছিল।'

'খুব ভাল বঁটি মা, আর তালাটাও খুব মজবুত।'

'রাম-রাম তাই বলে নিতে হবে ? রাখ শীগ্‌গীর।'

'কে বললে আপনাকে ?' নীহার মনে মনে রাগিয়াছে।

'তার নাম বলে আমি বিপদ বাধাই আর কি। যেই বলুক, তুমি রাখ।'

'আচ্ছা রাখলাম—পড়েই ত ছিল। ভাগ্যি আমরা বাড়ী ভাড়া নিয়েছি—নইলে পাঁচ বছর বাড়ী অমনি রয়েছে। কে নেবে এত ভাড়া দিয়ে? ভারি তো তালা—ভারি বঁটি—'আপন মনে বলিতে বলিতে নীহার জিনিষ দুটা বারান্দার এক কোণে সশব্দে রাখিয়া দিল।

মেদিনীপুর আসিয়া কিছুদিন পরে সুরুচি আবার খবর পাইলেন, নীহারদের ঘরের দরজায় সেই তালা এবং উক্ত বঁটিতেই মাছ কাটা চলিতেছে।

খানিক রাগারাগি করিয়া সুরুচি বলিলেন, 'কাউকে দিয়ে দিক ও দুটো—'

নীহার বলিল, 'এত বকুনি খেলাম যার জন্যে—সে আর কাউকে দিচ্ছিনে।'

কয়েক দিন পরে বাসার দুইটি ভাল তালা হারাইয়া গেল। একখানা বঁটি ভেঙে পড়িয়া নষ্ট হইল। সুরুচি বলিলেন, 'নাও, হল এখন? ঐ একটা পচা পাঁচ আনার তালার বদলে ভাল তালা দুটো গেল তো? আর এই পচা বিশ্রী বঁটি—দু'খানা বঁটী বাড়ীতে, তবু পরের জিনিষ চুরি করলে! এ হবেই, ওর শোধ তুলতে আরও কত যায় দেখ!'

এবার নীহারের চৈতন্যোদয় হইল। বলিল, 'দুত্তেরী হতভাগা বঁটির এমন গুণ জানলে কে আনত?'

গিরির বাসা একটু দূরে। সুরুচি বঁটিটা গিরিকে দিয়া দিলেন। তালাটা খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। বাহির হইতে কে লইয়া গিয়াছে।

বিশ্বকর্ম্মা উত্তর হইতে দক্ষিণে বদলী হইলেন।

সুরুচিকে ম্যালেরিয়ায় ধরিয়াছে। শরীর দুর্ব্বল। তাঁহাকে পিত্রালয়ে রাখিয়া বিশ্বকর্ম্মা গিয়া কাজে যোগ দান করিলেন। মাস খানেক পরে ছুটি লইয়া সুরুচিকে লইতে আসিলেন।

রাত্রি দশটায় ট্রেন। সুরুচি ও ছোট শ্যালককে লইয়া বিশ্বকর্ম্মা যাত্রা করিলেন। তখন হিন্দু-মুসলমানে খুন দাঙ্গা—একটু থামিয়াছে।

সকলেই বলিলেন, 'এমন দিনে না এলেই হত'। ঝগড়াঝাঁটি একেবারে মিটে গেলে যাওয়াই উচিত ছিল।'

সান্তাহার গিয়াই খবর—কলিকাতায় আবার ভীষণ দাঙ্গা বাধিয়াছে। অনেক খুন-জখম হইতেছে।

টেলিগ্রামটা পাইয়া যাঁরা সান্তাহার পর্য্যন্ত তুলিয়া দিতে আসিয়াছিলেন, একবাক্যে সকলে নিষেধ করিলেন, 'আজ ফিরে যান, বিপদে ঝাঁপ দেবেন না।'

কিন্তু বিশ্বকর্ম্মা অচল অটল। 'কিছু হবে না'—বলিয়া উড়াইয়া দিলেন।

ভোরবেলা শিয়ালদহ পৌঁছিয়া অনেক দেখিয়া বিশ্বস্ত পরিচিত লোকের দ্বারা হিন্দুর ট্যাক্সি ঠিক করিয়া বিশ্বকর্ম্মা একটা ভাল বোর্ডিং-এর নাম বলিয়া দিলেন।

সেই কলিকাতা!—সভয়ে সুরুচি বলিলেন, 'দেখেছ? পথে লোকজন কিছু নেই। ট্রেনে অন্য মেয়েরা ছিল, কিন্তু এ পথে কেউ আসেনি তো—'

'কলকাতা ছেড়ে সব পালাচ্ছে—আসবে কি?'

'কি জানি কি হয়—'

'কিছু ভয় নেই। সকালের দিকে গোলমাল হয় না বড়।'

প্রাণ হাতে করিয়া বোর্ডিং-এ পৌঁছান গেল।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'আমি কিছু জিনিষপত্র কিনে নিয়ে আসি।'

সুরুচি তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, 'সে হবে না, এক পা যেতে পাবে না।'

'তেল না হলে স্নান করবে কি করে? সাবান তোয়ালে কিনতে হবে—ওখানে ভাল পাওয়া যায় না। এই নীচেই দোকান—এখুনি আসছি।'

'না—না কিছু দরকার নেই। দেখছ পথের অবস্থা? লোকজন আছে?'

'আরে—আমি পথে বেরুব না কি? বোর্ডিং-এর নীচেই দোকান।'

'তবে আরদালী সঙ্গে যাক—'

বিশ্বকর্ম্মা নামিয়া গেলেন। সুরুচি জানালা দিয়া দেখিতে লাগিলেন, সত্যই পথে বাহির হন কি না।

মিনিট পাঁচেক পরে বিশ্বকর্ম্মা ফিরিলেন। কেবল দু'বাক্স সাবান ও এক শিশি জবাকুসুম। বলিলেন, 'দেখ কত শীগ্গির এসেছি।'

হোটেলের পরিচারক চায়ের সরঞ্জাম টেবিলে রাখিয়া গেল। চা-পানাদির পর বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'টাকা দাও দেখি।'

'টাকা কি হবে? এখন?'

'ঐ জিনিষপত্রগুলি আনব। তোমার কাপড়ও আনব।'

'আমার কাপড়? আমার কাপড়ের কোন দরকার নেই তো?'

'আছে—আছে, আমি জানি। কলকাতার ওপর দিয়ে যাব কিছু না নিয়ে? তা কি হয়? তুমি দাও টাকা—'

'সে কি, সর্ব্বনাশ করবে তুমি।'

'পাগল না কি? আমার প্রাণের মায়া নেই?'

মনিব্যাগ খুলিয়া বলিলেন, 'ও: ঢের আছে—এতেই হবে।'

'তুমি স্নানটান কর—আমি আসছি—' ছড়ি লইয়া বিশ্বকর্ম্মা চলিয়া গেলেন।

সুরুচি চৌকি দু'খানাতে বিছানা পাতিলেন। টেবিলের উপর কাগজ পাতা হইল। ঘরটি তেতলার এক দিকে রাস্তার উপর। কলের পুতুলের মত কাজ করিতে করিতে পথ দেখিতেছেন।

ছোট ভাই হেমেন বলিল, 'দিদি, ভাবনার কিছু নেই। এখনি আসবেন।'

সুরুচি বলিলেন, 'আমি স্নান করে আসি—পরে তুই যাস।'

শিশি খুলিয়া তেল ঢালিতে ঢালিতে সুরুচির মনে হইল এ তেল অমূল্য, দারুণ সঙ্কট-সময়ের আনীত এ জিনিষ—ইহা ব্যবহারের নয়—তু'লয়া রাখিবার।

স্নান করিয়া আসিয়া জানালার কাছে বসিয়া সুরুচি বলিলেন, 'এবার তুমি স্নান করে এস।'

পথে লোকজন চলিতেছে—গত দিনের মারামারির ইতিবৃত্ত সকলের মুখে—বেলার সঙ্গে সঙ্গে পথে জনতা হইয়াছে—কিন্তু স্বাভাবিক যেমন হওয়া উচিত তাহার তুলনায় এক আনা মাত্র।

সেই সময় কতকগুলি লোক ছুটিতে ছুটিতে বলিয়া গেল, 'আবার বেধেছে—আবার বেধেছে—এই আরম্ভ হল—'

তাহাদের চীৎকারে পথিকেরা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

আবার একদল!—'কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে, কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে!—'

সর্ব্বনাশ!—বিশ্বকর্ম্মা জুতা কিনিতে নিশ্চয় কলেজ ষ্ট্রীটে গিয়েছেন। জুতার উপর তাঁর যা ঝোঁক! কলিকাতায় আসিলেই জুতা কেনা চাই।

সুরুচির ভাবিবারও শক্তি নাই—উঠিবারও শক্তি নাই, পথের উত্তেজিত বাক্য সকল কাণে আসিতেছে।—কিন্তু অর্থ গ্রহণ করিবার মন নাই।

আটটা বাজিল। এমন নির্ব্বান্ধব স্থান—আরদালীটি পর্য্যন্ত সঙ্গে গিয়াছে। কাকে পাঠাইবেন—কে কোথায় খুঁজিবে?

হেমেন স্নান করিয়া ঘরে আসিল। বলিল, 'দিদি, জামাইবাবু এখনও এলেন না,—সবাই বলছে আজ ভোর থেকেই কাটাকাটি বাধল।'

সুরুচি ভাবিলেন, আজ সব শেষ,—সমস্ত ভাবনা-চিন্তার আজ অবসান।

কেশতৈলের স্নিগ্ধ মিষ্ট গন্ধ বিশ্বকর্ম্মার স্নেহ-পরিপূর্ণ মনের অগাধ প্রীতির পরিচয় দিতেছে।

বোর্ডিংবাসীরাও স্থানে স্থানে জটলা করিতেছিল। কোথায় খুন হইয়াছে—কলেজ ষ্ট্রীটে দাঙ্গা বাধিল,—বড়বাজারে ভীষণ কাণ্ড, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে বহু জখম; অত্যাচারীরা উন্মত্ত হইয়া ঘুরিতেছে, বালক-যুবা-স্ত্রী কারও নিস্তার নাই। কখন বোর্ডিং আক্রমণ করে, এই ভয়ে সকলে সশঙ্ক।

বিশ্বকর্ম্মা ঘরে ঢুকিলেন। আরদালী কয়েকটা প্যাকেট রাখিয়া গেল।

বিশ্বকর্ম্মা একটা প্যাকেট খুলিয়া দেখাইলেন কতকগুলি শাড়ী, একখানা খুব মিহি ও লালপাড়, বেশ দামী। কাপড়ের পাড়গুলি দেখাইতে কি আগ্রহ! সুরুচি কাপড় দেখিবেন কি, ক্রেতার নিরাপদ প্রত্যাবর্তন তাঁহার তখনও বিশ্বাস হইতেছে না। নীরবে উঠিয়া সরবৎটি আনিয়া হাতে দিলেন।

এই শাড়ীখানি সুরুচি বহু যত্নে রাখিয়াছিলেন, মাঝে মাঝে দু'একদিন পরিতেন। বলিতেন, 'এ কাপড় অমূল্য

জীবন বিপন্ন করে কেনা—পৃথিবীতে এর দাম নেই। মনে হলেও আমার প্রাণ কাঁপে।'

খাওয়ার পর ঘণ্টা দুই নিদ্রা। বেলা চারটার সময় আরদালী সংবাদ দিল কলিকাতার অবস্থা খুব খারাপ। ভীষণ কাণ্ড!—ক্রমেই বৃদ্ধি!—চতুর্দিকে খুন-জখম—আর্ত্তনাদ, কোলাহলের ভীতিপ্রদ সংবাদ!

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'বিপ্লব বাড়তেই থাকবে। চল—হাওড়া গিয়ে বসে থাকিগে। সেখানে নিরাপদ। 'আফতাব—লরী ডাক—'। লরী আসিল। নূতন সংবাদও আসিল—মেসিন গান, গোরা ও অশ্বারোহী সেনা শান্তিরক্ষার জন্ত দুর্গ হইতে পাঠান হইয়াছে। শিয়ালদহ হইতে হাওড়া পর্য্যন্ত পথের মধ্যে পূর্ণবেগে বিপ্লব চলিতেছে।

ঠিক হইল বায়ুবেগে পথটুকু যাইতে হইবে। বেশ-ভূষা সারিয়া বিশ্বকর্ম্মা, সুরুচি, জেজেন ও আফতাব গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

লরী ছুটিল, মাথার উপর বৈশাখের তীব্র তাপ—চারিদিকে ঘোর বিপ্লব, অন্তরে দারুণ উদ্বেগাতঙ্ক। বিশ্বকর্ম্মা মনের ভার চাপিয়া সামনের দিকে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সুরুচি বুঝিতেছেন।

পথ নিস্তব্ধ, দুই দিকের গৃহ-শ্রেণীর ঘরে জানালা বন্ধ—লোকজনের চিহ্ন নাই। কোন পথে দুই তিনটি লোক দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছে। কোথাও মুক্ত-দ্বার ঘরে দু'একটি বালককে দেখা গেল। স্থানে স্থানে সজ্জিত ঘোড়সোয়ার পুলিশ ও বন্দুকধারী গোরা সেনা রহিয়াছে। কিন্তু সব নিস্তব্ধ। পথে যান-বাহনের চিহ্নমাত্র নাই।—যেন ঘুমন্ত পুরী।

হঠাৎ এক জায়গায় জনতা দেখিয়া সুরুচি চমকিয়া উঠিলেন। সামনে কয়েকখানা গরুর গাড়ী—লরী থামিল। প্রাণ যেন হাতে। একটি বন্দুকও সঙ্গে নাই। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'বড় ভুল করেছি বন্দুক আনি নি।'

সুরুচি বলিলেন, 'আনলেই বা কি হত—ক'জনকে মারতে?'

জেজেন বলিল, 'ট্যাক্সিতে এলে এর আগে পৌঁছে যেতাম।'

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'ট্যাক্সিতে এত জিনিষ ধরত না।'

গাড়ী পুলের উপর উঠিল। দুই দিকে গঙ্গা-বক্ষে অর্ণবযান। কিন্তু সে শোভা দেখিবার মত মন নয়।

ষ্টেশনে গাড়ী থামিল। সে কি কোলাহল! যেন প্রলয় কাল। যেন মহা ঝড় সুরু হইয়াছে—যেন বিরাট মেলা বসিয়াছে!

যা হোক, ভগবানের কৃপায় নিশ্চিন্ত হইয়া সুরুচি বলিলেন, 'জল, এমন তৃষ্ণা পেয়েছে।'

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'ভয়ে।'

'তোমার ভয় হয় নি? সত্যি বল।'

বিশ্বকর্ম্মা একটু হাসিয়া বলিলেন, 'সে আর বলে কি হবে!'

ওয়েটিং-রুমে টিফিন ও বরফ দেওয়া জিঞ্জারেড আসিল।

সুরুচি বলিলেন, 'কি মনে হচ্ছে?'

'থাক, বলে কাজ নেই।'

অতঃপর আড়াইটা হইতে রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত কাল্না বাস। বহু লোক দলে দলে সস্ত্রীক কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতেছে। সামনে যে ট্রেন দেখে তাতেই উঠিয়া পড়ে। বলে, 'কলিকাতা তো ছাড়ি—দু'ষ্টেশন গিয়ে তখন যা হয় ব্যবস্থা করব।' যার যেখানে যে আছে, সে সেইখানেই ছুটিয়াছে।

ট্রেনে উঠিয়া বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'নাও এখন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও—নামতে হবে ভোর চারটেয়।'

ততক্ষণে সুরুচি শয্যাদি ঠিক করিয়া বসিয়াছেন। বলিলেন, 'হাত মুখ ধুয়ে এস—তারপর আমরা খাব।'

খোলা জানালা দিয়া ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগিল।

একে একে হাত-মুখ ধুইয়া ফিটফাট হইয়া নিশ্চিন্ত ভাবে নিশ্বাস ফেলিয়া সকলে বিছানায় বসিলেন। বিশ্বকর্ম্মা সিগারেট ধরাইয়া বলিলেন, 'উঃ কি অন্যায় করেছি, ভগবান রক্ষা করেছেন।'

'ভগবান কি এখন রক্ষা করেছেন? সেই তখন থেকে যখন এক দোকানের শাড়ী পছন্দ হল না বলে আর এক দোকানে গেলে—প্রায়ই মারামারি হচ্ছিল।

'কে বললে?'

'বললে আফতাব। আবার কপালে যাব, ঠাকুর ডাকিয়া—এসে না বিশ্রাম না কিছু—আগেই শাড়ীর প্যাক দেখান!—শাড়ী-পরা জন্মের মত ঘুচে গিয়েছিল আজ!'



জন্ম—১২৮৩ সাল, ৩১শে ভাদ্র] শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [মৃত্যু—১৩৪৪ সাল, ২রা মাঘ

হারাধনের পাঁচটি জরু



কংগ্রেস নামক ভদ্রলোকের [illegible], শ্রমিক, হিন্দুসভা, কিষাণ ও মুসলিম লীগ নামে পাঁচটি সহধর্মিণী। [illegible]

বর্ত্তমান জগৎ

— শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

চীনে পট-পরিবর্ত্তন

সাংহাই গেছে, নানকিং গেছে, হ্যাংকৌও গেল। জাপানের প্রধান সেনাপতি জেনারেল মাৎসুই জানিয়েছেন, এই দুরন্ত শীতে জাপানী বাহিনী এখন কিছুদিন বিশ্রাম নিতে চায়। সেই সঙ্গে চীনের প্রতি গভীর অনুকম্পায় তাঁকেও ভেবে দেখবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ করার দুর্ব্বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দেওয়া সমীচীন হবে কি না।

সৌভাগ্যের বিষয়, চীন এই অমূল্য হিতোপদেশের মর্য্যাদা উপলব্ধি করে নি। ৯ই ডিসেম্বর মার্শাল চিয়াং-কাই-সেকের ওয়াশিংটনের পরামর্শদাতা মিঃ ডুগিন মাইনা ঘোষণা করেছেন, "নানকিঙের যাই হোক না কেন, চীন যুদ্ধ চালাবেই। দু'তিন বৎসর যুদ্ধ চালাবার প্রয়োজন হলেও দমবে না।"

মনে হয়, এ তাদের শূন্য আস্ফালন নয়। জাপান যতখানি অধিকার করেছে, তার পরেও বিপুল ভূখণ্ড পড়ে রয়েছে। সেখানে থেকে গরিলা-যুদ্ধ চালান তাদের পক্ষে সহজ হবে। যদি দীর্ঘকাল তারা জাপানকে যুদ্ধে ব্যস্ত রাখতে পারে, তা হলে নিশ্চয়ই অর্থসঙ্কটে পড়ে জাপানকে বাধ্য হয়ে রাজ্যলোভ ত্যাগ করতে হবে।

কিন্তু আকস্মিক ভাবে একটা মস্ত বড় পরিবর্ত্তন চীনে ঘটেছে। মার্শাল চিয়াং-কাই-সেক যে-কমিউনিষ্ট দলের উচ্ছেদ-সাধনের জন্য সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন এবং অমানুষিক অত্যাচার করতেও কুণ্ঠিত হন নি, সেই কমিউনিষ্ট দলই আজ ভাগ্য-চক্রের পরিবর্ত্তনে চীনের বর্ত্তমান সঙ্কটে উদ্ধার-কর্ত্তারূপে আবির্ভূত হয়েছে। উত্তর-চীনে কমিউনিষ্ট নেতৃত্বে নূতন গণ-বাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে। জেনারেল চু টে তার অধিনায়ক। তাঁর নেতৃত্বে অষ্টম-রুট আর্ম্মি গত চার মাস থেকে যে ভাবে যুদ্ধ করছে, তার কিছু পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

গত চার মাসের মধ্যে একটি চীনা বাহিনীও, এমন কি একটি চীনা সৈন্যও শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করে নি বা শত্রুপক্ষে যোগ দেয় নি। অষ্টম-রুট আর্ম্মিই এখন জন-আন্দোলনের নেতৃত্ব করছে, পার্টির অধীনে জন-বাহিনী গঠন করে তাদের অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত করছে এবং শত্রু-বাহিনীকে বিভক্ত ও উৎপীড়িত করে ধ্বংস করবার ব্যবস্থা করছে।



নিরপেক্ষতা আইনের গভীর মনোযোগে পাঠক—

চারিদিকে যুদ্ধের গোলমাল, উপর্যুপরি বারুদের গোলা ফাটিতেছে। বিশেষ করিয়া সাংহাই-এর ব্যাপারটা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে অনেক সাড়া দিয়াছে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে। তবু যুক্তরাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকিবার চেষ্টা করিতেছে।

এই প্রসঙ্গে অষ্টম-রুট আর্ম্মির সহকারী অধিনায়ক জেনারেল পেং-তে হুয়েই-এর একটি কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন,—

"আমাদের মধ্যে অনেকের আগে বিশ্বাস ছিল, জাপানের রণকৌশল অতুলনীয় এবং অভ্রান্ত। কিন্তু এই কয়মাসের যুদ্ধের পরে আমি মনে করি যে, জাপানের রণ-কৌশল

যেমন কিছু নয়। তারা প্রায় সম্পূর্ণরূপেই কামান, ট্যাঙ্ক ও বিমান-পোতের উপর নির্ভর করে। তাদের সঙ্গে আমাদের অষ্টম-রুট আর্মির ছোট বড় প্রায় ছ'শো লড়াই হয়েছে। চীনে আমাদের বাহিনীর অস্ত্র-শস্ত্র সব চেয়ে খারাপ। তবু তারা আমাদের একটি রাইফল্ও হস্তগত করতে পারে নি। উপরন্তু আমরাই প্রায় তিন হাজার জাপানী রাইফল্, কিছু বড় কামান, বহু মেশিন গান, বহু পরিমাণ গুলি-গোলা, বোমা, গ্যাস-মুখোস, বিমানধ্বংসী কামান, বহু পরিমাণ খাদ্য ও বস্ত্র হস্তগত করেছি এবং



পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদীদের ক্লাবের মেম্বর। 'এটা কোন্ দেশী ইয়ারকি ?'

জাপানী বাহিনীর উৎকৃষ্ট যে পঞ্চম বাহিনী তাকেও পরাজিত করেছি। একে অস্ত্রসজ্জায় দুর্বল, তার উপর শত্রুর সৈন্য-সংখ্যা কোথাও কোথাও আমাদের থেকে দশ গুণ বেশী, তবু যেখানে জাপানের দশ হাজার সৈন্য হতাহত হয়েছে, সেখানে আমাদের তার অর্দ্ধেকও হয়নি।"

জেনারেল পেং-তে হোয়েই জানিয়েছেন, "আমরা সিদ্ধান্ত করেছি, যতদিন না জাপান চীন এবং মাঞ্চুরিয়া থেকেও বিতাড়িত হচ্ছে, ততদিন, (অবস্থা যাই হোক না কেন, আমাদের বাহিনী শানসী, হোপেই এবং সমস্ত উত্তর-চীন থেকে নড়বে না।"

তাঁর বিবৃতি থেকে আমরা জানতে পারি, তাইসিয়েন কুওসিয়েন, তাইউয়ানফু, শোইয়াং, ইউৎসে এবং পিঙ্ তিং-এর অর্দ্ধাংশ এখনও তাঁদের হাতে আছে। চাহার প্রদেশের ওয়েইসিয়েন, চুলো ও ইউকচিয়েন এবং হোপেই প্রদেশের তাংসিয়েন, শিন্তাং, লিনৎসে, চুইয়াং, ওয়ানসিয়েন, মানসিংয়েং, কুপিং, লাইউয়ান ও জেচিংকোয়ানও তাঁদেরই অধিকারে।

জেনারেল চু টে অস্ত্র, বস্ত্র, ঔষধ-পথ্য, অর্থ প্রভৃতির জন্য বোধ হয় সকল দেশের কাছেই সাহায্য চেয়েছেন, ভারতের কাছেও। একটা জাপানী সংবাদে প্রকাশ, মার্শাল চিয়াং কুওমিনটাঙের অর্দ্ধেক আসন কমিউনিষ্ট দলকে দিতে সম্মত হওয়ায় রুশিয়া অনেকগুলি এরোপ্লেন ও বৈমানিক পাঠিয়েছে। ওদিকে আমেরিকা থেকেও গত মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কয়েক জন বৈমানিক মেজর ও সাধারণ বৈমানিক এসে পৌঁছেছেন। সেই সঙ্গে চীনেও বিমান-যুদ্ধ শেখাবার জন্যে বিরাট আয়োজন আরম্ভ হয়েছে। তাতে এক বৎসরের মধ্যেই বহু সহস্র বৈমানিক শিক্ষিত হবে।

বর্ত্তমান অভিজ্ঞতায় চীন বুঝেছে, এ যুগে বিমান-শক্তিই সব চেয়ে বড় শক্তি। শুধু আত্মরক্ষার কৌশলেই নয়, আক্রমণের কৌশলও তাদের আয়ত্ত করতে হবে। অস্ত্র-সজ্জায় দুর্ব্বল চীনের পক্ষে শুধু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে যুদ্ধ করলে চলবে না, গতিশীল প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন দল সংগঠন করে শত্রু বাহিনীর পুরোভাগ এবং পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করতে হবে। এখন তারা এই ভাবেই রণ-কৌশলের পরিবর্ত্তন করেছে।

অষ্টম-রুট আর্মির দৃঢ়তা বুঝতে হলে কি অমানুষিক অত্যাচার সয়েও যে তারা শুধু টিকে আছে—কেবল তা নয়, কি ভাবে তারা ক্রমশঃ শক্তি বৃদ্ধি করেছে, সে ইতিহাসও জানতে হয়। সেই মর্ম্মান্তিক ইতিহাসের কিছু পরিচয় দেবার জন্য বিখ্যাত মহিলা সাংবাদিক শ্রীমতী অ্যাগ্নিস স্মেডলীর লেখা থেকে কিয়দংশ তুলে দিলাম।

...অষ্টম চীনা রুট আর্মির সিয়ানফুর শিবিরে শুয়ে আছি। আগে এই বাহিনী কমিউনিষ্ট বাহিনী নামে পরিচিত ছিল।

জাতির দুর্দ্দিনে সব এক হয়ে গেছে। যে হাজার হাজার কমিউনিষ্টকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল অনিচ্ছা সত্ত্বেও চিয়াং-কাই-সেক তাদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছেন।

আমার ছোট ঘরটিতে শুয়ে আছি। একটি অপরিচিত লোক ছায়ামূর্ত্তির মত উঠানে ঘোরাঘুরি করছে। লোকটি সবে এখানে এসেছে। বোঝা যায়, সে একজন সদ্যোমুক্ত কয়েদী,—এখনও অবাধ মুক্তিতে অভ্যস্ত হয় নি। পরণে তার জেলের পোষাক। শীর্ণ, রুক্ষ চেহারা, বকের মত সরু গলা, মুখের প্রত্যেকটি হাড় উঁচু হয়ে উঠেছে। দুই হাত পিছনে দিয়ে অত্যন্ত ধীরে ধীরে কুঁজো হয়ে হাঁটছে। যে লোক জীবনে অসহ্য দুঃখ পেয়েছে, তার মুখে সকল সময়ের জন্য যেমন একটি শীর্ণ বাঁকাহাসি ফুটে থাকে, তার মুখে সেই হাসি।

তাকে আমি ডাকলাম।

হাঁ, সদ্যোমুক্ত রাজনৈতিক বন্দীই বটে। দশ বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করে মাত্র কদিন পূর্ব্বে নানকিং সামরিক বন্দীনিবাস থেকে মুক্তি পেয়েছে। বললাম—তোমার কাহিনী আমাকে বলবে?

পরের দিন সে তার বন্দী-জীবনের কাহিনী শোনাতে লাগল।

•

'১৯২৭ সালে আমি গ্রেপ্তার হলাম। আমি যে কমিউনিষ্ট, সে সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পুলিসের হাতে ছিল না। সুতরাং উৎপীড়ন করে তারা স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করলে। প্রথমেই 'বাঘ-বেঞ্চি'। দুখানা পাথরের উপর হাঁটু গেড়ে বসলাম। ওরা হাঁটুর ফাঁকে একটা লোহার ডাণ্ডা দিয়ে সেই ডাণ্ডার দুই দিকে দুজনে দাঁড়িয়ে দোল দিতে লাগল। অল্পক্ষণেই আমি যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে গেলাম। ওরা আমার চৈতন্য সম্পাদন করলে এবং জ্ঞান হওয়ার পরে আবার 'বাঘ বেঞ্চি' দিলে।

তাতেও যখন আমি স্বীকার করলাম না, তখন একটা নতুন রকম শাস্তি দিলে। এখানে তাকে বলে 'এরোপ্লেন'। ওরা আমার দুটো হাত পেছন দিকে বাঁধল, আর সেই দড়ীর অপর প্রান্ত কড়ির উপর দিয়ে নিয়ে একবার টানতে লাগল আর ঢিল দিতে লাগল। দড়ী টানে আর আমি উপরে উঠি, ঢিল দেয় আর আমি নীচে নামি। অমনি করে কিছুক্ষণ ঝোলানর পরেই অজ্ঞান হয়ে গেলাম এবং রক্তবমন করতে লাগলাম, মনে হল আর আমি বাঁচব না। যারা এতেও অজ্ঞান না হয় তাদের বুকে হাতুড়ীর ঘা মারে।

যখন এতেও স্বীকারোক্তি পেল না, তখন আর একটা নতুন রকম শাস্তির ব্যবস্থা করলে। আমাকে মেঝের চিৎ করে শুইয়ে নাকের মধ্যে দিয়ে ক্রমাগত জল ঢালতে লাগল—যতক্ষণ না পেট জলে বোঝাই হয়ে গেল। তারপরে একজন লোক পেটের উপর হাঁটু গেড়ে বসে সেই জল বার করতে



পুল বুঝি টেকে না—

সভ্যতা-দেবী কোন মতে ১৯৩৭ সাল পার হইয়াছেন, সর্ব্বদা ভয় এই বুঝি মারামারি করিতে করিতে মানুষ ধ্বংসপ্রায় পুলটির দফা একেবারে নিকাশ করিয়া দিল।

লাগল। এমনই উপর্য্যুপরি কয়েক বার। মনে হত আমি বাঁচব না। কিন্তু প্রতি বারই অজ্ঞান হতাম এবং জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুক্ষণ বিশ্রাম পেতাম। আমার বুকে ইলেক্‌ট্রিক্ শক্‌ও দেওয়া হয়েছিল।

আমি একা নই, প্রত্যেক কমিউনিষ্টকে পর পর এই যন্ত্রণার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছিল। আর যে স্বীকার করেছে যে, সে কমিউনিষ্ট, তাকে হয় ফাঁসীতে, নয় পুলিশের

গুলীতে মরতে হয়েছে। যে কিছুতেই স্বীকার করত না, সে সামরিক গুপ্ত বিচারে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হত,—তার বিরুদ্ধে প্রমাণ থাক আর নাই থাক। কর্ত্তৃপক্ষের ভয় ছিল, মুক্তি পেলেই এরা নির্যাতনের সব কথা ফাঁস করে দেবে। সুতরাং একবার ধরা পড়লে মুক্তির কোনই আশা থাকত না।

দণ্ডিত হয়ে প্রথম এলাম হ্যাংচৌ সামরিক কারাগারে। চীনের প্রত্যেকটি জেল তখন রাজনৈতিক বন্দীতে পূর্ণ। এখানেও আমরা প্রায় একশ-জন ছিলাম। তা' ছাড়া অন্যান্য বন্দীও শতখানেক ছিল। কমিউনিষ্ট বন্দীদের প্রায় সকলেই সুশিক্ষিত। তাদের মধ্যে শ্রমিক খুবই কম ছিল এবং কৃষক একেবারেই ছিল না। দেখে অবাক্ হয়ে গেলাম, এরা সবাই



চীন-জাপান যুদ্ধের জোজোৎসবে নিমন্ত্রিতা শান্তি দেবী :—
হায় রে কপাল, আমি যে এখানে আছি কারও তা খেয়াল পর্য্যন্ত নেই!

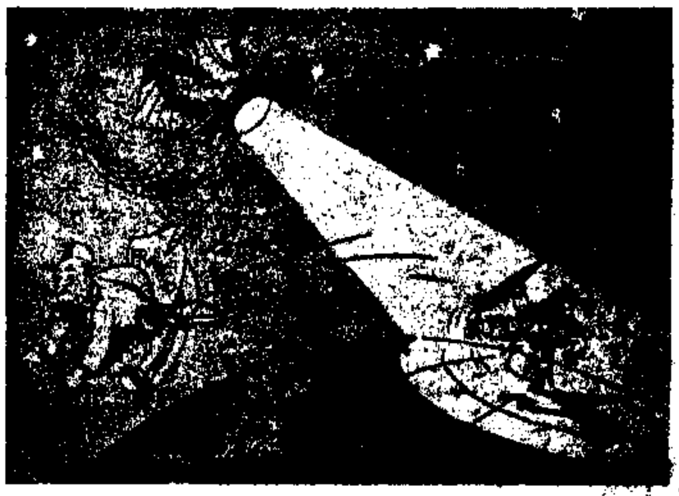
বেশ স্ফূর্ত্তিতে আছে। কেবল যাদের দেহে নির্যাতনের বেদনা আছে, তারাই মনমরা হয়ে নিঃশব্দে বসে আছে। প্রথম প্রথম আমিও তেমনই করে থাকতাম। বহুদিন পরে একটু একটু করে হাঁটতে সক্ষম হলাম এবং তাদের সঙ্গে হাসি-খেলায় যোগ দিতে লাগলাম। আরও আশ্চর্য্য হলাম, কমিউনিজমের সাফল্য সম্বন্ধে এরা একটুকুও হতাশ হয় নি। জেলের বাইরে যে দুঃখ এরা সহ্য করেছে, তাতে জেলের ভিতরের দুঃখ সহ্য করা এদের পক্ষে বড় কঠিন হয় নি। আরও একটা কারণ ছিল, জেলের ভিতরেও এরা গুপ্ত কার্য্য চালাতে লাগল। অন্যান্য কয়েদীদের সঙ্গে সামান্য কয়েক মিনিটের জন্যে যেই একটু মেশবার সুযোগ পেতাম, অমনই তাদের আমরা আমাদের নীতি সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার চেষ্টা করতাম। জেলের মধ্যেই আমরা নানা বিষয়ে আলোচনা করতাম এবং অন্যান্য বন্দীদের লেখাপড়া শেখাতাম। কয়েক মাসের মধ্যেই অনেক অ-রাজনৈতিক বন্দী পড়তে শিখল। অনেকে আমাদের রাজনৈতিক আদর্শ মেনে নিল।

আমরা যে অ-রাজনৈতিক কয়েদীদের, বিশেষ করে সামরিক কয়েদীদের সঙ্গে মিশি, এটা কর্ত্তৃপক্ষ একেবারেই পছন্দ করত না। লেখাপড়া করবার, ব্যায়াম করবার এবং অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে কথা বলবার অধিকার পাওয়ার জন্য যে কত সংগ্রাম করতে হয়েছে এবং কত নির্য্যাতন সইতে হয়েছে, তার ইয়ত্তা নাই। প্রত্যহই সামরিক কয়েদীদের সঙ্গে কথা বলার অপরাধে এক দল না এক দল রাজনৈতিক বন্দীকে নিদারুণ প্রহার সহ্য করতে হয়েছে।

কিন্তু তবু আমরা পড়া বন্ধ করি নি। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে বই আনাতাম। জেল-কর্ত্তৃপক্ষ লেখাপড়া অতি সামান্য জানে, তারা সে-সব বই বার বার পড়েও কিছু বুঝতে পারত না।

আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সামরিক কয়েদীদের লেখাপড়া শেখান। কিন্তু তাদের উপযোগী বই পাওয়া বড়ই কঠিন। সে-রকম বই চাইতে গেলেই কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের উদ্দেশ্য টের পেয়ে যাবে। অগত্যা নিজেরাই বই লিখতে আরম্ভ করলাম। সে এক প্রকাণ্ড সমস্যা—কাগজ নেই, কালি নেই, কলম নেই, তুলিও নেই,—আমরা কাগজ সংগ্রহ করতে আরম্ভ করলাম। কোন বইয়ে একখানা শাদা পাতা পেলে ছিঁড়ে রাখতাম। শাদা কাগজে মুড়ে ওষুধ আসত, তাও জমাতে লাগলাম এবং সেই কাগজের লোভে প্রায়ই মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে অসুস্থ হতাম। আমাদের প্রহার করবার জন্য আফিসে নিয়ে গেলে সেখান থেকেও সুযোগ-মত কাগজ চুরি করে আনতাম। ঝাঁটার কাঠি কেটে কলম তৈরী করতাম। জেলের ডাক্তারের কাছ থেকে কালি এবং কখন কখন কলমও চুরি করতাম। কিন্তু এই সব মহামূল্য জিনিষ পরম যত্নে লুকিয়ে রাখতাম। সব সময় ব্যবহার করতে মমতা হত।...'

আজকে যে প্রশ্ন সকলের চেয়ে আগে মনে আসে, তা এই যে, এত সহজে জাপানের কাছে চীন হারল কেন? তার একটা উত্তর এই যে, অমিত বলশালী জাপানের কাছে তার পরাজয় কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু সেইটেই সমস্ত উত্তর নয়। এই পরাজয়ের অন্তরালে আছে কমিউনিষ্ট দলের প্রতি অত্যাচারের রোমাঞ্চকর কাহিনী, নিরবচ্ছিন্ন গৃহ-বিরোধ এবং চীন-সরকারের নৃশংস হত্যালীলা। দেশ-রক্ষায় ও জাতি-গঠনে যারা চীনের মুখোজ্জ্বল করতে পারত, এমনই কত সহস্র সহস্র তরুণ যে সরকারী বিচারে কমিউনিজমের অপরাধে মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে, তার ইয়ত্তা নাই। বড় বড় জেনারেল মুহূর্ত্তের বিচারে প্রাণ দিয়েছে। তার ফলে, চীন যে ভিতরে ভিতরে কতখানি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল, তা বোঝা গেল এখন। দশ বৎসর ধরে হাজার হাজার ছেলে অশেষ দুঃখ এবং অমানুষিক নির্য্যাতন ভোগ করেছে। আজ তারা মুক্তি পেয়েছে সত্য, কারাগার থেকে ছুটেছে রণক্ষেত্রে, বিপন্ন মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য সরকারের সঙ্গে কমিউনিষ্ট দলের মিলনও ঘটেছে,—কিন্তু বহু বীরের মৃত্যুতে যে জাতীয় ক্ষতি হয়েছে, তা পূরণ হয় নি।



রণ-দেবতা। কে হে, জাপান না কি? বেশ বেশ, তোমার রণ-নৃত্য জমবে ভাল।

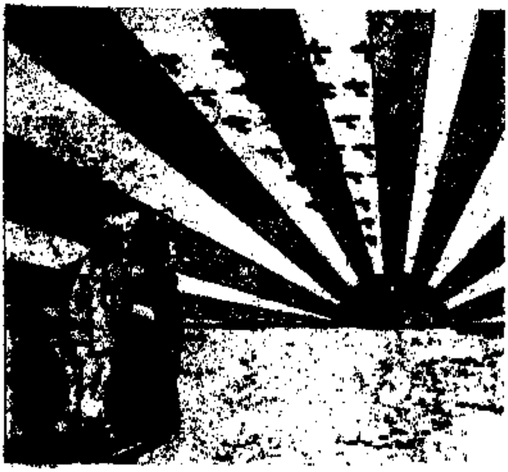
(সিনেমা-'ষ্টার'দের মত পৃথিবীর রণ-রঙ্গমঞ্চে নিত্য নূতন 'ষ্টার' কেরামতি দেখাইতে আবির্ভূত হইতেছে এবং সকলের দৃষ্টি তাহার দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। ফ্রাঙ্কোকে (স্পেন যুদ্ধ) ডাস দিয়া জাপান এখন 'ষ্টার' হইয়াছে। সংসারে কয় সপ্তাহ চলে কে জানে)

চীনের লোক-সংখ্যা চল্লিশ কোটি। কিন্তু এই বিপুল লোকবল আধুনিক যন্ত্র যুগে জাপানের বিরুদ্ধে কোন কাজেই লাগল না। গত দশ বৎসর যাবৎ মার্শাল চিয়াং-কাই-সেককে কমিউনিষ্ট দমনে ব্যাপৃত থাকতে হয়েছে। তাঁর সৈন্য-বল অপ্রমেয়। কিন্তু তারা আধুনিক যন্ত্র-সজ্জায় সুসজ্জিত নয়। জনৈক চীনা জেনারেল দুঃখ করে বলেছেন, মার্শাল যদি সৈন্যশক্তি বৃদ্ধি না করে সেই অর্থ বিমান-সজ্জায় ব্যয় করতেন, তা হলে চীনকে এই দুঃখ-দুর্গতি ভোগ করতে হত না।

চিয়াং-কাই-সেক আরও একটা ভুল করলেন। চীনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাহিনী তিনি যুদ্ধের প্রারম্ভেই সাংহাই-রক্ষায় নিয়োজিত করলেন। সেই বাহিনীর পরাজয়ের পরে জাপানের পক্ষে নানকিন অভিযান অত্যন্ত সহজ হয়ে গেল। সাংহাই থেকে নানকিনের পথে সৈন্যের গতি প্রতিহত করার মত কোন চীনা বাহিনীই রইল না।

১৯৩৭ সালের ৭ই জুলাই সন্ধ্যায় একটি জাপানী পল্টন পেইপিং-এর সন্নিকটস্থ লুকৌচিয়াও রেল ষ্টেশনে এসে যে অনাচার করল, তার প্রতিবাদ করতে গিয়েই চীন আজ বিপন্ন। ১৩ই আগষ্ট সাংহাই যুদ্ধ আরম্ভ হল। জাপান একসঙ্গে জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে সাংহাই আক্রমণ করল। সাংহাই চীনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্দর। বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জ চীনের হৃদ্‌পিণ্ডকে যথাস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন করে এইখানে প্রতিষ্ঠিত করেছে। জাপান সর্ব্বাগ্রেই সাংহাই দখলের সংকল্প করল। এইখানে বিদেশী শক্তিপুঞ্জের স্বার্থও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। তাঁরা উভয় পক্ষকেই সাংহাই থেকে সৈন্য সরিয়ে নেবার অনুরোধ জানালেন। নীতি হিসাবে চীন এই অনুরোধ মানতে রাজী হল। কিন্তু জাপান একেবারেই বেঁকে দাঁড়াল। বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জের সাহস হল না জাপানের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। দুটি বিরাট বাহিনীর মধ্যে পড়ে সাংহাইয়ের ধন-প্রাণ-সম্পত্তির যে অপচয় হল, সে আর বলবার নয়

উত্তর-চীনেও চীনা-বাহিনী যথেষ্ট বীরত্বের সঙ্গে নানকাও রক্ষার চেষ্টা করলে। কিন্তু একপক্ষ কাল পরে জাপান যখন বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করতে আরম্ভ করল, তখন পিছু হটতে বাধ্য হল। দেখতে দেখতে জাপ-সৈন্য



চীনা অবলা ও শিশু। ঐ আসে ঐ

(চীনকে জাপান যে রকম ভীষণভাবে আক্রমণ করিয়াছে, তাহাতেও জাপানের অধিকাংশ দল সন্তুষ্ট নহেন—চীন সম্বন্ধে আরও কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া শীঘ্রই একটা হেস্তনেস্ত করিয়া ফেলিবার জন্য তাঁহারা জাপ-সরকারকে পীড়াপীড়ি করিতেছেন। উদীয়মান সূর্য জাপানের জাতীয় চিহ্ন)

কলগান অধিকার করল, এবং সেপ্টেম্বরের গোড়াতেই সেখানে দক্ষিণ চাহার গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করল। মাঞ্চুরিয়ার মত এই গবর্ণমেণ্টও নামে স্বায়ত্ত-শাসনশীল হলেও কাজে জাপানের তাঁবেদার। জাপ-বাহিনী অতঃপর পেইপিং-হ্যানকাও টিয়েণ্টসিন-পুকোও রেলপথ ধরে অগ্রসর হতে লাগল এবং অচিরকাল মধ্যে পেইপিং ও টিয়েণ্টসিন অধিকার করে নিল।

দক্ষিণ-চীনও জাপানের বিমান-আক্রমণ থেকে নিষ্কৃতি পেল না। ২১এ আগষ্ট ক্যাণ্টন, সোয়াটাও ও চ্যাংকাও-এর উপর একসঙ্গে বোমা পড়ল। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সোয়াটাও-এর উপর দ্বিতীয় বার বোমাবর্ষণ হল। মোট কথা, দু-একটি প্রদেশ ছাড়া চীনের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কোথাও বোমা পড়তে বাকী রইল না। সাধারণ নাগরিকের উপর বোমা-বর্ষণ সামরিক নিয়ম-বিরুদ্ধ। কিন্তু আধুনিক যুদ্ধে সে নিয়ম বাতিল হয়ে গেছে। রেড-ক্রশ বাহিনী যুদ্ধ-ক্ষেত্র থেকে আহত সৈন্যদের শুশ্রূষার জন্য হাসপাতালে নিয়ে আসে। ১৯২৯ সালে জাতিসঙ্ঘে এই নিয়ম বিধিবদ্ধ হয়েছে যে, এদের উপর আক্রমণ করা চলবে না। কিন্তু জাপান সে নিয়মও মানল না। যুদ্ধের প্রারম্ভেই তারা চেনজু ও নান-সিয়াং হাসপাতালের উপর বোমা ফেললে। অনেক সময় তারা রেড-ক্রশের গাড়ীর পিছু পিছু ধাওয়া করতেও দ্বিধা করে নি। শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রগুলিও জাপানের আক্রমণ থেকে নিষ্কৃতি পায় নি। বিখ্যাত নানকাই বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং আরও বহু স্কুল ও কলেজ ভস্মস্তূপে পরিণত হয়েছে।

২৫শে আগষ্ট তারিখে জাপানী নৌ-বহর সাংহাই থেকে দক্ষিণ চীনের সোয়াটাও বন্দর পর্য্যন্ত সমুদ্রকূল অবরোধ করল। টোকিও থেকে ঘোষণা করা হল, এই অবরোধের ফলে শান্তিপূর্ণ বাণিজ্য বিপন্ন হবে না। কিন্তু জাপানী রণতরীর কর্তৃপক্ষ সে ঘোষণারও মর্য্যাদা রক্ষা করল না। তারা সমস্ত বৈদেশিক জাহাজকে জানিয়ে দিলে যে,



সভ্যতা দেবী—। শোবার পোষাক পরে শুতে যাচ্ছি, কোথা থেকে ঢুকল।
নিদ্রিত ব্রিটিশ (পাশ ফিরিয়া)। কে? আহ্বা অসভ্য তো!

প্রয়োজন বোধ করলে যে কোন বৈদেশিক বাণিজ্য জাহাজ খানাতল্লাস করতে পারবে। অনেকে আশা করেছিলেন, পাশ্চাত্য বীরবৃন্দ এই অপমান কখনই সহ্য করতে সম্মত হবেন না। তাঁরা আশ্চর্য্য হয়ে দেখলেন, কি ইংল্যাণ্ড

কি ফ্রান্স, কি আমেরিকা সকলেই নিঃশব্দে ঐ হুকুম মাথা পেতে মেনে নিলে। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে অবরোধ আরও বাড়ান হল,—উত্তরে চীনওয়াংটো থেকে দক্ষিণে পাখৈ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় সমগ্র চীনা উপকূল।

পেইপিং— সাংহাই— নানকিং— ক্যান্টন··· চীনে এই চারটি বড় সহর। পেইপিং পুরানো চীন; সাংহাই নতুন চীন, নানকিন আধা-নতুন আধা-পুরানো; আর ক্যান্টন হল দক্ষিণ-চীন। পেইপিং প্রায় মঙ্গোলীয়; উটের শ্রেণী আজও চলেছে পণ্যসম্ভার নিয়ে। সাংহাই প্রায় ইয়োরোপীয়; তার সু-উচ্চ সৌধশীর্ষ আকাশ ছুঁয়েছে, পানশালায় চলেছে বল্‌নৃত্যের সমারোহ। নানকিনে চলেছে প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে নব্য সভ্যতার সামঞ্জস্য-বিধানের দুরূহ চেষ্টা। আর ক্যান্টন হল দক্ষিণ-চীনের পরিপূর্ণ অন্তরের প্রকাশ।

পেইপিং আজও রাজতন্ত্রি; সাংহাই বহুতন্ত্রী; নানকিন গণতন্ত্রী আর ক্যান্টন বিশেষ করে বিপ্লব-পন্থী। চীনের বিখ্যাত চারটি নগরের এই হল সত্যকার পরিচয়। এর মধ্যে পেইপিং, সাংহাই এবং নানকিন আজ ভস্মস্তূপে পরিণত। বোধ হয় ক্যান্টনেরও ধ্বংস অতঃপর জাপানীদের হাতেই সংঘটিত হবে। এই নগর-চতুষ্টয়ের কী যে পরিণতি হবে, কে বলতে পারে।

ইউরোপ

ডিবেটিং ক্লাব

ইতিমধ্যে ইউরোপের একটা বড় ঘটনা এই যে, ইটালী রাষ্ট্র-সঙ্ঘ ত্যাগ করেছে। খবরটা আকস্মিকও নয়, অপ্রত্যাশিতও নয়। আবিসিনিয়া-যুদ্ধের সময় রাষ্ট্র-সঙ্ঘ ইটালীকে যখন অন্যায় আক্রমণকারী (aggressor) বলে ঘোষণা করলেন, তারপর থেকে নামে-মাত্র সদস্য থাকলেও, সঙ্ঘের ছোট বড় কোন সভাতেই ইটালী যোগ দেয় নি। সুতরাং ইটালীর সঙ্ঘ-ত্যাগে বিশেষ যে কিছু এসে গেছে, তা নয়। কিন্তু এসে গেছে অন্যদিকে। জার্ম্মানী এবং জাপানকে নিয়ে ইটালী একটা কমিউনিষ্ট-বিরোধী শক্তিমান দলের সৃষ্টি করেছে। অন্য দিকে আবিসিনিয়া, স্পেন ও চীনের ব্যাপারে বৃটেন এবং ফ্রান্স যে অক্ষমতা দেখিয়েছে, তার ফলে মধ্য-ইউরোপের ছোট ছোট রাজ্যগুলি,—রুমানিয়া, পোল্যাণ্ড, চেকো-শ্লোভাকিয়া, জুগোশ্লোভিয়া প্রভৃতি—নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশঙ্কিত হয়ে উঠেছে। মহাযুদ্ধের পরে জাতির রাষ্ট্রসঙ্ঘ যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন বড় করে ঘোষণা করা



জাপান : লক্ষীছাড়া চীনারা কোন্ সাহসে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছে ? কি অন্যায়

হয়েছিল যে, সঙ্ঘ ছোট-বড়-মাঝারী প্রত্যেক রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা-রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। সে দায়িত্ব সঙ্ঘ কোনদিনই পালন করতে পারেন নি। অথচ ছোট ছোট রাজ্যগুলি বিশেষ করে এই প্রলোভনেই সঙ্ঘে যোগ দিয়েছিল। বৃটেনের পররাষ্ট্র-সচিব এখন প্রকাশ্য ভাবে সঙ্ঘকে সেই দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে নিছক একটা "ডিবেটিং-ক্লাবে" পরিণত করতে চান। তাতে করে সুবিধা এই হবে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের অর্থাৎ রাষ্ট্রসঙ্ঘের মাতব্বর সদস্যদের অক্ষমতার লজ্জা অনেকখানি কমবে। কিন্তু তার ফলে ছোট ছোট রাজ্যগুলির কাছে সঙ্ঘের কোন আকর্ষণই আর থাকবে না।

রুমানিয়ায় পরিবর্ত্তন

তারও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি রাষ্ট্রসঙ্ঘের অনিশ্চিত আশ্রয়ের মমতা কাটিয়ে একে একে ফ্যাসিজমের বলিষ্ঠ আশ্রয়ের দিকেই ঝুঁকছে। সম্প্রতি রুমানিয়াতেও ফ্যাসিষ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজা

ক্যারল আত্মপ্রভুত্ব-বৃদ্ধির জন্য "জাতীয় কৃষকদলের" মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে যে বিষবৃক্ষের বীজ বপন করেছেন, এ তারই স্বাভাবিক পরিণতি। এই বিচ্ছিন্নতার সুযোগ নিয়ে মশিয়ে অক্টেভিয়ান গোগা আজ রুমানিয়ার ডিক্টেটর হলেন। অবশ্য শাসনভার গ্রহণ করেই তিনি পুরাতন বন্ধুদের সঙ্গেও



তিয়েনসিন রক্ষার ব্যর্থ চেষ্টায় নিযুক্ত চীনা সৈন্য জাপানীদের মেশিনগানের সম্মুখে এইভাবে প্রাণ দিয়াছে।

করমর্দন করেছেন। কিন্তু হিটলার ও মুসোলিনীর উপর তাঁর এই রকম অনুরাগ, তাতে শান্তি সম্বন্ধে মঁশিয়ে গোগার উদ্দেশ্য-অভিপ্রায় সত্ত্বেও কেউ বিশেষ কোন ভরসা করতে পারছেন না। রুমানিয়া এখনও অবশ্য রাষ্ট্রসঙ্ঘেই রইল। পরিবর্তনের মধ্যে শুধু এইটুকু দেখা গেল যে, রাজা ক্যারলের "বিশেষ বন্ধু" মাদাম লুপেস্কো যে কোথায় অন্তর্হিত হলেন, তার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

আয়রে

আর একটা পরিবর্তন হল আয়ার্ল্যাণ্ডে। গত ২৯শে ডিসেম্বর থেকে আয়ার্ল্যাণ্ডে যে নতুন রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল, তা প্রকাশ্যতঃ না হলেও, কার্যতঃ স্বাধীন গণতন্ত্রেরই অনুরূপ। এখন থেকে কার্যতঃ স্বাধীন দেশের সকল অধিকারই মিঃ ডি. ভ্যালেরার হাতে এসেছে। বাকী রইল উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডকে দক্ষিণ আয়ার-ল্যাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করা। উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড এখনও রাজভক্ত দলের হাতে। এঁরা বৃটিশ প্রতিক্রিয়াপন্থীদেরই খেলার পুতুল, তাঁদের অঙ্গুলীসঙ্কেতে চলেন ফেরেন। কিন্তু মনে হয়, অদূর-বর্তীকালে তাঁদের এ চেষ্টা ব্যর্থ হবে। তখন দক্ষিণ-আয়ার্ল্যাণ্ডের বন্ধুত্ব লাভের জন্যে বৃটেনকে বাধা হয়েই উত্তর-আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে হাত সরিয়ে নিতে হবে। এখন থেকে আয়ার্ল্যাণ্ডের নাম হল আয়রে (Eire)। বর্তমান ব্যবস্থায় আইরিশ জাতির আশা ও আকাঙ্ক্ষা অনেকখানি চরিতার্থ হবে।

একতা

…যখন দেশের সমস্ত স্তরের মানুষের মধ্যে অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব এবং শান্তির অভাব উত্তরোত্তর একানুপাতভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন কি উপায়ে অনতিবিলম্বে ঐ তিনটি অভাব দূরীভূত হইতে পারে, তাহার চিন্তা করাই যে নেতৃবর্গের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্য এবং ঐ তিনটি অভাবের দূরীকরণ যে দেশের সকল মানুষের মধ্যে একতাস্থাপন ব্যতীত সম্ভাবিত হইতে পারে না—এতৎসম্বন্ধে কোন চিন্তাশীল মানুষ অস্বীকার করিতে পারেন না। অথচ কংগ্রেসের নেতৃবর্গ তাঁহাদের কার্য্যতালিকায় যাহা যাহা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার কোনটির দ্বারা দেশের কোন মানুষের কোনরূপ অভাব দূর হওয়া অথবা দেশের মধ্যে একতা স্থাপিত হওয়া ত' দূরের কথা, ঐ নেতৃবর্গের প্রত্যেক কার্য্যের ফলে দেশের লোকের অর্থের অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব এবং শান্তির অভাব যেরূপ ক্রমশঃই আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, সেইরূপ আবার দেশের মধ্যে ঝগড়াঝাটি এবং দলাদলি উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করিবে।…

শিল্পীর প্রেম

—অ্যান্টন চেখভ

ছ'সাত বছর আগেকার কথা, সেবার আমি আমার বন্ধু বাইলোকারভের জমিদারীতে বেড়াতে গিয়েছিলুম। আমার এই বন্ধু ছিল অতি অদ্ভুত লোক, সে কারও সঙ্গে মিশত না, আর তার মুখের কথা ছিল এই যে, তার ওপর কারোর সহানুভূতি নেই। সে নিজের বাগান-বাড়ীতে থাকত আর আমি থাকতাম তাদের প্রকাণ্ড বাড়ীটাতে। বিরাট বাড়ী—তারই একটা ঘরে আমি থাকতাম। আমার ঘরের আসবাবের মধ্যে ছিল একটা বড় সোফা আর একটা টেবিল।

ক্রমাগত আলস্যে দিন কাটিয়ে কুঁড়েমি করাটা আমার এমনই মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল যে, আমার কোনও কাজই করতে ইচ্ছা করত না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে জানলা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে চেয়ে থাকতাম, কখনও বা রাস্তার দিকে, কখনও বা গাছের দিকে। মাঝে মাঝে বেড়াতে বেরিয়ে নিরুদ্দেশ ভাবে সন্ধ্যা অবধি চারিদিকে ঘুরে বেড়াতাম।

সে দিন বেড়াতে বেড়াতে একটা অচেনা জায়গায় গিয়ে পড়েছিলাম। সূর্য্য ডুবে যাবার আর বেশী দেরী ছিল না, সন্ধ্যার ধূসর ছায়া নামছিল চারদিক্ আচ্ছন্ন করে। সামনেই একটা গাছের ছায়ায় ঢাকা বিস্তৃত পথ, কেমন যেন একটা বিষণ্ণতায় ঢাকা। শুকনো পাতা পদদলিত করে আমি সেই পথ ধরে এগোতে লাগলাম। চারিদিক্ নিস্তব্ধ, গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে অস্তগমনোন্মুখ তপনের সোনালি আলো এসে পড়েছে পথের ওপর, চারিদিক্ থেকে ভেসে আসছিল একটা মিষ্টি গন্ধ। চারিদিকে যা কিছু গতস্ত তাদেরই সমারোহ। আমার পায়ের নীচে পড়ে শুকনো পাতারা কাতর ভাবে আর্ত্তনাদ করে উঠছিল। রাস্তা শেষ হয়ে গেল - সামনেই চোখে পড়ল একটা সেকেলে ধরণের দোতালা সাদা বাড়ী। বাড়ীর সামনে একটা ছোট্ট খেলার মাঠ, তার পাশেই একটা পুকুর, তার ধারে একটা ছোট্ট ঘর। পুকুরের জলেও ছোঁয়াচ লেগেছে অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিমাভার।

এই দৃশ্য দেখে আমার মনে জেগে উঠল আমার বাল্যের স্মৃতি—মনে হল যে, এই রকম সাদা বাড়ী, এই সূর্য্যের লাল আভা প্রতিফলিত হওয়া পুকুরের জল, এ যে আমার চির-পরিচিত—এ যে আমি বহুবার দেখেছি।

বাড়ী থেকে পুকুরে যাবার রাস্তার উপর একটা সিংহ দরজা। সেই গেটের নীচে দাঁড়িয়েছিল দুটি তরুণী। তাদের মধ্যে যেটি বড়, সে দেখতে অপরূপ সুন্দরী - পাতলা, ছিপছিপে ধরণের গায়ের গড়ন, মুখশ্রীও খুব সুন্দর, কিন্তু তার মুখে চোখে কেমন একটা রুক্ষ ভাব। অন্য মেয়েটি আরও ছেলেমানুষ; বয়স তার সতের আঠারর বেশী হবে না। এর চেহারাও এর সুন্দর। বোধ হয় দুজনে সহোদরা। ছোট বোনটির সঙ্গে চোখোচোখি হতেই সে লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিল—আমার পায়েরও গতি গেল বেড়ে। আমার মনে হতে লাগল যে, এ দুটি মুখই যেন আমার কত চেনা, কতবারের দেখা। বাড়ী ফিরে গেলাম, আমার মনে হতে লাগল যে, এই মাত্র একটা সুখস্বপ্ন দেখতে দেখতে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেছে।

দিন কতক বাদে আমি আর আমার বন্ধু বাড়ীর সামনে বাগানে বেড়াচ্ছি, এমন সময় একটা গাড়ী এসে দাঁড়াল, তার মধ্যে দেখি সেদিনকার সেই বড় মেয়েটি। পাড়ায় কিছুদিন আগে আগুন লেগেছিল, তাদের ঘর বাঁধতে সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে চাঁদা আদায় করবার জন্য তার এই আগমন। সে খুব করুণ ভাবে এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে দুর্দ্দশাগ্রস্ত অসহায়দের দুরবস্থার কথা বর্ণনা করে যাচ্ছিল, তা ছাড়া সে আমাদের, বিশেষতঃ আমার বন্ধুকে জানাল যে, এই সব অসহায়দের সাহায্য করবার জন্যে একটা রিলিফ-কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং সে নিজে সেই কমিটির একজন সভ্য এবং আমাদের দুজনকেই বেশ মোটা রকমের চাঁদা দিতে হবে। কাজের কথা হয়ে গেলে সে আমাদের কাছে বিদায় গ্রহণ করলে। যাবার আগে বন্ধুবরকে লক্ষ্য করে বলল—আপনি তো আজকাল আমাদের এক রকম ভুলেই গেছেন। একদিন আসবেন আর আপনিও (দেখলাম যে ইতিমধ্যেই আমার নাম ধাম সবই জানে) আসবেন নিশ্চয়ই, আপনাকে দেখলে মা খুব আনন্দিত হবেন। আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম।

সে চলে গেলে পর বন্ধুবর আমাকে তার পরিচয় দিতে লাগলেন। মেয়েটির নাম লিডিয়া ভলকান্‌নিনস্ক। তারা দুইবোন ও মা, এই তিন জনে নিজেদের জমিদারীতে বসবাস করে। এদের বাবা গভর্ণমেণ্টের অধীনে খুব বড় চাকরী করতেন, সম্প্রতি মারা গেছেন। যদিও এদের আর্থিক অবস্থা খুবই ভাল, তবু লিডিয়া নিজেদের গ্রাম্য-স্কুলে মাষ্টারী করে ও মাসে পঁচিশ রুবল্ করে মাইনে পায়। সে নিজে যে নিজের জীবিকা উপার্জ্জন করতে সক্ষম, এর জন্যে খুবই গর্ব্বিত। পরিচয় ইত্যাদি দেওয়ার পর বন্ধু বলল—চল, একদিন এদের ওখানে যাওয়া যাক, ওদের সঙ্গে আলাপ করে তুমি নিশ্চয়ই খুসী হবে।

দিন কতক বাদে বিকেল বেলায় আমরা দুজনে ওদের বাড়ীতে গেলাম। সকলেই বাড়ীতে ছিলেন। মেয়ে দুটির মা, একাটেরিনা প্যাভলোভনা আমার সঙ্গে ছবি আঁকার বিষয়ে কথা বলতে লাগলেন। তিনি মস্কো এগজিবিশনে আমার আঁকা ছবি কয়েকটা দেখেছিলেন, এখন সেইগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগলেন। লিডিয়া বেশীর ভাগ সময় আমার বন্ধুর সঙ্গেই কথাবার্ত্তা বলতে লাগল। একবার ওদের কথাবার্ত্তা কাণে এল, লিডিয়া বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করছে—আচ্ছা আপনি জেমস্‌ট্‌ভোতে * যোগ দেন না কেন? সত্যি কথা বলতে কি, আপনাদের মত লোকেরা যদি এরকম কাজে যোগ না দেন, তা হলে বড়ই পরিতাপের বিষয়।

—সত্যিই তো, লিডিয়া ঠিকই বলেছে—মা সম্মতিসূচক ভাবে ঘাড় নেড়ে বল্লেন।

—আমাদের এখানকার সমস্ত জেমস্‌ট্‌ভোটিই বালাকিন্ বলে একটি লোকের মুঠোর মধ্যে,—লিডিয়া আমাকে লক্ষ্য করে বলে যেতে লাগল—সে এই বোর্ডের চেয়ারম্যান, কাজে কাজেই যত চাক্‌রীই খালি হোক না কেন, তার ভাই-পো কিংবা জামাইরা ছাড়া আর কেউই পাবে না। তার কোন কাজে বাধা দেবার কেউ নেই, সে নিজের ইচ্ছামত যা খুসী তাই করছে। আমাদের কারুরই উচিত নয়, এরকম স্বেচ্ছাচারিতা বরদাস্ত করে যাওয়া। কিন্তু, দেখতেই ত পাচ্ছেন, এই এঁর কথাই ধরুন না, কি রকম নিস্পৃহ এখানকার সকলেই; কাকে আর দোষ দেব!

ছোট বোন্ জেনিয়া আমাদের এই কথাবার্ত্তার সময় আগাগোড়াই চুপ করে ছিল। প্রথমতঃ, সে বোধ হয় এই সব ব্যাপারে নিজেকে জড়াতে চাইত না, আর তা ছাড়া সে বোধ হয় ছেলে মানুষ বলে, এই সব ব্যাপারে কথা বলতেও পেত না। তবে, একটা জিনিষ আমি বরাবরই লক্ষ্য করছিলাম যে, মেয়েটি আমার দিকে মাঝে মাঝে কৌতূহলভরে চাইছিল। আর আমি যখন টেবিলের উপরকার ছবির এ্যাল্‌বামের পাতা উল্টাচ্ছিলাম, তখন সে নিজে থেকেই বুঝিয়ে দিচ্ছিল—এইটে তার মামার—এইটে কাকীমার।

আমরা সবাই মিলে বাগানে গেলাম। টেনিস খেলা হল। তারপর চা খাওয়া হয়ে গেলে পর আমরা সবাই বাগানে একটা চবুতরার উপরে বসে কথাবার্ত্তা বলতে লাগলাম। এ কয়দিনের নিঃসঙ্গ জীবনের নির্জ্জনতায় আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলাম, তাই আজকের এই আলাপ-আলোচনায় মন আমার উল্লসিত হয়ে উঠল—আমার মনের অবসাদ কেটে গেল। আমার সব-কিছুই সুন্দর বলে মনে হতে লাগল, সব-কিছুই ভাল লাগতে লাগল, বিশেষতঃ লিডিয়া ও জেনিয়া—দুই বোন্‌কে। কথাবার্ত্তার স্রোত ঘুরে ফিরে আবার সেই জেমস্‌ট্‌ভো আর স্কুল আর লাইব্রেরীতে এসে শেষ হল। এই সব আলোচনায় লিডিয়ার যেন আর উৎসাহের শেষ নেই—সে উত্তেজিত ভাবে ক্রমাগত নিজের মতামত ব্যক্ত করে যেতে লাগল, মাঝে মাঝে তার গলার আওয়াজ উঁচুতে চড়ে যাচ্ছিল—স্কুল-মাষ্টারী করাই বোধ হয় তার কারণ। আর অন্যদিকে বন্ধুবর একঘেয়ে কর্কশ গলায় তর্কের সুরে নিজের বক্তব্য বলে যাচ্ছিল। যাই হোক, তর্কের কোন মীমাংসা হবার আগেই আমরা উঠে পড়লাম। কেন না, ততক্ষণে বেশ রাত্রি হয়ে গেছে, তর্কের মীমাংসার আশায় বসে থাকলে রাত্রে বাড়ী ফেরবার আশা ত্যাগ করতে হত।

[২]

ওদের বাড়ী বেড়াতে যাওয়া আমার একটা অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেল। আমি প্রায় রোজই ওদের ওখানে যেতাম। আমি সেখানে গিয়ে বাগানের একটা বেঞ্চিতে চুপচাপ বসে থাকতাম, আর সেইখানে বসে বসে বাড়ীর ভিতরে সকলের কথাবার্ত্তা শুনতে পেতাম। বিকাল বেলায়

* আমাদের ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মত।

লিডিয়ার রোগী দেখবার সময়। তারপর সন্ধ্যা বেলায় ফিরে এসে সে উপস্থিত সকলের সঙ্গে পল্লী-উন্নয়ন ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করত। আমার সামনে যখনই এসব বিষয়ে কোন কথা হত, তখনই সে গম্ভীর গলায় বলত:—আপনার নিশ্চয়ই এসব কথা ভাল লাগবে না।

লিডিয়া আমাকে মোটেই পছন্দ করত না। তার অপছন্দ করবার কারণ ছিল এই যে, আমি শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্য ইত্যাদির ছবি আঁকতাম, কখনও ভুলেও দুর্দ্দশাগ্রস্ত অসহায় কৃষকদের অবলম্বন করে ছবি আঁকতাম না বা আঁকতে পারতাম না। তা ছাড়া, সে ভাবত যে, পল্লী-উন্নয়ন করবার জন্যে তার যে প্রচেষ্টা, তার প্রতি আমার কোন সহানুভূতি নেই। আমি বিদেশী বলে লিডিয়া ভাবত যে, এসব কাজে আমার কোন সহানুভূতি থাকতে পারে না। আমার প্রতি তার মনের ভাব যা-ই থাক, সে কোন দিনই তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করত না।

এদিকে জেনিয়াকে এসব বিষয়ে মোটেই মাথা ঘামাতে দেখতাম না, সে ছিল আমারই মত এসব বিষয়ে একেবারে নিস্পৃহ। সকালে উঠবার খানিক পরেই সে একটা বই নিয়ে সামনে বারান্দায় একটা ইজি-চেয়ারে গিয়ে বসত, কিংবা একখানা বই হাতে করে বাইরের বাগানের এক নির্জ্জন কোণে গিয়ে বসে থাকত। আমাকে দেখলে তার ভাবান্তর ঘটত—আমি এলে সে বই বন্ধ করে তার বড় বড় চোখ দুটো দিয়ে আমার মুখের পানে চেয়ে থাকত, তারপর ইতিমধ্যে এ অঞ্চলে কোথাও যদি কিছু ঘটনা ঘটে থাকে, তার খবর আমাকে দিত—যথা চাকরদের ঘরে একটা অগ্নিকাণ্ড হয়েছে, কিংবা কেউ হয়ত পুকুর থেকে খুব বড় একটা মাছ ধরেছে। আমরা দুজনে প্রায়ই বেড়াতে বেরোতাম, কখনও কখনও সামনের বড় পুকুরটায় নৌকোয় করে ঘুরে বেড়াতাম। সেও কখনও কখনও আমার বাড়ীতে যেত, আর তখন হয় তো আমি ছবি আঁকছি—সেও তন্ময় হয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকত, আর আমার ছবি আঁকা দেখত।

একদিন রবিবার বিকালে আমি ওদের বাড়ীর দিকে বেড়াতে বেড়াতে এসে গিয়েছিলাম। তখন বেলা ৯টা হবে। আমি উদ্দেশ্যহীন ভাবে সেই ছায়ায় ঢাকা পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম, খানিক বাদে দেখি জেনিয়া আর তার মা গির্জ্জা থেকে বাড়ী ফিরে আসছেন। আমার মত লোকের, কুঁড়েমি করে আলস্যে ক্রমাগত সময় কাটিয়ে আলস্যের মাধুর্য্য যাদের কাছে আর মোটেই নেই, তার কাছেও বসন্তকালের কর্ম্মচঞ্চলতাহীন রবিবারের এই অলস সকালটি অপরূপ মাধুর্য্য-মণ্ডিত হয়ে উঠল। যখন দেখি যে শিশির-ভেজা সবুজ ঘাসের উপর সোণালি আলোর হোলি-খেলা চলছে, যখন দেখতে পাই যে, তরুণ-তরুণীরা প্রজাপতির মত পোষাক পরে তাদের সজীব কলহাস্যে চারিদিক মুখরিত করে তুলছে, যখন দেখি যুবক-যুবতীরা মুক্ত আকাশের নীচে সবুজ মখমলে-ঢাকা বাগানে বসে প্রাতরাশ খাচ্ছে, যখন ভেবে দেখি যে, আজ এরা সকলে কেউই কিছু কাজ করবে না, আজ এদের সকলেরই ছুটি—তখন আমার মনে হয়, আমার সমস্ত জীবনটা যদি এই রকমই হত। আজকের এই অরুণোজ্জ্বল প্রভাতে আমার মনে এই ভাবটা প্রবল হয়ে উঠল, আমি উদ্দেশ্যহীন ভাবে এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম—আর ভাবতে লাগলাম যে, এই রকম অচঞ্চলভাবে যদি সমস্ত দিন, সমস্ত বসন্তকালটা কাটিয়ে দিতে পারি।

জেনিয়া একটা সাজি হাতে করে বাগানের দিকে আসছে দেখতে পেলাম। আমাকে দেখে সে খুব খুসী হয়ে উঠল। আমরা দুজনে কথা বলতে বলতে ব্ল্যাক্ বেরী কুড়োতে লাগলাম।

—আমাদের গ্রামে কাল একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে—সে আমাকে খবর দিতে লাগল—আমাদের গ্রামে একটা খোঁড়া বুড়ী ছিল, ডাক্তাররা অনেক চেষ্টা করেও তার পা ভাল করতে পারে নি; কিন্তু কালকে কোথেকে একটা অচেনা বুড়ী এসে ওর কাণে কাণে কি বলে গেল, তাতেই ওর পা একদম সেরে গেছে।

—তা এ আর এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার কি? আমরা বেঁচে আছি, এইটেই তো সবচেয়ে বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার। আর সত্যিকথা বলতে কি, যা কিছুই আমাদের বোধগম্য নয়, তাই তো আশ্চর্য্য ব্যাপার।

—আচ্ছা, যে সব জিনিষ আমাদের বোধগম্য নয়, সে সব জিনিষের প্রকৃতি জানতে পেরেও তাদের আপনি ভয় করেন না?

—না, ভয় করব কেন? যা আমি বুঝি না, তাদের ভয় না করে আমি সাহসভরে সোজা এগিয়ে যাই। আমার মনে হয়, মানুষ সকল কিছুর ঊর্দ্ধে—আর প্রত্যেকেরই এই কথাটা ভালভাবে পালন করা চাই, তাদের আচার-ব্যবহারে কাজে-কর্ম্মে।

জেনিয়া ভাবত যে, আমি শিল্পী বলে আমি অনেক কিছুই জানি। সে চাইত যে, আমি তাকে সীমার মাঝে অসীমের সন্ধান বলে দিয়ে তার সৌন্দর্য্যের মায়াপুরীর ভেতরে যাবার পথ সুগম করে দিই। আর, তার ধারণা ছিল—এ কাজটা আমি ইচ্ছা করলেই পারি। যখন সে আমার কাছে ঈশ্বর, মানব-জীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করত, তখন আমি জবাব দিতাম যে মানুষ অমর, কেননা আমার কবি হৃদয় কিছুতেই মেনে নিতে চাইত না যে, মৃত্যুর পরে মানুষের সাধনা, মানুষের উৎকর্ষ সব কিছুই শেষ হয়ে যায়। তাই আমি অসীম বিশ্বাসভরে তাকে বলতাম যে—মানুষ অমর, সে মরে না, সীমাহীন তার জীবন, যা অনাদি, অনন্ত-বিস্তৃত। সে মনদিয়ে আমার সব কথা শুনত, আর বিশ্বাসও সব করত অকপট চিত্তে, কেননা, কোনদিন সে আমার কাছে এই সব কথার সত্যতা যাচাই করবার জন্ত কোন প্রমাণ চায় নি।

আমরা দুজনেই ওদের বাড়ীর দিকে যাচ্ছিলাম, জেনিয়া হঠাৎ বলে উঠল:—আচ্ছা, লিডিয়াকে আপনার কি রকম মনে হয়? আমি ওকে খুব ভালবাসি। আচ্ছা,—এই বলে সে ছেলেমানুষের মত আমার হাতটা ধরে জিজ্ঞাসা করল—আপনি সব সময় দিদির সঙ্গে তর্ক করেন কেন? আপনি চটে যান কেন?

—কেননা তোমার দিদি সাধারণতঃ ভুল বিষয় নিয়ে তর্ক করেন। আমরা বাড়ীর দরজার সামনে এসে গিয়েছিলাম। দেখতে পেলাম যে, লিডিয়া সেইমাত্র কোথা থেকে ফিরে এসে চাকরকে কি সব করবার হুকুম দিচ্ছে। আজকে রোগা শরীরে ড্রেস্ পরায় তাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। খানিক বাদে ব্যস্তভাবে সে দুতিন জন গ্রাম্য লোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বাড়ীর মধ্যে চলে গেল। তারপর অনেক খোঁজাখুঁজির পর যখন আমাদের খাওয়া অনেকটা হয়ে গিয়েছে, তখন সে পোষাক বদলে টেবিলে এসে বসল। খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে জেনিয়া তার অভ্যাস-মত বারান্দায় একটা ইজি-চেয়ারে শুয়ে একটা বই পড়তে লাগল—আমি একটু দূরে সামনের দিকে উদাস ভাবে চেয়ে বসে রইলাম। আকাশটা দেখলাম, আস্তে আস্তে মেঘে ঢেকে গেল—খানিক বাদে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিও পড়তে সুরু করল। হাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়ে একটা বিশ্রী গুমোট ভাব দেখা দিল—আমার মনে হচ্ছিল যে, আজকের এই দিনের আর শেষ হবে না। জেনিয়ার মা একটা ছোট্ট পাখা হাতে করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

আমি এই ক'দিনেই জেনিয়ার মার খুব প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলাম, আমি দুদিন না এলে তিনি জেনিয়াকে পাঠাতেন খবর নিতে, আমার কোন অসুখ হল কি না। তিনিও জেনিয়ার মত আমার ছবির খুব প্রশংসা করতেন, আর আমি নতুন কিছু আঁকলেই তা দেখতে চাইতেন। জেনিয়ার মতন তিনিও আমার সঙ্গে প্রাণখোলা ভাবে আলাপ করতেন, এমন কি পারিবারিক সব কথাও আমার কাছে না বলে থাকতে পারতেন না।

একটা অদ্ভুত জিনিষ আমি লক্ষ্য করতাম যে, জেনিয়ার মত তিনিও তাঁর বড় মেয়েকে কেমন যেন একটা ভক্তির চোখে দেখেন। যদিও লিডিয়া যে তাঁকে কি চোখে দেখে, তা লক্ষ্য করবার তাঁর সময় মোটেই ছিল না।

মা প্রায়ই বলতেন—আমার লিডা অতি অদ্ভুত মেয়ে!

আজও আমাদের মধ্যে লিডিয়ার কথাই আলোচনা হচ্ছিল। আজও মা বলছিলেন আমার লিডার মত মেয়ে তুমি আর দুটি দেখতে পাবে না। দেখ, ও এই যে সব দেশের কাজ করছে, এতে আমার আন্তরিক সহানুভূতি আছে। কিন্তু, কোন কিছুতেই বাড়াবাড়ি করাটা খারাপ। ওর তেইশ বছর বয়স হল, অথচ এই স্কুল, ডিস্পেনসারী, বই, খাতা নিয়ে ও এত মেতে আছে যে, বিয়ের কথা ভাববার সময় ওর মোটেই নেই। আমি ত এত করে বলেও বিয়ে করতে ওর মত করাতে পারলাম না।

জেনিয়া বই পড়তে পড়তে একবার মাথা তুলে আমাদের দিকে চাইল, আমাদের কোন বিষয়ে কথাবার্ত্তা হচ্ছে, তা যেন বুঝবার চেষ্টা করল, তারপর আবার মাথা নীচু করে বই পড়াতে মন দিল।

বাইলোকারভ্ একটা গাড়ী করে এসে হাজির হল। বৃষ্টি যা গুঁড়ি গুঁড়ি হচ্ছিল তা যে কখন থেমে গিয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে, তা আমরা কেউই টের পাই নি। বাইলোকারভ আসাতে আমরা সব উঠে পড়লাম। তারপর বাগানে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে টেনিস্ ও ক্রোকি খেলা চলল। তারপর সন্ধ্যার পর খাবার টেবিলে আমাদের সান্ধ্য মজলিশ চলল, ঘুরে ফিরে স্কুল আর লাইব্রেরীতে আমাদের আলোচনা এসে পৌছল। সে দিন বাড়ী ফিরে গেলাম, সঙ্গে নিয়ে একটা নিরলস কর্ম্মবিমুখ দিনের মধু-স্মৃতি, আর তার সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হচ্ছিল যে, সুখের দিন, তা যতই দীর্ঘ হোক না কেন, তারও অবসান আছে।

আমরা যখন বাড়ী ফিরছি, তখন জেনিয়া আমাদের সঙ্গে গেট অবধি এসে পৌছে দিয়ে গেল। ফেরবার পথে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা, তুমি এ রকম একঘেয়ে আনন্দহীন দিন কাটাও কেমন করে? আমার কথা যদি বল ত তার জবাবে আমি বলব যে, আমি শিল্পী, আমি কবি, আমার কথা স্বতন্ত্র। আমার সমস্ত জীবনের উপর দিয়ে একটা নিরানন্দের, জীবনের সব কিছুর প্রতি একটা পরম ঔদাস্যের স্রোত বয়ে গিয়েছে, তা ছাড়া আমি গরীব, আমি ভবঘুরে, কিন্তু তুমি এসব কিছুই নও। তোমার অর্থ আছে, স্বাস্থ্য আছে। কিন্তু, তবুও এ রকম অর্থহীন অলস জীবন যাপন কর কি করে? জীবন থেকে নির্ম্মম হয়ে সব রসটুকু নিগড়ে বার করে নাও না কেন?

বাড়ী ফিরে বাইলোকারভ আর আমি দুজনে আমার ঘরে খানিকক্ষণ গিয়ে বসলাম। আমি স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছিলাম না—কেবলই ঘরময় পায়চারি করছিলাম। আমার মনও উদভ্রান্ত প্রেমিকের মতই অশান্ত হয়ে উঠেছিল।

আমি একবার হঠাৎ বন্ধুকে বললাম—দেখ, তোমাদের ঐ লিডিয়া একদিন জেমস্টভো'র কোনও এক কৃষক-প্রেমিকের সঙ্গে প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করবে। ওরকম মেয়ের জন্যে অনেকেই রাতারাতি কৃষক-প্রেমিক স্বদেশভক্ত হয়ে উঠতে পারে।

এর উত্তর দিতে গিয়ে বাইলোকারভ গড় গড় করে অনেক কিছুই বলে গেল, তার একটা কথাও আমার কাণে গেল না। খানিকক্ষণ একতরফা কথাবার্তা চালিয়ে আমি তার কোনও কথায় কাণ দিচ্ছি না দেখে সে বিরক্ত হয়ে উঠে চলে গেল।

[৩]

মা, জান, প্রিন্সের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, তিনি তোমাকে তাঁর নমস্কার পাঠিয়েছেন,—এই কথা বলতে বলতে লিডিয়া হাত থেকে দস্তানা খুলে ফেলল,—তার পর তাঁর কাছ থেকে কত খবর পেলাম। তিনি আমাকে কথা দিয়েছেন যে, প্রাদেশিক এ্যাসেম্‌ব্লীতে আমাদের জেলার একটা বড় রকমের হাসপাতাল খোলবার জন্য টাকার যাতে বরাদ্দ হয় তার জন্যে চেষ্টা করবেন···যদিও আশা খুবই কম। কথা বলতে বলতে সে হঠাৎ যেন আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে আমাকে লক্ষ্য করে বললে—মাপ করবেন, আপনার নিশ্চয়ই এ সব কথা ভাল লাগছে না?

আমি সামান্য ক্রুদ্ধ হয়ে বললাম—কেন, ভাল না লাগবার কারণ? আপনার যদিও আমার মতামতে কাণ দেবার সময় নেই, তবুও আপনাকে বলে রাখি যে, এ বিষয় নিয়ে আমি অনেক চিন্তা করেছি।

—তাই না কি?

—হাঁ তাই। এ কথাও বলে রাখি, এই জেলায় একটা বড় রকমের হাসপাতাল রিলিফ সেণ্টার খোলাটাকে আমি মোটেই প্রয়োজনীয় বলে মনে করি না।

—তা হলে আপনি কি প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন? প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি বোধ হয়?

—না তাও নয়। সত্যি কথা বলতে কি, আপনারা যা কিছু করছেন, তার একটাও আমি প্রয়োজনীয় বলে মনে করি না।

লিডিয়া চুপ করে গেল। তারপর সদ্য-আগত খবরের কাগজটার উপর চোখ বুলাতে বুলোতে সে শান্ত ভাবে বলল—গেল সপ্তাহে আমাদের পাশের গ্রামের অ্যানা বলে একটি মেয়ে ছেলে হতে গিয়ে মারা গেল, যদি আমাদের জেলায় ডাক্তারী রিলিফ সেণ্টার থাকত, তা হলে হয় ত সে এরকম অল্প চিকিৎসায় মারা যেত না। তা শিল্পী মহোদয় কি বলেন এ বিষয়ে?

—আমারও এবিষয়ে অনেক কিছুই বলবার আছে।

আমার মনে হয় যে, বর্ত্তমানে আপনাদের এই যে সব স্কুল, ডিস্‌পেনসারী, লাইব্রেরী এ সমস্তই লোকের দুর্দ্দশা না কমিয়ে বরঞ্চ বাড়াচ্ছে। চাষারা একেইত হাজার রকমের সামাজিক অর্থনৈতিক নাগপাশে জড়িত হয়ে রয়েছে, তার উপর আপনারা আর এই সব বোঝা তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবেন না, তাতে তাদের দুর্দ্দশা বাড়বে বই কমবে না। এই আমার মত, বুঝলেন?

লিডিয়া আমার দিকে চেয়ে একটু হাসল, আমি বলে যেতে লাগলাম—একজন আনা ছেলে হতে গিয়ে মারা গেল, সেইটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা নয়, সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে এই যে, কত আনা, মারভা, মাশা সব সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক কাজ করছে, নিজেদের সাধ্যাতিরিক্ত কাজ করে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তবুও তারা তাদের অাপজীবী ক্ষুধার্ত্ত ছেলেমেয়েদের মুখে দুবেলা দুটি করে অন্নও দিতে পারে না, তাদের সমস্ত জীবন ডাক্তারের হাতে বন্দী, তাই তারা অসুখের জ্বরে, অনাহারে, অর্দ্ধাহারে বৃদ্ধত্বের সীমায় পৌঁছবার পূর্ব্বেই পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। তাদের বংশধরেরাও এই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি করেই জীবন কাটিয়ে যায়—তাই বছরের পর বছর ধরে তারা বনের পশুর মতই দিন কাটায়। তাদের জীবনের এই ভয়াবহ পরিণতির জন্ত দায়ী তাদের নিজেদের জন্যে ভাববার সময়ের অভাব। শীত, অন্নাভাব, অমানুষিক পরিশ্রম একটা ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মত তাদের সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে আছে—তাদের ঈশ্বরের বিষয় চিন্তা করবার সময়ত নেই-ই, সামর্থ্যও নেই। আপনারা তাদের উদ্ধার করবার জন্ত সৃষ্টি করছেন স্কুল আর হাসপাতাল, কিন্তু এতে তাদের উদ্ধার না করে তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছেন অসহ্য দুর্দ্দশার ভার, কেননা এতে করে আপনারা তাদের মনে নতুন অভাব-বোধ জাগিয়ে তুলছেন। আপনাদের জেমস্‌টভোর জন্ত অতিরিক্ত কর দেওয়ার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।

লিডিয়া গম্ভীরভাবে বলল—আপনার সঙ্গে তর্ক করা মিছে, এসব কথা আমি পূর্ব্বে অনেকের কাছ থেকেই শুনেছি। তবে, একটা কথা আমি আপনাকে বলতে চাই, সেটা হচ্ছে এই যে, আমরা আমাদের হাত গুটিয়ে বসে থাকতে তো পারি না। হতে পারে যে, আমরা নির্য্যাতিত হতভাগ্য জনসাধারণের বিশেষ কোন উপকার করতে পারছি না, এমন কি আমরা যতটুকু কাজ করছি, তার মধ্যেই আমাদের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়ে যাচ্ছে, তবু আমরা আমাদের যথাসাধ্য তো করছি! এবং আমার মনে হয় যে, আমরা যে পথ অনুসরণ করছি, সেইটেই ঠিক। আমরা আমাদের যথাসাধ্য করছি এবং তা নিঃস্বার্থভাবেই, তবুও আপনি আমাদের কার্য্যকলাপ পছন্দ করেন না—তা কী করব বলুন, মানুষ যতই চেষ্টা করুক সবাইকে খুশী করতে সে পারে না।

—হাঁ তোমার কথা ঠিকই!—লিডিয়ার মা তার সামনে সর্ব্বদাই একটু ত্রস্ত ভাবে থাকতেন। তার সব কাজেই, বিশেষতঃ এই সব ব্যাপারে, তিনি সর্ব্বদাই মাথা নেড়ে সায় দিয়ে যেতেন।

—কৃষকদের দুপাতা পড়িয়ে আর দুটো শ্লোক মুখস্থ করিয়ে আর জেলায় জেলায় একটা করে রিলিফ-সেণ্টার খুলে, কখনও তাদের অশিক্ষা দূর করা বা মৃত্যু-সংখ্যা কমান যেতে পারে না,—আমিও আমার মতটা স্পষ্ট ভাষায় জানাবার চেষ্টা করছিলাম—আপনারা কাজ করছেন তা ঠিক, কিন্তু আপনাদের সে পরিশ্রম যাদের জন্ত করা, তাদের কোন উপকারই হচ্ছে না। তাদের দুপাতা পড়িয়ে আপনারা তাদের বাবু করে তুলছেন, আর জাগিয়ে তুলছেন তাদের মনে একটা নতুন অভাব-বোধ।

কিন্তু, আমাদের কিছু একটা করতে হবে ত—লিডিয়া বিরক্তির সহিত বলল।

—আপনাদের কি করতে হবে জানেন? আমি বলে যেতে লাগলাম—তাদের যে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়, তা লাঘব করতে হবে। তাদের নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবার অবকাশ দিন, তাদের বোঝবার সময় দিন যে, গরু ঘোড়ার মত শুধু মুখ বুজে খেটে যাবার জন্ত তাদের জন্ম হয় নি। তাদের পরিশ্রমের বোঝা একটু কমিয়ে দিন, তারা নিজেদের বিষয় চিন্তা করবার অবকাশ পাক, তারপর দেখবেন আপনাদের এই হাসপাতাল, এই স্কুল, এই লাইব্রেরী কত তুচ্ছ, কত অকেজো।

—তাদের পরিশ্রম করা থেকে মুক্তি দেব, কী যে বলেন!!—এই বলে সে অবিশ্বাসের হাসি হাসতে লাগল।

—কেন, তা অসম্ভব কেন? আপনারা নিজেরা ওদের কাজের অংশ গ্রহণ করুন। যদি দেশের সব লোক, উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে সব কাজ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে নেয়, তা হলে আর কারুরই কোনো কষ্টের কারণ থাকে না। ভেবে দেখুন ত,সেদিনের কথা, যেদিন সবলোককে দিনে মোটে তিন কি চার ঘণ্টা কাজ করতে হবে, আর বাকী সময়টা থাকবে তাদের অবসর। আর, সেই অবসর সময়ে যে নিজের উন্নতির জন্যে চেষ্টা করতে পারবে। আমরা নিজেদের ঘাতসহ করে গড়ে তোলবার সময় পাব, দেশের আনা, মারভা আর মাশার দল আর মারা যাবে না। ভেবে দেখুন ত, স্বাস্থ্যহীন দেশের লোকদের আবার স্বাস্থ্য ফিরে আসবে—আমরা ডাক্তার আর ওষুধের কথা ভুলে গিয়ে শিল্পকলা, সায়ান্সের উন্নতিতে মন দিতে পারব। আমাদের সমস্ত জাতি চেষ্টা করবে জীবনের অর্থ খুঁজে বার করবার—আমাদের জাতির ভাগ্যাকাশ থেকে মেঘ কেটে গিয়ে সূর্য্য উঁকি মারবে।

—আপনার কথার কিন্তু সামঞ্জস্য থাকছে না, যাই হোক, আপনি বোধ হয় ওষুধের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করেন না?

—না, করি না। রোগ হয়েছে ওষুধ দিয়ে সারিয়ে দিন, আবার তার পর দিনই সেই অসুখই হবে। আমাদের দেশে দরকার হচ্ছে রোগের কারণ কি তারই অনুসন্ধান করা। যদি চিকিৎসার একান্ত দরকারই হয়, সেটা আসল রোগের চিকিৎসা নয়, চিকিৎসা করতে হবে রোগের কারণের। যে সায়ান্স কেবল রোগের চিকিৎসা করবার কথা বলে, সে সায়ান্সকে আমি বিশ্বাস করি না।...

জেনিয়া, তুমি নীচে যাও।—লিডিয়া আদেশের সুরে বললে।

জেনিয়া কাতরভাবে একবার মার মুখের দিকে, একবার দিদির মুখের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

—লোকে যখন নিজে কিছু করে না, তখন সে এই রকম ভাবেই অন্যের কাজের খুঁত ধরে! যাক, আপনার সঙ্গে তর্ক করে কোন ফল হবে না, কেননা আমাদের দুজনের মতের মিল হওয়া একেবারেই অসম্ভব।

এই কথা বলে সে কথার সুর বদলে মার সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করলে। আমার সঙ্গে যাতে আর কথাবার্ত্তা না বলতে হয়, সেইজন্য সে মাকে প্রিন্সের সম্বন্ধে সব কথা বলতে লাগল। আমি বুঝতে পারলাম যে, আমার এখানে উপস্থিতি আর প্রার্থনীয় নয়, কাজেই আমি বিদায় নিলাম।

[৪]

বেশ রাত্রি হয়ে গেছে। চারিদিক নিঃশব্দ। গ্রামবাসীরা সব গাঢ়নিদ্রায় মগ্ন—কোথাও কোন আলো জ্বলছে না, খালি তারাদের মিটমিটে আলো পুকুরের জলে প্রতিফলিত হচ্ছে। গেটের কাছে এসে দেখি, জেনিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

কোনখানে কেউ আর জেগে নেই, এমন কি চোর-ছ্যাঁচড়রাও ঘুমোচ্ছে, খালি আমরা, ভদ্রলোকরা রাত্রি অবধি জেগে অর্থহীন তর্ক-বিতর্ক করছি।

শরতের নিঝুম রাত্রি—চারিদিকে কেমন যেন একটা বিষণ্ণভাব। আকাশ-ঢাকা কালো মেঘের বুক চিরে চাঁদ উঁকি মারতে সুরু করলে—তার সাদা আলো রাস্তার পাশে শস্যের ক্ষেতের উপর এসে পড়ল। জেনিয়া নিঃশব্দে আমার পাশে পাশে রাস্তা ধরে হাঁটছিল।

—আমার মনে হয় আপনার কথাই ঠিক, সে প্রথম নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করলে—যদি সকলেই নিজের বিষয়, ভগবানের বিষয় চিন্তা করবার সময় পায়, তা হলে তাদের অর্দ্ধেক দুঃখ-দুর্দ্দশা শেষ হয়ে যায়।

—নিশ্চয়ই। দেখ, মানুষ হচ্ছে জগতের শ্রেষ্ঠ জীব, আর সেই জন্যই মানুষের উচিত নিজের জীবনকে অন্য সব জীবের জীবনের চেয়ে উন্নততর করে গড়ে তোলা।

কথা বলতে বলতে আমরা বাড়ী থেকে অনেকটা দূরে চলে এসেছিলাম। এবার জেনিয়া দাঁড়িয়ে গিয়ে আমার সঙ্গে কর-কম্পন করে বিদায় নিয়ে বলল—শুভ রাত্রি, কালকে আসবেন কিন্তু।

আচ্ছা, আর একটু দাঁড়াও,—আমি তাকে অনুনয় করে বললাম।

সত্যি কথা বলতে কি, আমি জেনিয়াকে ভালবেসে ফেলেছিলাম। তার অপূর্ব্ব কমনীয়তা, তার মিষ্ট স্বভাব, আমার মতই অচঞ্চল জীবনযাত্রা-প্রণালী, বোধ হয় তাকে আমার কাছে প্রিয় করে তুলেছিল। কি সুন্দর তার গায়ের গড়ন, কি সুন্দর তার ফ্যাকাশে মুখখানি, কি সুন্দর তার ক্ষীণ হাত দুটি!! তার সব কিছুই গোড়া থেকে আমার ভাল লাগত। তার বোনের সঙ্গে তার স্বভাবের কি অসম্ভব পার্থক্য। তা ছাড়া জেনিয়াও আমাকে পছন্দ করে। প্রথম দিন থেকেই সে আমার শিল্পের ভক্ত! আজকের এই নির্জ্জন পথের মাঝে, নিঃশব্দতার মাঝে, আমি হঠাৎ বুঝতে পারলাম যে, আমি জেনিয়াকে প্রথম দিন থেকেই ভালবেসেছি, আর তাকে আমার জীবন-সঙ্গিনীরূপে না পেলে আমার জীবন ব্যর্থতায় পঙ্গু হয়ে যাবে।

আর একটু দাঁড়াও,—আমি বিনয় করে বললাম।

তারপর আমার গরম কোটটা খুলে তার গায়ের উপরে চাপিয়ে দিলাম। সে পাতলা জামা পড়ে শীতে কাঁপছিল। পুরুষ মানুষের কোট-পরে তাকে অদ্ভুত দেখাচ্ছে মনে করে

সে হেসে উঠল। আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না, তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে চুমোয় চুমোয় তার সমস্ত মুখ ভরিয়ে দিলাম। আমার বাহুবন্ধনের মধ্যে তার ক্ষীণ দেহ বার কতক চমকে কেঁপে উঠে তার মৌন সম্মতি জানিয়ে দিল। সে চাপা গলায়—যেন কেউ শুনতে পাবে—আমাকে বললে,—কালকে নিশ্চয়ই আসবে কিন্তু। আমি এখনি মাকে সব কথা বলব, মার কাছ থেকে আমার কোন কথাই লুকান নেই···কিন্তু দিদি? মা তোমাকে ভালবাসেন, কিন্তু লিডিয়া? ···কালকে খুব সকালেই তোমার আসা চাই।

এই বলে সে দ্রুতপদে বাড়ীর দিকে ফিরে গেল, আমি চেঁচিয়ে বললাম, "শুভ রাত্রি", সেও দূর থেকে তার প্রত্যুত্তর দিল।

আমি খানিকক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলাম; তারপর আস্তে আস্তে তাদের বাড়ীর দিকে চলতে লাগলাম। তাদের বাড়ীর সামনে গিয়ে গেটের ধারের পাথরের সিংহের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না, হঠাৎ চমক্ ভাঙ্গল একটা পেঁচার ডাকে। চাঁদটা আকাশের প্রায় মাঝামাঝি এসে গেছে—চারিদিক্ তার সাদা আলোয় ধব্ ধব্ করছে। এইবার বেশ শীত করতে লাগল। আমি আমার বাড়ীর পথ ধরলাম খানিক দূর এগিয়ে এসে দেখি, রাস্তার উপর আমার কোটটা পড়ে রয়েছে। সেটাকে তুলে নিয়ে বাড়ীর দিকে পা বাড়ালাম।

পরদিন একটু বেলা করেই ওদের বাড়ীতে গেলাম। একেবারে বাড়ীর মধ্যে না গিয়ে বাগানে গিয়ে একটা বেঞ্চির উপর বসে জেনিয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। তারপর সেখান থেকে উঠে বাড়ীর মধ্যে গেলাম। নীচের তলায় জনপ্রাণীর সাড়া নেই। আস্তে আস্তে উপরে গেলাম। বারান্দা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় লিডিয়ার গলার আওয়াজ কাণে এল—ভগবান্···একটি কাককে একদিন···। বেশ জোর গলায় সে কাউকে ডিক্‌টেশন্ দিচ্ছিল—ভগবান একটি কাককে একদিন···এক খণ্ড পনীর দিলেন···কে?—আমার পায়ের আওয়াজ শুনতে পেয়ে সে জিজ্ঞাসা করল।

—আমি।

—ওঃ আপনি! কিছু মনে করবেন না, আমি এখন একটু ব্যস্ত আছি।

—একাটেরিনা প্যাভলোভনা কি বাগানে আছেন?

—কে, মা? না, মা ত আজ সকালে জেনিয়াকে সঙ্গে নিয়ে আমার এক মাসীর বাড়ীতে বেড়াতে গেছেন। শীত পড়লে সেখান থেকে বাইরে কোথাও যাবেন।

তার পর একটু থেমে সে আবার পড়াতে আরম্ভ করলে—ভগবান একটি কাককে···এক খণ্ড পনীর···।

আমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে প্রথম দিন যে রাস্তায় এ বাড়ীতে প্রবেশ করেছিলাম, সেই রাস্তা দিয়ে বাড়ী ফেরবার জন্যে পা বাড়ালাম। পথে একটা ছোট ছেলে এসে আমার হাতে একটা চিঠি দিলে, তাতে লেখা—

"আমি মাকে আর দিদিকে রাত্রিতেই সব কথা বলি, মার কোন আপত্তি নেই, তবে আমাদের বিয়েতে দিদির একান্তই অমত। জানই ত দিদির অমতে কিছুই করবার সাধ্য আমাদের নেই। আমাকে ক্ষমা কোরো। তোমাকে ভুলতে কোনো দিন পারব না। আমাকে ভুলে যাও, তুমি সুখী হও এই প্রার্থনা করি।"

আমার সামনে বিস্তৃত পথ গাছের ছায়ায় ঢাকা। শুকনো পাতার করুণ আর্তনাদ উপেক্ষা করে আমি সেই পথ ধরে এগোতে লাগলাম। বাড়ী পৌঁছে আমি সেই রাত্রেই পিটারস্‌বার্গ অভিমুখে যাত্রা করলাম।

··· ··· ···

তাদের সঙ্গে আর কোনদিন দেখা হয় নি। অনেক দিন বাদে একবার ট্রেনে একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে বাইলোকারভের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দেখলাম, তার কোন পরিবর্তনই হয় নি। কথাবার্তার মাঝে জানতে পারলাম যে, সে বিয়ে করেছে ও নিজের জমিদারী বিক্রী করে স্ত্রীর নামে অন্য জায়গায় আরও একটা জমীদারী কিনেছে। লিডিয়া এখনও সেইখানেই এবং সেইরকম ভাবে পল্লী-উন্নয়নের কাজে মেতে আছে। আর, জেনিয়ার বিষয় বন্ধুবর কিছুই জানে না বললে, তবে বাড়ীতে সে আর থাকে না।

বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবার পরও বহুদিন কেটে গেছে। আমার ছন্নছাড়া ভবঘুরে দিন-যাপনশেষ আজও হয় নি। অতীতকে ভুলবার অনেক চেষ্টা করেছি, পারি নি। যখনই কিছু বা কোন ছবি আঁকি, তখনই অকারণে আমার চোখের উপর ভেসে ওঠে সেই সব দিনের কথা, মনে পড়ে সেদিনকার রাত্রে বুকে অদম্য আশা নিয়ে বাড়ী ফিরে আসার কথা। আবার যখনই আমার মন নিঃসঙ্গতায় কেঁদে ওঠে, তখনই আমার মনে হয় যে, সেও ত আমার কথা ভাবছে—সে আজও আমার জন্যে অপেক্ষা করছে, দেখা আমাদের দুজনের একদিন হবেই—জেনিয়া, তুমি কোথায়?···

রাজসাহী জেলা-পরিচিতি

—শ্রীসুশীল রায়

হিন্দু ও মুসলমান-সংখ্যা

রাজসাহী জিলার জন-সংখ্যা বর্ত্তমানে ১৪,২৯,০৩৮। উত্তর-বঙ্গের অন্যান্য জিলার মত এই জিলায়ও মুসলমানের সংখ্যা অধিক, - হিন্দু-সংখ্যা হইতে প্রায় তিন গুণ বেশী। বলিয়া রাখা দরকার, এই সংখ্যা-গরিষ্ঠতার হেতু হইতেছে, ইতিহাসের আমলে বাদশাহের রাজত্বকালে নানা কারণে বহু-সংখ্যক হিন্দু অনন্যোপায় হইয়া বাদশাহের সহিত সম-ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিল। আজ তাহাদেরই বংশধরগণ শাখান্বিত হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, এই মুসলমানদের পূর্ব্বপুরুষেরা পূর্ব্বকালে হিন্দু ছিলেন। আজ যাহাদিগকে আমরা দুই ভাগে ফেলিয়া হিন্দু ও মুসলমান বলিতেছি, তাহারা একই মাটি-জলে বাড়িয়াছে ও বাড়িতেছে, একই নিয়মে লালিত পালিত হইয়াছে এবং একই রক্তে জীবনীশক্তি লাভ করিয়াছে। আজও আমরা দেখিতে পাই যে, মন ও দৈহিক গঠনের দিক্ দিয়া এই দুই জাতির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কারণ, অনুচ্চ হিন্দু জাতি হইতেই এই মুসলমানের উদ্ভব। সে যাহাই হোক, বর্ত্তমানে আমরা দেখিতেছি, মুসলমান বলিতে আমরা যাহাদের বুঝি, এই জিলায় তাহাদের সংখ্যা খাঁটি হিন্দু-সংখ্যা হইতে অনেক বেশী। এই দুই জাতির তুলনা বুঝাইবার জন্য এখানে দুইটি স্তম্ভ আঁকিয়া দেওয়া হইল। পাশাপাশি স্তম্ভ দুইটির উচ্চতা হইতেই সহজে বুঝা যাইবে, হিন্দুর তুলনায় মুসলমানদের সংখ্যা কত বেশী। হিন্দুর সংখ্যা হইতেছে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ, সেই স্থলে মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় এগার লক্ষ।*

হিন্দু-সংখ্যার বিশ্লেষণ

হিন্দু-জনসংখ্যাকে বিশ্লেষণ করিলে তাহার ভিতর নানা-রূপ সম্প্রদায়-ভেদ দেখা যায়। এই সম্প্রদায়সমূহকে আবার দুই ভাগে ভাগ করিয়া ফেলা যায়—(ক) উচ্চস্তর ও (খ) অনুচ্চস্তর। উচ্চস্তরের মধ্যে তিনটি সম্প্রদায়, যথা—বৈদ্য, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ। ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, ২০,৬৪২ জন; তাহার পর কায়স্থ ৮,১৯৩ জন ও সর্ব্বাপেক্ষা কম বৈদ্য-সংখ্যা, মোট ১,৬৩৭ জন।

ইহা ছাড়া অনুচ্চ সম্প্রদায়ের মধ্যে নমঃশূদ্র ও মাহিষ্যের সংখ্যা অত্যধিক হওয়ায়, পরপৃষ্ঠার ছবিতে হিন্দু জাতিকে ভাগ করিবার সময় তাহার মধ্যে উক্ত সম্প্রদায়দ্বয়ের জন্যও দুইটি স্তম্ভের স্থান দেওয়া হইয়াছে। ছবি হইতে সহজেই বুঝা যাইবে যে, এই জিলায় কোন্ সম্প্রদায়ের জন-সংখ্যা কিরূপ।



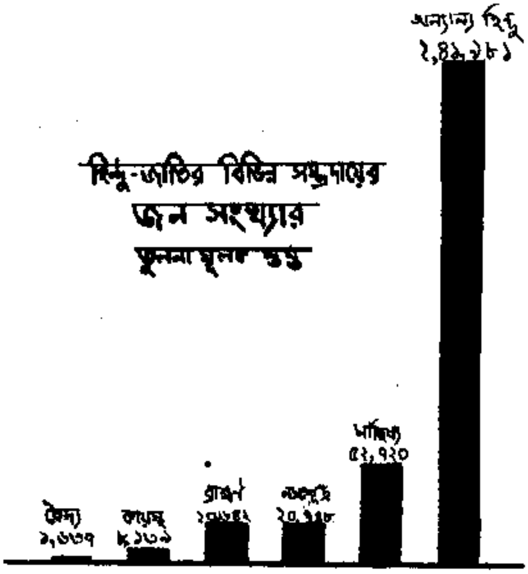
'অন্যান্য হিন্দু' নামে যে স্তম্ভটি গড়িয়াছি, তাহার মধ্যে অনুচ্চজাতিবর্গই আছে, যথা—(ক) বৃত্তিজীবী—মুচি, মেথর, গোয়ালা, নাপিত,ধোপা,ডোম,কলু ইত্যাদি ও (খ) নিম্নসম্প্রদায়, যাহারা বিভিন্ন উপায়ে জীবিকার সংস্থান করে, যেমন কুসীদ-ব্যবসায়, চাষ-বাস, কোচোয়ানী, ভৃত্যের কার্য্য ইত্যাদি; ইহারা নিজেদের পরিচয় দেয়—কৈবর্ত্ত, যুগী, কুর্মী, মালী, মালাকর, বাগদী, বৈষ্ণব, ভুঁইয়া প্রভৃতি বলিয়া। ইহাদের প্রত্যেককে লইয়া তুলনামূলক স্তম্ভ রচনা সম্ভব নয়, সেই জন্য তাহাদের সকলেরই এবং তাহার সহিত উচ্চ সম্প্রদায় এক সঙ্গে করিয়া একটি ফিরিস্তি দেওয়া হইল। ১৯২১-এ এই সংখ্যা কত ছিল এবং ১৯৩১-এ কত পাওয়া গিয়াছে, পাশাপাশি তাহাও দেওয়া হইল। '+' চিহ্ন দ্বারা সংখ্যাবৃদ্ধি ও '—' চিহ্ন দ্বারা সংখ্যাহ্রাস বুঝান হইয়াছে।

জন-সংখ্যার হিসাব

(ক) সম্প্রদায়	(খ) ১৯২১	(গ) ১৯৩১	(ঘ) হ্রাস-বৃদ্ধি
বৈদ্য	১,১০৫	১,৬৩৭	+৫৩২
ব্রাহ্মণ	১৯,১৯০	২০,৬৪২	+১,৪৫২
কায়স্থ	৭,১২৬	৮,১৯৩	+১,০৬৭
নমঃশূদ্র	২৪,৭৯৯	২০,৭৪৮	—৪,০৫১

* ১৯৩১ সালের সেন্সাস্-রিপোর্ট অনুযায়ী।

(ক)	(খ)	(গ)	(ঘ)
মাহিষ্য	৫৬,১৭০	৫২,৭২০	—৩,৪৫০
ধোপা	১,০৪০	১,৮৪১	+৮০১
গোয়ালা	৭,২৪৩	৬,২৩৪	—১,০০৯
জেলে	৫,৩২০	৪,৭৫৭	—৫৬৩
যুগী	৪,১৯৯	৩,৬৩৮	—৫৬১
কলু ও তেলী	৪,৯৫৭	১,২৫০	—৩,৭০৭
কুমার	৫,৩৮৩	৫,০৭৯	—৩০৪
কাপালী	৯৯৪	২,৪৬৫	+১,৪৭১
ঘটকর্পুর	৮,১৮৭	৭,৩৮০	—৮০৭
কুর্মী	৫,৬৩৯	৬,৮০৫	+১,১৬৬



(ক)	(খ)	(গ)	(ঘ)
মালাকর	৬৫২	৭১৮	+৬৬
মেথর	৩০৮	৩০৮	সমান আছে
মুচি	১০,৬৯০	৯,৩৯৭	—১,২৯৩
মুণ্ডা	১১,৯৪৭	১২,৬০৯	+৬৬২
নাপিত	৬,২৮৩	৫,৫৩১	—৭৫২
আগরওয়ালা*	...	১,২৬৯	...
বাগ্দী	৩,৮৬২	৩,১৪	—৭১৩
বৈষ্ণব	১৮,১৫৬	১৬,৫০৮	—১,৬৪৮

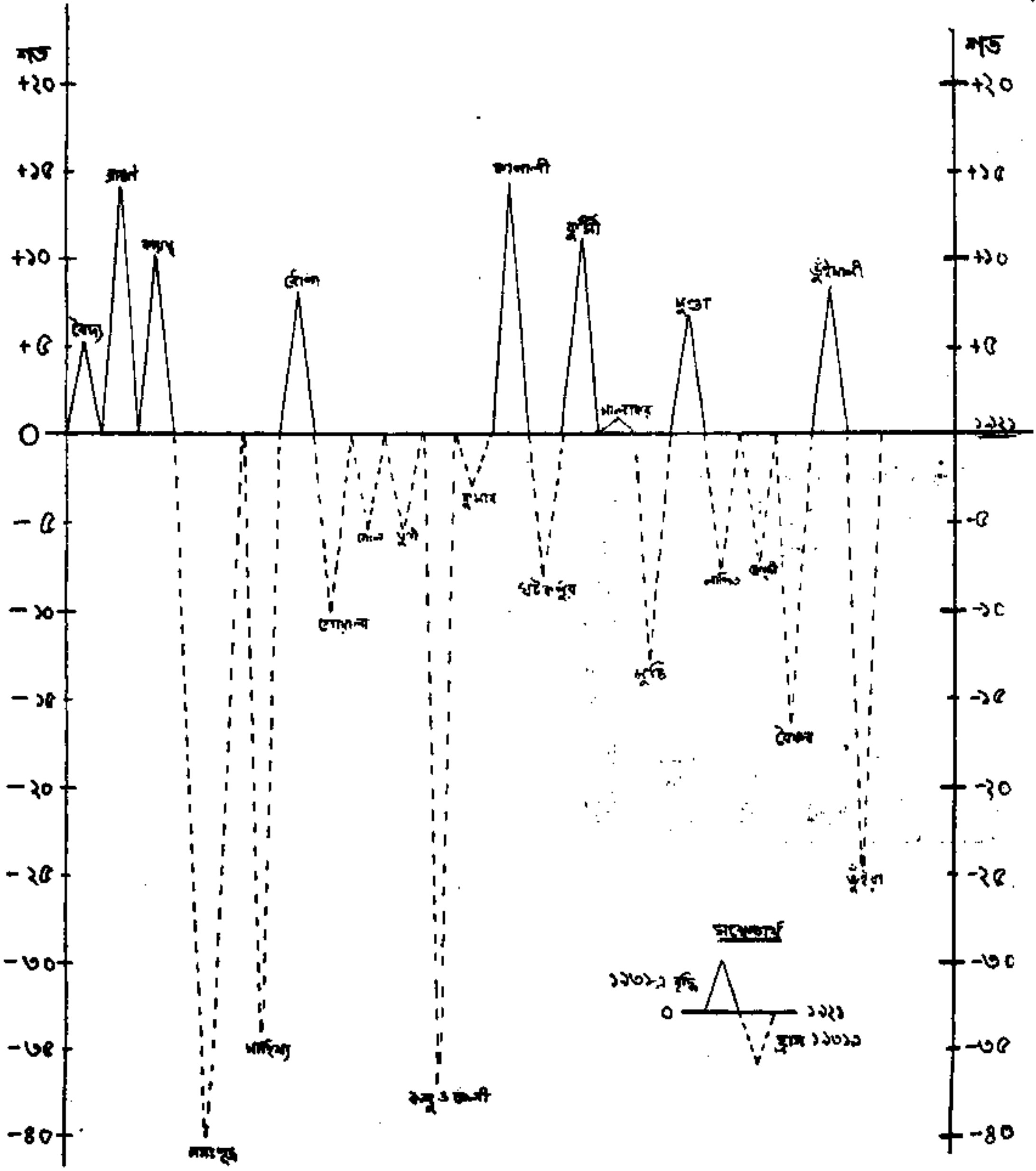
(ক)	(খ)	(গ)	(ঘ)
ভুঁইমালী	৩,৩১৩	৪,১৩৩	+৮২০
ভুঁইয়া	৪,৬৬৩	২,২৫৮	—২,৪০৫
মুসলমান	১১৩৯২৬৬	১০,৮৩,১০৫	—৫৬,১৬১

উপরে হিন্দু জাতির বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংখ্যা একসঙ্গে যোগ করিলে সমগ্র হিন্দু-সংখ্যা, অর্থাৎ ৩৪৫৯০৩ পাওয়া যাইবে না, তাহা হইতে কিছু কম হইবে। তাহার কারণ, উপরিলিখিত সম্প্রদায় ভিন্নও বহু অখ্যাত সম্প্রদায় আছে, যাহার উল্লেখ করা হয় নাই। কারণ, ইহাদের সংখ্যা শতক কিংবা দশকের ঘরে। এইরূপ ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা সেই জন্য প্রয়োজন মনে করা হয় নাই।

'জন-সংখ্যার হিসাব'-এ (ক) কলামে হিন্দুর সম্প্রদায়-ভেদ দিয়া তাহাদের নামোল্লেখ করা হইয়াছে। (খ) কলামে ১৯২১ সালের জন-সংখ্যা এবং (গ) কলামে ১৯৩১ সালের জন-সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সেইখান হইতে হিসাব করিয়া (ঘ) কলামে বৃদ্ধি ও হ্রাস পাওয়া যাইতেছে। এখানে একটা অতি প্রয়োজনীয় বিষয় লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, উচ্চ সম্প্রদায়ত্রয়েরই সংখ্যা ১৯৩১ সালে বাড়িয়াছে, তা ছাড়া অনুচ্চ সম্প্রদায়ের মধ্যেও কোন-কোনটির বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে এবং সেই সঙ্গে নিম্ন অর্থাৎ অনুচ্চ সম্প্রদায়ের মধ্যে রীতিমত জন-সংখ্যার হ্রাস দেখিতেছি। এই বিষয়টি সহজে বুঝাইবার জন্য সঙ্গে একটি ছবি আঁকিয়া দেওয়া হইল। পাঠকগণ ছবিটি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, বৈদ্য, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ধোপা, কাপালী, কুর্মী, মালাকর, মুণ্ডা, ভুঁইমালী ইত্যাদির সংখ্যা বাড়িয়াছে এবং নমঃশূদ্র, মাহিষ্য, গোয়ালা, জেলে, যুগী, কলু ও তেলী, কুমার, ঘটকর্পুর, মুচি, নাপিত, বাগ্দী, বৈষ্ণব, ভুঁইয়া ইত্যাদির সংখ্যা কমিয়াছে। ইহার কারণ বলা দরকার। কেবল বাঙ্গালার কিংবা বাঙ্গালার বিশেষ জেলায় নয়, ভারত-বর্ষের সর্ব্বত্রই দেখা গিয়াছে যে, পূর্ব্বে যাহারা নিজেদের পরিচয় দিয়াছে এক সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া, পরে তাহারাই আবার নিজেদের উচ্চস্তরে তুলিবার ইচ্ছায় অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়াছে। ছুতোর, কামার, কর্ম্মকার বলিয়া যাহারা পরিচিত ছিল, তাহারা দশ বছর পরের আদমসুমারীর সময় নিজেদের বিশ্বকর্ম্মা বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছে। আবার কেহ কেহ নিজেদের প্রথমে রাজপুত বলিয়া পরে আবার বলিয়াছে ব্রাহ্মণ। ফলে, নিম্নস্তরের জন-সংখ্যার হ্রাস ও সেই সঙ্গে

* ইহারা বিদেশী বণিক্। জাতিতে মাড়োয়ারী, এখানে বহু পূর্ব্বে ব্যবসায় করিতে আসিয়া বংশপরম্পরায় পাকাপাকি বসবাস করিতেছে। ১৯২১ সালের সংখ্যা পাওয়া যায় নাই।

উচ্চস্তরের বৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। এখানেও তেমনই নিম্নস্তরের যাহারা, তাহারা ধাপে ধাপে উচ্চস্তরে উঠিবার জন্ত নিজেদের আনুপাতিক উচ্চসম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া পরিচয় দিতেছে। পরিমাণে বৃদ্ধি হয় নাই। তাহার কারণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সমস্ত সম্প্রদায়ের নাম এবং জন-সংখ্যার হিসাব এখানে দেওয়া হয় নাই। সংখ্যা যত কমিয়াছে আমাদের দেওয়া



সেইজন্তুই আমরা দেখিতেছি যে, অনুচ্চসম্প্রদায়ের ভিড় কমিয়া উচ্চসম্প্রদায়ে জনতা বৃদ্ধি পাইতেছে। ছবিতে ইহাও লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, যে-পরিমাণে সংখ্যা কমিয়াছে, সেই এই হিসাবের আড়ালে বাইতি, বাগদি, বাউরি, বেদিয়া, ভূমিজ, বিন্দ ইত্যাদি যে-সমস্ত অখ্যাত সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা হয় নাই, তাহাদের মধ্যে সংখ্যার বৃদ্ধি হইয়া সমগ্রভাবে জন-

সংখ্যা হিসাব-মত মিল হইয়াছে। এই সমস্ত সম্প্রদায় অখ্যাত হইলেও কাহারও কাহারও নিকট নিম্ন সম্প্রদায় হইতে হয় ত ইহাদেরই মূল্য অধিক বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়া থাকিবে, সেইজন্ত তাহারা ১৯২১ সালে নমঃশূদ্র, মাহিষ্য, মুচি ইত্যাদি হইতে ১৯৩১ সালে বাইতি, বারনি, বালড়ি হইয়া গিয়াছে।

নিম্ন সম্প্রদায়ভুক্ত লোক বিভিন্ন সময়ে কিরূপ ভাবে নিজেদের উচ্চ সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া দাবী করিয়াছে তাহা বুঝাইবার জন্ত নিম্নে সংক্ষিপ্ত উদাহরণ দেওয়া হইল :—

পুরাতন পরিচয়	১৯২১ সালের দাবী	১৯৩১ সালের দাবী
কামার	ক্ষত্রিয়	ব্রাহ্মণ
সোনার	ক্ষত্রিয় রাজপুত	ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য
সূত্রধর	বৈশ্য	ব্রাহ্মণ
নৈ (Nai)	ঠাকুর	ব্রাহ্মণ
নাপিত	বৈদ্য	ব্রাহ্মণ
কাহার	বৈশ্য	ক্ষত্রিয়
মুচি	বৈদ্যঋষি	—
চামার	—	রাজপুত

উপরের এই উদাহরণ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সকলেরই ব্রাহ্মণ হইবার দিকে তীব্র ঝোঁক। কয়েক শতাব্দী এইভাবে চলিলে সমস্ত নিম্নসম্প্রদায়ই না ব্রাহ্মণ হইয়া যায়!

অধিবাসীদের ভাষা

এখানকার ভাষা অবশ্যই বাঙ্গালা। তবে, সেই বাঙ্গালা ভাষা উচ্চারণের মধ্যে অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। অশিক্ষিতদের মধ্যে ন-কে ল, জ-কে র, এবং র-কে অ বলিতে শোনা যায়। জন-সংখ্যা ১৪,২৯,০১৮ জন; তাহার মধ্যে পুরুষ-সংখ্যা ৭৪১,২৯৫ জন ও স্ত্রী ৬৮৭,৭২৩ জন। এই সংখ্যার মধ্যে কতজন কোন্ ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করে তাহার ফিরিস্তি নীচে দেওয়া হইল :—

	পুরুষ	স্ত্রী
* ১। বাঙ্গালা	৬৯৩,৫৯৯	৬৪৮,৬২২
২। আসামী	৫৪	৬
† ৩। বিহার ও উড়িষ্যার ভাষা	২৭,৬২৩	২৫,০২২
‡ ৪। ভারতের অন্যান্য ভাষা	৪৭০	২৫৬
× ৫। এশিয়ার বিভিন্ন ভাষা	২২	×
৬। ইংরেজি ভাষা	২৪	২২

ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে, এই জিলায় বিদেশী লোক আছে। পূর্ব্বে আগরওয়ালার যে-সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, এখানে দেখা যাইতেছে, বিহারী-ভাষাভাষীদের সংখ্যা তদপেক্ষা কম। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সেই আগরওয়ালা সম্প্রদায় বহুদিনের বসবাস হেতু এখন প্রায় বাঙ্গালীই বনিয়া গিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে অনেককে বিহারী বলিয়া চেনাই যায় না। ধরণে ও আচারে-ব্যবহারে তাহারা এই জিলার অধিবাসীদের মতই হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু, যাহারা এখনও নিজস্বতা হারায় নাই, তাহারা পুরাপুরি-রূপেই বিদেশী সাজিয়া থাকে। ইহাদের প্রধান কাজ লগ্নি-কারবার। এই জিলার অধিবাসীরা ইহাদিগকে 'কাঁইয়া' বলিয়া থাকে এবং সহরের যে অঞ্চলে ইহারা বাস করে, সেই অঞ্চলকে 'কাঁইয়াপট্টি' বলে।

আসামীর সংখ্যা এখানে কম। চীনারা শহরের একটি পাড়ায় ছুতারের কাজ করে, গ্রামে ইহারা বড় যায় না। কাঠের চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি তৈরি ও মেরামত করাই ইহাদের পেশা।

ইংরাজী-ভাষাভাষীর সংখ্যা সামান্তই। কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ এখানে দেখা যায়। কেহ উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী হিসাবে, কেহ মিশনারীর কাজে এবং কেহ বা শহরের উপকণ্ঠে সরদহে পুলিশ ট্রেনিং গ্রাউণ্ডের কর্ণধার হিসাবে এখানে বাস করেন।

উপরের এই বিদেশীবৃন্দ ব্যতীত বড় একটা পরদেশী লোক এখানে নাই। ইহা ছাড়া যাহারা এখানে বাস করে তাহাদের প্রায় সকলেরই আদি নিবাস এই জিলায়।

* বাঙ্গালাভাষাভাষীদের মধ্যে চাকমা, মাল পাহাড়িয়া ও শ্রীহট্টের ভাষা মিশ্রিত।

† বিহার ও উড়িষ্যার ভাষার মধ্যে কেওরাতী, কোড়া, মুণ্ডারী, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষা আছে।

‡ ভারতীয় ভাষা অর্থাৎ গুজরাটী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, রাজস্থানী, মাড়োয়ারী, তামিল ইত্যাদি।

× এশিয়ার ভাষা অর্থাৎ আরবীয়, পারস্য, চীনা ইত্যাদি।

আলোচনা

কবিরাজ গোস্বামীর নূতন পুঁথি ?

—শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য্য

কিছু দিন পূর্ব্বে হস্তলিখিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির অনুসন্ধান করিতে করিতে অন্যান্য পুঁথির সহিত একখানি মূল্যবান্ ক্ষুদ্র পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলাম—পুঁথিখানির নাম সাধ্য ভজনতত্ত্ব বা ভজনতত্ত্বসার এবং ভণিতায় শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদানুরক্ত কৃষ্ণদাসের নাম আছে। গ্রন্থের আকার ১০।″×৪।″ পত্র-সংখ্যা ১০ ; প্রাচীন তুলোট কাগজে মোটা মোটা হরফে দুই পৃষ্ঠা করিয়া লেখা। পুঁথিখানিতে প্রচুর পরিমাণে বর্ণাশুদ্ধি বর্ত্তমান। অল্প-শিক্ষিত লিপিকরগণের প্রসাদে হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি মাত্রই বিভীষিকাপ্রদ হইয়া পড়ে, ইহাতে তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আছে, তবে আখরগুলি সুগঠিত ও সুস্পষ্ট। গ্রন্থ মধ্যে কোথাও লিপিকালের বা লিপিকরের উল্লেখ নাই, তথাপি আখরের ছাঁদ দেখিয়া ইহাকে বেশ প্রাচীন বলিয়াই মনে হয়। কৃ, ত্ত, র, ব, ক্ষ প্রভৃতি অনেকগুলি হরফের আকৃতি বর্ত্তমান কালের মত নহে। পুঁথিখানি সংগ্রহ করিয়াছিলাম নদীয়া জেলার অন্তর্গত তারাগুনিয়া গ্রামে এক রজকের গৃহ হইতে ; একখানি ছিন্ন শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পুঁথির ভিতরে এই কয়েকটি পাতা লুক্কায়িত ছিল।

পুঁথিখানিতে আত্মতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব ভাব-ভক্তি-প্রেম, সাধ্য-সাধন, ভক্তিভেদ, সখিভেদ, রসভেদ, বৃন্দাবনতত্ত্ব, নাম-মন্ত্রবীজ, ভজনতত্ত্ব প্রভৃতি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জ্ঞাতব্য সর্ব্ববিধ বিষয় নিত্যানন্দ ও গৌরচন্দ্রের কথোপকথন-চ্ছলে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে।

বলাই বাহুল্য, বৈষ্ণব সাহিত্যে কৃষ্ণদাস একাধিক, তবে এই পুঁথির লেখকই যে সুবিখ্যাত চৈতন্য-চরিতামৃতের প্রণেতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, পত্র কয়খানি পড়িলেই সে বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

প্রথমতঃ ভণিতায় কবিরাজ গোস্বামীর প্রসিদ্ধ পয়ারটি "শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। সাধ্যতত্ত্ব কহে কৃষ্ণদাস॥" হুবহু মিলিতেছে। এই পয়ারটি কবিরাজ গোস্বামীর একেবারে নিজস্ব ট্রেডমার্ক। কৃষ্ণদাস বহু হইতে পারেন, কিন্তু শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যে একাধিক কৃষ্ণদাস আশা রাখেন নাই, তাহা বিশেষজ্ঞগণের অবিদিত নাই।

তারপর ভাব ও ভাষার দিক্ দিয়াও এখানি সর্ব্বতোভাবে চৈতন্য-চরিতামৃতের সহিত মিলিয়া যায়। নমুনাস্বরূপ এইখানে সামান্য একটু তুলিয়া দিলাম।

"প্রাভব বৈভব অংশ শক্ত্যাবেশ আর
বাল্য পৌগণ্ড দুই স্বরূপ বিহার
প্রাভব বৈভব রূপে বিলাস দ্বিধা করে
বৈভবে বৈকুণ্ঠ বিষ্ণু অনন্ত অপারে"

(সাঃ ভঃ তঃ)

"কৃষ্ণ স্বরূপেতে হয় ষড়বিধ বিলাস
প্রাভব বৈভব রূপে দ্বিবিধ প্রকাশ
প্রভুর বৈভব ভেদে বিলাস দ্বিধা করে
বিলাসের বিলাস ভেদে অনন্ত অপারে

(চৈঃ চঃ ২।২০)

"শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য চারি রস
মধুরাদি পঞ্চরস কৃষ্ণ যাতে বশ" (সাঃ ভঃ তঃ)
"দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, শৃঙ্গার চারি রস
চারি ভাবে ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ" (চৈঃ চঃ ১।৩)
আকাশাদি গুণ যেন পর পর ভূতে
এক দুই গননে পঞ্চ বাড়ে পৃথিবীতে (সাঃ ভঃ তঃ)
আকাশাদি গুণ যেন পর পর ভূতে
এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে (চৈঃ চঃ ২।১৯)

এই শ্লোকগুলি ত হুবহু এক বস্তু। এ' ছাড়া সমগ্র পুঁথিখানিই চৈতন্য-চরিতামৃতের ভাবের সহিত সামান্য ইতরবিশেষ ভাবে মিলিয়া যাইতেছে। চৈতন্য-চরিতামৃতের 'সনাতন শিক্ষা' ও 'রায় রামানন্দ' প্রসঙ্গে ভজনের ও রসতত্ত্বের যে ক্রম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, উক্ত ভজনতত্ত্বসারেও আমরা উহার হুবহু পুনরুক্তি পাইতেছি, সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ একটি কথাও নাই।

কবিরাজ গোস্বামী সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তি। চরিতামৃতের পত্রে পত্রে তাঁহার সেই পাণ্ডিত্যের পরিচয় জাজ্বল্যমান। ভাগবত, গীতা ও বিভিন্ন পুরাণাদি হইতে অসংখ্য শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তিনি চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ অলঙ্কৃত করিয়াছেন, ক্ষুদ্রকায় 'ভজনতত্ত্বসার'ও তিনি বহুল পরিমাণে সংস্কৃত শ্লোক-ভূষিত করিতে ত্রুটী করেন নাই।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে বৈষ্ণব-দর্শন সুষ্ঠুভাবে আলোচিত হইলেও তাহা প্রধানতঃ মহাপ্রভুর জীবনীগ্রন্থ। সুতরাং চরিতামৃত ছাড়াও স্বতন্ত্রভাবে শ্রীমহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সর্ব্ববিধ সাধ্যসাধনতত্ত্ব ও ভজনানুক্রম সংক্ষেপে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন হয়ত তিনি অনুভব করিয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র পুঁথিখানিতে আমরা তাহাই পাইতেছি।

কবিরাজ গোস্বামীর ভণিতা-সম্বলিত এই ভজনতত্ত্বসার পুঁথি আর কোথাও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া শুনি নাই। তবে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ হইতে প্রকাশিত 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ৩৪ সংখ্যায় উল্লিখিত একখানি পুঁথির সহিত এ'খানির অনেক মিল আছে। উক্ত পুঁথিখানির নাম 'তত্ত্বনিরূপণ' এবং ভণিতায় বৃন্দাবন দাসের নাম আছে। এই বৃন্দাবন দাস কে বলিতে পারি না, তবে পুঁথির পাঠ হইতে যতদূর সম্ভব প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ইহার লেখক স্বনামধন্য কবিরাজ গোস্বামীই—বৃন্দাবন দাস নহে। ভাষাগত, বাহ্যিক প্রমাণ ও ভাবগত আভ্যন্তরিক প্রমাণ উভয়ই উক্ত-মতের পরিপোষক। এবং এই হিসাবেই পুঁথিখানির মূল্য আছে মনে করিয়া সুধীবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম।

বঙ্গ-রমণী

—শ্রীঅপরাজিতা দেবী

চিরজীব-সুখিনী বঙ্গ-রমণী রমণীকুলপ্রবরা রে—ডি. এল. রায়

[১]

—শৈবালেতে শৈবলিনী

অগ্রহায়ণের ভোর। দুয়ার খুলিয়া নিঃশব্দে বিশ্বাসদের বড় বৌ বাহির হইয়া আসিল, দরজা আবার সাবধানে ভেজাইয়া রাখিয়া উঠানে নামিয়া পূর্ব্ব-মুখ হইয়া প্রণাম করিল—আঁচলটি গায়ে আঁটিয়া জড়াইয়া ঘর-দুয়ার ঝাঁট দিতে আরম্ভ করিল।

তখনও ভাল করিয়া আলো ফুটে নাই—পাড়াগাঁয়েও অত ভোরে বড় কেহ উঠে না।—মেজ বৌয়ের ঘর হইতে একবার ছেলের কান্না শোনা গেল—আবার সব চুপচাপ।

কুয়াশা কাটিয়া অল্পে অল্পে রোদ ছড়াইতেছে—বাড়ীর গৃহিণী উঠিলেন বারান্দায় বসিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিক চাহিয়া দেখিতেছেন—মুখে মৃদুস্বরে শতনাম—

ঘরের ভিতর হইতে কর্ত্তার জড়িত কণ্ঠ শোনা গেল—'নবাবজাদীরা এখনো ওঠে নি বুঝি?'

ঠাণ্ডার চোটে আলিসার আগুন শেষ রাত্রেই নিভিয়া গিয়াছে। গৃহিণী জবাব দিলেন—'বেগার-ঠেলা কাজ ঐ রকমই হয়, তুষে ঘুঁটে সাজিয়ে দু'হাতা আগুন দেবে—তা নয়, আগুন দিয়েই আল্সে ভরে রেখেছে—নিব্‌বে না ত কি? এতখানি বেলা হল—না পেলাম পান, না পোড়াতে পেলাম পাতা—আমি আল্সে সাজালে তিন দিন আগুন থাকে।'

বড় বৌয়ের ঘর-লেপা ও ঝাঁট-পাট হইয়া গিয়াছে। এই দিকেই আসিতে ছিল—শাশুড়ীর কথা শুনিয়া আবার ফিরিয়া গেল—পিছন দিকের আঙ্গিনায় প্রকাণ্ড দুটি ধান সিদ্ধ করিবার উনান, সেই উনান হইতে এক হাতা আগুন তুলিয়া আনিয়া শ্বশুরকে তামাক সাজিয়া দিল—আঁচলের কোণ হইতে এক টুকরা তামাক পাতা বাহির করিয়া হাতার আগুনে পোড়াইতে দিল।

—'উঁ-হুঁ—হুঁ-হুঁ-হুঁ:—রাম—রাম, দূর-দূর—দূর হও সব—যত সব পেত্নী—শ্যাওড়া গাছের পেত্নী, ভোর বেলা উঠে কি উৎপাত!—ফেলো, ফেলো, গন্ধে মানুষ টিক্‌তে পারে—'

গৃহিণী রাগিয়া উঠিলেন—'তামাকের বড় সুগন্ধি, নয়? আবার ঠাট্ করে এখানে পোড়াতে বস্‌লে কেন—তোমার বড্ড আদুরে-পনা—'

দত্ত-গিন্নী ডাকিয়া বলিতেছেন, 'ও বিশ্বাস মশাই, ভোর বেলাতেই কাকে দূর করা হচ্ছে—বিশুর মাকে না কি?'

কর্ত্তা অর্দ্ধ-স্বগত ভাবে আপন মনেই বলিলেন, 'হুঁ—ও হবে দূর আমায় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে—আমি বলে—'

মেজ বৌ উঠিয়াছে—পান সাজিয়া শাশুড়ীকে দিয়া আসিল—ছেলেটিকেও তাঁহার কাছে রাখিয়া আসিল। ঘর-বিছানা গুছাইতে অনেক বেলা হইয়া গেল।

বড় বৌ বাসন ধুইয়া আসিয়া রান্না-ঘরের বারান্দায় রাখিতেছে বারান্দায় অর্দ্ধেকটা মাজা বাসন-ঘটি-কলসীতে ভরিয়া গিয়াছে—পিছন হইতে মেজ বৌ বলিল, 'যত সকালেই উঠি—দেখি সব সেরে বসে আছ।'

'সকালে উঠিস্ না কি তুই?'

'সকাল বই কি—এর আগে উঠতে পারা যায় শীতে? তোমার হাত-মুখ নীল হয়ে গেছে, আবার এখুনি নাইবে না কি? রুক্ষ নেয়ো না।'

'না নাইব না, আজ রাত্তিরে জ্বর হয়ে ছিল ক'দিন মাথায় হাত দিই নি, জটটা ছাড়িয়ে রাখি।

'দাঁড়াও—আমি তেল নিয়ে আসি—মাসে আধ পোয়া তেল আন্‌বেন—ফুরুলে আবার আর পনের দিন বিনা তেলে নাইতে হইবে। তুমি ততক্ষণ পাকা পানগুলো ছিঁড়ে রাখ।'

রান্না-ঘরের বাঁদিকে, কুয়ার ধারে ছোট্ট বড় কয়েকটি সুপারী গাছ—তাহারই একটাকে ঘিরিয়া পানের লতা গোড়া হইতে জড়াইয়া জড়াইয়া উঠিয়া আরও দু'একটি

গাছকে বেড়িয়া একটা কুঞ্জের মত গড়িয়া তুলিয়াছে। গাছ-পানের জোর খুব বেশী।

গোটা দশেক পান পাড়িয়া বারান্দার এক কোণে রাখিয়া বড় বৌ চুলের জট ছাড়াইতে লাগিল—চিরুণীখানা অনেক দিন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—আর কেহ আনিয়া দেয় নাই।

'বলি হচ্ছে কি? হচ্ছে কি? ঢং দেখে মরে যাই—এখখুনি বিশু খেতে আসবে, বাহার দেখান হবে!—সে ছেলে আমার নয়—সে ঐ মেজো মুখ-পোড়া—ভারি বাঁশ-বনের পেত্নী—তারি পায়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে দিন-রাত, এ আমার সোনার বিশু—তাকে ভোলান তোমার কর্ম্ম নয়!'

চমকিয়া বড় বৌ মাথায় কাপড় দিয়াছে অনেকক্ষণ। শাশুড়ী বলিলেন, 'সাত সকালে নাপিয়ে নাপিয়ে পান পাড়া হয়েছে!—বলি এত ভোবে কি সেবা করা হল ছ'খিবিতে রান্না-ঘরের কোণে?—লক্ষ্মী ছাড়ল বলে—বলে

'বাসি মুখে দিয়ে পানি—
তিলে চালে এক চাকনি!'

বড় বৌ পানগুলি ধুইতে ধুইতে স্বাভাবিক মৃদু স্বরে বলিল, 'এত সকালে কোন্ দিন খাই যে আজ খাব--'

—ওঃ—রূপসী আমার কিছু নাহি খায়,
তিন কাঠা চালের ভাত পাওয়ায় উড়ায়।

—নিত্যি ধান-ভানা, পাঁচ সের চাল রোজ ফুঁয়ে ওড়ে—'

পিছন হইতে মেজ বৌ বলিল, 'দত্ত-বাড়ী রোজ সাত সের লাগে—'

'তাদের বাড়ী মানুষ কত?—তুমি বড় মানুষের বেটী আছ তো আছ—রাত-দিন কেবল পান আর পান। গাছ খালি করে দিলে। এই পান-গাছ থেকে হাত-খরচা আমার হয়ে গেছে—যাও, ঠাট করে দাঁড়িয়ে না, থেকে ডুব দিয়ে এসোগে—নিত্যি তো ভাতের বেলা হয়—'

শাশুড়ী চলিয়া গেলে মেজ বৌ বলিল—'এস—'

'না—থাক্ দেরি হয়ে যাবে—'

'হোক্‌গে দেরি—আমি তোমার সঙ্গে নেয়ে হু'টো উনুন জেলে নেব এখন—'

'—কি, ঐ সুগন্ধি তেল? মা রক্ষা রাখবে না—থাম্ নিক থাম্—'

'—তুমি বড্ড ইয়ে—ওঁরা তেল এনে দেবেন ভেবেছ? মা—আমায় বলে দেয়—তোর বড় যাকে দেখিস্—'

সে দিন হাট—হাটের দিন গৃহস্থের ভাণ্ডারে প্রায় কিছুই থাকে না—সকালে যেমন সংক্ষেপ রান্না-বাড়ি—রাত্রে তেমনি আয়োজন।

শ্যামল রবিবারের হাটে প্রায়ই যায়, স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল—'কি কি লাগবে বল?'

ভোর বেলা খাওয়ার খোঁটা খাইয়া মেজ বৌয়ের মনটা ভাল নাই। বলিল—'কি আবার—দিদির কাপড় যেন আসে—'

'—সে দাদা দেখবে। তোমার কি চাই বল না?'

দিন কয়েকের মধ্যেই মেজ বৌ বাপের বাড়ী যাইবে শ্যামল সেই উদ্যোগে ব্যস্ত।

সন্ধ্যার পরে হাট আসিল। মেজ বৌ ছেলেকে ঘুম পাড়াইতেছে—শ্যামল পুঁটুলিটা রাখিয়া বলিল—'নাও—'

এক জোড়া মিহি লাল পেড়ে ভাল সাড়ী—ছেলের দুটি মোটা কাপড়ের জামা, একখানা ডুরে গামছা—একটা সবুজ ফ্লানেলের হাত-কাটা বডি—

'—দিদির কাপড় কই?'

'—দাদা এনেছে, বোধ হয়—'

'দাদা কবে বৌয়ের কাপড় আনেন যে আজ আনবেন? বছরে চারখানা কাপড়—তা-ও সময় মতন জোটে না—ছেঁড়া কাপড়ে থাকলে তোমাদের খুব মান বাড়ে বুঝি?'

'যার বৌ—সে যদি না দেখে—আমার কি?'

'বলতে লজ্জা হয় না? তোমাদের ব্যবহার একেবারে ছোট লোকের মতন—তারাও ভাল, ঐ জন্যে এখানে থাকতে আমার মন চায় না—নেহাৎ বিয়ে হয়েছে কি করি—এই কাপড় আমি দিদিকে দেব—'

'অমন কাজও করো না, মা দেখলে রক্ষা রাখবে না!'

কথাটি সত্য, দুয়ার পর্য্যন্ত গিয়া মেজ বৌ ফিরিল।

[২]

খাটে খাটায় লাভের গাঁতি
তার অর্দ্ধেক মাথায় ছাতি—

রান্না-ঘরের বারান্দায় তিন ভাই আর উঠানে কৃষাণেরা খাইতে বসিয়াছে—শাশুড়ী তদারক করিতেছেন, পাড়াগাঁয় কৃষাণদের আদর-যত্ন বাড়ীর লোকের চেয়ে বেশী।

শ্যামল বলিল, 'নূতন জিনিষটা খাওয়া গেল না—যা রান্না হয়েছে, নুনে জরান একেবারে—'

'তা হবে না কেন? হাটের হাট নুন আনা--আর মনের সাধে ঢালা,—সারাদিন মেহনৎ—হাতে করে জিনিষটা আনলে, তা অখাদ্যি রেঁধে থুয়েছে।'

বিশাল বলিল, 'সোনাভাই খালি পাতে বসে আছে, সে দিকে হঁস্ আছে না কি?'

সোনা সেখ্ বলিল 'হোক্ হোক্—একা মানুষ দু'জনকে দিচ্ছে। তা খামু তুমি কপি খারাপ হয়েছে বললে কেন? বড় বিবি ভালই রাঁধে—মেজ বিবির রান্নাই খাওয়া মুস্কিল!'

—তিন কৃষাণ ও সুখেন উচ্চ শব্দে হাসিয়া উঠিল। সুখেনের সঙ্গে ভাই সম্পর্ক—ঠাট্টা সে করিতে পারে মুনিবের—কিন্তু কথাটা ঠাট্টা নয়।

গিন্নী বলিলেন—'আমার বৌ-কালে দু'খানা হাল ছিল—দু'জন কিষেণ রাখালে—তিনজন ইস্কুলের ছাত্তর, একা সব করিনি? তোদের ঠাকুমা সড়ে বসেছে? বেজু দত্তের অন্ন-প্রাশনে আমি একা রেঁধেছিলাম—এই কপি সেবার নতুন এল দেশে, খেয়ে সবাই ধন্যি ধন্যি! আজও কেউ ভোলেনি—

অনেক রাত্রে বড় বৌ ঘরে ঢুকিল। বিশাল শুইয়া গলা অবধি লেপে ঢাকিয়া বই পড়িতেছে—তাহার পান জল রাখিয়া, দুয়ার বন্ধ করিয়া বড় বৌ নিজের বিছানা পাতিতে লাগিল।

বিশাল চোখের কোণ দিয়া চাহিয়া দেখিতেছে—বড় বৌ নিজের পানটি মুখে দিয়া শয়নের উদ্যোগ করিল। বিশাল বলিল—মা যা বলে—মিথ্যা নয়, সুগন্ধি তেল মাখবার সখ হয়েছে বড্ড -

'—আমি চাইনি—সে জোর করে—'

'—জোর করে তোমার মাথায় ঢেলে দিয়েছে, নয়? মিথ্যা কথাটা আজও ছাড়তে পারলে না? তার বাপের পয়সার জিনিষ নিতে লজ্জা হয় না তোমার?'

বড় বৌ স্বামীর দিকে একবার চাহিল—দুটি ভীত করুণ চোখ—চোখ দুটি এমন কালো যে দেখিলে মনে হয় কাজল-পরা—এত শীতে পরিশ্রমেও মুখের গঠন ও রং নিটোল ও উজ্জ্বল—কে বিশ্বাস করিবে ইহার অসুখ—অসুখ হইলে দিন দিন এমন লাবণ্য-শ্রী ফুটিয়া ওঠে?

নিরুত্তরে বড় বৌ শুইয়া পড়িল, মাথাটা ধরিয়াছে, খুব জ্বর জ্বর বোধ হইতেছে। জ্বর হইলেই বা কি, ভোর হইলে তো উঠিতে হইবে।

কাঞ্চনপুরের কৃষ্ণধন বিশ্বাস মাঝারি গৃহস্থ। এতদিন প্রবল প্রতাপে রাজ্য করিয়াছেন, এখন বয়সের জন্য ও নানা রোগ-পীড়ায় প্রায় ঘরেই থাকেন, আর সমস্ত দিন স্ত্রী, ছেলে বৌদের উদ্দেশে গালাগালি করেন। বাড়ীতে হাল আছে। সংসারের আগাগোড়া বড় বৌয়ের হাতে। কাঞ্চনপুরের কোন ঘরেই এমন সুন্দর-গঠনা ও সুশ্রী বৌ নাই। অনাথা মেয়েটি মামার কাছে মানুষ, পিতৃকুল খুব উঁচু। ভাল কুলীনের সঙ্গে কাজ করিয়া নাম কিনিবার আশায় বিনা লাভে কৃষ্ণধন মেয়েটিকে বৌ করিয়াছেন! নিজেদের চেয়ে উঁচু বংশের মেয়ে বলিয়াই হোক—কি একটু বেশী রকম সুন্দরী বলিয়াই হোক—বড় বৌ সকলেরই বিষ-নজরে পড়িয়াছে। শোনা যায়—বিশাল আগে স্ত্রীকে খুব ভাল বাসিত—স্ত্রীর নাম স্বর্ণলতা বলিয়া 'স্বর্ণলতা' বই আনিয়া উপহার দিয়াছিল—শেষে সে দিন কোথায় লুকাইল—বড় বৌয়েরও মনে নাই।

মেজ বৌ বিশ্বাসদের সমান ঘরের মেয়ে। বাপের অবস্থা খুব ভাল—চার বোন, ভাই নাই। মেয়েরা বাপের বাড়ী থাকে বেশীর ভাগ—শ্বশুর-বাড়ী দু'একমাস। মেজ বৌ সুন্দরী নয়, কিন্তু মেঝ ছেলে স্ত্রীকে চোখে হারায়। মেজ বৌয়ের উপরও শাশুড়ী প্রসন্ন নন—পাড়ায় মনের ঝাল ঝাড়েন—সামনা-সামনি তেমন কিছু নয়—বলিলে বাপের বাড়ী চলিয়া যাইবে—আবার এই নাতিনীর মায়ায় বাঁধা পড়িয়াছেন। মেজ বৌ শ্বশুর-বাড়ী আসার সময়

নৌকা ভরিয়া যে সব জিনিষ-পত্র আনে, বিশ্বাসদের তিন মাসের খরচ চলিয়া যায়।—নানা কারণে মেজ বৌকে বেশী কিছু না বলিলেও গৃহিণী ভোর হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত স্বামী-ছেলে-বৌ-রাখাল-কৃষাণ-পাড়া-পড়সী একজন না একজনের উদ্দেশে বকিয়াই চলিয়াছেন, ইহা তাঁহার স্বভাব বলিয়া বাড়ীর ও পাড়ার লোকে মানিয়া লইয়াছে। বাড়ীর কুকুরটার অবধি নিস্তার নাই—

—তিন বেলা খায়—কাকটা তাড়ায় না—দিন-রাত খিবির পায়ে পায়ে ঘোরে!—

রাত্রে বড় বৌ ধান সিদ্ধ করে, কুকুরটা উনানের ধারে কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া থাকে

বিশাল, শ্যামল, সুখেন তিন ভাই—বিশালের দৈত্যের মত শক্তিমান্ চেহারা, বড় মায়ের ভক্ত ছেলে সে। জমি-জমা সংসার সব সে দেখে—কৃষাণদের সঙ্গে খাটিয়া দ্বিগুণ ফসল ঘরে আনে। শ্যামল একটু অলস ও বিলাসী—মাইল দেড়েক দূরে একটা স্কুলে মাষ্টারী করে। সুখেন ম্যাট্রিক ক্লাশে পড়ে, বয়স তেইশ চব্বিশ, মায়ের কোলের ছেলে—অনেক বয়সে স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছিল। সুখেনের বিবাহ হয় নাই—ঘটক আনা-গোনা করিতেছে।

[৩]

ভাবিছে জানকী যেন অশোক কাননে—
আপন উদ্ধার চিন্তা—

দুপুর বেলায় বড় বৌ কাঁথা সেলাই করিতে বসিয়াছে। বেতের সাজিটায় নানা রংয়ের সূতা ও পাড়, একখানা ছোট কাঁচি, এক কৌটা ক্ষুদ—ক্ষুদগুলি বড় বৌ লুকাইয়া রাখে, দুপুর বেলা পাখীরা যখন মাটিতে নামিয়া চরিয়া বেড়ায় সেই সময় ছড়াইয়া দেয়, তাহারা লেজ নাচাইয়া কেমন আনন্দের সহিত খুঁটিয়া খায়। বড় বৌ সেলাই ভুলিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া দেখে।—শান্ত সংযত-বাক্ মলিনমুখ বউটির দু'হাতে দুটি শাঁখা ছাড়া আর কিছু নাই—না সুখ, না শান্তি, না দুটি মিষ্ট কথা; কেমন করিয়া দিনগুলি কাটিয়া যায়—সে নিজেও বুঝি জানে না।

শাশুড়ী এ অপচয় টের পাইলে পিঠে খুন্তির ছেঁকা দিবেন। তাঁর শাশুড়ী চাল-ডালের ক্ষুদের খিচুড়ী সকাল বেলা বউদের জন্য রাঁধিয়া রাখিতেন। পিঠে-পার্ব্বণের দিনে সেই চালের ক্ষুদেই এক কৌটা দুধ ও এক ছিটে গুড় দিয়া পায়স তৈরি হইত। বড় বৌ-এর শাশুড়ীর একটু পাড়া বেড়ান অভ্যাস—এ জন্যই অনেক শুভ সঙ্কল্প কাজে লাগে না—ইহার ফলে মেজাজ আরও চটে।

বড়-বৌ সেই দেশেরই মেয়ে—যে দেশে শাশুড়ীর বধূ-নির্য্যাতনের কথা রূপ-কথার রূপ ধরিয়া আজও অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। শাশুড়ীর অত্যাচারে জর্জ্জরিত বধূরা—'চোখ গেল', 'ফটিক জল'—বলিয়া আজও মানুষের কানে অসহনীয় দুঃখ-যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ ঢালিয়া দেয়। কষ্ট সহিতে না পারিয়া পাখী হইয়া উড়িয়া গিয়াছিল—তবু স্মৃতি ভুলিতে পারে নাই। তাদের তবু যে ক্ষমতা ছিল—এখন—একালে তা-ও নাই। এমন যে বিল্বফল অনাহার-শীর্ণা বৌ লুকাইয়া খাইত, শাশুড়ী টের পাইয়া মন্ত্র পড়িয়া, ছাই ঢালিয়া দিয়াছিল—সেই হইতে অমৃত ফল অখাদ্য ভস্মে পরিণত হইয়াছে। হোক্ না এ সব পাঁচশ বছর আগেকার কথা,—তবু এ কথা কে ভুলিয়াছে? আজও বধূ-পীড়নের কথা উঠিলেই এ সব কথা সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া পড়ে। সন্ধ্যা-বেলা যে সব গিন্নীরা নাতি-নাতনীকে এই গল্প করিয়া ঘুম পাড়ান—তাঁরাও এক এক জন কম নন! কালের পরি-বর্ত্তনে ব্যবহারের ইতর-বিশেষ হইয়াছে বটে—কিন্তু মূলে সেই একই জিনিষ। আদিম যুগের গরুর গাড়ীর চাকা—তারপরে ট্রাম, রেল, ঘোড়ার গাড়ী—আর বর্ত্তমান কালের মোটরের চাকা—দৃশ্যতঃ বিভিন্ন হইলেও মূলতঃ এক,—তা যতই লোহা রবারের সাজ পরান থাক।

আমগাছের গোড়ায় ঠেস্ দিয়া, বাঁশঝাড়ের দিকে মুখ তুলিয়া ঘুঘুর ডাক শুনিতে শুনিতে বড়-বৌ ভাবে—'আমিই বুঝি সেই বৌ, মরে মরে কেবলই জন্মাচ্ছি। কত দিনে আমার মুক্তি হবে—জানি নে। কে আমায় বলে দেবে!—আর কোন্ ভাল কাজটা করছি যে, মুক্তি পাব। শুনেছি দীক্ষা নিলে দেহ শুদ্ধ হয়, তখন জপ-তপ করলে উদ্ধার হয়। এত করে বললাম ওঁকে—গুরুতো বছর বছরই আসেন—তা বলেন, 'অত টাকা কোথা পাব।' আমার মাকড়ী জোড়া অমনি পড়ে আছে,—বেচলে হয়, বলতে গেলাম—অপমান হলাম। আর দীক্ষা! ভিখিরীকে দুটো

চাল দিতে পারিনে। সে দিন সেই খোঁড়া ভিখিরীটা একটা পয়সার জন্ত বসেই রইল, শেষে বকুনি খেয়ে তবে গেল। কত পাপই যে করেছি!—'

'—বলি আমাদের ফুলবিবি কই, ঘুম ভাঙ্গেনি ঝি এখনও—ধন্তি মেয়ে! বেলা গড়িয়ে এল, তা মনে করে সেবার জন্তে দাসী রয়েছি আমি।'

বড়-বৌ তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় টানিয়া উঠিয়া আসিয়া বলিল, 'কি মা?'

'এই দেখ চিঠি—পড়ে দেখ, তোমার মত রূপসী আর দেশে নেই ভাব? দর্পে আর মাটীতে পা পড়ে না। দর্প ভাঙ্গল এবার! সুখেনের বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। তোমায় তো শাঁখা হাতে পার করেছিল তোমার কিপ্‌টে মামা। দেখ—ছোট-বৌ হাজার টাকা নিয়ে এসে উঠবে এখন। কাল পত্তর হবে। নাও এখন, গা তোল, দেখ দেখি ঘরে কি আছে, না-আছে। মেজ বিবির বাপের বাড়ী থেকে লোক এসেছে, সন্ধ্যা না হতে ওঁকে রওনা করতে হবে। এই মাসের-ই আটাশে বিয়ে। আর পঁচিশটা দিনও নেই—উনি এখন নাচতে নাচতে বাপের বাড়ী যান আর কি! তুমি চিড়ের জন্ত এক-বিশ ধান এখুনি জলে ভেজাও। চিড়ে, মুড়ি, খই, ডাল, মুড়কী, বড়ি, বিয়ের যা জিনিষ-পত্তর, বিয়ের পাঁচ ছ'দিন আগে সব তৈরী সারা হওয়া চাই।'

'—মেজ-বৌ কি বিয়ে অবধি থাকবে না?'

'—থাকবে না আবার! বলে দিইছি। তবু লোকটাকে খাইয়ে দাইয়ে দিই। কুটুমবাড়ীর মানুষ। যাবে বিয়ের পর। এখন গেলে পনের দিন পরেই ঘটা করে আবার আনতে পাঠাতে হবে। টাকার গাছ পুঁতেছি আর কি—কাছে একটু সরিয়া আসিয়া,—'উনি থাকলেই কি, গেলেই কি, কুটো ছিঁড়ে দু'খানা করবেন না—শুধু তিন-সন্ধ্যা ভোগ সরানো। মেজটা একেবারে বৌয়ের গোলাম, তবু তো সুন্দরী নন্! তুমিও অমনি সোয়াগী হতে গো, কিন্তু আমার আঁচল-ধরা ছেলে—তাই না?'

শাশুড়ী এহেন সুসংবাদটা পাড়ায় বিলাইবার জন্ত বাহির হইলেন। বড়-বৌ ধান ভিজাইয়া রাখিল। বৈকালিক কাজ করিতে করিতে ভাবিল, এবার একটি সাথী পাব। আবার নিশ্বাস ফেলিল—যা' ঠাকুর-পোর ব্যবহার!

নিজের ঘর গুছাইতে আসিয়া দেখে—মেজ-বৌ ঘর ঝাঁট দিতেছে। বার কয়েক মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া বড়-বৌ বলিল, 'মুখ এত ভারী কেন রে? বাপের বাড়ী যাওয়া হল না?'

'দিলে না যেতে—'

'তা—থাক্ না কেন ক'দিন। তবু একটু বাঁচি।'

'আমি থেকেই বা তোমার কোন্ কাজে লাগি? এত কাজ করতেও পারিনে, বসে বসে দেখতেও ভাল লাগে না। আমার ভয় হচ্ছে,—ঠাকুর-পোর বৌয়ের যা রূপের ব্যাখ্যা শুনলাম! মা তাকে মাথায় তুলছেন এখনি, বিয়ে না হতেই; এর পর কি যে হবে!'

'কি আর হবে? তাকে ভালবাসেন, সে তো ভাল কথা।'

'সে কথা বলিনে; মানে, আমাদের দুর্দ্দশা বাড়বে যে খোঁটা খেতে খেতে।'

'তা যার কপালে যা লেখা আছে, কে খণ্ডাবে? তোর দুর্দ্দশা কি? তুই থাকিস্ নে, কিছু ভুগতেও হয় না।

'তাই তো বলছি, থাকলেই ঠিক তোমার মতন হবে।'

'তা হবে না, ঠাকুর-পো যে তোকে ভালবাসে।'

'ওঁদের ভালবাসা দিদি,—কিছু বিশ্বাস নেই। শুনেছি, তোমার বিয়ের পর বটঠাকুরও তোমায় খুব ভালবাসতেন।'

বড়-বৌ উচ্ছ্বসিত নিঃশ্বাসটা চাপিয়া ফেলিয়া বলিল, 'কবে? মনে পড়ে না।'

'জানিনে মানুষের মন, এমন বৌকে কি করে হেলা করেন, তিনিই বলতে পারেন; সেই কবে কি হয়ে গেছে তা আজও ভুললেন না! আর এমন নির্জ্জলা মিথ্যা,—তোমারও দোষ আছে দিদি। অত নরম হয়ে থাকলে চলে কি? একটু শক্ত হও, তা নয়, যেন নতুন বৌ।'

'কি করব ভাই! এদের অসাধ্য কিছু নেই। কিছু বলিনে তাই দিনের মধ্যে কতবার তাড়িয়ে দিচ্ছেন। আমার তো কেউ কোথাও নাই বোন, গিয়ে দাঁড়াব কোথায়?'

[৪]

বাজনাদি সহ উঠে হুলুধ্বনি

সুখেনের বিবাহে দেশশুদ্ধ অবাক হইয়া গেল। বর-

যাত্রী আত্মীয়, অনাত্মীয় অনেকেই গিয়াছিলেন। বিয়ের দিন সকালে আশীর্ব্বাদের সময়ে মেয়ে দেখিয়া কাহারও মুখে কথা সরিল না। মেয়ের নাম শ্রীপঞ্চমী, সরস্বতী পূজার দিন জন্ম—তাই এই নাম। নামে পঞ্চমী—কিন্তু পূর্ণিমার মত রূপ-জ্যোৎস্নাময়ী। এক বিধাতা সম্বল। —বংশ অতিশয় সম্ভ্রান্ত।—নিতান্ত শিশুকালে মাতৃ-হীনা, বছর পাঁচেকের সময় বাপকেও হারাইয়াছে। সংসার ছেলে-পিলে হয় নাই। তিনিই মানুষ করিয়া-ছেন। বাপ ভাল চাকরী করিতেন—লাইফ-ইনসিওরের কতকগুলি টাকা পাওয়া গিয়াছিল,—সংমা তা মেয়ের বিবাহের জন্য পুঁজি করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই টাকা ও মেয়েটিকে বিশালের হাতে সঁপিয়া দিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, 'বাবা, তোমার কথা শুনেই মেয়েটাকে তোমার হাতে দিলাম, তোমারই মেয়ে মনে ক'রো। আমি গয়না-গাঁটি কিছুই দিতে পারি নি, ঐ থেকে কিছু দিয়ে খান কয়েক গয়না তৈরি করে দিও,—আর যা থাকে তা দিয়ে ওর নামে জমা-জমি করে দিও।'

বিশাল বলিল, 'আপনি নিঃসম্বল হচ্ছেন কেন? এর অর্দ্ধেক আপনি রাখুন, আমি যত দিন বেঁচে থাকব, আপনার মেয়ের কোন কষ্ট হবে না।'

'না ওর পৈতৃক ধন ওরই থাক্। তুমি আমায় যে ভরসা দিলে, সেই যথেষ্ট। আমি কে? ওরই সব। বাড়ীখানা আটকে রাখছি, সেই দুঃখ, আমি যদি এ ঘরে না আসতাম, আজই বাড়ীখানা ও পেত—'

অনেকে অনেক বুঝাইল, অনেক বাধা দিল, কিন্তু তিনি অটল, 'আপনারা ও কথা বলবেন না, ওর জিনিস ওকে বুঝিয়ে দিয়ে আমি ঋণ-মুক্ত হই, তার পরে আমি একা, আপনারা পাঁচজন দয়া করবেন।'

অনাত্মীয় বরযাত্রীরা গোপনে দেখা করিয়া তাঁহাকে বলিল, 'এ আপনি করলেন কি? এমন মেয়ে আপনার, আর এত টাকা পয়সা দিয়ে কি দেখে এই ঘরে দিচ্ছেন? আমরা পাড়াপড়শী, সব জানি, এ ঘরে কোন মতে আপ-নার মেয়ের বিয়ে হওয়া উচিত নয়। শাশুড়ীর যা যন্ত্রণা, আপনি ভাবতেও পারবেন না। তা ছাড়া কি বংশ, কি অবস্থা, কি ছেলে, কত অযোগ্য আপনার মেয়ের—'

'—ভাগ্য—কপালের লেখা। যেখানে লেখা আছে হবেই। আমি কত জনের হাত পা ধরেছি, একটাও তো ভাল পেলাম না, আমাদের কথা কে কাণে তোলে? এদিকে মেয়ে বড় হয়ে উঠল, দিন রাত ভয়ে মরি। ওর কপাল ভালই যদি হবে, তবে এমন অনাথ হবে কেন? আপনারা পাঁচজন দেখবেন। বিশালের কথা শুনেছি, সে না কি বড্ড ভাল ছেলে, আমার কোন ভয় নেই আর শাশুড়ীর কথা? ও সব ঘরেই আছে, বৌ মানিয়ে থাকলে সব মিটে যায়। শুনলাম ওদের ভায়ে ভায়ে খুব মিল, শ্বশুর-শাশুড়ী আছেন, বড় দুটি যা ঘরে, ছোট বৌ হয়ে সুখে থাক্‌বে। সব কাজ জানে আমার মেয়ে, ওকে ওঁরা ভালবাসবেনই। রাগ কাকে বলে মেয়ে জানে না।'

শ্রোতারা মাথা নাড়িয়া মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল, 'ভায়ে ভায়ে মিল সত্যই আছে, কিন্তু—'

এইরূপে বিধি-নির্ব্বন্ধবশে শ্রীপঞ্চমী দেবীর মত রূপ ও ধন-সম্ভার লইয়া বিশ্বাসদের ঘরে আসিল। পাড়ায় পাড়ায় বিস্ময়ের ঢেউ বহিতে লাগিল। ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো—কথাটা এত বড় সত্য? অট্টা-লিকায়, প্রাসাদে চাঁদের প্রবেশ-পথ নাই, তাই বুঝি ছিদ্রময় চালাঘরে শত ধারায় জ্যোৎস্না ঢালিয়া দেয়?

বিবাহে সাধ্যমত আয়োজন করা হইয়াছে, ছোট ছেলের বিয়ে, তায় অতগুলি টাকা পাওয়া গেল। বিশাল সে টাকার কিছুই খরচ করে নাই, নিজ হইতে আর কিছু ঋণ করিয়া বিবাহের খরচ চালাইল।

মুড়ি ভাজা, চিড়ে কোটা, ক্ষীরের সন্দেশ তৈরি করা, মুড়কী করা, বাড়ী ঘর লেপিয়া মুছিয়া, কাপড় চোপড় ক্ষারে সিদ্ধ করিয়া ফিট ফাট করা হইল। নূতন কুটুম ও বাহিরের লোক জন আসা যাওয়া করিবে, অতএব বাড়ীতে ঢেঁকির শব্দ হওয়া অবিধেয়। বিবাহের সমস্ত চাল, তিন চার রকম ডাল, হলুদ মশলার গুঁড়া বাড়ীতেই তৈরি হইল। বিয়ের সাতদিন আগে হইতে বিয়ের পরের একুশ দিন পর্য্যন্ত বিয়ে-বাড়ীর যে চাল ডাল লাগিবে—তাও তৈরি করিয়া রাখা হইয়াছে। এই একমাস বড়বৌ রাত্রে ঘুমায় নাই। দিনে ষষ্ঠী মেয়েদের মত বাঁধ-ভাঙা

শুইয়া একটু ঘুমাইয়া লয়। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে বিশালের পানের ডিবাটি ভরিয়া পান সাজিয়া রাখিয়া নিজের জন্য দুটি লইয়া ঘরের দরজা ভেজাইয়া রাখিয়া নিঃশব্দে প্রদীপটি হাতে ঢেঁকি-শালায় গিয়া ঢুকিত। সমস্ত রাত্রি পাড়ার লোক ঢেঁকির পাড়ের শব্দ শোনে, অবিশ্রাম চলিয়াছে, শুনিতে শুনিতে লোকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—শব্দের বিরাম নাই। উষাকালে সে শব্দ থামিয়াছে। কে এমন করিয়া নিঃশব্দ রাত্রির অন্ধকারে বিরামহীন শব্দকারিণী? বিশ্বাসদের বড়বৌ না হইলে আর কে!

তবে সব বাড়ীতেই প্রায় এই নিয়ম। বড়বৌয়ের মত পরিশ্রম অনেকেই করে, কিন্তু এমন নিঃশব্দ ভাবে এবং নয়—সংসারের যা-ননদ-শাশুড়ীর সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া করে, কাজের কষ্ট গায়ে লাগে না। এইটুকু তফাৎ। বড়বৌয়ের কারও সঙ্গে কথা বলিবার যো নাই। আর এ বাড়ীর ধরণে-ধারণে, অকথা কুকথার ভয়ে সাধ্য পক্ষে দূরে দূরেই থাকে। সকলের বাড়ীতেই পূজা-পার্ব্বণ, ক্রিয়া-কর্ম্ম আছে—যাদের সংসারে কাজের লোক বেশী নাই—তারা পাড়া-পড়সীর সাহায্য লয়—আবার নিজেরা পাড়া-পড়সীর সাহায্য করে।

এইরূপে খাটিয়া বড়বৌ জিনিস-পত্রে বাড়ী-ঘর গুছাইয়া তুলিল। সমস্ত কাজের মধ্যেই ভাবে—এবার সে একটা সাথী পাইবে।

তাই যখন সুখেন শ্রীপঞ্চমীকে লইয়া বাড়ীতে পা দিল, তখন অবাক্ হতবুদ্ধি হইয়া গিয়া কিছুক্ষণ সকলেই যেন নিশ্চেষ্ট রহিল। বড়বৌ, মেজবৌ মনের মধ্যে একটা ধাক্কা খাইয়া সজাগ হইল, এই যে সোনার প্রতিমা, এ কি এ সংসারে সুখী হইবে?

বিবাহের গোলমাল না মেটা পর্য্যন্ত বড়বৌ ছোটবৌয়ের দিকে মন দিতে পারে নাই—কাজের ঠেলায়। এখন দুই যায়ে ছোটবৌকে ঘিরিয়া ধরিল। নিজের সমস্ত দুঃখ অভিমান ভুলিয়া বড়বৌ ভাবিল—এবার সে একটু সুখের মুখ দেখিবে—এই সোনার পুতুল মেয়েটি সব সময় তারই মুখাপেক্ষী—দিদি-দিদি বলিয়া পিছন পিছন ঘুরিবে, দু'একটা হাল্কা ফরমাস করিয়া দিবে—একটু নিঃশ্বাস লইবার অবসর মিলিল বোধ হয়। আর, মেজবৌ ভাবিল—এখন হইতে তিন যায়ে এখানেই থাকিবে, বাপের বাড়ী বেশী যাইবে না। আর, এখন বয়স হইয়াছে —এখানে থাকাই ভাল, না হইলে একা একা দিদির প্রাণ যাওয়ার উপক্রম হয়।

[৫]

ফিরাইতে নিয়তির গতি
নাহি সাধ্য মানবের।

দুপুর বেলা রান্নাঘরের বারান্দায় কর্ত্তা ও তিন ছেলে খাইতে বসিয়াছেন—দিনের বেলা তিনি মাঝে মাঝে রান্না-ঘরের বারান্দায় খান। গিন্নী অদূরে নাতিকে দুধ খাওয়াইতে ব্যস্ত—আড়ে আড়ে এ দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন—পাছে কর্ত্তা ভাবেন, তাঁহারই খাওয়া দেখিতে বুঝি আগ্রহ,—সেই ভয়ে; কর্ত্তা-গিন্নীতে চিরদিন অহি-নকুল সম্বন্ধ। এতদিন কর্ত্তা জ্বালাইয়া আসিয়াছেন,—এখন অক্ষম—এবার গিন্নীর পালা। ছেলেদের খাওয়া দেখা অভ্যাস,—মাঝে মাঝে কর্ত্তা আসিয়া বসিলে মুস্কিল হয়।

পরিবেশন করিতেছে বড়বৌ; মাছের ঝোলের বাটী দেওয়ার পর কর্ত্তা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন, তার পর ডাক্ দিলেন, 'বলি বড় বৌ—'

বড় বৌ ঘোমটা টানিয়া দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল।

কর্ত্তা বাটীগুলি দেখাইয়া বলিলেন, 'এ করেছ কি? এই কি তোমার বিচার?'

গিন্নী আর উদাসীন থাকিতে পারিলেন না—উল্লসিত ভাবে কাছে আসিয়া বারান্দার কিনারে বিশালের সামনে চাপিয়া বসিলেন। নিশ্চয়ই বড় বৌ কোন অনর্থ করিয়াছে —দেখুক সকলে।

'বলি খিড়কী-সদর এক করেছ?—চারু বাটীতে সমান? ইতর-বিশেষ নেই?—আমি খাই না খাই—সে আলাদা কথা—কিন্তু একাকার কেন?—অ্যাঁ—খিড়কী-সদর একাকার?'

বড় বৌ আর এক বাটী মাছ শ্বশুরের পাতের কাছে আনিয়া রাখিল।

ছেলেদের মুখে একটু চাপা হাসি দেখা দিল।

বিশাল বলিল, মা, সুখেন একটু মাছ ভালবাসে ওকে দু'এক খানা বেশী দিলে দোষ আছে কি?

সুখেন বলিল, 'না চাইলে কোন দিন না—'

মা বলিলেন, 'তবে আর দুঃখ ছিল কি রে, বড় ভাই-বৌ মার মত, তা বড়বৌয়ের হাতে দেওরদের নামে জলটুকু গলে না—তা অন্য কিছু।'

'জিনিষ-পত্র কেউ বাপের বাড়ী থেকে নিয়ে আসে না—এটুকু তুমি বুঝিয়ে দিতে পার না মা?'

কর্ত্তা মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'বড়বৌয়ের বুদ্ধি-সুদ্ধি কিছু নেই, খিড়কী-সদরের তফাৎ ও জানে না—সব একাকার—সব একাকার!'

ঝোল পাতে ঢালিয়াই আবার ডাক, 'বড়বৌ—'

বড় বৌ পরিবেশনের থালা হাতে দাঁড়াইল।

'বলি কি এ?—এ কি?—হলুদ যাবে—মরিচ যাবে—তবু ঝোলের রং সাদা হবে?—এত পরিপাটি রান্নার—তবু রান্নার চেহারা এই? দিন রাত শব্দ শুনতে পাচ্ছি—মশলা কোটা হচ্ছে—মশলা কোটা হচ্ছে—এই তার নমুনা?'

শ্যামল বলিল, 'মেজ বৌয়ের যে কোন দিন রান্নার অভ্যাস নেই, তার রান্না এর চেয়ে শত—'

মা বলিলেন, 'থাক্ রে থাক্—বৌয়ের গুণ গাইতে হবে না তোকে,—বিবি খাট থেকে নড়ে বসেন না—তিনি আবার রাঁধবেন!—যার হাতে খাইনি সে বড় রাঁধুনী—যার ঘর করিনি সে বড় ঘরণী—আমরা চাইনে, তোকে বড় রেঁধে খাওয়ায়—তার আবার গপ্প!'

সুখেন বলিল, 'দাদা তোমার লজ্জাও নেই, মা বাবা দাদার সামনে বৌয়ের কথা না বললেই নয়!'

শ্যামল বলিল, 'সত্যি বলার আবার লজ্জা কি?'

খাওয়া-দাওয়ার পরে খানিক বিশ্রাম করিয়া বিশাল আবার মাঠে যায়। দুপুরে একটা উপন্যাস পড়িতে পড়িতে একটু ঘুমাইয়া লওয়া তাহার অভ্যাস। এই সময়টা বড়-বৌ তার পায় হাত বুলাইয়া দেয়, বাতাস করে। এত দিন বিবাহের গণ্ডগোল, অবসর পায় নাই। আজ অনেক দিন পর বড়-বৌ দুপুর বেলা শোবার ঘরে ঢুকিল।

বিশাল বাঁকা চোখে চাহিয়া বলিল, 'এত দিনে মনে পড়েছে? আমি ভেবেছি তোমাকে আর পা ছুঁতে দেব না। যাও,—যেখানে ছিলে সেইখানে যাও—'

নিরুত্তরে বড় বৌ পায়ের কাছে বসিল।

'—ই'স্—হাত নয়ত' হাতুড়ি—পায়ের ছাল উঠে না গেলে বাঁচি। আচ্ছা—তোমার কি লজ্জা অপমান বোধ কিছু নেই?—একদিনও তো আমি ডাকিনে তোমায়—তবু আমার কাছে আসতে লজ্জা হয় না তোমার? না, আর কোন মতলব করেছ মনে-মনে, সত্যি করে বল দেখি?'

'তুমি ঘুমোও—বাতাস দিচ্ছি।'

'ঘুমোব? তোমার খুব সুবিধা হয়, না? গ্লাসের জলে কিছু মিশিয়ে এনেছ বুঝি,—জন্মের মত ঘুম পাড়াবে বলে?'

বড় বৌয়ের চক্ষের পাতা জলে ভিজিয়া ভারি দেখাইল, করুণ সুরে বলিল, 'তুমি আমাকে কেন ও সব কথা বল? কেন আমায় খাঁড়ার ঘা দাও?—আমি কিছুতেই তোমাকে বিশ্বাস করাতে পারলাম না! মরণটা হলে বাঁচতাম—'

বিশাল স্ত্রীর মুখের দিকে কোন দিন চাহিয়া দেখে না। বইয়ের পাতায় চোখ রাখিয়াই দাঁতে দাঁতে চাপিয়া সরোষে বলিল, 'আমরাও বাঁচতাম। তোমার হাতের জল খেতেও আমার ভয় করে। সে সব কথা মনে হলে মাথায় খুন চাপে। নাও—আর পদ-সেবা করে পতি-ভক্তি দেখাতে হবে না—একটু বাতাস দাও—ভয়ানক গরম পড়েছে। ঘুমের দফাটা সারলে—না ডাকতে কাছে আস—তোমার মত বেহায়া আর দেখিনি আমি।'

বিশালদের বাড়ীর কাছে অনেক দিন আগে একঘর গোয়ালা ছিল—সেই গোয়ালার মেয়ে বিন্দু বিশালের খেলার সাথী ছিল। এখন জায়গা-জমি কিনিয়া তাহারা গ্রামের উত্তর পাড়ায় উঠিয়া গিয়াছে। বিন্দুর স্বামী ঘর জামাই—শ্বশুরের ক্ষেত-খামার দেখে। বিন্দুদের বাড়ীর নীচে দিয়া মাঠে যাইবার পথ। বিশাল সে বাড়ীর ছেলের মত—যাতায়াতের পথে দু'একবার সেখানে যাওয়াই চাই; প্রায়ই সেখান হইতে খাইয়া আসে—মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ হয়। অন্ন চলে না—কাজেই নিমন্ত্রণটা রাত্রে হয়। অনেকে বিন্দুর নামে বিশালের নাম যোগ করিয়া অনেক রকম কাহিনী তৈরি করিয়াছে,—অনেক ছড়া বাঁধিয়াছে। কোন পক্ষই তাতে রাগ করে না—মুখ টিপিয়া একটু হাসে বড় জোর।

বিন্দু বিশালদের বাড়ী বেড়াইতে আসে। লক্ষ্মীবিলাস তেলে চুল বাঁধিয়া মস্ত বড় সিন্দুরের ফোটা দিয়া লেসপাড় কোরা সাড়ী পরিয়া দিব্য সাজগোজ করিয়া আসে বিশালের মা বিন্দুকে খুব ভালবাসেন। বিন্দু গিন্নীর মত ঘরে ঢুকিয়া কলসী হইতে জল ঢালিয়া খায়—পান সাজিয়া মুখে দেয়।—এ বাড়ীতে তার বেশ দখল। মেজ বৌ তাকে দেখিলেই মুখ বাঁকায়। বড় বৌ তার অভ্যস্ত ধীর শান্ত ভাবে আদর সমাদর করে। বয়সে সে বড় বৌয়ের চেয়ে কিছু বড়।

শ্রীপঞ্চমীকে দেখিতে আজকাল বাড়ীতে নিত্যই পাড়ার গিন্নী, বৌ, মেয়ে দল বাঁধিয়া আসে। পঞ্চমী যা-দের কথানুসারে বসিবার পিঁড়ি, মাদুর, পাটি পাতিয়া দেয় —পান, জল, তামাকপাতা পোড়ার গুঁড়া দিয়া অভ্যর্থনা করে। এত লোক তাকে দেখিতে আসে—পঞ্চমীর বালিকা-মনে তারা আমোদ হয়। ঘোমটার ফাঁকে গিন্নীরা তার হাসিমুখখানা দেখিতে চেষ্টা করেন—কাছে বসাইয়া মুখখানি ধরিয়া ধরিয়া দেখেন। বৌ-মেয়েরা তার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে—হাতের কাজ করিয়া দেয়—দেখিয়া দেখিয়া সুখেনের মা জলিয়া যান। এ তো ভাল জ্বালা হইল— নিত্য বাড়ীতে এই রকম পান, জল, পাতার গুঁড়ার শ্রাদ্ধ চলিবে না কি? পাড়াপড়সীরাও সুন্দর মুখ দেখিয়া ভুলিয়া গেল না কি?—এ যে বড়বৌয়েরও বাড়া। তার উপর গিন্নীরা বলিতেন—'ভাখ পরশ, তোর কপাল বড় ভাল—বড়বৌটি তো নামডাকের রূপসী—দেখ্ না কদ্দিন বিয়ে হয়েছে—তবু যেন নতুন বৌটি—মেজবৌ ফরসা না হোক—দিব্যি ছিরিখান—মিষ্টি চেহারাটি। আর এই যে হীরের টুক্‌রোটুকু আনলি, এর তো কথাই নেই—মা যেন লক্ষ্মী, দু'হাতে ধন-সম্পত্তি নিয়ে এসে উঠল। সবাই বলে, বিশু ছোট বোয়ের নামে যে জমি কখানা কিনলে— সে সোনাফলা জমি; এ-সব বরাতে করে বোন—বরাতে করে।'

সুখেনের মার নাম স্পর্শমণি। তা হইতে পরশমণি ও বয়োজ্যেষ্ঠাদের কাছে পরশ এবং কনিষ্ঠাদের কাছে পরশ-দিদি, পরশ-পিসি, পরশ-খুড়ী, পরশ-জ্যেঠী ইত্যাদি।

ঘরে বাইরে ছোট বৌয়ের স্তুতিবাদ শুনিয়া শুনিয়া পরশমণি কটমট করিয়া চাহিতেন—সত্যযুগ হইলে শ্রীপঞ্চমী ভস্ম হইয়া যাইত;—কলিযুগ তাই হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটায়।

বিন্দু বৌ দেখিতে আসিল একদিন। বিয়ের সময় জ্বরে বিছানায় পড়িয়াছিল বলিয়া আসিতে পারে নাই।

দুপুরবেলা বিন্দু বাড়ী ঢুকিয়া দেখে সাড়াশব্দ নাই— সব ঘরের দরজাই বন্ধ। বাড়ীর গিন্নী-বৌয়েরা গেল কোথায়? 'খুড়ীমা ও খুড়ীমা'—বলিতে বলিতে বিশালের ঘরে গেল। বিশাল বই রাখিয়া বলিল, 'তুই? আমি বলি, কে ডাকাডাকি করে?'

'আহা, আমার গলা চেন না তুমি—আজ এখনও মাঠে যাও নি যে?'

'এই যাব একটু পরে—ও বেলা অনেক বেলায় এসে-ছিলাম।'

'তাই দেখলাম—'

'দেখলি? কি করে দেখলি?'

'রান্নাঘরের জানালা দিয়ে দেখা যায় না পথ? জান না? ন্যাকামি হচ্ছে। আচ্ছা বৌ কই—একা একা শুয়ে আছ যে?'

'বৌ রাত্তেই বড় কাছে থাকে—তা দিনের বেলা—'

'বল কি? বৌ শোয় কোথা?' বিন্দু ঘরের এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দেখিল।

'শোয় এই বিছানাতেই—এক কোণে পড়ে থাকে।'

'এখনও মন বদলায় নি? না—না,—বৌ তোমার ভাল, কেন শুধু মানুষটাকে কষ্ট দাও?—ওসব ওষুধ-বিষুধ ভদ্র ঘরের মেয়ে-বৌরা বড় করে না'—

'তা হলে তোরা করিস্? নিশ্চয় তুই তোর স্বামীকে ওষুধ করেছিস্—না হলে তোর এত বশ হয়? বড়বৌ পারে নি—পারলে আমিও বশ হতাম'—

'যাও—যাও'—বিন্দু হাসিতে লাগিল। বলিল, 'এবার অনেককাল পর তোমাদের বাড়ী এলাম। একটু ঘুরে দেখিগে—কাউকে দেখতে [illegible]লাম না—বোধ হয় ঘুম দিচ্ছে, যাই ডেকে তুলিগে। [illegible] তুমি ও [illegible] যাও নি, মা বললে, রাত্তিরে খাবে। [illegible]ঠাকুর এসেছেন—তাঁর প্রসাদ পাবে, জলপান [illegible] হবে না—'

'প্রসাদ ? এঁটো পাতে খাওয়াবিনে ত ? মার নাম করে তুই নেমন্তন্ন করেছিস্ বুঝি ?'

'তোমার মত নেমকহারামকে আবার নেমন্তন্ন করতে বালাই আমার' - বিন্দু হাসিতে হাসিতে ঘরের বাহির হইল। পরশমণি চোখ মুছিতে মুছিতে ঘরের বাহির হইয়া বিন্দুকে দেখিয়া বলিলেন, 'কে, বিন্দু ? আয়, আয়, কখন এলি ? ও ছোট বৌ, বসতে দাও এসে—'

বিন্দু বিশালের ঘর হইতে নামিয়া পরশমণির কাছে গেল, 'আমায় আর বসতে দিতে হবে না—কুটুম তো নই —বলিয়া একখান পিঁড়ি টানিয়া লইয়া বসিল।—'তারপর তোমরা আছ কেমন খুড়ীমা—মেজ বৌ এখানেই আছে ? —ছোট বৌ বিয়ের পর আর যায় নি ? বিশুদা'র কাছে শুনতে পাই তোমাদের কথা—আসি আসি করেও আসতে পারিনে—দূরও কম নয়,—আজ এলাম বৌ দেখতে—'

'তা বেশ করেছিস্ - আসবি বই কি, মেজবিবি এবার এখানেই রয়েছেন—ছোটবিবিও বিয়ের পর দিনকয়েক বাপের বাড়ী থেকে এল সুখেনের সাথে,—তা ও সব সমান—সব সমান! এই দেখলি তো ডাকা-ডাকি করলাম —কেউ এল ? আমায় কে গেরাহ্যি করে মা ? তিনজনে মিলে দিন-রাত্তির ফিস্‌ফাস্ হচ্ছেই - '

'তা খুড়ী মা যায়ে যায়ে মিল যদি হয় তো ভাল কথা। তা ছোট বৌ না কি পরীর মতন দেখতে—তা হলে সুখেনদার পড়াশুনা মাথায় উঠবে যে'—বিন্দু হাসিতে লাগিল।

'পরী-ফরী জানিনে মা—তবে যা বললে সত্যি কথা— সুখেন রাত্তিরে যা নিজের ঘরে শুত—নইলে সমস্ত দিন আমার কাছে কাছে—পাছে পাছে থাকত—তোরা দেখেছিস্ তো ?—তা বিয়ে করে এসে বৌ নিয়ে একেবারে অজ্ঞান—দেখে লজ্জায় মরে যাই। বড় বৌ, মেজ বৌও ঐ দলে, সব শত্তুর আমার।—ইস্কুল থেকে এসে খাবার টাবার না খেয়ে একবার বৌয়ের মুখখানা দেখাই চাই— রান্নাঘরে, বাঁশতলায় ঘুর ঘুর করে বেড়ায়—যতক্ষণ না দেখে।—ফুটবল খেলা, তাস খেলায় এত যে ঝোঁক ছিল— সব চুলোয় গেছে, সার করেছে বউ, ছুটীর দিনে দিনে দুপুরেই বৌ নিয়ে ঘরে গন্ন!—ঘেন্নায় মরি!—মার কথ আর মনেও নেই হতভাগার। কোথা থেকে এল, সরাসর চলল পাছবাড়ীতে। মেজটাকে ছাড়িয়ে উঠল এই দু'মাসে। বিশু আমার মা বই জানে না—তাকে বল্লি—বৌ দে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে—তা বলে এখানে আছে তবু, ইস্কুলে যাচ্ছে—বৌ পাঠিয়ে দিলে শ্বশুর-বাড়ী গিয়ে যদি বসে থাকে—লেখাপড়া মাটী!—মরণ হয়েছে মা—মরণ হয়েছে, দেখে শুনে আর ভাল লাগে না।'

'তুমি ভেব না খুড়ীমা—ও সব সেরে যাবে, নতুন নতুন তাই। বিশুদাও তাই ছিল না ? এখন তো বৌয়ের মুখই দেখে না—'

'সে ঐ হতভাগীর গুণে!—নইলে কি হতো কে জানে। কত দুঃখে মানুষ-করা ছেলেরা আমার—তখন মুখ-পুড়ীরা কোথায় ছিল ? এখন উড়ে এসে জুড়ে বসছে—'

নাও তুমি মন খারাপ ক'রো না—ও সব কিছু না। খুড়ো আছেন কেমন ?'

'দিন রাত মুখ চলছেই—ঘরে বসেছেন আমার মাথা খেতে—রাত দিন বকুনি—'

'আচ্ছা, আমি বউ দেখে আসি—তারপর তোমার কাছে বসব'—বলিয়া বিন্দু উঠিল। খানিক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিল কেহ কোথাও নাই, রান্নাঘরে শিকল দেওয়া। ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'কেউ নেই খুড়ীমা—'

'তবে বুঝি জল আনতে গেছেন। দল বেঁধে না গেলে জল আনা হয় না, তুই বলিস্ কি বিন্দু—বড়বৌটাই হচ্ছে নষ্টের গোড়া—'

বিন্দু শ্যামলের ঘরের শিকল খুলিয়া বলিল, 'খুড়ীমা, তোমার মেজ বৌ বড্ড পরিপাটী—দিব্যি ফিটফাট ঘর বিছানা—

পরশমণি মুখ বাঁকাইয়া জবাব দিলেন, 'দিন রাত ঐ নিয়েই আছেন।—ঘরে আছেই বা কোন ছাই, একটা হাঁড়ি কলসী রাখতে দেয় না, বলে ঘর নোংরা হবে—এমন কথা বাপের জন্মে শুনিনি।'

'—আর কিছু না থাক্—ঝক-ঝকে বাটায় পান আছে অনেক, জলও আছে কুঁজোয়—খাবে খুড়ীমা ?'

'না বাছা, না, ও সব আকাচা কাপড়ে কেওয়া জল আমি

খাইনে। বিবিদের কি আবার নিয়ম কিছু আছে? খালি মুখোমুখি পায়রার মতন বসে থাকতে জানে—'

'তবে আমি খাই, এতখানি পথ রোদ্দুরে হেঁটে এসে বড্ড তেষ্টা পেয়েছে'—কুঁজার মুখের গ্লাসে জল ঢালিয়া খাইয়া বিন্দু পান সাজিয়া পরশমণিকে দিয়া গেল, নিজে গোটা দুই খাইয়া আর একটা হাতে করিয়া শ্যামলের বিছানায় বসিল—বিছানার বালিশের ওয়াড়ের কিনারায় রাঙা পাড়ের সূতায় কাজ করা, বিন্দু হেলিয়া পড়িয়া সেগুলি দেখিতে লাগিল।

ঘরের পিছনে রান্না-ঘরের শিকল-খোলার শব্দ হইল। পরশমণি বলিলেন, 'ঐ এলেন নাচুনীরা।'

'যাই,—দেখছি তোমার বৌয়ের কারিগরী—কেমন লতা এঁকেছে বালিশের ওয়াড়ে—'

'—তুমি কে?'

বিন্দু ফিরিয়া দেখে মেজ বৌ ঘরের মেজেয় দাঁড়াইয়া। অনেক কাল আগে বিন্দু মেজ বৌকে দেখিয়াছিল—সেই বিয়ের পর, তার পরে আর দেখে নাই। এখন লম্বা হইয়াছে, মুখের চেহারাটি খুব সুশ্রী—পরিষ্কার কালপেড়ে কাপড় পরা, আঁচলে চাবি বাঁধা, অবাক্ হইয়া বিন্দুকে দেখিতেছে।

'আমি বিন্দু,'—বিন্দু উঠিয়া বসিল।—'আমায় চেননি বুঝি?'

'বিন্দু? কোন্ বিন্দু? দেবাড়ীর মেয়ে?—বড় ঠাকুরঝি?'

'না—না মেজ বৌদি, সব ভুলে গেছ,—কত না কড়ি খেলেছি তোমার সঙ্গে—তুমি আমি এক জোড়ে বসতাম আর হারতাম—মনে নেই? তোমার বিয়ের পর?'

মেজ বৌ একটু কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, 'তখন আমি নূতন বৌ—কত মেয়ে আসত যেত, মনে হচ্ছে না।'

'ভাল রে ভাল,'—বিন্দু হাসিয়া বলিল, 'আমার নাম শোন নি? সুখেন দার বিয়ের সব দই বাবা যোগান দিলে না? শ্রীদাম ঘোষ—উত্তরপাড়ার?—'

'তুমি? তুমি উত্তর-পাড়ার বিন্দু? তাই বল'—বলিতে বলিতে মেজ বৌয়ের মুখ কঠোর হইয়া উঠিল, রুক্ষ সুরে বলিল, 'তুমি এ ঘরে কেন?'

মেজ বৌয়ের মুখের ভাব ও ধরণ দেখিয়া বিন্দু একটু অপ্রস্তুত হইল। মেজ বৌ তীব্র চক্ষে চাহিয়া বলিল, 'পান খাওয়া হয়েছে—জল খাওয়া হয়েছে দেখছি—আমার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা কেন? কি মতলবে? তোমায় চিনি নে—তুমি আমার বিছানায় শুয়েছ কি বলে? সাহস ত কম নয়!'

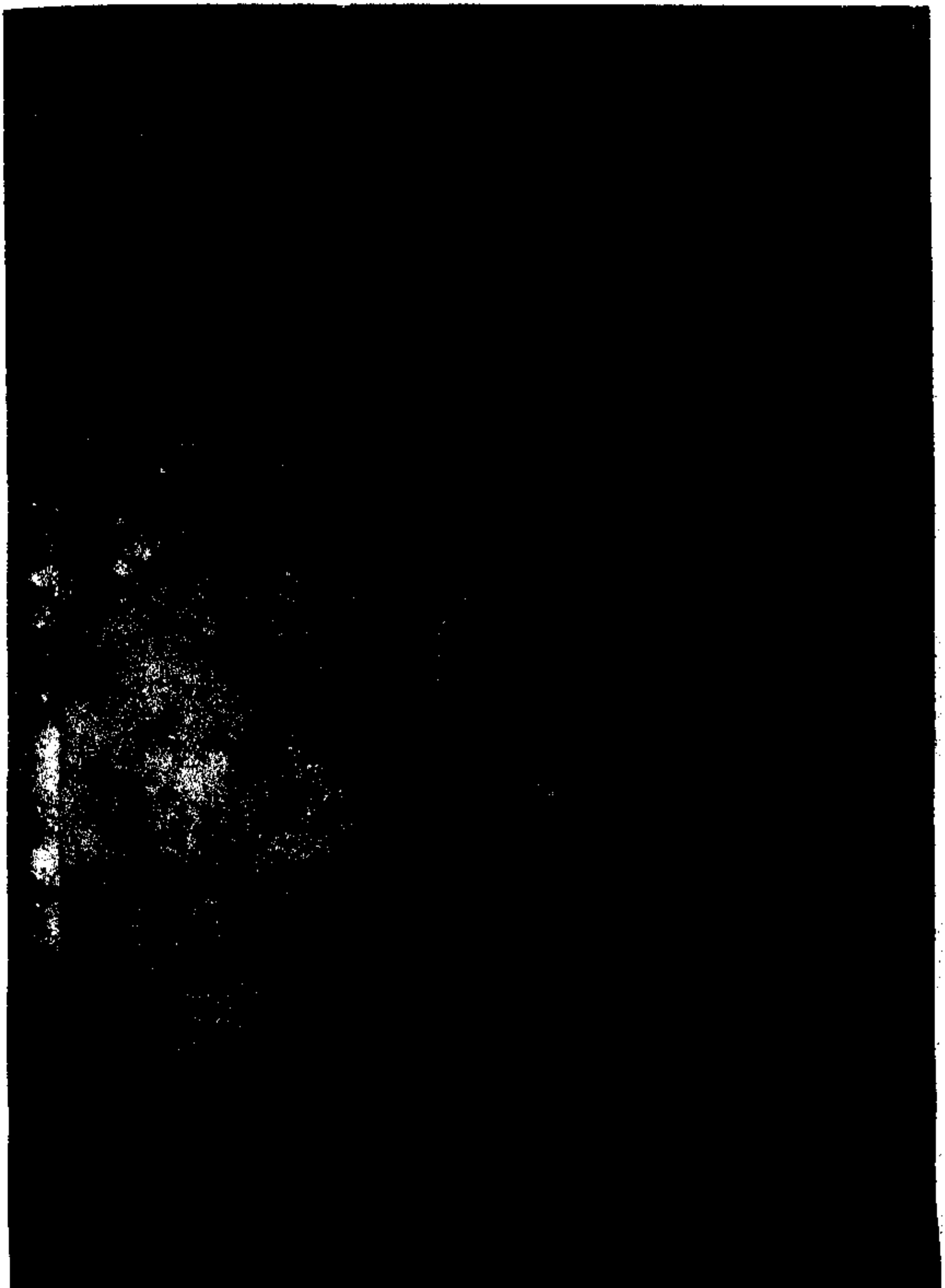
এবার বিন্দুরও রাগ হইল, সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'তুমি না বড্ড লেখাপড়া জান?—পণ্ডিত মানুষ, অতিথিকে বুঝি এই রকম আদর কর? আমি কি নতুন মানুষ? এ বাড়ীর মেয়ের মতন, শিশু-দা, শ্যামল-দা, সুখেন দা'র সঙ্গে ছেলেবেলা এই বাড়ীতেই মানুষ হয়েছি।'

'জানি, জানি, সব জানি। দিদির মাথাটি তো চিবিয়ে খেয়েছ—এবার কি আমার পালা?'—মেজবৌয়ের চোখ দুটি জ্বলিতে লাগিল।

বিন্দু অন্ধকার মুখে বাহির হইয়া গিয়া পরশমণির কাছে ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল। পরশমণির ঘর পাশাপাশি, তিনি সবই শুনিয়াছেন। মেজ বৌ আস্তে কথা বলে নাই।

বলিলেন, 'কেন মরতে গেছলি ও ঘরে?' মুখের কথা মুখেই রহিল—মেজ বৌয়ের ঘর হইতে জলের কুঁজাটা ধড়াস করিয়া উঠানে আসিয়া পড়িয়া খান খান হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল,—তার পিছনে জলের গেলাস ঠন্ করিয়া পড়িয়া গড়াইতে গড়াইতে উঠানের ওদিকে চলিয়া গেল। ঝনঝন করিয়া পানের বাটা, ডাবর, যাঁতি, চুণের হাঁড়ি, মশলার কৌটা সব আসিয়া পরশমণি ও বিন্দুর সামনে উঠানে পড়িতে লাগিল। তারপরে বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, গায়ের কাঁথা, পাখা সব একটা একটা করিয়া শূন্যপথে আসিয়া কতক পৈঠার উপর কতক বা উঠানে পড়িল। সব শেষে মেজ-বৌ নিজে বাহির হইয়া ঝনাৎ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া এলো চুলে রণরঙ্গিণী বেশে একবার পরশমণি ও বিন্দুর দিকে সরোষে চাহিয়া দেখিয়া মেঘভার মুখে বারান্দা হইতে নামিয়া খিড়-দুয়ারের দিকে চলিয়া গেল।

পরশমণি চাহিয়া চাহিয়া সবই দেখিলেন, কিন্তু একটা কথাও বলিলেন না। আর, বিন্দু যেন মাটিতে মিশাইয়া গেল। [ক্রমশঃ



প্রথম দিনের অধিবেশনের পর বিজ্ঞান-কংগ্রেস ১৩টি বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হইয়া যায় এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের বেকার ল্যাবরেটরী, আশুতোষ বিল্ডিং, সেনেট হল, স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন, অল্ ইণ্ডিয়া ইনস্টিটুটে অব হাইজিন এণ্ড পাবলিক হেল্‌থ, বিজ্ঞান কলেজ, এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উদ্ভিদ-বিজ্ঞান বিভাগ প্রভৃতি স্থানে এই সকল শাখার অধিবেশন হয়। সমস্ত বিজ্ঞান-কংগ্রেসে ৮৫০-এর অধিক মৌলিক প্রবন্ধ পঠিত হয়। বিভিন্ন শাখার সভাপতির অভিভাষণ ছাড়া বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের দ্বারা কয়েকটি বক্তৃতা প্রদত্ত হয় এবং বিভিন্ন শাখার একক বা মিলিত ভাবে ৩২টি আলোচনা-বৈঠক বসে। ইহা ছাড়া বিজ্ঞান-কংগ্রেস কয়েকটি সাধারণ-বোধ্য বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। এই



লর্ড রাদারফোর্ড

প্রথমে নির্বাচিত মূল সভাপতি

বক্তৃতাগুলি সমস্তই বিশিষ্ট বিদেশী বৈজ্ঞানিকগণ প্রদান করেন। ইহার মধ্যে একটি বক্তৃতা রাদারফোর্ডের স্মৃতি হিসাবে দেওয়া হয় (রাদারফোর্ড মেমোরিয়াল লেকচার)। এই বক্তৃতাটি দেন আইসোটোপের আবিষ্কর্তা, নোবেল-পুরস্কার-প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক অ্যাস্টন।



স্যর জেম্‌স হপউড জীন্স

মূল সভাপতি

এই সকল ও অন্যান্য কয়েকটি বক্তৃতার তারিখ, বিষয় ও বক্তার নামের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

৩রা জানুয়ারী	অধ্যাপক এচ. জে. ফ্লুর, এফ. আর. এস. (ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল-অধ্যাপক) —জাতি সম্বন্ধে য়ুরোপীয় ধারণা।
৪ঠা জানুয়ারী	ডক্টর এফ্. ডব্লিউ. অ্যাস্টন (ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরী) —পরমাণু ও আইসোটোপ।
	স্যর আর্থার এডিংটন্ (ক্যাম্ব্রিজের জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপক)—মানমন্দির।
	স্যর আর্থার হিল (ডিরেক্টর, কিউ গার্ডেন) —কিউ গার্ডেন।

৩ই জানুয়ারী অধ্যাপক আর্নেষ্ট বার্কার (কাম্ব্রিজ)
—আধুনিক রাজনীতির উপর গ্রীক প্রভাব।

স্তর জেম্‌স্ জীন্‌স্
—নীহারিকা।

অধ্যাপক সি. ই. স্পিয়ারম্যান।
—বুদ্ধিবৃত্তি

স্তর আর্থার হিল
—বৃক্ষবীজের কথা।

৪ই জানুয়ারী ডক্টর সি. এস. মায়ার্স (লণ্ডন)
—বৃত্তিগত মনস্তত্ত্ব



ডাঃ সি. ডব্লিউ. বি. নরম্যাণ্ড
পদার্থবিজ্ঞান ও গণিত-শাখার সভাপতি

স্তর জেম্‌স্ জীন্‌স্
—সৌরজগতের উৎপত্তি।

ডক্টর এফ. ডব্লিউ. অ্যাসটন
—আইসোটোপের পৃথকীকরণ।

অধ্যাপক সি. জি. ডারুইন, (কাম্ব্রিজ)
—অনিশ্চিতবাদ।

৭ই জানুয়ারী স্তর আর্থার এডিংটন
—ছায়াপথ ও তারকা।

ডক্টর আর্নেষ্ট বার্কার
—ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের ধারা।

৮ই জানুয়ারী অধ্যাপক জে. এচ. হুটন
—ভারতের প্রাক্-বৈদিক সভ্যতা।

৮ই জানুয়ারী অধ্যাপক এফ. এ. ই. ক্রু
—মৃত্যুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।

৯ই জানুয়ারী ভাইকাউণ্ট স্তামুয়েল
—দর্শনের ভিত্তিস্বরূপ বিজ্ঞান।

স্তর আর্থার এডিংটন
—স্টেলার স্পেক্ট্রস্কোপি।

১০ই জানুয়ারী অধ্যাপক জে. ই. লেনার্ড-জোন্স
—অন্তর-পরমাণবিক বলের নূতন মতবাদ

পদার্থবিজ্ঞান ও গণিত

সরকারী আবহ-বিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষ, ডিরেক্টর জেনারল অব অবজারভেটরীজ সি. ডব্লিউ. বি. নরম্যাণ্ড, এম. এ., ডি. এস-সি., এফ. এন. আই., এই শাখার সভাপতিত্ব করেন। তাঁহার অভিভাষণে ঝটিকার শক্তি সম্বন্ধীয় থার্মোডাইনামিক্স-সম্মত আলোচনা করা হয়। ঝটিকার শক্তির উৎস কোথায় এবং কিরূপে বিভিন্ন স্তরের বাতাসের মধ্যে বৈষম্যহেতু ঝটিকার উৎপত্তি হয়, তিনি তাহার আলোচনা করেন।

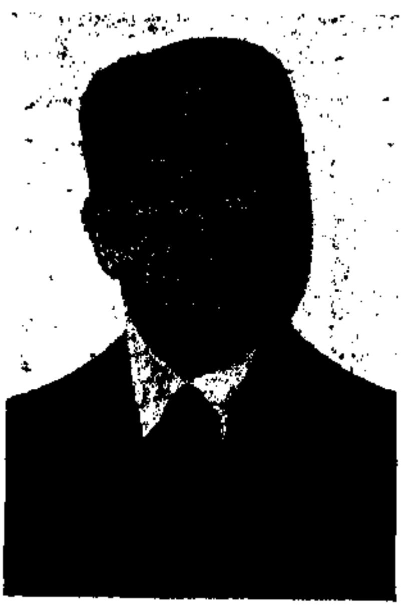
এই শাখায় যে সকল প্রবন্ধ পঠিত হয়, সেগুলিকে মোটা-মুটি ছয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়; (ক) জড়ের রূপান্তর ও গঠন, (খ) আপেক্ষিক-তত্ত্ব, অ্যাষ্ট্রোফিজিক্স, স্পেক্ট্রস্কোপী ইত্যাদি, (গ) জিওফিজিক্স, (ঘ) বৈদ্যুতিক তরঙ্গ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়, (ঙ) সাধারণ ও ব্যাবহারিক পদার্থবিজ্ঞান, এবং (চ) বিশুদ্ধ গণিত ও সংখ্যাগণিত। এই শ্রেণীগুলিতে যথাক্রমে ১৩টি, ২১টি, ১৭টি, ১৩টি ও ২৫টি প্রবন্ধ পঠিত হয়। ইহাদের মধ্যে এডিংটন (Scattering of protons by protons) অ্যাসটন, কোঠারী, ষ্ট্রাটন, সাহা, মুলেমন (আপেক্ষিক-তত্ত্বের নূতন মতবাদ) প্রভৃতির প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। প্রবন্ধ ব্যতীত কয়েকটি বক্তৃতাও এই শাখায় প্রদত্ত হয়। ইহাদের মধ্যে নক্ষত্রের আভ্যন্তরীণ শক্তি সম্বন্ধে অ্যাটকিনের, গ্রহাণুদের কক্ষবিচ্যুতি সম্বন্ধে ষ্ট্রাটনের এবং অনিশ্চিতবাদ সম্বন্ধে ডারুইনের বক্তৃতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রসায়ন

এই শাখায় সভাপতিত্ব করেন লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক শান্তিস্বরূপ ভাটনগর ও. বি. ই., ডি. এস-সি., এফ. ইনস্‌ট্. পি., এফ-এন. আই.। ইহাঁর অভিভাষণের

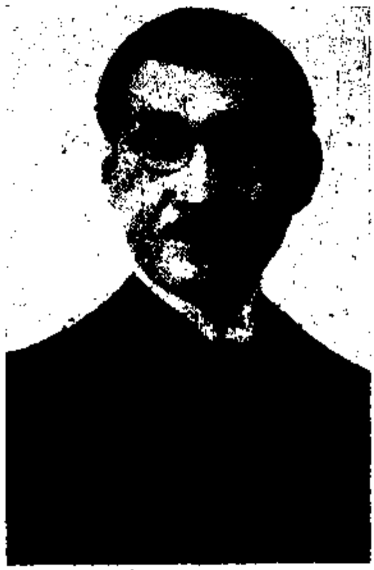
বিষয় ছিল রসায়নের সহিত সংশ্লিষ্ট চুম্বকতত্ত্বের আলোচনা। চুম্বকতত্ত্ব সম্বন্ধে ইনি একজন বিশেষজ্ঞ এবং লাহোর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এই বিষয়ে বিস্তৃত গবেষণা চলিতেছে। তাঁহার অভিভাষণে চুম্বকতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত এবং সম্পূর্ণ আলোচনা পাওয়া যায়।

রসায়ন শাখায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক, দুই শতেরও অধিক, মৌলিক প্রবন্ধ পঠিত হয়। ইহাদের মধ্যে অজৈব রসায়ন সম্বন্ধে মাত্র ১৬টি, আকৃতিক রসায়ন (ফিজিক্যাল কেমিষ্ট্রি) সম্বন্ধে ৪০টি, জৈব ও প্রাণী-রসায়ন (বাইয়ো-কেমিষ্ট্রি) সম্বন্ধে ১২৫টি এবং রসায়ন শিল্প সম্বন্ধে ২৪টি প্রবন্ধ পঠিত হয়। অজৈব রসায়নে গবেষণার ক্ষেত্র অনেক পরিমাণে সঙ্কীর্ণ; অধ্যাপক পঞ্চানন নিয়োগী গ্যালিয়াম ধাতুর কয়েকটি নূতন যৌগিক তৈয়ারী করিতে সক্ষম হইয়াছেন। জৈব ও বাইয়ো-কেমিষ্ট্রি বিভাগে বহু নূতন ঔষধ এবং নূতন রাসায়নিক তৈয়ারী করিবার চেষ্টা দেখা যায়। জৈব বিভাগে বাঙ্গালোরের জৈব রসায়নের অধ্যাপক পি. সি. গুহের নাম সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বাইয়ো-কেমিষ্ট্রি বিভাগে ভিটামিন সম্বন্ধে



অধ্যাপক শান্তিস্বরূপ ভাটনগর
রসায়ন-শাখার সভাপতি

গবেষণার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় খাদ্যসামগ্রীর গুণ সম্বন্ধে আলোচনাও দেখিতে পাওয়া যায়। রসায়ন-শিল্প, বিষয়ে ভারতীয় কাঁচা মালের উত্তরোত্তর ব্যবহার ও তাহাদের ধর্ম্ম আলোচনার আভাস পাওয়া যায়।



ডক্টর ডি. এন. ওয়াডিয়া
ভূতত্ত্ব শাখার সভাপতি

এই শাখায় অধ্যাপক লেনার্ড-জোন্স (Resonance and Molecular Structure)-এ অধ্যাপক বেলী দুইটি উল্লেখযোগ্য বক্তৃতা দেন।

ভূতত্ত্ব

পূর্ব্বে ভূতত্ত্ব ও ভূগোল একই শাখার অন্তর্গত হইত, কিন্তু এই বৎসর এই শাখাটিকে ভাঙ্গিয়া দুইটি শাখা করা হয়:— (১) ভূতত্ত্ব, (২) ভূগোল ও ভূমিতি। ভূতত্ত্ব শাখায় সভাপতিত্ব করেন—জিওলজিক্যাল সারভে অব ইণ্ডিয়ার ভূতত্ত্ববিদ ডি. এন. ওয়াডিয়া, এম. এ., এফ জি. এস., এফ. আর. জি. এস., এফ এন. আই., এফ. আর. এ. এস. বি.। তিনি তাঁহার অভিভাষণে হিমালয় পর্ব্বতের গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

এই শাখায় মোট ৪০টি প্রবন্ধ পঠিত হয়। Discrepancy between testimony of plant and animal fossils সম্বন্ধীয় আলোচনায় অনেকে যোগদান করেন।

ভূগোল ও ভূমিতি

জিওলজিক্যাল সারভে অব ইণ্ডিয়ার ডিরেক্টর এ. এম. হিরণ, ডি. এস-সি., এফ. আর. জি. এস., এফ. এন. আই., এফ. আর. এ. এস. বি. এই শাখার সভাপতিত্ব করেন।

এই শাখায় ২১টি প্রবন্ধ পঠিত হয়। পূর্ব্বে ভূগোল যেরূপ ভাবে পঠিত হইত, তাহা অত্যন্ত বিরক্তিকর, কিন্তু বর্ত্তমানে ভূগোল পঠন-পাঠনের ধারা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। ভূগোল কেবলমাত্র পৃথিবীর বহিরাবরণের পরিচয় নহে, ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে মনুষ্যের পরিবেশ সম্বন্ধীয় আলোচনা। এই হিসাবে ভূগোলের সহিত নৃতত্ত্বের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। ভূগোল শাখায় পঠিত প্রবন্ধগুলি হইতে ভূগোলের এই নূতন ও স্বাভাবিক রূপ খুব স্পষ্ট হইয়া উঠে। ইংরাজীতে যাহাকে *regional geography* (স্থানীয় ভূগোল) বলে, আমাদের দেশের অনেক ভূগোল-শিক্ষকও সে বিষয়ে



ডক্টর এ. এম. হিরণ
ভূগোল ও ভূবিজ্ঞান-শাখার সভাপতি

বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন না। এ দিক্ দিয়া ভারতবর্ষে অনেক কিছু করিবার বাকী রহিয়াছে। ভূগোলের সহিত মানুষের যোগসূত্র এই শাখায় পঠিত ম্যানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোলের অধ্যাপক ফ্লুরের প্রবন্ধে (Geography and Scientific Movement) বিশেষভাবে দেখান হইয়াছে। স্থানীয় ভূগোল সম্বন্ধে এডিনবরার অধ্যাপক অগিলভির প্রবন্ধও উল্লেখযোগ্য।

উদ্ভিদ-বিজ্ঞান

লক্ষ্ণৌ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক বীরবল সাহ্‌নী-এস. সি-ডি., এফ.আর.এস., এই শাখায় সভাপতিত্ব করেন। অধ্যাপক সাহ্‌নী প্যালিওবোটানী অর্থাৎ প্রাচীন কালের উদ্ভিদ্ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানের একজন বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ। এই বিষয়ে তাঁহার পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি আছে। তিনি তাঁহার অভিভাষণে এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন।

উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান শাখায় মোট ৪২টি প্রবন্ধ পঠিত হয়। এই শাখাটি কয়েকটি উপশাখায় বিভক্ত হয়,—(ক) ক্রিপ্টোগ্যাম—সভাপতি, অধ্যাপক আয়েঙ্গার, (খ) ফ্যানেরোগ্যাম ও ট্যাক্সোনমী - সভাপতি অধ্যাপক আঘরকর, (গ) জেনেটিক্স ও সাইটোলজী—সভাপতি ডক্টর মিস্ জানকী আম্মল, (ঘ) ফিজিওলজী ও ইকোলজী—সভাপতি অধ্যাপক পারিজা এবং (ঙ) প্যালিওবোট্যানী—সভাপতি অধ্যাপক বীরবল সাহ্‌নী। শেষোক্ত উপশাখায় যে কয়টি প্রবন্ধ পঠিত হয়, তাহা সমস্তই অধ্যাপক সাহ্‌নীর ছাত্র-ছাত্রীদের লিখিত। ইহাতে বুঝা যায় যে, এ সম্বন্ধে ভারতের অন্য স্থানে বিশেষ কিছু কাজ হইতেছে না। ফ্রিট্শ, ডার্লিংটন, রাগল্‌স্-গেটস, বুলার প্রভৃতির প্রবন্ধগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রাণিতত্ত্ব

লাহোর গবর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যাপক জি. মাথাই, এম. এ., এস-সি.ডি., এফ.এল.এস., এফ.আর.এস.ই., এফ.এন আই., আই.ই.এস., এই শাখার সভাপতিত্ব করেন। ইঁহার অভিভাষণের বিষয় ছিল ভারতে প্রাণিতত্ত্বের প্রসার। ভারতবর্ষের পক্ষে প্রাণিতত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রাণিতত্ত্ব শিক্ষার কিরূপে প্রসার করা যাইতে পারে, তিনি তাহার আলোচনা করেন। এই শাখায় ৫২টি প্রবন্ধ পঠিত হয়। ভারতের প্রাণিসমূহের সম্পূর্ণ বিবরণ এখনও অনেকাংশে অজ্ঞাত, কিন্তু সে বিষয়ে যে বহুমুখী কাজ চলিতেছে, তাহার পরিচয় এই প্রবন্ধগুলিতে পাওয়া যায়। প্রাণিতত্ত্বের আলোচনা কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্তও কেবলমাত্র সরকারী বিভাগ—জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ায়—নিবদ্ধ ছিল, কিন্তু এখন তাহা ক্রমশঃ বিভিন্ন বিদ্যাকেন্দ্রে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহার নিদর্শন এইগুলি হইতে পাওয়া যায়।

কীটতত্ত্ব

কীটতত্ত্ব বা এণ্টোমলজী শাখায় সভাপতিত্ব করেন পাঞ্জাব লায়ালপুর কৃষি কলেজের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আফজল হুসেন

এম.এ, এম.এস.সি., এফ.এন.আই., আই.ই.এস.। তাঁহার অভিভাষণের বিষয় ছিল—ভারতে কীটতত্ত্বের অতীত, বর্ত্তমান, ও ভবিষ্যৎ। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে কীটতত্ত্বের আলোচনার



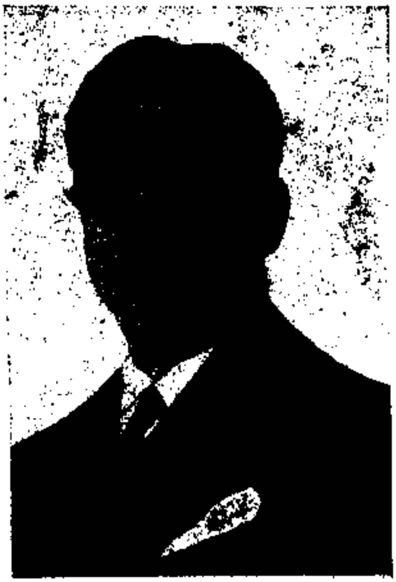
অধ্যাপক বীরবল সাহ্‌নী
উদ্ভিদ-বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি

বিশেষ সুযোগ বা সুবিধা নাই, কিন্তু প্রাচীন কাল হইতেই কীট সম্বন্ধে অনেক তথ্য ভারতবাসীরা জানিত। কীটতত্ত্ব ভাল করিয়া আলোচনা করিলে বহু ক্ষতিকর কীটের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। বহু ফসল কীটের অত্যাচারে নষ্ট হইয়া যায়। সভাপতির মতে, ভারতে বাৎসরিক প্রায় ২০০ ক্রোর টাকার সম্পত্তি এবং প্রায় দেড় লক্ষ লোকের জীবন কীটেরা নষ্ট করিয়া ফেলে। ভারতে প্রায় ২৫ লক্ষ জাতের কীট আছে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে আজ পর্য্যন্ত প্রায় ৮০ হাজার জাতের কীট সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে মাত্র, অর্থাৎ যে সকল কীট-পতঙ্গের আলোচনা করা হইয়াছে তাহার ৩০ গুণ কীট-পতঙ্গ সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান নাই। কৃষি ও শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে ভারতে বিশেষভাবে কীটতত্ত্ব আলোচনার প্রয়োজন আছে বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করেন। এই শাখায় ৫৭টি প্রবন্ধ পঠিত হয়।

নৃতত্ত্ব

জুলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়ার বিরজাশঙ্কর গুহ, এম. এ., পিএইচ. ডি, এফ. এন. আই., এই শাখার সভাপতিত্ব করেন। হিন্দুকুশ জাতিদের সংগঠন সম্বন্ধে তিনি তাঁহার অভিভাষণে আলোচনা করেন।

পূর্ব্বে নৃতত্ত্বের বিষয় সংকীর্ণ ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে ইহা এরূপ ভাবে প্রসার লাভ করিয়াছে যে, তাহার বহুমুখী শাখার সকলগুলির সহিত পরিচয় লাভ করা কোন একজন লোকের পক্ষে কেবল মাত্র কঠিন নহে, অসম্ভব।' এই শাখায় পঠিত ৪৪টি প্রবন্ধ হইতে এই বিষয়ের বিস্তৃতির কথাই মনে হয়। ব্রেসলাউ-এর ব্যারন ফন আইক্‌ষ্টেট 'নৃতত্ত্বের বর্ত্তমান সংকট (Crisis in Modern Anthropology)' সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন সময়ে নৃতত্ত্বের কিরূপ অর্থ করা হইয়াছিল এবং তাহার ফলে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তিনি তাহার আলোচনা করেন। নৃতত্ত্বের ক্ষেত্র বৃহৎ এবং বিস্তৃত, সুতরাং নৃতত্ত্বের দ্রুত অগ্রগতি যেরূপ সম্ভব, প্রচুর ভুল ছড়াইয়া দেওয়াও সেইরূপ সম্ভব। তাহা যাহাতে সম্ভব না হইতে পারে, সে জন্য বর্ত্তমানে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে একটি নির্দ্দিষ্ট পরিধির মধ্যে



অধ্যাপক জি. মাথাই
প্রাণিতত্ত্ব শাখার সভাপতি

নৃতত্ত্ব আবদ্ধ থাকা উচিত। রাঁচীর এস. সি. রায় অপর একটি প্রবন্ধে (A plea for a new out-look in Anthropology) বলিয়াছেন যে, ভারতীয় নৃতত্ত্ববিদ্‌রা মানসিক এবং

আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতি বিশেষ মনোযোগ না দিয়া মাংসপেশী ও শিল্প কৌশলের দিকেই অধিকতর মনোযোগ দিয়া থাকেন। আধ্যাত্মিক ও মানসিক বৃত্তিই মানুষকে পশু হইতে ভিন্ন



অধ্যাপক মোহাম্মদ আফজল হুসেন
কীটতত্ত্ব-শাখার সভাপতি

করিয়াছে, সুতরাং [illegible] শিক্ষার অঙ্গীভূত করা অন্যায়, যদিও ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান-পরিষদ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সেস তাহাই করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বেই এ কথা বলিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে আবার তাহার পুনরাবৃত্তি করিতেছেন, কারণ তাঁহার মতে এই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

কৃষি-বিজ্ঞান

সরকারী ইক্ষু-বিশারদ রাও বাহাদুর টি. এস. বেঙ্কটরমন, সি. আই. ই., বি. এ., আই. এ. এস, এফ. এন. আই., কৃষি-বিজ্ঞান শাখায় সভাপতিত্ব করেন। কোইম্বাটোরে কিরূপ ভাবে বিভিন্ন জাতীয় এবং বিভিন্ন দেশীয় ইক্ষুর সংমিশ্রণে অধুনাবিখ্যাত "কোইম্বাটোর"-ইক্ষু সৃষ্টি করা সম্ভব হইয়াছিল তিনি তাহার বিশদ আলোচনা তাঁহার অভিভাষণে করেন। ভারতের বিভিন্ন ফসলের উন্নত শ্রেণী তৈয়ারী করিবার যে চেষ্টা চলিতেছে, তাহার মধ্যে ইক্ষুই বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছে। বর্ত্তমানে যত জমিতে ইক্ষু চাষ হইতেছে, তাহার শতকরা [illegible] ভাগে এই ইক্ষু ফলান হয়। ইহার সহিত গম ১০%, তুলা ১৬% এবং ধান ৪% তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে চিনি বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয় না, তাহার কারণ এই উন্নত ইক্ষুর বহুল ব্যবহার এবং রক্ষণশুল্ক।

এই শাখায় ৫৬টি প্রবন্ধ পঠিত হয়। নূতন ফসল তৈয়ারী এবং তজ্জাতীয় বিষয়ে ১০টি প্রবন্ধ, বিভিন্ন প্রকার ফসল হইতে প্রাপ্ত দ্রব্য সম্বন্ধে ১২টি প্রবন্ধ এবং ফসল নষ্ট হওয়া ও তাহা নিবারণ সম্বন্ধে ২টি প্রবন্ধ পঠিত হয়। মাটী সম্বন্ধে ৯টি প্রবন্ধের সকলগুলিই 'বৈজ্ঞানিক' প্রবন্ধ, অর্থাৎ পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন ব্যতীত আর কিছুই নহে। জমীর সার সম্বন্ধে ৯টি প্রবন্ধ পঠিত হয়, ইহাদের মধ্যে গুড় সম্বন্ধে দুইটি এবং সবুজ পাতা সম্বন্ধে একটি। ক্যাম্‌ব্রিজের অধ্যাপক জে. এ. হেনের 'বিশ্বের কৃষি' সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য।

চিকিৎসা-বিজ্ঞান

এই শাখার সভাপতি ছিলেন স্যর উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, এম. এ., এম. ডি., পি-এচ. ডি., এফ. এন. আই., এফ. আর.



ডক্টর বিরজাশঙ্কর গুহ
নৃতত্ত্ব-শাখার সভাপতি

এ. এস. বি.। স্যর উপেন্দ্রনাথ ইউরিয়া ও এন্টিমনির একটি যৌগিক প্রস্তুত করিয়া কিরূপে কালাজ্বরের প্রকোপ নিবারণ করিয়াছেন, সেই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা তাঁহার অভিভাষণে

প্রদান করেন। এই নূতন ঔষধের জন্য আসাম ও বাংলার যে অংশে কালাজ্বরের প্রাবল্য ছিল, তাহা কিরূপে কালাজ্বরের প্রকোপ হইতে মুক্ত হইয়াছে, ইহাই তাঁহার মোট বক্তব্য ছিল।



ডক্টর টি. এস. ভেঙ্কটরমন
কৃষি বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি

মোট ৮৯টি প্রবন্ধ এই শাখায় পঠিত হয় কিন্তু আমাদের স্বদেশজাত দ্রব্যের ঔষধরূপে ব্যবহার করিবার মাত্র অল্প নিদর্শনই দেখা যায়। ভারতীয় খাদ্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে কিছু কিছু কাজের পরিচয় পাওয়া যায়। ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড ও প্লেগ প্রভৃতি রোগের ঔষধ বাহির করিবার চেষ্টা দেখা যায়। ডি.ভি. এস. রেড্ডী একটি প্রবন্ধে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এডিনবরার বিখ্যাত বায়োকেমিষ্ট ক্রু গর্ভাবস্থার অল্পকালের মধ্যেই পরীক্ষা দ্বারা গর্ভ-নিরূপণ সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

পশু-চিকিৎসা-বিজ্ঞান

এই শাখায় সভাপতি কর্ণেল স্যর আর্থার অল্ভার, কে-টি., সি. বি., সি. এম. জি., এফ-আর.সি.ভি এস., এফ.এন.আই., ভারতবর্ষে পশুচিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রসার সম্বন্ধে তাঁহার অভিভাষণে আলোচনা করেন। এই শাখায় ৫৬টি প্রবন্ধ পঠিত হয়, তাহার মধ্যে পরিপুষ্টি সম্বন্ধে ছয়টি।

শরীর-বিজ্ঞান

স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের অধ্যক্ষ ব্রেভেট-কর্ণেল আর. এন. চোপরা, সি. আই. ই., এম. এ. এম. ডি., এস-সি. ডি., এম. আর. সি. পি., এফ. এন. আই., এফ. আর. এ.এস. বি., এফ. এস. এস. এফ., আই. এম. এস., এই শাখায় সভাপতিত্ব করেন। গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে মনুষ্যের শরীরক্রিয়া তাঁহার অভিভাষণে আলোচিত হয়। ৬২টি প্রবন্ধ এই শাখায় পঠিত হয়। পূর্ব্বে শরীরবিজ্ঞান চিকিৎসা-বিজ্ঞান শাখার অন্তর্গত ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরে দুইটি পৃথক্ শাখা করা হইয়াছে। এই শাখাতেও পরিপুষ্টি সম্বন্ধীয় আলোচনা দেখা যায়। ইলিশ মাছ ও রুই মাছের পরিপুষ্টি-ক্ষমতা এবং চড়া, মুড়ি ও খইয়ের ভিটামিন পরিমাণ প্রভৃতি উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

মনোবিজ্ঞান

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক গিরীন্দ্রশেখর বসু, ডি. এস-সি., এম. বি., এফ. এন. আই.,



ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী
চিকিৎসা-বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি

এই শাখায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে দেখান যে, মানুষের মনে যুগপৎ দুইটি বিপরীতমুখী অভিলাষ থাকে। সাধারণতঃ পর্য্যায়ক্রমে এই বিপরীত বৃত্তির বিকাশ

হয়, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে একই সময়ে দুইটি বৃত্তির বিকাশ হয় এবং তখন মানুষের আচরণে বৈষম্য লক্ষিত হয়। ভালবাসা ও ঘৃণা, ঔদ্ধত্য ও আদেশানুবর্ত্তিতা প্রভৃতি বিপরীত মনোভাবের বিকাশ থাকিলে কোন লোককে *ambivalent* বলা হয়। ডক্টর বসু তাঁহার অভিভাষণে এ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন।



কর্ণেল স্যর আর্থার ওল্‌ভার,
পশু-চিকিৎসা-বিজ্ঞান-শাখার সভাপতি

বহুবিদেশের সুবিখ্যাত মনোবিজ্ঞানবিদ বৃন্দ মনোবিজ্ঞান শাখার অধিবেশনে যোগ দেন। তাঁহার ও স্পিয়ারম্যানের প্রবন্ধ এই শাখায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইয়াছিল। লণ্ডনের অধ্যাপক চার্লস আর্থারের প্রবন্ধও (Affective influence in Mental fatigue) উল্লেখযোগ্য।

আলোচনা

বিজ্ঞান-কংগ্রেসের কয়েকটি শাখার যুক্তভাবে বা একক যে সকল আলোচনা বৈঠক হয়, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য "নদী-বিজ্ঞান" বিষয়ে। এই আলোচনায় অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা সভাপতিত্ব করেন। ভারতবর্ষ নদীবহুল দেশ, সুতরাং নদনদী সম্বন্ধে সঠিক তত্ত্ব আলোচনায় বিশেষ প্রয়োজন আছে। বিশেষতঃ বাংলা দেশে বহু নদী মজিয়া গিয়াছে বা যাইতেছে এবং নদীর গতিপথ পরিবর্ত্তিত হইয়া স্বাভাবিক জলনিকাশের অসুবিধা হইতেছে। ইহার ফলে কোন স্থানে জলের অভাব এবং কোন কোন স্থানে বন্যা দেখা যায়। এই সকল নিবারণ করিবার জন্য কোন নদীর মডেল সাহায্যে কিরূপে সেই নদীর সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে, ইহা আলোচিত হয়। আলোচনায় দেখা যায় যে, এ দেশে এ সম্বন্ধে কিছুই হয় নাই বলিলেও চলে; পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যেখানে এ সম্বন্ধে কাজ হইয়াছে, সেখানে বিশেষ ভাবে ফল পাওয়া গিয়াছে। ভারতে যাহাতে নদী-বিজ্ঞানের আলোচনা ভাল করিয়া হয়, সে সম্বন্ধে দেশের লোককে সচেতন করিবার জন্য অধ্যাপক সাহা বহুদিন হইতেই চেষ্টা করিতেছেন।

রসায়ন ও ভারতের শিল্পোন্নতি, অ্যালকালয়েডের গঠন, উদ্ভিদ্-বিজ্ঞান সম্বন্ধে ভারতের জাতীয় সংগ্রহশালার প্রয়োজনীয়তা, ভারতে ভূগোল-শিক্ষা, ভারতে মৃত্তিকা-বিষয়ক গবেষণার প্রয়োজন, পরিপুষ্টি-সম্বন্ধীয় রোগ, ভারতে কীটতত্ত্ব আলোচনার প্রচার, চিকিৎসা-বিজ্ঞান কৃষি-বিজ্ঞান প্রভৃতিতে কলয়েড, পশু ও পশুরোগের সহিত মানুষের সম্বন্ধ, ক্ষতিকর কীটপতঙ্গের অত্যাচার নিবারণ, খাদ্য ও আবহাওয়ার সহিত সামঞ্জস্যবিধান প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনায় উল্লেখ করা যাইতে পারে।

পরলোকে জগদীশচন্দ্র

গিরিডিতে অবস্থান-কালে অকস্মাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গত ২৩শে নভেম্বর,(১৯৩৭) তারিখে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে এই সংবাদ আমাদের পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন। ভারতীয় বৈজ্ঞানিক সমাজে জগদীশচন্দ্র যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা পূরণ হইবে না। বিলম্ব হইলেও প্রয়োজনবোধে আমরা এখানে সংক্ষেপে তাঁহার জীবনী আলোচনা করিলাম :–

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর তারিখে ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে জগদীশচন্দ্রের জন্ম হয়। শিশুকাল হইতেই তিনি তাঁহার উদ্ভাবনী-শক্তির পরিচয় দেন। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, অধিকাংশ পিতাই শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের পথে সহায়ক না হইয়া পরিপন্থী হন, কিন্তু জগদীশচন্দ্রের সৌভাগ্য-ক্রমে তাঁহার পিতা ভগবানচন্দ্র বসু, জগদীশচন্দ্রের স্বাভাবিক

প্রবৃত্তির অনুশীলনে বিশেষ সহায়ক হন জগদীশচন্দ্রের প্রাথমিক শিক্ষা হয় গ্রামের পাঠশালায়; উত্তর জীবনে এই শিক্ষার ফল তাঁহার মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।



ডক্টর গিরীন্দ্রশেখর বসু
মনোবিজ্ঞান শাখার সভাপতি

পাঠশালার পাঠ শেষ করিয়া তিনি কলিকাতার হেয়ার স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করেন এবং সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ হইতে এফ. এ. ও বি. এ. পাশ করেন। ইহার পরে তিনি বিলাতে যান। তখনকার দিনে লোক প্রধানতঃ সিভিল সার্ভিসের আশায় বিলাত যাইত; জগদীশচন্দ্রেরও প্রথমে সেইরূপ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পিতা ভগবানচন্দ্র ইহাতে একেবারেই মত দিলেন না। অতঃপর জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞান চর্চ্চার জন্য বিলাত যাইতে চাহিলে পিতা সানন্দে সম্মতি দিলেন।

জগদীশচন্দ্র প্রথমে লণ্ডনে চিকিৎসা-বিজ্ঞান পাঠ করিতে লাগিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি ইহাতে লাগিয়া থাকিলেন না, ক্যাম্ব্রিজ ক্রাইষ্ট কলেজে ভর্ত্তি হইলেন এবং ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে "নাচারল সায়েন্স স্কলারশিপ" পাইয়া বি. এ. পাশ করিলেন। পর বৎসর তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এস. সি. উপাধি পান। ইহার পর তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন এবং বহু কষ্টে প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ পান।

প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতেই তাঁহার বৈজ্ঞানিক জীবনের সূত্রপাত হয়। প্রথমে তাঁহাকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজে তখন যন্ত্রপাতির অত্যন্ত অভাব ছিল এবং গবেষণা করিবার কোন সুযোগও ছিল না। অধিকন্ত, 'কালা চামড়া'র অপরাধে তাঁহাকে য়ুরোপীয় অধ্যাপকদের সমান বেতন দেওয়া হইত না। তিনি এই কারণে তিন বৎসর বেতন না লইয়া অধ্যাপনা করেন, পরে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের ভুল বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে পুরা বেতনই দেন। এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও জগদীশচন্দ্র অতি অল্প কালের মধ্যেই অধ্যাপনায় বিশেষ যশ অর্জ্জন করেন এবং সামান্য সামান্য সাধারণ দ্রব্যাদি দ্বারা যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া গবেষণা চালাইতে থাকেন।

তাঁহার প্রথম গবেষণাপূর্ণ মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসের 'জার্ণাল অব দি এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল'-এ। ক্রমশঃ বহু বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

জার্মান বৈজ্ঞানিক হার্ৎস প্রথমে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করেন। জগদীশচন্দ্র ভারতবর্ষে এ সম্বন্ধে



রেভেণ্ট কর্ণেল আর. এন. চোপরা
শরীর বিজ্ঞান শাখার সভাপতি

গবেষণা আরম্ভ করেন এবং বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সাহায্যে সঙ্কেত প্রেরণের কৌশল তিনিই সর্ব্বাগ্রে প্রকাশিত করেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার টাউন হলে তদানীন্তন বাঙলার ছোট-

খাটের সম্মুখে তিনি বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সাহায্যে সঙ্কেত প্রেরণ দেখান। কিন্তু তিনি এই পথ অধিকদূর অনুসরণ করেন নাই। বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সম্বন্ধে বহু তথ্য তিনি আলোচনা করেন এবং প্রাথমিক যুগের বেতার টেলিগ্রাফে ব্যবহৃত 'কোহিয়ারার' (*coherer*) যন্ত্র সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট মতবাদ তিনিই প্রথমে দেন। বর্ত্তমানে রেডিয়োতে ব্যবহৃত 'ক্রিষ্টাল রিসিভার'ও জগদীশচন্দ্রের গবেষণার ফল।

জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধসমূহ অতি অল্পকালের মধ্যেই বিলাতের সুবিখ্যাত বিজ্ঞান-পরিষদ রয়াল সোসাইটির দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং রয়াল সোসাইটী গবেষণা চালাইবার জন্য তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করেন। রয়াল সোসাইটির এই কার্য্যের ফলে সরকারও তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিতে আরম্ভ করেন এবং লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয় তাঁহাকে ডক্টর উপাধি দেন। জগদীশচন্দ্র রয়াল সোসাইটির প্রথম বাঙালী ফেলো।

বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সম্বন্ধে গবেষণার সময় জগদীশচন্দ্র দেখেন যে, কোন উত্তেজনা দিলে জড়বস্তুর উপর তাহার প্রভাব দেখা যায় এবং প্রাণীর ন্যায় জড়েও অবসাদ দেখা যায়। উদ্ভিদের স্থান জড় ও জীবের মধ্যবর্ত্তী, সুতরাং তিনি অতঃপর উদ্ভিদ সম্বন্ধেও গবেষণা করিতে আরম্ভ করেন। পদার্থ বিজ্ঞান হইতে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের গবেষণায় তিনি এইরূপে ব্রতী হন। তাঁহার পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিক জীবন উদ্ভিদের প্রাণধর্ম্মের গবেষণায় উদ্ভিদ ও প্রাণীর ঐক্য সাধনে ব্যয়িত হয়।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার তাঁহাকে ভারতের প্রতিনিধি রূপে প্যারিসের আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান কংগ্রেসে প্রেরণ করেন। প্যারিসে তিনি তিনটি বক্তৃতা দেন এবং তাঁহার নাম সমগ্র পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়ে।

জগদীশচন্দ্র পৃথিবীর প্রায় সকল প্রধান প্রধান বিদ্যাকেন্দ্রে তাঁহার গবেষণা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন। দেশে ও বিদেশে তাঁহার মত সম্মান অদ্যাবধি অন্য কোন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক পান নাই।

পূর্ব্বে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের অনেক বড় বড় পণ্ডিতের মত ছিল যে, প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে ব্যবধান আছে। জগদীশচন্দ্র প্রথমে প্রমাণ করেন যে লজ্জাবতীর পাতা স্পর্শ করিলে যে আকুঞ্চন হয় তাহা প্রাণীর দেহে স্নায়ুর ক্রিয়ার অনুরূপ। শরীরের কোন অংশ স্পর্শ করিলে যেমন স্নায়ুর দ্বারা সেই সংবাদ বাহিত হয়, লজ্জাবতীর পাতার ক্রিয়াও তাহার অনুরূপ। এই তথ্য প্রমাণ করিবার জন্য জগদীশচন্দ্র 'রেজোন্যান্ট রেকর্ডার' (*Resonant Recorder*) নামক অতি সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন। জগদীশচন্দ্রের উদ্ভাবিত আরও একটি যন্ত্রের উল্লেখ এখানে করা যাইতে পারে, যন্ত্রটির নাম 'ম্যাগনেটিক ক্রেস্কোগ্রাফ' (*Magnetic Crescograph*)। এই যন্ত্রে কোন উদ্ভিদের বৃদ্ধি বহুলক্ষগুণ পরিবর্দ্ধিত করিয়া দেখান যায়। বিলাতের 'টাইমস' পত্রিকায় এই যন্ত্রের পরিবর্দ্ধন-ক্ষমতায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়া কয়েকটি পত্র প্রকাশিত হওয়ায় রয়াল সোসাইটি ক্রেস্কোগ্রাফের পরিবর্দ্ধন ক্ষমতা কত, নির্ণয় করিবার জন্য একটি কমিটী গঠন করেন। এই কমিটীতে বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানবিদ স্যর উইলিয়াম ব্র্যাগ (ইনি পরে নোবেল পুরস্কার পান) ছিলেন। কমিটী পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে এই যন্ত্রের পরিবর্দ্ধন ক্ষমতা ১০ লক্ষ হইতে ১ কোটী গুণ।

জগদীশচন্দ্রের বহু পরীক্ষায় দেখা যায় যে, জীবদেহে যে সকল ক্রিয়া ঘটিয়া থাকে, উদ্ভিদদেহের তাহার অনুরূপ ক্রিয়া দেখা যায়। বিষের ক্রিয়া, উত্তেজক ঔষধের ক্রিয়া, বৈদ্যুতিক আঘাতের ক্রিয়া দুইয়ের পক্ষেই অনুরূপ। জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদকে বলিয়াছেন *"anchored animal"* (নোঙর-বাঁধা প্রাণী)। জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ইহা সপ্রমাণ করিতেই নিযুক্ত ছিল।

জগদীশচন্দ্রের খ্যাতির কারণ কেবল মাত্র ইহা নহে যে, তিনি একজন বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণার পথ এদেশে তিনিই প্রথমে উন্মুক্ত করেন, সেই হিসাবে তাঁহার কৃতিত্ব আরও অধিক। তিনি কেবল মাত্র বৈজ্ঞানিক নহেন, পথপ্রদর্শকও বটে।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপকের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার তাঁহার সময় হয় কিন্তু সরকার আরও দুই বৎসরের জন্য তাঁহার কর্ম্মকাল বৃদ্ধি করেন এবং ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে পেন্সনের পরিবর্ত্তে পুরা বেতনে তাঁহাকে অবসর দেওয়া হয়। আর কোন ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের বোধ হয় এরূপ সৌভাগ্য হয় নাই। অবসর গ্রহণের দুই বৎসর পরে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি "বসু বিজ্ঞান মন্দির" স্থাপনা করেন। এখন ইহা একটি পৃথিবীবিখ্যাত গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের সমস্ত লেখা ও উক্তির মধ্যে একটি সূক্ষ্ম দার্শনিক চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়।

জগদীশচন্দ্র ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে সি. আই. ই. ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সি. এস. আই., এবং ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হন।

নোয়াখালীর চর, দ্বীপ ও নদী

—শ্রীভারতচন্দ্র মজুমদার

নোয়াখালী জেলার চর ও ছোট ছোট দ্বীপাবলী

নোয়াখালীর নদী-সন্নিহিত স্থানগুলির আকার ও আয়তন সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হইতেছে।* প্রায়ই দেখা যায়, নদীগর্ভে কত ছোট ছোট চর ভাসিয়া উঠিতেছে ও ডুবিয়া যাইতেছে। যে পথ দিয়া এই বৎসর নৌকা ও ষ্টিমার প্রভৃতি চলাচল করিতেছে, দু' চার বৎসর পরে হয়ত বা সেই পথে চলাচল আর সুগম হয় না। বহু অস্থায়ী দ্বীপ ও চর স্থানে স্থানে দেখা দেয়, আর কিছুদিন পরে আবার নদীতে মিলাইয়া যায়। এই জন্য নদীগর্ভের এই সকল ছোট ছোট চর অঞ্চলের অবস্থান বিষয়ে স্থায়ী কোন মতামত ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য।

বিগত দেড় শ' দুই শ' বৎসরের মধ্যে এই ভাবের কত যে পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহা সত্বেও লোক-বসতির উপযোগী অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর কতিপয় আবাদী ও অনাবাদী দ্বীপ নোয়াখালীর নদীগর্ভে আছে। ঐ সকল দ্বীপ সম্বন্ধে নিম্নে সামান্য আলোচনা দেওয়া গেল।

নোয়াখালী জেলা ও চট্টগ্রাম জেলার মধ্যবর্ত্তী সীমামধ্যে ফেণী নদী অবস্থিত। এই নদীর মোহানা-স্থানকে বামনী নদী বলা হয়। এই বামনী নদীর অন্তর্গত চারিটি ছোট দ্বীপ বা চর আছে।—(১) খোপা চর বা চর খাইয়া (২) কচ্ছপিয়া চর (৩) ফিদ্‌কি চর (৪) চর রামনারায়ণ। এই চরগুলির সঙ্গে সংলগ্ন সন্দ্বীপের অন্তর্গত (সন্দ্বীপের কাছাকাছি) দুইটি চর আছে।—(১) চর পীরবক্স (২) চর বক্সু বা চর লক্ষ্মী।

সেইরূপ হাতীয়া দ্বীপের আশেপাশে উহার সংযোজক চর ষোলটি আছে।—(১) চর জারত (২) চর ঈশ্বর (৩) চর কিং (৪) চর লন্‌স্ (৫) নিলক্ষ্মী চর (৬) চর গাজী (৭) নলচিরা (৮) চর মীর মাহাম্মদ (৯) চর আমানুল্লা (১০) চর গোঁসাই (১১) চর আলেকজাণ্ডার (১২) চর হাসেন হুসেন (১৩) চর নেয়ামৎ (১৪) চর দুলাগাজী (১৫) চর ফকীর (১৬) চর সেহার।

ইহা ছাড়া হাতীয়া নদীর অন্তর্গত নয়টি চর আছে।—(১) চর জব্বর (২) চর জুবিলী (৩) চর মাধব (৪) চর ম্যাকফারসন (৫) চর আলেকজাণ্ডা (৬) চর বইবী (৭) চর পোড়াগাছা (৮) চর বেদমা (৯) সীতা চর।

হাতীয়া সীমার বাহিরে মেঘনাগর্ভে তিনটি চর আছে।—(১) চর বিহারী (২) চর লরেঞ্চ (৩) চর বদু।

নোয়াখালী জেলার পশ্চিম সীমান্তে ডাকাতিয়া নদীর মোহানায় চারিটি দ্বীপ বা চর দেখা যায়।—(১) চর আবাবিল (২) চর বংশী (৩) চর উদমারা (৪) চর মীরজাফরা।

চরের দৃশ্য ও প্রধান প্রধান খাল

প্রাচীন চরগুলি দেখিতে খানিকটা উপকূল ভূভাগের মত প্রতীয়মান হয়। সেখানেও একঅঞ্চলের মত লোকজন বাড়ী-ঘর করিয়া গ্রাম বা বস্তিমধ্যে বসবাস করিয়া থাকে। ঐ সকল স্থানে বসতি স্থাপন করিতেই অধিবাসীরা অনাবাদী অঞ্চল আবাদ করার সঙ্গে সঙ্গে মাদার গাছের শাখা স্থানে স্থানে মাটিতে পাতিয়া দেয়। শাখাগুলি ইহাতেই অনায়াসে বাঁচিয়া উঠে। মাদার পাতা জমিতে পড়িলে জমির উর্ব্বরা-শক্তি বর্দ্ধিত হয় ও নোনাপড়া জমির লবণাক্ততা কমিয়া যায়; অধিকন্তু মাদার গাছ প্লেগ রোগের প্রতিষেধক বলিয়াও কথিত হইয়া থাকে।

দূর হইতে চর অঞ্চলের দৃশ্য মনোরম। চারি দিকে বহু দূর ব্যাপিয়া জলতরঙ্গ থই থই করিতেছে, মাঝখানে শ্যামল শস্যভূমি পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী ও প্রান্তর। নারিকেল ও মাদার বনের সবুজ রেখা নীলাকাশের গায়ে মিশিয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে অধিবাসীদের কুটিরসমূহ ও গো-মহিষের পাল—দূরের নদীগর্ভ হইতে দেখিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়িয়া ছবির মত মনে হয়। সমস্ত সৌন্দর্য্যের বিচিত্র সজ্জায় ইতস্ততঃ যেন একটা সংযোগ-রেখা অনুরঞ্জিত হইয়াছে। দূর-দূরান্তর পর্য্যন্ত সবুজে, নীলে, কালোতে ও আরও কত মিশ্রিত রঙের আবরণে সজ্জিত প্রকৃতি দেবী যেন সমুদ্রের উপরে অভিনব সৌন্দর্য্যের ডালা সাজাইয়া রাখিয়াছেন।—

---

* গত কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যায় যথাক্রমে, সেকাল ও একালের নোয়াখালী, নোয়াখালীর জীবিকা ও অর্থসমস্যা এবং নোয়াখালীর শঙ্খ, শিল্প ও বাজারী সম্পর্কে আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে।

অপেক্ষাকৃত নূতন চরগুলিতে বৃক্ষলতা এখনও প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া উঠিতে পারে নাই। সবুজ শস্যভূমির বায়ু-হিল্লোলিত তরঙ্গরাজি যেন জলতরঙ্গের উপর ভাসিয়া বেড়াইতেছে। স্থানে স্থানে ঐ সকল সবুজ ভূভাগের মধ্য দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাল বা জলধারা আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে ও ক্রমশঃ উহারা বিশাল জলরাশিতে গিয়া মিশিয়াছে।

নোয়াখালী জেলার দক্ষিণ প্রান্তে যে সকল দ্বীপ আছে, উহারা প্রায় সমস্তই মেঘনা নদীর মধ্যে অবস্থিত। পূর্ব্বপ্রান্তে ফেণী মহকুমা। বড় ফেণী ও ছোট ফেণী নদী এবং উহাদের শাখা-প্রশাখা ফেণী মহকুমার মধ্য দিয়াই প্রবাহিত হইয়াছে। নোয়াখালী জেলার মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলের উপকূল-ভূভাগে কোন নদী দেখা যায় না। তদঞ্চলে কেবল কয়েকটি খাল আছে। এই খালগুলির অধিকাংশের সঙ্গে জোয়ার-ভাটার যোগ আছে। ইহাদের বিস্তৃতি-বর্দ্ধনের সম্ভাবনা নাই বলা চলে না। নোয়াখালী বা বেগমগঞ্জ খালের পূর্ব্বাপর পরিণতি যেরূপ অবস্থায় দাঁড়াইতেছে, ইহা দেখিয়া অপরাপর খাল যে কালক্রমে ভয়ঙ্কর রূপ পরিগ্রহ করিবে না, তাহা কে বলিতে পারে?

নোয়াখালী জেলায় জোয়ার-ভাটা-বহা খালসমূহের মধ্যে নোয়াখালী খাল, মহেন্দ্র খাল ও ভবানীগঞ্জ খাল এই তিনটিই প্রধান ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মেঘনা নদীর ইতিবৃত্ত

আসামের সুরমা পার্ব্বত্য উপত্যকা বিধৌত জলরাশির মিলিত ধারাকেই মেঘনা নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

বর্ত্তমান ব্রহ্মপুত্র নদ যে পথ ধরিয়া প্রবাহিত হইতেছে, পূর্ব্বে ইহার বহু পশ্চিমে স্রোতোধারা বিদ্যমান ছিল। বহুকাল পূর্ব্বের কথা নয়, প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে নদী-সন্নিহিত ভূভাগ যখন অল্পদিনের মধ্যে রূপান্তর পরিগ্রহ করিল, তখন ব্রহ্মপুত্র নদ অনেকটা পূর্ব্বদিকে মোড় ফিরিয়া স্রোতের ভিন্ন গতি নির্দ্দিষ্ট করিল। এই ভাবে ব্রহ্মপুত্র আসিয়া মেঘনার সঙ্গে মিলিত হইল।

যেখান হইতে ব্রহ্মপুত্রের স্রোতোধারাকে বহন করিয়া মেঘনা যাত্রা সুরু করিল, সেখান হইতেই মেঘনার উপকূল, কূলে কূলে উহার তাণ্ডব তরঙ্গ-সংঘাত অধিকতর বেগে আসিয়া লাগিতে থাকিল। কিন্তু এই দুর্য্যোগ বেশীদিন রহিল না। কিছুকাল পরে সাময়িক ভাবে তাণ্ডবতা কমিয়া গেল।

বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভে দেখা গেল, ব্রহ্মপুত্রের ঘূর্ণী-পথবর্ত্তী কুটিল প্রবাহ, মেঘনার প্রবাহের সঙ্গে যে সাংঘাতিক সংগ্রাম সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাতে ব্রহ্মপুত্রকেই অবশেষে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিতে হইয়াছে।

অবশেষে ব্রহ্মপুত্র উহার পূর্ব্ব পথেই স্রোত সঞ্চালিত করিয়া গোয়ালন্দের নিকটে গঙ্গার সঙ্গে গিয়া মিলিত হইল। এই মিলিত ধারা আসিয়া আবার চাঁদপুরের নিকটে মেঘনার সঙ্গে যুক্ত হইল।

অতএব দেখা যাইতেছে, মেঘনা বর্ত্তমান সময়ে যে বিপুল জলরাশি লইয়া সমুদ্র অভিমুখে নিত্য প্রবাহিত হইতেছে, তাহার মধ্যে রহিয়াছে ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা এবং আসামের শ্রীহট্ট ও সুরমা অঞ্চলীয় পার্ব্বত্য জলধারা।

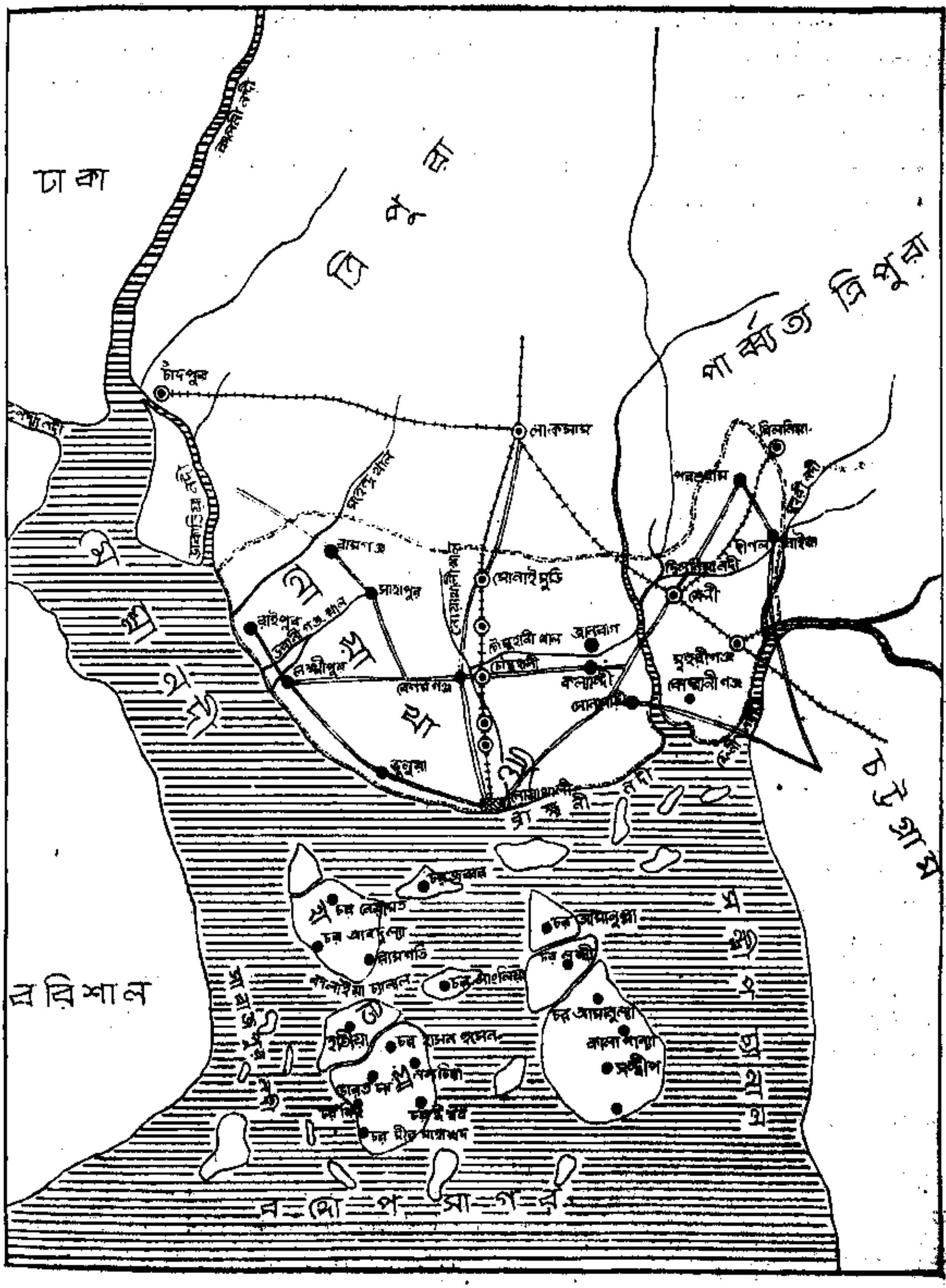
এতগুলি স্রোতোশক্তি সম্মিলিত হইয়া যে প্রবল সামুদ্রিক তাণ্ডবতার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার মুখে পড়িয়াছে যে-সকল অঞ্চল, তাহার মধ্যে নোয়াখালী জেলা অন্যতম। অতএব ইহার উপর দিয়া যে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের সংঘাত নিত্য চলিবে, উহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

এই বিস্ময়কর মিলিত শক্তি চাঁদপুর অতিক্রম করিয়া খানিকটা উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত ঘেঁষিয়া চর আবাবিলের নিকট দিয়া নোয়াখালী জেলাকে প্রথম আক্রমণ করিয়াছে। সেখানে মেঘনার পরিসর চার মাইলের কম হইবে না। তথা হইতে যত দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, ততই ইহার বিস্তার উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়াছে।

নোয়াখালী জেলার পশ্চিমস্থ লক্ষ্মীপুরের নিকটে আসিয়া মেঘনা চার মাইলের চেয়ে অনেক বেশী বিস্তৃত হইয়াছে। এখানে আসিয়া মেঘনা ডাকাতিয়া নদীর স্রোতোধারাকে আপনার সঙ্গে যুক্ত করিয়া লইয়াছে।

দ্বীপ-সন্নিহিত নদী ও জলোচ্ছ্বাস

নোয়াখালীর দক্ষিণে চর জব্বর নামক একটি দ্বীপ আছে। এই দ্বীপের দক্ষিণ দিক দিয়া যে জলপ্রবাহ হাতীয়া ও সন্দীপের মধ্যপথ ধরিয়া সমুদ্র অভিমুখে প্রবাহিত হইয়াছে, উহাকে ফেণী নদীর নিকটবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত বামনী নদী বলা হয়।


ঢাকা
ত্রিপুরা
পার্ব্বত্য ত্রিপুরা
চাঁদপুর
লোকসাম
রামগঞ্জ
সাহাপুর
রায়পুর
লক্ষ্মীপুর
সোনাইমুড়ি
চৌমুহনী
বেগমগঞ্জ
কল্যাণদী
ফেনী
বিলোনিয়া
পরশুরাম
চট্টগ্রাম
নোয়াখালী
বরিশাল
সন্দ্বীপ
হাতিয়া
বঙ্গোপসাগর

তথা হইতে এই স্রোত দক্ষিণ দিকে ঘুরিয়া চট্টগ্রামের নিকটবর্ত্তী সোন্ডোখালার সঙ্গে যোগ রাখিয়া সন্দীপের পূর্ব্বপ্রান্ত দিয়া ক্রমশঃ সমুদ্রে গিয়া পতিত হইয়াছে। এই জলপ্রবাহটিকে সন্দীপ চ্যানাল বলা হয়।

উত্তর-হাতীয়া ও দক্ষিণ-হাতীয়ার মধ্যবর্ত্তী বিস্তৃত জল প্রবাহকে কালাইয়া চ্যানাল বলে। এই চ্যানাল একদিকে মাধবপুর নদী ও অপর দিকে হাতীয়া নদীর সঙ্গে গিয়া যুক্ত হইয়াছে।

"চর আবাবিল" হইতে ফেণী নদীর মোহানা পর্য্যন্ত সুবিস্তীর্ণ জলপথের দূরত্ব ৬০ মাইলের কম নহে। হাতীয়া নদীও প্রায় ৩২ মাইলের কম চওড়া হইবে না।

এই সকল নদীর বিস্তৃতির পরিমাণ ঠিক করা সম্ভবপর নহে। তীরভূমির নিত্য ভাঙ্গা-গড়ায় সর্ব্বদাই ইহাদের বিস্তারের ইতর-বিশেষ হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময় নোয়াখালীর উপকূল-ভূভাগ হইতে চর জব্বরের মধ্য দিয়া সোজা হাতীয়া পর্য্যন্ত দূরত্ব প্রায় ২৫ মাইল হইবে। বামনী নদীর বিস্তারও ১৬ মাইলের অধিক হইবে। হাতীয়া ও সন্দীপের মধ্যবর্ত্তী জলপথের দূরত্ব প্রায় ২০ মাইল।

মেঘনা নদীর মধ্য দিয়া নৌকা ও জাহাজ-ষ্টিমার প্রভৃতির চলাচল খুব নিরাপদ নহে। প্রায় প্রত্যেক বৎসরই এই নদীপথে নৌকাডুবি হইয়া বহুলোকের জীবন নাশ হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ উত্তর-হাতীয়া ও দক্ষিণ-হাতীয়ার মধ্যবর্ত্তী কালাইয়া চ্যানাল সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর। এই চ্যানালপথে পূর্ব্বদিক হইতেও জলপ্রবাহ আসে, পশ্চিম দিক হইতেও আসে, তাই এখানে যে ভয়ঙ্কর আবর্ত্ত ও বিপুল জলতরঙ্গের সাংঘাতিক তাণ্ডবতা সৃষ্টি হয়, তাহার মধ্য দিয়া কোন রকম জলযান চালনা প্রায়ই সম্ভব হয় না।

মেঘনার ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাস সম্বন্ধে স্যর জোসেফ হুকার (Sir Joseph Hooker) নামক জনৈক ভ্রমণকারী তাঁহার "হিমালয়ান জার্ণাল" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, বঙ্গোপসাগরীয় শীর্ষাঞ্চল পথে যখন জলোচ্ছ্বাসকালে বিপুল জলরাশি গড়াইতে থাকে, তখন পশ্চিমাঞ্চলের ঢেউয়ের উচ্চতা যায় তের ফুটের কম হয় না, আর পূর্ব্ব অঞ্চলের ঢেউ ৩০—৫০ ফুটের অধিক উচ্চ হইয়া থাকে।

উপকূলের নিকটস্থ জলপ্রবাহের উপর দিয়া যে জলোচ্ছ্বাস চলিয়া যায়, তাহাও নোয়াখালী জেলার পশ্চিম প্রান্তে এবং হাতীয়ার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে প্রায় ১৪ ফুট উচু হইয়া গড়ায়; অথচ ফেণী নদীর কাছে জলোচ্ছ্বাস ইহা হইতে অনেক বেশী উচ্চ হইয়া দেখা দেয়।

এই যে জোয়ার-ভাটা, জলোচ্ছ্বাসের বর্ণনা দেওয়া হইল, ইহা সকল সময় সমভাবে পরিলক্ষিত হয় না। সাধারণতঃ পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে ইহার বেগ অধিকতর প্রবল হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া আকস্মিক ঝড় তুফান বা অপরাপর সামুদ্রিক দুর্য্যোগ বা প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের সময় ইহার রূপ কল্পনাতীত রূপে ভয়ঙ্কর হইতে পারে।

সাধারণতঃ ভাদ্র মাসের অমাবস্যাতে স্বাভাবিক জোয়ারের বেগ হইতে জলোচ্ছ্বাসের বেগ প্রবলতর হইয়া থাকে। পূর্ণিমা, অমাবস্যা বা বিশেষ বিশেষ সময়ে যখন প্রবল জলোচ্ছ্বাস নদীর উপর দিয়া গড়াইয়া আসিতে থাকে, তখন তীরভূমি হইতে মনে হয়, যেন কুড়ি পঁচিশ ফুট উচু হইয়া বিশাল তরঙ্গায়িত বরফের পাহাড় নদীর উপর দিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। তখন ঘণ্টায় প্রায় পনর হইতে কুড়ি মাইল বেগে এই জলোচ্ছ্বাস প্রবাহিত হইতে থাকে।

জলোচ্ছ্বাস-কালের বিপুল তরঙ্গ-গর্জ্জন বিশেষ বিশেষ ঋতুতে কখনও কখনও দুই তিন মাইল দূর পর্য্যন্ত স্পষ্ট শোনা যাইয়া থাকে। সেই সময় নিকটবর্ত্তী ভূখণ্ডের মৃত্তিকা যেন দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠে। সেই প্রবহমান তরঙ্গাবর্ত্তের মধ্যে নৌকা ত' দূরের কথা, ষ্টিমার পর্য্যন্ত চলিতে পারে না। পূর্ব্বাহ্নেই নাবিকেরা নিরাপদ স্থলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে ঝড় হইয়াছিল। সেই ঝড়ের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, সমগ্র হাতীয়া দ্বীপ তদানীন্তন বিপুল জলোচ্ছ্বাসে ডুবিয়া গিয়াছিল। তখন হাতীয়ার স্থলভূমির উপর ৪ ফুট জল হইয়াছিল। উহার নয় বৎসর পরে (১৮৭৬ খৃঃ অঃ, ১২৮৩ বঙ্গাব্দ) আবার এক ভয়ঙ্কর ঝড় হইয়াছিল। সেই ঝড়ের বীভৎস কাহিনী অদ্যাপি নোয়াখালী জেলার প্রাচীন বৃদ্ধদিগের মুখে শোনা যায়। সেই ঝড়ের রোমাঞ্চকর স্মৃতি 'তিরাশী-সনের তুফান' বলিয়া এতদঞ্চলের সকলের কাছে বিদিত আছে। সেই সময় নোয়াখালী

জেলাতে যে সকল লোকক্ষয়কর প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, নোয়াখালীর ইতিহাসে তাহা একটি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য বিষয়। বিশেষ করিয়া জলোচ্ছ্বাস-কালে সন্দ্বীপের অধিকাংশ নরনারী, গো, মেষ, ছাগাদি প্রাণীর জীবন বিনষ্ট হইয়াছিল, সেই সকল করুণ কাহিনী শ্রবণ করিলে ব্যথিত হইতে হয়।

সন্দ্বীপের ভূপৃষ্ঠোপরি তখন ১২ ফুট জল উত্থিত হইয়াছিল। নোয়াখালীর উপকূল-ভাগে চর ও দ্বীপ অঞ্চলে অসংখ্য মৃতদেহ সেই বন্যার জলে ভাসিয়া আসিয়াছিল ও কাক-শকুনির মেলা বসিয়াছিল বলিয়া তদানীন্তন প্রত্যক্ষদর্শীরা আজকালও উহার বিভৎস কাহিনী বর্ণনা করিয়া থাকেন। সেই সময় নোয়াখালীতে লক্ষাধিক লোকহানি হইয়াছিল।

উপকূল ভূভাগীয় নদী ও খাল

নোয়াখালী জেলার পশ্চিম প্রান্তে রায়পুর অবস্থিত। ডাকাতিয়া নদী এই রায়পুরের নিকটে মেঘনার সহিত মিলিত হইয়াছে। ত্রিপুরার পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে ডাকাতিয়া নদী উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ নানা শাখায় বিভক্ত হইয়াছে ও সকল শাখাই নানা অঞ্চল ঘুরিয়া অবশেষে মেঘনাতেই পতিত হইয়াছে। ডাকাতিয়ার সর্ব্বদক্ষিণস্থিত শাখা রায়পুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া মেঘনাতে পতিত হইয়াছে। রায়পুরের নিকটস্থ ডাকাতিয়ার জলপথে সারা বৎসর ধরিয়া ছোট বড় নৌকা-চলাচল হয়। নোয়াখালী জেলাতে রায়পুর বাজার একটা বড় ব্যবসায়-ক্ষেত্র। এখান হইতে নদীপথে সুপারী, নারিকেল, কলা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে স্থানান্তরে রপ্তানী হইয়া থাকে। এই ডাকাতিয়া নদীর যে অংশ নোয়াখালীর সীমামধ্যে পড়িয়াছে, উহার দূরত্ব প্রায় ১৫ মাইল।

লক্ষ্মীপুর থানার উত্তর অংশে উৎপন্ন হইয়া একটি খাল ভবানীগঞ্জের ভিতর দিয়া মেঘনার মোহানায় পতিত হইয়াছে। ইহাকে ভবানীগঞ্জের খাল বলে। এই খালের পথ ধরিয়া লক্ষ্মীপুর পর্য্যন্ত সারা বৎসর শ্রেণীর নৌকা চলাচল হইয়া থাকে। নদীর মোহানা হইতে এই খালের পথে লক্ষ্মীপুর পর্য্যন্ত দূরত্ব বার মাইল হইবে। গ্রীষ্মকালে খুব বেশী জোয়ার না হইলে ব্যবসায়ীদের বড় বড় নৌকার লক্ষ্মীপুর পর্য্যন্ত এই পথে যাওয়া সকল সময় সুগম হয় না।

নোয়াখালীতে মহেন্দ্র খাল নামক একটি খাল আছে। ত্রিপুরা জেলাতে এই খালের উৎপত্তি। ক্রমশঃ ইহা দক্ষিণ-বাহিনী হইয়া নোয়াখালী জেলার উপর দিয়া 'নদনা' অতিক্রম করিয়া মেঘনাতে পতিত হইয়াছে। যেখানে এই খাল মেঘনাতে পড়িয়াছে, সেখান হইতে হাতীয়া দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। এই খালে খুব বেশী নৌকা চলাচল হইতে পারে না। আজকাল কচুরিপানা ও জলজ উদ্ভিদাদিতে খাল প্রায় বুজিয়া গিয়াছে।

বেগমগঞ্জের নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া একটি খাল দক্ষিণ-বাহিনী হইয়া সুধারাম সহরের নিকট দিয়া নদীতে পড়িয়াছে। ইহার নাম নোয়াখালী খাল। নোয়াখালী হইতে এই খালের জলপথে প্রায় কুড়ি মাইল পর্য্যন্ত নৌ-চলাচল হইয়া থাকে।

চৌমুহানী হইতে ছিলনিয়া নদী পর্য্যন্ত আর একটি খাল আছে। চৌমুহানীর দক্ষিণে নোয়াখালী খালে ইহার প্রান্ত শেষ হইয়া গিয়াছে। অপর প্রান্ত ছিলনিয়া নদীতে পড়িয়াছে। এই খালের কল্যান্দী বাজার পর্য্যন্ত অংশকে সাধারণতঃ চৌমুহানী খাল বলা হইয়া থাকে। তথা হইতে উত্তর ও পূর্ব্বমুখ ঘুরিয়া জগৎপুর হাটের পার্শ্ব দিয়া ইহার যে অংশ ছোট ফেণী নদীতে গিয়া পড়িয়াছে, উহাকে বোল-কোদা খাল বলা হয়। চৌমুহানী হইতে ছোট ফেণী পর্য্যন্ত এই খালের দূরত্ব প্রায় কুড়ি মাইল হইবে। বর্ষাকালে সর্ব্বদাই চৌমুহানী-ফেণী পথের মালের নৌকা ও যাত্রীর নৌকা এই পথ দিয়াই চলাচল করে। ছোট ফেণী নদীর জোয়ারের বেগ এই খালের পূর্ব্ব অংশে পশ্চিম-বাহিনী হইয়া আসে। আর পশ্চিম অংশে চৌমুহানী হইয়া নোয়াখালী খালবাহী জোয়ার পূর্ব্ব-বাহিনী হইয়া আসিতে থাকে। গ্রীষ্মকালে ইহার অনেক অংশই প্রায় শুকাইয়া যায়।

ছোট ফেণী নদী ত্রিপুরার পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে উৎপন্ন হইয়া কুমিল্লার নিকট দিয়া প্রবাহিত হইয়া ঘুর্ণীপথে আসিয়া নোয়াখালী জেলাতে পতিত হইয়াছে। ফেণী মহকুমার পশ্চিম অংশ দিয়াই ইহার প্রবেশ-পথ। এখান হইতে সর্পিল গতিতে এই নদী প্রায় ৫০ মাইল পথে প্রবাহিত হইয়াছে। সারা বৎসরই এই নদীপথে বহু নৌকা চলিয়া থাকে।

বড় ফেণী নদীও পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে এই জেলার পূর্ব্ব প্রান্তের পথ ধরিয়া নামিয়া আসিয়াছে। বড় ফেণী

নোয়াখালীতে প্রথম যে স্থানে প্রবেশ করিল, সেখান হইতে সমুদ্রে পড়া পর্য্যন্ত যে অংশ, ইহাই নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের মধ্যবর্ত্তী সীমারেখা। এই সীমা বাহিয়া বড় ফেনী অর্দ্ধপথে উপস্থিত হইলে ডানদিক হইতে আগত মুহুরী নদীর জলপ্রবাহের সহিত ইহার মিলন ঘটিল।

এই মুহুরী নদী ত্রিপুরার পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে বাহির হইয়া ছাগলনাইয়া থানার উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলীয় পথে সর্ব্বপ্রথমে এই জেলাতে আসিয়া দেখা দেয়। তথা হইতে সোজা দক্ষিণ মুখে অভিযান করিয়া ফেণী মহকুমার পূর্ব্বদিক বাহিয়া প্রায় ৫১ মাইল পথ অতিক্রমের পর বড় ফেণীর সহিত ইহা মিলিত হইয়াছে। এই পথে সর্ব্বদাই নৌ-চলাচল হইয়া থাকে।

মুহুরী নদীর সঙ্গে ছিলনিয়া নদী আসিয়া মিশিয়াছে। মুহুরী ও ছিলনিয়ার মিলনস্থান হইতে ছিলনিয়ার ধারাপথে পার্ব্বত্য অঞ্চল পর্য্যন্ত দূরত্ব ২১ মাইল। এই পথে নৌ-চলাচল হইয়া থাকে। ছিলনিয়া নদীই ছাগলনাইয়া থানা ও ফেণী থানার মধ্যবর্ত্তী সীমা হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। নোয়াখালী জেলার পূর্ব্ব অঞ্চলীয় নদীগুলির জলপ্রবাহে বহু পার্ব্বত্য ঝরণাধারা আসিয়া সর্ব্বদাই প্রচুর জল যোগাইয়া থাকে। এই জন্ম যখন পাহাড় অঞ্চলে প্রচুর বারিবর্ষণ হয়, তখন নদীগুলি বিপুল জলরাশিকে স্বীয় স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিতে পারে না। তীর অতিক্রম করিয়া জলরাশি নিকটবর্ত্তী ভূখণ্ডে প্লাবনের সৃষ্টি করে।

পলাশী

—শ্রীদীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলা দেশের শহীদ-বীরের শোণিত-সিঁদুর ললাটে আঁকি,
হস্তে বাঁধিয়া দেশ-প্রাণতার রক্ত-লালিম প্রণয়-রাখী,
শুক অশ্রু-নদীর পারে বিগত স্মৃতির তর্পণ-রত,
অনাদি কালের রুদ্ধ ঘরের অন্তর-ভরা মোহের মত,
স্থির, নীরব, নিমীলিত আঁখি, অতীত স্বপ্নে বিভোর একা,
হে মোর পলাশী, আজিকে নয়নে কোন্ রূপে তব পেলাম দেখা!
তোমার জীর্ণ গোপন-পুরের অর্গলখানি আগলি ধরি,
প্রণাম করিনু প্রথম প্রভাতে বারে বারে মাথা আনত করি।
শুনিনু আকাশে বাতাসে তোমার মর্ম্ম-কথার বেদনা বাজে,
অশ্রু বীচির পল্লব-ছায়ে লুপ্ত কাহিনী ফুরায় না যে।
মুক্ত বাংলার উদার, স্বাধীন, সবল, সরল মূরতি-ছায়া,
স্নেহের মতন ঘেরে চারিপাশে আজও যেন তার যায় নি মায়া;
—অবারিত তব বিরাট বক্ষে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন কত,
রুদ্ধ করিয়া পাষাণ কোথাও, কোথাও বা তার গভীর ক্ষত;
[illegible] চূর্ণ করিয়া কত কামানের অনল ছাপ—
এক ধারে তব অতল পুণ্য, আর এক ধারে অচল পাপ।
[illegible] তব অভিমানে দূর দূরান্তে গিয়াছে সরি,
[illegible] হবে না সে আর আদর করি,

তব উন্নত বিজয়-সৌধ ধ্বসিয়া পড়েছে তাহার জলে,
আজও বুঝি তার শেষ কথা লয়ে সকলের আঁখি এড়ায়ে চলে।
বারিলেশহীন ধূ ধূ প্রান্তর বিস্ময়হত মূঢ়ের মত,
দূর-দিগন্তে রয়েছে চাহিয়া দীর্ঘ রজনী দিবস কত;—
কোন্ অনাগত যুগের স্বপ্নে সুখ-সমাধির শ্মশান 'পরে,
আজও বুঝি তার হৃদয়ে কম্প, নয়নে অনল অশ্রু ঝরে!
হৃদয়ে তাহার কত না কাহিনী বক্ষে তাহার কত যে প্রাণ,
রুক্ষ মাটির পঞ্জরতলে আজও ঘুমন্ত কত না গান,
শুভ-অশুভের, আলো-আঁধারের হাসি-কান্নার আলোক-ছায়া,
তোমারে ঘিরিয়া রয়েছে কত না সুখ-বেদনার অরূপ মায়া,
শোক-সান্ত্বনা, সোহাগ-যাতনা, জীবন মরণ সব এক সাথে
তোমার দুয়ারে মিলেছে আসিয়া একটি তোমার নয়নপাতে;
কেহ আর নাই,—মহা অতীতের মহা ইতিহাস পৃষ্ঠাখানি
ধূলি-বিমলিন, রৌদ্রশুষ্ক হেলায় পড়িয়া রয়েছে জানি।
কাল-সমাধির প্রস্তর-চাপা রুদ্ধ জাতির ক্ষুব্ধ মন,
মৃত্যু-গরলে চির অচেতন ভুলে গেছে তার অন্বেষণ,
পথের-ধূলায় লুটিত তার জয়-কৌস্তুভ অতুল মণি
শেষ সমাপন সন্ধ্যা লগনে পলকে পলকে প্রহর গণি।

আজিও তোমার মাটির পঙ্কে সেই রতনের উজল শিখা
জলে ক্ষণে ক্ষণে; মনে হয় বুঝি অলীক মিথ্যা সে-মরীচিকা
চিরবিস্মৃত অন্ধ মনের অতি নিরুদ্ধ গোপন পুরে,
সে আলোর শিখা নিভিয়া নিভিয়া হারায়ে গিয়াছে অনেক দূরে,
ধ্বংসের গীতা ধ্বনিত তোমার সমর-মুখর কুরুক্ষেত্র,
নীরব আজিকে শবের মতন, নির্জ্জীব চিরমুদিত নেত্র,
আপনার জয়-সৌধের তলে ক্ষীণ কঙ্কালরাশির নীচে,
শত গরিমার সমাধি শয়নে শায়িত তোমার হৃদয়টি যে।

কত ধনুঃশর বর্ম্ম কঠিন ক্ষুরধার কত ক্ষুধিত অসি,
কত অস্ত্রের ঘাত-সংঘাতে অগ্নির কণা পড়িল খসি'
কামান গোলায়, বর্শা ফলায় উদ্ধত শিরে শিরে—
কত তরুণের উষ্ণ রক্ত ছুটিল বক্ষ চিরে,
কত কৌশল, কত ছল বল, রিপুর তাড়না রাশি
তোমার দুয়ারে সবে এক ঠাঁই— সকলে মিলিত আসি,
হেথা এক ধারে বিজয়বাদ্য, ওঠে হাহাকার আর এক ধারে—
এক তীরে নাচে নর-পিশাচেরা—মানুষেরা কাঁদে অপর পারে।

তব গৌরব প্রাসাদ-পুরের ইষ্টক ধূলি স্তূপের পরে
যে ইতিবৃত্ত মহা অনুতাপে অনুশোচনায় গুমরি মরে,
তাহারই একটি অধ্যায় আজও মুছিয়াও যেন মুছে না হায়,
গৈরিক চিতা ভস্মবিভূতি মাখানো তাহার সকল গায়;
লাঞ্ছিত লুণ্ঠিত-শির স্খলিত-শস্ত্র ভিখারী বেশ
ফলিত নিয়তি ছলিত জীবন, দলিত বীর্য্য, ধ্বংস শেষ,
সারা বাংলার চিত্ত পথের মুক্তি মন্ত্রের মশানভূমি
মহা সাধনার মহা বাসনার চির সমাধার শ্মশান তুমি।

একপাশে নব-সূতিকা আগারে শিশু-রাজত্ব জনম লভে,
অপর পার্শ্বে ধূমায়িত চিতা ধূমকুণ্ডলী ছড়ায় নভে,
রক্তলোলুপ, ক্ষুধিত, করাল, কুজটিল কূট নীতির করে,
ভাগ্যহীনের মুক্তিকামনা ক্রূর ঘাতকের খড়্গে মরে।
বাংলার তুমি পরম তীর্থ, তরুণ মনের চরম বল,
প্রলয় পাগল মৃত্যুর দেশে জীবনের বেশে সমুজ্জ্বল,
শিশু সিরাজের রক্ত-মুকুট এখানে আছাড়ি' হয়েছে গুঁড়া,
মোহনলালের চিতাআলোকে জলে মীরজাফরের শাস্তির চূড়া।

কত ধনিকের ধনের দম্ভ, কত নায়কের যুক্তি বল,
কত না শঠের চতুর শাঠ্য এইখানে পেল মুক্তি ফল;
কত প্রতারক বিশ্বাসঘাতী, রাজ্য-লোলুপ গৃধ্নু কত,
কত বিপ্লবী ছদ্মবেশের আড়ালে স্বার্থসাধনরত,
কত সেনানীর ক্ষুব্ধ রক্ত, কত শহীদের অমর প্রাণ
কত ঘাতকের হিংস্র হিংসা, কত মীমাংসা, প্রেমের জাণ,
কত হাহাকার, বিরোধ কলহ, কত আহতের আর্ত্তরোল,
রণদুর্ম্মদ ক্ষুব্ধ সেনায় কত হুঙ্কার হট্টগোল,—

আত্ম-বিরোধী হিংসা-পাতকে কি মহামৃত্যু ঘনায়ে আনে
সেই নির্ম্মম সত্য কাহিনী লেখা যুগে যুগে তোমার প্রাণে;
চিরদুঃখের নিকষে ঘষিয়া চির সত্যেরে ফোটালে তুমি—
মৃত্যুর কালো আঁধারে আঁকিলে জীবনের চির-বিজয়-বাণী,
সত্য মনের মরণ দেখিলে মিথ্যা মোহের করাল হস্তে,
সারা বাংলার গৌরবরবি তব প্রান্তরে গিয়াছে অস্তে।
সিরাজের শেষ শ্মশানশয্যা বীর মহিমায় অকপাট,
পাপপুণ্যের মিলনক্ষেত্র বাংলার তুমি কুরুক্ষেত্র।

অশ্রুতীর্থ তুমি স্বদেশের অন্তর্বিলীন তোমার পথ
তোমার মাটির অতলে সুপ্ত অতীতের কবি দণ্ডবৎ।

নাক-ফুল

—শ্রীকৃষ্ণ মিত্র

[১]

এগ্রিকালচারাল কলেজ হইতে পড়া ছাড়িয়া বাহির হইয়া যখন দেখিলাম চাকুরী অসম্ভব, তখন চাষ-আবাদের ব্যবস্থার উদ্যোগ করিলাম। কিন্তু যখন দেখিলাম, হালচাষ করিয়া জীবন ধারণ করা আরও অসম্ভব, তখন একেবারে হাল ছাড়িয়া দিলাম এবং ছয় মাইল হাঁটিয়া রমণীবাবুর চিরুণীর কারখানায় ম্যানেজারবাবুর সাথে দেখা করিয়া অনাহারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দৈনিক তিন আনা হারের মজুরী-পদের অনুপ্রাপ্তি পাইলাম। বাড়ী ফিরিয়া কমলীকে খবরটা দিতেই সে নিমুর-মার কাছ হইতে আধ কাঠা ধান কর্জ্জ করিবার আশায় প্রস্থান করিল।

পরদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই আহারাদি সমাপন করিয়া গদাই বিলের পথ ধরিয়া চলিলাম। দেখিতে দেখিতে তিন ক্রোশ পার হইয়া গেল। কলের সিটি পড়িবার পূর্ব্বেই ম্যানেজার বাবুর সঙ্গে দেখা হইল। কাজ সুরু করিয়া দিলাম। অশিক্ষিত মজুর বলিয়া তিনি বুরুশের সাদায় কালোয় মিশ্রিত কুচী বাছিতে নিযুক্ত করিলেন। দু'একজন সহকর্ম্মীর সাথে আলাপ হইয়া গেল। সহজেই জানিলাম তাহারাও আমারই মত অভাগা, কাহারও হালের গরু মরিয়া গিয়াছে, কাহারও বা মনিব অপরের কু-বুদ্ধিতে তাহাকে এবার জমি ভাগে দেয় নাই, ইত্যাদি।

রাত্রটার সময় সিটি পড়িতেই যে যাহা সাথে করিয়া আনিয়াছিল, কারখানার দেওয়া আদরের কালো রং মিশ্রিত ভাত দিয়া তাহাই উদরসাৎ করিল। অপরিচিত আমি অনাহূত অতিথির মত পাশের কলটা হইতে একপেট জল ভিস্তিওয়ালার মত ভরিয়া লইলাম,—আশ্চর্য্য, নগদ দাম লাগিল না।

আবার কাজ সুরু হইল। যে যাহার কাজে লাগিয়া গিয়াছে, আমি টুলের উপর খোকাটির মত বসিয়া আছি। কলের ঝকঝকানিতে কানে কিছুই ঢুকিতেছিল না বটে, কিন্তু চোখে অনেক অনেক কিছুই দেখিতেছিলাম। সামনের দেয়ালের মাথার ওপরকার কাচের আরশীতে নজর পড়িল, দেখিলাম, আকাশের নীল স্রোতের উপর দিয়া সাদা সাদা মেঘের জাহাজ অসীমের দিকে যাত্রা সুরু করিয়াছে, আর কারখানার আমন্ত্রণে আহূত হইয়া কোথা হইতে কি করিয়া একটা প্রজাপতি কারখানায় ঢুকিয়া পড়িয়াছে। ফিরিয়া যাইবার পথ না পাইয়া কাঁচের আরশীর উপর প্রজাপতিটি আছাড়ি-বিছাড়ি খাইতেছিল। কতক্ষণ যে বসিয়া তাহাই লক্ষ্য করিতেছিলাম, তাহা নিজেই জানি না, হঠাৎ ম্যানেজার সাহেবের ডাকে জাগিয়া উঠিয়া প্রণাম করিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইলাম। আমার অলস প্রকৃতি দেখিয়া তিনি একটু দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু মুখের দিকে তাকাইয়া যেন অন্ন-ক্লিষ্টের করুণ মিনতি বুঝিলেন এবং পকেট হইতে তিনটি আনি বাহির করিয়া তাঁহার ঔদার্য্যের প্রমাণ দিলেন। কাজ শেষ হইতেই আবার মাঠের পাশে বনের পথে চলিতে আরম্ভ করিলাম। কুটীরের ক্ষীণ দীপালোকে বেশ স্পষ্টই দেখিলাম, মাটীর লক্ষ্মীর সামনে কমলী উবু হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। আমার ডাকে ছুটিয়া আসিয়া হঠাৎ আমাকে প্রণাম করিয়া বসিল। তারপর তিনটি আনি হাতে লইয়াই মা-লক্ষ্মীকে একেবারে পাঁচ পয়সার ভোগ মানত করিয়া বসিল।

পরদিন ভোরে কমলী সকাল সকাল উঠিতে পারে নাই বলিয়া না খাইয়াই রওনা হইতে হইল। পথে দেখিলাম, চাষীরা 'নাস্তা' হাতে করিয়া লাঙ্গল কাঁধে, উৎফুল্ল মনে চলিয়াছে। যাইতে একটু দেরী হইয়া গেল। সে দিন ম্যানেজার একটু শাসাইলেন। নির্ব্বিবাদে এবং নীরবে কাজে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ বাদে হঠাৎ সেই জানালাটার উপর নজর গিয়া পড়িল। সেখানে প্রজাপতিটা তখনও এক একবার ঝাঁপা-ঝাপি করিতেছে। সে বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছে, এই কারাগার হইতে বাহির হইবার এই একমাত্র পথ। কিন্তু কিসে যে তাহাকে বাধা দিতেছে, তাহা সে অনেক চেষ্টায়ও বুঝিতে পারিতেছে না। বাহির হইতে একবারে পরিষ্কার

কালো সাদা মেঘের আরশীতে প্রতিবিম্বিত হইয়া আসিয়া কারাগারের জমাট আঁধারকে মুক্তির পথ দেখাইয়া দিতেছে, প্রজাপতিটা তাহা বুঝিতে পারিয়াছে।

জানি না কেন মনে হইল, আমিও উহারই মত বন্দী হইয়াছি। কত দিক হইতে কত আলোর ধারাই তো আমারও অন্ধ প্রাণকে ডাক দিতেছে, বেশ স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছি, কিন্তু বুঝিতে পারিতেছি না। বুঝিতে পারিতেছি না কোন্ কাঁচের পর্দ্দায় আমায় বন্দী করিয়া রাখিয়াছে। প্রজাপতিটার মত আমিও যেন দূরে, বহুদূরে কোথায় মেঘের পাহাড় দেখিতেছি, বুঝিতেছি, মুক্তির ডাক তাহার গায়ে ঘা খাইয়া প্রতিধ্বনিত হইতেছে, যেন সাড়া দিবার উপক্রম করিতেছি, কিন্তু কিসের বাধায় আঘাত খাইয়া ব্যর্থ আস্ফালনে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছি!

কিসের বাধা?

স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, দেখিলাম, প্রজাপতিটা ঘা খাইয়া আবার মাটিতে পড়িয়া গেল। বাহির হইতে একখানা লম্বা বাঁশ কুড়াইয়া আনিয়া কৌশলে জানালাটাকে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু দেখিলাম, কাজটা কৌশলের বাহিরে। বলপ্রয়োগ করিলাম, মুহূর্ত্তে আরশীটি দ্বিখণ্ডিত হইয়া চুরমার হইয়া খসিয়া পড়িল! এক টুকরা আসিয়া পড়িল মাথায়। কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল।

খবর পাইয়া ম্যানেজার সাহেব আসিলেন। ব্যাপার দেখিয়া ক্রোধে তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। শক্ত কথায় গালি বর্ষণ করিলেন, অবশেষে পিঠে পদাভরণের স্পর্শ দিয়া চিরতরে বিদায় অভ্যর্থনা জানাইলেন।

বাহির হইয়া আসিয়া দেখিলাম, প্রজাপতিটাও মুক্তি পাইয়াছে, তবে সশরীরে নয়, কারণ তাহার একটি ডানা এক খণ্ড কাচের তলায় এখনও চাপা পড়িয়া রহিয়াছে!

সকালে খাওয়া হয় নাই। পথশ্রমে যেন চলিতে পারিতেছি না। পদ্মবিলের কাছে আসিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়াছিলাম। তারপর গণ্ডূষ ভরিয়া জল পান করিলাম! আবার চলিতে সুরু করিলাম। পথের মাঝে হোঁচট খাইয়া আসিতে আসিতে রাগ গিয়া পড়িল কমলীর উপর। বাড়ী পৌঁছাইতে না পৌঁছাইতে চীৎকার করিয়া ডাকিলাম—'কমলী'।

সে ছুটিয়া আসিল।

কোন দিক লক্ষ্য না করিয়া বলিলাম, 'ভাত রেঁধেছিস?'

—'না।'

—'কেন রে?'

—'তুমি সন্ধ্যে বেলায় ফিরবে কেবল...'

—'চুপ কর্। আর দরদ দেখাতে হবে না, দূর হয়ে যা এ বাড়ী থেকে। যত সব আপদ,—নিজের খিদে পেলে এক হাড়ি সিদ্ধ করে, দু'পাথর ভরে আমার চৌদ্দপুরুষের শ্রাদ্ধের পিণ্ডি গিলতে পারেন—আর আমার বেলায় যত সব...'

কমলী তথাপি চুপ করিয়া আছে দেখিয়া আরও রাগ হইল।

অসহ্য রাগে চীৎকার করিয়া উঠিলাম—'দাঁড়া দেখাচ্ছি তোকে। সব বুজরুকি। রোজ আবার মা-লক্ষীর পূজো করা হয়, মা লক্ষী না তোমার বাবা লক্ষী ওকে আবার দিতে হবে—ওকে আবার দিতে হবে ভোগ, না আমার পিণ্ডি?'

ঘরে ঢুকিয়া একটানে ফেলিয়া দিলাম তার মাটীর দেবী উঠানের মাঝখানে। তারপর বলিলাম—'তুই না মরলে এ বাড়ীর লক্ষী-ভাগ্য আর ফিরবে না। যাই, দেখি, গলায় দেবার একগাছা দড়ি জুটিয়ে দিতে পারি কি না।'

বাহির হইয়া নীলমণিদের ভূতের বাগের দিকে অগ্রসর হইলাম।

*

যখন রাগ পড়িল, তখন রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছে। বাড়ী ফিরিলাম। ঘরে ঢুকিয়া চাঁদের আলোয় বেশ স্পষ্ট দেখিলাম...

কি দেখিলাম?...কমলী গলায় দড়ি দিয়া ঝুলিতেছে! নাড়িয়া দেখিলাম সব শেষ হইয়া গিয়াছে। বেশ মনে আছে একবিন্দু চোখের জল ফেলি নাই, একবারও দীর্ঘশ্বাস পড়ে নাই, তবে মুখে বোধ হয় বিরক্তির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

ক্ষুধায় পেটের নাড়ী ছিঁড়িয়া যাইতেছিল, তাই আসিবার সময় বিশু বৈরাগীর দোকানে বাকী দুই পয়সার মুড়ি চাহিয়াছিলাম, তাহার উত্তরে সে বলিয়াছিল, 'এখানে ত আর তোর কমলিরাণী দোকান পাতায় নি।'

কথাটা সত্য। সে আমাকে বাকী দিবে কেন?... কমলী ছাড়া এ জীবনে কে কি বাকীতে দিয়াছে?

চাঁদের আলোয় চাহিয়া দেখিলাম কমলীর নাকে সেই দশ বছর আগেকার ছোট নাক-ফুলটুকু ঝিকমিক করিতেছে—আচম্বিতে প্রজাপতির সেই ভাঙ্গা ডানাটির কথা মনে পড়িল। সেটিও কাঁচের আরশীতে এমনই ঝিকমিক করিতেছিল.....

বাঙ্গালা গদ্যভঙ্গী ও অক্ষয়কুমার দত্ত

—শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী

সময়ের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে অক্ষয়কুমারের গদ্য-সাধনার চেষ্টা বিদ্যাসাগরের পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ হয়। কিন্তু বাঙ্গালা গদ্যভঙ্গীর ধারা ও ক্রমপরিণতির ইতিহাস সঙ্কলন করিতে হইলে, শুধু সন-তারিখ ঠিক করিয়া, কে আগে, কে পরে এইরূপ নির্দ্ধারণ করিলে ক্রমপরিণতি ও গতি-প্রগতির ধারার মধ্যে কোন সূত্র পাওয়া যাইবে না। ঐতিহাসিক ক্রম কোন সময়ই সন-তারিখ দিয়া ঠিক করা সমীচীন হয় না। অক্ষয়কুমারের প্রথম গদ্য-রচনার তারিখ ১৮৪১ সাল হইলেও সাহিত্যের ইতিহাসে এবং গদ্যভঙ্গীর ক্রমপরিণতির ইতিহাসে অক্ষয়কুমারকে বিদ্যাসাগরের প্রধান সহযোগী মাত্র বলিতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে অক্ষয়কুমারের গদ্যরচনার সজ্ঞান প্রচেষ্টা যখন আরম্ভ হয়, তখন হইতেই তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা প্রভাবান্বিত, এমন কি, তাঁহার রচনার মাঝে মাঝে বিদ্যাসাগরের যে হস্তক্ষেপ ছিল, তাহাও সর্ব্ববাদিসম্মত।

বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যিক প্রতিভা এবং সহজাত ভাষাজ্ঞান এত সুপরিপুষ্ট ছিল যে, তাঁহার সমসাময়িক অনেক ব্যক্তিই উপযুক্ত প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াও আপনার প্রতিভার বিকাশ করিবার সুযোগ পান নাই। বিদ্যাসাগর এত বড় ছিলেন যে, তাঁহার সমসাময়িক সকল ব্যক্তিই তাঁহার ছায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেন। না হইলে অক্ষয়কুমার দত্ত যে পথে পদক্ষেপ করিয়াছেন, সে পথ আজ পর্য্যন্তও খুব বেশী জনসমাগম ও জনচলাচলে সুগম হইয়া উঠে নাই। অথচ অক্ষয়কুমার যে স্বকীয় বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে সে দিকে দুঃসাহসীর মত যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহা শুধু সেকালে নয়, একালেও অত্যন্ত বিরল। তবুও তাঁহাকে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্বের কাছে তাঁহার সমস্ত বল-ভরসা-সাহস ছোট করিয়া লইতে হইয়াছে।

অক্ষয়কুমারের গদ্যভঙ্গী ও সাহিত্য-সাধনার প্রথম স্তরে বিদ্যাসাগরের প্রভাব অনিবার্য্য কারণে আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাঁহার মধ্যে যে বলিষ্ঠ স্বকীয়তা ছিল, তাহা পরবর্ত্তী [illegible] সুস্পষ্ট বুঝা যাইবে। কিন্তু তিনি শিক্ষানবিশী করিবার পরই অক্ষয়কুমার নিজের পথ চিনিয়া লইতে পারিয়াছিলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের সাহিত্য-সাধনার পথ যে ভিন্নমুখী, তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। শুধু সাহিত্য-সাধনা নয়, সমস্ত জীবন-সাধনা ও জীবনের কর্ম্মরীতি যে উভয়েরই বিভিন্ন, তাহা আমরা তাঁহাদের কর্ম্ম ও জীবননীতি অনুসরণ করিলেই ধরিতে পারি। বিদ্যাসাগর যেমন একদিকে দেশে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য প্রকৃত কর্ম্মবীরের ন্যায় শিক্ষাপদ্ধতিকে নবরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তেমনই অক্ষয়কুমারও দেশের শিক্ষার জন্যই অন্যদিকে জ্ঞান অন্বেষণ ও জ্ঞান পরিবেশনের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। উভয়ের আদর্শ শিক্ষা-বিস্তার হইলেও, এক জন ছিলেন কর্ম্মবীর, অন্যজন ছিলেন জ্ঞানবীর ও চিন্তাবীর। প্রকৃত জ্ঞানবত্তা ও বিদ্যাবত্তার দ্বারা সমাজের আদর্শকে উন্নত করিবার প্রয়াসই অক্ষয়কুমারের সাহিত্য-সাধনার উদ্দেশ্য ছিল। শিক্ষা-প্রচারের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় সাহিত্য-সৃষ্টির অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু সে সাহিত্য-প্রচেষ্টার মধ্যে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রসার ও গভীরতা খুব বেশী ছিল বলিয়া ধরিতে পারি না। বিদ্যাসাগরের সাহিত্য-সাধনা শিক্ষা-প্রচারে যে টুকু সাহায্য করিয়াছিল, তাহতে চিন্তারাজ্যের প্রথম সোপানে উঠিতে পারা যাইত মাত্র, কিন্তু অক্ষয়কুমার জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণা-মূলক যে সাহিত্য-সাধনায় প্রচেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন, তাহা আরও গভীরতর ও সুদূর-প্রসারী।

অক্ষয়কুমার জ্ঞান-বিতরণের যে আদর্শ লইয়া সাহিত্য-ব্রতী হন, তাহা তৎপরিচালিত "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" ও তৎসংলগ্ন ইতিহাস আলোচনা করিলেই সহজে ধরা যাইবে। ১৮৪০ সালে 'তত্ত্ববোধিনী'-সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং ১৮৪৩ সালে পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার সঙ্গে তাঁহার সাহিত্য-জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। এই 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা তাঁহা দ্বারা পরিচালিত হইয়াই তৎকালীন নবযুগের ভাবজীবনের ইতিহাসে এক শক্তিশালী ও বিপুল ব্যাপার

হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পত্রিকাখানি বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যে এক নূতন আদর্শের পথ দেখায়। যখন একমাত্র দলাদলি ও সাম্প্রদায়িকতাই সাময়িক পত্রিকার উপজীব্য ও আদর্শ ছিল, তখন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' যে কি কাজ করিয়াছিল, তাহা আজ বুঝিয়া উঠিবার সুযোগ নাই। তখন এই পত্রিকাখানি নূতন আদর্শে গম্ভীর ও তেজোপূর্ণ রচনা দ্বারা দেশার সমাজকে সুনীতি ও সুরুচি শিক্ষা দেওয়ার ভার গ্রহণ করিয়া ভাবুক-সমাজ ও গম্ভীর চিন্তাশীল লোকদের নিকট আদৃত হইয়াছিল। এই পত্রিকা দ্বারা যদি তৎকালে কিছুমাত্র সামাজিক সংস্কার হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার সমস্তটুকু কৃতিত্ব অক্ষয়কুমারের প্রাপ্য। এই 'তত্ত্ববোধিনী'র মধ্য দিয়া যখন তিনি তাঁহার সাহিত্য-সাধনার ও জ্ঞানান্বেষণের দ্বার উন্মোচন করিতেছিলেন, তখন হইতেই তাঁহার মধ্যে যে একটা বিশিষ্ট স্বাধীন চিন্তার প্রবণতা সৃষ্টি হইয়া উঠিতেছিল, তাহা আমরা দেখিতে পাইয়াছি। অক্ষয়কুমারের এই স্বাধীন চিন্তাধারার মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজের মত একটা সুপরিচ্ছন্ন সংস্কৃতির পরিচয় ছিল। অক্ষয়কুমারের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে হিন্দু-কলেজে যে স্বাধীন চিন্তার স্ফুরণ হইয়াছিল, সেই চিন্তাধারার মধ্যে নাস্তিকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা, বিজাতীয় ভাবানুকরণ ও স্বদেশদ্রোহিতার একটি তরুণসুলভ তারল্য ছিল। অক্ষয়কুমারের সুপরিচ্ছন্ন মানসিকতা স্বাভাবিক ভাবেই পূর্ব্ব-নাস্তিকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সুদৃঢ় ও গাঢ় ভাবে সৃষ্টি-ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

এই দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে অক্ষয়কুমারকে রামমোহনের ভাবজীবনের বংশধর বলা চলে। রামমোহন ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রীস্থাপনের যে আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার সহিত অক্ষয়কুমারের ভাবগত ঐক্য থাকিলেও তাঁহার পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে অন্য ধারায় মুক্তি পাইয়াছিল। রামমোহন পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে ভিত্তিভূমির উপর ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিকট সুস্পষ্ট হইয়া থাকিলেও দেশের কাছে তাহা তেমনভাবে সুস্পষ্ট করিয়া তিনি তুলিতে পারেন নাই। সেই জন্য তিনি ধর্ম্ম অথবা তৎকালীন সমাজ ও শিক্ষা-সংস্কার দায়ী, তাহা আমরা সঠিকভাবে বলিতে পারিব না।

অক্ষয়কুমার বলিতেন—"তোমরা চিন্তা-রাজ্যে স্বাধীন হও এবং প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়কে আদর করিয়া বুঝিবার চেষ্টা কর। আজ এই বিষবেদ তোমাদের গ্রহণীয়।" এই মনোভাব লইয়াই তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণায় মনোনিবেশ করেন এবং এই মনোভাব লইয়াই তিনি ভারতীয় ধর্ম্ম ও সমাজকে নূতন বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তিভূমিতে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, অনুশীলনের অভাব ও বৈজ্ঞানিকী বুদ্ধির অভাবই আমাদের মোহান্ধতার কারণ। বৈজ্ঞানিকী চিন্তায় দীক্ষিত করা এবং উন্নতশীল জগতের বিচিত্র সাধনা ও উদ্দেশ্যের সহিত সমাজকে পরিচিত করাই তাঁহার জীবনের সাধনা। তাঁহার সাহিত্য-সাধনা এই পথেরই বারবার ইঙ্গিত করিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অক্ষয়কুমারের মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজের মত একটি সুপরিচ্ছন্ন সংস্কৃতির পরিচয় ছিল। এই সংস্কৃত বুদ্ধির জন্যই তাঁহার মধ্যে প্রাচীন ভারতের প্রতি একটী অতি সুগভীর শ্রদ্ধা ও সুপবিত্র ভক্তিমিশ্রিত চিন্তা গড়িয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছিল। ভারতবর্ষের প্রাচীন প্রতিভা, মনীষা ও মহত্ত্ব তাঁহাকে বিমুগ্ধ করিয়াছিল এবং এই বিমুগ্ধ শ্রদ্ধা লইয়াই তিনি "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" লিখিতে আরম্ভ করেন। এই "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" লিখিবার কালে তাঁহার যেরূপ বৈজ্ঞানিকী বুদ্ধি, তথ্য ও তত্ত্ব-বিশ্লেষণের যে মনীষা ও প্রতিভার পরিচয় পাই, তাহা শুধু তৎকালে নয়, এই কালেও অতি বিরল। অতি বিরল বলি কেন, বর্ত্তমানে যেরূপ পল্লবগ্রাহিতা ও তরল-তারল্যের আতিশয্য দেখা যায়, তাহাতে এইরূপ মনীষা ও প্রতিভার পরিচয় আজিও কেহ দিতে পারেন নাই বলিলে কিছুমাত্র মিথ্যা বলা হইবে না।

অক্ষয়কুমারের "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" বাঙ্গালা ভাষায় একটি অতি বিরল, গভীর তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ পুস্তক। এইরূপ দ্বিতীয় পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় আছে কি না জানি না —অন্ততঃ আমাদের চোখে আজও পড়ে নাই। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, এই পুস্তকটি বর্ত্তমানে অতীব দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। কিছুদিন হইল লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে, বাঙ্গালার সাধনা সম্বন্ধে প্রায় যতগুলি প্রবন্ধ বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সমস্তগুলিই অক্ষয়কুমারের এই

পুস্তক অবলম্বন করিয়া লিখিত। দু'একটি প্রবন্ধ ব্যতীত খুব অল্প প্রবন্ধের মধ্যেই উক্ত পুস্তক অপেক্ষা জ্ঞাতব্য কোন তথ্যই লেখকগণ দিতে পারেন নাই। আরও দুঃখের কথা এই যে, খুব অল্প লেখকই এই অবসরে অক্ষয়কুমারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, অক্ষয়কুমারের মন ও সাহিত্যিক প্রেরণার মধ্যে প্রধান বস্তু ছিল বৈজ্ঞানিকী বুদ্ধি। এই জন্য অনেকে তাঁহার সাহিত্য-প্রচেষ্টাকে 'সাহিত্যিক রচনা'র পংক্তিতে ফেলিতে চান না। এই রূপ শ্রেণী-বিভাগ আংশিক সত্য। তিনি প্রবন্ধকার। কিন্তু প্রবন্ধ যে সাহিত্যপদবাচ্য নয়, এই রূপ বলিলে ভুল বলা হইবে—তবে ইহা ঠিক যে, তাঁহার সাহিত্যপ্রেরণা রস-সাহিত্যের অন্তর্গত নয়। কাজেই তাঁহার রচনার প্রেরণার মূলে যাহা রহিয়াছে, তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে তাঁহাকে প্রবন্ধকার হিসাবে দেখিলেই সুবিচার করা হইবে। তাঁহার রচনার মধ্যে যুক্তিতর্ক ও বুদ্ধির কৌশল ব্যতীত কবিত্বের বালাই নাই। তবে মাঝে মাঝে রচনাকে সরস করিয়া তুলিবার জন্য যে wit-এর পরিচয় দিয়াছেন, তাহা তাঁহার মত গম্ভীর লোকের মধ্যে যে কি করিয়া সম্ভব হইয়াছিল ভাবিলে বিস্মিত হই। তাঁহার মানস-প্রকৃতিতে কল্পনার অভাব ছিল এইরূপ বলিতে পারি না। তাঁহার প্রতিভা এবং স্বাভাবিক রসিকতা, বুদ্ধি ও কল্পনার মধ্যে যে সামঞ্জস্য দান করিয়াছে—তাহাতে কল্পনার গতি কোথাও তাঁহার 'রচনাকে আদর্শচ্যুত ও বৈশিষ্ট্য-বর্জ্জিত হইতে' দেয় নাই। পরিশেষে, যাহা সর্ব্বপ্রধান, তাহা এই যে, অক্ষয়কুমারের রচনা যে গুণের জন্য চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রকেই বিমুগ্ধ করিয়া থাকে, তাহা তাঁহার রচনার অন্তর্গত একটি সুপরিচ্ছন্ন সংস্কৃতি ও বলিষ্ঠ সংযম। তাঁহার রচনার অন্তর্নিহিত এই সংস্কৃত চিত্ত ও সংস্কৃত বুদ্ধি তাঁহার সাহিত্যকীর্ত্তিকে একটি বিশিষ্ট উচ্চ আসন দান করিয়াছে। "Akhoy-kumar idealised European Science" এ কথা অনেকে বলেন। কথাটা ঠিকই। এক দিকে যেমন তিনি ইলিয়ড, অডিসি, কুম্‌-এর Scientific Dialogue প্রভৃতির সহিত পরিচিত ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি অতীত ভারতের প্রতিও শ্রদ্ধা ও জিজ্ঞাসা ছিল—এইরূপ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জ্ঞান চিন্তা ও ভাবের সেতু-নির্ম্মাণ করিবার প্রতিভা থাকাতেই তিনি এত বিক্ষুব্ধ ও বিভিন্ন চিন্তাধারার মধ্যে খেই হারান নাই। এক কথায় বলিতে গেলে, তাঁহার লোকাতীত প্রতিভার জন্যই তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাবধারা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদ্বাহ সাধন করিতে পারিয়াছিলেন।

তিনি হয়ত বিজ্ঞানের নূতন তত্ত্ব ও তথ্য অথবা নূতন সত্য আবিষ্কার করেন নাই, কিন্তু এই চিন্তাশীল বিজ্ঞান-ধর্ম্মাবলম্বীর চিন্তাধারার মূলে যে আদর্শ ও সাধনার আভাস পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে এ কথা বলা যায়, প্রকৃত জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকী বুদ্ধি আয়ত্ত করিতে হইলে অক্ষয়কুমারের আদর্শে স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন মত ব্যক্ত করিবার সাহস একান্ত প্রয়োজন। বর্ত্তমান বাঙ্গালার চিন্তাশীল সমাজে কিংবা বিজ্ঞান-চর্চ্চার ক্ষেত্রে অক্ষয়কুমারের সাহিত্য-জীবনের আদর্শ, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কতটুকু প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা আজ ভাবিবার সময় আসিয়াছে।

অক্ষয়কুমারের ভাষা ও সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, পরবর্ত্তী যুগে তাঁহার ভাষা ও রচনা-রীতির বিবর্ত্তন কিংবা ক্রমবিকাশ হয় নাই। তাঁহার ভাষার এই পরম্পরা সংঘটিত না হইবার কি কারণ এবং এই জন্য দায়ীই বা কোন্ সংস্কার, তাহা ভাবিয়া দেখিবার সময়ও আজ আসিয়াছে।

অক্ষয়কুমারের ভাষা খাঁটি গদ্যলক্ষণযুক্ত। খাঁটি গদ্য রূপকে যে বলা হয় product of intellect, অক্ষয়কুমারের গদ্য তাহাই, কিন্তু তাঁহার পর বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্য যে ধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল, তাহা প্রধানতঃ রস-সাহিত্যের উদ্দেশ্যে এবং এই জন্যই পরবর্ত্তী যুগে রস-সাহিত্যের বাহন-স্বরূপ গদ্যভাষাও অনিবার্য্যরূপে কাব্যধর্ম্মী হইয়া উঠিল। ইহা দ্বারা হয়তো রস-সাহিত্য, তথা উপন্যাস-সাহিত্য কিঞ্চিৎ প্রসার লাভ করিল বটে, কিন্তু গদ্য বলিতে যে যুক্তিসম্মত (logical) গদ্যরূপের আবির্ভাবের সম্ভাবনা ছিল, তাহার পথ রুদ্ধ হইয়া গেল। অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা গদ্যরূপকে যে কাঠামো দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই আদর্শের অতি শীঘ্রই পরিবর্ত্তন ঘটিল।

বাঙ্গালা গদ্যরূপের কাঠামোর পরিবর্ত্তনের গতি-প্রকৃতির ধারার মধ্যে বাঙ্গালীর জাতিগত একটা বৈশিষ্ট্য কার্য্য করিয়াছে। খাঁটি গদ্যরূপের সাধনার জন্য যে রূপ চিন্তা,

যুক্তি ও বৈজ্ঞানিকী বুদ্ধির প্রয়োজন, তাহা বাঙ্গালীর ভাব-কল্পনায় কখনও খাপ খায় না—ভাব-প্রবণ বাঙ্গালীর পক্ষে গদ্য অপেক্ষা কাব্যই অধিকতর স্বাভাবিক ভঙ্গি লইতে বাধ্য। কিন্তু খাঁটি গদ্যরূপ কতকটা যে প্রথম যুগে—বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের রচনাতে—আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা আমরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছি।

অক্ষয়কুমারের রচনার প্রধান গুণ এই যে, তাহা সংক্ষিপ্ত, অনাড়ম্বর ও বাহুল্যবর্জ্জিত—'that absolute precision of statement which is the mark of excellent prose' অক্ষয়কুমারের গদ্যে তাহার আভাস পাইয়াছি।* প্রবন্ধ-রচনার অনুযায়ী, যথাযথ ভাব-প্রকাশের সংযম, উপযোগী ভাষা, "বিদ্যা পরম ধন, ধর্ম্ম তাহার উপরের বস্তু" ; "দুর্জ্জন-সংসর্গ অপেক্ষা নির্জ্জন বাস ভাল" প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত গদ্যরূপের প্রকৃষ্ট নমুনা আমরা অক্ষয়কুমারের রচনায় পাইয়াছি। কিন্তু উত্তরকালে বাঙ্গালা গদ্যের এইরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞানমূলক সাহিত্যসৃষ্টি না হওয়ায়, আমরা তাঁহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। বাঙ্গালা সাহিত্যের এই বিভাগে অক্ষয়কুমার নিতান্ত নির্জ্জনে একক হইয়া পড়িয়া থাকায় তাঁহাকে উপযুক্ত সম্মান ও সাহিত্যিক মর্য্যাদা দান করিতে পারি নাই।

বাঙ্গালা সাহিত্যের এই বিভাগের যদি কোনদিন চর্চ্চা হয়, তবে এই অক্ষয়কুমারের ভাষাই যে প্রধান উপজীব্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

* Middleton Murry—On style.

হে নটী-নগরী

—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

এ বিংশ শতাব্দীর যন্ত্র-যুগে যন্ত্রণার গীতি
সর্ব্বহারা নরকণ্ঠে যে ক্রন্দন উঠিতেছে নিতি,
তুমি তার বিন্দুমাত্র শুনেছ কি হে নটী-নগরী!
শুনেছ কি সিন্ধুতটে রুদ্র-নট রক্তবস্ত্র পরি
তোমার সংহার লাগি রণোল্লাসে দুর্য্যোগ-বিলাসী!
অদূর ভবিষ্যে বিষ বারুদের বাষ্পে পৌরবাসী
ভস্ম হবে অকস্মাৎ। তব ক্লীব নাট্যসম্প্রদায়
কোথায় রহিবে, কহ, সেদিনের দৈন্য-দুর্দ্দশায়!

শত শত পল্লী কাঁদে তুমি হাস প্রেমের উৎসবে,
ভাব নাই হে সুন্দরি! কালচক্রে তুমি ধ্বংস হবে!
তোমার বন্দর হতে বাজিবে না জাহাজের বাঁশী,
অশ্রুপারাবারে তব দেহখানি দূরে যাবে ভাসি।
কৃত্রিম সৌন্দর্য্য তব সর্ব্বনাশী সভ্যতার দান,
স্বভাব-সুষমা নাহি, সুকোমল নহে চিত্তপ্রাণ,
জলৌকার মত কবে জন্ম নিলে জীবনের স্রোতে
জীবের শোণিতপায়ী বিধাতার অভিশাপ হতে!

কলঙ্ক-কালিমা-পঙ্ক মাখিয়াছ আনন্দিত মনে,
সমগ্র জাতির রক্ত শুষিতেছ গাঢ় আলিঙ্গনে
তবু তুমি স্থির নহ। আকাঙ্ক্ষার উদগ্র স্পন্দন
প্রমত্ত যৌবনে তব নিত্য জাগে—কেমনে ক্রন্দন
শুনিবে কোথায় ওঠে! উচ্ছৃঙ্খল বিলাসীর সাথে
নৃত্য কর নিশিদিন, সুরাপাত্র শোভিতেছে হাতে
মত্ততায় বিবসনা। কোটি মুদ্রা দেহের বিলাসে
ঢালিতেছে মুগ্ধ নর তব পদে যৌবন পিয়াসে।

সহস্র ছলনা তব স্বার্থে স্বার্থে ঘাত-প্রতিঘাতে,
সংসারের যাত্রাপথে কঙ্কালের শুষ্ক মাল্য গাঁথে।
তোমার চক্রান্তে হেরি ভাগ্যলক্ষ্মী বনবাসে যায়
দুখিনী জানকী সম। দ্যূতক্রীড়া করিয়া হেথায়
সর্ব্বস্বান্ত নর-পশু—বাজি রাখে কুললক্ষ্মী যত,
দ্রৌপদীর সম তারা নির্য্যাতন সহি অবিরত
তোমার মৃত্যুর লাগি ঈশ্বরের করে আরাধনা,
দেহ-পণ্য-বিনিময়ে তুমি কর ঐশ্বর্য্য-সাধনা!

জোড়াদীঘির চৌধুরী-পরিবার

—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

[২২]

নাটোরের কালেক্টার মিঃ বার্ড মস্ত বীর। ইংরেজ মহলে তাঁহার উপনাম বোনাপার্ট-বিজয়ী। মিঃ বার্ডের জীবনে এক প্রকাণ্ড ইতিহাস আছে। উনবিংশ শতকের প্রথমে সে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক বড়সাহেবের খানসামারূপে ভারতবর্ষে আসে এবং দশ বারো বছর এ দেশে কাটাইয়া প্রভুর সঙ্গে ইংলণ্ডে ফিরিয়া যায়। সে ১৮১৫ খৃঃ অব্দের কথা; তখন নেপোলিয়ান বেলজিয়াম আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছেন; ডিউক অব্ ওয়েলিংটন ব্রুসেলসে সৈন্য সমাবেশ করিয়াছেন; দলে দলে ইংরেজ পুরুষ ও মহিলা তামাসা দেখিবার জন্য ব্রুসেলসে যাইতেছে। মিঃ বার্ডও একজনের অনুচর রূপে সেখানে গিয়াছিল।

১৬ই জুন ব্রুসেলস্-এর কিছু দক্ষিণে দুইটি যুদ্ধ হয়; লিনির যুদ্ধ-ক্ষেত্রে স্বয়ং সম্রাট্ ব্লুকারকে পরাজিত করিয়া খেদাইয়া দেন; তাহার কিছু পূবে কোয়াটার ব্রাস্-এর যুদ্ধ-ক্ষেত্রে ওয়েলিংটন ও মার্শাল নে'র মধ্যে লড়াই হয়। ব্লুকারের পরাজয়ে অনন্যগতি ডিউক কোয়াটার ব্রাস ত্যাগ করিয়া ব্রুসেলস্-এর দিকে পশ্চাদপসরণ করেন— (ইংরেজ পালাইতে পারে না—আর পালাইলেও ইতিহাসের পাতায় তাহা সংশোধন করিয়া লইতে জানে)। এই ব্যাপারে ব্রুসেলসের বীরবৃন্দের ইংরেজ-মহলে বড় ত্রাসের সঞ্চার হয়, যে যেমন ভাবে ছিল, তেমনই ভাবে পালাইতে আরম্ভ করে; ইংলণ্ড-গামী জাহাজে স্থান পাওয়া ভার হইয়া উঠে। মিঃ বার্ড এই পলায়নপর দলের অগ্রগণ্য ছিল।

ইংলণ্ডে ফিরিয়া কিছুকাল জিরাইয়া মিঃ বার্ড ভারতবর্ষে যাত্রা করিল—এবার সে একাকী, কাহারও অনুচর নহে। জাহাজ সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে পৌছিলে যাত্রীরা একটু বেড়াইয়া লইবার জন্য নামিল—কিন্তু মিঃ বার্ড অনুসরণ করিল না; ব্রুসেলস্-এর অভিজ্ঞতা সে ভুলিতে পারে নাই; যদিও নেপোলিয়ান তখন ইংলণ্ডের [illegible] থাকিতে এক [illegible] ঘোড়াশালে বন্দী—কিন্তু কি জানি কিছু বলা যায় না। মিঃ বার্ড জাহাজের রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া বাইনোকিউলার-সহযোগে বন্দী সম্রাটের কারাগারের ছাদ দেখিয়া লইল, তারপর একদিন সুপ্রভাতে কলিকাতায় পৌছিল।

কলিকাতার সাহেব-মহলে সে অচিরকালের মধ্যে ওয়াটার্লু যুদ্ধের এক জন আহত সৈনিক বলিয়া খ্যাত হইয়া উঠিল; পড়িয়া গিয়া কপালে চোট লাগিয়াছিল—ফরাসী সঙ্গীনের গুঁতা বলিয়া তাহা রটনা করিয়া দিল; স্বদেশ-প্রেমিক সাহেব ও মেমগণ দলে দলে মিঃ বার্ডের পেট্রিয়টিক গুঁতা দেখিতে আসিয়া নিজেদের ধন্য মনে করিতে লাগিল; শেষে একদিন সেই আঘাত লাটসাহেবের নজর পড়িয়া মিঃ বার্ডের অদৃষ্টের গুণে রাজটীকায় পরিণত হইল; এত বড় একটা জাঁদরেল বীর খানসামা-গিরি করিবে ইংরাজেরা তাহা সহ্য করিতে পারিল না; মিঃ বার্ড নাটোরের কালেক্টার নিযুক্ত হইল। সে কলিকাতা ত্যাগ করিলে কলিকাতার সান্ধ্য-মজলিস প্রত্যক্ষদর্শী বোনাপার্ট-বিজয়ীর নবনবায়মান গল্পের অভাবে নিরানন্দ হইয়া পড়িল, কিন্তু বোনাপার্ট-বিজয়ী মিঃ বার্ড নাটোরের কালেক্টার হইয়া দোর্দণ্ড প্রতাপে অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

এ হেন মিঃ বার্ডের কাছে জোড়াদীঘির অত্যাচারের কাহিনী লইয়া রক্তদহের লোক আসিল এবং মিঃ বার্ড ঘোড়ায় চড়িয়া জোড়াদীঘির দস্যুকে শাসন করিবার জন্য রওনা হইবার উদ্যোগ করিল। খবর পাইয়া সাহেবের পেস্কার আসিয়া বলিল—হুজুর দু'চার জন সিপাহী নিয়ে যাওয়া ভাল; চৌধুরীরা বড় ভাল লোক নয়।

সাহেব হাসিয়া বলিল, তুমি বিউনোপার্টের নাম শুনিয়েছ? পেস্কার নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নয়—সে বলিল, আজ্ঞে নাম শুনি নাই, তবে দেখেছি, সেই যে—

সাহেব তাহাকে থামা ইয়া দিয়া বলিল, আমি তাহাকে

জয় করিয়েছি এই বলিয়া সে শিষ দিতে দিতে ঘোড়া ছুটাইয়া জোড়াদীঘি রওনা হইয়া গেল।

জোড়াদীঘিতে আসিয়া সাহেব দেখিল জমিদার-বাড়ির বিশাল দেউড়ি বন্ধ; সে ঘোড়া হইতে নামিয়া চাবুক দিয়া ঘা দিয়া দরজা খুলিতে বলিল—কেহ তাহার কথা শুনিল না—দরজা বন্ধই রহিল। সাহেব রাগিয়া ইংরেজী ও বাংলায় তর্জ্জন করিল—দরজা তাহাতেও খুলিল না; বরঞ্চ ভিতর হইতে কে যেন হাসিয়া সাহেবকে ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দিল।

সাহেব রাগিয়া লাল হইয়া ইংরেজীতে শাসন করিয়া হিন্দুস্থানীতে শাসাইয়া ফিরিবার জন্ম ঘোড়ায় চড়িল।

এতক্ষণ গ্রামের ছোট ছোট ছেলে-মেয়ের দল চুপ করিয়া ছিল, এবার তাহারা বোনাপার্ট-বিজয়ীর পরাজয় দেখিয়া হাততালি দিয়া সুর করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল—

'হাতি পর হাওদা ঘোড়া পর জিন
জলদি যাও, জলদি যাও, ওয়ারেণ হেষ্টিন'

সাহেব কোন রকমে গ্রামের বাহিরে আসিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া নাটোরে আসিয়া পৌঁছিয়া মস্ত এক রিপোর্ট লিখিয়া ফেলিল।

সাহেব লিখিল, জোড়াদীঘিতে মস্ত এক brigand chief আছে; তাহার fortress দখল করিতে অন্তত পাঁচশত সিপাহী ও কামান দরকার। শীঘ্র ইহা দখল করিতে না পারিলে ইহারা রাজসাহী জেলা জয় করিয়া লইবে। রিপোর্ট কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়া সাহেব রংপুরে ও মুর্শিদাবাদে সিপাহী চাহিয়া জরুরি ঘোড়-সোয়ার পাঠাইল। বোনাপার্ট-বিজয়ী বীর সহজে এই 'নেটিভ ব্রাইগ্যাণ্ড'কে ছাড়িবে না।

[২৩]

পরন্তপ রায়কে জোড়াদীঘির বাড়ীতে আনিয়া প্রথমে দর্পনারায়ণ সদখানে রাখিয়াছিল—কিন্তু পরন্তপ গোলমাল আরম্ভ করিল, মারধর সুরু করিল, শেষে পালাইতে গিয়া তিন চার বার ধরা পড়িল। তখন বাধ্য হইয়া তাহাকে কয়েদ-খানায় স্থানান্তর করা হইল। সেকালের বড় বড় জমিদারদের সকলেরই প্রায় কয়েদ-খানা থাকিত; দুর্দ্ধর্ষ লোকদের এই সব ঘরে বন্ধ করিয়া রাখা হইত; কাহাকেও নিহত করিবার আবশ্যক হইলেও এই খানে বধ করা হইত।

চৌধুরীদের কয়েদ-খানা মাটির তলে অবস্থিত, বাহির হইতে বুঝিবার উপায় নাই। ভিতরের হতভাগ্য বন্দী চীৎকার করিয়া মরিলেও বাহির হইতে তাহা শোনা যায় না; ইহা এমন সুকৌশলে প্রস্তুত যে, যে জানে না, সে ইহার অস্তিত্ব টের পাইবে না।

কয়েদ-খানাটি বিশ হাত, দশ হাত ছোট একটি কুঠুরী, এদিকে দেওয়ালের খুব উঁচুতে লোহার শিক লাগানো ছোট একটি ঘুলঘুলি; কোন রকমে বন্দীর বাঁচিয়া থাকিবার মত একটু আলো-বাতাস আসিতে পারে মাত্র; একটি মাত্র দরজা—লোহার, বাহির হইতে বন্ধ করিয়া দিলে পৃথিবীর সঙ্গে কয়েক-খানার সম্বন্ধ লোপ পায়। পরন্তপ রায়কে এই ঘরে বন্ধ করিয়া দর্পনারায়ণ নিজের শয়ন-কক্ষে চাবি রাখিয়া দিল। দিনের মধ্যে তাহার তত্ত্বাবধানে পাচক-ব্রাহ্মণ বার দুই খাদ্য ও জল দিয়া আসিত।

রক্তদহ হইতে কয়েক গাড়ী পথরেছে আসিয়া পৌঁছিল। বাস্তুর বাগানের নিভৃততম অংশে গভীর গর্ত্ত করিয়া তাহা পুঁতিয়া ফেলা হইল, হত্যাকাণ্ডের সমস্ত চিহ্ন এই ভাবে নিশ্চিহ্ন করা হইল।

ইতি মধ্যে বার্ড সাহেব আসিয়া ফিরিয়া গেল; সকলে নিশ্চিন্ত হইল; কিন্তু দর্পনারায়ণ, আদিত্যনারায়ণ ও দেওয়ানজী বুঝিল, ইহা বিপদের কেবল সূচনা; তাহারা আসল বিপদের জন্ম প্রস্তুত হইতে লাগিল।

[২৪]

ইন্দ্রাণী আবার বনমালাকে চিঠি লিখিতে বসিয়াছে। চাঁপা ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিল, চিঠিখানা হারাইয়া না গেলে সে কোন না কোন রকমে তাহা বনমালার হাতে পৌঁছিয়া দিত; ইন্দ্রাণী পুনরায় তাহাকে পাঠাইবে স্থির করিয়া চিঠি লিখিতেছে। বনমালার নাম ইন্দ্রাণী

জানিত না ; দরকারও নাই, কারণ চাপা গিয়া চিঠি তাহার হাতে দিয়া আসিবে।

ইন্দ্রাণী লিখিল—

"বোন্,

আমাকে তুমি চেন না, আমিও তোমাকে জানি না। কিন্তু রক্তদহ বলে একটা গ্রাম আছে, এতদিনে বোধ হয় তা শুনেছ ; আমি রক্তদহের জমিদার-কন্যা, আবার রক্তদহেরই জমিদার-পত্নী।

তুমি জোড়াদীঘির জমিদার-পত্নী ; জোড়াদীঘি আর রক্তদহের ইতিহাস নিশ্চয়ই তুমি শুনেছ ; সে ইতিহাসের মাঝখানে যে-আবর্ত আজ পঙ্কিল হয়ে উঠে রক্তদহকে গ্রাস করতে চলেছে, তার সর্বগ্রাসী ক্ষুধাকে এখন একমাত্র তুমিই বাধা দিতে পার।

আমি বয়সে তোমার চেয়ে যে খুব বেশি বড় হ'ব তা নই, কিন্তু কালের হিসাব সংসারের হিসাব নয় ; বিধাতা কাউকে পাঠিয়ে দেন শুক্তির মধ্যে পূরে, তাঁর ইচ্ছা মুক্তা চিরকাল থাকুক কোমল ; মানুষ তাকে টেনে বের করলেই সে কঠিন হয়ে উঠে ; আবার কাউকে পাঠিয়ে দেন কঠিন কঙ্করের আকারে, কালক্রমে তার কঠোরতা কোমলতায় হয় পর্য্যবসিত। কাজেই বয়সের হিসাবে মাপলে তোমাকে আমার উপদেশ দেবার অধিকার নেই ; কিন্তু তবুও আছে, কেন না মহাকাল আমাকে উপেক্ষা করেন নি ; বহু দুঃখের অভিজ্ঞতার চাপে আমার মনের কোমল মুক্তা প্রস্তর হয়ে উঠেছে।

তাই আজ তোমার কাছে স্বীকার করছি, এক সময়ে অনভিজ্ঞতার প্রগল্‌ভতায় ভেবেছিলাম সুখ হচ্ছে জীবনের লক্ষ্য ; কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই দণ্ডিত মন বুঝতে পারল, সুখ নয়, জীবনের লক্ষ্য, শান্তি।

এ কথা স্বীকার করবার কারণ হচ্ছে এই যে, সুখকে লক্ষ্য মনে করে যে পথে একদা চলেছিলাম, তখন জানতাম না, কিন্তু এখন বুঝেছি, সেই পথ গিয়েছিল ঐ ইতিহাসের আবর্তের ঘাটে, শৈল-সোপান যার পতনে পিচ্ছিল, প্রবল স্রোতধার বিশ্বাসঘাতী, স্রোত যার সর্ব-গ্রাসী সাগরমুখী এবং তার আবর্ত শত্রু-মিত্রের তুচ্ছ বিচার জানে না।

নিজে চলে যেখানে এসেছি, তার দায়িত্ব অস্বীকার করি কেমন করে ? ইচ্ছাও নেই, আর থাকলেই বা কি ? বিধাতার দণ্ড যেমন বৃহৎ তেমনই সূক্ষ্ম-বিচারী, তার কাছে মানুষের সূক্ষ্ম বিচার অত্যন্ত স্থূল।

এইটুকু ভূমিকা। আমার স্বামী চৌধুরীদের বাড়ীতে বন্দী ; দোষ তাঁর আছে ; অন্তত যে কৃপাপ্রার্থী তার পক্ষে দোষ-গুণ বিচার সমীচীন নয়। বিধাতার দণ্ড থেকে কেউ বাঁচাতে পারে না, কিন্তু মানুষের দণ্ড থেকে পারে ; বিধাতার দণ্ড তাঁকে লাগবেই, আর তার থেকে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখব এমন শক্তিশালী আমি নাই, তেমন ইচ্ছাও নেই ; সে দণ্ড না পেলে তিনি হবেন কৃপার পাত্র। কিন্তু মানুষের দণ্ড থেকে বাঁচাতে কেন না চেষ্টা করব ! তুমিও আমার অবস্থায় করতে ! জানি না, তাঁর প্রতি কি বিধান হয়েছে, যদি তাঁকে বাঁচাতে পার—চেষ্টা করো ! মানুষের শাস্তি থেকে তাঁকে বাঁচাতে পারলেও নিশ্চয় জেন বিধাতা তাঁকে ভুলবেন না ; তিনি কাউকেই ভুলবেন না ; আর যারা দণ্ডের যোগ্য, তাদের দণ্ড ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। জীবনে তুমি সুখ পাও, এমন প্রার্থনা করব না, কারণ আমি তোমার শত্রু সে জন্য নয়, আসল কারণ আগেই লিখেছি, যা হবার নয়, তা দিয়ে তোমাকে, যার কাছে আমি কৃপাপ্রার্থী, তাকে বঞ্চনা করবার মত আমি বিশ্বাসঘাতক নই। জীবনে শান্তি পাও। ইতি—

ইন্দ্রাণী।"

আমরা যত সহজে লিখিলাম, ইন্দ্রাণী তত সহজে লিখিতে পারিল না ; অনেক ছিঁড়িল, অনেক ভাবিল, বহুক্ষণের পরিশ্রমে সে চিঠি তৈয়ারী করিয়া চাঁপার খোঁজ করিতে যাইবে, এমনই সময়ে বেতা ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া উপস্থিত।

ইন্দ্রাণী কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই সে সুর করিয়া ধরিল —

এবার কংস ধ্বংস হবে,
গোকুলের গোয়ালার কোপে —

তারপরে খাঁটি গদ্যে বলিল,—মা ঠাকরুণ—এবার মজা বুঝবে—পাখীটিরও যাতায়াতের পথ বন্ধ ! বলিয়া আবার পূর্ব্বোক্ত গান ধরিল।

ইন্দ্রাণী বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—ব্যাপার কি ?

—আর ব্যাপার ! আমি আর বলি কেমন করে ? থাকত মোতির মা, বলত !

– মোতির মা যখন নেই, তুই-ই বল।

তারপরে বেঙার কাছ থেকে ইন্দ্রাণী যাহা সংগ্রহ করিল, তার মধ্যে হইতে সুর, পাঁচালী ও অনুপস্থিত মোতির মার অভিজ্ঞতা বাদ দিলে দাঁড়াইল এই যে,—নাটোরের কালেক্টার সাহেব পাঁচশত (বেঙার বর্ণনা ! কিছু কম হওয়া আশ্চর্য্য নয়) সিপাহী আনিয়া চৌধুরী-বাড়ী ঘেরাও করিয়াছে—বাড়ীর ভিতরে বাহিরে যাতায়তের পথ একেবারে বন্ধ !

সংবাদ শুনিয়া ইন্দ্রাণীর আনন্দিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল ! সে ভাবিল, তাহা হইলে এই চিঠি লইয়া যাইবার যেটুকু আশা ছিল, তাহাও গেল। তাহার মনে হইল, অকস্মাৎ অতর্কিত ভাবে বিপন্ন হইয়া দর্পনারায়ণ পরন্তপের উপরে মারাত্মক কিছু করিয়া বসিতে পারে। সে বুঝিল—পুলিশ আসিয়া পড়াতে তাহার সমস্যা জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে।

তাহার মনে হইল, এই চিঠি বনমালার হাতে পৌছানো আগের চেয়ে আরও বেশী দরকার, কিন্তু কে লইয়া যাইবে ? চাঁপা মেয়েমানুষ হইলেও তাহাকে প্রবেশ করিতে দিবে না—আর, তাহার যাইতেও সময় লাগিবে।

হঠাৎ একটা উপায় তার মনে পড়িল। বেঙা বনমালার লোটন পায়রাটি চুরি করিয়া আনিয়াছিল ; সে বলিয়াছিল, এ পায়রা ছাড়া পাইলেই আবার বনমালার কাছে উড়িয়া যাইবে ; ইন্দ্রাণী তাহাকে সযত্নে খাঁচায় পুরিয়া রাখিয়াছিল। তাহার মনে হইল—এই পায়রা ছাড়া চিঠি পাঠাইবার আর উপায় নাই।

ইন্দ্রাণী পায়রাটি খাঁচা হইতে বাহির করিয়া আনিয়া তাহাকে একটু আহার্য্য দিল, তাহার গায়ে যত্নে হাত বুলাইল, তারপর চিঠিখানা ভাঁজ করিয়া লাল রেশমী সুতা দিয়া সন্তর্পণে তাহার পায়ের সঙ্গে ভাল করিয়া বাঁধিয়া দিল। তখন সে পায়রাটিকে লইয়া পশ্চিমের ছাদে গিয়া দাঁড়াইল। মনে মনে ভগবানের নাম স্মরণ করিল ; তারপরে দুই বাহু ঊর্দ্ধে আন্দোলিত করিয়া পায়রাটি আকাশে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দিল। পায়রাটা কো... অনেক উচ্চে উঠিয়া গিয়া ঠিক ইন্দ্রাণীর মাথার উপরে কয়েকবার পাখা ঝটপট করিয়া উড়িল, তারপরে তীরবেগে জোড়াদীঘির দিকে সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারের মধ্যে বিলীন হইয়া মিলাইয়া গেল। পায়রাটি সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টির অতীত হইলে ইন্দ্রাণী ছাদ হইতে ঘরে ফিরিয়া আসিল।

[২৫]

সেদিন সন্ধ্যায় বনমালা তেতলার শয়ন-কক্ষে একাকী বসিয়া ছিল ; কিছুদিন হইতে তাহার মনের অবস্থা ভাল ছিল না ; একটার পরে একটা অশান্তির ঢেউ চৌধুরী-পরিবারকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল—সে একাকী বসিয়া তাহার তরঙ্গ গণনা ছাড়া আর কি করিতে পারে !

তাহার স্বামী ও দেবরেরা রক্তদহের বাড়ী লুঠ করিতে গিয়াছিল ; সেখান হইতে তাহারা বিজয়ী হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে ; রক্তদহের জমিদারকে ধরিয়া আনিয়া কয়েদ-খানায় বন্দী করিয়া রাখিয়াছে ; তারপরে সে শুনিয়াছিল, কালেক্টার সাহেব আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে ; অবশেষে গত কল্য হইতে সাহেব সিপাহী লইয়া আসিয়া বাড়ী ঘেরাও করিয়াছে। দেউড়ি এখনও খুলিয়া দেওয়া হয় নাই ; তবে সে শুনিয়াছে, সিপাহীরা গুলী চালাইলে দেউড়ি খুলিয়া দেওয়া হইবে ; রাজশক্তিকে প্রতিরোধ করা চৌধুরীদের কর্ত্তব্য নয় এবং সম্ভবও নয়।

পশ্চিমের বিলীয়মান আলোকের পটে, ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে বনমালা যেন তাহার জীবনের, চৌধুরীদের ইতিহাসের আভাস দেখিতে পাইতেছিল—এমন সময় তাহার কোলের উপরে কি যেন আসিয়া পড়িল—সে একেবারে চমকিয়া উঠিল ; পর মুহূর্ত্তেই তাহার বিস্ময় আনন্দে পর্য্যবসিত হইল ! তাহার পায়রাটি ! কোথা হইতে এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে সে আসিল ? পাখীটি বনমালার কোলে বসিয়া তাহার বুকের উপরে মুখ ঘসিয়া অব্যক্ত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। বনমালা তাহাকে হাতে করিয়া পাখার হাত বুলাইয়া, গালের উপর চাপিয়া ধরিয়া আদর করিতে লাগিল ; হঠাৎ তাহার হাতে কি যেন বাধিল ; তাকাইয়া দেখে, একখানা কাগজ ভাঁজ করিয়া

তাহার পায়ে বাঁধা; কাগজখানা খুলিয়া দেখিল; একখানা চিঠি। তাহার বিস্ময় বাড়িল বই কমিল না, সে [illegible] মধ্যে [illegible] আলো জ্বালাইয়া এক নিঃশ্বাসে চিঠিখানা পড়িয়া ফেলিল।

পায়রা দিয়া চিঠি পাঠাইবার বুদ্ধি স্থির হইলে ইন্দ্রাণী [illegible] দিয়া লিখিয়াছিল :—

“ভাই, একদিন আমাদের চাকর বৈরাগী সেজে তোমাকে দেখতে গিয়েছিল, ফিরে আসবার সময় সুযোগ পেয়ে তোমার পায়রাটি চুরি করে এনেছিল। সে জন্য তাকে বকেছিলাম; কিন্তু আজ মনে হচ্ছে এর মধ্যেও অদৃষ্টের ইঙ্গিত ছিল, নইলে এই চিঠি আজ তোমাকে পাঠাতাম কেমন করে?”

চিঠির ‘পুনশ্চ’ অংশ পড়িয়া বনমালার কাছে পায়রা চুরির ইতিহাস স্পষ্ট হইয়া উঠিল। সে অনেক বার রক্ত-[illegible] জমিদার-কন্যার ছাপ ধ্যানে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে, শুনিয়াছে, সে অহঙ্কারী, দাম্ভিক, আজ এমন অসময়ে তাহার পরাজয়-স্বীকারে বনমালার আনন্দিত হওয়া উচিত ছিল—কিন্তু হইতে পারিল না; কিংবা আনন্দিত হইয়াছিল, বুঝিতে পারিল না। নতুবা এমন করিয়া তাহার [illegible] জন্য প্রস্তুত হইতে পারিত না।

বনমালা চিঠিখানা পাঁচ সাত বার পড়িয়া স্থির করিল, [illegible] জমিদারকে বাঁচাইতে হইবে; সেই অদৃষ্টা, অহঙ্কারিণী পত্র-লেখিকার মিনতিকাতর দুই চোখ বারংবার তাহার মনে পড়িতে লাগিল; বনমালা স্থির করিল, স্বামীকে না জানাইয়াই সে বন্দী জমিদারকে ছাড়িয়া দিবে। ভাল কাজ করিতে আবার অনুমতির কি আবশ্যক? তাতে তাহার স্বামীরও কল্যাণ হইবে।

কয়েদখানার চাবি শয়ন-ঘরেই থাকিত; সে চাবিটি লইল, চিঠিখানা লইল এবং বাম হাতে একটি প্রদীপ লইয়া কয়েদখানার দিকে প্রস্থান করিল।

কয়েদখানার দিকে লোকজন ছিল না—বনমালা সকলের অলক্ষিতে কয়েদখানার দরজায় গিয়া দাঁড়াইল এবং নিঃশব্দে বন্ধ দ্বার খুলিয়া ফেলিল।

কিন্তু পরন্তপ তাহাকে দেখিতে পাইল না. সে তখন পিছন ফিরিয়া মাটিতে অর্দ্ধ-প্রোথিত একটা নর-কঙ্কালের উপর লাথি মারিতেছিল; পায়ের আঘাতে একটা হাড় ছিটকাইয়া পড়িল—পরন্তপ তাহা দেখিয়া হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর সে নিজের মনে বকিতে লাগিল—

একটা, আর একটা! এই তো আমার উপযুক্ত শয্যা! নর-কঙ্কালের শর-শয্যা! যত মানুষ মরেছে আজ তারা কঙ্কাল বিছিয়ে আমার জন্য শয্যা রচনা করে রেখেছে!

একখানা অস্থি হাত দিয়া তুলিয়া দেয়ালের উপর ঠুকিতে ঠুকিতে পুনরায় বলিতে লাগিল—আর দেরি নেই, সময় হ'য়ে এল; পাতো বিছানা আমি আসছি!

পরন্তপকে দেখিয়া চিনিবার উপায় নাই, এই কয়দিনে এমনই তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; মাথার চুল রুক্ষ হইয়া অবিন্যস্ত হইয়াছে; মুখে দাড়ি কণ্টকিত, চক্ষু রক্তবর্ণ; গায়ের সজ্জাতেও যেন ভাগ্যহীনতার আভাস! কণ্ঠস্বর ভগ্ন ও গম্ভীর, যেন কোন্ কবরের মধ্য হইতে উঠিতেছে। কয়েদখানায় নিক্ষিপ্ত হইবার পর হইতে তাহার ধারণা হইয়াছে, মৃত্যু তাহার নিশ্চিত; আর মৃত্যুর চিহ্ন এখানে এমন অবিরল যে, মৃত্যু ছাড়া আর কিছু ভাবিবারই উপায় নাই। এই আর্দ্র, সিক্ত, ভূগর্ভনিহিত, অন্ধকার, নির্জ্জন কক্ষ মৃত্যুর প্রতীক! না ইহাই মৃত্যু। উপরের ওই লোকালয়, আলো, বায়ু, হাসি, গান, প্রাণের চাঞ্চল্য, জীবন; আঃ, এই লোকচক্ষুর অতীত কারাগার মৃত্যু! মৃত্যুর পরে মানুষ এই রকম এক বিভীষিকা-লোকে জাগিয়া ওঠে। তাহার এক একবার ভুল হইয়াছে, সে সত্যই মরিয়া আছে, না জীবিত!

হঠাৎ পরন্তপের কি রোখ চাপিল, সে দেয়ালে আঘাত করিতে লাগিল; ইটের গাঁথুনি হইতে অনেক কষ্টে দু'এক খানা ইট খসাইয়া সবেগে মাটিতে নিক্ষেপ করিল; একখানা স্থূল অস্থি উঠাইয়া লইয়া প্রাণপণে দেয়ালের উপর আঘাত করিতে লাগিল; জীর্ণ অস্থি বহু খণ্ড হইয়া ছড়াইয়া পড়িল; সে পুনরায় হাঃ হাঃ করিয়া উন্মাদের হাসি হাসিল, এই পরিশ্রমে সে খুঁকিয়া পড়িয়াছিল, হাত দিয়া কপালের ঘাম মুছিতে লাগিল।

বনমালা নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল—বন্দীকে

তাকিতে তাহার সাহস হইল না। বন্দী যে অপরাধী সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল না, কিন্তু এখন তাহার অবস্থা চোখে দেখিয়া মন গলিয়া গেল। এই লড়াইয়ে বহু লোক মরিয়াছিল, সে জানিত; সে জানিত আরও অনেক লোক আহত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে এত দুঃখ হয় নাই; কিন্তু এখন একটা লোকের দুঃখ দেখিয়া বহু অদৃষ্ট লোকের পুঞ্জীভূত দুঃখ সে ভুলিয়া গেল—এমন কি, এই লড়াইয়ের ন্যায়পরতায় পর্য্যন্ত তাহার অবিশ্বাস জন্মিল! মানুষ এমনই অদ্ভুত জীব! ইন্দ্রিয়ের অগোচর অভিজ্ঞতা তাহার কাছে মিথ্যারই সামিল। বনমালা যেমনটি ছিল নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, অজ্ঞাতসারে তাহার চক্ষুপ্রান্তে অশ্রু জমিয়া উঠিতে লাগিল।

পরন্তপ আগের মতই নিশ্চল দেয়ালকে লক্ষ্য করিয়া যেন বলিতে লাগিল—জীবনের প্রান্তে মৃত্যু সুনিশ্চয়! কিন্তু সে মৃত্যু যদি আসে ক্লান্তদেহে, শয্যাপার্শ্বে, ম্লান দীপালোকে, সেবা-রত, স্নেহ-কোমল হস্ত দুখানির তত্ত্বাবধানের অবকাশ এড়িয়ে, তবে আর সে মৃত্যু মৃত্যু নয়, বিভীষিকা নয়, ক্ষোভের নয়। আর এই মৃত্যু—অন্ধকার কক্ষে, নির্জ্জনে, নিঃসঙ্গে, উঃ কী ভীষণ!

এই কথা স্মরণ করিয়া সে যেন আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল। আবার বলিয়া চলিল—মৃত্যু, তিলে তিলে, পলে পলে, অনাহারে, কদর্য্যে। না, না, তার চেয়ে ঘাতকের খড়্গ অনেক ভাল! এক আঘাতে অনেক দুঃখের পর্য্যাবসান!

সে থামিল; মনে হইল দ্বার খুলিয়া কেহ দাঁড়াইয়াছে সে যেন জানিতে পারিয়াছে; সে ঘুরিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, কে এসেছ, আমার ঘাতক! কাছে আসিয়া দীপহস্তা বনমালাকে দেখিয়া প্রেত-দৃষ্টের মত চমকিয়া উঠিল! বনমালাও এবারে তাহাকে দেখিল; সে ভয়ে বিস্ময়ে কাঠ হইয়া না গেলে চমকিয়া উঠিয়া তাহার হাতের দীপ পড়িয়া যাইত; কিন্তু কাষ্ঠ-পুত্তলিকার হাত হইতে দীপ পড়িল না। দীপের আলো পরন্তপের মুখে পড়িল, আর উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে নিষ্পলক ভাবে চাহিয়া রহিল।

পরন্তপ দেখিল পলাশীর মাঠের সেই রমণী; বনমালা দেখিল, পলাশীর মাঠের সেই উদ্ধত যুবক; পরন্তপ লক্ষ্য করিল—তাহার বধূ-বেশ; বনমালা দেখিল—দুর্দ্দশাপন্ন সেই যুবক; পরন্তপ বুঝিল—আজ আর তাহার নিস্তার নাই; বনমালা ভাবিল—ইহাকে কখনই সে উদ্ধার করিবে না।

পরন্তপ প্রথমে কথা বলিল; জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কে?

বনমালা বলিল—আমি চৌধুরী-বাড়ীর পুত্রবধূ।

পরন্তপ আবার জিজ্ঞাসা করিল—আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি।

বনমালা সংক্ষেপে বলিল—সে কথা ভুলে যান।

পরন্তপ বলিল—ভুলব! ভুলতে ত চাই! কিন্তু আমি ভুললেও যে ভগবান্ তোলেন না! না, ভগবান্ আছেন!—সে যেন নিজের মনেই কথাগুলি বলিল!

—না, না, ভগবান আছেন সুনিশ্চিত। তা নইলে আজ এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে দণ্ডের আয়োজন তিনি করবেন কেন? ভগবান আছেন, নইলে অসহায়ের হাতে বজ্র দেয় কে? পাপের প্রায়শ্চিত্ত এমন অমোঘ হয়ে দাঁড়ায় কার আজ্ঞায়? মৃত্যু এবার সুনিশ্চিত! এই বলিয়া সে ক্ষোভে, দুঃখে, বিস্মিত ত্রাসে দুই হাত দিয়া মাথার চুল ছিঁড়িতে লাগিল।

পরন্তপ যখন এই সব কথা বলিতেছিল, বনমালা ভাবিতেছিল, এই দুর্ব্বৃত্তকে উদ্ধার করিয়া কাজ নাই; দণ্ড যাহার প্রাপ্য, ভগবান যদি তাহাকে দণ্ডের জন্য আনিয়া থাকেন, তবে মুক্তি দিবার তাহার কি অধিকার আছে? সে একবার ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছিল, কিন্তু অমনি ইন্দ্রাণীর অদৃশ্য চক্ষু-যুগল তাহার মনে পড়িল, সে আবার দাঁড়াইল।

পরন্তপ বলিতে লাগিল—আজ তোমার দণ্ড দেবার দিন, সুযোগ করায়ত্ত; ছেড় না আমাকে, আমি প্রস্তুত। কি দণ্ড, আজ্ঞা কর!

বনমালা কথা বলিতে পারিল না।

—শুধু—এই অনুরোধ, জানি অনুরোধের অধিকার

আমার নেই—তবু বলছি! তিলে, তিলে পলে পলে কারাগারের বিষাক্ত বায়ুতে আমাকে মরতে দিও না—যেমন ওই সব হতভাগ্য নর-কঙ্কাল! তোমার ঘাতক আছে, সৈন্য আছে, খড়্গ আছে, বন্দুক আছে, তারই এক আঘাতে, একগুলিতে। শাস্তির মধ্যেও তারতম্য আছে; দণ্ডাদেশেও দয়ার স্থান আছে। মুহূর্তের দণ্ডবিধানে তুমি কৃপা কর।

এই বলিয়া সে দ্রুত ছুটিয়া আসিয়া বনমালার পায়ের কাছে পড়িল।

বনমালা বলিল—আপনি বাইরে চলুন। বিস্মিত পরন্তপ বলিল—বাইরে। একটু থামিয়া বলিল—তবে আমার প্রার্থনা মঞ্জুর! কারাগার, নয় ঘাতক!

বনমালা আবার বলিল—বাইরে চলুন—তাড়া আছে।

পরন্তপ যন্ত্র-চালিতের মত তাহাকে অনুসরণ করিয়া বাহিরে আসিল; বনমালা আবার বলিল—আমার সঙ্গে আসুন। পরন্তপ তাহাকে অনুসরণ করিয়া চলিল; বনমালা তাহাকে সঙ্গে করিয়া ক্ষীণ দীপালোকিত পথ দিয়া অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া বাহির বাগান অতিক্রম করিয়া চৌধুরী-বাড়ীর প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল।

পরন্তপ জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় তোমার ঘাতক?

বনমালা বলিল—আপনি মুক্ত!

সে মূঢ়ের মত আবৃত্তি করিল—আপনি মুক্ত!

বনমালা বলিল—আপনি মুক্ত। এই পথ দিয়ে সোজা বের হয়ে চলে যান, অন্য পথ ধরবেন না; তাতে ক্ষতি হবে। কিছু দূর গেলেই বিলের ধারে গিয়ে পড়বেন—সেখানে রক্তদহ যাবার পথ পাবেন, রাত্রি থাকতেই রক্তদহে গিয়ে পৌঁছবেন—নইলে আবার ধরা পড়বার আশঙ্কা আছে!

সে যেন কিছুই বুঝিতে পারিল না!

বনমালা বলিল—তাড়াতাড়ি চলে যান; বিলম্বে বিপদ হতে পারে।

পরন্তপ শুধু বলিল—মুক্তি কেন?

বনমালা তাহাকে ইন্দ্রাণীর চিঠিখানা দিয়া বলিল,—এই কাগজখানা পড়ে দেখবেন, সব বুঝতে পারবেন! আমি চললাম, আপনার আর বিলম্ব করা উচিত নয়।

এই বলিয়া সে অন্তঃপুরের পথ ধরিল। পরন্তপ এক মুহূর্ত কাগজখানা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া যখন বুঝিল, তাহার মুক্তি যথার্থ, বিদ্রূপ নয়, তখন সে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া দ্রুত চৌধুরী-বাড়ী ত্যাগ করিয়া মাঠের মধ্যে নামিয়া পড়িল।

[২৬]

চৌধুরী-বাড়ীর বৈঠকখানায় মন্ত্রণা-সভা বসিয়াছে; বার্ড সাহেব বহু সিপাহী লইয়া বাড়ী ঘেরাও করিয়াছে; গুজব রটিয়াছে যে কামান আসিতেছে; আসিয়া পৌঁছিলেই বাড়ী আক্রান্ত হইবে।

অনেক পরামর্শের পর স্থির হইল, দেউড়ি খুলিয়া দেওয়াই উচিত, কিন্তু তার আগে সাহেবের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি লইতে হইবে যে, বাড়ীতে অযথা কোন অত্যাচার হইবে না।

তখন রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়াছে, আলিবন্দী সর্দার একটি মশাল হাতে করিয়া দেউড়ির দালানের উপর উঠিয়া কোম্পানীর ফৌজকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "সাহেব কোম্পানীর সঙ্গে বিবাদ করা আমাদের ইচ্ছা নয়, সে শক্তিও নাই, আমরা দেউড়ি খুলে দিতে রাজি আছি, কিন্তু তার আগে সাহেবের কাছে থেকে জবান চাই বাড়ীর মধ্যে কোন অত্যাচার হবে না। যদি হয়, বাড়ীতে আমাদের এখনো আড়াইশ লাঠিয়াল আছে, এ কথা মনে রাখতে বলি।'

বার্ড সাহেব জাত-ইংরেজ, কোথায় কতখানি বল প্রকাশ করিতে হয় জানে; সে প্রতিশ্রুতি দিল অযথা অত্যাচার করা হইবে না।

বিনাজলে দেউড়ি খুলিয়া গেল।

বার্ড সাহেব সশস্ত্র পঁচিশ জন সিপাহী লইয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, চৌধুরীদের কয়েদখানা কোথায়? সেকালের বড় বড় জমিদারদের প্রায় সকলেরই কয়েদখানা থাকিত, কাজেই সাহেবের প্রশ্ন অসঙ্গত হয় নাই, বিশেষ, তাহার পাশেই রক্তদহের

একজন লোক ছিল, সে লোকটাই কয়েদখানার সংবাদ দিয়াছিল।

এতক্ষণে দর্পনারায়ণ ও আলিবর্দীর চমক ভাঙ্গিল; তাহারা বুঝিল সাহেব আসিবার পূর্ব্বে পরন্তপকে মুক্তি দেওয়া উচিত ছিল; গোলমালে কথাটা কাহারও মনে পড়ে নাই; কিন্তু এখন আর হায় হায় করা বৃথা, সকলে সাহেবকে কয়েদখানার দিকে লইয়া চলিল।

কয়েদখানার ঘরে উপস্থিত হইয়া সাহেব ও দর্পনারায়ণ উভয়েই বিস্মিত হইল; বোধ করি দর্পনারায়ণেরই বিস্ময় অধিক হইল; সাহেব নিশ্চিত সংবাদ পাইয়াছিল, রক্তদহের জমীদার কয়েদখানায় বন্দী; কিন্তু নিজের চক্ষে সে দেখিল, কয়েদখানা শূন্য; দর্পনারায়ণ ভাবিল, পরন্তপ গেল কোথায়? মুক্তি পাইল কেমন করিয়া, সাহেব নিজের মনে চিন্তা করিয়া বলিল, হুম্! তার পর হাতের ছড়ি দিয়া রক্তদহের লোকটার পিঠে কয়েক ঘা বসাইয়া দিয়া বলিল, "নিকালো শালা, ইউ লায়ার।"

কিন্তু ইহাতে চৌধুরীদের ভাগ্য প্রসন্ন হইল না, চৌধুরীদের কর্তৃক সাহেবের বৃটিশ প্রেষ্টিজ অপমানিত হইয়াছে; বোনাপার্ট-বিজয়ী লাঞ্ছিত হইয়াছে; সাহেব সেই নষ্ট প্রেষ্টিজ উদ্ধার করিবার আশায় ফিরিয়া গিয়া চৌধুরীদের বৈঠকখানায় বসিল, সাহেবের আদেশকে অমোঘ করিয়া তুলিবার জন্ত পঁচিশ জন সশস্ত্র সিপাহী সঙ্গীন খাড়া করিয়া চারি দিকে দাঁড়াইয়া রহিল।

[২৭]

পরন্তপ বিলের ধারে গিয়া রক্তদহের পথ ধরিল, শীতের রাত্রে পথ নির্জ্জন, সে দ্রুত চলিতে লাগিল; কিন্তু প্রাণপণে চলিয়াও সে ভোর হইবার পূর্ব্বে রক্তদহে পৌঁছিতে পারিল না, পথ কম নয়, শরীর দুর্ব্বল। দিনের বেলা পথ চলিবার সাহস তাহার ছিল না, স্থান অরাজক, তাই সে কোথাও আত্মগোপন করিবার ইচ্ছা করিল।

গ্রামের নাম লক্ষ্মীপুর; রক্তদহ এখান হইতে বেশি দূর নয়; সে স্থির করিল, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এখানে লুকাইয়া থাকিয়া রাত্রি প্রথম প্রহরের মধ্যেই বাড়ী পৌঁছিবে।

পথের ধারে একটা জঙ্গল ছিল; সেখানে প্রবেশ করিয়া দেখিল, পুরানো একটা দীঘির পাড়ে জীর্ণ একটা মন্দির; সে প্রাণ ভরিয়া দীঘির জল পান করিল; জঙ্গল হইতে কিছু ফলমূল সংগ্রহ করিয়া খাইল; তারপরে মন্দিরের মধ্যে শুইয়া পড়িল; অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ঘুমাইয়া পড়িল।

যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, দেখিল সন্ধ্যা আসন্ন; বিলম্ব না করিয়া আবার পথে চলিতে লাগিল।

রাত্রি দেড় প্রহরের সময় সে রক্তদহের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল, কাহারও সাথে দেখা করিবার আগে সে বরাবর ইন্দ্রাণীর কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল।

ইন্দ্রাণী তখন অন্ধকারে একাকী বসিয়া ছিল,—স্বামীকে দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল, কিন্তু পরন্তপের চোখে সে চমক ধরা পড়িল না।

পরন্তপ তাহার কাছে গিয়া বলিল—ইন্দ্রাণী আমি এসেছি।

ইন্দ্রাণী অত্যন্ত সাধারণ ভাবে বলিল—শরীর ভাল তো? তাহার কণ্ঠস্বরে হৃদয়াবেগের লেশ মাত্র ছিল না।

পরন্তপ চমকিয়া উঠিল! এ কি! এত বিপদের পরে সাক্ষাতের এই কি কণ্ঠস্বর! সে পুনরায় বলিল—ইন্দ্রাণী অনেক বিপদ কাটিয়ে এসেছি; ফিরবার কোনই আশা ছিল না, ইন্দ্রাণী শুধু বলিল—জানি!

পরন্তপ মূঢ়ের মত অনুবৃত্তি করিল—জানি। তারপরে বলিল—আমি ফিরে আসাতে তুমি সুখী হওনি?

পাষাণী বলিল—অসুখী হইনি!

পরন্তপ বিস্মিত হইয়া বলিল—বটে? আমাকে মুক্তি দিবার জন্তে চিঠি দিয়েছিলে কেন?

ইন্দ্রাণী আবেগহীন কণ্ঠে বলিল—চিঠি লিখেছিলাম কেন? তবে শোন—এ সর্ব্বনাশের খেলায় তোমাকে আমিই নামিয়ে ছিলাম, তোমার বিপদের দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার, সেইজন্ত কর্ত্তব্য পালন মাত্র করেছি।

ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন হইল—ইন্দ্রাণী তুমি কি আমায় ভালবাস না?

অতি সংক্ষিপ্ত একটি উত্তর—না।

—কিন্তু আমি যে তোমাকে ভালবাসি ইন্দ্রাণী—

—অনাবশ্যক।

আবেগোলিত কণ্ঠে পরন্তপ চীৎকার করিয়া উঠিল—তুমি পাষাণী, পাষাণী!

ইন্দ্রাণী দাঁড়াইয়া উঠিয়া সংযত কণ্ঠে বলিল—এতদিনে তুমি আমাকে বুঝেছ! আমি পাষাণী—সত্যিই পাষাণী!

তারপরে শূন্য গহ্বরের মধ্য হইতে উত্থিত ধ্বনির ন্যায় শ্রুত হইতে লাগিল—আমি পাষাণী! আমার হৃদয় নাই, হৃদয়াবেগ নাই; ভালবাসা নাই, ভালবাসার আবশ্যকতা নাই; আমাকে কেউ ভালবাসতে পারে না, আমিও কাউকে ভালবাসি না; আমার সংসার নাই, সাংসারিকতা নাই। যে-বিধাতা মানুষ গড়েন, আমি তাঁর সৃষ্টি নই; যিনি গড়েছেন পাহাড়-পর্ব্বত, নদী-সমুদ্র, অরণ্য-কান্তার, আমি তাঁরই রচনা; মানুষের সংসারে আমি প্রক্ষিপ্ত; আমি লোকাতীত, লোকোত্তর আমার শত্রু নাই, মিত্র নাই, আপন নাই, পর নাই; আমার দোষ নাই, প্রেম নাই, আমার হিংসা নাই, ঈর্ষা নাই; আমি পুরুষ নই, নারী নই; আমি পাষাণী! আমি পাষাণী! পাষাণের মত নির্ব্বাক, নির্জ্জন, নির্জ্জীব, নিস্তব্ধ; বাসনার অতীত; সুখ-দুঃখের ঊর্দ্ধে, আমার প্রাণ নাই, কাজেই মৃত্যুও নাই; আমি ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ কিছু নই; আমার ন্যায় নাই, অন্যায় নাই; সত্য নাই, মিথ্যা নাই, আমি মানুষ নই, কাজেই মানুষের মাপকাঠি আমার কাছে পরাঙ্মুখ; আমি অলৌকিক, আমি পাষাণী!

স্থির সংযত কণ্ঠে এই কথাগুলি বলিতে বলিতে ইন্দ্রাণী অন্ধকারের মধ্যে প্রস্থান করিল।

মূঢ় পরন্তপ একাকী দাঁড়াইয়া রহিল।

[২৮]

বার্ড সাহেব চৌধুরীদের সহজে ছাড়িলেন না; যদিও পরন্তপ রায়কে বে-আইনীভাবে বন্দী করিয়া রাখিবার অভিযোগ প্রমাণিত হইল না, তবু তাহারা নিস্তার পাইল না। বে-আইনী দাঙ্গা এবং সাহেবকে দেউড়ির সম্মুখে অপমানিত করিবার জন্য দর্পনারায়ণ, রঘুনাথ, বিশ্বনাথ ও [illegible] দায়রে চালান দেওয়া হইল। বিচারে তাহাদের সাত বৎসর করিয়া জেল হইল। তাহারা রাজসাহী ফাটকে আবদ্ধ হইল।

আইনের ক্রোধ এইখানেই থামা উচিত, কিন্তু বোনাপার্ট-বিজয়ী সাহেবের ক্রোধ থামিল না। সে উপরে লিখিয়া দর্পনারায়ণ ও উদয়নারায়ণের যাবতীয় জমিদারী বাজেয়াপ্ত করিল, সে-কালে কোম্পানীর আইন ন্যায় অন্যায়ের সূক্ষ্ম ভেদ করিয়া তারের উপরে দিয়া বিচরণ করিত না; ঘটোৎকচের মত দোষী-নির্দোষ সকলের ঘাড়ের উপর চাপিয়া পড়িত। সাহেবের রোষে চৌধুরীদের মধ্যম তরফ সর্ব্বস্বান্ত হইল।

সাহেবের ক্রোধ হইতে সামান্যই রক্ষা পাইল, বাড়ী খানা ও কায়ক্লেশে গ্রাসাচ্ছাদন চালাইবার মত কিছু ব্রহ্মোত্তর জমি মাত্র বাঁচিল।

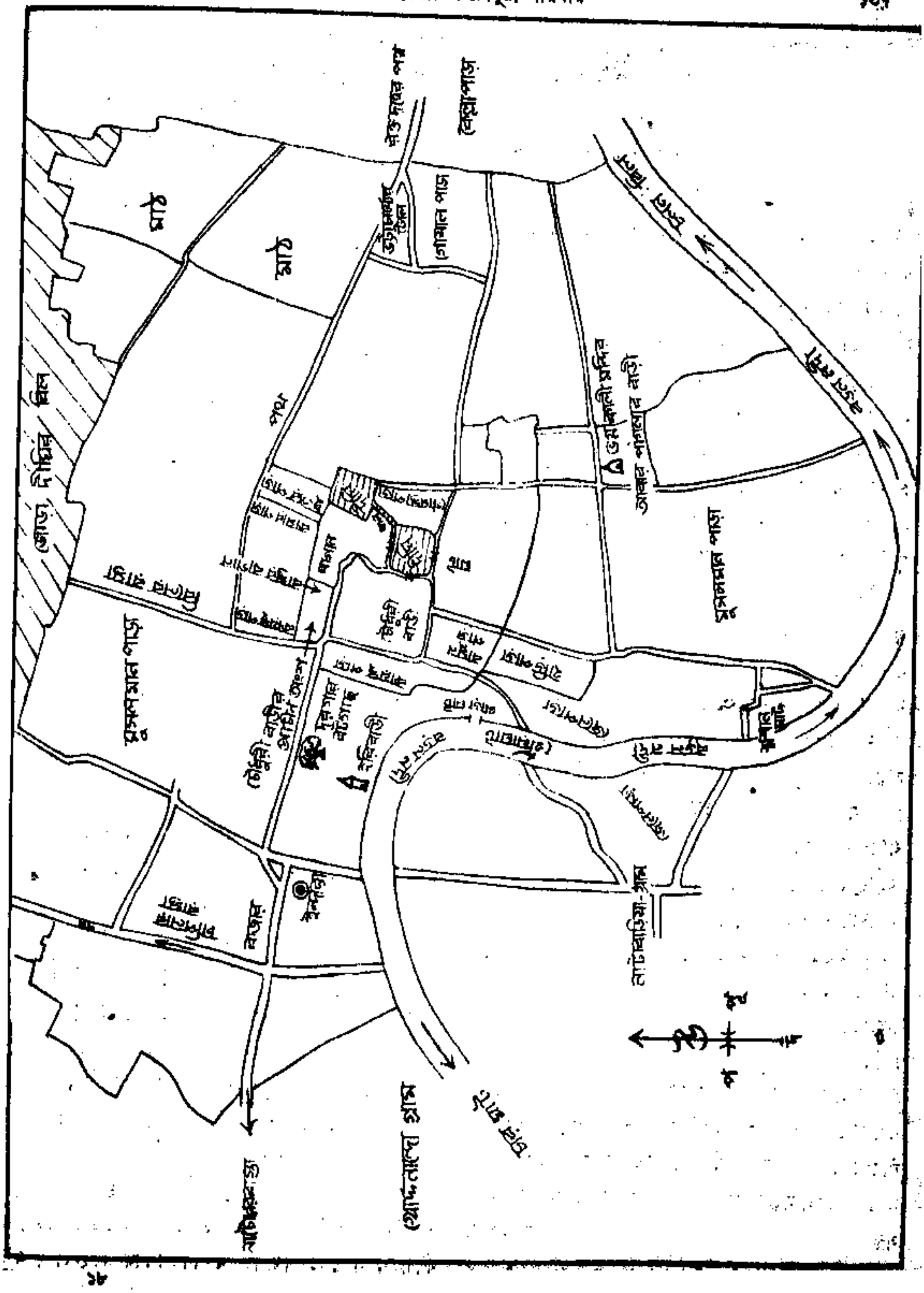
উদয়নারায়ণ

[১]

বহুদিন আমরা উদয়নারায়ণের সাক্ষাৎ পাই নাই; এতবড় একটা ঘটনা ঘটিয়া গেল তাহার মধ্যে উদয়নারায়ণকে দেখা গেল না। এই ঘটনা ত্রিশ বছর আগে ঘটিলে তাহাকে সর্ব্বাগ্রে দেখা যাইত এবং খুব সম্ভবতঃ দর্পনারায়ণের পরিণাম তাহার ঘটিত না।

কিন্তু আসন্ন-নবতিবর্ষ বৃদ্ধ আজ যে শুধু জীর্ণদেহ তাহা নয়। প্রকৃতি তাহার প্রতি অভাবিত করুণা করিয়াছেন। যে-ইন্দ্রিয়গ্রামের মাধ্যমে সংসারের সুখ-দুঃখ মানুষ ভোগ করিয়া থাকে, তাহার সেই ইন্দ্রিয়গ্রাম আজ বিকল, নবতিবর্ষ বয়সে সুখবোধের সম্ভাবনা আর কোথায়—মানুষের অদৃষ্টে তখন অবিমিশ্র দুঃখ; কিন্তু সে যদি অন্ধ হয়, বধির হয়, সেই পরিমাণে তাহার সৌভাগ্য, দৃষ্টি ও শ্রুতির কটু অভিজ্ঞতা হইতে তাহার রক্ষা। উদয়নারায়ণ আজ অন্ধ, বধির, চলৎশক্তিহীন।

অনেকদিন তাহার শরীর ভাঙিয়া পড়িতেছিল, কিন্তু পৌত্রের বিবাহের জন্য বিজয়ী জরার নিকটে সে পরাজয় স্বীকার করে নাই, বহু-বাঞ্ছিত বিবাহে বাধা পড়িল, ক্ষীয়মান শক্তিকে শেষ বারের জন্য সংহত করিয়া সে পৌত্র



ও পৌত্রদ্বয়ের সন্ধানে বাহির হইল; অনেক অন্বেষণ করিয়া তাহাদের বাড়ীতে ফিরাইয়া লইয়া আসিল এবং দর্পনারায়ণকে জমিদারীর ভার অর্পণ করিয়া বৃদ্ধ সংসারের নিকট বিদায় লইয়া তেতালার ঘরে আশ্রয় লইল। সেখানেই তাহার আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম; নীচে নামিত না; কদাচিৎ বাহিরের লোকের সঙ্গে দেখা করিত; এখন আর চৌধুরী-বাড়ী কম্পিত করিয়া তাহার অট্টহাস্য ও তীব্র ভর্ৎসনা ধ্বনিত হয় না; জীবনের হাসি ও অশ্রু উভয়ের কাছ হইতে সে ছুটি পাইয়াছে।

কাজেই উদয়নারায়ণ রক্তদহের সঙ্গে দাঙ্গার কথা জানিতে পারিল না; জানাইবার আবশ্যকতাও কেহ বোধ করিল না; দর্পনারায়ণের কয়েদও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবার কথাও সে জানিতে পারিল না; জানাইতে কেহ সাহসও করিল না; অন্ধত্ব ও বধিরত্বের অজ্ঞতার আবরণে পূর্ব্ববৎ সে সুখে জীবনযাপন করিতে লাগিল।

ইতিপূর্ব্বে দেওয়ান রামজয় লাহিড়ী বনমালার সঙ্গে কথা বলিত না, কিন্তু এখন বিপদের চাপে তাহাদের মধ্যের সঙ্কোচের ভেদ ঘুচিয়া গেল, সব রকম সাংসারিক ব্যবস্থায় রামজয় বনমালাকে সঙ্গী করিয়া লইল।

সঞ্চিত অর্থ যাহা ছিল, বেশির ভাগই রক্তদহের সঙ্গে দাঙ্গায় ও মামলায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। তাহা দিয়া লোকের দেনা-পাওনা মিটানো হইল, অধিকাংশ দাসদাসী, আমলা, কর্ম্মচারী ও বরকন্দাজদের মাহিনা শোধ করিয়া বিদায় করিয়া দেওয়া হইল।

বাড়ীর মধ্যের দুজন চাকর ও দাসী, যাহাদের তিন কুলে কেহ ছিল না, এবং যাহাদের জীবনের তিন ভাগ এই বাড়ীতে কাটিয়াছে, কেবল তাহারা থাকিল; আর থাকিল দেউড়িতে বৃদ্ধ কর্ত্তার সিং; বলা বাহুল্য রামজয় লাহিড়ী থাকিল; সে কখনও নিজেকে চৌধুরী-বাড়ীর ভৃত্য মনে করে নাই, কাজেই তাহার চাকুরী ছাড়িয়া দিবার কোন কথাই উঠিল না। কয়েকটি প্রাণী লইয়া বাড়ীর কাজকর্ম্ম নীরবে চলিতে লাগিল, কর্ত্তা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কেবল সন্ধ্যাবেলায় দেউড়িতে ডঙ্কা বাজাইবার সময় [illegible] শঙ্কিত হইয়া থাকিত; স্মরণাতীত কাল হইতে [illegible] অবিচ্ছেদে ডঙ্কা বাজে, ইহার অন্যথা কখনও হয় নাই; সবাই জানিত কর্ত্তা এই সঙ্কেতের জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকেন, পাছে তিনি ডঙ্কার শব্দ না শুনিতে পান; ভীত আত্মজন বধিরের কর্ণকেও বিশ্বাস করিতে পারিত না, কর্ত্তার সিং সন্ধ্যাবেলা ডঙ্কায় কাঠি দিত; যে দিন সে অলক্ষ্য কারণে অনুপস্থিত থাকিত, রামজয় লাহিড়ী চুপি চুপি গিয়া ডঙ্কা পিটিয়া আসিত, সে না পারিলে বুড়ী দাসী গিয়া ডঙ্কায় ঘা দিত।

রামজয় লাহিড়ী মাসে মাসে কর্ত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইত; বৃদ্ধ কাণে সাধারণতঃ শুনিতে পাইত না বটে, কিন্তু কেহ পরিচিত কণ্ঠে উচ্চস্বরে কথা বলিলে কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেন; সেই জন্য তাঁহার সঙ্গে খুব জোরে কথা বলিতে হইত, তাই সকলের কণ্ঠ তাঁহার শ্রুতিগোচর হইত না; বৃদ্ধ বলিত, রামজয় কান দুটো একেবারে গিয়েছে, এত বড় বাড়ীতে এত লোকজন, একটু গোলমালও কানে পৌঁছায় না। শঙ্কিত লাহিড়ী মনে মনে ইষ্টনাম স্মরণ করিত।

কর্ত্তা মহালের খবর লইতেন, আদায়-পত্রের সংবাদ জানিতে চাহিতেন, লাহিড়ী দশ বৎসর আগে যেমন বলিত, তেমনই বলিয়া যাইত। তিনি লাটের খাজনার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিতেন, দেওয়ানজী তাঁহাকে নিরুদ্বেগ করিত। আর দর্পনারায়ণের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, কখনও বলিত, সে মহালে গিয়াছে, কখনও বলিত, জরুরী কাজে তাহাকে সদরে যাইতে হইয়াছে, কখনও বলিত, সে নীচেই আছে। কর্ত্তা হাসিয়া বলিতেন, আজকাল ওর খুব খাটুনী পড়েছে, কি বল?

তারপরে নিজের মনেই বলিতেন, বুঝুক একবার জমিদারী দেখা কি যে-সে কাজ! বুঝুক এখন বুড়ো ঠাকুরদাদাকে কি পরিশ্রমই না করতে হয়েছে!

মাঝে মাঝে পুরাতন কর্ম্মচারী, চাকর, প্রজাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিতেন; দেওয়ানজী বলিত, তাহারা সকলেই ভাল আছে; কখনও বলিত, অমুক প্রধান কাল দেখা করতে এসেছিল।

[২]

কিন্তু একটা বিপদের জন্য কেহই প্রস্তুত ছিল না, না বনমালা, না দেওয়ানজী। আশ্বিন মাসের কাছাকাছি এক

দিন উদয়নারায়ণ দেওয়ানজীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামজয় এবার পুজোর কি করছ ?"

রামজয় ইহার জন্ত প্রস্তত ছিল না, চমকিয়া উঠিল, কিন্তু পর ক্ষণেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "আজ্ঞে যথারীতি হবে।

কর্ত্তা বুঝিয়া বলিলেন, "যথারীতি নয়, এবার একটু ধুমধাম বেশী করতে হবে।"

তারপর যেন নিজের মনেই বলিয়া চলিলেন, "আর বেশী দিন বাঁচব না, এবার পূজা যদি পাড়ি দিতে পারি, তবেই যথেষ্ট, বেশী বাঁচলেই নানা দুঃখ দেখে যেতে হয়, এবার একটু আয়োজন ভাল করে' কর।"

তারপর রামজয়কে বলিলেন, বস, আমার যা ইচ্ছে বলে যাই ; একখানা কাগজে টুকে নাও।"

এই বলিয়া দুর্গাপূজার রাজস্থয় ধরণের এক তালিকা প্রস্তত করিয়া দিলেন ; চৌধুরীদের পূজায় খুব ধুম হয়, কিন্তু এবারের আয়োজন তাহাকেও ছাড়াইয়া গেল ; রামজয় মাথায় হাত দিয়া নামিয়া আসিল।

রামজয় ও বনমালা পরামর্শ আরম্ভ করিল ; বহু দিন বহু বার তর্ক ও পরামর্শের পর স্থির হইল, কর্ত্তার তালিকা মত, সামান্ত ভাবেও পূজা করা অসম্ভব, অতএব বৃদ্ধকে, অন্ধ, বধির, চলৎশক্তিহীন জরাগ্রস্ত বৃদ্ধকে বঞ্চনা করিতে হইবে।

রামজয় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "সম্পত্তি নেই, পূজা করা সম্ভব নয়, বলে কর্ত্তার মনে আঘাত দিতে পারব না ; তাতে ব্রহ্মহত্যা ঘটবে ; তার চেয়ে তাঁকে বঞ্চনা করব, এর যা পাপ তার দায়ী আমি।"

বনমালা শুধু বলিল, "অর্দ্ধেক দায়িত্ব আমার।"

[৩]

সপ্তমীর দিন প্রভাতে তিনজন লোকের সাহায্যে উদয় নারায়ণ পূজা-মণ্ডপের বারান্দায় আসিয়া বসিলেন, তারপরে প্রতিমা-বিহীন বেদী-মূলে প্রণাম করিয়া বলিলেন, মা জীবনে অনেক অপরাধ করেছিলাম, নইলে বেঁচে থেকেও তোমাকে দেখতে পাব না কেন ? চোখে দেখতে পাই, আর না পাই তুমি আছই ; এ পোড়া মনে ভক্তি আছে কি না তাহা মা, সে কথা তুমিই ভাল জান।

তারপরে নিজের মনেই যেন বলিলেন, তবে এই সৌভাগ্য যে তুমি নিজের বাড়ীতে এসেছ ; অবস্থা যেমনই থাকুক, বৎসরান্তে একবার নিজের বাড়ীতে আসতে ভুল না।

মণ্ডপের মধ্যে গৃহ-দেবতার পূজাস্থান হইতে ধূপ ও শেফালি ফুলের গন্ধ আসিতেছিল, বৃদ্ধ তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, রামজয় ঢাকের বাজনাই বল আর ঘণ্টার শব্দই বল, ধূপের গন্ধ আর শিউলী ফুলের সুবাসের কাছে কিছুই নয়। এ দুটো থেকেই বোঝা যায় মা ঘরে এসেছেন।

তারপরে একটু থামিয়া, হাসিয়া বলিলেন, মার দয়া আছে ; আমার চোখ কাণ নিয়েছেন বটে, দেখতেও পাইনে, শুনতেও পাইনে, কিন্তু তবু বুঝতে পারি শরৎকাল এসেছে, আর তার সঙ্গে এসেছে উমা ! বুঝলে রামজয়, আমরা যখন খুব ছোট ছিলাম, পুজোর আগে ভোর বেলা উঠে শিউলী কুড়োতে যেতাম ; ফুল-বাগানের উত্তর কোণে একটা শিউলী গাছ ছিল, তোমরা সেটা দেখনি, অনেকদিন হল মরে গেছে ; সেই সময় ভোর বেলা এক বৈরাগী এসে গান ধরত—

কাল রাতে স্বপন দেখেছি গিরিরাজ।

বৃদ্ধ গুণগুণ স্বরে গানের ছত্রটি আবৃত্তি করিয়া বলিলেন, বেশ পরিষ্কার মনে আছে। ওখানে ও কে ?

উচ্চকণ্ঠে বলিল, আজ্ঞে প্রাতঃপ্রণাম হই কর্ত্তা, আমি বাণীবিজয় !

—ব'স, ব'স এবার বুঝি তুমিই পূজা করছ ?

—আজ্ঞে হাঁ।

রামজয় এই বঞ্চনার মধ্যে ভট্টাচার্যকে টানিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ভট্টাচার্য্য সমস্ত ব্যাপারটাকে অনুমোদন করিলেও নিজে ইহাতে যোগ দেন নাই, তিনি বাণীবিজয়কে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

বাণীবিজয় দেওয়ানজীকে বলিল, দেওয়ানজী, জীবনে আমি অনৃত বাক্য প্রয়োগ করি নাই, কিন্তু এবার করছি বন্ধু আদেশ করেন, এ মিথ্যা সত্যের চেয়েও মহৎ।

কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বাণী, এবার পূজার আয়োজন কি রকম দেখছ ?

বাণী ঈষৎ হাস্ত করিয়া সংকোচে বলিল, চৌধুরী-বাড়ীর

পূজার আয়োজন আবার দেখব কি? তার মধ্যে এবারে আবার সবই বেশী দেখছি! সেই জন্যই তো আমার শাস্ত্র-পিতা পূজা করতে সম্মত হলেন না, বললেন, বুড়ো বয়সে এত পেরে উঠব না, বাণী তুমিই যাও!

বৃদ্ধ খুসী হইয়া বলিলেন, তা তুমি এসেছ বেশ করেছ! তুমিও তো লায়েক হয়ে উঠেছ!

কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, বাণী কাণে কিছু শুনতে পাই না, তার চার খানা ঢাক আর কাঁসির শব্দ একটু শুনতে পাচ্ছি না!

বাণী হাসিয়া বলিল, ওদের কিন্তু দোষ নেই কর্ত্তা, সকাল থেকে বাজাতে বাজাতে ওদের হাত ব্যথা হয়ে গেল।

তারপরে মুক্ত আঙিনার দিকে তাকাইয়া বলিল, ওরে, বাজা, খবরদার, বাজা, বাজা, জোরে বাজা, কর্ত্তা বলছেন তোরা বসে আছিস!

কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন, না, না, ওরা একটু জিরোক। শুনলে বাণী, আমার মনে হচ্ছে, বাড়ী একেবারে খাঁ খাঁ করছে, লোকজন কেউ নেই।

বাণী হাসিয়া বলিল, কি যে বলছেন কর্ত্তা, উঠোনে তিল-ধারণের স্থান নাই, অন্য বারের চেয়ে এবার ভিড় বেশী দেখছি; সব খবর পেয়েছে কি না, যে চৌধুরী-বাড়ীতে এবার ধুম কিছু বেশী।

কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন, হাঃ হাঃ ধুম তো বেশী হবেই!

চৌধুরী-বাড়ীতে পূজায় মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাপ্ত হইতে বেলা তিন প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া যাইত; যথা নিয়মিত সময়ে কর্ত্তা আবার আসিয়া মণ্ডপে বসিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, কি রকম খাওয়া হল।

রাণীবিজয় প্রস্তুত ছিল, কাণের কাছে মুখ লইয়া বলিল, সত্যি কথা বলব কর্ত্তা, কিছু মনে করবেন না, এ রকম ভোজ, এ বাড়ীতেও এর আগে হয় নি।

বৃদ্ধের মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বলিলেন, তোমাদের কথা বিশ্বাস করি না, যারা খেয়েছে, তাদের একজনকে ডাক।

বাণী বলিল, অমন হাজার লোক খেয়েছে, কাকে ডাকব। আচ্ছা দেখি, এই যে রমেশ, এদিকে আয় তো।

এ সেই রমেশ হাড়ি। সে সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া বঞ্চনার দলে যোগ দিয়াছে।

কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,রমেশ তোরা কত লোক খেলি?

রমেশ ফুসফুস-ফাটা চীৎকার করিয়া বলিল, তা অমন হাজার দু হাজার হবে; গুণে কি আর রেখেছি কর্ত্তা। কিন্তু এবারে দেখলাম পাঁচুপুর, গোবিন্দপুরের লোকেরাও এসেছে, অন্য বারে তো তাদের দেখিনি!

কর্ত্তা বলিলেন, আমি বলেছিলাম, বলেছিলাম, নইলে কি, অমনি আসে! আচ্ছা কি কি মিষ্টি খেয়েছিস বল তো।

রমেশ পূর্ব্বের মত উচ্চ কণ্ঠে বলিতে লাগিল, কত মনে রাখব কর্ত্তা! যা মনে আছে বলে যাই। রসগোল্লা, পান্তুয়া জিলিপি, বোঁদে, মতিচুর—

বাধা দিয়ে কর্ত্তা বলিলেন, মতিচুরও পেয়েছিস্—তা হলে রামজয় ফাঁকি দেয় নাই; যা বলেছিলাম, সব করেছে।

রমেশ বলতে লাগিল, মতিচুর, দুর্গামণ্ডা, মিহিদানা, ক্ষুধিত উদরে সে যাবতীয় সুখাদ্যের নাম করিয়া চলিল।

কর্ত্তা বলিলেন, কাল আবার আসবি তো?

রমেশ বিস্মিত হইয়া বলিল, শুধু কাল? সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী তিন দিন। তার পরে দশমীতে মহাদেবের প্রসাদ পেয়ে বিসর্জ্জন দিয়ে তবে তো ছুটি।

সন্ধ্যা হইয়াছে জানিয়া, কর্ত্তা উঠিয়া পড়িলেন। না খাইয়া বহুদিনের বহু খাওয়ার ঋণ শোধ করিয়া রমেশ বিদায় লইল।

এইরূপে তিনদিন চলিল, বিজয়া-দশমীতে বিসর্জ্জনের অভিনয়ও নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইল।

[৪]

বিজয়া-দশমীর রাত্রি গভীর; জোড়াদীঘির বিসর্জ্জনের বাজনা অনেকক্ষণ থামিয়া গিয়াছে, যে-সব ঢাক এখনও দূর-দূরান্তের গ্রামের ঘরে ফিরিয়া চলিয়াছে, তাহাদের বাজনা শোনা যাইতেছে।

চৌধুরী-বাড়ীর অন্তঃপুর হইতে চণ্ডীমণ্ডপে যাইবার পথে, নিভৃতে, নির্জ্জনে, বড় বড় দালানের ছায়ায় অন্ধকারে কে যেন চলিয়াছে। কাণ পাতিয়া শুনিলে মনে হয়, যে চলুক সে যেন পথ চলিতে অভ্যস্ত নয়; নিঃশব্দ অন্ধ যেমন

হাতড়াইয়া পথ চলে, পায়ের অপেক্ষা হাতের উপর যেমন তাহার অধিক বিশ্বাস, এ যেন সেই রকমের চলা, মাটিতে দুই পায়ের শব্দ, দেয়ালে দুই হাতের স্পর্শরব, আরও একটা একটা শব্দ—ক্লান্ত বক্ষপঞ্জরের ঘন ঘন নিশ্বাস।

শুনিলে বোঝা যায়, এ পথ লোকটির খুব পরিচিত, ইহার প্রতি খণ্ড ইষ্টক তাহার জানা, তবে যে শারীরিক শক্তিতে সে অনায়াসে চলাফেরা করিত, আজ তাহা লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া পরিচিত পথ আজ বিদ্রোহ করিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে সহজে পথ ছাড়িতেছে না, পদে পদে তাহাকে নাকাল করিতেছে, পোষা পশু বনে গিয়া বন্য হইয়া উঠিয়া মালিককে আক্রমণ করিলে যেমন হয়।

লোকটি অনেক কষ্টে, বহু চেষ্টায় চণ্ডীমণ্ডপে প্রবেশ করিল, একটি স্তিমিত শিখায় ঘরের অন্ধকারটুকু কেবল দৃশ্যমান; লোকটি ধীরে ধীরে পথ হাতড়াইয়া আসিয়া প্রতিমা-বিরহিত বেদীর মূলে প্রণাম করিতে গিয়া একেবারে ভাঙিয়া পড়িল, আর্তকণ্ঠে ক্রন্দন ও অভিযোগের মাঝামাঝি স্বরে বলিয়া উঠিল—মা, মা, তুমি এবার আসনি; সবাই আমাকে প্রবঞ্চনা করেছে, আমি জেনে শুনে প্রবঞ্চিত হয়েছি—আমি জানি এবার চৌধুরীদের মণ্ডপে তোমার পূজা হয় নি—আর কোনদিন হবে না। কত শত বৎসর পরে জানি না, এই প্রথম পূজা বন্ধ হল। কত শত ব্রহ্ম-হত্যা, নর-হত্যা করলে তবে এমন পাপ হয়…

…মা, তুমি যখন চৌধুরীদের ছাড়লে, ক্রমে সবাই ছাড়বে, যে মণ্ডপে তোমার পদার্পণ হল না, তার একখানা ইটও থাকবে না। এ সবই আমি জানি…

…আমি আরও জানি, দর্পনারায়ণ আজ কয়েদ হয়ে রাজার কারাগারে। কতদিন সেখানে থাকবে কে জানে! আমি আরও জানি, আমার নিজের গড়ে তোলা সম্পত্তির একটুও অবশিষ্ট নাই। সবাই আমাকে প্রবঞ্চনা করছে, আমি জেনে শুনে প্রবঞ্চিত হচ্ছি, যে কটাদিন বেঁচে থাকব এমনিভাবে প্রবঞ্চনায় ঠাট বজায় রেখে যাব, নইলে বাঁচব কি করে? কিছু যে নেই তার চেয়ে বড় অপমান কিছুই নাই সেটা জানতে পেরেছি, জানতে দেওয়ায়…

…এ তিন দিন তোমাকে যে প্রণাম করেছি, সে প্রণাম মিথ্যা, তোমার পায়ে তা পৌঁছায় নি—তাই আজ তোমাকে সত্যি প্রণাম করতে এলাম; জানাতে এলাম যে আমি জানি, তুমি আসনি—আর কখন আসবে না। আমার অপরাধের গুরুত্ব আমি জানি না, তার মার্জনা আমি চাই না, শুধু এইটুকু আশীর্বাদ কর, যেন শেষ পর্যন্ত এই মিথ্যাটুকু বাঁচিয়ে রেখে মরতে পারি।

এই পর্যন্ত বলিয়া, ভূতলশায়ী বৃদ্ধ কাঁদিয়া উঠিল। সুবৃহৎ চণ্ডীমণ্ডপের খিলানকরা ছাদে একদল চামচিকা, তাহাদের ছায়া, আর সেই ক্রন্দনের প্রতিধ্বনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া পথ খুঁজিতে লাগিল।

বাহিরে তখনও দূরতম গ্রামের বিসর্জনের বাদ্য একেবারে থামিয়া যায় নাই। [সমাপ্ত

কালক্রমে

একদিন ছিল, যখন ভারতবাসী তাহার জননী, পত্নী অথবা দুহিতাকে অসূর্য্যম্পশ্যা বলিয়া মনে করিত। যদি কেহ তাহার মাতাকে, পত্নীকে অথবা দুহিতাকে জনসভায় আনিবার চেষ্টা করিত, তাহা হইলে সে অপমানিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইত। তখন পুরুষ, যাহা করিলে মানুষের প্রত্যেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রসার সংঘটিত হয়, তদনুরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধীশ্বর হইয়া তাহার জন্য জনসমাজের মধ্যে অক্লান্তভাবে কর্ম্মনিরত থাকিতেন, আর রমণী জনসমাজের অন্তরালে থাকিয়া মানুষের কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রসারের প্রয়োজন, তাহার স্থির করিতেন এবং যাহাতে স্ব স্ব সংসার বজায় থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। অপর কেহ মাতা-পত্নী ও দুহিতাস্বরূপিণী রমণী মূর্ত্তিকে চিত্রিত করিতে আপত্তি থাকা ত' দূরের কথা, আমরা নিজেরাই তাঁহাদিগকে উপন্যাসে, গল্পে এবং ছবিতে অস্বাভাবিক ভাবে চিত্রিত করিতে আরম্ভ করিয়াছি। কাহারও এমনই পরিণাম যে, এখন মাতৃস্বরূপিণী রমণীর মূর্ত্তির আমাদের পণ্যদ্রব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং এমন পাঠকও আছেন, যাঁহারা ঐ মূর্ত্তিকেই উপাদেয় বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। একদিন সমাজের এমন অবস্থা ছিল যে, কেহ প্রবৃত্তির বশে হঠাৎ আমাদের কোন রমণীকে আংশিক ভাবেও নগ্ন করিবার চেষ্টা করিলে শাস্তিপ্রাপ্ত হইত, আর আজ রমণীকে লইয়া প্রকাশ্য ভাবে নর্ত্তন কুর্দ্দন করিতে পারিলে প্রশস্তি সাধিত হইয়েছে বলিয়া বিবেচিত হয়। অন্যভাবে, অধুনাতন মানুষের বুদ্ধি যে অত্যন্ত বিকৃত হইয়াছে, ইহা তাহারই পরিচয়।

চিত্র-চরিত্র

—শ্রীঅমিত রায়

মাইকেল মধুসূদন

মাইকেল কলিকাতা হইতে গৌরদাসের চিঠি পাইয়াছেন ভাবিলেন, গৌর 'ক্যাপটিভ লেডি' সম্বন্ধে কি লেখে দেখা যাক্ ; এক সময়ে সে তো কাব্যের সমঝদার ছিল—এখনও আছে কি না, আজ তাহা বোঝা যাইবে। মধু আগ্রহের সঙ্গে চিঠি খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন —

"তোমার প্রেরিত 'ক্যাপটিভ লেডি' পাইবা মাত্র বহু দিনের আকাঙ্ক্ষিত আগ্রহের ভরে পড়িতে আরম্ভ করিলাম। আমার মনে যে আনন্দাতিশয্য হইয়াছিল, তাহার ধারণা তোমাকে দিতে পারিব না। তোমার কিশোর প্রতিভার প্রথম অর্ঘ্য স্বরূপ এই কাব্যকে জয়ধ্বনি দ্বারা বরণ না করিয়া উপায় নাই ; সেই সঙ্গে মনে পড়ে সখ্যরসের দ্বারা আপ্লুত আমাদের বন্ধুত্বের দিনগুলি—আমার জীবনের আনন্দময় সংক্ষিপ্ত কিন্তু শ্রেষ্ঠ দিনগুলি। তোমার কাব্যপাঠ সমাধা করিয়া তোমার প্রতিভা সম্বন্ধে আমার ধারণা উজ্জ্বলতর হইয়াছে, এবং আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, ইঙ্গ-ভারতীয় সাহিত্যে তুমি যুগান্তর আনয়ন করিবে। আজ আর না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না যে, তোমার প্রতিভা যে কেবল তোমাকে অমরত্ব দিবে তাহা নয়, আধুনিক বঙ্গদেশকেও গৌরবান্বিত করিবে। ইহা স্তুতিবাদ নয়, আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তোমার লেখক-জীবনের গতিকে আমি পরম আগ্রহের সঙ্গে পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকিব।"

মধু ভাবিলেন, হাঁ গৌরদাস কাব্য-রসিক বটে। এত খানি তিনি গৌরের কাছে আশা করেন নাই। এই প্রশংসা-পূর্ণ চিঠিতে অন্যান্য প্রশংসার কথা মনে পড়িয়া গেল।

মাইকেলের মনে পড়িল—'এথিনিয়ম' পত্রে একজন সমালোচক লিখিয়াছেন—আমার বিশ্বাস, এ কাব্যে এমন অনেক অংশ আছে, যাহা স্কট ও বায়রন লিখিলে গৌরব বোধ করিতেন।

আবার মনে পড়িল—একজন সমালোচক গ্রন্থ সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন—এই অপূর্ব্ব কাব্যখানি চব্বিশ বৎসরের একজন বাঙ্গালী যুবকের রচনা ; কাজেই ইহার পাতায় পাতায় বিদেশী ভাষার উপরে লেখকের অসাধারণ কৃতিত্বের কথা মনে পড়ে। শেলি বা বায়রণ মাতৃভাষায় লিখিতেছেন, না, একটি বাঙ্গালী যুবক বিদেশী ভাষায় ভাব প্রকাশ করিতেছে ? সাহিত্যিক প্রতিভা না থাকিলে এরূপ লেখা যায় না। ইহার ছত্রে ছত্রে যে ভাষা-নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে, সে কথা ছাড়িয়া দিলেও ইহার ভাব-সম্পদ্ সত্যকারের কবি ছাড়া কেহ লিখিতে পারিত না। ইহার কোন কোন অংশ লর্ড বায়রণ বা স্যার ওয়াল্টার স্কটের শ্রেষ্ঠ অংশের সমতুল্য, ইহা অত্যুক্তি নয়।

মাইকেল যে কাব্যখ্যাতির জন্য বাল্যকাল হইতে লালায়িত, তাহারই ক্ষীণরেখা যেন দিক্‌চক্রবালে দেখিতে পাইলেন ; কিন্তু গৌরদাসের পত্রে আরও বেশী আশা করিয়াছিলেন ; গৌরদাস যেমন কাব্য-রসিক তেমন ব্যবসায়ী নয় ; বই বিক্রয় সম্বন্ধে কিছুই সে লেখে নাই। কত কপি দরকার তাহার উল্লেখ নাই ; কি বিপদ্!

"ক্যাপটিভ লেডি" প্রকাশিত হইলে মাইকেল প্রচুর প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন—কিন্তু তাহাতে ছাপাখানার বিলের চিন্তার লাঘব হয় নাই ; ঋণোদ্‌ভ্রান্ত কবি এক হাতে প্রশংসা-পত্র, অন্যহাতে ছাপাখানার বিল লইয়া বসিয়া রহিলেন।

এই গ্রন্থপ্রকাশ মধুর মাদ্রাজ-প্রবাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘটনা ; প্রাক্-মেঘনাদবধ পর্ব্বের শ্রেষ্ঠ ঘটনা ; কিন্তু মাদ্রাজের কবির জীবনযাত্রা আরও বিশদ ভাবে না জানিতে পারিলে তাঁহাকে সম্যক্ রূপে জানা যাইবে না।

১৮৪৮ খৃঃ অব্দের প্রথম ভাগে তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া মাদ্রাজে যাত্রা করেন, সেখানে পৌঁছিয়া, প্রথমে, নিঃসহায়, বিদেশী, অপরিচিত এই বাঙ্গালী যুবক বড় অর্থ-কষ্টে পড়িয়াছিলেন ; অবশেষে কয়েকজন সহৃদয় দেশীয় খৃষ্টানের চেষ্টায় তিনি অনাথ বালক-বালিকাদের জন্য

প্রতিষ্ঠিত এক বিদ্যালয়ে সামান্য একটি চাকুরী পাইলেন; অনাথ বালক-বালিকাদের অনাথ শিক্ষক।

এই বিদ্যালয়ে রেবেকা ম্যাক্টাভিস নামে একটি বালিকা পড়িত; মধু তাহার প্রেমে পড়িলেন। বালিকা একেবারে অনাথ ছিল না, তাহার আত্মীয়-স্বজন এই বিবাহে আপত্তি তুলিল, বোধ করি সেই জন্য মধুর রোখ চাপিয়া গেল, অবশেষে এডভোকেট জেনারেল জর্জ্জ নর্টন-এর সাহায্যে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল।

মাইকেলের অর্থ-ভাগ্য ছিল না, কিন্তু বন্ধুভাগ্য ছিল; চিরদিন তিনি এমন বন্ধু পাইয়াছেন, যাহারা সব রকমে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছে, অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারে নাই, কারণ মধুর আত্মনাশ করিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল।

জর্জ্জ নর্টন এই সময়ের মাইকেলের শ্রেষ্ঠ বন্ধু; ইঁহাকে না পাইলে মধুর মাদ্রাজ-প্রবাস সম্পূর্ণ অন্য আকার গ্রহণ করিত।

১৮৪৮ খৃঃ অব্দে 'ক্যাপটিভ লেডি' 'মাদ্রাজ সারকুলেটর' পত্রে প্রকাশিত হয়; তখন মধুসূদন নিজের নাম প্রকাশ না করিয়া টিমথি পেনপোয়েম নাম ব্যবহার করিয়াছিলেন। কাব্য গ্রন্থকারে বাহির হইলে জর্জ্জ নর্টনকে উৎসর্গীকৃত হয়।

১৮৫১ সালে মধুসূদন 'হিন্দু ক্রনিকল' নামে সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক হন; এই পত্র ১৮৫২ সালে দ্বি-সাপ্তাহিকে পরিণত হয়।

১৮৫১-এ মধুসূদনের মাতার মৃত্যু হয়—এই সংবাদ পাইয়া তিনি গোপনে একবার কিছুদিনের জন্য কলিকাতা আসিয়াছিলেন। তখন তিনি পিতা ছাড়া আর কাহারও সঙ্গে দেখা করেন নাই, এমন কি গৌরদাসও এ সংবাদ তাঁহার মাদ্রাজ প্রত্যাবর্ত্তনের অনেক পরে পাইয়াছিলেন। মাইকেলের জীবনে এই রকম এক একটা রহস্য-কূট আছে, যাহার সম্যক্ সত্য আবিষ্কার করা প্রায় অসম্ভব।

১৮৫২ সালে মধুসূদন মাদ্রাজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হাইস্কুল বিভাগে দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন—প্রধানতঃ ইহা জর্জ্জ নর্টনের চেষ্টায় হইয়াছিল—নর্টন সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ছিলেন।

[২]

সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিলে মনে হয় এই সময়ে মধুসূদনের মানসিক অবস্থা সুস্থ থাকিবার কথা; অর্থের আপাত-অভাব দূরীভূত; কবিখ্যাতি আশাতীত পরিমাণে পাইয়াছেন; ইংরেজ-রমণীকে বিবাহ করিবার জন্য পূর্ব্ব-ত্যাগ করিয়াছিলেন—এখন তিনি ইংরেজ-রমণীর স্বামী; পুত্র-কন্যাও জন্মিয়াছে, এমন কি ছাপাখানার বিলের তাড়নাও তেমন দুঃসহ নয়! কিন্তু মধুসূদনের মনে শান্তি ছিল না।

এই সময় এক মাদ্রাজী বন্ধুকে দুইটি সনেট লিখিয়া উপহার দিয়াছিলেন—সনেট দুইটিতে কবির গভীর অশান্তি ও চাঞ্চল্যের পরিচয় আছে।

"Each eagle-winged thought
Droops powerless to soar with airy aim,
Fettered by cold and sullen apathy;
Life's varied scenes with Joy and music fraught,
Visions of laurell'd Glory and of Fame,
Stir not. The heart is as a tideless sea."

কবির অশান্তি এমন মর্ম্মান্তিক যে, কবিমনও [illegible] নাড়া দিতে পারে না; জোয়ারহীন সমুদ্রের মত কবির চিত্ত নিস্পন্দ!

"And such dark grief is his, whose
sleepless soul
Strives, but in vain, to burst the galling thrall
Of circumstances."

*

"Round whom cold penury e'en as a pall
Of lighteless texture aye doth darkly fall."

*

"Who doth feel the light,
Lit from Heaven's hallowed alter in the shrine
Of Crush'd heart…

*

……When morrow smiles it dies away."

নিজের অবস্থা-চক্রকে স্থির করিবার প্রয়াস মধুসূদনের চরিত্রের অন্যতম বিশেষ আকৃতি; রাজধানী অর্থহারি

দুর্গের প্রাকারকে লঙ্ঘন করিতে তিনি চেষ্টা করিয়াছেন; এই প্রয়াস তাঁহাকে বহুদূরে আনিয়া ফেলিয়াছে, স্বধর্ম হইতে, স্বজন হইতে, স্বদেশ হইতে বহু দূরে।

অর্থের দুর্ভিক্ষ তাঁহার নিকট পীড়াদায়ক, আপাত দৃষ্টিতে দেখিলে মনে হয়, আর দশ জনের অর্থাভাবে যে জন্ত কষ্ট, মধুরও তা-ই; কিন্তু তা নয়; অর্থ তাঁহাকে মানসলোক গড়িবার উপাদান যোগাইবে। বস্তুর অভাবে শিল্প রূপ পাইতেছে না; কাজেই এই দুর্ভিক্ষে তাঁহার অন্তরলোক পীড়িত।

মাঝে মাঝে দূরে কিরণ-পংক্তি উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে, কিন্তু পরদিনের প্রভাতে তাহার আর কোন চিহ্ন থাকে না; মধুসূদন চিরদিন এইরূপে বিড়ম্বিত হইয়াছেন; প্রত্যেক শিল্পীই অন্ন-বিত্তের এই বিড়ম্বনা ভোগ করিয়া থাকে।

এই সনেট দুইটি হইতে বুঝিতে পারা যায়, বাংলা দেশ হইতে মাদ্রাজে আসিয়া কবির মানসিক অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নাই; সত্য কথা বলিতে কি, মধুর চিন্তালোক চিরদিন একই রকম, আলো-ছায়ায়, সত্য-মিথ্যায় চিহ্নিত ছিল। চিন্তা-জগতে কোন পরিবর্তন হয় নাই, এ কথা বলিবার অর্থ প্রায় এই যে, চিন্তা-রাজ্যে তাঁহার চির-শৈশব, শিল্পজ্ঞান তাঁহার পর্বে পর্বে বাড়িয়াছে; কিন্তু মৃত্যুর পূর্বেও মধুসূদন চিৎ-শক্তিতে শিশু ছিলেন; শিশুরা কল্পনা ও বাস্তবে প্রভেদ বুঝিতে পারে না, সত্য-মিথ্যা তাহাদের কাছে সগোত্র; বয়স হইলে এই শৈশবের সত্যযুগ কাটিয়া যায়, মধুর কখনও তাহা যায় নাই; সেই জন্ত তাঁহার কাছে জীবনে ও স্বপ্নে, সত্যে ও মিথ্যায়, আকাঙ্ক্ষায় ও তথ্যে, ঋণদানে ও ঋণগ্রহণে, পাওনায় ও দেনায়, কোন ভেদ ছিল না। সেইজন্তই নানাপ্রকার উদ্বেগের মধ্যেও তিনি লিখিতে পারিতেন—

বোধহয় তুমি জান না যে, আমি দৈনিক অনেক কয়েক ঘণ্টা তামিল পড়িবার জন্ত ব্যয় করি। যে কোন স্কুলের বালকের চেয়েও আমি পড়াশুনায় বেশী ব্যস্ত। আমার পাঠলিপি দেখ—৬-৮টা হিব্রু; ৮-১২টা স্কুল; ১২-২টা গ্রীক, ২-৫টা তেলেগু ও সংস্কৃত; ৫-৭টা ল্যাটিন, ৭-১০টা ইংরাজি। আমি কি মাতৃ-ভাষাকে অলঙ্কৃত করিবার জন্ত নিজেকে প্রস্তুত করিতেছি না?

[৩]

মধুসূদন বন্ধু-বান্ধবদের অনেককেই 'ক্যাপটিভ লেডি' পাঠাইয়াছিলেন; বন্ধু ছাড়া শিক্ষক, পরিচিত ও নামশ্রুত ব্যক্তিদের অনেককেও কাব্য উপহার দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বাংলার শিক্ষা-বিভাগের সভাপতি বেথুন সাহেবকেও এক কপি প্রেরিত হইয়াছিল।

'বেঙ্গল হরকরা' নামে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত এক সংবাদপত্রে মধুসূদনের কাব্যের তীব্র শ্লেষপূর্ণ এক সমালোচনা বাহির হয়; ইহার তীব্রতা ও শ্লেষ বাদ দিলে সমালোচনাকে অন্যায় বলা চলে না। যখন বহু সংবাদ পত্র হইতে উচ্ছ্বসিত সমালোচনার করতালি উঠিতেছিল, সে সময় কোন কোন কাগজ যে নিন্দার অত্যুক্তি করিবে, তাহাতে বিস্ময়ের কি আছে?

বলা বাহুল্য এই প্রবন্ধ পড়িয়া মধুসূদনের আরও রোখ চাপিয়া গেল, তিনি গৌরদাসকে লিখিলেন—

"আমি দেখিতেছি তোমাদের হরকরা কাগজ বড়ই রুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। অভিশপ্ত রাস্কেল! আমি বীরের ন্যায় কোমর বাঁধিয়াছি* কিন্তু এমন সব লোকের প্রশংসা আমি অর্জন করিয়াছি, যাহাতে এটুকু নিন্দা আমি অনায়াসে সহ্য করিতে পারি।"

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে গৌরদাসের মারফতে আর এক খানি পত্র তাঁহার হাতে আসিল, যাহা তাঁর অটল আত্মবিশ্বাসকে শিথিল করিয়া দিল, তাঁহার তৎকালীন মনোভাব তাঁহারই লিখিত একটি ছত্র দ্বারা প্রকাশ করা যায়—

'এ কি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে?'

"বেথুন সাহেব 'ক্যাপটিভ লেডি' উপহার পাইয়া গৌরদাসকে লিখিতেছেন—আপনি এই উপহারের জন্ত আপনার বন্ধুকে আমার ধন্যবাদ জানাইবেন। অপ্রীতিকর হইলেও একটি কথা না বলিয়া পারিতেছি না,এ কথা আমি আপনাদের দেশবাসীদের অনেককেই বলিয়াছি, তিনি ইংরাজি কবিতা না লিখিয়া বাংলায় রচনা করিলে বুদ্ধিমানের কাজ করিবেন। ইংরাজি ভাষায় দক্ষতা দেখাইবার জন্ত মাঝে মাঝে এরূপ রচনা চলিতে পারে; কিন্তু যদি তিনি ইংরাজি সাহিত্য পাঠ করিয়া যে জ্ঞান ও শিল্পবোধ লাভ করিয়াছেন, তাহা বাংলা ভাষার চর্চায়

নিয়োগ করেন তবে মাতৃভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধি করিতে পারিবেন—অবশ্য কাব্য-রচনাই যদি জীবনে আদর্শ বলিয়া মনে করেন।

বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আমি যেটুকু জানি তাহাতে মনে হয়, অশ্লীলতা ও স্থূলতায় ইহা পূর্ণ। উচ্চাকাঙ্ক্ষী কবির পক্ষে শক্তিনিয়োগের এমন ক্ষেত্র আর নাই; তিনি শতাব্দীর মধ্যে সাহিত্যিক উচ্চ আদর্শ সৃষ্টি করিতে পারেন। অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিলেও প্রকৃত কাজ করিবেন—এই ভাবেই ইউরোপের সব জাতির সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে।"

মাইকেল এই পত্র পড়িয়া কি ভাবিয়াছিলেন! এ তো হরকরার পরশ্রীকাতরতা নয়; এ তো ইংরাজি অনভিজ্ঞ পাঠকের অজ্ঞতা নয়; এ তো রসবোধের অভাব নয়; যে-ইংরাজি সাহিত্য তাঁর আদর্শ, সেই সাহিত্যের, সেই জাতির অন্যতম একজন উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিতের অভিমত।

কিন্তু, বেথুন সাহেবের এই অপ্রীতিকর অভিমতের উপর অযথা গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে; যেন এই উপদেশ না পাইলে তিনি কখনই বাংলা ভাষায় রচনা করিতেন না। বস্তুত বেথুনের উপদেশ মূল্যবান্ হইলেও ইহাকে একেবারে অনিবার্য্য বলা চলে না।

মাইকেলের যে উচ্চস্তরের শিল্পবোধ ছিল, তাহাতে তিনি অনতিকালমধ্যে নিশ্চয় বুঝিতে পারিতেন, ইংরাজি ভাষায় তাঁহার আত্ম-বিকাশ অসম্পূর্ণ হইতেছে; নিজের এই সহজাত শিল্পবোধই তাঁহাকে একদা মাতৃভাষার দিকে ফিরাইয়া আনিত; কিংবা বেথুনের পত্র পাইবার আগে হইতেই তিনি সেই দিকে মনে মনে ফিরিতেছিলেন।

বেথুনের চিঠির তারিখ ২০শে জুলাই ১৮৪৯; মধুসূদন একখানি পত্রে গৌরদাসের কাছে কাশীদাসের মহাভারত ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন;—তার তারিখ ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৯। কবির মনের অবচেতন লোকে এইরূপ একটা আন্দোলন চলিতেছিল বলিয়াই তিনি পুরাতন বন্ধু কাশীদাস ও কৃত্তিবাসকে স্মরণ করিতেছিলেন; বিকালে ২-টা হইতে ৫-টা পর্য্যন্ত সংস্কৃত শিক্ষা করিতেছিলেন; এই আন্দোলনজাত অশান্তির খানিকটা পূর্ব্বোক্ত সনেট দুইটিতে প্রকাশিত হইয়াছে। মাইকেলের অন্তরের রসলোকে যে বিরাট দৈত্যশিশু খেলা করিতেছিল, ইংরাজি ভাষায় সে যেন অতিকষ্টে নিশ্বাস ফেলিতেছিল।

বেথুনের পত্রকে যে গুরুত্ব দেওয়া হয়, তাহা সত্য হইলে মধু মাদ্রাজেই বাংলা রচনা করিতে আরম্ভ করিতেন, কিন্তু করেন নাই, দেশে ফিরিয়া অনেকটা পরিমাণে আকস্মিক ভাবে তাঁহাকে বাংলা কাব্য লিখিতে হইয়াছিল। তবে, বেথুনের পত্রে এইটুকু করিয়াছিল যে, কবির মনে অজ্ঞাতসারে যে সংশয় ছিল, বেথুন স্পষ্ট ভাবে তাহাকে সমর্থন করিয়াছিলেন। মাইকেলের শিথিলপ্রায় ইংরাজী সরস্বতীর বেদীতে এই পত্রাঘাত ফাটল ধরাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু, আশুফল ফলাইতে পারে নাই; মাইকেলের দেশে ফেরা যেমন আকস্মিক বাংলা রচনা আরম্ভ তেমনই আকস্মিক; দেশে না ফিরিলে তিনি দেশী ভাষাতেও ফিরিতে পারিতেন না।

মাদ্রাজ-প্রবাসের শেষ বৎসরে তিনি পত্নীর সহিত বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করেন। পত্নীর সহিত এবং দুইটি পুত্র ও দুইটি কন্যার সহিত।

অল্পদিন পরেই তিনি হেনরিএটা সোফিয়া নামে একটি ফরাসী মেয়েকে বিবাহ করেন, ইঁহার পিতা মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। মাইকেলের পত্নী বলিতে সাধারণত ইঁহাকেই বুঝায়।

১৮৫৫ সালের ১৬ই জানুয়ারী মধুর পিতার মৃত্যু হয় এবং তাঁহার আত্মীয়-স্বজন মধুকে মৃত মনে করিয়া পৈতৃক সম্পত্তি ভাগাভাগি করিয়া লইবার চেষ্টা করিতে থাকে। সেই বৎসর ডিসেম্বর মাসে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মাদ্রাজে যান, গৌরদাস পিতার মৃত্যু-সংবাদ তাঁহার মারফতে মধুকে পাঠান ও অবিলম্বে দেশে আসিতে অনুরোধ করেন।

মধুসূদন মাদ্রাজ হইতে জানুয়ারী মাসে বেণ্টিঙ্ক জাহাজে রওনা হইয়া ২রা ফেব্রুয়ারী কলিকাতা আসিয়া পৌঁছান। মাদ্রাজ ত্যাগ করিবার সময়ে হয়তো তিনি ভাবিয়াছিলেন, অল্প কিছু দিনের জন্য তিনি দেশে যাইতেছেন, কাজ মিটিলে ফিরিয়া আসিবেন।

মুসোলিনী ও হিটলার

—এমিল্ লাড্‌উইগ

ইতালী ও জার্মানী—মুসোলিনী ও হিটলার :— সামরিক সংগঠনের নিয়ম-শৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ উচ্ছৃঙ্খল ও অসংযত দুটি প্রদেশের দুজন ডিক্টেটর। মেঘের আড়াল হইতে যেমন হঠাৎ বোমাবর্ষী বিমানপোত দেখা দিয়া জনপদের অধিবাসীদের ভীত সন্ত্রস্ত করিয়া তোলে, তেমনই আজ ইউরোপের, তথা পৃথিবীর রাজনৈতিক গগনে এই দুইজন ডিক্টেটরের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। ইতিহাস দুজনকে সমপর্যায়ভুক্ত বলিবে, অতি সাধারণ অবস্থা হইতে ক্ষমতার চরম শিখরে আরোহণের উদাহরণ স্বরূপ ইতিহাস দুজনকে পাশাপাশি মানুষের সামনে দাঁড় করাইয়া দিবে। কিন্তু এই দুইটি মানুষের মধ্যে যে বিপুল পার্থক্য, ইতিহাস কি মানুষকে সে কাহিনী শোনাইবে?

দুজনের তেইশ বছর বয়সের দুখানা ফটো সম্মুখে রাখিলে, চোখে পড়িবে, মুসোলিনীর নিটোল মাথা আর সুপরিপুষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৈশিষ্ট্য, এবং হিটলারের বৈশিষ্ট্য-বর্জ্জিত অপরিণত দেহের গঠন। বাল্যে ও প্রথম যৌবনে মুসোলিনী যেমন কর্ম্মপ্রিয় ছিলেন, হিটলার ছিলেন তেমনই অলস প্রকৃতির।

মুসোলিনী আঠার বৎসর বয়স হইতে স্বাবলম্বী। পিতার কামারখানায় হাতুড়ি পিটানর কাজে যেমন তাঁহার বিরক্তি বা অবহেলা ছিল না, তেমনই আলস্য বা শৈথিল্য ছিল না পড়াশোনায়। এক দিকে তিনি কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতেন, অন্য দিকে নিবিড় মনোযোগের সহিত করিতেন জ্ঞানানুশীলন এবং সেই সঙ্গে চলিত বড় হইবার কল্পনা। এ দিকে, এই বয়সে হিটলারের না ছিল পড়াশোনার দিকে ঝোঁক, না ছিল উৎসাহ, শক্তি বা জীবনের বড় কোন্ আদর্শ। মাঝে মাঝে পিকচার পোষ্টকার্ড বিক্রয় করিয়া দু'চার পয়সা রোজগার করিতেন এবং নিষ্কর্ম্মা দিনগুলি কাটাইয়া দিতেন। আজ জার্ম্মানী যুবকদের যুদ্ধক্ষেত্রের বীরত্বের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিবার তোড়-জোড়ের সীমা নাই, কিন্তু হিটলারের জীবনে সংগ্রামক্ষেত্রে নির্ভীকতার পরিচয় দিয়া গৌরব অর্জ্জনের কোন দৃষ্টান্তই নাই—মুসোলিনীর আছে। ১৯২৩ সালে মুনিকের রাজপথে গুলির আঘাতে সহচরেরা যখন প্রাণ দিতেছিল, হিটলার তখন চুপি চুপি গিয়াছিলেন পালাইয়া। হিটলার যে কত ভীরু, আজও অহরহ তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। পথের দুধারে তিনসারি করিয়া রক্ষী সৈন্য দাঁড়াইয়া না থাকিলে তিনি রাজপথে বাহির হন না।

তবু যে হিটলার আজ জার্ম্মানীর ভাগ্যনিয়ন্তা, তাহার কারণ উচ্ছ্বাসপূর্ণ বক্তৃতার স্রোতে তাঁহার মানুষকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবার ক্ষমতা। চীৎকার করিয়া, হাত পা ছুঁড়িয়া, জার্ম্মানগণের হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠে, এমন কতকগুলি বুলি বার বার ব্যবহার করিয়া, দেশের কথা, যুদ্ধের কথা, বড় বড় বীর ও মহাপুরুষের কথা বলিয়া হিটলার অত্যাশ্চর্য্য শব্দ-জাল বুনিয়া চলেন—বক্তৃতার মোহকারী প্রভাবে অভিভূত জার্ম্মানেরা মাথা নত করিয়া তাঁহাকে মানিয়া লয়। একটু বিশ্লেষণ করিলেই হিটলারের বক্তৃতার বৈশিষ্ট্য ধরা পড়িয়া যায়—উচ্ছ্বাস, নাটকীয়ত্ব, অতিশয়োক্তি প্রভৃতির সাহায্যে অবিরাম আত্মপ্রচারের প্রয়াস। মুসোলিনীর বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত, সুস্পষ্ট, বাহুল্যবর্জ্জিত,—দ্বিধা-সংশয়ের ভারে নিপীড়িত নহেন বলিয়া মুসোলিনীর বক্তৃতায় আত্মপ্রচারের কোন প্রয়াস নাই। ইথিওপিয়া বিজয়ের পর মুসোলিনী যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি 'আমি' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছিলেন মাত্র দুইবার, হিটলারের প্রত্যেক বক্তৃতাটি 'আমি' শব্দে কণ্টকিত। এইরূপ অব্যবস্থিত-চিত্ত, বাগাড়ম্বরপ্রিয়, দুর্ব্বল প্রকৃতির মানুষের হাতে দেশের ভাগ্যনির্দ্দেশের ক্ষমতা ছাড়িয়া দেওয়ার মধ্যে জার্ম্মানগণের প্রকৃতির একটি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিহাসেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত আছে, দ্বিতীয় উইলহেলমও অনেকটা হিটলারের মত ছিলেন।

মুসোলিনীর বয়স পঞ্চাশ পার হইয়া গিয়াছে, আজও তিনি দেশবাসীকে কায়িক পরিশ্রমের মূল্য বুঝাইবার জন্য কারখানায় হাতুড়ি পেটেন, প্রকাশ্য রাজপথে মালবাহী ট্র্যাক্টর চালনা করেন, তিপ্পান্ন বছর বয়সে তিনি এরোপ্লেন-পরিচালনা শিক্ষা করিয়া পাইলট হইবার পরীক্ষা দিয়াছেন। হিটলার কোনরূপ কায়িক পরিশ্রমের ধার ধারেন না, এমন কি মোটরগাড়ী চালাইবার ক্ষমতাও হিটলারের নাই।

ডিক্টেটর হইবার পরেও মুসোলিনী নিজেকে সবজান্তা বলিয়া ধরিয়া লন নাই, আজও শিক্ষা করিবার প্রত্যেকটি সুযোগের তিনি সদ্ব্যবহার করেন। জার্ম্মান, ফ্রান্স ও ইংরাজী ভাষায় মুসোলিনী অবাধে কথা বলিতে পারেন। কেহ সাক্ষাৎ করিতে আসিলে নিজের কথার স্রোতে

মুসোলিনী সাক্ষাৎকারীকে ভাসাইয়া লইয়া যান না, মনোযোগের সঙ্গে তাঁহার কথা শোনেন, নূতন জ্ঞান আহরণ করিয়া নিজের জ্ঞানের ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখেন।

হিটলারের কাছে কোন আগন্তুক মুখ খুলিবার সুযোগ পান না; প্রথম হইতেই হিটলারের বাগাড়ম্বর সুরু হয়, কথা বলিতে বলিতে তিনি এমন উত্তেজিত হইয়া পড়েন যে, কথাগুলি তাঁহার চীৎকারে পরিণত হয়, দুই চোখ বিস্ফারিত হইয়া চোখের তারা ঘূর্ণায়মান গোলকের মত হইয়া উঠে, দুই হাতে তিনি জানালার পাটাতনে আঘাত করিতে থাকেন, তারপর হঠাৎ কথার মাঝখানে থামিয়া অতিথিকে বিদায় দেন।

মুসোলিনীর আশে পাশে এমন কেহ নাই, যাঁহার মুসোলিনীর অপেক্ষা জ্ঞান বা বুদ্ধি বেশী আছে, সকলেই ধরিতে গেলে মুসোলিনীর সেক্রেটারী মাত্র। কিন্তু, হিটলারকে তাঁহার কয়েকজন মন্ত্রীর কাছে নত হইয়া থাকিতে হয়,—তিনি কেবল প্রোপাগাণ্ডার ক্ষেত্রে একচ্ছত্র সম্রাট্।



করমর্দনরত মুসোলিনী ও হিটলার

এই দুইটি ডিক্টেটরের কর্ম্মজীবন, সামাজিক জীবন, ব্যক্তিগত জীবন কিছুর মধ্যেই এতটুকু মিল নাই—এবং এই অমিলের দর্পণে উভয়ের পার্থক্য প্রতিবিম্বের মত রূপ গ্রহণ করে। মুসোলিনীর কাছে কাজ অপেক্ষা বড় কিছু নাই, গ্রীষ্মকাল ছাড়া আর কোন সময় মুসোলিনী রাজধানী ত্যাগ করিয়া কোথাও যান না, অর্থহীন ভোজোৎসবের আড়ম্বরপূর্ণ 'সোসাইটী লাইফ' বলিয়া মুসোলিনীর কিছু নাই, গল্প-গুজবে নষ্ট করিবার সময় মুসোলিনীর একেবারেই নাই, কিন্তু হিটলার একা থাকিতে পারেন না, কথা না বলিয়া চুপচাপ দিন কাটান তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, চিন্তা অথবা শিক্ষার প্রতি তাঁহার দারুণ বিতৃষ্ণা। বার্লিনে তিনি থাকিতে পারেন না, বার্লিন হইতে বহু দূরে নিজের গ্রাম্য ভবনে বন্ধু-বান্ধব লইয়া সময় কাটান,—সঙ্গী হিসাবে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পছন্দ করেন সিনেমা-ষ্টারদের। একজন সিনেমা-ষ্টার হিটলারের গ্রাম্য-ভবনে একটি সন্ধ্যার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। সর্ব্বসমেত কুড়িজন অতিথি, হিটলার স্বহস্তে তাঁহাদের মত পরিবেশন করিলেন, কিন্তু নিজে জল ছাড়া আর কিছু পান করিলেন না—তারপর পুরা তিন ঘণ্টা অজস্র স্ফূর্ত্তি জম অতিথিদিগকে বক্তৃতা শোনাইলেন। ইহাই হিটলারের প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য, শ্রোতার সম্মুখে অভিনয় করিবার জন্য অভিনেতার অদম্য প্রবৃত্তি! হিটলারের প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত ও কার্য্য নাটকীয় এবং এই নাটকীয়ত্বের উৎসের ইঙ্গিত পাওয়া যায় অতিথিদের স্বহস্তে মদ পরিবেশন করিয়া নিজে জল পান করিয়া তিন ঘণ্টা তাঁহাদের সম্মুখে অভিনয় করার মধ্যে। এইজন্য হিটলারের সিদ্ধান্ত ও কার্য্য বিপজ্জনক, কখন যে তিনি কি করিয়া বসিবেন, কিছুরই স্থিরতা নাই।

ইয়োরোপে আর একটি মহাসমর আরম্ভ করিবার পরিকল্পনা মুসোলিনীর নাই, তাঁহার মধ্যে ইতালীয় রাজনৈতিকের বৈশিষ্ট্যগুলি পূর্ণ বিকাশ পাইয়াছে,—তিনি কূটনৈতিক, বাস্তবপন্থী, সুবিধাবাদী এবং আদর্শে অবিশ্বাসী। ঝোঁকের মাথায় কোন কাজ করা মুসোলিনীর স্বভাব নহে, অপরে যখন যুদ্ধ করে, তিনি চুপচাপ অপেক্ষা করেন এবং শেষে যোগ দেন জয়ীর পক্ষে। এ দিকে হিটলার জার্ম্মানীর প্রাধান্য ও প্রভুত্ব-বিস্তারের জন্য বে-হিসাবী জুয়াড়ীর মত সর্ব্বস্ব বাজী রাখিতে কুণ্ঠিত নহেন,—জয় অথবা সর্ব্বনাশ।

হয় ত শেষ মুহূর্ত্তে হিটলার আসন্ন সংগ্রাম পরিহার করিবার চেষ্টা করিবেন, কিন্তু তখন আর প্রতিকার করিবার ক্ষমতা তাঁহার থাকিবে না, সংগ্রামই তাঁহাকে গ্রাস করিয়া বসিবে।

হিটলার বাধাইবেন সংগ্রাম, মুসোলিনী হইবেন লাভবান্।*

---

* ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসের 'ফোরাম'-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের সার-সঙ্কলন।

সংবাদ ও মন্তব্য

[শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক লিখিত]

সংবাদ-পত্রের পরিচালনা ও আনন্দ-বাজার পত্রিকা

আমাদের নিয়মিত পাঠকবর্গ অবগত আছেন, গত সংখ্যায় আমরা আনন্দবাজার পত্রিকার এক সপ্তাহের সম্পাদকীয় সন্দর্ভের ত্রুটীসমূহ প্রদর্শন করিয়াছি। কোন্ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া আমরা ইহা করিতেছি, তাহা পাঠকদিগের জানিবার বিষয়।

কোন ব্যক্তিই হউক, অথবা কোন সঙ্ঘই হউক, উহা যখন কোনরূপ বিপজ্জালে পতিত হয়, তখন কোন না কোন বিষয়ে উহা যে ভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহা বুঝিয়া লইতে হয়, কারণ যে কোন অবস্থার মূলে যে কোন না কোন কারণ বিদ্যমান, তাহা কখনও অস্বীকার করা যায় না। অন্যান্য প্রদেশের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমাদের বাংলাদেশ যে অতীব বিপন্ন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। এই বিপদ্ কোথায়, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে অনেকে হয় ত অনেক কথা বলিবেন। কেহ হয় ত বলিবেন, আমরা শিল্প-বাণিজ্যে পশ্চাৎপদ হইয়া গিয়াছি, কেহ হয় ত রাজনীতি-ক্ষেত্রে আমাদের পশ্চাদ্‌বর্ত্তিতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিবেন, কেহ হয় ত ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে আমাদের যুবকেরা এখন আর যে প্রায়শঃ সর্ব্বোচ্চ স্থানসমূহ লাভ করিতেছেন না, তাহা দেখাইয়া দিবেন ইত্যাদি।

আমরা কিন্তু ঐ সমস্ত বড়মানুষের বড়মানুষীর দিকে লক্ষ্য করিতেছি না। দুই বেলা দুই মুঠা অন্ন ও সারা বৎসরে দুইখানি পরিধেয় বস্ত্র লইয়া জনসাধারণের প্রাত্যহিক অস্তিত্ব। জনসাধারণ যখন তাহার জন্যও অভাবে অভাবগ্রস্ত হয়, তখন ঐ সমাজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত যে টলটলায়মান হইয়াছে, তাহা চক্ষু বুজিয়া না থাকিলে অস্বীকার করা যায় না।

বাংলাদেশের জনসাধারণের মধ্যে অনেকেরই যে ঐ উপরোক্ত দুই মুষ্টি অন্নের ও দুই খানি পরিধেয় বস্ত্রের অভাব আরম্ভ হইয়াছে, আমাদের শিক্ষিত যুবকেরা যে খাটিয়া খাইতে চাহিয়াও খাটিয়া খাইবার স্থান পায় না, আমাদের উকিল-ডাক্তারেরা যে সদ্ভাবে জীবন যাপন করিতে চাহিয়াও পেটের দায়ে তাহা পারেন না, পরন্তু নানাবিধ চাতুরীর আশ্রয় লইতে বাধ্য হন, আমাদের সর্ব্ব-সাধারণ যে প্রায়শঃ বিংশ বৎসর হইতেই নানাবিধ রোগে জীর্ণ হইয়া পড়িতেছেন, আমাদের বাৎসরিক জন্মসংখ্যার শতকরা ৬৩ জন যে ৪০ বৎসরে উপনীত হইতে না হইতেই কালগ্রাসে পতিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং সেই হিসাবে এখন আর আমাদের মধ্যে যে পরিণত বয়সের প্রবীণ মানুষ প্রায়শঃ দেখা যায় না এবং দেশটি যে প্রায়শঃ কতকগুলি চল্লিশ বৎসরের অনধিক-বয়স্ক ছেলে-ছোকরার দেশ হইয়া পড়িতেছে, ইহা বাস্তব সত্য। অথচ, এই বাংলাতেই এমন একদিন ছিল, যখন কৃষকের সন্তান কৃষিকার্য্য করিয়া, তাঁতীর সন্তান বস্ত্রবয়নের কার্য্য করিয়া, কুম্ভকারের সন্তান হাঁড়ী-কলসী তৈয়ারী করিয়া, কর্ম্মকারের সন্তান [illegible] কার্য্য করিয়া, তেলী, সাহা প্রভৃতি বৈশ্যের সন্তান বাণিজ্য ও মহাজনী করিয়া, বৈদ্যের সন্তান চিকিৎসা-বিদ্যার আশ্রয় লইয়া, ব্রাহ্মণের সন্তান গুরুতা ও যাজনবৃত্তি করিয়া স্বাধীন ভাবে পুরুষানুক্রমে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। কাহারও জীবিকার জন্য দেশীয় হউক অথবা বিদেশীয় হউক, কোন কলেজে প্রবেশ করিয়া তথাকথিত শিক্ষা লাভ করিবার প্রয়োজন হইত না এবং ঐ জীবিকার জন্য এক

কায়স্থ-সন্তান ছাড়া অপর কাহারও সন্তানের নকরগিরী করিতে হইত না।

এক কায়স্থগণের সন্তান ছাড়া আর কাহারও জীবিকার জন্ম প্রায়শঃ চাকুরী প্রার্থী হইতে হইত না, অথচ কাহারও মধ্যে প্রায়শঃ অন্নাভাব দেখা যাইত না। অথচ, আজ নকরগিরীর জন্য লালায়িত নহে, এমন কাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। নকরগিরীর জন্য কাড়াকাড়ি করিয়াও তাহা অনেকেই জুটাইতে পারিতেছেন না, যাঁহারা ঐ নকরগিরী জুটাইতে পারিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকেরই অপ্রচুর বেতনবশতঃ কোন ক্ষেত্রে বা উদরান্নের জন্য, আর কোন ক্ষেত্রে বা পুত্রকন্যার শিক্ষা ও বিবাহের জন্য (পিতামাতার শ্রাদ্ধ অথবা আত্মীয়-স্বজনের পোষণের জন্য নহে) দারুণ অর্থাভাব থাকিয়া যাইতেছে। নকরগিরী করিয়া যে-কতিপয় মানুষ অর্থাভাব ঘুচাইতে সমর্থ হইতেছেন, তাঁহাদেরও অনেকেই পারিবারিক অস্বাস্থ্য এবং পুত্রকন্যার দুশ্চরিত্র লুক্কায়িত করিবার জন্য সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতে বাধ্য হইতেছেন। আমাদের সোনার বাঙ্গলায় কেন এই অবস্থা হইল, ঐ দারুণ অবস্থার দারুণতা কেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, কেনই বা আমাদের মত দুই একটা জড়দেহের বলি সাধন করিয়া ঐ ক্রোড়ক্রোড় কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ভগ্নী, পুত্র ও কন্যাগণের চোখের জল মুছান সম্ভবযোগ্য হইতেছে না, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে সর্ব্বাগ্রে আমাদের নিজেদের কার্য্যকলের মূলে নিজেদের কোন না কোন দোষ আছে, তাহা একদিকে যেরূপ প্রাণে প্রাণে মানিয়া লইতে হয়, অন্যদিকে আবার সমগ্র একটা প্রদেশ অথবা মানবজাতি যখন ব্যাপকভাবে বিপন্ন হয়, তখন কাহার কাহার চেষ্টায় জনসাধারণকে ঐ বিপদ্ হইতে রক্ষা করা সম্ভব হয়, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

একটা প্রদেশ অথবা মানবজাতি যখন ব্যাপকভাবে বিপন্ন হয়, তখন কাহার কাহার চেষ্টায় জনসাধারণকে ঐ বিপদ্ হইতে রক্ষা করা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, দেখা যাইবে যে, তখন দেশের ও দশের জন্য অনেকেরই অকৃত্রিমভাবে বিভিন্ন রকমে স্থাপন করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে বটে, কিন্তু প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্ট, দ্বিতীয়তঃ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, তৃতীয়তঃ সংবাদপত্রবাহক, চতুর্থতঃ শিক্ষাবিভাগীয় নেতৃবৃন্দ, পঞ্চমতঃ বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞান বিভাগের বিশেষজ্ঞগণ কায়মনোবাক্যে সাধনাতৎপর না হইলে অপর কাহারও চেষ্টায় জন-সাধারণের রক্ষার উপায় আবিষ্কৃত হওয়া অথবা তাহা কার্য্যকরী হওয়া সম্ভবপর হয় না।

কাজেই, যখন একটা প্রদেশে যখন ব্যাপকভাবে জনসাধারণের বিপদ্ আরম্ভ হয় এবং বিপদ্ যখন ঘোরাল হইতে অধিকতর ঘোরাল অবস্থায় উপনীত হইতে আরম্ভ করে, তখন ঐ প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের, সংবাদপত্র-বাহকগণের, শিক্ষাবিভাগীয় নেতৃবৃন্দের, বিবিধ বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞগণের কার্য্য যে কোন না কোন রকমের দোষ-প্রমাদযুক্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহে মানিয়া লইতে হয়।

এই হিসাবে বাঙ্গালাদেশের গবর্ণমেণ্টের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের, সংবাদপত্র-বাহকগণের, শিক্ষা-বিভাগীয় নেতৃবৃন্দের এবং বিবিধ বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞগণের কার্য্য যে কোন না কোন রূপের দোষ-প্রমাদযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং কোথায় সেই দোষ-প্রমাদ, তাহা যতদিন পর্য্যন্ত সঠিকভাবে ধরা না পড়ে, ততদিন পর্য্যন্ত যে জনসাধারণের রক্ষার উপায় নাই, তাহা যুক্তিসঙ্গত ভাবে অস্বীকার করা যায় না।

গভর্ণমেণ্ট, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সংবাদপত্রের বাহক, শিক্ষা-বিভাগের নেতৃবৃন্দ এবং বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞগণ কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কিরূপ ভাবের দোষ-প্রমাদের জন্য দায়ী, তাহা দেখাইয়া দেওয়া আমাদের বঙ্গশ্রীর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য এবং প্রতি সপ্তাহে নানা রকম ভাবে সংবাদপত্রের বাহকগণের ত্রুটি ছাড়া আর সকলের ত্রুটিই যে আমরা এতাবৎ দেখাইয়া আসিতেছিলাম, তাহা আমাদের পত্রিকা যথাযথভাবে পাঠ করিলে বুঝা যাইবে।

বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলির মধ্যে যে একমাত্র আনন্দবাজার পত্রিকাই দুষ্ট তাহা নহে। আমাদের মতে, যাঁহারা সম্পাদকীয় সন্দর্ভ পড়িলে উহার সম্পাদক যে [illegible]-ব্যবহারজ্ঞানবিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, ইহা মনে করা

যাইতে পারে, এমন একখানি সংবাদপত্রও বাংলাদেশে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

পরন্তু, বিপন্ন প্রদেশের জনসাধারণকে তাহাদের বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে হইলে যে যে বিষয়ের সাধনা ও অভিজ্ঞতা, সংবাদপত্র-সম্পাদকের একান্ত প্রয়োজনীয়, সেই সাধনা ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন না করিয়াও যে অধিকাংশ সম্পাদকই সংবাদপত্র-সম্পাদনের কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন এবং পরোক্ষভাবে বাঙ্গালী জন-সাধারণের সর্বনাশ সাধন করিতেছেন, তাহা তাঁহাদের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ হইতে অনায়াসে প্রমাণিত হইতে পারে।

আমাদের মতে, একমাত্র গবর্ণমেণ্টের সংস্কার সাধন করিতে পারিলেই যে দেশের জনসাধারণকে রক্ষা করা সম্ভবযোগ্য হইবে, তাহা নহে; রাজনীতি, সংবাদপত্র, শিক্ষাবিভাগ ও বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞগণের মনস্থিত আশঙ্কাগুলি দূরীভূত করিবার ব্যবস্থা করাও একান্ত প্রয়োজনীয়।

বাংলায় এতাদৃশ বিপদের সময় বাঙ্গালী জনসাধারণকে রক্ষা করিতে হইলে সংবাদপত্র-সম্পাদকগণের যে যে সাধনা ও অভিজ্ঞতা একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা বাংলায় যে যে সংবাদপত্র-সম্পাদকের না থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা বাঙ্গালীর আদর লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তন্মধ্যে আনন্দবাজারের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। আমাদের কথা যে সত্য, তাহা দেখাইবার জন্যই আমরা আনন্দবাজারের সম্পাদকীয় সন্দর্ভের সমালোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। এতাদৃশ পত্রিকা যে বাঙ্গালীর আদর লাভ করিতে পারিয়াছে, তাহা একদিকে যেরূপ বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশকর, অন্যদিকে উহা আবার বাঙ্গালীর পাণ্ডিত্যের সূচক। জ্ঞান যেরূপ জ্ঞানীর প্রিয় হইয়া থাকে, অজ্ঞান সেইরূপ অজ্ঞানীরই প্রিয় হয়—ইহা চিরন্তন সত্য। সাধুর কাছে সংযম যেরূপ আদর লাভ করে, অসাধুর কাছে উহা যেমন আদর লাভ করিতে পারে না, আবার অসংযম অসাধুর কাছে আদর লাভ করিতে পারে বটে, কিন্তু সাধুর কাছে সর্ব্বদা বর্জ্জনীয় হইয়া থাকে। কাজেই বলা যাইতে পারে যে, যাহা আদরণীয় ও আদরের নহে, তাহা বাঙ্গালী সমাজে বিস্তার লাভ করিতে পারিয়াছে, তাহা হইতে সংবাদপত্র-পাঠী বাঙ্গালী সমাজ যে পাণ্ডিত্য লাভ করিতেছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমরা আমাদের নিন্দনীয় অভ্যাসসমূহ সর্ব্বতোভাবে বজায় রাখিব, অথচ আমাদের দুরবস্থা দূর হয় না কেন, তজ্জন্য খেদ প্রকাশ করিব, ইহা কখনও সমীচীন নহে। আমাদের দুরবস্থা দূর করিতে হইলে আমাদের নিন্দনীয় অভ্যাসসমূহ বর্জ্জন করিতেই হইবে। কাজেই, আমরা বাংলাদেশের পত্রিকা সম্বন্ধে বাঙ্গালী পাঠকবর্গকে যেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করি, সেইরূপ আবার পত্রিকাসমূহ যাহাতে দোষমুক্ত হয়, তাহার চেষ্টার জন্যও উহার পরিচালকদিগকে যত্নবান্ হইতে অনুরোধ করি।

আনন্দবাজার পত্রিকায় যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বাহির হয়, তাহার প্রায় প্রত্যেকটী হইতে সম্পাদক যে উপরোক্ত একান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞানের সাধনা ও অভিজ্ঞতার সীমানার পর্য্যন্ত উপনীত হইতে পারেন নাই, তাহা প্রমাণিত হইতে পারে। কোথায়ও বা সাম্রাজ্য-পরিচালনা-বিস্তার সমালোচনা, কোথায়ও বা বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় আলোচনার সমালোচনা, কোথায়ও বা শ্রমিক সংগঠনের সমালোচনা প্রভৃতি গুরুতর বিষয়সমূহ ঐ কাগজে স্থান পায় বটে, কিন্তু ঐ ঐ বিষয়ের প্রাথমিক জ্ঞান পর্য্যন্ত যে সম্পাদকের নাই এবং তদনুসারে ঐ ঐ প্রবন্ধের দ্বারা উহার পাঠকগণের বিপথগামিতা যে অনিবার্য্য, তাহা প্রত্যেক প্রবন্ধটী বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যাইবে। "গদাধর চন্দ্রের দুধ ও তামাক খাওয়া" একসঙ্গে চলিতে পারে না। বাংলার জনসাধারণ যাহাতে তাহাদের বিপৎ-সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহা করিতে হইলে অন্যান্য কার্য্যের সহিত বাঙ্গালীর আদরের সংবাদপত্রে যাহাতে অধিকতর সাধনা ও অভিজ্ঞতার পরিচয়ের ব্যবস্থা হয়, নতুবা উহা যাহাতে নিন্দনীয় হয়, তাহা করিতেই হইবে। বিপথগামী ও চরিত্রহীন মানুষের সংস্পর্শ যেরূপ যুবকের পক্ষে নিন্দনীয়, সেইরূপ যে সমস্ত সংবাদপত্র যুবকগণের বিপথগামিতা আনয়ন করিতে পারে, তাহা যে ঐ যুবকগণের পক্ষে বর্জ্জনীয়, ইহা বলাই বাহুল্য।

আমাদের কথা যে যুক্তিসঙ্গত, তাহা আমরা দুই

দিগের সম্পাদকীয় সন্দর্ভ বিশ্লেষণ করিয়া পাঠকবর্গকে দেখাইতেছি।

২১শে পৌষ মঙ্গলবারের আনন্দবাজার পত্রিকায় সম্পাদকীয় সন্দর্ভ তিনটি ; যথা—(১) 'স্বরূপরাণী নেহেরু', (২) বাঙ্গালার নদী, (৩) পণ্ডিতজীর উত্তরে মিঃ জিন্না।

"৮ স্বরূপরাণী নেহেরু'-শীর্ষক প্রবন্ধে স্বরূপরাণী নেহেরুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হইয়াছে।

যে সমস্ত সংবাদপত্র মানব-সমাজের বিপৎসময়ে ঐ বিপদ্ হইতে কি করিয়া মানব-সমাজ রক্ষা পাইতে পারে, তাহার সন্ধান করাই তাঁহাদিগের অন্যতম কর্ত্তব্য বলিয়া বাছিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে কাহারও জন্য শোক প্রকাশ করার অবসর যে কিরূপে থাকিতে পারে এবং তদনুসারে কি উদ্দেশ্যে যে আনন্দবাজার পত্রিকা ঐ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমাদের মনে হয়, কোন দলবিশেষের প্রিয় হইবার জন্য চাটুকারিতা, অর্থাৎ মোসাহেবী করাই এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য। কর্ম্মীগণ কোন কোন বিশেষ জীবনের অবসানে ঐ জীবন সম্বন্ধে শিক্ষণীয় মন্তব্যগুলি প্রচার করা জনসেবী সংবাদ-পত্রগুলির যে অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু, মনে রাখিতে হইবে যে, জীবনী সম্বন্ধে প্রচার করিবার একমাত্র প্রধান উদ্দেশ্য ঐ জীবনী হইতে শিক্ষণীয় কি, তাহা পাঠকবর্গকে দেখাইয়া দেওয়া। তাহা দেখাইয়া না দিয়া তৎসম্বন্ধে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিলে জনসেবার পক্ষে কি ফলোদয় হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

আমাদের এই কথায় হয় ত অপরিণত বুদ্ধির যুবকগণের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেলেও যাইতে পারে, কিন্তু দুঃখেতে অনুদ্বিগ্নমনতা অভ্যাস করা যে ব্যাসবাক্যানুসারে জীবনের মহাব্রত হওয়া সঙ্গত এবং তাহার অন্তর্ধান দুঃখ-দারিদ্র্য যে অনিবার্য্য, তাহা তাঁহাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে। আনন্দবাজারের সমগ্র প্রবন্ধটিতে সুশিক্ষার একটি কথাও নাই, বরং কুশিক্ষায় উহা পরিপূর্ণ।

লাভজনক ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়া দেশবাসীর অভি-মান, দম্ভ ও গর্ব্ব পোষণ করা আর "ঐশ্বর্য্যরূপ ধনমত্ততার মোহ হইতে মনকে মুক্ত করা" যে এক কথা নহে, তাহা না বুঝা পর্য্যন্ত কোন দায়িত্বপূর্ণ জনসেবী সংবাদপত্রের সম্পাদকতা গ্রহণ না করাই সঙ্গত। প্রাণে যদি কোন ধর্ম্মের প্রেরণা থাকে, তাহা হইলে মানুষ কখনও অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া থাকিতে পারে না, ইহা বাস্তব সত্য। যে-কোন কার্য্যে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনার অভাব দেখা যায়, তাহাতেই ধর্ম্মভাবের অভাব রহিয়াছে ইহা দেখিতে হইবে —ঋষিদিগের ইহাই উপদেশ। "প্রাণধর্ম্মের প্রেরণায় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়া"— এবংবিধ বাক্য ফাঁটালের আমলজের অনুরূপ।

স্বর্গীয়া স্বরূপরাণী নেহেরুর মৃত্যুকে ভিত্তি করিয়া লিখিত প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদিগের এতাদৃশ স্পষ্টোক্তি প্রকাশ করিতে হইতেছে বলিয়া আমরা দুঃখিত। এই দুর্দ্দিনে জনসমাজের সেবার প্রকৃত এইরূপ কঠোর। এমন বহু বিষয় আছে, যাহা আপাতদৃষ্টিতে কর্ত্তব্যজ্ঞান-প্রসূত বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে উহাই আমাদের পতনের কারণ, ইহা মনে রাখিয়া প্রত্যেক বিষয়ে বিবেচনা-পরায়ণ না হইলে আমাদিগের দুঃখের পরিসমাপ্তির আশা সুদূরপরাহত থাকিয়া যাইবে।

"বাঙ্গালার নদী"-শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রধানতঃ ঐ সম্বন্ধে ডক্টর মেঘনাদ সাহার একটি বক্তৃতার ভাষ্য। ঠিক ভাষ্য ইহাকে বলা চলে না, কারণ ভাষ্যেতে মূল কথার উৎকর্ষ ও অপকর্ষ দুইই দেখান হইয়া থাকে। 'ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট অব সায়েন্সে' ডক্টর মেঘনাদ সাহা 'বাঙ্গালার নদী' সম্বন্ধে যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক কথাটি প্রণিধানযোগ্য, ইহা বলাই "বাঙ্গালার নদী" শীর্ষক প্রবন্ধের অন্যতম কথা। যদি বাস্তবিক পক্ষে দেখা যায় যে, ডক্টর মেঘনাদ সাহার উপরোক্ত অভিভাষণের প্রত্যেক কথাটি প্রণিধানযোগ্য, তাহা হইলে 'বাঙ্গালার নদী'-শীর্ষক প্রবন্ধটিকে উহার ভাষ্য বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু যদি দেখা যায় যে, ডক্টর মেঘনাদ সাহার অভিভাষণ কতকগুলি প্রলাপের সমষ্টি, অথচ আনন্দবাজার উহার অপকর্ষ তাঁহার পাঠকবর্গকে না দেখাইয়া নিছক উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় ব্যাপৃত হইয়াছেন, তাহা হইলে দুর্ভিসন্ধিতাবে আনন্দ-

বাজারের ঐ প্রবন্ধটিকে তোসামোদের উক্তি বলিয়া আখ্যাত করিতে হইবে।

আমাদের যুবকবৃন্দের মধ্যে ডক্টর মেঘনাদ সাহা যে সুখ্যাতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহাতে তিনি প্রলাপবাক্য বলিয়াছেন অথবা প্রলাপবাক্য বলিয়া থাকেন, এবংবিধ কথা বলিলে হয়তো আমাদের যুবকবৃন্দের অনেকেই শিহরিয়া উঠিবেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাঙ্গালীর সমস্যা কি করিয়া পূরণ হইতে পারে, তাহার সুস্পষ্ট ধারণাযুক্ত একজন লোকও যদি এই ডক্টর মেঘনাদ সাহার শ্রেণীর মানুষের মধ্যে থাকিত, তাহা হইলে বাঙ্গালীকে আজ এত বিপন্ন হইতে হইত না। যাঁহারা পরের মাথায় কাঁঠাল না ভাঙ্গিয়া অথবা চাকুরী কিম্বা মাসিক বেতন গ্রহণ না করিয়া, নিজ জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে অক্ষম, তাঁহাদের মধ্যে যে প্রকৃত চিন্তাশীল মানুষ থাকিতে পারে না, তাহা আমাদের যুবকগণকে সর্ব্বাগ্রে বুঝিতে হইবে। স্থানাভাববশতঃ ডক্টর মেঘনাদ সাহার সমগ্র বক্তৃতাটির সমালোচনা এখানে করিতে পারিব না। ঐ বক্তৃতাটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, উহা আগাগোড়া প্রায়শঃ কতকগুলি প্রলাপের সমষ্টি। কাজেই আনন্দবাজার পত্রিকাটির এই প্রবন্ধটিকেও ডক্টর মেঘনাদ সাহা-শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকবৃন্দের চাটুকারিতা বলিতে হইবে।

২৭শে পৌষ তারিখের তৃতীয় প্রবন্ধটিতে মিঃ জিন্নার সহিত পণ্ডিত জওহরলালের সাম্প্রদায়িক মিলন সম্পর্কে যে-কথাবার্ত্তা চলিয়াছে, তাহার সমালোচনা করা হইয়াছে। এই প্রবন্ধের মূল বক্তব্য, মিঃ জিন্না মস্তিষ্কবিহীন সাম্প্রদায়িকতাবাদী এবং তাঁহার জন্যই হিন্দু-মুসলমানের বিবাদের অবসান হইতেছে না। আমাদের মতে, এই প্রবন্ধটিতে একদিকে যেরূপ জাতীয় শত্রুতার পরিচয় পাওয়া যাইবে, অন্যদিকে আবার ইহাতে ১৯৩৫ সনের নূতন আইনের প্রকৃত সমর্থনের সাক্ষ্যও দেখা যাইবে।

অনেকে মনে করেন যে, আনন্দবাজার পত্রিকা জাতীয়তাবাদিগণের মুখপত্র এবং ১৯৩৫ সনের নূতন আইনের বিরোধী। কিন্তু, আমাদের মতে, তাঁহারা প্রকৃত জাতীয়তাবাদের বিরোধী এবং ১৯৩৫ সনের নূতন আইনের যাহা-কিছু প্রশংসনীয়, তাহার বিরোধী বটে, কিন্তু ঐ আইনের যাহা-কিছু নিন্দনীয়, তাহার সমর্থক। আমাদের এই কথা যে সত্য, তাহা উপরোক্ত প্রবন্ধে পরিস্ফুট হইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে জাতীয়তাবাদের সমর্থক হইলে, যাহাতে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া না হয় এবং যে-সমস্ত ক্ষেত্রে মুসলমানগণ হিন্দুদের বিরুদ্ধে অথবা হিন্দুগণ মুসলমানের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ আরম্ভ করেন, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে ঐ নিন্দাবাদ যে গর্হিত, হয় তাহা দেখাইতে প্রযত্নশীল হইতে হয়, নতুবা চুপ করিয়া থাকাই সঙ্গত হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যবহার না করিয়া মুসলমানগণের হিন্দুর সম্বন্ধে নিন্দাবাদের বিরুদ্ধে হিন্দুগণের মুসলমান সম্বন্ধে নিন্দাবাদ চলিতে থাকিলে যে, সাম্প্রদায়িক বিরোধিতার সহায়তা করিয়া পরোক্ষ ভাবে জাতীয়তা গঠনের সম্ভাবনার ধ্বংস করা হয়, ইহা যুক্তিসঙ্গতভাবে অস্বীকার করা যায় না।

উপরোক্ত ভাবে হিন্দু-মুসলমানের বিবাদের পোষকতা করিলে যে, পরোক্ষ ভাবে ১৯৩৫ সনের নূতন আইনের নিন্দনীয় অংশের সমর্থন করা হয়, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। কারণ, ১৯৩৫ সনের আইনের অন্যতম নিন্দনীয় বিষয়, সম্প্রদায়মূলক ভোটদানের নিয়মের দ্বারা হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ-সংগঠন।

উপরোক্ত 'পণ্ডিতজীর উত্তরে মিঃ জিন্নার উত্তর'-শীর্ষক প্রবন্ধ তলাইয়া পড়িলে দেখা যাইবে যে, মিঃ জিন্না যে হিন্দুগণকে আক্রমণ করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে আনন্দবাজার পত্রিকাও মুসলমানগণকে আক্রমণ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া, অন্য কোন মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে না।

কাজেই, আনন্দবাজার পত্রিকা যে কার্য্যতঃ আমাদের জাতীয়তা-গঠনের বিরোধিতা করিতেছেন এবং ১৯৩৫ সনের নূতন আইনের নিন্দনীয় অংশের সমর্থন করিতেছেন, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

বুধবার ২৮শে পৌষ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধের একটির নাম "শিল্পোন্নতিতে বৈজ্ঞানিক শক্তির প্রয়োগ" এবং অপরটির নাম "ধর্ম্মের অপব্যবহার।"

আনন্দবাজারের সম্পাদকগণ—এ, [illegible] [illegible]

সমস্যার সমাধান-সম্বন্ধীয় সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান-বিবর্জ্জিত এবং চাটুকারিতায় নিপুণতা-সম্পন্ন, তাহা উপরোক্ত প্রথম প্রবন্ধে পরিস্ফুট হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার সাধন করিতে পারিলেই বেকার ও দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান হইতে পারে এবং বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ বৈজ্ঞানিক উন্নতি যথেষ্ট ভাবে সাধন করিতেছেন না বলিয়া বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টকে 'অসভ্য গবর্ণমেণ্ট' বলা যাইতে পারে, ইহা এই প্রবন্ধের প্রধান বক্তব্য। আনন্দবাজারের এই মতবাদের অন্যতম সমর্থক ডক্টর মেঘনাদ সাহা।

আনন্দবাজারের এই প্রবন্ধটি পড়িলে মনে হয় যে, ডক্টর মেঘনাদ সাহা যখন এই মতবাদ তাঁহার কোন অভিভাষণে প্রচার করিয়াছেন, তখন উহার অভ্রান্ততা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু, বিশ্ব-দুনিয়ার দিকে একটু চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলে বাস্তব সত্য যে ইহার বিরুদ্ধ, তাহা প্রতীয়মান হইবে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিতে পারিলেই যদি বেকার ও দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়, তাহা হইলে ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী, ইটালী, ফ্রান্স, ইউনাইটেড ষ্টেটস্ প্রভৃতি দেশে চাকুরীমুখাপেক্ষী নকরের হার ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে কেন? প্রত্যেক দেশেই পরের দেশে বাজার বৃদ্ধি করিবার এত আয়োজন চলিতেছে কেন?

আনন্দবাজারের এই প্রবন্ধটিতে আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইঁহাদের মতে, রাশিয়া দারিদ্র্য নিবারণ সম্বন্ধে উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াছে। রাশিয়া যদি বাস্তবিক পক্ষে উন্নতির শিখরেই উঠিতে পারিত, তাহা হইলে তাহার দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধানের পরিকল্পনা পরিবর্ত্তিত করিতে হয় কেন এবং তাহার ইংলণ্ডের নিকট হইতে কর্জ্জ লইয়া আমদানী বৃদ্ধি করিতে হয় কেন? যাহাদের এতটুকু সাধারণ জ্ঞান নাই, তাহারা এই দুর্দ্দিনে দায়িত্বপূর্ণ সংবাদ-পত্রের সম্পাদনায় ভার লয় কেন?

এই প্রসঙ্গে আমরা ডক্টর মেঘনাদ সাহাকেও বলিতে চাই যে, সাধারণের আর্থিক সমস্যার সমাধানের কথা আর ছাত্রদিগকে টিয়াপাখীর বুলি শিখাইবার মত কথা যে এক নহে, তাহা না বুঝিয়া লইয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল জনসাধারণকে বিপথগামী করা যে দায়িত্বজ্ঞান-হীনতার পরিচায়ক, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না কেন?

"ধর্ম্মের অপব্যবহার" নামক দ্বিতীয় প্রবন্ধটিও সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির দৃষ্টান্ত। এই প্রবন্ধে ঐ মনো-বৃত্তি অপেক্ষাকৃত সংযত করিবার প্রযত্ন পরিলক্ষিত হয় বটে, কিন্তু সম্পাদকের অনিপুণতা বশতঃ ইহাতেও ঐ মনোবৃত্তি সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন করা সম্ভব হয় নাই।

এইরূপভাবে আনন্দবাজারের যে কোন দিনের যে কোন প্রবন্ধ ধরা যাউক না কেন, তাহার অধিকাংশ প্রবন্ধেই কার্য্যতঃ জাতীয়তা-গঠন-বিরোধিতার এবং সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

যতদিন পর্য্যন্ত প্রদেশের সংবাদপত্রগুলি ও রাজনৈতিক নেতৃবর্গ তাঁহাদের মনোভাব পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য না হইবেন, ততদিন পর্য্যন্ত ভারতবাসীর কোন সমস্যারই সমাধান করা সম্ভব হইবে না, ইহা আমাদের অভিমত। আমাদের এই কথা এখনও অতীব শ্রুতিকটু বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহা যে অতীব সত্য, তাহা অদূরভবিষ্যৎ প্রতিপন্ন করিবে।

বিজ্ঞান কংগ্রেস

কলিকাতার বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে সমাগত বিদেশীয় বৈজ্ঞানিকগণ জনসাধারণের জন্য অনুষ্ঠিত কয়েকটি সভায় কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। স্থানাভাববশতঃ ঐ সকল বক্তৃতার সার মর্ম এখানে উপস্থিত করা সম্ভব হইল না, (সাপ্তাহিক বসুমতীতে উহাদের সারমর্ম প্রকাশিত হইয়াছে)। নিম্নে ঐ সকল বক্তৃতার বিষয়, বক্তার নাম ও তারিখ উল্লেখ করিয়া তৎসম্বন্ধে আমাদের মতামত দেওয়া হইল।

পাঠক লক্ষ্য করিবেন, আমরা আমাদের মন্তব্যে যেমন আলোচ্য বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বর্তমান বিজ্ঞানের দোষ-ত্রুটির উল্লেখ করিয়াছি, তেমনই প্রাচীন ভারতীয় ঋষিগণের ঐ বিজ্ঞান-বিষয়ক নির্দেশ কোন্ কোন্ গ্রন্থে পাওয়া যাইতে পারে, তাহারও উল্লেখ করিয়াছি।

জ্যোতিষ-বিজ্ঞান

এই বিষয়ে ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রখ্যাতনামা অধ্যাপক স্যর আর্থার এডিংটন তিনটি বক্তৃতা দান করেন। (১) ৪ঠা জানুয়ারী গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে রোটারী ক্লাবের সাপ্তাহিক সভায় প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয়:—অবজারভেটরীর কার্য্যপদ্ধতি। এই বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন, অবজারভেটরীর প্রধান কাজ ঘড়ির

সাহায্যে নিখুঁৎভাবে দূরত্ব, সময়, নক্ষত্রাদির অবস্থান নির্ণয় করা। বক্তার মতে মঙ্গলগ্রহ প্রভৃতিতে জীবের অস্তিত্ব সম্ভবপর। ফলিত জ্যোতিষ-শাস্ত্রকে তিনি ধোঁকাবাজী বলিয়া মনে করেন।

৭ই জানুয়ারী সিনেট হলে প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয়—ছায়াপথ এবং দূরতর জগৎ (The Milky Way and Beyond)। ঐ দিনই সন্ধ্যায় বেতারযোগে তিনি "আলোক বিশ্লেষণ দ্বারা নক্ষত্র সম্পর্কে গবেষণা" (Stellar Spectroscopy) সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দান করেন।

স্যর আর্থার এডিংটন যে-কয়টি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহা প্রধানতঃ পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধীয়। পাশ্চাত্ত্যের অন্যান্য বিজ্ঞানের মত পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষশাস্ত্রও অত্যন্ত অসম্পূর্ণ এবং ভ্রান্তিময়। পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষশাস্ত্রে যে-সমস্ত কথা আছে, তাহা সম্পূর্ণ অথবা অসম্পূর্ণ, উহা ভ্রান্তিময় অথবা ভ্রান্তিহীন, ইহা বুঝিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে ব্যাবহারিক জীবনে জ্যোতিষশাস্ত্রের কি প্রয়োজনীয়তা, তাহা জানিবার আবশ্যকতা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রের যে কি প্রয়োজনীয়তা, তৎসম্বন্ধীয় কোন সন্ধানই পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষশাস্ত্র তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিলেও পাওয়া যাইবে না। জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে ভারতীয় ঋষিগণের প্রণীত বহু গ্রন্থ দেখা যাইবে, ইহার যে-কোনখানিতে জ্যোতিষশাস্ত্রের যে কি প্রয়োজনীয়তা, তাহা নিখুঁৎ ভাবে লেখা রহিয়াছে। মানুষের জন্মমৃত্যু কেন হয়, ভ্রূণ, অণ্ড ও জীবের উৎপত্তি হয় কি প্রকারে, জীবের কার্য্যশক্তির উৎপত্তি হয় কোথা হইতে, এবংবিধ সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া বহু সহস্র বৎসর আগে ভারতীয় ঋষিগণ সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহ, উপগ্রহগণের প্রয়োজনীয়তা যে কি, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিলেন। জ্যোতিষ্কমণ্ডলের কোন্‌টির আয়তন কতখানি, পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব কতখানি, উহাদের প্রত্যেকের উৎপত্তি হয় কি প্রকারে, কেবল মাত্র এবংবিধ সংবাদই যে ঋষিগণের প্রণীত গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে, তাহা নহে, এবংবিধ তথ্য তাঁহাদের গ্রন্থে যেরূপভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, সেইরূপ আবার ঐ সমস্ত তথ্যের সত্যতা কিরূপ ভাবে প্রত্যক্ষ করিতে হয়, তাহাও তাঁহারা জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলিতে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বেদাঙ্গের আর্চ ও যাজুষ জ্যোতিষ, হোরা-বিজ্ঞান প্রভৃতি গ্রন্থে যথাযথ ভাবে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে আমাদের কথার সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে।

জ্যোতিষ্কমণ্ডলের প্রত্যেক গ্রহ, উপগ্রহটি কিরূপ ভাবে জীবের প্রয়োজন সাধন করিতেছে, তাহা পাশ্চাত্ত্য জ্যোতির্ব্বিদগণের জানা নাই বলিয়াই প্রায়শঃ ইহাঁরা ফলিত জ্যোতিষের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারেন না। জ্যোতিষ্কমণ্ডল সম্বন্ধীয় কয়েকটি প্রাথমিক কথার দিকে নজর করিলেই, পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষের বিফলতা প্রতীয়মান হইবে। জ্যোতিষ্কমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহের ঘূর্ণয়ন সম্বন্ধে বহু কথা ও বহু গণিত আধুনিক জ্যোতিষশাস্ত্রে স্থান পাইয়াছে বটে, কিন্তু পৃথিবীর ঘূর্ণয়ন সম্বন্ধে উপরোক্ত জ্যোতিষিগণের কথা বিশ্বাস না করিলে, অন্য কোন্ উপায়ে পৃথিবীস্থ জীবের পক্ষে ঐ ঘূর্ণয়ন প্রত্যক্ষযোগ্য হইতে পারে, তাহার কোন নির্দ্দেশ আধুনিক জ্যোতিষের কোন গ্রন্থে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না এবং আধুনিক জ্যোতিষিগণের কেহ যে উহা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই, তাহা উপরোক্ত সত্য হইতে প্রতীয়মান হইবে। ইহাঁরা হয় তো বলিবেন যে, পৃথিবীর ঐ ঘূর্ণয়ন মানুষের পক্ষে প্রত্যক্ষের যোগ্য নহে, কিন্তু যাঁহারা যজুর্ব্বেদের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া উহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা প্রকৃত সত্য যে অন্যরূপ, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন।

যে দিক্ দিয়াই দেখা যাউক, স্যর আর্থার এডিংটনের জ্যোতিষশাস্ত্র-সম্বন্ধীয় বক্তৃতাবলী, বর্ত্তমান জ্যোতিষের অসম্পূর্ণতার নির্দ্দেশক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

ভূগোল-বিজ্ঞান

ম্যাঞ্চেষ্টারের প্রথিতযশা অধ্যাপক এইচ. জে, ফ্লুর, এফ-আর-এস এই বিষয়ে দুইটি বক্তৃতা দান করিয়াছেন। ৩রা জানুয়ারী সেনেট হলে প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয়—ইউরোপের জাতিত্ববোধ (The Idea of Nation in Europe) এই বক্তৃতায় তিনি তিনটি বিষয়ের আলোচনা করেন—(১) জাতিত্ববোধের উন্মেষ কি প্রকারে হইয়াছে? (২) বিভিন্ন দেশের জাতিত্ববোধের পার্থক্য ও তাহার কারণ, (৩) ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্ম্মানীর জাতিত্ববোধের পার্থক্য ও তাহার কুফল।

আমাদের মতে, ইউরোপীয়গণ কয়েক শতাব্দী হইতে জীব ও জগৎ সম্বন্ধে বহুবিধ রহস্য জানিবার জন্য উৎসুক

হইয়াছেন, কিন্তু কিরূপ ভাবে অগ্রসর হইলে ঐ ঔৎসুক্য নির্ভুল ভাবে চরিতার্থ করা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে, এক দিকে যেরূপ সেইরূপ ভাবে অগ্রসর হইতে তাঁহারা এখনও পর্য্যন্ত সক্ষম হন নাই, অন্যদিকে আবার জীব ও জগৎ সম্বন্ধে কোনও সত্যই এখনও পর্য্যন্ত তাঁহারা যথাযথ ভাবে পরিজ্ঞাত হইতে সক্ষম হন নাই।

অধ্যাপক ফ্লুরের এই বক্তৃতাটি আমাদের উপরোক্ত মন্তব্যের অন্যতম প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। মানব-জাতির বর্ত্তমান বিপজ্জনক অবস্থা হইতে মানবজাতিকে রক্ষা পাইতে হইলে ইউরোপীয়গণের মিলনের প্রয়োজনীয়তা যে ইউরোপীয়গণের মধ্যে কেহ কেহ বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার সাক্ষ্য অধ্যাপক ফ্লুরের বক্তৃতায় পাওয়া যায়। অধ্যাপক ফ্লুরের মতে কেবল মাত্র ইউরোপীয়গণ মিলিত হইতে পারিলেই মনুষ্যজাতি তাহার বিপদ্‌সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু অদূরভবিষ্যতে দেখা যাইবে, যতদিন পর্য্যন্ত সমগ্র মানবজাতির আন্তরিক মিলনের আরম্ভ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত ইউরোপীয়গণের পরস্পরের মধ্যে আন্তরিক মিলন সম্ভবযোগ্য হইবে না এবং ততদিন পর্য্যন্ত মানবজাতির পক্ষেও তাহার বর্ত্তমান বিপদ্‌সাগর উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হইবে না। আমাদের উপরোক্ত কথা যে যুক্তিসঙ্গত, তাহা প্রমাণিত করিতে হইলে আমাদিগকে অনেক কথা বলিতে হইবে, স্থানাভাব বশতঃ উহা বর্ত্তমানে সম্ভব নহে।

ইউরোপীয়গণ যে কেন মিলিত হইতে পারিতেছেন না, তৎসম্বন্ধে অধ্যাপক ফ্লুর যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার চিন্তাশীলতার পরিচয় আছে বটে, কিন্তু ঐ মতবাদও যুক্তিসঙ্গত নহে। সমগ্র মানবজাতির মধ্যে সমতা ও বৈশিষ্ট্য কোথায় এবং কেনই বা যুগপৎ ঐ সমতা ও বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হয়, কি করিলে দুইটি শক্তির বৈশিষ্ট্যকে পরস্পরের মধ্যস্থিত সমতায় পরিণত করা সম্ভবযোগ্য হয়, তাহা যতদিন পর্য্যন্ত আবার মানবসমাজ পরিজ্ঞাত হইতে না পারিবে, ততদিন পর্য্যন্ত এক দিকে যেরূপ, কেন যে মানুষে মানুষে এত অমিলন, তাহা বুঝা সম্ভব হইবে না, সেইরূপ আবার পরস্পরের আন্তরিক মিলনও সম্ভবযোগ্য হইবে না। যাঁহারা এই তথ্য নির্খুৎ ভাবে জানিতে চাহেন, আমরা তাঁহাদিগকে সংস্কৃত ভাষা প্রকৃত ভাবে পরিজ্ঞাত হইয়া গৌতমসূত্র ও কণাদসূত্রে অভিনিবিষ্ট হইতে অনুরোধ করি। অধ্যাপক ফ্লুরের মতবাদ যে ভ্রান্তিময়, গৌতম ও কণাদসূত্র পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে যথাযথ ভাবে তাহা বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয় এবং এই দুইখানি গ্রন্থে মানুষের মিলন ও অমিলন-রহস্য যেরূপ ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, সেইরূপ ভাবে উহা যে আর কোন আধুনিক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয় নাই, তখন তাহাও বুঝিয়া উঠা সম্ভব হইতে পারে।

৯ই জানুয়ারী অধ্যাপক ফ্লুর বেতারযোগে "মানবসভ্যতার ইতিহাস এবং ভারতবর্ষের ও ইউরোপের সভ্যতার বৈশিষ্ট্য" বিষয়ে এক বক্তৃতা দান করেন। এই বক্তৃতায় তিনি অন্যান্য বিষয় আলোচনা করিয়া জানাইয়াছেন,—"ইউরোপে মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব মিটিতে পারিতেছে না" এবং ভারতবর্ষকে নিকট ইউরোপের শিখিবার বিষয় আছে, তাহাও স্বীকার করিয়াছেন।

অধ্যাপক ফ্লুরের উপরোক্ত বক্তৃতার দুইটি বিষয় আমাদের বড়ই মুখরোচক হইয়াছে। তাঁহার সমগ্র বক্তৃতাটি পড়িলে দেখা যাইবে, তাঁহার মতে ইউরোপের অবস্থা বহু বিষয়ে ভারতের অবস্থার তুলনায় নিন্দনীয়। ইহা ছাড়া এমন বহু বিষয়ের তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা হইতে বুঝিতে হয় যে, ইউরোপের পক্ষে তাহার নিজ শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা নিজকে রক্ষা করা সম্ভব নহে। তাঁহার মতে ভারতবর্ষের পক্ষে ইউরোপকে রক্ষা করা সম্ভবযোগ্য। আমাদের ভারতীয় রাজনৈতিক ও শিক্ষা-বিভাগীয় ভাবসঙ্কর গুরুগণ অধ্যাপক ফ্লুরের সহিত একমত হইতে পারিবেন কি?

অধ্যাপক ফ্লুরের উপরোক্ত দুইটি কথা আমাদের মুখরোচক হইয়াছে বটে এবং তন্মধ্যে যুক্তিযুক্ততাও বহু পরিমাণে দেখা যায় বটে, কিন্তু ভারতীয় ইতিহাস ও ভারতীয় ঋষিগণের জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ঐ সম্বন্ধীয় প্রাচীন কথাই যে জানা নাই, তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। নিখুঁৎভাবে ভারতের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস জানিতে হইলে বেদাঙ্গপ্রোক্ত ভাষাতত্ত্ব ও সংস্কৃতভাষা পরিজ্ঞাত হইয়া ঋষিপ্রণীত গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করা একান্ত প্রয়োজনীয়

হয়। তাহা না করিয়া ইঁট-পাটকেল দেখিয়া তাহতেতিহাস প্রণয়ন করিতে গেলে যে-ফললাভ হয়, তাহার দৃষ্টান্ত অধ্যাপক ক্লুরের বক্তৃতায় দেখা যায়। আধুনিক ঐতিহাসিকগণের পক্ষে এই সত্যটুকু উপলব্ধি করা কি এতই দুরূহ ?

পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন

বিলাতের ক্যাভেণ্ডিশ লেবরেটরীর সুযোগ্য ডিরেক্টর ডক্টর এফ. ডব্লিউ. অ্যাষ্টনের ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে সিনেট হলে প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয়—"পরমাণু ও সমধর্ম্মী মৌলিক পদার্থ (Atoms and Isotopes)" এই বক্তৃতায় তিনি পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের এ্যাটম বা পরমাণুর ব্যাখ্যা দিয়াছেন এবং লর্ড রাদারফোর্ডের গবেষণার ফলে কি ভাবে Isotope-এর আবিষ্কার সম্ভব হইয়াছে এবং ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া গিয়াছে, তাহার বিবরণ দান করিয়াছেন।

৩ই জানুয়ারী সেনেট হলে জয়কৃষ্ণ মুখাৰ্জ্জি স্বর্ণপদক প্রদান উপলক্ষে আহূত সভায় ডক্টর অ্যাষ্টন প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয়—"সমধর্ম্মী মৌলিক পদার্থের স্বতন্ত্রীকরণ (Separation of Isotopes)। এই বক্তৃতায় তিনি সীসক, নিয়ন, ক্লোরিন, পারদ প্রভৃতি মৌলিক পদার্থের স্বতন্ত্রীকরণের প্রচেষ্টা ও সাফল্যের বিবরণ দান করেন।

অ্যাটম ও আইসোটোপ-সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিকগণের কথাগুলি আপাতদৃষ্টিতে বড়ই মুখরোচক বটে, কিন্তু আমাদের মতে, উঁহাদের ঐ কথাগুলি ঐ সম্বন্ধীয় জ্ঞানের অসম্পূর্ণতার পরিচায়ক। অ্যাটম ও আইসোটোপ-সম্বন্ধীয় পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকদের জ্ঞান যে অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্তিপূর্ণ, তাহা শ্রদ্ধাশীল হইয়া যথাযথ ভাবে অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করিতে পারিলে যেরূপ প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ আবার নিজ শরীরের মধ্যে যে শ্লৈষ্মিক-ঝিল্লী সর্ব্বশরীর পরিব্যাপ্ত হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে, অহরহঃ তাহার উৎপত্তি ও পরিবর্ত্তন কিরূপে হইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিলেও বুঝিতে পারা যাইবে। আমাদের মতে, ইউরোপীয় তাবৎ-বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা ও ভ্রান্তিনিবন্ধন যাহা বিজ্ঞান নয়, তাহাকে যেরূপ ইউরোপীয়গণ বিজ্ঞান বলিতেছেন, সেইরূপ আবার যে সাধনাবলে প্রকৃত বিজ্ঞানে প্রবেশ লাভ করা সম্ভব হয়, সেই সাধনায় সন্ধান তাঁহারা প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হন নাই বলিয়া, প্রকৃত বিজ্ঞান-রাজ্যেও তাঁহারা এখনও প্রবিষ্ট হইতে সক্ষম হন নাই। ইহারই ফলে 'বিজ্ঞান', 'বিজ্ঞান' বলিয়া নানাবিষয়ে তাঁহারা হৈ চৈ করিতেছেন বটে, কিন্তু মানুষ যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া যাইতেছে এবং মানুষের প্রত্যেক বিষয়ের ক্লেশ সর্ব্বতোভাবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

কবে আমাদের মোহান্ধতা দূরীভূত হইবে ?

৯ই জানুয়ারী ভারতীয় বিজ্ঞান-সমিতির ভবনে অধ্যাপক জে. ই. লেনার্ড-জোন্স প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় Recent Advances in the Theory of Interatomic Forces. এই বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন, থিয়োরিটিক্যাল কেমিষ্টের এক উদ্দেশ্য, গবেষণার ফলাফলসমূহের মধ্যে সম্পর্কস্থাপনা এবং মূল-সূত্রসমূহের সাহায্যে তাহাদের ব্যাখ্যা করা। রসায়ন শাস্ত্রের পরীক্ষাসমূহ হইতে অণু ও পরমাণুসমূহের পরস্পরের মধ্যে যে শক্তিগুলি কার্য্য করে, তৎসম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান অপেক্ষা মৌলিকতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া কেমিষ্টগণের পক্ষে সম্ভব নহে। এই শক্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করিয়া কেমিষ্টগণ বিবিধ গবেষণামূলক তথ্যসমূহ ব্যাখ্যা করিতে পারিবেন।

ইহা কি ঠিক কথা ? ইহার সঠিকতা প্রত্যক্ষযোগ্য করা যায় কি ? ঐ কথাগুলি যে অসম্ভব, তাহা প্রয়োজন হইলে আমরা প্রতিপন্ন করিতে পারিব

উদ্ভিদ্-বিদ্যা

স্তর আর্থার উইলিয়াম হিল্ বিলাতের প্রসিদ্ধ 'কিউ গার্ডেন্স'-এর প্রখ্যাতনামা ডিরেক্টর। এই উদ্যানে নানা দেশীয় উদ্ভিদ্ সম্পর্কিত গবেষণাগার। ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে স্তর আর্থার সিনেট হলে, কিউয়ের রয়াল বোটানিক গার্ডেন কি ভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এবং বিশেষভাবে ভারতবর্ষ সম্পর্কে কি কাজ করিতেছে, তাহার পরিচয় দিয়া একটী বক্তৃতা দান করেন। ঐ বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন, বর্ত্তমানে কিউ গার্ডেনে ভারতবর্ষে উৎপন্ন বিভিন্ন খাদ্য-শস্যের খাদ্য-মূল্য নির্দ্ধারণ বিষয়ে গবেষণা হইতেছে। তাঁহার মতে, ঐ গবেষণার ফলে ভারতবাসীর উৎপন্ন খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা আছে।

৫ই জানুয়ারী সেনেট হলে স্তর আর্থারের প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয়—"বীজ ও বীজ হইতে চারার জন্ম সম্বন্ধে গবেষণা (The Study of Seedlings and their modes of Germination)."

পাশ্চাত্ত্য উদ্ভিদ্‌বিদ্যা প্রায়শঃ হাস্যোদ্দীপক। তাহার নিদর্শন উপরোক্ত বক্তৃতা দুইটির মধ্যেও পাওয়া যাইবে। উদ্ভিদ্-বিদ্যাকে মানুষের ব্যবহার বিষয়ে প্রয়োজনীয় করিতে হইলে প্রথমতঃ বীজের উৎপত্তি হয় কেন, যে-বীজ ও যে

ভূমির সহযোগে কোন উদ্ভিদ্‌বিশেষের উৎপত্তি সম্ভব হয়, অন্য কোন ভূমির সহযোগে তাদৃশ উদ্ভিদের উৎপত্তি না হইয়া কেবল মাত্র সেই ভূমির সহযোগেই উহা হয় কেন, কোন্ কালে কোন্ বীজ বপন করিলে কত দ্রুত গতিতে ঐ বীজ হইতে চারা, পুষ্প ও ফলাদির উৎপত্তি হওয়া সম্ভব হইতে পারে, এবংবিধ তথ্য যে সর্ব্বাগ্রে আলোচ্য, ইহা একটু চিন্তা করিলেই প্রতীয়মান হইবে। এবংবিধ তথ্য যে বর্ত্তমান উদ্ভিদ্‌-বিজ্ঞান পরিজ্ঞাত হইতে পারে নাই, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। কাজেই বর্ত্তমান তথাকথিত উদ্ভিদ্‌-বিজ্ঞানকে যাঁহারা বিজ্ঞান বলিয়া আনন্দানুভব করেন, তাঁহারা যে বিজ্ঞান শব্দের প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে অজ্ঞতা-হেতু উহাকে অপমানিত করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না, তাহাই বুঝিতে হয়।

যাঁহারা প্রকৃত উদ্ভিদ্‌-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু জানিতে উৎসুক, আমরা তাঁহাদিগকে প্রকৃত সংস্কৃত শাস্ত্র অবগত হইয়া নিরুক্তের বিভিন্ন অধ্যায়ের সূত্রগুলি এবং অথর্ব্ববেদ যথাযথ ভাবে অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করি। এই বিদ্যার মূলকথাগুলি যে বাইবেল ও কোরাণেও স্থান পাইয়াছে, তাহা অনুমান করিবার কারণ আছে।

রাষ্ট্র-বিজ্ঞান

আর্ণেষ্ট বার্কার ক্যাম্ব্রিজের খ্যাতনামা অধ্যাপক। ৫ই জানুয়ারী আশুতোষ হলে এবং ৮ই জানুয়ারী ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে যথাক্রমে তিনি 'আধুনিক রাজনীতিতে গ্রীক জাতির প্রভাব' এবং 'ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট প্রথা' সম্পর্কে বক্তৃতা দান করেন। প্রথম বক্তৃতাটিতে তিনি বর্ত্তমান রাজনীতিতে ও অর্থনীতিতে গ্রীক চিন্তার প্রভাবের পরিচয় দান করেন এবং দ্বিতীয়টিতে পার্লামেণ্ট প্রথার ক্রমবিকাশ, কমন্স সভা ও রাজনৈতিক পার্টির সম্পর্ক এবং কমন্স সভা ও মন্ত্রিসভার সম্পর্ক বিষয়ে বক্তৃতা দান করেন। প্রথম বক্তৃতাটিতে তিনি প্রসঙ্গতঃ স্বীকার করিয়াছেন মানুষের যুক্তিজ্ঞানের দ্বারা মানুষের মধ্যে বিশ্বজনীন সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতামূলক নিয়ম ও শৃঙ্খলার ধারণা সৃষ্টি করা সম্ভব।

আধুনিক রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান যে অধ্যাপক আর্ণেষ্ট বার্কার গভীরভাবে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন, তাহার সাক্ষ্য তাঁহার বক্তৃতা দুইটিতে পাওয়া যাইবে। ব্যক্তিগত হিসাবে অধ্যাপক বার্কার প্রশংসার যোগ্য বটে, কিন্তু তাঁহার কথিত তথাকথিত-বিজ্ঞানের মতবাদগুলি যে পরস্পর-বিরোধিতামূলক কথায় পরিপূর্ণ এবং সেই হিসাবে ঐ বিজ্ঞান যে নানারূপ দোষে দুষ্ট, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। এতাদৃশ বিরুদ্ধ কথাগুলিকেও যে মানুষ বিজ্ঞান বলিয়া মনে করে, ইহা বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজের অবনতির পরিচায়ক।

একমাত্র যুক্তিজ্ঞানের দ্বারাই যদি মানুষের মধ্যে বিশ্বজনীন নিয়ম ও শৃংখলার সৃষ্টি করা সম্ভবযোগ্য হয়, তাহা হইলে মানুষের মধ্যে বিশৃংখলা ও অনিয়ম দেখা যায় কেন? এতৎসম্বন্ধে গভীর সত্য যদি কেহ প্রত্যক্ষ করিতে চান, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে বেদ ও মন্বাদি বিংশ সংহিতা অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করি।

মনোবিজ্ঞান

৫ই জানুয়ারী জনসাধারণের জন্য অনুষ্ঠিত এক সভায় অধ্যাপক সি. ই. স্পীয়ারম্যান 'বুদ্ধি' সম্বন্ধে তাঁহার মতবাদের ব্যাখ্যা করেন। বক্তৃতার প্রধান বক্তব্য—বুদ্ধি সম্বন্ধে বক্তার অন্যান্য থিয়োরীর তুলনায় বক্তার নিজস্ব থিয়োরীর অধিকতর উপযোগিতা।

অতিথির কোনরূপ নিন্দা করা ভারতীয় আচার-বিরুদ্ধ; সেই হিসাবে বৃটিশ সায়ান্স এসোসিয়েশনের যে-সমস্ত সভ্য ইণ্ডিয়ান সায়ান্স এসোসিয়েশনের জুবিলী-উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কথাবার্ত্তায় সামান্য সামান্য ত্রুটী পরিলক্ষিত হইলে আমরা তাহাকে উপেক্ষা করিবার জন্য মনকে প্রস্তুত করিয়া বসিয়াছি।

কিন্তু অধ্যাপক স্পীয়ারম্যানের কথাগুলি বড়ই প্রতারণামূলক, ইহা উপেক্ষার যোগ্য নহে। মন ও বুদ্ধি জীবের বাহিরের জিনিষ নহে, উহা জীবের অন্তরের জিনিষ; বাহিরের রাজ্যে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ তাঁহাদিগের প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছেন বলিয়া স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু জীবের অন্তরের রাজ্যে তাঁহারা যে প্রবেশ করিতে পারিয়াছেন, এতাদৃশ কোন স্পর্দ্ধার কথা আমরা এতাবৎ পরিজ্ঞাত ছিলাম না। মানুষের বুদ্ধি অথবা মন কি জিনিষ, তাহা যথাযথ ভাবে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে তথাকথিত 'কুসংস্কারান্ধ' 'জপ' ও 'ধ্যান' লইয়া মানুষকে ব্যস্ত হইতে হয়। একমাত্র 'জপ' ও 'ধ্যান' ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে নিজ অন্তরস্থিত বুদ্ধি ও মনকে প্রত্যক্ষ করা অথবা তৎসম্বন্ধে কোন নির্ভুল সত্য বাক্য

করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। কেন যে ইহা সম্ভব নহে, তাহা পাঠকবর্গকে বুঝাইতে হইলে অনেক কথা বলিতে হইবে। ইহা তাহার সমুচিত স্থান নহে। আমাদের মতে অধ্যাপক স্পীয়ারম্যান্ অনধিকার-চর্চ্চা করিয়াছেন। এতাদৃশ ভাবে যুবকবৃন্দকে বিপথগামী না করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য বলিয়া আমাদের পরামর্শ।

৭ই জানুয়ারী বেতারযোগে লণ্ডনের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডক্টর সি, এস, মায়ার্স 'বৃত্তিগত মনস্তত্ত্ব (Occupational Psychology)' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দান করিয়া বলেন—'ভারতবাসীর যে কর্ম্মশক্তির অভাব দেখা যায়, তাহা কেবল ভারতবর্ষের আবহাওয়ার জন্য নহে, অধিকক্ষণ কার্য্য করা, অল্প বেতন ইত্যাদিও ইহার জন্য দায়ী।'

বক্তৃতাটি উপাদেয় বটে। কিন্তু স্যর, অম্বেল ইয়োর ওন মেজিন্। কথাটি বড়ই অসভ্য হইল—না ?

বিবিধ

ক্যামব্রিজের অধ্যাপক সি, জে, ডারউইন, এফ-আর-এস ৬ই জানুয়ারী আশুতোষ কলেজ হলে 'অনিশ্চয়তাবাদ (Uncertainty)' শীর্ষক এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—'আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি যে, কোন বিষয়েই আমাদের নিখুঁৎ জ্ঞানলাভ সম্ভব নহে, যে বিষয়ে আমরা যতখানি জানিতে পারি, তাহার মধ্যে কিছু অনিশ্চয়তা থাকিয়া যাইবেই।'

কথাটা খুবই সত্য বটে, কিন্তু উহার মধ্যেও বৈজ্ঞানিকের অভিমান একটু উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে না ? বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যে প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারেন নাই, এই উক্তিটি যে সত্য, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু ঐ উক্তিটির সহিত 'অনিশ্চয়তা' নামক বিজ্ঞানের উক্তি স্থান পাওয়ায় অধ্যাপক ডারউইনের বক্তৃতাটি বৈজ্ঞানিকের অভিমানের নিদর্শনস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায় নাই কি ?

৮ই জানুয়ারী সেনেট হলে এফ. ই. ক্রু প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয়—The Biology of Death। বক্তৃতার আরম্ভে বক্তা 'মৃত্যুর পরে কি ঘটে, বিজ্ঞান আজও সেই রহস্যের যবনিকা উত্তোলন করিতে সমর্থ হয় নাই' বলিয়া স্বীকার করিয়া শেষে বলিয়াছেন—'একটি জীবকোষবিশিষ্ট জীবের মৃত্যু নাই, বহু জীবকোষবিশিষ্ট জীবই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।'

আমাদের মতে, ইহা বক্তার সম্পূর্ণ অনধিকার-চর্চ্চা। কেন জীবের মৃত্যু হয়, অথবা মৃত্যুর পর জীব কোন্ অবস্থায় উপনীত হয়, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া তদ্বিষয়ে কোন জীবন্ত সত্য পরিজ্ঞাত হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে জিহ্বার বিদ্যমানতা কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহা অনুভব করিতে হইবে। মদ্য, মুরগী, কিংবা কোন রকম ডিম্ব গলাধঃকরণ করিয়া অথবা নিজেকে নানারূপ কৃত্রিম বেশ ও বিহারে ভূষিত করিয়া জীবনকে তথাকথিত উপভোগে ব্যাপৃত থাকিলে উপয়োক্ত অনুভূতি কথনও সম্ভবযোগ্য হয় না। আমাদের কথা যে সত্য, তাহা প্রয়োজন হইলে আমরা যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে প্রস্তুত আছি।

বক্তৃতাটি পাঠ করিয়া আমাদের বলিতে ইচ্ছা হইয়াছিল যে, মাসিমাসী, 'ডুট ও টামাক' এক সঙ্গে খাওয়া চলিবে না।

ষ্ট্যাটিস্টিক্স

৭ই জানুয়ারী কলিকাতার সেনেট হলে ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল কনফারেন্সের প্রথম অধিবেশন হয়। ঐ অধিবেশনে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের গল্টন-অধ্যাপক আর, এ, ফিশার সভাপতির অভিভাষণপ্রসঙ্গে নানা বিষয় আলোচনা করেন। অধিবেশনের উদ্বোধন করিয়াছিলেন বঙ্গদেশের নবীন শাসনকর্ত্তা—লর্ড ব্যাবোর্ণ। অধিবেশন-সংশ্লিষ্ট 'মেডিক্যাল এণ্ড পাব্লিক হেল্থ' শাখার সভাপতি বাঙ্গালা সরকারের পাবলিক হেল্থ-কমিশনার কর্ণেল জি, এইচ, রাসেল বহু বিষয় আলোচনা করেন।

আমাদের মতে, একমাত্র বৃত্তান্ত-সংকলন (from compilation of statistics) হইতে কোনও মৌলিক বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হইতে পারে না এবং তদনুসারে ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল সাযান্স সম্বন্ধে যে-সমস্ত কথাবার্ত্তার আদান-প্রদান হইয়াছে, তাহা প্রায়শঃ অর্থহীন। বিজ্ঞান হিসাবে বৃত্তান্তসংকলনের বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা না থাকিলেও বৃত্তান্ত-সংকলনের (Statistics) যে অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে এবং তদনুসারে বৃত্তান্ত-সংকলন-বিদ্যা যে উৎসাহদানযোগ্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আজকাল যে সমস্ত ষ্ট্যাটিস্টিক্স প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা প্রায়শঃ অবিশ্বাসযোগ্য ও নিষ্প্রয়োজনীয় হয়। ইহার কারণ, বৃত্তান্ত-সংকলনের যাঁহারা প্রণেতা, তাঁহারা প্রায়শঃ কোন্ বৃত্তান্ত বিষয়ে কি কি দ্রষ্টব্য, তদ্বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে

অবগত হন না। আমরা এতদ্বিষয়ে বৃত্তান্ত-সংকলকারিগণের মনোযোগ আহ্বান করিতেছি।

দর্শন

এই জানুয়ারী সিনেট হলে ভাইকাউণ্ট স্তামুয়েল 'দর্শনের ভিত্তিস্বরূপ বিজ্ঞান (Science as a Basis of Philosophy)' বিষয়ে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দান করেন। ঐ বক্তৃতায় তিনি নানা বিষয়ক আলোচনা করিয়া বলেন যে, 'জগৎ যে আজ দর্শনের বাণী কানে তুলিতে চাহে না, তাহার একটি কারণ, দার্শনিকের কথা জনসাধারণ বুঝিতে পারে না, অপর কারণ দার্শনিকগণের মতানৈক্য।'

লর্ড স্তামুয়েলের উপরোক্ত বক্তৃতাটিতে চিত্তাকর্ষক অনেক কথা দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ঐ কথাগুলি প্রায়শঃ যুক্তিসঙ্গত নহে। ব্যবহার-ক্ষেত্রে দর্শনের গণ্ডী কতখানি, বিজ্ঞানের গণ্ডী কতখানি এবং জ্ঞানের গণ্ডী কতখানি, তাহা যে ইউরোপীয় ভাবুকগণ বিদিত নহেন, তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত লর্ড স্তামুয়েলের উপরোক্ত বক্তৃতা। দর্শনের গণ্ডী কতখানি, তাহা বুঝিতে হইলে দর্শন ও দৃষ্টি, এই দুইটি শব্দের মধ্যে কি পার্থক্য, তাহা সর্ব্বপ্রথমে বুঝিয়া লইতে হইবে। যখন কোন একটি বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া থাকে, তখন উহা আমাদিগের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়াছে ইহা বলিতে হইবে।

কোন একটি বস্তু দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইলে, হয় ঐ বস্তুর রূপ সম্বন্ধে রাগ অথবা দ্বেষের উদ্ভব হইয়া থাকে, নতুবা ঐ বস্তুটি দেখিতে অথবা ক্রিয়াশক্তিতে ঐরূপ কেন হইয়াছে, তদ্বিষয়ে প্রশ্নের উদ্ভব হয়। ঐ বস্তুটি দেখিতে বা ক্রিয়াশক্তিতে ঐরূপ কেন হইয়াছে, তদ্বিষয়ে প্রশ্নের উদ্ভব হইবার পর তাহার মীমাংসার জন্য প্রথমতঃ মানুষ যে যে কার্য্যে নিযুক্ত হয়, তাহা বিজ্ঞানের কার্য্য। বিজ্ঞানের কার্য্যে অগ্রসর হইবার পর মানুষ বুঝিতে পারে যে, প্রত্যেক বস্তুটির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থার মূলে বুদ্ধিগ্রাহ্য একটি অবস্থা রহিয়াছে এবং বস্তুটির রূপ ও ক্রিয়াশক্তি কেন ঐরূপ হইয়াছে, তাহার মীমাংসা-সাধনার্থ বস্তুর বুদ্ধিগ্রাহ্যাবস্থা পর্য্যন্ত বিশ্লেষণের প্রবৃত্তির উদ্রেক হয়। বস্তুর বুদ্ধিগ্রাহ্যাবস্থার বিশ্লেষণের নাম বিজ্ঞানের কার্য্য। এইরূপ ভাবে বিজ্ঞান ও জ্ঞানের কার্য্য দ্বারা বস্তু সম্বন্ধে যাহা কিছু পরিজ্ঞাত হইবার প্রয়োজন হয়, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে তৎসম্বন্ধে লোকশিক্ষার্থ বাঙ্ময় অভিব্যক্তি হইতে আরম্ভ করে। ইহারই নাম দর্শন।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, কোন বস্তুর সম্পূর্ণ জ্ঞান আরম্ভ হয় তাহার দৃষ্টিতে এবং ঐ জ্ঞানের অগ্রগতি সাধিত হয় উহার বিজ্ঞান ও জ্ঞানে এবং পরিসমাপ্তি হয় উহার দর্শনে। কাজেই যতদিন পর্য্যন্ত কোন বস্তুবিষয়ক বিজ্ঞান সাফল্য লাভ না করে, ততদিন পর্য্যন্ত ঐ বিষয়ক দর্শনও সাফল্য লাভ করিতে পারে না। মানব-জগতে একদিন প্রত্যেক বস্তু-বিষয়ক বিজ্ঞান ও জ্ঞান সাফল্য লাভ করিয়াছিল এবং তাহার ফলে ঐ ঐ বিষয়ক দর্শনও সাফল্য লাভ করিয়াছিল। কিন্তু, কালক্রমে মানুষ ঐ বিজ্ঞান ও জ্ঞান ভুলিয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলে দর্শন বলিয়া মানুষ যাহা প্রচার করে, তাহাও সম্পূর্ণ ভ্রান্তিময়। আমরা মনে করি বটে যে, বর্ত্তমানে মানুষ জ্ঞান ও বিজ্ঞান জানিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু তাহা যে সত্য নহে, তাহা আমরা এই সংখ্যার সম্পাদকীয় 'বর্ত্তমান বিজ্ঞান ও ভারতীয় বিজ্ঞান-সভার রজতজুবিলী' সন্দর্ভে দেখাইয়াছি।

লর্ড স্তামুয়েল যে বলিয়াছেন, দার্শনিকের কথা অনেকে বুঝিতে পারে না ইহা আধুনিক দার্শনিকের পক্ষে সত্য, কিন্তু প্রকৃত দার্শনিক হইলে তাঁহার কথা কখনও মানুষের অবোধ্য হয় না, পরন্তু প্রকৃত জ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিকের সূক্ষ্মতম অলক্ষ্যভাব একমাত্র দার্শনিকগণই তুলিকা দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে অঙ্কিত করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। আধুনিক দার্শনিকগণের কথা যে সাধারণ মানুষের বুঝিবার অযোগ্য হইয়া থাকে, তাহার একমাত্র কারণ ঐ দার্শনিকগণ প্রকৃত ভাবে দার্শনিক নহেন। প্রকৃত ভাবে দার্শনিক না হইয়াও যে মানুষের পক্ষে দার্শনিক বলিয়া আখ্যা লাভ করা সম্ভব হয়, তাহার কারণ বর্ত্তমান জগতে প্রকৃত জ্ঞানী ও প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের অভাব রহিয়াছে। বিদ্যা-বিষয়ে বর্ত্তমান দুনিয়ার প্রতারকের মেলা মানুষ কবে বুঝিতে পারিবে ?



শিক্ষানবীশ

শিল্পী—শ্রীগোবর্দ্ধন আশ

"ত্বমসীস্বং বাঙ্ময়ত্বাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

বঙ্গশ্রী

ফাল্গুন—১৩৪৪

৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম খণ্ড—২য় সংখ্যা

সম্পাদকীয়

[শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক লিখিত]

ভারতের মুক্তির পন্থা

কোন্ পন্থায় ভারতের মুক্তি হওয়া সম্ভব, তৎসম্বন্ধে কিছু দিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্রনাথ রায় দুনিয়াবাসীকে কয়েকটী কথা শুনাইয়াছেন। ঐ কয়েকটী কথা আমাদের মতে নানা কারণে মনোযোগের যোগ্য। প্রধানতঃ সুভাষচন্দ্র ও মানবেন্দ্রের ঐ বক্তৃতা কয়েকটী লক্ষ্য করিয়াই এই প্রবন্ধ রচিত হইয়াছে।

এই প্রবন্ধে আমরা প্রধানতঃ নিম্নলিখিত তিনটী বিষয়ের আলোচনা করিব :—

(১) মুক্তি কাহাকে বলে ?

(২) মুক্তির পন্থা সম্বন্ধে প্রচলিত প্রধান প্রধান মতবাদ কি কি এবং ঐ মতবাদসমূহের দুষ্টতা কোথায় ?

(৩) মুক্তির যুক্তিসঙ্গত উপায় কি ?

ভারতের মুক্তির পন্থা সম্বন্ধে বিশদভাবে কিছু বলিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে যে 'মুক্তি' এই পদটীর সংজ্ঞা সম্বন্ধে কিছু বলা একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা বলাই বাহুল্য।

মুক্তির সংজ্ঞা

'মুক্তি' এই শব্দটীর প্রাথমিক অথবা প্রাকৃতিক অর্থে, মানব রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, আধ্যাত্মিক ও পারত্রিক বহু রকমের কষ্ট পায়, সেই সেই কষ্টসমূহের মূল কারণ কি কি, তাহা অনুভব করিয়া লইয়া ঐ ঐ কষ্টের সমূলে উচ্ছেদ সাধন করিবার কার্য্য।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে মুক্তি সম্বন্ধে যতকিছু কথা বর্ত্তমানে প্রচলিত আছে, তাহা সম্পূর্ণভাবে তলাইয়া চিন্তা করিলে বলিতে হয় যে, মুক্তি সম্বন্ধে বর্ত্তমান সমগ্র জগদ্ব্যাপী মতবাদ মুখ্যতঃ চারিটী :—

(১) এক শ্রেণীর মানুষের মতে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অথবা রাষ্ট্রীয় মুক্তিই মুক্তি।

(২) দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষের মতে মুক্তি দ্বিবিধ—যথা, ঐহিক ও পারত্রিক।

(৩) তৃতীয় শ্রেণীর মানুষের মতে মুক্তি ত্রিবিধ—যথা, ঐহিক, আধ্যাত্মিক ও পারত্রিক।

(৪) চতুর্থ শ্রেণীর মানুষের মতে কৃষ্টিগত (cultural) মুক্তিই মুক্তি।

উপরোক্ত চারি শ্রেণীর মতবাদের মধ্যে কোন কোনটীর বক্তব্য আমাদের মতে মোটেই পরিষ্কার নহে, আর কোন কোনটী কথঞ্চিৎ পরিমাণে পরিষ্কার বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ ভ্রান্তিপূর্ণ।

যাঁহারা বলেন যে, রাষ্ট্রীয় মুক্তিই একমাত্র মুক্তি, তাঁহারা

দের বক্তব্য পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় বটে, কিন্তু মানুষের সর্ব্বপ্রকার কষ্টের উচ্ছেদ সাধন করিবার সহিত মুক্তির কোন সম্বন্ধ আছে, ইহা স্বীকার করিয়া লইলে এক দিকে যে, একমাত্র রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা দ্বারা কোন প্রকার মুক্তিই সাধিত হইতে পারে না, অন্যদিকে আবার রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা না থাকিলেও যে মুক্তির পন্থায় অগ্রসর হওয়া সম্ভব, এই দুইটী বিষয়ে অবহিত হইলে, ঐ মতবাদকে ভ্রান্তিময় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হয়।

যাঁহারা ঐহিক ও পারত্রিক নামক দ্বিবিধ অথবা ঐহিক, পারত্রিক ও আধ্যাত্মিক নামক ত্রিবিধ মুক্তির কথা বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের কথা আমাদের কাছে অত্যন্ত অস্পষ্ট।

যাঁহারা কৃষ্টিগত মুক্তির কথা বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের কৃষ্টি যে কি বস্তু ও তৎসম্বন্ধে অন্যান্য কথাও আমরা সঠিক ভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

আমরা এই প্রবন্ধে যে মুক্তির পন্থার কথা বলিব, সেই মুক্তি লাভ করিতে পারিলে—সর্ব্বপ্রথমে দেশ হইতে সর্ব্ব-প্রকারের অর্থাভাব, পরমুখাপেক্ষিতা, অস্বাস্থ্য, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যুর উচ্ছেদ সাধন করা সম্ভব হয়। দ্বিতীয়তঃ—মানুষের পক্ষে রোগ-যন্ত্রণা ও মৃত্যুযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। এবং তৃতীয়তঃ—মৃত্যুর পর মানুষের যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহা যাহাতে সদ্গতিসম্পন্ন হয় এবং কোন জীবের পক্ষে উহা যাহাতে কোনরূপ ক্লেশকর না হয়, তাহার ব্যবস্থা সাধিত হয়।

আমাদের কথা আপাতদৃষ্টিতে আজগুবী বলিয়া মনে হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু উহা যে বাস্তবিক পক্ষে আজগুবী নহে, পরন্তু উহা যে অত্যন্ত বাস্তব ও প্রয়োগযোগ্য, তাহা এই প্রবন্ধের যথাস্থানে দেখাইবার চেষ্টা করিব।

আজকাল রাষ্ট্রীয় মুক্তি, অর্থ-নৈতিক মুক্তি, আধ্যাত্মিক মুক্তি ও পারত্রিক মুক্তি প্রভৃতি নানাবিধ মুক্তির কথা শোনা যায় বটে, কিন্তু আমাদের মতে মুক্তি কেবল মাত্র একই শ্রেণীর। যত দিন পর্য্যন্ত আর্থিক মুক্তি সাধিত না হয় অর্থাৎ অর্থকষ্ট হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা পাওয়া সম্ভব না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত অপর কোন বিষয়ে মুক্তিলাভ করা সম্ভব হয় না। অর্থ-নৈতিক মুক্তি, রাষ্ট্রীয় মুক্তি, আধ্যাত্মিক মুক্তি ও পারত্রিক মুক্তি প্রভৃতি বিবিধ মুক্তির কথা আপাতদৃষ্টিতে পৃথক্ পৃথক্ বটে, কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে সর্ব্ববিধ মুক্তিই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

ঐহিক কষ্ট অর্থাৎ অর্থাভাব, পরমুখাপেক্ষিতা, অস্বাস্থ্য, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, বার্দ্ধক্য এবং অকালমৃত্যু হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা পাইবার সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারিলেই, কি আধ্যাত্মিক, অথবা কি পারত্রিক, সর্ব্ববিধ কষ্ট হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

আমরা এই সন্দর্ভে মুক্তি সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিব, মূলতঃ তাহার কোন কথাই আমাদের মস্তিষ্কপ্রসূত নহে। উহার প্রত্যেক কথাটি ভারতীয় ঋষির বেদাঙ্গের সাহায্যে, বেদ, মীমাংসা, দর্শন ও সংহিতা হইতে গৃহীত। আমরা কোথা হইতে ঐ কথাগুলি লইতেছি, তাহা প্রয়োজন হইলে উপযুক্ত ক্ষেত্রে দেখান যাইতে পারে।

অনেকে মনে করেন যে, ভারতীয় ঋষিগণ ঐহিক মুক্তি সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা বলেন নাই। কিন্তু, তাহা সত্য নহে। তাঁহাদের বেদ, বেদাঙ্গ, মীমাংসা, দর্শন, সংহিতা, পুরাণ, উপবেদ এবং দণ্ডনীতি নামক দ্বাবিংশতি বিদ্যার প্রত্যেকটি মানুষের ঐহিক মুক্তির উদ্দেশ্যে লিখিত। সর্ব্বতোভাবে মানুষের পক্ষে ঐহিক মুক্তি কোন্ উপায়ে সাধিত হইতে পারে, তাহার সন্ধান তাঁহারা পাইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা জগতের সর্ব্বত্র "মানবধর্ম্মে"র মূলমন্ত্র ছড়াইয়া সমগ্র জগতের শ্রদ্ধেয় হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ভারতীয় ঋষিগণ যে তাৎকালিক সমগ্র মানবসমাজের শ্রদ্ধালাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা আমরা অনেক প্রসঙ্গে প্রমাণিত করিয়াছি। প্রয়োজন হইলে আরও বিশদভাবে আবার উহা প্রতিপন্ন করিব। ভারতীয় ঋষিদিগের শাস্ত্র সম্বন্ধে আধুনিক পণ্ডিতগণ যে অন্ত শ্রেণীর কথা বলিয়া থাকেন, তাহার এক মাত্র কারণ বৃহদিবসাবধি ঋষিগণের ভাষা সম্বন্ধে মানুষের অজ্ঞতা।

পেট ক্ষুধায় জ্বলিতে থাকিলে অথবা দেহ অস্বাস্থ্যের যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত হইতে থাকিলে যে, কোন বিদ্যায় অথবা সাধনায় পারদর্শিতা অর্জ্জন করিয়া কোনরূপ মুক্তিলাভ

করা সম্ভব নহে, তাহা সহস্র সহস্র বৎসর আগে ভারতীয় ঋষিগণ মানবসমাজকে শুনাইয়া গিয়াছেন।

মুক্তির পন্থা সম্বন্ধে প্রচলিত বিভিন্ন মতবাদ ও তাহার দুষ্টতা

জগতের কোন্ দেশে, কোন্ মুক্তির কথা কিরূপ ভাবে বর্ত্তমানে প্রচলিত আছে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, যে-দেশে যে-শ্রেণীর ব্যথা যেরূপ ভাবে প্রকট, সেই দেশে সেই শ্রেণীর মুক্তির কথা সেইভাবে ছড়াইয়া রহিয়াছে।

যে যে দেশে আর্থিক অভাব, সেই সেই দেশে অর্থ-নৈতিক মুক্তির কথাই সর্ব্বাধিক ভাবে আলোচিত হয়, আর যে যে দেশে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা বিদ্যমান, সেই সেই দেশে রাষ্ট্রীয় মুক্তির কথাই বেশীর ভাগ মানুষের মুখে শুনা যায় ইত্যাদি। রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা ও পরাধীনতা এবং আর্থিক অভাব না থাকিলে হয় ত আধ্যাত্মিক ও পারত্রিক মুক্তির কথা শুনা যাইত, কিন্তু বর্ত্তমান জগতে রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা ও আর্থিক অভাব প্রত্যেক দেশেই এতাদৃশ ভাবে ছড়াইয়া রহিয়াছে যে, সর্ব্বত্রই মানুষ রাষ্ট্রীয় মুক্তি ও আর্থিক মুক্তির কথা লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

রাষ্ট্র-নীতি ও অর্থ-নীতি, এই দুই-এর মধ্যে আধুনিক মানুষ রাষ্ট্র-নীতির কথা লইয়াই অধিকতর ব্যস্ত। তাঁহাদের অধিকাংশের মতে রাষ্ট্রীয় মুক্তি সাধিত না হইলে আর্থিক মুক্তি অথবা অন্য কোন মুক্তি সাধিত হওয়া সম্ভব নহে। ভারতীয় ঋষিগণের মত উহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহাদিগের মতে আর্থিক মুক্তি সাধিত না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য কোন মুক্তি সাধিত হওয়া সম্ভব নহে এবং যতদিন পর্য্যন্ত কোন দেশে আর্থিক মুক্তি সাধিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত অন্য কোন মুক্তির জন্য ব্যাকুল হওয়া সম্ভব নহে। যাহাতে আর্থিক মুক্তি সাধিত হয়, তাহা না করিয়া রাষ্ট্রীয় মুক্তিসাধনার কার্য্যে অগ্রসর হইলে পদে পদে মনুষ্য-সমাজকে বিপর্য্যস্ত হইতে হয়। ভারতীয় ঋষিগণের উপরোক্ত কথা যে অতীব সমীচীন, তাহা বর্ত্তমান যুগে যে সমস্ত দেশ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহাদের আর্থিক অবস্থা লক্ষ্য করিলে সম্যক্ ভাবে বো-যাইবে। আমাদের মতে, ভারতীয় ঋষিগণের কথার অন্যথা আচরিত হইতেছে বলিয়া অর্থাৎ আর্থিক মুক্তি লাভ করিবার চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে না করিয়া রাষ্ট্রীয় মুক্তির চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া জগতের সর্ব্বত্র হাহাকার উঠিয়াছে। আর্থিক মুক্তির সাধনায় সিদ্ধি লাভ না করিয়া রাষ্ট্রীয় মুক্তির সাধনায় ব্যাপৃত হইলে শুধু যে আর্থিক অভাব প্রকৃত ভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে তাহা নহে, সর্ব্বতোভাবে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা, সন্তুষ্টি ও শান্তি রক্ষা করাও সম্ভব হয় না।

আমরা এক্ষণে জগতের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক অবস্থার পর্য্যালোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

বর্ত্তমান জগতে যতগুলি দেশ আছে, তাহা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বিষয়ে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এক শ্রেণীর দেশ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের দেশবাসি-গণের দ্বারা পরিচালিত এবং এই শ্রেণীর দেশকে স্বাধীন বলিয়া অভিহিত করা হয়। আর এক শ্রেণীর দেশ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বিষয়ে অল্পাধিক ভাবে পরদেশীয়গণের দ্বারা পরি-চালিত হয়। এই শেষোক্ত দেশগুলিকে প্রচলিত ভাষায় পরাধীন বলিয়া আখ্যাত করা হইয়া থাকে।

স্বাধীন দেশসমূহে পরাধীনতার কোন বালাই নাই বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, ঐ সব দেশে রাষ্ট্রীয় কোন অশান্তি বিদ্যমান নাই, কিন্তু অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, আসল সত্য সম্পূর্ণ বিপরীত।

স্বাধীন দেশসমূহের প্রত্যেকটিতে আধুনিক ঐতিহাসিক কালের প্রারম্ভ হইতে রাষ্ট্রীয় কর্ম্মকর্ত্তা কে হইবেন, তাহা লইয়া বিবাদ চলিয়া আসিতেছে। এই কালের প্রথমভাগে রাজার হস্তে রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম-কর্ত্তৃত্ব ন্যস্ত হইবার মতবাদ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, কিন্তু তখনও কে রাজা হইবেন তাহা লইয়া প্রায়শঃ ঝগড়া-বিবাদ চলিত। রাজার হস্তে রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম-কর্ত্তৃত্ব ন্যস্ত হইবার মতবাদ ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্ত-মানে গণ-তান্ত্রিক (Democratic) রাষ্ট্রীয় পরিচালনার মতবাদ জগতের প্রায় সর্ব্বত্র আধুনিক শিক্ষিত-সমাজে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে—কিন্তু এখনও রাষ্ট্রীয় অবস্থা কিঞ্চিন্মাত্রও অশান্তি এবং উচ্ছৃঙ্খলতাবিহীন নহে।

গণ-তান্ত্রিক প্রায় প্রত্যেক দেশেই, কে কে গণ-তান্ত্রিক গবর্ণমেন্টের প্রধান কর্ণকর্তৃত্ব অর্থাৎ মন্ত্রিত্ব ও প্রধান মন্ত্রিত্ব পাইবেন, তাহা লইয়া দলাদলি ও বিবাদ সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছে। গণ-তান্ত্রিক দেশসমূহের অভ্যন্তরস্থ উপরোক্ত দলাদলি ও বিবাদের দিকে লক্ষ্য করিলে, রাষ্ট্রীয় অশান্তি হইতে রক্ষা পাইবার জন্ম গণ-তান্ত্রিকতার মতবাদ কোন রূপে সমর্থনের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

স্বাধীন দেশসমূহের আর্থিক, মানসিক ও স্বাস্থ্যের অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ ঐ বিষয়ে তাঁহারা আপাতদৃষ্টিতে ভাল আছেন বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু তলাইয়া দেখিলে ঐ-ঐ-বিষয়ক সত্যও সম্পূর্ণ অন্য রকমের বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। প্রত্যেক দেশেই মোট টাকার সংখ্যা এবং সেই হিসাবে হিসাব-গত মাথাপ্রতি আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া দেখা যায় বটে, কিন্তু ঐ স্বাধীন দেশগুলির মধ্যে এমন একটি দেশ পাওয়া যায় না, যে-দেশে অর্থাভাবযুক্ত মানুষের সংখ্যা এবং পরাধীন চাকুরীর প্রতি মুখাপেক্ষিতার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় নাই।

প্রত্যেক দেশের খেলাধুলা, সিনেমা, থিয়েটার, নাচ-গান প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা যেরূপ ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার দিকে লক্ষ্য করিলে মানুষের মনের শান্তিরক্ষার উপায় বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু মানুষ যদি নিজেকে নিজের শান্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, তাহা হইলে প্রত্যেকেরই যে অশান্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। অর্থাভাব ও অস্বাস্থ্য বিদ্যমান থাকিলে প্রকৃত শান্তি লাভ করা সম্ভব হয় না। মূল সত্য উদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা করিলে দেখা যাইবে যে, প্রকৃত পক্ষে জগতের প্রত্যেক দেশের প্রায় প্রত্যেক মানুষের অশান্তির কারণ বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া উপরোক্ত ভাবের আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করিয়া মানুষ নিজদিগকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছে।

স্বাধীন দেশের প্রত্যেকটীতেই যে অস্বাস্থ্যও বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা ঐ-ঐ দেশের স্বাস্থ্য-বিবরণী পাঠ করিলেই দেখা যাইবে। প্রত্যেক দেশের লোকসংখ্যা-বিবরণী (Census Statistics) পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, জন্মহার ও মোট লোকসংখ্যা প্রত্যেক দেশেই বৃদ্ধি পাইতেছে বটে, কিন্তু কোন দেশেই জন্মহারের তুলনায় ২৫ বৎসরের উর্দ্ধ পরিণতবয়স্ক লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে না। জন্মহারের বৃদ্ধি সত্ত্বেও তদনুযায়ী পরিণত-বয়স্ক লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে না কেন, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, যখন প্রাকৃতিক অবস্থার উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও মানুষ ঐ প্রাকৃতিক উন্নতি সংরক্ষণ করিতে অক্ষম হয় এবং স্বাস্থ্যরক্ষার প্রাকৃতিক উপায়গুলি ভুলিয়া যায়, তখনই এইরূপ হওয়া সম্ভবযোগ্য হয়।

এইরূপ ভাবে দেখিলে দেখা যাইবে যে, স্বাধীন দেশগুলি খুব ভাল অবস্থায় আছে বলিয়া আমরা ভারতবর্ষ হইতে মনে করিয়া থাকি বটে, কিন্তু তাহাদের আর্থিক, মানসিক ও স্বাস্থ্যের অবস্থা সমান ভাবেই শোচনীয়।

কি করিয়া এই আর্থিক, মানসিক ও স্বাস্থ্যের অবস্থার উন্নতি হইতে পারে, তাহা লইয়া আমাদের ভারতবর্ষে যেরূপ হৈচৈ শুনা যাইতেছে, অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, স্বাধীন দেশগুলিতে তদপেক্ষা অধিক হৈচৈ কয়েক বৎসর আগে হইতেই আরম্ভ হইয়াছে।

আমাদের দেশে যেরূপ ঐ-সম্বন্ধীয় হৈচৈ সত্ত্বেও প্রায় প্রত্যেক পরিবারের আর্থিক, মানসিক ও স্বাস্থ্যের কষ্ট উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, স্বাধীন দেশের অবস্থাও ঠিক ঠিক তদ্রূপ।

যদি দেখা যায় যে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেক দেশের জনসাধারণের অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, ও শান্তির অভাব বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা হইলে যাঁহারা বলেন যে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা হইলেই মানুষের মুক্তি হইতে পারে, তাঁহাদের কথা যে ভ্রান্তিময়, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা সত্ত্বেও কেন যে মানুষের অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ও শান্তির অভাব এতাদৃশ ভাবে বৃদ্ধি পায়, তাহার অনুসন্ধান করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, এতাদৃশ অবস্থার প্রধান কারণ দুইটি, যথা :—

(১) গণ-তান্ত্রিক গবর্ণমেন্ট। যে গণতান্ত্রিকতার জন্য মানুষ এত ক্ষিপ্ত হইয়াছে সেই গণতান্ত্রিকতাই মানুষের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে।

(২) অর্থ-বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের ছুষ্টতা।

গণতান্ত্রিকতার বর্ত্তমান ব্যবস্থার ফলে প্রধান প্রধান কর্ম্ম-সচিবগণের কাহারও কার্য্যকাল কোন দীর্ঘ সময়ের জন্ত সুনিশ্চিত থাকে না এবং প্রায়শঃ তাঁহাদিগকে তাঁহাদের দলরক্ষা ও দল-পুষ্টির জন্ত ব্যাকুল থাকিতে হয়। ইহার ফলে তাঁহাদিগের পক্ষে সর্ব্ববিধ লোক-হিতকর কার্য্যের অবসর কমিয়া যাওয়া অবশ্যম্ভাবী হয় এবং কোন কার্য্যে গভীর ভাবে মনোনিবেশ করাও দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। এইরূপে যে অভিনিবেশ ও দীর্ঘ-সময়ব্যাপী সাধনার ফলে প্রকৃত লোকহিতকর কার্য্যের পন্থা আবিষ্কার করা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে, সেই অভিনিবেশ ও দীর্ঘসময়ব্যাপী সাধনা বর্ত্তমান গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টসমূহের কর্ম্মকর্ত্তাগণের পক্ষে রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া থাকে এবং ইহারই ফলে যে সমস্ত পন্থা আবিষ্কৃত ও গৃহীত হইলে প্রকৃতপক্ষে মানুষের অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ও শান্তির অভাব দূরীকৃত হইতে পারে, তাহা আবিষ্কৃত ও গৃহীত হইতে পারিতেছে না।

কাজেই বলিতে পারা যায়, রাষ্ট্রীয় গঠনে যে নিছক গণতান্ত্রিকতার মতবাদ মানুষের আর্থিক মুক্তি লাভ করিবার পক্ষে ভ্রান্তিযুক্ত এবং গণতান্ত্রিকতার দ্বারা, এমন কি রাষ্ট্রীয় বিষয়েও সম্পূর্ণ শৃঙ্খলা, শান্তি ও সন্তুষ্টি রক্ষা করা সম্ভব নহে।

অনেকে মনে করেন যে, রুশিয়াতে যেরূপ গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ঐরূপ ভাবের গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে এবং গবর্ণমেণ্টের হস্তে জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নতির ভার সম্পূর্ণ ভাবে ন্যস্ত হইলে মানুষের রাষ্ট্রীয় মুক্তি ও আর্থিক মুক্তি সম্পাদিত হওয়া সম্ভবযোগ্য। এই শ্রেণীর মানুষ ইহাও মনে করেন যে, রুশিয়ার জনসাধারণের আর্থিক ক্লেশ অনেকাংশে নিবারিত হইয়াছে।

একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, যেরূপ ভাবে রুশিয়ার গণতান্ত্রিকতার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে এবং যেরূপ পদ্ধতিতে ঐ দেশের জন সাধারণের আর্থিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হইতেছে তাহাতে ঐ দেশে রাষ্ট্রীয় শান্তি ও শৃঙ্খলা অথবা অর্থ-নৈতিক সমস্যার সমাধান সর্ব্বতোভাবে হওয়া সম্ভব নহে এবং বস্তুতঃ পক্ষে রুশিয়ায় তাহা এখনও পর্য্যন্ত সাধিত হয় নাই। এই প্রবন্ধে উপরোক্ত বিষয় বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিতে গেলে ইহার কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কায় আমরা এখানে তাহা করিব না। রুশিয়ায় কে কে ও কেন কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতেছেন, তাহার দিকে লক্ষ্য করিলে তথায় রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা যে এখনও পর্য্যন্ত সম্যক্ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই, তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে।

রুশিয়ার অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলি এত দ্রুতভাবে পরিবর্ত্তিত হয় কেন, রুশিয়া ইংরাজের নিকট হইতে ক্রোর ক্রোর টাকা কর্জ্জ করে কেন, তাহাদের দেশের রপ্তানী (export) বৃদ্ধি না পাইয়া আমদানী (import) বৃদ্ধি পায় কেন, এবংবিধ বিষয়গুলি পর্য্যালোচনা করিলে রুশিয়ার আর্থিক উন্নতি যে কথঞ্চিৎ পরিমাণেও সম্পাদিত হইতে পারে নাই এবং যাঁহারা ইহার অন্যথা মনে করেন, তাঁহারা যুবকসমাজে যতই খ্যাতি লাভ করিতে থাকুন না কেন, প্রকৃতপক্ষে অর্থনীতি বিষয়ে তাঁহারা যে চঞ্চলমতি বালকের ন্যায়, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

যদি বাস্তবিক পক্ষে রাষ্ট্রীয় ও অর্থ নৈতিক সমস্যা রুশিয়ার পক্ষে সমাধান করা সম্ভবযোগ্য হইত, তাহা হইলে সমগ্র ইয়োরোপে ও আমেরিকায় প্রত্যেক দেশ তাহাদের অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিত এবং কোন দেশেই জনসাধারণের অবস্থার জন্ত ব্যাকুলতার কথা শুনা যাইত না।

এইরূপভাবে দেখিলে দেখা যাইবে যে, কি রুশিয়া, কি জার্ম্মানী, কি ইটালী, কি ফ্রান্স, কি ইংলণ্ড, কি আমেরিকা—ইহার কোন দেশেই রাষ্ট্রীয় অথবা অর্থ-নৈতিক সমস্যার কোনটিই কথঞ্চিৎ পরিমাণে সমাধান করা সম্ভব হয় নাই এবং প্রত্যেক দেশেই রাজপুরুষগণ রাষ্ট্রীয় শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্ত জনসাধারণকে নানারূপ স্তোকবাক্য শুনাইতেছেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জন-সাধারণের অবস্থার জন্ত ব্যাকুলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

এই হিসাবে রাষ্ট্রীয় সংগঠন বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য মতবাদগুলি যে অর্থনৈতিক সমস্যা-সমাধান-কার্য্যে ব্যর্থ হইয়াছে এবং তদনুসারে উহার প্রত্যেকটি যে দুষ্ট, তাহা যুক্তিসঙ্গত ভাবে স্বীকার করিতে হইবে।

পাশ্চাত্ত্য অর্থনৈতিক মতবাদগুলিও যে ভ্রান্ত, তাহা আমরা এক্ষণে দেখাইবার চেষ্টা করিব।

যে অর্থনৈতিক মতবাদের দ্বারা জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি না হইয়া ক্রমশঃ অবনতি হইতে থাকে, তাহা যে কোন না কোন রকমে দুষ্ট, তাহা এক কথাতেই বলা যাইতে পারে।

অর্থনীতি সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্যের আধুনিক সূত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেও উহার দুষ্টতার সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে।

আধুনিক অর্থ-বিজ্ঞানানুসারে সর্ব্বদেশেই আজকালকার মানুষের ধারণা যে, কাঁচামাল উৎপন্ন করিবার জন্য কথঞ্চিৎ পরিমাণে কৃষিকার্য্যের প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু শিল্প ও বাণিজ্যে পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে না পারিলে ঐশ্বর্য্যশালী হওয়া যায় না। তদনুসারে সর্ব্বদেশেই গত ৮০।৯০ বৎসর হইতে কৃষিকার্য্য প্রায়শঃ উপেক্ষা করিয়া শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিবার প্রয়াস চলিতেছে। শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার সাধন করিতে হইলে বাজারের প্রসার সাধন করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে এবং তদনুসারে প্রত্যেক স্বাধীন দেশই যাহাতে নিজ দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সাধিত হয়, তজ্জন্য জগতের সর্ব্বদেশেই নিজের বাজার প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে সর্ব্বদা ব্যাকুল হইয়া থাকেন।

শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার সাধন করিতে হইলে এক দিকে যেরূপ উহার বিক্রয়ার্থ বাজারের প্রয়োজন হইয়া থাকে, সেইরূপ শিল্পদ্রব্যের কাঁচামালের ক্রয়ার্থও বাজারের প্রয়োজন হয়। এইখানে মনে রাখিতে হইবে যে, গবর্ণমেণ্টের মুদ্রা-আইনের পদ্ধতি অনুসারে জগতের প্রত্যেক কাঁচামালের বাজারে প্রত্যেক দেশের নোট অথবা অন্যান্য মুদ্রা চলে না এবং যে কাঁচামালের বাজারে যে দেশের নোট অথবা অন্যান্য মুদ্রা যত অধিক পরিমাণে চলিতে পারে, সেই দেশের পক্ষে ঐ কাঁচামালের বাজারে কাঁচামাল ক্রয় করিবার তত অধিক সুবিধা হইয়া থাকে। কারণ, নোট প্রস্তুত করা যত সহজ ও সুলভ, ধাতু-মুদ্রা প্রস্তুত করা তত সহজ ও সুলভ নহে। ইহারই জন্য আজকালকার জগতের প্রায় প্রত্যেক দেশটী একদিকে যেরূপ বিক্রয়ার্থ বাজার প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যাকুল হন, সেইরূপ আবার অন্যান্য দেশের কাঁচামালের বাজারে নিজ নিজ নোট ও মুদ্রা যাহাতে চলিতে পারে, তাহার জন্যও প্রযত্নশীল হইয়াছেন।

উপরোক্ত অর্থনীতিক উপদেশানুযায়ী শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার-সাধনের কার্য্যে উদ্যোগী হইয়া ইংলণ্ড প্রভৃতি কয়েকটি দেশের কয়েকটি মধ্যবিত্ত লোক প্রথম প্রথম ক্রোরপতি হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং তাহা দেখিয়া তাঁহাদের অনুকরণে জগতের প্রায় প্রত্যেক দেশেই শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার সাধন করিবার জন্য হুড়াহুড়ি লাগিয়া গিয়াছে। কিন্তু, এখন আর কোন দেশেই কোন মানুষ অথবা ফার্ম্ম শিল্প ও বাণিজ্যের দ্বারা পূর্ব্বের মত ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে সক্ষম হইতেছে না এবং বহুস্থানে বহু বণিক্ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া দেউলিয়া হইতে বাধ্য হইতেছেন। শুধু যে প্রত্যেক দেশের বণিক্গণই উপরোক্তভাবে দেউলিয়া হইয়া পড়িতে বাধ্য হইতেছেন তাহা নহে; ইহা ছাড়া একদিকে যেরূপ জনসাধারণের কর্ম্ম-নিয়োগের অভাব ও অর্থ-ক্লেশ আরম্ভ হইয়াছে, সেইরূপ আবার গবর্ণমেণ্টগুলির পরস্পরের মধ্যে অবিশ্বাস ও মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাইতেছে।

এক্ষণে যদি প্রশ্ন করা যায় যে, যে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের দ্বারা ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে অনেক মানুষের পক্ষে ক্রোরপতি হওয়া সম্ভবযোগ্য হইয়াছিল, প্রত্যেক দেশেই বৈজ্ঞানিক উপায়ে সেই শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার সাধিত হওয়া সত্ত্বেও বণিক্গণ আজকাল অধিক পরিমাণে দেউলিয়া হইতে বাধ্য হইতেছেন কেন, প্রত্যেক দেশেই জনসাধারণের অর্থক্লেশই বা এত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে কেন, বিভিন্ন দেশস্থ গবর্ণমেণ্টসমূহের পরস্পরের মধ্যে অবিশ্বাস ও মনোমালিন্যই বা এত অধিক পরিমাণে প্রসার লাভ করিতে পারিতেছে কেন, এবং এই তিনটি প্রশ্নের মীমাংসা করা যায়, তাহা হইলে আধুনিক অর্থ-

বিজ্ঞান যে দুষ্ট, তাহা যেমন বুঝা যাইবে, সেইরূপ আবার উহার দুষ্টতা কোথায়, তাহাও অনুমান করা সম্ভবযোগ্য হইবে।

আমাদের মতে উপরোক্ত তিনটি প্রশ্নের মীমাংসা করিবার উপায় প্রধানতঃ দুইটি : এক, 'অর্থ'সম্বন্ধীয় দর্শনের আলোচনা করা ; অপর, প্রাচীন কালে অর্থাৎ বর্ত্তমান অর্থ-বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে মানবসমাজে অর্থ-সংস্থানের কি ব্যবস্থা ছিল এবং কেনই বা আধুনিক অর্থ-নীতির উদ্ভব হইল, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া। 'অর্থ'সম্বন্ধীয় দর্শন অতীব দুরূহ। অভিমান, স্ত্রী-পুরুষের উচ্ছৃঙ্খলতা, মিথ্যা-চিন্তা, মিথ্যা ব্যবহার এবং পানাহার প্রভৃতি কয়টি বিষয়ে সংযম, চাকুরীজীবিগণ প্রায়শঃ যে চাটুকারিতা করিতে বাধ্য হন, তাহার বর্জ্জন ও কঠোর সাধনা ব্যতীত তাহা সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হওয়া সম্ভব নহে। কাযেই, আমরা অর্থ-সম্বন্ধীয় ঐ দর্শনের আলোচনা এখানে করিব না। বর্ত্তমান অর্থ-বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে মানবসমাজে অর্থ-সংস্থানের ব্যবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার আলোচনার দ্বারা আমরা উপরোক্ত তিনটি প্রশ্নের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিব।

ভারতীয় ঋষিগণের বিজ্ঞানের মূলসূত্রানুসারে মানবজাতির মধ্যে কাহারও, এমন কি কোন একটি নগণ্য মানুষেরও যাহাতে খাদ্য, পরিধেয়, বাসস্থান প্রভৃতি একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্য কোনরূপ অর্থের অভাব না হয়, তাহা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে স্বাভাবিক উপায়ে কোন কৃত্রিম সার ব্যবহার না করিয়া যাহাতে প্রতি বিঘা জমি হইতে সর্ব্বাধিক পরিমাণে (ন্যূন-পক্ষে ১২ মণ) খাদ্য শস্য, অথবা তুলা, অথবা বাসগৃহের উপকরণ উৎপাদিত হয়, তাহা করিতে হয়। উপরোক্ত অর্থ-বিজ্ঞানানুসারে এইরূপ একদিকে যেরূপ খাদ্য-শস্য, তুলা অথবা রেশম ও পশম এবং বাস-গৃহের উপকরণ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করিতে হয়, সেইরূপ আবার ঐসকল কাঁচা জিনিষ হইতে যাহাতে মানুষের প্রয়োজনোপযোগী খাদ্য, পরিধেয় ও বাসগৃহ প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হয় এবং উপরোক্ত বিভিন্ন দ্রব্যের আদান-প্রদানে যাহাতে কৃত্রিম মুদ্রার ব্যবহার সর্ব্বাপেক্ষা অল্প হয়, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য করিতে হয়।

উপরোক্ত বিজ্ঞানের মতে কৃষিকার্য্য, শিল্প ও বাণিজ্য ঐরূপ ভাবে সংঘটিত হইলে একমাত্র কৃষিকার্য্যের দ্বারাই দেশের প্রত্যেকের পক্ষে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা সম্ভব হয় এবং তখন কৃষকগণ অবসর-সময়ে সমাজের প্রয়োজনীয় শিল্প-কার্য্য সাধন করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন, যাহাতে মাঠে প্রচুর পরিমাণে যাহাতে খাদ্যশস্য, তুলা, রেশম, পশম ও বাসগৃহের উপকরণ অনায়াসে উৎপন্ন হইতে পারে, তদ্রূপ কৃষি-কার্য্য এবং ঐ কাঁচামাল হইতে যাহাতে মানুষের প্রয়োজনীয় সামগ্রীসমূহ প্রত্যেক কৃষক অবসরসময়ে প্রস্তুত করিতে পারে, তদ্রূপ শিল্পবিদ্যা এবং টাকাকড়ি ব্যতীত যাহাতে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বস্তুর আদান-প্রদান সম্পাদিত হইতে পারে, সমাজের মধ্যে তদ্রূপ ব্যবস্থা সাধিত হইলে যে, অর্থাভাব বলিয়া কোন অবস্থা জনসমাজের মধ্যে বিদ্যমান থাকিতে পারে না এবং অর্থাভাব বিদ্যমান না থাকিলে যে, চৌর্য্য ও লুণ্ঠনপ্রবৃত্তির ক্রমশঃই হ্রাস প্রাপ্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। উপরোক্ত ভাবে কৃষিকার্য্য, শিল্প-বিদ্যা ও বাণিজ্যের ব্যবস্থা সংঘটিত হইলে যে, কোন দ্রব্যের বিক্রয়ার্থ বাজারের জন্য হুড়াহুড়ি করিতে হয় না এবং তখন যে লাভ-লোকসান বলিয়া কোন অবস্থা বিদ্যমান থাকে না, পরন্তু মনুষ্যসমাজের প্রত্যেকের পক্ষেই খাদ্য, পরিধেয় ও বাসভূমি সম্বন্ধে প্রাচুর্য্য উপভোগ করা সম্ভব-যোগ্য হয় এবং মনুষ্যসমাজের প্রত্যেকের পক্ষেই খাদ্য ও পরিধেয় ও বাসভূমি সম্বন্ধে প্রাচুর্য্য উপভোগ করা সম্ভবযোগ্য হইলে-মনুষ্য সমাজের পরস্পরের মধ্যে দলাদলি অথবা যুদ্ধ-বিগ্রহের আশঙ্কা হ্রাস প্রাপ্ত হওয়া যে অবশ্যম্ভাবী, তাহাও সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

ভারতীয় ঋষিগণের উপরোক্ত অর্থনৈতিক মতবাদ যে কেবলমাত্র গ্রন্থেতেই লিপিবদ্ধ ছিল তাহা নহে, পরন্তু সমগ্র জগতের সমগ্র মানবজাতি যে, ঐ মতবাদানুসারে নিজ নিজ দেশের অর্থনৈতিক সংগঠন সাধিত করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ এখনও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে।

যন্ত্র-বিজ্ঞান ও আধুনিক কাছেরী-ব্যবস্থা আবিষ্কৃত

হইবার আগে জগতের কোন্ দেশে মনুষ্যসমাজে অর্থসংস্থান সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে অনুমান করা যাইবে যে, জগতের প্রত্যেক দেশেই এমন এক সময় ছিল, যখন কৃষিকার্য্য, শিল্প-বিদ্যা ও বাণিজ্যের ব্যবস্থা হুবহু উপরোক্ত ভাবে সংগঠিত হইয়াছিল এবং তখন কোন দেশের কোন মানুষকে অর্থো-পার্জ্জনের জন্য বাণিজ্য-ব্যপদেশে কোন বিপৎ-সঙ্কুল রাস্তার জন্য কোন দেশে গমনাগমন করিবার প্রয়োজন হয় নাই এবং তখন বাজার-সৃষ্টির জন্য এক দেশের মানুষকে অপর দেশের মানুষের সহিত মারামারি করিতে হয় নাই; অথচ জগতের কোন দেশে জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য কোনরূপ অর্থাভাব ছিল বলিয়া কোনরূপ নিদর্শন পাওয়া যায় না; তখন কোন দেশেই ষ্টীমার, রেল, মোটরগাড়ী অথবা অ্যারোপ্লেনের কোন প্রয়োজন হয় নাই।

বর্ত্তমান অর্থ-নীতি ও ঋষিগণের অর্থ-নীতি সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে দেখা যাইবে, বর্ত্তমান অর্থ-নীতির দ্বারা জনসাধারণের আর্থিক অভাব দূর হওয়া ত দূরের কথা, তদ্দ্বারা প্রত্যেক দেশেই জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার জটিলতা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং প্রত্যেক দেশকেই রাষ্ট্রীয় অশান্তির কালমেঘ সর্ব্বদা ঘিরিয়া রাখিয়াছে; অন্যদিকে, ঋষিগণের অর্থ-নীতির সহায়তায় প্রত্যেক দেশের জনসাধারণের প্রত্যেকের অর্থনৈতিক সমস্যার যেরূপ সমাধান হওয়া সম্ভব, সেইরূপ আবার রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধান হওয়া অবশ্যম্ভাবী এবং প্রাচীনকালে প্রত্যেক দেশে হইয়াছিলও তাহাই।

মানুষের অর্থসংস্থানের যে যে ব্যবস্থা একদিন মানব-সমাজের প্রত্যেককে অর্থাভাব ও রাষ্ট্রীয় অশান্তি হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিল, অর্থ-সংস্থানের সেই সেই ব্যবস্থা বিলুপ্ত হইয়া কেন আধুনিক অর্থ-বিজ্ঞানের অথবা অর্থ-সংস্থানের নূতন নূতন ব্যবস্থার উদ্ভব হইল, আমরা অতঃপর তাহার আলোচনা করিব।

ঐ আলোচনায় একদিকে যেরূপ কেন মানবসমাজে নূতন অর্থনীতির উদ্ভব হইল তাহা বুঝা যাইবে, অন্যদিকে আবার যে নূতন অর্থনীতির দ্বারা ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের একদিন সমৃদ্ধিশালী হওয়া সম্ভব হইয়াছিল, সেই দেশে জনসাধারণকে পুনরায় অর্থাভাবে বিব্রত হইতে হইয়াছে কেন, তাহাও বুঝা যাইবে।

এইরূপভাবে পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রনীতিতে ও অর্থনীতিতে যে ভ্রান্তি আছে, তাহা বুঝিতে পারিলে, ভারতের মুক্তির জন্য যে যে মতবাদের সাধনা চলিতেছে, তাহার ভুল কোথায়, তাহাও অনায়াসে বুঝা সম্ভব হইবে এবং তখন ভারতের মুক্তির পন্থা কি, তাহা আবিষ্কার করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইবে।

মানুষের অর্থ-সংস্থানের যে যে ব্যবস্থা একদিন মানব-সমাজের প্রত্যেককে অর্থাভাব ও রাষ্ট্রীয় অশান্তি হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল, অর্থ-সংস্থানের সেই সেই ব্যবস্থা বিলুপ্ত হইয়া কেন আধুনিক অর্থ-বিজ্ঞানের অথবা অর্থ-সংস্থানের নূতন নূতন ব্যবস্থার উদ্ভব হইল, এক্ষণে তাহার আলোচনা করা হইবে।

মানুষের অর্থ-সংস্থানের জন্য ঋষিগণ যে যে ব্যবস্থা সমগ্র জগতে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, যে যে ব্যবস্থার ফলে একদিন মানব-সমাজের প্রত্যেকে অর্থাভাব ও রাষ্ট্রীয় অশান্তি হইতে মুক্ত হইতে সক্ষম হইয়াছিল, অর্থ-সংস্থানের সেই সেই ব্যবস্থা বিলুপ্ত হইয়া কেন আধুনিক অর্থ-বিজ্ঞানের নূতন নূতন ব্যবস্থার উদ্ভব হইল, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঋষিগণের অর্থ-নৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য ঋষিগণ মানব-সমাজে যে যে ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, দুইটি বিষয় লইয়া তাহার প্রারম্ভ। যথা—

(১) যাহাতে প্রত্যেক বিঘা জমি হইতে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ অন্ততঃপক্ষে ১২ মণের কম না হইয়া সর্ব্বাধিক হয়, তাদৃশভাবে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি;

(২) মানুষের নিষ্প্রয়োজনীয় অথবা স্বাস্থ্যপক্ষে অনিষ্টকর দ্রব্যের চাষ-আবাদ না হইয়া যাহাতে ধান, গম, ডাউল প্রভৃতি খাদ্যশস্য, পরি-ধেয়ের জন্য তুলা, রেশম ও পশম প্রভৃতি পরিধার্য্য বস্ত্র এবং বাসগৃহের জন্য বাঁশ, বেত,

শালগাছ, সেগুন গাছ প্রভৃতি উদ্ভিদের চাষ-আবাদ হয় তাহার ব্যবস্থা।

অল্প কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি ও স্বাস্থ্যবর্দ্ধনে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের কৃষি-কার্য্যই ছিল তখনকার অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার প্রাথমিক কার্য্য। এই দুইটী প্রাথমিক কার্য্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল কৃষকের শিল্প-বিদ্যা ও কুটীরশিল্প এবং মুদ্রার ব্যবহার-হীন বাণিজ্য অথবা যাবতীয় দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়। ইহার পর আবার জনসাধারণের নৈতিক চরিত্র যাহাতে কোনরূপে অবনতি প্রাপ্ত না হইতে পারে, তাদৃশ শিক্ষা অথবা তাদৃশ প্রচারের ব্যবস্থাও বিদ্যমান ছিল।

জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি, স্বাস্থ্যরক্ষণোপযোগী দ্রব্যের কৃষিকার্য্য, কৃষকদিগের শিল্প-বিদ্যা, বিস্তৃত কুটীর-শিল্প, মুদ্রার ব্যবহার-হীন বাণিজ্য, নৈতিক চরিত্রের উন্নতি-বিধায়ক শিক্ষা, এই কয়েকটি বিষয়ের ব্যবস্থা যে-সমাজে বিদ্যমান থাকে, সেই সমাজের প্রত্যেক মানুষের অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ও শান্তির অভাব অধিকাংশ পরিমাণে দূর হওয়া যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি।

জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি অটুট থাকিলে একমাত্র কৃষিকার্য্যের দ্বারা অনায়াসে বৎসরের মধ্যে ৪।৫ মাস পরিশ্রম করিয়াই কৃষকগণের নিজেদের জন্য ও মানব-সমাজের অপরাপর প্রত্যেকের জন্য প্রচুর খাদ্যশস্য ও কাঁচামাল উৎপন্ন করা সম্ভব হয় এবং তখন বৎসরের বাকী কয় মাস কৃষকগণের পক্ষে শিল্পকার্য্যে ক্ষেপণ করাও সহজ-সাধ্য হইয়া থাকে। মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তুর আদান-প্রদানে কোনরূপ কৃত্রিম মুদ্রার ব্যবহার না থাকিলে আধুনিকভাবে লাভ-লোকসানের কোন কথারই উদ্ভব হইতে পারে না এবং তখন কৃষিকার্য্যে অথবা শিল্পকার্য্যে কৃষকের কোনরূপ লোকসান হওয়া সম্ভব হয় না।

যে ছয়টি বিষয়ের ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকিলে মানব-সমাজের প্রত্যেকের অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ও শান্তির অভাবসমূহ দূর করা সম্ভব হয় বলিয়া উপরে বলা হইল, তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ কি, তাহা চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি এবং মুদ্রার ব্যবহারহীন বাণিজ্য, এই দুইটী বিষয়ের ব্যবস্থা বিদ্যমান না থাকিলে অপর চারিটি বিষয়ের সুবিধা প্রবর্তিত করা কখনও সম্ভবযোগ্য হয় না।

একটু তলাইয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, কৃষি-কার্য্য হইতে উৎপন্ন শস্য ও উৎপন্ন উদ্ভিদের পরিমাণ প্রচুর না হইলে ব্যবসায়-বাণিজ্যে ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রা অথবা কাগজনির্ম্মিত মুদ্রার ব্যবহার প্রতিহত করা যায় না। কারণ, উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ প্রয়োজনাপেক্ষা কম হইলে মানব-সমাজের কেহ না কেহ অভাবগ্রস্ত থাকিতে বাধ্য হন এবং তখন যাঁহারা চতুর, তাঁহারা যাহাতে অভাব-গ্রস্ত না হন, তাহা করিবার জন্য তাঁহাদের দ্বারা মুদ্রার ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অন্য পক্ষে, উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ প্রচুর হইলে, মানব-সমাজের কাহারও অভাবগ্রস্ত হইতে হয় না এবং তখন প্রত্যেকের পক্ষেই প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করা সম্ভব হয় বলিয়া কোন মুদ্রা-ব্যবহারের আবশ্যকতা থাকে না। এইরূপ ভাবে কৃষি-জাত দ্রব্যের প্রাচুর্য্য সংঘটিত করিতে না পারিলে যেরূপ মুদ্রার প্রচলন ত্যাগ করা সম্ভব হয় না, সেইরূপ আবার মুদ্রার প্রচলন ত্যাগ করিতে না পারিলে জনসাধারণকে লাভ-লোকসানের হাত হইতে মুক্ত করা সম্ভব হয় না এবং তাহাদিগকে লাভ-লোকসানের হাত হইতে মুক্ত করিতে না পারিলে একদিকে অনবসরবশতঃ কুটীরশিল্পের বিস্তৃতি সম্ভবযোগ্য হয় না এবং অন্যদিকে অভাবে স্বভাবে নষ্ট হয় বলিয়া তাহাদিগের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধন করা কষ্টসাধ্য হয়।

কাজেই বলা যাইতে পারে যে, যে-ব্যবস্থায় মানব-সমাজের প্রত্যেকের অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ও শান্তির অভাব দূর করা সম্ভব হয়, তাহার মূল ভিত্তি দুইটি। একটির নাম জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি সম্পাদনের ব্যবস্থা এবং অপরটির নাম কৃত্রিম ধাতু ও কাগজনির্ম্মিত মুদ্রা-হীন বাণিজ্যের ব্যবস্থা।

অর্থনীতি বিষয়ের আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের অনেকেই হয়ত আমাদের উপরোক্ত কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিবেন—কারণ, আধুনিক অর্থ-নীতির প্রধান উপকরণ ধাতু ও কাগজনির্ম্মিত মুদ্রা। ধাতু ও কাগজ-নির্ম্মিত মুদ্রা ছাড়া যে বাণিজ্য চলিতে পারে এবং

ধাতু ও কাগজনির্ম্মিত মুদ্রা ছাড়া যাহাতে বাণিজ্য চলিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত না হইলে যে, জনসাধারণের জীবনে কিছুতেই প্রাচুর্য্য সম্ভাবিত হয় না, তাহা আধুনিক অর্থনীতি-বিশারদগণ এক্ষণে স্বীকার করুন আর না-ই করুন, মানব-সমাজ যে অবস্থার মধ্য দিয়া বর্ত্তমানে চলিতেছে, তাহাতে অদূরভবিষ্যতে উপরোক্ত সত্য অনেকেরই পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভবযোগ্য হইবে বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে।

যাহাতে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি সংরক্ষিত ও বর্দ্ধিত হয় এবং কোনরূপ ধাতু অথবা কাগজনির্ম্মিত মুদ্রা ছাড়াও যাহাতে বাণিজ্য চলিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইলে ক্রমে ক্রমে অস্বাস্থ্যকর দ্রব্যের কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র স্বাস্থ্যকর দ্রব্যের কৃষিকার্য্য করা, কৃষকদিগকে শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করান, কুটীরশিল্পের বিস্তার করা এবং যাহাতে নৈতিক চরিত্রের কোনরূপ অবনতি না হয়, তাদৃশ শিক্ষা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা সম্ভবযোগ্য হয় বটে এবং তখন মানব-সমাজ হইতে অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব এবং শান্তির অভাব সমূলে বিদূরিত করাও অনায়াসসাধ্য হয় বটে, কিন্তু কি করিলে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি সংরক্ষিত ও বর্দ্ধিত হয় এবং কেনই বা তাহার তারতম্য ঘটে, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া অতীব দুরূহ।

অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, ভারতীয় ঋষিগণ ঐ বিদ্যার মূলভাগ সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং তদনুসারে মানব-সমাজের সংগঠন সাধিত করিয়াছিলেন।

ঐ বিদ্যা জগতের বিভিন্ন দেশের ব্রাহ্মণ অথবা পুরোহিতগণকে সম্পূর্ণ ভাবে শেখান হইয়াছিল, কারণ তখন যাঁহারা স্বভাবতঃ মানব-সমাজের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাসম্পন্ন হইতেন, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ অথবা পুরোহিত বলা হইত। ব্রাহ্মণ অথবা পুরোহিতগণ একদিন মানুষের অর্থাভাব দূর করিবার ঐ মহামন্ত্র বিদিত ছিলেন বলিয়াই মানব-সমাজের অপরাপর মানুষগুলি পরবর্ত্তী কালেও সংস্কারবশে ব্রাহ্মণ অথবা পুরোহিত-বংশোদ্ভব-দিগকে অন্ধ-ভাবে আত্মভক্তি অর্পণ করিয়া আসিতেছিলেন।

কিন্তু কালক্রমে ব্রাহ্মণ অথবা পুরোহিত-বংশোদ্ভবগণ ঐ মহামন্ত্র বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছেন।

কি করিয়া জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইতে পারে, তাহার মূল বিদ্যা বিস্মৃত হওয়ায় পরবর্ত্তী কালে ক্রমে ক্রমে জমীর উর্ব্বরাশক্তি হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং জগতের কোন কোন দেশে কয় সহস্র বৎসর হইতে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য ও কাঁচামাল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। এই অপ্রাচুর্য্যের জন্যই ক্রমে ক্রমে ধাতুনির্ম্মিত ও কাগজ-নির্ম্মিত মুদ্রার প্রচলন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছে। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, যখন কোন দেশে খাদ্যশস্য ও (শিল্পের জন্য) কাঁচামাল এতাদৃশ পরিমাণে উৎপন্ন হইতে আরম্ভ করে যে, প্রত্যেকের প্রয়োজনানুরূপ অথবা ততোধিক পরিমাণে উহার প্রত্যেকটি পাওয়া সম্ভব হয়, তখন কোন মুদ্রার প্রচলন না থাকিলেও প্রয়োজনীয় বস্তুর আদান-প্রদান অথবা বাণিজ্য অনায়াসে চলিতে পারে। কিন্তু, যখন ঐ খাদ্যশস্য অথবা কাঁচামাল প্রয়োজনানুরূপ উৎপন্ন হয় না, তখন মানব-সমাজের এক অংশ উহার জন্য অভাবগ্রস্ত থাকিতে বাধ্য হয় এবং মুদ্রার সাহায্যে চতুর ব্যক্তিগণ অপেক্ষাকৃত অল্প চতুর লোকের স্কন্ধে অভাবগ্রস্ততার বোঝা চাপাইয়া দিয়া নিজেরা অভাবের হাত হইতে মুক্ত হন।

জগতের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, জমীর উর্ব্বরাশক্তির হ্রাস, ধাতু ও কাগজের মুদ্রার অবাধ প্রচলনাবধি কৃষিকার্য্যের লাভজনকতা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে এবং কৃষকগণ উত্তরোত্তর দুরবস্থাপন্ন হইতে বাধ্য হইতেছে। কৃষকগণের দুরবস্থা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পক্ষে অবসর-সময়ে কুটীরশিল্পের কার্য্য করা আর সম্ভবযোগ্য হয় না এবং এইরূপে জগতের সর্ব্বত্রই কুটীর-শিল্পের বিস্তৃতি প্রতিহত হইয়া যন্ত্র-শিল্পের উদ্ভব হইয়াছে। ইহা ছাড়া, আরও দেখা যাইবে যে, জগতের যে-দেশে জমীর উর্ব্বরাশক্তি যত অধিক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে, সেই দেশে ধাতু ও কাগজ-নির্ম্মিত মুদ্রা তত অধিক পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছে, যে-দেশে ধাতু ও কাগজনির্ম্মিত মুদ্রা যত অধিক পরিমাণে

প্রচলিত হইয়াছে, সেই দেশে স্বাধীন কৃষিকার্য্য তত বেশী অসম্ভবযোগ্য হইয়াছে এবং কৃষকগণও তত অধিক দুরবস্থাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে; যে-দেশে কৃষকগণ যত অধিক পরিমাণে দুরবস্থাপন্ন হইয়াছে, সেই দেশের কুটীরশিল্প তত অধিক পরিমাণে বিনষ্ট হইয়াছে এবং সেই দেশে যন্ত্র-শিল্প তত অধিক পরিমাণে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।

এইরূপ ভাবে জমীর উর্ব্বরাশক্তির হ্রাস আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জগতের প্রত্যেক দেশে কৃষিকার্য্যের ও কৃষকের দুরবস্থা আরম্ভ হইয়াছে এবং ঐ কৃষকের দুরবস্থার সঙ্গে কুটীরশিল্পের বিনাশ ও যন্ত্রশিল্পের অভ্যুদয় সংঘটিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান অর্থনীতির ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, যন্ত্র-শিল্পের অভ্যুদয় ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক অর্থ-বিজ্ঞান তাহার আধুনিকতম রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

কাযেই, মানুষের অর্থসংগ্রহের যে যে ব্যবস্থা একদিন মানব-সমাজের প্রত্যেককে অর্থাভাব ও রাষ্ট্রীয় অশান্তি হইতে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিল, সেই সেই ব্যবস্থা বিলুপ্ত হইয়া কেন আধুনিক অর্থ-বিজ্ঞানের উদ্ভব হইল, এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইবে, উহার আদি কারণ জমীর উর্ব্বরাশক্তির হ্রাস, অথবা যে উপায়ে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির সংরক্ষণ ও বৃদ্ধিসাধন সম্ভবযোগ্য, সেই উপায় সম্বন্ধে বিস্মৃতি।

জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি যাহাতে সংরক্ষিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং ধাতু ও কাগজনির্ম্মিত মুদ্রার প্রচলন করিতে যাহাতে বাধ্য না হইতে হয়, তাহা করিতে পারিলে যে, জনসাধারণের আর্থিক দুরবস্থা সর্ব্বতোভাবে দূরীকৃত হইতে পারে, এই সত্যটি উপরোক্ত ভাবে বুঝিয়া লইতে পারিলে, যে-শিল্প ও বাণিজ্যের দ্বারা ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের একদিন সমৃদ্ধিশালী হওয়া সম্ভব হইয়াছিল, সেই শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের জনসাধারণের অর্থাভাব বৃদ্ধি পাইল কেন, তাহা সহজে বুঝা যাইবে। যে-শিল্প ও বাণিজ্যের দ্বারা ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের একদিন সমৃদ্ধিশালী হওয়া সম্ভব হইয়াছিল, সেই শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের জন-সাধারণের আবার অর্থাভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে কেন, তাহা বুঝিতে হইলে আধুনিক শিল্প ও বাণিজ্যের দ্বারা জগতের কোন্ দেশ সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছে, তাহা যেরূপ পরিজ্ঞাত হইবার প্রয়োজন হইবে, সেইরূপ আবার ইংলণ্ডের সমৃদ্ধি কিরূপ ভাবে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাও জানিতে হইবে।

আধুনিক শিল্প ও বাণিজ্য যে সর্ব্বাগ্রে ইংলণ্ডকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধি প্রদান করিয়াছিল, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। কোন্ উপায়ে আধুনিক শিল্প-বাণিজ্যের সহায়তায় ইংলণ্ড তাহার সমৃদ্ধি সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, যেদিন ইংলণ্ড ভারত সাম্রাজ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছে, সেইদিন হইতে তাহার সমৃদ্ধির খ্যাতি আরম্ভ হইয়াছে।

ইংলণ্ডের সমৃদ্ধি যে ভারত সাম্রাজ্যের দ্বারা প্রসূত, ইহা স্বীকার করিয়া লইলে, একমাত্র শিল্প ও বাণিজ্যের দ্বারাই যে সমৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে, তাহা বলা চলে না, কারণ ভারতের কৃষিকার্য্য তখনও পর্য্যন্ত জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল। এই বিষয়ে একটু তলাইয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, তখনও পর্য্যন্ত ভারতের কৃষিকার্য্য সম্পূর্ণ ভাবে বিনষ্ট হয় নাই বলিয়া, অথবা তখনও পর্য্যন্ত ভারতের কৃষিসম্পদ্ কথঞ্চিৎ পরিমাণে অপ্রতিহত ছিল বলিয়া ভারত সাম্রাজ্য লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের পক্ষে যেরূপ সমৃদ্ধিশালী হওয়া সম্ভব হইয়াছিল, সেইরূপ আবার ইংলণ্ডের সহিত যে যে দেশ সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদেরও অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

তলাইয়া চিন্তা করিলে আরও দেখা যাইবে যে, যতদিন পর্য্যন্ত ভারতের কৃষিসম্পদ্ সম্পূর্ণ ভাবে এখনকার মত নাড়াচাড়া পায় নাই, ততদিন পর্য্যন্ত ইংলণ্ড ও তাহার সখ্যসূত্রে আবদ্ধ অন্যান্য দেশগুলিকে বেকার ও অর্থাভাবের জন্ত বিব্রত হইতে হয় নাই এবং যেদিন হইতে ভারতবর্ষ

কৃষক ও কৃষিকার্য্য টলটলায়মান হইয়াছে, সেইদিন হইতে ভারত সাম্রাজ্য ও বৈজ্ঞানিক শিল্প-বাণিজ্য থাকা সত্ত্বেও ইংলণ্ড এবং তাহার সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ দেশসমূহকে আর্থিক বিব্রত হইতে হইয়াছে।

ইংলণ্ডের সমৃদ্ধি তাহার ভারত সাম্রাজ্য লাভের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ঐ সমৃদ্ধিশালিতার অবনতি ভারতীয় কৃষক ও কৃষি-কার্য্যের অবস্থার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট, ইহা বুঝিয়া লইতে পারিলে বর্ত্তমান শিল্প ও বাণিজ্য যে বস্তুতঃপক্ষে ইংলণ্ডের সমৃদ্ধির মূল কারণ নহে, পরন্তু ভারতের কৃষি-কার্য্যই তাহার মূল কারণ, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

অর্থনীতি সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্যগণের আধুনিক সূত্র কি, তাহা বিশ্লেষণ করিতে বসিয়া উপরে যে যে কথা বলা হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, একদিন মানব-সমাজ জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি, স্বাস্থ্য-রক্ষণোপযোগী কৃষিকার্য্য, কৃষকদিগের শিল্পবিদ্যা, কুটীর-শিল্পের বিস্তৃতি, ক্রয়-বিক্রয়ে ধাতু ও কাগজনির্ম্মিত মুদ্রা ব্যবহারের বিরতি, জনসাধারণের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি-বিধায়ক শিক্ষা, এই ছয়টি বিষয়ের ব্যবস্থার দ্বারা জন-সাধারণের প্রত্যেকের অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ও শান্তির অভাব সম্যক্ ভাবে বিদূরিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। আর, আধুনিক অর্থবিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের ফলে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি সম্বন্ধে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার সাধনের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে কৃষিকার্য্যে অবনতি, কৃষকের দুরবস্থা, কুটীরশিল্পের পতন, যন্ত্রশিল্পের উত্থান, সর্ব্বসাধারণের আর্থিক দুরবস্থার সূচনা, বিক্রয়ের বাজার লইয়া মারামারি, জগতের সমস্ত দেশে পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য ও অবিশ্বাস আরম্ভ হইয়াছে।

কাযেই, বর্ত্তমান অর্থবিজ্ঞান যে সম্পূর্ণভাবে দুষ্ট তাহা যুক্তিসঙ্গত ভাবে অস্বীকার করা যায় না।

আধুনিক রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ও অর্থ-বিজ্ঞান যে ভ্রান্তিযুক্ত এবং জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির বৃদ্ধি ও ধাতু ও কাগজ-নির্ম্মিত মুদ্রাহীন ক্রয়-বিক্রয়-প্রচলনের দ্বারা যে জনসমাজের আর্থিক উন্নতি সাধন করা সম্ভব হয় এবং আর্থিক উন্নতি হইলেই শারীরিক ও মানসিক উন্নতি হওয়াও সম্ভব, এই সত্যটি বুঝিয়া লইলে আর্থিক স্বাধীনতার সাধনা অগ্রে গ্রহণযোগ্য, অথবা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সাধনা অগ্রে গ্রহণযোগ্য তৎসম্বন্ধে সহজেই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

এই বিষয়ে একটু তলাইয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সাধনা আরম্ভ করিলে দলাদলি ও মনোমালিন্য অনিবার্য্য এবং দলাদলি ও মনোমালিন্য আরম্ভ হইলে, যে যে কার্য্যের দ্বারা জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির সংরক্ষণ ও সংবর্দ্ধন সম্ভবযোগ্য, সেই সেই ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা কোন ক্রমেই অনায়াসসাধ্য হয় না। এই হিসাবে বলিতে হয় যে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার দিকে ধাবমান হইলে জনসাধারণের আর্থিক দুরবস্থা অনিবার্য্য। অন্যদিকে, আর্থিক স্বাধীনতার সাধনায় ব্যাপৃত হইলে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির সংরক্ষণ ও সংবর্দ্ধনের দিকে উদ্যোগী হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয় এবং তখন মনোমালিন্য ও দলাদলির প্রবৃত্তি মিটাইয়া ফেলা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে।

এইরূপ ভাবে কোন দেশের অভ্যন্তরস্থ দলাদলি ও মনোমালিন্য বিদূরিত হইলে, সেই দেশের মানুষের উপর যে, অন্য কোন দেশের মানুষের কোনরূপ প্রভুত্ব করা সম্ভব-যোগ্য হয় না, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এই হিসাবে বলিতে হয়, আর্থিক স্বাধীনতার সাধনায়, আর্থিক দুরবস্থা দূর করাও যেরূপ সম্ভবযোগ্য, সেইরূপ আবার রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা দূর করিয়া রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করাও অনিবার্য্য হয়।

কাযেই, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা-লাভের চেষ্টা যে জন-সাধারণের দুরবস্থার উৎপাদক, আর আর্থিক স্বাধীনতার চেষ্টা যে উহার প্রতিষেধক, তাহা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

অতএব, ভারতবর্ষের যে রাষ্ট্রীয় গুরুগণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছেন এবং ঐ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক স্বাধীনতার পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেন, তাঁহাদের মতবাদও যে ভ্রান্ত, ইহাও কোন ক্রমে অস্বীকার করা যায় না।

ভারতবর্ষে এমন এক শ্রেণীর মানুষ আছেন, যাঁহারা মনে করেন যে, ভারতবর্ষের জন-সাধারণের আর্থিক উন্নতির কোন চেষ্টায় হস্তক্ষেপ করিলেই ইংরাজগণ তাহাতে বাধা

প্রদান করিবেন এবং এই হিসাবে তাঁহাদের মতে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত আর্থিক স্বাধীনতার কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হয় না।

শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি না হইলে আর্থিক উন্নতি সাধন করা সম্ভব নহে, এই বিশ্বাসানুসারে একমাত্র শিল্প ও বাণিজ্যের দ্বারা আর্থিক উন্নতি-সাধনে কৃতোদ্যম হইলে ইংরাজের সহিত সংঘর্ষের আশঙ্কা যে আছে, তাহা সত্য, কিন্তু কেবলমাত্র শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির দ্বারা আর্থিক উন্নতিসাধন সম্ভবযোগ্য নহে, পরন্তু আর্থিক উন্নতিসাধন করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরা-শক্তি সাধন করিয়া কৃষির উন্নতি সাধন করা কর্ত্তব্য, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আর্থিক উন্নতিসাধনের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ব্যতীতও যে আর্থিক স্বাধীনতা-সাধন সম্ভবযোগ্য, তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইবে।

মোটের উপর, উপরোক্ত ভাবে যে দিক্ দিয়াই দেখা যাউক, রাষ্ট্রীয় মুক্তি ও আর্থিক মুক্তির যত কিছু মতবাদ বর্ত্তমান স্বাধীন দেশগুলিতে এবং ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে, তাহার প্রত্যেকটি যে ভ্রান্ত, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়।

ভারতের মুক্তির যুক্তিসঙ্গত উপায়

ভারতবর্ষের মুক্তির যুক্তিসঙ্গত উপায় কি, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, মুক্তির সংজ্ঞানুসারে যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের প্রত্যেক মানুষটী যাহাতে অন্ততঃপক্ষে অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ও শান্তির অভাব হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা সম্পাদিত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের মুক্তি কথঞ্চিৎ পরিমাণেও সাধিত হইয়াছে, ইহা বলা চলে না। তাহার পর, আরও মনে রাখিতে হইবে যে, যাহাতে প্রত্যেক ভারতবাসী অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ও শান্তির অভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাদৃশ ব্যবস্থা সম্পাদিত হইলে, ভারতের মুক্তির প্রথম সোপানটি অতিক্রম করা হইল, ইহা মনে করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত যাহাতে রোগযন্ত্রণা, মৃত্যুযন্ত্রণা এবং মৃত্যাবশেষের অসদ্গতির আশঙ্কা তিরোহিত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মুক্তির সর্ব্বাঙ্গীন ব্যবস্থা সম্পাদিত হইয়াছে, ইহা মনে করা চলে না।

কাযেই, ভারতের মুক্তির সর্ব্বাঙ্গীন ব্যবস্থা সাধন করিতে হইলে প্রত্যেক ভারতবাসীর অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ও শান্তির অভাব দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে এবং তাহার পর যাহাতে তাহাদের রোগযন্ত্রণা, মৃত্যুযন্ত্রণা এবং মৃত্যাবশেষের অসদ্গতির আশঙ্কা তিরোহিত হয়, তাহার ব্যবস্থায় যত্নবান্ হইতে হইবে।

মুক্ত হইতে হইলে কোন্ কোন্ অবস্থায় উপনীত হইতে হইবে, তৎসম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল, তাহা যে একমাত্র ভারতবর্ষের পক্ষেই প্রযোজ্য তাহা নহে, চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, জগতের যে যে দেশে মানব-সমাজ বিদ্যমান আছে, তাহার প্রত্যেক দেশের পক্ষেই উপরোক্ত কথা কয়টি প্রযোজ্য। পাশ্চাত্ত্য স্বাধীন দেশসমূহে তথাকথিত রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও অর্থনীতি, স্বাস্থ্যনীতি প্রভৃতি-বিষয়ক উপরোক্ত অবস্থাগুলি বিদ্যমান নাই বলিয়া তাঁহারা প্রায়শঃ মানুষ হইয়াও পরিবার অথবা আত্মীয়-স্বজন লইয়া প্রায়শঃ মানুষের মত জীবন যাপন করিতে সক্ষম হন না।

সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হইতে হইলে সর্ব্বশেষে কোন্ কোন্ অবস্থায় উপনীত হইতে হইবে, তাহা যেমন সর্ব্বদা স্মরণ-পথে জাগরূক রাখিতে হয়, সেইরূপ আবার উপরোক্ত চরম অবস্থায় উপনীত হইতে হইলে সাধারণতঃ কোন্ কোন্ সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়, তাহাও পরিজ্ঞাত হওয়ার প্রয়োজন হয়।

মুক্তি-সম্বন্ধীয় আধুনিক পণ্ডিতগণের মতবাদগুলির দুষ্টতা-বিষয়ক সন্দর্ভে দেখান হইয়াছে যে, মুক্তি লাভ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করিবার সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হয় এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আর যাহাই করা যাউক না কেন, তাহাতে মানুষের অভিমান চরিতার্থ করা সম্ভব হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা মুক্তির প্রথম সোপানেও উপনীত হওয়া সম্ভব নহে। পরন্তু, আর্থিক স্বাধীনতার সাধনায় প্রবৃত্ত না হইয়া আর

যাহাই করা হউক না কেন, তদ্দ্বারা মুক্তির আশা উত্তরোত্তর অধিকতর সুদূরপরাহত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আর্থিক স্বাধীনতালাভের সাধনায় প্রবৃত্ত না হইয়া প্রধানতঃ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা-রক্ষার প্রযত্নের জন্যই যে পাশ্চাত্ত্য মানুষগুলি মানুষ হইয়াও প্রকৃত পক্ষে ঘর-বাড়ী, পরিবার এবং আত্মীয়-স্বজনবিহীন অমানুষের মত "শয়নং যত্র তত্র ভোজনং হট্টমন্দিরে" জীবন যাপন করিতে প্রায়শঃ বাধ্য হইয়াছেন, তাহা দেখান হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য মানুষগুলি মানুষ হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু পশুসমূহের যে যৌন শৃঙ্খলা এবং স্ত্রী-পুত্র, ভাই-বোন প্রভৃতি পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি দায়িত্ববোধ দেখা যায়, তাহা পর্য্যন্ত যে প্রায়শঃ উঁহারা বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহা উঁহাদের বিভিন্ন চালচলনে পরিলক্ষিত হইবে। কেন উঁহারা মানুষের রূপ পরিগ্রহ করিয়াও চাল-চলনে ঐরূপ হইয়া পড়িয়াছেন, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উহার মূলে রহিয়াছে মানুষের জীবনের প্রতি যথাযথ মমতার অভাব এবং তাহার মূলে রহিয়াছে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার উন্মাদনা অথবা যুদ্ধপ্রবৃত্তির উত্তেজনা। এইখানে মনে রাখিতে হইবে যে, জীবনের প্রতি মমতার আধিক্য প্রশংসনীয় নহে বটে, কিন্তু যথাযথ মমতা অথবা কর্ত্তব্যসাধনের আগ্রহ সর্ব্বদা প্রয়োজনীয়।

উপরোক্ত যুক্তি অনুসারে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা প্রভৃতি অপরাপর সর্ব্ববিধ স্বাধীনতা সাধনের ভ্রমাত্মকতা উপলব্ধি করিয়া সর্ব্বাগ্রে আর্থিক স্বাধীনতা সাধনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারিলে, স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করিবার উপায় ছয়টী, যথা :—

(১) জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ।

(২) ক্রয়-বিক্রয়ে অথবা শিল্প ও বাণিজ্যে ধাতু ও কাগজনির্ম্মিত কৃত্রিম মুদ্রার ব্যবহারের বর্জ্জন।

(৩) অস্বাস্থ্যকর দ্রব্যের কৃষি-কার্য্য বর্জ্জন করিয়া কেবলমাত্র স্বাস্থ্যকর দ্রব্যের কৃষিকার্য্যের উন্নতি।

(৪) কৃষকদিগের শিল্প-বিদ্যা শিক্ষা করিবার ব্যবস্থা।

(৫) যন্ত্র-শিল্পের বর্জ্জন ও কুটীরশিল্পের বিস্তৃতি-সাধন।

(৬) নৈতিক চরিত্রের অবনতিকর শিক্ষার সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন এবং উহার সর্ব্বতোভাবে উন্নতিকর শিক্ষার গ্রহণ।

এইরূপ ভাবে আর্থিক স্বাধীনতালাভের উপায়গুলি পরিজ্ঞাত হইয়া আর্থিক স্বাধীনতালাভের কার্য্যে সাফল্য লাভ করিতে পারিলে, কোন্ কোন্ উপায়ে স্বাস্থ্যাভাব ও শান্তির অভাব এবং রোগযন্ত্রণা, মৃত্যুযন্ত্রণা ও মৃত্যাবশেষের দুর্গতির আশঙ্কা হইতে মুক্তি লাভ করা যায়, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় এবং তখন ঐ ঐ সাধনায় সাফল্য লাভ করাও যে অনায়াসসাধ্য হয়, ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে।

সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হইতে হইলে সর্ব্বশেষে কোন্ কোন্ অবস্থায় উপনীত হইতে হইবে এবং ঐ ঐ অবস্থায় উপনীত হইতে হইলে, কোন্ কোন্ উপায় একান্তভাবে অবলম্বনীয়, তাহার সঠিক ধারণা সর্ব্বদা স্মরণপথে জাগরূক রাখা যেরূপ আবশ্যকীয়, সেইরূপ আবার ঐ ঐ বিষয়ে ভারতবর্ষ বর্ত্তমানে কি কি অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহার সঠিক ধারণাও একান্ত প্রয়োজনীয়।

কোন রোগীকে আরোগ্য করিতে হইলে, যেরূপ সম্পূর্ণ আরোগ্য কাহাকে বলে, সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবার উপায় কি কি এবং রোগীর তাৎকালিক রোগের অবস্থা কি কি, এই তিনটি বিষয় জানিবার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ কোন দেশকে মুক্ত করিতে হইলে সর্ব্বতোভাবে মুক্তি কাহাকে বলে এবং ঐ মুক্তিলাভের উপায় কি কি, তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া দেশের তাৎকালিক অবস্থার বৈশিষ্ট্য কি কি, তাহাও পরিজ্ঞাত হইবার প্রয়োজন হয়।

সর্ব্বতোভাবে মুক্তিলাভ করিতে হইলে যে যে বিষয়ে সাধনার প্রয়োজন, সেই সেই বিষয়ে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থার বৈশিষ্ট্য কি কি, তৎসম্বন্ধে সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, যে যে সাধনায় সাফল্য দ্বারা কোন্

একটি দেশের মুক্তি সাধন করা সম্ভব হয়, ভারতবর্ষ ঠিক তাহার বিপরীত সাধনায় মত্ত হইয়া রহিয়াছে।

আমরা আগেই দেখাইয়াছি যে, সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হইতে হইলে, প্রথম প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতালাভের মমতা পরিত্যাগ করিয়া আর্থিক স্বাধীনতা-লাভের সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া, অথচ ভারতের রাষ্ট্রীয় গুরুগণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার কথা লইয়াই সর্ব্বদা ক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা কয়েক বৎসর হইতে মুখে আর্থিক উন্নতির কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কি করিয়া আর্থিক স্বাধীনতা তো দূরের কথা, আর্থিক উন্নতি সম্ভবযোগ্য হইতে পারে, তাহার সূত্র পরিজ্ঞাত নহেন বলিয়া, কার্য্যতঃ তাঁহারা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা-লাভের কথাতে (তাহাও কার্য্যে নহে) ব্যাপৃত রহিয়াছেন এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করিতে না পারিলে আর্থিক উন্নতি হওয়া সম্ভবযোগ্য হইবে না, ইহা বলিয়া ভারতীয় যুবকগণকে ও জনসাধারণকে পরোক্ষভাবে বিপথগামী করিতেছেন।

আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করিবার প্রথম উপায়—জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি। অথচ, এক্ষণে জমীর উর্ব্বরাশক্তির উন্নতির জন্য যাহা কিছু করা হইতেছে, তাহার সমুদয় কার্য্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, উহা আংশিকভাবে কৃত্রিম উর্ব্বরাশক্তির বৃদ্ধির সহায়ক বটে, কিন্তু উহার কোনটাই স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির বৃদ্ধির সহায়ক নহে, পরন্তু উহার প্রত্যেকটি স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির অপহারক।

জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি অথবা আর্থিক স্বাধীনতা-লাভের দ্বিতীয় উপায়—ক্রয়-বিক্রয়ে অথবা শিল্প ও বাণিজ্যে ধাতু ও কাগজনির্ম্মিত কৃত্রিম মুদ্রা-ব্যবহারের বর্জ্জন, অথচ গভর্ণমেণ্টের মিণ্ট ও কারেন্সী বিভাগে কি কার্য্য চলিতেছে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, বাৎসরিক উৎপন্ন ধাতু ও কাগজ-নির্ম্মিত মুদ্রার সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে এবং উহার বৃদ্ধি সাধিত করিবার জন্যই নূতন আয়োজনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা সাধিত হইয়াছে।

জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি সাধন করিবার তৃতীয় উপায়—অস্বাস্থ্যকর দ্রব্যের কৃষিকার্য্য বর্জ্জন করিয়া কেবলমাত্র স্বাস্থ্যকর দ্রব্যের কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন করা, অথচ বর্ত্তমান ভারতে কোন্ কোন্ দ্রব্যের কৃষিকার্য্য বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হুড়াহুড়ি লাগিয়াছে, তাহার সন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, স্বাস্থ্যের উন্নতিকর যে যে দ্রব্য ভারতবর্ষে উৎপন্ন হইত, তাহার চাষবাস ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে এবং যাহা কিছু স্বাস্থ্যের অনিষ্ট-বিধায়ক, তাহার চাষবাস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি সাধন করিবার চতুর্থ উপায়—কৃষকদিগের শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিবার ব্যবস্থা-সাধন। অথচ, এই বিষয়ে বর্ত্তমান ভারতবর্ষের অবস্থা কি, তাহার সন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, শ্রমজীবিগণের মধ্যে যাহারা এক সময়ে তাঁতী, কুম্ভকার, কর্ম্মকার, স্বর্ণকার, সূত্রধর প্রভৃতির কার্য্যের সহিত কৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত, তাহাদের সন্তানগণের মধ্যে অনেকেই ঐ ঐ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, তথাকথিত শিক্ষা লাভ করিয়া চাকুরী অথবা নফরগিরীর কার্য্যের জন্য উদ্গ্রীব হইয়া পড়িতেছে।

জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি অথবা আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করিবার পঞ্চম উপায়—যন্ত্রশিল্পের বর্জ্জন ও কুটীর-শিল্পের বিস্তৃতিসাধন। এতৎসম্বন্ধে ভারতবর্ষের কি অবস্থা, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে, কুটীর-শিল্পই উত্তরোত্তর বর্জ্জিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং যন্ত্রশিল্প প্রসার লাভ করিতেছে।

জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি সাধন করিবার ষষ্ঠ উপায়—নৈতিক চরিত্রের অবনতিকর শিক্ষার সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন এবং উহার সর্ব্বতোভাবে উন্নতিকর শিক্ষার গ্রহণ। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শিক্ষার অবস্থা কি, তাহার তল্লাসে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, এক্ষণে শিক্ষা বলিয়া যাহা কিছু চলিতেছে, তাহার প্রত্যেক কার্য্যটি নৈতিক চরিত্রের অবনতিকর এবং একদিন যে সমস্ত শিক্ষার ফলে ভারতীয় নৈতিক চরিত্র জগতের শিক্ষা-গুরুর পদলাভে সক্ষম হইয়াছিল, সেই শিক্ষাপদ্ধতির অকিঞ্চিৎকর যাহা কিছু অবশিষ্ট ৩০ বৎসর আগেও বিদ্যমান ছিল, তাহা ক্রমশঃই বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হইতে হইলে কোন্ কোন্ অবস্থায় উপনীত হইতে হইবে, ঐ ঐ অবস্থায় উপনীত হইতে হইলে কোন্ কোন্ উপায় একান্ত অবলম্বনীয়, তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া ঐ ঐ বিষয়ে ভারতবর্ষ বর্ত্তমানে কি রকম অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহা উপরোক্ত ভাবে পর্য্যালোচনা করিলে ভারতের মুক্তির যুক্তি-সঙ্গত উপায় কি, তাহা খুঁজিয়া বাহির করা অনায়াসসাধ্য হয়।

আমাদের মতে, ভারত যে অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, সেই অবস্থা হইতে তাহার সর্ব্বতোভাবে মুক্তি সাধন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া, ইংরাজ প্রভৃতি বিদেশীয়গণের সহিত অকৃত্রিম সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আর্থিক স্বাধীনতার সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এইরূপ ভাবে আর্থিক স্বাধীনতা-লাভের সাধনায় উদ্যত হইলে শুধু যে ভারতবর্ষেরই আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব হইবে, তাহা নহে, সমগ্র জগতের অন্যান্য জাতিগুলিকেও আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করিবার পন্থা ভারতবর্ষ দেখাইয়া দিতে পারিবে।

আমরা আগেই দেখাইয়াছি যে, আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করিবার প্রথম ও প্রধান কার্য্য—জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ এবং ক্রয়-বিক্রয়ে অথবা শিল্প ও বাণিজ্যে ধাতু ও কাগজনির্ম্মিত কৃত্রিম মুদ্রাব্যবহারের বর্জ্জন। যাঁহারা বর্ত্তমান অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের প্রভাবে প্রভাবান্বিত, সংস্কারের প্রভাববশতঃ তাঁহাদিগের পক্ষে উপরোক্ত দুইটি উপায়ের সমীচীনতা অথবা সার্থকতা বুঝিয়া উঠা সহজসাধ্য নহে এবং তদনুসারে যে-সমস্ত ইংরাজ অথবা দেশীয় রাজপুরুষগণের হস্তে ভারতীয় অর্থনীতির পরিচালনার ভার ন্যস্ত রহিয়াছে, তাঁহারা উপরোক্ত দুইটি উপায় অবলম্বন করিতে সর্ব্বদাই কুণ্ঠা ও সঙ্কোচ বোধ করিবেন। তাঁহাদিগের এই কুণ্ঠা ও সঙ্কোচের ফলে ভারতবর্ষের জনসাধারণের অর্থনৈতিক দুরবস্থা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

এতাদৃশ অবস্থা হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, বর্ত্তমান অর্থ-বিজ্ঞানের উপরোক্ত অপটুতা গবর্ণমেণ্টের ফাইন্যান্স বিভাগের ভারপ্রাপ্ত রাজপুরুষগণ ও প্রাদেশিক গবর্ণরগণ যাহাতে কার্য্যতঃ বুঝিতে পারেন, তাঁহাদের প্রতি সসম্মান ভাবে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এই চেষ্টা কিরূপ ভাবে সম্ভবযোগ্য, তাহার আলোচনা আমরা সন্দর্ভান্তরে করিয়াছি। প্রয়োজন হইলে উহা আবার করিব।

কাহার চেষ্টায় রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আন্দোলন পরিত্যাগ করিয়া উপরোক্ত ভাবের আর্থিক স্বাধীনতার আন্দোলন আরম্ভ করা সম্ভব হইবে, তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে, কারণ কোন দেশের মুক্তি সাধন করিতে হইলে উহার কার্য্যের জন্য কোন মানুষ ব্যতীত কেবলমাত্র উহার পরিকল্পনার দ্বারাই তাহা সিদ্ধ হয় না। কাহার চেষ্টায় যে মানুষ তাহাদের বর্ত্তমান ভ্রান্ত পথ হইতে ভারতের মুক্তির সঠিক পথে অনুগমন করিবে, ইহা বলা বড় কঠিন। আমাদের মনে হয়, মানুষের দারিদ্র্য, উচ্ছৃঙ্খলতা ও দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অবিচার যেরূপ উত্তরোত্তর পুঞ্জীভূত হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে অদূরভবিষ্যতে স্বয়ম্ভু-শক্তির আবির্ভাব হইবে এবং ঐ শক্তির বলে, যে সমস্ত যুবক অকৃত্রিমভাবে কংগ্রেসপন্থী, তাহারা যে তাহাদের নেতৃবর্গ ও বর্ত্তমান বিজ্ঞানের দ্বারা বিপথে পরিচালিত হইতেছে এবং পরোক্ষভাবে তাঁহাদের দ্বারাই যে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান দুরবস্থা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা বুঝিতে পারিবে। তখন কংগ্রেসপন্থী ঐ যুবকগণের দ্বারাই ভারতের মুক্তি সাধিত হওয়া সম্ভবযোগ্য হইবে।

এইরূপ ভাবে জনসাধারণের আর্থিক মুক্তি সাধন করিতে পারিলে স্বাস্থ্যাভাব, শান্তির অভাব, রোগের যন্ত্রণা, মৃত্যুর যন্ত্রণা, মৃতাবশেষের অসদগতি হইতে মুক্ত হইবার উপায় পরিজ্ঞাত হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আর্থিক মুক্তি সাধিত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অপরাপর মুক্তির কথা আলোচনা করিলে স্বীয় পাণ্ডিত্যের অভিব্যক্তি হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা জনসাধারণের কোন হিত সাধিত হইবে না, কারণ আগেই বলিয়াছি যে, পেটের জ্বালায় জর্জ্জরিত হইতে থাকিলে ইন্দ্রিয়ের কার্য্য, অথবা মনের কার্য্য, অথবা বুদ্ধির কার্য্য কখনও যথাযথভাবে সংনিয়ন্ত্রিত হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে।

কাজেই, আমরা এখানে মুক্তির অবশিষ্টাংশের কথা আলোচনা করিব না। যদি কখনও ক্ষেত্রের প্রয়ো-

অনীয়তা নয়নপথে উদিত হয়, তখন ঐ অংশের আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল।

উপসংহারে আমরা নেতৃবর্গকে এখনও অবহিত হইয়া, জনসাধারণের মুখের পানে চাহিয়া অগ্রসর হইতে অনুরোধ করি। ব্রিটিশ প্রভুত্বের উচ্ছেদ সাধিত হইলেই ভারতের জনসাধারণের দুর্দ্দশা দূরীভূত হইবে, এই অজুহাতে তাঁহারা বর্ত্তমান জনসাধারণের আনুগত্য লাভ করিতে সক্ষম হইবেন বটে, কিন্তু কোন অদৃষ্ট শক্তির আকস্মিক কার্য্য আরম্ভ না হইলে কংগ্রেস-নেতৃবর্গ যে-পন্থায় চলিতেছেন, সেই রাস্তায় কখনও ব্রিটিশ প্রভুত্বের উচ্ছেদ সাধিত হইবে না, এবং ব্রিটিশ প্রভুত্বের উচ্ছেদ সাধিত হইলেও দেশের দারিদ্র্য দূরীভূত হইবে না।

এদিকে জন-সাধারণের দারিদ্র্য এতাদৃশ চরমাবস্থায় পৌঁছিয়াছে যে, অনতিবিলম্বে উহার প্রতিবিধানের কোন ব্যবস্থা সাধিত না হইলে, তাহাদের পক্ষে ধৈর্য্য বজায় রাখা সম্ভবযোগ্য হইবে না। যাহারা আজ আনুগত্য করিতেছে, তাহাদেরই আবার ঐ নেতৃবর্গের বিদ্রোহী হইবার আশঙ্কা আছে, ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে।

সংবাদপত্র-পরিচালনা ও আনন্দবাজার পত্রিকার দায়িত্বজ্ঞান

কি রাষ্ট্রনীতি, কি অর্থনীতি, কি সমাজনীতি ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের ক-খ সম্বন্ধে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক যে অজ্ঞ, তাহা তাঁহার নিম্নোক্ত সম্পাদকীয় স্তম্ভের প্রত্যেকটিতে প্রস্ফুট হইয়াছে।

রবিবার ২রা মাঘের আনন্দবাজারের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ দুইটি। একটির নাম :—স্বায়ত্তশাসনের নূতন ধারা এবং অপরটির নাম, বিজয়ের পথে ডি. ভ্যালেরা।

স্বায়ত্তশাসনের নূতন ধারা-শীর্ষক প্রবন্ধে যুক্তপ্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলীর দ্বারা যে-সমস্ত পরিকল্পনা গৃহীত হইতেছে, তদ্দ্বারা প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের হিত সাধিত হইবে বলিয়া মন্তব্য করা হইয়াছে, বস্তুতঃপক্ষে যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের ঐ পরিকল্পনাগুলির দ্বারা যে, কোন প্রকৃত হিত সাধিত হওয়া ত' দূরের কথা, তদ্দ্বারা তাহাদিগের অধিকতর অনিষ্টই সাধিত হইবে, ইহা ঐ পরিকল্পনাগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার ক্ষমতা থাকিলে সহজেই বুঝা যাইবে। স্থানাভাবে আমরা উহার বিশ্লেষণ এখানে করিব না বটে, কিন্তু আমাদের কথা যে সত্য, তাহা অদূর-ভবিষ্যৎ প্রমাণিত করিবে।

বিজয়ের পথে ডি. ভ্যালেরা-শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়িলে মনে হয় যে, আনন্দবাজারের মতে, আয়ার্ল্যাণ্ড একণে স্বাধীনতা লাভ করিতে সক্ষম হইয়া নন্দন-কাননবৎ একটা কিছুতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আয়ার্ল্যাণ্ডের বর্ত্তমান অবস্থা কি, তৎ-সম্বন্ধে যথাযথভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, আয়ার্ল্যাণ্ডে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও প্রজাতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু আয়ার্ল্যাণ্ডের জনসাধারণ তাহাদিগের ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনপক্ষে যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গিয়াছে। তাহাদের দেশে তথাকথিত রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও প্রজাতন্ত্র গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু নূতন কোন শক্তি অথবা মতবাদের কার্য্য আরম্ভ না হইলে, তাহাদের মারামারি, দলাদলি, ঝগড়া-ঝাঁটি, অশান্তি ও অসন্তুষ্টি এবং অর্থাভাব সমান ভাবেই চলিতে থাকিবে।

৩রা মাঘ সোমবারের আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় সন্দর্ভের নাম শরৎচন্দ্র। এই সন্দর্ভে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য, চরিত্র, রচনা সম্বন্ধে অনেক স্তবস্তুতি উচ্ছ্বসিত ভাবে প্রচারিত হইয়াছে। শুধু যে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকই শরৎচন্দ্রের সাহিত্য, চরিত্র ও রচনা সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা প্রচার করিতেছেন তাহা নহে, আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত জনসাধারণের অনেকেরই ঐ মত। শরৎচন্দ্র আজ মৃত। প্রত্যক্ষভাবে মৃতের কোনরূপ নিন্দা করা কাপুরুষের কার্য্য বলিয়া আমরা মনে করি এবং তজ্জন্য শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আমাদের লেখনী সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছে।

আমরা শুধু পাঠকবর্গকে এই জানাইতে চাই যে, চরিত্র গঠিতে অদ্ভুত থাকা, বুঝায়, তাহা লাভ করিতে পারিলে মানুষের কোনরূপ দুঃখ থাকিতে পারে না। চরিত্র লাভ করিতে পারিলেও যদি মানুষের দুঃখ-কষ্ট পাওয়া সম্ভব হইত তাহা হইলে স্মরণাতীত কাল হইতে মনুষ্য-সমাজে চরিত্র-গঠনের জন্য এত উদ্‌গ্রীবতা বিদ্যমান থাকিত না।

যে গ্রন্থকার চরিত্র-অঙ্কনে নিপুণ, সেই গ্রন্থকারের গ্রন্থ পড়িলে চরিত্র গঠন করা অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে এবং তদনুসারে এতাদৃশ গ্রন্থকারের পাঠকের পক্ষে সর্ব্ববিধ দুঃখকষ্ট হইতে অব্যাহতি পাওয়া সম্ভব হয়। যদি দেখা যায় যে, শরৎচন্দ্রের অতীব অনুগত পাঠক পর্য্যন্ত তাঁহার গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া চরিত্র গঠন করিতে সক্ষম হন নাই এবং দুঃখকষ্টের হাত হইতেও অব্যাহতি পান নাই, তাহা হইলে শরৎচন্দ্রের চরিত্রাঙ্কন-বিদ্যা ও সাহিত্যকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা কি জনসমাজকে প্রতারিত করিবার সমতুল্য হয় না?

অন্যপক্ষে, এইরূপ প্রবন্ধ লিখিলে কি আধুনিক তরুণ-তরুণীর প্রবৃত্তি বাড়ুকে বিপথগামী না হয়, তাহা না করিয়া, তাহাদের খোসামোদী কথার নিদর্শন স্বরূপ হয় না?

৫ই মাঘ মঙ্গলবারের আনন্দবাজার পত্রিকায় সম্পাদকীয় সন্দর্ভ তিনটি। একটির নাম হরিপুর কংগ্রেসের উদ্যোগপর্ব, অপর দুইটির নাম প্রবাসী ভারতীয়ের দুর্দ্দশা ও পরলোকে অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র।

প্রথম প্রবন্ধটি কংগ্রেসের দলাদলি-সম্বন্ধীয় বিবৃতিতে পরিপূর্ণ। উহা আনন্দবাজার পত্রিকার পৌনে দুই কলম শোভিত করিয়াছে বটে, কিন্তু ঐ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য যে কি এবং উহা পাঠ করিয়া যে জনসাধারণের কি লাভ হইতে পারে, তাহা কাহারও পক্ষে বুঝা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। সমগ্র প্রবন্ধটিতে কংগ্রেসের দলাদলি সম্বন্ধে কতকগুলি অসংলগ্ন প্রলাপ রহিয়াছে বটে, কিন্তু এই দলাদলির মূল কারণ যে কি, এবং উহার নিরাকরণ করিবার উপায়ই বা যে কি, তাহার সন্ধান খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

প্রবাসী ভারতীয়ের দুর্দ্দশা-শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত। দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রভৃতি বিদেশে যে-সমস্ত ভারতীয় বাস করিতেছেন, তাঁহাদের উপর কিরূপ পক্ষপাতমূলক ব্যবহার করা হয়, তাহার কিছু নমুনা ঐ প্রবন্ধের প্রথম ভাগে দেখান হইয়াছে। আর, দ্বিতীয় ভাগ ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে প্রতিশোধমূলক যে আইন প্রণয়নের প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে, তাহার ওকালতীতে পরিপূর্ণ।

অহিংসা ও সত্যের তথাকথিত অবতার গান্ধীজীর এতাদৃশ চেলা যে-আনন্দবাজার, সেই আনন্দবাজারের সম্পাদকীয় স্তম্ভে যে কিরূপে প্রতিশোধমূলক আইনের ওকালতী চলিতে পারে, তাহা আমরা খুঁজিয়া পাই না। প্রতিশোধ কি হিংসার অপর নাম নহে? আমাদিগকে কি বুঝিতে হইবে যে, আজকালকার বাঙ্গালী যুবকদিগের প্রিয় হইতে হইলে মুখে অহিংসার বাণী এবং বাস্তবতঃ হিংসামূলক কার্য্যের সমর্থন করিতে হইবে?

পরলোকে অধ্যাপক হেরম্বচন্দ্র-শীর্ষক প্রবন্ধটি মোটামুটি ভাবে প্রশংসার যোগ্য।

বুধবার, ৬ই মাঘ, আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম সম্পাদকীয় সন্দর্ভে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগপর্ব। যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে লর্ড লোথিয়ান অথবা লর্ড স্যামুয়েল কি করিতেছেন, কি বলিতেছেন, তৎসম্বন্ধে অনেক কথায় এই প্রবন্ধটি পরিপূর্ণ। ইহা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনার উপর কিছু কিছু বিদ্রূপের বাণীও পরিলক্ষিত হয় বটে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণীয় অথবা বর্জ্জনীয়, অথবা যুক্তরাষ্ট্রকে কেন গ্রহণীয় অথবা বর্জ্জনীয় মনে করিতে হইবে, তাহা সমগ্র প্রবন্ধের কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না।

ঐ দিবসের অপর প্রবন্ধের নাম 'নির্ব্বাচনে দুর্নীতি'। এই প্রবন্ধটিতে নির্ব্বাচন সম্পর্কে অনেক অসংলগ্ন কথাই বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু নির্ব্বাচনসমূহ যে কিরূপে ও কেন পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে যুক্তিসঙ্গত একটি কথাও সম্পাদক তাঁহার সন্দর্ভে কুত্রাপি বলেন নাই।

৮ই মাঘ, বৃহস্পতিবার দিন আনন্দবাজারের সম্পাদকীয় সন্দর্ভ দুইটি—সুভাষচন্দ্র ও মোস্লেম লিগ।

প্রথম প্রবন্ধটি সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস্-সভাপতি নির্বাচনের সংবাদকে ভিত্তি করিয়া লিখিত। প্রবন্ধটি বিবাহের প্রীতি-উপহারের ন্যায় একটি উচ্ছ্বাস। সমগ্র প্রবন্ধের কোন স্থানে কোনও কর্ত্তব্যনির্দ্দেশ নাই।

দ্বিতীয় প্রবন্ধটির মুখ্য বক্তব্য 'রোজনা হিন্দ'-নামক উর্দ্দু দৈনিক পত্রের বিরুদ্ধে বাংলা সরকার আনীত মামলা সম্বন্ধে। ঐ প্রবন্ধটি পরোক্ষভাবে সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধন স্বরূপ।

শুক্রবার, ৭ই মাঘ তারিখের প্রথম সম্পাদকীর প্রকাশ্য তদন্ত চাই-শীর্ষক প্রবন্ধটির মূল বক্তব্য দুইটি :—(১) বিহিটা রেল-দুর্ঘটনায় যে প্রকাশ্য তদন্ত আরম্ভ হইয়াছে, সেই তদন্ত সরকারের পক্ষে প্রশংসার যোগ্য বটে, কিন্তু উহাতে কোন কোন কথা রেল কর্তৃপক্ষ গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। উহার দ্বিতীয় বক্তব্য—বিহিটা দুর্ঘটনার যেরূপ প্রকাশ্য তদন্ত হইতেছে, বামলৌরী দুর্ঘটনারও সেইরূপ তদন্ত হওয়া সঙ্গত।

এই সন্দর্ভটি মোটামুটি ভাবে প্রশংসার যোগ্য।

অপর প্রবন্ধ 'কারাকাহিনী'তে জেলে কিরূপ ব্যবহার সাধারণতঃ বন্দী ও বন্দিনীদের প্রতি করা হয়, তৎসম্বন্ধে পাঠকবর্গের ও গবর্ণমেন্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সাংবাদিকের এতাদৃশ চর্চ্চাও সর্ব্বতোভাবে নিন্দার যোগ্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। কিন্তু, আমাদের মতে, ঠিক ন্যায়পরায়ণতার সহিত কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইলে যাঁহারা আইন ও সমাজের শৃঙ্খলা-বিরুদ্ধ কাজ করিয়া রাজবিচারে দণ্ডিত হন এবং তদনুসারে বন্দী ও বন্দিনী হইতে বাধ্য হন, তাঁহাদের প্রতি দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে মন্তব্যকালে যথাসম্ভব সংযত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

যাঁহারা দণ্ডনীয়, তাঁহাদিগের দণ্ড না হওয়া যে, সমাজের পক্ষে বিশৃঙ্খলাজনক, সেইরূপ আবার যাঁহারা দণ্ডিত, তাঁহাদের দণ্ড যে অতীব ক্লেশকর, তাহা যাহাতে তাঁহারা বুঝিতে পারেন, তাহা না করিলে দণ্ড নিষ্ফল হইয়া যায়, ইহা সাংবাদিকগণের মনে রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

৮ই মাঘ শনিবারের আনন্দবাজার পত্রিকায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধ তিনটি। একটির নাম "স্বামী বিবেকানন্দ" এবং অপর দুইটির নাম 'বসুমতীর মামলা' ও '[illegible] লোথিয়ানের সফর'।

স্বামী বিবেকানন্দ-নামক সন্দর্ভটি স্বামীজীর ষট্সপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষে লিখিত। এই প্রবন্ধে মুখ্যতঃ নিম্নলিখিত মতবাদ কয়েকটি প্রচারিত হইয়াছে :—

(১) চিরদিনই মুষ্টিমেয়-মানব ক্ষমতা, আধিপত্য ও ঐশ্বর্য্যলোভে সমষ্টিকে সর্ব্বদেশে পীড়ন করিয়াছে।

(২) মানুষ চিরদিনই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা চাহিয়াছে এবং তাহাই চাওয়া উচিত।

(৩) ব্যক্তিগত মুক্তিকামনাকে তুচ্ছ করিয়া সমষ্টি-মুক্তির মহাবার্ত্তা বরণীয়।

(৪) প্রেমই জীবন, ঘৃণাই মৃত্যু।

একটু তলাইয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, আনন্দবাজার পত্রিকার উপরোক্ত চারিটি মতবাদের প্রত্যেকটি যেরূপ ভ্রান্তিময় সেইরূপ আবার ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও প্রকৃতির নিয়ম-সম্বন্ধীয় ক-খ-তে পর্য্যন্ত যে সম্পাদকটি পৌঁছিতে পারেন নাই, তাহার পরিচয়ও ঐ কথা কয়েকটিতে পাওয়া যায়।

গত আড়াই হাজার বৎসর হইতে যে মুষ্টিমেয় মানব লালসার বশে সমষ্টিকে সর্ব্বদেশে নিপীড়িত করিয়া আসিতেছেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু চিরদিন মানব-সমাজে এতাদৃশ অবস্থা বিদ্যমান ছিল না।

মানবসমাজে চিরদিন এতাদৃশ অবস্থা বিদ্যমান ছিল অথবা ছিল না, তৎসম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইতে হইলে মানবসমাজের প্রাচীনতম গ্রন্থগুলির মূলভাষা ও মূলভাবের সহিত পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। ঐ পরিচয়ের সৌভাগ্য আনন্দবাজারের সম্পাদক মহাশয়ের হইয়াছে কি? তাহা না হইয়া থাকিলে তিনি এতাদৃশ ভাবে 'জ্যেঠামী' করিয়া অপরিণতবয়স্ক যুবকদিগের বিপথগামিতার সহায়তা করেন কেন?

[illegible] মানবসমাজের [illegible] [illegible]

[illegible] মূলভাষার সহিত পরিচিত হইয়া উহার মূলভাব অধ্যয়ন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ঐ ঐ [illegible] স্বভাবের নিয়মবশে মানবসমাজ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে। এক শ্রেণীর নাম "বুদ্ধিজীবী" এবং অপর শ্রেণীর নাম "শ্রমজীবী"। যাঁহারা প্রকৃত বুদ্ধিজীবী, তাঁহারা চিরদিনই স্বভাবের নিয়মবশে পরের জন্য জীবন যাপন করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং সর্ব্ববিধ লালসা, রাগ ও দ্বেষ স্বীয় আত্মাধীন করিতে সক্ষম হন। যখন প্রকৃত বুদ্ধিজীবীর অভ্যুদয় হয়, তখন কুত্রাপি কাহারও প্রতি কোন পীড়ন হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় না এবং তাহারই জন্য তাহাদের প্রতি সমাজের শ্রমজীবিগণ অকৃত্রিম ভাবে আন্তরিক শ্রদ্ধা পোষণ করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ এই বুদ্ধিজীবিশ্রেণীর মানুষের বংশোদ্ভূত। আধুনিক ব্রাহ্মণাদি বর্ণের মানুষগুলি ব্রাহ্মণাদি বর্ণের কর্ত্তব্যের হিসাবে যে নিতান্ত নিন্দনীয়, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু, তাঁহারা চিরদিন পতিত ছিলেন না। একদিন যে তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে উন্নত ছিলেন, তাহা তাঁহাদিগের প্রতি শূদ্রগণের শ্রদ্ধার মাত্রা লক্ষ্য করিয়া ও সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা অনুমান করা সম্ভব হয়। যদি একদিন তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে উন্নতই না থাকিতেন, তাহা হইলে শূদ্র-বংশধরগণ কিছুদিন আগেও তাঁহাদের প্রতি সংস্কারবশে এত আন্তরিক শ্রদ্ধা পোষণ করিতে পারিতেন না।

একতৎসম্বন্ধীয় মানবসমাজের প্রাচীনতম গ্রন্থসমূহ যথাযথ অর্থে অধ্যয়ন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, সর্ব্ববিধ লালসা ত্যাগ করিয়া সমাজসেবায় উপযুক্ত হইবার কঠোর সাধনায় যাহাতে প্রকৃত বুদ্ধিজীবিগণ প্রবৃত্ত হন, তদ্রূপ সংগঠন প্রাচীনতম মানবসমাজের মধ্যে বিদ্যমান ছিল; এবং তখন মানবসমাজের প্রত্যেক দেশে প্রকৃত ব্রাহ্মণ, প্রকৃত ক্ষত্রিয়, প্রকৃত বৈশ্য এবং প্রকৃত শূদ্র বিদ্যমান ছিল। যখন মানবসমাজে ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ প্রকৃতভাবে দেখা যায়, তখন ক্ষমতা, আধিপত্য ও ঐশ্বর্য্যের [illegible] কাহারও প্রতি কাহারও পীড়নের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

[illegible] চিরদিনই যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা চাহিয়াছে, এই [illegible] কথা সম্ভব নহে। এই সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, আর্থিক স্বাধীনতা চিরদিনই মানুষ চাহিয়া থাকে বটে এবং তাহা চাহিলে মানুষের ক্রমে ক্রমে উন্নতি ছাড়া অবনতি হয় না বটে, কিন্তু একদিকে যেরূপ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা চিরদিন মানুষ চাহে নাই, সেইরূপ আবার আর্থিক স্বাধীনতাকে উপেক্ষা করিয়া মানুষ যখন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য ক্ষিপ্ত হয়, তখন সর্ব্ববিষয়ে মানুষের অধোগতি সুনিশ্চিত হইয়া পড়ে।

এই সম্বন্ধে আরও বিশদভাবে বুঝিতে হইলে আমরা পাঠকদিগকে এই সংখ্যার সম্পাদকীয় স্তম্ভ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

তৃতীয় উক্তিটি, অর্থাৎ ব্যক্তিগত মুক্তিকামনাকে তুচ্ছ করিয়া সমষ্টিমুক্তির মহাবার্ত্তা বরণীয়, এতাদৃশ মতবাদ সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের অভাবের পরিচায়ক।

ব্যক্তি লইয়াই যে সমষ্টি, ব্যক্তিগত উন্নতি অথবা মুক্তি না হইলে যে সমষ্টিগত উন্নতি অথবা মুক্তি হওয়া সম্ভব নহে, তাহা ভারতবাসিগণ যতদিন না বুঝিতে পারিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত ভারতবাসিগণের দুর্দ্দশা অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকিবে।

'প্রেমই জীবন, ঘৃণাই মৃত্যু', এতাদৃশ উক্তিও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক-খ-সম্বন্ধে পরিজ্ঞানের অভাবের নিদর্শন। যাঁহারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধক, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, একমাত্র কর্ত্তব্যসাধনেই জীবনের উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে। মানুষ যখন মানুষকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহার পতন যেরূপ অনিবার্য্য, সেইরূপ মানুষ যখন মানুষের প্রতি আসক্তিসম্পন্ন হয়, তখনও ঐ আসক্তি অথবা প্রেমবশতঃ কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়া অধোগামী হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়।

কাযেই, 'প্রেমই জীবন, ঘৃণাই মৃত্যু', এবংবিধ কথা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না।

বসুমতীর মামলা-শীর্ষক প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য, জরুরী প্রেস আইন এবং রাজদ্রোহের আইনের প্রতিবাদ করা বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু উহাতেও বাঙ্গালায় মুস্লিমগণের প্রতি বিদ্বেষের নিদর্শন পাওয়া যাইবে।

লর্ড লোথিয়ানের সফর-শীর্ষক প্রবন্ধটী লর্ড লোথিয়ানের ভারত-ভ্রমণ-প্রসঙ্গে লিখিত। এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য যে কি, তাহা পরিস্ফুট হয় নাই। পরন্তু, ইহাতে কতকগুলি আস্ফালন, যুক্তিতর্কহীন মন্তব্য দেখা যায়।

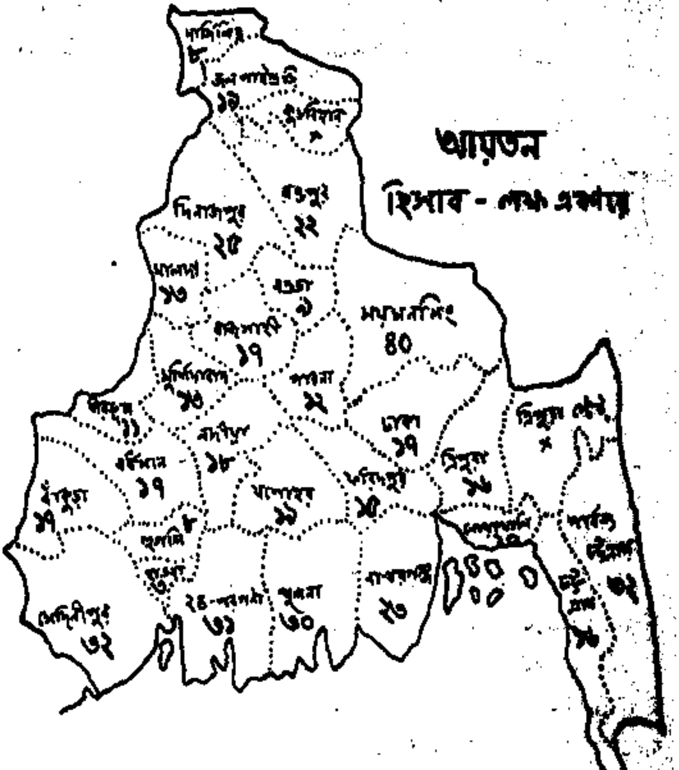
আমরা আনন্দবাজার পত্রিকার পরিচালক ও পাঠকদিগকে এখনও সতর্কতা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করি।

বাঙ্গালার কৃষিজাত দ্রব্যাবলী

—শ্রীকালাচাঁদ দাস

ইহা অতি পুরাতন, সর্ব্বজনশ্রুত এবং সর্ব্বজনস্বীকৃত কথা যে, আমাদের বাঙ্গালাদেশ কৃষির উপর নির্ভর করে। বাঙ্গালা আঠাশটি জিলায় বিভক্ত, এখানে প্রতিটি জিলায় কোন্ ফসল কি পরিমাণে উৎপন্ন হয়, তাহারই পরিচয় দিবার চেষ্টা করিতেছি।

স্থূলভাবে দেখিতে গেলে, এখানে আমরা ভূমিজ এগার প্রকারের দ্রব্য পাই, যথা :—ধান, পাট, চা, তৈলবীজ, আখ, তামাক, গম, তুলা, সিনকোনা, মশলা, ফলমূলাদি। সরকার কর্ত্তৃক সংগৃহীত হিসাবের উপর আমরা নির্ভর করিতে বাধ্য। সরকারের শেষতম (১৯৩৬-৩৭) গৃহীত হিসাব হইতে আমরা প্রতিটি জিলার আয়তনের মধ্যে কত একার জমি কোন্ শস্যের জন্য ধার্য্য আছে, তাহার যে-পরিচয় পাইয়াছি, তাহা হইতে ভাঙ্গা-সংখ্যাকে পুরা সংখ্যার হিসাবে আনিয়া যে-অঙ্ক দাঁড়াইয়াছে, তাহা দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিব। ইহাতে পাঠকবর্গের বুঝিতে ও জিলাসমূহের পাশাপাশি তুলনা করিতে সুবিধা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। পার্শ্বে বাঙ্গালার জিলাসমূহের আয়তন নির্দ্দেশ দিয়া একটি ছবি দেওয়া হইল। সেই আয়তনের মধ্যে কোন্ ফসলের জন্য কত পরিমাণ জমি ব্যবহৃত হইতেছে, পরবর্ত্তী ছবি দেখিয়া পাঠকবর্গ তাহা সহজেই ধরিতে পারিবেন।



(ক) ধান : লক্ষ একারের হিসাব :—

প্রথমে ধানের কথা বলা যাক। ধানের প্রকার-ভেদ আছে; আউশ, আমন, অগ্রাণী ইত্যাদি। কিন্তু এখানে একত্রে সর্ব্ববিধ ধানেরই হিসাব দেওয়া হইতেছে। পরপৃষ্ঠায় যে-ছবি দেওয়া হইল, তাহাতেও জিলা ভাগ করা হইয়াছে, কিন্তু প্রতিটি জিলার মধ্যে যে-সংখ্যা বসান হইয়াছে, ঐ ছবিতে তাহার দ্বারা 'লক্ষ একার জমি' বুঝিতে হইবে। ময়মনসিংহ জিলায় '২৫' সংখ্যাটি আছে, অর্থাৎ এখানে ২৫ লক্ষ একার জমিতে ধান্য উৎপন্ন হয় এবং বাঙ্গালার জিলাসমূহের মধ্যে এখানেই ধান্যের জন্য ধার্য্য জমির পরিমাণ সবার চেয়ে অধিক। বাঁকুড়া ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে '১' বসান হইয়াছে, তাহার অর্থও সহজে করা যাইবে যে, এই দুই স্থানের প্রত্যেকটিতে মাত্র ১ লক্ষ একার জমিতে ধান্য উৎপন্ন হয়। উপরে পুরা সংখ্যায় হিসাবে প্রত্যেকটি জিলার আয়তন কত তাহা দিয়াছি, এই হিসাবে পাঠকবর্গ কত আয়তনের মধ্যে কোন্ জিলা কত পরিমাণ জমি

[illegible] জন্য ব্যবহার করে, তাহার হিসাব করিয়া লইতে [illegible]। কুচবিহার ও ত্রিপুরায় '×' চিহ্ন দেওয়া আছে। [illegible] করদ-রাজ্য, বর্তমানে আমাদের হিসাবের বাহিরে।



(খ) পাট, চা ও তৈলবীজ : দশ হাজার একারের হিসাব :—

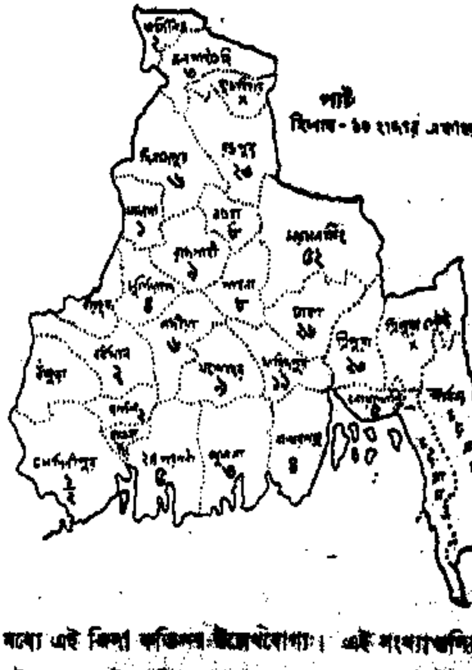
[illegible] হিসাবে সংখ্যাকে লক্ষ একার বুঝিতে নির্দেশ [illegible]। কিন্তু হিসাব করিবার সুবিধার জন্য পাট, চা ও তৈলবীজের জন্য ধার্য্য জমির আয়তন বুঝিবার জন্য নিম্নের ছবির সংখ্যাকে ১০ হাজার দিয়া গুণ করিলে পরিমাণ পাওয়া যাইবে। পাটের জন্যও ময়মনসিংহে সবার চেয়ে অধিক জমি [illegible] হয়। ময়মনসিংহে '৫২' সংখ্যাটি আছে, ইহার অর্থ ৫২ × ১০ হাজার = ৫২০ হাজার, অর্থাৎ ৫ লক্ষ একারের কিছু বেশি জমিতে পাটোৎপাদন হয়। সর্বনিম্ন সংখ্যা হাওড়া ও মেদিনীপুরে '½' করিয়া। অর্থাৎ ½ × ১০ হাজার = ৫ [illegible] একার জমি। যে জিলায় কোন সংখ্যা দেওয়া নাই, [illegible] পাট আদৌ হয় না; যথা—বীরভূম, বাঁকুড়া, [illegible] ও পার্বত্য চট্টগ্রাম।

[illegible] হয় কেবল জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিংএ। এই দুই জিলা [illegible] ছবিতে অন্য কোন জিলায় সংখ্যানির্দেশ [illegible]। কিন্তু পার্বত্য [illegible] '×' চিহ্ন দেওয়া আছে। এই চিহ্নের অর্থ হইতেছে যে, উক্ত জিলায় কিছু পরিমাণে চা জন্মে, কিন্তু আমাদের সংখ্যা দিয়া বুঝাইবার পক্ষে যৎকিঞ্চিৎ। পার্বত্য চট্টগ্রামে মাত্র ২শত একার জমিতে চা উৎপন্ন হয়।

তৈলবীজও ময়মনসিংহ জিলায় উৎপন্ন হয় সকলের চেয়ে বেশি জমিতে। ২১ × ১০ হাজার, অর্থাৎ ২ লক্ষ একারেরও অধিক। সর্বনিম্ন উৎপন্ন হয় ২৪ পরগণা, বীরভূম, হাওড়া ও চট্টগ্রামে। উক্ত জিলা-চতুষ্টয়ে '+' চিহ্ন (পরপৃষ্ঠা) দেওয়া হইয়াছে। এখানে যে-পরিমাণে তৈলবীজ উৎপন্ন হয়, আমাদের হিসাবে আনিবার পক্ষে তাহা সুবিধাজনক নয় বলিয়া উক্ত চিহ্ন দ্বারা তাহাদের সঙ্কেত করিতে হইয়াছে।

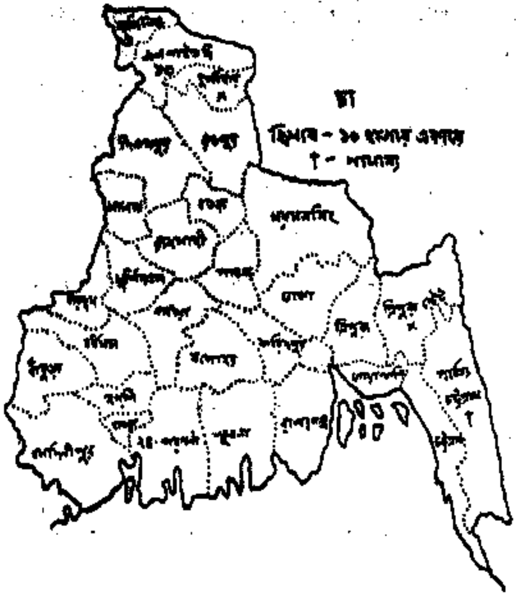
(গ) হাজার একারের হিসাব : আখ, তামাক, গম, তুলা, সিন্‌কোনা, মশলা ও ফলমূল

আখ : পরপৃষ্ঠার ছবি হইতে দেখিতে পাইতেছি যে, দিনাজপুরে সব চেয়ে বড় সংখ্যা, অর্থাৎ '৫৩' বসান হইয়াছে। তাহার পর ময়মনসিংহ ৫০, তাহার পর বাখরগঞ্জ ৪৫, তাহার পর ঢাকা ৪৩, রংপুর ৩০, রাজশাহী ২১। অধিক সংখ্যার



মধ্যে এই জিলা কয়টিকে উল্লেখযোগ্য। এই সংখ্যাগুলির অর্থ হইতেছে যে, উক্ত জিলাসমূহে [illegible]

জন্য খালি আছে। সর্ব্ব নিম্ন হইতেছে পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম, ১। অর্থাৎ এখানে মাত্র এক হাজার একার জমিতে আখ চাষ হয়।



তামাক ঃ তামাকের জন্য রংপুর জিলা অনেক পরিমাণ জমি ব্যবহার করে। বাঙ্গলার মধ্যে এই জিলায় তামাকের



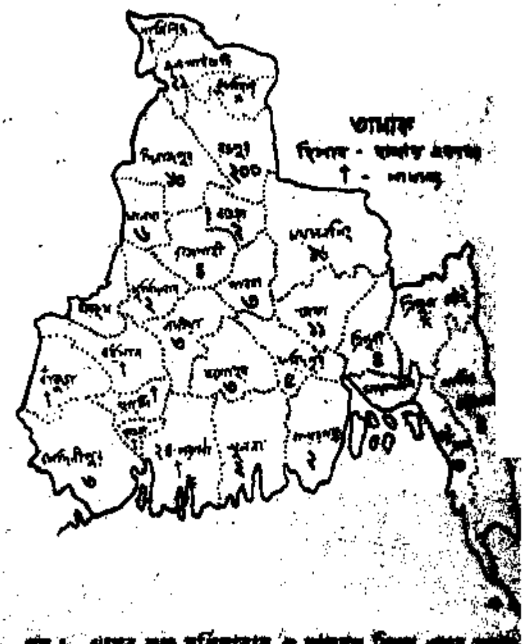
জন্য প্রসিদ্ধি সর্ব্বজনবিদিত। এখানে আমরা দেখিতেছি যে, ১০০ হাজার একার জমি রংপুরে তামাক উৎপন্ন করিবার জন্য

রাখিয়াছে। ইহা ...

হয় নাই। কোন ... জিলায় ...

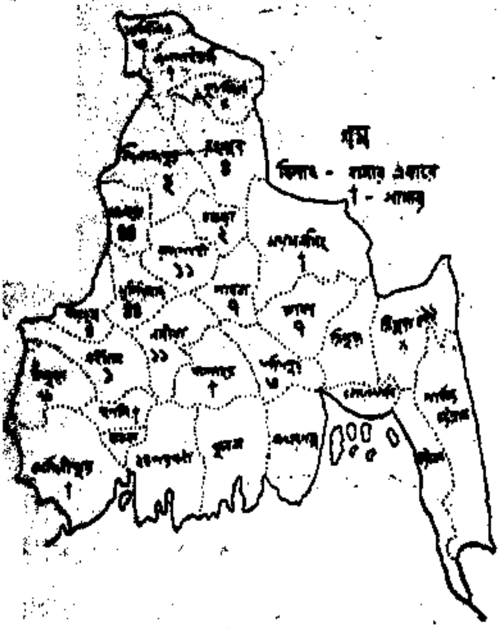


নাই, অর্থাৎ তথায় তামাক উৎপন্নই হয় না। কোন জিলায় '+' চিহ্ন দেওয়া আছে—সেখানে খুবই সামান্য তামাক হয়।



পাট ঃ পাটের জন্য মুর্শিদাবাদ ও পাবনা জিলা প্রায় সমান জমি ব্যবহার করে,—৩৫ হাজার একার পরিমাণ

বাঙলার অনেক জিলায় পান আদৌ হয় না, কোন কোন স্থানে হয়ত জন্য ধার্য্য জমির পরিমাণ নাম মাত্র। ('†' চিহ্ন দ্বারা নাম-মাত্র বুঝিতে হইবে।)



তুলা, সিন্‌কোনা ও মশলার জন্য ব্যবহৃত জমির পরিমাণ বুঝাইবার জন্য ছবি ব্যবহার করা হইল না। তাহার কারণ, তুলা বাঙলায় অতি সামান্যই জন্মে, একেবারে জন্মে না বলিলে ভুল হয় না। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে কিছু পরিমাণ তুলা উৎপাদিত হয়, সেখানে ৫২ হাজার একার জমি তুলার জন্য ধার্য্য আছে। তাহা ছাড়া ময়মনসিং, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জিলাত্রয়ে খুবই সামান্য পরিমাণ জমিতে তুলা উৎপাদিত হয়। ময়মনসিং জিলায় ৪ হাজার, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ায় এক হাজার একার করিয়া জমিতে তুলা উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া বাঙলায় ২৮টি জিলার মধ্যে অন্য কোথাও তুলা হয় না।

সিন্‌কোনা হয় কেবলমাত্র দার্জ্জিলিঙে, মাত্র ৩ হাজার একার জমিতে। আর কোথাও সামান্য পরিমাণেও সিন্‌কোনা হয় না।

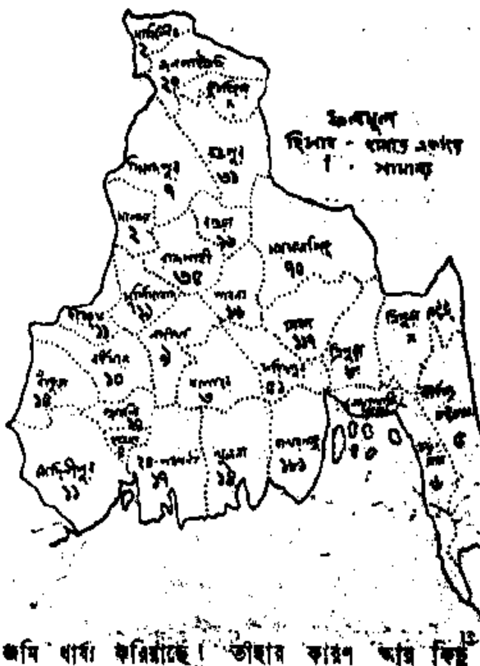
নানাবিধ মশলা উৎপন্ন হয় বাঙলায় প্রায় সর্ব্বত্রই। তন্মধ্যে সব চেয়ে বেশী হয় ফরিদপুর জিলায়; এখানে [illegible] হাজার একার জমিতে মশলা হয়। বর্দ্ধমান, বীরভূম [illegible] আদৌ হয় না। মশলার জন্য কোন ছবি [illegible]।

ফলমূল :

কৃষিপ্রধান বাঙ্গালার উৎপন্ন দ্রব্যাবলীর মধ্যে ফল-মূলাদির স্থান বিশিষ্ট। ইহা উৎপাদন করিবার জন্য কত পরিমাণ জমি কোন্ জিলায় ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা বুঝাইবার জন্য একটি ছবি দেওয়া হইল। নিম্নের ছবিতে দেওয়া সংখ্যাকে হাজার ধরিতে হইবে। বাখরগঞ্জে সকলের বেশী ফলমূল জন্মে, জমি ব্যবহৃত হয় ১৮১ হাজার একার; তারপর ঢাকা ১১৭, নোয়াখালী ৮৬, ইত্যাদি।

উপরের ছবিগুলি হইতে দেখা যাইতেছে যে, ধান, তৈলবীজ, আখ, এই তিনটি পদার্থ বাঙ্গালার প্রত্যেকটি জিলাতেই অল্পবিস্তর জন্মে। পাট জন্মে বীরভূম, বাঁকুড়া, চট্টগ্রাম, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত বাঙলার বাকি প্রত্যেকটি জিলাতেই। তামাক বীরভূম আর নোয়াখালী ছাড়া আর প্রায় সর্ব্বত্রই জন্মে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য শস্য বাঙ্গালার বহু জিলায় জন্মে, কিন্তু অনেক জিলায় আদৌ জন্মিতে দেখা যায় না।

আর একটি জিনিষ লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, কৃষিজাত দ্রব্যাদির জন্য ময়মনসিংহ জিলা সব বিষয়েই বেশী পরিমাণ



জমি ধার্য্য করিয়াছে। তাহার কারণ আর কিছু নয়, বাঙ্গালার জিলাসমূহের আয়তনের ছবি হইতে দেখা যাইতেছে

যে, ময়মনসিং জিলার আয়তন সর্ব্বোচ্চ—প্রায় ৪০ লক্ষ একার। আয়তনে বেশি হওয়ার দরুণ ময়মনসিংহ বিভিন্ন ফসলের জন্য অধিক পরিমাণ জমি দিতে পারিয়াছে।

এখানে বলিয়া রাখা দরকার যে, মুদ্রিত বিভিন্ন চিত্রে যে-সকল সংখ্যা ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহারা নিখুঁৎ-সংখ্যা নয়। ভগ্ন-সংখ্যাকে নিকটতম পূর্ণ-সংখ্যায় (nearest whole number) আনিয়া যে অঙ্ক পাওয়া গিয়াছে, উক্ত চিত্রাবলীতে তাহাই ব্যবহার করা হইয়াছে। পূর্ণ-সংখ্যায় আনিলে হিসাব বুঝিতে সহজ হইবে বলিয়াই তাহা করিতে হইয়াছে।

পুনরায় বলিতেছি যে, চিত্রে যে-সকল জিলায় কোন সংখ্যা দেওয়া নাই, সেখানে উক্ত ফসল আদৌ হয় না বুঝিয়া লইতে হইবে। এবং যেখানে ফসল হয়, কিন্তু জমির পরিমাণ পূর্ণ-সংখ্যায় আনিতে বিশেষ অসুবিধা, সেখানে '↑' চিহ্ন দিয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণে ফসল জন্মে, ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছি।

প্রত্যেকটি চিত্রে, পাঠকবর্গ লক্ষ্য করিবেন, কুচবিহার ও ত্রিপুরা ষ্টেট্-এ '×' চিহ্ন দেওয়া আছে। উহার অর্থ ইহা নয় যে, উক্ত স্থানদ্বয়ে কোন ফসলই জন্মে না। উক্ত চিহ্ন দিয়া বাঙ্গালার হিসাব হইতে তাহাদের বাদ রাখা হইয়াছে, তাহার কারণ তাহারা স্বাধীন করদ-রাজ্য, তাহাদের হিসাব বৃটিশ বাঙ্গালার মধ্যে আসিতে পারে না এবং সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত হিসাবের মধ্যে তাহাদের কোন স্থান দেখা যায় নাই।

আর একটি কথা, উৎপন্ন ফসলাদিকে (ক), (খ) ও (গ) এই তিন ভাগে ভাগ করিয়া হিসাব দেওয়া হইয়াছে। তাহার কারণ, প্রত্যেকটি দ্রব্যকে একই হিসাবে আনিয়া সংখ্যা দিয়া নির্দ্দেশ দেওয়া দুরূহ। অতএব লক্ষ, দশ হাজার এবং হাজার, এই তিন ভাগে ভাগ করিয়া হিসাব করা হইয়াছে। ইহাতে পূর্ণ-সংখ্যা দিয়া বুঝাইতে ও বুঝিতে সুবিধা।

রুদ্র-ভগবান

—শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

ওগো　রুদ্রদয়াল, ওদের যে গো ডাকনু বারে বারে,
এই　রাতের শেষে হাজার ডাকে আঘাত দিনু দ্বারে।
ওগো　শুধাই তোমায় ওদের কেন ভাঙলো নাকো ঘুম,
হোথা　ওই যে দূরে প্রলয় আসে ঐ উঠেছে ধুম।
আজ　শিয়রে ওই মৃত্যু যে তার জাগলো না যে তবু।
বুঝি　মোদের ডাকে ওদের মোহ ভাঙবে না কো কভু।
তুমি　প্রেরণ কর তোমার ওগো ভৈরব আহ্বান,
তুমি　রুদ্র হয়ে ওদের ডাক রুদ্র-ভগবান।

আজ　সংস্কারেরি ধর্ম্মে ওদের মর্ম্ম হল ভারি,
চলে　কথার পূজা, দেবতা কোথায় নেই ঠিকানা তারি।
ওগো　ওদের যে আজ রোগ ধরেছে যৌবনেতে জরা,
এই　বসুন্ধরার বাতাস হল ওদের পাপে ভরা।
আজ　যাত্রাপথে ওদের নানান বিধি-নিষেধ-মানা,
ওরা　জাগ্রত কি ঘুমিয়ে আছে নেইকো ওদের জানা।
তবু　তারির মাঝে বাঁচিয়ে ওরা রাখতে চাহে প্রাণ,
তুমি　রুদ্র হয়ে ওদের ডাক রুদ্র-ভগবান।

ওগো　হাজার যুগের আচার ওদের মনটি ঘিরে ঘিরে,
ওই　ঢাকলো আজি জীবন-শিবের পরম সত্যটিরে।
তাই　সত্য যে আজ হাঁপিয়ে ওঠে শিবের চুলে আঁখি,
ওগো　সুন্দরেরি অঙ্গ ওরা ধুলায় দিল মাখি'।
ওই　ক্রন্দন ওঠে মন্দিরেরি আকাশ ঘেরি ঘেরি,
ওগো　ধ্বংস হতে আর বুঝি বা নেইকো ওদের দেরী।
আজ　নিত্য যে গো করছে ওরা নিজের অপমান,
তুমি　রুদ্র হয়ে ওদের জাগাও রুদ্র-ভগবান।

ওগো　আর বুঝি বা রয়না ওরা জাতির অভিশাপে,
আজ　আত্মা ওদের পঙ্গু অচল, চলতে ওরা কাঁপে।
ওরা　একঘরে' গো, বলছে তবু—আমরা সবার বড়,
ওগো　এর চেয়ে যে লজ্জা নাহি, ওদের দয়া কর।
বুঝি　মোদের ডাকে ওদের কভু আর হবে না জাগা,
ওরা　আত্মভোলা মরণমুখী বড়ই হতভাগা।
তুমি　ওদের লাগি প্রেরণ কর ভৈরব আহ্বান,
তুমি　রুদ্র হয়ে ওদের ডাক রুদ্র-ভগবান।

গণ-আন্দোলন

—শ্রীরাঘবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

Mass egition—গণ-আন্দোলন শিক্ষা—টেবিলে চাপড় ঘুঁসি মেরে বীরু চেঁচিয়ে উঠল—এই-ই চাই। দেখতে দেখতে দেশের উন্নতি হয়ে যাবে। বিশ্বাস হচ্ছে না? চারিদিকে তাকিয়ে দেখ, মার্কিন—জাপান—'আর ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়'।

সামনের টেবিলে মাথায় ব্যাণ্ডেজ, ডান হাত কাঠ দিয়ে বেঁধে গলায় সঙ্গে ঝোলান এক ভদ্রলোক বসে ছিলেন। বীরু যখন দম নিচ্ছে, তখন হঠাৎ বললেন, শুধু ও-তে হবে না মশায়। গণ-শক্তি ও শিক্ষার সমন্বয় চাই—কল্কি-অবতার।

গিরীন-দা' ভদ্রলোককে দেখে একটা সহানুভূতিসূচক আওয়াজ করে জিজ্ঞেস করলেন, খুব চোট লেগেছে দেখছি। accident হয়েছিল বুঝি? আর যা' হয়েছে মশাই আজকালকার বাস-ড্রাইভারগুলো! এই তো সেদিন—

ভদ্রলোক বললেন, না, accident হয় নি। আমায় চেনেন না বোধ হয়। আমি নিখিল-বঙ্গ গণ-শক্তি ও শিক্ষা-বিস্তার সমিতির সভাপতি। গ্রামেই থাকি। আজ সকালে কলকাতায় এসে পৌঁছেছি।

ছোট গদা চাপা গলায় বলল, সোস্তালিষ্ট। বিশ্বাস নেই গিরীন-দা'—পুলিশে ধরবে।

কথাটা ভদ্রলোকের কাণে গিয়েছিল। একটু হেসে ছোট গদার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি ও সব কিছুই নই মশায়। আমি দরিদ্র লোক-শিক্ষক। আমি চাই লোক-সমাজের কল্যাণ। আমার উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে কেউ যদি ঠাট্টা করে—এমন কি ধরে মারেও—তা হলে এই প্রমাণ হয় যে, আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে শিক্ষা-প্রচারের কত বেশী দরকার।

বীরু অসম্ভব উৎসাহ দেখিয়ে বলল, একেবারে ঠিক। এই তো আমিই একটু আগে বলছিলাম—

বাধা দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, শুনুন। প্রথম আমি গ্রামে গ্রামে ঘুরে স্কুল-মাষ্টারদের বোঝাতে আরম্ভ করলাম যে, তাঁদের শিক্ষা ও শেখান দুই-ই ভুল—ভয়ানক ভাবে ভুল।

ছোট গদা টিপ্পনী কেটে বলল, সে-কি মশায়, আমরা তো জানতাম মাষ্টাররা ঠিকই শেখান।

—ভুল জানতেন। মাষ্টাররা সব সময়েই বেঠিক শেখান। লোক-শিক্ষা প্রচার করতে গেলে এই সত্য আগে পড়ে।

গিরীন-দা' বললেন, তা' হতে পারে। স্কুলে পড়লে কি আর বিদ্যে হয়। এই তো কত বি-এ, এম্-এ—

ভদ্রলোক গম্ভীর ভাবে বললেন, দেখুন, এই বিদ্যে কথাটা আমি পছন্দ করি নে। এই ধরণের কতকগুলো কথা দিয়েই আমরা এখনও চাণক্য পণ্ডিতের যুগের সঙ্গে গাঁটছড়া-বাঁধা রয়েছি। আমি স্কুল-মাষ্টারদের সকলকে বোঝাচ্ছিলাম আজও বলছি—বর্ণ পরিচয় বা হাতের লেখা শেখা, এ সব [illegible] যুগে মানাত। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মহাযুদ্ধের পর এ [illegible] রীতিমত অচল। ছাত্ররা লেখাপড়া শিখে কি করবে? বই পড়বে—rubbish বই—কিংবা গল্প-কবিতা লিখবে—বাস্। মনে করুন এ না করে যদি কোন রকম হাতের কাজ বা শিল্পকলা শেখে, তাহলে বুদ্ধিবৃত্তি চমৎকার ভাবে পরিস্ফুট হ'তে পারে। চোখের সঙ্গে হাতের ও মনের সংযোগের ফলে অভূতপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রত্যেক ছেলের মুখে জ্বল্‌জ্বল্ করবে। কিন্তু হেডমাষ্টার কি বলল জানেন? আর বলবেই বা না কেন? সবাই ওরা জীবনে second hand শিখে এসেছে। ছেলেমানুষের মত উত্তর দিল—কলম দিয়ে লেখাই তো মস্ত হাতের কাজ। যখন বললাম, চালাকী রাখুন। Logical কিছু বলবার থাকলে বলুন। তখন দারোয়ান দিয়ে আমায় বের করে দিল। আমিও বলে এলাম—পশুবলে মানুষকে আটকে রাখা যায়, কিন্তু সত্যকে আটকান যায় না।

বীরু উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, আহা-হা! কি সুন্দর কথাটি!

বিরক্ত হয়ে গিরীন-দা' বললেন, হয়েছে—এখন থামো। তার পর কি হ'ল?

চীৎকার করে চারে দুধ কম হয়েছে জানিয়ে দিয়ে ভদ্র-লোক আরম্ভ করলেন, আমি বুঝলাম, সকলের সহানুভূতি না পেলে এত বড় কাজ একা করা সম্ভব হবে না। কিন্তু গ্রামের জন-সাধারণ একেবারে অতি সাধারণ। ভেবে দেখলাম মন্ত্রে এরা বিশ্বাস করে— কিন্তু জানে না, মন্ত্র আর কিছুই নয়—কেবল suggestion। চাষারা যদি দেখে যে, আমি suggestionএ-রোগ সারাতে পারি, তা হলে দলে দলে আমার কাছে আসবে—আমি যা বলব তা করবে। ফ্যাসাদ হল এই যে, কোন রোগী পাওয়া যায় না। অনেক চেষ্টা করে বিরিঞ্চি বলে একজনকে রাজী করান গেল। লোকটা বাতে প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়েছিল। শুধু suggestion দিয়ে লোকটাকে সারাতে পারলেই লোকশিক্ষার জন্ত আর সাহায্যের অভাব হবে না।

ছোট গদা বলল, সারে নি নিশ্চয়। বাত মশায় সারা বড় শক্ত। আমার বাবার—

অধৈর্য্য হয়ে ভদ্রলোক বললেন, শুনুন। বাতের চেয়ে এ ঢের বড় জিনিষ। আমি বন্দোবস্ত করলাম যে, বিরিঞ্চিকে একটা ঠেলা গাড়ীতে বসিয়ে সারা গ্রামে ঘোরান হবে। বিরিঞ্চি চীৎকার করবে—'আমার বাত একেবারে সেরে গিয়েছে। সাতদিনের মধ্যেই আমি হেঁটে বেড়াব'। suggestion-এর জোরে নিশ্চয়ই দিন সাতেকের মধ্যে লোকটা সেরে উঠত···কিন্তু ভাগ্যের দোষে তিনদিনের দিন ঘোরবার সময় থানার বড় দারোগার সঙ্গে দেখা। বড় দারোগা নিজে বাতে ভুগছিলেন অনেক দিন—কিছুতেই কিছু হয় নি। তিনি তো বিরিঞ্চির ব্যপারে চটে আগুন। ঠেলা-গাড়ীশুদ্ধ বিরিঞ্চিকে থানায় নিয়ে গিয়ে খুব ধমকে দিলেন—ফের এ রকম মিথ্যে কথা চেঁচিয়ে বলে বেড়ালে তাকে জেলে দেবেন।

সুতরাং আমার এ চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। ভাবতে লাগলাম কি করা যায়। এদের মনের নাগাল পাওয়া যায় কি করে? এই যে লাখ লাখ গ্রামবাসী কেবলমাত্র শিক্ষার অভাবে ছোট বড় অত্যাচার, কষ্ট ভোগ করে—তা থেকে এদের বাঁচানই আমার ব্রত। বড় দারোগা আমাকেও এসে যাচ্ছেতাই বলে-আমার নামও লিখে নিয়ে গিয়েছিলেন। তা যাক। পৃথিবীতে যিনিই নতুন কিছু করতে এসেছেন, তাঁকেই পদে পদে বাধা পেতে হয়েছে। ভেবে দেখুন, গ্যালিলিও প্রমুখ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের কথা—মনে করুন, এক একটি ধর্ম্ম লোক-গ্রাহ্য হবার আগে প্রচারকদের কি নিদারুণ অত্যাচার ভোগ করতে হয়েছে। আমিও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চেষ্টা করছি ভেবে সমস্ত মন আনন্দে ভরে উঠল। এত বড় আইডিয়া প্রচারের ভার যার ওপর, সে কি তুচ্ছ হেডমাষ্টার আর বড় দারোগার কথা ভেবে চুপ করে থাকতে পারে!

গলাটা একটু ভিজিয়ে নিয়ে আরম্ভ করলেন,—আমি ঠিক করলাম এদের কাজের মধ্যে দিয়েই এদের মনে পৌঁছাতে হবে। সাধারণ কাজ কি করে অসাধারণ রকম সহজ ও সুষ্ঠুভাবে করা যায়, সেই শিক্ষা দেবার জন্তে আমি গ্রামে 'ছন্দ-সপ্তাহ' প্রবর্ত্তন করলাম।

ভুরু কুঁচকে গিরীন-দা' জিজ্ঞেস করলেন—ছন্দ-সপ্তাহ কি?

—কলকাতায় থাকেন অথচ ছন্দ-সপ্তাহ বোঝেন না? এই যেমন শিশুমঙ্গল সপ্তাহ, খাদি সপ্তাহ, তেমনি ছন্দসপ্তাহ।

গিরীন-দা' কি বুঝলেন তিনিই জানেন। কিছু না বলে একটা বিড়ির সরু দিকটায় ফুঁ দিতে লাগলেন।

—বোধ হয় আপনারা লক্ষ্য করে দেখেছেন যে, প্রকৃতির প্রত্যেক গতিতেই ছন্দ আছে। এখানেই মানুষের তৈরী যন্ত্রের গতির সঙ্গে এর প্রভেদ। আমি গ্রামের সবাইকে বুঝিয়ে দিলাম যে, ছন্দের দিকে নজর রেখে কাজ করলে প্রত্যেক কাজ কেমন চমৎকার ভাবে করা যেতে পারে। সাধারণ কাজ, এই ধরুন যেমন জল তোলা, কাপড় কাচা, গাড়ী চালান, ধান কাটা—এ সব কাজ করবার বিভিন্ন ছন্দ আছে।

ছোট গদা বলল—কোনটা লঘু ত্রিপদী, কোনটা বা পয়ার, এই রকম।

ভদ্রলোক বললেন—আজ বিশ্বাস করছেন না, কিন্তু জেনে রাখবেন—এই theory অদূর ভবিষ্যতে কর্ম্ম-জগতে revolution এনে দেবে। ছন্দোহীন ভাবে আজ যে কাজ করতে লাগবে দশ দিন—সে কাজ ঠিক ছন্দে করলে করা যাবে আধ ঘণ্টায়। আমার এ কথায় গ্রামের চাষীদল খুব impressed হয়েছিল। তখন ধান কাটার সময়। সবাই আমাকে ধরল, ধান কাটার ছন্দটা দেখিয়ে দিতে হবে। আমি সেই বিপুল জনতার সামনে ধানক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ঠিক ছন্দে

কাজে চালাতে লাগলাম। বার দশেক চালাবার পর সবাই বলল—কাস্তে অতি চমৎকার ছন্দে চলছে বটে—কিন্তু কিছুই কাটছে না। বারো বারের বার সে ত্রুটিও রইল না; আমার বাঁ পা এমন কেটে গেল যে, ঘা শুকুতে লাগল একমাসের ওপর।

বীরু কেমন দমে গিয়েছিল। ছোট গদা ফিস্ ফিস্ করে তার কাণের কাছে গিয়ে বললে—mass agitation—গণ-আন্দোলন।

ভদ্রলোক হাঁপিয়ে পড়েছিলেন। খানিকক্ষণ উদাসভাবে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলতে লাগলেন—মনে হল আর ফিরে যাব না। কিন্তু এরা এত অসহায় যে, এদের ওপরে রাগ করাও যায় না। কু-শিক্ষায় সবার মন ভরা। বহুযুগের অন্ধ সংস্কার মনকে এমন করে আষ্টে-পিষ্টে বেঁধে রেখেছে যে, নতুন কিছু এরা কিছুতে নিতে চায় না। বুঝলাম—প্রথমেই মন তৈরী ক'রতে হবে। Complex আর repression এদের মানসিক বৃত্তি subconscious জগৎ থেকে ছেড়ে বাইরে আসতে পারে না। একবার যদি বোঝে, কি এরা চায় তা হলেই শিক্ষা পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠবে। সকলের বাড়ী বাড়ী গিয়ে বোঝালাম—অন্ততঃ পাঁচটা দিন বিকেলে এক ঘণ্টা করে মন যা চায় তাই কর।

ছোট গদা বলল—এত কাণ্ডের পরেও?

—হাঁ, তাই। লোকশিক্ষা অত সহজ নয় মশাই। এখানে বসে পল্লীর কথা খবরের কাগজে পড়ে কি আর কিছু বোঝা যায়? যা বলছিলাম—মোটে পাঁচটা দিন রোজ একঘণ্টা করে সবাই যদি মনের যা ইচ্ছে তা করে—তা' হলেই মনের স্বাস্থ্য দ্বিগুণ বেড়ে যাবে। অবশ্য বুঝিয়ে দিয়েছিলাম যে, মনে বে-আইনী কিছু যদি থাকে, সেটা না করাই ভাল।

গিরীন-দা' জিজ্ঞেস করলেন—সবাই তাই করল তো?

প্রায় কান্না চেপে ভদ্রলোক উত্তর দিলেন—সবাই করল? ঘুঁসি, চড়, লাথি—এমন কি ছেলেরা পর্যান্ত ঢিল মেরে আমাকে গ্রাম থেকে বার করে দিল। তাই বলছিলাম, কল্কি-অবতার চাই। শিক্ষা ও শক্তির সমন্বয়……

আচ্ছা আসি এখন, বলে—গুন্ গুন্ করে 'অবনত ভারত চাহে তোমারে, এস সুদর্শনধারী মুরারে' গাইতে গাইতে ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন।

গিরীন দা' বললেন—আহা বেচারী, বুদ্ধির দোষে কি কষ্টটাই না পেয়েছে!

ছোট গদা নিজের মাথায় আঙুল দিয়ে অর্থ-পূর্ণ ভাবে ঘাড় নাড়ল।

অর্থ ও ধন-বিজ্ঞান

সংস্কৃত ভাষার শব্দগত অর্থানুসারে—যাহার সহায়তায় মানুষের "আমির আমি"কে উপলব্ধি করিবার, এবং যে যে বস্তুর দ্বারা মানুষের পরমায়ু (longevity) অটুট থাকিতে পারে, তাহা উৎপন্ন করিবার এবং যে যে ব্যবস্থায় মানুষ নীরোগ থাকিতে পারে, সেই সমস্ত ব্যবস্থা কি করিয়া করিতে পারা যায়, তাহার জ্ঞান লাভ করিবার উপায় জানা যায়, তাহার নাম "অর্থ-শাস্ত্র"। ভারতীয় ঋষিদিগের ভাষার শব্দগত অর্থানুসারে—যাহাতে মানুষের অঙ্গ-সৌষ্ঠব সাধিত হয় এবং মানুষ কর্ম্মময় জীবনের মধ্যে কর্ম্ম-বিরতি অথবা বিশ্রাম-সুখ লাভ করিতে পারে, তাহার নাম "ধন"। ঐ ভাষার ব্যুৎপত্তিগত অর্থানুসারে যাহা জমী হইতে উৎপন্ন হয়, তাহারও নাম "ধন"।

ঋষিদিগের কথানুসারে মানুষের অর্থ লাভ করিবার মুখ্য উপায় তিনটি:—

(১) জমীর উর্ব্বরতা রক্ষা এবং উন্নতি বিধান করিবার ব্যবস্থা;

(২) বায়ুমণ্ডলের ও জলমণ্ডলের বিশুদ্ধিরক্ষা এবং উন্নতি বিধান করিবার ব্যবস্থা;

(৩) মানুষ যাহাতে প্রকৃত জ্ঞান ও বিজ্ঞান লাভ করিতে পারে এবং সম্পূর্ণ ও অব্যাহতভাবে তৎসম্বন্ধে উন্নতি-কামী হয়, তাহার ব্যবস্থা।

ঋষিগণের "অর্থ-শাস্ত্রে" যে ঐ তিনটী ব্যবস্থার অনুসন্ধান আছে, তাহা ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা এবং ঋষিগণের গ্রন্থাদি পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়।……

দ্বিতীয় সংসার

—শ্রী বসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী

নবীনচন্দ্র সদ্য বিপত্নীক হইয়াছে, মানসিক অবস্থা ভাল নহে। মায়ের অনেক বলা-কওয়ায় আজিকার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছে। বিয়ে-বাড়ী; অনেক লোক একত্র হইয়াছে, বাড়ীর ছাদে প্যাণ্ডেলের নীচে বরযাত্রী ও কন্যাপক্ষীয় লোকেরা একসঙ্গে আহারে বসিয়াছে, অনেকগুলি যুবক কোমর বাঁধিয়া ক্ষিপ্রতার সহিত অভ্যাগতদের লুচি-তরকারী পরিবেশন করিতে এ দিক ও দিক ফিরিতেছে। কন্যাকর্ত্তা হুকায় টান দিতে দিতে ছাদ হইতে নীচে নামিয়া একখানি খালি চেয়ারে বসিয়া শ্রান্ত পদযুগলকে খানিক বিশ্রাম দিতেছেন, এমন সময়ে নবীনচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল।

"আরে নবীন যে, এস এস", বলিয়া কন্যাকর্ত্তা নবীনকে সাদর-অভ্যর্থনা জানাইলেন। নবীন একখানা খালি চেয়ারে বসিবার উপক্রম করিল।

কর্ত্তা বলিলেন, "আর এখানে বসবার দরকার কি? চল একেবারে ছাদে গিয়া বসবে, লোকজন সবে এইমাত্র বসেছে, তোমায় এক পাশে একটু জায়গা করে দেব, কেন মিছে রাত্র করবে।"

নবীন কন্যাকর্ত্তার সহিত ছাতে উঠিয়া আসিয়া দেখিল, একখানি পাতাও খালি নাই। একটা কোণে একজনের স্থান হইতে পারে বুঝিয়া কন্যাকর্ত্তা একখানা আসন, একটা কলাপাতা ও একটা মাটির গেলাস রাখিয়া নবীনকে বসাইয়া দিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আলো কম হবে কি?"

নবীন হাসিয়া বলিল, "হলেও ক্ষতি নাই, হাত মুখ চেনে, চলে যাবে, আপনি নীচে বসুন গে।"

কন্যাকর্ত্তা চলিয়া গেলেন, নবীন লুচি-তরকারী পাইয়া বসিল। নবীনের ডান পাশে যে ভদ্রলোকটি আহার করিতেছিলেন, তিনি আহার ছাড়িয়া একবার নবীনের আপাদমস্তক দেখিয়া পুনরায় আহারে মনোযোগ দিলেন।

নবীন লোকটির আহারে তৎপরতা দেখিয়া বুঝিয়াছিল, খাইয়ে লোক। পরিবেষ্টারাও জোগান, এই লোকটিকে প্রচুর লুচি-তরকারী চাহিয়া দিতেছে, তিনি অম্লান বদনে খাইতেছেন, না বলিতেছেন না। নবীন যতক্ষণে চারিখানি মাত্র লুচি শেষ করিল, পাশের লোকটি দুই দফা লুচি ও মাছের তরকারী চাহিয়া বসিলেন। নবীন ভাবিতেছিল—যখন খাইতে পারেন খান না, তাড়াতাড়ি করেন কেন? লোকটি মাথা নীচু করিয়া বোধ হয় প্রয়োজনেরও অধিক খাইয়া বসিল।

মিষ্টান্ন আসিয়া পড়িল, এক রকম, দু রকম মিষ্টান্ন পাতে পড়িতেছে, চাহিয়া লন না, দিলেও আপত্তি নাই। নবীন ভাবিতেছে—বোধ হয় মিষ্টান্নে তত রুচি নাই, অথবা ডাক্তারের নিষেধ আছে, বহুমূত্রের রোগী। তিন রকম মিষ্টান্নের বেলায় আপনা আপনি বলিলেন, "ইস, করেছে কি, এ রকম ত আর নয়।" অথচ খাইয়া যাইতেছেন, বাকি পড়িতেছে না, যখন ক্ষীরের নাড়ু পাতে আসিয়া পড়িল, তখন আর থাকিতে পারিলেন না, নবীনকে বলিলেন, "রকম ত দেখছি অনেক করেছে, এইসব ভাল ভাল জিনিষ করা, পেটে চালাই কি করে?"

নবীন হাসিতে হাসিতে বলিল, "তাহলেই চলবে, এর মধ্যে পেট ভরলে ছাড়বেন কেন, খেয়ে যান।"

লোকটি বলিল, "কতক বাবিল লুচি খেয়ে ফেলেছি, এ যে একটির পর একটি বেরুতে রইল, দেখে মাথা ঘুরে যাচ্ছে, খেতেও ত হয়, কিছুই কি করে?"

নবীনের কৌতুক জাগিল, বলিল, "কখানা লুচি খেয়েছেন বলুন ত?"

লোকটি বলিল, "গুণি নি, তবে বিশ পঁচিশ খানি হতে পারে, পেট ভরে খেয়ে আর চেয়ে নিই নি। বাড়ী থেকে সংকল্প করে বেরিয়ে ছিলাম, আজ আর ঠকব না। এখন দেখছি ঠকা যে ভাল ছিল, এখন যে আপশোষে এসে দাঁড়াল, গিলি কেমন করে?"

নবীন হাসিতেছিল। ক্ষীরের নাড়ু ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া মুখে পুরিয়া চিবাইতে চিবাইতে বলিল, "আর একদিনের কথা এখনও ত বলেন নি, তাই বুঝে উঠতে পারছি না, বলেন কোথায়?"

লোকটি বলিল, "ও পাড়ায় নব গোঁসাইকে চেনেন?"

তা ওখানে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে ভেবেছিলাম গোঁসাই-বাড়ী মাল্‌পো-মিষ্টির এলাহি ব্যাপার হবে, লুচিটা কম খেয়ে যাই, মিষ্টিটা বেশী চালাব, বেশী নয় মোটে দু'খানা লুচি খেয়ে, মিষ্টির আশায় পিছি পেতে খেয়ে বসে রইলাম। ও মশায়, একটা সন্দেশ আর এক রসগোল্লা দিয়েই পান বার করে ফেল্লে; হাঁকা-হাঁকি করেও আর মিষ্টি বেরুল না, সমস্ত রাত খিদেয় মরি!”

নবীন স্বভাবতঃই কৌতুকপ্রিয়। লোকটি নিতান্ত অল্প বয়সের নয়—চল্লিশেরও ওপর, কিন্তু কথাবার্ত্তা বালকের মত। নবীন আলাপটা পাকাইবার জন্য বলিল, “শুধু ঠকা নয়, শিক্ষা হয়েছে বলুন, কিন্তু সব বাড়ী যে নন্দ গোঁসাইয়ের নয়, ওইখানেই বেশীর ভুল করেছেন।”

আহার চলিতেছিল। দু রকম সন্দেশ এক সঙ্গে আসিয়া পড়িল। নবীন দেখিল, লোকটি যেন নিরুপায়, পরিবেষ্টকরা সামনে আসিয়া দাঁড়ায়, দুটা পাতে ফেলিয়া আরও দুটা দিতে চায়, লোকটি ফ্যাল ফ্যাল চাহিয়া থাকে, হাত নাড়িয়া অসম্মতি জানায়। নবীন পাশে থাকিয়া মজা দেখে আর হাসে, তাহার পর রাবড়ী আসিতেছে দেখিয়া নবীন হাসিতে হাসিতে বলিল, “ওই দেখুন রাবড়ী বেরিয়েছে।”

লোকটি চটিয়া গেল; বলিল, “আপনি হাসছেন, আমার যে কান্না আসছে, রাবড়ী ফিরোই কি বলে? আজ আমায় এও করতে হবে?”

নবীন অনেকদিন ভাল করিয়া হাসে নাই, কিন্তু এই কথায় হাসি ঠেকাইতে পারিল না। লোকটি মহা রাগিয়া উঠিল, বলিল, “আপনিও একজন কম যান না, আমার আলাপ করাই দোষ হয়েছে।”

নবীন সঙ্কোচে ম্লান হইয়া গেল, আর হাসিল না, বলিল, “মাপ করবেন, আমি এমনি হেসেছিলাম, আপনাকে লক্ষ্য [illegible] ছিল না।”

লোকটি নরম হইয়া গেল, কিছু পরে আবার কথা সুরু করিল। জিজ্ঞাসায় জানিল, লোকটির নাম ভোলানাথ, [illegible] কাজ করে। [illegible] থাকে। [illegible] ভোলানাথ ত্যাগ করিতে পারিল না, নবীনের অনুরোধে [illegible] করিয়া দুটী [illegible]। [illegible] ভোলানাথ [illegible] খাইতে পারিল না,

ক্ষোভে হায় হায় করিয়া উঠিল। আহার সমাপ্ত হইলে এক সঙ্গে সকল লোক উঠিয়া পড়িল। নীচের তলায় হাত-মুখ প্রক্ষালনের জল বাহির-বাটিতে ব্যবস্থা ছিল, নবীন ও ভোলানাথ ভিড়ের ভিতর দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, লোক পাতলা হইলে আচমন সারিবে। কতকগুলি নূতন নিমন্ত্রিত লোক চেয়ারগুলি অধিকার করিয়া বসিয়া আছে, ভোলানাথের দৃষ্টি সেই লোকগুলির উপর পড়িতে দেখিতে পাইল, দুটি পরিচিত যুবক দূর হইতে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে। ভোলানাথ নবীনকে বলিল, “ওই দেখুন দু ব্যাটা এসে হাজির হয়েছে, এখনি একটা হাঙ্গামা বাধাবে।”

নবীন লোক দুটিকে দেখিল, কিন্তু বুঝিল না, কিসে হাঙ্গামা বাধিতে পারে।

ভোলানাথ বলিল, “চলুন রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি, আমায় ছেড়ে যাবেন না।”

ভোলানাথ ও নবীন হাত-মুখ ধুইয়া অতি সত্বর রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। কিছু দূর আসিয়া ভোলানাথ পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল, লোক দুটা পাছু লইয়াছে। ভোলানাথ বলিল—“আপনি দাঁড়ান, ও দুব্যাটা চলে যাক।” ভোলানাথ পথের এক ধারে বসিয়া পড়িল, লোক দুটা [illegible] সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল এবং একটু পরেই [illegible] পাহারাওয়ালা ডাকিয়া আনিয়া, ভোলানাথকে দেখাইয়া বলিল, “ওই দেখ রাস্তার উপর কি করছে, একে ধর।” পাহারাওয়ালা আসিয়া ভোলানাথকে ধরিল। পাহারাওয়ালা দেখিয়া ভোলানাথ ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল, অনুনয়-বিনয়ের সহিত বলিল, “ভুক্তা হায়, ছেড়ে দাও ঠাকুরজী।”

পাহারাওয়ালা বলিল, “প'এসাব কিয়া?” ভোলানাথ বলিল, “নেই কিয়া, তুমি দেখ না, ওই দুব্যাটা [illegible] হায় দেখে খালি বসেছিলাম, ভুক্তা হায়, ছেড়ে দাও বাবা, বাড়ী যাগা।”

নবীন পাহারাওয়ালাকে বুঝাইল, কোন অপরাধ হয় নাই, যারা তোমায় ডেকে এনেছে, ওদের নষ্টামি। পাহারাওয়ালা ব্যাপার বুঝিয়া ভোলানাথকে ছাড়িয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

ভোলানাথ নবীনকে বলিল, “দেখলেন ত?”

ইতিমধ্যে লোক দুটিও অদৃশ্য হইয়া গেল।

নবীন জিজ্ঞাসা করিল, “ওরা [illegible]?

ভোলানাথ বলিল, "এইত রোগ; বুঝতে পারবেন না, ধ্যাপাবার চেষ্টা করে। ওদের সঙ্গে মিশি না, তাই রাগ করে, খেতে বসে বড় ভয় হয়েছিল, একটা যদি কেলো বেরুত দেখতেন, আমাকে নিয়ে একটা কাণ্ড করত।"

নবীন। ওদের লাভ?

ভোলা। ওই ত! বুঝতে পারলেন না, পাগল ভাবে।

নবীন। সত্য ত পাগল নন, অমন করে একটা ভাল মানুষকে কষ্ট দেয় কেন?

ভোলা। আর কেন? লোকের পেছু লাগাই ওদের রোগ। কর্পাই, আপিসে টেঁকতে দেয় না, যাতাকাপ কষ্ট-নষ্ট করে; ট্রামে ওঠ, দেখবে দু তিন ব্যাটা মজুত আছে, ওদের জ্বালায় ট্রামে উঠি না, হেঁটে যাই আমি, তাও রাস্তার মাঝখান দিয়ে,—দুবার মোটরের ধাক্কা খেয়েছি, তাকেও কি নিস্তার আছে, দৈবাৎ যদি দেখা পায়, সঙ্গ নেয়।

নবীন মনে মনে হাসিতেছিল, মুখে বলিল, "মুস্কিল ত।"

ভোলা। ছেলেবেলা থেকে, এক রকম বোকা গোছের ছিলাম বলে, বিদ্যা সাধ্যি হয় নি, বুঝতেই পারছেন। তা না হলে পঁচিশ টাকায় কাজ করি? আপিসের বড়বাবু আমার বউ-এর কি রকম আপনার লোক বলে চাকরী করছি। বউ গিয়ে বড় বাবুকে ধরেছিল তাই চাকরী হয়েছে। বউ মাঝে মাঝে বড়বাবুদের বাড়ীতে যায়, ফিরতে রাত হলে যদি বলি, কেন দেরী হল? বউ বলে খুব করব যাব, দেখবে মজা, এখনি তোমার চাকরী খেয়ে দিতে পারি।"

নবীন বুঝিল—একটি রত্ন, সকলে মূল্য বুঝবে না, কিন্তু কদর বুঝতে পারলে সমঝদার কখনও অনাদর করে না, আমিও করব না।

কথায় কথায় নবীন আপন গৃহ-দ্বারে আসিয়া পৌঁছিল, পথে দাঁড়াইয়া বলিল, "ভোলানাথ বাবু, বড় আনন্দ হল আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে, এই আমাদের বাড়ী।"

কথায় বার্তায় ভোলানাথ নবীনের উপর সন্তুষ্ট হইয়াছিল, বলিল, "আসব আপনার এখানে, আসছে রবিবার দুপুর বেলায় আসব, রাগ ক'রবেন না ত?"

নবীন বলিল, "রাগ, আপনি আসবেন, বসবেন, কথাবার্তা হবে। অনেক কথা জানতে বাকি রইল।"

ভোলানাথ মনের আনন্দে চলিয়া গেল, কিন্তু ফিরিয়া নবীনকে জিজ্ঞাসা করিল, "আসল কথাই ভুলে গেছি, আপনার নামটা?"

নবীন। নবীনচন্দ্র ঘোষ।

ভোলা। গয়লা?

নবীন হাসিয়া বলিল, "না, আমরা কায়স্থ, দাস ঘোষ।"

এইবার ভোলানাথ সত্য সত্য চলিয়া গেল।

নবীন উপরে আসিয়া দেখিল, পুত্র ঘুমাইতেছে, মা বসিয়া আছেন, বৌদিদি মার কাছে বসিয়া আছেন।

নবীনকে দেখিয়া মা বলিলেন, "গেলি আর এলি, খাস নি বুঝি?"

নবীন। খেয়েছি, নবীন ঘুমল?

মা বলিলেন, "হাঁ, এই ঘুমুচ্ছে। যাব না বলছিলি, আমার কথা রেখে গেলি, তবুও পাঁচ জনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হল, চাই বই কি বাবা বেরুনো চাই, তবে ত মনটা ঠাণ্ডা হবে।"

নবীনের বড় ভাইএর স্ত্রী হাসিতে হাসিতে বলিল, "ঠাকুরপোর হাসিমুখ অনেক দিন দেখিনি, আজ ঘরে ঢুকতে মুখখানা হাসি হাসি দেখাচ্ছিল।"

নবীন হাসিয়া বলিল, "বৌদি খেতে বসে এক আশ্চর্য্য বন্ধু লাভ হয়েছে, তিনি মনে মনে ঠিক করে এসেছিলেন, মিষ্টান্ন কম হবে, লুচি-তরকারীতে পেট ভরান চাই। অনেকগুলি লুচি খাবার পর যখন দেখলেন, রকম বেরকম মিষ্টি আসতে সুরু হচ্ছে, তাই না দেখে প্রায় কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললেন, করলুম কি? লুচি খেয়ে পেট ভরিয়ে রাখলুম, তখন সব মিষ্টি কি না ভরা পেটে দেখতে হল।"

বৌদি বলিল, "খ্যাপা না কি?"

নবীন। মাথার ছিট আছে, আসলে রয়েছে মানুষ ভাল, পরে অনেক পরিচয় পাবে।

মাও হাসিতে লাগিলেন। পুত্রবধূর মৃত্যুর পর দুই মাস কাটিয়াছে, নবীনের মুখে হাসি ছিল না, বর্ষাকালের আকাশের মত সর্ব্বদাই মেঘঢাকা। নবীনের মুখটি নিরানন্দ ছিল, আজ যেন সে শোকের ভার নামাইয়া হাসিতে পারিয়াছে, দেখিয়া মা ও বৌদিদি সন্তুষ্ট। নবীন মায়ের কাছে বিছানায় বসিয়া পড়িল।

নবীন বলিল, "মা বুড়ো হয়েছেন, কোথায় আমরা তাঁর কাজ করিয়া দেব, উনি নিজের করে ঠাকুর-দেবতা আপ

করছিস; "আর আশালতা" আশীর্বাদ করবেন, তার বদলে রবিকে ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেও ওঁর বিছানা দখল করেছি, মা কিছু বলতে পারেন না, কিন্তু কষ্টও ত হয় ?"

মা বলিলেন, "কি যে বলিস, ঠিক নেই, রবিকে আমি না দেখলে দেখবে কে ? বউ ত পারে না, নিজের ছেলে-মেয়েগুলিকে এঁটে উঠতে পারে না, তার ওপর রবি। আমি ছিলুম, তাই ওকে বুকে তুলে নিইছি, এখনও বেঁচে আছে। তুমি ত' নিজের অমন ঘর ছেড়ে আমার ঘরে উঠেছ, ছেলে-নাতি জড়িয়ে-বাঁধে, আমার আবার কষ্ট কি ? তোমার সাজান ঘর খাঁ খাঁ করছে ঢুকতে পার না, বল ঘর যেন গিলতে আসে। তা হবে না, অমন ঘরণী বউ, রূপে গুণে মা আমার ঘর আলো করে ছিল, কোথা থেকে কাল রোগ এল, বাঘের মত মুখে করে তুলে নিয়ে গেল।"

নবীন বিমনা হইল, বড়বউ ইঙ্গিতে শাশুড়ীকে নিরস্ত করিল।

বড় বউ বলিল, "তোমার দাদাকে কে না কি এর-মধ্যে ধরেছে মেয়ে দেখবার জন্য, আমি বলে দিলাম, যাক না আরও একটা মাস, মেয়ে দেখতে হবে বৈকি তাড়াহুড়োর কাজ নয়। ঠাকুরপোর নিজের অসুখ, ঠাকুরপো একটু সামলে নিক সব হবে। যে গেল সে অভাগীর কপাল মন্দ, এমন স্বামী-পুত্র নিয়ে ঘর করতে পেলে না।"

নবীন। ও সব যেন না করেন, দাদাকে বলে রেখ, তা হলে বাড়ী ছেড়ে পালাব।

বড় বউ। কেন বল ত ? বলি যদি কোন ছেলে এক-জামিনে ফেল্ করে, সে কি বই-টই বেচে ফেলে পড়া বন্ধ করে দেয়, না আবার মন দিয়ে ভাল করে পড়ে, পাশ দেয় ? ঝড়ে ঘরখানা ভেঙে পড়ে গেল, গাছতলায় বাস হল সে, কি চিরকাল ওই গাছতলাই সার করবে ? না, লোকজন ডেকে নতুন করে ঘর তুলবে ? করে নিজের দুঃখ ঘোচাবে। ঘরে ঘরে কুঁজোয় জল ভরা থাকে, তৃষ্ণা পেলে গেলাসে ঠাণ্ডা জল ঢেলে খেয়ে লোকে আরাম বোধ করে, দৈবাৎ কুঁজোটা ভেঙে গেল, সেই সঙ্গে জল খাওয়া ছাড়বে ? না, বাজারে গিয়ে নূতন রাঙা টুকটুকে প্রাচুর ভাল দেখে শুনে একটা কুঁজো কিনে জল পুরে ঘরে রাখবে, যেমন পূর্ব্বে করতে তেমনি সময়ে সময়ে জল গড়াবে আর ঠাণ্ডা জল খাবে।

মাও বলিলেন, "পাগলামী বুদ্ধি করো না। তুমি ত ছোটটি নও যে ধরে বেঁধে তোমার একটা ঘটিয়ে দেব। তোমার বন্ধু হরিশ কি করছে, সেও তোমার মত হয়েছিল, এখন আবার বিয়ে করে কেমন ঘর-সংসার করছে, আজ বাদে কাল ছেলে হবে।"

নবীন। আমার বড় ভায়রাভাই-এর সঙ্গে সে দিন পথে দেখা হয়েছিল, ধরে নিয়ে গেছলো তার বাড়ীতে। বড়শালীর দুই ছেলে এক মেয়ে রেখে মারা যায়, ভায়রাভাই আবার বিয়ে করলেন, এ পক্ষের সাতটি আটটি এমনি এমনি ছেলে মেয়েতে ঘর বোঝাই। এক সঙ্গে দাঁড়ালে কোনটি ছোট বা কোনটি তার উপর বোঝবার যো নাই ছেলেগুলো পেট ভরে খেতে পায় না। সকালে গেছলুম, দেখি নতুন গিন্নী সেই অত সকালে এক হাঁড়ি গরম ভাত ঢেলেছেন, তাতে একটু ঝিঙের ছিটে আর নুন মাখিয়ে সব কটাকে এক সঙ্গে বসিয়ে দিয়েছেন, আর ত বেশী নয়, কি করে বল ? কত দুঃখ করলে, বললে, ভাই এমন কাজ যেন কেউ না করে।

মা বলিলেন, "ও রকম দুটো একটা বহর-বিবাগী দেখা যায়, তা বলে সকলে কি ওই রকম হয় ? ও সব হতভাগীরা হাঘরের মেয়ে, দুঃখু দেয় যতদিন বাঁচে দুঃখু পায়।"

(ক্রমশঃ)

ড্রেসডেন ও ওয়াখিমষ্টাল

—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র [illegible]

ষ্টকহলম হইতে কোপেনহেগেন ফিরিলাম। ইচ্ছা ছিল, সুইডেন হইতে ফিনল্যাণ্ড ও ফিনল্যাণ্ড হইতে রাশিয়া ঘুরিয়া আসিব।

কোপেনহেগেনের বৃটিশ কনসালের কাছে রাশিয়ান ভীসার জন্য গেলাম, কারণ হামবুর্গের কনসাল এটি আমার রদ করিয়া দিয়াছিলেন। কোপেনহেগেনের কনসাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "হামবুর্গ ওটি রদ করিয়াছিলেন কেন?"

আমি বলিলাম, "তাহা জানি না, বোধ হয় এই কারণে যে, ভারতীয়দের রাশিয়া গমন কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছা নয়। বোধ হয় তাঁহার ভয় হইয়াছিল, আমি রাশিয়ায় গেলে এম্পায়ারের একটা ওলট পালট হইয়া যাইবে।"

কনসাল হাসিলেন, বলিলেন, "সে তো বছর দুই আগেকার কথা।"

কনসালের ভাবে সাহস পাইয়া আমি বলিলাম, "এতদূর আসিয়াছি, ফিনল্যাণ্ডেও যাইব, তারপর রাশিয়াটা বাদ থাকিয়া গেলে আমার আপশোষ থাকিয়া যাইবে।"

কনসাল বলিলেন, "All right, I'll give you"

কনসাল ষ্ট্যাম্প ও ছাপ মারিয়া পাসপোর্টে লিখিয়া দিলেন,—Valid for the Union of Soviet Socialist Republics—Not valid for Spain!

হামবুর্গ ভাবিয়াছিলেন, আমি রাশিয়ায় গিয়া এম্পায়ারকে বিপন্ন করিব, আর ইনি ভাবিলেন, আমি রাশিয়ায় গিয়া সেখান হইতে লুকাইয়া স্পেনে গিয়া স্প্যানিশ গবর্ণমেন্টের জন্য প্রাণটা দিব। কত দূরদর্শিতা! Non-interference নীতির বলে এখন কোন বৃটিশ প্রজারই স্পেনে যাইবার অধিকার নাই, তবু রাশিয়া যাইতেছি বলিয়া, সাধারণ নিষেধটাকে বেশী করিয়া দাগাইয়া দিবার প্রয়োজন কি ছিল? যাই হোক, রাশিয়া-নির্ব্বাসন হইতে মুক্তি পাইয়া আরাম অনুভব করিলাম। তবে এখানে ও শুনিলাম, রাশিয়ায় গেলে দেখিতে পাইবে না কিছুই, উহারা যেটা দেখাইতে চায়, তার বেশী কিছু দেখিবার চেষ্টা করিলে বিপদ [illegible] পারে। বিদেশীর পক্ষে খরচও খুবই বেশী। [illegible] শুনিয়া রাশিয়ান কর্ত্তৃপক্ষের কাছে—তিন কপি ফটো, [illegible] তিন প্রস্থ ফর্ম্ম ভর্ত্তি করিয়া যে ভীসার দরখাস্ত পাঠাইয়াছিলাম, তার আর উত্তর আনিতে গেলাম না। ফিন-ল্যাণ্ডও এ যাত্রা স্থগিত থাকিল।

ষ্টকহলম হইতে ট্রেনে সুইডেনের দক্ষিণ-পশ্চিমের [illegible] সহর মালমো আসিলাম, ১০ ঘণ্টার পথ। [illegible] সাগর পাড়ি দিয়া কোপেনহেগেনে পৌঁছিলাম। [illegible]-হেগেনে আবার কিছুদিন থাকিয়া বার্লিনে [illegible] হইলাম। পথে একটা জায়গায় ষ্টীমারে ছোট একটু [illegible] পার হইতে হইল। এখানে এখন ব্রিজ বাঁধা [illegible], অক্টোবর হইতে ট্রেন চলিবে। ইহা [illegible] ব্রিজ।

ডেনরা ইঞ্জিনিয়ারীতে খুব পটু। বিদেশের [illegible] বড় ইঞ্জিনিয়ারিং কনট্রাক্ট ডেনরা পাইয়া থাকে। [illegible] ষ্টীমারে পৌঁছিয়া বড় জাহাজে বাল্টিক সাগর পার [illegible] জার্ম্মানীর ওয়ার্নেম্যুণ্ডে নামক সহরে নামিলাম [illegible] সহরের উপর দিয়া বার্লিন পৌঁছিলাম। [illegible] হিন্দুস্থান-হাউসে অনেক পূর্ব্ব-পরিচিতদের সাক্ষাৎ মিলিল।

বার্লিনে দিনকয়েক থাকিয়া ড্রেসডেন [illegible]। পূর্ব্বে তিনবার এই সহরটার উপর দিয়া গিয়াছি, [illegible] দেখা হয় নাই। এবার বোধ হয় বর্ষচক্রে 'ফলং [illegible]' লেখা ছিল, মিউনিক, প্যারিস ও ড্রেসডেন [illegible] দেখিবার খেদ এই ছুটিতে মিটিল। ড্রেসডেনের [illegible] নদীর ধারটি বড় সুন্দর, রাজবাড়ী, অপেরা-[illegible], [illegible] জিন্গর, গির্জ্জা প্রভৃতি বড় বড় প্রাসাদগুলি নদীর ধারে। ড্রেসডেন জার্ম্মানির স্যাক্সনি প্রদেশের প্রধান নগর, [illegible] কালে এই সহর খুব সমৃদ্ধ ছিল। এখানকার মিউজিয়াম খুব প্রসিদ্ধ, র‍্যাফেল প্রভৃতি বিখ্যাত শিল্পীদের [illegible]

এখানকার মিউজিয়মের গৌরব। ড্রেসডেনে ঘুরিয়া বেড়াইতে দৈবাৎ পথে একটি জার্ম্মান ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হইল, ইনি সরকারী হাসপাতালের ডাক্তার, বলিলেন, এতদিন নিজের শাস্ত্র লইয়া ব্যাপৃত ছিলেন, সাধারণ কালচারের প্রতি দৃষ্টি দিতে পারেন নাই, এখন একটু সময় পাইয়াছেন, তাই ছুটিতে সাধারণ কালচারের দিকটা একটু ঝালাইয়া লইতেছেন। ডাক্তার ছুটিতে



রেডিও-অ্যাক্‌টিভ জলের উৎস।

আড্ডা না মারিয়া, মিউজিয়ম ঘুরিয়া আর্ট বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন, এ'টি আমার বড় ভাল লাগিল। এরা এ দেশে বহু চেষ্টা-যত্ন করিয়া যে বিষয়ে আগ্রহ, সে বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়ায়। পড়া আছে, দেখা আছে, তারপর সে বিষয়ে চর্চা আছে, একেই বলে সাধনা। আমাদের দেশে প্রায় দেখিয়াছি, সবাই সব বিষয়ে স্বয়ম্ভূ পণ্ডিত, 'আত্মানং পণ্ডিতং মন্যতে ইতি পণ্ডিতম্মন্যঃ'। সব বিষয়ে মত প্রকাশ ও তর্ক করা চাই, বিদ্যা ও সামর্থ্যের দৌড় কিন্তু নিজের সে বিষয়ে স্বকপোলকল্পিত আজগুবি ধারণার বেশী আগায় না। আমাদের দেশে intellectual discipline নাই, নিজের ব্যক্তিগত subjective খেয়ালকে তথ্যের ও সত্যের objectivity দিতে লোকে বিন্দুমাত্র লজ্জিত হয় না। দামী জিনিষের কদর বুঝিবার জন্য যে discipline বা সাধনার প্রয়োজন, সেটা নাই বলিয়া সস্তা জিনিষকে দামী মনে করে, standard-হীনতায় দেশের বহু বুদ্ধিশক্তি ও কর্ম্মশক্তি উপযুক্ত পরিপুষ্টির অভাবে বিপথে চালিত হইয়া অচিরে বন্ধ্যাত্ব লাভ করে।

ড্রেসডেন হইতে চেকোশ্লোভাকিয়ার পশ্চিম-সীমান্তে সাংক্‌ট্ ওয়াখিমষ্টাল (St. Joachimsthal) নামক স্থানে আসিলাম। ইহার চেক নাম য়াখিমভ্ (Jachymov)। পাহাড়ে জায়গায় দুটি পাহাড়ের মাঝখানে এই ছোট সহরটির হাজার দশেক অধিবাসী অধিকাংশই জার্ম্মান। এইখানকার মাটিতে মাদাম ক্যুরি প্রথম রেডিয়াম পান। চেকোশ্লোভাক গবর্ণমেণ্ট এখন এখানে একটি রেডিয়াম চিকিৎসালয় খুলিয়াছেন, এইখানে বাতজাতীয় ব্যথাটার চিকিৎসা করাইতে আসিলাম। পৃথিবীতে যত জায়গায় রেডিয়াম পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে এখানকার রেডিয়ামই না কি সবচেয়ে প্রখর। এ পর্য্যন্ত সারা পৃথিবীতে যতটা রেডিয়াম পাওয়া গিয়াছে, তাহার পরিমাণ মাত্র ১৭০ গ্রাম, তার মধ্যে ১০৩ গ্রাম প্রস্তুত হইয়াছে এই ওয়াখিমষ্টালের কারখানায়। এক গ্রাম রেডিয়ামের দাম প্রায় এক লক্ষ টাকা।

চিকিৎসার ধারাটা এখানে রেডিয়াম জলে স্নান, রেডিয়াম ধূম সেবন ও পীড়িত স্থানে রেডিয়াম প্রয়োগ। এখানকার গরম ফোয়ারার জলে রেডিয়ামের অংশ থাকে, সেই জল স্নানাগারে পাম্প করিয়া আনা হয়, রোগীকে এই জলে ২০ মিনিট শরীর ডুবাইয়া থাকিতে হয়। ধূম সেবন বা inhalation এইরূপ—একটি ঘরে দুয়ার জানলা বন্ধ করিয়া রোগীরা বসিয়া থাকে, ঘরের মাঝখানে একটা যন্ত্রে বিদ্যুৎ-উত্তাপিত জলন্ত-লোহিত একটা সিলিণ্ডার হইতে ধূম বাহির হয়, এই ধূমে রেডিয়াম-ক্ষারের অংশ থাকে ও সুগন্ধি করিবার জন্য গন্ধদ্রব্য যোগ করা হয়।

৪৫ মিনিট এই ধূম সেবন করিতে হয়, ঘরটা ধূমে এমন ভরিয়া যায় যে, জানালার আলোর ক্ষীণাভাস দেখা গেলেও ক্রমে ঘরের আর কিছু দেখা যায় না, শুধু মাঝখানের উত্তপ্ত সিলিণ্ডারটি ছাড়া, পরে সেটাও অদৃশ্য হয়, মাত্র যন্ত্রটার ধূমোদগার শব্দ কানে শুনা যায়। ধূম-সেবনের সময় মনে হয় একটা ভৌতিক seance-এ বসিয়াছি।

এখানে বসিয়া আমার বেদান্ত-দর্শনের কথা মনে হইত—"দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া," সত্বরজস্তম ত্রিগুণময়ী মায়াতে ব্রহ্ম জগৎপ্রপঞ্চ আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন, ত্রিগুণের মূলে যিনি আছেন, তাঁহাকে জীব দেখিতে পায় না, "প্রকৃত্যা ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মানি সর্ব্বশঃ, অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহং ইতি মন্যতে!" এখানে ব্রহ্ম হইতেছেন মাঝখানের জলন্ত সিলিণ্ডারটি; ধূমটি হইতেছে তাঁর দৈবী মায়া; ত্রিগুণ হইতেছে ধূমের তিনটি উপাদান, যথা সত্ব= রেডিয়াম, রজঃ=গন্ধদ্রব্য, তমঃ= ধূমোৎপাদক পদার্থ; জানালার আলোটি হইতেছে প্রকৃতি, আর ধূমসেবী রোগী হইতেছেন অহং!

স্নান ও ধূম-সেবন ছাড়া বেদনার জায়গায় রেডিয়াম প্রয়োগ হয় এই-ভাবে—কাঁচ, স্বর্ণ ও প্লাটিনাম-জড়িত পাত্রের মধ্যে রেডিয়াম থাকে, তাহার নীচে পুরু সোনার আবরণ থাকে, উপরে কাপড় জড়াইয়া একটা চৌকা গজার মত কিউব তৈরি করা হয়, এই কিউবটি বেদনার উপর প্লাসটার দিয়া আঁটিয়া বার ঘণ্টা রাখা হয়, কিউবের নানা আবরণ ও শরীরের চর্ম্মমাংস ভেদ করিয়া রেডিয়াম-রশ্মি তাহার কাজ করে। কিউবের মধ্যে যেটুকু রেডিয়াম থাকে, তার পরিমাণ ৫০ মিলিগ্রাম, দাম ছয় হাজার টাকা। আমার শিরদাঁড়ার দুটা গাঁটের উপর ডাক্তার একদিন দুটা কিউব বাঁধিয়া দিলেন, সারারাত নিজেকে [illegible] হাজার টাকার লঘু ভারবাহী [illegible] বলিয়া মনে হই[illegible]।

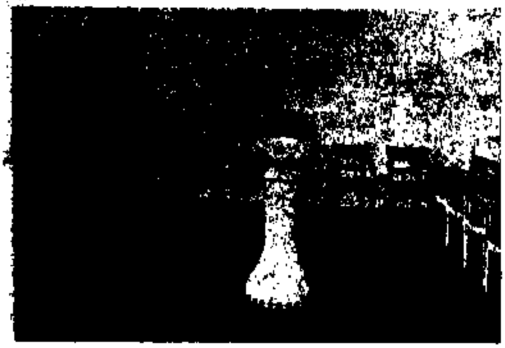
চিকিৎসার [illegible] এখানে প্রতি স্নান=[illegible] টাকা, প্রতি ধূমসেবন=২[illegible] টাকা, প্রতি কিউব প্রয়োগ=৭৲ হইতে ২০৲ টাকা। রেডিয়াম[illegible] রোগী ইচ্ছা হইলে পান করিতে পারেন, তাহার দাম লাগে না। হোটেল প্রভৃতির ব্যবস্থাও এখানে বেশ, একটি প্রকাণ্ড প্রাইভেট হোটেল ও একটি মাঝারি গোছের সরকারী হোটেল ও গোটা তিন চার ছোট প্রাইভেট হোটেল আছে।

এখানকার পাহাড়ে মাটির নীচে একরকম শক্ত পাথরের মত পাওয়া যায়, ইহা এক জাতীয় গুরুভার কৃষ্ণবর্ণ উজ্জ্বল ধাতবপদার্থ। এই দৃঢ় ধাতুকে সোডা ও নাইট্রেট সহযোগে পুড়াইলে ৫০% উরানিয়াম পাওয়া যায়। এই ভস্মকে আবার গন্ধক-দ্রাবকে পাক করিলে তাহার উরানিয়ামবাহী ½ অংশ পৃথক হইয়া যায়, বাকী ½ অংশ তরলে পরিণত না হইয়া কঠিনই থাকিয়া যায়। এই ½



রেডিয়াম প্রস্তুতের জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়া।

অংশকে আবার বহু জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া আনিলে তাহা হইতে বারিয়াম বাহির হইয়া যায়, যাহা বাকী থাকে তাহাই রেডিয়াম। প্রায় ৩০০ মণ ঐ কৃষ্ণবর্ণ



ধূম-সেবন কক্ষ।

ভারী উজ্জ্বল ধাতবপদার্থ হইতে মাত্র ১ গ্রাম রেডিয়াম বাহির হয়। রেডিয়ামের বিশেষত্ব ইহার বিকিরণ-শক্তি, এই শক্তি এত দীর্ঘকাল স্থায়ী যে, রেডিয়ামের মাত্র আংশিক শক্তি বিকীর্ণ হইয়া যাইতে ১৬০০ বৎসর লাগে। রেডিয়ামের সমগ্র শক্তি বিকীর্ণ হইয়া গেলে ইহা সীসায় পরিণত হয় এবং এই পূর্ণ পরিণতি ঘটিতে ১৬,০০০ বৎসর লাগে। আচ্ছা, রেডিয়ামের জীবন ও মৃত্যু তো পাইলাম, কিন্তু রেডিয়াম নিজে উৎপন্ন হয় কোথা হইতে? উরানিয়াম ধাতু বহু কোটী বৎসর বিকীর্ণ হইবার পরে রেডিয়ামে পরিণত হয়।

"সর্ব্বং অত্যন্তগর্হিতং", অত্যন্ত পরিমাণে যাহার সান্নিধ্যে বিবিধ শরীরাভ্যন্তরীয় ক্ষয়দোষ নিবারিত হয়, সেই ধাতুর অতি-সান্নিধ্যের ফলে রেডিয়াম খনিতে যাহারা কাজ করে, তাহারা শুনিলাম বছর দশেকের পরই কর্কট ও অন্যান্য বিবিধ উৎকট রোগে গুরুতররূপে আক্রান্ত হইয়া পড়ে।

ওয়াখিমষ্টালে চিকিৎসা ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসংগ্রহের মধ্যে সামাজিক জীবনও কিছু উপভোগ করা গেল। হোটেলে আমার টেবিলে বসিতেন প্রাহার শ্রেষ্ঠ ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল দৈনিক "লিদোভে নোভিনি"র সম্পাদক। পাশের এক টেবিলে বসিতেন চেকোস্লোভাকিয়ার স্লোভাকিষ্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি। একজন রুমেনিয়ান জজ এখানে চিকিৎসাধীন ছিলেন, তাঁহার সঙ্গে বাসে করিয়া আশে-পাশের পাহাড়গুলি একদিন ঘুরিয়া আসিলাম, প্রায় জার্ম্মান সীমান্ত ঘেঁষিয়া। জার্ম্মান আক্রমণের ভয়ে সীমান্তের রাস্তাগুলিতে মাঝে মাঝে দেওয়াল গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে শত্রুপক্ষের ট্যাঙ্ক, কামান ও সেনাবাহী মোটর অপ্রতিহতগতি না হইতে পারে। পাহাড়ের মাথা হইতে দেশের অনেকটা অংশ দেখা যায়, একটা গোলাকৃতি স্তম্ভের উপর কম্পাসের আকারে দাগ কাটিয়া দেখান হইয়াছে, কাছের বা দূরের কোন্ জায়গা এই চূড়া হইতে ঠিক কোন্ দিকে।

এই অঞ্চটির বিদায় উপলক্ষে একদিন ওয়াইনের স্রোত ঢালা হইল, তারপর আসিল শ্যাম্পেন্, তারপর প্রস্তাব হইল, চল যাওয়া যাক্ বড় হোটেলটার বারে, সঙ্গে দলস্থ হইলেন একজন জেনারেলের স্ত্রী। বারে গেলে জেনারেলের স্ত্রীকে নাচে একচক্র ঘুরাইয়া আনিলেন চেকোস্লোভাকিয়ার যুদ্ধ-মন্ত্রী (দেশটি শান্তিপ্রিয় বলিয়া এ বিভাগের স্থানীয় নাম Ministry of National Defence)। জেনারেলের স্ত্রী, তাঁহার ভগ্নী ও একজন স্লোভাকিয়ান পার্লামেন্ট-মেম্বারের স্ত্রী একদিন স্লোভাকিয়ান গ্রাম্য পরিচ্ছদ পরিয়া ফটো তুলিলেন ভারতীয়কে সঙ্গে লইয়া। স্থানীয় একটি কলাচক্রে আহূত হইলাম এক সন্ধ্যায়, একটি পিয়ানো-বাদিকা, দুটি কবি ও একটি চিত্রকর নিজ নিজ কলার নিদর্শন দিলেন।



স্নানাগার।

দেশের উদ্ধারকর্ত্তা মাসারিকের পীড়া উপলক্ষে স্লোভাকিষ্ট পার্টির সেক্রেটারি বলিলেন, "মাসারিক আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তিনি ৯০ বৎসর বাঁচিবেন (এখন

মাসারিকের ৮৭ বৎসর বয়স); এ পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার সব প্রতিশ্রুতিই দেশের কাছে পালন করিয়াছেন।"

কিন্তু মহাপুরুষ শেষ প্রতিজ্ঞায় দেশকে নিরাশ করিলেন, রেডিওতে শেষরাত্রে তাঁহার তিরোভাব-সংবাদ আসিল। দেশময় শোকোচ্ছ্বাস বহিল, সিনেমা, থিয়েটার সব বন্ধ, বাজনা শুধু গম্ভীর ও শোকোদ্দীপক। বাড়ীতে বাড়ীতে কাল-নিশান, এক সন্ধ্যায় গৃহে গৃহে বাতায়নে মোমবাতির সারি জ্বালিয়া তাঁহার স্মৃতি-পূজা হইল।

প্রাহায় ফিরিয়া দেশনেতার সমাধি দেখিলাম। কি জনস্রোত, ইউরোপকে চমক লাগাইয়া দিয়াছে! রাস্তার মোড়ে মোড়ে স্তম্ভের উপর চিতাগ্নি প্রজ্জলিত হইয়াছে, প্রতি দোকানের জানলায় মৃতের মূর্ত্তি, প্রত্যেক দেশের গবর্ণমেণ্ট বিশিষ্ট ক্যাবিনেট-মন্ত্রীকে প্রতিভূ পাঠাইয়াছেন, প্যারিসের সরবন্ প্রভৃতি জ্ঞান-মন্দিরের রেক্টারও আসিয়াছেন। সমাধির শোভাযাত্রার সময় আকাশে অগণ্য এরোপ্লেন, মিনিটে মিনিটে কামানের সেলামি, শতাধিক গির্জ্জার যুগপৎ ঘণ্টাধ্বনি।

চরিত্র, বিদ্যা, বুদ্ধি ও কর্ম্মশক্তিতে গাড়োয়ানের ছেলে দেশকে স্বাধীনতা দান করিয়া ১৯১৮ সালে দেশবাসীর উন্মত্ত জয়োল্লাসে অভিনন্দিত হইয়া উইলসন-ষ্টেশন হইতে গিয়াছিলেন যে-রাজপ্রাসাদে, আজ তিনি সেই প্রাসাদ হইতে কামান-শকটে চিরশায়িত হইয়া লক্ষ লক্ষ শ্রদ্ধাবনত শোকস্তব্ধ দেশবাসীর সামনে দিয়া আবার সেই ষ্টেশনের দিকে অন্তিমযাত্রায় নীত হইলেন। "যস্মিন্ জীবতি জীবন্তি বহবঃ, স তু জীবতু!"

প্রণাম

—শ্রীমন্মুজচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী

হে ঈশ্বরি,
তোমারে প্রণাম করি।
তুমি নর অন্ধচিত্তে দান কর প্রেমের আলোক
সকৌতুক স্নিগ্ধ হেসে দূর কর বিরহের শোক।
ওগো দেবি
মৃত্যুশীল মানবেরা তোমার যুগল পদ সেবি
পেল বরাভয়
জয় জয়।

যখন আনন্দ-ধ্বনি করি নিরন্তর
তোমার পরশ পেয়ে রসাপ্লুত হয়েছে যে নর।
হে ঈশ্বরি,
উচ্ছৃঙ্খল দর্পে যারা গিয়াছিল তোমায় বিস্মরি
কঠিন ভ্রূভঙ্গে তব হে বিশ্বমোহিনী
স্তব্ধ হক তাহাদের স্মারক-শিঞ্জিনী।

বীণাপাণি,
বর্ব্বরে বিনষ্ট কর ব্যর্থতা প্রদানি।

ঈশ্বরি ঈশ্বরি,
তব রূপে দিনমান তুমি আন মহান্ শর্ব্বরী;
বুকে রাখি ভালবাসা পদে চাপি করিছ শাসন
দস্যুরে করেছে কবি তব পদ্মপলাশলোচন,
প্রেমভিক্ষা তরে নর, পদতলে লুটিয়াছে শির
দেহেতে পেয়েছে কান্তি পান করি ওই বক্ষ-ক্ষীর।

তুমি জয়ী
নিখিল বন্দিতা ওগো চিরানন্দময়ী
সাধনার তুমি পরিণাম
তোমায় প্রণাম দেবি, তোমায় প্রণাম।

বঙ্গ-রমণী

—শ্রীঅপরাজিতা দেবী

[৬]

কত অত্যাচার হায়, কত অবিচার
সহিয়াছে অভাগিনী—

কাল-বৈশাখীর ঝড়-ঝঞ্ঝা ঘনাইয়া আসিতেছে। উনানশুদ্ধ জিনিষ রোদে দেওয়া—দু'তিন রকম গোটা ও আধ ভাঙ্গা কলাই—হলুদের গুঁড়ো, তেঁতুল, বড়ি, আচার ইত্যাদি গৃহস্থ-ঘরের ভাঁড়ারের জিনিষ—যা রোজই রোদে দিতে হয়।

ঢেঁকি-ঘরে ধান ভানা হইতেছে। বড় বৌ ও ছোট-বৌ পাড় দিতেছে—মেজ-বৌ পাড় দিতে পারে না—সে ঝাড়িয়া দেয় ও লোটের ধান উলটা-পালটা করিয়া দেয়। তিনজনে এই শ্রম-সাধ্য কাজের মধ্যেও এমন ভাবে নিজেদের কথাবার্ত্তায় ডুবিয়া আছে যে, কোন দিকে খেয়াল নাই। ঢেঁকি-ঘর একে খড়ের, তায় দু'দিক খোলা—উপরে আম গাছ,—খুবই ঠাণ্ডা। তবু পঞ্চমী বড় একঘটি জল, গেলাস ও পানের বাটা, জর্দ্দা আনিয়া রাখিয়াছে। ঘটির মুখে গেলাস, পানের বাটায় একখানা ভিজে গামছা। পঞ্চমীর কাজের ধারা নিখুঁত ও পরিপাটী। বড়-বৌকে হার মানাইয়াছে। পাড় দিতে দিতে এক একবার নামিয়া নিজে জল খায়—দুই দিদিকে জোর করিয়াই খাওয়ায়—পান সাজিয়া দু'জনকে দেয়—নিজেও খাইয়া আবার ঢেঁকিতে ওঠে। পরশমণি বলেন 'আমার চোদ্দ পুরুষে ঢেঁকি-ঘরে এত নবাবী দেখি নি।' বড়-বৌও বলে, 'খাটছি চিরকাল—এ সব তো করি নি কোন দিন - পিপাসা হলে একবার জল খেয়ে আসতাম—এর বেশী নয়।' পঞ্চমী বলে—'দিদি, খাটনী অনেক কমে যায়—যদি মাঝে মাঝে একটু আরাম নেওয়া যায়। আমি মার কাছে শিখেছি।'

বড়-বৌ বলে, 'আমাদের একটি ভিন্ন দুটি পান বরাদ্দ ছিল না, মেজ-বৌ এখানে থাকলে ওর ঘর থেকেই আমাকে সারাদিন দেয়, নইলে আমার পান খাওয়া হয় না বড়।'

মেজ-বৌ বলিল, 'পান গাছের,—কেনা ত নয়—সুপুরিও গাছের, তুমি নিজের দোষেই আরও কষ্ট পাও। সব কথা ধরতে গেলে কি চলে? যে যা বলুক, কান না দিলেই হল। অত ভয় করে চলতে গেলে বাঁচা যায়?'

বড়-বৌ একটু হাসিল, ম্লান হাসিটুকু ভাল ফুটিল না। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'ভয় না করে কি করি বল?—কোথাও তো যাবার যায়গা নেই—মরে বেঁচে এখানেই থাকতে হবে—তাই সব সয়েই থাকি।'

পঞ্চমীকে বড়-বৌ ঢেঁকিতে উঠিতে দিতে চায় না। দু'তিন বার ঠেলিয়া নামাইয়া দিয়াছে। বলে, 'কচি পা—এতক্ষণ পারবি কেন? এত কাজের সখ তো ঘর-টর ঝাঁট দিগে যা—'

পঞ্চমী কিছুতেই শোনে না, বলে, 'আমার অভ্যাস আছে। আর দু'জনে পাড় দিলে কারুরই কষ্ট হয় না, একা একা ঢেঁকি তুলতে নামাতে পারা যায়?' তারপরে পঞ্চমী বড়-বৌয়ের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করিল—সেই ঢেঁকির উপরেই, কে কাকে ঠেলিয়া ফেলিতে পারে। মেজ-বৌ হইল বিচারক, দেখা গেল—বড়-বৌয়ের চেয়ে পঞ্চমী হীনবল নয়।

মেঘ-গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুর ও পরশমণির গর্জ্জন শোনা গেল। মেঘ দেখিয়া বেড়ান অসমাপ্ত রাখিয়াই পরশমণি তাড়াতাড়ি ফিরিয়াছেন। আকাশের অবস্থা দেখিয়া বড়-বৌ ঢেঁকি হইতে নামিয়া পড়িল। মেজ-বৌ বলিল, 'তোমরা ও দিকে যাও—আমি এগুলো ঘরে তুলছি।'

বড়-বৌ ছুটিয়া আসিয়া উঠানের জিনিষপত্র তুলিতে লাগিল। পঞ্চমীও তার সঙ্গে যোগ দিল। বড়-বৌ বলিল, 'তুই কাপড়-চোপড় বাসন-কোসন তোল্‌গে—এ আমি একাই পারব।' পঞ্চমী একটু হাসিয়া বলিল, 'আর, ঘুঁটেগুলো ভিজে গেলে, বকুনী খাবে কে?'

উদ্বিগ্ন মুখে আকাশের দিকে চাহিয়া বড়-বৌ বলিল,

'বৃষ্টি হবে, মা শুধু ঝড়, বুঝতে পারছিনে, তা যা হয় হোক্ গে—তুই ঘরে যা—নতুন বৌ, বিয়ের বছর ঘোরে নি, এ সময় ঝড়-বাতাসে বাইরে থাকতে নেই।'

বারকোশের সরিষা হাঁড়িতে ঢালিতে ঢালিতে নিশ্চিন্ত মনে পঞ্চমী জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হয়?'

'হয় তোর মাথা, যা যা ঘরে যা—'

পরশমণি দেখা দিলেন। —'ও আমার কপাল, তিন বিবিতে কি হচ্ছিল সারা দিন? গপ্প—গপ্প। রাঁধতে বসে গপ্প—ঘাটে গিয়ে গপ্প! ঘরের লক্ষী ছাড়িয়ে দিলে! এই যে বিষ্টির ফোঁটা পড়তে লাগল সবগুলি তো বাইরে, কে এখন সামাল দেয়? আসুক না বিশু বাড়ী,—দেখাচ্ছি আজ মজা। ওরা না হয় ছোট, তুমি বুড়ো ধাড়ী কি বলে ওদের সঙ্গে নাচ? আর ছোটটাকেও বলি,—ঘরে পা দিয়েই দিদির আঁচল ধরেছেন! ওঁর সাতজন্মের দিদি! পেছন পেছন ঘুরছেই দিনরাত।'

বকিতে বকিতে বারান্দার বাঁশে মেলা একখানা কাপড় টান মারিয়া তুলিতে গিয়া সেটা ছিঁড়িয়া গেল;—কাপড়টা বিশালের, 'বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে, মুখপুড়ীর কাজের ছিরি দেখ! এ আর বৌয়ের পা-ধরা শ্যামল নয়, দেবে এখনি চুলের মুটি ধরে বাড়ীর বার করে।'

এদিকে উঠানের জিনিষপত্র ঘরে তোলা হইয়া গেল। বড়-বৌ ঘুঁটে আনিতে ছুটিল। পঞ্চমী আর একটা ঝুড়ি লইয়া শ্বশুরের ঘরের আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল। গোয়াল ঘরটা বাইরের ঘরের ওদিকে। নূতন-বৌকে সেদিকে যাইতে দেওয়া হয় না। কর্ত্তার ঘর ও বাহিরের ঘরের পিছন দিয়া বড়-বৌ যাতায়াত করিত। সহজে সে লোকের চোখে পড়িতে চায় না। সকলেই তার দিকে একটু করুণা ও আগ্রহের সঙ্গে চাহিয়া দেখে, তাই সে সাধ্যমত এড়াইয়া চলে।

বড়-বৌ ঘুঁটে আনিয়া অর্দ্ধ পথে পঞ্চমীর হাতে দিয়া পঞ্চমীর শূন্য ঝুড়িটা লইয়া যায়—পঞ্চমী এক ছুটে ঢেঁকি-ঘরের মাচায় সেগুলি ঢালিয়া আসিয়া বড়-বৌ আসিবার আগেই যথাস্থানে দাঁড়াইয়া থাকে।

ধুলাবালি উড়াইয়া প্রবল বাতাস আসিয়া পড়িল। শেষ ঝুড়ি ঘুঁটে লইয়া দু'জনে ফিরিতে ফিরিতে দেখিল, —শ্বশুর ঘরের সামনে বসিয়া তীব্র চক্ষে দেখিতেছেন। ফিরিয়া আসিতে আসিতে শুনিতে পাইল—'হুঁ—নবাব-জাদীরা ঘুমুচ্ছিলেন বুঝি?—সে পাড়াবেড়ানী বুড়ী তো কুটো ছিঁড়ে দু'খানা করে না—তোমরাও যদি না পার, যাও সব একদিক থেকে বাড়ী ছেড়ে বেড়িয়ে—কেষ্ট বিশ্বাস এখনও মরে নি, একাই সংসার চালাব, লোক রেখে কাজ করাব! কাজের সময় কাজ—এই হল আমার ব্যবস্থা—কেষ্ট বিশ্বাসের সব রুটিন বাঁধা—এদিক ওদিক হবার যো নেই।'

ঝড় উঠিল। ধুলায় চতুর্দ্দিক অন্ধকার। বৃষ্টি নামিয়াছে অনেকক্ষণ, কিন্তু বাতাসে বোঝা যায় না। আকাশ ঘন কৃষ্ণবর্ণ, নিমেষে নিমেষে বিজলী জ্বলিয়া উঠিতেছে কৃষাণরা, সুখেন ও বিশাল ভিজিতে ভিজিতে আসিয়া পৌঁছিল। সুখেন প্রায়ই বৈকালে মাঠে গিয়া কাজ দেখিত—বিয়ের পরে আর যাওয়া হয় নাই—আজই সবে গিয়াছে।

কৃষাণেরা বলদ, রাখাল, গরু লইয়া ব্যস্ত হইল। সুখেন নিজের ঘরে গেল। বিশাল কুয়ার ধারে হাত-পা ধুইয়া বারান্দায় উঠিল। পরশমণি সেখানেই দাঁড়াইয়া আছেন। বিশাল বলিল, 'মা কাপড়টা দিতে বল, আর এক গ্লাস জল, ভিজে গেছি আসতে আসতে—সুখেন গেল কোথা, কাপড় ছেড়ে ফেলুক।'

'যাবে কোথায়—ঢুকছে গিয়ে কোণায়। কি বৌই আনলে বাবা, এ যে শ্যামলের বাড়া হল! ইস্কুল যাবে—বৌয়ের সঙ্গে দুটো কথা না বলে যেতে পারে না। আগে ত' এই দিকের পথে ইস্কুলে যেত আসত, এখন বাঁশ-তলার পথ ধরেছে। ছোট বিবি করে কি শুনবি? পানের কৌটো হাতে করে রান্নাঘরের পেছনে বাঁশ-তলায় আগে থেকে দাঁড়িয়ে থাকে,—আজ সকালে ঝাঁটাটা খুঁজতে খুঁজতে গিয়েছি,—আমি কি জানি—দেখে অবাক বাবা,—যেন দু'মাসের পথ যাচ্ছে। মাথায় কাপড় নেই, কিছু না—সুখেনের কাঁধে মাথা দিয়ে—'

বিশাল লজ্জা পাইয়া বলিল, 'থাক্‌গে মা ও সব কথা। নতুন নতুন ও রকম হয়। ছোট বৌমা স্বয়ং লক্ষী,—ওঁর

নামে যে জমি কিনেছি—কোনদিন অন্নকষ্ট হবে না মা। মার যেমন রূপ—তেমনি গুণ—দেখছ ত ?'

মা বিরস মুখে বলিলেন, 'দেখছি বই কি, আরও দেখব। ছেলেটার মাথা খেয়েছে আরও কি কপাল আছে—তুই যাই বলিস বাবা, এসব ওই বড়-বৌয়ের শেখানি—নইলে ও অত সাহস পায় না।'

'তা আর কি করবে ? এত অপমানেও যার লজ্জা নেই—'

'ওকে তুই রেখে আয় বনপুর—আবার বিয়ে কর। এবার ভাল বৌ আনব দেখিস।'

'রেখে আসতে পারি এখুনি—তা হলে সবাই বাঁচি। কিন্তু কোথা রেখে আসব ? বিধবা মামী বাপের বাড়ী চলে গেছে ছেলে-পিলে নিয়ে। ও পাপ সইতেই হবে, যতদিন বাঁচে। একটা কেলেঙ্কারী হলে আমাদেরই লজ্জা,—নইলে এখুনি বাড়ী থেকে বার করে দেওয়া যায়,—যেখানে খুসী যাক। কই জল দিতে বললে না ?'

মা রান্না-ঘরের দিকে মুখ বাড়াইয়া যথাসাধ্য চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'জল দিয়ে যাও বিশুকে—'

অন্ধ-কারে খুঁজিতে খুঁজিতে বড়-বৌ রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া শয়ন-ঘরে আসিয়া দেখিল—মা কাপড়টা বিশালকে দেখাইতেছেন।

ঘরেই কলসীতে জল গ্লাসে জল ঢালিয়া বড়-বৌ সামনে ধরিল। বিশাল চেঁচাইয়া বলিল, 'কাপড় ছিঁড়লে কেন ?'

মা বলিলেন, 'খেগার-ঠেলা কাজ কি ঘরের বৌয়ের মানায় বাপু ? মেজ বিবি এদ্দিন এখানে থাকেন নি—সে ছিল একরকম ভাল, কাজকর্ম সব মন দিয়ে করত তবু—এমন চব্বিশ ঘণ্টা দেখ গিয়ে—রান্নাঘরে আর বাঁশ তলায় তিনজনায় মিলে ;—সেদিন ছিদামের বাড়ী নেমন্তন্নে গেছিস—আসতে রাত হয়েছে—ও মা—ঘরের দোর সব খোলা দেখে গেলুম পাছবাড়ীতে—নিশুতি রাত—কোথাও সাড়াশব্দ নেই—না তিনটেতে বাঁশতলায় বসে গল্প জুড়েছে—ওরা কি মানুষ ? না ভয়-ডর আছে পরাণে—বিশ পেত্নীতে চুল ধরে বাঁশের আগায় ঝুলে—ত ভাল হত। আমরাও বৌ ছিলাম একদিন—[illegible] কোন দিকে চাইনি, কারো সাথে একটি কথা কয়েছি কি তোর ঠাকুমা দিয়েছে অমনি ঠেঙ্গিয়ে—আমি কি না নেহাৎ ভাল মানুষ তাই কিছু বলিনে, হত আমার শাশুড়ী তিন সন্ধ্যা না ঠেঙ্গিয়ে জল মুখে দিত না—এমন দিন-রাত কড়িখেলা আর হি-হি-হি বাপের জন্মে দেখি নি—এ উঠতে বসতে ঝাঁটার কাজ—'

'তাই উচিত' বলিয়া জল খাইয়া গ্লাসটা ঠক্ করিয়া নামাইয়া রাখিয়া বিশাল কাপড়খানা বড়-বৌয়ের গায়ে ছুঁড়িয়া দিয়া কহিল, 'বাঁশের গিঁঠটা দা' দিয়ে চেঁছে ফেলতেও পার নি ? তোমার মরণটা হলে আমি নিস্তার পেতাম—যাও, কাপড় নিয়ে যাও, রিপু করে দাও—এখনি আমি চাই,—রান্না হয়েছে মা ?'

'জানিনে বাছা, তোমার বউ ঠাকরুণকে জিজ্ঞাসা কর।'

বড়-বৌ সূচ ও সূতা এবং কাপড় লইয়া রান্নাঘরে ফিরিয়া আসিল। উনানে ভাত ফুটিতেছে—বিশাল রান্নার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছে আজ সে সুনিশ্চিত সকালে সকালে খাইবে। উনানের আগ ঠেলিয়া দিয়া বাতির দিকে ঝুঁকিয়া সে সেলাই করিতে বসিল।

হেঁসেলটা আড়াল করিয়া হাত তিনেক লম্বা ও হাত দুই উঁচু একটা মাটীর দেওয়াল—তার কিনারায় মাটী দিয়াই একটা বিঁড়ে তৈরী করা, সেখানে কেরোসিন-কুপীটা বসান থাকে। বাহিরে ঝড়ের বেগ কমিলেও বাতাস জোরে বহিতেছে—বৃষ্টি নামিয়াছে ; অন্ধকার নিবিড়। বাতাসের বেগে কুপীটার শিখা এক একবার কাঁপিয়া উঠিয়া নিবিবার মত হইয়াছিল, ম্লান আলোকে রুক্ষ, মলিন-বেশ বড়-বৌ সেলাই করিতে করিতে চোখের জল মুছিয়া ফেলিল। কেহ দেখিবার নাই, তবু সতর্কতা তার স্বভাব-সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

হঠাৎ ভেজান দ্বার ঠেলিয়া পঞ্চমী ঘরে ঢুকিল। মুখে-চোখে কৌতুকের হাসি উছলিয়া পড়িতেছে, বড়-বৌ অবাক হইয়া বলিল—'হ্যাঁরে তুই পাগল না আর কিছু, এই আঁধারে জলে ভিজে মরতে এলি কেন ? ঘরে ঠাকুর-পো নেই ?'

নিখিল-ভারত পঞ্চাঙ্গুলীয় পুতুল-নাচ



CULTURAL CONQUEST বা বুদ্ধির বাঁধ] গুণী চালক:—নাচ, বাছুরা নাচ, ! হেলে দুলে উঠে নেমে পুতুল-মণি নাচ, ! যেমন ভাবে নাড়ি আঙুল তেমনই ভাবে নাচ, ! শিক্ষা দিয়ে, বিজ্ঞান দিয়ে, সংবাদপত্র-চালনা দিয়ে রাজনীতি আর কিষাণ-প্রেমে নাচ, !

ছু পিম্বার



—শুধু তোমার বাণী নয় হে বন্ধু, হে প্রিয়।
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও॥

'আছেন। সেই কাপড়টা দিদি? দাও আমি সেলাই করি—'

'আছেন? তবে এলি যে—'

'আসতে দেয় না কি? বললাম, বারান্দায় কাপড় ভিজছে নিয়ে আসি—বলে দোর খুলেই দে ছুট—হাত বাড়িয়েছিল ধরতে পারেনি'—পঞ্চমী খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল।

'না বোন, অমন করিসনি। তোদের এই ভালবাসা জন্ম-জন্ম অক্ষয় হোক্—ঠাকুর-পোর অবাধ্য হয়ে তাকে রাগাস নে—'

'তা আমি কি করব—শুধু শুধু দুষ্টুমী করবে সব সময়, এই দেখ—আমার খোঁপা খুলে দিয়েছে—বলে খোলা চুলে বেশী ভাল দেখায়।—এগুলো পাগলামী নয়? চুল খোলা থাকলে রাত্তিরে ঘুম হয়? অত করে দুপুরে বাঁধলুম—আবার এখন বাঁধি!—তুমি একাটি রয়েছ, আমি কখন থেকে আসবার জন্যে ছট্‌ফট করছি—আমায় ধরতে এল—মা দেখেছে; তোমার ঘরে মা আর বটঠাকুর বসে কথা কইছেন। মেজদি কই?'

'ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্ছে। তুই যা—নইলে ঠাকুর-পো রাগ করবে—'

'করুকগে—তা বলে আমি এখন ঘরে বন্ধ হয়ে থাকতে পারব না—কুটনো কুটব? না হয়ে গেছে এই যে, তবে কি করব বল?'

'তা হলে ভাত নামিয়ে তরকারীটা রেঁধে ফেল—ততক্ষণ আমার সেলাই হয়ে যাবে। তোর বটঠাকুর সকাল সকাল খাবেন। কাপড় আর রান্না এক সঙ্গে চাই—নইলে রেগে যাবেন।'

পঞ্চমী হেঁসেলে ঢুকিয়া গিন্নীর মত মুখ করিয়া বলিল, 'তবে তুমি ওদিকে সরে বসে সেলাই করগে—এখখুনি রেঁধে ফেলছি—ঝোল চড়িয়ে খাবার জায়গা করে রেখে ওঁদের ডেকে আনব। মেজ-ঠাকুর আসবেন না আজ?'

'না, কাল আসবে বলে গেছে। খাবার জায়গা ঘরেই কর—'

কাপড় রিপু করিয়া বড়-বৌ বিশালকে দিয়া আসিল। বিশাল ও সুখেন রান্নাঘরে খাইতে আসিল। বড়-বৌ শ্বশুরের খাবার লইয়া তাঁহাকে খাওয়াইতে গেল।

মা আসিয়া দরজার গোড়ায় বসিলেন। বিশাল বলিল, 'ছোট-বৌমাকে বড্ড খাটায় ও, একদণ্ড দেখিনে যে ছোট-বৌমা বসে আছে। যেন ওর জন্যেই ওকে এনেছি—কাল পরশু বৌমাকে আমি রেখে আসব—দেখি কি করে ওর চলে? আর মাঐমা নবদ্বীপ যাবেন বলছিলেন জ্যৈষ্ঠ মাসে—একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করাও দরকার।'

পরশমণি মুখভঙ্গী করিলেন। ছোট-বৌ না থাকিলে বড়-বৌয়ের আক্কেল হয়, আবার বাপের বাড়ী গেলে সুখেন দৈনিক শ্বশুর-বাড়ী যাইবে—এই উভয় সমস্যায় পড়িয়া তিনি কোন কথা বলিতে পারিলেন না।

সুখেনের সঙ্গে পঞ্চমীর দু'একবার চোখোচোখি হইয়াছে—পঞ্চমীর মুখে হাসি—সুখেনের মুখ প্রলয়-গম্ভীর। কিন্তু বটঠাকুরের কথাটা শেষ হইবামাত্র ঘোমটার ফাঁকে একবার সুখেনের দিকে চাহিয়া দেখিল।

কাজ-কর্ম্ম সারিয়া বৌয়েরা হাত-পা ধুইয়া ধোয়া শাড়ী পরিয়া শয়ন-ঘরে যায়। কাপড় বার বার বারান্দার দড়িতেই থাকে। পঞ্চমী কাপড় ছাড়িয়া ঘরে গিয়া চুল বাঁধিতে বসিল। সুখেন বিছানায় শুইয়া আছে—সে দিকে একটু পিছন ফিরিয়া বসিল। চুল বাঁধিয়া দরজা বন্ধ করিয়া পঞ্চমী মেজেতে মাদুর পাতিল। মেজ-বৌয়ের ঘর হইতে 'রহস্য-মুকুর' বলিয়া একখানা বই পান খাইতে গিয়া সে এখনই আবিষ্কার করিয়াছে। 'রহস্য-মুকুরে'র রহস্য তাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে—এমন বই সে জীবনে পড়ে নাই।

হঠাৎ সুখেন আসিয়া কাছে বসিল—পঞ্চমীকে কাছে টানিয়া লইয়া বিষণ্ণ মুখে বলিল, 'তুমি বাপের বাড়ী যাবে? তুমি গেলে বাঁচব না আমি—'

এ কি আশ্চর্য্য!—পঞ্চমী অবাক হইয়া সুখেনের মুখের দিকে চাহিল—পঞ্চমী এমন কি একটা মানুষ যে তার যাইবার কথা হইলে একজনের মনে এত কষ্ট হয়? সে এখানে আসিবার সময় মা কাঁদিয়াছিলেন—কিন্তু তিনি মা—কোলে করিয়া মানুষ করিয়াছেন—কাঁদিবারই কথা।

এঁরা তো তা নয়—ছুটি মাসের চেনা-শোনা—তাতেই এত ?

'তুমি যাবে ? তুমি যাবে পঞ্চমী, আমাকে ফেলে ?' সুখেন পঞ্চমীর চিবুকটি ধরিয়া উত্তরের আশায় অপেক্ষায় রহিল।

পঞ্চমীর চোখে জল আসিয়া পড়িল।—এঁরা এত ভাল, তবে দিদির উপর এত চটা কেন ? বলিল, 'বট্‌ঠাকুর নিয়ে গেলে কি 'না' করতে পারি ?'

'তবে আমি ইস্কুল থেকে বাড়ী আসব না। তোমাদের ওখানে চলে যাব—'

'সে বেশ হবে, তোমার লজ্জা করবে না ? মা বকবেন যে—'

'কেন বকবেন ? তোমার কাছে যাব—কে বারণ করবে ? আর করলেও শুনব কেন ? তোমাকে না দেখে থাকতে পারব না।'

পঞ্চমী একটুক্ষণ ভাবিল, বলিল, 'একটা কথা বলব ?'

'একটা কেন দশটা বল—আজ আর ঘুমোব না। যদি কাল যাও ?—আমার পান কই ?'

'ভুলে গেছি, যাঃ বইটা পেয়ে আর মনে নেই। এক্ষুণি নিয়ে আসছি—'

'দেরি করবে না ? গল্প পেলে যে সব ভুলে যাও—'

'না-না এলাম বলে'—দরজা খুলিয়া হরিণীর মত পঞ্চমী ছুটিয়া মেজ-বৌয়ের ঘরে গেল। মেজ-বৌ ছেলেকে দুধ খাওয়াইতেছে। তখনও দরজা খোলা রহিয়াছে। বলিল, 'কি চাই রে ?'

'পান নিতে ভুলে গেছি দিদি,' বলিয়া পান সাজিবার কোন উদ্যোগ না করিয়া পঞ্চমী মেজ-বৌয়ের কাছে বসিল, 'দিদি, একটা কথা বলবে ? ওঁকে জিজ্ঞেস করতে গেলাম, তা ওঁরা তো কেউ দিদির ওপর খুশী নয়—তাই তোমাকে বলছি,—আচ্ছা কি হয়েছিল দিদি ? কেন বট্‌ঠাকুর দিদিকে দু'চোখে দেখতে পারেন না ?'

'হয়েছিল কিছু না—দিদির কপালের দোষ। বিয়ের বছরখানেক তো বট্‌ঠাকুর দিদিকে চোখে হারাতেন। একদিন হয়েছে কি—বট্‌ঠাকুরের জ্বর হয়েছে, বেশী জ্বর না—অল্প অল্প। তখন আমার বিয়ে হয়েছে মাসকয়েক হবে, আমিও এখানে। দিদিই পথ্য-টথ্য সব দেয়। একদিন দুধ জ্বাল দিয়ে এসে দেখে ঘরে তিনি নেই। দিদি বরাবরই পাকা গিন্নী,—হাটের সওদা এলে, সব জিনিষ কিছু কিছু লুকিয়ে নিয়ে বাক্সে রাখে, কেউ এল,—কি খুব ঠেকার সময়, তাই দিয়ে কাজ চালায়। বাক্স খুলে একটু মিছরী এনে দুধে দিলে, অমনি পেছন থেকে মা দেখে বললেন, 'দুধে কি দিলে ? কি ওষুধ দিলে ? ছেলেকে গোলাম করেছ—তাও সাধ মেটেনি ? আবার কি মতলব ?' তখন দুপুর বেলা—সবাই তেতে পুড়ে এসেছে ; বাড়ীময় হৈ রৈ কাণ্ড বাঁধিয়ে দিলে মা চেঁচিয়ে। বট্‌ঠাকুর উঠে পড়লেন—পাড়া-পড়শী ছুটে এল। দিদি তুলসীগাছ ছুঁয়ে দিব্যি করলে, তবু মা মানলেন না। দুধ ঢেলে দেখলে মিছরী নেই,—ক'টা সাগুদানা পড়ে রয়েছে। মিছরী গলে গেছে, মা বললে, 'এই দেখ অষুধের বড়ি'। আমি জানি, দিদির বাক্সে সাগু-মিছরী এক সঙ্গেই থাকে, ভিজে হাতে মিছরী নিতে সাগুদানা লেগে গেছে;—আমি বাক্স খুলে সাগু-মিছরী এনে দেখালাম। কিছুতেই কিছু হল না। অনেকেই ত অষুধ-বিসুধ করে, বিশু মুখপুড়ীও না কি ওর স্বামীকে ওষুধ করেছে। বট্‌ঠাকুরও শেষে বিশ্বাস করলেন। সেই থেকে দিদির হাতে দু'তিন বছর খান নি ! ঘরে ঢুকতেও দেন নি। আমার বড় ননদ তখন এখানে ! তিনিও যাবার সময় হাতে ধরে কত বললেন—কিছুতেই কিছু নয়। ঐ যে ঘেরা বারান্দাটুকু ওতেই দিদি রাত্রে থাকত।'

পঞ্চমী নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া শুনিতেছিল ; নিশ্বাসটা ফেলিয়া বলিল, 'ভয় করত না ?'

'ভয় ? দিদির আর ভয় কি ? স্বামীর অবিশ্বাসী হলে জীবন মরণ সমান। মা কি কম ? চুল টেনে ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। পিঠে দেখিস্ পোড়া খুন্তির দাগ কতগুলো। এই আমারই গায়ে কোন দিন হাত দেন নি।'

'দিদি আড়ালে বট্‌ঠাকুরকে বুঝিয়ে বললে না কেন ?'

'তা বুঝি বলে নি ? পা ধরে কত কান্না কেঁদেছে, কত শপথ করেছে,—কিছুতেই মন ফিরালেন না। মুখ দেখেন নি কতকাল ! সামনে এলে দূর দূর করতেন। শেষে

পাড়া-পড়শীরা বলতে, 'অমন সুন্দর বৌ একা পড়ে থাকে বাইরে; যে দিন-কাল পড়েছে,—পাড়ায় পাজী বদমায়েসের অভাব নাই; যদি তেমন কিছু ঘটে, চির-কালের মত্ত বংশে কলঙ্ক পড়বে। আর মনটাও নরম হয়ে এসেছিল, তাই আবার ঘরে ঠাঁই দিলেন। কিন্তু ভাল-বাসতে পারলেন না আর।'

'দিদি, শুনে শুনে ভয় হচ্ছে, এঁরা এমন? আমাকেও যদি এমনি করে বলে—?' ভয়ে পঞ্চমী কথা শেষ করিতে পারিল না।

'তা এরা পারে। এদের কিছু বিশ্বাস নেই। আচ্ছা, বট্‌ঠাকুরই না হয় মন্দ, এরা তো দেওর! এদের তো কিছু পাওয়াতে যায় নি, এরা একটু সদ্ব্যবহার করলে ত দিদি বাঁচে। তা' না—সবারই ঠিক বটঠাকুরের সুর। দেখিস এ পাপের শাস্তি সবাই একদিন পাবে। মা গুরুজন, কিছু বলিনে। কিন্তু উনি মানুষ নন, মানুষ এমন হয় না। তোর উপর যা রাগ দেখছি,—একটু সাবধান থাকিস। দেখিস নে—শ্বশুর ওঁকে দেখতে পারেন না মোটে? উনি না পারেন এমন কাজ নেই। পাড়ার সবাই দিদিকে ভাল-বাসে, কেউ দিদির দোষ ধরে না। সেবার মা বেড়াতে এসেছিলেন, বললেন, 'তোমার বড়-বৌটির মত লক্ষ্মী আর দেখিনি বেয়ান।' এই শুনে মার সাথে ঝগড়া। মা বট্‌ঠাকুরকে, এদের দু'ভাইকে অনেক বললেন। কিছুই হয়নি।'

'আমিও ওঁকে বলি দিদি, তা শোনে না। সেইজন্য আমার রাগ হয়।'

'তুই ও সব কিছু বলতে যাসনে। ভগবান ভিন্ন মানুষের সাধ্য কি কপালের লেখা ফেরায়? যা পান নিয়ে শীগগীর যা। নইলে রেগে ভূত হয়ে থাকবে। ঠাকুর-পোকে রাগাসনি যেন, তা হলে মরবি।'

[৭]

...দেবী বসুন্ধরে!

তোমার হৃদয়ে মাতা লুকাও আমায়।

'মা, মা—কই গো তোমরা?'

বড়-বৌ বিশালকে পান সাজিয়া দিতে আসিয়াছে, বিশাল বলিল, 'যাও—জটা পাগলা বুঝি এসেছে, ওকে খেতে দাও গে।'

বড়-বৌ ঘর হইতে বাহির হইয়া দেখিল—জটা পাগলাই বটে।

জটা পাগলা বলিল, 'এই যে মা কেমন আছ? তেমনি দেখছি একটু বদ্‌লায় নি?

খণ্ডং খণ্ডং ত্যজতি ন পুনঃ স্বাদুতামিক্ষুদণ্ডং।
দগ্ধং দগ্ধং ত্যজতি ন পুনঃ কাঞ্চনং কান্তিবর্ণং।
ঘৃষ্টং ঘৃষ্টং ত্যজতি ন পুনশ্চন্দনশ্চারুগন্ধং।
প্রাণান্তেঽপি প্রকৃতি বিকৃতি জায়তে নোত্তমানাম্।

দুঃখ কি মা? জগতের নিয়ম এই। পরীক্ষা—পরীক্ষা, এ শুধু সেই চক্রধারীর পরীক্ষা। যাও, ভাত বাড়, নেয়ে আসছি—'

জটা পাগলা বিশালের সঙ্গে পড়িয়াছে। তারপরে পাশ করিয়া কলেজে বি-এ পড়িবার সময় তার মাথা খারাপ হইয়া যায়। আর সারে নাই। মা-বাপ, ভাই-বোন সবই আছে; কিন্তু সে ঘর ছাড়িয়াছে। হঠাৎ কোন বাড়ীতে অতিথি হয়,—নিতান্ত অসময়ে, একবেলা খাইয়াই চলিয়া যায়। আবার হয়তো ছ'মাস পরে আসে। দেশে বিদেশে সকলেই তাকে চেনে। নিজের বাড়ী সম্বন্ধেও এই একই নিয়ম; এক বেলার বেশী থাকে না। আগে মাথায় জট ছিল, তাই নিজের নাম লোপ পাইয়া 'জটা পাগলা' নাম হইয়াছে। এখন জট নাই, একখানা কাপড়, একটি চাদর এই সম্বল। আর সব সময় মুখে, 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ হরে রাম হরে রাম—'

জটা পাগলা নাহিতে গেল। বড়-বৌ তাকে বিশেষ জানে, আসিবে ঘণ্টা দুই পরে। রান্নাঘরে আসিয়া দেখে উনান নিভিয়া গিয়াছে; ঘরে কাঠ-কুটাও নাই, আবার যোগাড় করিয়া আনিয়া রান্না চড়াইতে ইচ্ছা হইল না। জটা পাগলার অপেক্ষায় রান্নাঘরের বারান্দায় বসিয়া রহিল।

এ দিকে জটা পাগলা বাহিরের ঘর ঝাঁট দিল। গোয়াল-ঘরের পাশে কতকগুলা আগাছা জঙ্গল জন্মিয়াছে—সেগুলি সাফ করিল। কৃষ্ণধনকে তামাক সাজিয়া খাওয়াইল। বাদের আঁটিগুলি এদিক ওদিক পড়িয়া রহিয়াছে—কৃষাণরা

মজুরে মাঠ হইতে আনিয়া ফেলিয়াছে,—সেগুলি একদিকে গাদা করিয়া রাখিয়া উঠান ঝাঁট দিল। ঝরা ধানগুলি একটা ঝুড়ি ভরিয়া রাখিয়া আরও দু'চারটা কাজ করিয়া স্নান করিয়া আসিল। চাদরটা পরিয়া কাপড়টা মেলিয়া দিয়া একেবারে অন্দরে চলিয়া গেল। জটা পাগলা কারও কাপড় পরে না। ছিঁড়িয়া গেলে যদি কেহ অযাচিতে একখানা দেয়—তবেই নেয়—নতুবা শতছিন্ন কাপড় পরিয়া থাকিলেও চায় না।

'রাম-রাম কৃষ্ণ-কৃষ্ণ—তুমিই সত্য—তুমিই সত্য।—কই মা —'

জটা পাগলা কলাপাতায় খায়। বড়-বৌ খাবার দিল। পিঁড়িটা ঠেলিয়া দিয়া মাটীতে বসিয়া জটা বলিল, 'বুঝেছি, এ তোমার ভাত, তোমার ভাগের,—তোমার আজ উপোস, তা ভালই। রাত্রে বেশী করে খেয়ো।'

খাওয়া হইলে পাতা ফেলিয়া জটা মুখ ধুইয়া আসিল। বলিল, 'আল্‌সের আগুন নিবে গেছে—একটু আগুন দাও মা—তামাক খেয়ে যাই।' বড়-বৌ হাতা করিয়া নিবন্ত ছাইয়ের মধ্য হইতে বাছিয়া কয়েক টুকরা আগুন তুলিয়া বারান্দার কিনারে রাখিল। জটা সেগুলি কলিকায় তুলিতে তুলিতে বলিল, 'অনেক কষ্ট পেয়েছিস, আরও অনেক কষ্ট পাবি—সুখের মুখ দেখবি—কিন্তু থাকবে না—শেষে পাবি সত্যিকার পথের সন্ধান। কষ্ট কি মা—কষ্ট কি? সব মিথ্যা, সব মিথ্যা—মায়া-মায়া! কৃষ্ণ কৃষ্ণ।—কৃষ্ণ নাম ভুলিস নে যেন—'

জটা পাগলা চলিয়া গেল। বড়-বৌ দুঃখের নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, 'আমার আবার সুখ—'

অগ্রহায়ণের বেলা পড়িয়া গিয়াছে। মেজ-বৌ বাপের বাড়ী গিয়াছে আশ্বিন মাসে—শ্যামল তাকে আনিতে গিয়াছে। কাল-পরশু আসিবে। পঞ্চমীও জ্যৈষ্ঠমাসে মায়ের কাছে গিয়াছিল—দিনকয়েক হইল ফিরিয়াছে। এ বেলা সেই রাঁধিবে। বড়-বৌ বৈকালের কাজ সারিয়া ধান সিদ্ধ করিবার জন্ত উনান জ্বালিল।

'বাড়ীতে আছ গো মা?' এক বৈষ্ণবী ঝুলি কাঁধে আসিয়া দাঁড়াইল। বড়-বৌ ফিরিয়া দেখিয়া বলিল, 'এই অবেলায় ভিক্ষা?'

'ভিক্ষে না মা, ভিক্ষে না', বৈষ্ণবী হাসিয়া বলিল, 'ভিক্ষে নেব আর একদিন। আমার মাসীর কাছে নতুন এসেছি এখানে; মাসীর জ্বর, বড্ড শীত পড়ে রাত্তিরে—একখান কাঁথাটাথা দাও যদি বেঁচে যাই—'

দু'যায়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল। পরশমণি বা কর্ত্তা, কি ছেলেদের কেহ মুষ্টি-ভিক্ষা ছাড়া অন্য কিছু দিতে একান্ত নারাজ। মেজ-বৌ থাকিলে বা জোরজবরদস্তি করিয়া কিছু দেয়। এ বৈষ্ণবী নতুন, এখানকার কোন ফকির বৈষ্ণব এ বাড়ীতে নিয়মের ভিক্ষা ছাড়া কিছু চায় না—তারা জানে। অথচ এই অবেলায় সামান্ত জিনিষটা চাহিয়া পাইবে না—এটা কেমন হয়?

'থাকে যদি তবে দাও মা—ছেঁড়াখোঁড়া যাই হোক্—আর ওষুধ নেবে মা? আমার কাছে খুব ভাল বাতের ওষুধ আছে—শনিবার দিন সকালে উঠে জল না ছুঁয়ে যদি বাঁ হাতে বাঁধ,—একেবারে সেরে যাবে।' বলিতে বলিতে বৈষ্ণবী ঝুলি নামাইয়া একখণ্ড নেকড়ায় বাঁধা পুঁটুলি খুলিয়া খানিকটা জড়ান শুকনো শিকড় বাহির করিল; তাহার এক টুকরা ভাঙ্গিয়া হাতে রাখিয়া বাকী শিকড়টা আবার বাঁধিয়া ঝুলির ভিতরে রাখিয়া দিল। বলিল, 'নাও, ঘরে রেখ, কাজ দেবে।'

পঞ্চমী ঘোমটাটুকু সরাইয়া আগাইয়া আসিয়া বলিল, 'দিদি আমার মা বড্ড কষ্ট পাচ্ছেন—আমারও একটু নিয়ে দাও —'

'বাত না আছে কার মা? এই যে এত খাটো-খোটো দু'দিন বসেছ কি বাত ধরেছে। তা তোমায় আর আলাদা দিতে হবে না—এরই থেকে একটু ভেঙ্গে নিও। এমন ওষুধ আর পাবে না—পরখ করে দেখো—'

বড়-বৌ শিকড়টুকু লইয়া অর্দ্ধেকটা ভাজিয়া পঞ্চমীর হাতে দিল, বলিল, 'বাক্সে রেখে আয়। উনি তো রোজই হাত-পায়ের ব্যথায়—উঁঃ আঃ করেন, দেখি পরশু তো শনিবার—'

পঞ্চমী ঔষধ রাখিয়া আসিতে গেল। ফিরিল একখানা কাঁথা হাতে করিয়া, বৈষ্ণবীকে দিয়া বলিল, 'এই নাও, আমার মার সেলাই করা কাঁথা, আমায় দিয়েছেন—বাক্স থেকে বারও করে নি—'

বৈষ্ণবী বলিল, 'তোমার মার হাতের জিনিষটা রাখ, —আর একটা থাকে ত দাও।'

'না—এইটাই নিয়ে যাও। মা সেলাই করে দেবেন আবার একটা—মার বাক্সে এগারখানা কাঁথা আছে।'

'আমি তোমায় কাঁথা দিতে পারলাম না,—কাপড়ও নেই। এই গামছাটা নতুন, নাও মাথা মুছতে পারবে।'

রান্নাঘরের বেড়ায় গোঁজা গামছাটা বড়-বৌ বৈষ্ণবীকে দিয়া দিল।

বৈষ্ণবী হাসিয়া বলিল, 'দাও মা, ভালবেসে যা দেবে তাই ভাল—মনে ক'র না আমি তোমাদের ঠকিয়ে গেলাম। এমন ওষুধ আর নেই—আবার আমি কতবার আসব তোমাদের বাড়ী—তখনই শুনতে পাব—মাসীর কাছেই থাকব এখন থেকে—একটা পান দেবে?'

মেজ বৌ এখানে না থাকিলে পান রান্নাঘরেই থাকে —কুয়ার ধারে গাছ-পানের লতা সুপারীগাছকে জড়াইয়া উঠিয়াছে। গোটা দুই পান ছিঁড়িয়া পঞ্চমী সুপারী খয়ের দিয়া সাজিয়া বৈষ্ণবীকে দিল। সুপারী গাছ হইতে পাড়িয়া বিশাল বিক্রী করিয়া ফেলে। গাছতলায় যা পড়ে—বৌয়েরা কুড়াইয়া গোপনে রাখে,—তাতেই তাদের পান খাওয়া চলে। তবে মেজ-বৌ ভাসুরের কাছে ইদানীং চাহিয়া লইয়া বৎসরের সুপারী নিজের ঘরে রাখিয়া দেয়।

বৈষ্ণবী চলিয়া গেলে বড়-বৌ সন্ধ্যাবাতি জ্বালিতে গেল। পরশমণি বেড়ান শেষ করিয়া সেদিনের মত ফিরিয়া আসিতে আসিতে মেজ-বৌয়ের উদ্দেশ্যে বলিতেছেন, 'ছেলেটা যদি রেখে যায়!—একা একা মরি, কে দেখে,—নবাবের বেটির ছেলে কোলে বাপের বাড়ী না গেলেই নয়,—যত রাজ্য ঝেঁটানো ছাইমুখীরা আমারি কপালে এসে জুটেছে।'

বিশালের ঘরের বারান্দা পরশমণির বৈঠকখানা। হাত-পা ধুইয়া সেখানে বসিলেন। বাড়ীর বড় কৃষাণটি দিয়াশলাই চাহিতে আসিয়াছে, ওদিক হইতে বড়-বৌ আসিতে আসিতে কৃষাণকে দেখিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া শাশুড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া মৃদু স্বরে বলিল, 'কি রান্না হবে?'

—'যত ঘোমটা—তত খেমটা! সকলকে ভোলাওগে, আমায় ভোলাতে পারবে না'—বেড়ার বাতায় আটকানো দেশলাইটা কিষাণের দিকে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, 'আর আমায় জিজ্ঞাসা কেন,—বলি আমায় জিজ্ঞেস করা কেন? যখন সোয়ামী-বশের ওষুধ-পত্তর করা হয়—মন্তর-তন্তর করা হয়—তখন কোন্ বিবি আমায় জিজ্ঞেস করতে আসে? বলি, দাসী-বাঁদি যাই হই,—দশমাস পেটে ধরেছি—কোন্ চোখখাকী না বলবে? আজ বড় আপনার হয়েছে সব, বিষ খাইয়ে মারলেও আমি কথাটি কইতে পারব না—?'

বড়-বৌ বুঝিল পরশমণি কথায় উত্তর দিবেন না—সে তখন ফিরিয়া গেল।

সন্ধ্যার পরেই খাওয়া-দাওয়া মিটিয়া যায়। পঞ্চমী বলিল, 'দিদি আজ আর ধান সেদ্ধ কর না—দু' হাঁড়ি করেছ, ওতে দু'দিন হবে। তুমি ওদের ডেকে আন—সারাদিন উপোস করে রয়েছ, ওঁদের খাওয়া হলেই তুমিও দুটো মুখে দিতে পারবে—'

বিশাল ঘরে বিছানায় উত্তেজিত ভাবে বসিয়া, নীচে দরজার কাছে মা, বড়-বৌ কাছে গিয়া মৃদুস্বরে বলিল, 'মা, খেতে যেতে বলুন সবাইকে—'

'এই যে এস খাওয়াচ্ছি'—লাফ দিয়া বিশাল নামিয়া বড়-বৌয়ের সামনে দাঁড়াইল—'বলি, আবার কি করা হয়েছে, অ্যাঁ?—ওষুধ? ওষুধ করবার সখ মেটে নি? কিসের ওষুধ কিনেছ নতুন গামছা দিয়ে?'

বড়-বৌ ভয় পাইয়া পিছাইয়া যাইতে যাইতে অস্ফুট স্বরে বলিল, 'বাতের ওষুধ—'

'বাতের? আমার চোখে ধুলা দেবে? শয়তানি, এখনও তোমার কু-মতলব গেল না—'

পরশমণি বলিলেন, 'ঐ দেখ্ না, এখনও ওর আঁচলে বাঁধা রয়েছে—'

বড়-বৌয়ের হাত চাপিয়া ধরিয়া এক ঝটকায় টানিয়া ঘরের মধ্যে আনিয়া বিশাল তাহার আঁচলের গিরা খুলিয়া দেখিল, সেই ঔষধটা। এক মুহূর্ত্ত সেটা দেখিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, 'দূর হয়ে যাও—দূর হয়ে যাও—

জন্মের মত ত্যাগ করলাম তোমায়—অবিশ্বাসিনী, শয়তানী,—বেরোও ঘর থেকে—'

ঠেলা খাইয়া চৌকাঠে বাধিয়া বড়-বৌ পড়িয়া গেল।

সেই শব্দে ও বিশালের কণ্ঠস্বরে সুখেন আসিয়া পড়িল। পঞ্চমী ছুটিয়া আসিয়া লজ্জা-ভয় ভুলিয়া ঘরে ঢুকিয়াছে। কৃষাণেরা থালা ও ঘটি হাতে অন্দরে খাইতে যাইতে থমকিয়া দাঁড়াইয়া আগাইয়া আসিল। বিশাল তখন উন্মাদের ন্যায় গাহিতেছে, 'সেই সময় খুন করে ফেলা উচিত ছিল,—উচিত ছিল আমার। তুমি সব পার,—সব পার—যে স্ত্রী স্বামীকে ওষুধ করে বশ করতে যায়—তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারা উচিত—'

সুখেন বলিল, 'কি হয়েছে দাদা ?'

পরশমণি বলিলেন, 'যা হয়ে থাকে। আমি গেছি দে-বাড়ী—ওদের নতুন বৌ এল, দেরী হয়ে গেল আসতে। বাঁশতলা দিয়ে ঢুকতে দেখি এক বোষ্টমীর কাছে নিজের গামছাটা দিয়ে ওষুধ কিনে নিলে—বোষ্টমীটিকে দেখিনিও কোনদিন। তারপরে ঘুরে সদর দিয়ে এসে উঠলাম। আমি না দেখলে সর্ব্বনাশ হয়ে যেত। কতদিন থেকে বলছি—দে ওটাকে তাড়িয়ে—একটা বিয়ে করে ঘর-সংসার কর। এমন ডাইনী কি ঘরে পুষে রাখতে আছে ?—ভাবিস্ মা বুঝি কেবলি মিথ্যা বলে ? নিজে দেখলি ত ? তবু হাড়হাবাতে পড়শীরা বলবে—শাশুড়ীরই দোষ—'

কৃষাণরা বাহিরে ফিরিয়া গেল।—এ ব্যাপার নিয়ত দেখিয়া তারা অভ্যস্ত। বড়-বৌ উঠিয়া বসিয়াছে, পঞ্চমী পরশমণির কাছে বসিয়া পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, 'মা, ও যে বাতের ওষুধ—দিদির দোষ নেই—আমিও বাত জন্যে নিয়েছি—'

'সর-সর! তোমার আর ভাল-মানুষি করতে হবে না—তুমিও ঐ দলের!—শুনলি বিশু ? ডাইনি এটাকেও সব শেখাচ্ছে পড়াচ্ছে! সুখু তো বৌয়ের পাদ-পদ্ম সার করেছে, বুঝবে ঠেলা এর পর—'

বিশাল রুক্ষ স্বরে বলিল, 'ছোট বৌমা,—তুমি ওর সঙ্গে মিশ না, তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি। যাও, রান্নাঘরে যাও, ভাত বাড়ো গে—আমরা আসছি। আর ওর হাতে আমি খাব না—আমার জন্তে তুমি, মেজ-বৌ, নয় ত মা রাঁধবে—মনে রেখ।'

ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে পঞ্চমী উঠিয়া গেল। সুখেন বলিল, 'বড়-বৌ নিজের দোষে কষ্ট পায়—ওর বুদ্ধি সত্যিই ভাল নয়—'

'মরুকগে,—চল্ খেতে যাই, ছোট বৌমা বসে থাকবে আবার। ও আমায় বশ করবে ওষুধ দিয়ে—ছি-ছি-ছি! ওর মুখ দেখলে পাপ হয়।—দু'দুবার—দু'বারই ধরা পড়েছে—ভগবান আছেন।'

খাওয়া-দাওয়ার পরে যে যার ঘরে গেল। বড়-বৌ নিজের ঘরের বারান্দায় চুপ করিয়া বসিয়া আছে। পঞ্চমী আর তাহাকে ডাকিতে সাহস করিল না। নিজেও খাইল না। হেঁসেল তুলিয়া ঘরে গিয়া দরজা দিল। সুখেনের পরীক্ষা সামনে—বিছানায় বসিয়া বই পড়িতেছে, পঞ্চমী তাহার গায়ের উপর কাঁদিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল, 'ছাখ, তুমি কি ভাবলে আমায় ? তুমিও কি ভাবলে ও বশ করবার ওষুধ ?'

সুখেন তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, 'না, তুমি কেঁদ না চুপ কর—তবে বড়-বৌয়ের সঙ্গে মিশ না—ও সব পারে।'

'কখখনো না, এ বাতের ওষুধ—'

'তুমি কি বুঝবে ? তোমাকে যা বোঝাবে তাই। ঘরে ঘরে বেশীর ভাগই ওষুধ-বিষুধ চলে—কানু মিস্তির, দেবু দে, শুরো মণ্ডল, বেণু দত্ত এদের মত বদমাস—যারা বৌকে সাতবার বাড়ী থেকে না তাড়িয়ে জল গ্রহণ করে না—নিধু পরামাণিকের বৌয়ের কাছে থেকে ওষুধ নিয়ে নিয়ে এদের বৌরা এদের বশ করে ফেলেছে! সন্ধ্যার পর কেউ আর কোথাও যায় না—'

'সে শুনেছি, নিধু পরামাণিকের বৌকে ত বটঠাকুর আমাদের বাড়ী আসতেই বারণ করে দিয়েছেন।—ঘাটে যেতে দু'একদিন দেখেছি পথে। মেজদি বলে ওষুধে অনেকে খোঁড়া হয়—কানা হয়—কেউ অবশ হয়ে যায়—'

'সে হবেই, দ্রব্যগুণ যাবে কোথা ? এই সব বাজে স্ত্রীলোক একটা বলে আর একটা দেয়, চেনে না ত ? কাজেই বিপরীত ফল হয়। সাবধান, তুমি কখনো

ওদিকে চেও না, এই বোষ্টমী ফকিররা অনেক কিছু জানে। আমি আর আমাদের বাড়ী ওদের আসতেই দেব না—'

'তা হলে দোষ তার—দিদির নয়। আমি সেখানে ছিলাম যে। বট্‌ঠাকুর বিশ্বাস না করলেন, তোমরাও করবে না? দিদি দাঁড়াবে কোথা?'

নিজের কাপড়ে পঞ্চমীর চোখের জল মুছাইয়া সুখেন বলিল, 'ও সব ভেব না, বই থাক্‌গে। এস গল্প করি—' আলো নিভাইয়া উভয়ে শয়ন করিল। সুখেন বলিল, 'আমার জন্তে তুমি পূজো মেনে রেখ পঞ্চমী, সুবচনী সুমতি পূজো। পাশ করি যেন, ফেল করলে সবাই দুষ্‌বে তোমায়—'

পঞ্চমী কথা কহিল না। দিবানিশি সে দেবতার পায়ে স্বামীর সফলতা কামনা করে—সুখেন ফেল করিলে তার যে দশা হইবে, সে কিছু কিছু বুঝিতেছে যেন।

রাত্রি বাড়িতে লাগিল। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠিতেছে, জ্যোৎস্না উজ্জ্বল নয়। বড়-বৌ উঠিল। সারা দিনের উপবাস, পিপাসায় গলা শুকাইয়া গিয়াছে। ধীরে ধীরে দরজা বন্ধ করিয়া কলসীর কাছে গিয়া এক গ্লাস জল ঢালিয়া খাইল।—বিশাল বিছানায় শুইয়া উপন্যাস পড়িতে পড়িতে আড়চোখে চাহিয়া দেখিতেছে, বড়-বৌ উঠিয়া দাঁড়াইতেই কঠোর সুরে বলিয়া উঠিল, 'খবরদার—এ বিছানায় এস না, বিছানা ছোঁবে কি তোমার একদিন—'

বড়-বৌ বিছানার দিকে যায় নাই। মাদুর পাতিয়া মাটিতেই শুইবে মনে ভাবিয়াছিল—বিশালের ঐ কথার পর আর তার পা কোন দিকে সরিল না—ধীরে ধীরে সেইখানে বসিয়া পড়িল।

খানিকক্ষণ পরে বিশাল বাতি নিভাইয়া দিল—আরও কিছুক্ষণ পরে তার নিশ্চিন্ত নিদ্রার নাসিকাধ্বনি হইতে লাগিল। তখন নিঃশব্দে বড়-বৌ উঠিয়া দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া দরজা টানিয়া ভেজাইয়া রাখিয়া উঠানে নামিল। ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া ডান হাতের শাঁখাটি ভাঙ্গিয়া সেই শাঁখায় কপাল কাটিয়া গিয়াছিল, কপালে ও গালে রক্তের ধারা জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে।

[৮]

আপন কর্ত্তব্য পথ রয়েছে তোমার—
সম্মুখেতে প্রসারিত। ত্যজিয়া তাহার
অদৃষ্ট তিমিরগর্ভে করো না প্রবেশ—

তখনও রাত্রি আছে। খোলা মাঠে শীতের হাওয়া বড় কন্‌কনে। শেষ-জ্যোৎস্নায় বছিরদ্দী সেখ ধানের দর যাচাই করিবার জন্য ও নূতন ঘরের এক বাঁক টিনের জন্য রাঘবপুর হাটে চলিয়াছে, বাড়ী হইতে হাট দু'ক্রোশ। ভোরেই ফিরিয়া আসিয়া আবার গাড়ী করিয়া হাট-বেলার আগে ধান লইয়া যাইতে হইবে।

চারিদিকে লোকজনের সাড়া-শব্দ নাই। বছিরদ্দী শীষ্‌ দিয়া মৃদু মৃদু গান গাহিতে গাহিতে হাতের বাঁশের লাঠিখানা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া স্বচ্ছন্দভাবে পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ চমকিয়া উঠিল, বাঁ দিকে একটা পুকুরের পাড়ের কলাগাছের সারির আড়ালের পথ হইতে একটি স্ত্রীলোক আসিয়া মাঠের পথ ধরিল।

বছিরদ্দী ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতে দেখিতে চলিবার গতি মন্দ করিল। স্ত্রীলোকটি আগে আগে যাইতেছে, বছিরদ্দী পিছনে। কিছুদূর গিয়া মেয়েটি শ্রান্ত ভাবে দাঁড়াইল, একবার পূর্ব্বদিকে মুখ ফিরাইয়া চাহিল। বছিরদ্দী তখন কাছে গিয়া পড়িয়াছে, মেয়েটি ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছে, যেন চলিবার সাধ্য নাই। বছিরদ্দী প্রশ্ন করিল, 'তুমি কে গো?'

মেয়েটি সহসা ভয় পাইয়া চমকিয়া উঠিল। বছিরদ্দী ঝুঁকিয়া তীক্ষ্ণ চোখে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল, মাথায় কাপড় নাই, একরাশি রুক্ষ চুল জড়ান একটা প্রকাণ্ড খোঁপা, আধ-ময়লা একখানা কাল-পাড় কাপড় পরা, দু'তিন জায়গায় ছেঁড়া কাপড়খানার আঁচলখানা আঁট করিয়া গায়ে জড়ান। শ্রান্ত, ভাঙ্গিয়া-পড়া দুটি সুন্দর চোখ, মুখখানা শুকনো, ভয়ে যেন ফ্যাকাশে হইয়া গেল।

'তুমি, তুমি—তোমাকে চেন-চেন করছি যেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক, তুমি বিশ্বাসদের বড়-বৌ না?'

বড়-বৌ যেন চেতনা পাইল, আস্তে আস্তে মাথার কাপড় তুলিয়া দিল।

'আল্লা! আল্লা! আমি কিছু বুঝতে পারছিনে,—তুমি এ পথে কোথা? আর এই রাত্তিরে? বল দেখি কি হয়েছে?'

বড়-বৌ চিনিল, তাদের রাখালের বাপ বছিরদ্দী সেখ; কোন দিন তার সাথে কথা বলে নাই। বছর কতক আগে এও বিশ্বাসদের বাড়ীতে কৃষাণ ছিল, এখন নিজের চাষবাস দেখা শোনা করে।

'অবিশ্বাস করিস্‌নে মা! ভয় পাসনে, বল্ দেখি কেন বেরিয়েছিস্?'

'আমার আর ও বাড়ী জায়গা নেই, আমি নবদ্বীপ চলে যাব।'

বড়-বৌয়ের কণ্ঠ আহত পাখীর মত সেই নির্জ্জন মাঠে করুণ সুরে বাজিয়া উঠিল। বছিরদ্দী বলিল, 'জানি ওরা মানুষ নয়। কিন্তু একা তুমি নবদ্বীপ যাবে কি করে? সে কি এখানে? ইষ্টিমার ঘাটে, রেলে তবে যেতে হয়। আর দিন হলেই তোমায় লোকে ছেঁকে ধরবে যে?'

'তবে—তবে কি করব?' অসহায় ভাবে বড়-বৌ সেইখানে বসিয়া পড়িল।

বছিরদ্দীও দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, কি করা যায়, ইহাকে ফিরাইয়া লইয়া গেলে—তারা আর নিবে না, একেবারেই ত্যাগ করিবে বছিরদ্দীর সঙ্গে দেখিলে। বছিরদ্দী সাধু নয়, একটি বিবাহের ও দুটি নিকার বৌ। তা ছাড়া অন্য দুর্নামও যথেষ্ট আছে। পথের মধ্যে এ কি বিপদ। ইহাকে ফেলিয়া যায়ই বা কি প্রকারে? বিপদ্ চারিদিকে হাত বাড়াইয়া আছে, এর মধ্যে একে রাখিয়া এক পা চলা চলে না!

হঠাৎ যেন কূল পাইয়া বলিল, 'আচ্ছা এক কাজ করি, তোমাদের গুরুঠাকুরের বাড়ী যাবে? সে এই সামনের মাঠ পরেই,—তেনার কাছে গিয়ে যা বলেন শুনে তখন ক'রো তাই। কি বল? ভাল না?'

'গুরুদেব? এই দিকে বাড়ী? সে যে নীলগঞ্জে?'

বছিরদ্দী একটু হাসিয়া বলিল, 'এই নীলগঞ্জ।'

'নীলগঞ্জ? আমাদের বাড়ী থেকে—'

'দু'-পো কিটি, তোমাদের বাড়ী থেকে আড়াই কোশ, মনের ঝোঁকে চলে এসেছ বুঝতে পার নি। এস, আর দাঁড়িও না, ভোর হল বলে—'

বছিরদ্দী আগে আগে চলিল। এক এক বার ফিরিয়া দেখে—বড়-বৌ পিছাইয়া পড়িতেছে, তখন আস্তে হাঁটে।

রাধাবিনোদ গোস্বামী ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে বিছানা ছাড়িয়া ওঠেন। বংশে বহু শাখা,—পৈত্রিক দালান-পুকুর ছাড়িয়া দিয়া অন্য পাড়ায় খড়ের ঘর করিয়া সপরিবারে উঠিয়া আসিয়াছেন। বাড়ীর সামনে খোলা মাঠ—বহুদূর দেখা যায়। অন্য তিন দিকে গাছ-পালায় ঘেরা। ভোর-ভোর সময়ে বছিরদ্দী বড়-বৌকে সঙ্গে লইয়া গোস্বামীর বাড়ীতে আসিয়া উঠিল।

বাড়ীর সামনে ফুলের বাগান, গোস্বামী নামাবলী গায়ে জড়াইয়া বাগানের ধার দিয়া পাদচারণা করিতে করিতে নিজ মনে স্তব পাঠ করিতেছিলেন। বড়-বৌ আসিয়া তাঁহার পায়ের উপর পড়িল।

গতি বন্ধ করিয়া গোস্বামী চাহিলেন। ভোরের আলোতে ও জ্যোৎস্নায় মাখামাখি হইয়া দিন কি রাত্রি বোঝা যায় না। কাকগুলি এক এক বার ডাকিয়া উঠিয়া আবার চুপ করিতেছে। খণ্ড চাঁদ বিবর্ণ, শুক-তারা জ্বলিতেছে, গাছপালার মসীবর্ণ ঘুচিয়া কতকটা সুস্পষ্ট ভাব।

'নারায়ণ—নারায়ণ—কে মা তুমি? ওঠ—ওঠ', হাত ধরিয়া গোস্বামী বড়-বৌকে তুলিলেন। সেই উষা ও জ্যোৎস্নাবেশা ম্লান ছায়ার মত মেয়েটি কম্পিত করুণ সুরে বলিল, 'বাবা আমায় আশ্রয় দিন।'

পিছন হইতে বছিরদ্দী সামনে আসিল, বলিল, 'চিনতে পারেন নি ঠাকুর মশায়? বিশ্বেসদের বড়-বৌ।'

'ওঃ—চিনেছি—কিন্তু এ—এ এর খানে কি?—কপালে মুখে রক্তে মাখামাখি—হাতে শাঁখা নেই, এ কি ব্যাপার?'

'মা বল তোমার কথা তুমি নিজে—বল দেখি।'

গোস্বামী সেইখানে বসিলেন, বড় বৌ তাঁহার পায়ের কাছে বসিল—বছিরদ্দী বসিল একটু দূরে।

দিনের আলোকে যা পারা যায় না, রাত্রের রহস্যময়

আঁধারে তা সহজসাধ্য হয়। যে বড়-বৌয়ের মুখে অতি-নিকটের পাড়া-পড়শীও একটি কথা কোন দিন শুনিতে পায় নাই, সেই দীনা ভীরু কুণ্ঠিত-স্বভাবা মেয়েটি অকপটে নিজ জীবনের সমস্ত কাহিনী নিবেদন করিল তাঁরই কাছে,—যাঁকে ঘোমটার মধ্য হইতে বছরে দুইবার সে প্রণাম করিয়াছে মাত্র। আকাশে সাক্ষী চাঁদ ও তারা—একদিকে মাঠ, অন্য দিকে শ্রেণীবদ্ধ গাছগুলি পায়ের উপর দিয়া ঘন সবুজ মাথা তুলিয়া দেখিতেছে; সামনে নির্ব্বাক অধোমুখ গোস্বামী, অদূরে বলিষ্ঠ-সাহসী প্রকাণ্ডকায় বে-পরোয়া বছিরদ্দী—সেও অধোমুখ।

সব কথা শোনা হইয়া গেলে গোস্বামী বলিলেন, 'মা বুঝেছি, এর পর সহ্য করা অসম্ভব। যা তুমি এতদিন পেরেছ এই আশ্চর্য্য। কিন্তু কোথায় যাবে? তুমি সুন্দরী, অল্প বয়স, বিপদ পদে-পদে, সুখ দুঃখ কিছু চিরস্থায়ী নয়। তোমার পাপ ক্ষয় হচ্ছে—এটা মনে ক'রো। এ জীবনে হয়ত তেমন পাপ করনি, যার জন্যে এই শাস্তি পাচ্ছ, কিন্তু গত জন্মের কথা কিছুই তো মনে নেই? জন্ম-জন্মান্তরে কৃতকার্য্যের ফল ভোগ করতে হয়—ঐ বিধির বিধান। এ লঙ্ঘন করা কার সাধ্য নেই। এই যে ঘর ছেড়েছ—যদি এর চেয়েও কষ্ট পাও,—তখন মনে হবে—এই ছিল ভাল। মা, মন নিজের বশে, মনকে বশ কর—এত কষ্ট হবে না। তার পর এক দিন না একদিন সুদিন আসবেই।'

এমন মিষ্ট মধুর করুণ সুরে ধীরে ধীরে বুঝাইয়া গোস্বামী কথাগুলি বলিলেন যে, বড়-বৌয়ের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অন্তরের জ্বালা সান্ত্বনার সুধাময় প্রলেপের মত জুড়াইয়া দিল। গোস্বামীর কথা শেষ হইলে বলিল, 'আপনার কাছে যদি থাকি?—'

'সেই দাস্য-বৃত্তিই যদি কর,—নিজের ঘরেই কি ভাল নয়? এখানে এমনও হতে পারে—তোমার সেখানের চেয়েও কষ্ট বেশী হবে? তা ছাড়া তুমি হবে কৌতূহলের জিনিস—অহরহ সকলের কৌতূহল মেটাতে মেটাতে শ্রান্ত হয়ে পড়বে। আর কিছু দিন দেখ,—তার পরেও যদি পরিবর্ত্তন না হয়—আমাকে জানিও,—আমি নিজে গিয়ে তোমাকে নিয়ে আসব। তার পরে কোন তীর্থেই রাখি কি এই বাড়ীতেই রাখি, সে তখন দেখব, এখন এ ভাবে তোমার কোথাও থাকা হয় না। তুমি ফিরে যাও, এবার মন বেঁধে দেখি মা, যে যত আঘাত করুক নিও না, মনে ক'র, এ সব তাঁরই পরীক্ষা, তিনি তোমার কষ্টের মধ্য দিয়ে বিশুদ্ধ করে তুলবেন—'

'বাবা, মন বাঁধব কি দিয়ে? কতবার মনে হত—যদি দীক্ষাটাও নিতাম। কষ্ট-দুঃখ পেলে নিজের মনে একটু জপ-সন্ধ্যা করেও শান্তি পেতাম, কত বলেছি ওদের। বলেন বড্ড খরচ—কে অত টাকা দেবে? মনে যখন দুঃখ পাই, কোথাও কূল-কিনারা পাই না,—কাকে ডাকব? কি বলে ডাকব—? শুধু আঁধারে হাতড়ে বেড়াই—'

গোস্বামী স্থির ভাবে কয়েক মুহূর্ত্ত বড়-বৌয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। বলিলেন, 'তুমি দীক্ষা নেবে? ইচ্ছা হয়েছে? আচ্ছা—আমি তোমায় দীক্ষা দেব—কোন খরচ লাগবে না। কৈ কোন দিন আমায় বলনি ত? যাও স্বামীর ঘরেই ফিরে যাও, এই মাসেই তোমায় দীক্ষা দেব—।

বড়-বৌ মাথা নীচু করিল, চোখের জল লুকাইতে লুকাইতে বলিল, 'তা হলে আমি সহ্য করতে পারব সব—তবে যাই এখন?'

গোস্বামী হাসিলেন, সদুঃখে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'এত অবোধ? এত সরল? এমন লোকও রাত্রে ঘর ছেড়ে বেরোয়, না জানি সে কি ভীষণ অত্যাচার! না—মা, তোমার এ ভাবে যাওয়া হবে না, ঝোঁকের মাথায় এসেছ পথ চিনবে না—'

'বছিরদ্দী মিয়ার সঙ্গে যাব—'

'তা হলে আর ভাল!—এস বাড়ীর ভিতরে এস, সারা দিন-রাত্রি উপবাসী, আমার অনাহূত অতিথি তুমি, স্নানাহার বিশ্রাম করে নাও, আমি তোমায় নিজে নিয়ে যাব। বছিরদ্দী, তুমিও আমার সঙ্গে যাবে—তুমিও এস বাড়ীতে।'

[ক্রমশঃ

মধ্য-বঙ্গের বিধ্বস্ত পল্লী-অঞ্চলের পুনঃসংস্কার

—শ্রীহরিদাস মিত্র

জাতিসমূহের বর্ণানুক্রমিক সূচী ও বিশেষ পরিচয় *

(সাঙ্কেতিক চিহ্ন সকলের ব্যাখ্যা)

V ক চিহ্নিত জাতিগুলি ক্ষয়িষ্ণু।

ধ খ চিহ্নিত জাতিগুলি স্থিতিশীল। হ্রাসবৃদ্ধি নাই।

D গ চিহ্নিত জাতিগুলি দ্রুতবর্দ্ধনশীল।

Q ঘ চিহ্নিত নিম্ন-জাতিগুলির পৃথক্ ব্রাহ্মণ, পরামাণিক আছে।

ম ঙ চিহ্নিত নিম্ন-জাতিগুলির পৃথক্ ব্রাহ্মণ নাই।

এ চ চিহ্নিত জাতিগুলির শিল্প বা বৃত্তি অধুনা লুপ্ত।

Ŋ ছ চিহ্নিত জাতিগুলি মুসলমান-ধর্ম্মী।

M জ চিহ্নিত জাতিগুলি মুসলমান-সংশ্লিষ্ট।

I ঝ চিহ্নিত জাতিগুলি পূর্ব্বে বৌদ্ধ-ভাবাপন্ন।

ম ঞ চিহ্নিত জাতিগুলি শাক্ত।

ন ট চিহ্নিত জাতিগুলি শৈব।

M ঠ চিহ্নিত জাতিগুলি গৌড়ীয় বৈষ্ণব।

দ্রষ্টব্য:—ইংরাজী, লাটিন প্রভৃতি বিদেশীয় শব্দ নাগরী অক্ষরে দেওয়া হইবে।

V ক আচার্য্য ব্রাহ্মণগণ—আপনাদিগকে গ্রহবিপ্র ও শাক-দ্বীপীয় মগ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন। ব্রাহ্মণ-সমাজে ইহাঁদের নিম্নস্থান, লোকব্যবহার বশতঃ।

VM কজ ভাটুলাই ব্রাহ্মণগণ—অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী নিষ্ঠা-বান ও এদেশের ভূস্বামী ছিলেন। ভৈরব নদের অপর পারে সে সময়ে প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি কালিদাস রায়, বিভাগদি গ্রামে সমাজপতিরূপে দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থদিগের মধ্যে মর্য্যাদা লাভ করেন। কালিদাস রায়ের মাতৃশ্রাদ্ধের ভোজ্য (সিধা) এবং দান, ভাটুলাই ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করেন। ইহাতে বিশেষ অপমানিত হওয়ায়, কালিদাস রায় চক্রান্ত করিয়া, এই বংশকে, মিথ্যা কলঙ্কে, সমাজে পতিত করেন। এইরূপ কিংবদন্তী এতদঞ্চলে প্রচলিত। ভাটুলাই ব্রাহ্মণগণ মাত্র কয়েকটী পরিবারে দাঁড়াইয়াছেন। কয়েকটী প্রকাণ্ড বট, বকুল, স্বর্ণচম্পক, অশোকাদি বৃক্ষ এবং কয়েকটী বড় বড় দীর্ঘিকা শৈবাল তৃণপূর্ণ হইয়া, পূর্ব্বগৌরবের সাক্ষ্য দেয়। গৃহ-দেবতা কালাচাঁদ, কৃষ্ণপ্রস্তরের গোপালমূর্ত্তি এতদঞ্চলের প্রাচীন শ্রীবিগ্রহ। নিতান্ত দুঃখ, দারিদ্র্যের মধ্যেও (ভাটুলাই ব্রাহ্মণ) রায় পরিবারদের সঙ্গীত এবং অভিনয়-পটুতা পূর্ব্ব আভিজাত্যের শেষ চিহ্নরূপে লক্ষ্যযোগ্য। ভাটুলা পরগণার নাম—'ভট্টপাল' বা 'ভট্টালয়' হইতে ব্যুৎপন্ন কি না বিবেচ্য।

ভৈরব নদের অপর পারে উত্তর-রাঢ়ীয় চাঁচড়ার রাজগণ 'অভয়া' নগরে অল্পদিন রাজধানী পত্তন করিয়া, দ্বাদশ বৃহৎ শিবলিঙ্গাদিযুক্ত গড়-বেষ্টিত প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। দ্বাদশটী শিব-মন্দির সবিগ্রহ আজিও বর্ত্তমান। সর্ব্ববৃহৎ মন্দিরের কারুকার্য্য উৎকৃষ্ট। অভয়ানগরের চতুষ্পার্শ্বের ভাটপাড়া, পাইকপাড়া প্রভৃতি গ্রামে সম্ভবতঃ ভট্ট এবং পদাতিকদের বাস নির্দ্দিষ্ট ছিল লেখকের জন্মস্থান রাজঘাট গ্রাম, ঐ নানা ভূস্বামিগণের স্মৃতি বহন করিতেছে। রাজঘাট গ্রামের ব্রত-নৃত্যও প্রাচীন গ্রাম্যোৎসব বা অনুষ্ঠান হিসাবে, বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টি (এবং প্রশংসা) আকর্ষণ করিয়াছে।

VD কক বেদে, বেদিয়া—সংখ্যা: যশোহরে ২৮২; খুলনায় ৭।

বৃত্তি: একশ্রেণী কৃষি-জীবী ও শ্রমিক এবং ভাম, খাটাশ, বাঘডাঁশ, বন-বিড়াল, বাদুড় প্রভৃতি মারিয়া খায়। গুলতি (গুরোল) এবং ফাঁদ দিয়া ইহারা শিকার করে। নওয়াপাড়া থানার মধ্যে এই শ্রেণীর বেদিয়া আছে। ইহারা নিজেদের পরিচয় দেয়—শিক্রারি, ব্যাধ নামে।

অন্য একশ্রেণী বেদিয়াদের নাম-মাত্র ঘর-বাড়ী থাকিলেও ইহারা যাযাবর। বর্ষাকাল দেশে কাটাইয়া, অন্যান্য সময়ে সর্ব্বদা টোল ফেলিয়া বেড়ায়।

* এই প্রবন্ধের প্রথমাংশ গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

বৃত্তি : সর্প ধরা এবং খেলান ; অশ্বপালন ; তুবড়ি-বাজি, যাদু-বিদ্যা এবং মন্ত্রৌষধি প্রচার।

সর্প-বিষের আয়ুর্ব্বেদীয় এবং অন্যান্য চিকিৎসায় ব্যবহার থাকায়, ইহাও একটি মূল্যবান পণ্য। সর্প-চর্ম্ম এবং বসা(চর্ব্বি)মূল্যে বিক্রীত হয়। অজগর-জাতীয় সর্প-চর্ম্মে মূল্যবান পাদুকা, পেটিকা প্রভৃতি প্রস্তুত হয় ; এবং বসা, ঘৃতে ভেজাল দিবার জন্য দুষ্ট ব্যবসায়ীরা ব্যবহার করে। লেখকের বিশ্বাস, এতদ্বারা উৎকৃষ্ট ল্যুব্রিকেটিং অয়েল প্রস্তুত হয় ; এবং আসবাব, তৈজস, চর্ম্মাদি মসৃণার্থ রঞ্জন পদার্থের বেষ্ট-রূপে ব্যবহার হইতে পারে। হয়ত ঔষধার্থেও ব্যবহার চলে কি না, তাহাও অনুসন্ধেয়।

চব্বিশপরগণার মধ্যে ভাঙ্গড়ে বহু সর্পাজীবী (সাঁপুড়ে) বেদের বাস। যশোহরস্থ থাজুরা গফরপুরে এবং বনগ্রাম মহকুমার গাইঘাটা থানার মধ্যে এইরূপ বহু বেদিয়ার বাস।

অন্য একশ্রেণীর বেদিয়া যাযাবর-প্রকৃতির এবং ইহাদের চৌর্য্যাপরাধের অখ্যাতি আছে। সংখ্যা : বনগ্রাম মহকুমায় অধিক।

অন্য একশ্রেণী বেদিয়া যাযাবর-প্রকৃতির, কিন্তু নৌ-জীবী। ইহারা যাত্রী লইয়া যাতায়াত করে। ডুমুরিয়ায় শ্রেণীবিশেষ আছে। ইহারা নৌকাযোগে ভৈরব, মধুমতী বক্ষে সর্ব্বদা বিচরণ করে। কাঁচের চুড়ি, বালা প্রভৃতি বিক্রয় এবং বিনিময় করে। পূর্ব্বে ইহাদের নিকটে উৎকৃষ্ট শাক্তি (শুক্তি) ঝিনুক বিনিময়ে পাওয়া যাইত। সম্ভবতঃ বিল, বাওড় হইতে উহারা এইগুলি সংগ্রহ করিত।

কোন কোন জাতীয় বেদেরা পর পর অনেকগুলি বাঁশের নল (সাতনলী → সপ্তনলী) চালাইয়া, 'বেদের আটা' দ্বারা, নিঃশব্দ পদসঞ্চারে পক্ষী সকল ধৃত করে। বট প্রভৃতি বৃক্ষের আটা দ্বারা ইহারা যে পদার্থ প্রস্তুত করে, উহা এরূপ দৃঢ়ভাবে জড়াইয়া ধরে যে, তাহা হইতে নিস্তার পাওয়া অসম্ভব। 'বেদের আটা' প্রবাদ-বাক্যের বিষয় হইয়াছে। বেদেরা চড়ুই, শালিক প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষী নির্ব্বিচারে ধরিয়া খায় এবং তজ্জন্য শিকারি পাখী, শ্যেন, বাজপাখী পালন করিয়া থাকে। মুসলমান দরবেশ ফকিররাও বাজপাখী পালন করে। শ্যেন-পক্ষী পালন বিদেশীয় বিদ্যা বলিয়া অনুমান হয়। ভারতীয় বৈদিক আজ শৈনিক (শৈনিক ? শ্যেনপক্ষী বিষয়ক) বিজ্ঞান ও অর্ব্বাচীন গ্রন্থ।

৩ য বৈদ্য—সংখ্যা যশোহরে ২১৭৬ ; খুলনায় ২৫৯১। বৈদ্যগণ চিকিৎসা-ব্যবসায়ী এবং আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদ হইতে উদ্ভূত। এজন্য তাঁহারা বেদাধ্যায়ী। স্থলবিশেষে ইহাঁদের আচার-ব্যবহার প্রায়ই ব্রাহ্মণ-সদৃশ এবং কোথায়ও কায়স্থাদি তুল্য। পূর্ব্ববঙ্গে কায়স্থ এবং বৈদ্যের বিবাহ প্রচলিত ছিল এবং অদ্যাপি আছে। বল্লাল সেনের পূর্ব্ব হইতে বৈদ্যবংশে সিদ্ধ, সাধ্য ও কষ্ট, এই তিন শ্রেণী ছিল। তন্মধ্যে সিদ্ধগণ বল্লালের নিকট কৌলীন্য পান। সর্ব্ব সম্প্রদায়ের কুলীনগণের বাস যশোহর খুলনায় আছে। ইহাঁদিগকে বঙ্গজ বৈদ্য বলে এবং সর্ব্বপ্রধান কুলস্থান বলিয়া সেনহাটির প্রসিদ্ধি আছে। রাঢ়দেশে শ্রীখণ্ড সপ্তগ্রাম প্রভৃতি সমাজের বৈদ্যেরা রাঢ়ী বৈদ্য। তাহাদের মধ্যে শ্রীখণ্ডের আচার-ব্যবহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

ঘটক-কারিকার মহাকুলীন দুহি ও লক্ষ্মণ সেনের সভার অলঙ্কার স্বরূপ শ্রুতিধর ধোয়ীকবি অভিন্ন ব্যক্তি মনে হয়। তাঁহার দুই পুত্র কাশী ও কুশলী। কুশলী রাঢ় হইতে আসিয়া, শুভ মুহূর্ত্তে ভৈরবতটে শুভরাঢ়া গ্রামে বাস করেন। তথা হইতে বৈদ্য ডাঙ্গায় (বেজের ডাঙ্গা রেলওয়ে ষ্টেশনের সম্ভবতঃ প্রাচীন নাম) ও তৎপরে নিকটস্থ পয়োগ্রামে বাস করেন। মধুমতী তীরে ইতনা ও কালিয়া—যশোহর জেলায়, এবং মূলঘর ভৈরবতীরে —খুলনা জেলায় বৈদ্য-প্রধান বিশিষ্ট গ্রাম। বৈদ্যজাতি জ্ঞানে এবং গুণে, ধন-ধান্যে, বাংলার মধ্যে বিশিষ্ট শ্রেণী।

জীবন-চিত্র

—শ্রীবিজনবালা দেবী

বিশ্বকর্ম্মার বায়স্কোপ দেখা

বিশ্বকর্ম্মা বদলী হইলেন। জিনিস-পত্র সব প্যাক করিয়া পাঠাইয়া দিয়া নিজেরা পরে রওনা হইলেন। দীর্ঘকাল এক স্থানে বাস,—ফেয়ারওয়েল, অভিনন্দন, টি-পার্টি, ডিনার-পার্টি, নিমন্ত্রণ প্রভৃতি দেশী, বিলাতী আদর-অভ্যর্থনা শেষ হইলে একদিন প্রত্যূষে যাত্রা।

কলিকাতা কালীঘাট পার্কের সামনে বিশ্বকর্ম্মার দ্বিতীয় শ্যালকের বাস-গৃহ। সুরুচির বোনেরা, ভাই, ভ্রাতৃবধূ ও পিতা আসিয়াছেন। দিন কয়েক সেখানে বিশ্বকর্ম্মা বিশ্রাম করিবেন।

সকলে মিলিয়া একদিন সিনেমা দেখিবার পরামর্শ হইল। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'তরুণী দেখবে চল।'

সুরুচি বলিলেন, 'বাবাকে তরুণী দেখাব না কি? এমনি বাবাকে কোন থিয়েটার-সিনেমা দেখতে রাজী করা বিপদ। তার পরে যদি বা রাজী হয়েছেন—তরুণী দেখলে বলবেন কি?'

সুরুচির মেজ ভাই বলিল, 'তরুণীই ভাল। দেখে আসুন।'

ছোট তেজেন বলিল, 'না, বাবাকে তরুণী দেখানো উচিত নয়।'

শেষে সকলে ঠিক করিলেন—'দক্ষযজ্ঞ।' কিন্তু বিশ্বকর্ম্মা অন্তরে ক্ষুণ্ণ,—বলিলেন, 'সেই টিকি আর লম্বা সাদা দাড়ী নেড়ে 'হরিবোল'—'হরিবোল'—বলতে বলতে একশবার আসবে। অবশেষে সেই?'

বর্ণনা শুনিয়া সুরুচির মন দমিল। বলিলেন, 'তাই কি?'

মেজ ভাই বলিল, 'যেমন বুদ্ধি,—তাই দেখুন গিয়ে।'

সুরুচির দিদি বলিলেন, 'উনি এত করে বলছেন, তরুণীই দেখা যাক।'

সুরুচি বলিলেন, 'না দিদি, দক্ষযজ্ঞ দেখার ইচ্ছে—বাবা খুসী হবেন।'

অবশেষে তাই ঠিক হইল।

ভবানীপুরের একজন বন্ধু নিজের গাড়ী বিশ্বকর্ম্মার ব্যবহারার্থ দিয়া রাখিয়াছেন। বিশ্বকর্ম্মা বেলা চারিটার সময় গাড়ী আনিতে পাঠাইলেন।

তেজেন বলিল, 'এখনও ঢের দেরী।'

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'তোমার দিদির হাত-মুখ ধুতেই দু'ঘণ্টা—তৈরী হতে আরও দু'ঘণ্টা—দাঁড়াও, মজা দেখ!'

সকলে তৈরী হইলেন। গাড়ী তখনও আসে নাই। বিশ্বকর্ম্মা রাগারাগি শুরু করিলেন। বলিলেন, 'একখানা ট্যাক্সি ডাকতে বল।'

তেজেন বলিল, 'খবরটা দেখি।'

'আর দেখতে হবে না। যে বেটা ডাকতে গেছে—সে আর এক গাধা—বেটাদের নিয়ে আমার মরণ-যন্ত্রণা!—গাড়ী না পেলি, ফিরে আয়,—গাড়ীর অভাব কি?'

ভাড়াটে ট্যাক্সি ডাকিয়া সকলে রওনা হইলেন। তেজেন আগে বাস-এ চলিয়া গেল।

অর্দ্ধ পথে গিয়া বিকট এক আওয়াজ! সুরুচি বলিলেন, 'টায়ার ফাটল।'

একটু পরে গাড়ী গতিহীন হইয়া দাঁড়াইল।

আর গাড়ী নাই। ফুটপাথে সকলে অধীর হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বিশ্বকর্ম্মার অগ্নিকটাক্ষ, সুরুচির দিকে চাহিয়া অস্ফুট গর্জ্জন! সামনে শ্বশুর, বুড় করিয়া কিছু বলিবার যো নাই। রাগের অর্থ এই—'তরুণী দেখিলে এত হাঙ্গামা হইত না—সেটা কাছে। এত দূর আসিতে গিয়াই তো এই বিপত্তি!' কিছুক্ষণ পরেই ট্যাক্সি পাওয়া গেল। সুযোগ বুঝিয়া ভাড়া-টায়ারওয়ালা পূরা দাম আদায় করিল। পথচারী ভদ্রলোকেরা বলিলেন, এ বেটা ভয়ানক পাজি—পচা টায়ার ফাটিয়ে আপনাদের বিপদে ফেলেছে—আবার ডবল দাম চায়!—দেবেন না।'

বিশ্বকর্ম্মার তখন অত্যন্ত তাড়া, কাজেই যা চাহিল দিয়া প্রস্থান।

গাড়ী ছুটিতেছে। বাঁ দিকে একটা জায়গায় অত্যন্ত ভিড়—বহুসংখ্যক গাড়ী দাঁড়াইয়াছে। লাল নীল আলোক দ্বারা সৌখিনিয়ে লেখা 'দক্ষযজ্ঞ'—দেখিয়া সুরুচির দিদি বলিলেন, 'এই বোধ হয়—'

—'ড্রাইভার জানে,—এটা বোধ হয় বিজ্ঞাপন।' সুরুচি বলিলেন।

গাড়ী চলিয়া গেল। আরও অনেক দূর গেল—শেষে বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'এতদূর কি? পথ যে ফুরায় না!'

সুরুচির দিদি বলিলেন, 'পিছনে ফেলে এলে বোধ হয়।'

তখন ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করা হইল। সে বলিল, 'আমি ঠিক জানিনে—কোথায় যাবেন?'

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'বেশ তো তুমি? কোথা যাব না জেনেই গাড়ী চালিয়ে এলে তিন চার মাইল?

সুরুচির পিতা বলিলেন, 'কাউকে জিজ্ঞাসা কর।'

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'থামাও গাড়ী—থামাও'—দু'জন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহারা অবাক্ হইয়া বলিলেন, 'এ দিকে কোথা? মাইল তিনেক পিছনে ফেলে এসেছেন।'

গাড়ী ঘুরিল। বিশ্বকর্ম্মা অস্ফুট স্বরে বলিলেন, 'বিড়ম্বনা!'

'ক্রাউনে' আসিয়া গাড়ী থামিল। সকলে নামিয়া পড়িলেন, তেজেন বলিল, 'আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি, দেখি আপনারা বরাবর চলে গেলেন। হাত তুলে ডাকাডাকি করলাম—শুনলেন না।'

পিছন হইতে বন্ধুবরের ড্রাইভার বলিল, 'বাবু আমাকে ডাকতে গেছে—আমি পেট্রোল আনতে গেছলাম। তাই কয়েক মিনিট দেরী হয়েছে। এত আগে আপনারা চলে এলেন কেন? এখনও ত ঢের দেরী আছে।' আমি বাসায় গিয়ে দেখি আপনারা নেই—তখন এখানে এসেছি,—দেখি আপনারা চলে যাচ্ছেন।'

'আচ্ছা-আচ্ছা—গাড়ী এনেছ ত?'

'আজ্ঞে নিশ্চয়।'

ভিতরে গিয়া ঠিক-ঠাক হইয়া বসিবার কিছুক্ষণ পরে 'শো' আরম্ভ হইল। প্রথম ছবি—একটি মেয়েকে মাষ্টার পড়াইতেছে। দ্বিতীয় ছবি একটা পথের জনতা—এই রকম আট দশটা ছবি পর পর দেখিতে দেখিতে সুরুচি মৃদুস্বরে বলিলেন, 'এ কি ব্যাপার—আজ কি দক্ষ-যজ্ঞ নয়?'

ছোট বোন তাপসী বলিলেন, 'তাই দেখছি, মজা মন্দ নয়। আমার জ্বর এল, তা জোর করে তোমরা উঠিয়ে আনলে কি এই দেখাতে?'

—'কি কাণ্ড! বিজ্ঞাপন দিয়েছে আজই দক্ষযজ্ঞ—এ কি?'

—'জামাই বাবু এমনি রেগে আছেন। এই সব ছাই-মাটী দেখবার জন্তে কি বাবাকে নিয়ে এলাম?'

'মরণ হবে আমার! এত কাণ্ড করে আসা শুধু দক্ষ-যজ্ঞ দেখবার জন্তে। আমার মুখ থাকবে না আর।'

হঠাৎ বড় বড় অক্ষরে ছবি ফুটিয়া উঠিল, 'আসিতেছে।'

তাপসী বলিলেন, 'দেখ দিদি দেখ।'

—'কি জানি, দেখা যাক।'

তার পরই ফুটিল—'দক্ষ-যজ্ঞ'—সুরযন্ত্রী' 'পরিচালক' পর্য্যায়ক্রমে এই সব।

বিশ্বকর্ম্মা ও তেজেন পাশাপাশি উপবিষ্ট। দশ-মহাবিদ্যার ছবি যখন একটি একটি করিয়া ফুটিতে লাগিল—বিশ্বকর্ম্মা মৃদু মৃদু বলিতেছেন, 'কালী, তারা, মহাবিদ্যা—তার পর যেন কি—মনে আসছে না,—ভুবনেশ্বরী—'

তেজেন বলিল, 'রাখুন জামাই বাবু, আগে দেখে নিন—পরে মনে করবেন।'

রাত্রি সাড়ে নটায় শেষ হইল। বাড়ী ফিরিয়া সুরুচি বলিলেন, 'নারদের ভয়ে তুমি যেতে চাওনি—কেমন লাগল?'

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'বেশ।'

মেজ শ্যালক দ্বিজেন বলিল, 'আপনি বেশ বললেন জামাই বাবু? ওর কোন্‌টা বেশ?'

সুরুচি বলিলেন, 'বাবা খুব খুসী হয়েছেন।'

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'বলেছেন তিনি?'

'হাঁ। আমাদেরও ভাল লেগেছে।'

তাপসী বলিলেন, 'সত্যি, আপনারা যা বলবেন—আমাদের বাবস্থা নেই,—আর যা কিছু খুঁত সবই মেনে নেব। তবু দক্ষযজ্ঞ আমাদের খুব ভাল লাগল।'

ফিরেন বার কয়েক সবিক্রমে ভগিনীপতির সহিত দৃষ্টি-বিনিময় করিল। ভেজেন্দ্র বলিল, 'দিদিদের যদি ভাল লেগে থাকে তা হলেই ভাল।'

বিশ্বকর্ম্মার নিমন্ত্রণ-রক্ষা

বিশ্বকর্ম্মার বৌ-দি আসিয়াছেন।

ইনি সম্পর্কে বড় হইলেও বয়সে ছোট। বিশ্বকর্ম্মার মেজ ভাইয়ের দ্বিতীয় পক্ষ।

মেজ-বৌয়ের কাছে সুরুচি সংসারের অনেক কাহিনী শুনিতেন। বিশেষ করিয়া বিশ্বকর্ম্মা-চরিত। কেমন রাগী,—বাড়ী শুদ্ধ ভয়ে জড়সড় হইয়া থাকিত। কখনও উদাসীন—কখনও অধীর। শান্ত—অথচ উগ্র। ভীষণ এবং প্রসন্ন,—স্নেহশীল—আবার নিষ্ঠুর। বিচিত্র প্রকৃতি—অদ্ভুত আচরণ!

মেজ-বৌ অতীত কাহিনী বলিতেন। ডালে একটি খোসা কি ভাতে একটি ধান পাইলে বিশ্বকর্ম্মা থালা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা দিতেন। ব্যঞ্জনে একটু ঝাল বেশী হইলে রন্ধনকারিণীর চক্ষে উক্ত ঝোল ঢালিয়া দিতে চাহিয়া রান্না শিখাইতেন। হাতের পিঠে দুধ না লাগিলে বাটি শুদ্ধ ফেলিয়া দিয়া দুধ ভাল করিয়া জ্বাল দিতে বলিতেন। রান্নায় একটু দেরী হইলে না খাইয়া শুইয়া থাকিয়া সকলকে অনাহারে রাখিয়া সকাল সকাল রান্না করিবার অভ্যাস করিয়া দিতেন। ইত্যাকার শত কাহিনী।

সুরুচি বলেন, 'সত্যি দিদি, এমন মানুষ দুনিয়ায় আর নেই—এ আমি ঠিক বলছি। এখানে এত জনায় মিলে আমরা একজনের যোগাড় করি—তাই এই অনর্থ করেন। বাড়ীতে তো তা নয়? আরও দশজন আছে—সংসারের হাজার কাজ আছে;—পেরে ওঠা যায় কি? আমাদের যেন অন্য কাজ নেই,—সবশুদ্ধ এক ঠাকুর সেবা করি।'

আবার বিশ্বকর্ম্মার ভাল দিকও আছে! কলেজে জল-খাবার পয়সা জমাইয়া বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের সৌখীন জামা খেলনা, বৌদের ফিতা, কাঁটা, শাঁখা, চিরুণী কেনা,—বৌদের কাজ বেশী দেখিলে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া বাধান, বাড়ীতে আশ্রিত অতিথি-আগন্তুকদের সঙ্গে সমভ্রাতৃভাব, কাহাকেও ফেলিয়া জলবিন্দুও মুখে না দেওয়া—এ সব গুণের কথাও মেজ-বৌ গল্প করিতেন।

সুরুচি বলিলেন, 'হোক্ গে—তিন ভাগ মন্দ—এক ভাগ ভাল। অতি ভালও ভাল নয়—অতি মন্দও ভাল নয়, সবই মাঝামাঝি ভাল। সারাদিন রাত কেবল ঝোঁকের মাথায় আর রাগ করছেন!'

বিশ্বকর্ম্মা শুনিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'আমি সব শুনেছি, পতি-নিন্দা করা হচ্ছে!'

সুরুচি জবাব দিলেন, 'পতির সম্বন্ধে সত্যি কথাই বল্‌ছি। মেজদি তো কিছু জানে না মোটেও—যে, আমি আবার তাঁর কাছে নিন্দা করব।'

সেদিন অমাবস্যা তিথি—রাত্রে শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা। প্রফেসর আশুবাবুর বাড়ী রাত্রে নিমন্ত্রণ। বাজারের সময় সুরুচি বলিলেন, 'কাল থেকে সরস্বতী পুজো পর্য্যন্ত আর ইলিশ মাছ খেতে নেই। যদি পাও বেশী করে এন।'

কমল সেনের বাড়ীতে। সুশান্ত মাছ-প্রিয় নহে। বাজার হইতে চারিটা ইলিশ আসিল।

দুটি মাছ বিশ্বকর্ম্মা নিঃশেষ করিলেন (ভাজা, ঝোল, ঝাল, অম্বল ও সিদ্ধ)। ধীরে সুস্থে বলিলেন, 'দেখুন মেজ-বৌ মাছ আমি তেমন পছন্দ করি নে, না হলেও চলে।'

মেজ-বৌ বলিলেন, 'হাঁ।'

'সত্যি—এই এঁর জন্যে (সুরুচিকে দেখাইয়া) মাছ আসে—ইনি মাছ না হলে কুরুক্ষেত্র করেন। কাজেই বাড়ীতে আসে, বাধ্য হয়েই খেতে হয়—কে আর আমাদের জন্যে আলাদা রাঁধছে বলুন? গিন্নীর ইচ্ছাতেই কর্ম্ম—নইলে দেখছেন তো—আমি মাছ-টাছ তেমন খেতে পারিনে—'

মেজ-বৌ বলিলেন, 'মোটেই না।'

সুরুচি আবার মাছ আনিয়া দিলেন। অহি আর একখানাও পারিল না। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'আর খেলে অসুখ করবে না?'

'না কিছু হবে না—'

'তোমাদের?'

'আরও অনেক আছে—'

ইতস্ততঃ করিতে করিতে হঠাৎ মনে হইল রাত্রে নিমন্ত্রণ। বিশ্বকর্ম্মা উঠিয়া পড়িলেন—বলিলেন, 'নিমন্ত্রণ আছে যে গো?'

সুরুচি ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, 'নিমন্ত্রণ করবার আর দিন পেলে না!'—

অহি বলিল, 'আশুবাবুও অনেক ইলিশ নিয়েছেন।'

সন্ধ্যা হইতেই আশুবাবুর ঘরে গান-বাজনার মজলিস বসিল। জানালা দিয়া দেখা যায়—বাড়ী বেশী দূর নয়।

রাত্রি একটার সময় নিমন্ত্রণ সারিয়া বিশ্বকর্ম্মা ফিরিলেন। সুরুচি বই পড়িতেছিলেন। বলিলেন, 'এত রাত ?'

'খেয়েই আসছি। রান্না হতে বড় দেরী করে ফেলেছে।'

'কেমন খেলে ?'

'মন্দ নয়। তবে মাছগুলো একেবারে পচা।'

'ও বেলা মাছ কিনেছে—ভেজে রাখে নি বুঝি, অসুখ না করে।'

'না বেশী খাই নি।'

পরদিন বেলা আটটা হইতে ভীষণ পেটের অসুখ।

প্রথম অবস্থায় বিশ্বকর্ম্মা ঔষধ খাইলেন না, বলিলেন, 'পেট পরিষ্কার হয়ে যাক্—দাস্ত হঠাৎ বন্ধ করতে নেই।' বিশ্বকর্ম্মা সমস্ত দিন অনাহারে শুইয়া রহিলেন। সুরুচি ও মেজ-বৌ কাছে বসিয়া রহিলেন।

বৈকালে ডাক্তার আসিলেন। দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন, 'খেয়েছেন কি ?'

'কিছু না।'

'একেবারে কিছু না ?'

অহি বলিল, 'সকালে চা –'

ডাক্তার। 'কাল রাত্রে ?'

বিশ্বকর্ম্মা। 'রাত্রে নিমন্ত্রণ খেয়েছিলাম।'

অহি। 'রাত বারটার সময় খেয়েছিলেন। মাছ না কি পচা ছিল।'

ডাক্তার। 'মাংস ছিল ?'

বিশ্বকর্ম্মা। 'ছিল।'

ডাক্তার। 'এই সিজ্‌ন্ চেঞ্জ-এর সময়! অত রাত্রে খাওয়া—তায় পচা মাছ-মাংস!—আচ্ছা, দিনের বেলা ?'

বিশ্বকর্ম্মা। 'দিনের বেলা ? দিনের বেলা ছুটো ইলিশ মাছ—'

ডাক্তার। 'ছুটো ইলিশ ?'

বিশ্বকর্ম্মা। (সহাস্যে) 'হঁ্যা।'

ডাক্তারও হাসিয়া বলিলেন, 'স্বকৃত কর্ম্মফল। এখন আছেন কেমন ?'

'ভাল।'

'কোন ভাবনা নেই। একটু ঘোল আর ছানা মিছরীর জলই চলুক আজ—কাল সকালেই আসব।'

বিশ্বকর্ম্মার রাগ

বিশ্বকর্ম্মা ভাল হইয়া উঠিয়াছেন।

স্থানীয় একটা উৎসব উপলক্ষে একটি ছোটখাট মেলা বসিয়াছে। বন্ধুরা বৈকালে আসিয়া ধরিলেন—মেলায় যাইতে হইবে।—'চলুন একসঙ্গেই যাই।'

সুরুচি বলিলেন, 'দেখলেন মেজদি ? একপাল এসে ধরেছে।' বিশ্বকর্ম্মার বন্ধুবর্গের উপর সুরুচি প্রসন্ন নন।

বলিতে বলিতে বিশ্বকর্ম্মা ভিতরে আসিলেন। বেশভূষা ও জুতা পরিবার জন্য।

মেজ-বৌ বলিলেন, 'এই শরীর নিয়ে যাবেন ?'

'বেশী দূর নয়। এখনই ফিরব।'

সুরুচি বলিলেন, 'কিছু খেয়ে বেয়োও।'

ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'না কিছু না। ক্ষিধে মোটে নেই।'

তথাপি সুরুচি একগ্লাস ঘোল দিলেন। বলিলেন, 'রাত্রে কি খাবে ?'

'বোধ হয় কিছুই না। ক্ষিদে না থাকলে খাওয়া উচিত নয়, আবার পড়ব তা হলে।' ঠক্ করিয়া গেলাসটা নামাইয়া রাখিয়া বিশ্বকর্ম্মা দ্রুত বহির্গত হইলেন।

কার্ত্তিকের সন্ধ্যা শীঘ্রই ঘনাইয়া আসিল। সুরুচি বলিলেন, 'মেজদি, উনি যে বলেছেন কিছু খাবেন না—সে কথা কথাই নয়। বলেছেন ঝোঁকের মাথায়। আমি রান্না চড়িয়ে দি। খান ভাল, না খান না খাবেন।'

মেজ-বৌ বলিলেন, 'তবে দে।'

আলো জ্বালিবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বকর্ম্মা ফিরিলেন। ঘরে পা দিয়াই বলিলেন, 'রান্না হয়েছে ?'

সাড়া পাইয়াই সুরুচি রান্নাঘর হইতে আসিয়া বলিলেন, 'চড়িয়েছি।'

'হয় নি ?'— স্বর অত্যন্ত তীব্র।

'বেশী দেরী নেই।'

'কেন এতক্ষণ হয় নি? অসুখ মানুষের জন্যে কি এই ব্যবস্থা?'

'বাজার থেকে মাছ এল, ও বেলার মাছ খেতে চাও না যে—'

'আগে ভাত করে রাখা হয় নি কেন? তা হলে আমি এখনই খেতে পেতাম।'

'আর দেরী নেই।'

'দেরী নেই? এসেই কি আমার খেতে পাওয়া উচিত ছিল না?'

'হয়েছে এতক্ষণ, দেখি—' সুরুচি রান্নাঘরে গেলেন।

বিশ্বকর্ম্মা গর্জ্জিয়া বলিলেন, 'হোক্—ও আমার জন্যে নয়।'

মেজ-বৌ সন্ধ্যাহ্নিক করিতেছেন এবং শুনিতেছেন। উঠিয়া আসিয়া রান্নাঘরের সামনে দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, 'হয়েছে?'

'হ্যাঁ—আমি নিয়ে যাচ্ছি। আপনি ডাকুন।'

মেজ-বৌ ঘরে আসিয়া দেখেন বিশ্বকর্ম্মা শুইয়া আছেন। বলিলেন, 'খেতে আসুন।'

বিশ্বকর্ম্মা কথা বলিলেন না।

মেজ-বৌ দেবরটিকে বিলক্ষণ চেনেন। সসঙ্কোচে কাছে আসিয়া বলিলেন, 'ভাত বেড়েছে, আসুন।'

'না—'

'কেন?'

'খেতে ইচ্ছে নেই।'

'এই বললেন দেরী হল, আবার এখনই ইচ্ছে নেই? রাগ হয়েছে, না?'

'কার রাগ না হয় এতে? দেখুন দেখি অবিচার! আমি অসুখ মানুষ—সেই নিশি-রাত না হলে খাবার জুটবে না?' একটা বিবেচনা পছন্দ চাই মানুষের—প্রয়োজনের সময় যা আমি পাব না—সে আমার কাছে একেবারে অখাদ্য, অস্পৃশ্য।'

'ছি রাগ করতে আছে কি? এই তো সবে সন্ধ্যা হল—এখনও আঁধার হয় নি। আপনি যখন এলেন তখন সব হয়ে গেছে, ভাত ফুটছে। দেরী তো একটুও হয় নি। না খেলে শরীর আরও খারাপ হয়ে যাবে।' মেজ-বৌ বিশ্বকর্ম্মার হাত ধরিয়া টানিলেন।

'না—না—না, আমি খাব না, আমি খাব না—আমার জীবের প্রতিজ্ঞা। যান্ আপনি যান্।'

বিশ্বকর্ম্মার চোখমুখ দেখিয়া মেজ-বৌ আর কিছু বলিলেন না। ফিরিয়া আসিলেন।

সুরুচি দরজার পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন। বিছানার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন, 'এস—'

বিশ্বকর্ম্মা কথা কহিলেন না।

'কেন রাগ করছ? এস,—নিজেই কষ্ট পাবে যে? খেয়ে দেয়ে শোবে এস।'

এক মিনিট অপেক্ষা করিয়া সুরুচি বলিলেন, 'এস গো এস, দোষ মেনে নিচ্ছি—আর কেন? ভুল-ভ্রান্তি কি মানুষের হয় না? তা কি মাপ করতে নেই? আর কিসের ওপর রাগ? যা না খেলে প্রাণ বাঁচে না তারই ওপর? আর তোমার জিনিষ তুমি খাবে—তার আবার রাগ কি? ওঠ—'

বিশ্বকর্ম্মা মেঘগর্জ্জনবৎ বলিয়া উঠিলেন, 'আমি বক্তৃতা শুনতে চাইনে, কেন বিরক্ত করতে এসেছ?'

সুরুচি বিশ্বকর্ম্মার হাত ধরিয়া বলিলেন, 'এস শীগ্‌গির, খেতে বসলেই রাগ থেমে যাবে এখন।'

বিশ্বকর্ম্মা হাত ছাড়াইয়া চোখে অগ্নিবর্ষণ করিয়া উগ্র-কঠোর হইয়া বলিলেন, 'বার বার বলছি খাব না—তবু বিরক্ত করবে? সাধাসাধি করে আমার রাগ বাড়িও না বলছি।'

'বেশ, খেতে ডাকছি তাতে তোমার রাগ বাড়ছে!—রাগ কি কেবল তোমারি আছে, আর কারও নেই? একপাল বন্ধুর সঙ্গে যখন হৈ হৈ করতে করতে দিশেহারা হয়ে ছুটে গেলে—তখন বলা হল কিছু খাব না। তবু আমি তখনই রান্না চড়িয়েছি। বিনা দোষে এমন উল্টো শাস্তি কেউ দিতে পারে না তোমার মতন,—থাক তোমার রাগ নিয়ে তুমি—কে আর ডাকতে আসে দেখি।'

সুরুচি বারান্দায় আসিয়া বসিয়া পড়িলেন। মেজ-বৌ দাঁড়াইয়া ফলাফলের অপেক্ষা করিতেছিলেন—তিনিও নিঃশব্দে বসিলেন।

ঘরে বারান্দায় আলো জ্বলিতে লাগিল। নীহার দরজার কাছে বসিয়া আছে। কিছুক্ষণ পরে বাহিরের বারান্দায় জুতার শব্দ হইল, বিশ্বকর্ম্মা হুঙ্কার দিলেন, 'কে?'

'আমি—'

'এখানে আয়।'

সভয়ে সুশান্ত ঘরে ঢুকিল। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'হ্যাঁরে কমলা লেবু উঠেছে ?'

'উঠেছে বোধ হয়।'

'বোধ হয় মানে ? দেখিস্ নি বুঝি ? আন্দাজি বলছিস ?'

'ক'দিন আগে দেখেছিলাম।'

'যা দেখি, পাস্ যদি নিয়ে আয়। দেরী করিসনে।'

সুশান্ত চলিয়া গেল। বাজার অতি কাছে, তখনই ফিরিল। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'পেয়েছিস ?'

'পেয়েছি'—পকেট হইতে সুশান্ত চারিটা লেবু বাহির করিল। বিশ্বকর্ম্মা উঠিয়া বসিয়া বলিলেন—'আন্।'

লেবুগুলি দেখিতে বড় সাইজের কাগজী লেবুর মত, রংও প্রায় তদ্রূপ। তবে এক পাশ দিয়া হলুদে রং ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে।

একটা ছাড়াইয়া বিশ্বকর্ম্মা মুখে ফেলিতেছেন—সুশান্ত আর একটা ছাড়াইতেছে।

'এঃ একেবারে কাঁচা, কি এনেছিস !'

'আর কোন দোকানে নেই—কেবল একটা দোকানেই আছে।'

'সে রকম কাঁচা—ততটা টক নয়।'

একটা শেষ করিয়া অপরটা আরম্ভ করিয়া বলিলেন, 'আমাদের মাছ কে এনেছিল ?'

সুশান্ত বারান্দায় আসিয়া জানিয়া গিয়া বলিল, 'নীহার।'

'কি মাছ ?'

সুশান্ত আবার আসিয়া নীহারকে প্রশ্ন করিল, 'কি মাছ ?'

নীহার মৃদু স্বরে বলিল, 'কি জানি—চিনিনে। বড় মা, —কি মাছ কয় ?'

নীহারের বাড়ী মুঙ্গের জেলা—কিন্তু খাঁটি বাঙ্গালী। কথা বলে বিশ্বকর্ম্মার দেশের মত, খাস ময়মনসিংহী ভাষা।

বিশ্বকর্ম্মা ঘর হইতে শুনিতে পাইয়া বলিলেন, 'তুই একটা আস্ত গাধা,—মাছ চিনিসনে তবে এনেছিস কি করে ?'—স্বর উগ্র নহে, উদার এবং শান্ত।

নীহার আরও নরম সুরে বলিল, 'এ মাছ খুব ভাল—নাম মনে থাকে না।' বলিয়া বিপন্ন ভাবে মেজ-বৌকে প্রশ্ন করিল 'কি মাছ বড় মা ?'

'আমি দেখিনি ভাল করে। হাঁ রে, কি মাছ ?'

সুরুচি কথা বলিলেন না। মেজ-বৌ বলিলেন, 'জানতে চাইছে যে, বল্ না ?'

সুরুচি জোর গলায় বলিয়া উঠিলেন, 'যে খাবে না, তার অত খবরে দরকার কি ?'

মেজ-বৌ উঠিয়া ঘরে গেলেন। বিশ্বকর্ম্মার কাছে গিয়া বলিলেন, 'খেতে বসে দেখবেন আসুন—'

বিশ্বকর্ম্মা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া মেজ-বৌয়ের দিকে চাহিলেন। বলিলেন, 'কি বলছেন ?'

'বলছি—খেতে বসে মাছ দেখতে আসুন।'

'রান্না কি হয়েছে ?'

ঈষৎ হাসিয়া মেজ-বৌ বলিলেন, 'কোন্ কালে !'

'আচ্ছা।'

মেজ-বৌ দ্রুত আসিয়া সুরুচিকে বলিলেন, 'যা, রাগ থেমেছে, এখন খাবে।'

সুরুচি চুপ-চাপ।

'নে ওঠ্ ওঠ্—একজনের চোটেই অস্থির, তুই আর রাগ করিস নে !—যা খাবার আন শীগগির।'

সুরুচি বলিলেন, 'হাঁ, খাবার দিয়ে সাধতে যাই—আর পঞ্চাশ রকম কথা শুনে ফিরে আসি !—আমি সারা রাত এখানে বসে থাকব—তবু কাউকে ডাকতে যাব না।'

ঘর হইতে বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'মেজ-বৌ, খেতে দিতে বলুন।'

সুশান্ত বলিল, 'দিচ্ছেন।'

'আচ্ছা' বলিয়া বিশ্বকর্ম্মা উঠিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইলেন। সুরুচি পূর্ব্ববৎ বসিয়া রহিলেন।

শান্ত সহাস্য মুখে বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'কই গো, কি দেবে, আন দেখি।'

তখন সুরুচি উঠিয়া গিয়া অন্ন-ব্যঞ্জনাদি আনিয়া দিলেন এবং রান্নাঘরে গিয়া বসিয়া রহিলেন।

কাছে কেহ না বসিলে বিশ্বকর্ম্মার খাওয়া হয় না। বলিলেন, 'মেজ বৌ এখানে বসুন।'

মেজ-বৌ নিকটে গিয়া বসিলেন। বিশ্বকর্ম্মা রান্নাঘরের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিলেন, 'মেজাজ বড় কড়া, নয় ?'

'হুঁ।'

'দেখুন দেখি কি অবিচার ! আমার রাগ করবার কথা, তা নয়, নিজেই রাগ করে রয়েছে। ঘরে এ রকম অশান্তি কি সহ্য হয় ? আমার গৃহিণী ত নন—সাক্ষাৎ উগ্রচণ্ডা !'

'হুঁ।'

খাওয়া শেষ হইল। জল পান করিয়া গ্লাসে হাত ধুইতে ধুইতে বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'আর রাগ কর না গো, দেখ—যা যা দিয়েছ, সব খেয়েছি—কিছু পাতে রাখি নি। দিয়েছিলে কম নয় ! এতেও তোমার প্রসন্ন হওয়া উচিত।'

উঠিয়া আচমন করিয়া ঘরে গিয়া বিছানায় বসিলেন। বলিলেন, 'মেজ-বৌ এখানে আসুন।'

মেজ-বৌ গেলেন।

'রাগটা পড়ে নি ?'

'না।'

'কিসে পড়বে ?'

মেজ-বৌ এতক্ষণ হুঁ-হাঁ দিয়া গিয়াছেন। এখন আর ভয় কি ? বলিলেন, 'কি জানি ? কি যে রাগ করেন আপনি ছোট ছেলের মত, লজ্জাও করে না ? যতক্ষণ সাধা-সাধি করলাম—বাবুর রাগ বাড়তেই থাকল, তারপর সব যখন চুপচাপ, তখন বাবু সুড় সুড় করে উঠলেন ! ও বলে যে মিছে নয়।'

'সত্যি মেজ-বৌ, ঠিক বলেছেন। কি প্রবলা স্ত্রী দেখলেন ? প্রলয়ঙ্করী !'

মেজ-বৌ হাসিয়া বলিলেন, 'আপনার ঐ রকমই দরকার !'

আদর্শ সন্ন্যাসী

—শ্রীচুণীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

জয় জয় মহাদেব ভোলানাথ ভোলা মহেশ্বর।
নিখিল-নরের মনে তুমি দেব হয়েছ অমর ॥
কামেরে করেছ জয় প্রেম দিয়া হে রাজ-বৈরাগী।
জটায় জটায় ফিরে সুরধুনী তব প্রেম মাগি ॥
বাহিরে মাখিয়া ছাই হইয়াছ কর্কশ কঠোর।
অন্তরে সুন্দরে পেয়ে অনুরাগে রয়েছ বিভোর ॥
তোমার দুয়ারে বুঝি তাই দেব নন্দীভৃঙ্গী দ্বারী ?
অন্তঃপুরে নারী সহ বিরাজিছ ওগো ব্রহ্মচারি ॥
অন্নপূর্ণা ঘরে বাঁধা—ভিক্ষা করা তবু তব সাধ।
ঐশ্বর্য্যের মাঝে কর দৈন্যের কি মধুর আস্বাদ !
সন্ন্যাসের ছদ্মবেশে শিরে বহি দীর্ঘ জটাভার
আবরিতে পার নাই অন্তরের পুলক জোয়ার।
জটা সহ অন্তরালে যেই ধারা হয় প্রবাহিত।
তাহার মাধুর্য্য কি যে জানে শুধু জানে তব চিত ॥
ত্যাগেরে লইয়া সাথে কেমনে করিতে হয় ভোগ।
গৌরী সহ তাহি তুমি নিশিদিন করিতেছ যোগ ॥
ঐশ্বর্য্য চাহনি তুমি ষড়ৈশ্বর্য্য পায়ে পায়ে তব।
দাসী হয়ে ফিরিতেছে হে সম্রাট ইন্দ্রের বৈভব ॥
সেই মন্ত্রে মহাশক্তি নিজে এসে বশীভূত হয়।
আপন অন্তরে পেয়ে তাঁরে তুমি করিয়াছ জয় ॥
তোমার আত্মজা তাই বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী সরস্বতী।
কার্ত্তিক গণেশ পুত্র জায়া তব দশ-ভুজা সতী ॥
নাই লোভ নাই ক্ষোভ নাই মোহ নাই তব রোষ।
সর্ব্বগুণাতীত তাই হইয়াছ তুমি আশুতোষ ॥
লজ্জা তব কাছে যেতে লজ্জা পেয়ে ফিরে ফিরে আসে।
পতিত-পাবনী গঙ্গা ফিরে তব নিশ্বাসে প্রশ্বাসে ॥
ধূলি তোমা কোন দিন পারে নাই করিতে মলিন।
মায়ার অতীত হয়ে হইয়াছ মায়ার অধীন।
স্বর্গ হতে গঙ্গা যবে নেমেছিল ভাগীরথ সাথে।
সেই বেগ হে পিণাকি ধরেছিলে তুমি নিজ মাথে ॥
পিতৃ-যজ্ঞে সতী যবে পতিনিন্দা কানে শুনে হায়।
ত্যজিল পবনে—সেই শব তুমি তুলিয়া মাথায়—
ঘুরেছিলে ত্রিভুবন সতীশোকে হইয়া পাগল
কেঁদেছিল পশু-পক্ষী হেরি তব নয়নের জল ॥
যুগল প্রেমের এই মহাচিত্র স্থাপিয়া অন্তরে।
ভারতের নর-নারী আজও পূজে ভোলা মহেশ্বরে ॥
শব সহ যে যে স্থানে পড়েছিল চরণ তোমার।
সেই সেই স্থান আজও জগতের সর্ব্বতীর্থসার ॥
ধরার মাঝারে তবু ধরার অতীত তব বাণী।
হে চির আদর্শ গৃহী—হে আদর্শ প্রেমিক সন্ন্যাসী ॥

গোপীচন্দ্রের গান

—শ্রীসুবোধরঞ্জন রায়

বক্ষ্যমান প্রবন্ধটি নূতন তথ্য আবিষ্কার বা গবেষণা নহে, প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের অংশবিশেষের বিশদ আলোচনা মাত্র। মাণিকচন্দ্র রাজার গান, গোপীচন্দ্রের পাঁচালী, ময়নামতীর গান প্রভৃতি বিভিন্ন নামের একই বিষয়-বস্তু ও কাহিনীমূলক কতকগুলি গাথা প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের একটা দিক্ নির্দ্দেশ করিতেছে। রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস-গ্রহণের করুণ কাহিনীই এই সমস্ত গাথার একমাত্র উপজীব্য বলিয়া আমরা সর্ব্বত্র "গোপীচন্দ্রের গান" এই সাধারণ নামটি প্রয়োগ করিব। উহার জনপ্রিয়তা, বিষয়-বস্তু, চরিত্র, ঐতিহাসিকতা, রচনাকাল, সামাজিক রীতি-নীতির প্রতিচ্ছায়া, বৈশিষ্ট্য প্রভৃতির একে একে আলোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য।

জনপ্রিয়তা

বাঙ্গালা দেশের রাজা গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্র আপনার পূত চরিত্রে ও অতুলনীয় ত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া ইতিহাসে অমর হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার শোকাবহ সন্ন্যাস-কাহিনী সমগ্র ভারতে সুবিদিত ছিল। হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর কবি সেই কাহিনী অবলম্বনে বহু গাথা রচনা করিয়াছেন। ভাগলপুর, পাঞ্জাব, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশগুলিতে এখনও গোপীচন্দ্রের গান প্রচলিত আছে। হিন্দীভাষায় "গোপীচাঁদকা পুথি" এখনও দৃষ্ট হয়। লক্ষ্মণদাস-কৃত হিন্দী গানে বঙ্গীয় রাজার গুরু জলেন্দ্র যোগী, তাঁহার মাতা মৈনাবতী, তদীয় গুরু গোরক্ষনাথ প্রভৃতি বঙ্গের গীতোল্লিখিত চরিত্রগুলির উল্লেখ রহিয়াছে। মহারাষ্ট্র-কবি মহীপতি (১৭১৫-১৭৯০ খৃঃ) এই প্রসঙ্গ লইয়া তাঁহার "সন্তলীলামৃত" ও পুণার আপ্পাজি গোবিন্দ "গোপীচাঁদ" নাটক রচনা করিয়াছেন (১৮৩৯খৃঃ)। চিত্রকর রবিবর্ম্মা কর্ত্তৃক অঙ্কিত রাণীগণের নিকট হইতে গোপীচন্দ্রের বিদায়গ্রহণের করুণ চিত্র উল্লেখযোগ্য। ভগিনী নিবেদিতার মতে এই গোপীচন্দ্রের নাম হইতেই না কি "গোপীযন্ত্রের" নামকরণ হইয়াছে। শ্রীযুত দুর্গাচরণ শাস্ত্রী মহাশয় হিন্দী ও উর্দু ভাষায় নানা কবির রচিত মাণিকচন্দ্র রাজার গান পাঞ্জাব হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন।* সুতরাং সমগ্র ভারত পরিব্যাপ্ত বাঙ্গালীর এই একান্ত নিজস্ব কাহিনী বাঙ্গালীর অতি প্রিয় হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিষয়বস্তু

প্রভাবশালিনী মাতা ময়নামতীর (ময়ূরভঞ্জে প্রাপ্ত পুঁথি অনুসারে ইহাঁর নাম মুক্তা মহাদেবী) প্রবল আগ্রহে রাজা গোপীচন্দ্রের যৌবনে হাড়িপার শিষ্যত্ব ও সন্ন্যাস-গ্রহণ এবং বহুক্লেশে মহাজ্ঞান লাভ করাই এই গাথার বিষয়-বস্তু। উক্ত উপাখ্যানটি সংক্ষেপতঃ এইরূপ—

বঙ্গে মাণিকচন্দ্র নামে এক রাজা ছিলেন। তিলকচাঁদের কন্যা ময়নামতী তাঁহার অন্যতমা ভার্য্যা। ময়নামতী গোরক্ষনাথের শিষ্যা ছিলেন। ইহাঁর কৈশোর বয়সে গোরক্ষনাথ তিলকচন্দ্রের রাজপ্রাসাদে একবার দর্শন দেন এবং ইহাঁকে 'মহাজ্ঞান' শিক্ষা দিয়া চলিয়া যান। এই মহাজ্ঞান-প্রভাবে চিরজীবী হওয়া যায় এবং শোক-তাপ দূরীভূত হয়। মাণিকচন্দ্রের সহিত বিবাহ হইবার পর উক্ত রাজকন্যা স্বামীকে মহাজ্ঞান শিক্ষা দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু স্বামী পত্নীকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন না। কালক্রমে মাণিকচন্দ্র বহু-বিবাহের চিরন্তন প্রথা পালন করিলেন। প্রায় সকল পুঁথিতেই তাঁহার বহু পত্নীর উল্লেখ আছে। "ময়নামতীর গানে" আছে—তাঁহার "নও কুড়ি ভারযা" অর্থাৎ ১৮০টি ভার্য্যা ছিল। তৎপর ময়নাকে বিবাহ করেন, তাহাতে তৃপ্তি হইল না বলিয়া দেবপুরের পাঁচ কন্যাকে বিবাহ করেন। ময়নামতী মন্ত্রতন্ত্র জানিতেন বলিয়া তাঁহাকে "ডাইনী" বলা হইয়াছে। দেবপুরের পাঁচ কন্যার সহিত কলহ হওয়ায় রাজা ময়নাকে ফেরুসা নগরে ভিন্ন বাড়ীতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন। একটি বিশিষ্ট পাঠে দেখা যায়—তিলকচন্দ্রের ময়নামতী ও সিন্দুরমতী দুই কন্যা, ময়নার মাণিকচন্দ্রের সহিত এবং সিন্দুরের নীলমণি

রাজার ঘরে বিবাহ হয়। ময়নাকে বিবাহ করিবার পর রাজা পুনরায় ৫০টি কন্যা বিবাহ করেন এবং পারিবারিক কলহের ভয়ে "ফেরুসা" নগরে ময়নামতীর বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে মাণিকচন্দ্রের আলয় সময় উপস্থিত হইল এবং তখন ময়নামতী পুনরায় রাজপ্রাসাদে আহূত হইলেন। এই সময় মাণিকচন্দ্রের প্রধানা ভার্য্যার জন্য অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যান্য রাণীদের সেবায় তিনি তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন—

একশত রাণীর হস্তের জল আঁটানি গোন্ধায়

অর্থাৎ অপর রাণীদের হাতের জলে আঁষ্টে গন্ধ পাই। তখন ময়নামতী প্রাণপণে সেবা করিতে লাগিলেন। প্রজাপীড়নরূপ পাপের ফলে মাণিকচন্দ্র অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। রাজাকে বাঁচাইবার ময়নামতীর সকল প্রচেষ্টা নিষ্ফল হইল। অবশেষে তিনি গোরক্ষনাথের বরে পুত্রলাভ করিলেন। এই পুত্রই আমাদের উপাখ্যানের নায়ক গোপীচন্দ্র। পথিমধ্যে প্রাপ্ত অপর এক কাঙ্গালের পুত্র তিনি গ্রহণ করিলেন। সেই পুত্রটি লঙ্কেশ্বর, খেতুয়া, নেজা এই তিন নামে গাথাসমূহে পরিচিত। যথারীতি শিক্ষা-দীক্ষার পর গোপীচন্দ্র সিংহাসন লাভ করেন এবং রাজা হরিশ্চন্দ্রের কন্যা অদুনাকে বিবাহ করেন এবং পদুনাকে যৌতুকস্বরূপ প্রাপ্ত হন (ময়ুরভঞ্জ পুঁথির মতে রোহ্না ও পদুনা)। গোপীচন্দ্রের অদৃষ্টলিপি এই ছিল যে, অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বাদশ বর্ষ কাল প্রবাসে না কাটাইলে উনবিংশ বর্ষে তাঁহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং নির্দিষ্ট বয়সে ময়নামতী তাঁহাকে হাড়িসিদ্ধার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে বাধ্য করেন। এই সময়ে গোপীচন্দ্রের রাণীগণ এই কার্য্যে বাধা দিবার জন্য বহু বহু ষড়্‌যন্ত্র করিয়াও ব্যর্থ-মনোরথ হন। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গোপীচন্দ্রকে বহু কষ্ট সহ্য করিতে হয়। হীরা নাম্নী এক রূপসী গণিকা তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে বিফলমনোরথ হইয়া তাঁহাকে দুর্গতির চরম সীমায় উপনীত করে। এই সময় হাড়িসিদ্ধা আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া গেলেন। বহুবর্ষ পরে জ্ঞানলাভ লাভান্তে রাজধানীতে ফিরিয়া গিয়া তিনি পুনরায় রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন।

চরিত্র

এই উপাখ্যানের নায়ক গোপীচন্দ্রকে ইতিহাসের দিক্ হইতে আমরা ক্ষমতাশালী নৃপতি বলিয়াই জানি। কিন্তু ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের ভাষায়—"গ্রাম্য কবিরা তাঁহাদের সংকীর্ণ ও অমার্জ্জিত কল্পনা দ্বারা ইঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য আয়ত্ত করিতে না পারিয়া ইঁহাকে কেহ বা 'ষোল দণ্ডের' রাজা করিয়াছেন, কেহ বা ইঁহার পৈত্রিক 'সরুয়া নলের বেড়ার' প্রশংসা করিয়াছেন।" কিন্তু কয়েকটি গাথা হইতেও তাঁহার প্রবল প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। ময়ুরভঞ্জের পুঁথিতে আছে—

মহাপ্রতাপী রাজা বলে বলিয়ায়ো।
তিনি কোশ আয়তন কটক ইহায়ো।
তিনি পুর বান্ধুলা সে পাথর পাচে চিরি।
তিনি তাল গভীর বিশাল খনা খুলি॥

এই বিবরণ হইতে আমরা প্রসিদ্ধ গোবিন্দচন্দ্রের ক্ষমতার কতকটা যথাযথ বর্ণনা পাইতেছি, ইঁহার সৈন্যগণ তিন ক্রোশ ব্যাপিয়া অবস্থান করে, পাথর চিরিয়া তিনটি পুরী নির্ম্মিত হইলে, তিন তাল পরিমিত বিশাল খনা (গর্ত্ত) খুঁড়িল, অর্থাৎ জলাশয় প্রস্তুত করিল। আর এক স্থানে উল্লেখ আছে—

নব লক্ষ বজ্র তোর তের শত হাতী।
ষোল শত তুরঙ্গ উট শতে হস্তি॥

মাতার আদেশে পূর্ণযৌবনে ভোগৈশ্বর্য্যের বিপুল আবেষ্টনী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কঠোর সন্ন্যাস অবলম্বন করাতে তাঁহার কিঞ্চিৎমাত্রও অভিরুচি ছিল না, সুতরাং মাতার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ ও কটূক্তি করা তাঁহার পক্ষে অশোভন হইলেও অস্বাভাবিক নহে। গ্রন্থভাগের বর্ণনা হইতে মনে হয়, তিনি কিছু মাত্রায় স্ত্রৈণ ছিলেন, তাঁহার বিচারবুদ্ধির উপর রাণীরা প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইত। মাতার চরিত্রের প্রতি পুত্রের সন্দেহপূর্ণ ইঙ্গিত আমাদের রুচিতে অত্যন্ত বিসদৃশ মনে হয় এবং উহা কিছুতেই সমর্থন করিতে পারি না, মাতাকে উত্তপ্ত তৈল-পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া তৎপর তাঁহার মৃত্যুতে শিশুর মত ক্রন্দন করা অনেকটা ন্যাকামী বা ভাণ বলিয়া মনে হয়। ময়নামতীকে শেষ পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া তবে তিনি তাঁহার

অলৌকিক জ্ঞানে আস্থাসম্পন্ন হন এবং মাতার আদেশ শিরোধার্য্য করেন, সন্ন্যাস-গ্রহণের পরে তাঁহার সংযম ও কষ্টসহিষ্ণুতা প্রশংসনীয়। তাঁহার নৈতিক জীবন কিন্তু পূর্ব্বাপরই নিষ্কলঙ্ক ছিল। সন্ন্যাস-যাত্রার প্রাক্কালে রাণী পদুনাকে তিনি বলিয়াছেন যে, যখনই তিনি সুন্দরী রমণী দেখিবেন, অমনি তাঁহার বিশ্বস্তা স্ত্রীর কথা স্মরণ হইবে এবং তজ্জন্য তিনি রোদন করিবেন। তিনি সেই রমণীদিগের মাতার ন্যায় শ্রদ্ধা করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে নতনেত্রী আলাপ করিবেন। হীরা বেশ্যার সহিত ব্যবহারে আমরা তাঁহার নৈতিক সততায় নিঃসন্দেহ হইতে পারি।

গোপীচাঁদের মাতা ময়নামতীকে আমরা অত্যন্ত প্রভাব-শালিনী রমণীরূপে দেখিতে পাই। আমাদের পৌরাণিক যুগের ধ্রুব, অথবা বুদ্ধদেব, চৈতন্য প্রভৃতি সাধকগণ অন্তঃপ্রেরণাবশেই গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু গোপীচন্দ্র সেইরূপ কোন মহৎ উদ্দেশ্যের তাড়নায় সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার পশ্চাতে মাতা ময়নামতীর প্রবল আগ্রহ ও চেষ্টা নিয়োজিত ছিল। বহু বিবাহ করিবার পর মাণিকচন্দ্র

বুড়া দেখি মএনামতিক ব্যাগল করি দিলে,
মএনার ঘর বান্দি দিলে ফেরুসার বন্দর॥
মহারাজা রাজ্য করি যায় পাটের উপর।
মএনামতি চরখা কাটি ভাত খায় বন্দরের ভিতর॥

এই যে কঠোর স্বাবলম্বন, ইহাই তাঁহার দৃঢ় চরিত্র, মহত্ব, শক্তি ও খ্যাতির পরিচয় ঘোষণা করিতেছে। কিন্তু এই অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্যেও তিনি আপন ধর্ম্মবিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইতে পশ্চাদপদ হন নাই। তন্ত্রমন্ত্রের জ্ঞান থাকায় তাঁহার "ডাকিনী" আখ্যা হইলে, সাধারণের এই বিশ্বাস হইল যে, সকল দেবদেবীগণ তাঁহার আজ্ঞা-পালনকারী, তিনি যমের ক্ষমতার বহির্ভূত। বাস্তবিকই ময়নামতীর হস্তে যম এবং বহু দেবতাকে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে।

এই গানের কতকগুলি বিষয় দ্বারা ময়নামতীর চরিত্রে সন্দিহান হইতে হয়। রাণীর চরিত্রের প্রতি পুত্র গোপী-চন্দ্রের কঠোর অভিযোগ লক্ষ্য করার বিষয়। তদুপরি, নাথ সম্প্রদায়ের অপর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "গোরক্ষ বিজয়ে"ও ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু হাড়িসিদ্ধা রাণীর গুরু-ভাই এবং তন্ত্রমন্ত্র সাধনার সহায়ক, ইহা নানা স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে মনে হয়, সম্ভবতঃ এই কলঙ্ক ভিত্তিহীন এবং গোপীচন্দ্রের উত্তেজিতা রাণীগণ কর্তৃক ময়নামতীকে হীন প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহাদের অপচেষ্টার আরও নিদর্শন আমরা পাইয়াছি। সতীত্বের জয়গানে বঙ্গ-সাহিত্য মুখর, এ দেশের নারীর পক্ষে সতীত্ব চিরগৌরবের সম্পদ। সে ক্ষেত্রে একটি চরিত্র-ভ্রষ্টা রমণী দেবীরূপে এবং নায়িকারূপে শ্রদ্ধালাভ করিবেন, ইহা একেবারে অবিশ্বাস্য। এই জন্য অশিক্ষিত পল্লী-কবিদের বিকৃতরুচির নিন্দা করিতে হয়। আজ পর্য্যন্ত রংপুরবাসী তাঁহার বাসস্থানের স্মৃতি শ্রদ্ধার সহিত রক্ষা করিয়া আসিতেছে। গোপীচন্দ্রের কঠোর অভিযোগের উদ্দেশ্য ছিল মাতার আদেশের প্রতিবাদ করা। গাথা হইতেই জানিতে পাই, তিনি পরে মাতার মহত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়া সানন্দে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুত্রকে নির্ব্বাসন দিয়া তিনি নিজে রাজ্যভোগে অভিলাষিণী ছিলেন, ইহাকে অমূলক অপবাদ বলিয়া মনে হয়। কেন না, গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসের পরে তাঁহার ভ্রাতা খেতুয়া রাজ্য পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং ময়নামতী ফেরুসায় অবস্থান করিতেছিলেন। পুত্রের মঙ্গল কামনা করিয়াই তিনি নির্ম্মম হইতে পারিয়াছিলেন। বাঙ্গালী রাজা গোপীচন্দ্রের গৌরবের মূলে রহিয়াছেন এই কঠোরা রমণী, মাতা ময়নামতী।

অদুনা, পদুনা প্রভৃতি রাণীগণ সম-সাময়িক বাঙ্গালী ঘরের রমণীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ঈর্ষা, ক্রোধ, পতিপ্রেম প্রভৃতি লইয়াই চিত্রিত হইয়াছেন। স্বামীর প্রতি তাঁহাদের মমত্ব ও দায়িত্ববোধ প্রশংসার্হ। সুতরাং রাজার সন্ন্যাসের প্রস্তাবে তাঁহাদের তীব্র প্রতিবাদ খুবই স্বাভাবিক। ময়নামতীর বিরুদ্ধে ষড়্যন্ত্র করা ও তাঁহাকে নির্য্যাতন করা নির্ম্মমতার পরিচায়ক হইলেও একেবারে অহেতুক নয়। ডক্টর দীনেশচন্দ্রের ভাষায়—"এই সন্ন্যাস উপলক্ষে অদুনার বিলাপ কারুণ্যের নির্ঝর। প্রাচীন গ্রাম্যভাষার কর্কশ উপলখণ্ডের মধ্য হইতে সেই মর্ম্মান্তিক কষ্টের ঝরণা বহিয়া আসিয়াছে।" এই যুগে যে সকল নারীচরিত্র

আমরা পাই, তাহাদের মধ্যে কেহ আদর্শ রমণীর মূর্ত্ত প্রতীক। সতীত্বের আদর্শ তখন প্রায়ই উপেক্ষিত হইত। সেই যুগেই অদুনা পদুনা সতীত্ব-গৌরব বহন করিয়া দীর্ঘ দিনের জন্য পতিবিরহ ভোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু গোপীচন্দ্রের অন্তঃপুর—

একশত রাণী গেল খেতুর বরাবর।

তাঁহারা নির্ব্বিবাদে সতীধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে ইতস্ততঃ করেন নাই।

গোপীচন্দ্রের ঐতিহাসিকতা

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় গোপীচন্দ্রের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশদ গবেষণা করিয়াছেন। আমরা এখানে তাঁহার গবেষণার ধারা অনুসরণ করিয়া সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিব।

বঙ্গদেশের রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস-কাহিনী এক সময় সমগ্র ভারতবিদিত ছিল, সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই বিখ্যাত লোক ছিলেন। এই গান কবে কাহার দ্বারা প্রথম রচিত হয়, তাহা আজও অজ্ঞাত, কিন্তু গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাসের সঙ্গে সঙ্গেই যে এই গাথার সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা যায়, কেন না, সাধারণতঃ কোন ধর্ম্মগুরু বা বীরের জীবন-উপাখ্যান তাঁহার সমসাময়িক কালে বা মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই রচিত হইয়া থাকে। গ্রিয়ারসন সাহেব গোপীচন্দ্রের পিতা মাণিকচন্দ্রকে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই গাথায় কড়িদ্বারা রাজকর আদায়ের প্রথা পরিদৃষ্ট হয়; এবং ইহা প্রধানতঃ হিন্দু রাজত্বের প্রথা; এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় মাণিকচন্দ্রকে একাদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

ভারতের নানা স্থানে গোপীচাঁদের গানের প্রচলন থাকিলেও তিনি অবিসংবাদিত ভাবে বাঙ্গালা দেশের ভূপতি ছিলেন। উপাখ্যানাংশে এবং বংশ-বিবরণে বিভিন্ন গাথার বহুস্থলে অনৈক্য আছে। গোপীচন্দ্রের পিতৃনাম বঙ্গীয় গাথাসমূহে একই পাওয়া যায়, কিন্তু বঙ্গের বাহিরে অন্য নামের প্রচলন আছে। কিন্তু তাঁহার পিতার পূর্ব্বপুরুষ সম্বন্ধে প্রত্যেক গাথার মধ্যেই অনৈক্য রহিয়াছে। তাঁহার গৃহত্যাগ, সন্ন্যাস, হাড়িপার শিষ্যত্ব, অদুনা পদুনার সতীত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ মতভেদ নাই। তাঁহার কাহিনীর বহুল প্রচার দেখিয়া তাঁহাকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু ঘটনাবলীর বিভিন্নতা ও অন্যান্য অসংখ্য অসঙ্গতির হেতু কি তাঁহার প্রাচীনত্ব?

কিন্তু এই গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্র কোন্ সময়ের লোক? গাথা হইতে প্রমাণিত হইবে যে, ময়নামতী গোরক্ষনাথের শিষ্যা এবং গোপীচন্দ্র হাড়িপার শিষ্য। সুতরাং ইঁহাদের আবির্ভাব-কাল কবে, তাঁহাদের প্রচারিত নাথধর্ম্মের আয়ুষ্কালই বা কত, ইহা জানিতে আমাদের কৌতূহল হয়। শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের মতে নাথপন্থ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষে প্রথমে বঙ্গদেশে প্রভুত্ব লাভ করে, তারপর ভারতের বিভিন্ন অংশে বিস্তৃতি লাভ করে। নাথপন্থীদের মধ্যে গোরক্ষনাথই অধিক প্রতিপত্তিশালী, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে বিভিন্ন মতের স্তূপ হইতে সত্য উদ্ধার করা অত্যন্ত কঠিন, তদুপরি একাধিক গোরক্ষনাথের অস্তিত্ব কেহ কেহ স্বীকার করিয়াছেন। পঞ্চম, নবম, দশম, দ্বাদশ, চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ শতাব্দীসমূহ গোরক্ষনাথের আবির্ভাব-কাল বলিয়া ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক অনুমিত হইয়াছে। এদিকে আবার গোরক্ষনাথকে প্রাচীন করিবার প্রবাদ এত বেশী যে, তাহার বিচার করিতে গিয়া ঐতিহাসিককে হতাশ হইতে হয়। হাড়িপার কাল-নির্দ্ধারণের উপযোগী উপকরণের একান্ত অভাব। সুতরাং গোরক্ষনাথ ও হাড়িপার সময় নির্দ্ধারণ করিয়া তাহা হইতে গোপীচন্দ্রের সময় নির্ণয়ের চেষ্টা নিরর্থক।

দাক্ষিণাত্যের রাজেন্দ্রচোলদেবের তিরুমলয়ে উৎকীর্ণ শিলালিপির মতে তিনি দণ্ডভুক্তিতে ধর্ম্মপাল, দক্ষিণ রাঢ়ে রণশূর, উত্তর রাঢ়ে মহীপাল এবং বাঙ্গালার রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করেন। এই বঙ্গেশ্বর গোবিন্দচন্দ্র যে আমাদের আলোচ্য গাথার নায়ক, ইহাতে সন্দেহ নাই। অন্ততঃ এখন পর্য্যন্ত বিরুদ্ধ প্রমাণ উপস্থাপিত করা হয় নাই। রাজেন্দ্রচোলের রাজত্ব-কাল খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ, প্রায় এই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী চন্দ্র উপাধিধারী এক বংশের রাজত্ব দৃষ্ট

হয়। গোবিন্দচন্দ্র এই চন্দ্র-বংশীয় রাজগণের বংশধর। পূর্ব্বে গোপীচন্দ্র পাল-বংশীয় রাজা বলিয়া অনুমিত হইয়াছিলেন, কিন্তু এখন সেই অনুমান অমূলক বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। দশম শতাব্দীর শেষভাগে প্রথম মহীপালদেব রাজত্ব করেন। গোবিন্দচন্দ্র এই মহীপালদেবের সমসাময়িক। অষ্টম শতাব্দী হইতে দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের ইতিহাস অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন। এই অন্ধকার যুগের কোন এক সময়ে মাণিকচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রের বঙ্গদেশ শাসন করা একেবারে অসম্ভব নহে, কিন্তু তাহার নির্ভর-যোগ্য প্রমাণের অভাব। অন্যদিকে রাজেন্দ্রচোলের অভিযান-কালে বঙ্গদেশে গোবিন্দচন্দ্র নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন এবং তিনি রাজেন্দ্রচোল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। এই হিসাবে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রের আবির্ভাব অনুমান করা যায়। তিনি আরও প্রাচীন হইতে পারেন কিন্তু অর্ব্বাচীন নহেন।

রংপুর এবং ত্রিপুরা উভয় দেশই গোপীচন্দ্রের বাসস্থানের গৌরব দাবী করে। রংপুরে সংগৃহীত গাথায় রাজার বাসস্থানের উল্লেখ নাই, তবে সেখানে "ময়নামতীর কোট," "পাটপাড়া" "হরিশ্চন্দ্রের পাট," প্রভৃতি স্থান এখনও নির্দ্দিষ্ট হয়। এই সকল নিদর্শন হইতে রংপুর যে ময়নামতী ও গোপীচন্দ্রের সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহা অনুমান করা যায়। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে আবিষ্কৃত গ্রন্থসমূহ অনুসারে গোচপীন্দ্র ত্রিপুরা জেলার মেহেরকুল পরগণার রাজা। ত্রিপুরা জেলায় যে সকল প্রবাদ প্রচলিত আছে ও অতীত কীর্ত্তির নিদর্শনসমূহ পাওয়া যাইতেছে, ভবানী দাস ও সুকুর মামুদ যে ভাবে মেহেরকুলের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে লালমাই পর্ব্বতের অংশ-বিশেষ,—যাহাকে এক্ষণে ময়নামতীর পাহাড় বলা হয়—সেইখানেই গোপীচন্দ্রের মূল রাজধানী ছিল। সুতরাং ত্রিপুরার পক্ষের প্রমাণ অধিকতর প্রবল এবং যুক্তিযুক্ত বলিয়া আমাদের মনে হয়। নিরক্ষর গ্রাম্যকবির অজ্ঞতাপূর্ণ বর্ণনা সত্ত্বেও গোপীচন্দ্র যে একজন প্রতিপত্তিশালী নৃপতি ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং ত্রিপুরা হইতে রংপুর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ গোপীচন্দ্রের শাসনদণ্ড স্বীকার করিত, এইরূপ অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিক নহে।

গোপীচন্দ্রের শ্বশুর হরিচন্দ্র বা হরিশ্চন্দ্র কোন্ স্থানের লোক ছিলেন তাহাও নিশ্চিতরূপে জানিবার উপায় নাই। ভবানীদাসের গাথায় উল্লেখ আছে, গোপীচন্দ্র 'উরয়া' বা উড়িয়া দেশের রাজার কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। এই রাজা রাজেন্দ্রচোল বলিয়া অনুমান করা যায়। মহীপালের সহিত যুদ্ধে গোপীচন্দ্রের সহায়তা ও তৎকর্ত্তৃক যুদ্ধ-বিজয়ের পর চোলরাজের কন্যা বিবাহ করা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার নহে। কিন্তু সমস্ত অনুমানটি অত্যন্ত অনিশ্চিত, সুতরাং ঐতিহাসিকের পক্ষে নির্ভরযোগ্য নহে।

"মাণিকচন্দ্র রাজার গানে" গোপীচন্দ্রকে বেনিয়া জাতি ও ক্ষেত্রিকুল হইতে উদ্ভূত বলা হইয়াছে। সুকুর মামুদের গ্রন্থে মাণিকচন্দ্র রাজার পরিচয় আছে—

> কুলে শীলে ছিল রাজা গন্ধো বণিক।

বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত এই পরিচয় গ্রহণ করাই সমীচীন। চাঁদবেনিয়ার সহিত সম্পর্কের উল্লেখও এই মতের পরিপোষক।

ভবানীদাসের পুঁথি হইতে জানা যায়—

> গুপিচাঁদের বংশ নাহি ভুবন জুড়িয়া

অর্থাৎ তাঁহার বংশ বিলুপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার পুত্রের নাম উদয়চন্দ্র বা ভবচন্দ্র বলিয়া রংপুর অঞ্চলে প্রবাদ আছে।

গাথাসমূহের রচনাকাল

গোপীচন্দ্রের গান বহুকাল হইতেই উত্তর-বঙ্গে বিশেষভাবে প্রচলিত আছে, যুগ-পরম্পরায় হয়ত ইহাতে বহু শাখা-উপশাখা যোজিত হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথম গ্রীয়ারসন্ সাহেব উহা সংগ্রহ করেন এবং ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালে "মাণিকচন্দ্র রাজার গান" নাম দিয়া প্রকাশ করেন। ১৩১৫ সনে শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় আর একটি পুঁথি সংগ্রহ করেন। ভবানীদাস নামক এক কবি অনুমান দুইশত বৎসর পূর্ব্বে একখানি কাব্য রচনা করেন। দুর্ল্লভমল্লিক নামক জনৈক কবি ময়নামতী সম্বন্ধে সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে একটি গান রচনা করিয়াছিলেন এবং প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে সুকুর মামুদ নামক আর এক

কবি "যোগীর পুথি" নামে গোপীচন্দ্র সংক্রান্ত আর এক সুবিস্তৃত গান রচনা করেন। বিস্তর পাঠান্তর সত্ত্বেও এগুলি যে একই প্রাচীন গাথার রূপান্তর এবং পুনরাবৃত্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। গোপীচন্দ্রের আবির্ভাবের অল্পকাল পরেই মূল গাথা রচনা হওয়ার সম্ভাবনা।

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন বলেন, "রাজার জন্য প্রথম যে বেদনা গাথার আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই বেদনাজাত কাব্যকথা এ পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হইয়া আসিতেছে। ইহা শুধু কাব্য নহে—ইহা গান, ইহা লেখা নহে—বাচনিক আবৃত্তি, সুতরাং ইহা যে গায়কের কণ্ঠে যুগে যুগে নূতন ভাষা পরিগ্রহ করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি ইহা যে অতি প্রাচীন গানের অপেক্ষাকৃত নব সংস্করণ তাহাতে ভুল নাই। অনেক স্থলে প্রাচীন ভাষা পর্য্যন্ত অবিকৃত রহিয়াছে। আর প্রায় সর্ব্বত্রই প্রাচীন সমাজ ও রীতিনীতির প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে।"

ভবানীদাস ও সুকুর মামুদের গাথা হস্তলিখিত পুঁথি হইতে গৃহীত; সুতরাং উহাদের ভাষা পরিবর্ত্তন না হওয়ারই সম্ভাবনা অধিক। ভবানীদাস প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বেকার লোক বলিয়া অনুমিত হয়। তাঁহার গাথায় চৈতন্যদেবের উল্লেখও রহিয়াছে। মনে হয়, যখন চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম সমস্ত বাংলাদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তখনই তিনি আবির্ভূত হন। এইরূপ প্রায় প্রতি গাথাতেই চৈতন্য-প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। "মাণিকচন্দ্র রাজার গানে" আছে—

> পাঁচ বৈষ্ণব ধরিয়া কৌপান পরাইবার লাগিল।
> ভাঙ্গা কন্থা ভাঙ্গা কৌপান ভাঙ্গা বহির্ব্বাস।
> সবে মেলিয়া মারত আছে চৈতন্যের দাস।
> শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অধিক রাধে সীতা।
> শ্রীগুরু বৈষ্ণব বন্দম ভাগবতগীতা।

"ময়নামতীর গানের" একস্থলে আছে,

> হরিধ্বনি দিয়া কাছারি বরখাস্ত করিল।
> রাধাকৃষ্ণ রাম রাম কর্ণে হস্ত দিল।

দুর্ল্লভের গীতে রাজাকর্ত্তৃক শ্রীবিষ্ণুপুরাণ শুনার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং কোন গাথাই চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী নহে। আলোচ্য গাথাগুলির ভাষায় ও ভাবে স্থানে স্থানে প্রচুর ঐক্য দেখা যায়। এই সমস্ত গাথায় উপর সংস্কৃত প্রভাব আদৌ পড়ে নাই, ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের এই সিদ্ধান্ত সঠিক বলিয়া মনে হয় না। মুখে মুখে যে সমস্ত গাথা চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে সংস্কৃত শব্দ, উপমা ইত্যাদি না থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু হস্তলিখিত পুঁথিগুলিতে সংস্কৃত প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। সুকুর মামুদ তাঁহার গাথা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের অনুকরণে রচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ইহাতে সংস্কৃত বহু শব্দ, উপমা, বর্ণনরীতি প্রভৃতির নিদর্শন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রহিয়াছে—

> কোকিলানাং স্বরোরূপং নারীরূপং পতিব্রতা।
> বিদ্যারূপং কুরূপানাং ক্ষমারূপং তপস্বিণাম্।

প্রভৃতি সংস্কৃত শ্লোকও উদ্ধৃত হইয়াছে; দুর্ল্লভ মল্লিককৃত গাথাটি স্পষ্টতঃ সংস্কৃত প্রভাবান্বিত।

যে সময়ের ঘটনা এই গাথাগুলির অবলম্বন, তখন বৌদ্ধমত বঙ্গদেশে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। শ্রীযুত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মতে—"গোপীচন্দ্রের গানটি বোধহয় কোনকালেই সম্পূর্ণ বৌদ্ধ-জগতের ছিল না, ইহা বহুকাল হিন্দুত্ব ও বৌদ্ধত্বের সংমিশ্রণে উৎপন্ন সম্প্রদায়-বিশেষের উপজীবিকাস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে এবং ইহাই বোধ হয় গাথাটির পরমায়ু বৃদ্ধির প্রধান কারণ। যে সমাজে ইহা প্রচলিত, সে সমাজ এখনও সংস্কৃত ও হিন্দুত্বের গণ্ডী দ্বারা আপনাকে প্রাচীনতর সমাজ হইতে সম্যক রূপে স্বতন্ত্র করিতে পারে নাই।"

সামাজিক অবস্থা

এই গাথায় হিন্দু রাজত্বের সময়কার বহু সামাজিক রাজনীতির প্রতিচ্ছায়া পাওয়া যায়। ইহার দীর্ঘ দীর্ঘ অত্যুক্তিপূর্ণ বর্ণনার অভ্যন্তর হইতে তৎকালীন প্রজাগণের সুখ-সমৃদ্ধি এবং দেশের উন্নত আর্থিক অবস্থার কথা জানা যায়। গ্রন্থে আধুনিক সমাজ হইতে বিভিন্নতাসূচক যে সকল সামাজিক প্রথার উল্লেখ দেখা যায়, তাহা কতকটা গীত-রচয়িতার সমসাময়িক অবস্থা; কিন্তু যে প্রাচীন গীতি সকলের মূল, তাহা হইতেও প্রকৃত তথ্য সংগৃহীত হয় নাই, একথা বলা যাইতে পারে না। হিন্দু রাজত্বে প্রজাশক্তির প্রভাব, রাজ্য-শাসনে তাহাদের অধিকার কি পরিমাণে ছিল, তাহা এই গাথাসমূহ হইতে উপলব্ধি

করিতে পারা যাইবে। হিন্দু রাজত্বে প্রায়ই নরবলি দেওয়া হইত, বাল্য-বিবাহ, বহু বিবাহ, সতীদাহ, যৌতুক স্বরূপ পত্নীর ভগ্নীকে লাভ প্রভৃতি প্রথা কিছুকাল এ দেশে প্রচলিত ছিল, কয়েকটি জায়গায় বিধবাবিবাহ প্রথার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সে-সময়ে জনসাধারণের মধ্যে সতীধর্ম্মের প্রতি আস্থা খুব প্রবল ছিল কি না, এই বিষয়ে সন্দেহ করিবার অবকাশ আছে। স্ত্রী-স্বাধীনতা যে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। স্ত্রী-লোকদিগের বেশ-বিন্যাস, বিশেষতঃ কুন্তল-সৌষ্ঠবের বর্ণনা বহু স্থানেই পাওয়া যায়। বস্ত্রের নানা বৈচিত্র্য এবং বয়ন-কুশলতার নানারূপ উল্লেখও যথেষ্ট রহিয়াছে। ইহাতে আরও দেখা যায় যে, সমস্ত দেশময় তখন তান্ত্রিক আচার ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং অলৌকিক শক্তিতে লোকের আস্থা স্থাপিত হইয়াছিল।

বিশেষত্ব

ইতিহাসের কষ্টি-পাথরে "গোপীচন্দ্রের গানে"র যথোচিত মূল্য নিরূপিত হইয়াছে। বঙ্গের পূতচরিত্র রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে ইহা ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়াছে এবং বাঙ্গালার এক অন্ধকার যুগের প্রতি আলোকপাত করিয়াছে। গোপীচন্দ্রের গান ততটা মার্জ্জিত ও সুন্দর না হইলেও ইহাদের কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, এই জন্য ইহারা সাহিত্যের সম্পদ্ হইয়া থাকিবে। এই গাথাগুলি নাগরিক সভ্যতাবহির্ভূত; পুনরুত্থান যুগের কবিদিগের মত ভাবকে ইঁহারা শব্দচাতুর্য্য ও অলঙ্কারনৈপুণ্য দ্বারা শ্রীমণ্ডিত করিয়া উপস্থাপিত করিতে তত বেশী প্রয়াস পান নাই। এই গ্রাম্য কবিদের সারল্য প্রশংসনীয়। তাঁহাদের বর্ণনার একটা বিশিষ্ট ভঙ্গী আছে, যাহা বুঝিতে বেশী বিলম্ব হয় না। অতি সাধারণ কথায় তাঁহারা বর্ণনীয় বিষয় অতি স্পষ্ট ও মর্ম্মস্পর্শী করিয়া তুলিতেন। ডাঃ দীনেশচন্দ্রের ভাষায়—"চিরপরিচিত বঙ্গ-কুটীর, মেয়েলীছড়া, প্রাচীন প্রবাদ-বাক্য—এই সমস্তই গাথার প্রাণস্বরূপ এবং ইহাতে বঙ্গীয় কাব্যশ্রী সামান্য বসন পরিহিতা, বঙ্গীয় পুরস্ত্রীর মতই অনাড়ম্বর ভাবে আমাদিগকে দর্শন দিতেছেন।" অধিকন্তু ইহা প্রাচীন সমাজ-জীবনের যে আলেখ্য আমাদের সম্মুখে মেলিয়া ধরিয়াছে, তাহা অতি প্রয়োজনীয়।

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য প্রধানতঃ ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। "গোপীচন্দ্রের গান" তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম্ম ও পৌরাণিক শৈবধর্ম্মের সমন্বয় হইতে উৎপন্ন নাথধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের রচিত ও প্রচারিত সাহিত্যের অন্তর্গত। এই নাথ-সম্প্রদায়ের চেষ্টায় গোরক্ষনাথ ও তাঁহার শিষ্যবর্গের কাহিনী সমগ্র ভারতে বিস্তার লাভ করিয়াছে। এই জন্যই ময়নামতী ও হাড়িসিদ্ধার গুণগানের জন্য এই গোপীচন্দ্রের গান রচিত হইয়াছিল।

"গোপীচন্দ্রের গান" শূন্যপুরাণ, গোরক্ষবিজয়, প্রাচীন রূপকথা ও ব্রতকথা, লক্ষ্মী ও সূর্য্যের ছড়া, ডাক ও খনার বচন, ময়মনসিংহ-গীতিকা প্রভৃতি গ্রাম্য কবিতার সমপর্য্যায়ভুক্ত। এই গান নিরক্ষর নিম্নশ্রেণীর লোকগণ-কর্ত্তৃক রচিত, সুতরাং ইহাতে রচনা-চাতুর্য্য এবং নির্ম্মল রুচির সন্ধান করিতে যাওয়া সঙ্গত নহে। ইহাতে এমন সব বর্ণনা এবং আচরণের উল্লেখ রহিয়াছে, যাহা আমাদের আধুনিক রুচিতে অত্যন্ত ঘৃণার্হ বলিয়া বিবেচিত হইবে। কিন্তু এই কারণে ইহারা মূল্যহীন বা উপেক্ষণীয় নহে। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের খুব বেশী নিদর্শন আমরা পাই না। বৌদ্ধগান ও দোহার পরেই দ্বিতীয় স্তরে আমরা শূন্য-পুরাণ ও এই গাথাগুলি পাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রচনা হিসাবে এইগুলি কতকটা আধুনিক হইলেও ইহারা প্রাচীন গাথারই রূপান্তর, সুতরাং বঙ্গসাহিত্যের পৌর্ব্বাপর্য্য বা ক্রমবিকাশের ধারা পর্য্যবেক্ষণের জন্য ইহাদের সমধিক মূল্য আছে।

মৃত্যুর পরে

—শ্রীঊষাপ্রভা সেন

পাত্র-পাত্রী—বিজয়, অমূল্য, লীনার প্রেতাত্মা, মিহিরের প্রেতাত্মা।

স্থান—বিজয়ের গৃহ।

কাল—রাত্রি।

(বিজয় প্রেততত্ত্ববিদ্—স্যর আর্থার কনান ডয়েলের শিষ্য। প্রায়ই রাত্রি ১১টা হইতে ৩টা পর্যন্ত প্রেত আহ্বান করিয়া পরলোক-তত্ত্ব সংগ্রহ করে। নির্দিষ্ট রাত্রে তাহার গৃহে বহু লোক আহূত হয়।

বিজয় সোফায় উপবিষ্ট, কক্ষবাতির মৃদু নীলাভ আলোকে গৃহ স্বপ্নলোকের ন্যায় আবেশপূর্ণ।

বিজয় স্থির ভাবে বসিয়া আছে। কিছুক্ষণ পরে অতি অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি হইতে ধীরে ধীরে পূর্ণাবয়ব নারী-মূর্তি আবির্ভাব হইয়া সম্মুখের আসনে বসিল)।

বিজয়। তুমি এসেছ লীনা!

লীনা। হাঁ, তুমি ডাকলে আর ত থাকতে পারি না!

বিজয়। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল)।

লীনা। কেন ডেকেছ? কত দিনই ত ডাকলে, কিন্তু কেন ডাক, তা একদিনও বল না।

বিজয়। কেন ডাকি তা কি জান না? তোমার মুখে যে কথাটি শুনবার জন্ত আমি লালায়িত ছিলাম, তা শুনবার ইচ্ছা এখনও হয়। কিন্তু আবার ভাবি, এখন তা শুনে কি হবে? যে-কথা শুনলে আমার নীরস শুষ্ক জীবন সজীব হয়ে উঠত, সে কথা শুনে এখন আর কোন লাভ নেই!

লীনা। তখনও তা জানলে কোন লাভ হত না, তোমার দুঃখ আরও বাড়ত।

বিজয়। এইখানেই তুমি ভুল করেছিলে! তোমার কাছে যে কথা আমি শুনতে চেয়েছিলাম, তা যে আমার সব দুঃখের উপরে ছিল, কেন তা বুঝলে না?

লীনা। তুমি কি মানুষের মুখের কথা ছাড়া কিছুই বোঝ না? একদিনও কি তুমি আমার অন্তর দেখতে পাও নি?

বিজয়। পেয়েছিলাম বলেই ত সে কথাটি শুনতেও চেয়েছিলাম। এখনও বুঝতে পারি না লীনা, এত কঠিন, এত কঠোর হয়ে তুমি কি করে থাকতে পারতে?

লীনা। তুমিও ঠিক এইখানেই ভুল করেছিলে। তুমিও বুঝলে না, কি ক্রন্দন আমার হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ছিল! হৃদয়ের স্পন্দন আমি সবলে রুদ্ধ করে রেখেছিলাম।

বিজয়। তার কি কোন দরকার ছিল লীনা?

লীনা। ছিল না? বল কি? তুমি আমাকে যা দিতে উদ্যত হয়েছিলে, তা নেবার কোন অধিকার যে আমার ছিল না! যদি একটি অবস্থাও আমার অনুকূল হত, তবে যে তোমার উপহার আমি নতজানু হয়ে নিতাম। নিয়ে সার্থক হতাম!

বিজয়। কেন তা নিলে না? কেন ফিরিয়ে দিলে? তোমার স্পর্শে আমার হৃদয়ের দ্বার খুলে গিয়েছিল, তার মধ্যে কেন তুমি এলে না? ভালবাসার উত্তাপে আমার পাষাণ হৃদয় গলিয়ে দিয়ে দূর থেকে শুধু খেলা করলে, তার মধ্যে প্রবেশ করলে না!

লীনা। তার ত কোন উপায় ছিল না।

বিজয়। ছিল বই কি লীনা। তাতে দুটি প্রাণ ব্যর্থতার ভস্মে চাপা পড়ে এ ভাবে নষ্ট হত না।

লীনা। ও সব বার্ণার্ড শ'রী মত রেখে দাও। শুনতে লজ্জা হয়। কোন শিক্ষিত বিবেকপরায়ণ লোক বার্ণার্ড শ'কে সমর্থন করেন?

বিজয়। ক্ষমা কর। আমি এখনও বুঝতে পারি না আমার কি করা উচিত ছিল। আমি ভাবতাম মানুষ যা তৈরী করেছে, তা সে ভাঙতেও পারে। বিবাহ ত একটা সামাজিক চুক্তি মাত্র, মানুষের তৈরী—কিন্তু ভগবান-দত্ত ভালবাসা কি তারও নীচে?

লীনা। ভালবাসতে ত তোমাকে কেউ নিষেধ করে নি! তবে যে সমাজকে এতটা অবজ্ঞা করছ, তাকে আবার ভয় করলে কেন? সেটা প্রকাশ্যে করলেই তোমার সাহসের পরিচয় পেতাম।

বিজয়। আমি জ্ঞান হারিয়েছিলাম লীনা! তোমার

সাহচর্য্যের জন্ত আমি পাগল হয়েছিলাম। এও সত্য যে, সমাজের রক্তচক্ষু আমি গ্রাহও করি নি!

লীনা। তবে গুপ্ত বিবাহ করতে চেয়েছিলে কেন? তুমি প্রকাশ্যে যা করতে সাহস কর নি, গোপনে তাই চেয়েছিলে। সমাজের ভয়েই ত?

বিজয়। বিধবা-বিবাহ কি অসামাজিক?

লীনা। তবে কেন তা কর নি?

বিজয়। এইখানেই আমার দুর্ব্বলতা! তাই তোমাকে বিবাহ করবার সাহস হয় নি। আমার মানস-প্রতিমা, আমার ধ্যানের দেবী—ভেবেছিলাম, কিন্তু—

লীনা। কিন্তু কি? বল; তুমি কোন্ অধিকার নিয়ে এসেছিলে?

বিজয়। কোন অধিকারই আনি নি লীনা, আমার কোন অধিকারই ছিল না। শুধু তোমাকে ভালবাসতাম—এই অধিকার।

লীনা। ভালবাসার অধিকার থাকে হৃদয়ের উপর; সমাজের জোর থেকে তা মানুষকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না।

বিজয়। তুমি যে আমার কল্পনার অধিক! তোমার রূপে যে আমার দুই চোখ ভরে ছিল, আর কোন ছায়া যে সে চোখে পড়ল না। আমি কিছুতেই যে তা মুছতে পারি নি!

লীনা। কেন পার নি? তাই করাই তোমার উচিত ছিল। আমি ত কোন দিন তোমাকে মিথ্যা আশা দিয়ে ভুলাই নি।

বিজয়। কেন দাও নি? আজ এর উত্তর দিতে হবে। বল, কেন আমাকে এমন একটা কথাও বল নি, যাতে আমি এই ভেবে শান্তি পেতাম যে, আমার মত তুমিও কষ্ট ভোগ করতে।

লীনা। যা বেঁচে থাকতে বলি নি, মৃত্যুর পর তা বলবার জন্ত কেন এমন পাগলামী করছ?

বিজয়। (ব্যথিত ভাবে) তা হলে ঠিক! আমি মিথ্যা আশা করেছিলাম! তুমি আমাকে ভালবাসতে না!

লীনা। এই কি ঠিক?

বিজয়। ঠিক না? তবে কি ঠিক? লীনা—লীনা, একবার বল কি ঠিক?

লীনা। কি ঠিক? তোমাকে আমি কত ভালবাসতাম তা ত তুমি জান না! কি আকুলতা, কি উচ্ছ্বাস আমি হৃদয়ে বন্ধ করে রেখেছিলাম, প্রতি দিন কি ভাবে তোমার প্রতীক্ষা করতাম, তা ত তুমি জান না!

বিজয়। কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে যেরূপ নির্লিপ্ত ও নির্ব্বিকার ব্যবহার করতে, তা আমাকে উল্টো কথাই বলত!

লীনা। তোমার বক্ষে বিলীন হয়ে যেতে, তোমার পদতলে লুটিয়ে পড়তে কি প্রবল পিপাসা আমি দমন করেছি, তা ত তুমি জান না!

বিজয়। (আত্মহারা হইয়া উঠিয়া লীনার সম্মুখে নতজানু হইয়া তাহার জানুর উপর মাথা রাখিল)।

লীনা। (অস্থির ভাবে) উঃ উঃ সরে যাও! এখনি আমার শরীর মোমের মত গলে যাবে।

বিজয়। (বিচলিত ও ত্রস্তে উঠিয়া নিজের চেয়ারে বসিয়া) লীনা, লীনা, কেন এ কথা বেঁচে থাকতে একবারও বল নি! এই একটি কথার জন্ত আমার জীবন যে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল!

লীনা। বলে কি হত? আমাদের মধ্যের অলঙ্ঘ্য ব্যবধান ত কেউ লঙ্ঘন করতে পারতাম না!

বিজয়। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) তা পারতাম না। তবে থাক ও কথা; আর একটা কথা বলি, বল উত্তর দেবে?

লীনা। দেব, আজ আর বাধা নেই। আজ আমি সকল প্রতিকূল অবস্থামুক্ত, সমাজমুক্ত, দেহমুক্ত। আজ সব কথারই উত্তর দেব। কিন্তু আগে আমার একটা কথার উত্তর দাও, তুমি আগে ত প্রেত ও পরলোক মানতে না, তবে কি করে আমাকে পরলোক থেকে টেনে আন?

বিজয়। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) লীনা, তোমার মৃত্যুর পর ভাবলাম, সত্যই কি দেহ-শেষে কিছুই থাকে না, দেহের সঙ্গেই কি মানুষের সব শেষ হয়? এ কথা মন মানল না, মন বলল, না, না, মৃত্যুই শেষ নয়। এর পর আছে!······তখন আর আনন্দহীন কর্ত্তব্যপালনে নিজেকে রত রাখতে পারলাম না, বিলাতে গিয়ে প্রেত-বিদ্যা শিক্ষা করলাম। উদ্দেশ্য, তোমাকে পাওয়া!

লীনা। মুগ্ধিত হলাম! জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় এই আলেয়ার পেছনে খরচ করেছ!

বিজয়। অনেক কাচ? হ্যাঁ, বাজে কাচ বই কি! কারণ শুধু এই পাঁচ বছরই আমি নিজেকে নিয়ে ছিলাম!

লীনা। কেন তুমি এ অভাগিনীকে এত ভালবেসে-ছিলে? আজও মনে হয়,—বড় উজ্জ্বল ভাবে মনে হয়, সেই একদিনের কথা—যে-দিন একখানা চিঠির জন্ত তুমি অসুস্থতা সত্ত্বেও ক্লান্ত ভাবে আমার কাছে এসেছিলে, না পেয়ে ব্যথিত হয়ে ফিরে গেলে—

বিজয়। বল, বল, শেষ না! এ কি! তোমার কষ্ট হচ্ছে? চোখের জলে যে কাপড় ভিজে গেল!

লীনা। নয়…সে দিন আর আমি আত্মসম্বরণ করতে পারি নি! আমার অটল ধৈর্য্য সে দিন পরাস্ত হয়েছিল! তুমি চলে গেলে আমি চোখের জল মুছে শেষ করতে পারি নি। এ যে আমার স্বপ্নের অগোচর! আমার ভাঙ্গা ঘরে এ রত্ন কোথায় রাখব! কেন আমাকে এত ভালবেসে-ছিলে?

বিজয়। আমার নিঃসঙ্গ একক জীবনে তুমি স্বর্গের মাধুরী এনেছিলে। কিন্তু দূর থেকেই তা দেখলাম, কাছে পেলাম না!

লীনা। আমি দুর্ভাগিনী! যখন তুমি আমার সম্মুখে নতজানু হতে, যখন আমার হাতের উপর মাথা রাখতে—তোমার সে ব্যাকুলতা, সে বেদনা আমি কি করে সহ্য করতাম, তা বুঝাতে পারব না! কিন্তু আমার কোন সাধ্য ছিল না!

(এমন সময় বাহির হইতে কে ডাকিল "বিজয় বাবু"। লীনা তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল। বিজয় লণ্ঠনের আলোক নিভাইয়া বিদ্যুতের আলোক জ্বালিয়া অমূল্যকে গৃহে আনিয়া বসাইল।)

বিজয়। বসুন অমূল্যবাবু, আপনাকে আসতে বলেছিলাম —কিন্তু সে কথা আমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম।

অমূল্য। সেজন্ত কিছু হয় নি, বরং আমার লাভই হয়েছে।

বিজয়। কি রকম?

অমূল্য। বাইরে থেকেই বোনটিকে স্পষ্ট দেখলাম, তার কথা শুনলাম।

বিজয়। ওঃ তবে তো যে জন্ত আসতে বলা তা হয়েই গেল। তা এখন আপনার বিশ্বাস হল তো?

অমূল্য। (হাসিয়া) আমার বাবারও যে বিশ্বাস না হয়ে উপায় নেই। (ইতস্ততঃ করিয়া) কিন্তু এ কি সত্য?

বিজয়। কি অমূল্য বাবু?

অমূল্য। (মাথা চুলকাইয়া) এই—লীনা যে আপনাকে ভালবাসত।

বিজয়। ভালবাসা কি অন্যায়?

অমূল্য। স্থান, কাল, পাত্র হিসাবে।

বিজয়। আমি কি অপাত্র?

অমূল্য। অপাত্র যে কে সে কথা এখন থাক—

বিজয়। না থাকবে কেন? হয়েই যাক না। ভাল-বাসাকে আপনি অন্যায় বলেই মনে করছেন, তা না হলে এ প্রশ্ন করতেন না।

অমূল্য। তা হলে হেঁয়ালী ছেঁড়ে স্পষ্ট ভাবেই বলি, লীনার পক্ষে এ কি অন্যায় নয়?

বিজয়। স্থান, কাল হিসাবেই। নতুবা এ অবস্থায় হিন্দু ভিন্ন অপর জাতি—ধরুন ইউরোপ, কি আবার বিবাহ করে না?

অমূল্য। সোজা পথে আসুন না, দেশের নিক্তিতেই দেশের ওজন হবে; এটা ইউরোপ নয়, এ কথা ভুলে যান কেন।

বিজয়। বর্ত্তমান যুগে এ কথা আর চলবে না অমূল্য বাবু, গণ্ডীর মাঝে মানুষের বিচার আর চলবে না। মানব-মনের যা চিরন্তন ধর্ম্ম তাই দিয়েই বিচার করতে হবে।

অমূল্য। কিন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে—

বিজয়। আবার ভুল কথা বললেন। তারাও তো মানুষ,…এটা স্বীকার করেন তো?

অমূল্য। কি আশ্চর্য্য! আমাদের দেশে বাল-বিধবাও একনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে!

বিজয়। অমূল্য বাবু, আমরা কি ঠিক আমাদের পিতামহের মত আছি? ওরাও যদি পিতামহীর মত না থেকে বদ্‌লে যায়, সেটা বিশেষ গুরুতর মনে করবার কোন কারণ আছে বলে তো আমার মনে হয় না।

অমূল্য। বিজয় বাবু, হয় তো আপনার কথাই ঠিক। কিন্তু এখনও ওটা মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

বিজয়। তা হলে, পিতামহের দৃষ্টান্তটা আপনি একটু

বাড়াবাড়ি মনে করতে পারেন। কিন্তু এতে এক তিল অতিরঞ্জন নেই। কোনান ডয়েলের কর্পোরেল ব্রুষ্টার ও তার নাৎনী নোরা ব্রুষ্টারের কথা মনে আছে কি? ৯০ বছরের বুড়ো কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে নি যে, নাৎনীর আমলের "ব্রীচলোডিং গান" সাবেক আমলের "ব্রাউনবেসের" চেয়ে কিসে শ্রেষ্ঠ? নোরা আর পাঁচজন মেয়ে-যাত্রীর সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ীতে না এসে, একা ট্রেণে চলে এসেছে শুনে বুড়োর ভ্রূ ঘৃণায় কপালে উঠেছিল। সে জন্য কি মনে করতে হবে যে, ঐ যুগের লোকের কাছে যা ভাল লাগেনি এ যুগেও তা লাগবে না? তবে কেবল "ব্রীচলোডিং গান" ও রেলগাড়ী কেন, কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই তো আমাদের কাছে আমল পাওয়া উচিত নয়।

অমূল্য। তা নয়ই তো! বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব কি এই কথাই বলছেন না যে, জীবনটাকে কৃত্রিম কলকারখানা ও তথাকথিত বৈজ্ঞানিক যুগের আবিষ্কারের বহর এড়িয়ে চলতে হবে?

বিজয়। (হাসিয়া) দেখুন, আর যাই করুন, আমাদের এ আলোচনার মধ্যে সেই ক্ষুদ্রদেহ, দন্তহীন, লেংটিপরা সেই একমণী লোকটিকে আমদানী করবেন না। তা হলে দিন রাত্রি বলেও কথার শেষ হবে না। কারণ এঁর সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা শ্রেষ্ঠ মনীষীদের পক্ষে সম্ভবপর হচ্ছে না। সুকন্থি সাহেবের সমস্যা তো জানেনই।

অমূল্য। অর্থাৎ সুকন্থি সাহেব প্রভৃতি যেখানে সামঞ্জস্য খুঁজে পান নি, সেখানে আমরাও পাব না, এই তো?

বিজয়। তা বৈ কি! কিন্তু এ কথাও আপনাকে বলছি, সামাজিক ব্যাপারে এই অসাধারণ লোকটির মত আমাদের অনুকূলেই হবে। তিনি বিধবা-বিবাহের কত পক্ষপাতী তা জানেন তো?

অমূল্য। জানি, আর সে মতের সঙ্গে আমার কোন দ্বন্দ্বও নেই।

বিজয়। তবে তো মীমাংসা হয়েই গেল, তা হলে লীনার প্রতি দোষারোপের কি আছে?

অমূল্য। দোষারোপের কথা পরে আসবে, আমি এখনও ততদূর যাই নি। এইমাত্র বলছি যে লীনার কাজটা আমার কাছে আশ্চর্য্য বোধ হয়েছে। হিন্দু রমণীর একনিষ্ঠা জগতে অতুলনীয়, অথচ তার পক্ষে বরাবরই তা সহজসাধ্য হয়েছে। সামাজিক শিক্ষা-দীক্ষা এবং আবেষ্টনীর প্রভাবে হিন্দু-নারীর একনিষ্ঠ পাতিব্রত্য স্বামীর মৃত্যুর পরও অক্ষুণ্ণ থাকে। এ আমাদের গৌরবের কথা। পিতামহ যুগের কথা-প্রসঙ্গে আপনি অনেক কথা বলেছেন; কিন্তু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মূলে সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসের উপকরণ বৃদ্ধির যে বাহ্য পরিবর্ত্তন—সে সম্বন্ধে যখন মতভেদের অভাব নেই, তখন অন্তর্জ্জগতের নীতি ও ধর্ম্ম-ভাবের আমূল পরিবর্ত্তন এত সহজে মেনে নেওয়া সম্ভব কি?

বিজয়। আমি স্পষ্ট ভাবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, উত্তর দিন। আপনি যে একনিষ্ঠার কথা বলছিলেন, সেটা একটু বুঝিয়ে বলুন না।

অমূল্য। স্বামী-স্ত্রীর ভিতর জীবনে মরণে সর্ব্বাবস্থায় যে অচ্ছেদ্য প্রেম-বন্ধন জন্মে সেটাই একনিষ্ঠা। জীবনে "সাহচর্য্য" ও মরণে "স্মৃতি"—আদর্শ দম্পতির নিকট একই জিনিষ। জীবনে এঁরা পরস্পরকে ছাড়া জানেন না, মরণেও স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকেন। মুহূর্ত্তের জন্যও সে পুণ্যস্মৃতি তৃতীয় ব্যক্তির ছায়াপাতে অপমানিত হয় না।

বিজয়। চমৎকার! অমূল্য বাবু, যে সুন্দর ভাবে আপনি কথাটি বুঝালেন তাতে প্রশংসা না করে পারছি না। তা হলে দুটো কথা আমরা মেনে নিচ্ছি—

প্রথমতঃ, একনিষ্ঠা সেখানেই সম্ভব যেখানে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রেমে মশগুল হয়ে স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য পর্য্যন্ত ভুলে গেছে;

দ্বিতীয়তঃ, একনিষ্ঠতা মহৎগুণ তা মাত্র নারীরই ধর্ম্ম নয়, পুরুষের উপরও এর আধিপত্যের দাবী চুলমাত্র কম নয়। কেমন এই তো?

অমূল্য। নিশ্চয়।

বিজয়। তা হলে বলুন হিন্দু রমণীর একনিষ্ঠার ব্যবস্থার সঙ্গে হিন্দু পুরুষেরও একটা ব্যবস্থা থাকবে?

অমূল্য। তা নেই, যা ছিল না বা থাকবে না, তাতো বলি নি।

বিজয়। কিন্তু আছে, ছিল বা থাকবে তাও বলেন নি! লীনার কাজটাকে আশ্চর্য্য মনে করবার আগে একবার ভেবে

ভেবেছিলেন কি, যদি লীনা মরে তার স্বামী বেঁচে থাকতেন, তবে তিনি কি করতেন ?

অমূল্য। তাই তো! বিজয় বাবু দুঃখের সঙ্গে আমাকে স্বীকার করতে হচ্ছে যে একনিষ্ঠার কথাটা আমি কেবল নারীর দিক দিয়েই ভেবেছিলাম।

বিজয়। ঠিক করেছিলেন কি না, একটু ভেবে দেখবেন কি ? এতে কি নারীর প্রতি অবিচার করা হয় নি ? এই রকম একতরফা বিচারেই তো আমরা জাতটাকে উচ্ছন্ন দিতে বসেছি।

অমূল্য। তাই না কি ? কেন বলুন তো !

বিজয়। তাও বলতে হবে ?

অমূল্য। প্রত্যেক দেশের একটা স্বতন্ত্র মাহাত্ম্য আছে তা কি আপনি স্বীকার করেন না ?

বিজয়। অতীতে যা দীর্ঘকাল ধরে ঘটে এসেছে, তাই যে নির্ভুল সত্য, আপনি কি তাই বলতে চান ? সামাজিক বিধি চিরন্তন সত্য নয়,—তা সাময়িক ব্যাপার মাত্র। তাই গত কালের সত্য আজ টিঁকে থাকলেও, আগামী কালও যে টিঁকে থাকবে, তাই কি আপনি আশা করবেন ?

অমূল্য। কিন্তু তাই বলে কোন সুদূর ভবিষ্যতে কি ঘটবে তাই ভেবে তো বর্তমান বাস্তবকে উপেক্ষা করতে পারা যায় না।

বিজয়। আপনার এ বারের কথাগুলো নিতান্ত ভাব-প্রবণতা প্রকাশ করছে !

অমূল্য। হতে পারে আপনার যুক্তি অকাট্য, কিন্তু মন তা সমর্থন করে না।

বিজয়। একটু ভাবুন অমূল্য বাবু, তর্কবিতর্ক নয়—শুধু একটু ভেবে দেখতে বলি।

এতে আশ্চর্য্য বা অন্যায় বলে চমকে ওঠবার কিছু নেই নি অমূল্য বাবু। যারা পরার্থে জীবন উৎসর্গ করে, তাদের কথা স্বতন্ত্র, সেরূপ মানুষ হাজারের মধ্যে একজন,—আর বাকী নিরানব্বই জনই সাধারণ মানব-মানবী ছাড়া কিছু নয়। তারা যদি একবারের স্থানে দুইবার বিবাহ করে, আবার সংসারধর্ম করে, তাতে কোন দুর্বলতা বা লজ্জার কথা হয় না; অন্ততঃ, আমার এই রকম বিশ্বাস।

অমূল্য। তবে আপনি লীনাকে বিবাহ করেন নি কেন ? তাকে তো এই রকমই বলতে শুনলাম।

(বিজয় উত্তর না দিয়া বিদ্যুতের আলো নিভাইয়া দিল। কক্ষটি লীলাভ মৃদু আলোকে আবার গৃহ প্লাবিত হইল। অল্পক্ষণ পরে লীনার মূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া নির্দিষ্ট চেয়ারে বসিল।)

বিজয়। লীনা !

লীনা। বল, সব সময়েই আমি উত্তর দিতে প্রস্তুত আছি।

বিজয়। (উচ্ছ্বসিত আবেগে) লীনা ! লীনা ! লীনা !

(লীনা চকিত ভাবে চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইল। বিজয়ের প্রতি চাহিয়া দুই পা অগ্রসর হইয়া তখনই অদৃশ্য হইয়া গেল। ক্ষণপরে বিজয়ের অতি নিকটে লীনার দুইখানি হাত মাত্র দেখা গেল। পরে তাহাও অদৃশ্য হইল। বিদ্যুতের আলোর মত অতি তীব্র আলো বিজয়ের সম্মুখে, পশ্চাতে ও পার্শ্বে বারবার ঝলসিতে লাগিল। তাহাও অদৃশ্য হইল এবং বিজয়ের মুখের নিকট লীনার মুখখানি শূন্যে ভাসিতে লাগিল। গৃহের নানাস্থান হইতে ছাড়াছাড়া ভাবে লীনার কথা শুনা যাইতে লাগিল।)

ডেক না…এ রকম করে আর ডেক না ! বড় অশান্তি …কোথায় তুমি…আর পারি না…কোথায় তুমি, বিজয় !

অমূল্য। কি করছেন বিজয়বাবু, চক্রের সর্ত্ত কি ভুলে গেলেন ? লীনা যে অস্থির হয়েছে !

বিজয়। (প্রবল চেষ্টায় আত্মসম্বরণ করিয়া) স্থির হও, স্থির হও, লীনা, তোমার চেয়ারে বস।

লীনা। (বসিয়া) কেন ডেকেছ ? বেঁচে থাকতে অন্তরের যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিলাম, মৃত্যুতেও কি তার শেষ হবে না ?

বিজয়। তোমরা যন্ত্রণার শেষ ! জানি না কিসে হবে ! কিন্তু আমি কি করব লীনা, আমাকে যে তুমি শেষ করে দিয়েছ ! তুমি কেন আমাকে ভালবাসলে ? শুষ্ক নিরানন্দ জীবন নিয়ে বেশ ছিলাম, মানুষের বিদ্বেষে বেশ অভ্যস্ত হয়েছিলাম, কেন তুমি মরুভূমি মধ্যে ওয়েসিস্ সৃষ্টি করলে লীনা !

লীনা। তুমি কি আমাকে ভালবাসতে না ?

বিজয়। বাসতাম কি ? জানি না ! এ কি ভালবাসা ? তাই কি এত জ্বালা ? লীনা, লীনা, এক মুহূর্ত্ত যে তোমাকে ভুলতে পারি না ! আমি নিজেই আশ্চর্য্য হতাম, জানতাম না যে তোমাকে ভালবাসি ! তাই পাঁচ বছর সময় চেয়েছিলাম। বড় দীর্ঘ সময় না লীনা ? ভেবেছিলাম এ যদি মোহ হয়

তবে পাঁচবছরে এর চিহ্নমাত্র থাকবে না। লীনা, লীনা, আমার প্রিয়া, আমার আরাধ্যা, তোমাকে কত ভালবাসতাম তা বুঝলাম তোমার মৃত্যুর পর।

লীনা। তোমার দুঃখ যে আমি সহ্য করতে পারতাম না। পাঁচ বছর এমন কি দীর্ঘ সময়? তোমার জন্ম সৃষ্টির শেষ দিন পর্য্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে পারতাম।

বিজয়। (গম্ভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) তা কৈ করলে লীনা? আমার জন্ম অপেক্ষা তো করলে না। আমি যে ফিরে গেলাম?

লীনা। ফিরে গেলে? সে কি?

বিজয়। পাঁচ বছর পরে তোমার কাছে গিয়েছিলাম। তোমাকে হৃদয়ের রাণী, গৃহের লক্ষ্মীরূপে বরণ করে আনতে গিয়েছিলাম। কিন্তু তোমাকে পেলাম না। গিয়ে দেখলাম সব শেষ হয়ে গেছে। আমার জন্ম অপেক্ষা না করে তুমি আরও দূরে চলে গেছ।

লীনা। (সাগ্রহে) তুমি গিয়েছিলে? সত্যই গিয়েছিলে?

বিজয়। তোমার মৃত্যু-স্থির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম।…তার পর এক সপ্তাহ মধ্যে সঙ্কল্প স্থির করলাম, বিলাত চলে গেলাম।

লীনা (চক্ষের জল-ধারা মুছিয়া ফেলিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া) তুমি গিয়েছিলে। ভগবান আর একদিন কেন আমাকে বাঁচিয়ে রাখলে না।

অমূল্য। চমৎকার। আজ যা দেখলাম, যা শুনলাম, তা অপূর্ব্ব। এ যে শিবের সতী-সাধনা। শিব তাঁর তপস্যা ছেড়ে যদি সতী-সাধনা করতে পারেন, তবে বিজয় যে লীনা-সাধন করবে তাতে আশ্চর্য্য কি?

বিজয়। কথাটা ব্যঙ্গ কি না ঠিক বোঝা গেল না।

অমূল্য। আমি কিন্তু আশ্চর্য্য না হয়ে পারছি না যে, মৃত ব্যক্তি পরলোক থেকে এসে একদিন বেঁচে না থাকার জন্ম আক্ষেপ করে।

লীনা। আশ্চর্য্য কিছুই নয়, বহুকাল পরেও মুক্তাত্মাকে অতীত কর্ম্মভূমিতে এসে তার অতীত কাজের হিসাব-নিকাশ করতে হয়।

অমূল্য। যাক। কেমন আছ লীনা?

লীনা। তোমাদের অভ্যাস মত প্রশ্ন করলে, কিন্তু আমি তোমাদের পংক্তি থেকে পৃথক্ হয়ে গেছি; এ প্রশ্ন শরীরীর।

অমূল্য। "কেমন আছ" প্রশ্নে কি শুধু শরীর সম্বন্ধেই বুঝায়?

লীনা। সাধারণতঃ তাই।

অমূল্য। বেশ—প্রশ্ন প্রত্যাহার করলাম; আমাকে চিনতে পারছ? এ প্রশ্ন বোধ হয় বেঠিক হয় নি?

লীনা। পারছি বৈ কি। মৃত্যু কি প্রিয়জনকে ভুলিয়ে দেয়?

অমূল্য। দেয় না। তোমার ব্যবহারে আমার তাই মনে হয়েছিল?

লীনা। কথাটা অ-বৈজ্ঞানিকের, বৈজ্ঞানিক বলেন, মনের মধ্যে যা একবার প্রবেশ করে, তা লুপ্ত হয় না, অন্তরের অতল তলে তলিয়ে গেলেও তা মনের মধ্যেই থাকে।

অমূল্য। (সস্নেহে) ঠিক আগের মতই আছ। কথায় কথায় বিজ্ঞানের দোহাই দেওয়া তোমার অভ্যাস ছিল। কিন্তু সকলে তো বৈজ্ঞানিক নয়, অন্তরের অতল তলে তলিয়ে যাওয়াকেই আমরা ভুলে যাওয়া বলি।

লীনা। অর্থাৎ—বলেই ফেল না, কি বলতে চাচ্ছ।

অমূল্য। বলছি—পরে। পরলোক কি রকম লীনা? ওখানেও কি রাস্তা-ঘাট, পশু-পক্ষী, আলো-অন্ধকার আছে?

লীনা। (হাসিয়া) আমি মরে যা জেনেছি তোমরা বেঁচে থাকতেই তাই জানতে চাও? সব তো বেশ। অনেকে বলেন, ভগবান যা আড়ালে রেখেছেন, তা প্রকাশ হওয়া তাঁর ইচ্ছা-বিরুদ্ধ।

অমূল্য। মানুষকে বুদ্ধি দিয়েই ভগবান মস্ত ভুল করেছেন। তাঁর লুকোন জিনিষও টেনে বার করি।

লীনা। (হাসিয়া) মানুষের বুদ্ধি ভগবানের এক ডিগ্রি ওপর।…পরলোকে জাগ্রত হয়ে প্রথমেই দেখলাম, আমার চারি-ধার অতি সুন্দর অসংখ্য শিশির-সিক্ত গোলাপফুল ঘিরে আছে। ফুলগুলি নীরব ভাষায় তার ব্যথা-ভরা ভালবাসা প্রকাশ করত। শিশির তার অশ্রু। তাদের নীরব ভাষার কথায় আমার মন-প্রাণ সর্ব্বদা আকুল উতলা

হয়ে থাকত। সুদূর অতীত লোক থেকে কে যেন আমাকে ডাকছে।

অমূল্য। প্রেম বুঝি পরলোকে ফুলের রূপ ধারণ করে?

লীনা। একদিন দেখলাম একটি চন্দনমাখা পদ্ম অতি ধীরে আমার কাছে আসছে, অনেক দূর থেকে তার সুগন্ধ পাচ্ছিলাম। পদ্মটি কাছে এল, তার উপরেও শিশির-বিন্দু! কে? এ কার ভক্তির ভালবাসা আজ পদ্ম হয়ে আমার কাছে এসেছে।

অমূল্য। শুধু ফুল? কোনান ডয়েল বলেন—

লীনা। ফুলটি আমি ছেড়ে দিতে পারলাম না। দু'হাতে বুকে চেপে রাখলাম।...একদিন দেখি অতি তীব্র বেগে এক খানা আগুনের খড়্গ আমার পাশ দিয়ে ছুটে গেল। কার ভীষণ ক্রোধ মূর্ত্তি ধরেছে। অমূল্য, মানুষের চিন্তাগুলি মিথ্যা নয়, তাদেরও রূপ আছে, তারাও কাজ করে।

অমূল্য। প্রেততত্ত্ববিদ্ তাই বলেন বটে। তারপর গোলাপগুলি কি হল?

লীনা। যাদের ছেড়ে আমরা পরলোকে আসি, তাদের কথা মনে না থাকলেও স্নেহ ভালবাসা থাকে। তাদের আকর্ষণ আমরা তীব্রভাবে অনুভব করি। যেমন আঘাতকারী চলে গেলেও আঘাতের বেদনা থাকে। ব্যক্তি নেই, স্মৃতি নেই,—কিন্তু তার অনুভূতি আছে। একদিন গোলাপগুলি আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। তারপরই আমি বিজয়ের সম্মুখে এলাম। কিন্তু ফিরে গেলেই সব ভুলে যাই, কেবল তীব্র বেদনার সঙ্গে অনুভূতি থাকে।

অমূল্য। এইবার আসল কথা বলি, ব্যাপারটা আমাকে ভারি আশ্চর্য্য করেছে লীনা, এই সীতা-সাবিত্রীর দেশে।

লীনা। সমাধান অতি সহজ,—

গৌরী সমধে ভসম্‌ভার
পিয়ারী সমধে কালা,
শচী সমধে সহস্র-লোচন
বীর সমধে বীরবালা।
গঙ্গা-গর্জ্জিত শম্ভু জটপর
ধরণী বৈঠত বাসুকী ফণমে,
পরম যৌবন আকুল-সখা
বীর ভজত যুবতী মনমে।

অমূল্য। বীর? কাপুরুষ! বিজয়বাবু এইবার আমার কথার উত্তর দিন। অনেকগুলি অনুকূল অবস্থা সত্ত্বেও দুটি তৃষিত প্রাণ পরস্পরকে চেয়েও কেন পায় নি?

লীনা। আমিই উত্তর দিচ্ছি অমূল্য,—

অমূল্য। না, না, লীনা, এ প্রশ্ন তোমার নয়। তোমার প্রশ্নও আছে, তার উত্তর তুমি দিও।

বিজয়। আপনারা সংসারে সুখী, না অমূল্য বাবু? অবশ্য অবিমিশ্র সুখের কথা বলছি না। কিন্তু আমার ভাগ্যে কি এসেছিল জানেন? প্রতারণা, স্বার্থপরতা, বিশ্বাসঘাতকতা, আর এসেছিল নির্লজ্জা নারীর প্রলোভন। এর ফলে আমি সংসারে বিশ্বাস হারিয়েছিলাম। কর্ত্তব্য-পালন আমার ব্রত, কিন্তু সে কর্ত্তব্যে আনন্দের অনুভূতি ছিল না। কিন্তু জীবন তো কাটাতে হবে, তাই একটা পথ ঠিক করে নিলাম; দেশের কাজে নিজেকে ডুবিয়ে দিলাম। একভাবে এক নিয়মে জীবন চলতে লাগল, এতে নূতনত্ব নেই।

অমূল্য। ভগবানকে ধন্যবাদ! এ রকম না হলে আপনাকে আমরা পেতাম না।

বিজয়। তারপর যৌবনের প্রান্ত-সীমায় এসে লীনার দেখা পেলাম। ম্লানমুখী বিধবা নারী। নারী সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা তিক্তই ছিল, কিন্তু তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার পর সে ধারণা দূর হয়। দেখলাম নারী কতদূর স্বাধীন-প্রকৃতি ও দৃঢ়-চরিত্রা হতে পারে। জানি না লীনা কেন আমাকে ভাল বেসেছিল। তার ভালবাসা জানতে পেরে আমি বিস্মিত, ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম, আমি যে একটা কাঠখোট্টা নীরস মানুষ। বললাম "লীনা, আমার হৃদয় কঠোর, এতে ভালবাসার প্রতিক্রিয়া হয় না। সুতরাং ফিরে যাও, তোমার দুঃখের মাত্রা আর বাড়িও না।"

অমূল্য। বেশ!

বিজয়। কিন্তু উত্তরে সে যদি বলে যে, আমি প্রতিদান চাই না, তখন আর আমার কি বলবার থাকে? এ কি আশ্চর্য্য! ভালবাসা যে আপেক্ষিক, তোমাকে আমি ভালবাসব, তবেই তো তুমি আমাকে ভালবাসবে! কিন্তু এখানে তো তা হয় নি।

অমূল্য। এইখানে আমাকে আবার পূর্ব্ব প্রশ্ন করতে হচ্ছে।

বিজয়। লীনাকে কেন আমি বিয়ে করি নি, এ প্রশ্ন নিশ্চয় আপনি করতে পারেন। আমার অনুকূল মত যতই থাক, প্রতিকূল মতও যথেষ্ট ছিল।

অমূল্য। আর তা সত্ত্বেও আপনি কাপুরুষের মত তাকে প্রণয় নিবেদন করতে, আর মুগ্ধা নারীর প্রণয় গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হন নি! আর যে হতভাগিনী অন্তরের যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল, মৃত্যুর পরও তাকে রেহাই দেন নি! তার পরলোকগত আত্মাকে নিজের স্বার্থের জন্ম যন্ত্রণা দিতে আপনার লজ্জা নেই!

(বিজয় উত্তর হস্তে নত মস্তক স্থাপন করিল)

অমূল্য। লীনা, নিজের অবস্থা তুমি ভুলে গিয়েছিলে, তুমি হিন্দু বিধবা, সন্তানবতী। মৃত স্বামীর স্মৃতি অবলম্বন করে শান্ত জীবন যাপন করা তোমার কষ্টসাধ্য ছিল না, কিন্তু অকারণ অশান্তি সৃষ্টি করে নিজের জীবন তুমি দুঃখময় করেছিলে।

লীনা। (স্থির ভাবে) এ জন্য দায়ী কে জান? স্বামীর সঙ্গে যখন সব হারালাম, তখন তোমরা—তোমাদের স্ত্রীরা আমার সঙ্গে কি ব্যবহার করেছিল? আমাকে তোমাদের ভরণ-পোষণ করতে হবে, সে কি আমার অপরাধ? দুর্দিনে আত্ম-নির্ভর করবার মত উচ্চ শিক্ষা কেন আমাকে দাও নি?

অমূল্য। সুন্দর কৈফিয়ৎ! এ জন্য তুমি নিজের অবস্থা, হিন্দু বিধবার কর্ত্তব্য ভুলে গেলে?

লীনা। কিছুই ভুলিনি অমূল্য! মানুষ শুধু দেহ নিয়েই নয়, পেট ভরে খেতে পেলেই মানুষ সুখী হয় না, মনেরও খোরাক চাই। তোমরা পুরুষ, বাঙ্গালীর ঘরে বিধবার কি অবস্থা তা বুঝবে না! সে সময় শোক-দগ্ধ হৃদয় নিয়ে যার দিকে চেয়েছি, সেই প্রবল ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছে। ভিতরের পাগলটা যে তখনও ভালবাসা চায়!

অমূল্য। তারপর?

লীনা। সেই স্নেহ-বুভুক্ষিত পাগলটার জন্য শূন্যে ভাল-বাসা অর্পণ করে, স্মৃতি নিয়ে আমি থাকতে পারি নি! আমি দুর্বল।

অমূল্য। নিঃসন্দেহ! তারপর?

লীনা। যদি তোমাদের স্নেহচ্ছায়া আমাকে আচ্ছন্ন রাখত, তবে আমার এ দশা হত না। ভালবাসার অভাবে মানুষ কত উচ্ছৃঙ্খল হয়, তা কি জান না?

অমূল্য। জানি লীনা। তারপর?

লীনা। তারপর অপরিসীম সুখে আমার সকল দুঃখ দূর হয়ে গেল। আমার মনে হল এই পৃথিবী বড় সুন্দর। আবার বাঁচতে ইচ্ছে হল। শাশ্বত নারী তার চিরন্তন পরি-তৃপ্তিতে ভরে উঠল, প্রেম যে নারীর জীবন! আমি কি অন্যায় করেছিলাম?

অমূল্য। (সকৌতুকে) এই যে! পাশ্চাত্য আলোক-প্রাপ্তা বিংশ শতাব্দীর নারীর পেছন থেকে আমাদের বুড়ী ঠাকুর-মা উঁকি দিচ্ছে?

লীনা। (ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া) আমি বিধবা। সুখের স্বপ্ন দেখা আমার অপরাধ।

(এই সময় লীনার পার্শ্বে তাহার স্বামী মিহিরের প্রেতাত্মা আবির্ভাব হইল)

মিহির। লীনা!

লীনা। এতদিন পরে! অন্তরের অন্ধকারতম প্রদেশে না পরলোকের তমসাবৃত স্থানে—কোথায় তুমি ছিলে?

অমূল্য। (বিস্ময়ের আতিশয্যে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল) কি আশ্চর্য্য ঘটনা! কি অপরিসীম সৌভাগ্য!

বিজয়। (বিস্মিত মুখে মিহিরকে একখানা চেয়ার অগ্রসর করিয়া দিয়া) বসুন মশায়, এই চেয়ারে বসুন।

মিহির। (বসিয়া) আমাকে তুমি ভুলে গিয়েছিলে লীনা?

লীনা। (ভগ্ন-স্বরে) আজ আমার বিচার! পরলোক-প্রস্থিত আত্মা আর ইহলোকবাসী মানুষ—এই দু'য়ের কাছে আজ আমার বিচার।

মিহির। বিচার? না লীনা, আমি বিচার করতে আসি নি। কোন অদৃশ্য হস্ত কি উদ্দেশ্যে আমাকে এখানে এনেছে তাও জানি না। শুধু দেখছি আমি তোমাদের কাছে এসেছি; আর দেখছি অমূল্যর তূণ অফুরন্ত। আর বাণ-বিদ্ধা হরিণী পালাবার পথ ভুলে ছটফট করছে। তুমি আমাকে ভুলে গিয়েছিলে লীনা?

লীনা। যদি গিয়েই থাকি, তাতে এমন কি অপরাধ হয়েছে? কালের অমোঘ প্রভাবে পাথরও ক্ষয় হয়, নারীর হৃদয় কি পাথর থেকেও কঠিন যে, তাতে একবার অঙ্কিত হলে আর তা যাবে না? একের তিরোধানের অনেক দিন

পরে, ধীরে ধীরে, তিলে তিলে, মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে, মানুষের প্রেম-প্রীতি যদি পাত্রান্তরে যায়, তবে কোন্ স্বাধীন সত্ত্বাবিশিষ্ট মানুষ—কোন্ নিরপেক্ষ জ্ঞানী আছে—যার বলতে সাহস হবে যে এ অন্যায়?

(বিজয় ও অমূল্য নির্ব্বাক হইয়া রহিল।)

অমূল্য। (বহুক্ষণ পরে) শাস্ত্র বলে—

লীনা। শাস্ত্রের উপর আর একটি জিনিষ আছে, তা মনুষ্যত্ব। আমি কি তোমার স্থাবর অচেতন সম্পত্তি যে অনন্তকাল অদৃশ্য থেকেও আমার উপর তোমার অখণ্ড অধিকার থাকবে? এ বিধানের কর্ত্তা কি ভগবান? স্বীকার করি না। প্রেম-প্রীতির জন্যই মানুষ—মানুষ।

অমূল্য। (ঈষৎ অপ্রতিভ ভাবে) স্মৃতির জন্যও মানুষ—মানুষ। অন্য প্রাণীর স্মৃতি থাকে না, কিন্তু মানুষ স্মৃতি নিয়ে থাকে।

লীনা। মিথ্যা কথা। বাঙ্গালীর মেয়ের স্মৃতিশক্তি কবে থেকে এত প্রখর হয়েছে তা জানি না। মহা-সাধক যে শক্তির জন্য তপস্যা করেন, বাঙ্গালীর মেয়ে কি বৈধব্য হবা মাত্র সেই ধারণা-শক্তি লাভ করে?

মিহির। মনে পড়ছে সেই হারিয়ে-যাওয়া গৃহ। যে গৃহে তুমি ছিলে দয়া-দানে বিভূষিতা গৃহিণী, আমার প্রেমময়ী স্ত্রী, আমরা সন্তানের মাতা।

লীনা। কিন্তু তুমি তো জানতে যে, মা আর স্ত্রীর কাছে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলিনি। কোন বস্তুর অন্তরালে আমার ব্যক্তিত্ব চাপা পড়ে নি।

মিহির। জানতাম। জানতাম তুমি দৃঢ়-চরিত্রা মনস্বিনী। তাই আজ আমার বিস্ময় যে নিতান্ত লঘু-প্রকৃতি নারীর মত কেন তোমার এ দুর্ব্বলতা।

লীনা। দুর্ব্বলতা? তুমি কি আমাকে জানতে না? কটা মেয়ে আমার মত মানসিক বলসম্পন্ন? আমি কি প্রলোভন অক্লেশে জয় করেছিলাম তা তুমি নিশ্চয় জান? সীতা জয় করেছিলেন দুর্ব্বৃত্ত কামুকের প্রলোভন—যা নারীর সহজ কর্ত্তব্য। আর আমি করেছিলাম আমার প্রেমিকের—আমার প্রেমাস্পদের সুমার-হৃদয়ের উচ্ছ্বাসময় অকৃত্রিম প্রেম-নিবেদন। যাঁর মহত্ত্ব ও মনস্বিতার কাছে নারীর হৃদয় মুগ্ধ হয়েছিল, যাঁর পায়ে আমার পূজার অর্ঘ্য অঞ্জলি দিয়েছিলাম, তাঁর কাছে আমি চিরদিন অচঞ্চল ছিলাম। আমি গর্ত্তে লুকিয়ে আত্মরক্ষা করিনি। তোমার এ তিরস্কার আমার অসহ্য।

মিহির। লীনা, তিরস্কার নয়। প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রমে মানুষ আশ্চর্য্য না হয়ে পারে না, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে কয়টা জিনিষ আমরা বুঝতে চেষ্টা করি?

লীনা। তুমি মহৎ দেব-প্রকৃতি। আমার অন্তরে জ্ঞানে, কর্ম্মে মণ্ডিত আর এক মূর্ত্তি ছিল। সেই কল্পনার মূর্ত্তি বাস্তব হয়ে দেখা দিল। কিন্তু বড় অসময়ে।

অমূল্য। এঁর আরও কিছুদিন আগে মরা উচিত ছিল।

লীনা। (মিহিরের প্রতি) এখানেও আমার স্বাধীন মত হারাই নি। আমার ব্যক্তিত্ব চির-জাগ্রত ছিল। আমি চিরদিন স্বচ্ছ নির্ম্মল ছিলাম। তাঁর দুর্ব্বলতা আমি জানতাম। সমাজ লঙ্ঘন করবার সাহস তাঁর ছিল না, সমাজের মঙ্গলকর সুপবিত্র বিবাহ-প্রথাকে আমি শ্রদ্ধা করি। প্রকাশ্যে যা সমাজ থেকে নিতে পারি নি,—তা চুরিও করিনি। তিনি গান্ধর্ব্ব বিবাহ করতে চেয়েছিলেন।

অমূল্য। (ভ্রূ-ভঙ্গী করিয়া) বীরত্বের যে সীমা নেই।

মিহির। (প্রশান্ত দৃষ্টিতে বিজয়ের প্রতি চাহিয়া) দুঃখিত।

(বিজয় বিবর্ণ)

লীনা। আমি মিলন-প্রয়াসী ছিলাম না। প্রেম শেখায় ত্যাগ; সংসারে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই যে, দুইটি প্রাণী জীবনের শেষ পর্য্যন্ত পরস্পরকে নিঃশেষে ভালবেসে গিয়েছে, কিন্তু কঠোর কর্ত্তব্যের জন্য মিলিত জীবন যাপন করতে পারে নি।

বিজয়। (ব্যাকুল ভাবে) এ কি লীনা, তোমার কি কষ্ট হচ্ছে? এত কাঁপছ কেন?

লীনা। (মিহিরের প্রতি) আমার বিচার কি শেষ হয়েছে? বল আমি কি অন্যায় করেছিলাম?

মিহির। তবে কি আমি বিচার করতে এসেছিলাম? লীনা, ভগবান কোন্ জিনিষ কোন্ নিক্তিতে ওজন করেন তা তো জানি না। কিন্তু তোমার যে-যুদ্ধ কেবল অন্তরের, যার সঙ্গে বাহিরের কোন সম্বন্ধ নেই, তা যে অন্যায়, তা কি করে বলতে পারি।

(লীনা চেয়ারে হেলিয়া হাতে মাথা রাখিল। চক্ষে জল-ধারা বহিতে লাগিল।)

অমূল্য। (ভীত ভাবে) বিজয়বাবু, দেখছেন এ কি? লীনা যে গলে যাচ্ছে।

(বিজয় ব্যাকুল ভাবে চাহিয়া রহিল। লীনার দেহ মোমের মত গলিতে লাগিল।)

লীনা। উঃ বড় কষ্ট!

বিজয়। লীনা!

(লীনার দেহ গলিয়া পরে অদৃশ্য হইয়া গেল)

বিজয়। (আর্ত্তনাদ করিয়া) লীনা, লীনা, তোমাকে যে আমার অনেক কথা বলবার ছিল!

মিহির। লীনা আর আসবে না। (অন্তর্দ্ধান)

বিজয়। (বহুক্ষণ পরে) লীনা আর আসবে না!!

অমূল্য। (চেয়ার হইতে উঠিয়া বিজয়ের স্কন্ধে হাত রাখিয়া) এ রকম অধৈর্য্য হবেন না বিজয় বাবু, প্রেতাত্মা নিয়ে অনর্থক সময়ের অপব্যবহার না করে অন্য কাজে মন দিন। আপনার কাজের অভাব কি? এতে কি হবে?— এই যে ভোর হয়েছে, ঘড়িতে ৫টা।

(অমূল্য উঠিয়া কক্ষরাসের আলো নিভাইয়া দরজা খুলিয়া দিল। কিন্তু বিজয় এক ভাবেই চেয়ারে বসিয়া রহিল।)

কবির প্রতি

—শ্রীহারাণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ভোল কবি বরষার নীপ-বনে
　　সুমধুর বাঁশরীর ধ্বনি,
ভুলে যাও মধুমাখা মদির-নয়নে
　　সাবলীল বধুর চাহনি।
আঁকিও না মানসের কল্পলোকে
　　বাহুলতা-বেষ্টনে প্রিয়ারে
রিরংসার বেদীমূলে কেন তুমি,
　　বিসর্জ্জন কর ক্ষুব্ধা তারে?
কল্পনার ইন্দ্র-ধনু এঁকে এঁকে
　　আজিও কি মিটিল না আশা?
শান্ত কর জীবনের ছন্নছাড়া
　　লক্ষ্যহীন, দুরন্ত পিপাসা।

*

উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা দলে দলে
　　বাতায়নে আসিয়া দাঁড়ায়,
নিটোল দেহের মধু মাধুরী তাদের
　　পলে পলে তোমারে ভুলায়।
স্নান সারি, পল্লীবালা সচকিতে
　　বস্ত্রভার দেহপরে রাখি,
তব ভয়ে কম্পিত-হৃদয়ে
　　চলে ধীরে নত করি আঁখি।
ক্ষুধিতের লুব্ধ দৃষ্টি ওগো কবি,
　　কেন হেরি নয়নের কোণে,
ভুলেছ কি মহীয়সী রূপ তার?
　　সে রূপ কি নাহি পড়ে মনে?

আর কেন? ফের কবি, শুনিয়াছ
　　বহুবার মধু-গুঞ্জরণ,
যুগে যুগে স্তব্ধ রাতে
　　প্রিয়ারে করেছ দরশন।
ছাড়ায়ে দিয়েছ তার সুসজ্জিত
　　সুবাসিত কবরী-বন্ধন,
ভাঙ্গিয়াছ অর্দ্ধরাতে প্রেয়সীর
　　তন্দ্রাতুর মধুর স্বপন।
জাগায়ে তুলেছ তারে ঘুমঘোরে
　　আঁখিপাতে করিয়া চুম্বন,
কতবার প্রেয়সীর পাদমূলে
　　সঁপিয়াছ অর্ঘ্য অকারণ।

*

থাক্ কবি, সে সব ভুলিয়া যাও
　　চাও আজি বাস্তবের পানে।
পুঞ্জীভূত বেদনার দাহ যেথা
　　নিদারুণ তীব্র শেল হানে।
যেথা কোটি বুভুক্ষিত নর-নারী
　　মর্ম্মভেদ তোলে হাহাকার,
তাদের ব্যথার গানে বেহাগের সুরে
　　পূর্ণ কর বিষাণ তোমার।
জাগো কবি, তামসের সুপ্তি হতে
　　মানবেরে কর আবাহন,
কণ্ঠ হতে ব্যথিতের সুর
　　আজি তব হোক নিঃস্বনন্।

সুপ্রজনন

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ

এটা হচ্ছে প্ল্যানিং-এর যুগ ; সব কাজেই প্ল্যানিং-এর কথা শুনতে পাচ্ছি। সমাজকে একটা সুনির্দিষ্ট প্ল্যানিং-এর সাহায্যে উন্নততর করে তোলবার কল্পনা তাই নূতন বা বিচিত্র নয়। কিন্তু সমাজকে উন্নততর করার কথা যখনই আমরা বলেছি, তখনই অর্থ-নৈতিক দিক্‌টার প্রতিই বেশী জোর দিয়েছি। অথচ সমাজকে পুরাপুরি উন্নততর করে তুলতে চাইলে 'ইউজেনিক্ রিফর্ম' বা সৌজাত্যের কথা ভুললে চলবে না।

বর্তমান প্রবন্ধে এই সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য দেশে যে-সকল গবেষণা হয়েছে, তারই পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। কেউ যেন মনে না করেন, এ সম্পর্কে এখানে যা আলোচনা করা হয়েছে, তাই এ বিষয়ে শেষ-কথা।

লোকবল আলোচনায় আধুনিক গুরু ম্যালথাস্ সংখ্যার (quantity) উপরই জোর দিয়েছেন, উপযুক্ততার (quality) উপর তেমন জোর দেন নি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্ম-শাসন আন্দোলন দেখা দেয় এবং তার ফলে সন্তান-জন্মহার কমে আসে। কিন্তু ভাবনার কথা এই যে, জন্ম-শাসন আন্দোলনের ফলে তাদেরই বেশী করে সন্তান-সংখ্যা কমে আসছে, যারা জনক-জননী হবার সব চেয়ে বেশী উপযুক্ত। ফলে দেশের মধ্যে অনুপযুক্ত (unfit) ও অকেজো (unproductive) লোক-সংখ্যা যাচ্ছে বেড়ে। সুতরাং এ বিষয়ে চিন্তা করার সময় এসেছে।

বিগত ত্রিশ বছরে যক্ষা রোগ বহুল পরিমাণে বেড়ে গেছে, বিশেষতঃ সহর ও কল-কারখানা অঞ্চলে। ইদানীং আবার গ্রামের ভিতরও এই রোগের প্রকোপ দেখা যাচ্ছে। গ্রামে একবার এই রোগ ঢুকলে তা আগুণের মত ছড়িয়ে পড়ে। এক বাংলা দেশেই ১৬৫২4 জন মরেছে এই রোগে (পাবলিক্ হেথ্‌লস্ রিপোর্ট, ১৯৩৫)। যক্ষারোগ বংশানুক্রমে চলে বলেই ধারণা। সুতরাং এরূপ রোগগ্রস্ত লোকদের সন্তান হওয়া দেশের পক্ষে ক্ষতিকর।

কুষ্ঠব্যাধির প্রকোপ দক্ষিণ ও পূর্ব্ব-ভারতেই সর্বাধিক ; এই অঞ্চলে জনসংখ্যার ২% থেকে ৩% পর্য্যন্ত এই ব্যাধি-গ্রস্ত ; কোন কোন গ্রাম অঞ্চলে ৫% থেকে ৭% পর্য্যন্ত কুষ্ঠরোগী দেখা যায়। হিমালয়ের উপত্যকা অঞ্চলেও কুষ্ঠ-ব্যাধি প্রবল। বাঁকুড়া জেলায় ৩০,০০০ লোক পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, ৮৭৮ জন কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত, অর্থাৎ শতকরা ৩ জনের কুষ্ঠরোগ আছে। এই সব রোগীর সন্তান শুধু লোক-সংখ্যাই বাড়ায়, জাতীয় উন্নতির সহায়তা করে না।

১৯৩৫-এর যৌন-ব্যাধিগ্রস্তের একটা হিসাব দিচ্ছি—

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১০,২৮৫
পাঞ্জাব	৩২,৫৯৯
দিল্লী	৮১,৭৭৩
যুক্ত-প্রদেশ	৬,৪৭৮
বিহার-উড়িষ্যা	৭৬,০৩৩
বাংলা	১০০,৩২৬
মধ্যপ্রদেশ	৩৪,০১৮
বোম্বাই	৪৫,৪৪৩
মাদ্রাজ	৩১১,৩৬৩
কুর্গ	৪৬০
আসাম	৬,৯২১
ব্রহ্মদেশ	৬২,১৩৪
বেলুচিস্থান	৪৪৮
	মোট—৭৭৫,৮০৪

এ ত' শুধু হাঁসপাতাল ও ডিস্পেন্সারীতে যারা চিকিৎসার জন্য এসেছিল তাদের হিসাব। সমাজ-দেহে কি রকম ঘুণ ধরেছে, তার আঁচ পাওয়া যাচ্ছে বোধ হয়।

এ দেশে মাত্র ১৯টী উন্মাদ-আশ্রম আছে (mental hospitals); তাতে ৯৩০৮টী রোগী রাখার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ১৯৩৫ সালের যে হিসাব পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে, আশ্রমগুলির উন্মাদের সংখ্যা ১৩,৩২৯, অর্থাৎ যত রোগী থাকার বাসস্থান আছে, তার চেয়ে ৩৯% বেশী

রোগীকে স্থান দিতে হয়েছিল। কত রোগী যে স্থান পায় নি, তা কে বলবে!

এ পর্য্যন্ত আমরা যে হিসাব দিয়েছি, তাতে সেই সব ব্যাধির কথাই উল্লেখ করেছি, যেগুলো বংশ-পরম্পরায় প্রবাহিত হতে থাকে বলেই বিশ্বাস। অবশ্য উপরে যে হিসাব দিয়েছি, সেটাই ব্যাধি-প্রকোপের সম্পূর্ণ ইতিহাস নয়, তবে এ থেকে বোঝা যাবে যে, ভবিষ্যৎ সমাজের কথা ভাবলে এদের সম্বন্ধে চিন্তা করবার সময় হয়েছে। রোগীর রোগ কি করে নিরাময় করা যায়, তার ঔষধ ও ব্যবস্থার কথা অনেকেই চিন্তা করছেন, কিন্তু আমাদের এখন ভেবে দেখতে হবে যে, এই সব ব্যাধিগ্রস্তদের অবাধে সন্তান উৎপাদন করতে দেওয়া হবে কি না। হিট্‌লার জার্ম্মানীর ভাগ্য-নিয়ন্তা হয়ে বসেই লক্ষ্য করলেন, সে দেশের মধ্যে আছে—

(১)	দুর্ব্বল মনন-শক্তিসম্পন্ন লোক	২০০,০০০
(২)	সিজোম্যানিয়া (Schizomania)	৮০০,০০০
(৩)	উন্মাদ	২ ০০,০০০
(৪)	মৃগী (Epilepsy)	৬০,০০০
(৫)	সেণ্ট ভিটাস্ ডান্স	৬০০
(৬)	অন্ধ	৪,০০০
(৭)	বোবা-কালা	১৮০০০
(৮)	বিকলাঙ্গ	২০,০০০
(৯)	মদ্যাসক্ত (Chronic Alcoholism)	১০,০০০

তাই ঘোষণা করলেন যে ৪০০,০০০ লোককে জোর করে বন্ধ্যা করে (sterilize) দেওয়া হবে। ১৯৩২ সালে এই সংবাদ রাষ্ট্র হয়ে যাবার পর সারা জগতে একটা সাড়া পড়ে যায়। হিট্‌লারের এই ঘোষণা আমাদের যতই চঞ্চল করুক এবং কার্য্যটা যুক্তিসঙ্গত হয়েছে কি না, সে বিষয়ে যতই কেন না মতভেদ থাকুক, এটা সত্য যে, হিট্‌লার সমাজকে নবীন ভাবে উন্নততর করে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। তাঁর প্রদর্শিত পথ আমরা অনুসরণ করি আর না করি, এ বিষয়ে চিন্তা করে দেখার সময় এসেছে।

সমাজকে নূতন ভাবে গড়ে তুলতে হলে ভেবে দেখতে হবে, আমাদের আদর্শ কি। অন্ততঃ কি আমরা চাই না, তা সহজেই বলা যায়; আমরা চাই না যে উন্মাদ, বিকলাঙ্গ, অন্ধ, অপরাধী, হাবা-কালা প্রভৃতিতে দেশ ছেয়ে যাক্। সমগ্র জাতের স্বাস্থ্য, বুদ্ধিবৃত্তি, চরিত্রবত্তা যাতে উন্নততর হয়, আমাদের লক্ষ্যই হবে তাই। যদি, যারা অনুপযুক্ত বা unfit তাদের সন্তান-সংখ্যা কমিয়ে আনা যায়, আর যারা উপযুক্ত তাদের সন্তান-সংখ্যা বাড়ান যায়, তা হলে সহজেই সমাজ প্রকৃষ্টতর হয়। দেশের লোক-বলের মধ্যে অধিকাংশই যদি উন্নত শ্রেণীর লোক হয়, তবে দেশও উন্নত হয়, আর তাদের মধ্যে যদি স্বল্পবুদ্ধি বা দুর্ব্বল মনন-শক্তি-বিশিষ্ট (feeble-minded) লোকের সংখ্যাই বেশী হয়, তা হলে সে জাতির উন্নতি সুদূর-পরাহত। যে সব নর-নারীর বুদ্ধি আজীবন একটা দশ বছরের ছেলের বুদ্ধির অনুরূপ থেকে যায়, তাদের কাছ থেকে সমাজ কিছু আশা করতে পারে না, তারা হয়ে থাকে সমাজের ভার-স্বরূপ। আমাদের দেশের সাধারণ লোকের বুদ্ধি কোন্ পর্য্যায়ে পড়ে, সে বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয় নি। বুদ্ধির পরিমাপ করবার একটা উপায় হচ্ছে, "ইন্‌টেলিজেন্‌স্ টেষ্ট" বা "বুদ্ধি পরীক্ষা" করা। এই ভাবে পরীক্ষা করে আমরা পাই I. Q. (intelligence quotient),– কোন ব্যক্তির 'বুদ্ধির বয়স'কে (mental age) সত্যিকারের বয়স (chronological age) দিয়ে ভাগ দিলে পাওয়া যায় 'ইন্‌টেলিজেন্‌স্ কোশেণ্ট'। যেমন ১৯ বৎসর বয়সের যুবকের বুদ্ধির বয়স যদি হয় ১৩, তা হলে I. Q. হল ·৬৮ ; বা ২৩ বৎসর বয়সের লোকের যদি বুদ্ধির বয়স হয় ১৫ তা হ'লে I. Q. হল ·৬৫। আমেরিকার ৪,৮০০,০০০ জন সৈন্যের I. Q. হল ·৭০, অর্থাৎ নর্ম্যাল বুদ্ধি যা থাকা উচিত, তার চেয়ে অনেক কম আমেরিকান সৈন্যদের বুদ্ধি। এই ভাবে একটা বুদ্ধি-পরীক্ষা করলে বোঝা যাবে, আমাদের মধ্যে দুর্ব্বল মননশক্তিবিশিষ্ট (feeble-minded) লোকের সংখ্যা কি রকম। তবে সংখ্যাটা নেহাৎ কম দাঁড়াবে না, তা অনেকটা অনুমান করা যায়। সংবাদপত্র ও সিনেমার কথা একবার ভেবে দেখুন। টাকা উপার্জ্জন করতে যদি না পারে, তা হলে এ দুটী প্রতিষ্ঠান টেঁকে না এবং টাকা রোজগারের জন্য সংবাদপত্র এমন ভাবে সম্পাদন করতে

হয় এবং সিনেমার ছবি এমন ভাবে তৈরী করতে হয়, যাতে খরিদ্দার পাওয়া যায়। এবং খরিদ্দার পাকড়াবার জন্ম জানা দরকার হয় সাধারণ বুদ্ধির দৌড় কতখানি। সুচতুর ব্যবসায়ী জানেন যে, সাধারণ সিনেমা-দর্শক ও পত্রিকা-পাঠকের বুদ্ধি ১২।১৪ বছরের ছেলেদের অনুরূপ। এই অপরিণত বুদ্ধির দর্শক-পাঠকদের খুশী করতে পারলেই ব্যবসায়ীর পকেট ভরে ওঠে, কেন না পনর আনা দর্শক-পাঠকই এই শ্রেণীর। তাই দেখি যে, আমরা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করলেও সংবাদপত্র ও সিনেমায় 'ভাল্‌গার' কুরুচির পরিচয় এত স্পষ্ট।

আমেরিকার ডাক্তার হ্যারি এইচ. লাফলিন, (Superintendent of the Eugenic Record Office) বলেন যে, তাঁর দপ্তরখানার দলিল-দস্তাবেজ দেখে তিনি এ প্রমাণ পেয়েছেন যে, দুর্ব্বল মনন-শক্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বংশানুক্রমে বর্ত্তায়। একটা ছেলে যদি নাগরিক জীবন যাপনের অযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়, তা হলে তার বংশানুক্রম, কি পরিবেশ, সে জন্ম দায়ী, তাতে কিছু আসে যায় না—আসল কথা তার পিতামাতা তাকে জীবনে প্রতিষ্ঠা দিতে পারে নি বা সৎপথে চালিত করতে পারে নি। এরূপ অনুপযুক্ত পিতামাতার সন্তানের জন্ম দেওয়া উচিত হয় নি; কেন না সমাজ চায় সৎ পিতার সৎ সন্তান। সন্তান-প্রতিপালনের যে গুরুভার মাকে বহন করতে হয়, তা খুব কঠিন কাজ; দুর্ব্বল মনন-শক্তিবিশিষ্ট মা সে কাজের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। সুতরাং এ রকম মায়ের কাছ থেকে সন্তানকে সরিয়ে নেওয়া আবশ্যক। কিন্তু তা হলে আবার সন্তান মায়ের স্নেহচ্ছায়া থেকে বঞ্চিত হয়; সন্তানের পক্ষে এটা খুব বড় লোকসান। দুর্ব্বল মনন-শক্তি-বিশিষ্ট পিতার সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। অতএব এরূপ লোকের সন্তান হওয়া অবাঞ্ছনীয়। পক্ষান্তরে যদি এদের সন্তান-প্রজননে বাধা না দেওয়া যায়, তা হলে তাদের বংশ বাড়বেই। ভবিষ্যতের কথা কল্পনা করবার মত বুদ্ধিবৃত্তি এদের নেই; এদের সন্তান-জন্মের ফল যে বিষময়, তাও এরা ভাবতে জানে না। সমাজের কল্যাণের জন্ম তাই এদের সন্তান-প্রজননকে বাধা দেওয়া আবশ্যক কি না তা ভেবে দেখতে হবে।

তার উপর আছে 'ক্রিমিন্যালস্' যা আইনের চোখে অপরাধী। পরিবেশ ও প্রলোভন অনেককে ক্রিমিন্যাল করে তোলে। আবার এমন অনেকে আছে, যারা জন্ম থেকেই অপরাধ-প্রবণ। বহু মনীষীই বলেছেন যে, একজন অপরাধীর সন্তানের পক্ষে কোন অপরাধ করার সম্ভাবনা, সৎ লোকের সন্তানের চেয়ে দশগুণ বেশী। কিন্তু তবু বলা যায় না যে, তার জন্ম পরিবেশ কতটা দায়ী এবং রক্তের টানই বা কতটা দায়ী। তবে হয় ত এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, যদি ক্রিমিন্যালস্‌দের সন্তান-সংখ্যা কমে আসে, তা হলে ভবিষ্যৎ সমাজে অপরাধের (crime) পরিমাণও কমে আসবে। আমরা যাদের বড় বড় সহরে বস্তিবাসী বলি, তাদের সাধারণতঃ বুদ্ধি-বৃত্তি কম দেখা যায় (mentally low-grade)—ব্যতিক্রম যে দেখা যায় না, তা নয়। সহরের চোর-ডাকাত, পকেট-কাটা (city gangs) এই সব বস্তিপ্রদেশ থেকেই আসে। বস্তির মধ্যে যে পরিবেশ থাকে, তাতে দুর্ব্বল-মনন-শক্তিবিশিষ্ট লোকের পক্ষে বিপথে যাওয়া খুব সহজ। সুতরাং সমাজকে উন্নত করতে চাইলে এই বস্তি-অঞ্চল উচ্ছেদ হওয়া চাই।

পরিবার-সংখ্যা কমিয়ে আনার দুটী উপায় আছে—(১) প্রবর্ত্তন (persuasion), ও (২) বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা। বাধ্য করার চেয়ে প্রবর্ত্তন অবশ্যই কাম্য, যদি তাতে ফল পাওয়া যায়। স্বার্থত্যাগ মানুষের পরম ধর্ম্ম; যদি সন্তান উৎপাদন হতে বিরত হলে ভাবী সমাজ উপকৃত হয়, তা হলে সে ক্ষেত্রে বিরত থাকাই ভাল। কিন্তু লোককে বিয়ে করতে বারণ করলেই কি শুনবে? কিংবা যারা বিয়ে করেছে, তাদের উপরোধ করলেই কি তাদের সন্তান জন্মাবে না? যাদের সন্তান হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়, তাদের সন্তান যদি না হয়, তা হলে হয় ত এককালে পৃথিবীর বুক থেকে সেই সব ব্যাধি-বিকৃতি লোপ পাবে। কিন্তু জীবনের ধারা দেখে মনে হয়, মানুষের যৌন-জীবনকে উপেক্ষা করে তা সম্ভব হবে না, কেন না এটা আশা করা করা যায় না যে, সবাই জিতেন্দ্রিয় হবে। যাদের নৈতিক বল সুদৃঢ়, তারাই জিতেন্দ্রিয় হতে পারে। কিন্তু যাদের ইচ্ছাশক্তি দুর্ব্বল, তারা এ বিধান উপেক্ষা করবে। ফলে

এই হবে যে, এদের সন্তান-সংখ্যাই যাবে বেড়ে ; তার ফলে এই সব জনক-জননীর যা বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ অসতর্কতা (carelessness), স্বার্থপরতা ও কামপ্রবৃত্তি (sexual passions) ভাবী সমাজে সেই সবই প্রবল হয়ে উঠবে। তা ছাড়া আর একটা বিপদও আছে,—হয় ত স্বামী বা স্ত্রী এই নৈতিক বিধান মেনে নিতে প্রস্তুত, কিন্তু অপর পক্ষ অস্বীকৃত—সে স্থলে ব্যভিচার বেড়ে যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়।

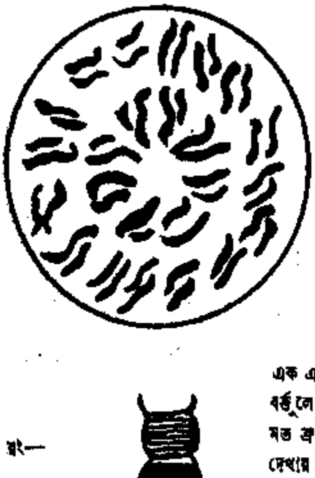
সন্তান-জন্ম রোধ করার এক উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে,—তাকে বলে বার্থ-কন্ট্রোল মেথড্ বা জন্মশাসন-প্রণালী। অনেকে ভয় করেন বার্থ-কন্ট্রোল মেথড্ ব্যবহারের ফলে ব্যভিচার বাড়বে। কথাটা যে একেবারে ভিত্তিহীন, তাও বলা যায় না। কিন্তু সমস্যা এই যে, অবাঞ্ছিতদের সন্তান-সংখ্যা বাড়তে দেওয়া যায় না, তাই বার্থ-কন্ট্রোল প্রয়োজন ; এ দিকে বার্থ-কন্ট্রোল ব্যবহার শেখালে ব্যভিচার বাড়ারও সম্ভাবনা। সুতরাং করা যায় কি ? অধিকন্তু যাঁদের বুদ্ধি-বিবেচনা বেশী, যাঁরা নিজেদের ও সন্তানদের ভালমন্দ চিন্তা করতে শিখেছেন, তাঁরাই সহজে জন্ম-শাসন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ফলে দাঁড়ায়, অবাঞ্ছিতদেরই সন্তান-সংখ্যার প্রাধান্য। তাই বার্থ-কন্ট্রোল একদিকে যেমন ভরসা দেয়, অন্যদিকে তেমনি ভাবনাও বাড়ায়।

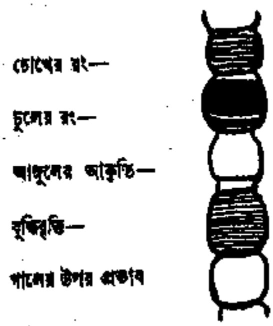
সমস্যার শেষ এখানেই নয়। এমন লোকের অভাব নেই, যারা ইন্দ্রিয়-জয়ীও নয় এবং কোন রকম হাঙ্গামা পোহাতেও নারাজ। এদের জনক-জননী হওয়া নিবারণ করা যায় কি করে ? এক উপায় আছে—সেটা হল ষ্টেরিলাইজেশন্। কথাটা শুনলেই আমরা আঁৎকে উঠি, মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এবং তার প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে, আমরা ক্যাষ্ট্রেশনের (castration) সঙ্গে এটাকে গোলমাল করে ফেলি। ষ্টেরিলাইজেশন এক প্রকার অস্ত্রোপচার মাত্র। একটা সামান্য অস্ত্র করার ফলে (vasectomy পুরুষের বেলায় ও salpingectomy নারীর বেলায়) নর-নারী সন্তান-সন্ততি-প্রজননের শক্তি হারায়। অস্ত্র করার পূর্ব্বে এবং অস্ত্র করার পরে যৌন-জীবন সমানই থাকে। শুধু শুক্রাণুর মধ্যে, কোন সন্তান জন্মে না। বার্থ-কন্ট্রোলের সঙ্গে ষ্টেরিলাইজেশনের তফাৎ এই যে, বার্থ-কন্ট্রোল ত্যাগ করলে নরনারী আবার সন্তানের জনক-জননী হতে পারে ; কিন্তু একবার ষ্টেরিলাইজ করলে আর ফেরার পথ নেই বলে অনেক বৈজ্ঞানিক বলেন। তবে এখন আবার অনেকে বলছেন যে, আবার একটা অস্ত্র করে প্রজনন-শক্তি ফিরিয়ে দেওয়া যায়। অষ্ট্রিয়ার গ্রাৎস্ (Gratz) সহরের অধ্যাপক Schmerz কোর্টে দাঁড়িয়ে শপথ গ্রহণ করে বলেন যে, তিনি অস্ত্র করে প্রজনন-শক্তি ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন (he had successfully restored fertility by a plastic operation on the sperm ducts, after having sterilized patients at an earlier date by vasectomy)।

বার্থ-কন্ট্রোল করার ফলে যে সন্তান-জন্ম নিবারিত হবেই, এমন কথা জোর করে বলা যায় না। কেন না, এখনও জন্ম-শাসন সম্বন্ধে এমন প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হয় নি, যাকে বলা চলতে পারে, 'সেন্ট-পারসেণ্ট সাক্সেস্ফুল' (শতকরা ১০০ ক্ষেত্রেই কার্য্যকরী)। ষ্টেরিলাইজেশন কিন্তু খুব কার্য্যকরী,—সন্তান হবার কোন সম্ভাবনা নেই। কোন কোন দেশে অপরাধীদের শাস্তি-স্বরূপ (punitive measure) ষ্টেরিলাইজ করা হত ; এখনও অপরাধীদের ষ্টেরিলাইজ করার ব্যবস্থা অনেক দেশে আছে। কিন্তু তার উদ্দেশ্য শাস্তি দেওয়া নয়, সমাজের কল্যাণ সাধন করা, সমগ্র জাতিকে উন্নত করা। যাদের যৌন-লিপ্সা বিকৃত (sexual perverts), তাদের কথাও এখানে উল্লেখ করা যায়। বিকৃত যৌন-লিপ্সা বংশানুক্রমে প্রবাহিত হয় কি না, এখনও বৈজ্ঞানিকেরা ভাল ভাবে সিদ্ধান্ত করতে পারেন নি। যে সভ্যতার মাঝে আমরা গড়ে উঠছি, তাতে যৌন-লিপ্সা কিছুমাত্রায় বিকৃত হওয়া আশ্চর্য্য নয় ; অধিকন্তু বাল্যের সঙ্গদোষও আছে ; তা ছাড়া দেশ-কালভেদেও বিকৃতির সংজ্ঞা বিভিন্ন হয়। সুতরাং যৌন-লিপ্সার বিকৃতি লক্ষ্য করলেই সৌজাত্যের দোহাই দিয়ে ষ্টেরিলাইজ করতে হবে, এ যুক্তি চলে না, যদিও কোন কোন ইউজেনিষ্ট সে কথা বলেন এবং কোথাও কোথাও সে ব্যবস্থা আছে। কিন্তু যদি ধরা যায় যে, যাদের যৌন-লিপ্সা বিকৃত, তাদের

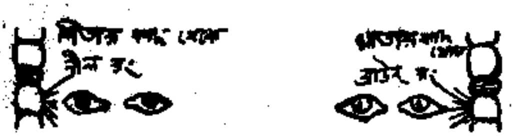
মনও বিকৃত (psychological abnormality), সুতরাং আদর্শ সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম, তা হলে জাতির কল্যাণের জন্য ষ্টেরিলাইজ চলতে পারে। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, ভ্যাসেকটমি অপারেশনের ফলে যৌন-সহবাস-শক্তি তারা হারায় না, তাই বিকৃত প্রবৃত্তি দমন হয় না। অবশ্য

ক্রমোসোমগুলি 'জেলি'র সরু সুতার মত দেখিতে।
২৪ জোড়া করিয়া থাকে প্রত্যেক কোষে।





এক এক সময় কাঁচের বর্তুলের (বিড) মালার মত ক্রমোসোমগুলি দেখায়। বিড্গুলি হল 'জিন্'—এরাই বংশানুক্রম নির্ভর করে। প্রত্যেক জিনের কাজ আলাদা। একটা ক্রমোসোমের কয়েকটা জিনের হয়ত এই কাজ—



সন্তানের চোখের রং।

১নং চিত্র।

এ ক্ষেত্রে ক্যাষ্ট্রেশনের কথা উঠতে পারে; ক্যাষ্ট্রেশন করার ফলে তারা যৌন-শক্তি হারায় বটে, কিন্তু exhibitionists, masochists, sadists প্রভৃতিকে নিবৃত্ত করা যায়, তার কোন প্রমাণ নেই। ডক্টর নরম্যান হেয়ার বলেছেন যে, বিকৃত যৌন-লিপ্সা প্রতিরোধ করার জন্য ক্যাষ্ট্রেশন্ করে দেখা গেছে, কোন ফল হয় নি।

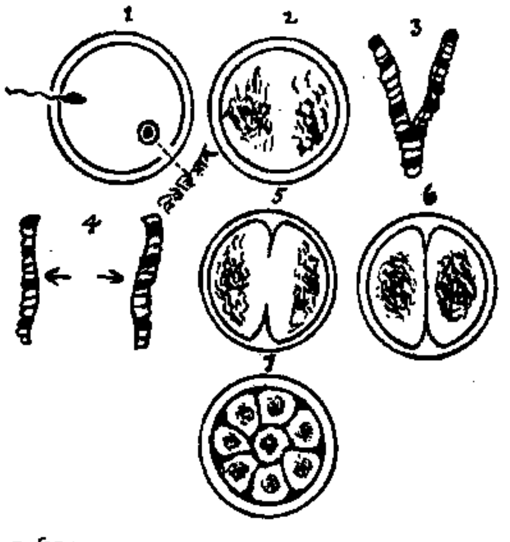
যাঁরা সুপ্রজনন-বিদ্যা নিয়ে আলোচনা করছেন, তাঁদের কাছে ষ্টেরিলাইজেশন একটা বড় অস্ত্র। বংশানুক্রমে যে সব রোগ চলতে থাকে, তাকে আমূলে নির্ব্বংশ করবার প্রকৃষ্টতম উপায় হচ্ছে ষ্টেরিলাইজেশন। বংশানুক্রম ও ষ্টেরিলাইজেশন সম্বন্ধে বুঝতে গেলে প্রজনন-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তাই প্রথমে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করি।

এটা হয়ত সবাই লক্ষ্য করেছেন, দুটী যমজ সন্তানও কখনও একেবারে এক রকম হয় না। দুটীর মিল থাকে অনেক বটে, কিন্তু পার্থক্যও থাকে ঢের। আর লোকের সঙ্গে লোকের যে কত অমিল—কি স্বাস্থ্যে, কি মানসিক পরিণতিতে—তা সবাই জানেন। দুটী লোক একেবারে এক রকম হয় না। বৈজ্ঞানিকেরা এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, এর কারণ হল 'ক্রমোসোম্‌স' (chromosomes), শরীরের প্রত্যেক কোষের (cell) মধ্যেই এর অবস্থিতি। এগুলি 'জেলি'র সুতোর মত দেখতে (strings of jelly-like substance)। পরীক্ষা করে বৈজ্ঞানিকেরা এরই মধ্যে বংশানুক্রম-ধারার (hereditary factors) সন্ধান পেয়েছেন। মানুষের প্রত্যেক কোষের মধ্যে থাকে ২৪ জোড়া (৪৮টা) ক্রমোসোম্—শুধু শুক্র-কীট ও নারীর ডিম্বের মধ্যে থাকে ২৪ জোড়া নয়, ২৪টা। শুক্র-কীট ও ডিম্বের মিলনের ফলে তা দাঁড়ায় ২৪ জোড়ায় (১নং চিত্র)। তাই সন্তানের জীবনের উপর থাকে পিতা-মাতার আধা-আধি প্রভাব। ২৪ জোড়ার প্রত্যেকটা থেকে একটা করে নিয়ে পিতা বা মাতা ২৪টা ক্রমোসোম্ দেয় সন্তানকে। মাত্র ৪ জোড়া থেকে ৪টা করে নিয়ে সাজালে যদি ১৬টা বিভিন্ন 'কম্বিনেশন' পাওয়া যায়, তা হলে ২৪ জোড়ায় কত শত 'কম্বিনেশন' হয়? অর্থাৎ, এই ভাবে হিসাব করলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক পিতা-মাতা, ক্রমোসোম্‌সের, তথা বংশানুক্রম-ধারার, ১৬,৭৭৭,২১৬ কম্বিনেশন উৎপাদন করতে পারে, এবং এর প্রত্যেকটাই থাকে বিভিন্ন। এর কোন্ কম্বিনেশন যে গর্ভোৎপাদনে কাজে লাগবে—কে বলতে পারে। অধিকন্তু গর্ভাধানের জন্য চাই শুক্র-কীট এবং ডিম্বের মিলন। ১৬,৭৭৭,২১৬ শুক্র-কীটের মধ্যে কোনটা যে ডিম্বের কোন্ কম্বিনেশনের সঙ্গে মিলিত হবে,

তাও কেউ বলতে পারে না। ৩০০,০০০,০০০,০০০ বারের মধ্যে একবারই একটা বিশেষ ক্রমোসোম্ কম্বিনেশনের মিল হতে পারে। সুতরাং দুটী লোকের পক্ষে সম্পূর্ণ এক রকম হওয়া কত অসম্ভব ও কেন অসম্ভব বোঝা যাচ্ছে। যাই হোক, শুক্র-কীটের সঙ্গে ডিম্বের যখন মিলন হয়, তখন শুক্র-কীট এতক্ষণ যে ২৪টী ক্রমোসোম্ বহন করে এনেছিল, তা ডিম্বের মধ্যে ত্যাগ করে; সেই মুহূর্ত্তে ডিম্বের নিউক্লিয়াস্ও নিজের ২৪টী ক্রমোসোম্ ছেড়ে দেয়। মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয় যে ২৪ জোড়া ক্রমোসোম্ তা এইভাবেই আসে (২নং চিত্র)। ভবিষ্যতে সন্তান কি হবে, তার বীজ এখানেই রোপণ হল। চোখের বর্ণ তার নীল হবে কি কালো হবে, সোনালী চুল না চিকণ কালো, বিকলাঙ্গ না ডায়েবেটিস্-রোগী—এই সবই ঐ ২৪ জোড়া ক্রমোসোম্ নির্দ্ধারিত করবে। ঐ ক্রমোসোম্গুলি চারিধারে যে আহার্য্য পায়, তা-ই পেয়ে মোটা হতে থাকে; তারপর আপনা থেকেই হয় দ্বিখণ্ডিত; দুটী অংশ সম্পূর্ণ পৃথক্ হয়ে গোলাকৃতি ধারণ করে। এই ভাবে একটীর স্থানে ঠিক্ একই রূপ দুটী কোষ হয়—অতএব ২৪ জোড়ার স্থানে ৪৮ জোড়া ক্রমোসোম্ হল। এই ৪৮ জোড়ার ২৪ জোড়া করে থাকে দুটি কোষের প্রত্যেকটীতে। আবার এই 'প্রসেস্' পুনরাভিনীত হয়ে ২টীর স্থানে ৪টী কোষ হয়; ৪টীর স্থানে ৮টী, ইত্যাদি। এইভাবে ভ্রূণ বাড়তে বাড়তে নানা বিভিন্ন প্রসেসের মধ্য দিয়ে হয় সন্তানের জন্ম। আমাদের আলোচনায় এত খুঁটি-নাটি জানার প্রয়োজন হবে না বলে সে-সব বাদ দিলাম। এইখানে এইটুকু বোঝা গেল যে, যে ২৪ জোড়া ক্রমোসোম্ নিয়ে ভ্রূণ যাত্রা সুরু করে, তারই প্রতিলিপি থাকে মানুষের দেহের প্রত্যেক কোষে।

ক্রমোসোম্গুলির মধ্যে থাকে আরও সূক্ষ্ম পদার্থ। তাদের বলে—জিন্স্ (genes); শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের পরিণতি নির্ভর করে এই জিন্স্গুলির উপর (১নং চিত্র)। প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যের (characteristic) জন্য আছে ১ জোড়া জিন্স্; এই জোড়ার একটা দেন—পিতা, ও অপরটা দেন—মাতা।

মনে করা যাক, পিতার আছে নীল চোখের উপযুক্ত এক জোড়া জিন্স্, আর মাতার আছে ব্রাউন চোখের উপযুক্ত একজোড়া জিন্স্। সন্তানের চোখের জন্যও চাই এক জোড়া জিন্স্—কেন না, জিন্স্ও থাকে জোড়া-জোড়া ভাবে। এখানে চোখের জন্য সন্তান পাবে, একটা নীল চোখের জিন্ (পিতার কাছ থেকে), আর একটা ব্রাউন চোখের জিন্ (মাতার কাছ থেকে)। দুটী জিনের প্রকৃতি দু-রকম। এরূপ ক্ষেত্রে সন্তানের চোখের রং কি হবে? সন্তানের চোখের জন্য জিন্-দুটী (genes for eyes) যদি



২নং চিত্র।

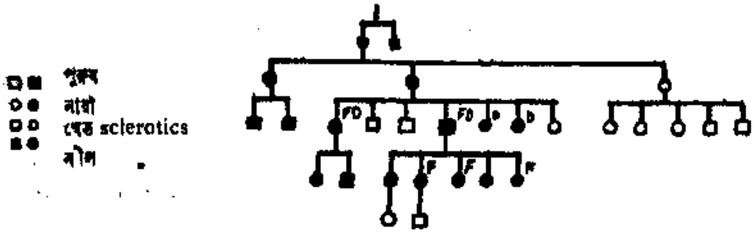
১। শুক্রকীটের ডিম্বে প্রবেশ। ২। শুক্রকীট ও ডিম্বের নিউক্লিয়াসে ক্রমোসোম্ ছাড়িয়া দিতেছে। ৩। প্রত্যেক ক্রমোসোম্ দুই ভাগে ভাগ হইতেছে। ৪। প্রত্যেক ভাগ দুই পাশে সরিয়া পূর্ণাকৃতি হইতেছে। ৫। কোষ দ্বিখণ্ডিত হইতেছে। ৬। একটি প্রাচীর উঠিয়া দুইটি কোষে পরিণত। ৭। এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির ফলে বহু কোষের জন্ম।

একই প্রকৃতির হত, তা হলে প্রশ্নই উঠত না, কেন না, তা হলে সন্তানের চোখের রংও ঐ অনুযায়ী হত। কিন্তু আমরা যে উদাহরণ নিয়েছি, তার বেলায় কি হয়? হয়ত বলা হবে, ব্রাউন ও নীল রং মেশালে যে একটা মিশ্র রং হয়, সেই রং-এর হবে। কিন্তু তা নয়—ছেলের চোখের রং হবে ব্রাউন (১নং চিত্র)। কেন বা কি করে হয়, তা বলা শক্ত। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, ব্রাউন চোখের জিনের সঙ্গে নীল চোখের জিন মেশালে ফল হয়—ব্রাউন

চোখ। (when a gene for brown eyes is mated with a gene for blue eyes, the result will be brown eyes).

মেণ্ডেল বলেছেন যে, প্রবল দুর্ব্বলকে দাবিয়ে রাখে। প্রবল জিন্‌কে 'ডমিন্যাণ্ট' (dominant) আর দুর্ব্বলকে 'রিসেসিভ' (recessive) বলা হয়। উপরে যে উদাহরণ নিয়েছি, তাতে নীল চোখের জিন্ উড়ে যায় নি, শুধু ব্রাউন চোখের জিনের দাপটে আত্মগোপন করে আছে। ব্রাউন চোখের জিনই প্রবল বা 'ডমিন্যাণ্ট' হয়েছে। কোন্ জিনের প্রভাবে কি রোগ বংশানুক্রমে প্রবাহিত হয়, তার অনেকগুলিই আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে।

(Genes that result directly in or produce a tendency toward diabetes, insanity, feeble-mindedness, epilepsy, cancer (not yet certain),



বংশ চিত্র। ["ট্রেজারী অব হিউম্যান্ ইনহেরিটেন্স" হইতে

asthma, deafness, deaf-mutism, blindness, hemophilia, cataract and scores of eye-defects, many teeth-defects, and hundreds of strange abnormalities such as dwarfism, "claw"-hands and feet, missing fingerjoints & complete absence of limbs have now been identified).

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই যদিও ব্রাউন চোখ হয় (এবং নীল চোখের জিন্ 'রিসেসিভ' বা লুক্কায়িত থাকে), তবু কোন কোন সন্তানের চোখ নীলবর্ণের হতে পারে। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যদি 'রিসেসিভ' জিন-বিশিষ্ট হন, তা হলে তাঁদের সন্তানের কখন 'ডমিন্যাণ্টের' বৈশিষ্ট্য আসতে পারে না। নীল চোখওয়ালা স্বামী-স্ত্রীর সন্তানের ব্রাউন চোখ হতেই পারে না। কেন না, ব্রাউন 'ডমিন্যাণ্ট' বলে স্বামী-স্ত্রী কারও না কারও ব্রাউন চোখ থাকতই।

(When two recessives marry, they cannot have children bearing the dominant trait ; for the dominant trait is just dominant ; if either parent possessed it, it would be apparent).

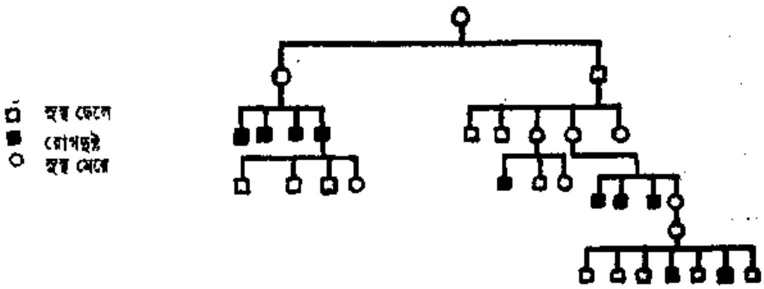
বংশানুক্রম-ধারার একটা নিয়ম মেণ্ডেল বার করেছেন। একটা সহজ উদাহরণ নিয়ে বুঝিয়ে বলি :—দুটি পাত্রে দু'রকম মার্ব্বেল রাখ। একটায় সাদা, আর একটায় কালো। যে পাত্রে কালো মার্ব্বেলগুলি আছে, তা থেকে যে কোন মার্ব্বেলই তুলে নিই না কেন, শুধু কালো মার্ব্বেলই তুলব। সাদা মার্ব্বেলের পাত্র থেকে শুধু সাদা মার্ব্বেলই তুলব। এই উভয় ক্ষেত্রেই বিশুদ্ধ একবর্ণের মার্ব্বেল তুলেছি। মার্ব্বেলগুলিকে যদি জিন্‌সের প্রতীক বলে ধরি, তা হলে বিশুদ্ধ জিন্‌সই দুটোর বেলাতেই পেলাম (In each case we have drawn out two 'pures')।

কিন্তু যদি সাদা পাত্র থেকে একটা ও কালো পাত্র থেকে একটা তুলি, তা হলে পাই দু' রকম মার্ব্বেল—'ডমিন্যাণ্ট' ও 'রিসেসিভ' বা 'প্রবল' ও 'দুর্ব্বল' দুই একসঙ্গে। এবারে মনে কর, একটা পাত্রে ১০০টী কালো ও ১০০টী সাদা মার্ব্বেল এক সঙ্গে মিশিয়ে রাখা হল। এখন যদি ২টী করে মার্ব্বেল এই মিশ্রিত পাত্র থেকে তুলি, তা হলে দেখব যে, হয় (১) দুইটাই কালো (২) নয় দুইটাই সাদা (৩) আর নয় একটী সাদা, একটী কালো মার্ব্বেল তুলছি। চোখ বুজে অন্ধের মত যদি ২টী করে মার্ব্বেল তুলে যাই, তা হলে যখন সব মার্ব্বেলগুলি তোলা শেষ হবে, তখন দেখা যাবে যে, প্রায় ২৫ জোড়া সম্পূর্ণ কালো, ২৫ জোড়া সম্পূর্ণ সাদা ও ৫০ জোড়া সাদা-কালো মিশানো মার্ব্বেল তুলেছি। বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা করে দেখতে পার। মেণ্ডেল এই তত্ত্বটী আবিষ্কার করেন। ২০০ রকম বিভিন্ন characteristics এই ভাবে বংশ-পরম্পরায় চলে, বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে।

বংশানুক্রমিতা সম্বন্ধে যদি এটাই শেষ-কথা হত, ত হলে একটা জাতিকে উন্নত করা সহজ হয়ে যেত ; কেন ন

তা হলে যাদের দেহের মধ্যে ব্যাধি-বিকৃতির পরিপোষক জিন্ লুকিয়ে আছে, তাদের খুঁজে বার করে, ষ্টেরিলাইজ্ করে দিলেই ল্যাঠা চুকে যেত। কিন্তু মুস্কিল এই যে, এত সহজে তা হবার জো নেই। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক্—অস্থির ভঙ্গুরতার (brittleness of bone) কথাই ধরা যাক্। এমন অনেক পরিবার আছে, যাদের সন্তানদের হাড় সহজেই ভেঙ্গে যায়, এবং তার ফলে বিকলাঙ্গ (cripples) দেখা দেয়। যাদের অস্থি ক্ষণভঙ্গুর, তাদের চোখের সাদা অংশটা ফিকে নীলাভ-ধূসর রঙের হয় (blue sclerotics)। চোখের দৃষ্টি থাকে সাধারণ লোকের মত, কিন্তু সাধারণতঃ তারা কালা। ডমিন্যাণ্ট জিনের জন্য হয় ব্লু-স্লেরোটিক্স্ এবং অর্দ্ধেক সন্তানদের এ রোগ হয়। ৩নং চিত্রে একটা পরিবারের ইতিহাস দেওয়া হয়েছে; কালো দাগগুলির অর্থ, যাদের ব্লু-স্লেরোটিক্স্ আছে। F হল 'ফ্র্যাক্‌চার' (ভাঙ্গা), D হল কালা। চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, যাদের ব্লু-স্লেরোটিক্স্ আছে, তাদের কারও কারও হাড়-গোড় ভাঙ্গা, কেউ বা কালা, আবার ২ জনের এই দুই রোগই বর্ত্তমান। কিন্তু আবার অনেকে ব্লু-স্লেরোটিক্স্ থাকা সত্ত্বেও এ দুটীর কোনটির কবলে পড়েনি—যদিও ভবিষ্যৎ বংশধরদের বেলায় কি হবে, তা বলা যাচ্ছে না। যদি এখন আমরা কালা বা হাড়-গোড় ভাঙ্গার দল কমাতে চাই, তা হলে যাদের রোগ দেখা দিয়েছে, তাদের সন্তান-প্রজননে শুধু বাধা দিলে হবে না, যে কোন লোকের ব্লু-স্লেরোটিক্স্ আছে তাকেই ষ্টেরিলাইজ করা আবশ্যক হবে, কেন না, তাদের সন্তানদের—ঐ দুটো রোগ দেখা দিতে পারে; অর্থাৎ যারা unfit বা অনুপযুক্ত, শুধু তাদের ষ্টেরিলাইজ করলেই চলবে না, যারা fit বা উপযুক্ত তাদেরও ষ্টেরিলাইজ করা দরকার এবং এদের করাই বেশী দরকার, কেন না যাদের অস্থি ক্ষণভঙ্গুর, তারা যে বড় বেশী সন্তান প্রজনন করতে পারবে, তা মনে হয় না। যদি এই নীতি অনুবর্ত্তন করা যায়, তা হলে একটা অসুস্থ সন্তানের জন্ম নিবারণ করতে গিয়ে, দুটো অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যবান সন্তানের জন্মের পথে কাঁটা দেওয়া হয়। আরও অনেক রোগ বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়—যেমন, অকালে ছানি পড়া (pre-senile cataract)।

আর এক ধরণের বংশানুক্রমের উদাহরণ নেওয়া যাক,—এগুলো যৌন-সংযোগগত বংশানুক্রম (sex-linked inheritance) বলে পরিচিত। হিমোফিলিয়া (haemophilia) এমন একটা রোগ, যার ফলে রক্ত সহজে জমাট বাঁধতে চায় না (blood does not clot normally)। এ এমন একটা রোগ, যেটা পুরুষের কাছ থেকে সন্তান পায় না। অথচ মেয়েরাই এটা প্রায় আধা-আধি পুত্র-সন্তানদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেয়। চিত্র নং ৪ হিমো-

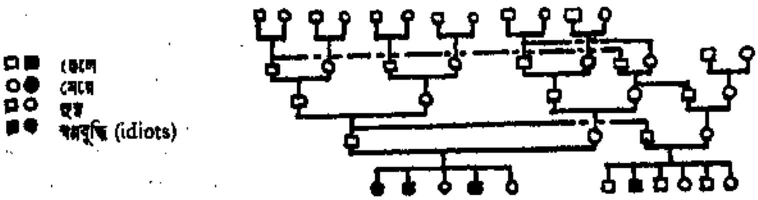


৪নং চিত্র। ["ট্রেজারী অব্ হিউম্যান্ ইন্‌হেরিটেন্স" হইতে

ফিলিয়া রোগের একটা উদাহরণ; এ ক্ষেত্রে পুরুষেরা সন্তান-প্রজননের উপযুক্ত বয়স পর্য্যন্ত প্রায়ই বাঁচে না। সুতরাং পুরুষদের সন্তান-প্রজননে বাধা দেবার ব্যবস্থা করায় কোন ফল নেই, যে হেতু বাল্যেই তারা ভবলীলা সাঙ্গ করে; অধিকন্তু ষ্টেরিলাইজ্ করবার জন্য যে অস্ত্র-প্রয়োগ করা হবে, হয়ত তার ফলে রক্তপাতেই তারা মারা যাবে। অতএব প্রশ্নটা এই দাঁড়ায় যে, রোগের বীজ-বাহক (carrier) নারীদের ষ্টেরিলাইজ করা হবে কি না। যদি হিমোফিলিক্ বীজ-বাহক সকল মা ও মেয়েকে ষ্টেরিলাইজ করে দেওয়া হয়, তা হলে একটী রোগদুষ্ট সন্তানের জন্ম নিবারণ করতে গিয়ে তিনটী সুস্থ সন্তানের জন্মে বাধা দেওয়া হবে। যদি আবার মা-মেয়ের সঙ্গে বোনদেরও ষ্টেরিলাইজ করা হয়, তা হলে ১টা রোগদুষ্ট সন্তানের সঙ্গে সঙ্গে ৭টা সুস্থ সন্তানের জন্মেও বাধা দেওয়া

হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সমস্তাটা বেশ একটু কঠিন। অধিকন্তু শুধু ষ্টেরিলাইজ করে হিমোফিলিয়াকে মূল শুদ্ধ উৎপাটিত করা যায় না। কেন না অনেক সময়ে এ রোগ আপনিই দেখা দেয় (sporadic appearance of gene through mutation); বোধহয় এক-চতুর্থাংশ রোগী এই শ্রেণীর। স্পেনের প্রাক্তন রাজা অ্যাল্‌ফন্‌সোর সন্তানদের এ রোগ আছে। একটী রাজকুমার ইতিমধ্যেই রক্তপাতে মারা গেছে; তবু তাঁর ভগিনীর বিয়ে আটকায় নি, যদিও এই রাজকুমারী তাঁর সন্তানদের মধ্যে এ রোগ সঞ্চারিত করতে পারেন। হিমোফিলিয়া রোগটা ইউরোপের রাজবংশে বেশ ব্যাপক। রুশিয়ার Czarewitch হিমোফিলিয়া রোগে ভুগতেন—ডাক্তারেরা সে রোগ ভাল করতে পারেন নি। র‍্যাস্‌পুটিন্ ঐ রোগ ভাল করে দেবার আশা দিয়েছিলেন বলেই Czar ও Czarinaর উপর অতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন, এ মতও শুনা যায়। আরও অনেক রোগ এই ভাবে বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়, যেমন বর্ণ-অন্ধতা (colour-blindness)।

এবার আর এক রকম বংশানুক্রমের কথা দেখা যাক এইসব বিকৃতির (abnormality) মূলে থাকে autosomal recessive genes। যে ব্যক্তি এই ধরণের মাত্র একটী জিন বহন করে তারা হয় নর্ম্যাল—কিন্তু যার আছে দুটী জিন্, সে হয় বিকৃত (a person carrying one such gene is entirely normal, but a person carrying two is abnormal)। যে-সব বিকৃত-মস্তিষ্ক লোক (abnormal persons) জন্মায়, প্রায় ক্ষেত্রেই তাদের পিতা ও মাতা একটী করে লুকান নর্ম্যাল জিন্ বহন করে (carries a concealed normal gene)—এদেরই 'হেটারোজিগটস্' (heterozygotes) বলে। ৫ নং চিত্রে একটা উদাহরণ দিলাম—juvenile amaurotic idiocy। এই সব রোগী সাধারণ ছেলের মত জন্মায়; প্রায় ছয় বৎসর বয়সের সময় ক্রমশঃ অন্ধ হয়ে যায়; তারপর ক্রমশঃ বোকা বনতে থাকে। ১৪ বৎসর বয়সে গণ্ডমূর্খ (hopeless idiots) হয়ে দাঁড়ায়—এবং বিশ বৎসর পূর্ণ হবার পূর্ব্বেই মারা যায়। চিত্রে স্বামী-স্ত্রী দুই দেখান হয়েছে; এই সব মূর্খদের পিতারা সব তাই এবং প্রত্যেকেই একজন করে জ্ঞাতিকে (cousin) বিয়ে করেছে। এই চিত্র Sjogren-এর গবেষণার ফল। সুইডেনের সমস্ত অন্ধ-স্কুলগুলি ঘেঁটে Sjogren ১৫৫টী কেস্ পান। তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, প্রত্যেক দশ লক্ষে ৩৮টি বালক-বালিকার এই রোগ হবার আশঙ্কা আছে। সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে ১% লোক first-cousin বিয়ে করে; কিন্তু এই সব মূর্খদের (idiots) পিতা-মাতাদের মধ্যে ১৫% 'কাজিন্' বিয়ে করেছে; এবং আরও ১০%-এর মধ্যে কোন-রকম না কোন-রকম রক্তের সম্বন্ধ আছে। হিসাব করে দেখা গেছে যে, আনুমানিক শতকরা একজন সুইডেনবাসী এই হিসাবে 'হেটারোজিগট' (অর্থাৎ, carries one gene for juvenile amaurotic idiocy), এটা ধরা পড়ে, যখন দুই 'হেটারোজিগটে'র বিবাহের ফলে সন্তান জন্মে (can only be detected if he or she has children by a similar spouse)।



৫নং চিত্র।

এইসব ক্ষেত্রে ব্যাধিগ্রস্তদের ষ্টেরিলাইজ করলে কোন ফল হয় না, কেন না এদের যে সন্তান হয়; তার কোন প্রমাণ বা রেকর্ড নেই। 'হেটারোজিগট' ধরে ধরে যে ষ্টেরিলাইজ করে দেওয়া হবে, তাও সমীচীন বলে মনে হয় না—কেন না তা হলে 'ঠগ্ বাছতে গাঁ উজাড়' হয়; হেটারোজিগটের সংখ্যা অনেক এবং কে যে হেটারোজিগট, তাও নির্দ্ধারণ করা সহজ নয়। মনে হয় যে, যদি কোন পিতা-মাতার একটা সন্তানও 'অ্যাবনর্ম্যাল' জন্মে থাকে, তা হলে তাদের আর যাতে সন্তান না হয়, তার চেষ্টা করা উচিত, তার জন্ম বিবাহ-বন্ধন ছেদ করতে হয়, কি জন্ম-শাসন বা

ষ্টেরিলাইজ করতে হয়, কিন্তু যায় আসে না। আর এক উপায় হচ্ছে জ্ঞাতি-বিবাহ হতে না দেওয়া। হাবা-কালাদের (congenital deaf-mutism) ২০% থেকে ৪০% পর্য্যন্ত কাষ্ট-কাজিন্ বিবাহের ফল; Retinitis Pigmentose-র এক-তৃতীয়াংশ কাষ্ট-কাজিন্ বিয়ের ফল। Xeroderma pigmentosum এমন একটা ভয়ানক চর্ম্মরোগ যে, তার ফলে সাধারণতঃ ২৫ বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই ক্যানসার রোগ দেখা দেয়। যারা এই রোগে ভোগে, দেখা গেছে যে, প্রায়ই তাদের পিতা-মাতাদের মধ্যে একটা নিকট রক্ত-সম্বন্ধ আছে। জ্ঞাতি-বিবাহ হলেই যে এমন একটা অঘটন ঘটবেই, তার কোন মানে নেই, তবে এই রকম অঘটন ঘটবার সম্ভাবনা তাতেই সব চেয়ে বেশী (two members of the same family are more likely to carry the latent or recessive genes for degenaracy than two persons are who are not members of the same family)। তাই পূর্ব্ব হতেই সাবধান হওয়া ভাল।

মানসিক বিকৃতি (mental defect) হবার অনেক কারণ হতে পারে; জন্মের সময় কোন আঘাত, কোন রকম রোগ, গর্ভের সময়কার পরিবেশ···এমনি সব নানা কারণেও মানসিক বিকৃতি দেখা দিতে পারে। আবার অনেক সময়ে উপরে উল্লিখিত রিসেসিভ জিনের দরুণও হতে পারে। বিকৃত-মস্তিষ্কের সন্তান হিসাবে মানসিক বিকার অল্পই দেখা যায়। বার্মিংহামে অনুসন্ধান করে দেখা গিয়েছিল যে ৩৪৫ জন শিশুর পিতা-মাতার মস্তিষ্কের দোষ ছিল। এদের মধ্যে মাত্র ২৫ জন বা ৭%, বিকৃত-মস্তিষ্কের জন্য যে বিশেষ স্কুল, তার ছাত্র। বাকী সকলের-বুদ্ধি সাধারণ ছেলের বুদ্ধির চেয়ে কিছু কম ছিল, তা বলে সেটা ভয়ানক কিছু নয়—পারিবারিক পরিবেশ যে এর জন্য কতটা দায়ী তা কে বলতে পারে? মিঃ পেন্‌রোজ এ বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ; তিনি বলেন যে, প্রায় ৫% মানসিক বিকারগ্রস্তের (mental defectives) পিতা-মাতা বা উভয়ের একজন বিকৃত-মস্তিষ্ক। কেউ কেউ আর একটু বেশী বলেন। প্রফেসর হ্বাল্‌ডেনের মতে, যদি সব বিকৃত-মস্তিষ্ককেও ষ্টেরিলাইজ করে দেওয়া যায়, তবু বিকৃত-মস্তিষ্কওয়ালার সংখ্যা এক-পুরুষ পরে মাত্র ১৫% কমতে পারে। যাদের বুদ্ধিবৃত্তি কম বলে ধরা হয় (defective), তাদের অনেককে দেখা যায় বেশ দু-পয়সা উপার্জ্জন করে খাচ্ছে; এই বেকার-সমস্যার দিনে যারা নিজের পেট চালিয়ে নিতে পারে, তাদের বুদ্ধি কম বলা যায় কি না ভাববার কথা, যদিও হয় তো অনেকের চেয়ে কম হতে পারে। সুতরাং 'ইউজেনিক মেজার' (eugenic measure) হিসাবে স্বল্প-বুদ্ধিওয়ালাদের ষ্টেরিলাইজ করা যুক্তিসঙ্গত কি না ভাববার কথা। তার চেয়ে লোকসমাজ থেকে সরিয়ে তাদের জন্য একটা পৃথক্ উপনিবেশের (segregation) মত করে দিলে কি হয়? যেমন, পুরুলিয়ায় কুষ্ঠব্যাধিদের একটা আশ্রম আছে?

সমাজ-সমস্যা সমাধানে ষ্টেরিলাইজেশনের উপর অনেক ইউজেনিষ্ট জোর দেন। ইউজেনিষ্ট কথায় কথায় পশুর সঙ্গে তুলনা দেন। কোন একটা বিশেষ গুণ যখন পশুর মধ্যে দেখতে চাই, তখন অধিকাংশ পুং-পশুকে হয় ক্যাষ্ট্রেট করে, নয় ধ্বংস করে ও কাম্য স্ত্রী-পশুকে দিয়ে জন্ম দিইয়ে সেই গুণটি বাড়িয়ে তুলি (in domestic animals we select in the most rigid manner for desirable characters by castrating or killing a large majority of males, by only breeding from selected females, and, above all, by fixing such characters as we have got by fairly close inbreeding)। কিন্তু প্রথম ২।৪ পুরুষে (generation) অনেক বিকৃত পশু (abnormal type) জন্মায়। এইগুলিকে নষ্ট করা হয়। মানব-সন্তানকেও যদি দোষ-দুষ্ট দেখলেই নির্ম্মমভাবে হত্যা করে ফেলা চলত, তা হলে যেভাবে পশুদের মধ্যে কাম্য গুণগুলো প্রবল হয়, ঠিক্ তেমন ভাবেই মানব-সমাজকেও উন্নত করা হয় তো চলত। কিন্তু তা সম্ভব নয়, তাই ষ্টেরিলাইজেশন খুব কার্য্যকরী হয় না।

সুনিয়ন্ত্রিত সমাজের (planned society) জন্য চাই সুনিয়ন্ত্রিত জন্ম। এই জন্ম-নিয়ন্ত্রণের হল ত্রিবিধ ধারা: উৎকৃষ্টের জন্য জন্ম-হার বৃদ্ধি, সাধারণের জন্য অনড় জন্ম-হার; আর নিকৃষ্টের জন্য জন্ম-হার হ্রাস (birth-liberation for those best endowed by Nature birth-maintenance for the great average; birth-reduction for the lowest social elements)। উৎকৃষ্ট বলতে পশু-শক্তি বোঝাচ্ছি না; যা কিছু জীবনকে মধুময় করে তোলে · সৌন্দর্য্য, প্রেম, আদর্শ, good citizenship, সম্মান, স্বাস্থ্য—এই সবই হবে তার গুণ। আমাদের ভবিষ্যৎ সমাজ এই আদর্শেই গড়ে উঠুক।

ব্রহ্মোত্তর

—শ্রীবিনয় চৌধুরী

মা বলিলেন, "ব্যবসাতে আর কাজ নেই, যা আছে বেচে কিনে দেনা মিটিয়ে দাও—"

নিদান উপায় হিসাবে গোকুলও ইহা ভাবিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু তারপর? সে কথার সোজা উত্তর কেহ দেয় না। মা বলেন "অত জানিনে বাপু! তাই বলে বাঁওনের ছেলে শেষটায় হাতে দড়ি পড়বে! সেটাই খুব ভাল হবে?"

গোকুল মহা-ফাঁপরে পড়িল। ব্যবসা করিতে গিয়া দেনায় জড়াইয়া পড়িয়াছে। পাওনাদারেরা নিত্য দু'বেলা বাড়ী চড়িয়া কড়া কথা শুনাইয়া যাইতেছে, নালিশ করিবে বলিয়া শাসাইতেছে। এদিকে লোকসানী কারবার ক্রমাগত খারাপ দাঁড়াইতেছে। বিপন্ন গোকুল ভাবিয়া কূল-কিনারা পায় না: আপাততঃ আর কিছু টাকা ঢালিতে পারিলে হয়ত এ যাত্রা উদ্ধার পাইত, কিন্তু সে টাকাগুলাও যে জলে যাইবে না তারও তো স্থিরতা নাই! তা ছাড়া, টাকাই বা গোকুল এখন পাইতেছে কোথায়?

অথচ ব্যবসা করিয়া দেশে অনেকেই দাঁড়াইয়া গিয়াছে, নাম করিয়াছে, প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক হইয়াছে। ভাগ্যের কথা বলা যায় না,—বাপের মৃত্যুর পর পৈতৃক থোক কিছু টাকা হাতে পাইয়া গোকুলও ব্যবসায়ে নামে। গোকুল পরিশ্রমী, হিসাবী, ব্যবসায়-বুদ্ধিরও তার অসদ্ভাব ছিল না। সুতরাং ব্যবসায়ে লোকসান যাইবার কথা নয়। লোকসান যায়ও নাই প্রথমটা। পাঁচ-ছয় বছর পরপর কারবারে লাভই দেখা গেল। তারপর অকস্মাৎ একদিন রাত্রে গঞ্জে আগুন লাগিয়া গোকুলের গুদামের অর্দ্ধেক পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। এবং সেই যে কারবার চোট খাইল, শত চেষ্টায়ও আর গোকুল সামলাইতে পারিল না। তাগাদায় তাগাদায় পাওনাদারেরা জীবন দুর্ব্বহ করিয়া তুলিল। বৃথাই গোকুল সকলের হাতে পায়ে ধরিল। শেষ পর্য্যন্ত বাস্তু-ভিটা বাদ দিয়া বিষয়-সম্পত্তি যা ছিল, দেনার দায়ে সমস্তই গেল।— ব্যবসায় তুলিয়া দিয়া গোকুল বাড়ী আসিয়া বসিল।

গোকুল সর্ব্বস্বান্ত হইল।

লাখেরাজ ব্রহ্মোত্তর, এক আধ দিন নয়, দু'শ বছর ধরিয়া পুরুষানুক্রমে ভোগ-দখল করিয়াছে। জন্মিয়া মা, বাবা, ভাই, বোন পাওয়ার মতই ব্রহ্মোত্তরের স্বত্ব বর্ত্তায়, আমরণ উপস্বত্ব ভোগ করার অধিকার জন্মায়। সেই নিষ্কর মালেকানা হারাইল গোকুল!

গ্রামের লোকে বলিল, 'উড়ুনচুড়ে বাঁওনের ঘরের মুখ্যু,—ব্যাত্‌নার ধারে জন্মে উনি গেছেন ব্যবসা করতে! কেমন, বেনো-জল ঢুকে ঘরের টুকুও নিয়ে গেল ত! এই বার—'

আরও কত কি বলিল।

গোকুল নির্ব্বিকার। কিছুদিন বাড়ীর বাহির হইল না, কারও সাথে দেখা-সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করিল না, একেলা বসিয়া বসিয়া কেবল তামাক পুড়াইল। তারপর একদিন পোঁটলা পুঁটুলি বাঁধিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

নানান জায়গায় ঘুরিতে ঘুরিতে গোকুল কলিকাতায় আসিল। চাকরি করিবে!—কোন পুরুষে কেহ যার বাড়ীর বহির হয় নাই—গ্রামের লোক গোকুল—বাপ বাঁচিয়া থাকিতে খাইয়া পরিয়া টো-টো করিয়া কাটাইয়াছে আর বাপের মৃত্যুর পর ব্যবসা করিয়া লোকসান দিয়াছে, সেই ছাত্রবৃত্তি-পাশ,—গোকুল চাকরি করিবে! মহাজনদের ধরিল, গ্রামের যারা ভাল চাকুরে, তাদের ধরিল, অচেনা লোকের সাথে যাচিয়া আলাপ জমাইয়া চাকরির কথা পাড়িল। চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখিল না।

এই সময় আমার মেসে আসিয়া গোকুল কিছু দিন ছিল। সেই সূত্রেই তার সঙ্গে আলাপ-পরিচয়। রাত্রে শুইয়া শুইয়া সারা দিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার বর্ণনা করিয়া যায় গোকুল, অনর্গল বকিতে থাকে। তার পর এক সময় হাই তুলিয়া তুড়ি দিতে দিতে বলে—"দেখবেন একটা কাজ-কর্ম্মের যোগাড় আমার জন্ত চৌধুরী মশাই,...আপনারাই আমার ভরসা..."

নিমতলায় কাঠের গোলা হইতে—ভাঙা খালের ইটখোলা পর্য্যন্ত ঢুঁড়িতে গোকুল ত্রুটি করিল না। এদিকে পুঁজি

ফুরাইয়া আসিল। ম্লান মুখে গোকুল শেষে একদিন বাড়ী ফিরিয়া গেল।

পুঁজি-পাটা যৎসামান্ত ছিল, কিছু দিন চলিল; তারপর অভাবের সংসারে শ্রীহীন দারিদ্র্য বীভৎস হইয়া উঠিল। নাই আর নাই, মানুষের মন স্বতই খিঁচাইয়া যায়। অভাবের মধ্যে মানুষ খেলে না,—বেকার উপায়-অক্ষমের বিরুদ্ধে পোষ্যদের মন অভিমান আর প্রত্যাশার বিফলতায় বিরূপ হইয়া ওঠে।

মা বলেন—"চাকরি নিয়ে বসে আছে লোকে! নিষ্কারণে এক কাঁড়ি টাকা উড়িয়ে এল কলকাতায় না কোন চুলোয় গিয়ে!—থাকলে দুমাস সংসার খরচ চলত।…"

অবিশ্রাম খাটুনির সঙ্গে সঙ্গে বউ-এরও মুখের বিরাম নাই।

সংসারে খরচের সমস্যা অতি নিদারুণ, অথচ গোকুল নিরুপায়। এক বাগানের বাঁশ বেচিয়া যে আয় হয়! কিন্তু পাড়াগাঁ পেনসনের দেশ, বাহির হইতে টাকা আসিবার ব্যবস্থা থাকিলে দিব্য পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া খাও,—বিনা সম্বলে খাটিয়া খুটিয়া দুমুঠা অন্নের সংস্থান করিবে, এমন জায়গাই নয় বাংলাদেশের পাড়াগাঁ। তবু গোকুলের দিন কাটিতে লাগিল এবং একটা একটা করিয়া বছর ঘুরিয়া গেল।

শীতের মুখে ফসল পাকিল, কাটা হইল, গাড়ী বোঝাই করিয়া চাষীরা ধান-বিচালি মনিব-বাড়ী বাড়ী দিয়া আসিল। এ বছর গোকুলের বেড়ার হুড়কা বন্ধই রহিল।

গ্রামপ্রান্তে গোকুলের বাড়ী, বাড়ীর পাশ দিয়া গ্রামে ঢুকিবার পথ। চাকার শব্দে গোকুলের ছেলে ছুটিয়া যায় পথের দিকে; হুড়কা ধরিয়া দাঁড়াইয়া বলে—"ও ছোলেমান, চলে যাচ্ছ যে, আসবা না আমাদের বাড়ী? হুড়কো খুলে দেবো?" যতক্ষণ গাড়ীখানা না অদৃশ্য হয়, একদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে, তারপর ফিরিয়া আসিয়া গোকুলকে বলে—"ওরা এলো না কেন বাবা আমাদের বাড়ী?"

গোকুল জবাব দিতে পারে না।

মুখুজ্জেদের নারাণী লাউ লইয়া যাইতেছিল। রান্নাঘরের পিছনে বসিয়া গোকুল বাঁশের আগালে কাটিয়া আপনি করিতেছিল, শুনিল, তার মা নারাণীকে ডাকিয়া বলিতেছেন—"দিব্যি তকতকে ত লাউ দুটো! তোদের ক্ষেতের বুঝি?"

নারাণী দাঁড়াইয়া জবাব দিল—"হাঁ জেঠিমা—"

"—অনেক হয়েছে বুঝি? তোর বাবে সকলে একা খেলে হজম হবে না,—জেঠিমা বলেছে…"

খানিকক্ষণ পরে নারাণী একফালি লাউ দিয়া গেল। খাইতে বসিয়া গোকুলের ইচ্ছা হইল তরকারির বাটিটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়, কিন্তু পারিল না।

থাকিতে যাহা অকিঞ্চিৎকর ছিল, আলো-বাতাসের মতই গা-সওয়া হইয়া খেয়ালে আসিত না হয় ত কস্মিন কালে, নষ্ট হইয়া তাহাই অতি বিপুল আয়তন ধরিয়া হারানর ক্ষতি অপরিমেয় হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিক হইতে সর্ব্বদাই যেন একটা অদৃশ্য আঙুল গোকুলের দিকে উঁচাইয়া আছে। কৃতকার্য্যের গ্লানিতে গোকুলের সকল দাপট জল হইয়া যায়।

বর্ষাকাল আসিল। বড় দুঃসময় পাড়াগাঁর বর্ষাকাল। বিশেষ করিয়া গরীবের পক্ষে। গোকুলের ঘরের চাল ফুটা হইয়া জল ঝরিল। রাত্রে বিছানা-পত্র সরাইতে গিয়া গোকুলের বউ বলে—"এ এক হয়েছে ভাল। পেটে ভাত নেই, দুদণ্ড শুয়েও যে নিশ্চিন্দি হব, তারও জো নেই। বিড়ালের মত তান-তোবড়া নিয়ে কেবল এখান থেকে ওখানে, আর ওখান থেকে সেখানে……"

পাড়ার লোকের কাছে তার মা দুঃখ করিয়া বলে—"নিজেরা খাই না খাই, লোকে দেখতে আসবে না, কিন্তু ঐ একটা অবলা জীব, ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে শুধু মুখে! পোড়া কপাল আর কি!"

মার গলা শুনিয়া গরুটা মুখ তুলিয়া চায়, মা বলে—"দেখছ কি, শুকিয়ে মরতে হবে না-খেয়ে না-খেয়ে! ছিলে যেমন আমার কাছে! আমি কি করব!……কত পাপই যে জমা হচ্ছে!"—বলিয়া নিঃশ্বাস ফেলেন।

পুরাতন প্রজা কারও দেখা পাইলে মা ডাকিয়া বলেন—"দিওনা বাপু দু'-গল্লা বিচিলি! কতুর হয়ে যাবা না কিছু তার জন্যে……"

পুরুষানুক্রমিক রায়ত-মনিব সম্পর্ক, সকলে ঠেলিতে পারে না কথা। মাথায় বহিয়া দিয়া যায় কিছু কিছু।

একদিনের দাবী আজ দয়া-প্রার্থনায় দাঁড়াইয়াছে। তবু গোকুল ফিরাইতে পারে না। নিজের দোষে নয়, দৈব দুর্ব্বিপাকেই তাদের জীবনে দুর্ভাগ্য নামিয়া আসিয়াছে, তবু ইহাতে সহানুভূতি নাই, সান্ত্বনা নাই। দারিদ্র্যের সংসারের

শীতবেলার নিরুপায় গোকুলকে একটা অনির্দিষ্ট আক্রোশে অধীর করিয়া তুলিল। বাড়ী কণ্টকশয্যা হইল, গোকুল আবার কলিকাতায় ছুটিল।

কলিকাতায় আসিয়া গোকুল এবারও আমাদের মেসে উঠিল। কলিকাতা এবার আর নূতন নয়, গল্প করিবার মত আর কিছু নজরে পড়ে না। সারাদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরিশ্রান্ত গোকুল বিছানায় শুইয়াই ঘুমে একেবারে অচৈতন্য হয়। মুখের সে অনর্গল ভাষা নাই, চোখের সে আশা-মাখান উজ্জ্বলতা ম্লান হইয়াছে। ঠোঁটের সে সরল সলজ্জ হাসি মিলাইয়া গিয়াছে। অধিকাংশ দিন রাত্রে আসিয়া আর খায় না, ক্ষুধা চাপিয়া শুইয়া পড়ে। দেখিলে মায়া হয় লোকটাকে। সকলেই চেষ্টা-চরিত্র করিল গোকুলের জন্য, এবং মাসখানেকের মধ্যে একটা কাজ জুটিয়া গেল। চেৎলার এক চালের আড়তে আদায়-সরকারী। থাকা-খাওয়া বাদ মাস-মাহিনা দশ টাকা। গোকুল পূর্ণ উৎসাহে কাজে লাগিয়া গেল।

তারপর সাত আট বৎসর কাটিল। গোকুল চাকরি করে। মাহিনা বাড়িয়া এখন কুড়ি টাকা হইয়াছে। থাকে আড়তেই, খায় নিজে রাঁধিয়া। বলে—"হলই বা গঙ্গাতীর। হোটেলে খেতে যাব কোন দুঃখে? বাঁওনের ছেলে কি রাঁধতে জানিনে!"—শুধু বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় প্রজ্বলিত উনানের উপর ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ির দিকে চাহিয়া অভুক্ত গোকুলের খাওয়ার আগ্রহ চলিয়া যায়!

ভারি মেহনতের কাজ আদায়-সরকারী। দিন নাই, রাত্রি নাই টো-টো করিয়া শুধু বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াও। কেবল ওয়াদার পর ওয়াদা করিবে লোকগুলা। অনাদায়ে মনিবও খুশী হয় না। মনিবকে তুষ্ট করিতে একবারের জায়গায় সাত বার গোকুল লোকের কাছে যাতায়াত করে।

আড়তের অন্য লোকেরা বলে—"বাঙাল, গেঁয়ো ভূত। অত খাট কেন! লাভ হলে তোমায় বখরা দেবে?"

গোকুল কানে তোলে না সে কথা।

পাড়াগাঁয়ের লোক, একটু গৃহগত প্রাণ। চিরকাল মা বউ-এর সেবায় যত্নে লালিত গোকুলের প্রবাসে একলা বড় উতলা হয় মন। কখনও বাড়ী ছাড়িয়া থাকে নাই দীর্ঘকাল,—বাড়ীর লোকের জন্য মন ছটফট করে। কারও অসুখের সংবাদ পাইলে অস্থির হয়,—গ্রামের লোক কলিকাতায় আসিয়াছে শুনিলে দূরের পথ হাঁটিয়া গিয়া দেখা করিয়া আসে। শতকোটি প্রণাম জানাইয়া রাত্রি জাগিয়া এক হাঁটুর উপর কাগজ রাখিয়া বসিয়া বসিয়া মাকে পত্র লিখিয়া শেষ করে—'সেবকাধম গোকুল'। কত সাবধান করিয়া উপদেশ দিয়া ছেলেমেয়েদের যত্ন করিতে বলিয়া অবশেষে ভালবাসা জানাইয়া স্ত্রীকে পত্র লিখিয়া শেষ করে, 'অক্ষম হতভাগ্য গোকুল।'

চৈত্র-বৈশাখ মাসে কাজের ভিড় থাকে না, বছরের ঐ সময়টা ছুটি লইয়া গোকুল বাড়ী যায়। মাসখানেক মাস-দেড়েক থাকে, তার পর কলিকাতায় ফিরিয়া মাসে মাসে টাকা পাঠায়। এবং সুযোগ ও সুবিধা বুঝিয়া অন্য সময় দুই এক রাত্রির জন্য বাড়ী ঘুরিয়া আসে।

ইতিমধ্যে বাড়ীর পরিবর্তন হইয়াছে। সংসারে স্বচ্ছলতা আসে নাই, তবে অভাবের তীব্রতাও নাই। খাইয়া পরিয়া সকলে নিশ্চিন্তে আছে। গোকুলের মা অকালবার্দ্ধক্যে স্থবির হইয়া পড়িয়াছেন ইদানীং। উঠা হাঁটা করিতে পারেন না বড়। মাথার উপর ঘোমটা তুলিয়া বউ গৃহিণী হইয়াছে। আর দুইটা সন্তান বাড়িয়াছে গোকুলের তাদের লইয়া এবং সংসারের কাজ করিতে করিতে বউ-এর উচ্চ কণ্ঠস্বর দূর হইতে শোনা যায়। শাশুড়ী বউ-এ বনে না, ঝগড়া ছাড়া কথা নাই তাদের! বাড়ী গিয়া বিপদ হয় গোকুলের; মাতা-পুত্রকে একত্র দেখিলে অকারণে পাশ দিয়া চলিয়া যায় বউ। ঠোঁট উলটিয়া বলে—"উঃ লাগান-ভাঙান হচ্ছে আমার নামে! —লাগাও না, কত লাগাবে, তোমার ছেলে আমার মাথাটা কেটে নেবে হাতে!"

মা মাথা নাড়িয়া বলেন, "শুনলি একবার কথা। কি কাল-সাপিনীই যে রেখে গেছ বাবা, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারলে…"

দেখিতে দেখিতে দুই জনে তুমুল কলহ বাধিয়া যায়। হতভম্ব গোকুল নিঃশব্দে সরিয়া পড়ে।

সত্যই যাদের পিছনে রাখিয়া আসিয়াছিল, বাড়ী ফিরিয়া গোকুল আর তাদের পাইল না। ইহারা তাহার অপরিচিত, সে এখানে আগন্তুক। এখানকার জীবন এখানকার নিয়মেই আবর্তিত হয়, গোকুলের আর প্রত্যক্ষ হাত নাই তার সংসারে।

দিনের পর দিন কাটে। ইতর-বিশেষ নাই কোন। সেই পরিশ্রম, স্ব-পাক আহার, আর একক জীবন। কেবল মধ্যে মধ্যে রাতে ঘুম আসে না গোকুলের এবং বউ-এর চিন্তাও এর কিছুতেই মন হইতে তাড়াইতে পারে না সে সময়, —বিছানায় শুইয়া এপাশ ওপাশ করিতে করিতে এক সময় উঠিয়া পড়ে। উঠিয়া আলো জ্বালিয়া বাক্সটা খুলিয়া পোষ্টাফিসের বইখানা বাহির করে— তিনশ এগার। আরও শ তিনেক চাই এখনও। তবে দু'বছর সময়ও আছে সামনে। সম্পত্তি ফিরাইয়া আনিবে, বাড়ীর লোকে খুসী হইবে, গ্রামের লোকে বলিবে, সাবাস—গভীর রাত্রে আলো জ্বালিয়া জাগিয়া বসিয়া গোকুল হিসাব করে মনে মনে।

সময় পাইলেই গোকুল আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করে। নির্ব্বান্ধব সহরে স্নেহের কাঙাল এই লোকটি—দুটো মিষ্ট কথা শুনিবার জন্য দীর্ঘপথ হাঁটিয়া আসে। দীর্ঘচ্ছন্দে বলিয়া যায় তার সংসারের কথা, চাকরির কথা, দৈনন্দিন কাজকর্ম্মের কথা, ভবিষ্যৎ ভাবনার কথা। আমি অতিশয় ধৈর্য্যশীল শ্রোতা। বাড়ী হইতে আসিয়া বলে—"আমাদের দেশ হল এই কলকাতা! বাড়ী যাওয়া আমাদের কুটুম্বের মত, আদর যত্নে খাও দাও, দু'চারদিন থাক—বাস্ ; কি বলেন ?" তারপর যত দিন যায়, তার কথার সুর বদলাইয়া যায়। পরের চাকুরী না গোলামী, ইহা কি ভদ্রলোকের কাজ! মা, ছেলে, বউ ছাড়িয়া একেলা টাকার জন্য এই প্রাণপাত পরিশ্রম, গোকুল চিরকাল কিছুতেই এই অপকর্ম্ম করিয়া উঠিতে পারিবে না। সে মতলবে আছে, দিন আসিলেই সে এইসব ছাড়িয়া ছুড়িয়া দিয়া ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া যাইবে। মতলবের কথা সে কাহাকেও জানায় না, মাকেও না, বউকেও না। কেবল আমার কাছে সব কথা খুলিয়া বলে। সম্পত্তি বেচিবার সময় দশ বছরের একরার ছিল, গোকুলের একাগ্র চেষ্টা টাকা জমাইয়া সেই জমি ফের কিনিবে।

আড়তের লোকেরা বলে, হাড়-কৃপণ, হাত দিয়া জল গলে না, আহাম্মক! বলে, মহাপ্রাণীকে বঞ্চিত করিয়া জমান টাকাকড়ি কোন্ শ্রাদ্ধে লাগিবে গোকুলের! চলুক গোকুল তাদের সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা, ফুলও ফূর্ত্তি করিয়া আসিবে। অভাব তো আছেই আমরণ।...

সহরে সমাজের এই স্তরে নারী-পুরুষে মিলিয়া স্বাভাবিক নিয়মে সংসার গড়িয়া উঠিতে পায় না নারী-বর্জ্জিত জীবনের তাই ইহাদের চক্ষুলজ্জা নাই—

ইহাদের মধ্যে থাকিয়াও ইহাদের দলে যোগ দেয় না গোকুল। নিতান্ত হিসাবী সে খরচের ব্যাপারে। বাঁধা বরাদ্দের নড়চড় করে না। কলিকাতা সহরে খরচ করিবার সমস্ত লোভ জয় করিবার তার আশ্চর্য্য ক্ষমতা।

একদিন গোকুল আসিয়া হাজির। পকেট হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া দেখাইল। নবীন কুণ্ডু—যাহাকে জমি বেচিয়াছিল গোকুল—চিঠি লিখিয়াছে। হঠাৎ টাকার টান পড়ায় গোকুলের জমিটা সে বেচিয়া ফেলিতে চায়। গোকুলের তো সম্পত্তি, তাকেই সর্ব্বাগ্রে জানান উচিত বিধায় লিখিতেছে, যে টাকাটা সে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে, তাহা পাইলেই সম্পত্তি সে ফিরাইয়া দিবে। ব্রাহ্মণকে সে ঠকাইবে না ইত্যাদি ইত্যাদি।

গোকুলের খুসীর সীমা নাই। জমির শোক সে ভুলিতে পারে নাই,—জমি না লক্ষ্মী—এত কাল সে ইহারই স্বপ্ন দেখিয়াছে, এই দিনের প্রতীক্ষায় কাটাইয়াছে। বাড়ী গিয়া প্রতিবারই সে নবীনের সাথে দেখা করিয়া একরারের কথা স্মরণ করাইয়া আর কিছুদিন সবুর করিতে অনুরোধ করিয়াছে। দিন আসিয়াছে, লক্ষ্মীদেবী বাটিয়া আজ তার কাছে উঠিতেছেন। তার সৌভাগ্যের তুলনা নাই। কিন্তু সব টাকা হাতে নাই গোকুলের, প্রায় আড়াই শ' টাকা কম পড়িতেছে। এই টাকাটার যোগাড় করিয়া দিতে হইবে আমাকে।

জমি-জমা সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশেষ পারদর্শী নই, কত জমি কি দরে কিনিলে কত লাভ থাকে, সে সব বুদ্ধি আমার মাথায় খেলে না। তবু বলিলাম, যাহা আছে এখন দিয়া বাকীটা পরে ক্রমশঃ শোধ করিবে বলিয়া গোকুল লিখিয়া দিক না?

গোকুল সে চেষ্টা করিয়াছে। নবীন সম্মত নয়। এক কিস্তিতে গোকুল টাকা দিতে পারে ভালই, নহিলে নবীন অপরের নিকট জমি বেচিয়া ফেলিবে। খরিদ্দারের অভাব নাই। গোকুল এক উপায়ও ঠিক করিয়াছে—আমার মনিবের তেজারতি আছে, তিনি আমার দেশের লোক, আমি গিয়া একটু ধরিলে টাকাটা গোকুল পাইতে পারে; তার পর খাটিয়া এ দেনা শোধ করিয়া দিবে। গোকুল নাছোড়বান্দা।

শেষ পর্য্যন্ত আমাকে তার কথায় রাজী হইতে হইল এবং আমার মধ্যস্থতায় অত্যন্ত চড়া সুদে গোকুল টাকা পাইল।

দ্বিতীয় সন্ধ্যা। রেজেষ্টারি-করা দলিলখানা মায়ের সামনে ধরিয়া গোকুল বলিল, "এই নাও মা, তোমাদের সম্পত্তি তোমাদের ফিরিয়ে দিলাম।"

মা ব্যাপারটা জানিতেন না, কিছু বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, "তার মানে? কি ও—?"

বউ ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "ঢং—"

"দর একটু বেশী নিয়েছে, তবু নিজেদের জিনিষ ফিরে পেলাম!"

গোকুল সব বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিল, শুনিয়া মা বলিলেন, "বেশ! রাখতে পারলে আখেরে তোমাদেরই ভাল। আমার আর কি? আজ আছি কাল নেই!—রাখ, তুলে রাখ গে।"—বলিয়া গায়ে কাপড় জড়াইয়া জপে বসিলেন।

টাকা দিয়া বউ-এর অন্য সাধ ছিল, সেও প্রসন্নচিত্তে লইতে পারিল না ব্যাপারটা। বলিল, "এক গুণ জিনিষ তিন গুণ দামে কিনে কি বাহাদুরীই যে করা হচ্ছে!"

গোকুল আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ভাবিয়াছিল, আচমকা খবরটা দিয়া নিজের কৃতিত্বের গৌরবে সকলকে সে তাক্ লাগাইয়া দিবে। কিন্তু কোথায় কি? অধিকন্তু, কত কাল এখনও বিদেশে পড়িয়া ঋণ-শোধ করিতে হইবে কে জানে! ইহাকেই কি অদৃষ্ট বলে? মানুষ ভাবে এক, হয় আর?

তবু গোকুলের মনে একটা আনন্দ খেলা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বাপ-পিতামহের যে দান সে হারাইয়াছিল, নিজের চেষ্টায় আবার তো সে তাহা ফিরাইয়া আনিয়াছে! কলিকাতায় আসিয়া, আমায় বিবরণটা শুনাইয়া, সে এই আত্ম-সান্ত্বনার কথাটাই বলিল।

আমি সায় দিয়া বলিলাম, "নিশ্চয়, তাতে কি সন্দেহ আছে? কর্ত্তব্য পালন করাই কর্ত্তব্য-পালনের পুরস্কার।"

ধান্যশ্রী

—শ্রীসুধীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী

সুপুষ্ট-মঞ্জরী ভারে অবনত ধানগাছগুলি
দিগন্ত-বিস্তৃত ওই মাঠখানি রেখেছে ভরিয়া;
দিনে যে সোনার ক্ষেতে রবিকর উঠিত উছলি,
চেয়ে দেখ তারি বুকে ফুল-জ্যোৎস্না পড়িছে ঝরিয়া।

কোন্ নব আষাঢ়ের বারিধারা কোমল অন্তরে
নবীন অঙ্কুররাজি দেখা দিল হরিত শোভায়;
আলো আর বাতাসের সম্মিলিত প্রাণদ অন্তরে
ভাসিল উষর মরু উচ্ছ্বসিত জীবন-বন্যায়।

দীর্ঘ দিন সবে মিলি ভিজে-পুড়ে রৌদ্র-বরষায়
বহু শ্রমে বহু স্নেহে যাহাদের করেছি লালন
তারি শিরে নীলাকাশ শিশিরের আশিস্ ছড়ায়;
সার্থক সাধনা যত—আনন্দে উৎফুল্ল তাই মন।

আমি যে ধানের ক্ষেতে প্রাণের সঙ্কেত খুঁজে পাই,
পুষ্টির অন্নের মাঝে তৃপ্তির অমৃত লভি তাই।

বিচিত্র জগৎ

ম্যাডিরা দ্বীপ

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি যখন ম্যাডিরা দ্বীপ ভ্রমণে যাই, তখন গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি।

ম্যাডিরা দ্বীপ পর্টুগীজ গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত, পূর্ব্ব আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত। এই দ্বীপের পুষ্পিত বনানী ও উচ্চ পর্ব্বতমালা, গভীর উপত্যকারাজি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আমার মনে একটি স্থায়ী প্রভাবের সৃষ্টি করেছিল।

সেখান থেকে যখন চলে এসেছিলাম, তখন শীতকাল। কিন্তু ম্যাডিরার সৌন্দর্য্য তখনও অক্ষুণ্ণ ও অটুট দেখে এসেছি, পরিপূর্ণ সূর্য্যালোক, পুষ্পসমাকুল অরণ্যানী শীতের প্রভাবে এতটুকু ম্লান হয় নি, উত্তাপও কমেনি।

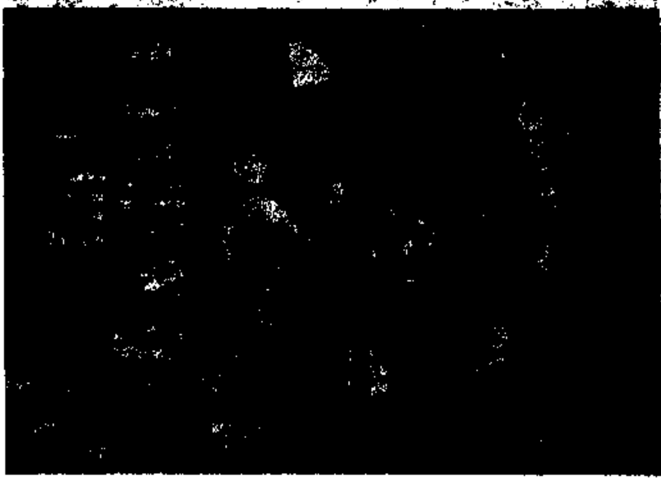
ডিসেম্বর মাসে ম্যাডিরার রাজধানীর পিছন দিকে অবস্থিত উচ্চ পর্ব্বতমালার শিখরাগ্রভাগে কিছু কিছু তুষার-সঞ্চার দেখা যায়—কিন্তু দ্বীপের অন্য সব জায়গায় শ্যামলতার প্রাচুর্য্য পূর্ব্ববৎ থাকে। পুরাতন ফুঞ্চল সহরের সর্ব্বত্র ফুলের শোভা অটুট থাকে।

ইন্দ্রনীল মণির মত সমুদ্রের পটভূমিতে থাকে থাকে সজ্জিত শ্যামল শৈলশ্রেণীর কি শোভা!

উদ্যান-রচনা ম্যাডিরা দ্বীপের ও তার রাজধানীর একটি প্রধান শিল্প; এমন কোন স্থান নেই, যা চক্ষুকে পীড়া দান করে তার কুশ্রীতার দ্বারা। সমগ্র ম্যাডিরা দ্বীপ যেন একটি বর্ণ-সমৃদ্ধ উপবন।

সহরের প্রত্যেক রাস্তা, ফুটপাথ, উদ্যান-পথ ব্যাসাল্ট পাথর দিয়ে বাঁধান। অধিকাংশ স্থলে সমুদ্রের ঢেউ এসে এসে ধুয়ে দিচ্ছে এই পথ-ঘাট ও সোপানাবলীকে।

বড়-রাস্তার দুধারে ধাপে ধাপে উঠেছে ফুলের বাগান, তার প্রাচীরের পাথরগুলিতে নানা রকম কারুকার্য্য, ফুলের



ফুঞ্চলের বাজারে বিক্রয়ার্থ প্রদর্শিত ক্যানারী পাখীর খাঁচা।

ক্ষেতের চারিধারে নানাবিধ জ্যামিতিক আকারে সাজান পাথরের নুড়ি।

অনেক দেশ থেকে বৃক্ষ-লতা আমদানী করে ম্যাডিরাকে সাজান হয়েছে। কোথাও ব্রেজিল দেশীয় পাইনশ্রেণী, কোথাও অষ্ট্রেলিয়ার ইউক্যালিপটাস্, তারপর আম্র বৃক্ষ, তাল ও ম্যাগনোলিয়া, পত্র-নিবিড় ডুমুর গাছের পাশেই মাডাগাস্কার দ্বীপের বিচিত্রবর্ণের পুষ্পবৃক্ষ। এমন কি, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের প্রবাল বৃক্ষ এবং জাপানী কর্পূর-বৃক্ষও দেখতে পাওয়া যাবে সহরের বড় বড় রাস্তার ধারে ধারে।

সমস্ত গাছপালার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ তাদের নামের তালিকা দিলে একখানা বড় বই হয়ে যায়।

তা বলে এ কথা যেন কেউ মনে না করেন যে, ম্যাডিরা দ্বীপে এই সব বিদেশী গাছ ছাড়া নিজস্ব উদ্ভিজ্জ সম্পদ্ কিছু নেই। এ দ্বীপের স্থানীয় বৃক্ষ-লতা বহু বিচিত্র শ্রেণীর, তার মধ্যে ড্রাগন গাছ অত্যন্ত অদ্ভুত ধরণের ও দুষ্প্রাপ্য। দুঃখের বিষয় দু'দশটি ড্রাগন গাছ ব্যতীত এই উদ্ভিদ্ প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছে।

শীতকালে নানা জাতীয় পুষ্পিত লতাই বেশী। বেগুনী রংয়ের বিগোনিয়া ও রাঙা বোগেনভিলিয়া লতা সর্ব্বত্রই দেখা যায়। পাহাড়ের গায়ে গায়ে এই সব



"একটা শিলিং ফেলে দিন, মিষ্টার, একটা শিলিং ফেলে দিন।"

লতার যখন ফুল ফোটে, দূর সমুদ্রের নীল পটভূমিতে রঙীন পুষ্পিত লতা ম্যাডিরা দ্বীপকে স্বর্গের মত সুন্দর করে তোলে।

পাহাড়ের কোলে ওই সব ফুল গাছ, নীচে উপলাকীর্ণ সমুদ্র-তীর, বড় বড় সফেণ ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে সমুদ্রের তীরে, সমুদ্রের ধারে লাল টালি-ছাওয়া ঘর-বাড়ীর সারি, সব শুদ্ধ মিলে ফুঞ্চলের সমুদ্রতীরের শোভা ঠিক ছবির মত।

এক ঋতুতে যখন এক শ্রেণীর ফুল শেষ হয়ে যায়, ফুঞ্চলে তখনই আবার অন্য ধরণের ফুলের উৎসব সুরু হয়।

বসন্ত কালে ব্রেজিল দেশীয় জাকারাণ্ডা বৃক্ষ যখন পুষ্পিত হয় এবং তার সঙ্গে যখন মেশে উইষ্টারিয়া লতার ল্যাভেণ্ডার রংয়ের ফুলের ঝাড় এবং 'প্রাইড-অফ-ম্যাডিরা' বৃক্ষের নীলফুলের রাশি, তখন ভ্রমণকারীর মনে হয়, অর্থের সার্থকতা হয়েছে ম্যাডিরা বেড়াতে এসে।

ম্যাডিরা দ্বীপের অধিবাসীরা তাদের রুচির পরিচয় দিয়েছে এই সব সুদৃশ্য পুষ্পবৃক্ষ ও উদ্যানের দ্বারা, কিন্তু ধনের পরিচয় দেবার তাদের তেমন কিছু নেই।

ম্যাডিরা দ্বীপে ব্যবসায়-বাণিজ্য বলতে তেমন কিছু নেই।

এখানকার সর্ব্বপ্রধান উপার্জ্জনপ্রদ ব্যবসায় বলতে হলে বলতে হয় এখানে আগত ভ্রমণকারীর দলকে। বড় বড় আটলাণ্টিক লাইনের জাহাজ ব্যতীত আরও অনেক ছোট ছোট জাহাজ একক হিসেবে 'আটলাণ্টিকের পুষ্পোদ্যান' এই সুন্দর দ্বীপে যাত্রী নিয়ে আসে।

যে সব জাহাজ অন্য জায়গাতেও থামে, যাবার পথে তারা অন্ততঃ এক দিনের জন্যও ম্যাডিরা দ্বীপে থামিয়ে রেখে যাত্রীদের ম্যাডিরার সৌন্দর্য্য দেখবার সুযোগ দিয়ে থাকে।

আমি জনৈক পুরাতন অধিবাসীকে বলতে শুনেছি, 'আমাদের এখানে ফসলের চাষ নেই তেমন, কিন্তু আমাদের প্রাচীন ফসল এই ভ্রমণকারীর দল!'

ভ্রমণকারী-রূপ শস্য কি ভাবে নিখুঁত রূপে চাষ করতে হয়, বহু বৎসর অভিজ্ঞতার ফলে প্রত্যেক ম্যাডিরাবাসী তা জানে।

এরা ভ্রমণকারীর কাছ থেকে পয়সা আদায় করার কৌশল অদ্ভুত রকমে আয়ত্ত করেছে। ভ্রমণকারীরা জাহাজ থেকে ষ্টীম-লঞ্চে চেপে জেটিতে নামবার পূর্ব্বেই ছোট ছোট দেশী নৌকা নানারকম জিনিসপত্র নিয়ে জাহাজ ঘিরে দাঁড়ায়। কেবল সরল ও অনভিজ্ঞ ভ্রমণকারীর চক্ষু ধাঁধিয়ে দিতে পারবার ক্ষমতা থাকা ছাড়া এ

সব জিনিসের জন্ত কোন মূল্য বড় একটা নেই। ম্যাডিরার সর্ব্বত্রই এইসব টুকিটাকি সৌখীন জিনিস তৈরী করবার কারখানা আছে। এর মধ্যে অনেক রকম দ্রব্য আছে।

ম্যাডিরার বিখ্যাত সূচীশিল্পের নমুনা, বেত ও বাঁশের কাজ, কাঠের উপর খোদাই কাজ ও পাথর-বসান কাঠের কাজ, ছড়ি, অলঙ্কার, পালকের ফুল ইত্যাদি সাধারণতঃ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। এ সব বাদে আছে খাঁচা বোঝাই সবুজাভ ক্যানারি পাখী, দেশী টিয়া। পর্টুগীজ পূর্ব-আফ্রিকার বাঁদর ও নারিকেল।

জাহাজ যেমন এসে ডাঙায় ভিড়ল, অমনই ডুবুরি বালকের দল আসে জলের তলায় পয়সা ফেলে দিলে ডুব দিয়ে তা সংগ্রহ করবার জন্যে।

—একটা শিলিং ফেলে দিন, মিষ্টার, একটা শিলিং ফেলে দিন। (পূর্ব্বপৃষ্ঠায় চিত্র দ্রষ্টব্য)।

তারপর যেমন ফেলে দেওয়া, অমনি চক্ষের পলকে ডুব দিয়ে স্বচ্ছ সমুদ্রতল থেকে চক্‌চকে মুদ্রাটি তুলে এনে একগাল হেসে ভ্রমণকারীকে দেখাল। অবশ্য মুদ্রাটি আর ফেরৎ দিল না। একটা জিনিস লক্ষ্য করবার বিষয়, যে দেশের পতাকাই উড্ডীয়মান থাকুক জাহাজের মাস্তুল থেকে, এরা সর্ব্বদাই একটি শিলিং চাইবে। ব্রিটিশ মুদ্রার ওপর এদের অগাধ বিশ্বাস। ম্যাডিরা দ্বীপে পর্টুগীজ গবর্ণমেন্টের ভিন্ন রকম মুদ্রা প্রচলিত থাকলেও ব্রিটিশ শিলিং-ও চলে। ভ্রমণকারীদের মধ্যে ইংরেজদের সংখ্যাই বেশী থাকে।

তীরে নামলেই দেখা যায়, মোটর-চালকের দল মোটর গাড়ী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা নানাদিকে মোটর-ভ্রমণের চিত্তাকর্ষক বর্ণনা সুরু করবে এবং শাল গায়ে মেয়েরা ভায়োলেট, গোলাপ প্রভৃতি বিক্রি করতে আসবে।

মোটর-বাস ও গাড়ী বাদে ফুঞ্চলের রাস্তায় দেশী গরুর গাড়ী চলে। এই গরুর গাড়ীর ওপর আচ্ছাদন দেওয়া, মধ্যে বেঞ্চি পাতা আছে। ভ্রমণকারীরা নিজেদের ইচ্ছামত মোটর বা গরুর গাড়ী পছন্দ করে নিয়ে ফুঞ্চলের পাথর-বাঁধান উঁচু-নীচু রাস্তা বেয়ে রেলওয়ে ষ্টেশনে নীত হয়।

রেল শুধু পাহাড়ে উঠবার জন্ত। প্রায় খাড়া, ঢালু পথ দিয়ে কগ্ রেলওয়ের ট্রেণ ৩৫০০ ফুট উঠে যায়। রেলওয়ে ট্রেণ বেয়ে উঠবার সময় ছেলেমেয়েরা যাত্রীদের গায়ে ফুল ছড়িয়ে দিয়ে অভ্যর্থনা করে। এই রেলপথের দুধারে তারা ফুল হাতে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে এবং তাদের এই কাজটী খুবই হৃদয়গ্রাহী বলে গণ্য হত যদি না



জুতার বাজার : ফুঞ্চলের অধিবাসীরা ছাগচর্ম-নির্ম্মিত পাদুকা ব্যবহার করে

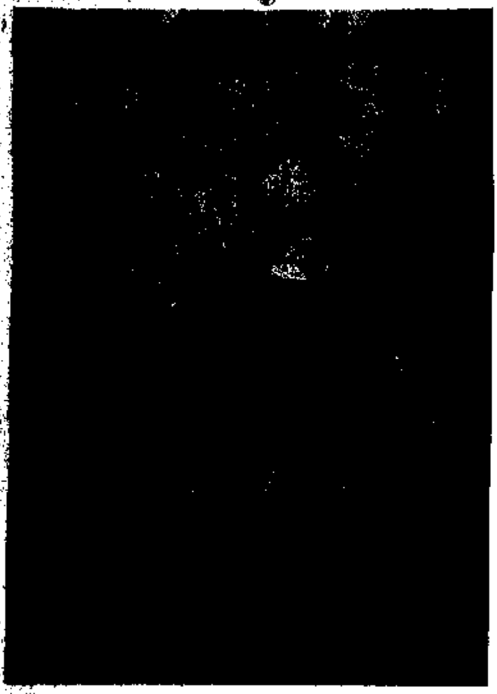
তারা সঙ্গে সঙ্গে চেঁচাত—একটা পেনি, মিষ্টার, একটা পেনি!

পাহাড়ে উঠবার সময় ট্রেণ খুব আস্তে আস্তে যায়, কিন্তু নামবার সময় যে সব যাত্রী চমক পছন্দ করেন, তাঁরা গড়ানো স্লেজ যোগে নামতে পারেন।

ওপর থেকে চার পাঁচখানা স্লেজ এক সঙ্গে ছাড়ে। গড়ান, ঢালু রাস্তা বেয়ে যখন স্লেজগুলো সবেগে নীচের দিকে নেমে আসছে, তখন সাহসী যাত্রিগণ মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে

অজুন নতুন দৃশ্যাবলীর সম্মুখীন হন। এই ফুলের বন, এই হঠাৎ এক ঝলক নীল সমুদ্রের দৃশ্য, এই অনাবৃত ম্যাজেন্টা রঙের পাহাড়ের দেওয়াল, এই হয় তো একটা লাল টালি-ছাওয়া আবাসগৃহ, কখনও বা পাশের প্রাচীরের ওপর ঝুলন্ত্যমান উৎসুক-মুখ সুশ্রী বালক-বালিকার দল।

স্লেজের সঙ্গে গাইড থাকে, বাঁকের মুখে স্লেজগুলো এলে, সে স্লেজ থেকে লাফিয়ে পড়ে স্লেজের গতি সংযত করে।



ম্যাডিরাবাসী দুইটি বালক। ঢালু পথ চলিতে, পাহাড়ে উঠিতে এবং মোট বহন করিতে লাঠি হাতে থাকা বড়ই সুবিধাজনক। ছেলে দুইটির হাতে বেতের লাঠি দেখা যাইতেছে।

আপাতদৃষ্টিতে এ-রকম ভাবে নামা বিপজ্জনক মনে হয় যদিও, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ম্যাডিরার ঢালু-পথে নামবার জন্য কোন দুর্ঘটনার কথা শোনা যায় নি।

সময় হাতে থাকলে দর্শকগণ দ্বীপের আরও অনেক সুন্দর স্থানে মোটরে বেড়াতে পারেন। সহর থেকে দূরে অবস্থিত পার্ব্বত্য উপত্যকাগুলি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়, কিন্তু আফ্রিকা থেকে যাতায়াতের পথে যাঁরা এখানে নামেন, তাঁদের সময় বড়ই কম থাকে, ফলে তাঁরা শুধু ফুঞ্চল সহর ও চারিপাশের পাহাড়ের দৃশ্য দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হন।

খুব কম ভ্রমণকারীরাই দ্বীপের অভ্যন্তর-ভাগের এই নির্জ্জন উপত্যকাগুলি দেখেছেন। ম্যাডিরার সাধারণ লোকের একটি বিশেষত্ব সকলের চোখেই পড়বে, তারা বোঝা বইতে অদ্বিতীয়। পল্লী-অঞ্চল থেকে তারা নানা জিনিষ সহরে বিক্রি করতে আনে, পাথরের কঠিন রাজপথে চলবার সুবিধার জন্য তাদের পায়ে নরম ছাগ-চর্ম্মের পাদুকা, কিন্তু তাদের কাঁধের বোঝার বিপুল বহর দেখলে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের দৈহিক ওজন অপেক্ষা ভারী বোঝা অক্লেশে বহন করে।

পর্ত্তুগালের এটি একটি উপনিবেশ, কিন্তু এই ঔপনিবেশিকদের মাতৃভূমির রাজধানী লিসবন—এই শান্ত, অর্দ্ধ-নিদ্রিত ফুঞ্চল সহর ও ম্যাডিরার নিভৃত পল্লীপ্রান্তের তুলনায় কত চঞ্চল ও শব্দ-মুখর।

লিসবনের রাজপথগুলি দ্রুতগামী মোটর-গাড়ীর ভিড়ে ও সচল যান-বাহনের শব্দে সর্ব্বদা ধ্বনিত হচ্ছে, অথচ ৬০০ মাইল দূরবর্ত্তী এই ক্ষুদ্র দ্বীপটি যেন শান্তির আকর, কবি ও ভাবুকের উপযুক্ত বাসস্থান বটে।

জানি না স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে কবির সংখ্যা কত!

এখানকার স্লেজ পাহাড়ী রাস্তায় ওঠা-নামা করবার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত, এ দেশে এই গাড়ী না হলে স্থানীয় অধিবাসীদের চলে না। লিসবনের মত মোটরের ভিড় হলে এখানকার অধিবাসীদের কোন সুবিধা নেই।

পৃথিবীর সব দেশই যদি এক রকম দেখতে হত, তবে বেড়াবার প্রবৃত্তি মানুষের থাকত কি? আজকাল বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে ঠিক সেই অবস্থাতেই এসে দাঁড়াচ্ছে পৃথিবী। সব সহর এক রকম; সেই মোটরের ভিড়, সেই ট্র্যাফিক পুলিশ, সেই লাল-নীল আলোর বিজ্ঞাপন, সেই সিনেমা, হোটেল, রেস্তরাঁ…।

আমেরিকা, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, ইউরোপ, ভারতবর্ষ, সব দেশ ক্রমশঃ একাকার হয়ে আসছে। এখন তাই ভাল

লাগে সেই সব দেশকে, যে-দেশের নিজস্বতা এখনও বিলুপ্ত হয় নি, এখনও যে-দেশে গরুর-গাড়ী চলে, রেডিও লোকে চোখেও দেখে নি, মোটর গাড়ীতে কালে ভদ্রে চড়েছে। পৃথিবীর সেই শ্রেণীর দুষ্প্রাপ্য দেশসমূহের মধ্যে ম্যাডিরা দ্বীপ একটি প্রধান স্থান।

ফুঙ্কলের রাস্তায় এতটুকু ধুলো নেই কোথাও। রাস্তা-ঘাট সর্ব্বদা পরিষ্কার, ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করছে। এই ধরণের দ্বীপগুলি আসলে সমুদ্রগর্ভস্থ বিরাট পর্ব্বতের স্কন্ধদেশ ও মস্তক। ম্যাডিরাকে যদি আমরা এইরূপ একটি পর্ব্বত বলে ধরি, তা হলে এর আকৃতি আমাদের সত্যই বিস্মিত করে।

ম্যাডিরার সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতের শিখর মাউন্ট রুইভো থেকে দ্বীপের গভীরতম তলদেশ, যা সমুদ্রতলে ঠেকেছে সবটা প্রায় ২০,০০০ ফুট।

এই পর্ব্বতের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র ম্যাডিরা দ্বীপ নামে পরিচিত হয়ে লোকচক্ষুর গোচরীভূত। বাকী অংশ সহরের দক্ষিণদিকের লবণাক্ত সমুদ্রগর্ভে প্রোথিত।

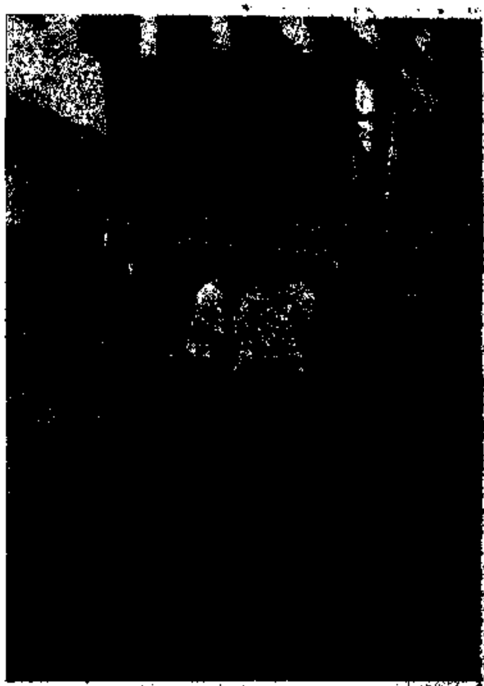
ম্যাডিরা একটা দ্বীপ নয়, দ্বীপপুঞ্জ। আরও অনেক-গুলি দ্বীপ পাশাপাশি ছড়িয়ে রয়েছে, যেমন ফুঙ্কলের পূর্ব্ব-উত্তরে পের্টো সান্টো ও আরও দুইটী দ্বীপ, তাতে মানুষে বাস করে না। বেশ বোঝা যায় যে, এর উৎপত্তি ঘটেছে পুরাকালের সমুদ্রগর্ভস্থ কোন আগ্নেয় উপদ্রবের দরুণ।

চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী সমুদ্রের যা গভীরতা, ম্যাডিরার নিকট-বর্ত্তী সমুদ্রের গভীরতা তার চেয়ে অনেক বেশী। যে আগ্নেয় উপদ্রবের ফলে এই দ্বীপপুঞ্জ সৃষ্টি হয়েছিল, তারপরে বহুকাল চলে গিয়েছে। আজকাল আগ্নেয় গিরির জীবন্ত অগ্নি-কটাহ ম্যাডিরা দ্বীপপুঞ্জের কোথাও দেখা যায় না, যেমন দেখা যায় আরও দক্ষিণে ক্যানারি ও কেপ ভার্ড দ্বীপপুঞ্জে।

শাসনকার্য্যের দিক থেকে দেখতে গেলে ম্যাডিরা পর্টুগালের ঠিক উপনিবেশ নয়, অন্ততঃ সে ভাবে এর শাসন-কার্য্য চলে না। ম্যাডিরা দ্বীপপুঞ্জকে পর্টুগালের একটা জেলা বলে গণ্য করা হয়ে থাকে, কেন্দ্রীয় গবর্ণ-মেন্ট এখানে গবর্ণর নিয়োগ করে পাঠান।

অন্য দিক দিয়ে বিচার করে দেখতে গেলে, এক জন কালিফোর্ণিয়াবাসীর পক্ষে তাদের দেশের রাজধানী ওয়াশিংটন, ডি. সি-তে পৌছুতে যে সময় লাগে, এক জন ম্যাডিরাবাসী তার অর্দ্ধেক সময়ে নিজের মাতৃভূমির রাজ-ধানী লিসবনে পৌছুতে পারে।

ম্যাডিরা দ্বীপের আবিষ্কারের কাহিনী বড় রোমান্টিক ধরণের। এই কাহিনীর মধ্যে কতখানি ঐতিহাসিক



পাহাড়ের উপর হইতে নামিবার স্লেজ-গাড়ী। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই গাড়ী উচ্চস্থান হইতে সমতল ভূমিতে নামিয়া আসে, তখন আবার পিঠে বহন করিয়া স্লেজটিকে পাহাড়ের উপর লইয়া যাইতে হয়।

সত্য আছে, তা বিচার করে বলা শক্ত। সে কাহিনীটি এই যে, চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দুটী ইংরেজ প্রেমিক-প্রেমিকা, রবার্ট ম্যাকিম ও আনা ডারফে, ক্ষুদ্র একটি নৌকায় অনকতক মাঝি-মাল্লা নিয়ে ফ্রান্সের উপকূলের দিকে যাত্রা করে।

লুকিয়ে পালিয়ে গিয়ে পরস্পরকে বিবাহ করবে, এই ছিল এদের উদ্দেশ্য।

কিন্তু এদের ক্ষুদ্র জাহাজখানা ঝড়ের মুখে পড়ে গেল

এবং ডুবু ডুবু অবস্থায় ম্যাডিরা দ্বীপের পূর্ব্ব উপকূলে নীত হল। সকলে জাহাজ থেকে নেমে এই দ্বীপের বনের ফলে ও ঝরণার জলে কিছু কাল নিজেদের ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করে আনন্দে দিন কাটাতে থাকে।

তারপর এল দুর্ঘটনা।

এক রাত্রিতে বিষম ঝড়ে ওদের তরী বাহির সমুদ্রে গিয়ে পড়ল। সেই সময়কার কষ্টে ও বিপদে মেয়েটী মারা গেল। শোক সহ্য করতে না পেরে কিছুদিন পরে রবার্টও মারা পড়ল। পূর্ব্বের তরীখানা ভেঙে-চুরে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মাঝি-মাল্লারা আর একখানা নৌকা তৈরী করে দেশের দিকে রওনা হল।

কিন্তু প্রতিকূল বায়ুতে তাদের নৌকা নীত হল বার্কারি উপকূলে, সেখানে ওরা মুর জাতির হাতে হল বন্দী।

এ ঘটনার পরে বহুদিন চলে গেল। অনেক কাল পরে জুয়ান্ ড মরেলস্ নামে জনৈক নাবিকের আত্মীয়েরা নিষ্ক্রয়-পণ স্বরূপ অনেক টাকা দিয়ে তাকে উদ্ধার করলে মুর দস্যুদের হাত থেকে। এই জুয়ান্ ড মরেলস্ দেশে ফিরে পর্টুগীজ নাবিকদের কাছে রবার্ট ম্যাকিন ও তার প্রেমিকা অ্যানা ডারফের গল্প করল ও প্রসঙ্গক্রমে ম্যাডিরা দ্বীপ আবিষ্কারের কথাও বললে। জুয়ান্ ড মরেলস্ এ গল্প শুনেছিল বন্দী অবস্থায় অন্য বন্দীদের কাছে, যারা রবার্ট ম্যাকিনের জাহাজের মাল্লা ছিল। ক্রমে এই গল্প উঠল সে যুগের সুবিখ্যাত নাবিক ও দেশ-আবিষ্কারক প্রিন্স হেনরী দি নেভিগেটরের কানে। তিনি এই গল্পের সত্যতা নির্দ্ধারণ করবার জন্য একখানা জাহাজ সাজিয়ে সে কালের অন্যতম বিখ্যাত নাবিক জোয়াও গনসালভে জার্কোর অধ্যক্ষতায় দক্ষিণ-আটলান্টিকে পাঠিয়ে দিলেন।

জার্কোর সময়ে যখন গল্পটা এসে পৌঁছল, তখন আমরা দৃঢ়তর ঐতিহাসিক ভিত্তির ওপর এসে দাঁড়িয়েছি। প্রিন্স হেনরীর সপক্ষে তিনি সিউটার যুদ্ধে মুরদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। তিনি ১৪১৯ খৃষ্টাব্দে পোর্টো স্যান্টোতে জাহাজ নিয়ে যান এবং এখান থেকে তেইশ মাইল দূরবর্ত্তী আর একটা দ্বীপে গিয়েও নোঙর ফেলেন। দূর থেকে দেখা গিয়েছিল, এক খণ্ড সুবৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ মেঘ দ্বীপটার উপর যেন উপুড় হয়ে রয়েছে। সে যুগের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে এই দৃশ্য ছিল অমঙ্গলসূচক। কিন্তু জার্কো তা গ্রাহ্য করেন নি।

তিনি যখন জাহাজ নিয়ে দ্বীপের নিকটবর্ত্তী হলেন, তখন দেখা গেল কৃষ্ণবর্ণ মেঘ খণ্ড আর কিছুই নয়, অতি সুন্দর, অরণ্যাকীর্ণ একটা উচ্চ পর্ব্বতের উপরিস্থিত বাষ্প রাশি। দ্বীপটির সৌন্দর্য্য তাঁকে মুগ্ধ করল। জার্কো সঙ্গিগণসহ নিকটবর্ত্তী একটী শান্ত উপসাগরে জাহাজ নোঙ্গর করলেন।

এই উপসাগরের তীরেই আজকাল ম্যাডিরা দ্বীপের অন্যতম ক্ষুদ্র সহর ম্যাচিকো অবস্থিত। এই স্থানটী ফুঞ্চল থেকে প্রায় বারো মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত।

যদি ইংরেজ প্রেমিকযুগলের গল্পে কিছু মাত্র সত্যতা থাকে, তবে এই সহর আজও তাদের নাম বহন করছে।

অত্যন্ত বন্যাকীর্ণ হওয়ায়, নবাবিষ্কৃত দ্বীপের নামকরণ করা গেল 'ম্যাডিরা'। পর্টুগিজ ভাষায় এর অর্থ 'বন'। জার্কো দ্বীপের প্রথম শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হলেন। বন্যজন্তু ও বিষাক্ত সর্প বিতাড়নের জন্য প্রত্যেক দিন বনে আগুন দেওয়ার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হল। তাতে ম্যাডিরার আদিম অরণ্যানীর শোভা ক্রমশঃ নষ্ট হয়ে যেতে লাগল। এ অগ্নিদান সম্পূর্ণই নিরর্থক ছিল, কারণ ম্যাডিরার বনে কোন বন্যজন্তু বা সর্প ছিল না।

সিসিলি থেকে ইক্ষুর আমদানী করা হয়। শীঘ্রই এখানে বড় বড় ইক্ষুক্ষেত্র গড়ে উঠল এবং নিগ্রো ও মুর ক্রীতদাস আফ্রিকা থেকে আমদানী করা হতে লাগল ইক্ষুক্ষেত্রের কাজের ও রাস্তা এবং পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদি প্রস্তুতের কাজের জন্যে।

সেই প্রাচীন যুগের পয়ঃপ্রণালী ম্যাডিরার উচ্চ পর্ব্বতমালার সানুদেশে এখন বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে, এবং এখনও তাতে বেশ কাজ চলে যায়। এই পয়ঃপ্রণালী না থাকলে ম্যাডিরার সমতল-ভূমিতে বৎসরের অধিকাংশ সময় জল পাওয়া যেত না।

ক্রমে অভিজাত বংশীয় একদল লোকের আবশ্যক হয়ে পড়ল ম্যাডিরার সাধারণ শ্রেণীর অধিবাসীদের নেতৃত্ব

করবার জন্য। তখন পর্টুগাল থেকে কয়েক জন অভিজাত বংশীয় লোক ম্যাডিরায় প্রেরিত হল, এদের মধ্যে তিন জন তরুণ অভিজাত যুবক ছিল, জার্কোর তিন মেয়ের সঙ্গে এদের তিন জনের বিবাহ হয়।

দ্বীপে প্রথম জন্মগ্রহণ করে যমজ শিশু, ভাই ও ভগ্নী। তাদের নামকরণ হয়েছিল আডাম ও ইভ। জার্কো অভিজাত পদবীতে উন্নীত হয়ে চল্লিশ বৎসর দ্বীপ শাসন করেছিলেন। আমি ফুঙ্কলের প্রাচীনতম গির্জ্জা সাণ্টা ক্লারার সমাধিভূমিতে জার্কোর সমাধি দেখেছি।

আর এক জন জগদ্বিখ্যাত লোকের সঙ্গে পোর্টো সাণ্টো ও ম্যাডিরার পূর্ব্ব ইতিহাস জড়িত আছে। অজ্ঞাত পশ্চিম মহাসমুদ্র সম্বন্ধে খবর নেবার জন্য ক্রিষ্টোফার কলম্বাস তখন জাহাজে এখানে ওখানে বেড়াতেন, এ অবস্থায় তিনি পোর্টো সাণ্টোতে আসেন এবং স্থানীয় গবর্ণরের সুন্দরী কন্যা ফিলিপা পেরেস্ট্রেলোকে বিবাহ করে কিছুদিন এখানে অবস্থান করেন। পোর্টো সাণ্টোতে ভিলা ব্যালিয়া সহরে সে বাড়ীটা আজও আছে।

কলম্বস্ এই বাড়ীতে বসে নির্জ্জনে পশ্চিম মহাসমুদ্রের চার্ট তৈরী করেন। মাঝে মাঝে ফুঙ্কলে এসে প্রাচীন নাবিকদের কাছে নানা খবর জিজ্ঞাসা করতেন। ম্যাডিরা, কানেরি ও আজোরস্ দ্বীপপুঞ্জে তিনি প্রত্যেক অভিজ্ঞ নাবিকের মুখের গল্প ধীর ভাবে শুনতেন, তা থেকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করতেন ও পশ্চিম আটলাণ্টিকের ঢেউয়ে কূলে ভেসে আসা কাঠ-কুটো, কি অন্যান্য জিনিষ-পত্র মনোযোগের সঙ্গে পর্য্যবেক্ষণ করতেন।

তারপর যখন ক্রিষ্টোফার কলম্বসের প্রতিভা পশ্চিম মহাসমুদ্রের পারে এক অজ্ঞাত মহাদেশ আবিষ্কার করল—তখন এই সব দ্বীপের সুদিন। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ-গামী যে সব ছোট বড় জাহাজ এই পথ দিয়ে যেত, পোর্টো সাণ্টো ও ম্যাডিরার বন্দরে তারা জাহাজ ভিড়াত দু' এক দিনের জন্য। এতে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য বেড়ে গেল।

ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে ম্যাডিরা দ্বীপের আরও উন্নতি সুরু হল।

ঠিক ঐ সময় পর্টুগালের সঙ্গে গ্রেট বৃটেনের রাষ্ট্রনৈতিক মৈত্রী সংঘটিত হয়, ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস পর্টুগালের রাজকন্যা ক্যাথারিণকে বিবাহ করার দরুণ। ফলে বৃটিশ বণিকদল নানা রকম সুযোগ ও সুবিধামূলক সনন্দ নিয়ে দলে দলে ম্যাডিরাতে আসতে আরম্ভ করল।



গ্রাম্য নারীরা হস্ত-নির্ম্মিত বেতের ঝোড়া বিক্রয়ার্থ ফুঙ্কলের বাজারে লইয়া যাইতেছে।

যদিও প্রায় এক শতাব্দী কাল হল ম্যাডিরা হতে বৃটিশ বাণিজ্য-কুঠী উঠে গিয়েছে, এখনও দ্বীপের অধিকাংশ বাণিজ্য ইংরাজদের হাতে। এখানে একটি বৃটিশ উপনিবেশ আছে এবং এখনও দ্বীপে যে সকল ভ্রমণকারী বেড়াতে আসে, তাদের মধ্যে অধিকাংশই ইংরেজ।

ম্যাডিরা দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে কয়েকটা দ্বীপে কেউ বাস করে না। এদের মধ্যে বড়টার নাম ডেজার্টা গ্রাণ্ডি, এখানে বহু বন্য জন্তু দেখতে পাওয়া যায়। এক ধরণের সামুদ্রিক পাখী এর সমুদ্রতীরস্থ পাহাড়ের ফাটলে বাস করে। ম্যাডিরা থেকে মাঝে মাঝে শিকারীরা পক্ষী শিকারের জন্য ওখানে যায়।

(হ্যারিয়েট অ্যাডামস্-এর লিখিত প্রবন্ধ হইতে।)

মনের সাথী

—শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

একদিন সকালে প্রকাশ মেসের তিতলে একটি ঘরে এম-এ পরীক্ষার জন্ত কি একটা বই পড়িতেছে, এমন সময়ে নীচের তলার পিওন "চিঠি" বলিয়া হাঁকিয়া কয়েকখানি চিঠি দিয়া গেল। কয়েকদিন হইতে বাড়ীর কোনও সংবাদ না পাওয়ায় প্রকাশের মনটা একটু উদ্বিগ্ন ছিল। সে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতেই সহপাঠী এক বন্ধু তাহার বাবার লেখা একখানি পত্র তাহার হাতে দিল। সংবাদ খুবই ভাল, বাড়ীর সকলে ভাল তো আছেই, উপরন্তু শনিবার দিন প্রকাশের বিবাহের সংবাদ লইয়া তাহার ভাবী শ্বশুর তাহাকে দেখিতে আসিবেন। প্রকাশের মনটা হঠাৎ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

শনিবার আসিতে যে কয়দিন দেরী ছিল, সে কয়দিন সকল কাজ ও চিন্তার মধ্যে কেবল ভাবী শ্বশুরের আসার কথাটাই মনে পড়িতে লাগিল। ভোরবেলা ঘুম ভাঙিয়াই সেই কথা মনে পড়ে,—কলেজের লেক্চার শুনতে শুনিতেও সেই কথা মনে আসে, আবার ঘুমাইবার আগে প্রায় অজ্ঞাতে সেই কথা ভাবিতে ভাবিতেই সে ঘুমাইয়া পড়ে। শনিবার দিন বিকালে প্রায় দুই ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতেই তাহার মুখ মোছা, ফর্সা কাপড় পরা, টেরীকাটা সমস্তই আরম্ভ হইয়া গেল। টেরী যতই কাটে ঠিক যেন সমান হয় না, কাপড়টা কোথায় যেন কোঁচকাইয়া থাকে, মুখখানা অনেকবার মুছিয়াও ভাল পরিষ্কার হয় না। সহপাঠী একজন বন্ধু বলিল, "আরে, বেশ দেখাচ্ছে, কেন ব্যস্ত হচ্ছিস্?" কিন্তু মনঃপূত বেশভূষা হইবার পূর্ব্বেই অদূরে সিঁড়িতে পদশব্দ হইবামাত্র প্রকাশ একলম্ফে শয্যায় উঠিয়া একখানি স্থূলকায় পুস্তক খুলিয়া তাহাতে মনঃসংযোগ অথবা চক্ষুসংযোগ করিয়া বসিয়া রহিল।

একজন গৌরবর্ণ প্রৌঢ় ভদ্রলোক ঘরে প্রবেশ করিয়াই ক্ষণমাত্র ইতঃস্তত করিয়া উজ্জ্বল বেশধারী প্রকাশের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আমার নাম শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু, তোমার নাম কি প্রকাশচন্দ্র মিত্র?"

প্রকাশ শয্যা হইতে উঠিয়া, "আজ্ঞে হ্যাঁ" বলিয়া দুই হাত মাথায় তুলিয়া নমস্কার করিল। পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করা অথবা সাধারণ নমস্কার করা,—কোন্‌টি এ ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত, ইহা মীমাংসা করিবার জন্ত আজই সকাল বেলা প্রায় তের চৌদ্দটি এম-এ-পড়া ছাত্রদের খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে এক সভার বিশেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছিল। অনেক গবেষণার পর স্থির হইয়াছিল যে, সাধারণ নমস্কার করাই শ্রেয়ঃ, কারণ বিবাহ হইবে কি না তাহাই যখন অনিশ্চিত, তখন অনর্থক ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া নিজেকে ছোট করিবার প্রয়োজন নাই। যদি বিবাহ ফস্‌কাইয়া যায়, তাহা হইলে প্রণামটা মিথ্যা হইয়া যাইবে।

উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, প্রশান্তবদন ও প্রতিভাদীপ্ত চক্ষু দুইটিতে প্রকাশকে সুন্দরই দেখাইত, সুতরাং ভূপেন্দ্রবাবু ও তাঁহার বন্ধু দুই একটি সাধারণ বিষয়ে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। এতক্ষণ প্রকাশের কোনও কোনও বন্ধুবান্ধব দরজার সম্মুখ দিয়া ভিতরে বকদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে কতই ব্যস্ততা সহকারে যাতায়াত করিতেছিল—একটি বুদ্ধিমান্ ছাত্র প্রকাশের ঘরে প্রবেশ করিয়া টেবিল হইতে একখানা কি পুস্তকও উঠাইয়া লইয়া গেল। ভূপেন্দ্রবাবু চলিয়া যাইবামাত্র কোথা হইতে স্রোতের মত যুবকসৈন্য আসিয়া প্রকাশের ঘর অবরোধ করিল, মহা আনন্দ সহকারে হুলুধ্বনি দিল, তাললয়বিহীন নৃত্য করিল এবং ভাবীশ্বশুরের গৌরবর্ণ হইতে তাঁহার মেয়ের রং, মুখচোখ, অঙ্গসৌষ্ঠব সমস্তেরই একটা মোটামুটি হিসাব করিয়া ফেলিল। একটু অবসর পাইয়া প্রকাশ তাড়াতাড়ি উঠিয়া আর একবার আরশীতে নিজের মুখখানা দেখিয়া লইল।

কিছুদিন ব্যাপী অনেক দরকষাকষির পর দেনা-পাওনা স্থির হইল এবং প্রকাশের বাবা গিয়া পাত্রী দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিলেন। পাত্রীর রং সম্বন্ধে প্রকাশের মার বারংবার প্রশ্নের উত্তরে বৃদ্ধ তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন, পাত্রী উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, অসামান্যা সুন্দরী। পাত্রীর পিতা -মত লোক, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, প্রকাশ এম-এ পাশ

করিলে হয়তো তাহাকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট করিয়া দিতে পারেন।

বিবাহের দিন শুভদৃষ্টির সময় প্রকাশের মনটা হঠাৎ দমিয়া গেল। নব-বধূর মুখখানি বেশ, কিন্তু শ্যামবর্ণ-গৌরবর্ণ রং সে অবয়বটির ত্রি-সীমানাও স্পর্শ করে নাই। প্রকাশের বাবা সেকালের বৃদ্ধ লোক, রূপ-বিচারে বিশেষ দক্ষ নহেন, সন্ধ্যার উজ্জ্বল বিজলী আলোকে পাত্রীর বর্ণ ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। শেলী, কীটস্ প্রভৃতি কবিদের লেখা পড়িয়া যে রূপপিপাসা প্রকাশের মনে জাগরিত হইয়াছিল, তাহা এক মুহূর্তের শুভদৃষ্টিতে কোথায় তিরোহিত হইল। এ দিকে যৌতুকের দেনাপাওনা লইয়াও কি একটা গোলমাল হওয়ায় প্রকাশের বাবা বৈবাহিকের উপর অসন্তুষ্ট হইলেন। পিতা-পুত্রে পরদিন বধূকে লইয়া ম্লানমুখে নিজগ্রামে প্রত্যাবর্তন করিলেন, প্রকাশের বাইশ বৎসরের স্বপ্ন নিমেষের মধ্যেই বাস্তব জগতের ভিতর কোথায় বিলীন হইল। মনের অন্ধকারের ছায়ায় প্রকাশের ফুলশয্যার রাত্রও যেন ব্যর্থ হইয়া গেল।

"তারপরে শূন্য হোলো ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ নিবিড় নিশীথে" প্রকাশের ক্ষুদ্র কুটীরখানি। গ্রামে সেবার দুরন্ত বসন্ত রোগ মহামারীরূপে দেখা দিল। বিবাহের পর শ্বশুরের সঙ্গে মনোমালিন্য অথবা বধূর সহিত তাহার সাধারণ সৌন্দর্য্য লইয়া একটা হিসাব-নিকাশ শেষ হইবার পূর্ব্বেই প্রকাশের বাবা, মা এবং নবপরিণীতা স্ত্রী একসঙ্গে দুই একদিনের মাত্র ব্যবধানে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িল। মেসে গিয়া ভাল করিয়া পড়াশুনা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই প্রকাশকে ফিরিয়া আসিয়া রোগীদের শুশ্রূষার ভার লইতে হইল। মা নিজের ঘরে প্রবেশ করিতে প্রকাশকে বারংবার বারণ করিলেন, বাবা তাহাকে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ দিলেন। বালিকা-বধূ নিস্পন্দ-নয়নে শুধু প্রকাশের দিকে অসহায় দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল। প্রকাশের মনে হইল, যেন সেই সময়েই তাহার মসীমাখাতনু বধূকে শুভদৃষ্টির শুভলগ্ন অপেক্ষা অনেক সুন্দর দেখাইতেছিল। কিন্তু তবুও তখন কিছুই ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবার তাহার সময় ছিল না। অনাহার ও অনিদ্রায় সেবাশুশ্রূষা করিয়াও কোনও ফল হইল না। একে একে তাহার বাবা ও স্ত্রী মৃত্যুমুখে পতিত হইল, কেবল তাহার মা মাসাধিক কাল জীবন-মৃত্যুর ভিতর দিয়া সংগ্রাম করিতে করিতে ধীরে ধীরে সুস্থ হইলেন। প্রকাশ দেখিল, সংসারের ভার পাইয়া হঠাৎ যে সে সাবালক হইয়াছে তাহাই নয়, নববধূর সহিত পরিচয়ের পূর্ব্বেই পরিচয় শেষ হইয়া গিয়াছে, বাইশ বৎসর বয়সেই সে বিপত্নীক হইয়া পড়িয়াছে। গৃহ-শ্মশান ত্যাগ করিয়া প্রকাশ তাহার মাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল।

তখনও তিন মাস সম্পূর্ণ হয় নাই; প্রকাশের এক খুড়শ্বশুর তাঁহার এক দূরসম্পর্কীয়া জ্ঞাতিকন্যার সহিত প্রকাশের পুনরায় বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। এই খুড়শ্বশুরটি প্রকাশের প্রায় সমবয়স্ক, উভয়ের মধ্যে হাসিঠাট্টা প্রায়ই চলিত। কিন্তু এই বিবাহে সম্মতি দেওয়া প্রকাশের পক্ষে কঠিন হইল। তাহার এক বিপত্নীক বন্ধু দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ তাহাকে কথায় এবং ব্যবহারে অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিত করিত। আজ সে নিজে বিবাহ করিলে ভাল দেখাইবে না, সকলে তাহাকে ভণ্ড ও দুর্ব্বলচিত্ত বলিয়া ঠাট্টা করিবে। প্রকাশ কিন্তু তাহার নিঃসঙ্গ অবস্থাটি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছিল। আজ সে বুঝিতে পারিয়াছে, বিপত্নীক হইলে অনেক বয়সেও লোকে বিবাহ করে কেন। কিন্তু মনের ভিতর একটা পরিবর্ত্তন হইলেও তাহা বাহিরে প্রকাশ করা লজ্জাকর, সুতরাং প্রকাশ তাহার খুড়শ্বশুরের পত্রের উত্তরে লিখিল, সে বিবাহ করিবে না।

খুড়শ্বশুরটি সংসারী লোক, সুতরাং অত সহজে প্রকাশের চিঠিতে বিশ্বাস করিলেন না। একখানি সুদীর্ঘ পত্রে পাত্রীর রূপবর্ণনা করিয়া প্রকাশকে একবার মাত্র পাত্রী দেখিবার জন্য তিনি অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। বারংবার পত্রাঘাতে বিরক্ত হইয়া প্রকাশ একদিন পাত্রী দেখিবার জন্য জলপাইগুড়ি যাত্রা করিল। মনে মনে স্থির রহিল, বিবাহ সে কখনই করিবে না, কেবলমাত্র একবার পাত্রী দেখিয়া খুড়শ্বশুরের পুনঃ পুনঃ অনুরোধের হাত এড়াইয়া আসিতে ক্ষতি কি?

জলপাইগুড়ি গিয়া প্রকাশ পাত্রী দেখিল। কোমল, দীর্ঘাকার, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ কিশোরীকে দেখিয়া প্রকাশের সব দর্শন, বিজ্ঞান, যুক্তি ও দৃঢ়তা কোথায় ভাসিয়া গেল। প্রকাশকে সর্ব্বাপেক্ষা মোহিত করিল পাত্রীর প্রস্ফুটিত কমলের মত চোখ দুইটি। রূপবহ্নি তাহার অন্তরটিকে যেন

উজ্জ্বল করিয়াছিল, তাহাতে লক্ষ সুন্দরী স্ত্রীলোকের মধ্যে দাঁড়াইলেও তাহার সৌন্দর্য্যের একটি বিশিষ্টতা তাহাকে ভদ্র ও শিক্ষিত বংশসম্ভূতা বলিয়া চিনাইয়া দিত। এ শুধু সৌন্দর্য্য নয়—সৌন্দর্য্যের উপরে একটি মহীয়সী মূর্ত্তি, যাহা অনেক অপূর্ব্ব সুন্দরীদের মধ্যেও সচরাচর দেখা যায় না। এই দীপ্তিমতী রমণীকে দেখিয়া প্রকাশের মনের কোন্ নিভৃত কোণের অতৃপ্ত রূপপিপাসা হঠাৎ জাগিয়া উঠিল। খুড়শ্বশুর মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন? বই-পড়া দুর্ব্বুদ্ধি এখন কেটেছে তো?"

প্রকাশ ঈষৎ হাসিল মাত্র, কিন্তু সেই হাসি তাহাকে ধরাইয়া দিল। প্রকাশকে নমস্কার করিয়া উঠিয়া যাইবার সময় মেয়েটির দুইটি চোখ হঠাৎ মুহূর্ত্তের জন্য প্রকাশের চোখের উপর পড়িল। অন্ধ প্রকাশ মনে করিল, চোখ দুইটিতে যেন করুণা ও ভালবাসা তাহারই জন্য সঞ্চিত রহিয়াছে। বিপত্নীক জীবনের অনেক বিড়ম্বনা!

তারপরের ঘটনাগুলি অতিক্রুত বেগে হইয়া গেল। জলপাইগুড়ি হইতে বিবাহের প্রস্তাব, প্রকাশের সম্মতি, পুনরায় কি একটা কারণে বিবাহ স্থগিত রাখার সংবাদ, সর্ব্বশেষে খুড়শ্বশুরের সুদীর্ঘ পত্র। মেয়ের বাপ হঠাৎ এক শিক্ষিত অবস্থাপন্ন যুবককে পাত্র স্থির করিয়াছেন, প্রকাশ দ্বিতীয় পক্ষ বলিয়া তাঁহার আপত্তি হইতেছে। কিছুদিন পরেই খুড়শ্বশুর পুনরায় সংবাদ দিলেন যে, মহাসমারোহে মেয়েটির বিবাহ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার জন্য প্রকাশের দুঃখ করিবার কিছুই নাই, কারণ এই বিশাল বাংলাদেশে সুন্দরী অপেক্ষাও সুন্দরীতম পাত্রী অসংখ্য আছে, সুতরাং প্রকাশ নিশ্চিন্ত থাকুক, একমাসের মধ্যেই অপূর্ব্ব সুন্দরী পাত্রীর সহিত প্রকাশের বিবাহ স্থির করিয়া তবে তাঁহার অন্য কাজ। প্রকাশ শুধু একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল যে, তাহার স্বর্গগতা স্ত্রীর জন্য যে অপূর্ব্ব ভালবাসার কথা লোকে বলাবলি করিত, তাহা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়া গেল, অথচ বিপত্নীক প্রকাশ যে তিমিরে সেই তিমিরেই পড়িয়া রহিল।

এইবার প্রকাশের সব ভুলিবার পালা আসিল। সে দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত এম-এ ও আইনপাঠ শেষ করিয়া তাহাদের দেশের প্রধান সহর বাঁকুড়াতে যাইয়া ওকালতি আরম্ভ করিল। অদম্য উৎসাহ ও প্রতিভার দীপ্তিতে সকলকে বিস্মিত করিয়া প্রকাশ ৫।৬ বৎসরের মধ্যেই সেখানকার একজন শ্রেষ্ঠ উকিল বলিয়া পরিগণিত হইল। তাহার এই অকস্মাৎ অভ্যুদয় বাঁকুড়া উকিলসভার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় বলিয়া সকলে স্বীকার করিল। প্রকাশ ভাবিল, অতীতের সব স্মৃতি সে মুছিয়া ফেলিয়াছে।

একবার পূজার অবকাশে প্রকাশ কাশী বেড়াইতে গেল। আজ প্রায় এক বৎসরের বেশী হইল তাহার মা ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। এতদিন যে স্নেহের কোমল নীড়ের মধ্যে শিশুরই ন্যায় সমস্ত আবদার ও অভিমান করিয়া ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত সে কাটাইয়াছে, সেই নীড়ভ্রষ্ট হইয়া প্রকাশের যেন সমস্তই নূতন ঠেকিতে লাগিল। আজকাল প্রকাশ ছুটি পাইলেই কোথাও না কোথাও বেড়াইতে যায়। এ বার সে কাশীতে আসিয়া বিশ্বনাথের মন্দির ও দশাশ্বমেধের ঘাটে সকাল-সন্ধ্যা যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছে। যখন মানুষের কাছে মানুষের ভালবাসা নিঃশেষ হইয়া যায়, চারিদিকেই যখন মানুষ দেখা যায় কিন্তু আপনার লোক দেখা যায় না, তখন মানুষ ধীরে ধীরে প্রায় নিজের অজ্ঞাতে বিশ্বনাথের দিকে যাইয়া পড়ে। আজ এই বিশাল সংসারে প্রকাশ মক্কেলের নমস্কার ও টাকার ঝনঝনানিতে প্রাণ দেখিতে না পাইয়া কঠিন বিশ্বনাথের পাষাণ হৃদয়ের মধ্যে প্রাণের সন্ধানে আসিয়াছে। কি পাইয়াছে, কি না পাইয়াছে, তাহা সে নিজেই জানে না, তবু তাহার দিনগুলি একরকম কাটিয়া যাইতে লাগিল।

কাশীতে দাশশ্বমেধ ঘাটে যাতায়াত করিতে করিতে এক নূতন বন্ধু জুটিল। মহেন্দ্রবাবু বাংলার কোন্ এক জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের অফিসের কর্ম্মচারী। সস্ত্রীক কাশী বেড়াইতে আসিয়াছেন। দশাশ্বমেধের ঘাটে বসিয়া নানারকম গল্পগুজব করিতে করিতে তাঁহার সহিত প্রকাশের আলাপটি বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। প্রকাশ রামাপুরায় এক অবস্থাপন্ন মক্কেলের প্রকাণ্ড শূন্যবাড়ীর ঠাকুর-চাকরের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া একাকী বাস করে শুনিয়া এক দিন তিনি প্রকাশকে নিজ বাটিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। নিমন্ত্রণে প্রকাশের অসীম উৎসাহ, কিন্তু কাশীতে আসিয়া সে যেন কুড়ে হইয়া পড়িয়াছে, কোথাও যাইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার উৎসাহ পর্য্যন্ত তাহার নাই। অনেক বার অনুরোধ এড়াইয়া একদিন তাহাকে মহেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতে হইল।

তখন রাত্রি প্রায় আটটা। মহেন্দ্র বাবুর দুইটি ছেলে ও একটি মেয়ে আসিয়া প্রকাশকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। মহেন্দ্র বাবু আয়োজনে ব্যস্ত, একবার ভিতরে যাইতেছেন, একবার বাহিরে আসিতেছেন। ইতিমধ্যে প্রকাশ তাঁহার ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে বেশ জমাইয়া ফেলিয়াছে। মেয়েটি কোলে উঠিয়া বসিয়াছে, ছোট ছেলেটি তাহার দাদার অত্যাচার সম্বন্ধে উদাহরণের পর উদাহরণ দিয়া চলিয়াছে, 'দাদা' তাহার একবার প্রতিবাদ করারও প্রয়োজন মনে করিতেছে না, কেবল ভিকুর দোকানের বড় বড় জিলিপি ও রঙ্গিন কাঠের বল সম্বন্ধে নিজ অভিজ্ঞতা ও মতামত প্রকাশ করিতেছে। এমন সময়ে প্রকাশের খাওয়ার ডাক পড়িল। দ্বিতলের প্রকোষ্ঠে আসন-পাতা ছিল, একটি তরুণী আসিয়া নানাবিধ খাদ্যদ্রব্যপূর্ণ থালা প্রকাশের সম্মুখে রাখিলেন।

মহেন্দ্র বাবু বলিলেন, "ইনি আমার স্ত্রী, সব ইনিই রেঁধেছেন।"

প্রকাশ ঈষৎ হাসিয়া নতমুখে তাঁহাকে নমস্কার করিল এবং বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া পূর্ব্বের সংস্কার মত অতি দ্রুতগতিতে থালাটি খালি করিতে লাগিল। আহারাদির পর পান দিবার জন্য মহেন্দ্র বাবুর স্ত্রী ঘরে প্রবেশ করা মাত্র হঠাৎ তাঁহার দিকে তাকাইয়া প্রকাশ চম্‌কাইয়া উঠিল। যে রূপের স্রোত একদিন জলপাইগুড়িতে তাহার সমস্ত দৃঢ়তা ভাসাইয়া দিয়াছিল, এ সেই রূপ, সেই প্রস্ফুটিত কমলের মত চক্ষু, আজ ৭।৮ বৎসর পরেও কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই। কেবল কিশোরী আজ যুবতী, কৈশোরের চঞ্চল সৌন্দর্য্য আজ নিস্তরঙ্গ শান্ত যৌবনে পরিণত হইয়াছে। আজ সুদীর্ঘ আট বৎসর পরে প্রকাশ যেন হঠাৎ আবার এম্‌-এ পড়া ছাত্র হইয়া গেল। বাড়ী ফিরিবার সময় তাহার কেবল মনে হইতে লাগিল, তরুণী কি তাহাকে চিনিতে পারিয়াছে?

সে রাত্রে বাসায় ফিরিয়া প্রকাশের ঘুম হইল না, বিছানায় এপাশ-ওপাশ করিয়া বিনিদ্র রাত্রি কাটিয়া গেল। এক একবার সে নিজের মনকে প্রশ্ন করিয়াছে, কেন তাহার এই উদ্বেগ, কিসের তাহার দুঃখ? একদিন একজনকে বিবাহ করার কথা হইয়াছিল মাত্র, বাঙালীর ঘরে এমন তো হামেশা হইতেছে; সে যে তাহাকে পায় নাই বলিয়াই বিবাহ করে না, এমনও তো বলা চলে না, তবে কেন সে এখন হায় হায় করিয়া মরে!

কিন্তু মানুষের মন এমন আশ্চর্য্য পদার্থ যে, তাহা এক-কে আর ভাবিয়া লয়, ইচ্ছাকে সত্য মনে করে, আকাঙ্ক্ষাকে তথ্য মনে করে, এমন যে-মন তাহাকে লইয়া ঘর করা এক বিড়ম্বনা।

প্রকাশের মনে হইল, সে তরুণীকে পায় নাই বলিয়া বিবাহ করিল না, আর তরুণী কি না দিব্য বিবাহ করিয়া স্বামী-পুত্র লইয়া ঘর-করণা করিতেছে।

প্রকাশ প্রকৃতিস্থ থাকিলে এমন ভাবিতে পারিত না, কিন্তু তরুণীকে দেখিবার পর হইতে তাহার মনের ভারকেন্দ্র বিচলিত হইয়া গিয়াছিল।

নিজের প্রতি তাহার কেবল ধিক্কারের ভাব বুকের মধ্যে ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল; কেবলি নিজেকে সে ধিক্কার দিয়া বলিতে লাগিল—মূঢ় মূঢ়, কার জন্য জীবনটাকে তুই এমন অতল শূন্যতার মধ্যে নিক্ষেপ করিলি? যার জন্য, আজ তো তার দেখা পাইয়াছিস, সে সুখে সংসার পাতিয়াছে; তোর দুঃখের অংশ-ভাক্ তো সে নয়! তবে আর কেন?

প্রকাশের মনে হইল, জীবনের দাবা-খেলায় সে চরম হারা হারিয়া গিয়াছে, এখন আর দাবার ছকের কাছে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া থাকিয়া কি লাভ! এবার ছকখানা উল্টাইয়া ফেলিয়া দিয়া অন্য কাজে মন দিলেই হয়।

কিন্তু তাহাতে সান্ত্বনা কই? যে প্রকৃত অপরাধী, তাহার তো দণ্ড হইল না। আর সে কি না বিনা অপরাধে, বড় জোর সমান অপরাধে, সারাজীবন দণ্ড ভোগ করিয়া মরিবে! না, তাহা হইবে না। স্থির করিল, এমন বিধান সে করিবে, যাহাতে ওই তরুণী, সংসার-সুখী রমণী, চির জীবন জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিবে, ঘোমটার তলে তার চোখে অশ্রুর অনাদি উৎস খুলিয়া যাইবে।

পর দিন সে মহেন্দ্র বাবুর বাড়ী গেল না। বিকালের দিকে মহেন্দ্র বাবু আসিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি প্রকাশ বাবু, আজ যে গেলেন না?"

প্রকাশ বলিল, "আমি হঠাৎ তার পেয়ে বাড়ী যাচ্ছি, দিন পনেরর মধ্যেই আবার ফিরব। আপনি তো এখন মাস-খানেক আছেন?"

মহেন্দ্র বাবু বলিলেন, "তা আছি। কিন্তু হঠাৎ বাড়ী কেন ?"

প্রকাশ বিশেষ কিছু বলিতে নারাজ দেখিয়া মহেন্দ্র বাবু আর পীড়াপীড়ি করিলেন না। প্রকাশ সেই রাত্রেই বাড়ী রওনা হইল।

পনের দিন পরে প্রকাশ ফিরিয়াছে কি না দেখিবার জন্য মহেন্দ্র বাবু প্রকাশের বাড়ী আসিলেন, বাসার সম্মুখেই প্রকাশের দেখা পাইলেন। প্রকাশ মহেন্দ্র বাবুকে বন্ধ করিয়া বৈঠকখানায় লইয়া বসাইল, মহেন্দ্র বাবু ছাদের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "প্রকাশ বাবু, শাড়ি ঝুলছে কার ? আপনার কোন আত্মীয়া কি—"

প্রকাশ বাধা দিয়া বলিল, "আমার স্ত্রী।" মহেন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন "আপনার স্ত্রী ? কি ব্যাপার ?"

প্রকাশ ব্যাপারটি প্রকাশ করিল। একটু বাড়াইয়া বলিল যে, কিছু দিন হইতে বিবাহের কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, কন্যাপক্ষের আতিশয্যে সে আর বিলম্ব করিতে পারে নাই; মহেন্দ্র বাবুকে আগে না জানাইবার জন্য সে ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

মহেন্দ্র বাবু বলিলেন "ক্ষমা পরে হবে, আগে আপনার গৃহিণীকে নিয়ে আমাদের বাড়ী চলুন।" প্রকাশ তো তা-ই চায়।

তাহারা তিন জনে মহেন্দ্র বাবুর বাড়ী রওনা হইল, প্রকাশ কেবলি ভাবিতে লাগিল, মহেন্দ্র বাবুর স্ত্রী এবার জব্দ হইবে। আহা, বেচারা হয় তো কাঁদিয়া কাটিয়া এক কাণ্ড করিবে, নয় তো মূর্চ্ছা যাইবে। কল্পনায় মহেন্দ্র বাবুর স্ত্রীর দুর্দ্দশা দেখিয়া সে মনে পরম আনন্দ পাইল, এমন আনন্দ সে অনেকদিন পায় নাই।

মহেন্দ্র বাবুর বাড়ী পৌঁছিয়া মহেন্দ্র বাবু নিজের স্ত্রীর সঙ্গে প্রকাশের পত্নীর পরিচয় করাইয়া দিলেন, দুই তরুণী অন্তঃপুরে গেল, মহেন্দ্র বাবু ও প্রকাশ বাহিরে বসিয়া রহিলেন।

মহেন্দ্র বাবু কি ভাবিতেছিলেন জানি না, হয় তো ফুলকপি কিংবা মাছের দর, আর প্রকাশ কল্পনায় মহেন্দ্র বাবুর স্ত্রীর দুর্দ্দশার কথা ভাবিতেছিল, তাহার মনে হইতেছিল, এবার সেই বিশ্বাসঘাতিনী রমণী দেখিবে, প্রকাশও বিবাহ করিতে জানে, দেখিবে, প্রকাশ তাহার জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সারা জীবন বসিয়া না থাকিতেও পারে। প্রকাশ ভাবিতেছিল, বিধাতা এমনি করিয়া অপরাধীকে শাস্তি দেন।

কিন্তু মূর্চ্ছা বোধ হয় হয় নাই, হইলে এতক্ষণে জানিতে পারা যাইত। মূর্চ্ছা না হোক, চোখের জল পড়িবে, দীর্ঘনিশ্বাসের বাড়াবাড়ি হইবে, প্রকাশের স্ত্রীর সঙ্গে বেশী কথাবার্ত্তা হইবে না, তাহার মুখ গম্ভীর হইবে। বাঃ, সে বড় মজা হইবে। প্রকাশ স্থির করিল, স্ত্রীর কাছে হইতে সব ব্যাপার শুনিতে হইবে।

সন্ধ্যার পরে, জলখাওয়া সারা হইলে প্রকাশ ও তাহার স্ত্রী বাসায় রওনা হইল। প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল, "মহেন্দ্র বাবুর স্ত্রীকে কেমন দেখলে ?

স্ত্রী বলিল, "বেশ, বড় ভালমানুষ বেশ হাসিখুসী।"

প্রকাশ বিস্মিত হইয়া বলিল, "হাসিখুসী ! তোমার সঙ্গে কথা বললেন ?"

স্ত্রী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "বল কি ! সারাক্ষণ আমার সঙ্গে কথা বলেছেন, কত গল্প, কত আলাপ, কাল আবার যেতে বলেছেন।"

প্রকাশ জিজ্ঞাসা করিল, "ওর মূর্চ্ছা হয় নি ?"

স্ত্রী বলিল, "মূর্চ্ছা হবে কেন ?"

প্রকাশ সামলাইয়া বলিল, "ওর হিষ্টিরিয়ার মত আছে কি না, তাই।"

স্ত্রী বলিল, "না, না সে সব কিছু হয় নি।" একটু থামিয়া বলিল, "জান আমরা সই পাতিয়েছি, মনের রাখী।"

প্রকাশ আর কোন প্রশ্ন করিল না, কোন্ কথা বলিল না, তাহার স্ত্রী মহেন্দ্র বাবুর স্ত্রীর প্রশংসা করিয়া যাইতে লাগিল।

প্রকাশ আর একবার নিজেকে ধিক্কার দিতে আরম্ভ করিল এবং মনে মনে কেবলি বলিতে লাগিল, মূঢ়—মূঢ় কে ? প্রকাশ বোধ করি নিজেও তাহা জানে না।

মুর্শিদাবাদ বৃত্তান্ত

—শ্রীবিবেকানন্দ গোস্বামী

রাজনৈতিক ইতিহাস

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থাপিত হয়। তদবধি প্রায় একশত বৎসর-ব্যাপী মুর্শিদাবাদের ইতিহাস গোটা বাংলারই ইতিহাস। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ঢাকা বাংলার রাজধানী ছিল। তখন নবাব ছিলেন সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের পৌত্র যুবরাজ আজিম উস্‌মান আর তাঁহার দেওয়ান ছিলেন কারতলব্ খাঁ ওরফে মুর্শিদকুলী খাঁ। তিনি দাক্ষিণাত্যবাসী ব্রাহ্মণ-সন্তান, পারস্যদেশে নীত হইয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং কারতলব্ খাঁ নাম পরিগ্রহ করেন। তাঁহার সহিত মোগলের প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কই প্রধান ছিল। তাই সম্রাট্-পৌত্র তাঁহাকে হীন চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করেন। মনোমালিন্য বৃদ্ধি পায় এবং মুর্শিদের প্রাণনাশের চক্রান্ত হয়। সর্ব্ববিবরণ সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের গোচরীভূত করিয়া তিনি রাজাদেশে মকসুদাবাদে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন এবং স্বীয় নামানুসারে ঐ স্থানের নাম মুর্শিদাবাদ রাখেন। নবাব আজিম উস্‌মানও পিতামহের আজ্ঞায় পাটনায় যাইয়া রাজধানী স্থাপন করেন এবং ঐ স্থানের নাম স্বীয় নামানুসারে আজিমাবাদ রাখেন।

পরে মুর্শিদ দেওয়ানী ও নবাবী উভয় পদই লাভ করিলে মুর্শিদাবাদই বাংলার রাজধানী হয়। মুর্শিদের প্রযত্নে মুর্শিদাবাদে শোভন হর্ম্যাবলী নির্ম্মিত হয়। তাঁহার নিজ প্রাসাদ যে স্থলে অবস্থিত ছিল, তাহা কুলোরিয়া নামে পরিচিত। তথায় মুর্শিদ-মহিষী নসেরুবানু বেগমের সমাধি রহিয়াছে। মুর্শিদের সমাধি বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদের ১ মাইল পূর্ব্বে "কাটরা" নামক স্থানে বিরাট এক মসজিদের সোপানাবলীর নিম্নভাগে অবস্থিত। তাঁহার কর্ম্মচারী মোরাদ ফরাস বহু হিন্দুমন্দির চূর্ণ করিয়া তাহাদের উপাদানে ঐ সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করেন, - এরূপ প্রবাদ আছে। অত্যাচারী মোরাদ পরবর্ত্তী নবাব সুজাউদ্দিন কর্ত্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

অনেক ঐতিহাসিক বলেন, হিন্দুদিগের প্রতি, বিশেষতঃ হিন্দু জমীদারগণের প্রতি মুর্শিদের ব্যবহার অতিশয় কঠোর ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র স্বীয় গ্রন্থে মুর্শিদের নিন্দাই করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও মুর্শিদ যে সুযোগ্য এবং ন্যায়পরায়ণ ছিলেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তিনি পরনারীহরণের অপরাধে স্বীয় একমাত্র পুত্রকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

মুর্শিদ যখন বাংলার শাসক, তখন দিল্লীর রাজতক্ত লইয়া নানা গোলযোগ চলিতেছিল, কিন্তু মুর্শিদ কোনও গোলযোগে কাণ না দিয়া যখন যিনি সম্রাট্ হইতেন, তাঁহাকেই বাংলার রাজস্ব প্রেরণ করিতেন। তিনি কৃষকগণের উন্নতির জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহার কঠোর আদেশের জন্যই সম্রাটের ফারমান পাওয়া সত্ত্বেও ইংরাজগণ বাংলা দেশে কোনও গ্রাম ক্রয় করিতে পারেন নাই। মুর্শিদের আমলে বাংলার রাজস্ব বৃদ্ধি পায়। মুর্শিদ বাংলার অধিকাংশ জমীদারী হিন্দুদিগকেই প্রদান করেন। সে সময় রাজা দর্পনারায়ণ, রাজা জয়নারায়ণ প্রভৃতি বাংলার প্রধানগণ কানুনগোর পদে কার্য্য করিতেন। রঘুনন্দনও ঐ সময়ে নবাব-সরকারে কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনিই নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহার ভ্রাতা রামজীবনই ঐ বংশের আদিপুরুষ; আর রাজা দর্পনারায়ণ পুঁটীয়ার অধিপতি ছিলেন। ইঁহারা সকলেই বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

১৭২২ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদ বাংলার রাজস্ব এক কোটী বিয়াল্লিশ লক্ষ অষ্টাশীতি সহস্র মুদ্রা ধার্য্য করেন। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মুর্শিদের পরলোকগমনের পর তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দিন বাংলার নবাব হন এবং স্বীয় তনয় সরফরাজ খাঁকে দেওয়ান নিযুক্ত করেন।

সুজা চারিজন মন্ত্রীর সাহায্যে বাংলা শাসন করিতেন। তাঁহাদের নাম রায় রায়ান আলমচাঁদ, জগৎশেঠ ফতেচাঁদ, হাজী আহম্মদ এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মীর্জ্জা মহম্মদ।

পরে মীর্জ্জা মহম্মদ আলিবর্দ্দী খাঁ নাম-ধারণপূর্ব্বক সুজার অধীনে বিহার প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন।

আলমচাঁদ বাংলার সহকারী দেওয়ান এবং জগৎশেঠ কোষাধ্যক্ষ ছিলেন।

সুজা হিন্দু ও মুসলমানকে সমানচক্ষে দেখিতেন। তিনি প্রজারঞ্জক ও দানশীল ছিলেন। তাঁহার সময় টাকায় আটমণ চাউল পাওয়া যাইত। তিনি ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে ফরহাবাগ ও রোশনীবাগ রচনা করেন। ফরহাবাগের প্রমোদ-উদ্যান আর নাই, পুষ্করিণীটী মাত্র আছে। রোশনীবাগে সুজার সমাধিভবন অবস্থিত। ১৭৩৯ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

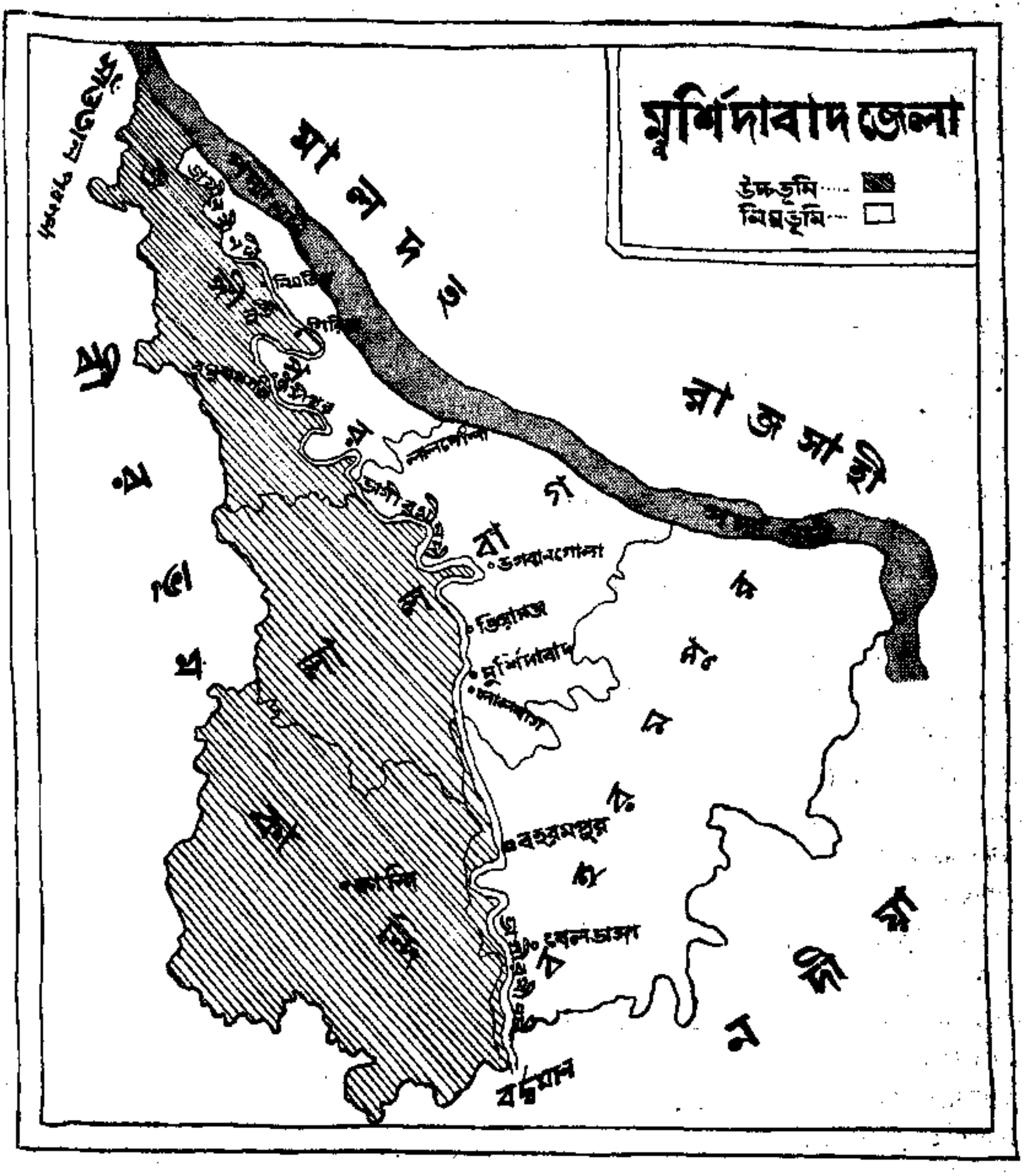
সুজাউদ্দিন মৃত্যুকালে স্বীয় তনয় সরফরাজ খাঁকে উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশ করেন, তদনুসারে সরফরাজ মুর্শিদাবাদের মসনদে উপবেশন করেন। সরফরাজও মন্ত্রিসভার পরামর্শানুসারে কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁহার প্রবল ইন্দ্রিয়লালসাই তাঁহার কাল হইল। রাজকার্য্যে অবহেলা নিবন্ধন তিনি প্রধান প্রধান ব্যক্তির বিরাগভাজন হইলেন। ক্রমে জগৎ শেঠ, আলমচাঁদ ও হাজী আহম্মদের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য হইল। ইহাঁরা পরামর্শ করিয়া বিহার প্রদেশের শাসনকর্ত্তা আলিবর্দ্দী খাঁর জন্য বাদসাহী সনন্দ আনয়ন করিলেন। ঐ সনন্দে আলীবর্দ্দীকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাবপদে স্থাপিত করা হইয়াছিল। অনন্তর আলীবর্দ্দী পাটনা হইতে সসৈন্যে বহির্গত হন। গিরিয়ার প্রান্তরে সরফরাজের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সরফরাজ নিহত হন। ঐ যুদ্ধই গিরিয়ার ২য় যুদ্ধ। সরফরাজ ১৩ মাস মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। সরফরাজের সমাধি বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ রেলওয়ে ষ্টেশনের পার্শ্বে অবস্থিত।

গিরিয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আলীবর্দ্দী বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদাররূপে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার পুত্র ছিল না। তিনটি মাত্র কন্যা ছিল। তাঁহার ভ্রাতা হাজী আহম্মদের তিন পুত্রের সহিত তাঁহার তিন কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা নওয়াজকে তিনি পূর্ব্ববঙ্গের শাসনভার প্রদান করেন। তিনি ঢাকায় থাকিতেন। প্রথমে হোসেন কুলি খাঁ, পরে রাজা রাজবল্লভ রায় তাঁহার সহকারী ছিলেন। ঘসেটী বেগম ইহারই পত্নীর নাম। দ্বিতীয় জামাতা জৈনুদ্দিন বিহারের শাসনভার প্রাপ্ত হন। তিনি পিতা হাজী আহম্মদ এবং পত্নী আমিনা বেগম সহ পাটনা সহরে বাস করিতেন। সরফরাজের ভগ্নীপতি মুর্শিদকুলী খাঁ উড়িষ্যার শাসক ছিলেন। তিনি আলিবর্দ্দীর প্রভুত্ব অস্বীকার করায় আলিবর্দ্দী তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত ও উড়িষ্যা হইতে বিতাড়িত করেন। ঐ পদে তখন আলিবর্দ্দীর কনিষ্ঠ জামাতা সৈয়দ আহম্মদ নিযুক্ত হন। পরে তাঁহাকে পূর্ণিয়া প্রদেশের শাসনভার প্রদান করা হয়। আলিবর্দ্দী জৈনুদ্দিনের জ্যেষ্ঠপুত্র মীর্জ্জা মহম্মদকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ইনিই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নবাব সিরাজউদ্দৌলা।

রাজা জানকীরাম আলিবর্দ্দীর মন্ত্রী, মুস্তাফা খাঁ সেনাপতি, মীরজাফর বক্সী এবং আতাউল্লা সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ১৬ বৎসর (১৭৪০-৫৬) রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বের প্রধান ঘটনা বর্গীর হাঙ্গামা। নাগপুর-রাজ রঘুজী ভোঁসলা স্বয়ং এবং তাঁহার ব্রাহ্মণ-সেনাপতি টহলরাম ভাস্কর পণ্ডিত এবং পুণার পেশোয়া বালাজী বাজীরাও—ইহাঁরা কয়েকবার বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন ও অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া স্বীয় নাম ইতিহাসে ঘৃণিত করিয়া রাখিয়াছেন। দিল্লীর বাদশাহ এ বিপদে নবাবকে সাহায্য করিতে অপারগ হন, সে জন্য তিনি দিল্লীতে রাজস্ব-প্রদান বন্ধ করেন। পেশোয়া বহু অর্থ পাইয়া প্রস্থান করেন, কিন্তু ভাস্করের অত্যাচারে দেশে হাহাকার উঠে। আলিবর্দ্দী ভাস্করকে সুকৌশলে সংহার করেন বটে, কিন্তু রঘুজীর সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া তাঁহাকে উড়িষ্যা প্রদেশ ছাড়িয়া দিয়া এবং বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা চৌথ প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করেন (১৭৫১ অব্দ)।

আলিবর্দ্দীর সময় দেশে তিনবার বিদ্রোহ হয়। প্রথম, তাঁহারই বিশ্বস্ত সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ সিংহাসন-লাভোদ্দেশে বিদ্রোহী হন, কিন্তু পরাজিত হইয়া মারাঠাদের দলে যোগ দেন। মারাঠাদের সহিত শান্তি স্থাপিত হইলে তিনিও রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ হইতে অদৃশ্য হন। দ্বিতীয়, সর্দ্দার খাঁ এবং সমসের খাঁ নামক পাঠান প্রধানদ্বয় বিহার প্রদেশে বিদ্রোহী হইয়া হাজী আহম্মদ, জৈনুদ্দিন ও আমিনা বেগমকে বন্দী করেন। আলিবর্দ্দী প্রথমে মীরজাফরকে, পরে আতাউল্লাকে বিদ্রোহ-দমনে প্রেরণ করেন। কিন্তু তাঁহারা উভয়েই কর্ত্তব্য-কার্য্যে ঔদাসীন্য দেখাইয়া মুর্শিদাবাদের মসনদ লাভের নিমিত্ত চক্রান্ত করিতে থাকেন। নবাব স্বয়ংই তখন

রণ-ক্ষেত্রে অগ্রসর হন। কুতজ্ঞীশ্বর নবাবের হাতে আত্ম-সমর্পণ করেন এবং তাঁহার কদালাভ করিতে সমর্থ হন। তুমুল যুদ্ধের পর পাঠানেরাও পরাস্ত ও বিতাড়িত হয় এবং পাঠান-সর্দারদ্বয় নিহত হন। তখন আলিবর্দ্দী স্বীয় কন্যার উদ্ধার সাধন করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও জামাতা ইতিপূর্ব্বে কারাগারেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। পাটনা প্রদেশের শাসনভার অতঃপর সিরাজউদ্দৌলার উপর অর্পিত হয়। তিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া রাজা জানকী রায় তাঁহার প্রতিনিধি-স্বরূপ উক্ত প্রদেশ শাসন করিতে থাকেন। এ ব্যবস্থা বালক সিরাজের মনঃপূত হয় নাই। তাই নবাব কটক প্রদেশে মহারাষ্ট্রীয় দস্যু দমনে অগ্রসর হইলে সিরাজ স্বীয় সেনাপতি মীর্জা মেহেদী আলির সহায়তায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন



এবং পাটনা আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন। ইহাই তৃতীয় বিদ্রোহ। যুদ্ধে মীর্জ্জা মেহেদী আলি নিহত হন এবং সিরাজ রাজা জানকীরাম কর্ত্তৃক পরাজিত ও বন্দী হন। পরে তিনি নবাবের ক্ষমা লাভ করেন।

এই সময় চরিত্রহীনতার জন্ম হোসেন কুলী খাঁ সিরাজ কর্ত্তৃক নিহত হন এবং রাজা রাজবল্লভ ঢাকা প্রদেশ শাসন করিতে থাকেন, আর নওয়াজেস মহম্মদ মুর্শিদাবাদ প্রদেশের রক্ষণাবেক্ষণের ভারপ্রাপ্ত হইয়া মুর্শিদাবাদের অনতিদূরে অশ্ব-ক্ষুরাকৃতি মতিঝিলের সান্নিধ্যে স্বীয় প্রাসাদ ও মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। তিনি সিরাজের মধ্যম ভ্রাতা এক্রামউদ্দৌলাকে পোষ্যপুত্র লন। নওয়াজেস, এক্রামউদ্দৌল্লা এবং তাঁহার পুত্র মতিঝিলের সমাধি-ক্ষেত্রে চির-নিদ্রায় নিদ্রিত।

নবাব আলিবর্দ্দীর নাম বাংলার ইতিহাসে অতিশয় প্রসিদ্ধ। আলীবর্দ্দীর পবিত্র চরিত্র, কঠোর শ্রমশক্তি, শাসনে যোগ্যতা এবং অপক্ষপাত ব্যবহার তাঁহার নাম অমর করিয়া তুলিয়াছে। তিনি সুরাপায়ী বা ইন্দ্রিয়াসক্ত ছিলেন না। আলস্য ও বিলাসিতা তিনি ঘৃণা করিতেন। সিংহাসন লাভ করার পর অধিকাংশ সময়ই তাঁহাকে অসি হস্তে রণক্ষেত্রেই ছুটাছুটি করিতে হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীয়-দমন ও বিদ্রোহ-নিবারণ এই দুই কার্য্যেই তাঁহার রাজ্যকাল ব্যয়িত হইয়াছিল। প্রজার সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধানে তাঁহার তীব্র দৃষ্টি ছিল। কৃষকের তিনি যথার্থ বন্ধু ছিলেন। হিন্দু আর মুসলমান দুই-ই তাঁহার চক্ষে সমান ছিল। এ বিষয়ে তাঁহাকে পূর্ব্বতন নবাব সুজা-উদ্দীনের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। কেহ কেহ সম্রাট আকবরের সহিত তাঁহার তুলনা করিয়া আকবর অপেক্ষাও তাঁহাকে উচ্চস্থান দিয়াছেন। চরিত্রবত্তাই তাহার কারণ। বৈদেশিকগণের প্রতি তিনি কখনও অত্যাচার করেন নাই। ইংরাজগণের সম্বন্ধে তাঁহার দুইটি প্রসিদ্ধ-উক্তি আছে। (১) তিনি ইংরাজের সহিত বিবাদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলেই বলিতেন—"স্থলের আগুন নিবান যায়, জলের আগুন নিবাইবে কে?" (২) "কালে টুপীওয়ালারাই এ দেশের মালিক হইবে।"

আলিবর্দ্দীর মহিষী শরফুন্নেসা বেগমও অত্যন্ত গুণবতী রমণী ছিলেন। তাঁহার নামও বাংলার ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। পলাশীর যুদ্ধের পরও তিনি জীবিতা ছিলেন। ১৭৫৬ অব্দে নবাব আলিবর্দ্দী লোকান্তরিত হন। গঙ্গার অপর তীরে খোসবাগের সমাধিভবনে স্বীয় জননীর সমাধির সান্নিধ্যে তিনি সমাহিত হন। ঐ সমাধি-ভবনে শরফুন্নেসা বেগম, নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা, লুৎফউন্নেসা ও আরও কয়েকজনের সমাধি রহিয়াছে।

নবাবের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রিয়তম দৌহিত্র নবাব মনসুর উল মুলক্‌, সিরাজউদ্দৌল্লা শাহ কুলীখাঁ মীর্জ্জা মহম্মদ হায়বৎ জঙ্গ বাহাদুর মুর্শিদাবাদের মসনদে উপবেশন করেন। ইনি চৌদ্দমাস মাত্র রাজত্ব করেন। ইঁহাকেই সাধারণতঃ বঙ্গের শেষ স্বাধীন নৃপতি বলা হয়। যদিও মীরকাশিমই যথার্থ শেষ স্বাধীন নৃপতি। সিরাজের জন্ম-সময় সঠিক জানা যায় না। কেহ কেহ ১৭৩০ অব্দকেই তাঁহার জন্ম সন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। জৈনুদ্দীনের ঔরসে আমিনা বেগমের গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়।

তাঁহার সময় রাজা রামনারায়ণ রায় পাটনার, রাজা রাজবল্লভ রায় ঢাকার, রাজা রামরায় সিংহ মেদিনীপুরের এবং নবাবের মাতৃস্বসৃ-তনয় সওকৎজঙ্গ (সৈয়দ আহম্মদের পুত্র) পূর্ণিয়ার শাসক ছিলেন। নবাব সওকৎ জঙ্গ দিল্লীর যুবরাজ শাহ আলমের সাহায্যে বাংলার নবাব হইবার চেষ্টা করেন। যুদ্ধ ঘোষিত হয়। কিন্তু রাজা রামনারায়ণ পাটনায় শাহ আলমের গতিরোধ করেন, আর সওকৎ স্বীয় মন্ত্রী শ্যামসুন্দরের সাহায্যে যুদ্ধ করিয়া সিরাজ-সেনাপতি বীর মোহনলাল কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। তখন মোহনলালের উপর পূর্ণিয়া প্রদেশের শাসনভার অর্পিত হয়।

নবাব আলিবর্দ্দীর বৈমাত্রেয় ভগিনী শা-খানুমকে মীরজাফর বিবাহ করিয়াছিলেন। ঐ বিবাহের সন্তান মীরণ। মীরজাফর সিরাজের প্রধান সেনাপতি এবং রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ রায় দুর্লভ মন্ত্রী ছিলেন। এতদ্ব্যতীত মীরমদন, দুর্লভ রাম, ইয়ার লতিফ খাঁ, মহারাজ নন্দকুমার, জমাদার আমীরবেগ প্রভৃতি সেনা-নায়কগণের এবং কৃষ্ণবল্লভ (কৃষ্ণদাস), মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, মহারাণী ভবানী, শ্রেষ্ঠী মহাতাপচাঁদ জগৎ শেঠ, উমিচাঁদ, মহম্মদী বেগ ও মীরকাশিম প্রভৃতি ব্যক্তিগণের নাম সে যুগের ইতিবৃত্তে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

সিংহাসন-লাভের পর সিরাজ মতিঝিলের প্রাসাদ অধিকার করেন। অতঃপর রাজা রাজবল্লভের সহিত তাঁহার বিবাদ হয়। রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস সপরিবারে কলিকাতায় গিয়া ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলে নবাব কলিকাতা আক্রমণ করেন। কলিকাতার গভর্ণর হলওয়েল পলায়ন করেন। সিরাজ যুদ্ধ করিয়া কলিকাতার দুর্গ অধিকার করেন এবং মাণিকচাঁদের উপর কলিকাতা শাসনের ভার দিয়া প্রস্থান করেন। এই পর্য্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে, তাহা ইতিহাস-পাঠকমাত্রেরই জানা আছে এবং এই প্রসঙ্গে ইহার পর যাহা বলা হইবে, তাহা সুপরিচিত। কিন্তু মুর্শিদাবাদ-বৃত্তান্ত লিখিতে গিয়া এই সমস্তই পুনরাবৃত্তি করিয়া লওয়া প্রয়োজন। কেন—তাহা অতঃপর বুঝা যাইবে।

পরে সেনাপতি ক্লাইভ সসৈন্যে মান্দ্রাজ হইতে আসিয়া কলিকাতার পুনরুদ্ধার সাধন করিয়া নবাবের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন।

এই সময় ইউরোপে সপ্তবার্ষিকী যুদ্ধ (Seven Years' War) চলিতেছিল। ক্লাইভ সেই সুযোগে এদেশে ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া তাঁহাদের অধিকৃত চন্দননগর নবাবের নিষেধ সত্ত্বেও অধিকার করিলেন। অনন্তর তিনি নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া পাটুলী ও কাটোয়া অধিকার করিয়া পলাশীর প্রান্তরে আসিয়া সৈন্য সমাবেশ করিলেন। নবাব প্রস্তুত হইয়া সসৈন্যে পলাশীর মাঠে উপস্থিত হইলেন। যুদ্ধে সেনাপতি মীরমদন দেহত্যাগ করিলেন। অমিতবিক্রমে যুঝিয়া ফরাসী সেনাপতি সিন্ ফ্রে (St. Frais) পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইলেন। মীরজাফর ও তৎপক্ষীয় দুর্লভরাম এবং ইয়ার লতিফ খাঁ ইংরাজদিগের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, তাই তাঁহারা যুদ্ধে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিলেন। মহাবীর মোহনলাল অসীম বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করিয়াও মীরজাফরের আদেশে রণক্ষেত্র ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। নবাব ভীত হইয়া অপরাহ্ণেই মুর্শিদাবাদ পলাইয়া গেলেন। বিজয়ী ক্লাইভ মীরজাফরকে বঙ্গ ও বিহারের নবাব ঘোষণা করিয়া দিয়া অগ্রসর হইলেন এবং মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে তাঁহার আসন পাতিয়া দিলেন। হতভাগ্য সিরাজ পলায়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজমহলের সান্নিধ্যে মীরজাফর-জামাতা মীরকাশিম কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদে আনীত হইলেন এবং মীরণের আদেশে জাফ্রাগঞ্জের প্রাসাদে মহম্মদ-ই-বেগের তরবারির আঘাতে তাঁহার দেহ খণ্ডবিখণ্ড হইল। খোসবাগের সমাধি ভবনে তিনি চির-নিদ্রায় নিদ্রিত রহিলেন।

তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী লুৎফা, আলীবর্দ্দী মহিষী ও তাঁহার প্রথম ও দ্বিতীয় কন্যা ঢাকায় নির্ব্বাসিত হইলেন। কন্যাদ্বয় ঢাকায় নদীগর্ভে জীবন বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হন। শরফুন্নেসা ও লুৎফা মুর্শিদাবাদে আনীত হন এবং কাল পূর্ণ হইলে খোসবাগের সমাধি-ভবনেই সমাহিতা হন। সিরাজের একমাত্র কন্যা-সন্তান উম্মত জোহরার বংশধর এখনও আছেন বলিয়া শুনা যায়।

সিরাজের চরিত্র লইয়া মতভেদ আছে। সে সমস্ত মতামতের মূল্য যাহাই হউক না কেন, তিনি যে হতভাগ্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহার মৃত্যুতে মুসলমান রাজত্বের অবসান সূচিত হয়। মীরজাফর বাংলার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার শাসনদক্ষতা ছিল না। মহারাজ নন্দকুমার তাঁহার মন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেন। ইংরাজগণ এই সময় হইতেই বাংলার শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে থাকেন। মীরজাফর তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইয়াই চলিতেন—বিশেষতঃ ইংরাজগণের নিকট তাঁহার প্রভূত দেনাও ছিল। এই সময় যুবরাজ শাহ আলম পুনরায় বিহার আক্রমণ করেন। ইংরাজগণের সাহায্যে মীরণ তাঁহাকে পাটনা হইতে বিতাড়িত করিতে সমর্থন হন বটে, কিন্তু তিনি নিজে সেখানে বজ্রাহত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। রাজমহলে তাঁহার সমাধি আছে।

কুচক্রী মীরজাফর অনন্তর ইংরাজগণের অনিষ্ট-কামনায় ওলন্দাজগণের সহিত চক্রান্ত করেন, কিন্তু ক্লাইভের বীরত্বে ওলন্দাজদিগের উদ্যম পণ্ড হয়, আর মীরজাফর ১৭৬০ অব্দে ইংরাজ গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট কর্ত্তৃক পদচ্যুত হইয়া কলিকাতায় বাস করিতে থাকেন। তাঁহার জামাতা মীরকাশিম তাঁহার পরিবর্ত্তে বাংলার নবাব ঘোষিত হন।

মীরকাশিম মীরণের সহোদরা ফাতিমা বেগমের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নবাব হইয়া চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর ও বীরভূ জেলায় অধিকার ইংরাজগণকে প্রদান করেন। তারপর ব্যয় কমাইয়া ও আয় বাড়াইয়া তিনি অত্যল্পকাল মধ্যেই ইংরাজগণের প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করিয়া দেন। ইতিপূর্ব্বে ইংরাজগণ মীরজাফরের নিকট হইতে ২৪ পরগণা জেলার জমীদারী-স্বত্বও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শাহ আলমের সহিত চক্রান্ত করার অপরাধে তিনি মহারাজ নন্দকুমারকে পদচ্যুত ও কারারুদ্ধ করেন। অনন্তর তিনি ইংরাজগণের

প্রতিপত্তি খর্ব্ব করিবার মনসে মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুঙ্গেরে রাজধানী স্থাপনা করিয়া তথায় গোলা-বারুদের কারখানা প্রস্তুত করেন এবং সমরু বা ওয়াল্টার রেণহার্ড নামক জনৈক জার্মান এবং গ্রেগরী নামক আরমেনিয়ানের সাহায্যে ইউরোপীয় প্রথায় সৈন্যদলকে শিক্ষিত করিবার ব্যবস্থা করেন। এই সময় তিনি নেপালেও অভিযান করিয়াছিলেন। ইহাই বোধ হয় মুসলমান ভূপতিগণের প্রথম ও শেষ নেপাল আক্রমণ।

অচিরে বাণিজ্য-শুল্ক লইয়া ইংরাজগণের সহিত তাঁহার বিরোধ আরম্ভ হইল। ইংরেজ কোম্পানী বাদসাহী সনন্দ বলে বিনাশুল্কে বাণিজ্যের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কর্ম্মচারীরা এই সুবিধার অপব্যবহার করিতেন, ইহাতে দেশীয় বণিকবৃন্দের যথেষ্ট ক্ষতি হইত। কাশিম ইংরাজ কৌন্সিলে লিখিয়া এই কুপ্রথা দমনের আয়োজন করেন, কিন্তু অপারগ হইয়া তিনি দেশীয় বণিকগণের নিকটও শুল্কগ্রহণ বন্ধ করিয়া দেন। ইংরাজগণ ইহাতে বিরক্ত হইলেন এবং দুর্দ্দান্ত এলিস সাহেব পাটনা দখল করিলেন। অচিরেই নবাবী ফৌজ পাটনা উদ্ধার করিয়া সসৈন্যে এলিস সাহেবকে বন্দী করেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ১৭৬৩ অব্দের ৭ই জুলাই ইংরাজগণ কাশিমের বিরুদ্ধে রণঘোষণা করিয়া মীরজাফরকে পুনরায় মুর্শিদাবাদের নবাবী পদ প্রদান করিলেন। মহারাজ নন্দকুমার তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর পদে বৃত হইলেন। মীরজাফর কলিকাতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অগ্রদ্বীপে আসিয়া ইংরাজগণের সহিত যোগ দিলেন। কাটোয়া সহরের পরপারে মাণিকাডিহি নামক গ্রামের সান্নিধ্যে বিস্তৃত প্রান্তরে মীরকাশিমের শিক্ষিত সৈন্য ইংরাজগণের নিকট পরাভূত হইল। সেনাপতি তকী খাঁ এই যুদ্ধে নিহত হন।

পুনরায় নবাবী ফৌজ গিরিয়ার প্রান্তরে ইংরাজ সৈন্যের সহিত সমরে পরাজিত হইয়া সাঁওতাল পরগণার অন্তঃপাতী উধুয়ানালা বা উদয়নালায় শিবির সন্নিবেশ করে। গিরিয়ার এই যুদ্ধই তৃতীয় যুদ্ধ। গিরিয়া মুর্শিদাবাদের পাণিপথ নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। উধুয়ার যুদ্ধেও নবাব পরাজিত হন। বিজয়ী ইংরাজ মুঙ্গেরের দিকে অগ্রসর হন। মীরকাশিম মুঙ্গের পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাটনায় আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তথায় তাঁহার আদেশে সমরু কর্ত্তৃক বন্দীকৃত ইংরাজগণ নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হইল। ইহার পূর্ব্বে রাজা রাজবল্লভ, তৎপুত্র কৃষ্ণদাস, মহাতাপ চাঁদ জগৎ শেঠ ও তাঁহার ভ্রাতা স্বরূপচাঁদ প্রভৃতি পদস্থ হিন্দুগণকে পরাজয়োন্মত্ত কাশিম গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করেন।

অনন্তর বিহার প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া কাশিম অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌল্লার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সম্রাট্ শাহ আলম তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক হন। ১৭৬৪ অব্দের ২৩শে অক্টোবর বক্সার নামক স্থানে সুজা ইংরাজগণের সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হন, কিন্তু সেনাপতি মেজর হেক্টর মনরো কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া স্বরাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোহিলখণ্ডে পলায়ন করেন। যুদ্ধের পূর্ব্বেই সুজা মীরকাশিমের ধনরত্ন অপহরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিয়াছিলেন। হতভাগ্য নবাব প্রথমে রোহিলখণ্ডে, পরে দিল্লীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার শেষ জীবন চরম দুর্দ্দশার কাল। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এক প্রবন্ধে এই সময়ে মীরকাশিমের জীবন-যাত্রা প্রণালী বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি স্বহস্তে খাদ্য প্রস্তুত করিতেন, প্রাণ ভয়ে সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত থাকিতেন এবং নিজের যে কয়টি স্বর্ণ মুদ্রা ছিল তাহা সযতনে রক্ষা করিতেন। অবসর সময়ে তিনি জ্যোতির্বিদ্যার অনুশীলন করিতেন এবং বাংলার নবাবী পুনরায় পাইবার জন্য ইংরাজগণকে কয়েকখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, তাঁহার এ প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় তাঁহার 'মীরকাশিম' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ১৭৭৮ অব্দের ৮ই জুন তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে এক জোড়া শাল ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। তাহাই বিক্রয় করিয়া তাঁহার দেহ দিল্লীতে সমাহিত করা হয়।

জনশ্রুতি আছে যে, কাশিমের কন্যা গুল ও পুত্র বাহার মুঙ্গেরে ইংরেজ সেনানায়ক কর্ত্তৃক বন্দুকের গুলিতে নিহত হয়।

মীরকাশিম হিন্দুদ্বেষী ছিলেন ইহা হয় তো সত্য, কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, তিনি সিরাজউদ্দৌলার ন্যায় দুর্ব্বলচিত্ত বা মীরজাফরের ন্যায় অকর্ম্মণ্য ছিলেন না। বস্তুতঃ তিনি যে প্রজারঞ্জক ও তেজস্বী ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মীরকাশিমের সহিত যুদ্ধের সময়েই মীরজাফর পুনরায়

কোম্পানীর নবাব রূপে মুর্শিদাবাদের মসনদে আরোহণ করেন, কিন্তু তিনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, বিশেষতঃ পুত্রশোক তাঁহার হৃদয়ে বাজিয়াছিল। তিনি ক্লাইভের আগমন সম্ভাবনায় কলিকাতায় গিয়াছিলেন, কিন্তু ক্লাইভের আসার বিলম্ব হওয়ায় তিনি মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার মণি বেগম ও বব্বু বেগম নামক আরও দুইটি পত্নী ছিল। নজমউদ্দৌল্লা ও সৈফউদ্দৌল্লা মণি বেগমের এবং মবারকউদ্দৌল্লা বব্বু বেগমের পুত্র। তিনি নজমউদ্দৌল্লাকে নিজের উত্তরাধিকারী নির্দেশ করেন। এ সময় তাঁহার পরলোকগত পুত্র মীরণের শিশু পুত্রও জীবিত ছিল ও জাফ্রাগঞ্জের প্রাসাদে বাস করিতেছিলেন কিন্তু তিনি সিংহাসন পান নাই। মীরণের বংশধরগণ আজিও ঐ প্রাসাদেই বাস করিতেছেন। তাঁহারা সাধারণো জাফরাগঞ্জের নবাব নামে পরিচিত।

বার্দ্ধক্যে মীরজাফর কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন। বেদনা অসহ্য হওয়ায় তিনি স্বীয় মন্ত্রী মহারাজ নন্দকুমারের উপদেশ মত শ্রীশ্রীকিরীটেশ্বরীর চরণামৃত পান করিয়াছিলেন।

ইঁহার দরবারেই বৈষ্ণবগণের স্বকীয়াবাদ ও পরকীয়াবাদের বিচার হয় এবং বিচারে পরকীয়াবাদী বঙ্গীয়গণ শ্রীরাধামোহন ঠাকুরের নেতৃত্বে পরিচালিত হইয়া পশ্চিমদেশীয় স্বকীয়াবাদীগণকে বিচারে পরাজিত করতঃ নবাব মীরজাফরের স্বাক্ষরিত জয়পত্র গ্রহণ করেন। ১৭৬৫ অব্দে নবাবের মৃত্যু হয় এবং তাঁহার দেহ জাফ্রাগঞ্জের সমাধি-ভবনে প্রোথিত করা হয়। উহাই মুর্শিদাবাদের বর্ত্তমান নবাবগণের সমাধি-ক্ষেত্র। মৃত্যুর পূর্ব্বে মীরজাফর উইল করিয়া অনেক ধন-রত্ন ক্লাইভের নামে রাখিয়া যান। ইঁহার মৃত্যুর কিয়ৎকাল পরে ক্লাইভ এ দেশে পদার্পণ করেন। মীরজাফরের মৃত্যুর পর নজমউদ্দৌল্লা মুর্শিদাবাদের সিংহাসন আরোহণ করিলেন। বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ রহিল বটে, কিন্তু টাকশাল কলিকাতায় উঠিয়া গেল। ব্যবস্থা হইল যে, মহম্মদ রেজা খাঁ বাংলার এবং শিতাব রায় বিহারের প্রতিনিধিরূপে কার্য্য করিবেন এবং কোম্পানীর প্রতিনিধি স্বরূপ একজন ইংরাজ নবাব দরবারে উপস্থিত থাকিবেন। অনন্তর লর্ড ক্লাইভ এ দেশে পদার্পণ করিলেন এবং অচিরে সুজাউদ্দৌল্লা ও শাহআলমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত গোলযোগের অবসান ঘটাইলেন। ১৭৬৫ অব্দের ১২ই আগষ্ট তারিখে দিল্লীর বাদশাহ শাহআলম ইংরাজ কোম্পানীকে বাংলা ও বিহারের দেওয়ানী প্রদান করিলেন। উত্তর সরকার প্রদেশও ইঁহাদের করে অর্পিত হইল। সৈন্যরক্ষার ভার সুবাদারের, কিন্তু সে ভারও ক্লাইভ কোম্পানীর প্রতিনিধি স্বরূপ গ্রহণ করিলেন।

দেওয়ানী গ্রহণের দলিলই ইংরাজ-রাজত্বের সর্ব্বপ্রধান দলিল। উহারই বলে ব্যবস্থা হইল যে, ইংরেজগণ নবাবকে ও বাদশাহকে তাঁহাদের প্রাপ্য প্রদান করিয়া অবশিষ্ট অর্থ নিজ তহবিলে রাখিবেন। অতঃপর নবাব ইংরেজগণের বৃত্তি-ভোগী হইয়া গেলেন, দেশের শাসনভার প্রকৃত পরিমাণেই ইংরেজগণের হস্তে চলিয়া গেল। তাহাতে নবাবও ক্ষুণ্ণ হইলেন না। ১৭৬৬ অব্দে নবাবের হঠাৎ মৃত্যু হইল এবং তাঁহার সহোদর সৈফউদ্দৌল্লা সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। ১৭৬৬ হইতে ১৭৭০ মাত্র চারি বৎসর ইঁহার রাজত্ব-কাল। ইহার মধ্যে প্রধান ঘটনা ১৭৬৯ অব্দের (বাংলা ১১৭৬ সালের) প্রসিদ্ধ দুর্ভিক্ষ, যাহা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। দেশে নবাবী ও ইংরেজী এই দ্বৈত-শাসন চলিতেছিল, ফলে শাসনকার্য্যে নানা অসুবিধা সৃষ্ট হয়। তার পর মহম্মদ রেজা খাঁর অত্যাচারে প্রজাবৃন্দ বিশেষ দুর্ভোগ সহ্য করিতেছিল—এমন সময় পর পর দুই বৎসর অজন্মা হয়। ফলে এই নিদারুণ দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব। এই দুর্ভিক্ষে এবং তাহার আনুষঙ্গিক বসন্তে বঙ্গের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বিংশতি বর্ষীয় নবাবও বসন্ত রোগের কবলে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করেন। জাফ্রাগঞ্জেই তিনি সমাহিত হন এবং তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মবারকউদ্দৌল্লা সিংহাসন লাভ করেন।

এই দুর্ভিক্ষের অলন্ত বিবরণ স্যর জন শোর (পরবর্ত্তী কালে লর্ড টেইনমাউথ) ইংরেজী কবিতায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ইহার পর হইতেই মুর্শিদাবাদের অধঃপতনের সূত্রপাত। ইহার বাণিজ্য হ্রাস পায়, নদীও ক্ষীণস্রোতা হইতে আরম্ভ করে, শিল্প-সম্পদও হীনতর হইয়া যায়।

মবারক বব্বু-বেগমের পুত্র, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বিমাতা মণি বেগমই তাঁহার অভিভাবিকা নিযুক্তা হন। এই প্রতিপত্তি-শালিনী রমণী ইতিহাসে মাদর-ই-কোম্পানী (Mother de-

Company) নাম লাভ করিয়াছিলেন। মীরজাফরের উপরও ইঁহার যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

মবারকউদ্দৌলার আমলে বাংলার রাজনীতি-ক্ষেত্রে গুরুতর পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। ১৭৭২ অব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংস বাংলার গবর্ণর, পরে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে রচিত Regulating Act অনুসারে ভারতস্থ ইংরাজাধিকারের গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন। এই সময় মহম্মদ রেজা খাঁ ও খেতাব রায় নানা অপরাধের জন্য অভিযুক্ত ও পদচ্যুত হন। খেতাব রায় মুক্তি লাভ করিয়া অবসাদে প্রাণত্যাগ করেন, আর রেজা খাঁ মুক্তি লাভ করিয়া পরে স্ব-পদে প্রতিষ্ঠিত হন। মহারাজ নন্দকুমারের পুত্র গুরুদাস মবারকউদ্দৌলার মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু ১৭৭৫ অব্দে জালিয়াতীর অপরাধে মহারাজ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলে গুরুদাস ও মণি বেগম উভয়েই রাজকার্য্য হইতে অপসৃত হন। রাজস্ব-বিভাগ কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয় এবং গবর্ণর জেনারেল কাউন্সিলের সাহায্যে দেশ শাসন করিতে থাকেন। ১৭৯০ অব্দ হইতে ফৌজদারী বিভাগের ভারও ইংরাজগণ স্বহস্তে গ্রহণ করেন। আদালত বিভাগও কলিকাতায় উঠিয়া যায় এবং তথায় সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত নামে দুইটি আদালত স্থাপিত হয়। সুপ্রীম কোর্ট নামক সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়ও এই সময় প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতা এইবার পুরাপুরি রূপেই রাজধানীতে পরিণত হইল এবং মুর্শিদাবাদের গৌরব-সূর্য্য অস্ত গেল। ১৭৯৩ অব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিশের শাসনকালে মবারকউদ্দৌলার দেহান্তর ঘটে। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র বাবর জঙ্গ মুর্শিদাবাদের সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার রাজ্যাভিষেকের সময়ে ইংরাজ প্রতিনিধি হ্যারিংটন তাঁহার যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা করেন। ১৭ বৎসর রাজত্বের পর ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দেহাবসান হয় এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র আলিজা নবাব হন। পিতার মৃত্যুর পর আলিজা মণি বেগমের চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া দিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তদানীন্তন বড়লাট মিণ্টো বাহাদুর আলিজাকে সহানুভূতিসূচক পত্র প্রেরণ করেন। রিচার্ড রচি সাহেব নবাব-প্রাসাদের পর্য্যবেক্ষক নিযুক্ত হন।

আলিজা সঙ্গীত ও মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। বায়ু-পরিবর্ত্তনার্থ মুঙ্গেরে গিয়াও তিনি স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারেন নাই। ১৮২১ অব্দের ৩ই আগষ্ট তিনি পরলোকে যাত্রা করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি এক ব্রাহ্মণকে ১টি হস্তী ও ৫টি স্বর্ণমুদ্রা দান করিয়াছিলেন। তাঁহার পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ওয়ালাজা নবাব হন। আলিজার বিধবা পত্নীর সহিত তাঁহার কতকগুলি অস্থাবর বিষয় লইয়া মনোমালিন্য হইয়াছিল। পরে তাহার মীমাংসা হয়। তিনি মাত্র তিন বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৮২৫ অব্দে তাঁহার দেহত্যাগ হয় এবং তাঁহার পুত্র হুমায়ুনজা নবাব হন।

ওয়ালাজা কতকগুলি দরবারী আদব-কায়দার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন

নবাব হুমায়ুনজা মোবারক মঞ্জিল নামে একটি সুন্দর উদ্যান-বাটীকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তথায় তিনি সাজাহান-তনয় শাহসুজার আমলের প্রস্তুত একটি সুন্দর মসনদে উপবেশন করিতেন। ঐ মসনদের বিবরণ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় তাঁহার "মীরকাশিম" গ্রন্থে প্রদান করিয়াছেন। উহা এক্ষণে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে রহিয়াছে। নবাব হুমায়ুনজা অতিশয় তেজস্বী ও জাঁকজমকপ্রিয় ছিলেন। তাঁহারই আমলে ১৮৩৭-৩৮ অব্দে বর্ত্তমান হাজার-দুয়ারী নামক মনোরম প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। ঐ প্রাসাদে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ হইতে বর্ত্তমান নবাব বাহাদুর পর্য্যন্ত প্রত্যেকেরই সুন্দর তৈলচিত্র আছে। তদানীন্তন ইংলণ্ডেশ্বর চতুর্থ উইলিয়াম প্রেরিত পত্র ও তাঁহার ছবি, মহীশূর যুদ্ধের ছবি, স্যর জন মুরের সমাধি প্রভৃতি অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি এবং অন্যান্য বহু দ্রষ্টব্য বস্তু আছে। শুনিতে পাওয়া যায় Burial of Sir John Moor নামক ছবিখানি লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে প্রস্তুত হইয়াছিল।

১৮৩৮ অব্দে নবাব হুমায়ুনজার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র মনসুর আলি খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহার রাজত্ব-কাল ৪৩ বৎসর (১৮৩৮-১৮৮১) ইনি নবাব ফেরিদুনজা নামে পরিচিত। ইনিই বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শেষ নবাব-নাজিম।

ইঁহার রাজত্ব-কাল বড়ই বৈচিত্র্যপূর্ণ। প্রথম আফগান যুদ্ধের সময় ইনি নবাবপদে অভিষিক্ত হন। ইঁহারই আমলে সিপাহী-বিদ্রোহ ঘটে। মুর্শিদাবাদের অনতিদূরবর্ত্তী বহরমপুরেই সিপাহী বিদ্রোহের সূত্রপাত—অবশ্য প্রথম ব্যারাকপুরে গোলযোগ হয়, তার পরেই বহরমপুর। নবাব ফেরিদুনজা ঐ বিদ্রোহের প্রতিকূলতা করায় বিদ্রোহ মুর্শিদাবাদ প্রদেশে

পরিব্যাপ্ত হইতে পারে নাই। বিদ্রোহের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি লণ্ডনে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিকট উপঢৌকন প্রেরণ করেন। তিনি ১৮৪৭ অব্দে বর্ত্তমান ইমামবাড়া ও ১৮৫৪ অব্দে নবাব বাহাদুরের ইনষ্টিটিউসন নামে পরিচিত হাই-স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেন। বর্ত্তমান মাদ্রাসাটীও তাঁহারই সময়ে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার সময় হইতেই বিনা পাশে কেল্লার ভিতরে প্রবেশের প্রথা প্রচলিত হয়।

নবাব ফেরিদুনজা ১৮৬৯ অব্দে বিলাত যাত্রা করেন এবং কতকগুলি অভিযোগ পার্লিয়ামেন্টে উপস্থাপিত করেন। দিল্লীশ্বরের আবেদন যেরূপ ফল লাভ করিয়াছিল, নবাব নাজিমের অভিযোগসমূহও তাহার অধিক ফল-লাভে সমর্থ হয় নাই। নানা আলোচনার পর তিনি এককালীন ১০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে "বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব নাজিম" (Nawab Nazim of Bengal, Bihar and Orissa) উপাধি চিরতরে ত্যাগ করেন। ১৮৭৭ অব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের সম্রাজ্ঞী (Empress of India) ঘোষিতা হন।

বলা বাহুল্য যে, দিল্লীর মোগল রাজপদ ১৮৫৮ অব্দেই বিলুপ্ত হইয়াছিল এবং বাবর শাহের বংশধর দিল্লীর শেষ সম্রাট্ মহম্মদ বাহাদুর শাহ রেঙ্গুনে নির্ব্বাসিত হইয়া ১৮৬২ অব্দে দেহত্যাগ করেন। ১৮৮১ অব্দে ফেরিদুনজা সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং তাঁহার পুত্র আলি কাদের হোসেন মীর্জ্জা মুর্শিদাবাদের প্রথম নবাব বাহাদুর ঘোষিত হন। ঐ নূতন উপাধির সনন্দ বাংলার তাৎকালিক ছোটলাট টমসন সাহেব ১৮৮২ অব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী প্রদান করেন। নবাব ফেরিদুনজা সিংহাসন ত্যাগ করিয়া প্রথমতঃ বোম্বাই যান, পরে মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া আসেন। ১৮৮৪ অব্দে এখানেই ইনি প্রাণত্যাগ করেন। ইহাঁর শব আরবদেশের কারবালা ক্ষেত্রে সমাহিত হয়।

প্রথম নবাব বাহাদুরের কার্য্যকাল ১৮৮১ হইতে ১৯০৬ অব্দ পর্য্যন্ত। ইনি ১৮৬৫ অব্দে অধ্যয়নার্থ ইংলণ্ডে প্রেরিত হন। ইংরাজী, পারস্য ও আরবী এই তিন ভাষাতেই ইনি ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ১৮৮৭ অব্দে তিনি K. C. I. E. এবং ১৮৯০ অব্দে G. C. I. E. উপাধি লাভ করেন। ১৮৯১ অব্দে ইহাঁর মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর ও আমীর-উল-ওমরা উপাধি বংশানুক্রমিক (hereditary) বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়।

নবাব হোসেন আলি মীর্জ্জা বাহাদুর অতিশয় ধার্ম্মিক, পরোপকারী এবং সহৃদয় ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই তাঁহার সমান প্রীতি ছিল। Musnad of Murshidabad গ্রন্থের প্রণেতা পূর্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয় শতমুখে ইহাঁর প্রশংসা করিয়াছেন। ইনি নবাব মীরজাফরের অধস্তন সপ্তম পুরুষ। শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'মুর্শিদাবাদ কথা'য় লিখিয়াছেন যে, লর্ড ক্লাইভের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ লর্ড পইস্ (Powis) নবাব বাহাদুরসহিত সাক্ষাৎকালে ও করমর্দ্দন করিয়া এবং মীরজাফরের ছবি দেখিয়া আনন্দযুক্ত হইয়াছিলেন। নবাব বাহাদুর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে অনেক দুষ্প্রাপ্য (rare) ও মূল্যবান্ দ্রব্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। ১৯০৬ অব্দের ডিসেম্বরে ইহাঁর লোকান্তর-প্রাপ্তি হয় এবং ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ওয়াসিফ আলি মীর্জ্জা মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর হন। ইনিই বর্ত্তমান নবাব। ১৮৭৫ অব্দে ইহাঁর জন্ম। বাল্যে ইনি বিদ্যাশিক্ষার্থ ইংলণ্ডে প্রেরিত হন। পাঠ-সমাপনান্তে বিবিধ দেশ পর্য্যটনপূর্ব্বক ১৮৯৫ অব্দে মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমন করেন। ইনি মীর [illegible] তনয়ার পাণিগ্রহণ করেন এবং ১৯০১ অব্দে ইহাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ ওয়ারেস আলি মীর্জ্জা বাহাদুর ভূমিষ্ঠ হন। ১৮৯৯ অব্দে ইনি মুর্শিদাবাদ মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান হন এবং ১৯০১ অব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদ লাভ করেন। ঐ অব্দেই ইনি সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে বড়লাট লর্ড কার্জ্জন বাহাদুর কর্ত্তৃক বাংলার প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন।

নবাব বাহাদুর মুর্শিদাবাদের কেন—সমগ্র বাংলার তথা ভারতের একটি উজ্জ্বল রত্ন। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যস্থাপনের জন্য তিনি যে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন, তাহা তাঁহার ন্যায় মনস্বী ও মহাপ্রাণ ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব।

একদিন মুর্শিদাবাদে অভাব ছিল না—অর্থনৈতিক স্বাধীনতা (economic independence) যাহা বড় আদরের বস্তু—তাহা একদিন মুর্শিদাবাদের অঙ্কে বিরাজিত ছিল। বর্ত্তমান জীবন-সংগ্রামের মধ্যে মুর্শিদাবাদও আসিয়া পড়িয়াছে, আর এই দুর্দ্দিনে হিন্দু আর মুসলমান, এই দুই ভাই দুঃখ

কারণে বিবাদ করিয়া অশান্তির মাত্রা বাড়াইয়া দিতেছে। স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা এই অশান্তির অনলে ইন্ধন যোগাইয়া নিজের স্বার্থ-সাধনের নিমিত্ত আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। এই দুঃসময়ে এই অশান্তির বীজ অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিবার জন্ম নবাব বাহাদুর বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন। হিন্দু-মুসলমান ঐক্য-সমিতি তাঁহারই প্রচেষ্টায় স্থাপিত হইয়াছে। তিনি ও শান্তি-প্রয়াসী আরও কয়েকজন উদার-হৃদয় নেতা এই প্রচেষ্টা সাফল্যের পথে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

নবাব বাহাদুরের চেষ্টা সফল হউক, মনোমালিন্য দূর হউক, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ নদীর জলে ভাসিয়া যাউক—ইহাই আজ কাম্য। হিন্দু আর মুসলমান একত্র হইয়া দারিদ্র্য দূর করিতে সচেষ্ট হউক, লক্ষ্মী উভয়েরই ঘরে চির-বিরাজ করুন, ইহাই মনুষ্যোচিত প্রার্থনা। সুখ দুঃখ চিরদিনই থাকে, উহা লইয়াই এই সংসারের লীলাখেলা। বর্ত্তমানের ন্যায় সেকালেও সুখ ছিল, আবার দুঃখও ছিল। সেকালের সুখদুঃখের কথা অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় তাঁহার সিরাজউদ্দৌলা গ্রন্থে নিপুণ ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন।

বর্ত্তমানের আকাশযান, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, বেতার ও রেডিও, কলের জাহাজ, টেলিফোন, টকী ও অন্যান্য যান্ত্রিক কাণ্ড-কারখানা অবশ্য সে যুগে ছিল না, দস্যুভয় যথেষ্ট ছিল। দুর্ভিক্ষও মধ্যে মধ্যে দর্শন দিত, কিন্তু তাই বলিয়া সুখও যে ছিল না এমন নয়। অর্থ-নৈতিক স্বাধীনতা সে যুগে পুরাপুরি ভাবেই ছিল। তখন জীবন-সংগ্রাম ও বেকার সমস্যা এমন প্রবলতর হয় নাই। কৃষক কৃষিলব্ধ দ্রব্যে সরল ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। শিল্পী স্বহস্তে কার্য্য করিয়া সুখে থাকিত, আর বণিক্ বাণিজ্য করিয়া ধনশালী হইত—এবং ঐ ধনের কতকটা জন-সেবায় নিয়োজিত করিত। জমীদার ... আদায় করিতেন, প্রজার সুখ-দুঃখ দেখিতেন, আর চিন্তাশীল ব্রাহ্মণগণকে গ্রন্থ-প্রণয়নে, স্বধর্ম্ম-পালনে ও শাস্ত্র-মর্য্যাদা-রক্ষণে সহায়তা করিতেন। বিশ্রাম-বহুল মস্তিষ্ক-সঞ্চালনকারী ব্রাহ্মণেরা সে যুগে কায়িক পরিশ্রম ও দাসত্বকরণের দায় হইতে অব্যাহতি পাওয়ায় স্বাধীন ভাবে শাস্ত্রচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিতে পারিয়াছিলেন। পরতন্ত্রতা যে স্বাধীন চিন্তার অন্তরায়, এ কথা বোধ হয় অস্বীকার করা চলে না।

শারীরিক বলশালী ব্যক্তিগণ অসি, আর কায়স্থ প্রভৃতি জাতিগণ মসী চালনা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। বৈশ্য এবং কর্ম্মকার, কুম্ভকার, মালাকার প্রভৃতি জাতীয়গণ স্ব স্ব ব্যবসায়েই লিপ্ত থাকিতেন।

কুটীরশিল্পই তখন প্রধান ছিল। মহাযন্ত্রের প্রবর্ত্তনে কুটীরশিল্পের বিনাশ হয় বলিয়া শাস্ত্রে মহাযন্ত্রের (কল-কারখানার) প্রবর্ত্তন অবৈধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। সে যুগে মহাযন্ত্র কুটীরশিল্পকে ধ্বংস করে নাই। তাই শিল্প-সমৃদ্ধ মুর্শিদাবাদ অন্ন-চিন্তায় ব্যাকুল ছিল না। অন্ন-চিন্তার অভাবে জনসাধারণের দেহ ও মন বর্ত্তমানের ন্যায় প্রক্ষীণ হয় নাই।

গোচর সে যুগে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। তাই আহারপুষ্ট গাভী মানবকেও ভালভাবেই পুষ্ট করিত। গাভীর মূত্র ও মলে জমীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত - শস্য প্রচুর ভাবে জন্মাইত। সুতরাং বর্ত্তমানের ন্যায় আর্থিক পরাধীনতা এবং তজ্জন্য চিত্তবৃত্তির হীনতা সে যুগে অল্পই ছিল। এটা যে সে যুগের আশীর্ব্বাদ, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

বর্ত্তমানে যান্ত্রিক সভ্যতা তখন ছিল না বটে, কিন্তু মানুষ নিজেও সে সময় ঐ সভ্যতা লাভ করিয়া যন্ত্রে পরিণত হয় নাই। তখন "টোলনে"র বিদ্যালয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিরই ছিল প্রাধান্য—আর এখন হইয়াছে "লাইকার-গ্যাসের" শিক্ষায়তনের প্রভুত্ব—ইহা সে যুগে ও এ যুগের একটা ব্যবধান দেখাইয়া দিতেছে।

ব্যবহারিক বিজ্ঞান সে যুগে ছিল না—আর সেই সঙ্গে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের মন্দ দিকটা (যথা মারণযন্ত্র ও বিষবায়ু নির্ম্মাণ) অজ্ঞাতই ছিল। স্থাপত্য-বিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যা মুর্শিদাবাদে প্রচলিত ছিল—তার সাক্ষী রাঘবানন্দের পঞ্জিকা আর বড়নগরে মহারাণী ভবানীর দেব-মন্দির।

তখন বিদেশ হইতে বস্ত্র আর মোটরকার আমদানী হইয়া দেশের অর্থ শোষণ করিত না। খেলনা বিক্রয় করিয়া জাপান ও বিলাস দ্রব্য বিক্রয় করিয়া পাশ্চাত্তাদেশ দেশের অর্থ আত্মসাৎ করিতে পারিত না। বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রস্তাব তখন হয় নাই—তবু দেশের লোক কথকতার সাহায্যে সে যুগে জ্ঞানলাভ করিত। সমাজ-সংস্কারের প্রচেষ্টা সে যুগেও ছিল। ব্যায়ামচর্চ্চা তখন দেশব্যাপীই ছিল। লোকের রুচি তখন বহির্ম্মুখী ছিল না, অন্তর্ম্মুখীই ছিল। এখন যেমন "ঘর করিনু বাহির, আর বাহির করিনু ঘর" নীতি প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে—তখন তাহা হয় নাই। তাই এ যুগে বসিয়া সে যুগকে আঁধারের যুগ বলিতে পারি না। এ যুগের বহ্বাড়ম্বর তখন ছিল না সত্য, কিন্তু যে economic independence, বা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এ যুগে লুপ্ত হইয়া বেকার-সমস্যাকে দিন দিন বাড়াইয়া তুলিয়াছে—মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়কে ধ্বংসের পথে ঠেলিয়া দিতেছে তাহা তখন ছিল না। আর ধনিক ও শ্রমিকের স্বার্থ-সংঘাত, যাহা মহাযন্ত্র-প্রবর্ত্তনের বিষময় ফল—তাহাও তখন অজ্ঞাত ছিল। তাই বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, নবাবী আমলে যুগোচিত অভাব-অভিযোগ সত্ত্বেও মুর্শিদাবাদ সমৃদ্ধই ছিল। ইহার শিল্প ও বাণিজ্যের ধ্বংস এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অন্নাভাব পরবর্ত্তী কালের ঘটনা।



[শিল্পী—শ্রীমাণিক

বিজ্ঞান-জগৎ

চিকিৎসাবিজ্ঞান, রসায়ন ও প্রণ্টোসিল

—শ্রীসুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী

কিছুদিন পূর্ব্বে 'প্রণ্টোসিল' নামে একটি নূতন রাসায়নিক আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং নানা রোগের চিকিৎসায় ইহা ব্যবহৃত হইতেছে। বর্ত্তমান কালে ঔষধ হিসাবে বহু নূতন নূতন রাসায়নিক ব্যবহৃত হইতেছে। চিকিৎসাক্ষেত্রে রাসায়নিকের ব্যাপক ব্যবহার অধিক দিনের নহে, অধুনা রসায়ন ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের যোগ ঘনিষ্ঠতর হইতেছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে "কেমোথেরাপী" (chemotherapy), অর্থাৎ রাসায়নিক প্রয়োগে রোগের চিকিৎসার ইতিহাস সম্বন্ধে প্রসঙ্গতঃ কিছু আলোচনা করা হইবে।

শুনা যাইতেছে যে, আজ পর্য্যন্ত যত রাসায়নিক ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের কোনটিই গুণে প্রণ্টোসিলের সমকক্ষ নহে। একই ঔষধে বহু বিভিন্ন রোগের প্রতিকার কেবল মাত্র প্রণ্টোসিল দ্বারাই না কি সম্ভব। খবরের কাগজের কলমে ইহার সম্বন্ধে বহু সম্ভব, অসম্ভব, বিশ্বাস্য ও অবিশ্বাস্য কথা শুনা গিয়াছে এবং যাইতেছে। প্রণ্টোসিলের কোন গুণ নাই, এ কথা মনে করিলে কিন্তু নিতান্ত ভুল করা হইবে, কিন্তু সুব্যবহার অপেক্ষা অনেক ক্ষেত্রেই ইহার অপব্যবহার হইতেছে। সকল ভাল ঔষধের যাহা প্রধান দোষ, অর্থাৎ ঠিক ভাবে ব্যবহার না করিতে পারিলে ভাল না হইয়া ক্ষতির সম্ভাবনা, প্রণ্টোসিল সম্বন্ধেও সমান ভাবে প্রযোজ্য। ঔষধটি প্রথম আবিষ্কৃত হয় জার্ম্মানীতে, ভারতেও ইহা যথেষ্ট পরিমাণে চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। বিনা ব্যবস্থাপত্রে সোজাসুজি ডাক্তারখানা হইতে প্রণ্টোসিলের বড়ি কিনিয়াও অনেকে খাইতেছেন। কিন্তু ইহার ফল কি দাঁড়াইতে পারে, তাহা কেহই ভাবিয়া দেখেন না—বোধ হয় আমাদের দেশে চিকিৎসকগণও এ সম্বন্ধে নির্দ্দোষ নহেন। নূতন কিছু হইলেই অনেকেই খুসী হইয়া থাকেন এবং ভাবেন তাঁহারা 'প্রগতি' পাইতেছেন। নূতন এবং ভালকে সমার্থক মনে করা বোধ হয় 'সভ্যতা'র পরিচয়।

প্রণ্টোসিলের অপব্যবহার সম্বন্ধে একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। যাঁহারা সংবাদপত্রের নিয়মিত পাঠক, তাঁহারা হয় ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, কিছুদিন পূর্ব্বে আমেরিকায় "এলিক্সির অব সাল্‌ফ্যানিল্যামাইড" নামক পেটেন্ট 'টনিক' সেবনে প্রায় সত্তর জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। এই এলিক্সির অব সাল্‌ফ্যানিল্যামাইড প্রণ্টোসিল ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে-দ্রব্যটির রাসায়নিক নাম সাল্‌ফ্যানিল্যামাইড, তাহারই অপর নাম প্রণ্টোসিল। এই এলিক্সিরের মধ্যে প্রায় সিকি ভাগ ছিল প্রণ্টোসিল এবং বাকী অংশ "ডাই-ইথিলিন গ্লাইকল"। ডাই-ইথিলিন গ্লাইকল সাধারণ হিসাবে বিষ নহে, কিন্তু অধিক পরিমাণে খাইলে ক্ষতিকর। চিকিৎসকের বিবেচনা অনুসারে সেবন করিলে প্রণ্টোসিল ক্ষতিকর নহে বরং উপকারীই বটে, কিন্তু অধিক পরিমাণে যথেচ্ছ সেবন করিলে ইহাও বিষের ন্যায় কাজ করে। এই 'টনিক' সেবন করিয়া প্রায় সত্তর জনের ভবরোগ নিরাময় হইয়া গিয়াছে। যখন একে একে লোক মরিতে লাগিল, তখন আমেরিকার জনসাধারণ, এলিক্সিরের নির্ম্মাতা কোম্পানী ও মার্কিন সরকারের টনক নড়িল এবং সমগ্র দেশের মধ্যে যেখানে যত 'এলিক্সির' পাওয়া গেল, বাজেয়াপ্ত করা হইল। যে কোম্পানী এই এলিক্সির তৈয়ারী করিয়াছিল, তাহারা বলে তাহারা নির্দ্দোষ, কারণ প্রণ্টোসিল বা ডাই-ইথিলিন গ্লাইকল কোনটিই 'ফার্ম্মাকোপিয়া' অনুসারে বিষ নহে। আইন অনুসারে অবশ্য

তাহারা দোষী নহে, কিন্তু আইনই সব কি না, পাঠকেরা বিচার করিবেন।

বর্ত্তমানে চিকিৎসকেরা বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, সকল রোগের মূলেই কোন জীবাণু আছে, অন্ততঃ থাকা উচিত। এই সকল জীবাণু অনুকূল অবস্থায় বৃদ্ধি পায় এবং রোগের সৃষ্টি করে। যদি কোন রোগীর দেহে এমন কোন দ্রব্য প্রবিষ্ট করান যায়, যাহাতে রোগীর কোন ক্ষতি না হয়—অর্থাৎ হইলেও সামান্যই হয়, অথচ রোগ-জীবাণুগুলি বৃদ্ধির অনুকূল অবস্থা না পায়, তাহা হইলে রোগ আরাম হয়। এই প্রক্রিয়া যখন কোন রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা হয়, তখন এই চিকিৎসাপদ্ধতিকে কেমোথেরাপী (chemotherapy বলা হয়। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ঔষধপ্রয়োগে রোগটি সারিল, কিন্তু অন্য কোন নূতন উপসর্গ দেখা দিল। ম্যালেরিয়া সারাইবার জন্য অত্যধিক কুইনিন সেবনে অল্পাধিক কালা হওয়া—বাঙ্গালা দেশে বিশেষ করিয়া জানাইবার প্রায়োজন নাই। নিউমোনিয়া রোগে 'অপটোকিন' (optochine) নামে ঔষধ প্রয়োগের ফলে রোগীর অন্ধত্ব জন্মাইতে দেখা গিয়াছে; অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই অন্ধত্ব সাময়িক।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, কেমোথেরাপী চিকিৎসাবিজ্ঞানে নিতান্তই নূতন আগন্তুক। কতকাংশে ঠিক হইলেও ইহা সম্পূর্ণ সঠিক নহে। বহু পুরাকাল হইতেই বহু দেশে বিভিন্ন রোগের উপশমের জন্য অনেক দ্রব্য প্রয়োগ করা হইত, যাহার ক্রিয়া কেমোথেরাপীর অনুরূপ। বৈজ্ঞানিকভাবে এবং ব্যাপকভাবে কেমোথেরাপীর আরম্ভ করেন জার্ম্মান-ইহুদি চিকিৎসক পাউল এরলিশ। এরলিশ ছিলেন প্যাথোলজিষ্ট, সুতরাং তাঁহাকে বহু সময় অণুবীক্ষণ লইয়া কাজ করিতে হইত। অণুবীক্ষণে যখন দেহের কোন অংশ দেখা হয়, তখন তাহার অংশবিশেষ সুপরিস্ফুট করিবার জন্য নানা প্রকার রঙ্ লাগান হয়। এই রঙ্গুলির বিশেষত্ব এই যে, কেবল মাত্র অংশবিশেষের উপর ইহারা ক্রিয়া করে। পরে দেখা যায় যে, কতকগুলি রঙ্ কেবল মাত্র রোগজীবাণুর উপরই ক্রিয়া করে।

এরলিশের জন্ম হয় ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে, কিন্তু তিনি যৌবনকালেই যক্ষ্মাক্রান্ত হন। স্বাস্থ্যান্বেষণে তিনি মিশরে যান এবং ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বেলিনে রবার্ট কখের নিকট আসেন। রবার্ট কখের নাম বোধ হয় অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। ইনি যক্ষ্মার জীবাণু আবিষ্কার করেন। এই সময়ে য়ুরোপে অ্যান্টিটক্সিন সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা চলিতেছিল। কোন রোগের বিষ বা 'টক্সিনে'র ক্রিয়া যে-সকল দ্রব্য নষ্ট করিতে পারে তাহাদের 'অ্যান্টিটক্সিন' বলা হয়।

টক্সিন ও অ্যান্টিটক্সিনের মতবাদ হইতে এরলিশ নূতন আলোকের সন্ধান পান এবং 'ইমুনিটি' (immunity সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা) সম্বন্ধে তাঁহার বিখ্যাত মতবাদ প্রচার করেন। সাধারণবোধ্য সহজ কথায় তাঁহার মতবাদ এই: সকল রোগই মূলতঃ রাসায়নিক, সুতরাং রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা রোগ প্রশমন করা সম্ভব। আধুনিক আবিষ্কারের আলোকে দেখিলে তাঁহার কথা অনেকাংশে সত্য বলিয়া বোধ হয়। সংপ্রতি দেখা গিয়াছে যে, অনেক রোগই কোন জীবাণুর ক্রিয়ায় ঘটে না, দেহের মধ্যে নানা প্রকার বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য 'ভিরাস'-এর (virus) ক্রিয়ার বিভিন্ন প্রকারের ব্যাধি জন্মে। এই ভিরাসগুলি প্রাণী নহে, অথচ অনুকূল অবস্থায় আপনা আপনিই বৃদ্ধি পাইতে পারে।

দেহের বিভিন্ন অণুকোষ বা 'টিসু' (tissue) এবং রোগবীজাণু জটিল রসায়নিক পদার্থে নির্ম্মিত। বহুসংখ্যক অণু দ্বারা এইগুলি গঠিত, সুতরাং যদি কোন রাসায়নিক দ্রব্যপ্রয়োগে অণুগুলির বিন্যাস এমনভাবে পরিবর্ত্তিত করা যায়, যাহাতে ইহা ক্ষতিকর না থাকে, তাহা হইলেই রোগ নিরাময় হইবে। পূর্ব্বেই কয়েকটি রঙের বিশিষ্ট ক্ষমতার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে, কোন কোন রঞ্জক-পদার্থ কেবল কয়েকটি বিশিষ্ট জীবাণুর উপর ক্রিয়া করিতে পারে; যদি এই সকল রঞ্জক-পদার্থের সহিত এমন কোন দ্রব্য মিশাইয়া দেওয়া যায়, যাহাতে জীবাণুগুলির রোগ বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা চলিয়া যায়, তাহা হইলে চিকিৎসার নির্দ্দেশ পাওয়া গেল।

এরলিশ প্রথমে আফ্রিকার ঘুমরোগের ঔষধ বাহির করিতে চেষ্টা করেন, কারণ এই রোগের জীবাণু অতি সহজেই রোগীর রক্তের মধ্যে পাওয়া যায়। তিনি প্রথমে

প্রায় পাঁচ শত রঞ্জক-পদার্থের সহিত আর্সেনিক (সেঁকো-বিষ), অ্যান্টিমনি প্রভৃতি যুক্ত করিয়া ব্যবহার করেন, কিন্তু ইহাতে কোন সুফলই পাওয়া গেল না। ইহার পরে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি আর্সেনিক-ঘটিত একটি দ্রব্য 'অ্যাটোক্সিল' ব্যবহার করিয়া দেখেন যে, তাহাতে ঘুম-রোগ সারে, কিন্তু রোগীর চক্ষু নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। তিনি ইহার রাসায়নিক গঠন অল্প অল্প পরিবর্ত্তন করিয়া পরীক্ষা করিতে থাকেন এবং ১৯০৭ সালে ৬০৫ বার বিফল হইবার পর ৬০৬ বারের সময় কৃতকার্য্য হন। এই ঔষধ কেবলমাত্র ৬০৬ সংখ্যা দ্বারা বিখ্যাত হয়, ইহার অপর নাম 'সালভারসান' বর্ত্তমানে সুপরিচিত। সালভারসানের আবিষ্কার কেমোথেরাপীর যুগের সূত্রপাত মনে করা যাইতে পারে। গত বৎসর সালভারসান আবিষ্কারের ত্রিংশ বর্ষ উত্তীর্ণ হওয়ায় কলিকাতার বিশিষ্ট চিকিৎসকগণের উদ্যোগে একটি সভা হয় এবং সেই সভায় কেমোথেরাপীর জনক এরলিশের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়।

অনেকের ধারণা সালভারসন সিফিলিস বা উপদংশের ঔষধ, কিন্তু প্রথমে উহা ঘুমরোগের ঔষধ হিসাবেই ব্যবহার করা হয়। এরলিশের ধারণা হয় যে, সিফিলিস ও ঘুম-রোগের জীবাণু একই গোষ্ঠির অন্তর্গত, সুতরাং ঘুমরোগে যখন ফল পাওয়া গিয়াছে, তখন সিফিলিসেও ভাল ফলের আশা করা যাইতে পারে। এখনকার চিকিৎসকরা অবশ্য জানেন যে, এই দুইটি রোগের জীবাণু এক জাতীয় নহে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সিফিলিস রোগে সালভারসনের আশ্চর্য্য ক্রিয়া দেখা গেল। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, ভুল মতবাদ হইতে নূতন সত্য আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে। সাল-ভারসানের বিশ্বব্যাপী খ্যাতি ঘুমরোগের ঔষধ হিসাবে নহে, সিফিলিসের ঔষধ হিসাবেই। সালভারসন আবিষ্কারের পূর্ব্বে সিফিলিস রোগের কোন বিশ্বাসযোগ্য ঔষধ ছিল না। পরে সালভারসান হইতে নানা প্রকার অধিকতর উপযোগী ঔষধ প্রস্তুত করা হয়। ইহাই কেমোথেরাপীর সূত্রপাত এবং তাহার পরে বহু দেশে এই বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা আরম্ভ হয়। আমাদের দেশেও এ বিষয়ে বহুল ভাবে কাজ হইতেছে।

সংপ্রতি ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস জীবাণু সম্বন্ধে চিকিৎসকদের বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে। এই জাতীয় জীবাণু বহু প্রকারের ক্রিয়া করিয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, কক্কাসজাতীয় জীবাণুর ক্রিয়াতেই দুগ্ধ হইতে দধি উৎপন্ন হয়। বহু প্রকারের রোগ, যথা স্কার্লেট ফিভার, এরিসিপেলাস, নানাপ্রকারের রক্তদুষ্টি প্রভৃতি এই জাতীয় জীবাণুর ক্রিয়া। শরীরের বহুস্থানের টিস্যু ইহারা আক্রমণ করে এবং ইহাদের ক্রিয়া প্রতিরোধ করা অত্যন্ত দুরূহ। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক ডোমাক্



পাউল এরলিশ [১৮৫৪-১৯১২]

প্রথমে ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস জীবাণুর ক্রিয়া প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হন। তিনি ইহার জন্য যে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করেন, তাহার নাম দেন প্রণ্টোসিল। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, প্রণ্টোসিলের রাসায়নিক নাম সাল্-ফ্যানিল্যামাইড।

ইহার পর প্রণ্টোসিল বা প্রণ্টোমিল জাতীয় ঔষধ ফরাসী দেশে এবং ইংলণ্ডে ব্যবহৃত হয় এবং তাহাতে সুফল পাওয়া যায়। স্কার্লেট ফিভার, সূতিকা, টনসি-লাইটিস, মেনিনজাইটিস প্রভৃতির চিকিৎসায় প্রণ্টোসিল ব্যবহৃত হইয়াছে এবং সুফল পাওয়া গিয়াছে। প্রণ্টোসিল

খাইবার জন্য ট্যাবলেট হিসাবে অথবা ইঞ্জেকশনের জন্য তরল অবস্থায় পাওয়া যায়।

বর্ত্তমানে যেরূপ ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে মনে হয় প্রন্টোসিলের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ, কিন্তু এ কথা মনে রাখাও বিশেষ প্রয়োজন যে, ইহা এখনও পরীক্ষামূলক স্তর অতিক্রম করে নাই। যতদিন আরও ব্যাপকভাবে অনুসন্ধানের ফল জানা না যায় ততদিন পর্য্যন্ত নির্ব্বিচারে প্রন্টোসিল ব্যবহার করা সমীচীন নহে। চিকিৎসকেরা ব্যবস্থাপত্র ব্যতীত প্রন্টোসিল সেবন করা অন্যায়। এ বিষয়ে আমাদের দেশের চিকিৎসকগণের যথেষ্ট দায়িত্ব রহিয়াছে, তাঁহাদের দেখা উচিত যে, ইহার অপব্যবহার না হয়।

বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ সম্বন্ধে নূতন মতবাদ

মহাকাশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বহু নক্ষত্র দেখা যায়। দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে, নক্ষত্রের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায় এবং নক্ষত্র ব্যতীত অন্য আরও একপ্রকার জ্যোতিষ্ক দেখা যায়,—এইগুলিকে বলা হয় নীহারিকা। দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে নীহারিকাগুলিকে মেঘের মত অস্পষ্ট আলোকময় বলিয়া বোধ হয়। অতিশয় শক্তিশালী দূরবীক্ষণ দিয়া পর্য্যবেক্ষণের ফলে দেখা গিয়াছে যে, নীহারিকাগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে বহুসংখ্যক নক্ষত্রের সমষ্টিমাত্র। দূরত্বের বিশালতার জন্যই উহাদের মেঘের মত বলিয়া বোধ হয়। এই দূরত্বের বিশালতার ধারণার করা একটু কঠিন। নক্ষত্র প্রভৃতির দূরত্ব প্রকাশ করিবার জন্য মাইল ব্যবহার করা হয় না, কারণ দূরত্বের তুলনায় মাপ-কাঠি অত্যন্ত ছোট বলিয়া দূরত্ব প্রকাশ করিবার জন্য অত্যন্ত বড় সংখ্যার প্রয়োজন হয়। মহাকাশে বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের দূরত্ব প্রকাশ করিবার জন্য যে মাপ-কাঠি ব্যবহার করা হয়, তাহাকে বলা হয় আলোকবর্ষ; অর্থাৎ ১ বৎসরে আলোক যে পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করিতে পারে, তাহা এক আলোকবর্ষ; আলোকের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল, সুতরাং ১ আলোকবর্ষ ১,৮৬,০০০ × ৩৬৫ × ২৪ × ৬০ × ৬০ মাইল। যাহা হউক, নীহারিকার দূরত্ব সম্বন্ধে এই কথা বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে, এমন নীহারিকা দেখিতে পাওয়া যায়, যার দূরত্ব ৫০ কোটী আলোকবর্ষ।

নীহারিকা হইতে আগত আলোকের বর্ণচ্ছত্র বিশ্লেষণ করিয়া বৈজ্ঞানিকরা দেখিলেন যে, বিভিন্ন বর্ণের আলোক অতি সামান্য পরিমাণে বর্ণচ্ছত্রের লাল প্রান্তের দিকে সরিয়া যায়। বৈজ্ঞানিকরা বলেন, এরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে দুইটির একটি কারণে,—হয় পৃথিবী নীহারিকা হইতে পিছন দিকে সরিয়া আসিতেছে, অথবা নীহারিকাটি পৃথিবী হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। অর্থাৎ, এক কথায় পৃথিবী ও নীহারিকার মধ্যের দূরত্ব বাড়িয়া যাইতেছে। বর্ণচ্ছত্রের রেখাগুলির অবস্থান মাপিলে নীহারিকা কতদূরে পৃথিবী হইতে সরিয়া যাইতেছে, তাহা নির্ণয় করা যাইতে পারে। বহু বিভিন্ন নীহারিকার বর্ণচ্ছত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা গিয়াছে, নীহারিকার বেগ নির্ভর করে দূরত্বের উপর। পৃথিবী হইতে যে নীহারিকা যত দূরে অবস্থিত, তাহার বেগও তত বেশী হইবে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, কোন কোন নীহারিকা প্রতি সেকেণ্ডে ২৫ হাজার মাইল বেগে পৃথিবীর বিপরীত দিকে সরিয়া যাইতেছে।

এই ঘটনা হইতে বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন যে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড অত্যন্ত দ্রুতভাবে আয়তনে বৃদ্ধি পাইতেছে। আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক-তত্ত্ব প্রচারের পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকদের বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে ধারণা খুব স্পষ্ট ছিল না; তাঁহারা মনে করিতেন যে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তৃতি সীমাহীন। আইনষ্টাইন দেখান যে, আপেক্ষিক-তত্ত্ব অনুসারে ব্রহ্মাণ্ড অসীম হইতে পারে না—সসীম। পরে অন্যান্য বৈজ্ঞানিকরা দেখান যে, ব্রহ্মাণ্ড কেবল সসীম হইলেই চলিবে না, সাবানের বুদ্বুদের মত ইহাকে প্রতি মুহূর্ত্তে আকারে বড় হইতেই হইবে। ইহাই বর্ত্তমানগ্রাহ্য বিখ্যাত 'exploding universe' নামক মতবাদ।

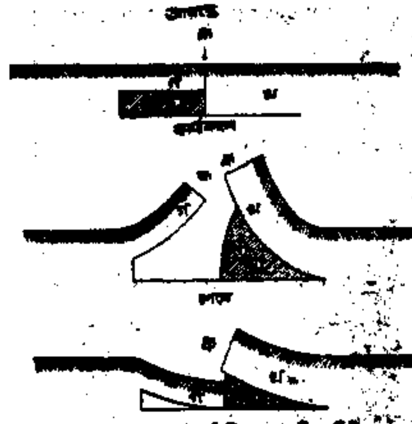
সংপ্রতি কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের ফেলো ডক্টর সাধুবুদ্ধি একটি অতিনব মত প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ব্রহ্মাণ্ড ক্রমশঃ স্ফীত হইতেছে না, ধীরে ধীরে জাগতিক সকল কিছুর মাপ খুব হইতে ক্ষুদ্রতর হইতেছে।

অর্থাৎ, যে সকল মাপকাঠির সাহায্যে কোন জিনিষ পরিমাপ করি, সেই মাপকাঠিগুলিই ধীরে ধীরে ছোট হইয়া যাইতেছে, সুতরাং যদিও আপাতদৃষ্টিতে বোধ হইবে যে, নীহারিকাগুলি প্রচণ্ড বেগে পৃথিবীর বিপরীতদিকে ধাবমান হইতেছে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে পৃথিবী ও নীহারিকার মধ্যবর্ত্তী দূরত্ব কমিয়া যাইতেছে। তিনি বলেন যে, সকল প্রকার পরিমেয়ের এই যে সংকুচন হইতেছে, তাহা এতই সূক্ষ্ম যে, সাধারণ ভাবে তাহা মাপিয়া বাহির করা যাইবে না, কিন্তু যথেষ্ট সময় পাইলে এই সূক্ষ্ম পরিমাণ সংকুচনও পরিমাপ করা যাইতে পারে। তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ক্যাড্‌মিয়াম নামক ধাতুর বর্ণচ্ছত্রের একটি বিশিষ্ট রেখার তরঙ্গান্তর (wavelength) এখন মাপিয়া রাখা হউক এবং পুনরায় ৩৫০ বৎসর পরে আবার তাহা পরিমাপ করা হইবে। যদি ডক্টর সাধুবুদ্ধির মতবাদ ঠিক হয়, তাহা হইলে এই দুইটি ফলে ব্যতিক্রম দেখা যাইবে। দুঃখের বিষয় তখন ডক্টর সাধুবুদ্ধি, বিজ্ঞান-জগতের লেখক, পাঠক-পাঠিকা কেহই বাঁচিয়া থাকিবেন না!

ভূমি-সংরক্ষণের অভিনব পন্থা

ঢালু জায়গা হইতে অনেক পরিমাণে মাটী বর্ষাকালে ধুইয়া যায়। জমির মাটী নষ্ট হওয়ার অর্থ জমির উর্ব্বরা-শক্তি হ্রাস পাওয়া। জমির উপরে সমান উচ্চে যদি কয়েকটি আল বাঁধা যায়, তাহা হইলে বৃষ্টিতে মাটী ধুইয়া যাইতে পারে না, এবং বৃষ্টির জলও ধরিয়া রাখা যায়। সাধারণতঃ আল বাঁধিতে হইলে দুই পাশের মাটী কাটিয়া উঁচু করিয়া দেওয়া হয়। তাহাতে আলের দুই-পাশের কিছু জমি অকেজো হইয়া যায়।

সংপ্রতি আমেরিকায় আল বাঁধিবার জন্য এক প্রকার লাঙ্গল নির্ম্মিত হইতেছে। এই লাঙ্গলের সাহায্যে একটুও মাটী নষ্ট না করিয়া ৮ ইঞ্চি উঁচু আল বাঁধা যায়। ছবি হইতে যন্ত্রের ক্রিয়া সহজে বুঝা যাইবে। প্রথমে ঢালু জমির যেখানে আল বাঁধিতে হইবে, সেইখানে ৮ ইঞ্চি গভীর করিয়া কাটা হয়। ছবিতে বাম দিকে জমির উচ্চতর অংশ ও দক্ষিণ দিকে নিম্নতর অংশ দেখান হইয়াছে। ইহার পর দক্ষিণ দিকে ৮ ইঞ্চি এবং বাম দিকে ৪ ইঞ্চি মোটা দুইটি টুকরা করা হয়। এই সমস্ত কাটার ব্যাপার মাটীর ভিতরেই হয়, উপরে তাহার কোন চিহ্ন থাকে না। ইহার পর লাঙ্গলের ফালের মত ফাল দিয়া দুই দিকের জমি উঁচু করিয়া উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং বাম দিকের ৪ ইঞ্চি মাটীর নীচ হইতে আরও ৪ ইঞ্চি পরিমাণ মাটী দক্ষিণ দিকের ৮ ইঞ্চি মাটীর তলায় ঠেলিয়া দেওয়া হয়। ইহার পর ভারী রোলার দিয়া চাপ দিলে বাম দিকের মাটী পূর্ব্বেকার অপেক্ষা ৪ ইঞ্চি নীচে নামিয়া যায় এবং দক্ষিণের মাটী ইহার চেয়ে ৮ ইঞ্চি উঁচুতে থাকিয়া একটি আলের সৃষ্টি করে। এই প্রকার আল বাঁধিতে যতগুলি প্রক্রিয়ার



কলের লাঙ্গলের সাহায্যে আল বাঁধিবার পদ্ধতির বিভিন্ন স্তর এই চিত্রে দেখান হইয়াছে। (ক) মাটীর মধ্যে ৮ ইঞ্চি গভীর ছেদ। (খ) ঢালু দিকের ৮ ইঞ্চি মাটীর টুকরা। (গ) উঁচু দিকের ৪ ইঞ্চি পুরু মাটীর টুকরা। (ঘ) এই অংশের মাটী বাম দিক হইতে ঠেলিয়া দক্ষিণ দিকের মাটীর নীচে লইয়া যাওয়া হয়।

কথা বলা হইল সকলগুলি একটি কলের লাঙ্গলে লাগান বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে হইয়া থাকে।

এডিসনের স্মৃতিদীপ

সংপ্রতি আমেরিকার মেনলো পার্ক নামক স্থানে বিখ্যাত উদ্ভাবক এডিসনের স্মৃতি হিসাবে একটি বিরাট বৈদ্যুতিক দীপ নির্ম্মিত হইয়াছে। বৈদ্যুতিক দীপ আমেরিকার এডিসন ও ইংলণ্ডে সোয়ান প্রথমে উদ্ভাবন করেন। প্রথমে ইঁহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ছিল কিন্তু পরে দুইজনে একসঙ্গে কাজ করেন। এডিসনের কারখানা ছিল মেনলো পার্কে, সেই জন্য মেনলো পার্কে এই স্মৃতি-

দীপ নির্ম্মিত হইয়াছে। বাতিটি ১৪ ফুটেরও কিছু উঁচু। বাতিটিকে বৈদ্যুতিক বাল্বের মত আকার দিবার জন্য ইস্পাতের একটি কাঠামো তৈয়ারী করা হয় এবং ইহার উপর প্রায় ৭৫ মণ ওজনের পীতাভ কাচ লাগান হয়। বাল্বটির ব্যাস ৯ ফুটের কিছু উপর। দীপটিকে আলোকিত করিবার জন্য ভিতরে ৯৬০টি বৈদ্যুতিক বাতি এবং একটি প্রতিফলক আছে। এই প্রকাণ্ড দীপটি সম্পূর্ণ করিতে প্রায় ৬ মাস সময় লাগিয়াছে। উঁচু একটি স্মৃতি-স্তম্ভের উপর দীপটি বসান হইবে এবং বিমান চালকের পথের নির্দেশ দিবে, আলোকের বর্ণ পীতাভ করার উদ্দেশ্য এই



এই ১৪ ফুট বৈদ্যুতিক দীপটি সুবিখ্যাত উদ্ভাবক এডিসনের স্মৃতিকল্পে নির্মিত হইয়াছে।

যে, শ্বেত আলোক অপেক্ষা পীতাভ আলোক অধিকতর পরিমাণে কুয়াসা ভেদ করিতে পারে।

বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার

পূর্ব্বে প্ল্যাস্‌টিক সম্বন্ধে বহু কথা এই পত্রিকায় লেখা হইয়াছে। প্ল্যাসটিক যে কত বহুমুখী কাজে লাগান যাইতে পারে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কাঠ, সেলুলয়েড, ভালকানাইট, গাটাপার্চা প্রভৃতি জিনিষ যেখানে পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইত, এখন সেই সকল স্থানে বহুল পরিমাণে প্ল্যাস্‌টিক ব্যবহৃত হইতেছে। প্ল্যাস্‌টিকের আরও একটি গুণ এই যে, ইহা বিদ্যুতের প্রতিরোধক, সুতরাং বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিতে প্ল্যাস্‌টিক বহুল ভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এক জাতীয় প্ল্যাস্‌টিক তৈল হইতে প্রস্তুত করা হয়, উদাহরণ স্বরূপ সুপরিচিত প্ল্যাস্‌টিক বেকেলাইটের উল্লেখ করা যাইতে পারে; ইহার প্রধান উপকরণ রেড়ীর তৈল। সংপ্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর মহেন্দ্রনাথ গোস্বামী এদেশজাত তৈল হইতে প্ল্যাস্‌টিক তৈয়ারী করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহার উদ্ভাবিত উপায় তিনি প্রকাশ করেন নাই। তিনি জানাইয়াছেন যে, তাঁহার প্রস্তুত প্ল্যাস্‌টিক তৈয়ারী করিতে খরচ খুবই কম পড়ে। আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে তৈলবীজ এবং তৈল জন্মায়, সেই তৈল হইতে প্ল্যাস্‌টিক তৈয়ারী করা ব্যবসায় হিসাবে লাভজনক না হইবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। ভারতে বহু টাকার প্ল্যাস্‌টিক আমদানী হইয়া থাকে এবং এই আমদানীর পরিমাণ বাড়িয়াই চলিতেছে। ডক্টর গোস্বামীর চেষ্টা ব্যবসায়ের দিক্ হইতে সফল হইলে প্ল্যাস্‌টিক বাবদ অনেক অর্থ এ দেশেই থাকিয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

ভূমিকম্প ও আলোক

অনেক কাল পূর্ব্বে হইতেই অনেকে বলিয়া আসিয়াছেন যে, ভূমিকম্পের সময় এক প্রকার নৈসর্গিক আলোক দেখিতে পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকেরা কিন্তু এ কথা পূর্ব্বে বিশ্বাস করিতেন না, তাঁহারা বলিতেন যে, উহা দৃষ্টিবিভ্রম ছাড়া আর কিছুই নহে। বর্ত্তমানে কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, বড় বড় ভূমিকম্পের সময় এক প্রকার নৈসর্গিক আলোক দেখা যায়।

ভূমিকম্পের সহিত সংশ্লিষ্ট আলোকের প্রথম উল্লেখ খৃষ্টজন্মের প্রায় ১ শতাব্দী পূর্ব্বে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান কালে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রায় ২৮ বৎসর পূর্ব্বে জনৈক ইতালীয় অধ্যাপক গাল্লি, ভূমিকম্পের সময় দৃষ্ট

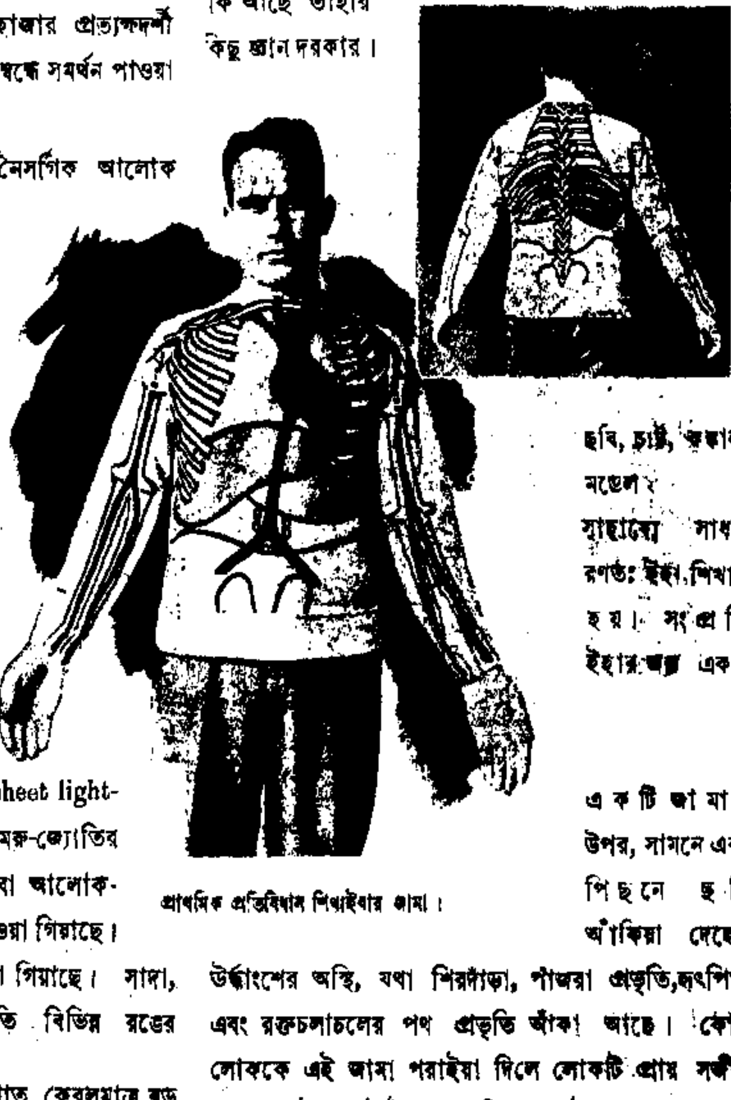
নৈসর্গিক আলোকের বিবৃতিগুলি সংগ্রহ করিয়া একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। ইহাতে ১৪৮টি ঘটনার উল্লেখ ছিল। ভূকম্পবিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতেরা ইহাতে বিশেষ আস্থা স্থাপন করেন নাই, কিন্তু ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে জাপানে যে ভীষণ ভূমিকম্প হয়, তাহাতে এই ঘটনার সত্যতা নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হয়। জাপানের ভূমিকম্প-গবেষণা প্রতিষ্ঠানের দুইজন বৈজ্ঞানিক নিজেরা এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন এবং আরও দেড় হাজার প্রত্যক্ষদর্শী লোকের নিকট হইতে ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সমর্থন পাওয়া যায়।

পর্য্যবেক্ষণের ফলে দেখা যায় যে, নৈসর্গিক আলোক ভূমিকম্পের ঠিক পূর্ব্বে আরম্ভ হয় এবং কম্পন শেষ হইবার কিছুক্ষণ পর পর্য্যন্ত দেখা যায়। ভূমিকম্পের তীব্রতা যখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, আলোকের ক্রিয়াও তখন সর্ব্বাধিক হইতে দেখা গিয়াছে। যে সময়ে এইরূপ আলোক দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, সেই সময়ে আকাশে বিদ্যুতের কোন চিহ্ন ছিল না, সুতরাং এই প্রকার আলোককে কোন প্রকারের বিদ্যুৎপাত বলা চলে কি না সন্দেহ। আলোকের প্রকাশ অনেকটা বিস্তৃত বিদ্যুৎপাত, sheet lightning-এর মত। কোন কোন সময় মেরু-জ্যোতির মত আলোকের খেলা, কোন সময় বা আলোকময় গোলাকার পিণ্ডের মত দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। আলোকের বর্ণও নানা প্রকারের দেখা গিয়াছে। সাদা, ঈষৎ নীলাভ, লালচে, কমলা প্রভৃতি বিভিন্ন রঙের আলোকপাত দেখা গিয়াছে।

এই প্রকার নৈসর্গিক আলোকপাত কেবলমাত্র বড় বড় ভূমিকম্পের সময় দেখা যায় বলিয়া প্রকাশ। আমাদের দেশে অল্প দিন হইল দুইটি বড় ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে, বিহারে এবং কোয়েটায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলিতে পারেন এখানেও এইরূপ আলোক দেখা গিয়াছিল কি না। লেখক সংবাদপত্রে অন্ততঃ এইরূপ আলোকের কোন উল্লেখ পান নাই।

প্রাথমিক প্রতিবিধান শিখাইবার অভিনব উপায়

প্রাথমিক প্রতিবিধান শিখিতে হইলে দেহের কোথায় কি আছে তাহার কিছু জ্ঞান দরকার। ছবি, চার্ট, কঙ্কাল, মডেল প্রভৃতির সাহায্যে সাধারণতঃ ইহা শিখান হয়। সংপ্রতি ইহার জন্য একটি



প্রাথমিক প্রতিবিধান শিখাইবার জামা।

একটি জামার উপর, সামনে এবং পিছনে ছবি আঁকিয়া দেহের উর্দ্ধাংশের অস্থি, যথা শিরদাঁড়া, পাঁজরা প্রভৃতি, হৃৎপিণ্ড এবং রক্তচলাচলের পথ প্রভৃতি আঁকা আছে। কোন লোককে এই জামা পরাইয়া দিলে লোকটি প্রায় সজীব মডেল হইয়া উঠিবে। ছবিতে এইরূপ জামা পরা লোকের সম্মুখ ও পিছন হইতে তোলা ফটোগ্রাফ দেখা যাইতেছে।

চিত্র-চরিত্র

—শ্রীঅমিত রায়

মধুসূদনের নিজের কলমে আত্মপ্রকাশ

মধুসূদন তাঁহার কাব্য ও কাব্যশিল্প সম্বন্ধে অনেক চিঠি বন্ধু-বান্ধবকে লিখিয়াছিলেন ; সৌভাগ্যতঃ, সেগুলি রক্ষিত হইয়াছে ; এই সব চিঠিপত্র পড়িলে মধুসূদনের কাব্য-জীবন সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়, মধুর কাছে নিজের কাব্য-জীবন অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল। শর্ম্মিষ্ঠা হইতে বীরাঙ্গনা অবধি, প্রথম ছত্র বাংলা রচনা হইতে বাংলা লেখা পরিত্যাগ অবধি, যে সব ভাব, যে সব ইঙ্গিত তাঁর মনে উদিত হইয়াছে, সে সব তিনি তখনই বন্ধুদের লিখিয়াছেন, তাঁর চিঠি হইতে আমরাও তা জানিতে পারি। আমাদের সৌভাগ্য যে মধু কবিত্ব-শক্তি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, শিশুসুলভ অহঙ্কারী ছিলেন, নতুবা এ সব কথা জানিবার আর কি উপায় ছিল। বঙ্কিমের সাহিত্য-জীবন ও সাহিত্য-সৃজন সম্বন্ধে আমরা কি জানি ?

মধুসূদনের প্রথম বাংলা নাটক শর্ম্মিষ্ঠা লিখিত হইলে বন্ধুদের অনুরোধে কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব-এর লেখক নাটুকে রামনারায়ণকে তা দেখিতে দেওয়া হইয়াছিল ; রামনারায়ণ এমন শিকার আগে আর পান নাই, শর্ম্মিষ্ঠাকে আগাগোড়া বদল করিবার মতলব আটিতেছিলেন ; মধুসূদন সে সম্বন্ধে গৌরদাসকে লিখিতেছেন—

"রামনারায়ণ আমার নাটকের যে পাঠ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা আমাকে হতাশ করিয়াছে। তাঁহার সাহায্য আমি আর গ্রহণ করিব না, স্থির করিয়াছি। হয় আমি নিজের শক্তিতে একাই দাঁড়াইব, নয়, একাই পড়িব। আমার লেখাকে ঢাকিয়া রাখিতে আমি রামনারায়ণকে বলি নাই, কেবল ব্যাকরণের ত্রুটি থাকিলে সংশোধন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম মাত্র। তুমি জান যে, ষ্টাইল লেখকের মনের প্রতিবিম্ব, এবং আমার বন্ধু ও আমার মনের মধ্যে ঐক্য অত্যন্ত অল্প। যা হোক, আমি তাঁর কর্তৃক সংশোধন গ্রহণ করিব।...আমি জানি আমার নাটকে বৈদেশিক ছায়া থাকা সম্ভবপর, কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়। যদি ব্যাকরণের দোষ না থাকে, যদি ভাবের উজ্জ্বলতা থাকে, যদি গল্প চিত্তরঞ্জক হয়, চরিত্র-সৃষ্টি সুসংবদ্ধ হয়, তবে বৈদেশিক ছায়াতে কার কি আসে যায়। মুরের কবিতাতে প্রাচ্যছায়া, বায়রণের কবিতায় এশিয়ার ছবি, কার্লাইলের রচনায় জার্ম্মানিকতা আছে বলিয়া কি তাহা তোমার ভাল লাগে না ? আর মনে রাখিও, আমার দেশবাসীদের মধ্যে যাঁহারা আমার ভাবে ভাবিত, প্রতীচ্য ভাবধারায় যাহাদের মন গঠিত, আমি লিখিতেছি, তাহাদের জন্য ; সংস্কৃত হইলেই আদর্শ স্থানীয় এই দূষিত ধারণার শৃঙ্খলকে ছিন্ন করিব ইহাই আমার সঙ্কল্প।

আমার সাহসকে দুঃসাহস বলিয়া ভয় পাইও না। আমি এই নাটক এমন সব লোককে দেখাইয়াছি, যাহারা ইংরাজী জানে না, তাহাদের ইহা ভাল লাগিয়াছে। সাহিত্য বিষয়ে, বন্ধু, আমি ধার-করা পোষাকে পৃথিবীর সম্মুখে উপস্থিত হইতে লজ্জা বোধ করি, আমি একটা নেকটাই বা কোর্ত্তা ধার করতে পারি, কিন্তু আগাগোড়া পোষাক ! কখনো নয় !

দেখিও আমি এমন নাটক রচনা করিব, যাহাতে এই দুষ্ট পণ্ডিতের দল বিস্মিত হইয়া যাইবে।"

পণ্ডিতের দল বিস্মিত হইয়াছিল, এবং তাঁর ইংরেজি জানা বন্ধু-বান্ধবদের বিস্ময়ও অল্প হয় নাই, তবে দুই বিস্ময় একার্থক নয়।

পুনরায় শর্ম্মিষ্ঠা সম্বন্ধে গৌরদাসকে—

"শর্ম্মিষ্ঠা সম্বন্ধে একটি মাত্র দোষ সবাই দেখিতে পাইয়াছে—ইহার ভাষা দর্শকদের পক্ষে দুরূহ। কিন্তু ইহাকে আমি দোষ মনে করি না—

দেশের সাহিত্য-ভাণ্ডারে স্থায়ী-সম্পদ রূপে যদি ইহা গণ্য হয়, তবে বিশ বছর পরে এ দোষে কেহ শর্ম্মিষ্ঠাকে দোষী মনে করিবে না। সত্য কথা বলিতে কি, প্রথম প্রয়াসেই আমি এমন সাফল্য লাভ করিব, কখনও ভাবি

নাই। শর্ম্মিষ্ঠা আমাকে বাঙ্গালী লেখকদের মধ্যে প্রায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দান করিয়াছে।

যেখানে তুমি আছ, সে-স্থান হইতে সমুদ্র, অবাধ সমুদ্র কত দূরে? সমুদ্রের নিয়তধ্বনিত বিরাট কল্লোল কি শুনিতে পাও? সে স্বর আমার চির-পরিচিত, ভগবান জানেন আর কখনও তাহা শুনিতে পাইব কি না?"

গৌরদাস বালেশ্বরে তখন অবস্থান করিতেছিলেন।

মধুসূদনের চিত্ত চিরকাল অবাধ সমুদ্রের বিরাট সঙ্গীতের জন্য উৎকর্ণ ছিল। ইংলণ্ডের জন্যই সমুদ্র তাঁর কাছে প্রিয়, না, সমুদ্র-পরপারবর্ত্তী বলিয়াই ইংলণ্ড প্রিয়!

রাজনারায়ণ বসুকে—

তিলোত্তমা শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। ......আমার ভয় হইতেছে, আমার ষ্টাইলকে তুমি কঠিন মনে করিবে,......কিন্তু অনুপ্রেরণার স্রোতে ভাসিয়া শব্দগুলি অযাচিতভাবে আপনিই আসিয়া পড়ে। উৎকৃষ্ট অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ স্বভাবতঃই ধ্বনিগম্ভীর এবং ইংরাজী শ্রেষ্ঠ অমিত্রাক্ষর ছন্দোরচয়িতা দুরূহতম লেখক—মিল্টন—ভার্জ্জিল ও হোমারের কাব্যকে কোনক্রমেই সহজ বলা চলে না। সে কথা যাক্। একজনের প্রথম কাব্যে অনেক দোষ-ত্রুটি মার্জ্জনা করিতে হয়। খেলাচ্ছলে আমি এই কাব্য রচনা আরম্ভ করিয়া ছিলাম, কিন্তু এখন দেখিতেছি, এমন কাব্য লিখিয়া বসিয়াছি, যাহা আমাদের অতীত কাব্য-সাহিত্যকে উচ্চস্বরে উদ্গীত করিয়াছে, অন্তত ভবিষ্যৎ বাঙ্গালী কবিদিগকে কৃষ্ণনগরের সেই লোকটার প্রবর্ত্তিত কাব্যধারা হইতে পৃথক্‌ভাবে অনুপ্রাণিত কাব্য লিখিতে শিখাইবে। কৃষ্ণনগরের লোকটার উচ্চস্তরের প্রতিভা থাকিলেও তাহার প্রবর্ত্তিত কার্য্যধারা অত্যন্ত দূষিত।

লেখক হিসাবে আমার প্রহসন দুইখানি যে তোমার ভাল লাগিয়াছে, তাহাতে আমি সুখী। কিন্তু ও দু'খানা ছাপাইয়া এখন দুঃখ বোধ করিতেছি। তুমি জান যে আমাদের জাতির কোন প্রকৃত থিয়েটার নাই, অর্থাৎ—ক্লাসিক্যাল ছাঁদে রচিত যথেষ্ট নাটক নাই, যাহা আমাদের রুচিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে, এখন আমাদের প্রহসন রচনা করা উচিত নয়। তুমি আমার শর্ম্মিষ্ঠা দেখিয়াছ কি না জানি না। আমার আর একখানা নাটক [পদ্মাবতী] একদল সৌখীন অভিনেতা-দ্বারা অভিনীত হইবে। যদি বাঁচিয়া থাকি, তবে দেশের লোককে ক্লাসিক্যাল ছাঁদে রচিত আরও তিন-চারখানা নাটক দান করিব, তারপরে ঐতিহাসিক ও অন্য বিষয় লইয়া পড়িব। তুমি জাতীয় মহাকাব্যের জন্য যে বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছ, তাহা অতি উত্তম, কিন্তু আমার মনে হয় না—কাব্য-শিল্পের উপরে আমার এত অধিকার জন্মিয়াছে, যাহাতে ঐ বিষয়ে লিখিলে সফলতা লাভ করিতে পারিব—এখনও কয়েক বছর অপেক্ষা করিতে হইবে। ইতিমধ্যে আমার প্রিয়-বীর ইন্দ্রজিতের মৃত্যুকে স্মরণীয় করিবার উদ্যোগ করিতেছি—ভয় পাইও না, পাঠককে আমি বীর-রসের দ্বারা উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিব।......রুশিয়ার রাজমুকুট ধারণ অপেক্ষা দেশের কাব্য-সাহিত্যের সংস্কারকে আমি অধিক গৌরবের মনে করি।

আমি বুঝিতে পারিতেছি না, কোন্ ইউরোপীয় ভদ্রলোক তোমাকে বলিয়াছিল যে, আমি বাংলা ভাষাকে ঘৃণা করি—এক সময় তাহা সত্য ছিল।...... মেঘনাদবধের প্রথম কয়েকছত্র তোমাকে পাঠাইলাম—কেমন লাগে জানিতে চাই। Ode-জাতীয় ছোট একখানি কাব্য-গ্রন্থ যন্ত্রস্থ—আগাগোড়া রাধার বিরহ সম্বন্ধে।"

জীবিত ও মৃত বাঙ্গালী কবিদের মধ্যে মধুসূদন ভারতচন্দ্রকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিতেন—সেইজন্য কৃষ্ণনগরের লোকটার প্রতিভা স্বীকার করিলেও তাঁহার কাব্য-রীতিকে স্বীকার করিতে পারিতেন না।

শর্ম্মিষ্ঠা রচনার পরে আশী বছর অতিক্রান্ত, তবু আমাদের বাঙ্গালী নাট্যশালা সম্বন্ধে মত পরিবর্ত্তনের সময় আসে নাই। ভাল নাটক-দর্শকেরা বুঝিতে পারিবে না—এ যুক্তি আজিও নাট্যশালার অমোঘ অস্ত্র, আজিও মূর্খ ম্যানেজার তেমন মিষ্ট হাসি মুখে থাকিয়া সরস্বতীর পথ রোধ করিয়া নাট্যশালার দ্বারে দণ্ডায়মান।

রাজনারায়ণ বসুকে—

"আমার ধারণা জন্মিয়াছে যে, বাঙ্গলা নাটক অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত হওয়া উচিত, গদ্যে নয়; কিন্তু এ পরিবর্ত্তন ক্রমে ক্রমে করিতে হইবে; যদি আমি আর নাটক লিখি, তবে নিশ্চয় জানিও, সাহিত্য-দর্পণকার

বিশ্বনাথের কথা মানিয়া কখনই চলিব না, ইউরোপের নাট্য-রথীদের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিব। পদ্মাবতী তোমার কেমন লাগিল জানাইও—ইহার প্রথম অর্দ্ধেক গ্রীক স্বর্ণ-আপেলের কাহিনীকে ভারতীয় পোষাক দিবার চেষ্টা করিয়াছি।……

মেঘনাদ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। হয় তো এই বছরের শেষ পর্য্যন্ত ইহার রচনা সমাপ্ত হইবে। তোমার যে প্রথম কয়েক ছত্র ভাল লাগিয়াছে, সে জন্ত আমি সুখী। সত্য কথা বলিতে কি, বন্ধু, আমি খৃষ্টান, হিন্দু ধর্ম্মের জন্ত তোয়াক্কাও করি না, কিন্তু আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের রচিত পৌরাণিক কাহিনীগুলি আমার এত ভাল লাগে! আগা গোড়া কবিত্বপূর্ণ! গল্প বলিবার মাথা থাকিলে এই সব কাহিনী দিয়া কি না করা যায়।…তিলোত্তমা কাব্যখানা পাইলে এমন একটা সমালোচনা লিখিবে. যাহাতে দেশের লোক সমালোচনা-বিজ্ঞান শিখিতে পারে!

আমাদের দেশে বর্ত্তমানে সাহিত্যিক প্রচেষ্টার কত বড় ক্ষেত্র! হায় ভগবান, আমার যদি সময় থাকিত। কাব্য, নাটক, সমালোচনা, রোমান্স—গ্রীক ও রোমান বীর পুরুষগণের অপেক্ষা অধিক খ্যাতি একজন ইচ্ছা করিলে অর্জ্জন করিতে পারে।"

মধুসূদন বারংবার তাঁর পত্রাবলীতে সময়ের অল্পতার জন্ত আক্ষেপ করিয়াছেন! সময়ের অল্পতা কেন? আসল কথা ক্ষণস্থায়ী কাব্য-জীবনকে মধুসূদন চরম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই; তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আইন পড়িতেছিলেন, ইংলণ্ডে যাইবার ইচ্ছা তো গোড়া হইতেই ছিল; এবার দুটা ইচ্ছায় মিলিয়া ব্যারিষ্টারি পাশের সঙ্কল্প মনে দেখা দিতেছিল—তাই সময়ের জন্ত আক্ষেপ!

রাজনারায়ণ বসুকে—

"এই কাব্যে [তিলোত্তমা সম্ভব] মানবরসের অভাব হয় তো লক্ষ্য করিয়াছ, কিন্তু মনে রাখিও ইহা দেব-দৈত্যের কাব্য, ইহাতে মানুষকে আনিয়া ফেলা সম্ভব নয়। তোমার অংবিশ্বাসী বন্ধুদের জন্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে কিছু ব্যাখ্যা লিখিতে বলিয়াছ, কিন্তু ব্যাখ্যা করিবার অল্পই আছে।… বস্তুতঃ, অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রচলন আমাদের দেশে কেবল সময়সাপেক্ষ; তোমরা, বন্ধুরা যদি যথাস্থানে যতি রক্ষা করিয়া অমিত্রাক্ষর পড়িতে পারে, তবে দেখিবে যে, ইহা ছন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! আমার উপদেশ এই যে, বারংবার পাঠ কর; এই ছন্দে কাণকে দীক্ষিত কর, তখন বুঝিবে এ কি জিনিষ!…রঙ্গলাল রাজপুতদের কাহিনী অবলম্বন করিয়া আর একখানা কাব্য লিখিতেছে; বায়রণ, ম্যুর, স্কট তাহার কাছে কবিত্বের পরাকাষ্ঠা; আমার ইচ্ছা করে সে আরও যদি অগ্রসর হইত! আমি বাল্মীকি, ব্যাস, হোমার, কালিদাস, দান্তে, টাসো ও মিল্টন ছাড়া আর কিছু পড়ি না। কবিত্ব-প্রতিভাবান্ ব্যক্তিকে এই সব কবিকুলগুরুরা প্রথম শ্রেণীর কবিতে পরিণত করিতে পারেন।"

রাজনারায়ণ বসুকে পুনরায়—

"তোমার এই বন্ধুর মত কাব্যলক্ষ্মীর জন্ত এমন পাগল আর কেউ আছে! দিবারাত্রি কবিত্ব-কলায় আমি বিলুপ্ত, আমি এই কাব্যখানাকে [মেঘনাদবধ] এই বছরের মধ্যে শেষ করিবার জন্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি; হিরোইক ষ্টাইলে কতখানি সাফল্য লাভ করিয়াছি তাহা জানিতে চাই। বিশেষ আমার মত সাহিত্যিক বিপ্লবীর পক্ষে বন্ধু-বান্ধবদের উৎসাহ-বাক্য একান্ত আবশুক। এত দিন যে-সব লেখককে আমার দেশের লোক পূজা করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে ভণ্ড ও সম্মানের অযোগ্য বলিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছি। প্রত্যেক নূতন কাব্য লিখিবার সঙ্গে আমার শক্তির অভিনব বিকাশ প্রার্থনীয়। যদি মেঘনাদবধ কাব্য তুমি অযোগ্য মনে কর, আমি কিছুমাত্র দুঃখ না করিয়া দগ্ধ করিয়া ফেলিব। তোমার বন্ধু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে জানি না। আমি শুনিয়াছি তাঁহার এক পুত্র না কি ভাল কবিতা লেখেন; আমার প্রিয় কাব্য মেঘদূতের তিনি অনুবাদ করিয়াছেন।

আমি মেঘনাদের দ্বিতীয় সর্গ অর্দ্ধেক সমাপ্ত করিয়াছি; আমি যে আর দশ জনের অপেক্ষা বেশী পরিশ্রমী তা নয়, কিন্তু যখন কবিত্বের ঝোঁক আসে, পাহাড়ের ঝরণার মত ছুটিয়া চলি! মদের কথা লিখিয়াছ, যদিও আমি সাধু কিংবা অপায়ী অহঙ্কারী ব্যক্তি নই, তবু লিখিবার সময়ে মদ স্পর্শ করি না, করিলে ছুটো আইডিয়া

পাশাপাশি সাজাইতে পারি না; তিলোত্তমার একটি ছত্রও নেশার ঝোঁকে লিখিত নয়। অমিত্রাক্ষর ছন্দে তিনটি ছোট কাব্য লিখিয়া তারপরে মিত্রাক্ষরে কিছু করিব; ভয় নাই, ত্রিপদী ও পয়ার নয়; ইটালীর অষ্টপদী ছন্দে একটা রোমান্টিক কাহিনী লিখিব।

এই অবান্তর পত্রের জন্য ক্ষমা করিও, কিন্তু রাবণের বিজয়ী পুত্রকে তোমার কেমন লাগিল? সে একটা লোক ছিল বটে, আর বিভীষণ না থাকিলে বানর-সেনাকে সে সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দিত। কবিবর যদি রামের সঙ্গে কতকগুলি মানুষ অনুচর দিতেন, তবে আমি মেঘনাদের মৃত্যুর বিষয়ে রীতিমত একখানা ইলিয়াড লিখিয়া ফেলিতাম।"

তিলোত্তমাসম্ভব সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসুকে—

"ইন্দ্রের প্রতি তুমি অবিচার করিতেছ; সে বীরপুরুষ, কিন্তু অদৃষ্টের বিরুদ্ধে সে কি করিবে? সুন্দ-উপসুন্দের প্রতি সহানুভূতিতে তুমি ইন্দ্রকে বুঝিতে পার নাই; আমিও উহাদের ভালবাসি, এবং ইচ্ছা ছিল আরও একটা সর্গ বাড়াইয়া দিয়া উহাদের মূর্ত্তি উজ্জ্বলতর করিয়া তুলি। আদিরসের বাহুল্যের কথা লিখিয়াছ, উহা বোধ করি কালিদাসের প্রভাবের দরুণ।

মেঘনাদ বধের প্রথম সর্গ শেষ করিয়াছি। আমার ইচ্ছা গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীর সৌন্দর্য্য আমাদের কাহিনীর সঙ্গে মিশাইয়া দিই; এই কাব্যে আমি কল্পনাকে অবাধ বিহার করিতে দিব, এবং বাল্মীকি হইতে যত কম সম্ভব গ্রহণ করিব। ভয় নাই, কাব্যকে অহিন্দু বলিয়া অভিযোগ করিবার কারণ ঘটিবে না; গ্রীক যে ভাবে লিখিত, সেইভাবে লিখিব, অন্ততঃ লিখিতে চেষ্টা করিব।"

"প্রিয় রাজনারায়ণ, মেঘনাদ তোমার ভাল লাগিয়াছে জানিয়া কি সুখীই না হইয়াছি! নয় সর্গে ইহা শেষ করিবার ইচ্ছা। দ্বিতীয় সর্গ শেষ করিয়াছি, আশা করি, এই সর্গ তোমাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিবে। বরুণানীকে আমি এক অক্ষর কমাইয়া বারুণী করিয়া ফেলিয়াছি, ইহা বরুণানীর অপেক্ষা অনেক বেশী সঙ্গীতে পূর্ণ। সংস্কৃত ব্যাকরণ লইয়া কেন যে মাথা ঘামাইব বুঝিতে পারি না। বিধবা-বিবাহের প্রবর্ত্তক বিদ্যাসাগরের মূর্ত্তি-স্থাপনের জন্য আমি মাহিনার অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত দান করিতে

"প্রিয় রাজ, এবারে আমি রীতিমত একখানা ট্র্যাজেডী লিখিতেছি, গদ্যে। গল্পটা টডের রাজস্থান গ্রন্থ হইতে লওয়া। তুমি বোধহয় হতভাগ্য কৃষ্ণকুমারীর কাহিনী অবগত; আর একটা অঙ্ক লিখিলেই হয়—পঞ্চমাঙ্ক। মেঘনাদ বধের হাতে-লেখা যে কপি পাঠাইলাম, তাহা বর্ণাশুদ্ধিতে পূর্ণ; কিন্তু কিছুদিন আগেও তো আমরা 'শিব' বানান 'সীব' করিয়া লিখিলে বিস্মিত হইতাম না। আমাদের মাতৃভাষা কি দ্রুত উন্নত হইতেছে, বহুযুগের নিদ্রা কেমন অনায়াসে ভাঙ্গিতেছে!

মেঘনাদের দ্বিতীয় সর্গ পড়িয়া তোমার ইলিয়াডের চতুর্দ্দশ সর্গের কথা মনে পড়িবে; আইডা পর্ব্বতের জুপিটারের কাছে জুনোর অভিসার-দৃশ্যকে আমি জানিয়া শুনিয়া ধার করিয়াছি—তবে তাহাকে যতদূর সম্ভব হিন্দু-পোষাক দিতে চেষ্টা করিয়াছি।...ইহার অমিত্রাক্ষরে অনেক পরিমাণে ভার্জ্জিলের মাধুর্য্য আনিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

তিলোত্তমা বেশ বিক্রয় হইতেছে। অমিত্রাক্ষর এক্ষণে চালু হইয়া গিয়াছে। ভারতের মানচিত্র দেখিয়া রণজিৎ সিংহ বলিয়াছিল—সব লাল হো যায়গা; আমি বলিতেছি "সব অমিত্রাক্ষর হো জায়গা।"

পুনরায় রাজনারায়ণ বসুকে—

"আমি কৃষ্ণকুমারীর ট্র্যাজেডি শেষ করিয়াছি।... মেঘনাদের তৃতীয় সর্গ ধরিয়াছি, যদি বাঁচিয়া থাকি, তবে ইহা দশ সর্গে শেষ করিয়া রীতিমত একটা এপিক গড়িয়া তুলিব। বিষয়টি সত্য সত্যই এপিকোচিত; কিন্তু বানরগুলা বিপদে ফেলিয়াছে। সবটা শেষ করিবার আগে প্রথম পাঁচ সর্গ আগে ছাপিব; দিগম্বর মিত্র মহাশয় গ্রন্থ ছাপিবার খরচ দিবেন, এ বিষয়ে আমি খুব সৌভাগ্যবান্; যাহা লিখি তাহারই পৃষ্ঠপোষক ও ক্রেতা জুটিয়া যায়। বঙ্গ-সাহিত্যে আমি সনেটের প্রবর্ত্তন করিতে চাই; কয়েক দিন আগে নিম্নলিখিত সনেট লিখিয়াছি—

> নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন
> অগণ্য; তা সবে অবহেলা করি,
> অর্থলোভে দেশে দেশে করিনু ভ্রমণ,
> বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।
>
> ... ...

কি বল! আমার মনে হয় প্রতিভাবান কবিরা সনেট লিখিতে আরম্ভ করিলে কালক্রমে ইটালীয় সনেটের সঙ্গে আমরা প্রতিযোগিতা করিতে পারিব।...বিদ্যাসাগর মহাশয় অবশেষে আমার কাব্যে প্রতিভার লক্ষণ দেখিতে পাইয়াছেন।"

আর একখানি চিঠিতে মেঘনাদ সম্বন্ধে—

"আমি ৭৫০ ছত্রে ষষ্ঠ সর্গ শেষ করিয়াছি। এই কাব্য খুব লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, কেহ কেহ বলিতেছে, ইহা

মিল্টনের অপেক্ষাও ভাল, কিন্তু তাহা সম্ভব নহে, মিল্টনের অপেক্ষা ভাল হওয়া অসম্ভব; কাহার কাহার মতে ইহা কালিদাসকে পরাজিত করিয়াছে, ইহাতে আমার আপত্তি নাই; আমার মনে হয় ভার্জিল, কালিদাস ও টাসোর সমকক্ষ হওয়া অসম্ভব নয়; যদিও মহাখ্যাত, তবু তাহারা মানুষ বই নয়; মিল্টন দেবতা!"

"শুনিয়া সুখী হইবে যে, কিছুদিন আগে বিদ্যোৎসাহিনী সভা ও তাহার সভাপতি কালিপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় আমাকে চমৎকার একটী রূপার পান-পাত্র উপহার দিয়াছেন। বিরাট একটি সভা হইয়াছিল, বাংলা ভাষায় মানপত্র দান করা হইয়াছিল; খুব সম্ভব তুমি সেই মানপত্র ও বাংলায় তার উত্তর পড়িয়াছ। কল্পনা কর, যে, আমাকে বাংলায় বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল!

বইখানা [মেঘনাদ] বেশ কাটিতেছে। তোমার বন্ধু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন যে, অন্য কোন হিন্দু গ্রন্থকার ইহাঁর [মধুসূদনের] কাছে দাঁড়াইতে পারে না; ইহাঁর কল্পনা দূরতম প্রসারী।"

"মেঘনাদের নবম সর্গের কয়েক ছত্র লিখিতে এখনও বাকি আছে।...মেঘনাদের দ্বিতীয়ার্দ্ধ প্রথমার্দ্ধের অপেক্ষা তোমার ভাল লাগিবে।...আমার ধারণা ছিল না যে, আমাদের মাতৃভাষা—এত বিপুল ঐশ্বর্য্য লেখকের সম্মুখে ধরিয়া দিবে, আর আমি তো পণ্ডিত নই, জানই। কল্পনা ও চিন্তার স্রোতে শব্দ আপনিই ভাসিয়া আসে, যে সব শব্দ আমি কখনও ভাবি নাই যে জানি। দেখ, কি রহস্য!... আমি কাব্যখানা নিখুঁত ভাবে লিখিবার চেষ্টা করিয়াছি, এবং কোন ফরাসী সমালোচকও ইহাতে ভুল ধরিতে পারিবে না। বোধ হয়, চতুর্থ সর্গের সীতা-হরণের বৃত্তান্ত ইহাতে না দিলেও চলিত; কিন্তু ইহা কি বাদ দেওয়া যায়! অনেকের মতে প্রথম পঞ্চ সর্গের মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ, যদিও যতীন্দ্র ও তাঁহার দল তৃতীয় সর্গকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। আমার মুদ্রাকর (তিনি ভারতচন্দ্রের ভক্ত) প্রথম সর্গকে সে স্থান দিতে চাহেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের শত্রুদের ইহা পরাজিত করিয়াছে!...

আমাকে ইতিমধ্যেই লোকে কালিদাস ও মিল্টন বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, আমি জানি না কতদূর ইহা সত্য! আরও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকি, এবং কাব্য-চর্চ্চা করি, তবে আরও উন্নতি করিব, সন্দেহ নাই; তিলোত্তমা ও মেঘনাদের অমিত্রাক্ষরে কত প্রভেদ দেখ!

ঈশ্বরচন্দ্রের [পাইকপাড়ার রাজা] মৃত্যুতে বাংলা নাট্য-মঞ্চের ক্ষতি হইল; কিন্তু এ যুগ নাটকের যুগ নয়; লোকের কাণ আগে অমিত্রাক্ষর ছন্দে অভ্যস্ত হওয়া দরকার! কৃষ্ণকুমারী, শর্ম্মিষ্ঠা ও পদ্মাবতীকে ছাড়াইয়া গিয়াছে।

"কালিদাস, ভার্জিল, টাসোর কথা মনে কর। আমার মনে হয় না ইংলণ্ডে ইহাঁদের সমকক্ষ কোন কবি আছে। মিল্টন অন্যস্তরের ব্যক্তি! তদ্রচিত শয়তানের মত সে উচ্চতম কল্পনা ও ভাবনায় সে পূর্ণ; কিন্তু ভালবাসার ভাব তাহার মধ্যে নাই; সে ভাব পাঠকের মন উচ্চতম স্তরে উন্নীত করিতে পারে, হৃদয়কে স্পর্শ করে না। ফলে কি হইয়াছে; তাঁহার খ্যাতি অসীম, কিন্তু পাঠক কয়টি? মিল্টনই শয়তান; সে আমাদের অপেক্ষা উন্নততর জীব, কিন্তু তাহার জন্য আমরা সমবেদনা অনুভব করি না; বিস্ময়ে ও ত্রাসে তাহার জলদগর্জ্জন কাণে প্রবেশ করে; নির্জ্জন বনে সিংহের গভীর গর্জ্জনের মত তাহার কণ্ঠস্বর!

"একটা মজার ঘটনা শোন। একদিন আমার চীনা বাজারে যাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল, সেখানে গিয়া দেখি যে, একজন লোক দোকানের সম্মুখে বসিয়া একখানা বই পড়িতেছে; জিজ্ঞাসা করিলাম কি বই? সে ইংরাজিতে বলিল—'নূতন একখানা কাব্য।' 'কাব্য? আমার তো ধারণা ছিল বাংলায় কোন কাব্য নাই।' সে বলিল—'সে কি কথা? এই দেখুন এক খানা কাব্য, জগতের যে কোন জাতিকে মহা গৌরবান্বিত করিতে পারে!' আমি বলিলাম—'পড়ে দেখি।' সে আমাকে দেখিয়া সন্দিগ্ধ ভাবে বলিল - 'মহাশয় আপনি বোধ হয় ইহা বুঝিতে পারিবেন না।' আমি বলিলাম—'চেষ্টা করিতে ক্ষতি কি?' সে তখন মেঘনাদের দ্বিতীয় সর্গ হইতে পড়িল—

...বাঁচালে দাসীরে
আশু আসি তার পাশে হে রতি-রঞ্জন।

লোকটা বেশ পড়িতে পারে! পণ্ডিত ও পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিদের কথা মনে পড়িয়া গেল! আমি তখন বইখানা লইয়া খানিকটা পড়িলাম; সে অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমি কোথায় থাকি? আমি যা-তা একটা উত্তর দিয়া পলাইয়া আসিলাম, লোক আসিয়া পড়িয়া বিরক্ত করে ইহা আমি চাহি না। আসিবার সময় তাহার করমর্দ্দন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম - বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ চলিবে কি না?—সে বলিল—নিশ্চয়, বাংলার ইহা শ্রেষ্ঠ ছন্দ।"

পণ্ডিত তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী

—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার বা রাধাকান্ত দেবের ন্যায় তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর নামের সঙ্গে আমরা তেমন পরিচিত নহি। অথচ ইঁহারা যেমন দেশের উন্নতিমূলক নানা কার্য্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তারাচাঁদও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য ও প্রচেষ্টা দ্বারা দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী শতাব্দীব্যাপী রাজনীতি-চর্চ্চার তিনি অন্যতম পথ প্রদর্শক,এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় সিভিলিয়ানদের চক্রান্তে তারাচাঁদেরও চাকরী গিয়াছিল। পরে আবার তিনি তাঁহারই মত সংবাদপত্র-সেবা ও রাজনীতি-চর্চ্চা আরম্ভ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যাঁহারা কিছুমাত্র আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই নানা ক্ষেত্রে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর কৃতিত্ব লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি হিন্দু কলেজের শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের নেতারূপে গণ্য হইয়াছিলেন। তিনি ইঁহাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ, এমন কি নব্যবঙ্গের গুরুস্থানীয় হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও অপেক্ষা তিন বৎসরের বড় ছিলেন। এই যুবকদল সকল কর্ম্মে তাঁহার পরামর্শ লইতেন। তিনিও সকল আন্দোলনের পুরোভাগে যাইতে দ্বিধা বোধ করিতেন না, যদিও তিনি স্বভাবতঃ সরল, অমায়িক, মিতভাষী, নীরবকর্ম্মী ছিলেন। হয়ত এই সকল কারণেই তাঁহার নাম সাধারণ্যে তেমন প্রচারিত হয় নাই। পরবর্ত্তীকালে তাঁহার জীবনীকারগণকে অধিকাংশ স্থলে যে কিংবদন্তীর আশ্রয় লইতে হইয়াছিল, তাহার কারণও সম্ভবতঃ ইহাই।

সত্য কথা বলিতে কি, জীবনী অর্থে আমরা যাহা বুঝি, উপযুক্ত মাল-মশলার অভাবে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী সম্বন্ধে তেমন কিছুই এ পর্য্যন্ত লিখিত হয় নাই। তারাচাঁদের মৃত্যুর আনুমানিক পঞ্চাশ বৎসর পরে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ" লেখেন। রামতনু নব্য দলের, কাজেই তাঁহার বিষয় আলোচনাকালে তারাচাঁদের কথা স্বতঃই আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ইহাও সংক্ষিপ্ত ও স্থানে স্থানে ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ। ইহার ত্রিশ বৎসর পরে, মাত্র গত ১৯৩৪ সনে, শ্রীযুক্ত (অধুনা ডক্টর) বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় "History of Political Thought from Rammohon to Dayananda (1821-84)" শীর্ষক পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। গ্রন্থকার তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর ন্যায্য দাবী স্বীকার করিয়াই বোধ হয় একটি অধ্যায়ে তাঁহার বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। তারাচাঁদের রাজনৈতিক মতামত ও কার্য্যাকার্য্য সম্পর্কে "The Bengal Spectator" নামক দ্বিভাষিক পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলির উপর তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইয়াছে। ইহার যুক্তিযুক্ততা পরে আলোচনা করিব। তবে এই সব বিষয়কে ভিত্তি করিয়া আলোচনা করিতে গিয়া মজুমদার মহাশয়ও কোন কোন ক্ষেত্রে কম ভ্রমে পতিত হন নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, তারাচাঁদের কি জীবন-কথা আলোচনায়, কি রাজনৈতিক মতবাদ বিশ্লেষণে, হয় কিংবদন্তী, নয় ব্যক্তিগত ধারণার উপর কম-বেশী নির্ভর করিতে হইয়াছে। অথচ গত শতাব্দীর ইঙ্গ-বঙ্গ সংস্কৃতির সংঘাত ও তাহার ফলস্বরূপ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রচেষ্টার কথা জানিতে হইলে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর কার্য্যকলাপ আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন।

সুখের বিষয়, ১৮৪০ সনের প্রথম পর্য্যন্ত তারাচাঁদ-জীবনের একটি নির্ভরযোগ্য কাহিনীর সন্ধান পাইয়াছি। প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁহার ইংরেজী "ডেভিড হেয়ার" পুস্তকে (পৃঃ ৩২) তারাচাঁদের কথা বলিতে গিয়া লেখেন,—'Tarachand's biographical sketch drawn up by me appeared in a number of the India Review." ১৮৪০ সনের মার্চ্চ সংখ্যা 'ইণ্ডিয়া রিভিউ' পত্রিকায় প্যারীচাঁদ তাঁহার অগ্রজপ্রতিম বন্ধু ও সহকর্ম্মী তারাচাঁদের জীবন-কথা বর্ণনা করেন। এই কাহিনীটির

সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এখানে দিলাম। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকারদ্বয় গ্রন্থ প্রণয়নকালে এই বিবরণটি পাইলে অত সামান্ত ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্যেও কতকগুলি মারাত্মক ভুল করিতেন না, বুঝিতে পারি। তবে পাঠকবর্গ স্মরণ রাখিবেন, এ কাহিনী ১৮৪০ সনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। ইহার পরবর্ত্তী কালের ঘটনাবলী এ রূপ ধারাবাহিকভাবে জানিবার উপায় নাই। যতটুকু সংগ্রহ করিতে বা জানিতে পারিয়াছি, তাহাই পরে সন্নিবিষ্ট করিব।

প্যারীচাঁদ মিত্র লিখিত কাহিনীর তাৎপর্য্য

তারাচাঁদ বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। তাঁহার জন্ম হয় ইংরেজী ১৮০৬ সনে। দশ বৎসর বয়সে তারাচাঁদের পিতৃবিয়োগ হয়। এত অল্প বয়সেই পরিবার প্রতিপালনের ভার তাঁহার উপর পড়িয়াছিল।

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার কয়েকমাস পরে তারাচাঁদ অবৈতনিক ছাত্ররূপে এখানে পড়িতে আরম্ভ করেন। ১৮২২ সন পর্য্যন্ত পড়িবার পর তিনি কলেজ ত্যাগ করেন। তখন তিনি মিঃ [সিল্ক] বাকিংহাম সম্পাদিত 'ক্যালকাটা জার্ন্যাল' পত্রের জন্ত 'চন্দ্রিকা' ও 'কৌমুদী' নামক দুইখানি বাংলা পত্রিকার ইংরেজী অনুবাদকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। রাজা রামমোহন রায় তাঁহাকে এই কর্ম্ম যোগাড় করিয়া দেন। এক বৎসর পরে যখন দেখিলেন, তাঁহার দ্বারা অনুবাদের আর প্রয়োজন হইতেছে না, তখন তারাচাঁদ এ কর্ম্ম ত্যাগ করেন। তিনি অতঃপর ডক্টর এইচ. এইচ. উইলসনের তত্ত্বাবধানে এবং বাবু রামকমল সেন ও শিবচন্দ্র ঠাকুরের (ইনি হিন্দু কলেজের আর একজন ছাত্র) সহযোগে পুরাণসমূহের ইংরেজী অনুবাদ-কার্য্যে নিয়োজিত হইলেন। আমরা এ বিষয় নিঃসন্দেহ যে, বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণ্যালে প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রসমূহের ব্যাখ্যান প্রকাশ করিতে প্রাচ্য বিদ্যায় সুপণ্ডিত ডক্টর উইলসনকে এই অনুবাদ বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। এই কর্ম্ম তারাচাঁদের রুচিসম্মতও হইয়াছিল। কিন্তু বর্দ্ধমানে অধিক বেতনের একটি স্থায়ী চাকরীর আশায় বন্ধুদের পরামর্শে এক বৎসর যাইতে না যাইতেই ইহা ছাড়িয়া দিয়া তিনি সেখানে গমন করিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার সে চাকরি হয় নাই। কি কারণে হয় নাই তাহা এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহাকে অগত্যা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হইল। তারাচাঁদ যখন হিন্দু কলেজের ছাত্র, তখনই রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। সেই সময়, বিশেষতঃ তাঁহার পিতার মৃত্যুকাল হইতে দৈন্তের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইতেছিল বলিয়া রামমোহনের সঙ্গে পরিচয়ে তাঁহার বিশেষ উপকার হয়। এই অলোকসামান্ত মহাপুরুষ ও দার্শনিকের মধ্যে তারাচাঁদ এমন একজন বন্ধু পাইলেন, যিনি সব সময়ের তরে উপদেশ দিতে ও উপকার করিতে ব্যগ্র ছিলেন। রামমোহন রায়ের প্রতিপত্তি থাকায় ভূতপূর্ব্ব ম্যাকিন্তোষ কোম্পানীর আফিসে তিনি কেরাণীর কাজে নিযুক্ত হন। এখানে প্রায় প্রত্যহই তাঁহাকে কোম্পানীর বড় সাহেবের সংস্পর্শে আসিতে হইত। এই সাহেবপুঙ্গব তাঁহার নিকট হইতে সেই পরিমাণ হীন বশ্যতা আশা করিতেন, যাহা অন্যান্য বাঙ্গালী বাবুর নিকট হইতে সচরাচর পাইয়া তাঁহার আভিজাত্য-গর্ব্ব চরমে উঠিয়াছিল। সকলেই যাহাতে প্রাচ্যভাবে তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করে, তিনি এইরূপ জিদ করিতেন। এইসব ব্যাপারে বিরক্ত হইয়া তারাচাঁদ এ চাকরীও ছাড়িয়া দিলেন। ইহার অব্যবহিত পরে এদেশীয় শিক্ষার একনিষ্ঠ বান্ধব মিঃ ডেভিড হেয়ারের অনুগ্রহে তিনি স্কুল সোসাইটির পটলডাঙ্গা স্কুলে শিক্ষকের কার্য্য প্রাপ্ত হন। এই সময় তিনি বাংলা-ইংরেজী অভিধান সঙ্কলন করেন। স্কুল বুক সোসাইটি ইহার প্রকাশের ভার লইলেন। তারাচাঁদ সোসাইটি হইতে সভ্যস্বরূপ সাত শত টাকা পাইয়াছিলেন। তিনি এই অভিধানখানি মিঃ উইলিয়ম য়্যাডামের নামে উৎসর্গ করিয়াছেন।* তিনি

---

* অভিধানখানি ১৮২৭ সনে প্রকাশিত হয়। উৎসর্গ-পত্র এই,—

To

The Reverend

William Adam,

The following pages are most respectfully dedicated, as a humble tribute of gratitude for the able assistance which, as a true philanthropist and liberal promoter of the cause of literature, he has benevolently bestowed on a foreigner in the present work, by

Calcutta,

November, 1827.

His much obliged,
and most obedient
humble servant
Tarachand Chuckurburttee

তিনি তাঁহাকে একজন হিতৈষী বলিয়া গণ্য করিতেন। তারাচাঁদ উন্নত চরিত্র ও স্বাধীন-চিত্ততার জন্যও তাঁহাকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন।

তারাচাঁদ যখন পটলডাঙ্গা স্কুলে শিক্ষক, তখন তিনি সুপ্রীম কোর্টের ব্যারিষ্টার মিঃ ক্লেল্যাণ্ডের সহকারী পদে অধিক বেতনে নিয়োগের প্রস্তাব পান। নিজের এবং পরিবারবর্গের প্রতি সুবিচার করিবার জন্য তিনি এই পদগ্রহণ যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। তারাচাঁদ এই ভদ্রলোকের অধীনে প্রায় চার বৎসর কর্ম্ম করেন। ইঁহার নিকট হইতে এরূপ সদয় ব্যবহার পাইতেন যে, কখনও মনে হইত না, তিনি একজন অধীনস্থ কর্ম্মচারী। মিঃ ক্লেল্যাণ্ড তারাচাঁদকে এত ভালবাসিতেন যে, তাঁহার উপকার করিবার কোন উপায় উপস্থিত হইলেই তিনি তাহার সুযোগ লইতেন। তিনি একদিন তারাচাঁদকে ডাকিয়া পাঠান। তারাচাঁদ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে একখানা চিঠি পড়িয়া শোনান। চিঠিখানায় মিঃ ক্লেল্যাণ্ড জে. ডবলিউ. হগকে এই অনুরোধ জানাইলেন যে, তারাচাঁদকে বিচার-বিভাগে একটি ভাল কর্ম্ম দিবার জন্য তিনি যেন মিঃ ডি. সি. স্মিথের নিকট একখানা প্রশংসা-পত্র দেন। চিঠিতে তারাচাঁদের এত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ছিল এবং তাঁহার উপর ক্লেল্যাণ্ড সাহেবের নিবিড় মমতা এত সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে, তারাচাঁদ ইহা শুনিয়া অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন নাই।

মিঃ ক্লেল্যাণ্ডের পত্রে তারাচাঁদের চরিত্র সম্বন্ধে যেরূপ উচ্চ প্রশংসা ছিল, তাহা পাঠ করিয়া স্মিথ সাহেব খুবই প্রীত হইলেন। তিনি তারাচাঁদকে হুগলীর জাহানাবাদে মুন্সেফী পদে নিযুক্ত করেন। এই পদে তারাচাঁদ মাত্র এক বৎসরের কিছু উপর অধিষ্ঠিত ছিলেন। যে অবস্থার মধ্যে তাঁহাকে উক্ত পদ ত্যাগ করিতে হয়, তাহা এই,—

একদা একটা মোকদ্দমা বিচার করিবার সময় তারাচাঁদ একজন সাক্ষীর মিথ্যা সাক্ষ্য ধরিয়া ফেলেন। তিনি তখন এই ব্যাপার তৎকালীন হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এম্. এস. গিলমোরের গোচরে আনা কর্ত্তব্য মনে করিলেন। এই ব্যাপারের বিচারার্থ সাক্ষীকে তাঁহার নিকট পাঠান। এই ধুরন্ধর লোকটি কিন্তু অতীব কৌশলের [illegible] সাক্ষীগণ যোগাড় করিয়া প্রমাণ করিল যে, মুন্সেফ তাহাকে আটক রাখিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর সাক্ষ্য প্রমাণ সমর্থন করিয়া হুগলীর জজ মিঃ হেরিংটনের নিকট তাঁহার 'রুবকারী' সমেত কাগজ-পত্র পাঠাইয়া দিলেন। বক্তব্য বলিবার জন্য তারাচাঁদেরও তলব হইল। তিনি তাঁহার বক্তব্য বাংলায় পেশ করিলেন। ইহা এখন আর পাইবার উপায় নাই। তারাচাঁদের কথা কিন্তু জজ মহোদয়ের মনঃপূত হইল না। তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে একমত হইয়া এই নির্দ্দোষ এবং সৎ কর্ম্মচারীকে কুড়ি টাকা জরিমানা করিলেন! এত অল্প টাকা জরিমানার বিরুদ্ধে আপীল সরকারী নিয়ম অনুযায়ী নিষিদ্ধ ছিল। এ কারণ কোন উচ্চতর আদালতে বিচার দ্বারা তাঁহার উপর আরোপিত দোষ-ক্ষালনের কোন উপায় রহিল না। তাঁহার প্রতি এতাদৃশ ব্যবহারে তারাচাঁদ মনে এত আঘাত পাইলেন এবং এই কর্ম্মে ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হইত এত বেশী যে, বিনিময়ে যৎসামান্য বেতনের কথা ভাবিয়া চাকরী ছাড়িয়া দিতে ক্ষণমাত্রও দ্বিধা বোধ করিলেন না। তারাচাঁদ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন এবং মিঃ থিওডোর ডিকেন্সের চেষ্টায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সলিসিটর পরলোকগত মিঃ পলিনের সহকারী নিযুক্ত হইলেন। পলিনের মৃত্যুর পর মিঃ লঙ্গোভিল ক্লার্কের সহকারী হন। ১৮৩১ সনে তিনি মিঃ ডি. সি. স্মিথের অনুরোধে সদর দেওয়ানী আদালতে মোটা বেতনে কেরাণীর কর্ম্ম গ্রহণ করেন। লঙ্গোভিল ক্লার্কেরও ইহাতে সম্মতি ছিল।

মিঃ ক্লেল্যাণ্ডের অধীনে কর্ম্ম করিবার সময় তারাচাঁদ স্যর উইলিয়ম জোন্সের ইংরেজী অনুবাদ ও মূল সংস্কৃত পাশাপাশি রাখিয়া টীকাটিপ্পনী সমেত মনুসংহিতা পাঁচ খণ্ড পর্য্যন্ত প্রকাশিত করেন। রাজা রামমোহন রায় তারাচাঁদের নিকট এক খানি পত্রে এই গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অর্থাভাব বশতঃ তাঁহাকে এই প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করিতে হয়। স্বশ্রেণী ছাড়া অন্যের নিকটে অনুগ্রহ

স্থিকা করায় অপারগ হওয়ায় এবং হয়ত তাহাদের নিকট হইতে সাহায্য মিলিবে না, এই আশঙ্কায় তারাচাঁদ এই বিষয় শিক্ষা কাউন্সিলের (The Committee of Public Instruction) বা এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্যদের গোচরে আনেন নাই। ইঁহাদের কাহারও এই পুস্তকের প্রকাশ-ভার গ্রহণ করিতে আপত্তি করা উচিত হইত না, কারণ এ রূপ ব্যাপার ইঁহাদেরই কর্ত্তব্যের মধ্যে।

আমরা এমন একজন লোকের জীবনী আলোচনা করিয়া নিশ্চিত আনন্দ পাইলাম, যিনি সর্ব্বদা সাদা-সিধা ভাবে জীবন যাপন করেন এবং কখনও সাধারণের গোচরে আসিতে ভালবাসেন না। তারাচাঁদ জগদ্বাসীর নিকট মহত্ত্বের একটি পরিপূর্ণ আদর্শ। এমন সব গুণে তিনি ভূষিত, যাহা এ দেশীয়দের মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। তাঁহার নীতিজ্ঞান প্রখর বটে, কিন্তু তাহা কখনও অকৃত্রিম সরল শিষ্টাচারের গণ্ডী অতিক্রম করে নাই। তিনি সকল বিষয়েই নিরপেক্ষ, অথচ বন্ধু ভাবে কথা বলিয়া থাকেন, নিঃস্বার্থ অথচ দৃঢ় ভাবে কর্ত্তব্য-কর্ম্ম করিয়া যান, নিজের বা অন্য কাহারও স্বার্থ তাহাতে বিপন্ন হয় কি না, সে দিকে তিনি নজর দেন না। যাহারা বিদ্যায় বুদ্ধিতে তাঁহার সমকক্ষ নহে, তাহাদের সঙ্গেও তিনি এমন সুন্দর ব্যবহার করেন যে, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বিশেষ শাখাসমূহে তিনি যে তাহাদের অপেক্ষা অধিকতর ব্যুৎপন্ন, তাহা মোটেই বুঝা যাইবে না। ইংরেজী ভাষায় তারাচাঁদের অদ্ভুত দখল, আইন-জ্ঞানও গভীর। তিনি বাংলা সাহিত্যে পারদর্শী ত বটেনই, ফার্সি, হিন্দুস্থানী ও সংস্কৃতও তিনি খুব ভাল জানেন। তিনি পারিবারিক জীবনে সুখী, বন্ধুবৎসল ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি দয়ালু। বাঙ্গালীদের মধ্যে এরূপ অল্প লোকই আছেন, যাঁহারা বাঙ্গালা ইংরেজী জ্ঞানে তাঁহার সমকক্ষ। কলিকাতার শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। তাঁহারা ১৮৩৮ সনে "সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিক সভা" (Society for the Acquisition of General Knowledge) প্রতিষ্ঠাকালে তারাচাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁহাকেই সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থায়ী সভাপতি নির্ব্বাচিত করেন। সভার বয়স এখন দুই বৎসর। ইহার উন্নতির জন্য তারাচাঁদের উৎসাহ উদ্দীপনা অনেকাংশে দায়ী। *

মেকানিক্‌স্ ইনষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠানকালে এদেশীয়দের মধ্যে তাঁহার পরামর্শই সর্ব্বাগ্রে লওয়া হইয়াছিল। †

* এই সভায় বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি, সমাজ প্রভৃতি নানা বিষয়ে আলোচনা হইত। ১৮৪০, ১৯ই জানুয়ারী সংখ্যা 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রে এই সোসাইটির কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হয়। সভার প্রতিষ্ঠা অবধি তারাচাঁদ সভাপতিরূপে ইহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। কাজেই ইহার সাফল্যের মধ্যে তাঁহার কৃতিত্ব সমধিক। এই জন্য বিবরণটি এখানে উদ্ধৃত হইল,—

"Society for the Acquisition of General Knowledge

'Under this designation, there has existed in Calcutta a society of respectable Hindoo young men, who meet once a month with the view of mutual edification and improvement. Although the society has existed for several years, its members are so modest and have so studiously resisted publicity as to be hardly known that the society does exist. They have nevertheless, been steady and zealous in promoting the objects they have in view, and have gone on silently, though surely, in effectuating those objects. They profess to depend themselves to "the acquisition of general knowledge,"and to gain this end the members assemble once every month at the Hindoo College, when several of the young gentlemen produce each his essay or paper, which is read to the meeting, and received as part of the proceedings. There is no restriction imposed as to the character or nature of the subject to be treated upon, but any member may select whatever subject he considers within the scope of his ability or which may be most consonant with his peculiar taste or department of study; nor is the liberty denied for the writer to dress his essay either in the English or in the Bengalee language as he may think best. In this way, since the establishment of the society, a great variety of topics have been treated of at the meetings of the society, and the most choice essays and papers have been collected together and printed as the "transactions' of the society Two little volums of these transactions have already passed through the press. It may be added that the society at present has about two hundred members.'

† তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী মেকানিক্‌স্ ইনষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা অবধি ইহার কার্য্যকরী সমিতির একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। ১৮৪০, ৭ই মার্চ ইহার চতুর্থ বার্ষিক সভা হয়। ইহাতেও তিনি সভ্য নির্ব্বাচিত হন। (বেঙ্গল হরকরা, ৯ই মার্চ ১৮৪০)। বিজ্ঞানের নূতন নূতন আবিষ্কারে ও গবেষণায় যে সব উন্নতি হইয়াছে তাহা কাজে লাগাইয়া কারিগরী বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া ইহার উদ্দেশ্য ছিল। প্রধানতঃ, ফিরিঙ্গী-সন্তানদের জন্যই এই ব্যবস্থা হয়। এতদ্বিষয়ে ১৮৩৯, ৭ই মার্চ সংখ্যা 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' দ্রষ্টব্য।

এই সময়কার আর কয়েকটি ঘটনা

১৮৪০ সনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তারাচাঁদ-জীবনের বহু অজ্ঞাত কথা এখন আমরা জানিতে পারিলাম। তারাচাঁদ এই সময় এমন আরও কোন কোন ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, যাহার গুরুত্ব সম-সময়ে উপলব্ধি না হওয়ায় মিত্র মহাশয় উল্লেখ করেন নাই। প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয়, রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত তাঁহার সংস্রবের কথা। এই সম্বন্ধে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ" পুস্তকে লিখিয়াছেন (পৃঃ ১০৩, ১০৪),—

"এই বৎসরের (১৮২৮ সাল) ৬ই ভাদ্র দিবসে রামমোহন রায় ফিরিঙ্গী কমল বসু নামক এক ভদ্রলোকের বাহিরের বৈঠকখানা ভাড়া লইয়া সেখানে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। একদিন রবিবার রামমোহন রায় বন্ধুগণের এডামের উপাসনা হইতে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছিলেন। তখন তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও চন্দ্রশেখর দেব তাঁহার গাড়ীতে ছিলেন। পথিমধ্যে চন্দ্রশেখর দেব বলিলেন,—'দেওয়ানজী বিদেশীয়ের উপাসনাতে আমরা গতায়াত করি, আমাদের নিজের একটা উপাসনার ব্যবস্থা করিলে হয় না?' এই কথা রামমোহন রায়ের মনে লাগিল। তিনি কালীনাথ মুন্সী, দ্বারকানাথ ঠাকুর, মথুরানাথ মল্লিক প্রভৃতি আত্মীয়-সভায় বন্ধুগণকে আহ্বান করিয়া এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। সকলের সম্মতিক্রমে সাপ্তাহিক ব্রহ্মোপসনার্থ একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া তথায় সমাজের কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রতি শনিবার সন্ধ্যাকালে ব্রহ্মোপাসনা হইত। ...তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী এই প্রথম সমাজের সম্পাদক ছিলেন।"

রামমোহন রায় তারাচাঁদকে কিরূপ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন, তাহার নিদর্শন প্যারীচাঁদ মিত্রের বিবরণে একাধিক বার পাওয়া গিয়াছে। রামমোহন তারাচাঁদের গুণপনায়ও মুগ্ধ ছিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজের প্রথম সম্পাদক হওয়া তাঁহার কম গুণপনার পরিচায়ক নহে।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি হিন্দু-কলেজের বিখ্যাত ছাত্রবৃন্দ সকলেই তারাচাঁদের অনিষ্ঠ ছিলেন। ইহাঁরা তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন, নানা বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ লইতেন। তারাচাঁদ যখন স্কুল সোসাইটির পটলডাঙ্গা স্কুলের শিক্ষক, তখন (১৮২৭-২৮ সনে) উক্ত ছাত্রবৃন্দ শিক্ষক ডিরোজিওর নেতৃত্বাধীনে 'একাডেমিক য়্যাসোসিয়েশন' নামে একটি বিতর্ক-সভা স্থাপন করেন। ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি নানা বিষয়ের এখানে আলোচনা হইত। কোন সাক্ষাৎ প্রমাণ না পাওয়া গেলেও তারাচাঁদও যে এই গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

তারাচাঁদ ১৮৩১ সনে সদর দেওয়ানী আদালতে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কয়েক বৎসরের জন্ম কলিকাতায় স্থায়ী ভাবে রহিয়া গেলেন। সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জনী সভা ও মেকানিক্‌স্ ইন্‌স্টিটিউটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া জনহিতকর কার্য্যে যোগদান করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল। তাঁহার নামও ক্রমশঃ ছড়াইয়া পড়িল। কোল্‌সওয়ার্দি গ্রান্ট সে যুগের একজন বিখ্যাত চিত্রকর। তিনি এই সময় তারাচাঁদের একখানি ছবি আঁকেন। বলা বাহুল্য, তারাচাঁদের এই ছবিই আমরা সচরাচর দেখিয়া থাকি। এই ছবি আঁকা সম্বন্ধে 'সমাচার দর্পণ' (১৮৩৯, ৩০এ মার্চ্চ) লেখেন,—

"পূর্ব্বদেশীয় লোকের মুখচ্ছবি। পূর্ব্ব দেশীয় লোকের মুখচ্ছবি লিখিত চতুর্থসংখ্যক গ্রন্থ শ্রীযুত গ্রাণ্ট সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশ হইয়াছে ঐ গ্রন্থের মধ্যে অতি বদান্য, পরহিতৈষী পারসীয় মহাজন শ্রীযুক্ত রষ্টমজী কাওয়াসজী এবং বঙ্গভাষার গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীযুত তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও কলিকাতার টাকশালের জমাদার শ্রীযুত রামপ্রসাদ ঘোষ ও মহেশচন্দ্র তর্কপঞ্চানন এই সকল মহাশয়ের ছবি অবিকল মুদ্রিত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা শ্রীযুত গ্রাণ্ট সাহেব অতি প্রশংসা হইয়াছেন।"

তারাচাঁদ কবে সরকারী কর্ম্ম ত্যাগ করেন সঠিক, জানা যায় নাই। রামগোপাল ঘোষ তাঁহার এক বন্ধুকে ১৮৩৯, ২৪শে নবেম্বর লেখেন যে, অন্যান্যদের সঙ্গে তারাচাঁদও ব্যবসায়ে মন দিয়াছেন।*

*General Biography of Bengal Celibrities both living and dead. Vol. 1. By Ramgopal Sanyal. 1889. P. 179.

তারাচাঁদের পরবর্ত্তী জীবন

শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজে' (পৃঃ ১৪২) প্যারীচাঁদ মিত্র প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"তিনি এক দিকে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী-র কর্ম্ম করিতেন, অপর দিকে তাঁহার বন্ধু তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর সহিত সম্মিলিত হইয়া বিষয় বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নানাবিধ দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানীর কাজ করিতেন। ...১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর মৃত্যু হইলে, তিনি আপনার দুই পুত্রকে অংশীদার করিয়া নিজে কারবারে প্রবৃত্ত হন।"

১৮৩৯ সনে তারাচাঁদ প্যারীচাঁদ প্রমুখ বন্ধুদের সঙ্গে ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছিলেন জানিয়াছি। এখন জানা যাইতেছে, ১৮৫৫ সনেও তারাচাঁদ এইরূপ ব্যবসা করিতেন। ইহা হইতে সাধারণতঃ এই ধারণা হইতে পারে যে, তিনি এই দীর্ঘ কাল ব্যবসায়েই লিপ্ত ছিলেন। তাহা ভুল। তিনি বর্দ্ধমানেও পাঁচ-ছয় বৎসর চাকরী করিয়াছিলেন। তাহা পরে বলিতেছি।

সংবাদপত্রের সঙ্গে তারাচাঁদের সম্পর্ক বহুদিনের। সংবাদপত্রে তাঁহার প্রথম রচনা পাই ১৮৩০ সনে। এই সনের ৫ই ও ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখের 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' তারাচাঁদ গৌহাটি-নিবাসী হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন কৃত 'আসাম বুরুঞ্জি'র সমালোচনা করিয়া প্রবন্ধ লেখেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ইহাতে তাঁহার ইংরেজী-জ্ঞানের সুন্দর পরিচয় পাইতে পারেন। বলা বাহুল্য, বন্ধুদের পরিচালিত 'জ্ঞানান্বেষণে'ও তিনি লিখিয়া থাকিবেন। কিন্তু সাক্ষাৎ ভাবে তিনি সংবাদপত্রের সংস্পর্শে আসেন ১৮৪২ সনের এপ্রিল মাসে। 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' মাসিক রূপে এই মাস হইতে প্রথম বাহির হয়। ইহার সাধারণ সম্পাদক ও পরিচালক ছিলেন রামগোপাল ঘোষ। কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই পত্রিকা প্রকাশের জল্পনা চলিতেছিল। রামগোপাল এই সম্পর্কে বন্ধু গোবিন্দচন্দ্র বসাককে একখানি দীর্ঘ পত্র লেখেন। আবশ্যক অংশ এখানে উদ্ধৃত হইল,—

"The magazine is to appear, if possible, on the 1st proximo. Krishna, Tarachand and Peary are to be regular contributors. They are pledged each of them to give one article each number. Tarachand will also look over the articles generally, and I am to be the puppet show and probably an occasional scribbler."

ইহা হইতে বুঝা যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও প্যারীচাঁদ মিত্র প্রত্যেকেই ইহাতে প্রতিসংখ্যায় লিখিবেন এবং বিশেষ করিয়া তারাচাঁদ প্রবন্ধগুলি দেখিয়া দিবেন স্থির হইয়াছিল। পত্রিকাখানি ১৮৪২ সনের সেপ্টেম্বর মাস হইতে পাক্ষিক এবং পর বৎসর মার্চ্চ হইতে সাপ্তাহিক রূপে বাহির হয় ও পরবর্ত্তী ২০ এ নভেম্বর শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পর উঠিয়া যায়। পত্রিকা সম্পাদনের রামগোপাল উক্ত পত্রে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহার কোনরূপ অন্যথা হইয়াছে বলিয়া পরে কোথাও উল্লিখিত হয় নাই। পত্রিকাখানি অগৌণে নব্যবঙ্গের মুখপত্র হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিল। ইহা যেমন সরকারের কৃতকর্ম্মের কঠোর সমালোচনা করিতে কুণ্ঠিত হইত না তেমনই সমাজের নানা গলদ উদ্‌ঘাটিত করিতেও পশ্চাৎপদ হইত না। প্রগতিমূলক সকল প্রচেষ্টারই ইহা অগ্রণী ছিল।

এই প্রসঙ্গে বিমান বাবুর পুস্তকখানির কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। তিনি 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটরে'র সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলি সাধারণতঃ তারাচাঁদের লেখা এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন (পৃঃ ১১০)। আর এই নিবন্ধগুলির নিরিখেই তাঁহার রাজনৈতিক ও সামাজিক মতামতের আলোচনা করিয়াছেন। অবশ্য, 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটরে' প্রকাশিত অভিমত সম্পর্কে ইহার সম্পাদক-গোষ্ঠি সাধারণতঃ একমত ছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া ইহার সব বা প্রায় সব নিবন্ধই তারাচাঁদের লেখা এরূপ ধরিয়া লওয়ায় বিপদ কম নহে। রামমোহন সম্পর্কে এই পত্রিকায় যে সব মন্তব্য বাহির হইয়াছে, তাহা তারাচাঁদের লেখা মানিয়া লওয়া কঠিন নয়। কিন্তু ডিরোজিও, স্ত্রীশিক্ষা, ধর্ম্মসভা ও বিবিধ সামাজিক, নৈতিক ও রাষ্ট্রিক সব বা প্রায় সব মন্তব্যেরই রচয়িতা তারাচাঁদ এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না। কৃষ্ণ-

* The Calcutta Review, January, 1911.

মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্যারীচাঁদ মিত্রও হইাতে রীতিমত লিখিতেন। সুতরাং একমাত্র তারাচাঁদের উপর এই সব রচনা আরোপ করিলে অন্যদের উপরও হয়ত অবিচার করা হইবে। তবে তারাচাঁদ তখন নব্য বঙ্গের, এমন কি সম্পাদক গোষ্ঠিরও নেতৃস্থানীয়। তাঁহার নির্দেশ ইঁহারা সাগ্রহে মানিয়া চলিতেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার এই সব নির্দেশ বা অভিমতের স্পষ্ট রূপ আমাদের জানিবার উপায় না থাকায় বহুক্ষেত্রে অনুমানের আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

১৮৪২ সনের ডিসেম্বর মাসে দ্বারকানাথ ঠাকুর ভারতবর্ষে ফিরিবার কালে বিলাতের পার্লামেণ্ট সদস্য মানবহিতৈষী জর্জ টমসনকে সঙ্গে লইয়া আসেন। টমসন ইতিপূর্ব্বে ক্রীতদাস-প্রথার উচ্ছেদ-সাধনের জন্য আন্দোলন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তখন বিলাতে ভারত-কথা আলোচনার জন্য ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি নামে একটি সমিতি ছিল। টমসন ইহার একজন বিশিষ্ট সভ্য। ভারতবর্ষের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া লইতে তিনি এ দেশে আগমন করেন। ১৮৪৩, ১১ই জানুয়ারী "সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভার" অধিবেশনে নব্য বঙ্গের মুখপাত্রগণের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইলেন। তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হইলে সভার তরফ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হয়।

সভার সভ্যগণ ইহাতেই নিরস্ত না হইয়া যাহাতে প্রতি সপ্তাহে তাঁহারা এক স্থানে মিলিত হইয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিতে পারেন, সে জন্যও উদ্যোগী হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগান-বাড়ীতে প্রতি সোমবারে সভা হইবে স্থির হইল। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি করিবার জন্য ইহার সম্পাদক নিযুক্ত হন।* ক্রমে যখন লোকসমাগম বেশী হইতে লাগিল, তখন ৩১ নং ফৌজদারী বালাখানায় সভা স্থানান্তরিত হইল। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এইখানে অধিবেশনে উপস্থিত হইতেন, টমসনের বক্তৃতা মনোযোগপূর্ব্বক শুনিতেন ও আলোচনায় যোগদান করিতেন। ক্রমে সঙ্ঘবদ্ধভাবে রাজনীতি আলোচনার জন্য একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভূত হইলে ইহা স্থাপনেরও প্রস্তাব হইল। 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর'-ও টমসনের সাহায্যে মার্চ্চ মাস হইতে সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। এ সম্বন্ধে উহার ২য় খণ্ড ৪-৫ সংখ্যায় এইরূপ বিজ্ঞপ্তি বাহির হয় যে, 'এতৎ ক্ষুদ্র পত্রিকাদ্বারা যাহাতে ভারতবর্ষের উপকার হয়, তন্নিমিত্ত উক্ত সাহেব অতি যত্নবান্'।

পরবর্ত্তী ২০এ এপ্রিল বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী স্থাপিত হইল। যে সভায় ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাতে টমসন সভাপতিত্ব করিলেও প্রস্তাবগুলির উত্থাপক ও সমর্থক প্রায় সকলেই বাঙ্গালী ছিলেন। সোসাইটী গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী। সভাপতি টমসন তারাচাঁদকে এই প্রস্তাবটী উত্থাপন করিতে আহ্বান করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি তারাচাঁদ সম্পর্কে বলেন—

"A man whose earnest though quiet zeal, whose retiring modesty, whose benevolent feelings, and whose incorruptible integrity, entitled him and, had he believed we might say won for him, the esteem and admiration of all who knew him. *

টমসন সাহেবের এই প্রশংসা হইতে তারাচাঁদের উন্নত চরিত্রের কথাই শুধু জানা যাইতেছে না, তিনি প্রস্তাবিত বিষয়টি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যে বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন, তাহারও আভাস পাওয়া যায়। এই জন্যই বোধ হয়, মূল প্রস্তাবটি তাঁহার দ্বারা উত্থাপিত করা হয়। তারাচাঁদের উত্থাপিত প্রস্তাবটি এই,—

That a Society be now formed and denominated the Bengal British India Society; the object of which shall be, the collection and dissemination of information, relating to the actual condition of the people of British India, and the Laws, Institutions and the Resources of

*The Bengal Hurkaru, February 8, 1843

*The Bengal Hurkaru, April 24, 1843

the country ; and to employ such other means of a peaceable and lawful character, as may appear calculated to secure the welfare, extend the just rights and advance the interests of all classes of our fellow subjects."

সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হইল। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, চন্দ্রশেখর দেব, রামগোপাল ঘোষ ও প্যারীচাঁদ মিত্র এই চারিজনকে লইয়া বিবৃতি রচনা ও কর্ম্মচারী নিয়োগের জন্ম কমিটি নিযুক্ত হইল।* ইঁহাদের দ্বারাই সমিতির কার্য্য প্রথমতঃ আরম্ভ হয়। পর বৎসর ২রা মে তারিখে সোসাইটির প্রথম বার্ষিক সভা হয়। ইহাতেও তারাচাঁদ অন্যান্ত বন্ধুদের সঙ্গে সোসাইটির কর্ম্ম-কর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন।† এইরূপে ভারতবর্ষে নিছক রাজনীতি-চর্চ্চার সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য—যাহা তারাচাঁদের প্রস্তাবে ব্যক্ত হইয়াছে, পরবর্ত্তী কালে কংগ্রেসের প্রথম যুগ পর্য্যন্ত এ দেশের রাজনীতি চর্চ্চাকে প্রভাবিত করিয়াছিল, ও তাহা এই খাতেই চলিয়াছিল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-প্রচেষ্টার ইতিহাসে ইহা একটি স্মরণীয় ঘটনা।

ইতিমধ্যে এমন আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহাতে নব্যদলের নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। ১৮৪৩, ৮ই ফেব্রুয়ারী হিন্দুকলেজ গৃহে সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভার এক অধিবেশন হয়। স্থায়ী সভাপতি তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী এ দিনেও সভাপতিত্ব করিতেছিলেন। সভায় দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় "The Present State of the East India Company's Criminal Judicature and Police, Under the Bengal Presidency" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। হিন্দুকলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ ক্যাপটেন ডি. এল. রিচার্ডসন নিমন্ত্রিত হইয়া সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রবন্ধের যেখানে সরকারের কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হইতেছিল, তাহা শুনিয়া রিচার্ডসন চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তিনি প্রবন্ধ পাঠে বাধা দিয়া অন্যান্ত কথার মধ্যে বলিলেন যে, কলেজ-গৃহকে তিনি রাজদ্রোহের আস্তানায় পরিণত [illegible]তে দিবেন না। তাঁহার এতাদৃশ বাধাদানে সভাপতি তারাচাঁদ দৃঢ় অথচ স্পষ্টভাবে বলেন যে, রিচার্ডসন কলেজ-গৃহের অধ্যক্ষ নহেন, ইহা ব্যবহারের অনুমতি তাঁহার নিকট হইতে লওয়া হয় নাই। তিনি অভ্যাগত মাত্র। তাঁহার মন্তব্য কিছুতেই সমীচীন হয় নাই। উহা তাঁহাকে প্রত্যাহার করিতেই হইবে। তিনি যদি তাঁহার উক্তি প্রত্যাহার না করেন, তাহা হইলে কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষের এবং প্রয়োজন হইলে গবর্ণমেণ্টের গোচরেও এই ব্যাপার তাঁহাকে আনিতে হইবে। দক্ষিণারঞ্জন এই আদেশ সমর্থন করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। সহকারী সভাপতি কালাচাঁদ শেঠও ইহা সমর্থন করেন। সভার ভাবগতিক দেখিয়া রিচার্ডসন অগত্যা তাঁহার মন্তব্য প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হন। সভার কর্ত্তৃপক্ষ এখানে আর সভা করিবেন না—স্থির করেন।*

এ ব্যাপারের কিন্তু এখানেই পরিসমাপ্তি হইল না। সংবাদপত্রসমূহে এ বিষয় লইয়া তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইল। 'ইংলিশম্যান', 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' প্রমুখ সরকার-ঘেঁষা পত্রিকাগুলি নব্যদলের রাজনীতি-চর্চ্চা লইয়া নানা রূপ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, কটুকাটব্য করিতে লাগিল। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী এই দলের নেতা বলিয়া ইহার নামকরণ হইল 'চক্রবর্ত্তী ফ্যাকশন' বা 'চক্রবর্ত্তী চক্র'। দক্ষিণারঞ্জনের অন্য একটি বক্তৃতার উপর মন্তব্য করিতে গিয়া 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' লেখেন যে, উহা খাঁটি রাজদ্রোহাত্মক এবং এরূপ রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা বাটাভিয়া বা সামারঙে (যবদ্বীপ) করা হইলে, কম করিয়া হইলেও বক্তাকে নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করা হইত।† সে যাহা হউক, দক্ষিণারঞ্জনের আলোচ্য বক্তৃতাটি বেঙ্গল হরকরা পরবর্ত্তী ২রা ও ৩রা মার্চ্চ সংখ্যায় সবটাই প্রকাশিত করেন এবং এই বলিয়া বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, ইহার মধ্যে এমন কিছুই নাই, যাহার জন্য নব্যদল এ রূপ নিন্দাভাজন হইতে পারেন। বলা বাহুল্য, বেঙ্গল হরকরা এই সময় নব্যদলের কার্য্যকলাপে সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিলেন।

* The Bengal Harkaru, April 24, 1843.

† The Friend of India, May 9, 1844.

* এই বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ ১৮৪৩ সনের ১০ই ফেব্রুয়ারী সংখ্যা 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রিকায় দ্রষ্টব্য।

† The Friend of India, February 16, 1843.

এইরূপ বিরুদ্ধ ও কঠোর সমালোচনা হইলেও তারাচাঁদের নেতৃত্বে নব্যবঙ্গ যে রাজনীতি চর্চ্চা নবোদ্যমে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় ও অন্যান্য কার্য্যকলাপে বুঝা গিয়াছে। তারাচাঁদ বক্তা নহেন, কিন্তু নীরবে যতটা সম্ভব কার্য্য করিয়া যাইতেন। ১৮৪৩ সনের নভেম্বর মাসে অর্থকৃচ্ছ্রতার জন্য নব্যযুগের মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' তুলিয়া দিতে হইল। কিন্তু রাজনীতি চর্চ্চার প্রধান অবলম্বন সংবাদপত্র। খুব সম্ভব এই সময় 'দি কুইল' নামক সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়া তারাচাঁদ এই অভাব মিটাইয়া ছিলেন। এই পত্রিকার ফাইল পাওয়া যায় নাই। ইহা প্রকাশের ও বন্ধ হইয়া যাইবার দিন তারিখও জানিতে পারি নাই। তবে ১৮৪৬ সনে তারাচাঁদ বর্দ্ধমান রাজের দেওয়ান রূপে অবস্থান করিতেছিলেন।* কাজেই ইহার পূর্ব্বে 'কুইল' প্রকাশ ও বন্ধ হইয়া থাকিবে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এই পত্রিকাখানি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"তিনি [তারাচাঁদ] 'The Quill' নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করিতেন এবং তাহাতে গবর্ণমেণ্টের রাজ-কার্য্যের দোষ-গুণ বিচার করিতেন। তাহা গবর্ণমেণ্ট পক্ষীয় ব্যক্তিগণের অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল।"

তারাচাঁদ ১৮৫১ সনের আরম্ভ অবধি বর্দ্ধমান রাজের দেওয়ানী কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময় কলিকাতার জনহিতকর প্রচেষ্টায় কায়মনে যোগদান করা সম্ভবপর ছিল না। তথাপি একটি ব্যাপারের সঙ্গে তাঁহার নাম যুক্ত দেখিতেছি। গত শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে, বিশেষতঃ তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে কলিকাতায় তথা বঙ্গদেশে খ্রীষ্টীয়ান হইবার ধুম পড়িয়া যায়। সনাতনী, প্রগতিপন্থী উভয় দলই ইহাতে প্রমাদ গণিলেন। ইহার প্রতিষেধ কল্পে হিন্দুসন্তানদের জন্য খ্রীষ্টানী ভাবমুক্ত একটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য হিন্দু প্রধানেরা অগ্রসর হন। 'হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয়' নামে ইহা পরিচিত হইবে স্থির হয়। রাধাকান্ত দেব, মতিলাল শীল, আশুতোষ দেব, রমাপ্রসাদ রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বিশিষ্ট প্রাচীন ও নব্যপন্থীদের লইয়া একটি কর্ম্মীসংঘ গঠিত হয়। কিন্তু ১৮৪৮ সনে ইউনিয়ান ব্যাঙ্ক ফেল পড়ায় গচ্ছিত অর্থ নষ্ট হইয়া যায়। বিদ্যালয়ও আর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

তারাচাঁদ ১৮৫১ সনের প্রথমেই বর্দ্ধমানের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন। তাঁহার পদত্যাগ সম্বন্ধে ১৮৫১, ৭ই ফেব্রুয়ারী সংখ্যা 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' লেখেন,—

"বর্দ্ধমানাধিপতির মন্ত্রী—শ্রীযুত বাবু তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী বর্দ্ধমানাধিপতির মন্ত্রীস্বরূপে থাকিয়া কএক বৎসর রাজ সম্পর্কীয় কার্য্য উত্তম রূপ নির্ব্বাহ করাইতেছিলেন এবং তাঁহার গুণগরিমায় সকলে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার গৌরব করিত। উক্ত মহাশয় কয়দিন হইল আপন পদ পরিত্যাগ করিয়া এখান হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। এক্ষণে তৎপদে শ্রীযুত বাবু শম্ভুচন্দ্র ঘোষ নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুত বাবু চন্দ্রশেখর দে ইতিপূর্ব্বে রাজদরবারের কর্ম্মত্যাগ করিয়াছিলেন বাবু তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীও ত্যাগ করিলেন, কারণ কি বলিতে পারা যায় না।"

তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী যে শেষ জীবনেও প্যারীচাঁদ মিত্রের সঙ্গে ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর রামতনু লাহিড়ী সম্পর্কীয় পুস্তকের কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে। এই সময় মনে হয়, তিনি কতকটা নিরিবিলি ও অবসর জীবন যাপন করিতেছিলেন। কারণ এ সময়কার প্রচেষ্টাগুলিতে তাঁহার সংযোগের আর উল্লেখ পাই না। শাস্ত্রী মহাশয়ের কথায় জানা যায়, তারাচাঁদ ১৮৫৫ সনে ইহলোক ত্যাগ করেন। কিন্তু সমসাময়িক পত্রপত্রী তাহাতে যাহা পাওয়া যাইতেছে, কোথাও তারাচাঁদের মৃত্যুসংবাদের উল্লেখ নাই। অথচ তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর নাম এককালে শিক্ষিত সমাজে খুবই প্রচলিত ছিল। শাস্ত্রী মহাশয় প্রদত্ত মৃত্যু-সন সঠিক কি না, তাহা যাচাই করিয়া লইবার এখনও সুতরাং অবকাশ আছে। তারাচাঁদ-জীবনের বহু ঘটনার মত মৃত্যুও কি রহস্যজালে আবৃত থাকিবে?

তারাচাঁদ সম্বন্ধে এখানে যে আলোচনা করিলাম, তাহা সম্পূর্ণ নহে, তথাপি যতটুকু নূতন কথা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার নিরিখে তারাচাঁদের গুণপণা ও শক্তি-সামর্থ্যের কতকটা সঠিক আভাস পাওয়া যাইবে। পূর্ব্ববর্ত্তিগণের আলোচনাও ইহা দ্বারা কথঞ্চিৎ সংশোধন ও

* রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত, পৃঃ ৫৫।

যাচাই করিয়া লওয়া সম্ভব হইবে। তারাচাঁদ সম্বন্ধে এখনও অনেক কথা জানিতে বাকী। তাঁহার মৃত্যু-তারিখটি পর্য্যন্ত ঠিক ঠিক পাওয়া যাইতেছে না। তাঁহার বংশধরগণ কেহ জীবিত আছেন কি না, জানি না। তাঁহারা কেহ জীবিত থাকিলে বহু নূতন তথ্যের সন্ধান হয়ত দিতে পারিবেন।

আরম্ভেই বলিয়াছি, তারাচাঁদ ও সুরেন্দ্রনাথের জীবনে ও কর্ম্মে অনেকটা সাদৃশ্য আছে। কিন্তু বৈষম্যও ছিল। সুরেন্দ্রনাথ বাগ্মী, কিন্তু তারাচাঁদ মিতভাষী, নীরব কর্ম্মী। তবে আসল উদ্দেশ্যে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। দেশমাতৃকার সেবাই ইঁহাদের সকল কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। তারাচাঁদ সুরেন্দ্রনাথের ন্যায় নির্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন তো বটেই, তিনি সম-সময়ের সরকারী বিচার ও অন্যান্য বিভাগের অনাচার ও দুর্নীতির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় লাভেও সমর্থ হইয়াছিলেন। তাই পরবর্ত্তী রাজনীতিক আন্দোলনগুলির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হইয়াছিল এই বহু-ব্যাপ্ত দুর্নীতির বিলোপসাধন। দক্ষিণারঞ্জন তাঁহার বক্তৃতায় যে সব দুর্নীতির কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহার অনেকগুলিই তারাচাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত। বঙ্গদেশ, তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনের গোড়াপত্তনে তারাচাঁদ তাঁহার সমস্ত অভিজ্ঞতা, পাণ্ডিত্য ও শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। এ জন্য তিনি কখনও রাজ-পুরুষদের সুনজরে ছিলেন না। এরূপ দেশহিতব্রতীর পুণ্য জীবন-কথা আলোচনা করিয়া আমরা বিশেষ উপকৃত হইতে পারি।

কবিতা

—শ্রীঅনুরূপা দেবী

নিবেদন

যা কিছু ছিল মম, এনেছি উপহার
ক্ষুদ্র জীবনের তুচ্ছ উপচার,
ধর গো ধর হাতে আশিস্ দানো মাথে,
কণ্ঠে ধর প্রভু! এ মম গাঁথা হার।
চরণ-সরোরুহে মন-মধুপ মম,
ফেরিয়া ফিরে যেন মুগ্ধ অলিসম,
বিষাদে বেদনায়, বিপথে নাহি যায়,
ও দুটী পদতলে রাখিও স্থান তার।

আবেদন

জীবন-খাতার পাতায় পাতায় নামটী তোমার লিখিয়ে দাও
পুরানো সব কালির আঁখর মুছিয়ে নিতে শিখিয়ে দাও।
শব্দ-জালের ভাঙা বেড়ায়, মন-পাখী মোর উড়ে বেড়ায়,
পিঞ্জরে তায় বসিয়ে গলায়, নামের মালা দুলিয়ে দাও।
মন-ভোলানো তুচ্ছ কাজে, রেখ না এই বিশ্বমাঝে,
তোমার মহান্ কাজের ঠেলায়, তুচ্ছতা মোর ভুলিয়ে দাও।

সমবেদন

অন্ধ তমসা-ভরা বিজন এ হৃদি-মন
গোপন গুহার তলে ঘনাবৃত অনুক্ষণ।
নিবিড় আঁধার গায়, বিজলী চমক প্রায়,
তোমার করুণা-জ্যোতিঃ মাঝে মাঝে দেখা যায়।
এ জ্যোতিঃ বিশোক সম, কত দিনে প্রিয়তম!
স্থির জ্যোতি হয়ে থাকি আলোকিবে এ জীবন?

গান

[১]

ওগো, শেষের দিনের সাথি! আমি তোমার
সঙ্গ পাব কি?
নৈলে, ঘোর বিপাকের পাকে পাকে পাক্
খেয়েই শেষ যাব কি?
ঝড়-তুফানের টানে টানে এগিয়ে চলি
অতল পানে,
তলিয়ে যদি যাই সেখানে,
তবে, তোমারে আর চাব কি?

[২]

আমার যাত্রাপথের শেষ যেখানে, সেইখানেতে থেক,
পথ যেখানে হারিয়ে যাবে, নামটী ধরে ডেক,
তোমার বাণী কানে, যেন পশে এসে প্রাণে,
নিশার আঁধার প্রাক্রান্ত হলে, তোমার, আলোক-শিখায়
ঢেক।

আলোচনা

ব্যাকরণ-বিভ্রাট

সুগৃহীত-নামা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় 'ব্যাকরণ-কৌমুদী' লিখিয়া প্রাথমিক সংস্কৃত শিক্ষার পথ বহু গুণে বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমানে তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বহু বৈয়াকরণ প্রাথমিক সংস্কৃত-শিক্ষার্থী-দিগকে নূতন নূতন সুবিধা আনিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। পণ্ডিত-মণ্ডলীর অশেষ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দুই এক স্থানে প্রথম-শিক্ষার্থীদের ক্লেশের লাঘব হয় নাই।

ব্যাকরণ-কৌমুদীর পুনঃসংস্কার অনেকেই করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের সম্পাদিত পুস্তকগুলি আগাগোড়া পাঠ করিয়া যে একটা সমালোচনা করিব, এমন বুদ্ধি, বিদ্যা বা শক্তি কিছুই নাই। মাত্র দুই একটা স্থানে কৌমুদী ও বিভিন্ন ব্যাকরণ-লেখকগণ কি বলিয়াছেন, তাহাই মাত্র আলোচনা করিব।

প্রথমেই একটী উদাহরণ লইব, নতুবা আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করা আমার পক্ষে সুকঠিন।

উদাহরণটী এই :—'While walking along the path, he was seen by three running thieves', এই ইংরেজী বাক্যটীর সংস্কৃত অনুবাদ করিতে হইলে, 'walking এবং running' এই দুইটী ক্রিয়াপদ সংস্কৃতের 'শতৃ' ও 'ক্বসু' এই দুইটীর কোন্ প্রত্যয়টী দ্বারা নিষ্পাদিত করা উচিত, ইহাই আলোচনার বিষয়। কথাটি আরও স্পষ্ট করিয়া বলি, বর্ত্তমানকালে বিহিত 'শতৃ' প্রত্যয় বর্ত্তমান ভিন্ন অন্যকালেও ব্যবহৃত হয় কি না, এবং লৌকিক সংস্কৃতে 'ক্বসু' প্রত্যয়ের বহুল প্রয়োগ আছে কি না।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় 'শতৃ' ও 'ক্বসু' সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ধাতুর উত্তর বর্ত্তমানকালে 'শতৃ' এবং অতীতে 'ক্বসু' হয়। পরবর্ত্তী কৌমুদী সম্পাদকমণ্ডলীর প্রত্যেকের পুস্তক দেখার মত সৌভাগ্য আমার হয় নাই। মাত্র শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর, শ্রীযুক্ত হরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জগত্তারণ দাস, শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, এই পণ্ডিত চতুষ্টয়ের সম্পাদিত পুস্তক চারিখানা দেখিয়াছি। শ্রীযুক্ত জগত্তারণ দাস ভিন্ন অন্য পণ্ডিতত্রয় 'শতৃ' ও ক্বসু'র বেলায় ঐকমত্য প্রকাশ করিয়া, আসল কৌমুদী অনুসারে 'বর্ত্তমানে শতৃ' ও 'অতীতে ক্বসু' করিয়াছেন।

কৌমুদী ভিন্ন স্বাধীন ভাবে যাঁহারা প্রথম-শিক্ষার্থীদের সাহায্যকল্পে সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার 'A Manual of Higher Sanskrit Grammar and Composition' নামক পুস্তিকার ২০৬ পৃষ্ঠার ৩নং শাখা-সূত্রে বলিয়াছেন : "The present participle (শতৃ) is seen with the past tense to denote the past time ; as বসন্ দদর্শ, আগচ্ছন্ উবাচ।" এই পুস্তকেরই ২০৯ পৃষ্ঠার ১নং শাখা সূত্রে বলিয়াছেন,—'The use of the perfect participle (ক্বসু) is vey limited ; as স [illegible] মমার, these forms are substituted in place of লিট্। In Classical Sanskrit, we meet with the perfect participle forms of সদ্, বস্, শ্রু, গম্, হন্, বিদ্ and দৃশ্, only ;" পাদটীকায় 'ভাষায়াং সদ-বস-শ্রুবঃ' এই অষ্টাধ্যায়ীর সূত্রটিও দিয়াছেন।

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্ত্তৃক 'সংস্কৃত-ব্যাকরণ-প্রবেশিকা' নামে একখানা ব্যাকরণ উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের পাঠ্য স্বরূপ মনোনীত হইয়া সম্পাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকের ৩১০ পৃষ্ঠার পাদটীকায় লেখা আছে,—"ধাতু-সম্বন্ধে প্রত্যয়াঃ—ধাত্বর্থানাং সম্বন্ধে যত্র কালে প্রত্যয়াঃ উক্তাস্ততোঽন্যত্রাপি স্যুঃ। তিঙন্ত অর্থাৎ মুখ্য ক্রিয়ার কালের অনুরোধে, যে কালে যে প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে, তদন্যকালেও (অর্থাৎ মুখ্য ক্রিয়ার কালেও) সে প্রত্যয় হয়। 'বসন্ দদর্শ' এই বাক্যে 'দদর্শ' এই মুখ্য ক্রিয়ার ভূত কালের অনুরোধে 'বসন্' এই সুবন্ত পদস্থ বর্ত্তমানকালে বিহিত শতৃ প্রত্যয় ভূত কালে হইয়াছে। সোমযাজী অস্য পুত্রো জনিতা—পুত্রোঽস্য জনিতা য চ সোমেন যষ্টা ; এখানে ভূত কালে বিহিত ণিনি প্রত্যয় ভবিষ্যৎ কালে হইয়াছে। সোমেন ইষ্টবান্ ইতি সোমযাজী, করণে যজঃ (পাণিনি ৩।২।৮৫)। গোমান্ আসীৎ—গাবোঽস্য আসন্, গোমান্ ভবিতা—গাবোঽস্য ভবিতারঃ, তদস্যাস্ত্যস্মিন্নিতি মতুপ্। নিবৃত্তবিপ্লবো মনো ন বিরাগে (ভবিষ্যৎ কালে বিহিত ক্তবতু ভূত কালে হইয়াছে)। কৃতঃ কটঃ শ্বো ভবিতা।"

এই পুস্তকেই 'ক্বসু' প্রত্যয়ের ব্যাখ্যায় পাদটীকায় লেখা আছে,—"ছন্দসি লিট্ (ভূত-সামান্যে)। লিটঃ কানজ্ বা ক্বসুশ্চ। ভূত-সামান্যে ছন্দসি লিট্, তস্য বিধীয়মানৌ ক্বসু-কানচৌ অপি ছান্দসৌ ইতি ত্রিমুনিমতম্, কবয়স্তু বহুলং প্রযুঞ্জতে। ভাষায়াং সদ-বস-শ্রুবঃ, উপেয়িবান্ অনাশ্বান্ অনূচানশ্চ।"

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বনমালী বেদান্ততীর্থ, এম্-এ মহোদয় এবং শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র বেদান্ততীর্থ, এম্-এ মহাশয় এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

পণ্ডিত জগত্তারণ দাস মহাশয়ও শতৃর কাল-নির্ণয় এবং ক্বসুর ব্যবহার উক্ত প্রকারই দেখাইয়াছেন, তবে তত পরিস্ফুট করেন নাই।

পণ্ডিত নবচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় শতৃ-র বেলায় প্রাগুক্ত কৌমুদী-সম্পাদক-ত্রয়ের সহিত একমত না হইলেও 'ক্বসু'র বেলায় এক মতেই চলিয়াছেন। তিনি তাঁহার 'পাণিনি-সার' নামক গ্রন্থের নবম সংস্করণের ২০২ পৃষ্ঠায় ৮৮নং সূত্রে শতৃ শানচের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, "শতৃ-শানচ্ যদিও বর্ত্তমান কালে বিহিত হউক, তথাপি 'ধাতু সম্বন্ধে প্রত্যয়াঃ' এই সূত্র দ্বারা মুখ্য ক্রিয়ার অধীন হইয়া কাল প্রকাশ করিবে। যথা, 'বসন্ দদর্শ' এখানে অতীত কাল বুঝাইবে।

অবশ্য, উক্ত ব্যাকরণ সমূহের কোনখানাই ব্যাকরণ বিষয়ে প্রামাণ্য-পুস্তক অর্থাৎ চরম মীমাংসার স্থল নহে। ব্যাকরণের চরম প্রমাণ পাণিনি-কাত্যায়ন এবং পতঞ্জলি (ত্রিমুনি) যাহা বলিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বদা সকল স্থলেই চূড়ান্ত মীমাংসা বলিয়া পরিগণিত হয়। 'ক্বসু' মাত্র বৈদিক ভাষায় প্রযুক্ত হয়, ইহা উক্ত তিন মুনিই বলেন, এবং বর্ত্তমান ভিন্ন অন্যকালেও 'শতৃ' হয়, ইহাও বলেন।

এক্ষণে বলা বাহুল্য যে, 'ধাবদ্ভিঃ তস্করৈস্ত্রিভিঃ পথি দৃষ্টঃ স চলন্', এ প্রকার শতৃ প্রয়োগ না করিয়া কেহ যদি যাস্, ও চল্ ধাতুর উত্তর ক্বসু প্রয়োগ করেন, তবে ঐ লেখাটা সম্পূর্ণরূপেই অশুদ্ধ হইবে।

—শ্রীনলিনীভূষণ ভট্টাচার্য্য

রাজসাহী জেলা-পরিচিতি

—শ্রীসুশীল রায়

গত সংখ্যায় রাজসাহী জিলার অধিবাসী সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব বিশদ আলোচনা শেষ হইয়াছে। মানব-অধিবাসী ছাড়াও এখানে অন্য শ্রেণীর যে-অধিবাসী আছে, আজ তাহাদের বিষয় কিছু বলার ইচ্ছা। এখানে জীবজন্তু ও পশুপক্ষীর কথা বলিতে চাই।

এই জিলার আভ্যন্তরীণ প্রাণি-তত্ত্ব লিখিবার আগে ভূমিকাস্বরূপ প্রথমে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করিলে বক্তব্য স্পষ্ট হইবে আশা হয়।

ভারতবর্ষের মানব-অধিবাসীর মধ্যে জাতিগত, ভাষাগত, প্রকৃতিগত, আকৃতিগত যে প্রকাণ্ড একটা ভেদের পরিচয় আমরা পাই, জীবজন্তুর আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিতে গেলেও আমরা সেই বিভেদের বিশালতা প্রত্যক্ষ করি আরও বিস্ময়কর রূপে। এত বিভিন্ন প্রকারের, এত অভিনব আকারের জীবজন্তু ও কীট-পতঙ্গের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে যে, তাহাদের সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভবপর নয়। তাহার কারণ, ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক বিভাগ ও আবহ-অবস্থা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপ। সুতরাং উক্ত স্থানাবলীর প্রাণীদের আকার-প্রকার বিভিন্নতর হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। মন্‌সুন্‌-বাতাস বছর বছর ঠিক একস্থান দিয়া উড়িয়া আসিয়া তাহার প্রভাব বিস্তার করে দিকে দিকে, নানা নানা রূপে। কোথাও বৃষ্টি হয় অতিমাত্রায়, কোথাও বা অনাবৃষ্টিতে দেশ শুকাইয়া উঠে। তা ছাড়া, কোন স্থানে গ্রীষ্মের অত্যন্ত প্রাখর্য্য, কোথাও আবার শৈত্য অতি নিদারুণ। এই সব কারণেই ভারতবর্ষের জীবজন্তুদের আচার-বিচার, হাব-ভাব, আকৃতি-প্রকৃতি, জীবন-ধারণ-প্রণালী এক এক স্থানে এক এক রূপ হইতে বাধ্য। ইহাদের মধ্যে পাখী-শ্রেণী ও কীট-পতঙ্গের ভেদাভেদই দেখা যায় অতি বিচিত্ররূপে।

বিজ্ঞানের দিক্ হইতে এই বিষয়ক আলোচনা আমাদের দেশে বর্ত্তমান কালে একেবারেই হয় নাই। এই সম্বন্ধে কোন আলোচনা চলিতে পারে, চলা উচিত এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, আজও সংবাদ ও সাহিত্যপত্রের রাজনীতি-মত্ততার দিকে চাহিয়া মনে হওয়া কঠিন।

রাজসাহীর পশু

প্রথম বানর। এই জীবের সংখ্যা এই জিলায় খুব বেশি না থাকিলে জঙ্গলে ইহাদের গাছে গাছে উৎপাতের বিরাম নাই। লোকালয়ে ইহাদের বড়-একটা দেখা যায় না। ইহাদের মধ্যে জাতিভেদ আছে। জাতিভেদ অর্থে আকারের পার্থক্য। Gibbon সম্প্রদায়ভুক্ত hylobates জাতির বানর আসামের জঙ্গলে দলে দলে বিচরণ করিলেও, এখানে তাহাদের সংসারের দুই একটি নিরুদ্দিষ্ট শিশুকে পাওয়া গিয়াছে। তা ছাড়া, রামায়ণ খ্যাত হনুমানের বংশধরগণ তাহাদের দীর্ঘ লাঙ্গুল ও ঋজু অবয়ব লইয়া অন্তরালে লুকাইয়া থাকিলেও মাঝে মাঝে ধূমকেতুর মত লোকালয়ে আসিয়া হানা দেয়। নতুন করিয়া বলা প্রয়োজন মনে করি না যে, ইহারা নিরামিষাশী।

মাংসাশী জন্তুর মধ্যে তিনটি ভাগ করিয়া লওয়া দরকার। (১) মার্জ্জার শ্রেণী: বিড়াল, নেউল, হায়না; (২) কুকুর শ্রেণী: কুকুর, শেয়াল, নেকড়েবাঘ ও খেঁকশেয়ালী; এবং (৩) ভল্লুক শ্রেণী।

ইহারা সকলেই স্থলচর; রাজসাহীতে কেন, ভারতবর্ষের এলাকার মধ্যে জলচর ঠিক যাহাকে মাংসাশী বলা যায়, সেরূপ জীবের চিহ্ন আদৌ পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।

(১) মার্জ্জার-শ্রেণীর মধ্যে অতিকায় বিড়াল বহু পুরাকাল হইতে এখানে দেখা যাইত। কিন্তু সংপ্রতি তাহাদের সংখ্যা কমিতে কমিতে তাহাদের চিহ্ন প্রায় লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। ইহারা বাঁশবন ও ঝোপে ঝাড়ে বাস করিতেই ভালবাসে। এই জিলা হইতে তাহাদের অন্তর্ধানের কারণ সঠিক বলিতে না পারিলেও অনুমান করা যায় যে, এখানে তাহাহারা তাদের বাসোপযোগী স্থানের ও আহারাদির অভাবের দরুণই অন্যত্র গমন করিতে বাধ্য হইয়াছে।

অতিকায় বিড়ালের পর ক্ষুদ্রাকারের বিড়ালের কথা বলিতে হয়। এই জাতির বিড়ালকে আমরা, শুধু রাজসাহীর কেন, বাঙলার ঘরে ঘরে দেখিতে পাই। ইহারা গৃহপালিত জীবের পর্য্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইহাদেরই স্বজাতির

অনেক বিড়াল বনে বনেও বিচরণ করিয়া থাকে। তাহাদের বাসের জন্যে নিবিড় ও ঘন বনের প্রয়োজন হয় না। যেখানে ঘাস, ছোট আগাছা ইত্যাদি আছে, সেখানে ইহারা নিশ্চিন্তে জীবন ধারণ করিতে পারে। বনবাসী এই বিড়াল ছাড়াও বন-বিড়ালী নামে আর এক শ্রেণীর বিড়াল দেখা যায়। ইহারা গাছে গাছে দৌড়াইয়া বেড়ায়। caracal নামের এক প্রকার শিকারী বিড়াল আছে, কিন্তু রাজসাহীতে তাহাদের অস্তিত্ব নাই। Fishing Cat নামের এক জাতির বিড়াল হিমালয়ের জঙ্গলে বেশি বাস করিলেও, রাজসাহীর নদীর কিনারে বনে তাদের অস্তিত্ব মেলে। Golden cat ও marbled cat নামের দুই জাতির বিড়ালের সামান্য দুই একটা রাজসাহীতে কখনও কোথাও কালে ভদ্রে দেখা গিয়াছে। ইহারা সচরাচর হিমালয় পর্ব্বতের পূর্ব্বপ্রান্তে এবং আসাম ও ব্রহ্মদেশেই বাস করে।

এক প্রকারের নেউল আছে যাহারা নদীর কিনার, কর্ষিত ভূমি, জলাভূমি ইত্যাদি স্থানে বাস করিয়া থাকে। নেউলের মধ্যে অনেক প্রকার ভেদ আছে: ruddy mongoose, stripe-necked mongoose, indian mongoose ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত, অর্থাৎ Indian Mongooseই এখানে সাধারণতঃ পাওয়া যায়। ইহারাও বন-বিড়ালীর মত জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ায়। সাপুড়েরা ইহাদের পালন করিয়া থাকে, তাহার কারণ সর্পবিষ নাশের ঔষধ না কি ইহারা জানে, সেই জন্য সর্পদংশন হইতে ইহাদের মৃত্যু বড়-একটা ঘটে না।

হায়না সচরাচর পাহাড়ের কোটরেই থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে ইহাদের চিহ্ন পাহাড়হীন দেশের জঙ্গলেও পাওয়া যায়। যদিও রাজসাহীতে হায়না-আবিষ্কারের কোন তথ্য পাই না।

(২) কুকুরজাতির জীবের মধ্যে অনেকগুলি বিভাগ আছে। ইহার মধ্যে নেকড়েবাঘের দুইটি বিভাগ ও শৃগালের একটি, বন্যকুকুরের দুইটি এবং খেঁক্‌শেয়ালীর পাঁচটি। ইহাদের মধ্যে নেকড়েবাঘের একটি জাতিকে (canis pallipes) রাজসাহী জিলাতে পাওয়া যায়, আর একটি জাতি কেবল পাঞ্জাব ও সিন্ধু দেশেই বাস করে। শৃগাল সম্বন্ধে বেশি বলা দরকার মনে করি না। ইহারা শুধু মাত্র এখানেই নয়, বাঙ্গালায়,



এমন কি, সমস্ত ভারতবর্ষেরই গ্রাম ও সহরের উপকণ্ঠে প্রত্যহ সন্ধ্যার পূর্ব্বে অযথা চেঁচাইয়া অধিবাসীকে বিব্রত করিয়া তুলে। বন্য কুকুর এখানে নাই, ইহারা গভীর বন ছাড়া থাকে না। খেঁক্‌শেয়ালীর উৎপাতও এখানে পুরাদস্তুর বিদ্যমান।

(৩) ভল্লুকবংশের কাহাকেও এই জিলার সীমার মধ্যে কখনও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাই নাই। ইহারা সকলেই বাস করে পাহাড়ে, গ্রীষ্ম বরদাস্ত করিতে পারে না আদৌ।

পতঙ্গজীবীর মধ্যে ছুঁচোর চিহ্ন এখানে পাওয়া যায় বিস্তর।

এবার বাদুড়ের কথা বলিতেছি। ইহাদের প্রায় ৩২টি ভাগ ও ৮০টি জাতি আছে। তাহার মধ্যে সামান্য কয়েকটি জাতির বাদুড়ের বাস এখানে দেখা যায়। ইহারা ফলমূল খাইয়া জীবন ধারণ করে। সারাদিন ইহারা গাছে গাছে দল বাঁধিয়া অন্ধকারের মধ্যে ঝুলিয়া থাকে, তারপর সন্ধ্যার সময় দল বাঁধিয়াই আহারের অন্বেষণে গৃহস্থের বাগানে গিয়া হানা দেয়। যেহেতু আলোয় ইহারা তাকাইতে পারে না, সেই জন্য অন্ধকারই পছন্দ করে বেশি। একটু স্যাঁৎসেঁতে স্থানই ইহাদের বাসের উপযোগী। রাজসাহী সহরের উপকণ্ঠে নদীর কিনারে তালাইমারী নামক স্থানে ইহাদের বৃহৎ একটি সংসার দেখা যায়। তালাইমারী স্থানটী নিরিবিলি, একটু বৃক্ষপ্রধান, অতএব কিছুটা অন্ধকার ও আর্দ্র। এই জিলায় বাদুড়ের সংখ্যা খুবই বেশি। Vampire bat নামে এক জাতির বাদুড় আছে, তাহারা ভগ্ন অট্টালিকার কোণে, মন্দিরের কার্ণিশের নীচে, পরিত্যক্ত ভবনে বাস করে, আর অন্যান্য বাদুড়, ব্যাঙ ও পোকামাকড় খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। তা ছাড়া painted bat নামে আর এক জাতির বাদুড় কলাগাছের উপরেই বেশি বাস করে। তাহারা রম্ভার প্রতি অতি আসক্ত।

ইঁদুর ও মূষিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সচরাচর গৃহস্থের বাড়ীতে চাউল, তরি-তরকারী ইত্যাদির অনিষ্ট সাধনে রত যে জীবদ্বয়ের পরিচয় আমরা পাই ও ক্ষতি স্বীকার করি, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। কারণ, তাহারা বিচরণ করে সর্ব্বত্রই, এখানেও তাহাদের প্রভাব প্রবল। Bush rat (golunda ellioti) নামে খ্যাত ইঁদুর সাধারণতঃ কর্ষিত ভূমির উপর বাস করে। এই জাতির ইঁদুরের দেখা আমরা এখানেও পাই।

খরগোস এই জিলার জঙ্গলে কিছু কিছু দেখা যায়। ইহাদের সংখ্যা এখানে খুব বেশি নয়। তবে এক এক স্থানে ইহাদের দুই একটি দল আছে, যথা—রাজসাহীর সংলগ্ন শিরোইল-নামক গ্রামের পার্শ্বস্থ বনে।

গরু ও মহিষ জাতীয় পশুর মধ্যে Gaur (Indian bison) নামে একপ্রকার তৃণাহারী জীব বেশির ভাগ পর্ব্বতময় স্থানেই বাস করে। রাজসাহীতে পাহাড়ের বালাই না থাকিলেও শিকারীদের বিবৃতি হইতে পাওয়া যায় যে, বনের মধ্যে মাঝে মাঝে ইহাদের সামান্য চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। ব্রহ্মদেশেই এই জীবটির বাস অধিক। ভারতীয় বন্যমহিষ (bubalis bubalis) ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গানদীর তীরে বাস করে। রাজসাহীতে ইহাদের পাওয়া যায়, নদীর কিনারস্থ শা-নগর, চারঘাট ইত্যাদি অঞ্চলে। আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে ইহারা ভীষণ।

মেষ ও ছাগ জাতীয় জীবের মধ্যে মেষের বড় একটা চিহ্ন এখানে নাই। সামান্য যে কয়েকটিকে পাওয়া যায়, তাহারা গৃহপালিত জীবের মত গৃহস্থের বাস-ভবনেই বাস করে কিন্তু ক্ষুদ্রকায় ছাগের সংখ্যা এখানে একেবারে কম নয়। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই গাভীর মত দুগ্ধ-ব্যবসায়ীরা ইহাদিগকেও লালন করে। ইহার দুধ পুষ্টিকর, অতএব দুগ্ধের মূল্যও অধিক।

হরিণের জাতিভেদ অনেক কস্তুরীমৃগের কথা বলিবার প্রয়োজন নাই, ইহারা এ-অঞ্চলে আদৌ বাস করে না, নেপাল কাশ্মীর, সিকিম ইত্যাদি স্থানে পাহাড়ের পাইন রাজ্যেই ইহাদের বাস। এখানে হরিণের সাধারণ জাতিটিকে পাওয়া যায়। গভীর নিঃশব্দ লতাকুঞ্জে ইহারা নিজেদের সদাসন্ত্রস্ত দেহটি লুকাইয়া রাখে।

বন্যবরাহ ও শূকরের মধ্যে প্রথমোক্ত জীবের প্রাধান্য রাজসাহীতে স্বীকৃত। জঙ্গলে ও গ্রামে তাহাদের প্রভাব নিদারুণ, তাহা ছাড়া সদর শহরের উপরেও ব্যবসায়ীরা বন্য বরাহ পালন করে। ইহারা ঘাসপ্রধান বনেই বিচরণ করে। নওগাঁর দিকে ইহাদের সংখ্যা বেশি।

ঘোড়া ও গণ্ডারের মধ্যে কোনটাই এ-অঞ্চলে নাই। গণ্ডার তো নাই-ই, ঘোড়া নাই অর্থে আমি বন্য-অশ্বের কথা বলিতেছি। গাড়ী ও মালবাহী ঘোড়া অবশ্য যথেষ্টই আছে এখানে, কিন্তু তাহাদের উৎপত্তি এখানে হয় নাই। হাতীও এখানে কোন বনে পাওয়া যায় নাই। দীর্ঘবৃক্ষপূর্ণ বন এবং বাঁশঝাড়-বহুল স্থানেই ইহারা বাস করে, রাজসাহীতে অনুরূপ বনের অভাব হেতুই তাহারা এখানে বাস করে না। তবে, রাজসাহীতে হাতীর সংখ্যা যত আছে, বাঙ্গালার অন্য কোন জেলায় তত নাও থাকিতে পারে। কারণ, এখানে প্রত্যেক রাজ-পরিবারই একাধিক হাতী পুষিয়া থাকেন।

পক্ষী

ভারতীয় বনভূমি পার্ব্বত্য অঞ্চল ও প্রান্তরবিহারী পাখী তাহাদের নানারূপ বর্ণ-বৈচিত্র্য ও কাকলির জন্য সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। খুব কম করিয়াও প্রায় ২,৩০০ রকমের বিভিন্ন পাখীর চিহ্ন ভারতে পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে বেশির ভাগই এই ভূখণ্ডের অধিবাসী, কেহ কেহ আবার ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরদিক হইতে এইখানে উড়িয়া আসে, প্রধানতঃ শীতকালেই তাহারা উষ্ণতর স্থানের সন্ধানে সমতল প্রদেশে আসিয়া থাকে।* কোন কোন শ্রেণীর পাখীর মধ্যে এই উভয় প্রকারের পাখীই পাওয়া যায়।

দাঁড়কাক, কাক, jackdaws, rook দিগকে কাক শ্রেণীর পাখীই বলা হয়। ইহারা সাধারণতঃ লোকালয়ে থাকিতে ভালবাসে। এখানে ইহাদের সংখ্যা অনেক। Jackdaw ও rook এর বাঙ্গালা প্রতিশব্দ নাই, তবে ইহাদিগকে কাক বলিয়াই জানিয়া রাখিতে হইবে। ইহারা শীতাগমে ভারতবর্ষে উড়িয়া আসে। রাজশাহী শহরের উপর ইহাদের আবির্ভাব মাঝে মাঝে ঘটিয়া থাকে বটে, তবে ইহাদের স্থায়ী বাস এখানে নাই।

বুলবুলেরা সচরাচর বাগানে ও শহরে বাস করে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বন-জঙ্গলেরই প্রিয় বেশি। তাহাদের গ্রামের ঝোপে-ঝাড়ে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া চড়াই, কোকিল, টিয়া, ময়না, চিল, শঙ্খচিল ও শকুনের চলাচল এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। চড়াইপাখী বেশির ভাগ জনপদে অট্টালিকায় বাস করে। কোকিল নিজ অঙ্গ লুকাইয়া বসন্ত ঋতুতে বৃক্ষান্তরাল হইতে কুহুধ্বনি করে। টিয়া ও ময়না খুব কমই দেখা যায়। চিল ও শকুনের মধ্যে শকুনের সংখ্যাই অধিক। গ্রামে ইহাদের বাস খুব বেশি নয়। রাজশাহীর পদ্মাতীরস্থ ভূখণ্ডেই ইহারা ঝাঁক বাঁধিয়া উড়িয়া আসে। কারণ এখানে তাহাদের খাদ্য গলিত মৃত গবাদি স্রোতে ভাসিয়া আসে, কিংবা তীরেই মৃতদেহ পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া শহরের শ্মশানভূমি তালাইমারীর দিকে শকুনের উৎসব ও বীভৎস চীৎকারে আকাশ মুখরিত হইয়া রহিয়াছে।

পতঙ্গজীবী পাখীর মধ্যে shrike উল্লেখযোগ্য। ইহারা শিকারী জাতি, পতঙ্গ কিংবা অন্যান্য ক্ষুদ্র পক্ষী ধরিয়া নিজ বাসার নিকট কণ্টকে বিদ্ধ করিয়া রাখে।

বাবুই ও অন্যান্য পক্ষী রাজশাহী অঞ্চলে অল্প-বিস্তর দেখা যায়। কিন্তু শহরের দিকে ইহাদের অস্তিত্বের সন্ধান তত মেলে না। নদীকিনারস্থ চারঘাট, সরদহ, এবং নদী হইতে দূরবর্ত্তী গ্রাম পুঠিয়া, শিবপুর অঞ্চলেই ইহাদের বাস বেশি ইহার কারণ ইহারা জনপদের তত ভক্ত নয়।

কাঠ-ঠোকরা পাখী জঙ্গল ছাড়া আদৌ বাস করে না। নিবিড় বনের বৃহৎ বৃক্ষের কোটরেই ইহাদের দেখা যায়। নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে শব্দহীন অরণ্যের গাঢ় স্বপ্নের মধ্যে ইহারা একটানা ঠক্ ঠক্ শব্দ করিয়া মধ্যাহ্নের স্তব্ধতাকে গাঢ়তর করিয়া তোলে। ইহারা বোধহয় জাত-কবি। তাই অরণ্যের পত্রপুঞ্জের আড়ালে বসিয়া অলসভাবে কবিত্ব করিতেই ভালবাসে। অতএব তাহেরপুর, পুঠিয়া, পঞ্চপুর ইত্যাদি স্থানের জঙ্গলেই ইহারা বাস করে।

পেচকের মধ্যে প্রায় ৩৫ রকম-ফের দেখা যায়। তাহার মধ্যে মাত্র দুটি রকমের পেচক এখানে পাওয়া গিয়াছে: ধূসর ও শ্বেত। ইহারা বাদুড়ের মত নিশাচর।

পায়রা, ঘুঘু এখানে বিস্তর পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে পায়রা লোকালয়ে বাস করিতে ভয় পায় না। শহরের বৃহৎ অট্টালিকার কার্ণিশের নীচে ইহারা ঝাঁক বাঁধিয়া বাস করিয়া থাকে। কিন্তু ঘুঘু বাস করে পড়ো-বাড়ীতে বেশি। গ্রামেই ইহাদের সন্ধান পাওয়া যায় অধিক। 'ভিটায় ঘুঘু চরে' বলিলে সাধারণতঃ আমরা প'ড়ো ভিটার কথাই বুঝিয়া থাকি।

মোরগ ও মুরগী প্রায়ই আমরা এখানকার গ্রামে পাই। এখানকার মুসলমান অধিবাসীদের গৃহে গৃহপালিত জীবের মত ইহা নিঃসঙ্কোচে বিচরণ করিয়া থাকে। এবং প্রতি প্রত্যূষে নিজেদের স্বভাব সুলভ চকিত আওয়াজে পল্লীর ঘুম ভাঙ্গাইয়া থাকে। রাজশাহীর বনে মুরগী কিংবা মোরগের বাস আছে কি না, সে সংবাদ পাই নাই। তবে, ক্ষেতুর

*ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে: Jackdaws, Rooks, Starlings, Martins, Cranes, Culls, Pelicans, Swans, Turns, Curlews ইত্যাদি।

খবর পাওয়া যায়, তার সবই উল্লিখিত গৃহপালিতদিগের কথাই বলে।

এবার জলচর শিকারী পাখীর কথা বলিব। বক ও শিকারী হাঁস জলায় ও স্রোতোহীন নদীতীরেই বাস করে। শহরের উপকণ্ঠে বকের সন্ধান মেলে বটে, কিন্তু প্রধানতঃ তাহারা বাস করে নওহাটা ও কলসগ্রামে। তাহার হেতু উক্ত গ্রামদ্বয়ের পার্শ্বেই সার-বাঁধা বিল রহিয়াছে। এখানে উক্ত পাখীদের তাহাদের আহার ক্ষুদ্র মৎস্য প্রায়। সারসপক্ষীও এই শ্রেণীতেই পড়ে। ইহারাও সচরাচর বাস করে এই অঞ্চলে। পাতিহাঁসকেও এই দলে ফেলা যাইত, কিন্তু ইহারা আদৌ শিকারী স্বভাবসম্পন্ন নয় এবং ইহারা পোষও মানে সহজেই, অতএব ইহারা ভিন্ন গোত্রের জীব। সচরাচর গৃহস্থদের পুকুরেই ইহারা সাঁৎরাইয়া বেড়ায়, গ্রামে ইহাদের সংখ্যা খুব বেশি

সরীসৃপ

এই শ্রেণীর মধ্যে কুমীর, কচ্ছপ, টিকটিকি, গিরগিটি, সাপ ইত্যাদি জীব পড়ে। পদ্মানদীতে এককালে কুমীরের দৌরাত্ম্য ছিল অত্যন্ত। কিন্তু এখন নদীর স্রোত মরিয়া আসায় এবং জল অনেক শুকাইয়া ওঠায় কুমীরের উৎপাত অনেক কমিয়াছে। ইহারা প্রাণ ধারণ করে মাছ, পাখী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাদি ভক্ষণ করিয়া। মাঝে মাঝে মানুষ পাইলে তাহাকেও আক্রমণ করিতে ছাড়ে না। ইহারা জলের মধ্যে সমস্ত শরীর ডুবাইয়া রাখিয়া কেবল একটি মাত্র চোখ ও উপরের ঠোঁটের কিঞ্চিৎ ভাগ জলের উপর রাখিয়া ভাসিয়া বেড়ায়। দৈর্ঘ্যে ইহারা প্রায় ২০ ফুট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহারা কেবল-যে পদ্মাতেই আছে এমন নয়, বনের মধ্যের পুরাতন পুকুরে এবং রাজসাহীর বিলেও ইহারা অনেক পরিমাণ লুকাইয়া থাকে, এবং সুবিধা ও সুযোগ বুঝিলে যে-কোন জীবের উপর আক্রমণ করিয়া বসে। জাতিতে ইহারা তিন প্রকারের, তাহার মধ্যে ঘড়িয়ালই এ-প্রদেশে বিখ্যাত।

কচ্ছপ বা কাছিম বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। ইহারাও নদীতে ও অন্যান্য জলায় বাস করিয়া থাকে। ইহারা সাধারণতঃ বালু ও কাদা পছন্দ করে। অতএব পদ্মানদীতে এবং চলনবিলে ইহাদের সংখ্যা অনেক। তাহা ছাড়া অনেক পুকুরেও ইহাদের পাওয়া যায়।

টিকটিকি, গিরগিটির কথা সবিশেষ বলিবার প্রয়োজন মনে করি না। কারণ ইহাদের বসবাস সর্ব্বত্রই প্রায় সমান। টিকটিকি মানুষের সঙ্গে একই ছাতের নীচে বাস করে, কিন্তু গিরগিটি গৃহস্থাবাসের সন্নিকটস্থ ক্ষুদ্র বৃক্ষাদির উপর বাস করে।

ভারতবর্ষ সাপের জন্য বিখ্যাত। কথিত আছে, সর্পজাতির মধ্যে এমন কোন জাতি নাই, যাহা ভারতবর্ষে পাওয়া যায় না। সর্পাঘাতে মৃত্যু-সংখ্যাও ভারতে সেইজন্য অধিক এবং এই কারণেই প্রাণিতত্ত্ববিদ্ ও ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক এমন উপায় আবিষ্কারের চেষ্টা চলিতেছে, যাহাতে অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ ব্যক্তি বিষাক্ত ও বিষহীন সাপের পার্থক্য বুঝিতে পারে। সাধারণভাবে বলিতে গেলে রাজশাহী জিলাকে ভারতের প্রতিনিধি-স্বরূপ বলা চলে। তাহার কারণ এখানেও সর্পজাতির সংখ্যা অনেক। বিষধর হইতে আরম্ভ করিয়া নিতান্ত নিরীহ সাপ এখানে দেখা যায়। বর্ষায় ইহারা বাহির হয় বেশি, কারণ, তাহাদের নিভৃত গর্ত্ত বর্ষার জলে ভরিয়া উঠিলে ইহারা মানুষের আবাসে কিংবা গরুর গোহালে মাথা গুঁজিবার জন্য স্থান খুঁজিতে আসে। গ্রামে গ্রামে সর্পভয় বিষম, কাজে-কাজেই পথচারীরা রাত্রে আত্মরক্ষা-হেতু মোটা লাঠি হাতে করিয়া কাজে বাহির হইয়া থাকে। প্রত্যেক জাতির সাপের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করিলাম না।

মৎস্য

এই জিলার মৎস্যের বিবরণ লিখিবার সময় সর্ব্বপ্রথম মনে পড়ে ইলিশ মাছের কথা। এই মাছ সুস্বাদু। জলের মধ্যে স্রোতে উজান সাঁতার কাটিয়া চলে। বদ্ধ জলে ইহাদের বাস আদৌ নাই। অতএব পদ্মানদীর স্রোতেই ইহাদের পাওয়া যায়। গোদাগাড়ি ঘাট, পাতিবনা, প্রেমতলী হইতে ক্রমশঃ ভাটাইয়া আসিলে চারঘাট পর্য্যন্ত স্থানসমূহে ইহাদের বিচরণ খুব বেশি। ইহা ছাড়া নদীর মাছের মধ্যে নাম করা যায়: আড়, চিতল, রুই, কাৎলা ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত দুইটি পুকুরে ও বিলেও পাওয়া যায় যথেষ্ট পরিমাণে। এই গেল বড়জাতের মাছের কথা। ছোট মাছের মধ্যে বাঁশপাতা নামক মাছ এই অঞ্চলে বিখ্যাত এই মাছের গড়ন অনেকটা বাঁশের পাতার মতো, রং দুধের মত সাদা, খুব লঘুপাকের জন্য এই মাছের ব্যবহার আছে। রাই-খয়রা

খয়রা, মৃগেল ইত্যাদি মাছেরও যথেষ্ট খ্যাতি ও বিস্তৃতি আছে এখানে। সাধারণতঃ ইহাদের সহরের সন্নিকটস্থ গ্রামের পুকুরে বেশি পাওয়া যায়। পদ্মায় খুব ছোটজাতের মাছের মধ্যে পুটি, বেলে ও বাণমাছ প্রসিদ্ধ। ইহা ছাড়া কাঁছিমের মত গোলাকার গড়নের ও দীর্ঘপুচ্ছধারী একপ্রকার মাছ আছে, তাহার নাম শঙ্কর মাছ। অধিবাসীদের কাছে ইহা খুবই রুচিকর; ইহাদের ধরা হয় পদ্মা হইতেই। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, রাজসাহীর বেশির ভাগ মাছই পদ্মা হইতে পাওয়া যায়। কিন্তু পুকুর ও বিলের মাছের পরিমাণ যে খুব সামান্য, এমন কথা বুঝায় না। বনে-ঘেরা বহু পুরাতন পুকুর হইতে বৃহদাকারের মাছ গ্রাম হইতে সহরের বাজারে আনিতে দেখা যায়। ইহার মধ্যে রুই ও কাৎলার সংখ্যাই বেশি।

উপরে মৎস্যের কথা লিখিবার সময় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত মাছের নাম ও ধামের উল্লেখ করিলাম না। সাধারণতঃ যে সব মাছের নাম উল্লিখিত হয় এবং সচরাচর যাহাদের ব্যবহার আছে, এখানে কেবল তাহাদেরই স্থান দিয়াছি। ইহা ছাড়াও আরও বহুপ্রকারের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মাছ স্রোতে ও বদ্ধজলে আছে বটে, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার স্থান ইহা নহে।

এই প্রসঙ্গে এই জিলার 'গৃহস্থালী' পশুর (live stock) মধ্যে কোনটার সংখ্যা কত আছে, তাহার একটি ফিরিস্তি দিয়া এই অধ্যায়ের উপসংহার করা যুক্তিসঙ্গত। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের জিলাসমূহের এই সংবাদ সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ান্তরে নেওয়ার রীতি প্রচলিত। বাঙ্গালার জিলাসমূহের পশ্বাবলীর সংখ্যার হিসাব নেওয়া হয় প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর। সেই হিসাবের একটি নকল নীচে দেওয়া হইল।

১। গোজাতি

(ক) ষাঁড়	(খ) বলদ	(গ) গাভী	(ঘ) বাছুর
৫৯,২০৭	৩,০২,৭৯৮	৫,৯৫,৬৬৮	২,৫০,২৯০

২। মহিষজাতি

(ক) পুং-মহিষ	(খ) স্ত্রী-মহিষ	(গ) শাবক
৫৩০০৮	৩,৮৮৫	১,৩৫৮

৩। অশ্বজাতি

(ক) পুং-অশ্ব	(খ) স্ত্রী-অশ্ব	(গ) শাবক
২,৭৭১	১,৭০৫	৫৫৯

৪। মেষ	৫। ছাগল
২২,৫২৭	২৩১,১০৩

৬। অশ্বতর (খচ্চর)

১০

৭। গর্দ্দভ	৮। উষ্ট্র
১৮	২

উপরোক্ত আট প্রকারের জীবের মধ্যে ২। (গ) মহিষ-শাবক; ৪। মেষ; ৩। (ক) (খ) (গ) পুং-অশ্ব, স্ত্রী-অশ্ব ও অশ্ব-শাবক; ৬। অশ্বতর (খচ্চর) ব্যতীত বাকী জীবগুলির সংখ্যা পূর্ব্বতন হিসাবের চেয়ে এই হিসাবে কিছু কিছু কম দেখা গিয়াছে। এই সংখ্যাহ্রাসের একমাত্র কারণ উক্ত জীবাদির মৃত্যু এবং সেই সময় সেই হারে প্রজনন না হওয়া। এই জীবাদি অন্য কোন উপায়ে স্থানান্তরিত হয় নাই। কারণ, সরকারের বিবৃতি হইতে পাওয়া যায় যে, এই হিসাবগ্রহণের সময় স্থানান্তরিত জীবের সংখ্যাও তাঁহারা তাঁহাদের এই সংখ্যার মধ্যেই ধরিয়া লন, সংখ্যা হইতে বাদ দেন না। একটা উদাহরণ দিতেছি: উষ্ট্র এই জিলার জীব নহে, কোন সওদাগরের মারফৎ পাকাপাকিরূপে এখানে আসিয়া এখানকার স্থায়ী অধিবাসী হইয়াছে। এখন তাহার সংখ্যা মাত্র ২, কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী হিসাবে এই সংখ্যা ছিল ৩, গত পাঁচ বছরের ভিতর ১টির মৃত্যু ঘটিয়াছে এবং সেই সময়ে অন্য কোন উষ্ট্রের আমদানীও হয় নাই, প্রজননও হয় নাই। যদি উষ্ট্রটি হিসাবগ্রহণের সময় পার্শ্ববর্ত্তী জিলায় চলিয়া যাইত, তাহা হইলেও হিসাবে আমরা ৩ পাইতাম।

সংবাদ ও মন্তব্য

[শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য-লিখিত]

বৈদেশিক প্রভুত্ব

> গত ২১শে জানুয়ারী কলিকাতায় এক জনসভায় শ্রীমানবেন্দ্র নাথ রায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন :...বর্ত্তমান ভারতের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা বৈদেশিক প্রভুত্ব। এ দেশে সোস্যালিজ্‌ম ও কম্যুনিজ্‌মের আদর্শ সফল করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে বৈদেশিক প্রভুত্বের অবসান হওয়া প্রয়োজন।...আজও পর্য্যন্ত কংগ্রেসের কার্য্য-তালিকা যথোপযুক্তরূপে সুনির্দ্ধারিত নহে।...কংগ্রেসের বর্ত্তমান সংগঠন-পদ্ধতি ও মার্কা মারা সদস্য-সংগ্রহ পরিত্যাগ করিতে হইবে।

মানবেন্দ্রবাবু অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ে অনেক কথা এই বক্তৃতায় বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না বটে, কিন্তু আমাদের মতে তাঁহার কোন বিষয়ের কোন কথাটিই ঠিক ঠিক ভাবে প্রয়োজনীয় হয় নাই। তাঁহার বক্তৃতা একটু তলাইয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, তিনি একদিকে যেরূপ দেশের মধ্যে আপামর সর্ব্বসাধারণের একতার আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছেন, অন্যদিকে আবার রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা না হইলে কোন সমস্যারই সমাধান হইবে না, তাহাও প্রচার করিয়াছেন। আমাদের মতে, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার মতবাদ প্রচার করিতে বসিলে পরোক্ষভাবে ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রচার করা হয় এবং ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রচারিত হইতে থাকিলে দেশের মধ্যে দলাদলি অনিবার্য্য। ইহা ছাড়া মানবেন্দ্রবাবু গণতান্ত্রিকতার কথাও বলিয়াছেন। ঐ গণতান্ত্রিকতার কার্য্যেও কথঞ্চিৎ পরিমাণে দলাদলি অপরিহার্য্য।

কাযেই বলিতে হইবে যে, অন্যদেশে স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিকতার কথা প্রযুক্ত হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু এক্ষণে ভারতবর্ষ যে-অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, তাহাতে এইখানে একসঙ্গে স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিকতা ও একতাবন্ধনের আন্দোলন চলিতে পারে না।

মোটের উপর মানবেন্দ্রবাবুর বক্তৃতায় আমরা বিশেষ কোন চিন্তার নিদর্শন খুঁজিয়া পাইলাম না।

কংগ্রেসের দলাদলি

> লক্ষ্ণৌ-এ গত জানুয়ারী মাসের শেষ ভাগে যুক্ত-প্রদেশের কংগ্রেসের এক সভায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বক্তৃতায় বলিয়াছেন :—কংগ্রেসের দলাদলির কারণ দুর্ব্বল প্রকৃতির ব্যক্তির কংগ্রেসে যোগদানের সুযোগলাভ।

কংগ্রেসের মধ্যে যে অধিকতর দলাদলির সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে, বিভিন্ন প্রদেশের কিষাণ আন্দোলনের দিকে লক্ষ্য করিলে তাহা যেরূপ অস্বীকার করা যায় না, সেইরূপ আবার ঐ দলাদলি বিষয়ে কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষগণ যে শঙ্কান্বিত হইয়াছেন, পণ্ডিত জওহরলালের এই বক্তৃতা হইতে তাহারও আভাস পাওয়া যায়। আমাদের মতে, ভারতবর্ষের প্রত্যেকের পক্ষে যাহাতে কংগ্রেসের সভ্য হওয়া সম্ভব হয় এবং কংগ্রেসের সভ্যগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও যাহাতে তন্মধ্যে দলাদলির বৃদ্ধি না হয়, তাহা সর্ব্বতোভাবে না করিতে পারিলে, কংগ্রেসের প্রকৃত উদ্দেশ্য সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ হওয়া সম্ভব নহে।

কোন প্রতিষ্ঠানে সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে যদি তন্মধ্যে দলাদলির প্রভাব অধিকতর ভাবে বিস্তার লাভ করে, তাহা হইলে ঐ সভ্যগণের মধ্যে যে কুশিক্ষা বিদ্যমান আছে, তাহা যেরূপ একদিক্ হইতে বুঝিতে হয়, সেইরূপ আবার উহার পরিচালকবর্গও যথাযথভাবে সুনিপুণ নহেন, তৎসম্বন্ধেও কৃতনিশ্চয় হইতে হয়।

কংগ্রেসের সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলির আশঙ্কাও বাড়িয়া যাইতেছে, ইহা শুনিলে যুক্তিসঙ্গতভাবে মিঃ গান্ধীপ্রমুখ নেতৃবর্গকে দোষারোপ না করিয়া পারা যায় না। সভ্য-সংখ্যার বৃদ্ধি সত্ত্বেও যাহাতে কংগ্রেসের মধ্যে দলাদলি না হয়, তাহা

করিতে হইলে, বহু বিষয়ে কংগ্রেসের মূলনীতির পরিবর্ত্তন করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই, এই সত্যটুকু দেশবাসী যতদিন পর্য্যন্ত না বুঝিতে পারিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত কংগ্রেসের নামে অনেক কিছু দেখা যাইবে বটে এবং হো হো হাসির রোলও সময়ে সময়ে বহিতে থাকিবে বটে, কিন্তু জনসাধারণের অর্থাভাব প্রভৃতি উত্তরোত্তর বাড়িতেই থাকিবে।

আমাদের কথা যে সত্য, ভবিষ্যৎ তাহা প্রমাণিত করিবে।

লর্ড স্যামুয়েল

> গত ১০ই জানুয়ারী এলাহাবাদে লর্ড স্যামুয়েল এক সভায় ভারতীয় উদারনীতিক দলের মূলনীতির অসম্পূর্ণতা দেখাইয়া এক বক্তৃতা দান করেন।
>
> ১৭ই জানুয়ারী এলাহাবাদ বিশ-বিদ্যালয়ে "আধুনিক যুগোপ-যোগী দর্শনের প্রয়োজনীয়তা" শীর্ষে এক বক্তৃতায় বলেন:—পুরাতন যুগের জগৎকে বাদ দিয়া বর্ত্তমান যুগের জগৎকে দর্শনের ভিত্তি স্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে। আজ পর্য্যন্ত দর্শনে যে জ্ঞান সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা অধ্যয়ন করিয়া আমাদের নিজস্ব আদর্শসমূহ লইয়া বর্ত্তমান যুগোপযোগী নূতন দর্শন সৃষ্টি করিতে হইবে।

লর্ড স্যামুয়েলের প্রথম বক্তৃতাটি জগতের উদারনীতিক-গণের কর্ম্মতালিকার মূলসূত্র সম্বন্ধীয় এবং দ্বিতীয় বক্তৃতাটি দার্শনিক ও দর্শনের দায়িত্ব সম্বন্ধীয়। এই দুইটি বক্তৃতা পড়িলে উপরোক্ত দুই বিষয়ে বর্ত্তমান ভাবধারা কি, তাহা জানিতে পারা যায়।

উদারনীতিকগণের কর্ম্ম-তালিকার মূলসূত্র তিনটি। যথা,—শান্তি, স্বাধীনতা ও সামাজিক সুবিচার (peace, liberty and social justice)। আমাদের মতে মানুষ যখন বর্ত্তমান কালের তুলনায় জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে আর একটু অগ্রসর হইতে পারিবে, তখন বুঝিতে পারিবে যে, বর্ত্তমান কালের স্বাধীনতা ও প্রকৃত শান্তি ও প্রকৃত সুবিচার এক-সঙ্গে থাকিতে পারে না। বর্ত্তমান কালের স্বাধীনতার উচ্ছৃঙ্খলা ও অশান্তি অনিবার্য্য এবং যখন উচ্ছৃঙ্খল ও অশান্তি মানুষের মনে অধিকার লাভ করে, তখন নর-ঘাতককে নিরপরাধ বলিয়া মুক্তি দেওয়া এবং রায়ের ধন বায়কে বিলাইয়া দেওয়া অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। আধুনিক স্বাধীনতার প্রবৃত্তি এত বিস্তার লাভ করিয়াছে বলিয়াই মানুষ আজ গৃহহীন ও পরিবারহীন হইয়া হোটেলবাসী হইয়া পড়িয়াছে, শৃঙ্খলিত বিবাহিত জীবন পরিত্যাগ করিয়া উচ্ছৃঙ্খল সঙ্কটময় জীবন পরিগ্রহ করিয়াছে এবং মদ্যপায়ী হইয়া সমস্ত অশান্তি ভুলিবার চেষ্টা করিতেছে। এতাদৃশ স্বাধীন প্রবৃত্তি, উচ্ছৃঙ্খল ও অশান্তির ফলেই বিচারকের আসনে বসিয়া বহু স্থানে মানুষ অবিচার করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেছে না এবং অবিচারকেও বিচার মনে করিয়া নিজদিগকে গৌরবান্বিত বলিয়া অনুভব করিতেছে।

আধুনিক স্বাধীনতা, শান্তি ও সুবিচার যে একসঙ্গে থাকিতে পারে না, তাহা ঐ উদারনীতিকগণ বুঝিতে পারেন না বলিয়াই তাঁহাদের কর্ম্মসূত্র লোকপ্রিয় হইতে পারিতেছে না এবং সর্ব্বত্রই এই মতাবলম্বী সম্প্রদায় সংখ্যায় খর্ব্বতা লাভ করিতেছে।

দর্শন সম্বন্ধে আজকাল যে সমস্ত কথা প্রচলিত, তন্মধ্যে মায়াবাদ, কর্ম্মবাদ, জ্ঞানবাদ, বিজ্ঞানবাদ প্রভৃতি কথা যথেষ্ট স্থান পায় বটে, কিন্তু প্রত্যেক কথায়ই যে তাহার অন্তরস্থিত ধ্বনির অনুযায়ী স্বভাবানুগ এক একটী প্রাথমিক অর্থ আছে, ইহা উপলব্ধি করিয়া মানুষ যখন প্রত্যেক কথার ঐ প্রাথমিক অর্থ অথবা প্রত্যেক পদের প্রকৃত সংজ্ঞা পরিজ্ঞাত হইতে পারিবে, তখন দেখা যাইবে যে, মায়াবাদ ও কর্ম্মবাদ প্রভৃতি কথা আধুনিক দার্শনিক সমাজে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে প্রচলিত রহিয়াছে।

আপাতদৃষ্টিতে যদিও মনে হয় যে, বর্ত্তমান জগতে জ্ঞান-বিজ্ঞান ক্রমশঃই প্রসার লাভ করিতেছে, কিন্তু বস্তুতঃ-পক্ষে দেখিলে দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজ এখনও প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের গোড়ার সন্ধান কিঞ্চিন্মাত্র পরিমাণেও লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই।

জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দর্শন, অথবা Knowledge, Science and Philosophy এই কয়টি পদের কোনটির কি স্বভাবানুগ অর্থ, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, বিজ্ঞান ও জ্ঞানের সাধনায় সম্যকভাবে সিদ্ধি-লাভ না করিতে পারিলে দর্শনের সাধনায় প্রবেশ লাভ সম্ভব হয় না এবং আধুনিক দর্শন যে এলোমেলো ভাবের

খিচুড়ীতে পরিপূর্ণ, তাহার একমাত্র কারণ, প্রকৃত বিজ্ঞান ও জ্ঞানের অভাব।

প্রকৃত বিজ্ঞান, অথবা প্রকৃত জ্ঞান অথবা প্রকৃত দর্শন পরিজ্ঞাত হইতে হইলে যে স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মিলন, পান-ভোজনের অসংযম, আত্মপরীক্ষাহীন বিদ্যাবত্তার অভিমান সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহা মানুষ এখনও বুঝিতে পারে না বটে, কিন্তু প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য করিলে আমাদিগকে বলিতে হয় যে, মানুষকে তাহা অদূরভবিষ্যতে বুঝিতে হইবে এবং তখন লর্ড স্যামুয়েলের মত বর্ত্তমান দার্শনিকগণের স্থান যে কোথায়, তাহাও মানুষ বুঝিতে পারিবে।

ফেডারেশন

> গত ১৮ই জানুয়ারী হায়দ্রাবাদে লর্ড ও লেডী লিনলিথ-গোর সম্মানার্থে অনুষ্ঠিত দরবারে—নিজাম বাহাদুর 'ফেডারেশন' বিষয়ে একটি বক্তৃতা দান করেন।

যতদূর দেখা যাইতেছে, যুক্তরাজ্যের পরিকল্পনা লইয়া ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ বড়ই অধীর হইয়া পড়িয়াছেন, অন্যদিকে আবার ভারতীয় ষ্টেট্‌স্‌ম্যানগণ তাহার বিরোধিতায় বিভোর হইয়াছেন। ভারতে যুক্তরাজ্যের পরিকল্পনা গৃহীত না হইলে ব্রিটিশ জনসাধারণের যে কি অনিষ্ট, অথবা উহা পরিগৃহীত হইলে ভারতীয় জনসাধারণের যে কি অনিষ্ট, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

১৯৩৫ সালের অ্যাক্টখানি তলাইয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ অ্যাক্টে ভারতবর্ষের পক্ষে যুক্তরাজ্যকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় করিয়া তোলা হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহাতে জনসাধারণের কোন ইষ্ট অথবা অনিষ্ট সংঘটিত হইবার আশঙ্কা নাই।

আমরা বলি, যখন দেখা যাইতেছে যে, উহার জন্য রাজ-পুরুষগণ এত অধীর, তখন উহার বিরোধিতা না করিলে ক্ষতি কি?

লর্ড ব্র্যাবোর্ণ

> গত ২০শে জানুয়ারী কলিকাতা ফুটবল ক্লাব গ্রাউণ্ডে সেণ্ট জন অ্যাম্বুলেন্স এসোসিয়েশনের বাৎসরিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে পুরস্কার-বিতরণ উপলক্ষে লর্ড ব্র্যাবোর্ণ এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন :—সেণ্ট জন অ্যাম্বুলেন্স এসোসিয়েশন—৯০০ বৎসর পূর্ব্বে যখন স্থাপিত হইয়াছিল, তখন ইহার মূল আদর্শ ছিল—দুঃখ-নিবারণ। আজিও সমিতি এই আদর্শ অনুসরণ করিতেছেন।

সেণ্ট জন অ্যাম্বুলেন্স অ্যাসোসিয়েশনের মূল উদ্দেশ্য কি, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। প্রয়োজন অনুসারেই মানুষের আবিষ্কারের কার্য্য চলিতে থাকে—necessity is the mother of invention. এই উক্তিটির সত্যতা স্বীকার করিয়া লইলে বলিতে হয় যে, ৯০০ শত বৎসর আগে যে উদ্দেশ্যে এই অ্যাসোসিয়েশনের সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহার পূর্ব্ববর্ত্তীকালে ঐ উদ্দেশ্যের কোন প্রয়োজনীয়তা মনুষ্যসমাজে বিদ্যমান ছিল না, অর্থাৎ এক কথায় ৯০০ শত বৎসর আগে মানুষের যে যে দুঃখ নিবারণের জন্য তাদৃশ অ্যাসোসিয়েশনের প্রয়োজন হইয়াছিল, ঐ ৯০০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তীকালে মনুষ্য-সমাজে তাদৃশ দুঃখও বিদ্যমান ছিল না এবং ঐ অ্যাসোসিয়েশনেরও প্রয়োজন ছিল না।

ইহার পর আবার দেখা যাইবে যে, এই ৯০০ শত বৎসরের মধ্যে মানুষের দুঃখ-নিবারণ করিবার জন্য নানাবিধ দুঃখ-নিবারণী অ্যাসোসিয়েশনের উদ্ভব হইয়াছে বটে, কিন্তু মানুষের নূতন নূতন দুঃখ নূতন নূতন ভাবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া চলিতেছে। এই অবস্থাটি পর্য্যালোচনা করিলে এতাদৃশ অ্যাসোসিয়েশনের পুরস্কার-বিতরণী সভা কি পরিহাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না?

অবশ্য এই অ্যাসোসিয়েশনের সভ্যগণ যে ব্যক্তিগত ভাবে অনেক কারণে প্রশংসার যোগ্য, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

বঙ্গশ্রী

চৈত্র—১৩৪৪

৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম খণ্ড—৩য় সংখ্যা

সম্পাদকীয়

[শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক লিখিত]

ভারতীয় কংগ্রেসের এক-পঞ্চাশত্তম অধিবেশনে সভাপতি সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতার সমালোচনা

হরিপুর কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্র যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, আমরা চারি ভাগে তাহার সমালোচনা করিব। প্রথম ভাগে থাকিবে, ঐ বক্তৃতা সম্বন্ধে আমাদিগের মন্তব্য। দ্বিতীয় ভাগে থাকিবে, বক্তৃতার সার-মর্ম্ম, তৃতীয় ভাগে বক্তৃতায় মধ্যে যে সমস্ত মোটা মোটা পরস্পর-বিরোধী ও অসমঞ্জস কথা বিদ্যমান আছে, তাহা প্রদর্শিত হইবে এবং শেষ ভাগে দেশবাসীকে কয়েকটি সতর্কতার বাণী শুনাইয়া ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপসংহার সন্নিবিষ্ট হইবে।

সভাপতি সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য

সুভাষচন্দ্রের রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রারম্ভ যে অনন্যসাধারণ দেশ-প্রেমিকতার দৃষ্টান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা সর্ব্বজন-বিদিত। তদনুসারে আমাদের মতে সুভাষচন্দ্র দেশ-বাসীর আশীর্ব্বাদ ও শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁহার রাষ্ট্রীয় জীবনের (political life-এর) প্রথম ভাগ আমাদের মতে প্রধানতঃ নির্ভীকতা ও দেশ-প্রেমিকতার একাধিক উদাহরণে সমুজ্জ্বলিত। তাঁহার রাষ্ট্রীয় জীবনের এই ভাগে বাল-সুলভ চাপল্যের ও অদূরদর্শিতার কোন দৃষ্টান্ত নাই, তাহা যুক্তিসঙ্গত ভাবে বলা চলে না বটে, কিন্তু সুভাষচন্দ্র দেশ ও দেশবাসীকে বিস্মৃত হইয়া স্বীয় প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতির লোলুপতায় ব্যাকুল হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার উপর দোষারোপ করা যাইতে পারে, এমন একটি কার্য্যের দৃষ্টান্তও খুব সম্ভব খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। কিন্তু, হরিপুর কংগ্রেসের সভাপতি-রূপে সুভাষচন্দ্র দেশবাসীকে যে সমস্ত কথা শুনাইয়াছেন, তাহাতে আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। আমাদের মতে হরিপুরে আমাদের শ্রদ্ধেয় সুভাষ-চন্দ্রের নির্ভীক, স্বাধীনতাপ্রিয় দেশপ্রেমিক জীবনের অবসান ঘটিয়াছে এবং তৎস্থলে গান্ধীজীর উপর নির্ভর-শীল, গান্ধীজীর কথামৃতে আত্মহারা সদসদ্-বিচার-জ্ঞান-হীন, আত্ম-প্রতিষ্ঠাপ্রয়াসী নূতন সুভাষচন্দ্রের উদ্ভব হইয়াছে। সভাপতি সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতার মুখ্য বক্তব্যগুলি প্রায়শঃ মিঃ গান্ধীর মতবাদের প্রতিধ্বনিমাত্র এবং তাহাতে প্রায়শঃ কোন গভীর চিন্তার নিদর্শন আমরা খুঁজিয়া পাই নাই।

গত আঠার বৎসরে দেশের মধ্যে জালজালী, চুরি ও প্রবঞ্চনা (cheating), পারিবারিক জীবনে কলহ ও

পুত্রগণের অবাধ্যতার জন্ম অশান্তি, অর্থাভাব, অস্বাস্থ্য, বেকার, অকালমৃত্যু ও উচ্ছৃঙ্খলতা যাদৃশ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার দিকে লক্ষ্য করিলে মিঃ গান্ধীর রাষ্ট্রীয় জীবন লইয়া যদিও খুব বাহবার রোল এখন পর্য্যন্ত শুনা যাইতেছে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে উহা যে সম্পূর্ণ ভাবে বিফল হইয়া আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছে ও করিতেছে, তাহা যুক্তিসঙ্গত ভাবে অস্বীকার করা যায় না।

যে মতবাদ ও কর্ম্মতালিকা গত আঠার বৎসর ধরিয়া গান্ধীজী ভারতবাসিগণের মধ্যে প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন, তাহাই যে ভারতবাসিগণের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার প্রধান কারণ, তাহা দেশের তাৎকালিক যুবকবৃন্দের মধ্যে অনেকেই বুঝিতে অক্ষম হইলেও পণ্ডিত জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র উহা কথঞ্চিৎ পরিমাণে বুঝিতে পারিতেন বলিয়া মনে করিবার কারণ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু, কালের এমনই পরিহাস যে, কংগ্রেসের সভাপতিত্ব-লোলুপতায় জওহরলাল এবং সুভাষচন্দ্র উভয়েই ক্রমে ক্রমে নিজদিগকে প্রায়শঃ বিসর্জ্জিত করিয়া গান্ধীজীর পোঁ-ধরা হইয়া পড়িলেন। জওহরলালের সম্ভাষণসমূহে কথঞ্চিৎ পরিমাণে স্বকীয়ত্ব খুঁজিয়া পাওয়া গেলেও যাইতে পারে বটে, কিন্তু সুভাষচন্দ্রের কথাগুলিতে প্রায়শঃ গান্ধীজীর সুর ছাড়া আর কিছুই আমরা দেখিতে পাইতেছি না।

রাষ্ট্রীয় (political) ও আর্থিক (economical) জীবনের মূল সম্বন্ধ কোথায় এবং কি করিয়া রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক জীবনের উন্নতি-সাধন করিতে হয়, তদ্বিষয়ে আমূল চিন্তার কোন নিদর্শন বিন্দুমাত্র পরিমাণেও যেরূপ গান্ধীজীর কোন কথায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সেইরূপ সভাপতি সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতাটীতেও ঐ আমূল চিন্তার কোন চিহ্ন আমরা তন্ন-তন্ন করিয়া বাহির করিতে পারি নাই।

গান্ধীজীর কথাগুলি যেরূপ প্রায়শঃ পরস্পর-বিরোধী (self-contradictory) ও অসামঞ্জস্যে (inconsistency) পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, সভাপতি সুভাষচন্দ্রের কথাগুলিও ঠিক সেইরূপ অসমঞ্জস ও পরস্পর-বিরোধিতায় পরিপূর্ণ বলিয়া পরিলক্ষিত হইয়াছে। ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার নামে গান্ধীজী যেরূপ গত আঠার বৎসর ধরিয়া বিজাতীয় ভাবধারাগুলি আমাদিগকে বিতরণ করিয়া আসিতেছেন, সভাপতি সুভাষচন্দ্রও তাহাই করিতে আরম্ভ করিলেন বলিয়া আমাদের কাছে প্রতীয়মান হইয়াছে।

গান্ধীজী যেরূপ উপরোক্তভাবে স্বাধীনতার নামে প্রকৃতপক্ষে কৃষ্টিগত পরাধীনতার শৃঙ্খল অধিকতর মাত্রায় আমাদিগের কণ্ঠে জড়াইয়া দিতেছেন, সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতাতেও ঐ বাস্তব পরাধীনতার নিদর্শন দেখা যাইবে।

গান্ধীজীর নেতৃত্বকালে যেরূপ দেশ ও দেশবাসী যুবক ও প্রৌঢ়গণের সর্ব্ববিধ অবস্থা উত্তরোত্তর হীন হইতে হীনতর হইয়া পড়িতেছে, আমাদের মতে, সতর্ক না হইলে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বেও ঐ একই অবস্থার পুনরভিনয় ঘটিতে থাকিবে।

যে সুভাষচন্দ্র একদিন আমাদিগের আশীর্ব্বাদ ও শ্রদ্ধার যোগ্য ছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে আমাদিগকে উপরোক্ত কঠোর অপ্রিয় সত্য কথা বলিতে হইতেছে বলিয়া আমরা দুঃখিত। কিন্তু, দেশের শিক্ষিত বেকার যুবকবৃন্দ, কৃষক, শিল্পী, উকীল, ডাক্তার ও তথাকথিত ধনিকবৃন্দের দুর্দ্দশার দিকে তাকাইলে, গান্ধীজী-পরিচালিত নেতৃবৃন্দের কার্য্যের ফলেই যে আমাদের সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে, তাহা দেশবাসীকে বুঝান ছাড়া আর কোন পন্থা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতার বিরুদ্ধে আমাদের উপরোক্ত অভিযোগগুলি যে সত্য, তাহা আমাদের পরবর্ত্তী আলোচনায় প্রমাণিত হইবে।

সভাপতি সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতার সারমর্ম্ম

<u>হরিপুর কংগ্রেসের সভাপতির সমগ্র অভিভাষণটি আমাদের মতে ছয় ভাগে বিভক্ত।</u>

<u>ঐ বক্তৃতার প্রথম ভাগে কংগ্রেসের সভাপতি হওয়ায় কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন, দ্বিতীয় ভাগে দেশের প্রসিদ্ধ কংগ্রেসকর্ম্মী ও কর্ম্মিণীগণের মৃত্যুতে শোক-বিজ্ঞাপন, তৃতীয় ভাগে জগতের, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এবং ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক আলোচনা, চতুর্থ ভাগে বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ করিবার উপায়, পঞ্চম ভাগে স্বাধীনতা লাভ করিয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করিবার পর সামাজিক সংগঠন করিবার পদ্ধতি এবং ষষ্ঠ ভাগে</u>

কংগ্রেসের কয়েকটী অত্যাবশ্যক আশু-কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

তৃতীয় ভাগে সমগ্র জগৎ, বিশেষতঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ও ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় অবস্থার পর্য্যালোচনা করিতে বসিয়া সুভাষচন্দ্র বলিয়াছেন যে,—

উত্থান ও পতনের নিয়মানুসারে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য্য। তাঁহার মতানুসারে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যে জটিল অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহা হইতে উহাকে রক্ষা করিতে হইলে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে কয়েকটি সমভাবাপন্ন স্বাধীন জাতির সংঘ-রূপে পরিণত করা ছাড়া আর কোন উপায় নাই।

সমগ্র জগতের রাষ্ট্রীয় অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে বসিয়া প্রত্যেক জাতি যে আপন আপন রক্ষাকল্পে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে এবং এখন আর তাহাদের অনেকেরই যে অন্য কাহারও দিকে নজর করিবার অবসর নাই, তাহাই তাঁহার বক্তৃতায় এই অংশে প্রধান স্থান লাভ করিয়াছে।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিতে বসিয়া সুভাষচন্দ্র সমগ্র জগৎকে শুনাইয়াছেন যে, যদিও ভারতবর্ষের বিস্তৃতি, সাধারণতঃ উহার উন্নতির পরিপন্থী, তথাপি বর্ত্তমান রাজনৈতিক আবহাওয়ায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছে।

বর্ত্তমান অবস্থায় স্বাধীনতা লাভ করিবার উপায় কি, তাহার আলোচনা করিতে বসিয়া সুভাষচন্দ্র বলিয়াছেন যে, ভারতবাসিগণের ঐক্যসাধনের দ্বারাই উহা সাধিত হইতে পারে। তিনি এই প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝিতে হয় যে, হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি, ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশ ও দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে পরস্পরের সহানুভূতি এবং একযোগে কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি, বর্ণ-হিন্দু ও তপশীলভুক্ত জাতিগুলির মিলন সংঘটিত হইলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ করা অপেক্ষাকৃত অনেক সহজসাধ্য হইবে।

ইহার পর, হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর ভিতরে কিরূপে ঐক্য সাধিত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে কতকগুলি কথাও তিনি তাঁহার শ্রোতৃবর্গকে শুনাইয়াছেন।

তাঁহার মতে, হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্যে যাহাতে mutual agreement, অর্থাৎ পরস্পরের সহযোগ সংস্থাপিত হয়, তাহা করিতে পারিলেই হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ অবসান প্রাপ্ত হইতে পারে। উচ্চ ও নীচবর্ণের হিন্দুগণের মধ্যে যাহাতে মিলন সংঘটিত হয়, তাহা করিতে হইলে, নীচবর্ণের হিন্দুগণকে যে-সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছে, সেই সমস্ত অধিকার যাহাতে নীচবর্ণের হিন্দুগণ পুনরায় প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, ইহাই সুভাষ বাবুর এতৎসম্বন্ধে অভিমত।

ভারতবাসিগণের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মিলন সম্বন্ধে তিনি যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝিতে হয় যে, তাঁহার মতে কংগ্রেস হইতে ঐ সম্বন্ধে যাহা যাহা করা হইতেছে, অথবা করিবার চেষ্টা হইতেছে, তাহা যথাযথ ভাবে অনুধাবিত হইলে হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর মানুষের সর্ব্বতোভাবের মিলন সাধিত হইবে।

ভারতীয় স্বাধীনতা সম্বন্ধে তিনি আরও বলিয়াছেন যে, স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে এক দিকে ভারতবাসিগণের ঐক্যবন্ধন একান্ত প্রয়োজনীয়, অন্যদিকে আবার সত্যাগ্রহ অথবা অহিংস অসহযোগের (non-violent non-co-operation-এর) আশ্রয় লইবার প্রয়োজন হইবে। এই স্থানে তিনি আমাদিগকে আরও শুনাইয়াছেন যে, ভারতবাসিগণকে মনে রাখিতে হইবে যে, নূতন আইনের ফেডারেশন-পরিকল্পনা যাহাতে ব্যর্থ হয়, তাহা করিতে হইলে অদূর ভবিষ্যতেই আবার হয় ত আইন-অমান্য আন্দোলনের আবশ্যকতা দেখা যাইবে।

ভারতীয় স্বাধীনতার স্বরূপ কি, তাহা বুঝাইতে বসিয়া সুভাষবাবু দুইটী কথা বলিয়াছেন। প্রথমতঃ ইংরাজের সংস্রব পরিত্যাগ করা ও দ্বিতীয়তঃ সমগ্র ভারতবর্ষে ফেডারেল রিপাব্লিকের রচনা করা ভারতীয় স্বাধীনতার মুখ্য উদ্দেশ্য।

ইহার পর বক্তৃতার পঞ্চম ভাগ আরম্ভ হইয়াছে। উপরোক্ত ভাবে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইবার পর যে সংগঠনে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও রোগ সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত হইতে পারে এবং বৈজ্ঞানিক উৎপাদন ও বণ্টন

প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কংগ্রেসের অনেকে হয় ত মনে করেন যে, ইহা কংগ্রেসের কার্য্য নহে। স্বাধীনতার যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিলেই কংগ্রেসের কর্ত্তব্যের অবসান হইবে। কিন্তু, ইহা সত্য নহে। উপরোক্ত ভাবে সংগঠনের দায়িত্বও গ্রহণ করিতে হইবে।

দেশের সর্ব্বসাধারণের দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও ব্যাধি সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মূল করিয়া বৈজ্ঞানিক উৎপাদন ও বন্টন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সুভাষবাবুর কথানুসারে দ্বিবিধ কার্য্যতালিকা গ্রহণ করিতে হইবে। এক শ্রেণীর কার্য্যতালিকার নাম হইবে "immediate programme" অর্থাৎ "আশু কার্য্যতালিকা", আর অপর শ্রেণীর কার্য্যতালিকার নাম হইবে "A long-period programme" অর্থাৎ "দীর্ঘকালব্যাপী কার্য্যতালিকা"।

আশু কার্য্যতালিকায় (immediate programme), প্রধানতঃ তিনটী কার্য্যভার গ্রহণ করিতে হইবে। এক, আত্মত্যাগ-শিক্ষা; দুই, একতাবন্ধন; তিন, কৃষ্টিগত ও স্থানগত স্বায়ত্তশাসনাধিকার (cultural and local autonomy)।

আত্মত্যাগ-শিক্ষা এবং কৃষ্টিগত ও স্থানগত স্বায়ত্তশাসনাধিকারের কার্য্যতালিকা যে কিরূপ হইবে, তৎসম্বন্ধে সুভাষবাবুর বক্তৃতায় বিশেষ কোন কথা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। একতাবন্ধনের জন্য সুভাষবাবুর মতে প্রথমতঃ একটী ক্ষমতাপন্ন কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা সাধন করিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ একটী সাধারণ ভাষা ও একটী সাধারণ শিক্ষা-প্রণালীর (common educational policyর) আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

দীর্ঘকালব্যাপী কার্য্যতালিকায় (long period programme) প্রধানতঃ নিম্নলিখিত সাতটী কার্য্য স্থান পাইবে—

(১) লোকসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ (restrict population for the time being);

(২) জমিদারী-প্রথা রহিত করিয়া কৃষি-বিধির আমূল সংস্কার (radical reform of land system including the abolition of landlordism);

(৩) কৃষিঋণ-পরিশোধ (liquidation of agricultural indebted-ness);

(৪) অল্প সুদে গ্রামবাসিগণের ঋণ পাইবার ব্যবস্থা (provision for cheap credit for the rural population);

(৫) কো-অপারেটিভ আন্দোলনের প্রসার (extension of the co operative movement);

(৬) জমির উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক কৃষিকার্য্যের প্রবর্ত্তন (scientific agriculture with a view to increasing the yield from the land);

(৭) গবর্ণমেণ্টের স্বত্বাধিকারে এবং গবর্ণমেণ্টের পরিচালনাধীনে শিল্প-প্রসারের বিস্তৃত পরিকল্পনা (a comprehensive scheme of industrial development under state ownership and state control);

সুভাষবাবুর মতে জনসাধারণের দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও ব্যাধি সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মূল করিতে হইলে সমাজতন্ত্রবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

ইহার পর সভাপতির বক্তৃতার ষষ্ঠ ভাগ আরম্ভ হইয়াছে।

এই ভাগে সুভাষবাবুর প্রধান কথা এগারটি, যথা :—

(১) কংগ্রেস যাহাতে অধিকতর শক্তি-সম্পন্ন হয়, তদুচিত কার্য্য কংগ্রেস-পরিচালিত প্রদেশসমূহের মন্ত্রিগণকে অনতিবিলম্বে গ্রহণ করিতে হইবে। এতদর্থে প্রথমতঃ যাহাতে সিভিলিয়ানগণের ক্ষমতা হ্রাস প্রাপ্ত হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, —পান-দোষ-নিবারণ, কারাগার-সংস্কার, জলসেচন-প্রণালী, শিল্প, কৃষি এবং শ্রমিকগণের উন্নতি প্রভৃতি সংস্কারের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে।

(২) কংগ্রেসের কার্য্যকরী সভার সভ্যবৃন্দ যাহাতে দেশের বিবিধ বিভাগের শাসন-সংস্কার-কার্য্যে নিপুণতা লাভ করিয়া ভবিষ্যতে গবর্ণমেণ্ট পরি-

চালনার উপযুক্ততা অর্জ্জন করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে।

(৩) ১৯৩৫ সনের নূতন আইনের ফেডারেশন-পরিকল্পনা যাহাতে সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জিত হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

(৪) উপরোক্ত ফেডারেশন-পরিকল্পনা যে ভারতবর্ষের বাণিজ্যগত (commercial) এবং অর্থগত (financial) উন্নতির পরিপন্থী, তাহা ভারতবাসিগণকে সর্ব্বতোভাবে বুঝিতে হইবে।

(৫) ভারতবর্ষ যাহাতে ইংলণ্ডজাত দ্রব্যের বিক্রয়-ভূমি (dumping ground of British products) না হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

(৬) জনসাধারণের মধ্য হইতে যাহাতে সুনিয়ন্ত্রিত স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী সংগঠিত হয়, তাহার আয়োজন করিতে হইবে।

(৭) ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও কিষাণ সভাসমূহ যাহাতে কংগ্রেসের সহিত একযোগে কার্য্য করিতে পারে, তাহার পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৮) জগতের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অবস্থা কিরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহা যাহাতে ভারতীয় কংগ্রেসের পক্ষে নিখুঁত ভাবে বুঝিতে পারা সম্ভব হয়, তাহার আয়োজন করিতে হইবে।

(৯) ভারতীয় কৃষ্টির বিস্তৃত বিবরণ যাহাতে অন্যান্য দেশের পক্ষে পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভবযোগ্য হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

(১০) রাজবন্দিগণ যাহাতে অনতিবিলম্বে মুক্ত হইতে পারে, তাহার জন্য প্রযত্নশীল হইতে হইবে।

(১১) কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ বিবাদ যাহাতে অনতি-বিলম্বে মিটিয়া যায় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

উপসংহারে গান্ধীজীর দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া সুভাষ বাবু তাঁহার বক্তৃতা শেষ করিয়াছেন।

সভাপতি সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতামধ্যস্থ পরিকল্পনাসমূহের প্রধান প্রধান অসামঞ্জস্য ও অসঙ্গতির দৃষ্টান্ত

পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, সুভাষচন্দ্র তাঁহার বক্তৃতার যতগুলি কার্য্য-পরিকল্পনার কথা বলিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটী অশেষবিধ রকমের অসামঞ্জস্য ও অসঙ্গতিতে পরিপূর্ণ। উহার যে কোনটীতে হস্তক্ষেপ করা যাউক্ না কেন, তাহার প্রত্যেকটীতে দেশবাসীর উপকার হওয়া তো দূরের কথা, অপকার হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

ছোট-খাটো অসঙ্গতির কথা বাদ দিলে দেখা যাইবে যে, বড় বড় ষোলটী অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যের দৃষ্টান্ত সুভাষ বাবুর বক্তৃতায় পরিস্ফুট হইয়াছে।

সৈনিক যখন খাদ্যাভাবে বুভুক্ষু তখন তাহার খাদ্যের বন্দোবস্ত না করিয়া ক্ষুধা-প্রপীড়িত সৈনিক লইয়া যুদ্ধে আহ্বান হওয়া, আর শূন্যের উপর দুর্গনির্ম্মাণের আয়োজন করা যে একার্থক এবং এতাদৃশ কার্য্য যে নিতান্ত অসঙ্গত ও অদূরদর্শিতার পরিচায়ক, তাহা সহজেই বুঝা যাইবে।

সুভাষ বাবুর বক্তৃতার প্রথম ভাগেই উপরোক্ত ভাবের কার্য্যের দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হইবে।

দেশবাসী যাহাতে সর্ব্বপ্রথমে স্বাধীনতার যুদ্ধে আহ্বান হয়, ইহাই তাঁহার বক্তৃতার সর্ব্বপ্রথম কথা। যতদিন পর্য্যন্ত স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কি উপায়ে বেকারাবস্থা অপনয়ন করা, অথবা জনসাধারণের অর্থাভাব দূর করা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে, তাহার কোন কথা না কহিয়া স্বাধীনতা লাভ করিবার পর আর্থিক অভাব দূর করিবার কি পরিকল্পনা গৃহীত হইতে পারে, তাহার অনেক আলোচনা তিনি করিয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, দেশের জনসাধারণের আর্থিক দুরবস্থা যেরূপ ভাবে প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহারা প্রায়শঃ যেরূপ অনশনে ও অর্দ্ধাশনে প্রপীড়িত হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে তাহাদিগের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে সংঘটিত না হইলে তাহাদিগের দ্বারা আর কতদিন স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিচালিত করা সম্ভবযোগ্য হইবে, তাহা সুভাষ বাবু ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? সুভাষ বাবু দেশবাসীকে যে উপায়ে স্বাধীনতা-সংগ্রাম পরিচালনা করিবার

পরামর্শ দিয়াছেন, ঐ উপায়ে স্বাধীনতা লাভ করিতে যতদিন সময় লাগিবে, ততদিন পর্য্যন্ত জন-সাধারণের কয়জন জীবন রক্ষা করিয়া সুভাষ বাবুর অর্থাভাব দূর করিবার পরিকল্পনা-গুলির সহায়তা লাভ করিবার সুযোগ পাইবে, তাহা কেহ ভাবিয়া দেখিবেন ? সুভাষ বাবুর এই পরিকল্পনাটী কি কতকটা "প্রাণ যায় ভিক্ষা মাগিয়া খাব" এই মনোবৃত্তির অনুরূপ নহে ? সুভাষ বাবু যে ধনীর সন্তান, তাঁহার পক্ষে অন্নাভাব যে কি ভীষণ, তাহা বুঝা সম্ভব নহে, ইহা স্মরণ করিয়া যদি বলা যায় যে, "চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে" ? তাহা হইলে কি অসঙ্গত হইবে ?

সুভাষ বাবুর বক্তৃতায় আর কিছু দূর অগ্রসর হইলেই দেখা যাইবে যে, তিনি পরাধীন প্রবৃত্তি লইয়া স্বাধীনতা লাভ করিবার পরিকল্পনা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহা আমাদের মতে তাঁহার বক্তৃতায় দ্বিতীয় অসঙ্গতির দৃষ্টান্ত।

ইংলণ্ড যখন বিপদাপন্ন, তখন তাহার বিপন্নাবস্থার সহায়তা লইয়া ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ করিবার চেষ্টা আমাদের মতে পরাধীন প্রবৃত্তি লইয়া স্বাধীনতা লাভ করিবার পরিকল্পনার অনুরূপ। স্বাধীনভাবে নিজেদের বুদ্ধি দ্বারা ইংরাজকে বিপন্ন করিয়া অথবা পরাজিত করিয়া স্বাধীনতা লাভ করা, আর কে কখন ইংরাজকে বিপন্ন করিবে, সেই সুযোগে ফাঁকতালে স্বাধীনতা লাভ করিবার পরিকল্পনা যে এক কথা নহে, তাহা সহজেই বুঝা যাইবে।

সুভাষ বাবু যে স্বাধীনতা-সংগ্রামের পরিকল্পনা তাঁহার বক্তৃতায় দাখিল করিয়াছেন—উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ঐ পরিকল্পনানুসারে দেশের মধ্যে ঐক্য-বন্ধনের কথা আছে বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামে জয় হইবার বেশী ভরসা ইংরাজের বর্ত্তমান দুরবস্থা ; দার্শনিক ভাবে এই অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া লইয়া ইতিহাসের দৃষ্টান্তের দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করিলে দেখা যাইবে যে, যতদিন পর্য্যন্ত ভারতবাসিগণ নিজেরা যোগ্যতা লাভ করিতে না পারেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের পক্ষে কখনও স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভবযোগ্য হইবে না। ইংরাজ যদি বাস্তাবিক পক্ষে বিপন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে হয় ত তাঁহাদের সাম্রাজ্য ধ্বংস হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের স্থলে যে জাপানীগণ, অথবা ইটালীবাসিগণ, অথবা রুশিয়াবাসিগণ ভারতবর্ষে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবেন না, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই।

সুভাষ বাবুর বক্তৃতায় তৃতীয় অসঙ্গতি তিনি সংগ্রামের প্রবৃত্তি লইয়া একতাবন্ধনের অথবা দ্বন্দ্বহীন হইবার চেষ্টা দেখাইয়াছেন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে যে সর্ব্বাগ্রে একতার প্রয়োজন, তাহা সুভাষবাবু তাঁহার বক্তৃতায় একাধিক স্থানে স্বীকার করিয়াছেন এবং ঐ একতা কিরূপ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহার আলোচনাও ঐ বক্তৃতায় স্থান পাইয়াছে বটে, কিন্তু এক নিঃশ্বাসেই আবার তিনি বলিয়াছেন যে, "আমাদের স্বাধীনতার চরম লক্ষ্য ব্রিটিশারগণের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করা" ; "কংগ্রেসকে ক্ষমতাশালী করিতে হইলে সিভিলিয়ানদিগের ক্ষমতার খর্ব্বতা সাধন করিতে হইবে" ; "প্রয়োজন হইলে আবার ব্যাপক ভাবে আইন-অমান্য অস্ত্রের ব্যবহার করিতে হইবে" ; "নূতন আইনের ফেডারেশন-কল্পনা যাহাতে ব্যর্থ হয় তাহা করিতে হইবে।" ব্রিটিশারগণের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করার কথা, সিভিলিয়ানদিগের ক্ষমতার খর্ব্বতা সাধন করিবার কথা আইন-অমান্যের কথা এবং নূতন আইনের ফেডারেশনের পরিকল্পনার কথা যে কলহ-প্রবৃত্তি হইতে উদ্ভূত, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইবে। এতাদৃশ কথাগুলির সাহায্যে রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রের উষ্ণতা রক্ষা করা অথবা অপরিণতবয়স্ক যুবকদিগকে উত্তেজিত করা সহজসাধ্য হয় বটে, কিন্তু ঐ প্রবৃত্তির ফলে যে, দেশের মধ্যে বিবাদ ও দলাদলি অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে, তাহা সহজেই পরিলক্ষিত হইবে। সংগ্রামের প্রবৃত্তির সহিত একতাবন্ধনের চেষ্টা কতকটা একসঙ্গে 'দুধ ও তামাক' খাইবার চেষ্টার অনুরূপ। উহাতে কখনও সিদ্ধকাম হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় না, তাহা আমাদের এখনও বুঝা উচিত।

সুভাষবাবুর বক্তৃতায় চতুর্থ অসঙ্গতি তিনি বিনিময়ের প্রবৃত্তি লইয়া একতাবন্ধনের চেষ্টা দেখাইয়াছেন।

হিন্দুর সহিত মুসলমানের ৷ গরিষ্ঠ (majority) দলের সহিত লঘিষ্ঠ (minority) দলের। অবনত জাতি-গুলির সহিত উন্নত জাতিগুলির মিলন কিরূপ ভাবে সম্ভব-

যোগ্য হইবে, তাহার আলোচনায় তিনি যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, ঐ সব কথাতে আমাদের উপরোক্ত অভিযোগের সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে।

বিনিময়ের প্রবৃত্তির দ্বারা যে ঐকান্তিক মিলন কখনও সম্ভবযোগ্য হয় না, ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যে সন্দেহের ভাব সর্ব্বদা জাগ্রত থাকে, তাহা বাস্তব জগৎ নিরীক্ষণ করিলে অস্বীকার করা যায় না।

রাগ এবং দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র কর্ত্তব্যবুদ্ধি দ্বারা কিরূপ ভাবে কার্য্যে প্রণোদিত হইতে হয়, তাহা শিক্ষা করিতে না পারিলে, অথবা জনসাধারণকে শিখাইতে না পারিলে অন্য কোন উপায়ে যে মানুষে মানুষে ঐকান্তিক মিলন হওয়া সম্ভবপর নহে, তাহা মানুষ আজকাল বুঝিতে পারে না বটে, কিন্তু অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, বহুসহস্র বৎসর আগে ঐ কথার সত্যতা অতি পরিষ্কার ভাবে বেদ, বাইবেল ও কোরাণে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

সুভাষ বাবুর বক্তৃতার পঞ্চম অসঙ্গতি, তিনি উচ্ছৃঙ্খলতার দ্বারা সৎকার্য্যসাধনের চেষ্টা দেখাইয়াছেন।

আইন-অমান্য (civil disobedience) যে উচ্ছৃঙ্খলতার দৃষ্টান্ত তাহা অনুমান করা খুব সম্ভব আমাদিগের যুবকগণের পক্ষে পর্য্যন্ত সহজসাধ্য হইবে।

কোনরূপ উচ্ছৃঙ্খলতার দ্বারা যে কোনরূপ সৎকার্য্য সাধিত হইতে পারে না, ইহাও সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে।

কাজেই, যাঁহারা আইন-অমান্যের দ্বারা দেশোদ্ধারের কথা বলিয়া থাকেন, তাঁহারা গান্ধীজী-ই হউন, আর সুভাষ বাবুই হউন, তাঁহাদিগের ভাগ্যে যে প্রকৃত রাষ্ট্রনীতি-বিজ্ঞানের "ক"-"খ"তে প্রবেশলাভ সম্ভবযোগ্য হয় নাই, ইহা যুক্তিসঙ্গত ভাবে অস্বীকার করা যায় না।

সুভাষবাবুর বক্তৃতার ষষ্ঠ অসঙ্গতি, তিনি কৃতঘ্নতার প্রবৃত্তি লইয়া সৎকার্য্য-সাধনের চেষ্টার উদ্যোগ দেখাইয়াছেন।

ইংরাজদিগের সহিত বিচ্ছিন্ন হইবার পরিকল্পনা আমাদিগের মতে কৃতঘ্নতার প্রবৃত্তিপ্রসূত। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজ ভারতবর্ষে যাহা যাহা করিয়াছেন, তাহাতে ভারতবাসিগণের পক্ষে যে ইংরাজের প্রতি কৃতজ্ঞ হইবার অনেক কারণ আছে, তাহা মানুষ হইলে অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজের ঐ সমস্ত কার্য্যে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী সম্পূর্ণ ভাবে রক্ষা পায় নাই, তাহা সত্য। কিন্তু, তজ্জন্য ইংরাজকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। কোন্ কারণে কোন্ কার্য্য হয়, তাহার দর্শন (philosophy) (অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞা-দর্শন) যখন আবার মনুষ্যসমাজে যথাযথ অর্থে প্রচারিত হইবে, তখন আমাদিগের উপরোক্ত কথার সত্যতা সহজেই প্রতিভাত হইবে।

কৃতঘ্নতার প্রবৃত্তি লইয়া যে, কোন শ্রেণীর সৎকার্য্য সাধন করা সম্ভব হয় না, তাহা খাঁটী ভারতীয় সন্তানগণের পক্ষে বুঝা সহজসাধ্য হওয়া উচিত।

জনসাধারণকে আত্মত্যাগ শিখাইবার কথা সুভাষ বাবুর বক্তৃতার সপ্তম অসঙ্গতির পরিচয়।

প্রকৃত দর্শনে প্রবেশ লাভ করিতে পারিলে বুঝা যাইবে যে, কোন শ্রেণীর মানুষের পক্ষে আত্ম-সংযম অভ্যাস করা সম্ভবযোগ্য হয় বটে এবং সময় সময় অভিমান-ত্যাগও সাধনা-সাধ্য ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হয় বটে, কিন্তু আত্মত্যাগ কখনও সম্ভব-যোগ্য হয় না। যাঁহারা আত্মত্যাগের কথা কহিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বর্ত্তমান যুগে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন বটে, কিন্তু তলাইয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, "আত্মত্যাগ" একটি কথার কথা, সোনার পাথরের বাটীর অনুরূপ। উহা কখনও কার্য্যতঃ সিদ্ধ হয় না।

সুভাষ বাবুর সম্মান রক্ষা করিবার জন্য আত্ম-সংযমকে যদি আত্ম-ত্যাগের প্রতিশব্দ বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলেও উহা জনসাধারণের প্রত্যেকের শিক্ষণীয় নহে, কারণ উহা শিক্ষা করা প্রত্যেকের পক্ষে সম্ভবযোগ্য নহে। "ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ অজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্", এই ব্যাস-বাক্য মিথ্যা নহে।

Local ও cultural autonomy-র, অর্থাৎ স্থানগত ও কৃষ্টিগত স্বায়ত্ত-শাসনের কথা—সুভাষ বাবুর বক্তৃতার অষ্টম অসঙ্গতির পরিচয়। দার্শনিক ভাবে তলাইয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে, উহাও একটি কথার কথা। উহা কখনও কার্য্যতঃ সিদ্ধ হওয়া সম্ভব নহে।

সুভাষ বাবুর বক্তৃতার নবম অসঙ্গতি—তিনি অস্বাভাবিক উপায়ে স্বভাবের উন্নতি সাধন করিবার চেষ্টা দেখাইয়াছেন।

সমগ্র ভারতবাসীর মধ্যে একতাস্থাপনকল্পে একটি ভাষা ও একটি লিখনপ্রণালী চালাইবার প্রসঙ্গে তিনি যে যে কথা বলিয়াছেন, ঐ ঐ কথাগুলির মধ্যে আমাদের উপরোক্ত অভিযোগের সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে।

প্রকৃত ভাষাতত্ত্বে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক ভাষার তিনটি রূপ আছে। একটির নাম প্রাকৃত, দ্বিতীয়টীর নাম লৌকিক এবং তৃতীয়টীর নাম সংস্কৃত। উর্দ্দু, হিন্দী প্রভৃতিকে লৌকিকভাষা বলিয়া আখ্যাত করিতে হয়। যাঁহারা হিন্দীভাষা-ভাষী, তাঁহাদিগের পক্ষে কথাবার্ত্তায় সম্পূর্ণভাবে উর্দ্দু ভাষা ব্যবহার করা, অথবা যাঁহারা উর্দ্দু-ভাষাভাষী, তাঁহাদিগের পক্ষে যে সম্পূর্ণ নিখুঁত ভাবে হিন্দীভাষা ব্যবহার করা সম্ভবযোগ্য হয় না, তাহা বাস্তব জগৎ তলাইয়া লক্ষ্য করিলেই প্রতীয়মান হইবে। যে ভাষা যাহার মাতৃভাষা নহে, তাহাকে সেই ভাষায় কথা কহিতে আদেশ করিলে যে অস্বাভাবিকতার প্রচলন করা হয়, ইহা সহজেই বুঝা যাইবে এবং তাহাতে কখনও সম্পূর্ণ ভাবে সিদ্ধি লাভ করা সম্ভব হয় না।

অথচ, তিনি ভারতীয়গণের একতাস্থাপনের জন্য এতাদৃশ পরিকল্পনা দাখিল করিয়াছেন। দর্শনে প্রবেশ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, মানুষের পরস্পরের একতা স্বভাবানুগ। প্রকৃতি অথবা স্বভাব মানুষকে প্রতিনিয়ত সঙ্ঘবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন, অথচ মানুষে মানুষে যে দ্বন্দ্ব-কলহ হয়, তাহার একমাত্র কারণ, মানুষের কুশিক্ষা অথবা উচ্ছৃঙ্খলতা।

কাজেই বলিতে হইবে যে, সুভাষ বাবু ভারতীয়গণের একতাবন্ধনরূপ স্বভাবানুগ কার্য্য নিষ্পন্ন করিবার জন্য সমস্ত মানুষের মধ্যে একটি লৌকিক ভাষার প্রয়োগরূপ অস্বাভাবিক পরিকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে সাফল্য লাভ করা কখনও সম্ভবযোগ্য নহে।

সমস্ত মানুষের পক্ষে একই লৌকিক ভাষা যেরূপ স্বভাববিরুদ্ধ পরিকল্পনা, সেইরূপ আবার সমস্ত ভাষায় একই রকমের লিখনপ্রণালীও (script) প্রকৃতিবিরুদ্ধ। ইহা ইউরোপীয়গণ এখনও বুঝিতে পারেন না বটে, কিন্তু শব্দতত্ত্বে প্রবেশ লাভ করিতে পারিলে উহা যে বাস্তব সত্য, তাহা উপলব্ধি করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়।

ভাষা অথবা লিখনপ্রণালী এক হইলেই যে মানুষের পক্ষে একতাবন্ধনে বদ্ধ হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে, তাহা সুভাষবাবু ও গান্ধীজীর দিকে লক্ষ্য করিলেই সপ্রমাণিত হইবে। সুভাষবাবু ও গান্ধীজী যে সম্পূর্ণ নিখুঁত না হইলেও প্রশংসাযোগ্য ভাবে ইংরাজী বলিতে ও লিখিতে শিখিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তাঁহারা ইংরাজগণের সহিত ঐকান্তিক মিলনে মিলিত হইতে পারিয়াছেন কি ?

মনুষ্যজাতির পতনের পরাকাষ্ঠা না ঘটিলে ভাষা ও লিখনপ্রণালীর অস্বাভাবিকতা মনুষ্যসমাজে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না, ইহা ভারতীয় ঋষিগণের অভিমত।

ভাষাতত্ত্ব ও শব্দতত্ত্বে প্রবেশ লাভ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উহা অতীব দুরূহ। যাঁহারা আত্ম-প্রচারের জন্য ব্যাকুল, তাঁহাদের পক্ষে উহাতে বিন্দুমাত্র পরিমাণেও প্রবেশ লাভ করা সম্ভবযোগ্য নহে। আমাদের মতে সুভাষবাবু প্রভৃতি আধুনিক রাষ্ট্রগুরুগণ এই বিদ্যার সম্পূর্ণ অনধিকারী এবং সুভাষবাবুর এই অনধিকার-চর্চ্চা না করাই সঙ্গত।

সুভাষবাবুর বক্তৃতার দশম অসঙ্গতি—তিনি স্বভাবের বিরোধিতা করিয়া জনসাধারণের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

লোকসংখ্যা-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে তিনি যে যে কথা বলিয়াছেন, সেই সমস্ত কথাতে আমাদের উপরোক্ত অভিযোগের সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে।

কৃত্রিমভাবে লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা করিলেই যদি লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবযোগ্য হইত এবং তাহা হইলেই যদি জনসাধারণের দুঃখ দূর করা সম্ভবযোগ্য হইতে পারিত, তাহা হইলে ইয়োরোপীয় জনসাধারণের কোন দুঃখ থাকিতে পারিত না।

আমাদের মতে স্বভাবের বিরোধিতা করিয়া কখনও কোন অশান্তি অথবা অভাবের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয় না।

কি করিয়া মানুষের যাবতীয় অভাব দূর করিতে হয়, মানুষের সৃষ্টি, স্থিতি ও পরিবর্ত্তনের কারণ কি, তৎসম্বন্ধীয় দর্শনে ও বিজ্ঞানে প্রবেশ লাভ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, অধিকতর জনসংখ্যা প্রকৃতির দান এবং অর্থাধিক্য যেরূপ মানুষের শক্তিমত্তার পরিচয়, সেইরূপ জনাধিক্যও মানুষের শক্তিমত্তারই পরিচয়।

ব্যক্তিগত জীবনে অকৃতিত্ব বশতঃ আত্মহত্যার প্রয়াস যেরূপ নিন্দনীয় ও দণ্ডার্হ, সেইরূপ জাতীয় জীবনে যাঁহারা জনসংখ্যা-নিয়ন্ত্রণের কথা কহিয়া থাকেন, তাঁহারা আমাদের মতে ধিক্কারযোগ্য ও দণ্ডার্হ হওয়া উচিত।

সুভাষ বাবুর বক্তৃতার একাদশ অসঙ্গতি—তিনি কৃষিকার্য্যকে অঙ্গহীন করিয়া তাহার উন্নতিবিধানের কথা বলিয়াছেন।

জমিদারী-স্বত্বের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি সাধন করিয়া কৃষি-কার্য্যের উন্নতিবিধান সম্বন্ধে সুভাষবাবু যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, সেই সমস্ত কথায় আমাদের উপরোক্ত অভিযোগের সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে।

বর্ত্তমান জমিদারগণ যে প্রায়শঃ কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু জমীদার না থাকিলে কখনও কৃষিকার্য্যের উন্নতি হওয়া সম্ভব নহে। কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন করিতে হইলে প্রথমতঃ তৎসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান, অর্থাৎ কি উপায়ে স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির বৃদ্ধি ও রক্ষা প্রভৃতি পরিজ্ঞাত হইবার প্রয়োজন হয়, দ্বিতীয়তঃ কৃষি-বিজ্ঞান যাহাতে কৃষকগণ জানিতে পারে এবং কৃষিকার্য্য যাহাতে অনায়াস-সাধ্য হয়, এবং তৃতীয়তঃ যথোপযুক্ত সময়ে যাহাতে উপযুক্ত ভূমিতে উপযুক্ত বীজবপনাদির কার্য্য সাধিত হয়, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবার প্রয়োজন হয়। এই তিনটি কার্য্যের প্রথমটির জন্ত বৈজ্ঞানিক, দ্বিতীয়টির জন্ত জমীদার এবং তৃতীয়টীর জন্ত কৃষকের আবশ্যক হয়। এই তিনটীর কোনটীকে বাদ দিয়া কৃষির উন্নতির পরিকল্পনা করিলে ঐ পরিকল্পনা অঙ্গহীন হইয়া থাকে এবং তাহা কখনও সাফল্যলাভ করিতে পারে না। বর্ত্তমানে কাল ও অদৃষ্টবশে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ও প্রকৃত দায়িত্বজ্ঞানযুক্ত জমীদার বিলুপ্ত হইয়াছে এবং তৎস্থানে কতকগুলি অভিমানগ্রস্ত কেরাণ পাল হৈ চৈ করিতে পারিতেছে বলিয়াই মানবসমাজে কৃষিকার্য্য এতাদৃশ অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং নিরপরাধ কৃষকগণ দুঃখ-দৈন্তে হাবুডুবু খাইতেছে। বর্ত্তমান অবস্থায়, যাঁহারা বৈজ্ঞানিক অথবা দায়িত্বজ্ঞানযুক্ত জমীদার না হইয়াও বৈজ্ঞানিকের অথবা জমীদারের পালায় অভিনয় করিতেছেন, তাঁহাদিগকে পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু জমিদারী-স্বত্বের বিলুপ্তিসাধনের দ্বারা কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধিত হইতে পারে, এমন কথা কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির মুখ হইতে নির্গত হইতে পারে না। সুভাষ বাবুকে মনে রাখিতে হইবে যে, কোন বিষয়কে অঙ্গহীন করিয়া সর্ব্বতো-ভাবে তাহার উন্নতি সাধন করা কদাচ সম্ভবযোগ্য হয় না।

সুভাষবাবুর বক্তৃতার দ্বাদশ অসঙ্গতি—তিনি কৃষক-গণের ঋণ করিবার পন্থা সুগম করিয়া তাঁহাদিগকে নির্দ্দায়িক করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন।

তাঁহার বক্তৃতার যে স্থলে কৃষকগণের সস্তা ঋণ (cheap credit), কো-অপারেটিভ আন্দোলন (co-operative movement for the benefit of producers and consumers) প্রভৃতির কথা রহিয়াছে, সেই কথাগুলির মধ্যে আমাদের উপরোক্ত অভিযোগের সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে।

অভাবগ্রস্ত মানুষের ঋণ পাওয়া সহজসাধ্য হইলে তাহাদের ঋণ বৃদ্ধিই পাইতে থাকে। কখনও উহার পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না।

দৈনন্দিন খরচ নির্ব্বাহে যাহাতে কৃষকগণের কোন ঋণের প্রয়োজন না হয়, তাহা করা যতদিন পর্য্যন্ত সম্ভব-যোগ্য না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কৃষকগণের দুর্দ্দশার মোচন করা কোনরূপেই সম্ভবযোগ্য হইবে না এবং ততদিন পর্য্যন্ত কোন শিল্প-বাণিজ্য, ওকালতি, ডাক্তারী প্রভৃতি ব্যবসায় নিরুপদ্রবে চলিতে পারিবে না, ইহা একটু তলাইয়া চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে।

সভাপতি সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতার কথাগুলি যে প্রায়শঃ পরস্পর-বিরোধী ও অসামঞ্জস্যে পরিপূর্ণ, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

ছোট-খাট অসঙ্গতির কথা বাদ দিলেও আমাদের মতে বড় বড় ষোলটি অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যের দৃষ্টান্ত

সুভাষ বাবুর বক্তৃতায় পরিস্ফুট হইয়াছে। এই ষোলটি অসঙ্গতির মধ্যে বারটী অসঙ্গতির দৃষ্টান্ত আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি।

সুভাষ বাবুর বক্তৃতার ত্রয়োদশ অসঙ্গতি—তিনি অস্বাভাবিক উপায়ে জমির প্রসবিনী শক্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।

জন-সাধারণের আর্থিক দুঃখ দূর করিতে হইলে জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতে হইবে এবং তজ্জন্ত পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের আশ্রয় লইতে হইবে, এবংবিধ কথা তাঁহার বক্তৃতার যে স্থলে স্থান পাইয়াছে, সেই স্থলে আমাদের উপরোক্ত অভিযোগের সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে।

প্রকৃত পক্ষে বিজ্ঞান হউক আর না-ই হউক, বিজ্ঞানের নাম দিয়া কোন একটা কথা হইলেই আমাদের দেশের লোক তাহাতে আজকাল আকৃষ্ট হইয়া পড়েন এবং মনে করেন যে, উহার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন না কোন সারবত্তা আছে। কিন্তু, অধিকাংশ স্থলেই উহা সত্য নহে। পাশ্চাত্ত্য কৃষি-বিজ্ঞান আমাদের এই অভিযোগের অন্যতম দৃষ্টান্ত। পাশ্চাত্ত্য কৃষি-বিজ্ঞানে যদি কোন সারবত্তা থাকিত, তাহা হইলে প্রায় প্রত্যেক পাশ্চাত্ত্য জাতিটীকে উদরান্নের জন্ত দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত না, কাঁচামালের (raw materials) জন্তও অন্ত দেশের মুখাপেক্ষী হইতে হইত না এবং তাঁহাদের কৃষকগণকে স্বাধীন কৃষি ছাড়িয়া দিয়া উত্তরোত্তর চাকুরীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হইত না।

আধুনিক তথাকথিত কৃষি-বিজ্ঞানের পাতা যাঁহারা উল্টাইয়াছেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, ঐ বিজ্ঞানে কৃষির উন্নতিপন্থিকল্পে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, তাহা মুখ্যতঃ অস্বাভাবিক উপায়ে প্রসবিনী শক্তি বৃদ্ধি করিবার পরিকল্পনা। এই অস্বাভাবিক উপায়ের ফলে প্রথমতঃ—কৃষকদিগকে বৈজ্ঞানিক ও ধনিকদিগের মুখাপেক্ষী হইতে হয় এবং ক্রমশঃ স্বাধীন কৃষির বিলুপ্তি ঘটিয়া কৃষকদিগকে চাকুরী-জীবী হইতে বাধ্য হইতে হয়, দ্বিতীয়তঃ—প্রথম প্রথম কয়েক বৎসর ফসলের পরিমাণ কথঞ্চিৎ পরিমাণে বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু, অস্বাভাবিক উপায়ের ফলে জমীর উর্ব্বরাশক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে এবং মাঝে মাঝে জমীকে অনাবাদী না রাখিলে সন্তোষজনক পরিমাণে ফসল পাওয়া অসম্ভব হইয়া উঠে, তৃতীয়তঃ—জমী হইতে যে সমস্ত ফসলের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা স্বাস্থ্য-সাধনের ক্ষমতা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে আরম্ভ করে এবং পরিশেষে অস্বাস্থ্যের সূচনা ঘটিয়া থাকে।

অনেকে হয়ত বলিবেন যে, আমাদের উপরোক্ত কথাগুলি প্রমাণসাপেক্ষ। চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিতে পারিলে বর্ত্তমানে পাশ্চাত্ত্য দেশের কৃষিকার্য্যে যাহা ঘটিতেছে, তন্মধ্যেই আমাদের অভিযোগের যথেষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু, দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, আজকাল মানুষ অতিরিক্ত পান-ভোজন ও স্ত্রী-পুরুষের মিলিত নর্ত্তন-কুর্দ্দনে অত্যধিক প্রমত্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার ফলে প্রায়শঃ মানুষের বুদ্ধি হ্রাস পাইয়াছে। ইহারই ফলে, অতীব সাধারণ সত্যসমূহও মানুষ এখন আর বুঝিতে সক্ষম হয় না।

সুভাষবাবুর বক্তৃতার চতুর্দ্দশ অসঙ্গতি—তিনি ব্যক্তি-গত পরাধীনতার বৃদ্ধি সাধন করিয়া জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করিবার পরিকল্পনা দাখিল করিয়াছেন।

গভর্ণমেণ্টের মালিকানায় (State ownership) এবং গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে (State control) শিল্পোন্নতির জন্ত যে সমস্ত কথা তিনি বলিয়াছেন, সেই সকল কথার মধ্যে আমাদিগের উপরোক্ত অভিযোগের সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে।

শিল্পকার্য্য যাহাতে শিল্পিগণের প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে চালাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা না হইয়া যাহাতে সমস্ত শিল্পকার্য্যের মালিক ও পরিচালক গভর্ণমেণ্ট হন, তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইলে শিল্পিগণকে বাধ্য হইয়া চাকুরীজীবী হইয়া পড়িতে হয় এবং তখন ক্রমশঃ মানুষ ব্যক্তিগতভাবে পরাধীন হইতে বাধ্য হয়। এইরূপ ভাবে ব্যক্তিগতভাবে মানুষের পরাধীনতা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে কোন জাতির স্বাধীনতা বিদ্যমান থাকিলেও ঐ জাতির মানুষগুলির পক্ষে ব্যক্তিগত অথবা পরিবারগত ভাবে প্রকৃত সুখলাভ করা সম্ভবযোগ্য হয় না। আমাদের উপরোক্ত কথা যে সর্ব্বতোভাবে সত্য, তাহা যে-কোন

তথাকথিত স্বাধীন পাশ্চাত্ত্য জাতির মানুষের ব্যক্তিগত জীবন পরীক্ষা করিলেই প্রতিপন্ন হইবে।

প্রকৃত সুখের পরিবার, অথবা অকৃত্রিমভাবে আন্তরিক সহানুভূতি-সম্পন্ন আত্মীয়-স্বজন লইয়া সমাজ-বন্ধন প্রায়শঃ পাশ্চাত্ত্যগণের মধ্যে দেখা যায় না। ইহার ফলে তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবন "ভোজনং যত্র তত্র শয়নং হট্টমন্দিরে" হইয়া পড়িয়া পশুর জীবনের অনুরূপ হইয়া পড়িয়াছে। যে-জাতির মানুষ-গুলি ব্যক্তিগতভাবে উপরোক্তভাবে অমানুষোচিত হইয়া থাকে, তাহাদের জাতীয় স্বাধীনতার প্রকৃত কোন মূল্য আছে কি?

ভারতীয় নেতৃবর্গের অনুকম্পায় এখানকার যুবকগণ প্রায়শঃ মনে করিয়া থাকেন যে, রাশিয়া দ্বিতীয় স্বর্গের অনুরূপ হইয়া পড়িয়াছে। আর্থিক অবস্থার ভাল-মন্দ কিরূপভাবে বিচার করিতে হয়, তাহা আমাদের নেতৃবর্গের পরিষ্কার ভাবে জানা নাই বলিয়া তাঁহারা রাশিয়াকে সুখের আগার মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু, সঠিকভাবে বিচার করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, রাশিয়ার নূতন জীবন আরম্ভ হইয়াছে উচ্ছৃঙ্খলতা লইয়া এবং তাঁহাদের আর্থিক অবস্থায় লোভনীয় কিছুই সুলভ এখনও হয় নাই।

সর্ব্বতোভাবে গভর্ণমেণ্টের মালিকানায় ও গভর্ণমেণ্টের পরিচালনায় শিল্পোন্নতির পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হইয়া যাহাতে প্রত্যেক শিল্পী অথবা প্রত্যেক কৃষক স্বাধীনভাবে শিল্পকার্য্যে অথবা কৃষিকার্য্যে লাভবান্ হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত কোন দেশের মানুষের পক্ষেই কথঞ্চিৎ পরিমাণেও প্রকৃত শান্তি লাভ করা সম্ভবযোগ্য হইবে না।

সুভাষবাবুর বক্তৃতার পঞ্চদশ অসঙ্গতি—তিনি দেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ বৃদ্ধি করিয়া ঐক্য সাধন করিবার পরিকল্পনা ঘোষণা করিয়া থাকেন।

তাঁহার বক্তৃতায় যে স্থানে সিভিলিয়ানগণের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করিয়া গবর্ণমেণ্টকে স্থায়ী ভাবে সংযত করিবার প্রবন্ধের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সেই স্থানে আমাদের উপরোক্ত অভিযোগের সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে।

সিভিলিয়ানগণের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করিতে গেলে যে দেশের মধ্যে তীব্র ভাবে কলহের উদ্ভব হইবে এবং তাহাতে যে দলাদলি বৃদ্ধি পাওয়া অবশ্যম্ভাবী, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কাজেই, একসঙ্গে একতা-সাধনের কথা ও সিভিলিয়ানগণের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করিবার কথা কহিলে বাস্তব-জীবনের অনভিজ্ঞতার নিদর্শন প্রকাশ করা হইয়া থাকে।

সুভাষবাবুর বক্তৃতার ষোড়শ অসঙ্গতি—তিনি দ্বন্দ্ব-কলহের দ্বারা জনসাধারণের অভাব মোচনের এবং শান্তি-লাভ করিবার চেষ্টার পরিকল্পনা ঘোষণা করিয়া থাকেন।

ভারতবর্ষ যাহাতে ব্রিটিশ-জাত দ্রব্যের বিক্রয়-ভূমি না হইতে পারে (not to be a dumping ground of British products), এতাদৃশ কথা সুভাষবাবুর বক্তৃতায় যে স্থানে বলা হইয়াছে, সেই স্থানে আমাদের উপরোক্ত অভিযোগের নিদর্শন পাওয়া যাইবে।

আমাদের উপরোক্ত কথার সত্যতা হয় ত এখনও অনেকেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। বণিক্‌দের মধ্যে অনেকেই হয় ত এখনও ব্রিটিশ-জাত বস্ত্র যাহাতে ভারতবর্ষে বিক্রয় না হয়, তাহার আন্দোলনের দ্বারা কিছু অধিক বিক্রয়কার্য্যে সাফল্য লাভ করিবেন, কিন্তু ঐ-জাতীয় আন্দোলনের দ্বারা যে জন-সাধারণের আর্থিক অপকার ছাড়া কোন উপকার সাধিত হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে, তাহা এই-বিষয়ক বুদ্ধি থাকিলে একটু তলাইয়া চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে।

কোন দেশের দ্রব্য কোন বাজারে বিক্রয় করিতে যাহাতে কোন বিঘ্ন উপস্থিত না হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি থাকিলে প্রতিযোগিতা-বশতঃ দ্রব্যের মূল্য হ্রাস প্রাপ্ত হওয়া ও দেশীয় শিল্পিগণের শিল্প-নৈপুণ্যে উন্নতি-লাভে যত্নবান্ হওয়া যে অবশ্যম্ভাবী এবং তাহার ফলে জনসাধারণের ব্যয় কমিয়া যাওয়া যে অনিবার্য্য, তাহা বুঝা কি এতই সুকঠিন।

উপসংহার

উপসংহারে আমরা বলিতে চাই, গান্ধীজী অথবা সুভাষবাবু দেশের স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য যে-রাস্তা বাতলাইয়াছেন এবং দেশের লোকগুলিকে যে-রাস্তায় পরিচালিত করিতেছেন, তদ্দ্বারা ভারতবর্ষের কখনও কি রাষ্ট্রীয়, অথবা কি আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভবযোগ্য

হইবে না। পরন্তু, ঐ রাস্তায় চলিলে কৃষ্টিগত পরাধীনতা অধিকতর দৃঢ়ভাবে ভারতবাসিগণকে জড়াইয়া ধরিবে।

ভারতবর্ষকে ও ভারতবাসিগণকে মুক্ত করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে যাঁহারা বিবিধ রকমের পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, শিল্প ও দর্শনের বক্তব্য কি কি, তাহা সঠিক ভাবে বুঝিতে পারিয়া ঐ বিজ্ঞান, শিল্প ও দর্শন যে জনসাধারণের প্রকৃত উন্নতিবিষয়ে সম্পূর্ণভাবে অসার, তাহা প্রাণে প্রাণে বাস্তব জীবনে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন, এমন কয়েকটি মানুষকে প্রকৃত শব্দ ও ভাষা-বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে এবং ঐ ভাষা-বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রাচীন সংস্কৃত, অথবা প্রাচীন হিব্রু, অথবা প্রাচীন আরবী ভাষাতে প্রবেশ করিয়া কোন্ উপায়ে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরা-শক্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে এবং কোন্ উপায়ে বিবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যের মধ্যে সমতা (parity) রক্ষিত হইতে পারে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, কাহারও সঙ্গে কোন দ্বন্দ্ব-কলহে প্রবৃত্ত না হইয়া, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জন্য কোনরূপ আন্দোলনে উদ্যত না হইয়া, যাঁহারা যখন গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করেন, সম্পূর্ণভাবে তাঁহাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইয়া, তাঁহাদের নিকট জন-সাধারণ যাহাতে চাকুরীর মুখাপেক্ষী না হইয়া দুই বেলা দুই মুঠোর সংস্থান করিতে পারে, তাদৃশ ব্যবস্থা যাচ্ঞা করিতে হইবে।

এতাদৃশ যাচ্ঞা উপস্থিত করিলে দেখা যাইবে যে, যাঁহারা বর্ত্তমানে গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজনও ঐ যাচ্ঞা পূরণ করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। আরও দেখা যাইবে যে, ঐ যাচ্ঞা উপস্থিত হইলেই জন-সাধারণের মধ্যে জাতি, ধর্ম্ম ও বর্ণ-নির্ব্বিশেষে একতা-স্থাপন হইবে।

এই অবস্থায়, কোন্ কোন্ উপায়ে চাকুরীর মুখাপেক্ষী না হইয়া জন-সাধারণের পক্ষে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান হইতে পারে, তাহা দেশের মধ্যে যাঁহারা অবগত হইতে পারিয়াছেন, তাঁহারা আগুয়ান হইলে অনায়াসেই তাঁহাদের পক্ষে দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করা সম্ভব হইবে এবং তখন সর্ব্বরকমের স্বাধীনতা ও মুক্তি করায়ত্ত হইতে পারিবে।

যতদিন পর্য্যন্ত গান্ধীজী ও তাঁহার অনুচরবর্গের ভেল্কীবাজীর ফাঁকী মানুষ না বুঝিতে পারিবে, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের কথার সারবত্তা অথবা সত্যতা মানুষের পক্ষে বুঝা সম্ভব হইবে না।

দেশের জন্য যাঁহাদের প্রাণ কাঁদে, তাঁহাদিগকে ও জনসাধারণকে আমরা এখনও সতর্কতা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করি।

স্বাধীনতার বুলি

…যাঁহারা ভারতবর্ষে "স্বাধীনতা" "স্বাধীনতা" বলিয়া হৈ চৈ তুলিয়াছেন, তাঁহারা কি করিলে দেশের প্রত্যেকের অন্নাভাব, অসন্তুষ্টি, অশান্তি, অস্বাস্থ্য এবং অকালমৃত্যু দূর হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে চিন্তা করেন নাই। কেবল পাশ্চাত্য দেশের অন্ধ অনুকরণে এই স্বাধীনতার বুলি এই দেশে আসিয়াছে। এই স্বাধীনতার বুলি পাশ্চাত্য দেশের প্রত্যেক জাতিকে অন্ধ করিয়া তুলিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশের কেহই স্ব স্ব দেশে কি করিয়া পরমুখাপেক্ষী না হইয়া অন্নসংস্থান করিতে হয়, তাহা পরিজ্ঞাত নহেন এবং প্রায় প্রত্যেক দেশেই অন্নাভাব ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে। এতদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা কখনও কখনও পাশবিক বলের সহায়তায় অন্য দেশ জয় করিয়া, কখনও কখনও ছল-চাতুরী দ্বারা অন্য দেশের বাজার (market) অর্জ্জন করিয়া তাঁহাদের অন্নসংস্থান করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু এখন আর জগতে এমন কোন দেশ নাই, যে-দেশে সেই দেশবাসীর নিজদেরই অন্নাভাব হয় না।…

প্রাচীন ভারতের গ্রাম

—শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

প্রাচীন ভারতের গ্রাম্য-শিল্পি-সঙ্ঘ, গ্রাম ও গ্রামশাসনবিধি সম্বন্ধে অনেক দেশীয় ও বৈদেশিক পণ্ডিত বহু গবেষণা করিয়াছেন। কিন্তু সে সমস্ত আলোচনার অধিকাংশই বৈদেশিক ভাষায় লিখিত। বঙ্গভাষায় এ-সম্বন্ধে যাহা কিছু আলোচনা, তাহা আংশিক ও অসম্পূর্ণ। এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ আলোচনা করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব। মূল বিষয় সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করাই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। *

বৈদিক যুগ

বৈদিক যুগ বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহার প্রারম্ভ-কাল হইতে অবসানকাল অন্ততঃ কয়েক সহস্র বর্ষ-ব্যাপী দীর্ঘ। এই দীর্ঘ কালের প্রথমভাগের বহুপূর্ব্ব হইতে, যাঁহাদিগকে আর্য্য বলা হয়, তাঁহারা কুটীর-নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন এবং গো-মেষাদি পালনের সঙ্গে সঙ্গে রীতিমত কৃষিকর্ম্মও করিতেন। ইঁহারা যে এই সময়ে পঞ্চসিন্ধু-বিধৌত ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বাস করিতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে যে তাঁহারা কোথায় ছিলেন এবং কোথা হইতে আসিয়াছেন, তাহার কোন সন্তোষজনক প্রমাণ এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই।

ঋক্ ও অথর্ব্ব বেদে বহুস্থলে আধুনিক অর্থে 'গ্রাম' শব্দের ব্যবহার দেখা যায় (ঋক্—১।৪৪।১০; ১৪৪।১; ২।১২।৭; ১০।১৪৬।১; ১৪৯।৪; অথর্ব্ব—৪।৩৬।৭-৮; ৫।১৭।৪; ৬।৪০।২; বাজসনেয় সং—৩,৪৫; ২০।১৭)। এ-সময়ে আর্য্যগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত প্রদেশসমূহে গ্রামসকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে অবস্থিত ছিল। কোন কোন গ্রাম পরস্পরের নিকটবর্ত্তী ছিল, আবার কোন কোন গ্রাম বহু দূরে দূরে অবস্থিত ছিল (শতপথ ব্রাঃ—১৩।২।৪।২; ঐতরেয় ব্রাঃ—৩।৪৪) এবং ঐ-দূরবর্ত্তী গ্রাম সকল পথদ্বারা সংযুক্ত ছিল (ছান্দোগ্য উপ—৭।৬।২)। একই কুলের কয়েকটী পরিবার কয়েকটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া একত্র বাস করিত। এই সকলের সমষ্টিই 'গ্রাম' নামে কথিত হইত। গ্রাম শব্দের প্রাচীনতম অর্থ 'সমূহ'। গৃহ অথবা পরিবারের সমূহই গ্রাম। তবে এ-কথা ঠিক নহে যে, একগ্রামে কেবলমাত্র একই কুলের লোক বাস করিত। গ্রামের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী ছিল বটে, তবে শিল্পিগণ ও অন্যান্য বৃত্তিজীবিগণ গ্রামে বাস করিত (অথর্ব্ব—৪।২২।১)। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন যে, বৈদিক যুগের প্রথমভাগেই আর্য্যগণ সবেমাত্র যাযাবরবৃত্তি ত্যাগ করিয়া কুটীরে বাস করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু কেবলমাত্র ঋগ্বেদেই আমরা যে-সভ্যতার উদাহরণ পাই, তাহা যাযাবর জাতির সভ্যতা নহে, সে সভ্যতা বহু প্রাচীন ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর অবস্থিত। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণই স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতের আর্য্যগণের নির্ম্মিত কুটীর আধুনিক যুগের গ্রাম্য কুটীরের ন্যায়ই রৌদ্র-বৃষ্টির ঝঞ্ঝাবাতের উপদ্রব সহ্য করিবার পক্ষে যথেষ্ট সুদৃঢ় ছিল * এবং তাহা রীতিমত বেড়া দিয়া ঘেরা থাকিত ও নদীতীরবর্ত্তী গ্রামসমূহ বাঁধ দ্বারা সুরক্ষিত এবং উচ্চভূখণ্ডের উপর স্থাপিত হইত।† আর্য্যগণ

* কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত একবিংশতিতম সাহিত্য-সম্মেলনের অর্থনীতি শাখায় পঠিত।

* The Aryan colonists lived in their houses; for they had already changed the moveable tents of the shepherd and nomad for a more fixed shelter. "Columns were set up on firm ground with supporting beams leaning obliquely against them, and connected by rafters on which long bamboo-rods were laid, forming the high roof. Between the corner posts other beams were set up, according to the size of the house. The crevices in the walls were filled in with straw or reeds, tied in bundles, and the whole was to some extent covered with the same material The various parts were fastened together with bars, pegs, ropes and thongs," —Kaegi Rigveda.

† A number of such dwellings form the village, fenced and enclosed settlements give protection against wild animals; against attack of enemies and against innundations large tracts were arranged in higher ground protected by earth-works and ditches, —Ibid.

যে কুটিরে বাস করিতেন, তাহাতে আধুনিক যুগের ন্যায়ই দ্বার থাকিত এবং সেই দ্বার অর্গল বদ্ধ করা হইত।†

গো-পালন যে বৈদিকযুগের একটি প্রধান উপজীবিকা ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই এবং এই গো-মেষাদি যে কোন শষ্পাচ্ছাদিত ভূখণ্ডে বিচরণ করিত, তাহাও সহজে অনুমেয়। কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলেন, এই সকল গ্রাম অরণ্যের পার্শ্বেই অবস্থিত ছিল, অর্থাৎ গ্রামের বাহিরেই অরণ্য। তাঁহারা গ্রাম শব্দের অর্থে -কেবল কয়েকটি কুটীরের সমষ্টিই মনে করেন, শস্যক্ষেত্রও যে এই গ্রামের অন্তর্ভুক্ত এবং গো-চারণ ভূমিও যে গ্রামের অঙ্গবিশেষ ছিল, তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন না বা অনুমান করিতে পারেন না। তাঁহারা বলেন, গোসকল অরণ্যে বিচরণ করিত। কিন্তু অরণ্যানীর উদ্দেশ্যে লিখিত ঋক্ হইতে ঠিক তাহার বিপরীত অর্থই বোধগম্য হয়। এই ঋকের রচয়িতা বলিয়াছেন :—হে অরণ্যানি তোমার মধ্যে এমন গভীর নির্জ্জনতা যে সময়ে সময়ে ভ্রম হয় কোথাও যেন গাভী চরিতেছে অথবা কোথাও যেন অট্টালিকা দৃষ্ট হইতেছে ("উত গাব ইবাদন্ত্যত বেশ্মেব দৃশ্যতে" ঋক্ ১০।১৪৬।৩)। প্রকৃত যদি অরণ্যে গাভীই চরিত, তবে এরূপ উক্তির সার্থকতা কি? হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি গোচারণ করে না। পরবর্ত্তী সাহিত্যে আমরা অরণ্য শব্দের যে সকল প্রয়োগ পাইয়াছি, তাহার অর্থ গ্রামের বহির্ভাগ (শুক্রনীতি—১।২৬৪)। যাহা হউক সূত্রযুগে আমরা "গোপ্রচার" বা গোচারণ-ভূমির উল্লেখ পাই (যাজ্ঞিকদেবস্থ পদ্ধতি--কাত্যায়নস্থ শ্রৌতসূত্রস্থ ২।১৬৬)। প্রাচীন কালে গো-সকল গ্রামের বাহিরে চরিতে যাইত এবং সন্ধ্যায় গ্রামে প্রত্যাগমন করিত। (ঋক্ ১০।১৪৯।৪; মৈত্রায়ণী সং-৪।১।১)। গোপালন ব্যতীত আর্য্যগণ অশ্বপ্রভৃতি চতুষ্পদ পশুও পালন করিতেন (অথর্ব্ব-৪।২৭।২; ৮।৭।১১)। বৈদিক সাহিত্যে গৃহপালিত পশু ও গ্রাম্য বৃক্ষাদি হইতে বন্যপশু ও বন্য উদ্ভিদাদির বিভিন্নতা যে সুস্পষ্ট ছিল, তাহার প্রমাণ আছে (ঋক্-১০।৯০।৪ অথর্ব্ব-২।৩৪।৪; ৩।১০।৫; ৩১।৩; তৈত্তিরীয় সং ৫।২।৫।৫; ৭।২।২।১; ৭।৩।৪।১; কাঠক সং ৭।৭; ১৩।১; বাজসনেয় সং ৯।৩২; পঞ্চবিংশতি ব্রাহ্মণ-১৬।১।৯; শতপথ ব্রাঃ-৩।৮।৪।১৬ ইত্যাদি)।

বৈদিক সাহিত্যে গোষ্ঠ শব্দের উল্লেখ আছে। গোষ্ঠ শব্দের অর্থ গবাদি পশু থাকিবার স্থান, তাহা হইতে পরবর্ত্তী যুগে গোপ্রচার অর্থেও ইহা প্রযুক্ত হইত। গোষ্ঠী শব্দের অর্থ পরিবার বা সভা। এই গোষ্ঠ শব্দ হইতেই গোষ্ঠী শব্দের উদ্ভব। সম্ভবতঃ একই পরিবারের লোক কোন এক সুরক্ষিত স্থানে গো-সকল রক্ষা করিতেন, তাহা হইতেই একই পরিবারের লোককে একই গোষ্ঠীভুক্ত বলা হইত। গোত্র শব্দের অর্থ পরে যাহাই হউক না কেন (ঋক্-১।৫১।৩; ২।১৭।১; ১০।১০৩।৭ ইত্যাদি), ইহার মূল অর্থ যে গোরক্ষার স্থান তাহা সকলেই স্বীকার করেন।

কৃষি সম্বন্ধে Zimmer প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন যে, ভারতীয় আর্য্যগণ বৈদিক যুগে লাঙ্গল, মই, কোদালী ও খন্তা সাহায্যে ভূমিকর্ষণ করিতেন, আবশ্যক হইলে খাল কাটিয়া জমিতে জল সেচন করিতেন, বৎসরে দুই বার করিয়া শস্য বপন করিতেন এবং শস্য পাকিলে ভূমিতে আছড়াইয়া তাহা শীষ হইতে পৃথক্ করা হইত এবং উদূখল অথবা ঢেঁকিতে কুটিয়া কুলার দ্বারা ঝাড়িয়া তুষ ও খুদ পৃথক্ করা হইত এবং পরে সেই শস্য যাঁতায় পিষিয়া চূর্ণ করা হইত ও সেই চূর্ণ হইতে রুটি প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইত।* যবই তখন প্রধান শস্য ছিল। গ্রামে শস্যাগার থাকিত এবং তাহাতে শস্য সংগৃহীত হইত (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৬।৩।১৩ কাণ্ব-২২ মাধ্যন্দিন)। এই সংগৃহীত শস্য সমগ্র রাজ্যের অন্ন সংস্থান করিত। গ্রামে সূত্রধর, কর্ম্মকার, তন্তুবায়, কুম্ভকার প্রভৃতি শিল্পিগণ বাস করিত। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে বাণিজ্য চলিত।

বৈদিক সাহিত্য হইতে আমরা জানিতে পারি, আর্য্যগণ ইন্দ্রাদি দেবতার পূজা করিতেন। যজ্ঞ শব্দের অর্থ 'উৎসব'।

† The houses could be shut in by a door which as in Homeric houses was fastened with a strap.

—Ibid.

* "The ground is worked with plough and harrow, mattock and hoe, and when necessary watered by means of artificial canals. Twice in the year the products of the field, especially barley ripen; the grain is threshed on the floor, the corn, separated from husk and chaff by winnowing, is ground in the mill and made into bread."

—Ibid.

এই উৎসব ধর্মার্থে অথবা প্রমোদার্থে অনুষ্ঠিত হইত। মানবের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যাবতীয় সংস্কার,সকল ক্ষেত্রেই দেবতার উদ্দেশ্যে পূজা দেওয়া হইত। আর্য্যগণ মন্দির নির্মাণ করিয়া বৈদিক দেবদেবীর প্রতিমা পূজা করিতেন, তাহার প্রমাণ আছে।*

বৈদিক সাহিত্যে সভাগৃহের বহু উল্লেখ আছে। এই সভায় বৃদ্ধগণ সামাজিক বিষয় বিচার বিবেচনা করিতেন এবং বিবাদ ও অপরাধের বিচারও করিতেন। এতদ্ব্যতীত গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি, পথ, দেবালয়াদি সংস্কার ও গ্রামের রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনাও এই সভায় হইত। এই সভায় রীতিমত বক্তৃতা ও তর্কযুদ্ধ হইত তাহার প্রমাণও পাওয়া যায় (ঋক্—১০।৭১।১০; ৬।২৮।৬; ৮।৪।৯; ২।২৭।১৩; ১০।৩৪।৬; অথর্ব্ব—৭।১২।৪; ২।২৭; ৭।১২।১-৩; ৫।৩১।৬; ১২।৩।৭৬, শুক্লযজুঃ—২০।১২; ১৬।২৪; বাজ সং—৩০।১৮; তৈত্তিরীয়ব্রাঃ—৩,৪।১৬।১ (সায়ণ))। বাগ্মিগণ সযত্নে বক্তৃতা অভ্যাস করিতেন, বক্তৃতা যাহাতে যুক্তিপূর্ণ, সরল, হৃদয়গ্রাহী ও সুষ্ঠু হয়, তাহার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করা হইত। এই সভায় সময়ে সময়ে দ্যূতক্রীড়া প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদ চলিত। আমোদ-প্রমোদ সম্বন্ধে আমরা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি, সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। †

গ্রাম্য সমাজ সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানিতে পারি না, তবে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সামাজিক বিষয়ের বিচার ও আলোচনা গ্রামসভায় হইত। গ্রামে চৌরভয় ছিল, দুশ্চরিত্র পুরুষ ও দুশ্চারিণী রমণীরও অভাব ছিল না বলিয়া অনুমান হয়। অনেকে অত্যন্ত দ্যূতাসক্ত ছিলেন এবং মদ্যপান করিতেন। মত্ত ব্যক্তির কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণের উদাহরণও আমরা বৈদিক সাহিত্য হইতে পাইয়া থাকি।

গ্রামশাসন হইত রাজনিয়োজিত কর্ম্মচারী দ্বারা, তবে সেই কর্ম্মচারী গ্রামেরই অধিবাসিগণের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইত (তৈত্তিরীয় সং ২।৫।৪।৪; কাঠক সং ৮।৪; ১০।৩; শতপথ ব্রাঃ ৩।৪।১।১৭; পঞ্চবিংশ ব্রাঃ ১৯।১৪ ইত্যাদি)। গ্রামণী গ্রামশাসন করিতেন (ঋক্ ১০।৬২।১১; ১০৭।৫)। সাধারণতঃ কৃষিজীবী বৈশ্যগণের মধ্য হইতে গ্রামণী নিযুক্ত হইতেন (শতপথ ব্রাঃ ৫।৩।১।৬)। এই গ্রামণী একজন বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারী বলিয়া গণ্য হইতেন (ঋক্ ১০।৬২।১১) গ্রাম রক্ষার ভার গ্রামণীর উপরেই ছিল। উপযুক্ত প্রহরী ও কর্ম্মচারী দ্বারা গ্রামণী গ্রামরক্ষা করিতেন এবং সামাজিক কার্য্যে তিনি সভাপতি হইতেন। গ্রামণী ব্যতীত "গ্রাম্যবাদী" নামক একজন কর্ম্মচারীর উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যে মধ্যে গ্রামসমষ্টি রক্ষার জন্য পুর বা দুর্গ থাকিত। মহাগ্রাম বা গণ্ডগ্রামের উল্লেখও বৈদিক সাহিত্যে আছে (জৈমিনীয় উপনিষৎ ব্রাঃ ৩।১৩।৪)।

রামায়ণের যুগ

রামায়ণের যুগের গ্রাম যথেষ্ট উন্নত। সেই যুগের গ্রাম সম্বন্ধে অযোধ্যাকাণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে—"ততো ধান্যধনোপেতান্ দানশীলজনান্ শিবান্। অকুতশ্চিদ্ভয়ান্ রম্যাংশ্চৈত্যযূপসমাবৃতান্॥ উদ্যানাম্রবনোপেতান্ সম্পন্নসলিলাশয়ান্। তুষ্ট-পুষ্ট-জনাকীর্ণান্ গোকুলাকুলসেবিতান্॥ রক্ষণীয়ান্ নরেন্দ্রাণাং ব্রহ্মঘোষাভিনাদিতান্। রথেন পুরুষব্যাঘ্রঃ কোশলানত্যবর্ত্তত॥ (রামায়ণ ২।৫০।৮-১০), অর্থাৎ "পরে সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরাগ্রগণ্য রাম রথযোগে কোশলরাজ্যস্থিত, রাজগণরক্ষিত, বেদধ্বনিনিনাদিত, ধনধান্যসমন্বিত, দাতৃজনগণে অধ্যুষিত, অপর হইতে ভয়রহিত, আম্রবনবিরাজিত, চৈত্য-যূপ-সমাবৃত, বিশুদ্ধ জলাশয়সম্পন্ন, হৃষ্টপুষ্ট জনগণে সমাকীর্ণ এবং বহুগোকুলপরিব্যাপ্ত, রমণীয়, সর্ব্বসুখকর বহুতর গ্রাম অতিক্রম করিলেন।" এই বর্ণনা ফাহিয়ানের পাটলীপুত্রের বর্ণনা স্মরণ করাইয়া দেয়।

* কাসীৎ প্রমা প্রতিমা কিং নিদানমাজ্যং কিমাসীৎ পরিধিঃ ক আসীৎ। ছন্দঃ কিমাসীৎ প্রউগং কিমুক্থং যদ্দেবা দেবমযজন্ত বিশ্বে॥ (ঋক্ ১০।১৩০।৩)

** তথা প্রতিমা হবিঃ প্রতিযোগিত্বেন যাগতে নির্মীয়তে ইতি প্রতিমা দেবতা। সা চ তস্য যজ্ঞস্য কাসীৎ। (সায়ণ)

অরং যথা ন আভুবত্বষ্টা রূপেব তক্ষ্যা। অস্য ক্রত্বা যশস্বতঃ॥ (ঋক্ ৮।১০২।৮)

অরমলঙ্কৃতিং... তক্ষ্যা বিকর্ত্তব্যানি রূপেব ত্বষ্টা রূপাণি যথা বিদধে যথা যেন প্রকারেণাভুবৎ আভবতি ... (সায়ণ)

† বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্য সম্মেলনে ইতিহাস শাখায় পঠিত "ভারতের প্রাচীন ক্রীড়াকৌশল" নামক প্রবন্ধ—বঙ্গশ্রী ১৩৪৪ আষাঢ় ও শ্রাবণ দ্রষ্টব্য।

মহাভারতের যুগ

মহাভারতে অবশ্য বহু গ্রামের বর্ণনা আছে। শান্তিপর্ব্বে রাজ্যপালন সম্বন্ধে উপদেশদানকালে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন—কাহাকে একগ্রামের, কাহাকে দশগ্রামের, কাহাকে শতগ্রামের ও কাহাকে সহস্রগ্রামের আধিপত্য প্রদান করা নরপতির কর্ত্তব্য। ঐ সকল গ্রামাধিপতি ভূপতি কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া প্রজারক্ষণে যারপর-নাই যত্নবান্ হইবেন এবং একগ্রামের অধিপতি দশগ্রামাধিপতির নিকট, দশগ্রামাধিপতি বিংশতি গ্রামাধিপতির নিকট, আপন আপন অধিকারস্থ মানবগণের দোষ নির্দ্দেশ করিবেন। এইরূপে সকলেরই অপেক্ষাকৃত উচ্চপদারূঢ় ব্যক্তির নিকট স্ব স্ব প্রজাগণের দোষ প্রকাশ করা আবশ্যক। গ্রামসমুৎপন্ন দ্রব্যসমুদয়ে গ্রামিকের অধিকার থাকে। এক গ্রামাধিপতি দশগ্রামরক্ষককে ও দশগ্রামাধিপতি বিংশতি গ্রামের রক্ষককে কর প্রদান করিবেন। শতগ্রামের অধিপতি এক বহুজনপরিপূর্ণ প্রধান গ্রামের সমুদয় দ্রব্য ভোগ করিতে পারেন। শতগ্রামাধিপতির ভোগ্য গ্রাম সহস্রগ্রামাধিপতির আয়ত্ত থাকা আবশ্যক। সহস্রগ্রামের অধিপতি ধনধান্য-পরিপূর্ণ শাখানগর ভোগে অধিকারী হইয়া থাকেন। ঐ সকল গ্রামপালের সংগ্রাম ও গ্রাম সম্বন্ধীয় ও অন্যান্য কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত একজন আলস্যবিহীন বিচক্ষণ মন্ত্রীকে, এবং প্রতিনগরের কার্য্যদর্শনার্থ এক একজন সর্ব্বাধ্যক্ষকে নিযুক্ত করা রাজার আবশ্যক (মহাভাঃ, শান্তি, ৮৭-৩।৯।) সভাপর্ব্বে গ্রামে পাঁচজন রাজকর্ম্মচারী থাকার উল্লেখ আছে। টীকাকার নীলকণ্ঠ তাহাদের নাম করিয়াছেন প্রশাস্তা অর্থাৎ শাসক, সমাহর্ত্তা অর্থাৎ করসংগ্রাহক, সংবিধাতা অর্থাৎ বিধিকর্ত্তা (lawgiver), লেখক ও সাক্ষী। (মহাভাঃ, সভা ৫।৮০, টীকা)।

মহাভারতের যে এই শাসনপদ্ধতির কথা উদ্ধার করিলাম, তাহার কারণ ইহা নহে যে, বিশেষ কোন যুগে এইরূপ আত্মশাসনপদ্ধতি প্রচলিত ছিল। রামায়ণ, মহাভারত একদিনে লিখিত হয় নাই, সুতরাং উক্ত বর্ণনা চিরাচরিত গ্রামশাসনপদ্ধতির পরিচায়ক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই বর্ণনায় প্রধান লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ইহাতে কেন্দ্রীভূত শাসনের সহিত গ্রাম্য-স্বায়ত্তশাসনের আদর্শের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য বিধান করা হইয়াছে। গ্রামিক গ্রামবাসিগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইতেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে ঊর্দ্ধতন সমষ্টির প্রতিনিধির অনুশাসন মানিয়া চলিতে হইত। এ ব্যবস্থা ঠিক যেন বাঙ্গালায় অধুনা প্রচলিত স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার বিপরীত, কেন না এখন চৌকীদার, দফাদার প্রভৃতি নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণের ভার জেলার শাসনকর্ত্তার উপর, অথচ তাহাদের বেতন যোগাইবার ভার গ্রামগুলির উপর। শান্তিপর্ব্বে উল্লিখিত বিচক্ষণ মন্ত্রী আধুনিক স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রীর পূর্ব্বপুরুষ, যদিও তাঁহার গ্রাম্যসভার সভ্য মনোনয়নের ক্ষমতা ছিল না।

জাতকের যুগ

জাতকের যুগে আমরা গ্রামণী ব্যতীত গ্রামভোজক (খরস্সর জাতক) নামক একপ্রকার অমাত্য বা কর্ম্মচারীর উল্লেখ পাই। সম্ভবতঃ এই কর্ম্মচারীর কার্য্য ছিল, গ্রামের শস্যবণ্টন ও রাজার গ্রাম্যষড়্‌ভাগ গ্রহণ। কুলাবক জাতকে আমরা দেখিতে পাই, গ্রামণী গ্রামের বিচার করিত ও অপরাধীদিগকে অর্থদণ্ড করিত সেই অর্থের অধিকাংশ সে নিজে আত্মসাৎ করিত গ্রামের লোকে নিজের চেষ্টায় পথসংস্কার করিত, সেতু নির্ম্মাণ করিত, পুষ্করিণী কাটিত ও শালা নির্ম্মাণ করিত। এই সকল কার্য্য গ্রামের লোকে সমবায় প্রণালীতে করিত, আমরা তাহার পরিচয় এই জাতক হইতে পাই। অনাচারী গ্রামণী বা গ্রামভোজককে গ্রামবাসিগণ রাজদ্বারে দণ্ডিত করাইত এবং সময়ে সময়ে নিজেরাই স্বহস্তে শাস্তি দিত। গহপতি জাতকে লিখিত আছে, একদা কাশীগ্রামের এক গ্রামভোজক গ্রামের এক গৃহস্থের স্ত্রীর প্রতি অবৈধ ভাবে অনুরক্ত হয়। সেই সময়ে সেই অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। গ্রামবাসিগণ একত্র হইয়া গ্রামভোজককে দুইমাস পরে শস্য হইলে শস্য দিবে এই অঙ্গীকার করিয়া তাহার একটি বৃদ্ধ ষণ্ড চাহিয়া লইয়া ভক্ষণ করে। এই সময়ে একদিন পূর্ব্বোক্ত গৃহস্থ গৃহে অনুপস্থিত থাকিলে গ্রামভোজক তাহার গৃহে গমন করে, কিছুক্ষণ পরে গৃহস্থকে আসিতে দেখিয়া তাহার দুশ্চারিণী স্ত্রী গ্রামভোজককে দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া শস্য চাহিতে বলে এবং সে নিজে শস্যাগারের উপর হইতে বলে যে, গৃহে মোটে শস্য নাই, সুতরাং এখন তাহার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না। গৃহস্থ অবশ্য তাহাদের চাতুরী ধরিতে

পারে ও দম্পতি গ্রামভোজককে যথেষ্ট প্রহার করিয়া গৃহ হইতে বিতাড়িত করে ও স্ত্রীকে যথোচিত ভর্ৎসনা করে।

গামণি চণ্ড জাতকে লিখিত আছে, চণ্ড একজন অবসর-প্রাপ্ত গ্রামণী ছিল। সে কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। একদা সে কয়েকটি গ্রামবাসী কর্ত্তৃক অন্যায় ভাবে নিগৃহীত হয় ও রাজসকাশে নীত হয়। নৃপতি তাঁহার পিতার এই পুরাতন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর নিকট তাহার নিগ্রহের কাহিনী শুনিয়া সুবিচার করিয়া তাহাকে অভিযোগ মুক্ত করেন। এই জাতক হইতে আমরা জানিতে পারি যে, গ্রামণীগণ আজীবন রাজার কর্ম্মচারী থাকিত না এবং তখনও এই পদ বংশানুক্রমিক হয় নাই। জাতকের কাহিনীসমূহ হইতে আমরা তদানীন্তন গ্রাম্যজীবনের বেশ একটি চিত্র পাই। তাহা হইতে মনে হয়, গ্রাম্য জীবনই সে যুগে সাধারণ লোকের জীবন ছিল। গ্রামে শিল্প ও বাণিজ্যের যথেষ্ট চর্চ্চা হইত। গ্রাম্যশিল্পিগণই দেশের শিল্পসামগ্রী সরবরাহ করিত। মিলিন্দপন্হ গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি, রাজাদেশে মধ্যে মধ্যে গৃহপতিগণের সভা আহূত হইত। গ্রামের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া রাজকর্ম্মচারী তিনবার গ্রামের গৃহপতিগণকে আহ্বান করিতেন। এইরূপে গ্রামের গৃহপতি-গণের সভা আহূত হইত। এই সভায় গ্রামের যাবতীয় রাষ্ট্রীয় সামাজিক ও স্বাস্থ্যোন্নতি ও পথঘাট প্রভৃতি নির্ম্মাণ বিষয়ে আলোচনা হইত।

মৌর্য্যযুগ

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হইতে আমরা মৌর্য্য যুগের গ্রাম ও তাহার সামাজিক রীতি-নীতি ও শাসনবিধির কথা বিশেষ ভাবে জানিতে পারি। মৌর্য্যযুগ প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার এক প্রকার উৎকর্ষের যুগ ছিল। রাজশক্তির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের সর্ব্বপ্রকার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, কিন্তু প্রবল রাজশক্তির প্রভাবে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বহুল পরিমাণে রাজমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছিল। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বহু নগর ও পত্তনের সৃষ্টি হইলেও অধিকাংশ অধিবাসী তখন বর্ত্তমান কালের ন্যায় গ্রামেই বাস করিত। নূতন স্থাপিত গ্রামে অন্ততঃ একশত পরিবার বাস করিত। বৃহৎ গ্রামে পাঁচ শত পরিবার পর্য্যন্ত বাস করিত। এই গ্রামবাসিগণের অধিকাংশই কৃষিজীবী শূদ্র, কিন্তু গ্রামে যে শিল্পজীবী বা উচ্চ জাতীয় লোকগণ বাস করিত না, এমন নহে। এই সকল গ্রাম বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের মধ্যে অবস্থিত থাকিত। নৃপতিগণ অপর দেশবাসিগণকে আনাইয়া এবং নিজ রাজ্যান্তর্গত জনবহুল গ্রাম ও নগর হইতে লোক লইয়া নূতন গ্রাম পত্তন করিতেন। এই সকল গ্রাম কখনও বা পূর্ব্বপরিত্যক্ত গ্রামে অথবা নূতন ভূখণ্ডে স্থাপিত হইত। গ্রামসকল এক ক্রোশ (২২৫০ গজ) হইতে দুই ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইত। প্রত্যেক গ্রামের সীমা নদী, পর্ব্বত, বন, গুহা, কোন সেতু বা কোন বৃহৎ বৃক্ষ প্রভৃতি দ্বারা নির্ণীত হইত।

বলা বাহুল্য যে, গ্রামের মধ্যস্থলে বাস্তু বা বাসগৃহগুলি নির্ম্মিত হইত। এই বাস্তু অংশের চতুষ্পার্শ্বে কৃষিক্ষেত্র ও বিবীত* বা গোচারণ-ভূমিসকল থাকিত। গ্রামের যে-সকল গোচারণ ভূমি থাকিত, তাহা সাধারণতঃ উপত্যকা বা নিম্ন-ভূমি, এই সকল গোচারণ ভূমি চোর ও শ্বাপদ হইতে রক্ষিত হইত। ইহার পরিমাণ হইত অন্যূন একশত ধনু। বিপদ আপদে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসকল পরস্পরের সাহায্য করিত। কোন কোন গ্রাম বেড়া দিয়া ঘেরা থাকিত। ইহা ব্যতীত অষ্টশত গ্রামের মধ্যে "স্থানীয়" অর্থাৎ সুরক্ষিত নগর ও চতুঃশত গ্রাম মধ্যে "দ্রোণ-মুখ" অর্থাৎ পট্টনবিশেষ এবং দ্বিশত গ্রামের মধ্যে খর্ব্বট অর্থাৎ ক্ষুদ্র নগর এবং দশটি গ্রামের মধ্যে সংগ্রহণ নামক গণ্ডগ্রাম থাকিত এবং রাজ্যের সীমান্তে দুর্গসমূহ থাকিত। এই সীমান্ত-রক্ষকগণ রাজ্যের প্রবেশদ্বারসমূহ রক্ষা করিত। রাজ্যের আভ্যন্তরীণ রক্ষার ভার ছিল বাগুরিক, শবর, পুলিন্দ, চণ্ডাল ও অরণ্যচরগণের উপর। গ্রামবাসিগণ এইরূপে নির্ব্বিঘ্নে কৃষিশিল্প ও বাণিজ্যাদি করিত।

কৃষিক্ষেত্র সকল কৃষিজীবিগণকে বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইত, তাহারা রাজাকে শস্যে অথবা অর্থে কর দান করিত; কিন্তু ইহাদের কেহ যদি ভূমি কর্ষণ করিয়া পতিত করিয়া রাখিত, তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইত। ঋত্বিক্‌, আচার্য্য, পুরোহিত ও শ্রোত্রিয়গণকে ব্রহ্মদেয় বা ব্রহ্মত্র দান করা হইত। অধ্যক্ষ, সংখ্যায়ক, গোপ (village accountant), স্থানিক, অনীকস্থ, চিকিৎসক, অশ্বদমক ও জঙ্ঘাকরিক

*বিবীত শব্দের অর্থ যে-ভূমিতে কৃষিকার্য্য করা হয় না। গোচারণভূমি ও reserved forest উভয়কেই বিবীত বলা হইত।

(messenger) প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারিগণকে নিষ্কর ভূমি দান করা হইত, কিন্তু তাহাদের দান, বিক্রয় বা দায় সংযুক্ত করিবার অধিকার ছিল না।

জনপদ সকল সাধারণতঃ চারিটী ভাগে ভাগ করা হইত এবং গ্রাম সকলের মধ্যে আয় অনুসারে জ্যেষ্ঠ, মধ্যম ও কনিষ্ঠ তিন প্রকার ভাগ করা হইত এবং তাহাও আবার এইরূপ ভাগ হইত :—(১) পরিহারক বা নিষ্কর, (২) আয়ুধীয় অর্থাৎ যাহারা যৌদ্ধ সরবরাহ করিত, (৩) যে সকল গ্রাম উৎপন্ন দ্রব্য দ্বারা অথবা অর্থ দ্বারা করদান করিত, এবং (৪) যে সকল গ্রাম করের পরিবর্ত্তে কায়িক শ্রম দ্বারা সাহায্য করিত। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে, সে যুগে ব্রাহ্মণ গ্রাম, ক্ষত্রিয় গ্রাম, বৈশ্য গ্রাম ও শূদ্র গ্রাম ছিল। আমরা মহাভারতে, জাতকে ও অন্যান্য বৌদ্ধ গ্রন্থে এইরূপ উল্লেখ পাই, এইরূপ জাতিপ্রধান গ্রামের অধুনা উত্তর-ভারতে ও দাক্ষিণাত্যেও অভাব নাই। এইরূপ গ্রামে সংখ্যাধিক জাতীয় লোকের মধ্য হইতে গ্রামিক বা মণ্ডল নিযুক্ত হইত। অর্থশাস্ত্রে কর্ষকপ্রধান গ্রামে কৃষির বিঘ্ন উৎপাদনের আশঙ্কায় প্রমোদাগার নির্ম্মাণ ও নটাদির প্রবেশ নিষেধ ছিল। একটি তাম্রশাসন হইতে প্রথম জটবর্ম্মন সুন্দর পাণ্ড্যের রাজত্বকালে একটী এইরূপ ব্রাহ্মণ গ্রাম পত্তনের বিষয় জানিতে পারা যায়। এই গ্রামের নাম "বিক্রম পাণ্ড্য চতুর্ব্বেদী মঙ্গলম্", তাহাতে ১০৮ ঘর ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। এই ব্রাহ্মণ অধিবাসিগণ ব্যতীত একজন পুস্তকাগার-রক্ষক (পরবর্ত্তী ভাণ্ডাররক্ষক) এবং কুম্ভকার, কর্ম্মকার, স্বর্ণকার, রজক, নাপিত, চৌকীদার, ভৃত্য, সূত্রধর, চিকিৎসক, হিসাবরক্ষক এবং ঢক্কাবাদক প্রভৃতির বাস ছিল। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বেদজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। গোচারণের জন্য পৃথক্ ভূমি ছিল এবং একটী পুষ্করিণীতে ব্রাহ্মণগণ সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিতেন। এই সকল ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য সেবকগণের প্রত্যেকের জন্য নির্দ্দিষ্ট ভূমি ছিল। ইহা ব্যতীত দেবায়তন, পুস্তকাগারে শিলনাগার ও অন্যান্য জাতির বাসস্থানও এই গ্রামে ছিল।

আধুনিক যুগেও বঙ্গদেশের একপ্রান্তে বর্দ্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার আড্ডাড়া নামক গ্রামে বাসকালে আমরা দেখিয়াছিলাম, ঐ গ্রামে প্রায় ৩০ ঘর ব্রাহ্মণের বাস, তাম্বা বারুজীবি তিলি, নাপিত, গোয়ালা, কেয়ট, বাউরী প্রভৃতি বহু ব্রাহ্মণেতর জাতি ঐ গ্রামে বাস করে। গ্রামে মুখোপাধ্যায় উপাধিধারী একবংশের লোক মণ্ডল আখ্যায় পরিচিত, তাঁহারা পূর্ব্বকালে গ্রামের মণ্ডল ছিলেন। এই গ্রামটী উপরোক্ত রূপ ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রামের একটি জীবন্ত উদাহরণ। গ্রামে এখনও "ষোল আনা" অর্থাৎ গ্রামবাসিগণের সভা হইয়া থাকে, তথায় সামাজিক অনাচারের বিচার হইয়া থাকে।

অর্থশাস্ত্র হইতে আমরা জানিতে পারি, প্রতি গ্রামের কর-সংগ্রহ, শাসন ও শান্তি-রক্ষার জন্য প্রজাসাধারণ হইতে ব্যক্তি মনোনীত বা নিযুক্ত হইতেন। তাঁহাকে "গ্রামিক" * বলা হইত। এই গ্রামিক গ্রামের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিবার জন্য গ্রামের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেন, সেই সময়ে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য কয়েকজন গ্রামবাসীর তাঁহার সঙ্গে থাকা কর্ত্তব্য ছিল। এই কর্ত্তব্যে অবহেলা করিলে দেড় পণ অর্থদণ্ড দিতে হইত। গ্রাম-শাসন সৌকর্য্যার্থে চৌর ও লম্পট ব্যক্তিকে গ্রামিক গ্রাম হইতে নির্ব্বাসিত করিতে পারিতেন, কিন্তু নিরপরাধকে শাস্তি দিলে তাঁহারই দণ্ড হইত। শান্তি-রক্ষার জন্য গ্রামে শান্তিরক্ষক ও চর নিযুক্ত হইত। এই চরগণ ছদ্মবেশে নানাস্থানে ঘুরিয়া লোক-চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিত। চোর ধরিবার জন্য এক প্রকার গোয়েন্দা ছিল, তাহার নাম "চোর-রজ্জুক"। গ্রামে চুরি হইলে গ্রামবাসিগণও দায়ী হইতেন। গ্রামের বাহিরে চুরি হইলে বিবীতাধ্যক্ষ দায়ী হইতেন। গোপনামক কর্ম্মচারী পঞ্চ বা দশগ্রামের হিসাব পরিদর্শন করিতেন, গ্রামের সীমা নির্দ্ধারণ করিতেন, আবাদী, গর-আবাদী, ডাঙ্গা, কেদার, আরাম, ষণ্ড (অনুর্ব্বর ভূমি) বাট (প্রাচীর), বন বাস্তু, চৈত্য, দেবগৃহ, সেতুবন্ধ (সেবার্থ জলাশয়) শ্মশান, সত্র, প্রপা (জলদানের স্থান) পুণ্যস্থান, গোচারণভূমি ও পথ সকলের হিসাব রাখিতেন; ক্ষেত্রসীমা লিখিয়া রাখিতেন, দান-বিক্রয়াদির বিষয় লিখিতেন এবং গৃহ ও ভূমির কর মাপ করিলে তাহাও লিখিয়া রাখিতেন। কোন্ গৃহ হইতে কর আদায় হয়, কোন্টাই বা নিষ্কর

* বৈদিক যুগে গ্রামীন শব্দের উল্লেখ পাই। জাতক-এ গ্রামিক শব্দ আছে। মহাভারতে, স্মৃতিশাস্ত্রসমূহে ও অর্থশাস্ত্রে গ্রামিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

তাহাও লিখিয়া রাখা তাঁহার কার্য্য ছিল। গ্রাম সকলের অধিবাসীদিগের আদমশুমারী রীতিমত লিখিত হইত দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জীবের তালিকাও তাঁহার নিকট থাকিত এতদ্ব্যতীত গ্রামের আদায়ের একটি সঠিক হিসাব তাঁহাকে রাখিতে হইত। প্রত্যেক গ্রামবাসীর কি আয়, কিরূপ চরিত্র, কাহার কত বয়স, সমস্ত বিষয়েরই হিসাব থাকিত এবং এই হিসাব ঠিক মত রক্ষিত হইতেছে কি না, সমাহর্ত্তা (collector general) তাহা স্থানিক নামক কর্ম্মচারী দ্বারা পরীক্ষা করাইতেন এবং গুপ্তচর দ্বারা সন্ধান রাখিতেন। গুপ্তচরগণ দেশের আগন্তুক লোকদিগের চরিত্র ও বণিকদিগের নিকট শুল্ক আদায় করার উপযুক্ত দ্রব্যাদি আছে কি না, এই সকল বহু বিবরণের সন্ধান লইত। ইংলণ্ডের নৃপতি প্রথম উইলিয়ম Domesday book সঙ্কলন করিবার অন্ততঃ ১০০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতে ঐরূপ সংখ্যা-নির্ণয়-প্রণালী প্রথা হিসাবে প্রচলিত ছিল।

গ্রামের পথ, বাজার, জলাশয় ও পুণ্যস্থান সকল নৃপতি নির্ম্মাণ করাইতেন, অথবা অন্য কেহ নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাদিগকে তাহার উপযুক্ত ভূমিদান করিতেন। গ্রামের লোকে একত্রিত হইয়াও এই সকল কার্য্য করিতেন। এই সম্মিলিত কার্য্যে যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় যোগ না দিত, তাহাকে তাহার ভৃত্য ও বলীবর্দ্দাদি প্রেরণ করিতে বাধ্য করা হইত এবং তাহাকে ব্যয়ের অংশ বহন করিতে হইত, কিন্তু সে লাভের অংশ পাইত না।

গ্রামবাসিগণ চাঁদা করিয়া গ্রামে উৎসব, সমাজ ও নাটকাদি অভিনয় করিত, সেই সকল উৎসবে কেহ সাহায্য না করিলে তাহাকে যোগদান করিতে দেওয়া হইত না। যদি কেহ লুকাইয়া যোগদান করিত বা দেখিত, ধরা পড়িলে তাহার দণ্ড হইত। এই সকল সৎকার্য্য ও উৎসব অনুষ্ঠানের ভার গ্রামের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির উপর দেওয়া হইত এবং গ্রামবাসিগণ তাঁহার আদেশমত চলিতে বাধ্য হইত। তাঁহার আদেশ অমান্য করিলে দণ্ড হইত।

গ্রামের বাস্তু, ক্ষেত্রের সীমা অথবা অধিকার লইয়া বিবাদ হইলে গ্রাম-বৃদ্ধগণ তাহার বিচার করিতেন; দুই গ্রামের সীমা লইয়া বিবাদ হইলে পঞ্চ বা দশ গ্রামের গ্রামবৃদ্ধগণ বিচার করিতেন। গ্রামের কোন সম্পত্তি বিক্রয় হইলে গ্রামবৃদ্ধগণের সমক্ষেই তাহার নিলাম হইত গ্রামবৃদ্ধগণের মধ্যে যদি বিচারে মতভেদ হইত, তাঁহা হইলে কয়েকজন সচ্চরিত্র, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাহার মধ্যস্থতা করিতেন

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রগুলির বিধি-ব্যবস্থা অনেকক্ষেত্রে একই রূপ। মনুসংহিতায় লিখিত আছে—রাজ্যের সুরক্ষাবিধানার্থ বিস্তৃতি অনুসারে দুই, তিন কিংবা পাঁচ অথবা একশত গ্রামের মধ্যে উপযুক্ত একজন অধিনায়কের অধীনে একদল সৈন্যসংস্থাপন পূর্ব্বক একটি গুল্ম নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ প্রত্যেক গ্রামে এক এক অধিপতি, পরে ক্রমশঃ অধিক প্রতাপবিশিষ্ট দেখিয়া দশ গ্রামের একজন, বিংশতি গ্রামের একজন, শত গ্রামের একজন এবং সহস্র গ্রামের একজন অধিপতি রাজা নিযুক্ত করিবেন। গ্রামে চৌর্য্যাদি কোন প্রকার দোষ সংঘটিত হইলেও গ্রামাধিপ স্বয়ং তাহার সমাধা করিতে অসমর্থ হইলে দশগ্রামাধিপতির নিকট তাহা আবেদন করিবেন এবং তিনিও যদি তৎপ্রতিকারে অসমর্থ হন, তবে বিংশতি গ্রামাধিপের নিকট জানাইবেন। এইরূপে বিংশতি গ্রামাধিপ শতাধিপকে এবং শতাধিপ সহস্রাধিপকে জানাইবেন। গ্রাম্যলোকেরা অন্ন, পানীয় ও ইন্ধনাদি যে কোন বস্তু প্রতিদিন রাজাকে দান করিবে, তৎসমস্ত গ্রামাধিপতির প্রাপ্য। "কুল" অর্থাৎ ষড়্‌গবাকৃষ্ট হলদ্বয়ে কর্ষণ-যোগ্য ভূমি দশ গ্রামাধিপের বৃত্তিস্বরূপ প্রাপ্য। বিংশতি গ্রামাধিপের তাহার পঞ্চগুণ এবং শতাধিপের একখানি গ্রাম, সহস্রাধিপের একটি নগর প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। রাজনিযুক্ত আর একজন হিতকারী মন্ত্রী নিরালস্য হইয়া সেই সমুদয় অধিপতিদিগের গ্রাম্য কার্য্য ও অন্যান্য কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। (মনু ৭।১১৪-১২০)।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় লিখিত আছে—"ক্ষেত্রের সীমা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে চতুষ্পার্শ্বের গ্রামস্থ ব্যক্তি, বৃদ্ধ গোপালক, সীমান্তস্থিত ভূমিকর্ষক, বনসন্নিহিত অধিবাসি-সকল কোন বৃক্ষ, সেতু প্রভৃতির দ্বারা সীমা নির্দ্ধারণ করিবে, অভাবে সমগ্রামের চার, আট বা দশজন লোক সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া দিবে। (যাজ্ঞবল্ক্য ২।১৫৩—১৫৫)।

মনুসংহিতাতেও এইরূপ সীমা-বিবাদ-বিচারের নির্দেশ আছে।

স্মৃতিশাস্ত্রের গ্রাম্যসমাজ—অর্থশাস্ত্রের সময় হইতে বহুল পরিমাণে সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। রাষ্ট্রনীতিও কতকটা যেন শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের আজ্ঞাবর্ত্তী বলিয়া মনে হয় কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে মনুসংহিতার নির্দেশ মত কার্য্যক্ষেত্রে কোন রাজা চলিতেন কি না সন্দেহ হয়।

পরবর্ত্তী যুগ

শুক্রনীতিসার সম্ভবতঃ বহু পরবর্ত্তীকালে লেখা। তাহাতে গ্রামকে ক্রোশাত্মক বলা হইয়াছে (১ ক্রোশ = ২৫০০ গজ) এবং তাহার আয় এক সহস্র রৌপ্য মুদ্রা। গ্রামার্দ্ধকে পল্লী ও পল্ল্যর্দ্ধকে কুম্ভ বলিত। শুক্রনীতিতে গ্রামের পথ, জলনিকাশের ব্যবস্থা, বাজার প্রভৃতির নিয়ম সুন্দর ভাবে লেখা আছে। পথ সম্বন্ধে শুক্রনীতিতে এইরূপ লিখিত আছে :—

"রাজমার্গাস্তু কর্ত্তব্যাশ্চতুর্দিক্ষু নৃপগৃহাৎ।
উত্তমো রাজমার্গস্তু ত্রিংশদ্ধস্তমিতো ভবেৎ॥
মধ্যমো বিংশতিকরো দশপঞ্চকরোঽধমঃ।
পণ্যমার্গাস্তথা চৈতে পুরগ্রামাদিষু স্থিতাঃ॥
ত্রিহস্তমিতিকা পদ্যা বীথিঃ পঞ্চকরামিতা।
মার্গো দশকরঃ প্রোক্তো গ্রামেষু নগরেষু চ॥
প্রাক্ পশ্চাৎ দক্ষিণোদক্ তান্ গ্রামমধ্যাৎ প্রকল্পয়েৎ।
পুরং দৃষ্ট্বা রাজমার্গান সুবহূন্ কল্পয়েন্নৃপঃ॥
ন বীথিং নচ পদ্যাং হি রাজধান্যাং প্রকল্পয়েৎ।
বহির্যোজনমাত্রেঽধ্বশো রাজমার্গঞ্চ চোত্তমম্॥
কল্পয়েৎ মধ্যমং মধ্যে তয়োর্মধ্যে তথা ধমম্।
দশহস্তাত্মকং নিত্যং গ্রামে গ্রামে নিয়োজয়েৎ॥
কূর্ম্মপৃষ্ঠা মার্গভূমিঃ কার্য্যা গ্রামৈঃ সসেতুকা।
কুর্য্যান্ মার্গান্ পার্শ্বখাতান্ নির্গমার্থং জলস্য চ॥
রাজমার্গমুখানি স্যুর্গৃহাণি সকলান্যপি।
গৃহপৃষ্ঠে মলা বীথিং মলনির্গমনায় চ॥
পঙ্ক্তিদ্বয়গতান্ হি গেহানাং কারয়েৎ রথ্যাং।
মার্গান্ সুশর্করৈর্বা বদ্ধান্ প্রতিবৎসরম্॥
অভিযুক্তবন্দিভির্বা কুর্য্যাৎ গ্রামজনৈর্নৃপঃ।"

(শুক্রনীতিসারঃ ১।২৫৮—২৬৬)

অর্থাৎ, নৃপগৃহের চতুর্দ্দিক হইতে রাজমার্গ নির্ম্মাণ করাইতে হইবে। উত্তম রাজমার্গ ত্রিশ হস্ত প্রশস্ত, মধ্যম বিশ হস্ত এবং অধম পঞ্চদশ হস্ত। এই রাজমার্গের উভয় পার্শ্বে গ্রামস্থাপনা করিবে। এই রাজমার্গগুলি গ্রাম ও নগরের পণ্যমার্গ বলিয়া বিবেচিত হইবে। পদ্যা বা পায়ে হাঁটা পথ তিন হস্ত ও বীথি পঞ্চ হস্ত পরিমিত, গ্রামের মধ্যে ও নগরে যে সকল মার্গ থাকে, তাহা দশ হস্ত প্রশস্ত। গ্রাম হইতে পূর্ব্ব পশ্চিম ও উত্তর দক্ষিণদিকে এই মার্গ নির্ম্মাণ করিতে হয়। নগরবিশেষে রাজমার্গের সংখ্যা নির্ণয় করিতে হয়। রাজধানীতে বীথি বা পদ্যার ন্যায় ক্ষুদ্র পথ নির্ম্মাণ করা উচিত নহে। গ্রামের বাহিরে * ছয় যোজন অন্তর উত্তম রাজমার্গ নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহার মধ্যে মধ্যে মধ্যম রাজমার্গ ও মধ্যম রাজমার্গগুলির মধ্যে অধম রাজমার্গ নির্ম্মাণ করিতে হয়। গ্রামে গ্রামে দশহস্ত পরিমিত মার্গ নির্ম্মাণ করা উচিত। এই মার্গ কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় হওয়া উচিত এবং মধ্যে মধ্যে সেতু নির্ম্মাণ করা উচিত। এই মার্গের উভয় পার্শ্বে জলনির্গমার্থ খাত খনন করা উচিত। গৃহ সকলের সম্মুখ রাজমার্গের দিকে হওয়া উচিত। দুই সারি গৃহের পর একটি মার্গ হওয়া উচিত। প্রতি বৎসর এই মার্গ চুণ ও কাঁকর দিয়া সংস্কার করা উচিত। অভিযুক্ত বা বন্দী গ্রামবাসিগণ দ্বারা এই কার্য্য করান উচিত।

শুক্রনীতি হইতে আমরা আরও জানিতে পারি, গ্রাম বা নগরে পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ করিয়া রাজমার্গের উভয় পার্শ্বে দোকান বসান হইত (১।২৫৮-২৫৯)। বাজারে রাজ-চিহ্নাঙ্কিত ওজন ও পরিমাপ ব্যবহৃত হইত (১।৩০৯)। দুঃখের বিষয়, বিংশ শতাব্দীতেও এইরূপ রাজচিহ্নাঙ্কিত মান ও পরিমাপ ব্যবহৃত হইবার প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত নাই। শুক্রনীতিতে লিখিত আছে,—"দুই গ্রামের মধ্যস্থলে এক একটি পান্থশালা থাকিত, তাহা রীতিমত প্রত্যহ পরিষ্কার করা হইত। পান্থশালার অধিকারী তথায় আগত পথিককে সে কোথায় যাইবে, কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহার সঙ্গে লোক আছে কি-না, বাহন আছে কি না, অস্ত্র আছে কি না, সে কি জাতি, কোন্ বংশে

* [illegible] অর্থ [illegible] নহে। গ্রামের বাহিরে—[illegible]।

প্রশ্ন, কি নাম, কোথায় বাড়ী সমস্ত জিজ্ঞাসা করিয়া লিখিয়া রাখিত। সন্ধ্যাকালে তাহার নিকট হইতে অস্ত্রাদি লইয়া তাহাকে সাবধান হইয়া নিদ্রা যাইতে উপদেশ দিত এবং পথিকগণের সংখ্যা গণনা করিয়া পান্থশালার দ্বার বন্ধ করিয়া দিত এবং রাত্রিতে পাহারা দিবার জন্ত প্রহরী রাখিত। প্রভাত হইলে তাহাদিগকে জাগাইয়া অস্ত্রশস্ত্র ফিরাইয়া দিয়া ও পুনর্ব্বার গণনা করিবার জন্ত দ্বার খুলিয়া দিত এবং গ্রামবাসিগণ গ্রামের সীমান্ত পর্য্যন্ত তাহাদিগকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিত (১২৬৯-২৭৫)।

উত্তর-ভারত ও দক্ষিণ-ভারতের তাম্রশাসনসমূহ হইতে প্রাচীন গ্রামের বিষয়ে অনেক তথ্য জানিতে পারা যায়। বাহুল্যভয়ে তাহা এই প্রবন্ধে আলোচিত হইল না। এক্ষণে শিল্পশাস্ত্রাদিতে গ্রাম-বিন্যাস সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহার বিষয়ে অতি সংক্ষেপে দু একটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। শিল্পশাস্ত্রগুলির মধ্যে গ্রাম-বিন্যাস সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ নিয়মাদি লিখিত আছে। ময়মত ও মানসার দুইখান সুবৃহৎ শিল্পশাস্ত্র, উভয় পুস্তকের নবম অধ্যায়ে গ্রাম-বিন্যাস সম্বন্ধে বস্তুতঃ একই নিয়ম লিখিত আছে। স্থপতি গ্রাম নির্ম্মাণ করিবার জন্ত উপযুক্ত স্থান বাছিয়া লইবেন। নদীতীরবর্ত্তী স্থানই গ্রামস্থাপনের পক্ষে প্রশস্ত। অসমতল প্রদেশে পূর্ব্বাভিমুখে ঢালু ভূমিই গ্রামস্থাপনের উপযোগী, কারণ প্রভাতের সূর্য্যকিরণ এইরূপ ভূমিতে অধিক পরিমাণে পড়িয়া থাকে। ভূমি নির্ণীত হইলে দিঙ্‌নির্ণয় করিয়া গ্রামের প্রধান পথগুলি সর্ব্বাগ্রে নির্ম্মাণ করিতে হইবে। গ্রামগুলি পূর্ব্বপশ্চিমে দীর্ঘ হওয়া উচিত। মানসারে দণ্ডক, নন্দ্যাবর্ত্ত, পদ্মক ও স্বস্তিক এই চারিপ্রকার গ্রামের নাম আছে। সকল প্রকার গ্রামেই গ্রামের ঠিক মধ্য দিয়া পূর্ব্বপশ্চিমে একটি রাজমার্গ নির্ম্মিত হইত এবং ঠিক ঐরূপ উত্তর-দক্ষিণে আরও একটি অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব পথ নির্ম্মিত হইত। তাহার নাম বামন। এই দুই পথের সমান্তরালে নাতিপ্রশস্ত পথসকল নির্ম্মিত হইত ও গ্রামের চতুষ্পার্শ্বে একটি পথ থাকিত। এইরূপ গ্রাম বিন্যস্ত হইলে গ্রামের সকল অংশে রৌদ্র ও বায়ু যথেষ্ট প্রবেশ করিত। দুইটি প্রধান পথের সঙ্গমস্থলে গ্রাম্য সভামণ্ডপ নির্ম্মিত হইত। প্রধান চারিখণ্ডে বিভক্ত গ্রামের উত্তর-পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে বৃহৎ পুষ্করিণী নির্ম্মিত হইত। গ্রামের বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন দেবায়তনাদি নির্ম্মিত হইত। প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রে যে ভাবে গ্রামবিন্যাসের নির্দ্দেশ আছে, তাহা স্বাস্থ্য ও বাসের পক্ষে সর্ব্বপ্রকারে উত্তম। স্মৃতিশাস্ত্রাদিতে, কালিকাগম নামক তন্ত্রে ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে গ্রামবিন্যাস সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে।

প্রাচীন ভারতের গ্রাম সম্বন্ধে মোটামুটি একটা আলোচনা করা গেল। আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি আধুনিক যুগের পল্লীগ্রাম অপেক্ষা সে যুগের গ্রাম বহু অংশে শ্রেষ্ঠ ছিল। পল্লী-স্বাস্থ্য, পল্লী-শাসন, পল্লী-সমাজ সকল বিষয়েই প্রাচীন গ্রাম আধুনিক পল্লীগ্রাম অপেক্ষা বহু অংশে উত্তম ছিল। কালের প্রভাবে ও সম্ভবতঃ জগতের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামেরও অবনতি হইয়াছিল। এখন চারিদিকে পল্লীসংস্কারের ধূয়া উঠিয়াছে এবং সেই জন্ত সরকার হইতে কিছু কিছু অর্থব্যয়ও হইতেছে। কিন্তু তাহাতে পল্লী সংস্কার কতটুকু হইতেছে,তাহা এখনও বুঝা যাইতেছে না। কেবল কয়েকটী প্রদর্শনী ও কয়েক দিন আমোদ-প্রমোদ হইয়াই পল্লী-সংস্কারের কার্য্য শেষ হইতেছে। যদি প্রকৃতই পল্লী-সংস্কার করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের ভারতের প্রাচীন আদর্শ লইয়া যাহাতে গ্রামের স্বাস্থ্য ও সম্পদের উন্নতি হয়, সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত। পল্লীর কুটীর-শিল্প, কৃষি, গো-পালন প্রভৃতি প্রাচীন অনুষ্ঠানগুলির আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রথায় যতদূর সম্ভব উৎকর্ষ সাধন করিলে গ্রামের উন্নতি সম্ভবপর। ইউনিয়ন বোর্ড অথবা পল্লী মিউনিসিপ্যালিটীর পদপ্রার্থী হইয়া অযথা অর্থব্যয় না করিয়া সেই অর্থ সমবায়-পদ্ধতিতে পল্লীর যথার্থ উন্নতিকামনায় ব্যয় করিলে পল্লীর প্রকৃত সংস্কার করা হইবে। আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, পল্লীবাসী ও পল্লী-সংস্কারকামী সহৃদয় ব্যক্তিগণের এবং সরকারের সুমতি দিন, যাহাতে সকলে একযোগে একই উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া নিঃস্বার্থ ভাবে পল্লীর উন্নতির চেষ্টা করেন।

এরোপ্লেন

—শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র সোম

নীরস বালুকাস্তর পদ্মার চড়ায়,
চক্ষুঃ-পীড়াকর চন্দ্রকিরণ বিহনে।
তাহাতে যা সরসতা, শ্যামলতা দানে
(প্রথম উদ্গম যার এ হেন জমীতে
কৃষকে প্রেরণা দেয় শস্যাদির চাষে),
এক জাতি চারা গাছ, পাতি ঝাউ যারে
বলে জনসাধারণ, তাহার আড়ালে,
সৌরকরপরিস্নাত সারা দিনমান,
ছোট-বড়, কাঁচা-পাকা ফুটিতরমুজে
ভরা ক্ষেত, কৃষকের ভরসার স্থান।
বিরলসংসর্গ অতি জীবন যাহার,
তাহাকে আনন্দ দান করিতেই যেন,
মাছ-রাঙা মাটি খুঁড়ি করে তায় বাসা,
টিট্টিভও মাঝে-মাঝে আসিয়া তাহার
পুচ্ছসঞ্চালনরঙ্গ দেখায় কৃষকে।
কর্ম্মজ আনন্দ তার অবশ্যই আছে,
তা ছাড়া এ দু'টি আছে, দুর্ভাগ্য সে নয়।
আজ যেন হৃষ্ট বেশি দেখি', পাকিয়াছে
বড়-বড় ফুটি রম্য ক্ষেতটি ভরিয়া।
ফুড়ান না হ'তে শেষ, নিত্যশ্রুত স্বর
অদূরে শুনিয়া চাষী আঁটিল মতলব
হইলে সমীপবর্ত্তী, হাতছানি দিয়া,
বলিল বিমানপোতচালক-উদ্দেশে,
"আসুন, আসুন, হেথা আসুন নামিয়া।"
ঝট্‌পট্ দুই হাতে তুলি' এক ফুটি
বলিল, "গরীব আমি, এই দেব খেতে।"
ব'লেই কেটে সে জিভ দাঁতে মনে-মনে
বলে, "তোবা তোবা! আমি, ছুলীর মাকেও
এই সরমের কথা বলিতে নারিব,
লোকে টের পেলে মোর মাথা কাটা যাবে।
ও যে নামিবে না, ও যে নামিতে পারে না,
আমি জানিতাম না-কি? আমি কি বেকুব?
করিব শেয়ানা তবে লোকে কেন বলে?
তবু এ খেয়াল কেন চাপিল মাথায়?
লোকটা আমায় বদ্ধ পাগল ভাবিল;
ভাবুক, উহার সাথে দেখা তো হবে না?
ওর সাথে যারা আছে তারাও জানিল;
জানুক, ক'জনে মিলি' হেসে খুশি হ'ক্।"
এ শ্রেণীর মানুষের রহস্য গোপন
রাখা বড় শক্ত, কিন্তু অরূপ, অকাল

অতি-ক্ষীণ; তাই তিন দিন যাইতেই
ঘটনা ভুলিয়া শান্তি পাইল কৃষক।
পর দিন ক্ষেতে গিয়া দেখে, কি ব্যাপার!—
বহু, বহু কাগজের খণ্ড সুরঞ্জিত,
ঈষৎ শিশিরসিক্ত ছড়াইয়া ক্ষেতে
শুধু ক্ষেতে নয়, আশেপাশেও তাহাই।
বিস্ময়ে ও ভয়ে অভিভূতপ্রায়, তবু
এক খণ্ড তুলি' দেখে, শঙ্কা যে তাহার
তাহা বুঝি লেখা আছে—ছাপার হরপ
(বুঝিল সে), কিন্তু তার কাছে হিজিবিজি।
ধিক্কার সে দিল নিজে নিরক্ষর ব'লে।
পাটের বহুল চাষে বাধা প্রদানিতে,
সরকার এরোপ্লেন হইতে বরষি,
অনুরূপ কাগজের খণ্ড রাশি রাশি,
চাষিগণে সাবধান করিছেন, তাহা
তার জানা ছিল; ফুটি আর তরমুজও
লাট সাহেবের বিষ-নজরে পড়িল,
এ আশঙ্কা বেচারারে করিল ব্যাকুল!
অপরাধ তার, সরকারী কাজে রত
যে-জন তাহার অপমান সে করেছে।
হায়! তায় কে রক্ষিবে বিপদে এমন?
সরমের কথাটাও ফাঁস হয়ে যদি,
উদরান্ন সংস্থানের সামান্ত উপায়,
এই ফুটি আর তরমুজের আবাদ,
রক্ষা পায়, সে উপায় কে বলিয়া দিবে?
রাজনীতি-ফিতির সে ধার নাহি ধারে
তবু যে স্বদেশী বলে গ্রামে পরিচিত,
রাজনীতি বিষয়ে যে বক্তৃতাও দেয়,
তাহার শরণাপন্ন হইল কৃষক।
কাগজের খণ্ড পড়া সুরু করিয়াই
সে তো হতভম্ব—পাঠে মন নাহি আসে!
তাহার মুখের ভাবে ত্রাসিত কৃষক
এক নিশ্বাসেই বলে, "বলুন, বলুন
কর্ত্তা, ফুটি, তরমুজ আবাদ করিয়া
খাইতে পাইব কি না? যেমন পাটের।
বেলা, এ চাষেও বাধা দেয়া কি হইবে?
আমার কসুর যদি হইয়াই থাকে
পাগলের বে-আদবি ব'লে মাফ নাই?
ছুলীকে, তাহার মাকে লইয়া করিম
শুকাইয়া মরিবে কি ভিটায় পড়িয়া?

গ্রাম্য দেবতাটি তবে করিল উত্তর—
"করিম, নসীব তোর খুব ভাল দেখি ;
তোর যে আশঙ্কা তার বিস্তর কারণ
থাকা সত্ত্বে তুই কিন্তু বেঁচে গিয়েছিস।
রাষ্ট্রীয় মন্ত্রণা-সভা মুখরিত হয়
যাহাদের বক্তৃতায়, অধিকাংশ তারা
অগ্নিমান্দ্যরোগগ্রস্ত। বেশি পড়িলেই
একরূপ রোগ (বদহজম কিতাবি
যারে বলে তাই) হয়, এ কিন্তু তা নয়।
কিতাবি কৃতিত্ব-লাভে ব্যগ্রতার হেতু,
স্বাস্থ্য-রক্ষা-নীতি-প্রতি উপেক্ষাবশতঃ,
ব্যাপক ব্যাধির রূপে যাহার প্রকাশ,
আমি তার কথামাত্র বলিতেছি হেথা।
এ রোগ থাকায়, রুটি আর তরমুজ
এই দুই গুরুপাক জিনিসের প্রতি
তাহারা বিরূপ হবে, বিচিত্র কি ইহা ?
অতএব চাষ বন্ধ করিতে এদের,
লাট সাহেবেরে তারা পরামর্শ দিবে
ইহা হয় অতিমাত্র স্বভাব-সঙ্গত।
ইহা তারা করে নাই, আশ্চর্য্য ইহাই।
বিবাহাদি বিষয়ে যে আইন-কানুন
হয়, তার মূলে আমি দেখি ইহাদের
নিজ সুখ-সুবিধার চেষ্টা বেশ থাকে।
থাকা কি সঙ্গত নহে ? আপনি বাঁচিলে
তবেই বজায় থাকে বাপেরও নাম
এ সোজা কথাটা তুই অবশ্য বুঝিস।
দেখ্ না, আমিই নিজে যাহা কিছু করি,
তার মূলে না থাকিলে ভাত-কাপড়ের
জন্য চেষ্টা, হয় না কি পটোল তুলিতে ?
গীতার নিষ্কাম কর্ম্মবাদ দিয়া বাদ,
শিখা-আদি যত্নে রাখি শিকায় তুলিয়া,
হিন্দুরা অধুনা সাধে 'নব্য কর্ম্মযোগ'
স্বরাজ-সাধনা গাল-ভরা নাম যার,
হিন্দু কি মুসলমান যে যোগ সাধনে ?
তুল্য অধিকারী নব্যতন্ত্রী নাম ধারী।
এই দলভুক্ত আমি, মোল্লায় ছাড়িয়া
তাই এলি মোর কাছে, সত্য কি-না ভাই
তোদের যে পরকাল তাহার বিধান
মোল্লারই হাতে জানি ; কিন্তু ইহকালে
খেয়ে পরে বাঁচা চাই আগে, সত্য কি-না ?
তাহারই বন্দোবস্ত আমাদেরই হাতে।
বড় মোর ভাগ্য, তুই বুঝেছিস এটা।

এখন ঘটনা খুলে বল, বুঝে দেখি।
কাগজ পড়িয়া আমি মাথামুণ্ড তার
কিছু ঠাওরাতে নারি। কবে তুই কোথা
অভ্যর্থনা করেছিলি এ পাইলটেরে ?
কি জিনিষ তোর উপঢৌকন আছিল,
তাহা মাত্র অনুমানে আসিছে আমার।"
সরমের মাথা খেয়ে কৃষক বলিল
হুবহু যা ঘটিয়াছে। বাবু বলে শুনে,
"করিম রে ভাগ্যবান্, স্বপ্নলব্ধ ধন
হ'ল তোর হস্তগত, অদৃষ্টই সার।
ক্ষণিক মনের ঝোঁকে যা করিলি তুই,
আজ তোরে ফল দিল, মোর ফক্কাকার
সার বক্তৃতাদি দানে স্বরাজ-বিষয়ে।
ইহার কারণ (আমি করি অনুমান—
সত্যবাদী তোর কাছে মিছা না বলিব)
কেবল সরল আমি তোর মত নই,
মুখে এক, মনে আর তাও বলি কেন,
সংসার চলে না মোর ইহা না হইলে ?
সংসার কঠিন বড়, করিম রে ভাই।
খেটে খাই তোর মত বড় ইচ্ছা হয়,
ইচ্ছামত কাজ করি যো আছে কি তার ?
বাবু সেজে কাবু ভাই, ভদ্র হয়ে সাজা,
কাগজে কি লেখা আছে এবে তবে শোন্
"তোমার এ অভ্যর্থনা তুচ্ছ নহে মোর,
দিতে যা চাহিয়াছিলে তাও তুচ্ছ নয় ;
দাতার মনের ভাব ব্যক্ত হয় দানে,
তোমায় যে ভালবাসি তাহাও কারণ।
দেখার সুযোগ মোর হয় হে যেমন,
তেমন কাহার হয় ? তবু কিন্তু আমি,
কৃষকে নীরবে ক্ষেত্রে কার্য্যে লিপ্ত দেখে
যে আনন্দ পাই, তার তুলনা মিলে না।
পুরস্ত্রীরা কথঞ্চিৎ অসংবৃত হ'য়ে,
বিমুক্ত নদীর তীরে, অথবা বৃক্ষের
মেখলা পরিয়া শোভে নিভৃতে যে বাপী
তার তটে, সসম্ভ্রমে দৈনন্দিন কাজে
রত রয় এ দৃশ্যও মনোরম মোর
নিজ কাজে অতি লিপ্ত মনে তৃপ্তি দেয়।
হইয়া আসন পীঁড়ি রন্ধনশালার
দাওয়ায় বসে হৃষ্টচিত্তে শিশুগণ
চেখে চেখে খায় ইহা দেখিয়া আমার
ক্ষুধার উদ্রেক হয়, বড় সাধ হয়
ঝুপ করে, গৃহাঙ্গনে প'ড়ে টানি কাই

একখানি পিঁড়ি, আর খেতে বসে যাই,
শিশুরা নিজেরা তবে ক্রস্ত ব্যস্ত হয়ে
খাবার খাইতে দিবে, এতে কি সন্দেহ ?
তাতে টান পড়িলেও গৃহিণী সদয়া
আবার রন্ধনে মন দিবেন নিশ্চয় ।
ইহাতো প্রায়শঃ শুনি, সহৃদয় জন
আমায় আকাশ-পথে যাইতে দেখিলে,
চা-পান-ভোজন-বেলা, মোর সঙ্গ চান ।
ভগবান্ দেখিছেন সব, এ বিশ্বাস
হারাইয়া লোকে করে অসদাচরণ ।
আমি যে থাকিয়া লোকচক্ষুরন্তরালে
অনেক কিছুই দেখি, হলে এ বিশ্বাস,
অপকর্ম অনেকাংশে হবে অপনীত ।
ধর্মাধিকরণে সাক্ষী মানিবে আমায়
ভবিষ্যতে, অসম্ভব নহে ইহা জেনো ।
এখন যা বলিব তা শুনিয়া তোমার
হাসি পাবে, তবু ভালবাসি বলে বলি—
সূর্য্যোদয়-কালে, সূর্য্য অস্ত যান যবে
রাঙ্গকন্যা চেয়ে রয় ভাব-ভরা হৃদে,
খানিক সুস্থির হয়ে এ দৃশ্য দেখিতে
বড় সাধ হয় (অবিশ্রান্ত সুখধারা
বহে তাতে, না, দুঃখেরও অবসর হয়
জানিতে এসব তত্ত্ব কে না অভিলাষী ?),
কিন্তু হে (দুঃখের কথা) এ যানারোহণে,
যথেচ্ছ বিশ্রাম, অবতরণও তথা,
অদ্যাবধি একেবারে হয় নাই স্থির ।
অন্ততঃ ট্রেনের মত না হলে এ যান,
মোর আকাঙ্ক্ষার যোটে তৃপ্তি না হইবে ।
আমৃত্যু এ তৃষ্ণা মোরে করিবে পীড়ন—
উটপাখী ভয় পেয়ে বালুকাভ্যন্তরে
মুখ গুঁজে যবে ভাবে, 'আর ভয় নাই,'
এরোপ্লেন হতে তার পিঠে ঝুপ করে
পড়িয়া দৌড়াই তাতে মৃত্যুও স্বীকার ।
হেরিয়া সাহারাবাসীদের গৃহে বাস,
তাদের খেজুর-বীজে তৈয়ার মদিরা
পান করাও আমার খুব আকাঙ্ক্ষিত ।
ল্যাপলাণ্ডবাসীদের বরফের ঘরে
অন্ততঃ দিনেক বাস, অন্ত অভিলাষ ।
সাধ মোর সংখ্যাতীত, সানন্দে বরণ
করিব মৃত্যুরে আমি তারই তৃপ্তি তরে ।
আমি জানি স্থির, "হরি-ল্যাপসে" মরিলে
ভক্তবাঞ্ছা হরি যথা ভক্তের মানস
পূরান জনমে আন, তেমনই পূরিবে
মোর আশা, যাহা মোর উপাস্য দেবতা ।
বাসনা-সংযম নহে, বাসনা-পূরণ
মোর আকিঞ্চন, মোর সাধনা নিয়ত ।"
এরূপে কাগজ-পড়া সেরে বলে বাবু,
"খাটুনি দেশের কাজে অত্যধিক বলে,
রুজি-রোজগার নাই তেমন কিছুই ;
পরি তো খদ্দর মোটা, মোটা চালের
ভাত খাই, তাও ছাই জোটে না দু'বেলা ;
ছেলে-পুলে তবু কিন্তু ভাল খেতে চায় ।
ফুটি, তরমুজ মরসুমী ফল ভাল ;
গোটা দুই যেন ফল পাঠাস ও-বেলায় ।
করিম এ কথা শুনে দুঃখে মনে ভাবে,—
"ভদ্দর লোকেরা খায় কলম পিষিয়া
গতর খাটায়, এই কথা তো শুনি নি ;
হাটে, মাঠে, ঘাটে (শ্রীমা লোক দেখিলেই),
'দেশ দেশ' করে এরা, শুনিয়া বুঝি না,
জিজ্ঞাসি ছাগীর মাকে, সেও বলে তাই ।
মরুক গে' ছাই মোর কাজ নাই ভেবে ।"
প্রকাশ্যে বলিল, "এর জন্তে কমিনেরে
বলিতে হবে বা কেনে ? খোদা-ই দিয়াছে
এ সব কাজের জন্তে বুদ্ধি তার ঘটে ।
কর্তা যে মেহেরবান্ তা কি সে বোঝে না ?
ক্ষেতে গেলে কেউ তারে না চাইতে দিই ।
আসল কথাটা, কর্তা আপনাকে কই,
জমীর খাজানা কম—না দিলে চলেও
মন্দা চর হলে, গেছে সে দিন এখন
দুইটা পয়সা আছে, এখনও এ চাষে
নৈলে চাষে পেট ভরে আগেকার মত ?
মজুরি না দিলে কই সহরে না পেলে ?
দেশ কি সে দেশ আছে, সে সুখের দেশ ?

বেঙ্গল

—শ্রীসুশীলকুমার বসু

বাড়ীর দাস-দাসীরাও আড়ালে আলোচনা করে। বলে, "অনেক সাহেব-সুবো দেখেছি, কিন্তু এমন সাহেবিয়ানা আর কোথাও দেখি নি। সাহেব তবু যেমন—তেমন, মেম-সাহেব তাঁর ওপরে! পাশই না হয় দুটো করেছে, তা…বলে? পান থেকে চুণ খসবার উপায় নেই!"

যার যেমন মন।

কেউ বা বলে, "ছেলেকে নিয়ে সারা দিন যেন কুস্তি চলছে। 'এ ভাবে দাঁড়াবে না, ও ভাবে বসবে না।… কুঁজো হয়ে বসে কারা জান? যাদের কেউ কখনও বিলেত যায় নি। বাপ-ঠাকুর্দার মত তোমাকেও সেখান থেকে এঞ্জিনারি পাশ করে আসতে হবে, সারাক্ষণটি মনে রাখবে'।…"

অল্পবয়স্কদের কেউ কাছে থাকলে সমবেদনা জানিয়ে বলে, "ধীরেনও হয়েছে তেমনি—ভয়েতে সারাক্ষণ যেন সন্ত্রস্ত। বংশের একমাত্র ছেলে হয়ে যেন কেউ কখনও না জন্মায়।" ইত্যাদি…

অন্তরালের আলোচনায় সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় ও অধিকার-অনধিকার নিয়ে অনেক প্রশ্ন ওঠে। সুতরাং একটা উদাহরণ দেওয়া দরকার। যেমন—

সুখলতার কাছে ধীরেনকে পড়তে বলে সকালে কি-একটা কাজে বোস-সাহেব বাইরে গিয়েছিলেন। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পরে, বাড়ী ফিরে তিনি ধড়া-চূড়া ছাড়তে গিয়ে ডাকলেন, "খোকা—!"

দূর থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর এল, "যাচ্ছি, পাপা!"

সাড়া পেয়ে সুখলতা হাতের সেলাইয়ের কাজে মনোযোগী হয়ে প্রবেশ করলেন, বললেন, "আমাকেও বাইরে যেতে হয়েছিল, এই একটু আগে ফিরেছি। কিন্তু তোমার এত বেলা হল কেন?"

—"কেন! ইউ আর নাথিং লেস্ দ্যান্ এ নটী ওয়াইফ্ (you are nothing less than a naughty wife)! তোমার কাছে আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে?" যেন হঠাৎ ভুলে যাওয়া কোন কথা মনে করে তিনি বললেন, "ও লর্ড, আই ফরগট্ দ্যাট উই আর হাজ্‌ব্যাণ্ড এণ্ড ওয়াইফ্ (Oh Lord, I forgot that we are husband and wife)। হাঁ, জিজ্ঞাসা করবার অধিকার তোমার আছে।……আমি একটা অচল মেসিন্ সচল করে এসেছি। এইবার তোমারটা বল।"

সুখলতা হাসছিলেন। আরও হেসে বললেন, "খোকার এই গেঞ্জিতে একটা নতুন ডিজাইন তুলব। তাই তিনজনকে টি-পার্টির নিমন্ত্রণ করতে বেরিয়েছিলুম। কাল সকালেই তাঁরা আসবেন।"

এতক্ষণে ধীরেন এসে হাজির হল। পিছনে তার সাধের কুকুর। এর রং অনেকটা রয়েল্ বেঙ্গল্ টাইগারের মত বলে সে নাম দিয়েছে "বেঙ্গল"।

এই বেঙ্গলকে সংগ্রহ করার পিছনে একটা ইতিহাস আছে। মাস কয়েক পূর্ব্বে পিতার সঙ্গে প্রাতর্ভ্রমণে বের হয়ে মাইল দেড়েক দূরে, একটা ভাঙা বাড়ীর মধ্যে একে একেবারে শিশু অবস্থায় এর মা ও ভাইদের কাছে ধীরেন আবিষ্কার করে। তখন বোস-সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে ধীরেন তার দুর্দমনীয় ইচ্ছার কথা বলতে সাহস পায় নি। পরদিন অতি প্রত্যুষে একা গিয়ে এর মাকে খাবার দিয়ে ভুলিয়ে, একে লুকিয়ে নিয়ে, ছুটে পালিয়ে আসে। অর্দ্ধেক পথ চলে আসার পর, পথের পাশে মস্তবড় একটা নূতন বাড়ীর ভিতর থেকে একটা বিজাতীয় কুকুর, সম্ভবতঃ তারই বাচ্চা নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে মনে করে, দৌড়ে এসে ধীরেনকে কামড়ে দেয়। কামড়েছিল, কিন্তু ভাল ভাবে কামড়ানোর সুযোগ পায় নি, ধীরেন মরি-কি-বাঁচি পণ করে ছুট দিয়েছিল।

বাড়ীতে এসে, প্রথম দফায় বেঙ্গলকে লুকিয়ে রেখেছিল—চাকর মধুর ঘরে। পরে বোস-সাহেব ধীরেনকে প্রায়ই নজর-ছাড়া হতে দেখে বেঙ্গলকে মধুর ঘর থেকে গ্রেপ্তার করেন এবং চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসন-দণ্ড দেওয়ার—

প্রাক্কালে ধীরেনের সজল চোখের দিকে তাকিয়ে, এই সর্ত্তে ক্ষমা করেন যে, ভবিষ্যতে কুকুর নিয়ে ধীরেন মূল্যবান্ সময় নষ্ট করতে পারবে না ও পিতা-মাতার একান্ত বাধ্য হয়ে থাকবে। তবু সেই কুকুরে কামড়ানর কথা ঘুণাক্ষরেও সে প্রকাশ করে নি। মনকে এই বলে প্রবোধ দিয়েছে যে, সব কুকুরের বিষ থাকে না এবং এমন বিশেষ কোন কারণ ঘটে নি, যে জন্য তার ভাগ্যেও তেমন কিছু ঘটিতে পারে। সেই বেঙ্গলকে সে এখন স্বেচ্ছায় সঙ্গে আনে নি, তাকে অনুসরণ করে সে এসেছে।

দেখেই বোস-সাহেব জ্বলে উঠলেন, বললেন, "তুমি এখনও কুকুর নিয়ে খেলা করছ! তোমাকে কাল থেকে কি বলে রেখেছি আমি?"

—আজ ছুটির বার, বাড়ীর প্ল্যান (plan) সম্বন্ধে—

—উপদেশ দেব, কেমন? দেন হোয়াই'এণ্ট ইউ ইয়েট্ রেডী (then why 'aint you yet ready)?

ধীরেন বাধা পেয়ে চুপ করে গেল।

তার হয়ে বেঙ্গল যেন উত্তর দিয়ে ডেকে উঠল, "ঘেউ···ঘেউ···ঘেউ।" অর্থাৎ, দিন নেই, রাত নেই, সব সময়েই হুকুম চালালে তা' পালনে আগ্রহ থাকে না। অন্যায় নীরস তিরস্কার মনকে বড় দমিয়ে দেয়। ভাল-মুখে বললে সে খুব খুসী হয়ে করবে'খন।

উত্তরে বোস-সাহেবের বুট-জুতা-সমেত প্রশস্ত লাথি খেয়ে বেঙ্গল পালিয়ে গেল। এ-ব্যাপারে প্রথম প্রথম ঝি-চাকরেরা ছুটে আসত। ইদানীং এতে আর বিশেষত্ব কিছু নাই। কিন্তু, বেঙ্গলের আর্ত্তনাদটা যে কি ভয়ানক মর্ম্মভেদী, তার জীবন্ত প্রমাণ দিলেন সুখলতা।

হাতের বুননকার্য্যে সুখলতার অখণ্ড মনোযোগ ছিন্ন হল। বিরক্তিতে মুখখানাকে যথাসম্ভব বিকৃত করে তিনি বললেন, "বাঁদর ছেলে, কোথা থেকে একটা নেড়ী-কুত্তা জুটিয়েছে, কাণে তালা লাগিয়ে, সুতোর খেইটা গুলিয়ে দিয়ে, জ্বালাতন করে মারলে।" বোধ হয় বাঁচবার জন্যই তিনি সেই হারানো সুতোর খেই খুঁজতে লাগলেন।

পূর্ব্ব কথার জের টেনে বোস-সাহেব বলতে লাগলেন, "আমার ছেলে হয়ে রাস্তার কুড়নো কুকুর নিয়ে দহরম-মহরম করতে তোমার লজ্জা লাগে না! পাছে তোমার 'কেরিয়ার' নষ্ট হয়ে যায়, তাই; নইলে ভাল বিলাতী জাতের একটা কুকুর কি আমি আনতে পারি না? সে সব কুকুরের কেমন ট্রেনিং, দেখবে আমার সঙ্গে গিয়ে?"

—আমার এখনও খাওয়া হয় নি। এর পর এক সময়—

এবার সুখলতা গর্জ্জে উঠলেন। চোখ-মুখ পাকিয়ে বললেন, "কেন হয় নি? এ জীবনে তুমি 'ডিস্-ইপ্লিন' শিখবে না। শাস্তি না পেলে তোমার শিক্ষা হবে না। সেই জন্যেই এখন যাওয়া দরকার। পরে গেলে শিক্ষা করার কিছুই এতে থাকবে না। তখন মন চলে যাবে অন্য দিকে। দিন দিন বদ্মাইসী বুদ্ধি বাড়ছে!" বলে তিনি যথেষ্ট ক্রোধ প্রকাশ করে চলে গেলেন। দুর্ব্বলতা ধরতে দিলেন না।

বোস-সাহেব কোথায় যেন এইরূপ একটা উৎসাহের প্রয়োজন অনুভব করছিলেন। তিনি উল্লসিত হয়ে তাঁকে শুনিয়ে দিলেন, 'ইয়েস্ ইউ আর রাইট ডিয়ার (yes you are right, dear)। এস ধীরেন।" তাকে টেনে নিয়ে তিনি কুকুর দেখাতে চললেন।

[২]

উদাহরণের জের—

মোটর থামতেই ধীরেন অবাক্ হয়ে দেখল, এ যে সেই বাড়ী, যার ভিতর থেকে কুকুর এসে তাকে কামড়েছিল!

বাড়ীর সম্মুখে ক্ষণকালের জন্য দাঁড়িয়ে বোস-সাহেব বললেন, "এই বাড়ীর আইরন্-ওয়ার্ক আমি নিয়েছিলুম। এঁরা আমার কাজে এত খুসী হয়েছেন যে, এঁদের দামী বিলাতী কুকুরের বাচ্চা হতেই খবর দিয়ে আমাকে একটা 'প্রেজেন্ট' করার অনুমতি চেয়েছিলেন।"

বোস-সাহেবের খবর পেয়ে গৃহস্বামী এলেন, সঙ্গে করে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গিয়ে মিষ্টি কথায় তাঁকে আপ্যায়িত করলেন। ক্রমে প্রেজেন্টের কথা উঠল।

কুকুরের ঘরে নিয়ে গিয়ে সে সম্বন্ধে অনেক কথা কইতে লাগলেন।

'প্রেজেন্ট' নিয়ে নিজেকে ছোট করবেন না মনে প্রাণে জেনে কেবল মাত্র ধীরেনকে শোনাবার জন্যে বোস-সাহেব অন্য প্রসঙ্গ তুললেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা কিনতে গেলে এ জাতের কুকুরের কি রকম দাম পড়ে ?"

—দেড়শো টাকার কম ত নয়ই, বরং বেশী।

—প্রেজেন্ট করছেন কবে।

– খবর দেওয়ার পাঁচ সাত দিন পর যে দিন খুসী নিয়ে যাবেন।

—তার মানে ?

—যে বাচ্ছাটা নেবেন সে'টাকে প্রথমে এক দিন—পরে দু'দিন অন্তর সরিয়ে রেখে ধাড়ীটাকে সইয়ে নিতে হবে। নইলে বাচ্ছার শোকে ধাড়ীটার স্বাস্থ্যভঙ্গ হতে পারে।

কুকুরগুলির যত্ন নেওয়ার এবং এদের একটিকে মা-ছাড়া করার সুনির্দ্দিষ্ট পন্থার পাশে বেঙ্গলের কথা তুলনা করে ধীরেন নিজেকে আর সংবরণ করতে পারল না। এ ঘরে আসা অবধি সে যে কথাটা বলা-না-বলার সংশয়ে দু'পা এগিয়ে তিন পা পিছিয়ে যাচ্ছিল, তা প্রকাশ করে ফেলল।—ধাড়ীটাকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশে দেখিয়ে বলল, "বাবা ওই কুকুরটাই আমাকে—"

তার কথা শেষ না হতেই গৃহস্বামী ভিন্ন অর্থ ধরে হো-হো শব্দে হেসে উঠলেন। হাসির বেগ হ্রাস পেলে বললেন, "ওটা যে ওদের মা। ওকে নিয়ে গিয়ে কিছুতেই পোষ মানাতে পারবে না।"

বোস-সাহেবের মুখ রাঙ্গা হয়ে উঠল। তিনি ধমকে উঠলেন, "তোমার কি বুদ্ধি-শুদ্ধি কিছু নেই ?" গৃহস্বামীকে বললেন, "এই ছেলের জন্যেই নিতে পারছি না ; নিলে কুকুর নিয়ে ও দিনরাত মেতে থাকবে। বুঝে দেখি, পরে খবর দেব। আচ্ছা—এখন আসি, নমস্কার।"

—নমস্কার।

[৩]

পরদিন আহারান্তে পিতাপুত্র ভিন্ন কক্ষে প্রস্তুত হতে ব্যস্ত—অন্যান্য দিনের মত ধীরেনকে স্কুলে নামিয়ে দিয়ে বোস-সাহেব সেই মোটরেই আপন কাজে যাবেন। ওদিকে আপন কক্ষে সুখলতাও ব্যস্ত তাঁর বন্ধুদের নিয়ে। কাল আঘাত পাওয়ার পর বার কয়েক দেখা হলেও বেঙ্গলকে ধীরেন সান্ত্বনা দেওয়ার সুযোগ পায় নি ; এই ফাঁকে সে মায়ের এবং বাবার ঘরে অলক্ষ্যে উঁকি দিয়ে নিঃশব্দে গিয়ে হাজির হল বাড়ী-সংলগ্ন বাগানে। সেখানে বেঙ্গল বাঁধা থাকে।

তাকে নিকটস্থ হতে দেখে বেঙ্গলের বিলম্ব যেন সহ্য হচ্ছিল না। চেনটায় কয়েক বার বেশ টান দিয়ে হতাশ হয়ে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে, সে লেজ নাড়তে নাড়তে "উঁ-আঁ। ও" শব্দে আনন্দ জ্ঞাপন করল।

ধীরেন তার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করল, ফিস্ ফিস্ করে বলল, "চুপ-চুপ ! ওপরে শুনতে পাবে যে।"

গায়ে ওঠার জন্য কিংবা এমনও হতে পারে—তার চোখের কাছে নিজের চোখ তুলে ধরে নীরব ভাষায় অন্তরের স্নেহ-শ্রদ্ধা-কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য বেঙ্গলের মধ্যে যে চাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছিল, তাতে ধীরেনের কথা বেশ কাজ করল। বেঙ্গল ধীরেনের পায়ের ওপর মুখখানাকে লম্বাভাবে রেখে স্থির হয়ে বসে আধ-খোলা চোখে চেয়ে রইল। যেন, তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শান্তি সে ভোগ করছে।

কয়েক মুহূর্ত্তমাত্র। পরক্ষণে রুদ্রমূর্ত্তিতে সুখলতা দেখা দিলেন। বেঙ্গল ডেকে উঠল, "ঘেউ-ঘেউ।" বোধ হয় জানাতে চাইল, তার জন্য তার পরমাত্মীয়কে কিছু বললে ভাল হবে না।

সুখলতা ক্ষিপ্র-পদে এলেন। চেন্‌টা খুলে নিলেন। দেশী কুকুরকে পোষার জন্য তাঁর বন্ধুদের দেওয়া অপমানের ঝাল ঝাড়লেন—চেন্‌টাকে চাবুকের মত সপাং করে বসিয়ে দিতেই বেঙ্গল অতি করুণ কণ্ঠে চীৎকার করে প্রাচীর-ঘেরা বাগানের মধ্যে যথাসম্ভব দূরে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল।

ধীরেন শিউরে উঠল, বলল, "কী করলে মা। ওর চোখ দিয়ে যে রক্ত পড়ছে ; ওকে কাণা করে দিলে।"

সম্ভবতঃ অসহিষ্ণুতার শাস্তি-স্বরূপ ধীরেন কাণমলা খেয়ে মৌন হয়ে রইল। সেদিকে বারেক দৃষ্টিপাত করে সুখলতা বললেন, "কিন্তু তার মূলে ত তুমিই। তোমার

মাসীমায়া ওপরের বারান্দা দিয়ে যাওয়ার সময় তোমাকে বেঙ্গলের মাথায় হাত বুলোতে না দেখলে এমনটি ঘটত না” বলে তিনি সকল অপরাধের বোঝা ধীরেনের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে সটান গিয়ে প্রবেশ করলেন বোস-সাহেবের ঘরে।

ধীরেন বেঙ্গলের চোখ-মুখ মুছে দিলে, তবু রক্ত পড়তে লাগল। ওদিকে বোস-সাহেবের ঘরে একটা কিছু ব্যবস্থা যে বেঙ্গলের সম্বন্ধে হচ্ছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বলল, “বেঙ্গল, আমার কাছে দেখলেই তোকে ওরা মারে, কাজ কি মিথ্যে এমন শাস্তিতে? এবার থেকে তুই আমার কাছে যাসনে, আমিও তোর কাছে না আসতে সাধ্যমত চেষ্টা করব। বুঝলি?” যত শীঘ্র পারল সে সরে পড়ল সেখান থেকে।

বেঙ্গল আপন ভাষায় বোধ হয় বলল, সে প্রহার খায় এই দেশে তার জন্ম বলে। সে তার দুর্ভাগ্য, ধীরেনের অপরাধ নয়।

বোস-সাহেবের কক্ষপাশে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কি-সব শুনে চোরের মত পা টিপে-টিপে মধুর কাছে গেল। বলল, “মধু! বেঙ্গলকে তুমিই প্রথমে বায়গা দিয়েছিলে; এইবারটির মত তুমিই তাকে কোনরকমে রক্ষা কর। বিলাতী কুকুর আনার ও সেই সঙ্গে বেঙ্গলকে নিরুদ্দেশ করার যুক্তি হচ্ছে ওপরে। এ কাজ তোমাকে দিয়েই করানো হবে, শুনে এসেছি। লক্ষীটি, আমার কথা রেখো।”

তার ব্যাকুলতা দেখে মধু মনে বেশ ব্যথা পেল। বলল, “আচ্ছা রাখব দাদাবাবু। রাখবার মত না হলেও রাখতে খুব চেষ্টা করব; তুমি নিশ্চিন্ত থাক গে’।”

ধীরেন স্কুল থেকে ফিরে গোপনে খবর নিয়ে জানল, বেঙ্গলকে নিয়ে মধু কোথায় গেছে। রাত্রে শোবার সময়ও খোঁজ নিয়ে শুনল, না মধু, না বেঙ্গল কেউই ফেরে নি। সমস্ত রাত্রি শয্যায় ছট্‌ফট্ করে অতি ভোরে গিয়ে মধুকে ডেকে তুলল, শুধাল, “কি করলে মধু?”

—সে হল না।

আশঙ্কায় কাতর হয়ে জিজ্ঞাসা করল, “কি হল না?”

—বেঙ্গলকে রাখা হল না। আমাকে কোথায় যেতে হবে, কি করতে হবে বুঝিয়ে দিয়ে কর্তাবাবু বললেন, “বেঙ্গলকে তুই-ই এক সময় লুকিয়ে রেখেছিলি, আমার মনে আছে। নিমকহারামি না করিস্ ত পাঁচ টাকা বখসিস্ পাবি।” কর্তাবাবুর কথা তবু নরম ছিল। গিন্নী-মা বললেন, “বেঙ্গল যদি ফিরে আসে তা হলে তোর চাকরি যাবে।” এ কি কম সর্বনেশে কথা! চাকরি গেলে আমি খাব কি?

—কিন্তু বেঙ্গল কি খাবে তা’ একবার ভাবলে না! কোথায় ছেড়ে দিয়ে এলে তাকে?

—গিন্নী-মা বলতে বারণ করেছেন।

শুনে ধীরেন হতাশায় বসে পড়ল। কতক্ষণ একভাবে কেটে গেল, তারপর সে পাহাড়-প্রমাণ চিন্তার ভারে ক্লান্ত হয়ে সেখান থেকে ধীরে ধীরে সরে যাওয়ার সময় বলল, “সব, সবাই আমার শত্রু। এই শত্রুপুরীতে আমি থাকতে পারব না।”

বেলা হলে বোস-সাহেব এসে পড়াতে বসলেন। পড়ানোর পূর্ব্বে তার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, “বেঙ্গলকে তাড়িয়েছি বলে দুঃখ ক’রো না, সেই দেড়শো টাকা দামেরটা শীঘ্রই আসবে। নাও, কি পড়া আছে পড়ে নাও।”

[৪]

বিলাতী কুকুর এল। বিলেতের বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়ানোর সময় ঠিক কোন্ দেশে এই রকম একটা কুকুর দেখেছিলেন মনে করতে অক্ষম হয়ে সমগ্র ইউরোপের ভ্রমণ-স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখার জন্য বোস-সাহেব এর নাম “ইউরোপ” রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। শুনে স্বর্ণলতা সানন্দে সম্মতি দিলেন এবং আবার একটা নূতন ডিজাইন্ তোলার ছলে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে ইউরোপ-কে দেখিয়ে, পাওয়ার এবং নাম-করণের কথা সবিস্তারে বললেন। বন্ধুরা উচ্চকণ্ঠে সুরুচির প্রশংসা করে গেল; স্বর্ণলতা এবং তাঁর দেখা-দেখি বোস-সাহেবও কৃতার্থ হলেন।

কেউ কাউকে না বললেও এ বাড়ীর প্রায় প্রত্যেকের মনে ইউরোপের প্রতি ধীরেনের উদাসীনতা অদৃশ্য কাঁটার মত মাঝে-মাঝে খচ্-খচ্ করে উঠতে লাগল। ক্রমে তা’

কালবৈশাখীর মেঘের মত বোস-সাহেব ও সুখলতার মনের কোণে দেখা দিয়েই অত্যল্প কালের মধ্যে চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে উভয়কে সচেতন করে তুলল।

আর একদিনের মত ধীরেনকে পড়াতে বসে বোস-সাহেব নির্ভুল উত্তর না পেয়ে রেগে গেলেন। কথার ওপর জোর দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আজকাল তোমাকে বড় অন্যমনস্ক দেখছি, কেন?"

ধীরেন মনে-মনে যাচাই করে দেখেছে, মা অথবা বাবার কাছে তার কথার কোন মূল্য নাই। সেখানে আছে দুর্লঙ্ঘ্য বাধার মত পাশ্চাত্য আদব-কায়দার চুল-চেরা বিচারের অভ্রভেদী পাহাড়, অতিক্রম করার উদ্দেশ্যে সেই পাহাড়ের সম্মুখীন হলে পিছনের গভীর খাদ্ তিরস্কারের মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করে এগিয়ে আসে। তখন, শতকরা প্রায় নিরানব্বুইটা ক্ষেত্রে, নিরুপায় হয়ে তাকে তিরস্কারের কবলে পড়তে হয়। ব্যথায় তার দেহ-মন টন্ টন্ করে ওঠে, বহু বার উঠেছে।

তাকে নিরুত্তর দেখে বোস-সাহেব পুনরায় বললেন, "আমার যে সময় তোমার পড়ানোর পিছনে ব্যয় করি, তা' নিজের কাজে লাগালে দশজন মাষ্টারের মাইনে হত, আশা করি তুমি তা' জান। সুতরাং ঘরে পড়ানোর জন্যে দু'জনের যায়গায় পাঁচজন মাষ্টার রাখলে টাকা খরচ এবং পরিশ্রম যত কম হবে, তেমনি দশজনের একজন হওয়ার দিকে তুমি তত পিছিয়ে থাকবে; তাই আমার এত মাথা-ব্যথা। বেঙ্গলকে—বাধা পেয়ে তাঁকে থামতে হল।

—ধীরেন, আমার কুরুশ-কাঠিটা দেখেছ? বলতে বলতে সুখলতা এসে উপস্থিত হলেন।

শুনে বোস-সাহেব যেন ক্ষেপে গেলেন, বললেন, "কুরুশ-কাঠি নিয়ে কেউ পড়তে বসে না কি! ধীরেন কি তোমার কুরুশ-কাঠি নিয়ে পড়তে বসেছে যে, তুমি এখানে কুরুশ-কাঠি খুঁজতে এসেছ?"

—খুঁজে পাচ্ছি না তাই জানতে এসেছি, সেই কাঠিটা কোথাও পড়ে থাকতে ও দেখেছে কি না। তাতে হয়েছে কি, এত রাগই বা কিসের?

কি বলতে উদ্যত হয়ে বোস-সাহেব থেমে গেলেন। পুত্রকের পাতার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন, "না—কিছু নয়। তোমার সঙ্গে তর্ক করার সময় নেই, তুমি যাও এখান থেকে।"

—না, আমি যাব না।

—বেশ দাঁড়িয়ে থাক। বলে সুখলতার উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করে বোস-সাহেব পূর্ব্বকথার জের টেনে বললেন, "বেঙ্গলকে তাড়িয়েছি তোমার ভালর জন্যেই। আমার এই অমানুষিক পরিশ্রমকে তুমি হেলায় হারাচ্ছ কেন?"

তবু সে নত-মস্তক দেখে এবার বোস-সাহেব বড় বিরক্ত হলেন। আবার শুধালেন, "কি হয়েছে তোমার? মাথা তুলছ না কেন?"

—আজ পড়া হয় নাই বুঝি, মুখ দেখি তোর। বলে সুখলতা বহু দিন পরে ধীরেনের অঙ্গ স্পর্শ করলেন। নতমুখ তুলে ধরতেই চমকে উঠে বললেন, "এ কি রে! তোর গা এত গরম কেন?"

—গা গরম! বলে বোস-সাহেবও উঠে গিয়ে গায়ে হাত দিয়ে উত্তাপ পরীক্ষা করলেন। পরে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন, "মাথাও ধরেছে?"

—হ্যাঁ, রোজ এমন হয়।

—কতদিন হচ্ছে?

—প্রায় এক মাস।

—এক মাস! বলে সুখলতার মুখের ওপর দৃষ্টিপাত করে বোস-সাহেব খাড়া হয়ে দাঁড়ালেন।

সেই দৃষ্টির অর্থ তত স্পষ্ট না হলেও, সুখলতার পক্ষে তা' সহ্য করা কঠিন। তিনি বললেন, "আমার দিকে অমন কটমট করে তাকানোর মানে?"

—মানে? ওটা ওর সংস্কারের প্রশ্ন, তোমার নয়, তুমি ওর মা। আমার মায়ের কথা মনে পড়ে কি? বলে বোস-সাহেব নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিয়ে বললেন, "তোমার মত আমার মাও বিলেত-ফেরতের বৌ ছিলেন। তাঁর বন্ধু-সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না, তাঁদের সঙ্গে তিনি মেশবার সময় করতেন, কিন্তু ঘর-সংসার ভুলে নয়; এ ব্যাপার তাঁর জীবনে কোন দিন ঘটে নি। পরে ধীরেনকে বললেন, "আর আজ থেকে তোর শোয়ার ব্যবস্থা আমার কাছে হবে।"

তিনি তাকে নিয়ে চলে গেলেন।

[৫]

টাকায় খই ফুটে গেল; কিন্তু ধীরেনের অসুখ সারল না, বৃদ্ধি পেতে লাগল। আশঙ্কায় ক্রমশঃ বোস-সাহেব ও সুখলতার মনোমালিন্যকে হ্রাস করে তার অসুস্থতা ভীষণাকার ধারণ করল। সকালে বোস-সাহেব সাহেব-ডাক্তার ডেকে আনলেন।

সাহেব ডাক্তার রোগীকে অনেকক্ষণ পরীক্ষা করলেন, রোগের উপসর্গ খুঁজে বেড়ালেন। পরে জিজ্ঞাসা করলেন, "টোমাকে কক্‌ণো কুকুরে কামড়াইয়াছিল?"

—হাঁ, কামড়েছিল।

—পানি পিনেসে বহুৎ কষ্ট হোতা?

—হাঁ, হয়।

—গা কি শুকাইয়া গেছে?

—কখনো শুকিয়ে যায়, কখনো বা সর্ সর্ করে—অজান্তে চুসকে ফেলি, বেড়ে ওঠে; আবার ছোট হয়ে আসে।

ডাক্তার সাহেব কাপড় সরিয়ে ক্ষতস্থান দেখলেন, টিপে রস বা'র করলেন। স্তম্ভিত বোস-সাহেবের ও সুখলতার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ইয়েস্, ইট্ ইজ হাইড্রোফোবিয়া (yes, it is hydrophobia)।" ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করে চিকিৎসা সম্বন্ধে নানা কথা কয়ে তিনি চলে গেলেন।

বোস-সাহেব তাঁকে মোটর পর্য্যন্ত পৌঁছে দিতে গিয়েছিলেন; ফিরতেই সুখলতা আগ্রহে এগিয়ে গিয়ে বললেন, "এত অসুখ—জ্বর বাড়লে ক'দিন ধ'রে ভুল বকছে, তবু তোমার ছেলের দুষ্টবুদ্ধি ছাড়ে নি। বলে কি না আমাদের ইউরোপের মা ওকে কামড়েছে। অর্থাৎ ইউরোপকে তাড়িয়ে দিয়ে বেঙ্গলকে ডেকে আন, তা হলেই ওর অসুখ সেরে যাবে।"

তার মুখের দিকে তাকিয়ে বোস-সাহেব থমকে দাঁড়ালেন। মুখ ভেংচে বিকৃত সুরে বললেন, "থাক—তর্ক অনেক হয়েছে। এখন পার ত' সারাক্ষণ ওর কাছে থাকতে চেষ্টা কর।"

—সে চেষ্টায় লাভ কিছু নেই বরং ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। কারণ, স্নেহদুর্ব্বল মন সন্তানের দুষ্টবুদ্ধিকে প্রশ্রয় দেয়। তা ছাড়া আমারও দু'টো কাণ আছে, ডাক্তার সাহেব যাবার সময় বলে গেলেন, "ইট ইজ এ কমন্ ডিজিজ্ ইন্ ইউরোপ (it is a common disease in Europe)—আমি কি তা শুনতে পাই নি?

বোস-সাহেবের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল। বিলেত থেকে পরে-আসা খোলসটাকে ছিঁড়ে ফেলে তিনি নিজমূর্ত্তি ধরলেন। চীৎকার করে বললেন, "বেঙ্গল ইউরোপ নয়, ইউরোপ বেঙ্গল নয়, বুঝতে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করার দরকার হয় না; যাদের হয়, তারা এ ঘরে আসার অযোগ্য, আসতে পারে না। যাও,—তুমি নিজের ঘরে গিয়ে তর্ক কর গে।" আঙ্গুল দিয়ে দরজা দেখিয়ে দিলেন।

সেই ভীষণ মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে সুখলতা আজ হত-বাক্ হয়ে ঢোক গিলে ফেললেন। সিঁড়িতে ঝি-চাকরদের পদশব্দ পেয়ে মুখখানাকে কালো করে তিনি আপন কক্ষে গিয়ে সশব্দে খিল দিলেন।

নিস্তব্ধ দুপুর। সুখলতা খিল এখনও খোলেন নি। ওষুধ খেয়ে ধীরেন অগাধে ঘুমুচ্ছে, মাঝে মাঝে বড় ভয় খাচ্ছে ও চমকে উঠছে বলে অভয় দেবার জন্য বোস-সাহেব শয্যার পাশে চেয়ার টেনে তার অঙ্গস্পর্শ করে বসে ছিলেন; রাত্রি-জাগরণের ফলে তাঁরও তন্দ্রা এসেছে।

ধীরেন হঠাৎ তাঁকে চমকে দিয়ে শয্যার ওপর উঠে বসল। বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে সে বলল, "বাবা! বেঙ্গল আসছে। মধু যে ট্রেনে ফিরে এল, সেই গাড়ীর পিছনে সে প্রাণপণে ছুটে আসছিল, ক্রমে পিছিয়ে পড়ল। তারপর ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল।…তার এক চোখে রক্তের দাগ, অন্য চোখে অশ্রু! সকাল হয়, সে হাটতে সুরু করে, সন্ধ্যায় শ্রান্ত হয়ে পথের পাশে শুয়ে পড়ে। মুখের কাছে খাবার পেলে খায়, খাদ্যের খোঁজে অন্য পথে যায় না। তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীরা তাকে দলে টানতে এগিয়ে আসে, সাদর অভ্যর্থনা জানায়, তবু সে অন্য পথে যায় না। প্রতিদিন পথ-চলার শক্তি তার ফুরিয়ে আসে।…পরে দেখা দিল সমস্যা—সেই রেলপথের এক তেমাথায় এসে দাঁড়াল, ভুল করল, অন্য পথে চলে গেল। তারপর কত গ্রাম, কত মাঠ-ঘাট ঘুরে সে অতি শীর্ণ-ক্লান্ত দেহে

এই সহরে ঢুকেছে।…আমি ঠিক দেখেছি, স্বপ্ন আমার মিথ্যে নয়।"

পরে সে আব্দার করে বললে, "বাবা, আমি ঐ জানালার ধারে বসব।"

—বেশ ত' বসবে চল। বলে চেয়ারখানা জানালার ধারে রেখে এসে, বোস-সাহেব তাকে ধরে ধীরে ধীরে নিয়ে গেলেন। মনে মনে ভাবলেন, ভালই হল যেমন অসুখটা আজ বেড়েছে, তেমনি রাস্তার গাড়ী-ঘোড়া দেখে অন্যমনস্ক থাকবে।

চেয়ারে বসতে গিয়ে ধীরেন রাস্তার দিকে চেয়ে আনন্দে যেন লাফিয়ে উঠল। বলল, "ওই আমার বেঙ্গল আসছে! রাস্তা পার হয়ে গেটের ভিতর ঢুকল! আমাকে দেখতে পেয়ে আনন্দে ও লেজ নাড়ছে! কি লাফালাফি করছে দেখ, বাবা! এ কি! ইউরোপ ওকে তেড়ে যাচ্ছে কেন?"

স্বপ্নের সত্যতা উপলব্ধি করে বোস-সাহেব যেন আপন চক্ষুকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। ইউরোপকে সংযত করার জন্য তিনি উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগলেন, "এই ইউরোপ! ইউরোপ! সরে যা বলছি, নইলে তোকেও তাড়িয়ে দেব।"

ইউরোপ অস্পষ্ট গোঁ-গোঁ শব্দে তাড়া করে এগিয়ে যেতে লাগল। ডাকাডাকির দিকে সে ভ্রূক্ষেপও করলে না।

ধীরেন ব্যাকুলকণ্ঠে চীৎকার করে বলে উঠল, "বাবা, এ দিকে দেখ—একটা মোটর পূর্ণ বেগে আসছে! ইউরোপের তাড়া খেয়ে বেঙ্গল যে ভাবে পিছিয়ে যাচ্ছে,… যদি আরো খানিকটা রাস্তার মধ্যে নেমে যায় তা হলে ওর মৃত্যু অনিবার্য্য, ওর পেটের ওপর দিয়ে চাকা চলে যাবে। যাবে কি, এ যে গেল দেখছি! গেল গেল—গে—লঃ।"

বেঙ্গলের মর্ম্মভেদী করুণ আর্ত্তনাদ সকল কণ্ঠের ঊর্দ্ধে উঠে, চারিদিক্ চমকিত করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে ধীরেন ঘরের মধ্যে সজোরে পড়ে গেল। হৈ-চৈ শুনে বাড়ীর যে যেখানে ছিল, ছুটে এসে হাজির হল। সুখলতাও এলেন, এসে আছাড় খেয়ে পড়লেন।

ডাক্তার ডাকা হল, বুকফাটা কান্না কোন মতে থামিয়ে তিনি কেবল মাত্র বলতে পারলেন, "ডাক্তারবাবু, এ মূর্চ্ছা…?"

ধীরেনের মৃত্যু হয়েছে।

[৬]

প্রথমে মনে হয়েছিল শোকের পাথার ঠেলে এ বাড়ীর কেউ বুঝি আর উঠবে না। পরে দেখা গেল, দাস-দাসীরা উঠেছে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পাড়ার পাঁচজন নিয়মিতভাবে সান্ত্বনা ও উপদেশ দিয়ে যেতে লাগলেন। বোস-সাহেব উঠলেন, কিন্তু বড় গম্ভীর।

সুখলতাকে কেউ ওঠাতে পারছে না। অনেকেই বলাবলি করছে, "এ যাত্রা ওঁর রক্ষা পাওয়া সংশয়। হাজার হোক মা! মায়ের পুত্রশোক বলে কথা! তা'ও আবার একমাত্র, আর একটি নেই যে তাকে নিয়ে ভুলে থাকবে।" অভিজ্ঞরা সমর্থন করে বলে বেড়াচ্ছেন, "অতি সত্য কথা। কিন্তু, শোক চিরস্থায়ী নয়। শোক চিরস্থায়ী হলে বিশ্ব-সংসার ধ্বংস হয়ে যেত।" অবশেষে সুখলতাও উঠলেন।

দিনগুলি বড় নিরানন্দে কাটতে লাগল; বাড়ীটা যেন গিলতে আসছে। কাজ-কর্ম্ম চুকে গেলে কিছুকাল বাইরে ঘুরে বেড়ানোর ব্যবস্থা হল এবং তা অনতিবিলম্বে কাজে পরিণত করা হল।

*

ফিরেই বোস-সাহেব সুখলতার অদৃষ্ট-প্রায় পুত্র-শোককে নিঃশেষে মুছে ফেলার জন্য আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পাড়ার পাঁচজনকে নানা ছলে নিমন্ত্রণের পর নিমন্ত্রণ দিয়ে বাড়ী গুলজার করে রাখলেন। কিন্তু, কৃতকার্য্য হতে তাঁর অনুমানেরও অনেক বেশী সময় লাগল।

আরও কিছুকাল পরে একদিন সকালে বারান্দায় বোস-সাহেব ও সুখলতার চা-পান চলছিল। উপভোগ্য আলোচনা প্রাণান্ত পর্য্যন্ত চালিয়ে কথায় কথায় ক্লান্তি এসে এমনি একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে যে, তখন কোন নূতন প্রসঙ্গ আর না তুললেই নয়। সেই সময়—

বাগান-বাড়ীর বহুকালের নোনা-ধরা পাঁচিলের যে অংশটা কাল পড়ে গেছে, তার দিকে তাকিয়ে বোস-সাহেব সংস্কার করার বিষয় চিন্তা করছিলেন। সেই ভাঙার ফাঁকে বেঙ্গলকে দেখতে পেলেন। ইতিপূর্ব্বে সন্ধান নিয়ে শুনেছিলেন মোটরের চাকা তার কোমরের ওপর দিয়ে চলে গেছে, সে মরে নি, ভাঙা কোমর নিয়ে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়েছে। শুনে মনকে প্রবোধ দিয়ে বলেছিলেন, নিরুদ্দেশ হবারই কথা। এখন বুঝতে বাকী রইল না, 'বেঙ্গল ইউরোপের ভয়ে সদর দিয়ে প্রবেশ করার সাহস পায় নি; এ যাবৎ তাকে আত্মগোপন করতে হয়েছে।' কিন্তু, স্বপ্নেও কখনও কল্পনা করতে পারেন নি, এই মর্ম্মান্তিক দৃশ্য তাঁকে দেখতে হবে।—

সত্যই তার কোমর গেছে ভেঙে, দেহ হয়েছে কঙ্কাল-সার, কাদায় মাখামাখি, মরণের আর বুঝি বাকী নেই।

অস্পষ্ট যন্ত্রণামূলক শব্দে মানুষের পা দুখানা দিয়ে পিছনের অবচেতনের স্তরবর্তী কিছুকে টেনে ধীরে ধীরে সে আসছে। আবার হঠাৎ তুলে তীব্রকণ্ঠের একটা অতিক্ষীণ আর্তনাদের সঙ্গে দেহের সম্মুখভাগটা মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ল।

সুখরঞ্জন মুক্তে চেয়ে সম্ভবত: কোন হাসির কথা ভাবছিলেন। তাই সশব্দে হেসে তিনি কি বলতে গিয়ে থমকে থেমে গেলেন।

বোস-সাহেব দৃষ্টি অনুসরণ করতেই বাগানবাড়ীর দৃশ্যটা তাঁর হর্ষোৎফুল্ল মুখের ওপর আর একদিনের চাবুকের মত পড়ল। তিনি তাঁর বিবর্ণ মুখচ্ছবি গোপন করার ব্যর্থ চেষ্টায় চঞ্চল হয়ে বললেন, "তখন সবাই বলাবলি করলে, বেঙ্গল গাড়ী-চাপা পড়েছে, এখন ওখানে এল কি করে, তবে কি বেঙ্গল আজও বেঁচে আছে?"

শেষ-রাত্রি

—শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়

চাহিয়া দেখ   কাঁপিছে ওই   মৌন নিশীথ রাত,
কাঁপিছে তার   আবেগ অপরূপ,
ছায়ায় যার   ঘুমায় বসুমতী;
চাহিয়া দেখ   তাহার রথ   চলিছে বেগবান্,
তারার দিঠি   এড়ায়ে চলে   তিমির মনোহর!

নিশীথ রাতে   কাঁপিয়া উঠে যাহা,
কাঁপিয়া ওঠে   নীরব সুরে   গুমরি সুকরুণে,
পরশ তারি   শিহরি ওঠে   মোদের জীবনেতে;
জান কি তুমি,   সে গূঢ় ব্যথা   কাঁদিছে অবিরাম—
পরাণ মাঝে   বিফল বিলাপেতে,
তাহার সুর   আঁধার সীমাহীন!

মোদের এই   জীবনমাঝে আজ,
কাঁপিয়া ওঠে   নিশীথ রাত   আবেগে অপরূপ,
কাঁপিয়া ওঠে   প্রতিটী পলে   ভয়াল বিভীষিকা;
মরণ যেন   মৌন-শীতল,   আগায়ে আসে কাছে,
আগায়ে আসে,   অনমুভূত   আকৃতি কায়াহীন;
নিশাস তার   আঁধার-মনোহর!

আমরা, যারা   এই জীবনে   কাঁদিয়া গেনু শুধু,
ক্ষোভে ও দুখে,   বিফল বিলাপেতে,
আমরা যারা   এ বিফলতা   সফল সাধনার
পরম ফল   বলিয়া ল'নু   মনেতে আমাদের;
কাঁদিনু শুধু   কাঁদা বিলাস বলি—
নাহি খুঁজিয়া,   নাহি চাহিয়া,   অপর কোন কিছু;
আমরা, যারা   বিফলতার   বিফল স্বপনেতে—
নিজেরে করি   সর্বহারা   ডাকিনু মরণেরে,
তাদের তরে   কি আছে আর   পাওয়ার লো প্রিয়া;
স্বপন-মায়ার   স্বপন ভুলি   রচিনু এদি মোরা—
সুর-করুণে   ছন্দ-হারা   জাগিল কোলাহল!

রচিনু মোরা   এই জীবন   আদিম অবসরে
এ জীবনের   দিক্‌বিদিক্ কত—,
উজল করি   এ ধরণীর   উন্মুখর বুক;
মোদের শিরে   রবির শিখা   আশিস্-ধারা সম
পড়িল ঝরি   আমরা হনু   সৃজনী প্রতিভার
রূপ-পিয়াসা   জলিল হোমানল!

সেই আগুনে   পূত আগুনে   পেয়েছি বহু কিছু,
রচেছি কত   মোদের ইতিহাস,
আজিও যাহা   উজলি ওঠে   নিশীথ মৌন রাতে,
ঘন আঁধারে   লেলিহ হোমানল!
সহসা নভে   উঠিল মেঘ,   বহিল ঘন ঝড়,
সফেন নদী   ফুলিয়া উঠি,   ভাসায়ে দিল সব,
পড়িল বাজ   চমকি উঠি   লুকাল সৌদামিনী
ভাসিনু মোরা   দুখের দরিয়ায়!

সেদিন হতে   আজিও চলি ভাসি
লক্ষ্যহারা   এ জীবনের পথে;
এ জীবনের   নানান্ দিক্,   নানা স্বপন-সখী,
সব ভুলিয়া   একটী দিকে   রাখিয়া আঁখি ঠিক;
সেই দিকেরে   বাঁচাতে গিয়ে   হারানু মোরা সব!

তাইত আজ   মোদের যুগে,   জীবন ধারণের,
দিন যাপন   ব্যাধি এ যুগে   আর কিছুই নয়,
এই যুগের   ভাগ্যাকাশ   মৌন নিশীথ রাত;
তারার দিঠি   এড়ায়ে চলে   মৌন রাতের রথ,
চাহিয়া দেখ   নিশীথ রাত্রি কাঁপে!

রাত্রিশেষে   ডাকিনু তোমা   ওঠ লো প্রিয়া ওঠ,
কাঁপিয়া ওঠে   মৌন নিশীথ রাত,
কাঁপিছে তারা   কাঁপিছে শশী   কাঁপিছে নীহারিকা,
ফুরায়ে গিছে   আলোর সমারোহ;
পরিক্রমায়   তরল লাজ,   লেলিহ হয়ে ওঠে,
আঁধারে বল   কাঁপিছে রাত—উষার কত দেরী।

কাটা-ছেঁড়া টুক্‌টাক্ এই মোর কর্ম।
তালি মেরে জুড়ে দিই এই মোর ধর্ম ॥



ছাগলের ব্যা-ব্যা হংসের প্যাঁক্-প্যাঁক্ ।
দুই-এ মিলি ছাগ-হাঁস, অদ্ভুত জীব এক ॥

কার্য্যনিয়োগের নূতন ক্ষেত্র



......বেকার-সমস্যার সমাধান প্রসঙ্গে আমরা বিস্তৃততর নীতি ও কর্ম-পদ্ধতির কথাই ভাবিয়া থাকি। ইহার মূল কথা হইল, দেশের কর্মক্ষম অধিবাসীদের জীবিকা অর্জনের এবং কার্য্যে নিয়োগের নূতনতর ক্ষেত্র সৃষ্টি করা......

— আনন্দবাজার পত্রিকা (সম্পাদকীয় সন্দর্ভ) ঃ

অসলোর স্মৃতি

—শ্রীমতিলাল দাশ

নভেম্বরের শীতে অসলো যাব না ভেবেছিলাম, বন্ধুবর চক্রবর্ত্তী বললেন, "না অসলো ও ষ্টকহলম দেখে যাবেন।" কি সুন্দর সহর, আর তার উপর লোকগুলি কি অমায়িক ও মধুর! বন্ধু সত্য কথাই বলেছিলেন।

চির-সূর্য্যের দেশ নরওয়ে, শীতে চির-তুষারের দেশ। নরওয়ের বনভূমি—তার শৈল-শিখর, তার জলাশয়, তার শ্যামল দেশকে প্রকৃতির লীলা-নিকেতন করে তুলেছে।

অসলোর সাথে পরিচয় হল রাত্রির আলোকোজ্জ্বল সজ্জায়—তার পথে পথে দীপমালা, তার সচল জনস্রোত, বৈচিত্র্য নাই হয়ত, কিন্তু এর হোটেলে পেলাম সত্যকার আতিথ্য।

টেবিলে জিনিষ সাজানো রয়েছে—তোমার যা খুসী নাও। মদের বদলে আসল দুধের গেলাস, এটা খৃষ্টানী আড্ডা—তবু এর নূতনত্ব মুগ্ধ করে।

সকালে উঠে পেলাম প্রাতরাশ—স্বেচ্ছা-ভোজন। তারপর ব্যাঙ্কে টাকা ভাঙ্গানোর উদ্দেশে বার হলাম বেলা নয়টায়। কিন্তু, এদের দেশে দশটার আগে কাজ চলে না আফিসে। তাই সহরের উপর এক চক্র দিয়ে ফিরলাম ওয়াই. এম. সি. এ. (Y. M. C. A.)-র সম্পাদকের সঙ্গে মোলাকাৎ করতে।

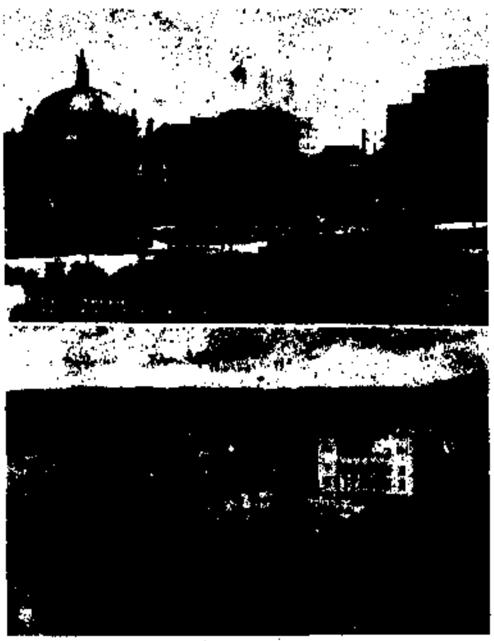
তরুণ যুবা স্যাণ্ডলুসেন বললেন, "দুঃখিত, কিন্তু আমি ভারি ব্যস্ত—আমার হাতে নানা কাজ।"

হোটেল থেকে টাকা ভাঙ্গিয়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চললাম। তিনি সমস্ত দেখিয়ে দিলেন।

অসলোর সকলের চেয়ে বড় রাস্তা—কার্ল য়োহানস্-গাটে—শেষ হয়েছে এসে রাজপ্রাসাদে। বাইরে থেকে রাজপ্রাসাদের মাঝে কোনও কারুকলা নেই। সামান্য বাড়ী, একটু উঁচু পাহাড়ের মত স্থানে ত্রিতল প্রাসাদ—চারিদিকে চলেছে পথ। একটা পার্ক গড়ে উঠেছে প্রাসাদের চারিদিকে, এই পথ দিয়ে লোক চলছে নিঃশঙ্ক।

আমাদের পথে প্রথমে পড়ল এখানকার বিশ্ব-বিদ্যালয়, তার সম্মুখে এখানকার জাতীয় রঙ্গমঞ্চ। সেটা ছাড়িয়ে চোখে পড়ল এখানকার পার্লামেন্ট-গৃহ। বন্ধু এখানকার পি. ই. এন. ক্লাবের সভ্যের ঠিকানা দেখিয়ে বিদায় নিলেন—আমি চললাম এখানকার মর্ণিং-পোষ্ট আফিসে ফিরেল ক্রগস্তিগের সন্ধানে—

ক্রগষ্টিগ আসেন নি—খানিক বসতে হল। অনেক পরে এল তরুণ যুবা, সৌম্যদর্শন। আমায় আফিস-ঘরে নিয়ে আলাপ আরম্ভ করলেন, বললেন, অল্প সময়ের মধ্যে কোনও সভা করার সুযোগ পাব না—তবে আমাদের সভাপতি মিঃ



অসলো: উপরে সহরাভ্যন্তর, নিম্নে বন্দর।

কেন্ট ও আমার সঙ্গে আপনি মধ্যাহ্নে ত্রিষ্টল হোটেলে ভোজন করবেন—তখন আলাপ হবে।

বিগডেগ কলাভবন দেখতে যাব সংকল্প করে প্রভাতে বার হয়েছিলাম, ঐ নিমন্ত্রণ পেয়ে সে আশা ত্যাগ করলাম। তারপর এদের পার্লামেন্ট দেখবার জন্য চেষ্টা করলাম, কিন্তু চারিদিকের দরজা বন্ধ, কাজেই ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে, রাজপ্রাসাদ দেখতে চললাম।

রাজপ্রাসাদ দেখে পার্ক বেয়ে এখানকার শিল্পশালায় সুইডিস চিত্রকলার মেলা দেখলাম। দক্ষিণা লাগল এক ক্রোনার, এক শিলিং প্রায়। নূতন চিত্রকলা, এতে প্রাচীনের বর্ণভঙ্গিমা নেই, আছে বর্ত্তমানের সরল রেখার সমন্বয়ে তৈরী নূতন ধরণের ছবি আর লেপ-চিত্র।

তবে, একটা জিনিষ সর্ব্বত্রই চোখে পড়ছে, নগ্ন নারীর চিত্রের প্রতি সর্ব্বত্রই রূপদক্ষের প্রীতি।

বিবসনা নারী-দেহ কামুকের চিত্তে কাম আনয়ন করে, রসিকের চিত্তে রসধারা বহায়—শিল্পী হয়ত এই কথা বলবেন। মানুষের অঙ্গে অঙ্গে রূপের যে বিলোল মাধুরী, সে মাধুরীতে লজ্জার স্থান নেই, তার মাঝে কলার আনন্দ, আর্টের সুমহান্ প্রকাশ। এ কথা ঠিক মনে ধরে না, এই উলঙ্গ নারী-চিত্র দেখে আমার মনে এই সব জাগে নি, আমার হয়ত শিল্পীর দেবচক্ষু নেই, আমার হয়ত রসিকের রসসাধনা নেই।

আমার মনে হয়, কাম মানুষের আদি বাসনা। কাব্যে, শিল্পে ও সাহিত্যে তাই মানুষ কামনাকে প্রকাশ করে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। সে দেয় এর বড় বড় নাম—রস, কলা, আনন্দ। যতই বড় নাম দেই না কেন, আদপে আমাদের পশুমনের আদিম লালসা—এই নগ্ন শিল্পকল্পনায় ওতঃপ্রোত।

এই সৃষ্টিকে বড় বলায়, মহৎ বলায় মানুষের প্রতি অবিচার হয়। তবে, য়ুরোপের কথা স্বতন্ত্র। এ দেশে সমাজের সুর বদলে চলেছে। পশুর উচ্ছৃঙ্খল জীবনকে এরা আর ঘৃণার চোখে দেখে না, এদের মনীষী ও পণ্ডিতেরা বলছেন, নর-নারীর মিলন-লালসা স্বাভাবিক, তার চরিতার্থতায় পাপও নেই, পুণ্যও নেই। ওটা স্বাভাবিক, ওটা স্বভাবের ডাক, যে যখন সে ডাকে সাড়া দিক্, সে সাড়া তার স্বভাবানুসরণ, তাতে লজ্জা নেই।

এই নবতন্ত্র য়ুরোপের সমাজ-জীবনে বিপ্লব তুলেছে। এ দেশের পুরুষ ও নারী যথেচ্ছ বিহারকে আর ঘৃণার চোখে দেখছে না। অবশ্য, এটা ঘরে ঘরে নয়, তবে এই ভাবের বন্যা খুব জোরে চলছে।

ওখান থেকে ফিরে ছুটো কলাভবনে গেলাম। ছুটোয়ই দ্বার বন্ধ। সেখান থেকে ষ্টেশনে গিয়ে ষ্টকহলমের গাড়ীর খবর নিলাম, তারপর ব্যাঙ্কে গিয়ে কিছু টাকা ভাঙ্গালাম, তারপর পোষ্টাফিসে গিয়ে চিঠি লিখলাম।

সেখান থেকে এদের সৈন্য-বিভাগের দিকে গিয়ে এদের পুরাতন প্রাসাদ আকেরহাস দুর্গ দূর থেকে দেখে কিছু ছবি কিনলাম।

তারপর ব্রিষ্টল হোটেলে আসা গেল। দেখি বন্ধুবর মিঃ ক্রেগহিগ আগেই এসে রয়েছেন।

ঠিক দেড়টায় এলেন সভাপতি মিঃ কেণ্ট।

আহারের আদেশ দিয়ে আলাপ আরম্ভ হল।

কেণ্ট জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার য়ুরোপের অভিজ্ঞতা কি হল?"

আমি বললাম, "এক কথায় বলা দায়, যাযাবর পথিক বাইরের ছবি দেখে, ভিতরকে সে দেখতে পায় না। তবে, য়ুরোপের চারিদিকে একটা বৃহৎ নৈরাশ্য দেখতে পেয়েছি। য়ুরোপে এসেছিলাম তীর্থযাত্রী—য়ুরোপের সংঘশক্তি, য়ুরোপের কর্ম্মোদ্যম, এ আমার ভাল লেগেছে, কিন্তু আমার মনে ছাপ দিতে পারে, এমন আশার বাণী এখানে কোথাও পাই নি।"

কেণ্ট বললেন, "তা ঠিক, ধর্ম্মের একটা নূতন জাগরণ আরম্ভ হয়েছে। ধর্ম্মের ভিত্তিতে ছাড়া জীবনের শান্তি মেলে না। চারিদিকে লোকে নিরাশ্রয় বেদনায় মুষড়ে পড়েছে, ওরা আশ্রয়ের ভিখারী, সে আশ্রয় ওরা কোথাও পাচ্ছে না। হয়ত আলো আসবে, কিন্তু কবে, কোথায় তা জানি নে।"

আমি বললাম, "আপনি কি এই শুভক্ষণের প্রতীক্ষা করছেন?"

কেণ্ট বললেন, "আশা ত করি—কিন্তু—"

বুঝলাম, আশার আলো তাঁর প্রাণের মর্ম্মস্থলের কথা নয়। তিনি বললেন, "য়ুরোপ হয়ত দুঃখের মাঝ দিয়ে, ঝঞ্ঝার মাঝ দিয়ে নিজেকে ফিরে পাবে, কিন্তু ভবিষ্যতের কথা কেউ জানে না।"

আমি বললাম, "তা ঠিক, কিন্তু এই ভবিষ্যৎকে নিয়েই ত আমাদের জল্পনা-কল্পনা। এইচ. জি. ওয়েলস তাঁর সমগ্র লেখায় এই ভাবী যুগের স্বপ্ন দেখেছেন, তাঁর নূতন বই The Anatomy of Frustration কি পড়েছেন?"

কেণ্ট বললেন, "না।"

আমি বললাম, "এটায় তিনি বলেছেন যে, জগৎকে দিতে

হবে নূতন শিক্ষা—নূতন আলো, কিন্তু আমার মনে হয়, শুধু বুদ্ধির দীপশিখায় আমরা পথ চলতে পারব না। আমাদের চাই প্রেরণা—শুভ বুদ্ধির—"

কেণ্ট বললেন, "তা ঠিক, এমন কিছু চাই যা আমাদের willকে চালাতে পারে—আমাদের higher willকে। তার জন্য চাই নূতন বাণী, নূতন প্রেরণা। মানুষ পুরাতনের স্বপ্ন ভুলতে পারছে না···একটা নূতন revival চাই—"

আমি প্রশ্ন করলাম, নরওয়ের সমাজ-জীবনে কি বিপ্লবের সাড়া জেগেছে? উন্মাদ আত্মহত্যার বাণী, প্রমত্ত ভোগ-বাসনা কাজ করছে?"

কেণ্ট বললেন, "না, আমরা না কি একটু দূরে, একটু কোণে—য়ুরোপের তাণ্ডব-লীলা আমাদের সমাজে পুরাপুরি নেই; তবে আছে আমাদের মাঝে—অল্প অল্প secularization of life, সেটার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া মুস্কিল।"

আমি বললাম, "অথচ আশ্চর্য্য, আপনাদের ইবসেনের নোরার মুখেই জেগেছিল বিদ্রোহের প্রথম বাণী, যে বাণী আজ আগুন হয়ে ঘর-দোর পোড়াতে আরম্ভ করেছে।"

কেণ্ট হাসলেন। হোটেলের পরিচারক আনল কড মাছের মাথা। কেণ্ট বললেন, "আর গল্প নয়, কড মাছ খাওয়া একটা ritual, একটা তপস্যা—ওতে এখন দিতে হবে মন।"

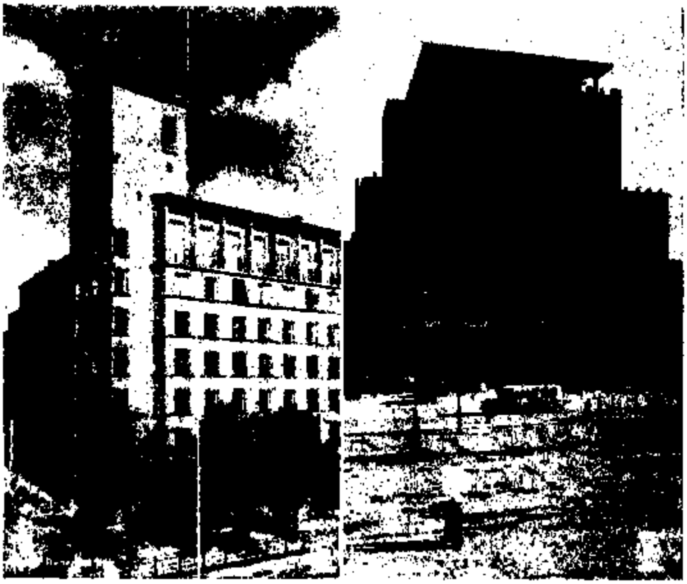
খাওয়া চলল, খাওয়ার ব্যবস্থা সুন্দর।—তবে, এর দামও অনেক, আমাদের মত গরীবের পক্ষে এই সমস্ত দামী হোটেলে যাওয়া শোভা পায় না।

কেণ্ট বললেন, "আপনার কোনও লেখা ইংরেজীতে থাকলে দেবেন—পড়ব।" সাথে ছিল রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধের ছাপানো প্রতিলিপি, তারই দুটো দুই বন্ধুকে পরে দিয়ে মান রক্ষা করেছিলাম।

তারপর বললেন, "আপনাকে এখানকার সাহিত্যিকগণের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিতাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় এ-সময়টা বই লেখার মরসুম, সমস্ত লেখকই বই-লেখা নিয়ে ব্যস্ত। নরওয়েতে বই-বিক্রী হয় খ্রীষ্টমাস পার্ব্বণে, এ পার্ব্বণের পণ্যসংগ্রহের আয়োজনে তাই সবাই ব্যস্ত, তবে জন বোয়ারের সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারেন, কিন্তু তিনি থাকেন অনেকটা দূরে, ক্নুট হামসুনও তাই, আর তা ছাড়া হামসুন সহসা কারও সাথে দেখা করতে চান না।"

আমি বললাম, "আমার সময় অল্প—বাইরে যাওয়ার সুযোগ জুটবে না।"

মাদাম ওয়াডিয়ার কথা উঠল, আমি বললাম, "উনি ফরাসী মেয়ে।" কেণ্ট এ বিষয়টা জানতে পারেন নি। মাদাম



অট্টালিকা, রেস্তরাঁ।

এমন ভাবে ভারতীয় হয়ে গেছেন যে, সহসা ওঁকে য়ুরোপীয়েরা আপন স্বজন বলে মনে করে না। বললেন, "আর্জ্জেণ্টাইনে ডক্টর নাগ ও মাদাম ওয়াডিয়ার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তবে মাদাম ওয়াডিয়ার সময় ছিল না বেশী, ও-দেশের অটোগ্রাফ-লিপিয়েরা তাঁকে পেয়ে বসেছিল।

কেণ্ট আহারান্তে বিদায় নিলেন। সত্যই এঁর ভিতর ছিল আন্তরিক সৌজন্য। এত স্বল্প পরিচয়ে একজন বিদেশীকে এমন আপ্যায়ন দুর্ল্লভ। মিঃ ক্রগভিগ আমার সঙ্গে হোটেলে এলেন, এখানকার লাইব্রেরীর অধ্যক্ষের সঙ্গে আলাপের জন্য টেলিফোন করলেন, কিন্তু ভদ্রলোক বেতার-বক্তৃতা তৈরী;

করবার জন্ম ব্যস্ত ছিলেন বলে আলাপের সুযোগ হল না।

খানিক বসে আমরা গেলাম এখানকার শিল্পীদের ভোজনালয়ে। এখানে রূপদক্ষেরা মেলামেশা করেন, এর দেওয়ালে রয়েছে Red nose order-এর ছবি। সেটা যে কি ব্যাপার, বন্ধু তাঁর স্বল্প ইংরেজী বিদ্যায় বোঝাতে পারলেন না, তবে, অনুমানে বুঝলাম, সেটা একটা শিল্পি-সংসদ, তারই জ্ঞাপক নানা ছবি কাঠের পটে রয়েছে আঁকা।

চা-পান শেষ হল। মিঃ ক্রগভিগ তাঁর স্ত্রীকে ফোন করে আসতে বললেন। মিসেস্ ক্রগভিগ, নামটি তাঁর মজার, 'আরসুলা'—এলেন, যোল-সতের বছরের মেয়ে, হাস্যমুখী, চঞ্চলা, এসেই হস্ত-মর্দন করে বললেন, "নমস্কার, কেমন আছেন? এই আমার প্রথম ভারতীয়ের সঙ্গে আলাপ।"

তারপর কথা চলল নানা বিষয়ে— ভারতীয় মেয়েদের কথা উঠল।

আরসুলা যখন শুনলেন যে, আমি আমার বিয়ের আগে আমার স্ত্রীকে দেখি নি, তখন অবাক্ হয়ে গেলেন। বললেন, "তা কি করে হয়?"

আমি বললাম, "বিয়েটাকে আমরা চুক্তি বলে দেখি না, ওটাকে দেখি ধর্ম্মের অঙ্গ বলে। জীবনে ঈপ্সিতকে পাওয়া ভার, তাই যাকে পাই, তাকেই সহজ ভাবে গ্রহণ করে প্রেমের বনিয়াদ আমরা গড়ি।"

এ কথা ওদের অবাক্ করে। আমি বললাম, "তোমাদের দেশে এত যে বিবাহচ্ছেদ হচ্ছে, এ কথা কি জানিয়ে দেয় না যে, তোমরা সুখী নও, তোমাদের কোর্টশিপ জিনিষটা ভুয়ো, ওটা একদিনের ঝড়েই উড়ে যায়?"

আরসুলা বললেন, "না, না, আপনি আমাদের ভুল বুঝবেন না। আমরা পরস্পরের প্রেমে জীবনকে সুখী করতে চেষ্টা করি, কিন্তু যখন দুজনে মিলতে না পারলে, তখন বিবাহচ্ছেদই ভাল।"

আমি বললাম, "বিবাহচ্ছেদকে সহজ করলেই ওটা সহজ হয়ে ওঠে। আমাদের নেই বলে আমরা মানুষের দোষ-ত্রুটিকে ক্ষমা করি, বৈষম্যকে মেনে সাম্যের রাস্তা খুঁজি।"

আরসুলা জিজ্ঞাসা করলেন, তা হলে কি বলতে চান যে, আপনারা সুখী?

"এ কথা বলা মুস্কিল—তবে আমার মনে হয়, আমাদের গৃহধর্ম্মে, আমাদের পারিবারিক জীবনে এখনও মধুরতা আছে, তোমাদের মত অশান্তির অগ্নিজ্বালা নেই, তোমাদের স্বার্থ-পরতার বিবদাহে তোমরা জর্জ্জরিত, কিন্তু আমাদের কুঁড়েঘরে আছে প্রেমের স্বপ্ন—ত্যাগের ছবি, আছে পরস্পরকে ভাল-বাসবার ও ভাল করবার সাধনা।"

দেখেছি, য়ুরোপে ভারতীয় পারিবারিক জীবন জানবার জন্ম অসীম আগ্রহ রয়েছে। ওদের পরিবার ও আমাদের পরিবারে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। যেখানেই আলাপ আমাদের গৃহের সম্বন্ধে হয়েছে, দেখেছি, বুঝিয়ে বলবার পর ওরা আমাদের গৃহ-জীবনের শান্তি ও মাধুর্য্যের অজস্র আন্তরিক প্রশংসা করেছে।

খানিক পরে বললেন, "তুমি মদ খাও না?"

আমি বললাম, "না।"

"কেন? তোমার ধর্ম্মে বারণ রয়েছে?"

আমি বললাম, "রয়েছে, 'মদ্যমপেয়মদেয়ম্'।"

আরসুলা বললেন, "কিন্তু তুমি কি মদ খেতে পার না?"

"পারব না কেন, তবে খাব না। তোমাদের সাথে এই-খানে আমাদের তফাৎ, তোমরা চাইছ নূতন নূতন অভাব গড়তে, তোমাদের পাওয়াটাকে বড় করতে, আমরা চাইছি ছাড়তে, সংসারে ত্যাগ করে করে চলতে। তোমাদের আদর্শ ভোগ—আমাদের ত্যাগ। তোমরা যদি বল তোমরা সুখী, তবে কোনও উত্তর নাই। যদি বল নও, তা হলে প্রাচীর কাছে তোমাদের জানবার অনেক আছে।"

আহার-শেষে আরসুলা ফরাসী ভাষা শিখতে চললেন। বান্ধবী লেখাপড়া জানেন বেশ। এক পুস্তক-প্রকাশকের দোকানে কাজ করেন। জার্ম্মান ভাষা থেকে একখানি বই অনুবাদ করেছেন। বিদায়-বেলায় বললেন, "আপনার আলাপ আমার খুব মিষ্টি লেগেছে। আপনি সন্ধ্যায় কি করবেন?"

আমি বললাম, "এখানকার ঐতিহাসিক কর্ম্ম-ভবনে এক-বার চোখ বুলিয়ে যাব।"

"তা হলে সন্ধ্যায় আমাদের ওখানে চলুন না, বেশ গল্প করা যাবে।"

আমি উত্তর দিলাম, "বেশ, তবে এবার আপনাদের কথা শুনব। আমি অনেক কথা বলেছি, আপনাদের কথা শুনব।"

"না না, আপনি বেশ বলতে পারেন—আপনার কথা শুনব।"

"আমার এক দোষ আছে, কথা উঠলে আমি অনেক বলে চলি, কিন্তু না, আপনি আমায় নীরব করে দেবেন, আপনার মধুর ভাষণে।"

ক্রগস্তিগ ও আমি ঐতিহাসিক কলা-ভবনে চোখ বুলিয়ে নিলাম। ওদের ভাইকিং-জাহাজে চড়ে যে-সব নাবিক সাগরের ভয়াল রূপকে জয় করেছিল, তাদের ডোবা-জাহাজে যে-সব জিনিষ পাওয়া গেছে, তা এনে ওরা জড় করেছে এখানে।

সময় অল্প, ঐতিহাসিক নষ্ট, প্রত্নতত্ত্বের স্পর্শ হৃদয়কে উৎফুল্ল করে না। তবে, অনেকগুলি গহনার সঙ্গে আমাদের অলঙ্কারের সাদৃশ্য দেখে একটু আশ্চর্য্য হলাম।

রাত্রি আটটায় নেমে এলাম লিফ্‌ট বেয়ে। এসেই দেখি, বন্ধু এসেছেন, সঙ্গে তাঁর বন্ধু, জাহাজের কর্ম্মচারী ও মালিক মিঃ ওয়াকার।

ওয়াকার বেশ ইংরেজী বলতে পারেন। খানিক পরেই এলেন বান্ধবী, তারপর চলা গেল ট্যাক্সি করে ওঁদের বাড়ী। অসলোর সহরতলীতে।

এটা ছিল বনভূমি। এক বৎসরের মধ্যেই চারিদিকে গড়ে উঠেছে সুন্দর সুন্দর বাড়ী। এখানে এ দেশের মজুরেরা সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করে। এর বাড়বার গতির দিকে লক্ষ্য করে ওরা হাসতে হাসতে বলল, "এটাকে বলি আমরা আমেরিকান সহর।"

কথা উঠল ভারতের দারিদ্র্যের। আমি বললাম, "ভারত-বর্ষের লোক বোধ হয় জগতের সব চেয়ে দরিদ্র। আমাদের গড়পড়তা আয় বোধ হয় এক ক্রোণও হবে না।" শুনে ওরা বিস্মিত হল।

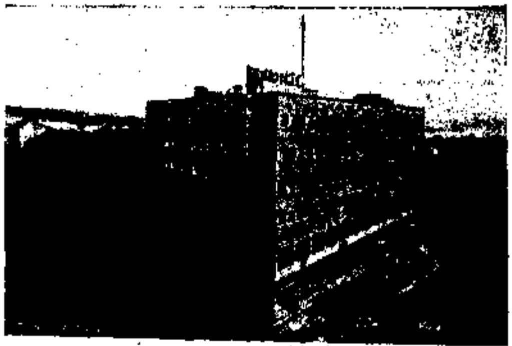
ওয়াকার বললেন, "এখানে মজুরেরা মাসে পায় তিন শ ক্রোণ, অর্থাৎ প্রায় ২০০৲ টাকা।"

আমি বললাম, "ভাগ্যবান্ জন কয়েক মাত্র আমাদের দেশে এত আয় করে।"

আরসুলা বললেন, "আমাদের জীবন-ধারণ ভিন্ন, এ দেখে তুমি ত ব্যথিত হবে না ?"

আমি উত্তর দিলাম, "না, বৈচিত্র্যকে আমরা ভালবাসি, তাকে অবজ্ঞা করি না। জগতে মানুষে মানুষে বিভিন্নতা আছে ও থাকবে, তাকে বুঝতে চেষ্টা করাই শ্রেয়ঃ।"

আরসুলা তার ঘরকন্না সব দেখালেন। চঞ্চলা, চপলা







অসলো : (১) উদ্যান ; (২) চৌরাস্তা ; হাল-স্থাপত্যের বাড়ী।

হরিণী। আমরা বসলাম, আরসুলা গেলেন আহারের আয়োজনে।

কথা উঠল আর্টের। ক্রগস্তিগ তাঁর পুস্তকাগার থেকে নরওয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর মামকোর সম্বন্ধে একখানি বই বার করলেন।

আমি বললাম, "এই যে নগ্নতার প্রতি প্রীতি, এর কারণ কি ?"

ওয়াকার বললেন, "ওটা বেড়ে চলেছে আমাদের দেশে। মেয়েরা অর্দ্ধনগ্ন হয়ে নাচে, এটা বোধ হয় আপনার কাছে shocking ?"

আমি বললাম, "তা ঠিক। গ্রীক্‌দের নগ্ন ভাস্কর্য্য দেখেছি, সে শ্রদ্ধা জাগায়। বর্ত্তমানের উলঙ্গতা জাগায় উদ্দাম কাম।"

মিসেস্ ক্রগভিগ বল্‌লেন, "এটা বদ্‌লে গেছে ফ্রয়েডের আবিষ্কারের পরে।"

আমি বললাম, "ফ্রয়েডের বাণী সত্য নয়। কাম মানুষের আদিমতম বৃত্তি, কিন্তু এটাই সব নয়।"

ওয়াকার বল্‌লেন, "কিন্তু য়ুরোপে এই কামায়ন রচনা হচ্ছে।"

আমি বল্‌লাম, "এটা কি ভাল ? শিল্প নেবে রসলোক।"

ক্রগভিগ বললেন, "না, এটা আপনার ঠিক নয়, শিল্প হবে জীবনের প্রতিলিপি। সে দেখাবে জীবনের সত্য ছবি।"

আমি বললাম, "শেখা বুলি না বলে অন্তরে জিজ্ঞাসা করুন, আর্ট ফটোগ্রাফি নয়, জীবনকে হুবহু নকল করলে সেটা শিল্প হয়ে ওঠে না, কবি ও শিল্পী দেন আর্টে এমন রসাবেগ, এমন একটা আলো, যা তাকে সাধারণতার পঙ্কিলতা থেকে তুলে নেয় আনন্দের অমরলোকে।"

ওয়াকার বললেন, "এখানকার সাহিত্য over-sexed, কিন্তু তবু তার ভিতর আমরা পাই আলো, আমরা পাই রসবোধ।"

"এ কথার উত্তর নেই, আমার ধারণা অন্যরূপ। শিল্প মানুষকে রসের আনন্দে সঞ্জীবিত করে, বর্ত্তমানের রিংরসার সাহিত্য মানুষকে পঙ্কিল করছে।"

আহার আরম্ভ হল। রুটি, জ্যাম, হেরিং মাছ, ডিম, মাংস, মাখন, চা। আমি মাংস খাই না, অন্ন খাই, তাই নিয়ে আরস্থলা বিদ্রূপ করলেন।

আমি বললাম, "আমাদের দেশে মাংস খাওয়া প্রয়োজন হয় না।"

ওয়াকার বললেন, "কিন্তু আমাদের এই ঠাণ্ডা দেশে শরীরকে গরম রাখতে হলে অনেকটা লার্ড খাওয়া দরকার।"

আরস্থলা জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কটা বিয়ে করতে পার ?"

আমি বললাম, "ইচ্ছামত, কোনই বাধা নেই আইনে। তবে কার্য্যতঃ একেরই শাসনে পিষ্ট হই।"

"তোমাদের মেয়েরা কি অধীনা নয় ?"

আমি বললাম, "না, আমরা সাধারণতঃ কাজের করেছি ভাগ, মেয়েদের রাজত্ব অন্তঃপুরে, পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্র বাহিরে, এটা ভাল কি মন্দ, সে কথা স্বতন্ত্র, তবে নারী আমাদের দেশে পান শ্রদ্ধা, ও সম্মান।"

আরস্থলা বললেন, "কিন্তু মেয়েরাও কি যতগুলি ইচ্ছা বিয়ে করতে পারেন ?"

আমি বললাম, "নারী মাতা, তাই তাঁর সংযমের প্রয়োজন, আমাদের সতীত্বের ধারণা ভিন্ন, কায়মনোবাক্যে থাকতে হবে সতী।"

আরস্থলা বললেন, "এ সম্ভব নয়।"

আমি বললাম, "এ সম্ভব হয়েছে আমাদের দেশে। আমাদের দেশে সতীর আদর্শ যুগ-যুগান্তর ধরে মানুষের মাঝে প্রচার করে এটা আমাদের কাছে পরীক্ষিত সত্য হয়েছে।"

আরস্থলা বললেন, "নারী ও পুরুষের থাকবে অবাধ স্বাধীনতা।"

আমি বললাম, "ভোগের ও উদ্দাম লালসার ?"

"তাতে ক্ষতি কি ?"

"ক্ষতি কিছুই নাই। তা হলে পশু ও মানুষে তফাৎ থাকে না। যথেচ্ছ বিহার পশুর, মানুষের নয়। সে দিন একটা বইয়ে পড়ছিলাম যে, এ দেশে একটিও কুমারী বিয়ের মন্ত্র পড়ে না।"

ওয়াকার বললেন, "এ কথা সর্ব্বৈব সত্য নয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্য। তা ছাড়া বাগদানের পুরে এরা থাকে স্বামী ও স্ত্রীর মত।"

আমি বললাম, "সে কথা বলছি না। আমি বলছি আদর্শের কথা, আজকাল এক দল নর ও নারী বলছেন, ভোগ-পিপাসা স্বাভাবিক। স্বেচ্ছামত তার নিবৃত্তি নির্দ্দোষ, এটা আমি বুঝতে পারি না।"

আরস্থলা বললেন, "কিন্তু এই খানেই আমাদের তফাৎ,

আমি বলছি, এতে দোষের কিছু নেই, সতী হয়ে থাকা দুষ্কর নয়, তার প্রয়োজনও নেই।"

"তা হলে তর্ক বৃথা, এ দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন মতবাদ, এর কোথাও মিল হতে পারে না। আমার মনে হয়, এই কল্পনাই সব চেয়ে আমার মনে আঘাত দেয় যে, পবিত্রতা ও শুদ্ধির আদর্শ তোমাদের মন থেকে চলে যাচ্ছে কি করে।"

আরসুলা হাসতে হাসতে বললে, "ফ্রয়েডের পরে এ পরিবর্ত্তন হয়েছে।"

আমি বললাম, "তা হয়ত হবে, কিন্তু তোমরা চলেছ বন্যার বেগে, এ পথ জীবনের নয়, এ পথ মৃত্যুর।"

ফিরবার পথে ওয়াকার বললেন, "আমাদের জীবনে এই উচ্ছৃঙ্খলতা এসেছে, এটা সাময়িক, মনুষ্য আবার ফিরে যাবে, সংযম ও সাধুতার পথে। এ আশা সফল হোক।"

তারপর বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের কথা উঠল, আমি বললাম, "এই পর্য্যটনে আমার মনে হচ্ছে যে, দেশে দেশে দিনে দিনে যে বিরোধের ভাব, সেটা ঘুচে যাচ্ছে; জাগছে একটা মৈত্রীর কল্পনা, ভ্রাতৃত্বের স্বপ্ন।"

আরসুলা বললেন, "এ আমার মনে হয় না। স্বাদেশিকতা ও বিশ্ব-প্রেমিকতা এ হল তরঙ্গদোলায় আবর্ত্তনের মত, একটার পর আর একটা আসে।"

আমি বললাম, "এ কথা কি ঠিক? অতীতে বিশ্বপ্রেমের অস্তিত্ব ছিল না, বিশ্বভ্রাতৃত্ব বর্ত্তমানের বাণী, এটা সফল হবে কি বিফল হবে, সে কথা নিয়ে বাদানুবাদ চলে, কিন্তু এটা একেবারে নূতন আদর্শ!"

বিদায় নেওয়ার পালা আসল, আরসুলা বললেন, "আমি যাব ভারতবর্ষে।"

আমি বললাম, "বেশ, আমার গরীব কুটীরে রইল আপনার নিমন্ত্রণ; বড় বড় হোটেলে বাস করলে একটা জাতিকে চেনা যায় না, প্রাচী ও প্রতীচীর মধ্যে রয়েছে অনেক আড়াল, কিন্তু সেটাকে জানা ও চেনা উভয়ের পক্ষেই ভাল।"

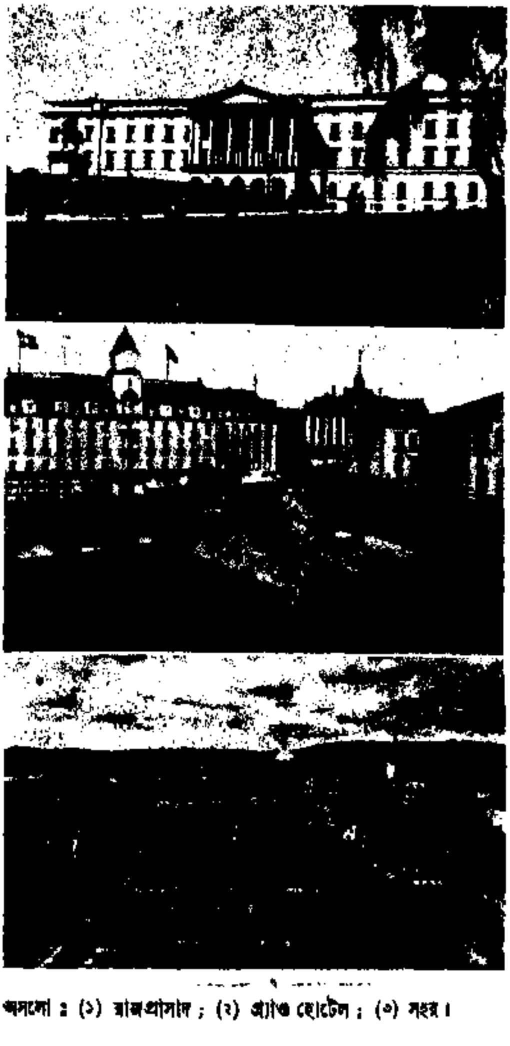
করমর্দ্দন করে বললাম, "আজকের এই স্মৃতি রবে চিরদীপ্ত হয়ে, আজ পেলাম যে স্নেহের স্পর্শ সে হবে আমার সুখের স্বপ্ন।"

রাস্তায় বেরিয়ে দেখি, ওরা জানালা দিয়ে টুপি নাড়ছে।

ওয়াকার ও আমি অটোবাস করে সহরে ফিরলাম।

ওয়াকার বললেন, "চলুন আমার সঙ্গে উত্তর-নরওয়ে দেখবেন।"

আমি বললাম, "আমি পড়ে গেছি বাঁধা আমার প্রোগ্রামের মাঝে, আমার ত সময় নেই বন্ধু!"



অসলো: (১) রাজপ্রাসাদ; (২) গ্র্যাণ্ড হোটেল; (৩) সহর।

বললাম, "আপনি কি বিয়ে করেছেন?"

ওয়াকার বললে, "না—আমি পড়েছি দোটানায়। আমি নব্য নই। আধুনিকতার এই উন্মাদনা আমি মানি নে, আবার অতীতের স্নিগ্ধ সরলতাকে গ্রহণ করতে পারি নে; কাজেই আমি রয়ে যাব একক।"

রাত হয়ে ছিল বারটা, হোটেলে ফিরে ঘুমিয়ে পড়া গেল, কিন্তু ঘুম আসে না সহসা।

তন্দ্রাতুর চোখে জাগে এই তন্বী তরুণীর ভাবধারা, এর লাবণীল জীবনের মাধুর্য্য আমার মুগ্ধ করেছিল। এর রয়েছে কর্ম্মবিপুল উদ্যম, কিন্তু তবু এর নূতন আড়ষ্টতাহীন অভিবান এ আমার মনে হয় অসহ।

কিন্তু, আমার মনে হল, মানুষ তার পরিবেশের দাস, য়ুরোপের আবহাওয়ায় ছড়িয়ে রয়েছে যে বিষবাষ্প, আরমুলা তারই উদ্গীরণ করছিলেন।

এদের সুমধুর দাম্পত্য জীবন, সেটা সুন্দর। বিকালে কাফেতে আরমুলা তার স্বামীকে বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, "তা হলে এখন থেকে আমরা হব হিন্দু—কি বল? তুমি কিন্তু পারবে না?" এই ছবিটাই মনে আসছিল।

পরদিন সকালে বিদায় নিলাম, রাতের গাড়ীতে ষ্টকহলম যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু তা হলে নরওয়ে ও সুইডেনের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা হবে না বলে দিনেই রওনা হলাম।

বেলা ১০টা ৩৫ মিনিটে ট্রেণ। তুষার-কণায় প্লাটফর্ম ছাওয়া, গাড়ী চলল, চারিদিকে কি সুন্দর দৃশ্য! তুষারের হিমস্পর্শে ধরণী পরেছে রূপালী আবরণ। নূতন, অপূর্ব্ব, অনবদ্য।

অষ্টমূর্ত্তি

—শ্রীমণীন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ

সৃজনের আদিভোরে বিকশিত সৃষ্টির কমল,
রূপোচ্ছ্বাস করে টলমল॥
রত্নাসনে মূর্ত্তিমতী ভূত-ধাত্রী হলে অধিষ্ঠান।
নয়ন-তরঙ্গে রঙ্গে ফুটে উঠে সৃষ্টির সন্ধান॥
আদিমূর্ত্তি ক্ষিতিরূপা দিক্‌পাল চারিদিকে ঘিরে।
বদ্ধাঞ্জলি রহে নতশিরে॥

সুশ্যামল স্নিগ্ধ করে প্রকৃতির অঙ্গ বুলাইতে।
দেখা দিলে তুমি অসংবৃতে॥
কৃষ্ণ-কাদম্বিনী কেশে সর্ব্বদিক্ উঠিল আবরি।
ধরণীর বক্ষ ছেয়ে শ্যামলিমা পড়ে ঝ র ঝরি॥
জলময়ী ছায়া-মূর্ত্তি মহাশূন্যে উঠিল নাচিয়া।
সারা সৃষ্টি উঠে শিহরিয়া॥

বিশ্বনাশী প্রলয়ের রুদ্র-রোষে বাজিল বিষাণ।
দাউ দাউ জ্বলিল শ্মশান॥
লকমুখী শতশিখা নিখিলের ঝলসি নয়ন।
দাহে দাহে ধরণীর হাহাকারে উঠে আবর্ত্তন॥
অগ্নিময়ী মূর্ত্তি হাসে বিশ্বব্যাপী দহনের খেলা।
নিঃশেষিত সৃজনের মেলা॥

মহাশূন্য আলোড়িয়া যবে তুমি করিলে নর্ত্তন।
বজ্রবাহু করি উত্তোলন॥
শিহরিল ধরাধর চরাচর ভয়ে কম্পমান।
ঈশানের জটাজাল উড়াইল পিঙ্গল নিশান॥
উগ্রমূর্ত্তি বায়ুরূপা করালিনী এ কি ভয়ঙ্করী।
ডেকে আনে মরণ-শর্ব্বরী॥

অতীতের সাক্ষিরূপে অপরূপ সুনীল সুন্দর।
অনাদির আদি কলেবর॥
স্বরগ মরত দুই সুস্পষ্টরূপে করি ব্যবধান।
টেনে দিলে যবনিকা-উত্তরীয় নীল বস্ত্রখান॥
বৈরাগী গভীরা কারা নিত্যস্থিরা আকাশ-মূরতি।
ঊর্দ্ধ-আঁখি ধরা করে নতি॥

বসন্তের অবসানে হে তাপস কর তুমি যাগ।
তীব্রানল জ্বালি পুরোভাগ॥
আচ্ছাদিল বরবপু ধূম্রাচ্ছন্ন গৈরিক বসন।
চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে ধূমজাল আবরে গগন॥
মার্ত্তণ্ড ময়ূখদীপ্ত যজমান মূরতি তোমার।
হুতাশন জ্বলে অনিবার॥

সুধা লাগি সুরাসুর ক্ষীরোদধি করিল মন্থন।
অকস্মাৎ তব জাগরণ॥
রূপের আলোকে ধৌত ধরাতল সুধায় ধবল।
পাষাণের বুক চিরে নর্ম্মধারা বহে কল কল॥
প্রেমের আকর তুমি, সোমমূর্ত্তি সুধার আধার।
নয়নের প্রীতি পারাবার॥

মহোল্লাসে উল্লসিয়া রক্তঢেউ ভেসে ভেসে আসে।
পূর্ব্বাশায় ম্লানমুখ হাসে॥
কম্পিত ধরায় পানে চেয়ে বিধি উঠিল চমকি।
যবে তব স্বর্গ রথ দিগচক্রে দাঁড়াল থমকি॥
তপন মূরতি তব নিবারিল আদি অন্ধকার।
পরকাশি রূপ দেবতার॥*

---

* শিবের অষ্ট মূর্ত্তি—ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র ও যজমান (মতান্তরে—পঞ্চভূত, চন্দ্র, সূর্য্য এবং অগ্নি)।

নোয়াখালীর জলপথ ও স্থলপথ

শ্রীভারতচন্দ্র মজুমদার

নদীপথ ও তীর-ভূমি

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, নোয়াখালীর চর, দ্বীপ ও উপকূল ভূভাগীয় অঞ্চল প্রতি বৎসর নদী-সংঘাতে রূপান্তরিত হয়।* বর্ত্তমান ম্যাপ অনুযায়ী নোয়াখালীর যে রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাচীন কালে যে এই রূপ ছিল না, উহা নিঃসন্দেহে ধরা যাইতে পারে।

রেনাল (Rennell) সাহেবের ম্যাপ অনুযায়ী ১৮৮০-৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নদী ও দ্বীপগুলির যে অবস্থা ছিল, তাহার সহিত ওয়াল্টার (Walter) সাহেবের ম্যাপ তুলনা করিয়া ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের অবস্থা ও রেভিনিউ সার্ভে ম্যাপ অনুসারে ১৮৬২-৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে যে তারতম্য দেখা যায়, মিঃ জে. ই. ওয়েবষ্টার-এর (Mr. J. E. Webstar) তুলনামূলক উক্ত সিদ্ধান্তের সহিত প্রাচীন তথ্যমূলক জনশ্রুতি মিলাইয়া দেখিলে স্পষ্টই অনুমান হয় যে, প্রাচীন কালে সন্দ্বীপ, হাতীয়া ও বামনী অঞ্চল একই দ্বীপসীমা-মধ্যে সংযুক্ত ছিল, অথবা বিভক্ত থাকিলেও উহাদের সীমা মধ্যপথে খুব সরু নালার মত জলধারা প্রবাহিত হইত। লোকবসতি-স্থাপন সম্বন্ধে অনেকের এই ধারণা যে, ঐ সকল দ্বীপ অঞ্চলেই উপকূল-ভূভাগের পূর্ব্বে উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল।

রেনাল সাহেবের ম্যাপ-দৃষ্টে দেখা যায়, মেঘনা নদী লক্ষ্মীপুরের কাছে পড়িয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তৎকালীন কাপড়ের কারখানার নিকট দিয়া ক্রমশঃ নোয়াখালী জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমায় একটু বঙ্কিম গতি ধারণ করিয়াছিল, এবং বর্ত্তমান নোয়াখালীর অবস্থিতি হইতে পাঁচ মাইল দক্ষিণ চাপিয়া প্রবাহিত হইয়া উহা ফেণী নদীর মোহনার কাছে পৌঁছিয়াছিল। তথা হইতে উহা উত্তর দিকে মোড় ফিরিয়া বর্ত্তমান কোম্পানীগঞ্জের দুই মাইল দক্ষিণ দিয়া তৎকালে উহা প্রবাহমান ছিল।

রেনাল সাহেবের ম্যাপে ইদানীন্তন চরগুলির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। হয়ত বা এত বিস্তারিত সন্ধান সংগ্রহের জন্য তিনি অধিক চেষ্টাও করিয়াছিলেন না। হাতীয়াকে তিনি অবিভক্ত দ্বীপ হিসাবেই একই সীমার মধ্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই দ্বীপ অঞ্চলের উত্তর-দক্ষিণে ১৫ মাইল দৈর্ঘ্য ও পূর্ব্ব-পশ্চিমে ১০ মাইল বিস্তার এই পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সন্দ্বীপকে অনেকটা বর্ত্তমান আকারেই পাওয়া যায়, কিন্তু সন্দ্বীপ ও উপকূল-ভূভাগের মধ্যবর্ত্তী নদীগর্ভে তিনি বামনী নদীর অবস্থিতি স্থির করিয়াছিলেন। সেই সময়ও নদী নোয়াখালীর উপকূল-ভূভাগের দিকেই ভাঙ্গিতেছিল এবং সুধারাম সহরের দক্ষিণে চর-দরবেশ তখন সবেমাত্র উৎপন্ন হইতেছিল।

মিঃ ওয়াল্টারের ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ম্যাপ অনুযায়ী মিঃ ওয়েবষ্টার ইহাও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন যে, বামনী দ্বীপের ও উপকূল-ভূভাগের অন্তর্বর্ত্তী স্থান দিয়া অল্প-পরিসর একটি খাল ছিল। এই খালের নাম মেছুয়াদোনা।

তখনকার বামনী দ্বীপের অবস্থিতি পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায়, উহার পূর্ব্ব-দক্ষিণ প্রান্ত চট্টগ্রামের মীরেশ্বরাই-এর নিরক্ষ রেখার নিম্ন ও সীতাকুণ্ডের সামান্য নিম্নস্থলের সহিত সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত ছিল। তখন উপকূল-ভূভাগীয় তীরভূমি বামনী দ্বীপের সীমা হইতে সোজাসুজি পশ্চিম-উত্তর গতিতে নয় মাইল চলিয়া চর-দরবেশের সঙ্গে আসিয়া সংযুক্ত হইয়াছিল। তথা হইতে ভুলুয়ার চর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া তীরভূমির গতি প্রায় সোজা উত্তরমুখী ফিরিয়া লক্ষ্মীপুর পর্য্যন্ত গিয়াছিল। সেই কালে তাহারই নিকটে সবে মাত্র ডাকাতিয়া নদীর মোহনায় চর-শ্যামসুন্দর উৎপন্ন হইতেছিল।

মিঃ ওয়াল্টারের মতে তৎকালেও সন্দ্বীপ একটি আলাদা দ্বীপ ছিল। উহা চট্টগ্রামের উপকূল হইতে ১২ মাইল ও বামনী হইতে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। সন্দ্বীপের দৈর্ঘ্য উত্তরে দক্ষিণে ১৪ মাইল ও বিস্তার পূর্ব্বে পশ্চিমে ১২ মাইল। তখন চর-বস্থ ও চর-সিদ্ধি লোক-বসতির উপযোগী হয় নাই। হাতীয়া দ্বীপ নোয়াখালীর উপকূল-ভূভাগ হইতে পাঁচ মাইল

* মাঘ-সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

মাইল দূরে অবস্থিত ছিল এবং সন্দ্বীপ হইতে উহার দূরত্ব ছিল ষোল মাইল। তাঁহার মতে হাতীয়ার দৈর্ঘ্য ছিল ২০ মাইল এবং প্রস্থ ছিল ১৬ মাইল। সেই সময় হাতীয়া দ্বীপের উত্তর-সীমা নদীতে ভাঙ্গিতেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহার পশ্চিমে ও দক্ষিণে নূতন চরের উৎপত্তি হইতেছিল। এই ভাবে হাতীয়ার পশ্চিমস্থ নদীতে বহু নূতন চরের সৃষ্টি হইল ও উহার অনেকগুলি ক্রমে হাতীয়ার সহিত সংযুক্ত হইয়া গেল এবং কতিপয় দক্ষিণ-সাবাজপুরের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল।

রেভিনিউ সার্ভে আমলের যে বিবরণী আমরা পাইয়া থাকি, তাহাতে দেখিতে পাই, রেনাল সাহেবের সময়ের মেঘ্না নদীর তীরসংলগ্ন লক্ষ্মীপুর হইতে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে নদী তিন মাইল সরিয়া গিয়াছিল এবং চর-ভুলুয়া ভাঙ্গিয়া উপকূলের তীরভূমি ভবানীগঞ্জ খালের মুখ হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে চলিয়া গিয়াছে। তীরভূমির এই টেরচা গতি বরাবর সুধারাম সহরের দক্ষিণ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। তখন নোয়াখালী খালের মুখ পর্য্যন্ত চর-জব্বরের পরিমাণ-ফল প্রায় ১৫ বর্গমাইল বিস্তৃত ছিল।

রেভিনিউ সার্ভে ম্যাপে চর-লরেন্স, শিবনাথ-চর, চর-বসু, চর-জব্বর, চর-পেন, চর-মীর মহাম্মদ আলী, টুম-চর, চর-ম্যাকফারসন, চর-সিদ্ধি ও চর-বকুলী পাওয়া যায় বলিয়া ওয়েবষ্টার সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন।

অপর দিকে ছোট ফেণী কোম্পানীগঞ্জের দুই মাইল পশ্চিম দিক্ দিয়া আসিয়া বামনী চ্যানেলের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে।

১৮২০ খৃষ্টাব্দ হইতে নদীর যে পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইয়াছে, তাহাতে তৎকালে দেখা গিয়াছিল, সুধারাম সহর হইতে নদী তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। অথচ, তখনও নদীর উত্তরমুখী ভাঙ্গনের অবস্থাই ছিল। এই ভাঙ্গনের ফলে নোয়াখালীর দক্ষিণস্থিত নদীগর্ভে অবস্থিত চর-জব্বর, সহরের পক্ষে একটা বিপজ্জনক অভিসম্পাত-স্বরূপ হইয়াছিল, কারণ এই চর মধ্যস্থলে থাকিয়া মেঘ্না নদীর জলপ্রবাহকে দুই দিকে বিভক্ত করিয়া দেওয়াতে চর-জব্বর ও সুধারাম সহরের মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ পথে একটি প্রবল স্রোতোধারাকে প্রবাহিত হইতে হইতেছে, আর অপর একটি স্রোতোধারাকে চর-জব্বর ও উত্তর হাতীয়ার মধ্যবর্ত্তী পথে চলিতে হইতেছে। অতএব, উত্তর ধারাই অধিকতর ভয়ঙ্করী হইয়া একদিকে নোয়াখালী বা সুধারাম সহরকে শোচনীয় ভাবে গ্রাস করিতেছে, অপর দিকে উত্তর-হাতীয়াকে ভাঙ্গিয়া চলিয়াছে।

স্যর জোসেফ হুকার নামক জনৈক নাবিক ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে মেঘ্না নদীতে ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনায় পাওয়া যায়, তিনি দেখিয়াছিলেন, মেঘ্না ক্রমশঃ পশ্চিমে সরিয়া যাইতেছে ও উপকূলের স্থলভাগ বর্দ্ধিত হইতেছে। সুন্দরবনের দিকে নদী অগ্রসর হইয়া তত্রত্য দ্বীপপুঞ্জকে ভাঙ্গিয়া দিতেছিল বলিয়াই উপকূলের বিপরীত দিকে তখন দ্বীপসকল উৎপন্ন হইতেছিল। নোয়াখালীর পশ্চিম প্রান্তস্থিত তীরভূমি তখন ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে নাই। বরং, উত্তরোত্তর ভূখণ্ড সমুদ্র অভিমুখে বর্দ্ধিত হইয়াই চলিয়াছিল। তিনি বলেন, ২০ বৎসরের মধ্যে নোয়াখালীর উপকূল-ভূভাগীর স্থলভাগ সমুদ্রের দিকে চারি মাইল বিস্তারিত হইয়া গিয়াছিল।

চর-সিদ্ধি তখন ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়, কারণ হুকার সাহেব ঐ চরে অবতরণ করিয়া আবার তথা হইতে হাতীয়ার দিকে অভিযান করিয়াছিলেন।

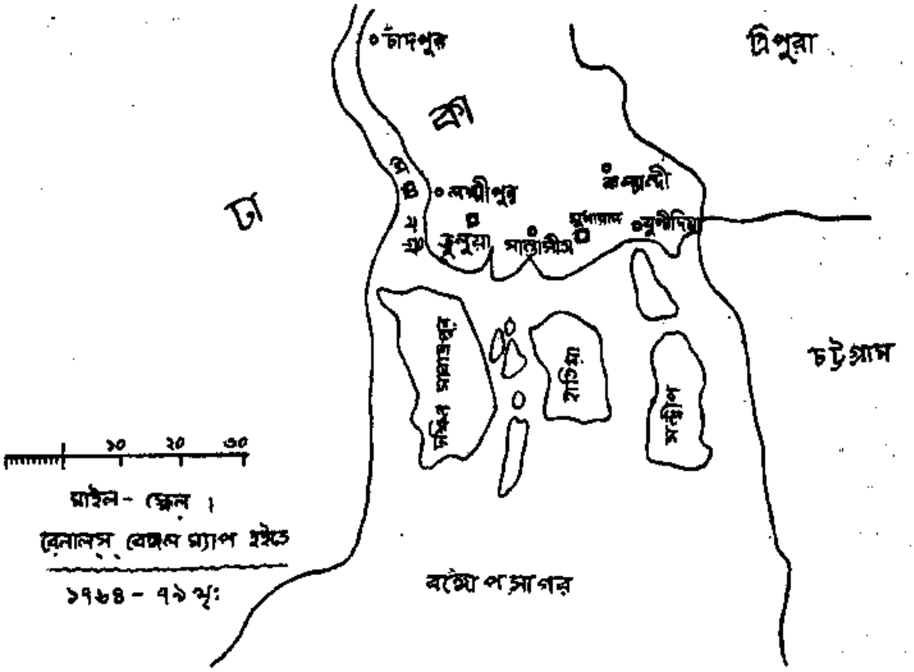
মেঘ্না নদীর সন্নিহিত উপকূল-ভূভাগ ও চরদ্বীপাবলীর পরিবর্ত্তনশীল অবস্থা সম্বন্ধে পরিচয় দেওয়া গেল।

প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান নোয়াখালীর নদী-সন্নিহিত উপকূল অঞ্চলের ও হাতীয়া, সন্দ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপাবলীর আকৃতি কিরূপ ছিল, ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দের রেনাল সাহেবের ম্যাপ অনুযায়ী যাহা অনুমিত হয়, নিম্নে তাহার মোটামুটি পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

তৎকালীন বঙ্গদেশের ম্যাপে দেখা যায়, নোয়াখালী বলিয়া কোন নাম উহাতে পাওয়া যায় না এবং বর্ত্তমান নোয়াখালীর সীমারেখার মতও কোন কিছু উহাতে দৃষ্ট হয় না। ভুলুয়া, কল্যান্দী, অমরাবাদ, দুগীদিয়া, লক্ষ্মীপুর, সুধারাম ও সান্তাসীতা প্রভৃতি বর্ত্তমান নোয়াখালীস্থ স্থানগুলির নাম উহাতে উল্লিখিত আছে। ব্যাপক ভাবে ঢাকা অঞ্চলের সীমামধ্যেই এই সকল নাম পাওয়া যায়। উক্ত ঢাকার চতুঃসীমা-রেখাঙ্কিত অঞ্চলগুলির নাম উল্লেখ করিলেই তৎকালীন ঢাকার বিস্তার সম্বন্ধে ধারণা জন্মিবে। ঐ সীমামধ্যে পড়িয়াছে কুমিল্লা, আগরতলা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রামপুর, সরাইল, মাণিকগঞ্জ, ঢাকা, ভোলা,

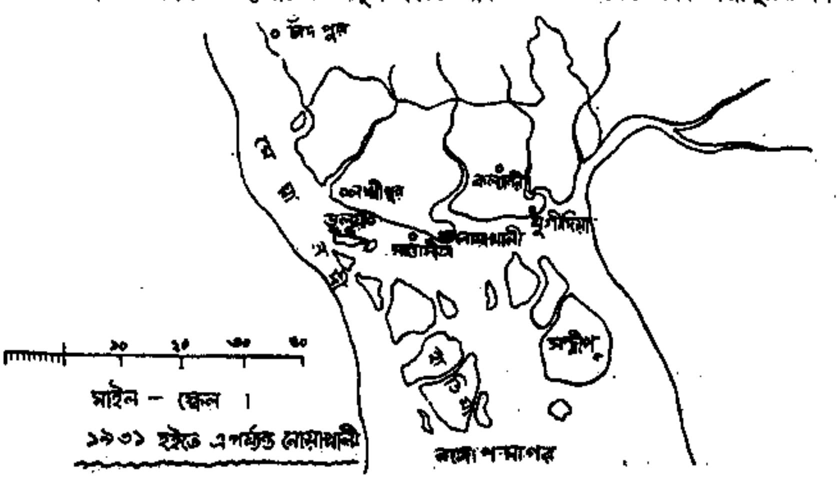
পটুয়াখালী, সাবাজপুর, হাতীয়া, সন্দীপ, নলচিরা, ভাণ্ডারহাট, ফাজিলপুর, ছাগল নাইয়া, চৌদ্দগ্রাম। এই আবেষ্টনীর মধ্যে দেখা যাইতেছে, বর্ত্তমান বঙ্গদেশের ম্যাপ অনুযায়ী ঢাকা জেলার সঙ্গে ত্রিপুরার কতক অংশ, চট্টগ্রামের কতক অংশ, নোয়াখালীর অধিকাংশ ও বরিশালের কিছু অংশ যুক্ত ছিল।

বর্ত্তমান নোয়াখালীর দক্ষিণস্থিত মেঘার দ্বীপ হিসাবে তৎকালীন ম্যাপে বামনী, সন্দীপ ও হাতীয়ার অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। রেনাল সাহেবের ম্যাপ অনুযায়ী তৎকালীন বামনী দ্বীপ দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৭ মাইল ও ৪ মাইল প্রশস্ত ছিল। উহা নোয়াখালীর উপকূল-ভূভাগ হইতে প্রায় ২ মাইল ও চট্টগ্রামের উপকূল হইতে প্রায় ১০ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। সন্দীপ বামনী হইতে প্রায় দুই মাইল ও চট্টগ্রাম হইতে ১০ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল।



উহার দৈর্ঘ্য প্রায় ২১ মাইল ও প্রস্থ প্রায় ১১ মাইল। সন্দীপ হইতে প্রায় ৭ মাইল, বামনী হইতে প্রায় ১২ মাইল দূরে ও সুধারামের উপকূল হইতে প্রায় ৮ মাইল দক্ষিণে দৈর্ঘ্যে ১৫ মাইল ও ১০ মাইল বিস্তৃত ভূ-ভাগ লইয়া হাতীয়া দ্বীপ অবস্থিত ছিল।

সেই সময় লক্ষ্মীপুরের নিকটে নদী যে অবস্থায় ছিল, এখনও অনেকটা সেই ভাবেই আছে। তখন ভুলুয়ার যে স্থান হইতে নদী ৮ মাইল দূরে ছিল, এখন সেই অঞ্চল নদীগর্ভে। সান্তাসীতা হইতে তখন সোজা দক্ষিণে ৫ মাইল ও একটু দক্ষিণ-পশ্চিম ঘেঁসিয়া প্রায় ১০ মাইল দূরে নদী অবস্থিত ছিল। এখন সান্তাসীতা নদীগর্ভে। সান্তাসীতার স্বনামখ্যাত জমিদার মোহিনীমোহন চৌধুরীর কীর্ত্তি ও বিলাস-বৈভব নদীগর্ভে লুপ্ত হইয়াছে।



তাঁহার বাড়ীর মূল্যবান্ ঐশ্বর্য্য-সামগ্রী ভুলুয়া অঞ্চলের বর্ত্তমান সম্পৎ-শালী অধিকাংশ বড় লোকের গৃহে ছড়াইয়া আছে, অথচ তাঁহার পুত্র-পৌত্রদিগের দুবেলা নিয়মিত আহার্য্য জোটাই কষ্ট—নিজস্ব বলিতে গৃহখানিও নাই।

বর্ত্তমান নোয়াখালী বা সুধারাম সহর হইতে তৎকালে নদী পাঁচ মাইল দক্ষিণে ছিল। সুধারাম এখন নদীগর্ভে প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। কীর্ত্তি ও বৈভবসম্পন্ন স্বর্গীয় সুধারাম মজুমদারের বাড়ীর দরজাতেই বর্ত্তমান নোয়াখালী সহরের আদি পত্তন হইয়াছিল। এখন সহরের সেই অঞ্চলের চিহ্নমাত্র নাই; সমস্ত সৌধ-সম্পদ্ মেঘার বুকে নিমজ্জিত। উত্তর-পশ্চিম কোণের সামান্য একটু স্থান জুড়িয়া ক্ষুদ্র নদীর আবেষ্টনীর মধ্যে সহরখানি যেন শঙ্কা-শিহরণে সঙ্কুচিত হইয়া কোন রকমে অস্তিত্বের চিহ্নরূপে কাল কাটাইতেছে। উহার সমৃদ্ধি-সম্পদ্ এখন আর কিছুই নাই। নবগঠিত অঞ্চলে সহর স্থানান্তরিত হইবে বলিয়া অনেক দিন ধরিয়াই গড়িমসি চলিয়াছে।

অন্তঃপ্রবাহিনী জলধারা ও বাণিজ্য-কেন্দ্র

পল্লী-সম্পদের দিক্ দিয়া এই সকল নদীপথের একটা কার্য্যকারিতা আছে। নোয়াখালীর দক্ষিণ, পশ্চিম ও পূর্ব্ব-সীমায় সুবিস্তীর্ণ জলরাশির সঙ্গে নোয়াখালীর গ্রাম পল্লীগুলির সংযোগ রহিয়াছে। জেলার অন্তঃপ্রবাহিত ছোট ছোট নদী ও নালা-খাল প্রভৃতি বর্ষার সুদিনকালে কাঁচামাল শ্রেণীর স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্য চলাচলের ও ব্যবসায়-সংক্রান্ত আর্থিক ও বস্তুগত আগম-নিগমের সহায়ক হইয়া থাকে।

নোয়াখালী জেলার উত্তর-পশ্চিম-অঞ্চলীয় নদনা, রামগঞ্জ, রাইপুর, লক্ষীপুর ও অপরাপর ছোট-খাটো বহু পল্লীর হাট হইতে নৌকা করিয়া ছোট খালের পথে জিনিষপত্র জেলার নানা স্থানে আবশ্যক ও সুবিধামত চলাচল হয় ও বহির্ব্বাণিজ্যো-পযোগী জিনিষপত্র চারিদিক্ হইতে সমাগত হইয়া মহেন্দ্র খাল ও ভবানীগঞ্জ খালের পথে ডাকাতিয়া বা মেঘানদী ধরিয়া বড় বড় বালাম-নৌকায় করিয়া চাঁদপুর বন্দরে নীত হয়। তথা হইতে জাহাজে করিয়া দূর-দূরান্তরে বাণিজ্যের প্রসার ছড়াইয়া পড়ে।

* নোয়াখালী জেলার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের উৎপন্ন শস্য হিসাবে সুপারী, নারিকেল ও পাটই প্রধান; ইহা ছাড়া গুড়, কচু, চাটাই, চুন, কলা, ধান, পান ও গরু প্রভৃতি উক্ত নদী-পথে ব্যবসায়-ব্যপদেশে চলাচল হয়।

নোয়াখালীর উত্তর-পূর্ব্ব-অঞ্চলীয় জিনিষপত্র আসাম ও চট্টগ্রামের দিকে রেলপথেই অধিক চলাচল হয়। উহা ছাড়া ছিলনিয়া, বড় ফেণী, ছোট ফেণী ও মুহুরী নদীর পথে বামনী নদী ও মেঘা নদী ধরিয়া উপকূলের কাছ ঘেঁসিয়াও একটা বাণিজ্যধারা চলে, আর বরাবর বঙ্গোপসাগর ধরিয়া সুন্দরবনের পথে কলিকাতাভিমুখেও আর একটা বহি-র্ব্বাণিজ্যের পথ আছে। পূর্ব্ববর্ণিত নোয়াখালীর উত্তর-পশ্চিম-অঞ্চলীয় বাণিজ্যোপকরণও এই বঙ্গোপসাগরীয় পথে চলাচল হইয়া থাকে। তাহা ভবানীগঞ্জ ও চাঁদপুর উত্তর স্থান হইতেই হয়। ইহা ছাড়া নোয়াখালীর দক্ষিণ-অঞ্চলীয় বাণিজ্যোপকরণ নোয়াখালী খাল ধরিয়া মেঘার দিকে যায়।

নোয়াখালীর উত্তর-পূর্ব্ব-অঞ্চলীয় পথে পার্ব্বত্য বনভূমি হইতে আগত প্রচুর কাঠ বাণিজ্যব্যপদেশে নদী ও সমুদ্র ধরিয়া নানা দিকে রপ্তানী হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া এতদঞ্চলের তুলা, শন, সূতা, জাল, পাটী, চিকনি, চাউল, চিড়া, কাপড়, ডিম, সরিষা, লঙ্কা, তিল, তিসি ও গুড় প্রভৃতি উৎপন্ন দ্রব্য চারিদিকে বাণিজ্যার্থে রপ্তানী হয়।

পল্লীর বেচাকেনা-সংক্রান্ত কেন্দ্রস্থল হিসাবে রাইপুর, লক্ষীপুর, নদনা, ভবানীগঞ্জ, সোনাইমুড়ি, চন্দ্রগঞ্জ, রাজগঞ্জ, পরশুরাম, ছাগলনাইয়া, ফেণী, চৌমুহানী ও সোনাগাজী প্রভৃতি বাজার ক্রমশঃ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। জেলা-মধ্যে আন্তর্বাণিজ্যিক সাহায্যকারী মাঝিমাল্লার সংখ্যা নোয়াখালীতে ছয় হাজারের উপরে হইবে।

রাস্তা-ঘাটের ব্যবস্থা

নৌপথে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও লোক-চলাচলের সুবিধা হইতে ক্রমশঃ যেমন স্থানে স্থানে হাট-বাজার বা গঞ্জ প্রভৃতি শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে, সেইরূপ যানবাহন চলাচল বা পায়ে চলার পথেও বহু পল্লীকেন্দ্রে হাট-বাজার রহিয়াছে। রাস্তাঘাট পূর্ব্বে খুব কমই ছিল। আজকাল উহার প্রাচুর্য্যে অধিবাসীদিগের বহু সুবিধা হইয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর নোয়াখালীতে দুই চারি খানি জাঙ্গাল-

তোয়া সাধারণ রাস্তা ছাড়া চলা-ফেরার উপযোগী ভাল রাস্তা ছিল না বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না।

ত্রিপুরার কলেক্টর মিঃ টমাস্ পার-এর ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের রিপোর্ট হইতে পাওয়া যায়, তখন নোয়াখালীর দিকে রাস্তা-ঘাট এক প্রকার ছিল না। বর্ষাকালে লোক-চলাচলের ভয়ানক কষ্ট হইত। কুমিল্লা হইতে একটি রাস্তা দক্ষিণমুখে দশ মাইল পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। উহাই বড়রাস্তা; অথচ এই রাস্তাতে তৎকালে ভাঙ্গাচুরির অন্ত ছিল না। বর্ষাকালে খানিক পথ হাটিতে না হাটিতেই কোথাও হাটু-জল, কোথায়ও তদতিরিক্ত জলবিপত্তিতে পথিকদের পথ-চলায় কষ্টের অবধি থাকিত না।

মিঃ টমাস্ পার-এর বর্ণনায় যত অসুবিধার কথা শোনা যায়, মিঃ রেনাল সাহেবের ম্যাপ ও রাস্তা-ঘাটের তালিকায় ততটা দুরবস্থার আভাস পাওয়া যায় না; অথচ উহা ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বের ব্যাপার। তখন তিনি নোয়াখালীর রাস্তা-ঘাটের যে ফিরিস্তি দেখাইয়াছেন, তাহাতে মেঘনার তীরস্থ লক্ষ্মীপুর হইতে চাঁদপুর ও কুমিল্লা পর্য্যন্ত রাস্তা এবং লক্ষ্মীপুর হইতে কল্যান্দী ও যুগীদিয়া পর্য্যন্ত রাস্তা, পূর্ব্ব-অঞ্চলীয় চিটাগাং রোড, কুমিল্লা হইতে খণ্ডল ও ছাগলনাইয়া রাস্তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি বলিয়া গিয়াছেন। তৎকালে ডাকাতিয়া, বড়ফেণী, ও ছোটফেণী নদীতে রাস্তার মুখে ফেরী বা খেয়া-পারাবার-এর বন্দোবস্ত ছিল বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বকালে সাধারণতঃ স্থানীয় জমিদারগণই রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ করিতেন। গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে এতৎসংক্রান্ত কোন চুক্তিপদ্ধতি জমিদারদিগের ছিল না। অনেকেই জনসাধারণের প্রয়োজনে উহাকে জমিদারী কর্ত্তব্য হিসাবে কর্ত্তব্য-কর্ম্ম মনে করিয়াই রাস্তাঘাট করিতেন। অবশেষে ১৮২০ খৃষ্টাব্দের ২০শে নভেম্বর কাউন্সিলে রাস্তা-ঘাট নির্ম্মাণের জন্য জমিদারদিগের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য্য করিবার প্রস্তাব বিধিবদ্ধ করা হইল। তখন হইতে গবর্ণমেণ্ট নিজ দায়িত্বে রাস্তাঘাট-উন্নতির কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। সরকারী বিবরণীতে দেখা যায়, ১৮৫৬-৫৭ খৃষ্টাব্দে ১২৪০০ টাকা ও উহার পর বৎসর তদতিরিক্ত ৫০০০ টাকা নোয়াখালীতে রাস্তাঘাট ও পুল প্রভৃতির জন্য ব্যয় হইয়াছিল। তাহাতে দেখা গেল, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ৭০ মাইল মাত্র রাস্তা জেলামধ্যে নানা দিক্ দিয়া পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তখনও অনেক স্থানে পুল হয় নাই এবং রাস্তাঘাট আশানুরূপ ভাল বাঁধান হয় নাই এবং চট্টগ্রামের দিকে যে রাস্তা গিয়াছে, উহা মেরামতের অভাবে জঙ্গলে ভর্ত্তি হইয়া উঠিতেছিল।

এখন আর নোয়াখালীতে রাস্তাঘাটের অভাব বিশেষ অনুমিত হয় না। সকল অঞ্চলেই অন্ততঃ মানুষের পথ চলিবার বা যান-বাহনাদি-চলাচলের উপযোগী রাস্তার অনেকটা সুবিধা হইয়াছে। ঢাকা হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত যে ট্রাঙ্ক-রোড আছে, উহা নোয়াখালী জেলার ফেণী মহকুমার হেড্ কোয়ার্টারের মধ্য দিয়াই গিয়াছে। ইহা ছাড়া ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও লোকাল বোর্ডের রাস্তা নোয়াখালীতে প্রায় হাজার মাইল ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ট্রাঙ্ক-রোড ফেণী মহকুমার মধ্য দিয়া ১৪ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া চট্টগ্রাম সীমায় পড়িয়াছে। উক্ত রাস্তার দুইধারে মেহগিনি, শিশু, জারুল, মহুয়া ও আমগাছের সারি রাস্তার যেমন সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিয়াছে, রৌদ্রতপ্ত পথিকের ছায়া-সুখ বিতরণেরও পর্য্যাপ্ত সহায়ক হইয়াছে। ইহা ছাড়া ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তাগুলিতেও তরুছায়ার ব্যবস্থা রহিয়াছে। ট্রাঙ্ক-রোডের মেরামত-সংক্রান্ত কার্য্যাদি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের দ্বারাই পরিদৃষ্ট হয়। ফেণী নদীর উপর এই রাস্তার মুখে কোন পুল নাই। খেয়ার বন্দোবস্ত আছে।

মেঘনার তীর হইতে লক্ষ্মীপুরের মধ্য দিয়া বেগমগঞ্জ হইয়া ফেণী নদী অতিক্রম করিয়া যে-রাস্তা চট্টগ্রাম চলিয়া গিয়াছে, উহাকে পুরাতন বেগমগঞ্জ রোড বলা হয়।

ফেণী হইতে নোয়াখালীর দিকে যে রাস্তা গিয়াছে, উহাকে ফেণী-রোড বলা হয়। উহার বিস্তার ১৮ ফুট, দূরত্ব ২৬ মাইল। ২২ মাইলের গোড়ায় পূর্ব্বে নোয়াখালী খালের উপর পুল ছিল। তখন খালের পরিসর খুব বেশী ছিল না, এখন ঐ স্থান বহুবিস্তৃত হইয়া নদীর আকার ধারণ করিয়াছে। কিছুকাল খেয়া-চলাচল হওয়ার পরে এখন তাহাও বিপজ্জনক হইয়াছে; তাই স্থানান্তরে খেয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ফেণী হইতে উত্তর-পূর্ব্ব দিকে এক রাস্তা গিয়াছে। বরাবর ১৬ মাইল দূরবর্ত্তী পরশুরাম গিয়া উক্ত রাস্তা ঘুরিয়া তথা হইতে ছাগলনাইয়া হইয়া বড়ফেণী ধরিয়াছে। ফেণী

হইতে ১০ মাইল ও ১৭ মাইলের গোড়ায় ডাক-বাংলো আছে। ফেণী রোডে ছয় মাইলের গোড়া হইতে চিটাগাং রোড নোয়াখালী জেলার দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া ১১ মাইল বিস্তৃত ছিল। সেই রাস্তা কোম্পানীগঞ্জ, দালগঞ্জ, সোনাগাজী, চাপড়াশীর হাট হইয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমানে উহা নদীগর্ভে।

নোয়াখালী হইতে ৯ মাইল দূরবর্ত্তী বেগমগঞ্জ হইয়া লাকসাম, কুমিল্লা ও চাঁদপুর অভিমুখে যে রাস্তা গিয়াছে, উহাকে নূতন বেগমগঞ্জ রোড বলা হয়।

নোয়াখালী হইতে ভবানীগঞ্জ খালের উত্তর পর্য্যন্ত ১৮ মাইল যে রাস্তা আছে, উহাকে ভবানীগঞ্জ রাস্তা বলে। ভবানীগঞ্জ হইতে লক্ষ্মীপুরের দূরত্ব পাঁচ মাইল। লক্ষ্মীপুর বিরাট কাজ-কারবারের স্থান। এখানে মুন্সেফী কোর্ট আছে। তথা হইতে তিন মাইল দালাল বাজার। দালাল বাজার হইতে রাস্তার এক শাখা উত্তর-পশ্চিমে ছয় মাইল গিয়া রাইপুরের নিকটস্থ ডাকাতিয়ার মুখে পৌঁছিয়াছে। তথা হইতে ঐ রাস্তা চাঁদপুর অভিমুখে গিয়াছে। অপর এক শাখা তথা হইতে সোজা পূর্ব্ব-উত্তরে দশ মাইল গিয়া রামগঞ্জে পড়িয়াছে। লক্ষ্মীপুর, রাইপুর ও রামগঞ্জে ডাক-বাংলো আছে। নোয়াখালী হইতে ভবানীগঞ্জের যে রাস্তার বর্ণনা দেওয়া হইল, উহা বর্ত্তমান সময়ে নাই, নদীগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

নোয়াখালী জেলার মধ্য দিয়া দুইটি রেলপথ গিয়াছে। উভয় পথই আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের অন্তর্ভুক্ত। লাকসাম জংসন হইতে একটা লাইন ফেণী হইয়া চট্টগ্রামের দিকে গিয়াছে। এই রেলপথ ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অপর লাইন লাকসাম হইতে সোনাইমুড়ী, চৌমুহানী হইয়া নোয়াখালী গিয়াছে। এই পথ ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে প্রস্তুত হইয়াছে। চট্টগ্রাম হইতে ফেণী পর্য্যন্ত ট্রেনে সাড়ে চারি ঘণ্টার পথ। এই পথে প্যাসেঞ্জার ও মালবাহী গাড়ী এক সাথে চলে। আসাম-বেঙ্গল রেলপথগুলি ই. বি. আর ও ই. আই. আর প্রভৃতির রেলপথের তুলনায় অল্প-পরিসর (মিটারগজ)। লাইনও পাশাপাশি দুইটা নাই। এক লাইনেই গাড়ী যাতায়াত করে।

নোয়াখালী জেলার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও লোকাল বোর্ড রাস্তাগুলিতে সর্ব্বদাই মাল ও যাত্রিবাহী গরুর গাড়ী যাতায়াত করিয়া থাকে। আজকাল দুই এক রাস্তায় কচিৎ কদাপি—মোটর চলিতেও দেখা যায়। সহর-সীমার বাহিরে পাকা রাস্তা নাই। সম্প্রতি পুরাতন বেগমগঞ্জ রোডে ইট-সুরকী বা খোয়া ফেলিয়া উহার অধিকতর শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা চলিয়াছে। বর্ষাকালে রাস্তাগুলি গাড়ী-চলাচলের দরুণ ভয়ানক কর্দ্দমাক্ত হইয়া যায়।

নোয়াখালীর যাত্রিবাহী গো-যানগুলির গঠন-শ্রীতে একটু উন্নত ধরণের বৈশিষ্ট্য আছে। সাধারণতঃ বাঁশ ও বেতের কাজে এই অঞ্চলের উক্ত শ্রেণীর শিল্পিগণ অনেক জেলার তুলনায় অধিকতর পটু। অধিকাংশ গোযানের ছৈ দেখিলে গাড়োয়ানদিগের শিল্প সম্বন্ধে রুচি ও যত্নের দিকে স্বতঃই মন আকৃষ্ট হয়। কোন রকমে কাজ-চলা গোছের ছৈ করিয়া গাড়োয়ানগণ তৃপ্ত হয় না। উহার মধ্যে রঙ্ লাগানো ও সূক্ষ্মকাজের বুননমূলক সুবিন্যাস-সংযোজনায় উহাকে সুশোভন করিয়া না তুলিতে পারিলে যেন উহাদের তৃপ্তি হয় না। যাত্রীর বসিবার স্থান ছাড়া গাড়োয়ানের মাথার উপরে ছৈ-এর সংশ্লিষ্ট একটা সুদৃশ্য বারান্দা সন্নিবিষ্ট থাকে। এইরূপ সুগঠিত বারান্দাযুক্ত গরুর গাড়ীর ছৈ বাংলা দেশে খুব কম স্থানেই সচরাচর দেখা যায়।

মনুষ্যত্ব

…মানুষের প্রকৃত শক্তির অভিব্যক্তি কোথায়, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ব্যবহারের কার্য্যে মানুষের মনুষ্যত্ব প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং ঐ পাঁচটি কার্য্যে মানুষ যত অধিক নিপুণতা লাভ করিতে সক্ষম হয়, ততই শক্তিমান্ বলিয়া আখ্যা লাভ করে। ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইবে যে, ঐ পাঁচটি শক্তির মূল, শব্দ-শক্তির ব্যবহারে নিহিত রহিয়াছে, কারণ শব্দ ব্যবহারের শক্তি হইতে স্পর্শ, স্পর্শ ব্যবহারের শক্তি হইতে রূপ, রূপ ব্যবহারের শক্তি হইতে রস এবং রস ব্যবহারের শক্তি হইতে গন্ধ ব্যবহারের শক্তির উন্মেষ হইয়া থাকে।…

কাশি-রোগের প্রাকৃতিক চিকিৎসা

—শ্রীকুঞ্জরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

[১]

বুকের ভিতর বায়ু গৃহীত হইলে, কোন কোন সময় শ্বাস-নালীর দ্বার (glottis) বন্ধ হইয়া যাইবার জন্য বুকের ভিতর বায়ু আটকাইয়া যায় এবং তাহার ফলে ভিতরে একটা অস্থিরতা উৎপন্ন হয়। তখন কণ্ঠনালীর (larynx) দ্বার খুলিয়া যায় এবং বদ্ধ বায়ু শব্দ করিয়া বাহির হয়। ইহাকেই কাশি বলে।

কাশি প্রকৃত পক্ষে রোগ নয়, ইহা অন্য রোগের লক্ষণ মাত্র। আমাদের দেহ-যন্ত্র যে বাহিরের কোন শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিবার কাশিই প্রকৃতির অন্যতম ভাষা। অথবা, ইহা প্রকৃতির danger signal—বিপদ্ জানাইবার সঙ্কেত।

কাশি সাধারণতঃ দুই প্রকার,—প্রত্যক্ষ কাশি (direct cough) ও অপ্রত্যক্ষ কাশি (indirect cough)। বুকের বিভিন্ন যন্ত্রের জন্য যে কাশি, তাহাকে প্রত্যক্ষ কাশি বলে। প্রত্যক্ষ কাশি সাধারণতঃ কণ্ঠনালী (larynx), শ্বাসনালী (bronchial tubes), ফুসফুস এবং ফুসফুসের আবরণের (plurar) রোগ হইতে উৎপন্ন হয় এবং যক্ষ্মা, নিমোনিয়া, প্লুরিসি, পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস্, হাঁপানি ও সর্দ্দি প্রভৃতির সহিত বর্ত্তমান থাকে। শ্বাসযন্ত্র ব্যতীত অন্য কোন যন্ত্রের রোগ হইতে কাশি উৎপন্ন হইলে তাহাকে অপ্রত্যক্ষ কাশি বলে। অপ্রত্যক্ষ কাশি কর্ণ, বৃহৎ ধমনী ও শিরা, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী, মেরুদণ্ড, লিভার, জরায়ু অথবা ক্ষুদ্রান্ত্রের ক্রিমি, হামজ্বর, গেঁটে বাত, বাতব্যাধি, স্নায়ুরোগ প্রভৃতি বিভিন্ন রোগে এবং ছেলেদের দাঁত উঠিবার সময় হইতে পারে। যদি শয্যা-ত্যাগের পূর্ব্বে ভোরবেলা কাশি আসে, তবে তাহা বিশেষ ভয়ের সহিত দেখা উচিত এবং সত্বর তাহার প্রতিকার করা কর্ত্তব্য। কারণ, তাহা অনেক সময় যক্ষ্মা-রোগের অগ্রদূত রূপে আসে। যে-কাশি প্রতি বৎসর শীতকালে আসে, তাহা প্রায়ই পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস হইতে উৎপন্ন হয়।

[২]

যখন বুকের ভিতর কফ আটকাইয়া যায় এবং স্বাভাবিক ভাবে তাহা বাহির হইতে পারে না, তখন প্রকৃতি কাশ সৃষ্টি করিয়া তাহা বাহির করিয়া দিতে চায়। যদি ঐ-কফ বুকের ভিতর থাকিয়া যায়, তবে তাহাতে জীবনই বিপন্ন হইতে পারে। এই জন্য দেহকে রক্ষা করিবার নিমিত্তই প্রকৃতি কাশি উৎপন্ন করিয়া থাকে। বুকে কফ আটকাইয়া যাইবার জন্য যে-অস্থিরতা আসে, তাহাই অনেক সময় কাশি সৃষ্টি করে। যখন কাশির সঙ্গে সঞ্চিত কফ উঠিয়া যায়, তখনই রোগীর অস্থিরতা দূর হয় এবং রোগী আরাম বোধ করে। এই জন্য জোর করিয়া কখনও কাশি বন্ধ করিতে নাই। অনেক সময় অহিফেন-ঘটিত বিভিন্ন ঔষধে কাশি সহজে আরোগ্য হয়; কিন্তু তাহার ফলে অনেক সময় রোগীর অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা হইয়া থাকে। এই জন্য একজন বিখ্যাত ডাক্তার বলিয়াছেন, যে-কোন মূর্খ একটা কাশি বন্ধ করিতে পারে, কিন্তু তাহাতে যে অনিষ্ট হয়, তাহা দূর করিতে এক জন বিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন। যতক্ষণ কাশিতে কিছু উঠিয়া আসে, ততক্ষণ কাশিতে সর্ব্বদাই উপকার হয়। এই নিমিত্ত ঐ কাশিকে ডাক্তারী ভাষায় বলে, useful cough, প্রয়োজনীয় কাশি; কিন্তু যখন কাশি কিছুই তুলিয়া আনে না, তখনই ইহা দেহের পক্ষে ক্ষতিকর হইয়া থাকে। তখন সেই কাশির কারণ দূর করিয়া কাশি আরোগ্য করিতে হয়।

কাশি সর্ব্বদাই একটা দৈহিক বিশেষ অবস্থায় প্রতিক্রিয়া (reflex act) জনিত উত্তেজনা হইতে উৎপন্ন হয়। এই জন্য রোগ-চিকিৎসার পূর্ব্বে প্রথমেই স্থির করা আবশ্যক, কি বিশেষ অবস্থার জন্য কাশি হইতেছে এবং তদনুযায়ী চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য।

কাশিকে অঙ্গবিশেষের রোগ (local disease) বলিয়া মনে করা উচিত নয়। যখন কাশি কিছুতেই

সারিতে চাহে না, তখন বুঝিতে হইবে, কাশি কিছুতেই স্থানীয় রোগ নয়। প্রকৃত পক্ষে কাশি স্থানীয় রোগ নয়ও; সকল রোগের মতই ইহা সর্ব্বদৈহিক ব্যাধি (constitutional disease) এবং ইহার মূল কারণ রক্তের ভিতর নিহিত থাকে। এই জন্য যাহাদের কাশি রোগ আছে, তাহারা গুরু ভোজন করিলে, বিলম্বে আহার করিলে, শ্রান্ত হইবার পর বিশ্রাম না করিয়া আহার করিলে, অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলে, বদ্ধ স্থানে থাকিলে এবং রাত্রিতে ভাল ঘুমাইতে না পারিলে কাশি দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই জন্য সর্ব্বতোভাবে দেহকে দোষমুক্ত করাই কাশির সর্ব্বপ্রধান চিকিৎসা।



তলপেটের উষ্ণকর পটি (abdominal heating compress)।

[৩]

আমাদের তলপেটই দেহের প্রধান আস্তাকুঁড়। এই জন্য চিকিৎসার পূর্ব্বে প্রথমেই তলপেটটি পরিষ্কার করিয়া লওয়া আবশ্যক। তলপেটের উষ্ণকর পটি (abdominal heating compress) কোষ্ঠবদ্ধতার অন্যতম ব্রহ্মাস্ত্র। চার হইতে আট-ভাঁজ এক খানা ভিজা নেকড়া তলপেটের উপর রাখিয়া এবং তাহা ফ্লানেল দ্বারা ভালরূপে আবৃত করিয়া পরে এক খানা শুষ্ক দীর্ঘ বস্ত্রখণ্ড দ্বারা পেট ও পিঠ ঘুরাইয়া বাঁধিয়া দিলেই ঐ পটি নেওয়া হয়। আহারের দুই ঘণ্টা পরে ইহা সমস্ত রাত্রির জন্য নেওয়া আবশ্যক।

রাত্রিতে পটি গ্রহণ করিয়া দিনের বেলা স্নানের পূর্ব্বে ৫ মিনিট হইতে ১৫ মিনিটের জন্য কটি-স্নান (হিপ-বাথ) গ্রহণ করিতে পারিলে খুব ভাল হয়। তাহাতে কোষ্ঠ যেমন পরিষ্কার হয়, তেমনি দেহ স্নিগ্ধ হওয়ার জন্য সর্ব্বপ্রকার স্নায়বিক কাশি মন্ত্রের মত আরোগ্য লাভ করে। বড় একটা জলের গামলায় পা বাহিরে রাখিয়া নাভি পর্য্যন্ত ডুবাইয়া বসিয়া অনবরত তলপেট ও উরুসন্ধি ঘর্ষণ করিলেই কটিস্নান গ্রহণ করা হয়।

যদি জরুরী প্রয়োজন হয়, তবে ডুস লইয়াই চিকিৎসা আরম্ভ করা উচিত। কিন্তু, যদি তত জরুরী প্রয়োজন না থাকে, তাহা হইলে উল্লিখিত উপায়েই কোষ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

অধিকাংশ কাশিই বুকের দোষের জন্য হইয়া থাকে। যখন বুকের ভিতর সর্দ্দি বসিয়া যায়, তখন কাশিই হয় তাহার প্রধান লক্ষণ। ঐ অবস্থায় তলপেট পরিষ্কার করিয়া লইয়া খালি পেটে দেড় ঘণ্টার জন্য একটা বুকের পটি গ্রহণ করিলে বিশেষ ফল হয়। একখানা ভিজা নেকড়া বগল হইতে কোমরের হাড় পর্য্যন্ত বুক ও পিঠ ঘুরাইয়া আনিয়া একখানা দীর্ঘ ফ্লানেল অথবা পশমী আলোয়ান দ্বারা শক্ত করিয়া তাহা আবৃত করিলেই বুকের পটি নেওয়া হয়। এই সকলের বিস্তৃত প্রয়োগ-পদ্ধতি মৎপ্রণীত 'বৈজ্ঞানিক জল-চিকিৎসা' গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে।

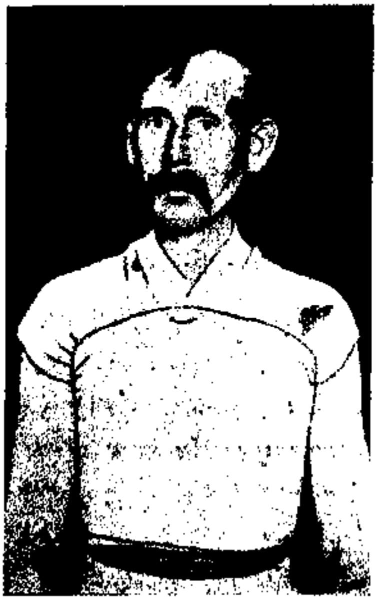
যদি ঐ পটি দ্বারা স্কন্ধ-দেশ আবৃত করা যায়, তবে আরও বিশেষ ফল হয়। এক খানা ভিজা নেকড়া বিশেষ পদ্ধতিতে কাঁধ, বুক ও পিঠ ঘুরাইয়া এই পটি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। উহাও পরে ফ্লানেল দ্বারা এরূপ ভাবে আবৃত করা আবশ্যক, যেন পটির নীচে একটা উত্তাপের সৃষ্টি হয়।

বুকের পটি খুলিয়া ফেলিবার এক ঘণ্টা পর দশ মিনিটের জন্য একবার কটি-স্নান গ্রহণ করা বিশেষ ভাবে কর্ত্তব্য। ভোরে পটি দিয়া তাহার পর স্নানের অব্যবহিত পূর্ব্বে কটিস্নান গ্রহণ করিতে পারিলেই খুব ভাল হয়। স্নানের সময়ও বুক, পিঠ ও গলা-প্রভৃতি খুব ভাল করিয়া মর্দ্দন করা আবশ্যক। যদি নাতিশীতোষ্ণ অথবা নাম-মাত্র উষ্ণ জলধারার নীচে বসিয়া বুক ও পিঠে খালি-হাতে সুদীর্ঘ সময়ের জন্য মর্দ্দন করা যায়, তবে বিশেষ ফল

হয়। গা মোছার পরেও গা রগড়াইয়া রগড়াইয়া পুনরায় গরম করিয়া লওয়া প্রয়োজন।

প্রশ্বাস-বায়ুর সহিত সিক্ত উত্তাপ-গ্রহণ কাশি আরোগ্যের পক্ষে একটা চমৎকার ব্যবস্থা। অপরাহ্নে মাথাটি পূর্ব্বে ধুইয়া লইয়া মুখ বন্ধ করিয়া মিনিট দশেকের জন্য নাসিকা দ্বারা বাষ্প গ্রহণ করা যাইতে পারে। বাষ্প গ্রহণ করিবার পরে সমস্ত শরীর ভিজা শীতল তোয়ালে দ্বারা মুছিয়া ফেলা কর্ত্তব্য।

সন্ধ্যার পরও রোগীর বুকে পনর মিনিটের জন্য গরম স্বেদ দিয়া তাহার পরে এক ঘণ্টার জন্য বুকের পটি প্রয়োগ



বুক ও কাঁধের পটি।

করিলে কাশি অত্যন্ত দ্রুত আরোগ্য লাভ করে। গরম স্বেদ প্রয়োগ করিবার সময় প্রত্যেক ৫ মিনিট অন্তর অন্তর বুকটা শীতল জলে ভিজা তোয়ালে দ্বারা ২০ সেকেণ্ডের জন্য মুছিয়া লওয়া উচিত। বুকের পটি সরাইয়া লইয়াই সর্ব্বদা সমস্ত বুক ও পিঠ শীতল গামছা দ্বারা অর্দ্ধ-মিনিট কাল মুছিয়া পুনরায় বস্ত্রাবৃত করিয়া গরম করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

শীতল ও গরম জলের দ্বারা পর্য্যায়ক্রমে দিনে তিন বার কুল্লি করিলে কাশির পক্ষে বিশেষ উপকার হয়। প্রথম গরম জলের দ্বারা মিনিট খানেক কুল্লি করিয়া ঐ জলটি ফেলিয়া দিয়া পর মুহূর্ত্তেই শীতল জল দ্বারা মিনিট খানেক কুল্লি করিতে হইবে। এই ভাবে দুইবার গরম ও দুই বার শীতল জল দ্বারা কুল্লি করা উচিত। সর্ব্বদাই গরম জলের দ্বারা কুল্লি আরম্ভ করিতে হইবে এবং শীতল জলের দ্বারা শেষ করিতে হইবে।

কাশি-দমনের পক্ষে অন্যতম প্রধান প্রয়োজন ইচ্ছা-শক্তির উদ্বোধন করা। অনেকে গলায় সামান্য সুড়সুড়ি বোধ করিলেই একবার কাশিয়া লন। ইহাতে আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির ভিতর কাশিবার একটা অভ্যাস দাঁড়াইয়া যায়। ইচ্ছাশক্তির দ্বারা এই অভ্যাসকে জয় করিতে হয়। কয়েক দিন এই ভাবে কাশি দমন করিলে আপনিই কাশির ভাব কমিয়া আসে।

তথাপি সাধারণ কাশির জন্য এত কিছু করিবার মাত্রই আবশ্যক হয় না। পেট পরিষ্কার করার পর কয়েকদিন কটিস্নান করিলে, বুকে গরম পটি দিলে এবং প্রশ্বাসের সহিত বাষ্প টানিলেই খুব কঠিন কাশিও তিন চার দিনে আরোগ্য লাভ করে।

(৪)

পথ্য-বিষয়ে রোগীর বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। বিশেষভাবে সহজপাচ্য খাদ্য তাহার গ্রহণ করা উচিত। তাহা ব্যতীত প্রতিদিন এমন কিছু খাওয়া আবশ্যক, যাহাতে সহজে কোষ্ঠ-পরিষ্কার হয়। এ জন্য কয়েকটা দিন তাহার বেল, কমলা লেবু, পেয়ারা, কিসমিস, আখরোট অথবা দুধ-মনক্কা গ্রহণ করা উচিত। রোগীর লেবুর রস সহ প্রচুর জলপান করা কর্ত্তব্য। কাশিরোগের পক্ষে শীতল জলপান অত্যন্ত হিতকর। জলের সঙ্গে একটু মধু মিশাইয়া অল্প অল্প করিয়া পান (sip) করিলে বিশেষ উপকার হয়। যখন কাশির সঙ্গে কিছুই উঠিবে না, তখনই ঐরূপ ভাবে পান করা উচিত।

স্বাস্থ্যের সাধারণ বিধিগুলি কাশির রোগীর পক্ষে বিশেষ ভাবে মানিয়া চলা কর্ত্তব্য। রোগী প্রতিদিন প্রভাতে ও অপরাহ্নে মুক্ত স্থানে ভ্রমণ করিয়া বিমল হাওয়া গ্রহণ করিবেন এবং যথাসম্ভব দীর্ঘ সময় ঘরের বাহিরে অবস্থান করিতে চেষ্টা করিবেন। রাত্রিতেও ঘরের জানালাগুলি খুলিয়া রাখিয়া রোগীর নিদ্রা যাওয়া উচিত। রোগীর জামা খুব পাতলাও হওয়া উচিত নয়, খুব মোটা এবং অত্যধিক গরমও হওয়া উচিত নয়। যাহাতে শীত-গরমে কষ্ট পাইতে না হয়, এরূপ জামা-ই তাঁহার ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। জনাকীর্ণ স্থান, অনিয়মিত আহার ও নিদ্রা, অত্যধিক পরিশ্রম প্রভৃতিও কাশির রোগীর বিশেষ ভাবে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

বঙ্গ-রমণী

—শ্রীঅপরাজিতা দেবী

[৯]

'সমর্পণ এ যৌবন এইরূপ রাশি
প্রজ্বলিত হোমানলে,—হাসি কি আবার !'

অনেক বেলায় বড়-বৌয়ের খোঁজ পড়িল।—কোথায়ও তাহাকে পাওয়া গেল না। পঞ্চমী রান্না-ঘরে লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। পরশমণি দিব্য নিশ্চিন্ত মনে বারান্দায় পা ছড়াইয়া বলিতেছেন, আপদ গেছে, বেঁচেছি। এই মাসে বিশুর বিয়ে দিয়ে বৌ ঘরে না তুলি ত' আমার নাম পরশ নয়—

বিশাল মাঠে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে ভাবিতে মায়ের কথার উত্তরে বলিল, কিন্তু গেল কোথায় ?

'ও সব মানুষ যেখানে যায়, ও জানাই আছে ; বাঁশ-তলার পথে চুল এলিয়ে যে পথের লোককে রূপ দেখায়, তার ভাবনা তোকে আর ভাবতে হবে না। তোর নিজের ভাবনা ভাব—'

বাড়ীর কেহই তেমন গা করিল না। কৌতূহলও নাই। কিন্তু, ক্রমে পাড়ায় কথাটা রটিয়া গেল। অবিলম্বে নানা স্থানে জটলা বাধিল ; কেহ কেহ খুঁজিতে বাহির হইতে চাহিল। বিশাল, সুখেন অন্যান্য বাড়ীর জটলা কিন্তু বাড়ীতে বসিয়াই দেখিয়া দেখিয়া রাগে ফুলিতে লাগিল। অন্য বাড়ীতে চড়াও হইয়া কিছু বিবাদ করা যায় না, তাহারাই বা সহিবে কেন ? অথচ, তিন চারখানা বাড়ী একেবারে মুখো-মুখী, কথা-বার্ত্তা সবই শোনা যায়।

একজন বলিতেছিল, থানায় খবর দেওয়া যাক্—

সুখেন ও বিশাল চমকাইয়া উঠিল। এ দিক্‌টা তারা ভাবে নাই। আর, এ কথায় দলশুদ্ধ যেরূপ উৎসাহিত হইয়া উঠিল, তাহাতে বিলক্ষণ বিপদের কথা। আজ আর মাঠে যাওয়া হয় না ; সুখেনকে স্কুলে যাইতে বারণ করিয়া বিশাল বাড়ীতেই রহিল। আশে পাশের কথায় কাণ না দিবার ভাণ করিয়া যেন কাজে ব্যস্ত, এই ভাবে একজন মাছ ধরিবার পলো তৈরী করিবার জন্য বাঁশের বাঁখারী চাঁছিতে ও অপর জন কলাপাতা কাটিয়া কাক ধরিবার ফাঁদ তৈয়ারী করিতে মন দিল। কেবল কৃষ্ণধন বিশ্বাস বারান্দায় বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে এক একবার টিপ্পনী কাটিতেছিলেন, 'ও যত যায় ততই মঙ্গল, বুড়ী শুদ্ধ যে-দিন বেরোবে, সেই দিন ভাবব লক্ষ্মী এল। যত রাজ্যের গেছো-পেত্নী এসে জুটেছে এই বাড়ীতে—'

সহসা ডাক শুনিয়া বিশাল পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিল।

'এ কি, গুরুদেব যে—'

বিশাল দা, বাঁখারি ফেলিয়া আসিয়া পদধূলি লইল। গোস্বামী কৃষ্ণধনের কাছে গেলেন। কৃষ্ণধন ত্রস্তে জল-চৌকী আগাইয়া দিয়া ভূমিষ্ঠ, অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে পরশমণি আসিয়া প্রণতা। বর্ষায় একবার করিয়া গুরু নৌকায় শিষ্যবাড়ী আসেন, এমন অসময়ে কি কারণ ? বাড়ীশুদ্ধ চঞ্চল হইয়া উঠিল, গুরুর অভ্যর্থনার জন্য।

কৃষাণরা নাস্তার জন্য আজ আসে নাই। বাহির হইতেই মাঠে চলিয়া গিয়াছে। সুখেন বাজারে যাইবার জন্য উঠিল।

গোস্বামীর পিছন পিছন পাড়ার লোকজন আসিয়া উপস্থিত। ছোট বারান্দায় ধরে না, কেহ বসিয়া, কেহ দাঁড়াইয়া রহিল। বিশাল অবাক্ হইলেও কর্ত্তব্য ভুলিল না। মাদুর, কম্বল, সতরঞ্চি যাহা হাতের কাছে পাইল, তাড়াতাড়ি সমাগত লোকদের বসিবার জন্য পাতিয়া দিল।

গোস্বামী সুখেনকে বলিলেন, এখন বাজারে যেয়ো না, এদিকে আয় তোরা।

আজ্ঞামাত্র দু'জন বেহারা একখানা কাপড়-ঢাকা ডুলি বহিয়া আসিয়া সকলের সামনে দাঁড়াইল। পথ হইতে এই ডুলি আসিতে দেখিয়াই বাড়ীতে এত লোক-সমাগম। ডুলির সঙ্গে বছিরদ্দী সেখ।

বেহারাদ্বয় ডুলি নামাইল। গোস্বামী বলিলেন, মা, বেরিয়ে এস। এখানে এস—

ডুলির কাপড় সরাইয়া ঘোমটা-দেওয়া বড়-বৌ ধীরে ধীরে নামিয়া গোস্বামীর কাছে গিয়া হেঁট মাথায় দাঁড়াইল। গোস্বামী উঠিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, বিশাল –

'আজ্ঞে—'

'এখানে এস—'

বিশাল আগাইয়া গেল। গোস্বামী বলিলেন, তুমি এঁকে নাও, তোমারই স্ত্রী। এঁকে ত্যাগ করলে অন্তের তেমন কিছু নয়, কিন্তু তোমার মহাপাপ—

বিশাল হাত জোড় করিয়া বলিল, আমার একটা

'না, একটা কথাও না, আমি বলি, তোমরা শোন। মার কাছে আমি সবই শুনেছি। ঘরের বৌকে লাঞ্ছনা করলে লক্ষ্মীছাড়া হতে হবেই। তুমি সৎ, তবে কেন এমন নিষ্ঠুর এর উপর? আমার কথা বিশ্বাস কর, যদি এর কিছু মাত্র দোষ থাকত, আমি তোমায় দিতে আসতাম না। কাল সমস্ত দিন উপবাসী, আমি অনেক চেষ্টা করে-ছিলাম খাওয়াতে, কিন্তু জলস্পর্শও করে নি, শুধু শাঁখা পরিয়েছি।

গোলমাল শুনিয়া গ্রামের প্রধানেরাও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। সকলেই ব্যাপারটা জানিতে চাহিলেন, তখন গোস্বামী সব বলিলেন। সুখেন ও বিশালও স্বীকার করিল, কথা এইরূপই বটে। তবে সে বড়-বৌয়ের মুখের কথা।

গোস্বামী বলিলেন, যদি একে না রাখ, আমি নিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু অন্য গুরু দেখো।

গুরুত্যাগ! পরশমণি মাথায় কাপড় দিয়া লোক-জনের মধ্য দিয়া পথ করিয়া আসিয়া গুরুদেবের পায়ে পড়িলেন।

বিশাল বলিল, এমন কথা বলবেন না, আপনার কথায় আমি রাজী হলাম।

সকলে আসিয়া গুরুদেবকে প্রণাম করিল। তিনি অবশ্য সকল বাড়ীরই দীক্ষাদাতা নন, তবু তো গুরু। আর, অতি তেজস্বী ব্রাহ্মণ।

গোস্বামী বলিলেন, আর এক কথা, বড়-বৌকে আমি দীক্ষা দেব আজ মা, যাও তৈরি হও গে—

পরশমণি হতাশ হইয়া সরিয়া গিয়া দূরে দাঁড়াইয়া আছেন। সেখান হইতেই অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিলেন, তা দীক্ষা নিলে দেহ-শুদ্ধি হয়, রাত্তির করে কোথায় গিয়েছে না গিয়েছে, তার মোচনমান—

'আল্লা! আমারো বিটি আছে, ওনার চেয়ে বড়ই হবে। আমরা যতই মন্দ হই, তোমাদের থেকে অনেক ভাল—'

বছিরুদ্দীর রাগ ও জলন্ত চোখ দেখিয়া পরশমণি বুদ্ধি হারাইয়া থ' হইয়া রহিলেন। শুধু বলিলেন, টাকা-পয়সা জিনিষপত্র অনেক লাগে, হাতে খরচ নেই একেবারেই—

গোস্বামী বলিলেন, কিছু লাগবে না, আমি ফর্দ্দ দিচ্ছি, দেখ।

পরশমণি তবু বলিলেন, দিন-ক্ষণ···

'দিন-ক্ষণ আমার কাছে, সে ভাবনা তোমাদের নয়। আমি স্বেচ্ছায় দীক্ষা দিতে চাইলে দিন-ক্ষণ লাগে না। আর প্রতিবাদ করো না মা, যা করেছ এতদিন যথেষ্ট, এবার একটু সামলে চল।

নীরবে এক পাশ দিয়া বড়-বৌ ভিতরে চলিয়া গেল। সকলেই একবার চাহিয়া দেখিল। নিঃশ্বাস ফেলিল অনেকেই, কিন্তু কোন কথা কেহ বলিতে পারিল না, বিশ্বাস ভাইদের ভয়ে।

এই সময় আর একখানা ডুলি আসিয়া উপস্থিত হইল, পিছনে শ্যামল ডুলি অন্দরে গেল, শ্যামল দলে আসিয়া যোগ দিল।

কাজকর্ম্ম সারিয়া স্নানান্তে ঘরে আসিয়া বড়-বৌ সিঁদুর পরিতেছে। তখন বাহিরের লোকজন চলিয়া গিয়াছে, গুরু স্নানে গিয়াছেন। বিশাল ঘরে আসিয়া চাপা ও কঠোর স্বরে বলিল, এলে আবার? গুরুর কথা অমান্য করতে পারি নে, সর্ব্বনাশ হবে তা হলে। তা এসেছ থাক, কিন্তু আমার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ নেই, এ কথা যেন মনে থাকে।

বড়-বৌ চোখ ফিরাইয়া স্বামীর দিকে চাহিল। বিশাল একটু অবাক্ হইল, এ সেই ভীরু সঙ্কুচিত চাহনি নয়, যেন কি ভাবিতেছে, সেই দিকে সমস্ত মন পড়িয়া আছে, চাহনি উদাস ও অন্যমনস্ক। বিশাল যে কি বলিল, তা সে ভাল বুঝিতেই পারে নাই। এত বড় একটা কাণ্ড হইয়া গিয়াছে যার উপর, এ যেন সে মানুষ নয়।

নিত্যকার মত সহজ ভাব। বিশালের কথায় 'আচ্ছা' বলিয়া বাক্স খুলিয়া কি যেন এক মনে খুঁজিতে লাগিল। সমস্ত বাক্স ওলোট-পালট করিয়া সিকি, দুয়ানী, পয়সা একটা একটা করিয়া বাহির করিতে লাগিল। শেষে বাক্স ঝাড়িয়া দেখিল আর একটা পয়সাও নাই। অগত্যা খোলা বাক্স ফেলিয়া পয়সাগুলি গণিয়া দেখিল সর্ব্বশুদ্ধ আট আনা, ইহাই তাহার সম্বল, গুরু-দক্ষিণা দিবে।

বৈকালের পড়ন্ত রোদে রান্নাঘরের পাশে দাঁড়াইয়া বড়-বৌ ভিজা চুলগুলি পিঠের উপর ছড়াইয়া দিতেছে। মেজ-বৌ বাক্স হইতে একখানা ধোয়া লাল-পেড়ে সাড়ী বাহির করিয়া ধুইয়া শুকাইয়া দিয়াছিল। সেই খানি পরিয়া বড়-বৌ দীক্ষা লইয়াছে। হাতে গুরুদত্ত দুটি লাল শাঁখা, রোদের আভায় কাপড় খানা তসরের মত দেখাইতেছিল।

মেজ-বৌ আসিয়া বাটা হইতে একটা পান বড়-বৌয়ের হাতে দিয়া বলিল, সেই কখন খেয়েছ, একটা পানও কি খেতে নেই? তোমায় কেমন দেখাচ্ছে দিদি বলব? ঠিক সন্ন্যেসিনীর মতন—

'সন্নেসিনীরা এই রকম ঝাঁটা খেয়ে পথে বেরোয় না কি?' বড়-বৌ হাসিতে লাগিল—অবাধ, স্বচ্ছন্দ, নির্ম্মল সে হাসি। গুরু তাহার সমস্ত মনের ভার হরণ করিয়া লইয়াছেন, আজ আর তাহার মনে কোন দুঃখ-তাপ নাই।

কখন নিঃশব্দে পরশমণি কুয়ার ধারে পান ছিঁড়িতে আসিয়াছেন। লাল-পেড়ে নূতন কাপড়ে, লাল শাঁখায়, তরুণ দেহ-লাবণ্যে যে লক্ষ্মী-শ্রী ফুটিয়াছে, তাহা তাঁহার চোখে কাঁটার মত বিঁধিল, 'বলি কি হচ্ছে, ও কালা-মুখ দেখাতে লজ্জাও করে না? ছাই-কপালি চলানি, কোন্ মুখে হাসি হচ্ছে?'

শয়ন-ঘরের ভিতর হইতে বিশাল বলিল, 'মা—'

সে ডাকের অর্থ পরশমণি বুঝিলেন। গুরু এখনও যান নাই। জিভ্ কাটিয়া পরশমণি ছেলের ঘরে গিয়া ঢুকিলেন।

'চল দিদি, ঘরে গিয়ে বসি একটু। মার যন্ত্রণায় কোথাও যদি দাঁড়াবার যো আছে। পান নেই ঘরে, দাঁড়াও নিয়ে আসি।

এক গোছা পান ছিঁড়িয়া আনিয়া মেজ-বৌ বালতীর জলে সেগুলি ধুইয়া লইল। বড় বড় কয়েকটা পানে কাকের বিষ্ঠা দেখিয়া সেগুলি ফেলিয়া দিয়া বিরক্ত ভাবে বলিল, ভাল পান ক'টাই গেল!—লক্ষীছাড়া কাকের জালায় কোন কিছুতে যদি হাত দেবার যো থাকে,—

বহু দিন আগে একবার সীলেটের জন-কয়েক ব্যাপারী এই দেশে আসিয়াছিল। সুপারী গাছ জড়াইয়া ওঠা পান-গাছে গোছা গোছা পান এবং সেই পানের দু'চারটায় কাকবিষ্ঠা দেখিয়া তাহারা বলিয়াছিল—

কিবা ভাগে আইলাম ভাই রে, কি বা ভাগের গুণ।
এ্যাকই গাছে পান-সুপারী, এ্যাকই গাছে চুণ॥

[১০]

'তথাপি একটি রেখা, নাহি কি গেল রে লেখা
তাহার হৃদয়ে একদিন?
পুরুষ কি রূপজ্ঞানহীন!'

সুখেন ফেল করিল। যে দিন খবরটা পাওয়া গেল, বাড়ীশুদ্ধ কাহারও মুখে অন্ন উঠিল না, বিশাল ঘরে গিয়া শুইয়া রহিল, মাঠে গেল না। পরশমণি কাঁদিতে ও বকিতে লাগিলেন। সুখেন ঘরের বাহির হইল না, আর পঞ্চমী কাঁদিয়া চোখ-মুখ ফুলাইয়া ফেলিল।

দিন কয়েক পরে শোকটা একটু কমিলে বিশাল বলিল, যা হয়েছে হয়েছে, তুই আবার পড়। এখন সংসারে কোন টানা-টানি নেই, আমি বলি কি তুই রাঘবপুর স্কুল-বোর্ডিং-এ থেকে এবার দেখ—

'না দাদা, ও পথে আর নয়। পাশ আমি করতে পারব না, শুধু সময় নষ্ট হবে। আমি চাঁপাতলার নূতন স্কুলের মাষ্টারি নেব, আর তোমার সঙ্গে কাজ-কর্ম্ম দেখব ঠিক করেছি।

বিশাল অনেক বুঝাইল, তিন জনার একজনও ম্যাট্রিকটা পাশ করিল না, এ বড় দুঃখের কথা হইবে। সুখেন দাদাকে বুঝাইল, লেখা-পড়ার বিশেষ মূল্য এখন তাদের পক্ষে নাই। ম্যাট্রিক পাশ করিয়া ভাল চাকরি মিলে না, আর আই-এ, বি-এ পড়িতে গেলে গবর্ণমেণ্ট সার্ভিসের বয়স চলিয়া যাইবে, তখন লেখা-পড়া নিরর্থক।

শেষে বিশাল সম্মত হইল।

পরশমণি কেবল বলিলেন, বৌটা অলক্ষী, ওকে দূর করে দে বিশু, সুখুর আবার বিয়ে দি'। ঘরে পা দিয়ে সোয়ামীর বিত্ত-টিত্ত সব খেয়ে হজম করে ফেললে! নইলে সুখেন তোদের মতন নয়, লেখা-পড়ায় ভাল ছিল বরাবর। এ' ডাইনী সব মাটি করলে, ছেলেটিকে ভেড়া বানিয়ে ফেলেছে।

'ও সব বলো না মা, ছোট বৌ-মার মনঃকষ্ট হয়েছে সব চেয়ে বেশী। এক জনের দোষ আর এক জনের ঘাড়ে চাপিয়ে লাভ কি? যাক্ গে, সুখেন যা বললে, মন্দ নয়। সুখে শান্তিতে দিন কাটে সেই ভাল। ও আমার সাথে কাজ করলে এক বছরে বাড়ীময় টিনের ঘর তুলে পুকুর কাটাব। না পড়ে না-ই পড়ল—

সুখেনের ও দুই মায়ের প্রবোধ পঞ্চমীকেও শান্ত করিয়াছে।

নববর্ষায় জল আসিল। সংসারের কাজ করিয়া তিন যায়ে প্রচুর অবসর পায়, যখন তখন বাঁশতলায় আসিয়া বসিয়া বসিয়া জল দেখে। মেজ-বৌয়ের আর একটি মেয়ে হইয়াছে, সেটী পঞ্চমীর কোলেই মানুষ হইতেছে। সকালের কাজ সারা মাত্র মেজ-বৌ বলে, দিদি, পাতা-পোড়া দি?

বড়-বৌ এদিক্-ওদিক্ চাহিয়া বলে—দে—

তামাক-পাতা যখন রোদে দেওয়া হয়, তখনই বৌয়েরা তাহা হইতে নিজেদের জন্য সঞ্চয় করে। পরশ-মণির তামাক-পাতা-পোড়ার গুড়া দাঁতে দেওয়া অভ্যাস, সেটা তিনি পাড়াতেই সারেন। বৌয়েরা এমন অপব্যয় করিবে, তা কি তিনি সহিবেন? একদিন দেখিতে পাইলে গালাগালি করিয়া ভূত ছাড়ান।

তবু ইহার একটা নেশা আছে, নিষিদ্ধ কাজে উৎসাহ। মেজ-বৌ পাতাগুলি বাছিয়া বাছিয়া খানিকটা ছিঁড়িয়া নিবন্ত আগুনে পোড়া দেয়, একদিনে বেশী গুঁড়া করিয়া রাখিতে পারে না, গন্ধে সকলে টের পায়। মাথায় তেল মাখিয়া গামছা হাতে কলসী কাঁখে তিনজনে সেই সুধা-চূর্ণটুকু লইয়া কাড়াকাড়ি বাধায়।

বড়-বৌ বলে, আমি বড়, আমায় একটু বেশী দিতে হয়।

ছোট-বৌ বলে, তা কেন? আমি ছোট, আমিই তো পাব; মাছ, দুধ সব আমায় বেশী দাও ছোট বলে, এর বেলা কম নেব না।

মেজ-বৌ গৃহিণীর মত জবাব দেয়, আমি যে মাষ্টার, তোমাদের হাতে ধরে শেখালাম, গুরুর চেয়ে দড় হতে চাও না কি? সে হবে না।

তেঁতুলতলায় বর্ষা-বন্যায় জল ঢেউ খেলিতেছে। কাঠের তক্তা দিয়া ঘাট পাতা। নির্জ্জন ছায়াস্নিগ্ধ ঘাট, তিনজনে পাতার গুঁড়া দাঁতে দিয়া গিন্নীদের মত মুখ টিপিয়া বসিয়া কলসী মাজিতে মাজিতে কথাবার্ত্তা বলে। তেঁতুলতলা হইতে হাত পঁচিশেক দূরে দত্তদের আমতলায় তাহাদের ঘাট। এই দত্তদের মেজবাবুর সঙ্গে বিশ্বাসদের মেজ-বৌয়ের সেজ বোন গিরিবালার বিয়ে হইয়াছে। এ দিক্টা দুই বাড়ীরই পাশের দিক্। সদর দক্ষিণ দিকে, আর এটা পশ্চিম দিকে—দুই বাড়ীরই খিড়কী-ঘাটের মত। দত্তদের বাড়ী চার বৌ, তারাও ঠিক এই সময়ে স্নান করিতে আসে। দত্ত-বাড়ীর পরে মিস্ত্রীদের তিনখানা বাড়ী, এদিকে বিশ্বাসদের বাড়ীর পরে পালবাড়ী। সমস্ত বৌ-ঝিদের দেখা-শোনা আলাপের সময় এই।

গিরি সাঁতার দিয়া এ ঘাটে আসে, বলে, বড়দি এনেছ?

বড়-বৌ আঁচল খুলিয়া কাগজে মোড়া একটু পাতার গুঁড়া বাহির করিয়া দেয়।

মেজ-বৌ বলে, দত্ত-গিন্নী টের পেলে ঝাঁটা—

গিরি মন দিয়া গুঁড়াটুকু দাঁতে দিতে দিতে বলে, তোমার শাশুড়ীর মত কি আমার শাশুড়ী? হাজার অন্যায় করলেও দু'একটা কথার বেশী বলেন না—

মেজ-বৌ বলে, তা সত্যি বলেছিস, এমনটি আর নেই।

জল তোলপাড় করিয়া সকলে স্নান করে। স্নিগ্ধ জল, মাঝে মাঝে গাছের পাতার ফাঁকে রৌদ্র আসিয়া জলে পড়িয়াছে। এ ঘাটের ঢেউ ও ঘাটে গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, জল ছাড়িয়া উঠিতে ইচ্ছা হয় না।

দুপুরবেলা রান্নাঘরের পিছনে পাটি পাতিয়া বসিয়া বড়-বৌ জল দেখে। কাল যেখানটায় চিহ্ন দিয়া রাখিয়াছে, আজ তার চেয়ে জল বেশী হইয়াছে। তা যতই হউক,

তাহাদের এ জায়গাটুকু ডোবে না কোনদিন। ঘরের সামনে উঁচু। মেজ-বৌ বই পড়ে, কাঁথা সেলাই করে। ছোট-বৌ লঙ্কা ভাজিয়া গুঁড়া করিয়া লবণ মিশাইয়া রাখিয়াছে। সেই কৌটাটা ও ছুরি-বঁটি লইয়া ব্যস্ত, একদণ্ড সুস্থির হইয়া বসে না। এ গাছ ও গাছ হইতে কাঁচা আম পাড়িয়া পাড়িয়া নুণ-লঙ্কার গুঁড়া দিয়া তিনজনে মিলিয়া খায়। আষাঢ় মাসে গাছে বড় কাঁচা আম থাকে না। সবই পাকে। কাজেই অনেক খুঁজিতে হয়।

বাঁশবনের কিনারা দিয়া ছোট ডিঙ্গি-নৌকাগুলি যাতায়াত করে, তাহারা দেখে, কিন্তু বাহির হইতে তাহাদের দেখা যায় না। নির্জ্জন দুপুরবেলা। দূরে একটা গাছে চিল সকরুণ সুরে থাকিয়া থাকিয়া ডাকে, মাথার উপরে ঘুঘু তেমনই লুকাইয়া থাকিয়া অলস করুণ সুরে ডাকিয়া ডাকিয়া বলে, ঠাকুর-গোপাল ওঠ—ওঠ—ওঠ—

বড়-বৌয়ের মনে হয় ঠাকুর-গোপাল বুঝি একটু সজাগ হইয়াছেন, দুঃখ? না, আজ তার দুঃখ নাই। দিনগুলি কেমন সহজ ভাবে বহিয়া যাইতেছে, বাড়ীতে পূজার জন্য আলাদা ঘর নাই—এক মণ্ডপ-ঘর, তা সেই বাহিরে। ঢেঁকি-ঘরের একপাশে খান দুই চাটাই দিয়া নিজেই বড়-বৌ ঘিরিয়া লইয়াছে। রাত্রি থাকিতে উঠিয়া এইখানে জপ করিতে বসে। ভোর হইলে কাজে হাত দেয়। তারপরে ফুল তুলিয়া, দুর্ব্বা-তুলসী তুলিয়া, চন্দন ঘসিয়া রাখে। সকলের খাওয়া হইলে পূজা করে। শেষে তিন যা'য়ে একত্র খায়। রাত্রে পঞ্চমী বা মেজ-বৌ রাঁধে, সে জপ সারিয়া লয়। কোন লাঞ্ছনা বা তিরস্কার আর যেন তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না।

পূবপাড়ায় গায়ে-হলুদের নিমন্ত্রণ। রায়-বাড়ী ও দে-বাড়ীর বৌ-মেয়েরা যাইবার পথে বিশ্বাস-বাড়ী আসিল। একসঙ্গে সকলে যাইবে

বড়-বৌ বলিল, খালি বাড়ী ফেলে আমি যাব না ভাই। নিরুরা যাবে।

'সে হয় না, খুড়ীমা রইলেন। কতক্ষণ লাগবে? তুমিও চল, নইলে মেজ-বৌদিরাও যাবে না। দাঁড়াও বড়-দাকে বলে দি—'

কুঞ্জ রায়ের বড় মেয়ে সরসী বিশালকে গিয়া বলিল। বিশাল ভ্রূ বাঁকাইয়া বলিল, তা যাবে কেন? ওর সব একগুঁয়ে সৃষ্টিছাড়া। সে বার দশ দিন জ্বরে দাঁত-কপাটি লেগে রইল, শশী কাকার মা দিনরাত থাকতেন, নইলে তো গেছলো জন্মের মতন, আজ তাঁর মেয়ের গায়ে হলুদ ও যাবে না! না যদি যায়—

অগত্যা বড়-বৌকে যাইতে হইল। তাহার কোথাও যাওয়া শাশুড়ী সহিতে পারেন না বলিয়াই সে আপত্তি করিয়াছিল, আর সাজসজ্জা করিয়া কোথায়ও যাইবার প্রবৃত্তিই তাহার নাই।

চুল আঁচড়াইয়া জড়াইয়া বাঁধিয়া বড়-বৌ বাহির হইতেছে। দেখিয়া সরসী বলিল, কাপড় ছাড়লে না?

'এ কাপড় আজই ক্ষার কেচেছি।'

'ছি ঐ পরে যাবে? দেখি।' সরসী বড়-বৌয়ের বাক্স খুলিয়া দেখিল, বাক্সে কিছুই প্রায় নাই। খানকয়েক পুরান কাপড়ের নীচে একখানা বাপের বাড়ীর দেওয়া সেকেলে ময়ূরকণ্ঠী রঙের চিকণ-পাড় তসর রহিয়াছে। প্রথম বধূ-জীবনে মাঝে মাঝে এখানা সে পরিত। সরসী কাপড়খানা বাহির করিয়া জোর করিয়া বড়-বৌকে পরাইয়া দিল, বলিল, তোমার পছন্দ নেই না কি? তোমার মতন সুন্দর হলে গরবে আমরা মাটীতে পা ফেলতাম না। দেখ দেখি কেমন মানিয়েছে! চট্ করে সিঁদুর পরে নাও। আমি মেজ-বৌদিকে নিয়ে আসি, সে তোমার মতন নয়, দিব্যি সাজ করে—

কাপড়খানায় পুরাতন একটি মৃদু অতি-প্রিয় সৌরভ জড়ান, বড়-বৌকে যেন জড়াইয়া ধরিয়াছে। সিঁদুর পরিতে পরিতে বহুদিনের হারান সুখের স্মৃতিগুলি এলোমেলো অস্পষ্ট ভাবে মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিতে চায় যেন, চেনা কিন্তু চিনিতে পারা যায় না, বহু দূরের বাঁশীর সুরের মত।

'কই, বড়-বৌদি—'

ঘোমটা টানিয়া দিয়া বড়-বৌ বাহির হইয়া আসিল। বিশাল সেই সময় ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বড়-বৌয়ের দিকে চাহিল। বড়-বৌ বাহির হইয়া গেলেও বক্র চোখ ভ্রূকুটি করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। উঠানে দুই বাড়ীর মেয়েরা রহিয়াছে। বাধ্য হইয়াই মুখের কথা সংবরণ করিয়া লইতে হইল।

সরসীর চোখে ধুলা দেওয়া সহজ নয়। সে এ বাড়ীর সবই জানে। নৌকায় উঠিয়া সে বলিল, বড়দাটা কি কাট-খোট্টা! এই শাড়ীখানি পরে বৌদিকে যা দেখাচ্ছে, তা ওঁর চোখে পড়ল না। উল্টে আবার চোখ রাঙ্গালে।

মেজ-বৌ বলিল, দিদি এত সুন্দর বলেই অমন। মা বলেন, মেয়ে মানুষের বেশী রূপ সয় না।

বড়-বৌ কোন কথায় ভ্রূক্ষেপ করে না। সব তার সহিয়া গিয়াছে।

বাঁশতলায় প্রতিদিনই নিয়ম-মত সভা বসে, কিন্তু কাঁথা সেলাই সে আজ-কাল করে না, রামায়ণ পড়ে, আর না হয় তো জলের দিকে চাহিয়া সব ভুলিয়া বসিয়া থাকে।

পঞ্চমী বলে, দিদি গান গাইব একটা? ভারি গান গাইতে ইচ্ছে হচ্ছে। আমি অনেক গান জানি—

'হ্যাঁ, তা হলেই হয়, মা এবার গলা টিপে মেরেই ফেলবে। আমাদের শুনিয়ে কাজ নেই, ঠাকুর-পোকে শোনাস্— '

'তা শুনিয়েছি—'

'সে কি রে? কবে? তুই তো কম নোস!'

'আমার দোষ বুঝি? মা ওকে বলেছিল আমি গান গাইতে জানি। রোজ আমায় বলে, সে দিন—এই পূর্ণিমার দিন অনেক রাত্রে চুপে চুপে উঠে নৌকা করে আমায় নিয়ে গেল অনেক দূর—মিরপুরের মাঠে। সেখানে গিয়ে শুনিয়েছিলাম।' বলিয়া পঞ্চমী হাসিতে লাগিল।

'বাবা, এ যে আমাকেও ছাড়িয়ে গেলি। শুনলে বড়দি?'

বর্ষার মাঝামাঝি, কৃষ্ণধন বিছানায় পড়িলেন। ব্যারাম অনেক-গুলি, সবগুলিই জোর করিল। কবিরাজ দেখিতে লাগিল বটে, কিন্তু ভরসা দিলেন না। পরশমণি স্বামীর ঘর ছাড়িয়া একেবারে বিশালের ঘরে বাসা লইলেন।

বড়-বৌ জাগিয়া উঠিল, যেন তন্দ্রার ঘোর ভাঙ্গিল। কাজ তাহাকে ডাক দিয়াছে। সংসার দুই জায়ের হাতে ফেলিয়া দিয়া শ্বশুরকে লইয়া রহিল। এবার তাহার মনে হইল এইটিই যেন তার ন্যায্য কাজ, গৃহত্যাগিনী বধূ সে, তাও লোক জানিয়াছে,—গোস্বামী দেখিতে পাইয়া ফিরাইয়া আনিয়াছেন। বজ্রিবন্দীর কথা বাড়ীর লোক দূরে থাক, পাড়ার অনেকেই বিশ্বাস করে নাই। বড়-বৌয়ের কথা লইয়া আন্দোলন আজও চলে। তবে পাড়ার লোকের সহানুভূতি আছে, তারা বলে, গিয়েছিল বেশ করেছিল। অত অত্যাচার ও বলে সইছে, আর কেউ হলে কোন দিন বাড়ী-ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে চলে যেত। এই রকম অনেক সুন্দরী কত শাশুড়ী-স্বামীর লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সইতে না পারিয়া কুলত্যাগ করিয়া গিয়াছে। এখন তাদের সুখের সীমা নাই। দ্বিতল, ত্রিতল বাড়ী, গাড়ী, গহনা, দরোয়ান, কত কি! নাম বদলাইয়া ফেলিয়াছে নিজেদেরই স্বামী-দেওর হয় তো বিখ্যাত বারনারী ভাবিয়া দরজায় মাথা গলাইতে গিয়া দরোয়ানের ধাক্কা খাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহাকেই বলে প্রকৃতির প্রতিশোধ। বড়-বৌ নেহাত বোকা, ঝাঁটা লাথি খাইতে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। আর বড়-বৌয়ের মতন দুরদৃষ্ট খুব কম দেখা যায়, বৌদের শ্বশুর-শাশুড়ী, দেওর, যা-ননদ যতই অত্যাচার করুক না কেন, স্বামীর ভালবাসাটুকু থাকে, তা সে যতই গোপন হোক। কিন্তু, বড়-বৌয়ের সব উল্টা। স্বামীই তার কাল, তার সমস্ত দুঃখের কারণ।

ইহাই পাড়া-পড়শীর আলোচনার ধরণ।

সংসারে বিশৃঙ্খলা ঘটিল। মেজ-বৌ সূতিকা-রোগিণী, বেশী পরিশ্রমে রোগ বাড়িল। একা পঞ্চমীর হাতে সংসার, কিন্তু বড়-বৌ আর ফিরিয়াও চাহিয়া দেখে না, দিন-রাত্র শ্বশুরের সেবায় মন ঢালিয়া দিয়াছে। তাহার তিন বারের পূজা-জপ-ধ্যান এখন মাত্র ইষ্টমন্ত্র-জপে দাঁড়াইল।

পরশমণি পাড়ায় বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, ও আবাগীর চালাকি তোমরা বুঝবে কি? বুড়োর কোমরের চাবির লোভ, সব ওকেই দেবে ভেবেছে। বুড়ো শক্ত কাঠি, আমি জানতে পারলাম না কোন দিন যে, কোথায় কি আছে—আর-ও, হুঁ—ও আশায় ছাই, বাসী উনুনের ছাই।

সকাল হইতে রাত্রি, রাত্রি হইতে ভোর, বড়-বৌ রোগীর কাছে। কৃষ্ণধনের মেজাজ আরও চড়া, সব সময় বিশ্রী গালাগালি করিতেছেন। কখনও খাবার বাটী

ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেন, বলেন, তোমার হাতে খাব না, তুমি নিকে করতে গিছিলে, আমার জাত যাবে।

বড়-বৌ আবার নূতন করিয়া পথ্য তৈয়ারী করিয়া করিয়া আনিয়া মুখের কাছে ধরে, বলে, রোগা মানুষের বিচার করতে নেই, ওতে রোগ বাড়ে। সেরে উঠলে গঙ্গা-স্নান করে আসবেন, শুদ্ধ হবেন।

'গঙ্গা-স্নান! গঙ্গা-স্নান অমনি মুখের কথা কি না? এক কাঁড়ি টাকা লাগবে না?'

'সে আপনি ভাববেন না, আমি যোগাড় করে দেব, এখন খান।'

'আচ্ছা, তা হলে দাও—খাই, আর কে দেবে? কেউ এ ধারে আসে না, তুমি, তুমি ছাড়া গতি নেই যখন। দাও, কিন্তু গঙ্গা-স্নানের খরচটা দিও বুঝলে? ভুলো না যেন।'

'না, ভুলব না। আপনি ঘুমোন একটু, পা টিপে দিচ্ছি।'

পরশমণি হয় ত ঘরের সামনে দিয়া যাইতে যাইতে কথাগুলা শুনিয়াছিলেন, চেঁচাইয়া বাড়ী মাথায় করিলেন, দেখ দেখ, তোমাদের সতীলক্ষ্মী বৌয়ের কথা শোন, আমি মন্দ, আমি দোষী! এই যে নিজের মুখে নিজের গুণের কথা শ্বশুরকে শোনান হচ্ছে, মরণ! মরণ! পোড়া-মুখী অমর হয়ে জন্মেছে! এত দিন বলে বিবি শানকীতে করে মাদুরে বসে কাবাব খেত, তা গোঁসাই হতে দিলে না, নিয়ে এল পথে থেকে ধরে। তা স্বভাব যাবে কোথা, ও আবার বেক্কল বলে, দেখ তোমরা তখন, দেখে নিয়ো। ওর পেটে পেটে বজ্জাতি, আমি পরশমণি বুঝতে পারি নি?

পাড়ার লোক সর্ব্বদা দেখিতে আসে। ছেলেরা ডাক্তারের পর ডাক্তার, কবিরাজের পর কবিরাজ বদল করিতে লাগিল। পরশমণি বলেন, যেন রাজযজ্ঞি চলেছে, ডাক্তার কবিরাজ দেখলেই কি ব্যারাম সারবে? এই যে আবার অম্বলের ব্যথা, কোন হতচ্ছাড়া ডাক্তার সারাতে পেরেছে, শুধু হাত পেতে টাকা নেবার যম! ও সব ঝেঁটিয়ে বিদায় কর।

শুনিয়া রোগশয্যা হইতে কর্ত্তা বলিয়া উঠিলেন, আঃ ঐ আপদটাকে কেউ ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে পার তোমরা কেউ? তা হলে আমার অসুখ এমনিতেই সেরে যায়।

[১১]

'প্রিয়ে, এই চরণে তোমার—'

বৈধব্য-দশা পরশমণিকে কিছু মাত্র কাতর করিতে পারিল না। সাদা থান পরিয়া তিনি এখন অতিমাত্রায় শুদ্ধাচারী, ডিঙ্গাইয়া ডিঙ্গাইয়া হাটেন। আলাদা নিরামিষ ঘর একটা তাঁহার জন্য উঠিয়াছে। মেজ-বৌ কি ছোট-বৌ সেখানে রাঁধে। বড়-বৌ-এর হাতে খাওয়া ছাড়িয়াছেন। ঐ 'নিকের বিবি'র হাতে জল খাইয়া পরকাল নষ্ট করিতে পারিবেন না।

শীত পড়িয়াছে, শীতের বেলায় অবসর মেলে না। সমস্ত শস্য একটার পর একটা করিয়া আসিতে থাকে, দুই ভাইয়ের পরিশ্রমে জমিতে সোনা ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। বড়-বৌ শস্যাদি ঝাড়া, বাছা, তোলা, ধান-সিদ্ধ, ধান-ভানা, কলাই-ভানা, তিল কুটিয়া তেল তৈয়ারী করা, এই সব কাজ লইয়াই থাকে, তাহার আজ-কাল নিশ্বাস ফেলিবার সময়ও হয় না। পরশমণি ভোরে উঠিয়া নাতি-নাতনী একটিকে কোলে লইয়া সকালে পাড়ায় বাহির হন, দুপুর বেলা ফিরিয়া স্নানাহার করেন, তারপর একটু গড়াইয়া উঠিয়া আবার যে যান, ফেরেন সন্ধ্যার পরে।

সমস্ত কাঞ্চনপুরটা তাঁহার নখ-দর্পণে।

রান্নাঘরের বারান্দায় তিন ভাই খাইতে বসিয়াছে। ছোট-বৌ পরিবেশন করিতেছে। মেজ-বৌ নিরামিষ-ঘরে শাশুড়ীর জল-খাবার গুছাইতেছে। উঠানে উনান জ্বালিয়া বড়-বৌ ধান-সিদ্ধ চড়াইয়া পান সাজিতেছিল। নিরামিষ-ঘরের বারান্দার কিনারে একটা কেরোসিনের কুপি, সেই আলোতে বড়-বৌ কাজ করিতেছিল। পান সাজিতে সাজিতে একবার একবার উনানের জাল ঠেলিয়া দেয়, রান্নাঘরের দিকে একটু পাশ ফেরার, মুখের একটা পাশ দেখা যায়—রুক্ষ চুলের ভার, যেন মেঘের মত, নামিয়া কপালের পাশ, চোখের কিনারা ও গালের

অর্দ্ধেকটা ঢাকা। শান্ত বিষণ্ণ বড় বড় দুটি কালো চোখের পল্লব একবার হাতের দিকে আর একবার উনানের দিকে উঠা-নামা করিতেছে। খোঁপার উপরে কাপড়টা অনেকখানি ছেঁড়া।

বিশাল বার কয়েক চাহিয়া দেখিল, বিশাল যেন একটু অন্যমনস্ক। সুখেন ও শ্যামল কি বলিতেছিল, বার দুই তাহাকে কে জিজ্ঞাসাও করিল, কিন্তু কোন উত্তর পাইল না। দুধের বাটীটা না ছুঁইয়াই শেষে বিশাল উঠিয়া পড়িল

শ্যামল বলিল, ও কি দাদা? দুধ খেলেন না?

বিশাল একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, ওঃ—না, একটু সর্দ্দির মত হয়েছে দুধ খেলাম না তাই—

সুখেন বলিল, বড়-বৌ একটু সরষের তেল গরম করে দাদার পায়ে দিয়ে দাও গে, ঠাণ্ডাটা বেশী পড়েছে। ফাল্গুন মাস এল, তবু যেন শীত বেড়েই চলেছে।

মুখ ধুইয়া বিশাল নিজের ঘরে চলিয়া গেল। সিদ্ধ ধান ঝুড়িতে ঢালিয়া বড়-বৌ রান্না-ঘরে আসিল। খাওয়া-দাওয়া মিটিলে হাত-পা ধুইয়া যে যাহার ঘরে যাইবার সময় মেজ-বৌ বলিল, দিদি তেল নিয়ে যাও—

'কিসের তেল?'

'শোন নি? বটঠাকুরের সর্দ্দি হয়েছে, তাঁর পায়ে একটু তেল দিয়ে দাও গে—'

'আমি?' বড়-বৌ আজকাল একটু উদাসীন হইয়াছে, সব কথা শুনিলেও বোঝে না। আপন মনে কাজ-কর্ম্ম লইয়াই কাটায়। অনেক কথা দু' তিনবার বলিলে তবে খেয়াল করে। সুখেনের কথা বুঝিতে পারে নাই। আর পারিলেই বা কি, সাধ্য-পক্ষে সে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারের দিকে থাকে না, রান্না করা প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছে। নেহাৎ ঠেকা হইলে রাঁধে, সে দিন বিশাল মায়ের নিরামিষ-ঘরে খায়। অনেক সময় বিশালের মনে না থাকিলেও পরশমণি মনে করাইয়া দেন। বড়-বৌকে রান্না-ঘরে দেখিলেই এমন চীৎকার ছাড়েন যে, সকলে লজ্জায় ব্যস্ত হইয়া উঠে। আর, রান্নার কাজে বড়-বৌ থাকিলে ক্ষেত-খামারের ভারি ভারি কাজগুলি কে করিবে?

'বিবি বুঝি এই ঘাড়ে তিনজন লোকের চাল সিদ্ধ করে সারাদিন বাঁশ-ঝাড়ের তলায় খেমটা নাচবেন'?

রান্নার দিকে থাকিলে যতটুকু কাজ,—সে ঘরের মধ্যেই। আর, বাহিরের কাজে রৌদ্রে বৃষ্টিতে সমানে ঘুরিয়া ফিরিয়া পরিশ্রম। কাজেই, বড়-বৌকে এই কাজ দেওয়াই চাই। আর, বড়-বৌয়েরও তাহাতে আপত্তি নাই। রাঁধিয়া সকলকে খাওয়াইতে তাহার যেন একটা বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গিয়াছে। কাজেই, বাহিরের এই সব কাজ লইয়া নীরবে সে এক রকম ভালই থাকে।

'আমি?' বলিতে বলিতে বড়-বৌয়ের চোখে যে বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, মেজ-বৌ তাহা দেখিয়া বলিল, হাঁ, তোমাকেই দিতে হবে, আমরা তো পারব না, নইলে দিয়ে আসতাম।

একবার কি বলিতে গিয়া বড়-বৌ থামিল। তারপরে নিরুত্তরে তেলের বাটী হাতে লইয়া নিজের ঘরে গেল। কাপড় ছাড়িয়া দরজা বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া এক মুহূর্ত্ত ভাবিল, সেই ঘটনার পর হইতে বিশালকে সে স্পর্শ করে নাই। পঞ্চমী যথারীতি ডিবাভরা পান ও খাবার জল রাখিয়া গিয়াছে, এ ঘরে আজ-কাল খাবার জল থাকে না। সর্ব্বপ্রকারে স্বামী তার ছোঁয়া বাঁচাইয়া চলেন। ক্ষণেক ভাবিয়া তেলের বাটি লণ্ঠন রাখিবার টুলটার এক কোণে রাখিয়া দিয়া মেঝেতে নিজের বিছানা পাতিল। পরে বিশালের বিছানার একটু দূরে দাঁড়াইয়া মৃদু স্বরে বলিল, তেলটা জুড়িয়ে যাবে, পায়ে দিয়ে নাও।

এক বছরের বেশী হইবে, স্বামীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বন্ধ, গলার স্বর ভাল ফুটিল না। কি বলিল, কথাটা স্পষ্টও হইল না, সে নিজেই বুঝিল। কিন্তু, দ্বিতীয় বার আর কিছু না বলিয়া ফিরিয়া আসিয়া নিজের কম্বল-শয্যায় শুইয়া পড়িল।

রাত্রি তখন কত ঠিক নাই, দারুণ শীত অনুভব করিয়া বড়-বৌ ঘুম ভাঙ্গিয়া জাগিল। একখানা কাঁথা পাতা, আর একখানা কাঁথা ও একটি কম্বল গায়ে। দুরন্ত শীত মানে না, জড়সড় হইয়া পাশ ফিরিতেই কিসে বাধা পাইয়া চমকিয়া চোখ মেলিল, যাহা দেখিল, বিশ্বাস হইল না, আবার চোখ মুদিল।

চোখে আলোক অনুভব করিয়া আবার চোখ চাহিল, তন্দ্রাঘোর এবার ছুটিয়া গেল, বিশাল পাশে

বসিয়া আনত চোখে তাহারই দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। বিশালেরই আহ্বানে বাধা পাইয়া তাহার ঘুম ছুটিয়া গিয়াছে। তাহাকে চোখ মেলিতে দেখিয়া ধীরে ধীরে বিশাল ডান হাতটি তার রুক্ষ চুলে ভরা মাথার উপরে রাখিল, আর এক হাতে তাহার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া অতি মৃদু বিষণ্ণ সুরে বলিল, বড়-বৌ আমায় মাপ করতে পারবে কি ?

[১২]

'সময়ের নাহি সাধ,

শান্তি আজি বাসনা আমার।'

সংসারের মধ্যে যে দিক্‌টায় পরশমণি একান্ত নিশ্চিন্ত ছিলেন, সেই দিক্‌টাতেই যে এত বড় পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে, ইহা পরশমণির স্বপ্নেরও অগোচর। যে ঘর লোহায় তৈয়ারী বলিয়া তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন, সেই ঘরেই চুরি হইয়া গেল, আরও আশ্চর্য্য যে, তিনি কিছু জানিতেও পারিলেন না। ভিতরে দুর্নিবার স্রোত, উপরে নিস্তরঙ্গ নদীর মত তাঁহার চোখের উপরে পরিবর্ত্তনের প্রবাহ বহিতে লাগিল। প্রদীপের নীচেই সব চেয়ে বেশী অন্ধকার।

বিশালের শরীরটা কিছুদিন হইল ভাল যাইতেছে না, খাইতে বসিয়া অর্দ্ধেক জিনিষ পাতে ফেলিয়া উঠিয়া যায়, কোথায়ও বেড়াইতে যায় না, মাঠে যাতায়াতও কমিয়া গিয়াছে। পরশমণি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, বিশাল তাঁহার প্রিয় সন্তান। আর দুটি তো বৌয়ের পায়ে দাসখত লিখিয়া দিয়াছে, তাহাদের মুখদর্শনেও ইচ্ছা নাই, কিন্তু বিশালের লোহার মত শরীরে এ কি পরিবর্ত্তন! কোন দিন যে তাহার মাথাটিও ধরে না।

কারণ, ঐ ডাইনী, হয়ত গোপনে আবার কি খাওয়াইয়া দিয়াছে! কারণটা মা ছেলের কাছে ভাঙ্গিয়া বলিলেন। বিশাল বলিল, মা কিছুদিন কোথাও ঘুরে আসি, জন্ম থেকে একই জায়গায়, বছরে দু' একদিনও কোথাও গিয়ে থেকেছি কি না সন্দেহ, কয়েক দিন অন্য কোথাও থেকে এলে এ সব সেরে যাবে।

পরশমণি ইহা ভাল বলিয়া বুঝিলেন। বলিলেন, কোথা যাবি ?

'ভেবেছি দিদির কাছে গিয়ে মাস খানেক থাকিগে, বিষমপুর খুব ভাল জায়গা, একেবারে নদীর ওপর বলেই অত ভাল—'

'মোহিনীর কাছে ? তা ভাল, তাই যা, কবে যাবি ?

'কাল সোমবার সকালেই যাব।

মা রাজী হইলেন। মোহিনী বিশালের মাসতুত বোন। তাঁহাদের ছোট্ট সংসার, ছেলে পিলে নাই। অভাবও নাই। এ বাড়ীর নিত্য ঝগড়া ও অশান্তি দেখিয়া মোহিনী আর আসে না। ক্রিয়া-কর্ম্মে আসিলেও এক দিনের বেশী থাকে না।

'দেখ বিশু, তোকেই সব বলি, আর কাকে বলব, কেই বা শুনবে আমার কথা! তিনটেতে মিলে আবার কি যুক্তি পাকাচ্ছে যেন, রাতদিন ফিস্‌ফাস্ আর হাসি, আজকাল যেন বেড়েছে, তোর পান-জল ছোট বিবিই ত' দিচ্ছিল, কদিন ধরে দেখি মেজ-বৌ নিজে পান সেজে রেখে আসে, ঘর গুছিয়ে দিয়ে যায়, দিন কতক তুই অন্য কোথাও থাকগে যা, সেই ভাল—'

'ও সব এসে ঠিক করব মা—তুমি ভেব না।'

পরের দিন বিশাল যাত্রা করিল। মোহিনীর বাড়ী মাইল বার দূর। মাঝখানে শ্যামলের শ্বশুর-বাড়ী পড়ে, সেখানে বিশ্রাম করিয়া পরদিন বিষমপুর পৌছিবে, তাহা হইলে পথশ্রমে কষ্ট হইবে না।

বিশাল যাইবার দিন চারেক পরে একদিন সকালে মোহিনীর স্বামী ডুলি-বাহক লইয়া আসিয়া উপস্থিত! জামাই দেখিয়া পরশমণির মাথায় কাপড় উঠিল, দারুণ আশঙ্কাও হইল, বলিলেন, কি খবর ?

'খবর ভাল, বিশালকে ডাক্তার দেখিয়েছি। ভাল ডাক্তার আমাদের ওখানে আছে, মেডিক্যাল কলেজের পাশ-করা ডাক্তার। তিনি বলিলেন, খুব যত্ন করবে, আর পথ্য ওষুধ সব ফর্দ্দ গেঁথে দিয়েছেন, তার একচুল এদিক্-ওদিক্ হবার যো নেই, ভীষণ রেগে যাবেন, আর রোগী দেখবেন না। তা আপনার মেয়ে দিন-রাত্রি বিশুকে নিয়েই আছে, তার ঘরের বারান্দায় উনুন করে নিয়েছে, নিজে সব তৈরি করে, কারও সেদিকে যাবার যো নেই। কিন্তু, এদিকে আমরা না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছি, আমি

আমার ছোট ভাইপো ছুটো, রাখালটা, আমাদের নিরুপায়। এ তিন দিন আমিই রেঁধে চালিয়েছি, আর পারি নে। বিশু বললে, তুমি যাও, মাকে বলগে, বড়-বৌকে পাঠিয়ে দিলে তোমাদের খাবার কষ্টটা হবে না। মা যা বলেন, তাই ক'রো। এখন আপনি যা বলেন।'

এমন যে মায়ের অনুগত ছেলে, তাহার কথায় মা কি অরাজী হইতে পারেন? অত্যন্ত সহজে সম্মতি দিয়া বলিলেন, তা তুমি নিয়ে যাও, বিশু বাড়ী নেই, বিবি পাটে বসেছেন। সকালে দশটার আগে ওঁর জপ সারা হয় না, সন্ধ্যেয় বসেন, ওঠেন সেই রাত্তির নটায়। ঢং দেখে অরুচি ধরে গেছে, বাবা। এখন দিন কতক তোমরা দেখ, তবে একটা কথা, ওর হাতের কিছু বিশু যেন না খায়।

'আজ্ঞে না, সে কি করে হবে? আপনাদের মেয়েই সব করছেন, তিনি সে ঘরে ঢুকতেই দেবেন না। ইনি সংসার দেখবেন, আর আমাদের দুটো দুটো রেঁধে খাওয়াবেন।'

'আচ্ছা, আর দেখ, তোমরা তো ক্ষেত-খামারের কাজ মানুষ রেখে করিয়ে নাও, বারমেসে ধান-ভানুনীও তোমাদের আছে, এখন তা ক'র না, (একটু নিম্নস্বরে) ও সব কাজ জানে, এই এ বাড়ীর মানুষ তো কম নয় দেখছ, সব ধান ওরাই ভানে, সেদ্ধ, শুকনো অবধি, ঝাঁট-পাট, গোয়াল-গোবর সব। ও সবই তোমার ওখানে করিয়ো। কাজের মধ্যে যদি না রাখ, একদিন পালিয়ে যাবে, সেই সে বারের মত, তোমাদেরই কলঙ্ক হবে। আর, ওখানে গিয়ে যদি বসে থাকে, এখানে ফিরে এলে আর কি কাজে মন যাবে? বোঝা-বওয়া ঘোড়াগুলো দেখ না, দুদিন বসে রইল কি বেতো হয়ে গেল।'

পরশমণি ভাল করিয়া সমস্ত কথা জামাতাকে বুঝাইয়া বলিলেন। জামাতাও সব শুনিয়া হুঁসিয়ার হইয়া সে বেলাটা থাকিয়া দুপুর না শেষ হইতেই বড়-বৌকে লইয়া রওনা হইয়া গেলেন। স্বীকার করিয়া গেলেন, সপ্তাহে দু'খানা করিয়া চিঠি দিবেন। বিশালের অসুখটা পরে কঠিন আমাশায় দাঁড়াইতে পারে, ডাক্তার এইরূপ বলিয়াছেন। সুতরাং যত্নের ত্রুটি হওয়া চলিবে না, এ কথাও বেশ করিয়া পরশমণিকে বুঝাইয়া গেলেন।

[ক্রমশঃ

তমসো মা জ্যোতির্গময়

-শ্রীআশুতোষ সান্যাল

সেই কবে আর্য্যঋষি আলোকের লাগি
পুণ্যময় তপোবন-উটজ-অঙ্গনে—
ফিরেছিল নম্রশিরে কত ভিক্ষা মাগি,
বিশ্ব-বিধাতার পদে—তৃষাতুর মনে!
হয়তো দ্যুলোক-দ্যুতি ক্ষণিকের তরে
তড়িতের লেখাসম উঠিয়া প্রস্ফুরি—
গিয়াছে ঝলকি তার আঁখির উপরে,
দেখাইয়া অপরূপ অ লোক-মা
রহস্য-সঙ্কুল! সেই তপোবনচ্ছায়া—
স্নিগ্ধশুচি হবির্গন্ধ—মন্ত্রগুঞ্জরণ—
কোথায় মিলায়ে গেছে, যেন কোন্ মায়া!
তবুও থামে নি হায়, আত্মার ক্রন্দন
সে আলোক-শিখা লাগি। কবে, কতদিনে
পরম সে প্রভাতিরে লব মোরা চিনে!

বিষ্ণুপুরের প্রত্নকলাকীর্ত্তি

—শ্রীযামিনীকান্ত সেন

গত জানুয়ারী মাসের ২৯শে তারিখ হইতে কয়দিন বাঁকুড়া জিলার বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের ষট্‌ত্রিংশ অধিবেশন হইয়া



দলমাদল কামান।

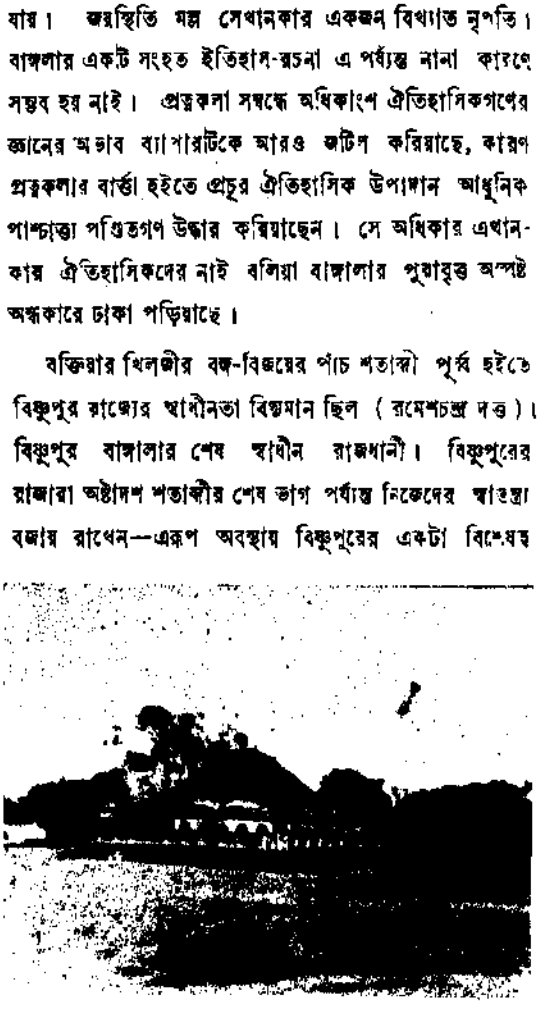
গিয়াছে। বাঙ্গালার রাজনৈতিক ইতিহাসে বিষ্ণুপুর অমর-কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে। ইহার স্থাপত্য ইত্যাদি বিভিন্ন শিল্পেরও মূল্য আছে। এই প্রবন্ধে তাহার সামান্য পরিচয় দিবার চেষ্টা করা হইল।

বিষ্ণুপুরের ঐশ্বর্য্য অনুভব করা আধুনিক যুগে দুঃসাধ্য হইয়াছে। ভারতের বিখ্যাত কয়েকটি অভ্রভেদী মন্দির ও মসজিদ সৌন্দর্য্য-সেবকগণের মনোযোগ এমন ভাবে আকর্ষণ করিয়াছে যে, আর কোথাও তাহা নিবিষ্ট হইতে চায় না। বিশেষতঃ, বাঙ্গালাদেশের দুর্গম জঙ্গল ও পাহাড়ের ভিতর নিমজ্জিত সৌধশ্রেণী ইদানীং একেবারে লোকের অন্তর হইতে মুছিয়া গিয়াছে। বিষ্ণুপুরের ও গৌড়ের সৌধকলা ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পের ক্ষেত্রে কিরূপ মহার্ঘ্য দান, তাহা অতি সামান্য ভাবেই ইদানীং অনুভূত হয়।

বিষ্ণুপুরে হিন্দু-রাজগণের মহিমা প্রচুর ভাবে প্রসারিত হয়। গৌড়ে মুসলমান বাদসাহগণও বাঙ্গলার সভ্যতা ও শীলতার বিশিষ্টভাবে আপ্লুত হন। এ জন্য এই দুইটি জায়গায় দেখা যাইবে, বাঙ্গালার অফুরন্ত ও বিচিত্র সৌন্দর্য্য-পুলকের অজস্র বার্ত্তা। ভারতের আর কোথাও এই বার্ত্তা লক্ষ্য করা সম্ভব হয় না।

বিষ্ণুপুর রাজ্যের মল্লরাজগণ ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। "মল্লরাজ", এই নাম নেপালের ইতিহাসেও পাওয়া যায়। জয়স্থিতি মল্ল সেখানকার একজন বিখ্যাত নৃপতি। বাঙ্গলার একটি সংহত ইতিহাস-রচনা এ পর্য্যন্ত নানা কারণে সম্ভব হয় নাই। প্রত্নকলা সম্বন্ধে অধিকাংশ ঐতিহাসিকগণের জ্ঞানের অভাব ব্যাপারটিকে আরও জটিল করিয়াছে, কারণ প্রত্নকলার বার্ত্তা হইতে প্রচুর ঐতিহাসিক উপাদান আধুনিক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ উদ্ধার করিয়াছেন। সে অধিকার এখানকার ঐতিহাসিকদের নাই বলিয়া বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত অস্পষ্ট অন্ধকারে ঢাকা পড়িয়াছে।

বক্তিয়ার খিলজীর বঙ্গ-বিজয়ের পাঁচ শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে বিষ্ণুপুর রাজ্যের স্বাধীনতা বিদ্যমান ছিল (রমেশচন্দ্র দত্ত)। বিষ্ণুপুর বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন রাজধানী। বিষ্ণুপুরের রাজারা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখেন—এরূপ অবস্থায় বিষ্ণুপুরের একটা বিশেষত্ব



রাধা-মঞ্চ।

আছে। মুসলমান ও অন্যান্য হিন্দু-রাজগণের সহিত সকল সংগ্রামে বিষ্ণুপুরের কীর্ত্তি উজ্জ্বল। কিন্তু, সে দিন চলিয়া

গিয়াছে। আধুনিক যুগে প্রাচীন বিষ্ণুপুরের বহু অংশ অরণ্যে আচ্ছন্ন।



মদনমোহন-মন্দির।

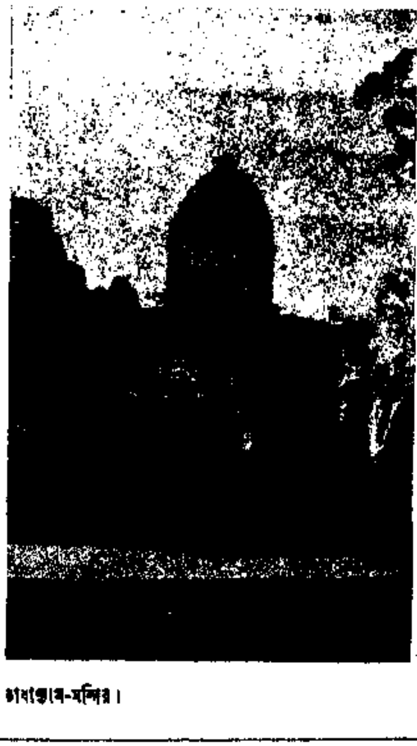
সম্প্রতি এ অঞ্চল বাঁকুড়ার একটা মহকুমা মাত্র। জনসংখ্যা প্রায় বিশ হাজার হইলেও ইহাদের দারিদ্র্যের সীমা নাই। বহু শিল্পী বিষ্ণুপুরের আনুকূল্যে এক সময় বর্দ্ধিত হইত। সেদিন চলিয়া গিয়াছে বলিয়াই এ সব কারিগরদের দুঃসহ অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরের তসর ও গরদ এক সময় বিখ্যাত ছিল—বিখ্যাত বেগুনী রঙের পাটশাড়ী এক সময় সমগ্র বাঙ্গালা দেশে ব্যবহৃত হইত। ইদানীং আবার কিছু নূতন সৃষ্টির চেষ্টা হইলেও প্রাচীন ব্যবসার তুলনায় তাহা নগণ্য।

বিষ্ণুপুরের ইতিহাসে বহু বিচিত্র শিল্পকলার প্রসঙ্গ উত্থাপিত করা যাইতে পারে। তবে, সব কিছুই রাহুগ্রস্ত ও স্তিমিতপ্রায় হইয়াছে। তথাপি ইহার ভিতর জীর্ণপ্রায় মন্দিরগুলি এক অপরূপ বার্ত্তা উদ্ঘাটিত করিতেছে। মল্লরাজগণের কীর্ত্তি এই সব মন্দির হইতে যতটা প্রকাশ পাইবে, এমন আর কিছু হইতে নয়। একটি বিশিষ্ট সভ্যতার দান বলিয়াই এই সব রচনা অমূল্য। বৈচিত্র্যে ও অভিনবত্বেও এই সব সৌধ তুলনাহীন।

এখানকার রাজবংশের আদি প্রতিষ্ঠাতা আদিমল্ল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে আদিমল্লের জন্মকাল। তিনি ৩৩ বৎসর রাজত্ব করেন। এই বংশ ক্রমশঃ একটি ব্যাপক রাজমহিমার ধারা সৃষ্টি করে। ৭০৯ খৃষ্টাব্দে আদিমল্ল স্বর্গারোহণ করেন। আদিমল্লের পুত্র জয়মল্ল সিংহাসনে আরোহণ করিয়া প্রদ্যুম্নপুরের রাজাকে পরাজিত করেন। বিষ্ণুপুর সম্বন্ধে বহু লিপিবদ্ধ কাহিনী আছে। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে কৎলু খাঁ বিষ্ণুপুর জয় করেন।*

হলওয়েল বিষ্ণুপুর-রাজবংশ ও রাজ্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিলে সমসাময়িক ভারতে বিষ্ণুপুরের গৌরব ও প্রতিষ্ঠা অনুভব করা যাইবে।†

গৌড়ের স্বাধীনতা লুপ্ত হওয়ার পরও বিষ্ণুপুরের স্বাধীনতা বজায় থাকে।



রাধাশ্যাম-মন্দির।

* Stewart, History of Bengal, p. 192.

† The district produces an annual revenue of between 30 to 40 lakhs. From the happiness of his situation the ruler is perhaps the most independent Rajah of Hindusthan It would almost be cruel to molest th se happy people for in this district are the only vestige of the beauty, purity, regularity, equality and strictness of the ancient Indosthan Government.

বিষ্ণুপুর আদর্শ হিন্দুরাজ্য। বিষ্ণুপুরে চৌর্য্য বা ডাকাতির কথা কখনও শোনা যাইত না। পথিকদের বিনামূল্যে সহযাত্রী দেওয়া হইত। কোন জিনিষ পাওয়া গেলে প্রত্যর্পণের জন্য ঘোষণা করা হইত। এমন করিয়া হিন্দু-রাজত্বের সততা ও স্বচ্ছ ঔদার্য্য বিষ্ণুপুরের দৈনন্দিন জীবন-পরিচালনে নানা ভাবে প্রকাশিত হইত।

বিষ্ণুপুরের প্রাচীন ধর্ম্মে শৈব প্রভাব ছিল বেশী। পরবর্ত্তী যুগে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা প্রচারিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে রাজারা বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। রাজা বীর হাম্বীর (১৫১১-১৫১৬) বৃন্দাবন তীর্থ পর্য্যটন হইতে ফিরিয়া বিষ্ণুপুরের দীঘি-



জোড়াবাঙ্গালা মন্দির।

গুলিকে 'যমুনা', 'কালিন্দী', 'শ্যামকুণ্ড', 'রাধাকুণ্ড' প্রভৃতি নাম দেন। এমন কি, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলিরও 'দ্বারকা', 'বৃন্দাবন' প্রভৃতি নাম দেওয়া হয়। রাজা বীর হাম্বীরই মোগলদের সহিত যোগ দিয়া আফগানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

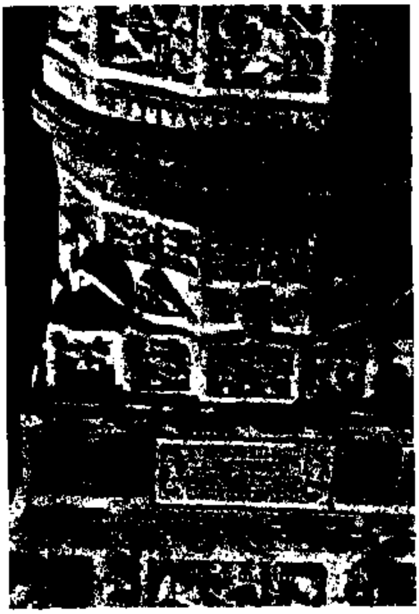
রাজা গোপাল সিংহের রাজত্বকালে বর্গীর আক্রমণ হয়। কিংবদন্তী আছে, মদনমোহন বিগ্রহ হাতে দলমাদল কামান ছুঁড়িয়া শত্রুদের ছত্রভঙ্গ করেন। এই বিগ্রহ চৈতন্য সিংহ কলিকাতার গোকুল মিত্রের নিকট বন্ধক রাখিয়া অর্থ-সংগ্রহ করেন। আত্মীয়দের সঙ্গে মামলা করিতে বহু অর্থ-ব্যয় হয়। মামলায় জয়ী হইলেও বিষ্ণুপুর-রাজ এই ভাবে একটা জমিদারীতে পরিণত হয়। রাজা মাধব সিংহ কোম্পানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া বন্দী হন। মাধব সিংহের পরবর্ত্তীরা গবর্ণমেন্ট হইতে ৪০০৲ হইতে ক্রমশঃ ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত পেন্সন পান। এমন করিয়া বিষ্ণুপুরের রাজত্ব শেষ হয়।

বিষ্ণুপুরের কীর্ত্তি সমগ্র বাঙ্গালা দেশে বিস্তৃত। বিষ্ণুপুরে বাঙ্গালার হিন্দু-সভ্যতার শেষ-চিহ্ন বর্ত্তমান। যুদ্ধ-বিগ্রহ, কলা-কীর্ত্তি সব কিছুর জন্য বিষ্ণুপুর বিখ্যাত। বিষ্ণুপুরের প্রাচীন চিত্রকলা ইদানীং দুর্ল্লভ। এক সময় প্রচুর চিত্রসম্পদ এই জায়গায় পাওয়া যাইত।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, বাঙ্গালার অধ্যাত্ম সৌধ-কলার ঐশ্বর্য্য সুস্পষ্ট হইয়াছে দুইটি জায়গায়—গৌড়ে ও বিষ্ণুপুরে। দুইটি জায়গারই রচনা একান্ত ভাবে বাঙ্গালার আদর্শে। বাঙ্গালার কুটীরের ভঙ্গীকে অবলম্বন করিয়া এই রকমের রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই রীতি ক্রমশঃ বাঙ্গালা দেশ হইতে সমগ্র ভারতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অমৃতসরের শিখদের স্বর্ণ-মন্দিরের শীর্ষদেশে বাঙ্গালার এই আদর্শ দীপ্যমান। কুটীরের বৃত্তাকার চাল চারদিকে অবনত হইয়া এক আশ্চর্য্য রূপকুহক সৃষ্টি করে—যাহাকে বৃত্তাকার বা চক্রাকার বলা চলে না। চক্রের গোলাকার অনেকটা একঘেয়ে—তাহাকে রূপান্তরিত করা দুঃসাধ্য। বস্তুতঃ, জগতের কোন স্থাপত্য-কীর্ত্তিতে বৃত্ত ও কোণের সামঞ্জস্য স্থাপিত করিয়া একটা সুসঙ্গত রূপ সৃষ্ট হইতে পারে নাই। শুধু বাঙ্গালা দেশেই তাহা সম্ভব হইয়াছে। এ জন্য গৌড়ের মসজিদ ও বিষ্ণুপুরের মন্দিরের শোভা অতুলনীয়। গোলাকার মধ্যভাগ—চারি কোণ চাপা—এমন ভাবের সৃষ্টি একটা চমৎকার রূপের সূচনা করিয়াছে, যাহার নূতনত্ব দেখিয়া মন তৃপ্ত হয়। এই জন্যই সমগ্র ভারতে এ রকমের রচনা ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

বিষ্ণুপুরে দেখা যায়, শুধু এক রকমের সৃষ্টি মাত্র নয়—সব সৃষ্টির অতুলনীয় বৈচিত্র্য। এখানকার এক একটি মন্দির এক এক রকমের। শিল্পী যেন অহরহ নূতনত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াও ক্লান্ত হন নাই। বাঙ্গালা দেশের স্বাধীন চিন্তা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়া পুলকিত হয়। একঘেয়ে এক রকমের রচনায় বাঙ্গালী আনন্দ পায় না। এ জন্য গৌড়ের মসজিদগুলি যেমন নানা রকমের ভঙ্গীতে তৈয়ারী—বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলিও সেই

রকম। জোড়া-মন্দির, মদনমোহনের মন্দির, কালাচাঁদ মন্দির প্রভৃতি নানা ভঙ্গীর সৃষ্টি। এর ভিতর মহেশ্বরের মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন।



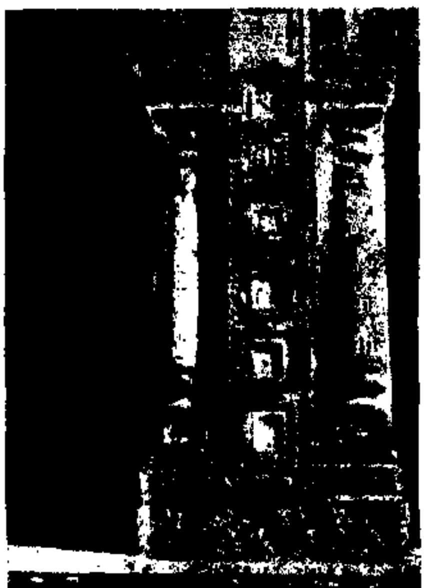
জোড়াবাঙ্গালা মন্দিরের অলঙ্করণ।

বাঙ্গালার সর্ব্বত্র মন্দির-রচনায় এই বৈচিত্র্য লক্ষ্য করার বিষয়। বাঙ্গালার ভাস্কর্য্যেও এই বৈচিত্র্য লক্ষ্য করার বিষয়। তান্ত্রিক মতবাদ অসংখ্য রূপকদম্ব সৃষ্টি করিয়াই পুলকিত হইয়াছে।

জোড়াবাঙ্গালা মন্দির সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে তৈয়ারী হয়। এই মন্দিরের bas-relief অতি অদ্ভুত। যাহারা বলে এখানকার শিল্পীরা অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিত জিনিষ রচনা করিয়া তৃপ্তি পায়, তাহারা জোড়াবাঙ্গালার মূর্ত্তি হিসাবে রচিত নানা দৃশ্য দেখিয়া অবাক্ হইবে। ঘোড়ার চড়িয়া মানুষ চলিয়াছে, এমন দৃশ্য এখানে এমন জীবন্ত ভাবে তৈয়ারী হইয়াছে যে, দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। কোনরূপ কৃত্রিমতা নাই, সব কিছুতেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উদ্ঘাটন করা হইয়াছে। মন্দিরের রচনার বৈচিত্র্য যেমন বাঙ্গালার সভ্যতা ও শীলতাকে (culture) প্রকাশ করে—তেমনই এই সব রচনার বৈচিত্র্যও মুগ্ধকর। মাধুর্য্য, স্বাভাবিকতা, রহস্য ও ঝঙ্কার এই সব লইয়া যেমন গীতগোবিন্দ ও বৈষ্ণব-কাব্য রচিত হইয়াছে, তেমনই মন্দিরকলার বহুমুখী রসনির্ঝরও কল্পিত হইয়াছে।

মল্লরাজা দুর্জ্জন সিং ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে মদনমোহন মন্দির তৈয়ারী করেন। মন্দিরগাত্রের শিলালিপিতে এই মন্দিরকে "সৌধং সুন্দররত্নমন্দিরমিদং" বলা হইয়াছে।

বাঙ্গালা দেশ ভাবের আবেশে আত্মহারা হয়। এই সব মন্দিরের সৃষ্টি-বৈচিত্র্যও এই আবেশ ঘনীভূত করে। এক সময়ে, এক রকমের গতানুগতিক দৃষ্টিতে বাঙ্গালা দেশ আনন্দ পায় না। এই জন্য বাঙ্গালার স্থাপত্য-শিল্প একেবারে স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠ। বস্তুতঃ, বিষ্ণুপুর একটা প্রাচীন হিন্দু-কল্পনার লুপ্ত পুরী। এখানকার সততা, সরলতা ও পবিত্রতা ফরাসী-পরিব্রাজক Abbe Raynalকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। অপর দিকে যুদ্ধ-সমারোহের উপাদান "দলমাদল" কামান ও দুর্গ প্রভৃতিও এ রাজ্যের বিভীষিকাময় সৃষ্টি। সৌন্দর্য্য-রচনার ক্ষেত্রে বিষ্ণুপুরের নানা বিচিত্র মন্দির, রাসমঞ্চ, রাজপ্রাসাদ, দীর্ঘিকা ও চিত্রসমূহ বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠতম সভ্যতার সৃষ্টি। শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের সংস্পর্শে বিষ্ণুপুর অসীম সম্পদের অধিকারী হয়।



জোড়াবাঙ্গালা মন্দিরের অলঙ্করণ।

মন্দিরগাত্রে যুদ্ধবিগ্রহের দৃশ্যাদি হইতে মনে হয়, সেকালে অস্ত্রশস্ত্রের চর্চ্চা ও সমারোহ প্রচুর ভাবে হইত। মন্দিরে এই

সমস্ত সমরায়োজনের সম্ভার ও ঐশ্বর্য্য দেখাইবার কোন সার্থকতা থাকিত না, যদি ক্ষাত্রধর্ম্মের প্রচুর বন্দনায় এক সময় বিষ্ণুপুর রাজ্য ধ্বনিত না হইত। বস্তুতঃ, এ রাজ্যকে নানা সংগ্রামের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে হইয়াছে।

বিষ্ণুপুর স্বাধীন বাঙ্গালার শেষ প্রতীক। বাঙ্গালী স্বাধীন হইলে কি ভাবে রাজ্যশাসন, ধর্ম্মপালন, ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারে, তাহার নিদর্শন এখানে পাওয়া যায়। ইহা বাঙ্গালীর অপূর্ব্ব সৃষ্টি। সে হিসাবে এই রাজ্যটি একেবারে একটা দুর্লভ মিউজিয়াম-স্থানীয়। অরণ্যের ভিতর আজ বাঙ্গালা সভ্যতার শেষ-চিহ্ন বর্ত্তমান। ইহার ভিতর বাঙ্গালার বহুমুখী প্রতিভার অসংখ্য নিদর্শন আছে, সকলের পক্ষে এই জন্য বিষ্ণুপুর তীর্থস্থানে পরিণত হওয়া উচিত।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ মানভূমের পঞ্চকোট নামক জায়গা হইতে যে শিলালিপি উদ্ধার করেন, তাহাতে মনে হয়, ছোট-নাগপুর মল্লরাজ্যের সীমার ভিতর ছিল। সমসাময়িক ইতিবৃত্ত হইতে মনে হয়, বিষ্ণুপুরের চারিদিকের বিংশতি মাইল পর্য্যন্ত মল্লরাজ্যের সীমানা ছিল। *

* Archæological Survey of India, Vol. VIII, Hunter's Reports VII P. 36.

কবিদের প্রতি

—কীট্‌স্

কবিবর বাসনার, প্রহসন, শোক বিষাদের
স্বর্গভূমে গেলে ত্যজি মর্ত্ত্যভূমি, এত আদরের!
আছে কি মধুরতর নব স্বাদ স্বর্গরাজ্যমাঝে,
স্বর্গদেশে, মর্ত্ত্যদেশে দ্বি-জীবন তোমার বিরাজে?

যারা আছ স্বর্গদেশে কর সবে বাক্য আলাপন
চন্দ্রসাথে, সূর্য্যসাথে, অপরূপ নির্ঝর স্পন্দন
মধুকলনাদ সাথে, গূঢ়ধ্বনি গম্ভীর স্বননে,
মন্দার তরুর সেই মর্ম্মরিত পত্রগুচ্ছস্বনে,
নন্দনকানন মাঝে যেথা শুধু কামধেনু চরে
বসি সেথা কও কথা স্বজনেতে শান্ত স্বচ্ছ স্বরে
নীলপুষ্পকুঞ্জতলে, নিজে নিজে যেথা কৃষ্ণকলি
বিতরে গোলাপগন্ধ, গোলাপের গন্ধ হার দলি
মর্ত্ত্যগন্ধে; নাহি গায় বুলবুল্ বৃথা, অর্থহীন,—
গায় ঐকতান; স্বর্গ-শুদ্ধ কথা ঐক্যে সমাসীন।

স্বর্গরাজ্যে বাস কর পুন কর মর্ত্ত্যে অধিবাস
তোমাদের লিপিগুলি শিক্ষা দেয় খুঁজিতে আবাস
যেথায় সকলে মিলি আনন্দিত, স্ফূর্ত্তিযুক্ত মন,
তৃপ্তি নাহি পূর্ণভাবে, নাহি তাহে নিদ্রা অচেতন।
হেথায় মোদের কহে তাহাদের ক্ষণ-জীবনের
লজ্জা, যশ, বাসনার, অহঙ্কার, দুঃখ, আনন্দের
যাহা কিছু শক্তি, দেয় খর্ব্ব করে। পৃথিবীর মাঝে
প্রতিদিন দাও তুমি এই শিক্ষা কিন্তু নাহি রাজে।

কবিবর বাসনার, প্রহসন, শোক বিষাদের
পরিত্যজি গেলে তুমি মর্ত্ত্যভূমি রাখি আমাদের,
স্বর্গমাঝে আছে তব আনন্দিত নূতন জীবন
স্বর্গদেশে, মর্ত্ত্যদেশে নবভাবে চিরাবরক্ষণ।

অনুবাদক—শ্রীঅনিল বন্দ্যোপাধ্যায়



দ্বিতীয় সংসার

নবীনের বয়স ত্রিশের ভিতর। বড় আপিসে চাকরী করে, ভাল মাহিনাও পায়। জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভূপেন বর্ত্তমান। তিনি নবীনকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। বাহিরের বৈঠকখানাটা নবীনকেই দিয়াছেন এবং নবীনের বন্ধুদের ভূপেনবাবু অন্তরালে ডাকিয়া বলিয়াছেন, 'তোমরা স্বচ্ছন্দে বৈঠকখানায় গান-বাজনা করবে, আপনার বাড়ীর মত ভাববে। নবীন ভারি মনমরা হয়েছে, যাতে আবার বিয়ে ক'রে সংসারী হয়, সেই পরামর্শ দেবে।'

বন্ধুরা সন্ধ্যার পর নবীনের বৈঠকখানায় জটলা করে, গান গায়, তাস খেলে। ছুটীর দিনে দুপুর বেলায় সেখানে পুরা মজলিস বসে।

আজ রবিবার। খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরে বন্ধুরা সকলে বৈঠকখানা গুলজার করিয়াছে।

নবীন সদালাপী, ঠাণ্ডা মেজাজী, সুপুরুষ ও স্বাস্থ্য-সম্পন্ন। বন্ধুভাগ্য অশেষ। অনেকগুলি সমবয়স্ক যুবক তাহার বৈঠকখানায় একত্র হয়।

নবীনের পত্নী-বিয়োগের পর বন্ধুরা নানা ছল ও কৌশলে তাহার মনের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি আনিবার চেষ্টা করে। বন্ধুদের ভিতর হরিশ একজন। হরিশের পক্ষান্তর হইয়াছে। হরিশের দ্বিতীয় পক্ষ লইয়া বন্ধুদের ভিতর যখন তখন অনেক রকম রহস্যালাপ হয়; হরিশ চটে না, জবাবে বলে, 'তোরা মর্ম্ম বুঝবি কি? ভাগ্য কতখানি সুপ্রসন্ন হলে পক্ষান্তর হয় জানিস? জগৎ সৃষ্টি হবার পর ব্রহ্মা-বিষ্ণু মহেশ্বর জটলা করে ব্যবস্থা করলেন—ভাগ্যবানের মাগ মরে। মিলিয়ে দেখ, তখন থেকে এমন একটিও ভাগ্যবন্ত খুঁজে পাবি না, যার দুটো বিয়ে হয় নি। এঁদোপড়া একতলায় কোঠায় যে থাকে, সে দ্বিতলায় আলো-বাতাসের আরাম যে কি সুখ দেয়, তার খবর রাখে? হিংসের মরিস্ ভাই কেন বল না।"

আজও হরিশের দ্বিতীয় পক্ষের কথা উঠিয়াছে। বন্ধুরা সব হরিশ-বর্ণিত দ্বিতীয় পক্ষের ভক্ত। নবীন একটু বিমনা। হরিশকে সে প্রশ্ন করিল—দ্বিতীয় বার বিবাহ করে তুমি সুখী হয়েছ?

হরিশ। নিশ্চয়।

নবীন। তা হলে তোমার প্রথমা স্ত্রীকে তুমি ভাল-বাসতে না। ইনি কি খুব সুন্দরী?

হরিশ। তাঁকেও ভাল বাসতুম এঁকেও ভালবাসি। সুন্দরী তিনিও ছিলেন, ইনিও বটে।

নবীন। পরিষ্কার বোঝা গেল না।

হরিশ। পরিষ্কার করে বলতে হবে? তবে শোন, তুমি মনোযোগ বেশী দিও, কেন না তোমার ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে, বীজ বপন করলে ফসল জন্মাতে পারে। যখন মা মলেন, পাড়া-পড়শী কত সব এলে, রাজ্যি শুদ্ধ মেয়ে মানুষ এসে দাঁড়াল। গাড়ী করে দূর দূর থেকে আত্মীয় অনাত্মীয়া এসে পড়ল, সকলের মুখে ওই এক কথা, ভয় কি বাবা, মা স্বর্গে গেছেন, দুঃখ ক'রো না আমরা রইছি, বিপদ্ আপদে এসে হাজির হব, ইত্যাদি। কিন্তু, পরিবার যখন চোখ কপালে তুলে স্থির হয়ে রইল, তখন? কেউ কি একবার উঁকিটি মেরেছে? না কিছু আশ্বাস দিয়েছে? এই যে তোমরা এতগুলি অন্তরঙ্গ বন্ধু রয়েছ, বল না তোমাদের ভেতর কারুর বউ-এর এমন সৎসাহস হয়েছিল, আমার সামনে এসে বলতে, ভয় কি? আমি আছি।

বন্ধুরা এক সঙ্গে মার মার করিয়া উঠিল। নবীন বলিল, যেতে দাও, হতভাগা আরও কি বলে শোনা যাক।

হরিশ। পত্নী-দায় বড় দায়। পিতৃ-মাতৃ-দায়, কন্যাদায়, এটি সকল দায়ের ওপর। মানুষ ছন্ন-ছাড়া হয়ে যায়, ভেসে ভেসে বেড়ায়, খেয়ে সুখ পায় না, বসে সুখ পায় না, শুয়েও সুখ নেই, রাবণের চিতার মত সদাই বুক জ্বলছে। দেখ না, মাগ মলে একজন একখানা বই লিখে ফেললে, বইখানা পড়ে দেখ, মনে হবে কাকে হাতে শোক পোষাচ্ছে, তবে না কলমে এই সব কথা বেরিয়েছে, নিশ্চয়ই পাগল হবে যাবে। বিধাতার কলকাঠিটি একবার দেখ, কিছুদিন না যেতেই

দ্বিতীয় পক্ষ সামনে এসে দাঁড়ালেন। বয়সটা যে অতি ভীষণ, তার ওপর চেহারাখানাও এমা ভেবিয়া ভোল, অত বড় লিখিয়ে মুখে আর কথাটি নেই, মাথাটি নীচু ক'রে কেঁচোটির মত হয়ে গেলেন। শুনেছি, দ্বিতীয় পক্ষ জিজ্ঞেস করেছিলেন তুমি বই লিখে চলিয়েছ কেন? কবুল দিতে পারলেন না। শেষে বললেন, ও আমি নয়, আমার নামে ও আর একজন। তবেই বোঝ, এমন কোন মিঞা নেই, যিনি গর্ব্ব করে বলতে পারেন, আমি দ্বিতীয় পক্ষ করব না। এত দেখে শুনেও, নবীন, তোমাকে বলছি, যদি ঘাড়ে ভূত চাপে, অগ্রসর না হও, দুর্গতির একশেষ হবে। দ্বিতীয় পক্ষটি কেমন জান, যেমন বোম্বাই ল্যাংড়া খাও, সন্দেশ রসগোল্লা খাও, রাবড়ী মালাই খাও, নিছক মিষ্টি, ঝাল নেই, টক নেই, নোনা নয়, কেবলই মিষ্টি—মনে মনে ভেবে নাও সেটা কেমন? তা হলেই কিছু কিছু বুঝতে পারবে।

বন্ধুরা হাসিতে লাগিল। নবীন বলিল, কি কতক গুলো আবল-তাবল বকলে। সবুর কর, বছরে একটি ক'রে দ্বিতীয় পক্ষ বিয়েন সুরু করুন, তখন সুখের বহরটা টের পাবেন। যাক ও সব বাজে কথা।

বন্ধুরা সব হৈ হৈ করিয়া উঠিল, বাজে কথা!—এর চাইতে কাজের কথা আর আছে না কি?

নবীন বলিল, হ্যাঁ আছে। শোন বলি, আজ একজন নূতন লোকের আসবার কথা আছে, এক বিয়ের নিমন্ত্রণে এঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তোমাদের আগেই জানাচ্ছি, তাঁকে দেখে কি তাঁর কথা শুনে কেউ হেসে উঠো না। একটু মাথার দোষ আছে, একবার রেগে গেলে বসবে না, পালাবে, তখন হায় হায় করবে।

নবীনের কথা শুনিয়া বন্ধুরা মোটা-মুটি লোকটির প্রকৃতি বুঝিয়া লইল। হরিশ যাতে তাতে যখন-তখন হাসে, নবীনের কথা শুনিয়া বেদম হাসিতে লাগিল।

সুরেশ বলিল, তুই সব মাটি করবি, যা বেরো এখান থেকে।

সকলেই বলাবলি করিয়া সাবধান হইল। আরও কিছুক্ষণ কাটিলে ভোলানাথকে নবীনের বৈঠকখানার দ্বারে উঁকি মারিতে দেখা গেল। একদল যুবক একত্র বসিয়া আছে দেখিয়া ভোলানাথ বাহির হইতে নবীনকে বলিল, একবার উঠে আসুন না, একটা কথা বলে যাব।

ভোলানাথকে অভ্যর্থনা করিয়া নবীন বলিল, আসুন, আসুন, ভেতরে এসে বসুন।

বন্ধুরা ততক্ষণে কেহ একখানা খবরের কাগজ পড়িতে সুরু করিয়া ছিল, কেহ বা শুইয়া পড়িয়া ঘুমাইবার ভান করিতেছিল, কেহ বা সেতারের সুর বাঁধিতে বসিয়াছিল। ভোলানাথ আস্তে আস্তে ঘরের ভিতর আসিয়া নবীনের গা ঘেঁসিয়া বসিল। ইহাদের দেখিয়া অতি সন্তর্পণে নবীনের কাণের কাছে মুখ আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এরা সব ভদ্র লোক ত?

নবীন চুপে চুপে বলিল, সকলেই লেখাপড়া-জানা, আপনার কোন ভয় নেই। হরিশ কাৎ খাড়া করিয়া শুইয়া ছিল, পাশ ফিরিয়া শুইল।

নবীন ও ভোলানাথের কথা হইতেছিল। ভোলানাথ জিজ্ঞাসা করিল, এখানে গান-বাজনা হয়?

নবীন। গান-বাজনা হয়, পড়াশোনা হয়, শাস্ত্রেরও চর্চ্চা চলে, বাজে ইয়ার্কি আমরা পছন্দ করি না।

ভোলানাথ যেন খুশী হইয়াছে এমনি মুখখানা করিল, জিজ্ঞাসা করিল, গান-টান হবে? আপনি গাইতে জানেন?

নবীন। আমি সেতার বাজাই।

ভোলা। ভারি শক্ত বাজনা, না? একটু বাজান না শুনি।

নবীন রাজী হইয়া সুরেশকে ডাকিয়া বলিল, ওহে, তবলাটা নাও না, একটা গৎ বাজাই।

নবীন সেতারে অভ্যস্ত। সঙ্গতের সহিত দিব্য করিয়া একখানা চুটকী গৎ বাজাইয়া দিল।

ভোলানাথ খুব খুসী। হাসিয়া বলিল, বেশ বাজান ত। আমি বাজনার কিছু বুঝি না। গান দিন কতক অভ্যাস করেছিলাম, গলা ত তেমন নয়, কিছু হল না।

সুযোগ বুঝিয়া সুরেশ কথায় যোগ দিয়া বলিল, অভ্যাস রাখতে হয় মশাই, গান ছাড়লেন ত গেলেন।

ভোলা। অভ্যাস করি কোথায়? শেখাবেই বা কে?

দেবেন বই রাখিয়া বলিল, মানুষ নিজের চেষ্টায় শেখে, এ কাজে নামতে হলে ঘরে বসে আগে গলা সাধতে হয়।

ভোলা। গান শেখবার ইচ্ছে আছে। কিন্তু যেখানে থাকি, সেখানে ও চর্চ্চা হবার যো নেই। চেষ্টা করতে গিয়েছিলাম একবার, পাঁচজনে থামিয়ে দিলে। না হলে ত' এতদিনে কিছু হতে পারত।

নবীন। কেন, কি ব্যাঘাত হল, পাঁচজনে থামালে কেন?

ভোলা। বলব, আপনারা হাসবেন না ত? আমার ওই ভয়।

নবীন, সুরেশ, দেবেন প্রভৃতি আশ্বাস দিয়া বলিল, স্বচ্ছন্দে বলুন, আপনার কোন ভয় নাই।

ভোলা। রাত তিনটের পর আস্তে আস্তে উঠে দরজা খুলে রাস্তার ধারে বাড়ীর রোয়াকে বসে দিন কতক গলা ছেড়ে গেয়েছিলাম, পাড়া-প্রতিবাসীর সইল না, হিংসে হল। বাড়ীওয়ালাকে দল বেঁধে এসে লাগালে। বাড়ীওয়ালা আমায় ডেকে বললে, ও সব গান-টান চলবে না, পাড়া-প্রতিবাসীরা বলে, আপনার ভাড়াটের জ্বালায় বাস ওঠাতে হবে, গান শুনে ছেলে-পুলে কাঁদে, ঘুমুতে পারে না। আমরা পুরুষানুক্রমে কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ঘর করছি, গান শুনে আমাদেরই পিলে চমকে উঠে।...শুনেছেন মশায়, কথা?

হরিশ শুইয়া ছিল, উঠিয়া দুড় দুড় করিয়া ঘরের বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল। সে কাশিতেছিল কি হাসিতেছিল বোঝা গেল না। কিছুক্ষণ পরে চোখ-মুখ লাল করিয়া হরিশ যখন ঘরে ফিরিল, ভোলানাথ কট-মট করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া থাকিল। আর আর সকলে দাঁতে দাঁত চাপিয়া কোন রকমে বসিয়া রহিল। বন্ধুরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া লইল। সকলেই সকলকে সংকেত করিতেছিল, সাবধান, খুব সাবধান, হেসো না কেউ।

মুহূর্ত্তে এই চাপা-চাপির ভাব কাটিয়া গেল। পুনরায় স্বচ্ছন্দে কথা আরম্ভ হইল। ভোলানাথের গান শিখিবার কথায় সূত্র ধরিয়া সতীশ বলিল, লজ্জা কি ভয় থাকলে কোন কাজ সিদ্ধ হয় না। ভরসা চাই। লোকের কথা শুনে পেছনো আহাম্মকি।

দেবেন গুন্ গুন করিয়া কি একটা গান গাহিতেছিল, ভোলানাথকে বলিল, এই দেখুন আমি গান গাচ্ছি। লজ্জাও করি না, ভয়ও নেই

দেবেন স্পষ্ট করিয়াই গানটা ধরিল। নবীন সেতারে যোগ দিল। সুরেশ তবলা চাপড়াইতে আরম্ভ করিল। ভোলানাথকে সকলে মিলিয়া যেন ইহাই বুঝাইয়া দিল, গান গাওয়া কেবল ভরসার দরকার।

দেবেন বলিল, অবিশ্যি গাইতে হলে প্রথম প্রথম চোখ বুজে গাওয়াই ভাল। গান শুনে কেউ কিছু বললে মোটেই গ্রাহ্য করতে নেই, তবে না অভ্যাস হয়।

ভোলানাথ বলিল, গান গাওয়া ছেড়ে দিইছি অনেক দিন। আপনাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে একখানা গাই, আপনারা সবাই যখন চর্চ্চা করেন।

নবীন। বেশ ত গান না। সুর রয়েছে গানে জোর পাবেন। আবার কিছু দোষ থাকলে, আমরাই শুধরে দেব।

নবীনের যুক্তিটা ভোলানাথের মন্দ লাগিল না; বলিল, তা হলে গাই, কি বলেন?

সুরেশ বলিল, হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। তবে একটা কথা বলে রাখি, চোখ বুজেই গাইবেন। গাইতে গাইতে যেন চোখ খুলবেন না।

পাড়ার লোকে শত্রুতা করে নাই, সত্যই ভোলানাথের গলা নাই। কেবল ষাঁড়ের মত চেঁচায়, সুর-বোধ নাই। গানের কথাও ঠিক ঠিক মনে রাখিতে পারে না। ভোলানাথের বিশ্বাস, যাহা গায় ভাল না হইলেও একেবারে মন্দ নহে। ভোলানাথ শুনিয়াছে, ভগবানের নাম যেমন-তেমন করিয়া গাওয়া চলে, ক্ষতি হয় না। উপস্থিত সকলের আগ্রহ বুঝিয়া ভোলানাথ বলিল, তা হলে চোখ বুজি?

সভায় সকলে একবাক্যে 'তথাস্তু' বলিল।

ভোলানাথ গান ধরিল। সে গানের না আছে সুর, না আছে তাল।

কাশী যাব হে কেমনে,
কাশী যাওয়া ভাল নয়,
যাবেন কাশী
কালশশী ভস্মরাশি দেখে পায়।
মরি হায় হায়।
বঁধু যাবে যে কাশীতে
কি কারণে কাশীবাসীতে?

আর কানাই কি বাঁধিবে
হাই চাঁদ-বদনে ?
হাসিবে গোপিনীকুল
কাঁদিবে ব্রজাঙ্গকুল
আর পীতাম্বর ভজে পীতাম্বর
'ঘ্যাঘাম্বর' কি শোভা পায়।
মরি হায় হায়।

গান সুরু হইতেই হরিশ সিধা হইয়া বসিয়াছিল।

গান শেষ হইলে ভোলানাথ চোখ খুলিল।

সুরেশ বলিল, মন্দ গাননি ত ? তবে অভ্যাস নেই। একটু যে গলা সেধেছিলেন, আওয়াজে বেশ বোঝা যায়।

দেবেন বলিল, আপনি নিশ্চয় গোপনে কোথাও ওস্তাদের কাছে আনা-গোনা করেছিলেন, লুকোলে চলবে না।

ভোলানাথ হাসিল, এ যেন অপ্রত্যাশিত। গান শুনিয়া কেহ হাসে নাই, বরং ভালই বলিতেছে।

হরিশ থাকিতে পারিল না, বলিল, গানটা যদিও পুরোনো, কিন্তু যায়গায় যায়গায় আপনার নিজের বাঁধা ; কেমন কি না বলুন ?

ভোলানাথ চটিয়া উঠিল, বলিল, অত আমড়া-গাছি করা হচ্ছে কেন ? আমি গান বাঁধি ? কোন্‌টা আমার নিজের বাঁধা বলুন ত ?

নবীন বলিল, থাক না,…কথা বাড়িয়ে…

ভোলানাথ রাগিয়াছিল, বলিল, ওঁকে বলতেই হবে, কোন্‌খানটা আমি বেঁধেছি।

হরিশ। বলব ?

কাশী যাওয়া ভাল নয়
কাশী যায় হে কেমনে…
কানাই কি বাঁধিবে হাই ও চাঁদবদনে…
পীতাম্বর ভজে পীতাম্বর…
'ঘ্যাঘাম্বর' কি শোভা পায়…

এই ক'লাইন আপনার বাঁধা। আমি ত মন্দ বলি নি, সুখ্যাতি করছি, আপনি রাগছেন কেন ?

ভোলানাথ হরিশের কথা শুনিয়া খুসী হইয়া গেল।

নবীন বলিল, এইবার তোমরা কেউ গাও, ভোলা বাবু শুনুন, আমি বাড়ীর ভেতর থেকে গোটাকতক পান ভোলা বাবুর জন্ম আনি।

নবীন তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া গেল এবং বৌদিদির ঘরে আসিয়া সহাস্যে জানাইল, বৌদি, শীগ্‌গির গোটাকতক পান সেজে দাও। মস্ত গুণী লোক বাইরে এসেছেন।

বৌদিদি অন্তঃপুর হইতে বাইরের গান শুনিতে পাইয়াছিলেন, হাসিয়া বলিলেন, বুঝেছি। সেই লুচিখেকো পাগলাটা এসেছে। তা মড়াকান্না কাঁদছিল কেন ?

রবীন জানালার ধারে কোথায় দাঁড়াইয়া ছিল। বাবাকে দেখিয়া জোরে হাসিয়া উঠিল। নবীন চাহিয়া দেখিল, একটি তরুণীর কোলে রবি বসিয়া আছে। বাবাকে দেখিয়া রবীন খুসী হইয়া বলিল, আমরাও যাত্রা শুনেছি, বাবা।

নবীন হাসিল, তারপর বৌদিদিকে জিজ্ঞাসা করিল, রবিকে কোলে নিয়ে কে ?…

বৌদি বলিলেন, আমার ছোট নলিনী, চিনতে পার নি ? এই খানিকক্ষণ হল এসেছে।

নবীন বিস্ময়ে নলিনীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, ও ! মোটে চেনা যায় না, কত বড় হয়ে গেছেন।

বড়-বৌ ভগিনীকে ডাকিয়া বলিলেন, পান সাজত বোন। ঠাকুর-পোর তাগিদ ভারি।

নলিনী রবীনকে কোলে তুলিয়া উঠিয়া আসিল।

নবীন রবীনের দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহাকে বস্তুতই প্রফুল্ল দেখাইতেছে। গান শুনিয়া কি নলিনীর কোলে উঠিয়া, তাহার ম্লান মুখখানি আজ যেন আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। নবীন হাসিমুখে আসিয়াছিল, কিন্তু রবীনের হাসির কারণ বুঝিতে গিয়া নবীনের মুখের হাসি মুখেই মিলাইয়া গেল।

নবীন বলিল, বৌদি পান সাজা হোক, তলে পাঠিয়ে দিও, নয় ডেকে পাঠিও।

বৌদি বলিলেন, একটু দাঁড়াও না, আরও ত পাঁচ জন রয়েছে, পাগলাকে আগলে রাখবে।

নলিনী পান সাজিতেছিল, হাসিয়া উঠিল, বলিল, দিদি এমন গান কখনও শুনি নি। শুনে হেসে হেসে আমার পেটে খিল লেগে গেছে।

বৌদি বলিলেন, নলিনী এসে পর্য্যন্ত তোমাদের দেখছে আর হাসছে। জোটেও ত', ঠাকুর-পোর দুখে দুখে ভগবান্ পাগলাকে জুটিয়ে দিয়েছেন।

নবীন বলিল, সত্যি বৌদি সকলেই আমোদে আছে, মনে হচ্ছে কিছু মিষ্টিমুখ করিয়ে দিই, প্রথম দিনটা। আবার মিষ্টান্ন-ভক্ত।

বৌদি। ও যা গান গেয়েছে, ওতে মিষ্টি দিলে অমান্য করা হয়। এক কাজ কর, রান্না ঘরে যাও, উনন নিভে আছে, উটকে খানিকটা বার করে রেকাবি করে নিয়ে যাও, যেমন গান তার ঠিক পাল্টা খাবার।

নবীন নলিনীর কোলে বসিয়া নলিনীর মুখের উপর চাহিয়া ছিল, সকলে হাসিতেছে, সেও হাসিতে লাগিল, নলিনী পান-সাজা রাখিয়া এক হাতে তাহাকে নিবিড় ভাবে আকর্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভারি মজা হচ্ছে, না রবি বাবু?

রবি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ। মাতার মৃত্যুর পর হইতে রবি সর্ব্বদাই ম্রিয়মাণ থাকে, যেন কান্না ছাড়া হাসির কথা একেবারে ভুলিয়াছে। নবীনের সন্তপ্ত হৃদয় আজ সেই প্রিয় পুত্রের হর্ষোদ্বেষ দেখিয়া তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল, রবি, বাইরে যাবে? আমার সঙ্গে?

নলিনী আগাইয়া দিলেও রবি কিন্তু তাহার কোল ছাড়িল না, ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতি জানাইল।

নলিনী পান সাজিয়া একটা ছোট থালায় করিয়া সবগুলি পান নবীনকে ধরিয়া দিল।

বৌদিদি পানগুলি দেখিয়া বলিলেন, করেছিস্ কি? সব ওজড় করে দিয়ে বসলি?…তুই-ই সংসার করবি!

নবীন পানের পাত্রটা লইয়া যত শীঘ্র পারিল, ঘরের বাহির হইয়া গেল। [ক্রমশঃ

উষা

—শ্রীমুরারিমোহন সান্যাল

ক্ষণিক রাজত্ব মোর;
রজনীর অন্ধকার, প্রভাতের আলো—
উভয়ের মাঝখানে সন্ধিক্ষণ ক্ষীণ;
এখনও ঘুমের ঘোর,
রজনীর ছায়া কালো
ধরিত্রীর অঙ্গ হতে হয় নাই লীন;
মেলে যদি আঁখি
ভুলক্রমে কোনো পাখী,
মন্ত্র-মুগ্ধ তখনই সে
ঘুমের পরশে—
নিদ্রায় বিবশ-তনু, হয় সংজ্ঞাহীন॥

বিরাট স্তব্ধতা যেন মূর্ত্তি ধরি'
ছড়ায় বিষাদ-রশ্মি চৌদিকে আমার!
বিশাল সাম্রাজ্য 'পরি
বিস্তারিয়া বিশ্বব্যাপী দুটি পক্ষ তার॥

চন্দ্রিমা সুষমা-হারা,
লুপ্ত-প্রায় সব তারা;
বিদায়-মণিকারূপে
শুক তারা চুপে চুপে,
দীপিয়া ললাটে মোর,
বিষণ্ণ মলিন চাঁদ গাহে শেষ-বাণী—
বিশ্ব বিষণ্ণ হল শুনি' সেই বাণী॥

হইল গভীরতর,
বিশ্বের বিষাদ ঘোর,
নিবিড় স্তব্ধতা মাঝে বায়ু অচেতন;
রাজে
তারি মাঝে
তোমার নীরব নাট্য—চন্দ্রমা-পতন!
দেখেছি, দেখেছি আমি,
হে মোর নিখিল-স্বামী,
হে অপূর্ব্ব কবি,
তোমার অঙ্কিত ছবি—
চাঁদ সব-হারা!
ঝর ঝর বহে যায় তাই অশ্রু-ধারা—
সিক্ত করি' আকাশ-বাতাস,
ধরণীর অন্তর উদাস—
সিক্ত করি' পদতল,
দেবতার পদ-শতদল॥

ক্ষণিক রাজত্ব মোর!
ঐ আসে কনিষ্ঠা ভগিনী মম,
প্রস্ফুটিত পুষ্পসম,
সহস্র আনন্দ-সুরে আকুল, বিভোর!
বিদায়, বিদায়, কাল শেষ হল মোর॥

বিচিত্র জগৎ

আইল্ অফ ম্যান

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ম্যান্ দ্বীপ আইরিশ সমুদ্রে গ্রেটবৃটেন ও উত্তর আয়র্ল্যাণ্ডের মধ্যে অবস্থিত। হল্ কেন্ তাঁর উপন্যাসে এই দ্বীপকে সাহিত্যে প্রসিদ্ধ করে গিয়েছেন বটে, কিন্তু বাহিরের লোক এখনও ম্যান্ দ্বীপ সম্বন্ধে অজ্ঞ।

সংক্রান্ত গল্পের মতই অদ্ভুত। পূর্ব্বে না কি এখানে পরীদের রাজা রাজত্ব করতেন। তারপর আয়র্ল্যাণ্ড থেকে সেণ্ট প্যাট্রিক এসে দ্বীপ থেকে বিষধর সর্পকুল তাড়িয়ে দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করেন।



আইল্ অফ ম্যান: নির্জ্জন কুটির। এই রাস্তা দিয়া দ্বীপের উত্তরতম আলোক-স্তম্ভে যাওয়া যায়। সমুদ্রের ঝটিকা প'ড়ে খড়ের ছাউনি উড়াইয়া লইয়া যায়, তাই ছাদের খড় দেওয়ালে লাগানো রহিয়াছে।

কিংবদন্তীর কথা বাদ দিয়েও যখন আমরা ঐতিহাসিক সময়ের মধ্যে আসি, তখনও দেখতে পাই, ম্যান্ দ্বীপের ইতিহাসের সঙ্গে বহু বিস্ময়কর ঘটনা জড়িত। এখানে কেল্ট-জাতির যে উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল প্রাচীনকালে, তাদের ওপর দিয়ে কালের কত রূঢ় ঘটনাস্রোত অবাধ গতিতে চলে গিয়েছে—কিন্তু তাদের শক্তি ও আনন্দকে দমিয়ে দিতে পারে নি।

এই দ্বীপে আইরিশ, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান, স্কচ ও ইংরেজ রাজারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রাজত্ব করেছেন। তারপরে যখন প্রথম এডওয়ার্ডের শাসনাধীনে এই দ্বীপ এল, তখন তিনি ও তাঁর বংশীয়গণের প্রথা ছিল যে, সভাসদ্‌গণের মধ্যে প্রিয়পাত্র যে, তাঁকে এই দ্বীপ জায়গীর দেওয়া হত।

১৪০৫ খ্রীষ্টাব্দে এই ভাবে ম্যান্ দ্বীপ ষ্টান্‌লি বংশের জায়গীরভুক্ত হয়ে পড়ল। এই বংশের নাম ইংলণ্ডের ইতিহাসে সুপরিচিত,—এঁদের আদি বাড়ী ল্যাঙ্কাশায়ারে। ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এঁরাই ম্যান্ দ্বীপ শাসন করেন, পরে ডিউক্ অফ আটোল-এর দখলে এই দ্বীপের জায়গীর-স্বত্ব চলে যায়।

প্রবাদ আছে যে, প্রাচীন যুগে জনৈক আইরিশ বীর ফিন্ ম্যাক্‌কুল শত্রুবিনাশের জন্য একমুষ্টি আয়র্ল্যাণ্ডের ধূলি নিক্ষেপ করাতে এই দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছিল। এই প্রবাদের মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে, তাহা বৈজ্ঞানিক ধরণের। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে ম্যান্ দ্বীপ এক সময়ে নিকটবর্ত্তী বৃহত্তর দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

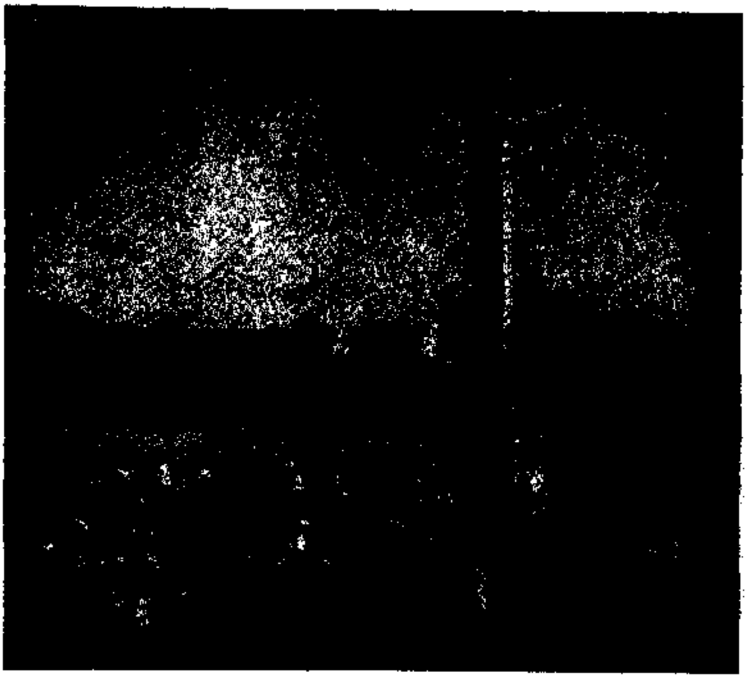
ম্যান্ দ্বীপ আর ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ 'লেক্ ডিষ্ট্রিক্ট'-এর ভূতত্ত্ব একই।

এই দ্বীপের প্রাচীন অধিবাসিগণের বিবরণ ফিন্ ম্যাক্‌কুল-

এর উনত্রিশ বছর পরে ব্রিটিশ জাতির নিকট এই দ্বীপ বিক্রীত হয়।

যদিও বর্ত্তমানে ইহা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীন—কিন্তু দ্বীপের প্রাচীন প্রথাগুলি ও আইন এখনও বজায় আছে। ম্যান্ দ্বীপ বিশেষ বড় নয়, দৈর্ঘ্যে মাত্র ত্রিশ মাইল এবং প্রস্থে বারো মাইলের বেশী নয়। কিন্তু, এখানে এদের নিজেদের আদালত, আইন ও ব্যবস্থাপক সভা আছে। নতুন আইনগুলি অবশ্য ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের অনুমোদনের অপেক্ষা রাখে।

গত বৎসর গ্রীষ্মকালের এক সুন্দর দিনে আমি দীর্ঘ অবকাশ-যাপনের জন্যে ম্যান্ দ্বীপে পদার্পণ করি। যে জাহাজে আইরিশ সমুদ্র পার হচ্ছিলাম, তার নাম "বেন্-মাই-ক্রি"—অর্থাৎ 'হৃদয়-রাণী'। ম্যান্ দ্বীপের লাল পতাকা জাহাজের মাস্তুলে উড়ছিল। পতাকায় যে চিত্রটী অঙ্কিত আছে, এটী ম্যান্ দ্বীপের প্রাচীন জাতীয় পতাকার চিহ্ন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর যে রাজকীয় অসি এখানকার শাসন-কর্ত্তৃত্বের প্রতীক, তার হাতলের গায়েও এই চিহ্নটী খোদাই দেখতে পাওয়া যায়।



ডগলাস : সম্মুখে স্মৃতিস্তম্ভটি বিগত মহাযুদ্ধে মৃত বীর সৈনিকের উদ্দেশে স্থাপিত। বড়-রাস্তার লোক-চলাচল ও সেকেলে ঘোড়ার গাড়ী দ্রষ্টব্য।

জাহাজে যতক্ষণ ছিলাম, বেশ কাটল। একদল ল্যাঙ্কা-শায়ারের নরনারী ছুটী পেয়ে বেড়াতে যাচ্ছিল ম্যান্ দ্বীপে, তারা খুব আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সঙ্গে গান গাইতে গাইতে চলেছিল।

তারা সবাই যাচ্ছিল ম্যান্ দ্বীপের আধুনিক রাজধানী ডগলাস সহরে। সহরটি খুব সুন্দর একটি উপসাগরের তীরে অবস্থিত।

কিন্তু, ডগলাস সহরের আধুনিক হোটেলগুলির আমার নিজের কোন মমতা ছিল না, সুতরাং আমি ট্রেনে চেপে পুরাতন রাজধানী কাস্‌লটাউনের দিকে চল্‌লাম। কাস্‌লটাউন দ্বীপের দক্ষিণাংশে অবস্থিত এবং এর সঙ্গে অনেক ঐতিহাসিক স্মৃতি জড়িত আছে।

এখানে ট্রেনে চড়া বড় মজার ব্যাপার। এই ছোট্ট পুতুল-পুরীর মত দ্বীপে সবই যেমন ছোট্ট, এখানকার রেল-গাড়ীও তেমনি ছোট ব্যাপার; বিশেষতঃ ইংলণ্ড ও ইউরোপ মহাদেশের অন্যান্য দেশ থেকে আসবার পরে এ রেলওয়ের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা থাকে কি করে? কিন্তু, কাসলটাউনের একটা নিজস্ব আভিজাত্য আছে।

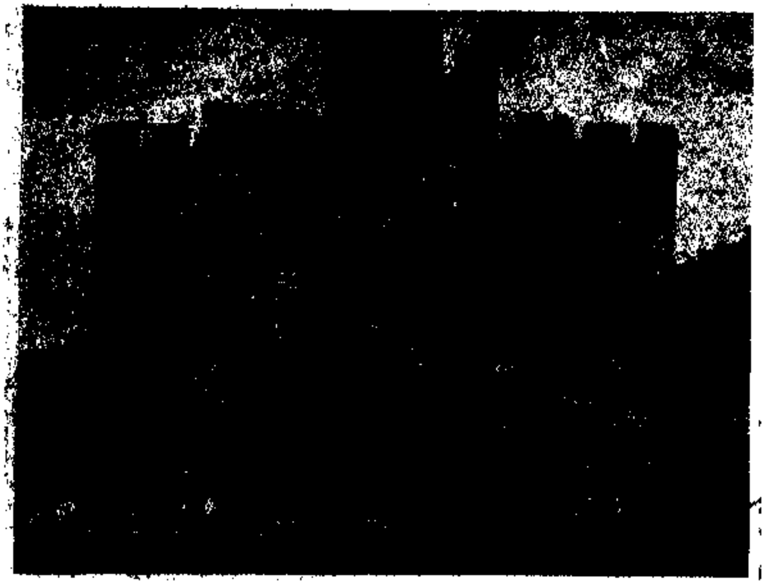
ম্যান্ দ্বীপের অন্যান্য সহর ভ্রমণকারীরা ক্রীড়াভূমিতে পরিণত করে, কিন্তু কাস্‌লটাউনের প্রতি তারা তেমন মমতা দেখায় না,—শুধু প্রাচীন প্রাসাদ-দুর্গটি দেখেই চলে যায়। ফলে, সহরটির প্রাচীন আবহাওয়া ও শান্তি আধুনিকতার হট্টগোলে কলঙ্কিত হয় নাই।

কাস্‌লটাউন উপসাগরের তীরে এই সহরটি অবস্থিত। কাস্‌ল্ রুশেন নামে প্রাচীন প্রাসাদ-দুর্গের চারিপাশ ঘিরে এই সহর তৈরী হয়েছিল। সহরের রাস্তাঘাট পুরান ধরণে তৈরী ও অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। বড় একখানা মোটর-বাস চলবার উপায় নেই রাস্তায়। কিন্তু, সহরের অধিবাসীরা

এ জন্য কোন অসুবিধা বোধ করে না, বরং তারা তাদের প্রাচীনত্বের জন্য গর্ব্বই অনুভব করে।

প্রাসাদ-দুর্গের সামনে একটি পার্ক। এই পার্কে এক অদ্ভুত মনুমেণ্ট আছে, পৃথিবীর কোথাও তেমন নেই, এ কথা জোর করে বলা যায়।

পার্কের ঠিক মাঝখানে একটি প্রস্তরের উচ্চ পাদ-পীঠ, তার গায়ে লেখা আছে যে, কর্ণেল কর্ণেলিয়ান স্মেণ্ট নামে জনৈক ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তার প্রস্তরমূর্ত্তি এখানে সাধারণের অর্থানুকূল্যে স্থাপিত হল—তাঁর প্রতি জনসাধারণের অসীম ও শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ।



কাস্‌ল্ রুশেন : রাজ্ঞী প্রথম এলিজাবেথ-প্রদত্ত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘড়ী : ইহার মিনিটের কাটাটি নাই

কিন্তু, পাদ-পীঠে সে প্রস্তরমূর্ত্তি কৈ? পাদ-পীঠ শূন্য কেন?

করলে জানা যাবে যে, যতদূর চাঁদা আদায় হয়েছিল, তাতে ঐ পর্য্যন্তই নির্ম্মিত হয়েছে। বাকী চাঁদা আজ পর্য্যন্তও কেউ দেয় নি। সুতরাং মূর্ত্তি গড়া সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি। শ্রদ্ধা ও প্রীতির অপূর্ব্ব নিদর্শন বটে!

আর একটা অদ্ভুত জিনিস এখানকার সময়জ্ঞাপক যন্ত্র। এটি একটি প্রাচীন সূর্য্য-ঘড়ী। এখানকার লোক এই ঘড়ী দেখে কি ভাবে সময় ঠিক করে, জানি না, আমি তো পারি নি। কিন্তু, এর চেয়ে আরও অদ্ভুত জিনিষ আছে এ সহরে। অনেককাল আগে ইংলণ্ডের রাণী এই দ্বীপের রাজধানীকে একটি সেকালের ঘড়ী উপহার দিয়াছিলেন—ঘড়ীটা একটা ক্লক-টাওয়ারে বসান আছে। খুব বড় ও খুব চমৎকার ঘড়ী। কিন্তু, ঘড়ীটার দিকে ভাল করে চেয়ে থাকবার পরে দর্শকের মনে হয় ঘড়ীটাতে কি যেন একটা নেই। তারপরেই তার চোখে পড়ে ঘড়ীতে মাত্র একটি কাঁটা, ঘণ্টার কাঁটাটা আছে, অন্য কাঁটাটি বহুদিন হল ভেঙে গিয়েছে, আর সারান হয় নি।

এ সবের দরুণ স্থানীয় লোকের বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না। কারণ, অন্যান্য দেশের মত এদের জীবন কর্ম্মব্যস্ত নয়; কোন কাজে এদের বিশেষ তাড়া নেই। দু-এক ঘণ্টার এদিক্-ওদিক্ হলে, এদের বিশেষ কিছু যায় আসে না। কাস্‌ল্ রুশেন মধ্য-যুগের স্থাপত্যের সুন্দর নিদর্শন। স্থানীয় চূণা-পাথরে এই প্রাচীন দুর্গের আগাগোড়া তৈরী এবং এই চূণা-পাথরের প্রাসাদ বহু শতাব্দীর ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করে আজও অটুট আছে।

রবার্ট ব্রুস ১৩১৩ খৃষ্টাব্দে দীর্ঘ অবরোধের পরে এই দুর্গ দখল করেন। দুর্গ হিসেবে কাস্‌ল্ রুশেন প্রাচীনকালে, অর্থাৎ গোলাবারুদ আবিষ্কারের পূর্ব্বে যে নিতান্তই দুর্ভেদ্য ছিল, তা এখনও চোখে দেখলেই বোঝা যায়।

এই দুর্গের সঙ্গে আর একজন ঐতিহাসিক পুরুষের নাম জড়িত আছে।

প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে এই দ্বীপে রাজত্ব করতেন সপ্তম আর্ল অব ডার্বি। ইতিহাসে ইনি ‘গ্রেট ষ্টানলি’ নামে প্রসিদ্ধ। ইনি ও এঁর স্ত্রী এখানে নিজেদের বাসের জন্য তাঁদের ল্যাঙ্কাশায়ারের বিখ্যাত প্রাসাদ ‘ল্যাথম হল’-এর অনুকরণে একটি সুন্দর বাড়ী নির্ম্মাণ করেন।

এই আর্ল ও তাঁর স্ত্রী ইংলণ্ডের গৃহ-যুদ্ধের সময় রাজাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। এঁর স্ত্রীর নাম ছিল, শার্লট্ ডা ত্রেমুই। ল্যাঙ্কাশায়ারের প্রাসাদে ইনি একা ছিলেন, যখন সৈন্যগণ তাঁর প্রাসাদ আক্রমণ করে, তাঁর স্বামী তখন ম্যান্ দ্বীপে রাজার পক্ষে সৈন্যসংগ্রহ করতে ব্যস্ত ছিলেন—কিন্তু, বীর-নারী একা মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে বহুদিন পর্য্যন্ত শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করেছিলেন।

ষ্টান্লি নিজেকে খুব লোকপ্রিয় করতে পারতেন, যদিও তাঁর রাজত্বকালে প্রজাগণকে কর দিতে হত বেশী এবং অনেক সৈন্য পুষবার খরচাও দিতে হত। তাঁর একটা কথা এখনও ম্যান্ দ্বীপে প্রচলিত আছে:—

"আমার একটা অভ্যাস আছে, লোকজনের মধ্যে এসে প্রথমেই আমি মাথা থেকে টুপি খুলব, দু একটা মিষ্টি কথা বলব, একটু হাসব সকলের দিকে চেয়ে। এতে করে সহৃদয়তার পরিচয় দেওয়া হয় লোকের কাছে—এ সব করতে এমন কিছু বেশী হাঙ্গামা নেই, কিন্তু লোকজন খুব বাধ্য থাকে।"

রাজা দ্বিতীয় চার্লসের সময় ইনি ধৃত ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

তাঁর বিধবা স্ত্রী এই প্রাসাদ-দুর্গে বহুদিন রাজত্ব করেন। তার পর পার্লিয়ামেণ্টের পক্ষের সৈন্যদলের কাছে ইনি আত্ম-সমর্পণ করতে বাধ্য হন।

এত ঐতিহাসিক স্মৃতি যে-প্রাসাদের সঙ্গে জড়িত—সেটি যে ম্যান্ দ্বীপের একটি প্রধান দ্রষ্টব্য বস্তু, সে বিষয়ে কোন ভুল নেই। কিন্তু, আমার মনে হচ্ছিল, মধ্যযুগের স্থাপত্য হিসেবে দুর্গটি চমৎকার হলেও এই দুর্গে সেকালে মানুষে বাস করত কি করে। বেজায় পুরু পাথরের দেওয়াল, জানালা ত নেই বললেই হয়—যা আছে সে নিতান্তই ক্ষুদ্র, মাঝে মাঝে আবার ফুটন্ত পিচ ঢালবার গর্ত্ত—দুর্গ হিসেবে খুব ভাল এবং এক সময়ে এ সবের খুবই দরকার ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু বাসগৃহ হিসেবে কারাগার-তুল্য ছিল না কি? তবে, প্রাসাদের অধিবাসীদের একটা সান্ত্বনা ছিল দেখা যাচ্ছে। সেই একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, প্রাসাদের ভূগর্ভস্থ কারাকক্ষের বন্দিগণ তাদের চেয়েও দুরবস্থায় কাল যাপন করছে।

অন্যান্য প্রাচীন প্রাসাদের ন্যায় কাস্ল্ রুশেনেও ভূতের প্রবাদ প্রচলিত আছে। গভীর রাত্রে মাঝে মাঝে না কি এক শুভ্রবসনা স্ত্রীলোককে সদর ফটক দিয়ে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে দুর্গে ঢুকতে দেখা যায়।



ডগ্লাস: সমুদ্র-তীর। জাহাজের চিম্নী-নির্গত ধূমরাশির নীচে টাওয়ার অব্ রেফিউজ (Tower of refuge), ওয়ার্ড্সওয়ার্থ-এর ডগ্লাস-বে-সম্বন্ধীয় সনেটে ইহার উল্লেখ আছে; আপাতি-মূর্তি ১৮৩২ সনে বিপন্ন জাহাজের আশ্রয় হিসাবে নির্মিত হয়।

কাস্ল্ টাউন সহরের কেন্দ্রস্থল থেকে আধ মাইল দূরে একটা ছোট পাহাড়, পূর্ব্বে ঐ পাহাড়টি ছিল প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত লোকের বধ্যভূমি। সমুদ্রতীর থেকে ছোট্ট পাহাড়টি উঠেছে। এর পিছনে বিখ্যাত কিং উইলিয়াম্স্ কলেজ। কলেজের সামনে যে সবুজ ক্রীড়াভূমি দেখা যায়—অত বড় খেলার মাঠ আমি কোন কলেজে দেখি নি। কিং উইলিয়াম্স্ কলেজ শুধু ম্যান্ দ্বীপে নয়, সমগ্র ইংলণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ডের মধ্যেও একটি বড় ও ভাল পাবলিক্ স্কুল। অনেক নামজাদা ইংরেজ এই কলেজে শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

এখান থেকে পায়ে হেঁটে ডার্বি হ্যাভেন বলে একটা ছোট জেলেদের গ্রামে যাওয়া যায়।

পূর্ব্বে এই গ্রাম বে-আইনী মদ চোলাই করার একটা বড় আড্ডা ছিল, বর্ত্তমানে এটা এরোপ্লেনের আড্ডায় পরিণত হয়েছে। এখান থেকে মাইল দুই দূরে ভ্রমণের একটি সুন্দর স্থান আছে। স্থানটির নাম ল্যাংনেস, খানিকটা জায়গা



আইল্ অব ম্যানের রাজধানী ডগ্‌লাস সহরের প্রান্তবর্ত্তী মাঠ। নীচের গির্জ্জার নাম—নিউ কার্ক ব্যাডেন: সম্মুখে হাজার হাজার লোক গির্জ্জার পাদ্রীর বক্তৃতা শুনিতে সমবেত। গাছ-পাতার অন্তরালে অস্পষ্ট গির্জ্জাটির নাম —ওল্ড কার্ক ব্যাডেন: এখানে প্রতি বৎসর একবার ম্যান দ্বীপের প্রাচীন ভাষা ম্যাংক্স-এ (Manx) উপাসনা হয়।

সমুদ্রের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, এর একদিকে কাস্‌ল্ টাউন উপসাগর, অন্যদিকে ডার্বি হ্যাভেন। এখানে গল্‌ফ খেলার সুন্দর বন্দোবস্ত আছে।

আকাশ যেদিন নির্ম্মল থাকে, সেদিন এখানে গল্‌ফ খেল্‌বার মত আনন্দদায়ক ক্রীড়া আর কিছুই নাই। তিন দিকে নীল সমুদ্র, উঁচুনীচু মাঠে ছিলার গাছে রক্তবর্ণ ফুল, পেছনের জমি একটু একটু করে উঁচু হতে হতে শেষে সাউথ ব্যারুল্ পর্ব্বতের পাদভূমিতে গিয়ে ঠেকেছে। এ দৃশ্য দেখলে এই ক্ষুদ্র দ্বীপকে কখনও ভোলা যাবে না।

সহরের মধ্যেও বেড়াবার সুন্দর স্থান আছে। স্থানীয় লোকেরা অত্যন্ত আমোদ-প্রিয়, সন্ধ্যার সময় দিনের কাজ সেরে তারা সহরের পার্কগুলিতে বসে আড্ডা দেয় ও গান গায়, মাঝে মাঝে নানাবিধ লোক-নৃত্যেরও অনুষ্ঠান হয়। প্রাচীন দিনের প্রথা ও রীতি নীতি এখানকার অধিবাসীরা আজও ঠিক বজায় রেখেছে, যদিও দ্বীপের আদিম ভাষা এখন প্রায় সবাই ভুলে গিয়েছে।

ক্যাস্‌ল্ টাউন সহর থেকে কয়েক মাইল দূরে বিখ্যাত রুশেন য়্যাবী অবস্থিত। ভ্রমণকারীদের এটি একটি প্রিয় স্থান। এমন সুমিষ্ট ষ্ট্রবেরী ও সুস্বাদু ক্রীম্ ম্যান্ দ্বীপের আর কোথাও পাওয়া যায় না। ঔদরিক ভ্রমণকারীরা ষ্ট্রবেরী খাবার লোভে গ্রীষ্মকালে দলে দলে এখানে আসে।

এক দিন খুব বর্ষা হয়ে গেল। ট্রাউট মাছ ধরার লোভে আমি ক্যাস্‌ল্ টাউনের নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র একটি খাঁড়িতে নৌকা করে গেলুম। সহর পার হয়েই এক জায়গায় একটা জলচালিত ময়দার কল। কলের বৃদ্ধ মালিক আমাকে খুব গর্ব্বের সঙ্গে তার কলটি দেখালে এবং বললে যে, প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক পুস্তক 'ডুমস্‌ডে বুক'-এ এই খাঁড়ির ও এই স্থানের উল্লেখ আছে। নদীর দু'ধারে এক প্রকার বন্য লতার সোণালী ফুল অজস্র ফুটেছে, এখানকার ভাষায় এই লতার নাম কুলাগ। এর ফুল ম্যান্ দ্বীপের জাতীয় পুষ্প। প্রাচীন কালে বীরেরা কুলাগের ফুল বুকে ও টুপীতে গুঁজে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করত।

অনেক ট্রাউট মাছ ধরেছিলাম সে দিন। তাই যখন রুশেন্ রাবীতে পৌছে দেখলুম যে, এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অট্টালিকার মধ্যে একটি পায়রার ঘর ও একটি স্তম্ভ ছাড়া আর কিছুই মাটীর ওপর দাঁড়িয়ে নেই, তখন মাছ ধরার আনন্দে মনের কষ্ট ভুলে গেলাম। কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে সিস্টারসিয়ান সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণ কর্ত্তৃক এই ভজনালয় নির্ম্মিত হয়। কালে এখানকার সাধু-সন্ন্যাসিগণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও অতিমাত্রায় শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। মার্টিন লুথারের নূতন ধর্ম্ম প্রচারের পর এঁদের শক্তি খর্ব্ব হয়। এই বিরাট ভজনাগারের উদ্যানে আর একটি প্রাচীন কীর্ত্তি কালের ধ্বংসলীলা উপেক্ষা করে আজও দাঁড়িয়ে আছে—সেটি একটি ক্ষুদ্র কুব্জ-দেহ সেতু। সেতুটির নাম সন্ন্যাসীর সেতু (monk's bridge)। নামটি যদিও এখনও প্রচলিত আছে, তথাপি সেতুর ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে কেও কিছু জানে না, কেবল এর তিনটি প্রাচীন খিলানের নীচে দিয়ে ক্ষুদ্র শান্ত পল্লীনদী স্যানটন্ বার্ণ চার শ' বছর আগেকার মতই নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রবে বয়ে যাচ্ছে। এই নদীর ট্রাউট মাছ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। ম্যান্ দ্বীপের অধিবাসীরা সুনিপুণ মৎস্য-শিকারী। স্যানটন বার্ণ নদীর ধারে কয়েকটি বড় জেলেদের গ্রাম ও মাছ ধরার আড্ডা আছে।



উপরে: পোর্ট এরিন সমুদ্র-তীরে গর্দ্দভারূঢ়া সুন্দরী; এই গাধায় চড়িয়া তিন-পা না যাইতেই ডিগবাজী খাইবার মজার জন্যই এই খেলার সৃষ্টি।

স্থানীয় পার্লিয়ামেণ্টে যে সব আইন পাশ করা হয়, এখানকার প্রাচীন রীতি অনুসারে প্রতি বৎসর ৫ই জুলাই তারিখে ঐ আইন টিন্‌ওয়াল্ড পাহাড় থেকে সকলকে পড়িয়ে শুনিয়ে দেওয়া হয়। এই উপলক্ষে এখানে একটি দরবার হয়।

এই নিয়ম যে কত দিনের পুরোনো, তা কেউ জানে না। তবে, এটা ঠিক যে, ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে ম্যান্ দ্বীপের প্রথম পার্লিয়ামেণ্ট বসবার সময় থেকেই এ নিয়ম প্রচলিত রয়েছে। যখন এ দ্বীপে স্কাণ্ডিনেভীয় রাজারা রাজত্ব করতেন, মনে হয়, প্রথাটা সেই সময় থেকে চলে এসেছে, কারণ স্কাণ্ডিনেভীয় রাজারা মুক্ত আকাশতলে রাজসভা বসাতেন এবং পাহাড় বা কোন উচ্চ স্থান থেকে তাঁদের আদেশ প্রজাসাধারণকে জানিয়ে দিতেন।

এবার ৫ই জুলাই এসে পড়াতে আমি ঠিক করলাম, আমিও দরবার দেখতে যাব।

জনৈক বন্ধু তাঁর মোটরে আমাকে সেণ্ট জন্‌স্ গ্রামে নিয়ে গেলেন, সেখানে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ টিন্‌ওয়াল্ড পাহাড় অবস্থিত।

সারবন্দী হয়ে দর্শকদল দেখি পাহাড়ের নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমাদেরও তাদের মধ্যে স্থান-সংগ্রহের জন্যে বিশেষ বেগ পেতে হয় নি।

পাহাড়টি কৃত্রিম, বারো ফুট উঁচু এবং আশী ফুট পরিধি বিশিষ্ট। প্রবাদ এই যে, দ্বীপের সতেরোটি বিভিন্ন ধর্ম্ম-যাজকীয় জেলা থেকে এই পাহাড়ের মাটি আনা হয়েছে। ঢিবির উপরে এক স্থানে বিশিষ্ট ধর্ম্মযাজকদের আসন, তাঁদের পাশেই ম্যান্ দ্বীপের পার্লিয়ামেণ্টের (স্থানীয় হাউস্ অফ্ কিজ) সভ্যদের আসন, এঁদের পেছনে দ্বীপের অন্যান্য বিশিষ্ট কর্ম্মচারীদের আসন। শাসন-কর্ত্তার উপাধি লেফটেনাণ্ট গভর্ণর। এঁর বসবার জন্যে একখানা উঁচু চেয়ার পাতা।

সেন্ট জনের ভজনালয় থেকে দু'শো গজ দীর্ঘ সোজা রাস্তা চলে গিয়েছে টিন্‌ওয়াল্‌ড পাহাড়ে। এই রাস্তার দু'ধারে লোকে লোকারণ্য। কিং উইলিয়াম্‌স্ কলেজের একদল সামরিক ছাত্র সার দিয়ে রাইফল-হাতে দাঁড়িয়ে আছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা আবশ্যক যে, কিং উইলিয়াম্‌স্ কলেজের এই ছাত্র-সৈনিকগণ ব্যতীত ম্যান্ দ্বীপে আর কোনও সৈন্য নেই।

সকলে পাহাড়ে এসে সমবেত হওয়ার পূর্ব্বে গির্জ্জার প্রধান ধর্ম্মযাজক একটি প্রার্থনা-মন্ত্র পাঠ করলেন. তারপর গির্জ্জার দরজা খুলে এক বিরাট শোভাযাত্রা ধীরে ধীরে পাহাড়ের দিকে রওনা হল। সকলের আগে জনৈক সামরিক কর্ম্মচারী রাজকীয় তরবারি-হাতে যাচ্ছিলেন, তাঁর পেছনে লেফটেনেন্ট গভর্ণর, তাঁর পিছনে লর্ড বিশপ, তাঁর পিছনে ম্যানদ্বীপের প্রধান বিচারালয়ের বিচারকগণ (স্থানীয় নাম, ডিম্‌ষ্টারস্)। এঁদের পেছনে স্থানীয় পার্লিয়া-মেন্টের মেম্বারগণ, এঁদের পেছনে বিভিন্ন জেলার ধর্ম্মযাজক-গণ।

এঁদের সকলেরই পরনে নানা রঙের জমকালো পোষাক। সুতরাং, শোভাযাত্রাটি যে নানা বর্ণে সমৃদ্ধ, তা সহজেই অনুমেয়।

লেফটেনাণ্ট গভর্ণর আসন গ্রহণ করবার পূর্ব্বে ব্যাণ্ড বেজে উঠল এবং সৈন্যগণের তলোয়ার ও বেয়নেট রৌদ্রে ঝক্‌ঝক্ করে উঠল।

গভর্ণরের উঠবার সিঁড়ির ধাপগুলোতে খড় বিছান। এ না কি এখানকার বহু প্রাচীন প্রথা।

গভর্ণর আসন গ্রহণ করবার পরে একটি মজার রীতি অনুষ্ঠিত হয়। জনৈক কর্ম্মচারী, তাঁর উপাধি 'করোনার' (আমাদের শেরিফের মত), তিনি একটি মন্ত্র উচ্চারণ করে সভাকে বেঁধে ফেলেন (যেমন ভূতের ওঝা মন্ত্র উচ্চারণ করে গৃহস্থের বাড়ী বাঁধে)।

এ সব প্রাচীন অনুষ্ঠান যথাযথভাবে শেষ হয়ে যাওয়ার পরে একজন কর্ম্মচারী উঠে দাঁড়িয়ে ইংরাজী ও ম্যান্ দ্বীপের ভাষায় নতুন বছরের আইনগুলি উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করে সর্ব্বসাধারণকে শুনিয়ে দিলেন।

তারপরে গত বৎসরের করোনারগণ কার্য্য পরিত্যাগ করে তাঁদের নিজ নিজ পদের পোষাক ও দণ্ড নতুন বৎসরের করোনারগণের হাতে তুলে দিলেন।

শোভাযাত্রা আবার পূর্ব্বের মত প্রণালীতে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে গির্জ্জার দিকে চলল। সেখানে গভর্ণর আইনগুলিতে স্বাক্ষর করেন।

সভা ভেঙে গেলে আমি তো সেখান থেকে নিকটবর্ত্তী পিল সহরে একটা বড় মেলা বসেছে, তাই দেখতে গেলাম। পথে একটা উঁচু পাহাড় পড়ে, আমার বন্ধু বললেন,—এক সময় ডাইনীদের এই পাহাড় থেকে নীচে ফেলে মারা হত।

পিল সহরের নিকটেই সমুদ্রের খাড়ির মুখে সেন্ট প্যাট্রিক দ্বীপ। এই দ্বীপে একটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দুর্গ আছে। দুর্গের নাম সেন্ট প্যাট্রিক কাস্‌ল্। বারুদ আবিষ্কারের পূর্ব্বে এই প্রাসাদদুর্গ সত্যই দুর্ভেদ্য ছিল।

ঢুকবার মুখেই একজন বৃদ্ধ অধিবাসী প্রাসাদ সম্বন্ধে একটি ভূতের গল্প করলে।

দুর্গের সম্মুখে যে প্রহরীদের ঘর আছে, ওখানে আগে প্রতিরাত্রে একটা কালো কুকুর এসে অগ্নিকুণ্ডের সামনে বসত। কুকুরটা যে ভূতযোনি, এ বিষয়ে কারও সন্দেহ ছিল না। সেজন্য একা কোন প্রহরী রাত্রে দুর্গের মধ্যে যাতায়াত করত না। একবার একটা সৈন্য মদ খেয়ে অতিরিক্ত মাতাল হয়ে পড়ে। সে বাজী রেখে কালো কুকুরের পেছনে একা যায়। একটু পরে লোকটা প্রহরীদের ঘরে ফিরে এল বটে, কিন্তু তার বাক্‌শক্তি রোধ হয়ে গিয়েছিল। তিন দিন পরে সে বিষম যন্ত্রণা পেয়ে মারা পড়ে। কুকুরটাকেও সেই থেকে আর কেউ দেখে নি।

এই প্রাসাদ-দুর্গের গল্প বহুকাল থেকে প্রচলিত। স্যর ওয়ালটার স্কট্ ম্যান্‌দ্বীপের এই ভূতের গল্প শুনে এমন চমৎকৃত হয়েছিলেন যে, তাঁর 'The Lay of the Last Ministrel' কবিতার মধ্যে এর উল্লেখ করেছেন :—

For he was speechless, ghastly, wan,
Like him, of whom the story ran
That spake the spectre hound in Man.

—ক্যাপ্টেন এফ্.-এচ্. মিলার লিখিত বর্ণনা হইতে।

ভারতের শিল্প-সংস্থান

—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

ভারতবর্ষ কৃষি-প্রধান দেশ হইলেও সর্ব্বদেশের শিল্প-জাত দ্রব্যসম্ভার এ দেশে প্রচুর পরিমাণে আমদানী হইয়া আসিতেছে। অল্পদিন হইল, এ দেশের বর্ত্তমান শিল্পগুলির উন্নতিবিধান ও নব নব শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রচেষ্টা হইতেছে। ইহা ভাল কি মন্দ, সেই আলোচনা না করিয়া এই প্রবন্ধে সাধারণভাবে কয়েকটী শিল্পের বিষয় বর্ণিত হইবে।

এ দেশজাত মূল উপাদানগুলিকে (raw materials), অর্থাৎ যাহাকে কাঁচামাল বলা হয়, প্রধানতঃ তিনটী শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়, যথা :—

(১) উদ্ভিজ্জ, (২) প্রাণীজ ও (৩) খনিজ। চাউল, গম, তুলা ও তৈল-বীজ উদ্ভিজ্জ দ্রব্যের মধ্যে প্রধান। পশু-লোম, অস্থি, চর্ম্ম, গালা, রেশম প্রভৃতি প্রধান প্রাণীজ সামগ্রী। ধাতুর আকর, কয়লা, চীনামাটি, বক্সাইট্ প্রভৃতি প্রধান খনিজ দ্রব্য। বর্ত্তমান প্রবন্ধে উদ্ভিজ্জ কয়েকটী দ্রব্যের বিষয় আলোচিত হইবে।

আমাদের নিত্য-ব্যবহার্য্য শস্য, ফল ও সব্জীর চাষ কৃষকদের উপর নির্ভর করে। বহুকাল হইতে প্রচলিত ও স্বল্পব্যয়সাধ্য প্রণালীতেই এই সকল চাষ-আবাদ হইয়া থাকে। সরকারী কৃষি-বিভাগের চেষ্টায় তেজস্কর বীজ ও সারের প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে মাত্র।

চাউল ও গম : ডেক্সট্রিন, শ্বেতসার ও গ্লুকোজ

এ দেশে উৎপন্ন ধান ও গম প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হয় ও ঐ সকল শস্য হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিদেশ হইতে আমদানীও হয় যথেষ্ট। সমগ্র ভারত ও ব্রহ্মদেশে প্রতি বৎসর প্রায় ৮,৬৪ কোটি মণ ধান ও ২৭ কোটী মণ গম জন্মে। এই উভয় শস্যেরই মূল উপাদান শ্বেতসার। চাউলের গুঁড়া বা আটাকে জলমিশ্রিত করিয়া বর্দ্ধিত চাপে (increased pressureএ) উত্তপ্ত করিলে ডেক্সট্রিন্ (dextrin) প্রস্তুত হয়। অল্প পরিমাণ অ্যাসিডের সহিত ঐ দ্রবণকে বেশীক্ষণ ফুটাইলে, শ্বেতসার গ্লুকোজে (glucoseএ) পরিণত হয়। পরে দ্রবণটীকে অ্যাসিডমুক্ত করিয়া, মৃদু তাপে ঘনীভূত করিলে গ্লুকোজ পাওয়া যায়। পরিষ্কৃত শ্বেতসার, ডেক্সট্রিন্ ও গ্লুকোজ এ দেশে প্রচুর পরিমাণে আমদানী হয়। শ্বেতসার কাগজ ও কাপড়ের মাড়ের জন্য ব্যবহৃত হয়, গ্লুকোজ ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং ডেক্সট্রিন্ হইতে ভাল আঠা প্রস্তুত হয়।

তুলা : নাইট্রো-সেলুলোজ

বোম্বাই প্রেসিডেন্সী ও মধ্যভারত তুলার জন্য প্রসিদ্ধ। সমগ্র ভারতে প্রতি বৎসর প্রায় ৩০॥ কোটি মণ তুলা জন্মে। ইহার কিয়দংশ রপ্তানী হয়, কিয়দংশ দেশের কলগুলিতে ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু এই তুলার আঁশ (fibre) আশানুরূপ দীর্ঘ না হওয়ায় ইহা হইতে প্রস্তুত বস্ত্রাদিও তাদৃশ সূক্ষ্ম হয় না। যদিও তুলার চাষের উন্নতিবিধায়ক গবেষণার ফল যথেষ্ট আশাপ্রদ বলিয়া মনে হইতেছে, তথাপি কাপড়ের কলে অব্যবহার্য্য ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত তুলা ও কাপড়ের কলে পরিত্যক্ত অব্যবহার্য্য আঁশগুলির পরিমাণও অল্প হইবে না। এই আঁশ হইতে সেলুলয়েড (celluloid) জাতীয় দ্রব্য প্রস্তুত হইলে বস্ত্রের মূল্য আরও হ্রাস করা সম্ভব এবং সেই সঙ্গে নূতন একটী শিল্পে ব্যবহারোপযোগী মূল উপাদান সরবরাহ করা যাইতে পারে। তুলার আঁশের মূল উপাদানের রাসায়নিক নাম সেলুলোজ (cellulose)। ইহাতে অঙ্গার, হাইড্রোজেন্ ও অক্সিজেন্ বর্ত্তমান আছে। পরিষ্কৃত তুলার আঁশকে তীব্র নাইট্রিক (nitric) ও সাল্ফিউরিক্ (sulphuric) অ্যাসিডের সহিত মিশ্রিত করিলে নাইট্রো-সেলুলোজ নামক দ্রব্য প্রস্তুত হয়। এই প্রক্রিয়ায় একাধিক ধর্ম্মবিশিষ্ট নাইট্রো-সেলুলোজ প্রস্তুত হয়। উহাদিগকে আংশিকভাবে পৃথক্ করিয়া লইলে বিস্ফোরক দ্রব্য, সেলুলয়েড প্রভৃতি পাওয়া যায়।

সেলুলয়েডের পাত এদেশে প্রচুর পরিমাণে আমদানী করা হয় ও উহা হইতে বিবিধ প্রকারের কৌটা, যাবাদানী,

চিরুণী প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। সেলুলয়েডের দ্রবণ হইতে নকল রেশম (artificial silk) ও মূল্যবান রং প্রস্তুত হয়।

কাঠের গুঁড়া : মিথিল্ সুরা, অক্‌সালিক অম্ল

মধ্যপ্রদেশ, নেপাল ও আসাম অঞ্চলের কাঠ চেরাই-এর কারখানাগুলি হইতে প্রচুর পরিমাণে কাঠের গুঁড়া সংগ্রহ করা যায়। বিভিন্ন দিয়াশলাই-এর কল হইতেও কাঠের গুঁড়া পাওয়া যায়। শুষ্ক কাঠের গুঁড়ায় অগ্নি সংযোগ করিলে উহা জ্বলিয়া যায় ও সামান্যমাত্র ভস্ম অবশেষ থাকে। সম্পূর্ণ রূপে আবৃত বায়ুশূন্য আধারে উত্তপ্ত (বিধ্বংসতির্য্যকপাতন) করিলে এই দহন-প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হয়। উত্তাপের ফলে বাষ্পাকারে বিবিধ দ্রব্য বাহির হয়। উহাকে শীতল করিলে যে তরল পদার্থ সংগৃহীত হয়, তাহাকে আংশিক ভাবে পৃথক্ (fractional distillation) করিলে মিথিল্ সুরা (methyl alcohol) ও অ্যাসেটিক অম্ল (acetic acid) প্রভৃতি পাওয়া যায়। এই উভয় দ্রব্যই দ্রাবক (solvent) হিসাবে বহুল পরিমাণে আমদানী করিয়া ব্যবহৃত হয়। কষ্টিক সোডার সহিত কাঠের গুঁড়াকে উত্তপ্ত করিলে অক্‌সালিক অম্ল (oxalic acid) প্রস্তুত হয়। এই অম্ল আলোকচিত্র শিল্পে এবং রেশমী ও পশমী বস্ত্রাদি পরিষ্কৃত করিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়।

সুরাসার

কাঠের গুঁড়া হইতে সাধারণ স্পিরিট (ইথিল সুরা) বা সুরাসার প্রস্তুত হয়। কিঞ্চিৎ দ্রাবকের সহিত কাঠের গুঁড়াকে বর্দ্ধিত চাপে পরিপাক করিলে মণ্ডে পরিণত হয়। পরে ঐ অম্লাংশকে প্রশমিত (neutralise) করিয়া এক জাতীয় বীজাণু দেওয়া হয়। ঐ সকল বীজাণুর জীবনক্রিয়ার ফলে মণ্ডাংশ রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের ফলে সুরাসার (ethyl alcohol) প্রস্তুত হয়। দেখা গিয়াছে যে, এই প্রণালীতে প্রস্তুত সুরাসারের মূল্য খুবই কম হয়। রবিকর-প্লাবিত অরণ্যাংশের সতেজ বনানী হইতে সুদূর ভবিষ্যৎকাল পর্য্যন্ত এই প্রণালীতে প্রস্তুত সুরাসারের সাহায্যে যান্ত্রিক সভ্যতা পরিপুষ্ট হইতে পারে।

জাভা হইতে প্রচুর পরিমাণে সুরাসার পানের অযোগ্য (methylated) করিয়া এ দেশে আমদানী হয় ও এ দেশীয় চিনির কারখানায় অব্যবহার্য্য গুড় হইতেও কিয়ৎ পরিমাণে সুরাসার প্রস্তুত হয়, কিন্তু অল্প মূল্যে প্রচুর পরিমাণে সুরাসার প্রস্তুত হওয়া বাঞ্ছনীয়। দেখা গিয়াছে যে, সাধারণ মোটর গাড়ীর এঞ্জিনের নির্মাণপদ্ধতি সামান্যরূপে পরিবর্ত্তিত করিলেই পেট্রোলের পরিবর্ত্তে সুরাসার ব্যবহৃত হইতে পারে। বর্ত্তমানে এ দেশে প্রচুর পরিমাণে পেট্রোল আমদানী হয়, অথচ ভারতবর্ষ ও সমগ্র পৃথিবীর তৈলের খনিগুলি হইতে যে অফুরন্ত ভাবে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য পেট্রোল পাওয়া যাইবে, সে বিষয়ে নিশ্চয়তা নাই।

পেট্রোল : লুব্রিকেটিং অয়েল, মোম

এই স্থলে পেট্রোলের জন্মকথা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমেরিকা, এসিয়া-মাইনর, আসাম ও ব্রহ্মদেশে ভূগর্ভে নলকূপ খনন করিয়া কর্দ্দম, জল ও বালি-মিশ্রিত ঘন তৈল উত্তোলিত করা হয়। উহাকে তাপের সাহায্যে আংশিকভাবে পৃথক্ (fractional distillation) করিলে, যথাক্রমে পেট্রোল ও বিভিন্ন বর্ণের কেরোসিন সংগৃহীত হয়। অবশিষ্ট ঘন অংশ হইতে লুব্রিকেটিং তৈল (lubricating oil) এবং মোম (wax) পাওয়া যায়।

তৈলবীজ : ওয়াটারপ্রুফ্, লিনোলিয়াম, সাবান

এ দেশে উৎপন্ন বিবিধ প্রকারের তৈলবীজের পরিমাণ ১১৩০ লক্ষ মণ। তিসি জন্মে প্রায় ১০৪ লক্ষ মণ ও রেড়ীর পরিমাণ প্রায় ৩২ লক্ষ মণ। প্রথমতঃ, ঐ সকল বীজ হইতে প্রাপ্ত তৈল এ দেশেই বিশেষভাবে পরিষ্কৃত করিলে অধিকতর মূল্যে বিক্রীত হওয়া সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, ঐ সকল তৈল হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদিরও যথেষ্ট চাহিদা আছে। তিসির তৈল বিশেষ প্রণালীতে পাক করিয়া রংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহা হইতে জলরোধক (water proof) ত্রিপল ও বস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়। লিনোলিয়াম্ (linoleum), নকল চামড়া (artificial leather) এবং অয়েলক্লথ্ (oil cloth) প্রস্তুত করিতে হইলে তিসির তৈলের প্রয়োজন হয়। রেড়ীর তৈল ঔষধে ব্যবহারোপযোগী করিতে হইলে সুপরিষ্কৃত হওয়া প্রয়োজন। ইহা হইতে সাধারণ ব্যবহারের পক্ষে উৎকৃষ্ট সাবান প্রস্তুত হয়। ঐ সাবান সহজেই জলে দ্রবীভূত হইয়া যায় বটে, কিন্তু ত্বক্ খুব মসৃণ রাখে। সে কারণ এই তৈল হইতে উচ্চশ্রেণীর সাবান ও তরল সাবান (liquid soap) প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ঈনান্থল্

মৃদুচাপে (reduced pressure) বায়ুশূন্য আধারে উত্তপ্ত করিলে রেড়ীর তৈল হইতে ঈনান্থল্ নামক উগ্রগন্ধযুক্ত একটী দ্রব্য পাওয়া যায়। ইহা সুগন্ধির প্রসারকরূপে ব্যবহৃত হয়। রেড়ীর তৈলের সহিত কিঞ্চিত তীব্র গন্ধকাম্ল মিশ্রিত করিয়া অল্পক্ষণ উত্তাপ দিলে উহার রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটে। শীতল হইলে ঐ মিশ্রণ হইতে মাখনের ন্যায়

একপ্রকার নমনীয় (plastic) দ্রব্য পাওয়া যায়। উহাকে পরিষ্কৃত করিয়া বেকিলাইটের (bakelite) ন্যায় বিবিধ ব্যবহারে আনা যাইতে পারে। অপরিষ্কৃত রেড়ীর তৈল এ দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হয় এবং পরিষ্কৃত হইয়া এ দেশে আমদানী হয়। এই তৈলের সংমিশ্রণে প্রস্তুত লুব্রিকেটিং তৈলও আমাদের দেশে আমদানী হয়।

ভেজিটেবল ঘী, সাবান ও বিস্কুট

সূতার কলে অব্যবহার্য্য তুলার বীজ হইতে যে তৈল পাওয়া যায়, নিকেল্ নামক ধাতুর সূক্ষ্ম কণার সহিত মিশ্রিত করিয়া উত্তপ্ত অবস্থায় ঐ মিশ্রণের মধ্যে হাইড্রোজেন গ্যাস চালিত করিলে তৈলটী ঘনীভূত হইয়া যায়। বর্ত্তমানে এদেশে ব্যবহৃত উদ্ভিজ্জাত ঘৃত (vegetable ghee) এই প্রণালীতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এইরূপে ঘনীভূত তৈল হইতে উৎকৃষ্ট সাবান প্রস্তুত হয়। সাবান প্রস্তুতের জন্য চর্ব্বির পরিবর্ত্তে অন্যান্য তৈলের সহিত এই ঘনীভূত তৈলও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

নারিকেল তৈলকে উপযুক্ত পরিমাণ কষ্টিক্ সোডার সহিত ফুটাইয়া সাবান প্রস্তুত হয়। ঘন হইয়া আসিলে সাবানকে ছাঁচে ঢালিয়া দেওয়া হয়। তবে শুধু নারিকেল তৈল হইতে প্রস্তুত সাবান নরম হয় ও সহজেই দ্রবণীয় হয় বলিয়া কম ফেনা হয়, কিন্তু নারিকেল তৈলের সহিত চর্ব্বি মিশ্রিত করিলে সাবান কঠিন হয় ও জলে পরিমিত পরিমাণে দ্রবণীয় হয়। এ দেশে সাবানের কারখানায় এই তৈল প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পরিষ্কৃত নারিকেল তৈল কোন কোন স্থানে ঘৃতের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। নারিকেলের খইল হইতে সুস্বাদু বিস্কুট প্রস্তুত হয়।

ফল : জ্যাম,

এ দেশের বিভিন্ন প্রদেশের নানাপ্রকার ফল প্রচুর জন্মে। প্রায় ৭২ লক্ষ বিঘায় ফলের আবাদ হইয়া থাকে। ঐ সকল ফলকে কিছুদিন অবিকৃত অবস্থায় রাখিয়া অন্যান্য অঞ্চলে রপ্তানী করা প্রয়োজনীয় ও লাভজনক ব্যবসায়।

ঐ সকল ফলের রসও উপাদেয় ও উপকারী খাদ্য। সাধারণ কয়েকটী ফল হইতে জ্যাম ও জেলি প্রস্তুত হইতে পারে।

সাইট্রিক য়্যাসিড

পাতি ও কাগজী লেবু হইতে সাইট্রিক অম্ল প্রস্তুত করিতে পারা যায়। লেবুর রসের সহিত বিশুদ্ধ খড়িমাটী (chalk) মিশ্রিত করিলে ক্যালসিয়ম সাইট্রেট নামক লবণ প্রস্তুত হয়। উহাকে পরিষ্কৃত করিয়া সালফিউরিক য়্যাসিড দিলে ক্যালসিয়াম সালফেট্ (calcium sulphate) নামক দ্রব্যের প্রক্ষেপ হয় ও সাইট্রিক য়্যাসিডের দ্রবণ পাওয়া যায়। ইহা এদেশে প্রচুর পরিমাণে আমদানী হয়। ঔষধে ও সরবতে ইহা ব্যবহৃত হয়।

টার্টারিক য়্যাসিড

তেঁতুলও এদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হয়। ইহাতে টার্টারিক য়্যাসিড (tartaric acid) আছে। উপরোক্ত প্রণালীতে তেঁতুল হইতে টার্টারিক অম্ল প্রস্তুত হইতে পারে। এই অম্লও প্রচুর পরিমাণে আমদানী হয়।

ট্যানিন

হরিতকী, বহেড়া, খদির প্রভৃতি ফলে ট্যানিন্ নামক একপ্রকার কষায় দ্রব্য আছে। এই ফলগুলি ও খদির এ দেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হইয়া থাকে, কিয়দংশ মাত্র দেশীয় চামড়ার কারখানাগুলিতে ব্যবহৃত হয়। পরিষ্কৃত ট্যানিক্ ও গ্যালিক য়্যাসিড এ দেশে আমদানী হয়। সুতরাং এই দুইটি অম্ল-প্রস্তুত শিল্পের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ বলিয়া মনে হয়।

এই প্রবন্ধে বর্ণিত কয়েকটী দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ ও তাহার মূল্যের তালিকা (১।৪।৩৭ হইতে ৩১।৩।৩৮)।

রপ্তানী

	পরিমাণ	মূল্য
চাউল—	১,৮৩,৭২৬ টন	২,০৬,৩৩,৯২৭ টাকা
গম—	৪,২৭,৬৯২ "	৪,৬০,৪৪,২৮০ "
তুলা —	৩,৯৩,৭০৬ "	২৪,১৩,৮৩,৪২৩ "
রেড়ীবীজ—	৪০,০৭৪ "	৩১,১১,১০৪ "
তিসি—	১,৯২,৩৫৭ "	৩,০৪,০৯,৮৫১ "
হরিতকী—	৩৫,৩৫৭ "	৩৯,৫২,৪৬১ "

আমদানী

	পরিমাণ	মূল্য
মেন্থল ও জেস্পটীন—	৬৫,৭০৪ "	৫৭,৯৫,৫১৮ "
য়্যাসেটিক্ অম্ল—	৩৫৭ "	২,৫৫,৫৭১ "
অক্জালিক অম্ল—	১০৩ "	৭০,৩৭১ "
বিশিষ্ট সুরা (মেথিলেটেড স্পিরিট)—	৩,১৮,০৬৮ গ্যালন	৫,৭৯,৩৫৬ "
সাইট্রিক অম্ল—	১১৪	১,২৬,৩৬৭ "
টার্টারিক	৩১	৭০,৮২৪ "

নদীয়ার কথা

—শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য্য

ভৌগোলিক অবস্থিতি ও নামোৎপত্তি

নদীয়া বাংলার অতীত গৌরব-বাহিনী। সুদূর অতীত কাল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাক্-বৃটিশ যুগ অবধি নদীয়াই ছিল বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল। জ্ঞানে, ধর্ম্মে, সাহিত্যে, সভ্যতা ও কৃষ্টির আদর্শে সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া নদীয়াই প্রাচ্য-ভারতের এই সুবৃহৎ ভূখণ্ডের নায়কত্ব করিয়া আসিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নদীয়ার জ্ঞানদীপ্তিতে বাংলা ভাস্বর, নদীয়ার অফুরন্ত প্রেমধর্ম-প্রবাহেই প্রাচ্য-ভারত এমন অপরূপ রসোদ্বেলিত। বাঙ্গালার বহু গৌরবগাথা নদীয়াকে লইয়া, আবার বিগত ইতিহাসের বহু মর্ম্মন্তুদ শোচনীয় ঘটনাও নদীয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট। এক কথায় নদীয়াই প্রাচীন বাংলার ইতিহাস রচনা করিয়াছে, জাতীয় উত্থান-পতনের মানদণ্ড ধারণ করিয়া আছে। এই হিসাবে নদীয়ার পুরাবৃত্ত আলোচনায় একটি স্বতন্ত্র মূল্য আছে এবং বাঙ্গালার এই সর্ব্বাঙ্গীন দুর্দ্দশার দিনে নদীয়ার পুরাতন ও বর্ত্তমান পরিস্থিতির কথা নূতন করিয়া আলোচিত হইবার সময় আসিয়াছে; তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন হিন্দু নরপতি লক্ষ্মণ সেন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত নবদ্বীপ হইতেই এই জেলার নামকরণ হইয়াছে—নদীয়া। তাহারও পূর্ব্বে এই সঙ্কীর্ণ ভূখণ্ডের অস্তিত্ব ও পরিচয় সম্বন্ধে কিছু কিছু জানিতে পারা যায়। বিশেষজ্ঞগণের মতে প্রাগৈতিহাসিক যুগে গঙ্গার মোহনাস্থিত সাগর-উপকূলে ধীরে ধীরে পলিমাটি সঞ্চিত হইয়া কালে উক্ত বিশাল পাললিক (alluvial) ভূখণ্ডের উদ্ভব হয়। সেই সময় ভৌগোলিক আকৃতি হিসাবে ইহা সাগর উপকণ্ঠে ভাগীরথী-ধারার শতধা-বিভক্ত ব-দ্বীপশ্রেণী মাত্র ছিল। টলেমীর দ্বিতীয় শতকের আগে ইহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় আছে। গ্যারেট সাহেব নদীয়ার গেজেটিয়ারে ইহার উৎপত্তির কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছিলেন—Nadia in those days appear to have been a fen country intersected by rivers and morasses. রঘুবংশে মহাকবি কালিদাস রঘুর দিগ্বিজয় উপলক্ষে বঙ্গদেশে গঙ্গা-প্রবাহ-মধ্যবর্ত্তীর যে দ্বীপের উল্লেখ করিয়াছেন,* তাহাও এই স্থান বলিয়া মনে হয়। প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙ সপ্তম খৃষ্টাব্দে যখন এই দেশে আসিয়াছিলেন, সেই সময় দক্ষিণ-বঙ্গ সমতট ও তাম্রলিপ্তি, এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। হিউ-এন-সাঙের উক্ত বর্ণনা হইতে অনুমান করা যায় যে, নদীয়া সে সময়ে হয় ত সমতটের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বহুকাল পরে বল্লাল সেন বঙ্গদেশকে পুনরায় চারিটী প্রদেশে বিভক্ত করেন—উত্তর ভাগ, বারেন্দ্র ও বঙ্গ, ব্রহ্মপুত্র নদ দ্বারা বিভক্ত এবং দক্ষিণ ভাগ, রাঢ় ও বাগড়ি, গঙ্গার শাখা জলাঙ্গী নদী কর্ত্তৃক পৃথকীকৃত। এই বাগড়িই সম্ভবতঃ নদীয়া জেলা। বলা বাহুল্য, কালে উক্ত দ্বীপাকৃতি ভূভাগই গঙ্গার পলিতে ক্রমশঃ বিস্তীর্ণ ও উচ্চতা প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান আকৃতি ধারণ করিয়াছে—ইহাই বিশেষজ্ঞগণের অভিমত।

প্রাগৈতিহাসিক কালের অনুমানিক বিবরণ ছাড়িয়া দিয়া ঐতিহাসিকতার নির্দ্দিষ্ট সীমা-রেখার মধ্যে ফিরিলে দেখি, গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণ সেন গৌড় হইতে তাঁহার রাজধানী অপসারিত করিয়া দ্বাদশ শতকের শেষ ভাগে ভাগীরথী-তীরস্থ নবদ্বীপে লইয়া আসেন এবং এই খানেই বিন্ বক্তিয়ার খিলজী বিনা যুদ্ধে তাঁহার নিকট হইতে ১২০০ খৃষ্টাব্দে বাংলার রাজদণ্ড কাড়িয়া লন। বাংলার রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের অন্তর্গত এই কলঙ্কময় জনশ্রুতি সম্বন্ধে পরবর্ত্তী অধ্যায়ে যৎসামান্য আলোচনা করা যাইবে। মোটের উপর এই সময় হইতেই প্রকৃতপক্ষে নবদ্বীপের বা নদীয়ার ইতিহাসের সূচনা।

এই স্থানের নাম নবদ্বীপ বা নদীয়া কেমন করিয়া হইল, সে সম্বন্ধেও কয়েক প্রকার জনশ্রুতি আছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, খরস্রোতা গঙ্গার গর্ভে বিশাল চর উদ্ভূত হইয়া এই ভূখণ্ড গঠিত হইয়াছে। কথিত আছে, ঐ চরের কোনও

---

* বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌ-সাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোহন্তরেষু সঃ॥
৩৬।৪র্থ রঘুবংশ

নির্জন স্থানে একজন সন্ন্যাসী প্রত্যহ রাত্রে নয়টি দীপ বা প্রাম্য ভাষায় 'দীয়া' জ্বালাইয়া যোগ-সাধনাদি করিতেন। নৌকারোহিগণ দূর হইতে ঘনান্ধকারে নয় দীপ বা দীয়া জ্বলিতে দেখিয়া উক্ত চরকে নবদ্বীপের চর বা নদীয়ার চর বলিত এবং তাহা হইতেই কালে উক্ত স্থান নবদ্বীপ বা নদীয়া নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। বলা বাহুল্য, ইহা জনশ্রুতি মাত্র।

দ্বিতীয় প্রবাদ—গঙ্গাগর্ভে এই বিশাল নূতন দ্বীপ জাগিয়া উঠিলে যখন ক্রমে ইহার উপর জনবসতি হইতে আরম্ভ হইল, সেই সময়ে ইহার নূতন দ্বীপ বা নবদ্বীপ নাম-করণ করা হয়।

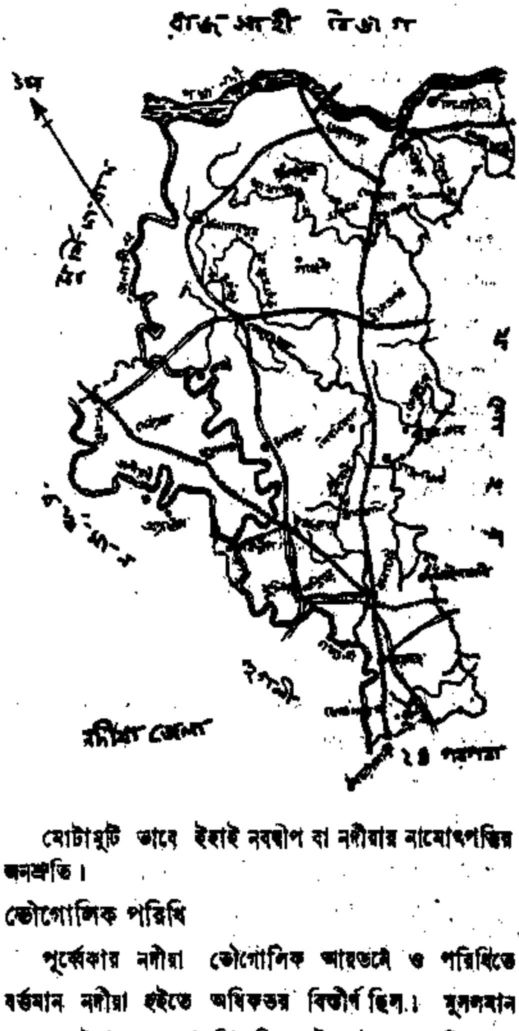
তৃতীয় প্রবাদ—এই সমগ্র দেশটি প্রাচীন কালে নয়টি ছোট ছোট দ্বীপে বিভক্ত ছিল এবং তাহা হইতেই এই স্থানের নাম হইয়াছে নবদ্বীপ। এই প্রবাদের সত্যতা সম্বন্ধে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া না গেলেও পূর্ব্বে এই অংশ যে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপাবলীর সমষ্টি মাত্র ছিল, সে কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই হিসাবে নয়টি দ্বীপ দ্বারা গঠিত প্রদেশকে নবদ্বীপ নাম দেওয়া অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না, এইটুকু মাত্র বলিতে পারা যায়।

নবদ্বীপ সহর হইতেই সমগ্র জেলার নামকরণ হইয়াছে নদীয়া। রাজধানীর নামানুসারে যেমন অনেক স্থলেই রাজ্যের নামকরণ হইয়া থাকে, তেমনই বোধ হয় হিন্দু-রাজত্বকালের রাজধানী নবদ্বীপ হইতেই চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রাম ও নগর-উপকণ্ঠের মিলিত নামকরণ হইয়াছিল—নদীয়া। বৈষ্ণব কবি নরহরি ঠাকুর নবদ্বীপ-পরিক্রমা গ্রন্থে উক্ত প্রবাদ সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন—

"নবদ্বীপে নবদ্বীপ নাম।
পৃথক্ পৃথক্ কিন্তু হয় এক গ্রাম।
তৈছে রাজধানী কেহো হান।
যদ্যপি অনেক তথা হয় এক নাম।

নরহরি ঠাকুর এই নয়টি পৃথক্ পৃথক্ দ্বীপের নাম দিয়াছেন ১। অন্তর্দ্বীপ (আতোপুর); ২। সীমন্তদ্বীপ (সিমলা); ৩। গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা); ৪। মধ্যদ্বীপ (মাজদা); ৫। কোলদ্বীপ (কুলিয়া); ৬। ঋতুদ্বীপ (রাতুপুর); ৭। মোদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি); ৮। জহ্নুদ্বীপ (জান নগর); ৯। রুদ্রদ্বীপ (রাহুপুর)।

নবদ্বীপ-পরিক্রমা গ্রন্থে এই নয়টি দ্বীপের অবস্থিতি, ঐশ্বর্য্য ও মহিমা কীর্ত্তন করিয়া ঠাকুর মহাশয় যে সুদীর্ঘ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে ঐতিহাসিক সত্যতা অপেক্ষা অলৌকিকত্বের অধিক বাহুল্য থাকায় এখানে তাহা উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন অনুভব করিলাম না। এইটুকু মাত্র বলিতে পারা যায় যে, উক্ত নয়টি দ্বীপ এখন দ্বীপাকারে না থাকিলেও নবদ্বীপ গ্রামের চতুষ্পার্শ্বে উক্ত নামের গ্রাম সত্য সত্যই আছে।



মোটামুটি ভাবে ইহাই নবদ্বীপ বা নদীয়ার নামোৎপত্তির জনশ্রুতি।

ভৌগোলিক পরিধি

পূর্ব্বেকার নদীয়া ভৌগোলিক আয়তনে ও পরিধিতে বর্ত্তমান নদীয়া হইতে অধিকতর বিস্তীর্ণ ছিল। মুসলমান আমলে ইহার যে আকৃতি ছিল, ইংরাজ-শাসনাধিকারের সূচনায় তাহা হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং পরবর্ত্তী কালে আরও কমিয়া বর্ত্তমান আকৃতি ধারণ করিয়াছে।

একণে ইহার আয়তন মাত্র ৩৪২১ বর্গ মাইল। ভৌগোলিক অবস্থিতি—উত্তরে ২৩°২৪´৫´´ অক্ষাংশ ও পূর্ব্বে ৮৮° ২৫´৩´´ দ্রাঘিমার মধ্যবর্ত্তী স্থানে, এবং নিম্নলিখিত রূপে ইহার চতুঃসীমা নির্দ্দিষ্ট—

উত্তরে—রাজসাহী,
পূর্ব্বে—পাবনা ও যশোহর,
দক্ষিণে—২৪ পরগণা,
পশ্চিমে—বীরভূম, বর্দ্ধমান ও হুগলী,
উত্তর-পশ্চিমে—মুর্শিদাবাদ।

এই সীমারেখা প্রায়ই নদ-নদী প্রভৃতি প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রিত, রাজ-শাসনের কাল্পনিক রেখায় নহে। উত্তরে পদ্মানদীর বিশাল স্রোতোধারা ইহাকে পাবনা ও রাজসাহী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, উত্তর-পশ্চিমে জলাঙ্গী নদী মুর্শিদাবাদ হইতে ও ভাগীরথী, হুগলী; বর্দ্ধমান হইতে স্বাভাবিক সীমারেখা টানিয়া পৃথক্ করিয়াছে। তবে দক্ষিণ অংশে এই ভৌগোলিক সীমার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়।

নবদ্বীপ ভাগীরথীর অপর পারে অবস্থিত। এই ১১ বর্গ মাইল স্থান উল্লিখিত নির্দ্দেশানুযায়ী বর্দ্ধমান জেলার সীমায় পড়িলেও বর্ত্তমানে কাল্পনিক সীমায় নদীয়া জেলারই অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, পূর্ব্বে নবদ্বীপ ভাগীরথীর পূর্ব্ব কূলেই অবস্থিত ছিল। নদীর গতি পরিবর্ত্তনে এখন উহা পশ্চিম কূলে অবস্থিত হওয়ায় এই নৈসর্গিক সীমার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলে অবস্থিত মহাপ্রভুর লীলানিকেতন, অতীত গৌরব-বিমণ্ডিত প্রাচীন নবদ্বীপ আজ গঙ্গাগর্ভে বিলীন। অপর পারে নবদ্বীপ নাম মাত্র লইয়া নূতন সহর গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান সহর দেখিয়া একেবারেই আধুনিক বলিয়া মনে হয়, প্রাচীনত্বের বিশেষ কোন নিদর্শনই সেখানে নাই।

উপরোক্ত নৈসর্গিক ব্যতিক্রম ঘুচাইবার জন্য স্যর জন ক্যাম্বেল একবার নবদ্বীপকে বর্দ্ধমানের অন্তর্ভুক্ত করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। নবদ্বীপ হইতেই নদীয়ার নামকরণ, নবদ্বীপকে কেন্দ্র করিয়াই নদীয়ার শিক্ষা ও সংস্কৃতি, সুতরাং ভৌগোলিক সীমার খাতিরে নদীয়া হইতে নবদ্বীপকে বিচ্ছিন্ন করা দেহ হইতে মুণ্ড বিচ্ছিন্ন করিবার মত। পরবর্ত্তী গভর্ণর স্যর রিচার্ড টেম্পল এই নির্দ্দেশ রদ করিয়া দেন। কিন্তু, নবদ্বীপের ১৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত অগ্রদ্বীপ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে বর্দ্ধমানের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়।

প্রাকৃতিকী

সকল দেশেরই আভ্যন্তরিক সম্পদ্ ও শ্রী তাহার নদনদীর অবস্থা ও অবস্থিতির উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। এই দিক্ দিয়া বিচার করিলেই নদীয়ার পূর্ব্বতন সমৃদ্ধি ও বর্ত্তমান দুর্দ্দশার একটা স্থূল কারণ জানিতে পারা যাইবে বলিয়া মনে হয়।

নদীয়া নদী-বহুল দেশ। মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাইব, ছোট-বড় বহুসংখ্যক নদীপ্রবাহধারায় এই নদীয়ার ভূখণ্ড বিখণ্ডিত। রেলপথ নির্ম্মাণের পূর্ব্বে এই সকল নদীই তাহার বাণিজ্য-সম্ভারকে দেশদেশান্তরে লইয়া গিয়াছে। তটপ্লাবী জলধারা তাহার উভয় কূলবর্ত্তী ভূভাগের উর্ব্বরতা ও স্বাস্থ্য-প্রদান করিয়া নদীয়াকে ধন-ধান্যে শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছিল।

সেই নদীয়ার নদী আজ মৃতকল্প। সমগ্র দেশ আজ প্রবাহময়ী স্রোতস্বতীর পরিবর্ত্তে অজস্র খাল, বিল ও শীর্ণ, ক্ষীণ জলরেখার জালাবরণে আবৃত। বড় নদীগুলির মধ্যে পদ্মা, জলাঙ্গী, ভৈরব, ভাগীরথী, মাথাভাঙ্গা বা হাউলিয়া, চূর্ণী, ইচ্ছামতী, গরাই প্রভৃতি কয়েকটির নাম উল্লেখযোগ্য। গ্রীষ্মকালে ইহাদেরও অনেকগুলি শুষ্কপ্রায় হইয়া যায়।

এই শোচনীয় অবস্থার সূচনা অবশ্য বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই হইয়াছে। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে মেজর রেনেল ইহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—They were not usually navigable in the dry season। বর্ত্তমানে এই দুরবস্থা এতই চরমে উঠিয়াছে যে, অদূরভবিষ্যতেই হয়ত জলাঙ্গী, চূর্ণী প্রভৃতি কয়েকটি নদী শতধা-বিভক্ত ছোট ছোট খাল-বিলে পরিণত হইয়া এই জেলারই অঞ্জনা, চন্দনা প্রভৃতি কয়েকটি ভূতপূর্ব্ব নদীর অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। শেষোক্ত দুইটির নামকরণে আজও নদীশব্দ ব্যবহৃত হইয়া ইহাদের অতীত অবস্থার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে মাত্র। বর্ত্তমানে উহাদের গর্ভে রীতিমত চাষ-আবাদ চলিয়া থাকে।

নদীবহুল দেশের নদী হইতেই তাহার বাণিজ্য-শ্রী ও স্বাস্থ্য-সম্পদ্, তাহা হইতেই জনসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি, তাহা হইতেই কৃষি-বিস্তার, পরিশেষে উহা হইতেই দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি-অবনতির অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। একটিকে বাদ দিয়া অন্যটির আলোচনায় সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া মনে হয় না। তাই নদীয়ার প্রাকৃতিকী হইতে আরম্ভ করিয়া একে একে ইহার সকল অবস্থা ও সকল পরিস্থিতির কথা পর পর আলোচনাপূর্ব্বক এই প্রবন্ধে মূল সমস্যা সন্ধানের চেষ্টা করা হইবে। নদীয়ার যাহা সমস্যা, সামান্য ইতর-বিশেষ করিয়া সমগ্র বাঙ্গালা দেশেরও তাহাই সমস্যা। এই হিসাবে সকলেরই এই দিকে অবহিত হইবার সময় আসিয়াছে।

বৈষ্ণব মুসলমান

—স্বামী ভূমানন্দ

উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে যে সমস্ত ভক্ত সাধক ও আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষদিগের নাম প্রচলিত আছে, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেক হিন্দু-ভাবাপন্ন মুসলমানের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত মুসলমান সাধকগণের অধিকাংশই বৈষ্ণব ছিলেন ও কয়েক জন আত্মজ্ঞানী যোগী পুরুষও ছিলেন। ইহাঁদিগের মধ্যে অনেকেরই জীবনের কোনও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহাও উল্লেখ-যোগ্য নয়। কিন্তু, তাঁহাদিগের প্রেম, ভক্তি ও জ্ঞান-বিষয়ক বাণীগুলি তাঁহাদিগকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

বাঙ্গালা দেশে এক মাত্র যবন হরিদাসের নামই বিশেষ ভাবে শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে এবংবিধ অনেক বৈষ্ণব মুসলমানের বাণী এখনও সঙ্গীতাকারে প্রচলিত রহিয়াছে এবং দেব-মন্দিরে ভজন-কালে সেই সমস্ত পদ-কীর্ত্তন হয়। বাঙ্গালা দেশে অবশ্য অনেক মুসলমান কবির রচিত হিন্দু দেব-দেবী সম্বন্ধে পদ এখনও প্রচলিত রহিয়াছে, কিন্তু ঐ সমস্ত কবি ধর্ম্মতঃ মুসলমানই ছিলেন, কেবল মাত্র কবি হিসাবে পৌরাণিক ঘটনা বা দেবতা অবলম্বনে পদ রচনা করিয়াছিলেন মাত্র। দরাফ খাঁ লিখিত গঙ্গা-স্তোত্র এখনও হিন্দুদিগকে আবৃত্তি করিতে শুনা যায়; কবম আলির "রাধা-বিরহ", পরাগল খাঁর "যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ" প্রভৃতি অনেক কবিতা এখনও এ দেশে প্রচলিত রহিয়াছে।

পশ্চিম দেশীয় যে-সকল মুসলমান সাধকের পদ এই প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই হিন্দু-পদ্ধতি অনুসারে সাধন-ভজন করিয়া ভগবৎ-প্রেম ও ভক্তি-লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন ও কেহ কেহ সদ্‌গুরুর উপদেশে যোগাদি অভ্যাস দ্বারা স্বদেহেই আত্মদর্শন করিয়া পূর্ণ-মনোরথ হইয়াছিলেন। এবংবিধ কয়েকজন মুসলমান সাধকের কয়েকটি পদ ও পদাংশ নিম্নে দেওয়া হইল। পদগুলি পড়িলেই মনে হয়, পদকর্ত্তা স্বকীয় মনোভাব দোঁহাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অনেক পদই ভাবে ও রসে প্রচলিত বৈষ্ণব পদাবলী অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন বলিয়া মনে হয় না। পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে মহাত্মা কবীরের কোনও পদ এখানে দেওয়া হইল না; কারণ, তিনি স্বরূপতঃ হিন্দু ছিলেন, কিন্তু বাল্যকালে অভিভাবকশূন্য অবস্থায় একজন মুসলমান জোলা কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে মুসলমান বলিয়া অনেকের ভুল ধারণা আছে। কবীরের উৎকৃষ্ট পদাবলী মৎপ্রণীত "কবীর-পন্থা" পুস্তকে দ্রষ্টব্য। নানক সাহেবকেও অনেকে মুসলমান বলিয়া জানেন, কারণ তাঁহার মুসলমান শিষ্য ছিল, কিন্তু স্বরূপতঃ তিনিও জাতিতে হিন্দু ছিলেন; এই জন্য তাঁহার রচিত পদও এখানে দেওয়া হইল না।

১। রহিম…

(ক) কমলদল-নৈনকী উনমানি।
বিসরতি নাহি সখী, মো মনতেঁ,
মন্দ মন্দ মুসকানি।
যহ দসননি-দুতি, চপলাহুতেঁ,
মহাচপল চমকানি।
বসুধাকী বস করী মধুরতা,
সুধা পগী বতরানি।
চঢ়ী রহে চিত উর বিসালকী,
মুকুত-মাল থহরানি।
নৃত্য-সময় পীতাম্বর হুকী,
ফহরি-ফহরি ফহরানি।
অনুদিন শ্রীবৃন্দাবন ব্রজতেঁ,
আবন আবন জানি।
অব "রহীম" চিততেঁ ন টরতি হৈ,
সকল শ্যামকী বানি।

আহা, পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি কি মনোহর! হে সখি, আমি তাঁহার মৃদুমন্দ হাসি ভুলিতে পারিতেছি না। তাঁহার দন্তপাঁতির জ্যোতিঃ বিদ্যুৎ অপেক্ষাও উজ্জ্বল। তাঁহার অমৃতময় মধুর বাক্যে

সমগ্র বসুধা বশীভূত। বিশাল বক্ষস্থলে দোদুল্যমান মুক্তার মালা, আমার চিত্ত অধিকার করিয়াছে; নৃত্য-সময়ে তাঁহার পীতাম্বর কি সুন্দরভাবে ফর ফর করিয়া উড়িতে থাকে! প্রত্যহই শুনিতেছি, তিনি শীঘ্রই শ্রীবৃন্দাবনে আসিবেন, কিন্তু আসিতেছেন ত না। "রহীমে"র চিত্ত হইতে শ্যামের বাক্যগুলি একটুও সরিয়া যাইতেছে না, অর্থাৎ তাঁহার বিদায়-কালের বাক্যগুলি সমস্তই স্মৃতিতে রহিয়াছে, একটুও ভুল হয় নাই।

(খ) কটিন কুটিল কালী দেখ দিলদার জুলফেঁ,
অলি কলিত-বিহারী আপনে জীকী কুলফেঁ।
সকল শশি-কলাকো রোশনী-হীন লেখৌ,
অহহ ব্রজ-লালাকো কিস তরহ্ ফের দেখৌ।

শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর উজ্জ্বল ঘন-কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম দেখিয়া, পুষ্পবিহারী ভ্রমর মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার বদন-কান্তিতে পূর্ণ-চন্দ্রকেও আভাহীন বলিয়া বোধ হইতেছে। আহা, আমি কেমন করিয়া পুনরায় সেই ব্রজদুলালকে দেখিব!

২। রসখানি…

(ক) মানুষ হৌ তো বহি রসখানি,
বসৌঁ ব্রজ গোকুল গাঁয়কে গারন।
জো পশু হৌ তো কহা বশ মেরো,
চরৌঁ নিত নন্দকী ধেনু-মঝারন॥
পাহন হৌ তো বহী গিরিকো,
জো ধর্যো কর ছত্র পুরন্দর-কারন।
জো খগ হৌ তো বসেরো করৌ মিলি,
কালিন্দী-কূল-কদম্বকো ডারন॥

'রসখানি' বলিতেছেন, জন্মান্তরে যদি তুমি মানুষ হও, তাহা হইলে ব্রজ-গোকুলে গোপদিগের মধ্যে বাস করিও; যদি পশু হও, তবে নন্দের ধেনুর সহিত নিত্য চরিয়া বেড়াইও; যদি পাষাণ হও, তবে ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে গোবর্দ্ধন গিরিকে ছত্রের ন্যায় ধারণ করিয়াছিলেন, সেই পর্ব্বতের পাথর হইও; আর যদি পক্ষী হও, তবে যমুনাকূলে কদম্ব বৃক্ষের ডালে বাসা বাঁধিয়া থাকিও।

(খ) জা দিন তৈঁ নিরখ্যো নংদ নন্দন,
কানি তজী ঘর-বন্ধন ছুট্যো।
চারু বিলোকনিকী নিসি মার,
সঁভার গয়ী, মন মারনে লূট্যো॥
সাগরকৌ সরিতা জিমি ধাবতি,
রোকি রহে কুলকো পুল টুট্যো।
মত্ত ভয়ো মন সঙ্গ ফিরে,
"রসখানি" স্বরূপ সুধারস ঘুট্যো॥

যে দিন নন্দ-নন্দনকে প্রথম দর্শন করিয়াছি, সেই দিন হইতেই আমার লজ্জা ও সংসার-বন্ধন ছুটিয়া গিয়াছে। তাঁহার সুন্দর নয়নের কটাক্ষ-বাণ কোনও রকমে সামলাইলাম, কিন্তু ওদিকে কামদেব আমার মন লুটিয়া লইলেন। 'রসখানি' বলিতেছেন, নদী যেমন কূলে আটকাইয়া থাকে, কিন্তু বাঁধ ভাঙ্গিলে সাগরের দিকে ছুটিয়া যায়, আমিও সেইরূপ এতদিন কুল-বন্ধনে বদ্ধ ছিলাম, এখন সে বন্ধন ছুটিয়া গিয়াছে। আমার মন তাই এখন মত্ত হইয়া সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দিকেই ছুটিয়াছে ও তাঁহার সঙ্গেই ফিরিতেছে। আমি এখন তাঁহার সেই সুন্দর রূপের অমৃত রস পান করিতেছি।

৩। দরিয়া সাহব (মাড়বার)…

(ক) মুরলী কৌন বজাবৈ হো, গগন-মংডলকে বীচ
ত্রিকুটী সংগম হোয় কর, গংগ-জমুনকে ঘাট,
যা মুরলীকে সবদসে, সহজ রচা বৈরাট।
গংগ-জমুন বীচ মুরলী বাজৈ, উত্তর দিসি ধুন হোহি,
বা মুরলীকী টেরহিঁ সুন সুন, রহী গোপিকা মোহি।
জই অধর ডালী হংসা বৈঠা, চুগত মুক্তা হীর,
আনংদ চকবা কেল করত হৈ, মানস-সরোবর তীর।
সব্দ ধুন মৃদঙ্গ বাজত হৈ, বারহ মাস বসন্ত,
অনহদ ধ্যান অখংড আতুর রে, বারত সব হী সন্ত।
কানহ গোপী করত নৃত্যহিঁ, চরণ বঁহু হি বিনা,
নৈন বিন "দরিয়াব" দেখৈ, আনংদরূপ ঘনা।

গগন-মণ্ডলে কে মুরলী বাজাইতেছে? গঙ্গা-যমুনার (ইড়া-পিঙ্গলার) সঙ্গম-স্থল ত্রিবেণীতে এই মুরলীর শব্দ ধ্বনিত হইতেছে। এই মুরলীর সহজ শব্দ (প্রণব) অবলম্বনেই বিরাট বিশ্বের সৃষ্টি। গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে মুরলী বাজিতেছে; উত্তর-দিকে উহার ধ্বনি

চলিতেছে। এই মুরলীর শব্দ শুনিতে শুনিতে গোপীগণ মোহিত হইয়াছে। সেখানে অধরশাখায় হংস বসিয়া হীরা-মুক্তা খাইতেছে; আনন্দস্বরূপ চক্রবাক সেই মানস-সরোবর-তীরে কেলি করিতেছে। সেখানে নিত্য মৃদঙ্গধ্বনি হইতেছে। বারমাসই সেখানে বসন্ত। সাধুগণ সেখানকার অনাহত শব্দে অখণ্ড-ধ্যান-পরায়ণ হইয়া রহিয়াছেন। সেখানে দেহ ও চরণ-বিহীন কানাই ও গোপীগণ নৃত্য করিতেছেন। "দরিয়া" চক্ষু ব্যতিরেকেই সেই আনন্দ-ঘন রূপ দেখিতেছে।

"দরিয়া" রাম ভজৈ সো সাধু,
　　জগত ভেষ উপহাস করে।
তাকো দোষ ন অন্তর আনৈ,
　　চঢ় নাম-জহাজ ভব সিন্ধু তরে।

"দরিয়া" বলিতেছেন, যিনি রামকে ভজনা করেন তিনিই সাধু। জগতের লোক তাঁহার বেশ দেখিয়া উপহাস করে; তা করুক, তাহাদের দোষ তিনি অন্তরে স্থান দেন না। তিনি রামনাম-জাহাজে চড়িয়া ভব-সিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়া যান।

। তাজ…

(ক) ছৈল জো ছবীলা, সব রংগমেঁ রংগীলা, বড়া
　　চিত্তকা অড়ীলা, দেবতোঁসে ন্যারা হৈ।
মাল গলে সোহৈ, নাক মোতি সেত জোহৈ, কান
　　কুংডল মন মোহৈ, লাল মুকুট সির ধারা হৈ।
দুষ্ট জন মারে, সব সন্ত জো উবারে, তাজ
　　চিত্তমে নিহারে প্রণ প্রীতি করনবারা হৈ।
নন্দজুকা প্যারা, কংসকো পছারা, বহ
　　বৃন্দাবনবারা কৃষ্ণ সাহেব হমারা হৈ।

যাঁহার সুন্দর কিশোর রূপ, যিনি সর্ব্বরঙ্গে রঞ্জিত চিত্তাকর্ষক ও অন্য দেবতা হইতে পৃথক্, যাঁহার গলে মালা ও নাসিকায় শ্বেত মতি শোভা পাইতেছে, যাঁহার কর্ণে মনোহর কুণ্ডল, মস্তকে সুন্দর মুকুট, যিনি দুষ্ট-দমন ও শিষ্ট-পালন, যাঁহাকে অন্তরে দর্শন করিলে প্রাণ প্রীত হয়, যিনি কংসকে বধ করিয়াছিলেন, বৃন্দাবনের সেই প্রিয়তম নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণই আমার প্রভু।

(খ) নন্দকে কুমার কুরবান তেরী সুরতপৈ
　　হোঁ তো মুগলানী হিন্দুয়ানী হৈ রহুঁগী মৈ।

হে নন্দদুলাল, তোমার অপরূপ রূপমাধুর্য্যের নিকট আমি আত্ম-বলিদান করিলাম। আমি ত মুসলমান, তাহাতে কি; আমি হিন্দু হইয়াই তোমার সেবা করিব।

৫। শেখ…

মিটি গয়ো মৌন, পৌন-সাধনকী সুধি গঈ,
　　ভুলি জোগ-জুগতি বিসার্যো তপ বন কো।
"শেখ" প্যারে মন কো, উজার্যো ভয়ো প্রেম নেম,
　　তিমির অজ্ঞান গুন নাস্যো বালপনকো॥
চরণকমলহীকী লোচনমেঁ লোচ ধরী,
　　রোচন হৈ রাচ্যো, সোচ মিট্যো ধাম ধন কো।
সোক লেস নেকহূঁ, কলেস কো ন লেস রহ্যো,
　　সুমরি শ্রীগোকলেস গো কলেস মন কো॥

আমার মৌনব্রত মিটিয়া গেল, পবন-সাধনের (প্রাণায়ামাদির) বুদ্ধি দূর হইল। যোগ, বিচার, বনবাসে থাকিয়া তপস্যা প্রভৃতি সমস্তই আমি ভুলিয়া গেলাম। "শেখ" বলিতেছেন, যখন আমার প্রিয়জন, প্রেমালোকে আমার মন উদ্ভাসিত করিলেন, তখন আমার অজ্ঞান-তিমির ও বালকোচিত ব্যবহার সমস্তই দূর হইল; কেবলমাত্র আমার লোচন তাঁহার চরণ-কমলে প্রীতির সহিত লাগিয়া থাকিল; তাঁহার প্রেমে আমি রঞ্জিয়া উঠিলাম। সেই গোকুলেশ্বরকে স্মরণ করিয়া আমার শোকের লেশমাত্রও রহিল না, দেহের যাবতীয় ক্লেশ ও মনের সর্ব্ব সন্তাপ দূরীভূত হইল।

৬। নজীর…

(ক) ইক রোজ মুঁহমেঁ কানহনে মাখন ছিপা লিয়া,
　　পূছা জসোদানে তো বহা মুঁহ বনা দিয়া,
　　মুঁহ খোল তিন লোককা আলম দিখা দিয়া
　　ইক আনমেঁ দিখা দিয়া, ঔ ফির ভুলা দিয়া।
　　ঐসা থা বাঁসুরীকে বজৈয়াকা বালপন,
　　ক্যা ক্যা কহুঁ মৈঁ কৃষ্ণ কনহৈয়াকা বালপন।

এক দিন কানাই মুখের ভিতরে মাখন লুকাইয়া রাখিলেন। মাতা যশোদা জিজ্ঞাসা করায় কানাই

মুখ-ব্যাদান করিলেন ও তাঁহার সেই মুখ-গহ্বরে ত্রিভুবন দেখাইয়া দিলেন। যশোদাকে মুহূর্ত্তের জন্য কানাই এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখাইলেন ও পরক্ষণেই আবার সমস্ত ভুলাইয়া দিলেন। আহা, শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-চরিত আর কত বলিব ? বাল্যকালে কি সুন্দর বাঁশীই তিনি বাজাইতেন !

(খ) জব মুরলী ধরনে মুরলীকো অপনে অধর ধরী,
ক্যা কম পরেম প্রীত ভরি উসমে ধুন ভরী।
লৈ উসমে "রাধে রাধে" কী হরদম ভরী খরী
লহরাই ধুন জো উসকী, ইধর ও উধর জরী।
সব সুননেবালে কহ উঠে জৈ জৈ হরি হরি,
ঐসী বজাই কৃষ্ণ কনৈহেয়ানে বাঁসুরী।

মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ যখন মুরলী আপনার অধর-সংলগ্ন করিলেন, তখন সেই মুরলী হইতে কি সুন্দর প্রেমপূর্ণ ধ্বনি বাহির হইতে লাগিল! মুরলী হইতে পুনঃ পুনঃ পরিষ্কার ভাবে "রাধে রাধে" ধ্বনি নির্গত হইতে লাগিল ও সেই শব্দ-তরঙ্গ চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। কৃষ্ণ-কানাই এমনই মধুর বাঁশী বাজাইলেন যে, সেই বংশীধ্বনি যাঁহারা শুনিলেন, তাঁহারা সকলেই "জয় জয় হরি হরি" বলিয়া উঠিলেন।

৭। কারে খাঁ…

বৃন্দাবন কীরতি বিনোদ কুংজ কুংজন মে,
আনংদকে কংদ লাল মূরতি গুপালকী।
কালীদহ "কারে" পতাল পৈঠি নাগ নাথ্যো,
কেতকী ফুল তোরি লায়ে মালা হারকী।
পাপতকী পুতনা পরমগতি পায় গঈ,
পলকহী পায় পায়ো অজামিল নারকী।
গীধ-গুন-গানহার, ছাঁচকে উপাসহার,
আঈ না অহীর, ক্যা হমারী বারবার।

বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে আনন্দ-খনি বিনোদ-গোপালের সুন্দর মূর্ত্তি শোভা পাইতেছে। "কারে খাঁ" বলিতেছেন, তুমি পাতালে প্রবেশ করিয়া কালীয় নাগকে বিধ্বস্ত করিয়া মালা গাঁথিবার জন্য কেতকী ফুল ছিঁড়িয়া লইয়া আসিয়াছ; রাক্ষসী পুতনা তোমার স্পর্শে পরম গতি লাভ করিয়াছে; নারকী অজামীল মুহূর্ত্তের জন্য তোমার নাম উচ্চারণ করিয়া ভবসাগর পার হইয়াছেন; তুমি ভক্ত গৃধ্রের গুণগান করিয়াছ, গোপিনীদিগের নিকট হইতে ঘোল চাহিয়া খাইয়াছ; কিন্তু হে গোপনন্দন, আমার পালা কি এখনও আসে নাই ?

৮। ইন্‌শা…

অব ছাঁড়ি করীল কী কুংজন কো
রহাঁ দ্বারকামে হরি জায় ছয়ে।
কলধৌতকে ধাম বনায় ঘনে,
মহারাজন কে মহারাজ ভয়ে।
তজ মোরকে পংখ ঔ কামরিয়া,
কছু ঔরহি নাতে নেহ জোড় লয়ে!
ধরি রূপ নয়ে, কিয়ে নেহ নয়ে,
অব গইয়াঁ চরাইবো ভূল গয়ে।

করীল-কুঞ্জবিশিষ্ট বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া হরি এখন দ্বারকায় গিয়া বাস করিতেছেন। তিনি সেখানে বহু রজত-প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া মহারাজাদিগেরও উপর মহারাজা হইয়াছেন। তিনি ময়ূর-মুকুট ও কম্বল পরিত্যাগ করিয়াছেন ও অন্যের সহিত নূতন সম্বন্ধ পাতাইয়াছেন। তিনি এখন নূতন রূপ ধারণ করিয়া নূতন প্রেমে বদ্ধ; এখন তিনি গোচারণ ভুলিয়া গিয়াছেন।

৯। বাজিন্দ…

(ক) রাম-নামকী লুট ফবে হৈ জীবকো,
নিশি-বাসর কর ধ্যান সুমর তু পীবকো।
যহৈ বাত প্রসিদ্ধ কহত সব গাম রে,
অধম অজামিল তরে নারায়ণ-নাম রে।

রাম-নাম সমাদরে গ্রহণ করাই জীবের শোভা পায়। সেই প্রিয়তমকে নিশিদিন ধ্যান ও স্মরণ কর। সর্ব্ব-লোকের মধ্যেই এই প্রসিদ্ধি রহিয়াছে যে, নারায়ণ নাম লইয়া অধম অজামিলও পরিত্রাণ পাইয়াছে।

(খ) নহিঁ হৈ তেরা কোয়, নহী তু কোয়কা,
স্বারথকা সংসার, বনা দিন দোয়কা।
"মেরী মেরী" নাম ফিরত অভিমানমে',
ইতরাতে নর মূঢ় এহি অজ্ঞানমে'।

এই সংসারে তোমার কেহ নাই, তুমিও কাহারও নও। স্বার্থের জন্যই এই সংসার ; তাহাও আবার দুদিনের জন্য। মূঢ় নর কেবল অজ্ঞানবশতঃই "আমার আমার" করিয়া অভিমানবশে বৃথা গর্ব্ব করিয়া বেড়াইতেছে।

১০। বুল্লেশাহ···

(ক) কব মিলনী মৈঁ বিরহোঁ সতাঈ নূঁ।
আপ ন আবৈ, না লিখি ভেজৈ,
ভট্টি লাকে হো লাঈ নূঁ।
তৈঁ জেহা কোই হোর নাঁ জানা,
মৈঁ তনি শূল সবাঈ নূঁ।
রাত-দিনেঁ আরাম ন মৈনূঁ,
খাবৈ বিরহ কসাঈ নূঁ।
'বুল্লেশাহ' ধৃগ জীবন মেরা,
জো লগ দরস দিখাঈ নূঁ॥

হে কৃষ্ণ! তুমি কবে আমার সহিত মিলিত হইয়া আমার বিরহ-জ্বালা শান্ত করিবে? নিজেও আসিতেছ না, পত্র লিখিয়াও সংবাদ পাঠাইতেছ না। তুমি এখন কোথায় আছ, কেহই সে সংবাদ জানে না। আমার তনু বিরহ-বেদনায় অত্যন্ত জর্জ্জরিত ; দিন-রাত্রিতে একটুও আরাম পাই না ; বিরহ-কশাই আমার দেহ খাইতেছে। "বুল্লেশাহ" বলিতেছেন, তোমার দর্শন অভাবে, আমার জীবনে ধিক্।

(খ) ··· ··· ··· ···
না মৈঁ মুল্লা, না মৈঁ কাজী,
না মৈঁ সুন্নী, না মৈঁ হাজী।
'বুল্লেশাহ' নাল লাঈ বাজী
অনহদ সবদ বজায়া হৈ॥

আমি মোল্লাও নই, কাজীও নই। আমি সুন্নিও নই, হাজীও নই। "বুল্লেশাহ" অনাহত ধ্বনি বাজাইয়া ভগবানের সঙ্গে বাজী ধরিয়াছে।

১১। আদিল...

মুকুটকী চটক, লটক বিংবি কুংডলকী,
ভৌঁহকী মটক নেকু, আঁখিন দেখাউ রে।
এরে বনবারী, বলিহারী জাউঁ তেরী মেরী,
গৈল কিন নেকু গায়ন চরাউ রে॥
"আদিল" সুজান রূপ গুণকে নিধান কান্হ,
বাঁসুরী বজায় তন-তপন বুঝাউ রে।
নন্দকে কিসোর চিত-চোর মোর পংখবারে,
বংশীবারে সাঁবরে পিয়ারে ইত আউরে॥

হে কৃষ্ণ! তোমার মুকুটের সৌন্দর্য্য, কর্ণ-বিলম্বিত কুণ্ডলের প্রতিবিম্ব, তোমার সুন্দর কুটিল কটাক্ষ, আমার চক্ষে একবার প্রত্যক্ষ করাও। হে বিপিন-বিহারী, তুমিই ধন্য। তুমি স্বর্গ হইতে নামিয়া একবার গোচারণ কর। "আদিল" বলিতেছেন, হে সর্ব্বরূপের ও সর্ব্বগুণের আধার কানাই, তুমি তোমার বাঁশী বাজাইয়া একবার আমার দেহের তাপ উপশম কর। হে নন্দকিশোর, চিত্তচোর, ময়ুর-মুকুটধারী, আমার প্রিয় বংশীধর শ্যাম, তুমি একবার এদিকে এস।

১২। মকসুদ···

লগ ভাদোঁ দুখো দুখ দেনে ভারী,
ঘটা চড়ি উর ঝুক আঈ হৈ সারী।
ভরী জল থল চড়ী নদিয়োঁ কি ধারেঁ,
সখী, অবতক ন আয়ে পী হমারে।
ঘটা কারী অঁধেরী নিত ডরাবৈ,
পিয়া বিন নীঁদ বিরহিন কো ন আবৈ।
অরে কাগা, তু উড়কে জা বিদেসা,
সলোনে শ্যামকো লেকর সন্দেসা॥

সখি, এই ভাদ্র মাস আমাকে দুঃখ দিবার জন্যই বুঝি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। চতুর্দ্দিকে ঘনঘটায় মেঘ নামিয়াছে, নদীর ধারের সমস্ত স্থল, জলে ভরিয়া গিয়াছে ; কিন্তু আমার প্রিয়তম তো এখনও আসিতেছেন না। এই ভয়ঙ্কর অন্ধকার দেখিয়া আমার ভয় হইতেছে ; প্রিয়ের বিরহে নিদ্রা আসিতেছে না। রে কাক, তুই আমার এই সংবাদ লইয়া, সেই শ্যামসুন্দরের নিকট উড়িয়া যা।

১৩। মৌজদীন···

ফাগুন আয়ো ধাঁয়ে ডফ বাজৈ,
তীর তন্ধী অতি ভারী।
মোহিত আস তিহারে মিলন কী,
ভুল গঈ সুধু সারী॥
মোহি গুলাল লাল, বিন তোকে,
ভঈ হৈ রৈন অঁধিয়ারী।
অঁসুবন অব রংগ বনো হৈ,
নৈন বনে পিচকারী।
বৃন্দাবনকী কুংজ গলিন মেঁ,
ঢুঁড়ত ঢুঁড়ত হারী।
দেহো দরস মোহি অপনী মৌজনে,
এহো কৃষ্ণ মুরারী,
পিয়া মোহি আস তিহারী।

ফাল্গুন মাস আসিল। চতুর্দ্দিকে করতাল, ডফ বাজিতেছে ; শুনিয়া আমার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। আমি ত তোমার সঙ্গে মিলিবার আশায় অপেক্ষা করিতেছি, কিন্তু তুমি যে আমাকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছ। আজ হোলির এই আনন্দ-দিনে, তোমার অভাবে লাল গুলাল আমার নিকট অন্ধকার রাত্রি বলিয়া বোধ হইতেছে। আজ আমি নয়নকে পিচকারী ও অশ্রুজলকে রং করিয়া হোলি খেলিব। বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে তোমাকে খুঁজিতে খুঁজিতে

আমি হয়রান হইয়াছি। হে কৃষ্ণ, হে মুরারি, এখন তুমি দয়া করিয়া স্বেচ্ছায় একবার দর্শন দাও। প্রিয়, আমি যে কেবল তোমারই আশা করি।

১৪। রাহিদ…

সুন্দর মুস্কান পর, মন্দ মুস্কানপর,
বাঁসুরীকী তান পর, ঠৌরন ঠগী রহে।
মূরতি বিশাল পর, কংচনকী মালপর,
খংজনকী চালপর, খৌরন খগী রহে।
ভৌঁ হৈঁ ধনু মৈনপর, লোনে দুগ নয়নপর,
সুন্দর বৈনপর, রাহিদ পগী রহে।
চংচল রা তনপর, সাঁবরে বদন পর,
নন্দকে নংদনপর, লগন লগী রহে।

"রাহিদ" বলিতেছেন—শ্যামসুন্দর নন্দনন্দনের সুমধুর হাস্য, বংশীর তান, তাঁহার বিশাল মূর্ত্তি, কাঞ্চন-মালা, খঞ্জনের ন্যায় চঞ্চল গতি, ধনুকের ন্যায় সুবঙ্কিম ভ্রূ, সুন্দর তনু ও তাঁহার বদনে আমার মন নিত্য আকৃষ্ট রহিয়াছে।

১৫। আফসোস…

কা সংগ ফাগ মচাউঁ রী,
কুব্জা-সংগ গিরধারী রহত হৈঁ।
অঁসুয়নকো সখি রংগ বনাও,
দোউ নৈনা পিচকারী রহত হৈঁ।
বিরহবেদন কছু ন-পরত পল-ছিনহুঁ,
ব্যাকুল সখিয়া সারী রহত হৈঁ।
নিসিদিন কৃষ্ণ মিলনকো সখিয়াঁ,
আস লগায়ে ঠাড়ী রহত হৈঁ
"আফসোস" পিয়াকো নেহ সুরতিয়া,
বিবশ নর ও নারী রহত হৈঁ।

সখি, আজ, এই হোলির দিনে আমি কার সঙ্গে ফাগ খেলিব? গিরিধারী যে এখন কুব্জার সঙ্গে বাস করিতেছেন। আমি দুই চক্ষুকে পিচকারী করিয়া অশ্রুজলকে রং করিয়া হোলি খেলিব। সখি, বিরহ-বেদনায় আমার এক মুহূর্ত্তও কিছুই ভাল লাগিতেছে না। সখিগণও ব্যাকুল হইয়াছে, তাহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের আশায় দিবারাত্রি খাড়া হইয়া রহিয়াছে। "আফসোস" বলিতেছেন, নরনারীগণ প্রিয়তমের প্রেমপূর্ণ ব্যবহার দেখিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া রহিয়াছে।

১৬। কাজিম…

ফাগ খেলন কৈসে যাউঁ রী,
হরি-হাথন পিচকারী রহতী হৈ।
সবকী চুনরিয়া কুসুম-রংগ-বোরী,
মোরি চুনরিয়া ঘনসারী রহতী হৈ।
কোই সখী গাবতি, কোই বজাবতি,
হমকো তো সুরত তিহারী রহতী হৈ।
কহত হৈ "কাজিম" অপনী সখীসোঁ,
সৈয়াঁকী সুরত মতবারী রহতি হৈ।

সখি, ফাগ খেলিতে কেমন করিয়া যাই, হরির হাতে যে পিচকারী রহিয়াছে। সকলেরই কাপড় কুসুম রংয়ে রঙ্গানো, আমার কাপড় যে (প্রিয়তমের রঙ্গেই) ঘোর লাল। কোনও সখী আনন্দে গান করিতেছে, কোনও সখী বাজাইতেছে; কিন্তু আমার মন ত' কেবল তোমাতেই আসক্ত রহিয়াছে। কাজিম আপনার সখীদিগের নিকট বলিতেছেন, তিনি স্বামীর প্রেমরসে নিত্য মত্ত রহিয়াছেন।

১৭। খালস্…

… … … …
তুম নাম-জপন ক্যোঁ ছোড় দিয়া?
ক্রোধ ন ছোড়া, ঝুট ন ছোড়া,
সত্য বচন ক্যোঁ ছোড় দিয়া?
ঝুটে জগমেঁ দিল লগা-কর,
অসল বতন ক্যোঁ ছোড় দিয়া?
কৌড়ীকো তো খুব সংভালা
লাল রতন ক্যোঁ ছোড় দিয়া?
জিন সুমিরনসে অতি সুখ পাবৈ,
তিন সুমিরন ক্যোঁ ছোড় দিয়া?
"খালস্" এক ভগবান ভরোসে,
তন মন ধনকো ছোড় দিয়া।

তুমি ভগবানের নাম-জপ কেন ছাড়িয়া দিলে? ক্রোধ ছাড়িলে না, মিথ্যা ছাড়িলে না, সত্য বচন কেন ছাড়িয়া দিলে? এই মিথ্যা জগতে আসক্তি করিয়া আসল বস্তু ছাড়িলে কেন? তুমি একটি সামান্য কড়িকে অতি সাবধানে সামলাইয়া রাখিতেছ, কিন্তু মহামূল্য রত্ন কেন ছাড়িয়া দিলে? যে ভগবানের ধ্যানে পরম সুখ পাওয়া যায়, তাঁহার ধ্যান কেন ছাড়িয়া দিলে? "খালাস" একমাত্র ভগবানের ভরসাতেই দেহ, মন ও ধনের প্রতি আসক্তি ছাড়িয়া দিয়াছে।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

প্রতিদ্বন্দ্বী

—শ্রীরমাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

বেশ ছিল পণ্টু। কখনও মায়ের কোলটি জুড়ে, কখনও বা দোলনায় দুলে দিব্যি আরামেই তার দিন কাটছিল। পণ্টুর আদর-যত্নের এতটুকু ত্রুটী হবার জো নেই। ঘরভর্ত্তি লোক সর্ব্বদাই তার জন্তে শশব্যস্ত।

দেখতে দেখতে দু'বছর পেরিয়ে আরও চার মাস উত্তীর্ণ হ'ল। বাবা বলে, "আড়াই বছর।"

"উ হুঃ"—মা অমনি মুখ বেঁকিয়ে তীব্র প্রতিবাদের সুরে জানিয়ে দেন—"পণ্টু এই আশ্বিনের প্রথমে ঠিক দু'বছর পাঁচ মাসে পা দিল।"

পণ্টুর জন্ম-সন, তিথি-নক্ষত্র মা'র যেন নখদর্পণে। এ সম্বন্ধে মা'র নির্ভুল গণনা পাঁজীকেও হার মানায়। পণ্টুর দিদির বয়সও বাবা ভুল করে বলে—"সাড়ে পাঁচ বছর।"

"তাও জান না?"—মা অমনি ঠিক করে দেন আঙুল গুণে—"ছয় বছর।"

সকালের দিকে মা রান্না-বান্না খাটা-খাটুনি নিয়ে হেঁসেলে ব্যস্ত থাকেন। মীরা দিদি ততক্ষণ কাক দেখিয়ে, বক দেখিয়ে, কত রকমে ভুলিয়ে পণ্টুকে খাইয়ে দাইয়ে দোলনায় শুইয়ে দেয়। পণ্টু ছোট ছোট নিঃশ্বাস ফেলে ঘুমিয়ে যায়। দুপুরের দিকে মা কাজ-কর্ম্ম সেরে হেঁসেল থেকে বেরিয়ে এসে চুমু খেয়ে কোলে নিলে পণ্টুর আবার ঘুম ভাঙ্গে। ঘুম-ভাঙ্গা চোখে এক এক দিন পণ্টু ফিক্ করে হাসে। দিদি বলে, "মা দেখবে এস, খোকন স্বপ্ন দেখে কেমন হাসছে!"

মা এসে অমনি তার স্পর্শাতুর হাতদুখানি দিয়ে পণ্টুকে বুকের ভেতর জাপ্টে ধরেন। পণ্টু হাসে, আর অমনি উচ্ছ্বসিত মাতৃস্নেহ মার বুকে উথলে ওঠে। যেন পূর্ণিমার চাঁদে জোয়ার লাগে!

প্রথম বয়সে হাঁটতে গিয়ে পণ্টু একবার পড়ে গিয়ে ব্যথা পায়। পণ্টু কেঁদে ওঠে। তখন পা তার খুবই নরম—পণ্টুর কান্না শুনে মা ভিতিবিরক্ত হ'য়ে ছুটে আসেন, বাবা দৌড়ে আসেন।

এই দুর্ঘটনার পর থেকে পা-চালি করতে গেলেই পণ্টুর দিদি এসে পথ আগলায়। দিদির বাম হাতের স্নেহবেষ্টনীর ভেতর পণ্টুর সরু কোমর সুরক্ষিত করে পণ্টু ধীরে সন্তর্পণে পা বাড়ায়।

"হাঁটি-হাঁটি পা-পা"—পণ্টু অমনি মীরা দিদির সুরের তালে তালে দুলকি চালে চলতে থাকে।

—"হাঁটি-হাঁটি পা-পা
ওরে পণ্টু চলে যা"—

দূরের থেকে মীরার ছড়া শোনা যায়।

মীরাদিদির একান্ত বিশ্বাস, তার ওরকম ছড়া-বাঁধা গান না শোনালে পণ্টু অমন দ্রুত সুন্দর হাটতে পারত না। মা দৈনন্দিন কাজকর্ম্মের ফাঁক দিয়ে ভাইবোনের আলে এই অপূর্ব্ব স্নেহ-মমতার নূতন টানটুকু লক্ষ্য করে আনন্দে গলে পড়তেন। সকাল নেই দুপুর নেই, পণ্টু যখনই হাঁটি-হাঁটি করে, দিদি অমনি ছুটে এসে সামনে দাঁড়ায়। পণ্টুর সেই কবেকার পড়ে যাওয়ার দুর্ঘটনার কথা কতবার করে দিদির মনে জাগে। তার সর্ব্বদাই ভয়, পণ্টু পড়ে না যায়। কোথাও ঠুক করে একটু শব্দ হলেই মীরার বুকের মধ্যটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। মীরা হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে বলে, "এই রে!"

কিচ্ছুই না, মীরা দেখে পণ্টু মায়ের কোলে দিব্যি ঘুমোচ্ছে। ছোট ভাইটির ওপর ভগ্নীর এমন মধুর প্রীতির পরিচয় অনুভব করে মা মনে মনে খুশী।

পরম সুখেই পণ্টুর দিন কাটছিল। কিন্তু, হঠাৎ দিন দিন সে যেন কেমন শুকিয়ে আসতে লাগল। তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে যেন! একটুতেই তার চোখের কোণে জল দেখা যায়, মুখ ভার করে থাকে। মার কোলছাড়া হবার পরেও কিছুদিন পণ্টুর মনে ততটা খেদ ছিল না; অনেকদিন পরে হঠাৎ একদিন তার ছোট্ট বিছানাটীর ওপর চোখ পড়তেই কেমন চমকে গেল সে। পরম বিস্ময়ে সে অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারলে, তার বিছানাটা মায়ের পাশ থেকে অনেকটা তফাতে চলে গেছে। অবাক্

হয়ে গেল পণ্টু। কে এই ব্যবধান সৃষ্টি করলে! গভীর গবেষণার পরেও কিছু সুরাহা করতে পারে না পণ্টু। সেদিন থেকে পণ্টু মনের ব্যথা মনেই চেপে রাখে। আর তা-ছাড়া উপায় কি। কথা ত' সব বলতে পারে না মুখ ফুটে!

কিছুকাল যায়। একদিন পণ্টু ঘাড় উঁচিয়ে চোখ বাঁকিয়ে ঘরের কড়িকাঠের দিকে তাকাতেই হকচকিয়ে গেল। পণ্টুর চোখের পাতা পড়েও না নড়েও না। বেশ লক্ষ্য করছে, তারই এতকালের সাধের দোলনায় শুয়ে আর একজন কে খুদে খোকা পিট্ পিট্ করে পণ্টুর পানে তাকাচ্ছে। পণ্টু ভেবে ভেবে সারা। বড় দুঃখ ব্যথায় হায় হায় করে উঠল তার মনের তলা। একবার ইচ্ছা হল, বেড়ালের মত ফোঁস্ ক'রে ওঠে। পরমুহূর্ত্তে আবার কি ভেবে ভুলে গেল পণ্টু। ছেলে মানুষ কি না! কিন্তু, ভুলে গেলে কি হয়? দুঃখু ত করেই। নতুন খোকা কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে মায়ের কোল। তাইত মা আগের মত যখন তখন তাকে আর কোলে নেয় না। বাবাও বেশী ঘেঁষ দেয় না। পণ্টুর পাশ কেটে সটান এগিয়ে যায় নতুন খোকার কাছে। সব দেখে, সব বোঝে পণ্টু। মুখ ফুটে তেমন করে বলতে না জানলে কি হয়। সব অনুভব করে সে মনে মনে!

পণ্টু ভাবে, তাকে মায়ের কোলের রাজ-সিংহাসন থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে এই নূতন খোকা। তারই জন্ত পণ্টু আজ মেজের ধুলোয় ফকির। ভেবে ভেবে সারা হয় পণ্টু। পণ্টুর মুখখানা অভিমানে ফুলে ওঠে যখন তখন। তার চোখের পাতা ভিজে আসে। সত্যি, আর সে আগের মত মায়ের কোল খালি পায় না। কোল-ছাড়া পণ্টু ছন্নছাড়ার মত একলাটী ঘুরে বেড়ায়।

এক এক দিন বাবার কাছে তাড়া খেয়ে পণ্টু ছুটে যায় মার কাছে। কিন্তু, যেমনি মায়ের কোলে খোকাকে দেখা, অমনি অভিমানভরে পণ্টু বেঁকে দাঁড়ায়। আর এগোয় না।

খোকা-কোলে মা পণ্টুকে ডেকে ডেকে সারা। পণ্টু খুঁটীর মত শক্ত কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বাঁকা মুখ, হেঁট মাথা। কথা যেটুকুও বা ফুটত, খোকাকে দেখে তাও ফোটে না।

পণ্টুর মনের দুঃখ ক্রমেই তার বুকের কাছে উথলে উঠছে। সে আর কোন মতেই সইতে পারছে না। এক এক দিন টস্ টস্ করে তার চোখের জল পড়ে। মা হয়ত কচি খোকার মাথার চুল থেকে মরামাস তুলছেন। পণ্টু দূর থেকে তাই দেখে আড় নয়নে কেমন গুম্ হয়ে বসে থাকে। মা যত ডাকেন 'পণ্টু,' ততই সে ফিরে ফিরে যায় আর তাকায়। কথা বলে না একবারও।

মার লক্ষ্য ঠিক আছে। নূতন খোকার আসা অবধি পণ্টুর রিষ্ আর জিদ্ কিছুই মার অবিদিত নেই।

"ও পণ্টু, এগিয়ে আয় না! তোর ছোট ভাইকে দেখে অমন-ধারা মুখ গুঁজে থাকতে আছে, ছিঃ।"

মা মিনতি-ভরা করুণ স্নেহসুরে কতবার করে ডাকে, আর পণ্টুর মান করার ঢং দেখে টেনে টেনে হাসে। পণ্টু ততই ফুলে ফুলে ওঠে। মা হাসেন আদরে, পণ্টু ভাবে, কিসের! ও ঠাট্টার হাসি—বিদ্রূপ!

একদিন পণ্টু কি একটু দুষ্টুমি করেছিল। এমন কিছু নয়। খেলতে খেলতে রবারের বলটা কচি ভাইটীর গালে গিয়ে লাগে। খোকার গায়ে বল লাগতেই খোকার কি কান্না! খোকার আবার সেদিন অসুখ। কঁকিয়ে কাঁদতেই পাশের ঘর থেকে বাবা রেগে মেগে মারলে পণ্টুর গালে এক চড়। অমনি তীরের মত ব্যথা বিঁধল পণ্টুর মনে। সেই যে পণ্টু ঠোঁট উল্টিয়ে কাঁদতে বসল, সে ঠোঁট আর কিছুতেই সিধে হয় না। পণ্টু আড়ি করে সে দিন আর কিছুতেই খায় না।

"ও পণ্টু, খাবি নি?" মা, বাবা কত সাধ্যি-সাধনা করে, ডেকে ডেকে হয়রান! পণ্টু একদম নিশ্চুপ, শক্ত কাঠ হয়ে পড়ে আছে। শেষ-মেশ মীরা পেছন দিক্ থেকে পা টিপে টিপে—পণ্টু যেন দেখতে পায়নি, আস্তে আস্তে পণ্টুর গলা জড়িয়ে খুব নরম সোহাগ-ঢালা সুরে বললে—"ও পণ্টু, খাবিনি? ছিঃ, বাবা মারলে রাগ করতে আছে? বাবা-মার রাগ যে মিষ্টি!"

মীরা ও বয়সে ঢের বোঝে। খেতে খেতে পণ্টু আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। খেতে চায় না। মীরা বোঝে, ভাই-এর লুকানো মনের ব্যথা। পণ্টু ত' আর কথা কইতে পারে না ভাল করে। মীরা বোঝে, পণ্টু কথা কইতে পারলে তার মনের কথা উজাড় করে নিশ্চয়ই দিদিকে বলত।

কাজেই দিদি তার মনের কথা কাড়বার জন্যে এক কথা

শত বার করে শুধোয়। পল্টু আধখানা করে খায় আর আধখানা করে বলে,—"বা-আ-বা"—

দিদি তার মনের ব্যথাভরা কথা টেনে নিয়ে স্নেহার্দ্র স্বরে জিজ্ঞাসা করে,—"বাবা মেরেছে ?"

উপর্যুপরি প্রশ্নের ধাক্কায় পল্টু ঘাড় নেড়ে জানায়—"হু—মা"—বলতে গিয়ে ঠোঁটের ফাঁকে দুধ পড়ে যায় গড়িয়ে।

"মা কোলে নেয় না ?"—দিদি যেন সে-ভাষী।

"কো—কা"—পল্টু তর্জনী তুলে দেখায়।

"খোকার জন্যে মা তোমায় কোলে নেয় না ?"

পল্টু অমনি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়। আবার ঠোঁট-দুটিতে বুঝি তার কান্না আসে। মীরা ভাবে, সত্যিই ত! মা কি ক্ষুদেকেই নিয়ে থাকবে সবখণ ? পল্টু ত' সবই ছেড়েছে খোকার জন্য! তার দোলনা ছেড়ে দিয়েছে। পল্টুর পুতুলগুলো সব সে হাত করেছে, কতক ভেঙেও ফেলেছে। খোকার কাঁচের পুতুল, হাতের বাঁশী, তালপাতার ভেঁপু, সে কি আর আস্ত আছে ? মীরা ভাবে, সত্যিই ত' ছোটখোকার কচি হাতের মুঠোর চেয়ে পল্টুর প্রত্যেক পুতুলটাই যে বড়!

মীরা অমনি পল্টুকে জড়িয়ে ধরে কোলে নিয়ে। দিদির তপ্ত বুকে মুখ রেখে পল্টু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

কিন্তু, দিন দিন তার দুঃখ বেড়েই চলেছে! বাস্তবিক, নূতন খোকা আসা অবধি স্নেহময়ী জননীর কোলভরা সুখোষ্ণ-স্পর্শ থেকে পল্টু যেন চিরবঞ্চিত। উপরন্তু, পল্টু কোলে ওঠার জন্যে হাত বাড়াতে গেলেই "ধাড়ী ছেলে" বলে মার কাছে যখন-তখন বকুনি খায়। পল্টু কালোমুখ করে একান্তে কাঁদে আর ভাবে, মার স্নেহাঞ্চলের ভিতর কি সুখের দিনই তার ফুরিয়েছে!

আর একটু ছেলেবেলার স্মৃতি পল্টুর চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠে। তখন পল্টু খুব কচি। একবার তার ছোট্ট বুকের মধ্যে সর্দ্দি বসে গিয়ে জর হয়। মাথাধরা, ব্যথাভরা মুখখানা নিয়ে পল্টু আর হাসতেও পারে না, কথাও বলে না। জ্বরে বেহুঁস পড়ে আছে। অসুখের সময়ে বাপ-মার সে কি আদর-যত্ন! পল্টু আজও তা ভোলে নি। বেশ মনে আছে বাবা শিয়রে বসে ঘণ্টায় ঘণ্টায় পল্টুকে থার্ম্মমিটার দিয়ে জ্বরের তাপ দেখছে। মা ঠাকুর-দেবতার কাছে কত মানত করছে, কত জটাবাঁধা সন্ন্যাসী আসছে, কত মাদুলী, কত রকমের ওষুধ। পল্টুর নিউমোনিয়া আস্তে আস্তে সেরে উঠল।

রোগশয্যায় চেয়ে পল্টুর সব চাইতে ভাল লাগত শীতের ম্লান অপরাহ্ণ, ছোট বেলা পড়ে এসে ঘরের দাওয়ার রোদ মিলিয়ে যাচ্ছে। আর একটু রোদ সরে গেলেই উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় পল্টু ভাবত কখন বাবা আসবে অফিস থেকে। বাবা আসত, আর আনত কত রকম ফল, বিস্কুট, কি সুন্দর সোণালী রঙের টিন; আর বাবা অমনি সোহাগভরে ডাকতেন—ও পল্টু কেমন আছিস্, এই দেখ্ কি এনেছি। কি আহ্লাদ! পল্টুর রোগশীর্ণ মলিন মুখখানাতে তখন ফিকে হাসি ফুটে বের হত।

পল্টুকে ভোলাবার জন্যে বাবা তখন কত পুতুল, কত-রকম সেলুলয়েডের খেলনা এনে উপহার দিতেন। ক্রমে ক্রমে সে সব পল্টুর মাথার কাছে পাহাড়ের মত স্তূপ হয়ে থাকত। একবার একটা নকল সাপ এনেছিলেন। কল টিপতেই সাপটা সত্যি সত্যি ফোঁস্ করে দৌড়তে লাগল। ভয় পেলেও পল্টু তা দেখে কত খুসীই না হয়েছিল! পল্টু ভাবে অতীতের সে সুখের দিন আর কি আছে! বাবাও আর আগের মত আর করে না – সে মাও তেমন নেই!

... ...

একদিনের সামান্য ঘটনা হলে কি হয়। ছেলেমানুষ পল্টুর কাছে তখন কিছুই তুচ্ছ নয়। সে দিন সারা দুপুর অবিরাম বৃষ্টি হয়ে গেছে। মা খোকাকে জড়িয়ে শুয়ে আছে। দূরে ভিন্ন বিছানায় শুয়ে পল্টু এ পাশ ও পাশ করছে। কি কাণ্ডকারখানা! টাটকা সোহাগে উৎফুল্ল খোকা মার কোলে লুটোপুটি খাচ্ছে। দেখতে দেখতে পল্টু বাদলার ঝরঝরানির ভেতর কখন ঘুমিয়ে গেছে।

হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই পল্টু চোখ কচলাতে কচলাতে মার দিকে তাকায়, আর ফিরে যায়।

"ও পল্টু ফিরলে কেন—আর না"—মা ঠোঁট চেপে মুচকি হেসে যতবার করে ডাকে, পল্টু উত্তর দেয় না। পল্টু ততক্ষণ বাইরে গিয়ে দরজার কাটলে চোখ রেখে ভাগ করে দাঁড়িয়ে রইল। পল্টু কাটলের ছিদ্রপথে কত কি-ই দেখছে। যেন বায়স্কোপ। ছবির পর ছবি।

প্রথম দৃশ্য—খোকার কচি গালে গাল লাগিয়ে দুগাল এক করে মার কি আদর। তারপর পল্টু অলস্ত মনোযোগ দিয়ে যখন দেখতে গেল, মা তাঁর পানখাওয়া লাল টুকটুকে ঠোঁট দুখানি দিয়ে খোকার ফুটফুটে কচি মুখখানি ঘন ঘন চুমু খাচ্ছেন—চুক্-চুক্-চুক্ শব্দ পর্য্যন্ত শোনা যাচ্ছে, তখন মনের দুঃখে পল্টু এক দৌড়ে বারান্দায় গিয়ে কাঁদতে বসল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে কখন। কান্নার বেগ যখন থেমে এসেছে, তখন, পল্টু রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে। বর্ষণশ্রান্ত আকাশে মেঘ কেটে চাঁদ উঠেছে চাঁদের আলোয় ঝিকিক ফুটছে। অনেক রাতে মা যখন তাকে ধরে আনতে গেল, পল্টু তখন জোৎস্নায় পড়ে ঘুমোচ্ছে। মা দেখল, জোৎস্নার আলোয় পল্টুর ব্যথাতুর মুখখানা কি সুন্দর ম্লান।

অনেক ডাকাডাকির পর পল্টুর ঘুম ভাঙ্গল। চেয়ে দেখে মা। মার কোলখানি পেয়ে মার গলা জড়িয়ে তখন তার কি কান্না। অথচ, চোখে এক ফোঁটাও জল নেই পল্টুর।

"আ-মরি —কি সোহাগে কান্না—বলতে বলতে মার মন উথলে ওঠে দরদে। অমনি নিবিড় স্পর্শে মা পল্টুকে বুকের ভেতর জাপটে ধরে। আহ্লাদে গরবে খুসী পল্টুর মুখে হাসি ফোটে। আত্মহারা পল্টুর আনন্দ দেখে কে। তার ছোট ভাইয়ের ওপর প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর আড়াআড়ি তখন তার মন থেকে সব ধুয়ে মুছে গেছে।

শুধু একবার ছোট হাত বাড়িয়ে তর্জ্জনী তুলে পল্টু বলে—খো-কা।

হে আত্মবিস্মৃত জাতি

—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

উৎসবের স্মৃতি রাখি' কত যুগ হ'ল অবসান
হে আত্ম-বিস্মৃত জাতি! কর নাই তাহার সন্ধান
বিশীর্ণ বিচ্ছিন্ন মাল্য কণ্ঠে তব গর্ব্বভরে দোলে,
সে মাল্যের মূল্য নাহি, মূলে তার মিথ্যা আছে বলে।
অতীতের জীবন-সোপান
অহল্যার মত কাঁদে, মৃত্তিকায় হয়েছে পাষাণ।

তোমার গৌরব-দিন আসিয়াছে শত শত বার,
ঝড়-বিদ্যুতের পথে মিশিয়াছে পদধ্বনি তার,
রহস্যের পারাবারে দলগুলি নিস্তব্ধ নিশায়
উড়ে গেছে, নিখিল-সংসার
থমকিত মুহূর্ত্তে তারে দিয়েছে কি অশ্রু উপহার!

তোমার গৌরব দিন ভারতের এক প্রান্ত হতে
মরু-মেরু পার হয়ে চলে গেছে আলোকের রথে,
গ্রহে গ্রহে তারাদলে তুলিয়াছে শুভ্র যবনিকা,
তাহারি বিজয়বার্ত্তা ঘোষিয়াছে নীল সাগরিকা
অবিশ্রান্ত অনন্তের স্রোতে।
গেছ ভুলে স্থান তব ছিল কোথা অসীম জগতে!

কল্পনার আন্দোলনে ভ্রান্তিভরা তব ইতিহাস
সিন্ধুপারে বসি' যারা লিখিয়াছে করি' উপহাস,
তাহাদের লিপিগুচ্ছ ছিঁড়ে ফেল, অসত্যের চাপে
সত্য যাহা অন্তরালে সমাহিত—তোমাদের পাপে
তাহাদের পূর্ণ অভিলাষ।
সত্যেরে সন্ধান কর, পরবাক্য ক'র না বিশ্বাস।

কাগান উপত্যকা

—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

[১]

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঁচটি জিলার মধ্যে হাজারা জিলাই স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যসম্পদে সর্ব্বাপেক্ষা-সমৃদ্ধ। সেই হাজারা জিলার উপত্যকাসমূহের মধ্যে কাগান উপত্যকাই সুন্দরতম। এ বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না। ভূস্বর্গ কাশ্মীরের পরম প্রীতিপ্রদ উপত্যকাসমূহের সহিত কাগানের তুলনা চলিতে পারে। যাঁহারা এই উপত্যকার বুকে বিচরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, ইহা স্বভাব-শোভায় হিমাদ্রি-বক্ষে বিরাজিত সুন্দরতম উপত্যকার সমকক্ষ।

এই উপত্যকার বক্ষে যে-সকল পর্ব্বত দণ্ডায়মান, তাহাদের মধ্যে মালিকা-পর্ব্বত নামক শৃঙ্গটিই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। এ ভারতের, কাঞ্চন-জঙ্ঘা প্রভৃতি অভ্রাচ্চ শৃঙ্গ-গুলির তুলনায় ইহাকে অতি ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও ইহার অম্বর-চুম্বী শীর্ষের গম্ভীর গরিমায় চমৎকৃত না হইয়া থাকা যায় না।

কাগান উপত্যকার আয়তন ৮ শত ৬০ বর্গ-মাইলের বেশী হইবে না। এই প্রদেশের যে স্থানটুকুতে কৃষি-কার্য্য চলিতে পারে, তাহার আয়তন মাত্র আটাশ বর্গ-মাইল। এই উপত্যকার উত্তরে চিলাস, পশ্চিমে কোহিস্থান, পূর্ব্বে কাশ্মীর এবং দক্ষিণে কুনহার। ইহার পশ্চিমেই সীমান্তের স্বতন্ত্র সম্প্রদায়সমূহ বাস করে। কুনহার-নামক নদীর জন্ত হাজারা জিলার অংশবিশেষ কুনহার নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। কুনহার নদ কাগান উপত্যকার বক্ষে বিরাজমান পর্ব্বতপুঞ্জ হইতে প্রবাহিত। এই উপত্যকার অন্তর্গত লুলু-সার হ্রদের উত্তর-প্রান্ত হইতে এই নদ জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

কুড়িটি সরকারী বন এবং কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য পল্লী এই উপত্যকা-বক্ষে বিদ্যমান। এক একটি পল্লী বিক্ষিপ্ত ভাবে বিরাজিত কতিপয় কুটীরের সমষ্টি। গুজার জাতির ছোট ছোট কুটীরগুলি "ঝুগি" নামে অভিহিত। এই সকল পল্লীর মধ্যে বালাকোট সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এখানে অপেক্ষাকৃত বড় বড় বাড়ীও দেখা যায়। কাগান উপত্যকার মধ্যে এক মাত্র বালাকোটেই হিন্দুরা বাস করে। বালাকোট-



* কৃষ্ণপর্ব্বতের পাদ-মূলে—হাজারা জিলা

বাসীরা গ্রীষ্মকালে অশ্বতর, বলদ এবং গর্দ্দভের পৃষ্ঠে তামাক, তুলা, কাপড়, নীল, লবণ, শস্ত, ঘৃত প্রভৃতি পণ্য বোঝাই করিয়া চিলাস, গিলগিট, কোহিস্থান ইত্যাদি স্থানের অধিবাসীদিগের নিকট বিক্রয় করিবার জন্ত লইয়া যায়।

কাগান উপত্যকার আদিম ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। অতি প্রাচীন কালে ইহা "উরগা" নামে অভিহিত হইত। যে "উরগা" নামক প্রদেশের কথা মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছে, উহা কাগান উপত্যকবলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস। প্রাচীন প্রতীচীর প্রধান ভৌগোলিক টোলেমি এই প্রদেশের উল্লেখ করিয়াছেন। যখন দিগ্বিজয়ী

আলেকজেণ্ডার ভারতে আগমন করেন, তখন আসাসিস্ এই প্রদেশের অধীশ্বর। আলেকজেণ্ডার অথবা তাঁহার সেনাসমূহ এই উপত্যকায় প্রবেশ করিয়াছিল কি না, সে বিষয় কোন স্থির সিদ্ধান্ত করা কঠিন। তবে, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই যে, এই উপত্যকার নিকটবর্ত্তী তক্ষশীলা নগরে তিনি অবস্থান করিয়াছিলেন। এ বিষয়েও সংশয় নাই যে, বৌদ্ধযুগে এই উপত্যকা তক্ষশীলা বিভাগের অন্তর্গত ছিল।

খৃষ্টপূর্ব্ব ২৭২ অব্দে সম্রাট্ অশোকের শাসন এই প্রদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কাগান উপত্যকার পাদদেশে অবস্থিত মানশেহরার নিকটবর্ত্তী গিরি-গাত্রে উৎকীর্ণ লিপিসমূহ অশোকের উন্নত অনুশাসন ব্যতিরেকে অন্য কিছু নহে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন্ সিয়াং এই প্রদেশ পরিদর্শন করেন। তিনি ইহাকে ঘুলাসি নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার দ্বারা ইহা কাশ্মীরের শাসনাধীন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বহু শতাব্দী ধরিয়া এই উপত্যকা কাশ্মীরের সহিত রাষ্ট্র-নীতিক সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিল।

তৈমুরলঙ্গ ভারত আক্রমণের পর ফিরিবার সময় কয়েক জন কার্লু'থ শ্রেণীর তুর্কীকে এই উপত্যকার বুকে রাখিয়া যান বলিয়া আমরা জানিতে পারি।



সোয়াত উপত্যকা : প্রাচীন দুর্গ।
এই দুর্গের নিয়বর্ত্তী পথে দিগ্বিজয়ী আলেকজেণ্ডার ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

গুজার, সৈয়দ এবং সোয়াথী বা সোয়াতী—ইহারাই এই উপত্যকার প্রধান অধিবাসী। এখানে একটিমাত্র পাঠান-পল্লী দেখা যায়। সোয়াতীরা দক্ষিণে এবং সৈয়দ ও গুজারগণ অন্যান্য অংশে বাস করিয়া থাকে। সর্ব্বসমেত ৩৭ হাজার লোক এই উপত্যকায় বাস করে। গ্রীষ্মকালে নিম্নতর প্রদেশের পশু-চারকগণের আগমনের জন্য লোক-সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পায়।

কাগান-উপত্যকাবাসী জাতিদের মধ্যে গুজারগণই সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। ইহারাই এই উপত্যকার আদিম অধিবাসী। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতক বা তাহারও বহু পূর্ব্ববর্ত্তী সময় হইতে ইহারা এই উপত্যকার বুকে বাস করিতেছে। গুর্জ্জর দেশ অর্থাৎ গুজরাটকে এই জাতির আদিম বাসস্থলী বলিয়া মনে হয়। অনেকে মনে করেন, "গুজার" ও "গুর্জ্জর" উভয় নামের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান। সম্ভবতঃ, "গুজার" গুর্জ্জর শব্দের অপভ্রংশ। গুজরানওয়ালা, গুজার খাঁ প্রভৃতি নগরের নাম এই জাতির সহিত সম্বন্ধের কথা ঘোষণা করিতেছে।

বর্ত্তমানে গুজার জাতি সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ভারতে বাস করিয়া থাকে। সিন্ধুনদের তটদেশ হইতে গঙ্গা-তীর পর্য্যন্ত এবং হাজারা জিলা হইতে গুজরাট বা গুর্জ্জর দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে এই জাতিকে বাস করিতে দেখা যায়। হাজারা ও কাগানের গুজারদিগকে ভারতাগত আদিম গুজারজাতির বংশধর বলিয়া মনে হয়। জাঠ ও আহীর জাতির সহিত গুজারদের সম্বন্ধের কথা জাতিতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। তবে, হাজারার তেজ-গুজারগণ নিজদিগকে রাজপুত জাতির বংশধর বলিয়া বিবেচনা করে। কেহ কেহ কহেন, গুজারজাতি তিন শত বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত, বাজার ও গোর্খি-শাখার গুজারগণ কাগান উপত্যকায় বাস করে।

অনেকে মনে করেন, মধ্য-এশিয়া হইতে আগত অতিশয় অশান্ত ও দুর্দান্ত শ্বেত হূণজাতি এবং গুজারগণ অভিন্ন। হইতে পারে, শ্বেত-হূণগণ সীমান্তে বাস করিবার পর, তাহাদিগের বংশাবলীর অংশ-বিশেষ গুজার নাম ধারণ করিয়াছিল। কাগানের সহিত কাশ্মীরের সম্বন্ধের কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বহুদিন ধরিয়া এই উপত্যকা কাশ্মীরের শাসনাধীন ছিল। খৃষ্টীয় ৫২৮ অব্দে শ্বেত-হূণজাতির নেতা সম্রাট্ মিহিরকুল কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রোম-সম্রাট্, নিষ্ঠুরতার প্রতিমূর্ত্তি নীরোর সহিত মিহিরকুলের তুলনা চলিতে পারে। কাশ্মীরবাসীরা আজিও পীর-পাঞ্জাল পর্ব্বত-পুঞ্জের মধ্যে অবস্থিত একটি উচ্চ স্থান দেখাইয়া থাকে, যেখান হইতে নির্দ্দয়-হৃদয় মিহিরকুল এক শত হস্তীকে তুঙ্গ পর্ব্বত-পার্শ্বের উপর দিয়া নিম্নবর্ত্তী গভীর গহ্বরে নিক্ষেপ করেন। হতভাগ্য হস্তীদের উচ্চ আর্ত্তনাদ উপভোগ করিবার জন্যই এই কার্য্য করা হইয়াছিল। পীর-পাঞ্জালের ঐ অংশটি আজিও "হস্তীভাং" আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে।



কাগানের অন্যতম অধিবাসী সোয়াতী সম্প্রদায়ের দুই জন যুবক।

সত্যসত্যই শ্বেত-হূণজাতি হইতে গুর্জ্জর বা গুজার জাতি সম্ভূত কি না, সে বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তবে; এই দুই জাতিই এক সময়ে মধ্য-এশিয়া হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ৮৪০ খৃষ্টাব্দে কান্যকুব্জকে কেন্দ্র করিয়া গুর্জ্জরগণ সমগ্র উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

কাগান উপত্যকার গুজারগণকে পশু-পালক এবং অর্দ্ধ-যাযাবর জাতি বলা চলে। ইহারা পূর্ব্বে হিন্দু ছিল এবং ইহাদিগের তৎকালীন ধর্ম্ম-মতের সহিত গোপাল বা বালক-কৃষ্ণের সম্পর্কের কথা কেহ কেহ কহিয়া থাকেন। সম্ভবতঃ, খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকে কাগান-উপত্যকা-বাসী গুজারগণকে জোরপূর্ব্বক ইসলাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হয়। কাশ্মীরের সুলতান সিকান্দার এই কার্য্য করেন বলিয়া আমরা জানিতে পারি। উত্তর-পশ্চিম ভারতের বহু মন্দির ও বিগ্রহ এই মুসলমান শাসনকর্ত্তার আদেশে ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছিল। ইঁহাকে কাশ্মীরী কালাপাহাড় বলা চলে। কাশ্মীরের হিন্দু-শাসনকর্ত্তারা যে সকল সুন্দর ও বিশাল সৌধ-মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এই দেব-দ্বেষী শাসকের দ্বারা সেগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল। ইসলাম-ধর্ম্ম গ্রহণ বা মৃত্যু উভয়ের একটিকে বরণ কর—ইহাই ছিল এই কঠোর-হৃদয় সুলতানের আদেশ।

কাগান উপত্যকায় গুজারগণের ব্যবহৃত ভাষা ও অনুষ্ঠিত আচারসমূহ তথাকার অন্যান্য জাতিদের ভাষা ও আচার হইতে স্বতন্ত্র। যে ভাষায় ইহারা কথা কহে, তাহা "গোজারী" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের গুর্জ্জর বা গুজারগণ এই ভাষা ব্যবহার করে বটে, তবে প্রদেশভেদে ভাষার মধ্যে কিছু কিছু বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কচিৎ কোনও স্থানের গুর্জ্জরগণ পিতৃ-ভাষা পরিত্যাগপূর্ব্বক যে প্রদেশে বাস করিয়াছে, তাহারই ভাষা গ্রহণ করিয়াছে। গোজারী শব্দ গুর্জ্জরী শব্দের অপভ্রংশ, সন্দেহ নাই। গুর্জ্জরী ভাষার সহিত রাজপুতানার রাজস্থানী ভাষার সাদৃশ্য অস্বীকার করা যায় না। উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তের অ-পাঠান জাতিসমূহ যে ভাষায় কথা কহে, তাহা হিন্দকী নামে অভিহিত। গুজারগণ হিন্দকী ভাষা ব্যবহার করিতে গেলে তাহাদের উচ্চারিত বাক্যগুলি অস্পষ্ট ও বিকৃত হইয়া পড়ে।

হাজারা জেলার মুসলমান গুজারদের মধ্যে এক অদ্ভুত কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। তাহারা বলে, তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষ নন্দ মিহর হজরৎ মহম্মদের সেবকগণের অন্যতম ছিলেন। এক দিন উপাসনার সময়ে তিনি হজরৎকে জলপানার্থ কিছু প্রদান করেন। এই সেবার পুরস্কারস্বরূপ হজরৎ বলেন, তোমার যে-কোন আকাঙ্ক্ষা আমি পূর্ণ করিব। নন্দ মিহর বলেন, আমার ঔরসে আমার স্ত্রীর গর্ভ হইতে পুত্র উৎপন্ন হউক, ইহাই আমার এক মাত্র আকাঙ্ক্ষা। ইহা শুনিয়া হজরৎ তাঁহাকে একটি দৈবশক্তিসম্পন্ন দ্রব্য প্রদান করেন, যাহা তাঁহার পত্নী সেবন করিলে পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে। নন্দ মিহরের স্ত্রী এই দ্রব্য সেবন করিতে অস্বীকার করে। নন্দ মিহর পত্নীকে উহা সেবন করাইবার জন্য চল্লিশবার (বিভিন্ন সময়ে) চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই সে সম্মতা হয় না। অবশেষে নন্দ মিহর ক্রুদ্ধ হইয়া চল্লিশ খণ্ডে বিভক্ত ঐ দ্রব্যটিকে একই সময়ে জোরপূর্ব্বক পত্নীকে সেবন করান। ফলে, ঐ নারী গর্ভবতী হইয়া চল্লিশটি পুত্র প্রসব করে। চল্লিশটি পুত্রের ভরণপোষণের ভার বহন করা নন্দ মিহরের পক্ষে অতিশয় কষ্টকর হইয়া উঠে। অবশেষে তিনি ত্রিশজনকে তাড়াইয়া দেন। ইহারা পিতৃগৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া অন্যত্র গমনপূর্ব্বক সাংসারিক উন্নতিসাধনে সমর্থ হয়। পিতার পূর্ব্ব ব্যবহার স্মরণ করিয়া তাহারা তাঁহাকে নিজ নিজ গৃহে আহ্বান করিত না বা প্রবেশ করিতে দিত না। শেষে হজরৎ নন্দ মিহরকে আদেশ করেন, তোমার অবশিষ্ট দশ পুত্রকে ঐ ত্রিশজনের হস্তে সমর্পণ কর। নন্দ মিহর হজরতের আদেশ পালন করেন। নন্দ মিহরের ঐ চল্লিশ জন পুত্রের বংশধরগণই গুজার জাতিরূপে ভারতের সর্ব্বত্র বাস করিতেছে।

যাহারা সৈয়দ জলাল বাবার সহিত হাজারায় আসিয়াছিলেন, কাগান উপত্যকার সৈয়দগণ তাঁহাদের বংশধর সত্যকার সৈয়দরা হজরতের জামাতা মহাত্মা আলির বংশধর। বলিয়া বিবেচিত। যাহারা আলির ঔরসে এবং হজরৎ-কন্যা ফতিমার গর্ভে উৎপন্ন সন্তানগণ হইতে সম্ভূত আলির অন্যান্য পত্নীর গর্ভে জন্মিয়াছিল, তাহারাই বিশুদ্ধ সৈয়দ। তাহাদের বংশধরগণ উলাভী সৈয়দ আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। অনেকেই নিজদিগকে সৈয়দ বলিয়া পরিচয় দেন, কিন্তু বিশুদ্ধ সৈয়দ কাহারা তাহা স্থির করা সহজ নহে। পশ্চিমে একটা বচন প্রচলিত আছে—গত বৎসর আমি ছিলাম জোলা, এ বৎসর হইয়াছি সেখ এবং আগামী বৎসর সঙ্গতিশালী হইতে পারিলে হইব সৈয়দ। ইহা হইতেই বুঝা যায়, যাঁহারা নিজদিগকে সৈয়দ বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহাদের অনেকেই আদৌ সৈয়দ নহেন।

কাগান উপত্যকার উর্দ্ধাংশে দেখা যায়, যাহারা জমিদার তাহাদের সকলেই সৈয়দ, গুজাররাই প্রজা। এইস্থানে বলা আবশ্যক, কাগানের সৈয়দগণ হাজারা জিলার অন্যান্য স্থানের সৈয়দ হইতে স্বতন্ত্র।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকে মোগল-প্রাধান্য যখন ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছিল, তখন পেশওয়ারের উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত সোয়াত প্রদেশের (সোয়াত-নদের তীরবর্ত্তী) অধিবাসী সোয়াতীরা পাঠান-সম্প্রদায়সমূহের দ্বারা তাড়িত হইয়া কাগান উপত্যকার পাদদেশে প্রসারিত মানশেহরা তহশীলের অন্তর্গত পাখলি-প্রান্তরে উপস্থিত হয়। সর্ব্বশেষ সোয়াতীদল সৈয়দ জালাল বাবার নেতৃত্বে আগমন করে। কাগানের পশ্চিমস্থ ভোগারমাং উপত্যকায় সৈয়দ জালাল বাবার সমাধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ধর্ম্ম-গুরু সৈয়দ জালাল বাবার দ্বারা পরিচালিত সোয়াতীগণ তৈমুরলঙ্গের অনুচর তুর্কীগণকে হাজারা জিলা হইতে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হয়। হাজার তুর্কী সৈন্য অবস্থান করিত বলিয়া এই স্থান হাজারা নাম প্রাপ্ত হয়।

সোয়াতীরা নিজদিগকে পাঠান বলিয়া ঘোষণা করে। সীমান্তের "রাণীজাই" সম্প্রদায়ের সহিত সোয়াতীদের সম্পর্ক আছে। পেশওয়ার জিলার আজুসুফজাইগণ রাণীজাই জাতি হইতে সম্ভূত বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন। সোয়াতীরা নীতির দিক্ দিয়া আদৌ উন্নত নহে। সাধারণতঃ তাহারা ভীরু, ছলনাপ্রিয়, অলস ও অসত্যানুরাগী। তাই বলিয়া তাহাদের মধ্যে সাধু বা সাহসী ব্যক্তি একেবারেই নাই, তাহা নহে। অন্য বিষয়ে যাহাই হউক, সোয়াতীরা স্বভাবতঃ বুদ্ধিমান্ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এমন কয়েকজন সোয়াতীকে আমরা জানি, যাঁহাদের চরিত্র বিশেষ প্রশংসনীয়। এই স্থানে একটি অপ্রিয় সত্য স্বীকার না করিলে উপায় নাই, কাগান উপত্যকাবাসী সৈয়দ ও সোয়াতী উভয় জাতির অনেকেই

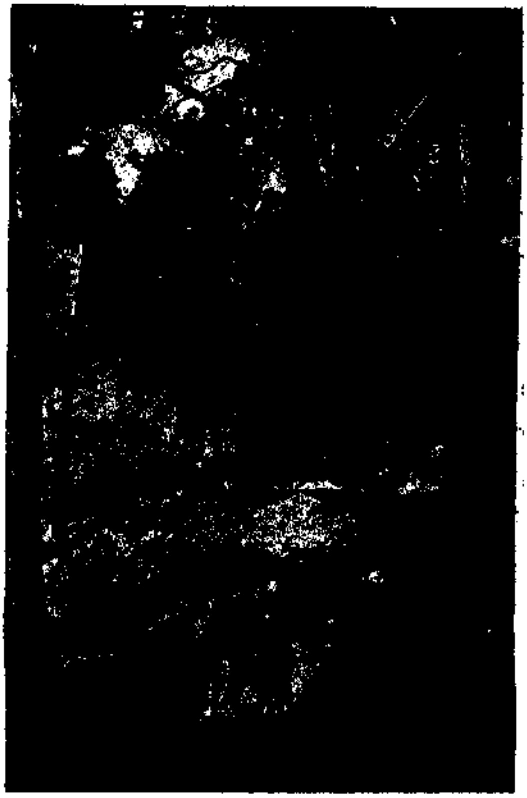
অহিফেনাসক্ত। সুখের বিষয়, নেতাদের চেষ্টায় এই আসক্তি ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে।

নাদিরশাহের উত্তরাধিকারী আহমদশাহ দুরাণীর দ্বারা পঞ্চনদ আক্রান্ত হইলে সেই আক্রমণের ফলস্বরূপ তিনি ঐ প্রদেশ এবং কাশ্মীর ও কাগান উপত্যকা প্রাপ্ত হন। ইহার পর এই সকল প্রদেশের উপর শিখ-আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে হাজারা জিলা শিখদের শাসনাধীন হইয়াছিল বলিয়া আমরা জানিতে পারি। ইহার পর একদল ধর্মোন্মত্ত মুসলমান শিখদের হাত হইতে কাগান উপত্যকা কাড়িয়া লইতে সমর্থ হয়। এই সম্প্রদায় "হিন্দুস্থানী ধর্মোন্মত্ত" দল নামে অভিহিত। যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত বেরিলীর অধিবাসী সৈয়দ আহম্মদ নামক এক ব্যক্তির দ্বারা এই দল গঠিত হয়। এই দল সীমান্তে আসিয়া, ধর্মের নামে প্রবল উত্তেজনা ও অশান্তি জন্মাইতে চেষ্টা করে। এই সম্প্রদায় এখনও সীমান্তে রহিয়া ইসলামের নামে উত্তেজনা সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে বলিয়া আমরা জানিতে পারি।

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে "হিন্দুস্থানী ফ্যানাটিক্" আখ্যায় অভিহিত এই সম্প্রদায় মানশেরা তহশীলের অন্তর্গত ফুলরা নামক স্থানে সুপ্রসিদ্ধ শিখ সেনাধ্যক্ষ হরিসিংহের দ্বারা পরাজিত হয়। কিন্তু, এই পরাজয় ইহাদিগকে সংযত বা শান্ত করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহারা ক্রমশঃ কাগান উপত্যকার অধিকাংশ অধিকার করিয়া ফেলে। কাগানের রাজধানী কুন্হার নদের তীরবর্তী বালাকোট পর্যান্ত এই দুর্দমনীয় দুর্দ্দান্ত দলের প্রাধান্য প্রসারিত হয়। কুন্হার নদ কাশ্মীর-হাজারা সীমান্তস্থিত পাট্টান খুর্দ্দ নামক স্থানে ঝিলাম নদে পতিত হইয়াছে।

সেনাধ্যক্ষ শের সিংহের নেতৃত্বে শিখগণ ইহাদিগকে পুনরায় পরাজিত করে। বালাকোটে এই দল-ভুক্ত বহু ব্যক্তি নিহত হয়। দলের নেতা "খলিফা" সৈয়দ আহম্মদও হত হন বলিয়া আমরা অবগত হই। বিপক্ষের দ্বারা সৈয়দ আহম্মদের মৃতদেহ কুন্হার-নদের বক্ষে নিক্ষিপ্ত হয়। দলপতির দেহ উদ্ধার করিবার জন্য তাহারা অনেক চেষ্টা করে। অবশেষে তালহাট্টা নামক স্থানের নিকটে উহা পাওয়া যায়। সেই স্থানেই সৈয়দ আহম্মদের শবকে সমাহিত করা হয়।

সৈয়দ আহম্মদের মৃত্যুর সহিত কাগান উপত্যকার হিন্দুস্থানী ফ্যানাটিক্ দলের প্রভাব নষ্ট হইল, তাহা নহে। সৈয়দ ও সোয়াতীদের সহকারিতায় ঐ দলের প্রাধান্য পুনরায় প্রসার পাইতে লাগিল। উহারা প্রচার করিতে লাগিল, খলিফা সৈয়দ আহম্মদের মৃত্যু হয় নাই, তিনি সত্বর পুনরায় আবির্ভূত হইবেন। কাশ্মীরের রাজা গুলাব সিংহ জম্মু হইতে দেওয়ান ইব্রাহিমকে এই দলকে দমন করিবার জন্য



শ্যাম সুন্দর শৈল-সানু।

পাঠাইয়া দেন। বালাকোটবাসী সোয়াতী ও কাগানের সৈয়দগণের দ্বারা দেওয়ান ইব্রাহিম কাগান-পল্লীর নিরবর্ত্তী শৈল-সানুতে স-সৈন্যে নিহত হন।

ইহার পর এই দুর্দ্দান্ত দল কাগানের কাওয়াই নামক স্থানে সম্মিলিত হয় এবং উত্তর হাজারার অধিবাসীরা ইহাদিগের সহিত যোগ দান করে। তৎপর তাহারা শিখদিগের অধিকৃত দুর্গসমূহ অধিকার করিবার জন্য চেষ্টা

করে। ক্রমশঃ সমগ্র হাজারা জিলায় বিদ্রোহ-বহ্নি বিপুল বিক্রমে জ্বলিয়া উঠে। বিদ্রোহ-দমনের জন্য শিখ শাসনকর্ত্তা দিওয়ান মূলরাজ স-সৈন্যে হাসান আবদাল নামক স্থানে উপস্থিত হন। হাজারার সর্দ্দারগণ সিতানাবাসী ধর্ম্মোন্মত্ত সৈয়দ আকবরকে নেতা ও শাসক বলিয়া স্বীকার করে। সৈয়দ আকবরের অল্পকাল স্থায়ী শাসন "লুণ্ডী মুসলমানী" আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। বাক্যটির অর্থ "অসম্পূর্ণ"।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ ও শিখদের মধ্যে শান্তি বা সন্ধি স্থাপিত হইলে রাজা গুলাব সিংহ হাজারা ও কাগান উপত্যকা সহ সমগ্র কাশ্মীরের অধীশ্বর বলিয়া স্বীকৃত হন। হাজারা-বাসীরা ইহাতে অতিশয় অসন্তুষ্ট হয়। সৈয়দ ও সোয়াতীরা গুলাব সিংহের শাসন স্বীকার করিতে অসম্মত হইয়া অশান্তি সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করে। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজদের সহকারিতায় কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তা দিওয়ান করমচাঁদ সোয়াতীগণ এবং "হিন্দুস্থানী ফ্যানাটিক" দলকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিতে সমর্থ হন। সোয়াতীরা কাশ্মীর-শাসনকর্ত্তার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয় এবং "ফ্যানাটিক্"রা স্বস্থানে প্রস্থান করে। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে হাজারার বক্ষে বৃটিশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রসিদ্ধনামা জেমস্ এবটের উপর হাজারা জিলা শাসনের ভার অর্পিত হয়।

সীমান্তে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জেমস্ এবটকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল এবং অশান্ত সীমান্তবাসীর সহিত পদে পদে সঙ্ঘর্ষ সংঘটিত হইয়াছিল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে পঞ্চনদ প্রদেশ ইংরেজদের অধিকারভুক্ত হইলে অক্লান্তকর্ম্মী জেমস্ এবট হাজারার ডেপুটি কমিশনর নিযুক্ত হন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হাজারা জিলায় সৈয়দরাই জমিদার, গুজারগণ দরিদ্র প্রজা-মাত্র। কাগানের গুজারগণ জেমস্ এবটের নিকট আবেদন করিল, সৈয়দের দ্বারা তাহাদের উপর অতিশয় অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এবট সৈয়দদিগকে কাগান পরিত্যাগ করিতে আদেশ প্রদান করেন। এবটের পর হার্ব্বার্ট এডওয়ার্ডস্ হাজারার ডেপুটি কমিশনার নিযুক্ত হন। ইঁহার দ্বারা সৈয়দরা পুনরায় কাগানে আসিয়া বাস করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে পুনরায় বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্বলিত হওয়ার জন্য কাগান উপত্যকার দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বহু কষ্টে ও চেষ্টায় এই বিদ্রোহ দমিত হয়। কাশ্মীর সরকার ১ শত ২৪ জন বিদ্রোহীকে বন্দী করিয়া তাহাদিগকে বৃটিশ সরকারের হস্তে প্রদান করেন। ইহাদিগের উপর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হয় বলিয়া আমরা জানিতে পারি। যে পথ কাগান উপত্যকার উপর দিয়া চিলাস পর্য্যন্ত প্রসারিত, উহা ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়।

স্বাধীনতা

...ভারতবর্ষ একদিন স্বাধীন ও সম্পূর্ণ ছিল। যে শ্রেণীর স্বাধীনতা ও সম্পূর্ণতা ভারতবর্ষ অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, জগতের অপর কোন জাতি আজ পর্য্যন্ত সেই শ্রেণীর স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অর্জ্জন করিতে পারে নাই তাহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে। কারণ, রাজনৈতিক স্বাধীনতা সত্ত্বেও আজও পর্য্যন্ত কোনও জাতি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে পারে নাই। কোন্ বিদ্যায় সেই স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে সমস্ত জগৎ এখনও অপরিজ্ঞাত। ভারতবাসিগণও সেই বিদ্যা মূলতঃ চারি হাজার বৎসর আগে বিস্মৃত হইয়াছেন এবং ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন।...

চিত্র-চরিত্র

—শ্রীঅমিত্র রায়

মাইকেলের নিজের কলমে আত্মপ্রকাশ

মধুসূদন যে তাঁর প্রতিভা সম্বন্ধে কেবল সচেতন ছিলেন তা নয়, কাব্য-শিল্প সম্বন্ধেও তাঁর চৈতন্য অতিশয় সূক্ষ্ম ছিল; কাব্য-সৃষ্টি অপেক্ষা কাব্য-সৃষ্টির প্রক্রিয়া তাঁর কাছে কম সত্য ছিল না, আর অসাধারণ বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যের সঙ্গে তিনি সেই প্রক্রিয়াকে নিজের সম্মুখে আনিয়া বিচার করিতে পারিতেন; কবি শিল্প-জীবনের ইতিহাস নিজেই যেন লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন; বন্ধুদের কাছে লিখিত চিঠি হইতে তাঁর শিল্প-সাধনার যে দিগ্দর্শন পাওয়া যায়, তাতে তাঁর কবি-স্বরূপটি স্পষ্ট হইয়া ওঠে; মধুসূদনের সবচেয়ে বড় জীবনী-লেখক তিনি স্বয়ং।

রাজনারায়ণ বসুকে লিখিতেছেন :—

এক বছরের মধ্যে—সে বছরও পূরা গত হয় নাই, একখানা ট্র্যাজেডি, একটি গীতি-কাব্য, আর আস্ত মহাকাব্যের অর্দ্ধেক! আর যদি কোন জন্যে আমাকে প্রশংসা না কর, অন্তত পরিশ্রমী বলিয়া করিতেই হইবে। দাঁড়াও, আমি গদ্য লিখিয়া যে সব ভদ্রলোক বড় লেখক বলিয়া গর্ব্ব করেন, তাঁহাদের অহঙ্কার ভস্মসার করিয়া দিতেছি! বড় লেখক! মাথা আর মুণ্ডু! তুমি নিশ্চয় জানিও বন্ধু, আমি আকস্মিক ধূমকেতুর মত আকাশে উদিত হইব—তাহাতে কোন ভুল নাই!

এইমাত্র মহরমের গোলমাল শেষ হইয়া গেল। ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে যদি কোন মহাকবির উদয় হয়—তবে তিনি হাসান-হোসেন ভ্রাতৃদ্বয়কে লইয়া একখানা সত্যকার মহাকাব্য লিখিতে পারেন—সমস্ত জাতির অনুভূতিকে তিনি কাব্যে রূপ দিতে পারেন। আমাদের হাতে সেরূপ কোন গল্প নাই। এখানে লোকে বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, মেঘনাদ-বধের কবির সমবেদনা রাক্ষসগুলার দিকে! ইহাই সত্য! রাম ও তাঁহার অনুচরদের আমি ঘৃণা করি; কিন্তু রাবণের আইডিয়া আমার কল্পনাকে উদ্দীপিত করিয়া তোলে; লোকটা সত্যই বিরাট ছিল!

*

মেঘনাদ-বধ শেষ করিয়া কবি কোন্ বিষয়ে লিখিবেন, চিন্তা করিতেছেন; বন্ধুরা বিভিন্ন বিষয়ে তাঁকে লিখিতে পরামর্শ দিতেছেন; সে সম্বন্ধে তিনি রাজনারায়ণ বসুকে লিখিতেছেন :—

যতীন্দ্র কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ লইয়া লিখিতে বলিতেছেন; আর এক বন্ধু বলিতেছেন, ঊষা-হরণ সম্বন্ধে লিখিতে; আমার কিন্তু ইচ্ছা তোমার পরামর্শ-মত সিংহল-বিজয় সম্বন্ধে লিখি!

*

মেঘনাদ-বধের চেয়ে ভাল কিছু লেখা সহজ নয়—তবু চেষ্টা করিতে ক্ষতি কি! কি বল! না, এখন হইতে কেবল ছোট ছোট গীতি-কবিতা ও সনেট লিখিয়া জীবন অতিবাহিত করিব! না, ইহা নিতান্ত অসহ্য। আমাকে সিংহল-বিজয়ের গল্পটা আবার পাঠাইও! যে কাহিনীতে সমুদ্র ও পর্ব্বত আছে, আর আছে সমুদ্র-যাত্রা, যুদ্ধ, আর প্রেমের জন্য নানারকম দুঃসাহসিকতা—এমন গল্প আমি ভালবাসি—কল্পনা অবাধ বিহারের সুযোগ পায়!

*

আমি বীরাঙ্গনা নামে একখানা কাব্য আরম্ভ করিয়াছি—ইহাতে পৌরাণিক রমণীরা স্বামী বা প্রণয়ীর কাছে পত্রাকারে মনোবেদনা জানাইতেছে—ইহা Heroic epistles বা পত্র-কাব্য। সবশুদ্ধ একুশখানা পত্র-কাব্য থাকিবে—এগারখানা ইতিমধ্যেই লিখিয়া শেষ করিয়াছি।

*

কিন্তু, আমার বিশ্বাস, আমার কাব্য-জীবন শেষ হইয়া আসিল—আমি ইংলণ্ডে ব্যারিষ্টারি পড়িতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছি, সুতরাং এবার কাব্য-লক্ষ্মীর কাছে বিদায় লইতে হইবে।

শুনিয়া সুখী হইবে যে, গ্রেট বিদ্যাসাগর এতদিনে নূতন কবিতার অনুরাগী হইয়াছেন—এবং এই কাব্য-শিল্পের প্রবর্ত্তনাকারীকে সম্মান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। নূতন

কাব্যের সঙ্গীতে এখনও তাঁহার কাণ অভ্যস্ত হয় নাই—কিন্তু ইহার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তাঁহার আর কোন সন্দেহ নাই।

*

এখন আর কবি মধুসূদন নয়। এবার মাইকেল এম. এস. ডাট্ এস্কোয়ার, ব্যারিষ্টার-এট্-ল অব্ দি ইনার টেম্পল্। চমৎকার শোনাইতেছে! আশা করি, আমি অকৃতকার্য্য হইব না!

খুব সম্ভব আগামী মাসে আমি ইংলণ্ড যাত্রা করিব। যদি ফিরিয়া আসি দেখা হইবে—আর যদি না আসি, আজ হইতে একশত বৎসর পরে আমার দেশবাসীরা কি বলিবে!

Far away, far away,
From the land he loved so well
Sleeps beneath the colder ray.

*

আমার নূতন কাব্যখানা বিদ্যাসাগরকে উৎসর্গ করিয়াছি! অসাধারণ লোক! নানাদিক্ দিয়া বিচার করিয়া দেখিয়াছি আমাদের দেশের মধ্যে সে এখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। যদিও সে এখনও নবপ্রবর্ত্তিত কাব্য উত্তমরূপে আবৃত্তি করিতে পারে না—তবু সে সম্বন্ধে তার ধারণা খুব উচ্চ। তার প্রশংসাকে সত্য বলিয়া লইতে পার—কারণ সে তো খোসামোদ করিবার লোক নয়।

বুধবার, ৪ঠা জুন, ১৮৬২।

প্রিয় রাজনারায়ণ,

শুনিয়া সুখী হইবে, আমি বিলাত-যাত্রার সমস্ত আয়োজন শেষ করিয়াছি, এখন ভগবান্ ইচ্ছা করিলে ৯ই সকালে ক্যাণ্ডিয়া জাহাজে যাত্রা করিব, আশা করিতেছি। তুমি ভাবিও না যে, আমি কাব্য-লক্ষ্মীকে ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছি; যদি নব-প্রবর্ত্তিত কাব্যের সমাদর না হইত, তবে নিশ্চয় আমি দেশে থাকিতাম, কিন্তু অতি সহজে আমাদের জয় হইয়াছে; এখন অপেক্ষাকৃত অল্প-বয়স্ক কবিদের উপরে ভার ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে—যদিও আমি দূর হইতে এই আন্দোলনকে সাহায্য করিতে থাকিব।

মেঘনাদ-বধের সটীক দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইতেছে, এবং সত্যকারের এক জন বি. এ. তাহার সমালোচনামূলক ভূমিকা লিখিতেছে—তোমার মতকেই সে সমর্থন করিয়াছে, বাংলা ভাষায় ইহা শ্রেষ্ঠ কাব্য। এক বছরে হাজার কপি মেঘনাদ-বধ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।

রাজনারায়ণ, আমি ত চলিলাম। একমাত্র ভগবান্ জানেন, আর দেখা হইবে কি না! কিন্তু, বন্ধুকে ভুলিও না—দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদ—চার বৎসর! কিন্তু, কি আর করা যায়! বন্ধুকে মনে রাখিও, আর তার খ্যাতির প্রতি দৃষ্টি রাখিও।

যেহেতু আমি কবি, কাজেই একটা কবিতা না লিখিয়া কি করিয়া যাই,—যা লিখিয়াছি, পাঠাইলাম।

বঙ্গ-ভূমির প্রতি

(সোনাই, সন ১২৬৯ সাল, খৃষ্টাব্দ ১৮৬২)।

My native land, good night!—Byron.

রেখো মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে,
সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ
মধুহীন করো না গো তব মনঃ-কোকনদে!

প্রিয় রাজ! এখন একমাত্র অনুরোধ করিতে পারি—
মধুহীন করো না গো তব মনঃ-কোকনদে!

*

পরবর্ত্তী চিঠিগুলি কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত। ইনি বেলগাছিয়ার নাট্যশালায় কখনও কখনও অভিনয় করিতেন; মধুসূদন তাঁর নট-প্রতিভার অনুরাগী ছিলেন,—তাঁকে গ্যারিক্ বলিয়া মাঝে মাঝে সম্বোধন করিতেন। নিজের নাটকগুলি সম্বন্ধে এবং নাটকের সঙ্গে অমিত্রাক্ষর ছন্দের কি সম্বন্ধ, সে বিষয়ে মধুসূদন তাঁকে প্রায়ই চিঠি-পত্র লিখিতেন। বলা বাহুল্য, এই সব চিঠিরও প্রধান উদ্দেশ্য, কোন এক জন রসিক ব্যক্তির কাছে, কোন একটা উপলক্ষে আত্ম-বিশ্লেষণ! এই জন্যই চিঠিগুলি আজও লোকের ঔৎসুক্যের কারণ হইয়া আছে।

কি ভাবে আমি অগ্রসর হইতেছি, সে বিষয়ে দু'চারটা কথা বলি। বলা বাহুল্য যে, সব ভাষাতেই অমিত্রাক্ষর কাব্যের পক্ষে যোগ্যতম ছন্দ; কু-কবির পক্ষে যেমন মিত্রাক্ষর, সত্যিকারের কবির পক্ষে তেমনি অমিত্রাক্ষর; ...শক্তিশালী মন বন্ধনে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, সে বন্ধন যে রকমই হক না কেন! চীন-দেশে মেয়েদের পা লোহার জুতায় আবদ্ধ করা হয়। তার ফল কি? খঞ্জত্ব!

আমার কবিতা পড়িবার সময়ে এই কয়েকটি বিষয়ে নজর রাখিবে—প্রথম, উপমা; দ্বিতীয়, যে ভাষায় সে উপমা ও ভাব প্রকাশিত; তৃতীয়, প্রত্যেক শ্লোকের গতি; সবটা মিলিয়া কি রকম হইল, সে দিকে দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন নাই; সময়ে তাহা লোকে বুঝিতে পারিবে। যদি উপরোক্ত তিনটি বিষয়ে সার্থকতা লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আর বন্ধুদের দুশ্চিন্তার কারণ নাই। আজ না হয়, কাল না হয়, ত্রিশ বছর পরে আমার কাব্যের খ্যাতি হইবেই।

যখন আমি প্রথমে বাংলায় লিখিতে আরম্ভ করি, আমার কাণ বিদ্রোহ করিয়া উঠিত, এখন বাংলা ভাষার সঙ্গে আমার আপোষ হইয়া গিয়াছে। অমিত্রাক্ষরের মাধুর্য্য ও শক্তিতে আমি বিস্মিত। নাটকের অমিত্রাক্ষরের আবৃত্তি যদি যথাযথ হয়, তবে ইংরাজি অমিত্রাক্ষর যেমন ইংরাজি গদ্যের মত শোনায়, বাংলাও তেমনি শোনাইবে, অবশ্য, গদ্যের স্বাধীনতার সঙ্গে কাব্যের মাধুর্য্যের ছাপ জড়াইয়া থাকিবে। আমি ইহাতে চমক ও অনুপ্রাস, যতটা আমি পছন্দ করি, তার বেশি ব্যবহার করিয়াছি, সেটা কেবল অমিত্রাক্ষরে অনভ্যস্ত কাণকে ভুলাইবার জন্য। নিশ্চয় জানিও, বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিবে, এবং আমরা বর্ত্তমান ইউরোপীয়দের মত, আমাদের ক্লাসিকাল লেখকদিগকে অতিক্রম করিতে না পারিলেও, অন্ততঃ তাহাদের সমকক্ষ হইতে পারিব। আমাদের মধ্যে যদি সে রকম প্রতিভাবান্ ব্যক্তি না থাকে, তবে অন্ততঃ ভবিষ্যতের জন্য আমরা পথিকৃৎ হইতে পারি। এস, আরম্ভ করিয়া দেওয়া যাক্। ললিত-লবঙ্গ-লতা-ওয়ালার দল, ভারতচন্দ্রের (আমাদের পোপ) অনুকরণ-কারীর দল, আমাদের চেষ্টায় বিরক্ত হইতে পারে কিংবা হাসিতে পারে, কিন্তু আমি বলি তারা চুলোয় যাক্।

*

কৃষ্ণকুমারী নাটকে স্ত্রী-চরিত্র-সৃষ্টিতে তিনি কি বাধা অনুভব করিতেছিলেন, সে সম্বন্ধে কেশববাবুকে লিখিতে-ছেন:—

ইউরোপে স্ত্রীলোকের স্থান, কি নাটকে, কি সমাজে, আমাদের চেয়ে স্বতন্ত্র রকমের। যদি কোন পতিব্রতা নারীকে, তার স্বামী ছাড়া আর কোন পুরুষের সঙ্গে আলাপ করিতেছে, দেখাই, তবে আমাদের দর্শক-রা শিহরিয়া উঠিবে। এই হইতেছে এমন একটা গণ্ডী, যার বাহিরে আমার যাইবার উপায় নাই। সুতরাং নাটককে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিবার জন্যে বেশি-সংখ্যক স্ত্রী-চরিত্রের আমদানি করিতে হয়। ইউরোপীয়ানদের অপেক্ষা আমরা, এশিয়া-বাসীরা, বেশি রোমান্টিক। শেক্সপীয়রের নাটকের দিকে তাকাও; মিড্ সামার নাইটস্ ড্রীম, রোমিও জুলিয়েট বা ওই রকম দু'চারখানা ছাড়া আর কোন্ নাটকটি সত্য রোমান্টিক? যে-ভাবে শকুন্তলা রোমান্টিক! ইউরোপীয় নাটকে জীবনের বাস্তবতা, প্রবৃত্তির দুর্দ্দামতা, ভাবাতিশয্যের মহত্ত্ব আছে। কিন্তু, আমাদের নাটকে, সবই কেবল কোমল, সবই কেবল রোমান্টিক। আমরা বাস্তবকে ভুলিয়া পরীর রাজ্যের স্বপ্নে বিভোর! এ দেশে নাটকের প্রাথমিক উন্নতিও হয় নাই; আমাদের নাটক, কেবল নাট্য-কাব্য! শর্ম্মিষ্ঠাতে আমি অনেক সময়ে নাট্যকারের কলম ছাড়িয়া কবির কলম ধরিয়াছি; অনেক সময় বাস্তবকে ভুলিয়া কবি-সুলভ হইয়া উঠিয়াছি। বর্ত্তমান নাটকে আমি নিজের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিব, কাব্যের জন্য ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিব না, তবে যদি সম্মুখে তাকে দেখি, অবশ্য ত্যাগও করিব না; এবং নিশ্চয় জানি, মাঝে মাঝে তার সঙ্গে দেখা হইবে; এবারে এমন সব চরিত্র সৃষ্টি করিব, যারা কবির মুখ-পাত্র মাত্র না হইয়া নিজেদের স্বকীয়ত্ব লাভ করিবে।

* * *

আমার ভাষা যে তোমার পছন্দ হইয়াছে, সে জন্য আমি আনন্দিত; অভ্যাসের দ্বারা-ই কেবল স্বচ্ছন্দতা লাভ করা যায়—এখনও আমি শিক্ষানবিশ মাত্র; কিন্তু আমি প্রগতিবান্ জীব! নাটকখানা ট্রাজেডি বলিয়াই কোন দৃশ্যকে কমিক করিয়া তুলিতে চেষ্টা করি নাই; আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বলিতে পারি, সে রকম করিলে নাটকের ভাবের সঙ্গে অসঙ্গত হইত; কিন্তু কথোপকথনের মধ্যে যেখানে রসিকতা আপনি আসিয়া পড়িয়াছে, তাকে ছাড়ি নাই; আমার আদর্শ হইতেছে, ট্রাজেডিতে জোর করিয়া কমিক হইবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু গৌণ দৃশ্যগুলিতে যদি হাস্যরস স্বতঃই আসিয়া পড়ে, তাহাকে ছাড়িবার কারণ নাই। আমার বিশ্বাস, শেক্সপীয়ারেরও ইহাই ছিল আদর্শ!

আমি কুড়ের মত বসিয়া আছি, ভাবিও না; দুই দিন আগে কৃষ্ণকুমারী শেষ করিয়াছি; ৬ই আগষ্টে আরম্ভ—৭ই সেপ্টেম্বরে শেষ খুব দ্রুত, কি বল!...

তুমি ইহার পঞ্চমাঙ্ক বিশেষ পছন্দ করিবে ভাবিয়া খুসী হইয়া উঠিতেছি। যেখানে হতভাগ্য কৃষ্ণকুমারী বুকে ছোরা মারিয়া শয্যার উপরে পড়িয়া গেল, সেখানে আমি অশ্রু সংবরণ করিতে পারি নাই!

বিজ্ঞান-জগৎ

নক্ষত্রের স্পন্দন

— শ্রীসুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী

পর্য্যবেক্ষণের ফলে দেখা যায় যে, আকাশের বহু নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য স্থির থাকে না। ঔজ্জ্বল্যের সাময়িক হ্রাসবৃদ্ধি হয়, এরূপ বহু নক্ষত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এই প্রকার নূতন নক্ষত্রের সন্ধান প্রায়ই পাওয়া যাইতেছে। বহু ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে একই নক্ষত্রের ফটো তুলিয়া দেখা গিয়াছে যে, বিভিন্ন সময়ে ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য হয়। জার্মানীর জ্যোতিষ সমিতি 'আষ্ট্রনমিশে গেজেলশাফ্‌ট' এই-জাতীয় নক্ষত্রের একটি তালিকা প্রকাশ করেন।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্যের এই তারতম্য কেন হয়? বিজ্ঞানে সকল 'কেন'র উত্তর দেওয়া প্রায় অসম্ভব বলিলেও চলে, কিন্তু কিরূপ ভাবে এবং কিরূপ ক্রমে কোন ঘটনা ঘটে তাহা বলা অধিকতর সহজ, কারণ এইগুলি পর্য্যবেক্ষণসাপেক্ষ। সুতরাং প্রথমেই 'কেন'র প্রশ্ন ছাড়িয়া দিয়া কিরূপভাবে এই তারতম্য হয়, তাহার আলোচনা করা যাউক।

একই সময় অন্তর ঔজ্জ্বল্য হ্রাস হয় এবং নির্দ্দিষ্টকাল পরে পুনরায় পুরাতন ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়া আসে অনেক নক্ষত্রে দেখা গিয়াছে। বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন যে, এগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে একটি নক্ষত্র নহে, দুইটি নক্ষত্র পরস্পর পরস্পরের চারিদিকে ঘুরিতে থাকে এবং তাহার ফলে অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল নক্ষত্রটি অপরটির আড়ালে পড়িয়া যায়; তাহাতে আমাদের বোধ হয় যে, নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য কমিয়া গিয়াছে। পরে দ্বিতীয়টি আরও সরিয়া গেলে প্রথমটির ঔজ্জ্বল্য আবার চোখে পড়ে। এই মত স্বীকার করিয়া লইলে এই জাতীয় যুগ্ম তারার ঔজ্জ্বল্যের হিসাব মিলান যায় বটে, কিন্তু ইহাতে প্রথমেই মানিয়া লওয়া হয় যে, নক্ষত্রগুলির প্রকৃত ঔজ্জ্বল্য কিছুই কমে না; এইরূপ ঘটনা সূর্য্য বা চন্দ্রগ্রহণের মতই সহজ ঘটনা।

কিন্তু এমন অনেক নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায় যেগুলির ঔজ্জ্বল্যের হ্রাসবৃদ্ধি উপরে লিখিত সহজ মতবাদের সাহায্যে কোনক্রমেই বুঝান যায় না। এই সকল নক্ষত্রে ঔজ্জ্বল্য যে প্রকৃত প্রস্তাবেই বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় তাহা নিশ্চিত। এই প্রকার পরিবর্ত্তনের কারণও অবশ্য ভিন্ন। যে সকল নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য সত্য সত্যই বাড়ে বা কমে বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন সেইরূপ নক্ষত্রের সকলগুলির আচরণ ঠিক একই প্রকার নহে। কোন শ্রেণীর নক্ষত্রে দেখা যায় যে, ঔজ্জ্বল্যের হ্রাসবৃদ্ধি কোন নিয়মের অধীন নয়, কোন কোনটি হঠাৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠে এবং ধীরে ধীরে এই ঔজ্জ্বল্য কমিয়া যায়; কোন কোনটির ঔজ্জ্বল্যের হ্রাসবৃদ্ধির পুনরাবৃত্তি দেখা যায়, যদিও অনেক ক্ষেত্রে কালের ব্যবধান সমান থাকে না।

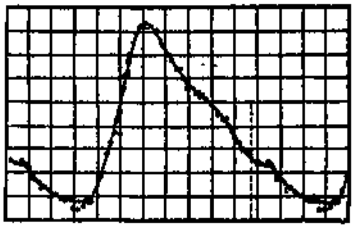
যতপ্রকার নক্ষত্রে এই জাতীয় পরিবর্ত্তন দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিয়মানুগ গুলিকে বলা হয় 'সিফিড ভ্যারিয়েবল' (cepheid variable)। সিফি নক্ষত্রপুঞ্জের উজ্জ্বল তারা 'ডেল্টা সিফি' এই জাতীয় নক্ষত্রের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ বলিয়া এইরূপ নামকরণ করা হইয়াছে। সিফিড ভ্যারিয়েবল নক্ষত্রগুলির নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট ভাবে ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য হয়; সাধারণতঃ এই পরিবর্ত্তনের কাল নক্ষত্র হিসাবে দেড় দিন হইতে পঞ্চাশ দিন পর্য্যন্ত হইতে দেখা গিয়াছে। এই জাতীয় নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য বহুসংখ্যক গুণ বৃদ্ধি পায় না; চার পাঁচ গুণের অধিক হইতে এই পরিবর্ত্তন সাধারণতঃ দেখা যায় না। অবশ্য চোখে না দেখিয়া ফটোগ্রাফের সাহায্যে তুলনা করিলে এই সংখ্যা আরও একটু বাড়ে, কারণ ফটোগ্রাফে চক্ষুর অদৃশ্য আল্ট্রা-ভায়লেট্ আলো আরও ভাল ভাবে ধরা পড়ে।

সিফিড ভ্যারিয়েবল নক্ষত্রের পরিবর্ত্তন হইতে মনে হয় যে, কোনও কারণে উহার বহিরাবরণের উত্তাপ বৃদ্ধি পায়, কারণ

উত্তাপ বৃদ্ধি পাইলে ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায় এবং বর্ণ আরও শ্বেত হইয়া থাকে। নক্ষত্রের বর্ণছত্র ও ঔজ্জ্বল্য প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণের ফলে এই কারণই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। হিসাব করিয়া পাওয়া যায় যে, নক্ষত্রের উত্তাপ মাধ্যমিক অবস্থা হইতে শতকরা ১৫ হইতে ২৩ ভাগ পরিবর্ত্তিত হয়। নক্ষত্রের বহিরাবরণের উত্তাপ সাধারণতঃ ৫।৬ হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, সুতরাং এই হিসাবমত নক্ষত্রের বহিরাবরণের উত্তাপ প্রায় ১ হাজার ডিগ্রি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হয়। শুধু তাহাই নহে, নির্দ্দিষ্ট সময় পরে পরে এই পরিবর্ত্তন নিয়মিত ভাবে পুনরাবৃত্ত হইতে থাকে।

এই প্রকার আচরণের কারণ নির্ণয় করিবার জন্ম একটু সরল পদার্থবিজ্ঞানের আশ্রয় লওয়া যাক। ঘড়ির দোলক বা পেণ্ডুলাম সকলেই দেখিয়াছেন। ঘড়ির দোলককে যদি মধ্যের নিশ্চল অবস্থা হইতে একটু এক পাশে টানিয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, দোলকটি প্রথম অবস্থায় ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু এই অবস্থায় থামিয়া না থাকিয়া বিপরীত দিকে চলিয়া যাইবে এবং এইরূপে ক্রমান্বয়ে একদিক্ হইতে অপর দিক্ পর্য্যন্ত আন্দোলিত হইতে থাকিবে। এইরূপ আন্দোলনের জন্ম মাধ্যাকর্ষণ দায়ী। দোলকটি এক পাশে থাকিলে পৃথিবীর আকর্ষণে তাহা আকৃষ্ট হইয়া পূর্ব্বের অবস্থায় আসিতে চেষ্টা করে, কিন্তু সচল বস্তুর স্বাভাবিক ধর্ম্ম জড়ত্বার জন্ম সেখানে না থামিয়া বিপরীত দিকে ধাবিত হয়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়া উহার গতি রোধ না করে। এইরূপে মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়ায় ঘড়ির দোলকে আন্দোলন বা স্পন্দন হইতে থাকে। যদি রবারের সূতায় বাঁধা একটি ভারী জিনিষকে নীচের দিকে টানিয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, রবারের স্থিতিস্থাপকতার জন্ম জিনিষটি উপর হইতে নীচে স্পন্দিত হইতে থাকিবে। এই সামান্য এবং সহজসাধ্য পরীক্ষা হইতে দেখা যায় যে, মাধ্যাকর্ষণ বা স্থিতিস্থাপকতা যে কোন কারণে কোন বস্তু স্পন্দিত হইতে পারে।

সিফিড শ্রেণীর নক্ষত্রে এই দুই প্রকার ক্রিয়াই ঘটিয়া থাকে। নক্ষত্রের উপাদানগুলি অত্যন্ত উত্তপ্ত বলিয়া কঠিন বা তরল অবস্থায় থাকিতে পারে না, থাকে বাষ্পাকারে বা গ্যাস-রূপে। স্থিতিস্থাপকতা গ্যাসের একটি ধর্ম্ম এবং গ্যাসের চাপ এই স্থিতিস্থাপকতার পরিমাণ নির্দ্দেশ করে; ইহা ছাড়া নক্ষত্রের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়াও বর্ত্তমান। এখন মনে করা যাক যে, কোন একটি নক্ষত্রের আয়তন কোন উপায়ে কিছু পরিমাণ ধরা যাউক ব্যাসের শতকরা ১০ ভাগ কমাইয়া দেওয়া হইল। তাহা হইলে গ্যাসের কণিকাগুলি আরও নিকটবর্ত্তী হওয়ায় মাধ্যাকর্ষণের পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে কিন্তু হিসাব করিয়া দেখা যায় যে, গ্যাসের চাপও অধিকতরভাবে বৃদ্ধি পাইবে। গ্যাসের চাপ বৃদ্ধি পাইলেই তাহা আয়তনে বাড়িতে চেষ্টা করে, কাজেই ফল হইবে এই যে, নক্ষত্রটি স্ফীত হইতে হইতে পূর্ব্বের আয়তনে আসিবে কিন্তু এই আয়তনে আসিয়াও স্ফীতি থামিয়া যাইবে না—পূর্ব্বের আয়তন অপেক্ষা আরও কিছু বাড়িয়া যাইবে। অর্থাৎ পূর্ব্বে যদি ব্যাস শতকরা ১০ ভাগ কমিয়া থাকে তাহা হইলে এখন ব্যাস মাধ্যমিক



ডেল্টা সিফি নক্ষত্রের আলোকের হ্রাস-বৃদ্ধি

অবস্থা অপেক্ষা শতকরা ১০ ভাগ বাড়িয়া যাইবে। এই শেষের অবস্থায় আসিলে গ্যাসের কণিকাগুলির মধ্যের ব্যবধান বাড়িয়া যাইবে সুতরাং চাপ কমিয়া যাইবে এবং তখন মাধ্যাকর্ষণের ফলে নক্ষত্রটি আবার সংকুচিত হইতে থাকিবে। অর্থাৎ প্রথমে যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে, কোন কারণে নক্ষত্রের আয়তন একবার কমিয়া গিয়াছিল তাহা হইলে অনন্তকাল ধরিয়া নক্ষত্রটি আয়তনে যথাক্রমে হ্রাস ও বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। অবশ্য একথা ভুলিলে চলিবে না যে, প্রথমে কেন বা কিরূপে নক্ষত্রের আয়তন কমিল তাহার কোন সদুত্তর দেওয়া সম্ভব নহে। পেণ্ডুলামের স্পন্দনকাল অর্থাৎ এক দিক হইতে অপরদিক যাইতে যে সময় লাগে তাহা প্রধানতঃ পেণ্ডুলামের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে এবং একই পেণ্ডুলামের স্পন্দনকাল সকল সময়ই এক থাকে। নক্ষত্রের স্পন্দনকালও সেইরূপ নক্ষত্রটীর আকার ও আয়তনের উপর

নির্ভর করিবে এবং একই নক্ষত্রের স্পন্দনকাল সকল সময়ই অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া যাইবে।

নক্ষত্রটি যখন সংকুচিত হয় তখন চাপবৃদ্ধির ফলে নক্ষত্রের অভ্যন্তরের উত্তাপও বৃদ্ধি পায়; সেইরূপ আয়তনে বৃদ্ধি পাইলে চাপ কমিয়া যায় এবং নক্ষত্রের অভ্যন্তর অপেক্ষাকৃত শীতল হয়। উত্তাপ বৃদ্ধি ও হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে আলোকের পরিমাণও বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় এবং নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য ঘটে। নক্ষত্রের দেহ-স্পন্দনের এই মতবাদ প্রথমে প্রচার করেন শেপলী এবং পরে এডিংটন ইহার গণিতসম্মত ব্যাখ্যা দেন।

যে সকল নক্ষত্রে এই প্রকার স্পন্দন হয় সেগুলি সাধারণতঃ অত্যন্ত বৃহৎ এবং উজ্জ্বল। একটি সামান্য উদাহরণ হইতেই উহা বুঝা যাইতে পারে; স্পন্দনশীল নক্ষত্রের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট আকারের তারাতে ঔজ্জ্বল্যের তারতম্যই একশত সূর্য্যের আলোক অপেক্ষা অধিক!

পর্য্যবেক্ষণের ফলে আরও দেখা গিয়াছে যে, মোটামুটি হিসাবে কোন নক্ষত্রের গড় ঔজ্জ্বল্য নির্ভর করে তাহার স্পন্দনকালের উপরে। তিন দিন স্পন্দনকাল হইলে নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য সূর্য্যের প্রায় ৩৫০ গুণ, ১০ দিন স্পন্দন-কাল হইলে ১০০০ গুণ এবং ৮০ দিন হইলে প্রায় ৩০০০ গুণ হইতে দেখা গিয়াছে।

যে সকল নক্ষত্রের স্পন্দন-কাল তিন চার দিন মাত্র সেগুলির বর্ণছত্র হইতে মনে হয় যে, আলোক বিকিরণ-ক্ষমতায় উহারা সূর্য্যের অনুরূপ অর্থাৎ প্রতি বর্গ মাইল হইতে সম্ভবতঃ একই পরিমাণ আলোক বিকীর্ণ হয়। এই মত সত্য হইলে এই নক্ষত্রগুলির ব্যাস হইবে সূর্য্যের ব্যাসের প্রায় ২০ গুণ অর্থাৎ প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ মাইল। যে সকল নক্ষত্রের স্পন্দনকাল অপেক্ষাকৃত অধিক সেগুলি শীতলতর মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে, সুতরাং এই নক্ষত্রগুলির প্রতি বর্গ মাইল ক্ষেত্র হইতে সূর্য্যের অপেক্ষা অল্প পরিমাণে আলোক বিকীর্ণ হইবে। হিসাব করিয়া দেখা যায় যে ১০ দিন স্পন্দনকাল হইলে নক্ষত্রের ব্যাস সম্ভবতঃ ৪ কোটি মাইল হইবে। সেইরূপ ৪০ দিন স্পন্দনকাল হইলে ব্যাস সম্ভবতঃ ১০ হইতে ১৫ কোটি মাইলের মধ্যে অর্থাৎ পৃথিবীর পরিভ্রমণ-পথের ব্যাসের কাছাকাছি।

এইরূপ বৃহদাকার নক্ষত্র যদি স্পন্দিত হয় তাহা হইলে যেরূপ বেগে উহার বহিরাবরণ বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় তাহা বর্ণ-ছত্রের সাহায্যে পরিমাপ করা সম্ভব (গত সংখ্যা "বঙ্গশ্রী" পৃঃ ২৭৮ দ্রষ্টব্য)। যে সকল সিফিড ভ্যারিয়েবল ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করা হইয়াছে, সেগুলি হইতে দেখা যায়, এই বেগ গড়ে প্রায় প্রতি সেকেণ্ডে ১৩ মাইল। নক্ষত্রের সম্মুখভাগ এবং পশ্চাদংশ দুইই এই হারে পরিবর্ত্তিত হইলে নক্ষত্রের ব্যাস প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ২৫ মাইল হিসাবে কমিয়া বা বাড়িয়া যাইবে। অর্থাৎ সময়ে সময়ে এক দিনে একটি নক্ষত্রের ব্যাস ২০ লক্ষ মাইলের বেশী বাড়িয়া বা কমিয়া যাইতে পারে। যে সকল নক্ষত্রের স্পন্দনকাল অল্প সেই সকল ক্ষেত্রে এক বা দুই দিনের মধ্যেই সমস্ত পরিবর্ত্তন,—বৃদ্ধি বা হ্রাস—ঘটিয়া থাকে; মোট পরিবর্ত্তন কচিৎ ৯ লক্ষ মাইলের অধিক হয়। কিন্তু যে সকল নক্ষত্রের স্পন্দনকাল অপেক্ষাকৃত অধিক সে-গুলির সংকোচন ও প্রসারণের বেগও অধিক এবং ব্যাসের পরিবর্ত্তনও অনেক বেশী। আজ পর্য্যন্ত একটি নক্ষত্রের ব্যাস ৪ কোটি মাইল হ্রাস বা বৃদ্ধি পাইতে দেখা গিয়াছে—অবশ্য এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই নক্ষত্রের মোট ব্যাস সম্ভবতঃ ১৫ কোটী মাইল—অর্থাৎ দুই দিকে, সম্মুখে এবং পিছনে শতকরা প্রায় ১৩ ভাগ করিয়া পরিবর্ত্তন ঘটে। ছোট নক্ষত্রে এই পরিবর্ত্তন সাধারণতঃ ১০ ভাগের কম হইয়া থাকে।

নক্ষত্রস্পন্দনের মতবাদ আপাতদৃষ্টিতে বেশ চিত্তাকর্ষক বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ইহাতে কিছু অসঙ্গতি আছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, যখন কোন নক্ষত্র সর্ব্বাপেক্ষা সংকুচিত অবস্থায় থাকে তখন উহার উত্তাপ, কাজেই আলোকও বৃদ্ধি পায়, সুতরাং সংকুচিত অবস্থায় উজ্জ্বলতর এবং প্রসারিত অবস্থায় ম্লানতর দেখিবার আশা করা যায়। পর্য্যবেক্ষণের ফলে কিন্তু দেখা যায় যে নক্ষত্র যখন সর্ব্বাপেক্ষা বেগে প্রসারিত হইতেছে তখনই তাহার ঔজ্জ্বল্য সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায় এবং যখন সর্ব্বাপেক্ষা বেগে সংকুচিত হইতেছে তখন নক্ষত্রটির ঔজ্জ্বল্য সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। এইরূপ ঘটনার কারণ সম্বন্ধে নানাপ্রকার জল্পনা আছে, কিন্তু কোন সন্তোষজনক মীমাংসা নাই। দেখা গিয়াছে যে, উজ্জ্বলতম অবস্থা হইতে ম্লানতম অবস্থায় আসিতে যে সময় লাগে ম্লানতম অবস্থা হইতে

উজ্জ্বলতম অবস্থায় আসিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহার প্রায় অর্দ্ধেক সময় মাত্র লাগে ; ইহারও কোন সন্তোষজনক মীমাংসা পাওয়া যায় নাই।

বেতারযন্ত্র পরীক্ষা

আকাশযানে ব্যবহৃত বেতার সংবাদ প্রেরণের যন্ত্র বহু বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে কাজ করে। ঝড়, বৃষ্টি, তুষার, অত্যধিক উত্তাপ, প্রচণ্ড শীত, বাতাসের চাপের দ্রুত পরিবর্ত্তন, ঝাঁকানি প্রভৃতি অনেক অত্যাচার এই যন্ত্রগুলিকে সহ্য করিতে হয়। সাধারণ হিসাবে গৃহে বা পরীক্ষাগারে যে যন্ত্রকে ভাল বলিয়া মনে করা হয় অনেক সময় সেগুলি পারিপার্শ্বিক অবস্থার বৈষম্যের কারণে ভাল করিয়া কাজ করিতে পারে না। আকাশযানে ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে কোন যন্ত্রকে ঠিক ব্যবহারযোগ্য বলা যায় কি না তাহা কাজেই আগে বুঝা সম্ভব ছিল না।

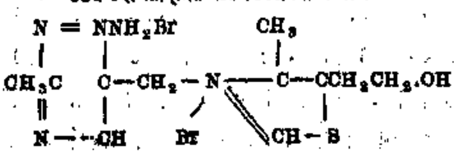
সংপ্রতি উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন অবস্থায় বেতারযন্ত্র কিরূপভাবে কাজ করে তাহা পরীক্ষাগারে নির্ণয় করিবার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। এই পরীক্ষার জন্য ১৮ ইঞ্চি পুরু দেওয়ালযুক্ত দুইটি ঘর তৈয়ারী করা হইয়াছে। দেওয়ালের ভিতর ও বাহির পুরু ইস্পাতের চাদরে মোড়া এবং ভিতরে গ্লাস-উল ও কর্ক দ্বারা শব্দ ও তাপ রোধ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পরীক্ষার জন্য কাহারও ভিতরে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন নাই, প্রকোষ্ঠগুলিতে ১ ইঞ্চি পুরু কাচের কয়েকটি জানালার সাহায্যে ভিতরের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ এবং বিভিন্ন যন্ত্রের পাঠ গ্রহণ করা যাইতে পারে।

ঘরের ভিতরের উত্তাপ ০° ফারেনহাইটের নীচে আরও ৬০° নামান যায় এবং উত্তাপ বৃদ্ধি করা যায় ১৬০° পর্য্যন্ত। ঘরের ভিতরের আর্দ্রতাও একটি যন্ত্র সাহায্যে ৫০% হইতে ১০০% পর্য্যন্ত করা যাইতে পারে। সাধারণ অবস্থায় জমিতে বাতাসের চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চি ক্ষেত্রের উপর প্রায় সাড়ে সাত সের কিন্তু এরোপ্লেন বা উড়োজাহাজ প্রায়ই ৩০,০০০ ফুট উপর দিয়া যাতায়াত করে। এই প্রকার উচ্চে বাতাসের চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে মাত্র ২ সের। প্রকোষ্ঠগুলির চাপও বায়ু নিষ্কাশন করিয়া কমান যায়। বাতাসের ঝাপটা লাগিলে কিরূপভাবে কাজ হয় দেখিবার জন্য দুইটি ফ্যান সাহায্যে ঘণ্টায় ৫০ মাইল বেগে বাতাস চালিত করা হয়। ঘরের উত্তাপ কমাইবার জন্য একটি কার্বন-ডাইঅক্সাইড তুষারের (dry ice বা carbon dioxide snow) কল আছে এবং উত্তাপ বাড়াইবার জন্য পাঁচটি 'হীটার' আছে। ইহা ছাড়া ঝাঁকুনি লাগিলে যন্ত্রের কি অবস্থা হয় তাহা দেখিবার জন্য একটি ঝাঁকুনি-কল (shaking machine) আছে। এই সকল পরীক্ষা হইতে আকাশযানে ব্যবহার করিবার উপযুক্ত বেতারযন্ত্র নির্ব্বাচনে বিশেষ সহায়তা হইতেছে।

বেরিবেরি ভিটামিন

বহু কাল হইতেই চিকিৎসকদের ধারণা আছে যে, শরীরে কোন বিশেষ ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণের অভাব ঘটিলে বেরিবেরি জন্মিয়া থাকে। বেরিবেরি প্রধানতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশের রোগ। অনেকে মনে করেন যে, কলে ছাঁটা অত্যধিক পালিশ করা চাউল খাওয়ার ফলে এই রোগ জন্মায়। তাঁহাদের মত এই যে, চালের যে অংশ কলে ছাঁটিবার সময়ে উঠিয়া যায় তাহাতে বেরিবেরির প্রতিষেধক ভিটামিন বর্ত্তমান। ভুষিতেও এই ভিটামিন বর্ত্তমান আছে এবং ভুষি হইতে ইহা নিষ্কাশন করা যাইতে পারে। সংপ্রতি জনৈক মার্কিন চিকিৎসক ডক্টর আর. আর. উইলিয়াম্‌স্ ২৬ বৎসর পরিশ্রমের ফলে কৃত্রিম উপায়ে বেরিবেরির প্রতিষেধক ভিটামিন তৈয়ারী করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি কিছুদিন হইল অ্যামেরিকান কেমিকাল সোসাইটির একটি অধিবেশনে এই বিষয় জানাইয়াছেন এবং ভিটামিনটির রাসায়নিক গঠনও * বর্ণনা করিয়াছেন। ভিটামিনটি একটি 'হেটেরোসাইক্লিক' যৌগিক (heterocyclic compound) (হেটেরোসাইক্লিক কম্পাউণ্ড কাহাকে বলে তাহা বুঝাইবার কোন চেষ্টা করা হইল না—কারণ রসায়নবিদ ছাড়া সাধারণ পাঠক তাহা বুঝিবেন না)। ডক্টর উইলিয়াম্‌স্ তাঁহার বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, বর্ত্তমানে এই ভিটামিন যখন তৈয়ারী করা যাইতেছে তখন সকল বিভিন্ন প্রকারের প্রাণী

* ডক্টর উইলিয়াম্‌সের মতে ভিটামিনটির গঠন :



উদ্ভিদ, পশু প্রভৃতির পুষ্টি কি করিয়া হয় তাহা আলোচনা করিবার অনেক সুযোগ পাওয়া যাইবে। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে সুরাবীজ, ব্যাক্টিরিয়া, ব্যাঙের ছাতা, মটর, বিলাতী বেগুন, আরশুলা, পাখী, ছাগল, ইঁদুর, খরগোস, মানুষ প্রভৃতি এই ভিটামিন ব্যবহার করিয়া থাকে। ভিটামিনটি বিশুদ্ধভাবে প্রাপ্ত হওয়ায় ইহার ক্রিয়া বিশেষ ভাবে বুঝা যাইবে এবং বহু রোগ যথা নিউরাইটীস, আর্থ-রাইটীস, বাত প্রভৃতির প্রতীকার করাও বোধ হয় সম্ভব হইবে। চিকিৎসকরা গত বিশ বৎসর বেরিবেরি রোগের কারণ এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা জানিলেও রোগ নিবারণের ব্যাপক ব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত কোথাও অবলম্বিত হয় নাই। কেবল মাত্র ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজে এই বিষয়ে কিছু চেষ্টা হইয়াছে। তিনি বলেন যে, আইন করিয়া পালিশ করা চাউল বিক্রয় বন্ধ না করিলে বেরিবেরি নির্ম্মূল করা সম্ভব হইবে না। বেরিবেরিতে যত লোক মরে তাহার অপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোক চিরকালের জন্য অকেজো হইয়া যায়; একমাত্র ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জেই এইরূপ লোকের সংখ্যা দেড় লক্ষ বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ইহাদের চিকিৎসার এই ভিটামিন বিশেষ কাজে লাগিতে পারে।

নিউমোনিয়ার প্রতিষেধক টীকা

নিউমোনিয়া রোগ প্রতীকারের জন্য পূর্ব্বেই টীকা বা সীরম ব্যবহৃত হইতেছিল। রোগ হইলে রোগ সারানর অপেক্ষা রোগ যাহাতে না জন্মাইতে পারে সে চেষ্টা নিশ্চয়ই অধিকতর বাঞ্ছনীয়। বসন্তরোগের প্রতিষেধক হিসাবে টীকার ব্যবহার বর্ত্তমানে সুপ্রচলিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিছুকাল হইতে মার্কিন সমর-বিভাগের চিকিৎসকগণ নিউমোনিয়ার প্রতিষেধক টীকা তৈয়ারী করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এই চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলপ্রসূ এখনও হয় নাই, এ বিষয়ে পরীক্ষা এখনও চলিতেছে।

মাংসের সুরুয়ার মধ্যে নিউমোনিয়া জীবাণু বৃদ্ধি পাইতে দেওয়া হয় এবং তাহা হইতে এই টীকা তৈয়ারী করা হইতেছে। ৫০ গ্যালন (১ গ্যালন প্রায় ৫ সেরের সমান) সুরুয়া হইতে মাত্র ১।৩ আউন্স সীরম পাওয়া যায়, কিন্তু এই সামান্য পরিমাণ সীরমেই ৪০০০ ব্যক্তিকে টীকা দেওয়া সম্ভব বলিয়া শুনা যাইতেছে। অবশ্য পরীক্ষামূলক স্তর অতিক্রম না করিলে এই সীরমের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা সম্ভব হইবে না।

খনিজ তৈল হইতে বিস্ফোরক

বর্ত্তমান সকল সভ্য জাতিই যুদ্ধের জন্য যথাসাধ্য আয়োজন করিতেছে, বোধ হয় সভ্যতার অঙ্গই যুদ্ধ। সকল জাতির ভয় যে অন্য জাতিগুলি অধিকতরভাবে রণসম্ভার নির্ম্মাণ করিতেছে। বর্ত্তমান কালের যুদ্ধ অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ এবং আধুনিক বিজ্ঞানের একটি প্রধান কাজ হইতেছে, নূতন নূতন উপায়ে যুদ্ধসম্ভার সৃষ্টি করা। যুদ্ধ করিতে গেলেই প্রচুর পরিমাণে বিস্ফোরক প্রয়োজন। পূর্ব্বে বিস্ফোরক বলিতে সাধারণ বারুদই বুঝা যাইত কিন্তু বর্ত্তমানে উহা অপেক্ষা বহু-গুণ মারাত্মক অনেক প্রকার নূতন বিস্ফোরক প্রস্তুত হইতেছে। অধুনা যে সকল বিস্ফোরক (high explosive) ব্যবহৃত হইতেছে তাহার মধ্যে প্রধান ট্রাই-নাইট্রো-টলুইন এবং সংক্ষেপে টি.এন.টি. (T.N.T.)। পূর্ব্বে টি.এন.টি. প্রধানতঃ কয়লা হইতে তৈয়ারী করা হইত। সংপ্রতি আমেরিকায় খনিজ তৈল হইতে টি.এন.টি. প্রস্তুত করিবার একটি উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। আমেরিকায় প্রচুর পরিমাণে খনিজ তৈল পাওয়া যায় সুতরাং যুদ্ধ বাধিলে উদ্ভাবিত নূতন পদ্ধতিটি বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিবে। পদ্ধতিটির সম্পূর্ণ অবশ্য প্রকাশ করা হয় নাই। মাত্র জানা গিয়াছে যে, ৫০০ ডিগ্রির উপরে উত্তাপ দিলে একটি ক্যাটালিস্ট (catalyst —যে দ্রব্য নিজে পরিবর্ত্তিত না হইয়া কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটায়) সাহায্যে তৈল হইতে প্রাপ্ত হেপটেনকে টলুয়িনে রূপান্তরিত করা যায়। সালফুরিক ও নাইট্রিক অ্যাসিডের ক্রিয়ায় এই টলুয়িন হইতে ট্রাই-নাইট্রো টলুয়িন প্রস্তুত করা হয়। আলোচ্য পদ্ধতিটি প্রকৃত প্রস্তাবে তৈল হইতে টলুয়িন প্রস্তুত করিবার পদ্ধতি মাত্র। আবদ্ধ পাত্রে কয়লা উত্তপ্ত করিয়া যে আলকাতরা পাওয়া যায় তাহাতে কিছু পরিমাণ টলুয়িন থাকে। পূর্ব্বে এই টলুয়িন হইতেই টি.এন.টি. প্রস্তুত করা হইত।

পাঠক-পাঠিকারা বোধ হয় জানেন যে, কয়লা হইতে বহু সহস্র বিভিন্ন প্রকার রঙ, ঔষধ, রাসায়নিক, সুগন্ধি প্রভৃতি প্রস্তুত করা যায়। তৈল হইতেও যে বহু প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত

করা যাইতে পারে সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি পূর্ব্বে বিশেষ পড়ে নাই। বর্ত্তমান কালে খনিজ তৈল সম্বন্ধে ব্যাপকতর গবেষণার ফলে দেখা যাইতেছে যে, খনিজ তৈলও বহুভাবে কাজে লাগান যাইতে পারে। পূর্ব্বে খনিজ তৈলের বিভিন্ন অংশ নানা প্রকার জ্বালানী হিসাবেই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইত। বর্ত্তমানে খনিজ তৈল হইতে যে কয়েকটি দ্রব্য প্রস্তুত করা গিয়াছে তাহাতে তৈলের শতকরা প্রায় ১০ ভাগ মাত্র কাজে লাগান যায়। খনিজ তৈল হইতে গৃহনির্ম্মাণের উপযোগী প্ল্যাস্টিক এবং খাদ্যের উপযোগী চর্ব্বিজাতীয় জিনিষের সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে। উদ্ভিজ্জ তৈল হইতেও যে প্ল্যাস্টিক তৈয়ারী করা যাইতে পারে তাহা পূর্ব্বে কেহ ভাবেন নাই।

পৃথিবীর বৃহত্তম অণুবীক্ষণ

আমেরিকার বেল টেলিফোন কোম্পানী একটি বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান। নিউইয়র্কে ইহাঁদের একটি গবেষণাগার আছে। টেলিফোন তৈয়ারী করিতে বহু প্রকারের ধাতু ও ধাতুসঙ্কর ব্যবহার করিতে হয়, বিশেষতঃ ধাতুর আভ্যন্তরীণ গঠন কিরূপ তাহা জানা বিশেষ প্রয়োজন। আভ্যন্তরীণ গঠন পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য এখানে একটি বিরাট অণুবীক্ষণ যন্ত্র আছে। যন্ত্রটি ব্যবহার করিবার জন্য সাজাইলে ১২ ফুট লম্বা ও ১০ ফুট চওড়া স্থান অধিকার করে। ইহার সাহায্যে সাত হাজার গুণ বর্দ্ধিত অবস্থায় ধাতুর কণিকাগুলির ফটোগ্রাফ তোলা যায়। সাধারণতঃ দুই তিন হাজার গুণ পরিবর্দ্ধন ক্ষমতা খুব বেশী বলিয়া মনে করা হয়, সুতরাং এই যন্ত্রটি যে কিরূপ শক্তিশালী তাহা সহজেই অনুমেয়। পৃথিবীর মধ্যে ইহাই সর্ব্ববৃহৎ অণুবীক্ষণ।



পৃথিবীর বৃহত্তম অণুবীক্ষণ।

কেঁচোর মস্তিষ্ক গজান

যদি একটি কেঁচোর মাথা কাটিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে কেঁচোটি মরিয়া যায় না, উহার একটি নূতন মাথা এবং নূতন মস্তিষ্ক গজায়। জনৈক ফরাসী বৈজ্ঞানিক, বোর্দো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, মার্সেল আভেল বহুদিন হইতে এই বিষয়ে গবেষণা করিতেছেন। অন্য অনেক প্রাণী আছে যাহাদের কোন অঙ্গ কাটিয়া দিলে তাহা আবার গজাইতে পারে। আভেল ফরাসী বিজ্ঞান পরিষদে এই বিষয়ে একটি বিবৃতি দিয়াছেন। তিনি দেখেন যে কেঁচোর যে নূতন মস্তিষ্ক গজায় তাহা স্পাইন্যাল কর্ড হইতে বৃদ্ধি পাইয়া সৃষ্ট হয় না; দেহের সাধারণ টিস্যু হইতেই এই মস্তিষ্ক জন্মায় এবং এই মস্তিষ্কই কেঁচোর সকল আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে। কি পদ্ধতিতে এই পরিবর্ত্তন সম্ভব হয় আভেল তাহার গবেষণা করিতেছেন। তিনি আশা করেন যে মনুষ্যদেহের বিভিন্ন অংশ এবং মস্তিষ্কের ক্ষতিগ্রস্ত টিস্যু মেরামত করিবার নির্দ্দেশ ইহা হইতে পাওয়া যাইবে।

সর্দ্দির চিকিৎসা

প্রকৃত প্রস্তাবে সর্দ্দির কোন চিকিৎসা নাই। প্রচুর জল পান করিলে না কি কিছু উপশম হয়। সেইজন্য অনেক চিকিৎসকেরা মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ছোট ছেলেদের সর্দ্দি হইলে তাহাদের লজেঞ্জ খাইতে দেওয়া উচিত। ইহার কারণ দুইটি, প্রথম লজেঞ্জের প্রধান উপাদান চিনির সকল খাদ্য অপেক্ষা তাপ দিবার শক্তি অধিক, সুতরাং খাদ্য হিসাবেও ইহা ভাল; দ্বিতীয় কারণ এই যে, লজেঞ্জ খাইলে শিশুরা স্বভাবতঃই তৃষ্ণার্ত্ত হইবে সুতরাং জলও বেশী করিয়া পান করিবে। অবশ্য তাঁহারা এ কথাও বলিয়াছেন যে কি কারণে শিশুদের লজেঞ্জ খাইতে দেওয়া হইতেছে তাহা শিশুদের নিকট প্রকাশ

না করাই ভাল, কারণ তাহা হইলে শিশুদের সর্দ্দি সহজে সারিতে চাহিবে না।

রাতকাণা রোগের কারণ

সর্দ্দির সহিত রাতকাণা রোগের সম্বন্ধ থাকিতে পারে তাহা মনে করা কঠিন কিন্তু দুইজন মার্কিন চিকিৎসকের মতে



মাজ্জোরে হ্রদের বিচিত্র বিদ্যুৎপাত।

উহাদের মধ্যে যোগসূত্র আছে। তাঁহাদের পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, ভিটামিন "এ"র অভাব ঘটিলে রাতকাণা রোগ জন্মায়। তাঁহারা বলেন যে, ভিটামিন 'এ'র অভাব ঘটিলে চোখের রেটিনা তাড়াতাড়ি নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না। রাত্রে যখন আলোকের ঔজ্জ্বল্য অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্ত্তিত হয়, সেই সময়ে রেটিনার নিয়ন্ত্রনের অভাবে রোগী ভাল করিয়া কিছু দেখিতে পারে না। এই চিকিৎসকদ্বয় আরও বলেন যে, যে-সকল লোকের শরীরে ভিটামিন 'এ'র অভাব আছে তাহারা সহজেই সর্দ্দিতে আক্রান্ত হয় এবং যে-সকল লোকের সর্দ্দি হইয়াছে তাহারাই অধিকতর সংখ্যায় রাতকাণা হয়। রাত্রে যাহাদের অধিকক্ষণ মোটর চালাইতে হয় তাহাদের কৃত দুর্ঘটনার আলোচনা করিয়া ইঁহারা জানিয়াছেন যে, সর্দ্দির অব্যবহিত পরেই অধিকাংশ দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

বিচিত্রদর্শন বিদ্যুৎপাত

সুইট্‌সারল্যাণ্ডের জনৈক সৌখিন ফটোগ্রাফার মাজ্জোরে হ্রদে একটি বিচিত্রদর্শন বিদ্যুৎপাতের ফটো তুলিয়াছেন। একটি প্রকাণ্ড চাদরকে পাকাইলে যেরূপ দড়ির মত দেখায় ইহা দেখিতে তাহারই অনুরূপ। এরূপ বিচিত্র বিদ্যুৎস্ফুরণ কচিৎ দেখা যায় এবং ইহার পূর্ব্বে এই জাতীয় বিদ্যুৎস্ফুরণের কোন ফটোগ্রাফ লওয়া হয় নাই। বৈজ্ঞানিকরা অনুমান করেন যে, আকাশে কোন দাহ্য বস্তু থাকায় তাহা বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের সাহায্যে জ্বলিয়া গিয়া এইরূপ বিচিত্র দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

নূতন রোগ

আমেরিকা অদ্ভুত দেশ, বহু বিচিত্র সংবাদ সেখান হইতে পাওয়া যায়। সংপ্রতি ক্লিভল্যাণ্ড হইতে জনৈক চিকিৎসক এক নূতন রোগ আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। রোগটি কি এবং রোগের উৎপত্তির কারণ কি তাহা আজ পর্য্যন্ত কেহই নির্ণয় করিতে পারেন নাই। রোগের লক্ষণগুলি এই, রোগীর অস্থিগুলি ক্রমশঃ গোলাপী বর্ণ ধারণ করিতেছে, এবং মজ্জা কঠিন টিস্যুতে রূপান্তরিত হইতেছে। রোগী যুবক, বর্ত্তমান বয়স ২৮ বৎসর মাত্র, ১১ বৎসর পূর্ব্বে এই রোগ তাহাকে আক্রমণ করে। রোগী সমস্ত গাঁটে এবং পিঠে ব্যথা অনুভব করে, কিন্তু উহা ছাড়া অন্য কোন বিশেষ কষ্ট তাহার নাই। সে কয়েকবার চিকিৎসার জন্য হাঁসপাতালে ভর্ত্তি হয়, চিকিৎসকরা রঞ্জনরশ্মি ও মাইক্রোস্কোপ সাহায্যে এবং রাসায়নিক উপায়ে নানাভাবে পরীক্ষা করিয়াও চিকিৎসার অথবা রোগনির্ণয়ের কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই।

জীবন-চিত্র

—শ্রীবিজনবালা দেবী

ভোজন-বিলাস

বিশ্বকর্ম্মা মফঃস্বলে গিয়াছিলেন। কয়েক দিন পরে ফিরিয়াছেন।

'ব্যাটারা সব কোথা গেছে? একটাকেও যে দেখছি নে? ডাকতে আবার একজন লোক রাখতে হবে না কি?'

'বাজারে গেছে।'

'সবগুলোই বাজারে গেছে?'

'না, নীহার ঘর গোছাচ্ছে।'

'বাজারে গেছে কখন? ভোরেই বোধ হয়? মজা করে ঘুরে বেড়ান হচ্ছে আর কি! কোন শাসন নেই, বেড়েই চলেছে, যা খুসী করছে। তোমাকে বলা বৃথা, এ সব দিকে তোমার কোন নজরই নেই। এই ঠাকুর, ঘুরছ যে? রান্না করবে না?'

'আজ্ঞে, ডাল চড়িয়েছি।'

'আমার স্নানের জল গরম করতে বল। দেরি না হয়, আমি সারারাত জেগেছি।'

ঠাকুর রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিল।

কমল-দের ঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া—'এরা সব কোথায়?'

'ঘরেই ছিল—'

'হুঁ—ছিল, খুব গিন্নী! খুব নজর চারদিকে—বাবুগিরি আর বেড়ান, এ ভিন্ন আর কাজ কি? আমার রিষ্ট-ওয়াচটার ব্যাণ্ড ছিঁড়ে গেছে, ক'দিন থেকে বলছি আনতে, তা খেয়ালই নেই। কোথা গেছে ডাকাও।'

বিরক্ত-চিত্তে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বিশ্বকর্ম্মা ঘরে আসিয়া চেয়ারে বসিলেন। বলিলেন, 'চিঠিপত্র আছে?'

'না।'

'কেন?'

'কেন তা আমি কি জানি। পিয়নকে জিজ্ঞাসা কর গে। তোমার হয়েছে কি? চার পাঁচদিন পরে এলে, কুশল-প্রশ্ন করবে, ভাল মন্দ কথা বলবে, তা নয়, একেবারে অগ্নি-মূর্ত্তি ধরেই বাড়ী ঢুকেছ! কেন অপরাধ কি? তোমার বাবা করে থাকতে নেই, একা থাকতে হয়।'

বিশ্বকর্ম্মা চশমা খুলিয়া টেবিলে রাখিলেন। শান্ত সহজ স্বরে বলিলেন, 'জল গরম হয়েছে?'

'হচ্ছে।'

'আচ্ছা, তাড়াতাড়ি নেই, আমি নাপিতটাকে ডাকাই। চুলটা একটু কাটতে হবে।'

আয়নায় মুখ দেখিতে দেখিতে বলিলেন, 'আচ্ছা আমার শরীরটা ভাল হয়েছে, না খারাপ হয়েছে?'

প্রতিবার মফঃস্বল হইতে, আসিয়া বিশ্বকর্ম্মা এই প্রশ্ন করেন, সুরুচিও উত্তর দেন। আজ কিছুই বলিলেন না।

'কৈ গো, বল না?'

'বলব আবার কি? আমি অত বুঝি নে।'

আয়না রাখিয়া ফিরিয়া চাহিয়া বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'মেজাজ বড় কড়া দেখছি!'

'বেশ!'

'আচ্ছা হোক আপত্তি নেই। ও অভ্যাস আছে, তবে যদি চা দাও একটু, রাত জাগতে হয়েছে।'

সুরুচি চা তৈরি করিয়া আনিয়া দিলেন।

'শোন, শোন, বস এখানে।'

'না বসতে চাই নে।'

'এত রাগ?'

'কেন নয়? আমি বাড়ীর গিন্নী!—যখন তখন সবার সামনে আমার ওপর চোট্ করবে, আর আমি খুব খুসী থাকব, নয়?'

বিশ্বকর্ম্মা চোখ পিট্ পিট্ করিতে করিতে বলিলেন, 'গিন্নী? ওঃ ভারি গিন্নী!'

'গিন্নী হতে যাব কেন? বাঁদী বল, বাঁদী! ক্রীতদাসী!'

সুরুচি চলিয়া গেলেন।

স্নানাদি হইতে এগারোটা হইল।

সকাল হইতে সকলে তটস্থ। হাঁক শুনিবামাত্র কাঁপিতে কাঁপিতে ঠাকুর ভাত আনিল।

"ইঃ—ভাতে কি ছুঁচোর গন্ধ! রাম—রাম!'

সামনের ভাত সরাইয়া রাখিয়া আবার নূতন করিয়া মাখিলেন।

একবার মুখে দিয়াই—"উঃ, তেমনি গন্ধ!' তারপর ক্রুদ্ধ হইয়া—'এ কখনও খাওয়া যায়? এ কি খেতে দেওয়া না শাস্তি দেওয়া, দণ্ড দেওয়া! চাল কোথা ছিল?'

ছুঁচা-ভীতি বিশ্বকর্ম্মার অতি প্রবল এবং ছুঁচা সম্বন্ধে ঘ্রাণেন্দ্রিয় খুব তীক্ষ্ণ। প্রায় প্রতি জিনিষেই তিনি যথার্থ অথবা কাল্পনিক ছুঁচার গন্ধ পান।

সুরুচি বলিলেন, 'এই দেখ, বড় টীনের কৌটাটি, একটি পিঁপড়ে খেতে পারে না, ওতে চাল রেখেছি।

ভাঁড়ার-ঘরের খোলা দরজা দিয়া ভিতরের জিনিষপত্র দেখা যাইতেছে। চাহিয়া দেখিয়া বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'তবে এমন গন্ধ হল কি করে?'

'দোকানের হতে পারে।'

'নাঃ, এ খাওয়া যাবে না। তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? দেখ—দেখ—'

'দেখব আর কি, গন্ধ না হলে কি তুমি বলছ?'

'না, তুমি দেখ'—বিশ্বকর্ম্মা এক মুঠা অন্ন তুলিয়া সুরুচির নাকের কাছে ধরিলেন।

সুরুচি হাসিয়া বলিলেন, 'কৈ ছুঁচোর গন্ধ? কাটারিভোগ আতপের সুগন্ধ!'

'গন্ধ পেলে না বুঝি? তোমার নাকই নেই।'

'তা হবে।'

'বল দেখি কি যন্ত্রণা, খেতে বসে এই রকম দগ্ধ হওয়া?'

'থাক্, ও খেয়ো না; বড় হাঁড়ির ভাত হয়েছে, এনে দিক। সেও বেশ ভাল চাল'।

'না থাক, এতেই হবে।'

'অপ্রবৃত্তি নিয়ে খাওয়া উচিত নয়। দাও ঠাকুর!'

অন্ন পরিবর্ত্তিত হইল। কিছুক্ষণ পরে বিশ্বকর্ম্মা আবিষ্কার করিলেন, 'ঝোল এমন তিতো কেন?'

'তিতো?'

'হ্যাঁ, যেন নিম দেওয়া!'

কমলকে প্রশ্ন করিলেন, 'তিতো নয়?'

কমল বিপদে পড়িল। মাথা ও স্বর যথাসম্ভব নীচু করিয়া বলিল, 'আমার কাছে লাগছে না।'

'লাগছে না? তোদের মুখে কোন স্বাদ নেই। এমন তিতো যে মুখে দেওয়া যায় না, 'আর তুই বলছিস্, না?'

সুরুচি বলিলেন, 'ওদের যেমন লাগবে তেমনি তো বলবে?'

'রাখ ওদের কথা! এক গাদা মশলা দিয়েছে, তাই এমন তিক্তস্বাদ হয়েছে। ঠাকুর ব্যাটা ভাবে বেশী বেশী মশলা দিলেই রান্না ভাল হয়।'

'তোমার পেটের অসুখটা হবার পর থেকে মোটেও রান্নায় মশলা দেওয়া হয় না। শুধু আদা হলুদ ছাড়া। দেখছ না কেমন পাতলা হলুদ রং?'

'তবে কেন এমন হল? যন্ত্রণার একশেষ আর কি!'

'আচ্ছা, থাক গে, আর সব দিয়ে খাও। আমাদের ঝোল এনে দিচ্ছে।'

তেঁতুলপাতার ঝোল পাতে ঢালিয়া বলিলেন, 'দেখেছ, দেখ, দেখ, কাণ্ড দেখ! অম্বলে চুল রয়েছে। সাধে কি পেটের অসুখ করে? এই সব ছাই-মাটী খেয়েই আমরা মরি!'

সুরুচি হাত দিয়া ফেলিতে গিয়া বলিলেন, এ বুঝি চুল? তেঁতুলপাতার ক'চি ডগার আঁশ! এই দেখ!'

'প্রায়ই থাকে, আজ হয় তো নেই। উঃ, এটায়ও ছুঁচার গন্ধ!'

'রান্নার একটু আগে গাছে উঠে ডাল ভেঙ্গে এনেছে, আর চিনি থাকে কৌটায়। এতে গন্ধ হওয়া অসম্ভব।'

বিশ্বকর্ম্মা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া এদিক্ ওদিক্ চাহিতে লাগিলেন। একটা কাঁচের প্লেটে কতকগুলি কাগজী লেবু রহিয়াছে, দেখিয়া বলিলেন, 'ঐ যে লেবু রয়েছে অমনি খোলা পড়ে? রাত্রে ছুঁচো মজা করে ঘেঁটে রেখে গেছে, ঐ লেবুই তো দিয়েছ? সাধে কি গন্ধ হয়েছে?'

'লেবু ধুয়ে কেটেছি। কি যে বাই হয়েছে তোমার, কেবল তুমিই গন্ধ পাও? যা যত্ন করে আমি জিনিষ রাখি। ও সব তোমার মনের ধাঁধা। অমন খুঁৎ খুঁৎ করে বিরক্ত হয়ে খাও বলেই তোমার পেটের গণ্ডগোল বারমাসই লেগে থাকে।'

ইহার পর আর গোলযোগ হইল না। দুধের বাটিটি টানিয়া কেবল বলিলেন, 'চিনিটা দেখে দাও।'

অচল সিকি

কে একজন উপরওয়ালা সাহেব আসিবেন, সুতরাং পোষাক চাই ভাল রকম। ঘরে প্রদর্শনী বসিল জামা-কাপড়ের। গোটা তিরিশেক কোট হইতে সীহার ভাল ভালগুলি বাছিতে লাগিল। বিশ্বকর্ম্মা সার্ট গায়ে দিতেছেন।

সার্ট পরিয়া দেখেন একটা হাতে বোতাম নাই—'এ কি যন্ত্রণা? এ কি মানুষে সইতে পারে? জীবনটা বিষময় হয়ে গেল একেবারে, একটা জিনিষও কি ঠিক মত পেতে

নেই ?' বলিতে বলিতে গলা গলাইয়া সার্ট না খুলিয়া বুকের মাঝামাঝি এক টানে ছিঁড়িয়া খুলিয়া ফেলিয়া দিলেন।

সুরুচি অন্য একটা সার্টে বোতাম দেখিয়া দিলেন, বলিলেন, 'এটায় তো সেদিন বোতাম লাগান হয়েছে।'

নীহার বলিল, 'এক্ষে ধোবা-বাড়ী গেলে কি বোতাম টেঁকে ? একদিনের বেশী কোন জামা পরেন না, যেমন ধুয়ে আসে অমনি আবার ধুতে যায়। সেদিন বাবুর কতকগুলো কোট-প্যাণ্ট ধোবা হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, পথে বাবুরা দেখে বললে, একি দিতে যাচ্ছিস ? ধোবা বললে, না নিয়ে যাচ্ছি। বাবুরা বললে, তবে আমাদের দিয়ে যা, পরে একটু ময়লা করে দিই, পরে ধুয়ে দিস্। এ তো যেমন তেমনি, এ ধোবে কি ?'

সুরুচি বলিলেন, 'আর বলে কি হবে ?'

ব্যাপারটা সহজেই মিটিল। বিশ্বকর্ম্মা অফিসে চলিয়া গেলেন।

দুই এক জায়গায় সাহেবের সঙ্গে ঘুরিতে হইবে বলিয়া আজ টিফিন যায় নাই। সাড়ে চারিটার সময় বিশ্বকর্ম্মা ফিরিলেন।

পথ হইতে 'নীহার—নীহার !'

নীহার তো প্রস্তুত। বিশ্বকর্ম্মার অভ্যাস, সব সময় কারণে অকারণে ডাকা। বিছানায় শুইয়া আছেন, হঠাৎ ডাকিয়া উঠিলেন, নীহার,—

সুরুচি বলেন, 'বলি, নীহার এখন এসে কি করবে ?' বলিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দেন।

যা হোক, আফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া একেবারে ইজিচেয়ারে শয়ন।

'খাবার কি আছে ?'

'সবই আছে। লুচি—'

'লুচি ? অ্যাঃ—,'

'সে কি ? লুচি ভাল না ?'

'ওতে কিছু স্বাদ আছে না কি ?'

'সেই বোর্ডিং-এ লুচি, আলুর দম আর আলুভাজা দৈনিক খেয়ে একেবারে অরুচি জন্মে গেছে।'

'লুচিতে অরুচি আজ পর্য্যন্ত কেউ বলে নি। যাক্ সে ডিম ভাজা, চা-রুটী—'

'না ডিম নয়—'

'বাঙ্গালী ফলার দিই ? ক্ষীর, মুড়কী, কলা—'

'নাঃ এখন কি ঐ সব খায় ? খাদ্যের সময় অসময় নেই কি ?'

'কালকের করমাসী লেডিক্যানি, আছে আর,—

'আরে ছ্যাঃ।'

সামনের ছোট টেবিলটার উপর সুরুচি দুটি প্লেট আনিয়া রাখিলেন। একটায় মুড়ি-চিড়ে ভাজা, নারিকেল, কাঁটাল-বীচি-ভাজা। অন্যটায় লবণ, শশা, লঙ্কা, পেঁয়াজ-কুচি।

বিশ্বকর্ম্মা উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, 'এ সব আছে, তবে আগে বল নি কেন ?'

'একটু মজা দেখলাম। সেই যে ছেলেবেলার মতন কাঁটালবীচি-নারকেলে মন। আর সব মুখেও দেবে না এমন কারো দেখি নি। এবার সাহেবের পছন্দ হয়েছে ?'

'বল দেখি আমি কি ভালবাসি ?

'বলতে হবে কেন, দেখতেই পাচ্ছি।'

'বলই না শুনি।'

'মাছ-মাংস আর এই সব।'

'ঠিক বলেছ।'

জলযোগান্তে স্নান সারিয়া বিশ্বকর্ম্মা সিনেমায় যাইবেন, তৈরী হইলেন। সুরুচি আগের দিন গিয়াছিলেন। বলিলেন, 'দুইবার কি দেখব ?'

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, বাড়ীতে বসেই থাকব, যাই ঘুরে আসি।

ছড়ি-হাতে বাহির হইবার মুখে হঠাৎ চির-অন্যমনস্ক বিশ্বকর্ম্মার দৃষ্টি খুলিল, বলিলেন, 'কিছু পয়সা দাও।'

'পয়সায় কি হবে ?

'পান-টান কিনে খাই যদি, পকেটে সর্ব্বদা কিছু থাকা ভাল। কখন দরকারও হতে পারে। বিনা সম্বলে পথ চলিও না।'

শৈশবে পঠিত দ্বিতীয় ভাগের উপদেশ-বাক্যাবলী সবই প্রায় এখনও বিশ্বকর্ম্মার কণ্ঠস্থ আছে।

'কথা শোন; উনি আবার পান কিনে খাবেন। ডিবের পান যার ডিবেতে শুকোয়।' সুরুচি একটি সিকি দিলেন।

'চলবে ? হ্যাঁ গা চলবে ত ?' বিশ্বকর্ম্মা সিকিটিকে টেবিলের উপর বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, 'সেদিন টাকাটা দিয়েছিলে, ষ্টেশনে গিয়ে দেখি অচল। শেষে নোট ভাজিয়ে টিকিট করি। কই, বাজেটা সে রকম ?'

'তোমায় কি বলব। নিকেলের সিকি আবার বাজিয়ে দেখতে হয় না কি ? ও কি বাজে ?'

'বাজে না ? না ? তা কে জানে।' সিকিটা পকেটে ফেলিয়া বিশ্বকর্ম্মা প্রস্থান করিলেন।

মুর্শিদাবাদ-বৃত্তান্ত

—শ্রীহৃষীকেশ গোস্বামী

সীতারাম

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পাঠান কর্তৃক বঙ্গদেশ বিজিত হয়, কিন্তু সমগ্র বঙ্গদেশ অধিকার করিতে পাঠানগণের আরও অনেক দিন লাগিয়াছিল। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ গণেশ বাঙ্গালার রাজদণ্ড পাঠানের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলেন। ইহার পরে ১৫৭৫ অব্দে বাঙ্গালা মোগল ভূপতিবৃন্দের শাসনে আসে। সে আমলেও বাঙ্গালা দুইবার স্বাধীনতার জন্য মাথা তুলিয়াছিল, একবার প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি ভৌমিকগণের নেতৃত্বে, আর একবার রাজা সীতারাম রায়ের অধিনায়কত্বে।

তখন মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে মুর্শিদ সমাসীন। জমীদারগণ তাঁহার ভয়ে সন্ত্রস্ত। সেই সময় ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করিয়া সীতারাম স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারাম উপন্যাসে, অন্ধ লেখক যদুনাথের সীতারাম গ্রন্থে এবং শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মুর্শিদাবাদ-কথায় এই কাহিনী কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিবৃত হইয়াছে। ভূষণা পরগণার সীতারাম মহম্মদপুরের স্বাধীন ভূপতি সীতারাম, এই মুর্শিদাবাদ জেলায় মাতুলালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের বাসও এই মুর্শিদাবাদ জিলায় ছিল। ইঁহারা উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ। সীতারাম বাল্যে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত এবং আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষা করিয়া সৈন্যবিভাগে প্রবেশ করতঃ সামরিক বিদ্যা আয়ত্ত করেন। অনন্তর বিদ্রোহী করিম খাঁকে পরাজিত ও নিহত করিয়া নবাব শায়েস্তা খাঁর অনুগ্রহে ভূষণা পরগণা জায়গীর-স্বরূপ লাভ করেন।

ইহার পর তিনি কয়েকটি দস্যুদলকে উন্মূলিত করিয়া মগ ও ফিরিঙ্গীদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া দেশে শান্তি ফিরাইয়া আনেন। অনন্তর তিনি রামরূপ ঘোষ, বক্তার খাঁ, রূপচাঁদ প্রভৃতি বীরপুরুষগণের সহায়তায় স্বীয় বিশাল জমীদারী-পরিচালনে অগ্রসর হন। কায়স্থ-সন্তান মুনিরাম নবাব সরকারে ইঁহার উকিল-পদে নিযুক্ত ছিলেন। মুনিরাম কিন্তু সৎ-প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তাঁহারই প্ররোচনায় নবাব মুর্শিদকুলী সীতারামের ঐশ্বর্য্যে ঈর্ষাম্বিত হন এবং সীতারামের বিরুদ্ধে ভূষণার ফৌজদার আবুতোরাপকে প্রেরণ করেন। স্বাধীনতাকামী সীতারামের সহিত তুমুল যুদ্ধে আবুতোরাপ পরাজিত ও নিহত হন এবং রামরূপ তাঁহার ছিন্নমুণ্ড সীতারামকে উপহার প্রদান করেন। ইহার পর নবাব-প্রেরিত সেনাপতি বক্স আলীও সীতারামের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করেন।

পুনঃ পুনঃ পরাজয়ে ক্রুদ্ধ নবাব বর্ত্তমান দিঘাপাতিয়া রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা দয়ারামকে সসৈন্যে সীতারামের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। অপর সেনাপতি সিংহরাম সহ দয়ারাম সীতারামের রাজধানী মহম্মদপুর আক্রমণ করিলেন। ভীষণ যুদ্ধের পর সীতারাম পরাজিত ও বন্দী হইয়া মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হন। মুর্শিদাবাদেই তাঁহার প্রাণ-বিয়োগ হয়।

সীতারাম অনেক পুষ্করিণী ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানী মহম্মদপুরের চারি পাঁচ ক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত মথুরাপুরের দেউল তাঁহারই নির্ম্মিত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। যশোহর ও ফরিদপুর জেলার সীমান্তে মহম্মদপুর অবস্থিত। সেখানে জঙ্গলের মধ্যে এখনও অনেক অট্টালিকার নিদর্শন পাওয়া যায়।

উদয়নারায়ণ

রাজা সীতারামের ন্যায় আর একজন বাঙ্গালী জমীদার ঘটনাচক্রে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইঁহার নাম উদয়নারায়ণ। ইনি রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং মুর্শিদাবাদ প্রদেশই ইঁহার জন্মভূমি। বীরভূম, সাঁওতাল-পরগণা ও মুর্শিদাবাদের কতকাংশ লইয়া তাঁহার জমীদারী গঠিত হইয়াছিল। স্বীয় মিত্র (ally) গোলাম মহম্মদের সাহায্যে তিনি ক্রমে ক্রমে শক্তি সঞ্চয় করিয়া প্রতাপশালী হইয়া উঠেন। তাঁহার ক্ষমতায় ঈর্ষাম্বিত হইয়া নবাব তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলে তিনি মিত্র গোলাম মহম্মদ এবং পুত্র সাহেবরাম সহ নবাবী ফৌজের

বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। বর্ত্তমান সাঁওতাল পরগণার অন্তঃপাতী বীরকীটী নামক স্থানে উভয় পক্ষের যুদ্ধ হয়।

যুদ্ধে গোলাম মহম্মদ নিহত হন এবং উদয়নারায়ণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। পরে ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদে আনীত হন। মুর্শিদাবাদের কারাগারেই তাঁহার প্রাণাত্যয় ঘটে।

কথিত আছে, নাটোর রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ রামজীবন রায়ের ভ্রাতা রঘুনন্দন রায়ই এই যুদ্ধে নবাবী ফৌজ পরিচালিত করিয়াছিলেন।

উদয়নারায়ণ ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তিসমূহ মুর্শিদাবাদের বড়নগরে (আজিমগঞ্জের সন্নিহিত, যেখানে মহারাণী ভবানী প্রতিষ্ঠিত বহু বিগ্রহ বিরাজিত) এবং ঐ জেলার কণকপুর (ই. আই. আর. লুপ লাইন দিয়া যাইতে হয়, এখানে পাষাণময়ী কালিকামূর্ত্তি শ্রীশ্রীঅপরাজিতা দেবী বিরাজিতা) প্রভৃতি স্থানে দৃষ্টিগোচর হয়।

মহারাজ নন্দকুমার ও তাঁহার বংশধরগণ

মহারাজ নন্দকুমারের পূর্ব্বপুরুষগণও মুর্শিদাবাদ জেলারই অধিবাসী ছিলেন। পরে তাঁহারা বীরভূম ভদ্রপুরে বসতি স্থাপন করেন। ঐ স্থানেই নন্দকুমারের জন্ম হয়। তিনি বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়া নবাব সরকারের কার্য্য গ্রহণ করেন। সামরিক বিদ্যাও তিনি শিক্ষা করিয়াছিলেন।

নন্দকুমারের জীবন বৈচিত্র্যময়। পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বে তিনি হুগলীর ফৌজদার ছিলেন। যুদ্ধান্তে তিনি মুর্শিদাবাদে উচ্চপদে নিয়োজিত হন।

নবাব মীরকাশেমের পতনের পর মীরজাফর পুনরায় নবাবী পাইলে নন্দকুমার তাঁহার প্রধান মন্ত্রী হন। কিন্তু, নবাবের মৃত্যুর পর পদচ্যুত হইয়া কলিকাতায় বাস করিতে থাকেন। এই সময়ে দেশে নানা অনাচার চলিতেছিল। এই সমস্ত অনাচারের বিরুদ্ধে তিনি দণ্ডায়মান হন এবং ইহার ফলে তদানীন্তন বড়লাট ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য ঘটে। নন্দকুমারের বিরুদ্ধে এক জালীয়াতির অভিযোগ সুপ্রীমকোর্টে আনা হয় এবং তিনি দোষী সাব্যস্ত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৭৭৫ অব্দের ৫ই আগষ্ট তাঁহার ফাঁসী হয়। তাঁহার বিচারের পূর্ণ বিবরণ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে "হিকি"র (Hickey) বেঙ্গল গেজেটে প্রকাশিত হয়। ইংরাজী ১৯০৩ অব্দে ব্যারিষ্টার পি. মিত্র মহোদয় ঐ বিবরণ পুনর্মুদ্রিত করেন।

নন্দকুমারের নাম বাংলার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বংশধর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। এক লক্ষ ব্রাহ্মণকে তিনি স্বগৃহে আহ্বান করিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন। শ্রীপাদ ঠাকুর মহাশয় নন্দকুমারকে সপারিষদ চৈতন্যদেবের যে তৈল-চিত্র প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার দৌহিত্র-বংশীয় কুঞ্জঘাটার রাজকুমার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ রায় মহোদয়ের গৃহে আছে। ঐ রাজবাটীতে নন্দকুমার-প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি বিগ্রহ এখনও অর্চ্চিত হন। নন্দকুমারের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীসিংহবাহিনী দেবীও তথায় বিরাজিতা আছেন

মহারাজ নন্দকুমারের বিচার-কাহিনী লইয়া মহাত্মা বিভারিজ সাহেব ইংরাজী ভাষায় Trial of Nanda Kumar নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত সত্যচরণ শাস্ত্রী ও চণ্ডীচরণ সেন মহাশয়দ্বয় মহারাজের জীবন-বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়াছেন এবং নিখিলনাথ রায় মহাশয়ও স্বরচিত মুর্শিদাবাদ-কাহিনী গ্রন্থে মহারাজের জীবন-কথা আলোচনা করিয়াছেন।

মহারাজের পুত্র রাজা গুরুদাস কিছুকাল মুর্শিদাবাদে নবাব নজম উদ্দৌলার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। রাজার তিনটি ভগিনী ছিলেন, তন্মধ্যে সম্মানী নামক ভগিনীর সহিত জগচ্চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। জগচ্চন্দ্র স্বীয় শ্বশুরের অনিষ্টাচরণে বিন্দুমাত্র ত্রুটী করেন নাই। জগচ্চন্দ্রের পুত্র রাজা মহানন্দ ও তৎপুত্র রাজা বিজয়কৃষ্ণ মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। নবাব সরকারের সহিত ইহাঁদের যথেষ্ট সৌহার্দ্দ্য ছিল। ইহাঁরা উভয়েই পরম বৈষ্ণব ও দানশীল ছিলেন। বিজয়কৃষ্ণের পৌত্র কুমার দুর্গানাথ বিষয়াভিজ্ঞ ও সঙ্গীতোৎসাহী ছিলেন। মাত্র ৩৮ বৎসর বয়সেই ইহাঁর মৃত্যু হয়। ইহাঁর পুত্র কুমার দেবেন্দ্রনাথই বর্ত্তমান কুঞ্জঘাটা রাজবাটীর অধিকারী।

কুঞ্জঘাটা রাজবাটীর রথোৎসব মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে বিখ্যাত। রাজবাটীর যে গৃহে মহারাজ নন্দকুমার অবস্থান করিতেন,

তাহার ভিত্তি-গাত্রে ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড কার্জ্জন বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রস্তরফলক গ্রথিত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে,—"Here resided Maharaja Nandakumar, 1775".

জগৎশেঠ

কবি নবীনচন্দ্র তাঁহার পলাশীর যুদ্ধ কাব্যে মহাতাপ চাঁদ জগৎশেঠের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—

"সম্ভব হইবে লুপ্ত শারদ-চন্দ্রিমা
অসম্ভব হবে লুপ্ত শেঠের গরিমা।"

জগৎ শেঠের এই উক্তি আজ মিথ্যায় পরিণত। শেঠ-বংশধরেরা স্বাধীন ভাবে জীবিকানির্ব্বাহ করেন, এই পর্য্যন্ত; কিন্তু তাঁহাদের সে "গরিমা" সত্যসত্যই লুপ্ত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদের ছেনরী কোর্ড জগৎশেঠ, মহিমাপুরের মহিমময় জগৎশেঠ এক দিন সত্যই প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। ইনি নবাবের কোষাধ্যক্ষের কার্য্য করিতেন। টাকশাল ইহাঁদের বাড়ীতেই ছিল। সত্যই "আপনি নবাব যিনি অন্ত কোন্ ছার, ধন-পাশে সদা বাঁধা দুয়ারে যাহার," মহারাষ্ট্রীয়েরা দুই কোটি টাকার উপর লুঠ করিয়াও যাঁহাকে দরিদ্র করিতে পারে নাই—সত্যই "সে জগৎশেঠ আজ অবনত-মুখ।"

যোধপুর রাজ্যের অধিবাসী দরিদ্র হীরানন্দ ব্যবসায় ব্যপদেশে স্বীয় পুত্র মাণিকচাঁদকে ঢাকায় প্রেরণ করেন। তখন ঢাকাই বাংলার রাজধানী ছিল। রাজধানী মুর্শিদাবাদে আসিলে মাণিকচাঁদও রাজধানীর সান্নিধ্যে অবস্থিত মহিমাপুরে বসতি স্থাপন করেন। তিনি মুর্শিদের প্রিয়পাত্র ছিলেন ও টাকশালের ভার তাঁরই উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি দিল্লী দরবার হইতে শেঠ উপাধি পান। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভাগিনের ও উত্তরাধিকারী ফতেচাঁদ তাঁহার গদি দখল করেন। সম্রাট্ মহম্মদশাহ কর্ত্তৃক ফতেচাঁদ জগৎশেঠ উপাধি পান। তিনি নবাব সুজাউদ্দীনের মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য ছিলেন। নবাব সরফরাজের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য হইলে তাঁহারই গৃহে বঙ্গ-প্রধানগণ সমবেত হইয়া বিহারের শাসনকর্ত্তা আলিবর্দ্দীকে আহ্বান করেন। সরফরাজের পতনের পর আলিবর্দ্দী মুর্শিদাবাদের মসনদ অধিকার করেন। তাঁহার আমলে বর্গীর হাঙ্গামা হয় এবং লুণ্ঠনকারী ভাস্কর পণ্ডিতের দল ফতেচাঁদের প্রাসাদ আক্রমণ করিয়া দুই কোটি টাকার উপর আত্মসাৎ করে (১৭৪২)। ইহার দুই বৎসর পরে ফতেচাঁদ দেহত্যাগ করেন।

ফতেচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁহার পৌত্রদ্বয়—"মহারাজ" উপাধিতে ভূষিত "স্বরূপচাঁদ" এবং "জগৎশেঠ" পদবী-লাঞ্ছিত মহাতাপচাঁদ তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। এই মহাতাপচাঁদ জগৎশেঠই নবাব সিরাজদ্দৌল্লা কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করেন। ইহাঁরই বাড়ীতে মীরজাফর, ইয়ার লতিফ খাঁ, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, দুর্লভরাম, মহেন্দ্রনারায়ণ রায় দুর্লভ প্রভৃতি মিলিত হইয়া নবাবকে পদচ্যুত করিবার মন্ত্রণা করেন।

পলাশীর যুদ্ধের পর কলিকাতায় টাকশাল স্থাপিত হইলে জগৎশেঠের অনেক ক্ষতি হয়।

পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফর নবাব হইলে টাকশাল কলিকাতায় স্থাপিত হয়, ইহাতে জগৎশেঠের অনেক ক্ষতি হয়। মীরজাফরের পতনের পর মীরকাশিম নবাব হন এবং অচিরেই ইংরাজদিগের সহিত বিরোধের সূত্রপাত হয়। এই বিবাদে জগৎশেঠ ইংরেজ পক্ষে ছিলেন এই অপরাধে মীরকাশিম জগৎশেঠ ও তাঁহার ভ্রাতাকে মুঙ্গেরে গঙ্গার জলে ডুবাইয়া মারেন।

ইহাঁদের "হত্যা"র পর ইহাঁদের পুত্রেরা দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে পৈতৃক পদবী লাভ করেন। মহাতাপ-পুত্র খুসালচাঁদ জগৎশেঠ এবং স্বরূপনন্দন উদয়চাঁদ মহারাজ উপাধি পান। কিন্তু, এই সময় হইতেই তাঁহাদের আর্থিক অবনতি আরম্ভ হয়। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে ইহাঁদের যথেষ্ট ক্ষতি হয়।

খুসালচাঁদ কোম্পানীর কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। কিন্তু, রাজস্ব-বিভাগ কলিকাতায় উঠিয়া গেলে ইনি কর্ম্মত্যাগ করেন। ইহাঁর মৃত্যুর পর এই বংশের অবস্থা আরও মন্দ হয়।

খুসালচাঁদই বিহার প্রদেশে পরেশনাথ পাহাড়ের জৈন-মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

খুসালচাঁদের পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও উত্তরাধিকারী হরকচাঁদ কোম্পানীর নিকট হইতে জগৎশেঠ উপাধি লাভ করেন। হরকচাঁদ একজন বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর অলৌকিক শক্তি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত হন এবং মহিমাপুরে এক শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাঁর মৃত্যুর পর ইহাঁর বংশধরেরাও জগৎশেঠ নামে পরিচিত হন। কিন্তু, ইহাঁদের

যে ঐশ্বর্য্য হরকচাঁদের পর হইতেই অন্তর্হিত হইয়াছে। এখনও ইহাঁরা মহিমাপুরেই বাস করেন।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ

নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার সভাসদ্ "রসসাগর" পদবীধারী কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী মহাশয়কে "কাছে আওয়ান" সমস্যাটী পূরণ করিতে দেন। তদুত্তরে রসসাগর বলেন—

> "কৃষ্ণচন্দ্র, নবকৃষ্ণ, গোবিন্দ দেওয়ান
> কার সাধ্য এ তিনের কাছে আওয়ান।"

বাস্তবিকই খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই তিন ব্যক্তিই বঙ্গদেশে প্রধান ছিলেন। ইহার মধ্যে গোবিন্দ দেওয়ান বা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মহাশয় মুর্শিদাবাদের অধিবাসী। ১৭৩৯ অব্দে কান্দীর জমিদার-বংশে ইহার জন্ম হয়। ওয়ারেণ হেষ্টিংস ইহাঁকে কোম্পানির দেওয়ান পদ প্রদান করেন। দেওয়ান হইয়া গঙ্গাগোবিন্দ বহু প্রকারে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া হেষ্টিংসের অর্থলালসা চরিতার্থ করিতেন। নিজেও বহু লক্ষ টাকার সম্পত্তি অধিকার করিয়াছিলেন। সে সময় জমীদারগণ ইহাঁকে অত্যন্ত ভয় করিতেন। ১৭৮৪ অব্দে হেষ্টিংস কার্য্য ত্যাগ করিলে ইহাঁরও প্রভুত্বের অবসান হয়। নিখিলনাথ রায় মহাশয় স্বরচিত মুর্শিদাবাদ-কাহিনীতে ইহাঁর বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সকলেই জানেন, সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী বার্ক সাহেব (Edmund Burke) তাঁহার Speeches on the Impeachment of Warren Hastings-এ ইহাঁর কার্য্যের কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন।

অর্থ উপায়ের জন্য ইনি যৌবনে অনেক অনাচারেরই অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ জীবনে ইনি সৎকার্য্যেও বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। স্বীয় জননীর শ্রাদ্ধে ইনি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন বলিয়া প্রবাদ আছে। তিনি শিক্ষা-বিস্তারের জন্য অনেক অধ্যাপককে অর্থ সাহায্য করিতেন। দানও যথেষ্ট করিয়া গিয়াছেন। বার্দ্ধক্যে বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন-পূর্ব্বক ইনি বর্ত্তমান নবদ্বীপের সান্নিধ্যে রামচন্দ্রপুরে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া দেব-সেবা প্রকটিত করেন। ঐ মন্দির এক্ষণে বালুকাস্তূপে মগ্ন। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস-প্রমুখ মহাশয়েরা উহার আবিষ্কারের নিমিত্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। ১৭৯৯ অব্দে ইনি পরলোকপ্রাপ্ত হন। ইহাঁর পূর্ব্বজীবনের তুলনা করিলে স্বতঃই গিরিশচন্দ্রের একটী পঙ্‌ক্তি মনে পড়ে, "জীবন কলঙ্ক তার গৌরব মরণে।"

লালাবাবু

ইহাঁরই পৌত্র বৈষ্ণব-জগতে সুপরিচিত লালাবাবু। ইহাঁর প্রকৃত নাম কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ ও পত্নীর নাম রাণী কাত্যায়নী। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কান্দী রাজবংশে মহাত্মা কৃষ্ণচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যে ইনি সংস্কৃত ও পারস্য ভাষা শিক্ষা করিয়া উহাতে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই ইনি বর্দ্ধমানের কালেক্টারী অফিসে সেরেস্তাদারের পদ প্রাপ্ত হন এবং তথায় ও উড়িষ্যা প্রদেশে কিছু ভূ-সম্পত্তিও ক্রয় করেন। এই সময় ইহাঁর পিতার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিলে ইনি কার্য্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গৃহে আগমন করেন এবং স্বীয় সম্পত্তি পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকেন।

এই সময় একদিন এক রজকবালার "বাবা বেলা যায়, বাসনায় আগুন দেও", এই উক্তি শুনিয়া ইহাঁর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় এবং ইনি অতুল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবন-ধাম গমন করেন।

শ্রীবৃন্দাবনে ইনি যমুনা-পুলিনে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের একটি সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ মন্দিরে দেবার্চ্চনা ও ভোগরাগাদি আজিও যথেষ্ট যত্নের সহিত সম্পাদিত হইয়া থাকে। পশ্চিমাঞ্চলেও ইনি অনেক ভূ-সম্পত্তি ক্রয় করেন এবং এই সূত্রে বিখ্যাত শেঠবাবুদের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য হয়। পরে তিনি মাধুকরী-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া উহাঁদের বাড়ী ভিক্ষার্থে অগ্রসর হইলে ঐ বিবাদ প্রশমিত হয়। তাঁহার এই উদারতা ও ত্যাগশীলতা দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবাজী (যিনি লালজীউ প্রণীত ভক্তমালের বঙ্গানুবাদ করেন) ইহাঁকে দীক্ষা প্রদান করেন। ৪৫ বৎসর বয়সের সময় শ্রীগিরি-গোবর্দ্ধনে অশ্বক্ষুরাঘাতে এই মহাত্মার প্রাণ-বিয়োগ ঘটে। লালাবাবুর মৃত্যুর পরও তাঁহার পত্নী রাণী কাত্যায়নী জীবিতা ছিলেন। ১৮৬৯ অব্দে সৈদাবাদে গঙ্গাতীরে স্বীয় গুরু বিনোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে তাঁহার দেহাত্যয় হয়। পুত্র শ্রীনারায়ণ পূর্ব্বেই লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। তাঁহার কোনও পুত্র ছিল না। পত্নীর স্ত্রী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন।

ইঁহারা রাজা প্রতাপচন্দ্র ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র নামে পরিচিত। প্রতাপচন্দ্রই কান্দী-রাজস্কুল স্থাপন করেন। শিক্ষা-বৃদ্ধির নিমিত্ত ইঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। রাজ-ভ্রাতৃদ্বয় কলিকাতার সান্নিধ্যে পাইকপাড়ায় থাকিতেন। বেলগাছিয়া উদ্যান-বাটিকা ইঁহাদেরই সম্পত্তি। ইঁহাদেরই উদ্যোগে ও মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্ররোচনায় তথায় একটি রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয় ও কয়েকখানি নাটকের অভিনয় হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও তাৎকালিক অন্যান্য অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির সঙ্গে রাজ-ভ্রাতৃদ্বয়ের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। বাংলার নাট্যসম্পৎ প্রচারের ইতিহাসে ইঁহাদের নাম উজ্জ্বল অক্ষরে চিত্রিত থাকিবে।

রাজা প্রতাপচন্দ্রের রাজা গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি চারিটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রপৌত্র রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র মহাপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। অল্প বয়সেই ইঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটে। ইঁহার তিনটি পুত্র বর্ত্তমান। তাঁহারা পাইকপাড়া রাজপ্রাসাদে বাস করেন।

রাজা প্রতাপচন্দ্রের অন্যতম পুত্র কুমার শরৎচন্দ্রের পুত্র বীরেন্দ্রচন্দ্র রাজা উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

ইনি কান্দীতে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য লক্ষমুদ্রা দান করিয়া গিয়াছেন। ১৯১৮ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার উত্তরাধিকারী কুমার জগদীশচন্দ্র বেলগাছিয়ার উদ্যান-বাটিকায় বাস করেন।

রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের পুত্র রাজা ইন্দ্রচন্দ্র একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। কথিত আছে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সুপ্রসিদ্ধ নরিস সাহেবের আদালতে অভিযুক্ত হইলে ইন্দ্রচন্দ্র সুরেন্দ্রনাথের মুক্তির উদ্দেশ্যে লক্ষমুদ্রা সহ তথায় উপস্থিত ছিলেন। বিচারে সুরেন্দ্রনাথের দুই মাস কারাদণ্ড হয়।

ইন্দ্রচন্দ্রের মৃত্যুর পর তদীয় পত্নী কুমার অরুণচন্দ্রকে দত্তক-পুত্ররূপে গ্রহণ করেন।

কুমার অরুণচন্দ্র কাশীপুরে ও হ্যারিংটন ষ্ট্রীটের প্রাসাদে বাস করেন।

কান্দী রাজধানীতে ইঁহাদের দেব-সেবা বিশেষ শ্রদ্ধা ও সমারোহের সহিত নির্ব্বাহ হয়। অতিথিশালাও তথায় আছে।

বিশেষ পর্ব্ব উপলক্ষে ইঁহাদের কেহ কেহ কোনও সময় কান্দী গমন করেন। সম্প্রতি স্বর্গীয় রাজা বীরেন্দ্রচন্দ্রের সহধর্ম্মিণী রাণী বসন্তকুমারী দশ সহস্রাধিক মুদ্রাব্যয়ে কান্দীতে কুলদেবতা শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জীউ দেবের নাটমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

দানেশমন্দ

মুর্শিদাবাদ জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে সোনারুদ ডিহি বা সোনারুন্দী নামক গ্রাম আছে। পূর্ব্বে এই গ্রাম বর্দ্ধমান জেলায় ও তৎপূর্ব্বে বীরভূম জেলায় অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমানে ইহা বর্দ্ধমান ও মুর্শিদাবাদের সংযোগস্থলে মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যেই অবস্থিত। এই স্থান হইতে বীরভূম এবং নদীয়া জেলার এলেকা মাত্র কয়েক ক্রোশ ব্যবধান। ইহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে অনেক প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে। তন্মধ্যে নৈহাটী, ঝামটপুর এবং উদ্ধারণপুর প্রধান। কাটোয়া, শ্রীখণ্ড, দক্ষিণ খণ্ড ও মাণিক্যডিহি প্রভৃতি বৈষ্ণব পাটগুলি ইহারই চতুর্দ্দিকে অল্প ব্যবধানে অবস্থিত।

নৈহাটী এক সময়ে খুবই প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। এখানেই শ্রীরূপসনাতন ও শ্রীজীব গোস্বামীর পূর্ব্বনিবাস। তাহার সান্নিধ্যে ঝামটপুরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-প্রণেতা শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের এবং উদ্ধারণপুরে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাধু উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের আবাস ছিল।

ইংরাজী ১৭৫১ অব্দে সোনারুন্দী গ্রামে তন্তুবায়-কুলে নিত্যানন্দ দাস নামক এক বালক জন্ম গ্রহণ করে। বাল্যে পিতার আশ্রয় হইতে এই বালক চলিয়া যায় এবং দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া তদানীন্তন মোগল ভূপতি শাহ আলমের সুনজরে পড়ে। নিজের বুদ্ধিবলে নিত্যানন্দ সম্রাটের অমাত্য-পদবী পর্য্যন্ত লাভ করেন এবং দানেশমন্দ আজমউদ্দৌল্লা কেফায়েৎজঙ্গ হপ্ত হাজারী বাহাদুর উপাধি পান। তাঁহাকে সপ্তসহস্র সৈন্যের অধিনায়ক করা হয়। তিনি দেশে আসিয়া প্রথমে উদ্ধারণপুরে বাস করিতে থাকেন, পরে সোনারুন্দীর প্রান্তভাগে বনয়ারীবাদ গ্রাম স্থাপন করিয়া তাহাতে রাজোচিত হর্ম্ম্যরাজি ও তোরণ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার সাতটি কামান ছিল। তিনটী এখনও তাঁহার প্রাসাদ-দ্বারে দেখা যায়। বনয়ারীবাদে তিনি শ্রীশ্রীবনয়ারী দেবের সেবা স্থাপন করেন,

শ্রীবৃন্দাবনের অনুকরণে বিবিধ সরোবর এবং উদ্যান-বাটিকা এখানে রচিত হয়। তাঁহার জন্ম-সময় হইতে একটি অব্দ প্রচলিত হয়। উহা দানেশমন্দ নামে পরিচিত। ১১৫১ অব্দের ১৭ই আষাঢ় বা ১লা জুলাই হইতে উক্ত গণিত হয়। পূর্ব্বে গুপ্তপ্রেস প্রভৃতি পঞ্জিকায় উহার উল্লেখ দেখা যাইত। বর্ত্তমানে মাত্র বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত পঞ্জিকায় উহার উল্লেখ আছে। ইহাঁর তিনটি পুত্র ছিলেন, ইহাঁরা তিন জনেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে "মহারাজা" উপাধি লাভ করেন। ইহাঁদের বংশের প্রত্যেকেরই নামের আদিতে "বনয়ারী" শব্দ সংযুক্ত করা হয়। এই তিন ভ্রাতার মধ্যে মধ্যম ভ্রাতা শ্রীজগদিন্দ্র বনয়ারী গোবিন্দ দেব বাহাদুরেরই বংশধারা বিদ্যমান আছে। ইনি ১৮৬৪ অব্দে একটি মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। উহা পরে ১৮৭৬ অব্দে হাই-স্কুলে পরিণত হয়। ইহাঁর পুত্র মহারাজ-কুমার বনয়ারী আনন্দদেব। বার্দ্ধক্যে ইনি বিষয়-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় বাস করিতে থাকেন। ইহাঁর পুত্র শ্রীবনয়ারী মুকুন্দ দেব বর্ত্তমান উত্তরাধিকারী। ইনি সযত্নে পৈতৃক বিগ্রহের পূজার্চ্চনা ও উৎসবাদি নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। কিন্তু, ইহাঁদের সে অতুল ঐশ্বর্য্য আর নাই। দেবোত্তর সম্পত্তির যে আয়, তাহা হইতেই সব ব্যয় সম্পন্ন হয়। পূর্ব্বে এই স্থানে যাত্রা-কীর্ত্তন ও ব্রাহ্মণ এবং কাঙ্গালীভোজন প্রভৃতির ধুমধাম ছিল। বৈষ্ণবোচিত মহোৎসব এখানে সুন্দর-রূপে অনুষ্ঠিত হইত। এক্ষণে তাহার কিয়দংশ মাত্র অবশিষ্ট আছে। সে প্রাচীন হর্ম্ম্যরাজিও আর নাই। উদ্যানবাটিকাও বিনষ্টপ্রায়। কেবল কিশোরীবাগের মধ্যস্থিত রাধাকুণ্ড নামক গোলাকার সরোবরটী পথিকবৃন্দের নেত্ররঞ্জন করিয়া থাকে।

শ্রীবনয়ারী মুকুন্দ বাহাদুরের চারিপুত্র। ইহাঁরা সকলেই শান্তস্বভাব ও সৎ প্রকৃতির। তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত বনয়ারী রবীন্দ্রদেবই বিষয়কর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করেন।

এই স্থানে বিবিধ জাতির বসবাস। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ ও উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থই প্রধান। সকলেই প্রায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়-ভুক্ত। এই গ্রামের পূর্ব্বদিক দিয়া ই. আই. আরের এবং দক্ষিণ দিক দিয়া আমোদপুর-কাটোয়া লাইনের লৌহবর্ত্ম গিয়াছে। এই গ্রামের মাত্র এক ক্রোশ ব্যবধানে কেতুগ্রাম নামক স্থান-অবস্থিত। তথায় অট্টহাস ও বহুলা এই দুইটি পীঠস্থান রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই গ্রামের সান্নিধ্যে উত্তর দিকে শ্রীশ্রীচর্চ্চিকা দেবী এবং দক্ষিণে পাচুন্দী গ্রামে সুন্দর কৃষ্ণ-প্রস্তরের বাসুদেবমূর্ত্তি অবস্থিত আছেন, এ কথা পূর্ব্বেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। দক্ষিণখণ্ড গ্রাম এইস্থান হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত ও এই জেলারই মধ্যে। তথায় রসিক দাস, বনয়ারী দাস, যামিনী মুখোপাধ্যায়, রাধাশ্যাম দাস প্রভৃতি কীর্ত্তন-গায়কগণ জন্ম গ্রহণ করেন। বনয়ারী-হইতে মাত্র তিন ক্রোশ পশ্চিমে কাঁদরা গ্রাম। এখানেই পদ-কর্ত্তা জ্ঞানদাসের আবাস ছিল। এখান হইতেই কীর্ত্তন-প্রণালী প্রচার করা হইত।

অন্যতম প্রসিদ্ধ কীর্ত্তন-গায়ক প্রেমদাস এই স্থানেরই অনতিদূরে মালিহাটী গ্রামে বাস করিতেন। মালিহাটী ও দক্ষিণখণ্ডে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বংশধরগণ বাস করেন। এই জেলার আর তিন জন প্রসিদ্ধ কীর্ত্তন-গায়কের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায়, ইনি চাকটা আনখোলা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত রাধিকা নাথ সরকার, ইনি খরগ্রামের অধিবাসী; শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবন্ধু চৌধুরী, ইনি হাসনপুর গ্রামে বাস করেন।

কীর্ত্তন বাংলার নিজস্ব সম্পত্তি এবং মুর্শিদাবাদ-রাঢ় প্রদেশ কীর্ত্তনের জন্যই প্রসিদ্ধ। পরমবৈষ্ণব বনয়ারীবাদ রাজকুল এই সব প্রখ্যাত কীর্ত্তন-গায়ক এবং প্রসিদ্ধ রামায়ণ-গায়ক, চৈতন্যমঙ্গলগায়ক এবং শ্রীমদ্ভাগবত-কথকদিগের সমাদর করিয়া আসিতেছেন।

এই গ্রামের আশে পাশে অনেক রামায়ণ-গায়কের বস-বাস। চৈতন্যমঙ্গল-গায়ক পূর্ব্বে অনেকই ছিল, এক্ষণে দুই একটী দল মাত্র আছে। কৃষ্ণমঙ্গল পূর্ব্বে ছিল এখন আর দেখা যায় না। কৃষ্ণযাত্রা এখনও এ-অঞ্চলে খুবই প্রচলিত।

শ্রীমদ্ভাগবত-কথকও এ অঞ্চলে অনেক জন্মিয়াছেন। তন্মধ্যে ধুকুড়ি চট্টরাজের নামই প্রসিদ্ধ।

বাংলা সাহিত্যের প্রসিদ্ধ লেখক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পঞ্চানন্দ) এই গ্রামের মাত্র একক্রোশ পূর্ব্বে গঙ্গাটিকুরী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বংশধরগণ এখনও এ স্থলে

বাস করেন। একটী সংস্কৃত বিদ্যালয় এ স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে।

প্রসিদ্ধ ধাত্রীবিদ্যাবিদ্ শ্রীযুক্ত বামনদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসস্থান সিমুলিয়া গ্রামও এই স্থানের সন্নিকটে অবস্থিত। সম্প্রতি এই স্থানে একটী উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ সাধু দ্বারকানাথ তপস্বী মহাশয়ের প্রধান আশ্রম এক্ষণে দক্ষিণখণ্ড গ্রামেই অবস্থিত।

বনয়ারীবাদে বাজার ও পোষ্ট অফিস আছে। সম্প্রতি এক জন এম. বি. ডাক্তার এখানে আসিয়া চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ায় দেশবাসিগণের বড়ই সুবিধা হইয়াছে।

দেবীসিংহ

শুধু মুর্শিদাবাদ নয়, সারা বাংলার ইতিহাসেই দেবীসিংহ সুপরিচিত। ইনি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লোক, জাতিতে বৈশ্য। ব্যবসার উপলক্ষে বাংলা দেশে আসেন এবং ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া মুর্শিদাবাদের নায়েব দেওয়ান রেজাখাঁর অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। পূর্ণিয়া প্রদেশের শাসনভার তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। এই উপলক্ষে দেবীসিংহ যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করেন। রেজাখাঁর পদচ্যুতির সঙ্গে তিনিও রাজকার্য্য হইতে অপসৃত হন। পরে তিনি মুর্শিদাবাদের দেওয়ানী পদ লাভ করেন। নানা কারণে তিনি এই পদ পরিত্যাগ করিয়া দিনাজপুর-রাজের দেওয়ানী পদ গ্রহণ করেন। এই কার্য্যে থাকাকালে দেবীসিংহ কিছু ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন। কিন্তু, তাঁহার কর্ম্মচারিবৃন্দের অনাচারে প্রজারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। দেবীসিংহ ও জনৈক ইংরাজের প্রচেষ্টায় ঐ বিদ্রোহ প্রশমিত হয়। বিদ্রোহের মূলীভূত অনাচার-সমূহের তদন্তের জন্য এক কমিশন বসে। অনাচারের অপরাধী দেবীসিংহের বিচার হয়। বিচারে তিনি নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হইয়া মুক্তিলাভ করেন, কিন্তু তাঁহার এক কর্ম্মচারী কারাদণ্ড প্রাপ্ত হন।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে দেবীসিংহ কার্য্যভার পরিত্যাগ করতঃ মুর্শিদাবাদের সান্নিধ্যে অবস্থিত নসীপুরে বসবাস করিয়া স্বীয় জমিদারী সুশৃঙ্খলে পরিচালনা করিতে থাকেন। শেষ-জীবনে তিনি দান-ধ্যান প্রভৃতি বহুবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

দেবীসিংহের পুত্র-সন্তান ছিল না। তাঁহার ভ্রাতা বাহাদুর সিংহের বংশধরেরাই তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। বাহাদুরসিংহের পুত্র রাজা উদবন্তসিংহ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে "রাজা বাহাদুর" উপাধি লাভ করেন। উদবন্তসিংহ অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি স্বীয় কুলদেবতার অর্চ্চনা সুচারু ভাবে নির্ব্বাহ করিবার জন্য সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন।

দান ও তীর্থভ্রমণেও তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করেন। ১৮৬৪ অব্দে তাঁহার প্রপৌত্র কুমার রণজিৎ সিংহ সম্পত্তির অধিকারী হন। ইনি গবর্ণমেণ্ট হইতে মহারাজা উপাধি লাভ করেন এবং ইঁহার বংশধরের জন্য "রাজা বাহাদুর" উপাধি পুরুষানুক্রমিক হয়।

মহারাজা রণজিৎ উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান, জিলাবোর্ডের সদস্য, অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট, কাউন্সিলের মেম্বর প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া স্বীয় যোগ্যতার পরিচয় সুচারুরূপেই প্রদান করিয়াছেন। তিনি জনহিতকর অনেক কার্য্য সম্পাদন করেন। চিত্তও তাঁহার অতিশয় উদার ছিল। বাংলা ১৩২৫ সালে তিনি লোকান্তরিত হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ-পুত্র রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বি. এ. বাহাদুর তাঁহার উত্তরাধিকারী নির্দ্দিষ্ট হন। রাজা বাহাদুরের আরও তিন ভ্রাতা বর্ত্তমান।
সকলেই বি. এ. উপাধিধারী।

রাজা বাহাদুরও পিতার ন্যায় জেলা বোর্ডের সদস্য, অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট, কাউন্সিলের মেম্বার প্রভৃতি পদে কার্য্য করিয়া স্বীয় কার্য্য-কুশলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি বহু সমিতির সদস্য, অনেকগুলি "কমিটী"তেও তিনি কার্য্য করিয়াছেন।

কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি বাংলা সরকারের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া স্বীয় কার্য্য দক্ষতার সহিত সম্পাদন করেন।

তাঁহার পিতার মৃত্যু-তিথিতে প্রতিবৎসরই একটী সভা নসীপুর রাজবাড়ীতে হইয়া থাকে এবং তথায় রাজাবাহাদুর সমাগত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতবর্গকে বিদায় প্রদান করেন।

বঙ্গাধিকারী

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থাপিত করিলে তাঁহার কানুনগোদ্বয়ও তাঁহার সহিত মুর্শিদাবাদে আগমন

করেন। প্রথম কানুনগো[1] মুর্শিদাবাদ নগরীর অপর পারে কিয়দ্দূর ব্যবধানে অবস্থিত ঢাকাপাড়ায় স্বীয় বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করেন। ঢাকাপাড়া পূর্ব্ববঙ্গীয় প্রথানুযায়ী উচ্চারণের ফলে ডাহাপাড়ায় পরিণত হয় এবং ঐ নামেই এখনও ঐ স্থান পরিচিত। দর্পনারায়ণ জাতিতে উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ ভগবান্ রায় সম্রাট্ আকবরের সময় 'বঙ্গাধিকারী' উপাধি প্রাপ্ত হন।

দর্পনারায়ণ রাজকার্য্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বাংলার রাজস্ব-বিভাগ তাঁহার ইঙ্গিতেই পরিচালিত হইত। এ জন্য তদানীন্তন দেওয়ান মুর্শিদকুলী খাঁও তাঁহাকে বিশেষ সমীহ করিতেন। কিছু কাল পরে দর্পনারায়ণের সহিত মুর্শিদাবাদের মনোমালিন্য হয় এবং মুর্শিদ সুকৌশলে তাঁহাকে বন্দী করেন। এই ব্যাপারে দর্পনারায়ণের স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং তিনি ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেন।

দর্পনারায়ণ জলাশয় ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং স্বীয় বাসস্থানের অদূরে অবস্থিত পীঠমাতা শ্রীশ্রীকিরীটেশ্বরী দেবীরও অর্চনার সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

দর্পনারায়ণের পুত্র শিবনারায়ণ

শিবনারায়ণ নবাব সুজাউদ্দীনের আমলে এবং তৎপুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ নবাব আলীবর্দ্দীর আমলে কানুনগো পদে কার্য্য করিতেন। লক্ষ্মীনারায়ণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পর্য্যন্ত স্বীয় পদে অবস্থিত ছিলেন। পরে এই পদ উঠিয়া যায়। তিনি স্বীয় কার্য্যে অনেক ব্রাহ্মণকে ভূসম্পত্তি প্রদান করেন এবং বহু স্থলে বার্ষিকী দীপান্বিতা শ্যামাপূজার ব্যবস্থা করিয়া যান।

লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র সূর্য্যনারায়ণের সময় হইতেই ইঁহাদের আর্থিক অবস্থা হীনতর হইতে থাকে। এখনও সূর্য্যনারায়ণের বংশধরগণ ডাহাপাড়ায় অবস্থিতি করেন, কিন্তু ইঁহাদের অবস্থা মলিন হইয়া গিয়াছে।

১ ভ্রমবশতঃ ইঁহাকে মাঘ-সংখ্যায় পুঠিয়া রাজবংশের আদি-পুরুষ বলা হইয়াছে।

আজিমগঞ্জের উত্তান-বাটিকামি মণ্ডলকা বাহাদুরের, অনবধানবশতঃ ইঁহাকে পূর্ব্ব সংখ্যায় রাজা বিজয় সিংহের বলা হইয়াছে।

নবাব মীরকাসিম ইংরাজদিগকে বর্দ্ধমান জেলা দান করেন, ভ্রমবশতঃ মীরজুন মুদ্রিত হইয়াছে।

ভট্টবাটীর কানুনগো বংশ

নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর দ্বিতীয় কানুনগো জয়নারায়ণ মুর্শিদাবাদ নগরের পশ্চিম পাড়ে ভট্টবাটী নামক স্থানে স্বীয় বসতি স্থাপন করেন। ইনিও জাতিতে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ। ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণও রাজ-সরকারেই কার্য্য করিতেন।

জয়নারায়ণের পুত্র মহেন্দ্রনারায়ণ আলীবর্দ্দী খাঁর সময়ে কানুনগো পদে কার্য্য করিতেন। তিনিও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় পর্য্যন্ত কার্য্য করেন।

ইঁহারা এক সময়ে বিশেষ অবস্থাপন্ন ও প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। ইঁহাদের মূলবংশ এখানে নাই, দৌহিত্র বংশ রহিয়াছে। ইঁহাদের প্রাচীন বাসস্থান, ধ্বংসপ্রায় দেবায়তন প্রভৃতির নিদর্শন এখনও ভট্টবাটীতে দেখা যায়।

কান্তবাবু

শাস্ত্রে বলে, "আগচ্ছতি যদা লক্ষ্মীর্নারিকেল-ফলাম্বুবৎ", বাস্তবিকই এক এক ব্যক্তির জীবনে এই প্রবাদ-বাক্যের সার্থকতা যথেষ্টই দেখা যায়।

কান্তবাবুও এই শ্রেণীর ব্যক্তি। ইঁহার প্রকৃত নাম কৃষ্ণকান্ত নন্দী। আদিবাস বর্দ্ধমান জেলায়। ব্যবসায় উপলক্ষে তদানীন্তন বাণিজ্যকেন্দ্র কাশিমবাজারে আসেন এবং শ্রীপুর নামক স্থানে বাস করিতে থাকেন। ইনি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছিলেন, মুদীর দোকান করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন।

সে সময় কাশিমবাজারে ইংরাজদিগের কুঠী ছিল, ঐ সূত্রে তাঁহাদের সহিত কান্তবাবুর পরিচয় হয়। তিনি বাংলা ও পার্সীর সহিত সামান্য ইংরাজীও শিখিয়াছিলেন এবং কিছুদিন ইংরাজ কুঠীতে কার্য্যও করেন।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা ইংরাজগণের সহিত বিরোধের সূত্রপাত করিলে ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ সাহেব ভীত হইয়া কান্তবাবুর গৃহে লুক্কায়িত রহেন এবং "পান্তাভাত", "চিংড়ী মাছ" খাইয়া অতি কষ্টেই কাল কাটান।

কালে হেষ্টিংস্ বাংলার গভর্ণর হইলে কান্তবাবু রাজ-সরকারে উচ্চপদে নিযুক্ত হন এবং বহু ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করেন। এই সময়ে বিখ্যাত বাহারবন্দ পরগণা তাঁহার হস্তগত হয় এবং তাঁহার পুত্র লোকনাথ রাজ-পদবী লাভ

করেন। লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা[১] ও আরও বহু দ্রব্য কান্তবাবু কাশীধাম হইতে আনয়ন করেন। ১২০০ বঙ্গাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র রাজা লোকনাথ তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হন। লোকনাথ নিজামত হইতে মহারাজ উপাধিও পাইয়াছিলেন। ইঁহার পর ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিনাথ রাজা বাহাদুর উপাধি লাভ করেন। ইনি হিন্দু কলেজ স্থাপনার কার্য্যে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। ইঁহারই পুত্র রাজা কৃষ্ণনাথ ও পুত্রবধূ সুপ্রসিদ্ধা রাণী স্বর্ণময়ী।

কৃষ্ণনাথ বহু সৎকার্য্যে প্রভূত অর্থদান করেন। তাঁহারই নামে বহরমপুর সহরের কলেজ ও স্কুল পরিচিত। ১৮৪৪ অব্দে তিনি আত্মহত্যা করেন। তাঁহার বিধবা পত্নী মহারাণী স্বর্ণময়ী সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়া স্বীয় দেওয়ান রাজীব-লোচন রায় মহাশয়ের সাহায্যে সুচারুরূপে স্বীয় সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিতে থাকেন। ঐ সম্পত্তি অধিকার করিতে মহারাণীকে অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। সম্পত্তি লাভ করিয়া তিনি বিবিধ সৎকার্য্য করিয়া মুর্শিদাবাদে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার দানের সীমা ছিল না। গো-দ্বিজ-রক্ষণ ও অতিথি-সৎকার তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও বিধবা রমণীগণ তাঁহার সাহায্য প্রভূত পরিমাণেই প্রাপ্ত হইতেন। স্বীয় কুলদেবতার প্রতিও তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। বহরমপুর কলেজ পরিচালনের বায়ভার তিনি সরকারের নিকট হইতে স্বহস্তে গ্রহণ করেন। বহরমপুর সহরের জলের কলও মুখ্যতঃ তাঁহারই প্রদত্ত অর্থে প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের মহিলা-নিবাস ও ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের ছাত্রাবাস-নির্ম্মাণেও তিনি অকাতরে অর্থ সাহায্য করেন।

মহারাণীর মৃত্যুর পর তাঁহার শ্বশ্রু রাণী হরসুন্দরী ঐ সম্পত্তির অধিকারিণী হন। কিন্তু, তিনি বিষয়কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শেষ জীবনে পবিত্র বারাণসীধামে বাস করিতেছিলেন, তাই নিজে বিষয় গ্রহণ না করিয়া সমস্ত সম্পত্তি স্বীয় দৌহিত্রের করে অর্পণ করেন। ইনিই মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর। ইনি মহারাণী স্বর্ণময়ীর সম্পত্তিরই উত্তরাধিকারী হন নাই; তাঁহার অপূর্ব্ব ত্যাগ ও অভূতপূর্ব্ব দানশীলতারও উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

বাল্যে মণীন্দ্রচন্দ্র বহু দুঃখ ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন, তাই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া দরিদ্রের দুঃখ দূরীকরণই তিনি জীবনের প্রধান ব্রত করেন। তিনি দেড় কোটী টাকা দান করিয়াছেন। সময়ে সময়ে ঋণ করিয়াও দান করিতে তিনি পরাঙ্মুখ হন নাই।

দানশীলতাই মহারাজা বাহাদুরের একমাত্র ভূষণ নহে। শিক্ষার বিস্তারের জন্ম তিনি যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা অদ্ভুত। একটী প্রথম শ্রেণীর কলেজ, একটী টেকনিক্যাল বিদ্যালয়, একটী ইঞ্জিনিয়ারীং বিভাগ, একটী বাণিজ্য বিদ্যালয়, একটী বয়ন-বিদ্যালয়, একটী ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, একটী সংস্কৃত বিদ্যালয়, একটী বালিকা-বিদ্যালয় এবং দ্বাদশটী উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় তিনি পরিচালনা করিতেন। এতদ্ব্যতীত আরও বহু উচ্চ-ইংরাজী ও মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয়, কয়েকটী কলেজ এবং জাতীয় বিদ্যালয় তাঁহার অর্থে পরিপুষ্ট হইয়াছিল। কাশীধামে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মহারাজা মণীন্দ্র চেয়ার তাঁহার অপূর্ব্ব বদান্যতার স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছে।

বহরমপুর ও জিয়াগঞ্জের হাসপাতাল তাঁহার সাহায্যে পুষ্ট হইয়াছিল।

দেশের কৃষি ও লুপ্ত শিল্পের উন্নতির জন্ম তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। বিখ্যাত বাজেটীয়া প্রদর্শনী তাঁহারই অর্থে ও উদ্যোগে পরিচালিত হইত।

তৈল ও চামড়ার কলও তিনি স্থাপিত করিয়াছিলেন।

বঙ্গ সাহিত্যের তিনি অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ তাঁহারই প্রদত্ত জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্ভ্রান্ত-প্রেম-রচয়িতা চন্দ্রশেখরের সম্পাদকতায় 'উপাসনা' নামক মাসিকপত্রও তিনি বাহির করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব-ধর্ম্মে তাঁহার অবিচলিত শ্রদ্ধা ছিল। তিনি কয়েকবার বৈষ্ণব-সম্মিলনীর আহ্বান করিয়াছিলেন। রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ মহাশয়কে সম্পাদক-পদে বৃত করিয়া

১ লক্ষ্মীনারায়ণ শিলার লক্ষণ এইরূপ—

এক দ্বারে চতুশ্চক্রং বনমালা বিরাজিতং
স্বর্ণ রেখায়ুক্তং গোষ্পদেন সমন্বিতং
কদম্ব কুসুমাকারং লক্ষ্মীনারায়ণং বিদুঃ।

এইরূপ একটী শিলা মাণিক্যডিহি গ্রামে মাধবেন্দ্রপুরী পাদের বংশধরগণের গৃহে আছে।

তিনি বহু প্রাচীন বৈষ্ণব-গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। "শ্রীগৌরাঙ্গ-সেবক" নামক মাসিক পত্রিকা তাঁহারই ব্যয়ে তাঁহার সচিব শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইত।

তিনি ছাত্র-সমাজের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। কত ছাত্র যে তাঁহার অর্থে ও অন্নে পুষ্ট-কলেবর হইয়া দেশে ও বিদেশে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কৃতী হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

ব্রাহ্মণ জাতিকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। ১৩২৩ সালের ৯ই বৈশাখ বহরমপুরে ব্রাহ্মণ-সম্মিলনী হয়। তাহাতে তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বিবিধ প্রকারে ব্রাহ্মণ-ভক্তির নিদর্শন প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

তিনি বঙ্গীয় ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য-পদে কয়েকবার বৃত হইয়াছিলেন। মিউনিসিপালিটী ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যানের পদও তিনি কিছুকাল অলঙ্কৃত করেন। সরকার বাহাদুর তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন এবং বিবিধ উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। বিগত ১৩৩৫ সালের ২৫শে কার্ত্তিক সোমবার এই মহাত্মা সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করেন। মহারাজ বাহাদুরের একমাত্র পুত্র শ্রীশচন্দ্র নন্দী এম. এ. এম. এল. এ. বাহাদুর পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তির অধিকারী হন এবং "মহারাজা" উপাধি পান। বর্ত্তমান মহারাজা বাহাদুর বিদ্যোৎসাহী ও সরল-হৃদয় ব্যক্তি। তিনি একখানি গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। বৈষ্ণব-ধর্ম্মেও তাঁহার অনুরাগ আছে। তিনিও পিতার ন্যায় মিউনিসিপালিটী, জেলাবোর্ড প্রভৃতি জনহিতকর সমিতির সদস্য-পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ইনি বঙ্গীয় সরকার বাহাদুরের অন্যতম সচিবের পদে বৃত হইয়াছেন।

মুর্শিদাবাদের বৃত্তান্ত লিখিতে বসিয়া মহীয়সী রমণী-কুল-শিরোমণি "ধরামরেন্দ্র-বারেন্দ্র-বঙ্গ-ভূমীন্দ্র-ভামিনী" মহারাণী ভবানীর নাম উল্লেখ না করিলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ হয়। নাটোরেশ্বরী বাংলার রাজনীতি-ক্ষেত্রেও সুপরিচিতা ছিলেন। ইতিহাস এই কুশাগ্রীবধী মহিলার অপূর্ব্ব তেজস্বিতা, দান-শীলতা এবং রাজনীতি-প্রাবীণ্য উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছে।

মুর্শিদাবাদের সন্নিকটে অবস্থিত বড়নগরে মহারাণীর প্রাসাদ অবস্থিত ছিল। তথায় কন্যা তারাসুন্দরী সহ তিনি অনেক সময় বাস করিতেন। বড়নগরে তিনি যে সমস্ত অতুলনীয় মন্দিররাজি রচনা করিয়া তাহাতে বিবিধ বিগ্রহের অর্চ্চনার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আজিও পর্য্যবেক্ষকের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে। বড়নগরের "জোড়-বাংলা" মন্দির সাতিশয় প্রসিদ্ধ। মহারাণীর সহিত সম্পর্কযুক্ত এক রাজবংশ বড়নগরে বাস করেন। এক সময় ইহাঁরা খুবই সমৃদ্ধ ছিলেন। রাজা উমেশ এই বংশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। বর্ত্তমানে আর ইহাঁদের তাদৃশ ঐশ্বর্য্য নাই। কালবশে সবই মলিন হইয়া গিয়াছে।

বড়নগরেরই অপর পারে সাধক বাগের প্রসিদ্ধ আখড়া, যেখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রসিদ্ধ সাধক মস্তারাম বাবাজী অবস্থিতি করিতেন। মস্তারাম বাবাজীর অদ্ভুত শক্তি একদিন সারা বাংলায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। মেদিনীপুর জেলান্তর্গত মহিষাদল নামক স্থানের রাজবংশ এই আখড়ার মহান্ত মহাশয়দিগেরই শিষ্য।

মুর্শিদাবাদ জেলা জমীদার-প্রধান। যে সমস্ত জমীদারবংশ ইতিহাসের সহিত সম্পৃক্ত, তাঁহাদের কিঞ্চিৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল। বারান্তরে এই জেলার অন্যান্য রাজবংশ ও প্রধান প্রধান জমীদার বংশের উল্লেখ করা যাইবে।

এই জমীদারেরাই একদিন মুর্শিদাবাদের ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধির সহায় ছিলেন, আজ কালবশে সবই কি লুপ্ত হইবে?

প্রয়োজনীয় বস্তু

…গত তিনশত বৎসর হইতে জগতের বহুদেশে পুনরায় প্রচুর পরিমাণে মানুষের প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপন্ন করিবার আয়োজনের সাড়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু যে বিদ্যা থাকিলে মানুষের বস্তু অনায়াসে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করা সম্ভব হয়, সেই বিদ্যা অদ্যাবধি জগতের কোন দেশ লাভ করিতে পারে নাই। ঐ বিদ্যা একদিন একমাত্র ভারতবর্ষে বিদ্যমান ছিল এবং ভারতবাসিগণ উহা সারা জগৎকে বিতরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু, তাঁহাদের আলস্যের ফলে একণে তাঁহারা পর্য্যন্ত উহা বিস্মৃত হইয়াছেন এবং আধুনিক জগতে বিদ্যা ও শিল্পের নামে যাহা যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি মানুষের উপকার সাধন করা ত' দূরের কথা, বরং পক্ষে তাহাদের অপকারই সাধন করিতেছে।

রাজা

—শ্রীরজত সেন

কলকাতা সহরের পথে ঘাটে না কি পয়সা ছড়ান, শুধু আহরণ করবার কায়দাটা আয়ত্ত করতে পারলেই হল। মাড়োয়ারীরা লোটা থেকে সিন্ধুক এবং উড়িয়ারা থলি থেকে বস্তা শুধু ভরিয়েই চলেছে।

ভবদেব কর্মকার এ কাহিনী শুনে হাতে লোটা এবং ট্যাকে থলি নিয়ে একদিন কলকাতা হাজির। লোটা যদিও খালি, ট্যাক একেবারে ফাঁকা ছিল না।

হাওড়া ষ্টেশনে নেমে ভবদেব চৌধুরী হক্‌চকিয়ে গেল; পয়সা কোথায়? একসঙ্গে এত মানুষ ভবদেবের চৌদ্দপুরুষও দেখে নি। একটা ঘাড়কামান লোককে পাশ ঘেঁষে দাঁড়াতে দেখে মনে হল, গাঁটকাটা। ভবদেব ট্যাক সামলাতে ব্যস্ত।

শেষ পর্যন্ত কোনরকমে ঝঞ্ঝাট উত্তরে ভবদেব গুছিয়ে নিতে পেরেছিল। প্রায়ান্ধকার এক গলির মধ্যে উয়ে-ধরা পড়ন্ত এক দোতলা বাড়ী সে কপাল ঠুকে ভাড়া করে বসল। হোটেল খুলবে। ভদ্রলোক-নামীয় জীবদের আহার এবং বাসস্থানের সুব্যবস্থা এবং সুবন্দোবস্ত করতে তার কয়েকঘণ্টা মাত্র লাগল। কয়েকখানা দড়ির খাটিয়া, দিন সাতেকের চাল, ডাল, নুণ, মশলা একটি উড়িষ্যা-নিবাসী খাঁটি সদ্‌ব্রাহ্মণ এবং উত্তরদেশীয় একটি সধংশীয়া ঝি। ব্যস্, পুরোদস্তুর হোটেল। দেখে শুনে ব্যবসায়ে ভবদেবের মাথা খুলেছে।

দেখতে দেখতে ভদ্র-সন্তানরা জমায়েৎ হতে লাগল। বাড়ীর দরজায় প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড টাঙ্গান হল "দি পবিত্র হিন্দু হোটেল।" তারপরেই অপরূপ খাদ্য-সামগ্রীর একটি বিস্তৃত তালিকা। বিজ্ঞাপন দেখলে মনে হয়, সস্তায় বেশ ভূরি-ভোজনের ব্যবস্থা এবং শেষে একটি পান ও একটি "আজব সুন্দরী বিড়ি।"

নানা ধরণের লোক 'দি পবিত্র হিন্দু হোটেলে' বাসা বাঁধতে লাগল। দোতলায় তিনখানা এবং নীচে দু'খানা ঘর প্রায় ভর্ত্তি। এক এক ঘরে তিনজন চারজন করে। তাদের জীবন-যাপন এবং ঘরকন্নার বিচিত্র আসবাব-পত্রে ঘরগুলো একেবারে ঠাসা। তার মধ্যে দড়ির খাটিয়ার উপর তারা কোনরকমে হাত-পা ছড়িয়ে দেয়। মশা আছে, ছারপোকা আছে, আর আছে গন্ধ। কিন্তু, সন্ধ্যার পর সঙ্গীতও আছে। নীচের এক ভদ্রলোকের একটি হারমোনিয়াম; প্রায় সন্ধ্যার পরেই সেটা নিয়ে কালোয়াতি আরম্ভ হয়:

"সাঁঝের বেলাতে তোরে কে জল আনতে বলেছে।"

এদের বিচিত্র জীবনের সঙ্গে পরস্পরের যেন সম্বন্ধ আছে। ওদের পরিচয় হয়ে গেছে। চায়ের টেবিলে বা ড্রইং রুমে নয়। দড়ির খাটিয়ার বসে বিড়ি টানতে টানতে, বা কুমড়ার খোসা এবং মূলোপাতার ঘণ্টের স্বাদ নিয়ে। আলোচনার প্রধান বিষয়-বস্তু দি পবিত্র হোটেলের পরিচারিকা রাসমণি, নয় তো ম্যানেজার ভবদেববাবুর উঠানে স্নান করবার জায়গাটা ঘিরে দেবার প্রস্তাব।

নরহরি তার কামান ঘাড়ে হাত বুলাতে বুলাতে বললে, 'বেশ বাড়ী আপনার, ম্যানেজার বাবু, একটা বাথরুম পর্য্যন্ত নেই। সবার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাপড় ছাড়া, ছিইসেল।' নরহরি তার তোবড়ানো গালে একটা ভঙ্গি করল; বয়েস বছর ত্রিশ হবে। পাঞ্জাবীর পেছনে সন্তর্পণে সেলাই করা। 'পাল' হোটেলটা একবার দেখলে আপনার খানিকটা আইডিয়া হত। সেখানকার বাথরুম শ্বেত-পাথরের তৈরী', নরহরি বলে চলল; 'ওপরে আপনার না আছে পাইখানা, না আছে একটি কল, ঘরগুলো সব ক্লাইভ ষ্ট্রীটের গুদাম; পয়সা কি আমরা দেব না বলছি? ভাল করে থাকতে আমরাও জানি মশাই।'

কথা হচ্ছিল নীচের বারান্দায় কাঠের পার্টিশান দেওয়া 'অফিসে'

রবিবারের সকাল। সামনে টেবিলের ওপর হোটেলের হিসাব-পত্রের খাতা। লোহার চেয়ারে ম্যানেজার ভবদেব বাবু। আরও কয়েকখানা চেয়ারে হোটেলের অন্যান্য মেম্বরা জমাট হয়ে বসে আড্ডা দিচ্ছে।

'বিড়ি দাও হে বড় দা', বিহারী কুঞ্জবাবুকে বললে,

পেট ফুলে উঠেছে! ঘরের মধ্যে আমার বিড়ির কেস্‌টা ফেলে এলাম, কিছুতেই আর মনে থাকে না!'

'নাও নাও!' মৃত্যুঞ্জয় বাবু প্রায় ধমক দিয়ে বিহারীকে বললেন, 'তুমি যে নিজের পয়সায় বিড়ি কেনবার লোক সে আমরা সবই জানি; অত বাৎচিৎ কেন হে? ফিগি একটা চেয়ে নিয়ে ধরালেই পারতে!'

মৃত্যুঞ্জয়বাবুর বয়েস হয়েছে। স্থূলকায় শরীর, রগের দু'পাশে চুলে পাক ধরেছে। দাড়ি কামানো। কোন্ অফিসের না কি বড় বাবু; স্পষ্টবক্তা লোক, দু'ঘণ্টার মধ্যে দুজনকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করেন, আর বহাল করেন তিনজনকে।

নরহরি খোঁচা খেয়ে চুপ করল। এই দিন-কয়েক হল শালুকের ওধারে একটি লোকের ওষুধের ক্যানভাসিং-এর চাকরীটা খতম ক'রে দিয়ে এসে বেকার বসে আছে; মৃত্যুঞ্জয় বাবুকে ঘাঁটাতে সাহস করল না, কে জানে! বলেছে একটা চাকরী দেবে, দিতেও পারে। কলকাতা সহরে মানুষ চেনা যায় না; নরহরি জানে, সমস্ত বড়বাবুরাই বাড়ীতে পাঁচ-হাতি ধুতি পরে।

সিঁড়ি দিয়ে জুতোর কট্ কট্ শব্দ করে পরেশ লাহিড়ী নেমে এল। চোখে তখনও ঘুম! সর্ব্বাঙ্গে একটা শিথিল আলস্য। শোনা যায়, বড়লোকের ছেলে; সখ করে হোটেলে আছে। বালীগঞ্জে ওর হাকিম-মামার বাড়ী। ভবদেববাবু রীতিমত পরেশকে খাতির করে। বয়সে যুবক, ঠোঁটে পানের চিহ্ন; ঢাকাই ধুতিতে সিগ্রেটের পোড়া দাগ। 'আসুন আসুন, পরেশবাবু!' ভবদেব বাবু বেশ সম্মানের সুরে ডাকলেন। 'কাল অত দেরী হল কেন ফিরতে?'

'আর বলেন কেন?' পরেশ একখানা চেয়ারে জাঁকিয়ে বসল, 'মামীমা কিছুতেই না খেয়ে আসতে দেবে না! খাওয়া-দাওয়ার পর মামাত বোন বুলী বললে, পরেশ দা গাড়ীটা বার কর, বেশ চাঁদনী রাত, আজ যশোর রোড পর্য্যন্ত! আমি বললাম, আমার ঘুম পাচ্ছে! সে কি ছাড়ে মশাই? টু-সীটার খানা রাস্তা কাঁপিয়ে তবে ছাড়লে; বালীগঞ্জের মেয়ে!

'মাইল তিনেক আসবার পর দুষ্টুমি করে বললাম, বুলী, এ রাত্রে অ্যাক্সিডেন্ট হবে, ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে! আমাকে প্রায় ধাক্কা মেরে সরিয়ে সে হুইলে এসে বসল, বললে, ঘুমোও তুমি, আমি নিরুদ্দেশ-যাত্রী। গাড়ী উড়ে চলল রাস্তার উপর দিয়ে; সে স্পীডের আইডিয়া আপনাদের নাই, প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হবে এই বুঝি দম আটকে গেল। মাথার ওপরে চাঁদ। দুধারে ঘন গাছ-পালা, তন্দ্রাতুর গ্যাসলাইটের আলো ঠিকরে পড়ছে অ্যাস্‌ফাল্টের রাস্তায়। বললাম, বুলী আস্তে চালাও; আর সঙ্গে সঙ্গে স্পীডের কাঁটা ষাট থেকে সত্তর, সত্তর থেকে আশী, আশী থেকে নব্বই-এ ঘুরে চলল! বললাম, বুলী, সর্ব্বনাশ ঘটাবে আজ! কাণের কাছে শুনতে পেলাম বুলীর এক টুকরো রূপালী হাসি!

'যখন বাড়ী ফিরলাম রাত দুটো! বুলী বললে, এত রাত্রে কোথায় তোমার হোটেলে যাবে? এস, এস। পাগল হয়েছেন, মশাই? থাকা যায় কখনও পরের বাড়ী? ও বললে, একান্তই যদি যাবে ত গাড়ী নিয়ে যাও! বললাম, দরকার নেই, ট্যাক্সি নেব। ট্যাক্সি এসে যখন দরজার কাছে থামল তখন আড়াইটা। হ্যাঃ, গাড়ী একখানা নিয়ে আসি, আর নর্দ্দামার ধারে খাড়া করে রেখে দিই আর কি! আপনার যদি একখানা গ্যারেজও থাকত ভবদেব বাবু!'

ভবদেব বাবু লজ্জার হাসি হাসলেন। নরহরি আর মৃত্যুঞ্জয় আড়চোখে তাকিয়ে রইল পরেশের দিকে। নরহরির বলবার কিছু নেই, ও চুপ করে রইল। পরেশের বলবার ভঙ্গি চমৎকার, কিন্তু তবু নরহরির মুখ দেখে মনে করতে পারা যায় যে, পরেশকে সে সহ্য করতে পারছে না, লোকের অত আস্পর্দ্ধা ভাল নয়।

'যাদের পয়সা আছে!' মৃত্যুঞ্জয় একটা প্যাঁচ মারবার লোভ সংবরণ করতে পারল না, 'এ দুনিয়ায় তাদের আর ভাবনা কি? তবু এ সংসারে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াবার চেষ্টা অনেক প্রশংসনীয়।'

খোঁচাটা গায়ে না মেখে পরেশ লাহিড়ী হাসি-মুখে বললে, 'পৃথিবীতে যাদের স্থানাভাব, তারা দাঁড়াবার জায়গা খোঁজে, যাদের স্থানাধিক তারা দাঁড়ায়, বসে, শোয়, বা খুশী করে। আপনার অফিসে একটা চাকরী দিন না! বসে থেকে থেকে স্বভাব নষ্ট হয়ে গেল।'

এমন সুতীক্ষ্ণ আক্রমণের জন্যে মৃত্যুঞ্জয়বাবু প্রস্তুত ছিলেন না, আশাও করেন নি! প্রায় চীৎকার করে, বললেন,

'আপনার মত ঢের লোককে চাকরী দিয়েছি, কিন্তু তাদের মধ্যে মামার পয়লার ডাঁট কেউ মারে না।'

'বাবার পয়সার মারে', পরেশ বললে, 'তা বেচারা নরহরি বাবুর একটা হিল্লে করে দিন না, অনেকদিন ত আপনার পেছনে ঘোরালেন, তারপর আমি আছি, বেকার আপনার অফিসটা কোথায় ?'

তাই ত! কোথায় অফিসটা ? ভবদেব, নরহরি, কারুর মাথায় এ প্রশ্নটা কোন দিন জাগে নি। উৎসুক দৃষ্টিতে তারা মৃত্যুঞ্জয়বাবুর দিকে তাকাল।

মৃত্যুঞ্জয়বাবুর রগের কাছে চুলে পাক ধরেছে; সামলে নিলেন, 'যাবেন, একবার গিয়ে দেখে আসবেন, সাত নম্বর কটন ষ্ট্রীট; জামা-কাপড়ের দিকে একটু নজর দেবেন, গেটে রাইফেল-ধারী দারওয়ান।'

পরেশ কি বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ দরজায় প্রচণ্ড এক ধাক্কা দিয়ে সুপ্রকাশ ঢুকল। সেই সঙ্গে চমকে উঠল সবাই। ম্যানেজার ভবদেববাবু প্রতিবাদের সুরে কি বলতে যাচ্ছিলেন, সুপ্রকাশ পা দুটোকে ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগিয়ে এল, একখানা ভাঙ্গা টুলে ধপ করে বসে বললে, 'হয়েছে, হয়েছে মশাই, দরজা আপনার ভাঙে নি, একেবারে রাজবাড়ীর পেছনের দরজা, সেব একদিন আপনার এই উয়ে-খাওয়া বাড়ী তুড়ি মেরে উড়িয়ে।' একটা পায়ের ওপর আর একটা পা তুলে দিয়ে জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে বললে, 'বেশ ত জাঁকিয়ে বসেছেন দেখছি, আজকের সাবজেক্ট-টা কি ? অন্যান্য মেম্বররা কোথায় ? কেউ টাকা আর কেউ মেয়ের স্বপ্ন দেখছে বুঝি ?' সুপ্রকাশ তালিমারা জুতোগুলোকে প্রায় একদিকে ছুঁড়ে মেরে বললে 'মৃত্যু বাবু, আজ আপনার অফিসে একবার ঢুঁ মারব, কোথায় না আপনার অফিসটা ? আপনি আমায় বলেছিলেন, আমি স্রেফ ভুলে গেছি।'

মৃত্যুঞ্জয়বাবুকে ঐ নামেই সে প্রথম থেকে ডাকতে আরম্ভ করে, একদিন বলেছিল—'আপনাকে দেখলেই সোণাগাছি শ্মশানের সেই কাঙালীবাবুকে মনে পড়ে। মরে ভূতে আছে, অনেকটা আপনার মত ভুঁড়ি। তা ছাড়া বেজায় বড় আপনার নাম, একটু শর্টকাট করা গেল, কি বলেন ?' মৃত্যুঞ্জয়বাবু দু'দিনেই ছোঁড়াটাকে টের পেয়েছিলেন, দেখলেন, ঘাঁটিয়ে লাভ নেই, সুপ্রকাশের গলায় ঠাট্টার সুরটা সেদিন মৃত্যুঞ্জয়বাবুর কাণ এড়ায় নি! কিন্তু, তাঁকে বলতে হয়েছিল, 'তাতে আর কি হয়েছে, আপনার যে নামে খুশী আমায় ডাকবেন।'

সুপ্রকাশ কপালের চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে বললে, 'দেখুন মৃত্যুবাবু, সেদিন কে বলছিলেন আপনার সব বোগাস্, আফিস-টাফিস সব ভাঁওতা, কে না কি আপনার সেই সাতাত্তর নম্বর নলিনী সেট্ রোড ঘুরে এসেছে, প্রকাণ্ড মোষের আড্ডা! আচ্ছা ঠিক করে বলুন তো আপনি কি করেন ?' সুপ্রকাশ অদ্ভুত বিশ্রীভাবে হাসতে লাগল, আর কোঁচার হাওয়ায় দূর করতে লাগল তার শ্রান্তি।

উত্তরটা যে অত্যন্ত রূঢ় হবে, এ-ই সকলে আশা করেছিলেন। ভবদেব মৃত্যুঞ্জয়বাবুকে সমীহ করতেন, নরহরি আশা করত জীবিকার সংস্থান। তারা দু'জনেই সুপ্রকাশের ওপর বিরূপ হয়ে উঠল। কণ্ঠ যথাসম্ভব মোলায়েম করে মৃত্যুঞ্জয়বাবু বললেন, 'ওখানে খুঁজলে পাবেন কি করে ? নলিনী সেট্ রোড থেকে আফিস ত কটন ষ্ট্রীটে উঠে এসেছে।'

সুপ্রকাশ তখনও মুচকে হাসছিল। দি পবিত্র হিন্দু হোটেলে সে-ই সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ। জোয়ান ছেলে, বছর পঁচিশ হবে বয়েস। হাসিমুখে কথা বলে। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, জীবনের কোন সমস্যার ধার ধারে না। মনে কোন জিজ্ঞাসা নেই, হৃদয়ে নেই কোন আবেগ।

প্রায় সকলেই চুপ। মৃত্যুঞ্জয়বাবুর মুখ দেখলে মনে হবে পরাজিত খেলোয়াড়, নিরুৎসাহ, ভগ্নমনোরথ। খড়ম পায়ে দিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন হঠাৎ, বললেন, 'বসুন আপনারা, সেরে আসি কয়েকটা কাজ।' তিনি প্রস্থান করলেন। সুপ্রকাশ তাঁর পরিত্যক্ত আসনে একটা পা তুলে দিয়ে বললে, 'আ! কি আরাম! বাইরে যেখানেই যাই, বুঝলেন ভবদেববাবু, আপনার এই স্বাস্থ্যনিবাসে ফিরে না আসা পর্য্যন্ত মনে আর স্বস্তি নেই। বিড়ি-টিড়ি আছে ? বার করুন দিকি একটা!'

'আপনি আবার বিড়ি ধরলেন কবে ?' পরেশ লাহিড়ী এতক্ষণে কিছু বলবার সুযোগ পেয়েছে, 'গোড়ায় গোড়ায় ত দু'একটা সিগ্রেটে টান দিতেন!' পরেশ ভাবলে, বেশ একটা-গুখি মার মারা গেছে।

গায়ের শার্টটা একটানে খুলে ফেলে সুপ্রকাশ বললে 'পুঁজি ফুরিয়েছে, অবস্থা খারাপ ; না হলে বুঝছেন না আপনাদের মত লোকের কাছে বিড়ি চাইছি? যাদের রোজ পেট ভরাবার জন্যে পাঁচটি পয়সাও জোটে না!'

নরহরি কোনদিনই কাপ্তেনি করতে যায় নি, দুঃখটাকে সে স্বীকার করে নিয়েছে, মানসিক উৎকর্ষ তার সূক্ষ্ম নয়, বাক্যের তীক্ষ্ণতা তাই তাকে স্পর্শ করল না। কিন্তু, পরেশ একেবারে দপ করে জ্বলে উঠল। ভবদেব বাবুর খাতায় তার রীতিমত একটা ধার, অবশ্য ব্যাপারটা শুধু ভবদেব বাবুরই জানবার কথা। 'কয়েকটা টাকা ধার দেখেই আঁৎকে উঠছেন? বড়লোকদের সঙ্গে মেশেন নি কি না, তাই তাদের হাল-চাল সম্বন্ধে ওয়াকিব-হাল নন, ধার করাই ওদের ফ্যাসান, বুঝলেন?'

সুপ্রকাশ আবার সেই মুচকে হাসতে লাগল, ঘামে তার গেঞ্জিটা ভিজে গেছে। 'কথাবার্ত্তা একটু বলতে শিখুন, গেঁয়ো অভ্যাসগুলো ছাড়ুন।' সুপ্রকাশ অন্য পা-টাও তুলে দিলে চেয়ারে। 'রোজ দু'মাইল রাস্তা হেঁটে গিয়ে খবরের কাগজে চাকরীর বিজ্ঞাপন দেখে দেখেই ত দু'মাস কাটিয়ে দিলেন, চলুন না একবার মামার কাছে নিয়ে যাই ; আমি বললে একটা সুহারা তিনি করে দেবেনই!'

'কে? আপনার সেই কাল্পনিক মামা?' ওর হাসি তখনও অক্ষুণ্ণ, 'যার মেয়ে আপনাকে মোটরে চড়ায়? সাহেবি হোটেলে খানা খাওয়ায়?'

'দেখুন, মুখ সামলে আপনি কথা কইবেন, বুঝেছেন?' পরেশ লাহিড়ীর নাসিকা স্ফীত হতে লাগল।

'বেসামাল কোনখানটায় দেখলেন?' সুপ্রকাশ মিষ্টি করে বললে, 'জিজ্ঞাসা করে দেখুন না, এই ত নরহরিবাবু, ভবদেববাবু রয়েছেন, আপনি এ গল্প এদের কাছে কতদিন করেছেন!'

ওর মোলায়েম কণ্ঠস্বর শুনে পরেশ তাকে পেয়ে বসল, বারুদের মত ফেটে গিয়ে বললে, 'বলেছি ত কি হয়েছে? ঠাট্টার কি পেলেন আপনি?' 'পাগল হয়েছেন আপনি? বড়লোকের ভাগ্নেকে ঠাট্টা করবার মত আস্পর্দ্ধা আমার আছে না কি? কিন্তু, লজ্জিত হচ্ছি আপনার জন্যে। গলার শব্দটা সংযত করবার অভ্যেস করুন না কেন? ভাল হবে।'

পরেশ লাহিড়ী হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'ভবদেববাবু, আমি এ-সব কথার প্রতিবাদ করি; যত সব জঞ্জালকে আপনি এখানে রেখেছেন! না জানে কথা বলতে, না জানে ব্যবহার। আমি বিকেলেই এখান থেকে চলে যাচ্ছি!' পরেশ লাহিড়ী সেখান থেকে প্রস্থান করলে।

নরহরি লোকটার ওপর অনেক দিন থেকে খাপ্পা হয়েছিল, মনে মনে একটা গোপন বাসনা সে পোষণ করত, যদি একটা চাকরী তার যোগাড় হয়ে যায়, তা হলে এক চোট দেখে নেবে পরেশ লাহিড়ীকে।

ভবদেব বড়লোকের ছেলেকে হাতছাড়া করতে চায় না, সুপ্রকাশকে সে বললে, 'আপনার অমন করে ভদ্রলোককে বলা উচিত হয়নি, আপনারা এমন ঝগড়া-ঝাঁটি করলে আমার এখানে আপনাদের কি করে রাখি বলুন?'

সুপ্রকাশ হেসে উঠল, 'আপনি আবার রেখেছেন কোথায় আমায়?' সে কণ্ঠে বিস্ময় এনে বললে, 'আমিই ত আছি পয়সা খরচ করে। রেখেছেন ঐ লাহিড়ীকে, যে তিনমাসের খাই-খরচা যোগাড় করতে পারে নি, আরও কয়েকজনকে—যাদের নাম আমি বলতে চাইনে।' নরহরি উসখুস করতে লাগল। 'আমাকে রাখবার বা না রাখবার আপনার সাধ্য কি? যতদিন খুসী থাকব, যেদিন ইচ্ছে পাততাড়ি গুটোব ; সেদিন আর আপনার সামর্থ্যে কুলোবে না ধরে রাখবার!'

ভবদেব বললে না কিছু। হোটেলে একটিমাত্র লোক নগদ পয়সা দেয়, সে হচ্ছে সুপ্রকাশ। আর, বাসিন্দাদের মধ্যে কয়েকজন ছাড়া প্রায় সকলেই এই প্রিয়দর্শন যুবকটিকে পছন্দ করে। সকলের সঙ্গে মিষ্টি করে কথা বলে ও। কিন্তু, সহবাসীদের দুর্ব্বলতা, হীনতা এবং অজ্ঞতা নিয়ে ঠাট্টা করতেও ছাড়ে না। ওর কণ্ঠ সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন এবং দুর্দ্দান্ত হয়ে ওঠে এই লোকগুলির স্বভাবজাত শঠতার বিরুদ্ধে। এ-টুকু ও বুঝতে পারে, তাদের এ পরিবর্ত্তনের জন্য তারা দায়ী নয়। কিন্তু, সামাজিক রীতি

সৃজন করবার এবং প্রচলিত নীতির বিরুদ্ধতা করবার সাহস যাদের নেই, তাদের সুপ্রকাশ ক্ষমা করতে পারে না। দোষ করে অনুতপ্ত হওয়া পাপ, কাজ করে কপাল চাপড়ান মূর্খতা। প্রয়োজন থেকে বিবেক যেখানে বড়, সেখানে সুপ্রকাশের ঘৃণা এবং অবহেলার আর শেষ নেই। প্রয়োজন যে মেটাতে পারবে না সে কাপুরুষ; সুযোগ থেকে নীতি যার কাছে বড়, সে কখনও এ পৃথিবীতে দাঁড়াবার স্থান পায় না। সুপ্রকাশ এ সব বিশ্বাস করে, বোধ হয়।

বিপ্রহরে আহারের পর সকলেই শয্যাগ্রহণ করেছে। এ সময়টা অন্যদিন সকলেই বাইরে থাকে। যাদের প্রভু আছে তারা ছোটে দাসত্ব করতে, আর যাদের প্রভু নেই তারা ছোটে খোঁজ করতে। সকলেই নিদ্রাটুকু বেশ উপভোগ করে। হঠাৎ নীচে থেকে প্রচণ্ড একটা কোলাহলের শব্দে সবাই বিরক্ত হয়ে উঠে বসল।

গোলমাল উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। শোনা যাচ্ছে, পরিচারিকা রাসমণির কণ্ঠস্বর। আর একজনের গলা, কার ঠিক বোঝা গেল না।

প্রায় সকলেই নীচে এল। অফিস-ঘরে রীতিমত বচসা হচ্ছিল হারাধন আর রাসমণির সঙ্গে। হোটেলে ঐ হারাধনই সর্বাপেক্ষা নিরীহ এবং শান্ত, মিতভাষী এবং নম্র। কিন্তু, আজ তাঁর অন্য রূপ। চোখে আগুন। এক মিনিটে চার শ' আশীটা কথা তুবড়ির মত ঝরে পড়ছে তাঁর মুখ থেকে। রাসমণির কোমরে আঁচল জড়ান। গৌরাঙ্গী, জোয়ান শরীর, বয়স বছর ত্রিশ। বিষয়-বস্তু হচ্ছে, রাসমণি হারাধনের নিকট একটা টাকা পাবে, সে টাকাটা তার আজই দরকার। কয়েকবার তিনি তাকে ফিরিয়েছেন, আজ টাকা সে নেবেই। হারাধন বলতে চান, মেয়ে শয়তান এবং জোচ্চোর, খামোকা তাকে অপদস্থ করে টাকা আদায় করবার ফন্দী। রাসমণির বক্তব্য, টাকা পাবে বলেই চাইতে তার শরম নেই এবং টাকা সে আদায় করবেই।

'দূর!' বলে সুপ্রকাশ দু'জনকে ঠেলে বেরিয়ে এল। এ তুচ্ছ ব্যাপারে মধ্যস্থতা করবার তার সময় নেই।

খাটিয়ায় শুয়ে শুয়ে সে সমস্যার সমাধান করবার চেষ্টা করছিল। টাকা তার ফুরিয়েছে, কাল থেকে আর খরচ চলবে না। নিজের ওপর বিশ্বাস ছিল তার অগাধ, তাই আত্মীয়দের উপদেশ অবহেলা করে সামান্য পুঁজি নিয়ে গৃহত্যাগ করেছিল। জীবন-যুদ্ধে পরাজয় সে স্বীকার করবে না, এই ছিল তার পণ। কিন্তু, আজ চারমাস সে তদারক করেছে, উমেদারি করেছে, খোসামোদ করেছে, সহ্য করেছে অবহেলা এবং অপমান, উপহাস এবং বক্রোক্তি কিন্তু জীবিকার সংস্থান করতে সে পারে নি। এক এক সময়ে সে আশ্চর্য্য হয়ে যায়, লেখাপড়া শিখেছে, স্বাস্থ্যবান্, বুদ্ধিমান্; অন্নের জন্য পরিশ্রম করতে রাজী; কিন্তু তবু কোথায় অন্ন?

সুপ্রকাশ সিঁড়ি বেয়ে উঠছিল। একজোড়া জুতো, একটা শার্ট তার না কিনলেই নয়। সাবানের অভাবে পরিচ্ছদ অভদ্রজনোচিত হয়ে দাঁড়িয়েছে, পয়সায় কুলাতে না পেরে দাড়ি কামাবার দিন দিয়েছে বাড়িয়ে। এক পয়সার ছোলা তার তিন দিনের জলখাবার, তার রাসমণি আর হারাধনের কাহিনী শোনবার সময় কোথায়?

সিঁড়ির শেষ ধাপে পা দিয়ে তার বুকের মধ্যে হঠাৎ ধক্ করে উঠল; মেরুদণ্ডের মধ্যে বয়ে গেল একটা ঠাণ্ডা স্রোত। নিজের চোখকে সে বিশ্বাস করতে পারলে না; পায়ের কাছে একখানা ভাঁজ-করা দশ টাকার নোট। সে তাকাল চার পাশে, নেই কেউ কোন দিকে, নীচে কোলাহলের শব্দ। মরুক গে আজ পৃথিবীর সমস্ত লোক! তার কাজ কি মাথা-ব্যথায়। মুঠোর মধ্যে শক্ত করে নোটখানা ধরে তার মনে হল সে রাজা। ছুটে এল নিজের ঘরে। অন্য দুখানি শয্যা খালি; তারা নীচে গেছে ঝগড় দেখতে। মুঠোর ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখল, নোটখানা ঠিক নিয়ে এসেছে ত? ফেলে আসেনি-ত তাড়াতাড়িতে! কোথায় রাখা যায়? কয়েকটি গুপ্ত স্থানের উপর তার দৃষ্টি বিচরণ করল, নাঃ! দরকার কি অত ঝামেলায়? বেঁধে ফেলা যাক কোঁচায় খুঁটে। কাপড়ের খুঁটে বাঁধবার আগে সে সন্তর্পণে নোটের ভাঁজ খুলে ফেলল, জাল নয় তো? ভাঁজ খুলতে দেখা গেল নোট একখানা নয়, দু'-খানা। সুপ্রকাশের হাত কাঁপতে লাগল। বাপ্! এ যাত্রা

বেঁচে গেল সে! অন্ন, পরিচ্ছদ, পারিপাট্য সবকই তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

শয্যায় গা এলিয়ে দিয়ে সে চোখ বন্ধ করে ভাবতে লাগল, কি কি কিনবে, কত খরচা পড়বে। এখুনি খোঁজ পড়বে নিশ্চয়ই, হৈ চৈ পড়ে যাবে, তা যাক্। সে কি করবে? পৃথিবীতে এমন বোকা কেউ নেই যে, ঐ মহামূল্য জিনিষ ফেরৎ দিবে। আর, তার নিজের সম্বন্ধে সব চাইতে বড় কথা, প্রয়োজন। অর্থের যে মালিক তার যদি অনেক কষ্টের রোজগার হয়? হোক্ না। রোজগার করতে ত কষ্টই হয়, কিন্তু বৌ-এর চটুল একটা দৃষ্টি এবং মোহিনী একটু হাসির জন্যই হয়ত সে এক লহমায় টাকাটা দোকানে খরচ করে আসত। কিন্তু, সে তুলনায় তার প্রয়োজন কত অধিক। না, না, ও সব কোন বাজে যুক্তি সে শুনবে না। মনকে সে চোখ রাঙাল। এ মুহূর্ত্তে সে ঐ টাকাটা ছাড়া নিজেকে কল্পনাও করতে পারে না। আশ্চর্য্য! ভাগ্য তার হঠাৎ এমন সুপ্রসন্ন কেন হল, সে বুঝে উঠতে পারল না।

নীচে কোলাহল থামল। মেম্বররা সব ওপরে আসছে। তাদের পায়ের শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সুপ্রকাশের বুকের মধ্যে। সে প্রায় ঘেমে উঠল। পাঞ্জাবীটা গায়ে চাপিয়ে এক মিনিট আগেও সে বেরিয়ে যাবে ভাবছিল, কিন্তু অসাড় নিস্পন্দের মত পড়েই রইল কান খাড়া করে। এখুনি আর একটা ভীষণ গণ্ডগোল উঠবে। উঠুক। সে তার কি জানে? যে লোকটা সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে বুক চাপড়াবে, সে তাকে গিয়ে বলবে, হা হুতাশ করলে টাকা অমনি আশমান থেকে উড়ে পড়বে না, যান সবাইকে এক এক করে জিজ্ঞেস করুন; বাক্স-প্যাটরাগুলো একবার খোঁজ করুন, দেখেছেন বিছানা-বালিশ সব? তা হলে এখানে নেই; কোথায় বাইরে ফেলে এসেছেন তার ঠিক নাই, যান এখন ধেই ধেই করে নাচুন গে! এখনও পয়সা চিনলেন না, মশাই! দু'দু-খানা নোট। সুপ্রকাশ সেই অজ্ঞাত অভাগাকে আর কি বলা যায় ভেবে পেল না।

"কি মশাই ঘুমুচ্ছেন না কি?" কন-ঘেঁট বনবিহারী জিজ্ঞেস্ করল। সুপ্রকাশের প্রায় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। আচ্ছা বোকা সে! সবাই নীচে গেছে আর সে কি না বিছানায়, এতেই ত সন্দেহ হবার কথা। কিন্তু, এখন সাড়া দেওয়া মানে ধরা দেওয়া। 'কি মশাই! আপনি ত আচ্ছা কুম্ভকর্ণ দেখছি। ঘুমোচ্ছেন না ঘুমের ভাণ করে পড়ে আছেন?' এই রে! সেরেছে। সুপ্রকাশ একেবারে মরে গেল, বনবিহারীটা নোট তুলে নেবার সময় নিশ্চয়ই পেছন থেকে দেখে ফেলেছে! 'ও মশাই!' বনবিহারীর কণ্ঠ উচ্চতর হল। সুপ্রকাশ ধড়মড় করে উঠে বসল, 'কি হয়েছে, কি?' সে রাগান্বিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস্ করল, 'একেবারে ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছেন কেন? কাল রাতে এক ফোঁটা ঘুম হয়নি। কি হল কি? নীচে যেন কারা সব কথা-বার্ত্তা বলছে, দুপুরে কি চুরি-টুরি হল না কি? কলকাতা সহর!'

'না মশাই!' বনবিহারী প্রায় উৎফুল্ল কণ্ঠেই বললে, 'আপনি চুরির স্বপ্ন দেখেছেন, এ দিকে কি যে রগড়ের ব্যাপার…ছি ছি ছি!' কি ভয়ানক রকম কুৎসিত লোকটার হাসি। শৈশব থেকে এ লোকটার দাঁত বোধ হয় ক্ষয় হয় নি কখনও, তার ওপর পান এবং জর্দ্দা।

'দুত্তোর মশাই রগড়', সুপ্রকাশ আবার শয্যা গ্রহণ করল।

'বুঝলেন প্রকাশবাবু, এ দুনিয়ায় মানুষ চেনা ভার', পানের ডিবে খোলবার শব্দ হল। আরও কি বলতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু নরহরি হঠাৎ ঘরে ঢুকে বললে, 'সর্ব্বনাশ হয়েছে!' নরহরি এ-ঘরেই থাকে। 'কত আশা করেছিলাম, সমস্ত আশায় আমার ছাই পড়ল!' সুপ্রকাশ শক্ত হয়ে উঠে বসল বিছানায়; অলক্ষ্যে একবার কাপড়ের তলায় নোট দুখানা স্পর্শ করল। নরহরির জন্যে হঠাৎ অন্তর তার সহানুভূতিতে পূর্ণ হয়ে গেল এক মুহূর্ত্তে। কিন্তু, যাক্ না ও উচ্ছন্নে। সুপ্রকাশের তাতে কি? বুঝি টাকার জন্যে ওর ত আর ফাঁসি হচ্ছে না বা যাবজ্জীবন দীপান্তর হবারও ত সম্ভাবনা নেই। ওসব পচা সেন্টিমেন্ট তার নেই, সে নিজে ত আর বিদ্রোহ করতে পারে না।

'কি, হল কি আপনার?' কণ্ঠে যথাসম্ভব আন্তরিকতা বজায় রেখে সুপ্রকাশ জিজ্ঞেস্ করল।

'আর বলবেন না মশাই !' নরহরি মাথায় হাত দিয়ে খাটিয়াতে বসে পড়ল। 'ভাগ্য আমার চিরকালই এমনি !' তুমি গোল্লায় যাও, সুপ্রকাশ মনে মনে বললে। 'যে ভরসায় কলকাতা ছিলাম, সে ভরসা আজ আমার ধূলিসাৎ হল !' নরহরি তার লম্বা চুলের মধ্যে সরু রোগা আঙুলগুলো ঢুকিয়ে দিলে। 'সব স্বপ্ন আমার ভেঙ্গে গেল !' নরহরির দীর্ঘশ্বাসে বনবিহারীর হৃদয়ে মোচড় দিয়ে উঠল।

সুপ্রকাশ ক্ষেপে গেল, ইচ্ছে হল নরহরির গালে ঠাস্ করে এক চড় কসিয়ে দেয় ! বলে ফেল না বাবু দু'খানা নোট তোমার হারিয়েছে। 'কি মশাই ! বেশ ত কাব্যি করছেন দেখছি বসে বসে, হাঁড়িটা একবার ভাঙুন না, সাপ আছে না ব্যাং আছে। কি, হয়েছে কি আপনার !'

'সব গেছে !' হতাশ কণ্ঠে নরহরি উত্তর দিলে।

'কত টাকা ?' সুপ্রকাশ কঠিন কণ্ঠে জিজ্ঞেস্ করল।

'সমস্ত ! শাশুড়ী ঠাকরুণ সাত চল্লিশ বছর বয়সে একটি পুত্র-সন্তান প্রসব করেছেন। এমন বেহায়া মশাই মেয়েগুলো, আজ ন বছর ধরে অপেক্ষা করে আছি বুড়ো-বুড়ী কবে চোখ উল্টোবে, বাড়ীখানা আর নগদ হাজার দশেক টাকা ! তা না বিয়োলেন এক চামচিকে !'

সুপ্রকাশ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। পরমানন্দে সে জিজ্ঞেস্ করল, 'আপনার স্ত্রী-ই বুঝি তাঁদের একমাত্র সন্তান ছিলেন ?'

নরহরি তখন শয্যাগত। ক্ষুধার্ত্ত টিকটিকির মত সে ঝিমুচ্ছে।

৩

এক মুহূর্ত্তের জন্যে ট্রেনকলিশান হয়; যুদ্ধে বীরের পরাজয় ঘটে, প্রণয়ীর শেষকথা কখনও বলা হয় না। সুপ্রকাশ আর বিলম্ব না করে মলিন পাঞ্জাবীটা গায়ে দিয়ে নিয়ে নিলে; সাবধানে জুতোজোড়া ঢোকালে পায়। কিছু নেই আর বেচারী পাদুকার। আজকের দিনটা কোন রকমে চালিয়ে নিতে হবেই, কাল থেকে ত নূতন জুতোর ধার ভাঙতে হবে। দাড়িটা কাল কামিয়েছিল বলে রক্ষা, না হলে লোকে তাকে কি ভাবত সে জানে।

সিঁড়িতে পরেশের সঙ্গে দেখা। 'কোথায় চললেন ?' সে জিজ্ঞেস্ করলে।

'সময় নেই বাৎচিৎ করবার,' সুপ্রকাশ নামতে নামতে উত্তর দিলে, 'আজ যাবেন না আপনার সেই বালীগঞ্জের মামার বাড়ী, সেই বুলী, না বুলু ; দেখবেন ফুল ফুটিয়ে না দেয়।'

পরেশ কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সুপ্রকাশের শোনবার সময় নেই ; সে নীচে নেমে এল। যাক্ ! আর আটকায় কে ? পাশের ক্ষুদ্রাকৃতি ঘরটার দিকে তার নজর পড়ল। বাণেশ্বরবাবু উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, বিশেষ কোন শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করছেন। সুপ্রকাশ না ঢুকে পারলে না ঘরে। জুতোর শব্দে বাণেশ্বরবাবু চোখ তুলে তাকাল।

'কি হল আপনার ?' সুপ্রকাশ জিজ্ঞেস্ করল, 'অমন করে পড়ে আছেন যে ?'

বাণেশ্বরবাবু কোন উত্তর দিল না ; শূন্যদৃষ্টিতে সুপ্রকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। সুপ্রকাশের মনে আনন্দের সীমা নেই, সে কারুর দুঃখ আজ সহ্য করতে পারবে না। 'কি হয়েছে বলুন না ? অসুখ করেছে ?'

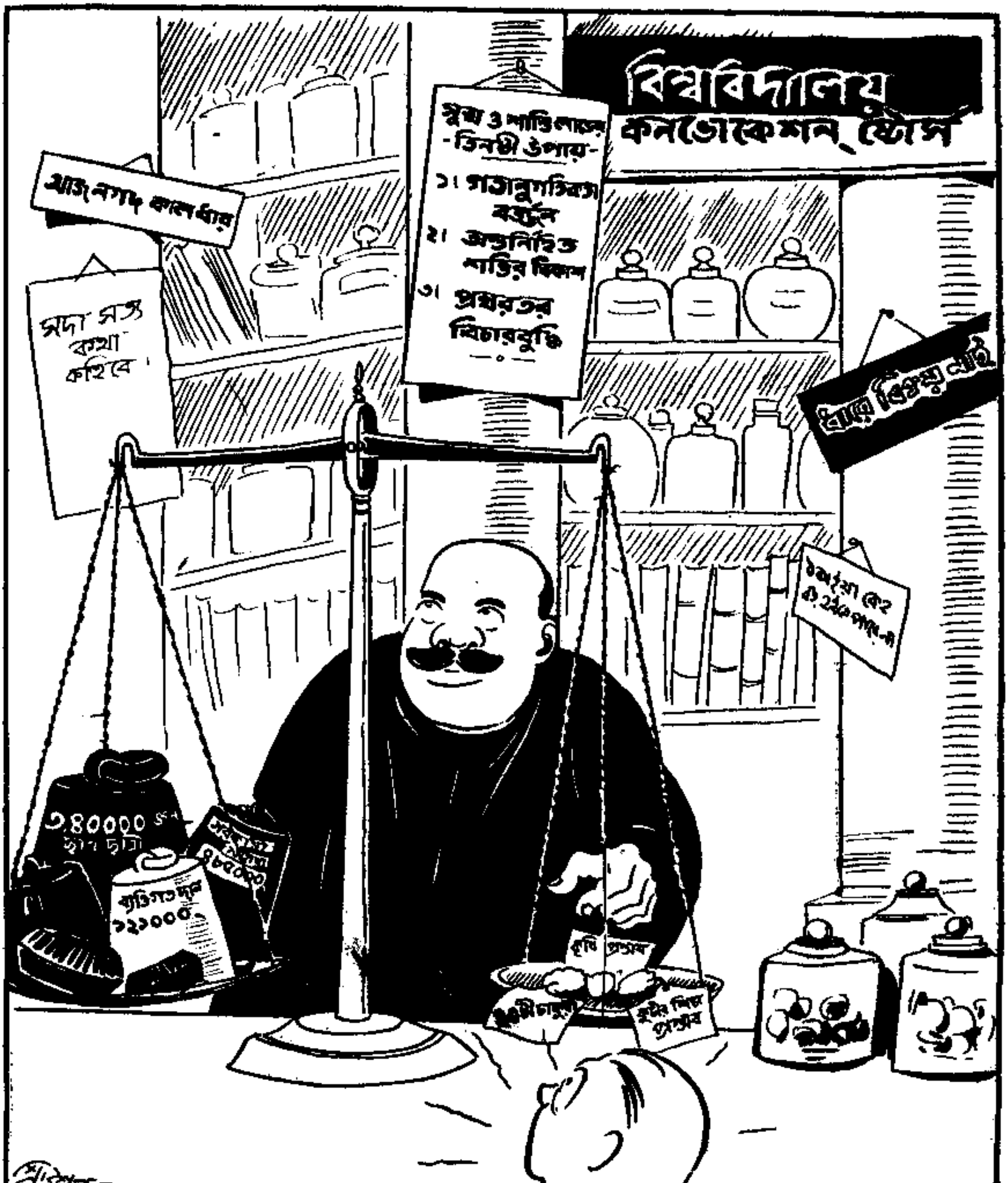
বাণেশ্বরবাবু বালিশের পাশ থেকে মেয়েলি হাতের লেখা একখানি চিঠি সুপ্রকাশের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, 'নিন, পড়ুন শেষের দিক্‌টায় !'

সুপ্রকাশ পড়ল :

"আজও তোমার টাকা পেলাম না, টুনির আজ পাঁচ দিন জ্বর, এক ফোঁটা ওষুধ মুখে ছোঁয়াতে পারি নি। ভরত কোবরেজ পষ্ট বলে দিয়েছে বিনি পয়সায় আর ওষুধ দিতে পারবে না। টাকার অভাবে ছোট্ ঠাকুরপোর স্কুল থেকে নাম কাটা গেছে, মুদির দোকানে অনেক ধার হয়ে গেছে, সে আর জিনিষপত্র দিতে চাচ্ছে না। এর ওপর মা বলছেন, টাকা তুমি পাঠিয়েছ, আমি লুকিয়ে রেখেছি। পত্রপাঠ টাকা পাঠাবে, নচেৎ দুর্দ্দশার আর সীমা থাকবে না। তুমি আমার শত সহস্র কোটি নমস্কার গ্রহণ কর।

ইতি শ্রীচরণে প্রণতা সুবালা !"

নিক্তির ওজন

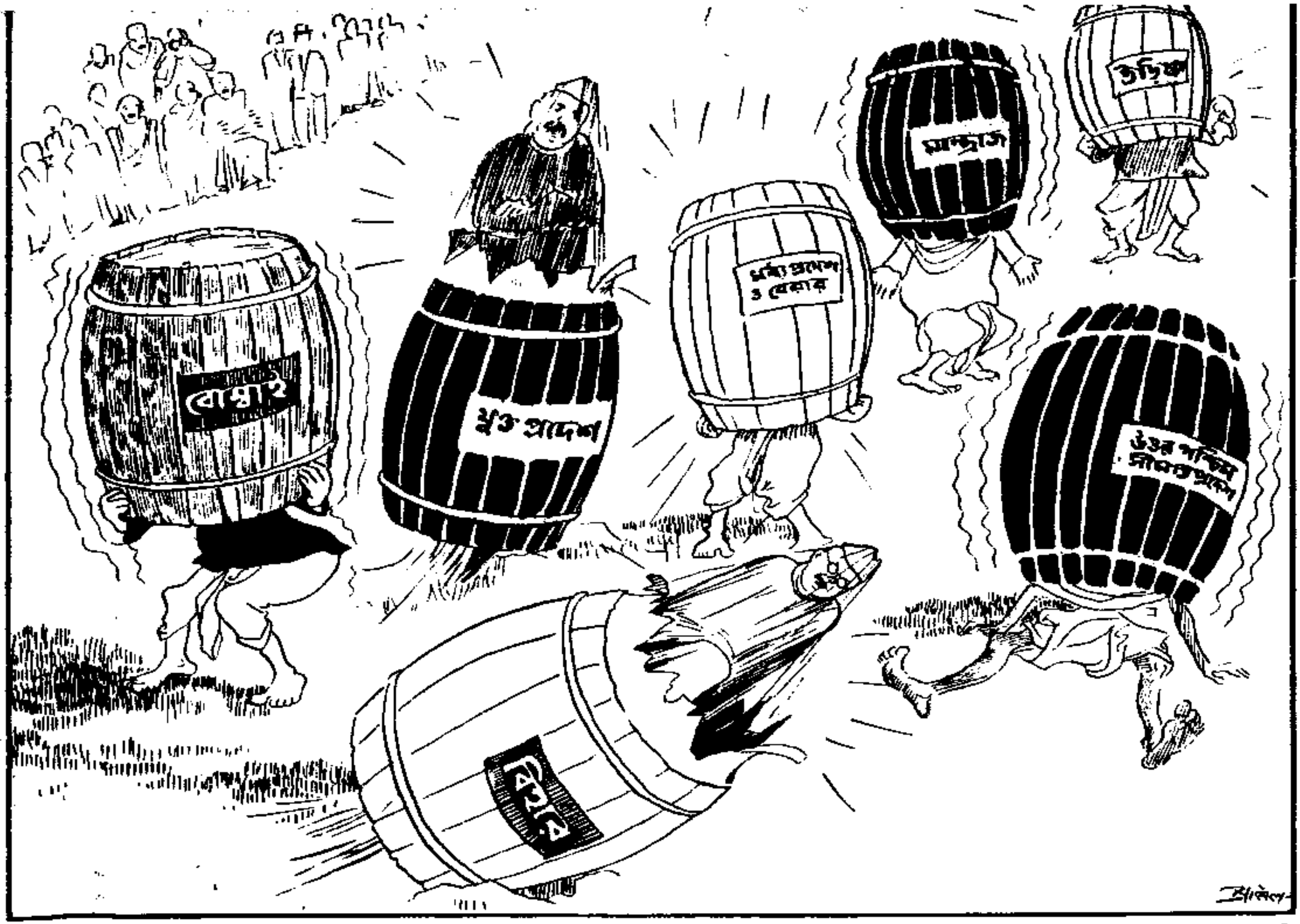


এক দিকে ৩ লক্ষ ৪০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী, অন্য দিকে ৪০টি চাকুরী,

এক দিকে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা সরকারী সাহায্য, ব্যক্তিগত দান এবং পরীক্ষার ফি প্রভৃতির আয়,

অন্য দিকে কৃষি ও কুটীর-শিল্পের প্রস্তাব—

কিন্তু নিক্তির ওজন সমান! মূল-মন্ত্র দেখিয়া দোকানীর নিষ্ঠায় সন্দেহ করিবে কে?



[অষ্ট্রাকুল প্রেসের অনুকরণে]

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ঝান্সীর এক জনসভায় কংগ্রেস-কর্ম্মিগণকে লক্ষ্য করিয়া পণ্ডিত জওহরলালের উক্তি—গবর্ণর ও মন্ত্রিগণের মধ্যে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইলেও মন্ত্রিগণ পদত্যাগ না করিয়া একটি প্রথম শ্রেণীর সঙ্কট সৃষ্টি করিতে পারিবেন!...ইহা কি 'তৃতীয় শ্রেণী'র সঙ্কট?

'আপনার স্ত্রীর চিঠি?' সুপ্রকাশ চিঠিখানা ফেরৎ দিয়ে বললে।

'হাঁ, দেখুন একবার কপাল, টাকাটা পাঠাব পাঠাব করে আজ চারদিন ধরে পকেটে পকেটে ঘুরছে। আর আজই গেল। যা মাইনে পেয়েছিলাম তার সবই গেছে ধার শোধ করতে। আর ছিল ওই সম্বল। গোটা পাঁচেক টাকা আমি রাখতাম। দেখুন না নীচে জুতোজোড়া, এক জোড়া জুতো, একটা শার্ট এবার না কিনলে আর ইজ্জত থাকে না। ওঃ আরও যে কত টুকি-টাকি জিনিষ কেনবার ছিল।' বাণেশ্বর বালিশে মুখ লুকালেন। সুপ্রকাশ চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে ঘুরে দাঁড়াল। বললে, 'নিন মশাই, উঠুন। সামান্য কুড়ি টাকার জন্যে এত মুষড়ে পড়লে চলবে কেন? জীবনে অনেক কুড়ি টাকা রোজগার করবেন।'

'আপনি জানেন, না সুপ্রকাশবাবু, কুড়ি টাকা আমার কতখানি; এই এ-জামাটার পকেটেই ছিল, আশ্চর্য্য! কেমন করে যে গেল ভেবে পাচ্ছি না, কখনও একটা আধলা আমার চুরি যায় নি!'

'খুঁজে পেতে একবার দেখুন না চারদিকে, যাবে কোথায়? জামার পকেট কটা দেখেছেন ত ভাল করে? বালিশের নীচে নেই ত?' সুপ্রকাশ দরজার বাইরে তাকাল; ভবদেব হিসাব দেখছে।

'না, না মশাই, কোথাও নেই!' বাণেশ্বর গোঁ গোঁ করে উঠল, 'সব আমি দেখেছি, ঘরের কোথাও নেই; হায় ঈশ্বর!'

সুপ্রকাশ হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল। বাণেশ্বর উঠল চমকে। হাসি তার থামে না, শরীর তার দুলতে লাগল। হাসতে হাসতে বসে পড়ল বাণেশ্বরের চৌকিতে।

'কি হল? হঠাৎ অমন করে হাসছেন যে!' বাণেশ্বর বিস্মিত হল।

'নিন, নিন মশাই! আপনি একটি আস্ত গর্দ্দভ!' সুপ্রকাশ দু'খানা ভাঁজ-করা নোট স্তম্ভিত বাণেশ্বরের হাতে গুঁজে দিলে। তার চোখের অদ্ভুত দৃষ্টিতে বাণেশ্বরের উদ্ভ্রান্ত আনন্দ স্তব্ধ হয়ে রইল। 'আপনি একটি পয়লা নম্বরের ইডিয়ট,' সুপ্রকাশ অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলে চলল, 'কাণ্ডজ্ঞান নেই, একেবারে বোগাস, একটি ভ্যাগাব্যাণ্ড!'

সুপ্রকাশের সমস্ত মুখে এক বিন্দু হাসি নেই, মুখের প্রত্যেকটি রেখা তার স্পষ্ট, কঠিন, নির্দ্দয়। নিজেকে সে সামলে নিলে, কিন্তু জিহ্বা তখনও চলছিল। বাণেশ্বর ভাঁজ খুলে নোট দু'খানা পরম স্নেহে নিরীক্ষণ করছিল, সুপ্রকাশের কর্কশ কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল। 'নিজের অবস্থার কথা ভুলে যাবেন না। আপনার মত গরীবদের তা হলে চলে না, এক পয়সার জন্যে মাথা বুক চাপড়ে মরে!'

কয়েক মিনিটের বিরতি।

দেওয়ালে একটা টিকটিকি পোকা ধরেছে, পোকাটা তার মুখগহ্বরে ছটফট করছিল; সেদিকে তাকিয়ে সুপ্রকাশ মোলায়েম কণ্ঠে বললে, 'ঠিক ভেবেছিলাম টাকা আপনার,' বাণেশ্বর এবার হাসল। 'সাবধানে রেখে দিন, আর খাইয়ে দেবেন মশাই!' সুপ্রকাশও হাসল।

'বাঃ খাওয়াব না?' বলতে বলতে বাণেশ্বরবাবু ট্রাঙ্ক খুলে নোট দু'খানা সন্তর্পণে জিনিষপত্রের সেই গহনতম কোণে লুকিয়ে রাখলেন। 'বাস্তবিক আপনার মত মহানুভব ব্যক্তি চোখে পড়েনি, কি খাবেন বলুন তো? কি পাওয়া যায় বাজারে? গরম মুড়ি? তেল দিয়ে? চমৎকার কিন্তু!'

'ওয়ানডারফুল, সঙ্গে এক পয়সার বেগুনি, না হয় আধ পয়সার ছোলা-ভাজা আনবেন না!'

হিন্দু-মুসলমানে মিলন

...হিন্দু-মুসলমানের আন্তরিক মিলন সম্ভবযোগ্য করিতে হইলে, আমাদিগের মতে সর্ব্বাগ্রে হিন্দু ও ইংরাজের আন্তরিক মিলন, অথবা মুসলমানে ও ইংরাজের আন্তরিক মিলন যাহাতে হয়, তাহার জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রযত্নশীল হইতে হইবে।...

পুস্তক ও পত্রিকা

বিজ্ঞান পরিচয়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম.এ, পি-এইচ. ডি, এস-সি. ডি, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ডি, এস্-সি, পি. আর. এস, কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক প্রণীত ম্যাকমিলান এণ্ড কোং লিমিটেড কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে বাঙ্গালা সাহিত্যের দুটি শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়—সেই কথাই বিশেষ ভাবে বলিব ; আমি বৈজ্ঞানিক নই, বিজ্ঞানের আলোচনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তার প্রয়োজনও নাই। লেখকদ্বয় বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক, বিখ্যাত অধ্যাপক ; কাজেই তাঁদের লিখিত গ্রন্থের বৈজ্ঞানিকত্ব বিনা প্রমাণে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

আমি আজ অন্য বিষয়ের আলোচনা করিব।

বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান পড়াইবার প্রস্তাব যখন বিশ্ব-বিদ্যালয় করিয়াছিল, একদল পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তির আপত্তি ছিল এই যে, এ ভাষা সাহিত্যের উপযোগী, বিজ্ঞানের উপযোগী নয়। অবশ্য বাঙ্গালায় অপাঠ্য পাঠ্য-বিজ্ঞান ছাড়া আর কিছু যখন লিখিত হয় নাই, তখন নিঃসংশয়ে কিছু বলা যায় না ভাবিয়া অনেকে মৌন ছিল, আমার মনেও যে সন্দেহ ছিল না এমন নয়।

এমন সময়ে একদিন বর্ত্তমান গ্রন্থ আমার হাতে পড়িল—পড়িয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম, এ কি করিয়া সম্ভব হইল ! বাঙ্গালা ভাষা সকলের অজ্ঞাতসারে কি শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে, যাহাতে এমন অনায়াসে, এমন অবলীলাক্রমে দুরূহ বৈজ্ঞানিক তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়া কেবলমাত্র গ্রন্থ হইয়া উঠিল না, সাহিত্য হইয়া উঠিল। কিন্তু ইহা কেবল বাঙ্গালা ভাষার গুণ এমন বলিতে পারি না, গ্রন্থকারদের হাতে সাহিত্যের কলম না থাকিলে এ বই হয় তো বিজ্ঞান হইত, কিন্তু বিজ্ঞান-সাহিত্য হইয়া উঠিত না।

দ্বিতীয় সমস্যাটিও আনুষঙ্গিক। বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্ত্তৃক রচিত পরিভাষাকে প্রথমে অনেকে প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই, তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, এই সব নবাগত শব্দ বাঙ্গালা সাহিত্যের আসরে অনধিকার প্রবেশ করিতেছে।

কিন্তু প্রমাণ তখনও বাকি ছিল ; সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ দৃষ্টান্ত ; এই গ্রন্থে পরিভাষার ব্যবহার দ্বারা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, কেমন হাতে পড়িলে নবাগত শব্দ প্রচলিত শব্দের সঙ্গে খাপে খাপে মিলিয়া যাইতে পারে, প্রভেদ বুঝিবার উপায় থাকে না।

এই গ্রন্থে বহু নবরচিত পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ আছে, কিন্তু কোথাও কানে বাধে নাই, মনে খটকা লাগে নাই, বা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় নাই। ইহাও কেবল বৈজ্ঞানিকের দ্বারা সম্ভব হইত না, যদি সঙ্গোক্ত সাহিত্যবোধ লেখকদের না থাকিত।

লেখকদ্বয় উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক সাহিত্য রচনা করিয়াছেন, সে জন্য ধন্যবাদের পাত্র, কিন্তু তাঁহারা যে উপরিউক্ত ধারণা দুটিকে দূরীভূত করিয়াছেন, সেজন্য তাঁরা শিক্ষিত সমাজের সম্বর্দ্ধনার যোগ্য।

আশা করি, তাঁহারা ভবিষ্যতে এই জাতীয় গ্রন্থ আরও রচনা করিয়া যুগপৎ বাঙ্গালা বিজ্ঞান ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবেন।

প্র. না. বি.

রামচরিতম্ পণ্ডিত অযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ কৃত সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত রামপাল-চরিতের সটীক অংশের অনুবাদ সহ বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত সংস্করণ। ইহা শিবাস্মৃতি সমিতি হইতে শ্রীজ্যোতিন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

এই ঐতিহাসিক দ্ব্যর্থবোধক সংস্কৃত কাব্য বাঙ্গালার ইতিহাসের বহু জটিল প্রশ্নের সমাধান করিয়াছে। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে এই মহামূল্য কাব্যের একটি পুঁথি আনিয়া Memoies of the Asiatic Society of Bengal-এর তৃতীয় খণ্ডে তাহা প্রকাশিত করেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রচেষ্টায় এই যুগের বাঙ্গালার ঐতিহাসিক সমস্যার অন্ধকারে যে আলোক সম্পাত হইয়াছিল, তাহার ফলে বাঙ্গালার ইতিহাসের বহু প্রহেলিকার রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। কিন্তু এই কাব্যের বহু অংশ টীকা সত্ত্বেও দুর্ব্বোধ্য থাকিয়া গিয়াছিল এবং একাধিক ঐতিহাসিক কাব্যের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া কল্পনার আশ্রয়ে বহু উদ্ভট সমাধানে উপনীত হইয়াছিলেন। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মূল কাব্যের ও টীকার প্রত্যেক শব্দের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করিয়া বহু কাল্পনিক কথার ভ্রান্তি অপনোদন করিয়া প্রকৃত অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অবশ্য আমরা এ কথা বলিতে পারি না, যে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সমস্ত ক্ষেত্রেই অভ্রান্ত, তবে যতদূর মনে হয়, তিনি পূর্ব্ব হইতে কোনরূপ ধারণার বশবর্ত্তী না হইয়া নিরপেক্ষ ভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৩৫ শ্লোক পর্য্যন্ত মূল পুস্তকের টীকা ছিল, সম্পাদক বহু পরিশ্রমে এই পরিচ্ছেদের অবশিষ্ট ১৫টি শ্লোকের অন্বয় ও অনুবাদ করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ভবিষ্যতে এই কাব্যের আরও দুই একখানি পুঁথি আবিষ্কৃত হইলে, অবশিষ্ট দুই পরিচ্ছেদের ব্যাখ্যাও অনুবাদ করা সহজ হইবে বলিয়া মনে হয়।

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

স্তব সমুচ্চয় (প্রথম প্রবাহ)—উদ্ভটসাগর, কৃত্তিবাস-রামায়ণ, কাশীরামদাস-মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ সম্পাদক শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুইটাকা। প্রায় ৩০০ শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ; নির্ভুল মুদ্রণ, কার্য্যকরী বাঁধাই।

যে যুগ কাটিয়া যাইতেছে, যখন নির্ভুল সংস্কৃত স্তব মুখস্থ করাইয়া মা-দিদিমারা আবৃত্তির অভ্যাস শিক্ষা দিতেন। সুতরাং যে সকল স্তব মা-দিদিমাদের মুখে মুখে ছিল, এ যুগে তাহাদের লিপিবদ্ধ হইবার প্রয়োজন। স্তব সমুদ্রঃ পুস্তক পাঠ করিবার পূর্ব্বে আমাদের এই ধারণা ছিল যে, লেখক ইহা করিয়া ভালই করিয়াছেন। তারপর পড়িয়া দেখিলাম বইখানিতে যে-কঠিন পরিশ্রমের পরিচয় রহিয়াছে, তাহা যে কোন গবেষকের গৌরবের বিষয়। এ দেশে মুদ্রিত এই শ্রেণীর পুস্তক ভুলে পরিপূর্ণ। বর্ত্তমান গ্রন্থে প্রত্যেক শ্লোকের পাঠ, ব্যাকরণ, ভাব, ছন্দ ইত্যাদির বিশুদ্ধিরক্ষার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহাতে পিতৃ-স্তব, মাতৃ-স্তব ইত্যাদি প্রত্যেক হিন্দুর আদরণীয় স্তবসমূহ পাওয়া যাইবে।

ভর্ত্তৃহরি কৃত বৈরাগ্যশতকম্—শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, কর্ণওয়ালিশ্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৸০ আনা। প্রায় ১০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ভাল ছাপা ও বাঁধাই।

সংস্কৃত সাহিত্যে কবি ভর্ত্তৃহরির trilogy নীতি শতকম্, শৃঙ্গার শতকম্ ও বৈরাগ্য শতকম্ সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। কথিত আছে, কবি নিজের জীবন দিয়া বস্তুতঃ যাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহাকেই এই তিনটি কাব্যে অমরত্ব দান করিয়াছেন। ভর্ত্তৃহরি সম্পর্কিত ইউরোপীয় ও দেশীয় পণ্ডিতগণের রচিত গ্রন্থ সাহায্যে বর্ত্তমান পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে। এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের সুলভ সংস্করণ উপস্থিত করিয়া লেখক বাঙ্গালী পাঠককে ঋণপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

রস-সাগর কবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী মহাশয়ের **বাঙ্গালা সমস্যা-পূরণ কবিতা**—শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা। মূল্য ২৲ টাকা। প্রায় ২০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ পুস্তক। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

এ দেশের মজলিসী-বৈঠকী চাল এখন অজ্ঞাত হইয়াছে। দেশের লোক এখন বিলাতী pun ও wit ইত্যাদিতে মুগ্ধ হইতেছি। সংপ্রতি cross word puzzle দেখা দিয়াছে। বর্ত্তমান গ্রন্থের সমস্যাপূরণ বিষয়ক কবিতা-সমূহের পরিচয় যিনি পাইবেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন কি শ্রেণীর সস্তা জিনিষের আমদানীতে আমাদের দেশের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য যাহা কিছু, সব ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া চলিয়াছে।

সমস্যা-পূরণের অর্থ হইতেছে যে, একটি কলি কবিতা বলিলে, তাহাকে সমান্বিত করিবার জন্য একটি সমগ্র রচনা মনে মনে মুহূর্ত্তে তৈয়ারী করিয়া ফেলিতে হইবে। দৃষ্টান্ত :—একজন বলিলেন,

রূপবতী নারী যথা দরিদ্রের ঘরে।

মুহূর্ত্তে পরবর্ত্তী কলি রচনা করিয়া অপর জন বলিলেন,—

ব্যাকরণ বিনা বর্ণি শোভা নাহি ধরে।
রূপবতী নারী যথা দরিদ্রের ঘরে।

এই রস-রচনার সিদ্ধহস্ত কবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীর জীবন-চরিত সম্বলিত এই গ্রন্থে তিন শতাধিক এই রূপ রচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানি এক দিকে যেরূপ আনন্দদায়ক ও উপভোগ্য, অন্যদিকে সেইরূপ বাঙ্গালার ভাবধারার একটি বিশিষ্ট দিকের পরিচায়কও বটে।

সঞ্চয়ন—কাজী মোতাহার হোসেন, এম-এ। প্রকাশক শ্রীশ্যামচন্দ্র দত্ত, সন্তোষ লাইব্রেরী, ঢাকা। মূল্য ১৷০ টাকা। ২৫০ শতাধিক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। আড়ম্বরহীন, রুচিসঙ্গত ছাপা ও বাঁধাই।

বাঙ্গালা ভাষায় এখন চিন্তাহীনতার প্লাবন আসিয়াছে। গল্প, উপন্যাস (অধিকাংশই অপাঠ্য) কবিতা (কচিৎ পাঠযোগ্য) ইহা লইয়াই বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য। এ যুগে চিন্তা করার সময় নাই। ঘণ্টায় ১২০ মাইল বেগে 'খোয়ার' লক্ষ্য করিয়া যে-ট্রেণ ছুটিয়াছে, সকলে মিলিয়া সর্ব্বনাশের যাত্রী সাজিয়া এ যুগে তাহারই প্যাসেঞ্জার। ইহার মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি স্থির ভাবে চিন্তা করিতে বসেন এবং অত্যন্ত শান্ত ভাবে সুযুক্তি দিয়া তাঁহার চিন্তাকে আকর্ষণযোগ্য রূপ দিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি যে আটপৌরে ব্যক্তি নহেন, ইহা বলিতেই হয়। বর্ত্তমান পুস্তক পড়িয়া আমাদের তাহাই মনে হইয়াছে—গ্রন্থকার আটপৌরে ব্যক্তি নন। এখানে সূচিপত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি, কি কি বিভিন্ন বিষয়ে তিনি চিন্তা করিয়াছেন :—লেখক হওয়ার পথে, ঔপন্যাসিক, নবীন সাহিত্যিক, নবীন সঙ্ঘ, এক-জামিনেশন হল, ভুলের মূল্য, অহঙ্কার, সঙ্কেত, কবি ও বৈজ্ঞানিক, উৎসব ও আনন্দ, সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ, বাদ্যযন্ত্রের স্বরতন্ত্রী, বাঙ্গালীর গান, আনন্দ ও মুসলমান গৃহ, শিক্ষিত মুসলমানের কর্ত্তব্য, বাঙ্গালীর সামাজিক জীবন, বাঙ্গালা সাহিত্যের স্বরূপ, সাহিত্যের দশম রস, বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্য-সাধনার পথ সাহিত্যে ব্যক্তিত্ব, মানব মনের ক্রম-বিকাশ, নাস্তিকের ধর্ম্ম, ধর্ম্ম ও সমাজ, আর্টের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ, মানুষ মোহাম্মদ, বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান-সাধনা, অতীতের সন্ধানে।

মজা হইতেছে এই যে, ইহার প্রত্যেকটি প্রবন্ধে চিন্তার পরিচয় রহিয়াছে। যে ব্যক্তি 'বাঙ্গালীর গান' ও 'মানুষ মোহাম্মদ' সম্বন্ধে একই ভাবে ও একই রূপে চিন্তা করিতে পারেন, তিনি যে-আটপৌরে ব্যক্তি নহেন, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। এই পুস্তক বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাণ্ডারে কণারূপে আসিলেও ইহাকে ঐশ্বর্য্যকণা বলিয়া পরিচয় দিলে অত্যুক্তি হইবে না।

পূর্ণানন্দ স্বামীর পত্রাবলী (প্রথম খণ্ড)—প্রকাশক আনন্দধাম, ২-সি, ধনদা ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২০০ শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ছাপা ও বাঁধাই ভাল। মূল্য ১৲ টাকা।

চট্টগ্রাম জগৎপুর আশ্রম ও কামাখ্যা কালীপুর আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা পূর্ণানন্দ স্বামী লিখিত ৭০ খানি পত্র। পত্রগুলির রচনাকাল ১৯১৭—১৮; বিভিন্ন শিষ্যকে বিভিন্ন বিষয়ে, লিখিত। একটি পত্রে (৭৩ সংখ্যক) তিনি

লিখিয়াছেন, এই যে স্বদেশী হুজুক উঠিয়াছে, ইহাতে বিদ্যা ও প্রতারণা আরও বৃদ্ধি পাইবে। কথাটি ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় ফলিয়াছে। আর একটি পত্রে পড়িলাম। 'আমার মা'র দ্বারা ইউরোপ, আমেরিকাদি পৃথিবীর অনেক স্থান পালিত আমরা মাতৃহীনের ন্যায় চীৎকার করি।" অনেক গভীর বিষয়ের চিন্তা ইহাতে পাওয়া যায়।

দুধের ব্যবসা (২৮ খানি ছবি সহ)—শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় ২০০ শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মনোরম ছাপা ও বাঁধাই।

লেখক ভূমিকায় বলিয়াছেন—'দুধের ব্যবসা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনা বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রথম।' দুধ, বৎস-পালন, গোড়ার কথা, গরুর খাদ্য, দুধের জীবাণু, জীবাণু শূন্য করা, দুধের কারখানা, মাখন তৈয়ারী, শেষ কথা, পরিশিষ্ট, এই কয়টি অধ্যায়ে পরিপূর্ণ। আমরা দুধের ব্যবসা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞও জানি না। বাঙ্গালা সাহিত্যের যে দুধ, তাহাতে বহু জল মিশ্রিত, সুতরাং খাঁটি দুধের ব্যবসায় সম্বন্ধে লিখিত কোন পুস্তক সম্বন্ধে আমাদের সমালোচনা করা দুঃসাহসিক হইবে। লেখক তাহাকে সহজ করিতে গিয়া মধ্যে মধ্যে হাস্যকর করিয়াছেন, যেমন, 'বৃষ দেখিতে হৃষ্টপুষ্ট এবং প্রকাণ্ড হইলেই চলিবে না, তাহার মা, দিদিমা, ঠাকুমা কত দুধ দিত জানা প্রয়োজন—ভাল গাই-এর মেয়ে যেমন বেশী দুধ দেয়, ছেলেও তেমনি।"...ইত্যাদি।

ঘোষালের ত্রিকথা—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী। ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১।০ সিকা। প্রায় ১০০ শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, সুন্দর এন্টিক কাগজে মুদ্রিত পুস্তক।

গল্প-পুস্তক। প্রমথ বাবু যদি সবুজ পত্রের সম্পাদক এবং বীরবল না হইতেন, তাহা হইলে তিনি বাঙ্গালা দেশের একজন শ্রেষ্ঠ গল্প-লেখক বলিয়া খ্যাত হইয়া থাকিতেন। বর্ত্তমান পুস্তকে তাহার পরিচয় আছে। জীবনের বিভিন্ন দিককে তিনি যে শিল্পীর দৃষ্টি দিয়া দেখিয়াছেন, তাহার পরিচয় ইহার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়।

এই ত জীবন—শ্রীশচীন সেন। ডি. এম. লাইব্রেরী ৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দুই শতাধিক পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মোটা এন্টিক কাগজে ছাপা বই। বাঁধাই ও প্রচ্ছদ সুরুচিসঙ্গত।

অদ্ভুত ভাষায় এই উপন্যাস। বর্ত্তমান বাঙ্গালী জীবনের একটি দিক লেখক উপন্যাসিক ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। লেখক যে, সে বিভিন্ন বিষয়ের চিন্তা ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট করিতে চাহে, উপন্যাসিক যে, সে রসসৃষ্টির জন্য উদগ্রীব। এই দোটানায় পড়িয়া বইটা স্থানে স্থানে যেমন জমিয়াছে, স্থানে স্থানে তেমনই জমে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও ইহা সুপাঠ্য।

শুদ্ধা মাধুরী—শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য প্রণীত। শ্রীমণীন্দ্র ব্রহ্মচারী পোঃ বহরপুর, ফরিদপুর। মূল্য—সাহায্য হিসাবে চারি আনা।

বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ধর্ম্ম শিক্ষা—শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য প্রণীত। শ্রীমৎ মণীন্দ্র ব্রহ্মচারী, গ্রাম বহরপুর, পোঃ ঐ, জিলা ফরিদপুর। মূল্য সাহায্য হিসাবে দশ আনা মাত্র। কাপড়ে বাঁধাই—চৌদ্দ আনা মাত্র।

কবির স্বপ্ন ও সুষমা ছন্দে ও গানে—শ্রীপার্ব্বতীচরণ রায় ডি. এম. লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভদ্রলোকের বি-এ পদবীটা লাগানো দেখিয়া বুঝিলাম, তিনি ভাবিয়াছিলেন, এ জীবনে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রী যখন এত সহজে অর্জ্জন করা যায়, তখন ভারতী দেবীকেও বুঝি ফাঁকী দেওয়া সহজই হইবে এবং বেমালুম বি-এ পদবীর সহিত কবি-পদবীও তিনি লাভ করিবেন। এমন নহে যে, কবিতায় প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় না, কিন্তু যে-পরিশ্রম ও সাধনা প্রতিভাকে সার্থক করিয়া তুলে, তাহার জন্য তিনি অপেক্ষা করেন নাই।

ইণ্ডিয়ানা—(জানুয়ারী হইতে জুলাই খণ্ড, ১৯৩৭) সম্পাদক শ্রীসতীশচন্দ্র গুহ। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, প্রায় ৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। গান্ধীগ্রাম, বেনারেস সিটি। বার্ষিক মূল্য ৬।।০ ; প্রতি সংখ্যা ১৲।

দেশে পাঠক-সংখ্যা বিরল, গবেষক-সংখ্যা আরও বিরল। যাঁহাকে প্রয়োজনীয় বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানের কার্য্য করিতে হইয়াছে, তিনিই জানেন, তৎসম্পর্কে সুসংবদ্ধ নামগণনার কত অভাব। বর্ত্তমান পত্রিকাখানি ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকাসমূহের অন্তর্ভুক্ত রচনাসমূহের বর্ণানুক্রমিক সূচী। লাইব্রেরীসমূহের এবং পুস্তক-প্রেমিকের পক্ষে ইহা অপরিহার্য্য। এই অতি প্রয়োজনীয় সম্পাদকের কার্য্যে সাফল্য প্রার্থনা করি।

আধুনিক শ্রেষ্ঠ গল্প—শ্রীরমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত। এন্টিক কাগজে সুন্দর ছাপা-বাঁধাই, মনোরম প্রচ্ছদ। মূল্য ১।।০।

যাঁহাদের গল্প লিখিয়া খ্যাতি হইয়াছে, তাঁহাদের প্রত্যেকটী গল্পই সুলিখিত নহে, কিংবা যাঁহাদের খ্যাতি হয় নাই, তাঁহাদের গল্প মাত্রেই অপাঠ্য নহে। গল্প-সঙ্কলন সম্পাদনায় বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত, খ্যাতি-অখ্যাতি-নির্ব্বিশেষে গল্পের গুণ বিচার করিয়া তাহার সঙ্কলন। বর্ত্তমান গল্পের সম্পাদক বোধ করি তাই সাহস করিয়া অনেক খ্যাত গল্প-লেখকের গল্প বর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি ভালই করিয়াছেন। এই গল্প-পুস্তকের প্রথম গল্পটি (কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাদার ছুরকিলম্বি') বাংলা গল্প সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে। ইহার পক্ষী (জটায়ু) অমর সৃষ্টি। কেদারবাবুর প্রতিভার বৈশিষ্ট্য যেন ইহার মধ্যে নির্য্যাস বাঁধিয়াছে। প্রমথ চৌধুরী, তারাশঙ্কর, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, বনফুল, সরোজ রায় চৌধুরী, বিভূতি মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি সকলেরই যে গল্প ইহাতে স্থান পাইয়াছে, তাহার মধ্যে লেখকের প্রতিভার বিশিষ্ট দিকটাই দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। হয় তো এই গল্প অপেক্ষা লেখকের অন্য কোন গল্প গল্প-হিসাবে ভাল, কিন্তু তাহার মধ্যে লেখকের নিজস্বতা এমন করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। এই গল্প-সঙ্কলনের বৈশিষ্ট্য ঠিক এইখানে। ইহার দ্বারা বর্ত্তমান বাংলা গল্পের বিভিন্ন-মুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইবে। ইহা একাধারে গল্পের ও সাহিত্য সম্পর্কে চিন্তার খোরাক দিবার উপযুক্ত বই। গল্পের আসরে প্রত্যেক লেখকের পরিচয়ের মধ্যে সাহিত্য সম্পর্কে চিন্তার খোরাক পাওয়া যাইবে। আমরা এই পুস্তকের প্রচার এই কামনা করি।

ফটোগ্রাফ

—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

পিতৃদত্ত নাম শ্রীধনঞ্জয় গাঙ্গুলী, কিন্তু আফিসের কৃপায় বহুরূপে রূপান্তরিত হইয়াছে। কেহ বলেন, ভালুক, কেহ বলেন ভালুক দাদা। আমি বলিতাম দাদা।

সেদিন সবে দশটার ঘন্টা পড়িয়াছে। তখনও পর্য্যন্ত সবাই আপন আপন সীটে পর্য্যন্ত যাইয়া বসিতে পারে নাই। কেহ হয় ত টেবিল-চেয়ারের ধুলা সাফ্ করিয়া লইতেছে, কেহ হয়ত খাতা-কলম বাহির করিতেছে, কেহ বা জলের গেলাস লইয়া মুখে তুলিতে উদ্যত, আবার কেহ কেহ বা নিজেদেরই মধ্যে অফিসে প্রথম সাক্ষাৎ-সংক্রান্ত অভিবাদনের আদান-প্রদান-পর্ব্বটুকু তখনও পর্য্যন্ত সারিয়া লইতে পারে নাই। এমন সময়ে সর্ব্বাঙ্গে শীলমোহরের সংখ্যাতীত ছাপ লইয়া বড়, ভারী একখানি লেফাফা আসিয়া উপস্থিত। ডাকপিয়ন সেখানা দিয়া চলিয়া যাইতেই সকলেরই ঔৎসুক্যের আর অবধি রহিল না। দাদাও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া, অবশেষে খামখানা যখন খুলিয়া ফেলিলেন, ভিতর হইতে যে চিঠিখানা তখন বাহির হইল, দেখা গেল সেখানা বিখ্যাত ফটোগ্রাফার মেসার্স জনষ্টন্-হফম্যানের বাড়ী হইতে আসিয়াছে। চিঠিখানার ভিতরে এইরূপ লেখা ছিল,—

প্রিয় মহাশয়,

গত···তারিখে আপনার যে ফটো লওয়া হইয়াছিল, আজ তাহার প্রুফ্ পাঠান হইল। প্রুফ্ অনুমোদন করিয়া দিলে ফাইন্যাল কপি যত সত্বর সম্ভব পাঠান হইবে। আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা ও আন্তরিক শুভেচ্ছা সম্বন্ধে আপনি নিঃসন্দেহ থাকিবেন।

আপনারই বিশ্বস্ত

জনষ্টন হফম্যান্ এণ্ড কোম্পানী।

চিঠি পড়িয়া বিস্মিত চমকিত হইয়া দাদা খামখানার ভিতর হইতে যে ফটোখানা টানিয়া বাহির করিলেন, চাহিয়া দেখি সেটি একটি প্রিয়দর্শন ভল্লুকের। প্রাণীটির চেহারাটি বেশ জমকাল। সম্মুখের দুই পা তুলিয়া পিছনের পা দুইটিতে ভর করিয়া কেমন ভাল মানুষের মত বসিয়া আছে। কোন দ্বিধা নাই, কোন সঙ্কোচ নাই, সে যে অপরাধ করিয়াছে বা কিছু করিয়াছে, তাহার মুখের আকৃতি দেখিয়া সে কথা মনেই হয় না।

*

ধনঞ্জয় গাঙ্গুলী, ওরফে ভালুকদাদাকে উপলক্ষ্য করিয়া এইরূপ হাসি-তামাসা ও রঙ্গরসের মধ্য দিয়াই কেরাণীর দল তাহাদের দৈনন্দিন কর্ম্মজীবনের একঘেয়েমীটাকে এইরূপেই অনেকখানি সরস করিয়া তুলিত।

ইহার পর কিছুকাল কাটিয়া গিয়াছে। ফটো দেখিবার জ্বালা দাদার অনেকটা এখন জুড়াইয়া আসিয়াছে। এখন তাঁহাকে আবার পূর্ব্বাদমে পূজা-আহ্নিক, গঙ্গাস্নান ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া সাধু-সন্ন্যাসী, এমন কি সহকর্ম্মীদের সহিতও স্মিতমুখে আলাপ-আলোচনা করিতে দেখা যায়। তাই যখন সেদিন আবার দাদা আসিয়া বেশ একটু বিমর্ষ মুখেই আমার পাশের চেয়ারখানা অধিকার করিয়া বসিলেন, আমি একটু উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, কি দাদা, কি খবর?

—কি করছ ভায়া?

—কেরাণী আবার কি করব দাদা?—মাছি মারছি।

ম্লান একটুখানি হাসির পর দাদার মুখখানা আবার বিমর্ষ ভাব ধারণ করিল। আমার একটু দুঃখই হইল। নিজেরই পিতৃ-পিতামহের দেওয়া আচার-অনুষ্ঠান শুদ্ধ সরল বিশ্বাসভরেই মানিয়া চলেন। তাঁহার বদ্ধমূল ধারণা যে, ঐ সব ক্রিয়াকলাপের জটিলতার অন্তরালেই তাঁহার স্বর্গের সিঁড়ি লুকাইয়া আছে; এমন ত কতশত লোকেরই আছে। এমনই অবিচলিত শ্রদ্ধা ও আবেগের সহিত এই সব লোক বিধি-নিষেধের যাতাকালে নিজেদের চেতনা

ও হৃদয়বৃত্তিকে জড়াইয়া জুলাইয়া রাখেন যে, তাঁহাদের কোন কার্য্যকলাপে আশে পাশে আর কোথাও অবিচার বা অপরাধের সৃষ্টি হইল কি না হইল, সে কথা ভাবিয়া দেখিবার বা অনুভব করিবার মত অবস্থাই ইঁহাদের থাকে না। নিজেদেরই রচিত বেড়াজালের কোন ফাঁক দিয়া পাছে কোন স্খলন বা আচারভ্রষ্টতা কোন ছলে বাহির হইয়া পড়িয়া নিজেদের মোক্ষের পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায়, সেই ভাবনাতেই ইঁহাদের সমগ্র সত্তা অনুক্ষণ সজাগ ও সতর্ক হইয়া থাকে। সে চিন্তার মধ্যে বুদ্ধির ফাঁকি হয় ত থাকিতে পারে, কিন্তু হৃদয়ের ছলনা বিন্দুমাত্র নাই। অথচ, আমাদের শুষ্ক চিন্তাধারার সহিত হৃদয়ের এই অকপট বিশ্বাসকে আমরা মিলাইতে পারি না বলিয়াই ব্যবধানটুকুকেই বড় করিয়া দেখিয়া কত প্রকারেই না কত সময় ইহাদের লাঞ্ছিত করিয়া তুলি। না জানি আবার কি নাকাল নিরীহ এই ভদ্রলোককে হইতে হইয়াছে মনে করিয়াই আমি দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি দাদা, মুখ অত বিষণ্ণ কেন?

ম্লান হাসিয়া দাদা কহিলেন, না ভাই, ও কিছু না।

ছাড়িলাম না, কহিলাম, তবু?

নড়িয়া চড়িয়া দাদা এবারে ভাল করিয়া বসিলেন, কহিলেন, দেখ ভাই, এই তো তুমি বললে আমরা কেরাণী মাছি মারি আর খাই,—কি বল? বললে কি না?

ঠিক ঐ-কথাই বলিয়াছি কি না, মনে না পড়িলেও ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া কহিলাম, বলেছি হয়ত।

খুসী হইয়া দাদা কহিলেন, তবেই দেখ, কত কষ্টে যে আমাদের গ্রাসাচ্ছাদন চলে, সে কথা বাইরের লোকে কি বুঝিবে বল? কেমন ভায়া, তাইত?

বাহিরের লোকটি যে কে, আমি ঠিক বুঝিতে না পারিলেও কহিলাম, তাইত।

দাদা একটু উৎসাহিত অথচ বিরক্ত ভাবেই কহিলেন, তবেই দেখ দেখি, না যদি বোঝেই কেউ - তা নিয়ে খামোকা রাগ-রক্ত করা কি উচিত?—কখনই নয়। নিজেই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া আবার নিজেই সবেগে মাথা নাড়িয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া দাদা চুপ করিয়া গেলেন, কিন্তু আমি কি জবাব দিব ভাবিয়া পাইলাম না। কে রাগ করিল, কাহার উপর রাগ করিল, কেনই বা রাগ করিল,—ইত্যাদি শত প্রকারের প্রশ্ন মনে উঠিয়া মনেই লয় পাইল; জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইতে ভরসায় কুলাইল না।

দাদা কিন্তু পরক্ষণেই আবার কহিলেন, তুমি কিন্তু কিছুই বুঝলে না,—না ভায়া?

স্বীকার করিয়া কহিলাম, না দাদা, কি হয়েছে?

দাদার কণ্ঠস্বর এবারে একটু মোলায়েম হইয়া আসিল, কহিলেন, আর ভাই বল কেন,—যত গেরো আফিসে বেরুবার সময়ই যত উৎপাত!—বেশ একদফা হাতাহাতি হয়ে গেল।

চট্ করিয়া মনে পড়িয়া গেল দাদার কুস্তী লড়িবার কথা; জিজ্ঞাসা করিলাম, কে লড়তে এসেছিল?

বিরক্ত হইয়া দাদা কহিলেন, লড়তে কে আসবে আবার? বাড়ীতে আর আছে কে?

রহস্য করিয়া প্রসঙ্গটাকে হাল্কা করিয়া দিবার জন্যই কহিলাম, তবে বুঝি হাতাহাতি হল—বৌদির সঙ্গে? তিনি তুললেন হাত আপনার গায়ে?

দাদার বিরক্তি আরও বাড়িয়া গেল, আমি যেন নিতান্তই অর্বাচীন, এমনই ভাবে কহিলেন, তা না কি কেউ আবার তোলে!—বলি নিজকে বাঁচাতে যেয়ে বনের পশুও হাত পা ছোড়ে গো। তুমিও হয়েছ যেমন! কোনও লাভ নেই তোমাকে কোন কথা বলে। আমার সম্বন্ধে সুদৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করিয়া নিতান্তই উঠিয়া চলিয়া যান দেখিয়া তাড়াতাড়ি কহিলাম, না দাদা আমি তা বলিনি। তা—আপনিই বা তাঁর গায়ে হাত তুললেন কেন?

নিতান্তই যেন একটা সাদাসিধা ব্যাপার,—এই ভাবে দাদা কহিলেন, রাগ হলেই হাত তোলে লোকে; কথায় বলে রাগ না চণ্ডাল।

কহিলাম, তা বটে তবু দাদা অবলার গায়ে হাত—

বাধা দিয়া দাদা কহিয়া উঠিলেন, অবলা! কে অবলা? তুমি জান না কি তাকে?

দাদার গৃহিণী যে অবলা নহেন, সে কথা জানিতাম না, স্বীকার করিতে হইল। দাদার উৎসাহ বাড়িয়া গেল,

কহিলেন, বেরুচ্ছি, সটান্ এসে বলে কি না, টাকা ফুরিয়ে গেছে, খরচার কিছু না হলে আর চলবেই না!

—তারপর?

—দিলুম কসে এক চড়; বললুম, এই যে সবে মাত্তর পেট ঠেসে খেয়ে উঠলুম; দুটো পানও এখনও মুখে দিই নি,—এর মধ্যেই টাকা ফুরোল! মাসপয়লা যে এক কাঁড়ি হাতে এনে দিলুম, সে টাকা করলি কি?—বলিয়া দাদা একটু হাসিয়া আবার কহিলেন, তুমিই বল ভায়া, রাগ কি হয় না?

—হয়ই তো, আজ সবে আটাশ দিন হয়েছে এ-মাসের।

—তবেই দেখ। তাছাড়া, চেয়েছিলামই না হয় সখ করে কোনদিন একটু রুইমাছের মুড়ো খেতে, শাকান্ন খেয়ে খেয়ে মুখে তো কিছু আর রোচে না;—তাই বলে বলা নেই কওয়া নেই—তুমি বললে প্রেত্যায় যাবে না ভাই —ছেলেটাকে বাজারে পাঠিয়ে সে কি প্রলয় মা—ছ্যাঃ! বললুম, ওরে মাছই না হয় খেতে চেয়েছি, তা বলে কি ভিখারী হতে বলিছি?—বলিয়া দাদা এবারে শেষ বারের মতই চুপ করিয়া গেলেন।

ব্যাপারটা এতক্ষণে পরিষ্কার হইল। দাদারই ফরমাইস্ মত দাদাকেই পেট ভরিয়া রুই মাছ খাওয়াইয়া দাদারই হাতের মিষ্ট প্রহার পুরস্কার-লাভ! উপরন্তু গালি-গালাজটা ফাও! বৌদির উপর রীতিমত হিংসা হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কথা কহিলাম না, তাহার পর প্রচ্ছন্ন তিরস্কারের সুরে ডাকিলাম, দাদা।

—কি ভাই? দাদার কণ্ঠস্বরও ঈষৎ করুণ।

—ভারী অন্যায় করেছেন। আপনারই দোষ।

দাদার চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠল, দোষ তো আমারই ভাই।

একটু হুকুমের সুরেই কহিলাম, বাড়ী যেয়ে ভাব করে ফেলুন।

মাথা নাড়িয়া সায় দিয়া দাদা কহিলেন, ভাব যে আমাকেই করতে হবে, তা কি আর জানি না। কিন্তু, কি করে যে তার মান ভাঙ্গি তাই তো ভেবে পাচ্ছিনে ভাই; বড় অভিমানিনী সে, তুমি তো আর জান না।

দাদার অভিমানিনীর মান ভাঙাইতে কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, সে কথা আমার জানার কথাও নয়, তথাপি তামাসা করিয়া রহস্যের সুরে কহিলাম, তার আর হয়েছে কি, 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' বলতে বলতে বাড়ী ঢুকে যা হোক কিছু করে ফেলুন গিয়ে। দোষ কি? কৃষ্ণ ঠাকুরও তো তাই করেছিলেন।

বিশিষ্ট একটা নজীর পাওয়ায় দাদার মুখ প্রসন্ন হাসিতে ভরিয়া গেল; ঠাকুর-দেবতার কথায় দাদার বড় আনন্দ, কহিলেন, দোষ আর কি, যা বলেছ ভাই,—যে অভিমানিনী ও ছাড়া আর উপায় নাই। দাদা চলিয়া গেলেন। প্রসঙ্গটা সে দিনের মত স্থগিত রহিল।

পরদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, কি দাদা? মানভঞ্জনের পালা এগুলো কতদূর।

আনন্দে খুসীতে হাসিয়া নাচিয়া দাদা একেবারে অস্থির হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, তোমার মুষ্টিযোগটা ভাই বড়ই কাজে লেগে গেছে।

—তাই না কি?

—হ্যাঁ ভাই মানিনীর সাধ্য কি আর গোমড়া-মুখে থাকেন, তোমার টোট্‌কা লাগাতেই হেসে ফেলে বলে উঠল, "বুড়ো! ভীমরতী হয়েছে না কি।" জান ভায়া, আমিও বুঝলুম আর কোন চিন্তার কারণ নেই।

আমার উৎকণ্ঠা তথাপি দূর হইল না, কহিলাম, একবার বুড়ো বলেছেন তাইতেই—

বাধা দিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে দাদা বলিয়া উঠিলেন, হ্যাঁ হে, তাইতেই। আরে সেবারেও যে তাই হয়েছিল। তুমি ত আর জান না সে কথা—আর জানবেই বা কি করে, তখন তুমি এই অ্যাত্তটুকু। বলিয়া দক্ষিণ করতল প্রায় আনত করিয়া দাদা দেখাইয়া দিলেন, তখন আমি কতটুকু। তাহার পর আবার কহিলেন, বুঝলে না? তখন মাত্র সে তের বছরের, আমাকে গেরাহ্যিই করত না, দেখলেই চোঁচা দৌড়, কেউ ধরে আনলে চেঁচামেচি, কান্নাকাটি—সে একেবারে অসহ্য ব্যাপার! হাঁ করে আছ কেন? শুনছ ত?

কহিলাম, হাঁ হাঁ।

হঠাৎ কণ্ঠস্বর একেবারে খাদে নামাইয়া আমার কানের কাছে মুখখানা আনিয়া বিচিত্র ভঙ্গীসহকারে দাদা কহিলেন, তোমাকে বলতে আর দোষ যা কিছু, তুমি তো আপ

পরি মও, পিছেরই হেঁটে ভাতের মত। বুঝলে ভাই, তখন আমার জেগান ধরস, জুতি-জুতি লড়ি, ঘরে সোরস বউ অথচ আমার দুঃখ কেউ বোঝে না, সে অবস্থায় আমাকে কি আর দোষ দেওয়া যায় ? বল ? তুমিই বল ?

—না না, তা কি আর যায়, কী হল সে অবস্থায় ?

—যা হবার তাই হল ; কিন্তু তাও বলছি ভায়া, 'ও পথে যেও না কাকা, ওপথেতে বিষম জ্বালা।' আমার তো বুকের কেতরটা দিন রাত্তির হু-হু করত, শেষে—হ্যাঁ, কি বলছিলাম ?

—হু—হু করত।

—আঃ, তা কেন ! হ্যাঁ, শেষে আমাদের ঐ হরিশ, বলি, হরিশকে চেন ত ? না, তাও চেন না ?

—তাও চিনি নে।

…আঃ কি গের ! দিলে সব গুলিয়ে-ঘুলিয়ে। হরিশ—হরিশ গো ! আমাদের জ্যোতিষের ছেলে। গঙ্গারামের পিসতুত ভাই ! সেই গঙ্গারাম, যার সম্বন্ধী ঘোড়ার রেসে হাজার টাকা পেলে ?

ব্যাপারটাকে আর জটিল করতে না দিয়া কহিলাম, হ্যাঁ হ্যাঁ হরিশবাবু, চিনেছি এবার।

আশ্বস্ত হইয়া দাদা কহিলেন, সেই হরিশ। তার কাছে একদিন হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলতেই সে অনেক আশ্বাস দিলে দিয়ে, দু'টো সুপুরি চাইলে।

—সুপুরি !

—হ্যাঁ, সুপুরি দিতেই, হরিশ সে দুটো নিয়ে পূজো করলে, এই অফিসেরই ঐ চিলে-কোঠায়। উঃ সে কী পূজো ! সে দিন তো হরিশ আর কাকে হাতই দিতে পারলে না। তারপর বললে, ধনঞ্জয়, যাও, এই সুপুরি পানে দিয়ে কোন রকমে তোমার বউকে খাইয়ে দাও গে।

—তারপর !

—দিলুম এক কিরিয়ে পানের সঙ্গে সেই সুপুরি খাইয়ে। দিতেই,—বুঝলে ভায়া—" বলিয়া দাদা হাসিতে হাসিতে একেবারে কাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিলেন।

—দিতেই, কি হল ?

—বলব ? একেবারে, ছোট্ট মেয়ে ছিল না, কেঁদে বললে, 'কি গো রাঙা-বৌ, বলি কথা বলবে না কি ?' আমার কথাটা যেইনা শোনা,—সে অমনি কি করলে জান ? ভেঙচে বললে, 'বুড়ো, কথা বলতে বয়ে গেছে ; সবাই বিয়ের পর ফটো তোলে, তুমি তুলেছ একখানা যে, কথা বলব ?'—বলিয়া দাদা আবার হাসিয়া অস্থির হইলেন।

কহিলাম, দিলেন ফটো তুলে ?

দাদা কহিলেন, দিলুম আর কোথায় ? সেই জন্যেই তো এসেছি তোমার কাছে।

—অ্যাঁ ! আমার কাছে অ্যাদ্দিন পরে !

—কী করব ভাই। ফটো তুলতে গেলেই অনেক খরচ। এবারে কিন্তু আর না তুলয়ে সে ছাড়ছে না। একটু সুবিধেও আছে এবার, বিনে খরচায় হয়ে যাবে।"

—কি করে ?

—ফুলবাবুর একটা ক্যামেরা আছে খবর পেয়েছি, তুমি একটু ধরলেই সে আর 'না' বলতে পারবে না।"

—আপনি বলুন না।

আমাকে কি জানি কেন ওরা কেউ দেখতে পারে না ভাই, আমি তাই পাগলা-ছাগলা মানুষ। তুমি ভাই এটা করিয়ে দাও বলে কয়ে। বল ? দেবে ?—বলিয়া আমার হাত দু'খানা তার দুই হাতে দাদা চাপিয়া ধরিলেন।

কহিলাম, আচ্ছা, দেখি ফুলবাবু কি বলে ?

*

ফুলবাবুর নিকটে গিয়া কথাটা উত্থাপন করিতেই হাসিয়া কহিল, তারপর ?—কি মনে করে ?

তাহাকে ব্যাপারটা খুলিয়া বলিতে সে রাজী হইয়া গেল, কহিল, আজ্ঞে আর হয়েছে কি, কিন্তু ভালুক-গিন্নী যে শুনেছি সাড়ে তিন মণ, আমারি ছোট্ট ক্যামেরায় আঁটবে কি !

—তোমার খালি ঠাট্টা। ক্যামেরায় আবার আঁটাআঁটি কি !

"আর একটা কথা আছে। শুনেছি ভট্টাচার্য্য-গৃহিণী না কি 'ভালুক-ভট্চায'-কেবল আঁটা একটি কালীর বোতল বললেই হয়, সব লাইট অ্যাবসর্ব করে নেন। শেষে যদি ফটো না ওঠে, বা কিছু খারাপ হয় ?

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া কহিলাম, "থাক তোমার ঠাট্টা নিয়ে, চললাম আমি।"

আমার হাতখানা ধরিয়া বসাইয়া দিয়া কহিল, সামান্য রহস্য নিয়ে রাগ কর কেন ভাই ?

— রহস্যেরও কি একটা সীমা থাকতে নেই ভাই ?

—তা' বটে। আচ্ছা ভালুককে পাঠিয়ে দাওগে আমার কাছে।

— দিচ্ছি, কিন্তু তাও বলে রাখছি, কোন রকম অসভ্যতা করতে পারবে না দাদার বাড়ী গিয়ে, অফিসে যা' কর তা কর।

ফুলবাবু মাথা নাড়িয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, আরে না মা না না, হল ত ? আচ্ছা চালা জুটেছে ভালুকের।

সুতরাং ফটো তুলিতে একদিন শনিবার দ্বিপ্রহরে অফিসের ছুটীর পরেই ফুলবাবু আর আমাকে লইয়া দাদা তাঁহার গৃহের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে ফুলবাবু একটু আধটু রুচিসঙ্গত রসিকতা করা ছাড়া ছ্যাবলামী কিছু করিল না। বরঞ্চ সে দাদার সঙ্গে বেশ একটু সসম্ভ্রমেই কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিল। আমিও একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম, বুঝিলাম সেদিনকার তিরস্কারে কাজ হইয়াছে।

দাদা থাকেন সহরের এক সীমান্তে—পাড়াগাঁ বলিলেও হয়। দু'চারখানি পুরাতন ইটের ঘর ও খানিকটা প্রাঙ্গণ লইয়া দাদার বাড়ী, আভিজাত্য বা সম্ভ্রান্ততার কণামাত্র কোথাও নাই। কিন্তু, সেই সামান্য গৃহের ভিতরে চারি দিকে সস্নেহ পরিচ্ছন্নতার যেন আর আদি-অন্ত ছিল না। ঘরের মেঝে হইতে সুরু করিয়া দেওয়াল—এমন কি ছাদ পর্য্যন্ত যেন ঝকঝক চক্ চক্ করিয়া শুভ্র নির্ম্মল লক্ষ্মীর হাসি হাসিতেছে। গৃহের আসবাবপত্র যৎসামান্যই; কিন্তু সেইগুলাকেই যেন কে সাজাইয়া গুছাইয়া, ঘষিয়া মাজিয়া, ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া, প্রতি ধূলিকণাটি পর্য্যন্ত তাহাদের যেন কে সযত্নে সস্নেহে মুছিয়া লইয়া এই মাত্র রাখিয়া চলিয়া গেছে; যেন সব কিছুরই ভিতর একখানি কল্যাণ-হস্তের সলজ্জ দৈন্যশূন্য, সমস্ত মহিমা, কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

ওদিকে দাদার আনন্দের আর অবধি ছিল না, চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া ছুটাছুটি করিয়া, হোঁচট খাইয়া, কাপড় ছিঁড়িয়া পাড়া একেবারে মাথায় করিয়া তুলিলেন—ওরে কোথায় গেলি, ছাঃ ছেলেটাকে কি ছাই কিছুতে যাবে আনা গেল, ওরে ও হতভাগা।

—কি বাবা ? বলিয়া ছেলে ছুটিয়া আসিল।

ভেঙাইয়া দাদা বলিলেন, কী বাবা ! পাজি ছেলে, পাখা দিতে বলেছিলুম না ?

ছেলে জবাব দিল, ঐ ত ওঁরা পাখা নিয়ে বাতাস খাচ্ছেন।

আবার ভেঙাইয়া দাদা কহিলেন, হুঁ! বাতাস খাচ্ছেন। চন্দনকাঠের পাখাটা কি আমার চিতায় পোড়াবি বলে রেখেছিস্ নচ্ছার—

ছেলে ছুটিয়া চন্দনকাঠের পাখা আনিতে চলিয়া গেল।

দাদা আবার হুঁকিয়া উঠিলেন, আঃ, পারিনে বাপু! বলি, বাড়ীর সকলে কি মরেচে। ডাব পাড়িয়ে রাখতে বলেছিলুম না ? সে হুঁস্ আছে ? নাঃ আমি সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে চলে যাব।

তাড়াতাড়ি ফুলবাবু কহিল, ঐ ত' রকের ও-ধারে ডাব কতকগুলো রয়েছে দেখছি।

অপ্রস্তুতভাবে দাদা কহিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে রয়েছে! আমারই মাথাটা গুলিয়ে মালিয়ে গেছে, খাও ভায়ারা খাও, তেষ্টায় পশুপক্ষীর পর্য্যন্ত ছাতি ফেটে যাচ্ছে, যে গরম!

আদর-অভ্যর্থনার এইরূপ সমারোহের মধ্যে সামান্য কিছু জলযোগও এক সময় সারিয়া ফেলা গেল। তাহার পর সুরু হইল ফটো-পর্ব্ব। অন্দরের উঠানটার মধ্যে কখনও চেয়ার রাখিয়া, কখনও আসন পাতিয়া, কখনও বেঞ্চি সাজাইয়া একবার পূব, একবার পশ্চিম, কখন উত্তর, কখন দক্ষিণ, এ দিকে, ও দিকে যত দিকে সম্ভব নিজে দাঁড়াইয়া বসিয়া, বৌদির কোলে বেচারা ফুলবাবুকে পাশে লইয়া 'ওঠ-বস' করাইয়া, কী ভাবে ফটো তোলা হইবে তাহাই ঠিক করিবার জন্য দাদার সে কি বর্ণনাতীত অধ্যবসায়! ফুলবাবু আবার একটা ভাবের গদগদ করিয়া বলিয়া ফেলিল; আমিও সেকথার তাৎপর্য বুঝিলাম না। গেলে

কপাল ঠুকিয়া বলিয়া ফেলিলাম, দাদা, হর-পার্ব্বতীর 'পোজ'টা আপনার পছন্দ হয়?

সন্দিগ্ধ-কণ্ঠে দাদা বলিলেন, মদন-ভস্মের আগে, না পরে?

তাড়াতাড়ি কহিলাম, না না, সে সব কিছু নয়, আপনি চেয়ারে স্থির হয়ে বসে থাকবেন, আর বৌদি আপনার পায়ের তলায় বসে আপনার মুখের দিকে চেয়ে থাকবেন, যেন ধ্যানস্থ মহাদেবের ধ্যানে স্বয়ং পার্ব্বতী বসেছেন।

যাক, ঠাকুর-দেবতার নাম এ স্থলে ব্রহ্মাস্ত্রের কাজ করিল। প্ল্যান্‌টা দাদার পছন্দ হইয়া গেল।

—যা-না, তোর মাকে ডেকে নিয়ে আয় না—বলিয়া প্রচণ্ড এক ধমকে ছেলের উপর হুকুম জারী করিয়া চেয়ারখানায় দাদা স্থির হইয়া বসিলেন। ছুটিয়া ছেলে মাকে আনিতে চলিয়া গেল। মা আসিলেন। সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই একটা অস্ফুট ধ্বনি ফুলবাবুর কণ্ঠ দিয়া বাহির হইয়া আসিল এবং সে না জানিয়াই যে তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহাতেও কোন সন্দেহ ছিল না। আমিও যে অনুরূপ একটা কোন আচরণ সে সময় করিয়া ফেলিলাম না, সেটা কতকটা আমি দাঁড়াইয়া ছিলাম বলিয়াই এবং কতকটা আমার ভাগ্য প্রসন্ন ছিল সেই জন্য, বলিতে হইবে।

চওড়া লাল-পাড় গরদের একখানা শাড়ী দেহে জড়াইয়া দুই হাতে মাত্র দুগাছি লাল শাঁখা পরিয়া, অলক্তরাগে চরণ দুখানি রাঙাইয়া ললাটে সিন্দুরবিন্দু ও সীমন্তে সিন্দুররেখাটি উজ্জ্বল করিয়া যিনি আসিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া আমার সত্যই মনে হইল, দাদা যেন স্বয়ং ভোলা মহেশ্বর, যুগযুগান্তব্যাপী তপশ্চরণের মহিমায় ভাস্বর, মহীয়ান্ হইয়া উঠিয়াছেন।

•

ফিরিবার পথে কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। এক সময় মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ হে, ধনঞ্জয়বাবুর কি দ্বিতীয় পক্ষ?

কহিলাম, না, কেন?

—কিছু না।—বলিয়া ফুলবাবু চুপ করিল।

কিছুক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ফুলবাবু আবার কহিল, নাঃ, কাজটা ভাল হয় নি।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কী কাজ ভাল হয় নি? ফটো কবে পাওয়া যাবে?

ফুলবাবু কহিল, ফটো পাওয়া যাবে না।

তার মানে!

—দেখ ভাই, কে জানত বল? ভেবেছিলাম ছুটো তামাসা করে বাড়ী ফিরে যাব, ক্যামেরায় প্লেট ছিল না।

•

দাদার গৃহ হইতে ফিরিবার পর মাত্র কয়েকটা দিন অফিসে গিয়াছিলাম, মনে আছে। ঐ কটা দিন দাদাকে আমি এড়াইয়াই চলিতাম; একটা কুণ্ঠা ও সঙ্কোচ সর্ব্বদাই যেন কাঁটার মত বিঁধিয়া বিঁধিয়া মনটাকে একেবারে ওদিক্ হইতে বিমুখ করিয়া রাখিত। দাদাও দেখিতাম, আমার দিকে বড় ভিড়িতেন না; ফটো পাইবার উৎসাহে ফুলবাবুর সঙ্গেই প্রায় সমস্ত সময়টা হাসিগল্পে কাটাইয়া দিতেন। ফুলবাবু তাঁহাকে কি বুঝাইয়াছিল জানি না; তবে এটুকু অনুমান করিয়াছিলাম যে, সঙ্কোচেই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক্ ফটো-ব্যাপারের আসল কথাটা সে চাপিয়াই গিয়াছে।

অফিস হইতে এক সন্ধ্যায় গৃহে ফিরিয়া দেখি, রমা বিছানায় শুইয়া আছে। রমা আমার স্ত্রী। সম্পদে বিপদে, সুযোগে দুর্য্যোগে, সময়ে অসময়ে—সব সময়েই রমাকে হাসিমুখে কাজই করিতে দেখিয়াছি; কোন কারণেই কোন কাজ ফেলিয়া শয্যা লইতে দেখি নাই। আজ সেই অসম্ভব ব্যাপারও যে রমার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে, সেটা যে সামান্য কোন অসুস্থতাকে উপলক্ষ্য করিয়া নহে, তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলাম। হইলও তাই। দেখিতে দেখিতে কয়েকদিনের মধ্যেই রমাকে লইয়া একদিকে যমরাজ ও অপরদিকে আমি তাহার কেরাণী-স্বামী, মহা উৎসাহে রীতিমত 'টাগ্-অব-ওয়ার' খেলায় মাতিয়া গেলাম।

কেরাণীর স্ত্রী যে তাহার কতখানি, সে কথা বুঝাইয়া বলিবার ভাষা কেরাণীর কণ্ঠে নাই; সে কথা জানে এক কেরাণী নিজে, আর জানেন যোগ হয় তিনি, যাঁহার সকল

কথা জানিবার কথা। অফিসের শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার খাতিরায় দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ বড়সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া বড়বাবু, তস্য বড়বাবু, এমন কি খুদে বড়বাবুরা পর্য্যন্ত যে সব বিচিত্র বিধিব্যবস্থা, গঞ্জনা, লাঞ্ছনা এবং আরও শতপ্রকারের উৎপীড়ন, দিনের পর দিন কেরাণী-মক্ষিকার হিতার্থে বরাদ্দ করিয়া রাখেন, তাহার মহিমায় কেরাণী কবে কোন্‌দিন শহীদ্ হইয়া নাম কিনিত, যদি না তাহার সমস্ত গ্লানি নিঃশেষে মুছিয়া লইবার জন্য দিনের শেষে কেরাণীর কল্যাণময়ী অন্তরলক্ষ্মী তাহার সেই ছোট্ট বুকখানির নিভৃত কন্দরে মধুর উৎসটুকু জাগাইয়া রাখিত।

রমাকে হারাইবার সম্ভাবনা মাত্রেই বুঝিলাম যে, তাহাকে কতখানি করিয়া আমি পাইয়াছিলাম।

জীবনে যাহা ভুলক্রমেও কোনদিন করি নাই, আজ তাহাই করিলাম। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি রমার রোগপাণ্ডুর ম্লান মুখশ্রীর দিকে চাহিয়া ভগবান্‌কে মনে করিলাম।

রমার অসুখ হঠাৎ একদিন অভাবিতরূপে ভালর দিকে মোড় ফিরিল। দেখিতে দেখিতে রমা সারিয়া উঠিতে লাগিল। জীবনের উত্তপ্ত উষর মরু আবার যেন তরুলতাপত্রপুষ্পের শ্যামল শোভায় হাসিয়া গাহিয়া উঠিল।

সেদিন গ্রীষ্মে, মধ্যাহ্নের ক্রুদ্ধ প্রতাপকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া ঘরের ভিতরে সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া আমি ও রমা নিরালার স্বাচ্ছন্দ্যে আলস্যে একটা শান্তিময় সুখনীড় রচনা করিতেছিলাম। শয্যায় রমার শীর্ণ দেহলতা সদ্য রোগমুক্তির শ্রান্তিতে যেন লীন হইয়া ছিল। তাহার তৈলবিহীন রুক্ষ মস্তকের চূর্ণ দু'একটি কুন্তল কিছুতেই যেন শাসন মানিতেছিল না। তাহাদেরই নিজ বশে আনিবার চেষ্টা করিতে করিতে আমি একটি কবিতা আবৃত্তি করিয়া রমাকে শুনাইতেছিলাম।

সদর দরজায় কড়া-নাড়ার শব্দে দরজা খুলিয়া দেখিয়া আনন্দে লাফাইয়া উঠিয়া কহিলাম, দাদা! আপনি!

তারপর ভায়া, তোমার স্ত্রী কেমন আছেন বল।—বলিতে বলিতে ছাতাটা মুড়িয়া দাদা ঘরে ঢুকিলেন।

ভাল আছে দাদা, ভাল আছে। আপনি! আমার বাড়ীতে! এ যে স্বপ্নেরও অতীত! বসুন দাদা, দাঁড়িয়ে কেন?

হস্ত-সঞ্চালনে আমাকে আশ্বস্ত করিয়া একটু অপ্রস্তুত ভাবেই দাদা কহিলেন, বসছি ভাই, ব্যস্ত হইয়ো না। পরস্পরের খবরাখবর নেওয়া, এত কর্ত্তব্যই ভাই; পারিনে নিতে, সেটা নানান্ ঝঞ্ঝাটের জ্বালায়। নইলে, এ আর এমন কি বল।

দাদা চেয়ারখানায় বসিয়া পড়িলেন। তাহার পর আবার কহিলেন, আমি তো জানতামও না। ছুটীর পরে 'জয়েন্' করে দেখি তুমিও আসছ না। শেষে কুলবাবুকে একদিন জিজ্ঞাসা করলুম, 'হ্যাঁ-হে, বলি ভায়ার কি ব্যাপার হয়েছে বল ত?' বললে, 'কেন! আপনি শোনেন নি!' তার মুখেই তোমার বিপদের কথা সব শুনলুম। শুনে ভাবলুম, যাই দেখে আসিগে, নিজেরও একটু দরকার রয়েছে। পথে আস্‌তে আস্‌তে জান ভায়া,—উঃ! যে রোদ্দুর! বুড়োমানুষ, মারা যাই আর কি! শেষে—

বাধা দিয়া কহিলাম, 'আমার পরে আপনিও ছুটী নিয়েছিলেন না কি? কেন? কি অসুখ করেছিল? সত্যিই তো, চেহারা বড় খারাপ দেখাচ্ছে আপনার।"

দাদা কহিলেন, "তা তো দেখাবেই ভাই, যমে মানুষে টানাটানি কি না—

কী অসুখ হয়েছিল?

অসুখ? সে কি একটু আধটু অসুখ হে, যে, বললেই চট্ করে বুঝে যাবে। ডাক্তার তো কত কথাই বললে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রোগটা কেউ ধরতেই পারে নি। ঐ তোমাদের আসাম দেশে কী একটা না কি ম্যালেরিয়ার মতন আছে? চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ধরেই সাবড়ে দেয়? —ওই তাই। এবার বুঝলে তো? কিন্তু, তাও বলি ভায়া, যমে মানুষে যখন লড়াই বেধেছে—

থামুন দাদা থামুন—কী সব বকে যাচ্ছেন! বৌদি কেমন আছেন?

হাসিয়া দাদা কহিলেন, ভালই আছেন—

তবে কি আবোল তাবোল বলছেন যা' তা'—আমি তো ভেবে পাই নি।

আবার হাসিয়া দাদা কহিলেন, আমিও পাই নে। দেখ ভায়া, তুমি চিরকালই ঐ একরকম; অত নরম প্রাণ হলে সংসারে ধাক্কাধুক্কি সামলাবে কি করে হে? ভগবান্ করুন, বৌমা যেন আমার সুস্থ শরীরে বেঁচেবর্ত্তে থাকেন; তাঁর তো আর তোমার বৌদির মত স্বামিভাগ্য নয়। যাক্,—সে হতভাগী অ্যাদ্দিনে নিষ্কৃতি পেয়েছে বেঁচে থাকতে তো কম জ্বালাই নি—

বৌদি বেঁচে নাই!

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ম্লান হাস্যে দাদা বলিলেন, না ভাই; সতীলক্ষ্মী মরে বেঁচেছে। কিন্তু, তাও বলি ভাই, এখনও পর্য্যন্ত যেন বিশ্বাস হয় না।

দাদা আমার মুখের দিকে চাহিয়া আবার কহিলেন, আঃ! তোমায় নিয়ে আর পারি নে বাপু। বলি, আমার চেয়ে তো তোমার বেশী লাগে নি গো। আমার কী অবস্থা হয়েছে একবার ভাব দেখি। অর্দ্ধেক দিনের ওপর তো খাওয়াই হয় না; দু'টো চিড়ে চিবিয়ে অফিস্ চলে আসি। ঘরে জিনিষ-পত্তরের যা' অবস্থা! যেন রেলের থার্ডক্ল্যাস ওয়েটিং শেড্! ছড়াছড়ি গড়াগড়ি ব্যাপার। গরু দুটোর একটা, তো না খেতে পেয়ে পেয়ে মরেই গেল। ছেলেটা—

ছেলে কেমন আছে?

তাকে নেবে ভাই? বিলেয়ে দেব। তার দুঃখ আর দেখা যায় না; দিবারাত্র মা মা করে কাঁদছে। আর আমিও তো প্রায় পাগল হয়ে গেছিলুম; যারে তারে গলা জড়িয়ে ধরে যখন তখন কাঁদতুম্। শেষে রামলোচন দা,—আমাদের ওই বুড়ো রামলোচন মুখুজ্জে গো, আমার বাড়ীর দু'খানা বাড়ীর পরেই তার বাড়ী। সে এসে বললে, দেখ ধনঞ্জয়, তুমি এক কাজ কর, টাকাকড়ি তো কিছু করেছ, তাই দিয়ে বৌমার নামে একটি দুর্গামন্দির প্রতিষ্ঠা কর, তাঁরও আত্মার স্মৃতিরক্ষা হবে, তুমিও মনে শান্তি পাবে। সত্য বলছি ভায়া, সেই কথা শুনে অবধি যেন মনের ভিতরে একটা জোর পেয়েছি; নইলে, এতদিনে তোমাদের এই বুড়ো ভালুককে সত্যিই হয়ত বনে চলে যেতে হত। হাসিয়া দাদা বলিয়া চলিলেন, কিন্তু বুঝলে ভায়া, রামলোচন দা শুধু মন্দির-প্রতিষ্ঠার কথাই বলেছে, আর কিছু করেনি। কিন্তু, আমি যে এ দিকে আর একটা মতলব এঁটেছি, সে কথা রামলোচন দার মাথায় খেলেই নি; কেউ জানে না, তুমিও বলতে পারবে না। পারবে?—বলত?

পারলুম না দাদা।

উৎফুল্ল হইয়া দাদা কহিলেন, হুঁ হুঁ তা তো পারবেই না; কেউ পারবে না,—তুমি তো ছেলেমানুষ। হবে কি জান? তোমার বৌদির মস্ত একখানা ছবি; ভিতরে সুমুখের গোড়ায়ই উপরে টাঙ্গান থাকবে। মন্দিরে ঢুকতে গিয়েছ কি, দেখতে হবে ছবিখানা। এখন তোমার কাছ থেকে ফটোগ্রাফখানা পেলেই হয়—দেখ ভাই ভাগ্যিস্ তখন ফটোখানা তোলা হয়েছিল,—উঃ! আমি তো ভাবতেই পারি না এখন, যে, একটা লোক জন্মের মত শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু তার একখানা ছবি পর্য্যন্ত দেখতে পাব না। ফুলবাবু যে আবার ফটোখানা তোমার কাছে দিয়ে দিয়েছে, আমি কি তা জানি। তার কাছে চাইতেই, আচ্ছা দেখ ভাই, এনলার্জ্জমেণ্ট সব থেকে ভাল কারা তোলে বল দেখি? আমি তো ভাবছি, হয় জনষ্টন্ হফম্যান, না হয়, বোর্ণ এণ্ড শেফার্ড—যে কোন একটা সাহেব-বাড়ীই চলে যাই; কি বল হে? বলি তুমি ওরকম থ মেরে আছ কেন? দাও, ফটোখানা—

ফটো নেই দাদা।

কি বলছ তুমি!

হ্যাঁ দাদা, ফুলবাবু নিশ্চয় লজ্জায় পড়ে বলতে পারে নি,—ক্যামেরায় প্লেট ছিল না—বলিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনাটি দাদার নিকটে বিবৃত করিলাম।

মুহূর্ত্তের জন্য দাদার মুখখানা পাংশুবর্ণ ধারণ করিল, তাহার পরেই হিষ্টিরিয়ার রোগীর মত উচ্চশব্দে তিনি হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন, উঃ! কি চমকাতেই ভালবাস তোমরা এই বুড়োটাকে! কর্ম্মফল। যা করে এসেছি, তার ফল কে খণ্ডাবে বল। ও কিছু না! আচ্ছা ভাই, আমি তা হলে চললুম্। তুমি কিছু দুঃখ করো না, ভাই! ভাগ্য কে খণ্ডাবে বল? আচ্ছা তা হলে আসি, যাক বৌমা তবে এখন একটু সেরেছেন। বেশ, বেশ।

পীচের রাস্তা গ্রীষ্মের রৌদ্রে তখন অগ্নিবাণ হাসিতে-ছিল, একটা ঝটকা হাওয়া হঠাৎ একরাশ উত্তপ্ত বালু খোলা দরজার পথে উড়াইয়া আনিয়া আমার চোখে মুখে নাকে কাণে যেন জ্বালা ধরাইয়া দিল। দেখিলাম ছাতাটী বগলে মুড়িয়াই ধীর মন্থর গতিতে থপ থপ করিয়া চরণ ফেলিতে ফেলিতে রাস্তার মোড়ে তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

আত্ম-সন্ধান

—শ্রীসুধীর গুপ্ত

আমি কবি, উচ্ছ্বসিত ছন্দ ভাবে সুরে
উদ্বেলিত যৌবনের বালু-বেলা পরে
প্রদীপ্ত মধ্যাহ্নে বসি গাহিতেছি গান ;
বিশ্ব-বাসী জড়, চেত কর অবধান।

সাগরের অবিশ্রান্ত অনন্ত কল্লোল,
কুন্দ-দন্ত আলোকিত হাসির হিল্লোল,
ব্যাকুলিত ব্যথাপূর্ণ শত শুভ্র আশা,
আমার বীণার তানে চাহে তারা ভাষা।

সম্মুখে অনন্ত অম্বু, পশ্চাতে প্রকৃতি,
ঊর্দ্ধে দীপ্ত নীলাম্বর, অধঃভাগে ক্ষিতি
অতল-জলধি-তলে আছে বর্ত্তমান ;
মধ্যদেশে বসি' আমি গাহিতেছি গান।

ওগো সিন্ধু, বন্ধু মম, তোমার বিস্তার
চিত্ত-তলে অবিরাম তোলে হাহাকার ;
তব সম উদ্‌ভ্রান্তেরে চাহি' মত্ত মন
গড়িয়া তুলিছে মোর গানের জীবন।

তব সম দুটি লোক,—অন্তর বাহির ;
একটি সুশান্ত তার, অন্যটি অস্থির।
তব সম সুখ দুঃখ প্রলয় আমার
কভু রহে চিরস্থির, করে হাহাকার।

যেথা মম অন্তর্লোকে জাগে অন্তর্যামী
তব বক্ষ-রত্ন সম, যবনিকা খানি—
টানি দিয়া' চতুর্দ্দিকে সলিলের মায়া ;
সেথা সদা আছে স্থির অস্থিরের ছায়া।

বহির্লোক মম সদা আলোকে আঁধারে
বর্ত্তমান বর্দ্ধমান ক্ষয় বারে বারে ;
তব সম সেথা জাগে পাপ পুণ্যরাশি,
ভাষা, আশা, সুখ, দুঃখ, ভালবাসাবাসি।

শান্তি আনে বাহ্যলোক তাই অবিরাম
ছুটিতেছে অন্তর্লোকে নাহি গো বিরাম ;
অন্তর্লোক তারে চুমি' সর্ব্ব ক্ষতি ব্যথা
মুছাইয়া দানিতেছে মহা নীরবতা।

হে সিন্ধু, হে বন্ধু মম, শোন পাতি কান,
তব বক্ষে পাও না কি কাহারো সন্ধান ?
কাহারো চরণ-ধ্বনি, আলোকের মালা,
শুনিতে, দেখিতে পাও, অনন্ত উতলা ?

ওই তব অন্তর্গেহে হের, জ্বলিতেছে
মণিমালা মুগ্ধমূর্ত্তি ; শোন, বলিতেছে
তব অন্তরীণ, "থামাও ক্রন্দন তব,
শান্ত কর ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা নব নব ;

"তুমি সেই, নাহি তব জন্ম মৃত্যু কিছু ;
তবু কেন ছুটিতেছ মরীচিকা পিছু ?
পুনর্ব্বার বেলাভূমে লভিয়া আঘাত,
তরঙ্গে তরঙ্গাহত কেন এ সংঘাত ?"

কান পাতি শুনিয়াছ বাণী, তবে আর
কেন এই মদমত্ত ক্ষুব্ধ হাহাকার ?
কিনাব্ধ-কঠিন করে পেতে চাও যাঁরে
সে যে তুমি, শুধু সদা ডাক আপনারে।

বন্ধু আজি আমি অকস্মাৎ তব প্রাণে
প্রাণ ঢালি, সীমা-মুক্ত আপনার পানে
লভিয়াছি এতদিনে বাঞ্ছিত-ঈশ্বর ;—
যেথা চাহি হেরি তারে সর্ব্ব-চরাচর।

ব্রহ্ম হতে অণু রেণু তিনি সর্ব্ব ঠাঁই ;
এত প্রেম আকর্ষণ বিশ্বমাঝে তাই।
সুখ, দুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, উত্থান, পতন—
সকলি তাঁহার খেলা লীলার কারণ।

অনলে, অনিলে, জলে, পৃথ্বী, প্রকৃতিতে
আমি কবি পারিয়াছি তাঁহারে দেখিতে ;
আমি মুক্ত ; আজি মোর নাম-বদ্ধ আমি
লভিয়াছে নাম-হীন মৌন অন্তর্যামী।

সিন্ধুতট ! আজি তুমি গেয়ে যাও গান ;—
জড় ও চেতন যত সবে মহাপ্রাণ,
সবে মুক্ত ; অম্বুরাশি ! ছাবি যাও বেগ ;
এ জীবন ভরে মন, করে যাও খেলা।

সংবাদ ও মন্তব্য

[শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য-লিখিত]

ভারত ও গ্রেটবৃটেন

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী ভারত সরকারের অর্থনীতি বিষয়ক পরামর্শদাতা ডক্টর গ্রেগরি বারাণসী হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এক সভার বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, আমেরিকা, গ্রেটবৃটেন ইত্যাদি দেশের অধিবাসীর তুলনায় ভারতবাসীর আর্থিক অবস্থা অসন্তোষজনক। কৃষকগণের অবস্থার একমাত্র প্রতিকার ব্যবস্থা হইতেছে, কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ও উহার সংকোচন।

*

মিষ্টার গ্রেগরি তাঁহার বক্তৃতায় আরও যে সব কথা কহিয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেক সত্য কথা আছে, কিন্তু ঐ কথাগুলির উপরের দুইটি কথা আমাদের মতে মোটেই সমীচীন নহে। ভারতবাসিগণ যে, রাষ্ট্রীয়ভাবে পরাধীন এবং তাহাদের আর্থিক অবস্থা যে উত্তরোত্তর হীন হইতে হীনতর হইতেছে, তাহা সত্য, কিন্তু তলাইয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, এখনও গ্রেটবৃটেন অথবা আমেরিকার জনসাধারণের তুলনায় ভারতবাসী জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় নহে। গ্রেটবৃটেনের মানুষগুলিকে নিজেদের খাদ্যের জন্য যত অধিক পরিমাণে অন্য দেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়, ভারতবাসী জনসাধারণকে তাহাদের খাদ্যের জন্য এখনও তত অধিক পরিমাণে অন্য কোন দেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় না। আমেরিকাবাসিগণের মধ্যে জীবিকার জন্য যত অধিক-সংখ্যক লোকের অপরের দাসত্ব অথবা চাকুরীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, ভারতবাসী শ্রমজীবী, কৃষক প্রভৃতিগণের পক্ষে এখনও তত অধিক পরিমাণে চাকুরী অথবা নফরগিরীর আশ্রয় লইতে হয় নাই। অবশ্য, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভারতবর্ষের আর্থিক ভাগ্য-নিয়ন্তাগণের যুক্তিহীন, অর্থহীন, দূরদর্শিতাহীন পাশ্চাত্ত্য অর্থনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিবার ফলে ভারতবাসিগণের অবস্থা যাদৃশ দ্রুত গতিতে হীন হইতে হীনতর হইয়া পড়িতেছে, অনতিবিলম্বে সেই অধোগতি অবরুদ্ধ করিতে না পারিলে ভারতবাসিগণের আর্থিক অবস্থা যে গ্রেটবৃটেন ও আমেরিকাবাসীদিগের আর্থিক অবস্থার তুলনায় অপেক্ষাকৃত ভাল, অদূরভবিষ্যতে উহা আর বলিবার যুক্তিযুক্ততা বিদ্যমান থাকিবে না। ভারতবাসিগণের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে মিঃ গ্রেগরি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে যেরূপ যুক্তিহীনতার নিদর্শন পাওয়া যায়, সেইরূপ আবার ঐ অবস্থার উন্নতি বিধান করিবার জন্য যে নির্দ্দেশ তিনি প্রদান করিয়াছেন, তাহাও আমাদের মতে অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। চাষের নিয়ন্ত্রণ অথবা সঙ্কোচনের দ্বারা কৃষকের অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে পারা যায় বলিয়া মিঃ গ্রেগরির মত ভারত গবর্ণমেণ্টও মনে করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু আমাদের মতে, ঐ নিয়ন্ত্রণ ও সঙ্কোচনের দ্বারা কৃষকের অবস্থার কোনরূপ স্থায়ী উন্নতি সাধন করা সম্ভবযোগ্য হইবে না।

পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও অর্থনীতির কু-নীতির ফলে সাধারণতঃ মানুষের বুদ্ধি এতই হীনতা পরিগ্রহ করিয়াছে যে, মানুষের পক্ষে আমাদের উপরোক্ত কথা এখনও বোঝা সম্ভব না হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু অদূর-ভবিষ্যতে উহার সত্যতা অনেকেরই উপলব্ধিযোগ্য হইবে। জগতের কৃষকগণ বর্ত্তমানে যে অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইতেছে, তাহা হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার উপায় কেবলমাত্র দুইটি :—

(১) যাহাতে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি পায়, তাহার ব্যবস্থা ; এবং

(২) যাহাতে জনসাধারণের বিবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য-মধ্যে সমতা রক্ষিত হয়, তাহার ব্যবস্থা।

যতদিন পর্য্যন্ত এই দুইটি ব্যবস্থা অবলম্বিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত আর যাহাই অবলম্বিত হউক না কেন,

তাহার দ্বারা কৃষকের দুরবস্থার কথঞ্চিৎ পরিমাণেও প্রতি-নিবৃত্তি সাধিত হইবে না। নাচন-কোঁদন, পান ভোজন অথবা সংস্কারাচ্ছন্নতা পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যোচিত বুদ্ধির সাহায্যে চিন্তা করিতে পারিলে, আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধিযোগ্য হইবে।

যাঁহারা ভারতবাসিগণের অবস্থা গ্রেটবৃটেন ও আমেরিকার অবস্থার তুলনায় হীনতর বলিয়া ঘোষিত করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে অনেকে ভারতবাসিগণের ব্যথিত বন্ধু বলিয়া মনে করেন, কিন্তু উহা আদৌ সত্য নহে। এই শ্রেণীর মানুষের এতাদৃশ উক্তির ফলেই ভারতবাসিগণ ক্রমশঃ মলিনভাবাপন্ন হইয়া থাকেন এবং তাহার ফলে, কৃষ্টিগত বিজয় (cultural conquest) অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইয়া থাকে।

যদি ভারতবর্ষে এখনও কাহারও প্রাণ ভারতবাসী জনসাধারণের ব্যথায় ব্যথিত হয়, তাহা হইলে উপরোক্ত উক্তিসমূহ সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

ভারতের কৃষক

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মোসলেম চেম্বার অব কমার্সের বার্ষিক অনুষ্ঠানে মিঃ এম, এ ইস্পাহানী পাট-চাষ সম্পর্কে একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন :—সরকার কর্তৃক পাটচাষ হ্রাসের আন্দোলন আরও জোরে চালান দরকার। পৃথিবীর পাটের চাহিদা মোটা-মুটি ভাবে প্রায় ৯৫ লক্ষ হইতে ১ কোটি গাঁইট। যত দিন কমিয়া সেই পরিমাণ পাটের চাষ আরম্ভ না হয়, ততদিন পাট-চাষ-হ্রাসের আন্দোলন চলা প্রয়োজন। এই পরিমাণ পাট উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হইলেই পাটের মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি লোপ পাইবে।

*

পাটের চাষ লাভজনক করিবার জন্ত মিঃ ইস্পাহানী যে-সমস্ত পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন, আমাদের মতে, ঐ সমস্ত নির্দ্দেশের অধিকাংশই কার্য্যকরী হইবে না এবং যাহা কিছু কার্য্যকরী হইবে, তদ্দ্বারাও কৃষকগণের পক্ষে কোন সুযোগ লাভ করা সম্ভব হইবে না। মিঃ ইস্পাহানীর প্রস্তাবগুলির অধিকাংশই মূলতঃ পাশ্চাত্ত্য মস্তিষ্ক-প্রসূত। কি করিয়া জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে হয়, তাহা যদি পাশ্চাত্ত্যগণের জানা থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাদের দেশের কৃষক ও শ্রমজীবিগণের মধ্যে অর্থাভাবের জন্ত এত হাহাকার থাকিতে পারিত না। অথচ, ভারতবর্ষের কৃষক ও অন্যান্য শ্রমজীবিগণের ৫০ বৎসর আগেও যাদৃশ আর্থিক অবস্থা বিদ্যমান ছিল, তাহাতে তাহাদিগের মধ্যে প্রায়শঃ কোন হাহাকারের কথা শুনা যাইত না। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে, জন-সাধারণের অবস্থার উন্নতি সাধন করিবার পরিকল্পনার সাক্ষ্য যদি কোথাও বাস্তবতঃ পাওয়া সম্ভব হয়, তাহা একমাত্র ভারতবর্ষ। পাশ্চাত্ত্য দেশে উহা পাওয়া কোন-ক্রমেই সম্ভব হইতে পারে না।

উপরোক্ত সত্য উপলব্ধি করিয়া কোন্ ব্যবস্থায় ভারত-বর্ষের জনসাধারণের মধ্য হইতে আর্থিক দুরবস্থা দূর করা সম্ভব হইয়াছিল, তাহার সন্ধানে যতদিন পর্য্যন্ত ব্যাপৃত না হওয়া যায়, ততদিন পর্য্যন্ত কোন ধার-করা কথার দ্বারা প্রকৃত কোন কার্য্য হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

বাণিজ্যের অবস্থা

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে সভাপতি মিঃ জে. রীড-কে বক্তৃতা প্রদান করিয়া জানাইয়াছেন :- পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ভারতে গত বৎসরের বাণিজ্যের অবস্থাকে তুলনায় ভাল বলিতে হইবে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কেহ যখন বাণিজ্যের মন্দার জন্ত আক্ষেপ করিতেছেন এবং কেহ বা তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন, তখন চারিদিকের ঘটনা বিচার করিয়া ১৯৩৮ সনে ভারতের বাণিজ্যের অবস্থা যে আশাপ্রদ, তাহা বলা চলে।

*

বাংলা দেশে যে সমস্ত ইউরোপীয় সওদাগর বিদ্যমান আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে মিঃ জে. রীড-কের প্রতিষ্ঠা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশের বাণিজ্য-বিষয়ক অবস্থা সম্বন্ধীয় তাঁহার কথাগুলি প্রায়শঃ শ্রদ্ধার যোগ্য। তাঁহার কোন কথার প্রতিবাদ করিতে আমরা প্রায়শঃ সঙ্কোচ বোধ করিয়া থাকি, তথাপি সত্যের খাতিরে আমাদিগকে বলিতে হইতেছে যে, তিনি বাণিজ্যের অবস্থার উন্নতি সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতায় এমন অনেক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, যাহা প্রতিপন্ন করিবার কোন নিদর্শন বর্ত্তমান বাণিজ্যের প্রকৃত অবস্থার

মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহা কি সত্য নহে যে, বড় বড় ইউরোপীয় সওদাগর-অফিসগুলির মধ্যে কাহারও কাহারও কর্ম্মচারী-সংখ্যা গত বৎসরেও কমাইতে হইয়াছে? যদি প্রকৃত পক্ষে ব্যবসায়ের উন্নতিই হইয়া থাকে, তাহা হইলে গরীব কর্ম্মচারীর সংখ্যা হ্রাস করিবার প্রয়োজন হয় কেন?

ভারতের সংস্থান

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের বাৎসরিক অনুষ্ঠানের সভাপতির অভিভাষণপ্রসঙ্গে মিঃ এস. এল. সাহা বলিয়াছেন:—ভারতের সংস্থান (resources) বিপুল ও ইহার শিল্প-প্রসার সম্ভাবনা বিরাট। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেশীয় ব্যাঙ্কসমূহের সহায়তায় কৃষি-বিষয়ক আর্থিক আদান-প্রদানের সহায়ক হইবে। পাট-ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট ও কয়লা ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট কয়েকটি বিষয়ের উপর নজর রাখা উচিত।

উপরোক্ত বক্তৃতায় কোন চিন্তার খাদ্য নাই। গতানুগতিক ভাবে কতকগুলি ধার-করা কথায় উহা পরিপূর্ণ। নূতন ভাবে আমাদের সমালোচ্য ইহার মধ্যে কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

শিক্ষার সংস্কার

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী নিজাম সরকারের ডিরেক্টর অব পাব্লিক ইনষ্ট্রাকসন সৈয়দ মহম্মদ হুসেন জাফারী হায়দ্রাবাদের শিক্ষা-সম্মেলনের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন:

আমরা শিক্ষা-বিষয়ক সংস্কার-পরিকল্পনার যে-কোনটিই কার্য্যকরী করিতে পারি, শিক্ষাকে বাস্তবানুযায়ী করিতে পারি, আমরা রাজ্যের সমস্ত বিদ্যালয়কে হয় কারিগরী, নয় শিল্পবৃত্তি, কিংবা কৃষি-শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করিতে পারি, কিন্তু তাহা হইলেও, আমরা দেশের বেকার-সমস্যার দূরীকরণ তো পরের কথা, হ্রাসও করিতে পারি না। বেকার-সমস্যা দূর করিতে হইলে, আমাদিগকে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিতে হইবে, রাজ্যের প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে কার্য্যে লাগাইয়া রাষ্ট্রের আর্থিক বনিয়াদ নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে।

*

কার্য্যের সূত্র হিসাবে খুব সত্য কথা।

ধর্ম্ম-শিক্ষা

পোদ্দারী নামক স্থানে মৈমনসিংহ জিলা-শিক্ষক সম্মেলনে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন:—সাম্প্রদায়িক বৈষম্য দূর করিবার জন্য বিভিন্ন ধর্ম্মের বিভিন্ন পুস্তকপাঠ সকল ছাত্রের বাধ্যতামূলক করা উচিত। বিভিন্ন মতাবলম্বী ছাত্রেরা ইহার দ্বারা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইবে।

*

এই বক্তৃতায় যে-শ্রেণীর চিন্তার নিদর্শন পাওয়া যায়, ঐ শ্রেণীর চিন্তা লইয়াও যে, বাঙ্গালার শিক্ষকগণের কোন সভায় অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিত্ব করা সম্ভব-যোগ্য হয়, ইহা ভাবিলে হতাশ্বাস হইতে হয়।

গণতন্ত্র

কয়েক সপ্তাহ হইল, মাদ্রাজের শাসনকর্ত্তা লর্ড আর্স্কিন মাদ্রাজ মিউনিসিপ্যালিটীর অভিনন্দনের উত্তরে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন—গণতন্ত্রের সার কথা, সাধারণের হিতার্থে সমবেত চেষ্টা। হিতের সংজ্ঞা সম্বন্ধে মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকিতে পারে, কিন্তু যাহাদের বিচারশক্তি আছে, তাহাদের মধ্যে মতের পার্থক্য ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণ হইতে পারে না। আমাদের সকলেরই সাধারণ উদ্দেশ্য হইতেছে—জনসাধারণের কল্যাণ। আমরা যত সকলে মিলিয়া মিশিয়া সকলের কষ্ট-নিবারণার্থে চেষ্টা করিব, তত শীঘ্র আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইবে।

*

ভাল কথা। ইংরাজগণ যে ইহা করিতেছেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মাতাল ও লম্পটের দুঃখ দূর করিবার যত আয়োজন বর্ত্তমান সভ্যতার সরঞ্জামে দেখা যায়, তাহা আর কোন দিন মনুষ্যসমাজে বিদ্যমান ছিল কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ আছে। কিন্তু কৈ? মানুষের দুঃখ বিন্দুমাত্রও হ্রাস পাইতেছে কি?

স্বাধীনতা ও শান্তি

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী কৃষ্ণনগরে ছাত্র-সঙ্ঘের পাঠচক্র বিভাগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভায় শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন:—স্বাধীনতা ব্যতীত শান্তি অসম্ভব। শান্তি ব্যতীত প্রগতি সম্ভব নহে।

*

আমরা শুধু জিজ্ঞাসা করি যে, স্বাধীনতা হইলেই যদি শান্তি হয়, তাহা হইলে পাশ্চাত্ত্য স্বাধীন দেশসমূহের মধ্যে এত অশান্তি কেন? আমাদের মতে এই শ্রেণীর বক্তৃতা চর্ব্বিত-চর্ব্বণে পরিপূর্ণ এবং উহার কোন কথাই চিন্তাশীল ব্যক্তির চিন্তার যোগ্য নহে।



উদ্ভবণ [শিল্পী — শ্রীভূদেব বিশ্বাস

"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

ধান্যশ্রী

বৈশাখ—১৩৪৫

৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম খণ্ড—৪র্থ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

[শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক লিখিত]

কৃষকের দুঃখ ও কৃষির উন্নতি

ভারতবর্ষের প্রাদেশিক আইন-পরিষৎসমূহের প্রায় প্রত্যেকটিতেই আগামী বৎসরের বাজেটের আলোচনায় কৃষক ও কৃষি সম্বন্ধে অনেক রকমের কথা শুনা যাইতেছে।

কৃষক ও কৃষির অবস্থা যে ক্রমশঃই হীন হইতে হীনতর হইয়া পড়িতেছে এবং উহা যে জনসাধারণের প্রতিনিধি-গণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে, তাহা ঐ সমস্ত কথা হইতে অনায়াসে বুঝা যাইবে।

কৃষক ও কৃষির অবস্থা যে ক্রমশঃ সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িতেছে এবং উহার উন্নতি সাধন করা যে একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা আমাদের জনসাধারণের প্রতিনিধিগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে বটে, কিন্তু ঐ অবস্থা যে কতখানি সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে এবং কি করিলে যে উহার উন্নতি সাধন করা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে, তদ্বিষয়ে তাঁহারা যথোপযুক্ত পরিমাণে বিচারশীল হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের কোন কথায় কোনরূপ সাক্ষ্য পাওয়া যায় না।

কৃষক ও কৃষির অবস্থা বর্ত্তমানে কতখানি সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িতেছে, তাহা সম্যক্ ভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে —সমাজে প্রত্যেক মানুষের আর্থিক অভাবহীন শান্তিময় জীবন রক্ষা করিতে হইলে কৃষক ও কৃষির উন্নতির কতখানি প্রয়োজন হয়, তাহার বিচার করিবার দরকার। সমাজে প্রত্যেক মানুষের আর্থিক অভাবহীন শান্তিময় জীবন রক্ষা করিতে হইলে কৃষি ও কৃষকের উন্নতির কতখানি প্রয়োজন এবং ঐ উন্নতি কিরূপে বজায় রাখা সম্ভব হয়, তদ্বিষয়ক আমূল ও বিস্তৃত গবেষণা একমাত্র ঋষি-প্রণীত প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থে আমাদিগের নজরে পড়িয়াছে। ঐ গবেষণা প্রাচীন হিব্রু ও আরবী ভাষায় লিখিত কোন না কোন গ্রন্থেও লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। প্রাচীন গ্রন্থসমূহে উহা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ইংরাজীভাষায় লিখিত আধুনিক কোন গ্রন্থে উহা আমারা খুঁজিয়া পাই নাই। শুধু যে ইংরাজীভাষায় লিখিত কোন গ্রন্থে কৃষি ও কৃষকের উন্নতি-বিষয়ক কোন আমূল ও বিস্তৃত গবেষণা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না তাহা নহে, বর্ত্তমান মানবজাতি কৃষি ও কৃষকের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেকখানি বিস্মৃত হইয়াছেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এমন কি, ঋষি-প্রণীত যে সমস্ত গ্রন্থে ঐ-বিষয়ক গবেষণা দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সমস্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যাকারগণ পর্য্যন্ত ঐ সম্বন্ধে যে আমূলভাবে প্রবেশ করেন নাই, তাহার ভূরি ভূরি সাক্ষ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। যথাযথভাবে সমাজরক্ষার জন্য কৃষি ও কৃষকের প্রয়োজন কতখানি, তাহা এইরূপভাবে বিস্মৃত হওয়ায়,

ও কৃষক বহু সহস্র বৎসর হইতে অবজ্ঞাত হইয়া আসিতেছে। মানবসমাজের নেতৃত্ব যে দিন হইতে পাশ্চাত্ত্যগণের হাতে হস্তান্তরিত হইয়াছে, সেই দিন হইতে জনসাধারণের ধারণা যে, একমাত্র শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিতে পারিলেই মানুষের ঐশ্বর্য্য অটুট রাখা সম্ভব হয় এবং তদনুসারে শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিবিধান করিবার জন্য নানা রকমের বন্দোবস্ত ও গবেষণা চলিয়া আসিতেছে। সমাজ-রক্ষার জন্য শিল্প ও বাণিজ্যের যে প্রয়োজন আছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই বটে, কিন্তু কৃষির উন্নতি না হইলে, কোনরূপ শিল্প অথবা বাণিজ্যের উন্নতি বিধান করা তো দূরের কথা, উহা বজায় রাখা পর্য্যন্ত সম্ভব হয় না। শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বস্ত্র-শিল্প প্রভৃতি যে-সমস্ত শিল্প জনসাধারণের প্রত্যেকের প্রয়োজনায়, তাহার কোনটীরই কাঁচামাল কৃষি ও কৃষকের উন্নতি বজায় না থাকিলে অনায়াসে পাওয়া সম্ভব হয় না। শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্য কৃষি ও কৃষকের উন্নতি যেরূপ একান্ত প্রয়োজনীয়, সেইরূপ আবার উহার বিক্রয় করিবার বাজার লাভ করিতে হইলেও কৃষি এবং কৃষকের উন্নতি সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক, কারণ জগতের প্রায় প্রত্যেক দেশে এখনও কৃষকগণই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক। তাহাদের ক্রয়-ক্ষমতা বজায় না থাকিলে শিল্পজাত দ্রব্যের সমধিক ক্রয়-বিক্রয় দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।

এইরূপভাবে দেখিলে দেখা যাইবে যে, শিল্প ও বাণিজ্য বজায় রাখিবার জন্য কৃষি ও কৃষকের উন্নতি যেরূপ সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয়, সেইরূপ আবার মানুষের জীবন ধারণ করিবার জন্যও কৃষির উন্নতি একান্ত প্রয়োজনীয়, কারণ কৃষিকার্য্যের দ্বারাই খাদ্য-শস্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

কৃষি ও কৃষকের উন্নতির প্রয়োজনীয়তা কতখানি, তাহা সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলে বুঝা যাইবে যে, মানবসমাজের সর্ব্বস্বের বিনিময়েও কৃষি ও কৃষকের অবস্থা যাহাতে অবনত না হইতে পারে, তদ্বিষয়ে অবহিত হইতে হয়।

রেলগাড়ী, মোটরগাড়ী, এরোপ্লেন, বৈদ্যুতিক আলো, বৈদ্যুতিক পাখা, রেডিও, বেতার, সিনেমা, থিয়েটার প্রভৃতি বিলাসিতার উপকরণ মানবসমাজে বিদ্যমান না থাকিলেও মানুষের পক্ষে শান্তিময় জীবন অতিবাহিত করা সম্ভব হইতে পারে বটে, কিন্তু কৃষি ও কৃষকের অবস্থা সন্তোষজনক না থাকিলে, মানুষের অস্তিত্ব বজায় রাখা পর্য্যন্ত ক্লেশকর হইয়া থাকে। এই হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, কৃষি ও কৃষকের অবস্থা যখন পতিত হইতে আরম্ভ করে, তখন তাহার উন্নতি করিতে হইলে যদি মানবসমাজ হইতে রেলগাড়ী, মোটরগাড়ী, এরোপ্লেন, বৈদ্যুতিক আলো প্রভৃতি বিলাসের উপকরণের বিলোপ সাধন করিবার প্রয়োজন হয়, তাহাতে পর্য্যন্ত পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না।

মানবসমাজের প্রত্যেকে যাহাতে আর্থিক ক্লেশ হইতে রক্ষা পাইতে পারে, তাহা করিবার জন্য বর্ত্তমান সময়ে কৃষি ও কৃষকের উন্নতি-বিষয়ে যে এতখানি অবহিত হইবার প্রয়োজন আছে, তাহা বর্ত্তমান মানবসমাজের কেহই কায়মনোবাক্যে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। মানবসমাজ-রক্ষার জন্য যে, সর্ব্বাগ্রে কৃষি ও কৃষকের উন্নতি এত প্রয়োজনীয়, তাহার ধারণা কথঞ্চিৎ পরিমাণেও সজীব থাকিলে, জগতের কমবেশী একশত পঞ্চাশ কোটী ও শ্রমিক যখন এতাদৃশভাবে বিপন্ন, তখন গান্ধীজী তাহাদের সমস্যার সমাধানে ব্যাপৃত না হইয়া কয়েক সহস্র রাজনৈতিক বন্দীর কথা লইয়া এতাদৃশভাবে ব্যস্ত হইয়া তাঁহার খ্যাতি বজায় রাখিতে পারিতেন না। কৃষি ও কৃষকের উন্নতি যে এতাদৃশ পরিমাণে প্রয়োজনীয় এবং এই উন্নতি বজায় রাখিতে হইলে যে সংযত ভাবের ঐকান্তিক সাধনার একান্ত প্রয়োজন, তাহার ধারণা মানবসমাজে বিদ্যমান থাকিলে অকৃতদার যুবক সুভাষচন্দ্র প্রকাশ্যভাবে পরস্ত্রী ও অনূঢ়া যুবতীগণের সহিত অবাধে মেলামেশা করিয়া অকুণ্ঠিত ভাবে তাঁহাদের সহ গৃহীত ফটো খবরের কাগজে প্রচার করিয়াও রাষ্ট্রপতির আখ্যা লাভ করিতে পারিতেন না।

কৃষক ও কৃষির-উন্নতি যে কতখানি প্রয়োজনীয় এবং এই উন্নতির পরিকল্পনা উদ্ধার করা যে কত কঠোর ও সংযত সাধনা-সাপেক্ষ, তাহার ধারণা যদি জনসমাজে

কথঞ্চিৎ পরিমাণেও অবশিষ্ট থাকিত, তাহা হইলে কংগ্রেস-প্রতিনিধিগণের মধ্যে যাঁহারা চপল বালকের মত অ্যাসেমব্লির মধ্যে বাদানুবাদে ঐ সম্বন্ধে অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহারা জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে, অথবা বাদানুবাদে চপল বালকের মত অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়া কর্ণ বজায় রাখিয়া চলা-ফেরা করিতে সক্ষম হইতেন না।

মানবসমাজে যাহাতে প্রত্যেকে শান্তিময় আর্থিক অভাবহীন জীবন যাপন করিতে পারে, তজ্জন্য কৃষক ও কৃষির উন্নতি যে কতখানি প্রয়োজন, তাহা এখনও অনেকেই আমাদের মতে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তথাপি যে এই বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে, তাহার কারণ ভোটদাতাগণের মধ্যে কৃষক ও শ্রমজীবিগণের সংখ্যাধিক্য। ভোট পাইবার জন্য কৃষক ও শ্রমজীবিগণের কাছে যাওয়া অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া আইন-পরিষদের সভ্যগণ তাহাদের অবস্থা ও উন্নতি সম্বন্ধে কিছু কিছু কথাবার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঐ কথাবার্ত্তা প্রায়শঃ অসার ও অদূরদর্শিতার পরিচায়ক।

বিশেষজ্ঞগণের দোহাই দিয়া ইহাঁরা যে সমস্ত পরিকল্পনার কথা কহিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা কৃষকের অথবা কৃষির কোন উন্নতি হইবে না, ইহাই আমাদের অভিমত। আমাদের এই অভিমতের সারবত্তা আমরা যুক্তির দ্বারা একাধিকবার প্রতিপন্ন করিয়াছি। প্রয়োজন হইলে আবার উহা করিব। আধুনিক বিশেষজ্ঞগণের কোন পরিকল্পনায় যে কৃষি ও কৃষকের অবনতি ছাড়া কোনরূপ উন্নতি হইবে না, তাহা মানুষ এক্ষণে বুঝিতে পারুক আর নাই পারুক, অদূর ভবিষ্যৎ উহা প্রমাণিত করিবে। সভ্যবৃন্দের মধ্যে কৃষক ও কৃষির উন্নতি-বিষয়ে যে সকল কথার আলোচনা হইয়া থাকে, তাহা প্রায়শঃ কৃষকের দুঃখের প্রতি সমপ্রাণতা হইতে উদ্ভূত নহে, পরন্তু যেন তেন প্রকারে কৃষকগণকে স্তোক দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলা হইয়া থাকে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

প্রাদেশিক অ্যাসেমব্লির অধিবেশনে যাঁহারা ঐ সম্বন্ধে কথা কহিয়াছেন, তাঁহাদের যে কাহারও কথা বিশ্লেষণ করিলেই আমাদের অভিযোগের সত্যতা প্রতিপন্ন হইবে।

আমরা এই উদ্দেশ্যে মহারাজ শ্রীশচন্দ্র এই সম্বন্ধে বাংলার অ্যাসেমব্লিতে যে-সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিব। তাঁহার উল্লেখযোগ্য কথা ছয়টী, যথা—

(১) খাঁটি জলসেচন, জলনিকাশ, বাঁধ এবং নৌ-চালনা, এই চারিটী বিষয় লইয়া জলসেচন বিভাগের কার্য্য।

(২) এক এক করিয়া বাঁধগুলি পরিহার করা গভর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান নীতি। বিশেষজ্ঞগণের মতে বাঁধগুলি মধ্য-বাঙ্গালার ক্ষয়সাধনের প্রধান কারণ।

(৩) পূর্ব্ব-বাঙ্গালা ও কলিকাতার মধ্যে যাহাতে একটি নৌ-চালনযোগ্য রাস্তা বিদ্যমান থাকে, তাহার আয়োজন করিতে হইবে।

(৪) বাঙ্গালার প্রধান প্রধান জল-পথগুলি জলের তলানি মাটির দ্বারা রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। উহা বাঁচাইতে হইলে, স্রোতের গতির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে; জলতল হইতে পঙ্কোদ্ধার করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে; সুচিন্তিত পরিকল্পনাসমূহ প্রস্তুত করিয়া তাহা কার্য্যকরী করিতে হইবে।

(৫) উর্ব্বরাশক্তির হ্রাস ও ম্যালেরিয়ার জন্য মধ্য-বাঙ্গালার বহুস্থান ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। এই সমস্ত স্থানের রক্ষা সাধন করিতে হইলে, স্যর উইলিয়াম উইলকক্সের মত বিশেষজ্ঞগণ যেরূপ ভাবে জলসরবরাহ করিয়া বৃহৎ নদীর তলানি-মিশ্রিত (silt-laden) জলসেচনের পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন, তাহা কার্য্যকরী করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে—হুগলী-হাওড়া স্কিম, মোর-প্রজেক্ট এবং দামোদর স্কীম নামক তিনটী পরিকল্পনায় গভর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।

(৬) বড় বড় পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা সময়-সাপেক্ষ। আগামী বৎসর ভৈরব ও তৎ-

সংশ্লিষ্ট আর কয়েকটী নদীর সংস্কারকার্য্যে গভর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিবেন।

জলসেচন সম্বন্ধে প্রধানতঃ এই ছয়টি কথার আলোচনা হইবার পর যাহাতে মোটর-রাস্তার উন্নতি সাধিত হয়, তাহার কথাও অ্যাসেম্ব্লিতে আলোচিত হইয়াছে এবং তজ্জন্ত টাকার মঞ্জুরী দেওয়া হইয়াছে।

কি করিয়া জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বজায় রাখা ও বৃদ্ধি করা সম্ভব হইতে পারে, তাহার গবেষণায় প্রবিষ্ট হইলে অনায়াসেই দেখা যাইবে যে, জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি রক্ষা ও বৃদ্ধি করিতে হইলে স্বাভাবিক জলপথগুলির গতি ও বেগ যাহাতে সম্পূর্ণভাবে অপ্রতিহত থাকে, তাহা করা একান্ত প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু, একসঙ্গে স্থলপথে মোটর ও রেলরাস্তার উন্নতি এবং স্বাভাবিক জলপথগুলির গতি ও বেগ অপ্রতিহত রাখা কোন ক্রমেই সম্ভব হয় না। স্থলপথে মোটর অথবা রেলরাস্তার উন্নতি সাধন করিতে হইলে সেতু নির্ম্মাণ করা ও বাঁধ দেওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে এবং তাহাতে স্বাভাবিক জলপথের গতিতে ও বেগে বাধা প্রদান করা অনিবার্য্য হইয়া থাকে। কাযেই, একসঙ্গে স্থলপথের উন্নতি সাধন করা এবং স্বাভাবিক জলপথ অপ্রতিহত রাখা কখনও সম্ভবযোগ্য হয় না। উহা করিতে যাওয়া, আর এক সঙ্গে 'ডুব ও টামাক' খাইবার চেষ্টা করা একই কথা। অথচ, মহারাজ শ্রীশচন্দ্র এক সঙ্গে 'ডুব ও টামাক' খাইবার কথা অপ্রতিহত ভাবে তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়া গিয়াছেন এবং হোমড়া-চোমড়া সভ্যবৃন্দের মধ্যে কেহই তাঁহার কথার অলৌকিকতা ও পরস্পর-বিরোধিতা দেখাইয়া দিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

তাহার পর, মহারাজ শ্রীশচন্দ্রের বাঁধগুলি পরিহার করিবার কথা। আজকালকার গভর্ণমেণ্টের বিশেষজ্ঞগণ বাঁধগুলি পরিহার করিবার কথা উঠাইয়াছেন বটে, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত স্বাভাবিক উপায়ে নদীসংস্কারের কার্য্য আরম্ভ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত নদীর পার্শ্ববর্ত্তী বাঁধগুলি উঠাইয়া দেওয়া জনসাধারণের হিতজনক হইবে না। কারণ, তাহাতে জলপ্লাবনের আশঙ্কা বৃদ্ধি পাইবে। এক্ষণে হয়ত অনেকেই আমাদের কথা বুঝিতে না পারিয়া আমাদের সহিত একমতাবলম্বন করিতে পারিবেন না, কিন্তু অদূরভবিষ্যতে মানুষ বুঝিতে পারিবে যে, যদিও গভর্ণমেণ্ট বাঁধগুলি পরিহার করিবার কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি উহা কার্য্যতঃ করা সম্ভব হইবে না। পরন্তু, উহাও কৃষি ও কৃষকের উন্নতি সম্বন্ধে একটী স্তোকবাক্য বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া পড়িবে।

বাঙ্গালার প্রধান প্রধান জলপথগুলি জলের তলানি মাটীর দ্বারা যাহাতে রুদ্ধ না হয় (to avoid silting up of the rivers), তাহা করিবার জন্ত মহারাজ শ্রীশচন্দ্র যে জলতল হইতে পঙ্কোদ্ধার করিবার ব্যবস্থা (dredging) করিবার কথা বলিয়াছেন, তাহা কার্য্যতঃ কখনও সফল হইবে না। কারণ, গোড়া কাটিয়া দিয়া আগায় সহস্রধারায় জলপ্রপাতের বন্দোবস্ত করিলে যেরূপ কোন ফলোদয় হয় না, সেইরূপ স্রোতস্বিনীকে কোথায়ও বা প্রস্তরের স্তূপের (heaps of boulders) দ্বারা, কোথায়ও বা বাঁধের দ্বারা, কোথায়ও বা রেল ও মোটর-রাস্তার দ্বারা, কোথায়ও বা সেতুর দ্বারা বাঁধিয়া ফেলিয়া কতকগুলি ড্রেজারের দ্বারা উহার পঙ্কোদ্ধার করিবার চেষ্টা ফলবতী হইতে পারে না। কাযেই, এতাদৃশ ড্রেজিং-এর কথাও সুচিন্তার পরিচায়ক বলিয়া ধরা যায় না এবং ইহাকেও কৃষি ও কৃষকের উন্নতি সম্বন্ধে অপর একটি স্তোকবাক্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

উর্ব্বরাশক্তির হ্রাস ও ম্যালেরিয়ার জন্ত মধ্য-বাঙ্গালার বহুস্থান যে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা হইতে ঐ সমস্ত স্থানকে রক্ষা করিবার জন্ত মহারাজ যে, স্যর উইলিয়ম উইল্‌কক্সের শ্রেণীর বিশেষজ্ঞগণের উপদিষ্ট পন্থা অনুসরণ করিবার কথা বলিয়াছেন, উহাও ঐ বিশেষজ্ঞগণের কথা বদহজম করিবার পরিচায়ক। স্যর উইলিয়ম উইল্‌কক্স শ্রেণীর জলসেচন-বিশেষজ্ঞগণ (irrigation experts) যে সমস্ত পরিকল্পনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা একাধারে এঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ্ ও চিকিৎসকের ন্তায় বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পারিলে দেখা যাইবে-যে, উহার কোনটির দ্বারা জমির উর্ব্বরাশক্তির অথবা জলবায়ুর উন্নতি সাধন করা সম্ভব নহে। পরন্তু, দেশের মধ্যে ঐ ধরণের জল-সেচন-প্রণালী গৃহীত হইলে স্বাভাবিক স্রোতস্বিনীর গতি ও

বেগ রুদ্ধ হওয়া অনিবার্য্য এবং তাহাতে ক্রমশঃ জমির উর্ব্বরাশক্তির হ্রাস ও অস্বাস্থ্যের বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। দ্রষ্টার ন্যায় চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, জগতের যে যে স্থানে বর্ত্তমান জল-সেচন-বিশেষজ্ঞগণের পরিকল্পনাসমূহ কার্য্যে অনুদিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানেই প্রায়শঃ জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি অচিরাৎ হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং নানারকমের অস্বাস্থ্যও দেখা দিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য জগতে যে কৃষিকার্য্য প্রায়শঃ নিষ্ফল হইয়া কৃষকের দুর্দ্দশা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার অন্যতম প্রধান কারণ উপরোক্ত বিশেষজ্ঞগণের অদূরদর্শিতা।

আমরা এখনও জনসাধারণের প্রতিনিধিগণকে স্তোকবাক্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া প্রকৃত ভাবুক ও কর্ম্মীর মত কৃষির উন্নতিসাধনের ও কৃষকের দুঃখমোচনের কার্য্যে অগ্রসর হইতে অনুরোধ করি।

ভেঁপু বাজাইবার কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিবার ও দর্শন করিবার কার্য্যে ক্ষমতা লাভ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, যতদিন পর্য্যন্ত জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি অটুট ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত পেপার-কারেন্সির কার্য্যকারিতা (efficiency) অপ্রতিহত গতিতে বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন হয় নাই এবং ততদিন পর্য্যন্ত কোথায়ও কৃষকগণ চাকুরীপ্রার্থী হইতে বাধ্য হয় নাই। পরন্তু, তাহারা সর্ব্বত্রই কৃষিকার্য্যের দ্বারা স্বাধীন ভাবে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিয়াছে এবং প্রায়শঃ তাহারাই অবসর-সময়ে কুটীরশিল্পের প্রসার সাধন করিয়া সমগ্র মানবসমাজের যাবতীয় শিল্পপ্রয়োজন সরবরাহ করিয়াছে। যতদিন জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি এতাদৃশ পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই এবং পেপার-কারেন্সির কার্য্যকারিতা অপ্রতিহত গতিতে বৃদ্ধি পাইতে পারে নাই, ততদিন পর্য্যন্ত যন্ত্রশিল্পের পক্ষে কুটীরশিল্পকে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করা সম্ভবযোগ্য হয় নাই এবং ততদিন পর্য্যন্ত মানবসমাজের শতকরা প্রায় ৮০ জন কৃষিকার্য্য ও কুটীরশিল্পের দ্বারা সমৃদ্ধির সহিত স্বাধীন ভাবে, কাহারও চাকুরী না করিয়া, জীবন যাপন করিতে পারিত। বাকী কুড়ি জনের মধ্যে পনের জনেরই কাহারও বাণিজ্য, কাহারও বা অধ্যাপনা এবং গবেষণা দ্বারা স্বাধীন ভাবে কালাতিপাত করা সম্ভবযোগ্য হইত। শতকরা পাঁচজন মাত্র, কেহ বা গৃহকর্ম্মের, আর কেহ বা রাজকার্য্যের দাসত্ব লইয়া জীবন অতিবাহিত করিতেন।

অন্যদিকে আবার দেখা যাইবে যে, যে দিন হইতে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই দিন হইতে কারেন্সির কার্য্যকারিতাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই দিন হইতেই কুটীর-শিল্প ধ্বংসোন্মুখ হইয়া পড়িয়াছে এবং সেই দিন হইতেই কৃষক উদরান্নের জন্য বিপন্ন হইয়া চাকুরীজীবী হইতে আরম্ভ করিয়াছে। কৃষকের পতনের সঙ্গে সঙ্গে জমিদার, জোতদার প্রভৃতি প্রত্যেকেই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন এবং সকলেই উদরান্ন-সংস্থানের জন্য চাকুরীপ্রার্থী হইয়াও তাহা সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না। তদবধি মানুষ নানারকমের হাতড়ান-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে এবং তাহার ফলে, নানারকমের তথাকথিত ধর্ম্ম, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অভ্যুদয় হইয়াছে বটে, কিন্তু মানুষের দুঃখ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াই চলিতেছে।

উপরোক্ত ঐতিহাসিক চিত্রটী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে অনায়াসেই বুঝা যাইবে যে, মানবসমাজকে তাহার বর্ত্তমান বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে এবং তৎসঙ্গে বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্যের মধ্যে যাহাতে সমতা (parity) স্থাপিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিবার উপায় কি, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, ঐ উপায় ইংরাজীতে লিখিত কোন পাশ্চাত্ত্য গ্রন্থে পাওয়া যায় না এবং উহা আবিষ্কৃত করিবার একমাত্র পন্থা, ধর্ম্মের এবং পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের গোঁড়ামী অথবা সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন ভাবে গবেষণায় প্রবৃত্ত হওয়া। জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে যাহাতে দেশের সমগ্র স্রোতস্বিনীতে বার মাস জল ও স্রোত অপ্রতিহত থাকে এবং তজ্জন্য নদীগুলির পঙ্কোদ্ধার করা

একান্ত প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু তাহা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকের কোন কৌশলের দ্বারা সম্ভবযোগ্য হইবে না। দেশের সমগ্র স্রোতস্বিনীতে যাহাতে বার মাস জল ও স্রোত অপ্রতিহত থাকে, তাহা করিতে হইলে প্রকৃতি ও বিকৃতিকে ভাল করিয়া প্রত্যক্ষ করিতে হইবে এবং প্রকৃতির নামে বিকৃতির খেলা যাহাতে না ঘটিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রকৃতি ও বিকৃতিকে ভাল করিয়া প্রত্যক্ষ করা সকলের পক্ষে সম্ভবযোগ্য নহে। মানুষের দুঃখে অকৃত্রিম ভাবে যাঁহাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিবে, যাঁহারা নিজেদের খ্যাতি ও অখ্যাতির কথা ও ভাবনা বিসর্জ্জন দিয়া একমাত্র জন-সাধারণের দুঃখ-মোচনের ভাবনায় ও কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন, তাঁহারা সংযত ভাবে নিভৃতে কঠোর সাধনায় উন্মত্ত হইলে উহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন।

কাযেই বলিতে হয় যে, কৃষকদের দুঃখ ও কৃষির উন্নতি সাধন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন কয়েকটী খাঁটি মানুষের এবং তৎসঙ্গে আরও প্রয়োজন—যাঁহারা অখাঁটি হইয়াও খাঁটির নামে বিকাইতেছেন, তাঁহারা যাহাতে এইরূপে বিকাইতে না পারেন, জন-সাধারণ যাহাতে তাঁহাদের স্বরূপ যথাযথ ভাবে বুঝিতে পারেন, তাহার আয়োজন।

১৯৩৫ সালের নূতন আইনের সাফল্য এবং ইংরাজের জয়

১৯৩৫ সালের ভারতবর্ষের নূতন আইনের বয়স এক বৎসর অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করিতে চলিয়াছে। এই আইন সফল হইয়াছে কি না, তাহার পরীক্ষা করা এই সন্দর্ভের উদ্দেশ্য। ইহা সফল হইতে চলিয়াছে অথবা বিফল হইয়াছে, তাহার পরীক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে কি উদ্দেশ্যে এই আইন ব্রিটিশ ষ্টেট্‌সম্যান-গণের দ্বারা প্রণীত হইয়া ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহার সন্ধান করিতে হইবে এবং যদি দেখা যায় যে, যে-যে উদ্দেশ্য লইয়া এই আইন প্রণীত হইয়াছিল, তাহার প্রত্যেক উদ্দেশ্যটী অল্লাধিক পরিমাণে সাফল্য লাভ করিয়াছে, তাহা হইলে এই আইন যে সফল হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। অন্যদিকে যদি দেখা যায় যে, ইহার উদ্দেশ্যের কোনটীই সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই এবং ভবিষ্যতে যে সাফল্য লাভ করিবে, তাহার চিহ্নও পরিলক্ষিত হয় না, তাহা হইলে ইহার বিফলতা প্রতিপন্ন হইবে। কাযেই, ভারতবর্ষে এই আইনের সফলতা অথবা বিফলতা সম্ভবযোগ্য, তাহার পরীক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম কি কি উদ্দেশ্য লইয়া ইহা প্রণীত হইয়াছিল, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

১৯৩৫ সালের ভারতীয় নূতন আইনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত রহিয়াছে। কাহারও কাহারও মতে ভারতবাসিগণের স্কন্ধে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের দায়িত্ব চাপাইয়া দিয়া কি করিয়া স্বাধীন ভাবে দেশের গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত করিতে হয়, তাহা কার্য্যতঃ শিক্ষা দেওয়া এবং এইরূপ ভাবে ভারতবাসিগণকে স্বাধীনতা লাভ করিবার উপযুক্ত করিয়া তোলা এই আইন প্রণয়নের প্রধান উদ্দেশ্য।

আর এক দল লোক আছেন, তাঁহারা মনে করেন যে ইংরাজ ষ্টেট্‌স্‌ম্যানগণ নানাবিধ কু-অভিসন্ধি লইয়া ভারতবর্ষের জন্য এই আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে —১৯০৬ সাল পর্য্যন্ত ভারতীয় কংগ্রেস যে ভাবে পরিচালিত হইয়া আসিতেছিল, তাহাতে ভারতবর্ষে সমগ্র ভারতবাসীর মিলনের উপর প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তার অভ্যুদয় হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল এবং ভারতবর্ষে অখণ্ড জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত হইলে ইংরাজের প্রভুত্ব বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা ছিল। এই আশঙ্কা বিদূরিত করিবার অভিপ্রায়ে ভারতবাসিগণ যাহাতে মিলিত না হইতে পারে, প্রধানতঃ তদুদ্দেশ্যে এই আইন ব্রিটিশ ষ্টেট্‌স্‌ম্যানগণের দ্বারা প্রণীত হইয়াছে বলিয়া এই সম্প্রদায়ের মত। ইঁহারা আরও মনে করেন যে, ভারতবাসিগণ যে স্বাধীন ভাবে শাসন-কার্য্যের অনুপযুক্ত, তাহা প্রমাণিত করা এবং তাহাদের অন্ন-সমস্যা, বেকার-সমস্যা, স্বাস্থ্য-সমস্যা প্রভৃতি বিভিন্ন

সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব যাহাতে ইংরাজগণের উপর আরোপিত না হইতে পারে, অথচ ঐ ঐ বিষয়ের প্রভুত্ব যাহাতে তাঁহাদের হাতে ন্যস্ত থাকে, তাহা করাও ১৯৩৫ সালের নূতন আইন প্রণয়নের অন্যতম উদ্দেশ্য।

আমরা দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্গত এবং আমাদের মতে, যদি দেখা যায় যে, ভারতবাসিগণের মধ্যে অনৈক্য বৃদ্ধি পাইতেছে, তাঁহারা শাসনকার্য্যের দায়িত্ব স্বীয় স্কন্ধে লইতে স্বীকার করিয়াছেন এবং উহার দ্বারা দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা হইলেই ১৯৩৫ সালের ভারতীয় নূতন আইনের সাফল্য স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

স্বাধীন ভাবে, নির্গণ্ডগোলে, কাহারও সহিত কলহে প্রবৃত্ত না হইয়া, অন্য কাহারও উপর নির্ভর না করিয়া, দেশের গভর্ণমেণ্ট সুশৃঙ্খলার সহিত কিরূপ ভাবে পরিচালিত করিতে হয় এবং এই পরিচালনার দ্বারা দেশের প্রত্যেকের দারিদ্র্য কিরূপ ভাবে বিদূরিত করিতে হয়, তাহা ইংরাজগণ নিজেরাই এখনও পর্য্যন্ত শিক্ষা করিতে পারেন নাই, ইহা আমাদের অভিমত। উপরোক্ত শ্রেণীর প্রকৃত স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট কিরূপ ভাবে পরিচালিত করিতে হয়, তাহা ইংরাজেরা নিজেরাই যখন শিক্ষা করিতে পারেন নাই, তখন উহা আর কোন দেশকে এবং জাতিকে শেখান তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। অনেকে হয়ত আমাদের উক্তির সহিত একমতাবলম্বন করিতে সক্ষম হইবেন না, কিন্তু আমাদের এই মত যে সত্য, উহা কয়েক বৎসরের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেই সপ্রমাণিত হইবে।

রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজত্ব-কাল হইতে অদ্য পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের ইতিহাসে একটিও নির্গণ্ডগোলের এবং কলহ-হীনতার বৎসর খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি? উপরোক্ত কয়েক শত বৎসরের ইংলণ্ডের ইতিহাসে যে বৎসরটী অন্য কোন দেশের উপর নির্ভর না করিয়া ইংরাজগণ নিজেদের খাদ্যের সংস্থান অথবা ঐশ্বর্য্যের সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, এমন একটী বৎসরও খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি? কি করিয়া দেশের মধ্যে কাহারও কাহারও ঐশ্বর্য্যের বৃদ্ধি সাধন করিতে হয়, তাহার কোন কোন কথা ইংরাজী অর্থবিজ্ঞানে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ইংরাজী ভাষায় লিখিত যে সমস্ত অর্থবিজ্ঞানের পুস্তক বিদ্যমান আছে, তাহার কোনখানিতে, কি করিয়া দেশের প্রত্যেকের অর্থাভাব ও পরমুখাপেক্ষিতা দূর করিতে হয়, তাহার কোন কথা খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি? কোন দেশের গভর্ণমেণ্ট প্রকৃত স্বাধীন ভাবে সুপরিচালিত হইতেছে, এতাদৃশ আখ্যায় আখ্যাত করিতে হইলে যাহাতে এই দেশের মানুষগুলির মধ্যে কোনরূপ গণ্ডগোল, দলাদলি অথবা দ্বন্দ্ব না থাকিতে পারে, অন্য কোন দেশের সহিত যাহাতে কোনরূপ মারামারি অথবা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া দেশের কোন লোককে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে না হয়, দেশের লোকের অন্ন-সংস্থানের জন্য যাহাতে অন্য কোন দেশের লোকের মুখাপেক্ষী হইতে না হয়, দেশের প্রত্যেকে যাহাতে কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া, কাহারও চাকুরী না করিয়া, নিজ নিজ প্রয়োজনের পূরণ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা হওয়া যে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়, এতদ্বিষয়ে যুক্তিযুক্ত ভাবে অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

ইংরাজের দেশে তাঁহাদের গবর্ণমেণ্ট কিরূপ ভাবে পরিচালিত হইতেছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, উহা যে প্রকৃত পক্ষে উপরোক্ত রকমে স্বাধীন ভাবে পরিচালিত হইতেছে, তাহা যখন প্রমাণিত হয় না, তখন ইংরাজগণ নিজেরাই যে প্রকৃত ভাবের স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট পরিচালন করিবার বিজ্ঞান আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, তাহা যুক্তিসঙ্গত ভাবে অস্বীকার করা যায় না।

কাজেই যাঁহারা মনে করেন যে, কি করিয়া স্বাধীন ভাবে দেশের গবর্ণমেণ্ট সুপরিচালিত করিতে হয় তাহা কার্য্যতঃ শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৯৩৫ সালের নূতন আইন রচিত হইয়াছে, তাঁহারা আমাদের মতে ভ্রান্ত।

যাহাতে ভারতবাসিগণের মধ্যে ঐক্য সাধিত হইয়া ইংরাজগণের ভারতীয় প্রভুত্ব খর্ব্ব হইতে না পারে, যাহাতে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব ইংরাজগণের উপর আরোপিত না হইয়া ভারতবাসিগণের উপর আরোপিত হইতে পারে, অথবা ইংরাজগণের প্রভুত্ব যাহাতে অক্ষুন্ন থাকে, ভারতবাসিগণ যে শাসনকার্য্যের অনুপযুক্ত, তাহা যাহাতে প্রতিপন্ন হইতে পারে, প্রধানতঃ এই তিনটি উদ্দেশ্য

সম্মুখে রাখিয়া ১৯৩৫ সালের নূতন আইন ব্রিটিশ ষ্টেটস্‌ম্যানগণের দ্বারা প্রণীত হইয়াছে -- এতাদৃশ অভিমত আমরা পোষণ করিয়া থাকি বটে, কিন্তু ঐ তিনটি উদ্দেশ্যের জন্য ইংরাজ ষ্টেটস্‌ম্যানগণ যে কোনরূপ নিন্দনীয়, তাহা আমরা মনে করি না। জীবনের মূল উদ্দেশ্য যাহা হওয়া উচিত, তাহা অব্যাহত রাখিলে ইংরাজগণের নিকট ভারতবাসিগণের শিক্ষণীয় কিছু আছে বলিয়া আমরা মনে করি না বটে, কিন্তু ভারতবাসী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কেহ বা যেরূপ গোঁড়া ও অভিমানগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন এবং কেহ বা যেরূপ চরিত্রহীন ব্যভিচারপরায়ণ পশুবৎ হইয়া পড়িয়াছেন, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য করিয়া ইংরাজগণের শিক্ষিতগণকে আমরা ভারতবাসী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের তুলনায় প্রশংসাভাজন বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকি।

আমাদের মতে, ভারতবাসিগণের মধ্যে যাহাতে একতা প্রতিষ্ঠিত হইয়া জাতীয়তার অভ্যুদয় হয়, তাহার চেষ্টায় ইংরাজগণের এক সম্প্রদায় একদিন হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং তদুদ্দেশ্যে তাঁহারা ভারতবর্ষে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু, পরবর্ত্তী কালে ভারতবাসিগণের মধ্যে ইংরাজগণের প্রভুত্ব কাড়িয়া লইবার স্পৃহা হওয়ায়, ভারতবাসিগণ যাহাতে তাহা না করিতে পারেন, তাহার আয়োজনে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

ঢিলটি মারিলেই পাটকেলটি খাইতে হয় এবং যাঁহারা দূরদর্শী তাঁহারা যাহাতে পাটকেলটি খাইতে না হয়, তাহার বন্দোবস্ত না করিয়া কখনও ঢিলটি মারিবার জন্য ব্যাকুল হন না।

কাজেই, অসংবদ্ধভাবে ১৯৩৫ সালের নূতন আইন তলাইয়া চিন্তা করিলে তাহার প্রণেতা ব্রিটিশ ষ্টেটস্‌ম্যানগণকে প্রতিহিংসাপরায়ণ পশুভাবাপন্ন অদূরদর্শী মানুষ বলিয়া নিন্দা করা যায় বটে, কিন্তু পূর্ব্বাপর মনে রাখিয়া উহার সমালোচনা করিতে বসিলে তাঁহাদিগকে কোনক্রমেই নিন্দনীয় বলিয়া মনে করা যায় না।

উপরোক্ত যে তিনটি উদ্দেশ্য লইয়া ১৯৩৫ সালের নূতন আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি, সেই উদ্দেশ্য তিনটি সফল হইতেছে অথবা বিফল হইতেছে, আমরা এক্ষণে তাহার পরীক্ষা করিব।

ভারতবাসিগণের মধ্যে ঐক্য বৃদ্ধি পাইতেছে অথবা অনৈক্য বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার পরীক্ষা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, কুড়ি বৎসর আগেও ভারতবাসী হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্যে এবং হিন্দুগণের পরস্পরের মধ্যে সময় সময় অসদ্ভাবের দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হইত বটে, কিন্তু মুসলমানগণের পরস্পরের মধ্যে অথবা বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে অথবা শ্রমজীবী ও কৃষকগণের পরস্পরের মধ্যে, অথবা পুরুষ ও নারীর মধ্যে, অথবা যুবক ও বৃদ্ধগণের মধ্যে, অথবা প্রভু ও চাকরের মধ্যে, অথবা দেনাদার ও পাওনাদারগণের মধ্যে, অথবা জমীদার ও প্রজাগণের মধ্যে, প্রায়শঃ কোনরূপ স্থায়ী ও তীব্র মনোমালিন্যের দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হইত না। গত এক বৎসরের বিভিন্ন প্রাদেশিক অ্যাসেম্ব্লি ও কাউন্‌সিলসমূহে যে সমস্ত বিষয়ে বাদানুবাদ হইয়াছে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, অদূরভবিষ্যতে কেবলমাত্র হিন্দু ও মুসলমানের মনোমালিন্যই যে দৃঢ়তর হইবে, তাহা নহে, হিন্দুর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য, মুসলমানের পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য, কৃষক ও জমীদারগণের মধ্যে মনোমালিন্য, দেনা ও পাওনাদারগণের পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য, প্রভু ও ভৃত্যগণের পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য, কৃষক ও শ্রমজীবিগণের পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য, যুবক ও বৃদ্ধগণের মধ্যে মনোমালিন্য, পুরুষ ও নারীগণের মধ্যে মনোমালিন্য, এক কথায় সর্ব্বত্রই অনৈক্যের রেখা উত্তরোত্তর অধিকতর পরিস্ফুট হইবার আশঙ্কা পরিলক্ষিত হইতেছে।

ভারতের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব ইংরাজগণ অধিকতর মাত্রায় গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, অথবা উহা ভারতবাসিগণের স্কন্ধে ন্যস্ত হইতেছে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ায় এবং কংগ্রেস ঐ শাসনভার গ্রহণ করিতে সম্মত হওয়ায়, ভারতবর্ষের প্রত্যেক সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব ইংরাজগণের স্কন্ধ হইতে অপসারিত হইয়া ভারতবাসিগণের স্কন্ধে ন্যস্ত হইয়াছে। অথচ, রাজপ্রতিনিধি

ভাবে প্রাদেশিক গবর্ণরগণের বিদ্যমানতা ও রক্ষাকবচসমূহের সহায়তা অটুট থাকায়, ইংরাজ-প্রভুত্ব সর্ব্বতোভাবে বজায় রহিয়াছে। যদি দেখা যাইত যে, ভারতবর্ষের সমস্যা কি কি ও তাহার সমাধান করিবার উপায়ই বা কি কি, তৎসম্বন্ধে ভারতবাসী নেতাগণ সর্ব্বতোভাবে সচেতন হইয়াছেন, তাহা হইলে হয়ত ভারতবর্ষের সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব ভারতবাসিগণের হাতেও ন্যস্ত হওয়ায় খেদ করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণের উদ্ভব হইত না, কিন্তু ঐ নেতাগণ তাঁহাদের বাদানুবাদে যে সমস্ত কথাবার্ত্তা বলিয়া থাকেন, তাহা তলাইয়া চিন্তা করিলে এবং তাঁহাদের কার্য্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, গান্ধীজী হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বনিম্ন নির্ব্বাক্ হাততোলা-সভ্যটী পর্য্যন্ত কেহই সমস্যা সমাধানের উপায় তো দূরের কথা, আমাদের প্রকৃত সমস্যা যে কি কি, তদ্বিষয়ে পর্য্যন্ত সচেতন নহেন। পুটিমাছ যেরূপ ফর ফর করিয়া থাকে, ইহারাও দেশবাসী জনসাধারণের নিরীহতার সহায়তা লইয়া দেশের মধ্যে সেইরূপ ফর ফর করিতেছেন বটে, কিন্তু ইহাঁদের কাহারও দ্বারা দেশের কোন প্রকৃত সমস্যা প্রকৃতভাবে পূরণ হইবার সম্ভাবনা নাই। আমাদের এই উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ কাহারও কাহারও মনে এখনও থাকিতে পারে বটে, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে বাস্তবতঃ যাহা ঘটিবে, তদ্দ্বারা উহার সত্যতা সর্ব্বতোভাবে সপ্রমাণিত হইবে।

ভারতবাসিগণ যে শাসনকার্য্যের অনুপযুক্ত, তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা অথবা শাসনকার্য্যে ভারতবাসিগণের উপযুক্ততা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা অধিকতর মাত্রায় চলিয়াছে, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু হইলে দেখা যাইবে যে, ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ যাহাতে শাসন-ব্যাপারে লিপ্ত থাকেন, তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য সময় সময় তাঁহাদিগের প্রশংসা করা হইয়া থাকে বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শাসনকার্য্যের উপযুক্ত হইতে হইলে এখনও যে তাঁহাদিগের অনেক কিছু শিক্ষা করিতে হইবে, তাহা প্রতিনিয়ত তাঁহাদিগকে শুনান হইয়া থাকে।

সম্প্রতি "হরিজন" পত্রিকায় এলাহাবাদের হিন্দু-মুসলমান-বিবাদ সম্পর্কে গান্ধীজী যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে ইংরাজগণকে বাদ দিয়া ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য চলিতে পারে না, তাহা তিনি স্বয়ংই স্বীকার করিয়াছেন। ইংরাজগণকে বাদ দিয়া ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য চলিতে পারে না, ইহা বলা আর ভারতবাসিগণ স্বাধীনভাবে শাসনকার্য্য চালাইবার অনুপযুক্ত, ইহা স্বীকার করা একই কথা।

উপরোক্ত ভাবে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে বলিতে হয় যে, প্রধানতঃ যে তিনটি উদ্দেশ্য লইয়া ভারতবর্ষের ১৯৩৫ সালের নূতন আইনের প্রণেতা ব্রিটিশ ষ্টেটস্‌ম্যানগণ ঐ আইন প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেকটি সাফল্য লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই হিসাবে ভারতবর্ষের নূতন আইন যে সফল হইতে চলিয়াছে, এবং ঐ আইনের প্রণেতাগণ যে এক একটি ষ্টেট্‌স্‌ম্যান, তাহা আপাতদৃষ্টিতে অস্বীকার করা যায় না।

আপাতদৃষ্টিতে নূতন আইনের সাফল্য ও উহার প্রণেতাগণের রাজনীতি-জ্ঞানের উৎকর্ষ বিষয়ে অস্বীকার করা যায় না বটে, কিন্তু নূতন আইন সফল হইলেই ভারতবর্ষে ইংরাজের প্রভুত্ব যে অটুট থাকিবে, তাহা মনে করা যায় না।

ভারতবর্ষের কৃষক ও অন্যান্য শ্রমজীবিগণের মধ্যে অন্নাভাব ও অর্থাভাব, শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে বেকার ও নৈরাশ্য যেরূপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে ঐ দুইশ্রেণীর যুবশক্তি ব্যক্তি লাভ করিয়া বদ্ধপরিকরভাবে রাজপ্রতিনিধি ও রাজপুরুষগণের নিকট এক সঙ্গে অন্ন-সমস্যা, অর্থ-সমস্যা, বেকার-সমস্যা ও নৈরাশ্য-সমস্যার সমাধান যাচ্ঞা করিলে রাজপ্রতিনিধি ও রাজপুরুষগণের পক্ষে গভর্ণমেণ্ট পরিচালনা যে অপেক্ষাকৃত অনেক পরিমাণে কষ্টকর হইয়া পড়িবে এবং এমন কি ব্রিটিশ প্রভুত্বের স্থায়িত্ব পর্য্যন্ত যে টলটলায়মান হইয়া পড়িতে পারে, তাহা একটু তলাইয়া চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে।

কাজেই, যদিও আপাতদৃষ্টিতে ১৯৩৫ সালের নূতন আইন সাফল্য লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, তথাপি ইংরাজ ষ্টেটস্‌ম্যানগণ যে জয়ী হইয়াছেন, তাহা যুক্তিসঙ্গতভাবে মনে করা চলে না।

ইংরাজ ষ্টেটস্‌ম্যানগণের উপরোক্ত পরাজয় একদিকে যেরূপ ইংরাজগণের অভিলষিত নহে, অন্যদিকে আমাদের

ভারতবাসিগণের পক্ষেও মঙ্গলজনক নহে। অনেকে মনে করেন যে, যে কোন প্রকারে ভারতবর্ষে ইংরাজের প্রভুত্ব খর্ব্ব হইলেই ভারতবাসিগণের পক্ষে স্বাধীনতা লাভ করা এবং ভারতবর্ষের বিবিধ সমস্যার সমাধান করা সম্ভবযোগ্য হইবে। আমাদের মতে, যাঁহারা উপরোক্ত ভাবের মতবাদ পোষণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে অদূরদর্শী। ভারতবর্ষে কু-শিক্ষার পরিমাণ ও কু-শিক্ষিতের সংখ্যা এতাদৃশ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, ঐ কু-শিক্ষার পরিবর্ত্তন সাধিত না হইলে, ইংরাজ জাতির নৈতিক প্রভুত্ব কোন ক্রমেই খর্ব্বতা প্রাপ্ত এবং ইংরাজগণও এদেশ হইতে বিতাড়িত হইবে না। তর্কের খাতিরে যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, ইংরাজগণকে তাড়াইয়া দেওয়া সম্ভবযোগ্য, তাহা হইলেও ভারতবাসিগণের পক্ষে স্বাধীনতা লাভ করা অনায়াস-সাধ্য হইবে না, কারণ যে সংযম, ন্যায়পরায়ণতা, আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ও জ্ঞান-বিজ্ঞান জানা থাকিলে দেশের জনসাধারণের প্রত্যেক সমস্যার সমাধান করিয়া তাহাদের সন্তুষ্টি বিধান করা ও যথাযথভাবে গভর্ণমেণ্ট পরিচালনা করা সম্ভবযোগ্য হয়, সেই সংযম, ন্যায়পরায়ণতা, আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ও জ্ঞান-বিজ্ঞান, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কেহই, এমন কি গান্ধীজী পর্য্যন্ত, শিক্ষা করিতে পারেন নাই। যে জ্ঞান-বিজ্ঞান পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেশের জনসাধারণের প্রত্যেক সমস্যাটীর সমাধান করা সম্ভব হয়, তাহা যদি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাহারও কথঞ্চিৎ পরিমাণেও জানা থাকিত, তাহা হইলে আমাদের জনসাধারণের দুরবস্থা এতাদৃশ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে পারিত না।

এতাদৃশ অবস্থায় ইংরাজ-প্রভুত্বের অবসান ঘটিলে দেশের মধ্যে অরাজকতা বৃদ্ধি পাওয়া অবশ্যম্ভাবী এবং তাহাতে যাঁহারা কোন সাধারণ সভার সভ্যের নামে, অথবা কোন সম্প্রদায়গত খবরের কাগজের জেনারেল-ম্যানেজারীর নামে পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া, চুরি, জুয়াচুরি, ডাকাতি, অথবা প্রবঞ্চনা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে চাহেন, তাঁহাদের কিছু সুবিধা আপাতদৃষ্টিতে হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু যাঁহারা সদ্ভাবে পরিশ্রম করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতে চাহেন, তাঁহাদের কোন সুবিধা ঘটবে না।

কাযেই, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ষ্টেটস্‌ম্যানগণের পরাক্রম যেরূপ ইংরাজ জনসাধারণের অভিলষিত হইতে পারে না, সেইরূপ উহা ভারতীয় জনসাধারণেরও মঙ্গলপ্রদ নহে।

এতাদৃশ অবস্থায় ভারতবর্ষে ইংরাজের স্বার্থ ও ভারতবাসীর স্বার্থ যাহাতে যুগপৎ রক্ষিত হয়, তাহার চেষ্টা ইংরাজ ও ভারতবাসিগণকে মিলিত হইয়া করিতে হইবে।

অনেকে মনে করেন যে, ভারতবর্ষে ইংরাজের স্বার্থ ও ভারতবাসীর স্বার্থ সম্পূর্ণ বিপরীত এবং তাহা যুগপৎ রক্ষিত হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে। এতাদৃশ মতবাদ রাজনীতি ও অর্থনীতি-ক্ষেত্রে অদূরদর্শিতার পরিণাম।

মনে রাখিতে হইবে যে, ভারতবাসী মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯৫ জন শ্রমজীবী আর পাঁচ জন বুদ্ধিজীবী।

একটু তলাইয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, যাহাতে অনায়াসে প্রচুর কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপত্তি হয় এবং যাহাতে শ্রমজীবিগণ অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যুতে বিক্ষুব্ধ না হয়, তাহা করিতে পারিলে, ভারতবর্ষের উপরোক্ত ৯৫ জন শ্রমজীবী এতাদৃশ পরিমাণে প্রকৃত ধনের উৎপত্তি সাধন করিতে সক্ষম হইবে যে, তাহাদের নিজেদের প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিয়াও যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে, তদ্দ্বারা ভারতবর্ষের ঐ পাঁচ জন বুদ্ধিজীবী ও ইউনাইটেড কিংডমের সমগ্র অধিবাসীর জীবিকানির্ব্বাহ অনায়াস-সাধ্য হইবে।

ইংরাজের স্বার্থ ও ভারতবাসীর স্বার্থ যুগপৎ রক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে যে-বিদ্যার দ্বারা অনায়াসে প্রচুর কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপত্তি হয় এবং যে-বিদ্যার দ্বারা মানুষের অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু দূর করা সম্ভব হয়, তাহা যে বর্ত্তমান জগতের কাহারও জানা নাই, তাহা ইংলণ্ডের ও ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া, ঐ বিষয়ে সম্পূর্ণ ভাবে অভিমানহীন হইয়া, আমূল ভাবে নূতন ধরণের গবেষণায় প্রয়াসী হইতে হইবে।

এই অবস্থার উদ্ভব সম্ভবযোগ্য করিয়া তুলিতে না পারিলে উভয় দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কেই চোখ-বাঁধা বলদের মত ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে এবং তাবৎকাল গান্ধীজীর স্বাধীনতার বুলিও যেরূপ ফাঁকা আওয়াজে পর্য্যবসিত থাকিবে, সেইরূপ ব্রিটিশ ষ্টেটস্‌ম্যানগণের

নানাবিধ চালবাজীও ফলতঃ অসার প্রতিপন্ন হইয়া, ব্রিটিশ-প্রভুত্ব উত্তরোত্তর অধিকতর টলটলায়মান হইতে থাকিবে।

আমাদের উপরোক্ত কথা এখনও মহাপণ্ডিতগণের অবোধ্য থাকিলেও থাকিতে পারে বটে, কিন্তু জন-সাধারণের অনাহারজনিত গুঁতার চোটে উহা তাঁহাদিগকে অদূর-ভবিষ্যতে বুঝিতে হইবে।

গান্ধীজীর ষ্টেটস্ম্যানশিপ ও তাঁহার প্রতি দেশবাসীর কর্ত্তব্য

ভারতবাসিগণের মধ্যে যাঁহারা গান্ধীজীর কথা লইয়া অল্পাধিক পরিমাণে ব্যস্ত থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে,তিনি একজন প্রকাণ্ড ষ্টেটস্ম্যান, আর কেহ কেহ মনে করেন যে, তিনি একজন "সেণ্ট" অথবা "অবতার"।

আমাদের মতে, তিনি ষ্টেটস্ম্যানও নহেন, অবতারও নহেন। "ষ্টেটস্ম্যান" কিংবা "অবতার" না হইয়াও তিনি যে ভারতবাসী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অংশবিশেষের উপর দীর্ঘকালব্যাপী নেতৃত্ব করিতে সক্ষম হইতেছেন, তাহা ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শিক্ষা যে প্রকৃত পক্ষে সুশিক্ষা নহে, পরন্তু কু-শিক্ষা, তদ্বিষয়ক সাক্ষ্য।

আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট করিতে হইলে অনেকের পক্ষে অনেকগুলি অপ্রিয় কথা আমাদিগকে বলিতে হইবে। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় দলাদলির রাজনীতি-ক্ষেত্রে সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়া কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করিতে হইলে আমাদের মতে দলবিশেষের অপ্রিয় হওয়া অনিবার্য্য। তথাপি, আমাদের কথাগুলি যাঁহাদের অপ্রিয় হইবে, তাঁহাদের নিকটে আমরা ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

গান্ধীজী কোনরূপ "অবতার" কি না, তৎসম্বন্ধে কৃত-নিশ্চয় হইতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে "অবতার" শব্দটীর প্রকৃত অর্থ কি, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হয়। শব্দ-বিজ্ঞান অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, 'জ্ঞপ্তি' নামক একটি অবস্থা লইয়া শিশুর পার্থিব জীবনের আরম্ভ ঘটিয়া থাকে এবং তাহার পূর্ব্বে আর যে যে অবস্থা থাকে, তাহার প্রত্যেকটী অব্যক্ত। শব্দ-বিজ্ঞানানুসারে 'অব্যক্ত' অবস্থা হইতে "জ্ঞপ্তি" অবস্থার উদ্ভব হইবার নাম "অবতরণ" এবং মানব-শরীরে প্রতিনিয়ত যে 'অব্যক্ত' আত্মা হইতে "জ্ঞপ্তি" আত্মার উদ্ভব হইতেছে, তাহা যিনি সর্ব্বদা নিজ শরীরে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হন, তাঁহার নাম "অবতার"। আমাদের এই ব্যাখ্যা যে শব্দ-বিজ্ঞানসম্মত, তাহা শব্দ-বিজ্ঞান পরিজ্ঞাত না হইলে বুঝা সম্ভব নহে। কাযেই, উহা লইয়া আমরা সময়ক্ষেপ করিব না, কারণ আজকাল পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ যে শব্দ-বিজ্ঞান যথাযথ ভাবে পরিজ্ঞাত, তাহার পরিচয় প্রায়শঃ কাহারও কথা-বার্ত্তা হইতে অথবা প্রবন্ধাদি হইতে পাওয়া যায় না। যাঁহারা বেদাঙ্গ হইতে শব্দ-বিজ্ঞান পরিজ্ঞাত হইয়া বেদের মন্ত্র দ্বারা উহার অনুশীলনে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারা স্বাধ্যায়-ভাবে ভাগবত পড়িতে আরম্ভ করিলে আমাদের উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুসরণ করিতে পারিবেন। "অবতার" কথাটী বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, যাঁহারা অবতার, তাঁহাদের শরীরে প্রায়শঃ কোনরূপ ব্যাধি থাকিতে পারে না এবং সঙ্গদোষে কোনরূপ ব্যাধির উৎপত্তি ঘটিলেও অনায়াসেই তাঁহারা নিজশক্তিবলে কোনরূপ ঔষধ ব্যবহার না করিয়া উহার উপশম করিতে সক্ষম হন। ইহা ছাড়া, যিনি প্রকৃত পক্ষে "অবতার" হইবার সৌভাগ্য লাভ করেন, তাঁহার সন্তান ও নিকট-আত্মীয়গণের মধ্যে কখনও কোনরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা অথবা অবিমৃষ্যকারিতা ঘটিতে পারে না এবং তাঁহাদের কোনরূপ অর্থক্লেশ অথবা মানসিক ক্লেশের উদ্ভব হয় না।

সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা চিন্তা করিয়া দেখিলেও দেখা যাইবে যে, যাঁহারা সাধারণ মানুষের মত প্রতিনিয়ত রক্তের চাপ (blood pressure) প্রভৃতি ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া থাকেন, যাঁহাদের সন্তানাদির মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা, অবিমৃষ্যকারিতা, অর্থক্লেশ প্রভৃতির দৃষ্টান্ত প্রতিনিয়ত পরিলক্ষিত হয়, তাঁহাদিগকে "অবতার" আখ্যায় আখ্যাত

করিলে "অবতার" শব্দটীর মধ্যে অশ্রদ্ধার চিহ্ন অবশিষ্ট থাকিয়া যায়।

এই হিসাবে গান্ধীজীকে কোনক্রমেই অবতার বলা চলে না।

তিনি ষ্টেট্সম্যান কি না, তাহার বিচার করিতে হইলে ষ্টেট্সম্যান বলিতে কি বুঝায়, তাহা যথাযথভাবে বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন হয়। মূলতঃ ষ্টেট্সম্যান অথবা রাজনীতিতত্ত্বজ্ঞ বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা ধরিয়া বসিলে মানবসমাজে এখন আর একটীও রাজনীতিতত্ত্বজ্ঞ দেখিতে পাওয়া যায় না, কারণ শব্দবিজ্ঞানানুসারে ষ্টেট্সম্যান অথবা রাজনীতিতত্ত্বজ্ঞ হইতে হইলে বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা কি, কোন্ উপায়ে প্রত্যেক জীবের বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষার বিলুপ্তি সাধন করিয়া তাহার প্রয়োজন নির্ব্বাহ করা সম্ভব হয়, তাহার 'দর্শন' পরিজ্ঞাত হইবার আবশ্যক হইয়া থাকে। মানবসমাজে এতাদৃশ রাজনীতিতত্ত্বজ্ঞ অথবা ষ্টেট্সম্যান একটীও বিদ্যমান থাকিলে মানবসমাজের কাহারও কোনরূপ অভাব কথঞ্চিৎ পরিমাণেও অবশিষ্ট থাকিতে পারে না। কাযেই, শব্দবিজ্ঞানানুসারে যে যে গুণসংযুক্ত হইলে মানুষকে ষ্টেট্সম্যান অথবা রাজনীতি-তত্ত্বজ্ঞ বলা যাইতে পারে, তাদৃশ ষ্টেট্সম্যান যে বর্ত্তমান মানবসমাজে নাই, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

বর্ত্তমানে রাজনীতি-ক্ষেত্রে ষ্টেটস্‌ম্যান শব্দটী নানা রকমের অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, W. R. Alger, ষ্টুয়ার্ট মিল, Lincoln, Burke, Fenelon, John Hall, Pope, Coleridge, Hare এবং Colton প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারগণের প্রায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ চিন্তানুযায়ী ঐ শব্দটীর সংজ্ঞা প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু কাহারও সংজ্ঞাগুলি সর্ব্বতঃসুস্পষ্ট ও দোষবিমুক্ত হয় নাই এবং কোন দুই জনের সংজ্ঞাই সর্ব্বতোভাবে একার্থক নহে। ইঁহাদের ভাবরাজ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, যদিও সর্ব্বতোভাবে দুই জনের মতবাদ একার্থক নহে,তথাপি ষ্টেটস্‌ম্যান হইতে হইলে যাহাতে দেশের মধ্যে একতা স্থাপিত হইয়া জাতীয়তার উন্মেষ হয় এবং ব্যক্তিগত ভাবে জাতির প্রত্যেকের উন্নতি যাহাতে হয়, ভবিষ্যতে কি ঘটিতে পারে তাহা বুঝিবার ক্ষমতা যাহাতে অর্জ্জন করা যায় এবং স্থায়ী ভাবে দেশের অনিষ্ট যাহাতে কেহ করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে অবহিত হইতে হয় ইত্যাদি বিষয়ে, প্রায়ই সকলেই একমত। *

কাযেই দেখা যাইতেছে যে, আধুনিক গ্রন্থকারগণ "ষ্টেটস্‌ম্যান" শব্দটী যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, তদনুসারে ষ্টেটস্‌ম্যান হইতে হইলেও অন্ততঃপক্ষে নিম্নলিখিত তিনটী গুণযুক্ত হইতে হয়।

(১) যাহাতে দেশের মধ্যে কোনরূপ দলাদলির উদ্ভব না হয়, সর্ব্বাবস্থায় তাহা কি করিয়া করিতে হয়, তদ্বিষয়ক অভিজ্ঞতা।

(২) প্রত্যেক অবস্থাতেই দেশের প্রত্যেক মানুষের প্রত্যেক প্রয়োজনীয় জিনিষটী কোন্ উপায়ে সরবরাহ হইতে পারে, তদ্বিষয়ক অভিজ্ঞতা।

(৩) যাহাতে দেশের মধ্যে দলাদলির বৃদ্ধি ঘটিতে পারে, যাহাতে দেশের কাহারও কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব ঘটিতে পারে, যাহাতে দেশপ্রাণ ব্যক্তিগণের উপর কোনরূপ দোষারোপ হইতে পারে, তাহা যাঁহারা করিতে চেষ্টা করিবেন, তাঁহাদের কার্য্য যাহাতে যথাযথভাবে বুঝিতে পারিয়া তদ্বিষয়ে বাধাপ্রদান করা সম্ভব হয়, তাহার অভিজ্ঞতা।

গান্ধীজীর এই তিনটি গুণ আছে কি না, তাহার পরীক্ষা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, ঐ তিনটি গুণের কোনটীই তাঁহার নাই।

* True statesmanship is the art of changing a nation from what it is into what it ought to be.

—W. R. Alger.

The worth of a State, in the long run, is the worth of the individuals composing it.

—J. Stuart Mill.

The great difference between the real statesman and the pretender is, that the one sees into the future, while the other regards only the present; the one lives by the day and acts on expediency; the other acts on enduring principles and for immortality. —Burke.

দেশের কোন অবস্থাতেই দেশের মধ্যে যাহাতে দলাদলি বৃদ্ধি না পাইতে পারে, তাহা কি করিয়া করিতে হয়, তাহা যদি তাঁহার জানা থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার নেতৃত্বকালে দেশের মধ্যে দলাদলি উত্তরোত্তর এতাদৃশ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে পারিত না।

প্রত্যেক অবস্থাতেই দেশের প্রত্যেক প্রয়োজনীয় জিনিষটী কোন্ উপায়ে সরবরাহ হইতে পারে, তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞতা যদি তাঁহার থাকিত, তাহা হইলে আমাদের প্রাণপ্রতিম শিক্ষিত যুবকবৃন্দকে এতাদৃশ নৈরাশ্যময় জীবন যাপন করিতে হইত না এবং প্রাণাধিক ঐ কৃষকগণের আর্থিক অবস্থা উত্তরোত্তর এতাদৃশ জটিলতা প্রাপ্ত হইত না।

কে কিরূপভাবে দেশের মধ্যে দলাদলি বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কোন্ কার্য্যের ফলে দেশের জনসাধারণের কাহারও অর্থাভাব ঘটিতে পারে, কিরূপ ভাবে চলিলে দেশ-প্রাণ ব্যক্তিগণের উপর কোনরূপ দোষারোপ হইতে পারে এবং কিরূপ ভাবেই উহার বাধা প্রদান করিয়া সাফল্য লাভ করা সম্ভব হইতে পারে, তদ্বিষয়ক অভিজ্ঞতা যদি গান্ধীজীর থাকিত, তাহা হইলে ব্রিটিশ ষ্টেটস্‌ম্যানগণের প্রণীত ১৯৩৫ সালের নূতন আইন সাফল্য লাভ করিতে পারিত না।

কাযেই, গান্ধীজীর ভক্তবৃন্দ এক্ষণে স্বীকার করুন আর না-ই করুন, গান্ধীজীকে যে আধুনিকভাবেও ষ্টেটস্‌ম্যান বলা যাইতে পারে না, তাহা যুক্তিসঙ্গতভাবে স্বীকার করিতেই হইবে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, গান্ধীজী যদি অবতার অথবা ষ্টেটস্‌ম্যান না হইয়া সাধারণভাবের একটি মানুষ মাত্র হন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে এত দীর্ঘকাল ধরিয়া কংগ্রেসের নেতৃত্ব করা সম্ভব হইতেছে কি করিয়া ?

ইহার যথাযথ উত্তর দিতে হইলে কংগ্রেসের ইতিহাসের দিকে একটু নজর দিতে হইবে।

ঐ ইতিহাসের দিকে নজর করিলে দেখা যাইবে যে, নিরীহ জনসাধারণের মধ্যে যখন নানারকম অভাবের অসহনীয় তাড়নার উন্মেষ ঘটিয়াছিল, তখন প্রাকৃতিক কারণে কয়েকজন দেশীয় ও বিদেশীয় সদাশয় ব্যক্তি মিলিত হইয়া ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা সাধন করিয়াছিলেন। তদবধি নিরীহ জনসাধারণ ভারতীয় কংগ্রেসের নিকট হইতে অনেক কিছু আশা করিয়া আসিতেছে এবং বস্তুত পক্ষে প্রকৃত ভাবের কংগ্রেস ব্যতীত মূক জনসাধারণের নানাবিধ সমস্যার কোনটীই সমাধান করা সম্ভব নহে।

এ দিকে দেশের মধ্যে শিক্ষার নামে কু-শিক্ষা সমধিক পরিমাণে প্রচারিত হওয়ায় নিরীহ যুবকবৃন্দ ঐ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া জীবিকানির্ব্বাহের জন্য কেহ বা আইন ব্যবসায় এবং কেহ বা চিকিৎসা ব্যবসায় প্রভৃতি অবলম্বন করিতেছেন। হৃদয়ে অনেক উচ্চ আশা পোষণ করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের স্ব স্ব ব্যবসায়ে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন এবং প্রথম প্রথম ঐ সমস্ত আশা পূরণ করিবার জন্য জ্ঞান-বিশ্বাসমত সৎ ভাবে পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করেন।

বস্তুতঃ পক্ষে তাঁহারা যে শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া নিজদিগকে সু-শিক্ষিত বলিয়া মনে করেন, সেই শিক্ষা সু-শিক্ষা না হইয়া কু-শিক্ষা হওয়ায়, তদ্দ্বারা তাঁহাদের অনেকেরই কোন আশা প্রায়শঃ পূরণ হওয়া সম্ভব হয় না এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে সদুপার্জ্জনের চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া নাম-যশ অর্জ্জন করিবার উদ্দেশ্যে ঐ আইন-ব্যবসায়ী ও চিকিৎসা-ব্যবসায়ী মানুষগুলি কংগ্রেসে যোগদান করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপ ভাবে পবিত্র ভারতীয় কংগ্রেসের পবিত্রতা নষ্ট হইয়া উহা প্রায়শঃ কতকগুলি হতাশাবিক্ষুব্ধ আইন-ব্যবসায়ী ও চিকিৎসা-ব্যবসায়ীর আড্ডা হইয়া পড়িয়াছে এবং উহার সভ্যবৃন্দের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও দেশের ও দেশবাসীর অবস্থা কোন বিষয়ে উন্নতি লাভ করা তো দূরের কথা, উহা সর্ব্ববিষয়ে অবনতিপ্রাপ্ত হইতেছে।

গান্ধীজীর যতই খ্যাতি বিস্তার লাভ করুক না কেন, অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে, তিনিও এইরূপ একজন কু-শিক্ষাপ্রাপ্ত, হতাশাক্ষুব্ধ আইনব্যবসায়ী। রাজনীতি ও অর্থনীতির কোন সাধনা না থাকিলেও কু-শিক্ষাপ্রাপ্ত হতাশা-বিধ্বস্ত মানুষের দল কিরূপভাবে পাকাইতে হয়, তদ্বিষয়ে তিনি নিপুণতা লাভ করিয়াছেন এবং ঐ নিপুণতার দ্বারাই এতদিন ধরিয়া ভারতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইতেছে।

পবিত্র কংগ্রেসকে উপরোক্ত অপবিত্রতা হইতে রক্ষা করিতে হইলে যাঁহারা এই বিষয়ে প্রকৃতপক্ষে ভাবুক এবং যাঁহারা হতাশাবিক্ষুব্ধ নহেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে কোন্ সংগঠনের দ্বারা জনসাধারণের প্রত্যেককে তাঁহাদের প্রত্যেক প্রয়োজনীয় বস্তুটী সরবরাহ করা যাইতে পারে, তাহার গবেষণায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ঐ গবেষণায় সিদ্ধিলাভ করিবার পর ঐ ভাবুকগণকে কংগ্রেসে প্রবিষ্ট হইয়া নিপুণতার সহিত হতাশাবিক্ষুব্ধ মানুষগুলির হাত হইতে কংগ্রেসের নেতৃত্ব অপসারিত করিয়া লইতে হইবে, ভাবুক না হইয়া, সাধক না হইয়া, কেবল দল পাকাইবার ঐ নিপুণতা লাভ করিতে পারিলে জনসাধারণের পক্ষে প্রকৃত ভাবের কোন স্থায়ী ফলোদয় যে হয় না, তাহা মানুষ কবে বুঝিবে?

শিল্প ও বাণিজ্যের অসাফল্য এবং সম্প্রদায়গত ও প্রদেশগত অমিলন দূর করিবার পন্থা সম্বন্ধে কংগ্রেসের গবেষণা

গত ১লা এপ্রিল শুক্রবার হইতে কলিকাতায় কংগ্রেসের কার্য্যকরী সভার অধিবেশন আরম্ভ হয়। ঐ অধিবেশনে যে যে বিষয় আলোচনা হয়, তাহার মধ্যে—(১) শিল্প ও বাণিজ্যের অসাফল্য, এবং (২) সম্প্রদায়গত ও প্রদেশগত অমিলন দূর করিবার পন্থা কি হইতে পারে, এই দুইটি বিষয় স্থান পাইয়াছে স্বয়ং গান্ধীজী এই আলোচনায় যোগদান করিয়াছেন।

শিল্প ও বাণিজ্যের অসাফল্য দূর করিবার জন্য কোন্ পন্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে, তাহার আলোচনায় স্থির হইয়াছে যে, যাহাতে ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যে স্বতন্ত্র রক্ষা-কবচসমূহ (discriminating protection) স্থান পায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এতদ্বিষয়ে গান্ধীজীর "ইয়ং ইণ্ডিয়া" নামক পত্রিকায় লিখিত "দৈত্য ও বামন (Giant and Dwarf)" শীর্ষক প্রবন্ধের দিকে সাধারণের নজর আহ্বান করা হইয়াছে।

সম্প্রদায়গত ও প্রদেশগত অমিলন কোন্ পন্থা অবলম্বনের দ্বারা বিদূরিত হইতে পারে, রবিবার পর্য্যন্ত তৎসম্বন্ধে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী সভা গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

আমাদের মতে, কোন স্বতন্ত্র রক্ষা-কবচের (discriminating protection) দ্বারা ভারতবর্ষের কোন শিল্প ও বাণিজ্যের কোন স্থায়ী উন্নতি সাধন করা সম্ভব হইবে না। ভারতবর্ষ একণে যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাতে তাহার শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি-সাধনার্থ কোন স্বতন্ত্র রক্ষা-কবচের পরিকল্পনা গ্রহণ করিলে তদ্দ্বারা শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি হওয়া তো দূরের কথা, উহার অবনতি হইতে থাকিবে।

এইরূপে শিল্প ও বাণিজ্যের রক্ষা ও উন্নতি বিষয়ে কংগ্রেসের কার্য্যকরী সভা যেরূপ অদূরদর্শিতা ও অর্ব্বাচীনতার পরিচয় দিতেছেন, সেইরূপ গান্ধীজী-পরিচালিত কংগ্রেসে সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক মিলনের যে সঙ্কেত (formula) আবিষ্কৃত হইবে, তাহাতেও যথেষ্ট অর্ব্বাচীনতা ও অদূরদর্শিতার সাক্ষ্য থাকিবে এবং তদ্দ্বারাও সম্প্রদায়গত ও প্রদেশগত অমিলন দূর হওয়া তো দূরের কথা, উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। যে সঙ্কেতের (formula) দ্বারা দেশব্যাপী মিলন ও জাতীয়তা প্রকৃত ভাবে সংঘটিত হইতে পারে, সেই সঙ্কেত গান্ধীজী অথবা তাঁহার কোন অনুচরের দ্বারা আবিষ্কৃত হইতে পারে না—আমাদের এতাদৃশ মতবাদের কারণ কি, তাহা পাঠকবর্গকে বুঝান অপেক্ষাকৃত দুরূহ। অনেকে হয়ত মনে করিবেন যে, আমরা গান্ধীজীর উপর কোন না কোন কারণে কোনরূপ বিদ্বেষ পোষণ করিয়া থাকি। কিন্তু তাহা সত্য নহে।

গান্ধীজী ও তাঁহার অনুচরবর্গের দ্বারা মানব-সমাজে কোনরূপ প্রকৃত মিলন সংস্থাপিত হওয়া সম্ভব নহে কেন, তাহা বুঝাইতে হইলে পূর্ব্বমীমাংসার কতকগুলি কথা পাঠকবর্গকে শুনাইতে হইবে। প্রকৃতি ও বিকৃতি লইয়া মানব-জীবন। প্রকৃতির ধর্ম্ম মিলন, আর

বিকৃতির ধরম্ অমিলন অথবা বিবাদ। যখন মানুষের মধ্যে সর্ব্বব্যাপী প্রকৃতির কার্য্য চলিতে থাকে, তখন এক-দিকে মানুষ যেরূপ তাহার নিজের উপর সর্ব্বতোভাবে সন্তুষ্ট হইতে পারে এবং তাহার ফলে তাহার নিজের শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হয়, সেইরূপ আবার অন্যদিকে সেই মানুষ অপর যাহাদের সংস্রবে সংশ্লিষ্ট হয়, তাহাদের প্রত্যেকের শারীরিক অস্বাস্থ্য ও মানসিক অশান্তিও ক্রমশঃই অল্পতা প্রাপ্ত হইতে থাকে। প্রধানতঃ, প্রকৃতির কার্য্যের সহায়তায় মানুষের জন্ম হইয়া থাকে এবং শৈশব অবস্থায় মানুষের মধ্যে প্রধানতঃ প্রকৃতির কার্য্যই সর্ব্বব্যাপী হইয়া থাকে। এইরূপ ভাবে আশৈশব বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত প্রকৃতির কার্য্যের সর্ব্বব্যাপিত্ব যে-মানুষের মধ্যে অটুট থাকে, সেই মানুষ হৈ-চৈএ যোগদান করিতে পারে না এবং সর্ব্বদাই সে নিজেকে অখণ্ড বিশ্বের সামান্য মাত্র একটি অংশ মনে করিয়া সর্ব্ববিধ অভিমান ও নেতৃত্বের কবল হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা করে। এতাদৃশ-ভাবে নিজের মধ্যে প্রকৃতির কার্য্যের সর্ব্বব্যাপিত্ব অটুট রাখা সহজসাধ্য নহে, পরন্তু সুচিন্তিত শিক্ষা ও কঠোর সাধনাসাপেক্ষ। মানুষের অবয়বের মধ্যে প্রকৃতির অস্তিত্ব বশতঃই বিকৃতির উদ্ভব হইয়া থাকে। যখন প্রকৃতি হইতে বিকৃতির উদ্ভব হইতে আরম্ভ করে, তখন সুশিক্ষার সহায়তার দ্বারা তদ্বিষয়ে জাগ্রত থাকিতে পারিলে নিজাভ্যন্তরস্থ প্রকৃতির উপর বিকৃতির প্রভুত্ব করা সম্ভব হয় না এবং তখন আর অভিমান ও নেতৃত্বাভিলাষ মানুষকে স্পর্শ করিতে পারে না। মানুষ তখন নিজের অধিকারের (Right) কথা ভুলিয়া গিয়া একমাত্র কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করে। এতাদৃশ মানুষ অতি সহজেই কোন্ সঙ্কেতে মানুষের মধ্যে মিলন সাধিত হইতে পারে, তাহার সন্ধান পাইয়া থাকে।

যে-মানুষ সুশিক্ষা ও সাধনার দ্বারা নিজের মধ্যে প্রকৃতির কার্য্য কতখানি ও বিকৃতির কার্য্য কতখানি, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া অনুভব করিতে অক্ষম হয়, তাহার অভ্যন্তরস্থ প্রকৃতির উপর বিকৃতি প্রতিনিয়ত প্রভুত্ব করিয়া থাকে। এতাদৃশ মানুষ সর্ব্বদা অভিমান ও নানা বিষয়ক নেতৃত্বাভিলাষে জর্জ্জরিত হইয়া কর্ত্তব্য বিস্মৃত হয় এবং প্রতিনিয়ত অধিকার, অথবা Right-এর কথা ও চিন্তা লইয়া বিব্রত হয়।

"প্রকৃতি" ও "বিকৃতি"-সম্বন্ধীয় উপরোক্ত কথাগুলির মধ্যে কথঞ্চিৎ পরিমাণে প্রবেশ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, যাঁহারা নেতৃত্বাভিলাষী ও অধিকারের কথা লইয়া বিব্রত, তাঁহারা প্রায়শঃ অভিমানগ্রস্ত হইয়া থাকেন এবং তাঁহাদের দ্বারা মানব-সমাজে প্রায়শঃ বিবাদেরই সৃষ্টি হইয়া থাকে। অন্য দিকে, যাঁহারা নেতৃত্বাভিলাষের দিকে ভ্রূক্ষেপ পর্য্যন্ত না করিয়াই সর্ব্বদা কর্ত্তব্যের সন্ধানে ও কর্ত্তব্যের পালনে উৎফুল্ল, তাঁহারা অভিমানের হাত হইতে নিজদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন এবং তাঁহারাই প্রকৃতভাবে মিলনের সঙ্কেত আবিষ্কার করিতে পারেন

আমরা গান্ধীজীর কথা ও কার্য্য বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে যাহা বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমাদের দৃষ্টিতে তিনি অত্যন্ত নেতৃত্বাভিলাষী, অভিমানগ্রস্ত, অধিকারের কথা লইয়া বিব্রত এবং কর্ত্তব্যবিস্মৃত। ইহারই জন্য তিনি কোন প্রকৃত মিলনের সঙ্কেত আবিষ্কার করিতে পারিবেন বলিয়া আমরা মনে করি না। পরন্তু, কংগ্রেসে তৎসদৃশ ব্যক্তির নেতৃত্ব যতদিন বজায় থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত দেশের মধ্যে বিবাদ নানা রকমে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং জনসাধারণের দুরবস্থাও উত্তরোত্তর অধিকতর ভীতিপ্রদ হইতে থাকিবে, ইহা আমাদের অভিমত।

১৯২১ সাল হইতে গান্ধীজীর নেতৃত্ব আরম্ভ হইয়াছে। এতাবৎকাল দেশের মধ্যে দলাদলি এবং জনসাধারণের আর্থিক দুরবস্থা কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার দিকে নজর করিলে আমাদের অভিমত যে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহার সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে। ইহাতেও যাঁহাদের চৈতন্যোদয় হইবে না, তাঁহাদিগকে আমরা ভবিষ্যতের দিকে বিশ্লেষণ-পরায়ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে অনুরোধ করি। তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, যতদিন পর্য্যন্ত কংগ্রেসে গান্ধীজী-সদৃশ ব্যক্তির নেতৃত্ব বজায় থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত কখনও দলাদলির বৃদ্ধি ছাড়া কোনরূপ ব্যাপকভাবের মিলন সম্ভবযোগ্য হইবে না এবং

ততদিন পর্যন্ত মানুষের আর্থিক অবস্থারও কোনরূপ উন্নতির সম্ভাবনা ঘটিবে না। পরন্তু, প্রায় প্রত্যেক সংসারেই অর্থোপার্জনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে বটে, কিন্তু অর্থাভাবজনিত হাহাকার ও নানা রকমের উচ্ছৃঙ্খলা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

শিল্প ও বাণিজ্যের অসাফল্য দূর করিবার জন্ম পাশ্চাত্যের অনুচরবর্গ যে স্বতন্ত্র রক্ষা-কবচের (discriminating protection-এর) সঙ্কেতে (formula) উপনীত হইয়াছেন, তাহা জগতের শিল্প-বাণিজ্যের ইতিহাসে অশ্রুত-পূর্ব্ব নহে। প্রত্যেক দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির কথা সম্বন্ধে—(১) স্বতন্ত্র রক্ষা-কবচ (discriminating protection) ও (২) অবাধ বাণিজ্য (free trade), এই দুইটি বিরুদ্ধ মতামত পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং বর্ত্তমানে স্বতন্ত্র রক্ষা-কবচের মতবাদেই প্রায়শঃ সর্ব্বত্র আধিপত্য লাভ করিতে পারিয়াছে।

অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, এই পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত যাঁহারা স্বতন্ত্র রক্ষা-কবচের কথা এবং অবাধ বাণিজ্যের কথা লিপিবদ্ধ করিয়া খ্যাতিলাভ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে রক্ষা-কবচের কথার প্রতিপোষকের সংখ্যাই অধিক। এই-বিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারগণের মধ্যে রক্ষাকবচ-বাদিগণের সংখ্যা ন্যূনকল্পে ২৯জন, যথা :—

(১) Ashley, (২) Balfour, ( ) G. Blondele, (৪) F. Bowen, (৫) B. Brande, (৬) G. B. Byles, (৭) H. C. Carey, (৮) C. H. Chomley, (৯) W. Cunningham, (১০) G. B. Curtis, (১১) W. H. Dawson, (১২) E. Duehring. (১৩) Dumesmil-Marigny, (১৪) Ganich, (১৫) G. Guenten, (১৬) Alexander Hamilton, (১৭) H. M. Hoyt, (১৮) E. I. James, (১৯) F. List, (২০) A. M. Low, (২১) H. O. Meredith, (২২) S. N. Patten, (২৩) Ugo Rubleno, (২৪) Ellis H. Roberts, (২৫) R. E. Thompson, (২৬) E. E. Williams, (২৭) J. P. Young, (২৮) Sir V. Cailliard, (২৯) E. E. Todd।

আর, এতদ্বিষয়ক প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারগণের মধ্যে অবাধ-বাণিজ্য-বাদিগণের সংখ্যা খুব সম্ভব ১০।১২ জনের বেশী হইবে না। ইহাঁদের মধ্যে যাঁহাদের বিচার-কৌশল আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে, তাঁহাদের সংখ্যা মাত্র আট জন।

(১) Fawcett, (২) Professor Bastable, (৩) W. Smart, (৪) A. C. Pigou, (৫) Adam Smith, (৬) G. Armitage, (৭) John Morley, এবং (৮) J. Shield Nicholson।

উপরোক্ত দুই শ্রেণীর বিরুদ্ধবাদিগণের ভাবে ভাবান্বিত হইয়া তাঁহাদের যুক্তিবাদ চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, উপরোক্ত দুই শ্রেণীর কথাতেই চিন্তাশীলতার পরিচয় আছে এবং ঐ দুই শ্রেণীর কথার মূলভিত্তি প্রধানতঃ দুইটী, যথা :—কি করিয়া স্ব স্ব দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করা সম্ভব হইতে পারে, এবং (২) কি করিয়া এক একটী বৃহৎ সাম্রাজ্য গঠন করা সম্ভব হইতে পারে। এইরূপভাবে দেখিলে শিল্প ও বাণিজ্য-বিষয়ক ঐ দুই শ্রেণীর মতবাদেই চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় বটে এবং কি করিয়া দেশের মধ্যে কতকগুলি লোক ধনী হইতে পারে, তাহার পরিকল্পনাও, আছে বটে, কিন্তু কোন্ উপায়ে মানব-সমাজের প্রত্যেকে তাঁহাদের নিজ নিজ জীবন ধারণ করিবার জন্ম ন্যূনকল্পে যে সমস্ত দ্রব্যের প্রয়োজন, তাহার প্রত্যেকটী পাইতে পারে, তদ্বিষয়ক কোন চিন্তার চিহ্ন উহার কোনটীতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই চিন্তার অভাবের জন্ম মানুষের দুঃখ ঘুচাইবার পক্ষে স্বতন্ত্র রক্ষা-কবচসমূহের (discriminating protection) সঙ্কেতও যেরূপ নিষ্ফল হইয়া থাকে, সেইরূপ অবাধ বাণিজ্যের সঙ্কেতও নিষ্ফল হয়।

কেন এইরূপ হয়, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে বসিলে সর্ব্বাগ্রে কি হইলে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য সফল হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, তাহা স্থির করিতে হইবে।

কি হইলে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য সফল হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, তদ্বিষয়ক চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলে সর্ব্বপ্রথমে দেশের কে কে শিল্প ও বাণিজ্যে সর্ব্বাধিক সংশ্লিষ্ট তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। যাঁহারা শিল্প ও বাণিজ্যে সর্ব্বাধিক সংশ্লিষ্ট, তাঁহারা যে যে উদ্দেশ্য লইয়া উহাতে সংশ্লিষ্ট, সেই সেই উদ্দেশ্যের প্রত্যেকটী সাফল্য লাভ করিয়াছে দেখিতে পাইলে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য

সাফল্য লাভ করিয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। শিল্প ও বাণিজ্যে সর্ব্বাধিক সংশ্লিষ্ট কে কে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রধান অঙ্গ পরিকল্পনা-কারী, (Brains), দ্বিতীয় অঙ্গ মূলধন-সরবরাহকারক (Capitalists), তৃতীয় অঙ্গ পরিচালক (Supervisors and Clerks), চতুর্থ অঙ্গ শ্রমজীবী (Labour), পঞ্চম অঙ্গ বিক্রেতাগণ (Sellers) এবং ষষ্ঠ অঙ্গ ক্রেতাগণ (Buyers)। যাঁহাদিগকে লইয়া শিল্প ও বাণিজ্যের ঐ ছয়টী অঙ্গের পরিপূর্ণতা, তাঁহারা কে কোন্ উদ্দেশ্যে দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট হইতেছেন, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমানকালে এক ক্রেতা ছাড়া আর পাঁচ শ্রেণীর মানুষেরই প্রধান উদ্দেশ্য, সংক্ষেপে শিল্প ও বাণিজ্যের দ্বারা নির্ঝঞ্ঝাটে সর্ব্বাধিক পরিমাণে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সুখ ও শান্তির সহিত দিনাতিপাত করা। আর, ক্রেতাগণের উদ্দেশ্য, সর্ব্বাধিক সুলভে সর্ব্বোৎকৃষ্ট দ্রব্য ক্রয় করিতে পারা। কাজেই শিল্প ও বাণিজ্যের যে ব্যবস্থায় পরিকল্পনাকারী, মূলধন-সরবরাহ-কারক, পরিচালক, শ্রমজীবী ও বিক্রেতাগণের সকলের পক্ষে সর্ব্বাধিক পরিমাণে লাভবান্ হওয়া এবং ক্রেতাগণের পক্ষে সর্ব্বনিম্নহারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পণ্যদ্রব্য পাওয়া সম্ভবযোগ্য হয়, সেই ব্যবস্থাকে শিল্প ও বাণিজ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত করিতে হইবে। কোন্ ব্যবস্থার দ্বারা যুগপৎ ভাবে উপরোক্ত পরিকল্পনাকারী, মূলধন-সরবরাহকারী, পরিচালক, শ্রমজীবী ও বিক্রেতাগণের লাভবান্ হওয়া এবং ক্রেতাগণের পক্ষে সর্ব্বনিম্নহারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পণ্যদ্রব্য পাওয়া সম্ভবযোগ্য হইতে পারে, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, কি স্বতন্ত্র রক্ষা-কবচ, অথবা কি অবাধ বাণিজ্য, এই দুইটীর কোনটিতেই উহা যুগপৎ সম্ভবযোগ্য হয় না।

স্বতন্ত্র রক্ষা-কবচের (discriminating protection) ফলে প্রায়শঃ পরিকল্পনা-কারী ও মূলধন-সরবরাহকারীর পক্ষে অপেক্ষাকৃত লাভবান্ হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় বটে, কিন্তু তাহার ফলে পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে এবং সেই কারণে একদিকে যেরূপ ক্রেতাগণের পক্ষে সর্ব্বনিম্ন হারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পণ্যদ্রব্য পাওয়া সম্ভবযোগ্য হয় না, অন্যদিকে, সেইরূপ আবার পরিকল্পনাকারী ও মূলধন-সরবরাহকারী যদি নিজ নিজ লাভের দিকে সমধিক মনোযোগী হন, তাহা হইলে পরিচালকগণ, শ্রমজীবী ও বিক্রেতাগণের লাভের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত হ্রাস প্রাপ্ত হওয়া অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। স্বতন্ত্র রক্ষাকবচের ফলে যে অবস্থার উদ্ভব হয়, তাহাতে যুগপৎ পরিকল্পনা-কারী, মূলধন-সরবরাহ-কারী, পরিচালক, শ্রমজীবী ও বিক্রেতাগণের পক্ষে লাভবান্ হওয়া এবং ক্রেতাগণের পক্ষে সর্ব্বনিম্ন হারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট দ্রব্য পাওয়া যেরূপ অসম্ভব হয়, সেইরূপ আবার পরিকল্পনাকারী ও মূলধন-সরবরাহকারিগণের পক্ষে সর্ব্বদা লাভবান্ হওয়ার সুনিশ্চয়তা বিদ্যমান থাকে না। কারণ, যে যে বস্তুর শিল্প ও বাণিজ্যে স্বতন্ত্র রক্ষাকবচের প্রয়োগ হইয়া থাকে, দেশের মধ্যে সেই সেই বস্তুর শিল্প ও বাণিজ্যের বিস্তৃতি ঘটিয়া উঠা অবশ্যম্ভাবী হয় এবং তখন অন্তর্ব্বাণিজ্যেই প্রতিযোগিতা হইতে আরম্ভ করে ও সময় সময় প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণে উৎপত্তি (production) হইয়া থাকে।

অবাধ-বাণিজ্যের ফলে প্রায়শঃ অতিরিক্ত প্রতিযোগিতার উদ্ভব হইয়া থাকে। তাহাতে ক্রেতাগণের পক্ষে সর্ব্বনিম্নহারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু পরিকল্পনাকারী, মূলধন-সরবরাহকারী, পরিচালক, শ্রমজীবী এবং বিক্রেতাগণের পক্ষে লাভবান্ হওয়ার সম্ভাবনা ক্রমশঃই অল্পতা প্রাপ্ত হইতে থাকে।

একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, কি স্বতন্ত্র রক্ষা-কবচ, অথবা কি অবাধ বাণিজ্য, এই দুইটির কোনটিতেই কোন দেশের জনসাধারণের পক্ষে মোটের উপর সুফলোদয় হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে বলিয়াই ইয়োরোপ ও আমেরিকায় কয়েকজন ক্রোরপতির উৎপত্তি হইয়াছে বটে, কিন্তু জগতের কোন দেশেই ঐ রক্ষা-কবচসমূহের প্রবর্ত্তনকালেই হউক, অথবা অবাধ বাণিজ্যনীতির প্রবর্ত্তনকালেই হউক, জনসাধারণের অবস্থার ক্রমিক অবনতি ছাড়া কোনরূপ উন্নতি সম্ভাবিত হয় নাই।

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, স্বতন্ত্র রক্ষা-কবচসমূহের বিফলতার এতাদৃশ অসংখ্য দৃষ্টান্তের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও

কংগ্রেসের কার্য্যকরী সভার সভ্যবৃন্দ উহাই গ্রহণ করিতে বসিয়াছেন। আমাদের মতে, যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা থাকিলে, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে কোন্ নীতি দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক অথবা অমঙ্গলজনক, তাহা বিচার করা সম্ভব হয়, সেই শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা গান্ধীজী অথবা কার্য্যকরী সভার কোন সভ্যের নাই বলিয়া তাঁহাদের দ্বারা দেশের উপকারের নামে প্রতিনিয়ত এতাদৃশ অপকার সাধিত হইতেছে।

শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে দেশে কোন্ নীতি প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত, আমূলভাবে তাহার বিচার করিতে হইলে শিল্প ও বাণিজ্যবিষয়ক দর্শনের অনেক কথা জানিবার প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় কেন স্বতন্ত্র রক্ষা-কবচ (discriminating protection) যে ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্যপক্ষে অবনতিজনক, তাহা সাধারণ বুদ্ধির (common sense) দ্বারাও বিচার করা যাইতে পারে।

কোন-বিষয়ক শিল্প অথবা বাণিজ্যের উন্নতির জন্য রক্ষাকবচের প্রয়োগ করিতে বসিলে কোনরূপ যোগ্যতা অর্জ্জন না করিয়াই একরূপ আইনের দ্বারা বিদেশীয় প্রতিযোগিগণের শিল্প ও বাণিজ্যের ধ্বংস সাধিত হইবার আশঙ্কা ঘটিয়া থাকে। বিদেশীয় প্রতিযোগিগণ চিৎটা খাইয়া পাটকেলটী মারিতে উদ্যত হন এবং সাধারণতঃ তাঁহারা অতি নিপুণতার সহিত গুপ্তভাবে দেশীয় শিল্পে ও বাণিজ্যে যাহাতে বিশৃঙ্খলা ঘটে, তদুদ্দেশ্যে পরিকল্পনাকারী, মূলধন-সরবরাহকারী, শ্রমজীবী ও বিক্রেতাগণের পরস্পরের মধ্যে যাহাতে মনোমালিন্য ও বিবাদের উদ্ভব হয়, তদ্বিষয়ে উদ্যোগী হইয়া থাকেন এবং এমন কি বিদেশীয় মাল যাহাতে দেশীয় নামে বিক্রীত হয়, তাহার কৌশল পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। অদূরদর্শিতার সহিত স্বতন্ত্র রক্ষাকবচের (discriminating protection) প্রবর্ত্তন সাধিত হইলে একদিকে যেরূপ ক্রেতারূপী জনসাধারণকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় এবং তাহাদের মধ্যে অসন্তুষ্টির উদ্ভব হয়, অন্যদিকে আবার উপরোক্তরূপে শিল্প ও বাণিজ্য-মহলে নানা রকমের বিবাদ ও ধর্ম্মঘটের উদ্ভব হয় এবং এমন কি, যে মহাজনগণের সর্ব্বদা মহাজন হওয়া প্রধান কর্ত্তব্য, সেই মহাজনগণের ভিতর প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা স্থান পাইতে থাকে।

চিন্তাশীলতার সহিত অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, কয়েক বৎসর হইতে ভারতবর্ষীয় শিল্পী ও বণিক্ মহলে শ্রমজীবী ও মূলধন-সরবরাহকারী, মূলধন-সরবরাহকারী ও পরিচালক, মূলধন-সরবরাহকারী ও বিক্রেতাগণের মধ্যে যে নানাবিধ মতপার্থক্য ও বিবাদের উদ্ভব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, বহু বিদেশীয় দ্রব্য যে দেশীয় বলিয়া চলিতেছে, তাহার মূলেও উপরোক্ত রক্ষাকবচসমূহের প্রয়োগ বিদ্যমান রহিয়াছে।

এতদবস্থায় কোন্ উপায়ে দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করা সম্ভব হইতে পারে তাহার চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমান মানবসমাজমধ্যে যাদৃশ-ভাবে শিল্প ও বাণিজ্য চলিতেছে, কোন ক্রমেই তাহাকে সর্ব্বতোভাবে নিরাপদ করা সম্ভব নহে, কারণ ঐ শিল্পে ও বাণিজ্যে লোকসানের আশঙ্কার বিলোপ অনিবার্য্য করা সম্ভব নহে এবং তদ্দ্বারা সমগ্র লোকসংখ্যার মধ্যে মাত্র কয়েকজনের পক্ষে ক্রোরপতি হওয়া সম্ভবযোগ্য হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু জনসাধারণের শতকরা ৯৯ জনকেই দরিদ্র ও অনশনগ্রস্ত হইতে বাধ্য হইতে হয়। কাজেই, যাহাতে জনসাধারণের প্রত্যেকের পক্ষে দারিদ্র্যের হাত হইতে মুক্ত হওয়া সম্ভব হইতে পারে, যতদিন পর্য্যন্ত তাহার উপায় গবেষণার দ্বারা আবিষ্কৃত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত এতাদৃশ শিল্প ও বাণিজ্যের সাময়িক প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও থাকিতে পারে বটে, কিন্তু ঐ উপায় আবিষ্কৃত হইবার পর এতাদৃশ যন্ত্র-শিল্প ও চতুরতামূলক বাণিজ্যের কোন প্রয়োজনীয়তা মানবসমাজে বিদ্যমান থাকিবে না। যাহাদের লইয়া যন্ত্র-শিল্পের সর্ব্বাঙ্গীনতা, তাহাদের প্রত্যেকের পক্ষেই যে উহা কুটীর-শিল্পের তুলনায় অনিষ্ট-জনক, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে।

আজকালকার যন্ত্র-শিল্পের দিনে আমাদের এই কথা যে অনেকেরই কাছে অতীব অভিনব বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, তাহা আমরা জানি, কিন্তু উহা যে অতীব সত্য, তাহা প্রয়োজন হইলে আমরা যুক্তি দ্বারা সপ্রমাণিত করিব। সন্দর্ভের কলেবর বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া, এখানে ঐ যুক্তির পর্য্যালোচনা হইতে বিরত থাকিলাম।

কোন্ উপায়ে জনসাধারণের প্রত্যেকের পক্ষে

দারিদ্র্যের হাত হইতে মুক্ত হওয়া সম্ভব, তাহার উত্তরে আমাদিগের পুরাতন কথা পাঠকবর্গকে শুনাইতে হইবে। জনসাধারণের প্রত্যেককে দারিদ্র্যের হাত হইতে মুক্ত করিবার প্রধান পন্থা কেবলমাত্র দুইটী। মানুষ আর যে প্রকারেই চেষ্টা করুক না কেন, অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিলে, দেখিতে পাইবে যে, যতদিন পর্য্যন্ত জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরা-শক্তি বৃদ্ধি না পায়, এবং যতদিন পর্য্যন্ত বিভিন্ন পণ্য-দ্রব্যের মূল্যের মধ্যে সমতা (parity) স্থাপিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত মানবসমাজের অনেকেই দারিদ্র্যে জর্জ্জরিত হইতে থাকিবে।

কংগ্রেসের কার্য্যকরী সভার সভ্যবৃন্দ যাহাতে অকার্য্য ও কুকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া উপরোক্ত সুকার্য্যে অভিনিবিষ্ট হন, তাহা করিতে হইলে, কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ যাহাতে পুঁটিমাছের মত ফরফরি পরিত্যাগ করিয়া, প্রকৃত সাধনা-প্রতিষ্ঠিত গবেষণায় প্রবৃত্ত হন এবং অনভিজ্ঞ নেতৃবৃন্দ যাহাতে নেতৃত্ব হইতে বিতাড়িত হন, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। ঐ নেতৃবৃন্দ যাহাতে উপরোক্ত গবেষণায় প্রবৃত্ত হন, তাহা করিতে হইলে, আমাদের মুকুটহীন সুরেন্দ্রনাথকে যে একদিন জুতার মালার সহিত পরিচিত হইতে হইয়াছিল, তাহা গান্ধীজী যাহাতে স্মরণ করিতে পারেন, তজ্জন্য দেশের যুব-শক্তিকে জাগ্রত হইতে হইবে।

গান্ধীজী প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের পাপের ষোল আনা কি এখনও পূর্ণ হয় নাই? কোনরূপ চিন্তাশীল পড়াশুনা না করিয়া, কোনরূপ সাধনায় প্রবৃত্ত না হইয়া, দেশের মাতৃস্বরূপা নারীগুলিকে লইয়া ধেই ধেই করিয়া নৃত্য করা এবং যুগপৎ নেতৃত্ব করা আর কতদিন চলিবে?

পরিবর্ত্তিত প্রজাস্বত্ব আইন এবং তাহার ভবিষ্যৎ

গত ১লা এপ্রিল শুক্রবার ইংরাজী হিসাবে আহম্মুকের দিনে (All fools' day—) বাঙ্গালার উচ্চ পরিষদ্ (Bengal Council) হইতে পরিবর্ত্তিত প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট ঐ আইনের যে সমস্ত পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন, তাহার প্রধান সমর্থক ছিলেন কংগ্রেসী দল। উঁহার বিরোধিগণের মধ্যে—(১) সন্তোষের মহারাজার পরিচালিত প্রোগ্রেসিভ পার্টি (Progressive Party), ও (২) ইয়োরোপীয়গণের দলের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রজাস্বত্ব আইনের যে-যে ধারা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছিলেন, রাজস্ব-মন্ত্রী (Revenue Minister) স্যর বি. পি. সিংহ রায়। ঐ প্রস্তাব উত্থাপনকালে রাজস্ব-মন্ত্রী একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। প্রজাস্বত্ব-বিষয়ক আইনের যে সমস্ত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, তাহার মূলে গভর্ণমেণ্টের কি উদ্দেশ্য আছে, তাহা যথাযথভাবে বুঝিতে হইলে স্যর বি.পি. সিংহ রায়ের বক্তৃতা মনোযোগের সহিত অনুসরণ করিবার প্রয়োজন হয়। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, কেবল মাত্র প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন-সমূহের ধারাগুলির শব্দগত অর্থ কি, তাহাতে নিবদ্ধ থাকিলে ঐ পরিবর্ত্তন-সমূহের মূল উদ্দেশ্য যথাযথভাবে বুঝা সম্ভব হয় না। উহার আরও অর্থ বিদ্যমান আছে। গভর্ণমেণ্ট ব্যাপকভাবে বাঙ্গালা দেশের প্রজাস্বত্ববিষয়ক বিধি পরিবর্ত্তিত করিতে চাহেন। এতদর্থে যে একটি কমিশন নিযুক্ত হইবে, তাহা আগেই প্রচারিত হইয়াছে।

বাংলার কৃষক কেন যে এতাদৃশ ভাবে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহার মূল কারণ এবং কোন্ উপায়ে কৃষকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা সম্ভব হইবে, তাহা ঐ কমিশন তদন্ত করিয়া স্থির করিতে পারিবেন, ইহা তিনি আশা করেন। তখন এই কমিশনের পরামর্শানুসারে পরিবর্ত্তনগুলি চূড়ান্তভাবে নিষ্পন্ন করা হইবে।

রাজস্ব-মন্ত্রী মহাশয় আরও বলিয়াছেন যে, প্রজাস্বত্ব-বিষয়ক আইনের প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনসমূহের ফলে জমীদারগণ তাঁহাদের স্বার্থ কথঞ্চিৎ পরিমাণে প্রজাদিগের হিতার্থে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। এই ত্যাগের ফলে জমীদার ও প্রজাদিগের মধ্যে যে সদ্ভাবের উদ্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে, তাহার দিকে নজর করিলে, জমীদারদিগের ঐ ত্যাগ নিষ্ফল না হইয়া সম্পূর্ণ সফল হইবে বলিয়া তিনি মনে করেন।

সর্ব্বশেষে তিনি জমীদারদিগকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, যাহাতে প্রজাগণের নিকট হইতে জমীদারদিগের খাজানা যথাসময়ে যথাযথ পরিমাণে আদায় হয় এবং যাহাতে জমীদার ও প্রজাদিগের মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য। যদি দেখা যায় যে, প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনসমূহের ফলে তাহা হইতেছে না, তাহা হইলে পুনরায় ইহার পরিবর্ত্তন সাধন করিতে গভর্ণমেণ্ট কুণ্ঠা বোধ করিবেন না।

রাজস্ব-মন্ত্রীর সমগ্র বক্তৃতাটি তাঁহার ভাবে ভাবান্বিত হইয়া পড়িতে পারিলে আমাদের মনে হয়, প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইনের পরিবর্ত্তন সাধন করিবার মূলে বর্ত্তমান বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য তিনটি, যথা :—

(১) কৃষকগণের দারিদ্র্য দূর করিয়া তাহাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি বিধান করা।

(২) জমীদারগণ যাহাতে অপেক্ষাকৃত সহজে প্রজাগণের নিকট হইতে তাঁহাদের প্রাপ্য আদায় করিতে পারেন, তাহার উপায় বিধান করা।

(৩) জমীদার ও প্রজাগণের মধ্যে যাহাতে আন্তরিক সদ্ভাব স্থাপিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা।

রাজস্ব-মন্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা হইতে যাহা বুঝা যায়, তাহা সুবোধ ও সুশীল বালকের মত প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস করিয়া লইলে, প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনের পরিবর্ত্তনের মূলে বর্ত্তমান বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের যে মহান্ উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু, আমাদের মতে, গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের মহান্ উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ম যে কর্ম্মপদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা মোটেই সমীচীন নহে। ঐ কর্ম্মপদ্ধতি, অর্থাৎ প্রজাস্বত্ব-বিষয়ক আইনের যে সমস্ত পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে চলিয়াছে, তাহার ফল সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া দাঁড়াইবে। কৃষকগণের দারিদ্র্য দূর হওয়া তো দূরের কথা, উহা উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধি পাইবে। প্রজাগণের নিকট হইতে জমীদারগণের প্রাপ্য আদায় করা অধিকতর দুরূহ হইবে এবং জমীদার ও প্রজাগণের মধ্যে অসদ্ভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনের প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনসমূহের ফলে কৃষকের দারিদ্র্য ও নৈরাশ্য এতাদৃশ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে বলিয়া আমরা আশঙ্কা করি যে, তজ্জন্য কৃষকগণ বাধ্য হইয়া অশ্রুতপূর্ব্ব রকমের উচ্ছৃঙ্খল হইয়া দাঁড়াইবে এবং তাহার ফলে, এমন কি গভর্ণমেণ্টের পক্ষে, তাঁহার প্রাথমিক দায়িত্ব যে শৃঙ্খলা রক্ষা করা, তাহা প্রতিপালন করা পর্য্যন্ত অধিকতর কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িবে।

আমাদের মতে গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রিগণের মধ্যে যাঁহারা এই উপরোক্ত পরিবর্ত্তনের সমর্থন করিতেছেন, তাঁহারা অদূরদর্শী। গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য যে মহান্ তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই বটে, কিন্তু যে-মন্ত্রিগণ এতাদৃশ বিশৃঙ্খলার উদ্ভবকর কর্ম্মপদ্ধতির প্রস্তাব আনয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা না করিয়া কৃষকগণকে তাহাদের আপাত সন্তুষ্টি বিধানের জন্ম স্তোকবাক্য দিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং তাহার ফল যে কতদূর বিষময় হইতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখিতেছেন না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত মনে করিতেছেন যে, এইরূপ ভাবে কৃষকগণকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে ভবিষ্যতে তাঁহাদের পক্ষে কৃষকগণের ভোট পাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইবে। আমাদের মনে হয়, পাঁচ বৎসর আগেও কৃষকগণের যে অবস্থা বিদ্যমান ছিল, তাহাতে প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা যাহাতে উন্নত হয় তাহা না করিয়াও কেবলমাত্র স্তোকবাক্যের দ্বারাই তাহাদের সন্তুষ্টি বিধান করা সম্ভবযোগ্য ছিল, কিন্তু আগামী পাঁচ বৎসরে কৃষকগণ যে পরিমাণ দুর্দ্দশায় উপনীত হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতে পারে, তাহাতে প্রকৃত পক্ষে তাহাদের আর্থিক অবস্থা যাহাতে উন্নত হয় তাহা না করিতে পারিলে, কেবল মাত্র স্তোকবাক্যের দ্বারা তাহাদের সন্তুষ্টি বিধান করা সম্ভব হইবে না।

আমাদের আশঙ্কা যুক্তিযুক্ত কি না তাহার বিচার করিতে হইলে, প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনের কি কি পরিবর্ত্তন প্রস্তাবিত হইয়াছে এবং কোন্টীর কি কু-ফল হইতে পারে, তাহার আলোচনা করিতে হইবে।

প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনের যে যে পরিবর্ত্তন প্রস্তাবিত হইয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ৮টি কথা উল্লেখযোগ্য :—

(১) ইহার পর আর নামপত্তনের জন্ম জমীদারগণকে সেলামী দিতে হইবে না।

(২) জমীদারদিগের অগ্রক্রয়াধিকার এখন হইতে উঠাইয়া দেওয়া হইবে।

(৩) খাজনা আদায় করিবার জন্য জমীদারদিগের সার্টিফিকেট করিবার বিধান এখন হইতে রহিত করিয়া দেওয়া হইবে।

(৪) জলপ্লাবনের ফলে যে সমস্ত জমী নষ্ট হইয়া পুনরায় বিশ বৎসরমধ্যেই আবার তাহা আবাদ-যোগ্য হয় তাহার প্রজাগণ চারি বৎসরের খাজনা প্রদান করিয়াই উহা পুনরুদ্ধার করিতে পারিবে।

(৫) ১৯২৮ সালের পূর্ব্বে অথবা পরে যাহারা দখলীস্বত্বের অধীনস্থ প্রজা ছিল, তাহাদিগকে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজাগণের অধিকার প্রদত্ত করা হইবে।

(৬) বাকি খাজানার উপর জমীদারগণ যে সুদ পাইয়া থাকেন, তাহার হার শতকরা ১২৷৷ টাকার স্থলে শতকরা ৬।• টাকা ধার্য্য হইবে।

(৭) বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনানুসারে জমীদার-গণের খাজানা বৃদ্ধি করিবার যে অধিকার বিদ্যমান আছে, সেই অধিকার আগামী দশ-বৎসরের জন্য উঠাইয়া দেওয়া হইবে। কোন জমীর প্রকৃত পরিমাণ রেকর্ডানুযায়ী পরি-মাণের তুলনায় অধিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে হারাহারিমতে জমীদারগণের যে অতিরিক্ত খাজনা ধার্য্য করিবার অধিকার ছিল, তাহাও উঠাইয়া দেওয়া হইবে।

(৮) প্রজাগণ তাহাদের জোত পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নামপত্তন করিয়া লইতে পারিবে।

এই আটটী প্রস্তাবের মধ্যে কোন্‌টীর ফল কি হইবার সম্ভাবনা, তাহা বিশদভাবে আলোচনা করিবার স্থানাভাব বশতঃ আমরা এখানে তাহা করিব না। সংক্ষেপতঃ, ঐ আটটী প্রস্তাবের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রত্যেকটীতেই জমীদারদিগের কতকগুলি অতিরিক্ত আদায়ের পন্থা তিরোহিত করা হইয়াছে। এই সমস্ত অতিরিক্ত আদায়ের পন্থার বিদ্যমানকালে যখন কার্য্যতঃ উহা আদায় করা হয়, তখন উহা উঠাইয়া দিয়া প্রজাদিগের যে খরচ কথঞ্চিৎ পরিমাণে বাঁচাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহাতে প্রজাগণের আর্থিক অবস্থার উন্নতির সম্ভাবনা যে কথঞ্চিৎ পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু, যখন ঐ সমস্ত অতিরিক্ত আদায়ের অধি-কারের বিদ্যমানতাসত্ত্বেও প্রজাগণের দুরবস্থার জন্যও ঐ অতিরিক্ত প্রাপ্য আদায় হওয়া তো দূরের কথা, নিয়মিত খাজনা পর্য্যন্ত প্রজাগণের নিকট হইতে আদায় করা হয় না, তখন এতাদৃশ আইনের দ্বারা প্রজাগণের আর্থিক অবস্থার কোন তারতম্য যে সংঘটিত হইতে পারে না, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইবে।

অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, গত ১০।১৫ বৎসর ধরিয়া জমীদারগণের কেহ কেহ প্রজাগণের নিকট হইতে উপরোক্ত অতিরিক্ত প্রাপ্যসমূহ আদায় করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু জমীদারগণের অধিকাংশই প্রজার দুরবস্থার জন্য সর্ব্বরকমের অতিরিক্ত প্রাপ্যের দাবী ছাড়িয়া দিয়া নিয়মিত খাজনা পাইলেই সন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া থাকেন। অনেকে নিয়মিত খাজনা পর্য্যন্ত আদায় করিতে পারিতেছেন না এবং কেহ কেহ চেষ্টা করিয়া অতিরিক্ত প্রাপ্যের বাবদ এক একখানি খৎ আদায় করিয়া লইতেছেন বটে, কিন্তু প্রায়শঃ কেহই চেষ্টা করিয়াও কার্য্যতঃ অতিরিক্ত প্রাপ্যসমূহের কথঞ্চিৎ অংশও আদায় করিয়া ঘরে তুলিতে সক্ষম হইতেছেন না।

জমীদারগণের পক্ষে যে সমস্ত অতিরিক্ত প্রাপ্য আদায় করা সম্ভব হইতেছে না এবং তাঁহারা নিজেরাই যাহার দাবী স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া দিতে পরাঙ্মুখ নহেন, সেই সমস্ত অতিরিক্ত প্রাপ্যের অধিকার আইন করিয়া রহিত করিলে, বাস্তবপক্ষে প্রজার আর্থিক অবস্থার কোন তারতম্য ঘটিবে না বটে, কিন্তু এই কারণে জমীদারের প্রতি প্রজার অবজ্ঞা এবং ক্রমশঃ তাহার উচ্ছৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাওয়া অবশ্যম্ভাবী। প্রজার এই অবজ্ঞা ও উচ্ছৃঙ্খলার ফলে একদিকে যেরূপ তাহাদিগের নিকট হইতে খাজনা আদায় করার দুরূহত্ব অধিকতর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কা ঘটিবে অন্যদিকে আবার তাহাদিগের পক্ষে জমীদার

ও মহাজনগণের আস্থা (faith) হারাইবার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পাইবে। ইহার ফলে, প্রজাগণের আর্থিক অবস্থার কোন উন্নতি বাস্তবতঃ ঘটিয়া উঠার কোন সম্ভাবনা হওয়া তো দূরের কথা, অর্থবিষয়ে তাহাদিগকে অধিকতর বিপন্ন হইতে হইবে, কারণ অভাবের সময়ে প্রধানতঃ যাহাদিগের নিকট হইতে কর্জ্জ করিয়া এতাবৎ তাহারা তাহাদিগের অভাব মোচন করিতে পারিত এখন আর তাহা পারা অপেক্ষাকৃত দুরূহ হইবে। এইরূপে, একদিকে যেরূপ কৃষকগণের আর্থিক বিপত্তি এবং জমীদারগণের খাজনা আদায়ের দুরূহত্ব বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, অন্যদিকে আবার জমীদার ও প্রজাগণের মধ্যের সমপ্রাণতাও উত্তরোত্তর ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইতে থাকিবে।

আমাদের মনে হয়, এতদ্বিষয়ে কোন আইন প্রণয়ন না করিয়াও কেবলমাত্র জমীদারদিগের শিক্ষা বিধান করিয়া এবং আভ্যন্তরীণ কৌশলবিশেষের প্রবর্ত্তন করিয়া গভর্ণমেণ্টের পক্ষে প্রজাগণকে স্থায়ী ভাবে অতিরিক্ত কর-ভার হইতে রক্ষা করা সম্ভব হইত এবং তাহাতে সাপও মরিত অথচ লাঠি ভাঙ্গিবার সম্ভাবনার উদ্ভব হইত না।

শিক্ষিত লোকের কমিশন নিয়োগ করিয়া প্রজাদিগের দুঃখের মূল কারণ কি, তাহার গবেষণায় সফল হইবার যে আশা গভর্ণমেণ্ট পোষণ করিতেছেন, আমাদের মতে তাহাও ঐ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর অদূরদর্শিতার পরিচায়ক।

আধুনিক কালের কৃষি-বিভাগের কোন বৈজ্ঞানিক অথবা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের কমিশনের দ্বারা যদি কৃষকের দুরবস্থার অপনয়ন করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে অ্যামেরিকা অথবা ইউরোপের কৃষকগণের মধ্যে কাহারও কোনরূপ দুরবস্থা থাকিতে পারিত না। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, কি অ্যামেরিকা, অথবা কি ইউরোপ, অথবা কি রুশিয়া ইহার প্রত্যেক দেশের কৃষকগণের অবস্থা ক্রমশঃ হীন হইতে হীনতর হইয়া পড়িতেছে। কৃষকগণের অবস্থা সম্বন্ধে যাঁহারা আমাদের এই মতবাদের বিরুদ্ধ মতবাদ পোষণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে মানুষের অবস্থা কিরূপভাবে বিচার করিতে হয়, তাহা বুঝিতে পারেন না, ইহা সহজেই সপ্রমাণিত হইতে পারে। আমরা একাধিক সন্দর্ভে উহা প্রমাণিত করিয়াছি এবং প্রয়োজন হইলে আবার তাহা করিব।

শিক্ষিত লোকের অথবা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের দ্বারা কোন কমিশন গঠিত না করিয়া, জেলায় জেলায় কৃষকগণের মধ্যে যাঁহারা মাতব্বর তাঁহাদিগকে লইয়া কমিশন গঠন করিলে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করা সম্ভব না হইলেও, অপেক্ষাকৃত অধিক সাফল্য লাভ করা সম্ভব হইবে, ইহা আমাদের অভিমত।

কি করিলে কৃষকগণের প্রত্যেকের আর্থিক অবস্থা সম্পূর্ণভাবে দূর করা সম্ভব হইতে পারে, এবং কেনই বা তাহাদিগের মধ্যে আর্থিক বিপত্তির উৎপত্তি হয়, তদ্বিষয়ে আমরা একাধিক সন্দর্ভে আলোচনা করিয়াছি। প্রয়োজন হইলে, আবার ঐ আলোচনায় হস্তক্ষেপ করিব।

মিঃ ফজলুল হক্-পরিচালিত মন্ত্রিবর্গের নিকট হইতে আমরা এখনও অপেক্ষাকৃত সুফল আশা করিতেছি। তাঁহারা কি এখনও অধিকতর দূরদর্শিতার পরিচয় দিবেন না?

এই সম্পর্কে কংগ্রেসের গুণপনার দিকে আমরা জনসাধারণের মনোযোগ আহ্বান করিতেছি। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্বের প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনসমূহের সমর্থন করা,আর দেশের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা-বৃদ্ধির সহায়তা করা এবং কৃষকগণের আর্থিক বিপত্তি বাড়াইয়া তোলা কি একার্থক নহে?

আমরা যে আশঙ্কাগুলির কথা এই সন্দর্ভে আলোচনা করিলাম, তাহা দৃঢ়ভিত্তিসংযুক্ত কিনা, তদ্বিষয়ে পরীক্ষা করিবার জন্য ভবিষ্যতে এই সম্বন্ধে কি ঘটে, তাহা বিশ্লেষণ-পরায়ণ হইয়া বিচার করিবার জন্য পাঠকবর্গকে অনুরোধ করিতেছি।

পরশা মরে নি—বেঁচেছে

—শ্রীমন্মথনাথ সরকার

পরশার বাড়ীটাকে লোকে আজও যে বাড়ী বলে—সে করুণা। চারিদিকের আগাছা জংলা লতাগুলো অনধিকার প্রবেশের আইন ডিঙিয়ে এসে বাড়ীর মালিককেই চোখ রাঙাচ্ছে। ঘরে আলো বাতাসের অভাব নেই। পরশার পরম সৌভাগ্য যে মাঠের মুক্ত বায়ু, জলজলে রোদ—উপভোগ করবার জন্য তাকে বাইরে যেতে হয় না, ঘরে বসে বসেই রাজার হালে অফুরন্ত পাওয়া যায়। স্বাস্থ্যতত্ত্বের ঐ যে দামী দামী কথা সব "মুক্ত বায়ু সেবন করিবে, আলোহীন ঘরে বাস করিবে না" বাস্তব হয়ে ফুটে উঠেছে—পরশার ঝাঁপ-কপাটবিহীন জানলা দরজায়, এমন কি উপরের মটকায়। যতই দিন যাচ্ছে প্রকৃতির অধিকার যেন ততই বেড়ে উঠছে এই বাড়ীখানায় উপর।.........

ব্যারামটা প্রথমতঃ দুরারোগ্য ছিল না, দুরারোগ্য হয়ে পড়ল নিঃস্ব পরশার পাল্লায় পড়ে। আগে—মাঝে মাঝে জ্বর হত, তারপর হাত পা ফুলতে লাগল, এখন দাঁড়িয়েছে উদরীতে। চিকিৎসা যে মোটেই হয়নি তা নয়, তবে যা হয়েছিল তা ঠিক চিকিৎসা নয়। গাছ-গাছড়া টোট্‌কা-টাট্‌কী—বিনা পয়সায় এবং দেহের শক্তিতে—যা পাওয়া সম্ভব হয়েছিল পরেশ তাতে ত্রুটী করে নি। শীতলা মার পায়ে মানসিকের কড়ার পর্যান্ত হয়েছিল। কিন্তু রোগ গেল না, মানসিকের কড়ার হয়েই থাকল—শীতলা মার ভোগে এল না, কারণ আগে থাকতেই কথা হ'য়েছিল, রোগ গেলে ভোগ দেবো।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। কাল-বোশেখীর ঝড় হুহু করে এসে ধুলো, বালি গাছের পাতায় অন্ধকার করে তুলল। মেটে বাড়ীর চালা উড়ল। গাছ-পালা উপড়ে পড়ল। পার্শ্ববর্ত্তী সহরে দোকানের সাইন-বোর্ডগুলো প্রায়ই রাস্তায় এসে পড়েছে, সামনেকার মেহোগিনি গাছটা ভেঙে গেছে। টেলিগ্রাফের তারগুলো, জায়গা জায়গায় গাছ ভেঙে পড়াতে ছিন্নভিন্ন হয়ে অধিকতর বৈজ্ঞানিক রূপের অভিনয় করছে। বলা মুস্কিল সহরের ক্ষতি বেশী কি গাঁয়ের—সহরের ক্ষতি অর্থসংক্রান্ত, গাঁয়ে প্রাণহানি—প্রায় ৮।১০ জন ঘর চাপা পড়ে' আঁধারে পাড়ি দিয়েছে।

পরশার ঘরের চালখানি প্রথম ঝাপটাতেই নিজের কর্ত্তব্যটুকু শূন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে ডিগবাজী খেয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়েছে—সার্কাসের জোকার-এর ভঙ্গীতে পথিককে ইঙ্গিত করে, বলছে "উদ্ধার ডেকে"।

ঘণ্টা খানেকের মামলা। আবার আকাশ পরিষ্কার, দিগন্ত উজ্জ্বল, প্রকৃতি ক্ষুণ্ণ অথচ শান্ত, আকাশের দিকে চাইলে মনে হয়, সে যেন এ দুর্য্যোগের কিছুই জানে না।

হীরু ডাক্তার ফুটবল খেলতে চলেছে, প্যান্ট-জামা পরে—পাশের গাঁয়ে একটা টিম্‌টিমে টিম আছে, সেইখানে খেলাধুলো হয়, পরশার বাড়ীটা হীরু ডাক্তারের খেলতে যাওয়ার পথেই।

ডাক্তার পরশার দুয়োর পর্য্যন্ত না এসেই হাঁকল "বেঁচে আছিস্ রে?"

পরেশ উত্তর দিল "হুঁ", খুব চড়ে গিয়েছে।"

এই কর্ত্তাবিহীন বাক্যের কর্ত্তা যে কে বা কি, ডাক্তার সেটা জানে। ডাক্তার হাসতে হাসতে বলল, "তুমি আর মরবে না"।

ঘরে ঢুকে পরেশকে দেখতে না পেয়ে ডাক্তার যেন কেমন হয়ে গেল। চোখে পড়ল পরশার শুয়ে-থাকা-মাচার তলে হাঁড়িগুলো নড়ছে। ডাক্তার আবার ডাক দিল প-র-শা। ডাকাটা ঠিক ডাকার মত নয় যেন ভয়মিশ্রিত শব্দোদ্গীরণ। পরক্ষণেই পরশা আস্তে আস্তে হাঁড়ি-কলসীর অন্তরাল হতে মুখ বের করল।

ডাক্তার বলল, "তাই হোক! আমি তো কেমন হয়ে গিয়েছিলাম।" পরেশ মাচার উপর শয়ন করিল, হীরু ডাক্তার জল-বের-করা যন্ত্রটা পেটে ঢুকিয়ে দিয়ে খেলতে চলল। আসবার পথে যন্ত্রটা নিয়ে যাবে।

বলা বাহুল্য, হীরু ডাক্তার কোন পাশ করা ডাক্তার নয়, তবে বহুদর্শিতা আছে এবং তা সে অর্জ্জন করেছে এই গাঁয়েরই নিঃস্ব কাঙাল, ডোম বাগ্‌দী—এদের ঘর থেকে। পরশাও এদেরই একজন। হীরু ডাক্তার তাকে দেখতে আসত শুধু তার দশা দেখে।

পরশাকে যমরাজা যে আজও নেয় নি—সেটা যমরাজার করুণা নয়,—বিরাট শক্তির কুটিল তাচ্ছিল্য—যেন মুঠোর মধ্যেই।

দুঃখ-ব্যাধির অন্তরালে পড়ে' যৌবনটা পরেশকে একেবারে ডাহা ফাঁকি দিতে বসেছে। এখন আর এমন শক্তি নেই যে, ঘাট থেকে খাবার জলটুকু নিয়ে আসে, তাই মাটীর ভাঁড়টী নিয়ে পথ চেয়ে বসে আছে, কখন মেয়েরা জল নিয়ে আসবে, কে তাকে দয়া করে' একটু খানি জল দেবে। পরেশ জল খায় শুধু পিপাসা দূর করতে নয়, জীবনের সব চেয়ে যেটা জটিল প্রশ্ন, সেই ক্ষুধা, তারও কিছু সমাধান হয়। তবে পরেশের জীবন-পঞ্জিকায় একাদশী তিথিটা খুবই বেশী এবং সেটি হিন্দু ঘরের বিধবার মতই কতদিন সে নিখুঁৎ ভাবে পালন করেছে।

আজ দুদিনের পর পরেশচাঁদ বেরিয়েছে দ্বাদশীর আয়োজন কোথাও হয় কি না। হাতে বাঁতাভাঙ একখানা লাঠি, পরনে শতচ্ছিন্ন একখানা মলিন গামছা; লজ্জা-নিবারণে ততটা সাহায্য করেনি যতটা করেছে তার নির্লজ্জতা। আম বাগান পেরিয়ে এসে', অফলা পতিত জমিটার মাঝামাঝি পথে পরেশ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে, বোশেখের এই আগত-প্রায় দুপুর বেলায় কি করে, শক্তি নেই দু'পা চলতে না চলতেই হাঁপিয়ে উঠছে, কিন্তু খিদে মানে না, এর জ্বালা বড় জ্বালা—এর চিকিৎসা নিতাই চাই। ঝোঁক সেরে নিয়ে পরেশ আবার পা পা করে চলতে সুরু করল, বাবুদের বাড়ীর পানে যদি কিছু পাবার আশায়।

বাবুদের বাড়ীটা রাস্তা হতে খানিকটা উঁচু জায়গায়। সামনে একটু প্রাঙ্গন। পাশেই শিউলি গাছ এবং এই শিউলি গাছের চারিদিকে ছোট্ট একটু সান-বাঁধান বসবার জায়গা। পাড়ার ছেলেরা এই শিউলি গাছটাকে রাজা করে' প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় "রাজা রাজা" খেলা করে। তাই সানের নীচেকার ঘাসগুলি আত্মগোপন করেছে ছেলেদের পায়ের দাপটে।

পরেশ বাবুদের দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছতে না পেরে শিউলি-তলার সানের উপরই বসে পড়ল। বাড়ীর সদর দরজা দিয়ে একটি বছর দুয়েকের ছেলে, হাতে কি একটা মিষ্টি নিয়ে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এল। পেছন পেছন রুবি কুকুরটাও বোধ হয় খোকারই ডাক শুনে পরশাকে খানিকটা ভর্ৎসনা করতে লাগল। ভাগিস্ খোকা ছিল—শুধু খোকা নয় খোকার মিষ্টিটাও বটে, পরশাকে কুকুরের ভর্ৎসনা হতেই বাঁচিয়ে দিল, আর এগতে পেল না। খোকা রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই জিজ্ঞেস করছে "কি নিবি? তিক্কে!" পরশা কোন উত্তর দিল না, শুধু অপলকে চেয়ে রইল খোকার হাতের মিষ্টিটির প্রতি—লজ্জাহীনের মত ঢোক গিলতে লাগল। তার জ্ঞান নেই, সে ভুলে গিয়েছে যে তার বয়স চব্বিশ—তার তো সাজে না অমন করে একটি ছোট্ট খোকার মিষ্টির উপর লোভ করা।

খোকা পথের দিকে মুখ করে রুবিকে আর একটা হ্যাংলা কুকুরের পিছু লেলিয়ে দিচ্ছে এই অবসরে পরশা সান ছেড়ে দু'পা এগিয়ে গিয়ে একবার এদিক ওদিক চাইল—তারপর—তারপর পরশার যদি কেউ আত্মীয় স্বজন সেখানে থাকত তবে তারা লজ্জায় মাথা হেঁট করত, ওই নিলর্জ্জ পরশা মাটিতে মুখ দিয়ে কি যেন চাটতে লাগল। বোধ হয় খোকার হাতের মিষ্টি থেকে ঝড়ে-পড়া রস।

কতটুকু রস পেয়েছিল জানি না, তবে মুখে যা ধুলো লেগেছিল তা থেকে এটুকু বেশ বোঝা যায় যে, যতটুকুই হোক না কেন—সেটুকু সংগ্রহের জন্ত তাকে বেশ খানিকটা মাটীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে। পরশাকে এবার দেখ—বেকুবের মত ধুলো মুখেই সানের উপর হাঁপাচ্ছে, বাড়ীর মুহুরি মশায় খাতাপত্রের কাজ সেরে যাবার পথে পরশাকে জিজ্ঞেস করল মুখে কিরে? পরশা নিরুত্তর, মুহুরি মশায়ও পরশার মুখ থেকে কোন উত্তর পাওয়ার বা সম্ভবমত নিজে কিছু একটা অনুমান করে নেবার প্রয়োজন বোধ করেন নি, প্রশ্ন প্রশ্ন!

"বেলাটা কত হল"—একবার আকাশের দিকে চেয়ে ছাতা খুলে গন্তব্য পথে চলে গেলেন।

এদিকে খোকা ছুটোছুটী করতে করতে মিষ্টিটা তার হাত ফসকে পড়ে গেল। পরশার মন কিল কিল করে উঠল। কিন্তু বড়ই সন্দেহ, খোকা হয়ত ওটির দাবী ত্যাগ করে নি, পরক্ষণেই সে সন্দেহ ভঞ্জন হল যখন রুবির ডাক পড়ল। রুবি খানিকটা দূরে কি যেন শুঁকে বেড়াচ্ছিল, পরেশচাঁদ এ সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারাতে পারে না। অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে সান ছেড়ে উঠে পড়ল। থপাস থপাস করে দু'পা এগতে না এগতেই রুবি মুখ তুলে চেয়ে ছুট দিল, মিষ্টিটার দিকে পরেশ রুবির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নাগালের বাইরে থেকেই লক্ষ্য বস্তুটির উপর হাত বাড়াতে গিয়ে যেমনি থপাস করে' মুখ থুবড়ে পড়ল অমনি তার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, দুঃখ, সুখ সব কিছুরই অবসান হল। শুধু একটু করুণ আর্ত্তনাদ করে, হাপরের মত পেটটাকে দু'বার নাড়া দিয়ে বিদায় নিল।

রুবি যা আশা করেছিল তাই পেয়েছিল। পরেশচাঁদ পেল আশার অতিরিক্ত—সর্ব্বশান্তি।

কাগান উপত্যকা

—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

গত সংখ্যায় কাগান উপত্যকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাঠকগণকে জানাইয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমাদিগের ভ্রমণ-সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার কথা জানাইব।

আমরা প্রথমে বালাকোট যাই। গণ্ডগ্রাম বা নগর এই স্থানটিকে যাহাই মনে করি না কেন, ইহাই কাগানের রাজধানী ও বাণিজ্য-কেন্দ্র। রাওলপিণ্ডি-কাশ্মীর পথ দিয়া এবটাবাদ বা ডোমেল, উভয় স্থান হইতে বালাকোটে যাওয়া চলে। আমরা গিয়াছিলাম এবটাবাদ হইতে। সীমান্তের অক্লান্ত-কর্ম্মা শাসনকর্ত্তা জেমস্ এবটের নাম হইতে এই স্থানটি এবটাবাদ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। সীমান্ত স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হইবার পর হইতে এই স্থানের কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্বে ভ্রমণকারী মাত্রকেই হাজারা জিলার ডেপুটি কমিশনারের অনুমতি লইতে হইত, আমাদিগকেও হইয়াছিল। সম্ভবতঃ, এখনও সেই নিয়মই প্রচলিত রহিয়াছে। তবে, এই অনুমতির জন্য কোন রাজনীতিক সন্দেহের কারণ না থাকিলে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না।



কৃষিকার্য্যরত পাঠান কৃষক।

আমাদিগের বিবেচনায় বালাকোটকে একটি গণ্ডগ্রাম বা বৃহৎ পল্লী বলিলেই ভাল হয়। ইহা কুনহার নদের দক্ষিণ-তীরে অবস্থিত। এখানে পুলিশ ষ্টেশন বা থানা আছে এবং পুলিশ রেষ্ট-হাউস্ নামে অভিহিত একটি বিশ্রামশালা দৃষ্ট হয়। বালাকোটের সন্নিকটে কুনহার নদের উপর একটি লম্বমান সেতু দেখা যায়। বালাকোটে পৌছিবার পূর্ব্বে আমরা মুসা-কা-মুশল্লা (Musa-ka-Musalla) নামক পর্ব্বত প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। ইহা সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ১৩ হাজার ৩ শত ৫৪ ফুট উচ্চ। ইহার শীর্ষদেশে ছোট ঘরের মত একটি প্রাচীর-ঘেরা স্থান দেখা যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতাকার দ্বারা শোভিত এই বেষ্টনীটি পয়গম্বর মুসার (Moses) উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। সেই জন্য সমগ্র পাহাড়টিই মুসা-কা-মুশল্লা অর্থাৎ মুসার প্রার্থনা-পতাকা নামে অভিহিত। হিন্দু, বৌদ্ধ বা জড়বাদী যাহাদেরই হউক, ইহা কোন প্রাচীনতর মন্দিরের সহিত সংশ্লিষ্ট, সন্দেহ নাই।

কুনহার নদের অপর তীরে মাক্রা নামক পর্ব্বত গম্ভীর মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান। ইহার উচ্চতা ১২ হাজার ৭ শত ৫২ ফুট। এই পর্ব্বতপার্শ্বে আমরা "চীর" আখ্যায় অভিহিত প্রকাণ্ড পত্র-পূর্ণ পাইন পাদপকে সারি সারি দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলাম।

বালাকোট হইতে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী একটি স্থানে পথের মধ্য-স্থলে গোলাকার প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড দেখিতে পাইলাম। পথ-প্রদর্শকের মুখে ঐ প্রস্তর-সম্পর্কীয় যে কাহিনী আমরা শুনিলাম, তাহার মর্ম্ম পাঠকগণকে জানাইতেছি। বিস্ময়কর শারীরিক শক্তিশালী এক গুজার রমণীর দ্বারা ঐ প্রকাণ্ড

প্রস্তরখণ্ড পথের মধ্যস্থলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। বহু পুরুষ ঐ প্রস্তরখণ্ডকে তুলিতে সমর্থ হইয়াছিল বটে, কিন্তু কেহই উহাকে মস্তকের ঊর্দ্ধদেশে উত্তোলন করিতে পারে নাই। অবশেষে ঐ গুজার নারী বলশালী পুরুষেরও অসাধ্য সেই কার্য্য সাধনপূর্ব্বক সকলকে বিস্মিত করিয়াছিল।

বালাকোট লোকালয়টির পার্ব্বত্য-পল্লী-সুলভ সৌন্দর্য্য ভ্রমণকারীর মনকে আকৃষ্ট করে। সর্দ্দারের হাবেলী বা গৃহ ব্যতিরেকে স্থাপত্য-শিল্পের কোন নিদর্শন এখানে আছে বলিয়া মনে হয় না। এই পল্লীর পার্শ্বে অনেকগুলি নেত্র-রঞ্জন শস্যক্ষেত্র আমরা দেখিতে পাইলাম। দ্রাক্ষা ক্ষেত্র এবং বাদাম, পেস্তা, আখরোট প্রভৃতি ফলের বাগান আমাদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। কুষ্ঠরোগীদের উপনিবেশ বালাকোটের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। এই স্থানে স্থাপিত বালা-পীর সংক্রান্ত মন্দিরই কুষ্ঠরোগিগণের আগমনের কারণ। বালা-পীরের পবিত্র প্রভাবে এই ভয়ঙ্কর ব্যাধি আরোগ্য লাভ করে বলিয়া, সীমান্ত-বাসীর বিশ্বাস। বালাপীর হইতে বালা-কোট নামের উদ্ভব, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। পীর স্থানকে অবলম্বন করিয়া, একটি বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইবার কথাও আমরা জানিতে পারিলাম।

পূর্ব্বে যে লুম্বাল সেতুর কথা বলিয়াছি,—উহার সাহায্যে কুনহার নদ পার হইবার পর ঐ নদের বামতীরে প্রসারিত পথ অবলম্বনপূর্ব্বক আমরা অগ্রসর হইলাম। ঐ পথটি আঁকিয়া বাঁকিয়া, কখন উচ্চে উঠিয়া, কখন নিম্নে নামিয়া প্রায় ৬৯ মাইল বিস্তৃত। এই সেতু হইতে প্রায় ১২ মাইল দূরে একটি বিশেষ প্রীতিপ্রদ প্রপাত দৃষ্ট হইয়া থাকে। বালা-কোট এবং তাহার ঊর্দ্ধস্থ ও নিম্নে প্রসারিত উপত্যকাদ্বয় বর্ষার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিশেষ গরম থাকে। পরে ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে।

আমরা যে প্রপাতের কথা বলিলাম, উহা হইতে কিছু দূরে পাঁচ হাজার ফুট উচ্চ স্থানে একটি বাংলো দৃষ্ট হয়। এই বাংলোয় আবহাওয়া গ্রীষ্মকালেও প্রীতিপ্রদ। মধ্যে মধ্যে এক একটি টেজিং বাংলো আছে বলিয়াই এই সকল জন-বিরল পার্ব্বত্য প্রদেশে ভ্রমণ সম্ভব হয়। আমরা যে টেজিং-বাংলোটির উল্লেখ করিলাম, উহা কাওয়াই নামক স্থানে অবস্থিত। ইহার পর তের মাইল দূরে মাহান্দ্রি নামক স্থানে আর একটি বাংলো দেখা যায়। কাওয়াই হইতে পার্ব্বত্য পথটি প্রথমে উপরে উঠিয়া পরে নীচে নামিয়া গিয়াছে। কাগান উপত্যকার মনোমদ মূর্ত্তি বা সত্যকার সৌন্দর্য্য কাওয়াই হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

মাহান্দ্রি হইতে কোণাকৃতি শৃঙ্গবিশিষ্ট এবং তুষারশুভ্র-শীর্ষ শৈলমালা-বেষ্টিত রাজন্ পাজ্ জি নামক পর্ব্বত দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই পর্ব্বতের উচ্চতা ১৭ হাজার ৫ শত ২৮ ফুট। দীর্ঘ-দেহ দেবদারু দলে দলে দণ্ডায়মান থাকিয়া, কাগান উপত্যকার এই অংশের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্যকে বহু-গুণ বাড়াইয়া তুলিয়াছে। যেখানে শৈল-সানু সঙ্কীর্ণতর আকার পরিগ্রহ করিয়াছে, সেখানকার সৌন্দর্য্য অধিকতর মনোমদ। দেবদারুবীথিবিমণ্ডিত সেই সকল শৈল-সানু, পর্ব্বত-পার্শ্ব ও তটিনী-তীরের অপূর্ব্ব সুষমা সুনিপুণ চিত্রকরের অঙ্কনের ও কল্পনা-কুশল কবির বর্ণনার উপযুক্ত।

আরও এগার মাইল যাইবার পর আমরা সৈয়দ সম্প্রদায়ের প্রধান অবস্থান-স্থান কাগান গ্রামে উপনীত হইলাম। পথে দিওয়ান বেলা (Dewan Bela) নামক স্থান দেখিতে পাইলাম। কাশ্মীরাধিপতি গুলাব সিং প্রেরিত দিওয়ান ইব্রাহিম এই স্থানে হত হন বলিয়া, ইহা এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। পথের দক্ষিণে অবস্থিত তুঙ্গ শৈল-সানু এই স্থানের অন্যতম দ্রষ্টব্য। শৈল-সানুর গাত্র ঠিক প্রাচীরের মত খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই আকস্মিক তুঙ্গতা ভ্রমণকারীর মনে একপ্রকার সম্ভ্রম, বিস্ময় ও শঙ্কার সঞ্চার করে। কাগান গ্রামখানি সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে সাত হাজার ফুট উচ্চে অবস্থিত। সৈয়দদের প্রধান বাসস্থলী এই পল্লীর নাম হইতে সমগ্র উপত্যকাটি কাগান নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

নারান নামক স্থান পর্য্যন্ত আমরা স্বভাব-শোভার অতুলনীয় সানুর পর সানু প্রাপ্ত হইলাম। অম্বরচুম্বী গম্ভীর গিরি-শ্রেণী—মধ্যে দীর্ঘ দেহ দেবদারু-দল-সুশোভিত সঙ্কীর্ণ শৈল-সানু—অদূরে মানুষ শৈল-শিখর মহিমামণ্ডিত মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান। এই সকল দৃশ্য দর্শকের অন্তরে স্বতঃই একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় হর্ষ জাগাইয়া তোলে।

নারান হইতে বাতাকুণ্ডি দশ মাইল। পথ যতই বাতা-কুণ্ডির নিকটবর্ত্তী হয়, ততই পার্ব্বত্য প্রকৃতি একপ্রকার অপূর্ব্ব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, ভ্রমণকারীর মনকে মুগ্ধ করে।

বাতাকুণ্ডির নিকটস্থ গোলাকার পাহাড়গুলি বিশেষ মনোরম।

এখানকার আর একটি বৈশিষ্ট্য, পর্ব্বত-পার্শ্ব বা গিরি-গাত্রগুলি বৃক্ষ-লতার পরিবর্ত্তে শ্যাম-সুন্দর শস্যের দ্বারা সমাচ্ছন্ন। পার্ব্বত্য পুষ্পের প্রাচুর্য্য স্বভাবের সৌন্দর্য্যকে অধিকতর সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।

আমরা এই মাত্র মাল্কর নামক যে শৈল-শিখরের নাম উল্লেখ করিলাম, উহার উচ্চতা ১৫ হাজার ১ শত ২৯ ফুট। বাতাকুণ্ডিতে পৌঁছিলে যে তুষার-শুভ্র শৈল-শীর্ষ আমাদিগের দৃষ্টি-পথে পতিত হইল তাহার নাম ডাবুকা। ডাবুকা ১৬ হাজার ১ শত ৯৬ ফুট উচ্চ। আমরা বাতাকুণ্ডির বাংলোতে বিশ্রাম করিলাম। এই বাংলোটি ৮ হাজার ৮ শত ৪৯ ফুট উচ্চ একটি স্থানে স্থাপিত।

বাতাকুণ্ডি হইতে যাত্রা করিয়া দীর্ঘ পথ পরিভ্রমণের পর আমরা বুরাওয়াই নামক স্থানে পৌঁছিলাম। উভয় স্থানের ব্যবধান আশী মাইলের কম নহে। রৌপ্য-শুভ্র দেবদারু ও নীলবর্ণ পাইন পাদপ যাহা এতক্ষণ প্রচুর পরিমাণে দেখা গিয়াছিল, এইবার তাহা বিশেষ বিরল হইয়া পড়িয়াছে। বিরল-বৃক্ষ গিরিগুলির ঊষর ও ধূসর মূর্ত্তিকে এক প্রকার ভীম-ভৈরব ভাবে ভূষিত বলিয়া মনে হয়। "বুরাওয়াই"-এর টেজিং বাংলো হইতে লোহাৎ-কা-সির ও রত্তি গালি পর্ব্বতের দৃশ্য অতিশয় চিত্তাকর্ষক। বুরাওয়াই হইতে আর কৃষি-কার্য্যের কোন চিহ্ন দৃষ্টি-পথে পতিত হয় না। যেন প্রকৃতি এখানে স্ব-ভাবে অধিষ্ঠিতা। স্বার্থ সঙ্কীর্ণ মানুষের সকল কৌশল এখানে ব্যর্থ। বুরাওয়াই পর্য্যন্ত শীতকালে বাস করা চলে। আরও উচ্চে যাহারা থাকে, তাহাদিগকে শীতকালে নিম্নতর প্রদেশে নামিয়া আসিতে হয়।



বাদ্রাল উপত্যকা— হাজারা জিলা।

বুরাওয়াই পরিত্যাগ করার পর পথটি কুনহার নদের বাম তীর হইতে দক্ষিণ তীরে চলিয়া গিয়াছে। নদীর দক্ষিণ তীরে এক প্রকার খর্ব্বাকার জুনিপার বৃক্ষ আমরা দেখিতে পাইলাম। ইহারা ক্রমশঃ খর্ব্বতর হইয়া পড়িয়াছে। ১৫ হাজার ২ শত ৪৩ ফুট উচ্চ সূক্ষ্মাগ্র ওয়েটার শৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া আমরা অগ্রসর হইলাম। গিরি-গাত্রগুলি আর তেমন তুঙ্গ বা খাড়া নহে। পার্ব্বত্য-পুষ্পের প্রাচুর্য্য এই প্রদেশের আর একটি বৈশিষ্ট্য।

পাশ্চাত্ত্য পর্য্যটকগণ বেসালের দৃশ্যকে স্কটল্যাণ্ডের দৃশ্যের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। বেসালের নিম্নে পুর্ব্বিয়ালা নামক পার্ব্বত্য প্রবাহিনী কুনহার নদের সহিত মিশিয়াছে। বেসালের বাংলোটি ১০ হাজার ৩ শত ৬০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। বাংলোর নিকটে একটি প্রস্তর-স্তূপ দৃষ্ট হয়। এই স্থানে অনেক ব্যক্তির মৃতদেহ সমাহিত রহিয়াছে। কাগানবাসীরা স্থানটিকে পবিত্র বলিয়া মনে করে। সীমান্ত প্রদেশের নানা স্থানে এইরূপ পবিত্র প্রস্তর-স্তূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কাগানবাসীর মনে জিন, পরী প্রভৃতি অপ্রাকৃত প্রাণীতে বিশ্বাস অতিশয় প্রবল। তাহাদের ধারণা, দুর্গম প্রদেশে—শুভ্র তুষাররাশির নিম্নে বিপুল ধন-রত্ন প্রোথিত রহিয়াছে।

আমরা বেসাল বাংলোতে বিশ্রাম করিয়া প্রকৃতির ভীম-কান্ত মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে পুনরায় অগ্রসর হইলাম। দুই মাইল দূরে লুলু-সর হ্রদ আমাদের দৃষ্টি পথে পতিত হইল।

এই হ্রদ হইতে কুনহার নদ জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। পথটি প্রায় দুই মাইল পর্য্যন্ত হ্রদের পূর্ব্ব তীরকে বেষ্টনপূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। ইহার পর আমরা গিটিদাস নামক স্থানের শান্ত সুন্দর সানুতে প্রবেশ করিলাম। এই শস্যশ্যামল পুষ্পপূর্ণ শৈল-সানুর সৌন্দর্য্য আমাদিগকে মুগ্ধ করিল। গিটিদাসের বাংলো ১১ হাজার ৮ শত ৬০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। গিটিদাসের পরে কাগান উপত্যকা শেষ এবং চিলাস প্রদেশ আরম্ভ হইয়াছে। গিটিদাস হইতে এগার মাইল দূরে রাষ্ট্রনৈতিক বিভাগের অধীন একটি ষ্টেজিং বাংলো দেখা যায়। স্থানটির নাম বাবুসর।

উপত্যকার প্রান্তে প্রসারিত পার্ব্বত্য পথটি ১৩ হাজার ৫ শত ৮৯ ফুট উচ্চে উঠিয়া পরে চিলাসের দিকে নামিয়া গিয়াছে। গিরিপথের শীর্ষদেশ হইতে চিলাসের দূরত্ব প্রায় ২৬ মাইল। পথের শীর্ষে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে চাহিলে চিলাস, গিলগিট, কাশ্মীর এবং কাগান উপত্যকার অভ্র-ভেদী পর্ব্বতপুঞ্জ সম্মুখে প্রসারিত হইয়া বর্ণনাতীত দৃশ্য প্রকাশিত করে।

গিরি-পথ হইতে আরও পাঁচশত ফুট উপরে উঠিলে তুষারশৃঙ্গ-নাঙ্গা-পর্ব্বতের মহিমামণ্ডিত মূর্ত্তি দর্শককে সম্ভ্রমভরা গাম্ভীর্য্যে অভিভূত করিয়া তুলে। যেন ধ্যানমগ্ন রুদ্রদেব ঊর্দ্ধবাহু হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। যেন কোন বিপুল-বপু মহাযোগী সমুন্নত শীর্ষের দ্বারা সুদূর শিবলোককে স্পর্শ করিয়া মহাভাবে সমাধিস্থ হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। নাঙ্গা-পর্ব্বতের উচ্চতা ২৬ হাজার ৬ শত ২০ ফুট। যে বরফাবৃত কুট উঠিলে নাঙ্গা-পর্ব্বত দৃষ্টিপথে পতিত হয়, উহা দুরারোহ ও কষ্টকর, কিন্তু যে মহিমাময় দৃশ্য দর্শকের সম্মুখে অভিব্যক্ত হয়, তাহার তুলনায় আরোহণের সেই কষ্ট কিছুই নহে। নিঃসঙ্গ ও নিস্তব্ধভাবে সগর্ব্বে দণ্ডায়মান সেই অভ্রভেদী শুভ্র শান্তি ও শুভ্রতা—সেই নাঙ্গা বা উলঙ্গ সৌন্দর্য্য—দুর্গম ও দুর্জ্ঞেয় রহস্যে পরিপূর্ণ সেই নীলাম্বর চুম্বিত স্তব্ধতা ও গাম্ভীর্য্য—বর্ণনার দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা ব্যর্থ বলিয়া বিবেচনা হয়। দেখিলে মনে হয়—মানুষের কলুষ-কলঙ্কিত কামনার কর্কশ কোলাহল হইতে বহুদূরে বিপুল বিজনতার বক্ষে অপাপবিদ্ধ বিশুদ্ধ বিরাট বিগ্রহের মত ঐ চিরতুষারমণ্ডিতমস্তক তুঙ্গতনু গিরিবর যুগ যুগান্তর ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

নাঙ্গা পর্ব্বতে উঠিতে গিয়া মামারি এবং তাঁহার দুইজন গুর্খা অনুচরের যে শোচনীয় পরিণাম সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, তাহা আমাদের স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। এইস্থানে বলা আবশ্যক, অল্পকাল পূর্ব্বে সংঘটিত জার্ম্মান অভিযান-সম্পর্কীয় মর্ম্মস্পর্শী বিষাদ করুণ ব্যাপারটি তখনও ঘটে নাই। দুইবারেই শীর্ষস্থ তুষাররাশি হইতে স্খলিত আভালাঞ্চ বা প্রকাণ্ড তুষার খণ্ডই দারুণ দুর্ঘটনার কারণ।

কাগানের হ্রদগুলি সাধারণতঃ উহার উত্তরপ্রান্তে প্রসারিত। বিরাট বিজনতার বক্ষে বিরাজমান এই হ্রদগুলি দর্শকমাত্রেরই অন্তরে একপ্রকার অপূর্ব্ব শান্তিরস সঞ্চারিত করে। হ্রদের জল আবহাওয়ার অবস্থানুসারে কখন নীলকান্তমণির মত নীল—কখন বা কৃষ্ণবর্ণ। লুলুসর, দুদীবারসর ও সফর মালুকসর—এই তিনটি হ্রদই বৃহত্তম। দুইটি পার্ব্বত্য প্রবাহিণী লুলুসরকে জল যোগাইতেছে। এই নদীদ্বয়ের সম্মিলিত জলরাশি পরে কুনহার নদরূপে হ্রদবক্ষ হইতে বাহির হইয়াছে। এই হ্রদের অবস্থান-স্থানের উচ্চতা ১১ হাজার ১ শত ৫৭ ফুট। জলের গভীরতা দেড়শত ফুট। কিংবদন্তী, সম্রাট আকবরের এক অন্ধা কন্যা এই হ্রদের জলে স্নান করার ফলে দৃষ্টিশক্তি পুনঃপ্রাপ্ত হন।

দুদীবারসর ১২ হাজার ফুট উচ্চ স্থানে অবস্থিত। পুর্বিমালাকাথা-নাম্নী পার্ব্বত্য প্রবাহিণী ইহাকে জল যোগাইতেছে। সফর মালুকসর নারান হইতে ছয় মাইল পূর্ব্বে বিরাজিত। ইহার অবস্থান-স্থানের উচ্চতা ১০ হাজার ৭ শত ১৮ ফুট। "সফর মালুকসর" শব্দের মর্ম্ম বহুদূর পর্য্যটনকারীর হ্রদ। এই হ্রদ সম্পর্কে একটি অপরূপ রূপকথা প্রচারিত আছে আমরা সেই বিচিত্র কাহিনী সংক্ষেপে জানাইতেছি।

তখন দিল্লীর সিংহাসনে সুলতান্ বলবন্ সুলতানের পুত্র একদিন স্বপ্নে এক অপরূপ-রূপবতী রমণীকে দর্শন করিয়া তাহার প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়া পড়িলেন। রাজকীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ স্বপ্ন-বিবরণ শুনিয়া সুলতান-পুত্রকে কোন বিশেষ শৈলসানুতে গমনপূর্ব্বক দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপিয়া ধ্যান-ধারণায় রত রহিতে উপদেশ দিলেন। তাঁহারা জানাইলেন—এইরূপ করিলে দ্বাদশ বৎসরান্তে সুলতান-পুত্রের মনস্কামনা পূর্ণ হইতে পারে। সুলতান-পুত্র বহুদূর পরিভ্রমণের পর সেই

শৈল-সানুতে পৌঁছিলেন। এই দীর্ঘ পথ পর্য্যটনের জন্য তিনি সফর মালুক আখ্যায় বিখ্যাত হইলেন।

একটি গিরি-গুহায় দ্বাদশ বৎসর-ব্যাপী ধ্যান-ধারণার পর সুলতান-পুত্র একদিন পরীদের রাণী বাদাল জামালকে দর্শন করিলেন। তিনি স্বপ্ন দৃষ্টা অপরূপ-রূপবতীর সহিত পরী-রাণীর সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখিতে পাইলেন। অন্যত্র পরী-রাণী গুল-বদন আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন। তিন শত সহচরীর সহিত গুল-বদন হ্রদের জলে স্নান করিতেছিলেন। সকলে স্ব স্ব বস্ত্র হ্রদের তীরে রাখিয়াছিলেন। সুলতান-পুত্র সফর মালুক গুল-বদনের বস্ত্র লুকাইয়া রাখিলেন। স্নানান্তে গুল-বদন বস্ত্র না পাইয়া ইতস্তত চাহিয়া সফর মালুককে দেখিতে পাইলেন। সফর মালুক কহিলেন—আমার পত্নী হইতে সম্মতা হইলে তবেই বস্ত্র ফিরিয়া পাইবে। গুলবদনও সুলতান-পুত্রকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি আসক্তা হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি পরিণয়-প্রস্তাবে স্বীকৃতা হইলেন। কিন্তু, এই মিলনের এক বিরাট ও বিকট বাধা ছিল। বেলকুশ নামক দুর্দ্দান্ত দৈত্যের সহিত গুলবদনের পরিণয়ের কথা পূর্ব্ব হইতে স্থিরীকৃত ছিল। গুলবদনের পরলোকগত পিতামাতা বাধ্য হইয়া বিবাহে সম্মতি দিয়াছিলেন। এই দৈত্যের দ্বারা গুলবদনের পিতৃরাজ্য অধিকৃত হইয়াছিল এবং তাহার মায়া-মন্ত্রের প্রভাবে প্রজা সকল শক্তিশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল।

সফর মালুকের সহিত গুলবদনের মিলনের সংবাদ বেলকুশের কর্ণ-গোচর হইল; সে ক্রুদ্ধ হইয়া রুদ্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল এবং প্রবল প্লাবন পাঠাইয়া দিয়া সমগ্র উপত্যকাকে ডুবাইয়া ফেলিল। সফর মালুক গুলবদনকে লইয়া গিরি-গাত্র আরোহণ-পূর্ব্বক রক্ষা পাইলেন। ইহার পর তাঁহারা উভয়ে দিল্লীতে পলায়নপূর্ব্বক তথায় পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। কিংবদন্তী, সফর মালুক সরোবরের সুনির্ম্মল জলে পরী আজিও স্নান করে। কেহ তাহাদিগকে দেখিলেও সে সংবাদ কাহারও নিকট প্রকাশ করে না, কারণ – বিশ্বাস, প্রকাশ করিলে তাহাকে মৃত্যু-মুখে পতিত হইতে হইবে।

সফর মালুক হ্রদের পূর্ব্বে চতুষ্ক-শীর্ষ মালিকা পর্ব্বত দণ্ডায়মান। কাগানের পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে ইহাই সর্ব্বোচ্চ, ইহার উচ্চতা ১৭ হাজার ৩ শত ৬০ ফুট। কাগান উপত্যকার দক্ষিণাংশের আবহাওয়া অংশতঃ গ্রীষ্মমণ্ডলের মত, অথচ উত্তরাংশের আবহাওয়া মেরু-মণ্ডলের মত প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। শীত ঋতুতে প্রচুর তুষার উপত্যকায় পতিত হয়। গ্রীষ্মকালে নিম্নতর প্রদেশগুলিতে বৃষ্টি এবং কুহেলিকা দৃষ্ট হয়, কিন্তু যত উচ্চে আরোহণ করা যায়, ততই এই দুইটি হ্রাস হইয়া আসে।



হাজারা জিলার জনৈক সর্দ্দার ও তাঁহার হাবেলী।

নয় হাজার ফিটের ঊর্দ্ধে বৃষ্টি ও কুহেলিকা খুবই কম দেখা যায়। ঐ সকল উচ্চতর স্থানে জল স্বভাবতঃই তুষাররূপে পরিণত হয়। বজ্র ও ঝঞ্ঝার উদ্দাম লীলা উপত্যকা-বক্ষে প্রায়ই দেখা যায়। যখন বজ্র রুদ্ররবে গর্জ্জিয়া উঠে এবং ভৈরবী ঝঞ্ঝা তাণ্ডবতালে নৃত্য করে, তখন পার্ব্বত্য প্রকৃতি যে ভীম-কান্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন, তাহা দেখিলে যুগপৎ শঙ্কিত, স্তম্ভিত ও চমৎকৃত হইতে হয়।

বঙ্গ-রমণী

—শ্রীঅপরাজিতা দেবী

[১৩]

'শরতের শশী যাহার আসে—'

আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি জলে নৌকা ভাসিল। আষাঢ়ের প্রথমেই জল আসিয়াছে, নূতন জলের মাছ ধরিতে ছেলে-বুড়ার সমান উৎসাহ, কল কল শব্দে নদী হইতে ঝরণার মত বেগবতী স্রোতোধারা আঁকিয়া বাঁকিয়া, নীচু পথ ধরিয়া খালে, বিলে, পুকুরে, ডোবায় আসিয়া পড়িতেছে—সে কি অভিনব দৃশ্য। সেই জল-ধারার মুখে কাপড়, দোয়াড়া, পলো, যে হাতের কাছে যা পাইতেছে, তাই ধরিতেছে। দেখিতে দেখিতে রাশি রাশি মাছ ধরা হইয়া যায়। নদী হইতে জলের সঙ্গে মাছগুলিও বহিয়া আসিয়াছে। পথ ছাপাইয়া জলের স্রোত তীব্রবেগে ছুটিয়াছে। এক বেলার মধ্যে দেখিতে দেখিতে সমস্ত জলাশয় ভরিয়া গিয়া জল উছলিয়া উঠিয়া মাঠ ঘাট পথ সব ডুবাইয়া দিল, কেবল বাড়ীগুলি দ্বীপের মত জাগিয়া রহিল মাত্র।

জল আসিতেছে, জল আসিল বলিয়া, গ্রামশুদ্ধ উৎসবে মাতিয়া যায়। মাছ ধরিবার আনন্দে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া জাগরণ, দিনে নিমন্ত্রণের উৎসব। সারা বছরের ঘুমন্ত দেশ যেন জল-ধারার সঙ্গে সঙ্গে জাগিয়া উন্মাদ হইয়া উঠে।

তবে, এ আনন্দেরও শেষ আছে। জল একই ভাবে কিছু দিন থাকিল, ইহাতে যাতায়াতের বড় অসুবিধা হয়, না নৌকা চলে, না হাঁটিয়া যাওয়া যায়। জল একদিনে বাড়িয়া গেলে আউশ ধানের আশা একরকম শেষ, তবে ধান ঘরে উঠিলে তখন জল-বৃদ্ধিতে ক্ষতি নাই। এই সময় মেঘের ডাক শুনিয়া ও আকাশের দিকে চাহিয়া দিন কাটে; কোন দিকে মেঘ ডাকিলে জল বাড়িবে বা কমিবে, সকলেই জানে। আবার জল যখন পরিপূর্ণ ভাবে বাড়িয়া স্থির হইয়া থাকে, তখন আকাশও নির্মল বৃষ্টিহীন। একটু মেঘ, ঈষৎ বাতাস, কি দু ফোঁটা জলের আশায় যখন সকলে ঊর্দ্ধমুখ, তখন উপরে আকাশ, নীচে বারিরাশি নিস্তরঙ্গ, নিস্তব্ধ ও প্রশান্ত।

বেলা বেশী নাই। সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছে, কিন্তু অন্ধকার হয় নাই। ধীরে ধীরে ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভাসিয়া ভাসিয়া একখানি ছোট ছই-দেওয়া নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগিল। আগে বিশাল ও পিছনে বড়-বৌ নৌকা হইতে নামিয়া বাড়ীতে উঠিল। বাহির-ঘরে জনকয়েক অচেনা ভদ্রলোক দেখিয়া বিশাল সেইদিকে গেল, বড়-বৌ অন্দরে ঢুকিল।

বড়ঘরের বারান্দায় পাড়ার গিন্নীরা তরকারী কুটিতেছিলেন, হঠাৎ বড়-বৌকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। আগাগোড়া পরিপাটী সুসজ্জিত বেশ, গায়ের রং আরও উজ্জ্বল হইয়াছে, কালোপেড়ে ফরাসডাঙ্গার শাড়ী পরা, গায়ে একটা বেগুনী রংয়ের সিল্কের জ্যাকেট, হাতে নূতন সোনার চুড়ি, যদিও তামার পাতের উপর সোনা দিয়া বাঁধানো, কিন্তু তাহা চোখে পড়ে না, স্বল্প ঘোমটার ভিতর দিয়া গলায় একটা হারও দেখা যায়; কপালে ছোট একটা সিঁদুরের ফোঁটা, কে বলে সেই মলিন-বেশা বড়-বৌ।

যতক্ষণ গিন্নীরা বড়-বৌয়ের আপাদমস্তক দেখিতেছিলেন, ততক্ষণ বড়-বৌ তাঁদের প্রণাম করিয়া পিছন-বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছে। মাঝ-উঠানের আলপনার উপর দিয়াই হাঁটিয়া গেল, পায়ের দিকে না চাহিয়া। সমস্ত বাড়ী সব লেপা-মোছা, ফিটফাট। বহু জিনিষপত্রের আমদানী কি একটা উৎসবের আভাস দিতেছে। বড়-বৌয়ের চোখে সবই নূতন ঠেকিল। অনেক দিন, তার পক্ষে সাড়ে তিন মাস অনেক দিনই বটে, এতদিন বাড়ী ছাড়িয়া থাকা এই প্রথম—কেবল বিয়ের বছরটা দু' তিন বার দু' পাঁচ দিনের জন্য যাত্রাবাড়ী গিয়াছে মাত্র।

এ দিকে কোথাও কাহাকেও না দেখিয়া সে মেজ-বৌয়ের ঘরে গেল। মেজ-বৌ বিছানায় মুখ ঢাকিয়া শুইয়া আছে, বড়-বৌ ডাকিল, দিদি।

চকিতে মুখের কাপড় সরাইয়া মেজ-বৌ উঠিয়া বসিল, হতাশ ভাবে বলিয়া উঠিল, 'এতদিনে এলে? সর্ব্বনাশ হবার পরে?'

'কেন রে ? কিসের সর্ব্বনাশ ?'

'ঠাকুরপো আবার বিয়ে করেছে—'

বড়-বৌ সেইখানে বসিয়া পড়িল, হঠাৎ যেন চোখে চারিদিক্ অন্ধকার দেখিল।

ঘরে ঘরে সন্ধ্যার বাতি জ্বলিল। মেজ-বৌ আলোটা কপাটের আড়ালে রাখিয়া বড়-বৌয়ের কাছে চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

'কেন নিরু, কেন এ—'

'কে জানে কেন, কিন্তু পঞ্চমীকে হারালাম।'

'কবে হলো, কবে হলো এ বিয়ে ?'

'পরশু বিয়ে হয়েছে। আমায় আজ সকালে আনতে গেছ্ল, আমি দুপুরে এসে পৌচেছি।'

'কেন, কিছু জানিস্‌নে ? কেউ জানে না ? কেউ কিছু করতে পারলে না ?

'আমিই কি জানি, তুমি গেলে ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তির আগের দিন। চৈত্র মাসের তিন না চার দিন গেছে, বাবা খবর পাঠালেন, মার রাত্তিরে হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে ভয়ানক লেগেছে—দাঁড়াতে পারেন না, বোনরাও কেউ কাছে নেই, আমি গিরি দুজনেই এখানে। আমি গেলাম, পঞ্চমী রইল একা, গিরির শাশুড়ীকে বলে গেলাম। বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি একদিন পঞ্চমীর এক ভাই ডুলি নিয়ে এসে হাজির, সেই যে পিসতুত ভাইয়ের গল্প ও করত ? গিরিকে রেখে গেলাম শুধু ওর জন্তেই, কিন্তু কে কাকে বাঁচাতে পারে দিদি ? ওর মুখের কথাই ওর কাল হল, বাপের বাড়ীর গল্প করে, সবাই তো সব জানে। এরা লেখাপড়া শিখলে না, বিদ্বান্ বড়লোকের নাম শুনলেই হিংসে হয়, ওর পিসতুতো খুড়তুতো ভাইরা সব ইস্কুল-কলেজে পড়ে, বাড়ীতে তাদের দালান-পুকুর। ভাইরাও দেখতে খুব সুন্দর। বড়ভাই উকীল না ডাক্তার বুঝি, সে ই নিতে এসেছিল, পঞ্চমীর মার খুব অসুখ, বাঁচেন কি বাঁচেন না এমনি দশা, বাড়ীতে কেউ নেই, ঠাকুরপো গিয়েছে রাঘবপুরের হাটে, ভোর র'য়ে উঠে পঞ্চমী কেঁদে-কেটে অনর্থ করলে, র'াধলেও না, ভাইকে খেতেও দিলে না, একেবারে ডুলিতে গিয়ে উঠলে এক কাপড়ে। মা কিছু বললেন না, তবে নতুন কুটুম্বকে আদর-যত্ন যা করবার করেছিলেন না কি, কিন্তু সে জলস্পর্শও করে নি। একখানা চিঠি লিখে ঠাকুরপোর নামে মার কাছে রেখে গেল—'

মেজ-বৌ একবার থামিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'ঠাকুরপো ফিরে এল রাত্তিরে, শুনে সে প্রথমটা কিছু বলে নি, মিথ্যা দোষ দেব না, শেষে দু' বেলা মা বলতে লাগলেন। তারপর কি হল. কে জানে। আজ সকালে আমাকে আনতে লোক গেছে, এসে দেখি এই, আমি এ সব গিন্নির কাছে শুনেছি।'

'পঞ্চমীর মা ভাল হয়েছেন না কি ?'

'আমি এসে ঠাকুরপোকে এই ঘরে ডেকে আনলাম। বললে, একজন পর লোকের সঙ্গে ঘরের বৌ চলে গেলে মাপ করা যায় না। গিয়ে একটা চিঠি অবধি না', আর বলে কি করব দিদি, সর্ব্বনাশ তখন হয়েই গেছে—'

বিশাল মাথা-পা চাদরে ঢাকিয়া নিজের ঘরে শুইয়া আছে। বড়-বৌ ঘরে ঢুকিতে গিয়া শাশুড়ীকে আসিতে দেখিয়া আর ঢুকিল না। এক কোণে সরিয়া দাঁড়াইল, শাশুড়ী বারান্দায় উঠিলে তাঁহাকে প্রণাম করিল। তিনি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ঘরে গিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ রে, নৌকা থেকে নেমে বড় শুয়ে পড়লি ? কাল বাড়ীতে বৌ-ভাত, এত করে চিঠি লিখে লিখে তোকে আনলাম, তা এ রকম করে থাকলে কাজ চলবে কি করে ? তোরা এলি নে বলে আমি নিজেই নৌকা করে গিয়েছিলাম ও-পাড়ার সোনা সেখের কাছে, কাল হাটে যাবার জন্তে।'

বিশাল চাদর সরাইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, 'মা, এ কি করলে, এ কি করলে তুমি ?'

'কেন রে, কি এমন করেছি ? বললে না বিশ্বাস করবি, এক ছোঁড়া এল ঠিক দুপুরবেলা, যেমন গায়ের রং তেমনি রূপ, তাকে দেখে না নিজে খেলে, না তাকে খেতে দিলে, একেবারে অজ্ঞান হয়ে উঠল গিয়ে তার ডুলিতে, অমন বৌকে আগুন পুড়িয়ে মারতে হয়। তা করি নি এই ভাগ্যি এখন ছেড়ে দিয়েছি, যেখানে যা খুসী করুক গে—'

'সে যে সে নয় মা, ব্রজদত্ত আমায় বললে, ওর পিসতুত ভাই দেবেন এসেছিল, দেবেন আমারও বড় বয়সে—'

'তুই দেখিস নি, আমি নিজে দেখেছি, এই কোঁকড়া চুল, যেমন রং তেমনি বাবু! তা বাছা যার বৌ সে যদি আবার বিয়ে করে, তোমার আমার কি বলবার আছে?'

'না, কিছু না।···মাগো, তোকে আমি বাঁচাতে পারলাম না। তোর মা বড় বিশ্বাস করে আমার হাতে সঁপে দিয়েছিল!' বলিয়া বিশাল চোখের জল মুছিতে কাপড়ের খুঁট উঠাইল।

পরশমণি অসময়ে আসিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বড় বৌ অদূরে দাঁড়াইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে থাকিল।

[১৪]

'জ্বালিনু আগুন প্রতিদান দিতে
হায় রে! আপনি লাগিনু দহিতে
কি আছে এখন পারে ভুলাইতে
বিদেশিনী মোর প্রিয়ার মুখ।'

এই যে একটা সাংঘাতিক মর্ম্মবিদারী কাণ্ড ঘটিয়া গেল, পাড়া পড়শীরা কিছু কিছু জানিলেও এটা যে ঘটবে তাহা জানে নাই। জানিলে অন্ততঃ শেষ চেষ্টা করিত। সুখেন হাট হইতে ফিরিয়া মায়ের কাছে শুনিয়া কিছুই বলে নাই। তার পরে যতই দিন যাইতে লাগিল, মনের মধ্যে রাগ অভিমান জমা হইতে লাগিল। সে এখানে নিশ্চিন্ত আছে, ওদিকে পঞ্চমী সেই রূপবান্ যুবকটিকে লইয়া মনের আনন্দে দিন কাটাইতেছে! দু' তিন বার শ্বশুর-বাড়ীর দিকে পা বাড়াইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, দুর্জ্জয় রাগ ও মান পদে পদে বাধা দিয়াছে। একখানা চিঠিও পঞ্চমী দিতে পারিল না? মার অসুখ এত বেশী? আর অহরহ পরশমণির মন্ত্রণা—

মাতাল নেশার ঝোঁকে যা যা করে, তা সে নিজেই জানে না। সুখেন স্বরূপ নয়, অহরহ সেই অদেখা রূপবান্‌টির উপর ঈর্ষ্যাবিষে জর্জ্জরিত হইতে হইতে শেষে মায়ের আদেশ সে পালন করিয়া বসিল।

বিবাহের আগাগোড়া সমস্ত ভারই পরশমণির হাতে। তিনিই ঘটক ডাকাইয়া মেয়ের খোঁজ করিয়াছেন। সে এত সন্তর্পণে যে, পাড়ার লোক, এমন কি দত্তরাও জানে না, অথচ তাহারা প্রায় সারা দিনই এ বাড়ী যাতায়াত করে। পরশমণির এক ভাই আছেন, সকলে তাকে নকুল মামা বলে, তিনিই বরকর্ত্তা হইয়া সুখেনের ভার লইয়া বিবাহ সারিয়া দিলেন। বিয়ের আগে বাড়ীতে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান কিছুই হয় নাই, কিংবা হইলেও শ্যামল টের পায় নাই। সে বৈকালে স্কুল হইতে ফিরিয়া প্রায়ই শ্বশুর-বাড়ী চলিয়া যায়। সুখেন বৌ লইয়া নৌকা হইতে নামিলে তখন সকলে টের পাইল। একে রাত্রিকাল, তায় নৌকা না হইলে এক পা চলে না। তারপরে নূতন-বৌ তখন বাড়ীতে পা দিয়াছে, তখন যথাযোগ্য কাজ-কর্ম্ম পাড়ার লোকেরাই করিল। নূতন কুটুম্বও জন দুই সঙ্গে আসিয়াছে, তাহাদের আদর সমাদরও হইল। শ্যামল পরদিন নিজে না গিয়া মেজ-বৌকে আনিতে লোক পাঠাইয়া দিয়াছে।

বিশাল এত সব বোঝে নাই: যত দূর ও নিকট-সম্পর্কিত জ্ঞাতি-বান্ধব আছে, সব জায়গায় বেড়াইয়া বেড়াইয়া এক নূতন জীবনের স্বাদ লইতেছিল। পরশমণি মাঝে মাঝে চিঠি দিয়া কুশল জানিতে চাহিতেছেন, তারপর এই দু'তিন দিন আগে এক জরুরি চিঠি পাইয়াই বিশাল চলিয়া আসিয়াছে। চিঠিতে লেখা ছিল—শনিবারের মধ্যে যেন আসিয়া পৌঁছে, বাড়ীতে অত্যন্ত প্রয়োজন, না আসিলে পরশমণি অত্যন্ত বিপন্ন হইবেন। সেই চিঠি পাইয়াই বিশাল চলিয়া আসিয়াছে। নতুবা আর দিনকতক পরেই আসিত। গৃহের বাহিরের মুক্তির আনন্দ পাইয়া সহজে খাঁচায় ঢুকিতে সাধ ছিল না।

রবিবারে বৌ ভাত হইল। ধূমধাম নয়, মাঝারি গোছের। বড় বৌ, মেজ বৌ যেন গা ছাড়িয়া দিয়াছে, নিতান্ত যা না করিলে নয়, তাই করে। পরশমণি একাই সব ভার লইলেন, আগাগোড়া সব তিনি দেখিতে লাগিলেন, একটা নূতন উৎসাহ তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে, যেন রাজ্য জয় করিয়া ফেলিয়াছেন।

বিশালকে সবই দেখিতে শুনিতে হইল। বাড়ীর কর্ত্তা সে, মান-অপমান তাহারই। সুখেনের সঙ্গে একটি কথাও বলে নাই, সুখেন বেশী সময় নিজের ঘরেই থাকে, তাহাকে দেখাও যায় না।

বিয়ের গোলমাল মিটিয়া গেল। নূতন-বৌ সরলাকে দেখিতে দলে দলে লোক আসিল। সরলার বয়স বছর ষোল হইবে, এক-হারা সুগঠিত দেহ, বর্ণ শ্যাম হইলেও মুখখানি

পায়ের রংয়ের চেয়ে অনেক ফরসা। পাতলা নাক, পাতলা দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁট দুটি, বড় বড় দুটি চোখ, নির্ভীক-স্পষ্ট চাহনি, সবশুদ্ধ মেয়েটি যেন একটি ধারাল ছুরি। মাথার চুলে কোন বাহার করে না, আঁট সাঁট করিয়া উঁচু খোঁপা বাঁধে, সব সময় ফিট-ফাট পরিষ্কার। ধবধবে লালপেড়ে শাড়ীটি পরিয়া সহজ অকুণ্ঠিত ভাবে সকলের সামনে দিয়াই আসা-যাওয়া করে, ঘোমটা আধখানা কপালের নীচে নামে না।

নূতন-বৌ দেখিয়া সকলেই প্রশংসা করিল।

একটা একটা করিয়া দিন কাটিতে লাগিল। মেঘের ডাকে ডাকে জল বাড়িয়া প্রায় বাড়ী সমান সমান হইয়াছে। আর আধ হাত বাড়িলেই বাড়ীতে জল উঠিয়া পড়িবে।

শ্রাবণের শেষে সরলা বাপের বাড়ী যাইবে। ভাদ্রমাস নূতন-বৌকে শাশুড়ীর দেখিতে নাই, নতুবা পরশমণি একেবারে আশ্বিন মাসেই পাঠাইতেন।

সেই বাঁশ-ঝাড়ের তলাটিতে মেজ-বৌ, বড় বৌ অভ্যাসমত আসিয়া বসে, পঞ্চমী ঘরে আসিবার পর আর পান সাজিয়া খাইতে হয় নাই, কিন্তু সে জন্য কোন অসুবিধা নাই। সরলা ঝকঝকে বাটা ভরিয়া পান আনিয়া দিয়া কাছে বসে। একটু নিরিবিলি বসিয়া, দুইজনে মনের কথা খুলিয়া বলিতে চায়, কিন্তু কোথাও সে সুযোগ নাই, হয় পরশমণি, নয় সরলা, একজন না একজন সর্ব্বদাই কাছে আছে।

কাজ কর্ম্মে সরলার জুড়ি পাওয়া ভার। পঞ্চমীর মত এ পরনির্ভরশীলা, লজ্জাবতী নয়, পঞ্চমীর যত কথা যত হাসি সব গোপনে, দিদিদের কাছে। সরলা আত্মবিশ্বাসী, দুই দিনেই সব বুঝিয়া লইয়াছে, সংসারের কাজকর্ম নিজেই গুছাইয়া লইয়া রান্না-বান্না করে, কাহাকেও বলিয়া বা জিজ্ঞাসা করিয়া লয় না। পঞ্চমী পিত্রালয়েই বেশী সময় থাকিত, বাহিরের দিকে কখনও আসিত না। সরলা রাখালকে দিয়া প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র আনায়। আগে বাড়ীতে কুটুম-সমাগম ভিন্ন ক্ষীর-নারিকেলের মিঠাই কখনও তৈয়ারী হইত না, চিঁড়ে, মুড়ী, মুড়কী, নারিকেল ও তিলের নাড়ু এই জল-খাবারই বাড়ীর ছেলেদের ও অতিথি-অভ্যাগতের চলিত। এখন সরলা [illegible] নারিকেলের [illegible] সব সময় ঘরে তৈয়ারী রাখে। [illegible]

খাওয়াইয়া নিজের ও সুখেনের খাবার খোরার করে ঢাকিয়া রাখে। সরলার পিতৃকুল বিশালদের সমাজে প্রায় অচল, কিন্তু ভাইয়েরা লেখাপড়া শিখিয়াছে, অবস্থাও ভাল, ক্রমশঃ উন্নত হইবার আশায়ই মেয়েকে দ্বিতীয়-বরে দেওয়া হইয়াছে।

মাসখানেকের মধ্যেই সরলার জয়-পতাকা উড়িল। বাড়ীর সব জায়গায় তাহার উপস্থিতি, সব কাজে তাহার [illegible], সব বিষয়ে তাহার হিসাব; যেমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তেমনই কর্ম্মপটুতা দেখিয়া অতিবড় শত্রুকেও স্বীকার করিতে হইল, এমন মেয়ে হাজারে একটা মেলে না। অমন-যে বড়-বৌ তাহাকেও হার মানাইয়াছে।

[১৫]

'কাদম্বিনী মনোহরা   বারি বিদ্যুতে ভরা
পূর্ণ বারি বিদ্যুতে ভরা—'

বিশালদের বাড়ীর সামনে দাঁড়াইলে, একটু আগে ডানদিকে রায়-বাড়ী। রায়েরা কাঞ্চনপুরের মধ্যে বিশিষ্ট পরিবার। একঘর এখানে, আর মিস্ত্রী-বাড়ীর পরে কুড়ি একুশ ঘর রায়। সব জ্ঞাতি-গোষ্ঠী। ঘন-বসতি জায়গা সব অকুলান বলিয়া, কৃষ্ণ রায় পৈতৃক-ভিটা ভাইপোদের ছাড়িয়া দিয়া, এই ফাঁকা খোলা জায়গায় আসিয়া বাড়ী করিয়াছেন। কৃষ্ণ রায়ের বাড়ীর পরে খানিক দূর হইতে মুসলমান-পাড়া আরম্ভ হইয়াছে।

কৃষ্ণ রায়ের বাড়ী কাঞ্চনপুরের আশ্রয়। বিবাদ-বিসংবাদ-নিষ্পত্তি, সালিশী, দরবার, মজলিস, খেলা-ধূলা, যাত্রা, কীর্ত্তন যতকিছু উৎসব সবই রায়-বাড়ীতে হয়; অসময়ে টাকা কর্জ্জ পাওয়া, ক্রিয়া-কর্ম্মের বাসন-পত্র হইতে আলো, শামিয়ানা, সতরঞ্চি, সব কৃষ্ণ রায়ের কাছে। কৃষ্ণ রায়ের ছেলেরা ও ভাইয়েরা সকলেই বিদেশে থাকে। কেবল সেজ রায় বাড়ীতে থাকিয়া ডাক্তারি করেন। সেজ-বৌই বাড়ীর গিন্নী। কৃষ্ণ রায়ের বিধবা বড় বোন এক দিন গিন্নী ছিলেন, এখন আর পারিয়া উঠেন না। তবে, তাঁর প্রতাপ ও কর্ত্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ আছে। কৃষ্ণ রায় রাশভারী মানুষ, কিন্তু সেজ রায় আমোদে-আহ্লাদে, সুখে-উৎসবে কাঞ্চনপুরের ইতর-ভদ্রের বন্ধু। সারা বৎসরটা রায়-বাড়ী নিরিবিলি নিঝুম হইয়া থাকে, পূজার সময় বিদেশ হইতে সকলে আসিলে, বাড়ীতে উৎসব আরম্ভ হয়। [illegible] বাড়ীতে [illegible] দিন-দুপুরে যেন কোজা-

ধজের ব্যাপার চলে। কাঞ্চনপুরের বেশীর ভাগ লোকই সে সময় রায়-বাড়ীতে বৈঠকখানা-ঘরে আসর জমায় এবং খাইবার ডাক পড়িলে আগত লোকজন-সমেতই রায়েরা খাইতে যান। তারপরে পূজার ছুটী ফুরাইলে, কেহ কেহ বার দিন পরে, কেহ কেহ একমাস পরে, যিনি যে ভাবে চাকরী করেন, সেই-ভাবে চলিয়া যান। ধীরে ধীরে বাড়ীটি আবার শান্ত হয়।

জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, শুক্ল পক্ষের চতুর্থীর মৃদু জ্যোৎস্না। বাহিরের ঘাটের উপর বড়-বৌ ও মেজ-বৌ বসিয়া রহিয়াছে। বাড়ীতে পুরুষ-মানুষেরা কেহ নাই, কৃষাণদের লইয়া বিশু ও সুখেন হাটে গিয়াছে, ফিরিতে রাত হইবে। শ্যামল রুগ্ন শাশুড়ীকে দেখিতে গিয়াছে।

আশ্বিন মাস ; জলে চারিদিক্ পরিপূর্ণ। হাট-প্রত্যাগত ছোট-বড় নৌকাগুলি ধীরে ধীরে ভাসিয়া চলিয়াছে ; নৌকার তাড়নে ঢেউ উঠিয়া, একটির পর একটী করিয়া ঘাটে আসিয়া লাগিয়া ছল্কিয়া উঠিতেছে। বাতাসে দু'জনার কাপড় কাঁপিতেছে। মেজ-বৌ বলিল, 'এবার পূজোয় ওরা কেউ আসবে না, সোনা-খুড়ী ঘাটে বললেন ও-বেলা।'

'কেউই আসবে না—?'

'না, পূজোর খরচের টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেজ-খুড়ী দুঃখ করছিলেন, বললেন, বছরে একবার দেখা, তাও হবে না।'

'তা হলে পূজোর ধুমধামও হবে না ?'

'তা' হবে, যেমন বছর বছর হয় তেমনি হবে। লক্ষ্মী-পূজায় নিমন্ত্রণে এবার যেতে কি মন সরবে দিদি ? তার কত ইচ্ছা, সেজে-গুজে কত আগে তৈরী হয়ে থাকত—'

'জানিনে কেমন আছে, মনে হয়, একখানা চিঠি লিখি, কোন্ মুখেই বা লিখব।'

'ঠাকুরপোকে চিঠি লিখেছে দিদি, সকাল বেলা নাইতে যাবার সময় সরলাকে ডাকতে গিয়ে দেখি, সরলা একখানা খামের চিঠি টুক্রো টুক্রো করে ছিঁড়ছে, আর রেগে ঠাকুরপোকে বলছে, তুমি নিশ্চয় চিঠি লিখেছিলে, নইলে সে লিখবে কেন ? ও-সব চালাকি তোমার চলবে না, ঠাকুরপো মাথা নীচু করে বসে রয়েছে—'

বড়-বৌ মেজ-বৌয়ের গা টিপিয়া দিয়া সতর্ক করিয়া দিল। মেজ-বৌ চম্কিয়া ফিরিয়া দেখে,—সরলা খুব কাছে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। একটু আগেও সরলা ও পরশমণিকে পরশমণির ঘরে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আসিয়াছে। পরশমণি কি বলিতেছিলেন, সরলা মন দিয়া শুনিতেছিল। তেমন নিবিষ্টতা এত শীঘ্র ভাঙ্গিবে তা আশা করে নাই।

দুইজনে শঙ্কিত মনে চুপ করিয়া রহিল। সরলার চোখ জলের দিকে ; বলিল, 'এখনো হাট থেকে ফিরছেন না কেন দিদি ?'

'পূজোর হাট করতে গেছেন, তা দেরী হবে না ?'

একখানা নৌকা আসিতে দেখিয়া বড়-বৌ বলিল, 'ঐটে হবে বোধ হয়—'

সরলা বলিল, 'না ওটা না—ওটা ছোট দেখছ না ?'

মেজ-বৌ বলিল, 'তুই কি করে বুঝলি ? আমরা ত' বুঝতে পারছিনে।'

'বুঝবে না কেন ? সবই তো দেখা নৌকা, রাত্তির হলেই অচেনা হবে ?'

নৌকাখানা সোজাসুজি আসিয়া বিশ্বাসদের ঘাট হইতে হাত দুই দূরে ডানদিকের বাঁকের অভিমুখে চলিল, সরলা বলিল, 'দেখলে ? মিস্ত্রী-বাড়ীর নৌকা।'

মিস্ত্রীদের ছোট ছোট জন তিন চার ছেলে নৌকায় ছিল —বড় কেহই না। বড়-বৌ বলিল, 'সদা তোরাই আজ হাটে গেছিলি ? তোর বাপ-কাকারা কেউ যায় নি !'

সদা দাঁড় বাহিতে বাহিতে বলিল, 'হাঁ৷ বৌদি, আবার কে যাবে ? আমরাই কি কম !'

'না—তোমরা কম হবে কেন ? তোমরা এক এক জনা একশ, তা আমাদের বাড়ীর ওদের দেখলি ! আসছে না কি !'

'বড়দাকে দেখেছি—আসছে, ছোড়দাকে দেখলাম মীর-পুরের এক ব্যাপারীর নৌকায় মীরপুরের দিকে গেল, তা আপনারা বুঝি তাদের আশায় ঘাটে বসে আছেন ! বড়দা ইলিশ মাছ কিনেছে চারটে, একা একা খেও না বৌদি—হজম করতে পারবে না।'

'আচ্ছা রে আচ্ছা, যাবার আগে একবারটি আসিস, নিয়ে যাস ; নইলে কাল দিয়ে পাঠাব।'

নৌকা তখন বাড়ীর গাছপালার আড়ালে গিয়াছে, জলে দাঁড় ফেলার শব্দ হইতেছে, সেখান হইতে সদা উচ্চস্বরে উত্তর দিল, 'আচ্ছা।'

সরলা স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল দেখিয়া মেজ-বৌ বলিল, 'বস্ না, দাঁড়িয়ে রইলি কেন! ঠাকুর পো আর আসবে না বোধ হয়, অত দূরে গেছে যখন।'

'কেন মীরপুরে গেল জান দিদি?'

'না, জানি নে, কোন কাজ পড়ে থাকবে হয় ত।'

'তোমরা জানবে কি, যার জানবার সে বুঝেছে,' বলিয়া সরলা সেখান হইতে চলিয়া গেল।

মেজ-বৌ বলিল, 'ঠাকুরপো আজ আসবে না শুনে ওর রাগ হয়ে গেছে।'

'কাল এসে রাগ ভাঙ্গাবে, আর বাড়ীর ভিতরে যাই।'

দুইজনে উঠিয়া দাঁড়াইল। জলের উপর দিয়া ঠাণ্ডা হাওয়া আসিয়া গায় লাগিতেছে, এত স্নিগ্ধ যে শীত শীত বোধ হয়।

পাছ-দুয়ারে গিয়া বড় বৌ অবাক হইল, রান্নাঘরে শিকল দেওয়া, সরলাকে দেখা গেল না। হাটের দিন রাত্রে বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়ার একটু ধুমধাম হয়। সে দিন আর সকাল সকাল রান্না চড়ে না, হাটের আশায় দেরী হয়। হাটে যথাসাধ্য ভাল মাছটি বিশালের কেনাই চাই এবং সেই মাছ রান্না হয়। ডাল বা তরকারী অন্য কিছু না। হাটের দিন রাত্রে সরলা রাঁধিবেই, বেশীর ভাগ সে-ই রাধে, তবে হাটের দিন রাত্রেই তাহার আগ্রহ বেশী। বিশাল আসিতেছে, এখনও রান্না-ঘরে সাড়া-শব্দ নাই, অথচ সরলা বৈকালেই জল তুলিয়া বাটনা বাটিয়া, চাল ধুইয়া হাঁড়ীতে ছাড়িয়া উনানের কিনারায় কাঠ-কুটা সাজাইয়া অপেক্ষায় বসিয়া আছে। সরলাকে খুঁজিতে বড়-বৌ সুখেনের ঘরে গেল, নিতান্ত অসময়ে তাহাকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, 'কি হয়েছে সরি?'

সরলা এ দিকে পিছন ফিরিয়া শুইয়া আছে, বাতিটা ছোট করিয়া একপাশে রাখা, তেমন পিছন ফিরিয়া থাকিয়াই ভারী ভার গলায় উত্তর দিল, 'বড্ড মাথা ধরেছে, উঠতে পারছি না।'

'তবে খানিকক্ষণ চুপ শুয়ে থাক্, আপনি সেরে যাবে, একটু তামাকপাতা চুন দিয়ে কপালে লাগিয়ে দিয়ে যাই।'

সরলা কথা বলিল না। বড়-বৌ ফিরিয়া আসিয়া রান্না-ঘরের শিকল খুলিল, উনান জ্বালিয়া ভাত চড়াইয়া দিতে দিতে বাহিরে নৌকা ঘাটে লাগিবার শব্দ ও কথাবার্ত্তা শোনা গেল। মেজ-বৌ ঘুমন্ত ছেলেমেয়ে দেখিতে শোবার ঘরে গিয়াছিল, সেও বাহির হইয়া আসিল। হাটের সওদা পরশমণির ঘরের বারান্দায় ঝুড়ি-চাঙ্গারীশুদ্ধ নামাইয়া রাখিয়া মাছ রান্নাঘরের সামনে ফেলিয়া—'ঠাকরুণ, মাছ রইল, বেরালে না খায়' বলিয়া কৃষাণেরা বাহিরের ঘরে গেল। ঘাটের জলে হাত-পা ধুইয়া লেপা-মোছা, ফিট-ফাট হইয়া ফিরিয়া আসিয়া আঙিনায় মাদুর বিছাইয়া তামাক খাইতে বসিল।

মেজ-বৌ মাছ কুটিতে বসিল, বলিল, 'ঠাকুর-পো আসবে না, সরলাও খায় কি না দেখ আজ।'

'তোরও খাওয়া উচিত নয়, মেজ-ঠাকুরপোও আজ আসবে না।'

মেজ-বৌ হাসিয়া বলিল, 'বরং উল্টো, তোমার নিজের কথা বল না।'

বিশাল ও কৃষাণদের খাওয়া হইলে মেজ-বৌ সরলাকে ডাকিতে গেল, বড়-বৌ হেসেল গুছাইতে লাগিল। বৈধব্যের পর পরশমণি বড় বৌয়ের ছোঁয়া খান না, বলেন, 'ওর জাত নেই, ওর ছোঁয়া খেয়ে কি পরকাল হারাব?'—বড়-বৌ পরশমণির রান্নাঘরের দিকেও যাইতে সাহস করে না। মেজ-বৌয়ের হাতেও খান না, কোলে কচি ছেলে-মেয়ে, কাপড়-চোপড় ছাড়ে না পেত্নীরা!—তিন ছেলে দুই মেয়ে কোলে তিনি একা সংসারের কাজ করিয়া শাশুড়ীকে শুদ্ধাচারে রাঁধিয়া খাওয়াইয়াছেন। এরা কি তাই? সাতবার কাচিয়া বিছানায় গিয়া বসিতেছে, আবার সেই কাপড়ে সব ছুঁইয়া একাকার করিতেছে। সরলার কোন বালাই নাই। তাহার হাতেই আজকাল সকালের রান্না ও বিকালের জলযোগ চলে। কিন্তু, আজ সরলা উঠিবে কি না, সে বিষয় বড়-বৌ সন্দিহান।

একটু পরে মেজ-বৌ ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'না সে খাবে না।'

'হাত ধরে তুলে আনতে পারলি না? রাত-উপোষী থাকবে ছেলে-মানুষ?'

'ছেলেমানুষ নও, কি বুঝেছে সে-ই জানে, ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলছে—কত সাধলুম, কিছুতে না—বললে, বেশী কথা কইলে মাথা ধরা বাড়বে।'

অগত্যা দুইজনে রান্নাঘরের কাজ সারিয়া লইল।

পরশমণি নিজের ঘরে ছটফট্ করিতেছেন, রাত্রি অনেক হইয়াছে, তবু চোখে ঘুম আসে না। সরলার কাছে গিয়া খানিক কথাবার্ত্তা বলিয়া আসিয়া একবার বাইরের ঘাটের ধারে দাঁড়াইয়া কোন মতে সময় কাটাইতেছেন, তবু সুখেনের দেখা নাই। বাঁশঝাড়ের কাছে বধূদিগের ঘাটে দাঁড়াইয়া মিস্ত্রী-বাড়ীর লোককে ডাকাডাকি করিয়া খবরটা একবার নিজ কাণে শুনিয়া লইলেন; সেখান হইতে বিশালের ঘরের পিছন দিয়া চলিলেন, পূর্ব্বদিকে যে দুই তিন ঘর মুসলমান কৃষাণের বাস, তাহারা এতক্ষণে হাট হইতে ফিরিল, তাহাদের কাছে সুখেনের কথাটা জানিয়া লইলেন, মীরপুরের পথ দিয়া যে সেই ছোটবিবির বাপের বাড়ীর পথ। মীরপুরের পরে দুই মাইলও নয়, এ খবটা পরশমণির অজানা নয়।

পূর্ব্ব দিকেও একটা ঘাট আছে। বর্ষায় চারিদিকেই ঘাট তবে এ ঘাটে পরশমণির আধিপত্য। বৌয়েরা বড় এ ঘাটে আসে না। সেই ঘাটের দিকে যাইতে যাইতে বিশালের ঘরের মধ্যে সহসা হাসির শব্দ শুনিয়া পরশমণি একেবারে চমকিয়া উঠিয়া সুখেনের কথা সব ভুলিয়া ঘরের গা ঘেঁসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু, আর কোন হাসি ও কথার শব্দ শুনিতে পাইলেন না—ঘর নিস্তব্ধ। পরশমণি পা টিপিয়া টিপিয়া সরিয়া গেলেন।

[১৬]

'নিবুক নিবুক দীপ!—আমার বাতিটি আহা!—
থাক্ চলি দুখ দুলাইয়া—
জ্বলিবে না আশা সব জীবনের এই তীরে—
অন্ত তীরে পূরাব মানস।'

ছোট খড়ের বাড়ীটির জীর্ণ দশা। ঘরের সামনে পঞ্চমীর মা বসিয়া মালা জপ করিতেছেন, পঞ্চমী ঘরের ভিতর বাতির কাছে একখানা বই পড়িতেছে।

বাড়ীটি নিঃশব্দ। শুধু একটা বড় কালো রংয়ের কুকুর উঠানে কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া রহিয়াছে।

মালা জপ সারিয়া প্রণাম করিয়া পঞ্চমীর মা উঠিতেছেন—একখানা নৌকা সামনের ঘাটে লাগিল, জন-তিনেক লোক নামিয়া পড়িলে নৌকাখানা আবার চলিয়া গেল, এ পাড়ার গ্রামেরই নৌকা, গ্রামের অনেক লোক একসঙ্গে হাটে যায়, ফিরতি-পথে সকলকে নামাইয়া দিয়া নৌকাওয়ালা শেষে নিজের বাড়ী যায়।

লোক তিনটি উঠিয়া ঘরের সামনে আসিল, একজন একটা পুঁটলি নামাইয়া রাখিয়া বলিল, 'খুড়ীমা, যা যা বলেছ, সবই এনেছি, বুদ্ধি করে আরও কিছু বেশী এনেছি—আর তোমার জামাইটিকেও এনেছি আজ, এই নাও।' বলিয়া সুখেনকে ফেলিয়া দুইজন ঘরের পাশের পথ ধরিয়া নিজেদের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। এরা পঞ্চমীর জ্ঞাতিভাই, সংসারের যা কিছু দরকার, ইহারাই করিয়া দেয়।

পঞ্চমীর মা চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন, সুখেন অবনত হইয়া প্রণাম করিল, বারান্দায় অন্ধকার, কেহ কাহারও মুখ দেখিতে পাইল না—ইহাই রক্ষা। শুধু চতুর্থীর চাঁদের অনুজ্জ্বল আলো সাক্ষী।

একটু পরে পঞ্চমীর মা অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, 'ঘরে গিয়ে বস, আমি আসি।'

পঞ্চমীর মা ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আবার বলিলেন, 'যাও ঘরে যাও।'

পঞ্চমীর মা নামিয়া পিছনের দিকে সরিকদের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেলেন।

সুখেন বারান্দায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, শেষে দ্বিধা-জড়িত ভাবে ঘরে গিয়া ঢুকিল। পঞ্চমী সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া জানালার উপর হাত রাখিয়া দরজার দিকে চাহিয়া ছিল—যেন অপেক্ষা করিতেছে।

অপরাধী তস্করের মত মাথা নীচু করিয়া সুখেন বিছানায় বসিল, পঞ্চমী কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

চার মাস—চার মাস পরে দেখা, পঞ্চমীর মুখ সুখেন কি ভুলিয়াই গিয়াছিল? সেই কাল দুটি চোখ, টানা দুটি ভ্রূ, কপালের কিনারা ঘেঁষিয়া ঘন কাল চুলের তরঙ্গ, মুখের রংএ যেন গোলাপ ফুটিয়াছে, সবই নূতন, অপরূপ মোহমাখা, সুখেন কেমন করিয়া ভুলিয়া গিয়াছিল? এই মুখ কি সরলার মৃত মুখকে আড়াল করিয়া যখন তখন সুখেনের মনে

চুকি দেয় না? সরলার চোখের পাতা কি এমনই স্থির? এমন শান্ত চাহনি তার? হায় রে, মেঘে আর বিদ্যুতে—

পঞ্চমী কাছে আসিয়া বসিল, মৃদু-স্বরে বলিল, 'দিদিরা ভাল আছেন? মা, বটঠাকুররা—মণি, বেলি?'

সুখেন মুখ তুলিতেই দু'জনের চোখে চোখে মিলিল, সহসা সুখেন হাত বাড়াইয়া পঞ্চমীকে কাছে টানিয়া আনিয়া তাহার কাঁধে মুখ গুঁজিল।

পঞ্চমীর চোখে জল আসিয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ চোখ মুছিয়া সুখেনের কোলের উপর হাত রাখিয়া বলিল, 'তুমি—তুমি অমন করে রয়েছ কেন? মুখ তোল কথা কও—তোমার কি দোষ?'

সুখেন সোজা হইয়া বসিল। পঞ্চমীর মুখের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতে ভাবিতে ধীরে ধীরে বলিল, 'কি জানি পঞ্চমী কি করে ফেললাম। এখনও আমি ভাল করে বুঝতে পারিনে কি করেছি—আমি করিনি পঞ্চমী, কে যেন আমায় দিয়ে করিয়ে নিলে। রাত্রে আমি চমকে চমকে চাই, মনে হয় তুমি কাছেই রয়েছ, চেয়ে দেখে ভুল ভেঙে যায়। দিন কাটবে কি করে পঞ্চমী? আমার দিনরাত্রি সব সমান হয়ে গেছে—'

'না গো না, কেন তুমি অমন কথা বলছ? আমার জন্যে তুমি মনে দুঃখ করো না। আমি জানি, তোমার দোষ নেই, মা তোমায় দিয়ে করিয়েছেন। তা হোক—তুমি যে আমায় মনে রেখেছ, এই আমার ঢের। আমি ভেবেছিলাম আমায় তুমি একেবারেই ভুলে গেছ—তা যাওনি—আমার কোন কষ্ট নেই আর।"

'যাবে তুমি? আমার সঙ্গে যাবে পঞ্চমী? আমি বলবার মুখ রাখিনি।'

এক মুহূর্ত পঞ্চমী ভাবিল, শেষে একটা নিশ্বাস চাপিয়া বলিল, 'থাকগে এখন না গেলাম। মা বড় রেগে আছেন, যেতে দেবেন না, দিদিদের বড় দেখতে ইচ্ছে হয়।'

'আমি নিয়ে আসব তাঁদের একদিন?'

'না, তা এনো না, তোমার মা রাগ করবেন—মা ত আমায় দেখতে পারেন নি কোনদিন। তবে, তুমি যদি মধ্যে মধ্যে আস—'

'আসব পঞ্চমী—আমি রোজই আসতে চেয়েছি—কিন্তু তোমার মায়ের সামনে পড়তে হবে—এই লজ্জায় আসি নি।'

'মার কথায় তুমি কিছু মনে করো না।' পঞ্চমী সুখেনের হাত চাপিয়া ধরিয়া ব্যাকুল ভাবে চাহিল।

'তুমি কি পাগল? তিনি যে আমার সঙ্গে কথা কয়েছেন, এই যথেষ্ট।'—বাহির হইতে ডাক আসিল, 'পঞ্চু!'

পঞ্চমী উঠিয়া গেল।

জামাইয়ের যোগ্য আদর-সমাদর কিছুই হইল না, কিন্তু সুখেনের মন সেদিকে নাই; সরলার ছাওয়ায় যে কাঠিন্য অনতিক্রম্যতায় তার মনকে নিরন্তর কড়া করিয়া রাখে, পঞ্চমীর সংস্পর্শে যেন তুষার গলিয়া জলধারা বহিয়া যাইতেছে।

সকালবেলা সুখেন বলিল, 'আমি আজকার দিনটা এখানেই থাকি।'

পঞ্চমী ভয় পাইয়া বলিল, 'তা হলে সরলা অনর্থ করবে—সব জেনে যাবে সবাই। সরলার কথা যা বললে তুমি—সে কিছুতেই তোমায় মাপ করবে না।'

'না করলে ত' বয়ে গেল, আমি যদি এখুনি তোমায় নিয়ে যাই!'

'তা তুমি পার—কিন্তু কি দরকার? মার কাছেই থাকি'—পঞ্চমী সংগোপনে চোখ মুছিল। বলিল, 'সরলা আমায় নেবে না—তা ছাড়া দাবী এখন তারই ষোল আনা, অনর্থক ঝগড়াঝাঁটিতে তোমারি অশান্তি বাড়বে শুধু—তার চেয়ে তুমি দু'একবার এসে আমায় দেখে যেও।'

পঞ্চমীকে আলিঙ্গনে বাঁধিয়া কয়েক মুহূর্ত স্থিরভাবে নীরবে থাকিয়া সুখেন যেন অন্তরের মধ্যে বল সঞ্চয় করিয়া লইল। তারপরে বিদায় লইয়া ঘরের বাহির হইয়া নৌকায় উঠিয়া বসিল।

যাহাদের নৌকায় গত রাত্রিতে আসিয়াছে, এ তাহাদেরই নৌকা, তেমনই লোকজনে ভরা—কাজে বাহির হইতেছে। আরোহীরা মনের স্ফূর্তিতে কেহ গান গাহিতেছে। গন্তব্য পথ বহুদূর বলিয়া কেহ কেহ তাস বাহির করিয়া খেলিতে বসিল। হাসি, গল্প, তর্ক, বাদানুবাদ ইত্যাদিতে নৌকা মুখর—সুখেন এককোণে জলের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। গত রাত্রির সুখ-স্মৃতিতে মন তাহার পরিপূর্ণ। শাশুড়ী আর একবারও দেখা দেন নাই, পাশের বাড়ীর মেয়েরা, যাহাদের সঙ্গে একদিন শ্যালী-সম্পর্কে কত মধুর হাস্যালাপে

সময় কাটাইয়াছে, তাহারাই গম্ভীরমুখে আসিয়া খাওয়াইয়া গেল।

কিন্তু, সুখেনের মনে অন্য কোন কথার স্থান নাই, শুধু পঞ্চমীর কথা, পঞ্চমীর চাহনী, পলকে পলকে যেন সে পঞ্চমীকে চোখে চোখে দেখিতে লাগিল। উজ্জ্বল রৌদ্রে চারিদিক্ ভরা—তাহারই মধ্যে অলস উদাস বাতাসে সুখেন স্বপ্ন দেখিতে লাগিল পঞ্চমীকে। পঞ্চমী এখন কি করিতেছে? স্নানে গেল বোধ হয়, স্নান করিয়া আসিয়া সেই জামদানী শাড়ী পরিবে, চুল পিঠে এলাইয়া দিবে, মাথায় ত কাপড় দিবে না, তারপরে যত্ন করিয়া সুখেনের কল্যাণের জন্য সীঁথিতে সিন্দুর পরিবে। মুখখানা দেখাইবে যেন শিশিরধৌত সাদা গোলাপ, পান সে খুব ভালবাসে, স্নান করিয়া পান খাওয়া অভ্যাস, তাহারই জন্য বিশাল আরও তিনটি পানের চারা নিজেদের কুয়ার ধারে বসাইয়া ছিল। আনমনে সুখেন একবার পকেটে হাত দিল, পঞ্চমীর পানে ভরা কৌটাটা হাতে বাজিল। একদিন সুখেন কৌতুক করিয়া পঞ্চমীর সাজা পান খায় নাই, পঞ্চমী অমনই রাগিয়া নিজের মুখের পান ফেলিয়া দিয়াছে। তার পর সুখেনের সে কি সাধাসাধি। পঞ্চমীও পান খাইবে না, সুখেনও ছাড়িবে না – শেষে গাল দুটি টিপিয়া ধরিয়া জোর করিয়া সুখেন তাহার মুখে পান দিয়াছে, তখন পরাজিতা পঞ্চমীর সে কি হাসি! জলতরঙ্গের বাজনার মত সে সুর সুখেনের কানে এখনও বাজিয়া আছে। হঠাৎ সুখেনের মনে পড়িল, গত রাত্রে পঞ্চমী একবারও তেমন করিয়া হাসে নাই—দু'একবার একটু হাসিয়াছে, সে এত সামান্য যে, চোখে পড়ে না—কেন সে হাসিবে, তাহার হাসি যে চিরদিনের জন্যই দস্যুর মত সুখেন লুটিয়া লইয়াছে। [ক্রমশঃ

বর্ষশেষের বন

—শ্রীগোপাললাল দে

এসেছি আবার পাতা ঝরাবার দিনে,
নব মঞ্জরী-পল্লব-পথ চিনে!
যত রূপ রস গন্ধ পরশ,
নব-জীবনের বেদনা হরষ
শত ঝঙ্কারে ভরেছে কানন-বীণে;
ধূলিতে ধূসর উন্মনা ধরণীরে
কচি কিসলয় চকিতে লইল জিনে।

ওগো ভালবাসি বরষ-শেষের বন,
বড় ভাল লাগে ভ্রমর গুঞ্জরণ,
কুহু কুহু ডাকা অশথের ছায়,
কুক্ কুক্ কুক্ বেণু-বীথিকায়,
নীরব দুপুরে ঘুঘুদের নিক্কণ;
বিরল-সলিল সরসীতে মরালীরা
নিভৃত কুলায়ে কপোতের গুঞ্জন।

শীতল-সলিলে আকণ্ঠ অবগাহ,
ধুয়ে মুছে নেওয়া তপ্ত দিনের দাহ,
চলিতে দগ্ধপথে, কিনারায়;
ক্ষণিক বিরাম বটতরুছায়,
ভূতল শয়নে যত ভালবাসা চাহ;
দীর্ঘ প্রহরে ঘুমঘোরে অচেতন,
শীতল-সলিলে আকণ্ঠ অবগাহ।

সাঁঝে জোছনায় চন্দন-চূয়া জিনে,
মন প্রাণ মোহে বায়ু বহি দক্ষিণে;
অতি দূরাগত বাঁশরীর স্বর,
মায়াজাল রচে কল্পনা পর,
কথা কওয়া-কহি আকাশের তারা চিনে,
কত দূর হতে কতদিন পরে ওগো,
আবার এসেছি পাতা ঝরাবার দিনে!

নদীয়ার কথা

—শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য্য

রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস

নদীয়ার রাষ্ট্রীয় ইতিহাস সঙ্কলন করিতে গেলে সাধারণ ভাবে বাংলার রাষ্ট্রীয় ইতিহাসেরই পুনরুক্তি করিতে হয়। বাংলার ইতিহাসের বহু অতীত গৌরব-কীর্ত্তি ও লজ্জাকর কলঙ্ক-কাহিনীর নীরব সাক্ষ্য নদীয়ার জলে-স্থলে ওত-প্রোত ভাবে মিশিয়া আছে। এইখানেই পঞ্চগৌড়ের শেষ স্বাধীন হিন্দু নৃপতি লক্ষ্মণসেনের হস্ত হইতে বাংলার শাসনদণ্ড মুসলমানদিগের হস্তে বিনাযুদ্ধে স্খলিত হইয়া পড়ে। নদীয়ার প্রান্তরেই বাংলার শেষ স্বাধীন মুসলমান নবাব সিরাজদ্দৌলার শিথিল মুষ্টি হইতে নবাগত ইংরাজ বণিক্-সম্প্রদায় কয়েকঘণ্টামাত্র যুদ্ধের ফলে তাহা কাড়িয়া নেন। এই ভাবে নদীয়ার রঙ্গমঞ্চেই বার বার বাংলার রাষ্ট্রনৈতিক ভাগ্যবিপর্য্যয়ের প্রহসন অভিনীত হইয়া আসিতেছে।

বৌদ্ধ-যুগ

খৃঃ দশম ও একাদশ শতকে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পাল রাজ-বংশ যে সময়ে গৌড়ের সিংহাসনে রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে এই নদীয়া ভূখণ্ডের রাষ্ট্রীয় অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কিন্তু, ইহা যে তৎকালে পালরাজা-দের অধিকারভুক্ত থাকিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম-প্লাবনে উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিল, নদীয়ার বিবিধ সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানগত বৌদ্ধপ্রভাব দেখিয়া আমরা ইহা অনুমান করিতে পারি।

বর্ত্তমান নবদ্বীপের সন্নিকটস্থ সুবর্ণবিহার গ্রামে উক্ত রাজন্যবর্গের এক সুবৃহৎ প্রাসাদ ছিল বলিয়া জনশ্রুতি আছে। আজিও সেই জঙ্গলাকীর্ণ পল্লীর বুকে সুপ্রাচীন প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকন্তু বৌদ্ধ মঠের অর্থবোধক বিহার শব্দ এই পল্লীর নামের সহিত যুক্ত থাকিয়া উক্ত মতেরই সমর্থন করিতেছে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে সন্ধ্যাকর নন্দী কৃত রামচরিত নামে যে একখানি অতি প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে রাজা রাম-পালের সহিত উত্তর-বঙ্গের কৈবর্ত্তরাজ ভীমের এক বিরাট যুদ্ধের বর্ণনা আছে। ঐ যুদ্ধে রামপাল জয়লাভ করেন এবং তাহাতে বালবলভীর অন্তর্গত দেবগ্রামের বিক্রমরাজ রামপালের মিত্ররাজরূপে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে বাগড়ীর পূর্ব্ব নাম বালবলভী * এবং এই বাগড়ী দেবগ্রামই যে পলাশীর নিকটবর্ত্তী নদীয়ার দেবগ্রাম পল্লী, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঐ পল্লীর সন্নিকটে একটি জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে ইতস্ততো-বিক্ষিপ্ত কয়েকটি প্রাসাদস্তূপ আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে, দেখা যায়।

পরবর্ত্তী কালে এই দেবগ্রামেই ভাগ্যবিড়ম্বিত মহারাজ দেবপালের মর্ম্মন্তুদ শোচনীয় অবসান ঘটে, যথাসময়ে তাহার উল্লেখ করিব।

হিন্দু-যুগ

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালরাজদিগের রাজত্বকালেই সেন-বংশীয় হিন্দু নরপতিগণের অভ্যুদয় ঘটে। দশম শতকের শেষভাগে কর্ণাট হইতে সামন্তসেন নামে একজন ক্ষত্রিয় রাজা শেষ-বয়সে গঙ্গাতীরে বসবাস করিবার উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশে আগমন করিয়া ভাগীরথী-উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করেন। †

দেবপাড়ার শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, এই সামন্তসেনের পৌত্র বিজয়সেন গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করিয়া গৌড়ের সিংহাসন কাড়িয়া লন। ‡ সুতরাং বিজয়-সেনই সেনরাজ-বংশের প্রথম স্বাধীন নৃপতি।

বাংলার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের ধুরন্ধর নরপতি বল্লালসেন এই বীরকেশরী বিজয়সেনের পুত্র।

---

* *Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, vol. III. p. 14.*

† কর্ণাটক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ।

‡ *Epigraphia Indica, Vol. I, p. 309.*

বঙ্গদেশ হইতে এই সময়ে বৌদ্ধ-রাজন্যবর্গের ও বৌদ্ধধর্ম্মের আমূল উচ্ছেদ-সাধন হইলে পর বল্লালসেন তৎকালীন শিথিল সমাজে ব্রাহ্মণ্য-শাসন সুদৃঢ় করিবার নিমিত্ত কঠোর কৌলীন্য-প্রথার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে বাংলার সামাজিক জীবনে এই জাতিগত কৌলীন্যপ্রথা যে কতখানি বিপ্লব আনয়ন করিয়াছিল, তাহা কাহারও অজ্ঞাত নাই।

বৃদ্ধ বয়সে তীর্থস্থানে বসবাস করিবার নিমিত্ত বল্লালসেন গঙ্গাতীরস্থ নবদ্বীপে এক বিরাট রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। কুলজী গ্রন্থে উল্লেখ আছে—

মুক্তি হেতু বল্লাল আসিল সেই স্থান।
জহ্নু-সাগরোত্তরে করে যে বাসস্থান॥

মহাপ্রভুর সম-সাময়িককালেও এই প্রাসাদ অর্দ্ধ-ভগ্ন অবস্থায় দৃষ্টি-গোচর হইত বলিয়া কড়চা-লেখক গোবিন্দদাস উল্লেখ করিয়াছেন।

বল্লাল রাজার বাটী তাহার নিকটে।
ভাঙ্গাচুরা প্রমাণ আছয়ে তার বটে॥
প্রকাণ্ড এক দীঘি হয় তাহার নিয়ড়।
কেহ কেহ বলে যারে বল্লাল-সাগর॥

সেনরাজদিগের এই বিরাট রাজপুরী ও দীঘির ধ্বংসস্তূপ আজিও বল্লাল-ঢিবি ও বল্লাল-দীঘি নামে অভিহিত হইয়া বাংলার অতীত ইতিহাসের একটি করুণ অধ্যায়ের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এখানেই একদিন স্বাধীন হিন্দু সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়, এইখানেই তাহার অবসান। সমাজপতি মহারাজ বল্লালসেন ও তদীয় পুত্র বীরকুলচূড়ামণি মহারাজ-চক্রবর্ত্তী লক্ষ্মণসেনের লীলাভূমি আজ এই কন্টকগুল্মবহুল বিরাট স্তূপের গর্ভে সাতশতাধিক বৎসরের পূর্ব্বেকার বাংলার স্মৃতি বক্ষে-ধারণ করিয়া ঘুমাইয়া আছে।

কিছুকাল পূর্ব্বে মোল্লাসাহেব নামে জনৈক ব্যক্তি এই ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে কয়েকখানি কাঠের বারকোশ এবং জরাজীর্ণ ছিন্ন শাল, রেশমী পোষাকের ছিন্নাংশ ও কয়েকটি রৌপ্যমুদ্রা-সম্বলিত একটি বল্মীকদষ্ট ভগ্ন কাঠের সিন্দুক আবিষ্কার করেন।*

এই ঢিবি যদি কোনও দিন ভাল করিয়া খনন করা হয়, সেইদিন হয়ত আমরা আমাদের অনেকগুলি ঐতিহাসিক প্রাচীন তথ্যের শুদ্ধ পাঠ মিলাইয়া লইতে পারিব।

কাহারও মতে নবদ্বীপের প্রাসাদ বল্লালসেন নির্ম্মাণ করান নাই। লক্ষ্মণসেন উহা নির্ম্মাণ করাইয়া পিতৃনামে উৎসর্গ করেন† এবং তদবধি ইহা বল্লাল-বাটী নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। বিশ্বকোষেও এই ঢিবিকে 'পিতৃনামে উৎসর্গীকৃত লক্ষ্মণসেনের অট্টালিকা' বলিয়া জনপ্রবাদের উল্লেখ করা হইয়াছে দেখিতে পাই। এই লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে বাংলার বিজয়পতাকা কামরূপ হইতে সুদূর গুজরাট পর্য্যন্ত সগর্ব্বে উড্ডীন হইয়া উক্ত দিগ্বিজয়ী সম্রাটের অতুল শৌর্য্যের পরিচয় দিয়াছে। এই সময়ে সেনরাজবংশের চরম উন্নতির কাল। জ্ঞানে, শিল্পে, সংস্কৃতিতে রাজানুগ্রহপুষ্ট নদীয়া বৃহত্তর বঙ্গের তখন আদর্শস্থল, নবদ্বীপের আকাশে বাতাসে তখন জয়দেব কবির কোমলকান্ত পদাবলী ভাবী কালের ভাববিগ্রহ মূর্ত্তি আঁকিবার সূচনা করিয়াছে।

আবার বিধাতার বিড়ম্বনায় এই পরম গৌরবময় যুগেই নদীয়ার ইতিহাস চরম কলঙ্ক-কালিমায় কলুষিত।

প্রাচীন ঐতিহাসিক মিনহাজের বর্ণনানুযায়ী এইখান হইতেই মহারাজ লক্ষ্মণসেন অশীতি বর্ষ বয়সে সতেরজন মাত্র অশ্বারোহীর ভয়ে জরাজীর্ণ জীবন বাঁচাইবার লালসায় মুখের অন্নগ্রাস ফেলিয়া প্রাসাদের খিড়কী-পথে এতই দ্রুত পলায়ন করিয়াছিলেন যে, পাদুকা পরিয়া যাইবার ফুরসুৎও তিনি পান নাই।

আপাতদৃষ্টিতে বাংলার ইতিহাসে এত বড় কলঙ্ক-কাহিনী আর নাই বলিলেও চলে। পরবর্ত্তী কালের বহু বিদেশী ও স্বদেশী লেখকবৃন্দ মিনহাজের এই সরস বর্ণনাটুকুর উপরে কল্পনার রং ফলাইয়া দিগ্বিজয়ী মহারাজ-চক্রবর্ত্তীর গৌরবময় মুখমণ্ডলে এতই কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিয়াছেন যে, তাহাতে প্রাচীন ইতিহাসের অনেকগুলি পত্র মসীময় হইয়া গিয়াছে।

তাম্রপটের লিখনানুযায়ী যে লক্ষ্মণ সেন শরণাগতের পক্ষে বজ্রপঞ্জর-স্বরূপ ছিলেন; অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ, কাশী-কামরূপে যাঁহার বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল, সেই 'বহু যুদ্ধের নায়ক, অশ্বপতি, গজপতি, নরপতি, রাজ-ত্রয়াধিপতি, বিবিধবিদ্যাবিচারবৃহস্পতি, —সোমবংশপ্রদীপ, পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ' লক্ষ্মণ সেন কি সত্য সত্যই মাত্র সতের জন অশ্বারোহীর ভয়ে আপনার দুর্লভ প্রাণ বাঁচাইবার নিমিত্ত এমন হীন ভাবে পলায়ন করিয়াছিলেন? ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মিনহাজ-প্রদত্ত এই বর্ণনা আদৌ বিশ্বাস না করিয়া

* On the other side of the river, there is a large mount still called after Ballal Sen. It was recently dug by one Mullah Shahib, who discovered some Barkoshes or wooden trays and a box containing remnants of shawls and silken dresses and also some silver coins.

—*Hunter Statistical Account of Bengal, Vol. II, p. 140.*

† According to local legends—it (Navadwip) is founded in 1063 by Lakshman Sen—son of Ballal Sen.

—*Hunter's Imperial Gazetteer of India, Vol. VII.*

নবদ্বীপে সেনরাজবংশের বাসস্থান সম্বন্ধেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু, ঘটনা সর্ব্বৈব অমূলক বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। নবদ্বীপের অদূরবর্ত্তী প্রান্তরে সেনরাজবাটীর ভগ্নাবশেষ আজিও অতীতের নীরব সাক্ষ্য হইয়া আছে এবং শান্তিপুরের সন্নিকটে যেখানে বক্তিয়ার মহম্মদ সদল-বলে গঙ্গা পার হইয়াছিলেন, আজিও তাহা 'বক্তিয়ারের ঘাট' নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

কিন্তু, মূল ঘটনা মিথ্যা না হইলেও অন্যান্য সমগ্র ঘটনা-পরম্পরা ধীর ভাবে আলোচনা করিলে লক্ষ্মণসেনের এই পলায়নে তাঁহার কাপুরুষোচিত ভীরুতা অপেক্ষা তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক বুদ্ধিরই পরিচয় পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। সমুদয় ঘটনা বিশদ ভাবে আলোচনা করিবার স্থান এখানে নাই। সংক্ষেপে ইহাই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, সুচতুর মুসলমান সেনাপতি বক্তিয়ার মহম্মদ তাঁহার বিপুল বাহিনী বনান্তরালে সংগুপ্ত রাখিয়া সামান্য অশ্ব-বিক্রেতার ছদ্মবেশে সতেরটি মাত্র অনুচর-সহ যে ভাবে নগরে প্রবেশ করেন, * গৌড়-বিজয়-অভিযান তাহা মোটেই নহে।

নবদ্বীপ সেনরাজাদের মূল রাজধানী না হইলেও, বৃদ্ধ মহারাজ তথায় শেষ বয়সে তীর্থাশ্রম বাস করিতেন; সৈন্য-সমাবেশ সেখানে বেশী থাকিবার কথা নহে। সেখান হইতে ছলে কৌশলে বৃদ্ধ মহারাজকে অতর্কিতে ধরিয়া ফেলিতে পারিলে ভবিষ্যতে মুক্তিপণস্বরূপ প্রচুর অর্থ-লাভের, এমন কি, কালে গৌড়ের সিংহাসন-লাভেরও সম্ভাবনা আছে মনে করিয়া সম্ভবতঃ বক্তিয়ার ও অনুচরবৃন্দ বিনীত রাজদর্শনেচ্ছু-রূপে প্রাসাদে উপস্থিত হইয়াছিলেন।†

বিদেশী ব্যবসায়ী রাজদ্বারে সম্মান-প্রদর্শনার্থ উপস্থিত হইয়াছেন; পুররক্ষিগণ ইহাতে সন্দেহের কিছু পাইলেন না। বক্তিয়ার নির্ব্বিবাদে পুরী-প্রাকার অতিক্রমপূর্ব্বক মূল প্রাসাদে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ‡

এই ভাবে প্রাসাদ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াই বিনীত বিদেশীর ছদ্মবেশ খুলিয়া গেল—মুহূর্ত্তমধ্যে নিজ মূর্ত্তি ধরিয়া তখন তিনি রাজভৃত্যদের নিহত করিতে লাগিলেন। *

রাজা সে সময়ে আহারে বসিয়াছিলেন। অকস্মাৎ রাজপুরীর ভিতরে এই অতর্কিত দুর্ঘটনা। শত্রু দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছে, তাহার সেনাবাহিনীর শক্তি-সামর্থ্যও নির্ণয়ের উপায় নাই। এই সময়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কালবিলম্ব করিলেই তাহার হস্তে ধৃত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই এবং তাহা হইলে ভবিষ্যতের আশা-ভরসা সমস্তই যে জলাঞ্জলি দিতে হইবে, বিচক্ষণ মহারাজের তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। মুহূর্ত্তমধ্যে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লক্ষ্মণসেন প্রাসাদের গোপন সুড়ঙ্গ-পথে পলায়ন করিয়া তাঁহার পূর্ব্ববঙ্গের সুরক্ষিত রাজধানী সুবর্ণপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সুচতুর লক্ষ্মণসেনের এই উপস্থিত বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় নবদ্বীপের রাজপুরীমাত্র বক্তিয়ারের করতলগত হইলেও বিরাট গৌড় সাম্রাজ্যের আর কোথাও তিনি দন্তস্ফুট করিতে পারেন নাই। নদীয়া-বিজয়ের প্রায় শতাধিক বৎসর পরে মুসলমান কর্ত্তৃক গৌড়-বিজয় সম্ভব হয়। লক্ষ্মণসেনের ইহা কলঙ্কময় পলায়ন-কাহিনী না দূরদৃষ্টিসম্ভূত তীক্ষ্ণ বিচক্ষণতা, তাহা পাঠকবর্গ বিচার করিবেন।

যাহা হউক, এই ভাবে ১২০৩ খৃঃ মহারাজ লক্ষ্মণ সেন নদীয়া হইতে পলায়ন করিলে পর বক্তিয়ার মহম্মদ নবদ্বীপ অবরোধ করেন। কিন্তু, এই অবরোধ অর্থে সাময়িক লুটতরাজ মাত্র। মহারাজকে অতর্কিতে বন্দী করিবার মতলব ফাঁসিয়া যাওয়ায় বঙ্গবিজয়ের আশা ত তাহাদের বিলীন হইয়া গেলই, উপরন্তু নদীয়াতেও তাহারা সামান্য লুটপাট ভিন্ন স্থায়ী ভাবে রাজ্য স্থাপনা করিতে পারিল না।

* They concealed the troops in a wood and accompanied by only 17 horsemen entered the city—*Stewart.*

† He did not molest any man but went peaceably and without ostentation, so that no one could suspect who he was; people would think that he was a merchant, who had brought horses for sale.

—*Stanley Lane Poole's Mediaeval India, p. 10.*

‡ On passing guards he informed them that he was an envoy, going to pay his respects to their master *Tabakat-i—Nasiri.*

* He and his party drew their swords and commenced a slaughter of the royal attendants—*Stewart.*

† The expedition of Nadia is only an inroad, a dash for securing booty natural to these Turkish tribes. The troopers looted the city with the palace, and went away. They did not take possession of that part and if they tried they would have most likely failed, as their base in Behar was too far off and too recent to be of much avail.

—*Disputed or doubtful Events in the History.*

জীবন-চিত্র

—শ্রীবিজনবালা দেবী

প্রাতরাশ

বিশ্বকর্ম্মা শীতের সময় কখনও কখনও কবিরাজী ঔষধ খান।

সন্ধ্যাবেলা সুরুচি ঔষধ দিতেছেন। ইতিমধ্যে বিশ্বকর্ম্মার দিদি ডাকিলেন। খল রাখিয়া সুরুচি শুনিতে গেলেন।

বাহিরে দু'একজন করিয়া মজলিস জমাইতে আসিতেছেন। বিশ্বকর্ম্মার ত্বরা। বড়িটি পেষণ করা হইয়াছে। মধু ঢালিয়া নিজেই তৈরি করিয়া মুখে সমস্ত ঔষধ ঢালিয়া দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ফেলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'ছি ছি, এ কি? রাম রাম! ওগো, করেছ কি?'

সাড়া-শব্দে সকলে চকিত হইয়া আসিয়া পড়িল। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'এ মধু নয়—ছি, গেছি একেবারে। কি কাণ্ড তোমাদের?'

'এ যে লক্ষ্মীবিলাস তেল! এই দিয়ে ঔষধ খেলে? মধুর শিশি এই তো বারান্দায় টেবিলে, আর এটা রয়েছে জানলার ওপর—কাছেরটা দেখতে পাও নি, দূরেরটা পেয়েছ?'

'তোমাদের জিনিষ রাখবার ছিরি, তাড়াতাড়িতে কে অত দেখতে গেছে—'

'গিলে ফেলেছ সবটা? মুখ ধুয়ে ফেলে পান খাও।'

নীহার বলিল, 'এত মানুষ থাকতে বাবুর এই দশা? আমি একটু বাজারে গেছি—আর এই অনর্থ।'

'কে জানে, তোমার বাবু তো দু'যেসে নন যে, আগে পাছে লোক চাই। তবু থাকে একটু যদি কাছে কেউ, না থাকল অমনি অনর্থ।'

'থাকবে বই কি—কেন লোক থাকবে না? সব আপনারা বাড়ী চলে যান্—বাবু একা থাকলে হুঁস হবে। এত লোক থাকতে তিনি হুঁস্ করবেন কেন?'

অহি বলিল, 'তুই-ই কাকাকে নষ্ট করলি!'

'বেশ করলুম—মা ছিলেন কোথা?'

'কি জানি বাপু, যেখানে খুসী সেখানে থাকি। তোমার সঙ্গে আর পারিনে।'

সেখান হইতে ভাঁড়ার-ঘরে গিয়া নীহার চেঁচাইয়া উঠিল, 'কই মা ছোলা? ছোলা ভিজিয়ে রাখি, সকালে আবার চেয়ে পাবেন না, আপনারা তো ভিজাবেন না?'

'দেখ সকালে কি চান—এখানেই ছোট ডেক্‌চিতে ছোলা রয়েছে। আজ খেয়েছেন বলে কি কাল খাবেন?'

যে কথা সে কাজ। সকাল বেলা বিশ্বকর্ম্মা প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া একটা নরম র‍্যাপার গায়ে জড়াইয়া বসিয়া বলিলেন, 'কি দিবি আন।'

ভিটামিন গুণযুক্ত ভিজে ছোলা, আদা, গুড়, লবণ আসিল।

'এঃ, তোদের একটু বুদ্ধি নেই রে! ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পড়েছে—এর মধ্যে এই?

'কাল বললেন, রোজ সকালে এই খাবেন।'

'রোজ মানে কি? ঠাণ্ডার দিনেও? আর যা আছে আন্—'

'চা রুটি দিই?'

'চা—? দুধ জাল হয় নি?'

'হয়েছে।'

'তবে তাই আন।'

পেয়ালার দুধে টোষ্ট-রুটি ডুবাইয়া বলিলেন, 'সকাল বেলা এটা মন্দ নয়। চা আমার সহ্য হয় না।'

কয় দিন পরে—

'এ কি রে? চা হয় নি?'

'হয়েছে, দেব?'

'আন্, আমি কি শিশু যে রোজ দুধ দিতে আরম্ভ করেছিস?'

কয়েক দিন চা-রুটি, মাখন চলিল।

তার পরে—

'নীহার!'

'কেন ?'

'না বললে তোদের চৈতন্ত হয় না। রোজ চা কি আমার সয় ? পেটটা আবার কি রকম হয়েছে। চোখ হলদে হয়ে গেছে—সরবৎ আন্।'

'দই নেইকো—আজকাল খান না বলে আর দই পাতা হয় না—'

'সে জানি। নিয়ম করে কাজ কদিন তোরা করবি ? দে যা হয়—'

সুরুচি নেবু-চিনির সরবৎ করিয়া দিলেন।

দিন-দুই কাটিল।

তৃতীয় দিনে—'হ্যাঁ রে, আমার আদা-ছোলা কই ? তাই দে—'

'ঘোলের সরবৎ ?'

'থাক্- দুপুর বেলা দিস্। এখন ছোলা দে—'

'ছোলা ভিজানো হয় নি কাল, খান্ না বলে—'

'যে দিন যেটা চাইব সে দিন সেটা কিছুতে যদি পাওয়া যাবে!—'

সুরুচি নিম্নস্বরে বলিলেন, 'অথবা যে দিন যেটা থাকবে না—সেই দিন তাই চেয়ে বসবেন।'

—'ঘোল দিই ? আজ কাল তাই তো খান -'

'হ্যাঁ, ঘোল খেতে দে—মাথায় ঢাল্। ঘোল দিয়ে দিয়ে সর্দ্দি বসিয়ে ফেলেছিস্।'

'একটু মোহনভোগ করে দিচ্ছি—'

'না-নাঃ, ও পুলটিশ আমি খাইনে!—'

'পুলিটশ কেন বললেন মা ?'

সুরুচি বলিলেন, 'এ কলেজ-বোর্ডিং-য়ে লুচির সঙ্গে দিত। সেই থেকে অরুচি, হাজার ভাল করে তৈরি করে দিলেও আর খান না।'

'তবে আজ চা-রুটিই খান।'

সপ্তাহ খানেক গেল। তারপর একদিন—

'তোরা ভেবেছিস কি ? ঘোড়ার মত রোজ দানা খাওয়াতে আরম্ভ করলি ? আমার পেলি কি ?'

নীহার বলিল, 'হায় ভগবান্, কি যে করি ভেবে বুঝিনে মা!'

অভ্যাগত

শীত পড়িয়াছে। সুরুচি ব্যবস্থা করিলেন—রুটি মাখন আলু ডিম কপিসিদ্ধ, কোন দিন চা, কোন দিন গরম জল বা দুধ।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'মন্দ নয়।'

বিশ্বকর্ম্মা সর্ব্বদা উদ্গ্রীব, উৎকর্ণ, উৎকণ্ঠিত। অহরহ তিনি বাইরে লোকের কথা শুনিতে পান এবং মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে প্রশ্ন করেন, 'কে ডাকে ? কে এল ?'

সুরুচি বলেন, 'যেই আসুক না, বাইরে আরদালীরা আছে খবর দেবে। তুমি এমন কাণ-খাড়া করে থাক কেন ?'

'না-না, ব্যাটারা খবর দেয় না, সেদিন উকীল বাবুকে দু'ব্যাটা বসিয়ে রেখেছিল।'

নীহার চুপে চুপে বলিল, 'না মা, উকীল বাবুকে বসতে দিয়ে এলাম, বাবু গোসলখানায় ছিলেন।'

হয় তো শেভ করিতে বসিয়াছেন, কি স্নানে গিয়াছেন, সেখান হইতেই—'কে রে নীহার ? বসতে বল, বল আমি এখনি আসছি,—সিগারেট দে—দিস নি বুঝি এখনও, নাঃ তোদের যন্ত্রণায় আর পারিনে। তোরা কিছুতে এটিকেট শিখবিনে।'

উদাসীন বটে, কিন্তু কি তীক্ষ্ণ লক্ষ্য। দৃষ্টি-শক্তি একটু কম (চশমাধারী), কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয় অসাধারণ তীক্ষ্ণ! খালি পায়ের শব্দটি পর্য্যন্ত এড়াইয়া যাইবার যো নাই।

নীহারও শুনিয়া শুনিয়া অনেক ইংরাজী শিখিয়া ফেলিয়াছে! যেমন 'ইটিকেট', 'ডিছিপ্লিন', 'ডিউটি' লোশনকে 'লশুন', প্রফেসারকে 'পেপাচার'।

নীহার গেছে বাজারে। বিশ্বকর্ম্মা ঢুকিয়াছেন বাথরুমে—বাহিরে ডাক শুনিয়া ঠাকুর গেল। ফিরিয়া আসিয়া সুরুচিকে বলিল, 'মা একজন লোক—'

বাথরুমে জল পড়ার শব্দ বন্ধ হইয়া গেল। ত্বরিত প্রশ্ন—'কে, কে ঠাকুর ?'

'আমি চিনিনে, আপনার সঙ্গে দেখা করবে।'

'বেশ, বসতে বল, সিগারেট দাও। বল আমি যাচ্ছি।

উল্লিখিত লোকটি বিশ্বকর্ম্মার ভূতপূর্ব্ব আরদালী। ছুটিতে গিয়াছিল। এক্ষণে দেখা করিতে আসিয়াছে।

লোকটী হিন্দু বাঙ্গালী। সাধারণ বাঙ্গালী বেশেই আসিয়াছে, অফিসের সময় ইউনিফর্ম্ম পাইবে।

ঠাকুর তাহাকে গদী-আঁটা চেয়ারে বসিবার ঘরে আনিয়া বসাইয়া বাবুর সিগারেট-কেস্ হইতে সিগারেট দিল। সে বেচারা বসিবে, না ভয়ে জড়সড়! ঠাকুরও ছাড়িবে না—বাবু তাহাকে খাইয়া ফেলিবেন! অগত্যা বাবু রাগ করিবেন জানিয়া বেচারা বসিল। লোকটি ছুটীতে যাবার পরে ঠাকুর আসিয়াছে, কাজেই চেনে না।

এ দিকে নীহারও বাজার হইতে ফিরিয়াছে। বিশ্বকর্ম্মা শীঘ্র স্নান করিয়া কেশ-বেশ সারিয়া দ্রুত বৈঠকখানায় গিয়া প্রবেশ। তারপর তিনি ফিরিলে সুরুচি হাসিয়া লুটোপুটি।

*

পাশের বাড়ীতে একজন সতীর্থ অফিসার থাকেন। ভদ্রলোক মফঃস্বল গিয়াছেন। তাঁর স্ত্রী একদিন নীহারদের ডাকিয়া শাসন করিলেন। সবাই না কি তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকে।

সুরুচি বাপের বাড়ী গিয়াছিলেন। মহিলাটির সঙ্গে বেশ কথা-কাটাকাটি হইল। ভদ্রলোক ফিরিলে স্ত্রীর কাছে শুনিয়া বিশ্বকর্ম্মাকে বলিলেন।

বিশ্বকর্ম্মা ডাক দিলেন। নীহার বলিল, 'উনি সব সময় বাইরে থাকেন। আমরা কি ঘোমটা টেনে বাড়ীর ভিতর থাকব? রাস্তার লোক সবাই তো দেখে? কাকে বলবেন?'

ভদ্রলোকদের একটা লাউগাছ হইয়াছে। দুই বাড়ীর মধ্যে একই দেওয়াল। দেওয়ালের সঙ্গে মাচা বাঁধিয়া লাউগাছটি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। নীহার নিজেদের বাড়ীর লিচু-গাছের ডাল-পালা কাটিয়া দেওয়ালের গায়ে খাড়া করিয়া দিল। লাউগাছ ডাল বহিয়া এদিকে আসিতে আরম্ভ করিল।

ইতিমধ্যে সুরুচি ফিরিয়াছেন। দেখিয়া বলিলেন, 'ছি নীহার! বুড়ো হতে চললে—তবু তোমার দুষ্টবুদ্ধি গেল না? পরের গাছে লোভ কর—দেখ তোমার নিজের কুমড়া গাছ শুকিয়ে উঠেছে।'

নীহার লক্ষ্য করিয়া দেখিল, তাহার সাধের কুমড়া গাছ, প্রতিদিন যার গোড়ায় মাছ-ধোয়া জল দেয়, শত ডালপালা মেলিয়া রান্নাঘরের চাল জুড়িয়া ফেলিয়াছিল, আর সে সজীবতা নাই। কেমন পক্ক অবস্থা ধরিয়াছে।

দেখিয়া দুই লাফে নিজের গাছের কাছে গিয়া—'তাই তো, খেয়াল করি নি তো? ছুতরি!—যত মন্দ কি আমাদের-ই হয়?'

সুরুচি কোথাও গেলে নীহার বাধাহীন স্বচ্ছন্দ ভাবে স্বেচ্ছামত বাবুর পরিচর্য্যা করে। দেশী, বিলাতী, হিন্দুস্থানী কোন রকম খাবার বাদ দেয় না। বাড়ীতে যেন নিমন্ত্রণ, এমন ভাবে নিজে বাজার করিয়া বিভিন্ন রকম জিনিস আনে। অবশ্য, পরিমাণে অল্প এবং যখন যা তৈরি করে, সব বাবুকে দেয়। আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত আম এবং বৈশাখ পর্য্যন্ত কমলা লেবু আফিসের জন্য বাঁধা। এ'ছাড়া আঙ্গুর পেস্তা, কিসমিস। সুরুচি বলেন, 'নীহার, পরিমাণ-জ্ঞান তোমার আজ পর্য্যন্ত হল না! এক এক দিন এক এক রকম দিতে হয়—নইলে ভালর চেয়ে মন্দ হয়। এই জন্যেই আমি কোথাও যাই তো এসে দেখি পেটের অসুখ। সইবে কেন?'

বিশ্বকর্ম্মা বলেন সুরুচিকে, 'তোমার জন্যে টাকা-পয়সা কিছু থাকবে না। শেষকালে ভিক্ষের ঝুলি সার হবে।'

'কি করেছি বল?'

'এই যখনই যা আনবার দরকার, অমনি বাজারে ছুটল!'

'আর যা চাইবে, তৎক্ষণাৎ না পেলে যে কুরুক্ষেত্র বাধাও?'

'টাকা-পয়সা যে যখন চাইছে অমনি দিচ্ছ!—'

'কিন্তু, চেয়ে যদি না পাও, তখন যে বল কেন খুচরো রাখ না? চেয়ে না পাওয়ার মত দুর্ভোগ আর নেই? তোমার কাছেই তো সব শিখেছি।'

বিচিত্র জগৎ

নাগাপর্ব্বত ও সারামতী

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মণিপুর রোড দিয়া নাগাপর্ব্বতে পৌছান যায়। এই রাস্তা ছ'হাজার ফিট পাহাড়ের উপর টপকে তারপর নেমে গিয়ে, ইম্ফাল সহরে মিশেছে। এই ইম্ফাল সহর আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের ষ্টেশন থেকে একশ চৌত্রিশ মাইল দূরে। এখান হইতে বর্ম্মা-সীমান্ত বেশী দূরে নয়।

নাগাপর্ব্বতে পৌছোবার আরও অনেক রাস্তা আছে। কিন্তু, সে-সব রাস্তা দুর্গম পাহাড়ের ওপর দিয়ে ঘুরে গিয়েছে। কাজেই, সভ্য মানুষের পক্ষে নিরাপদ নয়। এই রকম একটা রাস্তা দিয়ে আমি এবং আমার বন্ধু টান্‌ষ্টাল ১৯৩৫ সালের বসন্তকালের মধ্যাহ্নে যাত্রা করি। আমরা যে বিপদকে খুঁজছিলাম, তা' নয়, কারণ বিপদ্ না খুঁজলেও এ-পাহাড়ে তা' যথেষ্ট পাওয়া যায়। আমরা গেছিলাম, দুষ্প্রাপ্য গাছ-গাছড়ার সন্ধানে। আমরা জানতাম, এই সব জনবিরল দুর্গম পার্ব্বত্য অঞ্চল ছাড়া দুষ্প্রাপ্য গাছ-গাছড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, আমাদের অভিযান সাফল্য লাভ করেছিল।

এ অঞ্চলের সকল গ্রামই শৈলচূড়ায় অবস্থিত এবং তাদের চারিপাশ দুর্ভেদ্য কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা। পূর্ব্বে এই সব গ্রামের ফটক বন্ধ থাকত, আজকাল খোলা থাকে। নাগাজাতি স্বভাবতঃ মনুষ্য-মুণ্ড-শিকার-লিপ্সু, কিন্তু বর্ত্তমানে ব্রিটিশ রাজকর্ম্মচারীদের কঠোর তাড়নায় তাদের এই শিকার-লিপ্সা অনেকটা প্রশমিত হয়েছে।

প্রত্যেক গ্রামেই নাগাজাতির সর্দ্দারেরা আমাদের সঙ্গে হাসি-মুখে দেখা করল এবং চুকা নামক একপ্রকার চাল থেকে উৎপন্ন মদ দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করল। গ্রীষ্মের প্রাখর্য্য অত্যন্ত বেশী ছিল। সুতরাং, এই পানীয় গ্রহণ করতে দ্বিধা করলাম না। একটি গ্রামে আমরা কতকগুলি বিচিত্র গঠনের কাঠের গুঁড়ির খোল দেখতে পেলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম, এগুলি যুদ্ধে ব্যবহৃত ডোঙা, কিন্তু পরে যখন মনে পড়ল, নাগাপর্ব্বতের ত্রিসীমানায় কোন নদী নেই, তখন ভাবলাম, সেগুলি শবাধার। কিন্তু, পরে জেনেছিলাম, আসলে সেগুলি মদ চোলাই করবার পাত্র।

শীঘ্রই আমরা উলঙ্গ রেংমান জাতির দেশে পৌছিলাম।



একটি নাগা-গোড়ণের বাড়ী।

এখান থেকে নাগাপর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ সারামতী দূর আকাশের গায়ে চোখে পড়ে। এর তুষারাবৃত চূড়া সূর্য্যালোকে ঝক্‌ঝক্ কর[illegible] চিনে নিতে কোন কষ্ট হয় না।

সারাম[illegible] হাজার পাঁচশ ফুট উঁচু এবং এ পর্য্যন্ত এতে কেউ ওঠে নি [illegible] এর কারণ নয়, এর অবস্থান সভ্যজগৎ থেকে দূরে হওয়াই [illegible] একমাত্র কারণ। সারামতীর নাম কত-জন লোকে জানে? প্রকৃতপক্ষে এই পর্ব্বত-চূড়া মুণ্ড-শিকারী অসভ্য জাতির দেশের মাঝখানে অব[illegible] ম্যাপে এই অঞ্চলের বর্ণনা দেওয়া আছে, 'অশাসিত দেশ' ব'

অবশ্য যত সময় যাচ্ছে, এই অঞ্চলের সীমানা ক্রমে ততই সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। তবুও বলা যেতে পারে যে, এই অঞ্চলটী নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়।

এখানকার অসভ্য অধিবাসীদের কার্য্যে রাজপুরুষেরা কোন হস্তক্ষেপ করেন না, কেবল তাদের বলে দেওয়া আছে যে, কোন কারণেই তারা ব্রিটিশ-শাসিত অঞ্চলে ঢুকে উপদ্রব করতে পারবে না বা ব্রিটিশ আইন অমান্য করতে পারবে না। নিজের দেশে তারা যা হয় করুক।

অনেক সময়ে আইনের ও সুবিচারের মূল সূত্রগুলি এদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার ইচ্ছা দমন করতে হয়।

একবার এরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিল।



নাগাদের গ্রামে চুলার আড্ডা, তাড়িখানা।

এক অসভ্য গ্রামের অধিবাসীরা নিজেদের অঞ্চল পার হয়ে, ব্রিটিশ-শাসিত অঞ্চলের গ্রামগুলির ওপর অত্যাচার করেছিল। টিজু নদী পারের দুর্গম অরণ্য অঞ্চলে সেই লুঠের দ্রব্য নিয়ে জমা করে।

যথাসময়ে অত্যাচারিত গ্রামবাসীরা স্থানীয় ডেপুটি কমিশনারের কাছে নালিশ করলে। ডেপুটি কমিশনার খুব শান্ত মেজাজে অসভ্য জাতির দেশে গেলেন, একটা মিটমাটের জন্য। ভাবটা এই যে, যা হবার তা হয়ে গিয়েছে, ও নিয়ে আর আইন আদালত করে কি হবে, দুপক্ষ মুখোমুখি বসে ক্ষতির পরিমাণ ঠিক করে একটা সুবিধাজনক মিটমাট করে ফেলাই ভাল।

অবশ্য, মিটমাটের রাস্তা অধিকতর সুগম করবার জন্যে ডেপুটি কমিশনার সাহেব একজন ইংরেজ সৈনিক কর্ম্মচারীর নেতৃত্বে আসাম রাইফেল সৈন্যদলের পঞ্চাশ জন সৈন্য সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।

সুতরাং কাজের খুব সুবিধে হয়ে গেল। উভয় পক্ষ মিলে ক্ষতিপূরণের একটা সর্ত্ত নির্দ্ধারিত হল এবং লুণ্ঠনকারীর দল অনেকগুলো বর্শা, তীর, ধনুক, রন্ধনপাত্র, তলোয়ার এদের দিয়ে নিষ্কৃতি পেলে। উভয় পক্ষের সর্দ্দারের টিপসই নেওয়ার পরে ঘটনার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হল।

আমি ও টানৃটাং সাত দিনে একশো সাত মাইল অতিক্রম করে টিজু নদীর গভীর খাতের পারে উপস্থিত হই। ব্রিটিশ-শাসিত রাজ্যের এই শেষ সীমানা। আমরা এখানে স্থানীয় ডেপুটি কমিশনার ও অরণ্য-বিভাগের কর্ম্মচারী মিঃ বোংকে তাঁবুতে অবস্থান করতে দেখলাম।

আমরা তাঁবুতে আগে পৌঁছলাম, আমাদের পথ-প্রদর্শক ও কুলীরা এল পরে। টিজু নদীর ধারে পৌঁছে দেখি, নদীর ওপর বেতের দোদুল্যমান সাঁকো ছাড়া নদী পার হবার আর কোন উপায় নেই। সাঁকো এত বেশী দোলে যে, তিনজন কুলীর বেশী একসঙ্গে জিনিষপত্র নিয়ে তার ওপর দিয়ে যাবার কোন উপায় নেই।

একজন লোকের খালি হাত-পায়ে অন্ততঃ চার মিনিট লাগে সাঁকো পার হতে। হিসেব করে দেখা গেল, এ রকম হেঁটে অগ্রসর হলে আমাদের সমগ্র দলটির নদী পার হতে আজ সারাদিন লেগে যাবে। খুঁজতে গিয়ে আবিষ্কার করা গেল, নদীর একস্থানে জল বেশী গভীর নয়, সেখানে হেঁটে যাওয়া সুতরাং কিছু কষ্টকর নয়।

পার হয়ে দেখা গেল, পাহাড়ের গা বেয়ে সরু সংকীর্ণ রাস্তা এঁকে বেঁকে ওপরের দিকে উঠেছে। সেই দিয়ে যেতে যেতে এমন এক জায়গায় পৌঁছনো গেল, যেখানে পাহাড়ের ধ্বস নেমে রাস্তায় একদিকে পড়েছিল। নাগারা সেখানে কাঠের বেড়া দিয়ে ঘিরে রেখেছে শত্রুপক্ষের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে; বেড়ায় মাথায় মাথায় বাঁশের সড়াক। জায়গাটি দেখে মনে হল, আক্রমণকারী শত্রুর দলের পক্ষে

যতই ভীতিপ্রদ হোক্, আমরা যখন শান্তিপ্রিয় ভ্রমণকারী মাত্র, আমাদের কোন ভয়ের কারণ নেই এখানে।

আমাদের আসবার সংবাদ পেয়ে ও-পারের একটি গ্রামে নাগা সর্দ্দারেরা আমাদের অভ্যর্থনার আয়োজন করেছিল। কিন্তু, এ কথা আমরা সব সময়েই মনে রেখে চলছি যে, আমরা বর্ত্তমানে 'অশাসিত' অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি; ডেপুটি কমিশনার বলে দিয়েছিলেন যে, একা যেখানে সেখানে এ সব অঞ্চলে আমরা যেন না বার হই।

সে দিন বিকালে আমরা নিমি পৌঁছে গেলাম।

গ্রামের বাইরে একজায়গায় তাঁবু ফেলা হল এবং চা-পানান্তে পথ-প্রদর্শকেরা আমাদের নিমি গ্রামের দুর্ভেদ্য কাঠের বেড়ার মধ্য দিয়ে গ্রামে ঢুকে সব দেখতে নিয়ে গেল। গ্রামটি একটি গভীর নদীখাতের ধারে হাজার ফুট উঁচু পর্ব্বত-চূড়ায় অবস্থিত। সত্যই যে দুর্ভেদ্য স্থান, এ বিষয়ে কোন ভুল নেই।

একদিকে পাহাড়ের ওপরকার সমতল মালভূমির সঙ্গে এই গ্রামের যে যোগ আছে, সেদিকে ২০০ গজ চওড়া দুর্ভেদ্য ফণিমনসার কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গল। একটা ইঁদুর পর্য্যন্ত সে দিক দিয়ে ঢুকতে পারে না, মানুষ তো দূরের কথা।

সামরিক যান-বাহনের মধ্যে কেবল মাত্র ট্যাঙ্ক পারে সে দুর্ভেদ্য কাঁটাবন অতিক্রম করতে।

নিমিগ্রামে যেতে কাঁটার জঙ্গলের পাশ কাটিয়ে একটা সংকীর্ণ পথ দিয়ে আমরা গেলাম; আমাদের সামনে পিছনে বেয়নেট-ধারী সিপাহীর দল ও কোমরে বাঁশের বা কাঠির খাপ বাঁধা জোয়ান নাগা যোদ্ধার দল।

খানিকটা গিয়ে সামনে আর এক বাধা।

কয়েক ধাপ খাড়া উঁচু সিঁড়ি পার হয়ে একটা শক্ত কাঠের বেড়ায় গিয়ে খানিকটা ফাঁক। সোজা হয়ে যাবার যো নেই, হামাগুড়ি দিয়ে না গেলে বেড়া পার হওয়া যাবে না। যে কোন মুহূর্ত্তে ওপর থেকে একটা শক্ত ঝাঁপ ফেলে দিয়ে এই ক্ষুদ্র ফাঁকটুকুও বন্ধ করে দেওয়া যায়। সেই ঝাঁপের নীচের দিকে অসংখ্য ছোটবড় বাঁশের তীক্ষ্ণাগ্র সড়কী।

স্থানটি দেখে মনে হল যেন আমরা মরণের ফাঁদে পা দিয়েছি। পেছনে ফণিমনসার দুশো গজ গভীর জঙ্গল, সামনে এই সড়কী-কণ্টকিত ঝাঁপ-ফেলা সরু পথ। নাগারা যদি হঠাৎ আমাদের আক্রমণ করবার ইচ্ছা করে, তবে পালাবার পথ আমাদের বন্ধ।

আর কয়েকটি সিঁড়ি উঠেই আমরা একেবারে গিয়ে ওদের ঘাঁটির মধ্যে ঢুকলাম।

এখানে যদি নাগারা ইচ্ছে করত, আমাদের নিশ্চিহ্ন খুন করে ফেললেও আমাদের কিছু করবার উপায় ছিল না।

এই সুরক্ষিত নাগা গ্রামটি টিজু নদীর গভীর খাতের ঢালুতে থাকে থাকে সাজান। একটা বাড়ীর স্লেট-পাথরের ছাদ তার নীচের থাকের বাড়ীর মেজের সঙ্গে এক সমতলে



পার্ব্বত্য গ্রামে সদর [illegible] পাথরের মেজে এবং দেওয়াল কাঠের।

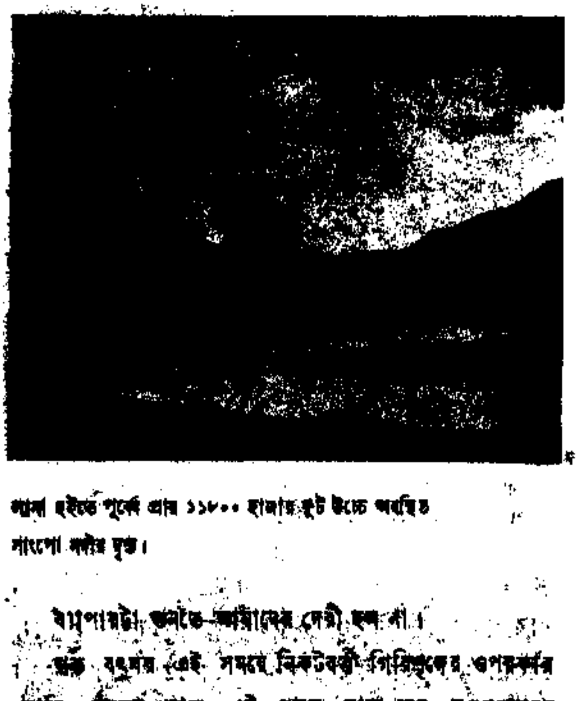
অবস্থিত। এখানে নাগা স্ত্রীলোকেরা হাতে মাটীর নানা রকম পাত্র গড়ছিল। পাত্রগুলির সুঠাম গড়ন দেখে মনে হবে যে, সেগুলি নিশ্চয়ই কুম্ভকারের চক্রে ঘুরিয়ে তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে সে জিনিষ এ দেশে অজ্ঞাত। যা কিছু গৃহস্থালীর আবশ্যক মৃৎপাত্র—তা হাতেই গড়া হয়ে আসছে এখানে চিরকাল।

আমাদের দৃষ্টি একটি লম্বা বাঁশের খুঁটির দিকে আকৃষ্ট হল।

খুঁটির আগায় বাটির আকারের একটা কি কালমত দ্রব্য উপুড় করে বসান। তার ধারগুলো যেন আগুনে পোড়া বলে মনে হয়।

য়, জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, জিনিষটা আসলে মানুষের মাথার খুলি। শত্রু বধ করে তার মাথার খুলি এ ভাবে জনসাধারণের সামনে প্রদর্শিত হওয়াতে গ্রামের গৌরব বেড়েছে। যে সমুখযুদ্ধে এই খুলিখানা সংগ্রহ করেছে, সেও সেখানে উপস্থিত ছিল। তার বয়স বেশী নয়, মেয়েলি ধরণের চেহারাটা। হাতে একখানা দা নিয়ে সে বাঁশের হুঁকো তৈরী করছিল, ধূমপানের জন্য।

ছোক্‌রা খুবই লাজুক, এ খুলি তারই দ্বারা সংগৃহীত কি না, আমাদের এ প্রশ্নের উত্তর সে অত্যন্ত বিনয় ও সঙ্কোচের সঙ্গে দিলে। এ রকম প্রকাশ্যভাবে সবাই তার বীরত্বের প্রশংসা করলে ছেলেমানুষের লজ্জা ও সঙ্কোচ হবারই কথা।



সারা মইতে পূর্বে প্রায় ১১৮০০ হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত সাংপো নদীর দৃশ্য।

ব্যাপারটা জানতে আমাদের দেরী হল না। গত বৎসর এই সময়ে নিকটবর্তী গিরিশৃঙ্গের ওপরকার চোমি গ্রামের লোক এই গ্রামে হানা দেয় মুণ্ডসংগ্রহের উদ্দেশ্যে। তাদের এ মহৎ উদ্দেশ্য বিফল হয় নি, তিনটি নরমুণ্ড সংগ্রহ করে যখন তারা বিজয়গর্বে ঘরে ফিরছিল, তখন এই তরুণ যুবক তীত ও সমস্ত গ্রামবাসীদের মধ্য থেকে বাছা বাছা জনকয়েক লোক সংগ্রহ করে বনের পথ দিয়ে চোমি গ্রামের দিকে রওনা হয়।

বনের মধ্যেই একস্থানে চোমি গ্রামের কয়েকজন লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এবং তাদেরই একজনের মাথার খুলি বর্তমানে বাঁশের খুঁটির ওপর উপুড় করা রয়েছে। নিমি গ্রাম যে কারও কাছে মার খেয়ে চুপ করে থাকবার পাত্র নয়, এ থেকে তাই প্রমাণিত হচ্ছে।

নিমি গ্রামের দ্রষ্টব্য বস্তুগুলি দেখা শেষ করে আমরা তাঁবুতে ফিরলাম।

আমরা কাঠের বেড়ায় সেই ফাঁকে পার হবার পরক্ষণেই একজন দীর্ঘাকৃতি অর্দ্ধ-উলঙ্গ নাগা-যোদ্ধা দা ও বর্শা হাতে সেখানে এসে প্রহরী স্বরূপ দাঁড়াল। নিমি গ্রামের সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন আমাদের তাঁবু থেকে তার দীর্ঘদেহ অস্পষ্ট অন্ধকারে আমরা বেশ দেখতে পেলাম—তাকে দেখাচ্ছিল যেন রোমান সৈনিকের মত। মুণ্ড-শিকারীদের দেশে রাত্রিকালে এরূপ পাহারার খুবই প্রয়োজন।

এর পরে একদিন আমরা সারামতী শৃঙ্গ আরোহণ করবার সংকল্প করলাম।

নিমি গ্রামের লোকে পথ-প্রদর্শক যোগাড় করে দিলে। নিমি গ্রামের কেউ কখনও কিন্তু সারামতী আরোহণ করে নি। আমাদের সুবিধে হল সাকালু বলে একজন সেমা জাতির সর্দারকে পেয়ে—লোকটির বয়স যদিও ষাট—কিন্তু, কী চেহারা আর স্বাস্থ্য তার। দেখবার জিনিষ বটে।

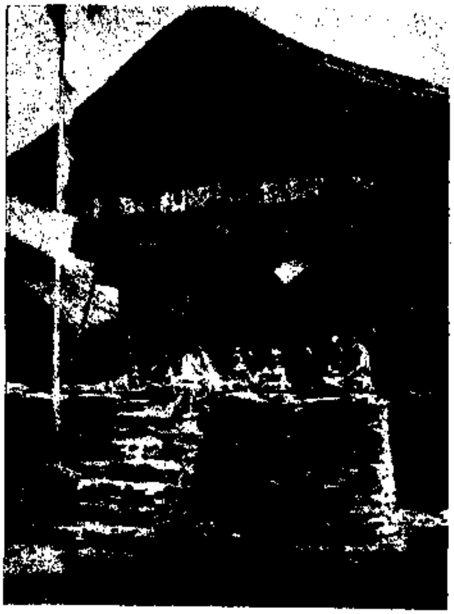
এক সময় সীমান্ত প্রদেশের কোন এক অভিযানে বৃদ্ধ না কি কুলীদের তত্ত্বাবধায়ক ছিল। কি একটি গোলমাল বাধে ও মারামারি হয়। সে সময়ে এই বৃদ্ধ একা আটটী নরমুণ্ড শিকার করেছিল।

নিমি গ্রাম ছেড়ে আমরা উপত্যকার তলায় নেমে গেলাম ও ছোট ছোট চারা-গাছের বন পার হয়ে ক্রমে চলে গেলাম গভীর জঙ্গলে।

তারপর আমরা ওপর দিকে ক্রমশঃ উঠতে আরম্ভ করি। দেখতে দেখতে নিমি গ্রামের উচ্চতা ছাড়িয়েও উঠে গেলাম। আমি এক জায়গায় গাছের ডালে কতকগুলি অর্কিড দেখতে কেমন সুন্দর উঁচু করে চেয়েছি, অমনি প্রায় সংকীর্ণ পথের ধার ছাড়িয়ে একেবারে শূন্যে—কেবল তখনই সশব্দে পড়ে গড়িয়ে যেতে যেতে একটা ঝোপের গায়ে আটকে থেমে গেলাম। নইলে কি গতি হত তা বোঝা শক্ত নয়।

আমরা যে পাকদণ্ডী পথে চললাম, আসল কিন্তু সেটাই

শেষ পর্য্যন্ত সারামতী শৃঙ্গের শিখরদেশে আমাদের নিয়ে গিয়ে ফেলবে, কিন্তু এত সহজে সারামতী ধরা দেবার নয়।



তিব্বতের এক সহর অঞ্চল।

আট হাজার ফুট ওপরে উঠে দেখা গেল শিখরদেশ হতে আমরা এখনও কয়েক মাইল দূরে রয়েছি। আমরা সে পাহাড়টার ওপরে খুব সহজেই উঠে গেলাম এবং অন্যদিকের ঢালুতে খানিকটা নামলাম ভাল করে চারিদিক্ চেয়ে দেখবার জন্যে।

দেখে শুনে স্পষ্টই প্রতীয়মান হল, সারামতী আরোহণ জিনিষটা যা ভাবা গিয়েছিল, তা নয়। আরও অনেক কঠিন ব্যাপার। তখন আমরা পাহাড়ের সাত হাজার ফুট সেই গাঁজটাতে তাঁবু স্থাপন করলাম ও সেই তাঁবুতে সেদিনের মত ক্লান্ত দেহকে বিশ্রাম দিলাম। পরদিনই আমাদের সারামতী আরোহণের শেষ দিন। যদি সে দিনের মধ্যে উঠতে পারি ভাল, নয় তো বাধ্য হয়ে পরাজয় স্বীকার করে তাঁবুতে ফিরতে হবে।

পরদিন যথেষ্ট চেষ্টা করা গেল এবং কঠিন পরিশ্রমের ও অধ্যবসায়ের ফলে আমরা শিখরদেশ থেকে তিন মাইলের মধ্যে এসে গেলাম। পথ অতীব দুর্গম, বেঁটে বেঁটে ন্যাড়া গাছের তলায় তুষারের স্তূপ কেটে যেতে হচ্ছিল, প্রকৃতপক্ষে বরফের স্তূপ কেটে পথ না করলে সে পথে অগ্রসর হওয়া চলে না। পাহাড়ের যে জায়গাটা দিয়ে যাচ্ছি, সেটা যেমন সংকীর্ণ, তেমনি তীক্ষ্ণাগ্র, যেন ক্ষুরের মত। দুইদিকেই গভীর খড, দেখলে মাথা ঘুরে যায়, মনে হয় ওর বুঝি তলা নেই, এমন অতলস্পর্শ খড় নাগাপর্ব্বতে এর আগে দেখি নি।

হঠাৎ সেই পথে এল ঘন কুয়াশা।

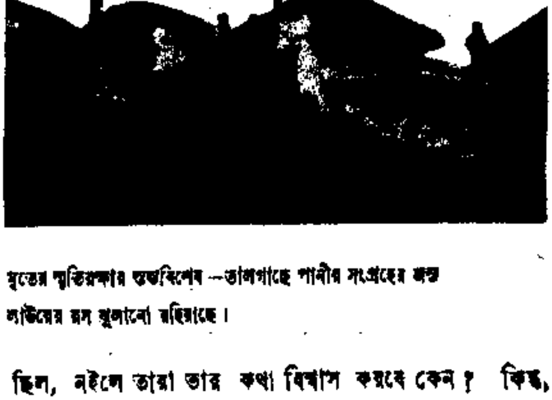
কিছু দেখা যায় না, নিজেদের হাত পা চোখে পড়ে না, কুয়াসায় চারিদিক্ থেকে আমাদের ঘিরে ফেলেছে। শিখর-দেশ সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে গেল কুয়াসায়।

সে অবস্থায় সেই ভীষণ দুর্গম গিরিপৃষ্ঠ বেয়ে আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব—নিশ্চিত মৃত্যু, যদি এতটুকু পদস্খলন হয়। পরাজয় স্বীকার করে আমরা ফিরলাম। সারামতী আমাদের ধরা দিলে না।

আশ্চর্য্য ব্যাপার, যেই তাঁবুতে এসে পৌঁছেছি, অমনি কুয়াসার মেঘ অপসারিত হয়ে সারামতীর তুষারাবৃত, ঝক্ঝকে শিখরদেশ আবার আমাদের ক্লান্ত চক্ষুর সম্মুখে পরিদৃশ্যমান হল।

কি মায়াই জানে সারামতী!

আমাদের সঙ্গী জনৈক নাগা কুলি পাহাড়ের ওপর থেকে কিছু তুষার সংগ্রহ করে এনেছিল থলের মধ্যে করে। বরফ দেখে তার খুব আনন্দ, সে জন্মে বরফ দেখে নি। বন্ধুবান্ধবদের দেখাবার জন্যেই সে কিছু বরফ থলের মধ্যে পুরে-



মৃতের স্মৃতিরক্ষার স্তম্ভবিশেষ—তালগাছে পানীয় সংগ্রহের জন্য লাউয়ের খল ঝুলানো রহিয়াছে।

ছিল, নইলে তারা তার কথা বিশ্বাস করবে কেন? কিন্তু, নেমে তাঁবুতে এসে থলে খুলে সবিস্ময়ে দেখলে, থলের মধ্যে

বরফ নেই! কোথায় গেল বরফ, সে দেবতার নামে শপথ করে বলতে পারে, এই থলের মধ্যেই সে বরফ পুরেছিল! বার বার সে প্রমাণ করতে ব্যগ্র হয়ে উঠল—এই থলেই সে পাহাড়ের ওপরে নিয়ে গিয়েছিল, তার আর কোন সন্দেহ নাই।

পরদিন আমরা ফিরে এসে, ডেপুটি কমিশনারের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে টিজু নদীর খাত বেয়ে, ব্রহ্মদেশের দিকে রওনা হলাম।

কিছু দূর গিয়ে দেখি নদী-খাত দিয়ে যাওয়া সুবিধাজনক নয়, পার্ব্বত্য নদীর জলধারা সমস্ত খাতটা জুড়ে বসেছে তখন আমরা খাত থেকে ওপরে উঠে দু-তিন হাজার ফুট একটা গিরিপৃষ্ঠ বেয়ে চলতে লাগলাম। আমরা সাংটুম জাতির দেশের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি তখন, এদের ভাষা আমরা বুঝি না। বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত। সুতরাং একজন কুকি ছোকরাকে দোভাষী ঠিক করে সঙ্গে নিলাম।

এ ঘোর অরণ্য-পথে মানুষের বাস খুবই কম। মাঝে মাঝে দু'একটা গ্রাম দেখতে পাওয়া যায়, দশ পনেরটা কুটীর নিয়ে এই সব ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য গ্রাম। অধিবাসীরা বেজায় নোংরা, কিন্তু খুব সদয় ব্যবহার তাদের।

নাগাজাতির বাসস্থান শুধু যে আসামে তা নয়, নাগা-পর্ব্বত চলে গিয়েছে উত্তর-ব্রহ্মদেশের হুকঙউইন্ জিলা পর্য্যন্ত।

আসাম প্রদেশে হিমালয় পর্ব্বতের যে অংশ অবস্থিত, তার খবর যে বেশী কেউ রাখে না, তার একটা প্রধান কারণ এই, উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলে যথেষ্ট বারিপাতের ফলে, এই পার্ব্বত্য অঞ্চল ঘন, দুর্ভেদ্য অরণ্যে আবৃত। তার ওপরে এই অরণ্য ও পাহাড় অঞ্চলের সর্ব্বত্রই দুর্দ্ধর্ষ নাগা, কুকি ও অন্যান্য অসভ্য জাতিদের বাস। মানুষের মুণ্ড-সংগ্রহ এদের জীবনের একটা প্রধান আনন্দ।

এ অবস্থায় উত্তর-পূর্ব্ব হিমালয় যে এখনও অনেকখানি অজ্ঞাত, এ আর বেশী কথা কি!

কিন্তু, হিমালয়কে অতিক্রম করে তিব্বতের দিকে যেতে হলে এই পথে যাওয়াই প্রশস্ত, কারণ উত্তর-পূর্ব্ব হিমালয়ের শৃঙ্গগুলি সিকিমে সবচেয়ে উঁচু, এদিকে এসে তারা খর্ব্বাকৃতি হয়ে মাত্র বিশ হাজার ফুটে দাঁড়িয়েছে

—ক্যাপ্টেন কিংডন ওয়ার্ডের বিবরণ হইতে

নব বর্ষে

—শ্রীবিবেকানন্দ পান

"ভোর হ'ল গো, ভোর হ'ল";
কোকিল ডাকে—"পথিক এল
দ্বার খোল;
বারো মাসের পথটি বেয়ে
তোমার দেশে এল ধেয়ে—
চেয়ে তোমার মুখের পানে,
মুখ তোল;
আহা! কত দূরের পথিক এল
দ্বার খোল!

বারো মাসের দুঃখ-সুখের
সুর-ধ'রে,
তোমার দ্বারে থামল আসি'
আজ ভোরে;
গত দিনের কান্না-হাসি
বিফলতার দুঃখ রাশি,
দ্বন্দ্ব-গ্লানি যা' আছে আজ
সব ভোল;
কত বার্ত্তা ল'য়ে পথিক এল
দ্বার খোল!

নূতন-বরষ-পথিক এল
দ্বল-দ্বারে,
বরণ ক'রে আজকে গৃহে
লও তারে;
ভবিষ্যতের যত ব্যথা
আনন্দেতে আজ ভোল তা',
নব আশায় জয়-গীতির
সুর তোল।
আজি আশিস্ ল'য়ে পথিক এল
দ্বার খোল!!"

কার্ণিভ্যাল

—শ্রীহিমাংশুশেখর গুপ্ত

হঠাৎ ভোজবাজীর মত মাঠের রূপ বদলাইয়া গেল। ক্যাণ্টনমেণ্ট মার্কেটের পেছনের যে নানা আগাছায় ভরতি ফাঁকা মাঠটা ছিল, একদিন বাজার করিতে যাইয়া দেখি, সেখানে বিস্তর জন-মজুর খাটিতেছে। কেউ জমি পরিষ্কার করিতেছে, কেউ বা বাঁশ পুঁতিবার জন্য গর্ত্ত খুঁড়িতেছে, কেউ বা দরমার বেড়া বাঁধিতেছে, কেউ কোদালি লইয়া অসমতল শক্ত জমী সমতল করিবার চেষ্টায় ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইতেছে।

উপরে নির্ম্মল নীল আকাশে সাদা মেঘ ভাসিয়া বেড়াইতেছে, দিনটি বেশ স্বচ্ছ, সুন্দর ও রৌদ্রোজ্জ্বল। শীতের রৌদ্রকিরণ বলিয়া বেলা নয়টায়ও রোদের তেজ কিছুমাত্র ছিল না, মাঝে মাঝে ফুরফুরে হাওয়ার সঙ্গে অদূরবর্ত্তী একটা প্যাগোডার মৃদু ঘণ্টাধ্বনি কাণে আসিতেছিল। কুরঙ্গী শ্রমিকেরা প্রাণপণে খাটিতেছিল। এখানে কোন বর্ম্মী উৎসব হইবে কি?

কৌতুহল হইল। কাছে যাইয়া এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপারটা কি মশাই?

ভদ্রলোক বাঙ্গালী; সার্ট শর্ট কায়দা-দুরস্ত ভাবে পরিধান করিলেও তাঁহার গাত্রবর্ণ তিনি যে ইউরোপ-প্রত্যাগত কোন শ্বেতাঙ্গ নন, তাহারই সাক্ষ্য দিতেছিল। ভদ্রলোক বোধ হয় কণ্ট্রাক্টর, সম্মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রাশভারী কণ্ঠে উত্তর দিলেন, কার্ণিভ্যাল হইবে। কোন ইয়োরোপীয় ক্লাবের বিল্ডিং উঠাইবার অর্থ-সংগ্রহের জন্যই কার্ণিভ্যাল হইবে, এই বলিয়া পরক্ষণেই কণ্ট্রাক্টর মহাশয় পকেট হইতে একটা বৃহদাকার বর্ম্মা চুরুট বাহির করিয়া কায়দামাফিক ভাবে দুই ঠোঁটে চাপিয়া ধরিলেন। জ্বালাইতে যাইয়া দেখেন, দেশলাই-এর বাক্সটি শূন্য; নিরুপায় হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ম্যাচিস আছে মশাই?

একান্ত বিনীতভাবে জানাইলাম যে, চুরোটিকার উপর আমার আসক্তি না থাকিবার দরুণই তাঁহাকে এই সময়োচিত সাহায্য দান করিতে পারিতেছি না।

হাসিয়া ঠিকাদার বাবু বলিলেন, তাই ত মশাই, অল্প বয়সে ও-জিনিসটার উপর বিশেষ আসক্তি না থাকাই ভাল। তবে, কাজকর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে একটু আধটু,—বেশ বেশ—বলিয়া তিনি একজন মজুরের কাছ হইতে দেশলাই চাহিয়া লইয়া চুরুট ধরাইয়া লইয়া আরামে ফুঁকিতে লাগিলেন।

এখানে আমার বেড়াইতে আসা। গত তিন মাস আগে শক্ত ব্যামো টাইফয়েড হইতে উঠিয়া কোথায় যাই, কোথায় যাই করিয়া শেষকালে বড় ভগিনী ও ভগ্নীপতির আহ্বানে বর্ম্মার এই জনবিরল সহরতলীটিতে আসিয়া আস্তানা বাঁধিয়াছি। দাদা ও বৌদি থাকেন মীরাটে, সেখান হইতেও আমন্ত্রণ আসিয়াছিল, কিন্তু সাত পাঁচ ভাবিয়া এখানেই আসিয়াছি। প্রথম কথা, মীরাটের জল-বায়ু, বৌদির যত্ন স্বাস্থ্যোদ্ধারের সহায়তা করিতে পারে, কিন্তু যে দেহ-মন জনবহুল সহরের খাঁচায় আবদ্ধ, সে দেহ-মন বাহিরের রূপ ও শোভা দেখিবার একান্ত কামনা করিয়া থাকে। সমুদ্র দেখি নাই, ব্রহ্মদেশে যাইতে হইলে বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া যাইতে হয়। সমুদ্রের শোভা দেখিতে পাইব; আর শুনিয়াছি, বর্ম্মাদেশটাও না কি মন্দ নয়। কাজেই, শেষ পর্য্যন্ত আমার এখানেই আসা হইয়াছে।

রোজ সকালে ওটমিল পরিজ ও ব্রাউন ব্রেড সহকারে এক পেয়ালা কড়া চা গিলিয়া ভ্রমণে বাহির হই, আবার মধ্যাহ্নে ষোড়শোপচারে আহার করিয়া দিবানিদ্রা, বিকালে স্থানীয় বাঙ্গালী ক্লাবের মেম্বারগণের সঙ্গে খানিকটা ভলীবল খেলিয়া, গল্প করিয়া, তাস পিটিয়া দিন গুজরান করিতেছিলাম। মাঝে মাঝে সখ করিয়া বাজার করিতে যাই সেনানিবাসের বাজারে, রেঙ্গুনের বগুলা বাজারেও যাই।

সেনানিবাসের মার্কেটের পিছনের জায়গাটায় যে কার্ণিভ্যাল হইবে, তাহা ইতিমধ্যেই প্রচারিত হইয়া সকলকে সচকিত করিয়া তুলিয়াছিল। আমাদের পাশের বাড়ীর আবহাওয়া বিভাগের 'অবজার্ভার' চ্যাটার্জ্জি মহাশয়ের নয় বছরের বালিকা সবজান্তা টুনু সমস্ত পাড়া ঘুরিয়া এই

আনন্দ-উৎসবের সুসন্দেশ বিতরণ করিয়া দিতেছিল। তাহার আনন্দই যেন সকলকার চাইতে বেশী। সে-দিন সকলকার মুখে কার্ণিভ্যালের গল্প খালি শ্রুতিগোচর হইল।

বিকালবেলা প্রোম রোড দিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে দেখি, চারিদিকে বেড়া দিয়া কার্ণিভ্যালের স্থান করা হইয়াছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর রাত্রিতে দিদিকে লইয়া কার্ণিভ্যাল দেখিতে গেলাম। ইতিমধ্যে কার্ণিভ্যালের নানা স্থানের বিজলীবাতি জ্বলিয়া স্থানটিকে পরম আকর্ষণীয় আলোক ও সৌন্দর্য্যের এক মায়াপুরী করিয়া তুলিয়াছিল। চারিদিকে আলো, আনন্দের ঢেউ ছাড়া যেন কিছু ছিল না।

কার্ণিভ্যালের প্রধানতম আকর্ষণ জুয়ার আড্ডাগুলি, নানা রঙ বে-রঙের আলোক-সজ্জায় সজ্জিত ব্রহ্মের জাতীয় নৃত্য পোয়ের জন্য একটা মঞ্চ বা ষ্টেজ একধারে তৈয়ারী করা হইয়াছিল। ষ্টেজের নীচে সারি সারি কাঠের চেয়ার সাজানো, সেখানে আশেপাশের কোয়ার্টার্সের বিভিন্ন দেশীয় স্ত্রী-পুরুষ আসিয়াছিলেন—বাঙ্গালীরও অভাব নাই। পোয়ে নাচ অবিরত চলিতেছিল। অনেকগুলি অল্পবয়সী বর্ম্মী মেয়ে সারি সারি করিয়া ষ্টেজের উপরে পোয়ে নাচ নাচিতেছিল। বেশ লাগিতেছিল দেখিতে। খুব বেশীক্ষণ দেখিলে পোয়ে নাচ বড় একঘেয়ে মনে হয়। নর্ত্তকীদের পরণে ছিল রঙীন রেশমী লুন্জী বা লুঙী, মুখে সযত্নে লিপ্ত তানাখা নামে চন্দন-জাতীয় ব্রহ্মদেশীয় অঙ্গরাগ, পায়ে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত হাতওয়ালা জামা বা অঙ্গি আঁটা।

সব চাইতে ভাল লাগিল একজন পুরুষ নর্ত্তকের নৃত্য-কৌশল। সে যে কত ভঙ্গীতে নাচিল, কত প্রকার চমকপ্রদ ক্রীড়া-কৌশল দর্শাইল, তাহা বলিবার নয়। দেখিয়া বাস্তবিক মুগ্ধ হইলাম। নৃত্যের মাঝে মাঝে দুইটি বর্ম্মী ভাঁড় আসিয়া অঙ্গভঙ্গী করিয়া কি সব অবোধ্য ভাষায় কথা বলিয়া উপস্থিত বর্ম্মী দর্শকদের মধ্যে হাস্যরস বিলাইতেছিল। ভাষা জানি না, কাজেই বাধ্য হইয়া হাস্যরস হইতে বঞ্চিত হইতে হইল।

কতকগুলি তরুণী সাহেবের মেয়ে খুব হাসিয়া হিল্লোল তুলিয়া দিয়া কাঠের ঘোড়ায় চড়িয়া পাক খাইতেছিল; কতকগুলি ছোকরা সাহেব কিছু দূরে দাঁড়াইয়া নির্নিমেষে তাহাদের দেখিতেছিল। দলে দলে সুসজ্জিত নরনারী ঘোরাফেরা করিতেছিল। কেউ বা কার্ণিভ্যালের রেষ্টুরেণ্ট হইতে চা পান করিতেছিল। কেহ তৃষ্ণা-নিবারণের জন্যে সোডা সহকারে রঙীন তরল পানীয় গলাধঃকরণ করিতেছিল। চারিদিকে আলোয় আলো। সমস্ত দৃশ্যটা যেন দৈনন্দিন জীবনের কঠোর মরুভূমি-বক্ষের ওয়েসিস্।

জুয়ার আড্ডাগুলি বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। পয়সা রোজগারের কত রকমারী ফন্দী। লাল, নীল, সাদা, হলুদ প্রভৃতি বিভিন্ন রং এর চিহ্ন বক্ষে লইয়া একটা কাঠের চাকা যন্ত্রের সাহায্যে ঘুরিতেছিল। পাশের টেবিলের উপরও ঐরূপ নানা রং এর চিহ্ন বুকে লইয়া আর একটা চাকা ছিল। টেবিলের উপরের চাকতির উপরে নিজের পছন্দমত রঙে পয়সা রাখিয়া, পিছনে পাখীর পালক লাগানো একটা তীরের মত লৌহ-শলাকা নিক্ষেপ করিয়া যিনি ঠিক ঐ রং-এর উপরে—অর্থাৎ যে রং-এর উপর পয়সা রাখা হইয়াছিল, ঐ ঘূর্ণায়মান চাকায় বিদ্ধ করিতে পারিবেন, তবেই তিনি চাকায় যে পয়সা রাখিয়াছিলেন, তাহার দ্বিগুণ পাইবেন, নতুবা তাঁহার পয়সা মাঠেই মারা যাইবে।

কতকগুলি হাঁসের গলায় বেতের রিং পরাইতে পারিলে হংসলাভ হইবে। ইহাতে কোনই সন্দেহ ছিল না। কয়টা গোরা সৈন্য ছাড়া আর সকলেই চঞ্চল জীবদের বেতের রিং-রূপ মাল্য দান করিতে অপারগ হইলেন দেখিলাম। বলা বাহুল্য, বেতের রিংগুলি পয়সার বিনিময়ে দেওয়া হইতেছিল।

একটা গামলার নীচে একটা টাকা দেখা যাইতেছিল। জলের উপর দিয়া যে কোন মুদ্রা টাকার উপর ফেলিতে পারিলে কাঞ্চন লাভ হইত, ইহাতেও সন্দেহ করিবার হেতু ছিল না, ইহা জোর গলায় ঘোষণা করা যাইতে পারে। কিন্তু, পদার্থবিদ্যার আলোক-বিচ্ছুরণের, laws of refraction-এর নিয়ম অনুসারে জলের উপর হইতে টাকার স্থান স্থির করা সহজসাধ্য মোটেই ছিল না।...এ সব সাধারণ অনেক খেলা ছাড়া আর এক দিকে ফ্লাশ খেলার আড্ডাটাও কয়েকজনের মধ্যে দিব্য জমিয়া উঠিয়াছিল। সেই দলের মধ্যে জনকয়েক পরিচিত ব্যক্তিও ছিলেন।

শৈলেন বাবু বিবিধ জুয়ায় আট টাকা হারিয়া গিয়া আমাকে বলিলেন, পাঁচটা টাকা ধার দিতে পারেন মশাই ?

কালই পাবেন। টাকা ছিল না, কি আর করি। অগত্যা তাঁহাকে নিরাশ করিতে হইল ; কিন্তু তাঁহাকে নেশায় পাইয়া বসিয়াছিল ; কুচপরোয়া নেই, ক্যান্টনমেন্ট মার্কেটের এক সুরতির কাছ হইতে পুনরায় খেলিবার জন্ম টাকা ধার করিয়া আনিলেন। হাসি-খুসী দেবেশ বাবুর খুব স্ফূর্ত্তি ; চার টাকা বারো আনা জিতিয়াছেন, কিন্তু দেখিতে দেখিতে উপরন্তু আট টাকা হারিয়া গিয়া তাঁহাকেও মুখটা পাঁচার মত করিতে হইল। তবু কি ছাই খেলিবার নেশা লোপ পায়! চ্যাটার্জ্জি মহাশয়কে নির্ব্বিবাদে নিঃসঙ্কোচে বলিয়া ফেলিলেন, দশটা টাকা kindly ধার দেবেন চ্যাটার্জ্জী মশাই, আংটীটা খুলে দিচ্ছি।

মিটার-রিডার বন্ধু বাবু পঞ্চাশ টাকা মাহিনা পান, চৌদ্দ টাকা হারিয়া গিয়া ঠিক কতখানি মর্ম্মাহত হইয়াছেন, তাহা বোঝা গেল না। স্ত্রীর কাছে সঞ্চিত কিছু টাকা ছিল, তাহারই কিছু চাহিয়া বসিলেন। স্ত্রী মিনতিভরা সকরুণ দুটি আঁখি স্বামীর দিকে তুলিয়া ধরিয়া আর খেলিতে বারণ করিলে বলিলেন, দেখো এবার নিশ্চয়ই জিতব।

রাত-বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কার্ণিভ্যাল ভীষণ ভাবে জমিয়া উঠিল। অসুস্থ শরীর লইয়া আর বেশীক্ষণ সেখানে থাকিবার সাহস পাইলাম না। জমাট কার্ণিভ্যাল পশ্চাতে ফেলিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলাম।

পরদিন সকলকার সঙ্গে যখন আবার ক্লাবে দেখা হইল, তখন সবাই গত রজনীতে কেমনতর বাজী জিতিয়াছেন, তাহা বুঝিতে আমার কিছুমাত্র বাকী ছিল না। সকলকার মুখই কেমন জানি ভার-ভার দেখাইতেছিল। সব চাইতে বিষণ্ণ বদন দেখিলাম মিটার-রিডার বন্ধু বাবুর। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, স্ত্রীর হার বন্ধক রাখিয়াও না কি ভদ্রলোক খেলিয়াছিলেন এবং হার-জিতের মাঝখানে কখন যে নগদ চল্লিশটি টাকা নিঃশেষিত হইয়াছিল, তাহা টের পাইতে বিশেষ বিলম্ব হয় নাই। এক রাত্রির মধ্যে সকলকেই কেমন অস্থির ও বিমর্ষ করিয়া তুলিয়াছিল।

ইয়োরোপীয়ান ক্লাবটার টাকা না কি নেহাৎ মন্দ ওঠে নাই, শীগগীরই জাঁকাল বাড়ী উঠিবে সে-সংবাদও কানে আসিল।

কিন্তু বেঙ্গলী ক্লাবে সে-দিন জলীবল খেলা মোটেই জমিল না।

নূতনের গান

—শরিফুল ইসলাম

জীবন-স্রোতের ভাসাফুল ওগো
কোন্ দেবতার দান,
বয়ে আন তুমি মর্ত্ত্যের বুকে,
নব-নবীনের গান,
তোমারে লভিয়া নিখিল ধরণী,
হয়েছে নূতন শ্যামলবরণী,
বিকশিত তার মরম মাঝারে
ডেকেছে নূতন বান,
নব-আভরণে সাজাতে ভুবন,
ব্যস্ত প্রকৃতি আজি অনুখন
বন মর্ম্মরে পিক-কলরবে,
উঠিছে নূতন তান।

বৈষ্ণব মুসলমান

—স্বামী ভূমানন্দ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

১৮। রহজন···

কহৈঁ অব কোন বহনা,
    গরাম হমারা নশিচানা।
সব সখিয়ন, মেরী চুনর মৈলী,
    মুঝে পিয়াঘর জানা।
জীমে ডর মেঁ হি সাস-ননদকা,
    চৌখে পিয়া দৈ হৈ তানা॥
প্রেম-নগরকী রাহ কঠিন হৈ,
    রহা রংরেজ সিয়ানা।
এক বোর সে দিয়ো চুনরী মেঁ,
    তাসেঁ পিয় পহিচানা॥
রাহ চলত সতগুরু মিলে "রহজন"
    উনকা হৈ নাম বখানা,।
মেহর ভই উনকী জব মোপর,
    তব হী লগী ঠিকানা॥

হে সখিগণ, আমার পতিগৃহে যাইবার সময় ত নিকটে আসিল, আমি এখন কি ছুতো করি? দেখ আমার ত এখন যাওয়া সম্ভব নয়; কারণ প্রথমতঃ আমার কাপড় ময়লা; দ্বিতীয়তঃ বাপের ঘর ছাড়িয়া স্বামীর ঘরে যাইতে হইবে সেই দুঃখ; তৃতীয়তঃ সেখানে শাশুড়ী ননদের ভয় আছে; চতুর্থতঃ স্বামী আমাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিবেন। সেই প্রেম-নগরীর রাস্তা বড় কঠিন। সেখানে যিনি কাপড় রং করেন তিনি বড় সেয়ানা। আমার কাপড় একবার মাত্র রংয়ে ডুবাইয়া দিলেন, আর আমি আমার প্রিয়তমকে চিনিলাম। "রহজন" বলিতেছেন, রাস্তা চলিতে চলিতে সদ্‌গুরু মিলিল, আমি তাঁহার স্তব-স্তুতি করিলাম; আমার উপর যখন তাঁহার কৃপা হইল, তখনই আসল ঠিকানা পাইলাম, অর্থাৎ স্বরূপ-সাধন প্রণালী পাইলাম।

১৯। লতীফ হুসেন···

উধো মোহন-মোহ না···
    জব জব সুধি আৱত হৈ হরি হরি,
        তব তব হিয় বিকলাৱে॥
বিরহ-বিথা বেধতি হৈ উন বিন,
    পল ছিন চৈন ন আৱে।
কাহ করোঁ কিত জাউঁ কৌন বিধি,
    তনকী তপনি বুঝাৱে॥
ব্যাকুল বাল বাল অতি দীখত,
    ব্রজবনিতা ঘবরাৱে।
গাম-বচ্ছ ডোলত অনাথ সম,
    ইত—উত হায় রঁভাৱে।
কংস-ত্রাস ভীষণ লখি সিগরো,
    ধীরজ ছুঁটো জাৱে।
কৌন বচায় কহৈগো, অব তো.
    যহ দুখ অসহ লখাৱে॥
জবলোঁ অবধি কংস-গৃহ পুরী,
    করিকৈ মোহন আৱৈ।
তবলোঁ কৌন উপায় করৈঁ হম,
    কোউ নাহিঁ বতাৱে।

হে উদ্ধব, মনোমোহন শ্রীকৃষ্ণের জন্য আমাদের যে মোহ আছে তাহা তো যাইতেছে না! থাকিয়া থাকিয়া যখনই তাঁহার কথা মনে পড়িতেছে, তখনই চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। তাঁহার অভাবে আমরা বিরহ-ব্যথায় অস্থির, এক মুহূর্ত্তও আরাম পাইতেছি না। কি করি, কোথায় যাই, কোন উপায় করিলে শরীরের এই উত্তাপ প্রশান্ত হয়? গোপবালকগণ তাঁহার অভাবে ব্যাকুল, ব্রজ-বনিতারা উৎসাহশূন্য, গাভী ও বৎসগণ অনাথের ন্যায় এদিকে ওদিকে ঘুরিতেছে; ভীষণ কংস-ভয়ে সকলের ধৈর্য্য লোপ হইয়াছে; এখন কে আমাদিগকে বাঁচাইবে? এখন আমাদের এই দুঃখ যে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে! যতদিন পর্য্যন্ত মনোমোহন কংস-পুরীর সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া ব্রজে ফিরিয়া না আসেন, ততদিন আমাদের কি উপায় হইবে, তাহা ত কেহই বলে না।

২০। মুকররংগ···

(ক) হরদম হরিনাম জপো জী।
    যো হরদম হরিনামকো জপি হৌ,

মুক্তি হৈন হৈ হৈ তোরী।
পাপ ছোড়কে পুণ্য জো করিহো,
তব বৈকুণ্ঠ মিলোরী,
করমসে ধরম মলো রী।
"য়করংগ" পিয়সোঁ জায় কহো কোঈ,
ঘর ঘর রংগ মচোরী।
সুর নর মুনি সব ফাগ খেলত হৈঁ,
আপনি আপনো জোরী,
খবর কোঈ ন লেত মোরী।

সর্ব্বদা হরিনাম ভজন কর। যদি সর্ব্বদা হরিনাম জপ কর, তাহা হইলে তোমার মুক্তি-লাভ হইবে। পাপ-কর্ম্ম ছাড়িয়া যখন পুণ্য-কর্ম্ম করিবে, তখন বৈকুণ্ঠ মিলিবে। কর্ম্ম দ্বারাই ধর্ম্ম-লাভ হয়। "য়করঙ্গ" বলিতেছেন, কেহ আমার প্রিয়তমের নিকট গিয়া এই কথাটি বল—ঘরে ঘরে রঙ্গের খেলা চলিতেছে, সুর-নর-মুনিগণ পরস্পর মিলিত হইয়া আনন্দে ফাগ খেলিতেছেন, আমার খবর ত কেহই লইতেছেন না।

(খ) সাঁবলিয়া মন ভায়া রে।
সোহিনী সূরত মোহিনী মূরত,
হিরদৈ বীচ সমায়া রে।
দেশমেঁ ঢুঁঢ়া, বিদেশমেঁ ঢুঁঢ়া,
অন্তকো অন্ত ন পায়া রে।
কাহুমেঁ অহমদ, কাহুমেঁ ঈসা,
কাহুমেঁ রাম কাহায়া রে।
সোচ বিচার কহৈ, "য়করংগ" পিয়া,
জিন ঢুঁঢ়া তিন পায়া রে।

হে শ্যামসুন্দর, তোমাতেই আমার মন আসক্ত। তোমার সপ্রেম মনোমোহন মূর্ত্তি, আমার হৃদয়ের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। আমি তোমার স্বরূপ জানিবার জন্য দেশ-বিদেশ খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু কোনও অন্তই পাই নাই। কেহ বলেন, আহম্মদই সেই ভগবান, কেহ বলেন, ঈশাই সেই ঈশ্বর, কেহ বলেন, রামই সেই সৃষ্টিকর্ত্তা। "য়করঙ্গ" সত্য বিচার করিয়া বলিতেছেন, তাঁহাকে যিনিই খুঁজিয়াছেন, তিনিই পাইয়াছেন।

২১। কায়ম…

গুরু বিন্ হোরী কৌন খেলাবৈ,
কোঈ পাথ লগাবৈ।
কহৈ কৌন নির্ম্মল রা জীকো,
মায়া মলকে ছুড়াবৈ।
জীকো রংগ জগতকে উপর,
গাঢ়ো রংগ চঢ়াবৈ।
লাল গুলাল লগায় হাতসোঁ,
ভস্ম অবীর উড়াবৈ।
তীন লোককী মায়া ফুঁককে
ঐসী ফাগ রমাবৈ।
হরি হেরত মৈঁ ফিরতি বাবরী,
নৈনমিঁমে কব আবৈ।
হরিকো লখি 'কায়ম' রসিয়াসোঁ,
কাহে ন ধুম মচাবৈ।

গুরু বিনা আর কে আজ আমাকে হোলি খেলাইবে? কে আমাকে প্রকৃত পথ দেখাইবে? কে আমার মন হইতে মায়া-মোহ দূর করিয়া দিয়া, আমাকে নির্ম্মল করিবে? জগতের এই ফিঁকা রংএর উপর কে ভগবানের গাঢ় রং চড়াইয়া দিবে? লাল রংএর প্রেমের আবির হাতে লইয়া কে উড়াইবে? ত্রৈলোক্যের মায়া অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া সেই ভস্মের ফাগ কে আমার গায়ে লাগাইয়া দিবে? হরিকে দেখিবার জন্য আমি পাগল হইয়া ঘুরিতেছি। কবে তুমি আমার নয়নের সমক্ষে আসিবে? হরির দর্শন পাইয়া "কায়ম" রসময়ের সঙ্গে কেন মহানন্দে মাতিয়া উঠিবে না?

২২। ফরহত…

(ক) বংসী মুখসোঁ লগায় ঠাঢ়ে শ্রীরাধাবর,
মধুর মধুর বজত ধুন সুন সব গোপী বেহাল।
থিরকত থিরক নাচৈ, মানোঁ ঘন বিচ দামিনি চমকৈ,
কারে মতবারে রতনারে দৃগ লটক চাল।
সীস মুকুট চমকৈ, মকরাকৃত কুণ্ডল দমকৈ,
"ফরহত" অতি প্যারী ঘুঁঘরারী অলক তিলক ভাল।

শ্রীরাধাকান্ত মুখে বাঁশী লাগাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বাঁশীতে মধুর মধুর সুর বাজিতেছে, গোপিনীগণ সেই সুর শুনিয়া জ্ঞানহারা হইয়াছে। কানাই তাথৈ তাথৈ নাচিতেছেন, মনে হয় যেন কৃষ্ণবর্ণ মেঘের মধ্যে সৌদামিনী চমকিতেছে। রাধানাথের চক্ষু রক্তবর্ণ, অক্ষি-গোলক কৃষ্ণবর্ণ, দৃষ্টি মদমত্তকারী ও চল ভঙ্গী-বিশিষ্ট। তাঁহার মস্তকের মুকুট চকমক করিতেছে, কর্ণে মকর-কুণ্ডল

ঝলমল করিতেছে। "ফরহক্ত" বলিতেছেন, ভগবানের কুঞ্চিত অলকদাম ও ললাটের তিলক অতি সুন্দর ভাবে শোভা পাইতেছে।

(খ) মারো মারো হো শ্যাম পিচকারী হো ॥
তাক লগায়ে খড়ী সখিয়ন সংগ,
ওট লিয়ে রাধা প্যারী হো।
দেখো দেখো শ্যাম হুহৈ কোউ আরতি,
অবীর লিয়ে ভরি থারী হো ॥
ইক পিচকারী উর প্রভু মারো,
ভীজ জায় তন সারী হো।
"ফরহক্ত" নিরখি নিরখি য়হ লীলা,
হরি-চরনন বলিহারী হো ॥

হে শ্যাম, তুমি শীঘ্র পিচকারী মার, পিচকারী মার। ঐ দেখ তোমার প্যারী রাধা সখীদিগের আড়ালে দাঁড়াইয়া, তোমাকে পিচকারী মারিবার জন্য তাক করিতেছে। শ্যাম দেখ দেখ, ওদিকে আর এক সখী থালা ভরিয়া আবির লইয়া আসিতেছে। প্রভু, আর এক পিচকারী উহাকেও মার, যাহাতে উহার সমস্ত শরীর ভিজিয়া যায়। "ফরহক্ত" শ্রীকৃষ্ণের এই অপূর্ব্ব দোল-লীলা দেখিয়া কৃতার্থ হইয়া বলিতেছেন "ধন্য ভগবান শ্রীহরির চরণ"।

২৩। আলম...

জসুদাকে অজির বিরাজৈঁ মনমোহন জু,
অংগ রজ লাগে ছবি ছাজৈঁ সুরপালকী।
ছোটে ছোটে আছে পগ ঘুঁঘুরু ঘুমত ঘনে,
জাতেঁ চিত হিত লাগে, শোভা বাল জালকী ॥
আছি বতিয়া সুনাবৈ, ছিন ছাঁড়িবো ন ভাবৈ,
ছাতীসোঁ ছাপাবৈ লাগে ছোহ বা দয়াল কী।
হেরি ব্রজনারী হারী, বারী ফেরী ডারী সব,
"আলম" বলৈয়া লীজৈ ঐসে নংদলালকী।

মাতা যশোদার প্রাঙ্গণে মনোমোহন শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ধূলি লাগিয়াছে, তাহাতে তাঁহার মূর্ত্তি সুররাজের ন্যায় সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছে। সুন্দর ছোট ছোট পায়ে ঘুঙুরগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া মধুর রুনু ঝুনু শব্দে বাজিতেছে; তাঁহার কেশদামের কি অপূর্ব্ব শোভা, দেখিয়া চিত্ত মোহিত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ অতি মধুর মধুর বাক্য শুনাইতেছেন। শুনিয়া আর তাঁহাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা করে না। গোপিনীগণ তাঁহাকে বক্ষে ধরিয়া আলিঙ্গন করিতেছেন; তাহাতে দয়াল কৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদিগের অনুরাগ বাড়িতেছে। শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে দেখিতে ব্রজ-নারীগণ হার মানিতেছে কিন্তু আবার তাঁহার প্রতিই নিজেকে উৎসর্গ করিয়া দিতেছে! "আলম" বলিতেছেন, বলিহারী সেই নন্দলাল।

২৪। তালিবশাহ...

মহবুব বাগে সুহাগে বনে হৈঁ,
মনমোহন গরে মাল ফুলোঁ কি লিয়ে হৈঁ।
মহারঙ্গ মাতে জমাতে মদনকে,
বিলোকত বদন খৌরী চন্দন দিয়ে হৈঁ।
য়হী বেশ হরিদেব ভ্রুকুটী তুম্হারে,
মুলকুটী ভ্রমর দেখ মা লখ লিয়ে হৈঁ।
দিয়ানা হুয়া হৈ নিশানা দরশকা,
"সুতালিব" য়হী শ্যাম গিরবর লিয়ে হৈঁ।

বৃন্দাবন-স্বামী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আজ অতি অপরূপ সাজে সাজিয়াছেন। মনোমোহনের গলায় সুন্দর ফুলের মালা দুলিতেছে। আজ মহারঙ্গে মাতিয়া তিনি মদনেরও গর্ব্ব চূর্ণ করিয়াছেন। আহা ভগবানের বদনের চন্দন-রেখার কি অপূর্ব্ব শোভা! হে হরিদেব, তোমার এই বেশ ও ভ্রমর-কৃষ্ণ বঙ্কিম ভ্রূযুগল দেখিবার জন্য আমি পাগল হইয়াছি। সুতালিব বলিতেছেন, এই শ্যামসুন্দরই গিরিবর গোবর্দ্ধনকেও ধারণ করিয়াছিলেন।

২৫। মহবুব...

আগে ধেনু ধারি গেরি গ্বালন কাতার ভাবেঁ,
ফেরি ফেরি টেরি ধৌরী ধূমরীন গনতে।
পোঁছি পটকান অংগোঁছনসোঁ পোঁছি পোঁছি,
চুমি চারু চরণ, চলাবৈ সু-যমুনতে।
কহৈ "মহবুব" ধরা মুরলী অধর ধর,
ফুঁকি দই খরজ নিখাদকে সুরনতে।
অমিত অনংগ ভরে কন্দ ছবি বৃন্দরতে,
মংদগতি আবত মুকুন্দ মধুবনতে।

বৃন্দাবনের সুন্দরমূর্ত্তি মুকুন্দ অত্যন্ত আনন্দের সহিত ধীরে ধীরে মধুবন হইতে গোচারণ শেষ করিয়া ফিরিতেছেন। তাঁহার সম্মুখ ভাগে গাভীগণ সুন্দরভাবে শ্রেণীবদ্ধ।

শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ 'ধবলী' "শ্যামলী" বলিয়া ডাকিয়া তাহাদিগকে ফিরাইতেছেন। কাহারও পুচ্ছ গামছা দিয়া মুছিতেছেন, কাহারও চরণ চুম্বন করিতেছেন, কাহাকেও মধুর বচন বলিতেছেন; এইভাবে গাভীগণকে তিনি চালাইতেছেন। "মহবুব" বলিতেছেন, হে ভগবান, তুমি একবার তোমার মুরলী অধরে ধরিয়া একটু ফুঁ দাও, উহা হইতে ষড়জ, নিখাদ প্রভৃতি স্বর বাহির হউক, গাভীগণ সেই মুরলীধ্বনিতে মুগ্ধ হইয়া নিজেরাই ঠিক রাস্তায় চলিবে, তোমাকে এত কষ্ট করিতে হইবে না।

২৬। নফীস খলীলী···

কনহৈয়াকী আঁখে হিরন-সো নশীলী।
কনহৈয়াকী শোখী কলীসী রসীলী।
কনহৈয়াকী ছবি দিল উড়ালেনেবালী।
কনহৈয়াকী সুরত লুভা লেনেবালী।
কনহৈয়াকী হর বাতমে এক রস হৈ।
কনহৈয়াকা দীদার সীখোঁ কফস হৈ॥

আমার কানাই-এর চক্ষু হরিণের চক্ষুর ন্যায় নেশাবিশিষ্ট। কানাই-এর ভাব পুষ্প-কলিকার ন্যায় রসাল। কানাই-এর মূর্ত্তি মনোহর, কানাই-এর প্রেম লোভজনক। কানাই-এর প্রত্যেক বচনই একমাত্র প্রেমরস-পূর্ণ; কানাই-এর দৃষ্টি কঠিন পিঞ্জরের ন্যায়, অর্থাৎ একবার সে দৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করিলে আর বাহির হওয়া যায় না।

২৭। সৈয়দ কাসিমঅলী···

মোহন প্যারে জরা গলিয়োঁমে হমারী আজা,
আজা, আজা, ইধর এ কৃষ্ণ কনহৈয়া, আজা।
দুখ হরনেকে লিয়ে তুনে ন কিয়া হৈ ক্যা ক্যা,
ফির বহ বংশী লিয়ে জমুনাকে কিনারা আজা।
লাখোঁ গৌএঁ তেরী অব ফিরতী হৈঁ মারী মারী,
শকল তুঝসে হী এক নংদ-দুলারে আজা।
তেরি ইস ভূমিমেঁ আফত হৈ গজব ধূমোঁকী,
ভিলমিলাকে হএ ভারতকো বচা যা, আজা।
গরচে তৈঁ ঐ বশ, তো আয় ইশারে, তেরে,
অব নহীঁ তাব পহে হিজরকী প্যারে আজা।
কমূ ন আ কি তেরে বাস্তে "অলী" ব্যাকুল হৈ,
কর্ম-ভূমিমেঁ যহী কর্ম সিখানে আজা।

হে আমার প্রিয় মনোমোহন, তুমি একবার আমার এই রাস্তায় এস। হে কৃষ্ণ কানাই একবার এদিকে এস, একবার এস। তুমি লোকের দুঃখ হরণের জন্য কি না করিয়াছ? তুমি আমাদিগের সন্তাপ দূর করিবার জন্য তোমার বংশী লইয়া যমুনার তীরে একবার এস। লক্ষ লক্ষ ধেনু আজ তোমার অভাবে এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; তাহাদিগের মন তোমাতেই লাগিয়া রহিয়াছে, তুমি একবার এস। তোমার এই বৃন্দাবন তুমি আজ বহু উৎপাতে বিপর্য্যস্ত; তুমি এক মুহূর্ত্তের জন্য আসিয়া এই ভারতকে বাঁচাইয়া যাও; তুমি একবার এস, একবার এস। তুমি যদি এখন আসিতে না পার, একবার আড়াল থেকে একটু ইসারা করিয়া আমাকে জানাইয়া দাও, তুমি কবে আসিবে। তোমার বিরহ সহ্য করিবার ক্ষমতা যে আর আমার নাই; হে জগতের প্রিয়জন, তুমি একবার এস। তোমার জন্য 'অলী' ব্যাকুল হইয়াছে, তুমি একবার শীঘ্র এস। তুমি এই কর্ম্মভূমিতে কর্ম্ম শিখাইবার জন্য একবার এস।

২৮। য়ারী সাহব···

(ক) গগন-গুফামেঁ বৈঠিকে রে,
অজপা জপে বিন জীভ সেতী।"
ত্রিকুটী সংগম জোতি হৈ রে,
তহঁ দেখি লবৈ গুরু-জ্ঞান সেতী।
শূন গুফামেঁ ধ্যান ধরৈ,
অনহদ সুনৈ বিন কান সেতী।
"য়ারী" কহৈ, সো সাধু হৈ রে,
বিচার করৈ গুরু ধ্যান সেতী॥

গগন-গুহাতে বসিয়া বিনা জিহ্বায় অজপা জপ কর। ত্রিবেণী-সঙ্গমে, অর্থাৎ ইড়া-পিঙ্গলার সংযোগ-স্থলে পরম জ্যোতি বিদ্যমান; গুরু-দত্ত জ্ঞান দ্বারা সেই জ্যোতি দেখিয়া লও। শূন্য গুহায় বসিয়া ধ্যান কর, বিনা কর্ণেই সেই অনাহত ধ্বনি শুনিতে পাইবে। "য়ারী" বলিতেছেন, তিনিই প্রকৃত সাধু, যিনি বিচারপূর্ব্বক গুরুর নিকট হইতে সেই ধ্যান লাভ করিয়াছেন।

(খ) আপমেঁ আপকো আপ দেখৈ,
চিত্ত কহু নহি চিত্ত জাবৈ॥

যখন তুমি আপনার ভিতর আপনাকে দেখিবে, তখন আর তোমার চিত্ত অন্য কোনও দিকে যাইবে না।

(খ) কই মূল ন ডার ন পাত হৈ রে,
বিন সীঁচে বাগ সহজ ফুলা।
বিন ডাঁড়ীকা ফুল হৈ রে,
বিবাসকে বাস্ উঁরর ফুলা।
দরিয়াহকে পার হিংডোলনা রে,
কোউ বিরহী বিরলা আ ঝুলা।
"যারী" কহৈ ইস ঝূলনমেঁ,
ঝুলৈ কোউ আসিক দোলা।

যেখানে মূল নাই, ডাল নাই, পাতা নাই, জল সিঞ্চন না করিলেও যেখানে সহজ ফুল ফুটে, যেখানে বৃন্ত অভাবেও ফুল বর্ত্তমান, যেখানে গন্ধ অভাবেও ভ্রমর-ভুলানো সুগন্ধ নিত্য প্রবাহিত, সমুদ্রের অপর পারে সেই বাগানে হিণ্ডোল (ঝুলনের দোলা) ঝুলিতেছে। "যারী" বলিতেছেন, এই ঝুলনের কদাচিৎ কোনও আকাঙ্ক্ষী বিরহী ঝুলিয়া দোল খাইতে পারে।

২৯। মংসুর…

অগর হৈ শৌক মিলনেকো,
তো হরদম লৌ লগাতা জা।
জলাকর খুদনুমাঈকো,
ভসম তনপর লগাতা জা।
পকড় কর ইশককী ঝাড়ু,
সফা কর হিজ্রএ দিলকো,
দুঈকী ধূলকো লেকর,
মুসল্লেপর উড়াতা জা।
মুসল্লা ফাড়, তসবী তোড়,
কিতাবেঁ ডাল পানীমেঁ।
পকড় তু দস্ত ফিরস্তোঁকা,
গুলাম উনকা কহাতা জা।
ন মর ভূখোঁ, ন রখ রোজা,
ন জা মসজিদ ন কর সিজদা,
বজুকা তোড় দে কুজা,
শরাবে শৌক পিতা জা।
হমেশা খা, হমেশা পী,
ন গফলতসে রহো ইকদম,
নশেমেঁ সৈর কর, অপনী
খুদীকো তু জলাতা জা।
ন হো মুল্লা, ন হো ব্রাহ্মণ,
দুঈকো ছোড় কর পূজা।

হুকুম হৈ শাহ কলংদরকা,
অনলহক তু কহাতা জা।
কহে মংসুর মস্তানা,
মৈঁনে হক দিলমেঁ পহচানা,
বহী মস্তোঁকা ময়খানা,
উসীকে বিচ আতা জা।

যদি সেই ভগবানের সহিত মিলনের ইচ্ছা তোমার থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বদাই তাঁহাতে মনের লয় করিতে চেষ্টা কর। "আমি "আমার" ইত্যাদি বোধ (অহংকার) জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ করিয়া, সেই ভস্ম সর্ব্বাঙ্গে লাগাও। প্রেমের ঝাড়ু দিয়া হৃদয়ের অন্তস্থলের যাবতীয় ময়লা ও আবর্জ্জনা পরিষ্কার কর। দ্বিত্ব-জ্ঞানকে ধূলা করিয়া উড়াইয়া দাও। নমাজের চাটাই ছিড়িয়া ফেল, জপের মালা ভাঙ্গিয়া ফেল, শাস্ত্র-গ্রন্থাদি জলে ডুবাইয়া দাও; কেবলমাত্র যিনি ভগবানের দূত তাঁহার হাত ধরিয়া বল, "ভগবান্, আমি তোমারই দাস"। উপবাস করিয়া মরিও না, রোজা করিও না, মসজিদে যাইও না, প্রণাম করিও না, ওজু করিবার জলপাত্র ভাঙ্গিয়া ফেল; কেবলমাত্র প্রেমের মদিরা পান করিয়া নেশায় ভরপুর হইয়া থাক। ক্ষুধা পাইলেই খাও, পিপাসা পাইলেই জল পান কর। ভগবানের নামে একদম উদাসীন হইয়া থাকিও না। অহমিকাকে জ্বালাইয়া দিয়া সেই ভগবানের নেশায় মসগুল হইয়া বিচরণ কর। মোল্লা হইও না, ব্রাহ্মণও হইও না। উভয়কেই ছাড়িয়া দিয়া আত্ম-পূজা কর। শাহ কলংদরের হুকুম তুমি কেবল সোঽহং সোঽহং বলিতে থাক। পাগল মংসুর বলিতেছেন, আমি আমার হৃদয়মধ্যেই আমার নিজস্ব আত্মতত্ত্ব চিনিয়া লইয়াছি; উহাই সেই ভগবানের সরাবখানা; তুমি যদি নেশা করিতে চাও ত সেই সরাবখানার ভিতরে চলিয়া এস।

৩০। কবীর বখস…

(ক) কৈসে তুম আ নৈহরবা ভুলানী?
সইয়াঁকা মহলা কবহুঁ নাহি জানী।
কাম কিয়ো নিত নিজ-মন-মানি,
পিয়াকী সুধ কাহে বিসরানী?
ঠেঁঠী চাল অজহুঁ তজ মুরখ,
চাহ পিয়াকী রহ দিওয়ানী?

মদ-মাতী ইটলাত ফিরতি কা,
 গোরী, কা তেরে হিয়মেঁ সমানী ?
গুন-ঢংগসো জো পিয়াকো রিঝাবৈ।
 "করীম" বহী হৈ সখী সয়ানী ॥

হে রমণি, তুমি এখানে আসিয়া কেমন করিয়া তোমার বাপের বাড়ীর কথা একেবারে ভুলিয়া গেলে ? তুমি তোমার হৃদয়ের স্বামীর কথা মানিতেছ না কেন ? তুমি ত নিত্যই নিজের খেয়াল-মত্ত কাজ করিতেছ। তোমার প্রিয়তমের কথা কেন ভুলিয়া গেলে ? রে মূর্খ, তোমার বাঁকা চাল-চলন ছাড়িয়া দাও ; এ জীবন ত দু চার দিনের জন্য! সুন্দরী, দেখিতেছি তুমি মদমত্ত হইয়া গর্ব্বভরে ফিরিতেছ ; তোমার হৃদয়ে কি প্রবেশ করিয়াছে ? "করীম" বলিতেছেন, তুমি নিশ্চয়ই জানিও, যে রমণী নিজের গুণ ও ব্যবহার দ্বারা নিজের প্রিয়তমকে খুসী করিতে পারে, সেই সখীই বুদ্ধিমতী।

(খ)

মুঝ পাপীকা পাপ ছুড়াও
 ডুবত বেরা পার লগাও।
ঝাঁঝরি নাব, পতবার পুরানা,
 বহু ডর মোরে হিয়ে সমানা।
জো তুম সুধ নহি লৈহো মোরী,
 বৈরি মাঝ মোহী দৈহে বোরী।
দিও বৈরি ইক সংগ লগায়ে,
 জো সীধে পথসোঁ দে বহকায়ে।
দেত দোহাঈ হোঁ অব তোরী
 হোহু সহায় বিপত্তমে মোরী ॥

হে ভগবান, তুমি এই পাপীর পাপ ছাড়াইয়া দাও। আমার এই জীবন-তরী ভবসাগরে ডুবিতেছে, তুমি পারে পৌছাইয়া দাও। আমার এই নৌকা বহু ছিদ্রবিশিষ্ট (একদম ঝাঁঝরা), হালটিও পুরাতন ; কাজেই আমার মনে ভয় হইতেছে। এখন তুমি যদি আমার খবর না লও, তাহা হইলে আমাকে শত্রুদিগের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হইবে। তুমি আমার সঙ্গে এক শত্রু দিয়াছ, সে সোজা রাস্তা হইতে আমাকে দূর করিয়া দেয়। আমি তোমার দোহাই দিতেছি, এই বিপদে তুমি আমার সহায় হও।

৩১ দীন দরবেশ…

হিন্দু কহৈ সো হম বড়, মুসলমান কহৈ হম্ম।
এক মূংগ দো ফাড় হৈ, কুণ জাদা কুণ কম্ম ॥
কুণ জাদা কুণ কম্ম, কভী করনা নহিঁ কজিয়া।
এক ভগত হো রাম, দূজা রহিমানসে রজিয়া ॥
কহৈ "দীন দরবেশ" দোয় সরিতা মিল সিন্ধু।
সবকা সাহব এক, এক মুসলিম এক হিন্দু ॥

হিন্দু বলেন আমি বড়, মুসলমান বলেন আমি শ্রেষ্ঠ। একটি মুগ ভাঙ্গিয়া দুইটি ডাউল ; ইহার মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠই বা কে, আর ইতরই বা কে ? ভাই, কে বড়, কে ছোট, ইহা লইয়া ঝগড়া করিও না। একজন রামের ভক্ত, অপরে রহিমানের উপাসক মাত্র "দীন দরবেশ" বলেন, যেমন দুই নদীর মিলন-স্থান একই সাগর, সেইরূপ হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই ভগবান্ একই।

৩২। দরিয়া সাহব (বিহার)…

রাম নাম নহিঁ হিরদে ধরা,
 জৈসা পশুয়া তৈসা নরা।
পশুয়া-নর উদ্যম কর খাবৈ,
 পশুয়া তো জংগল চর আবৈ।
পশুয়া আবৈ পশুয়া জায়,
 পশুয়া চরে পশুয়া খায়।
রাম নাম ধ্যায়া নহিঁ মাঈ,
 জনম গয়া পশুয়াকী নাঈঁ।
রাম নামসে নাহীঁ প্রীত,
 য়হ হী সব পশুবোঁকী রীত।
জীবত সুখ দুখমেঁ দিন ভরৈ,
 মুয়া-পছে চৌরাসী পরৈ।
জন "দরিয়া" জিন রাম ন ধ্যায়া,
 পশুয়া হী জোঁ জনম গঁবায়া।

যে নর হৃদয়ে রাম নাম ধারণ না করে, সে পশুতুল্য। নর-পশু নানা চেষ্টা করিয়া আহার সংগ্রহ করে, আর সাধারণ পশু জঙ্গলেই চরিয়া খায়। সকল পশুই আসে, যায়, (জন্মায় মরে) চরে ও খায়। রামনাম-ধ্যান যাহারা করে না, তাহাদের জন্ম পশুদিগের ন্যায়ই কাটিয়া যায়। পশুর রীতিই এই যে, তাহাদিগের রামনামে প্রীতি নাই। তাহারা জীবিত অবস্থায় সুখ-দুঃখে কাল কাটায় ও মৃত্যুর পর চৌরাশিলক্ষ যোনি ভ্রমণ করে। রাম "দরিয়া"

বলেন, যে নর রামনাম ধ্যান করে না, সেও পশুর মতই জীবন কাটাইয়া দেয়।

৩৩। কাজী অশরফ মহমুদ…

ঠুমুক ঠুমুক পগ, ঝুমুক ঝুংক-মন,
চপল চরণ হরি আয়ে,
হো হো চপল চরণ হরি আয়ে,
মেরে প্রাণ-ভুলায়ন আয়ে,
মেরে নয়ন-লুভায়ন আয়ে॥
ঝিমিক ঝিমিক ঝিম,
ঝিমিক ঝিমিক ঝিম,
নর্তন পদ-ব্রজ আয়ে,
হো হো নর্তন পদ-ব্রজ আয়ে
মেরে প্রাণ-ভুলায়ন আয়ে,
মেরে নয়ন-লুভায়ন আয়ে॥
অরুণ করুণ নয়,
হিয় হিয় তন,
করম বাণ রবি আয়ে,
হো হো করম বাণ রবি আয়ে,
মেরে প্রাণ-ভুলায়ন আয়ে,
মেরে নয়ন-লুভায়ন আয়ে॥
অমল কমল কর,
মুরলী মধুর ধর,
বংশী বজায়ন আয়ে,
হো হো বংশী বজায়ন আয়ে,
মেরে প্রাণ-ভুলায়ন আয়ে,
মেরে নয়ন-লুভায়ন আয়ে॥
পুংজ পুংজ হয়,
কুংজ কুংজ ভয়,
ভুংগ-রংগ হরি আয়ে,
হো হো ভুংগ-রংগ হরি আয়ে,
মেরে প্রাণ-ভুলায়ন আয়ে,
মেরে নয়ন-লুভায়ন আয়ে॥
ঝুন ঝুন ঝুল ঝুল,
মংজুল বুল বুল,
ফুল মুকুল হরি আয়ে,
হো হো ফুল মুকুল হরি আয়ে,
মেরে প্রাণ-ভুলায়ন আয়ে,
মেরে নয়ন-লুভায়ন আয়ে।

পদটিতে সাধকের আন্তরিক ভাবের উন্মাদনা অতি পরিষ্কার ভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পল্লী-জননী

—শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার

রক্ত-রঙিন মন্দার ফুল
শিশির সিক্ত করি',
কে আজি শিরেতে বরণের ডালা
সাজায়েছে মরি মরি!
বনকুন্তলা পল্লীর বুকে,
দাঁড়ায়ে জননী আজি হাসি মুখে;
গন্ধ-বিধুর কাঞ্চন ফুলে
সাজায়ে অর্ঘ্য করি,
দিতেছে পল্লী-জননীর পায়ে
বেদনায় আঁখি ভরি'।

সরিষার ক্ষেতে হরিৎ আঁচল
লুটিছে চরণ তলে,
সন্ধ্যার তারা—সিন্দুর টীপ,
ললাটে উঠিছে জ্বলে';
সাতনরী হার বুঝি খুলে পড়ে'
মটরশুটীর ফুলে গেছে ভরে,
হার-ছেঁড়া মণি কুড়াতে আসিয়া
ভিক্ষুক দলে দলে,
লুটিছে পল্লীজননীর পায়ে
ভাসিয়া নয়ন জলে।

প্রথম বই

—শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

সুরেশের সহিত আমার বহুদিনের বন্ধুত্ব কিন্তু মাঝে আর দেখা-সাক্ষাৎ না হওয়ার দরুণ তাহাকে একরকম ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। সে আজ অনেক দিনের কথা—তখন নালদহে পড়িতাম, সুরেশও আমার সহিত পড়িত। তারপর ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া কলিকাতায় আসি। সুরেশের খবর আর রাখি নাই, সেও রাখে নাই। মধ্যে অনেকদিনের ব্যবধান - ইহার মধ্যে বয়সের সাথে সাথে যেমন দেহ ও মনের পরিবর্ত্তন হইল, তেমনই পারিপার্শ্বিক অবস্থারও পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। বি-এ পাশ করিয়া যখন বাহির হইলাম, তখন চতুপার্শ্বে সতর্ক দৃষ্টি চালাইয়া আয় করিবার মত কোন পন্থাই আর বাহির করিতে পারিলাম না। অগত্যা ল' পাশ করিয়া দ্বিতীয় রাসবিহারী ঘোষ হইবার ইচ্ছা বক্ষের সুগোপন প্রদেশে সঙ্গোপনে রাখিয়া ল' ক্লাশে ভর্ত্তি হইব, ইহাই দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া ফেলিলাম। কিন্তু কিছুই হইল না, শুধু বাংলাদেশ যে দ্বিতীয় রাসবিহারী হারাইল মাত্র ইহাই নয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনে এক অভাবনীয় বিপর্য্যয় ঘটিয়া গেল। একদা এক ফাল্গুন প্রভাতে যে বস্তুর সন্ধান পাইলাম, তাহাতে আমার হৃদয়ের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত যুগপৎ আনন্দ, বিস্ময়, সুখ ও আহ্লাদ, সকল সুখদায়ক পদার্থের তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া আমার জীবনকে এক নূতন স্রোতে ভাসাইয়া লইল—আর সেই সঙ্গে ল' ক্লাশের কথা ডুবিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

হাতের পত্রখানির দিকে তাকাইয়া প্রফুল্ল মনে আর একবার হাসিলাম। চিঠিখানি আর কিছুই নয়—মাত্র আমার বিবাহের সংবাদ। বাবা জানিতে চাহিয়াছেন, বিবাহে আমার মত আছে কি না। ভাবিয়া দেখিলাম, পিতৃভক্ত সন্তানের পিতৃ আদেশ শিরোধার্য্য করাই কর্ত্তব্য। অতএব আমার আবার মতভেদ কি? বাবা জানাইয়াছেন, মেয়েটি দেখিতে সুশ্রী এবং লেখাপড়াও জানে - ইহা ছাড়া দেনাপাওনার পরিমাণ নিন্দনীয় নহে, বরং বেশ ভালই। আমি আর একবার হাসিলাম। ইহার পর ল' ক্লাশ সম্বন্ধে কোন কথাই না ভাবিয়া, তাহাকে সমূলে মন হইতে উড়াইয়া দিয়া বিবাহ করিয়া বসিলাম। আমার দিক হইতে মাত্র এই— তবে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। আমার শ্বশুর-শাশুড়ীর পুত্র বলিতে বা কন্যা বলিতে ঐ আমার স্ত্রী সেই হেতু একমাত্র মেয়ের উপর আদর-যত্ন সমধিক হওয়া অকারণ নয়। ইহা ছাড়া কলিকাতা ছাড়িয়া পাড়াগাঁয়ে বাস করার কথা তাঁহাদের মেয়ে বা তাঁহারা কল্পনাই করিতে পারেন না—অতএব আমিই স্থায়ীভাবে শ্বশুরালয় বিডন ষ্ট্রীটে থাকিয়া গেলাম। আছি বেশ, বিনা পরিশ্রমে আহার ও নিদ্রাকে আমি পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে করি। ইহাই আমার ইতিহাস—

সুরেশ যে এই সহরেই আছে তা জানিতাম, কিন্তু কোনদিনই খোঁজ করি নাই, আর খোঁজ করিবার প্রয়োজনও বোধ করি নাই। বন্ধুর প্রয়োজন যে অবস্থায় হয়, সুরেশ তাহার উপযুক্ত হইলে অবশ্য খোঁজ করিতাম। অর্থের প্রয়োজনে বন্ধুর দরকার, আর অর্থ থাকিলেও অর্থবান্ বন্ধুর দরকার হয়। সুরেশ যে ঐ দুটির একটিও নয়, এটি জানিতাম। তাই তাহার কোনদিনই খোঁজ করি নাই!

সেদিন সকালবেলা এবং শীতের সকালও বটে। আরাম করিয়া বসিয়া চা খাইতেছি এবং সখ হিসাবে খবরের কাগজ উল্টাইতেছি। এমন সময় দরজার কাছে কে যেন আসিয়া দাঁড়াইল। লোকটিকে দেখিলাম, দেখিবার কিছুই নাই। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির সবগুলি লক্ষণই তাহার সমস্ত দেহে ফুটিয়া উঠিয়াছে। চক্ষে হতাশা এবং ক্ষুধা, দেহ শীর্ণ এবং সর্ব্বদেহে সর্ব্বগ্রাসী দৈন্যের সুস্পষ্ট চিহ্ন। ভালভাবে তাকাইয়া দেখিলে মনে হয়, ভিতরে ভিতরে বহুদিন হইতে আগ্নেয়গিরির অগ্নি-বমন সুরু হইয়া গিয়াছে। ভিতরে সে শ্রান্ত এবং পরমুখাপেক্ষী—

লোকটি ভিতরে আসিয়া বসিয়া অত্যন্ত মৃদুস্বরে কহিল,

কেমন আছ, আমায় চিনতে পারছ না, আমি সুরেশ—। নাম শুনিয়া বিশেষ আনন্দ পাইলাম না, নিরানন্দ কণ্ঠে কহিলাম, ও তাই না কি? তা বেশ, কিন্তু এখানে কোথায়?

সুরেশ যেন একটু মলিন হইয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই আমার শুষ্ক অভ্যর্থনাকে সাদরে বরণ করিয়া লইয়া হাসিয়া কহিল, ভাই, লোকে বলে কালের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, সঙ্গে সঙ্গে দেহের ও মনের। আজ সেটা দেখে শিক্ষা হল। মনে কিছু ক'র না ভাই—

আমি তেমনই নিঃস্পৃহকণ্ঠে জবাব দিলাম, বিন্দুমাত্র নয়। তবুও সহজ ভদ্রতা একটা আছে—অবশ্য এটাও আবরণ। বলিলাম, চা খাবে। খাবে না, তা বেশ। এখন কি করা হয়?

সুরেশ যেন অন্যমনস্ক ছিল, তাই সামান্য পরে জবাব দিল, বিশেষ কিছুই নয়।

—বেশ, ভাল কথা, এর আগে কি বলছিলে না—কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে দেহের আর মনের? তোমার দিক হতে বিচার করলেই, এ বিরক্তকর কথাটা উঠত না। অর্থের প্রাচুর্য্যে আমার যেমন পরিবর্ত্তন—তেমনই অর্থের অভাবে তোমার পরিবর্ত্তন। টাকার এপিঠ ওপিঠ আর কি। দিন আর রাত, সুখ আর দুঃখ এমনি করেই ঘোরে। এখন উদ্দেশ্য কি সুরেশ?

সুরেশ সামান্য এক মুহূর্ত্ত কি যেন ভাবিল, তারপর মাথা তুলিয়া কহিল, উদ্দেশ্য বিশেষ কিছুই নয়, শুধু তোমাকে দেখাটাই উদ্দেশ্য—বহুদিনের পুরাতন বন্ধু তুমি। মৃদু হাসিয়া সুরেশ বলিতে লাগিল, কিন্তু তুমি আমায় হীন ভেব না। আমার অর্থের অভাব থাকতে পারে, কিন্তু আমি ভিক্ষুক নই। আমি যে ভিক্ষুক নই, এটাই আমার গর্ব্ব—এই অহঙ্কারই আমায় বাঁচিয়ে রেখেছে। অর্থের অভাব সত্যই, সম্ভবতঃ সেটা সর্ব্বাঙ্গেই প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু আমি ভিক্ষুক নই, শুধু এই কথাটাই তোমায় শোনাতে এসেছি। অন্যের কাছে বলা সম্ভব নয়, লোকে পাগল ভাবে। কিন্তু আমি পাগল নই, মস্তিষ্ক আমার সুস্থ, কিন্তু দেহ সুস্থ নয়। তাই সমাপ্তির পূর্ব্বে নিজস্ব অহঙ্কার একমাত্র তোমার কাছেই প্রকাশ করে গেলাম, এতে আনন্দ হয়, আমি তৃপ্ত হই।

আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম, মনে হইল কথাগুলি অপ্রাসঙ্গিক, এগুলি আমায় না বলিলেও চলিত।

দেখি তাহার দুই শীর্ণ চক্ষু জ্বলিতেছে, তাহার মুখ দীপ্ত, ললাট প্রসারিত। আমার মনে হইল, সে এখনই বুঝি ললাট-নেত্রের বহ্নি ফুটাইয়া সমস্ত বিশ্বকে ভস্মীভূত করিয়া দিবে।

আর কোন কথা না বলিয়া নীরবে উঠিয়া সুরেশ কহিল, আজ আসি ভাই। সুরেশ বিদায় লইল। তাহার গমন-পথের দিকে চাহিয়া মনে মনে হাসিয়া ভাবিলাম, শুধু এই কথা বলিবার জন্য সুরেশ নিশ্চয়ই আসে নাই। কি জন্য সে আসিয়াছিল তাহাও অস্পষ্ট নয়। হাত পাতিলে হয়তো বাল্য-স্মৃতি স্মরণ করিয়া কিছু দিতাম বোধ করি। তাহার পদশব্দ দূরে মিলাইয়া গেল, তবুও আমি নিঃশব্দে বসিয়া রহিলাম। মনের ভিতর কি একটা সুতীক্ষ্ণ বস্তু খচ্ খচ্ করিয়া বাজিতেছে মনে হইল, আমার চারিটি দেওয়াল-ঘেরা চতুষ্কোণ ঘরটির ভিতর যে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি ছিল, তাহা সুরেশের কণ্ঠস্বরে যেন ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া, আমাকে নিরতিশয় অশান্তির পাকে ঘুরাইতে লাগিল।

সুরেশের কথাটি কোনমতেই ভুলিতে পারিলাম না। তাহার ক্ষুধার্ত্ত চক্ষু, শীর্ণ দেহ, সর্ব্বক্ষণ চক্ষের সম্মুখে দুলিতে লাগিল। ভাবিলাম, তাহাকে ক্লেশ দিয়া ভাল করি নাই। কিন্তু সত্যই কি তাহাকে দুঃখ দিয়াছি, তবুও একটা অশান্তিতে মন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

*

সেদিন কোন প্রয়োজন বশতঃ সন্ধ্যাবেলাতেই বাড়ী ফিরিতেছিলাম—আপন মনে ধীরপদে সিগারেট টানিতে টানিতে হাঁটিতেছিলাম, হঠাৎ পিছন হইতে কাহার ডাক শুনিয়া চমকাইয়া উঠিলাম। পিছন ফিরিয়া দেখি, সুরেশ।

সুরেশ বলিল, মনে কিছু কর না ভাই—তোমায় দেখে বড্ড ডাকতে ইচ্ছে হল। এস না একবার, কাছেই আমার আস্তানা।—সুরেশ বড়ই করুণনেত্রে চাহিয়া এমনভাবে কথা কহিল, যেন সে ভিক্ষাপ্রার্থী। তাহার পিছনে পিছনে চলিতে লাগিলাম। এ গলি সে গলি করিয়া, এক অন্ধকার সুদীর্ঘ অপরিচ্ছন্ন গলির ভিতরের ক্ষুদ্র এক খোলার ঘরে আসিয়া ঢুকিলাম।

অত্যন্ত অন্ধকার ঘর, আলো জ্বালা হইলেও অন্ধকার কমিল না। ঘরের চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া বুঝিলাম, এখানে কোনরূপে দেহটাকে রাখা যায়, কিন্তু সুখ নাই, শান্তি নাই।

—কি দেখছ ?

সেই শীর্ণ আলোকে দেখিলাম সুরেশ আমার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে। মামি-র মত শীর্ণ, নিরক্ত, বর্ণহীন তাহার মুখ—আর ক্ষুধিত, কোটর-প্রবিষ্ট দুই চক্ষু। মাথায় রুক্ষ রুক্ষ লম্বা রাশীকৃত চুল, গালের উপর অনেকদিনের দাড়ি।

সুরেশ বলিল, অবাক্ হয়ে যাচ্ছ, কিন্তু আমায় দেখে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। আমার ভাই মাপ করতে হবে, তোমায় এখানে এনে শুধু কষ্ট দিচ্ছি। কিন্তু বেশীক্ষণ ধরে রাখব না।

আবহাওয়াটাকে সামান্য তরল করিবার জন্য পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া নিজে ধরাইয়া আর একটি সুরেশকে দিলাম। ইচ্ছা ছিল, সুরেশের সম্বন্ধে কিছুই জিজ্ঞাসা করিব না। কিন্তু এই আলো-বায়ুহীন রুদ্ধ ঘরে বসিয়া আমার অজ্ঞাতসারেই মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, এই ঘরে কি করে থাক ?

সে হাসিয়া কহিল, এ ভিন্ন উপায় কি, অর্থহীন লোকের এই তো রাজপ্রাসাদ।

বলিলাম, বাড়ী যাও তো মাঝে মাঝে ? বাড়ীতে এখন কে কে আছেন ?

মৃদু হাসিয়া সুরেশ বলিল, বাড়ীতে কেউ নেই। আর সে বাড়ীর কোন চিহ্ন নেই, সব বানের জলে তলিয়ে গেছে—

সবিস্ময়ে কহিলাম, বানের জলে !

সুরেশ বলিল, তবে সব কথাই বলি। সেই মালদহের স্কুল থেকে পাশ করার পর তোমায় আমায় ছাড়াছাড়ি হল। তুমি কলকাতা এলে পড়তে, আর আমি চলে গেলাম বাড়ীতে। একদিন এক-বর্ষা রাত্রে নদীতে এল বান—বানের জলে গ্রাম ভেসে গেল। মানুষ, গরু, বাড়ীঘর কিছুই বাদ গেল না। বাবা, মা, ভাইবোন সবাইকে হারালাম। বাড়ী, ঘর, গ্রাম সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আর আমার কপালে দুঃখ আছে, তাই কোনমতে একটা গাছকে আশ্রয় করে বেঁচে গেলাম। এখন দেখছি সে, সবার বানের জলে তলিয়ে যাওয়াই ভাল ছিল। যাক্—তারপর অনেক কষ্টে—কিছুদিন পর কলকাতায় এলাম। এখন এক দোকানে কাজ করি, মাইনে ষোল টাকা দেয়—

বলিলাম, এতে চলে ?

শান্ত সুন্দর হাস্যে সে বলিল, কেন চলবে না, বেশ চলছে। ঘরভাড়া চার টাকা, থাকে বার। নিজেই রেঁধে খাই।

সুরেশ বলিল বটে বেশ আছি, কিন্তু আমার মনে হইল, এই স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘর, অপর্য্যাপ্ত সারহীন আহার, অতিরিক্ত পরিশ্রম—এতে অতি শীঘ্র যে কোন কঠিন রোগ আক্রমণ করিবে তাহা নিশ্চিত। ভিতরে ভিতরে যক্ষা যে আরম্ভ হয় নাই, তাহাই বা কে বলিল ?

একসময় সিগারেট টানা বন্ধ রাখিয়া বলিল, অজয়, আমি বই লিখেছি।

অবাক হইয়া কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিলাম, বই লিখেছ তুমি ?

আমার চোখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া সুরেশ কহিল, হাঁ, আমি বই আমি লিখব না তো কে লিখবে ? আমার জীবনের এই ছাব্বিশ বৎসরের প্রতি মুহূর্ত্তের জ্বালা-যন্ত্রণা, অভাব-অনটন, ক্ষুধার দুঃখ, সব তাতে ফুটে উঠেছে। আমার দুঃখ দিয়ে বিচার করে পৃথিবীর অগণন দুঃখী মানুষের কথা তাতে ফুটিয়ে তুলেছি। আমার বই শুধু মাত্র উপন্যাস নয়—ওটা দুঃখী মানুষদের বেদনার ইতিহাস, তাদের অশ্রুর ইতিহাস। বই তো আমিই লিখব অজয়—জীবনের কথা তুমি কি জান, জীবনে কতটুকু দুঃখ বেদনা পেয়েছ, অন্নাভাবের দুঃখ তুমি তো জান না। অথচ কি আশ্চর্য্য, যারা যে জিনিষের সঙ্গে পরিচিত নয়, তারাই তাই নিয়ে বই লেখে। সুরেশ হাসিল।

আমি তাকাইয়া দেখি, তাহার শীর্ণ মুখ উদ্দীপ্ত—ললাট প্রসারিত, আর দুর্ব্বল অঙ্গুলিগুলি মুষ্টিবদ্ধ।

বলিলাম, বই কখন লেখ ? সমস্তদিনই তো দোকানে থাকতে হয়—

—কেন, রাত্রে, সমস্ত রাত ধরে লিখি। চতুর্দ্দিক যখন নিঝুম, নিস্তব্ধ, যখন সবাই ঘুমে অচেতন, তখন লিখি।

ক্রমশঃ

—ক'খানা লিখেছ ?

মৃদু নিশ্বাস ফেলিয়া সুরেশ কহিল, একখানা শেষ হয়েছে, আর একখানা লিখছি।

রাত হইয়াছিল, বাহিরের দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন করিলাম, বই ছাপাবে তো ?

সুরেশ এবার দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, ইচ্ছা আছে—কিন্তু ভাই কেউই ছাপাতে রাজী হচ্ছে না—তাই মনে করেছি, নিজের টাকায় ছাপাব।

অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে বলিলাম, নিজের টাকায়, সব কি ? তোমার টাকা কোথায় ?

উৎসাহের সহিত সুরেশ বলিল, কেন, ঐ মাইনের টাকা থেকে মাসে মাসে জমাচ্ছি যে—

আমি সমস্ত বুঝিলাম, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, সুরেশ আমার মনে হয়, তুমি শরীরের দিকে নজর দিচ্ছ না—ঐ খাটুনির পর রাত জেগে লেখা আর ঐ খাবার খেয়ে, টাকা জমানর মানে কিছু বোঝ ? এ যে আত্মহত্যা করার সামিল।

সুরেশ তাহার হাত প্রসারিত করিয়া কহিল—তা জানি। কিন্তু আমায় তুমি নিষেধ ক'র না। মৃত্যু তো হবেই, সে আজই হোক আর কালই হোক। আমি প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুকে অনুভব করছি। যক্ষ্মার অন্তিম অবস্থার দারুণ যন্ত্রণা—অভাবের তীব্রতা, এ সমস্তই আমি মাথায় করে লিখেছি। এতো ক্ষণিক—কিন্তু আমার সাহিত্য-সৃষ্টি, সে যে মৃত্যুর চেয়েও মহান, মৃত্যুর চেয়েও শ্রেষ্ঠ। আমার এই সান্ত্বনা যে, আমার এই সাহিত্যসৃষ্টি, থাকবে ক্ষয়হীন গৌরবে প্রতিষ্ঠিত। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে যাবে, আমার নশ্বর দেহের কথা, আমার মৃত্যুর কথা লোকের মনে থাকবে না। কিন্তু আমার এই সাহিত্য-সৃষ্টিই আমায় চিরকালের মত অমর, অম্লান করে রাখবে।

সুরেশ ক্ষণেক থামিয়া বলিতে লাগিল, অজয়, আমার প্রথম বইখানির স্বপ্ন দেখছি। বাইরে আজও তার কোন আকার নেই, কিন্তু আমি দেখছি, তার অবয়ব কি সুশ্রী, অক্ষরগুলি কি সুন্দর, পাতাগুলি কেমন মসৃন। সুরেশের দুই জ্বালাময় রুক্ষ চোখ এক অপূর্ব্ব আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আমি আর কথা না বলিয়া, সেদিনের মত বিদায় লইলাম। বিদায় লইবার সময় সুরেশ উঠিয়া মৃদু হাসিল। সে হাসিটি বড় চমৎকার, আজও বেশ মনে আছে।

ইহার পর আর কয়দিন সুরেশের সহিত দেখা হয় নাই। সেও আসে নাই, তাই সেদিন সন্ধ্যাবেলায় মনে হইল, যাই উহার খোঁজটা লইয়া আসি। সন্ধ্যার সময় সেই গলির ভিতর ঢুকিয়া তাহার ক্ষুদ্র ঘরটির সম্মুখে দাঁড়াইলাম। কিন্তু দেখি দরজাটি খোলা, ভিতর অন্ধকার। কাহাকে ডাকিয়া তাহার খোঁজটা লইব ইহাই ভাবিতেছিলাম, হঠাৎ একজন দরজার পাশ হইতে গলা বাড়াইয়া কহিল, কাকে চান মশায়—

বলিলাম, সুরেশ বাবু কোথায় বলতে পারেন ?

লোকটি আমার কথায় বাধা দিয়া কহিল, ও, তিনি তো কাল রাত্রেই শেষ হয়েছেন, আমরাই তো দাহ করে এলাম।

ধক্ করিয়া বুকে আঘাত পাইলাম—সুরেশ মরিয়া গিয়াছে, এত শীঘ্র ?

লোকটি বলিয়া যাইতে লাগিল, মশায় সে কি রক্ত, বিছানা বালিশ রক্তে মাখামাখি। ও মরা কি কেউ সহজে ছোঁয়, শেষে অনেক কষ্টে,···ভাগ্যে মাষ্টের ছিল।

বলিলাম, রাখ তোমার মাষ্টারের কথা, তার জিনিষপত্র কি হল ?

লোকটা অত্যন্ত অশ্রদ্ধায় মুখে একটা শব্দ করিয়া কহিল, হ্যাঁ, জিনিষপত্র তো ভারী, ভাঙ্গা টিনের বাক্স, ফুটো ঘটী-বাটী, তবে পঁচিশটে টাকা একটা কাগজে জড়ান ছিল। তা সবই খরচ হয়েছে। লোকজনকে দিতে হয়েছে—দু'এক বোতলের দামও দিতে হয়েছে—তা আপনি কে হন তাঁর ?

বলিলাম, আচ্ছা তাঁর কতকগুলি খাতা ছিল, সেগুলি কোথায় ?

লোকটি বলিল, তা ছিল বটে কতকগুলি খাতাপত্তর —তা সবই তাঁর সঙ্গে দিয়েছি।

অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিলাম, সে খাতাগুলিও চিতায় দিয়েছ না কি ?

অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া লোকটি বলিল,—আর মশায়, না দিয়ে করি কি—কি আর হবে, যত সব বাজে কাগজ—তাই যার জিনিষ তার সঙ্গে দিলাম।

রাগ সামলাইতে না পারিয়া কহিলাম—বেশ করেছ, খুব করেছ, ষ্টুপিড্ কোথাকার !

লোকটি অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। আমি সদর রাস্তার দিকে চলিতে লাগিলাম।



রাজসাহী জিলা-পরিচিতি

—শ্রীসুশীল রায়

কৃষি

আমাদের দেশ আগাগোড়াই কৃষিপ্রধান। শতকরা নব্বইজন আমরা বাঁচিয়া আছি কৃষির উপর নির্ভর করিয়া। শিল্পোন্নতির যে কোন সুযোগ-সুবিধা আমাদের নাই, তাহা নহে। আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল উৎপন্ন হয়, যাহা দ্বারা আমরা অনায়াসেই আমাদের দেশকে কৃষির পাশাপাশি শিল্পের দিক্ দিয়াও উন্নত করিয়া তুলিতে পারি। অনেক বিদেশী লেখক উদ্ধত ভাবায় ব্যক্ত করিয়া থাকেন যে, আমাদের শিল্পোন্নতির কোনই সুযোগ নাই। কিন্তু চারিদিক বুঝিয়া দেখিলে আমরা তাঁহাদের উক্তি অস্বীকার করিতে পারি। কারণ শিল্পের জন্য যে সকল দেশ খ্যাতি বিস্তার করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই কাঁচামালের জন্য অন্য দেশের মুখের দিকে চাহিয়া আছে। কিন্তু ভগবানকে ধন্যবাদ, তিনি আমাদের উপর অনেকটা সদয় ব্যবহার করিয়াছেন; আমাদের দেশ কাঁচামালের দিক্ দিয়া দরিদ্র নয়। যদি সরকার বাহাদুর কৃষির উন্নতি জন্য চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে আমাদের দেশের কৃষকদের দারিদ্র্য যেমন লাঘব হইতে পারিত, তাঁহারাও তদনুপাতে লাভবান হইতেন।

কৃষিপ্রধান দেশ হইলেও, দেশে বর্তমানে জলসরবরাহ করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রায় কোথাও নাই বলিলেই চলে। জলের জন্য কৃষককে বর্তমানে আকাশের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয়। রাজসাহীতে কিছু কিছু খাল আছে, তা ছাড়া জমিদারগণ কর্তৃক কৃত পাতকুয়া, পুকুর ইত্যাদিও আছে। এই সকল স্থান হইতেই আবাদী জমিতে জল-সেচনের কাজ চলে। রাজসাহীতে সরকার বাহাদুর কৃত জল-সেচনের কোন ব্যবস্থা নাই। তাহা হইলেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, শস্যোৎপাদনের নিমিত্ত যে পরিমাণ জলের প্রয়োজন, তাহা সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা জমির মালিক কিংবা জমিদারকেই করিয়া লইতে হয়। সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হিসাব হইতে পাওয়া যায়: রাজসাহীতে জলসেচনের ব্যবস্থার জন্য যে খাল কাটা হইয়াছে তাহা সরকারের নয়, সাধারণের। এই খাল প্রায় ২৯০০ একর জমিতে জল সরবরাহ করিতে পারে। কিন্তু রাজসাহীর আবাদী ভূমির পরিমাণ হইতেছে ১০,১৯,৬০০ একর পরিমাণ জমি। এই পরিমাণ জমির জন্য আরও প্রচুর খালের দরকার। কিন্তু তাহা নাই। বাধ্য হইয়া ইঁদারা, পুকুর ইত্যাদি হইতে জল আনিয়া জমিতে ঢালিতে হয়। ইঁদারা হইতে জল আনিয়া ৩০৫০ একর জমি কিষান হয়; এবং পুকুর হইতে যে জল পাওয়া যায়, তাহাতে ৭৮০০ একর জমির কাজ চলে। তাহা ছাড়া টিউবওয়েল, বিল ইত্যাদি হইতে



(ক) আবাদী জমির পরিমাণ
(খ) যে পরিমাণ জমিতে জলসেচনের বন্দোবস্ত আছে।

১নং চিত্র।

১৬০০ একর জমি জল পায়। উক্ত চতুর্বিধ উপায় দ্বারা কত পরিমাণ জমি জলসিক্ত হয়, তাহা সবগুলি একত্রে যোগ করিলেই আমরা হিসাব পাইব। (২,৯০০ + ৭,৮০০ + ৩,০৫০ + ১,৬০০ = ১৮,৩১০)। আগেই আমরা দেখিয়াছি, এখানে আবাদী জমির পরিমাণ হইতেছে ১০,১৯,৬০০ একর, তাহার মধ্যে বিবিধ উপায়ে ১৮,৩৫০ একর জমিতে জল দেওয়ার বন্দোবস্ত আছে, বাকী (১,০১৯,৬০০—১৮,৩৫০) একর পরিমাণ, অর্থাৎ ১,০০১,২৫০ একর জমিতে জল দিবার কোন ব্যবস্থাই নাই। উপরের স্তম্ভ দুইটি (১নং চিত্র) দেখিলেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন, আবাদী জমির তুলনায় তাহার জন্য জল-সরবরাহের ব্যবস্থা কত সামান্য।

মোট যে পরিমাণ জমিতে জল দিবার ব্যবস্থা আছে, পরপৃষ্ঠায় স্তম্ভগুলি তাহার এবং বিবিধ উপায়ের তুলনা দেখাইবার জন্য অঙ্কিত হইয়াছে।

কৃষির কথা বলিবার পূর্ব্বে জল-সেচনের কথা বলিলাম, কারণ জমিকে কৃষির উপযোগী করিয়া লইতে হইলে

(১)



(১) মোট জলসিক্ত ভূমির পরিমাণ
(ক) পুকুর হইতে, (খ) কূপ হইতে
(গ) সরকারকৃত খাল হইতে, এবং
(ঘ) অন্যান্য বিবিধ উপায়ে জলসেচনের ব্যবস্থা

২নং চিত্র।

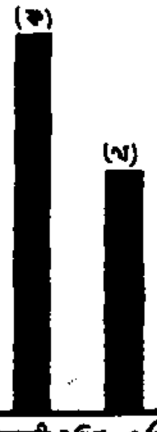
প্রচুর জলের দরকার। কৃষি সম্পর্কে আলোচনায় তাই জমি নরম ও সিক্ত করিবার উপায় সম্বন্ধে আগেই বলিয়া লইতে হয়।

এবার দেখা যাক্, কি পরিমাণ জমি কর্ষিত হয় এবং কত পরিমাণে আবাদ হয়। রাজসাহী জিলার আয়তন হইতেছে ১৬,৬৯,২৯৩ একর। তাহার মধ্যে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ১০,১৯,৬০০ জমিতে আবাদ হয়। বাকী (১৬,৬৯,২৯৩—১০,১৯,৬০০) অর্থাৎ ৬,৪৯,৬৯৩ একর জমিতে আবাদ হয় না। ৩নং ছবি হইতে তুলনাটি সহজেই বুঝা যাইবে।

অনাবাদী জমির মধ্যে ২,৬৫,০০০ একর জমি সহরের পথ-ঘাট, ঘর-বাড়ী ও পল্লীর কুটীর ইত্যাদি দ্বারা আচ্ছন্ন থাকায় তাহা চাষাবাদের জন্ম আদৌ পাইবার উপায় নাই। ইহা ছাড়াও যে জমিতে চাষ হয় না, তাহার মধ্যে ২,১৯,৬৯৩ একর জমি কর্ষিত হয় বটে, কিন্তু বছরে আনুমানিক এই পরিমাণ জমি কর্ষিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে, শস্য বপন করা হয় না। ইহার কারণ, জমিকে বিশ্রাম দেওয়া। যে জমিতে অত্যধিক চাষ হয়, তাহাকে জীবনীশক্তি সঞ্চয়ের অবকাশ না দিলে, পরে তাহাতে প্রচুর পরিমাণ সার দিলেও পূর্ব্বের মত অতটা উর্ব্বরতা লাভ করা সম্ভব নয়। কারণ, 'সয়েল্-ইরোশন' বলিয়া সম্প্রতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক মহলে যে নৈসর্গিক ক্রিয়ার কথা লইয়া তুমুল আলোচনা চলিতেছে, তাহার প্রভাবে অত্যধিক চাষ হেতু জমির উৎপাদিকা-শক্তি নষ্ট হইয়া যাইতে বেশী বিলম্ব হয় না। বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেছেন, দিনে দিনে ভূমির প্রাণ বিনিষ্ট হইয়া যাইতেছে; বৃষ্টি পড়িয়া জমির 'রক্ত-মাংস' ধুইয়া যায় এবং শেষে কেবল মাত্র কঙ্কালটুকুই পড়িয়া থাকে; অতএব একই জমির উপর বেশি উৎপীড়ন না করিয়া, তাহাকে এমন ভাবে রক্ষা করা দরকার, যাহাতে তাহার 'স্বাস্থ্য' না নষ্ট হইয়া যায়। এ বিষয় কিছুদিন আগে অন্যত্র বিশদ আলোচনা করিয়াছি।* পতিত জমি এবং জমি ভাগাভাগি হেতু আলের ব্যবস্থা দ্বারা প্রায় ১৬৫,০০০ একর জমি নষ্ট হয়। সবগুলি একত্রে যোগ করিলে আমরা পুরাপুরি অনাবাদী জমি অর্থাৎ ৬৪৯,৬৯৩ একর পাইতেছি:

পথ ঘাট, ঘর-বাড়ী	২,৬৫,০০০	একর
কর্ষিত অথচ অনাবাদী	২,১৯,৬৯৩	"
পতিত এবং আল	১,৬৫,০০০	"
	৬৪৯,৬৯৩	একর

এবার আবাদী জমির মধ্যে কত পরিমাণ জমিতে ধান হয়, তাহা বলিব। অগ্রাণী, রবি ও ভাদৈ এই তিন প্রকারের ধান এই জিলায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। অগ্রাণী শস্যের জন্ম



(ক) আবাদী জমির পরিমাণ
(খ) অনাবাদী জমির পরিমাণ

৩নং চিত্র।

*'সয়েল্ ইরোশন' শীর্ষক প্রবন্ধ (আর্থিক উন্নতি, মাঘ, ১৩৪০) দ্রষ্টব্য। লেখক।

প্রায় ৭,৪৯,৮০০ একর জমি, রবির জন্ত ২,৩১,০০০ এবং ভাদৈ শস্তের জন্ত ২,৫৭,৬০০ একর জমি ব্যবহৃত হয়। এই সূত্রে একটি কথা বলিয়া লওয়া দরকার। এই তিন প্রকারের শস্তের সঙ্গে সঙ্গে যে পরিমাণ জমির উল্লেখ করিয়াছি, পাঠকবর্গ ভুল করিয়া তাহা একত্রে যোগ করিয়া ধানের জন্ত ধার্য্য জমির পরিমাণ বুঝিতে চেষ্টা করিবেন না। কারণ, একই জমিতে রবিশস্ত উঠিবার পর ভাদৈ রোপিত হয়, এবং ভাদৈ-এর পর সেই জমিতেই অগ্রাণীর আবাদ হয়। অতএব বুঝিতে হইবে ধানের জন্ত ধার্য্য জমি উক্ত ত্রিবিধ শস্তের জমির যোগফল নয়।

ধান ছাড়া মোটামুটি নিম্নলিখিত শস্তাদি এই জিলায় উৎপন্ন হয়—গম, ডাল, তৈল-বীজ, তিল, আখ, পাট, তামাক ইত্যাদি। প্রত্যেক বছর ফসল সমান হওয়া সম্ভব নয়, প্রাকৃতিক নানাবিধ কারণে বেশি-কম হইয়া থাকে। কোন একটি বছরের ফসলকে (ঠিক কোন্ বছর জানা যায় নাই) ১০০ ধরিলে, সংপ্রতি তাহার অনুপাতে কোন্ শস্ত কতখানি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার একটা ফিরিস্তি দিতেছি :

শীতের ধান	
শরতের ধান	৬৭
গম	৯২
ডাল	৮৫
তৈল-বীজ	৭১
তিল	৭৭
আখ	৮৩
পাট	১০৭
তামাক	৭০

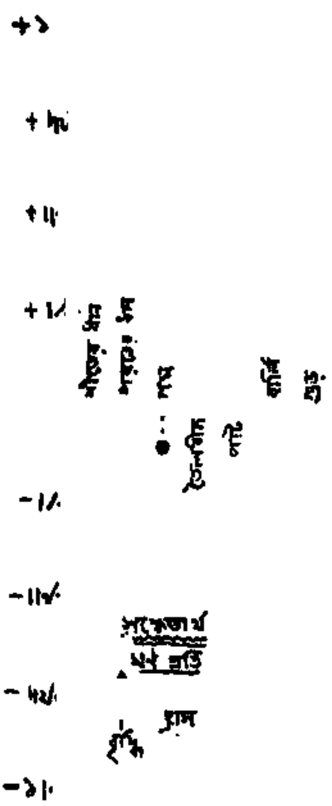
উপরের এই হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে যে, পাট সাধারণ পরিমাণ অপেক্ষাও বেশি হইয়াছে। পাটের জন্ত ধার্য্য জমির পরিমাণ হইতেছে প্রায় ৯০,০০০ একর। ধানের জন্ত ৮ লক্ষ একর, কিন্তু তাহার উৎপাদিকা শক্তি কিছু কমিয়াছে; কারণ দেখা যাইতেছে যে, উৎপন্ন শস্তের পরিমাণ অনেকখানি কমিয়া গিয়াছে। গমের জন্ত জমির পরিমাণ ১১ হাজার একর; গম প্রায় সমান-সমানই উৎপন্ন হইতেছে। ডালের জন্ত ধার্য্য জমির পরিমাণের হিসাব পাওয়া যায় না; কিন্তু উপরের ফিরিস্তি হইতে দেখিতেছি যে, উৎপাদন মারাত্মক ভাবে না কমিলেও, অনেকটাই কমিয়াছে। তৈল-বীজ হয় প্রায় ৭০ হাজার একর জমিতে; ইহার উৎপাদনের পরিমাণও সংপ্রতি কমিয়াছে। তিলের জন্ত কত পরিমাণ জমি আছে, তাহার কোন হিসাব পাওয়া যায় নাই। আখ হয় ২১ একর জমিতে এবং তাহার উৎপাদনের পরিমাণ ১০০ হইতে ৮৩-তে নামিয়াছে দেখিতেছি। এই সূত্রে একটি প্রয়োজনীয় কথা বলিয়া লওয়া দরকার। এই জিলায় উৎপন্ন আকে চিনির পরিমাণ ভারতবর্ষের যে কোন স্থানের আকের চেয়ে অনেক বেশি। এই সত্যটি সংপ্রতি আবিষ্কৃত হওয়ার দরুণ, এই জিলায় অধিক পরিমাণ আক চাষ করিবার একটি সাড়া পড়িয়া গিয়াছে এবং গোপালপুরে চিনির কলও স্থাপিত হইয়াছে। কিছু দিন পরের হিসাবে আমরা আকের জন্ত ধার্য্য জমির পরিমাণ অবশ্যই এখনকার পরিমাণ অপেক্ষা অনেক বেশি পাইব। তামাক হয় ৪ হাজার একর জমিতে এবং ইহার উৎপাদনও অনেক কমিয়া গিয়াছে।

এবার উপরোক্ত দ্রব্যাবলী মণ-করা কত দামে (টাকায় আনায়) বিক্রয় হইতেছে এবং গত বৎসর বিক্রয় হইয়াছিল, তাহার আর একটি ফিরিস্তি দিতেছি।

	(ক) পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর	(খ) বর্ত্তমান বৎসর	(গ) মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি
শীতের ধান	৩৷	৩।/০	—৵০
শরতের ধান	৩।০	৩৲	—।০
গম	৩।৶	৩।০	—৶০
ডাল	২৷০	২৷০	=
তৈলবীজ	৪৲	৫।০	+১।০
পাট	৪৷০	৫৷০	+১৲
তামাক	৬৲	৬৲	
যব	২৷০	২।০	—।০
গুড়	৫৸০	২৷০	—৩।০

উপরোক্ত এই হিসাবে (গ) কলমে আমরা দ্রব্যাবলীর দামের উঠানামা দেখিতেছি। '+' চিহ্ন দ্বারা বৃদ্ধি ও '—' দ্বারা হ্রাস বুঝান হইয়াছে এবং যে দ্রব্যের দাম উঠানামা কিছুই করে নাই, তাহাকে '=' দ্বারা সমান আছে বুঝান হইয়াছে। কোন্ কোন্ জিনিষের দাম চড়িয়াছে এবং কতখানি চড়িয়াছে, আর কোন্ দ্রব্যের দাম কতখানি নামিয়াছে এবং চিত্র দ্বারা তাহা বুঝান হইল।

উপরোক্ত ছবি হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, তৈলবীজ ও গুড়ের দামের হেরফের হইয়াছে সকলের চেয়ে বেশি। সেই সঙ্গে পাটের দামও অনেকটা বাড়িয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, পাটের উৎপাদন বাড়িয়াছে এবং পাটের জন্ত ধার্য্য জমির পরিমাণও ন্যূন নহে, তথাপি এক বৎসরে মণপ্রতি মূল্য এক টাকা বাড়িয়া গিয়াছে।



৫নং চিত্র।

সংপ্রতি পাটের চাহিদা খুবই বাড়িয়া গিয়াছে; দিনে দিনে দেশে দেশে বাণিজ্যের যে রূপ বিস্তৃতি ঘটিতেছে, তাহাতে গানিব্যাগ (বস্তা) তৈয়ারীর জন্ত প্রচুর পাটের দরকার। তাহা ছাড়া যুদ্ধ-বিগ্রহ হেতু প্রচুর পাটের বাড়তি রপ্তানী আছে। আর একটি সত্য এই যে, পাটকে কেবল মাত্র তুচ্ছ পাট জ্ঞান না করিয়া তাহা হইতে আজ কাল অনেক ফ্যাক্টরী সৌখীন কাপড় প্রস্তুতও আরম্ভ করিয়াছে। এইরূপ নানাবিধ কারণে পাটের দাম চড়িয়াছে বলিয়া অনুমান করা যায়।

এই জিলার আবাদী জমির মধ্যে কোন্ শস্তের জন্ত শতকরা কতটা জমি ধার্য্য আছে, তাহাই এক্ষণে উল্লেখ করিব। সবার চেয়ে বেশি (আবাদী জমির প্রায় তিন-চতুর্থাংশ) ধান্তের জন্ত ব্যবহৃত হয় এবং সকলের চেয়ে কম জমিতে ফলমূলাদি উৎপন্ন হয়। নিম্নের হিসাব হইতে এই তথ্যটি পরিষ্কার বুঝা যাইবে :—

ধান—	৭২·৬
নানাবিধ শস্ত ও ডাল—	১১·৯
পাট—	৬·১
ফলমূলাদি—	·৫
আখ—	১·৫
তৈলবীজ ইত্যাদি—	৭·৪

শিল্প ও বাণিজ্য

কোন স্থানের শিল্প গড়িয়া উঠে উপযুক্ত কাঁচামালের নিয়মিত সরবরাহ এবং নিপুণ শ্রমিকের কার্য্যতৎপরতার দরুণ। যন্ত্র-শিল্পের দিক্ দিয়া রাজসাহীর বিশেষ কোন দান নাই, বিশেষ কোন স্থান নাই। খনি হইতে যে কাঁচা-মাল পাওয়া যায়, যন্ত্রের তাহাই আহার। আহারাভাবে যন্ত্র জীর্ণ হইতে বিলম্ব করে না। রাজসাহীতে কোন ধাতব পদার্থের খনি নাই। কিন্তু এই জিলার কুটীর-শিল্প সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা যায়।

কুটীর-শিল্প কৃষির একটা বাড়তি লাভ। কারণ, আমরা জানি যে, যাহারা চাষ-বাস করিয়া জীবিকা সংগ্রহ করে, তাহারা বৎসরের বার মাসই কৃষিকার্য্যে লিপ্ত থাকে না। যখন শস্ত উৎপন্ন হয়, তাহার পর নূতন শস্ত বপন করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহারা কর্ম্মহীন দিন কাটায়। কুটীর-শিল্পের সাহায্যে তাহাদের এই কর্ম্মহীন জীবনের দিনগুলি কাজে লাগান সম্ভব হয়। ইহাতে আর্থিক সুবিধাও বিস্তর। কারণ, যখন আর কোন কাজ করিবার নাই, তখন ঘরে বসিয়াই আয় করিবার ইহা একটা উপযুক্ত সুযোগ। কুটীর-শিল্প দেশের দুর্গতির কিছুটা উপশম করিতে পারে। কুটীর-শিল্প গার্হস্থ্য শান্তি স্থাপনের একটি প্রধান উপায়। ঘরে বসিয়া সকলে একসঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিবার যে-আনন্দ,

দ্বার দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া কাজ করিলে তাহা হওয়া সম্ভব পর নয়। আজ কাল কুটীর-শিল্প সুন্দর রূপে গড়িয়া উঠিবার সুবিধা দেখা যাইতেছে স্পষ্টতর রূপে। সামান্য মূল্যে ছোটখাটো কল কিনিয়া ঘরে বসিয়া নির্ব্বিবাদে মোজা, গেঞ্জি, লেস্ ইত্যাদি তৈয়ারী করিয়া বাজারে চালাইতে পারিলে সাংসারিক সুবিধাও বিস্তর।

আমাদের দেশে একদিন বিস্তৃত কুটীর-শিল্প ছিল। সেই কুটীর-শিল্পের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া আসিতেছে। কোন কোন কুটীর-শিল্প একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে, কারণ তাহারা বিদেশী মালের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে নাই। বিদেশী মাল দামেও সস্তা, দেখিতেও মনোহর। কুটীর-শিল্পীরা কলে-প্রস্তুত মালের মত নিজেদের মাল অত পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও নিখুঁৎ করিয়া তুলিতে পারে না। আজকাল কুটীর-শিল্পের মধ্যে মোজা, গেঞ্জি ইত্যাদি কোন কোন স্থানের প্রধান সম্বল।

রাজসাহী জিলার যে-সকল গ্রাম একটু উন্নত এবং যে সকল গ্রামে শিক্ষিত জনসংখ্যা অধিক, সেই সকল স্থানে এই শিল্প কথনও কথনও দেখা যায়। গ্রামের অনেক ভদ্র গৃহস্থের ঘরের পুরনারীরা এই কার্য্যে লিপ্ত আছেন, দেখা যায়। বাহিরের প্রতিযোগিতার সঙ্গে ইহাঁদের পরিচয় নাই। কারণ ইহাঁরা প্রতি-বাসীদের চাহিদা মত নতুন নতুন ফ্যাসানের গেঞ্জি, মোজা তৈয়ারী করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন। সে ফাসান হয় ত বাজারে চলে না। কিন্তু, নিজেদের রুচিমত তাহার আদর দেখা যায়। নাটোরের অনেক ঘরে এই শিল্প পুরাদস্তুর বর্ত্তমান। কলম গ্রামের আশে পাশে সিঙ্গরা ও তলম ইত্যাদি স্থানের গৃহস্থেরা এই কার্য্যে লিপ্ত আছেন। ইঁহাদের তৈয়ারী মাল নিজেদের গ্রামের গণ্ডী পার হইয়া বাহিরে আসিয়া পৌঁছায় না।

বেতের চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি প্রস্তুত হয় অনেক গ্রামে। এই শিল্প চালাইতেছে অশিক্ষিত যাহারা, তাহারাই। রাজসাহী সহরের উপকণ্ঠে এই শিল্প অনেক মুসলমানের ঘরে অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। তাহা ছাড়া ঝুড়ি, চুপড়ি, ধামা জাতীয় ছোট-খাটো সাংসারিক দ্রব্যাবলী রাজসাহী সহরের ডোমেদের দ্বারাই প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাদের মালও বেশি দূর যায় না, সহরের অধিবাসীরাই ক্রয় করিয়া লয়। শিবপুর, বানেশ্বর, নওহাটা ইত্যাদি গ্রামের সাপ্তাহিক হাটের দিনে চারি দিক্ হইতে কুটীর-শিল্পের নানারূপ নিদর্শন হাটের একাংশ দখল করিয়া বসে। এই স্থান হইতে ক্রেতারা নিজেদের চাহিদামত মাল খরিদ করিয়া নিজেদের রুচির পরিচয় দেয় এবং কুটীরশিল্পকে বাঁচাইয়া রাখিতে সাহায্য করে। ইহা ছাড়া বিবিধ খেল্‌নার কথাও বলিতে হয়। শোলা দিয়া প্রস্তুত, মোটা কাগজ কাটিয়া রচিত, বাঁশের কঞ্চি দিয়া তৈয়ারী নানারূপ খেল্‌নাও এই হাটের দিন নগণ্য পল্লীর প্রান্ত হইতে জনতার মাঝে আসিয়া আত্ম-প্রকাশ করে। এই সকল দ্রব্যাবলী দেখিয়া মাঝে মাঝে চমক্ লাগে। রথের দিনেই এই দ্রব্যাবলী দেখিবার সুযোগ ঘটে বেশি। সেই দিন যত প্রকারের কুটীরশিল্প আছে, তাহার সব নিদর্শনই একত্রে মিলিত হয় নওহাটা গ্রামের পথে পবা-থানার নিকটবর্ত্তী জায়গায়।

রাজসাহী সহরের পশ্চিম দিকে গোদাগাড়ির প্রায় কাছাকাছি স্থানে বামনাইল নামে একটি গ্রাম আছে। সেই গ্রামে সরিষার তেলের ঘানি আছে অনেকগুলি। এই গ্রামকে কৃষকপল্লী বলিলে অত্যুক্তি হয় না, এখানে আবাদী জমির আদিদারদের বসতিই বেশি। জমিতে যে সরিষা উৎপন্ন হয়, তাহা দূরে টানিয়া না গিয়া পার্শ্বস্থ ঘানিতে পিষিয়া তৈল তৈয়ারী করা হয় এবং হাটের দিনে সমস্ত তৈল ক্রেতাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। এই সঙ্গে আর একটি স্থানের কথা বলিয়া লইতে হইবে। রাজসাহী জিলার লালপুর থানার নিকটবর্ত্তী বুধপাড়া নামক গ্রাম কাঁসার থালা, বাটী ইত্যাদির জন্য বিশেষ পরিচিত। এই গ্রামটি ছোট, কিন্তু গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই এই শিল্পে ব্যস্ত থাকে। ইহারা নিজেরাই সমস্ত স্বহস্তে প্রস্তুত করে এবং দল বাঁধিয়া ঘোড়ার পিঠে মাল চাপাইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে চলিয়া যায় বিক্রয় করিবার জন্য। পুরাতন ও ভাঙ্গা থালাবাটির পরিবর্ত্তেও তাহারা নূতন মাল দিয়া থাকে। সেই ভাঙ্গা থালাবাটি দিয়া আবার তাহারা নতুন দ্রব্য গড়িয়া লয়। ইহাকে ইহাদের বহির্ব্বাণিজ্য বলা যায়।

বহুপূর্ব্বে রাজসাহী জিলায় নীলকুঠি ছিল অনেকগুলি। আজ তাহাদের অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখন ঘরের তৈয়ারী টুকিটাকি দ্রব্যাবলী দিয়া যে ব্যবসা চলিতেছে, তাহাকে যদি বাণিজ্য বলিতে পারা যায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, এই জিলার বাণিজ্য জিলার সীমানা ডিঙ্গাইয়া বাহিরে পৌঁছাইতে পারিতেছে না। তৈয়ারী মালের সংখ্যা ও পরিমাণ এত অধিক নয় যে, নিজেদের গ্রামস্থ চাহিদা মিটাইয়া পরের দরজায় গিয়া সেই মাল বিক্রয় করা চলে।

দ্বিতীয় সংসার

—শ্রীবসন্তকুমার চক্রবর্তী

নবীনের মা আহারে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া নলিনীকে বলিলেন, রবিকে দাও, অনেকক্ষণ দিয়ে গিয়েছি। রবীনের দিকে হাত বাড়াইয়া বলিলেন, এস, উঠে এস ভাই।

রবীন উঠিল না। নলিনী বলিল, থাক্ না আমার কাছে, আপনি খেয়ে এলেন একটু শোন গে, ওতে আমাতে যাত্রা শুনছি।

রবীন বলিল, ঠাকুমা, কাশীর গান হচ্ছে, একটা লাঠি নিয়ে ওটার মাথায় মেরে এস।

ঠাকুমা হাসিলেন, নলিনীও হাসিল। ঠাকুমা চলিয়া গেলেন।

নলিনী রবিকে জিজ্ঞাসা করিল, রবিবাবু তোমার ভাল জামা নেই? এটা যে ভারি ময়লা হয়ে গেছে।

রবি বলিল, আছে, মার দেরাজে। চল না আমাদের ঘরে, দেখাচ্ছি।

নলিনী রবিকে লইয়া তাহার মার ঘরে প্রবেশ করিল। নলিনী দেখিল, ঘর শ্রীহীন। বিছানা-মাদুর গোটান অবস্থায় এক দিকে এলো-মেলো পড়িয়া আছে। চারিদিকে জঞ্জাল, দেওয়ালের গায়ে ঝুল পড়িয়াছে। রবি দেখাইয়া দিল, এই দেরাজ, ইহাতেই জামা আছে।

নলিনী দেরাজ টানিয়া খুলিয়া বলিল, খোলা রয়েছে, চাবি দেওয়া নেই।

রবীন বলিল, চাবি মার কাছে, সঙ্গে করে নিয়ে গেছে।

নলিনীর ইচ্ছা ছিল না, তবুও জিজ্ঞাসা করিল, মা কোথায়?

রবীন দ্বারের দিকে আঙ্গুল বাড়াইয়া বলিল, চলে গেছে।

নলিনীর চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। মাতৃহারা শিশুর কথার ভিতর হতাশ্বাস তাহার কোমল হৃদয়ে আসিয়া বাজিল।

চোখের জল রবি না দেখিতে পায়, এই জন্য নলিনী দেরাজের ভিতর হইতে জামা, প্যাণ্ট যত কিছু আছে টানিয়া বাহির করিল, পরে একে একে সবগুলি ঝাড়িয়া, পাট করিয়া, যথাস্থানে রাখিবার কালে রবিকে বলিল, কোন্‌টা পরবে রবিবাবু?

রবি মায়ের দেওয়া একটা ভাল জামা দেখাইয়া দিলে নলিনী সেইটি বাছিয়া বাহিরে রাখিল। দেরাজ পূর্ব্বের মত বন্ধ করিয়া রবিকে কোলে তুলিয়া দিদির ঘর হইতে এক গেলাস জল ও তোয়ালে লইয়া রবীনের মুখ হাত পা ধোয়াইয়া মুছাইয়া সকল ময়লা তুলিয়া দিল। নূতন জামাটি পরাইয়া রবিকে পুনরায় কোলে তুলিয়া তাহার মুখচুম্বন করিল, এরূপ গাঢ় চুম্বনের আস্বাদ রবি অনেক দিন পায় নাই।

দিদি শুইয়া ছিলেন, নলিনী নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ সময় রবি কি খায়?

দিদি বলিলেন, দুধ সন্দেশ খায়। এনে দেব? শাশুড়ীর কাছে আছে। নলিনী বলিল, আমি যাচ্ছি।

নলিনী রবীনের ঠাকুমার ঘরে আসিয়া খাবার চাহিল।

রবীনের ঠাকুমা শুইয়া ছিলেন, তন্দ্রা আসিতেছিল, রবীন পরিষ্কার বেশ-ভূষায় সাজিয়া নলিনীর অঙ্কে চড়িয়া সলজ্জ হাসিতে মুখখানি রাঙা করিয়া ঠাকুমাকে কি যেন বলিতে চায়—বৃদ্ধা কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া বসিলেন।

নলিনী বলিল, উঠে কাজ কি? দুধ খাবার কোথায় রাখেন বলে দিন, আমি নিচ্ছি।

ঘরের মধ্যে একটা তাকের উপর ঢাকা-চাপা খাবার ও দুধ ছিল, ঠাকুমা সঙ্কেতে দেখাইয়া দিলেন।

নলিনী ঘরের মেজেতে বসিয়া দুধ-সন্দেশ খাওয়াইয়া রবিকে জল খাইতে দিল। বৃদ্ধা একদৃষ্টে দেখিতেছিলেন, আর ভাবিতেছিলেন, এ যেন ঠিক মায়েরই মত যত্ন, আবার নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, হাঁ রে রবি, আজ যে দুধ দেখে কাঁদলি না? সবটা যে কোনদিন খাস না, সন্দেশ ভাল?

রবি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ। নলিনী বলিল, রবিবাবু, চল আমরা বারাণ্ডায় বেড়াই; রোদ পড়লে ছাতে উঠব।

রবীনকে লইয়া নলিনী চলিয়া গেল, নবীনের মা বসিয়া বসিয়া কিছুক্ষণ ভাবিলেন. পরে উঠিয়া বড় বউয়ের সন্ধানে গেলেন। বড় বউকে নবীনের মা বলিলেন, বউমা, ভরসা হয় না; তুমি আপনার লোক তোমাকে বলিতে পারি। তোমার ওই ছোট বোনটি, আহা কি যত্নটা না রবিকে করছে, দেখলে চোক জুড়িয়ে যায়। কোন ফিকির করে আমার নবীনকে ওটি দিতে পার? ওকে পেলে আমার সব বজায় হয়।

বড়-বৌ বলিলেন, বিয়ে যে ও করবে না মা। সে অনেক কথা, না হলে বাইশ বছর বয়স হল, আজও বিয়ে পড়ে থাকত? এত দিনে ছেলে-পুলের মা হয়ে গিন্নী হত।

নবীনের মা জিজ্ঞাসা করিলেন, বয়েস হয়েছে, সেত দেখলেই বোঝা যায়, বিয়ে না করবার কারণ কি? বড় বউ বলিলেন, শুনবেন সব কথা? আমরা সাত বোন, ভাই নেই, আপনি ত সব জানেন। নলিনী সবার ছোট বোন, মা বাপের বড় আদরের। ছোট বেলায় দেখতে ঠিক পদ্ম ফুলটির মত ছিল। আমাদের ছটিকে পার করতে দেড় বছর দু বছর অন্তর বিয়ের খরচের ঠেলায় বাবার বুকের পাঁজরা ভেঙ্গে পড়ে। পাঁচ হাজার থেকে আরম্ভ করে দু' হাজার পর্য্যন্ত গুণে এসেছেন, ওই ত' সামান্য আয়, তবে ঠাকুরদা যত দিন চাকরী করতেন, তিনিও দিতেন। বাবা ভাবলেন, মেয়েরা যদি এখনকার মত পাশ-টাশ দিত খরচটা হয় ত কম হত; তাই নলিনীকে স্কুলে পড়তে দিয়েছিলেন। গাড়ী করে নলিনী পড়তে যেত। ম্যাট্রিক পাশ করে তারপর আরও দু বছর কলেজে পড়ে। এদিকে বয়স হল আঠার, বাবা ভাবলেন, না, আর দেরি করা চলে না। বিয়ের সম্বন্ধের চেষ্টায় রইলেন। দু একটা বড় ঘরে চেষ্টা করলেন, দেখলেন, তাঁরা যে দরে ছেলে বিক্রী করেন তাঁদের কাছে এগোনো যায় না, মধ্যবিত্ত ঘরে দু'এক জনকে মেয়ে দেখিয়ে দেনা-পাওনায় আটকালে জানলেন, পূর্ব্বেও যা ছিল এখনও তাই, মেয়ে পাশ করেছে বলে ছেলের দর কোথাও কমেনি, দর সমানই আছে…

…যারা ছেলে বেচে খায় তারা যে রাশ টেনে রেখেছে, কমবে কোথা থেকে? কে না কি পরামর্শ দিলে, মেসে খবর নাও, ওখানে ছেলে সস্তা, ওখানকার ছেলেরা বাড়ী ছেড়ে পড়াশুনা করতে আসে, ওদের কাছে দর-দস্তুর নেই, পছন্দ নিয়ে কথা। ছুটলেন। কোথা থেকে টেনে নিয়ে এলেন একটাকে, সে না কি ডাক্তারী পড়ে। ছেলে দেখে মেয়ে খুব পছন্দ করলে, বলে গেল বাবাকে চিঠি লিখুন, তিনি রেঙ্গুনের ডাক্তার। চিঠি লেখা হল, খবর এল, তিনি কলকাতায় এসে মেয়ে দেখবেন, তবুও একটা ফর্দ্দ দিয়ে দিলেন, যার মানে দুটি হাজার। বাবা ভাবলেন, রেঙ্গুন দূর দেশ, মেয়ে আনতে পাঠাতে প্রতিবার একশ দু'শ টাকা বার করতে হবে, আবার এদিকেও দু'হাজার। একটু কম বল, তাও নয়। আবার বেরুলেন, মেসে মেসে গরু খোঁজা করতে লাগলেন। এবার এক কীর্ত্তিমান মেস থেকে তিন চার জন বন্ধু জুটিয়ে মেয়ে দেখতে এলেন, ইনি না কি এম-এ পাশ, ল পড়েন,—মেয়ে দেখা হল। বাবা তাদের বাইরের ঘরে বসিয়ে জল খাবার গিলিয়ে লেকচার দিলেন। আমি তখন ওখানে ছিলাম, সব শুনেছিলাম। বাবা বললেন, বাবারা, তোমরা হলে দেশের রত্ন, এর পর তোমরাই দেশের মুখ উজ্জল করবে। এই পণপ্রথার কথাটা একবার ভেবে দেখ, ছ'টা মেয়ের বিয়ে দিয়ে আমি সর্ব্বস্বান্ত, একটা সৎসাহস দেখাও, আমাদের মত বুড়োদের বুক দশ হাত হোক। লেখাপড়া শিখে এখনকার ছেলেরা যদি আগেকার মতই চলতে থাক, তবে আর ফল কি হল? বন্ধুদের ভেতর একজন বাবাকে বললে, পাত্র বলছে সে এখানেই বিয়ে করবে, দেশেতে বড় ভাই আছেন তাঁকে একবার জানাতে হয়, তার ঠিকানা দিচ্ছি, পত্র দিন, তিনি এসে আশীর্ব্বাদ করে যাবেন। বাবা চিঠি লিখলেন, চিঠিতে নিজের কথা এবং পাত্রের বন্ধু যে সব বলে গিয়েছিল জানালেন, জবাব এল। দাদা লিখছেন, গ্রামের মধ্যেই তিনি সুন্দরী পাত্রী দেখে রেখেছেন, তবে আপনার মেয়ে যদি খুব সুন্দরী হয় জানাবেন, কিন্তু নগদ ও বরাভরণ প্রভৃতিতে পাঁচ হাজার হওয়া চাই। চিঠিতে খুব সুন্দরীর নীচেতে একটা লাইন টেনে বুঝিয়ে দিয়েছেন, এইটি হলে তবে তিনি কলকাতায় আসতে পারেন। বাবা চিঠিটা পড়ে মাকে শোনালেন, নলিনী সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সব শুনে মহা রেগে গেল, মা-বাবাকে বললে, ফের যদি তোমরা বিয়ের কথায় থাক আমায় হারাবে, আমি আত্মহত্যা করব, আজ থেকে পড়া ছাড়লুম, কলেজ ছাড়লুম, খালি দুটী দুটী খাব, দিতে পারবে না? না পার বল যা হয় একটা কাজ খুঁজে নেব। বাবা মা কত বুঝালেন, পাঁচটা দেখতে দেখতে একটা লেগে যাবে। নলিনী

বললে, আর একটাও নয়, যেমন দেশ, যেমন জাত, তেমনি ব্যবস্থা! পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গা, মেয়েদের ভারি সহ্যগুণ তাই মুখ বুজে থাকে, বাপ মাকে দেনায় ডোবায়, দু'জনকে পার করতে ভিটে বাঁধা পড়েছে, এই বার বেচে ফেল, তাতেও কুলোবে না, খোলার ঘরে গিয়ে উঠতে হবে, যদি বা দুবছর বাঁচতে, দুমাসে মারা যাবে, তবুও মেয়ে পার হয়েছে ভাববে, এ পাপের প্রশ্রয় কেউ দিতে পারে? কেমন করে যে এ কুপ্রথা আজও চলছে কেউ বলতে পারে না, ছেলের বাপ বা ভাই যারা ছেলে বেচে, তাদের মুখে আগুণ আর লেখাপড়া শিখেও যে-ছেলে হাতে সুতো বেঁধে একজনকে প্রাণে মেরে বাপ-ভাইয়ের পেট ভরাতে বিয়ে করতে আসে, তারও মুখে আগুণ। আমাকে বেশী ঘাটিও না, অনর্থ বাধাব।—বিয়ের কথা বন্ধ হল, নলিনী স্কুল ছেড়ে দিলে, ঘরে বসে পড়ে, অন্ত পাঁচটা মেয়েদের মত সাজে গোজে না, বাহার দেওয়া মোটেই পছন্দ করে না, এমনি করে চার বছর কাটিয়েছে। মনটা খারাপ হলে বোনেদের কাছে আসে, থাকে না, বেড়িয়ে যায় —আজ দুপুরে এখানে এসেছে, রবিকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সন্ধ্যা হলে বাড়ী চলে যাবে। বাবা-মা হাল ছেড়ে দিয়েছেন, তাঁরাই যখন বোঝাতে পারলেন না, আমি কি করব বলুন?

শাশুড়ী বললেন—রাগের মাথায় কবে কি বলেছিল, ধন্য বাপ-মা, আজও সেটি ধরে রেখেছেন! ব্যাটা ছেলে হলে এতদিন রাগ করে বলতে পারে বিয়ে করব না। মেয়েরা ও কথা মুখে আনতে পারে? বাপ-মা ত চিরদিনের নয়, বল দেখি তোমার ওই সুন্দরী বোনটি কোথায় দাঁড়াবে? একটি ভাই বলতে নেই, বাদের খৃষ্টানী চাল-চলন, মেমেদের মত চলা-ফেরা, তাদের কথা স্বতন্ত্র, তাদেরি ওসব কোট সাজে, এই সব বলে বোঝাতে হয়।

বড়-বৌ। ডেকে দেব? আপনি ওকে বুঝিয়ে দিন না? এদিকে ভারি ভাল, বোঝে ও সব, কিন্তু বড় একরোখা, আমরা ওকে সবাই ভয় করি।

শাশুড়ী। না মা, আমার কর্ম্ম নয়, একদিনের জন্য এসেছে, আমোদ কচ্ছে, হাসছে, বেড়াচ্ছে, কি বলতে কি বলব হয় ত চলে যাবে, আর কখন আমাদের বাড়ীমুখো হবে না, তোমার বোন, তুমি বেশী বোঝ।

বড়-বৌ। যদি ভবিতব্য থাকে, এমন হয় যে, নলি এ-বাড়ীতে আমার ছোট জা হয়ে আসে, রবির জন্য আমাদের একটুও ভাবনা থাকে না; ভারি মায়ার শরীর। দেখেন নি, আমার ছেলেদের অমনি অমনি একটু আদর করে ছেড়ে দিয়েছে—রবির মা নেই শুনে ওকেই ধোয়াচ্ছে, পোছাচ্ছে, খাওয়াচ্ছে, লোকে পেটের সন্তানকেও অমন আদর করে না। সব দিকে ভাল, হাসি খুসী নিয়ে আছে, মুখ ভার করে থাকা, কি কার সঙ্গে ঝগড়া-ঝাটী করা এ সব কোন দোষ নাই।

উভয়ে দেখিল, নলিনী রবীনকে লইয়া ঘরের দিকে আসিতেছে, রবি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, রবির ছোট মাথাটী নলিনীর কাঁধের উপর কাত হইয়া রহিয়াছে।

নলিনী হাসিয়া নীচু গলায় দিদির শাশুড়ীকে বলিল, দিদির খাটের ওপর রবিকে শোয়াব? না, আপনার ঘরে বিছানা পাতবেন? ও ঘুমিয়েছে।

নবীনের মা বলিলেন, রোজ দুপুরে আমার সঙ্গে ঘুমোয়, আজ তোমায় পেয়ে ঘুমুতে চায় নি। রোগা শরীর, কতক্ষণ যুঝবে? তাই অবেলায় ঘুমিয়েছে, এস মা আমার ঘরে, এখানে চেঁচামেচিতে জেগে উঠবে।

ঘরে আসিয়া শয্যা পাতিবার সময় নবীনের মা জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ থাকবে ত? থাক না একদিন, ছেলেটা তোমায় বড় ভালবাসে।

নলিনী বলিল, না মা, এখনই পালাব, রবি জেগে উঠলে কাঁদতে থাকবে, আর আমি যাব, সে পারব না, ভারি কষ্ট হবে, আর একদিন আসব আমার মনটাও ওর ওপর পড়ে থাকবে, শান্তি পাব না; এখানে কেন এলুম? না এলেই ভাল করতুম [ক্রমশঃ

মৈমনসিংহ-পরিচিতি

—শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী

(১) পুরাতন ইতিহাস

আয়তনে মৈমনসিংহ বাংলা দেশের জেলাগুলির মধ্যে সকলের বড়। শুধু আয়তনে কেন, জনসংখ্যায়ও এই জেলা প্রথম স্থানীয়।

মৈমনসিংহ জেলাকে আমরা আমাদের কাজের সুবিধার জন্য দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া লইতে পারি। প্রাকৃতিক নিয়মে ব্রহ্মপুত্র নদ মৈমনসিংহকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতীর প্রদেশ পূর্ব্ব-ময়মনসিংহ, পশ্চিমতীর প্রদেশ পশ্চিম-মৈমনসিংহ। শুধু প্রাকৃতিক নিয়মেই যে ইহা দুইভাগে বিভক্ত তা নয়,—ভাষা, শিক্ষা, সংস্কার ও নৃতাত্ত্বিক দিক্ হইতেও ইহাকে দুইভাগ করিলে অন্যায় হয় না। এই জেলার আকার বক্র-চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের ন্যায়। জেলার উত্তর-সীমা গারো পাহাড়, পূর্ব্ব-সীমা শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা জেলা, দক্ষিণে ঢাকা, পশ্চিম-সীমা পাবনা, বগুড়া ও রংপুর জিলা।

ভূতাত্ত্বিক দিক্ দিয়া কবে হইতে মৈমনসিংহ মনুষ্য-বাসোপযোগী হইয়াছে, তাহা ঠিক করা সহজ নয়। অতি প্রাচীনকালে বঙ্গদেশেরই অস্তিত্ব ছিল কি না, বলা কঠিন। হিমালয়ের পাদদেশ হইতে ভারতবর্ষের পূর্ব্ব-সীমা সমুদ্র-গর্ভে নিহিত ছিল বলিয়া প্রমাণ হয়*। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের স্রোতবাহিত কর্দ্দম ও কঙ্কর হইতেই এই ভূমির উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন।

সেকালের মৈমনসিংহের সমস্ত বিবরণ পাইতে হইলে, আমাদের তৎকালীন বাঙ্গালা ও কামরূপের ইতিহাস আলোচনা না করিলে চলিবে না।

বেদে বাংলা দেশের কোন উল্লেখ নাই দেখিয়া, তৎকালে বাংলা দেশের কোন অস্তিত্ব ছিল না বলিয়া যদি ধরিয়া লই, তাহা হইলেও বেদ-পরবর্ত্তী রামায়ণ-মহাভারতের সময় বঙ্গদেশ যে একটি সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল, তাহার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি (১)। ইহা সত্ত্বেও সেই সময় বাঙ্গালা দেশের ভৌগোলিক অবস্থান কিরূপ ছিল, তাহা নির্ণয় করা সহজ নয়। মহাভারতের আশ্রয় গ্রহণ করিলে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে। মহাভারত বলেন—ভারতবর্ষের পূর্ব্বপ্রান্তে বঙ্গদেশ নামক একটি দেশ ছিল; ঐ সময়ে বঙ্গদেশ সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন প্রভৃতি রাজাদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তাম্রলিপ্ত সেই সময়ও বর্ত্তমান ছিল, তাহার প্রমাণ ও উল্লেখ আছে। বঙ্গদেশ পূর্ব্বদিকে লৌহিত্য প্রদেশ ও লৌহিত্য সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

মহাভারতের বনপর্ব্বে করতোয়া ও বৈতরণী নদীর উল্লেখ আছে। তাম্রলিপ্তও অতি প্রাচীন স্থান। করতোয়া, তাম্রলিপ্ত ও বৈতরণীর অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্ত হইতে বৈতরণীর দিকে রেখাপাত দ্বারা লৌহিত্য সাগরের অবস্থিতি সহজে ধরা যাইতে পারে। এই সব কারণে মহাভারতের সময় বর্ত্তমান মৈমনসিংহ জেলার কতক অংশ এবং বঙ্গদেশের কতক অংশ লৌহিত্য সাগরে নিমগ্ন ছিল বলিয়া অনুমান হয়।

পণ্ডিতগণ বলেন, উত্তর-ভারত হইতে একদল আর্য্য গৃহ-বিচ্ছেদ হেতু উত্তর-ভারত ত্যাগ করিয়া আসামে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। কালক্রমে সেই আর্য্য উপনিবেশই প্রাগ্-জ্যোতিষ নামে অভিহিত হয়। ব্রহ্মপুত্র (লৌহিত্য) তীরবর্ত্তী বর্ত্তমান গৌহাটি এই প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের রাজধানী ছিল *। আর্য্যাবর্ত্তে আর্য্যগণ যেমন গঙ্গার দুই তীরভূমিকে আপনাদের সংস্কৃতি বিস্তারের স্থান বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তেমনই প্রাগ্‌জ্যোতিষেও ব্রহ্মপুত্রের দুইতীরে

*Lyell—Geology Vol I.

(১) দ্রাবিড়া সিন্ধু সৌবিরাঃ সৌরাষ্ট্র দক্ষিণাপথাঃ।
বঙ্গাঙ্গ মাগধামৎস্যাঃ সমৃদ্ধা কাশিকোশলাঃ।
—অযোধ্যাকাণ্ড, ১০ম সর্গ।

* বোধ হয় এই রাজ্য পূর্ব্বকালের অনার্য্য ভূমির মধ্যে একা আর্য্যজাতির প্রভাব বিস্তার করিত বলিয়া ইহার নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর হইয়াছিল।
—বঙ্কিমচন্দ্র।

আর্য্য-উপনিবেশ ও সংস্কৃতির আবাসস্থান হইয়া উঠিয়া ছিল।

রামায়ণে ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্রের সময় নরকাসুর নামক এক রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি প্রাগ্‌জ্যোতিষে রাজত্ব করিতেন (১)। তেজপুর, নওগাঁ, শ্রীহট্ট (পঞ্চখণ্ড) ও বারাণসীতে যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে নরকাসুরকে কল্পিত নাম বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না এবং ইহার পরও প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজাদের যে বংশতালিকা পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে সেই রাজাগণ "নরকাসুর"-বংশজ বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন।

নরকাসুরের পুত্র ভগদত্ত। নরকাসুর কিরূপ রাজা ছিলেন, তাহার খুব বিস্তৃত বিবরণ নাই, কিন্তু তৎপুত্র ভগদত্ত একজন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন বলিয়া মহাভারতে উল্লেখ আছে। তিনি অর্জ্জুনের মত যোদ্ধাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন (২)। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বন করেন।

রামায়ণ-মহাভারতের প্রাগ্‌জ্যোতিষই পরবর্ত্তী কালে কামরূপ নাম গ্রহণ করিয়াছিল। মৈমনসিংহ জেলা তখন এই প্রাগ্‌জ্যোতিষের অন্তর্ভুক্ত ছিল (৩)। পুরাণে প্রাগ্‌জ্যোতিষের নামই কামরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। বিদেশাগত যে কোন জাতি নূতন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিলেও তাহাদের পূর্ব্ব-পরিত্যক্ত ভূমির মায়া ভুলিতে পারে না। এই প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়াই কামরূপের আর্য্যগণ সেই প্রদেশের নানা স্থান ও নদ-নদীর নাম আর্য্যাবর্ত্তের প্রসিদ্ধ জনপদের ও নদ-নদীর নামে পরিচিত করিয়াছিলেন। আসামের লখিমপুর জেলার সদিয়ার নিকট-বর্ত্তী দিক্রাং বা দিবাং নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান "বিদর্ভ রাজ্য" নামে পরিচিত ছিল। করোতোয়া ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্ত্তী দেশ "মৎস্য দেশ" নামে খ্যাত ছিল (১)।

মহাভারত ও বৌদ্ধ প্রভাবের মধ্যে প্রায় তিন হাজার বৎসরের ব্যবধান। এইটুকুর ইতিহাস কি ভাবে পাওয়া যায়? পুরাণের আশ্রয় লইলে এই অন্ধকার স্থানের মধ্যে রাস্তা পাইবার আশা আছে। পুরাণে ব্রহ্মপুত্র নদ তীর্থরাজ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া বঙ্গদেশে পূজা পাইতেছেন। পুরাণে এমন সমস্ত পৌরাণিক ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়, যাহা কামরূপে ঘটিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ এবং তাহা হইতে ইতিহাসের সূত্র বাহির করা খুব কষ্টসাধ্য নয়। সে কালে ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্ব-তীরবর্ত্তী পূর্ব্ব-মৈমনসিংহ প্রাচীন কামরূপের অন্তর্গত কৈকেয় প্রদেশান্তর্গত ছিল এবং শ্রীহট্টের কতকাংশ মগধ নামে পরিচিত ছিল(২)। শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরার সীমান্ত প্রদেশে 'মনু' নামে একটি নদী আছে। তন্ত্রে লিখিত আছে, সত্যযুগে ভগবান মনু এই নদীতীরে শিব পূজা করিয়াছিলেন (৩)।

খৃঃ ৭ম শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ভারতবর্ষে অপ্রতিহত ছিল। ক্রমে তন্ত্রাদির ও হিন্দুধর্ম্মের উত্থানে ইহার প্রভাব ম্লান হইয়া আসে। এই সময়ের ইতিহাস তন্ত্রাদি হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে। কামরূপের সীমা এই তন্ত্রাদির সময় বেশ বিস্তৃত ছিল (৪)।

ইহার দৈর্ঘ্য একশত যোজন ও বিস্তার ত্রিশ যোজন ছিল। ডাক্তার টেলার আইন-ই আকবরি প্রণেতা ঐতিহাসিক আবুল ফজলের মত উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, টোক-

(১) Narak and Bhagadatta were real and exceptionally powerful kings and probably included in their dominions the greater part of modern Assam and Bengal east of Karalya—History of Assam, Gait, p 14.

(২) দ্রোণ পর্ব্ব।

(৩) At the time of Mahabharata Mymensnigh formed part of Pragjyotish which 300 years later in Bhuddhistic time was known as Kamrup. Mym. Gazetteer p. 22.

(১) History of Assam, Gait.

(২) শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত ২য় ভাগ—শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী।

(৩) পুরাকৃত যুগে রাজন্ মনুনা পুজিত শিবঃ।
তত্রৈব বিরল স্থানে মনুনাম নদীতটে।

(৪) করোতোয়াং সমাশ্রিত্য যাবদ্দিকরবাসিনী।
উত্তরস্যা কঞ্জগিরি করোতোয়াস্তু পশ্চিমে।
তীর্থশ্রেষ্ঠা দিক্ষুনদী পূর্ব্বস্যাং গিরিকন্যকে।
দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রস্য লাক্ষায়াঃ সঙ্গমাবধি।
ত্রিংশৎ যোজন বিস্তীর্ণং দীর্ঘেণ শত যোজনম্।
কামরূপং বিজানীহি ত্রিকোণাকারমুত্তমম্।

—যোগিনীতন্ত্র।

চাঁদপুরের নিকট লক্ষ্যার উৎপত্তি-স্থানই প্রাচীন কামরূপের সীমা ছিল (১)।

দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত পূর্ব্ব-মৈমনসিংহ প্রাচীন কামরূপের রাজ্যভুক্ত ছিল। সেই সময় পূর্ব্ব-মৈমনসিংহের একটি স্বতন্ত্র নাম ছিল। এই প্রদেশকে তখন 'কৈকেয়' নামে অভিহিত করা হইত। রামায়ণোক্ত কৈকেয় দেশের সহিত ইহার সম্বন্ধ নাই। নবাগত আর্য্যগণ আর্য্যাবর্ত্তের জনপদের নাম অনুকরণ করিবার প্রবৃত্তির জন্যই ইহা হইয়াছে। বিশ্ব-বিজ্ঞান-প্রণেতা রঘুনাথ সার্ব্বভৌম মহাশয়ের জন্মভূমি সুসঙ্গ পরগণায় ও মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জন্মস্থান সেরপুর পরগণায়। তাঁহারা উভয়েই প্রাচীন নাম অনুসরণ করিয়া নিজ নিজ গ্রন্থে আত্ম-পরিচয় বর্ণনাপ্রসঙ্গে লৌহিত্যের (ব্রহ্মপুত্রের) তীরবর্ত্তী 'কৈকেয়' দেশে জন্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ হিউয়েন্থসান আপনার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে কামরূপ রাজ্যের যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আধুনিক আসাম, মণিপুর, কাছাড়, মৈমনসিং ও শ্রীহট্ট কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই সময় কামরূপ রাজ্যের পরিধি প্রায় দুই হাজার মাইল বিস্তৃত ছিল। রাজার নাম ভাস্করবর্ম্মণ। জাতিতে ব্রাহ্মণ। তখনও কামরূপে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশ করিতে পারে নাই। কারণ হিউয়েন্থসান সমগ্র কামরূপে একটিও বৌদ্ধ মন্দির দেখেন নাই, অথচ শতাধিক হিন্দু মন্দিরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বঙ্গদেশ তখন কতিপয় ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ হইতে দেখা যায় যে, ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম-তীর পর্য্যন্ত পৌণ্ড্র ও পূর্ব্ব-তীর পর্য্যন্ত কামরূপ রাজ্য বিস্তৃত ছিল। বর্ত্তমান পূর্ব্ব-মৈমনসিংহ ও পশ্চিম-মৈমনসিংহ দুইটি স্বতন্ত্র শাসনাধীন ছিল। মোগল সম্রাট্ আকবরের সময় পূর্ব্ব ও পশ্চিম মৈমনসিংহ সম্মিলিত হইয়া এক শাসনাধীনে যায়।

খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বাঙ্গালায় পাল ও সেনবংশ রাজত্ব করেন। উভয় বংশের রাজ্যই বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ক্রমে কামরূপও তাঁহাদের দখলে আসে। অনুমান প্রায় ১২০ বৎসর কাল এই দুই বংশ বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সময়ে মৈমনসিংহের দক্ষিণ অংশ, বর্ত্তমান কাপাসিয়া, রায়পুরা, ধামরাই ইত্যাদি স্থানে শিশুপাল, হরিশ্চন্দ্র ও যশোপাল নামক পাল বংশীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃপতির রাজ্য ও পশ্চিমাংশে মধুপুরে পাল-রাজ ভগদত্তের ক্ষুদ্র রাজ্য ধীরে ধীরে প্রবলতর হইয়া উঠে। কিন্তু সেন-রাজবংশের প্রবল প্রতাপে কিছু দিনের মধ্যেই ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি লুপ্ত হইয়া যায়। সেন-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রবল প্রতাপশালী বীরসেন বা আদিশূর দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে সমতট প্রদেশস্থ বিক্রমপুরে স্বীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। আদিশূরের প্রপৌত্র বিজয়সেনের সময় সমস্ত বঙ্গদেশ সেনবংশের অধীনে আসে। এমন কি বিজয় সেন মদ্র, কলিঙ্গ ও কামরূপেও আপনার অধিকার বিস্তার করেন। কাজেই বর্ত্তমান মৈমনসিংহ তখন কামরূপ রাজ্যের সহিত সেনবংশের শাসনাধীনে আসে।

বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন বাঙ্গালার ইতিহাসে নানা কারণে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তাঁহার রাজত্বের সময়ই বাঙ্গালার সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও অন্যান্য জীবনে নানারূপ আলোড়ন আসে।

আনন্দ ভট্ট কৃত 'বল্লাল-চরিতে' বল্লালসেনের অসবর্ণ বিবাহের যে ইতিহাস রহিয়াছে, তাহার সহিত মৈমনসিংহের ইতিহাস সংশ্লিষ্ট। বল্লালসেন তদীয় বিবাহকে সমাজকে মানিয়া লইবার জন্য যে শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাকে অস্বীকার করিয়া এক দল পূর্ব্ব-মৈমনসিংহের দিকে চলিয়া আসিয়াছিলেন। ইহাতেই মনে হয় যে, সেই সময় পূর্ব্ব-মৈমনসিংহ বল্লাল-শাসনের বাহিরে ছিল। "পশ্চিমে বল্লালী পূবে মসনদালি", এই প্রবাদই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী হইতেই পূর্ব্ব-মৈমনসিংহ ধীরে ধীরে কামরূপ-শাসনের দাসত্ব ত্যাগ করিয়াছিল।

কামরূপ-শাসনের শৈথিল্যের সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব্ব মৈমন-সিংহের অরণ্যভূমিতে কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্য গড়িয়া উঠিল। এই রাজ্যগুলি অসভ্য কোচ, হাজং, গারো প্রভৃতি দ্বারা, কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত জঙ্গলবাড়ীতে, নেত্রকোণার অন্তর্গত খালিয়াজুরিতে, জামালপুর অন্তর্গত গড়দলিপায়,

(১) Abul Fazal mentions that Kamrupa originally extended to where the Lakhia branches off from the Brahmaputra.—*Topography of Dacca*,

মদনপুর ও সুসঙ্গে, সদর অন্তর্গত বোকাইনগরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বল্লাল-ভয়-তাড়িত অনন্তদত্ত ও গুরুশ্রীকণ্ঠ দ্বিজ এই সময় কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত কাস্তল গ্রামে আসিয়া বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। এই গুরু-শিষ্যই সেই সময়কার পূর্ব্ব-মৈমনসিংহের একমাত্র সর্ব্বপ্রথম ভদ্র উপনিবেশী। ক্রমে মৈমনসিংহের বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য সমৃদ্ধি লাভ করে। সোমেশ্বর পাঠক নামক জনৈক পরাক্রান্ত যাযাবর পথিক বহু অনুচরের সহিত ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে সুসঙ্গ 'পাহাড়' মুলুকে আসিয়া বৈশ্যগারোকে নিহত করিয়া সুসঙ্গ হস্তগত করেন। ইনি কাণ্যকুব্জ হইতে আসিয়াছিলেন, এই রূপ প্রবাদ আছে। এইরূপে ধীরে ধীরে আদিম অধিবাসীদিগের হাত হইতে সমস্ত মৈমনসিংহ মুক্ত হইয়া বিদেশাগত ভাগ্যান্বেষী ও উপনিবেশস্থাপনকারীদিগের হাতে গিয়া পড়ে।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জেতারী নামক জনৈক ক্ষত্রিয় কামরূপের তৎকালীন রাজধানী "ভাটী" আক্রমণ করেন। তখন কামরূপের ভূম্যধিকারিগণ অতি দুর্ব্বল, তাই অতি সহজেই জেতারী ভাটী হস্তগত করেন।

বাঙ্গালার হিন্দুরাজার পতন ও বখ্‌তিয়ার খিলিজির বাঙ্গালা জয়, ইহা ছাড়িয়া দিয়া আমরা একেবারে পঞ্চদশ শতাব্দীতে মৈমনসিংহের সহিত জড়িত বাঙ্গলার ইতিহাস আলোচনা করিব। পঞ্চদশ শতাব্দীতে দ্বিতীয় ফিরোজ সা বাঙ্গলার স্বাধীন সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেই সময় তিনি তাঁহার সেনাপতি মজলিস খাঁকে ব্রহ্মপুত্রের তীরভূমি জয় করিতে পাঠান। মজলিস খাঁ মৈমনসিংহের উত্তর ভাগে প্রবেশ করিয়া, সেরপুর প্রদেশ আক্রমণ করেন। সেই সময়ে গড়দলিপায় (১) দলিপ সামন্ত নামক এক কোচবংশীয় রাজা রাজত্ব করিতেন। মজলিস খাঁ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তিনি নিহত হন। সেরপুরে ফিরোজসাহের প্রতিষ্ঠা হয় এবং ইহাই বোধ হয় মৈমনসিংহে মুসলমান রাজত্বের সূত্রপাত।

১৪৯৮ খৃঃ অব্দে হুসেন সাহ বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করেন। হুসেনসাহের সময় সমস্ত মৈমনসিংহ মুসলমান শাসনের অধীনে আসে। হুসেন সাহ যখন যে দেশে জয়-পতাকা উড়াইয়াছিলেন, সেই দেশে মস্‌জিদ্‌ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে স্মারকলিপি খোদাই করিয়া আপনার জয়ের চিহ্ন চিরস্থায়ী করিয়া রাখিয়াছেন। মৈমনসিংহের অধীনে টাঙ্গাইলের আটিয়া নামক গ্রামে হুসেন সাহের মস্‌জিদ্‌ ছিল। কালের হস্তাবলেপে এখন আর তাহার চিহ্নমাত্র নাই বটে, কিন্তু মসজিদ-গাত্রে প্রস্তরফলকে আরবী অক্ষরে যে বাণী আছে, তাহাতে পশ্চিম-মৈমনসিং বিজয়ের বার্ত্তা খোদিত হইয়া রহিয়াছে*। হুসেন সাহ ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বদিক জয় করিয়া ত্রিপুরা পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। খোআজ খাঁ এই বিজিত অংশের শাসনভার পাইয়াছিলেন। খোআজ খাঁর একখণ্ড প্রস্তরলিপিও পাওয়া গিয়াছে (১)। ইহা ব্যতীত মৈমনসিংহ জেলার অন্তর্গত হুসেনসাহি পরগণা এবং হুসেনপুর নামক স্থানও হুসেন সাহের শাসন-স্মৃতি স্বরূপ আজও মৈমনসিংহের বুকে রহিয়াছে। টমাস সাহেব বলেন—হুসেন সাহের রাজত্বের সময় মুয়াজ্জামাবাদে (২) টাকশাল স্থাপিত হইয়াছিল। টমাস সাহেব বাঙ্গালার নিম্নলিখিত স্থানে টাকশাল ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—(ক) লক্ষণাবতী (খ) ফিরোজাবাদ (গ) সাতগাঁও (ঘ) শা…(অস্পষ্ট) (ঙ) গয়াসপুর (চ) সোনারগাঁও (ছ) মুয়াজ্জমাবাদ। ব্লকম্যান ইহার পরও তিনটির নাম উল্লেখ করিয়াছেন—ফতাবাদ, খালি ফতাবাদ, হুসেনাবাদ। টাক-

(১) ইহা সেরপুরের অন্তর্গত।

* The Prophet—may God's blessing rest on him !"—says, "He who builds a mosque to God, will have a house like it built for him by God in Paradise." This Jami Mosjoid was built by the great and respected King Alauddunya Waddin Abbul Muzuffor Husain Shah, The King, son of Sayjid Ashraf, a descendant of Husain—may God perpetuate his rule and his Kingdom! Date A. H. 922. (A. D 1516)—Notes on Arabic and Persian Inscriptions—(J. A. S. B).

(১) On a new King of Bengal—J. A. S. B 1872.

(২) মুয়াজ্জমাবাদ সম্বন্ধে বহু তর্ক রহিয়াছে। ব্লকম্যান মুয়াজ্জমাবাদের অবস্থান সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হইতে পারেন নাই। তাঁহার মতে "The Union of Tiparah and Muazzamabad confirms my conjecture that it belonged to Sonargaon." মৈমনসিংহের ইতিহাস-প্রণেতা কেদারনাথ মজুমদার বলেন যে, মুয়াজ্জমাবাদ মৈমনসিংহের অন্তর্গত এবং ইহা ১৫১০ খৃঃ অব্দে খোয়াজ খাঁর শাসনাধীনে ছিল। ১নং ফুটনোট-এ যে প্রস্তরলিপির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতেও তাহাই সপ্রমাণ হয়।

শাসনের এই বিভাগ দেখিয়া মনে হয়, তখন বঙ্গদেশ বহু বিভাগে বিভক্ত ছিল*। হোসেন সাহের কামরূপ বিজয়ের পর নছরৎসাহ কামরূপের শাসনকর্ত্তা হন। কিন্তু অল্পকাল পরেই প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে এবং পূর্ব্ব-অধিবাসিগণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নছরৎসাহ পলাইয়া মুয়াজ্জামাবাদে চলিয়া আসেন। তাঁহার শাসনান্তর্গত সমস্ত প্রদেশকে "নছরৎসাহি" নাম দেওয়া হয়। তৎপরে এই দেশে মোগল-শাসন প্রবর্ত্তিত হইলে আকবর কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া রাজস্ব-সচিব টোডরমল্ল বাঙ্গলার রাজস্ব ও ভূমির বন্দোবস্তে মনোযোগ দেন। টোডরমল্লের সরকারী কাগজে নছরৎসাহী "সরকার বাজুহা" নামে পরিচিত হইয়াছে। ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভে সরকার বাজুহা "জেলা ময়মনসিংহ" নামে অভিহিত। নসিরাবাদ নামেও এই জেলা পরিচিত ছিল। ছেলেবেলায় দিদিমার মুখে এই জেলার নাম নসিরাবাদ জেলাই শুনিতাম। এখনও একটি পুরাতন বাসভবনে "নসিরাবাদ লোন অফিস" লেখা দেখিতে পাই।

* কেদারনাথ মজুমদার—ময়মনসিংহের ইতিহাস।

ময়মনসিংহ নামটি মমিনসাহীর সাধু সংস্করণ। প্রবাদ, আকবরের সময় মমিনসাহ নামে কোন ব্যক্তি বাজুহার এক অংশের অধীশ্বর ছিলেন। সেই মমিনসাহ হইতে তদীয় অধিকৃত মহলের নাম মমিনসাহী হইয়াছিল। আইন-ই-আকবর-ই গ্রন্থে মমিনসাহী মহালের নাম দেখা যায়। ক্রমে এই মমিনসাহী হয় লিপি-প্রমাদে, না হয় উচ্চারণ-বিড়ম্বনায় ময়মনসিংহ রূপ ধারণ করিয়াছে।

গায়ত্রী

—শ্রীমণীন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ

শঙ্কর ওঙ্কারে জনমিলে সুন্দরী উজলিল শত রবিদীপ্তি।
সৃষ্টির চঞ্চল শতদল আন্দোলি বিকাশিল রূপে অনুলিপ্তি॥
বন্দিল সুরাসুর ভকতির চন্দনে নারায়ণ তুলে নিল বক্ষে।
মুক্তির উচ্ছ্বাসে ব্রহ্মার বেদগান বাহিরিল ছন্দি অলক্ষ্যে॥
ব্রাহ্মণ আদি ভোরে দিবাকর মণ্ডলে নিরখিল বালারুণ ভর্গ।
পার্থিব সুখ দুখ পশ্চাতে রাখি তারা
ঢালি দিল কামনার অর্ঘ্য॥
বন্দিত রূপ রসে দেখা দিলে সুন্দরী
ঊষালোকে চড়ি রাজহংসে।
গাঙ্গেয় বারি ভরা করঙ্গ নিয়ে করে
অক্ষের মালা দোলে অংসে॥
আরক্ত বাস পরি ঋক বেদ উচ্চারে দাঁড়াইলে উজ্জ্বল অগ্নি।
ধ্যানস্থ ঋষিকুল সমাকুল উল্লাসে নিরখিল সাধনায় মগ্নি॥

মধ্য গগনপটে কৃষ্ণ কাদম্বিনী দক্ষিণ করে শোভে কম্বু।
বিহঙ্গরাজে চড়ি কদম্বমালা গলে গলে দোলে লাবণ্য অম্বু॥
ললাট-নেত্র কোণে ঝলসে উর্দ্ধমুখ অর্ব্বুদ লেলিহান রশ্মি।
ইষ্টের সাধনায় বিঘ্নের বিনাশক ভুজঙ্গ রিপুদল ভস্মি॥
চক্রের ঘর ঘর নির্ঘোষে চরাচর মুদগর ঘোরে বাম হস্তে।
সবিতৃ-মণ্ডলে শ্যামরূপা বৈষ্ণবী সবিতরী মাতঃ নমস্তে॥

সায়াহ্নে ছল ছল শশধর উজ্জ্বল বৃষারূঢ়া ধ্বংসের দৃপ্তি।
ডম্বুরু ডিমি ডিমি বাজে করে রুদ্রাণী
বিনাশের লীলা হেরে তৃপ্তি॥
অঞ্চলে দুলে নাচে সৃষ্টির নব খেলা রক্তের ঢেউ মহাশূন্যে।
সিন্দুর দিল ভালে সন্ধ্যায় তারাদলে
দুলে দুলে এ কি মহাপুণ্যে॥
আদি ঋষিমণ্ডলী সামগান উচ্চারি
যোগে রত সমাগত সন্ধ্যা।
নমোনমঃ রুদ্রাণী গায়ত্রী ত্রিধারূপা নমস্তে সুরাসুরবন্দ্যা॥

মধ্য-বঙ্গের বিধ্বস্তপল্লী-অঞ্চলের পুনঃ-সংস্কার

—শ্রীহরিদাস মিত্র

জাতিসমূহের বর্ণানুক্রমিক সূচি ও বিশেষ পরিচয়

'I N M স ট ঠ বঙ্গজ বৈদ্যগণ*। সাধারণতঃ উন্নতিশীল বর্দ্ধিষ্ণুজাতি ○ গ। তাঁহাদের মধ্যে শাক্তের সংখ্যা অধিক। বৈদ্যগণের মধ্যে রাঢ়ীয় শ্রেণী স্থিতিশীল, হ্রাস-বৃদ্ধি নাই II ব্ল। পক্ষান্তরে তাঁহাদের মধ্যে বৈষ্ণবের সংখ্যা অধিক N M 'I ষঠ। উভয় শ্রেণীর মধ্যেই শৈবেরা সংখ্যা-লঘিষ্ঠ।

H জ ভগবানিয়া। ইহারা মূলতঃ মুসলমান, পরে ঘোষপাড়ার 'কর্ত্তাভজা' সম্প্রদায়ের মন্ত্র গ্রহণ করিয়া হিন্দুভাবাপন্ন হইয়াছে। ইহাদের মন্দির বা মসজিদ নাই, পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস নাই; উপাসনার কোন সময়, স্থান বা প্রকার নাই। ইহারা মৃত ব্যক্তির শব মন্ত্রপূত করিয়া মুসলমানের মত কবর দেয়। মাংস মোটেই খায় না; উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করে না। মৎস্য সকলে খায়; আহারে হিন্দুর মত শুদ্ধাচারী এবং সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। ইহারা একমাত্র নিরাকার ভগবানে বিশ্বাস করে, এ জন্য ইহাদের নাম ভগবানিয়া। কিন্তু ইহারা জাতিতে মুসলমান বলিয়া কথিত হয় ও সেলাম দেয়।

I ঝ ভড় (প্রাচীন বরাহক। বৃত্তি মহস্তধরা, খাতধর্ম্ম, ইষ্টকনির্ম্মাণ)। ভড় এবং বরাহক, উভয়ই প্রাচীন নাম। যশোহরে এই শ্রেণী নাই, খুলনা ও বরিশালে অনেক ভড় আছে। কিন্তু এক্ষণে তাহাদের বৃত্তি বিভিন্ন। সম্ভবতঃ, এই ভড় ভড়ং হইতে অভিন্ন এবং শেষোক্তগণ বিশেষজ্ঞের মতে বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিল। (গন্ধবণিক দ্রষ্টব্য)। গন্ধবণিক, ভড়ং, এমন কি নিম্নশ্রেণীর কায়স্থ প্রভৃতি এই দেশের আদিম অধিবাসিগণও বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিল।

V (I ক ঘ ভূঁইমালী, ভূঁমালী (প্রাচীন ভূমিমালী)। সংখ্যা, যশোহরে ৫৯৩; খুলনায় ১৯২।

পূর্ব্ববঙ্গে এই জাতির সংখ্যা অধিক। পশ্চিম-বঙ্গের মল্লভূমিয়া জাতিই পূর্ব্ববঙ্গে ভূঁইমালী নামে পরিচিত। তথায় তাহাদের দুটি থাক আছে, বড় ভাগিয়া ও ছোট ভাগিয়া। বড় ভাগিয়াগণ—কৃষিকার্য্য, পাল্কিবহন ও নৌকাচালন করে। ছোট ভাগিয়াগণ মল পরিষ্কার করে এবং ঝাড়ুদারের কার্য্য করে। এইরূপ বড় ভাগিয়া ও ছোট ভাগিয়া শ্রেণী, বাংলা দেশের তাঁতীদের মধ্যে আছে, আর মধ্যবঙ্গের মুচিগণ এই দুই শ্রেণীতেই বিভক্ত এবং তাহাদের মধ্যে ছোট ভাগিয়াগণ নিম্নতর। (মুচি দ্রষ্টব্য)।

মালী (মালাকার) মধ্যে, ফুলমালী প্রভৃতি শ্রেণীর নির্দ্দেশ করিবার উদ্দেশ্য আছে। সম্ভবতঃ মালী বলিলে ভূঁইমালী ও (প্রাচীন ভূমিমালী) বুঝাইতে পারে।

---

*(সাঙ্কেতিক চিহ্ন সকলের ব্যাখ্যা)

V ক চিহ্নিত জাতিগুলি ক্ষয়িষ্ণু।
II ব্ল চিহ্নিত জাতিগুলি স্থিতিশীল। হ্রাস-বৃদ্ধি নাই।
○ গ চিহ্নিত জাতিগুলি দ্রুতবর্দ্ধনশীল।
(I ঘ চিহ্নিত নিম্ন-জাতিগুলির পৃথক্ ব্রাহ্মণ, পরামাণিক আছে।
ঙ চিহ্নিত নিম্ন-জাতিগুলির পৃথক্ ব্রাহ্মণ নাই।
ব চিহ্নিত জাতিগুলির শিল্প বা বৃত্তি অধুনালুপ্ত।
O ছ চিহ্নিত জাতিগুলি মুসলমান-ধর্ম্মী।
H জ চিহ্নিত জাতিগুলি মুসলমান-সংশ্লিষ্ট।
I ঝ চিহ্নিত জাতিগুলি পূর্ব্বে বৌদ্ধ-ভাবাপন্ন।
M ঞ চিহ্নিত জাতিগুলি শাক্ত।
'I ট চিহ্নিত জাতিগুলি শৈব।
N ঠ চিহ্নিত জাতিগুলি গৌড়ীয় বৈষ্ণব।
N ড চিহ্নিত জাতিগুলি খ্রীষ্টান।

(দ্রষ্টব্য—ইংরাজী, ল্যাটিন প্রভৃতি বিদেশীয় শব্দ নাগরী অক্ষরে দেওয়া হইবে)।†

† প্রবন্ধের প্রথমাংশ অগ্রহায়ণ ও মাঘের সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

১ ব ময়রা M ৪। কুরী (মোদক) দিগকে সচরাচর ময়রা হয়। (কুরী, কুরি দ্রষ্টব্য)। প্রকৃত পক্ষে মোদক, কুরী নহে। ইহাদিগের উপাধি মধুনাপিত।

১ M ব ৪ মধুনাপিত। মধুনাপিতের বৃত্তান্ত চৈতন্য-চরিতামৃত ও চৈতন্য-ভাগবতে আছে। সুতরাং এই জাতি চারিশত বৎসর মাত্র নাপিত হইতে পৃথক্ জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব সন্ন্যাসগ্রহণ জন্য মধু নাপিত নামক নাপিতের নিকট প্রথম মুণ্ডিত হন। মধু নাপিত আপনাকে পরম ভাগ্যবান বিবেচনা করিয়া প্রার্থনা করিল যে, সে যখন মহাপ্রভুর উত্তমাঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে, তখন সে আর অপরের পাদস্পর্শ (বা ক্ষৌর) করিতে ইচ্ছা করে না, প্রভুর পাদচিন্তা ব্যতীত অন্য অভিলাষ রাখে না। মহাপ্রভু মধুকে কহিলেন, বৎস, অদ্যাবধি তোমাকে আর ক্ষৌর কর্ম্ম করিতে হইবে না। তুমি মোদক ও লড্ডুকাদি প্রস্তুত কর, তোমার অধঃস্তন সন্ততিবর্গও যেন ক্ষৌরকর্ম্ম না করে। বৃত্তি—মিষ্টান্ন প্রস্তুতকরণ ও বিক্রয়। যশোহর, খুলনায় মূল মোদকের সংখ্যা অত্যল্প হইলেও, বনগ্রাম, যশোহর, সিঙ্গিয়া, নড়াইল এবং সাতক্ষীরার মিষ্টান্ন অতি উৎকৃষ্ট। নদীয়া জেলা হইতে অনেকানেক কুরী উপাধিক ব্যবসায়িগণ মধ্যবঙ্গে স্থায়ী রূপে বাস করিতেছেন।

৮ ও H M ক ক ক মাল, মালবৈদ্য। সংখ্যা, যশোহরে ৬৬২ ; খুলনায় ৪৫৬। মালদিগের রাজবংশী, সাপুড়িয়া, বেদিয়া প্রভৃতি থাক আছে। কোচদিগের রাজবংশী নামক একটি শ্রেণী আছে। মালজাতি মাত্রেরই মনসা একটি প্রধান দেবী। কোচদিগেরও মনসা বা বিষহরি প্রধান দেবতা। বঙ্গদেশের মল্লভূমি এবং মালদহ, মল্ল বা মালদিগের নামানুসারে, বিবেচনা হয়। কোন কোন মালেরা সাপ ধরে না, দাঁতের পোকা বাহির করে। (সাপুড়িয়া, বেদিয়া, রাজবংশী দ্রষ্টব্য)।

M ণ M ক ৫ ৪ মালাকার, মালাকর, মালী, ফুলমালী ৮ ক।—সংখ্যা যশোহরে ৮৫৭ ; খুলনায় ৪৬০। বৃত্তি—পুষ্পাভরণ, মাল্য, শোলার ফুল, টোপর, খেলনা, ডাকের সাজ প্রভৃতি নির্ম্মাণ ও বিক্রয়। বারুদ এবং বিবিধ আতসবাজি প্রস্তুত ও বিক্রয়। উত্তরডিহি (ভৈরব তীরে) ও দেওপাড়া গ্রামের মালাকরগণ, উৎকৃষ্ট বাজি প্রস্তুত এবং চিত্রকর্ম্ম করিত। প্রত্যেক প্রাচীন গ্রামের বিশিষ্ট চিহ্নমধ্যে, এই মালাকারগণের এবং পটকারগণের নিবাস বলিয়া ধরিতে হইবে।

৩ M ব ৪ মালো, বৃত্তি মৎস্যসংচয় ধীবর ও নৌচালন। সংখ্যা, যশোহরে ২৪২২৬ ; খুলনায় ১১৪৬৩। মধ্যবঙ্গের প্রাচীনতম প্রত্যেক জাতির মধ্যে দুইটি করিয়া থাক আছে। একটি নৌ ও মৎস্যাদিজীবী, অপরটি মৃগয়া ও কৃষিজীবী। মালো জাতীয়েরা ধীবর এবং সম্ভবতঃ, মল্ল এবং তাহাদের শাখা ঝল্ল এই দুই প্রাচীন জাতীয় হইতে উদ্ভূত। অধুনা কোথাও কোথাও (ঝল্ল-মল্ল) মালোজাতি ক্ষত্রিয়াচারী এবং একাদশাহিক অশৌচ পালন করে।

৩ ণ ম ব মেথর—বৃত্তি মল পরিষ্কার। শূকর এবং কুক্কুটপালন ও বিক্রয়, অন্যতম ব্যবসা। বঙ্গদেশের প্রাচীন, ময়লাপরিষ্কারক—হাঁড়ি, মুচি, কাওরা, ভুঁইমালী প্রভৃতি জাতি অনেক আছে। সে জন্য সম্ভবতঃ মেথর-জাতি বিভিন্ন প্রদেশাগত। এক্ষণে কোথাও কোথাও, হীন ব্রাহ্মণেরা ইহাদের যজন-যাজন করেন।

৮ ণ M M N ক ঘ ক ৪ ৪ মুচি (প্রাচীন চর্ম্মকার)। বৃত্তি চর্ম্মের সংস্কার, চর্ম্মনির্ম্মিত দ্রব্যাদি এবং বাদ্য যন্ত্র, মৃদঙ্গাদির নির্ম্মাণ ও বিক্রয় ; বাদ্য-বাদন। সংখ্যা, যশোহরে ৩৭১৫৮ ; খুলনায় ২১৬৩৫। (কপোতাক্ষী-তীরে) কোটচাঁদপুর, তালামাগুরা প্রভৃতি অঞ্চলের কর্ম্ম-কারদের বিশিষ্টতা আছে। তথায় ইহারা আচার ব্যবহারে, অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং বহু ভদ্র পরিবারে ভৃত্যকর্ম্মে নিযুক্ত হয়। ইহারা অধিকাংশই গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতানুসরণ করে। বড়দল (কপোতাক্ষীতীরে) অঞ্চলের প্রায় পাঁচশত পরিবার সম্প্রতি রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছে। উচ্চবর্ণের হিন্দুগণের হৃদয়-হীনতাই ইহার কারণ। রাঢ়ে ডোমগণ ও মধ্যবঙ্গে মুচিগণ ঢাক বাজায়।

৫ ক মোলেঙ্গা। প্রাচীন মোদগালিঙ্গী জাতি হইতে ইহারা অভিন্ন বলিয়া বিশেষজ্ঞগণের মত। মিগাস্থিনিস মিগাস্থিনিস এবং প্লিনি প্লিনী বলিয়াছেন যে, বঙ্গদেশ,

গঙ্গাসঙ্গমের নিকটবর্ত্তী একটি দ্বীপে মোদ্গালিঙ্গী জাতি বাস করিত। কেহ অনুমান করেন যে, এই দ্বীপ পূর্ব্ববঙ্গের কতকাংশ বুঢ়ন, বাক্‌লা, সন্দীপ প্রভৃতি স্থান লইয়া গঠিত এবং মোদ্গালিঙ্গী শব্দ, মোলঙ্গী বা মলঙ্গা শব্দের উচ্চারণভেদ মাত্র।

হিজলী অঞ্চলে এবং চব্বিশপরগণা ও খুলনায়, লবণাক্ত জল ও মৃত্তিকা হইতে, পূর্ব্বে বঙ্গদেশে প্রচুর লবণ প্রস্তুত হইত। লবণ প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহৃত এক প্রকার মৃণ্ময়ভাণ্ডকে মোলঙ্গা এবং লবণপ্রস্তুতকারকদিগকে মোলঙ্গী বলিত। চব্বিশ পরগণা ও খুলনা জেলায় বহুসংখ্যক মোলঙ্গীর বাস আছে, কিন্তু তাহারা এক্ষণে লবণ প্রস্তুত করিতে অধিকারী নহে।

চব্বিশপরগণার বসিরহাট মহকুমায়, ইচ্ছামতী তীরে মোলঙ্গাপাড়া আছে এবং কলিকাতায় মোলঙ্গা লেন আছে। ঐ সকল স্থানের সহিত এই মোলঙ্গী, লবণপ্রস্তুত-কারকদের সম্বন্ধ আছে কি না অনুসন্ধেয়। খুলনায় অধুনা পর্য্যন্ত, অনেক 'নিমক খালাড়ি মহল,' এই নামে পরিচিত ও বন্দোবস্তি জমি আছে। আজি পর্য্যন্তও খুলনার নানা স্থানে (যথা—বিল ডাকাতিয়ার উপকণ্ঠে) লোকে ব্যবহার্থ অল্পাল্প লবণ প্রস্তুত করিতে জানে।

হিন্দুস্থানী মুনিয়া বলিয়া একটি জাতি আছে। তাহাদের প্রধান ব্যবসা, লবণ ও সোরা প্রস্তুত করা। নমঃশূদ্র (চাণ্ডাল)দিগের মধ্যে মুনিয়া নামক এক থাক আছে।

৮ এ। ক ক ক যোগী, যুগী। জুগী—বৃত্তি বস্ত্রবয়ন ও কৃষি, আধুনিক। সংখ্যা যশোহরে ৬৯০৯; খুলনায় ১২৪১২। যোগীরা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। বৌদ্ধাচারের কিছু নিদর্শনও তাঁহাদের মধ্যে আছে। জীবিকার জন্য বস্ত্রবয়ন এবং বিক্রয়ের ব্যবসা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অনেকে আদা হলুদ, লঙ্কাদি উৎপাদনরূপ বিশেষ কৃষিকর্ম্মে বিলক্ষণ পটু, তথাপি তাঁহাদের মধ্যে সংস্কৃত পঠন-পাঠন এখনও পর্য্যন্ত আছে। অনেকে আয়ুর্ব্বেদ এবং জ্যোতিষের চর্চ্চা করিতেন। যোগী জাতির কোন ব্রাহ্মণ গুরু-পুরোহিত নাই। পৌরোহিত্য প্রভৃতি নিজেরাই সম্পন্ন করেন। এক-দশাহে শ্রাদ্ধ পালন করেন। যোগীগণ নাথ-সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধ ছিলেন। এখনও যশোহর, খুলনায়, কেশবপুর, বাগেরহাট প্রভৃতি অঞ্চলে অনেক যোগী আছেন। এতদঞ্চলে এখনও পর্য্যন্ত দেউল বা চড়ক (চরক) পূজার প্রকৃত পুরোহিত, যোগী জাতি। এবং এই উৎসবের অধিকাংশ ক্রিয়াকলাপ বৌদ্ধ মতমূলক। যোগীদের সাধারণ উপাধি নাথ এবং এই সংপ্রদায়ের গুরুপরম্পরা মধ্যে, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি অনেক শক্তিশালী আচার্য্য ছিলেন, যাঁহারা শৈবযোগী বলিয়াও গণিত ও পূজিত হইতেন।

৯ এ। ঘ ঘ রাজবংশী। বৃত্তি—মৎস্যজীবীবৎ ও কৃষি-কর্ম্ম। সম্ভবতঃ জেলে, পাড়ুই, ও রাজবংশীরা পৃথক্ জাতি ছিল এবং ক্রমে আচার-ব্যবহারে তাহারা (যশোহর-খুলনায়) অত্যন্ত সন্নিকৃষ্ট হওয়ায়, একের নাম অন্যের প্রতি প্রযুক্ত হইতেছে। মাগুরা মহকুমায় বাটাযোড়ে মূল রাজ-বংশীদের এক কেন্দ্র। রাজবংশী বলিয়া কোচদিগের এক শ্রেণী আছে এবং পাড়ুই বলিয়া জেলে-কৈবর্ত্তদিগের মধ্যে উপাধি আছে। মালো নামক ধীবরজাতিও ইহাদের সম্পর্কিত।

কৈবর্ত্তগণ দুই ভাগে বিভক্ত—দাস ও নাবিক। যাহারা কৃষিকর্ম্ম ও দাস্যবৃত্তি করে, তাহারই হেলে। কৈবর্ত্ত (দাস) ও যাহারা মৎস্য সঞ্চয় ও নাবিকের কার্য্য করে, তাহারা (জেলে) বলিয়া খ্যাত। জেলেদিগের জল আচরণীয় নহে। এই জেলেরা জেলে শব্দে আখ্যাত নহে, ইহারা আপনাদিগকে মালো শব্দে নির্দ্দেশ করে। জেলে বলিলে অত্যন্ত ক্রোধ করে। ইহারা কহে জেলে শব্দে চণ্ডাল-জাতীয় জেলেদিগকে বুঝায়।

'মনুক্ত ব্রাত্য ক্ষত্রিয়-সন্তান ঝল্ল, মল্ল জাতি বলিয়া, বর্ত্তমান জেলে মালোগণ দাবী করেন কিন্তু বীরভূম প্রদেশে যে সকল মল্লজাতি দৃষ্ট হয়, তাহাদের আচার ব্যবহার অন্যরূপ। তাহারা মৎস্যজীবী নয় বাহুযোদ্ধা। ঝল্ল জাতি লাঠিয়াল।'

কোন কোন মতে, ঝল্লজাতি, মল্ল জাতির শাখা-বিশেষ ও উহারা বর্ত্তমান জেলে, মালোগণের আদি। মতান্তরে, জেলে-মালোগণ নিঃসম্পর্কিত এবং ঝল্ল-মল্লগণ হইতে পৃথক্।

এই সকল কারণে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে, জেলেদিগকে মধ্যে 'কৈবর্ত্ত' পর্য্যায়ে, রাজবংশীদিগকে 'জেলে' পর্য্যায়ে এবং নমঃশূদ্রজাতীয় মৎস্যজীবীদিগকে 'জিয়ানি' নামে অন্তর্ভুক্ত করা হইল। (তৎ তৎ স্থানে দ্রষ্টব্য)। কোথায়ও কাহারও "নিকারীগণ" রাজবংশী বলিয়া পরিচয় দেয়, তজ্জন্য নিকারীরা নূতন মুসলমান মনে হয়।

৮ ক লোহার (প্রাচীন লৌহকার)। সংখ্যা, যশোহরে ৫৪; খুলনায় ১৭৫। লোহার ও কামার এক জাতি না হইলেও, লৌহকারক এবং অস্ত্রশস্ত্রনির্মাতা হিসাবে উভয়েরই এক বৃত্তি। লোহারগণ সম্ভবতঃ ভিন্ন প্রদেশাগত।

৩ গ শাঁখারি (প্রাচীন শঙ্খকার), শঙ্খবণিক। বৃত্তি শঙ্খের অলঙ্কার প্রভৃতি, কারুশিল্প। খুলনা সহরে, বাগেরহাট এবং মাগুরা মহকুমা মধ্যে, অনেক শাঁখারি আছে। খুলনায় প্রচুর শঙ্খের দ্রব্য প্রস্তুত হয়। শঙ্খের বলয়াদি হিন্দুরমণীরা ব্যবহার করেন। এমন কি, জৈন এবং বৌদ্ধগণও শঙ্খকে মাঙ্গলিক পদার্থরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল কারণে শঙ্খের কারুকদিগের বৃত্তি উৎসন্ন হইবার আশঙ্কা নাই। শঙ্খচূর্ণও, প্রসাধনের সুগন্ধি পদার্থ সকলের (আধার) বীজ রূপে এবং বৈদ্যক ঔষধ প্রস্তুতে, প্রচুর ব্যবহৃত হয়।

৪ অ শিয়াল-খগো। ইহারা, হিন্দুস্থানীভাষী, ভিন্ন প্রদেশ হইতে মধ্যে মধ্যে এই সকল অঞ্চলে আসে ও উগ্র, যাযাবর-প্রকৃতি। ইহাদের মধ্যে নানা ভাগ ও বিভাগ আছে। তন্মধ্যে 'কাল্লা' এবং 'যোগী' দুইটি প্রধান ভাগ —উভয়েই শৃগালের ডাক অনুকরণ করিয়া ভুলাইয়া আনিয়া শিক্ষিত কুকুর দ্বারা শৃগাল শিকার করে।

'কাল্লা'রা শিয়াল, খেঁকশিয়াল, বাঘ, চিতাবাঘ, কুমীর, শূয়ার, গোসাপ, তক্ষক সাপ—বস্তুতঃ সবই, আদরের সঙ্গে খায়। পক্ষান্তরে 'যোগী'রা, অখাদ্য বর্জ্জন করে বলিয়া, পরিচয় দেয়। তাহারা বলে না কি, শিয়াল কুমীর প্রভৃতি কয়েকটা জিনিস খায় না। কিন্তু খেঁকশিয়াল, শূয়ার, সজারু এবং কোন কোন সাপ পছন্দ করে।

৩ ঘ ঙ ঞ ব র শুঁড়ি (প্রাচীন শৌণ্ডিক)। বৃত্তি মদ্য প্রস্তুত ও বিক্রয়। ইহারা কেহ কেহ উপবীত গ্রহণ করিয়াছে এবং বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দেয়। বস্তুতঃ ইহারা এতদ্দ-অঞ্চলের ব্যবসায়ীজাতির মধ্যে প্রধান। শৌণ্ডিকগণ অজলাচরণীয় জাতির মধ্যে গণিত হইলেও, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব মতাবলম্বী এবং দানশীল। কার্য্যতঃ ইহারা বৈশ্য-বৃত্তি। কেবলমাত্র খুলনা সহর ব্যতীত, অন্যত্র এ অঞ্চলে, মদ্য প্রস্তুতের ভাটি, ভাটিখানা খোলা ঘাঁটি নাই। খুলনায় অনেক কুলী থাকায় দেশী মদের দোকান আছে। খুলনা যশোহরাদিতে পাউরুটি বীজ প্রস্তুত জন্য তাড়ির প্রয়োজন হয়। কিন্তু উহা খেজুর রস হইতে প্রাপ্ত।

৮ ক শিয়া। ৩ গ সুন্নি—মুসলমানদিগের দুইটী প্রধান শ্রেণী। যশোহর খুলনার স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে শিয়া নাই বলিলেই চলে; সহরে বাজারে যে দুইদশ জন শিয়া মুসলমান মহরমের তাজিয়া উৎসব করেন, তাঁহারা পশ্চিম হইতে আগত ব্যবসায়ী বা কর্ম্মচারী। এখানকার অধিকাংশ মুসলমানই সুন্নি এবং উহারা হানিফী মতাবলম্বী।

এখানকার হানিফী সুন্নিদিগকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—(১) আশ্‌রাফ্ (শরিফ্ শব্দজ) উৎকৃষ্ট; (২) আতরাফ্ (তরফ্ শব্দজাত) সাধারণ; (৩) আর্‌জাল (রজীল শব্দনিষ্পন্ন) নিম্নতম স্তরের, চামার মেহতর প্রভৃতি অনাচরণীয় মুসলমান।

যশোহর খুলনায় ৩২ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে প্রায় ১৮ লক্ষ মুসলমান। আশ্‌রাফ্ বা সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর মুসলমান সৈয়দ, মোগল, পাঠান ও সেখ—এই কয়টি প্রধান সম্প্রদায়ভুক্ত। 'যশোহর-খুলনায় সেখ ব্যতীত অপর সকলের সংখ্যা ২৫ হাজারের অধিক হইবে না, কিন্তু সেখের সমষ্টি প্রায় ১২ লক্ষ। আশ্‌রাফ সেখেরা পশ্চিম দেশ হইতে আগত সম্মানিত বংশ; উঁহাদের সংখ্যা ২।৩ লক্ষ মাত্র। অবশিষ্ট ৯ লক্ষ অর্থাৎ সমগ্র মুসলমান জন-সংখ্যার অর্দ্ধেক, সেখ-উপাধিধারিগণ হিন্দু জাতির নিম্নস্তর হইতে বহির্গত হইয়া এক সময়ে ক্রমে ইসলাম ধর্ম্ম পরিগ্রহ করেন।'

'হিন্দু সমাজের নির্য্যাতনে পলায়িত জাতিরা যখন দক্ষিণাঞ্চলে বনমধ্যে জীবন যাপন করিতেছিল, তখন উদারনীতি মুসলমান সাধকগণই এ দেশে প্রবেশ করিতে অগ্রণী হন; অনেকে সেই সকল পীরের আস্তানা সেখানে

বর্ত্তমান আছে। তাঁহাদের শিক্ষার ফলে ঐরূপ কতজাতি নব মতে দীক্ষিত হইয়া গেল।

যে সব উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ দৈব ঘটনায় ইসলাম্ ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও বহুকাল পর্য্যন্ত হিন্দুর আচার ব্যবহার কতকাংশে বজায় রাখিয়াছিলেন, তাহারাই পীরালি মুসলমান নামে এখনও চিহ্নিত। ৮ ক

আকৃতি ও বর্ণে, শিক্ষা ও সভ্যতায়, সৌজন্য ও সদাচারে উঁহারা এখনও বিশিষ্টতা রক্ষা করিতেছেন। সাধারণ মুসলমান সমাজের সঙ্গে ইঁহাদের বিবাহাদি সম্বন্ধ হয় না। যশোহরের পশ্চিমাংশে মহেশপুর প্রভৃতি স্থানে, মধ্যভাগে সিঙ্গিয়ার ও যশোহরের নিকট গ্রামসমূহে এবং দক্ষিণভাগে সাতক্ষীরা মহকুমায় ও পার্শ্ববর্ত্তী ২৪ পরগণার পূর্ব্বাংশে ইঁহাদের কেন্দ্র আছে। দক্ষিণ-ডিহি-নিবাসী গুড়-চৌধুরী ব্রাহ্মণ বংশীয় কামদেব ও জয়দেব পীরালি হন এবং ঐ সমাজ নানাস্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়ে....'

'ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুর সোনাই নদীর কূলে যে হাকিমপুর গ্রামে কাজিদিগের গৃহে একদা প্রতিপালিত হন, উক্ত কামদেব ঠাকুরের অধস্তন বংশধর···সেই গ্রামে বাস করেন। উঁহারা দেখিতে যেমন সুপুরুষ, বিদ্যা-চর্চ্চায় তেমনই সুশিক্ষিত এবং ব্যবসায়ে ধন-সম্পত্তিশালী। এতদঞ্চলে পীরালি মুসলমানদিগের তিনটি সমাজের পরিচয় পাই:—খাঁ-সমাজ, চৌধুরী সমাজ ও সুতলিয়া সমাজ।'

৩ ক 'আতরাফ্ সম্প্রদায়ের মুসলমানের মধ্যে সেখই অধিক। বস্ত্র-ব্যবসায়ী, জোল্‌হা, মৎস্য-ব্যবসায়ী, নিকারী ও চাকলাই (যশোহর—মণিরামপুর অঞ্চলে) মুসলমান, এবং দরজী, ফরাজী ও পীরালি প্রভৃতি থাকও এই শ্রেণী ভুক্ত। সেখ ব্যতীত আরও যে তিন লক্ষ আতরাফ্ আছে, তন্মধ্যে যশোহর-খুলনায় প্রায় ৮৪ হাজার জোল্‌হা, বা বস্ত্র-ব্যবসায়ী মুসলমানের বাস। অনেকেই পুরাতন ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া কৃষি বা অন্য ব্যবসায় এবং লেখা পড়ায় মন দিতেছেন।'*

৪ ক 'আশরাফ্ শ্রেণীতে এ প্রদেশে যাঁহারা আছেন, তন্মধ্যে সৈয়দ, উচ্চ শ্রেণীর সেখ, মীর্জা ও বেগ প্রভৃতি উপাধিধারী মোগল, খাঁ, মল্লিক, মীর মীরধা প্রভৃতি উপাধি-যুক্ত পাঠান, আখন্দজী (অপভাষায় আকুঞ্জী) ও খোন্দকার (অধ্যাপক), মুন্সী (লেখক) এবং কাজি (বিচারক) এই সকল বংশই প্রধান।'

বুঢ়ণ(বুড়ন)এর খাঁ, এবং তেঁতুলিয়ার কাজি, এই পরিবার দুইটি (পাঠশালার) গুরুগিরি কার্য্যের জন্য এ অঞ্চলে পূর্ব্বে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান লেখকের পিতৃদেব এবং লেখক, শৈশবে পাঠশালে মুসল-মান গুরু এবং ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত এই উভয়বিধ শিক্ষকের নিকট অধ্যয়ন করার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

৮ ক সদ্গোপ—বৃত্তি কৃষি ও ভৃত্যকর্ম্ম। সংখ্যা, যশোহরে ৯২৫৫ ; খুলনায় ৮৫৭৩। সম্ভবতঃ গোপদিগের মধ্য হইতে যাহারা কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, সমাজে কথঞ্চিৎ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহারা কালক্রমে সদ্গোপ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। চাষাধোপা জাতিও ঠিক এই প্রণালীতে ধোপা হইতে একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যশোহর সদর মহকুমার অনেক সদ্গোপ পরিবার উৎপন্ন হইয়াছে।

৩ গ 'দাগো' বলিয়া গোয়ালাদের মধ্যে এতদঞ্চলে যে এক থাক আছে, উহারা অন্যত্র 'ভোগা' গোয়ালা নামে পরিচিত। শ্রাদ্ধে উৎসর্গীকৃত বৃষকে চিহ্নিত করা এবং গরুর চিকিৎসা—ইহাদের বৃত্তি। ইহাদের জল আচরণীয় নহে। সিঙ্গিয়া ষ্টেশনের নিকটস্থ 'কৈখালি' গ্রামে অনেক উন্নতশীল 'দাগো' গোয়ালার বাস।

৩ ম গ ব ৪ ৪ গোপ, গোয়ালা। সংখ্যা, যশোহরে ১৮১৫৮ ; খুলনায় ১২৬৭৯। দধি, দুগ্ধ ব্যবসায়ী গোয়ালা দিগের জল, সর্ব্বপ্রথমে, বঙ্গদেশে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রচলিত করেন।

৩ ৫ ২ ম ক ক ক ৪ সুবর্ণবণিক্, সোণার বেণে। স্বর্ণ-কার, সেকরা। স্বর্ণবণিক ও স্বর্ণকারগণ জল অস্পৃশ্য শূদ্রমধ্যে গণ্য। কিংবদন্তী অনুসারে, ইঁহারা বল্লালসেনের আদেশানুসারে, সেই সময় হইতে সমাজে ঐরূপ হইয়া-ছেন।

* খুলনা-যশোহর জেলার জোলা জাতির সংখ্যা, এই প্রবন্ধের মধ্যে [illegible] উক্ত হইয়াছে। ঐ সংখ্যাগুলি নির্ভুল বলিয়া [illegible]। কিন্তু [illegible] করিবার উপায় নাই। [illegible] না দেখিয়া উহা দুঃসাধ্য।

পূর্ব্বে সুবর্ণবণিকগণ যে বড় জাতি ছিলেন, তাহার পরিচয় আছে। ইঁহারা পূর্ব্বে বৈশ্য ছিলেন এবং অনেকে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছিলেন। ইঁহারা সুবর্ণ ও মণি-মাণিক্যের ব্যবসায়ে ধনাঢ্য হন। নানা কারণে এবং বহুকাল বৌদ্ধাচার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য রাজকোপে পড়িয়া সমাজে নিগৃহীত হন। বঙ্গবাসী বণিকদিগের যজ্ঞসূত্র ধারণ করিবার অধিকার নাই। যাহা হউক, ইঁহারাও বারুজীবী * প্রভৃতি জাতির মত আপনাদিগকে আচারভ্রষ্ট বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহারা চিরদিনই বণিগ্‌বৃত্তি ও ব্যবসায়ী। প্রধান প্রধান বন্দর বা ব্যবসায়-কেন্দ্রে ইঁহাদের বাস ও প্রতিপত্তি। কলিকাতার অর্দ্ধেক ধনী ও রাজপরিবার সুবর্ণবণিক জাতীয়।

বল্লালীযুগে অত্যাচার-পীড়িত সুবর্ণবণিকেরা পশ্চিম-বঙ্গে, দক্ষিণ-বঙ্গে ও উড়িষ্যায় নির্ব্বাসিত হন। উহা হইতে সপ্তগ্রামী, দক্ষিণরাঢ়ী, কটকী প্রভৃতি সমাজ হয়। ইহাদের মধ্যে সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁ (হুগলীর নিকট সরস্বতী তীরে), সুবর্ণগ্রাম বা সোনারগাঁ (বিক্রমপুর, ঢাকা জেলা মধ্যে) এবং মামুদপুর বা মহম্মদপুর (যশোহর জেলার মধ্যে) শ্রেষ্ঠ সমাজ। সপ্তগ্রামীরা মুড়লীর পার্শ্ববর্ত্তী বগচরে, এবং দক্ষিণরাঢ়ীয়রা, ভূষণা অঞ্চলে বর্ত্তমান মামুদপুর (মহম্মদপুর), (লেখকের জন্মস্থান রাজঘাটের নিকটস্থ) ভাটপাড়া ও দক্ষিণডিহি, মহেশ্বর পাশা প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। নদীবহুল দক্ষিণ রাঢ়ে ইঁহারা পোতযানে বাণিজ্য করিতেন, এ কারণ ইঁহাদিগকে 'পোতদার' বা (উহার অপভ্রংশে) পোদ্দার বলে। জমিদারী বা সরকারী ধনাগারে খাজাঞ্চী ও মুদ্রাগণনাদি কার্য্য ইঁহাদের একপ্রকার একচেটিয়া। এ জন্য মুদ্রার হিসাব-রক্ষার কর্ম্মকেই পোদ্দারি বলে। ইঁহাদের পৃথক্ গুরু-পুরোহিত আছেন। এই বিশেষ পুরোহিতগণও সমাজে চলিত নহেন। ইঁহাদিগের মন্ত্রদাতা গুরুগণ গোস্বামী পদবাচ্য। ইঁহারা অধিকাংশই বৈষ্ণব মতাবলম্বী। পরম ভক্ত উদ্ধারণ দত্ত সপ্তগ্রামের সুবর্ণবণিককুল উজ্জ্বল ও পবিত্র করিয়াছিলেন। সপ্তগ্রামী ও দক্ষিণরাঢ়ী উভয় সমাজের প্রায় দশ সহস্র লোক যশোহর-খুলনায় বাস করিতেছেন। বংশ ও সম্পত্তিগৌরবে বগচরের পোদ্দার বংশ বিশেষ বিখ্যাত ও সম্মানিত। স্বনামধন্য দানবীর কালীপ্রসাদের অধিকাংশ সম্পত্তি রাজপথ, ধর্ম্মশালা প্রভৃতি দান-ধর্ম্মে উৎসৃষ্ট হইয়াছিল।

০ ৫ ম ব ঘ ত সাহা, শৌণ্ডিক। ইঁহারা মদ্য প্রস্তুত ও বিক্রয় করেন না। শৌণ্ডিকদিগের মধ্য হইতে একটি পৃথক্ থাক হইয়াছেন। ব্যবসায় প্রভৃতি অবলম্বন করায় ইঁহাদের আচার-ব্যবহার শিক্ষাদির ক্রমশঃ যথেষ্ট উন্নতি হইতেছে।

৫ ব হলধর—বৃত্তি কৃষিকর্ম্ম। সম্ভবতঃ ইঁহারা চাষী-কৈবর্ত্ত ও সদ্গোপ বা তদনুরূপ কৃষিজীবী জাতি হইতে উদ্ভূত। কেবলমাত্র বাটাযোড় (নবগঙ্গার তীরে) নামক প্রসিদ্ধ গ্রাম ও শিল্প-কেন্দ্রে কয়েক ঘর আছে।

ব ০ ক ক হাজাম—বৃত্তি ক্ষৌরকর্ম্মাদি। ইহারা কেবল মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশেষ সেবক। তাঁহাদিগের সুন্নত (খাৎনা) সংস্কারও করিয়া থাকে।

ব ৱ H I স ক ক ক ক হাড়ি (প্রাচীন হড্ডি, হড্ডিক)—বৃত্তি পুরীষ পরিষ্কার ও শূকরপালন ও স্থল-বিশেষে বেহারার কার্য্য। (ময়নামতীর, গোপীচাঁদের গীতে) প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতান্ত্রিক সিদ্ধপুরুষ বিশেষ, 'হাড়িপা'র পরিচয় ও অমোঘ শক্তির কথা পাওয়া যায়। হয়ত, হাড়িপ বা হাড়ি জাতীয় ছিলেন বলিয়া, ইহাঁর 'হাড়িপা' নাম।

এতদ্ব্যতীত, 'হাড়িকী' বলিয়া কোন হাড়িজাতীয় নারী, প্রাচীন বৌদ্ধ তান্ত্রিক যুগে সিদ্ধিলাভ করিয়া, চণ্ডী

---

* বৌদ্ধযুগে বহু বারুজীবী বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন। 'ধর্ম্ম' নামে বুদ্ধই হিন্দুদিগের দ্বারাও পূজিত হইতেন। 'ধর্ম্মমঙ্গল' গ্রন্থে দেখা যায়, ধর্ম্মের দ্বাদশজন সেবকমধ্যে শিবদত্ত ছিলেন। পশ্চিম বঙ্গে রাঢ়দেশে শিবদত্তের নিবাস ছিল ও তিনি বারুজীবী জাতীয় ছিলেন। ঐ স্থানে উৎসপুর গ্রামে আর একজন বারুজীবী ধর্ম্মসেবক ছিলেন। 'ধর্ম্মমঙ্গলে' আছে, তাঁহার নাম সুধদত্ত।

প্রাচীন কবি রামাই পণ্ডিতের গ্রন্থে একজন ধর্ম্মভক্ত বারুজীবীর উল্লেখ পাওয়া যায়, তাঁহার নাম শ্রীকুমার দাস। এই শ্রীকুমার দাস বৈদ্ধ-ধর্ম্ম পালন করিতেন। 'ধর্ম্মে'র পূজায় তাঁহার একান্ত ভক্তি ছিল ও বুকের রক্ত দিয়া তিনি ধর্ম্মের তুষ্টি বিধান করায় সুখ, আয়ু ও বংশের সমান লাভ করিয়াছিলেন। আজিও দত্ত ও দাস উপাধি বৈদ্ধ-বারুজীবীদের মধ্যে বেশী।

রূপে পূজা পাইতেন। তিনি হয়ত' তন্ত্রমন্ত্রে সিদ্ধ ছিলেন বলিয়া, অনেক মন্ত্রে তাঁহার দোহাই আছে।

বাউরি-হাড়ি ডোম-চণ্ডাল প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ অনেকে পূর্ব্বে বৌদ্ধ ছিলেন। পরে হিন্দু সমাজে আসিয়া নিকৃষ্ট বৃত্তি গ্রহণ করেন। হাড়িগণের হাটে ঘাটে ঝাঁট দেওয়া, বৃত্তির মধ্যে। কেহ কেহ মুসলমান হইয়া ঝাড়ুদার সংজ্ঞা পাইয়াছে। কোথায়ও কোথায়ও উত্তর-বঙ্গে তান্ত্রিক শক্তিপূজায় হাড়িজাতীয়গণ এখনও পুরোহিতের কার্য্য করেন। এদেশে, হাড়িগণ অতি ক্ষয়িষ্ণু জাতি

সাধারণ মন্তব্য

আলোচ্য অঞ্চলের বর্ণ ও জাতিবিভাগ এবং গুণ ও কর্ম্মানুসারে জীবিকা বা বৃত্তিসকলের ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিলে, বৃত্তিভেদের নিম্নরূপ মূলীভূত কারণ-সমূহ প্রাপ্ত হওয়া যায়:—

(ক) যে সকল শ্রেণীর বৃত্তি, পশুপক্ষী-জীবজন্তুর হিংসামূলক, তাহাদের জল অনাচরণীয়। এই কারণে মধ্যবঙ্গে, নৌ-মৎস্য-জীবী জেলে ও মালো, পশুঘাতক কাওরা ও মুচিরা অনাচরণীয়। উত্তর-বঙ্গে রেশম-কীটনাশ দোষে পুঁড়া ও পোঁড় জাতিরাও অচল।

(খ) যে সকল শ্রেণীর বৃত্তি, অশুচি, তারতম্যানুসারে তাহারাও আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে অনাচরণীয়। এই কারণে মদ্য-বিক্রয়ী শৌণ্ডিক, তৈল-বিক্রয়ী তৈলিক, এবং কিছু অংশে এই কারণে ধোপা অনাচরণীয়।

মল-মূত্র আবর্জ্জনা পরিষ্কারক বলিয়া, মেথর, ভুঁইমালী, হাড়ি, মুচিরা স্বভাবতঃই অনাচরণীয়। ইহারা অন্ত্যজ শূদ্র বলিয়া গণিত।

(গ) পক্ষান্তরে মাঙ্গল্য, পুজোপকরণ, ধূপ-গন্ধ, মালা, ঘট-দীপ, শঙ্খ, তাম্বূলবল্লী, বস্ত্র, পুষ্পাধার প্রভৃতির আহরণ-কারী বা বিক্রেতা-শ্রেণীসকল—গন্ধবণিক, মালাকর, কুম্ভকার, শঙ্খকার, তাম্বুলী, তন্তুবায়, কাংসাবণিক প্রভৃতি 'নবশাখ' বা 'নব-শায়ক' পদবাচ্য। ইঁহাদের আচার-ব্যবহার অনেকাংশে কায়স্থাদি উচ্চবর্ণের অনুরূপ ও জল আচরণীয়। ইঁহাদিগের পুরোহিত ও কায়স্থাদির পুরোহিত এক। পক্ষান্তরে জলানাচরণীয় জাতিদিগের পুরোহিতগণ, সেই সেই বিশেষ জাতির পুরোহিত এবং তাহারাও প্রত্যেক ক্ষেত্রে পতিত ব্রাহ্মণ।

(ঘ) অন্য ধর্ম্ম হইতে যে সকল জাতি হিন্দু-সমাজে আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কোন কোনটী কিছু বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছেন। যোগী জাতি এইরূপ।

কোন কোনটি হিন্দুসমাজের আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়া, সমাজে স্থান পাইয়াছেন। কপালী জাতি এই-রূপ।

পক্ষান্তরে কোন কোন শ্রেণী সমস্ত জাতীয় বৈশিষ্ট্য বিসর্জ্জন দিয়া, হিন্দু সমাজের মধ্যে নিম্নতম বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। হাড়ি, বাউরি, ডোমশ্রেণী এইরূপ। বলা বাহুল্য, ইহাদের অনেকের ব্রাহ্মণ নাই। আচার-ব্যবহারও নিকৃষ্ট হইয়াছে। নিম্নতম শ্রেণীরা উচ্চতর বৃত্তি বা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া, অধিক সামাজিক মর্য্যাদা লাভ করিতেছেন। এইরূপে রজক হইতে কৃষি-রজক, নাপিত হইতে মধু-নাপিত, গোপ হইতে সদ্গোপ, জেলে-কৈবর্ত্ত হইতে হেলে-কৈবর্ত্ত, শৌণ্ডিক হইতে শৌলোক, তৈলিক হইতে তিলির সৃষ্টি হইয়াছে।

এইরূপে বলিতে পারা যায়, অস্পৃশ্য শূদ্র হইতে অব্যব-হার্য্য শূদ্র, অব্যবহার্য্য শূদ্র হইতে জল আচরণীয় এবং জল আচরণীয় শূদ্র হইতে সৎশূদ্রের সৃষ্টি, বঙ্গোপবঙ্গে সঙ্ঘটিত হইয়াছে। বর্ণসংকরসমূহের সৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা, এ প্রবন্ধের বিষয় নহে।

নদীমাতৃক উপবঙ্গের প্রাচীনতম অধিবাসীবৃন্দেরও নানারূপ শ্রেণীবিভাগ লক্ষ্য করিবার বিষয়। নৌ-মৎস্য-জীবিগণ, সদাসর্ব্বদা নদী, জলাশয় সকলকে ভীতি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত—উহা হইতে তাহাদের জীবিকার সংস্থান হইত; পক্ষান্তরে অনেকের সলিল-সমাধিলাভে মৃত্যু হইত। স্বভাবতঃই নদীসকলকে দেবীরূপে পূজা দিবার পদ্ধতি আজি সমুদ্র-নদী-কূলবাসিগণের মধ্যে দেখা যায়। অনেক স্থানে জেলে-মালো প্রভৃতি নৌ-মৎস্য-জীবিগণ ঘটা করিয়া, (মাতাগঙ্গা) গঙ্গাদেবীর মূর্ত্তি পূজা করে। গঙ্গাদেবীর পূজা, রাজশাহীতে জেলেদের মধ্যে এবং পুরীধামে নুলিয়াদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

সর্পসঙ্কুল দেশের প্রাচীনতম অধিবাসিগণ মধ্যে সর্প-বিদ্যায় আস্থা ও সর্পের দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস স্বাভাবিক। নানারূপ বৃক্ষ, লতা-গুল্ম, ঔষধির সন্ধান রাখাও বন্য যাযাবর প্রকৃতির মনুষ্যসকলের সহজ। এই সকল কারণে মালবৈদ্য, গাচুলে, কোঁচ, বাগ্‌দি, নমঃশূদ্র, পোদ প্রভৃতি শ্রেণীরা সর্পবিদ্যায় চতুর এবং তাহারা অনেকেই মনসাদেবীর পূজক। এইরূপ সুন্দরবনে দক্ষিণরায় ব্যাঘ্রের দেবতা হিসাবে পূজা পান।

মৃগয়াপটু, মৎস্য-মাংসভোজী, অথচ শিশুসুলভ মনোবৃত্তির অধিকারী এবং বোঙা, ভূত, প্রেত, মন্ত্র, ঔষধে বিশ্বাসী, বঙ্গোপবঙ্গের প্রাচীনতম অধিবাসীবৃন্দের পক্ষে মদ্য-মৎস্য মাংসাদি দিয়া দেব-দেবী পূজা নিত্যপদ্ধতিও স্বাভাবিক। হাড়ি, কাওরা, সাঁওতাল, বুনাগণ (তন্মধ্যে কেহ কেহ অর্দ্ধ-হিন্দু) ছাগ, মহিষ, এমন কি শূকর, কুক্কুট দিয়াও, কালী মনসা প্রভৃতির পূজা করে। পক্ষান্তরে শীতলা, ওলাদেবী প্রভৃতিকে ভয়ও করে।

হস্ত-পদবিশিষ্ট এবং মৎস্য-মাংস প্রভৃতি দিয়া পূজা-যোগ্য দেবতার কথা ভিন্ন, ঐ সকল শ্রেণী কল্পনাও করিতে পারে না। পক্ষান্তরে ঐরূপ কল্পনা, ইস্‌লাম শাস্ত্রের বিরোধী। তজ্জন্য ঐ সকল শ্রেণী, ইস্‌লাম মত গ্রহণ না করিয়া, হিন্দুধর্ম্মের দ্বারা উত্তরোত্তর আকৃষ্ট হইয়াছে।

যে সকল নিম্নতম শ্রেণী (হিন্দুগণ মধ্যে) নিকৃষ্ট বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিল, উপবঙ্গে তন্মধ্যে অনেক গুলিই, ইসলামধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল খাঁজাহান আলি প্রভৃতির প্রচারের ফলে এবং নূতন ধর্ম্মে, অধিক সামাজিক সুবিধার আশায় দাই বেহারা, ঝাড়ুদার, বেদে প্রভৃতি এক সময়ে উপবঙ্গে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। ঐরূপ কারণেই বর্ত্তমান সময়ে, অনেক নিম্নতম শ্রেণী, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। অনেক নমঃশূদ্ররা গোপালগঞ্জে, মুচিরা বড়দলে, কাওরারা অন্যত্র খ্রীষ্টান হইয়া যাইতেছে।

ভূমি আকাশ জলবায়ু প্রভৃতির (অধিদেবতা সকলের) নিকট, নদীমাতৃক ও দেবমাতৃক প্রদেশের লোক স্বভাবতঃই মুখাপেক্ষী। কৃষিজীবিগণ শস্যের আশায়, ব্যবসায়িগণ অর্থলোভে, গৃহস্থগণ ধনজন-সম্পদের আশায় এইরূপ নানা উদ্দেশ্যে নানা শ্রেণীর লোক লক্ষ্মী, গণেশ, শীতলা প্রভৃতির পূজা, ব্রত, অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। সে সকল সংস্কার এরূপ বদ্ধমূল যে, অনেক সময় নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ, খ্রীষ্টান হইয়াও লক্ষ্মী পূজা করে। পক্ষান্তরে খাঁটি মুসলমান হইয়াও অনেকে বসন্ত পীড়ার ভয়ে শীতলার পূজা দেয়।

উচ্চতর বর্ণসকল, বুদ্ধি, বিদ্যা, শিক্ষা, সাধনার বলে গভীরতম তত্ত্ব এবং পারমার্থিক সত্য সকল উপলব্ধি ও প্রত্যক্ষ করিবার যোগ্যতা লাভ করেন। এই জন্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, কায়স্থ, বৈদ্যরা এখনও পর্য্যন্ত অনেকে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। শাক্ত দশমহাবিদ্যা, দুর্গা প্রভৃতির উপাসনাও ইঁহাদের মধ্যে অধিক প্রচলিত। কায়স্থগণ ও বৈশ্যগণ অনেকে উপবীত লইয়াছেন। পরম ভক্ত বৈষ্ণব হরিহোড় উপবীতী কায়স্থ ছিলেন। অনেক কায়স্থ পরিবারে বংশানুক্রমে অস্ত্রবিদ্যার চর্চ্চা ছিল একণে বৈশ্যাচারী অনেক সম্প্রদায়ও উপবীতী।

নবশাখগণের মধ্যে, এখনও বারুজীবীদিগের কুল-দেবতারূপে, প্রাচীন আর্য্যদেবতা উষা বা ঘটীয়া অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। ডাঃ ওয়াইজ শীঘ্রই তাঁহার গ্রন্থে লিখি-য়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গে আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষীয় নবমীতে বারুইগণ লক্ষ্যানদীর তীরে ব্রাহ্মণের সাহায্য ব্যতীত উষস্‌, অথবা, ঘটীয়া দেবী পূজা করেন। 'এ প্রসঙ্গে ইহাও বলা আবশ্যক যে, পর্ণলতিকা চিরকুমারী। হিন্দুশাস্ত্রে পর্ণলতিকা কৌমার্য্যের জ্ঞাপিকা। বেদোক্তা উষাদেবীও চিরকুমারী। যখন আশ্বিন শুক্লপক্ষে বঙ্গে কুমারী (দুর্গা) পূজা হয়, তখন এ দেশীয় বারুইগণ পর্ণলতিকার উদ্যানে উষা-পূজা করিয়া থাকেন। আর্য্যাচারের এরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সর্ব্বত্র সুলভ নহে।'

মধ্যবঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সংখ্যাও কম নহে। বৈষ্ণবাচার্য্যত্রয় রূপ সনাতন, জীব গোস্বামীপাদ, ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুর, মহাপ্রভুর অন্যতম পরিকর লোকনাথ গোস্বামী, এইরূপ অনেক ভক্ত মহাপুরুষ এতদঞ্চলে আবির্ভূত হইয়াছিল। বোধখানা, মহেশপুরে বেনাপলে এখনও প্রাচীন পাটবাড়ি আছে। হিন্দু-সমাজে যাহারা অনাচরণীয়, তাহাদিগের মধ্যে, বৈষ্ণব ভক্তেরা, মহাপ্রভুর পবিত্র নবধর্ম্ম প্রচার করিলেন। ব্রাহ্মণ চণ্ডালে,

খেলায়, কোন ভেদ রহিল না। দেশ হরিনামে মাতিয়া উঠিল। মুসলমান হইবার প্রবৃত্তিতে বাধা পড়িল। এমন কি অনেক মুসলমান বৈষ্ণব হইয়া গেল। ভগবানিয়া জাতি, এইরূপ এক অপূর্ব্ব নিদর্শন।

বর্ত্তমান সময়েও, এ দেশের ওড়াকান্দির গোঁসাই গোরাচাঁদ প্রভুর, 'হরি সত্য নাম' নমঃশূদ্রাদির মধ্যে প্রবল ভাবে প্রচারিত হইতেছে। উহার উদার প্রভাব নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগকে, ধর্ম্মান্তরগ্রহণের প্রলোভন হইতে রক্ষা করিতেছে। এক দিন যে গোপালগঞ্জে বহুসংখ্যক নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে, সেখানে ঐ নাম-মহিমা প্রচারের প্রয়োজন ছিল।

এতদ্ব্যতীত শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেব, প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজী এবং সন্তদাস বাবাজী ব্রজবিদেহী মহাশয়ের শিষ্য-প্রশিষ্যের সংখ্যাও এতদ্দেশে অনেক। নড়াইল জুড়িগ্রামে শ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজীর ভক্তেরা একটি ধর্ম্ম-সভা করিয়াছেন। শ্রীভোলানন্দ গিরি মহারাজের ভক্ত শিষ্য-প্রশিষ্যগণ সম্প্রতি খুলনার যোড়া-শিবমন্দিরটিকে উদ্ধার ও পুনঃসংস্কার পূর্ব্বক পূজার্চ্চনার ব্যবস্থা এবং একটি চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

ভারত-সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা প্রণবানন্দজীর খুলনায় ও আশাশুনিতে আশ্রম আছে। যশোহর ও বাগেরহাটে শ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণদেবের আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আরও কত কত, সাধুভক্ত মহাপুরুষগণের পাদস্পর্শে ও আবির্ভাবে এদেশ নিত্যপবিত্র হইয়াছে। বলা বাহুল্য, আমাদিগের পুণ্য যশোহরভূমি একদিন ধনধান্যাদি সম্বন্ধে অতুলনীয়া এবং বীর-কবি-ভক্ত-কুল-প্রসূতি ছিলেন।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত

জাগ আবার

—শ্রীসুনীলবরণ রায় চৌ

কৃষ্ণ! আমি মরছি কেঁদে
তোমায় কেহ দেয় না পূজা,
গোপিনীদের বসন-চোরাই কয়,
হায় ভোলানাথ! বলব কি আর
বুক ফেটে যায় গভীর দুঃখে
'গেঁজেল' খেয়ে তোমার পরিচয়!

যার যা খুসী বলবে সুখে,
মুখ বুজে তা সইবে সবি,
নারীর মত করবে অভিমান?
তোমার গড়া মানুষ যারা,
তারাই তোমায় করবে হেলা,
দম্ভ তাদের করবে না খান্ খান্?

মানুষ যেথায় পায় না পূজা,
মাটির ঢেলাই পুণ্য গো,
রুদ্র তোমার ক্ষুধা সেথায় জ্বলবে না?
মিথ্যা হবে যাবেই কি আজ,
সুদর্শনের চকচকানি
মরণেরি অজানে সে রণবে না?

যৌবনেরে বন্দী করে,
কারার প্রাচীর উঠবে কি রে,
নীল আকাশের দিকে কাছাকাছি।

তারুণ্য আজ করবে কি রে,
কিশোরীদের আঁচল ধরে,
মুক্ত মাঠে ধিঙ্গি নাচানাচি?

হায় দেবতা! তুমিও কি আজ রইবে ঘুমে,
চক্ষু মেলে চাইবে না,
দানব-ভয়ে থাকবে তাহা বুজে!
মানুষ কি আজ মরবে শুধুই
ক্ষণেক তরেও বাঁচবে না
মরণ-বিষই মরবে তারা খুঁজে?

জাগ আবার রুদ্র ঈশান জাগ,
ঊর্দ্ধে তোমার প্রলয় বিষাণ হাতে
মিথ্যারে দাও পাতালতলে ঠেলে।
দর্পহারী কই নারায়ণ,
সেই পদে ফের ফেলো;—
বলীর মাথায় যে পদ রেখেছিলে।

কৃষ্ণ এস বংশী ছেড়ে,
ঈশান ছেড়ে গৌরীরে,
তূর্য্যনাদে কাঁপিয়ে তোল দিক।
পাপের আঁধার যাক না মরে,
জাগুক বিরাট মানবতা,
চলার পথে চলুক তারা ঠিক।

রঙীন ফানুস

—শ্রীবীরেশ্বর বিশ্বাস

শূন্যে ঝুলিতেছে একটি রঙীন ফানুস।

কি সুন্দর আর কি দীর্ঘ এই দিনটা: কর্দমাক্ত কলতলার নীচে রোদ যেন আসিতেই চায় না; কিন্তু আসিবেই, নরহরি জানে—আজ না হয় একটু বিলম্ব হইতেছে। নেশা লাগিয়াছে কি নরহরির। এক দৃষ্টে সে দেখিতেছে বৈচিত্র্যহীন জীবগুলার একঘেয়েমী, কাজ করিবার উৎসাহহীন পদ্ধতি। একটি কল কোন্ যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া আজও কেমন করিয়া টিকিয়া আছে ভগবান জানেন, ভোরের ক্ষুধার্ত্ত কাকের করুণ চীৎকারের সাথে সাথে কলতলা ভীড়ের জোয়ারে ভাসিয়া যায়; তা ভীড় যতই হোক না কেন, এক এক জন করিয়া ধীরে জল লইলে সকল লেঠাই চুকিয়া যায়, কিন্তু তাহা ভাবিবার অবসর কাহারও নাই, জল লইবার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়াইয়া আছে বৃথা ঝগড়া করিবার জঘন্য প্রবৃত্তি, উৎকট আগ্রহ। লখিয়ার মা তখন হইতে সকলকে অগ্রিম পিণ্ডদান করিতেছে। কেহ তাহার সহৃদয়তায় কাণ দেয় না, কেহ বা 'তোর মুখে আগুন মাগী' বলিয়া পরম বিচক্ষণতার সহিত কলসী কাঁখে চলিয়া যায়। এখানে কেহ বাসন মাজিতে আসে না, মুখ ধুইতেও না, সকলেই চায় দু'এক কলসী খাইবার জল। কে কখন আসিবে নরহরি জানে, তাহাদের অস্থায়ী কোলাহলের ভাষা আরও পুরাতন, নরহরির এক রকম মুখস্থই হইয়া গিয়াছে। অন্তরের অকৃত্রিম দরদ দিয়া নরহরি অনুভব করে লখিয়ার মার অহেতুক লাঞ্ছনা। সকলের মত তাহারও যে জল লাগিতে পারে, তবু সকাল হইতে দশটা পর্য্যন্ত সকলের পিছনে পড়িয়া থাকে লখিয়ার মা।

কই, কলতলার নীচে এখনও ত রোদ আসিতেছে না, তবে কি বৃষ্টি হইবে! বিধাতার সৃষ্টি-ছাড়া ভ্রুকুটি: নরহরিকে আজ ভিজিতে হইবে: শরীর তাহার এখনও চাঙ্গা হয় নাই, বুকের ব্যথা থাকিয়া থাকিয়া জবর জ্বালা দেয়। ডাক্তার বাবু বলিয়াছিল, নিমুনিয়া, বাঁচিবার কোন আশা নাই: মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়া নরহরি কাটিয়া পড়িয়াছে; আজ জলে ভিজিলে রক্ষা নাই, মৃত্যু অনিবার্য্য; কিন্তু উপায় নাই, জগতে এ জাতীয় লোকের নিজস্ব কোন দাবী নাই, অথচ ইহাদের চাহিদা সবার উপরে।

মৃত্যু আসিয়া পথ রোধ করিলেও নরহরি প্রাণপণে ছুটিবে আফিসে। আজ মাহিনার দিন: অসুখের জন্য কয়েক দিন সে যাইতে পারে নাই: কে শুনিবে তাহা? শুনিবার এবং জানিবার অনেক কিছুই আছে এই হতভাগাদের। থাক্, নরহরি ঠিক করে, বড়বাবুর হাতে-পায় ধরিয়া ভবিষ্যতে কোন দিন কামাই না করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া সে রেহাই পাইবে। মনের নিভৃত গহনে এক অপূর্ব্ব সুর খেলিয়া বেড়াইতেছে—তিনদিন ছুটি, সে যে মাহিনা লইয়া বাড়ী যাইবে। সহসা শিহরিয়া উঠে নরহরি, যদি সে মাহিয়ানা না পায়? তাহার সোনার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে, এত আশা লইয়াও সে দেখিতে পাইবে না প্রতিমাকে! তাহার হঠাৎ উপস্থিতি বাড়ীতে চাঞ্চল্য আনিবে, কোনদিন সে বলিয়া কহিয়া বাড়ী আসে না। প্রতিমা কারণ শুধাইলে বলে, কি হবে তিনটে পয়সা জলে দিয়ে। কথাটা নেহাৎ মিথ্যা নয়, নরহরি বাড়ীতে চিঠি লেখে খুব কম: তাহার বাবা তারকেশ্বর এই আফিসেই দপ্তরির কাজ করিত। তাহাদের আমলে এক পয়সার পোষ্টকার্ড ছিল, হইল দুই পয়সা—ব্যস, সেই অবধি তারকেশ্বর বাড়ীর খবর লওয়া শ্রেফ বন্ধ করিয়াছিল: পোষ্টকার্ড আবার যখন তিন পয়সা হইল, তখন হইতে নরহরিও পিতৃপথ অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। যাক্ ওসব অবান্তর, আজ মাহিনা পাইলেই সে বজ্রাতকে বাহাদুর বলিবে।

তাই সে দেখিতে পাইতেছে শূন্যে দোদুল্যমান রঙীন ফানুস। লখিয়ার মার দুরবস্থা একটু বেশী করিয়াই যেন তাহার চোখে লাগিতেছে।

'ধর্ম্মদাস শোন,' নরহরি ডাকিল। গামছা হাতে

ধর্মদাস আগাইয়া আসে, 'কি রে আজ আফিসে যাবি না কি?'

'হ্যাঁ', নরহরি হাসে।

ধর্মদাসের মুখ গম্ভীর, মনে হয় যেন কেহ জোর করিয়া একটা অভাবনীয় বার্তা শুনাইয়া দিয়াছে; নিরীহ চোখের একটি ঝিলকানি তাহার মুখে খেলিয়া বেড়াইতেছে, ধর্মদাস নরহরির দিকে তাকাইতে পারে না।

বিস্মিত নরহরি জিজ্ঞাসা করে, 'কি হল তোর?'

'না, কিছু না' বলিয়া ধর্মদাস চলিয়া গেল।

ধর্মদাস নরহরির বন্ধু; এক গ্রাম হইতে উহারা আসিয়াছে, ভগবানের ইচ্ছায় চাকুরী একই অফিসে পাইয়াছে; যমরাজের সহিত মুখোমুখি যুঝিয়া ধর্মদাস ফিরাইতে পারিয়াছে নরহরিকে; একদা অসময়ে নরহরি সাড়ে আট টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছিল ধর্মদাসকে—আর ফিরাইয়া লয় নাই—সুতরাং উহারা বন্ধু।

রঙীন ফানুসটি কি উড়িয়া গেল!

না, ও কিছু না; নরহরির গা যেন একটু ম্যাজম্যাজ করিতেছে, আবার জ্বর আসিবে না কি? আকাশ ঘন কাল হইয়া গিয়াছে, উপরে উড়িতেছে কতকগুলি চিল; না, তবুও নরহরি আফিসে যাইবে, তিনদিনের ছুটি! প্রতিমার কাছে হাজিরা দেওয়া চাই; নরহরি বুঝিয়াছে, তাহার নীরব জীবনের আনাচে কানাচে ফাটল ধরিতে সুরু করিয়াছে অসময়ে, ভাষাহীন হাহাকারে তাহার অন্তরের অন্তর্হিত আত্মা আকুল আর্তনাদ করিতেছে; শীতল মৃত্যুর সস্নেহ সান্নিধ্য মুহুর্মুহু অনুভব করে নরহরি। মৃত্যুর সহিত সে মোলাকাৎ করিয়াছে, তাহার কঠিন রোগগ্রস্ত শয্যাতুর চাউনির আশে পাশে নাচিয়াছে লেলিহান যবনিকার সব বীভৎসতা।…ভয়ঙ্কর মাথা ধরিয়াছে, খাটিয়ার উপর শুইয়া পড়ে নরহরি। বুকের নিবিড় কিনারে জাগিয়া উঠে একখানি শুভ্র মুখ—সে কথা কহে না, হাসেও না, মূক চাউনির অজস্র নীরবতায় জাগিয়া যায় নরহরির বস্তিবাটীর অন্তরালে। প্রচ্ছন্ন প্রতিমার উজ্জ্বল চোখের ইশারা কি সত্যই নরহরি দেখিতে পাইতেছে? উদার নীল আকাশের কূলে যে প্রতিমা ছিল একদিন নরহরির ধ্রুবতারা, সেই প্রতিমা না জানি আজ কত লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে। নিত্য নূতন আশা আকাঙ্ক্ষা লইয়া যে-নারী নরহরির সংসারকে উজ্জ্বল করিয়াছিল, তাহাকে ছাড়িয়া আজ নরহরি কোথায় পড়িয়া আছে! এখানে কাহারও সহিত নরহরি প্রাণ খুলিয়া মিশিতে পারে না, চায়ও না। বিষাক্ত বাতাসে হাঁপাইয়া উঠে নরহরির অপরিণত ব্যাথাতুর মন। তাহার মনের প্রকৃতির সহিত ইহাদের খাপ খায় না।

প্রতিমা তখন নূতন সংসারে আসিয়াছে, সে অনেক দিনের কথা, সঠিক মনে নাই নরহরির, তবু যতদূর মনে হয়, প্রতিমা ছিল রূপসী, স্বাস্থ্যবতী, গাধার মত খাটিতে পারিত, জানিত না শুধু ঝগড়া করা, অকারণে ফাঁকি দেওয়ার উন্মুক্ত পথের সন্ধান।

প্রথানুসারে ভুল ধরিবার সময় আসিয়া পড়িল, পিসিমা সোৎসাহে লাগিয়া গেল। অজস্র ত্রুটি আসিয়া জমা হইতে থাকে, পিসিমা দুএকটিতে কাব্য মিশাইয়া নরহরির সম্মুখে ধরে। এক দিনের দৃষ্টান্ত মনে পড়িয়া যায় নরহরির; সন্ধ্যায় আধ-অন্ধকারে প্রতিমা ঘোষেদের পুকুর হইতে জল আনিতেছিল, সহসা কলসীটা কোমর হইতে ফসকাইয়া চুরমার হইয়া যায়।…অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া চীৎকার করিতে থাকে পিসিমা, 'গেরস্থের অকল্যাণ করতে কোমর বেঁধে লেগেছে!' তারপর প্রতিমার মাতাপিতার প্রতি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ, তাহাদের একবার দেখিয়া লইবার প্রস্তাব, ইত্যাদি! না আর নয়, নরহরি ঠিক করে পিসিমাকে সে খুব দুই কথা শুনাইয়া দিবে; এ সব 'অনাছিষ্টি' সে কোন মতেই বরদাস্ত করিবে না। কিন্তু যে পিসিমার কাছে মুখ তুলিয়া কথা বলিতে পারে না, সেই পরম পূজনীয়াকে কথা শুনাইবে নরহরি? সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য, নরহরি খাটে স্থির বসিয়া থাকে। প্রতিমা অনুনয় করে, 'শোও, শুয়ে পড়, আবার উঠলে?'

…'আবার জ্বরে পড়লি নরহরি?' ধর্মদাস স্নান করিয়া ফিরিতেছিল, কাছে আসিল। 'ওঃ তোর গা থেকে আগুন ছুটিতেছে যে' ধর্মদাস শিশুদের মত বলিয়া যায়। 'কিরে একটু খুব জোরেই লাগে রে?' নরহরি কহিল

'না'। বাধা দেয় ধর্ম্মদাস, 'একটু কোথায়, বেশ জ্বর এসেছে, শুয়ে থাক আমি খাবার ব্যবস্থা করি।'

রঙীন ফানুসটি কি চুপসাইয়া গেল!

ধর্ম্মদাস বলিতেছে ভীষণ জ্বর হইয়াছে; কিন্তু নরহরির ত' তেমন কিছু মনে হইতেছে না, সে স্বচ্ছন্দে উঠিয়া বেড়াইতে পারে। ধর্ম্মদাস জানে না, আজ নরহরির দেহে অলৌকিক শক্তি জন্মিয়াছে, আফিসের বড়বাবু বিশেষ কিছু বলিলে একচোট দেখিয়া লইবে। সাড়ে ছয়টা বোধ হয় বাজিয়াছে, এই মাত্র ধর্ম্মদাস খাইতে গেল, কিন্তু নরহরির কোন তাড়া নাই, সে খাইবেও না। কলতলায় রোদ আসে নাই, আসিয়াছে সর্ব্বনেশে ঝড় আর বিরামহীন বৃষ্টি। ছাদের কয়েকটি খোলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ঝর ঝর করিয়া জল পড়ে। মিলের বাঁশী বাজিবার সাথেই নারায়ণ চলিয়া গিয়াছে কাজে। তাহার অসহায় অনাদৃত খাটিয়া ভিজিতেছে। নরহরির উঠিবার সবটুকু সামর্থ্য কে যেন নিংড়াইয়া লইয়াছে, নারায়ণের খাটিয়া সরাইবার সে ব্যর্থ চেষ্টা করে। কাঁপিতে কাঁপিতে শুইয়া পড়ে নরহরি।

···দুর্দ্দান্ত ঝড় রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সকরুণ নীরবতার ভয়াবহ আবহাওয়ায় নরহরি প্রমাদ গণে; কি আশ্চর্য্য, তাহার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া গেল কেমন করিয়া, নিজেকেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না; নরহরি চলিতে থাকে দ্রুত, প্রতিমার কাছে হাজিরা দেওয়া চাই-ই।

গ্রামের পথে একহাঁটু জল, কাপড় বাঁচাইয়া অতি কষ্টে নরহরি পথ আবিষ্কার করিয়া চলে; প্রথমে গিয়া কি দেখিবে বাড়ীতে? প্রতিমা এতক্ষণে নিশ্চয়ই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, বাতি নিবাইতে ভুলিয়া যায় প্রায়ই সে, আজও হয়ত সে জন্ত পিসিমা চিড়েভাজা চিবাইতে চিবাইতে তাহার পিতৃপুরুষের পিণ্ডদান করিতেছে। যাক্, নরহরি আবার চেষ্টা করিয়া দেখিবে দু'কথা শুনান যায় না কি পিসিমাকে। প্রথমে প্রতিমার সহিত কিরূপে আলাপ করিবে! স্মৃতির স্রোতে ভাসিয়া যায় হাজার প্রশ্নের টুকরো অংশ: না, নরহরি হাসিয়া উঠে, যাহা মনে আসিবে তাহাই বলিবে সে, তাহার জন্ত ভাবিতে হইবে না।

'পিসিমা'—নরহরি ডাকে। দুয়ার খুলিয়া দেয় প্রতিমা। বাঃ! প্রতিমাকে অপূর্ব্ব সুন্দরী দেখাইতেছে ত'! সত্যই তাহার নামের সার্থকতা আছে, প্রতিমার যেন আজ নূতন এক রূপ চোখে পড়িতেছে। চাঁদের আলোয় মনে হইতেছে যেন অচেনা রাজপুরীর ছিনাইয়া আনা পরী। কিন্তু প্রতিমা অবাক হইতেছে না কেন? সে জানিত, নরহরি আসিবেই, তাই নিজে আসিয়াছে দরজা খুলিতে। 'অবাক হলে না কি'? নরহরি প্রশ্ন করে। প্রতিমা উত্তর দেয় না, মুখের কোলে ফুটিয়া উঠে একটু হাসি। এ কি, মুখরা প্রতিমা আজ স্তব্ধ হইয়া গেল কেন? অবান্তর কথাই ছিল যাহার প্রধানতম উপাদান, যে-কথার বন্ধনহীন স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে নরহরি, কোথায় হারাইয়া গেল তাহার উৎস!

পিসিমা থান-কাপড়ের অভ্যন্তরে, বুকের কাছে মালা জপিতে জপিতে নরহরিকে অভ্যর্থনা জানাইল: নরহরির না কি আয়ু আছে, কারণ কিছুক্ষণ পূর্ব্বে পিসিমা ত' তাহার কথাই ভাবিতেছিল, নরহরি ছাড়া দুনিয়ায় আর আপনার বলিতে কেই বা আছে: নরহরি একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, বুঝি বা কতকটা আশ্বস্ত হইয়াই।

জানালার ফাঁক দিয়া চাঁদ উঁকি মারিতেছে: ধবধবে বিছানা, যেন অজ্ঞাত মায়ার রহস্যময় ফেণায়িত শয্যা; এ শয্যায় কি ঘুম আসিবে নরহরির? স্বপনদেশের অশ্রুতপূর্ব্ব কবিতা শুনিতে পাইতেছে নরহরির অনভ্যস্ত কাণ। প্রতিমার কি এত কাজ লাগিয়াছে? যত কাজ নরহরি আসিলে। দিশেহারা নরহরি সারা ঘর পায়চারি করিতে থাকে।

'পাগলের মত কি করছ?' প্রতিমা দরজা বন্ধ করিতে করিতে বলে। নরহরি অবাক্ হইয়া যায় সেই হাসি দেখিয়া: এখনও প্রতিমা হাসিতে জানে, সেই বুকে শিহরণ জাগান হাসি! চোখের উজ্জল তারার মাদকতায় কি সত্যই নরহরি আবার পাগল হইবে?

…'জান, বোসেদের ছেলেটা কত বড় হয়েছে ? আর কি সুন্দর দেখতে, একেবারে রাজপুত্তুর।'—প্রতিমা আঁচলের চাবিটা নাড়া দেয়। নরহরি দ্বিতীয়বার অবাক্ হয়—কবেকার পুঞ্জীভূত বিরহব্যথা কি প্রতিমা নিঃশেষে হজম করিয়াছে ; আলাপের এ অদ্ভুত অকারণ কথা কেন বলে ? ধীরে ধীরে ধীরে সবই যেন গোলমাল হইয়া যাইতেছে। প্রতিমাকে এত কাছে পাইয়াও যেন দূরত্ব ঘুচিতে চায় না ; নরহরি বুঝিয়াছে, প্রতিমা মাতৃহৃদয়ের অধিকার হইতে বঞ্চিত, সাহারার প্রাণহীন উন্মত্ত হাহাকার বাজিতেছে প্রতিমার শান্ত বুকে। নির্ব্বাক্ নরহরি সান্ত্বনা দিবার ভাষা খুঁজিয়া পায় না, নিস্তব্ধতাকে দূর করিবার জন্য বলে, 'তোমার ও ছেলেটাকে খুব ভাল লাগে, না ? দুঃখ কি, সময় ত'—'

নিজের দুর্ব্বলতায় প্রতিমা লজ্জিত হয়, তারপর কথার মোড় ফেরায়, 'তুমি যে অসময়ে চলে এলে, চাকরী গেল না কি ?' প্রতিমা কি বলে ? হো হো করিয়া হাসিতে ইচ্ছা হয় নরহরির।…

*

'এই ওঠ্, শুনছিস, আর আফিসে গিয়ে কি হবে,তোর চাকরি গেছে, আর একজন নূতন দপ্তরী রাখা হয়েছে।' ধর্ম্মদাস নরহরিকে ঠেলিয়া দেয়।

'উঃ—এ্যাঁ-এ্যাঁ কি ব-বললি', সজোরে নরহরি লাফাইয়া উঠে, অবিরাম বৃষ্টিতে তাহার খাটিয়াও ভিজিয়া গিয়াছে।

'তুই হয়ত এই শরীর নিয়ে ভিজতে ভিজতে আফিসে যেতিস, তাই বলে গেলাম,' ছাতা-বগলে ধর্ম্মদাস কর্দ্দমাক্ত আবছা পথে পা বাড়ায়।

নরহরি চোখ রগড়াইতেছে, ক্রমেই সব অন্ধকার হইয়া আসে ; সম্মুখে পশ্চাতে নিরেট অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। ও ধারে নারায়ণ ভিজা খাটিয়াতে বসিয়া বৃষ্টির জলে গুণগুণ করিয়া গান ধরিয়াছে। দূর হইতে আসিতেছে লখিয়ার মা'র আর্ত্তনাদ। আকাশ-ভাঙ্গা বৃষ্টি নরহরিকে ঘিরিয়া তাণ্ডবনৃত্য সুরু করিয়াছে : উঃ কি দমকা হাওয়া। কাঁপিতে কাঁপিতে শুইয়া পড়ে নরহরি।

টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া ছিঁড়িয়া গিয়াছে শূন্যে দোদুল্যমান রঙীন ফানুস, বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহার ক্ষুদ্র অংশগুলি দূরে—বহুদূরে।

ভারতবাসীর মুক্তি

…ভারতবর্ষকে ও ভারতবাসিগণকে মুক্ত করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে যাঁহারা বিবিধ রকমের পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান, শিল্প ও দর্শনের বক্তব্য কি কি, তাহা সঠিক ভাবে বুঝিতে পারিয়া ঐ বিজ্ঞান, শিল্প ও দর্শন যে জনসাধারণের প্রকৃত উন্নতিবিষয়ে সম্পূর্ণভাবে অসার, তাহা প্রাণে প্রাণে বাস্তব জীবনে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন, এমন কয়েকটি মানুষকে প্রকৃত শব্দ ও ভাষা-বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে এবং ঐ ভাষা-বিজ্ঞানের-সাহায্যে প্রাচীন সংস্কৃত, অথবা প্রাচীন হিব্রু, অথবা প্রাচীন আরবী ভাষাতে প্রবেশ করিয়া কোন্ উপায়ে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে এবং কোন্ উপায়ে বিবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যের মধ্যে সমতা (parity) রক্ষিত হইতে পারে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, কাহারও সঙ্গে কোন দ্বন্দ্ব-কলহে প্রবৃত্ত না হইয়া, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জন্য কোনরূপ আন্দোলনে উন্মত্ত না হইয়া, যাঁহারা যখন গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করেন, সম্পূর্ণভাবে তাঁহাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইয়া, তাঁহাদের নিকট জন-সাধারণ যাহাতে চাকুরীর মুখাপেক্ষী না হইয়া দুই বেলা দুই মুঠোর সংস্থান করিতে পারে, তাদৃশ ব্যবস্থা যাচ্ঞা করিতে হইবে।…

বাঙ্গালায় বর্গী

-নিখিলনাথ রায়

[১]

খৃষ্টীয় ১৭৪২ অব্দে দুর্দ্ধর্ষ মহারাষ্ট্রীয়গণ সুবা বাঙ্গলার ভারত-ব্যাপিনী গৌরবগীতি শুনিয়া উক্ত প্রদেশ অধিকারের জন্য কালান্তক মূর্ত্তিতে বঙ্গদেশে উপস্থিত হয়।* যাহারা সমগ্র ভারতবর্ষকে আপনাদের ক্রীড়া-ক্ষেত্র রূপে পরিণত করিয়াছিল, বঙ্গভূমি যে তাহাদের পক্ষে অতি অকিঞ্চিৎকর, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে বঙ্গভূমি একজন উপযুক্ত লোকের দ্বারাই শাসিত হইতেছিল। মহারাষ্ট্রীয়গণ অনায়াসে বাঙ্গলায় প্রাধান্য স্থাপন করিবে বিবেচনা করিয়াছিল, কিন্তু আপনাদিগের সমকক্ষ আর একটি শক্তির সংঘর্ষণে তাহাদের সে আশা ফলবতী হইতে পারে নাই। আলিবর্দ্দী খাঁর প্রবল প্রতাপে তাহাদের যাবতীয় চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়।

রঘুজী ভোঁসলা মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে একজন পরাক্রমশালী বীরপুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। সমস্ত বিরার প্রদেশ পদানত করিয়া দাক্ষিণাত্যমধ্যে তাঁহার মহীয়সী ক্ষমতা বিস্তৃত হয়। পেশওয়া বালাজী বাজীরাও তাঁহাকে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে বিবেচনা করিতেন এবং রঘুজীর সহিত বিবাদে তাঁহাকে অনেক ক্ষতিগ্রস্তও হইতে হইয়াছিল। রঘুজী স্বাধীন ভাবে আপনার পরাক্রম এবং অধিকারবৃদ্ধির সর্ব্বদা প্রয়াস পাইতেন। তিনি দিল্লীর সম্রাট্‌কে নিতান্ত হীনবল জানিয়া বাঙ্গলা প্রদেশে চৌথ স্থাপনের ইচ্ছায় স্বীয় দেওয়ান ভাস্কর পণ্ডিতকে ১৭৪২ খৃঃ অব্দে বহুসংখ্যক সাহসী ও শিক্ষিত সৈন্যসহ বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন *। আলীবর্দ্দী খাঁ উড়িষ্যা বিজয় করিয়া মুর্শিদাবাদাভিমুখে অগ্রসর হওয়ার সময় পথিমধ্যে মৃগয়ামোদ ভোগ করিতেছিলেন। মোবারক মঞ্জিলের নিকট সাকরা নামক স্থানে তাঁহার শিবির-সন্নিবেশকালে ভাস্কর পণ্ডিত ২৫ হাজার অশ্বারোহীর সহিত ময়ূরভঞ্জ ও পঞ্চকূট উপত্যকা দলিত করিয়া "হর হর মহাদেও" শব্দে অরণ্য পর্ব্বত প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে মেদিনীপুরে উপস্থিত হন এবং তথা হইতে বর্দ্ধমান প্রদেশে উপনীত হওয়ার আয়োজন করিতেছিলেন। তাঁহার পঞ্চবিংশ সহস্র সৈন্যের কথা চতুর্দ্দিকে চত্বারিংশ সহস্র বলিয়া বিস্তৃত হইয়া পড়ে †। বাঙ্গালার যাবতীয় লোক আপনাদের মস্তকে

* স্বর্গীয় পিতৃদেব নিখিলনাথ রায় মহাশয় সন ১৩০৯ সালে তাঁহার মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত করেন। তাহার পর ধীরে ধীরে উহার দ্বিতীয় খণ্ডের রচনা চলিতেছিল। নানা কারণে তাহা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই এবং তাহার রচনা অর্দ্ধসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার লিখিত পাণ্ডুলিপি হইতে এই অসমাপ্ত ইতিহাসের একটী বিবরণ লইয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রকাশ করা হইয়াছে। প্রবন্ধের রচনা সম্পূর্ণই পিতৃদেবের লেখনীপ্রসূত। ইতি শ্রীত্রিদিবনাথ রায়।

* রঘুজীর বাঙ্গালা আক্রমণ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন। মুতাক্ষরীণকার বলেন যে, তিনি নিজাম উল মুলুক কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া অথবা লুণ্ঠন ইচ্ছায় বা চৌথ-স্থাপনের মানসে বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়াছিলেন (Vide Mutaquerin Vol. I. P 407)। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাস প্রণেতা Duff সাহেব বলেন যে, মুর্শিদকুলী খাঁর কটক পলায়নের পর তদীয় দেওয়ান মীর হাবীব ভাস্কর পণ্ডিতকে আহ্বান করেন। কিন্তু রঘুজী সে সময়ে কর্ণাটে থাকায় ও ভাস্করের উপর বিরার প্রদেশের ভার থাকায়, তিনি মীর হাবীবের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইতে পারেন নাই। পরে রঘুজী প্রত্যাগত হইলে তাঁহার অনুমতি লইয়া ভাস্কর বাঙ্গলায় উপস্থিত হন (Duff's History of the Marhattas, Vol I, p. 6)।

রিয়াজেও লিখিত আছে যে, মীর হাবীব, রঘুজী ভোঁসলার নিকট গমন করিয়া ভাস্কর পণ্ডিত ও আলীকার ওয়ালকে সঙ্গে লইয়া বাঙ্গালা আক্রমণে আসেন। মুতাক্ষরীণে কিন্তু লিখিত আছে যে, মীর হাবীব, প্রথমে নবাব পক্ষেই ছিলেন, পরে মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে বন্দী হইয়া তাঁহাদের সহিত যোগ দেন। ডফ সাহেব বলেন যে, মীর হাবীব, প্রথমে ভাস্করকে আহ্বান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি রঘুজীর আদেশের জন্য অপেক্ষা করেন। আলীবর্দ্দী কর্ত্তৃক উড়িষ্যা বিজিত হইলে মীর হাবীব, তাঁহারই বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

† Duff সাহেব বলেন যে, তাঁহার ১০।১২ সহস্র মাত্র সৈন্য ছিল, কিন্তু তাহা ৩০ সহস্র বলিয়া রাষ্ট্র হয়। Orme বলেন ৮০ সহস্র। Holwell বলেন ৮০ সহস্র। (Vide Holwell's Hist. Event. Pt. Chap II page 120, also 110) রিয়াজে ৬০ সহস্র লিখিত আছে।

শীঘ্রই অশনিপাত হইবে বলিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়ে। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ ভাস্করের আগমন-সংবাদে বিশেষ চিন্তাকুল হইলেন *। তিনি অধিকাংশ সৈন্যকে মুর্শিদাবাদাভিমুখে যাত্রা করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন তাঁহার সহিত তিনি চারি সহস্র অশ্বারোহী এবং পঞ্চ সহস্র বন্দুকধারী সৈন্যমাত্র অবস্থিতি করিতেছিল †; এবং তিনি চতুর্দ্দিকে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে মনে করিয়া নিজে মৃগয়ামোদে লিপ্ত ছিলেন। যখন স্থিরাকাশে ভীষণ ঝটিকার উদয়ের ন্যায় মহারাষ্ট্রীয়গণের আগমন-সংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইল, তখন তাঁহার ন্যায় ধীরচিত্ত লোকেরও মস্তিষ্ক বিলোড়িত হইয়া উঠিল। মহারাষ্ট্রীয়গণের অব্যর্থ আক্রমণের কথা তাঁহার অবিদিত ছিল না এবং তাহাদের প্রবল ক্ষমতায় যে সমগ্র ভারতবর্ষ বিকম্পিত হইতেছিল, তাহাও তিনি বিশেষরূপে জ্ঞাত ছিলেন। তিনি স্বীয় প্রজাবর্গের সর্ব্বনাশ উপস্থিত ভাবিয়া এবং আপনার মহীয়সী কীর্ত্তি কালিমামণ্ডিতা হইবে আশঙ্কা করিয়া, গভীর চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন। আপাততঃ তিনি বর্দ্ধমানে উপস্থিত হওয়া যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া মোবারক মঞ্জিল হইতে শিবির উঠাইয়া তৎপর দিবসেই বর্দ্ধমানের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভাস্কর পণ্ডিতও সংহারবেশে তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ বর্দ্ধমান প্রদেশের নানা স্থানে অগ্নি প্রদান করিল। অগ্নিদেব ধূধূরবে গৃহাদি ভস্মীভূত করিয়া তাহাদিগের আগমন ঘোষণা করিতে লাগিলেন। এইখানে উভয় পক্ষের কয়েকটি সামান্য যুদ্ধ হয় এবং সন্ধ্যা উপস্থিত হওয়ায় উভয় পক্ষই শিবিরে প্রত্যাগমন করেন।

ভাস্কর পণ্ডিত শিবিরে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নবাব-সৈন্যগণের যুদ্ধক্রিয়া ও আলিবর্দ্দী খাঁর বীর্য্যবত্তা চিন্তা করিতে লাগিলেন। সহজে যে তিনি জয়লাভ করিবেন, এরূপ বিশ্বাস তাঁহার হৃদয়ে ক্ষণমাত্রও স্থান পাইল না। অগত্যা তিনি স্বীয় সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এইরূপ বিপদসঙ্কুল যুদ্ধে লিপ্ত না হইয়া যাহাতে আলিবর্দ্দীর নিকট হইতে সহজে কিছু অর্থলাভ করিতে পারেন, তাহার চেষ্টায় মনোনিবেশ করিলেন। তিনি নবাবের নিকট এই মর্ম্মে দূত পাঠাইলেন যে, মহারাষ্ট্রীয়গণ বহু দূরদেশ হইতে বাঙ্গালায় উপস্থিত হইয়াছে, তাহারা পথশ্রমে এরূপ ক্লান্তি অনুভব করিতেছে যে, যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত হওয়া তাহাদের নিতান্ত অনিচ্ছা। যদি নবাব অতিথি বলিয়া তাহাদিগকে দশ লক্ষ মুদ্রা প্রদান করেন, তাহা হইলে তাহারা অনায়াসে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন না *। তিনি মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সমরাভিনয় না করিয়া গুপ্তভাবে তাহাদিগকে উৎকোচ প্রদানে বিদায় করিতে ইচ্ছা করিলেন না। বিশেষতঃ মুস্তাফা খাঁ তাঁহাকে ক্রমাগত যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করিতেছিলেন।

নবাব ভাস্করের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলে, সেই মহারাষ্ট্রীয় সিংহেরও ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি নবাবকে পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। অগত্যা উভয় পক্ষের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্তু উক্ত যুদ্ধ শৃঙ্খলার সহিত হইতেছে না দেখিয়া নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ স্বীয় খাদ্যদ্রব্যাদি ও শিবির পশ্চাদ্ভাগে পরিত্যাগ করিয়া কেবল সৈন্যদিগের সহিত

---

* উড়িষ্যা যাত্রার পূর্ব্বে নবাব মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণের কথা শুনিতে পান, কিন্তু তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই এবং ভাবিয়াছিলেন, যদি তাহারা বাঙ্গলায় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে বিষ্ণুপুর ও বীরভূমের রাজারা প্রথমে বাধা প্রদান করিবে, তাহার পর তিনি তাহাদিগের সম্মুখীন হইতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহার সিংহাসন-প্রাপ্তির পর উক্ত রাজাদের প্রতি অত্যাচার হওয়ায় তাহারা মহারাষ্ট্রীয়দিগকে কোন বাধা প্রদান করে নাই। আলিবর্দ্দী শুনিলেন যে, তাহারা একেবারে বর্দ্ধমান প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। (Holwell's Historical Events Pt. 1 Chap II pp 111—112) কিন্তু বিষ্ণুপুরের রাজা যে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বাধা দিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে।

† Orme সাহেবও তাঁহার দশ সহস্র সৈন্যের কথা উল্লেখ করেন, তন্মধ্যে পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী এবং তিন সহস্র পাঠান সৈন্য ছিল। (Orme II page 32)।

* হলওয়েল বলেন, ভাস্কর এইরূপ লিখিয়া পাঠান যে, নবাবকে তিন বৎসরের অনাদায়ী চৌথ এবং পূর্ব্ব নবাবদ্বয়ের সঞ্চিত সম্পত্তি দিতে হইবে; এবং ভবিষ্যতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের একজন কর্ম্মচারী প্রত্যেক কাছারীতে উপস্থিত হইয়া রাজস্বগ্রহণকালে চৌথ আদায় করিবে। আলিবর্দ্দী ইহাতে সম্মত হন নাই।

(Holwell. Hist. Events. Pt. 1 Chapt II, page 3)

মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রতি ধাবিত হইবার ইচ্ছা করিলেন। প্রভাত হইবামাত্র তিনি সমস্ত শিবিররক্ষকদিগকে কঠোর শাস্তির ভয় দেখাইয়া পশ্চাতে অবস্থিতি করিতে আদেশ দিলেন। কিন্তু তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই তাঁহার সে আদেশ প্রতিপালন করিতে সক্ষম হয় নাই। তাহারা মহারাষ্ট্রীয়গণের আক্রমণ হইতে আপনাদিগের প্রাণরক্ষার জন্য সৈন্যগণের মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। মহারাষ্ট্রীয়গণও চতুর্দ্দিক হইতে নবাবসৈন্যকে আক্রমণ করিল। যদিও নবাবসৈন্য স্থিরভাবে যুদ্ধ করিতেছিল, তথাপি তাহাদের রক্তে রণক্ষেত্রে বেগবতী নদী প্রবাহিত হইয়া গেল। ওমার খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মোসাহেব খাঁ এই যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। মোসাহেব খাঁ অত্যন্ত সাহসী ও বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি বিপক্ষগণের ব্যূহমধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ায় উপর্য্যুপরি আঘাতে অচেতন হইয়া ভূমিতে পতিত হন *। নবাব নিজে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জানিলেন, মুস্তাফা খাঁ, সমসের খাঁ প্রভৃতি আফগান সেনানীগণ তাঁহাদের সৈন্যের সহিত ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারা কোন কারণে নিশ্চয়ই তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, নতুবা এইরূপ ভয়াবহ সময়ে এ প্রকার ঔদাসীন্য করিবেন কেন? তিনি আপনার আসন্ন বিপদে চিন্তিত হইলেন। সম্মুখে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যগণ উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল মহাসাগরের ন্যায় অগ্রসর হইতেছে, পশ্চাতে তাঁহার অনুচরগণ বহু দূরে বালুকাস্তূপের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে। এই সময়ে সন্ধ্যা হওয়ার উপক্রম দেখিয়া তিনি অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না। যেস্থান পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, তথায় অবস্থানের ইচ্ছা করিলেন। সে-স্থানটি বর্দ্ধমান হইতে পাঁচ ছয় ক্রোশ দূরে অবস্থিত †।

কিছু পূর্ব্বে বৃষ্টি হওয়ায় পথ এরূপ কর্দ্দমাক্ত হইয়াছিল যে, কেহ পদচালনা করিলে স্থির ভাবে দণ্ডায়মান থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। নিকটে তিন চারিখানি শিবিকা ব্যতীত আর কোন প্রকার যানও ছিল না। অগত্যা অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমিতে একটী ক্ষুদ্র শিবির সন্নিবেশ করিয়া নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ তথায় থাকিতে বাধ্য হইলেন। সেই দিবস নবাবের যাবতীয় দ্রব্য ও অর্থাদি মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তগত হয়। রক্ষকগণ তরবারির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়। আফগানদিগের ঔদাসীন্যের জন্য অপরাপর সৈন্যগণ চতুর্দ্দিক হইতে মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত আঘাতের পর আঘাতে ধরাশায়ী হইতে থাকে। রজনী উপস্থিত হইলে উভয়পক্ষ স্ব স্ব স্থানে প্রতিনিবৃত্ত হয়। সে রাত্রিতে নবাব-সৈন্যগণের মধ্যে বিষম ভীতির সঞ্চার হয়। আহতগণের আর্ত্তনাদে ও তাহাদিগের শোচনীয় অবস্থা দর্শনে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠেন। তিনি এই ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে কিরূপে নিষ্কৃতি পাইবেন, তাহার কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

মুস্তাফা খাঁ, সমসের খাঁ ও সর্দ্দার খাঁ প্রভৃতি আফগান সৈন্যাধ্যক্ষগণ কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া অধোবদনে স্ব স্ব শিবিরে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা কয়েকটি কারণে নবাবের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। যখন কোন যুদ্ধযাত্রার প্রয়োজন হইত, তখন নবাব সমুদায় সৈন্য নিযুক্ত করিতেন। যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতে তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দেওয়া হইত। নবাব তাহাদিগকে স্থায়ীভাবে রাখিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিতেন, কিন্তু স্বীয় কার্য্য উদ্ধার হইলে, তাহাদিগকে অন্য উপায় দেখিতে বলিতেন। বিগত কটক যুদ্ধের সময় তিনি মুস্তাফা খাঁর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, এবার যাহাদিগকে যুদ্ধার্থে নিযুক্ত করা হইয়াছে, তাহাদিগকে আর বিদায় দেওয়া হইবে না। কিন্তু উক্ত যুদ্ধের পর যাবতীয় নূতন সৈন্য সরকারী কার্য্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। এই সমস্ত কারণে প্রধান প্রধান আফগান কর্ম্মচারী ও তাঁহাদের অধীন সৈন্যগণ নবাবের উপর বিরক্ত হইয়া তাঁহার কার্য্যে অবহেলা করিতেছিল। দ্বিতীয়তঃ, সাহাবাদ ভোজপুরের ফৌজদার আফগান সর্দ্দার রোশেন খাঁ জৈনুদ্দীনের আদেশে নিহত হওয়ায় এবং নবাব তাহার কোন বিচার না করায়, আপ-

* রিয়াজুস সালাতিনে লিখিত আছে যে, মহারাষ্ট্রীয়েরা নবাব বেগমের হস্তী ধরিয়া শিবিরাভিমুখে লইয়া যাইবার উপক্রম করিলে মোসাহেব খাঁ তাহার উদ্ধারের জন্য শত্রুব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিয়া জীবন বিসর্জ্জন দেন।

† রিয়াজুস সালাতিনে উক্ত স্থানকে পান্দুনিবাস বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

নাদের জাতির মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তির হত্যায় তাঁহারা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ, মুস্তাফা খাঁ নিজে কোন কারণে তিরস্কৃত হওয়ায় নবাবের উপর তাঁহার বিদ্বেষ জন্মে। সে কারণটি এই, নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ যখন মির্জ্জা বাখরের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন, সেই সময়ে ময়ূরভঞ্জ দিয়া গমনকালে উক্ত প্রদেশের রাজা নবাবসৈন্যের উপর অত্যন্ত উপদ্রব করেন। মির্জ্জা বাখরের সহিত রাজার প্রণয় থাকায় তিনি এইরূপ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ তাঁহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার ইচ্ছা করিলে ময়ূরভঞ্জাধিপ মুস্তাফা খাঁর স্মরণাপন্ন হন। মুস্তাফা খাঁ তাঁহার জন্য নবাবের নিকট বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়া লাভের মধ্যে অত্যন্ত তিরস্কৃত হন। নবাব মীরজাফর খাঁকে রাজার হত্যার জন্য আদেশ দেন, রাজা যখন আপনার আবেদন উপস্থাপিত করিবার জন্য শিবিরে প্রবেশ করিতেছিলেন, অমনি মীরজাফরের আদেশে তিনি খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁহার অনুচরগণেরও সেইরূপ দশা ঘটিয়াছিল। মুস্তাফা খাঁ এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া নবাবের প্রতি একেবারে বীতশ্রদ্ধ হন।

এই সমস্ত কারণে আফগানগণ সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধে ঔদাসীন্য দেখাইয়াছিল। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ আফগানদিগের বিরক্তির কারণ অবগত হইয়া তাহাদের এই প্রকার ঔদাসীন্যের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। তিনি মুস্তাফা খাঁকে বিদায় দেওয়া যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। একে মুস্তাফা খাঁর সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুতা আছে, তদ্ভিন্ন তাঁহার যাবতীয় সৈন্যাধ্যক্ষের মধ্যে মুস্তাফা খাঁই সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী ও কার্য্যদক্ষ। এরূপ ব্যক্তি কার্য্য হইতে অবসর লইলে কেহই তাঁহাকে আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারিবে না। তিনি প্রতিনিয়ত মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা করিতেছিলেন।

নবাব এরূপ সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ হইয়াছিলেন যে, চারিদিকে মহারাষ্ট্রীয়গণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়াছিল এবং কোন স্থান হইতে খাদ্যদ্রব্যাদি আনয়নের সম্ভাবনাও ছিল না। এই সকল কারণে আলিবর্দ্দী খাঁ আপনার অত্যন্ত বিপদ উপস্থিত দেখিয়া মহারাষ্ট্রীয়গণের মনোভাব পরীক্ষার জন্য মীর খয়েরউল্লা খাঁ নামক একজন দাক্ষিণাত্যবাসীকে ভাস্কর পণ্ডিতের শিবিরে প্রেরণ করিলেন। খয়েরউল্লা বর্দ্ধমানের রাজার সৈন্যগণের বক্সী ছিলেন। তিনি রাজা কর্ত্তৃক প্রেরণের ভাণ করিয়া মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতিকে শান্তি-স্থাপন করিতে অনুরোধ করেন। ভাস্কর পণ্ডিত এইরূপ ভাবে রাজাকে বলিতে বলিলেন যে, বাঙ্গালার নবাবের খাদ্যদ্রব্যাদি তাঁহাদের হস্তগত হইয়াছে এবং তিনিও মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়াছেন, তাঁহার কোনরূপে নিষ্কৃতির উপায় নাই। তবে তিনি যখন ভারতবর্ষের মধ্যে একজন প্রধান রাজা, তখন আমাদিগকে এক কোটী মুদ্রা ও তাঁহার যাবতীয় হস্তীগুলি প্রদান করিলে তাঁহাকে নিষ্কৃতি দিতে পারি। ভাস্করের প্রস্তাব নবাবের কর্ণগোচর হইলে তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণের মধ্যে অনেকে এই সময়ে শত্রুপক্ষের সহিত যোগ দান করিতেছিল। নবাব নানা কারণে অতিশয় চিন্তাযুক্ত হইলেন। তাঁহার মন্ত্রী ও দেওয়ান জানকীরাম তাঁহাকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রস্তাবে সম্মত হইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন যে, শত্রুপক্ষীয়েরা যেরূপ ভাবে বেষ্টন করিয়াছে, তাহাতে একটি প্রাণীরও নিষ্কৃতির আশা নাই। অথবা কোন প্রকারে এক দিনেরও খাদ্যদ্রব্য আনিবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রস্তাবে স্বীকৃত হওয়াই কর্ত্তব্য। বাঙ্গালার হস্তী কিছু অদ্ভুত পদার্থ নহে এবং নবাবের রাজ্য হইতে তাহা ভূরি ভূরি প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর এক কোটী টাকার মধ্যে তাঁহার নিকটেই ৪০ লক্ষ আছে এবং অবশিষ্ট ৬০ লক্ষ তিনি সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন। জানকীরামের অনুরোধে নবাবের হৃদয় বিদ্ধ হইল। তিনি তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিয়া বলিলেন যে, জীবন থাকিতে তিনি কখনও মহারাষ্ট্রীয়দিগের শরণাপন্ন হইবেন না। তাঁহার সহিত যে অল্পসংখ্যক সৈন্য আছে, তাহার দ্বারাই তিনি জয়লাভ করার আশা করেন এবং মহারাষ্ট্রীয়দিগকে স্তূপাকার অর্থরাশি প্রদানের পরিবর্ত্তে যদি তাহার কিয়দংশ তাঁহার সৈন্যগণের মধ্যে বিতরিত হয়, তাহা হইলে তাহারা অনায়াসে তাঁহার জন্য আপনাদের শোণিত দান করিতে পারিবে। এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া নবাব জানকীরামকে তাঁহার

৪০ লক্ষ টাকা হইতে ১০ লক্ষ টাকা তাঁহার বিশ্বাসী সৈন্যগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিতে আদেশ করিলেন।

এই সময় রাত্রি উপস্থিত হওয়ায় বিশ্ব-সংসার অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে নবাবসৈন্যগণের হৃদয় ভয় ও নিরাশায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহারা একে একে নবাবের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বিশেষতঃ খয়েরউল্লা খাঁর যাতায়াতে সকলে সন্ধির প্রস্তাব বুঝিতে পারিয়া অধিকতর আগ্রহসহকারে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যোগদানে যত্নবান হইল। কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, কর্ম্মচারিগণ ও পরিচিত প্রভুভক্ত দুই চারি জন সৈন্য ব্যতীত সকলেই নবাবের পক্ষ পরিত্যাগ করিতে সংকল্প করিয়াছিল।

যাহারা মহারাষ্ট্রীয়দের সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছা করিয়াছিল, মীর হাবীব্ তাহাদের অন্যতম। মীর-হাবীব মুর্শিদকুলী খাঁর উড়িষ্যা হইতে পলায়নের পর তাঁহার দেওয়ানী পরিত্যাগ করিয়া নবাব-দরবারে নিযুক্ত হন। কিন্তু তিনি মনে মনে আলিবর্দ্দী খাঁর উপর ঘোরতর অসন্তুষ্ট ছিলেন; এক্ষণে সুযোগ পাইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা এই সময় শত্রুপক্ষের দুর্দ্দশা দেখিয়া বিপন্ন লোকদিগের সাহায্যের জন্য দুইটি নিশান প্রোথিত করিয়া একটি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেয় এবং বিপন্ন লোকদিগকে আহ্বান করিতে থাকে। নবাব-সৈন্যগণের মধ্যে অনেকে উত্তম সুযোগ উপস্থিত মনে করিয়া আপনাদিগের দ্রব্যাদি সহ সেই স্থানে গমন করিতে করিল। মহারাষ্ট্রীয়েরা কাহাকেও বিপন্ন না দেখিয়া তাহাদিগের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া তথা হইতে বিদায় দিল। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ স্বীয় সৈন্যগণের নানারূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া ও মহারাষ্ট্রীয়গণের প্রবল আক্রমণে ব্যাকুল হইয়া অন্ধকারময় গভীর রাত্রিতে একমাত্র সিরাজউদ্দৌলাকে সঙ্গে লইয়া পদব্রজে মুস্তাফা খাঁর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, জগতে মনুষ্যের জীবন ভিন্ন অন্য কোন্ প্রিয় পদার্থ আছে? যদি তুমি আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া থাক, তাহা হইলে আমি আমার জীবন অপেক্ষা প্রিয় সিরাজের সহিত উপস্থিত আছি, এইক্ষণেই এক আঘাতে দুইজনের জীবন লইতে পার। আর যদি কখনও তোমার কণামাত্র উপকার করিয়া থাকি, তাহা হইলে শপথপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা কর যে, এ বিপদে আমাকে পরিত্যাগ করিবে না। আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি যে, বিনা চেষ্টায় সহজে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিব না।

মুস্তাফা খাঁ সুপ্তোত্থিত হইয়া নবাবের এইরূপ কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। পরে তিনি উত্তর করিলেন যে, অন্যান্য সেনানীর সহিত পরামর্শ না করিয়া উত্তর দিতে পারিবেন না। তখন সমসের খাঁ, সর্দ্দার খাঁ প্রভৃতি সেনাপতিগণ আহূত হইলেন। তাঁহারা সমস্ত বিষয় অবগত হইলে, মুস্তাফা খাঁ তাঁহাদের মত জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা বলিলেন যে, মুস্তাফা খাঁ যখন তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান ও তাঁহাদের জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তখন তাঁহার যাহা অভিমত, সকলেই তাহাতে সম্মত আছেন। অবশেষে মুস্তাফা খাঁ সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, আইস, তবে আমরা প্রতিজ্ঞা করি যে, নবাবের জন্য জীবন উৎসর্গ করিলাম এবং তাঁহার ও তাঁহার বংশের মঙ্গলের জন্যই আমাদের জীবন ব্যয়িত হইবে। আমার বিশ্বাস যে, আমাদের ন্যায় ৪০ জন মাত্র আফগান যদি তরবারি ধারণ করে, তাহা হইলে একটি রাজ্য অধিকার করিতে পারে। তাহাতে আমরা যখন অধিকসংখ্যক আছি, তখন নিশ্চয়ই মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পরাজিত হইতে হইবে।

মুস্তাফা খাঁর বাক্যে সকলে স্বীকৃত হইলে, নবাব নিঃশঙ্কচিত্তে শিবিরে প্রত্যাগমন করিয়া রজনীর শেষভাগ নিদ্রায় অতিবাহিত করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ সরফরাজ খাঁর জামাতা ইসুফ আলি খাঁর পিতা গোলাম আলি খাঁকে আফগানগণের মনোভাব জানিবার জন্য তাহাদের শিবিরে প্রেরণ করেন। গত রাত্রে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত আফগানদিগের যে পরামর্শ হইয়াছিল, সেই সময়ে তাহারই কথোপকথন হয়। মুস্তাফা খাঁ সকলকে বলিলেন, মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যাহাই হউক না কেন, যখন আমরা নবাবের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তখন তাহা প্রতিপালন করিতেই হইবে। নবাব গোলাম আলির প্রমুখাৎ সমস্ত শ্রবণ করিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্ত হইতে মুক্তির উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

নবাব পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, কোন প্রকারে শত্রুপক্ষের ব্যূহ ভেদ করিয়া মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইতে পারিলে, আবার নূতন সজ্জায় ও নূতন উৎসাহে তাহাদিগকে আক্রমণ করা যাইবে। এইরূপ পরামর্শ করিতে করিতে সে দিন অতিবাহিত হইয়া সন্ধ্যা উপস্থিত হয়।

মহারাষ্ট্রীয়েরা নবাব-শিবির হইতে একটি কামান অধিকার করিয়াছিল। এক্ষণে একটি বৃক্ষের উপর উক্ত কামান স্থাপন করিয়া নবাবসৈন্যের উপর গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে অগণ্য বন্দুকও চালিত হইতে লাগিল। চারিদিকে সৈন্যগণের হাহাকারে দিঙ্‌মণ্ডল বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। বর্দ্ধমান রাজার দেওয়ান মাণিকচাঁদ ভীত হইয়া প্রভাত হইলে স্বীয় প্রভুর নিকট পলায়ন করার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। সেই সময় গভীর রজনীযোগে দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়গণ ভীমবেগে নবাবসৈন্যের উপর চতুর্দ্দিক হইতে নিপতিত হইল। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ সহসা এইরূপে আক্রান্ত হওয়ায় স্বীয় সৈন্যের ব্যূহরচনার অবকাশ পাইলেন না। এমন কি তিনি নিজে হস্তি-পৃষ্ঠে আরোহণেরও সময় পান নাই। যে যেরূপে পারিল, আত্মরক্ষার জন্য সচেষ্ট হইল। ফলতঃ নবাব-সৈন্যগণ অত্যন্ত বিশৃঙ্খলার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। মীর হাবীব তিন স্থানে আহত হইয়া শত্রুপক্ষের হস্তে বন্দী হন। তাহার পর তিনি মহারাষ্ট্রীয়দিগের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। নবাবের গোলন্দাজ সেনাপতি হায়দার আলি খাঁ যদিও শত্রুপক্ষকে ধরাশায়ী করিতেছিলেন, তথাপি সেই অগণ্য পঙ্গপালের কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এদিকে মুস্তাফা খাঁ, সমসের খাঁ, সর্দ্দার খাঁ, ওমার খাঁ, রহিম খা প্রভৃতি প্রধান প্রধান সেনানীগণ প্রথমতঃ বিশৃঙ্খলার সহিত বিক্ষিপ্ত ভাবে যুদ্ধ করিতেছিলেন। অবশেষে সকলে দলবদ্ধ হইয়া চক্রাকারে মহারাষ্ট্রীয়দিগের পার্শ্ব আক্রমণ করিলেন। এই সুযোগে নবাবসৈন্যগণ যেন কিঞ্চিৎ নিশ্বাস গ্রহণ করিবার অবকাশ পাইল। তাহারা তাহার পর সমবেত হইয়া শত্রুপক্ষের ব্যূহ ভেদ করিয়া কাটোয়ার দিকে যাত্রা করিল। জগন্নাথের পথ ধরিয়া সৈন্যগণ অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারা ক্রমাগত যুদ্ধ করিতে করিতে অনাহারে অনিদ্রায় জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছিল। তাহাদিগের যেরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। কয়েকদিন কয়েকটি সামান্য যুদ্ধের পর তাহারা একটি স্থানে উপস্থিত হইলে, মুস্তাফা খাঁ সকলকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কি সেনাপতি, কি সৈন্য, সকলেই অনাহারে ও পথশ্রমে ক্ষিপ্তর ন্যায় হইয়াছিল, কাহারও মস্তিষ্ক স্থির ছিল না। মুস্তাফা খাঁ সকলকে মুসলমান ধর্ম্মের দোহাই দিয়া শত্রুদিগকে আক্রমণের জন্য উত্তেজনা করায়, ধর্ম্মের নামে কতকগুলি সৈন্য তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া বিপক্ষগণের উদ্দেশে গমন করে। এই সময়ে কতকগুলি মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করিয়া অস্ত্রশস্ত্র ছাড়িয়া উপাসনা ও রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। মুস্তাফা খাঁ সহসা তাহাদিগকে আক্রমণ করায় সকলে আপনাদের দ্রব্যাদি পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। মুস্তাফা খাঁর সৈন্যেরা তাহাদের খাদ্যদ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া লয় এবং তাহাদের নিকট অবগত হইয়া আরও কতিপয় নবাব-সৈন্য অবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া আনায় তাহাদের দুই তিন দিনের আহারের সংস্থান হইয়াছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়েরা তাহার পর হইতে এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিল যে, নবাব-সৈন্যগণ আর তাহাদিগকে সহসা আক্রমণ করার সুযোগ পায় নাই। একদিন প্রাতঃকালে মহারাষ্ট্রীয়েরা অকস্মাৎ নবাব সৈন্যকে আক্রমণ করে। নবাব-সৈন্যগণ চতুর্দ্দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া ব্যূহবদ্ধ হইবার সুযোগ না পাওয়ায় মহারাষ্ট্রীয়দিগের আক্রমণে ধরাশায়ী হইতে থাকে। একে তাহারা ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, তাহার উপর সেই দুর্দ্দান্ত কালান্তক শত্রুগণের আক্রমণে তাহাদের মধ্যে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। সকলেই প্রাণরক্ষার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। নবাব নিজে একাকীমাত্র কতিপয় মহারাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইলেন। কিন্তু দুইটি হস্তীর পথাবরোধের জন্য তিনি সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিলেন। দুইটি হস্তী প্রয়োজন মত দ্রব্য বহন করিয়া নবাবের হস্তীর অগ্রে অগ্রে গমন করিত। তাহারা কতকগুলি অপরিচিত ব্যক্তিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া আপনাপন শৃঙ্খলা দ্বারা তাহাদিগকে অনবরত আঘাত করিতে লাগিল। মহারাষ্ট্রীয়েরা এই দুই জন্তুর অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া নবাবের নিকট যাইতে সাহসী হইল না।

যদি উক্ত হস্তিদ্বয় সে দিবস পরাক্রম প্রকাশ না করিত, তাহা হইলে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নবাব হয় ত সেই দিন মহারাষ্ট্রীয় হস্তে নিহত হইয়া ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রত্যাবৃত্ত হইতে না হইতে নবাবের সাহায্যের জন্য অগ্রগামী নবাব-সৈন্যেরা তাহাদিগকে ভীমবেগে আক্রমণ করিলে, তাহারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। এইরূপ ক্রমাগত আত্মরক্ষা ও যুদ্ধের পর কয়েক দিবস পরে নবাব-সৈন্য কাটোয়ার দুর্গে উপস্থিত হইল। এই সময়ে নবাবের পক্ষে তিন সহস্র মাত্র অশ্বারোহী ছিল। অবশিষ্ট সৈন্য মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে জীবন বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হয়।*

---

* হলওয়েল বলেন যে, নবাবের ২৫০০০ হাজার সৈন্যের মধ্যে কেবল ২৫০০ হাজার পাঠান ও ১৫০০ বঙ্গসৈন্য অবশিষ্ট ছিল। শেষোক্তগণ আপনাদিগের অধ্যক্ষ মীর হাবীবের উৎসাহে পাঠানদিগের ন্যায় কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিল। Holwell's—Interesting Historial Events, Pt. I. Chap. II. p. 114.

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বস্ত্রহরণ



স নষ্টঃ কৌরবেয়েষু পূর্ব্বো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ।

“অর্দ্ধেক ময়ূর তুমি, অর্দ্ধেক বায়স”



...গত ২০শে মার্চ তারিখে উত্তর-কলিকাতার বীর অভ্যর্থনা-সভায় সুভাষচন্দ্র বলিয়াছিলেন—বর্ত্তমানে কংগ্রেসের [illegible]

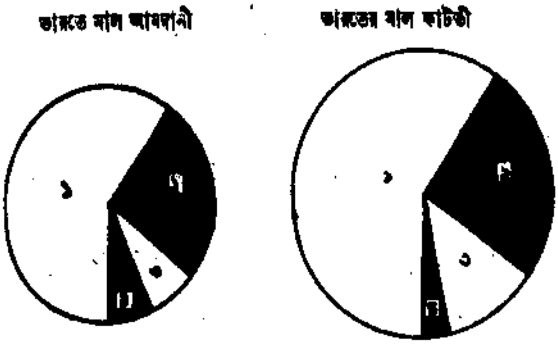
প্রাথমিক সংখ্যা-বিজ্ঞান

—শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

চিত্রে সংখ্যাপ্রকাশ পদ্ধতি

চিত্র বা নক্সা অঙ্কন করিয়া, কোন ঘটনা বা সংবাদ প্রকাশ করিবার প্রথা বহু পুরাকাল হইতে প্রচলিত আছে।

(ক)-চিত্র



(১) ইউরোপ, (২) এসিয়া ও অষ্ট্রেলিয়া, (৩) আমেরিকা, (৪) আফ্রিকা।

সংখ্যা-বিজ্ঞানে চিত্রদ্বারা তথ্য প্রকাশ করিবার রীতি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। যে কোন তথ্যের সংখ্যা সংগ্রহ করিবার পর সংখ্যাগুলির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা করিবার প্রয়োজন হয়। সংখ্যাগুলির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধারণা করিবার সহজ কৌশল হিসাবে চিত্র বা নক্সা অঙ্কন করা হয়। একই তথ্যের তাৎপর্য্য বিভিন্ন প্রকার চিত্রের মধ্য দিয়া পরিস্ফুট করা যায়। সংখ্যা-বিজ্ঞানে সাধারণতঃ মাত্র কয়েক প্রকার চিত্র ব্যবহার করা হয়, যথা :—

(১) বৃত্ত-চিত্র

(২) দণ্ড-চিত্র

(৩) রেখা-চিত্র

এই তিন প্রকারের মধ্যে রেখাচিত্রের ব্যবহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

বৃত্ত-চিত্র

কোন তথ্যের সংখ্যাগুলির অনুপাতে একটি বৃত্তের বিভিন্ন অংশ অঙ্কন করিলে সংখ্যাগুলির প্রকৃতি সম্বন্ধে তুলনামূলক ধারণা করা সহজ হয়। বৃত্ত এবং বৃত্তাংশ অঙ্কন-পদ্ধতি সাধারণ জ্যামিতি হইতে শিক্ষা করা যায়। একটি তথ্য (ক)-তালিকায় সংগৃহীত হইয়াছে। এই সংখ্যাগুলির অনুপাতে একটি বৃত্তের বিভিন্ন অংশ যে ভাবে কাটিয়া লওয়া যায়, তাহা (ক)-চিত্রে দেখান হইয়াছে।

(ক)-তালিকা—পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশের সহিত ভারতের মালকাটতি ও আমদানির হিসাব (১৯৩০-৩৪)

[ষ্ট্যাঃ সুঃ ইঃ ১৯৩৮, পৃঃ ৬৩৬, ৬৪৮]

(কোটি টাকার সংখ্যা)

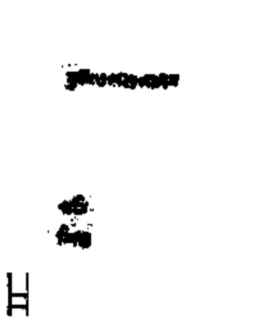
	মহাদেশ	কাটতি	আমদা
১।	ইউরোপ	৮২.৯	৭২.৯
২।	এসিয়া ও অষ্ট্রেলিয়া	৩৭.৫	৩০.৭
৩।	আমেরিকা	২০.৫	৭.৬
৪।	আফ্রিকা	৫.৩	৪.১
	মোট—	১৪৬.৩	১১৫.৪

দণ্ড-চিত্র

এক বা একাধিক দণ্ড আঁকিয়া এক একটি দণ্ডের বিভিন্ন অংশ কোন তথ্যের সংখ্যাগুলির অনুপাতে প্রকাশ করিলেও সংখ্যাগুলির তারতম্য সম্বন্ধে তুলনামূলক ধারণা করা সহজ হয়। সংখ্যা-বিজ্ঞানে দণ্ড-চিত্রের যথেষ্ট ব্যবহার হয়। লম্ব বা শায়িত যে কোন ভাবে দণ্ড অঙ্কন করা চলে। একটি তথ্য (খ)-তালিকায় সংগৃহীত হইয়াছে। এই তালিকার সংখ্যাগুলি একটি দণ্ডের বিভিন্ন অংশ দ্বারা যেরূপ ভাবে প্রকাশ করা যায়, তাহা (খ)-চিত্রে দেখান হইয়াছে।

(খ)-চিত্র

উপজীবিকা অনুপাতে লোকসংখ্যার তারতম্য, বঙ্গদেশ (১৯৩১)



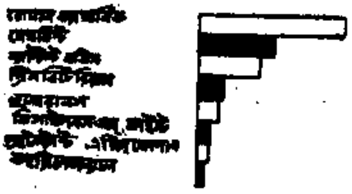
(খ)-তালিকা— বঙ্গদেশে উপজীবিকার শ্রেণী-বিভাগ।

[সেঃ ইঃ, ১৯৩১ ; ভ ১—ইণ্ডিয়া, পার্ট ১ ; পৃঃ ২৭৯]

(প্রতি হাজার লোক-সংখ্যার অনুপাতে)

কৃষি ও পশুপালনে	...	৬৮০
খনি	... ...	২
শিল্পে	... ...	৮৮
যানবাহনে	... ...	২০
বাণিজ্যে	... ...	৫৮
রাজ্যশাসন ও বৃত্তিচালনায়	...	২৮
অন্যান্য	... ...	১১৭

(গ)-চিত্র



আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে খৃষ্টধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অনুপাত।

একই দণ্ডের বিভিন্ন অংশে সংখ্যাগুলির তারতম্য দেখান অপেক্ষা ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যার অনুপাতে বিভিন্ন দণ্ড পাশাপাশি আঁকিয়া দেখাইলে, তুলনামূলক ধারণা করা আরও সহজ ও সুস্পষ্ট হয়। (গ)-তালিকায় ও (ঘ)-তালিকায় যে সংখ্যাগুলি সংগৃহীত হইয়াছে, সেগুলি (গ)-চিত্রে ও (ঘ)-চিত্রে দেখান হইয়াছে।

(গ)-তালিকা—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে খৃষ্টধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ে লোকসংখ্যা।

[ষ্ট্যাটিস্‌টিক্যাল অ্যাবষ্ট্রাক্ট অব ইউ. এস. এ. ১৯২৪, পৃঃ ৫৯]

রোমান ক্যাথলিক	...	১,৮২,৬০,৭৯০
মেথডিষ্ট	...	৮৪,৩০,২৫৮
ব্যাপ্‌টিষ্ট বডিস্‌	...	৮১,৮৯,৫১৮
প্রেসবিটেরিয়ান	...	২৫,০৯,৪১৩
লুথেরান	...	১৪,৬৫,৮৪১
ডিসাইপল্‌স্‌ অব ক্রাইষ্ট	...	১৩,৮৩,২৪৭
প্রটেষ্টান্ট এপিস্‌কোপাল্‌	...	১১,২৮,৮৫৯
কংগ্রেগেসনাল্‌	...	৮,৫৭,৮৬৬

(ঘ) তালিকা—কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা।

[আনন্দবাজার পত্রিকা, ১লা মার্চ্চ, ১৯৩৮]

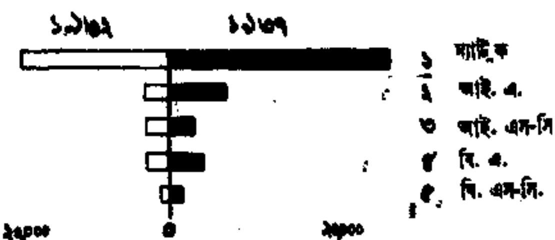
		১৯৩২ খৃঃ	১৯৩৭ খৃঃ
১।	প্রবেশিকা (ম্যাট্রিক) ...	১৯০৮১	২৭৫৫৫
২।	মধ্য, কলা (আই. এ.)	৩০৮১	৬২৭৪
৩।	মধ্য, বিজ্ঞান (আই. এস সি.)	৩২৭২	৩৪১৩
৪।	উপাধি, কলা (বি. এ.)	২৮১০	৪২১৪
৫।	উপাধি, বিজ্ঞান (বি. এস. সি.)	৭২৫	৮৫৭

একাধিক দণ্ড আঁকিবার সময় সুস্পষ্টতার জন্য দণ্ডগুলির মধ্যে ফাঁক দেওয়া যায়। এক প্রকারের বিভিন্ন কালের সংখ্যা বিভিন্ন প্রকারে চিহ্নিত দণ্ড দ্বারা প্রকাশিত হয়। (ঘ)-চিত্রে দুইটি পৃথক্ কালের সংখ্যা পৃথক্‌ভাবে চিহ্নিত দণ্ড দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৩২ সালের সংখ্যা ও ১৯৩৭ সালের সংখ্যা যথাক্রমে সূক্ষ্ম ও স্থূল বর্ণের দণ্ড দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে।

'কাঠামো'-চিত্র

পৌনঃপুন্য শ্রেণীর সংখ্যা চিত্রে প্রকাশ করিবার কার্য্যে দণ্ড-চিত্রের ব্যবহার হয়। (ঙ)-তালিকাতে পৌনঃপুন্য শ্রেণীর তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। এই দণ্ড-চিত্র দেখিতে একটি 'কাঠামো'র আকার গ্রহণ করে। এজন্য এরূপ চিত্রকে কাঠামো-চিত্র বলা হয়। পৌনঃপুন্য শ্রেণীর এক একটি সংখ্যার অনুপাতে এক একটি দণ্ড পাশাপাশি আঁকিয়া যাওয়া হয়। যে মাপে সংখ্যা প্রকাশিত থাকে তাহার এককের অনুপাতে প্রত্যেক দণ্ডের পাদদেশ বিস্তৃত রাখা হয়, অর্থাৎ প্রত্যেক সংখ্যা কেবল যে দণ্ডের দৈর্ঘ্যের অনুপাতে অঙ্কিত তাহা নহে, প্রত্যেক দণ্ডের পাদদেশ একক হওয়ায় প্রত্যেক দণ্ডের আয়তক্ষেত্র এক একটি সংখ্যার অনুপাতে গঠিত হয়। এইভাবে মোট কাঠামো যে আয়তক্ষেত্রে বিস্তৃত হয়, সংখ্যাগুলির সমষ্টি সেই মোট আয়তক্ষেত্র নির্দেশ করে, অর্থাৎ পৌনঃপুন্য শ্রেণীর সংখ্যাগুলির সমষ্টি একটি আয়ত-

(ঘ)-চিত্র

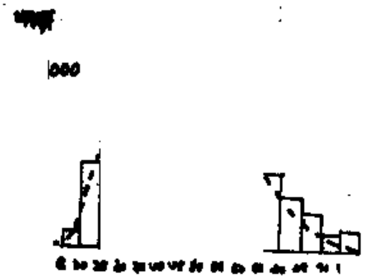


কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা।

ক্ষেত্র দ্বারা প্রকাশিত হয়। 'কাঠামো' যে আয়তক্ষেত্রে বিস্তৃত থাকে, তাহার উপরিভাগের পরিধি এক একটি দণ্ডের শেষ ভাগ দ্বারা গঠিত হওয়ায় অসমান থাকে। কোন বক্র-

রেখা দ্বারা 'কাঠামো'র উপরিভাগের পরিধি এমনভাবে অঙ্কন করা যায়, যাহাতে 'কাঠামো'র দণ্ডগুলি দ্বারা যে

(ঙ)-চিত্র



ভারতের বিভিন্ন বয়সের উন্মাদ পুরুষের অনুপাত।

আয়তক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট হয়, বক্ররেখাদ্বারাও সমপরিমাণ আয়তক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা হইলে সেই রেখাকে 'পৌনঃপুন্ন রেখা' নামে অভিহিত করা যায়।

(ঙ)-তালিকা—ভারতে বিভিন্ন বয়সের উন্মাদরোগী (পুরুষ) সংখ্যা।

[লোঃ ইঃ, ১৯৩১ ; ভ ১, পৃঃ ১৯২]

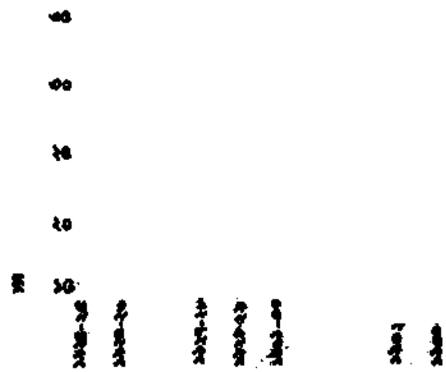
বয়স	সংখ্যা
০ হইতে ৫	১,০৬৯
৫ " ১০	৪,১২১
১০ " ১৫	৫,৪৪৯
১৫ " ২০	৬,৯৭১
২০ " ২৫	৮,০২২
২৫ " ৩০	৯,৬১৩
৩০ " ৩৫	৯,২৭১
৩৫ " ৪০	৮,০১৪
৪০ " ৪৫	৬,৭৭২
৪৫ " ৫০	৪,৭৫০
৫০ " ৫৫	৩,৬৪৮
৫৫ " ৬০	২,৬০৭
৬০ " ৬৫	১,৮৩১
৬৫ " ৭০	৯০১
৭০ হইতে ঊর্দ্ধে	১,২২৬

(ঙ)-তালিকার সংখ্যাগুলি লম্বভাবে দণ্ডদ্বারা (ঙ)-চিত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। যে যে বয়সের সংখ্যার দণ্ড অঙ্কিত হইয়াছে, সেই বয়সগুলির অনুপাতে আনুভূমিক রেখা চিহ্নিত করা হইয়াছে। সমস্ত দণ্ডগুলি পাশাপাশি দাঁড়াইয়া একটা 'কাঠামো'র আকার ধারণ করে। 'কাঠামো'টি যে আয়তক্ষেত্র অধিকার করে, প্রায় সেই পরিমাণ আয়তক্ষেত্রে পরিবেষ্টিত করা যায়, দণ্ডগুলির উপরিভাগে একটি টানা রেখাদ্বারা। (ঙ)-চিত্রে, এইরূপ একটি রেখা কিরূপভাবে টানা যায়, তাহা অস্পষ্ট রেখাদ্বারা দেখান হইয়াছে। এই রেখা দণ্ডের উপরিভাগের অসমানত্ব দূর করে। মনোমত নানারেখা আঁকিয়া এ অসমানত্ব দূর করা যায়, কিন্তু কোন্ রেখা টানিলে মূল সংখ্যাগুলির সহিত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সামঞ্জস্য থাকিবে এই বিষয়ে সংখ্যা-বিজ্ঞানের বহু গভীর চর্চ্চা হইয়াছে, সংখ্যা-বিজ্ঞানের প্রাথমিক আলোচনায় তাহার অবতারণা করা যুক্তিযুক্ত নহে।

রেখা-চিত্র

পৌনঃপুন্ন চিত্র দ্বারা দণ্ডের উপরিভাগ প্রকাশ করা হয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। রেখা-চিত্র অঙ্কন করিবার পদ্ধতি প্রাথমিক বীজগণিত হইতে শিক্ষা করা যায়। রেখাচিত্র অঙ্কন করিবার জন্য সাধারণতঃ ছক-কাগজ (গ্রাফ পেপার) ব্যবহৃত হয়। ছক-কাগজ কতকগুলি বামে দক্ষিণে ও উপর নীচে সমদূরবর্ত্তী সরলরেখা দ্বারা প্রস্তুত। বিশেষ তথ্যের উপযোগী করিয়া অন্য কাগজে ছক করিয়া লইয়া রেখাচিত্র অঙ্কন করা যায়।

(চ)-চিত্র



ভারতের পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে বিভিন্ন বৎসরে গচ্ছিত টাকা।

(চ)-তালিকায় একটি তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। এই তথ্যের উপযোগী করিয়া (চ)-চিত্রে প্রথম ছক কাটিয়া লইয়া রেখা-

চিত্র অঙ্কন করা হইয়াছে। এই চিত্রে সময়-বাচক বিষয় অনুভূমিক রেখাতে ও সংখ্যাগুলি লম্ব-রেখায় আনুপাতিক ভাবে প্রকাশ করা হয়। উভয় পার্শ্বেই পৃথক মাপ দেখান থাকে, অর্থাৎ ছকের এক এক ঘর কি বিষয় বা সংখ্যা নির্দেশ করে, তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখান থাকে।

(চ)-তালিকা :—পোষ্ট অফিস সেভিং ব্যাঙ্কে সমগ্র ভারতে কত টাকা গচ্ছিত আছে, তাহার তালিকা (ষ্ট্যাঃ অ্যাঃ, বৃঃ, ইঃ ১৯৩৬)

[কোটি টাকার সংখ্যা]

এপ্রিল হইতে মার্চ	
১৯২৪-২৫	১৮.২
১৯২৫-২৬	১৯.৮
১৯২৬-২৭	২১.২
১৯২৭-২৮	২৩.০
১৯২৮-২৯	২৭.২
১৯২৯-৩০	২৭.৩
১৯৩০-৩১	২৫.৪
১৯৩১-৩২	২৮.৫
১৯৩২-৩৩	৩২.১
১৯৩৩-৩৪	৩৮.২

রেখাচিত্র অঙ্কন করিবার সময় কয়েকটি নিয়ম মানিয়া চলা সুবিধাজনক, যথা :—

(১) বাম হইতে দক্ষিণে অনুভূমিক রেখাতে মাস বা বৎসর দেখান হয়।

(২) যতগুলি প্রয়োজন তদতিরিক্ত রেখা চিত্রে না দেখান।

(৩) ছক তৈরী করার জন্য যে অনুভূমিক ও লম্বরেখা অঙ্কন করা হয় সেগুলি স্থূল করিয়া অঙ্কন করা।

(৪) সংখ্যাগুলি লম্বরেখায় যে যে স্থান অধিকার করে, সেগুলি একটি স্থূল রেখা দ্বারা যুক্ত করা।

(৫) সংখ্যার মাপ লম্বরেখার বামপার্শ্বে ও সময়ের মাপ অনুভূমিক রেখায় নিম্নে দেখান হয়।

(৬) চিত্রের বিবরণ সংক্ষেপে অথচ সুস্পষ্টভাবে লিখিত হয়।

প্রভাতী

—শ্রীদীপঙ্কর বর্ণী

প্রভাতের রাগে রাঙিছে গগন—
কাটিছে রাতের অন্ধকার,
খুলে পুরবাসী, থেকো না মগন—
রেখো নাক আর বন্ধ দ্বার।
আঁধার-বিনাশি' যে-দেবতা আসে,
যাঁর পথ চেয়ে ফুলদল হাসে—
মুখরি কানন বিহগেরা সব
গাহে গান তাঁর বন্দনার ;
খুলে পুরবাসী, থেকো না মগন—
রেখ নাক আর বন্ধ দ্বার।

প্রভাত-আলোকে দাও আঁখি মাজি—
সব অবসাদ যাক্ মুছে,
নব জীবনের সুরু হোক্ আজি—
অতীত-কালিমা যাক্ ঘুচে।
বিপদ-পাথারে নাহি করি' ভয়
হও আগুয়ান—হবে শেষে জয়,
বেদনা-কমল আপনি ফুটিবে—
বহিবে বাতাস গন্ধ তার ;
খুলে পুরবাসী, থেকো না মগন—
রেখ নাক আর বন্ধ দ্বার।

চিত্র-চরিত্র

মাইকেল মধুসূদন

—শ্রীঅমিত রায়

মধুসূদনের বন্ধু-ভাগ্য অপরিমেয়, অন্য কোন লোক হইলে মাদ্রাজ হইতে ফিরিবার পরে, আট বৎসর দেশে অনুপস্থিত থাকিবার পরে, হঠাৎ দেশে ফিরিয়া বিপদে পড়িত, মধুসূদনকে সেই দুর্ভাগ্য হইতে বান্ধবেরা রক্ষা করিয়াছিল। শুধু তা-ই নয়, মধুকে চাকুরী সংগ্রহ করিয়া দিয়া তারা নিজেরা কৃতার্থ হইয়াছিল।

কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের অল্প দিনের মধ্যে তিনি পুলিশ আদালতের হেড-ক্লার্কের চাকুরী পাইলেন—কিশোরীচাঁদ মিত্র তখন পুলিশ আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট—উভয়ে বন্ধু।

মধু জানিতেন, তাঁর বন্ধুরাও জানিত, এ চাকরিতে তিনি কখনও স্থায়ীভাবে থাকিবেন না—এ যেন দুঃসময়ের একটা সাময়িক আশ্রয়। সিংহাসনে যার দাবী, তাকে নিম্নাসনে বসাইতে পারিলে লোকে কৃতার্থ হয়—সে-ও কিছু কৌতূহলে কিছু কৌতুকে কিছু বা কৃপামিশ্রিত অবজ্ঞায় সে-স্থান অধিকার করে। যোগ্যকে অযোগ্য আসন দিয়া মানুষ আনন্দ লাভ করে, যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের মিলন ঘটাইতে মানুষের তেমন আনন্দ নয়।

এই সময়ে মধুসূদন কিশোরীচাঁদের দমদমের বাগান-বাড়ীতে কিছুকাল ছিলেন, সেখানে সন্ধ্যাবেলা কিশোরী-চাঁদের অনেক বন্ধু আসিয়া বসিতেন, নানারকম গল্প-গুজব তর্ক আলোচনা চলিত—শেষে পান-ভোজন হইয়া সভান্ত ঘটিত।

সেখানে একদিন প্যারীচাঁদ মিত্র, বাংলা সাহিত্যের টেকচাঁদ ঠাকুরের সঙ্গে মধুর বাংলা ভাষা লইয়া তর্ক বাধিয়া উঠিল। মধু বলিলেন, এ আবার আপনি কি আরম্ভ করলেন! মুখের ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা করে তুলে সাহিত্যের মহিমা খর্ব করতে যাচ্ছেন! টেকচাঁদ বলিলেন, তুমি বাংলা ভাষার কি বুঝবে? তবে, জেনে রাখ, আমার প্রবর্তিত এই রচনা-পদ্ধতিই বাংলা ভাষায় নির্বিবাদে প্রচলিত এবং চিরস্থায়ী হবে।

মধুসূদন ভাষায় পোষাকী-খরণ তুলিয়া দিবার পক্ষপাতী ছিলেন না, ভাষার আটপৌরে ভাবের প্রশংসা শুনিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, সংস্কৃত থেকে যতদিন প্রচুর আমদানি না করছেন, ততদিন এ ভাষা মেছুনীদের ভাষা বই আর কিছু নয়।

তারপরে ভবিষ্যৎ-ভাষণের গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলিলেন, দেখবেন আমি যে ভাষার সৃষ্টি করব, তাই চিরস্থায়ী হবে।

উপস্থিত ভদ্রলোকেরা তাঁর এই উক্তিকে একটা মধুসূদনীয় পরিহাস বলিয়া মনে করিল, কারণ তখন তিনি এক ছত্রও বাংলা লেখেন নাই আর 'মাসিকপত্র' নামে কাগজে 'আলালের ঘরের দুলাল' ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে।

পুলিশ আদালতের কেরাণীপদে তাঁকে বেশি কাল থাকিতে হয় নাই, কিছুদিন পরে তিনি উক্ত আদালতের দোভাষীর পদটি পাইয়াছিলেন। তখন তিনি দমদমের বাগান-বাড়ী ছাড়িয়া ৬নং লোয়ার চিৎপুর রোডে উঠিয়া আসিলেন। এই বাড়ীতেই তাঁর অধিকাংশ কাব্য ও নাট্য লিখিত হয়।

দোভাষীর কাজ করিবার সময়ে মধুসূদন আইন অধ্যয়ন করিতে লাগিয়াছিলেন।

এই সময়ে পাইকপাড়ার রাজারা বেলগাছিয়ার নাট্যশালায় অভিনয়ের জন্য রামনারায়ণ তর্করত্নের রত্নাবলী নাটক নির্বাচন করেন। সে সময় এই সব অনুষ্ঠানে বড় বড় ইংরেজ কর্মচারীরা আহূত হইতেন—কাজেই তাঁদের হাতে দিবার জন্য রত্নাবলীর ইংরাজি অনুবাদ করার আবশ্যক হইল। মধুসূদন ভাল ইংরেজি লেখেন—পাইকপাড়ার রাজ-ভ্রাতৃদ্বয় ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ও প্রতাপ-চন্দ্র সিংহ জানিতেন, কাজেই তাঁরা গৌরদাসকে ধরিয়া মধুসূদনের উপরে এই ভার দিলেন। মধু যে কাজ

লইতেন, তাহাতে প্রাণ ঢালিয়া দিতেন, তিনি অল্প দিনের মধ্যে রত্নাবলীর অনুবাদ শেষ করিলেন, বলাবাহুল্য মধুসূদনের ইংরেজি অনবদ্য হইল। সাহেব-সুবো হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালী দর্শক ও পাঠক সকলে অনুবাদ পড়িয়া সন্তুষ্ট হইল—কিন্তু মধু খুশী হইলেন না।

তিনি অনুযোগের সুরে গৌরদাসকে বলিলেন, রাজারা একটা বাজে নাটকের জন্ত এত টাকা খরচ করছেন দেখে দুঃখ হয়। গৌরদাস উত্তর করিলেন, সে উত্তর ছাড়া নিরুত্তর হওয়া ভিন্ন উপায় ছিল না—কি করা যায় বল। বাংলার যে এর চেয়ে ভাল আর কিছু নেই!

তখন মধুসূদন কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন, ভাল নেই? আচ্ছা, আমি নাটক লিখব।

গৌরদাস তার চেয়েও বেশিক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন, ভালই! ইচ্ছা হইলে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পার।

মধুসূদন তার পরের দিন হইতেই সংস্কৃত ব্যাকরণ, অভিধান ও অন্যান্য কাব্য নাটক লইয়া বাংলা নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

শিক্ষিত বাঙালী মহলে রাষ্ট্র হইল সাহেব মধুসূদন বাঙ্গালা নাটক লিখিতেছেন! বন্ধুদের বিস্ময়, পণ্ডিতদের উপহাস ও পণ্ডিতমন্যদের অবজ্ঞার মধ্যে তিনি একটির পরে একটি অঙ্ক সমাপ্ত করিতে লাগিলেন।

নাটক লেখা শেষ হইলে পাইকপাড়ায় সভা-পণ্ডিত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের হাতে দেওয়া হইল—ঈশ্বরচন্দ্র বলিয়াছিলেন, যেখানে দোষ-ত্রুটী আছে মনে করেন, একটু দাগ দিয়ে রাখবেন।

কয়েকদিন পরে প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মধুসূদনের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, দাগ দিতে গেলে আর কিছু থাকবে না। তবে কি না আমি যে চোখে দেখছি, সে রকম চোখ আর গোটা দুই লোকের আছে; আমরা কজে হয়ে গেলে তোমার বই খুব চলে যাবে—বাহবা বাহবা পড়বে।

দুঃখের বিষয় প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের দল বাঙ্গালা সমালোচনার আসর হইতে আজিও একেবারে লুপ্ত হয় নাই, তবে তারা নাম-পরিচয় কিছু পরিবর্তন করিয়াছে, রচনা ভাল হইয়াছে বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিবার রীতি বাঙ্গালা দেশেই আছে। যে দেশে নাট্য-সাহিত্য মানে যাত্রার আসর, রঙ্গমঞ্চে যেখানে যুগপৎ সার্কাস ও ভেল্কি-বাজি চলে, সেখানে বলা বাহুল্য মধুসূদন অপ্রাসঙ্গিক।

তর্কবাগীশের দল যা-ই বলুন না কেন, ইংরাজি-শিক্ষিত বাঙালীর দল মধুসূদনের নাটক শর্ম্মিষ্ঠাকে আদর অভ্যর্থনা করিয়া লইল, তারা কুলীনকুলসর্ব্বস্ব ও রত্নাবলীর অন্ধকূপ হইতে বাহিরে আসিয়া শর্ম্মিষ্ঠার কল্পনামুখী মুক্ত বাতায়নে হাঁফ ছাড়িবার সুযোগ পাইল। অত্যন্ত উৎসাহে শর্ম্মিষ্ঠার রিহার্সাল চলিতে লাগিল এবং অবশেষে একদিন ১৮৫৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর আড়ম্বর করিয়া বেলগাছিয়ার নাট্য-শালায় শর্ম্মিষ্ঠার প্রথম অভিনয় হইয়া গেল।

সেকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালীরা শর্ম্মিষ্ঠাকে শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালা নাটক বলিয়া ঘোষণা করিল—ইহাতে এইটুকু ছাড়া আপত্তির কিছু নাই যে, শর্ম্মিষ্ঠাই সেকালের একমাত্র নাটক ছিল।

মধুসূদন শর্ম্মিষ্ঠার প্রারম্ভে একটি কবিতা লিখিয়া জুড়িয়া দিয়াছিলেন; মধুসূদনকে এ পর্য্যন্ত কেহ ঋষি বলে নাই—কিন্তু বাংলা নাটকের ভবিষ্যৎ আলোচনা করিলে, এই কবিতাটিতে তাঁর ঋষি-দৃষ্টি প্রকাশিত হইয়াছে।

মরি হায়, কোথা সে সুখের সময়।
যে সময়, দেশময়, নাট্যরস সবিশেষ ছিল রসময়।
শুন গো ভারতভূমি, কত নিদ্রা যাবে তুমি,
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ, ত্যজ ঘুমঘোর, হইল হইল ভোর
দিনকর প্রাচীতে উদয়।
কোথায় বাল্মীকি, ব্যাস কোথা তব কালিদাস
কোথা ভবভূতি মহোদয়।
অলীক কু-নাট্য রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।
সুধারস অনাদরে, বিষবারি পান করে
তাহে হয় তনু, মনঃ ক্ষয়
মধু কহে, জাগো মা গো, বিভু স্থানে এই মাগো
সুরসে প্রবৃত্ত হোক তব তনয় নিচয়।

মধুসূদন ও দীনবন্ধু একবার বঙ্গীয় নাট্য-সরস্বতীর পায়ে সুড়সুড়ি দিয়া অকালে নিদ্রাভঙ্গ করিতে চেষ্টা

করিয়াছিলেন, কিন্তু তারপরে ভক্তিরস ও ভাঁড়ামিতে বিরক্ত হইয়া, তিনি পাশ ফিরিয়া শুইয়াছেন। শীঘ্র আর জাগিতেছেন না। আদৌ জীবিত আছেন কি ?

[২]

বাঘে একবার মানুষের রক্ত আস্বাদ করিয়াছে—আর সে কি নিরস্ত হয়! শর্মিষ্ঠার জয়মাল্য কণ্ঠে শুকাইতে দিবার লোক মধুসূদন ছিলেন না, তিনি নূতন নূতন উদ্যমে প্রতিভাকে চালিত করিতে আরম্ভ করিলেন।

শর্মিষ্ঠার রিহার্সাল চলিতেছে, ঈশ্বরচন্দ্র মধুকে একটা ফার্স লিখিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, মধুসূদন যেন প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন; তিনি অল্পদিনের মধ্যে 'একেই কি বলে সভ্যতা' লিখিয়া ফেলিলেন। প্রতিভার গতি নিয়মতন্ত্র মানে না; একখানা ফার্স লিখিয়া মধুসূদন থামিলেন না—আরও একখানা লিখিয়া বসিলেন—'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া'।

বোধহয়, প্রথমখানার মধ্যেই দ্বিতীয়খানার সূচনা ছিল; 'একেই কি বলে সভ্যতা'র ইংরেজের অনুকারী নব্য বাঙ্গালীর প্রতি বিদ্রূপ ছিল, কিন্তু ইহা তো কেবল বাঙ্গালী সমাজের চিত্রপটের অর্দ্ধেক, কাজেই 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া' লিখিয়া সেই চিত্রপটকে তিনি সম্পূর্ণ করিলেন;—প্রাচীনপন্থীদের মধ্যে সামাজিক শিথিলতা ছিল, তার উপরেও লেখকের বিদ্রূপ বর্ষিত হইল; মাইকেল নিরপেক্ষভাবে দুই হাতে দুই জনকে আঘাত করিয়াছেন - তিনিই প্রকৃত সব্যসাচী।

এই অল্প কালের মধ্যে একখানা নাটক ও দুইখানা ফার্স লিখিয়া ফেলিয়াও ও মধুসূদনের প্রতিভার ক্লান্তি ছিল না—সে নবজাত গরুড়ের মত নিত্য নূতন খাদ্যের অনুসন্ধান করিতে লাগিল; মধুসূদন তাঁর চতুর্থ নাটক পদ্মাবতী আরম্ভ করিলেন।

পদ্মাবতীর কাহিনী অংশ মূলতঃ গ্রীক; এই গ্রীক উপাখ্যানকে যতদূর ভারতীয় পরিচ্ছদ দেওয়া সম্ভব, তাহা হইয়াছে। দুটি কারণে পদ্মাবতী নাটক মধু-প্রতিভার পতাকী স্থান; প্রথমতঃ তিনি এই নাটকেই প্রথম কয়েক ছত্র অমিত্রছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন, দ্বিতীয়তঃ, পরবর্ত্তী সমস্ত নাট্যে ও কাব্যে ভারতীয় ও ইউরোপীয় কাব্যধারার যে সংমিশ্রণ তিনি করিয়াছেন, তার সূত্রপাতও ইহাতে। বাহ্যদৃষ্টিতে পদ্মাবতীকে খাটি ভারতীয় ধরণের নাটক মনে হইলেও ইহার মূল ভিত্তি গ্রীক।

চারখানা নাটক লেখা হইল—বাংলা সাহিত্যে নাটকের অভাব কিছু পূর্ণ হইল, কিন্তু নাটকের অভাব পূরণ করিতে গিয়া মধুসূদন নিজের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিকে ও শক্তির কেন্দ্রকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। তিনি বুঝিলেন অমিত্র ছন্দ ছাড়া শ্রেষ্ঠ নাট্য রচনা সম্ভব নয়; নাটকের মাধ্যমস্বরূপ অমিত্র ছন্দ আবিষ্কার করিতে গিয়া নাট্যকার মধুসূদন কবি মধুসূদন হইয়া পড়িলেন—মধুসূদনের, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আর একটা যুগান্তকারী মোড় ফিরিয়া গেল।

কংগ্রেসী স্বরাজ

...যতদিন পর্য্যন্ত স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করা কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল এবং ঐ উদ্দেশ্য লাভ করিবার জন্য আবেদন নিবেদন করাই পন্থা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, ততদিন পর্য্যন্ত দেশের প্রকৃত অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নাই। কেবল মাত্র দেখা গিয়াছে যে, দেশ সম্বন্ধে দেশীয় লোকের একটা কর্ত্তব্য আছে, এই বোধটি জাগ্রত হইতেছিল।

স্বরাজ লাভ করা যখন কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হয় এবং তদর্থে যখন নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ প্রভৃতি পন্থা অবলম্বিত হয়, তখনই প্রথম দেখা গিয়াছে যে, দেশীয় লোকের মধ্যে যাহাতে অনৈক্য হয়, তাহার ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইয়াছে এবং দেশের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের দল এবং দলাদলির একটার পর একটার উদ্ভব হইয়াছে।

অসহযোগ এবং আইন-অমান্য নীতি অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে দলাদলির প্রকটতা এবং সংখ্যা ক্রমশই বাড়িয়া গিয়াছে এবং [illegible] অসংখ্য দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে এমন কি ভারতীয় কংগ্রেসের অস্তিত্ব নামে মাত্র থাকিলেও কার্যতঃ তাহার কোন অস্তিত্ব নাই, ইহা পর্য্যন্ত যুক্তিযুক্ত ভাবে বলা যাইতে পারে।...

ইতালির ইতিহাসে প্রাক্-ফাসিস্ত যুগ

—শ্রীইতিহাস-পাঠক

য়ুরোপের আন্তর্জাতিক রঙ্গমঞ্চে যে মহানাট্যের অভিনয় সুরু হইয়াছে, তাহার একটি শ্রেষ্ঠ ভূমিকার অভিনেতা হইতেছেন ইতালির রাষ্ট্রের কর্ণধার স্বনামখ্যাত মুসোলিনী (মুস্‌সোলিনী, Mussolini)। এই অদ্ভুতকর্ম্মা পুরুষের মতবাদ ও কর্ম্মপন্থা য়ুরোপের রাষ্ট্রীয় জগতে এক অভিনব আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছে। কাজেই তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে জানিবার ঔৎসুক্য খুব স্বাভাবিক। কিন্তু মুসোলিনির মত যে সকল জাতীয় বড়লোকের, এমন কি সমগ্র জাতির চিন্তা ও কর্ম্মের নিয়ামক, তাঁহাদিগকে বুঝিতে ও জানিতে হইলে শুধু তাঁহাদের ব্যক্তিগত ইতিহাসই পর্য্যাপ্ত নহে। পরন্তু যে অনুবর্ত্তী দেশ-কালের ইতিহাস তাহাদিগকে গড়িয়া তুলিবার সাহায্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে করিয়াছে। তাহা ভাল করিয়া জানা প্রয়োজন। অতএব, বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

ইতালি বহুশতাব্দী যাবৎ ভূতপূর্ব্ব অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী সাম্রাজ্যের পদানত ও নিষ্পেষিত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সমষ্টিমাত্র ছিল। এই সব রাষ্ট্রের মধ্যে ধর্ম্মগত ও বংশগত (racial) বিরোধ না থাকিলেও স্বার্থগত বিরোধ লাগিয়াই ছিল; তাহার ফলে তাহারা অষ্ট্রিয়ার অসহ্য অত্যাচারেও ঐক্যবদ্ধ হইয়া স্বাধীন ইতালি রাষ্ট্র গড়িবার চেষ্টা করিতে পারে নাই। পরাধীন, পরপদদলিত ইতালিয়েরা তখন পূর্ব্ব-পুরুষ-কৃত সুপ্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের অসীম গৌরবের কথা ভাবিয়া সেই আত্মপ্রসাদের জোরে নিজেদের বিকৃত জীবন বহন করিত। এই শোচনীয় দশা হইতে তাহাকে উদ্ধার করিলেন তিন মহাপুরুষ:— ম্যাটসিনী (=মাৎসিনি Mazzini), গ্যারিবল্ডি (=গারিবল্‌দি Garibaldi) ও ক্যাভূর (=কাভুর Cavour). এই মহাপুরুষত্রয়ের জীবনী ও কার্য্য-কলাপ আলোচনা এই প্রবন্ধের ক্ষুদ্র কলেবরে সম্ভবপর নহে। আর তাহার কোন রূপ প্রয়োজনও নাই, কারণ, আমাদের দেশের নর-নারীর নিকট তাঁহাদের জীবনী অনেকেরই সুপরিচিত।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসী ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে যুদ্ধের ফলে ফরাসীর পক্ষাশ্রিত ইতালীয় রাষ্ট্র স্যার্দিনিয়া ইতালির ঐক্য-বিধানের ভিত্তি পত্তন করিতে সক্ষম হইল। তাহার ফলে অচিরকাল মধ্যে এক রোম এবং অষ্ট্রিয়ার অধীন ভিনিস (Venice) ব্যতীত সমগ্র ইতালীয় ঐক্যবন্ধন ও স্বাধীনতা প্রাপ্তি ঘটল। পরে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ভিনিস ইতালির দখলে আসিল, অষ্ট্রিয়া-জার্ম্মানীর যুদ্ধের ফলে ইতালির ঐক্যবিধান সম্পূর্ণ হইল ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ২০শে সোমবার তারিখে। এইদিন ইতালির রাষ্ট্র পোপের হস্ত হইতে রোম ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী রাষ্ট্র কাড়িয়া লইল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের শেষাংশ হইতে নবযুগের আরম্ভ।

এই নবযুগের আরম্ভ হইতেই ইতালি প্রাচীন রোম-সাম্রাজ্যের গৌরবের কথা ভাবিয়া ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বপ্ন দেখিতে সুরু করিল, কিন্তু তখনও য়ুরোপীয় আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রীয়মণ্ডলে ইতালি একটি নগণ্য শক্তি এবং ফরাসী জাতির আক্রমণ-ভয়ে ভীত। এই ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সে জার্ম্মানীর শরণাপন্ন হইল। সুপ্রসিদ্ধ প্রিন্স বিসমার্ক (Bismark) তখন জার্ম্মান সাম্রাজ্যের কর্ণধার। তিনি তখন ফ্রান্সকে য়ুরোপে একঘরে করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। জার্ম্মানী ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে যে দ্বৈতসন্ধি (dual alliance) হইয়াছিল, তাহা অচিরে (১৮৮২ খৃঃ) ত্রৈত সন্ধিতে (triple alliance-এ) পরিণত হইল। ইতালি, জার্ম্মানী ও অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে মিত্রতা-বন্ধনে বদ্ধ হইল। সর্ত্ত হইল, ফ্রান্স যদি ইতালিকে আক্রমণ করে, তবে অপর রাষ্ট্রদ্বয় তাহাকে রক্ষা করিবে। ইতালিকেও মিত্র-রাষ্ট্রদ্বয়কে ঐরূপ অবস্থায় সাহায্য করিতে হইবে। এ ছাড়া আরও সর্ত্ত ছিল, কিন্তু সবই মাত্র পাঁচ বছরের জন্য। ঐ সময় গত হইলে পর ইতালির ফরাসী-ভীতি অনেকটা কমিয়া গেল। তখন ইতালি আর ঐ সর্ত্তে সন্ধি রাখিতে রাজী হইল না। তখন সে বন্ধুত্বের জন্য এমন মূল্য দাবী করিল, যাহা জার্ম্মানী সহজে দান করিতে পারে না। ফলে বিগত মহাযুদ্ধের সময় ইতালি ত্রিশক্তিসন্ধির পক্ষে

এবং জার্মানী-অষ্ট্রিয়ার বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল। রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বন্ধুত্বের অবস্থা এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। আর স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াই ইতালি তাহার আর্থিক ও অন্যান্য দৈন্য ভাল করিয়া উপলব্ধি করিল। এই দৈন্য দূর করিবার জন্য যে, সে যে কোন প্রকারে চেষ্টা করিবে, তাহাতে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নাই। ইতালি যখন সাম্রাজ্য গঠন করিয়া প্রাচীন রোমের উত্তরাধিকারিসুলভ অভিযান চরিতার্থ করিবার উদ্যোগ করিল, তাহার আগেই আশে পাশের সাম্রাজ্য-স্থাপনের উপযুক্ত দেশগুলি ইংরাজ বা ফরাসী কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। আর ইতালির আর্থিক বা সামরিক-শক্তিও তখন সাম্রাজ্য-স্থাপনের অনুকূল ছিল না। কাজেই ফরাসীরা যখন ইতালির চোখের সামনে উত্তর-আফ্রিকার তুনীস (Tunis) দখল করিল, তখন তাহাকে বাধ্য হইয়া চুপচাপ থাকিতে হইল এবং দীর্ঘদিন পরে ত্রিপোলী অধিকার করিয়া ইতালি সেই ক্ষোভ মিটাইয়াছিল। কিন্তু ত্রিপোলী বিশেষ লাভজনক রাজ্য নহে। তবে ইতালি ইরিত্রিয়া এবং সোমালিলাণ্ড নামক লোহিত সাগরের উপকূলবর্ত্তী দুই টুকরা দেশও দখল করিয়াছিল। সোমালিল্যাণ্ডে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ পূর্ব্ব-আফ্রিকার কিয়দংশও যুক্ত হইয়াছিল।

কিন্তু ইতালী এই সাম্রাজ্যে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে নাই। তাহার প্রধান লোভ ছিল আবিসিনিয়ার উপর। ঐ দেশ পর্ব্বতময় এবং ইহা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী শ্বেত-মিশ্রিত এক কৃষ্ণকায় জাতি দ্বারা অধ্যুষিত। তাহাদের সামরিক যোগ্যতাও মন্দ ছিল না। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ইতালিয়ানরা আবিসিনিয়া আক্রমণ করিলে হাবসীরা আদোয়ার যুদ্ধে তাহাদিগকে হারাইয়া দিল। যুদ্ধান্তে ইতালি আবিসিনিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া সন্ধি করিল। যদিও আবিসিনিয়ার সহিত যুদ্ধে ইতালি একবার পরাজিত হয়, পশ্চিম য়ুরোপে সে ক্রমে ক্রমে ফ্রান্স এবং ব্রিটেনের নিকট-বর্ত্তী আসনে বসিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতেছিল। তাহার লোকবল, ক্রম-বর্দ্ধমান জলযুদ্ধ ও স্থলযুদ্ধের আয়োজন, তাহার ঐতিহাসিক গৌরব এবং শক্তিমান রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব, এই কয়েকটি বিষয়ের জন্যই ইতালির পক্ষে য়ুরোপীয় মহাশক্তি-নিচয়ের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হওয়া সম্ভবপর হইয়াছিল।

কিন্তু ইতালীর প্রচুর ও বিচিত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য থাকিলেও ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্ম্মানী ও যুনাইটেড ষ্টেটের তুলনায় উহার খনিজ সম্পদ কম এবং রুশিয়ার তুলনায় উহার কৃষিযোগ্য ভূমির অভাব। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পরে একমাত্র ইতালীরই এমন অত্যধিক লোক-সংখ্যা ছিল, কৃষিকার্য্য অথবা শিল্প-প্রতিষ্ঠার দ্বারা যাহার পোষণ দুঃসাধ্য। তাহার ফলে জন্মহারের উচ্চতা বশতঃ ইতালির বহু লোককে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ আমেরিকার প্রবাসী হইতে হইয়াছিল।

মোটের উপর নবাভ্যুদিত স্বাধীন ইতালীর পক্ষে দারিদ্র্য একটি ভয়ানক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। এই দারিদ্র্য আরও বর্দ্ধিত হইল স্থল ও জলযুদ্ধের জন্য সরকারী আয়োজন-উদ্যমের সিদ্ধান্তে। আফ্রিকায় উপনিবেশ-স্থাপনের জন্য সৈন্য ও নৌ-বাহিনী গড়িবার চেষ্টা এবং দেশময় সংস্কারের আয়োজনে করভার বাড়িয়া গেল। তাহার উপর বহুশতাব্দী যাবৎ মৃতকল্প জীবনযাপন বশতঃ ইতালিবাসীর চরিত্রের শোচনীয় অধঃপতন ঘটিয়াছিল। তাহার ফলেও দেশময় অশান্তি বর্ত্তমান ছিল। দক্ষিণ-ইতালিতে বৃহৎ বৃহৎ জমিদারীর অধীন ভূমি নিতান্ত শিথিল ভাবে চাষবাস করা হইত এবং অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর ছিল। দাঙ্গা-হাঙ্গামা, দস্যুতা, পরসম্পত্তি লুণ্ঠন এবং প্রতিহিংসা গ্রহণ কেবল যে সর্ব্বত্র দেখা যাইত তাহা নহে, জন-সাধারণেও সেই সকল সমর্থন করিত।

ইতালির এই দুর্দ্দশার উপরে অন্য সঙ্কট ছিল পোপের সহিত ইতালির রাষ্ট্রের বিরোধ। পোপ ছিলেন দেশময় প্রচলিত রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মের গুরু। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের তিনি কিছুতেই ইতালির রাষ্ট্রকে বৈধ বলিয়া স্বীকার করেন নাই পূর্ব্বে। ঐ সালে মুসোলিনী ৭০ বৎসর ব্যাপী দ্বন্দ্বের অবসান করিলেন পোপের সঙ্গে সন্ধি করিয়া। পোপের প্রতি ভক্তিবশতঃ ইতঃপূর্ব্বে অনেক যোগ্য ইতালিয় ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে উদাসীন থাকিতে বাধ্য হইত। এই পোপের ভয়েই তিনি জার্ম্মানীর সঙ্গে সন্ধি বন্ধন করিয়াছিলেন, পাছে ক্যাথলিক রাষ্ট্রগুলির কেহ, ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া অথবা তদ্রূপ অন্য কোন রাষ্ট্র পোপের পক্ষ লইয়া ইতালিকে আক্রমণ করে।

ইতালির আভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং লোক-চরিত্র নিয়ন্-

শাসনের অনুকূল না হইলেও স্বনামখ্যাত কাভুর মৃত্যুকালে এই মহতী বাণী রাখিয়া গিয়াছিলেন যে, যেন 'সামরিক শাসন' (martial law) প্রবর্ত্তন না করা হয় এবং জনসাধারণকে ধীরে ধীরে স্বাধীনতার শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু সাধারণ ইতালিয়েরা সাধারণ ফরাসীদের মত নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিল না। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তাহারা বিশেষ কৌতূহল রাখিত না। কাজে কাজেই রাষ্ট্রশাসন দল বিশেষের নেতৃগণের খেলার বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে একজন মাত্র রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ খ্যাতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিলেন। তাঁহার নাম ফ্রানসেস্কো ক্রিস্‌পি (Francesco Crispi)। তিনি জার্ম্মানীর সঙ্গে সন্ধি-বন্ধন এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

ইতালি কর্তৃক আবিসিনিয়া-বিজয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হইলে ক্রিস্‌পির মন্ত্রিত্বের পতন হইল। তখন ইতালিয় সরকার দেশময় দারিদ্র্য, বহুলোকের দেশত্যাগ (emigration) শুরু করভার এবং বিপ্লবী অসন্তোষের দিক মন দিলেন।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে ইতালির রাজা একজন ইতালিয় এনার্কিষ্টের হাতে নিহত হইলেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর গোড়া হইতে ইতালির অবস্থা ভাল হইতে সুরু হইল।

উত্তরাঞ্চলে মিলান শহরের আশে-পাশে জলের শক্তিতে শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ চলিতে লাগিল। কয়লার অভাবে কষ্ট রহিল না। জাতীয় ধন-সম্পদ্ উন্নততর হইল। এই অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক রাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে আবার নূতন এবং মারাত্মক উদ্যম লক্ষিত হইল। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ইতালি ত্রিপোলী অধিকারের জন্য তুর্কীর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইল এবং পর বৎসরে কেবল ত্রিপোলী নয়, পরন্তু এশিয়া মাইনরের উপকূলবর্ত্তী দোদেকানেজ দ্বীপপুঞ্জও দখল করিয়া বসিল। মহাযুদ্ধের প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত ত্রৈত-সন্ধি (triple alliance) বজায় ছিল; ইতালি ত্রৈত বন্ধুত্বের (triple entente) সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর হইবার ফিকির খুঁজিতে লাগিল। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ইতালি এই সর্ত্তে ফ্রান্সের সহিত গোপনে মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হইল যে, যদি তৃতীয় পক্ষ বিনা কারণে ফ্রান্সকে আক্রমণ করে, ইতালি তবে আক্রমণকারীকে সাহায্য করিবে না। যদিও আক্রমণকারীর কোন নাম উল্লিখিত ছিল না, তবু জার্ম্মানীকেই যে লক্ষ্য করা হইয়াছিল, তাহা সুস্পষ্ট। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ইতালি রুশিয়ার সহিতও এক গোপন সন্ধি করিল এই সর্ত্তে যে, ত্রিপোলির ব্যাপারে রুশিয়া ইতালির সাহায্য করিবে, আর বস্‌ফোরস প্রণালীর অধিকার ব্যাপারে ইতালি রুশিয়ার সাহায্য করিবে।

এই সকল ঘটনার পরে বিগত মহাযুদ্ধের সময় ইতালি বেশ সুস্পষ্টভাবে জার্ম্মানী ও অষ্ট্রিয়ার পক্ষ ত্যাগ করিল। তবে এই পক্ষ ত্যাগ করিবার বদলে ব্রিটিশ ও ফরাসী মিত্রপক্ষ যে পর্য্যন্ত না উপযুক্ত দাম দিতে স্বীকার হইয়াছিল, সে পর্য্যন্ত ইতালী মহাযুদ্ধে নিরপেক্ষ ছিল। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল মিত্রপক্ষের সহিত ইতালি এই সন্ধি করিল যে, নিম্নলিখিত সর্ত্তে সে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে:— যুদ্ধে জয়লাভ হইলে উত্তর-ইতালির অষ্ট্রিয়ার অধীনস্থ অংশ-সমূহ ফিরিয়া পাইবে। আড্রিয়াতিক সাগরের উপকূলস্থ কতিপয় ভূভাগ ও দ্বীপপুঞ্জ, উত্তর দালমাতিয়া (northern Dalmatia), আলবেনিয়ার বলোনা (Valona) বন্দর ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী দেশ ইতালির ভাগে পড়িবে, ইত্যাদি।

উল্লিখিত সন্ধির পরে ইতালি প্রথমে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। এই সেই অষ্ট্রিয়া, যে অষ্ট্রিয়ার দাসত্বে ইতালিয়ানরা বহু শতাব্দী যাবৎ বদ্ধ ছিল। তারপরে জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হইল। অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর ১৯১৬ অব্দে যখন অষ্ট্রিয়ার পাল্টা আক্রমণ সুরু হইল, তখন ইতালি দ্রুত হারিতে লাগিল এবং অষ্ট্রিয়ার সৈন্য প্রায় ভিনিস উপত্যকায় আসিয়া উপস্থিত হইল। যদি ইতিমধ্যে রুশিয়া অষ্ট্রিয়াকে বিব্রত না করিয়া তুলিত, তাহা হইলে ইতালির অবস্থা সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইত। এইরূপ ঘটনাচক্রের ফলে ইতালিয়দের মধ্যে যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে মতভেদ দেখা দিল। ইতালির সামরিক পরিস্থিতি বড়ই বিপদসঙ্কুল হইয়া দাঁড়াইল। কারখানার সহরগুলিতে রুটির জন্য দাঙ্গা সুরু হইল। রণক্ষেত্রে অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ মাথা তুলিবার চেষ্টা করিল, বিপ্লববাদীদের মধ্যে নব-প্রচলিত বলশেভিজ্‌মের বাণী লইয়া কাণাঘুষা চলিতে লাগিল। ইহার মধ্যে যুদ্ধ-ব্যাপৃত সৈন্যমহলের মধ্যে এই গুজব রটিল যে, দেশের অসামরিক নর-নারীরা খাদ্যাভাবে কষ্ট পাইতেছে এবং এই সকল ঘটনায়

যুদ্ধলিপ্ত সৈন্যদের প্রতাপ অনেক মন্দীভূত হইয়া গেল। এই সুযোগে জার্ম্মানী ইতালি আক্রমণ করিবার মতলব করিল এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে জার্ম্মান সেনাবাহিনী প্রচণ্ডবেগে ইতালিয়গণকে আক্রমণ করিয়া কাপোরেত্তো (Caporetto) নামক স্থানে ভয়ানক ভাবে হারাইয়া দিল। পরাজিত ইতালীয় সৈন্যদল পশ্চাদ্ধাবন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইল। কিন্তু ১৯১৮ অব্দে অন্তর্বিপ্লবে ও অন্যান্য কারণে জার্ম্মানী ও অষ্ট্রীয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় ইতালি আবার নিজেদের দেশের শত্রু-অধিকৃত অঞ্চল পুনরাধিকার করিতে পারিল। কিন্তু নূতন কোন ভূমি ইতালির দখলে আসিল না।

সে যাহাই হৌক, মহাযুদ্ধে ইতালি বিজয়-গৌরবের অংশীদার বলিয়া গণ্য হইল, কিন্তু এই গৌরব জাতির পক্ষে সন্তোষজনক হইল না। ইতালির একটি সংখ্যালঘিষ্ঠ দল যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে বাধা দিয়াছিল এবং রীতিমত যুদ্ধকার্য্য চালাইয়া আসিলেও ইতালি যুদ্ধের ব্যাপারে কতকটা দোমনা ছিল। ইতালির জনসাধারণের কাছে যুদ্ধ অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সহিত তাহার ঘরোয়া বিবাদ মাত্র ছিল। এই বিবাদের কারণ ছিল আড্রিয়াতিক সাগরের প্রভুত্ব। শান্তিস্থাপনের বৈঠকে ইতালি কেবল তাহার নিজস্ব ভূমিলাভ ব্যাপারেই বেশী উদ্যম দেখাইয়াছিল এবং শান্তিস্থাপনের প্রধান দিক্‌গুলি ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। কিন্তু নিজ স্বার্থের ব্যাপারেও ইতালির রাষ্ট্র-ধুরন্ধরেরা খুব বেশী কৃতকার্য্যতা দেখাইতে পারেন নাই। ইতালি কেবলমাত্র ব্রেনার গিরি-সঙ্কট পর্য্যন্ত নিজ অধিকার বিস্তৃত করিতে পারিল। তাহাতে দক্ষিণ তীরল (Tirol) ইতালির দখলে আসিল। ইহা দ্বারা ট্রিষ্ট (Trieste), পোলা (Pola) এবং অন্য কয়েকটি স্থানও ইতালির হাতে আসিল। যুদ্ধে ইতালির একমাত্র লাভ হইল বহুদিনের শত্রু অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যের পরাজয় ও পতন। অষ্ট্রিয়া বা অন্য কোন স্থানে ইতালিয়-দের কোন মুরব্বিয়ানা (protectorate) প্রতিষ্ঠিত হইল না। এমন কি নিকটবর্ত্তী আলবেনিয়া রাষ্ট্রের উপরও তাহারা কোন খবরদারি করিবার অধিকার পাইল না। মোটের উপর, যুদ্ধকালে ইতালিতে যে জাতীয় উৎসাহের ভাব জাগ্রত হইয়াছিল, তাহা অন্যান্য দেশেরই নিষ্ফল স্বপ্নের মত মিলাইয়া গেল। কিন্তু ইতালির এই অবস্থার সঙ্গে অন্যান্য বিজয়ী দেশের এই পার্থক্য ছিল যে, ইতালির স্বপ্ন নিষ্ফল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা মনস্তাপ মিশ্রিত ছিল।

দেশপ্রেমিক ইতালিয়রা বলাবলি করিতে লাগিলেন, "আমরা যুদ্ধজয়ের ফলে ৯ হাজার বর্গ মাইল ভূমি ও ১৬ লক্ষ ইতালিয় ভাইকে রাষ্ট্রের অঙ্গীভূত করিতে পারিয়াছি, কিন্তু তাহার জন্য ৬ লক্ষ প্রাণ বলিদান দিতে ও সমগ্র দেশকে দারিদ্র্যে এবং ঋণভারে প্রপীড়িত করিতে হইয়াছে। সমগ্র ইতালির স্বাধীনতা ব্যাপারেও এত প্রাণনাশ ও অর্থব্যয় প্রয়োজন হয় নাই। অথচ ইংরেজ ও ফরাসীরা জার্ম্মান উপনিবেশগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র জগতের আর্থিক ব্যাপারে সর্ব্বোচ্চ স্থান দখল করিয়াছে। পোলাণ্ড এবং চেকোশ্লোভাকিয়াতে ইতালির চেয়ে অনেক বেশীসংখ্যক সংখ্যালঘিষ্ঠ অন্য জাতীয় লোক থাকিলেও এই দুইটি রাষ্ট্র নূতন ভাবে গঠিত হইয়াছে। যুগোশ্লাভিয়া এবং রুমানিয়া তাহাদের ভূমি ও লোকসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণিত করিয়াছে। ইহা বেশ সুস্পষ্ট যে, যুদ্ধকালে আমরা বন্ধু পাওয়ার বদলে কেবল প্রতিদ্বন্দ্বী লাভ করিয়াছি মাত্র এবং ইহাও সুস্পষ্ট যে, আমাদের গবর্ণমেণ্ট দুর্ব্বলতা ও মেরুদণ্ডহীনতা দেখাইয়াছেন এবং আমাদের 'হক্' পাওনা আদায় করিতে পারেন নাই। এক প্রবলতর উৎসাহময় জাতীয়তার জন্য আমরা কাহার পানে তাকাইব ?"

অপর ইতালিয়েরা কিন্তু মহাযুদ্ধের নিষ্ফলতা এবং ইতালির মিত্রবর্গের অকৃতজ্ঞতার কথা না ভাবিয়া সমস্ত যুদ্ধের নিষ্ফলতা এবং ধনতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদকেই বিশেষ ভাবে দায়ী করিলেন। সমাজতন্ত্রবাদী (socialists) ও সাম্যবাদী (communist) দলের লোকেরা পরস্পর-বিরোধী হইলেও অসন্তুষ্ট শ্রমিকগণের মধ্যে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতে লাগিল। তাহারা কেবল সভা-সমিতি ও খবরের কাগজের আন্দোলনেই সন্তুষ্ট রহিল না। পরন্তু ভয়ানক ক্ষতিজনক প্রচুর রাজনৈতিক ধর্ম্মঘট দ্বারা দেশকে আলোড়িত করিয়া তুলিল। যে-হেতু কোন জজ ফৌজদারী আইনে কোন রেলওয়ে শ্রমিককে দণ্ডদান করিয়াছেন, সেই হেতু যে-ট্রেনে তিনি ভ্রমণ করিতে-

ছেন, সেই ট্রেন আটকা পড়িল। নাবিক, ডক-শ্রমিক, সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনীয় কাজের শ্রমিক, ইহারা সকলে মিলিয়া সমস্ত লোক-চলাচল অসম্ভব করিয়া তুলিল। ভ্রমণকারীর দল এইরূপ বহুসংখ্যক ও অপ্রত্যাশিত ধর্ম্মঘটের ব্যাপার দেখিয়া ইতালি ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিলেন। দক্ষিণ-ইতালীর চাষীগণ ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিল।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে উত্তর-ইতালীর শিল্প-উৎপাদনের সহরগুলিতে ধাতুদ্রব্যের শ্রমিকরা কারখানাগুলি দখল করিয়া নিজেরাই সেগুলিকে চালাইতে আরম্ভ করিল। দেশের গভর্ণমেণ্ট এই সব ব্যাপারে বাধা না দিয়া আন্দোলনকে নিজে নিজে নির্ব্বাপিত হওয়ার সুযোগ দিলেন। যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগত লোকেরা আক্রান্ত ও প্রহৃত হইতে লাগিলেন। শান্তিবাদীরা চারিদিকে এক আশ্চর্য্য দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও অশান্তির সৃষ্টি করিল। কোন কোন ক্ষেত্রে টাউনহলের উপর লাল নিশান উড়াইল। টাকা-পয়সা ও ভূসম্পত্তির মালিকেরা ভীষণ ভাবে আতঙ্কগ্রস্ত হইলেন এবং যে-দলই তাঁহাদিগকে শান্তিতে ও নিরাপদে থাকিতে দেওয়ার আশা দিল, তাহারা সেই দলেই যোগদান করিতে ইচ্ছুক হইলেন।

রক্ষণশীল ব্যক্তিরা বৃথাই গবর্ণমেণ্টের মুখের দিকে তাকাইলেন। সমস্ত দলের লোকেরাই গবর্ণমেণ্টকে দোষ দিতে লাগিল, কিন্তু তাহাদের পরস্পর দলাদলির ফলেই গবর্ণমেণ্ট দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। পর পর বিভিন্ন মন্ত্রি-দল অশান্তি নিবারণে ভয় পাইলেন, যেহেতু কঠোর ভাবে বিপ্লব দমন করিতে গেলে তাঁহাদের দল লোকের অপ্রীতি-ভাজন হইবে। কাজেই তাঁহারাও অশান্তির অগ্নি স্বতঃ নিভিবার অপেক্ষায় রহিলেন। কারণ অশান্তি নিবারণার্থে উৎপীড় করিতে গেলে উহা বিপ্লবের আকার ধারণ করে।

কিন্তু এত সাবধানতার ফলেও একই মন্ত্রিমণ্ডল বহুদিন টিকিয়া থাকিতে পারিল না। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পাঁচ জন প্রধান মন্ত্রী পর পর ইতালির শাসনকার্য্যের ভার পাইলেন, কিন্তু কেহই দেশে শান্তিস্থাপনের সুবিধা করিতে পারিলেন না।

ইতালির যখন এরূপ নৈরাশ্যজনক অবস্থা, তখন তাহার রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চে এক নূতন অভিনেতার উদয় হইল। ইঁহারই নাম বেনিতো মুসোলিনী। ইনি কেবল ইতালিতে নয়, য়ুরোপে এক নবযুগ আনয়ন করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা প্রবন্ধান্তরে বর্ত্তমান ইতালি এবং এই পুরুষসিংহের কার্য্যকলাপ আলোচনা করিব।

কঃ পন্থা

...টল্‌ষ্টয়, লেনিন, কার্ল মার্কস্, হেনরি জর্জ, হিটলার যে অসাধারণ লোক, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই এবং সার্ব্বজনীন দুরবস্থাবশতঃ তাঁহারা যে প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত হইয়া বহুবিধ লোকহিতকর পন্থার উপদেশ দিয়াছেন, তাহাও নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু, কাহারও নির্ব্বাচিত পন্থা যে সর্ব্বতোভাবে অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়াছে, তাহা বলা যায় না। যদি তাঁহাদের নির্ব্বাচিত পন্থা অভীষ্ট ফল প্রদান করিতে সক্ষম হইত, তাহা হইলে তাঁহাদের স্ব স্ব দেশে বেকার-সমস্যা, দারিদ্র্য-সমস্যা এবং কৃষক-সমস্যা থাকিতে পারিত না। কি করিলে জগতের আসন্ন বিপদের ঐ কারণসমূহ দূরীভূত করা সম্ভব হইতে পারে, তাহাও যে পাশ্চাত্ত্য জাতির মধ্যে কেহ অদূর ভবিষ্যতে স্থির করিতে পারিবেন, ইহা মনে করিবার কোন যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অথচ, তাঁহাদের যে-জাতীয় শিক্ষা ও সাধনা, তাহাতে তাঁহারা যে সহজে তাঁহাদের অসামর্থ্যের কথা স্বীকার করিবেন, তাহাও মনে করা যায় না।...

গোলাপী রেশম

—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

তারাপদ বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিল, "তোমার হয়েছে কি শৈলেন? একটা মণিঅর্ডার নিতে যে হিমসিম খেয়ে গেলে! দুবার জায়গা ভুল করে কোন রকমে দস্তখৎটা ত সারলে, এখন আবার তারিখ নিয়ে ও কি কাণ্ড করছ?"

শৈলেন নিতান্ত অপ্রতিভভাবে তাড়াতাড়ি কলমটা তুলিয়া লইয়া বলিল, "ও, হ্যাঁ, তাইত! উনিশ শ' ছত্রিশ লিখছি কি বলে!..."

তাহার পর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "কত সাল যাচ্ছে বল ত এটা!"

পিওন বলিল, "আটত্রিশ পড়েছে বাবু।"

"ঠিক ত'। দেখ, মনেই ছিল না।" আরও বেশি-রকম অপ্রতিভ হইয়া ব্যস্তভাবে তারিখটা শুধরাইয়া টাকা কয়টা না গুণিয়াই পকেটে ফেলিয়া পিওনকে সে বিদায় করিল।

তারাপদ ভ্রূ তুলিয়া গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করিল, "এত অন্যমনস্ক, ব্যাপার কি বন্ধু?"

"কৈ, অন্যমনস্ক হই নি ত!"

"হয়ে যে ছিলে তাতে ত কোন সন্দেহ নাই, অধিকন্তু এখনও রয়েছ। আর গোপনের বৃথা চেষ্টা না করে কারণটা বলে ফেল দিকিন। কবি মানুষ, নতুন বসন্ত পড়েছে, আমি তেমন ভাল বুঝছি না।"

শৈলেন একটু লজ্জিতভাবে হাসিল, খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর আর একবার তাগাদা খাইয়া বলিল, "নিতান্তই ছাড়বে না তা হলে?"

তাহার পর জানালার বাহিরে খানিকটা স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "সাল ভুল করার জন্যে আমায় দোষ দিও না, আমি ১৯৩৮ সালে ছিলাম না খানিকক্ষণ, বোধ হয় এখনও ঠিকমত নেই।"

তারাপদ একটা তাকিয়ায় হেলান দিয়া ছিল, শুইয়া পড়িয়া বলিল, "এইচ. জি. ওয়েলস্‌-কল্পিত টাইম মেশিনে যে তুমি কোন দূর-ভবিষ্যতে কিংবা দূর-অতীতে পাড়ি মেরেছ তা বুঝতে পেরেছি। একটু পরিচয় দাও তোমার প্রবাস-যাত্রার, শোনা যাক।"

শৈলেন বলিল, "ভবিষ্যৎ ত মরুভূমি, সে দিকে গিয়ে কি করব? গিয়েছিলাম অতীতে, আজ থেকে ত্রিশ বৎসরের ব্যবধানে। সেখানে, কোন একটি শান্ত পল্লীগ্রামে রাধারমণের মন্দিরের পাশে উঁচু রকের ছায়ায় একটি ছোট মেয়ে খেলা করছে, তার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।"

তারাপদ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তার পাশটিতে একটি ছোট ছেলেও আছে।"

শৈলেন চোখ না ফিরাইয়াই বলিল, "আছে; তার নাম রাখা যাক শ..."

তারাপদ বলিল, "শ-য়ের আড়ালে 'শৈলেন' তেমন ঢাকা পড়ছে না, তুমি স্পষ্টাস্পষ্টি আত্ম-প্রকাশই কর। আর পবিত্র মন্দিরের পাশে একটি বালিকার সঙ্গে খেলা করছ বলে এই ত্রিশ বৎসরের ব্যবধান থেকে কাণমলা দেবে এমন লম্বা কারুর হাত নেই।"

শৈলেন দৃষ্টি ফিরাইয়া হাসিল। একটু নীরব থাকিয়া বলিল, "তোমায় পূর্ব্বে কখন বলেছি—ছেলে বেলায় আমার অভিভাবকেরা আমার পড়াশুনার সুবিধে হবে বলে তাঁদের কাছ থেকে অনেক দূরে বাংলায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—কেন না তাঁরা থাকতেন দূর পশ্চিমাঞ্চলে। আমিও এই সুবিধে পেয়ে পাঠশালা আর গুরুমশাইকে আমার নিজের কাছ থেকে খুব দূরে দূরে রাখতাম। বিদেশে পুত্রবিরহকাতর বাপ-মা যখন ভাবতেন, আমি গুরুমশাইয়ের উদ্যত ছড়ির নীচে বিদ্যাকর্ষণ করে যাচ্ছি, সে সময়টা আসলে আমি রাধারমণের মন্দিরের পাশে বেশ মাঝারি গোছের একটি দল জুটিয়ে অভিরুচিমত নানা রকম খেলায় মশগুল। দলের মধ্যে ছেলে-মেয়ে উভয়ই ছিল। তার মধ্যে একটি ছেলের পরিচয় দেওয়া আপাততঃ দরকার। ছেলেটার নাম ছিল..."

তারাপদ টুকিল, "লেডিস্‌ ফার্ষ্ট।"

শৈলেন হাসিয়া বলিল, "আমারও ইচ্ছা ছিল, শুধু তুমি কি মনে করবে সেই ভয়েই আগে ছেলের পরিচয় দিতে যাচ্ছিলাম। যাক; মেয়েটির নাম ছিল চারু, আমরা চারী বলে ডাকতাম। যখনকার কথা বলছি তখন তার বয়েস হবে—এই বছর আষ্টেক। চওড়া চওড়া গড়ন, ঘোরাল মুখ, মাথায় খেড়া বেণী; একটা তিন-পেড়ে কাপড় থাট করে পরা, আঁচলটা কোমরে মোটা করে জড়ান। পায়ে এক জোড়া হাঙর-মুখো মল ছিল, সে যুগে প্রায় সব মেয়ের পায়েই ওটা থাকত।

"এর ওপর চারীর ছিল টক্‌টকে রং, যা বাংলার পল্লী-গ্রামে দুর্লভ বলে টপ করে একটা বিশিষ্টতা এনে দেয়।

"চারীর বাড়ীতে শুধু ছিলেন তার বাপ আর ঠাকুরমা। মেয়েদের পক্ষে শুধু বাপ আর ঠাকুরমা থাকা মানে যোল আনা আদর। চারুর মা ছিলেন না, অর্থাৎ এই আদরের মধ্যে কোথাও শাসনের বালাই ছিল না। এর ফলে চারুর ছিল পূর্ণ-স্বরাজ এবং সেই জন্য সে আমার সমস্ত প্ল্যানগুলি পরিপক্ক করে তুলতে আর সবার চেয়ে সময় দিতে পারত। আমি ভুল বলছি, বরং অধিকাংশ প্ল্যানই তারই মাথায় জন্ম নিত এবং তারই দক্ষতায় দানা বেঁধে উঠত। সময়ের অভাব না থাকায় আমি তার হুকুম তামিল করে মতলবগুলি কাজে রূপান্তরিত করতে অন্য ছেলের চেয়ে বেশি সাহায্য করতাম মাত্র।

"আমরা যেখানটায় খেলা করতাম, সে জায়গাটা ছিল বেশ নিরিবিলি। তার একদিকে রাধরমণের মন্দির আর দু'দিকে দেয়াল। সামনেটা খোলা ছিল বটে, কিন্তু অনেক দূর পর্য্যন্ত ফাঁকা মাঠ, আর মাঠের শেষে আগাছার জঙ্গল। বাড়ী-ঘর নেই। ঘর-বাড়ী যা কিছু তা মন্দিরের পিছনে কিংবা দেয়াল দু'টোর আড়ালে। অর্থাৎ, জায়গাটা গ্রামের শেষ প্রান্তে আর কি।

"খেলার রকমারি ছিল, বুঝতেই পার। কখন পাঠ-শালা-পাঠশালা খেলা হত। আমি ছিলাম পাঠশালার কায়েমী পলাতক; সুযোগ-সুবিধা পেয়ে রোজ গড় পরতা আরও চার-পাঁচটি করে [illegible] জুটত—স্কুল-পাঠশালা-মিলিয়ে। বেতটা বাদ দিয়ে [illegible] সব বিষয়েই জিনিসটি স্বাভাবিক করবার চেষ্টা করা হত। এমন কি অনিচ্ছুককে চ্যাংদোলা করে টাঙিয়ে নিয়ে আসাও বাদ যেত না, আর যাকে টাঙিয়ে আনা যেত, সেও হাত-পা ছোঁড়া এবং অশ্রাব্য গালাগালি প্রয়োগে নকলটিকে সাধ্যমত আসল জিনিসে দাঁড় করাবার চেষ্টা করত। কখন কখন এমন হত যে, ব্যাপারটা অভিনয়ের কোটা থেকে সত্যই বাস্তবে এসে দাঁড়ায়। হঠাৎ কোথা থেকে স্কুল বা পাঠশালের সত্যিকার পোড়োরা এসে পড়ত এবং যাকে সখের চ্যাং-দোলা করে আনা হচ্ছে, আর যারা আনছে তাদের সবাইকে আসল চ্যাং-দোলা করে লটকে নিয়ে তারা অদৃশ্য হয়ে যেত। আমি গুরুমশাই হয়ে পাঠশালাতেই থাকতাম বলে, কিংবা চারু গুরুমশাই হলে, শিরপোড়ো হয়ে তার তামাক সাজতাম বলে, পালে বাঘ পড়লেই দূর থেকে গা ঢাকা দিতে পারতাম। চ্যাং-দোলা হই নি কখন।

"মাঝে মাঝে এই রকম আকস্মিক রসভঙ্গের জন্যে এ-খেলাটার প্রতি আন্তরিক টান থাকলেও, বড় বেশি সাহস করা যেত না। এ-ভিন্ন কাণামাছি ছিল, কুমীর-কুমীর ছিল, পাড়ার নিত্য দলাদলির নকল ছিল। কিন্তু সবচেয়ে যা বেশি হত তা অভিনয়ের অভিনয়, অর্থাৎ যাত্রার অনুকরণ।

"সে-সময় আমাদের গ্রামে ও-জিনিসটার খুব চল। নিম্ন শ্রেণীদের দু'টো যাত্রার দল ছিল, ভদ্রলোকদের একটা অপেরা পার্টি। গ্রামের কয়েকটা ছেলে কলকাতায় পড়ত, তারা সহরের আনকোরা আধুনিকতা আমদানি করে একটা থিয়েটার-ক্লাব পর্য্যন্ত দাঁড় করিয়েছিল। চারটি দলে যা করত, আমরা দুপুরে, মন্দিরের পাশটিতে তার পুনরাভিনয় করতাম। যাত্রাটাই আমাদের বেশি 'এ্যাপীল' করত; তবে থিয়েটারের সীনের দিকে একটা ঝোঁক ছিল, সেই জন্যে আমরা প্রায়ই থিয়েটারের ঢেঙে যাত্রার পালা ঢেলে অভিনয় করতাম। কেউ আনত গায়ের র‍্যাপার, কেউ মায়ের কস্তাপেড়ে শাড়ী, কেউ দিদিমার নামাবলী। নামাবলীটা হত অরণ্যের সীন, নামের জঙ্গলকে আমরা গাছের জঙ্গল করে নিয়েছিলাম আর কি। পুকুর দেখাতে হলে নামাবলীর মাঝখানটায় ছিঁড়ে দেওয়া হত। ধ্রুবের মা সুরুচি অরণ্যে ঘুরে ঘুরে তৃষ্ণার্ত্ত

হয়ে জল খাচ্ছেন দেখাতে হলে সুরুচি হাতজুটো অঞ্জলি-বদ্ধ করে নামাবলীর ছেঁড়া দিয়ে ভেতর দিকে গলিয়ে দিত এবং ওদিক থেকে ঘটি করে একজন জল ঢেলে দিত,—বাস্তবিকতার নেশায় কখন কখন পানাসুদ্ধ। পুকুরে জল-খাবার এমন কৌশল পাড়ার আর কোন পার্টিই দেখাতে পারত না বলে এই সীন্‌টি আমাদের সকলের বড় প্রিয় ছিল। ফলে, নামাবলী পাওয়া গেলেই ধ্রুবের পালা অনিবার্য্য ছিল, আর ধ্রুবের পালার ফাঁড়া কাটিয়ে কোন নামাবলীকেই কখন অক্ষত শরীরে ফিরে যেতে হয় নি।

"এই সব অভিনয়ে মেন-পার্ট থাকত চারুর। সে মল গামছা হাঁটুর কাছে তুলে, বেটাছেলের মত কাপড় পরে, দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে অর্জ্জুন হয়ে লক্ষ্য বিঁধত. পাণ্ডবের অজ্ঞাত-বাস-এ ভীম হয়ে কীচক বধ করত, শ্রীকৃষ্ণ হয়ে কংস ধ্বংস করত। মেয়ের পার্ট বড় একটা নিত না; সুধু 'সুভদ্রা-হরণ'-এ গোবরার মুখে লাগাম কষে অর্জ্জুনের রথ হাঁকিয়ে নিয়ে যাবার লোভে সে সুভদ্রা সাজত।

"এই পালাটির জন্মে আমি উন্মুখ হয়ে থাকতাম। কেন, সে কথা বলবার আগে গোবরার পরিচয়টা দেওয়া দরকার।"

"পরিচয়টি আগেই পেতে, কিন্তু তুমি নিজেই বাধা দিয়েছিলে, মনে থাকতে পারে।

"গোবরা আমাদেরই পাঠশালার ছেলে, আমার পরে ভর্ত্তি হয়। দুবেলা এক কোঁচড় করে মুড়ি এনে পাঠশালায় বসে বসে খেত, আর মুড়ি বিলি করে দল পাকাত। এ দিকে মাথা খেলত মন্দ নয়, তবে পড়াশুনার দিকে বড় একটা ঘেঁসত না। তার সঙ্গে আমার এই দ্বিতীয় বিষয়ে মিল ছিল এবং এরই বলে তাকে ক্রমে পাঠশালা ছাড়িয়ে আমাদের দলে ভেড়ালাম। ভুল হয়ে গিয়েছিল; যাকে বলে খাল কেটে কুমীর ঢোকান তাই করেছিলাম আর কি। গল্পটা শেষ পর্য্যন্ত শুনলেই বুঝতে পারবে।...

"আচ্ছা একটা কথা বিশ্বাস করতে পারবে?"

তারাপদ বলিল, "কি?"

"এই যে, আমি চারুকে ভাল বাসতাম।"

তারাপদ সবিস্ময়ে বলিল, "ভালবাসতে? তখন যে তোমরা দুধপোষ্য!"

শৈলেন অবিচলিত ভাবে বলিল, "ভালই যদি না বাসতাম তো সর্ব্বদা ওর কাছে কাছে থাকতাম কেন? আর কেনই বা হাজার কাছে থেকেও মনে হত যথেষ্ট কাছে নেই? এরই বা কারণ কি যে, ক্রমাগতই ইচ্ছে হত চারু একটা কিছু বিপদে পড়ুক,—খুব মারাত্মকরকম বিপদে, যেমন ভূতে তাড়া করা, কিংবা হাতীতে শুঁড়ে জড়িয়ে ধরা, কিংবা বাঁক-সজায় নৌকো থেকে পড়ে যাওয়া—আর আমি তাকে উদ্ধার করি। ভালবাসার লক্ষণ নয়? তা ভিন্ন পাঠশালা থেকেও যে কায়েমী ভাবে অনুপস্থিত থাকতাম, তারও মূলে ছিল চারুর প্রতি অনুরাগ, সুধুই গুরুমশাইয়ের প্রতি বিরাগ নয়।

"একদিন দুপুরে সুভদ্রা-হরণ হবে ঠিক হয়েছে। আমার মনটা খুব হৃষ্ট, কেন না এই পালায় আমি সাজতাম অর্জ্জুন। সকলে পাঠশালায় গেলাম—রথের ঘোড়াকে খবর দেবার জন্মে। তখন ঘোড়া সাজত নিবারণ। খবর পেলাম, সে চার পাঁচ দিন আসে নি। গোবরা ওদের পাড়ার ছেলে; জিগ্যেস করতে বললে—তার ক'দিন থেকে অসুখ। দুশ্চিন্তায় পড়া গেল।

"একটু পরে গোবরা প্রশ্ন করলে—'কেন র‍্যা নিবারণ কে?'

"ছেলেটা নালিশ করতে এক নম্বর। এর কাছে সব কথা হুট্ করে বলা নয়, বললাম, 'না, এমনি।'

"কিন্তু ঘোড়ার ভাবনায় মনটা বড় ব্যাকুল হয়ে রইল। একটু পরে একটা টোপ ফেলে দেখলাম; বললাম, 'আজ আমাদের ওখানে যাত্রা হবে কি না...'

"গোবরা স্লেটে একটা বর্ত্তুলাকার মুখ এঁকে তাতে দাঁত বসাচ্ছিল। মুখ না তুলেই জিগ্যেস করলে, 'কার দল রে? মধুর সার? তার দল হলে একবার দেখতাম।'

"আমি উত্তর করলাম, 'কেন, মধুর সার চেয়ে ভাল দল আর হতে নেই?'

"একটু উৎসুক ভাবে প্রশ্ন করলে, 'কি পালা রে?'

"বললাম, 'সুভদ্রা-হরণ।'

"গোবরা আমার মুখের দিকে চাইলে। তারপর আবার নির্লিপ্ত ভাবে দাঁত আঁকতে লাগল। আমি জিগ্যেস করলাম, 'যাবি না কি?'

"গোবরা একটু নিরাশ ভাবে বললে, 'না ভাই, পাঠশালা রয়েছে যে।' আমি বললাম, 'ঠাকুর-দেবতার পালা দেখলে আবার না কি দোষ হয়?'

"পাশের অনাথকে সাক্ষী মানলাম। সে কম কথায় সারে, বললে, 'দোষ হলে আর পাঠশালায় বসে পেল্লাদ কেষ্ট নাম করত না।'

"আমি উৎসাহের সঙ্গে বললাম, 'তুই যাবি না কি তা হলে?'

"অনাথ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে নাক সিঁটকে বললে, 'ধ্যাৎ।'

"গোবরা সে দিন ধরা দিলে না। কিন্তু কয়েকদিন পরে দেখা গেল নিজেই নিবারণের সঙ্গে হাজির হয়েছে। সে দিন আমাদের 'রিজিয়া।' দুদিন আগে কলেজের ছেলেরা প্লে করেছিল। নিবারণের পার্ট ছিল না। সে আর গোবরা অডিয়েন্স হয়ে ষ্টেজের বাইরে দুখানা চেয়ার নিয়ে বসল।...ঘাবড়ো না, 'চেয়ার' মানে অবশ্য থান ইঁট।

"নূতন দর্শক পেয়ে খুব চুটিয়ে প্লে করা গেল। ওঠবার সময় গোবরা বললে, 'তোরা করিস? তবে যে বললি, মথুর সার চেয়েও ভাল দল?'

"আমি মনে মনে চটলাম বললাম, 'মথুর সারা পেশাদার ...'

"তার পর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল; বিজয়-গর্ব্বের সঙ্গে প্রশ্ন করলাম, 'মথুর সা'র দলে সত্যিকার মেয়ে আছে?'

"গোবরা ঠোঁট উলটে বললে, 'আহা, সত্যিকার মেয়ে হলেই যেন সব হল! তোদের রিজিয়া না হয় মেয়েই, কিন্তু অন্নার দাদার কাছে দাঁড়াতে পারে?'

"আমি হো-হো করে হেসে উঠলাম, বললাম, 'খুব বুঝেছিস তো। রিজিয়া মেয়ে ছিল না কি? ওত পেনোর ভাই, ওর মাথায় তো ওটা বাবরি চুল।'

"তারকেশ্বরের মানত চুল নিয়ে পেনোর ভাই হারাধন খুব ঠকিয়েছে দেখে আমি আর হাসি সামলাতে পারছিলাম না। এমন সময় অন্য সবার সঙ্গে চারু এসে সামনে দাঁড়াল। ঝুঁকে, পায়ের মল নামাতে নামাতে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলে—'কিরে শৈল, হাসছিস্ কেন অত?'

"সে সেজেছিল বক্তিয়ার, তিনপেড়ে শাড়ীর মালকোঁচা-মারা বক্তিয়ার! বললাম, 'এ তোকে ভেবেছে বেটাছেলে আর হারাধনকে ভেবেছে মেয়ে মানুষ!'

"সকলে আবার হেসে উঠলাম।

"চারু একটু গম্ভীর হয়ে, একটু হেসে, চোখ দুটো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বললে, 'এবার থেকে তোরা আমায় চারু-দা বলে ডাকবি, খবরদার।'—সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরটা আলগা করে হো-হো করে হেসে উঠল।

"গোবরার অবস্থাটা যা হল তা আর বর্ণনা করে কাজ নেই, সুধু কাঁদতে বাকী রৈল বেচারির। মুখ রাঙা করে বললে, 'রোসো, তোমাদের সবার ভিরকুটি ভাঙছি গুরু মশাইকে বলে—মেয়েদের সঙ্গে মিশে এই সব খেলা হয় বাবুদের! নিবারণ, তোমারও এই বিদ্যে! বেশ...'

"নিবারণ বললে, 'দিস্ বলে; ভারী ভয়, ওঃ।'

"চারু একটু এগিয়ে এল গলা বাড়িয়ে বললে, 'তুই মেয়ে মানুষ দেখলি কোথায় রে এর মধ্যে? আমি তো চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।' বলে সোজা হয়ে গম্ভীর হয়ে দাঁড়াল। আর একটা হাসির রোল উঠল।

"তার পর দিন বিকেলে পাঠশালার ফেরৎ গোবরা আবার এসে হাজির বললে, 'চল সব, গুরু মশাই ডেকে পাঠিয়েছেন।'

"বিকেলে তখন অনেক ছেলে জুটেছে, তুমুল বেগে কি একটা ছুটোপাটি খেলা হচ্ছে; কেউ ওর কথায় বড় একটা কাণ দিলে না। সুধু পাঁচী বলে একটা মেয়ে খেলার মাঝেই শরীরটা অষ্টবক্র করে হাতের আঙ্গুলগুলো ছেতরে গোবরার কথাগুলোই বিকৃত করে ভেংচে উঠল। তারপর আর কেউ ওর কথা ভাবলেও না এবং অনেকক্ষণ পরে খেলার মাঠে একটা ছেলের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হয়ে পড়ে গিয়ে যখন ঝেড়ে ঝুড়ে উঠলাম,—দেখি ছেলেটা আর কেউ নয়—আমাদের গোবরা।

"সেই থেকে গোবরা ভিড়ে গেল আমাদের দলে, অবশ্য রোজ আসত না, তবে খুব বেশি দেরিও করত না, আর যত দিন যেতে লাগল ততই তার হাজরি ঘন ঘন হয়ে

উঠতে লাগল। ক্রমে আমাদের থিয়েটারের অডিয়েন্স হওয়া থেকে একদিন ষ্টেজের ওপর তার প্রোমোশন হল।

"সেদিন আমাদের 'রাধারমণ থিয়েটার পার্টি'র আজ-কালকার ভাষায় বলতে গেলে শ্রেষ্ঠ 'অবদান' 'সুভদ্রা-হরণ'। অশ্বিনীকুমার নিবারণ অনুপস্থিত—ঘোষালদের কাচ-বাঁধান দেয়াল টপকে বেল পাড়তে গিয়ে তার ক্ষুরে কাচ বিঁধে যায়।

"গোবরা ছিল, তাকে বললাম, 'তুই ঘোড়া হ গোবরা, হবি?'

"গোবরা বললে, 'যাঃ, ঘোড়ার পার্ট আবার মানুষে করে!'

"একটু থেমে বললে, 'যদি করি তো ও-রকম পেছনে ঝাঁটা বেঁধে ল্যাজ করতে পারব না।'

"অগত্যা লাঙ্গুলহীন ঘোড়াই নামান হল সেদিন। ষ্টেজে নেমে কিন্তু চিঁহিঁ-হিঁ শব্দ করে, ঠোঁট কাঁপিয়ে, লাগামে ঝাঁকানি দিয়ে এবং পেছনের নারকেল-ভেঁপোরের রথে অর্জ্জুন আর সুভদ্রাকে দু' একটা লাথি ঝেড়ে ঘোড়া সবাইকে তাক্ লাগিয়ে দিলে! এক মুহূর্ত্তেই প্লে'টার চেহারা বদলে গেল। খুসীতে, বিস্ময়ে চারু তো ষ্টেজের মর্য্যাদা ভুলে হাততালি দিয়ে চেঁচিয়েই উঠল।

"তখুনি সীন নামিয়ে দেওয়া হল। একটু পরে যখন আবার সীন উঠল, বিস্মিত অডিয়েন্স দেখলে ঘোড়ার পিছনে অস্মাদের লক্ষী-নারায়ণের রূপোর চামর বাঁধা, আর সুভদ্রা আর বাবরি চুলওয়ালা নকল-মেয়ে হারাধন নয়, স্বয়ং চারু।

"এই দারুণ সীনটির লোভে চারু কায়েমী ভাবে সুভদ্রার পার্ট নিলে, একাদিক্রমে চার দিন এই খেলাই চলল। সে যুগে এটা রেকর্ড।

"চারু গোবরার এত ভক্ত হয়ে পড়ল যে, কোথা থেকে খুঁজে-পেতে একটা সম্বন্ধও বের করে ফেললে—গোবরা তার ভাই হয়। এত বড় একটা ষ্টার-অ্যাক্টারের সঙ্গে আত্মীয়তা না বের করে সে সন্তুষ্ট হতে পারল না।

"আমার কিন্তু মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। বুঝতে পারলাম আমার ভালবাসার ক্ষেত্র আর মসৃণ নয়—গোবরা হতভাগাও মজেছে, সেও…"

তারাপদ "থামো!" বলিয়া, হাতটা বারণের ভঙ্গীতে উঁচু করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল, বলিল, "নিঃসাড়ে, নির্ব্বিবাদে শুনে যাচ্ছি বলে তুমি যে দস্তুরমত রোমান্স ফেঁদে বসলে দেখ'ছি হে! একটি মেয়ে, দুটি ছেলে—that damned eternal triangle again! সেই, শাশ্বতী ত্রয়ী, মতলবখানা কি বল দিকিন?"

শৈলেন বলল, "হিংসা আছে, দ্বেষ আছে, চক্রান্ত অভিসন্ধি, এমন কি হত্যা পর্য্যন্ত…রোমান্স বলতে আপত্তি থাকে, বল না।"

"নানাভাবে লক্ষণগুলি প্রকাশ পেতে লাগল। প্রথম প্রথম গোবরা আমাদের বেশ একটু চোখে চোখে রাখবার চেষ্টা করতে লাগল। খেলার মধ্যে আমরা দুজনে, অর্থাৎ আমি আর চারু একটু কাছে কাছে থাকতাম, কেন না আর সবার তুলনায় আমাদের দুজনের মধ্যে একটু ঘনিষ্ঠতাই ছিল। প্রায় দেখতাম, আমরা খুব ঘেঁসাঘেঁসি হতেই গোবরার বক্রদৃষ্টি আমাদের ওপর এসে পড়েছে। চারু কিছু বুঝত না, কেন না তার মনটা ছিল নি-দাগ, আমি কিন্তু একটু থতমত খেয়ে যেতাম, কেন না আমি চারুর সান্নিধ্যটা বেশ একটু সূক্ষ্মভাবে উপভোগ করতাম।

"এমনও হয়েছে—দুপুরবেলা, রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে, আমার মত নিতান্ত এলো-দেওয়া ছেলে এবং চারুর মত নেহাৎ আদরে-গলা মেয়ে ভিন্ন কেউই খাড়ির বার হতে পারে। না—আমরা দুটিতে মন্দিরের রকের কোণে বেল-গাছের ছায়ায় পাশাপাশি বসে গল্প করছি, হঠাৎ গোবরা নিতান্ত একটা অপ্রত্যাশিত জায়গা থেকে যেন মাটি ফুঁড়ে বেরুল। আমাদেরই আশ্চর্য্য হবার কথা, সে কিন্তু আগে ভাগেই কপালে চোখ তুলে প্রশ্ন করলে—'তুই এখানে, শৈলেন? আর আমি চারিদিক্ খুঁজে হয়রান হচ্ছি?'

"চারু হয়ত প্রশ্ন করলে, 'কেন র‍্যা গোবরা?'

"ওকে গুরুমশাই ডেকেছেন।'

"কেন?'

"কেন তা ওই জানে আর গুরু-মশাইই জানে। আর ডাকবে না? রোজ রোজ পাঠশালা কামাই করে এখানে এসে একলা একলা বসে থাকা…'

"চারু বললে, 'একলা কেন ? এই তো আমি রয়েছি।'

"এর উত্তর গোবরা দিলে না। আমিও চুপ করে রইলাম। একটু পরে গোবরা বললে, 'চল শৈলেন, বসে রইলি যে ?' আমি রেগে-মেগে বললাম 'যাঃ, যাব না।'

"গোবরা বললে,—'তা হলে যাই আমি, বলে দি'গে যে···'

"আমি তাই চাই—বেশ জমাটি গল্প চলছিল, আপদ বিদায় হলেই বাঁচ, বললাম—'যা, এক্ষুণি যা,···যাচ্ছিস না যে ?'

"গোবরা বললে, 'তোর হুকুম ?'

"চারু বললে,'তার চেয়ে তুইও আয় না গোবরা, একটু পরেই তো লক্ষ্মী, ফেলা, এরা সবাই আসবে।'

"গোবরা অবশ্য আসিতেই চায়, কিন্তু আসে না। বলে, 'হ্যাঁ, শৈলর সঙ্গে আমায় কেউ দেখে ফেলুক !'

"ছবিটি আমার যেন চোখের সামনে ভাসছে। চারু আঁচলটা দাঁতে কামড়ে, বুকের নীচে পা নামিয়ে গোড়ালি ঠুকে ঠুকে মল বাজাচ্ছে, সমস্ত শরীরটাও দুলছে, আমার পা দোলান বন্ধ হয়ে গেছে—খানিকটা দূরে সিঁড়ির ও-দিকটায় গোবরা দাঁড়িয়ে। গোবরার শেষের কথাটায় কি ছিল, চারু একেবারে 'হো হো' করে হেসে উঠল। বললে, 'তা হলে শৈল না থাকলে আসবি তো ? তুই যা তো শৈল।'

"সঙ্গে সঙ্গে গলাটা বাড়িয়ে নিয়ে এসে আমার কাণে কাণে বললে—'তুই অমনি ঘুরে পাঠশালা থেকে সবাইকে ডেকে নিয়ে আয়, উল্টে ওকেই চ্যাং-দোলা করে নিয়ে যাক ··'

"তারপরে কি হল সে দিন মনে পড়ছে না।···এক দিনের কথা মনে পড়ে, চারুকে মন্দিরে না পেয়ে তার বাড়িতে গেলাম। দেখি, ঘরে বারান্দায় বাঘবন্দীর ছক্ কেটে চারু আর গোবরা একাগ্রচিত্তে খেলায় মগ্ন। গোবরার পাশে পাঠশালার বই-স্লেট রাখা। চারু একবার চোখ তুলে আমার দিকে চাইলে, কিন্তু বোধ হয় খুব অন্যমনস্ক ছিল বলে কিছু বললে না। গোবরা আমার দিকে পেছন ফিরে ছিল।

"আমার গায়ে যেন আগুন ছড়িয়ে দিলে। ছেলে-বেলার কণ্ঠে যতটা কটুতা ভরা যায়, আর নেহাৎ কম৩ যায় না—ততটা ভরে বললাম, 'হ্যাঁ রে গোবরা, আর নিজের বেলায় বুঝি পাঠশালা কামাই হয় না ?'

"গোবরা চমকে ফিরে দেখে যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

"—'বাঃ আমি তো যাচ্ছিলাম পাঠশালা, আমার তেষ্টা পেয়েছিল তাই···'

"আহা, পাঠশালায় তো জল পাওয়া যায় না !··'

"চারু আধশোওয়া হয়ে খেলছিল, যেন ফণা ধরে উঠে বসল, হঠাৎ রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললে—'ও খাবে না পাঠশালার জল, তোর কি রে ? আ-মর! বাড়ী বয়ে কোঁদল করতে এল দেখ না। যা বের, ও যখন তোর বাড়ীতে যাবে বলিস'খন। আ-গেল যা! নিজে সারাদিন টো-টো করে বেড়াচ্ছে, তাতে কিছু নয়, আর ও বেচারি...তুই উঠিস নি তো গোবরা, ও কি করে আমি দেখব···'

"আমি হন্ হন্ করে বেরিয়ে এলাম; রাগ ছিল, অভিমান ছিল, আর কি ছিল ঠিক মনে পড়ে না, তবে খানিকটা গিয়ে প্রায় যখন মন্দিরের কাছাকাছি হয়েছি, হঠাৎ আমার গলা বন্ধ হয়ে এল, চোখে কি যেন ঠেলে উঠতে লাগল এবং বাপ-মা প্রভৃতিকে অনেক দিন দেখি নি বলে আমি কাপড়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম।

"হতাশ প্রেমের অশ্রু এই রকম একটা সম্পূর্ণ আলাদা কথা অবলম্বন করে উপরে ওঠে কি না, তোমরাই বলতে পার।

"তিন দিন যাই নি। চতুর্থ দিন চারু নিজে এসে আমায় ডেকে নিয়ে গেল। রাস্তায় একবার আমার কাঁধে হাত দিয়ে মুখের দিকে চেয়ে বললে, 'তোকে কথাগুলো বলে এত কষ্ট হয়েছিল, শৈল, মাইরি বলছি।'

"গোবরা কিন্তু সেদিন খুব আস্কারা পেয়েছিল। তারপরেও যে তিনদিন যাই নি, সে তিনদিনও নিশ্চয় তার একাধিপত্য গেছে। সে যে ক্রমে ক্রমে আমায় পরাস্ত করে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র থেকে সরাচ্ছে, তাতে আর তার সন্দেহ ছিল না। এর পরেও দু'একটা ব্যাপার ঘটল, যাতে তার উচ্চাকাঙ্ক্ষাটা পরিপুষ্ট হবার বেশ অবসর পেলে। তারপর একদিন সে মনের কথাটা স্পষ্টই বলে ফেললে।

"সেদিন আমাদের সেই 'শ্রেষ্ঠ অবদান' 'সুভদ্রা-হরণ'। প্রথমাবধিক আমি সাজব অর্জ্জুন, চারু সাজবে সুভদ্রা, গোবরা সাজবে ঘোড়া। ল্যাজের জন্য পেছনে চামর বাঁধবার সময় কিন্তু হঠাৎ সে বেঁকে বসল, বললে—'না, আমি ও সাজব না।'

"প্রথমে সকলে বেশ একটু কৌতুক অনুভব করলাম, গ্রামের যাত্রা-থিয়েটারে এই রকম প্রায় হয় বলে আমাদের যাত্রারও যেন কদর বেড়ে গেল। 'ঘোঁড়া বেঁকে বসেছে' বলে বেশ একটা আমোদ-মিশ্রিত রব উঠল। শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু ঘোড়ার জিদে সব পণ্ড হয় দেখে সবাই চটে উঠল। কে একজন জিগ্যেস করলে—'তবে তুই কিসের পার্ট নিবি শুনি?'

"গোবরা খানিকটা গোঁজ হয়ে রইল, তারপর আরও সবার পেড়াপিড়ির পর ঘাড়টা বেঁকিয়ে বললে, 'আমি অর্জ্জুনের পার্ট নেব।'

"সকলে এত বিস্মিত হয়ে উঠল, যেন সত্যিই একটা ঘোড়া অর্জ্জুনে রূপান্তরিত হতে যাচ্ছে, কয়েকজন একসঙ্গে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল—'অর্জ্জুনের!'

"গোবরা বললে, 'বাঃ, কেন হব না? দুবার ঘোড়া সেজেছি বলে আমি যেন মানুষ নই! আমি শৈলর চেয়ে ঢের বড়, ওর চেয়ে ঢের সুন্দর। আর ও আসুক দিকিন আমার সঙ্গে কুস্তিতে—'

"চারু একেবারে কপালে চোখ তুলে বলে উঠল, 'সে কি রে! তুই আমার সম্পর্কে দাদা হস না? বলতে তোর আটকাল না জিভে? তুই অর্জ্জুন সাজলে আমার সুভদ্রা সাজা চলে? তুই যে অবাক্ করলি রে।'

"নন্তী গালে তর্জ্জনী ঠেকিয়ে বললে, 'পাঠশালে পড়ে তোর এই বিদ্যে হচ্ছে গোবরা!'

"মাসখানেক থেকে পাঠশালে যে তার কোন বিদ্যেই অর্জ্জন হচ্ছে না সে কথাটা অবশ্য কেউ তুললে না।

"নিবারণ বললে, 'আর তুই কুস্তিতে যদি শৈলকে হারাতেই পারিস, তা হলে তো তুই ওর দাদা ভীম হলি, চারী তা হলে তোর ভাদ্দর-বৌ হল না?'

"সে দিনে আর প্লে হল না। ভালই হল, কেন না গোবরা আমার দিকে এমন ভাবে চাইলে, যাতে স্পষ্ট বোঝা গেল, সে ঘোড়া সাজলে একটি ক্ষুর যা ও ঝাড়ত, তাতে বীর অর্জ্জুনকে আর এ জন্মে গাণ্ডীব তুলতে হত না।

"এর ফল এই হল যে আমার আর চারুর সম্বন্ধটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। অর্থাৎ, চারু সুভদ্রা হলে আমার অর্জ্জুন হতে কোন দোষ নেই। বরং সব দিক্ দিয়ে আমিই যোগ্য। তুমি বিশ্বাস কর আর নাই কর, তারাপদ, এর পরে আমাদের দুজনের মনে মনে যেন একটা বোঝা-পড়া হয়ে গেল। করছ না বিশ্বাস?"

তারাপদ বলিল, "বিশ্বাস করি আর নাই করি, ওর কাব্যটুকু উপভোগ করতে বাধা হচ্ছে না। কৈশোরের প্রেম বড় মধুর; আমাদের ধর্ম্ম তাই একে দেব-মুখী করে শাশ্বত করে রেখেছে। সত্যিই নিজের শুদ্ধতার জোরে এ-প্রেম প্রেমাস্পদকে দেবতার সঙ্গে একাসনে···।"

শৈলেন তারাপদর মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে হাসিতে লাগিল; বলিল—"ঠিক বলেছ, দেবতার সঙ্গে একাসনই বটে। সেই কথা বলব বলেই আজ এত কথার অবতারণা।

"সে দিন কি একটা অজ্ঞাত কারণে সকাল থেকেই ভাল ছেলে হবার ঝোঁক চেপেছিল। খুব ভোরে উঠলাম। বইয়ের ছেঁড়া পাতাগুলি জোয়াল আঠা দিয়ে জুড়ে বই গুলোতে মলাট দিলাম, তারপর খাবার-টাবার খেয়ে বই-শ্লেট নিয়ে পাঠশালায় বেরুলাম।

"রেল পেরিয়ে চারুর সঙ্গে দেখা; জিজ্ঞেস করলে, 'কোথায় চলেছিস রে শৈল?—পাঠশালায়?'

"মাথা নেড়ে উত্তর দিলাম।

"জিজ্ঞেস করলে—'আজ আসবি না—?'

"বললাম, 'না। বাঃ পাঠশালায় যেতে হবে না? শুধু তোদের সঙ্গে খেলা করলে চলবে আমার?'

"চারু শুধু ঠোঁটটা একটু উল্টে চলে গেল। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ঘুরে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুই কোথায় যাচ্ছিস রে?'

"বললে—'সজনে ফুল কুড়ুতে, ঘোষদের পুকুরপাড়ে।'

"আমি আবার পাঠশালা পানে ঘুরলাম বটে, কিন্তু দু'পা এগুতে পাঠশালা আর সজনে ফুল, অর্থাৎ গুরুমশাই আর চারুর দোটানায় পড়ে গতিটা শ্লথ হয়ে উঠল এবং হঠাৎ

যখন মনে হ'ল, সজনে ফুল কুড়িয়ে বাড়িতে তরকারির সাহায্য করাও ভাল ছেলের একটা লক্ষণ, তখন বেশ একটা তৃপ্তি পেলাম।

"সেদিন সকাল বেলাটায় কিছু একটা ছিল। যেমন নিজেকেও খুব ভাল লাগছিল, ঘোষেদের পুকুর-পাড়ে চারুকেও তেমনি যেন বেশি করে মিষ্টি বোধ হচ্ছিল। তাকে ঝরে-পড়া ফুল কুড়ুতে দিলাম না, আমি থাকতে সে বাসী ফুল কুড়ুবে? গাছে উঠে ডাল ভেঙে ভেঙে টাটকা ফুলে তার কোঁচড় ভর্ত্তি করলাম। কিছু আমও চুরি করে দিলাম। তারপর বাস্তবক্ষেত্রে আর তার কোন উপকার করবার উপায় না দেখে বললাম 'আজ রিজিয়ার থিয়েটার করবি চারী?'

"মানে, তা হলে বক্তিয়ার-সেজে বীরেন্দ্রকৃষ্ণকে হত্যা করা যায়। বইয়ে যাই থাক না কেন। চারুর জন্যে একটা প্রকাণ্ড কিছু না করতে পারা পর্য্যন্ত যেন স্থির হতে পারছিলাম না। যদি পারি ত বীরেন্দ্রের পার্টটা গোবরাকেই দোব।

"চারু একটা টোকো আম দাঁত দিয়ে কুরে কুরে খাচ্ছিল। চোখমুখ কুঁচকে বললে, 'না।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন র্যা?'

"চারু বিরক্তভাবে বললে—'সাজ নেই, কিচ্ছু নেই, আমি অমন নামাবলী গায়ে দিয়ে রিজিয়া সাজতে পারব না, যাঃ।'

"একটু আশ্চর্য্য হলাম, কেন না চারুর কোন কালে পোষাকের ফ্যাসাদ ছিল না। কথাবার্ত্তায় রহস্যটা বোঝা গেল। আগের দিন শীতলাতলায় কলকাতার গণেশ পরামাণিকের দল গেয়ে গেছে। তারা আনকোরা-নতুন সাজে একেবারে তাক লাগিয়ে দিয়েছে, বিশেষ করে রুক্মিণী—সে আবার ঢুকল, ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের মত একটা প্রকাণ্ড গোলাপী রেশমী শাড়ী পেছনে টানতে টানতে। ও-জিনিষটা তখন সদ্য কলকাতার যাত্রা থিয়েটারে ঢুকেছে, আর নির্ব্বিচারে চলেছে। এখনকার ঢেঁকে গ্রীক্-প্যাটার্ণের অভিবাদনের মত—সেলুকাসের সেনাও ওই করছে, আবার শ্রীকৃষ্ণের দ্বাররক্ষীও ওই করছে, সেদিন এক জায়গায় দেখলাম দেবর্ষি নারদও বৈকুণ্ঠের মাথায় বীণা তুলে ঐ ইউনানী অভিবাদন করলে।... তুমি হাসছ যে, অমরলোকে না হয় সেখানকার বাসিন্দাদের মৃত্যুই নেই, তা বলে নূতন ষ্টাইল ঢুকবে না, এমন কোন সর্ত্ত আছে না কি?

"আমি একটু ব্যাকুল হয়ে উঠলাম; চারুর ভাল পোষাক পরবার সাধ হয়েছে, এই সময় যদি কিছু করা যেত!—বিশেষ করে চারুর মনোরঞ্জনের জন্যে আমার আর গোবরার মধ্যে যে রকম রেষারেষি চলছে।

"গল্প করতে করতে আমরা ঘাটে শানের বেঞ্চে গিয়ে বসলাম। আমি বললাম—'বৌদির ট্রাঙ্কে একটা শান্তি-পুরে-ডুরে শাড়ী আছে, যদি বলিস তো দুপুর বেলায় যখন ঘুমুবে...'

"চারু ঠোঁট দুটো কুচকে বললে, "মিছে বকিসনে শৈল, ডুরে শাড়ীর না কি আবার উড়ুনি হয়, তাও আবার শান্তিপুরে!—অরুচি।'

"বৌদির পরই জেঠাইমা আর ঠাকুরমা—থান আর নামাবলী। আমি অসহায়ভাবে চিন্তা করতে লাগলাম।

"একটু পরে ম'ল-শুদ্ধ পা ঠুকতে ঠুকতে চারু বললে—'এক জায়গায় পাওয়া যায়।'

"আমি ব্যগ্রভাবে বললাম, 'কোথায়, বল ত?'

"চারু উত্তর না দিয়ে অন্যদিকে চেয়ে পা দোলাতে লাগল। আমি আবার প্রশ্ন করতে বললে, 'সে তোর দ্বারা হবে না।'

"বললাম, 'বলই না।'

"বললে—'রাধারমণের মন্দিরে।'

"আমার সমস্ত অন্তরাত্মা মন্দির ওলট-পালট করে এল। নিষ্ফল হয়ে আবার জিজ্ঞেস করলাম—'মন্দিরে কোথায় রে?—সেখানে তো দোলনা, ঠাকুরের শোবার খাট, নৈবিদ্যির থালা...'

"চারু আঁচলটা দাঁতে চেপে পালিশ করতে করতে বললে, "রাধার গায়ে।'

"বলে, ফল কি হল দেখবার জন্যে একবার আড়চোখে আমার দিকে চাইলে। আমি আশ্চর্য্য হয়ে বললাম, 'রাধার উড়ুনি তুই গায়ে দিবি!'

"চারু বোধ হয় ভয় পেয়ে গেল, তাড়াতাড়ি বললে, 'দূর, তাই বললাম না কি ?'

"তারপরে গম্ভীরভাবে উঠে পড়ে বলল, 'বাড়ি যাই. তুই পাঠশালে যাবি নি ? খালি মেয়েদের সঙ্গে খেলা !'

"চারু রেগেছে। এক সঙ্গে আসতে আসতে খানিক পরে আমি বললাম, 'আর যদি কেউ টের পায় ? তা ছাড়া পাপও তো বটে ?'

"চারু কোঁচড় থেকে এক মুঠো সজনে ফুল বের করে শুঁকতে শুঁকতে বললে—'কে তোকে বলেছে ?—তার চেয়ে গোবরাকে বললে বরং'''

"চারু ঈর্ষার শক্তির কথা জেনেই কি ও কথা বলেছিল ? মেয়ে মানুষ,—ওদের মনের বৃত্তি কখন থেকে অঙ্কুরিত হতে থাকে কে জানে ? কিন্তু ঐতেই—ঐ গোবরার নাম এনে ফেলতেই—ফল হল। তারপর দিন দুপুরের পূজো করতে ঢুকে পুরুতঠাকুর দেখলেন রাধার গা খালি। একটুখানির মধ্যেই গ্রামে হৈ-চৈ পড়ে গেল।…সিগারেটের টিনটা এগিয়ে দাও দিকিন, দেশলাইটাও—থ্যাঙ্কস্।

"কখন চুরি গেল, কে করলে, কেমন করে—সে সব কথা থাক্। আজ একটু আগে বড় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম-না ? আসল কথা হচ্ছে—রাস্তা দিয়ে একটা লোক খানিকটা জরি-বসান গোলাপী রেশম নিয়ে যাচ্ছিল, দুপুরের রোদে ঝলমল করছে। আলোয় ঝলমল গোলাপী রঙ এখনও আমায় চঞ্চল করে তোলে। আমি আর বর্ত্তমানে থাকি না। কালের পর্দা হালকা রেশমের মতই ফরফরিয়ে উড়তে থাকে—দেখি তার ও প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে দুটি কিশোর-কিশোরী, স্থান—একটি পোড়ো-বাড়ির একটি নিভৃত প্রান্ত।

"মেয়েটির গা একটি জরির পাড় দেওয়া গোলাপী রেশমে জড়ান। তার ভাঁজে ভাঁজে ওপর থেকে এসে পড়েছে দুপুরের সূর্য্যের চোখ-ঝলসান আলো ; তাতে ভেতরের গায়ের রং আর বেড়াবেণীর ঝিকমিকি যেন হয়ে উঠেছে রূপকথার মায়া। ছেলেটি বিজয়গর্ব্বে দাঁড়িয়ে আছে ; রাজকুমারীকে সোনার গাছের হীরের ফল এনে দিয়ে অরূপকুমার নিশ্চয় একদিন এই রকম ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল।"

তারাপদ একটু অপেক্ষা করিয়া ঈষৎ হাসিয়া প্রশ্ন করিল, "তারপর ?"

শৈলেন বলিল, "হ্যাঁ, একটা 'তারপর' আছে বৈকি ;—তারপর সেই দৃশ্যমঞ্চে পুরোহিত প্রমুখ গ্রামের একপাল লোকের প্রবেশ—দুপুরের চেয়েও উগ্রমূর্ত্তি সবার ; পথ-নির্দ্দেশক গোবরা।…হাঁ, বলেছিলাম, এ রোম্যান্সে হত্যা পর্য্যন্ত আছে, সেটা আর কিছু নয়, তোমার গাভিস-লিকো-পড়া মনে ঔৎসুক্যটা জাগিয়ে রাখবার জন্যে ; ক্ষমা কর। ও কি !—তোমায় হঠাৎ অমন উদাস দেখাচ্ছে কেন ? রেশমী উড়নীর মায়ার ছোঁয়াচ না, গোবরার হাতে হত্যা হলাম না বলে নিরাশা ?—তার হাতে যতটুকু ছিল তা তো সে করেই ছিল।"

আমাদের অবস্থা

…আমাদের তাঁতী, ধোবা, ছুতার, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, চর্ম্মকার, এবং কৃষক প্রভৃতি জনসাধারণ একদিন যাহা বিনা ব্যয়ে শিক্ষা করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন করিতে পারিত, এক্ষণে আমাদের মধ্যবিত্ত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের সন্তানগণ পিতামাতার বহু টাকা খরচ করিয়া weaving-এর নামে তাঁতীগিরি, dyeing-cleaning-এর নামে ধোবাগিরি, carpentry-র নামে ছুতারগিরি, smithy-এর নামে কর্ম্মকারগিরি, pottery র নামে কুম্ভকারগিরি, tanning-এর নামে মুচিগিরী, agriculture-র নামে কৃষকগিরি শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অথচ, আমাদের তাঁতী প্রভৃতি একদিন বিনা ব্যয়ে যাহা যাহা শিক্ষা করিলে স্বাধীনভাবে জীবিকার্জ্জন করিতে পারিত, অধুনা মধ্যবিত্ত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের সন্তানগণ-পর্য্যন্ত বহু অর্থব্যয়ে তাদৃশবিষয়ক শিক্ষা লাভ করিয়াও স্বাধীনভাবে ত' দূরের কথা, চাকুরী করিয়াও সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে দিনাতিপাত করিতে সমর্থ হইতেছেন না।…

মগধ ও দক্ষিণ-বিহার

—শ্রীঅবনীনাথ রায়

প্রতি বছর প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের নাম করে দেশ-বেড়ানোর কাজটা হয়। না হলে ভারতবর্ষের মধ্যেই এই যে সামান্য একটু ঘুরে বেড়ানো তা-ও হয়ত হত না। এই রকম করেই দিল্লি আগ্রা, রাঁচি দেখা হয়েছে—এবার গেলুম পাটনায়। বিহারে এই আমার প্রথম যাত্রা।

প্রতিনিধি-নিবাস হয়েছিল ক্যাভেণ্ডিস হলে। নাম থেকেই বোঝা যাবে এটি বিজ্ঞান-কলেজের ছাত্রাবাস, ক্যাভেণ্ডিস একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ছিলেন। এই ছাত্রাবাসটি হুইলার হলের খুব সন্নিকটে, আর হুইলার হলে সম্মেলন বসবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সুতরাং প্রতিনিধিদের সম্মেলনে যোগ দেওয়ার কোন অসুবিধা হয় নি। কিন্তু সব চেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল হুইলার হলের প্রবেশদ্বারের তোরণ। কর্তৃপক্ষেরা এর নাম দিয়েছিলেন "অশোক তোরণ।" এটি মহারাজা অশোকের সময়কার পাটলিপুত্রের রেলিং-এর অনুকরণে তৈরি করা হয়েছিল।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহাশয় তাঁর অভিভাষণে পাটনার অতীত গৌরবময় কাহিনির উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, 'ইহা কি সম্ভব যে আজ আমরা উদয়ের কুসুমপুরে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সমবেত? ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য যে, আজ আমরা অশোক ও চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী সেই গৌরব-গরিমা-মণ্ডিত মহানগরী পাটলিপুত্রের তোরণদ্বারে দণ্ডায়মান?'

মনে হল, সাহিত্য-সম্মেলন উপলক্ষে পাটনায় এসে যদি বিংশ শতাব্দীর পাটনাটুকুই মাত্র দেখে যাই, তবে নিজেকে বঞ্চিত করব নিঃসন্দেহ। আর তা হলে বৃথাই অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহাশয় অতীতের পাটলিপুত্রের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে চেষ্টা করলেন। বর্তমান পাটনার মর্মপিঞ্জরে অতীত সভ্যতার যে কাহিনী আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় লুকিয়ে আছে, তার মর্মোদ্‌ঘাটন আমাদের করতেই হবে।

প্রাচীন মগধ তাৎকালীন সভ্যতার জন্মভূমি, এ কথা বললে অত্যুক্তি হয় না। নর্মাণদের পূর্বে ইংলণ্ডের ইতিহাসে ওয়েসেক্সের (Wessex) যে স্থান, বর্তমান জার্মানির ইতিহাসে প্রাসিয়ার (Prussia) যে স্থান, প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে মগধেরও সেই স্থান। অর্থাৎ,মগধকে কেন্দ্র করে বহু সভ্যতার উত্থান এবং পতন হয়েছে। তিনটি নগরের ইতিহাস বিবৃতি করলেই প্রধানত মগধের ইতিহাস বলা হবে - তাদের নাম রাজগীর, নালান্দা এবং পাটলিপুত্র। কেন না এরাই মগধের রাজধানী এবং সভ্যতার লীলাভূমি ছিল। আমরা সাহিত্য-সম্মেলন উপলক্ষে গিয়ে এই তিনটি দ্রষ্টব্য স্থান দেখে এসেছি।

এই প্রাচীন কাহিনীর আরম্ভ খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে (6th century B. C.), অর্থাৎ আজকের দিন থেকে আড়াই হাজার বছর পূর্বে। বলা বাহুল্য, এই সময়কার খুব নির্ভরযোগ্য ইতিহাস নেই *। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, বৌদ্ধ ধর্মের সময় থেকেই ভারতের ঐতিহাসিক যুগ আরম্ভ হয়েছে, তার পূর্বে নয় †। সুখের বিষয় এখন আমাদের দেশের সুধীজনের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে এবং প্রাচীন ভারতের ইতিহাস নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা চলছে।

ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে উত্তর-ভারত ১৬টি রাজ্যে বিভক্ত ছিল, তাদের নাম 'ষোড়শ মহাজনপদ'। যথা :—(১) অঙ্গ (২) মগধ (৩) ভজ্জি (৪) কাশী (৫) কোশল (৬) মল্ল (৭) বংশ (৮) চেদি (৯) পাঞ্চাল (১০) কুরু (১১) মৎস্য (১২) সুরসেন (১৩) অশ্বক (১৪) অবন্তী (১৫) গান্ধার (১৬) কাম্বোজ। বুদ্ধের সময় উত্তর-ভারত কতকগুলি ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়েছিল, তাদের মধ্যে তিনটি প্রধান। প্রথম মগধ, তার রাজধানী ছিল রাজগৃহে, দ্বিতীয় কোশল তার রাজধানী

* No Thucydides or Tacitus has left for posterity a genuine history of Ancient India—Political History of Ancient India, by Dr. H. C. Ray Chandhuri p. 1.

† The rise of Buddhism marks the beginning of the historical period in India—Prehistoric, Ancient and and Hindu India by R.D. Banerji p, 66.

শ্রাবস্তি এবং তৃতীয় বংশ (অথবা বৎস), তার রাজধানী কৌশম্বী।

তখন মগধ বলতে বর্ত্তমানের পাটনা এবং গয়া জেলা বোঝাত। মগধের প্রাচীন এবং প্রথম রাজধানী রাজগৃহ (বর্ত্তমান রাজগীর)। মহাভারতে এই সহরের নাম দেওয়া হয়েছে গিরিব্রজ, বৃহদ্রথপুর বা মগধপুর। পাঁচটি পাহাড়ের মধ্যে এই সহর সুরক্ষিত ছিল বলে এর নাম গিরিব্রজ। পাহাড়গুলির নাম :—বৈহার (বিপুল শৈল), বরাহ, বৃষভ, ঋষি-গিরি এবং চৈত্যক (ক)। রামায়ণে রাজগৃহের নাম দেওয়া হয়েছে বসুমতী। চীনা পরিব্রাজক হুয়েন্‌সাং নামোল্লেখ করেছেন কুশাগ্রপুর বলে। কোন কোন ভারতীয় বৌদ্ধ রাজগৃহের উল্লেখ করেছেন বিম্বিসারপুরী নাম দিয়ে।

রাজগৃহ সহর দু'বার নির্ম্মিত হয়। শিশুনাগ বংশের রাজত্বকালে পুরাণ সহর ছেড়ে এসে উত্তরদিকের ফটকের বাইরে নতুন সহরের পত্তন হয়। পুরাণ রাজগৃহ সুপেয় জল-সংযুক্ত একটি উপত্যকায় অধিষ্ঠিত ছিল—তার চারিপাশে ছিল পাহাড়। পাহাড়ের মাথার উপর পাথরের দেয়াল দিয়ে ছিল ঘেরা—এ দেয়াল গ্রীসের মাইসিন এবং টাইরিণের দেয়ালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় (Cyclopean walls of Mycenae and Tiryns in Greece)। এ দেয়াল এখনও বর্ত্তমান আছে এবং ডাঃ স্পুনারের মতে এর প্রস্তর-শিল্প (masonry work) ভারতের মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীন *। এই সহরে প্রবেশ করবার মাত্র দুটি রাস্তা ছিল—একটি দক্ষিণ মগধ, অর্থাৎ গয়া জেলার দিক দিয়ে। আর একটি উত্তর মগধ বা লিচ্ছবিদের দেশ দিয়ে। এই দুই গিরিসঙ্কটই ভারি পাথরের দেয়াল এবং স্তম্ভ (tower) দিয়ে সুরক্ষিত ছিল।

(ক) কারও মতে পাঁচটির নাম :—বৈভার (বা ব্যবহার), বিপুল, রত্নগিরি উদয়গিরি এবং সোনাগিরি।

* "The beginnings of the older city are quite lost in the impenetrable mists of the earliest antiquity but as the 'modern city' outside its gates dates from at least the sixth century B. C. it seems safe to assign the rude but massive masonry of the inner one to a period which can hardly be later than the eighth century B. C. and may be incalculably older—Dr. D. B. Spooner.

হিন্দুযুগে 'গিরিব্রজ' নামেরই উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়, বৌদ্ধযুগে রাজগৃহ নাম প্রসিদ্ধি লাভ করে।

মহাভারত এবং পুরাণাদির মতে মগধের সর্ব্বপ্রাচীন বংশ বৃহদ্রথ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। বৃহদ্রথের বাপের নাম বসু চৈদি ওপরিচর (Vasu Chaidy-Oparichara) এবং ছেলের নাম জরাসন্ধ। জরাসন্ধের সময় মগধ সৌভাগ্যের উচ্চশিখরে আরোহণ করে। জরাসন্ধ শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক। হরিবংশে জরাসন্ধের শৌর্য্যবীর্য্যের এবং ধনদৌলতের বিশেষ উল্লেখ আছে। মহাভারতের সভাপর্ব্বে* মগধের রাজধানী গিরিব্রজের বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায় এই সহরের গরু-বাছুর, পানীয়, বৃক্ষাদি, বাড়ী ঘরদোর, পাল-পার্ব্বণ উৎসব, প্রসন্নমুখ অধিবাসী, দোকান-পসার, খাদ্যদ্রব্য, ফুলের মালা প্রভৃতির প্রশস্তি করা হইয়াছে। বায়ুপুরাণের রাজগৃহ-মাহাত্ম্য থেকে দেখা যায় তখন সরস্বতী নদী সেখানে প্রবহমান ছিল। পুরাণে উল্লেখ আছে যে, রাজগৃহের সরস্বতী নদীতে একবার স্নান করলে নর্ম্মদায় দশমাস এবং গঙ্গায় এক বছর স্নান করার সমান পুণ্যলাভ হয়।

জৈন এবং বৌদ্ধযুগে রাজগৃহ সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করে। বিম্বিসারের রাজত্বকালে রাজগৃহ জৈন-ধর্ম্মের কেন্দ্র ছিল। উত্তরদিকের ফটকের বাইরে যে নতুন রাজগৃহ নির্ম্মিত হয়, কারও মতে বিম্বিসার তার নির্ম্মাতা, আবার কেউ বলেন অজাতশত্রু। কেউ বলেন বিম্বিসার শিশুনাগবংশীয়, কেউ বলেন হর্য্যাঙ্ককুলসম্ভূত। চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়ানের মতে নতুন রাজগৃহ অজাতশত্রু কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, আবার হুয়েন্‌-সাং কুশাগ্রপুরে, অর্থাৎ পুরাণ রাজগৃহে এক অগ্নিকাণ্ডের বর্ণনা করেছেন। পুরাণ রাজগৃহে বিম্বিসারের মৃত্যু হয়। পুত্র অজাতশত্রু এইখানেই পিতাকে কারারুদ্ধ করেছিলেন এবং রাণী রাজাকে রক্ষা করতে যথেষ্ট চেষ্টা করেন। শ্রমণফলসূত্র থেকে দেখা যায় যে, পুরাণ রাজগৃহ থেকেই অজাতশত্রু বুদ্ধের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য রওনা হয়েছিলেন এবং অনুতপ্ত রাজা পিতৃহত্যার অপরাধ স্বীকার করেছিলেন।

জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর রাজগৃহে অনেকদিন ছিলেন এবং তিনি নৃপতি বিম্বিসারকে জৈন-ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন বলে কথিত আছে। মহাবীরের এগার জন গণধর (Ganadharas)

*সভাপর্ব্ব, ১৯, ২২।৪,২১।

পবিত্রভূমি বলে রাজগৃহে দেহত্যাগ করেন। ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহে অনেক সময় কাটিয়েছিলেন। তাঁর পবজ্জাসুত্ত (Pabbajjasutta) এখানেই কথিত হয়। রাজগৃহের গৃধ্রকূট পর্ব্বতে ভগবান তথাগত মাঘ নামক যুবককে যে উপদেশ দেন তার নাম মাঘসুত্ত। বিম্বিসার বুদ্ধের বাসস্থানের জন্য এক বাঁশের কুঞ্জ উপহার দেন—তার নাম করণ্ড বেণুবন। এইখানে সভিয়া পরিব্রাজককে তথাগত যে উপদেশ দেন, তার নাম সভিয়াসুত্ত। গৃধ্রকূট পাহাড়ে মহাপরিনির্ব্বাণসুত্ত প্রদত্ত হয়। সত্য কথা বলতে কি, রাজগৃহের অনেক পাহাড়ের চূড়া, উপত্যকা, অধিত্যকা বুদ্ধের পদরেণুপূত। এখানেই সিদ্ধার্থ প্রথম ভিক্ষা করতে বেরিয়েছিলেন এবং রাজা বিম্বিসার তাঁকে ধনরত্ন দ্বারা প্রলুব্ধ করেছিলেন এবং অর্দ্ধেক রাজত্বদান করতে চেয়েছিলেন। রাজগৃহেই অজাতশত্রুর সঙ্গে বুদ্ধের দেখা হয় এবং বুদ্ধ এখানে ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেন। বুদ্ধের দেহত্যাগের পর প্রথম বৌদ্ধ সভা বা মহাসঙ্গীতি (Buddhist Council) এখানেই বসে। বুদ্ধের প্রধান শিষ্য মহাকাশ্যপ বৈহার পাহাড়ের নিকটে পুরাণ সহরের প্রাচীরের উপর বৌদ্ধ শ্রমণদের সমবেত করেছিলেন। এই স্থানের নাম সপ্তপর্ণি গৃহ (Sattapanni Hall) পাথরের উঁচু বেদি (stone platform) এবং পাথরের সিঁড়ি দ্বারা এই স্থানটির নিশানা এখন পাওয়া যায়। রাজগৃহ থেকে রাজধানী অপসৃত হওয়ার পর রাজগৃহের সমস্ত গৌরব লুপ্ত হয়।

এই ত গেল প্রাচীন রাজগৃহের কথা, যার বর্ত্তমান নাম রাজগীর। স্থানটি যে সুন্দর, স্বাস্থ্যকর এবং নয়নাভিরাম তা' আমরা দেখেই বুঝতে পারলাম। বিহার-বক্তিয়ারপুর লাইট রেলওয়ের এটি শেষ ষ্টেশন। ষ্টেশন থেকে ব্রহ্মকুণ্ড এক মাইলের বেশী পথ হবে। ব্রহ্মকুণ্ডে গরম জলের ঝরণা—ঝরণার উৎসমুখ কোথায় তা খুঁজে পাওয়া গেল না। স্নান করে আমাদের পথশ্রম অপনোদিত হল। ঝরণার জল খুব উপকারী ; কেউ কেউ বললেন কোলোনের (Cologne) জলের সঙ্গে তুলনীয় এবং সঙ্গে যে থার্মো-ফ্লাস্ক ছিল তা' বোঝাই করে জল নিলেম। সেখান থেকে আমরা মনিয়ার মঠ দেখতে গেলুম। এ জায়গাটি পুরাণো রাজগৃহ সহরের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত—নাগ মণিভদ্রের নামানুসারে হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ খুঁড়ে খুঁড়ে এই মন্দিরটির অনেক গুলি স্তর আবিষ্কার করেছেন। সেই স্তর গুলি থেকে স্থাপত্যের নিদর্শন অনুযায়ী অনেক গুলি যুগের প্রমাণ পাওয়া গেছে। কিন্তু আমাদের সব চেয়ে আশ্চর্য্য লাগল এই দেখে যে, সেখানে ভূগর্ভ থেকে যে স্থান খুঁড়ে বার করা হয়েছে সেখানে ইঁটের গাঁথা যজ্ঞভূমি বর্ত্তমান। আর শুধু যজ্ঞভূমি নয়, যজ্ঞভূমির ভস্ম পর্য্যন্ত রয়েছে এবং যে মৃৎপাত্র থেকে যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দেওয়া হত, সেই পাত্রগুলি পর্য্যন্ত পাওয়া গেছে। সেখান থেকে কিছু দূরে পাহাড়ের ভিতর একটি ঘর দেখতে পেলুম, শুনলুম সেটি না কি জরাসন্ধের ধনভাণ্ডার (treasury) ছিল। দেয়ালের গায়ে সোনালি রঙের দাগ এখনও বর্ত্তমান আছে। বাইরের দেয়ালে অজানা ভাষায় (hieroglyphic) কি সব লেখা আছে—প্রত্নতত্ত্ববিভাগও তার অর্থোদ্ধার করতে পারেন নি। গৃধ্রকূট পাহাড়ে চীনদেশীয় এবং ব্রহ্মদেশীয় অনেক বৌদ্ধ সাধু ঘণ্টা বাজিয়ে এবং ধুপুচি জেলে হাতে করে পূজা দিতে যাচ্ছেন দেখলুম। ওখান থেকে কিছু দূরে একটা জায়গায় সাদা খড়ির মত নরম মাটি পাওয়া গেছে শুনলুম, যা আশে পাশের মাটি থেকে একেবারে স্বতন্ত্র। খানিকটা জায়গা নিয়ে সেখানকার মাটি যেন চেষ্টা ক'রে নরম করা হয়েছিল, এর থেকে এই অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত নয় যে, জরাসন্ধের সঙ্গে ভীমের গদাযুদ্ধ সেখানে হয়েছিল।

রাজগীরের স্বাস্থ্য বিহার গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সেখানে ষাট হাজার টাকা ব্যয়ে রাজেন্দ্রপ্রসাদ হল নির্ম্মিত হবে। সেটা হবে কর্ম্মক্লান্ত কংগ্রেস-কর্ম্মীদের বিশ্রামাগার। কয়েক বৎসরের মধ্যেই রাজগীর হাওয়া বদলানোর একটি ফ্যাসনেবল স্থান বলে পরিগণিত হবে।

—

এইবার আমরা নালান্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কথা বলবও। কার্লাইল বলেছিলেন যে, বিশ্ব বিদ্যালয় মানে হচ্ছে, বইয়ের সমষ্টি (a true University is a collection of books). নিউম্যানের মতে বিশ্ব-বিদ্যালয় হচ্ছে এমন স্থান, যেখানে দেশ-বিদেশের শিক্ষার্থীরা সমবেত হয় (a school of universal learning, implying the assemblage of strangers from all parts in one spot). এই দুই মনীষীর মত

অনুসারে নালান্দা প্রাচীন ভারতের প্রকৃত বিশ্ব-বিদ্যালয় ছিল*।

নালান্দা বিহার বক্তিয়ারপুর লাইট রেলওয়ের একটি ষ্টেশন—রাজগীর থেকে ৮ মাইল। বক্তিয়ারপুর থেকে রাজগীর যেতে নালান্দা পথের মধ্যে পড়ে। স্থানটির নাম ছিল বড়গাঁ (ডাঃ ব্লকের (Dr. Bloch) মতে বরগড়)। এখন ষ্টেশনের নামও হয়েছে নালান্দা। ষ্টেশন থেকে শ্রমণাবাসের (monastery) ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়, বোধ হয় মাইল খানেক দূর হবে। রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি অব গ্রেট ব্রিটেন এণ্ড আয়র্লাণ্ডের চেষ্টায় এবং অর্থানুকূল্যে এখানকার খননকার্য্য আরম্ভ হয়। ভারতীয় স্থাপত্যের জনক জেনারেল কানিংহাম সর্ব্বপ্রথম এই স্থানটি চিহ্নিত করেন। তিনি বলেছিলেন যে, এইখানে ভারতীয় ভাস্কর্য্যের এবং বাস্তু-শিল্পের অনেক নমুনা দেখতে পাওয়া যাবে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে।

চীনা পরিব্রাজক ফাহিয়ান (Fa-hien) চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আসেন। তিনি তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে নালান্দার কোন উল্লেখ করেন নি। হুয়েন্থসাং (রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বানান Yuan chwang) সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আসেন। তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে নালান্দার বহুল বর্ণনা আছে। তার কারণ তিনি এক বছর সাত মাস নালান্দায় বসবাস করেছিলেন। হুয়েন্থ সাং দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে বিদেশ পরিভ্রমণ করেন। আটাশ কিংবা ঊনত্রিশ বছর বয়সে ৬২৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি চীন দেশ থেকে ভ্রমণে বেরোন এবং ৬৪৫ খৃষ্টাব্দে সেখানে ফিরে যান। ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি মগধে আসেন এবং বৌদ্ধদের সমস্ত তীর্থ দর্শন করেন। ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে তিনি নালান্দায় ছিলেন। হুয়েন্থসাং মধ্য-এসিয়ার মরুভূমি পেরিয়ে টাসখেন্দ এবং সমরখন্দের ভেতর দিয়ে ভারতবর্ষে পৌছান। তারপর বাল্‌খের (Balkh) ভিতর দিয়ে এসে হিন্দুকুশ পেরিয়ে তিনি কাবুলের নিকট কপিশায় পৌছান। কপিশায় এসে তিনি সর্ব্বপ্রথম ভারতবাসীদের দর্শন পান।

নালান্দার নামের উৎপত্তির বহু ইতিহাস শুনতে পাওয়া যায়। কারোর মতে বুদ্ধ এখানে প্রচুর দান ধ্যান করেছিলেন। তাই তাঁর স্মৃত্যর্থে 'না—অলম্ দা' (charity without intermission) বা নালান্দা সংঘারামের নামকরণ হয়। কারোর মতে সংঘারামের দক্ষিণে আম্রকুঞ্জের মধ্যে একটি পুকুর ছিল। সেই পুকুরের নাগের (dragon) নাম অনুসারে স্থানটির নাম হয়েছে নালান্দা। চীনা পরিব্রাজক ইত্‌সিং (I-tsing) বলেন, নাগ নন্দের নাম থেকে স্থানের নাম হয়েছে নালান্দা। হুয়েন্থসাং বলেন, ঐখানে অনেক আমের বাগান ছিল। পাঁচশো জন ব্যবসাদার দশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করে জায়গাটি ক্রয় করেন এবং বুদ্ধকে বাস করবার জন্যে দান করেন। পণ্ডিতেরা বলেন যে, স্বয়ং বুদ্ধকে সম্ভবতঃ স্থানটি দেওয়া হয় নি, পরবর্ত্তী কোন বৌদ্ধ সাধুকে দেওয়া হয়েছিল।

হুয়েন্থসাং-য়ের বিবরণ পড়ে জানা যায় যে, বুদ্ধের নির্ব্বাণ লাভের পর পাঁচজন রাজা পাঁচটি সংঘারাম তৈরি করিয়েছিলেন। তাঁদের নাম শক্রাদিত্য, বুদ্ধগুপ্ত, তথাগত, বলাদিত্য এবং বজ্র। মধ্য-ভারতের কোন রাজা (হুয়েন্থসাং তাঁর নাম দেন নি) আর একটি বড় সংঘারাম তৈরি করিয়েছিলেন এবং তার চারিপাশে উঁচু দেয়াল দিয়েছিলেন। তার একটি মাত্র ফটক ছিল এবং সেখানে একজন দ্বারপণ্ডিত বসতেন। ইনি বাইরের কেউ ভিতরে গিয়ে শাস্ত্রালোচনায় যোগ দেওয়ার উপযুক্ত কি না, সেটা পরীক্ষা করতেন।

মগধের রাজা বলাদিত্য হন সম্রাট মিহিরকুলের সমসাময়িক। মিহিরকুল ৫১৫ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব সুরু করেন। বলাদিত্যের পূর্ব্ববর্ত্তী ৩ জন রাজা যদি ২৫ বছর করে গড়-পড়তা রাজত্ব করে থাকেন, তবে শক্রাদিত্য ৪৫০ খৃষ্টাব্দে রাজা ছিলেন বলা যায়। অতএব নালান্দার মঠের বয়স ৪৫০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি এ কথা ধরে নেওয়া যায়। জেনারেল কানিংহামের মতে নালান্দার মঠ ৪২৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ৬২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হয়েছিল। হুয়েন্থসাং বলেন যে, বলাদিত্যের মঠ এবং বুদ্ধ-গয়ার মন্দিরের মধ্যে ষ্টাইলগত সাদৃশ্য আছে।

হুয়েন্থ সাং বলেন যে, নালান্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পুরোহিত-দের রাজা খুব খাতির করতেন এবং প্রায় একশ খানি গ্রামের রাজস্ব ওর ব্যয়নির্ব্বাহার্থে দান করেছিলেন। ছাত্রদের

* নালান্দা ছাড়া মগধে আরও দুটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, বিক্রমশীলা আর একটি ওদন্তপুরী। এ ছাড়া তক্ষশীলায় এবং কৃষ্ণা নদীর তীরে শ্রীধন্য কটকে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল।

আহারাদির বেশ সুব্যবস্থা ছিল। হুয়েন্ সাং নিজে প্রতিদিন ১২০টি জাম্বিরা, ২০টি পূগ (Areca nuts) এবং এক পেক (peck প্রায় ১৫ পাউণ্ড) মহাশালী ধান পাওয়ার জন্য পেতেন। এ ছাড়া দরকারমত তেল এবং মাখন তাঁকে দেওয়া হত।

নালান্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করার আইন খুব কড়া ছিল। অধ্যাপক এবং ছাত্রদের মধ্যে খুব যোগ ছিল। গুরুকে সেবা করার যে পুরাণ আদর্শ তা তখন ছিল। ওখান থেকে গ্রাজুয়েট হওয়ার পর ছাত্রেরা রাজ-দরবারে চাকরি খুঁজতে যেত। হুয়েন্‌সাংয়ের সময়ে দশ হাজার ছাত্র ওখানে বৌদ্ধধর্ম্মের 'Great Vehicle' অধ্যয়ন করত। এ ছাড়া বেদ, হেতুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা এবং সাংখ্য প্রভৃতি পড়ানো হত। পড়ানোর জন্যে অধ্যাপকদের একশ বেদী (pulpit) ছিল। শিক্ষকদের মধ্যে ধর্ম্মপাল, চন্দ্রপাল, গুণমতী, স্থিরমতী, প্রভামিত্র, জীনমিত্র, জ্ঞানচন্দ্র এবং শীলভদ্রের নাম পাওয়া যায়। শীলভদ্র বাংলা দেশের একজন রাজপুত্র ছিলেন এবং সংসার ত্যাগ করে এসেছিলেন। হুয়েন্‌সাং শীলভদ্রের কাছে পড়তেন। পরিব্রাজক ইৎসিং প্রতিভাশালী ছাত্রদের মধ্যে নাগার্জ্জুন, দেব অশ্বঘোষ, বসুবন্ধু, অসঙ্গ, দিগ নাগ এবং কমলশীলের নাম করেছেন। এদের মধ্যে নাগার্জ্জুন সর্ব্বপ্রধান। নাগার্জ্জুন সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। তিনি ছাত্র থেকে সুরু করে সমগ্র বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের গুরু পর্য্যন্ত হয়েছিলেন। তিনি এত সুন্দর ধর্ম্মোপদেশ দিতেন যে নাগেরা পর্য্যন্ত বালকবেশে তাঁর উপদেশ শুনতে আসত। বৌদ্ধ ধর্ম্মের মাধ্যমিক দর্শন তাঁর কৃত।

নালান্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রত্যেক ছাত্রকে প্রথমে ব্যাকরণ পড়তে হত। ব্যাকরণের পর বৃত্তিসূত্র (পাণিনিসূত্রের ভাষ্য)। তার পর হেতুবিদ্যা (Logic) এবং অভিধর্ম্ম কোষ (Metaphysics) পড়তে হত। ন্যায়বা তর্কশাস্ত্র পড়তে গিয়ে ছাত্রদের অনুমান (inference) করতে হত। তারপর বৌদ্ধ জাতক (Buddhist birth-stories) পড়তে হত। এ সব পড়া হয়ে গেলে পর তারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ঢুকতে পারত। এখন যেমন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ডিপ্লোমা দেওয়ার পদ্ধতি আছে, তখন তেমনি প্রসিদ্ধ ছাত্রদের নাম উঁচু ফটকে সাদা অক্ষরে লিখে রাখা হত।

তিব্বতী বিবরণ থেকে পাওয়া যায় যে, নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম্মযজ্ঞ বলে যে একটা বিভাগ, ছিল সেখানে খুব মূল্যবান গ্রন্থাগার ছিল। তিনটি বাড়ি জুড়ে এই গ্রন্থাগার অবস্থিত ছিল তাদের নাম রত্নসাগর, রত্নোদধি এবং রত্নারঞ্জক। বৌদ্ধ ধর্ম্মের বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং সংঘ, এই তিন নীতির অনুকরণে এই তিন লাইব্রেরি। রত্নোদধি বাড়িটা ছিল নয় তালা (nine storeyed), সেখানে প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র প্রভৃতি মূল্যবান গ্রন্থ রক্ষিত ছিল। মুসলমানদের আক্রমণে এই লাইব্রেরি নষ্ট হয় এবং পরে আগুনে একেবারে পুড়ে যায়।

নালান্দার একটি আদর্শ (motto) উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গ শেষ করব – Conquer anger by pardon, conquer a bad man by good deeds, conquer a miser by giving him more and conquer a liar by truth (ক্ষমা দ্বারা ক্রোধকে জয় কর, দুষ্টকে সৎকার্য্যের দ্বারা জয় কর, কৃপণকে দানের দ্বারা জয় কর এবং মিথ্যাবাদীকে সত্যের দ্বারা জয় কর)।

বঙ্গদেশের পালবংশের রাজা দেবপাল নালান্দার কয়েকটি ভিক্ষুনিবাস এবং সম্ভবতঃ বুদ্ধগয়ার বড় মন্দিরটির সংস্কার করিয়েছিলেন। দেবপাল শিক্ষা এবং সংস্কৃতির বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর রাজধানী তখন দেশ-বিদেশের বৌদ্ধ পণ্ডিতদের আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হুনদের দ্বারা তক্ষশীলা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর চারশো বছর ধরে রাজার সাহায্যে বাংলাদেশে এবং বিহারে বৌদ্ধধর্ম্ম টিঁকে ছিল। সুবর্ণদ্বীপের (বর্ত্তমান যবদ্বীপ) বৌদ্ধরাজা বলপুত্রদেব নালান্দার পুণ্যভূমিতে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাবার অনুমতি চেয়ে দেবপালের কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন*। দেবপাল খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে রাজত্ব করেছিলেন।

বর্ত্তমান নালান্দা ধ্বংসস্তূপ ব্যতীত আর কিছুই নয় – প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ ভূগর্ভ থেকে খুঁড়ে খুঁড়ে ভারতের প্রাচীন এবং লুক্কায়িত কীর্ত্তি লোকচক্ষুর গোচর করছেন। নালান্দায় ছাত্রেরা যে সব ঘরে বাস করত তা বেরিয়েছে, তাদের স্নানাগার, এমন কি শৌচের মাটির ভাঁড়গুলি পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে, যা আজকের দিনের মাটির বদনার মত, (কেবল জল ঢালার মুখটায় জোড় লাগান)। যেখানে খোঁড়া হচ্ছে সেখান

*Prehistoric Ancient and Hindu India—P. 260-261.

থেকে কিছু দূরে রাস্তার অপর পারে আম্রকানন, তারি মাঝখানে মিউজিয়াম—খননকার্য্যে যে সব বস্তু পাওয়া গেছে এবং এখনও পাওয়া যাচ্ছে,সেগুলি সেখানে রক্ষিত হচ্ছে। তার কতক কতক অবশ্য পাটনার বড় মিউজিয়ামেও রাখা হয়েছে। জল রাখার বড় জালা, আসনোপবিষ্ট বহু বুদ্ধমূর্ত্তি, তাম্রশাসন, মুদ্রা প্রভৃতি কত কি যে পাওয়া গেছে, তার ইয়ত্তা নেই। আম্রকাননে তাঁবু ফেলে দেশ-বিদেশের অনেকে রয়েছেন দেখলাম। শান্তিনিকেতন থেকে ছুটির সময় বিশ্বভারতীর ছাত্রেরা এসে নালান্দায় না কি তাঁবু ফেলে মাসখানেক কাটিয়ে যায়। বাস্তবিক যখন চতুঃপার্শ্বের দিগন্তব্যাপী মাঠের মাঝখানে ভূগর্ভে প্রোথিত ধ্বংসস্তূপের দ্বারে উজ্জ্বল সূর্য্যালোকে আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম, তখন বর্ত্তমান কালকে অতীতের রাজ্যে নেহাত প্রক্ষিপ্ত বলেই মনে হচ্ছিল।

এইবার পাটলিপুত্রের কথা বলে মগধের প্রাচীন কাহিনী শেষ করব। রাজগৃহের পর পাটলিপুত্রের অভ্যুত্থান হয় পূর্ব্বেই বলেছি। বুদ্ধের প্রধান শিষ্য আনন্দের মতে পাটলিপুত্র তখনও মহানগর বলে বিবেচিত হয় নি, যেখানে বুদ্ধের নির্ব্বাণ লাভ হতে পারে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, তখন পাটলিপুত্র রাজগৃহের চেয়ে ছোট জায়গা ছিল। মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র থেকে পাওয়া যায় যে, বুদ্ধ শিষ্যগণসহ রাজগৃহ থেকে বেরিয়ে নালান্দার ভিতর দিয়ে পাটলিগাঁম-এ আসেন। সেখানে তাঁরা সাদরে অভ্যর্থিত হন। পরদিন প্রাতে বুদ্ধ আনন্দকে জিজ্ঞাসা করেন, আনন্দ, কে এই পাটলিগাঁম সহর তৈরী করাচ্ছে? উত্তরে আনন্দ বলেন, প্রভু, ভজ্জিদের (Vajjis) আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্য মগধের প্রধান মন্ত্রী সুনিধ এবং বশকার এই সহর তৈয়ার করাচ্ছেন। তখন বুদ্ধ বলেন, আনন্দ, আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি এই সহর ভবিষ্যতে বহু দেবতার বাসস্থান হবে। কেবল এই সহরে তিনটি জিনিষের ভয় আছে—সে হচ্ছে আগুন, জল, আর অন্তর্বিপ্লব। এর পর বুদ্ধ পশ্চিম দরজা দিয়ে পাটলিগাঁম ত্যাগ করেন, উত্তরমুখে গিয়ে গঙ্গা পার হন। এই দরজার নাম এখন 'গোতমের দরজা' এবং পারঘাটের নাম 'গোতমের ঘাট'। অজাতশত্রু পুত্র উদয়ন (বা উদয়ভদ্র) তাঁর রাজ্যের চতুর্থ বর্ষে গঙ্গার দক্ষিণতীরে কুসুমপুর নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন গ্রন্থে এই কারণে পাটলিপুত্রের নাম কুসুমপুর বা পুষ্পপুর। জৈন পরিশিষ্ট পর্ব্বণ থেকে জানা যায় যে, পিতার মৃত্যুর পর উদয় অত্যন্ত শোকাকুল হয়ে পড়েন এবং রাজকার্য্য পরিচালনে অসমর্থ হন। তখন মন্ত্রীরা পরামর্শ দেন যে, পিতার স্মৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রাচীন রাজধানী ছেড়ে গেলে শোকের বেগ কম হবে। তখন নগর-পত্তনের জন্য সুলক্ষণযুক্ত একটি জায়গার খোঁজ করা হয় এবং গঙ্গার তীরে পত্রপুষ্প সুশোভিত পাটলি গাছ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাজা এই স্থানটি নির্ব্বাচন করেন। তারপর পাটলি গাছটিকে পূর্ব্বদিক রেখে নগরের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয় এবং পরে ঐ স্থান পাটলিপুত্র নামে খ্যাত হয়।

ঐতিহাসিক যুগে প্রথম পাটলিপুত্রের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় খৃষ্টপূর্ব্ব ৩০৩ শতাব্দীতে মেগাস্থিনিসের ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যে। মেগাস্থিনিস গ্রীক-রাজ সেলুকাস নিকটারের দূত এবং পাটলিপুত্রকে পালিমবোথ্রা বলে বর্ণনা করেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মেগাস্থিনিসের পাটলিপুত্র বর্ণনা এবং 'অর্থশাস্ত্রে'র মধ্যে চাণক্যের পাটলিপুত্র বর্ণনা হুবহু এক। অবশ্য এ কথা বলা প্রয়োজন যে, মেগাস্থিনিসের ভ্রমণ কাহিনীর বেশী অংশ নষ্ট হয়ে গেছে—কিছু কিছু অংশবিশেষ পাওয়া গেছে মাত্র। কিন্তু চাণক্যের 'অর্থশাস্ত্র' আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে এটুকু অন্তত প্রমাণ হয়েছে যে, মেগাস্থিনিসের ভ্রমণকাহিনী স্বকপোলকল্পিত নয়।

সারনাথের পঞ্চম পর্ব্বত অনুশাসনে (edict) রাজধানী পাটলিপুত্রের নাম লেখা আছে। অশোকের সময় পাটলিপুত্রে বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতির এক অধিবেশন (Buddhist council) হয়েছিল এবং অশোকের রাজসভায় তিসসা মোগগলিপুত্ত (Tissa Moggaliputta) (অন্যনাম উপগুপ্ত) ত্রিপিটক সম্বন্ধে বই লেখেন।

সুঙ্গ বংশের রাজত্বকালে পাটলিপুত্র মগধের রাজধানী ছিল। ঐ বংশের স্থাপয়িতা পুষ্যমিত্র হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় করে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। পুষ্যমিত্রের রাজত্বকালে মেনন্দার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, কিন্তু তাঁর আক্রমণ প্রতিরুদ্ধ হয়। পাতঞ্জলি পুষ্যমিত্রের সমসাময়িক ছিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের সংবাদ পাতঞ্জলি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। উক্ত যজ্ঞের সময় শোন নদের তীরে পাটলিপুত্র খুব বড় সহর ছিল।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রথম রাজা চন্দ্রগুপ্তের সময় পাটলিপুত্র খ্যাতনামা সহর ছিল, কিন্তু পরে রাজাদের বাসস্থান হিসাবে পাটলিপুত্র পরিত্যক্ত হয়। এই সময় থেকে পাল রাজাদের অভ্যুদয়েরসময় পর্য্যন্ত পাটলিপুত্র বিশেষ প্রসিদ্ধ সহর ছিল না। ফা হিয়ানের বিবরণে (৪০৫-৪১১ খৃষ্টাব্দে পাটলিপুত্রের লুপ্ত গৌরবের আভাস পাওয়া যায় *। হুয়েন্থ-সাংয়ের (৬৩০-৬৪৫ খৃষ্টাব্দে) বিবরণও নৈরাশ্যজনক, তিনি লিখেছেন, "পাটলিপুত্র বহুপূর্ব্বেই জনশূন্য হয়েছে। এখন শুধু সেখানে ভিত্তি-প্রাচীর অবশিষ্ট আছে। হিন্দুদের মন্দির ও বৌদ্ধদের স্তূপ ও বিহারের শত শত ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে, মাত্র দু'তিনটি এখন অটুট রয়েছে।"

পাটলিপুত্র সম্বন্ধে ভগবান বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মেগাস্থিনিসের সময়ে পাটলিপুত্র সে যুগের সকল নগরীর শীর্ষস্থানীয় ছিল। তখন পাটলিপুত্র লম্বায় সাড়ে নয় মাইল এবং চওড়ায় পৌণে দুই মাইল ছিল। বর্ত্তমান পাটনা সহরও (মারুফগঞ্জ থেকে লাট সাহেবের বাড়ী পর্য্যন্ত) লম্বায় সাড়ে নয় মাইল এবং চওড়ায় দেড় থেকে দু' মাইল। তার পর খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে পাটলিপুত্র বন-জঙ্গলে আচ্ছন্ন হয়েছিল, সে কথা আমরা হুয়েন্থসাংয়ের বিবরণ থেকে পাই। কুমহ্রারে প্রাপ্ত দগ্ধাবশেষ থেকে জানা যায়, আগুনের শিখা এই নগরকে দগ্ধ করেছিল। চীনদেশীয় লেখক মটলিন (Matalin) বলেন, ৭৫৬ খৃষ্টাব্দে সহরের এক অংশ শোনের কুক্ষিগত হয়। আর অশোকের মৃত্যুর পর এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষ সময়, অর্থাৎ হূনবিজয়ের ঠিক আগে গুপ্তরাজাদের মধ্যে অন্তর্ব্বিবাদ যে খুব প্রবল হয়ে উঠেছিল, ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। পণ্ডিতেরা গণনা করে স্থির করেছেন যে, ৫৩০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি পাটলিপুত্রে প্রবল ভূমিকম্প হয়।

নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপদ্ম নন্দকে (নামান্তরে উগ্রসেন) পুরাণে সর্ব্বক্ষত্রান্তক এবং একরাট্ বলা হয়েছে। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, তাঁর রাজ্যাধিকার প্রায় সমগ্র আর্য্যভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, মৌর্য্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই পাটলিপুত্র ভারতবর্ষের রাজধানী হয়েছিল।

মৌর্য্যযুগে পাটলিপুত্র যে গৌরবের অধিকারী হয়েছিল, ভারতের অন্য কোন নগরী আজ পর্য্যন্ত তা পায় নি। মৌর্য্য সাম্রাজ্য বৃটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের চেয়েও বড় ছিল। সে সাম্রাজ্য আয়তনে মহীশূর থেকে হিন্দুকুশ পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

পালবংশের রাজা ধর্ম্মপালের সময় পাটলিপুত্রের আবার সৌভাগ্যোদয় দেখা যায়। ধর্ম্মপালদেবের তাম্রলিপিতে পাওয়া যায়, তিনি পাটলিপুত্রে "জয়স্কন্ধাবার"(অস্থায়ী রাজধানী) স্থাপন করেছিলেন। এখান থেকে তাঁর এক সনন্দ দেওয়া হয়েছিল। দেবপালের মুঙ্গের-প্রশস্তিতে 'শ্রীনগর' সহরের উল্লেখ আছে। পরে শিলালিপি (palæography) থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই শ্রীনগর পাটলিপুত্র ছাড়া অন্য সহর নয়। উক্ত প্রশস্তিতে ধর্ম্মপালকে বলা হয়েছে 'পরম সৌগত পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজা শ্রীধর্ম্মপাল।'

মৌর্য্যযুগের আগে থেকেই শিক্ষা এবং সংস্কৃতির জন্য পাটলিপুত্রের প্রসিদ্ধি ছিল। পালযুগেও এই প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েচে। বড় বড় পণ্ডিতেরা পাটলিপুত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে গৌরব বোধ করতেন। যাঁরা পাটলিপুত্রে পরীক্ষা দিয়ে খ্যাতিলাভ করেছিলেন, তাঁদের নাম উপবর্ষ, বর্ষ, পাণিনি, পিঙ্গল, ব্যাড়ি, বররুচি ও পতঞ্জলি। উপবর্ষ মীমাংসাসূত্রের বৃত্তি লিখেছিলেন; বর্ষ পাণিনির অধ্যাপক ছিলেন; পিঙ্গল ছন্দোশাস্ত্রের রচয়িতা; ব্যাড়ি লক্ষ শ্লোকের এক সংগ্রহগ্রন্থ লিখেছিলেন; বররুচি পাণিনিসূত্রের বার্ত্তিক রচনা করেন। পাণিনি এবং পতঞ্জলির নাম সকলেই জানেন। "বুদ্ধচরিত" গ্রন্থের সুপ্রসিদ্ধ লেখক অশ্বঘোষ পাটলিপুত্রের বাসিন্দা ছিলেন। পাটলিপুত্রে ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে আর্য্যভট্ট জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ "সূর্য্যসিদ্ধান্ত" রচনা করেন।

এই গেল হিন্দু পাটলিপুত্রের কথা। দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলমান আক্রমণের ফলে পাটলিপুত্রের সমস্ত গৌরব তিরোহিত হয়। বিহার নামটি মুসলমানদের দেওয়া।

বর্ত্তমান পাটনা সহর আমাদের ভাল লেগেছিল। বিশেষ করে ওর গঙ্গার ধারটি। পাটনায় মশার বড় উপদ্রব

* For there were only the ruins, though the walls, doorways and the sculptured designs were no human work, Fahien, Chap. xxvii

দেখলাম। ডিসেম্বর মাসে শীতের সময় আমরা মশারি সঙ্গে না নিয়ে গিয়ে ঠকেছিলাম। পাটনায় মশার কামড়ে সমস্ত রাত ঘুমুতে পারি নি। তবে শুনলাম মশাগুলি না কি অ্যানোফিলিস্ সম্প্রদায়ভুক্ত নয়। যেখানে আমরা ছিলাম (বাঁকীপুর), সেখানে মাত্র দুটি রাস্তা সমান্তরালভাবে চলে গেছে। গলির ভিতরে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলে মনে হল না। পাটনার সাধারণ যান হচ্ছে একা। কিন্তু যুক্ত-প্রদেশের একার সঙ্গে এর পার্থক্য আছে। যুক্তপ্রদেশের একার মত ওর মাথার উপর আচ্ছাদন এবং পাশে হাত দিয়ে ধরার খুঁটি নেই। ফলে একা যখন জোরে চলে, তখন পড়ে যাওয়ার ভয় থাকে। পাটনা সায়েন্স কলেজ, পাটনা কলেজ, বিহার ন্যাশন্যাল কলেজ, খুদাবখ্শ লাইব্রেরি, গোলঘর, বিহার ইয়ংম্যান্স ইনস্টিটিউট্, রামমোহন রায় সেমিনারি—এই দ্রষ্টব্য স্থানগুলি আমরা দেখেছিলাম। কিন্তু 'পাটনার বিবরণ' পুস্তিকায় দ্রষ্টব্যস্থানের সংখ্যা দেখলাম ৩৬। সম্মেলন যদি ব্যবস্থা না করেন, তবে অপরিচিত স্থানে প্রতিনিধিবর্গের পক্ষে সামান্য সময়ের মধ্যে সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থান দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়।

ঐতিহাসিক গবেষণা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পাটনার অতীত গৌরবের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর সে আহ্বান যে একেবারে ব্যর্থ হয় নি এই প্রবন্ধ তার প্রমাণ। আমরা যে ভুঁইফোড় জাত নয়, আমাদের অতীত যে অবিনশ্বর কীর্তি দ্বারা উজ্জ্বল, সে খোঁজ আমাদের রাখা ভাল। কেন না আমাদের ভবিষ্যৎকে অতীতের বনেদের উপরই গড়তে হবে।*

---

*এই প্রবন্ধের উপকরণ অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দারের The Glories of Magadha, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের Prehistoric Ancient and Hindu India, ডাঃ হেমচন্দ্র রায় চৌধুরীর Political History of Ancient India এবং ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদারের 'পাটনার বিবরণে' থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

কিসের অভাব ?

...বর্তমান কালে হিন্দু কেবল মাত্র হিন্দুর দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা বলিতেছেন, আর মুসলমানগণ কেবল মাত্র মুসলমানের দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা লইয়াই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। ফলে এক ভারতবর্ষের মধ্যেই দুইটি খণ্ড পরস্পর বিরুদ্ধভাব লইয়া সর্ব্বদা দ্বন্দ্ব-কলহে মত্ত হইয়াছে এবং একটি ভারতীয় জাতির গঠন হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। ইহা ছাড়া কেহ কেহ শিক্ষার উন্নতিকর কার্য্যের জন্ত বিভিন্ন দল গঠন করিতেছেন, কেহ কেহ বা সামাজিক উন্নতিকর কার্য্যের জন্ত বিভিন্ন দল গঠন করিতেছেন, কেহ কেহ বা ধর্ম্মের উন্নতিকর কার্য্যের জন্ত বিভিন্ন দল গঠন করিতেছেন, কেহ কেহ বা স্বাস্থ্যের উন্নতিকর কার্য্যের জন্ত বিভিন্ন দল গঠন করিতেছেন। ইঁহারা সকলেই মুখে বলিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের কাহারও অপর কাহারও সহিত কোন বিরোধ নাই। কিন্তু বাস্তব অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, এই সমস্ত বিভিন্ন দলের লোকহিতকর কর্ম্মীর কার্য্যের ফলে প্রকৃতপক্ষে সারা দেশটি অসংখ্য দলে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে এবং যে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র একদিন এক জাতীয় শিক্ষা, একই সামাজিক নিয়ম, একই মানব ধর্ম্ম, একই স্বাস্থ্যের নিয়ম পরিলক্ষিত হইত, সেই ভারতবর্ষ ক্রমশঃ অসংখ্য দলে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে। ইহার জন্ত কাহাকেও যুক্তিযুক্তভাবে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। একই জাতির এইরূপ ভাবে অসংখ্য খণ্ডে বিভক্ত হওয়ার একমাত্র কারণ—যে জাতীয় প্রতিষ্ঠানে হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রত্যেকের অন্নসমস্যা, দারিদ্র্য-সমস্যা, শিক্ষা-সমস্যা, স্বাস্থ্যসমস্যা, সামাজিক সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে—সেই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের অভাব।...

নারী-মেধ

--শ্রীসুরেশচন্দ্র রায়

ভূমিকা

আমাদের দেশে অনেক উপন্যাস-লেখক কোন কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিকের দর্শিত পথে অবতীর্ণ হইয়া, একান্ত নিষ্ঠা ও আগ্রহের সহিত দেশের ধর্ম্ম ও সমাজের সব কিছুই মন্দ প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত লেখনী ধারণ করিয়াছেন। ফলে অনেক বাংলা নভেলই দেশের সমাজ, ধর্ম্ম, সংস্কার, লোকাচার, নীতি, কৃষ্টি, এক কথায় যাহা কিছু এতদিন নিজস্ব, সর্ব্বস্ব ও বিশেষত্ব ছিল; সব গুলিকেই নিতান্ত হেয়, জঘন্য, নক্কারজনক, পচা, দুর্গন্ধময়, বীভৎস এই কথা সহস্রবার প্রমাণ করিতেছেন। গ্রাম-মধ্যে ভণ্ড, সংকীর্ণমনা, দয়াদাক্ষিণ্যহীন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সমাজপতি হইতে আরম্ভ করিয়া, বিধবার দুঃসহ জীবন, প্রণয়শূন্য বিবাহ, ধর্ম্মের আগাগোড়া কুসংস্কার, ন্যাকামী, সমাজের সর্ব্বত্রই জোর-জুলুম, জবরদস্তি, পণ-প্রথা ও পর্দ্দা-প্রথার ইতরতা, বাল্যবিবাহের অমার্জ্জনীয় অপরাধ, স্ত্রী সত্ত্বেও বিবাহ করা, অশীতিপর বৃদ্ধের সহিত বালিকার বিবাহ ইত্যাদি শত শত দোষ দেখাইয়া সমাজের সব কিছুকেই একেবারে পথের ধূলার সহিত মিশাইয়া দিয়া, তাহার সমূলে উৎপাটন করিবার জন্য প্রকৃষ্ট আয়োজন করিয়াছেন। ইহার ফলে ছোট বড় সব গুলিকে একাকার করিয়া, ভালমন্দ একাকার করিয়া, বিচার করিবার সর্ব্বত্র অবসর না দিয়া, ঘৃণায় অবহেলায় তাহাদের তাড়াইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। একে ত আমরা বিদেশীয় শিক্ষা-দীক্ষা পাইয়া, সারা জীবন বিদেশীয় সাহিত্য, কলা, কৃষ্টি, সভ্যতা, লোকাচার, সংস্কারগুলিকে প্রাণপণে আয়ত্ত করিয়া, বিদেশীয়দের মানসপুত্ররূপে গঠিত হইয়াছি, তাহার উপর এই শিক্ষা-দীক্ষা প্রভাবে স্বজাতীয় প্রায় সব কিছুই ঘৃণা অবহেলা করিতে শিখিয়াছি। সুতরাং আমরা সুধু গায়ের বর্ণ ভিন্ন এবং ভাষার কতকটা ভিন্ন, সকল বিষয়েই অন্ধ-বধির অনুকরণ করিয়া, সুধু ধার-করা পরের দ্রব্যকেই জাবনে সম্বল করিয়াছি।

ইহারই নাম cultural conquest. এই পরাজয়ের তুল্য পরাজয় জগতে আর কিছু আছে কি না সন্দেহ, কারণ সুধু রাজ্য-পরাজয় জাতির বৈশিষ্ট্য নষ্ট করে না, কিন্তু মস্তিষ্ক বিক্রীত হইলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এই কারণে এবং আরও অনেক কারণে আমাদের দেশের ভরসা যে ছেলেমেয়ে, তাহারা প্রায় সকলেই দেশের যাহা কিছু গর্ব্ব করিবার, যাহা কিছু লইয়া জীবন সার্থক করিবার, যাহা কিছু লইয়া মাথা তুলিয়া জগতের সম্মুখে দাঁড়াইবার ভাব, কার্য্য বা আদর্শ ছিল, সব কিছুই প্রায় পদাঘাতে দূর করিয়া দিয়াছে। সেগুলিকে যাচাই না করিয়া, না দেখিয়া,না শুনিয়া,পরীক্ষা বা শিক্ষা করিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত না করিয়া তাহাদের ফাঁসীর হুকুম দিয়াছে। আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, বর্ত্তমানে সমাজ মধ্যে অনেক দোষ গ্লানি-আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু জগতে আজ কোন্ সমাজ দোষমুক্ত? আমাদের তরুণ-তরুণীরা বলেন "ভবানীভ্রূকুটিভঙ্গি ভবো বেত্তি ন ভূধরঃ"—এজন্য তরুণদের সমস্যা তরুণদের সমাধান করিতে দাও, বয়স্ক ব্যক্তি তাহা বুঝিবে না। কথা উঠিয়াছে, প্রাচীন সমস্ত বাদ দিয়া নূতন পথ অনুসরণ করাই শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ, বয়স্ক লোকেদের কথার কোন মূল্য আধুনিক চক্ষে ধরা পড়ে না। অভিজ্ঞতা বা অনুভূতি যাহা কিছু বয়স্ক লোক লাভ করিয়াছে, তাহাদের বাদ দিয়া যুবক-যুবতী আপন আপন জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চায়, বয়স্ক লোকের কোন কিছুতে হাত দেওয়া প্রছন্দ করে না, ইহাকে অনধিকার-চর্চ্চা বা ধৃষ্টতা মনে করে।

এইরূপ মনোভাব জগতে ইতিপূর্ব্বে এরূপ কার্য্যকরী হয় নাই। অধুনা ফলিত-বিজ্ঞানের অভাবনীয় প্রতাপে তরুণ-তরুণী আর ফাঁকা আওয়াজ করে না, এখন তাহাদের বন্দুকে গুলিভরা (Ben Lindsey, Revolt of Modern You'h)। তারুণ্যের যে সমস্ত অমোঘ নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা আজকাল হইতেছে, তাহার

মধ্যে একজাতীয় সিনেমাও নভেল একটি ব্রহ্মাস্ত্র বিশেষ। ইহাই দেশের সকল কিছুর বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়াছে। কিন্তু যে সব অতি গুরুতর অভিযোগ আমাদের সমাজের বিপক্ষে আনা হইতেছে, সেগুলি বাস্তবিক কতদূর বিচার-সহ, তাহা বড় কেহ চিন্তা করিয়া দেখিতেছেন না।

এই কারণেই আমরা আমাদের বিষয়টি নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছি।

সর্ব্বপ্রথমেই আমরা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া রাখি যে, দেশের প্রচলিত সকল ব্যবস্থা সমর্থন করিতে আমরা এই প্রবন্ধ লিখিতেছি না—সুধু ন্যায় অন্যায় বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি মাত্র। সুধু নারীর প্রতি আমরা বিশেষভাবে নির্য্যাতনকারী, এই অভিযোগ প্রকৃত কি না, এইটুকু বুঝিতে চাহিতেছি। বর্ত্তমান নভেল পাঠ করিয়া, সিনেমা দেখিয়া অনেকক্ষেত্রে মনে হয়, ভারতবাসীর মত নারী-দ্বেষী, নারী-মেধকারী সমাজ জগতে কোন কালে কুত্রাপি জন্মে নাই। বাস্তবিক এই অভিযোগ সত্য কি না, বুঝিতে হইলে শাস্ত্রানুশাসন ভাল করিয়া বিচার করা আবশ্যক। কিন্তু অধুনা "শাস্ত্র" কথাটি শুনিলেই অনেকে ক্ষেপিয়া উঠেন, কাজেই এই প্রবন্ধে আমাদের আধুনিক শিক্ষাগুরুদের বচন-সহায়তায় বিষয়টি বুঝিতে চেষ্টা করিব। তত্ত্বকথার নাম শুনিলেই অধুনা অনেকেই বুজরুকি, ভণ্ডামি বলিয়া থাকেন, সুতরাং আমরা যথাসাধ্য যে পথে নামিব না। আমরা প্রথমে দেখিবার চেষ্টা করিব, কি কারণে নারী-মেধ হয় এবং পরে দেখিব যে নারী-মেধ রহিত বা ধ্বংস করিবার যে আধুনিক জগদ্ব্যাপী অসংখ্য ব্যবস্থা হইয়াছে, সেগুলিতে নারী-মেধ বন্ধ হয় কি না।

(২) নারীমেধ কেন হয় ?

আমাদের কথা মত প্রথমে আমরা দেখিব, কেন পুরুষ নারীর প্রতি অত্যাচার করে, কারণ পুরুষকেই নারী-মেধ-কর্ত্তা বলা হয় এবং এই প্রসঙ্গে যে সব কথা উঠিবে, তাহার মধ্যে নর ও নারীর দাম্পত্য জীবনের প্রভাব কত দূর। এ কথা 'সত্যাত্তিসত্য' সকল দেশেই আজ সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে, পুরুষ অপেক্ষা নারীর প্রতি সমাজের বিধি-নিয়ম কঠোরতর। সে সব স্থানে আজি পর্য্যন্ত নারীর ও নরের দাম্পত্য-দাবীকে ঠিক একচক্ষে দেখা হয় না, double standard of morality অর্থাৎ এই বিষয়ে বিভিন্ন ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। সেখানেও শুনা যায় যে, পুরুষ নারীকে সকল দিকে চাপিয়া দাবাইয়া রাখিয়াছে, নর নারীকে কোন দিন তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবার কথা ত দূরের, তাহার সাধারণ জীবনেও প্রতিপদে বাধা দিয়াছে, দলিত, পিষ্ট করিয়াছে, দৈনন্দিন জীবনও নারীকে সুখে স্বচ্ছন্দে কাটাইতে দেয় নাই। সুতরাং 'home is the woman's prison' (Bernard Shaw—'Man and Superman') গৃহই নারীর কারাগার স্বরূপ। সকলদিকে নারীর স্কন্ধে ভার চাপাইয়া, স্বার্থপর পুরুষ চিরকাল আপনার সুখ খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে, নারীর মুখ তাকায় নাই; শুধু গায়ের জোর, জবরদস্তি করিয়া সর্ব্বদা নারীকে রিক্ত করিয়াছে। দেখা-দেখি,—এ দেশের শাস্ত্রকারগণ সব পুরুষ, সমাজ পুরুষের হস্তে, গায়ের জোর পুরুষের বেশী, এই কারণে পুরুষই চিরকাল নারীমেধ করিতেছে—অনেক বাংলা নভেল এই কথাগুলি সপ্রমাণ করিতে ব্যস্ত হইয়াছিল। প্রতিক্রিয়া বশে নারী-জাগরণ, নারী-স্বাধীনতা, নারী-বিদ্রোহ, নর ও নারীর সমান অধিকার, ইত্যাকার ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং প্রশ্ন দুর্নিবার হইয়া উঠে—বাস্তবিক পুরুষ কি নারীকে নারী বলিয়াই অত্যাচার করে? অধুনা অনেক নভেল, সিনেমা, থিয়েটার, ভূরি প্রচার (propaganda) করিয়া, সংবাদ ও মাসিক-পত্র, বক্তৃতা ইত্যাদি সমস্তই এই জাতীয় কথা রটনায় পঞ্চমুখ হইয়াছে এবং যেহেতু তরুণ তরুণী এবং দেশের অনেক খ্যাতনামা লেখক এই সব অপবাদ পুরুষের স্কন্ধে চাপাইয়াছেন, সেই হেতু সাধারণের চক্ষে এই অপবাদ চতুর্গুণ হইয়া উঠিয়াছে। একতরফা ডিক্রি ডিস্‌মিস্ হইয়া গিয়াছে।

আমরা ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, নারীর প্রতি পুরুষ অনেক সময় অত্যাচার, জবরদস্তি করে এবং করিয়াছে। ইহার কারণও আছে। সারা বিশ্বময় প্রকৃতির নিয়ম এই যে, প্রায় সকল ক্ষেত্রেই দুর্ব্বলের উপর প্রবল কোন না কোন প্রকার আধিপত্য করে। জন্তুদের মধ্যে দেখা যায়, দুর্ব্বলকে উদরসাৎ বা

উদ্ব্যস্ত করিয়াই অনেকক্ষেত্রে প্রবলের পক্ষে প্রাণধারণ সম্ভব হয়। যেখানে বুদ্ধি, বল, ক্ষিপ্রকারিতা ইত্যাদি যাহা কিছু প্রবল হয়, তাহারই পরিপূর্ণ সুযোগ লইয়া, যে-প্রাণী প্রবল সে ইহাদের সুখ-সুবিধায় লাগাইয়া, দুর্ব্বলকে ধ্বংস করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। মানুষের মধ্যেও এই ব্যবস্থা সর্ব্বত্র দেখা যায়। বিদ্যা, বুদ্ধি, স্বাস্থ্য, অর্থ, প্রতাপ, লোকবল, গায়ের জোর, কর্ম্ম-পটুতা, বিজ্ঞানের বল ইত্যাদি যাহা কিছুই থাকুক, তাহাদের সবগুলির পরিপূর্ণ সুযোগ সুবিধা লইয়া, প্রবল পক্ষ দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার—আজিও এত 'সভ্যতা' 'শিক্ষা' সত্ত্বেও অবাধে করিতেছে। কিন্তু, মানুষ বেশী বুদ্ধিমান, সেই জন্য সে ইতর প্রাণীর মত সোজাসুজি, খোলাখুলি অত্যাচার জবরদস্তি করে না, কূট যুক্তি, চাতুরী, জুয়াচুরী প্রদর্শন করিয়া আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি করে।

এই বিষয়ে জগদ্বিখ্যাত Prof. Dr. Gilbert Murray একটি সুন্দর কাহিনী দিয়াছেন। তিনি বলেন tit নামক এক প্রকার পক্ষী আছে। ইহাদের শাবক হইলে, যখন কতকগুলি ছোট কতকগুলি বড় থাকে, তখন বড় শাবকটি ছোট শাবকটির মাথা ঠুকরাইয়া ফুটা করিয়া, তাহার মাথার ঘিটুকু খাইয়া তাহাকে মারিয়া ফেলে। পরে মৃতভ্রাতার প্রতি অত্যন্ত রাগ দেখাইয়া অনবরত তাহাকে ঠোকরাইতে থাকে, যেন বলে, "তুই আমার ক্ষুধার সময় মাথার ঘিটুকু খাইতে না দিয়া আমায় এত রাগাইলি কেন? তাইত তোকে মারিয়া ফেলিলাম।" এইরূপ আপনার মনোমত যুক্তি দেখাইয়া (ইহারই নাম কি rationalising ?) এবং পরকে ঠকাইবার চেষ্টা করিয়া, দিব্য নিশ্চিন্ত মনে নৃত্যগীত করিতে থাকে।

এই জাতীয় ঘটনা অধুনা অনেক বড় বড় আন্তর্জাতিক ব্যাপারে ঘটিতেছে এবং ছোট-বড় বিষয়ে চিরকাল সংঘটিত হইয়া আসিতেছে। ঘরে বাহিরে ইহা ঘটে। এই কারণেই পুরুষ নারীর প্রতি অত্যাচার করে, কারণ অধিকাংশ মানুষ মূলে যে পশু ছিল সেই পশুই রহিয়া গিয়াছে; অনেক ক্ষেত্রে শুধু বাহিরের চটক ও কপটতার সাজ পরিয়া ভদ্র সাজিতেছে। আঁচড় দিলে সেই আদিম ছাগ, ব্যাঘ্র মর্কট, বা সর্প বাহির হইয়া পড়ে। অবশ্য মানুষের এই সঙ্গে উচ্চ বুদ্ধি এবং দেব-ভাবও আছে, কিন্তু যুগধর্ম্মে এগুলি অপেক্ষাকৃত বিরল ও দুর্ব্বল। নারীকে নারী বলিয়াই পীড়ন করে না, নারী দুর্ব্বল বলিয়াই তাহাকে পীড়ন করে; স্বারতঃ ইহা যতই দোষের হউক না কেন, প্রবল পক্ষ অধিক ক্ষেত্রে ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া থাকে। এই নীতি সমর্থন করিবার লোকেরও বর্ত্তমানে অভাব নাই। Nietzcke, Bernhardi বা জর্ম্মান বা ফ্যাসিষ্ট জাতি বাদ দিলেও, সর্ব্বত্রই এই মতবাদ সমর্থনকারী ব্যক্তি দৃষ্ট হয়। নীতিবাদ ইহাকে যত অন্যায়ই বলুক, মানুষ দুর্ব্বলতাকেই পীড়ন করিবে, এবং সবল ব্যক্তি দুর্ব্বলকে উৎসাদিত করা তাহার জন্ম-স্বত্ব, অকাট্য দাবী বলিয়া মনে করিবে। সম্প্রতি Herr Hitler এর বাণীই ইহার যথেষ্ট প্রমাণ। সুতরাং বুঝা যায় যে, যতদিন না মানুষের মধ্যে শান্ত দেবভাব দানবশক্তিকে পরাভূত করিতে পারিবে, সংযম যতদিন না অসংযমকে পরাস্ত করিতে পারিবে, ততদিন প্রবল দুর্ব্বলকে নাস্তানাবুদ করিতে ছাড়িবে না। এইটুকু বুঝিয়াই নারী আজ বোধ হয় সকল দুর্ব্বলতা ত্যাগ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

আদিম কাল হইতে নারী নরের অধীনতা বা বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে—কতক স্বেচ্ছায়, কতক অবস্থা-বিপর্য্যয়ে নিতান্ত বাধ্য হইয়াই। কারণ "আদিম মানুষ মধ্যে পুরুষ ছিল হিংস্র জন্তুবিশেষ এবং নারী ছিল (এবং এখনও আছে) সন্তানের জননী" (Elie Reclus)। অবস্থার ফেরে মানুষকে আজিও অনেক কাজ করিতে হয়, যাহাতে তাহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা থাকে, বা যাহা নীতিজ্ঞান, ধর্ম্ম ও আত্মসম্মানসম্মত নহে (আমরা সাধারণ মানুষের কথাই বলিতেছি, মহামানব বা মহাপুরুষের কথা স্বতন্ত্র)। যেহেতু নারী নরকে চিরকাল ভালবাসে, যেহেতু নারী বিশেষ করিয়া সন্তানকে সর্ব্বস্ব দিয়া রিক্ত হইয়া ভাল বাসিবার প্রকৃতিগত অদম্য প্রেরণা পাইয়াছে, যেহেতু মায়ের স্নেহের ধর্ম্মই আত্ম-বিসর্জ্জন দেওয়া এবং মাতৃত্বের বুভুক্ষা নারী মাত্রেরই প্রায় সর্ব্ব-প্রধান প্রেরণা (Darwin), যেহেতু গর্ভাবস্থায় এবং শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার বহুকাল পরেও সন্তানের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল-কামনায়, নারীক বাধ্য হইয়া, একজন সন্তানের রক্ষক, নিজের রক্ষক ও আহারদাতার একান্ত আবশ্যক হয়; যেহেতু ঋতুমতী হইলে আদিম যুগে

নারী, আপনার মন ও শরীর অসুস্থ বলিয়া এবং ভাবী সন্তানের কল্যাণ কামনায়, পুরুষের চক্ষের অন্তরালে থাকিতে চাহিত; যেহেতু আহার সংস্থান করা নারীর পক্ষে সুগম বা সহজ ছিল না এবং এই কারণেই স্থান হইতে স্থানান্তরে নর-নারী আদিম কালে ঘুরিয়া বেড়াইতে বাধ্য হইত, পুরুষেরই কার্য্য ছিল বন্য পশু-পক্ষীর মাংস সংগ্রহ করা; এই সমস্ত এবং ইত্যাকার কারণেই সেই আদিম কাল হইতে নারী নরের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং সন্তানের একান্ত শুভেচ্ছায় অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। অধুনা বিজ্ঞান দেখাইতেছে যে, নারীর শরীর-মধ্যস্থ রসস্রাবী গ্রন্থিসমূহ নারীর গর্ভসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত হইয়া, রস পরিবেশন বৃদ্ধি করে, এই রস নারীর শরীর এবং বিশেষ করিয়া মনে বাৎসল্য ভাবের সঞ্চার করে, যাহার জন্য নারী স্বভাবতঃ এই কালে পর-নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। আবার আদিম যুগে যখন নারী আপনার গৃহস্থালী, সন্তান ও সংসার লইয়া থাকিত, তখন পুরুষ গর্ভধারণজনিত ক্লেশ ও পরাধীনতা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, পৃথিবীর চারিধারে ঘুরিয়া বেড়াইত, আপনার মনের দুর্দ্দান্ত রিপুসমূহ তাড়িত হইয়া, মারামারি কাটাকাটি করিয়া বেড়াইত, সর্ব্বদাই প্রকৃতির সহিত মুখোমুখী থাকায় তাহার সহিত দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইত এবং ইহার ফলে প্রকৃতির জঠরমধ্য হইতে তাহার অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিবার 'প্রকৃতি-বিজয়ে' দিন যাপন করিত। ফলে প্রকৃতিকে জয় করিতে গিয়া, নর অনেক সময় নারীকেও দাবাইত, কারণ নারীই নরের কাছে প্রকৃতির পরিচয় ও প্রতীক। (Havelock Ellis, Man and Woman, Elic Reclus etc.)।

কিন্তু নারীর অধীনতার সুধু মন্দ দিকটাই দেখিলে চলিবে না। পুরুষ নারীকে যথার্থ দরদ করে বলিয়াই, ভালবাসে বলিয়াই অনেক সময় তাহাকে সর্ব্ব বিপদ হইতে রক্ষা করিতে চায়, আশ্রিতা করিতে চায়। অধুনা ইহা দোষের কথা দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু এখনও অধিকাংশ নারীই পুরুষের আওতায় থাকিতে চাহে, কারণ আহার ও বাসস্থান সংগ্রহ করিতেও অন্য পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতা আবশ্যক হয়, বাদ-বিবাদও সময় সময় করিতে হয়, আদিম যুগেও কতকটা এই ছিল। কিন্তু সন্তানের পক্ষে, সন্তানের জননীর পক্ষে, এই সব প্রতিকূল অবস্থা। বিশেষ করিয়া মনে রাখা আবশ্যক যে, আধুনিক সভ্যতার মধ্যমণি আমেরিকাতেও এখনও কোনও পুরুষ চায় না যে, তাহার স্ত্রী অর্থোপার্জ্জনে শরীর ও মন নিয়োগ করুক। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে ইহা সফল হয় না, কিন্তু পুরুষ মানুষ আপন স্ত্রীকে অর্থোপার্জ্জন করিতে দেওয়া আত্ম সম্মানের হানিকর মনে করে (Ben Lindsay, *Companionate marriage*), স্বামীর অধিক অর্থ স্ত্রী উপার্জ্জন করা স্বামীর অত্যন্ত আত্ম-সম্মানের হানিকর, আমেরিকাতেও বটে।

বাস্তবিক যদি পুরুষ নারীর প্রতি আবহমানকাল সুধু নির্য্যাতনই করিয়া আসিত, তবে আজিকার জগতে নারীর অবস্থা কি দাঁড়াইত? প্রকৃতির নিয়ম এই যে, মোটামুটী অর্দ্ধেক নর ও অর্দ্ধেক নারী জগতে জন্মায় বা বাঁচিয়া থাকে। ইহাই বৈজ্ঞানিক মত। কিন্তু পুরুষ যদি নারীর প্রতি নির্য্যাতনশীলতার অবাধ চর্চ্চা করিত, তাহা হইলে ইহার পরিমাণ কি হইত? আজিও সংসারে ভদ্রতা, সংযম, দয়া, মমতা আছে এ সমস্তই কি নারী-মেধের ফল? এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে, অনেক দেশে শিশু-কন্যা-বধ প্রথা ছিল ও কিছু কিছু এখনও আছে। কিন্তু ইহাদের মূল কারণ 'economic distress', আহারের অভাব এবং পুরুষের আহার সংস্থান করিবার ক্ষমতা অধিক, এই বিশ্বাস। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি নারীমেধ অনেক হয়, কিন্তু ইহা শুধু পুরুষের জোর জবরদস্তিতে হয় না। অন্য অনেক কারণও আছে। আমাদের দেশেও ৮০।৯০ বৎসর পূর্ব্বে পর্য্যন্ত সতীদাহ ও রাজপুতদের মধ্যে কন্যা-সন্তান-বধ করিবার ব্যবস্থা ছিল এগুলির প্রথমটির কারণ সতীত্বের অপ্রাকৃত মর্য্যাদা এবং দ্বিতীয়টির মূলে ছিল উৎকট আত্মসম্মান। অবশ্য এই দুই ক্ষেত্রে পুরুষের গায়ের জোর ছিল, নারীরও কতক সম্মতি ছিল। গত Boxer Rising, যাহা চীন দেশে প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, তাহাতেও চীনা রমণীরা একযোটে নদীগর্ভে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিল, এই ভয়ে যে পাছে তাহারা বিপক্ষদলের কাছে ধরা পড়ে (Dean Inge)। জহরব্রতের কথা এদেশে সকলেই জানে।

প্রকৃত কথা এই যে, পুরুষ চিরকাল নারীকে কম বেশী ভালবাসা, স্নেহ, দরদ দিয়াছে, দিতেছে, আবার জোর জুলুমও সময় সময় করিতে ছাড়ে নাই, কতক ক্ষেত্রে বেশীই করিয়াছে বা করিতেছে,—কিন্তু দুর্বল পাইয়াই এইরূপ করিতেছে। একই কালে এইরূপ বিপরীত ভাব নর ও নারীর মনে থাকা সম্ভব। ইহাকে ambivalence of feeling বলা হয়। আবার যদি পুরুষের জোর-জুলুম, অত্যাচার একমাত্র বা অধিক পরিমাণে থাকিত, তবে কাহার আওতায়, কাহার উৎসাহে, কাহার সহায়তায়, আজ নারী জগদ্ব্যাপী সাম্যবাদ অভিযানে জয়ী হইতে চাহে? নারী-স্বাধীনতার ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই জানেন যে, তাঁহাদের অভিযানের পশ্চাতে অনেক নরের সহানুভূতি-সাহায্য ছিল বলিয়াই, এখনও আছে বলিয়াই, আজ নারী সর্ব্ববিষয়ে নরের সমকক্ষতা অর্জ্জন-পথে এতটা অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন। অবশ্য অনেক পুরুষ বিষম বাধা দিয়াছে এবং এখনও দিতেছে, কিন্তু পুরুষ-সহায়তাও অনেক ছিল, এখন আরও অনেক হইয়াছে এটা নিঃসন্দেহ। Mary Wallastonecraft, Browning, Martineau, George Eliot, Pankhurst সকলেই ইহা অনুভব করিয়াছেন। নারী-স্বাধীনতার অগ্রবর্ত্তিনী নারীগণ অধিকাংশই আপন আপন ঘর-সংসার বাঁধিতে পারেন নাই। অনেকে ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন বা সমাজ-বিদ্বেষী ছিলেন। বাস্তবিক কর্ম্মক্ষেত্রে, জীবিকাক্ষেত্রে বা শিক্ষাক্ষেত্রে পুরুষের সহায়তা ব্যতীত এত শীঘ্র নারী এতটা অগ্রসর হইতে পারিতেন কি? এ সমস্ত বিদেশের কথা বটে, কিন্তু নারী-প্রগতির বন্যা এ দেশেও দুকূল ভাসাইয়া জয়যাত্রা করিতেছে, কাজেই এই সব বলিতে হয়। প্রকৃত কথা এই যে, নর ও নারী কেহ কাহাকেও সম্পূর্ণ বাদ দিয়া জীবন কাটাইতে পারেন না। প্রত্যেকেই এইরূপ না হইতে পারে, কিন্তু প্রায় সকলেই পরস্পর পরস্পরকে চায়। নারী ও নর উভয়েই অর্দ্ধেক, দুইয়ে মিলিয়া তবে এক পূর্ণ হয় (complementary)। এ কথা কিন্তু আজ মানা হয় না, আজ অনেক নারী পুরুষ হইতে চাহেন, তাঁহাদের সংখ্যা কোন কোন স্থানে প্রায় শতকরা ৩০ জন। (Havelock Ellis, *Psychology of Sex*)। কিন্তু, নারী-পুরুষ হইবার ইচ্ছা যে তাহাদের দুর্ব্বলতারই পরিচয়, inferiority complex, এ কথা মনে থাকে না এবং এই দুর্ব্বলতা যে মূলে নৈতিক অবনতির কারণেই হয়, তাহাও মনে থাকে না (Earnest Jones, *How the Wind Works*)। তাঁহারা পুরুষকে কোন কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ নিশ্চয় মনে করেন, নচেৎ কিসের ছলনায়, কিসের মোহে, তাঁহারা পুরুষের সমকক্ষতা লাভার্থ আত্মসম্মান জলাঞ্জলি দিতেছেন? কিন্তু বাস্তবিক কি পুরুষ শ্রেষ্ঠ? আমরা এই বিষয় কিঞ্চিৎ পরে দেখিব।

সাধারণ লোকমধ্যে দেখা যায় (জগতে সাধারণ লোকের সংখ্যাই অধিক) যে, আপন আপন গণ্ডীমধ্যে নারীর প্রতাপ অক্ষুণ্ণ, পুরুষ সে ক্ষেত্রে নগণ্য মাত্র। জীবন-যাত্রা ব্যাপারে, আহার, বিবাহ ও সমাজ বিষয়ে তাঁহারাই মূলাধার। খাদ্য, বস্ত্র, বিলাস, অলঙ্কার, লোক-লৌকিকতা ইত্যাদি সর্ব্ববিষয়ে নারীর ইচ্ছাই বলবতী। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ যাবৎ পুরুষ মানুষ জগতের মধ্যে অধিক অর্থোপার্জ্জন করে বটে, কিন্তু এই উপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় হয় নারীর ইচ্ছা, খেয়াল, পছন্দ, প্রবৃত্তি মত। দোষ হয় নারীর এই কথা খেয়াল থাকে না। ছোট বড় ব্যবসা-বাণিজ্য, কেনা-বেচা, দ্রব্যের চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি, নারীর পছন্দ বা ইচ্ছামতই হইয়া থাকে (H. G. Wells—*Work, Wealth and Happiness of Mankind*)।

একটু নজর করিলেই দেখা যায় যে, সংসারের গৃহিণীই জীবনে অনেক কিছুর কর্ত্রী, 'America is the wife's paradise', আমেরিকা স্ত্রীর স্বর্গ স্বরূপ। সকল দেশেই গৃহিণীর মান-মর্য্যাদা গৌরব আছে, মায়েরও সম্মান আছে, ভগ্নী-কন্যারও স্থান আছে। অবশ্য সর্ব্বত্র এক নহে বা সর্ব্বত্রই ভাল না হইতে পারে। কিন্তু ব্যবস্থা যদি মন্দও হয়, তাহার জন্য অনেক কিছুই দায়ী, যেমন অর্থহীনতা, স্বাস্থ্যহীনতা, পরাধীনতা, অভাব, বিভিন্ন লোকাচার ইত্যাদি। এই সমস্তকে কতক পরিমাণেও অন্ততঃ দায়ী না করিয়া, শুধু পুরুষের গায়ের জোরকেই দায়ী করার সার্থকতা কি? অনেকক্ষেত্রে নারী-দোষ কল্পনা-প্রসূত, তাহার দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

আজ শুনা যাইতেছে যে, জগৎ জুড়িয়া নারীর মনে

খেদ, অতৃপ্তি, রিক্ততা, ব্যর্থতা, অভিমান, ক্রোধ আছে। আপন অবস্থার উপর জাতক্রোধ, আপনার স্বামী-পুত্রাদিকে নিতান্ত অপদার্থ মনে করা এবং সঙ্গে সঙ্গে অপরের স্বামী-পুত্রাদিকে ভাল মনে করা ইত্যাদি ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষিত হইতেছে। এই মনোভাবের বিষয়ে অনেক কথা বলা যায়, তন্মধ্যে দুইটি প্রধান—"যে মাছটা ধরিতে পারা যায় না সেইটাই রুই বা কাৎলা"; এই অপ্রাপ্য বিষয়ে হিংসা দ্বেষ। পুরুষের স্বার্থপরতা, হৃদয়হীনতা, কাপুরুষতা ও অক্ষমতা বা অজ্ঞানতা ইত্যাদিকেই নারী পূর্ব্বোক্ত মনোভাবের জন্য দায়ী করেন। কেহ কেহ বলেন যে, দাম্পত্য ব্যাপারে পুরুষ অনেক ক্ষেত্রে নারীকে বঞ্চিত করে বলিয়াই এই অশান্তি। আমরা পরে এই বিষয়ে আলোচনা করিব। অপর কাহারও কাহারও মত এই যে, এ যাবৎ পুরুষের অত্যাচারে নারী বিপর্য্যস্ত হইত, এ জন্য তাহার মনে এত অশান্তি ছিল, অধুনা নারীর সকল-দিকেই সুখ-সুবিধার দিন আসিয়াছে, এইবার নারীর মনের অশান্তি অন্তর্হিত হইতেছে এবং আরও হইবে। অতিবড় ধনী নারী হইতে গ্রাম্য দরিদ্র বালিকা পর্য্যন্ত সকলেই ঘোর অতৃপ্ত। অধুনা নারী কিছুতেই সন্তুষ্ট নহে, এই দেখিয়া Sinclair Lewis প্রমুখ লেখকগণ বলেন যে, মাতৃহৃদয়ের প্রেরণাবশে সারা বিশ্বময় সর্ব্বহারাদের, লাঞ্ছিতদের, উদ্বাস্তুদের দুঃখমোচন করিয়া, জগতের সব কিছু ভাল দ্রব্য তাহাদেরই ব্যবহারে নিয়োগ করিতে অসমর্থ হন বলিয়াই নারী অতৃপ্ত। কিন্তু এই অতৃপ্তি যাইতে পারে না, কারণ এই দানবীয় সংসারে তাহা ঘটা অসম্ভব, কাজেই নারীর মাতৃহৃদয় তৃপ্ত হয় না, তাহাদের অশান্তি যায় না, মন ভরাট হয় না (*Main Street*)। ইহাই বাস্তবিক নারীর খেদের কারণ, যদিও অধিকাংশ শিক্ষিতা নারীই এই কথা হয়ত মানিবেন না। কিন্তু নর ও নারীর একমাত্র এবং সর্ব্বব্যাপী প্রভেদ মাতৃত্বমূলক। শরীরগত ও মনোগত যাহা কিছু বিশিষ্টতা নারীর আছে, প্রকৃতিদেবী তাহার সবগুলিই দিয়াছেন নারী মাতা হইবেন বলিয়া, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নহে। সুতরাং নারীত্ব ও মাতৃত্ব একই পদার্থ। মাতৃত্ব না থাকিলে নর ও নারী এক। "The maternal function marks the whole type [of woman], indeed the whole conception of woman" (Ellis, *op. cit.* iv, 199)। আবার মাতৃত্ব বিকাশ সন্তান হইতে, সন্তানেরই জন্য। পরার্থপরতার জন্ম মাতৃত্ব হইতে। কারণ মানুষের শিশুর মত অসহায় জীব জগতে আর নাই। এই শিশুকে দরদ, স্নেহ, মমতা দিয়া আপনার যথাসর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া, তবে মাতা তাহাকে পালন করেন, জীবনভোর মায়ের স্নেহ সন্তানের জন্য অক্ষুণ্ণ থাকে। এই কারণেই মাতাই পরার্থপরতার জননী (Drummond, *Ascent of Man*, Herbert Spencer, Mons. Ribot, *Psychology of the Emotions*)। সুতরাং পরের জন্য, বিশ্বযোড়া লোকের জন্য,একমাত্র মাতা বা নারীই দরদ অনুভব করিতে পারেন, অন্য কাহারও এই সাধ্য নাই। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, কেহ দেখেন না, হয়ত দেখিতে মনেও হয় না, যে এই মাতৃত্বকে জগদ্ব্যাপী বিস্তার করিলে, মনে ও কার্য্যে এই পরম পবিত্র বৃত্তিকে ঘনীভূত ও ঊর্দ্ধমুখী করিলে, জগতের যাবতীয় দুঃখ মিটাইবার জন্য ইহাকে নিয়োগ করিলে, তবেই নারীর জীবন পূর্ণতায়, সার্থকতায় ভরিয়া যায়। ইহারই নাম sublimation, ইহারই কৃপায় জগতে প্রায় যত কিছু অনিষ্ট দূর হয়। মাতৃত্বের এইরূপ বিকাশ ও তাহার কার্য্যই নারীর মধ্যে গুমরানি, ক্ষোভ, অভিমান, ক্রোধ, দাগা, দুঃখ, খেদ, অবসাদ, রিক্ততা, ব্যর্থতা ইত্যাদি নিবারণ করিতে সমর্থ হয়। অন্য সব ব্যবস্থা, যাহা জগৎ জুড়িয়া হওয়া সত্ত্বেও নারীর মনে অশান্তি মিটে না, তাহা বৃথা, আলেয়ার পশ্চাতে ছুটাছুটী মাত্র।

ইতিহাস-পাঠে জানা যায় যে, প্রাচীন মিশর, পারস্য প্রভৃতি দেশে যেখানে নারীই রাজ্ঞী হইতেন, অথবা যে সমাজে নারীর বহু-পতিত্ব দোষের নহে এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ ব্যাপারেও দেখা যায় যে, যদি নারী প্রবল পক্ষ হয়, সে স্থানে নারী পুরুষেরই মত অত্যাচার, ব্যভিচার করিতে ছাড়ে না। গৃহ-সংসারেও প্রবলা নারী দুর্ব্বল পুরুষের প্রতি হৃদয়হীন ব্যবহার করে, এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। শাশুড়ী যে ক্ষেত্রে প্রবল, সে ক্ষেত্রে কতক স্থানে বধূ-নির্য্যাতনও যেমন হয়, বধূ যে ক্ষেত্রে প্রবল, কতক স্থানে শাশুড়ী নির্য্যাতনও সেরূপ হয়। তবে সংবাদ পত্রে

বধূ-নির্য্যাতনের কথা অধিক বাহির হয় এবং বধূই সাধারণের সহানুভূতি পায়। শাশুড়ীর প্রতি অত্যাচার হইলে, তিনি গৃহ-কোণে আপনার অশ্রু মুছিয়া, অদৃষ্টকে শত ধিক্কার দিয়া দিন কাটান এই মাত্র প্রভেদ। দুর্ব্বল এবং প্রবল পক্ষ থাকিলে ইহাই কতকক্ষেত্রে ঘটে, কারণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। শাশুড়ী-নির্য্যাতনও নারী-মেধ এ কথাটা কাহারও মনে থাকে না। অবাধ বধূ-নির্য্যাতনও পুরুষে করে না, এটাও ভুল হয়।

সমাজ অর্থে নর ও নারী। অত্যাচারী অর্থে দরদহীন লোক। কোন সমাজই শুধু সৎ ও দরদী লোকে পূর্ণ হইতে পারে না। অধুনা আমাদের সমাজ আমাদেরই শ্রদ্ধা হারাইয়াছে, সুতরাং ইহা মৃতপ্রায়। যদি প্রাণের মধ্যে শ্রদ্ধা করিবার কিছু না থাকে, তবে সমাজ মরিবেই, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যে কষ্টি-পাথর দিয়া সমাজকে আজ বিচার করিয়া তাহার সবটাই হেয়, ধিক্কারজনক বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ ও কাজে করা হইতেছে, যদি সেই কষ্টিপাথরকেই আমাদের সমাজের তুলনায় যাচাই করা হইত, তবে সেই কষ্টিপাথরও ধূলায় গড়াগড়ি দিত। বাস্তবিক যদি আমাদের সমাজ মধ্যে কিছু জীবনী-শক্তি না থাকিত, তবে অনেক পূর্ব্বে ভারতবর্ষ লোপ পাইত। এই দুইটি কথাও অনেক স্থানে মনে হয় না কেন বুঝা যায় না।

এই নারী-মেধ ব্যাপারেও সর্ব্বাপেক্ষা সাংঘাতিক কথা এই যে, দেশে শতকরা ৩৫ জনের একবেলা আহার জুটে না, শতকরা ৮০ জন ভাল খাইতে পায় না, আমাদের ঘরে ঘরে অসংখ্য বেকার, আমাদের স্বাস্থ্যহীনতা সর্ব্বত্র প্রকট, আমাদের জীবনমধ্যে পরশ্রীকাতরতা, ইতরতা, কলহ-বিবাদের অন্ত নাই। শুধু প্রাণ রাখিতেই আমাদের প্রাণান্ত হয়, অধিক কিছু করিবার সামর্থ্য বা মন অধিকাংশেরই থাকে না। আমরা মাত্র ২২ বৎসর বাঁচি, আমরা মশার মত জন্মাই, মাছির মত মরি। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, দুর্দ্দৈব আমাদের নিত্য-সহচর। আমাদের উপজীবিকা-ক্ষেত্র ৫।১০ টি মাত্র। বৃথা অভিমান, উৎকট আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান আমাদের জীবনে অনেক সাফল্য নাশ করে। অধুনা আবার সর্ব্বোপরি আসিয়াছে বিলাসিতা, সর্ব্বত্র কামোদ্দীপক ব্যবস্থা, সিনেমা ও এক জাতীয় নভেল। ইহারা সমবেত শক্তিতে আমাদের স্ব-ছন্দ জীবন ঘুচাইয়া দিয়া, অপ্রাকৃত, বিকৃত অস্বাভাবিক আবেষ্টনীর ও আবহাওয়ার মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে। কাজে কাজেই কি অর্থনৈতিক, কি রাজনৈতিক, কি সমাজনৈতিক, কি দাম্পত্য-জীবন, কি ঘর-সংসার কোন খানেই যেন সুব্যবস্থা হইতেছে না। অথচ আমরা ঘোর অন্ধ অনুকরণকে জীবনের সার করিয়াছি, ভুলিয়া গিয়াছি যে যাঁহাদের অনুকরণ করি, তাঁহাদের অবস্থা কোন দিক্ দিয়াই অনুকরণীয় নহে।

জল-সেচন

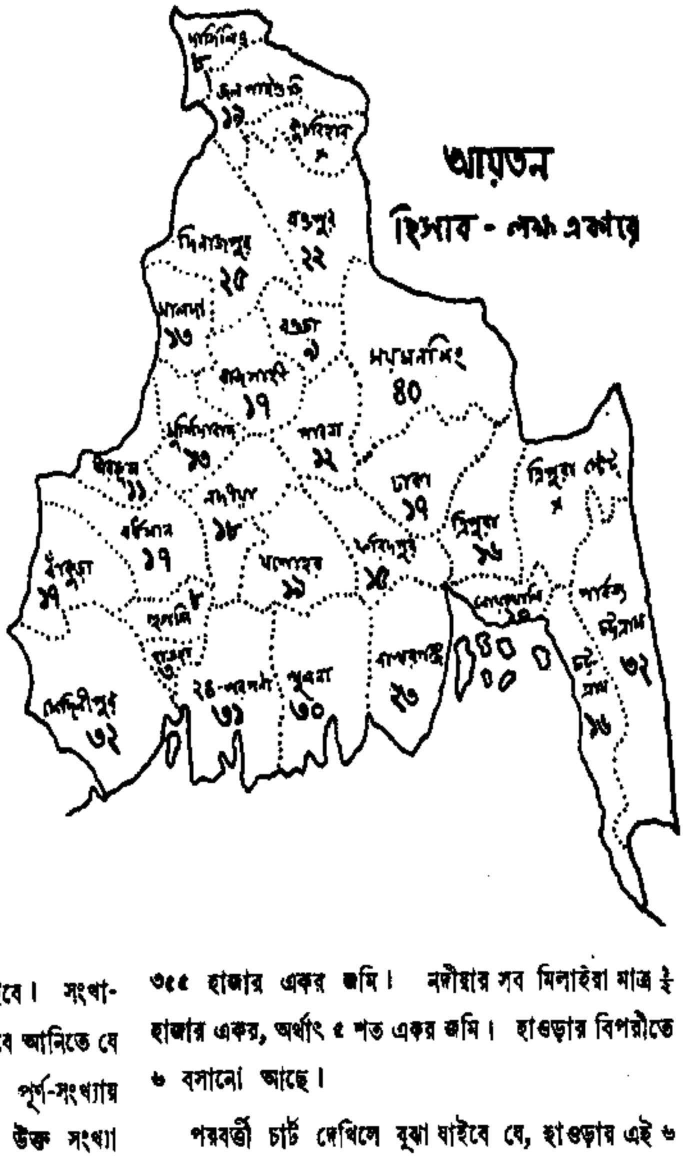
...বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক জলসেচন-প্রণালী (Irrigation) দ্বারা জমীর উৎপাদিকা-শক্তির উন্নতি সাধন করা সম্ভবপর নহে, কারণ তাহাতে কেবল জমীর উপরিভাগে জল-সিঞ্চনের ব্যবস্থা সাধিত হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা জমীর অভ্যন্তরে রস-সঞ্চয়ের কোন ব্যবস্থা সাধিত হয় না। পরন্তু বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক জলসেচন-প্রণালীতে ক্রতগামী স্রোত-প্রবাহের কোন বন্দোবস্ত না থাকায় জমীর মধ্যে বিষাক্ত বাষ্পের সঞ্চয় হইয়া থাকে এবং তাহাতে মশকাদি অতিরিক্ত কীট-পতঙ্গের উদ্ভব হইয়া দেশের মধ্যে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মানুষ বহু সহস্র বৎসর হইতে প্রকৃত কৃষিবিজ্ঞান বিস্মৃত হইয়াছে বলিয়া বহু সহস্র বৎসর হইতে জমীর উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্ত জগতের কুত্রাপি কেহ নদীগুলির পঙ্কোদ্ধার সাধন করেন নাই। ফলে জগতের সর্ব্বত্রই প্রায়শঃ নদীগুলি অপ্রসর এবং অগভীর হইয়া আসিতেছে এবং সর্ব্বত্রই জমীর উর্ব্বরাশক্তিও হ্রাস পাইয়া আসিতেছে। কৃত্রিম সারের সাহায্য ব্যতীত কোন এক বিঘা জমী হইতে প্রত্যেক পাঁচ বৎসরে গড়ে প্রতি বৎসর কত ফসল হয়, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি যে ক্রমশঃই হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে, তৎসম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায়।

বাঙ্গালায় জল-সেচনের ব্যবস্থা

—শ্রীকালাচাঁদ রায়

গত ফাল্গুন সংখ্যায় আমরা বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলার কৃষি-জাত দ্রব্যাবলীর বিষয় আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে কৃষির পক্ষে বর্ত্তমানে যাহা অপরিহার্য্য বলিয়া মনে করা হয়, সেই জলসেচন ব্যবস্থায় বাংলার বিভিন্ন জিলার অবস্থা কিরূপ, তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করা হইবে। বাঙ্গালার ২৮টি জিলার মধ্যে মাত্র কয়েকটিতে আমরা এই বন্দোবস্তের একটু আভাস দেখিতে পাই। সরকার হইতে এ পর্য্যন্ত মাত্র কয়েকটি জিলা ছাড়া এই ব্যবস্থা অন্য কোথাও করা হয় নাই এবং যে কয়টি জিলায় করা হইয়াছে, তাহার পরিমাণও এমন কিছু অধিক নয়।

প্রথমে বাঙ্গালার বিভিন্ন জিলার আয়তন বুঝাইবার জন্য লক্ষ একারের হিসাবে প্রস্তুত মানচিত্র অন্তর্ভুক্ত হইল। অতঃপর বাঙ্গালার কোন্ কোন্ জিলায় সরকারী খাল, বে-সরকারী খাল, দীঘি ও পুকুর, কূপ এবং অন্যান্য জলাশয় হইতে কত পরিমাণ জমিতে জলসেচন করা হইতেছে, নিম্নে ফিরিস্তি দিয়া পাঠকবর্গকে মোটামুটিভাবে তাহার হিসাব দিবার চেষ্টা হইল। ফিরিস্তিতে জিলার বিপরীতে যে সংখ্যা বসানো হইয়াছে, তাহাকে তত হাজার একর জমি বুঝিতে হইবে। সংখ্যাগুলি সম্পূর্ণ ঠিক নয়, কারণ হাজারের হিসাবে আনিতে যে ভগ্নসংখ্যা পাওয়া যায়, তাহাকে নিকটতম পূর্ণ-সংখ্যায় (nearest whole-number-এ) আনিতে উক্ত সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে। পরপৃষ্ঠার চার্ট-এ আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, বীরভূমের বিপরীতে সবার চেয়ে বড় সংখ্যা আছে, ৩১৫ এবং নদীয়ার বিপরীতে সর্ব্বনিম্ন, অর্থাৎ ½। তাহার অর্থ, বীরভূমে নানাবিধ উপায়ে (সরকারী খাল, দীঘি ও পুকুর, অন্যান্য জলাশয়, বে-সরকারী খাল, কূপ ইত্যাদি দ্বারা) সর্ব্বসমেত যে পরিমাণ জমি জলসিক্ত হয়, তাহাদের যোগফল



৩১৫ হাজার একর জমি। নদীয়ার সব মিলাইয়া মাত্র ½ হাজার একর, অর্থাৎ ৫ শত একর জমি। হাওড়ার বিপরীতে ৬ বসানো আছে।

পরবর্ত্তী চার্ট দেখিলে বুঝা যাইবে যে, হাওড়ার এই ৬ হাজার একর জমি শুধুমাত্র বে-সরকারী খাল হইতে সিক্ত করা হয়। নিম্নের চার্ট দেখিলে বুঝা যাইবে, কোন্ কোন্ জিলায়

জলসেচনের ব্যবস্থা আছে, আর কোন্ কোন্ জিলায় তাহা নাই। যে যে জিলায় ব্যবস্থা নাই, তাহাদের পার্শ্বে '×' চিহ্ন বসানো হইল।

(মোট জলসেচন-ব্যবস্থার হিসাব)

জিলার নাম	জলসেচনের ব্যবস্থা (হাজার একরে)
(১) ২৪ পরগণা	
(২) নদীয়া	½
(৩) মুর্শিদাবাদ	১৬৭
(৪) যশোহর	×
(৫) খুলনা	×
(৬) বর্দ্ধমান	৩১৮
(৭) বীরভূম	৩৪৮
(৮) বাঁকুড়া	৫৫৫
(৯) মেদিনীপুর	২৫২
(১০) হুগলি	৬৬
(১১) হাওড়া	
(১২) রাজসাহী	
(১৩) দিনাজপুর	
(১৪) জলপাইগুড়ি	১৫০
(১৫) দার্জ্জিলিং	৫৪
(১৬) রংপুর	×
(১৭) বগুড়া	×
(১৮) পাবনা	×
(১৯) মালদহ	৯৬
(২০) ঢাকা	×
(২১) ময়মনসিংহ	৬২
(২২) ফরিদপুর	×
(২৩) বাখরগঞ্জ	×
(২৪) চট্টগ্রাম	২৭
(২৫) ত্রিপুরা	×
(২৬) নোয়াখালি	×
(২৭) পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	×
(২৮) ত্রিপুরা ষ্টেট্	§

স্থূল ভাবে দেখিতে গেলে বিবিধ উপায় মিলাইয়া বাঙ্গালায় পাঁচপ্রকার বিধি দ্বারা জল সেচন করা হয়। যথা—সরকারী খাল, বে-সরকারী খাল, দীঘি ও পুকুর, কূপ এবং অন্যান্য জলাশয়। এই পাঁচটি বিধিকে দুইভাগে ভাগ করিয়া হিসাব দেখানো হইয়াছে, হাজারে এবং শতে। কারণ শুধু হাজারে কিংবা শতে আনিলে পূর্ণ সংখ্যার অঙ্ক দিয়া সমস্ত জিলার নির্দ্দেশ করা সুবিধাজনক নহে। সেই জন্য দুই প্রকার হিসাব করিতেছি :

(ক) হাজার একারের হিসাব :

১। সরকারী খাল, ২। দীঘি, ও পুকুর, এবং ৩। অন্যান্য জলাশয়।

১। সরকারী খাল আছে কেবল বর্দ্ধমানে, মেদিনীপুরে, বীরভূমে, হুগলীতে ও বাঁকুড়ায়। নীচের হিসাব হইতে দেখিতেছি, বর্দ্ধমানে সরকারী খাল দ্বারা প্রায় ১৪৭ হাজার একর জমি জল সিক্ত হইতেছে, মেদিনীপুরে হইতেছে ২৮ হাজার একর জমি, বীরভূমে ৮, হুগলিতে ৫ এবং বাঁকুড়ায় মাত্র ২ হাজার একর জমি। এইখান হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, জল-সেচনের ব্যবস্থার দিক্ দিয়া সরকার কতটা কাজ করিয়াছেন।

(সরকারী খাল দ্বারা জলসিক্ত জমির পরিমাণ)

জিলার নাম	হাজার একর
১। ২৪-পরগণা	×
২। নদীয়া	×
৩। মুর্শিদাবাদ	×
৪। যশোহর	×
৫। খুলনা	×
৬। বর্দ্ধমান	১৪৭
৭। বীরভূম	
৮। বাঁকুড়া	
৯। মেদিনীপুর	
১০। হুগলি	
১১। হাওড়া	
১২। রাজসাহী	×
১৩। দিনাজপুর	×
১৪। জলপাইগুড়ি	×
১৫।	×
১৬। রংপুর	×
১৭। বগুড়া	
১৮। পাবনা	
১৯। মালদহ	

× চিহ্নিত জিলায় জলসেচনের কোনই ব্যবস্থা নাই বুঝিতে হইবে।

§ ত্রিপুরা ষ্টেট করদ রাজ্য, অতএব বৃটিশ বাঙ্গলার মধ্যে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

২০। ঢাকা	×
২১। ময়মনসিং	×
২২। ফরিদপুর	×
২৩। বাখরগঞ্জ	×
২৪। চট্টগ্রাম	×
২৫। ত্রিপুরা	×
২৬। নোয়াখালি	×
২৭। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	×
২৮। ত্রিপুরা ষ্টেট্	†

২। দীঘি ও পুকুর হইতে জলসিক্ত জমির পরিমাণ বাঁকুড়ায় সকলের চেয়ে বেশি, প্রায় ৩০৬ হাজার একর জমি। তাহার পরেই স্থান পাইতেছে বর্দ্ধমান, ১৪৬ হাজার একর জমি। বাঙ্গালার অন্যান্য জিলার মধ্যে এই উৎস হইতে আর সামান্য কয়েকটি জিলা সামান্য জল পাইলেও বেশির ভাগ জিলায়ই কিছুই পায় না। নীচের হিসাব হইতে এই সত্যটি পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। যাহারা পায় না তাহাদের একমাত্র অবলম্বন নৈসর্গিক বারিপাত।

জিলার নাম	হাজার একর
১। ২৪ পরগণা	×
২। নদীয়া	½
৩। মুর্শিদাবাদ	১০৯
৪। যশোহর	×
৫। খুলনা	×
৬। বর্দ্ধমান	১৪৬
৭। বীরভূম	১৫৭
৮। বাঁকুড়া	৩০৬
৯। মেদিনীপুর	৯০
১০। হুগলী	১৬
১১। হাওড়া	×
১২। রাজসাহী	৮
১৩। দিনাজপুর	×
১৪। জলপাইগুড়ি	×
১৫। দার্জ্জিলিং	×
১৬। রংপুর	×
১৭। বগুড়া	×
১৮। পাবনা	×
১৯। মালদহ	৬৪
২০। ঢাকা	*×
২১। ময়মনসিং	×
২২। ফরিদপুর	×
২৩। বাখরগঞ্জ	×
২৪। চট্টগ্রাম	৪
২৫। ত্রিপুরা	×
২৬। নোয়াখালী	×
২৭। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	×
২৮। ত্রিপুরা ষ্টেট্	†

৩। নিম্নে অন্যান্য জলাশয়ের হিসাব হইতে দেখিতে পাইতেছি যে, বীরভূম পায় সকলের চেয়ে বেশি, ১৩৯ হাজার একর পরিমাণ জমির জল এবং ময়মনসিং তাহারই পরে, ৬২ হাজার একার জমিতে। দার্জ্জিলিঙে খাল, বিল, দীঘি, পুকুর কিছুই নাই; যে-পরিমাণ জমি দার্জ্জিলিং সিক্ত করিয়া থাকে, তাহার সমস্তটুকুই ঝর্ণার জল হইতে। নদীয়ার পার্শ্বে ½ বসানো হইয়াছে; নদীয়ায় খুবই সামান্য পরিমাণ জমি ভিজাইবার জন্য জল পায়।

(অন্যান্য জলাশয় দ্বারা সিক্ত ভূমির পরিমাণ)

জিলার নাম	হাজার একর
১। ২৪-পরগণা	×
২। নদীয়া	½
৩। মুর্শিদাবাদ	৫২
৪। যশোহর	×
৫। খুলনা	৮
৬। বর্দ্ধমান	২৩
৭। বীরভূম	১৩৯
৮। বাঁকুড়া	৪
৯। মেদিনীপুর	৫৬
১০। হুগলি	৩৯
১১। হাওড়া	×
১২। রাজসাহী	২
১৩। দিনাজপুর	×

† ত্রিপুরা ষ্টেট করদ-রাজ্য, বৃটিশ-বাঙ্গালার মধ্যে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

× চিহ্নিত জিলায় সরকারী খাল নাই বুঝিতে হইবে।

† ত্রিপুরা ষ্টেট্, করদ-রাজ্য, অতএব বৃটিশ-বাঙ্গলার মধ্যে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

× চিহ্নিত জিলায় দিঘি ও পুকুর দ্বারা জল সেচনের কোনোই ব্যবস্থা নাই, বুঝিতে হইবে।

১৪। জলপাইগুড়ি	
১৫। দার্জিলিং	৫৪
১৬। রংপুর	
১৭। বগুড়া	
১৮। পাবনা	
১৯। মালদহ	৩২
২০। ঢাকা	×
২১। ময়মনসিং	৬২
২২। ফরিদপুর	×
২৩। বাখরগঞ্জ	"
২৪। চট্টগ্রাম	১৮
২৫। ত্রিপুরা	×
২৬। নোয়াখালী	"
২৭। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	"
২৮। ত্রিপুরা ষ্টেট	‡

(ক) শত একারের হিসাব :

১। বে-সরকারী খাল ও ২। কূপ।

১। * বে-সরকারী খাল অর্থে জমির জমিদার কিংবা স্বয়ং জমিদারকৃত খালের কথাই বুঝিতে হইবে। বে-সরকারী খাল দ্বারা জলপাইগুড়িতে সকলের চেয়ে বেশি পরিমাণ জমি সিক্ত করা হয়, প্রায় ১৪৩৫ শত অর্থাৎ প্রায় ১৪৩॥০ হাজার একর জমি এবং সর্ব্বনিম্নে বর্দ্ধমান, মাত্র ২শত একর জমি। বর্দ্ধমানে বে-সরকারী খালের ব্যবস্থা এত তুচ্ছ হওয়ার প্রধান কারণ এখানে সরকারী খালের ব্যবস্থা অন্যান্য জিলার তুলনায় খুবই বেশি। (সরকারী খালের চার্ট দ্রষ্টব্য)। জলপাইগুড়ির পরের স্থান অধিকার করিয়াছে মেদিনীপুর। এখানে ৪৩২ শত অর্থাৎ ৪৩ হাজার একারের উপর জমি ভিজাইবার জন্য বে-সরকারী খাল নির্ম্মিত হইয়াছে। নিম্নের চার্ট হইতে অন্যান্য জিলার বিবরণ পাওয়া যাইবে।

(বে-সরকারী খালদ্বারা জলসিক্ত জমির পরিমাণ)

জিলার নাম	শত একার
১। ২৪-পরগণা	×
২। নদীয়া	৭
৩। মুর্শিদাবাদ	৫০
৪। যশোহর	×
৫। খুলনা	"
৬। বর্দ্ধমান	২
৭। বীরভূম	৫০
৮। বাঁকুড়া	১৮০
৯। মেদিনীপুর	৪৩২
১০। হুগলি	৭০
১১। হাওড়া	৬০
১২। রাজসাহী	২৯
১৩। দিনাজপুর	×
১৪। জলপাইগুড়ি	১৪৩৫
১৫। দার্জিলিং	
১৬। রংপুর	
১৭। বগুড়া	
১৮। পাবনা	
১৯। মালদহ	
২০। ঢাকা	
২১। ময়মনসিং	
২২। ফরিদপুর	
২৩। বাখরগঞ্জ	"
২৪। চট্টগ্রাম	৪০
২৫। ত্রিপুরা	×
২৬। নোয়াখালি	"
২৭। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	"
২৮। ত্রিপুরা ষ্টেট	*

২। কূপ দ্বারা জল সরবরাহ করা কঠিন। কারণ জল অনেক গভীর গর্ত্ত হইতে উপরে টানিয়া তুলিতে হয়। সেই জন্য আমরা নিম্নের চার্ট হইতে দেখিতেছি, এখানকার সংখ্যাগুলি সবই ছোট ছোট। একমাত্র বাঁকুড়ায় ২৫৫ সংখ্যাটি পাইতেছি এবং তাহার পরই মেদিনীপুরে পাইতেছি ১৬৫ অঙ্কটি। অর্থাৎ উক্ত জিলাদ্বয়ে যথাক্রমে ২৫½ ও ১৬½ হাজার একার জমি কূপের জলদ্বারা সিক্ত করা হয়। নদীয়া ও চট্টগ্রামে ½ চিহ্ন বসানো হইয়াছে, অর্থাৎ এই জিলাদ্বয়ে মাত্র ৫০ একর জমি কূপের জল দ্বারা-সিক্ত হয়।

× চিহ্নিত জিলায় '[illegible]' হইতে জমি সিক্ত করিবার কোন সুবিধা নাই।

‡ ত্রিপুরা ষ্টেট করদ রাজ্য, বৃটিশ বাঙ্গালার মধ্যে তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

* ত্রিপুরা ষ্টেট করদ রাজ্য, বৃটিশ বাংলার মধ্যে তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

× চিহ্নিত জিলায় বে-সরকারী খাল নাই বুঝিতে হইবে

কূপদ্বারা জলসিক্ত জমির পরিমাণ

	জিলার নাম	শত একার
১।	২৪-পরগণা	×
২।	নদীয়া	½
৩।	মুর্শিদাবাদ	১
৪।	যশোহর	×
৫।	খুলনা	··
৬।	বর্দ্ধমান	১৮
৭।	বীরভূম	২
৮।	বাঁকুড়া	২।৫
৯।	মেদিনীপুর	১৬৫
১০।	হুগলি	৬
১১।	হাওড়া	×
১২।	রাজসাহী	৬১
১৩।	দিনাজপুর	×
১৪।	জলপাইগুড়ি	৬·
১৫।	দার্জ্জিলিং	×
১৬।	রংপুর	··
১৭।	বগুড়া	··
১৮।	পাবনা	··
১৯।	মালদহ	··
২০।	ঢাকা	··
২১।	ময়মনসিং	··
২২।	ফরিদপুর	··
২৩।	বাখরগঞ্জ	··
২৪।	চট্টগ্রাম	½
২৫।	ত্রিপুরা	×
২৬।	নোয়াখালি	··
২৭।	পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	··
২৮।	ত্রিপুরা ষ্টেট	§

§ ত্রিপুরা ষ্টেট করদরাজ্য, বৃটিশ বাঙ্গলার মধ্যে তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

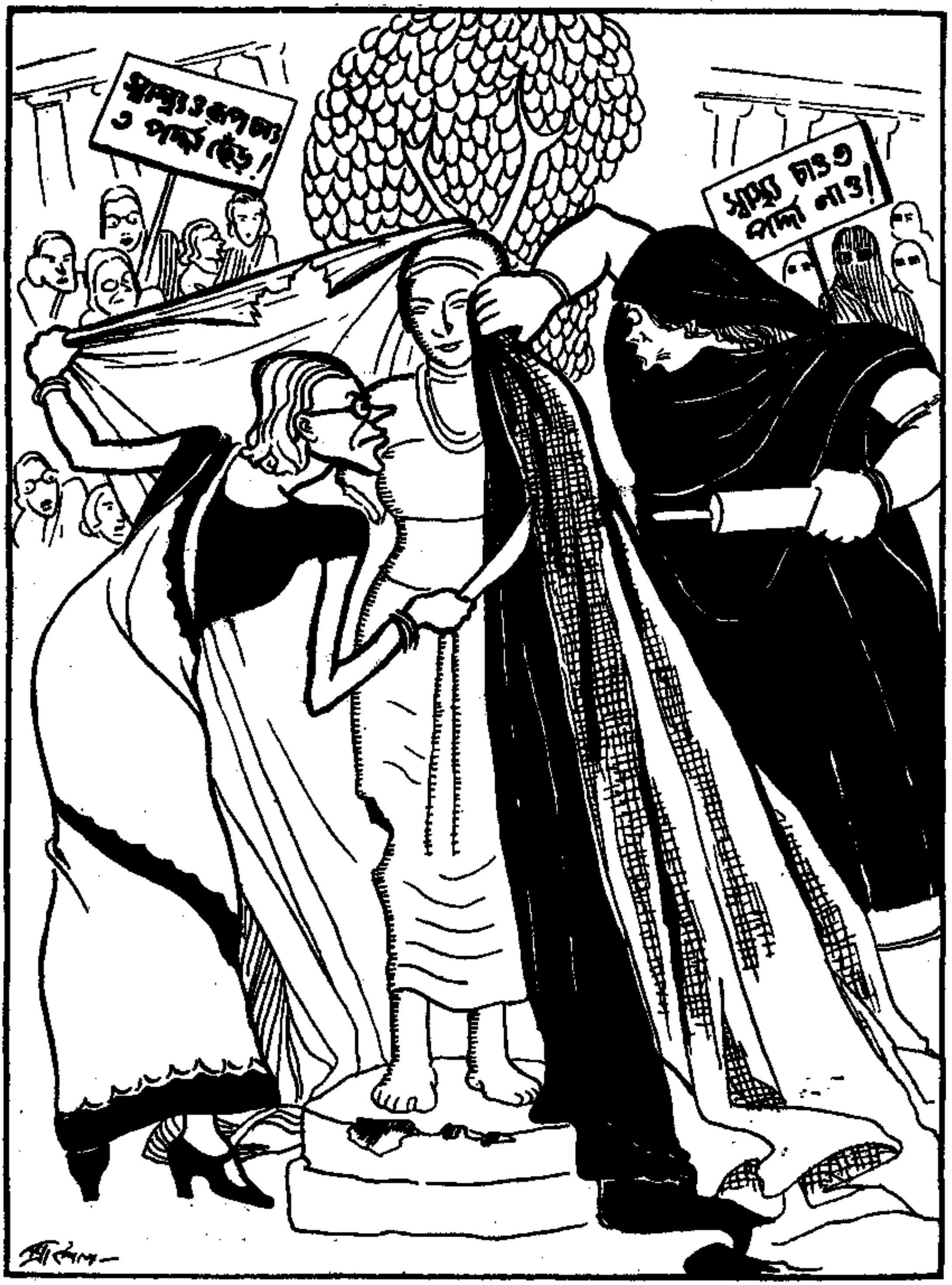
× চিহ্নিত জিলায় কূপদ্বারা জমি জলসিক্ত করা হয় না বুঝিতে হইবে।

গত ফাল্গুন-সংখ্যায় 'বাঙ্গলার কৃষিজাত দ্রব্যাবলী' প্রবন্ধে দেখা গিয়াছে যে, ময়মনসিং জিলা কৃষিজাত দ্রব্যাবলীর জন্য অনেক পরিমাণ জমি কাজে লাগায়। কিন্তু উপস্থিত প্রবন্ধে আমরা দেখিতেছি যে, জলসেচনের ব্যবস্থা তথায় খুবই সামান্য। অতএব বুঝিতে হইবে যে, ময়মনসিং তাহার জল সরবরাহের জন্য নিসর্গের উপরেই নির্ভর করিয়া আছে। তাহা ছাড়া ব্রহ্মপুত্র নদের শাখা-প্রশাখার নিকট হইতেও সে কিছু পরিমাণ জলের সাহায্য পায়।

বাখরগঞ্জ জিলায় অনেক শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু সেখানে কোন প্রকারের জলসেচনের ব্যবস্থা নাই। বাখরগঞ্জে খাল খননের আবশ্যকতা নাই, কারণ, আমরা জানি, বাখরগঞ্জ প্রাকৃতিক খাল দ্বারা আচ্ছন্ন। সমস্ত জিলা খালের জালে জড়িত। এখানে সেইজন্য সরকারী কিংবা বে-সরকারী খালের দরকার হয় না। অন্যান্য যে যে জিলায় জলসেচনের কোন ব্যবস্থাই নাই, তাহারা হইতেছে—বগুড়া, পাবনা, যশোহর, ২৪-পরগণা, ঢাকা, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, রংপুর ইত্যাদি। বাঙ্গালার জিলাসমূহের মধ্যে এতগুলি জিলা কোনরূপ জলসেচনের ব্যবস্থা হইতে বঞ্চিত। অতএব আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, ফসলের জন্য চাষীদের মনসুনের উপর নির্ভর করিতে হয়। মনসুন আসিয়া পৌঁছাইতে দেরী করিলে, কিংবা সহসা দু'দিন আগে আসিয়া পড়িলে শস্যের সমূহ অনিষ্ট হয়। যদিচ চাষীরা জানি যে মনসুন আসিবেই, তথাপি তাহাদের খানিকটা অনিশ্চয়তা লইয়া থাকিতে হয়, কারণ, ঠিক কবে তাহার আগমনের সূত্রপাত হইবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা দুরূহ।

পোষাকী নেতা

…বর্ত্তমানে যে কয়জন মনীষী কংগ্রেসের কর্ণধার রহিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ধনবান্ লোকের সন্তান। দারিদ্র্য যে কি জিনিষ এবং তাহার ভ্রূকুটী যে কি ভীষণ, তাহা তাঁহাদের জানিবার সুযোগ হয় নাই। অন্নাভাবে দেশের শতকরা ৯৮ জন লোকের উদর যে কিরূপ ক্ষুধায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে, অর্থাভাবে প্রিয়তম পুত্র ও দুহিতার রোগশয্যায় চিকিৎসার ব্যবস্থা না করিতে পারিলে এবং তাহাদের কাহারও অকালমৃত্যু দেখিতে হইলে প্রাণে যে কি যাতনা উপস্থিত হয়, পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি বিসর্জ্জন দিয়া যে পুত্রকে শিক্ষিত করান হইয়াছে, সেই পুত্র উপার্জ্জনক্ষম না হইতে পারিলে মনের যে কি অবস্থা হয়, তাহা তাঁহারা অনুমান করিতে পারেন না। তাই তাঁহারা কোন্ উপায়ে মানুষের অর্থাভাব, অসন্তুষ্টি, অস্বাস্থ্য এবং অকালমৃত্যু দূর হইবে, তাহার কথা চিন্তা না করিয়া অথবা দেশের জনসাধারণ যাহাতে তদনুরূপ কার্য্যে ব্রতী হয়, তাহার ব্যবস্থা না করিয়া অর্থহীন, অভিমানাত্মক "স্বাধীনতা অর্জ্জন করা" কংগ্রেসের কর্ম্মোদ্দেশ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন।…



গত ২১শে মার্চ্চ পাঞ্জাব ব্যবস্থা-পরিষদে মিসেস্ দুনীচাঁদ বলেন যে, "পাঞ্জাবী নারীদের মন্দ স্বাস্থ্যের জন্য পর্দ্দা-প্রথা দায়ী……।" বেগম রশিদা লতিফ নামক অপর একজন সদস্যা বলেন, "আমি আজীবন পর্দ্দার মধ্যে কাটাইয়াছি, কিন্তু সমগ্র লাহোরে আমিই সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠা স্ত্রীলোক।"

ভারতের শিল্প-সংস্থান

—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

গত সংখ্যায় আমরা চাউল, গম, তুলা, রেড়ীবীজ, তিসি, হরিতকী ইত্যাদি ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যের রপ্তানীর পরিমাণ এবং ঐ সকল দ্রব্যজাত শ্বেতসার ও ডেক্সট্রিন্, গ্যালেটিক অম্ল, অক্সালিক অম্ল, মিথিল সুরা, (মেথিলেটেড স্পিরিট), নাইট্রিক অম্ল, টার্টারিক অম্ল, ইত্যাদির বিদেশাগত আমদানীর পরিমাণ উল্লেখ করিয়া, কি উপায়ে চাউল ও গম হইতে ডেক্সট্রিন্, শ্বেতসার ও গ্লুকোজ, তুলা হইতে নাইট্রো-সেলুলোজ, কাঠের গুঁড়া হইতে মেথিলেটেড স্পিরিট, অক্সালিক অম্ল ও সুরাসার, তৈলবীজ হইতে ওয়াটার প্রুফ, লিনোলিয়াম, সাবান প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার আভাস দিয়াছি। বর্ত্তমান সন্দর্ভে আরও কয়েকটি দ্রব্যের রপ্তানী ও আমদানীর উল্লেখ করিয়া কি উপায়ে এক হইতে অপর দ্রব্য রূপান্তরিত হয়, তাহার সামান্ত আলোচনা করা হইতেছে।

এই প্রবন্ধে বর্ণিত কয়েকটি রপ্তানী বা আমদানীর পরিমাণ ও তাহার মূল্যের তালিকা (১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৩৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত হিসাব।)

রপ্তানী :	পরিমাণ	মূল্য
চিনি	৯৩,০৩২ টন	৩৮,৯৯,৩৮৮ টাকা
চন্দন তৈল	১১০,৭৩১ পাউণ্ড	১২,৮৩,৭৫৩ "
রবার (কাঁচা)	১৬,১২৭,২৭৪ "	৭৬,৩৫,১১৬ "
চা (পাতা)	৩২৪,০৭০,২৯৫ "	২৩,৬৪,৬৬,৮৮৮ "
" (গুঁড়া) কেফিন প্রস্তুতের জন্য	৫,৩০৯,৩১০ "	২,৬৮,৫৭১ "
কফি	৯৯'৮৯৯ "	৪১,০৭,২২০ "
তার্পিণ তৈল	৭১৫৪ হন্দর	৬১,৫৫৭ "
রজন	৫,৫৩৮ "	৫৬,১১৭ "
আমদানী :		
চিনি	১৩,৯৭৭ টন	১৭,৬১,১০৪ "
" (১৯৩৬-৩৭)	২২,৩৭৪ "	২২,৯৭,২০৩ "
" (১৯৩৭-৩৮)	২০০,২০০ "	১,৮২,৪৬,৫৭৬ "
মিছরী	৬১৯ "	৮৬,৬৮২ "
এসেটিক্ য়াসিড্	৩২৭ "	১,৫৪,২৭১ "
তার্পিণ তৈল	৫,৭৭৯ হন্দর	১,১৮,৭৫৫ "
রজন	১,৯২৮ টন	৩,৯৩,৫৭১ "
রবার (কাঁচা)	৬,৯৯১,১০৮ পাউণ্ড	১৮,৮২,২০৪ "
রবারের—সাইকেল টিউব	মোট সংখ্যা	টাকা
	১,৩০০,৮২৩	৩,৪৪,১৮৮ "
মোটর সাইকেল "	২,৯৩৭	৫,৯৫৩
মোটর গাড়ী "	১৯১,৮৫৫	১০,৮৫,৫৮০
মোটর টায়ার "	১৯৩৪	২,১১,৩১৮

ইক্ষু : চিনি, সুরাসার, গ্লুকোজ

যুক্ত-প্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার, বাঙ্গালা প্রভৃতি প্রদেশে প্রায় ১০২ কোটী বিঘায় ইক্ষুর চাষ হয়। ইতিপূর্ব্বে জাভা হইতে আনীত চিনিই এ দেশে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল, কিন্তু সংপ্রতি সরকারী সাহায্যের ফলে এ দেশেই প্রচুর পরিমাণে চিনি প্রস্তুত হইতেছে। বর্ত্তমানে এ দেশে প্রায় ১৩৭টী চিনির কল স্থাপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে যুক্ত-প্রদেশে ৬৭টী ও বিহারে ৩৫টী অবস্থিত। বিগত বর্ষে প্রায় ২৯৭ লক্ষ মণ সাদা চিনি প্রস্তুত হইয়াছিল।

ইক্ষুদণ্ডে সাধারণতঃ শতকরা ১৮ ভাগ চিনি থাকে। তপ্ত রোলারের চাপে ইক্ষু হইতে রস বাহির করা হয়। এই রসে শতকরা প্রায় ২০ ভাগ ইক্ষু, শর্করা বা চিনি থাকে। রসের অধিকাংশই জল। চিনি ব্যতীত ইহাতে সামান্ত পরিমাণ জৈব, অম্ল, লবণ, বর্ণ ও গঁদজাতীয় অপদ্রব্য মিশ্রিত থাকে। রসটীকে চূণ দিয়া ফুটাইলে অধিকাংশ অপদ্রব্যই ফেণাকারে একত্রিত হইয়া ভাসিয়া উঠে। সূক্ষ্ম তারের জাল দিয়া ছাঁকিয়া লইলে এই অপদ্রব্যগুলি পৃথক হইয়া যায়। এক্ষণে ঐ রসে কার্ব্বণ-ডাই-অক্সাইড ও স্যালফার ডাই-অক্সাইড্ গ্যাস চালিত করিলে রসটী প্রায় বর্ণহীন হয়। পরিষ্কার রসকে মৃদুতাপে উত্তপ্ত করিলে ক্রমশঃ ঘন হইয়া আসে এবং চিনির দানা বাঁধিতে আরম্ভ হয়। রস পাক করিবার জন্য ভ্যাকম্ প্যান্ (vacuum pan) নামক যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এই যন্ত্র সম্পূর্ণরূপে আবৃত একটী কটাহবিশেষ। নলের সাহায্যে ভিতরে ইক্ষুরস সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা আছে। আর একটি নল যন্ত্রপাত্রের পাশ দিয়া চক্রাকারে বসান থাকে। উহার ভিতর দিয়া ষ্টিম্ চালিত করিলে রসকে উত্তপ্ত করা যায়। যে কোন তরল পদার্থকে উত্তপ্ত করিলে এক সময়ে

উহা ফুটিয়া উঠে ও বাষ্পে পরিণত হয়। যে তাপে উহা ফুটিয়া উঠে, উহাকে ঐ দ্রব্যের স্ফুটনোত্তাপ (boiling point) বলে। দেখা গিয়াছে যে, তরল দ্রব্যটির উপরিতন বায়ু-চাপ হ্রাস করিলে উহার স্ফুটনোত্তাপও কমিয়া যায়, অর্থাৎ পূর্ব্বাপেক্ষা মৃদুতাপেই ফুটিয়া উঠে। ভ্যাকম্ প্যান্ হইতে কিয়ৎ পরিমাণ বায়ু নিষ্কাশিত করিয়া লইলে উহার মধ্যে বায়ু-চাপ কমিয়া যায়; ফলে রসটী মৃদুতাপে ফুটিতে থাকে। ঘন রসকে শীতল হইতে দিলে চিনির দানা জমিয়া যায়, কিন্তু কিছু তরল রস অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। উহা হইতে আর কোনরূপেই চিনি সংগ্রহ করা যায় না।

সাধারণতঃ ইক্ষুরসকে পাক করিলে গুড়ে পরিণত হয়। উহাতে চিনি, মাৎগুড় (molasses) ও বিবিধ অপদ্রব্য থাকে। সেণ্ট্রিফুগ্যাল্ যন্ত্রে (centrifugal machine) গুড় হইতে তরলাংশ পৃথক্ করিয়া লইলে দেশী চিনি পাওয়া যায়। এই চিনির বর্ণ পীতাভ; ইহাতে কিঞ্চিৎ অপদ্রব্য ও জলীয়াংশ থাকে। অবশিষ্ট তরলাংশকে মাৎগুড় (molasses) বলে। ইহাকে পুনরায় পাক করিয়া ঘন করিলে আঠাল হইয়া যায়—কোনরূপ দানা জমে না। বর্ত্তমানে এদেশীয় চিনির কলগুলিতে প্রচুর পরিমাণ অব্যবহার্য্য মাৎগুড় অবশিষ্ট থাকে। ইহার কিয়দংশ গৃহপালিত পশুদের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় ও কিয়দংশ দেশীয় তামাক প্রস্তুতের জন্যও ব্যবহৃত হয়। সুরা প্রস্তুত করিবার নিমিত্তও অল্প পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহাকে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করিবার নিমিত্ত বিশেষ গঠনের চুল্লী (furnace) উদ্ভাবিত হইয়াছে। এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রসায়নী ডক্টর শ্রীনীলরতন ধর মহাশয় দেখাইয়াছেন যে মাৎগুড় অনুর্ব্বর ভূমির সার হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। সুরা-বীজের (yeast) সাহায্যে পচনের (fermentation) ফলে মাৎগুড় হইতে সুরা প্রস্তুত হয়। মাৎগুড়ের দ্রবণে ক্রমশঃ সুরার পরিমাণ বর্দ্ধিত হইলে পচনক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। এই কারণে যাহাতে অল্প পরিমাণ সুরাই সংগৃহীত হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা হয়। সুরার মৃদু দ্রবণকে বিশেষ যন্ত্রে তির্য্যকপাতন (distil) করিলে প্রথমে সুরা ও জল উভয়ই বাষ্পে পরিণত হয়। এই বাষ্প মিশ্রণকে ধীরে ধীরে শীতল করিলে সুরাসার বা তীব্র সুরা সংগৃহীত হয়। ইহা পানীয় ছাড়াও অন্যান্য বহু প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গন্ধহীন সুরাসার (absolute alcohol), সুগন্ধি ও পুষ্পাদির নির্য্যাস প্রস্তুত করিবার জন্য বিশেষ মূল্যে বিক্রীত হয়। ঔষধে ব্যবহৃত গাছের ছাল, পাতা প্রভৃতির আরক প্রস্তুত করিতেও প্রচুর পরিমাণ সুরাসারের প্রয়োজন হয়। পৃথিবীর সর্ব্ব দেশেই সুরা পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে এবং এই কারণে প্রত্যেক দেশেই ইহার উপর অত্যধিক পরিমাণে আবগারী বিভাগের শুল্ক ধার্য্য করা আছে। সরকারের সহিত বিশেষ ব্যবস্থা করিলে ঔষধাদি প্রস্তুতের জন্য অল্প শুল্কে সুরাসার পাওয়া যাইতে পারে। চিনি কলের সন্নিহিত সুরাসার প্রস্তুতের কারখানা স্থাপন করিলে অব্যবহার্য্য মাৎগুড় হইতে লাভজনক উপফল (bye-product) পাওয়া যায়। এইরূপে চিনির মূল্যও কথঞ্চিৎ হ্রাস করা যায় ও নূতন শিল্পে ব্যবহার্য্য কাঁচামালও (raw material) সরবরাহ করা যায়।

বায়ুর সংস্পর্শে না আসিতে পারে, এরূপ একটি বদ্ধ পাত্রে মাতগুড়কে উত্তপ্ত করিলে মিথিল সুরা (methyl alcohol), এসিটোন (acetone), এসেটিক্ এসিড় (acetic acid), এমোনিয়া (ammonia) প্রভৃতি দ্রব্য বাষ্পাকারে নির্গত হয়। পাত্রমধ্যে যে ভস্মাবশেষ অবশিষ্ট থাকে, উহাতে পটাশিয়ম নামক ক্ষারযুক্ত লবণ পাওয়া যায়। ইহা হইতে সার প্রস্তুত হইতে পারে। মিথিল সুরা, এসিটোন্ ও এসেটিক এসিড ঔষধে ব্যবহৃত হয় ও ইহা হইতে কৃত্রিম সুগন্ধি তৈয়ারী হয়। লৌহ ও এলুমিনাম্ ধাতু এসেটিক্ এসিডে দ্রবীভূত হইয়া লবণে পরিণত হয়। এই লবণগুলি রঞ্জনশিল্পে (dyeing) ব্যবহৃত হয়। এসেটিক্ এসিডের মৃদু দ্রবণই 'ভিনিগার' রূপে ব্যবহৃত হয়। তবে ভিনিগার প্রস্তুতের প্রণালী একটু স্বতন্ত্র।

রসহীন নিষ্পেসিত ইক্ষুদণ্ডগুলি জ্বালাইয়া ফেলা হয় বা নামমাত্র মূল্যে বিক্রীত হয়। এই দণ্ডগুলির সহিত কিছু পাট, এস্‌বেসটস্ ও সীমেণ্ট মিশ্রিত করিয়া চাপ-যন্ত্রের সাহায্যে বোর্ড প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে। এই বোর্ড হাল্‌কা অথচ সস্তা হইবে। ছাউনীর জন্য ইহা

ব্যবহৃত হইতে পারে। বিদেশ হইতে আমদানী করা এস্‌বেস্‌টস বোর্ড ও ঢেউখেলান পাত (corrugated) ছাউনী ও অন্যান্য কাজের জন্য এদেশে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে ও দিন দিন যেন ইহার প্রচলন বৃদ্ধি পাইতেছে। এই বোর্ড ইচ্ছামত পুরু ও রঙিন করিতে পারা যায়।

চিনির সাধারণ ব্যবহার ছাড়া অন্যান্য ব্যবহারও আছে। চিনিকে উত্তপ্ত করিলে গলিয়া যায় ও ক্রমশঃ গাঢ় পীত বর্ণ ধারণ করে। এইরূপ দগ্ধ চিনি দেশী ও বিলাতী মিষ্টান্ন (confectionery) এবং সিরপ রং করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। চিনি যতই পরিষ্কার হয়, উহার দানা-গুলি ততই বড় হয়। ঘন চিনির রসকে ছাঁচে ঢালিয়া বিভিন্ন আকারের দানা প্রস্তুত করা যায়। এইরূপ চিনি-খণ্ডের মূল্য অপেক্ষাকৃত বেশী। মিছরী ও লজেন্স্‌ ঘন চিনির রস হইতে প্রস্তুত হয়। মিছরীর কারখানায় অল্প পরিমাণ রস অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। উহা হইতে আর মিছরীর দানা সংগ্রহ করা যায় না। কিঞ্চিৎ সাইট্রিক এসিড দিলে আরও কিছু দানা পাওয়া যাইতে পারে। এই অবশিষ্ট রস হইতে সহজেই সিরপ প্রস্তুত করা যায়। সিরপ নামে প্রচলিত বহু অল্প মূল্যের পানীয়ে চিনির পরিবর্ত্তে স্যাকারিন্‌ নামক কৃত্রিম চিনি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ঔষধ ও শীতল পানীয়ে ব্যবহারের জন্য প্রচুর পরিমাণে সিরপের প্রয়োজন হয়। এক সের ভাল সিরপে প্রায় আড়াই পোয়া পরিষ্কার চিনি দেওয়া থাকে। রসটীকে পাক করিয়া শীতল হইলে উহাতে ইচ্ছামত বর্ণ ও গন্ধদ্রব্য যোগ করা হয়।

চিনিকে সুরাসারে দ্রবীভূত করিয়া ঐ দ্রবণে কিঞ্চিৎ তীব্র হাইড্রোক্লোরিক এসিড দিয়া ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করিলে গ্লুকোজ প্রস্তুত হয়। এই প্রণালীতে ইক্ষুশর্করার অর্দ্ধাংশ গ্লুকোজে (glucose or grape sugar) ও অপরাংশ ফ্রুক্টোজে (fructose or fruit sugar) পরিণত হয়। তীব্র সুরায় গ্লুকোজ দ্রবণীয় হয় না বলিয়া উহার দানাগুলি পাত্রের তলদেশে সংগৃহীত হয়।

খেজুরের রস হইতেও কিয়ৎপরিমাণে চিনি প্রস্তুত হয়। কিন্তু এদেশে খেজুরের চিনি অপেক্ষা খেজুরের গুড়ই অধিক প্রচলিত। তালের রসেও চিনি আছে। উহা মিছরীরূপেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইউরোপে বীটের রস হইতে প্রচুর পরিমাণে চিনি প্রস্তুত হয়

দেখা যাইতেছে, বর্ত্তমানে দেশীয় চিনি প্রস্তুত শিল্পের প্রয়োজন : ইক্ষুচাষের উন্নতি করা, শর্করাপ্রধান ইক্ষু রোপণ করা এবং মাৎগুড় ও নিষ্পেশিত ইক্ষুদণ্ড হইতে অর্থাগমের ব্যবস্থা করা। কয়েম্বাটোরে সরকারী প্রচেষ্টায় ভারতীয় ইক্ষুর উন্নতি-বিধায়ক বহু কার্য্যকরী গবেষণা করা হইয়াছে।

পাইন : তার্পিণ, রজন

সমগ্র হিমালয় অঞ্চলে পাইন্‌ গাছ জন্মে। বৃক্ষকাণ্ডের ছালের উপর মাঝে মাঝে দাগ কাটিয়া দিলে একপ্রকার রস ও আঠা নির্গত হয়। ইহাই কাঁচা রজন নামে পরিচিত, কিন্তু সদ্যোসংগৃহীত পাইনের আঠায় তার্পিণ তৈল মিশ্রিত থাকে। এই মিশ্রণকে আবৃত পাত্রে রাখিয়া উহাতে ষ্টিম্‌ চালিত করিলে বাষ্পাকারে তার্পিণ তৈল বাহির হইয়া আসে। শীতল হইলে তৈলাংশ জলের উপরিভাগে ভাসিতে থাকে। পাত্রমধ্যে রজন অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। তার্পিণ তৈল বহুবিধ ব্যবহারে প্রয়োজন হয়। রং ও বার্ণিশের সহিত মিশ্রিত করিলে অল্পসময়েই শুষ্ক হইয়া যায়। ঔষধেও অল্পপরিমাণ তার্পিণের ব্যবহার আছে। ইহাতে আল্‌ফা-পিনিন নামক এক প্রকার যৌগিক দ্রব্য থাকে ; উহা হইতে কৃত্রিম কর্পূর, তার্পিণ-হাইড্রেট্‌ ও তার্পিনিয়োল নামে কৃত্রিম সুগন্ধি প্রস্তুত হয়। পাত্রমধ্যে যে রজন অবশিষ্ট থাকে, উহাকে তপ্ত অবস্থা-তেই ছাঁকিয়া লইলে পরিষ্কার হইয়া যায়। অপদ্রব্যের পরিমাণের অল্পাধিক্য অনুসারে রজনের বর্ণও ফিকা ও পীতাভ বা গাঢ় বাদামী হইয়া থাকে। ফিকা বর্ণের রজনই অধিকমূল্যে বিক্রীত হয়। এই শ্রেণীর রজন এ দেশে প্রচুর পরিমাণে আমদানীও হইয়া থাকে। ইহা হইতে পালিশ ও বার্ণিশ প্রস্তুত হয়। তৈল বা চর্ব্বির সহিত কিঞ্চিৎ রজন মিশ্রিত করিয়া অল্প মূল্যের সাবান প্রস্তুত হয়। কাপড় ও কাগজের মাড়ের জন্যও রজন ব্যবহৃত হয়।

চন্দন : তৈল, সুগন্ধি সাবান

দক্ষিণ-ভারতে মহীশূর ও পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালায় চন্দন গাছ জন্মে। ভারতীয় চন্দন প্রাচীন কাল হইতেই বিশেষ রূপে বিখ্যাত। বন হইতে চন্দনকাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া উহা হইতে তৈল বাহির করা হয়। এই তৈল হইতে উৎকৃষ্ট সুগন্ধি ও সাবান প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রথম শ্রেণীর চন্দন তৈলের বর্ণ পীতাভ ও ইহা অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। ইহা প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হয়। গাঢ়বর্ণযুক্ত অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যের তৈল দেশীয় সাবানের কলে ব্যবহৃত হয়। চন্দনতৈল শক্তিশালী বীজাণুনাশক; সে কারণ ইহা ঔষধেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চন্দন কাঠ ও উহার গুঁড়ারও বেশ চাহিদা আছে। গুঁড়া হইতে ধূপ প্রস্তুত হয়। চন্দন অন্য সুগন্ধিকে আকর্ষণ করিয়া (fixative) রাখিতে পারে। সে জন্য মিশ্র সুগন্ধিতে চন্দন তৈল থাকিলে ঐ গন্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। সুগন্ধি কেশতৈল প্রস্তুত করিতে হইলে উহাতেও কিঞ্চিৎ চন্দনতৈল দেওয়া যাইতে পারে, অথবা ঐ তৈলে চন্দনের গুঁড়া কিছুকাল ভিজাইয়া রাখিলেও উহা হইতে প্রস্তুত তৈলের সুগন্ধি বহুকাল স্থায়ী হয়।

চা : কেফিন্

আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে চা উৎপন্ন হয়। ভারতীয় চা বিখ্যাত। প্রায় ২৪·৬ লক্ষ বিঘাতে চায়ের আবাদ হইয়া থাকে। আসাম ও উত্তর-বঙ্গেই প্রায় ⅘ ভাগ আবাদ হয়। দক্ষিণ-ভারতে নীলগিরি অঞ্চলেও চা জন্মে। সুগন্ধে দার্জ্জিলিং চা ও বর্ণে আসাম চা বিশ্ববিখ্যাত। চা-এর পরিবর্ত্তে 'প্যারা চা' নামে এক প্রকার পানীয় ইউরোপে প্রচলিত হইতেছে। প্রতি বৎসর এ দেশে প্রায় ৫ লক্ষ মণ চা সংগৃহীত হয়। তন্মধ্যে রপ্তানী করিবার পর অধিকাংশই এদেশে পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অব্যবহার্য্য গুঁড়া চাও বহুল পরিমাণে রপ্তানী হয়। উহাতে শতকরা প্রায় ৩ ভাগ কেফিন নামক ঔষধ থাকে। ইহা হইতে প্রায়োজনীয় ঔষধ প্রস্তুত হয়। বিগত মহাযুদ্ধের সময় এ দেশে প্রচুর পরিমাণ কেফিন্ প্রস্তুত হইয়াছিল ও বেশ উচ্চমূল্যেই বিক্রীত হইয়াছিল। চায়ের চাষের উন্নতি করিবার জন্য বহুদিন হইতেই বিশেষ ভাবে গবেষণা চলিতেছে। আবাদের উপযুক্ত জমী, প্রয়োজনীয় সার ও উপযুক্ত চারা প্রস্তুত প্রভৃতি বিষয়ে আসামের অন্তর্গত তোকলাই নামক স্থানে ও কলিকাতায় বহু প্রয়োজনীয় ও কার্য্যকরী গবেষণা হইয়াছে।

মহীশূর, মাদ্রাজ, ও ত্রিবাঙ্কুর অঞ্চলে প্রায় ৫·৪ লক্ষ বিঘায় কফির আবাদ হয় ও প্রতি বৎসর প্রায় ২·৩৪ লক্ষ মণ কফি রপ্তানী হইয়া থাকে। পানীয় হিসাবেই ইহার প্রধান ব্যবহার। ইহাতেই প্রায় শতকরা ১ ভাগ কেফিন্ থাকে।

রবার :

দক্ষিণ-ভারতে মহীশূর, মাদ্রাজ ও ত্রিবাঙ্কুর অঞ্চলে প্রায় ২ লক্ষ বিঘায় রবার গাছের আবাদ হয়। সংগৃহীত রবারের আঠায় প্রায় সবই রপ্তানী হয় ও উহা হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদি এ দেশে আমদানী করা হয়। রবারের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে হইলে বিভিন্ন দেশজাত রবার বিভিন্ন অনুপাতে মিশ্রিত করা হয়। এ দেশে রবারজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত শিল্প সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। ইতি-মধ্যে কয়েকটি বিরাট বিদেশীয় প্রতিষ্ঠানও এ দেশে স্থাপিত হইয়াছে। রবারের জুতা, খেলনা, সাইকেল ও মটর-গাড়ীর টায়ার ও টিউব প্রভৃতি দ্রব্যেরই চাহিদা ও ব্যবহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। রবারের চাদর ও নল অল্লাধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। বৈদ্যুৎ সরবরাহকারী তারেও রবার-ঘটিত প্রলেপ দেওয়া থাকে।

রবার গাছের ছালের উপর দাগ কাটিয়া দিলে উহা হইতে রস নির্গত হইতে থাকে। উহাকে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া দিলে ক্রমশঃ ঘন ও আটাল হয়। কিন্তু ব্যবহারোপযোগী করিতে হইলে কাঁচা রবারকে পরিষ্কৃত করিয়া বিশেষ প্রণালীতে পাক করা হয়। এই প্রণালীতে ভল্‌ক্যানাইজ করা (vulcanisation) বলে। বায়ুর সংস্পর্শে না আসিতে পারে, এরূপে বদ্ধ একটি পাত্রে পরিষ্কৃত রবার ও কিয়ৎপরিমাণ গন্ধকচূর্ণ কিছুকাল ধরিয়া বিশেষ উত্তাপে তপ্ত করা হয়। এই পাত্রে নানাবিধ খনিজ দ্রব্য দিয়া রবারের গুরুত্ব বর্দ্ধিত করা হয়। ইচ্ছামত বর্ণাদি মিশ্রিত করিলে বিভিন্ন বর্ণের রবার প্রস্তুত হয়। গন্ধকের পরিমাণ বেশী দিলে ভল্‌কানাইট নামক কঠিন দ্রব্য প্রস্তুত হয়। রবার অপেক্ষা ইহার বৈদ্যুত-প্রবাহ রোধ করিবার ক্ষমতা অধিক।

সংবাদ ও মন্তব্য

[শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য-লিখিত]

দেশের হিত

দিল্লীতে নিখিল-ভারত কর্ম্মনিয়োগকর্তাগণের বার্ষিক সভায় সভাপতিত্ব করিয়া এক বক্তৃতায় শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম দাস বিড়লা বর্ত্তমানে শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিকদিগের পক্ষে যে সকল দাবী উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহার অসঙ্গতি প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন, "যদি শিল্পের দ্বারা দেশের সমৃদ্ধি বিধান করিবার চেষ্টা জাগ্রত হয়, তাহা হইলে সমগ্র দেশের উপকার কিসের দ্বারা হইবে, তাহাই ভাবিতে হইবে, কেবলমাত্র অংশবিশেষের উন্নতির কথা ভাবিলে চলিবে না।"

আমরা ঘনশ্যামবাবুর এই উক্তির সার্থকতা বুঝিতে পারিলাম না। আমাদিগকে কি ইহা বুঝিতে হইবে যে, জগতে এমন কিছু আছে, যদ্দ্বারা কোনও ব্যক্তি-বিশেষের অপকার সাধন করিয়াও সমষ্টি-বিশেষের উপকার সাধিত হইতে পারে? আমাদের মতে, এই মতবাদ অতীব অসমীচীন। যাহাতে কোন সমষ্টির উপকার হইতে পারে, তদ্দ্বারা ঐ সমষ্টির অন্তর্গত ব্যক্তির উপকার হওয়া অবশ্যম্ভাবী। কার্য্যক্ষেত্রে বাস্তবতঃ কি ঘটিয়া থাকে, তাহার দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, যাহার দ্বারা সমষ্টির অন্তর্গত ব্যক্তির হিত সাধিত হয় না, তদ্দ্বারা কোন সমষ্টিরও হিত সাধিত হইতে পারে না এবং যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তির হিত সাধিত হয়, তাহা না করিয়া সমষ্টির হিতসাধন করিতে গেলে, প্রায়শঃ ব্যর্থমনোরথ হইতে হয়। বর্ত্তমান জগৎ এই সত্যটুকু উপলব্ধি করিয়া, কি করিয়া দেশান্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তির প্রত্যেক সমস্যার সমাধান হইতে পারে, তদ্বিষয়ে যত্নশীল না হইয়া দেশের হিতসাধনে ব্রতী হইতেছে বলিয়াই সকল চেষ্টাই প্রায়শঃ আত্মপ্রবঞ্চনা রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে এবং সর্ব্বত্রই হাহাকার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। মিঃ জি. ডি. বিড়লার সমগ্র বক্তৃতা পড়িয়া আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই, পরন্তু নৈরাশ্য অনুভব করিয়াছি। সমগ্র বক্তৃতাটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, উহাতে পুঁথিগত বিদ্যার পরিচয় কথঞ্চিৎ পরিমাণে বিদ্যমান আছে বটে, কিন্তু ভারত-বিখ্যাত বণিক ঘনশ্যাম দাস বিড়লার নিকট যে বাস্তব অভিজ্ঞতার আশা করা যাইতে পারে, তাহার বিন্দুমাত্র নিদর্শনও উহার মধ্যে নাই—ইহা আমাদের অভিমত।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা

দিল্লী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ষোড়শ উপাধি-বিতরণ সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে স্যর মরিস্ গাইয়ার বলিয়াছেন, "...বিশ্ববিদ্যালয় আমাদিগকে যে সকল বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারে, তন্মধ্যে সত্যলিপ্সাই আমার মতে সর্ব্বপ্রধান।..."

*

শিক্ষার উদ্দেশ্য কি, তাহার উত্তরে যদি বলা হয় যে, সত্যলিপ্সা অথবা সত্যানুসন্ধান শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য, তাহা হইলে ঐ উত্তরকে সম্পূর্ণভাবে ভ্রমাত্মক বলিয়া মনে করা যায় না বটে, কিন্তু উহা যে সর্ব্বতোভাবে ভ্রমপ্রমাদ-বিহীন, তাহাও বলা চলে না। ভাষা-বিজ্ঞান জানা থাকিলে দেখা যাইবে যে, শিক্ষা, এই পদটির মধ্যেই শিক্ষার উদ্দেশ্য কি, অঙ্কিত রহিয়াছে। আমাদের মতে, শিশু যখন কৈশোরে উপনীত হয়, তখন তাহার রাজসিকতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং নানাবিধ আকাঙ্ক্ষার উদ্ভব হইয়া শিশুর সর্ব্বনাশের আশঙ্কা ঘটিয়া থাকে। এই রাজসিকতার জন্যই কিশোর ও কিশোরী, যুবক ও যুবতীগণ সাধারণতঃ কার্য্যে পরিশ্রান্তি অনুভব করেন এবং ক্রমশঃ নানা রকমের অস্বাস্থ্য ভোগ করিতে থাকেন। যাহাতে ঐ রাজসিকতা সংযত হইতে পারে, তাহা যাহাতে তাঁহারা পরিজ্ঞাত হইতে পারেন ইহা করাই শিক্ষার প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য, ইহা আমাদের অভিমত।

অস্পৃশ্যতা

গত ২৫শে মার্চ্চ উড়িষ্যা প্রদেশের দেলাঙ নামক গ্রামে গান্ধী-হরিজন-সেবা-সঙ্ঘের চতুর্থ অধিবেশন অনুষ্ঠানে গান্ধীজী বক্তৃতাপ্রসঙ্গে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে কয়েকটি মন্তব্য করিয়াছেন।

*

যে-ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ—এই তিনটি বিষয় লইয়া ভারতীয় ঋষির বেদ ও সংহিতা, যে-ব্যক্ত ও অব্যক্ত শক্তির কথা লইয়া ভারতীয় ঋষির তন্ত্র, তাহাতে বিন্দুমাত্র প্রবেশ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ব্যক্ত ও অব্যক্তের মধ্যে কি সম্বন্ধ, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে না পারিলে মানব-সমাজের প্রত্যেক মানুষটিকে কি করিয়া দুঃখের হাত হইতে মুক্ত করা যায়, তাহার জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নহে। ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইবে যে, ব্যক্ত ও অব্যক্তের জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে লাভ করিবার সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে, জগতে অনেক কিছু অস্পৃশ্য করিবার আবশ্যকতা আছে। যদি আবার কখনও প্রকৃত সাধনায় মানুষ প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, কোন্ অবস্থায় কি ভাব লইয়া কোন্ বস্তুকে অথবা কোন্ মানুষকে অস্পৃশ্য করিতে হয়, তাহা মানব-সমাজ বিস্মৃত হইয়াছে বলিয়াই মানুষ এত দুঃখে হাবুডুবু খাইতেছে।

গান্ধীজীর নেতৃত্ব

২৬শে মার্চ্চ তারিখের 'হরিজন' পত্রিকার এক প্রবন্ধে গান্ধীজী লিখিয়াছেন,—

'কংগ্রেসের হেড কোয়ার্টার এলাহাবাদে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং পুলিশ, এমন কি মিলিটারির সাহায্যগ্রহণ প্রমাণিত করে যে, কংগ্রেস এখনও ব্রিটিশ জাতির পরিবর্ত্তে ভারতের কর্ত্তৃপক্ষ হইবার যোগ্য হয় নাই। যতদিন পর্য্যন্ত কংগ্রেস এই যোগ্যতা অর্জ্জন না করিবে, ততদিন ব্রিটিশ সরকারকে তাড়াইয়া আমরা স্বাধীন হইতে পারিব না।"

*

আমাদের মনে হয়, গান্ধীজীর এই প্রবন্ধটি একটি সুন্দর হেঁয়ালী। তিনি কখনও বলেন, স্বাধীনতা না হইলে আমাদের কোন সমস্যারই সমাধান হইবে না। আবার কখনও বলিতেছেন যে, ইংরাজ না থাকিলে ভারতবর্ষের রাজ্য-শাসনই যথাযথভাবে চলিতে পারে না। অষ্টাদশ বর্ষব্যাপী নেতৃত্বের পরেও যদি বলিতে হয় যে, ইংরাজ না থাকিলে ভারতবর্ষের সাম্রাজ্য যথাযথভাবে পরিচালিত হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে, তাহা হইলে নেতারূপে তিনি ১৮ বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষের কি কার্য্য করিলেন, তাহা জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিবেন কি? স্বাধীনতা না হইলে দেশের কোন সমস্যারই সমাধান হইবে না, গান্ধীজীর এই কথা মানিয়া লইয়া, এখনও দেশ যে ইংরাজ ছাড়া শাসিত হইতে পারে না, সেই অবস্থার দিকে তাকাইলে কি বলিতে হয় না যে, যতদিন পর্য্যন্ত গান্ধীজী দেশের নেতা থাকিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত ভারতবাসীর কোন সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব হইবে না, পরন্তু প্রত্যেক সমস্যাই তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে থাকিবে? যে-দেশপ্রেমিক যুবশক্তি একদিন ভারতবর্ষের মুকুটহীন সম্রাট্ সুরেন্দ্রনাথকে জুতার মালা পরিধান করাইতে পারিয়াছিল, সেই যুবশক্তি কি ভারতবর্ষ হইতে সম্পূর্ণরূপে অন্তর্দ্ধান হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে?

১৯৩৫ সালের আইন

গত ৩রা এপ্রিল তারিখে আসানসোলে মুসলমান সম্প্রদায় প্রদত্ত নিজের এক অভ্যর্থনা সভায় বাংলার প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন, নূতন শাসন-তন্ত্র ভারতে ব্রিটিশ জাতির উল্লেখযোগ্য উপহার; নিখুঁত না হইলেও দেশের সেবা করিবার পক্ষে ইহাতে বিস্তর সুযোগ রহিয়াছে।

*

আমাদেরও এই অভিমত, কিন্তু গত এক বৎসর কাল ধরিয়া হক সাহেব তাঁহার কার্য্য দ্বারা প্রমাণ করিতে পারেন নাই, এই সুযোগ তিনি কাজে লাগাইতে পারিয়াছেন।

যুক্তপ্রদেশের দাঙ্গা

গত ৩১শে মার্চ্চ তারিখে এলাহাবাদে এক জন-সভায় বক্তৃতায় যুক্তপ্রদেশের দাঙ্গার দায়িত্ব দেশের সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ার স্কন্ধে চাপাইয়া জওহরলালজী বলিয়াছেন, "...কিন্তু কংগ্রেস ও জনসাধারণকেও এই বিঘ্নের জন্য দায়ী করিতে হয়। যদি কংগ্রেস ও জনসাধারণ তাহাদের প্রতিপত্তির সাহায্যে মতলবী ব্যক্তিবৃন্দের কার্য্যকলাপে বাধা উপস্থিত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে দাঙ্গা হইতে পারিত না।..."

*

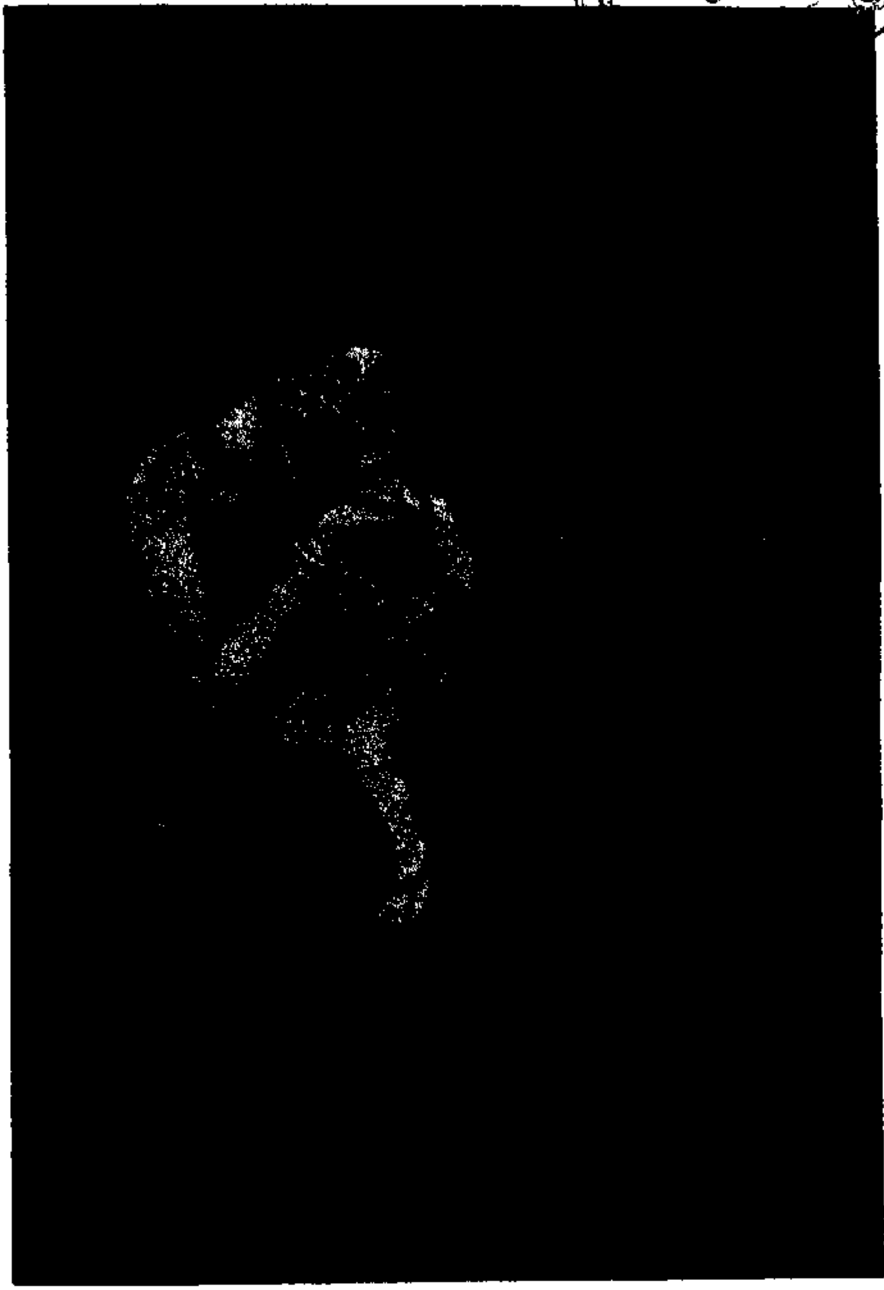
খুব সত্য কথা, কিন্তু এই দায়িত্ব হইতে পণ্ডিত জওহরলালজী নিজেকে মুক্ত করিতে পারেন কি? নেতৃবর্গ যদি তাঁহাদের নেতৃত্বের দায়িত্ব যথাযথ পালন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে এতাদৃশ দাঙ্গা কখনও সম্ভবযোগ্য হইতে পারিত কি?

চিকিৎসা-শিক্ষার্থীদের প্রতি

গত ৩১শে মার্চ্চ বাঙ্গালার সার্জ্জন-জেনারেল মেজর-জেনারেল পি. এস. মিল্‌স কলিকাতা মেডিকাল স্কুলের প্রাইজ-বিতরণী সভায় বক্তৃতায় চিকিৎসা-শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, "...শিক্ষা সাঙ্গ হইলে সহরে প্র্যাকটিস্ জমাইয়া লাভের আশায় না থাকিয়া—তাঁহাদের মফস্বলে যাওয়া উচিত, সেখানে প্র্যাকটিস্ জমিবার প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে।..."

*

ডাক্তারী পাশ করিয়া যাঁহারা গ্রামে গিয়া পসার জমাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, মিল্‌স সাহেব তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিতেন, গ্রামের লোকের পেটের ভাতই জোটে না, পাশ-করা ডাক্তারের ফি যোগাড় হইবে কোথা হইতে? এতাদৃশ উপদেশগুলি আর একটু জানিয়া শুনিয়া দেওয়া সঙ্গত নয় কি?



জননী

[শিল্পী—শ্রীমধুসূদন সরকার

"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

বঙ্গশ্রী

জ্যৈষ্ঠ—১৩৪৫

৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম খণ্ড—৫ম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

[শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক লিখিত]

গান্ধীজীর অহিংসা ও দেশপ্রেম

গান্ধীজীর "আদর্শবাদ" বলিয়া একটি কথা আজকাল অনেক স্থানে শুনিতে পাওয়া যায়। গান্ধীজীর আদর্শবাদ কি, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, প্রথমতঃ অহিংসা (non-violence) এবং দ্বিতীয়তঃ অসহযোগ (non-co-operation) লইয়া তাঁহার আদর্শবাদ। তিনি তাঁহার শিষ্যবৃন্দকে যত কিছু উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহার প্রায় প্রত্যেক কথাটিতে অহিংসা ও অসহযোগের বিষয় শুনা যায় বটে, কিন্তু অহিংসা ও অসহযোগ যে কি বস্তু, তাহা অদ্যাবধি আমূলভাবে তিনি কুত্রাপি কাহাকেও বুঝাইয়াছেন বলিয়া আমরা জানিতে পারি নাই। আমূলভাবে না বুঝাইয়া সাধারণভাবে এইটি অহিংসার কার্য্য, অথবা ঐটি হিংসার কার্য্য, এবংবিধ ভাবে অহিংসা যে কি বস্তু, তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিতে বসিয়া তিনি অহিংসা সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়া থাকেন, তাহা অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে, তিনি 'অহিংসা' শব্দটীকে একটি 'সোনার পাথরের বাটী' করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি নিজে যখন গভর্ণমেণ্টকে "স্যাটানিক" গভর্ণমেণ্ট, এবং ইংরাজকে "স্বার্থপর, স্বার্থসিদ্ধি-পরায়ণ (exploiters)" বলিয়া অভিহিত করেন এবং তাহার ফলে যুবকবৃন্দ ইংরাজ-বিদ্বেষী হইয়া ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজ-বিতাড়নেকৃত-সঙ্কল্প হইয়া থাকে এবং এমন কি ইংরাজ-হত্যায় পর্য্যন্ত প্রবৃদ্ধ হয়, তখন তাহাতে তাঁহার মতে কোন হিংসার কার্য্য সংঘটিত হয় বলিয়া মনে হয় না। অথচ, অপর কেহ যখন হিন্দুর স্বার্থ-রক্ষা অথবা মুসলমানের স্বার্থ-রক্ষা সম্বন্ধে কথা কহে এবং তাহার ফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা উপস্থিত হয়, তখন হিংসার কার্য্য করা হইয়া থাকে।

'হিংসা' এবং 'অহিংসা'র এবংবিধ সংজ্ঞা আমরা বুঝিতে পারি না। আমাদের মতে, শব্দ-বিজ্ঞানানুসারে হিংসা এবং অহিংসা বলিতে যে কি বুঝায়, তাহা যথাযথভাবে বুঝিয়া উঠা অত্যন্ত দুরূহ এবং ঐ সৌভাগ্য গান্ধীজী লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়াই অহিংস ভাবটীকে তিনি অত্যন্ত সস্তা করিয়া তুলিয়াছেন।

বাংলা ভাষায়, সাধারণতঃ কোন মানুষ যখন হিংসা সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করিতে সক্ষম হয়, তখন ঐ মানুষটি "অহিংস" হইতে পারিয়াছে, ইহা বলা হইয়া থাকে,

অপর কাহাকেও হত্যা অথবা কাহারও ক্ষতি করিবার প্রবৃত্তিকে "হিংসা" বলা হইয়া থাকে।

গান্ধীজী যে অর্থে "অহিংসা" শব্দটী ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা ঠিক ঠিক ভাবে উপরোক্ত অর্থের সদৃশ বলিয়া মনে করা যায় না। তাঁহার "অহিংসা" ইংরাজী নন্‌-ভায়লেন্স (non-violence) অথবা উত্তেজনা-বিহীনতার সহিত সমভাবাপন্ন। তাঁহার কথা হইতে বুঝিতে হয় যে, জ্ঞানেন্দ্রিয় অথবা মনের মধ্যে উত্তেজনা থাকিলেও অহিংস ভাব নষ্ট হয় না। কর্ম্মেন্দ্রিয়ে, অর্থাৎ বাক্যে, অথবা হাতাহাতিতে, অথবা দৌড়াদৌড়িতে উত্তেজনা প্রকাশ পাইলে অহিংস ভাব নষ্ট হইয়া যায় এবং তখন মানুষ হিংসাভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। গান্ধীজীর যুক্তিবাদানুসারে মানুষ অপরের হস্তে প্রহার খাইবে, তাহাতে তাহার ত্বক্‌ অর্থাৎ চর্ম্ম জ্বলিতে থাকিবে, অথচ বাক্য, হস্ত এবং পা সেই অবস্থায় যখন অনুত্তেজিত থাকে, তখন মানুষ অহিংসা অভ্যাস করিয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে।

আমাদের মতে, কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনের মধ্যে পরস্পরের সম্বন্ধ কি, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, সাধনা ও অভ্যাসের দ্বারা,—জ্ঞানেন্দ্রিয় আহত হইলেও কর্ম্মেন্দ্রিয়কে সময় সময় অনুত্তেজিত রাখা সম্ভব হইয়া থাকে বটে, কিন্তু সর্ব্বদা অথবা সকলের দ্বারা উহা সম্ভব হয় না। যাঁহারা বিশেষ সাধনা ও অভ্যাসে সিদ্ধ হইতে পারেন নাই, এতাদৃশ সাধারণ মানুষের পক্ষে কোন জ্ঞানেন্দ্রিয় আহত হইলে, অর্থাৎ তাহাকে কোন কুৎসিত দৃশ্য দেখাইয়া তাহার চক্ষুকে আঘাত প্রদান করিলে, অথবা কর্কশ গালাগালির দ্বারা তাহার কর্ণের অপ্রীতি উৎপাদন করিলে, অথবা অপ্রীতিকর গন্ধের দ্বারা তাহার নাসিকার বিরক্তি ঘটাইলে, অথবা অপ্রিয় খাদ্যের দ্বারা তাহার জিহ্বার ক্লেশোৎপাদন করিলে, অথবা প্রহার প্রভৃতির দ্বারা তাঁহার ত্বকের জ্বালা উৎপাদন করিলে, কোন কর্ম্মেন্দ্রিয়ই উত্তেজিত হইবে না, ইহা সম্ভবযোগ্য নহে। ঢিলটি খাইলেই পাট্‌কেলটি মারিবার চেষ্টা করা—ইহা সাধারণ মানুষের প্রকৃতি। ঢিলটি খাইলেও পাট্‌কেলটি মারিবে না, এবংবিধ অভ্যাসে প্রযত্নের দ্বারা কখন কখন সাময়িক ভাবে সিদ্ধি লাভ করা সম্ভব হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি একেবারে সমূলে উৎপাটিত করা কখনও সম্ভব হয় না। ইহার ফলে, সাময়িক ভাবে তখন তখন উত্তেজনা না দেখান সম্ভব হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু মনে মনে প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি থাকিবেই থাকিবে এবং অবকাশানুযায়ী উহার অভিব্যক্তিও ঘটিবেই ঘটিবে।

কাযেই, গান্ধীজী পরোক্ষভাবে যে অর্থে অহিংসা শব্দটী ব্যবহার করেন, সেই অর্থ পরিষ্কার না হইলেও অস্পষ্টভাবে তদ্দ্বারা যাহা বুঝা যায়, তাহা সাধন করা সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রায়শঃ সম্ভব হয় না। তদনুসারে ইহা বলা যাইতে পারে যে, গান্ধীজীর অহিংসা একটি হেঁয়ালী। ঐ অহিংসা কার্য্যতঃ সম্ভব-যোগ্য নহে এবং অহিংস না হইতে পারিলে স্বাধীনতা প্রভৃতি যাহা কিছু লাভ করা সম্ভবযোগ্য নহে বলিয়া গান্ধীজী প্রতিনিয়ত জাহির করিয়া থাকেন, তাহাও লাভ করা ঘটিয়া উঠিবে না। অথবা, এক কথায়, "নয় মণ তেলও পুড়িবে না, রাধাও নাচিবে না"।

গান্ধীজী যে অর্থে "অহিংসা" শব্দটী ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রয়োগযোগ্য নহে বটে, কিন্তু শব্দ-বিজ্ঞানানুসারে "অহিংসা" বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা অপ্রয়োগযোগ্য নহে। পরন্তু, শব্দ-বিজ্ঞানানুসারে "অহিংসা" বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাতে সিদ্ধ হইতে পারিলে মানুষ নিজেকে সর্ব্বতো-ভাবে সর্ব্বপ্রকার অস্বাস্থ্য হইতে মুক্ত করিয়া পুত্র ও কলত্রাদি পরিবারস্থ প্রত্যেককে এবং আত্মীয়-স্বজন-গণকে নানা প্রকারে স্বাস্থ্য প্রদান করিতে সক্ষম হয়। শব্দ-বিজ্ঞান-সম্মত অহিংসায় যিনি সিদ্ধ হইতে পারেন, তিনি কখনও নেতৃত্বের জন্য ব্যাকুল হন না। তাঁহার পক্ষে কখনও চাতুরী অবলম্বন করা সম্ভব হয় না। মুখে, 'আমি কংগ্রেসের চারি আনার মেম্বর পর্য্যন্ত নহি', 'আমার দ্বারা কংগ্রেসের কোন কার্য্য হওয়া সম্ভব নহে' ইত্যাদি জাহির করা, অথচ কার্য্যতঃ নিজের দলের

পুষ্টিসাধন দ্বারা কংগ্রেসের ভোটাধিক্য অর্জ্জন করিয়া কংগ্রেসের প্রত্যেক কার্য্যে সরদারী করা অতীব ঘৃণিত রকমের চাতুরী।

"অহিংসা" শব্দটি স্মরণাতীতকালে ভারতীয় ঋষিগণ তাঁহাদিগের বিভিন্ন গ্রন্থে ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহাদের কথাগুলি তলাইয়া বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, কোন্ কোন্ বস্তু ও প্রকরণের যোগে মানুষের বিভিন্ন অবয়বের ছয়টী বিকার (অর্থাৎ জন্ম, স্থিতি, মরণ, বৃদ্ধি, হ্রাস ও পরিণাম) সংঘটিত হইতেছে, তাহা নিজ অবয়বের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে এক এক করিয়া ক্রমশঃ আটটি প্রকরণের সহায়তা লইতে হয়। ঐ আটটী প্রকরণের মধ্যে "যম" নামক প্রকরণটী অন্যতম। এই "যম" নামক প্রকরণটীতে অভ্যস্ত হইতে পারিলে নিজ শরীর যে অসংখ্য পরমাণুর সমষ্টি এবং বায়ুর সহায়তায় যে ঐ অসংখ্য পরমাণু পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া এক একটি সুবৃহৎ জীবদেহ গঠিত করিতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়। আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে "যম" ও "সংযম" একার্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু, তাহা ঠিক নহে। "যম" প্রকরণের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে পারিলে "সংযম" করায়ত্ত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু "যম" ও 'সংযম' সম্পূর্ণভাবে একার্থক নহে। সংস্কৃত-ভাষায় যে-সমস্ত পদ ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যস্থ কোন শব্দটী কখনও অর্থহীন হইতে পারে না। 'যম' ও 'সংযম' সম্পূর্ণভাবে একার্থক হইলে 'সংযম' পদটির 'সং' শব্দটি অর্থহীন হইয়া পড়ে। শব্দ-বিজ্ঞানানুসারে নিজ-দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ুকে প্রত্যক্ষ করার নাম 'যম'।

একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, উপরোক্ত 'যম' নামক প্রকরণটীতে অগ্রসর হওয়া একেবারেই সহজসাধ্য নহে। মানুষ যে তাহার নাসিকার দ্বারা বায়ুগ্রহণ ও তাহার কার্য্য প্রতিনিয়ত সাধিত করিতেছে, ইহা সর্ব্বজনবিদিত, অথচ অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, ঐ নিশ্বাস যে শরীরের মধ্যে কোথায় যাইতেছে, অথবা শরীরের কোনখান হইতে কোন্ কোন্ রাস্তার দ্বারা উহা পরিত্যক্ত হইতেছে, তাহা সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, গেরুয়া-পরা, অথবা উলঙ্গ, বড় বড়-পেটওয়ালা সন্ন্যাসিগণ পর্য্যন্ত উহা প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হন না।

'যম' নামক প্রকরণটীতে অভ্যস্ত হইতে হইলে, তদ্বিষয়ক কার্য্যে অগ্রসর হইবার আগে আর পাঁচটি প্রকরণে সিদ্ধিলাভ করিবার প্রয়োজন হয় ইহা ভারতীয় ঋষিগণের কথা। ('অহিংসা-সত্যাস্তেয়-ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ'—পাতঞ্জল দর্শন, সাধনপাদ।) যে পাঁচটি প্রকরণের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে "যম" নামক প্রকরণে সিদ্ধিলাভ করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইয়া থাকে, 'অহিংসা' সেই পাঁচটি প্রকরণের অন্যতম।

শব্দ-বিজ্ঞানানুসারে পবিত্র ব্রহ্মরূপ যে ব্যক্ত জগৎ ও জীবের মূল কারণ, সেই ব্যক্ত জগৎ ও জীবের মধ্যে অপবিত্র তামসিকতা, অর্থাৎ 'রাগ ও দ্বেষের' উদ্ভব, হয় কি করিয়া, তাহা যে প্রকরণের দ্বারা বুঝা যায়, সেই প্রকরণের নাম 'অহিংসা'। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, উপরোক্ত অর্থের অহিংসার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে চলতি কথায় যাহাকে হিংসা বলা হইয়া থাকে, তাহা পরিত্যাগ করা সম্ভব হয় বটে, কিন্তু চলতি কথায় যাহাকে হিংসা বলা হইয়া থাকে, তাহা ত্যাগ করিতে পারিলেই অহিংস হওয়া যায় না। চলিত ভাষানুসারে একমাত্র হত্যা ও ক্ষতি করিবার প্রবৃত্তি প্রকট হইলে হিংসা-প্রবৃত্তির উদ্ভব হইয়াছে, ইহা বলা হইয়া থাকে বটে, কিন্তু ভাষা-বিজ্ঞানানুসারে হিংসা শব্দটির অর্থ আরও ব্যাপক। যে প্রবৃত্তির মধ্যে কোনরূপ দ্বেষের চিহ্নমাত্রও বিদ্যমান থাকে, ভাষা-বিজ্ঞানানুসারে তাহাকেও হিংসার প্রবৃত্তি বলিতে হয়। এতদনুসারে কোন হিন্দু যদি তাহার নিজ শিশু-সন্তানের দুঃখে যেরূপভাবে কর্ত্তব্য-সাধনায় আগুয়ান হয়, কোন খৃষ্টান শিশুর দুঃখে তাদৃশভাবে কর্ত্তব্য-সাধনায় আগুয়ান না হইয়া তৎপ্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে, তাহা হইলে ঐ উপেক্ষাকেও 'হিংসা' বলিয়া অভিহিত করিতে হয়।

ভাষা-বিজ্ঞানানুসারে "হিংসা" ও "অহিংসা"

কাহাকে বলে, তাহা সম্যক্ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, যিনি 'অহিংস' হইতে পারিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে হিন্দুর প্রতি হিন্দুর কার্য্য, অথবা মুসলমানের প্রতি মুসলমানের কার্য্য, অথবা খৃষ্টানের প্রতি খৃষ্টানের কার্য্য, অথবা বাঙ্গালীর প্রতি বাঙ্গালীর কার্য্য, অথবা ভারতীয়ের প্রতি ভারতীয়ের কার্য্য, বলিয়া কোন কার্য্য থাকে না। তাঁহার পক্ষে মানুষের প্রতি মানুষের কার্য্য বলিয়া একটি মাত্র শ্রেণীর কার্য্য অবশিষ্ট থাকে। তাঁহার কলম হইতে Giant and the Dwarf নামক প্রবন্ধ নির্গত হইতে পারে না। যিনি প্রকৃত পক্ষে অহিংসার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিবার জন্য যাঁহাদের হস্ত নর-হত্যার কার্য্যে কলঙ্কিত হইয়াছে এবং যাঁহাদের মন নর-হত্যার কল্পনায় কলুষিত হইয়াছে, তাঁহারা অনুতপ্ত হইয়া ব্যাকুল হইবেন বটে, কিন্তু তিনি নিজে ঐরূপ ভাবে কলুষিত কাহারও সাক্ষাৎ লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইতে পারেন না।

ঋষিদিগের কথানুসারে অহিংসায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে, কেন মানুষের অবয়বের মধ্যে ইচ্ছার উদ্ভব হয়, কি করিয়া শরীরাভ্যন্তরস্থ তেজ প্রয়োজনাতিরিক্ত হয় (ও কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতির উৎপত্তি সাধন করে), কেনই বা মানুষ ঐ তেজবশতঃ উত্তেজনাপ্রবণ হয় এবং যাহাতে কোনরূপ উত্তেজনার উৎপত্তি না হইতে পারে, তাহা কি করিয়া করা সম্ভবযোগ্য হয়, এতদ্বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করা যায়। ('অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ'—পাতঞ্জল—সাধনপাদ।)

অনেকে হয় ত মনে করিবেন যে, গান্ধীজীর অহিংসা যেরূপ অপ্রয়োগযোগ্য, সেইরূপ অহিংসা সম্বন্ধে ঋষিগণ যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহাও কথার কথা মাত্র এবং উহা কখনও কার্য্যে পরিণত করা সম্ভবপর নহে।

"ন স্বভাবতো বদ্ধস্য মোক্ষসাধনোপদেশবিধিঃ"। যাঁহারা স্বভাবতঃ বদ্ধ (অর্থাৎ অব্যক্তের অস্তিত্ব ও অব্যক্ত হইতে ব্যক্তের উৎপত্তি বিষয়ে উপলব্ধি করিতে অক্ষম) তাঁহাদিগকে কি করিয়া জ্ঞানের উৎপত্তি, প্রকৃতি হইতে বিকৃতির উৎপত্তি এবং বিবিধ রকমের কর্ম্মক্ষমতার উৎপত্তি হয়, তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতে চেষ্টা সঙ্গত নহে।

"শক্ত্যুদ্ভবানুদ্ভবাভ্যাং নাশক্যোপদেশঃ" (অর্থাৎ যাহার যে শক্তি নাই, তাহার সেই-বিষয়ক কার্য্য-চেষ্টার সামর্থ্য সম্ভব নহে), ঋষিদিগের এবংবিধ মতবাদের প্রতি লক্ষ্য করিলে স্বীকার করিতে হয় যে, তাঁহাদের মতে সকলকে সকল রকমের উপদেশ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। তাঁহাদের কথাগুলিতে প্রবেশ করিতে পারিলে আরও দেখা যাইবে যে, জনসাধারণের প্রত্যেকেই যে অহিংসার সাধনায় প্রবৃত্তিসম্পন্ন হইবে, অথবা সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে, এতাদৃশ আশা তাঁহারা পোষণ করেন নাই।

জনসাধারণের পক্ষে অহিংসার সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া, অথবা সিদ্ধিলাভ করা সম্ভবযোগ্য নহে বটে, কিন্তু যাঁহারা ঋষিদিগের উপদেশানুসারে যথাযথভাবে অগ্রসর হইতে পারিবেন, তাঁহাদিগের পক্ষে উহাতে সিদ্ধিলাভ করা প্রয়াসসাধ্য বটে, কিন্তু কোনক্রমেই সাধ্যাতিরিক্ত নহে, ইহা আমাদিগের অভিমত।

এইখানে হয়ত কেহ কেহ প্রশ্ন করিবেন যে, যদি উহা কাহারও পক্ষে প্রয়াস-সাধ্য হয়, তাহা হইলে যে-সমস্ত পণ্ডিত সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনে একাধিক উপাধি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই উহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও নিপুণতা লাভ করিতে পারেন না কেন।

তদুত্তরে আমরা বলিব যে, এই পণ্ডিতগুলি প্রায়শঃ পণ্ডিত নামের কলঙ্ক এবং তাঁহাদের মধ্যে প্রায়শঃ কেহই ঋষির শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ পরিমাণেও প্রবিষ্ট হওয়া তো দূরের কথা, শাস্ত্র ও কাব্যের মধ্যে যে পার্থক্য কোথায়, তাহা পর্য্যন্ত ইঁহারা সম্যক্ ভাবে অবগত নহেন। আজকালকার দিনে, শিশ্নোদরপরায়ণ ও আত্মবিজ্ঞাপনলিপ্সু কতকগুলি মানুষ বিবিধ বিষয়ে উপাধিদানের কর্ত্তৃত্ব লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং ঐ সমস্ত উপাধি লাভ করিতে হইলে মনুষ্যত্ব ও শাস্ত্র-প্রবেশের প্রয়াস বিসর্জ্জন করিয়া বিবিধ প্রকারের শিশ্নোদরপরায়ণ মানুষের পদলেহন করিতে হয়।

এইরূপ ভাবে যে সমস্ত আচার্য্য, শাস্ত্রী ও তীর্থগণ উপাধি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহারা প্রায়শঃ শিশ্নোদরপরায়ণ উপাধিদাতাগণের চাটুকারিতায় ব্যাপৃত থাকেন এবং প্রায়শঃ তাঁহাদের কাহারও ঋষির শাস্ত্রে প্রবেশ লাভ করিবার সৌভাগ্য ঘটে না। আমাদের মতে, যে দিন হইতে বর্ত্তমান উপাধিদানের প্রথা, অথবা অন্ততঃপক্ষে উপরোক্ত শিশ্নোদরপরায়ণ আত্মবিজ্ঞাপনলিপ্সু মানুষগুলির হাত হইতে উপাধি-দানের কর্ত্তৃত্ব কাড়িয়া লওয়া সম্ভব হইবে এবং বর্ত্তমান পি-এচ-ডি, এম্-এ, আচার্য্য, শাস্ত্রী ও তীর্থপ্রভৃতি পণ্ডিতগণ যে প্রায়শঃ পণ্ডিত নামের কলঙ্ক, তাহা যে দিন হইতে মনুষ্য-সমাজ প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া তদনুসারে কার্য্যে অগ্রসর হইবে, সেই দিন হইতে আমাদের যুবকগণের মধ্য হইতেই ঋষিগণের উপদেশ বুঝিবার মত মানুষের দেখা পাওয়া সম্ভব হইবে এবং ঋষিগণের প্রত্যেক কথাটি যে বর্ণে বর্ণে সত্য, তাহাও অনায়াসে প্রমাণিত হইবে।

সত্য এক, যাঁহারা ঋষি, তাঁহারা সত্যদ্রষ্টা, তাঁহাদিগের মধ্যে কখনও মতভেদ থাকিতে পারে না, যাঁহারা ঋষিদিগের কথায় মতভেদ আছে বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা ঋষিদিগের কথায় প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই। কোন বাক্যের অর্থগ্রহণে ঋষিদিগের কথায় মতভেদের উদ্ভব হইতেছে বলিয়া মনে হইলে উহা কোন না কোন রকমে বুঝিতে ত্রুটি হইয়াছে— এই কয়েকটি প্রাথমিক সত্যে যাঁহারা সম্যক্ ভাবে শ্রদ্ধা স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ যদি বেদের সাহায্যে পাতঞ্জল দর্শনের উপদিষ্ট কয়েকটি প্রকরণে সিদ্ধি লাভ করিবার প্রয়াসী হন, তাহা হইলে এখনও অহিংসার সাধক মানব-সমাজে দেখা যাইবে এবং তখন সমগ্র মানব-সমাজের পক্ষে তাহার বিবিধ সমস্যার হাত হইতে মুক্তি লাভ করা সম্ভবযোগ্য হইবে।

উপরোক্ত ভাবে তলাইয়া দেখিলে, গান্ধীজীর আদর্শবাদই যে কেবলমাত্র অসার ও প্রবঞ্চনামূলক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, তাহা নহে, আমাদের মতে, তাঁহার কোন দেশপ্রেম আছে কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহের উদ্ভব হইবে।

অগণিত শ্রমিকবৃন্দ, শিক্ষিত যুবকবৃন্দ, জমীদার, জোতদার, তালুকদার, উকিল, ডাক্তার, দোকানদার, যন্ত্রশিল্প ও বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের মালিক ও কুটীরশিল্পী, এক কথায়, মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেকের আর্থিক অভাব, শারীরিক ও মানসিক অস্বাস্থ্য এবং বিবেচনা-শক্তির খর্ব্বতা যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা বাস্তব সত্য। দেশের প্রতি যাঁহার বিন্দুমাত্রও প্রেম আছে তিনি যে, কি করিয়া ঐ অর্থাভাব, মানসিক ও শারীরিক অস্বাস্থ্য ও বিবেচনা-শক্তির পঙ্কিলতা দূর হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে সর্ব্বাগ্রে ব্যাকুল হইবেন, এতদ্বিষয়ে কোন মতভেদ হইতে পারে না। অথচ, গান্ধীজী গত বিশ বৎসর ধরিয়া কি কি করিয়া আসিতেছেন, তাহার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, তিনি ভুলক্রমেও এতদ্বিষয়ে কোনরূপ চিন্তার খাদ্য বিতরণ করেন নাই। তিনি প্রায়শঃ সত্য-মিথ্যায় মিলিত করিয়া, ইংরাজকে exploiters বলিয়া এবং গভর্ণমেণ্টকে satanic বলিয়া ইংরাজবিদ্বেষ যাহাতে বর্দ্ধিত হয়, তাহার উপকরণ বিতরণ করিয়া আসিতেছেন। অর্থাভাব, অথবা স্বাস্থ্যাভাব দূর করিবার জন্য যে-সমস্ত কথা তিনি এতাবৎ দেশবাসীকে শুনাইয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটী পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, উহার কোনটি তাঁহার নিজস্ব অথবা কোন সাধনাসম্ভূত-প্রয়াসমূলক নহে, উহার প্রত্যেকটি চর্ব্বিত-চর্ব্বণ ও মূলতঃ অপরের নিকট ধার-করা কথা এবং উহার দ্বারা যে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নহে, তাহা কার্য্যতঃ জগতের কোন না কোন দেশে সপ্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

যদি বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার দেশপ্রেম থাকিত, তাহা হইলে যখন অগণিত মানুষ এতাদৃশ ভাবে অর্থাভাব প্রভৃতিতে জর্জ্জরিত, তখন তিনি উপরোক্ত সাধনায় লিপ্ত না হইয়া মুহূর্ত্তের জন্যও কি এইরূপ ভাবে সস্তায় নাম কিনিবার কার্য্যে লিপ্ত হইতে পারিতেন?

আমাদের মনে হয়, প্রকৃতির কার্য্য যেরূপ ভাবে চলিতেছে, তাহাতে যেদিন গান্ধীজীর উপরোক্ত রূপ যথাযথ ভাবে মানুষ চিনিতে পারিয়া কর্ত্তব্যে অগ্রসর হইবে, সেই দিন হইতে ভারতবর্ষই সমগ্র জগতের সমগ্র মানব-সমাজের সমগ্র সমস্যার সমাধানে আগুয়ান হইবে। আজ মানুষ বুঝুক আর না-ই বুঝুক, অদূর-ভবিষ্যতে মানুষ বুঝিতে পারিবে যে, মস্তিষ্ক, হস্ত ও পদাদি লইয়া যেরূপ মানুষের সর্ব্বাঙ্গিকতা, সেইরূপ জগতের সর্ব্বাঙ্গিকতা এসিয়া, ইয়োরোপ প্রভৃতি দেশ লইয়া এবং তন্মধ্যে ভারতবর্ষ জগতের মস্তিষ্ক স্বরূপ। মাথা না হইলে যেরূপ কেবলমাত্র হস্ত ও পদের দ্বারা মানুষের সমস্ত রকমের প্রয়োজন অথবা সূক্ষ্মতম সাধনা-গুলিতে সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব হয় না, সেইরূপ প্রকৃত ভারতবর্ষের সাধনা না হইলে সমগ্র মানব-সমাজের প্রত্যেকের দুঃখ দূর করা সম্ভব হইবে না।

প্রাকৃতিক কারণে, প্রকৃতির সহায়তায় ভারতবর্ষের ঐ সাধনা জাগ্রতোন্মুখ হইয়াছে বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য কু-জ্ঞান ও কু-শিক্ষার জন্য উহা সমুদ্ভাসিত হইতে পারিতেছে না। আমাদের মতে, এই পাশ্চাত্ত্য কু-জ্ঞান ও কু-শিক্ষার নাবিকত্ব বর্ত্তমানে প্রধানতঃ গ্রহণ করিয়াছেন গান্ধীজী ও তাঁহার অনুচরবর্গ।

ইংরাজগণের মধ্যে যাঁহারা ভাবুক এবং এই দেশের মধ্যে যাঁহারা প্রধান ও সম্পূর্ণভাবে ক্লাউনের পাট অভিনয় না করিয়া দেশবাসীর জন্য কিঞ্চিন্মাত্রও হৃদয় পোষণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে উপরোক্ত সত্যটী সর্ব্বপ্রথমে উপলব্ধি করিতে হইবে।

সুভাষচন্দ্রের একতাসাধন

কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্র কলিকাতায় সম্প্রতি যে সমস্ত বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহার প্রায় প্রত্যেকটিতে জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে একতা স্থাপিত হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করিবার উপদেশ রহিয়াছে। আমাদের মতে, সুভাষচন্দ্রের এই উপদেশ প্রথম-প্রথম কথঞ্চিৎ পরিমাণে সাফল্য লাভ করিলেও করিতে পারে বটে, কিন্তু সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর অনুচরত্ব লাভ করা অবধি যে রাস্তায় চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেই রাস্তায় যতদিন পর্য্যন্ত তিনি চলিতে থাকিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার চেষ্টায় দেশের মধ্যে প্রকৃত একতা সাধিত হওয়া তো দূরের কথা, দলাদলি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং দেশের প্রত্যেক সমস্যাটির জটিলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে।

আমাদের উপরোক্ত মতবাদটী ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে মানব-সমাজে কত রকমের একতা সংঘটিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে হইবে।

ডাকাতগণ যখন ডাকাতির দল গঠন করে, অথবা প্রবঞ্চকগণ যখন প্রবঞ্চনার জন্য ষড়্‌যন্ত্র করেন, অথবা চরিত্রহীন লম্পটগণ যখন ব্যাপকভাবে লাম্পট্য-প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিবার জন্য প্রযত্নশীল হন, অথবা ধনিকগণ যখন দরিদ্রগণকে শোষণ করিবার জন্য দলবদ্ধ হন, তখনও কথঞ্চিৎ পরিমাণে কতকগুলি মানুষের একতা গঠিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু ঐ একতা একদিকে যেরূপ জনসমাজের হিতকর হয় না, সেই-রূপ আবার উহা দীর্ঘস্থায়িত্ব অথবা খুব ব্যাপকতা লাভ করিতে সক্ষম হয় না। পরন্তু, ঐ শ্রেণীর একতার ফলে দেশের মধ্যে দলাদলি বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

অন্যদিকে, কোন সাধক যখন মানব-সমাজের ক্ষত কোথায়, তাহা ঠিক ঠিক ভাবে স্বীয় সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন এবং কোন্ কোন্ উপায়ে ঐ ক্ষত নিবারিত হইতে পারে, তাহার পন্থা সঠিক ভাবে পরিজ্ঞাত হন, তখন ঐ সাধকের দ্বারা মুখে মুখে কোন একতার কথা প্রচারিত না হইলেও তাঁহার পতাকা-তলে অনেকেই মিলিত হইতে থাকে। এই শ্রেণীর একতা প্রায়শঃ অত্যন্ত ব্যাপকতা লাভ করিয়া থাকে, ইহার ফলে মানব-সমাজের দলাদলি ক্রমশঃ কমিতে থাকে এবং ইহা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী হয়।

ভগবান্ বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট এবং নবী মহম্মদের আবির্ভাবের ফলে মানব-সমাজে যে শ্রেণীর একতা সাধিত হইয়াছিল, তাহা উপরোক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর একতার চূড়ান্ত নিদর্শন।

সংস্কৃত ও ভাষা-বিজ্ঞানে প্রবেশলাভ করিয়া কার্য্য ও কারণের প্রকৃতিগত গতি কি, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলে এবং কার্য্য-কারণসঙ্গত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ভগবান্ বুদ্ধদেব তাঁহার সমসাময়িক মানব-সমাজের ক্ষত প্রধানতঃ কোথায় এবং কি করিলে ঐ ক্ষত বিলুপ্ত হইতে পারে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য কঠোর সাধনায় প্রকৃত প্রযত্নশীল হইয়া সিদ্ধি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। ঐ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি তাৎকালিক মানব-সমাজের সমস্যাগুলির সমাধান কিরূপে হইতে পারে, তাহা ক্রমশঃ সমগ্র মানব-সমাজ যাহাতে পরিজ্ঞাত হইতে পারে, তজ্জন্য যথেষ্ট আয়োজন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মানব-সমাজের একজনকেও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইবার জন্য আদেশ অথবা যাচ্ঞা জানান নাই। তাৎকালিক মানব-সমাজের অনেকেই ভগবান্ বুদ্ধদেবের উপদিষ্ট পন্থায় অগ্রসর হইয়া নিজ নিজ সমস্যার সমাধান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া, যত দিন পর্য্যন্ত বুদ্ধদেবের উপদেশে কোনরূপ বিকৃতি প্রবেশ করিতে পারে নাই, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার অনুচরের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া, তৎকালীন জনসংখ্যার অনেকেই বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া পড়িয়াছিলেন। এইরূপে তাৎকালিক জগতের অধিকাংশ স্থলেই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাধান্য লাভ করিতে পারিয়াছিল এবং পরবর্ত্তী পাঁচশত বৎসর পর্য্যন্ত ঐ প্রাধান্য বজায় ছিল।

ইহার পর বুদ্ধদেবের শিষ্যগণের মধ্যে তাঁহার উপদেশ বুঝা-বিষয়ে ভুলভ্রান্তি দেখা দিয়াছিল এবং তাহার ফলে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি আবার অবিশ্বাসের উদ্ভব হইয়াছিল এবং ক্রমে ক্রমে উপরোক্ত একতা বিলুপ্ত হইয়া আবার দলাদলির উদ্ভব হইয়াছিল।

খৃষ্টান ধর্ম্মের ইতিহাস ও খৃষ্টদেবের জীবনী পর্য্যালোচনা করিলেও উপরোক্ত সত্যের প্রতিধ্বনি পাওয়া যাইবে।

মানব-সমাজের ব্যথা [কোথায়] এবং কি করিলে মানব-সমাজকে তাহার ব্যথা হইতে মুক্তি দান করা সম্ভব হইতে পারে, সাধনার দ্বারা [তাহার] সত্য যথাযথ ভাবে আবিষ্কার করিতে পারিলে যে, মানব-সমাজের মধ্যে প্রকৃত একতা সাধন করা সম্ভব হয়, তাহার অলন্ত দৃষ্টান্ত নবী মহম্মদের জীবনী ও মুসলমান ধর্ম্ম। প্রকৃত মুসলমান ধর্ম্মে ঐ সত্য লিপিবদ্ধ আছে এবং উহা নবী মহম্মদ আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার জীবনকালের অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিব্বত হইতে সুদূর স্পেন পর্য্যন্ত সমগ্র অধিবাসী মিলিত হইয়া মুসলমান-ধর্ম্মী হইয়াছিলেন এবং পরবর্ত্তী কয়েকশত বৎসর পর্য্যন্ত, যতদিন মৌলবীগণের ব্যাখ্যায় বিকৃতির উদ্ভব না হইয়াছিল, ততদিন ঐ মিলন যে অটুট ছিল, তাহা মনে করিবার কারণ আছে।

মানব-সমাজে যে প্রধানতঃ উপরোক্ত ভাবের দুই শ্রেণীর একতা সংঘটিত হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলে দেখা যাইবে যে, ডাকাত, অথবা প্রবঞ্চক, অথবা চরিত্রহীন প্রভৃতি গণের মধ্যে যে একতা স্থাপিত হয়, তাহা ব্যক্তি অথবা দলবিশেষের প্রয়াসসাধ্য। এবংবিধ একতা সাধিত করিবার জন্য কোন ব্যক্তি অথবা তাঁহার দলবিশেষকে সর্ব্বদা চেঁচামেচি করিতে হয় এবং উপরোক্ত ষড়যন্ত্রের দ্বারা যাহা লাভ করা সম্ভব হয়, তাহার ছিটাফোঁটা দলের সকলের মধ্যেই বণ্টন করিয়া দিতে হয়।

আর, দ্বিতীয় শ্রেণীর একতা সাধন করিবার জন্য কাহারও কোন চেঁচামেচি করিবার প্রয়োজন হয় না এবং তাহাতে কোন লাভালাভ বণ্টনের কথা বিদ্যমান থাকে না। এই শ্রেণীর একতার মূলে থাকে ব্যক্তি-বিশেষের নির্ব্বাক্ ও নিভৃত কঠোর সাধনা এবং যিনি ঐ ব্যক্তিবিশেষের উপদেশ বুঝিতে বা অনুসরণ করিতে চেষ্টা করেন, তিনিই তাঁহার অভীষ্ট লাভ করিতে সক্ষম হন।

যে শ্রেণীর একতার জন্ম সুভাষচন্দ্র দেশবাসীকে আহ্বান করিয়াছেন, তাহা যে উপরোক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর নহে, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইবে। কারণ, মানবসমাজের বর্ত্তমান সমস্যা কি কি এবং কোন্ উপায়েই বা মানবসমাজের প্রত্যেকের প্রত্যেক সমস্যাটির সমাধান করা সম্ভব হইতে পারে, তদ্বিষয়ে কোন নির্ব্বাক্ অথবা নিভৃত সাধনা, সুভাষবাবু তো দূরের কথা, তাঁহার গুরু গান্ধীজী পর্য্যন্ত যে কখনও করিয়াছেন, এতাদৃশ অপবাদ কেহই তাঁহাদের স্কন্ধে চাপাইতে পারিবেন না। হৈ-চৈ ও কিচির-মিচির লইয়া যে ইহাঁদের রাষ্ট্রীয় জীবনের আরম্ভ এবং উহা লইয়াই যে ঐ জীবন এতাবৎ চলিতেছে, তাহা তাঁহাদিগের অতি বড় বন্ধুগণকেও স্বীকার করিতে হইবে।

জন-সমাজের অধিকাংশই যখন অর্দ্ধাশনে ও অনশনে ক্লিষ্ট, সমগ্র মানবসমাজে খাদ্য বলিয়া যাহা মোট পরিমাণে উৎপন্ন হয়, তাহা বণ্টন করিয়া দিলেও যখন ছয় আনার অধিক লোকের পক্ষে দুইবেলার খাদ্য পাওয়া সম্ভব হয় না, তখন যত দিন পর্য্যন্ত ঐ অনশন ও অর্দ্ধাশনের ক্লেশ কি করিয়া বিদূরিত হইতে পারে, তাহার সঙ্কেত আবিষ্কৃত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত মানুষের পরস্পরের মধ্যে প্রকৃত আন্তরিক মিলন সম্ভাবিত হইতে পারে না।

সুভাষবাবু ও তাঁহার অনুচরবর্গ আমাদের উপরোক্ত কথা বুঝুন আর না-ই বুঝুন, উহা বাস্তব সত্য। মানুষের মধ্যে প্রবঞ্চনা ও অবিশ্বাস যে ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কেন এই প্রবঞ্চনা ও অবিশ্বাস বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উহার মূল কারণ, মোট জনসংখ্যার যে ব্যবহার্য্যের প্রয়োজন, সেই ব্যবহার্য্যের পরিমাণের ঘাটতি। ঐ ঘাটতি বশতঃ জনসংখ্যার কতিপয় অংশের অনশন ও অর্দ্ধাশন অনিবার্য্য এবং তদ্বশতঃ ঠকাঠকি ও অবিশ্বাস অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের মনে হয়, সুভাষচন্দ্র অথবা তাঁহার অনুচরবর্গের হৃদয়ে মানুষের অনশন ও অর্দ্ধাশন-সম্বন্ধীয় ক্লেশ কথঞ্চিৎ পরিমাণেও স্থান পায় নাই।

কি করিয়া বাংলার লেজিসলেটিভ অ্যাসেমব্লিতে কংগ্রেসী দলের প্রাধান্য স্থাপিত হইবে, মুখ্যতঃ তাহাই তাঁহাদের চিন্তনীয় হইয়া পড়িয়াছে। মুসলমান ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব কংগ্রেসপন্থিগণের হস্তগত না হইলে তাঁহাদের পক্ষে অ্যাসেমব্লিতে সংখ্যাধিক্য লাভ করা সম্ভব হয় না বলিয়াই, মুসলমান ও অনুন্নত সম্প্রদায়কে কংগ্রেসপন্থী করিবার জন্য তাঁহারা এত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন, ইহা আমাদের বিশ্বাস।

১৯৩৫ সনের নূতন আইন যদি সুভাষ বাবুর ভাল করিয়া পড়া থাকে, তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইবেন যে, বাংলা দেশের অ্যাসেমব্লিতে যাহাতে বর্ত্তমান কংগ্রেসপন্থিগণ সংখ্যাধিক্য লাভ করিতে না পারেন, তদ্বিষয়ে ঐ আইনের প্রণেতা ব্রিটিশ ষ্টেটস্‌ম্যানগণ যথেষ্ট অবহিত হইয়াছেন বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে।

একে তো, কংগ্রেসপন্থিগণের পক্ষে বাংলাদেশের অ্যাসেমব্লিতে সংখ্যাধিক্য লাভ করা সহজসাধ্য নহে, তাহার পর আবার ঐ সংখ্যাধিক্য লাভ করিতে পারিলেও এখানকার দলাদলি বৃদ্ধি পাওয়াও অবশ্যম্ভাবী।

কাজেই, সুভাষবাবু যে-একতার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, সেই একতা জনসাধারণের পক্ষে হিতকর নহে। আমরা জনসাধারণকে এখনও সতর্কতা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করি।

আগেই দেখাইয়াছি যে, জনসাধারণের মধ্যে প্রকৃত একতা সাধিত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহাদের অনশন ও অর্দ্ধাশনের ক্লেশ যাহাতে সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। ঐ চেষ্টায় হস্তক্ষেপ করিতে হইলে ইংরাজের সহিত ঐকান্তিক মিলন ও স্বাধীনতার দাবী বিসর্জ্জন করা একান্ত প্রয়োজনীয় এবং তাহা করিতে হইলে গান্ধীজীর বর্ত্তমান মতবাদ যাহাতে আলোক প্রাপ্ত না হইয়া অন্ধকার প্রাপ্ত হয়, তাহা করিতে হইবে। সুভাষবাবু তাহার ব্যবস্থা করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি অর্জ্জন করিবার সুযোগ লইতে পারিবেন কি?

লোক-সংখ্যা ও জন-সাধারণের দারিদ্র্য সম্বন্ধে আনন্দবাজার পত্রিকা

গত ৯ই বৈশাখ শুক্রবার তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে "লোকসংখ্যা ও দারিদ্র্য" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। ঐ প্রবন্ধটী আমাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। আমাদের মতে উহার লেখক ধন্যবাদার্হ এবং ঐ প্রবন্ধ শিক্ষিত জনসাধারণের মনোযোগের যোগ্য।

সম্প্রতি, বোম্বাই সহরে "নিখিল-ভারত লোকসংখ্যা ও পারিবারিক স্বাস্থ্য সম্মেলনে"র অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সভায় পরোক্ষভাবে স্থির হইয়াছে যে, যাহাতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি না পাইয়া উহা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা করিতে না পারিলে পারিবারিক অস্বাস্থ্য এবং জনসাধারণের দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব হইবে না। আনন্দবাজারের "লোকসংখ্যা ও দারিদ্র্য"-শীর্ষক প্রবন্ধে উপরোক্ত জন্ম-সংখ্যা-নিয়ন্ত্রণ অথবা জন্ম-শাসনমূলক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হইয়াছে।

প্রবন্ধটীর মধ্যে একাধিক স্থানে পরস্পর-বিরোধী (self-contradictory) কথা বিদ্যমান আছে বটে, কিন্তু মোটের উপর উহা প্রশংসনীয়।

সম্পাদক মহাশয় ঐ প্রবন্ধের প্রথম ভাগে পরিষ্কার বলিয়াছেন :—

"আমরা বরাবরই নব্য ম্যালথাস-পন্থীদিগের এই কৃত্রিম জন্মশাসন-ব্যবস্থার তীব্র বিরোধিতা করিয়া আসিতেছি। প্রথমতঃ, অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের লোক-সংখ্যা যে, অতিরিক্তরূপে বৃদ্ধি পাইতেছে, এ কথা সত্য নহে। ভারতের লোকসংখ্যা এমন কিছু বাড়ে নাই, যাহার জন্য আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া কৃত্রিম উপায়ে লোকসংখ্যা-হ্রাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, লোকসংখ্যাবৃদ্ধি, কোন জাতির পক্ষে নিছক দুর্ব্বলতার হেতু নহে, বরং একদিক্ দিয়া উহা জাতির শক্তিবৃদ্ধিরই লক্ষণ। তৃতীয়তঃ, এই ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যা পোষণ করিবার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ভারতের আছে, যদি সেই ক্ষমতাকে আমরা বিকাশলাভের সুযোগ দিতে পারি। তারপর, ইউরোপ ও আমেরিকাতে যাহাই হউক না কেন, ভারতের জনসাধারণের পক্ষে কৃত্রিম উপায়ে জন্ম-শাসনের ব্যবস্থা গ্রহণের কল্পনা একান্ত অবাস্তর, কার্য্যক্ষেত্রে উহা কোন কালেই সফল হইবার সম্ভাবনা নাই।......" ইত্যাদি।

প্রবন্ধটীর মধ্যভাগের উল্লেখযোগ্য কথা :—"ভারতের লোক-সংখ্যাবৃদ্ধির তুলনায় প্রচুর খাদ্য উৎপন্ন হইতেছে না, ফলে দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যা প্রবল হইতেছে, ইহা ঠিক। কিন্তু, কিরূপে ভারতের কৃষি ও শিল্প-সম্পদ্ বাড়াইয়া, প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়া এই সমস্যার প্রতিকার করিতে হইবে, তাহাই আজ আমাদের চিন্তা করিবার বিষয়,—কৃত্রিম উপায়ে জন্মশাসন নহে। দেশীয় মন্ত্রি-মণ্ডল কর্ত্তৃক পরিচালিত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহকে এই দিকেই মনোযোগ দিতে হইবে।......" ইত্যাদি।

এই প্রবন্ধের উপসংহারের অন্যতম কথা :—"জনসাধারণের মধ্যে দারিদ্র্য যত হ্রাস হইবে, তাহাদের জীবনযাপন-প্রণালী যত উন্নত হইবে, ততই স্বাভাবিকভাবেই লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির হার সংযত হইবে।"

প্রবন্ধটীর প্রথমভাগ, মধ্যভাগ ও উপসংহারভাগের যে তিনটী কথা উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে দুইটী মতবাদ কার্য্যকারণের যুক্তিসঙ্গত এবং সেই হিসাবে বিশেষ প্রশংসার যোগ্য :— (১) "লোকসংখ্যাবৃদ্ধি কোন জাতির পক্ষে নিছক দুর্ব্বলতার হেতু নহে, বরং একদিক্ দিয়া উহা জাতির শক্তি-বৃদ্ধিরই লক্ষণ।"

(২) "কিরূপে ভারতের কৃষি ও শিল্প-সম্পদ্ বাড়াইয়া প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়া এই সমস্যার (অর্থাৎ দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যার) প্রতিকার করিতে হইবে, তাহাই আজ আমাদিগের চিন্তা করিবার বিষয়—কৃত্রিম উপায়ে জন্মশাসন নহে"।

আমাদের মতে, ধন ও জন লইয়া—পারিবারিক ও জাতীয় ঐশ্বর্য্য। কোন জাতির ধনের পরিমাণ ও কার্য্যক্ষম জনের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, ততই ঐ জাতির

ঐশ্বর্য্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। এই হিসাবে—লোকসংখ্যাবৃদ্ধি কোন জাতির পক্ষে কোনরূপ দুর্ব্বলতার হেতু হওয়া তো দূরের কথা, বরং উহা জাতির শক্তি-বৃদ্ধিরই লক্ষণ। লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও মানব-জাতির মধ্যে দৌর্ব্বল্যের লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় কেন, তৎসম্বন্ধে আমরা এই প্রবন্ধের অপরাংশে আলোচনা করিব।

আনন্দবাজারের দ্বিতীয় মতবাদটী অর্থাৎ "কিরূপে ভারতের কৃষি ও শিল্প-সম্পদ্ বাড়াইয়া প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়া দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যার প্রতিকার করিতে হইবে, তাহাই আজ আমাদিগের চিন্তা করিবার বিষয় – কৃত্রিম উপায়ে জন্ম-শাসন নহে"—খুব সত্য কথা।

আমাদের ভাষায় এই মতবাদটী প্রকাশ করিতে হইলে, বলিতে হইবে—"কিরূপে প্রাকৃতিক শক্তি অবিকৃত রাখিয়া ভারতের কৃষি ও শিল্প-সম্পদ্ বাড়াইয়া দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যার প্রতিকার করিতে হইবে, তাহাই আজ আমাদিগের চিন্তা করিবার বিষয়।"

মানুষের শব্দ করিবার ক্ষমতা উপস্থিত হয় কি প্রকারে, শব্দের সহিত তাহার অর্থের অপরিবর্ত্তনীয় সম্বন্ধ কোথায়, ভাষাজ্ঞানের এবংবিধ কথাগুলি পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ভাষাবিজ্ঞানানুসারে ঐশ্বর্য্য বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা মূলতঃ প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা অর্জ্জিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য বলিয়া ভাষাবিজ্ঞানসম্মত কোন কথা হইতে পারে না, কারণ, মুখ্যভাবে প্রকৃতি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কখনও কোন ঐশ্বর্য্য কাহাকেও প্রদান করেন না, পরন্তু উহা প্রযত্নের দ্বারা মানুষের অর্জ্জন করিয়া লইতে হয়। মানুষের মধ্যে, জাতির মধ্যে, ঐশ্বর্য্যের তারতম্য হয় কেন, তাহার অনুসন্ধান করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, সমস্ত মানুষের মধ্যে প্রাকৃতিক শক্তি মূলতঃ একই রকমের এবং একই পরিমাণের, কিন্তু স্থান ও কালবশতঃ ঐ প্রাকৃতিক শক্তি বিকৃত হইতে আরম্ভ করে এবং জ্ঞান ও প্রযত্নের তারতম্য বশতঃ বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বিকৃতির রকম ও পরিমাণে তারতম্য ঘটিয়া থাকে।

এই রকম সূক্ষ্মভাবে সমালোচনা করিতে বসিলে আনন্দবাজার পত্রিকার উপরোক্ত দুইটী মতবাদের ভাষায় ত্রুটী দেখান যাইতে পারে বটে, কিন্তু মোটের উপর পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার করিলে উহা যে প্রশংসার যোগ্য, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

আলোচ্য প্রবন্ধের তৃতীয় কথাটী—"জনসাধারণের মধ্যে দারিদ্র্য যত হ্রাস হইবে, তাহাদের জীবনযাপনপ্রণালী যত উন্নত হইবে, ততই স্বাভাবিক ভাবেই লোকসংখ্যাবৃদ্ধির হার সংযত হইবে"—আমাদের মতে যুক্তিসঙ্গত নহে।

আজকাল যাঁহারা কৃত্রিম ভাবে জন্ম-নিরোধ করিবার পন্থায় আস্থাবান্, তাঁহাদের মধ্যে দারিদ্র্য না থাকিলে সন্তানের সংখ্যা হ্রাস পাইয়া থাকে বটে, কিন্তু দারিদ্র্য বিদূরিত হইলেই যে, সন্তানসংখ্যা কমিয়া যাইবে, এতাদৃশ মতবাদ পোষণ করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পরন্তু, "দারিদ্র্যের হ্রাস সাধন করিয়া শারীরিক ও মানসিক বলের বৃদ্ধি সাধন করিতে পারিলে কার্য্যক্ষম সন্তানসংখ্যার বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব"—এতাদৃশ মতবাদের যথেষ্ট কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে চরিত্রহীনতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও অস্বাস্থ্য বিদ্যমান, সেইখানে ঐশ্বর্য্য থাকা সত্ত্বেও মানুষ নিঃসন্তান হইয়া থাকে বটে, কিন্তু বাস্তব জগতের যেখানে যুগপৎ একদিকে ঐশ্বর্য্য এবং অন্যদিকে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিদ্যমান থাকে, সেইখানে প্রায়শঃই সন্তানের অভাব দেখা যাইবে না। বাহ্যতঃ অন্যরূপ দেখা গেলেও অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, যেখানে ঐশ্বর্য্যের বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মানুষ নিঃসন্তান হয়, সেইখানে প্রায়শঃই অপ্রকাশ্য ভাবে হয় স্ত্রী, নতুবা পুরুষের মধ্যে মানসিক অথবা শারীরিক অস্বাস্থ্য এবং কোন না কোনরূপের উচ্ছৃঙ্খলতা বিদ্যমান থাকে।

ইহা ছাড়া এক নিশ্বাসে—'লোকসংখ্যাবৃদ্ধি কোন জাতির পক্ষে নিছক দুর্ব্বলতার হেতু নহে, বরং একদিক্ দিয়া উহা জাতির শক্তি বৃদ্ধিরই লক্ষণ"—এই কথাটী বলিয়া, পুনরায় "জনসাধারণের মধ্যে দারিদ্র্য যত হ্রাস হইবে, তাহাদের জীবনযাপনপ্রণালী যত উন্নত হইবে, ততই স্বাভাবিক ভাবেই লোকসংখ্যাবৃদ্ধির হার সংযত হইবে"—

এই কথা বলা পরস্পর-বিরোধী (self-contradictory) মনোবৃত্তির পরিচায়ক। লোকসংখ্যার বৃদ্ধি যে কোন জাতির পক্ষে নিছক দুর্ব্বলতার হেতু নহে, তাহা কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করিলে, কি করিয়া লোকসংখ্যাবৃদ্ধির হার সংযত হইবে, তাহার তল্লাস করিবার কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে কি ?

আনন্দবাজারের উপরোক্ত কথাগুলির মধ্যে যতই ভুল-চুক দেখা যাউক না কেন, অমৃতবাজার, ষ্টেটস্‌ম্যান, যুগান্তর প্রভৃতি কলিকাতার ইংরাজী ও বাঙ্গালা দৈনিক সংবাদপত্রগুলি দিনের পর দিন ইয়োরোপ ও আমেরিকা হইতে আনীত বস্তা-পচা মতবাদগুলি যেরূপভাবে যুবক-সমাজে পরিবেশন করিয়া যুবকগণকে প্রায়শঃ বিপথগামী করিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া আসিতেছেন, তাহার দিকে নজর করিলে আলোচ্য মতবাদের জন্ম আনন্দবাজার পত্রিকাকে ধন্যবাদ না দিয়া পারা যায় না।

আমাদের মতে সংবাদপত্রগুলির মধ্যে বাংলার যুবক-সমাজকে সর্ব্বাপেক্ষা বিপথগামী করিয়াছেন, আনন্দবাজার পত্রিকা। আনন্দবাজার পত্রিকায় কলহের খাদ্য অনেক থাকে বটে, কিন্তু উহাতে চিন্তার খাদ্য প্রায়শঃ যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তাহা একাধিক বার আমরা পাঠকবর্গকে দেখাইয়াছি। যে সংবাদপত্র বাঙ্গালীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচারিত এবং যাহা পরোক্ষভাবে এতাবৎ বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া আসিতেছে, তাহার এতাদৃশ পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমরা আনন্দানুভব করিতেছি বটে,কিন্তু এই পরিবর্ত্তন স্থায়ী হইবে কি না, তদ্বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। যিনি সর্ব্বদা মানুষের মধ্যে সুবুদ্ধি পরিবেশন করিয়া মানুষের অশেষবিধ কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন, তিনিই আনন্দবাজার পত্রিকার স্ফীত-মস্তিষ্ক পরিচালক-বর্গকে সুবুদ্ধি প্রদান করুন, ইহা আমরা সর্ব্বনিয়ন্তার নিকট প্রার্থনা করিতেছি। প্রথমতঃ, লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও মানবজাতির মধ্যে দৌর্ব্বল্যের লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় কেন এবং দ্বিতীয়তঃ, যে প্রাকৃতিক শক্তি অবিকৃত রাখিতে পারিলে ভারতের কৃষি ও শিল্প-সম্পদ্‌ বাড়াইয়া দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যার প্রতিকার করা সম্ভব হইতে পারে, কি প্রকারে সেই প্রাকৃতিক শক্তি অবিকৃত রাখা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে আমরা এক্ষণে আলোচনা করিব।

লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও মানবজাতির মধ্যে দৌর্ব্বল্যের লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় কেন ?

আমাদের মতে ধন ও জন্‌ লইয়া মানুষের ঐশ্বর্য্য। মানবসমাজে দীর্ঘায়ুসম্পন্ন জনসংখ্যা যত বৃদ্ধি পায়, প্রকৃত উপার্জ্জনক্ষম মানুষও তত বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে এবং ততই মানুষের দারিদ্র্য, পরমুখাপেক্ষিতা, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকালবার্দ্ধক্য এবং অকালমৃত্যু হ্রাস পাইতে থাকে এবং ভূমণ্ডল সুখের আগারে পরিণত হয়।

বর্ত্তমান কালের মানব-সমাজে যাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অন্যরূপ মতবাদ পোষণ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মতে বর্ত্তমান কালে মানব-সমাজের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়াই মানুষের মধ্যে অন্নাভাব ও অর্থাভাব এতাদৃশ পরিমাণে বাড়িয়া চলিয়াছে এবং জনসংখ্যা যাহাতে নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা না করিতে পারিলে অন্য কোন উপায়ে অর্থাভাব অথবা অন্নাভাব-সমস্যার পূরণ করা সম্ভব নহে। ইঁহারা যাহা বলেন, তাহা শুনিলে মনে হয় যে, সাধারণতঃ, 'জীব দিয়াছেন যিনি আহার দিবেন তিনি', এই বিশ্বাস মানুষ পোষণ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু ঐ বিশ্বাস ভিত্তিহীন। এই মতবাদ সরল ভাষায় প্রকাশ করিতে হইলে বলিতে হয় যে, স্রষ্টা জনসংখ্যা বাড়াইয়া তুলিয়াছেন বটে, কিন্তু অতিরিক্ত মানুষের আহারের কোন ব্যবস্থা করেন নাই।

এই শ্রেণীর মতবাদ আপাতদৃষ্টিতে ঈশ্বরের প্রতি যতই অবিশ্বাস ও অধর্ম্মের পরিচায়ক বলিয়া প্রতিপন্ন হউক না কেন, বর্ত্তমান সময়ে লোকসংখ্যা যে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং তাহা সত্ত্বেও মানুষের মধ্যে দারিদ্র্য ও অন্নাভাব যে বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

কাজেই, লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইলে মানুষের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা বাড়িতে থাকে, এই মতবাদের সত্যতা সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, বর্ত্তমান সময়ে,

লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও মানবজাতির মধ্যে দারিদ্র্য ও অন্নাভাব বাড়িয়া চলিয়াছে কেন, তাহার কৈফিয়ৎ সর্ব্বাগ্রে অনুসন্ধান করিতে হইবে।

লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও মানবজাতির মধ্যে দারিদ্র্য ও অন্নাভাব বাড়িয়া চলিয়াছে কেন, তাহার যুক্তি-সঙ্গত কৈফিয়ৎ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায় কেন, সর্ব্বাগ্রে তাহার সন্ধান করিতে হইবে।

আজকালকার ম্যাল্থাস-পন্থী অর্থনীতিবিদ্‌গণ মনে করেন যে, বর্ত্তমান কালে সমগ্র মানবসমাজের লোক-সংখ্যা যেরূপ অধিক হইয়া পড়িয়াছে, ইহার আগে আর কখনও এত অধিক লোকসংখ্যা ছিল না। আমাদের মতে, এই মতবাদ যথার্থ নহে। বর্ত্তমান জগতে লোক-গণনার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে ১৮৭১ সাল হইতে। ঐ সালের আগে মোট লোকসংখ্যা যে কত ছিল, তাহা যথাযথভাবে জানিবার কোন সাধারণ উপায় দেখা যায় না। কাজেই, যদিও ইহা বলা যাইতে পারে যে, ১৮৭১ সনের লোকসংখ্যার তুলনায় ১৯৩১ সনের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তথাপি ১৭৭১ সনের লোকসংখ্যার তুলনায় ১৯৩১ সনের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে কি না, তাহা কোন সাধারণ উপায়ের দ্বারা সঠিকভাবে বলা চলে না। পরন্তু, ভারতের পল্লীগ্রামের জরাজীর্ণ ছাড়া-বাড়ীর সংখ্যার দিকে অথবা মোট পল্লীগ্রামের সংখ্যার দিকে নজর করিলে, যে-জনসংখ্যা এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার তুলনায় যে একদিন উহা আরও বেশী ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। তাহার পর, ১৮৭১ সন হইতে প্রতি দশ বৎসরে যে লোক-গণনা হইয়া আসিতেছে, তাহার তালিকার দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ ১৮৭১ সন হইতে মোট লোকসংখ্যার পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে বটে, কিন্তু ৩০ বৎসরের নিম্নবয়স্ক লোকসংখ্যা যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে, উহার উচ্চতর-বয়স্ক লোকসংখ্যা তাদৃশ পরিমাণে বৃদ্ধি পায় নাই। ইহা হইতে বুঝিতে হয় যে, শিশু ও অপরিণতবয়স্ক লোকের সংখ্যার তুলনায় পরিণত-বয়স্ক লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে না। অথবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে, প্রাকৃতিক কারণে জন্মসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে বটে, কিন্তু যে উপায়ে মানুষের দীর্ঘায়ু সাধন করা সম্ভব হয়, সেই উপায় মানুষ পরিজ্ঞাত হইতে পারে নাই বলিয়া, পরিণত-বয়স্ক মানুষের সংখ্যা তাদৃশ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে পারিতেছে না।

সংক্ষেপতঃ ১৮৭১ সন হইতে প্রতি দশ বৎসরের লোক-গণনায় যে তালিকা বিদ্যমান আছে, সেই তালিকা-গুলির দিকে লক্ষ্য করিলে মনুষ্যসংখ্যা যে কোনও দুই বৎসর সম্পূর্ণভাবে সমান থাকে না এবং উহার বৃদ্ধি ও ক্ষয় যে প্রাকৃতিক কারণ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বশতঃ হইয়া থাকে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

কোন্ প্রাকৃতিক কারণে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি ও ক্ষয় ঘটিয়া থাকে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, দেখা যাইবে যে, জননশক্তির মূল কারণ তেজ ও রস। যখন পৃথিবীতে তেজ ও রস বৃদ্ধি পায়, তখন আপনা হইতেই পৃথিবীস্থ সমস্ত জীবের জননশক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু, তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষের অভাব থাকিলে জননশক্তির বৃদ্ধি বশতঃ অপরিণত-বয়স্ক লোকের সংখ্যা বাড়িতে থাকে বটে, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য মানুষের পরমায়ু কমিতে থাকে এবং পরিণত-বয়স্ক লোকের সংখ্যা সমানভাবে বৃদ্ধি পাইতে পারে না। পৃথিবীর তেজ ও রস কখনও বৃদ্ধি পায়, আবার কখনও বা কমিয়া যায় কেন, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, পৃথিবীর তেজ ও রসের মূলাধার সূর্য্য ও চন্দ্র। উহা প্রতিনিয়ত ঘুরিয়া বেড়াই-তেছে এবং ঘূর্ণয়ন বশতঃ সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যের দূরত্ব এবং চন্দ্র ও পৃথিবীর মধ্যের দূরত্ব সর্ব্বদা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। দূরত্বের এই পরিবর্ত্তনের জন্যই কখনও বা তেজ ও রস বৃদ্ধি পাইতেছে, আবার কখনও বা উহা কমিয়া যাইতেছে। এই রূপে পৃথিবীর জীবের জননশক্তি কখনও বা বৃদ্ধি পাইতেছে, আবার কখনও বা উহা কমিয়া যাইতেছে।

পৃথিবীস্থ জীবের জননশক্তি-বিষয়ক উপরোক্ত সত্য অনুধাবন করিতে পারিলে আরও বুঝা যাইবে যে, যখন পৃথিবীস্থ মানুষের মধ্যে জননসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তখন পশু-পক্ষী ও বিভিন্ন প্রকারের শস্যের জননশক্তির উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনাও বাড়িয়া যায়। জননশক্তি-

বিষয়ক উপরোক্ত সত্য হইতে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, যখন মানুষের জন্মসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তখন তাহার খাদ্যের উৎপত্তির বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনাও বাড়িতে থাকে। কিন্তু এই হিসাবে, লোকসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রকৃত ঐশ্বর্য্যের বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা অবশ্যম্ভাবী। তথাপি যে মানুষের খাদ্যের অভাব হয়, তাহার একমাত্র কারণ, প্রাকৃতিক নিয়ম এবং খাদ্যোৎপত্তি-বিষয়ে মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিপথগামিতা।

কাজেই লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও মানব-জাতির মধ্যে দৌর্ব্বল্যের লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় কেন, তাহার উত্তরে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, উহার প্রধান কারণ দুইটি, যথা—(১) প্রকৃতির নিয়ম-বিষয়ে মানুষের অজ্ঞতা, এবং (২) খাদ্যোৎপত্তি-বিষয়ে অথবা কৃষির বিজ্ঞান-বিষয়ে মানুষের বিপথগামিতা।

মানবসমাজের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া মানুষ আজ শিহরিয়া উঠিয়াছে এবং এই লোকসংখ্যার বৃদ্ধিকেই মানুষের বিবিধ সমস্যার অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দ্ধারিত করিতেছে—কিন্তু যখন ঠকিয়া ঠকিয়া, সে আজ যাহাকে জ্ঞান-বিজ্ঞান বলিয়া আদর করিতেছে, তাহা যে প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান নহে, পরন্তু উহা যে বিপথগামী কুজ্ঞান, তাহা যখন মানুষ বুঝিতে পারিবে এবং নূতন ধরণের সাধনার দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সক্ষম হইবে, তখন উপরোক্ত কথার সত্যতা স্পষ্টভাবে স্বীকার করা সম্ভব হইবে।

এখনও, পাশ্চাত্ত্য কৃষি-বিজ্ঞান যে আদৌ জন-হিতকর বিজ্ঞান নহে, পরন্তু কু-জ্ঞান ও মানুষের বর্ত্তমান অন্নাভাব-সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ, তাহা যে-মুহূর্ত্তে মানুষ বুঝিতে পারিবে, সেই মুহূর্ত্তে প্রাকৃতিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিবার আয়োজন আরম্ভ করা সম্ভব হইবে এবং তখন সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্যমূল্যের মধ্যে সমতা-স্থাপনের উদ্বেগও দেখা দিবে এবং তখন, জনবৃদ্ধি যে ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধির প্রধান সহায়ক, তাহাও প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হইবে।

যে প্রাকৃতিক শক্তি অবিকৃত রাখিতে পারিলে ভারতের কৃষি ও শিল্প-সম্পদ্ বাড়াইয়া দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যার প্রতিকার করা সম্ভব হইতে পারে, কি প্রকারে সেই প্রাকৃতিক শক্তি অবিকৃত রাখা যাইতে পারে ?

"লোকসংখ্যা ও দারিদ্র্য"-শীর্ষক প্রবন্ধে আনন্দবাজার-সম্পাদক বলিয়াছেন যে, কিরূপে ভারতের কৃষি ও শিল্প-সম্পদ্ বাড়াইয়া প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়া দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যার প্রতিকার করিতে হইবে, তাহাই আজ আমাদিগের চিন্তার বিষয়"। কোন্ সেই প্রাকৃতিক শক্তি, যাহার অক্ষুণ্ণতা ভারতের কৃষি ও শিল্প-সম্পদ্ বাড়াইবার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, জমী যাহাতে সর্ব্বদা সরস ও সতেজ থাকে, তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইলে অনায়াসে কৃষকের অত্যধিক পরিশ্রম ব্যতিরেকেও প্রচুর পরিমাণে বিবিধ শস্যোৎপাদন করা সম্ভব হয় এবং তখন বিবিধ শস্যের মূল্যের মধ্যে যাহাতে সমতা বিদ্যমান থাকে, তাহার ব্যবস্থা সাধন করিতে পারিলে জনসমাজের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক অস্বাস্থ্য কথঞ্চিৎ পরিমাণে বিদ্যমান থাকিলেও থাকিতে পারে বটে, কিন্তু অন্নাভাব অথবা অর্থাভাব প্রায়শঃ থাকিতে পারে না। এতাদৃশ ভাবে কৃষির উন্নতি সাধন করিতে পারিলে বৎসরের ৪।৫ মাসের চেষ্টাতেই সমগ্র বৎসরের সমগ্র জনসমাজের প্রয়োজনীয় খাদ্য ও কাঁচা মাল উৎপন্ন করা সম্ভব হয় এবং তখন কুটীরশিল্পের পক্ষে যন্ত্রশিল্পকে পরাজিত করিয়া সমুন্নত শিল্পে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করা সম্ভব হইয়া থাকে।

কাযেই, কোন্ সেই প্রাকৃতিক শক্তি যাহার অক্ষুণ্ণতা ভারতের কৃষি ও শিল্প-সম্পদ্ বাড়াইবার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহার উত্তরে জমীর সরসতা ও সতেজতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

কি করিয়া জমীর সরসতা ও সতেজতার বৃদ্ধি সাধন করা সম্ভব হইতে পারে, তাহার গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমান বিজ্ঞান ও সভ্যতার নির্দ্দেশানুসারে মানুষ তাহার ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্য যাহা কিছু করিতেছে, তাহার প্রত্যেকটি, হয় প্রত্যক্ষভাবে নতুবা পরোক্ষভাবে, জমীর রস ও তেজের হ্রাস সাধন করিবার

সহায়তা করিতেছে এবং পরোক্ষভাবে ঐ বিজ্ঞান ও সভ্যতাই মানুষের সর্বনাশ সাধন করিতেছে।

কয়েক বৎসর হইতে জনসমাজে জনসাধারণের দুঃখ-দুর্গতি দূর করিবার জন্য যে সমস্ত উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, তাহার যে কোনটী পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, উহার কোনটীই জনসাধারণের দুর্গতি দূর করিবার সহায়তা করা তো দূরের কথা, উহার প্রত্যেকটী ঐ দুর্গতির বৃদ্ধি সাধন করিতেছে।

আমাদের এই কথা যে ঠিক তাহা প্রতিপন্ন করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে বর্ত্তমানকালে জনসাধারণের দুঃখ দূর করিবার জন্য কি কি উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে, তাহার সন্ধান করিতে হইবে।

বর্ত্তমান কালে জনসমাজে জনসাধারণের দুঃখ-দুর্গতি দূর করিবার জন্য যে সমস্ত উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয় কয়টী উল্লেখযোগ্য :—

(১) রাষ্ট্রীয় গণ-স্বাধীনতার আন্দোলন ;
(২) জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে শক্তির উৎকর্ষ-সাধনের আয়োজন ও যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং রাজ্যবিস্তার ;
(৩) সন্ত্রাসবাদ ;
(৪) আইন-অমান্য এবং অহিংস অসহযোগ ;
(৫) স্ব স্ব দলের প্রভুত্ব-বিস্তার ;
(৬) যন্ত্র-শিল্পের ও রক্ষণ-শুল্কমূলক বাণিজ্যের বিস্তার;
(৭) শিক্ষাবিস্তার ;
(৮) লোকসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ ;

আধুনিক মনুষ্যসমাজে যাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের অধিকাংশের বিশ্বাস যে, ধনিকগণই জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশার কারণ এবং কোনক্রমে রাজ্যপরিচালনার ভার যাহাতে তাঁহাদের হাত হইতে জন-সাধারণের হস্তে হস্তান্তরিত হয়, তাহা করিতে পারিলেই জনসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশা বিদূরিত করা সম্ভব হইবে। ইহারই নাম রাষ্ট্রীয় গণ-স্বাধীনতার আন্দোলন। এই আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, মুখ্যতঃ গত একশত বৎসর হইতে।

গত একশত বৎসরের এই আন্দোলনের ফলে, জনসমাজের রাষ্ট্রীয় অবস্থা কোথা হইতে কোথায় উপনীত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক দেশেই যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের ভার প্রাপ্ত হন, তাঁহারা ক্রমশঃ ধনিক হইয়া পড়েন এবং ধনিকদিগের হাত হইতে রাজ্যভার কাড়িয়া লওয়া কোনক্রমেই সম্ভব হয় না। পরন্তু, এই আন্দোলনের ফলে, বর্ত্তমান জগতের প্রায় প্রত্যেক দেশের রাজস্বতার প্রায়শঃ কতকগুলি নর্ত্তনকুর্দ্দনে মত্ত, চরিত্রহীন, স্বার্থপর, কুচক্রী মানুষের হস্তে হস্তান্তরিত হইয়াছে এবং প্রায় প্রত্যেক দেশেই চরিত্রহীনতা ও অনশন ও অর্দ্ধাশনের ক্লেশ বাড়িয়া চলিতেছে। অধিকন্তু, এতাদৃশ আন্দোলনের ফলে, স্বভাবজ বুদ্ধিমান্ মানুষগণ বিপথগামী হইয়া, কুচক্রী হইয়া পড়িতেছেন এবং কোন দেশেই যে-শ্রেণীর মস্তিষ্কের দ্বারা প্রকৃত কৃষি-বিজ্ঞানের উদ্ধার হওয়া সম্ভব, সেই শ্রেণীর মস্তিষ্কের উদ্ভব হওয়া সম্ভব হইতেছে না।

মনুষ্য-সমাজের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের আরও বিশ্বাস যে, বিবিধ রকমের অস্ত্রশস্ত্র ও যান-বাহনের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিলে, শক্তিমান্ হওয়া সম্ভব হয়। তখন, রাজ্য বিস্তার করিয়া বাণিজ্য-বিস্তারের নামে স্ব স্ব দেশীয় কারেন্সী নোটগুলি বিভিন্ন দেশে প্রবর্ত্তিত করা সহজসাধ্য হয় এবং ফাঁকতালে ঐশ্বর্য্যশালী হওয়া সম্ভবযোগ্য হয়।

ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি শক্তিশালী দেশগুলি ঐ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া গত দুইশত বৎসর ধরিয়া রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন এবং কথঞ্চিৎ পরিমাণে সিদ্ধিলাভ করিতেও সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু, খাদ্যের জন্য সমগ্র ইংলণ্ডের পরমুখাপেক্ষিতা এবং ব্যক্তিগত ভাবে তথাকথিত জনসাধারণের মধ্যে অর্থাভাব, অন্নাভাব ও অনশন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

কাযেই, অস্ত্রশস্ত্র ও যানবাহনের উন্নতিসাধনের দ্বারা, অথবা রাজ্যবিস্তারের দ্বারা জনসাধারণের দুঃখকষ্ট বিদূরিত করিবার প্রযত্ন যে, সম্পূর্ণভাবে অসফল হইয়া থাকে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কেন এই প্রযত্ন অসফল হয়, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, অস্ত্রশস্ত্র ও যানবাহনের উন্নতির প্রযত্নের ফলে মানুষ অধিকতর

অভিমানগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং তাহার ফলে কোন বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি করা অসম্ভব হয়। এইরূপে যে-মস্তিষ্কের দ্বারা প্রকৃত কৃষি-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করা এবং জনসাধারণের উন্নতি সাধন করা সম্ভবযোগ্য হইয়া থাকে, সেই মস্তিষ্ক বিপথগামী হইয়া, যুদ্ধ-বিগ্রহে জনসাধারণের অকালমৃত্যুর পথের প্রশস্তি সাধন করিয়া থাকে।

সন্ত্রাসবাদ, আইন-অমান্য এবং অহিংস অসহযোগ, স্ব স্ব দলের প্রভুত্ব-বিস্তার, যন্ত্র-শিল্পের বিস্তার, রক্ষণ-শুল্কমূলক বাণিজ্যের বিস্তার, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বিস্তার এবং লোকসংখ্যার নিয়ন্ত্রণের দ্বারাও যে সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয় না, তাহাও ঐ ঐ শ্রেণীর আন্দোলনের ফলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে প্রত্যক্ষজ্ঞান হইবে।

এক্ষণে প্রশ্ন, কোন্ উপায়ে এদেশীয় ঐক্যসূত্র সম্পাদন করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইতে পারে।

আমরা এই প্রশ্নের উত্তর অনেক বার দিয়াছি। আনন্দবাজারের কর্তৃপক্ষগণের মধ্যে যদি সত্যসত্যই ঐ প্রশ্নের উদয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদিগকে মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখিয়া মানুষের মত নিরপেক্ষভাবে বঙ্গশ্রী পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তাঁহারা তাহা পারিবেন কি?

গান্ধী-জিন্না-সাক্ষাৎকার

২৮শে এপ্রিল হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিবার জন্য গান্ধীজী মিঃ জিন্নার সহিত সাক্ষাৎ করেন বলিয়া দৈনিক সংবাদপত্রের মারফৎ শুনা যায়।

এই সাক্ষাৎকারের ফলে কি ঘটিবে, তাহা অনুমান করিবার জন্য যে অনেকেরই প্রাণে নানা রকম প্রশ্নের উদয় হইতেছে, তাহা বলা বাহুল্য।

আমাদের মতে এই সাক্ষাৎকারের ফলে একটী প্রকাণ্ড অশ্ব-ডিম্বের উৎপত্তি হইবার আশা করা যাইতে পারে। পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন যে, এই সাক্ষাৎকারের ফলে যে কোন লাভ হইবে না, তাহা আমরা বলিতেছি না। গান্ধীজী কিরূপ ভাবে জিন্না-সদনে অগ্রসর হইতেছেন, কোন্ কোন্ অষ্টাদশবর্ষীয়া সুন্দরীর স্কন্ধে ভর করিয়া তিনি পদক্ষেপ করিতেছেন, কোন্ কোন্ প্রৌঢ়া পুরুষ-ভাবাপন্না বাগ্মিনী কামিনী তাঁহার সঙ্গ লইয়াছেন, এবংবিধ অনেক রকমের ফটো যে বিবিধ সংবাদপত্রের বক্ষ সুশোভিত করিবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া যাঁহারা দেশের প্রকৃত ঐশ্বর্য্য যে কি জিনিষ তদ্বিষয়ে জীবনাবধি কোনরূপ চিন্তা না করিয়া পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া ঐশ্বর্য্যের উপভোগ করিয়া ও জনসাধারণের উপর নেতৃত্ব করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে হয়ত একটা প্যাক্ট‌ও সংঘটিত হইবে এবং ঐ প্যাক্টের ফলে হয়ত ইন্দ্রজালের মত, যাঁহারা এতদিন ফেডারেশনের বিরোধিতা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারাই উহা আবার গ্রহণের জন্য ব্যাকুলতা দেখাইতে আরম্ভ করিবেন।

আমাদের মতে, উপরোক্ত অশ্বডিম্বের ফলে অনেক কিছু দেখিবার সম্ভাবনা হইবে বটে, কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের প্রকৃত একতার সম্ভাবনা বিন্দুমাত্রও বর্দ্ধিত হইবে না।

দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রকৃত একতা সাধন করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে দেশের প্রত্যেকে যাহাতে অবশ্য-প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি পাইতে পারে এবং দ্বিতীয়তঃ স্ব স্ব ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সামর্থ্যের তারতম্যানুসারে যাহাতে ঐ পাওয়ার পরিমাণের তারতম্য সংঘটিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আমি, রমজান সেখ অথবা হরিহর মণ্ডল রৌদ্র-বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া স্বাস্থ্যের বিনিময়ে কৃষিকার্য্যের দ্বারা আমার পরিবারের বাৎসরিক খাদ্য-প্রয়োজননির্ব্বাহের উপযোগী কেবলমাত্র ৩০ মণ ধান্য উৎপন্ন করিতেছি। আর, তুমি মিঃ অমুক, অথবা অমুক মহাত্মা, অথবা রাষ্ট্রপতি মূল্যের নামে কয়েকখানি নোটকাগজ অথবা ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রার লোভ দেখাইয়া, অথবা জনহিতৈষণার নামে কেবল কথার তোড়জোড় দ্বারা আমার ঐ স্ত্রীপুত্রের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইবে, তাহার ফলে আমার স্ত্রী-পুত্র অনশনে অথবা

অর্দ্ধাশনে জীর্ণশীর্ণ থাকিবে, অথচ আমার শ্রদ্ধা তোমার উপর চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং আমি চিরদিন তোমার সহিত মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিতে থাকিব, ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না।

হিন্দুই হউন আর মুসলমানই হউন, আমাদের নেতৃবর্গ যে আগাগোড়া আমাদিগকে ভাঁওতা দিতেছেন, তাহা কি আমরা এখনও বুঝিব না?

জনসাধারণের মধ্যে প্রকৃত একতা সাধন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে যে মন্ত্রের দ্বারা মানবসমাজের প্রত্যেকের পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি পাওয়া সম্ভব হইতে পারে, সেই মন্ত্রের আবিষ্কার করিতে হইবে এবং তাহার সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

সুমহান্ গান্ধীজীর অথবা তাঁহার অনুচরবর্গের কাহারও পেটে বোমা মারিলেও যে তদ্বিষয়ে 'কোঁক' শব্দ শুনা যাইবে না, ইহা আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে উপলব্ধি করিয়া দেশপ্রেমের নামে যাঁহারা আমাদিগকে বিপথগামী করিতেছেন এবং আমাদিগের উচ্ছৃঙ্খলতার সহায়তা করিতেছেন, আর যাহাতে তাঁহারা উহা না করিতে পারেন, আমাদের মতে, সেই ব্যবস্থা বর্ত্তমান অবস্থায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

স্বাধীনতার উদ্দীপনা

ভারতীয় নেতৃবর্গের মধ্যে অনেকেরই ধারণা যে, জগতের মধ্যে ভারতবাসী সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র এবং ঐ দারিদ্র্যের প্রধান কারণ, ভারতবাসিগণের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা। যতদিন পর্য্যন্ত ঐ রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা দূরীভূত হইয়া ভারতবর্ষে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত ভারতবাসিগণের আর্থিক দারিদ্র্য বিদূরিত করা সম্ভবযোগ্য হইবে না—ইহা তাঁহাদিগের অন্যতম অভিমত। প্রধানতঃ এই কারণেই তাঁহারা সর্ব্বদা স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার সংগ্রামের কথা বলিয়া থাকেন। স্বয়ং পণ্ডিত জওহরলাল ও সভাপতি সুভাষচন্দ্র যে সমস্ত বক্তৃতা প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে তাহার মধ্যে প্রধানতঃ স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার সংগ্রামের কথাই পাওয়া যাইবে। আমাদের যুবকগণের মধ্যেও অনেকেই ঐ বিশ্বাস পোষণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার সংগ্রামের বিরুদ্ধে কথা কওয়া দেশ-দ্রোহিতার রূপান্তর মাত্র। ইহাঁদের বিশ্বাস যে, যাঁহারা স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কথা কহেন, তাঁহারা শিক্ষিত ও সভ্য-সমাজের অপাঙ্‌ক্তেয়।

আমরা কিন্তু এই প্রচলিত মত-বাদের সম্পূর্ণ বিরোধী।

আমাদের মতে—ভারতবাসিগণ তাঁহাদের অতীত ঐশ্বর্য্যের তুলনায় অত্যন্ত দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছেন, ইহা সত্য এবং অদূরভবিষ্যতে কোন অদৃষ্ট-শক্তি ভারতবাসিগণকে তাঁহাদের দারিদ্র্য হইতে রক্ষা না করিলে তাঁহাদের অনেকেই অনশনে ও অর্দ্ধাশনে অকালমৃত্যুর কবলে পতিত হইতে বাধ্য হইবেন, তাহাও সত্য; কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে ঐশ্বর্য্যশালী হইতে হইলে, দাসত্ব অথবা নকরগিরি হইতে মুক্ত হইবার একান্ত প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান থাকে, ইহা স্বীকার করিয়া লইলে, ভারতবাসিগণকে এখনও জগতের অন্যান্য অনেকের তুলনায় সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র বলা চলে না। পরন্তু, ঐশ্বর্য্যের প্রকৃত সংজ্ঞা কি হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে তলাইয়া চিন্তা করিলে এখনও ভারতবাসিগণকে অনেকেরই তুলনায় অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধিশালী বলিয়া অভিহিত করিতে হয়।

ভারতবাসিগণ যে তাঁহাদের অতীত ঐশ্বর্য্যের তুলনায় ক্রমশঃ দরিদ্র হইয়া পড়িতেছেন, এবং ঐ দারিদ্র্য যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, আমাদের মতে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা উহার মূল কারণ নহে। যে কারণে ভারতবাসী রাষ্ট্রীয় ভাবে পরাধীন হইয়া পড়িয়াছে, সেই কারণেই ভারতবাসীর ঐশ্বর্য্য ক্রমশঃ বিলীন হইয়া পড়িতেছে এবং তাহাদের দারিদ্র্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার কারণ বহু। প্রধানতঃ ভারতীয় প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিলুপ্তি এবং উহার রক্ষাকর্ত্তা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের মূর্খতা, দাম্ভিকতা এবং অনাচারকেই উহার মূল কারণ বলা যাইতে পারে।

স্বাধীনতার সংজ্ঞার মধ্যে যদি ইংরাজগণকে তাড়াইয়া

দেওয়া অথবা গুণাগুণ-নির্ব্বিশেষে ভারতবাসিগণের দ্বারা ভারতবর্ষের গভর্ণমেণ্ট পরিচালনার কোন কথা থাকে, তাহা হইলে আমাদিগের মতে স্বাধীনতা অথবা স্বাধীনতার সংগ্রামের উদ্দীপনা দ্বারা কখনও ভারতবর্ষ প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিবে না এবং ঐ উদ্দীপনা দ্বারা ভারতবাসীর আর্থিক দারিদ্র্যও, এমন কি কথঞ্চিৎ পরিমাণেও, হ্রাস প্রাপ্ত হইবে না। পরন্তু, বর্ত্তমান সময়ে স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার সংগ্রামের কথা লইয়া যেরূপ ভাবের উদ্দীপনা দেশের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সেইরূপ ভাবের উদ্দীপনা চলিতে থাকিলে প্রকৃত দাসত্বভাব ও উচ্ছৃঙ্খলতা এবং দেশের প্রত্যেকেরই দারিদ্র্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

যে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিলে, ভারতবাসিগণের প্রত্যেকের পক্ষে আর্থিক দারিদ্র্য হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হইবে, সেই স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে মুখে মুখে স্বাধীনতার কথা কওয়া সম্পূর্ণ ভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং প্রাণে প্রাণে ইংরাজ-বিদ্বেষ বর্জ্জন করিতে হইবে। ইহা ছাড়া সামাজিক যে-পরিকল্পনার দ্বারা মানবসমাজের প্রত্যেকের পক্ষে অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি পাওয়া সম্ভব হয়, সেই পরিকল্পনার জ্ঞান লাভ করিবার জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

আমাদের উপরোক্ত অভিমত ঠিক অথবা আমাদের নেতৃবর্গের মতবাদ ঠিক, তৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে, আমাদিগকে নিম্নলিখিত তিনটি প্রশ্নের বিচার করিতে হইবে:—

(১) ভারতবাসিগণ জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র কি না?

(২) ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা ভারতবাসিগণের দারিদ্র্যের কারণ কি না?

(৩) ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইলেই ভারতবাসিগণের দারিদ্র্য দূরীভূত হইবে কি না?

ভারতবাসিগণ জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র কি না

ভারতবাসিগণ জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র কি না তাহার বিচার করিতে হইলে, কি হইলে মানুষকে ধনবান্ অথবা দরিদ্র বলা যাইতে পারে, সর্ব্বাগ্রে তাহার বিচার করিতে হইবে।

কাগজ-নির্ম্মিত নোট অথবা ধাতু-নির্ম্মিত মুদ্রার পরিমাণ দ্বারা যদি ঐশ্বর্য্যের পরিমাপ করা যায়, তাহা হইলে ভারতবাসিগণকে যে সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হয়, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, কাগজ-নির্ম্মিত নোট অথবা ধাতু-নির্ম্মিত মুদ্রার পরিমাণ হিসাবে ভারতবাসিগণের গড়পড়তা আয় জগতের অন্যান্য মানুষের তুলনায় সর্ব্বাপেক্ষা কম। এই হিসাবে ভারতবাসিগণের আয় সর্ব্বাপেক্ষা কম হইলেও, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এতাদৃশ দরিদ্র ভারতবর্ষের দুয়ারে জগতের সকল দেশের ধনী মানুষগুলি অন্ন-সংস্থানের জন্য আসিতে বাধ্য হইয়া থাকেন।

অথচ, ভারতবাসিগণ এখনও পর্য্যন্ত অন্ন-সংস্থানের জন্য অন্য কাহারও দুয়ারে যাইতে বাধ্য হন নাই। সমাজের সাধারণ নিয়মানুসারে ধনীর দুয়ারেই দরিদ্রগণ কখনও বা ভিখারীর বেশে, কখনও বা প্রতারকের বেশে, কখনও বা চোরের বেশে, কখনও বা দস্যুর বেশে উপস্থিত হয়। কিন্তু, দরিদ্রের দুয়ারে ধনী কখনও কোনরূপ যাচ্ঞা লইয়া উপস্থিত হয় না। কাজেই প্রশ্ন হইবে যে, এই দরিদ্র ভারতবাসীর দুয়ারে অস্বাভাবিকভাবে ধনিকগণের এত যাতায়াত কেন? তবে কি ভারতবর্ষ প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র নহে? কাগজ-নির্ম্মিত নোট অথবা ধাতু-নির্ম্মিত মুদ্রার পরিমাণ দ্বারা ঐশ্বর্য্যের পরিমাপ করিবার প্রথা কি সর্ব্বতোভাবে সুসঙ্গত নহে?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, বাস্তবিক পক্ষে কাগজ-নির্ম্মিত নোট অথবা ধাতু-নির্ম্মিত মুদ্রার পরিমাণ দ্বারা ঐশ্বর্য্যের পরিমাপ করিবার প্রথা সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে সুসঙ্গত নহে।

যতদিন পর্য্যন্ত মানুষ তাহার আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যের প্রত্যেক জিনিষটী কাগজ-নির্ম্মিত নোট অথবা ধাতু-নির্ম্মিত মুদ্রার দ্বারা ক্রয় করিতে সক্ষম হয়, ততদিন পর্য্যন্ত নোট ও মুদ্রাকে কথঞ্চিৎ পরিমাণে ঐশ্বর্য্যের পরিমাপক বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু যখন নোট অথবা ধাতু-নির্ম্মিত মুদ্রা থাকা সত্ত্বেও উহার দ্বারা আহার্য্য ও

ব্যবহার্য্যের প্রত্যেক জিনিষটী ক্রয় করা সম্ভব হয় না, তখন আর ঐ নোট অথবা ধাতু-নির্ম্মিত মুদ্রাকে ঐশ্বর্য্যের পরিমাপক বলিয়া মনে করা চলে না।

টাকার গণ্‌তি হিসাবে আমাদের দেশের যাঁহারা গরীব তাঁহারা, নোট ও মুদ্রা থাকা সত্বেও যে আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদা ক্রয় করা সম্ভব না-ও হইতে পারে, ইহা অনুমান করিতে পারেন না। কিন্তু, বাস্তবিকপক্ষে মানবসমাজের সমস্ত লোকের জন্য সর্ব্বসমেত যে পরিমাণ আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যের প্রয়োজন হয়, তাহা জমী হইতে উৎপন্ন না হইলে, ঘাটতির অংশ কোন পরিমাণের নোট অথবা মুদ্রার দ্বারা ক্রয় করা সম্ভব হয় না। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, জার্ম্মানী, ইটালী ও রুশিয়া প্রভৃতি তথাকথিত ঐশ্বর্য্যশালী দেশে এখনও যে কোন পরিমাণের মুদ্রা ও নোটের বিনিময়ে ডিম, মাখন প্রভৃতি বহুবিধ আহার্য্য জিনিষ আকাঙ্ক্ষানুরূপ পরিমাণে ক্রয় করা সম্ভব হয় না।

কাজেই, কাগজ-নির্ম্মিত নোট অথবা ধাতু-নির্ম্মিত মুদ্রার পরিমাণ দ্বারা ঐশ্বর্য্যের পরিমাপ করিবার প্রথা যে সর্ব্বতোভাবে সুসঙ্গত নহে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

একটু তলাইয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, নোট এবং ধাতু-নির্ম্মিত মুদ্রার পরিমাণ দ্বারা ঐশ্বর্য্যের পরিমাপ করিবার এই অসঙ্গত প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বলিয়াই আমরা আমাদিগকে পিতামহ ও প্রপিতামহগণের তুলনায় অধিকতর ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়া মনে করিয়া থাকি, অথচ তাঁহারা যেরূপ মানুষকে স্বাধীনভাবে খাওয়াইয়া পরাইয়া বাঁচাইয়া রাখিতে পারিতেন, আমরা এক্ষণে আর তাহাতে সক্ষম হই না।

এক্ষণে প্রশ্ন হইবে যে, নোট ও মুদ্রা যদি ঐশ্বর্য্যের সুসঙ্গত পরিমাপক না হয়, তাহা হইলে ঠিক ঠিক ভাবে ঐশ্বর্য্যের পরিমাপ করিবার পদ্ধতি কি হইতে পারে।

এই প্রশ্নের উত্তর সুসঙ্গত ভাবে প্রদান করিতে হইলে বেদ, বাইবেল ও কোরাণে অর্থনীতির যে সমস্ত কথা আছে, তাহার সূক্ষ্মতম কথাগুলি পাঠকগণকে শুনাইতে হইবে। উহা অতীব বিস্তৃত এবং দুরূহ। এই কথাগুলি জনসমাজের সকলের বুঝিবার যোগ্য নহে। কাজেই, উহার বিস্তৃত ও সূক্ষ্ম আলোচনায় আমরা এক্ষণে হস্তক্ষেপ করিব না।

মোটা কথায় জবাব দিতে হইলে বলিতে হইবে যে, যে-খাদ্য ও আহার্য্যের জন্য মানুষের নোট ও মুদ্রার প্রয়োজন হইয়া থাকে, সেই খাদ্য ও আহার্য্য মানুষের মাথা-পিছু যে-দেশে যত থাকিয়া যায়, সেই দেশকে তত ঐশ্বর্য্য-শালী বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। ইহা ছাড়া, ঐ খাদ্য ও আহার্য্য যে-দেশে যত কম চাকুরী অথবা নফরগিরি করিয়া মানুষ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হয়, সেই দেশ তত ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়া বুঝিতে হয়

ঐশ্বর্য্যের পরিমাপ করিবার উপরোক্ত পদ্ধতি যে যুক্তিসঙ্গত, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ভারতবাসিগণের নিজেদের আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য নির্ব্বাহের জন্য কত ঐশ্বর্য্যের প্রয়োজন হইতে পারে, তাহার কথা ধরিলে, ভারতবাসিগণের দারিদ্র্য যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা সত্য বটে, কিন্তু এখনও অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবাসিগণ দরিদ্র নহে। ইহারই জন্য অন্যান্য দেশের মানুষগুলিকে জীবিকার জন্য কখনও বা ভিখারীর বেশে, কখনও বা প্রতারকের বেশে, কখনও বা চোরের বেশে, কখনও বা দস্যুর বেশে জগৎ-ময় ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। আর, ভারতবাসিগণ এখনও নিজেদের দেশে বসিয়াই অর্দ্ধাশনের আহার মোটামুটিভাবে সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন।

অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, কালের আবর্ত্তনে ভারতবাসিগণের মধ্যে যাঁহারা বেতনভোগী নফর, তাঁহারাই প্রায়শঃ মন্ত্রী, ম্যাজিষ্ট্রেট ও জজ প্রভৃতিরূপে অন্যান্য ভারতবাসিগণের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া সম্মানিত হইতে পারিতেছেন বটে, কিন্তু এখনও ভারতবর্ষে নফরের সংখ্যা মোট অধিবাসীর সংখ্যার তুলনায় শতকরা ৬ জনের বেশী হইতে পারে নাই এবং ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশে প্রায়শঃ শতকরা আশী জন নফর হইয়া পড়িয়াছেন। এতদ্ অধিক বৈষম্যের কারণ, ভারতবর্ষের কৃষকগণের দারিদ্র্য উত্তরোত্তর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে বটে, কিন্তু এখনও তাঁহারা বেতনভোগী নফর হইয়া পড়েন নাই, অথচ আমেরিকা প্রভৃতি দেশের

কৃষকগণের অধিকাংশই বেতনভোগী শ্রমজীবিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছেন।

ঐশ্বর্য্যের উপরোক্ত চিত্রটীর দিকে ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিলে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর দারিদ্র্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে বটে, কিন্তু তথাপি ঐশ্বর্য্যের উন্নতি বিধান করিবার জন্ম পাশ্চাত্ত্য দেশে ভারতবাসীর অনুকরণযোগ্য কিছুই নাই। আমাদের মতে, যে নেতৃবর্গ এই সত্যটুকু না বুঝিতে পারিয়া কথায় কথায় পাশ্চাত্ত্য অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনাগুলি অনুকরণের জন্ম আমাদিগের চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে একদিকে যেরূপ অদূরদর্শী মূর্খ বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে, সেইরূপ আবার তাঁহারাই যে প্রকৃত পক্ষে তথাকথিত জ্ঞানজাত বিজয়ের (intellectual conquest) সহায়তা করিয়া দেশদ্রোহিতা করিতেছেন, তাহাও অস্বীকার করা যায় না।

অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, যে গান্ধীজী ও পণ্ডিত জওহরলালকে আমাদের দেশের বেতনভোগী নফর, বেতনাকাঙ্ক্ষী নফর-প্রবৃত্তিসম্পন্ন মানুষগুলি নেতা, মহাত্মা প্রভৃতি বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন, সেই গান্ধী-জওহরলাল কোম্পানী সময় সময় intellectual conquest-এর বিরুদ্ধে কথা কহিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহারাই পাশ্চাত্ত্য কু-শিক্ষার সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্ববৃহৎ দূত এবং জ্ঞানজাত বিজয় (intellectual conquest) অভিযানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি।

রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা ভারতবাসিগণের দারিদ্র্যের কারণ কি না

ভারতবাসিগণ জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র কি না, তাহা উপরোক্ত ভাবে বিচার করিতে পারিলে, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা ভারতবাসিগণের দারিদ্র্যের কারণ কি না, তৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ-সাধ্য হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা ভারতবাসিগণের দারিদ্র্যের কারণ কি না, ইহা স্থির করিতে হইলে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা আগে, অথবা ভারতবাসিগণের দারিদ্র্য আগে তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। যদি দেখা যায় যে, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা আরম্ভ হইবার অনেক আগেই ভারতবাসিগণের দারিদ্র্য আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা হইলে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা যে ভারতবাসিগণের দারিদ্র্যের মৌলিক কারণ নহে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা আরম্ভ হইয়াছে নবী মহম্মদ জন্মাইবার প্রায় ছয় শত বৎসর পরে, আর বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন নবী মহম্মদ জন্মাইবার প্রায় এক হাজার বৎসর আগে। বুদ্ধদেব কেন প্রচলিত ভাবধারার উপর বিরক্ত হইয়া নূতনের উদ্দেশ্যে নূতন ধরণে সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, বুদ্ধদেবের নূতন ভাবধারার প্রধান কারণ তিনটী, (১) তাৎকালিক জনসাধারণের মধ্যে উত্তরোত্তর দারিদ্র্যের বৃদ্ধি, (২) তাহাদের মধ্যে অকালবার্দ্ধক্যের বৃদ্ধি, (৩) অকালমৃত্যুর বৃদ্ধি।

ঋষিগণের অভ্যুদয়-কালে ভারতবাসিগণের আর্থিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তৎসম্বন্ধে পুরাণ হইতে কার্য্যকারণের সঙ্গতির সহিত মিলাইয়া অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতবর্ষে এমন এক দিন ছিল যখন ধনিকতার মধ্যে তারতম্য বিদ্যমান ছিল বটে, অর্থাৎ কেহ হয়ত বেশী ধনী এবং কেহ হয়ত অপেক্ষাকৃত কম ধনী ছিলেন, কিন্তু সর্ব্বস্তরের মানুষের মধ্যে দারিদ্র্য, অথবা অর্থাভাব সম্পূর্ণ ভাবে অপরিজ্ঞাত ছিল। প্রয়োজনীয় আহার্য্য অথবা ব্যবহার্য্যের জন্ম কথঞ্চিৎ পরিমাণেও অভাবগ্রস্ত এমন একজন মানুষও সমগ্র সমাজের মধ্যে কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হইত না। মানুষ আজকাল যে অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, তাহাতে ঐরূপ অর্থাভাব-শূন্যতা যে কখনও মনুষ্য-সমাজে বিদ্যমান থাকিতে পারে, ইহা সহসা বিশ্বাস করিতে সাহস হয় না। কিন্তু, এখনও ঋষি-প্রণীত যে কোন অর্থনীতির পুস্তকে এবং সংহিতাসমূহে যথাযথ ভাবে প্রবেশ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, যাহাতে সমাজের প্রত্যেকে যুগপৎ আর্থিক অভাবগ্রস্ততা, দৈহিক অসুস্থতা, মানসিক

অশান্তিগ্রস্ততা এবং বুদ্ধির বিপর্যয়গ্রস্ততা হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহার পরিকল্পনা ঋষিগণ স্থির করিতে পারিয়াছিলেন এবং ঐ পরিকল্পনা যাহাতে অনায়াসে সমাজের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থাও তাঁহারা করিয়াছিলেন। ঋষি-প্রণীত অর্থনীতি ও সংহিতায় যথাযথভাবে প্রবিষ্ট হইয়া প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্ত্য ভাবুকগণের অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রীয় দর্শনের পাতাসমূহ উল্টাইলে দেখা যাইবে যে, দারিদ্র্য সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার জন্ম ঋষিগণের পরিকল্পনার মত একটি পরিকল্পনাও প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্ত্যগণের মস্তিষ্কে স্থান পায় নাই। পরন্তু, উহার প্রত্যেকটি অসঙ্গতি ও পরস্পরবিরোধিতায় পরিপূর্ণ এবং সাধারণ মানুষের অবজ্ঞার যোগ্য।

ইতিহাসের এই অংশ দেখিলে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা আরম্ভ হইবার অনেক আগেই যে ভারতবাসিগণের মধ্যে দারিদ্র্য প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য, তাৎকালিক দারিদ্র্য হয়ত এখনকার মত সর্ব্বগ্রাসী ভীষণতম মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে নাই। কিন্তু, তখনও যে ভারতবাসিগণের মধ্যে দারিদ্র্য দেখা দিয়াছিল এবং ঐ দারিদ্র্য যে সমাজের কোন কোন মানুষের পক্ষে দুর্ব্বিষহ হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

এখানে হয়ত প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা যদি ভারতবাসিগণের দারিদ্র্যের কারণ না হয়, তাহা হইলে কোন্ কারণে, যে-ভারতবর্ষে একদিন দারিদ্র্য অপরিজ্ঞাত ছিল, সেই ভারতবর্ষে এতাদৃশভাবে উহা অধিষ্ঠান লাভ করিতে পারিয়াছে।

এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, উহার প্রধান কারণ দুইটী, যথা:- (১) কাল; (২) যাঁহারা পণ্ডিত নামে প্রচলিত, তাঁহাদের দাম্ভিকতা এবং মূর্খতা বশতঃ ভারতীয় ঋষিগণের প্রকৃত শাস্ত্রের (অর্থাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানের) বিলুপ্তি।

জাতীয় সমৃদ্ধির প্রকৃত মূল কোথায়, তাহার গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, প্রধানতঃ জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি এবং দ্রব্যমূল্যের সমতার সমাধান লইয়া জাতীয় আর্থিক সমৃদ্ধির তারতম্য ঘটিয়া থাকে। এই জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির তারতম্য ও দ্রব্যমূল্যের সমতা সমাধানের তারতম্যের উপর কৃষিকার্য্যের উন্নতির তারতম্য প্রতিষ্ঠিত। যখন কোন দেশের কৃষিকার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি লাভ করে, তখন আপনা হইতেই ঐ দেশের শিল্প এবং বাণিজ্যও সমতুল্য পরিমাণে সমুন্নত হইয়া থাকে। কোন কোন পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকগণের বিশ্বাস যে, কৃষিকার্য্যে উন্নতি লাভ না করিয়াও শিল্প ও বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করা সম্ভব। আমাদের মতে, এই বৈজ্ঞানিকগণ বৈজ্ঞানিক নামের কলঙ্ক এবং তাঁহাদের অদূরদর্শিতার ফলেই পাশ্চাত্ত্য জাতিগণ যুদ্ধ-বিগ্রহ লইয়া এতাদৃশভাবে হাবুডুবু খাইতেছেন।

জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির তারতম্যই যে আর্থিক সমৃদ্ধির তারতম্যের অন্যতম প্রধান কারণ, ইহা বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, কালের, অর্থাৎ পৃথিবীর ও সূর্য্যের মধ্যস্থিত ব্যবধানের এবং ঐ দুইটী গ্রহের পরস্পরের অবস্থানের তারতম্যানুসারে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির তারতম্য ঘটিয়া থাকে। এই সম্বন্ধে গভীর ভাবে গবেষণা করিলে দেখা যাইবে যে, যখন পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যস্থ ব্যবধান সর্ব্বাপেক্ষা অল্প হয় এবং দুইটী গ্রহ সর্ব্বতোভাবে সমগুরাণে অবস্থান করে, তখন জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরা-শক্তি আপনা হইতেই সর্ব্বোৎকৃষ্টতা লাভ করে। কিন্তু, যখন ঐ দুইটি গ্রহের ব্যবধান অপেক্ষাকৃত অধিক হয় এবং অবস্থানের ভাবান্তর ঘটে, তখন জমীর উর্ব্বরাশক্তিও আপনা হইতেই কমিতে থাকে। যখন এইরূপ ভাবে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি আপনা হইতেই কমিতে থাকে, তখন কি করিলে উহা বিপজ্জনক ভাবে না কমিতে পারে, তাহার মূলসূত্র ঋষিগণ তাঁহাদিগের বেদাঙ্গে ও বেদে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বেদ ও বেদাঙ্গের উপরোক্ত কথাগুলি পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে কোন অবস্থাতেই জমীর স্বাভাবিক-উর্ব্বরাশক্তি বিপজ্জনক ভাবে কমিতে পারে না। অন্যপক্ষে, যখন জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি উত্তরোত্তর কমিয়া গিয়া মানুষের দারিদ্র্য বিপজ্জনক ভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখন বুঝিতে হয় যে, পণ্ডিতগণ বেদ ও বেদাঙ্গের উপরোক্ত কথাগুলি বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। কাযেই, ভারতবাসিগণের বর্ত্তমান দারিদ্র্যের মৌলিক দায়িত্ব যে পণ্ডিতগণের স্কন্ধে ন্যস্ত করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত ভাবে অস্বীকার করা যায় না।

স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইলেই ভারতবাসিগণের দারিদ্র্য দূরীভূত হইবে কি না

স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইলেই ভারতবাসিগণের দারিদ্র্য দূরীভূত হইবে কি না, তৎসম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে স্বাধীনতার সংজ্ঞা কি, তাহা পরিজ্ঞাত হইবার প্রয়োজন হয়। স্বাধীনতার সংজ্ঞা লইয়া যে অনেক বিভিন্ন রকমের মতবাদ প্রচলিত আছে এবং শব্দ-বিজ্ঞানানুযায়ী স্বাধীনতার সংজ্ঞা যে বর্ত্তমানে বিলুপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহা আমরা পাঠকবর্গকে একাধিকবার জানাইয়াছি। বর্ত্তমান সন্দর্ভে, ইংরাজদিগকে বিতাড়িত করিয়া ভারতবাসিগণের দ্বারা ভারতবাসিগণের হিতার্থে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট-পরিচালনাকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বলিয়া আখ্যাত করিব।

স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইলেই ভারতবাসিগণের দারিদ্র্য দূরীভূত হইবে কি না, তৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার অন্যতম উপায়, যে-সমস্ত দেশে স্বাধীনতা বিদ্যমান আছে, সেই সমস্ত দেশের মানুষ দারিদ্র্য হইতে মুক্ত কি না, তাহার অনুসন্ধান করা। যদি দেখা যায় যে, যে-সমস্ত দেশ স্বাধীন, সেই সমস্ত দেশের প্রত্যেকটি দারিদ্র্য হইতে মুক্ত, তাহা হইলে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা হইলে যে, জনসাধারণের দারিদ্র্য দূরীভূত হইতে পারে, তাহা কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। আর যদি দেখা যায় যে, যে সমস্ত দেশ স্বাধীন, তাহার কোন কোনটী দারিদ্র্য হইতে মুক্ত এবং কোন কোনটী দারিদ্র্যগ্রস্ত, তাহা হইলে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিলেই যে দারিদ্র্য দূরীভূত হয়, তাহা বলা চলে না বটে, কিন্তু উহা লাভ করিতে পারিলে যে, দারিদ্র্য দূরীভূত হইবার সম্ভাবনা থাকে তাহা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু, যদি দেখা যায় যে, যে-সমস্ত দেশ স্বাধীন তাহার কোনটীই দারিদ্র্য হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত নহে, তাহা হইলে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিলেও যে দারিদ্র্য দূরীভূত না-ও হইতে পারে, তাহা অস্বীকার করা চলে না।

যে-সমস্ত দেশে স্বাধীনতা বিদ্যমান আছে, সেই সমস্ত দেশের মানুষ দারিদ্র্য হইতে মুক্ত কি না তাহার অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমান কালে জগতে এমন একটী দেশও নাই, যে দেশের মানুষ আর্থিক দারিদ্র্য হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হইয়া অবশ্য-প্রয়োজনীয় আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য সম্বন্ধে প্রাচুর্য্য উপভোগ করিতে পারিতেছে।

এই সমস্ত দেশের অবস্থা যথাযথভাবে পর্য্যালোচনা করিতে পারিলে এমন কথা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গতভাবে বলা চলে না যে, "স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইলেই ভারতবাসিগণের দারিদ্র্য দূরীভূত হইবে।"

কাজেই, যে-সমস্ত নেতৃবর্গ ইহার বিরুদ্ধ মতবাদ প্রচার করিয়া থাকেন, তাঁহারা গান্ধীজীই হউন, আর জওহরলালজীই হউন, আর সুভাষচন্দ্রজীই হউন, ইঁহারা যে অর্থ-বিজ্ঞান ও রাষ্ট্র-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অদূরদর্শী, তাহা অস্বীকার করা চলে না।

আমরা একাধিক বার দেখাইয়াছি যে, একদিকে যেরূপ শুধু স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইলেই জনসাধারণের দারিদ্র্য দূরীভূত হওয়া সম্ভবযোগ্য হইবে না, অন্যদিকে আবার যতদিন পর্য্যন্ত স্বাধীনতার উদ্দীপনা চলিতে থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত ইংরাজদিগকে বিতাড়িত করিয়া কেবল মাত্র ভারতবাসিগণের দ্বারা ভারতবাসিগণের হিতার্থে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট পরিচালনা করা সম্ভবযোগ্য হইবে না।

ভারতবর্ষ বর্ত্তমান সময়ে যে অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, তাহাতে প্রকৃত ভারত-হিতৈষিগণের মনের একতা সাধিত না হইলে কোন ক্রমেই স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভবযোগ্য হইবে না এবং যতদিন পর্য্যন্ত স্বাধীনতার হৈ চৈ চলিতে থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত ভারতহিতৈষিগণের মনের একতা প্রতিষ্ঠিত হইবে না। আমরা কেন একথা বলিতেছি, তাহা বুঝাইতে হইলে অনেক কথা বলিতে হইবে। স্থানাভাব বশতঃ আমরা ঐ কথার আলোচনা এখানে আর করিব না। আমাদের কথার সত্যতা ভবিষ্যৎ প্রমাণিত করিবে।

আমরা নেতৃবর্গকে এখনও সর্ব্বনাশী স্বাধীনতার উদ্দীপনা পরিত্যাগ করিয়া দূরদর্শী হইতে অনুরোধ করি।

মিঃ ডেনের অস্থায়ী ভাবে উড়িষ্যার লাটগিরী এবং মন্ত্রিসভার পদত্যাগের হুমকি

যিনি এক দিন মন্ত্রিমণ্ডলের আজ্ঞাধীনে কার্য্য করিতে ছিলেন, সেই মিঃ ডেনকে অস্থায়ী ভাবে গবর্ণরের পদে নিযুক্ত করায় উড়িষ্যার মন্ত্রিমণ্ডল যে পদত্যাগ করিবার হুমকি দেখাইয়াছিলেন এবং তাহার ফলে প্রকারান্তরে ঐ নিয়োগ যে নাকচ হইয়া গিয়াছে, তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন। দেশের হোমড়া-চোমড়া অনেকেই ইহাতে আনন্দ লাভ করিয়াছেন বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। আমরা কিন্তু ইহাতে সম্পূর্ণভাবে আনন্দ লাভ করিতে পারি নাই।

সাদাসিদে ভাবে দেখিলে, ভারতবাসিগণকে যে স্বায়ত্ত-শাসনের অনেকখানি দেওয়া হইয়াছে, তাহা মিঃ ডেনের অস্থায়ী নিয়োগ নাকচের দ্বারা প্রমাণিত হয় এবং দেশের দারিদ্র্য দূর করিবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গান্ধী-জওহরলাল-কোম্পানীপরিচালিত কংগ্রেসের উপর ন্যস্ত হয়। আমাদের আশঙ্কা হয়, ইংরাজ বন্ধুগণের এতাদৃশ ধৈর্য্য-সংরক্ষণের দ্বারা ভারতবর্ষের বর্ত্তমান নেতৃবর্গ যে কোন জনহিতকর সংগঠন-কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, তাহা অদূরভবিষ্যতে চূড়ান্ত ভাবে স প্রমাণিত হইবে। এতটুকু বুঝিবার দূরদর্শিতা কি ঐ আপনভোলা নেতৃবর্গের নিকট হইতে ভারতবাসী জনসাধারণ প্রত্যাশা করিতে পারে না? এতাদৃশ নেতৃবর্গই যে ভারতবাসীর কলঙ্কের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত, তাহা জনসাধারণকে আমরা এখনও বুঝিতে অনুরোধ করি।

পল্লী-স্মৃতি

—শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার

বুড়ো বটগাছ

বহুদিন পরে এসেছি আবার পল্লীর বুকে ফিরে,
অতীতের সুখ স্বপন ছবি যে নাচিছে আমারে ঘিরে;
আজো 'আফড়ার বুড়ো বটগাছ' তেমনি ছড়ায়ে শাখা,
অতীত দিনের সাক্ষী হইয়া হৃদয়ে রয়েছে আঁকা,
নদীর পারের অশথের তলে বসিত গ্রামের মেলা,
চলিত নদীর কালো জলে কত নৌকা বাইচ খেলা।
কেহ বা নৌকা এনেছে সাজায়ে সাফ্‌লার মালা গড়ি',
কেহ বা গাহিত সারি, জারি গান নানা সুর ধরি';
কেহ বা 'নায়ের' গলুয়ের পরে—লাঠি হাতে—হাত নাড়ি,
'আগ্ দোহারেতে' ধরিত 'গাহান' দোলায়ে বাবুড়ি দাড়ি,
কেহ বা নৌকা আনিত সাজায়ে—কাগজের ফুল দিয়ে,
ধীরে ধীরে গান গাহিয়া ঘুরিত, ঘাটে ঘাটে 'নাও' নিয়ে।
'মোল্লা-বাড়ীর'—বাইচের নাও - গিয়াছে সবার আগে,
সে দিনের ছবি হাসি উৎসব আজিও হৃদয়ে জাগে।

চড়কখোলা

নদীর ওপারে 'চড়ক খোলার' আজিও চিহ্ন আছে,
সে যে কত ছবি আঁকিয়া আঁকিয়া আজিও হৃদয়ে নাচে।
ছোট বড় কত 'পাট-ঠাকুরের' পূজা হলে অবসান;
চড়কের তলে 'সন্নাসী' কত গাহিত 'বোলান' গান,
কেহ বা উঠিত চড়কের গাছে মাজায় বাঁধিয়ে দড়ি;
কার পিঠে দিত বড়শি বিঁধায়ে—মোড়ল মন্ত্র পড়ি;
বড়শি খুলিয়া সন্ন্যাসীকে নামায়ে আনিত নীচে,
তাহাকে দেখিতে গ্রামের লোকের আনন্দ হ'ত কি যে!
'মূল-সন্ন্যাসী' মন্ত্র পড়িয়া রক্ত বন্ধ করি'
উঠায়ে তাহারে বসাইয়া দিত হাত দু'টি তার ধরি',
শুধন সকলে বলিত, মোড়ল তন্ত্র-মন্ত্র জানে,
প্রতি রাতে নাকি চালান করিয়া ভূত-প্রেত ডেকে আনে।
এমনি গল্প-গুজবে, গর্ব্বে মেলাটি উঠিত ভরি',
কেটে যেত সুখে দুই এক মাস মেলার গল্প করি'।

লিখন-পঠনক্ষম বাঙ্গালীর সংখ্যা

—শ্রীসুশীল রায়

আমাদের দেশের অধিবাসীর মধ্যে শতকরা মাত্র পাঁচ জন না কি লিখন-পঠনক্ষম ; বাকী ৯৫ জন নিরক্ষর, এইরূপ জনরব আমরা শুনিয়া থাকি। সেন্সাসে হিসাব হইতে আদৌ অনুরূপ ধারণা হইবে না। সেন্সাসের লিখন-পঠনক্ষম কেবল তাহাদিগকেই বলা হইয়াছে, যাহারা কোন বন্ধুর নিকট নিজে চিঠি লিখিতে পারে এবং সেই চিঠির জবাব পড়িতে পারে নিজেই। ইহারা কিন্তু ইংরাজি লিখিতে ও পড়িতে পারে না, নিজ ভাষার সঙ্গেই কেবল ইহাদের পরিচয় আছে। এখনে বাজলার বিভিন্ন জিলার অধিবাসীর মধ্যে লিখন-পঠনক্ষম জন-সংখ্যা সমগ্রভাবে কত, প্রথমে তাহাই দেখান হইয়াছে। তাহার পর হিন্দু ও মুসলমান, এই দুই সম্প্রদায়ের লিখন-পঠনক্ষম জন-সংখ্যার হিসাব দেওয়া হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী-জানা জন-সংখ্যার হিসাব দেওয়া হইল।

প্রথমে সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে মিলিতভাবে জনসংখ্যা কোন্ জিলায় কত এবং তাহার মধ্যে লিখন-পঠনক্ষম কতজন, পাশাপাশি তাহাই দেখান হইতেছে। ইহাতে সমগ্র জন-সংখ্যার সঙ্গে লিখন-পঠনক্ষম জনসংখ্যার তুলনা করা পাঠকবর্গের সহজ হইবে। হাজারের হিসাবে সংখ্যাগুলি বসান হইতেছে। হাজারের হিসাবে বসাইতে, ভাঙ্গা-সংখ্যা পুরা-সংখ্যায় আনিলে সামান্য হের-ফের অবশ্যই হইবে। ভাঙ্গা হাজারকে নিকটতম হাজারে আনিয়া হিসাব দেওয়া হইল।

(ক) সমগ্র জন-সংখ্যার হিসাব—

জিঃ নাম	জিঃ জনসংখ্যা (হাজার)	জিঃ লিখনপঠনক্ষম জনসংখ্যা (হাজার)	জিঃ ইং-জানা (হাজার)
১। বর্দ্ধমান	১৫৭৬	১৬৯	৪০
২। বীরভূম	৯৪৮	৬৩	১১
৩। বাঁকুড়া	১১১২	৯৫	১৪
৪। মেদিনীপুর	২৭৯৯	৪২৫	৪৩
৫। হুগলী	১১১৩	১৫৬	৪২
৬। হাওড়া	১০৯৯	১৯৮	৪৬
৭। ২৪ পরগণা	২৭১৪	২৯৭	৬২
৮। নদীয়া	১৫৪০	৯০	২৩
৯। মুর্শিদাবাদ	১৩৭১	৭২	১৮
১০। যশোহর	১৬৭১	১১১	২৩
১১। খুলনা	১৬২৬	১৩৭	৩০
১২। রাজসাহী	১৪২৯	৯৪	১৬
১৩। দিনাজপুর	১৭৫৫	১০৯	১৩
১৪। জলপাইগুড়ি	৯৮৩	৪৭	৯
১৫। দার্জ্জিলিং	৩২০	৩৪	৭
১৬। রংপুর	২৫৯৫	১৪৯	২৩
১৭। বগুড়া	১০৮৬	১০১	১৭
১৮। পাবনা	১৪৪৬	৮৫	২৪
১৯। মালদহ	১০৫৪	৬৩	৬
২০। ঢাকা	৩৪৩০	৩০৯	৮০
২১। ময়মনসিংহ	৫১৩০	৩২৮	৭৮
২২। ফরিদপুর	২৩৭২	১৮০	৪১
২৩। বাখরগঞ্জ	২৯১৩	৩১২	৫৩
২৪। চট্টগ্রাম	১৭৯৭	১৫৫	৩১
২৫। ত্রিপুরা	৩১১০	২৩৮	৪৪
২৬। নোয়াখালি	১৭০৭	১৮৩	২৬
৩৭। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম*	২১৩	৯	১

জন-সংখ্যা-স্তম্ভ হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি, ময়মনসিং-এ লোক-সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক (৫১৩০ হাজার জন) ; এবং সর্ব্বনিম্ন হইতেছে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে (২১৩ হাজার জন), কিন্তু লিখন-পঠনক্ষম জন-সংখ্যা সবার চেয়ে বেশী মেদিনীপুরে, ৪২৫ হাজার জন। ইংরাজি জানা লোক-সংখ্যা ঢাকায় সবার অধিক, ৮০ হাজার জন ; এবং সবার চেয়ে কম পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে, মাত্র ১ হাজার জন। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের লিখন-পঠনক্ষম জন-সংখ্যাও অন্যান্য জিলার মধ্যে সবার চেয়ে কম, ৯ হাজার জন। এই স্থানের লোক-সংখ্যাও সকলের চেয়ে অল্প। লোক-সংখ্যার অনুপাতে কোন্ জিলায় লিখন-পঠনক্ষম ও ইংরাজী-জানা জন-সংখ্যা সকলের চেয়ে বেশী কিংবা সর্ব্বনিম্ন, তাহার হিসাব এই তালিকা হইতেই করা যায়। এখানে কেবল সংখ্যার উচ্চতাকেই প্রথম স্থান দিয়া বুঝানো হইয়াছে। উপরে সমগ্র জন-সংখ্যার হিসাব একত্রে দেখানো হইল, এ বার সেই জনসংখ্যাকে মোটামুটী দুইভাগে (হিন্দু-মুসলমান) ভাগ করিয়া তাহাদের মধ্যে লিখন-পঠন-ক্ষম ও ইংরাজি-জানা জন-সংখ্যা কত জন, তাহা দেখানো হইবে।

(খ) লিখন-পঠনক্ষম হিন্দু জন-সংখ্যার হিসাব—

জিঃ নাম	জিঃ হিন্দু জন-সংখ্যা (হাজার)	জিঃ হিন্দু লিখনপঠন-ক্ষম সংখ্যা (হাজার)	ইং-জানা (হাজার)
১। বর্দ্ধমান	১২৩৯	১৩৯	৩৬
২। বীরভূম	৬৩৬	৫১	৯
৩। বাঁকুড়া	১০১২	৯০	১৩
৪। মেদিনীপুর	২৫৯৩	৩৯৮	৩৮
৫।	৯২৪	১৩২	৩৮
৬।	৮৬০	১৬৭	৪৭
৭। ২৪ পরগণা	১৭৫২	২২৫	৪০
৮। নদীয়া	৫৭৪	৬৪	১৮
৯। মুর্শিদাবাদ	৫৯০	৫০	১৪
১০। যশোহর	৬১৪	৭২	১৭
১১। খুলনা	৮১৭	৯১	২৩
১২। রাজসাহী	৩২৬	৩৬	৯
১৩। দিনাজপুর	৭৯৪	৪৩	৮
১৪। জলপাইগুড়ি	৬৬৪	২৮	৬
১৫। দার্জ্জিলিং	২০৭	৭৪	৩
১৬। রংপুর	৭৪৭	৬৩	১৩
১৭। বগুড়া	১৭৮	২৩	৬

১৮। পাবনা	৩৩২	৪৫	১৫
১৯। মালদহ	৪৪৪	১৯	৪
২০। ঢাকা	১১২৫	১৭৪	৫০
২১। ময়মনসিং	১১৭৪	১৪২	৩৫
২২। ফরিদপুর	৮৪৭	১১২	২৬
২৩। বাখরগঞ্জ	৮১৩	২০০	৩৭
২৪। চট্টগ্রাম	৩৯২	৬৬	১৭
২৫। ত্রিপুরা	৭৭১	১৫০	২০
২৬। নোয়াখালি	৩৬৬	৬৫	১২
২৭। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	৩৭	৩	১

বঙ্গদেশের জিলাসমূহের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা মেদিনীপুরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, ২৪৯৩ হাজার জন। পূর্ব্ব-বঙ্গ এবং উত্তর-বঙ্গের লোক-সংখ্যার মধ্যে মুসলমানেরা সংখ্যা-গরিষ্ঠ, কিন্তু মেদিনীপুরে তাহা নহে। হিন্দু-অধিবাসীর সংখ্যার দিক্ হইতে মেদিনীপুরের পরের স্থান অধিকার করিতেছে ২৪ পরগণা জিলা, ১৭৫২ হাজার জন। লিখনপঠনক্ষম হিন্দুর সংখ্যাও আমরা উপরের ফিরিস্তি হইতে দেখিতে পাইতেছি, মেদিনীপুরে সকলের চেয়ে বেশী, ৩৯৮ হাজার জন। সবার চেয়ে কম পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে, মাত্র ৩ হাজার জন, পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যাও বেশী নহে, ৩৭ হাজার। ঢাকা জিলার ১১২৫ হাজার জন হিন্দু-অধিবাসীদের মধ্যে ১৭৪ হাজার জন, লিখন-পঠনক্ষম, বাদ বাকী সকলেই নিরক্ষর। সে সংখ্যাও (১১২৫-১৭৪=৯৫১) নিতান্ত কম নহে। ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি এবং শিক্ষার সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও এই জিলার লিখন-পঠনক্ষম জন-সংখ্যার এত অল্পতার কারণ বুঝা যায় না। ইংরাজি-জানা হিন্দু লোক-সংখ্যা ঢাকাতেই সবার চেয়ে বেশী, ৫০ হাজার জন। মেদিনীপুর এই দিক্ হইতে অনেকটা পিছনে পড়িয়া আছে, দেখা যাইতেছে। তাহার লিখনপঠনক্ষম জন-সংখ্যার তুলনায় যত জন লোক (৩৮ হাজার) ইংরাজি জানে তাহার পরিমাণ সামান্য। ২৪ পরগণার ইংরাজি জানা জন-সংখ্যার আধিক্যের কারণ হইতেছে, কলিকাতা মহানগরীর উপকণ্ঠেই ইহার স্থিতি। অতঃপর মুসলমান জন-সংখ্যার হিসাব দেওয়া হইতেছে।

(গ) লিখন-পঠনক্ষম মুসলমান জন-সংখ্যার হিসাব—

জিঃ নাম	জিঃ মুসলমান জনসংখ্যা (হাজার)	জিঃ মুসলমান শিক্ষিত সংখ্যা (হাজার)	ইং জানা (হাজার)
বর্দ্ধমান	২৯২	২৬	
	২৫৩	১৯	
বাঁকুড়া	৫৬	৪	
মেদিনীপুর	২১২	৫২	
হুগলী	১৮০	২৪	
হাওড়া	২০৪	২৮	
২৪ পরগণা	৯১৩	৬৬	
৮। নদীয়া	৯৪৫	২৫	
৯। মুর্শিদাবাদ	৭৬২	৫১	৬
১০। যশোহর	১০৩৫	৩৯	৫
১১। খুলনা	৮০৫	[illegible]	৭
১২। রাজসাহী	১০৮৩	৫৮	৭
১৩। দিনাজপুর	৮৮৭	৩৫	৫
১৪। জলপাইগুড়ি	২৩৬	১৭	২
১৫। দার্জ্জিলিং	৮	১	†
১৬। রংপুর	১৮৩৭	৮৪	১০
১৭। বগুড়া	৯০৯	৭৭	১১
১৮। পাবনা	১১১২	৪০	৯
১৯। মালদহ	৫৭২	১৪	২
২০। ঢাকা	২,৯৯৩	১৩৩	২৯
২১। ময়মনসিং	৩৯২৮	১৮১	৪২
২২। ফরিদপুর	১৫০৭	৬৭	১৪
২৩। বাখরগঞ্জ	২১০৫	১৪৫	১৫
২৪। চট্টগ্রাম	১৩২৬	৮০	১১
২৫। ত্রিপুরা	২৩৫৭	৮৮	২১
২৬। নোয়াখালি	১৩৩৯	১১৭	১৩
২৭। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	*	*	*

বঙ্গদেশের জিলাসমূহের মধ্যে ময়মনসিং মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, ৩৯১৮ হাজার জন, তাহার পরেই ত্রিপুরা ২৩৫৭ হাজার জন; সর্ব্বাপেক্ষা কম দার্জ্জিলিঙে, ৮ হাজার জন। কিন্তু লিখন-পঠনক্ষম মুসলমানের সংখ্যা বাখরগঞ্জ জিলায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশি, ১৪৫ হাজার এবং সর্ব্বাপেক্ষা কম দার্জ্জিলিঙে, মাত্র ১ হাজার জন - দার্জ্জিলিঙের মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যাও অবশ্য সামান্য। পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে হয়ত মুসলমান অধিবাসী নাই, কারণ, তাহার উল্লেখ সরকারী দপ্তরে পাওয়া যায় নাই। ইংরাজি-জানা মুসলমান ময়মনসিং জিলাতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, ৪২ হাজার জন এবং সর্ব্বাপেক্ষা কম দার্জ্জিলিঙ ও বাঁকুড়ায় ('†' চিহ্ন 'সামান্য' বুঝান হইয়াছে)। বাখরগঞ্জের লিখন-পঠনক্ষম মুসলমানের অনুপাতে ইংরাজী-জানা মুসলমান অতীব সামান্য, ১৫ হাজার জন। ঢাকার মুসলমান লিখন-পঠনক্ষম জন-সংখ্যা বাখরগঞ্জের পরেই, ১৩৩ হাজার; বাখরগঞ্জের তুলনায় ঢাকায় ইংরাজি-জানা মুসলমান সংখ্যা অনেক বেশি, ২৯ হাজার জন।

প্রবন্ধে সমস্ত জিলার ফিরিস্তি দিয়া প্রায় বিশিষ্ট কয়েকটি জিলার আলোচনা করা হইল। যে সব জিলা সংখ্যাধিক্য-হেতু বিশিষ্টতা অর্জ্জন করিয়াছে, তাহাদেরও বিষয় লেখা হইল। আবার অনেক উল্লেখযোগ্য জিলার সংখ্যাল্পতার জন্য কোন উল্লেখ করা হইল না; পাঠকবর্গ ফিরিস্তি হইতে সমস্ত জিলার পরিচয় পাইবেন।

* এখানে হয়ত মুসলমান নাই; কারণ কোন সংখ্যা পাওয়া যায় না।

† সামান্য।

দিশাহারা গড্ডলিকা



...আমার আত্মবিশ্বাস শিথিল হইয়া যাইতেছে··· বাক্যে শক্তি ছিল, এখন আর সেই শক্তি নাই।······বাহিরের কারণে এই বিশ্বাস নষ্ট হয় নাই, ভিতর হইতেই এই প্রকার হইয়াছে।···আমি আত্মবিশ্বাস হারাইয়াছি···।

'উরোপে শীত-বিহার

—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

এ বৎসর ইউরোপের সর্ব্বত্র এত বরফপাত হইয়াছে যে, গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে না কি সেরূপ হয় নাই। আগের যে কয়টা শীত এখানে কাটিয়াছে, তাহাতে সহরে ও সহরের বাহিরে বরফপাত দেখিয়াছি, সহরের আশে পাশে স্কেটিং-এর ভীড় হইয়াছে, নদী ও হ্রদ জমিয়া গিয়াছে। গত বৎসর শীতের সময় ট্রেন হইতে দেখিলাম বরফে আবৃত দেশের মূর্ত্তি! এই সেদিনও হঠাৎ বার্লিন ও হাম্বুর্গে যাইতে হইল, ফিরিবার সময় সারাটা পথ অজস্র বরফ পড়িল, ট্রেনের উপরে, গায়ে ও নীচে স্তূপীকৃত বরফ জমিল। এখানে আসিয়া অবধি প্রতি শীতেই উইণ্টার স্পোর্টসের আহ্বান পাইয়াছি, কাজের তাড়া ও শারীরিক অক্ষমতার দরুণ কিন্তু তাহাতে যোগদান করা হইয়া উঠে নাই। স্কেটিং, স্কিইং প্রভৃতি শীত-ক্রীড়ায় সোৎসাহে ব্যাপৃত না থাকিলে বাহিরে বরফ দেখার যে আনন্দ, তাহা শীতের প্রকোপে শীঘ্রই শীতল হইয়া যায়। ঘরে বসিয়া বরফ-পাত দেখাই বেশী স্বস্তিজনক। শীত-নিবারণের জন্য এ দেশে ঘরে ডবল কাচের জানালা থাকে, দুই জানালার মাঝখানে শূন্যস্থানে একটা পরদা ঝুলে, আর ঘরের মধ্যে জানালার উপর একটা মোটা গরম পরদা থাকে। এ সবের উদ্দেশ্য বাহিরের ঠাণ্ডা ভিতরে আসা ও ভিতরের গরম বাহির হইয়া যাওয়া নিবারণ। যখন বাহিরে ক্রমাগত পেঁজা তুলার মত রাশি রাশি বরফ পড়িতে থাকে, তখন উত্তপ্ত ঘরে পরদা তুলিয়া দিয়া শ্লীপিং সুট ও ড্রেসিং গাউনে সোফায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় পাশের টেবিলে একটা বড় কাফির পাত্র লইয়া জানালার বাহিরে তুষারলীলায় বিশ্বসৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে, সে দৃশ্য দেখার বড় আনন্দ।

ইউরোপ-প্রবাস শেষ হইয়া আসিতেছে, বোধ হয় এই-টাই এ দেশের শেষ শীত। তাই ভাবিলাম, দেখাই যা'ক একবার পাহাড়ে বরফের মধ্যে শীত-বিলাসটা কেমন লাগে। শীতকালে শনি, রবি ও ছুটির দিনে এখানে "স্পোর্টস্ স্পেশাল" নামক অনেকগুলা ট্রেন সহর হইতে পাহাড়ের দিকে যায়। যাতায়াতের ভাড়া অর্দ্ধমূল্যে হয়। স্কিইং-এর সরঞ্জাম অর্থাৎ স্কি, হাতের দুটা লাঠি, বিশিষ্ট জুতা, বিশিষ্ট পাৎলুন ও কোর্ত্তা, পিঠে ঝুলাইবার রুক্স্যাক প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া Y. M. C. A.-র (এখানে লোকে এই আদ্যাক্ষর গুলাকে একত্র বসাইয়া "ইমকা" উচ্চারণ করে) একটি দলের সঙ্গে বৈকালে ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। ষ্টেশন ও প্লাটফর্ম্মের চেহারা দেখিয়া মনে হয়, মিলিটারী ট্রান্সপোর্ট হইতেছে, ভারি বুট ও অদ্ভুত পরিচ্ছদ পরিধানে, কাঁধে বন্দুকের মত স্কি, হাতে সঙ্গিনের মত লাঠিধারী লোকের এত ভীড়। খুব লম্বা স্পেশাল, বহু লোক চলিয়াছে স্কিইং করিতে, সকলেই তরুণ



স্কি-উল্লম্ফন।

ও যুবক, বান্ধবীসহায় হইয়াছেন অবশ্যই অধিকাংশ। যাত্রাস্থান আমাদের প্রাহা হইতে উত্তরে জার্ম্মান-সীমান্তের কাছে দৈত্য পর্ব্বত (Giant Mountains, জার্ম্মান নাম Riesengebirge রীজেনগেবির্গে)। স্পোর্টস স্পেশালের গতি এক্সপ্রেস ট্রেনের মত; তিন ঘণ্টার উপর চলিয়া সন্ধ্যার মুখে পাহাড়ের কাছাকাছি পৌছিয়া ট্রেন ত্যাগ করিলাম।

তারপর বাসে করিয়া পাহাড়ের গা বাহিয়া উঠিতে হইবে ঘণ্টাদুয়েক। বাসের ছাদে স্কিগুলি বোঝাই হইল। এত বরফপাত হইয়াছে যে বাস আস্তে আস্তে চলিয়াছে, মধ্যে

মধ্যে এক জায়গায় প্রায় আটকাইয়া যাইবার মত হইল। লোকজন নামিয়া পড়িয়া ভার কমাইলে চাকা বরফ হইতে উদ্ধার হইল। শেষটা এক জায়গায় আর চলিল না, একটু পিছাইয়া ইঞ্জিনে পুরাদম লাগাইয়া আগাইবার চেষ্টা করা হইল, খানিকক্ষণ এইরূপ 'হেঁইয়ো, হেঁইয়ো' ভাবে সামনে-পিছনে টাল খাইয়া ড্রাইভার ইঞ্জিন বন্ধ করিয়া জানাইল, গাড়ী আর আগাইতে পারিবে না। ভাড়ার এক-তৃতীয়াংশ ফেরত পাওয়া গেল। দলের লোকে স্কি পরিয়া লইয়া পাহাড়ে পথে



প্রাহার জমাট নদীর উপর আইস্-হকি।

অগ্রসর হইলেন; আমি অনভিজ্ঞতা বশতঃ স্কি পরিয়া চলিতে ভরসা করিলাম না, স্কি ঘাড়ে করিয়া চলিলাম। শুনিলাম, অন্ততঃ দু'ঘণ্টা চলিয়া পাহাড়ের উপর আমাদের হোটেলটিতে পৌঁছান যাইবে।

খানিক পথ চলিবার পর পিছন হইতে একটি ঘোড়ায় টানা স্লেজ উপস্থিত হইল, জনকয়েক লোক তাহাতে যাত্রী হইয়াছে। আমাদের হোটেল পর্য্যন্ত ভাড়া বলিল, জনপিছু ৩৲ টাকা লাগিবে। সঙ্গীরা বলিলেন, ইহা অত্যধিক, তাই আবার হাঁটিয়াই চলিলাম। আরও কিছুদূর চলিয়া মনে হইল, গোটা চড়াই পথ স্কি ঘাড়ে করিয়া এ ভাবে চলা শেষ পর্য্যন্ত বিশেষ আমোদজনক হইবে না। পিছনে আর একখানা স্লেজ আসিতেছে দেখিয়া আবার ভাড়া জিজ্ঞাসা করিলাম। স্লেজটি ছোট, চারজন যাত্রী চলিয়াছে, স্লেজচালক জানাইল, আর জায়গা হইবে না। জিজ্ঞাসা করিলাম, শুধু আমার স্কি-এর বোঝাটা হোটেল পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে পারিবে কি না। বিদেশী বুঝিয়া স্লেজ-চালকের দয়া হইল, অন্ধকারে বর্ণ বিচার করিতে না পারিয়া ইংরেজ মনে করিয়া বলিল, আমাকেও লইতে পারিবে। ভাড়ার কথা বলিল, সে জন্ত ভাবনা নাই, উপযুক্ত যাহা মনে করি দিলেই চলিবে। চড়িলাম স্লেজে। দুইজোড়া বন্ধু-বান্ধবী চলিয়াছেন। একটা মেয়ে সামনের সীটে গাড়োয়ানের পাশে, বাকি তিনজন একা-গাড়ীর মত উল্টাদিকে মুখ করিয়া পিছনের সীটে। গাড়োয়ান জানাইল, এই সেদিনও জনকয়েক ইংরেজ তাহার স্লেজ ভাড়া করিয়াছিল, বড়ই ভাল লোক তাহারা। মনে হইল, একে ইংরেজ টুরিষ্ট, তাহাতে বড়ই ভাল লোক হওয়ার অর্থ দ্বিগুণ ভাড়া চাহিয়া বসিবে। গাড়োয়ানটি জার্ম্মান, অচিরেই নিজ জাতীয়ত্ব ঘোষণা করিয়া তাহার ভুল ভাঙাইলাম।

নিজ জায়গা খালি করিয়া দিয়া গাড়োয়ান আমাকে তাহার জায়গায় বসাইল, নিজে কখন রেকাবির উপর দাঁড়াইয়া কখন পাশে হাঁটিয়া চলিল। পায়ের উপর একটা পুরু চামড়ার চাদর রাগের মত করিয়া দিলাম। ঠাণ্ডা খুবই, তবে বাঁচোয়া এই যে, হাওয়া বহিতেছে না। চারিদিকে বরফ-নিমগ্ন নিস্তব্ধতা। নৈশ আকাশের সামান্ত নক্ষত্রালোক বরফে প্রতিফলিত হইয়া ক্ষীণ চন্দ্রালোকের মত আভাস দিতেছে। সহযাত্রীদের সঙ্গে কিছু আলাপ হইল। গাড়োয়ান জানাইল, হোটেলে পৌঁছাইতে আড়াই ঘণ্টার কম লাগিবে না। প্রথমটা শীত বোধ হয় নাই, কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে শরীর শীতল হইয়া উঠিল, হাত পা প্রায় অবশ হইয়া গেল। গাড়োয়ান প্রচুর বিয়ার পান করিয়াছে, তাহাতে স্লেজের পাশে হাঁটিয়া চলিতে শ্রম বোধ হওয়ায় তাহার ভারি মোটা চামড়ার কোটটি খুলিয়া রাখিল, আমি সেটা আমার পায়ের উপর চাপাইলাম, কিন্তু শীত কমিল না। পাশের মেয়েটিও দেখিলাম, শীতে বিশেষ কাতর হইয়াছেন, সময়ক্ষেপের জন্ত তিনি মধ্যে মধ্যে এটা ওটা আলাপের চেষ্টা করিলেন, আমার কিন্তু প্রায় বাক্‌রোধের অবস্থা হইল।

অবশেষে রাত ১১টার পর হোটেলে পৌঁছান গেল।

গাড়োয়ান বলিল ২ টাকা ভাড়া লাগিবে। সহযাত্রীদের কেহ কেহ ইহা অন্যায় মনে করিয়া বিস্তর দরদাম ও তর্ক করিলেন, কিন্তু গাড়োয়ান নাছোড়বান্দা, "জনপিছু ২ টাকার এক আধলা কম লইব না"—মহাবিক্রমে ঘোষণা করিল। হোটেলে পৌঁছিয়া শুনিলাম, ঘর খালি নাই, যদিও আমরা আগে হইতে ঘর রিজার্ভের খবর দিয়াছিলাম। বরফ ভাঙিয়া ছুটিলাম, আর একটা হোটেলে, সেখানেও জায়গা মিলিল না, তৃতীয় একটা ছোট হোটেলে শেষে তিনজনের জন্য একটা ঘর মিলিল।

ডাইনিং হলে যদিও চুল্লিতে আগুন জ্বলিতেছে ও ঘর বেশ গরমই, তবু খাইতে বসিয়া শরীর যেন অপ্রকৃতিস্থ বোধ হইল। খাওয়ার সময় আহার্য্য গলা দিয়া নামিতে চাহে না। স্কিইং-এর ভারি বুট খুলিয়া ফ্লানেলের বেড-রুম স্লিপার পরিলাম, হাতে হাতে ঘষিতে লাগিলাম, কিন্তু জড়তা ভাঙ্গিল না। মনে পড়িল, নভেলে পড়া শীতাহত লোকের বর্ণনা; বর্ণনায় যেরূপ পড়া যায়, সেরূপ একটা অর্দ্ধচেতন মত্ততার ভাব আসিল, এই শীতমত্ততায় রোগী অ্যালকহল-মাতালের মত ব্যবহার করে। আমারও সেইরূপ বোধ হইতে লাগিল। বিষে বিষক্ষয় হয়, মনে পড়িল এরূপ শীতমত্ত লোককে, নভেলে পড়িয়াছি, কড়া ব্রাণ্ডি পান করান হয়। চায়ের সঙ্গে রাম মিশাইয়া খাইলাম, একটা কোনিয়াক অর্ডার করিয়া নির্জ্জলা পান করিলাম, চৈতন্য ফিরিয়া আসিতেছে বুঝিয়া হলের চারিদিকে হাত পা সবেগে চালনা করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলাম। আধ ঘণ্টাটাক পরে আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া আহারে বসিতে পারিলাম।

রাত বারটার পর শয়ন করিতে গিয়া দেখিলাম, শয়নঘর তুষার-শীতল। ঘরের কোণে একটা ছোট লোহার ষ্টোভ, তাহাতে খানকতক কাঠ জ্বালিয়া যে একটু আগুন দেখান হইয়াছে, তাহা শুধু কাড়াটের সান্ত্বনার জন্য, উহাতে আগুন চোখেই দেখা যায়, কিন্তু ঘরের হিমশীতলতার কোন তারতম্য হয় না। বিছানায় দেখিলাম, মাত্র একখানা পালকের লেপ, অন্য কম্বল বা পায়ের উপরের ছোট লেপ নাই। বিছানা শীতল। ভাবিলাম, আজ মৃত্যু অনিবার্য্য। যা হোক, ঘণ্টাখানেক লেপমুড়ি দিয়া নিশ্চল পড়িয়া থাকার পর শরীরের অতিসান্নিধ্যের ফলে বিছানা গরম হইল।

পরদিন সকালে উঠিয়া কাপড় পরিবার সময় যথাসম্ভব শীত-প্রতিরোধের সামগ্রী, অর্থাৎ গোটাকতক সুতার ও উলের গেঞ্জি, পুলোভার, স্কিইং-এর মোটা ওয়াটারপ্রুফ ফতুয়া প্রভৃতিতে আবৃত হইয়া ঘর হইতে বাহির হইলাম। ব্রেকফাষ্টের পর স্কি-এর তলায় মোম ঘষিয়া স্কি পরিয়া পথে বাহির হইলাম। চারিদিক গভীর বরফে সমাচ্ছন্ন। পথ-ঘাট উপত্যকা-অধিত্যকা সব প্রায় একাকার হইয়া গেছে। দলে দলে লোক চারিদিকে স্কিইং করিতেছে। পাহাড়ের গায়ে নিশান পুতিয়া স্কিইং-এর বিসর্পিত কোর্স পাতা



তুষারাবৃত পর্ব্বতাভিযান।

হইয়াছে, একজনের পর একজন করিয়া লোক বিদ্যুতগতিতে এই পিচ্ছিল পথে পাহাড়ের মাথা হইতে মুহূর্ত্তের মধ্যে হুস্-স্-স্-স্ শব্দে পাহাড়ের তলদেশে উপস্থিত হইতেছে, কেহ বা মাঝপথে পাদস্খলনে বে-সামাল হইয়া চিৎপটাং হইয়া ছিট্‌কাইয়া পড়িতেছে। কেহ বা অনেকটা পথ পাহাড়ের ঢালু গা বাহিয়া সবেগে নামিয়া সংগৃহীত গতিবেগে পরের ছোট একটু চড়াই অতিক্রম করিয়া সহর্ষ উল্লাসনাদে উল্লম্ফন করিয়া শূন্যমার্গে উড্ডীন হইয়া পরের উৎরাইএর উপর লাফাইয়া পড়িতেছে চমৎকার এই ক্রীড়া! এমন সৎপৌরুষ, বীর্য্যবান, গতিবেগের প্রচণ্ড ক্ষিপ্রতায় ঝঞ্ঝাবাত বা বিদ্যুৎ-

শিখাকেও হার মানায় যে খেলা, অথচ পিচ্ছিল-লঘু যাহার লীলা, 'এমন স্বাস্থ্যদায়ী আনন্দবর্দ্ধক খেলা বোধ হয় আর



পাহাড়ের বরফের মধ্যে হোটেল।

হয় না। কালিদাস নিশ্চয়ই হিমালয়কে মাত্র সানুদেশ হইতে জানিতেন, তুষারাবৃত গিরিরাজের নিভৃত-উচ্চ-দুর্গম প্রদেশের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না, তাই তিনি ইহার বর্ণনায় বিবিধ মনোহর অথচ অবাস্তব কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, যথা—

পদং তুষারস্রুতিধৌতরক্তং যস্মিন্নদৃষ্টাপি হতদ্বিপানাং
বিদন্তি মার্গং নখরন্ধ্রমুক্তৈর্মুক্তাফলৈঃ কেশরিনাং কিরাতাঃ।

হিমালয়ের তুষারাবৃত প্রদেশে কালিদাস-বর্ণিত হস্তী ও সিংহের সংঘর্ষ দেখা যায় না নিশ্চয়ই, কিন্তু স্কিইং-রত লোকদের ধাবন-উল্লম্ফন-উড্ডীয়ন দেখিয়া দ্বিপ-কেশরী জাতীয় শক্তিশালী পশুদের খেলাধুলার কথা মনে আসে।

আমাদের দলের লোকেরা খেলায় লাগিয়া গেলেন, আমার কিন্তু এখনও এ ভীমানন্দে মাতিবার সাহসে কুলাইল না। স্কিইং-এ যাইতেছি শুনিয়া প্রাহার একটি ইংরেজ বন্ধু বলিয়াছিলেন, "জীবনে কখন বোকা বনিয়াছ কি? যদি না বনিয়া থাক তো স্কিইং-এর সময় টের পাইবে!" আমি তাই বোকা-বনাটা যতটা দেরিতে সম্ভব পিছাইয়া দিবার চেষ্টা করিলাম। "ইর্‌কা"র জিমন্যাষ্টিক ডিরেক্টার আমাদের দলপতি ছিলেন। ইনি সুইট্‌জারল্যাণ্ড ও আমেরিকায় শরীর-চর্চ্চা শিখিয়াছেন।

কথা ছিল, ইনি আমাকে স্কিইং-এ হাতেখড়ি দেওয়াইবেন আমার ভয় দেখিয়া ইনি বলিলেন, পাহাড়ের এ-জায়গাটার ঢালুটা বড় তীক্ষ্ণ, উপরের একটা পাহাড়ের অপেক্ষাকৃত কম তীক্ষ্ণ একটা ঢালু আছে, সেখানে গেলে আমার শিখিবার সুবিধা হইবে। একটি ছোট দলে আমরা আবার পাহাড় ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। স্কি পরিয়া চড়াই ভাঙ্গা সহজ, মুস্কিল হয় ঢালুতে নামিতে গেলে

পাহাড়ের গা বাহিয়া একটা বনের মধ্য দিয়া আমাদের আঁকাবাঁকা পথ। পাইন ও কার গাছগুলি সব বরফে প্রায় ডুবিয়া আছে। আমরা পথের একপাশ ঘেঁষিয়া চলিলাম, কারণ দু-পাঁচ মিনিট পরপর দূরে উপর হইতে নিম্নস্বরে "হ্যালো-ও-ও" ডাক আসিতেছে, আর পর মুহূর্ত্তেই হুস্-স্-স্ শব্দে একজন লোক পাশের পথ দিয়া পাহাড়ের উপর হইতে প্রায় উড়িয়া নীচের দিকে যাইতেছে। অনেকটা উপরে উঠিয়া আমরা প্রথমে একটা হোটেলে গেলাম। সুন্দর হোটেল, এত উপরে ও ছোট হইলেও সেণ্ট্রাল হীটিং যুক্ত। কিছু গরম কফি খাইয়া লওয়া গেল, পরে বাহির হইয়া স্কি-এর বরফ ঝাড়িয়া মুছিয়া নূতন মোম লাগাইয়া



বরফে আচ্ছন্ন গাছ।

ঢালুর দিকে অগ্রসর হইলাম। এইবার আমার শিক্ষা শুরু হইবার পালা। চলিতে চলিতে কি করিয়া বরফে

ডুবাইয়া থামিতে হয়, কি করিয়া হাঁটু নোয়াইয়া সামনে ঝুঁকিয়া চলিতে হয়, পড়িয়া গেলে কি করিয়া উঠিতে হয়, প্রভৃতি সম্বন্ধে উপদেশ লাভ করিলাম। স্কিইং আরম্ভ করিবামাত্র কিন্তু সব শিক্ষা উড়িয়া যায়। ৫ সেকেণ্ড যাইতে না যাইতেই পতন! কখন পাশে, কখন সামনে, কখন পিছনে অনেক ডিগবাজি খাইলাম, বরফে প্রায় কবরস্থ হইয়া গেলাম কয়েকবার। বারে বারে উঠিয়া আবার যেই চলিতে আরম্ভ করা অমনি পা'জোড়া আগে রওনা হইয়া পড়ে, হাঁটু ধাকাইয়া সামনে ঝুঁকিয়া টাল সামলাইব কোথায়, তাহার আগেই পতন ও সশরীরে সর্-সর্ করিয়া খানিকদূর গমন! চূড়ান্ত বোকাই মনে হইল নিজেকে। ডাইনামিক্সের বিভিন্ন ল'গুলা যে এত পাজি তাহা কে জানিত! যা'হোক সঙ্গীরা প্রবোধ দিলেন যে, প্রথমবারে তাঁহাদের সবারই ঐরূপ বোকা বনিতে হইয়াছিল।

তারপর লাঞ্চের জন্য নীচের একটা হোটেলে নামিতে হইল। অন্যেরা সবাই পাহাড়ের গা বাহিয়া বা বনের পথটি দিয়া স্কি চড়িয়া মিনিট দশেকের মধ্যে এখানে উপস্থিত হইলেন। আমি স্কি পরিয়া ঢালু পথে হাঁটিতে সাহস করিলাম না, কারণ স্কিগুলি একটু ঢালু পাইলেই আগে ছুটিতে চায়, একটু অসতর্ক থাকিলেই তৎক্ষণাৎ পতন। স্কি ঘাড়ে করিয়া পাহাড়ে পথ দিয়া নামিলাম। স্কিএর দীর্ঘতায় মানুষ বরফের উপর দাঁড়াইতে পারে, কিন্তু বিনা স্কিয়ে পায়ে হাঁটিলেই প্রায় প্রতি পদক্ষেপে হাঁটু পর্য্যন্ত বরফে ডুবিয়া যায়। যেখানে লোকচলাচল করিয়া পথের উপর বরফ একটু চাপ খাইয়া শক্ত হইয়াছে, রাস্তার এরূপ অংশ ছাড়া অন্যত্র পা পড়িলেই বরফে ডুবিয়া যাইতে হয়। তাহাতে আবার পথের মাঝখানটা যেখানে বরফ শক্ত হইয়াছে সেখানটা দিয়া চলিবার উপায় নাই, কারণ ক্ষণে ক্ষণে পিছন হইতে 'হ্যালো-ও-ও' শব্দে সবেগে সেখান দিয়া লোক নামিতেছে। অতি সন্তর্পণে নামিয়া ঘণ্টাখানেক পরে নীচের হোটেলে পৌছিলাম। লাঞ্চের পর স্কি প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করা হইল, একটি মেয়ে প্রথম প্রাইজ পাইলেন।

বৈকালের দিকে অন্যলোকেরা স্কি চড়িয়া গেলেন, আমি হাঁটিয়া স্কি ঘাড়ে ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হইলাম। ঘণ্টা দুই বরফ-ঢাকা পথে চলিয়া বাস পাওয়া গেল। আসিবার সময় যেখানে বাস ছাড়িতে হইয়াছিল, তাহার অনেকটা আগেই বাস পাইলাম, কারণ ইতিমধ্যে লোক লাগিয়া পথের বরফ সরাইয়া রাস্তার দুপাশে দেয়ালের মত জমা করিয়া রাখিয়াছে। আসিয়াছিলাম একটা প্রকাণ্ড বাসে এখানকার বাসটি ছোট বলিয়া এতদূর আগাইয়া আসিতে পারিয়াছে। বাস ছাড়িতে একঘণ্টার উপর দেরি হইবে। বাস্-কণ্ডাক্টর জানাইল, আমাদের দলের লোকেরা আরও খানিকটা আগে একটা কাফেতে অপেক্ষা করিতেছেন। স্কি বাসের মাথায় চাপাইয়া কাফেতে আসিলাম। পরে বাস আসিলে ষ্টেশনে আসিয়া আবার "স্পোর্টস্ স্পেশালে" প্রাহায় ফিরিলাম।

গ্রীষ্মকালীন সাগরতীরের মত শীতকালের পাহাড়ের এই জায়গাগুলির মধ্যে কোন কোনটা খুব ফ্যাশনাবেল। সেখানে যাহাদের ভীড় হয়, তাহারা স্কিইং-উপলক্ষে আসিয়া দিনকয়েক নাচিয়া ও ফ্লার্ট করিয়া সময়টা কাটাইয়া যায়।

মানবধর্ম্ম

...ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের অমিলন কেন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার কারণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, জগতে এমন একদিন ছিল, যখন হিন্দু অথবা মুসলমান এবং খৃষ্টান নামে কোন ধর্ম্ম বিদ্যমান ছিল না এবং মনুষ্যসমাজে শারীরিক অস্বাস্থ্য, মানসিক অশান্তি এবং আর্থিক অভাবও প্রায়শঃ দেখা যাইত না। ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইবে যে, জগতে এমন একদিন ছিল, যখন সমগ্র মনুষ্যসমাজে একমাত্র "মানবধর্ম্ম" প্রচারিত হইয়াছিল এবং সমগ্র মনুষ্যসমাজ ঐ মানবধর্ম্ম সাগ্রহে ও ঐকান্তিকতার সহিত গ্রহণ করিয়া আর্থিক প্রাচুর্য্য, মানসিক শান্তি ও শারীরিক স্বাস্থ্য প্রায়শঃ লাভ করিতে পারিয়াছিল। যে-দিন ঐ মানবধর্ম্মের ব্যাখ্যার টীকাকারিগণের কৃপায় বিকৃতির স্থান হইয়াছিল, সেই দিন হইতে মানবধর্ম্ম নষ্ট হইবার সূচনা হইয়াছিল এবং তাহার পরে ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইয়া যাওয়ায় মনুষ্যসমাজে প্রায়শঃ অস্বাস্থ্য, অশান্তি, আর্থিক অভাব দেখা দিয়াছিল এবং ক্রমে ক্রমে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান এবং মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছিল।...

নদীয়ার কথা
রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস

—শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য্য

মুসলমান যুগ

বক্তিয়ার খিলজীর নবদ্বীপ অধিকারের পরে প্রায় সুদীর্ঘ দুই শতাব্দীকাল পর্য্যন্ত নদীয়ায় মুসলমান আধিপত্য স্থাপিত হইতে পারে নাই। কিন্তু স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রহিলেও দেশে শান্তিপূর্ণ, স্থায়ী রাজশাসনের অভাবে লক্ষণসেনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীন নদীয়ার গৌরব-রবি অস্তমিত হয়; স্থায়ী মুসলমান শাসনাধিকার স্থাপিত হইলেও তাহা আর পুনরুদিত হয় নাই। ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী পুণ্যভূমি বলিয়া একদিন যে নবদ্বীপ এতখানি সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, পরবর্ত্তী কালে পাঠান নৃপতিগণের তাচ্ছিল্যে তাহা ক্রমশঃই ভ্রষ্টশ্রী হইয়া পড়িতে লাগিল।

এই সময় হইতে বহুকাল পর্য্যন্ত নদীয়ার আর বিশেষ কোনও উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনার কথা জানিতে পারা যায় না। গৌড়ের মসনদে তখন অনবরত রাজাগিরির উত্থান-পতন চলিতেছে। আজ যে ক্রীতদাস কাল সে বঙ্গেশ্বর, তৎপর দিনই হয় ত তাহার ছিন্নমুণ্ড রাজপথে বিলুণ্ঠিত, এমনই তখন বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা।

ইতিমধ্যে নবদ্বীপ ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের অধিবাসী-বর্গের উপরে রাজাজ্ঞায় একবার প্রচণ্ড অত্যাচার করা হইয়াছিল বলিয়া জয়ানন্দ দাস উল্লেখ করিয়াছেন।*

সম্ভবতঃ নৃশংস হাবসীরাজ মজঃফর সাহের (১৪৯৭-৯৮ খৃঃ) আমলে উক্ত দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে।*

তবে মজঃফর সাহের এইরূপ অত্যাচার বেশী দিন ধরিয়া চলিতে পায় নাই। তাঁহার প্রধান অমাত্য সৈয়দ হুসেন সাহ দরবারস্থ হিন্দু ও মুসলমান অমাত্যের সহায়তায় তাঁহাকে হত্যা করিয়া গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। বাংলার লোকপ্রিয় নরপতিগণের তালিকায় এই হুসেন সাহের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়াছে। এত বড় সাহিত্যানুরাগী, বিদ্যোৎসাহী, ও গুণীজনপ্রতিপালক রাজা তৎকালে গৌড়ের সিংহাসনে অধিক আরোহণ করেন নাই বলা যাইতে পারে। সমসাময়িক কবিবৃন্দ তাঁহাদের কাব্যের নানা স্থানে এই গুণগ্রাহী ভূপালের স্তুতিগানে মুখর হইয়াছেন দেখিতে পাই।† হুসেন সাহের রাজত্বকালেই নদীয়ার চাঁদ শ্রীগৌরাঙ্গ দেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যথা সময়ে তাহার উল্লেখ করিব।

ষোড়শ শতকের শেষ ভাগে দিল্লীর সম্রাট্ আকবর বাদসাহ বঙ্গদেশে আধিপত্য-বিস্তার ও শাসন-শৃঙ্খলার জন্য রাজা টোডর মল্লকে এখানে প্রেরণ করিলে পর, সুচতুর টোডর মল্ল এই দেশ হইতে সৈন্য-সাহায্য ও সহায়তা লাভ করিবার মানসে বঙ্গদেশস্থ ভূম্যধিকারিগণের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া গৌড়ে পাঠান আধিপত্য লোপ করিতে চেষ্টিত হইলেন। এই সূত্রে নদীয়ার অন্তর্গত চতুর্ব্বেষ্টিত

---

* আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়।
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতি প্রাণ লয়॥
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র কাঁধে।
ঘর-দ্বার লোটে তার লাগপাশে বাঁধে॥
দেউল দেহারা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী।
প্রাণভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপবাসী॥
গঙ্গাস্নান বিরোধিল হাট ঘাট যত।
অশ্বত্থ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত॥
পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ॥ (চৈতন্য মঙ্গল)

* ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্ট লিখিয়াছেন—He (Muzuffir Shah) afterwards marched his armies against some of the tributary Hindoo princes and having seized them, put them to death, and plundered their estates.

† (১) নৃপতি হুসেন সাহ হএ মহামতি
পঞ্চ গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি
অস্ত্র শস্ত্রে সুপণ্ডিত মহিমা অপার
কলিকালে হবু যেন কৃষ্ণ অবতার।—পরাগলী ভারত।

(২) সাহ হুসেন জগত ভূষণ
সেহ এহি রস জান।—পদাবলী।

দুর্গাধিপতি রাজা কাশীনাথ রায় টোডর মল্লের পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক পাঠানরাজ দাউদ খাঁর বিরুদ্ধে অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ঐ যুদ্ধে কাশীনাথের শৌর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আকবর বাদশাহ তাঁহাকে প্রকাশ্য দরবারে গৌরবজনক 'সমর সিংহ' উপাধি ও বাদসাহী পাঞ্জা, অশ্বগজাদি শিরোপা দিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গের বর্ত্তমান নাম চৌবেড়িয়া। প্রাচীন কীর্ত্তির কোনও চিহ্ন এখন আর সেখানে নাই।

অতঃপর যশোহরের স্বনামধন্য স্বাধীন ভুঁইঞা রাজা প্রতাপাদিত্যের অভ্যুদয় হয়। নদীয়া সম্ভবতঃ এই সময়ে প্রতাপাদিত্যের রাজ্যভুক্ত ছিল। মোগল সম্রাটের সহিত বিবাদ বাধিলে মোগল সৈন্যের অগ্রগমনে বাধা দিবার নিমিত্ত তৎকালিক নদীয়ার অন্তর্গত জগদলে প্রতাপাদিত্য যে এক প্রকাণ্ড পরিখা খনন করাইয়াছিলেন, এখনও তাহা বিদ্যমান আছে। বর্ত্তমান নদীয়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভবানন্দ মজুমদারের সহায়তা লাভ করিয়াই মহারাজ মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করিয়াছিলেন বলিয়া একটা প্রবাদ শুনা যায়। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় বহু ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা উক্ত জন-প্রবাদের অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

শাসন-সৌকর্য্যার্থ এই সময় বঙ্গদেশ মোগল সম্রাট কর্ত্তৃক কয়েকটি ফৌজদারীতে বিভক্ত হইলে পর নদীয়া যশোহর ফৌজদারীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়।

এইরূপে বাংলার সমগ্র অংশই যখন ধীরে ধীরে পূর্ব্ব স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ক্রমশঃ মুসলমান শাসনাধিকারে আসিয়া পড়িতেছিল, সেই সময়ে নদীয়ার দেবগ্রামে আর এক শক্তিশালী স্বাধীন ভূম্যধিকারী মস্তকোত্তলন করিয়াছিলেন—ইঁহার নাম মহারাজ দেবপাল দেব।*

এই দেবপাল রাজা সম্বন্ধে বহুপ্রকার গল্প ও কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। এতকাল পরে তাহার ঐতিহাসিক সত্যতা নিরূপণের উপায় নাই। তবে তাহা হইতে শুধু এইটুকু অনুমান করা যায় যে, বল্লেশ্বরের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে দেবপাল মহারাজ দৈবদুর্ঘটনায় অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে সপরিবারে বিনষ্ট হইয়াছিলেন এবং দেবপালের বিশাল সম্পত্তি কালে ভবানন্দের বংশধর রাজা রাঘবের রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়।

যাহাই হউক, সমগ্র বঙ্গে মুসলমান শাসনাধিকার স্থাপিত হইলেও নদীয়ার বহুকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রত্যক্ষ কোন যোগ ছিল না। ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে ভবানন্দ মজুমদার সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে নদীয়া, মহৎপুর, সাঙ্গপদহ, লেপা প্রভৃতি চৌদ্দখানি পরগণার আধিপত্য লাভ করিয়া শুভক্ষণে যে নদীয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহারাই দেশের আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য্যে অপ্রতিহত হইয়া রহিলেন।

ভবানন্দ প্রথমে মাটিয়ারী গ্রামে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার পৌত্র রাঘব সেখান হইতে জলঙ্গী তটবর্ত্তী রেউই গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তথায় প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা ও প্রাসাদ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন। পরবর্ত্তীকালে রাঘবের পুত্র রুদ্ররায় উক্ত রেউই গ্রামের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নামানুসারে কৃষ্ণনগর নামকরণ করেন এবং সেই হইতে কৃষ্ণনগর নামের উৎপত্তি। (মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নামানুসারে তাঁহার রাজধানীর নাম কৃষ্ণনগর হইয়াছে বলিয়া একটা প্রচলিত ধারণা আছে, তাহা সত্য নহে)। স্বনামধন্য রাজরাজেন্দ্র রাজপেয়ী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এই বংশের ভবানন্দ হইতে অধস্তন নবম পুরুষ।

১৭২৮ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। নদীয়া রাজ্যের সীমানা এই সময়ে বহুবিস্তৃত।* এই সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ড পরিক্রমা করিতে ১২ দিন সময় লাগিত এবং ইহার মুনাফা প্রায় তেইশ লক্ষ মুদ্রারও অধিক ছিল বলিয়া হলওয়েল সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন।†

* দে'পারে আছিল রাজা দে'পাল কুমার।
পরলী পাতিয়াছিল বিখ্যাত-সংসার। —অন্নদামঙ্গল

* ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন—
রাজ্যের উত্তর সীমা মুরশিদাবাদ।
পশ্চিম সীমা গঙ্গা ভাগীরথী খাদ।
দক্ষিণের সীমা গঙ্গাসাগরের ধার।
পূর্ব্ব সীমা ধুল্যাপুর বড় গঙ্গা পার।—অন্নদামঙ্গল

†—he (Krishna Chandra) possessed a tract of country of about twelve days journey and that he was

কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালে বাংলার রাষ্ট্রীয় জীবনে সর্ব্বদিক্ দিয়াই বিপর্য্যয় ঘনাইয়া উঠিতেছিল। দিল্লীর অপ্রতিহত রাজশক্তি শিথিল হইয়া পড়ায় দেশব্যাপী যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অরাজকতার প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে। বঙ্গের নবাবগণ ইতিমধ্যেই স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহাদের অক্ষম শাসনে দেশব্যাপী অশান্তি ও যথেচ্ছাচারিতার প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইল। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ভয়াবহ বর্গীর হাঙ্গামায় জনসাধারণ সন্ত্রস্ত। বর্গীর ভয়ে বর্দ্ধমানাধিপতি সপরিবারে পলায়ন করিয়া নদীয়া-রাজের আশ্রয়গ্রহণপূর্ব্বক কাটগাছি গ্রামে গড়খাই ও প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু নদীয়াও এই ভীষণ হাঙ্গামা হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। ভাস্কর পণ্ডিতের নায়কত্বে নদীয়ার বহু গ্রাম বর্গীরা বিধ্বস্ত করিয়াছিল * বলিয়া প্রাচীন পুঁথিতে পাওয়া যায়।

এই হাঙ্গামায় কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণনগর ছাড়িয়া শিবনিবাসে কঙ্কণাকারে বেষ্টিতা ইছামতী নদীর উপকূলে সুদৃঢ় দুর্গ, প্রাসাদ ও বহু মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া অপেক্ষাকৃত নিরাপদে কিছুকাল বসবাস করিয়াছিলেন। তৎকালে মহারাজের প্রতিষ্ঠিত ১০৮টি শিব-মন্দিরের মধ্যে আজ দুই একটি মাত্র ভগ্নোন্মুখ অবস্থায় অবশিষ্ট আছে। শিবনিবাসের অতুল সমৃদ্ধি সে সময়ে কাশীর তুল্য বিবেচিত হইত বলিয়া প্রবাদ শুনা যায়।*

যাহাই হউক এই বর্গীর হাঙ্গামায় সমগ্র বঙ্গদেশ কিরূপ বিধ্বস্ত হইয়া পড়িয়াছিল তাহা ঐতিহাসিকগণের অবিদিত নাই। তারপর ওলন্দাজ, পোর্ত্তুগীজ, ফরাসী ইংরাজ প্রভৃতি ইউরোপীয়গণের সহিত নবাবের বিবাদ-বিসংবাদে বাংলার রাষ্ট্রগগন ক্রমশঃই ঘনকৃষ্ণ মেঘজালে আবৃত হইয়া আসিতেছিল।

একদিকে কিশোর নবাব সিরাজদ্দৌল্লার অপরিমিত বিলাসব্যসন ও প্রচণ্ড উচ্ছৃঙ্খলতার কলুষপঙ্কিল আব-হাওয়ায় দেশীয় ভূম্যধিকারিগণ সকলেই সন্ত্রস্ত, অন্যদিকে কূটনীতি-বিশারদ ইংরাজ বণিক-সম্প্রদায় এই দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া সামদান ও ভেদ-নীতি দ্বারা শক্তিসঞ্চয় করিতেছিলেন। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিল। ১৭৫৭ খৃঃ ২৩শে জুন নদীয়ার অন্তর্গত পলাশীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণে ইংরাজ সেনাপতি ক্লাইভ ন্যূনাধিক তিন সহস্র দেশী পল্টন ও ৮টি কামান সংগ্রহ করিয়া নবাবের বিপুল রণসম্ভারের সম্মুখীন হইলেন এবং কিছুকাল মাত্র পলাসীর লক্ষবাগ নামক আম্র কুঞ্জে আত্মগোপন করিয়া থাকিয়াই কি ভাবে সুদুর্লভ বিজয়-মাল্য অর্জ্জন করিয়া ফেলিলেন, সেই সকল শোচনীয় কাহিনীর পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সংক্ষেপে এইটুকু মাত্র বলা যায় যে, তাৎকালিক রাষ্ট্রীয় যথেচ্ছাচারিতার মধ্যে এই নব জাতিকে আহ্বান করিয়া আনিতে যাঁহারা সহায়তা করিয়া ছিলেন, নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রই তাঁহাদের অগ্রণী। কৃষ্ণচন্দ্রের ইহা গৌরব-কীর্ত্তি না কলঙ্ক-কাহিনী, আজ তাহা বিচার করা সহজ নহে। তবে, আমাদের পুরাতন শতধা-বিভক্ত পঙ্কিল জাতীয় জীবনে এই নববল দৃপ্ত পাশ্চাত্ত্য জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতি আনয়নের প্রয়োজন ছিল কি না, তাহা বর্ত্তমান পরিস্থিতি-

---

taxed at 2 lacs, per annum, though his revenue exceeded twenty-five lacs of rupees.

—*Kshitish Bangshabali Charitam* (*Trans, by W, Pertsch*)

* তবে কোন গ্রাম বর্গি দিল পোড়াইয়া।
সে সব গ্রামের নাম শুন মন দিয়া।
...   .
ভাটছালা পোড়াএ আর মেরচাপুর চাঁদড়া।
কুড়ধন পলাসি আর বঁটচি কেড়ড়া।
সমুদ্রগড় জাগ্রগর আর নদীয়া।
মাহাতপুর সুনটপুর থইল পোড়াএ গিয়া।
গোটপাড়া চাঁদপাড়া আর আগদিয়া। (অগ্রদ্বীপ)
রাতারাতি পাটলি দিল পোড়াইয়া।
...   .
সহর লুটিতে বর্গী তবে আইল ধাইয়া।
নৈহাটী উদ্ধাপপুর কাটএগা ডাইনে থুইয়া।
বাবলা নদী বরগি তবে পার হইল।
মঙ্গল পাড়া সাটুই কাসনগর আইল। —মহারাষ্ট্র পুরাণ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগৃহীত মহারাষ্ট্র পুরাণ পুঁথিখানি ভাস্কর নিধনের ঠিক আট বৎসর পরে নকল করা। সুতরাং ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ বিশ্বাস যোগ্য।

* শিবনিবাসী তুল্য কাশী ধন্য নদী কঙ্কণা।
উপরে বাজে দেবঘড়ি, নিচে বাজে ঠঠনা॥

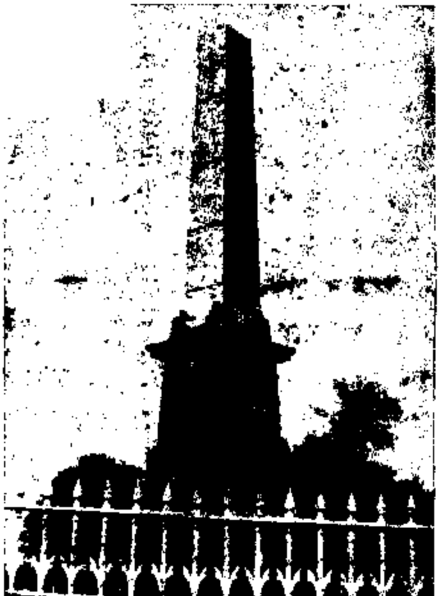
মূলক প্রমত্ত মনোভাব ত্যাগ করিয়া অতীত অবস্থা আলোচনা করিলেই অনুমান করিতে পারিব। ক্লাইভ এই পরোপকারের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কৃষ্ণচন্দ্রকে পলাশী-ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ১২টি কামান ও দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে রাজেন্দ্র-বাহাদুর উপাধি আনিয়া দিয়াছিলেন।* কয়েকটি কামান এখনও রাজবাটিতে সযত্নে রক্ষিত আছে।

ইংরাজ যুগ—(ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোং)

যাহা হউক, ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে বাংলার রাষ্ট্রীয় রঙ্গাভিনয়ের পট পরিবর্তন হইয়া গেল। ইংরাজ-গণ প্রথমে বঙ্গেশ্বর ও পরে ভারতেশ্বর হইয়া উঠিবার সুযোগ লাভ করিলেন। এই যুগান্তকারী যুদ্ধের স্মারক চিহ্ন রূপে বিজয়ী ইংরাজ পলাশী-ক্ষেত্রে প্রথমে একটি ক্ষুদ্র স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, পরে লর্ড কার্জ্জন ইহাকে পলাশী-কীর্ত্তির অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া একটি বৃহৎ প্রস্তর-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করান। পলাশীর রণক্ষেত্র ও সুবিখ্যাত লক্ষবাগ আম্রকুঞ্জ আজ গঙ্গাগর্ভে নিশ্চিহ্ন রূপে লোপ পাইয়াছে। বহুকাল পর্য্যন্ত একটি মাত্র আম গাছ অবশিষ্ট ছিল, তাহাও পলাশীর স্মারকরূপে বিলাতে পাঠান হইয়াছে।

এইরূপে ইংরাজ-বণিক সম্প্রদায় পলাশী যুদ্ধে জয়লাভ করিবার পর যখন দিল্লীশ্বর সাহ আলমের নিকট হইতে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ লাভ করিলেন, তখন বঙ্গদেশে তাঁহারাই প্রত্যক্ষ ভাগ্যবিধাতা হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তখনও বাঙ্গালার রাষ্ট্রীয় দুর্ভাগ্যের অপনোদন হয় নাই,—দেশের আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য্য অপেক্ষা শোষণকার্য্যেই তাঁহাদের অধিক মনোযোগী দেখা যাইত। বণিক সম্প্রদায় অকস্মাৎ রাজশ্রী প্রাপ্ত হইয়া ভীষণ অর্থগৃধ্নু হইয়া উঠিয়াছিলেন, সমসাময়িক ইতিহাসে তাহার উল্লেখ আছে। এমন কি, ইংরাজের অকৃত্রিম প্রণয়ভাজন উপকারী বন্ধু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও তাঁহাদের দুর্নিবার লুব্ধ ক্রোধ হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। দেশে বর্গীর হাঙ্গামা ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় গোলযোগ নিবন্ধন ইংরাজ-সরকারে যথাসময়ে রাজস্ব জমা দিতে না পারায়, বার্ষিক মাত্র ১০,০০০৲ টাকা বৃত্তির বিনিময়ে জমিদারী কাড়িয়া লইয়া, তাঁহাকে অশেষবিধ লাঞ্ছনা করা হইয়াছিল। *

কিন্তু তাহাতে আশানুরূপ স্বার্থসিদ্ধি না হওয়ায় পুনরায় এক চুক্তি-পত্রে সহি করাইয়া কৃষ্ণচন্দ্রকে তাঁহার জমিদারী প্রত্যর্পণ করা হয়। †



লর্ড কার্জ্জন-নির্ম্মিত পলাশী-যুদ্ধের স্মৃতি-স্তম্ভ।

* After Plassey battle, Clive conferred on him (Krishna Chandra) the title of Rajendra Bahadur and presented him with 12 guns used at Plassey.

(*Imperial Gazetteer of India Vol. VII*) *W. W. Hunter*

* Mr. Luke Scrafton writes from Mursidabad to Government complaining of the arrears of Revenue due in Nadia—It is possible that by threatening the Raja with loss of his caste and such corporal punishments as are in practice among those people something more may be extorted from him, * * As the chief cause of the balance is Raja's extravagance, it therefore appears to me to send a trusty person into his country to collect his revenue for him, only to deprive the Raja of all power in his country, allowing him only 10,000 per annum or whatever your honour etc. may think proper for his expenses and keep the son in Calcutta as security for the father's good behaviour.

Long's Selections from Unpublished records, No 337

† I promise to pay the above sum of Rs. 835,952

এই সময়ে বাঙ্গালার শাসনদণ্ড হইতে নবাবের শিথিল মুষ্টি স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু ইংরাজের বজ্রমুষ্টি তখনও দৃঢ়বদ্ধ হইয়া উঠিবার সময় পায় নাই। রাষ্ট্রীয় জীবনের এই নিরালম্ব অবস্থায় সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া চুরি, ডাকাতি ও অরাজকতার প্রাদুর্ভাব হইল। নদীয়ার বহু স্থানই এই সময়ে দুর্দ্ধর্ষ দস্যু-অধ্যুষিত হইয়া উঠে। বিশ্বনাথ, বৈদ্যনাথ, মনোহর প্রভৃতি বিখ্যাত দস্যুদলপতিগণের নানাবিধ বিভীষিকাময় কীর্ত্তিকলাপ শুনিলে আজিও শরীরে রোমাঞ্চ হয়। (তবে দস্যু হইলেও তাহাদের অনেকের বীরত্বপূর্ণ কার্য্যপ্রণালী অনুধাবন করিলে, তাহাকে পরস্বাপহারী দস্যুবৃত্তিমাত্র বলা চলে না, বরং বিশৃঙ্খল সমাজের অত্যাচারপ্রপীড়িত আর্ত্ত বীরের ক্রুদ্ধ বিদ্রোহ বলিয়াই মনে হয়)।

ইংরাজ-রাজপুরুষেরা বহুকাল পর্য্যন্ত এই ভীষণ যথেচ্ছাচারিতা প্রতিরোধ করিতে পারেন নাই। অবশেষে নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট ব্ল্যাকুয়ার সাহেব বহুকষ্টে নদীয়া হইতে দস্যুদল সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া পুরস্কারস্বরূপ ৬০০০৲ টাকা বোনাস ও মাসিক ৩০০৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। *

পলাশী-যুদ্ধের ঠিক একশত বৎসর পরে (১৮৫৭ খৃঃ) সমগ্র ভারতে সিপাহী-বিদ্রোহের রণডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। বাঙ্গালাতেও বহুস্থানে এই বিদ্রোহের ঢেউ ছড়াইয়া পড়ে, কিন্তু নদীয়ার রাজপুরুষগণ সূচনাতেই সাবধান হইয়া পড়ায় এখানে বিদ্রোহ বিশেষ পরিস্ফুট হয় নাই। * এই সিপাহী বিদ্রোহ দমিত হইবার অব্যবহিত পরেই সমগ্র নদীয়ায় নীলকর বিদ্রোহের আগুন ছড়াইয়া পড়ে। ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধ হইতেই ইউরোপীয়েরা এ দেশে নীলের চাষ প্রবর্ত্তন করেন। প্রথমে অবশ্য সামান্যভাবেই ২।১ জন বিদেশী ব্যবসায়ী এই লাভজনক ব্যবসায় সুরু করিয়াছিলেন, পরে অসংখ্য দেশী ও বিদেশী কুঠিয়ালের নীলকুঠিতে সমগ্র জেলা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। অগ্রিম দাদনে দরিদ্র প্রজার স্বাধীনতা হরণ করিয়া ধনী ব্যবসায়ী সম্প্রদায় তাহাদের সমুদয় জমিতে নীল বপন করিতে বাধ্য করিতেন ও যথাসময়ে চুক্তিমত মাল সরবরাহ করিতে না পারিলে তাহাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হইত। নিম্ন কৃষককুল বহুকাল এই নৃশংস অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া আসিতেছিল—শেষে এই সহের সীমা অতিক্রম করিল। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে নদীয়া ও যশোহরের প্রজাবৃন্দ একতাবদ্ধ হইয়া কুঠিয়ালদিগের নিকট হইতে কোনপ্রকার দাদন লইতে বা নীল বুনিতে প্রকাশ্যে অস্বীকার করিয়া এক ভীষণ সঙ্কটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়া বসিল। নদীয়ার কবি দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় নীলদর্পণ নাটক রচনা করিয়া অসহায় প্রজাবৃন্দের শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন এবং ঐ পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ করিয়া সদাশয় পাদ্রী লং সাহেব অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইলেন। সমগ্র দেশ তখন বারুদের স্তূপের মত প্রজ্জ্বলনোন্মুখ। তৎকালীন রাজপ্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং দেশের এই ভীষণ বিক্ষুব্ধ অবস্থার কথা উল্লেখ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, সে সময়ে কুঠিয়ালরা সামান্য মাত্র বল প্রয়োগ করিতে

---

agreeable to the kistbandi without delay or failure I will pay the same into the Company's factory. I have made this that it may remain in full force and virtue. Dated the 23rd. of Julvaid and the 4th. August of Bengali year 1166.

Hunter's Statistical Accounts, Vol. II.

* Mr. Blaquiere, the Magistrate of Nadia dealt very vigorously with this state of affairs and in the course of a year succeeded in almost freeing the district of these criminals. * * In token of the appreciation of Government Mr. Blaquiere was granted a bonus of Rs. 6000 and an extra permanant allowance of Rs. 300 per mensem.

(Bengal District Gazeteer Vol XXIV) Garrett

* In the Nadia Division, Berhampore garrisioned by Native troops, both cavalry and infantry, was rescued from threatened danger, first by rapid despatch of European troops by land and by steamer and secondly by the prompt and well-concieved measures for disarming the native garrision. * * * The districts generally have been perfectly tranquil, and furnish little matter to remark upon.

Lieutenant Governor Sir F. J. Halliday
Minute on the Mutiny

গেলেও দেশব্যাপী আগুণ জলিয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল। * নদীয়ার নীলকরদিগের অত্যাচার ও দরিদ্র প্রজাবর্গের অসমসাহসিক নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সংগ্রামের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিবার স্থান এখানে নাই। তাই সংক্ষেপে এই ভীষণ দুর্ঘটনার কাহিনী উল্লেখ করিয়া রাখিলাম মাত্র।

যাহা হউক, গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া মূল তথ্য অনুসন্ধানের নিমিত্ত এক কমিশন বসাইলেন। বহুদিন ধরিয়া বহুজনের সাক্ষ্য গ্রহণ ও বহু বাদানুবাদের পর তাঁহারা প্রজাবর্গকে কুঠিয়ালের যথেচ্ছ ব্যবহার হইতে রক্ষা করিবার প্রয়োজন সম্বন্ধে অবহিত হইয়া দেশে বিভিন্ন প্রকার শাসন-শৃঙ্খলার সুব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু এই নীলের হাঙ্গামা কেবল মাত্র শাসন-ব্যবস্থায় মিটিয়া যাইত বলিয়া মনে হয় না, যদি না ইতিমধ্যে বৈজ্ঞানিক রসায়নাগারে কৃত্রিম উপায়ে নীল তৈয়ারীর প্রণালী আবিষ্কার হইত। কৃত্রিম নীলের প্রতিযোগিতায় নীলের চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় ধীরে ধীরে এ দেশ হইতে নীলকুঠি গুলি উঠিয়া গেল, নদীয়ার কৃষককুল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

ইতিমধ্যেই (১৮৫৮ খৃঃ) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারত সাম্রাজ্যের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তদবধি নদীয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অবস্থায় বৃটিশ শাসনপ্রণালীর সুশৃঙ্খল নিয়মানুসারে শাসিত হইয়া আসিতেছে, তাহা বলাই বাহুল্য। ভবিষ্যতে স্বতন্ত্রভাবে এই বৃটিশ শাসনাধিকারের কথা আলোচনা করা যাইবে। উপস্থিত নদীয়ার রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের প্রাচীন কাহিনী এই স্থানেই শেষ।

* I assure you that for about a week it caused me more anxiety than I have had since the days of Delhi, and from that day I felt that a shot fired in anger or fear by one foolish planter might put every Factory in Lower Bengal in flames.

Lord Canning

(Buckland's Bengal under Lt. Governors)

... ও স্রষ্টা

—শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

যখন হয় নি সৃষ্টি—তুমি ছিলে সত্য ও সুন্দর,
আপন আনন্দে ছিলে আপনি মগন ;
কি ব্যথা উঠিল জাগি উদ্বেলিয়া প্রশান্ত অন্তর—
কোন্ গান গাহিবারে করিলে মনন ?
রূপ-হীন ভাষা-হীন অব্যক্তের ইচ্ছা রূপ ধরি,
রূপাতীত, রূপে রূপে ধরিলে আকার,
অসীম অম্বর-দেশ সঙ্গীতের সুরে গেল ভরি,
দেশ-কালে হল মহাবিশ্বের প্রসার।
দিকে দিকে বয়ে গেল সংখ্যাহীন চেতনার ধারা,
সৃষ্টির জীবন-বাণী তার মাঝে লেখা,
রচিলে সৃষ্টির কাব্য আপনারে করি তায় হারা,
স্রষ্টা হলে—সৃষ্টি মাঝে নাহি দিলে দেখা।

রবি-শশী-তারকারা মহাশূন্যে উঠিল ফুটিয়া,
অঙ্গে অঙ্গে দীপ্ত-জ্যোতি উঠিল বিকাশি,
শ্যাম-স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের রূপ-ডালি হৃদয়ে বহিয়া
দেখা দিল জীব-ধাত্রী পৃথিবী রূপসী !
দিকে দিকে রূপভরা, দিকে দিকে আনন্দের গান,
দিকে দিকে ছেয়ে গেল প্রাণের প্রকাশ ;
কোথা স্রষ্টা ? কোথা কবি ? বিশ্বে তব কোথায় সন্ধান ?
সৃষ্টি কাঁদে—বিশ্ব কাঁদে—কাঁদে গো আকাশ !
সৃষ্টির অন্তরমাঝে আজো সেই ব্যথাভরা সুর,
তোমারে খুঁজিয়া ফিরে দিক্-দিগন্তরে—
অলক্ষ্যে বসিয়া তুমি গাহ গান করুণ-মধুর—
"আমি আছি—আমি আছি—সৃষ্টির অন্তরে।"

[১৭]

'রমণীসুলভ ঈর্ষা প্রচণ্ড তপন'

সংসারে একটু মুস্কিল বাধিয়াছে। বড়-বৌয়ের ভোর রাত্রি হইতে জ্বর, উঠিতে পারে নাই। সরলা এক বার উঠিয়া হাত-মুখ ধুইয়া আবার ঘরে গিয়া শুইয়াছে। মেজ-বৌ কিছু কিছু কাজ সারিয়াছিল। কোলের মেয়েটির পেটের অসুখে ভুগিয়া একটু খিটখিটে স্বভাব হইয়াছে। মার পিছনে পিছনে মিন্ মিন্ করিয়া ঘুরিতেছিল। শেষে চৌকাটে বাধিয়া পড়িয়া গিয়া তারস্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

মেজ-বৌ নিরিবিলি স্বভাবের মানুষ, গোলমাল সে সহিতে পারে না, কাজ ফেলিয়া মেয়ে শান্ত করিতে বসিল।

পরশমণির পাড়ায় যাওয়া হয় নাই। একে সুখেনের ভাবনা, তার উপর গত রাত্রি বিশালের ঘরে যে হাসি শুনিয়াছেন, সে শব্দ তাঁহার বুকে তোল-পাড় আরম্ভ করিয়াছে। সারা রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়াছেন। একবার যখন সুখেন সেই রূপসীর কাছে গিয়াছে, আর রাখা যাইবে না। একবার ভয় ভাঙ্গিলে যখন তখন ছুটিবে। এত করিয়া সরলাকে উপদেশ দেওয়া সবই বৃথা হইল। সরলার জন্ম নিত্য-নূতন পাড়ের কাপড় ও তেল-আলতা নিজের পয়সা দিয়া কিনিয়া কিনিয়া আনা সবই বৃথা হইল। আবার ভাবেন—বড়-বিবির হাসিই নিশ্চয় ঐ রকম করিয়াই সে হাসে—কিন্তু বিশালের ঘর থেকে কোন দিন ত কথাটুকু শোনা যায় না, তবে হাসি কিসের? না, শুনিবার ভ্রম? আচ্ছা সুখেন যদি না আসে, সেখানেই ঘর-জামাই থাকিয়া যায়? তবে? তিনিই কি ছাড়িবেন না কি? সরলাকে লইয়া গিয়া হাজির হইবেন। না, ও হাসি নয়, নিশ্চয় বিশাল বকুনি দিয়াছে, তাই কাঁদিতেছিল। বিশাল ত বৌকে ছোঁয় না যে, দু'ঘা বসাইয়া দিবে। ছুঁবিনে—না ছুঁলি, কিছু ছুঁড়ে ফেলেও ত মারা যায়? কান্নাই নিশ্চয়—

দত্ত-গিন্নী নিজেদের ডিঙ্গীখানায় চড়িয়া গোটাকতক কাঁচালঙ্কার জন্য আসিয়াছেন, বলিলেন, 'এ কি দিদি? ঘর-দোয়ের এমন ছিরি কেন আজ? বাসি উঠানে ঝাঁটাও পড়ে নি যে? বচ্ছরকার দিন—'

পরশমণি গোটাকয়েক নারিকেল চাঁছিয়া পরিষ্কার করিতেছিলেন, বলিলেন, 'তোমরা দেখ, দেখ, আমি বলে দুষী হই কেন? বড়-বিবি ওঠেন নি এখনো খাট ছেড়ে, মেজ-বিবি দেখ গে, রান্নাঘরটা মুছেই মেয়ে নিয়ে সোহাগ করতে বসেছেন! ছোট-বৌটা কাল থেকে মাথা তুলতে পারে না, নইলে কি বাড়ী-ঘরের এই দশা থাকে? ও ঘরে এসে অবধি সব নিজেই করে—বিবিরা শুয়ে বসেই আছেন। রাত্তিরে জলটুকু মুখে দিলে না দিদি—তবু সকাল বেলা উঠে পড়েছে, আমি বললাম যাও শোও গে, জোর করে শুইয়ে রেখেছি। ওকে দেখে বিবিরা পাটে উঠেছেন! বলুক না কোন্ চোখখাকী বলবে যে, আমি মিছে কথা বলছি—'

দত্ত-গিন্নী সরলার ঘরে গিয়া তাহাকে দেখিলেন। বলিলেন, 'তা হলে উঠ না, মাথাটা ছাড়ুক।' তার পরে বড়-বৌকে দেখিতে গেলেন। জ্বরে বড়-বৌ অচৈতন্য, গায় হাত দিয়া দেখেন, গা আগুনের মত। মাথার দিকের খোলা জানালাটা দিয়া সর সর করিয়া সবেগে পূবে হাওয়া আসিতেছে। জানালাটা বন্ধ করিয়া দিয়া দত্ত-গিন্নী বাহিরে আসিয়া বলিলেন, 'তোমায় ত বেগতিক দেখছি; মেজ-বৌকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, দু'বোনে হাতাহাতি করে সেরে ফেলুক সব। আমি এসেছি দুটো কাঁচালঙ্কা নিতে, কালকার হাটে কাঁচালঙ্কাটাই ভুল। এখনো দু'দিন হাটের বাকী; লাগে রোজ একটি পোয়া করে; বৌ চাল-ভাজার ছোলা-ভাজার সঙ্গে মুঠো মুঠো লঙ্কা—'

পরশমণি বলিলেন, 'তোমার বউদের কথা, তারা লক্ষী! ঘর বুঝেই আসে—তোমার সংসারটিকে স্বগ্গ করে তুলেছে। আমার বৌ-বিবিদের মত আর কোথা দেখবে? যত পাড়া-কেঁটান জঞ্জাল আমার কপালে এসে জুটেছে

তা ছোট বৌটা যে মানুষের মতন হয়েছে, এই যা রক্ষা! মেজবিবির কাছে লঙ্কা নাও গে, কাল এক ধামা এসেছে—বেশী করে নিয়ে যাও, তোমার দুদিন হয় যেন। আমাদের বাড়ীর লোক ত চব্বিশ ঘণ্টাই তোমাদের বাড়ী এটা-ওটা আনতে যাচ্ছে—তোমরাই কিছু নাও না—'

'কে বলে নিই নে? লাউ ডাঁটা, কাগজী লেবু রোজই ত' নিচ্ছি,—তা তোমার ত' বেগতিক দেখছি। আমার ওখানেই তোমার রান্না হবে, চান করে সকাল সকাল খেয়ো—'

দত্ত-গিন্নী মেজ-বৌয়ের কাছে গিয়া লঙ্কা লইয়া যাইবার সময় বলিলেন, 'সুখেন বুঝি আসে নি?'

'না, কোথা গেছে জানিও নে—সরলা কেন যে এত রাগছে!'

'গেছে পঞ্চমীদের বাড়ী, পঞ্চমীর ভাইরা হাট থেকে ধরে নিয়ে গেছে—এ পাড়ায় সবাই জানে।'

'ও কপাল! তাই বলুন, তবে যে বললে, মীরপুরের পথে—'

'বোকা মেয়ে! সেই তো পথ। তা গেছে বেশ করেছে—সেই ত' সব—'

অদূরে পরশমণিকে দেখিয়া মেজ-বৌ চোখের ইঙ্গিতে সতর্ক করিয়া বলিল, 'গিরিকে পাঠালে আপনাদের অসুবিধে হবে না?'

'না কিছু না, তোমার শাশুড়ীর কাছে মেয়েটি রেখে ঘরটর গুলো ঝাঁট দাও ততক্ষণ, ভারি কাজ সব মেজ-বৌ করুক এসে—'

দত্ত-গিন্নী চলিয়া গেলেন। পরশমণি কোথা হইতে আধ ঘটি দুধ আনিয়া মেজ-বৌয়ের অদূরে বারান্দায় উনানটা জালিয়া একটা মাজা পিতলের বাটী করিয়া নিজেই জাল দিতে বসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে 'এই যে বৌটা পড়ে রইল—জলটুকু মুখে না দিয়ে কোন শত্তুরের চোখে পড়ল তা? একজন তো রূপ ছড়িয়ে খাটে বাহার দিচ্ছেন—আর একজন বসে বসেই হয়রান! বৌটা সমস্তটা দিন বাঁদীর মত খেটে মরে হাতে হাতে পান জল যোগাচ্ছে অষ্ট পহর—তা তার ঘরে উঁকিটি অবধি দিলে না—পরের বাড়ীর মানুষ সেও 'আহা' 'উহু' করে গেল। আমি ত' চিরকেলে মন্দ! মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখতে পারি নি। সোনা সেখকে ডাকাডা[illegible] টুকু নিয়ে এলাম, তা ঘাটেই [illegible] ছে ছাই[illegible] মুখপোড়া রাখাল গাই দুই[illegible] [illegible] নিয়ে গেছেন বেড়াতে। সোনা [illegible] যদি [illegible]টুকু [illegible] মেয়েটা উপোস করে মর[illegible]

মেজ-বৌয়ের মুখে [illegible]টু হাসি [illegible] দিল। পরশমণি দেখিয়া ফে[illegible]ন এই ভয়ে ফি[illegible] [illegible]সেল। কঠোর শিলা গলিয়াছে, [illegible] [illegible] [illegible] জলধারা যার মাথায়ই পড়ুক না কেন

পরশমণি কোন উত্তর না পাইয়া আবার বলিতে লাগিলেন, 'আপনার চেয়ে পরই ভাল, ভাগ্যি গিরির শাশুড়ী এসেছিল, আজ আমার কপালে উপোসই হত নইলে। একই ঝাড়ের বাঁশ, কেউ ফুলের সাজি, কেউ ঘর-ঝেঁটানো ঝাঁটা। একই বাপের মেয়ে, তা গিরি কেমন সংসারটাকে ঠিক রেখেছে! একেই বলে বরাত!'

পরশমণি দুধ বাটিতে ঢালিয়া ছোট-বৌয়ের ঘরে পা দিয়াছেন, সুখেনও ঘরে আসিয়া ঢুকিল। পরশমণি চাহিয়া দেখিলেন, সুখেনের মুখ দেখিয়া মুখের কথা মুখেই থাকিল। বৌকে বলিলেন, 'দুধটুকু খেয়ে নে, আর কে দেখবে তোকে, আমি রাখালটাকে দেখিগে, দুধ দুইয়ে সোনা সেখকে আগে আধ সের দিয়ে আসুক।'

সুখেন জামা-জুতা খুলিতেছে, সরলা চাহিয়া দেখিতেছে, সুখেনের যেন কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। সরলা শুইয়া আছে, শাশুড়ী দুধ দিয়া গেলেন, তবু সুখেন একবার চাহিয়াও দেখিল না, কথা বলা দূরের কথা। সুখেন বাহির হইয়া যায় দেখিয়া সরলা বলিল, 'শোন—'

সুখেন দাঁড়াইল। সরলা বলিল, 'কোথায় গিয়েছিলে কাল?'

সুখেনের যেন স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। সরলার মুখের দিকে চাহিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল; যেন মনে মনে কি খুঁজিতেছে। অসহিষ্ণু সরলা উঠিয়া বলিল, 'আমি বলব কোথায় গিয়েছিলে?'

'কোথায় গিয়েছিলাম?' সুখেনের স্বর শান্ত।

'যদি বলি তোমার পঞ্চমীর কাছে?'

সুখেন চুপ করিয়া রহিল।

'স্বীকার করছ? স্বীকার করলে তা হলে? সত্যি তবে? কেন?—কেন তবে আমায় বিয়ে করেছ?'

সুখেন কোন কথা বলিল না, সরলার গলা ক্রমে চড়িতে লাগিল, 'আমি বুঝেছি, তোমার মন শুধু সেইখানে পড়ে থাকে, তা যদি হয়, তবে কেন আমায় বেঁধে মেরে ফেলা? তাকেই আন—নিয়ে এস, আমি চলে যাচ্ছি এখুনি—'

সুখেনের মুখ সহসা একটু উজ্জ্বল দেখাইল এবং তাহা দেখিবামাত্র সরলা নিস্তব্ধ হইল, তারপরেই বিছানায় লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সুখেন ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

শ্যামল বৈকালে বাড়ী ফিরিল। রাত্রে শুইবার আগে গিরিবালাকে দত্ত-বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া আসিয়া মেজ-বৌ বড়-বৌয়ের ঘরের দিকে গেল। পরশমণি নিজের ঘরে আসিতে আসিতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন, বিশাল ঘরের মধ্যে ধুনাচিতে নূতন ধূপ-ধুনা দিতেছে, মেজ-বৌ আধ-ঘোমটা টানিয়া ঘরের মধ্যে ঘোরা-ফেরা করিতেছে, গ্লাসে, বাটিতে কি কি সব আনিয়া থালা ঢাকা দিয়া রাখিল, আবার নিজের ঘরে গিয়া একখানা পাখাও লইয়া আসিল। ওদিকে ঘুমভাঙ্গা মেয়ের কান্না থামাইবার জন্য শ্যামল কোলে করিয়া বেড়াইতেছে—

পরশমণি বারান্দা ঘেঁষিয়া ছায়ান্ধকারে দাঁড়াইয়া রহিলেন, মেজ-বৌ এক কলসী জল ও একটা ঘটি আনিয়া বিশালের বারান্দায় রাখিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল—পরশমণি আগাইয়া গিয়া বলিলেন, 'মেয়ে কেঁদে খুন হল, করছ কি তুমি?'

'জল রেখে গেলাম, দিদির জরটা বড্ড বেড়েছে, মাথা ধুইয়ে দিতে হবে বোধ হয়।' মেজ-বৌ নিজের ঘরে ফিরিয়া গেল। পরশমণি চুপি চুপি বলিলেন, 'বড়-বিবি না মেজের ভাত? আজ সারা দিনটা দেখছি, খাটে শুয়ে রয়েছে, বিশু থাকবে কোথায়?'

মেজ-বৌ বিরক্তি চাপিতে না পারিয়া তিক্ত স্বরে বলিল, 'ঠাকুর, যা কে কোথা শোবেন না শোবেন, তার খোঁজ নিয়ে বেড়াব আমি? কি যে বলেন মা'—বলিয়া মেজ-বৌ চলিয়া গেল।

ইহার পরে মেজ-বৌয়ের দরজা বন্ধ হইল। বিশালও দরজা বন্ধ করিল। সুখেনের ঘর হইতে সরলার রুষ্ট তর্জ্জন ও মাঝে মাঝে চাপা কান্নার শব্দ শোনা যাইতেছে। পরশমণি নিজের বারান্দায় নিঃশব্দে বসিয়া আছেন। ক্রমশঃ চারিদিকের শব্দ-সাড়া থামিয়া রাত্রি গভীর ও নিস্তব্ধ হইতে লাগিল।

আস্তে উঠিয়া পরশমণি সোনা সেখের বাড়ীর দিকে তাঁর নিজের খাটের পথে চলিলেন, ঘাট হইতে বাঁ দিকে রান্নাঘরমুখো ফিরিয়া বিশালের ঘরের পিছনে দাঁড়াইয়া বেড়ার ফাঁক দিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। বিশাল তখনও শোয় নাই, বাটী হইতে ঝিনুক করিয়া বড়-বৌয়ের মুখে কি দিতেছে, জলের গ্লাস লইয়া দু'তিন ঝিনুক জল দিল, গামছায় মুখ মুছাইয়া দিল, মাথায় বালিশগুলি ঠিক-ঠাক করিয়া দিল, গায়ের কাঁথাটি টানিয়া গলা পর্য্যন্ত ঢাকিয়া দিয়া নিজের পানের ডিবাটি হাতে বড়-বৌয়ের কাছে বসিল। ডিবা খুলিয়া নিজের মুখে দুটি পান পুরিয়া আর একটি বড়-বৌয়ের মুখের কাছে ধরিল, বড়-বৌ মাথা নাড়িয়া অস্পষ্ট স্বরে কি বলিল, বোঝা গেল না। বিশাল ছাড়িল না, পানটির খানিকটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সেটা বড় বৌয়ের মুখে দিয়া দিল। এলোমেলো রুক্ষ চুলগুলি গুছাইতে গুছাইতে একবার বড়-বৌয়ের গাল দুটি টিপিয়া দিল।

পরশমণির চক্ষে পলক নাই, একবার একবার চোখ মুছিয়া দেখিতেছেন, স্বপ্ন কি না! আদর তিনি চেনেন না? বিশাল যে বড়-বৌয়ের গা-মাথায় হাত বুলাইয়া মুখের দিকে পলকহীন চোখে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছে, মাথা টিপিয়া দিতেছে, গায়ের কাঁথা ঠিক করিয়া দিল, এ যদি যত্ন-আদর না হয়, তবে যত্ন-আদর কাকে বলে? কিন্তু পৃথিবী কি উল্টাইয়া গেল?

মনের দাবদাহে জ্বলিতে জ্বলিতে পরশমণি অর্দ্ধদগ্ধ ভাবে কেমন করিয়া যে নিজের বিছানায় আসিয়া পড়িলেন, তা তিনি নিজেই জানেন না।

[১৮]

'প্রেম সখী লুকালো কি যায়?'

বাড়ীর হাওয়া ঘুরিয়া গিয়াছে, দক্ষিণমুখো বাতাস হঠাৎ উত্তর দিকে বহিতেছে। ফুলের বাগান হইতে কারখানার মধ্যে গিয়া পড়িলে যে দশা হয়, সুখেনের তাই হইল। পুষ্প-সুরভি কখন মিলাইয়া গিয়াছে, এখন সামনে কঠোর যন্ত্রাদির অপ্রিয় কর্কশ শব্দমিশ্রিত কটু গন্ধ! কয়েক দণ্ড পরে মনের কোথাও সে ফুলের স্মৃতিটুকু খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

সরলা কোনই কেলেঙ্কারী করে নাই, পাড়ার লোককে কিছু জানিতে দেয় নাই, যা হইয়াছে সবই চুপে চুপে। আর এই প্রথম, সুতরাং তিন চার দিন পরে সে আপনিই স্থির হইল। আর যে মানুষ গালাগালি করিলেও কথা কয় না, তার সঙ্গে বোঝা-পড়া করিবে কে?

দুপুর বেলা সুখেন খাইতে বসিয়াছে, মেজ-বৌ পরিবেশন করিতে করিতে বলিল, 'কেমন দেখে এলে ওদের?'

ঘরে কেহ নাই, সুখেন বলিল, 'দেখবার আর কি আছে? তোমাদের দেখতে চাইলে।'

'আমাদের? এ মুখ তাকে না দেখানই ভাল, একটু খোঁজ-খবর নিয়ো, কোন সম্বল ত' নেই তাদের—'

'না, সবই শাশুড়ী ধরে দিয়েছিলেন—'

'তা হলে পঞ্চমীর জমিটা তাদের ফিরিয়ে দিলে হয় না?' কথাটা বলিয়া একটু কুণ্ঠিতভাবে মেজ-বৌ চাহিল, কি জানি সুখেন কি ভাবিবে!

উত্তরে সুখেন বলিল, 'আমি সেই চেষ্টায় রয়েছি, জমি ফিরিয়ে দিয়ে লাভ নাই, এত দূর থেকে তারা ফসল নেবে কি করে। জমিটা বেচে ফেলে টাকাগুলো দিয়ে আসব—'

'আর দুটি ভাত দিই? কি রে সরি, বড়দি কি বললে?'

'আমি ঘরে যেতে পারলাম না, বটঠাকুর দিদির মাথা ধুইয়ে দিচ্ছেন, একটু পরে আবার জেনে আসব—'

পরশমণি স্নানান্তে কেবল উঠানে পা দিয়াছেন, তাঁর পাড়া-চমকানো স্বর আকাশ উঠিল, 'শুধু মাথা ধোয়ানো? দেখে আয় গে তোরা দেখে আয় গিয়ে নিজের চক্ষে, চুল আঁচড়ে দেওয়া হচ্ছে, ধোয়া কাপড় কুঁচিয়ে বিছানায় রেখেছে, বিবি পরবেন, বিশু বিশুর এমন দশা দেখতে হল আমাকে, কি ওষুধ খাইয়ে আঁটকুড়ী এমন বশ করলে? এও আমার কপালে ছিল, এ আমি সইতে পারি নে, কিছুতেই না, শুধু তুই আমার নবদ্বীপ রেখে আয়, কত পাপ করেছি যে—'

পরশমণির কথাগুলি যেন হাহাকারের মত শুনাইল। নিজেই স্বীকার করিয়া ফেলিলেন যে, পাপ করিয়াছেন। কত দুঃখে যে এমন কথা তাঁর মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে, সে ভগবানই জানেন।

সুখেন উঠিয়া গেলে মেজ-বৌ বড়-বৌয়ের শিউলী পাতার বড়া, সুক্তো, সুজির রুটি, দুধ সব একটা থালায় গুছাইল, দুধটা আর একবার গরম করিয়া লইল। সরলা বলিল, 'আচ্ছা মা অমন করছে কেন? বটঠাকুর কি দিদিকে আগে ভাল বাসতেন না?'

মেজ-বৌ বলিল 'দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না—'

'সে কি? কেন?'

'ঐ মার জন্তেই।'

'তবে আবার বদলালেন যে?'

'মানুষের মন ত', কত আর অন্যায় করতে পারে। নিজের দোষ বুঝেছেন এখন—'

'মার এ ভারি অন্যায়, বড়-দির মতন মানুষকে কেউ না ভালবেসে পারে? আচ্ছা, তোমাকে আমাকে এ সব নিয়ে কিছু বলেন না?'

'বলেন না আবার। আমায়ও অমনই বলতেন তবে ইনি মানলেন না কি করবেন? তোর বরাত ভাল মার নজরে পড়েছিস '

'কি জানি, কাজ কর্ম্মে তুমি-আমি তেমন নই—তবু?'

'কাজের জন্তে না, তুই আমি সুন্দরী নই—তাই, সুন্দরী হলেই হয়েছিল আর কি, মা ভাবে সুন্দর বৌয়ের বশ হলে ছেলেরা একেবারে গোল্লায় যাবে—'

সরলার মুখ ম্লান ও গম্ভীর হইয়া গেল, এ সত্য সে খুবই জানে! সতীনের রূপের খ্যাতি আজও লোকের মুখে মুখে, মা তাকে দূর করিয়াছেন বটে, কিন্তু

অনাত্মীয়েরা যার কথা আজও ভোলে নাই, যার স্ত্রী সে কি করিয়া ভুলিবে? যার দূরদৃষ্টি আছে, কিন্তু এই রূপের আকর্ষণ ঠেকাইবার সাধ্য কি কাহারও হইবে?

ঝড় উঠিবে বলিয়াই যত ভয়, যত সাবধানতা, যত সতর্কতা। ঝড় উঠিলে আর কি? তখন হতাশ হইয়া দেখা ভিন্ন উপায় নাই। পরশমণি অন্তরে বাহিরে জ্বলিতে জ্বলিতে কখনও কাঁদিয়া ফেলিতেছেন। কখনও তীব্র অভিশাপ, কখনও যাচ্ছেতাই গালাগালি। দিনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও সহিয়া আসিতে লাগিল। না সহিয়া উপায় কি? তবু একটা অভিসন্ধি তাঁহার মনে উঠিয়াছে—বিশাল যদি আর একটি বিয়ে করে, তবে সবদিক রক্ষা হয়; না হইলে, বাঁদী যে খাটে বসিয়া তাঁহাকে চাহিয়া দেখে, এ সওয়া যায় না। বিয়েটা করিলে, পোড়া-কপালীর উচিত-আক্কেল হয়, যেমন সেই ছোট-বিবির হইয়াছে। রূপের গরবে মাটীতে পা দিত না, সারাদিন কেবল দিদি আর দিদি! রাত্তিরে পায় তেল দিতে আসিয়া তিন মিনিটে উঠিয়া পালাইত, এখন কেমন? নাকের জলে ভাসিতে হইতেছে। বড়টারও এ দশা হইলে তবে মনের খেদ মেটে।

যেমন সঙ্কল্প অমনি কাজ, পরশমণির ডাক পাইয়া ভাইটি আসিয়া উপস্থিত।

বিশাল বলিল, 'মামা, এ সব কথা কি আপনার মুখে মানায়! কোন কারণেই স্ত্রীকে আর কষ্ট দেব না, এ প্রতিজ্ঞা করেছি। যে মহাপাপ করেছি, বাকী জীবনটা যদি তার প্রায়শ্চিত্ত করতেও পারি, তবু অনুতাপ যাবে না। সুখেনের যা সর্ব্বনাশ করেছেন, সেই-ই যথেষ্ট, আর কেন? আপনি গুরুজন—অসম্মান করি নে, কিন্তু কোন দিন যেন আর এ সব কথা না শুনি!

নকুল-মামা লেজ গুটাইয়া প্রস্থান করিলেন।

পরশমণি গাহিতে লাগিলেন, 'ওরে আমার ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির! ইস্তিরিকে কষ্ট দেবেন না!—মাথায় তুলে নাচবেন! মামা গুরুজন—বুড়ো মানুষটা, তার মুখের উপর কি বলে বললি যে, 'পেরাচিত্তির করচি',—কর পেরাচিত্তির কর্। তোর ইষ্টি-দেবীর চরণে মাথা মুড়িয়ে পাদোক খা। গোল্লায় গেল—গোল্লায় গেল, সবগুলো এক পথ ধরলে, রং ধুয়ে ধুয়ে জল খাবে। ভদ্দর ঘরের বৌ, বাঈজীর মতন রং হলে মানায়? না সৎপথে থাকে? তা মুখ্যুরা বুঝবে না।'

বিশাল চিরদিন মাতার অনুগত। ব্যবহার তার তেমনই, মায়ের কথার জবাব কেউ দেয় না। তবে সুখেন যেন ইদানীং একটু অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে। যে কথায় বিশাল উত্তর দেয় না, যেন শোনেই নাই, সেই কথায় সুখেন বিষম চটিয়া যায়। মুখে সে আজও প্রতিবাদ করে নাই, কিন্তু চোখ-মুখ দেখিলেই বোঝা যায়, আরও বোঝা যায় যে, বেশীদিন সে সহিবে না। হয়ত একদিন মুখোমুখি ঝগড়া বাধাইয়া দিবে, এমনই মারমুখী ভাব।

পরশমণির ঘরেও শান্তি নাই, বাহিরেও না। আজ কাল মনের জ্বালা ভুলিবার জন্য সারা দিনই প্রায় পাড়ায় থাকেন। যখনই বাড়ীতে পা দেন, একটা না একটা চোখে পড়িবেই। হয়ত, বিশাল ঘরে বসিয়া স্ত্রীর সহিত কথা বলিতেছে, কিংবা বড়-বৌ হয়ত কাজ করিতেছে—বিশাল অতর্কিতে আসিয়া মাথার কাপড়টা ফেলিয়া দিয়া গেল, না হয়, চিরুণী লুকাইয়া রাখিয়াছে, তাই লইয়া দুজনে তর্ক হইতেছে। খাইতে বসিয়া প্রকাশ্যে কথাবার্ত্তা কয়, লজ্জা-সরম নাই। বড়-বৌয়ের মাথার কাপড় এখন অনেকটা উঠিয়া গিয়াছে, মাথার মাঝামাঝি থাকে সিন্দুর স্পষ্ট দেখা যায়! হতভাগীর বুকের বল বাড়িতেছে। সিঁথির সিন্দুর অপরের দেখিতে পাওয়া ভারি অলক্ষণ! তা কে মানে? মেজ-বৌয়ের ও শ্যামলের বেহায়াপনা দেখিয়া দেখিয়া সহিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহাদের কার্য্য-কলাপ চোখে লৌহশলাকার মত বেঁধে। পাড়ায় পাড়ায় বলিয়া বলিয়া পরশমণির মনের দুঃখ আর মেটে না।

রায়-বাড়ীতে পা ছড়াইয়া বসিয়া পরশমণি তামাক-পোড়ার গুঁড়াটুকু দাঁতে দিতে দিতে বলিলেন, 'বলব কি সেজ-বৌ, তোরা ত' সবই জানিস, আজকাল যেন বিবির নতুন বিয়ে হয়েছে এমনিভাব। চুল আঁচড়ান, নিত্যি সাবান দিয়ে চান করা—দুদিন পরা হলেই সে কাপড়ে অমনি সাবান সোডা দেওয়া, দেখে আর বাঁচি নে। আর ঐ ছুঁচো—হলই বা পেটের ছেলে,—তোরা ত' পর নোস্

তোদের কাছে সত্যি বলব—এই হাটে হাটে সাবান, আলতা, গামছা, চুলের ফিতে, কাঁটা—রকম-বে-রকম পেড়ে কাপড় আনা চাই-ই। তা বেশ, আনলি আনলি, চুপে চুপে দে—তা নয়, হাট থেকে বাড়ীতে পা দিয়েই—'ওগো এসো গো, শুনে যাও আগে', এই ডাকাডাকি—ছোট ভাই দুটো, ছোট ভায়ের বৌ—তা কোন জ্ঞানগম্যি নেই, কামলারা অবধি মুখ চেপে চেপে হাসে, লজ্জায় মরে যাই ভাই—আর সেয়ানা বিবিও এমন, কিছুতে যদি আসে, আদর বাড়ায়—'

সেজ-বৌ হাসে, বড়-বৌ তাহারই সমবয়সী। বিশালের রুদ্ধ বাঁধের মুখ খুলিয়াছে, কিন্তু বড়-বৌ আত্মহারা হয় নাই। সে যেমন তেমনই শান্ত, ধীর, কর্ম্ম-পরায়ণা, নিরলসা। এই যে তার প্রসাধন, এ সবও সেজ-বৌদেরই উপদেশে। তা ভিন্ন বিশাল ভালবাসিয়া যাহা আনিয়া দেয়, কেন সে ব্যবহার করিবে না!

মুখে বলিল, 'সত্যি দিদি, এ-কালের বৌ-ঝিদের সঙ্গে আপনি পেরে উঠবেন কেন? দেখুন তো আপনার এতখানি বয়স হল মাথার কাপড়টি কখন পড়তে দেখলাম না—আপনার বাঁ পায়ের সমান হতে পারবে কেউ?'

পরশমণি গলিয়া দ্রবময়ী। সেজ-বৌ এবং ও-পাড়ার পুণ্য রায়ের বৌ এই দু'জনের মত বৌ কোথাও নাই। সবদিকে এরা সমান গুণবতী। পুণ্য রায়ের বৌ এত লজ্জাশীলা যে কেউ এ পর্য্যন্ত তাঁর মুখ দেখিতে পায় নাই। আর পুণ্য রায়ের সংসারটিও খুব ছোট, এক ছোট ভাই স্ত্রী-পুত্রসহ বিদেশেই থাকে, নিজের ছেলেপিলে লইয়াই সংসার। আর সেজ-বৌ বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারের কর্ত্রী—ভাসুর, দেওর, মা', ননদ, ভাগনে, ভাগ্নী, ভাগ্নে-বৌ ভাসুর-ঝি, ভাসুর-ঝিদের ছেলেমেয়ে প্রভৃতি। কেহ বলিবে না, সেজ-বৌ একে কম দেখেন, ওকে বেশী দেখেন।

পাড়াশুদ্ধ সেজ-বৌয়ের ভক্ত, পরশমণিও। সেজ-বৌ পাকা গাছপান ভালবাসে, পরশমণির চোখে পড়িলেই গাছ হইতে পাকা পানগুলি ছিঁড়িয়া রাখেন এবং সেজ-বৌকে দিয়া আসেন। সেই পান সাজিতে সাজিতে সেজ-বৌ বলিল, 'ও সব আপনি দেখবেন না দিদি—ওরা যা খুসী করুক গে—'

'তাই করি—তবে যখন অসহ্যি হয় তোদের এখানে আসি। তুই কি বৌ নস? না সেজকর্ত্তা তোরে ভালবাসে না? কৈ তোরা ত অত ঠমক করিস নে? যে ভাল, সবাই তাকে ভাল বলে।'

পরদিন স্নানের ঘাটে দেখা হইলে সেজ-বৌ বড়-বৌকে বলিল, 'হ্যাঁ রে স্বর্ণ, ভাসুরপোকে একেবারে বশ করে ফেললি কি ওষুধ দিয়ে রে?'

বড়-বৌয়ের মুখে হাসি ফুটিল, 'খুড়িমা, তোমাদের দেখে দেখে—'

ঘাটশুদ্ধ সকলে হাসিতে লাগিল। সেজ-বৌ বলিল, 'তা বেশ করিছিস, শিখবি বই কি! তা একটু আড়ালে আদর সোহাগগুলো করতে পারিস নে? না একেবারে শাশুড়ীর চোখের ওপর?'

হাসিতে বড়-বৌয়ের স্নান-ধৌত মুখ দীপ্ত দেখাইতে লাগিল, সেজ-বৌ হাসিতে হাসিতে বলিল, 'আর ও মুখখানি দেখে আমরাই চোখ ফেরাতে পারি নে, বিশালের দোষ কি বল?'

বেলা তখন আটটা, এ সময় ছোট বৌ-ঝিদেরই রাজত্ব। সেজ-বৌয়ের কথায় সরলা বলিল, 'দিদি করবেন কি, বটঠাকুর কেবলি ডাকাডাকি করেন, দিদি ত সাড়াই দেন না—'

'দেখ, আমার কথাগুলো ফলল কি না, সবদিন কি সমান যায়, তা অত সাবান আলতা করিস কি? আমাদের ত এক শিশি আলতায় দু'মাসের ওপর যায়, এক বাক্স সাবান দেড় মাস—'

সরলা বলিল, 'মা যা বলে সব বিশ্বাস করেন বুঝি? বটঠাকুর মাসে এক বার করে ওগুলো আনেন, তিন প্রস্থ আনেন, আমাদের তিন জনার, মার কথার চার ভাগের এক ভাগ ধরবেন—'

'তা তুই সুনজরে পড়েছিস, তোর কপাল ভাল, তোর কিছু বলবার নেই শাশুড়ীর বিরুদ্ধে—'

'আমার কথা বলছি নে, তবে যা বললাম সত্যি—'

মেজ-বৌ বলিল, 'সরলা স্পষ্টবাদী মেয়ে, আমরা এখনও পর্য্যন্ত ভয়ে মরি—'

'ঐ করেই তোমরা গেলে, কেন, ভয় কিসের? বিয়ে

করে আনে নি ধর্ম সাক্ষী করে? মুখ বুঁজে সইব কেন? তবে অন্যায় করি যদি দশটা বকুনি দিন, তা নয়, শুধু শুধু সারাদিন যা-তা বলবেন আর মেনে নেব? যেমন বড়-দি তেমনি মেজ-দি, যেন কেনা দাসী; ওরা ও রকম করে থাকে বলে মা আরো সুবিধে পান—'

সেজ-বৌ অবাক হইয়া সরলার কথা শুনিতে লাগিলেন। সেজ-বৌয়ের সঙ্গে পাড়ার বৌ-ঝিদের দেখা সাক্ষাৎ হয় কম, গিন্নীরাই বেড়াইয়া বেড়ান, কিন্তু বৌদের বেড়ান নিয়ম নাই। তবে পাড়ার মধ্যে মাসে দু'এক দিন যাওয়া আসা চলে। সেজ-বৌ নিজেদের পিছন দিকের ঘাটে স্নান করেন, সে দিকে লোকজন নাই, অবারিত খোলা মাঠ বর্ষায় সাগর হইয়া দাঁড়ায়। আর যে দিন সময়টা বেশী থাকে, কাজের ভিড় কম, সেই দিন এই দিক্‌কার ঘাটে আসেন, সবার সঙ্গে দেখা হয়।

সরলাকে দেখিলেই সকলের পঙ্কমীর কথা মনে পড়ে। যতক্ষণ সেজ-বৌ সরলার কথা শুনিতেছিল, অজ্ঞাতে সরলার মুখের সঙ্গে পঙ্কমীর চেহারার তুলনা করিয়া দেখিতেছে, সে মুখ এমন উজ্জ্বল, কি সুন্দর দুটি কালো চোখ, ঠোঁট দুটি সব সময় একটু আদর ও অভিমানে ভারি ভারি, বাঁশীর সুরের মত মিষ্টি গলার সুর, হাসিটি কাণে লাগিয়া আছে, এমনটি যে, আর দেখা যায় নাই, পূর্ণিমার জোছনা করে মিলাইয়া গেছে, কিন্তু মনে ছাপ রাখিয়া গিয়াছে।

কিন্তু সরলার মুখও তুচ্ছ করিবার নয়, জলে ভিজিয়া ঝকঝকে চোখ দুটির পক্ষ আরও কালো দেখাইতেছে, ভ্রূ দুটি উপর দিকে টানা, এ ধরণের ভ্রূ যাদের তারা অত্যন্ত দৃঢ়চিত্তা হয়, পাতলা ঠোঁট দুটি পানের আভায় তখন একটু লাল আভা, ঝকঝকে সুগঠিত দাঁতের সারি, জলে ধুইয়া মুখখানা কচি পাতার মত সুচিকণ সমুজ্জ্বল। সেজ-বৌ নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিল, 'হতভাগার বৌ-ভাগ্যি আছে—'

আশ্বিনের জল পুনরায় বাড়িয়া কার্ত্তিকের শেষ পর্য্যন্ত সমান রহিয়াছে। তবে এখন একেবারে নিস্তরঙ্গ শান্ত, এই বার টান ধরিবে। তখন এ আনন্দমেলা ভাঙিয়া যায়। আজ যেখানে সাঁতার জল, শীত কালে এইটাই প্রধান হালট।

মিত্রী-বাড়ীর বৌয়েরা আগে উঠিয়া গেল। তার পরে সেজ-বৌ যাইবার সময় বলিল, 'সরি, এক দিনও আসিস্ নি এ বাড়ী—সেই পুজোর নেমন্তন্ন ছাড়া, এক দিন বেড়াতে আসিস।'

সরলা নিজেদের ঘাটে দাঁড়াইয়া মাথা মুছিতে মুছিতে বলিল, 'আর আপনি যে এক দিনও আসেন না।'

সেজ বৌ হাসিয়া বলিল, আমি একা একদণ্ড কোথাও গেলে চলে না রে, সবাই যদি বাড়ী আসত, দেখতিস রোজ যেতাম। মেজো-ঠাকুর অনেক দিন ধরে ভুগেছেন, চাকরী ছেড়ে দিয়ে বাড়ী এসে থাকবেন। আর বিদেশে থাকাই বা কেন, একটি মোটে ছেলে, কার জন্যে এত খাটুনি। বাড়ী এলে তিন দিনে সেরে উঠবেন, এমন জল হাওয়াটি কোথাও নেই। মেজদি আসুক তখন দেখিস রোজ যাব।'

সেজ-বৌ গেলে দত্ত-বাড়ীর বৌয়েরাও একে একে উঠিল। সবচেয়ে বড় কলসীটা, যেটা বড়-বৌএর নিজস্ব ছিল সেটা এখন সরলার। সেই প্রকাণ্ড জলভরা কলসীটা কক্ষে লইয়া এক হাতে বালতী-ভরা এক গাদা ধোয়া কাপড়—সরলা স্বচ্ছন্দ লঘু গতিতে উঠিয়া গেল। মাঝারি কলসীটা বড়-বৌয়ের, সব ছোটটি মেজ-বৌ।

[১৯]

'বিরহে হৃদয়—বলিতে যে সব কথা'

বাড়ীতে ঘর দুখানি। দুখানিই ছোট, একটিতে পঙ্কমীর মা পঙ্কমীকে লইয়া থাকেন। আর একটি মেয়ে-জামাইয়ের জন্য। সুখেন এখন প্রায়ই আসে। সরলার ভাইয়ের বিবাহ গিয়াছে, মাস খানেক হইল—এ-মাসটা সুখেন এখানেই কাটাইয়াছে। পঙ্কমীর মা যতটুকু না করিলে নয়, ততটুকুই দেখাশোনা করেন। কিন্তু পঙ্কমী হারানো দিন ফিরিয়া পাইয়াছে। আজকাল তার মনে হয়, কাঞ্চন-পুরের চেয়ে এখানে সে সুখী, এই বিচ্ছেদটা না ঘটিলে কি সে সুখেনের মূল্য বুঝিত? নিতান্ত সুলভ, হাতে পাওয়া জিনিষের মতই তাদের কাঞ্চনপুরের ব্যবহার ছিল, এখানকার এই আবেগ-আকুল প্রতীক্ষা-মিলনের মধুর আনন্দ, বিচ্ছেদের দারুণ ব্যথা—মুহুর্মুহু নব নব ভাবের

মধুর তরঙ্গে অন্তর ভরা—ইহার সহিত পরিচয় কোন দিন ছিল না। আগে যখন সুখেন পঞ্চমীকে লইয়া যাইতে আসিত, তখনও প্রতীক্ষা, কিন্তু সে প্রতীক্ষায় আর এই প্রতীক্ষায় আকাশ-পাতাল প্রভেদ। দিদিদের কথা প্রথম প্রথম খুবই মনে পড়িত, বড় কষ্ট হইত। সেই যখন সুখেন আসে নাই, সেই কয়েক মাস। এখন প্রতি সপ্তাহে সুখেন একবার করিয়া আসে। সাতদিন সেই একই ভাবনা, একই চিন্তা, একই প্রতীক্ষা, মনে অন্য কিছুর স্থান নাই।

মেয়ের ধরণ-ধারণ দেখিয়া মা অসন্তুষ্ট, মুখে কিছু বলেন না, মেয়ে মনে দুঃখ পাইবে; কিন্তু এ কাঙ্গালপনা তাঁহার অসহ্য, এত সুলভ হইয়াছিল বলিয়াই না এই দশা!

মার মনের ভাব পঞ্চমী বুঝিতে পারে, তবে তার উচ্ছ্বসিত ভালবাসার মুখে কোন বাঁধই মানে না, তথাপি একটু সংযত ভাবে থাকে। মা যখন এদিক ওদিক থাকেন কিংবা পূজায় বসেন, সেই সময়টুকুর মধ্যে সে ঘরখানি ঝাড়িয়া মুছিয়া ফিটফাট করে। বেড়াটা যেখানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সেখানে পুরানো ক্যানেস্তারা টিন কাটিয়া লাগাইয়া দেয়, তার উপর কাগজ। বিছানার কাছে টুলের উপর কাঁসার গ্লাসে পাতাশুদ্ধ ফুলের ঝাড়, দেশী সুগন্ধ ফুল। ডিবা সিন্দুকে তোলা, রেকাবীতে পান রাখিলে শুকাইয়া যায়, ছোট একটা কাঁসার বাটিতে সাজা পান ভরিয়া কয়েকটা সুগন্ধ ফুলের পাপড়ি ছড়াইয়া রেকাবী ঢাকা দিয়া রাখে। নিজেরই রঙ্গীন ছেঁড়া কাপড়ের টুকরা টুলটার ঢাকনী। পঞ্চমীর পিতার সময়কার বহু চেয়ার, টেবিল, লণ্ঠন, ঝাড়, টুল, টিপয়, বাক্স, আলমারী সবই পঞ্চমীর মা জ্ঞাতি-সরিকদের বিলাইয়া দিয়াছেন। কিছু কিছু জামাইয়ের জন্য রাখিয়াছিলেন, সুখেন দ্বিতীয় বিবাহ করিবার পর হইতে সে গুলি জীর্ণ দশা পাইতেছে। রূপা, কাঁসা, পিতল, আধুনিক কাচ, এনামেল ও চীনামাটীর বাসনপাত্রও কম ছিল না—কতক মেয়ের শ্বশুরবাড়ী, কতক বিতরণে ফুরাইয়াছে। যা দু' চারখানা আছে সেও বাক্সের কোণে। বড় বড় ঘর দুটি বেচিয়া ফেলিয়াছেন। এখন সেই শূন্য ভিটায় সবুজ রঙের শাক-সবজীতে ভরা। পঞ্চমীর বিবাহ দিয়া যখন এই রূপে তিনি নিজেকে সংসারের জালমুক্ত করিতেছিলেন, সেই সময়েই সে ফিরিয়া আসিয়া সব মাটী করিয়া দিল।

পঞ্চমীর বড় সাধ, সেই বিবাহের পর মা যে বিছানা, ঢাকনি, টেবিল-ক্লথ, ঝালর-দেওয়া বালিশ দুটি, নূতন ছিটের মশারী সব দিয়াছিলেন—সে গুলি আবার দেন—সে গুলি এখনও আছে বিলাইয়া দেন নাই, কিন্তু মার মুখের ভাব দেখিয়া চাহিতে সাহস হয় না। অগত্যা নিজের সাধ্যমত যা, তাই গুছাইয়া রাখে।

সন্ধ্যায় চারিদিক্‌কার অপূর্ণতা পূর্ণ করিয়া পঞ্চমীর মন স্বপ্ন-জগতে বিচরণ করে। খোঁপায় ফুলের মালা জড়ানো, দেশী তাঁতের নীলাম্বরী কাপড়টি পরা, কপালে সিঁদুরের টিপ। মা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া সন্ধ্যা-জপ করেন। পঞ্চমী উঠানের কোণের শিউলী ফুলের গাছতলাটিতে মোড়া পাতিয়া বসিয়া থাকে; দু'একটা করিয়া ফুল ঝরিয়া পড়ে—পঞ্চমীর খোঁপায় আটকাইয়া যায়। কোন দিন একটু রাত্রি বেশী হয়, বাতাস স্নিগ্ধ ও উতলা হইয়া ওঠে, চাঁদ মাথার উপর হইতে জ্যোৎস্না ঢালিয়া দেয়। নারিকেল ও সুপারী গাছের দীর্ঘ সবুজ পাতাগুলি জ্যোৎস্নায় দুলিতে থাকে। সমস্ত প্রকৃতির শান্ত-শ্রী ও নৈশ রহস্যের সঙ্গে পঞ্চমী যেন মিলাইয়া যায়, সে যেন পৃথিবীর মানব-দুহিতা নয়—রাত্রি-প্রকৃতির একজন রহস্যময়ী সঙ্গিনী।

সদর দিয়া যে কেহ আসুক, পঞ্চমীকে দেখা যায় না। কিন্তু পঞ্চমী স্পষ্ট দেখিতে পায়। নৌকা ঘাটে লাগিল, দুতিন জন লোক উঠিয়া আসিল। দু'জন পূর্ব্ববৎ নিজেদের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। একজন অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে ধীরে ধীরে পঞ্চমীর মায়ের ঘরের সামনে গিয়া দাঁড়াইল; পঞ্চমী দেখিল, এ সুখেন নয়; কিন্তু কতকটা তারই মতন। তার চেয়ে লম্বা-চওড়া দেহ, এই চলন, এই ধরণ পঞ্চমীর অত্যন্ত পরিচিত। মনে আছে, কিন্তু মনে পড়িতেছে না। আর একবার চাহিয়া দেখিয়াই স্পষ্ট চিনিল—এ তার বড় ভাসুর, অকৃত্রিম পিতৃস্নেহ সে যাঁর কাছে পাইয়াছিল—

শশব্যস্তে মাথায় ঘোমটা টানিয়া পঞ্চমী উঠিয়া নিজের ঘরে গেল। একটা মোড়া আনিয়া বিশ্বাসের সামনে

রাখিয়া মাটীতে লুটাইয়া প্রণাম করিয়া মায়ের ঘরে প্রবেশ করিল, মাকে জানাইয়া ও-দিকের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল। সুখেনের জন্ম প্রতীক্ষা-ব্যাকুলতা নিমেষে ভুলিয়া গৃহিণীর মত অভ্যাগতের জন্য, কন্যার মত পিতার জন্ম, আয়োজন উদ্যোগে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। মায়ের অপেক্ষা রাখিল না।

সুখেন বাড়ীতে ঢুকিয়া এ ঘরের সামনে আর আসে না। সোজাসুজি নিজেদের ঘরে যায়। যে দিন সে আসিবে পঞ্চমী জানে, সবই ঠিকঠাক থাকে, শ্যালীরা জানে, তারাও আসে। শাশুড়ীর সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয় না। দৈবাৎ দেখা হইলে একটা প্রণাম, তাও আশীর্ব্বাদ-হীন।

মা কন্যার শ্বশুর-বংশের উপর বিরূপ; তথাপি বিবেক-বুদ্ধি সাড়া দিল; ধীরে ধীরে অনিচ্ছুক নিস্পৃহভাবে ঘর হইতে বাহির হইলেন, দেখিলেন, শূন্য উঠানে বিশাল একা বসিয়া, দুই হাতে মুখ ঢাকা।

সহসা এই লজ্জা-বিপন্নতা পঞ্চমীর মায়ের অসাড় কঠিন চিত্তকে বিচলিত করিয়া তুলিল। যত্নে বাঁধ দেওয়া অপরিসীম ব্যথার সাগর উছলিয়া উঠিয়া অশ্রুর উচ্ছ্বাসে চোখের চাহনি অন্ধ করিয়া দিল। সাবধানে চোখ মুছিতে মুছিতে ধীরে ধীরে নামিয়া বিশালের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। পিঠের উপর হাত রাখিয়া বলিলেন, 'ওঠ বাবা, ঘরে এস—'

বিশালের হাত ধরিয়া তুলিয়া ঘরে আনিয়া বসাইয়া নিজে বারান্দায় আসিয়া একটা খুঁটি ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইহাদের এই আগমন তাঁহার একান্ত অসহ্য। সুপ্ত বেদনা ইহারা জাগাইয়া দেয়।

খানিকক্ষণ পরে মন সুস্থির করিয়া পঞ্চমীর মা ঘরে গেলেন। বিশাল চুপ করিয়া স্থির হইয়া বসিয়াছে, শুধু লজ্জা নয়, গভীর বিষাদে তাহার মুখ অন্ধকার।

কপাট ঠেস্ দিয়া পঞ্চমীর মা চৌকাঠের পাশে বসিয়া রহিলেন। কয়েক মিনিট পরে বিশাল বলিল, 'মা আপনাকে কথা দিয়েছিলাম, কিন্তু রাখতে পারিনি—'

পঞ্চমীর মা উঠানের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন, 'আমি জানি তোমার কোন দোষ নেই।'

'কে দোষী, কে নির্দ্দোষ তা আর বলবার মুখ রাখি নি, শুধু আপনাকে একটা প্রণাম করব—আর মাকে একবার দেখব, এই জন্যই এসেছি।' বিশাল উঠিয়া আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, 'তবে এখন আসি—'

'মা—রোসো, পঞ্চু নিজে রাঁধতে গেছে তোমার

বিনাবাক্যে বিশাল আবার বসিল।

পঞ্চমী দেড় বছর আগে যেমন ভাসুরদের রাঁধিয়া খাওয়াইত, তেমনই করিয়া সযত্নে বারান্দায় বিশালকে খাইতে দিয়া কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া পাতের দিকে নজর রাখিল।

খাইবার সময় বিশাল পঞ্চমীর মাকে বলিল, 'বৌমার নামে যে জমিটা কিনেছিলাম, সেটা বিক্রী করে টাকাটা বৌমাকে দিয়ে যাব। দরদস্তুর ঠিক হয়েছে। আমি নিজে যদি না আসতে পারি, সুখেনের হাতে পাঠাব।'

'না, দেওয়া জিনিষ আর ফিরে নেব না '

'মা, সংসার বড় কঠিন ঠাঁই, টাকা-পয়সার প্রয়োজন পদে পদে, আপনার নিজের প্রয়োজন সামান্য, কিন্তু বৌমা নিজের অর্থ থাকতে কেন কষ্ট করবেন? আপাততঃ জমাই থাক, দরকার হলে খরচ করবেন, আপনি না করুন বৌমা করবেন।'

যুক্তির সারবত্তা বুঝিয়া পঞ্চমীর মা নীরব রহিলেন।

সেদিন সুখেন আসিল না, কিন্তু পঞ্চমীর মনে কোন দুঃখ রহিল না। সুখেনের জন্ম সাজান ঘরের শিকল বন্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত ও মনে মায়ের কাছে বিছানায় আসিয়া শুইল ও মায়ের [illegible] হাতখানি রাখিয়া অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িল।

[২০]

'কেন অভাগীর মন হরিল সে জন—'

মাস দুই পরে বিশাল একদিন অনেক বেলায় বাড়ী ফিরিল, সুখেন সেদিন মাঠে যায় নাই, বাড়ীতেই ছিল। ক্রমে বিশালের জন্ম অপেক্ষা যখন উদ্বিগ্নতায় পরিণত হইল, তখন সে ফিরিল।

সন্ধ্যার আগে বিশালকে জামা-জুতা পরিয়া আবার বাহির হইতে দেখিয়া সুখেন মেজ-বৌকে গিয়া বলিল,

মেজ-বৌ আবার বড়-বৌকে বলিল, বড়-বৌ আসিয়া বিশালকে বলিল, 'তুমি আবার এ বেলা যাচ্ছ কোথা? ঠাকুর-পো চিলহাটি যাবে, দুজনে গেলে বাড়ীর কাজ চলে না, হঠাৎ কেউ এলে-টেলে বড় মুস্কিল, মা ত বাড়ীতেই থাকেন না।'

বিশাল বলিল, 'জমির টাকাটা বৌমাকে দিয়ে আসতে যাচ্ছি—'

'ও তুমিও চিলহাটি যাচ্ছ? টাকা সব পেয়েছ?'

'পেয়েছি—ও বেলা, সেইজন্তে অত দেরী হল আসতে। তা সুখেন যদি যায় সেই নিয়ে যাক, তাকে পাঠিয়ে দাও গে, আমি কাল পরশু যাব একবার।'

সুখেন আসিলে বিশাল বলিল, 'তা হলে তুই-ই নিয়ে যা। বৌমার মা নেবেন না, তবে তাঁর সামনে বৌমাকে দিস্। জমিটা বেচে প্রায় দেড় গুণ লাভ হয়েছে, সোনা-ফলা জমি, যাক লক্ষ্মীকে যখন অনাদরে ঠেলে ফেলে দিয়েছি তাঁর ধনসম্পত্তিও তাঁরই সঙ্গে যাক।'

মাথা নীচু করিয়া নোটের তাড়াগুলি ও খুচরা টাকা-পয়সা বাঁধা রুমালটা বিশালের হাত হইতে লইয়া সুখেন নিজের ঘরে গেল। দড়ি হইতে পাঞ্জাবীটা লইয়া দেখিল, ময়লা, তখন বাক্স খুলিয়া ধোয়া কাপড় জামা ও একটা গেঞ্জি বাহির করিল। বেশ বদলাইয়া জুতা পায়ে দিয়া মাথায় সিঁথি করিতে করিতে পায়ের শব্দে ফিরিয়া দেখে সরলা। সরলার মুখ চোখ লাল, উত্তেজিত, হাত বাড়াইয়া টাকার পুঁটলিটা ধরিয়া নিজের কাপড়ের আঁচলে শক্ত গিয়ো দিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, 'হচ্ছে কি? বড় আনন্দ করে সিঁথি-পাটি করা হচ্ছে সুয়ো রাণীর কাছে যাবে বলে? দাদা এল আমায় নিতে উনি মজা করে চললেন। বাপ রে! বাড়ীশুদ্ধ সব এক যুক্তি-বুদ্ধি। আমার ছেলেপিলে পথে বসুক, ওঁরা সর্বস্ব বিক্রী করে তাঁকে দিয়ে আসুন!'

বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিয়া সরলা ধপাস করিয়া বিছানায় লুটাইয়া পড়িল, 'আমি দেব না ঐ টাকা, আমায় মেরে ফেলে তবে নিয়ে যাক। সেই সব আমি কেউ নয়। ওমা, মাগো, এত আমি আর সইতে পারিনে, আমায় মেরে ফেলুক সবাই, তার পরে যে যা খুসী করুক।'

কান্না ও চেঁচানির শব্দে সুখেন সহসা হতভম্ব হইয়া গেল। কি বলিবে কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়া সরলার দিকে অগ্রসর হইতেই দেখিল, বিশালের বারান্দায় বিশাল এই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে, মেজ-বৌ, বড়-বৌও ভয়ে বিবর্ণ মুখে ঘরে আসিয়া ঢুকিল। পরশমণিও সবে-মাত্র বাড়ীতে পা দিয়াছেন, তিনিও ছুটিয়া আসিয়া পড়িলেন—

'ও মা—ও মা কি হয়েছে,—হ্যাঁরে সুখু কি বলছিস্, করলি কি? ভালোয় ভালোয় বাছারা দুটো দু'ঠাঁই হোক —ভয়ে আমার পেরাণ উড়ে যায় নিশিদিন—তুই কি গোলমাল বাধালি?'

সরলা উচ্চকণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'ঐ দেখ না, তোমার আদুরে ছেলে চিলহাটি যাচ্ছেন সর্বস্ব বেচে ফেলে টাকার পুঁটলি নিয়ে, আমি কি ভেসে এসেছি? এই মতলব যদি তোমাদের, কেন আমায় আনলে? হাত পেতে বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করবার জন্তে? ডাক দাদাকে— সব শুনুক, শুনে বলুক দেখি কি বলে? মা আমার কিছুতে এখানে বিয়ে দিতে চায় নি—'

আলুথালু ভাবে বিছানায় গড়াগড়ি দিয়া সরলা কাঁদিতে লাগিল। মাথার চুল গায়ের কাপড় এলোমেলো হইয়া গেল। বড়-বৌ ভয় পাইয়া মেজ-বৌকে বলিল, 'এগিয়ে যা নিরু ওকে থামা, ভরা আট মাস অমন করে কাঁদলে অঘটন ঘটাবে শেষে।'

পরশমণি একবার চেঁচাইয়া উঠিয়া আবার গলা নামাইলেন, 'সুখু তোদের মতলব কি? করছিস কি? সোণার চাঁদ ছেলে হবে, তার মুখে ছাই দিয়ে সেই বজ্জাত বেটীকে সর্বস্ব দিতে যাচ্ছিস, এ বুদ্ধি কোথা পেলি? কে দিল? এই উনপাঁজুরে হাড়হাবাতে বিবিরা? নয়? ছোট-বৌএর হিংসেয় গেলেন।' দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন, 'ভালোয় ভালোয় ফিরে আসুক ছেলে কোলে করে, দেখিস তখন, তোদেরও ছেলে আর ওর ছেলে—'

সরলার গায়ে হাত দিয়া বলিলেন, 'তুই শান্ত হ চুপ কর, চোখের জল ফেলে ছেলের অকল্যাণ করিস নি, শরীলে কি কিছু আছে? ক খানা হাড় সার হয়েছে। সেদিন রায়-বাড়ীর ঠাকুরঝি বললে, 'বৌ তোমার ছোট-বৌয়ের

যা চেহারা হয়েছে, কেমন শাড়িটি হয় দেখো—আমি বলে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে মরচি নেমন্তন্ন করে আর ঘরে এই কাণ্ড। আর ছুটো দিন পরেই তো যাচ্ছে ছ' মাসের মতন, তাও সবুর সইল না।'

মেয়ের চোখ মুখ মুছাইয়া বাতাস দিতে দিতে পরশমণি বলিলেন, 'বলি নিজেদের ঘর কি বেচে কিনে খেয়েছ? দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছ না কি? বলি কুটুমটা এসেছে, এক ঘটি জল দিয়েও জিজ্ঞাসা করেছ না কি?'

বড়-বৌ বলিল, 'আমরা দেখিনি—'

'তা দেখবে কেন? সিতিপাটী করা হচ্ছিল বুঝি? আমি রায়-বাড়ী থেকে দেখলাম, এসে বাড়ীতে উঠল—এখনও অবধি খোঁজও করা হয় নি? তা হবে কেন, ছুটো পাশ-করা ছেলে, তালুকদারের বেটা, ভাগ্যি বোন বিয়ে দিয়েছে, নইলে এ বাড়ী পা দেয়? একা বুঝি বাহিরেই বসে রয়েছে? অ মণি, মণি! বলি চোরের মতন টপকে যাওয়া হচ্ছে কোথা? বাইরে তোমার ছোট খুড়ীমার ভাই এসেছে ডেকে আন এখানে—'

বিশাল ডাক দিল, 'সুখেন শোন্।'

সুখেন ঘর হইতে বাহির হইয়া বিশালের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বিশাল বলিল, 'গোলমাল করিস নি, ও-টাকার আশা ছেড়ে দে। গণ্ডগোল করতে গেলে ছোট-বৌমা ক্ষেপে গিয়ে একটা বিপদ বাধিয়ে বসবেন। এ সংসারের কিছুই যাঁর ভোগে নেই তাঁকে কে তা দিতে পারবে?'

সুখেন বলিল, 'আমি আজ চিলহাটিতেই থাকব—' বলিয়াই প্রস্থান করিল।

বিশাল ফিরিয়া নিজের ঘরে ঢুকিল। একটু পরে বড়-বৌ আসিয়া দেখে, বিশাল বিছানায় শুইয়া উর্দ্ধদিকে চাহিয়া আছে। বড়-বৌ কাছে বসিল, বলিল, 'তুমি অমন ভেব না, আমাদের ত ছেলেপুলে নেই, আমাদের অংশটা বেচে কেনে পঞ্চমীকে তুমি নিজের হাতে টাকা দিয়ে এস। তুমি অক্ষম নও, দিন চলে যাবেই।'

বিশাল হতাশ ভাবে বলিল, 'না বড়, আর আমি নিজে চেষ্টা করতে যাব না—বড় মুখ করে বলে এসেছিলাম টাকা এনে বৌমাকে দেব, জমিটা বিক্রী করে দেড়াদাড করে আবদার বৌমা জীবনে অন্ততঃ অর্দ্ধকষ্টটা পাবেন না। দর্পহারী সব দর্পচূর্ণ করলেন। টাকা গেল—গেল, এ জীবনে চিলহাটিতে আর মুখ দেখাতে পারব না।'

বেলি পিছন-বাড়ীতে কান্না জুড়িয়াছে, বড়-বৌ উঠিয়া গিয়া তাহাকে আনিয়া বিশালের কাছে দিল। বেলি আজকাল জ্যেঠামহাশয়ের কাছেই সারা দিনরাত্রি থাকে, বিশালকে কিছুক্ষণ দেখিতে না পাইলেই কান্না জুড়িয়া দেয়।

পরশমণি পাখার বাতাস দিতে দিতে সরলাকে ঘুম পাড়াইয়া পাখাখানি সরলার নবাগত ভাইয়ের হাতে দিয়া উঠিয়া দেখিতে আসিলেন, বিবিরা এ দিকে কেহ নাই, বাঁশঝাড়ের দিকে মৃদু মৃদু কথার গুঞ্জন শোনা যায়। আড়াল হইতে শুনিবারও সময় নাই। নূতন কুটুমটা আসিয়াছে, যেমন করিয়াই হোক মান বজায় রাখা চাই। বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে (পাছে নূতন কুটুম শুনিতে পায়) নিজের ঘরে গেলেন।

দত্ত-বাড়ী হইতে গিরি, গিরির বড় যা, ছোট যা, সবাই খিড়কীপথে আসিয়া জুটিয়াছে। ব্যাপারটা জানাজানি হইতে বাকী নাই। বড়-বৌ বলিতেছে, 'ঠাকুরপো এত কাণ্ডের পরেও চিলহাটি চলে গেল, সরলা যদি টের পায় তবে আবার কি হবে, না জানি?'

মেজ-বৌ বলিল, 'কালপরশু ছুটো দিন—দোগরা বোশেখ সরি বাপের বাড়ী যাচ্ছে—এ তিনটে দিন সবুর করেই থাক্ না বাপু, যা হবার হয়েছেই—দেশ-বিদেশ শুদ্ধ কেলেঙ্কারী রটিয়ে কি লাভ? নিজেদের মুখেই চুণকালি মাখান বই তো নয়? সরির ভাই কি কিছু টের পায় নি ভেবেছ? সব গিয়ে বলবে। এদের গোঁয়ার্ত্তুমি দেখে দেখে আর সয় না—'

গিরি বলিল, 'তা বলুক গে, জেনে শুনেই বোন দিয়েছে। ভয়ে ভয়ে তোমরা গেলে। সে বৌটার স্বামী সংসার সব কেড়ে নিয়েও সাধ মেটে না। তার বাপের টাকাগুলিও নিয়ে নিলে? হলই বা কলিকাল, ধর্ম্মে সইবে না দেখো।'

গিরির ছোট-যা বলিল, 'আজকে মেজদি—শাপ-টাপ দিও না, এমনি শরীর যা চেহারা হয়েছে, যে দারুণ সঙ্কটে

পড়েছে ভগবান রক্ষা করুন'—ইহার সহিত সরলার সই-সম্পর্ক। সে পঙ্কজীকে দেখে নাই।

বড়-বৌ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'আয় নিরু, কাজ দেখি গে। সরলা কেমন আছে দেখে নিয়ে আগে জলটা নিয়ে আসি, তোরা যাবি ?'

'যাব, তোমরা যাবার সময় ডেকে নিও। সরিকে দেখবার আর দরকার নাই, অতগুলি টাকা পেয়ে ভালই থাকবে দেখো—আজ আর স্বামীরও খোঁজ করবে না, কিন্তু ও জানতে পারল কি করে ? আশ্চর্য্য !'

মেজ-বৌ বলিল, 'আমি বেলির দুধ আনতে যাচ্ছি, রান্নাঘরে দেখি আস্তে আস্তে মায় ঘাটের দিকে যাচ্ছে, আমি এগিয়ে দেখলাম।' 'বড়ঠাকুর আর ঠাকুরপো কি বলা-বলি করছে ও' ঘরের কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনেছে—আমি কিছু বুঝতে পারি নি, ফিরে এলাম। আমায় ও দেখতে পায় নি- একটু পরে এই দিক দিয়ে ঘুরে নিজের ঘরে গেল। তারপরে গণ্ডগোল। আমি তো দূরের কথা, বড়-দি অবধি একটু আগে জানত না এই টাকার কথা—'

'দেখ একবার সেয়ানা মেয়ে, ও তোমাদের এক হাটে কিনে আর একহাটে বেচে দিয়ে আসতে পারে। নে চারু, দেখে দেখে শেখ, তোর নতুন বিয়ে হয়েছে, তোর কাজে লাগবে।'

'আহা, সবাই সুখেন বিশ্বাস কি না ? আমরা অমন ধারা করতে গেলে তক্ষণি জন্মের মত বিদায় করে দেবে।'

[ক্রমশঃ

হে নববর্ষ

—শ্রীমনুজচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী

সে দিন গিয়াছে, যে দিন আমরা ছিলাম গাছের শাখে,
মাটির তলায়—গহ্বরে, যথা ইতর প্রাণীরা থাকে ;
পদে পদে ছিল শ্বাপদের সাথে হিংসার বিনিময়,
প্রকৃতির সাথে যুদ্ধে জীবন অযথা হইত ক্ষয়।
সেই দিন থেকে নবীনতা তরে সুরু হল অভিযান
আজিকার চেয়ে চাই আরো ভাল, চাই আশাভরা প্রাণ ;
আজিকার চেয়ে উন্নততর, এর চেয়ে আরো ভালো,
এর চেয়ে আরো সুস্থ জীবন, এর চেয়ে আরো আলো।
প্রতিটি বর্ষ সুমুখে তাহার নবীন হইয়া এসে,
নূতন বার্ত্তা নূতন প্রেরণা ঢেলে দিত মৃদু হেসে।
শিখিল মানুষ - মানুষ হইতে, বুকে নিয়ে নব আশা,
নীতি ও ধর্ম্ম শিল্প-কলায় ভাল হল ভালবাসা !

ঘুরিল দৃশ্যপট,
আবার মানুষ ডাকিয়া আনিছে আপনার সঙ্কট।
পুরাতন দিন ভুলিয়া গিয়াছে নব্য ভাবের মোহে,
অধিরোহণের পথ ভুলে গিয়ে আজ পুনঃ অবরোহে।
ভুলে গেছে তার সেই দারিদ্র্য; ভুলে গেছে সেই দুঃখ,
ভুলে গেছে তার আত্মজনের রক্তপ্লাবিত মুখ।
চির-অসহায়, অতি বর্ব্বর, ক্ষুধা-প্রপীড়িত নর
ভুলে গেছে তার সেই অবস্থা ছিল কি ভয়ঙ্কর !
দু মুঠো অন্ন যেই পাইয়াছে—পেয়েছে একটি কুঁড়ে,
আপন দম্ভ প্রকাশিতে ওঠে সারাটি জগৎ জুড়ে।
নূতন নূতন যন্ত্র আনিছে—নূতন দম্ভ নিয়ে
আত্ম-হনন করিবে তাহারা খলতা অস্ত্র দিয়ে।
পরকে আপন করিতে ভুলেছে,—যাতে পশু হত বশ,
আপনার জনে শত্রু করিয়া আজ খোঁজে তারা যশ।
আজ মানুষের সবার চাইতে মানুষই হয়েছে অরি,
নববর্ষের প্রভাত কালেতে দেখা যায় বিভাবরী।
ক্ষুধিতের মুখে অন্ন না দিয়ে "রেফিউজে" দেয় চাঁদা,
রজনীগন্ধার চাষ উঠে গিয়ে বাগানে শোভিছে গাঁদা।
মৃতকল্পের সেবা তুলে দিয়ে—পাঠায় হাঁসপাতালে,
অমৃত-মধুর পায়স যেন গো খাইছে সীসার থালে !
শিশুরা কামায় সেফ্‌টি ক্ষুরেতে, কেরাণী হয়েছে মেয়ে,
বিবর্ত্তনেতে সবে বিবর্ণ, টাকার গন্ধ পেয়ে।
মাটির তলার সার টেনে তোলে, শূন্য হতেছে খনি,
আম গাছে তাই শুধু আঁটি ঝোলে, তাহাও [illegible]
ঝোঁপ্‌রা মাটির ওপরে উঠেছে দুই শত তলা বাড়ী,
তবু এক হাত জমি নিয়ে হয় ভায়ে-ভায়ে ছাড়াছাড়ি !
পুনঃ পুরস্ত্রী করে বিবস্ত্রা—নূতন দুঃশাসনে,
আগামী কুরুক্ষেত্রে এবার বাঁচিবে না একও জনে।
যুধিষ্ঠিরের ছিল উদারতা, বিদুরের ছিল টান,
'ওডেসি'র বুকে স্বজনের তরে বহিত প্রেমের বান।
ছিল 'পেনিলোপী' স্বামীর জন্যে, ছিল সীতা রাম আশে,
একজনও তাই বাঁচিত তখন রক্ত-নদীর পাশে।
আদিম যুগের ভয় দূর হয়ে, এল সভ্যতা ভয়,
হে নববর্ষ ! সামনে বছরে এইটুকু যেন হয় ;
আকাশেই উড়ি, রেডিয়োই শুনি—পেটে যেন ভাত পাই;
আর—জননীর কাছে ঘুমাই যেন গো,
ভায়ের পাশেতে ভাই।

ভারতের শিল্প-সংস্থান

—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে চিনি, রঞ্জন, তার্পিণ, চন্দন-তৈল, রবার প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ উপাদান হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদির বিষয় আলোচিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আরও কয়েকটি উদ্ভিজ্জ শিল্পসংস্থান সম্বন্ধে বর্ণিত হইল।

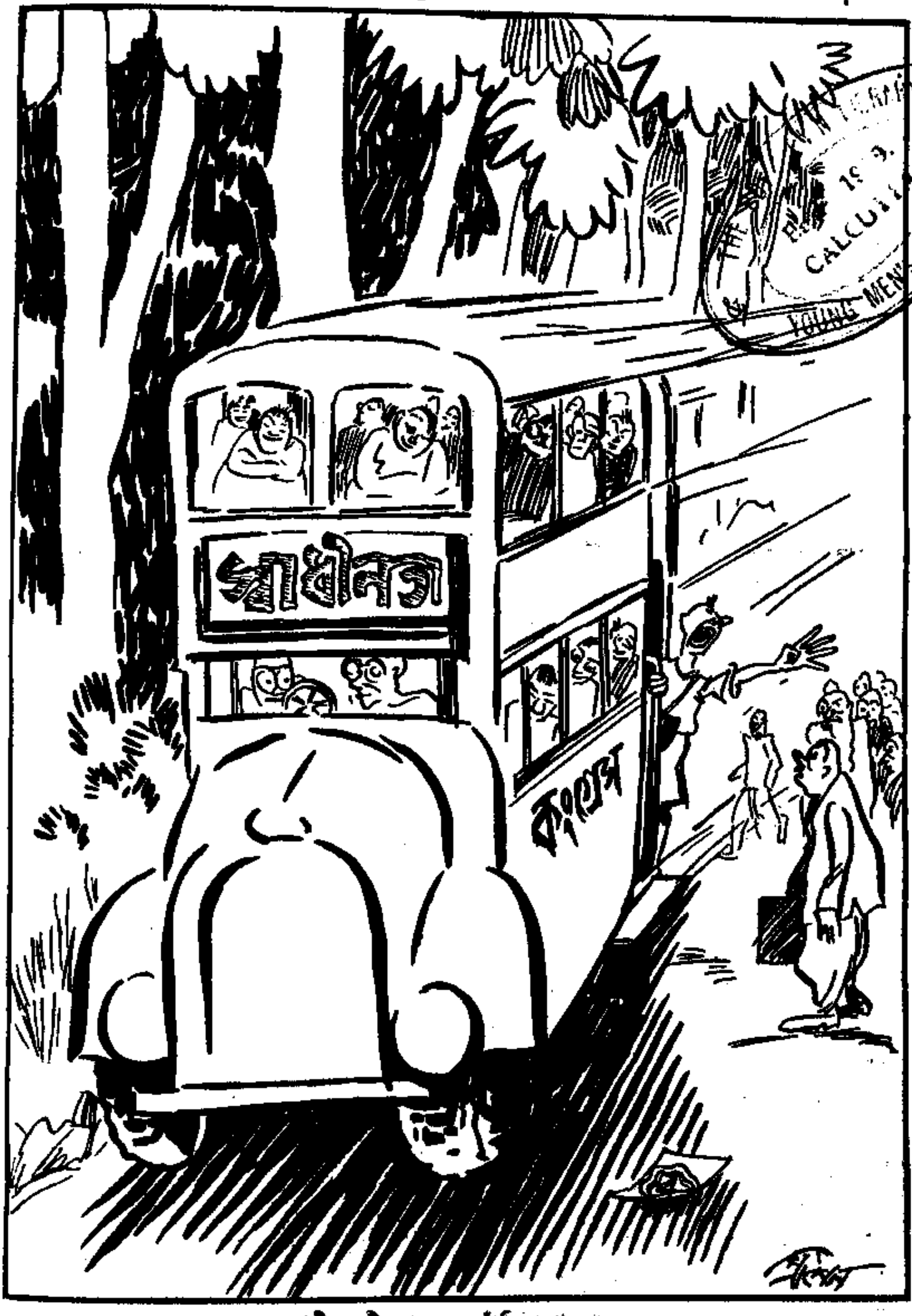
কাগজ, পেষ্টবোর্ড

কাগজ এ দেশে বিভিন্ন প্রয়োজনে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাগজ তৈয়ারীর উপযুক্ত উপাদান এদেশে যথেষ্টই পাওয়া যায়। সাবাই ঘাস, বাঁশ, খড়, কাঠ, পুরাতন কাগজ, কাগজের ছাঁট (scraps and cuttings) ও অব্যবহার্য্য বস্ত্রখণ্ড প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হইতে পারে। কয়েকটি সুবৃহৎ কাগজের কলও স্থাপিত হইয়াছে, তথাপি এখনও আমদানীর পরিমাণও যথেষ্ট। এতদ্‌সহ প্রদত্ত তালিকায় দেখা যাইবে, প্রায় ৩ কোটী ৮৬ লক্ষ টাকা মূল্যের কাগজ এ দেশে আমদানী হইয়াছে। প্রস্তুত কাগজ ও বোর্ড ছাড়া কাগজ প্রস্তুতের উপযুক্ত কাষ্ঠমণ্ডও (wood pulp) বিদেশ হইতে আনীত হয়।

কাগজ প্রস্তুত করিতে হইলে উপরিলিখিত উপাদান গুলিকে প্রথমে সূক্ষ্মাকারে কাটিয়া ক্ষার দ্রবণের সহিত মিশ্রিত করা হয়। এই মিশ্রণকে পাকযন্ত্রে লইয়া পাক করা হয়। পাকযন্ত্রটি সম্পূর্ণরূপে আবৃত একটি কটাহ বিশেষ। উত্তপ্ত হইলে উহার মধ্যস্থিত বায়ুচাপ বর্দ্ধিত হয়, ফলে মিশ্রণটি উচ্চতর তাপে ফুটিতে থাকে। এই রূপে ফুটিয়া ঘাস প্রভৃতির আঁইসগুলি খুব নরম হইয়া মণ্ডে পরিণত হয়। উদ্ভিজ্জের স্বাভাবিক বর্ণ ও অন্যান্য অপদ্রব্য বর্ত্তমান থাকায় মণ্ডটি বাদামী বর্ণ ধারণ করে। সুতরাং সাদা কাগজ প্রস্তুত করিতে হইলে মণ্ডটিকে বর্ণহীন করা প্রয়োজন। প্রথমে উহাকে প্রচুর পরিমাণ জলে ধৌত করা হয়। পরে ব্লিচিং পাউডার বা ক্লোরিণের দ্রবণ দিয়া মণ্ডটিকে বর্ণশূন্য করা হয়। এই প্রসঙ্গে ব্লিচিং পাউডার সম্বন্ধে সামান্য বর্ণনা দেওয়া হইতেছে।

রসায়নের মতে আমাদের নিত্যব্যবহার্য্য লবণ একটি যৌগিক পদার্থ। উহাতে বর্ত্তমান আছে সোডিয়ম নামে একটি বিষাক্ত ধাতব দ্রব্য এবং ক্লোরিণ নামে একটি বিষাক্ত গ্যাস। এই দুইয়ের রাসায়নিক সংযোগের ফলে উৎপন্ন হইয়াছে লবণ। লবণে কিন্তু উহার মূল উপাদানাদির বিষময় ধর্ম্মাদি মোটেই বর্ত্তে না। এই লবণ হইতে ধাতব অংশটি অর্থাৎ সোডিয়মকে মুক্ত করিয়া লইলে অবশিষ্ট থাকে ক্লোরিণ গ্যাস। এই গ্যাস জলে দ্রবণীয় এবং ঐ দ্রবণে বিশেষ ক্রিয়াশীল অক্‌সিজেন্ গ্যাস পাওয়া যায়। স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ বর্ণাদি এই অক্‌সিজেনের সহিত সংযুক্ত হইয়া বর্ণহীন হইয়া যায়। ক্লোরিণ গ্যাসকে চুণের সহিত মিশিতে দিলে ব্লিচিং পাউডার প্রস্তুত হয়। ব্লিচিং-পাউডারের দ্রবণে কিঞ্চিৎ হাইড্রোক্লোরিক্ বা সাল-ফিউরিক এসিড দিলেও বিশেষ ক্রিয়াশীল অক্‌সিজেন গ্যাস মুক্ত হয় এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্বাভাবিক বর্ণাদি মুক্ত করে। বর্ণহীন মণ্ডটিকে পুনরায় ভাল করিয়া ধৌত করিয়া লওয়া হয়। পরে উহাকে জলমিশ্রিত করিয়া সুপ্রশস্ত তারের জাল নির্ম্মিত ফ্রেমের মধ্যে ঢালিয়া দেওয়া হয়। ফ্রেমটিকে মৃদুভাবে কম্পিত করা হয়, ফলে মণ্ডটি সমানভাবে উহার উপর বিস্তৃত হইয়া পড়ে। মণ্ডের পরিমাণের অল্পতা বা আধিক্য অনুসারে প্রস্তুত কাগজও পাতলা বা পুরু হইয়া থাকে। ফ্রেমের অপর প্রান্তে কোমল মণ্ডটি চাপ-যন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে। ঐ যন্ত্রে কতকগুলি ফাঁপা রোলার বসান থাকে। ষ্টিমের সাহায্যে রোলারগুলি উত্তপ্ত করা হয়। সুতরাং ভিজা মণ্ডটি যন্ত্র-মধ্য দিয়া যাইবার সময় সমভাবে বিস্তৃত, জল-মুক্ত ও শুষ্ক হইয়া যায়। শুষ্ক কাগজের প্রান্তভাগ রীলের আকারে জড়াইয়া লওয়া হয়। পরে উহাকে ইচ্ছামত আকারে কাটিয়া প্রয়োজনমত ভাঁজ করা হয়। এইরূপে প্রস্তুত কাগজে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে ও ব্লটিং কাগজরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। ফিল্টার করিবার

চারি আনা মূল্যের স্বাধীনতা



স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে।

বা ছাঁকিবার জন্যও এই কাগজ ব্যবহৃত হইতে পারে। একটি মিশ্রণকে পরিষ্কার করিতে হইলে এইরূপ ছিদ্রবহুল এক খণ্ড ফিলটার কাগজকে ভাঁজ করিয়া একটি ফানেলের (funnel) মধ্যে রাখিয়া মিশ্রণটিকে ঢালিয়া দিলে তরল অংশ উহার ভিতর দিয়া নিম্নদিকে চলিয়া যায়, কিন্তু কঠিন অপদ্রব্যগুলি যাইতে পারে না। অপদ্রব্যের কণাগুলি কাগজের ছিদ্র অপেক্ষা সূক্ষ্ম হইলে উহার কিয়দংশও দ্রবণের সহিত চলিয়া যাইতে পারে। লিখিবার উপযুক্ত করিতে হইলে কাগজে সাইজিং বা মাড় মিশ্রিত করা হয়। মাড় দেওয়া কাগজে জল বা কালি ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। বিভিন্ন ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন পরিমাণে বিভিন্ন প্রকারের মাড় দেওয়া হয়।

প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে কাগজ প্রস্তুতের যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। খৃষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে চীনদেশে কাগজের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। আরবদেশে ৮ম ও ৯ম শতাব্দীতে কাগজ ব্যবহৃত হইত। ১২শ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে ফরাসী ও স্পেনদেশে মুরগণ কাগজের ব্যবহার প্রচলন করে। ইটালী ও জার্ম্মানীদেশে যথাক্রমে ১৩শ ও ১৪শ শতাব্দীতে সর্ব্বপ্রথম কাগজ ব্যবহৃত হইয়াছিল। বিলাতে ১৬ শতাব্দীতে এবং আমেরিকায় ১৭শ শতাব্দীতে কাগজ প্রস্তুত হয়। কাগজ প্রস্তুতের যন্ত্রাদি গঠিত হইবার পূর্ব্বে হস্তনির্ম্মিত (hand made) কাগজই ব্যবহৃত হইত। এখনও বিশেষ কার্য্যের জন্য এইরূপ কাগজের ব্যবহার হয়। ইহার প্রধান উপাদান অব্যবহার্য্য তুলার আঁইস ও পুরাতন বস্ত্রখণ্ড। ধূলিকণা ও তৈলাদি অপদ্রব্য মুক্ত করিয়া পূর্ব্ববর্ণিত প্রণালীতে ইহাদিগকে মণ্ডে পরিণত করা হয়। মণ্ডটিকে বিশেষভাবে পরিষ্কৃত করিয়া জলমিশ্রিত করিয়া একটি তারের জাল নির্ম্মিত ফ্রেমে ঢালিয়া দিয়া উপর হইতে আর একটি ফ্রেম চাপিয়া দেওয়া হয়। পরে উহাকে বাহির করিয়া শুষ্ক হইলে সাধারণতঃ শিরিষের দ্রবণে ডুবাইয়া মাড় দেওয়া হয়। ফলে কাগজের উপরিভাগে শিরিষের একটি সূক্ষ্ম আস্তরণ লাগিয়া যায়। ইহার পর পালিশ করিয়া কাগজগুলিকে মসৃণ করা হয় ও ইচ্ছামত পরিসরে খণ্ড করিয়া লওয়া হয়।

পেষ্ট-বোর্ডও এদেশে প্রচুর পরিমাণে আমদানী ও ব্যবহৃত হয়। এক্ষণে এদেশেও কিয়ৎ পরিমাণ বোর্ড প্রস্তুত হইতেছে। সাধারণতঃ অব্যবহার্য্য কাগজ হইতেই পেষ্ট-বোর্ড প্রস্তুত করা হয়। কাগজগুলিকে সূক্ষ্মাকারে কাটিয়া প্রথমে মণ্ডে পরিণত করা হয়। জলমিশ্রিত মণ্ডকে ছাঁচে ঢালিয়া পুরু বোর্ড প্রস্তুত করা হয়। শুষ্ক হইলে বোর্ডগুলিকে প্রয়োজনীয় আকারে কাটিয়া লওয়া হয়। অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যের বোর্ডে মাড় ও ইচ্ছানুরূপ বর্ণাদি দেওয়া হয়।

সংবাদপত্রের জন্য অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যের কাগজই প্রয়োজন। সাধারণতঃ কাঠের গুঁড়া হইতে প্রস্তুত মণ্ডই এই প্রকার কাগজ প্রস্তুতের প্রধান উপাদান। কিন্তু এই মণ্ডে লিগ্‌নিন্ (lignin) নামক এক প্রকার অপদ্রব্য থাকে। সূর্য্যালোক পড়িলে লিগ্‌নিন্-যুক্ত কাগজ ক্রমশঃ গাঢ় বাদামী বর্ণ ধারণ করে। কিন্তু সংবাদপত্রাদির পক্ষে এইরূপ পরিবর্ত্তন বিশেষ অসুবিধাজনক নহে। সে কারণ এইরূপ উপাদান হইতে সংবাদপত্রের জন্য এবং অন্যান্য অল্প মূল্যের কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কালি

লিখিবার ও ছাপিবার জন্য বিবিধ প্রকারের কালি এদেশে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দেশীয় কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে উভয় প্রকারের কালিই প্রস্তুত হইতেছে, কিন্তু বিদেশ হইতেও বহু টাকা মূল্যের কালি এদেশে আমদানী হইয়া থাকে।

ছাপিবার জন্য কাল কালিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এই কালির প্রধান উপাদান ভূষা। ঘন খনিজ তৈল বা উদ্ভিজ্জ তৈল জ্বালাইয়া এই ভূষা প্রস্তুত হয়। পুরু শলিতার সাহায্যে এই তৈল ধীরে ধীরে জ্বলিতে দেওয়া হয়। উদ্গত গাঢ় ধূম ও ভূষা ভিজা চটের উপর জমিতে থাকে। এইরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে কুটীর-শিল্পরূপে ভূষা প্রস্তুত হইতে পারে। ভূষা সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত এক প্রকার যন্ত্রও ব্যবহৃত হয়। ঐ যন্ত্রে একটি ফাঁপা পিপা থাকে। উহার ভিতর দিয়া শীতল জল প্রবাহিত করিয়া শীতল রাখা হয়। জ্বলন্ত শিখাগুলির

ঠিক উপরিভাগেই পিপাটি ধীরে ধীরে ঘুরিয়া যায়। ভুষাও পিপার গাত্রে লিপ্ত হয়। এই ভুষায় কিঞ্চিৎ তৈলাংশ অপদ্রব্যরূপে থাকিয়া যায় সে জন্য উহাকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈলমুক্ত করা হয়। পরিষ্কৃত ভুষাকে গুঁড়া করিয়া বিশেষ ভাবে পাক করা বা আলান তিসি-তৈলের সহিত সম্যক্‌-রূপে মিশ্রিত করিলে ছাপিবার উপযুক্ত ভাল কালি প্রস্তুত হয়।

লিখিবার কালির প্রধান উপাদান হরিতকী, বহেড়া ও ফেরাস্‌ সালফেট্‌ (ferrous sulphate) নামক লৌহ ঘটিত লবণ। হরিতকী ও বহেড়ার আরকে ফেরাস্‌ সালফেট্‌ দ্রবণ যোগ করিলে উহা কৃষ্ণাভ বর্ণ ধারণ করে। বায়ু সংস্পর্শে কিছুদিন রাখিয়া দিলে ঐ বর্ণ ক্রমশঃই গাঢ় হয়। সঙ্গে সঙ্গে দ্রবণের তলদেশে কিছু প্রক্ষেপ জমিতে থাকে। দ্রবণটিকে ছাঁকিয়া লইয়া সামান্য গঁদ ও কার্ব্বলিক এসিড্‌ দিয়া বোতলজাত করা হয়। হরিতকী ও বহেড়ার প্রধান রাসায়নিক উপাদান ট্যানিক্‌ ও গ্যালিক এসিড্‌; ইহা ছাড়া কিছু অপদ্রব্যও মিশ্রিত থাকে। সে কারণ উহা হইতে প্রস্তুত কালিতে কালক্রমে প্রক্ষেপ জমিতে থাকে। কিন্তু বিশুদ্ধ ট্যানিক্‌ ও গ্যালিক্‌ এসিড্‌ হইতে প্রস্তুত কালিতে এই অসুবিধা অনেক কম হয়। কালি প্রস্তুত ছাড়া এই উভয় এসিড্‌ই ঔষধে ও রঞ্জন-শিল্পে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চামড়া পাকাইবার (tanning) জন্যও প্রচুর পরিমাণ হরিতকী ব্যবহৃত হয়।

তামাক : সিগারেট, চুরুট, নস্য

তামাক এদেশজাত একটি প্রধান পণ্য। প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা মূল্যের তামাক পাতা ও তামাকজাত দ্রব্যাদি এদেশ হইতে রপ্তানী হইয়াছে। আবার বিদেশী তামাক ও উহা হইতে প্রস্তুত দ্রব্যও কিছু এ দেশে আমদানী করা হয়। বহুদিন হইতেই ভারতবর্ষে তামাকের প্রচলন ছিল। ইউরোপে কলম্বাসই সর্ব্বপ্রথম তামাক লইয়া যান। আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণও তামাক ব্যবহার করিত।

সংগৃহীত তামাক পাতাকে ব্যবহারোপযোগী করিতে হইলে বহুদিন রাখিয়া দিতে হয়। এইরূপে কাঁচা তামাকের বিশেষ উগ্র গন্ধ ও এক প্রকার তৈলময় অপদ্রব্য কমিয়া যায়। সিগারেট, চুরুট প্রভৃতি বিভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইলে তামাক পাতাগুলিকে বিভিন্ন প্রণালীতে কাটা হয়।

পাতাগুলি সূক্ষ্মাকারে কাটিয়া লইয়া মাতগুড় ও সুগন্ধির সহিত মিশ্রিত করিলে দেশীয় তামাক প্রস্তুত হয়। ইহা ছাড়া বিড়ি, সিগারেট, চুরুট প্রভৃতির মসলাতেও তামাক প্রধান। গুঁড়া তামাকের সহিত গন্ধদ্রব্য মিশ্রিত করিয়া জরদা, কিমাম ও নস্য প্রস্তুত হয়। তামাকের আরকে নিকোটিন নামে একটি তীব্র শক্তিশালী বিষাক্ত দ্রব্য বর্ত্তমান থাকে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশজাত তামাকের স্বাদ বিভিন্ন প্রকারের হয় এবং উহাদিগকে নানা অনুপাতে মিশ্রিত করিয়া বিশেষ স্বাদ ও বিশেষ ব্যবহারের জন্য তামাক প্রস্তুত হয়।

বিদেশীয়দের অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টায় উত্তর বিহারের তামাক সংগ্রহের বিরাট আড়ৎগুলি স্থাপিত হইয়াছে। সংগৃহীত তামাকের অধিকাংশই রপ্তানী হইয়া থাকে। মাদ্রাজ প্রদেশ জাত তামাক হইতে তথায় চুরুট ও নস্য প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। অধুনা দেশীয় উদ্যমের ফলে কয়েকটি সিগারেট, তামাক, চুরুট, বিড়ি, জর্দ্দা ও নস্যের কারখানা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সিগারেটের জন্য ব্যবহৃত কাগজ, আঠা ও সুগন্ধি বিদেশ হইতেই আমদানী করা হয়।

যব : মল্ট, পেটেন্ট ফুড

এদেশ হইতে ২৮ লক্ষ টাকারও অধিক মূল্যের যব রপ্তানী হইয়া থাকে, অথচ যবের গুঁড়া ও উহা হইতে প্রস্তুত বহুবিধ দ্রব্য এদেশে আমদানীও হয়।

জলসিক্ত যবকে অঙ্কুরিত হইতে দিলে উহার মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটে। যবের উপাদান শ্বেতসার; অঙ্কুরিত হইবার সময়ে উহা হইতে মল্টোজ নামে সহজপাচ্য শর্করা জাতীয় দ্রব্য গঠিত হয়। অঙ্কুরিত যব গুলিকে যথা সময়ে তপ্ত করিয়া শুষ্ক করিলে অঙ্কুর গুলির বৃদ্ধি বন্ধ হইয়া যায়। মল্টের গুঁড়া হইতে নানাবিধ লঘুপাক

পেটেণ্ট ফুড ও ঔষধাদি প্রস্তুত হয়। জলমিশ্রিত মল্টকে ঈষ্ট (yeast) নামক সুরাকারী জীবাণুর সাহায্যে পচাইলে সুরাসার প্রস্তুত হয়। উহা পানীয় রূপে ব্যবহার হইতে পারে।

যবের উপরিভাগ কঠিন আবরণে আবৃত থাকে। উহা মুক্ত করিয়া লইলে পার্ল বার্লি (pearl barley) প্রস্তুত হয়। যবচূর্ণ বা গুঁড়া 'বার্লি' মাড় ও খাদ্যরূপে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বিস্কুট, কেক্

বিস্কুট ও কেক্ প্রস্তুতের প্রধান উপাদান ময়দা ও চিনি এদেশেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। যদিও এদেশে কয়েকটী বিরাট প্রতিষ্ঠানে প্রচুর পরিমাণে বিস্কুট প্রস্তুত হইতেছে, তথাপি প্রায় সাড়ে ২৪ লক্ষ টাকা মূল্যের বিস্কুট ও কেক্ আমদানী করা হইয়াছে। বিদেশী বিস্কুটের বিশেষত্বও আছে। তবে স্বদেশী বিস্কুট ও উহার প্রস্তুত-প্রণালী ক্রমোন্নতির দিকেই চলিয়াছে এবং এই বিস্কুটের চাহিদাও যথেষ্ট হইতেছে। কুটীর শিল্পরূপেও প্রচুর পরিমাণে বিস্কুট তৈয়ারী হয়। এই বিষয়ে যে অল্পসংখ্যক বিশেষজ্ঞ আছেন, তাঁহারা সামান্ত গবেষণা দ্বারাই বিস্কুট প্রস্তুত শিল্পের বিশেষ উন্নতি সাধন করিতে পারেন। যদিও বিদেশী যন্ত্রপাতি ও চুল্লী প্রভৃতির উপরই নির্ভর করিতে হয়, তথাপি বিস্কুটের উপাদানগুলির যথাযথ অনুপাত, চুল্লীর যথাযথ তাপ প্রভৃতি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিলে সুফল আশা করা যায়। বিভিন্ন প্রকারের বিস্কুটে বিভিন্ন উপাদান বিভিন্ন অনুপাতে দেওয়া হয়। চুল্লীর তাপও বিভিন্নরূপ রাখা হয়।

এই প্রবন্ধে বর্ণিত কয়েকটী দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ ও মূল্যের তালিকা (১।৪।৩৭ হইতে ২৮।২।৩৮ পর্য্যন্ত) নিম্নে দেওয়া হইল

আমদানী

	পরিমাণ	মূল্য
কাগজ	৩,৪০২,০৩৯ হন্দর	৩,৮৬,৬৮,৩৭৯ টাকা
তামাক	৭,৩৫৮,৬৭৩ পাউণ্ড	৭৭,৪৩,৮৯০ "
যব	২,২৭০ টন	২,৭২,৮৫৮ "
বিস্কুট ও কেক্	২৬,৯০৭ হন্দর	২৫,১৮,৫৫৯ "
পেটেণ্ট ফুড	৩০৪,৪৯৪ হন্দর	২৩,৫০,৪৭৩ "

রপ্তানী

	পরিমাণ	মূল্য
তামাক	৫৮,০৯৭,১৪০ পাউণ্ড	১,৮০,১৩,০৭৩
যব	৩৪,১০২ টন	২৮,৯৬,৩৯০

আধুনিক ধর্ম্মমত

…আধুনিক কোন ধর্ম্মমত যদি অনিন্দনীয় হইত, তাহা হইলে একদিকে যেমন মনুষ্যজাতির অনেককেই সেই ধর্ম্মমতকে অনুসরণ করিতে দেখা যাইত, সেইরূপ অন্যদিকে আবার যাঁহারা ঐ ধর্ম্মমত অবলম্বন করিতেন, তাঁহাদিগের পক্ষে শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক শান্তি ও আর্থিক প্রাচুর্য্য উপভোগ করাও সম্ভব হইত। অথচ জগতের বাস্তব অবস্থার দিকে তাকাইলে দেখা যাইবে যে, এখন আর প্রায়শঃ কোন হিন্দু হিন্দুধর্ম্মকে, মুসলমান মুসলমানধর্ম্মকে, খৃষ্টান খৃষ্টানধর্ম্মকে, কায়মনোবাক্যে সম্মান করিতে চাহেন না। অধিকাংশ মানুষেরই বিশ্বাস যে, কোন ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আলোচনা করা একমাত্র পাদ্রী, অথবা মোল্লা, অথবা পুরোহিতদিগের কর্ত্তব্য এবং সাধারণ মানুষের উহা লইয়া মাথা না ঘামাইলেও চলিতে পারে। যদিও কোন একটি ধর্ম্মের প্রতিও মানুষের প্রকৃত শ্রদ্ধা বজায় থাকিত, অথবা আধুনিক কোন ধর্ম্ম-বাদ যদি শ্রদ্ধার যোগ্য হইত, তাহা হইলে সমস্ত ধর্ম্মের প্রতি মানুষের এত অবজ্ঞা অথবা ঔদাসীন্য প্রকাশ করা সম্ভব হইত কি?

একে ত' অধিকাংশ মানুষেরই কোন ধর্ম্মের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধার বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, তাহার পর আবার যাঁহারা ধর্ম্মবিশেষের মতবাদে আস্থাযুক্ত, তাঁহারা প্রায়শঃ স্বীয় জীবিকার জন্য অপরের কৃপাপ্রার্থী হইতে বাধ্য হন এবং অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যুতে জর্জ্জরিত হইয়া থাকেন। কাহারও ধর্ম্মমত যদি যথাযথ হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতি যে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন এবং যাঁহার প্রতি ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন, তিনি সাময়িক ভাবে ক্লেশ পাইলেও যে পরিণামে কোনরূপ ক্লেশ ভোগ করিতে পারেন না, তাহা আধুনিক প্রত্যেক ধর্ম্মেই স্বীকৃত হইয়াছে।…

আসার আশায়

—শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

শীতের দুপুর। সামনের বারান্দার ওপর মিঠে রোদ এসে পড়েছে। নীচে উঠানের একধারে খোঁটায় বাঁধা গাইটি পরম আলস্যে চোখ বুঁজে শুয়ে শুয়ে জাবর কাটছে। আর বারান্দারই এক পাশে লোহার একটা শিকে টাঙ্গান একটা খাঁচার ময়নাটা চুপ করে বসে ঘুমুচ্ছে।

নাকের ওপর চশমাটা ভাল করে বসিয়ে সুতোর ঝুঁপিটা একবার জিহ্বাগ্রে স্পর্শ করে দুই আঙ্গুলের ফাঁকে পাকিয়ে সরু ও শক্ত করে ছুঁচের মধ্যে অভিনিবেশ সহকারে পরাতে পরাতে সুখদা ডাকলেন—"অনিল"।

অনিল ঐ ডাকের অর্থ কি তা জানে। দালান থেকে উত্তর দিলে—"কেন মা।"—"কই, ওদের খবর আজও ত' কিছু এল না!"—"তাইত মা। আমার চিঠি এতদিনে নিশ্চয় তারা পেয়েছে।" তার পরেই কথাটায় একটু জোর দিয়ে বললে—"তা পেলেও, জবাব দিতে তাদের দু'-একদিন দেরীও ত' হ'তে পারে। সুধু সুধু তুমি কেন ব্যস্ত হচ্ছ মা? দেখো, দু'একদিনের মধ্যে নিশ্চয়ই চিঠি আস্‌বে।"

মা আর সে কথার কোন জবাব দিলেন না। নানান রংএর কাপড়ের পাড় থেকে তোলা রং-বেরং-এর সুতোর আলাদা আলাদা ভাগ থেকে একটা সুতোর ভাগ তুলে সেটাকে প্রথমতঃ ফেটির মতন করে হাতে জড়িয়ে, তারপর তাঁর প্রসারিত ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে সেই ফেটি খোলা সুতোর আগাটাকে জড়িয়ে দু'হাত দিয়ে পাকিয়ে সেলাইয়ের সুতো তৈরী করতে লাগ্‌লেন।

তাঁর এখন অনেক কাজ। এই পূজোয় তাঁর ছোট্ট দাদু আসছে। এই প্রথম তাঁর মেয়ে আসছে। অনেক দূরে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। তার ওপর জামাইয়ের যে কাজ, ছুটী পাওয়াই ভার। বছরে মাত্র বারটী দিন ছুটী।

কিছুদিন আগেই খবরটা তিনি পেয়েছিলেন। অনিলের কাছে একদিন কথাটা পাড়লেন। অনিল বোনকে নিয়ে আসার প্রস্তাব করে লিখে পাঠাল। কিন্তু তখন আর আনা সম্ভব নয়। ডাক্তারের বারণ।

বেহারীবাবু জানিয়েছিলেন—ভয়ের কোন কারণ নেই। ওখানকার একজন বড় ডাক্তারের তত্ত্বাবধানেই আছে। অবস্থার তারতম্য ঘট্‌লে ওঁদের জানান হবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। মায়ের অবশ্য ইচ্ছা ছিল মেয়েকে আনান। আহা, ঐ ত একরত্তি মেয়ে! তার ওপর সেই বিদেশ বিভূঁয়ে মা ছাড়া কি আর থাক্‌তে পারে। আর এই ত' প্রথম।

তারপর ক'মাস চলে গেছে। সুখদা হিসেব করে দেখেন, এই আশ্বিনে তাঁর ছোট্ট দাদু তিন মাসে পড়বে। একরাশ ফুলের মত নরম। নিশ্চয়ই খুব সুন্দর হয়েছে।

সুখদা আর একদিন কথাটা পাড়লেন। এবার ননীকে আনতেই হবে। তা ছাড়া এতদিনে সে বেশ সেরেসুরে উঠেছে। সে কথার উত্তরে অনিল বলেছিল—"নিশ্চয়ই, এবার ত' আনতেই হবে। তবে, তুমি আর একটু সেরে ওঠ। ডাক্তারে কি বলেছে জান ত'? তোমার এখন সম্পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন।" সুখদা পুত্র-প্রীতিতে একটু স্ফীত হয়ে উঠ্‌লেন। গলার স্বর একটু আর্দ্র ও কোমল হয়ে উঠ্‌ল। বল্‌লেন "না, না বাপু, অত বাড়াবাড়ি করিস্‌নে। আমি বেশ ভাল হয়েছি। এই পূজোর সময় ওদের তুই আনা।"

অনিল আর কথা কাটাকাটি করল না। বল্‌লে—"বেশ, তাই লিখে দিচ্ছি মা।"

এরপরে হঠাৎ একদিন এক চিঠি এল। বেহারীবাবু লিখ্‌ছেন অনিলকে—"তোমার বোনের অসুখের খুব বাড়াবাড়ি।"

অনিল সে চিঠি মাকে লুকিয়ে গেল।

আর একটি খবরও সে মাকে লুকিয়েছে। মায়ের "ছোট্ট দাদুর" মৃত্যু সংবাদ।

তখন সুখদা উত্থান-শক্তি-রহিত। ডাক্তার বল্‌লে, "এ সময়ে এ রকম খবর দেওয়া মানে বিপদকে ডেকে আনা।

সুখদা কিন্তু বিছানায় শুয়ে শুয়ে জিজ্ঞেস করলেন,—"কার চিঠি এল রে অনিল?"

অনিল বল্‌লে—"ননীদের কাছ থেকে মা।"

খুসীতে উজ্জ্বল হয়ে সুখদা বল্‌লেন—"কেমন আছে সব ওরা? বাচ্চাটার কথা কি লিখেছে?"

হাসি হাসি মুখে অনিল বল্‌লে—"খুব ভালই আছে ওরা। ননী নিজের হাতে লিখেছে। খোকা না কি খুব সুন্দর হয়েছে দেখ্‌তে।"

সুখদা একটি তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌লেন। তারপর থেকে সুখদা এই খবরই জানেন—তাঁর ছোট্ট দাদু খুব সুন্দর হয়েছে।

এই সেদিন তিনি অসুখ থেকে উঠেছেন। অনিল সাহস করে কিছু বল্‌তে পারে না। তা ছাড়া এই দু'মাস ধরে কি যত্নে, কত পরিশ্রমে দাদুর জন্যে কাঁথা সেলাই চল্‌ছে; ছোট ছোট জামা তৈরী হচ্ছে। নিজে জানেন না, তাই পাড়ার কে এক মেয়ের কাছ থেকে লাল পশমের ছোট মোজা বুনিয়ে রাখা হয়েছে। অসুখের পর থেকে সুখদা নিজে বড় একটা নড়াচড়া করতে পারেন না, অথচ বসে থাকবার মত লোকও তিনি নন, তাই যত রাজ্যের ছেঁড়া কাপড়, সুতো, ছুঁচ, এই নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। যেই একটা জিনিস তৈরী হয় অমনি সেটিকে ধুয়ে পাট করে থাক দিয়ে তোরঙ্গে গুছিয়ে রাখেন। রাস্তা দিয়ে ফেরীওয়ালা হেঁকে যায় "তরল-আলতা-সাবান" সুখদা ডেকে পাঠান "কৈ রে দেখি বাবা, কি আছে।" তারপর পছন্দ করে কিন্‌লেন হয়ত দাদুর জন্যে লাল একটা ঝুমঝুমি। মেয়ের জন্যে হয় ত' বা তরল আলতা এক শিশি কিংবা কোনদিন একটা গন্ধদ্রব্য বা অন্য কোন কিছু। পুরে ফেল্‌লেন সেগুলিকে বাক্সে। তারপর দিলেন চাবি।

এগুলি তাঁর মেয়ের; তাঁর নাতির। অনেকদিন থেকে এগুলির সংগ্রহ চল্‌ছে। অনেকদিন পরে তাঁর মেয়ে আস্‌ছে। এই মেয়েটি বাড়ীর মধ্যে সর্ব্ব-কনিষ্ঠ এবং সুখদার একটু বেশী বয়সের সন্তান ও শেষ সন্তান। এর পরে সুখদার আর কোন সন্তানাদি হয় নি। তাই তাঁর স্নেহে পক্ষপাতিত্ব এসে ছিল।

অবশ্য, এর একটু কারণও ছিল। বেশী বয়সে হওয়ার জন্যেই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক কন্যা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে যতদিন না একটু বড় হয়েছে, ততদিন পর্য্যন্ত মেয়ের স্বাস্থ্য মোটেই ভাল ছিল না। ফলে, সুখদাকে হ'তে হ'য়েছিল একটু বেশী মাত্রায় সন্ত্রস্ত ও ব্যগ্র। ক্ষুধার মত ধারাল মাতৃস্নেহে [illegible] নিজেকে উৎ[illegible] নিবেদিত করেছিলেন। তারপ[illegible] মেয়ে বড় হ'ল, মাতৃ-নির্ভরতা কাটিয়ে সে আ[illegible] হল। পরে বিবা[illegible] হিত হয়ে তাঁরই মত আজ [illegible]নের জননী। মেয়ে শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার পর [illegible] সুখদা অত্যন্ত চিন্তিত হ'য়ে পড়েছিলেন। মেয়ের কথা ভাবতেন। কিছুদিন পরে মেয়ের ক[illegible] সুস্থ ও ভাল আছে [illegible] সুখদাও [illegible] হয়ে উঠলেন। তারপর আরও [illegible] চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান চলল। সুখদা আস্তে আস্তে আবার আপনার জীবনে অভ্যস্ত হ'য়ে উঠলেন।

কিন্তু, আজ আবার তিনি যেন তাঁর সেই পূর্ব্ব-বাৎসল্যকে ফিরে পেয়েছেন। তাঁর কন্যার এই নব-পরিচয়ে তিনি যেন আবার নূতন করে তাঁর কন্যাকে আবিষ্কার করে ভালবাসতে সুরু করলেন এবং কন্যার অনুপস্থিতিতে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে সেই ভালবাসা গিয়ে পড়েছে এই বাক্সের ওপর।

যক্ষের মত তিনি তা আগ্‌লে রাখেন। একটি একটি জিনিস কেনেন—সাড়ী, চুলের ফিতে, কাঁটা বা অন্য কিছু আর ভরে ভরে রাখেন বাক্সের মধ্যে। মনে মনে ভাবেন, এই সাড়ীতে কেমন মানাবে তাঁর মেয়েকে—এই লাল চওড়াপাড় সাড়ীতে। মেয়েকে মনে করতে গিয়ে নিজেরই ছেলে বয়সের চেহারা চোখে ভেসে ওঠে। সেই বয়সে এই রকম সাড়ী তাঁকে মানাত। সুখদার মন খুসিতে ভরে ওঠে। ননীকেও মানাবে। সেও ত' তাঁরই মত দেখতে।

আবার বাক্স খোলা হল। কাপড়ের থাকের ওপর আর একখানি এসে সংখ্যা বৃদ্ধি করে বস্‌ল।

আর এক দিন। সুখদা অনিলকে ডেকে বল্‌লেন—"কৈ রে, কি লিখলে তারা তোর চিঠির উত্তরে? দিন টিন কিছু ঠিক করলি?"

অনিল একটু থতমত খেয়ে গেল। কিন্তু সে ক্ষণেকের জন্যে। নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—"হ্যাঁ মা, দিয়েছে ত'। তবে কি না ননীর শরীরটা তেমন ভাল নেই বলে সুবিধামত দিন স্থির করা হ'য়ে উঠছে না। একটু ভাল হ'লেই বিহারীবাবু লিখেছেন পাঠিয়ে দেবেন।"

সুখদা হাতের সেলাইটা পাশে নামিয়ে, চোখ থেকে চশমাটা খুলে আঁচলের আগাটা দিয়ে মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করলেন—"কৈ এতদিন ত' বলিস নি ননীর অসুখ?"

বলতে হয় না। ব্যথার স্থানে ব্যথা লাগে। হঠাৎ মনে হয় কি যেন ঘটল। অকারণে চোখের পাতা ভিজে ওঠে। দূর-প্রবাসী প্রিয় মুখখানি এমনি মধুরতম হ'য়ে স্মৃতিতে উদয় হয়।

সুখদার দীর্ঘ নিঃশ্বাস অনিলকে সচকিত করে তুলল। ব্যস্ত হয়ে অনিল বলল—"না মা, সে এমন কিছু নয়। এমনি সামান্য একটু আদটু জ্বর। সে হয় ত' এতদিন সেরেও গেছে।"

সুখদা আর কিছু বললেন না। চুপ করে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কোলের ওপর অসমাপ্ত সেলাই। এক হাতে চসমার খাপটা। ফাঁকা শূন্য চোখের নিরুপায় দৃষ্টি মূক বেদনার মত অভিব্যক্তিহীন। কিন্তু, হঠাৎ এ কি অমঙ্গলের আশঙ্কা! তিনি যে মা!

রাস্তায় পিওনের সঙ্গে দেখা।

"এই আমাদের কোন চিঠি আছে?"

"হাঁ জী, একঠো হ্যায়।"

অনিলের নামেই। বিহারীবাবু লিখছেন। মানুষের যা সাধ্য এবং এখানে যা সম্ভব তার ত্রুটী হয় নি। তবে অদৃষ্টের ওপর মানুষের হাত নেই। পরশু রাত বারটার সময় তোমার ভগ্নী মারা গেছেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অনিলের প্রথম মনে হ'ল, না, আর নয়। এ খবর তার মাকে এবার জানাতেই হবে। হয় ত' প্রথম থেকে জানানই তার উচিত ছিল। তাতে আঘাত থেকে সে তার মাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারত না সত্য, কিন্তু সহ্য করবার ক্ষমতা অনেকটা হয় ত' তিনি অর্জ্জন করতে পারতেন। সত্য যেমন আঘাত করে তেমনি আবার শক্তিও সঞ্চারিত করে। কিন্তু মিথ্যার বঞ্চনায় সত্যকে ঢাকতে, শুধু মিথ্যারই জাল সৃষ্টি করে চলতে হয়। আজ যদি এতদিন যাবৎ যে মিথ্যার জাল রচনা করে এসেছি তা যদি ছিন্ন না করি, তবে এই ভুলেরই মধ্যে অনুক্ষণ সন্দেহ-ছিন্ন মাতৃমন নির্ব্বাক বেদনায় হয় ত' রক্তাক্ত হ'য়ে উঠবে, আর আমাকে চলতে হবে নিত্য নূতন মিথ্যার ওপর মিথ্যার গুরুভার চাপিয়ে। বিভীষিকা বেড়ে চলবে, সাহস পরাস্ত হবে সেই মিথ্যা ভাঙ্গতে। তখন আর সইতে পারা নয়, জীবন নিয়ে টানাটানি হ'তে পারে।

তা ছাড়া কে জানে, ধর আজ যদি আমিই মারা যাই। কেমন ক'রে থাকবেন তিনি? অথচ হয় ত' তিনি থাকবেন, হয় ত' তাও সহ্য করে যাবেন। তিনি নলীরও মা, তার ভাল-মন্দের অংশীদারী তিনিও।

অনিল বাড়ী গিয়ে ডাক দিলে—"মা—"। ঘরের মধ্যে থেকে সুখদা উত্তর দিলেন—"কি-রে—। এইখানে আমি।"

অনিল চিঠিখানা পকেট থেকে হাতে করে নিয়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

প্রকাণ্ড তোরঙ্গটা সামনে খোলা। আশে-পাশে স্তূপীকৃত জিনিস-পত্র ছড়ান। আর সুখদা হাঁটু গেড়ে বসে মাথা নীচু করে সেই সব জিনিসের পাহাড় সাজিয়ে সাজিয়ে বাক্সের মধ্যে ভরছেন। এমন তিনি প্রায়ই করে থাকেন। কাজকর্ম্ম কিছু না থাকলেই তিনি এই বাক্স নিয়ে নাড়া চাড়া করেন। আজও করছিলেন। অনিল মা' বলে ঘরে ঢুকতেই সুখদা একযোড়া লাল পশমের মোজা তুলে ছেলেকে দেখিয়ে বললেন—"দেখ দেখি কেমন সুন্দর হয়েছে। ও বাড়ীর বৌটা যে এত ভাল বুনতে পারে তা ত' জানতাম না।" বলতে বলতে সুখদা আনন্দে ও খুসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। তারপর অনেকটা নিজের মনেই বললেন—"জমানই সার। কবে যে ওরা আসবে? তবু যদি একদিন দেখতাম ওরা পরেছে।"

সাহসেরও মাত্রা আছে। অনিলের সেই মিথ্যার বীজ আজ আর শুধু অঙ্কুরিত নয়, সে আজ এক মহীরুহে রূপান্তরিত। তার মূলোৎপাটন আর যার পক্ষে সম্ভব হোক অনিলের পক্ষে নয়।

অনিল ধীরে ধীরে চিঠিটা পকেটে রেখে দিলে। তারপর মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—"তার থেকে এক কাজ কর না মা? বরং সেই বাক্সটা ওদের কাছে পাঠিয়ে দাও না কেন?" সুখদা একটু ক্লিষ্টের হাসি হেসে বললেন—"এই দেখ তোর এক কথা। এই ত' সেদিন বললি ওরা সব আসছে। আর এরি মধ্যে এ গুলো পাঠিয়ে দেব।"

কেমন এক শুকনো গলায় অনিল বললে—"তা বোধ হয় আর হল না মা।"

"কালই আমি বিহারীবাবুর চিঠি পেয়েছি। তিনি যেন কোথায় বদলী হয়েছেন—আরও দূরে। এ সময় আর ছুটী পাবেন না। কাজেই আসছে বছর ছাড়া আর ত' ওদের আসার কোন সুবিধা দেখছি না।"

সুখদা এক নিমিষে বিরস ও বিমনা হয়ে উঠলেন। সমস্ত উৎসাহ যেন ফুৎকারে কোথায় অন্তর্হিত হয়ে গেল। বাক্সটা গুছিয়ে তোলবার লেশমাত্র ইচ্ছাও আর তাঁর রইল না। সেইখানেই পা ছড়িয়ে বসে চশমাটা খাপের মধ্যে রাখতে রাখতে বললেন—"তবে তাই দে বাপু পাঠিয়ে। আমি বাঁচি। এ যেন আমার এক ভার হয়ে উঠেছে।"

এ কথার অনিল আর কোন উত্তর দিল না কিন্তু মায়ের নিস্পৃহ ও শূন্য দৃষ্টিকে অনুসরণ করতে গিয়ে তার নিজেরই অশ্রু সংবরণ করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠল।

মৈমনসিংহ-পরিচিতি

—শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী

পুরাতন মৈমনসিংহের কয়েকটি ঐতিহাসিক সাক্ষ্য

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ব্রহ্মদেশ হইতে শান বংশীয় আহোমগণ উত্তর-কামরূপে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মপুত্রের উর্ব্বর তীরে উপনিবেশ স্থাপন করেন। ইহাঁরা অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ জাতি। যুদ্ধ ও শারীরিক বলে ইহাঁরা বড়ই বলবান ছিলেন। তথাকথিত শিক্ষা ও সভ্যতা ইহাঁদের মধ্যে তৎকালে প্রবেশ করিবার সুযোগ পায় নাই। কাজেই শারীরিক বল ও সাহসিকতা সম্বল করিয়াই ইহাঁরা কামরূপে স্থায়ী ভাবে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

শারীরিক বলে ইহাঁরা হিন্দুদিগকে জয় করিলেন, কিন্তু শিক্ষা ও সভ্যতায় ইহাঁরা আবার হিন্দুদিগের নিকট পরাজিত হইয়া গেলেন। হিন্দু রাজ্য অধিকার করিয়াও হিন্দু সভ্যতার নিকট মস্তক অবনত করিলেন। আহোমগণ হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে বাধ্য হইলেন।

পরাক্রান্ত আহোমগণ এই সভ্যতা ও ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই ধীরে ধীরে হীনবীর্য্য হইয়া পড়িল। হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণের পরই তাহারা ধীরে ধীরে জীব-হিংসা ত্যাগ করিল। ঐহিক ঐশ্বর্য্য হইতে পরলোকের দিকে তাহাদের বিশেষ আগ্রহ দেখা দিল, তাহারা অতিমাত্রায় দার্শনিক হইয়া উঠিল। পররাজ্য আক্রমণ দূরে থাকুক, স্বরাজ্য-রক্ষার সাহস পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া গেল। এই সুযোগে কোচ-বংশীয়েরা বলশালী হইয়া প্রাধান্য লাভ করিয়া বসিল।

কোচেরা যদিও হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহারা তাহাদের পার্ব্বত্য-জাতিসুলভ দুর্দ্ধর্ষতা ত্যাগ করিল না। কোচ-সামন্তদিগের মধ্যে বিশ্বসিংহ একজন শক্তিশালী পরাক্রান্ত বীরপুরুষ ছিলেন। বিশ্বসিংহই প্রতিভা ও শক্তিবলে বর্ত্তমান কোচবিহার রাজ্য স্থাপন করেন। এই কোচ রাজাদিগের মন্ত্রিগণ সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই ব্রাহ্মণদিগের প্রভাবেই কোচ রাজাগণ ক্ষত্রিয় আখ্যা প্রাপ্ত হন।

পূর্ব্ব-মৈমনসিংহ ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। আহোম রাজারা যখন কামরূপের হিন্দুরাজ্য ধ্বংস করিয়া নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তখন পূর্ব্ব মৈমনসিংহের সামন্তগণ এই সুযোগে স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। পশ্চিম মৈমনসিংহের স্থানসমূহ তখনও জনবাসের অনুপযুক্ত, নিবিড় অরণ্যে আবৃত ছিল। পূর্ব্ব-মৈমনসিংহের সামন্তরাজগণ বেশী দিন এই স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিলেন না। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহাদের কোচদিগের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইল।

কোচ রাজগণ শাসন-ব্যবস্থার সুবিধার জন্য বিভিন্ন স্থানে কোচ সামন্ত নিযুক্ত করিলেন। ধীরে ধীরে এই সামন্তরাজ্যের মধ্যে গড়দলিপা, মদনপুর, বোকাইনগর, জঙ্গলবাড়ী প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্য বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া উঠিল।

গড়দলিপা

গড়দীলিপ, কালক্রমে গড়দলিপ ও পরিশেষে গড়-জরিপায় পরিণত হইয়াছে। দীলিপ নামক হিন্দু-সামন্তের নামানুসারে এই দুর্গের নাম গড়দীলিপ হইয়াছিল। ইহা কামরূপের হিন্দুরাজাদিগের আমলে নির্ম্মিত হইয়াছিল। জামালপুর মহকুমার অন্তর্গত সহর সেরপুর হইতে আট মাইল উত্তরে গড়জরিপায় একটি মৃণ্ময় প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ আজও বর্ত্তমান আছে। দুর্গের অভ্যন্তর-সীমার পরিধি প্রায় ৩৩০০ বিঘা ভূমি। ইহার চারিদিকে মাটির দেওয়াল দিয়া অতি সুদৃঢ়ভাবে বেষ্টন করা হইয়াছে। প্রাচীর এখন প্রায় বহু স্থানেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কালক্রমে প্রায় সবটুকুই লুপ্ত হইবে বলিয়া মনে হয়। যেটুকুন সাক্ষ্য পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয়, এই প্রাচীরের উচ্চতা কোথায়ও ৪০ হাত, কোথাও ৫০ হাত এবং কোথাও ২০।২৫ হাত ছিল। বহিঃপ্রাচীরের অভ্যন্তরে একটি পরিখা ছিল। পরিখাটি ৪০০ হইতে ৫০০

হাতের মত প্রশস্ত। বর্ত্তমানে সংস্কার অভাবে ও কালের হস্তাবলেপে বহু স্থান মাটি ভরাট হইয়া ইহার প্রশস্ততা নিরূপণে বাধা জন্মায়। প্রথম প্রাচীরের বাহিরে আবার আর একটি পরিখা আছে। এই পরিখাটিও আভ্যন্তরীণ পরিখা হইতে ছোট নয় প্রায় সমান বলিয়াই মনে হয়। দ্বিতীয় পরিখার পর আবার একটি সুদৃঢ় মৃত্তিকানির্ম্মিত প্রাচীর। এইরূপ তিনটি প্রাচীর ও দুইটি পরিখার মধ্য-স্থলে একটি দ্বীপের ন্যায় ভূভাগ। এই দ্বীপ-ভূভাগের পরিমাণ প্রায় ১১৭০ বিঘা। তাহার মধ্যে রাজপ্রাসাদ, অস্ত্রাগার ও সেনানিবাস যে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ আছে।

এই দুর্গের ন্যায় বিস্তৃত ও সুদৃঢ় দুর্গ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞদের অন্ততঃ তাহাই মত। কামরূপের হিন্দুগণ এই প্রণালীতে সুবৃহৎ ও সুদৃঢ় প্রাচীর ও পরিখা বেষ্টিত দুর্গনির্ম্মাণের কৌশল জানিতেন। কোচ-বিহারের নিকট কামতাপুরের রাজা নীলধ্বজের দুর্গ ও রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ আজিও বর্ত্তমান আছে। তাহাও এই প্রণালীতে গঠিত। *

গড়দলিপার মধ্যভাগে কতকগুলি সুবৃহৎ দীঘির অস্তিত্ব দেখিয়াই বুঝা যায় যে, ইহা তৎকালের বৃহত্তম দুর্গ-গুলির অন্যতম। দুর্গের মধ্যবর্ত্তী একটি দীঘিকে মোতি-বিঞ্জার তালাব্ বলে।

দুর্গের চারিটি বড় বড় সুবৃহৎ প্রস্তরনির্ম্মিত দ্বার ছিল। সদর দরজাটিই ইহার মধ্যে সবচেয়ে দৃঢ় ও সুবৃহৎ ছিল। উহার স্তম্ভ ও ফ্রেমটি কঠিন কালো পাথরে নির্ম্মিত ছিল। খিড়কি দুয়ারের নিকট বর্ত্তমানে যে মস্‌জিদটি দেখা যায়, উহা না কি একটি শিবমন্দির ছিল।

"কালীদহ" নামক দীঘির মধ্যস্থলে যে উচ্চ ভূভাগের ভগ্নাংশ দেখা যায়, তাহার মধ্যে একটি প্রমোদ-উদ্যান ছিল।

বৈশাখ মাসের সংক্রান্তি লইয়া এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম তিন দিন এই ৪ দিন, ঐ স্থানে যে মেলা বসে, তাহা না কি দীলিপের মায়ের স্মৃতিরক্ষার্থে। দীলিপের পর এই দুর্গ মুসলমানগণ অধিকার করেন। কোচরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে কোচেরা ইহা অধিকার করেন।

তৎকালীন গৌড়ের বাদসাহ ফিরোজসাহ ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতীরে অধিকার-বিস্তার মানসে সেনাপতি মজলিস খাঁ হুমায়ুনকে পূর্ব্ব-মৈমনসিংহে প্রেরণ করেন। হুমায়ুন সৈন্য-সামন্ত লইয়া তৎকালীন গড়দলিপার শাসনকর্ত্তা দীলিপের রাজধানী দশকাহনিয়া (আধুনিক সেরপুর) প্রবেশ করেন। যুদ্ধে দীলিপ নিহত হন। হুমায়ুন দশকাহনিয়া দখল করেন। ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতীরে এই মুসলমান রাজত্বের পত্তন হইল।

মজলিস্ খাঁ মৈমনসিংহ হইতে আর ফিরিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি সেরপুরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহাকে গড়ের মধ্যেই কবর দেওয়া হয়। তাঁহার সমাধির উপর একটি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপরে একটি শিলালিপি স্থাপন করা হয়। ইহা দৈর্ঘ্যে ৪ ফুট ও প্রস্থে ৩ ফুট। ইহা তুঘ্রা আরবি ভাষায় লিখিত। ব্লাকম্যান সাহেব ইহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন। শিলালিপিটি খুলিয়া আনিবার সময় অকস্মাৎ পড়িয়া গিয়া হাতীর পায়ের নীচে পড়ে, তাহাতে ইহা দুই খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়। শিলালিপিটি ফিরোজসাহের নামে রহিয়াছে। *

---

* "নীলধ্বজের রাজধানীর পরিধি ছিল ১৯০ ক্রোশ, অতএব নগরী বেশ সুবৃহৎ ছিল সন্দেহ নাই। ইহার মধ্যে ৭ ক্রোশ বেড়িয়া নগরীর প্রাচীর ছিল। আর ২॥ ক্রোশ একটি নদীর দ্বারা রক্ষিত। প্রাচীরের ভিতর প্রাচীর, গড়ের ভিতর গড়, মধ্যে রাজপুরী। সেকালের নগরী সকলের এইরূপ গঠন ছিল। বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ—বঙ্কিমচন্দ্র।

* Inscription of Firoz Shah the slab of which was some years ago presented to the Society (Asiatic Society of Bengal) by Babu Hem Chandra Chaudhury of Serpur, Mymensingh. The slab is granite but the letters are very unclean and nearly one-fourth of the inscription is hopelessly illegible. The inscription was found at Gar Jaripa, north of Serpur town not far from Kar bari hills and about 16 miles south of the old frontier between Bengal and Assam. It was first attached to the iron rings at the gate of the mud fort of Gar Jaripa from where it had been removed to a place inside the fort called by the people "the tomb."
—J. A. S. 1874 P 300

জঙ্গলবাড়ী

জঙ্গলবাড়ী কোচরাজের একটি অধীন রাজ্য ছিল। লক্ষণ কোচ জঙ্গলবাড়ীর শেষ কোচ রাজা। জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান সাহেবদিগের পূর্ব্বপুরুষ বীর ঈষা খাঁ রাত্রিকালে সহসা সসৈন্যে লক্ষণ কোচের রাজধানী আক্রমণ করেন। লক্ষণ সেন কাপুরুষ ছিলেন না। কিন্তু আকস্মিক আক্রমণে যুদ্ধের সুযোগ না পাইয়া গুপ্ত পথে দুর্গ হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। ইষা খাঁ জঙ্গলবাড়ী অধিকার করিয়া স্বীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন।*

জঙ্গলবাড়ীর রাজধানী অতি বৃহৎ ছিল। এই রাজধানীও প্রাচীন রীতি অনুসারে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহাও চারিদিকে মৃত্তিকা-নির্ম্মিত দেওয়াল ও পরিখা দ্বারা বেষ্টিত ছিল। ভিতরের পরিখাটি প্রায় চারিশত গজ প্রশস্ত ছিল। পরিখাটি এখনও বর্ত্তমান আছে। ইহা যে বেশ গভীর ছিল, তাহার আজও প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ এখনও গ্রীষ্মকালে ১২।১৪ হাত জল থাক। চারিদিকে ইঁট না পাওয়া যাওয়াতে মনে হয় রাজধানীতে কোন অট্টালিকা ছিল না। রাজধানীর প্রবেশদ্বার বেশ প্রশস্ত ছিল। ইহার স্তম্ভ বিশাল, কারুকার্য্যে খচিত ও প্রস্তর নির্ম্মিত ছিল। এখনও সদর দরজার কয়েকটি প্রস্তর-স্তম্ভ গড়ে ইতস্তত প্রোথিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। নরসুন্দার শাখা নদীর দ্বারা রাজধানীটি প্রায় চারিদিকে বেষ্টিত ছিল। বর্ত্তমানে নদীটি প্রায় শুকাইয়াই গিয়াছে। বর্ষাকালে মাত্র নৌকা চলাচল করিতে পারে। চারিদিকে নদী-বেষ্টিত থাকাতে শত্রুর আক্রমণ হইতে ইহা সুরক্ষিত ছিল।

মৈমনসিংহ জিলার এই স্থানটি সুপ্রসিদ্ধ। কিশোরগঞ্জ সহর হইতে পাঁচ মাইল পূর্ব্বে জঙ্গলবাড়ী অবস্থিত।

* রাম লক্ষণ দুই ভাই কোচের প্রধান,
বাস্তব্য করেন থানে হইয়া গরিমান।
রাত্রি নিশাকালে ঈশা কোন কাম করে,
রাম লক্ষণ দুই ভাইরে গেল মারিবারে।
টের পাইয়া রাম লক্ষণ গেল পলাইয়া।
নিরুদ্দেশ হইয়া গেল জঙ্গল ছাড়িয়া। —ময়মনসিংহ-গীতিকা।

বোকাইনগর দুর্গ

মৈমনসিংহ সহর হইতে নয় মাইল পূর্ব্বদিকে বোকাইনগর অবস্থিত। বর্ত্তমান বোকাইনগর রেলষ্টেশনে ও তাহার পূর্ব্বদিকের বিস্তৃত গ্রাম কেল্লা-বোকাইনগরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহা দৈর্ঘ্যে ৬ মাইল ও প্রস্থে ৫ মাইল ছিল। দুর্গটি প্রায় দশ হাত উচ্চ ও পনের ষোল হাত পুরু মাটির প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল। মৈমনসিংহের অন্যান্য কেল্লার মতই ইহার চারিদিকে প্রশস্ত পরিখাও ছিল। কেন্দ্রস্থলে ছিল রাজধানী। দুর্গের মধ্যে রাজার অস্ত্রশালা ও কামারশালা ছিল। সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যই দুর্গে সঞ্চিত থাকিত।

এই দুর্গ কোচ রাজাদিগের দ্বারা নির্ম্মিত হয়। বোকা নামক কোচ সামন্তদিগের মধ্যে শেষ সামন্তের নাম অনুসারে ইহার নাম বোকাইনগর হয়।

কেল্লার সম্মুখভাগে একটি খাল ছিল। ঐ খাল বালুত্যা নদীর সহিত সংযুক্ত ছিল। দুর্গ হইতে বাহির হইয়া বালুত্যা নদী দিয়া সোজা ব্রহ্মপুত্রে পড়া যাইত। এখন এই খাল একেবারে মজিয়া শুকাইয়া গিয়াছে। এই কেল্লা নির্ম্মাণে সেকালের ইঞ্জিনিয়ারদের অসামান্য চাতুর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

কেল্লার অদূরে চারিটি বড় বড় ইষ্টকস্তূপ পাওয়া যায়। অনুমান, ঐ স্থানে প্রহরীদিগের আবাসস্থল ছিল। দুর্গ-প্রাচীরের চিহ্ন ১৩০৪ সালের ভূমিকম্পে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। বোকাইনগর কেল্লার পরিধি বহু মহল্লায় বিভক্ত ছিল। মুসলমান অধিকারের পর এই সকল বিভিন্ন মহল্লার সৃষ্টি হইয়াছিল, যথা—পাঠান টোলা, কায়স্থ টোলা, পটুয়া টোলা, মহল্লা গড়পাড়া, চকপাড়া, মহল্লা মামুদনগর, মহাজনটোলা ইত্যাদি। বোকাইনগরে প্রাচীন কালের একটি জীর্ণ মসজিদ এখনও বর্ত্তমান আছে। দ্বারের উপর আরবি ভাষায় একটি লিপি খোদিত আছে। যেটুকু পড়িতে পারা যায়, তাহাতে প্রমাণ হয় যে, ইহা সাজাহানের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল।*

* মসজিদের দ্বারে লেখা আছে—"লাইলাহা ইল্লাল্লা মহম্মদ রসুলাল্লা আবু বোকার ··· ··· সাহজাহানের রাজত্ব কালে"—ইত্যাদি।

মদনপুর কেল্লা

মৈমনসিংহ জেলার নেত্রকোণা সাব-ডিভিশন হইতে পাঁচ মাইল দক্ষিণে মদনপুর গ্রাম অবস্থিত। মদননারায়ণ নামক এক কোচ সামন্তের নামানুসারে এই স্থানের নাম মদনপুর হইয়াছিল। কোচের শাসনকালে সা-সুলতান রুমী নামক একজন মুসলমান ফকীর বহু অনুচর সহ রুম দেশ হইতে এই দুর্গে আগমন করেন।

সা-সুলতান কিরূপে মদনপুরে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, এই সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ আছে। কাহারও মতে রুমী ও তাঁহার অনুচরগণ যুদ্ধ করিয়া মদনকোচকে পরাজিত ও নিহত করেন। কোন প্রবাদের মতে, কোচরাজা রুমীকে বিষপ্রয়োগে বধ করিতে চেষ্টা করেন। রুমী একজন অলৌকিক গুণসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। এই কঠোর বিষপ্রয়োগে তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। তাহাতে বিস্মিত হইয়া রাজা তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কোচ রাজা রুমীর গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সসম্মানে মদনপুরে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার প্রদত্ত বহু লাখেরাজ ভূমি এখনও পর্য্যন্ত সা-সাহেবের দরগার সম্পত্তিরূপে বর্ত্তমান আছে। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে সরকার এই লাখেরাজ ভূমি বাজেয়াপ্ত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালীন খাদেমগণ ১০৮২ হিজিরার (১৬৭২ খৃঃ অঃ) একখানি সনন্দ প্রদর্শন করিলে উক্ত লাখেরাজ—জায়গীরদার জালালউদ্দিন মহম্মদের অনুকূলে পরিত্যাগ করেন। উক্ত সনন্দ হইতে জানা যায় যে, রুমী, তাঁহার গুরু ও অনুচর খাদেমগণ ৪৪৫ হিজিরায় (১০৫৩ খৃঃ) ঐ গ্রামে আগমন করিয়াছিলেন।* গেজেটিয়ারের কথা সত্য হইলে রুমী কোচ রাজ্য প্রতিষ্ঠার অনেক পূর্ব্বে এই অঞ্চলে আগমন করেন। মদন সামন্ত তাহার সমসাময়িক হইলেও, তিনি কোচ ছিলেন না, প্রাচীন কামরূপ হিন্দুরাজ্যের একজন শাসনকর্ত্তা ছিলেন। পরবর্ত্তী কালে কোচদিগের প্রাধান্যের সময় এই কেল্লা তাঁহাদিগের হস্তগত হয় মাত্র।

অধুনা এই গ্রামের অধিবাসীরা পূর্ব্বোক্ত দশজন খাদেমের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। প্রাচীন দশ ঘর প্রধান মুসলমান উক্ত দরগার আয় পর্য্যায়ক্রমে ভোগ করিতেছেন। এই দশ পরিবারের দশজন লোক সমবেত হইয়া দরগার যাবতীয় কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। যাঁহারা যে দিনের আয় গ্রহণ করেন, তাঁহারা সেই দিনের আগত অতিথিদিগের সৎকার করিয়া থাকেন। এই দরগার আয় নিজেদের মধ্যেই স্থায়ীভাবে রাখিবার জন্য এই গ্রামের পূর্ব্বোক্ত মুসলমান পরিবারগণ তাঁহাদের কন্যাদিগকে স্থানান্তরে বিবাহ দেন না।

রুমীর সমাধি এখনও বর্ত্তমান আছে। চারিদিকে ইটের প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। হিন্দু-মুসলমান সকলেই এই সমাধিতে সিন্নী দেন। সমাধির রক্ষকগণ যাত্রীদিগের নিকট হইতে বহু দর্শনী পান।

রুমীর সমাধির উপর আরবি ভাষায় খোদিত আছে "১০ই রবি অল আউল ৪৪৫ হিজরি"।

১৩০৪ সনের প্রবল ভূমিকম্পে মৈমনসিংহের এই প্রাচীন ঐতিহাসিক সাক্ষীগুলির অনেক ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। প্রায় সমস্ত কেল্লাগুলির প্রাচীর ও দীঘিগুলি ভাঙ্গিয়া কিংবা মৃত্তিকায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ধীরে ধীরে কালের হস্তাবলেপে এই সমস্ত প্রচীন ঐতিহাসিক কীর্ত্তিগুলি একেবারেই লোপ হইয়া যাইবে। যদি ঐতিহাসিকগণ ও স্থানীয় ভূম্যধিকারিগণ ইহার যত্ন না লন, তাহা হইলে কিছু দিন পরে আর ইহাদের চিহ্নও পাওয়া যাইবে না। আমরা ঐতিহাসিকগণকে এ দিকে দৃষ্টি দিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।

* It appears from the document that Mamad Sultan Rumi and his preceptor Saiyad Shah Surkh Khul Antia settled in this village with their disciples called Khadems in 445 A. H.—Mym. Gazetter, p. 152.

জীবন-চিত্র

—শ্রীবিজনবালা দেবী

একজিবিশন

কংগ্রেস একজিবিশন,—দেশময় সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

সুরুচি বলিলেন—'যাবে না?'

'—জানিতে বাসনা করি রাণীর কি মত?'

সুরুচি হাসিয়া বলিলেন—'কার না দেখতে ইচ্ছা করে?'

'তুমি আমি ভিন্নমত নহি প্রিয়ে—'

'তবে যাওয়া ঠিক?'

'নিশ্চয়! গিন্নী—আমার গৃহিণী, সিংহিনী—খুড়ি ভুলে বলেছি! গৃহিণী যা বলেন তাই আমার শিরোধার্য্য।'

'কবে থেকে?'

'চিরকাল—চিরকাল!'

'সেই জন্যই যদি বলি আজ মফঃস্বল যেও না, তা মানা হয় না।'

'সেটা বুঝলে না দেবী, রাজকার্য্য।'

'আর এটা—'

'এটা আমার গৃহিণীর অভিলাষ। এ আমার পূরণ করিতেই হইবে, তাতে ছার প্রাণ থাক আর যাক।'

উদ্যোগ সম্পূর্ণ করিয়া যথা দিনে বিশ্বকর্ম্মা সপরিবারে কলিকাতা আসিয়া ভবানীপুরে বাসা লইলেন। নীহার বাড়ী গিয়াছে। এ জন্য ভুবন নামে একটি লোক সঙ্গে গেল।

সুরুচির পিতা তাপসীকে লইয়া আসিবেন চিঠি দিয়াছিলেন। বিশ্বকর্ম্মা প্রতীক্ষায় রহিলেন। ঢাকা হইতে দ্বিজেন আসিল এবং তার বন্ধু। তেজেন কলিকাতায় কলেজে পড়ে।

বিশ্বকর্ম্মার ইচ্ছা শ্বশুর মহাশয় ও তাপসী আসিলে একত্রে পরিদর্শন করা। কিন্তু দ্বিজেন ও কমলের ইচ্ছানুসারে পরের দিন একজিবিশন দেখিতে যাত্রা করিলেন।

গেটের ভিতর ঢুকিয়া বাঁদিক্ হইতে দেখা সুরু হইল। সুরুচি বলিলেন, 'সব দেশের সব কিছু এনে জড় করেছে দেখছি—'

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন,—'না হলে একজিবিশন কিসের?'

ঘণ্টা তিনেক ধরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়াও আদি অন্ত পাওয়া গেল না। কোনরকম নোটিশও নাই যে, তাহা দেখিয়া বিষয় বোঝা যাইবে। অবিরত রৌদ্রে ভ্রমণের ফলে মাথা ধরিয়া ও গলা শুকাইয়া উঠিল। প্রথমটা সকলেই খুব উৎসাহযুক্ত ছিল—কিন্তু ক্রমশঃ গতি মন্দ হইয়া আসিল।

সামনে বিদ্যাসাগর বাণী-ভবন। সুরুচি গিয়া ভিতরের সাজান কারুশিল্পগুলি দেখিয়া আসিলেন। একটা ছায়াযুক্ত স্থানে দাঁড়াইয়া বলিলেন—'একটু জল পেলে হত। কিংবা পান।'

কমল বলিল, 'এত ঘুরলাম কোথাও ত একটা পান কি সোডা-লেমনেডের দোকান দেখলাম না।'

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'দোকান কি পথে করে রাখবে? কোথাও সে সব সারি দিয়ে সাজানো রয়েছে—আমরা সে দিকে যাই-নি। এস দেখা যাক।'

সুরুচি বলিলেন, 'আমি আর হাঁটতে পারছি নে।'

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন 'সে কি? অত উৎসাহ! এখনি মন্দা হল? এখনও ত সিকিও দেখনি! এখানে থাকলে জল এগিয়ে আসবে না, জলের কাছেই যেতে হবে।'

রৌদ্রে সকলেরই মুখ শুষ্ক। কাজেই সুরুচি আর কিছু বলিলেন না।

অনেক খুঁজিয়াও একটি চা, খাবার কি পানের দোকান বা পানীয় জলের সাক্ষাৎ মিলিল না।

কিছুক্ষণ পরে ভ্রাম্যমাণ অবস্থায়ই জন দুই স্বেচ্ছাসেবককে দেখিতে পাইয়া বিশ্বকর্ম্মা প্রশ্ন করিলেন। তাহারা বলিল, 'সব আছে, ঐ দিকে যান।'

সেই দিক লক্ষ্য করিয়া কিছু দূর গিয়া দেখা গেল, একটি তাঁবুর মধ্যে লম্বা টেবিলে কতকগুলি নর-নারী আহারে বসিয়াছে। সুরুচি বলিলেন, 'হিন্দু মতে কি না—'

কমল ভিতরে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'হ্যাঁ, বিশুদ্ধ হিন্দুমতেই বটে,—তবে সব রকম আছে,—যে যা চায়—'

সুরুচি আসিকা কুঞ্চিত করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'চল—'

'তোমরা কিছু খেয়ে এস না, আমি দাঁড়াই এখানে।'

'আমরা তেমন কাতর হইনি তুমি যেমন হয়েছ। অতএব চল—'

আবার ভ্রমণ ও অন্বেষণ। হঠাৎ একজন স্বেচ্ছা-সেবককে দেখা গেল। মরুভূমির ওয়েসিসের মতই ইহারা দুর্লভ-দর্শন।

বিশ্বকর্ম্মা তাহাকে ব্যাপারটা বলিলেন। এস বলিল, 'অনেকক্ষণ থেকে ধরে খুঁজছেন, পাচ্ছেন না? ও দিকে—'

'—ও দিকে একটা দেখে এলাম, কিন্তু হিন্দুর নয়।'

'ও হিন্দু? আসুন'—সহাস্যে ছেলেটী অগ্রবর্ত্তী হইল। খানিক দূর আসিয়া দূরে একটী চন্দ্রাতপ নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—'ওখানে যান।'

প্রশস্ত চন্দ্রাতপ। সকলে তাহার নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। সারি সারি সাদা কাপড় ঢাকা ছোট ছোট টেবিল ঘিরিয়া চারিখানি করিয়া হালকা চেয়ার পাতা। অনেক লোক বসিয়া গিয়াছে। অনেকগুলি টেবিল খালিও রহিয়াছে। বাঁ দিকের ষ্টলগুলিতে মেয়েরা চা ও জলযোগের আয়োজনে নিযুক্ত।

বিশ্বকর্ম্মা সদলে একটা টেবিল ঘিরিয়া বসিলেন। কমলের ইচ্ছা ছিল অন্য টেবিলে বসে। কিন্তু বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'এদিক-ওদিক দেখছিস কি? বসে পড় না।'

স্বেচ্ছা-সেবিকার ব্যাজ-ধারিণী একটী চশমা-পরা পরিচ্ছন্ন-বেশা তরুণী ক্ষিপ্র চরণে কাছে আসিয়া থামিয়া বলিল—'কি চাই আপনাদের?'

বিশ্বকর্ম্মা মেয়েদের সামনে অত্যন্ত লজ্জিত ও বিব্রত হন। কেহ বেড়াইতে আসিলে বাড়ী ছাড়িয়া পলায়ন করা অভ্যাস। এক্ষণে হঠাৎ বিপদাপন্ন হইয়া গেলেন। শেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, 'আমাদের জন্যে চার ডিস খাবার এবং চা—'

মেয়েটী একটু আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল, 'চার ডিস?' নম্রকণ্ঠে বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'হ্যাঁ।'

মেয়েটির আশ্চর্য্য ভাবে সবাই একটু আশ্চর্য্য হইল।

মেয়েটি তেমনি ক্ষিপ্রপদে নিজেদের ষ্টলে গিয়া ঢুকিল। পর মুহূর্ত্তেই দুটি সুবেশা ও ব্যাজধারিণী চারি খানি প্লেট হাতে আসিয়া সবার সামনে রাখিয়া গেল।

সাদা পোর্সিলেনের প্লেট। প্রতি প্লেটে চারি প্রকার জিনিস, দুটি দুটি ছোলা-মটর ভাজা, দুটি করিয়া চিঁড়ে ভাজা, দুখানি বেগুনী এবং ডিম ও আলু মিশাইয়া একটা করিয়া চপ ধরণের জিনিস।

দ্বিজেন এ দিকে ও দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল, 'এতে কি হবে?'

মেয়ে দু'জন চারি পেয়ালা চা দিয়া গেল। আর প্রথম মেয়েটি চারি খানি কার্ড আনিয়া টেবিলের মাঝখানে রাখিল। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'আমায় অনুগ্রহ করে এক গ্লাস জল—'

বিশ্বকর্ম্মা কোন দিনও চায়ের পেয়ালা শেষ করেন না। দু চার বার চুমুক দিয়া রাখিয়া দেন। এ জন্য তাঁর বাপে সুরুচি ছোট পেয়ালা কিনিয়া দিয়াছেন।

দ্বিজেন কার্ডগুলি তুলিয়া দেখিয়া বিশ্বকর্ম্মার হাতে দিয়া বলিল, 'দেখুন!'

বিশ্বকর্ম্মা পড়িয়া দেখিলেন, খাদ্য-পানীয়ের মূল্য স্বরূপ প্রত্যেককে এক টাকা করিয়া দিতে হইবে। চারি জনের চারি টাকা। এই টাকাটা কোন্ এক সাহায্যের জন্য কোথায় প্রেরিত হইবে।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'মন্দ নয়!'

সুরুচি বলিলেন, 'কি?'

'চার জনের চার টাকা বিল—'

'সে কি?'

মৃদুস্বরে বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'চুপ কর।'

কার্ডবাহিনী জলের গ্লাস টেবিলে রাখিয়া চলিয়া গেল। সুরুচি বলিলেন, 'সত্যি না ঠাট্টা?'

'এই দেখ—'

'—আশ্চর্য্য! এই সামান্য জিনিস যার দাম দু'আনা। আর এক পেয়ালা চা, বড় জোর চার পয়সা। এই ডিম

আনা যোট, চার জনের বারো আনা। তা নয় চা-র টা-কা ?'

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'কি সাহায্যের জন্য—'

'—কি সাহায্য আগে বলা উচিত, যার ইচ্ছা হয় দেবে, না হয় না দেবে, এ যেন জোর করে নেওয়া—'

বৃথা অর্থনষ্ট হেতু রোষ ও ক্ষোভে সুরুচি বিষপানের ন্যায় চা পান করিলেন। রুচি বহুক্ষণ চলিয়া গিয়াছে। শুধু পয়সার মায়ায়।

কমল চা খায় না। চা খাইলে তার ঘুম হয় না, কান ভোঁ-ভোঁ করে, মাথা ঘোরে—অনেক উপসর্গ। তবু দাম শুনিয়া সে পেয়ালাটা শেষ করিল। শুধু বিশ্বকর্ম্মার প্লেট ও পেয়ালায় সবই কিছু কিছু রহিল। সুরুচি বলিলেন, 'এক একটা ছোলা মটরের দাম এক এক পয়সা।' আর একটি স্বেচ্ছাসেবিকা আসিয়া উচ্ছিষ্ট পাত্রাদি লইয়া গেল। বিশ্বকর্ম্মা মনিব্যাগ বাহির করিয়া চারিটি টাকা তাহাকে দিলেন।

একটু দূরে চারিজন তরুণ যুবক এক টেবিলে বসিয়াছিল। দেখিয়া মনে হয় ধনী। বেশভূষা খুব মূল্যবান ও রুচিসঙ্গত। তার মধ্যে এক জনের কণ্ঠ উচ্চ হইয়া উঠিল। স্বেচ্ছাসেবিকা তাহাদের কার্ড দিয়া গিয়াছে। একজন বলিতেছে, 'এ কি রে ? চা'র টাকা দিতে হবে যে ?'

দ্বিতীয় বলিল, 'হঃ কও কি ? চা খাইয়া চা'র টাকা দিমু না ?'

তৃতীয় বলিল, 'ঠাট্টা করেছে !'

প্রথম বলিল, 'হ্যাঁ ঠাট্টা। পকেট থেকে টাকা ফেলে কথা বল।'

দ্বিতীয় বলিল, 'হক্কা কথা ? চা'র টাহা সোজা কথা ? গায়ে লাগে না ?'

চতুর্থ বলিল, 'তুমি খেলে কেন ? দিতেই হবে।'

দ্বিতীয় বলিল, 'খাইছি ? কি খাইছি ? ঘোড়ার ডিম খাইছি। না গেল ক্ষুধা, না গেল তিষ্টা, এক পয়সার চিড়া মটর, এক পয়সার বাগুন ভাজা, মগের মুলুক আর কি !'

চতুর্থ বলিল, 'চুপ কর ভাই, চুপ কর। চার দিকে সবাই হাঁ করে তোর কথা শুনছে। যা হবার হল, বলে লাভ কি বল ?'

দ্বিতীয়, "হঃ চুপ করুম ! তারা নিবার পারে, আমরা কইবার পারুম না ? এত ডর কিসের ? কইমুই ত, আরো কইমু !'

তৃতীয় বলিল, "আচ্ছা ভাই, যা বলবার বাড়ী গিয়ে বলিস। এখানে নয়।'

দ্বিতীয় বলিল, 'কেন্—এহানে কি হইল ? উচিত কথা কইমু তার খাতিরডা কিসের ? জাশের খিকা আসছি কি টাহা ছড়াইবার লাইগ্যা ? আমরা কি মাটন-চপ খাইছি, না কোর্ম্মাকারী খাইছি যে নগদ টাহা গুইনা দিমু ? চার জন চার টাহা ?—ডাহা সর্ব্বনাশ।'

প্রথম বলিল, 'থাক্ থাক্ তোর টাকার অভাব কি ? এই ক' দিন বন্ধু-বান্ধবের পিছনে কম খরচ করিস নি—আজকের এ তো সামান্য।'

বিলের টাকা মিটাইয়া দিয়া অপর তিনজন উঠিয়া পড়িল। প্রথম দ্বিতীয়ের বাহু ধরিয়া বলিল, 'চল, আর বসে আছিস কেন ?'

দ্বিতীয় বলিল, 'হ-হ, দেরি করলে আবার বিল না জায় যে চেয়ার টেবিল আটকাইয়া রাখচ তাও টাহা।'

তাহাকে টানিতে টানিতে বন্ধুরা চলিয়া গেল। বিশ্বকর্ম্মা হাসিয়া বলিলেন, 'চল আমরাও উঠি।'

উঠিয়া পথ চলিতে চলিতে বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'পান কোথা পাওয়া যায় আবার—'

সুরুচি বাধা দিলেন—'থাক্‌গে, একটা পান চার আনা হবে বোধ হয়।'

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'তবে চল—বাড়ী ফেরা যাক্।'

দ্বিজেন বলিল, 'কিছু দেখা হয়নি যে ?'

'না হোক, রোদে মাথা ধরে গেছে—আর ভাল লাগছে না।'

দ্বিজেন বলিল, 'আমি একটা মাফলার কিনব—'

'চল্'—একটা দোকানে ঢুকিয়া উচিত দামের প্রায় দ্বিগুণ দিয়া একটা মাফলার কেনা হইল। দ্বিজেন সেটি গলায় জড়াইতে জড়াইতে বলিল, 'আর খানিকক্ষণ দেখলে হত।'

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'আজ আর নয়।'

সুরুচি বলিলেন, 'এখনি যাব যদি—বাড়ী গিয়েই চা খাওয়া যেত।'

'তোমার জন্তে—আমাদের বিশেষ গরজ ছিল না।'

'হ্যাঁ—যত তাড়া আমারি। নিজেদের কিছু না!'

'সত্যি—তুমি কেমন কাহিল হয়ে পড়েছ'

'ঠাট্টা নয়। আমাদের কিছু বলা উচিত ছিল। তুমি বললে চুপ কর, চুপ কর।'

'বলে লাভ কি?'

কমল বলিল, 'এমন অনেকে একজিবিশনে এসেছে যার কাছে চার আনা আট আনার বেশী নেই।'

'তারা খেতে যাবে কেন?'

সুরুচি বলিলেন, 'তাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা নেই না কি?' গরীব ভদ্রলোক অনেকেই আছে যাদের পকেটে দু'এক টাকার বেশী নেই। একটা একজিবিশন ঘুরে দেখতে শ্রান্ত হয় সবাই। ছেলে পিলে স্ত্রী নিয়ে নিশ্চিন্ত ভাবে চা খেতে বস্‌লে—কিন্তু বিল দেখে কি করবে তখন?'

'তাদের উচিত দামের কথা আগে জেনে নেওয়া।'

'এ সব তুচ্ছ জিনিসের দাম আবার কেউ আগে জেনে নেয় না কি? কৈ তুমি তো তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে না? আগে জানলে কখনো বস্‌তে না এ কথা সত্যি। ন্যায্য ভাবে যত টাকা খরচ হোক মনে লাগে না। কিন্তু অন্যায় রকমে একটি পয়সা গেলেও কষ্ট হয়। সাধারণ ন্যায্য দামের চেয়ে যখন এতটা বেশী দাম এরা করেছে, তখন আগেই জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল এদেরই। খেতে দিয়ে পরে বিল দেওয়া মানে কানটি ধরে টাকা আদায় করা। কেন না, খাও না খাও টাকা দিতেই হবে তখন। ঢাকাই লোকটি যা বললে কিছু মিছে নয়।'

বাহিরে আসিয়া গাড়ীতে উঠিয়া দ্বিজেন বলিল, 'আরো কত জনের আমাদের মত দশা হচ্ছে দেখুন গিয়ে।'

ঘুঁটে

—শ্রীনারায়ণপ্রসাদ আচার্য্য

বিভূতি ভায়ার বাড়ীর গলির দুধারে
দেওয়ালে প্রচুর ঘুঁটে
দিবু দা বলেন, 'কবিতা মিলাও, কবি'—
আমি বলি, 'কে হবে মুটে
সে ঘুঁটে বওয়ার'? ঝোঁকের মাথায়
দিবু দা তখন দিলেন কথা:—
'লেখো ত পত্ত—বর' আমি ঘুঁটে'।
কবিতা কোথায় ঘুরিছে মাথা
কবিতা সুষমা-স্বপন-স্বরগ সফেন-সলিল-ইন্দ্রধনু
কেমনে বুঝাই ঘুঁটের মাঝেও ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাজায় বেণু?
আঁখি দিয়ে মোরা যাহা দেখি তাই সত্য -
তা'ছাড়া সকলি ফাঁকি
যদিও না দেখা র'য়ে যায় সব,—
কবিতা নীরবে আপনা ঢাকি,
রূপ হতে রূপে ফিরে চুপি চুপি,—
রসের সাগরে আপনা ঢালি
নিশি দিনমান রসের ভিয়ান করি রসিকের সাজায় ডালি।
শত প্রেমিকের বক্ষ-ক্ষত ফিরিছে গোপনে ধরার বুকে
রূপহীন ওই ঘুটের মতন আবরণে ঢাকা হিয়ার দুখে।
সেই প্রেমীদের হিয়ার লালিমা সময়ে সময়ে মনের ভুলে
ঢালে ভালবাসা গভীর আবেগে করবী কমল গুলাব ফুলে।
যত বাসি হওয়া শুক্‌নো ঘুঁটের ফুটে টুটে যাওয়া মধুর রাতি
কে জানে কোথায় আজিকে জ্বালায়
সরস-হরষ-স্মরণ-বাতি!
জান কি দিবু দা আজিকে যে খেলা
নিছক খেলার মতন খেলা
একদিন তাহা লীলা হতে পারে
স্মরণে যাহার কাটিবে বেলা?
মাটির মায়ার মানুষ আমরা মাটির মিলন-বিরহে কাঁদি,—
মৃন্ময়ী মা'রে চিন্ময়ী করে শত বন্ধনে নিয়ত বাঁধি।
গোবর বলিছে, বর ওগো বর! মাটি তোমাদের বন্দনীয়া—
মাটি তোমাদের জননী-ভগিনী-দয়িতা-দুহিতা দর্শনীয়া!
মাটির মমতা মাপ-কাঠি হয়ে মাপিছে মানব সভ্যতারে,—
মাটির মোহেতে মরিয়া মানুষ লঙ্ঘন করে ভব্যতারে।
মাটির মাধ্যাকর্ষণাবেগে আদিকাল হতে অদ্যাবধি
অন্ধ বেগেতে নিরবধি ফিরে ভিক্ষুর ঝুলি রাজার গদী।
এই মাটি হতে জনম লইয়া মাটির বুকেই পাইবে লয়,
মাটির প্রেমের পূজনের বলি,—ঘুঁটের বন্ধু এই পরিচয়।
জাগো জাগো নব 'দিব্য জ্যোতি,
জাগো হে পুরুষ রমণী জাগো,
যেয়ো না যেয়ো না মাটি হ'য়ে আজ
মাটির দুয়ারে বিভব মাগো।'

প্রাথমিক সংখ্যা-বিজ্ঞান

—শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

এক প্রকার রেখা দ্বারা সংখ্যা প্রকাশ করা হয়, তাহাকে 'সংযোজক' রেখা বলা যায়। সাধারণ সংখ্যা-শ্রেণী হইতে সংযোজক সংখ্যা-শ্রেণী সৃষ্টি করা হয় এই ভাবে—সাধারণ সংখ্যা-শ্রেণীর প্রথম ও দ্বিতীয় পদের সংযোগে নূতন যে সংখ্যা-শ্রেণীর সৃষ্টি হয়, তাহাকে দ্বিতীয় সংখ্যা ধরা হয়, এই নূতন সংখ্যার সহিত মূল সংখ্যা-শ্রেণীর তৃতীয় পদ সংযুক্ত করিয়া নূতন সংখ্যা-শ্রেণীর তৃতীয় পদ সৃষ্টি করা হয়। এই নূতন সংখ্যার সহিত মূল সংখ্যা-শ্রেণীর চতুর্থ পদ সংযুক্ত করিয়া নূতন সংখ্যা-শ্রেণীর চতুর্থ পদ সৃষ্টি করা হয়। এই প্রথায় মূল সংখ্যা-শ্রেণীর শেষ সংখ্যা পর্য্যন্ত যোগ করা হয়। নূতন সংখ্যা-শ্রেণীর শেষ যে পদের সৃষ্টি হয়, প্রকৃতপক্ষে সে পদ মূল সংখ্যা-শ্রেণীর সকল সংখ্যার সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ভাবে নূতন যে সংখ্যা-শ্রেণীর সৃষ্টি হয়, তাহাকে সংযোজক সংখ্যা শ্রেণী বলা যায়, এই সংখ্যা-শ্রেণী সৃষ্টি হওয়ার পর এই সংখ্যা-শ্রেণীর একটি রেখা চিত্র আঁকিলে যে রেখা হয়, তাহাকে 'সংযোজক' রেখা আখ্যা দেওয়া যায়।

একটি সাধারণ সংখ্যা-শ্রেণী হইতে কিরূপে 'সংযোজক' সংখ্যা-শ্রেণী সৃষ্টি করা যায় ও সেই সংখ্যা-শ্রেণীকে রেখা দ্বারা প্রকাশ করিলে কিরূপ দেখায়, তাহার উদাহরণ নিম্নলিখিত তালিকা হইতে দেখান হইবে—

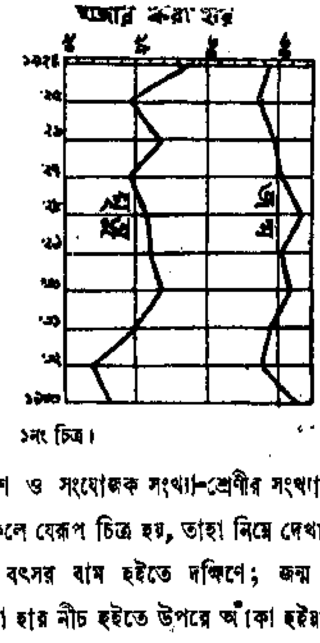
তালিকা—ভারতবর্ষে প্রতি হাজারকরা লোক-সংখ্যা অনুপাতে জন্ম ও মৃত্যুর হার—

	১৯২৪	১৯২৫	১৯২৬	১৯২৭	১৯২৮	১৯২৯	১৯৩০	১৯৩১	১৯৩২	১৯৩৩
জন্ম	৩৪·৪	৩৩·৭	৩৪·৮	৩৫·৩	৩৬·৮	৩৫·২	৩৬·০	৩৪·৪	৩৪·০	৩৬·৪
মৃত্যু	২৮·৫	২৫·৭	২৬·৮	২৫·৯	২৫·৬	২৬·০	২৩·৮	২৪·৯	২১·৯	২৩·০

—ষ্ট্যাটিসটিক্যাল্ অ্যাবস্ট্র্যাক্ট অব্ বৃটিশ ইণ্ডিয়া (১৯২৪-২৫ হইতে ১৯৩৩-৩৪), পৃঃ ৫২৯।

এই তালিকার সংখ্যাগুলিকে সাধারণ সংখ্যা বলা যায়, এই সাধারণ সংখ্যা হইতে সংযোজক সংখ্যা-শ্রেণীর জন্মহার ও মৃত্যুহার সৃষ্টি করা যায় এইরূপে—

	জন্মহার		মৃত্যুহার	
	সাধারণ	সংযোজক	সাধারণ	সংযোজক
১৯২৪	৩৪·৪	[illegible]	[illegible]	[illegible]
১৯২৫	৩৩·৭	[illegible]	[illegible]	[illegible]
১৯২৬	৩৪·৮	[illegible]	[illegible]	[illegible]
১৯২৭	৩৫·৩	[illegible]	[illegible]	১০৬·৯
১৯২৮	৩৬·৮	১৭৫·০	২৫·৬	১৩২·৫
১৯২৯	৩৫·২	২১০·২	২৬·০	১৫৮·৫
১৯৩০	৩৬·০	২৪৬·২	২৩·৮	১৮৩·৩
১৯৩১	৩৪·৪	২৮০·৬	২৪·৯	২০৮·২
১৯৩২	৩৪·০	৩১৪·৬	২১·৯	২৩০·১
১৯৩৩	৩৬·৪	৩৫১·৩	২৩·০	২৫৩·১
সমষ্টি	৩৫১·৩	—	২৫৩·১	



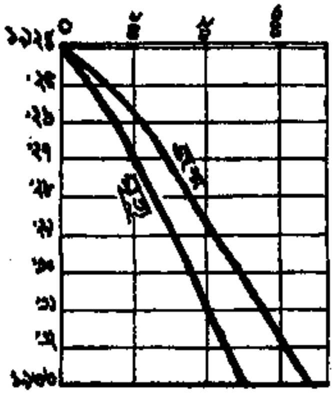
১নং চিত্র।

সাধারণ ও সংযোজক সংখ্যা-শ্রেণীর সংখ্যাগুলির রেখা-চিত্র আঁকিলে যেরূপ চিত্র হয়, তাহা নিম্নে দেখান হইল—

চিত্রে বৎসর বাম হইতে দক্ষিণে; জন্ম এবং মৃত্যুর হাজার করা হার নীচ হইতে উপরে আঁকা হইয়াছে। উভয় চিত্রেই মৃত্যু অপেক্ষা জন্মের হার যে বেশী তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে, জন্ম-রেখা মৃত্যু-রেখার উপরে প্রকাশ পাওয়ায়।

অনেক সময় সংযোজক শ্রেণীর শেষ পদকে অর্থাৎ সাধারণ সংখ্যা-শ্রেণীর সমষ্টিকে ১০০ ধরিয়া অন্যান্য সংখ্যার অনুপাতে সংযোজক সংখ্যাগুলির পরিবর্ত্তন পরিষ্কাররূপে বোঝা যায়। সংযোজক সংখ্যা-শ্রেণীর রেখা-চিত্র দ্বারা লাভ-লোকসান, ক্ষতি-বৃদ্ধি, বা সঞ্চয়-অপচয় ইত্যাদি বিপরীতার্থক

বিষয়গুলির তুলনামূলক পরীক্ষার সুবিধা হয়। সাধারণ সংখ্যা-শ্রেণীর সমষ্টির অনুপাতে সংযোজক সংখ্যাগুলি প্রকাশ



২নং চিত্র।

করিলে আর একটি সুবিধা এই যে, মোট লাভ মোট ক্ষতির অধিক হইলেও মোট লাভের যে অনুপাতে পরিবর্ত্তন হইয়াছে মোট ক্ষতির পরিবর্ত্তন অনুপাতে কখনও বেশী হইয়াছে কি না তাহা ধরা যায়। জন্ম-মৃত্যু হারের সংযোজক শ্রেণীর যে তালিকা করা হইয়াছে সেই সংখ্যাগুলির শেষ সংখ্যাগুলিকে ১০০ ধরিলে অন্যান্য সংখ্যাগুলি যেরূপ হয়, তাহা নিম্নের তালিকায় দেখান হইল—

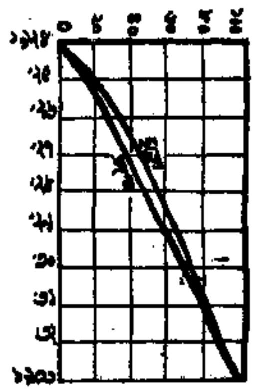
	জন্ম	মৃত্যু
১৯২৪	০	০
১৯২৫	১৯	২১
১৯২৬	২৯	৩১
১৯২৭	৩৯	৪১
১৯২৮	৫০	৫১
১৯২৯	৬০	৬২
১৯৩০	৭০	৭২
১৯৩১	৮০	৮০
১৯৩২	৯০	৯০
১৯৩৩	১০০	১০০

এই তালিকার সংখ্যাগুলি রেখায় প্রকাশ করিলে ১৯৩০ সাল পর্য্যন্ত মোট সমষ্টির অনুপাতে যে মৃত্যুহার জন্মহার অপেক্ষা বেশী ছিল তাহা পরিস্ফুট হইবে, কিন্তু কেবল সংযোজক সংখ্যার রেখা-চিত্র হইতে দেখা যায় যে, ১৯২৩ হইতে ১৯৩৩ মোট সংখ্যার তুলনায় জন্মহারের সংযোজক অনুপাত-সংখ্যা মৃত্যুহারের সংযোজক অনুপাত-সংখ্যা অপেক্ষা ক্রমান্বয়ে কয়েক বৎসরই কম। এই জন্য চিত্রে মৃত্যু-রেখা জন্ম-রেখার উপরে উঠিয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বে যে সকল উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক তালিকাতে দুইটি স্তম্ভে সংখ্যাগুলি প্রকাশ করা হয় এবং প্রথম স্তম্ভে যে রাশিগুলি থাকে তাহাদের পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে দ্বিতীয় স্তম্ভের রাশিগুলির পরিবর্ত্তন হয়। উভয় স্তম্ভেই পরিবর্ত্তনশীল কতকগুলি রাশির শ্রেণী বা পদ থাকে; এরূপ পরিবর্ত্তনশীল রাশিকে 'চল' রাশি নাম দেওয়া যায়। যে চল রাশির পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে অপর রাশির পরিবর্ত্তন হয় তাহাকে 'স্বাধীন' ও যাহার পরিবর্ত্তন স্বাধীন চল রাশির উপর নির্ভর করে তাহাকে 'অধীন' চল রাশি নাম দেওয়া যায়। যেমন, একটি রাশি ক-এর সাথে অপর একটি রাশি খ-এর এরূপ সম্বন্ধ থাকিতে পারে যে, স্বাধীন রাশি খ-এর পরিবর্ত্তনের সাথে অধীন রাশি ক-এর পরিবর্ত্তন হয়, এবং ক-এর পরিবর্ত্তনের মাত্রা এমন যে, খ-কে পাঁচগুণ করিয়া তাহার সহিত ৭ যোগ করিলে সর্ব্বদাই ক-এর মাত্রা জানা যায়; বীজগণিতের সঙ্কেতে ক ও খ-এর এই সম্বন্ধ সমীকরণ চিহ্ন (=) দ্বারা প্রকাশ করিলে এইরূপ হয়:—

$$ক = ৫খ + ৭$$

এখানে খ-এর পাঁচগুণ প্রকাশ করা হইয়াছে, ৫×খ না লিখিয়া, সংক্ষেপে ৫খ লিখিয়া।



৩নং চিত্র।

ক ও খ-এর সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ যে সমীকরণে দেখান হইয়াছে তাহা হইতে খ-এর বিভিন্ন পরিবর্ত্তনে ক-এর কিরূপ পরিবর্ত্তন হয় তাহা দেখা যায় খ-এর পরিবর্ত্তে বিভিন্ন সংখ্যা

লিখিয়া। খ-এর পরিবর্ত্তে যদি ০ হইতে ৪ পর্য্যন্ত এক একটি সংখ্যা ধরা যায়, তাহা হইলে ক-এর কিরূপ পরিবর্ত্তন হয় তাহা নিচের তালিকায় দেখান যায় :-

	১	২			
ক=	১২	১৭	২২	২৭	৩২

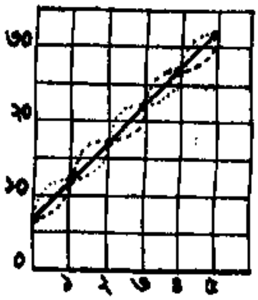
একটি চিত্র দ্বারা ক ও খ এর সম্বন্ধ প্রকাশ করা যায়। বীজগণিতে রৈখিক চিত্র আঁকিবার পদ্ধতিতে একটি বিন্দুর অবস্থান জানাইতে হইলে দুইটি সংখ্যার যুগ্ম অস্তিত্ব প্রয়োজন। এই দুইটি সংখ্যার তাৎপর্য্য এই যে, একটি বিন্দুর কোন সমতলে অবস্থান জানিতে হইলে একটি স্থির বিন্দুর কল্পনা করা প্রয়োজন হয়। এই স্থির বিন্দু হইতে দক্ষিণে বা বামে কয়েক পদ যাওয়ার পর উপরে বা নীচে আরও কয়েক-পদ গেলে সেই বিন্দুতে উপস্থিত হওয়া যায়। যেমন, টেবিলে যে দোয়াতটি রহিয়াছে তাহার অবস্থান প্রকাশ করিতে হইলে টেবিলের বাম কোণকে স্থির বিন্দু ধরিয়া সেই কোন হইতে হয়ত দক্ষিণে ১০ ইঞ্চি ও তথা হইতে উপরে ৬ ইঞ্চি গেলে দোয়াতটিতে পৌছান যায়; তাহা হইলে দোয়াতটির অবস্থান প্রকাশ করা যায় (১০,৬)। ক ও খ-এর সম্বন্ধ সম্পর্কে যে তালিকা দেখান হইয়াছে তাহাতে ৬ জোড়া সংখ্যা রহিয়াছে যথা—(০,৭), (১,১২), (২,১৭) (৩,২২), (৪,২৭) (৫,৩২); এগুলি এক-এক জোড়া-সংখ্যার এক-একটি বিন্দুর অবস্থান নির্দ্দেশ করিতেছে। চিত্রে এই বিন্দুগুলি প্রকাশ করিলে এরূপ দেখা যায় যে, এই বিন্দুগণ যেন একটি সরল রেখার পথে অবস্থিত। সরল রেখার পথ ব্যতীত অন্য পথেও যে বিন্দুগুলি অবস্থিত হইতে পারে তাহাও কল্পনা করাও সম্ভব; যথা চিত্রে সরল রেখা ব্যতীত দুই প্রকার তরঙ্গ রেখায় দেখান হইল, কিন্তু এরূপ কল্পনার মধ্যে যে জটিলতা রহিয়াছে তাহার অবতারণা এখানে না করা যুক্তিসঙ্গত। তবে, যে সমীকরণে ক=৫খ+৭, তাহাতে খ-এর মাত্রা আরও ছোট করিলে, অর্থাৎ খ ০ হইতে ৫ পর্য্যন্ত যে লওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যেই আরও সঙ্কীর্ণ বাস্তব বিভাগ রচনা করিলে এমন সমস্ত বিন্দু পাওয়া যাইবে যেগুলি সরল রেখা-পথেই থাকিবে; এই জন্য ক=৫খ+৭ সমীকরণ একটি নির্দ্দিষ্ট সরল রেখার অক্ষরের প্রতিলিপি ধরা যায়।

দুইটি রাশির সম্বন্ধ এমন হইতে পারে যে, সরল রেখা ব্যতীত অন্যান্য রেখা দ্বারাও সে সম্বন্ধ প্রকাশ করা যায়; যথা, ক ও খ রাশির সম্বন্ধ এমন হইতে পারে যে, খ সর্ব্বদাই ক-এর বর্গের সমান; অর্থাৎ আক্ষরিক চিহ্নে প্রকাশ করিলে ক ও খ রাশির সমীকরণ হয় ক২=খ

(এখানে ক২ বসিয়াছে ক২-এর বর্গের অর্থাৎ ক-কে ক দ্বারা গুণফল, ক×ক এর পরিবর্ত্তে) এরূপ সমীকরণের একটি তালিকা করা যায় এইরূপ :—

খ=	০	১	৪	৯
ক=	০	১	২	৩

এখানে খ ১-এর অর্থ এই যে স্থির বিন্দু (০,০) হইতে খ দক্ষিণে এক মাত্রা অগ্রসর হইলে ক=+১ অর্থাৎ ক উপরেও একমাত্রা নীচেও একমাত্রা যাইবে; তদ্রূপ খ=৪ হইলে

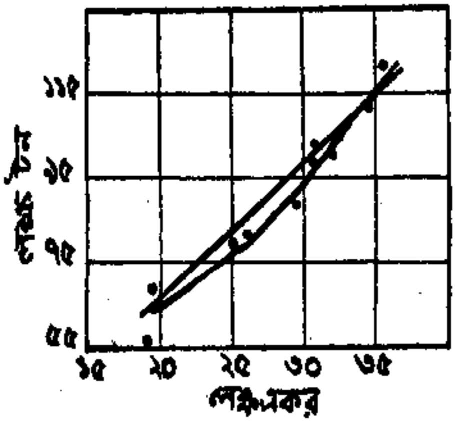


৫নং চিত্র।

ক=+২ অর্থাৎ ক তখন দুই মাত্রা উপরেও দুই মাত্রা নীচে যাইবে; স্বাধীন রাশি খ-এর প্রত্যেক মাত্রার সহিত অধীন রাশি ক দুই ভাবে জড়িত। যে কয়টি বিন্দুতে খ ও ক-এর সম্বন্ধ প্রকাশ করা যায় সেগুলিকে একটি রেখা দ্বারা যুক্ত করিলে যে রেখা হয় তাহার চিত্র নীচে দেওয়া হইল (এই রেখাকে অধিবৃত্ত বলে)

এমন অনেক বিষয় আছে যাহাতে দুইটি ঘটনা এরূপভাবে জড়িত যে একটি ঘটিলে অপরটি কোন নিয়ম অনুসারে ঘটিয়া থাকে; প্রথম ঘটনার উপর দ্বিতীয় ঘটনা নির্ভর করে। প্রথমটিকে 'স্বাধীন' বলিলে দ্বিতীয়টিকে 'অধীন' বলা যায়, একটি কার্য্য হইলে, অপরটি কারণ। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাতে বা ব্যবহারিক জীবনে এরূপ বহু বিষয়ে একটি ঘটনার সহিত অপর ঘটনার সম্বন্ধ লক্ষ্য করা যায়। এই ঘটনাগুলির যদি কোন মাপ-জোক করা যায় তাহা হইলে জোড়া-জোড়া

কতকগুলি সংখ্যাকে কতকগুলি বিন্দুদ্বারা চিত্রে প্রকাশ করা যায়। এই বিন্দুগুলি যে সর্ব্বদাই সরল রেখার পথে থাকিবে



৫নং চিত্র।

এমন কোন স্থিরতা সকল ক্ষেত্রে থাকিবে না। যে ক্ষেত্রে দুইটির সম্বন্ধ-প্রকাশক বিন্দুগুলি একটি সরল রেখায় অবস্থিত হইবে সে ক্ষেত্রে ঘটনা দুইটির একটি সহজ ও সরল সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ করা সম্ভব ; চিত্রের বিন্দুগুলির অবস্থান যত জটিল হইবে ঘটনা দুইটির সম্বন্ধও হইবে তত জটিল। কাল শ্রেণীর যে কয়েকটি চিত্র পূর্ব্বে দেখান হইল সে গুলির এক-দিকে সময় ও অপর দিকে বিভিন্ন তথ্য লইয়া কয়েকটি বিন্দুর অবস্থান স্থির করা হইয়াছে, তাহার পর বিন্দুগুলি রেখাদ্বারা যুক্ত করা হইয়াছে। ইহা কালের সহিত তথ্যগুলির সম্বন্ধ কিরূপ তাহার পরিচয়।

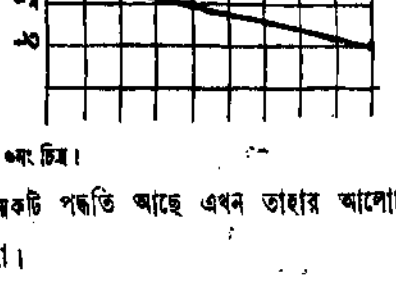
আবার একই সময়ে বিভিন্ন ঘটনা ঘটিলেও ঘটনাগুলির মধ্যে সম্বন্ধ কিরূপ তাহাও চিত্রে প্রকাশ করা সম্ভব। দুইটি ঘটনার সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে হইলে একদিকে প্রথম ঘটনার তথ্য, অন্যদিকে দ্বিতীয় ঘটনার তথ্য লইয়া চিত্র আঁকা যায়। কোন সময়ে কতটা জমিতে পাট চাষ হইয়াছিল ও কত পরি-মাণ পাট উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার তথ্য এইরূপ :—

(ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল অ্যাব্‌ষ্ট্রাক্ট ফর বৃটিশ ইণ্ডিয়া, ১৯২৪-২৫ হইতে ১৯৩৩-৩৪, পৃ ৩৯৫)

	পাটচাষের জমির পরিমাণ (লক্ষ একর)	উৎপন্ন পাটের পরিমাণ (লক্ষ টন)
১৯২৪-২৫	২১'৪	৮০'৬
২৫-২৬	২৯'২	৮৯'৪
২৬-২৭	৩৬'১	১২১'৩
২৭-২৮	৩২'৯	১০১'৯
২৮-২৯	৩০'৬	৯৯'১
২৯-৩০	৩২'৭	১০৩'৪
৩০-৩১	৩৪'০	১১২'০
৩১-৩২	১৮'৪	৫৫'৪
৩২-৩৩	১৮'৮	৭০'৭
১৯৩৩-৩৪	২৪'৯	৭৯'৯

জমির পরিমাণ বাম হইতে দক্ষিণে এবং উৎপন্ন সামগ্রীর পরিমাণ নীচ হইতে উপরে ধরিলে একটি চিত্রে দশ-জোড়া সংখ্যায় ১০টি বিন্দু পাওয়া যায় ; এই ১০টি বিন্দুকে একটি সরল রেখার উপরে অবস্থিত কল্পনা করা যায়। যে চিত্র আঁকা হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যাইবে, যেন একটি বক্ররেখাই এই বিন্দুগুলির অবস্থান আরও স্পষ্টভাবে দেখাইতেছে। সরল বা বক্ররেখা যাহাই নিদর্শন ধরা হউক না কেন, এই রেখা দ্বারা চাষের জমির পরিমাণের উপর উৎপন্ন সামগ্রীর পরিমাণের সম্বন্ধ নিরূপণ করা সম্ভব হয়।

দুই বা ততোধিক ঘটনার মধ্যে চিত্র দ্বারা সম্বন্ধ নিরূপণের পদ্ধতি ব্যতীত অঙ্কের পদ্ধতি দ্বারা মাপ-জোক করিবার



৬নং চিত্র।

যে কয়েকটি পদ্ধতি আছে এখন তাহার আলোচনা করা হইল না।

আগামী যুদ্ধ ও জার্ম্মানী

—শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

গত মহাযুদ্ধের পর সমগ্র জগৎ একসঙ্গে অখণ্ড শান্তির কথা ভাবিতে লাগিল। সকলেই তখন রণক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত এবং সকলেরই সামাজিক ও আর্থিক বনিয়াদ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত। যুদ্ধের ভয়াবহ ফল দেখিয়া, জনসাধারণ শাসকগণের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে ভবিষ্যতে এরূপ মহাসমর পুনর্ব্বার সংঘটিত না হয়, তাহার জন্য নানা চেষ্টা চলিতে লাগিল। সাহিত্যে, বক্তৃতায়, শুধু অখণ্ড শান্তির কথা ও যুদ্ধের ভয়াবহতা ও পৈশাচিকতার কথা নানা ভাবে আলোচিত হইতে লাগিল। এই শান্তি-স্বপ্নের জন্য কোন কোন মনীষী নোবেল-প্রাইজ পাইলেন—তাহাও আমরা দেখিলাম। সাহিত্যে, সিনেমায়, আমরা যুদ্ধের বিপরীত গান শুনিলাম—ভাবিলাম, বুঝি বা রণদেবতা সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ইউরোপের জনসাধারণ যুদ্ধের ফলে সব চেয়ে বেশী রকম ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে। তাহাদের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা কামানের মুখে পড়িয়া বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাদের আর্থিক মন্দা ও নৈতিক অধঃপতন যথেষ্ট পরিমাণে দেখা গিয়াছে,—আজিও গত যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া ইউরোপের জনসাধারণের সামাজিক জীবনে, ব্যক্তিগত জীবনে ও রাষ্ট্রে যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু গত মহাযুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা লাভবান হইয়াছে একটি সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্রেণী, ধনিক ও অস্ত্রব্যবসায়িগণ। অস্ত্রব্যবসায়ীরা অবশ্য কোন মতেই কোন কালেই অখণ্ড শান্তির কথা ভাবিতে পারেন না। এ কথাও স্বীকার্য্য যে, গত মহাযুদ্ধে জগতের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে ও সামাজিক জীবনে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছে, যাহার ফলে জার্ম্মানীতে রাজতন্ত্র ধ্বংস হইয়াছে ও রুশিয়ায় মহিমান্বিত জার-তন্ত্র ধ্বংস পাইয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রকৃত জনগণের হাতে আসিয়াছে এবং এই দিক্ হইতে, মহাযুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া অনেকেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। জগৎ ও সমাজ নূতনভাবে গড়িয়া উঠিবার পক্ষে ও রাজতন্ত্রের আধিপত্যকে ধ্বংস করিতে একমাত্র মহাযুদ্ধই সমর্থ, তাহা আমরা অবশ্যই মনে মনে উপলব্ধি করি। পুরাতন সামাজিক রীতিনীতি ও চিন্তার আমূল পরিবর্ত্তন এবং গণতন্ত্রের নামে স্বেচ্ছাতন্ত্র যে মহাযুদ্ধের কল্যাণে ধ্বংস হয়, ইহা মহাযুদ্ধের একটি সুখময় ফল বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়।

প্রকৃত প্রস্তাবে, আমরা প্রত্যেকেই যুদ্ধবিরোধী হইলেও—আমরা অজ্ঞাতসারে মহাযুদ্ধের কামনা করি। দেশে যখন বন্যা আসে, তখন সাময়িকভাবে, জনসাধারণের দুর্গতির সীমা থাকে না—এ কথা সত্য। কিন্তু ভবিষ্যতে ঐ মহাবন্যা হইতে আমরা লাভবান হই। যাহা ক্ষয় হইয়াছে বা যাহা জীর্ণ তাহা ধ্বংস হওয়াই বাঞ্ছনীয় ও সেই ঘনায়মান বিপদ্ সামাজিক রীতিনীতির আভ্যন্তরিক বনিয়াদের ধ্বংসের জন্য একদিন যে দেখা দিবেই ইহাও অবশ্যম্ভাবী। সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক অন্যায় যতদিন আমাদের সমাজে ও রাষ্ট্রে রহিবে, ততদিন যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। কারণ ঐ যুদ্ধ কাহারও ব্যক্তিগত আদেশে বা ইচ্ছায় সংঘটিত হয় না—একমাত্র অর্থ-নৈতিক ভিত্তির অসামঞ্জস্যের জন্যই যুদ্ধ দেখা দেয়। যতদিন ঐ অন্যায্য অর্থ-নৈতিক বনিয়াদ সামাজিক জীবনে রহিবে, ততদিন মানব-সমাজ প্রকৃতভাবে যুদ্ধের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে না।

গত মহাযুদ্ধের পর জগতের রাষ্ট্রনীতিবিদ্গণ যে অখণ্ড শান্তির তাসের ঘর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমানে সামান্য ফুৎকারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ফ্যাসিষ্ট ইতালীর আবিসিনিয়া বিজয়, স্পেনের অন্তর্বিপ্লবে য়ুরোপীয় রাষ্ট্রগণের প্রকাশ্য ও অ-প্রকাশ্য সাহায্য এবং সর্ব্বশেষ চীন-জাপানের যুদ্ধ প্রতিপন্ন করে যে, ভিতরের দুরারোগ্য ব্যাধি ও ক্ষতকে সুন্দর পরিচ্ছদে ঢাকিয়া রাখিলে তাহা নিরাময় হয় না। একদিন তাহা আত্ম-প্রকাশ করে, এবং সেই আত্মপ্রকাশ বড় ভয়াবহ ও করুণ। এই কথা সত্য যে, বর্ত্তমানে সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্স ও বৃটেন কোন বড় মহাযুদ্ধ চাহে না, যতটা সম্ভব সমস্ত অমঙ্গলকে পাশ কাটাইয়া চলাই তাহাদের বর্ত্তমান উদ্দেশ্য। কারণ, ফ্রান্স ও বৃটেনের যে বহুবিস্তৃত উপনিবেশ রহিয়াছে, তাহা যে আগামী মহাযুদ্ধে হস্তচ্যুত হইবে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে!

সুবিখ্যাত ভার্সাই সন্ধিতে মিত্র-শক্তিগণ পরস্পর জার্মানীর অধীন উপনিবেশ ও রাজ্যগুলি ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া একটি অখণ্ড শান্তির স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। কিন্তু সে স্বপ্ন টুটিয়া গেল। হিটলার সাহেবের নেতৃত্বে জার্মানীর আর যাহাই হউক, সে তাহার হৃতশক্তি পুনরুদ্ধার করিয়া ফেলিয়াছে। এ ছাড়া মিত্রশক্তিগণ কর্তৃক লিখিত সন্ধিপত্রকে ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষেপ করিয়াছে। বর্ত্তমানে খবর এই, হের হিটলার ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভার্সাই সন্ধির যে সকল বিধান অনুযায়ী বিভিন্ন ভূভাগ বিজয়ী রাষ্ট্রশক্তির হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে, তাহা জার্মানী আর বৈধ বলিয়া স্বীকার করিবে না।

ইহা ছাড়া পূর্ব্বের ইতিহাস আমরা জানি—রাইনল্যাণ্ডে সৈন্য-সমাবেশ,—যুদ্ধ-জাহাজ ও বিমান-জাহাজ নির্ম্মাণ ও বৃদ্ধি ও ব্যাপক ভাবে সৈন্য-বিভাগের উন্নতি ও বৃদ্ধি, তারপর প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে অন্যান্য শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া ইটালীর আবিসিনিয়া-বিজয়ের সাহায্যদান ও বর্ত্তমানে সমগ্র শক্তিকে রীতিমত ভাবে উপেক্ষা করিয়া জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে প্রকৃত নায়ক বলিয়া স্বীকার ও তাহাকে সাহায্যদান। সর্ব্বশেষ ব্যাপার জার্মানী কর্তৃক তাহার হৃত রাজ্যগুলি ও আফ্রিকার উপনিবেশগুলি দৃঢ়কণ্ঠে ফেরৎ চাহিয়া বসা।

বর্ত্তমানে এই সব উপনিবেশগুলি বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যের অধীন হইয়া রহিয়াছে। এই উপনিবেশগুলি ফেরৎ চাওয়াতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিটি কেন্দ্রে তীব্র উদ্বেগের সঞ্চার দেখা দিল। যাহাতে মিঃ ইডেন ও প্রধান-মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন হের হিটলারের সহিত বাক্যালাপে ও নানা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য মন্ত্রণায় হিটলারকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিয়া, অবশেষে জানাইতে বাধ্য হইলেন যে, জার্মানীকে উপনিবেশগুলি ফেরৎ দেওয়া বর্ত্তমানে সম্ভবপর নয়। তবে যাহাতে তাহার কাঁচামাল পাইতে বিশেষ বেগ বোধ না হয় তাহার চেষ্টা হইবে। কিন্তু ইহাতে জার্মানী কিছুমাত্র সন্তুষ্ট নহে। জার্মানীর সন্তুষ্ট হইবার কথাও নয়। কারণ, বর্ত্তমানে তাহার জনসংখ্যা দুই কোটির উপর। এই দুই কোটি লোকের উপযুক্ত খাদ্য এবং দেশরক্ষার জন্য নানাজাতীয় যুদ্ধসম্ভারের প্রয়োজনীয় বস্তু তাহার নিজ দেশ হইতে উপযুক্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয় না।

রবার, তুলা, স্বর্ণ, লৌহ, দস্তা, ম্যাঙ্গানীজ, কয়লা, তামা, টিন, পেট্রোল এবং অন্যান্য খাদ্য-দ্রব্য যেমন চা ও নানাজাতীয় ফল ও তরকারী প্রভৃতি জার্মানীতে কিছুমাত্র উৎপন্ন হয় না। এই সকলের জন্য জার্মানী অন্যদেশের মুখাপেক্ষী। গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে, যখন তাহার আফ্রিকার উপনিবেশগুলি ছিল, তখন জগতের মধ্যে পটাশ, কয়লা, লিগনাইট, এই ত্রিবস্তুতে জার্মানীর একচেটিয়া অধিকার ছিল।

বর্ত্তমানে জার্মানী মাত্র শতকরা ৯ ভাগ দস্তা—তিন ভাগ সীসা ও ১২ ভাগ রৌপ্য উৎপাদন করে। অপর দিকে বৃটেন জগতের উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে শতকরা ২৫ ভাগ তুলা, ৫০ ভাগ পশম, ৫৮ ভাগ রবার, ৬৫ ভাগ স্বর্ণ এবং শতকরা ১০০ ভাগ পাট উৎপাদন করে। ইহা ছাড়া শতকরা ৪০ ভাগ দস্তা, ৪৩ ভাগ টিন, ৩৫ ভাগ জিঙ্ক, ৩৩½ ভাগ ক্রোম ওর ও ৩০½ ভাগ ম্যাঙ্গানীজ ওরের মালিক।

ফরাসী শতকরা (জগতের উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে) ১৯½ ভাগ লৌহ, ২০ ভাগ পটাশ, ও ইহাছাড়া তুলা, রবার, প্রভৃতি বহুল পরিমাণে উৎপন্ন করে। আমেরিকা, রুশিয়া ফরাসী প্রভৃতি খাদ্যবস্তুতে, খণিজ দ্রব্যে ও অন্যান্য জিনিষে জগতের মধ্যে প্রধানতম স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে বর্ত্তমানে জার্ম্মানীর জনসংখ্যা দুই কোটির উপর। কিন্তু এই দুই কোটি লোকের উপযুক্ত খাদ্য ও জমিজায়গা তাহার নাই বর্ত্তমানে তাহার জনসংখ্যার প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে খাদ্য-দ্রব্যই শতকরা ২০ ভাগ কম। ইহা ছাড়া পেট্রোল, লোহা স্বর্ণ, দস্তা, রবার, প্রভৃতি যথাক্রমে শতকরা ৫০ ভাগ, ৬০ ভাগ, ৭০ ভাগ, ৯০ ভাগ ও ৯২ ভাগ কম। গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে তাহার উপনিবেশের আয়তন ছিল ১২,৩০০,০০০ বর্গ মাইল। আফ্রিকার উপনিবেশ হইতে তাহার প্রয়োজনীয় সমগ্র কাঁচামালের চাহিদা মিটিত। কিন্তু বর্ত্তমানে এই সুবৃহৎ প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটাইবার আর কোন উপায় নাই, বা এই সব কাঁচামালের পরিবর্ত্তে অন্য দ্রব্য দ্বারা তাহার পূরণ করিবারও উপায় নাই। বর্ত্তমানে ইটালীর যেমন জনসংখ্যার বৃদ্ধির জন্য, খাদ্য ও স্থানের সঙ্কুলানের জন্য, ও বর্ত্তমানে ধনতান্ত্রিক শক্তিগণের মধ্যে নিজকে শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী করিতে আবিসিনিয়া প্রয়োজন হইয়াছিল—তদ্রূপ জার্মানীরও ঠিক সেই অবস্থা আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই উপনিবেশগুলি

ফেরত চাওয়ার মূলে জার্ম্মানীর সেই মনোভাব প্রকাশ পাইতেছে।

এই উপনিবেশ ফেরত চাওয়ার দাবী যখন জার্ম্মানী মিত্রশক্তিবর্গকে জানাইল—তখন মিত্রশক্তিগণের মধ্যে, বিশেষতঃ বৃটিশ ও ফ্রান্সের মধ্যে, ঘরোয়া আলোচনা সুরু হইল। এই ঘরোয়া আলোচনা চলিবার পর জার্ম্মানীকে জানান হইল যে, বর্ত্তমানে উপনিবেশগুলি ফেরত দেওয়া সম্ভবপর নয়। তবে তাহার বাণিজ্যের সুবিধা ও কাঁচামাল প্রাপ্তির সুবিধার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইবে। এই সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, সমগ্র বৃটিশ-সাম্রাজ্যে দেশীয় ব্যক্তিদের সামনে দাঁড় করাইয়া জার্ম্মানীর এই দাবীর বিরুদ্ধে প্রবল যুক্তি সৃষ্টি করিবার চেষ্টা চলিতেছে। রবার্ট ফার্ণেস এম.পি. ও লর্ড ডি. লা. ওয়ার আফ্রিকা গিয়া সেখান হইতে একটি রিপোর্ট দাখিল করিলেন যে, "আফ্রিকার অধিবাসিগণ বর্ত্তমান শাসন-ব্যবস্থা হইতে কোনমতেই মুক্তি চাহে না। জার্ম্মানীর হাতে পড়িলে তাহাদের সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে।" এ ছাড়া নীতির দিক্ হইতে ও মানবতার দিক্ দিয়া বৃটেন ও ফ্রান্সের একটি মস্ত কর্ত্তব্য রহিয়াছে—সে কর্ত্তব্য হইতেছে, 'নেটিভ'দের নিজেদের আওতায় মানুষ করিয়া তোলা। কিন্তু জার্ম্মানীও ঘোষণা করিল—সেই নীতির দিক্ দিয়াও কৃষ্ণাঙ্গের উপর আধিপত্য করিবার তাহাদের কর্ত্তব্য আছে—সুতরাং তাহারা তাহাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটাইবার জন্য, পূর্ব্বে অপহৃত তাহাদের প্রাপ্য উপনিবেশ ফেরৎ চাহে। এই ভাবে উভয় পক্ষে কাগজে ও বক্তৃতায় যুদ্ধ ঘোষণা হইয়াছে।

জার্ম্মানীকে আফ্রিকার উপনিবেশগুলি ফেরত না দেওয়ার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। কারণ একে বর্ত্তমানে ইউরোপের সমস্যা অত্যন্ত জটিল। ইটালীর আবিসিনিয়া বিজয়ের পর, ইটালী আবিসিনিয়ার কাঁচামাল ও বহু-বিস্তৃত ঐশ্বর্য্যময় ভূমি পাইয়া তাহার ভিত্তি ও আর্থিক বনিয়াদ রীতিমত দৃঢ় ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ফেলিয়াছে। ইহার পর স্পেনে যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে ফ্রাঙ্কো-পক্ষের জয়লাভেরই প্রচুর সম্ভাবনা। যদি তাহাই হয়, তবে স্পেনে ইটালী ও জার্ম্মানী সর্ব্ববিষয়ে অধিকতর সুবিধা পাইবে ও ভূমধ্যসাগরে বৃটেন ও ফ্রান্সের প্রাধান্য বিন্দুমাত্র রহিবে না। স্পেনে ফ্রাঙ্কো-গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মানী, ইটালী, স্পেন একত্রে মিলিত হইবে। অষ্ট্রিয়া তো জার্ম্মানীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বেলজিয়ম ও পোল্যাণ্ড, ইহারাও জার্ম্মানী ও ইটালীর সহিত সন্ধি করিয়াছে। ইহার পর জার্ম্মানী যদি আফ্রিকার উপনিবেশগুলি ফেরত পায়, তবে সেখানে নিশ্চয়ই বিমান-বহর, যুদ্ধ-জাহাজ, এ সব রহিবে ও মধ্য-আফ্রিকায় তাহার ক্ষমতা দৃঢ় ভিত্তিতে সু-প্রতিষ্ঠিত হইবে। এইরূপ ভাবে ক্ষমতা-বৃদ্ধির আশঙ্কায় বৃটেন ও ফ্রান্স কোনমতে জার্ম্মানীকে উপনিবেশ ফেরত দিতে পারে না। পরন্তু, ফরাসীর ভয় ও বিপদ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। গত মহা-যুদ্ধের পর ফ্রান্স জার্ম্মানীকে বহু ভাবে দোহন করিয়াছে, 'সার'-কে ভোগ-দখল করিয়া নিজেকে পুষ্ট করিয়াছে।

ফরাসীর ঘরের নিকট জার্ম্মানী। বেলজিয়ম তাহার পক্ষে কখনই যোগ দিবে না। গত মহাযুদ্ধের ভয়াবহ কথা সে আজও ভোলে নাই। উপনিবেশ ফেরত পাইলে হিটলার কি শুধু তাহার উপনিবেশ লইয়াই সন্তুষ্ট রহিবে? অতএব উপনিবেশ ফেরত পাওয়া জার্ম্মানীর পক্ষে সম্ভবপর নয়। ইহার একমাত্র মীমাংসা যুদ্ধ। ইউরোপের গগনে আজ ২০,০০০ বিমানের ঘর্ঘর-ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। স্পেন ও চীন-জাপানের যুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে হয়তো আর একটি মহাযুদ্ধের কথা জগদ্বাসী শুনিতে পাইবে। মুসোলিনী-হিটলার মুলাকাৎ, জাপ, জার্ম্মানী ও ইটালীর মিত্রতা, জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে সর্ব্ববিধ সাহায্যদান ও ভূমধ্যসাগরে সাবমেরিণের উৎপাত—সেই আগামী মহাযুদ্ধের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। আগামী যুদ্ধ যে বাধিবে এবং এই যুদ্ধ যে বিগত মহাযুদ্ধের তুলনায় আরও ব্যাপক ভাবে এবং অতি নিষ্ঠুরতার সহিত সংঘটিত হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমানের এই পরিস্থিতি ও আন্তর্জ্জাতিক গোলমালের কারণ খুঁজিতে হইলে আমাদের আজ হইতে পনের বৎসর আগেকার ঘটনাবলী দেখা দরকার। আফ্রিকার এই আন্তর্জ্জাতিক বিপর্য্যয় ও ইউরোপের বিরাট অশান্তির মূল কারণ কি? ইহার মূল ভার্সাই সন্ধি। যখন মিত্রশক্তিগণ ভার্সাই সন্ধিপত্র রচনা করেন, তখনই একটা প্রকাণ্ড মহা-সমরের বীজ ভিতরে প্রোথিত করিয়া রাখেন। মিত্রশক্তিরা নিজ নিজ সুবিধা অনুযায়ী ইউরোপকে খণ্ড খণ্ড করিয়া এক

অস্ত্রের মুখে তুলিয়া দিয়াছেন। অবশ্য জার্ম্মানীকে যদি কেহ চিরদিনের মত দাবাইয়া ও পঙ্গু করিয়া রাখিবার মত পোষণ করে, সে ফ্রান্স। এই ফ্রান্সই সর্ব্বপ্রথম আত্মরক্ষার অজুহাতে রণ-সম্ভার বৃদ্ধি করিবার প্রথম পথ প্রদর্শন করে।

জার্ম্মানীর মানচিত্রের দিকে তাকাইলে আমরা দেখিতে পাই, আলসেস্-লোরেণ ও পশ্চিম সীমানার অয়পেন এবং মালমেদি বেলজিয়মে চলিয়া গিয়াছে। উত্তরে শ্লেশ্‌উইগ ডেনমার্কে গিয়াছে। ডাঞ্জিকের সহিত পূর্ব্ব-রুশিয়ার অনেক অংশ মিলিয়া একটী নিরপেক্ষ মণ্ডল সৃষ্টি হইয়াছে ও পোলাণ্ডকে সমুদ্রপথে বাণিজ্য করিবার সুবিধা দান করা হইয়াছে। উত্তর মেমন্ প্রদেশ লিথুয়ানিয়া হস্তগত করিয়াছে ও পূর্ব্বনিম্ন সাইলেশিয়ার অধিকাংশ চেকোশ্লোভাকিয়া পাইয়াছে। দক্ষিণের কিছু অংশ ইতালী লইয়াছে। এইভাবে প্রাচীন জার্ম্মানী ও জার্ম্মান জাতিকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে। উপনিবেশ সম্বন্ধে ভাগাভাগির ইতিহাসও এই-রূপ, আফ্রিকার অধিকৃত ভূমি ইংলণ্ড ও ফ্রান্স মোটা রকমের ভাগ পাইয়াছে, বাকিটা বেলজিয়ম ও ইতালী। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলি ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জাপান ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে। বর্ত্তমানে জার্ম্মানীর উপনিবেশ বলিতে কিছুই নাই।

এক সময়ে বেলজিয়ম তাহার বিরুদ্ধে অজস্র মিথ্যা অপবাদ দিয়া নানা কথা প্রচার করিয়াছে—ফরাসী 'সার' প্রদেশের উপর বসিয়া তাহাকে ইচ্ছামত শোষণ করিয়াছে, তাহার যুদ্ধ-জাহাজগুলিকে সমুদ্রে ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে—এবং প্রতি বৎসরে কোটী কোটী মার্ক ক্ষতিপূরণ চাওয়া হইয়াছে। এই সব অপমানকর ঘটনা জার্ম্মানী বিস্মৃত হয় নাই।

ভার্সাই সন্ধি, ওয়াশিংটন নৌ-চুক্তি, লোজান সন্ধি, কেলগ চুক্তি, লোকার্ণো চুক্তি ও নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন প্রভৃতির কথা তাহারা ভুলিয়া যায় নাই। ইহার পরের ঘটনা আলো-চনায় সমস্ত পরিষ্কার বোঝা যাইবে। জাপান রাষ্ট্রসঙ্ঘকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া মাঞ্চুরিয়া দখল করিয়া ফেলিল—রাষ্ট্রসঙ্ঘ কোন প্রতিবাদ করিতে পারিল না। ইহার পর হইল হিটলারের অভ্যুদয়। হিটলারের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রুশিয়ার রাষ্ট্রসঙ্ঘে যোগদান। হিটলারকে কেন্দ্র করিয়া জার্ম্মানী রাষ্ট্রসঙ্ঘ ত্যাগ করিল, সৈন্যবল বৃদ্ধি করিল—ও সঙ্গে সঙ্গে, আশ্চর্য্যের বিষয়, ১৯৩৫ সালে বৃটিশ ও জার্ম্মানীর সহিত একটি নৌ-চুক্তি হইয়া গেল। তখন হইতে বলিতে গেলে আন্তর্জ্জাতিক গোলমালের আরম্ভ। এই নৌ-চুক্তিতে বৃটিশের অতিবড় বন্ধু ফরাসী দুঃখিত ও ভীত হইয়া পড়িল ও নিজেকে নিতান্ত অসহায় ভাবিয়া ফ্রাঙ্কো-ইতালিয়ান আঁতাঁত করিয়া ফেলিল। এই আঁতাঁতের বিষময় ফল হইল এই যে, বিগত দুই সহস্র বৎসরের স্বাধীনতার মুকুট হতভাগ্য আবিসিনীয়গণের মস্তক হইতে খসিয়া পড়িল। ইহাতে রাষ্ট্রসঙ্ঘে আসিল নিষ্ক্রিয়তা ও দুর্ব্বলতা এবং এই দুর্ব্বলতার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের সমুদয় কার্য্য ব্যর্থতায় পরিণত হইল।

আবিসিনিয়া ও ইতালীর যুদ্ধের সময় যখন বৃটেনের পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ ইডেন রাষ্ট্রসঙ্ঘে গরম গরম বক্তৃতা দিতে-ছিলেন—যাহাতে ছিল ইতালীর উপর দোষারোপ ও আবি-সিনিয়াবাসিগণকে রক্ষা করিবার জন্য মনুষ্যত্বের নামে আহ্বান ও যদ্দ্বারা খাস লণ্ডন সহরে ইতালীর বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়িয়া উঠিতেছিল—ঠিক সেই সময় সিনর মুসোলিনী সকলের অলক্ষ্যে দাবার চাল দিলেন। যাহাতে আবিসিনিয়া-যুদ্ধের গতির মোড় ফিরিয়া গেল ও সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডন সহরের জনমত নিশ্চল ও শান্ত হইল। সঙ্গে সঙ্গে মিত্রশক্তিগণ বিশেষতঃ, বৃটিশ ও ফরাসী ভীত ও সচকিত হইল। সেই চালটি হইতেছে এই, মুসোলিনীর ইঙ্গিতে হের হিটলার ভার্সাই সন্ধিতে পদাঘাত করিয়া রাইনল্যাণ্ডে সৈন্য সমাবেশ করিল। অবশ্য জার্ম্মানী কারণ দেখাইল যে, লোকার্ণো চুক্তিকে উপেক্ষা ও পদাঘাত করিয়া ফরাসী ও রুশিয়ার মধ্যে ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েট চুক্তি সম্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে বৃটিশ ও ফরাসী রীতিমত ভীত হইয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে ইতালীর আবিসিনিয়া-বিজয়ের পথ সুগম হইল। ভূমধ্যসাগরে ইতালীর শক্তি বৃদ্ধি পাওয়াতে, ভূমধ্যসাগরের নিকটবর্ত্তী স্বাধীন ও অর্দ্ধ-স্বাধীন রাজ্যগুলির চিন্তার অবধি রহিল না। তুরস্ক দার্দ্দানেলিসে সৈন্য সমাবেশ করিবার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিকট দরবার করিল ও তাহা মঞ্জুর হইল। কারণ, অতি নিকটে কয়েকটি দ্বীপে ইতালীর আড্ডা। দার্দ্দানেলিসে সৈন্য সমাবেশ না করিলে, তাহার সুরক্ষিত হইয়া থাকিবার উপায় নাই।

এই সঙ্গে সঙ্গে বৃটেন মিশরের সহিত রফা করিল ও ইরাক্, ইয়েমেন, ট্রান্সজর্ডানিয়া প্রভৃতি ছোট ছোট রাজ্যগুলির সহিত প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইল।

ইতালীর আবিসিনিয়া অধিকারের পর দেখা গেল, ফরাসী বৃটেন, তুরস্ক, মিশর প্রভৃতি একসঙ্গে জোট পাকাইয়া আত্মরক্ষার্থে সচেষ্ট হইতেছে, ইহাতে ইতালী নিজকে অত্যন্ত অসহায় মনে করিল। অপর পক্ষে জার্মানী দেখিল, ফ্রান্স ও স্পেনে সাম্যবাদের অত্যন্ত প্রাধান্য, সাম্যবাদ যদি সসম্মানে ও ভালভাবে কায়েমী আসন গ্রহণ করে, তবে তাহার পক্ষে তাহা বড়ই ক্ষতিকর হইবে। কাজে কাজেই খুব সহজভাবে জার্মানী ও ইটালীর মিলন হইয়া গেল ও সঙ্গে সঙ্গে অষ্ট্রিয়াকে পাওয়া গেল। না পাওয়া গেলেও অষ্ট্রিয়া যোগ দিতে বাধ্য হইত, কারণ ইটালী তাহার পরম বন্ধু।

ইহার পর আসিল স্পেনের অন্তর্বিপ্লব। এই বিপ্লবের ইতিহাস সকলেই জানেন। এ বিপ্লবে মুসোলিনীর যে হাত আছে, এ কথাও স্বীকার্য্য। ভূমধ্যসাগরে ফরাসী আধিপত্য নষ্ট করাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য। গত ডিসেম্বরের মাঝামাঝি—জাপান ও জার্মানীতে একটা চুক্তি সম্পন্ন হইল এবং ইহাই চীনযুদ্ধের প্রথম সূচনা। শেষে আসিল জার্মানীর ভূভাগের বণ্টন অবৈধ বলিয়া ঘোষণা।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনাগুলিকে ভালভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায়, জার্মানী উপনিবেশ দাবী করিবার জন্যই প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ সব ঘটনাগুলি তাহাদের ইচ্ছামত পর পর অধিকাংশই সাজান হইয়াছে।

ইংলণ্ড জানিত যে, তাহাদের এই ভার্সাই সন্ধি অদূর-ভবিষ্যতে টিকিবে না। ইহার ফলে ভবিষ্যতে এক বিরাট যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। সেই জন্য রণসম্ভার নির্ম্মাণের জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়—সিঙ্গাপুর ঘাঁটী ১৯৩৮ সালের মধ্যে শেষ করার প্রাণান্ত চেষ্টা, হং কং-এ নূতন ঘাঁটী বসাইবার চেষ্টা ও পারস্য উপসাগর, জিব্রাল্টার আরও সুদৃঢ় করার প্রচেষ্টা সেই আগত মহাসমরের ইঙ্গিতেই প্রকাশ করে। এ ছাড়া অস্ত্র-শস্ত্র, বোমা-গ্যাস এ পরিমাণে তৈয়ারী করিবার ধুম লাগিয়া গিয়াছে কি শুধু শান্তিরক্ষার্থে ?

১৯৩৭ সালের জার্মানী চায় তাহার ভৌগোলিক রূপ হউক ১৯১৪ সালের, অর্থাৎ আফ্রিকার সমস্ত উপনিবেশ-গুলি তাহার সহিত সংযুক্ত হউক। কিন্তু তাহার এই ঘোষণায় ও উপনিবেশ ফেরত চাওয়ার দাবীতে ব্রিটিশ, ফরাসী ও অন্যান্য মিত্রশক্তিবর্গ কোন প্রকারেই মত দিতে পারে না। এখন একমাত্র মীমাংসার ক্ষেত্র যুদ্ধ। প্রশান্ত মহাসাগরে মহাযুদ্ধের প্রথম সূত্রপাত হওয়া বিচিত্র নয় এবং সেই যুদ্ধ সুরু হইবে জার্মানীর উপনিবেশ দাবী লইয়া। কারণ জার্মাণ জাতকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে তাহার উপনিবেশ চাই। যদি সহজে মীমাংসা হয়, তবে মহাযুদ্ধটা কিছুদিনের মত পিছাইয়া যাইতে পারে। কিন্তু সে সম্ভাবনা বিন্দুমাত্র নাই।

রাষ্ট্রনীতি

রাষ্ট্রনীতি ধরা যাউক, অথবা সমাজনীতি ধরা যাউক, অথবা যে কোন নীতিই ধরা যাউক না কেন, স্ব স্ব আর্থিক স্বচ্ছলতা, শারীরিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক শান্তি যাহাতে বজায় থাকে, তাহার জন্যই মানুষ রাষ্ট্র ও সমাজ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ক নীতির প্রয়াসী হইয়া থাকে। যখন ঐ বিভিন্ন বিষয়ক নীতি যথাযথ হয়, তখন মানুষের স্বাস্থ্য, মানসিক শান্তি এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, আর যখন উহা অযথাযথ হয়, তখন মানুষের অবস্থাও উত্তরোত্তর পতিত হইতে আরম্ভ করে।

বিচিত্র জগৎ

আগ্নেয়গিরির দেশ গোয়াতেমালা

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পিউর্তো ব্যারিওস্ থেকে কিরিগুয়া শুধু ৩০ মাইল রেলপথের ব্যবধান। কিন্তু যদি কেউ পিউর্তো ব্যারিওস্ থেকে কিরিগুয়া যায়, সে এই ষাট মাইল তো যাবেই—বহু



বোঝাবাহী ইণ্ডিয়ান। পিঠে কম্বল পাতিয়া তাহার উপর বোঝা চাপান হইয়াছে।—নীচে 'ক্যাকাস্টে'র (দাস-চিহ্ন) পায়া দেখা যাইতেছে। বোঝা নামানর সময় পায়াগুলি আগে মাটিতে ঠেকে।

শতাব্দী পূর্ব্বের প্রাচীন অতীতেও সে চলে যাবে। কারণ, কিরিগুয়া হচ্ছে প্রাচীন যুগের 'মায়া'-সভ্যতার কেন্দ্রস্থল।

এরই আশেপাশে কত স্মৃতি ছড়ানো রয়েছে দক্ষিণ-আমেরিকার সেই গৌরবময় অতীতের। এখানকার ঘন জঙ্গলের ধারে দাঁড়িয়ে পুরোনো দিনের প্রস্তর-স্তম্ভ দেখতে দেখতে এমন কোন্ মানুষ আছে যে, সেই সব প্রাচীনকালের জাঁকজমক ও বর্ব্বর প্রাচুর্য্যের মধ্যে কল্পনায় না চলে যায়? অন্যূন কুড়ি শতাব্দী পূর্ব্বের সেই মায়া-সভ্যতার অতীতে? জঙ্গলের ধারে দাঁড়িয়ে জঙ্গলকেই 'বর্ব্বর' বলে মনে হয়।

এমন ভীষণ ঘন জঙ্গল, অজগর সাপের মত মোটা আঁকা বাঁকা লতা, এত আগাছা, মোটা চকাট গাছের গুঁড়ি, দুর্ভেদ্য কাঁটা-ঝোপ, পরগাছার রঙীন ফুল, নানারকমের বন্য ফুলের বাহার, বিচিত্র বর্ণের প্রজাপতির ঝাঁক—দক্ষিণ-আমেরিকায় এই সব অরণ্যানী ছাড়া আর কোথায় দেখতে পাওয়া যাবে?

এই নির্জ্জন, ঘন অরণ্যের পটভূমিতে মোটা মোটা প্রস্তর-স্তম্ভ সর্ব্বত্র দেখা যাবে। এই সব স্তম্ভের গায়ে প্রাচীন দিনের অজ্ঞাত ভাষায় কি সব অক্ষর, নানারকমের মুখ গভীর ভাবে খোদাই করা আছে।

কত শতাব্দীর ঝড়ঝঞ্ঝা সহ্য করেও এই সব পাথরে খোদাই লেখা বা ছবি এখনও টিকে আছে, এইটাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

আমি এখানে গোয়াতেমালার প্রাচীন ইতিহাস বা প্রত্নতত্ত্ব লিখতে বসি নি—আমি সেখানে বেড়িয়ে যা দেখেছি, আমার যেমন মনে হয়েছে, তারই একটা মোটামুটি ছবি দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য।

প্রাচীন গল দেশের ন্যায় আবহাওয়া হিসেবে গোয়াতে-মালা তিন ভাগে বিভক্ত। এদেশে শুধু অবস্থান-বিন্দুর অক্ষ ও দ্রাঘিমা নির্ণয় করে আবহাওয়া নির্দ্ধারিত হয় না, উচ্চতাও একটা বড় হিসেব এ বিষয়ের।

যেমন ধরা যাক্, প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসমুদ্রের তীরবর্ত্তী অঞ্চল ও পর্ব্বতের প্রান্তদেশের সমতল-ভূমি খুব গরম। একে বলা যেতে পারে গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল। তার পর উঁচু জায়গাগুলি প্রায়ই নাতিশীতোষ্ণ, সাধারণতঃ এই অঞ্চলের উচ্চতা তিন হাজার থেকে ছ' হাজার ফুটের মধ্যে।



সন্ধ্যারাগ

[শিল্পী—শ্রীগোবর্দ্ধন আশ

তার পর হচ্ছে শীত-প্রধান অঞ্চল, এদের উচ্চতা সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে চৌদ্দ হাজার ফুট বা তারও বেশী। উত্তর কানাডার অনেক অঞ্চলের শীতের সঙ্গে এই অঞ্চলের শীত সমান।

পিউর্তো ব্যারিওস্ ষ্টীমার থেকে ভারী চমৎকার দেখতে। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি নীল অ্যাটলাণ্টিক্ উপসাগরের ধারে এই ক্ষুদ্র সহরটী অবস্থিত। ভ্রমণকারীর চোখে এই সুদৃশ্য সহরটী স্বপ্নের মত সুন্দর দেখায়, যে স্বপ্ন এই সব অঞ্চল ছাড়া পৃথিবীতে বুঝি আর কোথাও দেখা সম্ভব নয়। সহরটি ছোট যদিও, কিন্তু ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানীর আফিস ও গুদাম এবং রেল ষ্টেশন থাকাতে একটি বিশিষ্ট বাণিজ্যকেন্দ্র এ অঞ্চলের। এ সব সত্ত্বেও আমি এ কথা বলতে বাধ্য যে, এখানে বেশীদিন বাস করা চলে না বা সহরের হোটেল-গুলির এমন অবস্থা নয় যে, বার বার সেখানে ফিরে আসতে ইচ্ছে করে।

যতক্ষণ সময় এখানে ছিলাম, রাত্রে মশা ও অন্যান্য কীট-পতঙ্গের উপদ্রবে নিদ্রা যাওয়া অসম্ভব হয়েছিল। সেই জন্যেই বলছিলাম, পিউর্তো ব্যারিওস্ দূর থেকেই দেখতে ভাল। খুব নিকট থেকে দেখতে গেলে এর অনেকখানি সৌন্দর্য্য চলে যায়।

আজকাল জাহাজ থেকে নেমেই গোয়াতেমালার সর্ব্বত্র ট্রেণে যাওয়া যায়। ত্রিশ বছর আগে তা সম্ভব ছিল না, তখন দেশময় রেল ছড়িয়ে পড়ে নি। জনৈক মার্কিন ইঞ্জিনিয়ারের যত্ন ও চেষ্টায় এখানে এল্ র‍্যাঙ্কোর মরুভূমি ও সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত রেলপথ নির্ম্মিত হয়।

গোয়াতেমালা কফি ও কদলীর দেশ।

যেদিকে চোখ যায়, ট্রেণ থেকে দেখা যাবে শুধু কলা আর কফির বাগান। কলার বাগানই বেশী। কলার বাগান সুরু করা হয়েছে খুব বেশী দিন নয়। গোয়াতেমালার এই সব উপকূল-ভাগ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল। কলার বিস্তৃত চাষ আরম্ভ করবার পূর্ব্বে এই নীচু অঞ্চলের জলনিকাশের ভাল ব্যবস্থা করে একে স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত করতে হয়েছে।

পীতজ্বরের প্রাদুর্ভাব এ দেশে এত বেশী ছিল যে, কোন ইউরোপীয় এ দেশে টিকতে পারত না। ত্রিশ বছর আগে কলা বাগান অঞ্চলে সাহস করে কেউ আসত না, বিষম পীতজ্বরের ভয়ে। তারপর গর্গাস বলে একজন ধনী এসে জঙ্গল কেটে জল নিকাশ করে কলার আবাদ সুরু করেন এবং বহু বৎসর ধরে পীতজ্বর তাড়াবার বিশেষ চেষ্টা করেন। প্রধানতঃ তাঁরই যত্নে ও চেষ্টায় পীতজ্বর এ দেশ থেকে নির্ব্বাসিত হয়েছে।



ইণ্ডিয়ান বালিকা। প্রত্যেক ইণ্ডিয়ান সহরের পোষাকের নিজস্ব স্বরূপ আছে, ছোট ছেলে-মেয়েদের পোষাকেও এই বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট, যাহা দেখিলেই কে কোন্ সহরের অধিবাসী তাহা বুঝা যায়।

এখানকার রেলওয়ে, হাঁসপাতাল, সহর, পুলিশ সব এক উদ্দেশ্যে তৈরী হয়েছে—যাতে প্রতি বৎসর বিশ লক্ষ কলার কাঁদি সমুদ্রপথে আমেরিকার বাজারে নীত হতে পারে। চাষ ও ব্যবসা এক সঙ্গে কি করে করতে হয়, এ দেশের কলার চাষীদের দেখলে তা বোঝা যাবে। গবর্ণমেণ্টও যথেষ্ট সাহায্য করে থাকেন, তার কারণ এ দেশের গবর্ণমেণ্টের প্রধান আয় এই কলার ব্যবসা থেকেই।

কলা পচনশীল ফল। গাছ থেকে পেড়ে কতদিন আর তাকে অবিকৃত ও তাজা রাখা যায়? সুতরাং সময় এবং কদলীর এই স্বাভাবিক পচনশীলতার মধ্যে এরা যেন সংগ্রাম

বাধিয়েছে। ছোট জাহাজ, বড় সমুদ্রগামী ভাল জাহাজ, রেলওয়ে ট্রেণ, রেডিও, টেলিফোন, এরা সবাই মিলে কলা-বাগান থেকে কলার কাঁদি পচে যাওয়ার পূর্ব্বে মার্কিন যুক্তরাজ্যের দোকানে দোকানে পৌছে দেবার জন্তে ব্যগ্র হয়ে রয়েছে।

কর্ডিলেরা পর্ব্বতমালা থেকে মোটাগুয়া নদী বার হয়ে এক অতি উর্ব্বর উপত্যকা বেয়ে উত্তর দিকের উপকূলে গিয়ে সমুদ্রে পড়ছে। কর্ডিলেরা পর্ব্বতমালা গোয়াতেমালার



এই ভাবে মাথায় বোঝা লইয়া ইণ্ডিয়ান রমণীদের দীর্ঘ পথ যাতায়াত করিতে হয়।

রাজধানী থেকে দুশো মাইল দূরে। এই মোটাগুয়া নদীর দুধারে প্রাচীন মায়া-সভ্যতার বহু চিহ্ন বর্ত্তমান।

বিশ ত্রিশ ফুট উঁচু পাথরের স্তম্ভ এখানে বড় বড় তাল গাছ ও ঘন জঙ্গলের ছায়ায় আত্মগোপন করে রয়েছে। অরণ্যের মধ্যে আরও কত স্তম্ভ আছে, এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। যে প্রাচীন কালের লোকেরা এই স্তম্ভ তৈরী করেছিল, তারা যথেষ্ট সভ্য ছিল এ বিষয়ে ভুল নেই। কিন্তু এখন যে ভাষা স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ আছে, তার অর্থবোধ পর্য্যন্ত সম্ভব নয়। তাদের ভাষা, তাদের সভ্যতার ইতিহাস আজ পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে চিরদিনের জন্তে বিলুপ্ত হয়েছে।

আমার কাছে পরম বিস্ময়কর বলে মনে হয় একটা ব্যাপার।

এই প্রাচীন কালের অপেক্ষাকৃত অসভ্য লোকেরা বিশ টন ওজনের একখানা বৃহৎ পাথর কি করে এখানে এনেছিল? এই স্থানের নিকটে কোথাও পাথর কাটবার জায়গা নেই, এক বহু দূর উত্তরের পর্ব্বতমালা ছাড়া।

আজ এ প্রশ্নের কে উত্তর দেবে?

যাই হোক, কদলীক্ষেত্র ছেড়ে ইণ্টারন্তাশান্তাল রেলওয়ের ছোট ছোট গাড়ীতে চেপে আমরা দক্ষিণ দিকে রওনা হই।

কিরিগুয়া থেকে রেলপথ এঁকেবেঁকে চলেছে মোটাগুয়া নদীর উপত্যকা বেয়ে, একদিকে পাহাড়শ্রেণী, অন্য দিকে নদী। মাঝে মাঝে বড় বড় শস্তক্ষেত্র। মোটাগুয়া নদীকে এই রেলপথ বারবার পার হয়েছে। মাঝে মাঝে দেখছি ছোট বড় গ্রাম। তালীবনের ছায়ায় গ্রাম্য ইণ্ডিয়ান মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, নয়তো পার্ব্বত্য ঝর্ণার জলে স্নান করছে কি কাপড় কাচছে।

জাকাপা ছেড়ে গোয়াতেমালা সহরে গাড়ী উঠতে সুরু করে। অনেক দূর থেকে এই ওঠা আরম্ভ হয়। রেলপথ একটু একটু ওঠে, মাঝে মাঝে পাহাড়ের অর্দ্ধ-পথে অশ্বক্ষুরাকৃতি বাঁক, ছোট বড় টানেল, পুল, কত কি। অতি দুর্গম পথে রেল ওঠাতে হয়েছে।

রেল থেকে মাঝে মাঝে নীচের দিকে চাইলে চওড়া রূপালী ফিতের মত মোটাগুয়া নদী নজর পড়ে। আমরা এমন সব পার্ব্বত্য পল্লীর ধার দিয়ে চলেছি, যেখানে পাহাড়ের পাশ কেটে তরকারী ও ফসলের ক্ষেত্র তৈরী করা হয়েছে।

আমরা আরও উঠছি, উঠছি। আশে পাশে এইবার বড় বড় গন্ধকের জলের ঝর্ণা—তাতে গরম জল ফুটছে ও গন্ধকের ধোঁয়া ও জলীয় বাষ্পে মেঘের সৃষ্টি করছে। আগ্নেয় পর্ব্বতের ছাই-এর মধ্যে দিয়ে কেটে মাঝে মাঝে রেল নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

যত ওপরে ওঠা যাচ্ছে, বাতাস ক্রমশঃ খুব ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। সূর্য্যাস্তের সময়ে রক্তবর্ণ আকাশের পটভূমিতে

গৈরিক রংয়ের বড় বড় পর্ব্বতচূড়া দৃষ্ট হল—তার পরে এল রাত্রির অন্ধকার, সঙ্গে সঙ্গে আরও ঠাণ্ডা, আরও প্রবল নৈশ বায়ু। রাত হওয়ার কিছু পরে গোয়াতেমালা সহরের বিজলীর আলোর সারি চোখে পড়ে। পাহাড়ের মাথায় এক সুন্দর, সমতলভূমিতে এই সহরটি অবস্থিত।

রেলপথ কিন্তু এখানে শেষ হল না। গোয়াতেমালা ছাড়িয়েও পর্ব্বতের ওপর দিয়ে রেলপথ চলে গিয়েছে। রকি পর্ব্বত ও আন্দিজ পর্ব্বত, দুটো সুবৃহৎ পর্ব্বতমালাকে যোগ করেছে এই বিরাট রেলপথ। ছোট এঞ্জিনটা এই দুর্গম পথে আমাদের ১৯৪ মাইল এনেছে।

গোয়াতেমালা সহর আধুনিক যুগের সহর নয়—প্রাচীন স্পেনের গৌরবময় সাম্রাজ্য-বিস্তার ও শাসনের দিনের সহর এটা। গোয়াতেমালা সহর দেখলে বিজয়ী মুরদের কথা মনে হয়, তাদের স্থাপত্য, তাদের পাথর-বাঁধানো সঙ্কীর্ণ রাস্তা, রংবেরংয়ের বাড়ী, জালি-কাটা জানালা, বারান্দা প্রভৃতি মনে আসে—কারণ গোয়াতেমালা সহরের বাড়ীগুলি ঐ ধরণের তৈরী।

প্রাচীন দিনের গোয়াতেমালা এখনও বর্ত্তমান সভ্যযুগে প্রবেশ করে নি।

গোয়াতেমালার রাজধানীর প্রতি ভূমিকম্পের কোপ চিরদিনই অত্যন্ত বেশী।

কতবার যে ভূমিকম্পে এই সহর ভেঙেছে চুরেছে, নাচিয়েছে, কাঁপিয়েছে, দুলিয়েছে, পুরাণ আমলের কত ভাল ভাল বাড়ী ভেঙে ছত্রখান করে দিয়েছে—তার ফলে তিনটী বিভিন্ন স্থানে তিন তিনটী বিভিন্ন নামে এই সহর তৈরী হয়ে উঠেছে, আবার বিধ্বস্ত হয়েও গিয়েছে।

১৫২৭ খৃষ্টাব্দে পেড্রো ড আলভারাদো আগুয়া পর্ব্বতের তলুতে প্রথম সহর বসান। দিব্যি সহর গড়ে উঠল—বাণিজ্যের সুবিধার জন্যে অনেক বাড়ীঘর তৈরী হল। লোক-সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে—এমন সময়ে ১৫৪১ খৃষ্টাব্দের এক রাত্রিতে মুষলধারে নামল বৃষ্টি।

আওয়াজ দিল নির্ব্বাপিত আগ্নেয়গিরি। তার অগ্নিকটাহ একদিকে ভেঙে গেল এবং বর্ত্তমানে তাতে যে হ্রদ অবস্থিত—সেই হ্রদের জলে সহর ভাসিয়ে ধুইয়ে মুছিয়ে দিলে। প্রথম স্পেনীয় সহর এই ভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে, আগুয়া পর্ব্বতের চূড়ায় উঠলে প্রশান্ত মহাসমুদ্র ও আটলান্টিক মহাসমুদ্র উভয়ই দেখা যায়।

কিছুদিন পরে কয়েক মাইল উত্তরপূর্ব্বে আর একটা সহর গড়ে উঠল। কালক্রমে এই সহর দক্ষিণ আমেরিকায় একটি বিখ্যাত সহর হয়ে দাঁড়ায়। ধনে, জনে, সৌন্দর্য্যে অতুলনীয় এই সহরে প্রাচীন স্পেনের ধনী ঔপনিবেশিক অভিজাত সম্প্রদায় বড় বড় প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেছিলেন। প্রায় ষাটটীর ওপর বড় বড় গির্জ্জাও তৈরী হয় তাদের অর্থে।



চালান দিবার জন্ত কলা বোঝাই হইতেছে।

সবাই বেশ আছে। প্রাচীন রাজধানী ও তার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথা স্মৃতিতে পর্যাবসিত হয়েছে, ব্যবসা-বাণিজ্য দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে, সকলেরই হাতে দু'পয়সা জমছে। এমন সময়ে ১৭১৭ সালে কিছুদূরবর্ত্তী ফিউয়ে গো আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সঙ্গে এক ভীষণ ভূমিকম্প হল। সেই ভূমিকম্পেই সহর ফর্সা হয়ে গেল।

আবার গড়ে উঠল, কিন্তু ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে আবার গেল।

তখন অনেক পরামর্শের পরে ত্রিশ মাইল দূরে সহর স্থানান্তরিত করা হল। বর্ত্তমানে এখানেই সহর বিদ্যমান। ১৯১৭ সালে এ সহরেও বহু বাড়ী ভূমিকম্পে ভেঙে দিয়েছে, অনেক বাড়ীর দেওয়ালে ফাটলের সৃষ্টি করেছে। তবে কোন রকমে এই সহর এখনও টি'কে আছে, এখনও একেবারে ধ্বংস হয়ে যায় নি, এই পর্য্যন্ত বলা যায়।

১৯১৭ সালের ভূমিকম্পের পরে গভর্ণমেন্টের তরফ থেকে



ভলক্যানো ডা আগুয়া। এই পর্ব্বতের উপর হইতে ভূমিকম্পের দ্বারা মুক্তি পাইয়া একটি হ্রদের জল প্রথম স্পেনীয় সহরকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়া ছিল।

বিস্তর অর্থব্যয়ে রাজধানীর বিভিন্ন অংশ পুনর্নির্ম্মিত হয়েছে। বড় বড় বিপজ্জনক আগ্নেয়গিরির ছায়ায় বাস করে মরতে হয় সেও স্বীকার, তবুও মানুষের কি মায়া নিজের জন্মভূমি ও গৃহের ওপর!

বর্ত্তমান সহরের লোকসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। সহরটী রিও ভাকাস্ নামে পার্ব্বত্য-নদীর উপত্যকায় অবস্থিত—এর চারিদিকে শৈল-শিখর এবং বড় বড় আগ্নেয়-গিরি।

পূর্ব্বে সহরে যাজক সম্প্রদায়ের প্রবল আধিপত্য ছিল। এখন সে সব নেই—পূর্ব্বে যাজক সম্প্রদায়ের অর্থে যে সব বড় বড় বাড়ী তৈরী হয়েছিল এখন সেখানে ডাকঘর ও কাষ্টম আফিস। কোন কোন ভজনালয়ে আধুনিক রঙ্গালয় ও সিনেমা অবস্থিত।

সহরের মধ্যস্থানে একটি পার্ক, এই পার্কের চারিধারে ১৯১৭ সালের পূর্ব্বে সুন্দর সুন্দর গির্জ্জা ও প্রাসাদ ছিল। এখন সে সব ভেঙে চুরে যাওয়াতে পার্কের পূর্ব্বশ্রী নষ্ট হয়েছে।

গোয়াতেমালা সহরের রাস্তাঘাট ভাল নয়—শীর্ণকায় অশ্ব দ্বারা বাহিত যান এখনও এ সহরে যাতায়াতের একমাত্র উপায়—যদিও ধনী নাগরিকগণের মোটরগাড়ীর অভাব নেই। সহরে ভাল হোটেল, ক্লাব এবং সিনেমা আছে।

সহরের পথে দেশের আদিম অধিবাসী ইণ্ডিয়ানরা দলে দলে চলেছে। এ দেশে ওরা কুলী, গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান, অশ্বতর চালক, ভিস্তি ও ভৃত্যের কাজ করে।

দশ মাইল দূরে মিস্কো বলে ছোট একটা ইণ্ডিয়ান পল্লীগ্রাম, সহরের অধিকাংশ ফল, শাকসব্জি ও দুগ্ধবিক্রেতা ইণ্ডিয়ান আসে এই গ্রাম থেকে। যদি কেউ ইণ্ডিয়ানদের জীবনযাপন প্রণালী জানতে ইচ্ছা করে, আমি তাকে উপদেশ দিই যে, কোন এক নির্ম্মেঘ প্রাতঃকালে সে যেন মিস্কো গ্রাম থেকে যে রাস্তা এসেছে সহর পর্য্যন্ত, তারই ধারে বসে থাকে।

সে যে বিচিত্র শোভাযাত্রা দেখবে, সমগ্র মধ্য-আমেরিকার মধ্যে আর কোথাও তা সে দেখতে পাবে না।

ভোর হয়েছে। মিস্কো গ্রাম থেকে দলে দলে ইণ্ডিয়ান মেয়ে-পুরুষ বেরিয়ে চলেছে সহরে, সবাই হেঁটেই চলেছে, রোজ তারা দশ মাইল যাবে, আবার হেঁটে দশ মাইল ফিরবে। যার যা জিনিস, খুব বড় একটা ঝুড়িতে মাথায় বসান বা পিঠে ঝোলান আছে। রোদ উঠবার সঙ্গে সঙ্গে একটী

একটানা দীর্ঘ শোভাযাত্রা সহরের দিকে চলেছে, এ দৃশ্য প্রত্যহ দেখা যাবে।

গোয়াতেমালার বাজারে ইণ্ডিয়ানদের হাতে তৈরী নানা-প্রকারের জিনিসপত্র বিক্রী হয়, মেয়েদের জামা, ঘোড়ার সাজ, কোমরবন্ধ, টুপি, ছোরা, পুঁতির মালা, জুতা ইত্যাদি। আমেরিকার ধনী ভ্রমণকারীর কল্যাণে গরীব ইণ্ডিয়ানরা দু'পয়সা রোজগার করে থাকে।

একদিন আমি গোয়াতেমালা সহর থেকে বার হয়ে নিম্ন সমতল ভূমি অঞ্চলে যাত্রা করলাম। ট্রেনে যেতে যেতে আমাটিট্‌লান হ্রদ পার হয়ে পালিন বলে একটা ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়াল। এখান থেকে অনেক দূরের সমতলভূমি, প্রায় ৪০ মাইল পর্য্যন্ত এক সঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়। পালিন ষ্টেশন পার হয়ে ক্ষুদ্র ট্রেনখানি এঁকেবেঁকে ক্রমশঃ নামতে থাকে—পাহাড়ের পাশ কেটে রেলপথ ক্রমশঃ নেমে এসেছে প্রায় আড়াই হাজার ফুট ষোল মাইলের মধ্যে। ওপরে যেমন ঠাণ্ডা, যতই নীচে নামি, ততই গরম। এসকুঠ্‌লা থেকে আমরা প্রায় সমতল ভূমিতে এসে পৌছলাম—রেল লাইনের ধারে কফি ও আখের ক্ষেত, বড় বড় জায়াগুয়া ঘাসের ক্ষেত; এখান থেকে একটা রেলপথ গেল প্রশান্ত মহাসাগরের সান্ হোসে বন্দরে, অপরটা গেল মেক্সিকোর দিকে। যেখান থেকে দু'দিকে রেলপথ বেরিয়ে গেল, সেই ষ্টেশনের নাম সান্টা মেরিয়া। খুব বড় জংসন্ ষ্টেশন।

এখানকার ইণ্ডিয়ান মেয়েরা ট্রেনের টাইম-টেবল অনুসারে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। দিনে চারবার করে ওরা ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে আসবে জিনিষ বিক্রী করতে—ঘড়ির কাঁটার চেয়েও তারা সময়ের মূল্য সম্বন্ধে সচেতন।

গোয়াতেমালা থেকে যে ট্রেন সকালে ছাড়ে, তা এখানে আসে প্রায় দুপুর বেলা, সুতরাং আরোহীদের ক্ষুধা পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। ইণ্ডিয়ান্ মেয়েরা নানারকম খাবার জিনিস বিক্রী করছে দেখে কিনবার ইচ্ছে হল।

প্লাটফর্ম্মের এক জায়গায় একটী তরুণী বসে শাকসব্জি ও ফলমূল বিক্রী করছে সে একটা গোটা আর্ম্মাডিলো-ভাজা উঁচু করে হাতে তুলে ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। আর একজন তুলে ধরেছে একটা ভাজা গোসাপ—যতই ক্ষুৎপীড়িত হই, খাদ্যদ্রব্যের নমুনা দর্শন করে খাবার ইচ্ছে চলে গেল।

রেলপথের দু'ধারে কফির ক্ষেত।

প্রতি বৎসর গোয়াতেমালা ন' কোটী পাউণ্ড কফি পৃথিবীর বাজারে বিক্রয়ার্থ পাঠায়। পর্ব্বতসানুর সর্ব্বত্র বিস্তৃত কফির চাষ।

আমাদের সৌভাগ্যক্রমে কফির ফুল ফোটা দেখতে পেয়েছিলাম, কারণ কফি ফুল মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে ফোটে তার পরেই ঝরে পড়ে।

কফি-ক্ষেতের অঞ্চল শেষ করে আমরা এবার যেখানে



মারিম্বা সঙ্গীত-যন্ত্র।

এসে পড়েছি, এখানে কোকো বাগান পাহাড়ের নীচে সমতল-ভূমিতে।

সান আন্টোনিও বলে একটা গ্রামে একজন বড় কৃষকের বাড়ী আমি অতিথি হব বলে আগে থেকেই ঠিক ছিল। ষ্টেশনে তিনি আমায় অভ্যর্থনা করে নিয়ে যেতে এসেছিলেন। ষ্টেশন থেকে স্থানটী প্রায় দশ মাইল হবে। এই দশ মাইল পথ অতি সুদৃশ্য উঁচুনীচু সবুজ তৃণভূমির মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে ক্রমশঃ উঁচু হতে হতে দূরের পাঁচটী বিরাটকায় আগ্নেয় পর্ব্বতে গিয়ে যেন শেষ হয়েছে মনে হয়।

সে রাত্রে গুরুতর নৈশ ভোজনের পরে আমি জীবনে প্রথমে মারিম্বা বাজনা শুনলাম। মারিম্বা গোয়াতেমালার

জাতীয় বাদ্য। শুকনো লাউয়ের খোলের ওপর কাঠ ও শক্ত পেতলের পাত দিয়ে তৈরী করে। জলতরঙ্গের মত কাঠি দিয়ে বাজাতে হয়।

চাঁদ উঠেছিল। বড় বড় তালগাছের ছায়া বাঁকা ভাবে পড়েছে তৃণভূমির ওপর। উৎসব বেশে সজ্জিত বহু ইণ্ডিয়ান মজুর বাজনা শুনতে এসে তালগাছের তলায় জ্যোৎস্নালোকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মারিম্বা বাদ্যের অদ্ভুত ধ্বনির সঙ্গে সেই চাঁদ-ওঠা রাত্রের স্মৃতি আমার মনে অনেক দিন জেগে থাকবে।

এখান থেকে আরও ৩৫ মাইল দূরবর্ত্তী একটা যায়গায় পৌঁছে আমার রেলপথে গোয়াতেমালা ভ্রমণ শেষ হল।

রেলের ধারে দু' একটা গ্রাম দেখা গেল, সেখানে পুরুষেরা শুধু একটা সুতির প্যাণ্ট এবং মেয়েরা খাটো গাউন পরে থাকে। বহু অশ্বতর ও ইণ্ডিয়ান কুলী জিনিষপত্র বহন করে নিয়ে যাচ্ছে দেখলাম।

আমাদের পথ যেখানে শেষ হল—তার কিছু দূরে সাণ্টা মারিয়া আগ্নেয়গিরি কুয়াসার মধ্য দিয়ে একটু একটু দেখা যাচ্ছিল। ১৯০২ সালের অগ্ন্যুৎপাতে এর চূড়ার খানিকটা অংশ ছিঁড়ে গিয়েছে। এখনও সেই অবস্থায় আছে বিরাট সাণ্টা মারিয়া আগ্নেয়গিরি—১৯০২ সালের পরে আর কোন বড় রকমের বিপর্যায় ঘটে নি।

আজিকার কথা

—শ্রীসুশীল জানা

সুদূর দিবসের মৌন স্বপ্নটিরে
ভাষাহারা মুহূর্ত্তের বাহুপাশে ঘিরে
কত কথা চাই শুধাইতে।
গভীর কাজল আঁখি তার নীরবে চকিতে
ভাষাহারা—নত হ'য়ে আসে।

কবেকার
তরু-বীথিকার
আশ্রয় ছায়ায়,
ঝাউবন-মর্ম্মরিত সাগর-বেলায়
আজিকার স্বপ্নাতুর দিন মোর মরে ঘুরে ঘুরে
সে দিনের বঁধুরে খুঁজিয়া।

সে দিনের সন্ধ্যাম্লান দিগন্তের পানে
কম্প্রপক্ষ বিধুননে যে পক্ষীটি গিয়াছে উড়িয়া—
তার লাগি'
রহিবে সে অতন্দ্রিত রজনীটি জাগি'
ক্লান্ত দীর্ঘ তমসায়।
আজিকার যত কথা হায়
ফিরে এল একে একে ব্যথা-ম্লান নিরুত্তরে,
অতীত রহিল মৌন হ'য়ে।
হে দূর কালের বন্ধু,
ভাষা দাও—ভাষা চাই,
মূক জীবনের গান গাই।

আদালতের বিচার

—শ্রীমন্মথনাথ সরকার

"উকিল বাবু! উকিল বাবু বাড়ী আছেন?"

"কে?"

"আজ্ঞে, আমি রহিম। একবার নীচেয় আসুন।"

"বাইরের ঘরে বস, যাচ্ছি।"

নরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য তিন চারি বৎসর হইল ওকালতি ব্যবসা করিতেছেন। নরেন্দ্রমোহনের পিতা একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। এক বৎসর হইল তাঁহার কাল হইয়াছে। পুত্র এম.এ-বি. এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তিনি একটি ভাল সরকারী চাকুরীর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও যখন তাঁহার পুত্র সরকারী চাকুরী হইতে বঞ্চিত হইল, তখন তিনি অগত্যা পুত্রকে আইন-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে অনুমতি দিলেন। ডেপুটী বাবুর এমন ইচ্ছা ছিল না যে, তাঁহার পুত্র ওকালতি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়, কেন না তিনি সরকারী কার্য্যে ব্যাপৃত থাকাকালীন উকিলদিগের অবস্থা, কার্য্য-কলাপ প্রভৃতি দেখিয়া ঐ ব্যবসায়ের প্রতি একেবারেই বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কলিকাতার ফৌজদারী আদালতের প্রসিদ্ধ উকিল রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার একটু দূরসম্পর্ক ছিল, তাই তিনি রাসবিহারী বাবুকে বলিয়া নরেন্দ্রমোহনকে তাঁহার জুনিয়র করিয়া দিয়াছিলেন। নরেন্দ্রমোহনও বেশ বাক্-পটু এবং মক্কেলের মত বুঝিয়া কথা কহিবার শক্তি ও টাকা আদায় করিবার কায়দা অল্পদিনেই বেশ আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছেন, কাজেই পিতার মৃত্যু হইলেও তিনি কোনক্রমে ঐ ব্যবসায়ের উপর নির্ভর করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। নরেন্দ্রমোহনের মাতা তাঁহার পিতার জীবদ্দশাতেই পরলোকগতা হইয়াছিলেন। সহোদর ভাই তাঁহার আর নাই। কেবল দুইজন সহোদরা আছেন, একজন থাকেন রেঙ্গুনে, আর একজন থাকেন লাহোরে। নরেন্দ্রমোহনের সংসারে স্ত্রী লতিকা ও দুইটী শিশুপুত্র ব্যতীত আপনার বলিতে আর কেহই নাই। নরেন্দ্র-উপরের ঘরে বসিয়া স্ত্রী লতিকার সহিত কথা কহিতেছিলেন, এমন সময়ে রহিম আসিয়া ডাকিল।

রহিমকে বাহিরের ঘরে বসিতে বলিয়া নরেন্দ্রমোহন নীচে আসিয়া দেখেন যে, রহিম ও দুইজন লুঙ্গিপরা লোক চেয়ারে বসিয়াছে।

নরেন্দ্রমোহন ঘরে প্রবেশ করিলেই রহিম উঠিয়া সেলাম করিয়া বলিল, "বাবু, এখন উপায় কি? আমাকে ত বাঁচাতেই হবে। আমি একজন দাগী আসামী—তিনবার জেল খেটে এসেছি। পুলিশের লোকেরা আমাকে বেশ চিনে। এ চুরির চার্জ্জ থেকে আমাকে রক্ষা করতে হবে। সিনিয়র উকিল আপনার যাকে পছন্দ হয় আপনি সঙ্গে নিন। বাবু, আসল কথা আপনাকে বলি শুনুন; আমি একটা ভাল নিকার যোগাড়ে আছি। যে ঔরতের সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা চলছে, তাহার বেশ টাকা-কড়ি ও বাড়ী আছে। এই সময় যদি আমার সাজা হয়, তা হলে আমার আশা-ভরসা একেবারে জাহান্নামে যাবে।"

নরেন্দ্রমোহন একটু হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তোকে যদি বাঁচাতে পারি, তবে কি বক্শিস দিবি বল্। তোকে বেকসুর খালাস করিয়ে দেব। আর মজাসে নিকা করবি। কত টাকা দিবি বল্।"

রহিম আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "পঞ্চাশ টাকা বক্শিস, বাবু! আমার জান যাবে, তবু আমার বাৎ ঝুটা হবে না। আপনি ঘাবড়াবেন না, যেমন করে পারি আমি আপনাকে বক্শিস করবই।"

নরেন্দ্রমোহন নূতন উকিল হইলেও বক্শিসের বহরে মুগ্ধ হইবার পাত্র নন্। তিনি ও কথায় আর আলোচনা না করিয়া বলিলেন, "কাল তোর মোকদ্দমা হবে। কাল একজন সিনিয়র উকিল দেব। সিনিয়র উকিলের ষোল টাকা, আর আমার ফিস্ আট টাকা। এই আজ দিয়ে যা। আর কাল ঠিক দশটায় সময় কোর্টে হাজির থাকবি।

হাঁ ভাল কথা, তোর যে মোক্তার জামিনদার আছেন, তাঁর ফিস চার টাকা, এই আটাশ টাকা দে, বার কর শীগগির, দেরি করিস নে, এখনই আমাকে মামলার সব সওয়াল-জবাব ঠিক করে ফেলতে হবে। বার কর বার কর, দেরী করিস নি, রাত্রি ন'টা হল।"

রহিম বিনীত ভাবে গোলামের মত ভঙ্গীতে বলিল, "বাবু আজ ত অত টাকা নেই, আজ এই ছয় টাকা নিন বাবু; আপনি কাজ চালিয়ে দিন, আমি পরশু রোজ সবেরে আপনাকে বাকী টাকা একেবারে দেবই-দেব। আপনি ঘাবড়াবেন না বাবু, রহিম থাকতে আপনার মামলার জন্ম ভাবতে হবে না। কত মামলা করবেন বাবু আপনি? মাসে পাঁচটা নিউ কেস্ একেবারে গ্যারান্টি।"

রহিমের সঙ্গী দুইজনও অঙ্গভঙ্গী দ্বারা রহিমের উক্তির সমর্থন করিল। নরেন্দ্রমোহন একেবারে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "না—না। সে আমি পারব না। তুমি অন্য যায়গায় যাও, আমি তোমার কেস্ করতে পারব না।"

রহিমও উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বাবু, আপনার গোড় ধরছি, অন্য উকিল রহিম জানে না। রহিম চোর বটে, তবে সে ঝুটা বলে না। আপনি পরশু রোজ নিশ্চয়ই পাবেন! ওরে খাদেক, তোর কাছে টাকা থাকে ত তাই গোটাকত বাবুকে দে।" এই বলিয়া রহিম তাহার সঙ্গীকে ইঙ্গিত করিল। খাদেক তাহার বেল্টের ভিতর হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া উকিলবাবুর টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল, "আমার কাছে মোটে এই দুটি টাকা ছিল—এই নিন্ বাবু।"

নরেন্দ্রমোহনের গোয়ালা আজ তাগাদা করিয়া গিয়াছে। তার টাকা দিতে দেরী হইতেছে বলিয়া দুধও পাতলা হইতেছে দেখিয়া লতিকা অনুযোগ করিয়াছেন; সুতরাং নরেন্দ্রমোহন আর জিদ করিতে পারিলেন না। তিনি টাকা কয়টা দেখিয়া টেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে ফেলিয়া বলিলেন, "কিন্তু, দেখিস রহিম! পরশু টাকা না দিতে পারলে কিন্তু বড় ফ্যাসাদ হবে!"

রহিম আবার সেলাম করিয়া বলিল,—"নিশ্চয় বাবু, আপনি কাজ চালিয়ে দিন্। খরচার জন্যে কিছু ভাববেন না। রহিম গারদের বাইরে থাকলে আপনার কোন দুষমন থাকবে না—আপনি নিশ্চয় জানবেন, বাবু।" এই বলিয়া রহিম আবার সেলাম ঠুকিয়া সঙ্গীদের লইয়া চলিয়া গেল।

সুধীরকৃষ্ণ বসু নামে পোষ্ট-অফিসের একজন কেরাণী টাইম স্কেলের কৃপায় দেড়শত টাকা বেতন পাইতেছেন। সামান্য মাত্র লেখাপড়া শিখিয়া তিনি কোন ক্রমে জেনারেল পোষ্ট-অফিসে প্রবেশ করেন। কিছুকাল পরে ইউরোপীয় মহাসমর হয় এবং সমরান্তে সরকারী বিভাগসমূহের বেতন-বৃদ্ধি হয়। ঐ সুযোগে সুধীরেরও বেতন বাড়িতে থাকে। সুধীরকৃষ্ণের সংসারে খরচ কম, কাজেই তিনি কিছু কিছু সঞ্চয় করিয়া বেলিয়াঘাটায় কাঠা পাঁচেক জায়গা কিনিয়াছেন। ঐ জায়গায় তিনকাঠার উপর একখানি দ্বিতল বাড়ীর প্ল্যান বহু কষ্টে কলিকাতা কর্পোরেশন হইতে স্যাংসন করাইয়া লইতে সমর্থ হইয়াছেন। বাড়ীখানি একটু ভাল মালমশলা দিয়া যাহাতে তিন পুরুষ ভোগ হয়, এই ভাবে নির্ম্মাণ করিবার সুধীরকৃষ্ণের ঐকান্তিক বাসনা। বাড়ীর গাথনি আরম্ভ হইয়াছে এবং একতলায় দরজা জানালা বসিয়াছে। দরজা-জানালাগুলি বেশ দামী ইংলিশ সেগুন কাঠ হইতে ভাল মিস্ত্রীর দ্বারা নিজের পছন্দমত তৈয়ার করিয়াছেন। সুধীরকৃষ্ণের জায়গার পূর্ব্ব পার্শ্বে একটি বড় পুষ্করিণী। পুষ্করিণীটি রহিমের—অপর পাড়ে বিস্তীর্ণ খোলার বস্তীর মধ্যে রহিমের বাস।

একদিন সকালে সুধীরকৃষ্ণ নূতন বাড়ীতে যাইয়া দেখেন যে, একটি বড় দরজা কে খুলিয়া লইয়া গিয়াছে। মিস্ত্রীদের নিকট ও পাড়ায় অনেক খোঁজ করিয়াও তিনি দরজার কোন সন্ধান করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি থানায় যাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া ডাইরী লেখাইলেন। তাঁহার আশা ছিল যে, পুলিশের সাহায্যে নিশ্চয়ই তাঁহার দরজা উদ্ধার হইবে। কিন্তু থানাদার তাঁহাকে যে উপদেশ দিলেন, তাহাতে তাঁহার মনে হইল যে, থানায় না আসিলেই ভাল হইত। থানাদার তাঁহাকে বলিলেন যে, তিনি যেন নিজে সন্ধান করেন এবং কাহারও

উপর সন্দেহ হইলে তিনি থানায় আসিয়া সংবাদ দিলে থানা হইতে লোক গিয়া তল্লাস করিতে পারে। সুধীরকৃষ্ণ একটু দমিয়া গেলেন। আশা করিয়া নূতন বাড়ী করিতেছেন, আর তাহাতে কি না প্রথম দফাতেই চোরের হাত পড়িল। কি আর করিবেন, দুই চারি দিন খোঁজ-খবর করিয়া দেখিলেন, কিন্তু দরজার কোন সন্ধান মিলিল না। অবশেষে তিনি দরজার পুনরুদ্ধারের আশা ত্যাগ করিয়া আবার আর এক জোড়া তৈয়ার করাইলেন এবং যথাস্থানে বসাইয়া বাড়ীর কাজ চালাইয়া লইলেন।

রহিম দাগী আসামী। তাহাকে পুলিশ ভালরকমেই চিনে। অল্পদিনের মধ্যেই রহিমের বিরুদ্ধে আর একটি চুরির অভিযোগ পড়িল। পুলিশ রহিমের বাড়ী আসিয়া বহু তল্লাস করিয়াও চোরাই মালের কোন সন্ধান পাইল না। অবশেষে থানাদার কনষ্টেবলদিগকে রহিমের পুকুর তল্লাস করিতে আদেশ দিলেন। পুকুরে গিয়া খোঁজ করিতে করিতে চোরাই মাল কিছু পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু সুধীরকৃষ্ণের সেই দরজা বাহির হইল। দরজা টানিয়া পাড়ে উঠান হইল এবং রহিমকে থানাদার জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ঐ দরজা কাহার। রহিম শুনিয়া যেন একেবারে আকাশ হইতে পড়িল। থানাদার সুধীরকৃষ্ণকে ডাকাইলেন। সুধীরকৃষ্ণ আসিয়া দরজা দেখিয়া আনন্দে প্রায় নাচিয়া ফেলিলেন, ভগবান তাঁহার দরজা মিলাইয়া দিয়াছেন। যাহা হউক, থানাদার তাহাতেও সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া সুধীরকৃষ্ণকে মিস্ত্রী ডাকাইতে বলিলেন। যে কাঠগোলায় দরজা তৈয়ারী হইয়াছিল, সে কাঠগোলার নিকটেই মিস্ত্রীর বাড়ী। সুধীর গোলায় যাইয়া গোলার মালিক ও মিস্ত্রী দুইজনকেই সঙ্গে লইয়া আসিলেন। মালিক দরজা দেখিয়া বলিলেন যে, ইহা তাঁহার দোকানের ইংলিস টিক্ তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। মিস্ত্রী তাহার হাতের কাজ চেনে, সে থানাদারের সমক্ষে দরজার হুবহু বর্ণনা করিল, থানাদার মিলাইয়া দেখিল যে, মিস্ত্রীর বর্ণনায় কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। সুধীরকৃষ্ণ আনন্দিত হইয়া থানাদারকে বলিলেন, "তা হলে স্যর, আমি দরজা নিয়ে যাই ?"

"বলেন কি মশাই, আগে জিনিষ আপনার কি না ঠিক হোক। আপনাকে কেস্ করতে হবে। আদালতের বিচারে দরজা যদি আপনার প্রমাণ হয়, তা হলেই আপনি পাবেন, নতুবা এ দরজা আমার আপনাকে দেবার সাধ্য নেই।"

এই বলিয়া থানাদার সুধীরকৃষ্ণকে উপযুক্ত উপদেশ দিয়া দরজা উঠাইয়া থানায় লইয়া গেলেন। সরকারী মামলা, সুধীরকৃষ্ণের ইচ্ছা না থাকিলেও মামলায় নামিতে হইল এবং উকিল দিতে হইল। বলা বাহুল্য, থানাদার রহিমকে ধরিয়া লইয়া গেলেন এবং তাহার বিরুদ্ধে দরজা-চুরির অভিযোগ আনয়ন করিলেন।

এই দরজা-চুরির মামলায় নরেন্দ্রমোহন রহিমের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। রহিম মাত্র আট টাকা দিয়াছে, তাহাতে আর সিনিয়র নিযুক্ত করা হইল না। মামলায় রহিমের সুবিধাই হইল। রহিম যে ঐ দরজা চুরি করিয়াছে, কোর্ট ইনস্পেক্টর এমন প্রমাণ করিতে পারিলেন না। ম্যাজিষ্ট্রেট ধরিয়া বসিলেন। প্রমাণের অভাবে তিনি কোনক্রমেই আইনানুসারে আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিতে পারেন না। কাজেই তিনি রহিমকে নির্দ্দোষ বলিয়া বেকসুর খালাস দিলেন।

তৎপরে সমস্যা হইল যে, দরজা কে লইয়া যাইবে। বলা বাহুল্য, পুলিশ আদালতে ঐ দরজা আনিয়া হাজির করিয়াছে। রহিমের হেপাজত হইতে দরজা পাওয়া গিয়াছে এবং ঐ দরজা রহিম চুরি করিয়াছে এমন প্রমাণ পাওয়া গেল না ; সুতরাং ম্যাজিষ্ট্রেট হুকুম দিলেন যে, রহিম দরজা লইয়া যাইবে। হুকুম প্রচার হইবামাত্র রহিম ম্যাজিষ্ট্রেট বরাবর কুর্নিশ করিয়া সানন্দে সঙ্গীদের সাহায্যে দরজা লইয়া বাহির হইয়া গেল।

এই সমস্ত কাণ্ড-কারখানা দেখিয়া পোষ্ট-অফিসের কেরাণী সুধীরকৃষ্ণের একেবারে গালে মাছি। "যার দই তার দই নয়, নেপোয় মারে দই"—এই প্রবাদ-বাক্য তাঁহার মনে উদয় হইল। মামলা হইয়া গেলে তিনি দরজা বাড়ী লইয়া যাইবেন বলিয়া একেবারে কুলি ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, আর যে চোর সেই কি না হইল তাঁহার দরজার মালিক! আইনের সূক্ষ্ম বিচার দেখিয়া

সুধীরকৃষ্ণ একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন এবং তাঁহার উকিলকে বলিলেন, "কি হল উকিল বাবু!"

উকিলবাবু একগাল হাসিয়া বলিলেন, "এ ত জানা কথা। ও যদি চুরি না করে থাকে, তা হলে ফৌজদারী কোর্ট ওকেই ঐ মালের মালিক বলে ধরে নেবে, আপনাকে সিভিল সুট করতে হবে। কোন ভয় নেই আপনার, সিভিল সুটে আপনি ডিক্রী পাবেনই।"

সুধীরকৃষ্ণের আবার সিভিল সুট করিয়া দরজা উদ্ধার করিবার বাসনা একটুও না থাকিলেও, তাহাকে এমন বুঝান হইল যে, মামলা না করিলে তাঁহার বিপদ হইতে পারে; সুতরাং ভবিষ্যৎ বিপদের হাত হইতে এড়াইবার আশায় সুধীরকৃষ্ণ অগত্যা আবার কিছু খরচ করিয়া দরজা উদ্ধারের জন্য রহিমের নামে দেওয়ানী আদালতে এক নালিশ রুজু করিলেন।

দেওয়ানী মোকদ্দমার সমন জারি হইলে রহিম আসিয়া আদালতে লিখিত জবাব দাখিল করিল। রহিম ইতিমধ্যে সে দরজার কাঠ কিয়দংশ বদলাইয়া ফেলিল। তাহার বর্ণনায় এই কথা লিখিল যে, বাদী আক্রোশের বশে তাহার নামে এই মিথ্যা নালিশ রুজু করিয়াছেন। দরজা প্রকৃত পক্ষে তাহার নিজের। ঐ দরজার বাদী বা অপর কাহারও কোন দাবী কস্মিনকালে ছিল না এবং বর্ত্তমানেও নাই। বাদীর বিরুদ্ধে খরচার ডিক্রী পাইবার হকদার—ইত্যাদি আরও অনেক অভিযোগ সে বর্ণনায় লিপিবদ্ধ করিল। সুধীরকৃষ্ণ উকিলের মুখে রহিমের জবাবের মর্ম্ম অবগত হইয়া উকিলকে বলিলেন, "উকিলবাবু, আর আমার দরজায় কাজ নেই। এক জোড়া সামান্য দরজার জন্য এ পর্য্যন্ত যা খরচ করলাম তা'তে আমার বিশ জোড়া দরজা হয়ে যেত। আর আমার মামলায় ডিক্রী পেয়ে দরকারও নেই, আপনি মোকদ্দমা ছেড়ে দিন।"

উকিলবাবু শুনিয়া চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন, "সে কি বলেন মশায়! এই রকম ক'রে কি চোরকে প্রশ্রয় দেবেন? এ মোকদ্দমায় জিতলে কি শুধু আপনার জয় হবে, সাধারণ পাবলিকের যে এতে জয়! আপনি কিছু খরচ করলে যদি পাবলিকের উপকার হয় তা হলে সে খরচ কি শ্লাঘ্য খরচ নয়? আপনার কোন ভয় নেই, চোর বেটা একটা মিথ্যা মোকদ্দমা জিতে যাবে, এমন কি কখনও হয়। জবাবে আপনি ভয় পাবেন না। আপনি সাক্ষী মেনে দিন।"

সুধীরকৃষ্ণ সকল কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিলেন, "যাক, এত টাকা ত জলে গেল, আরও কিছু যায় যাক।"

সুধীরকৃষ্ণ কাঠগোলার মালিক, ছুতোর মিস্ত্রী ও দুই জন রাজমিস্ত্রীকে সাক্ষী মানিয়া দিলেন। রহিমের পক্ষ হইতেও কয়েকজন সাক্ষী মানা হইল।

মোকদ্দমার বিচারের দিন উপস্থিত হইল। উকিলবাবু সুধীরকৃষ্ণকে বলিয়া দিয়াছেন যে মোকদ্দমা আজ হইবেই, তিনি যেন সাক্ষীদের লইয়া বেলা সাড়ে দশটার সময়ে আদালতে হাজির হন। সুধীরবাবু পোষ্ট অফিসের কেরাণী, মামলা-মোকদ্দমা জীবনে কখনও করেন নাই। তদ্বির প্রভৃতির কূট বুদ্ধি তাঁহার মাথায় প্রবেশ করে না। তিনি উকিলবাবুর নির্দ্দেশ অনুসারে সাক্ষীদের উপর সমন জারি করিয়াছেন এবং আশা করিয়া আছেন যে, সত্য কথা তাঁহার সাক্ষীরা কেন বলিবে না! মিথ্যা কথা ত কাহাকেও বলিতে হইবে না, সুতরাং আফিস কামাই করিয়া সাক্ষীদের খোসামোদ করিয়া বেড়াইবার কি দরকার আছে? যাহা হউক, তিনি রাজমিস্ত্রী দুই জনকে যথাসময়ে আদালতে হাজির থাকিতে বলিয়া দিয়াছিলেন। বেলা নয়টা বাজিতে না বাজিতে কোন মতে নাকে মুখে চারটি ডালভাত গুঁজিয়া কাঠ-গোলায় ছুটিলেন। কাঠগোলায় যাইয়া শুনিলেন যে, গোলার মালিক পশ্চিমে হাওয়া খাইতে গিয়াছেন, ফিরিতে তাঁহার মাসখানেক হইবে এবং ছুতোর মিস্ত্রী এখনও কাজে আইসে নাই। মিস্ত্রী কাল শরীর অসুখ বলিতেছিল আজ এখনও যখন আসিল না, তখন নাও আসিতে পারে। সুধীরবাবুর ত সংবাদ শুনিয়া চোখ কপালে উঠিল। যাহা হউক, বিপৎকালে অধৈর্য্য পুরুষের কর্ত্তব্য নহে, মনে করিয়া তিনি ছুতোর-মিস্ত্রীর বাসার ঠিকানা লইয়া একখানা রিক্সায় চড়িয়া তাহার বাসার সন্ধানে চলিলেন। অনেক খুঁজিয়া পাতিয়া খোলার বস্তীর মধ্যে তাহার বাসা নির্ণয় করিলেন এবং মিস্ত্রীর নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে বারকতক ডাকিলেন। কাহারও কোন সাড়া না পাইয়া সুধীরকৃষ্ণ বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে বাহিরের দরজার পুরাতন চটের আবরণ ঠেলিয়া একটি লোক বাহিরে আসিল দেখিয়া সুধীরবাবু একটু আশ্বস্ত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাম মিস্ত্রী বাড়ীতে আছে বলতে পার?"

"হাঁ, ঐ যে মশাই তার মেগের সঙ্গে ঝগড়া করছে, শুনতে পাচ্ছেন না?"

এই বলিয়া লোকটি হন্‌হন্‌ করিয়া তাহার কাজে চলিয়া গেল। সুধীরবাবু আবার চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "দামু! ও দামু! একবার বাইরে এস। কোর্টে যেতে হবে যে আজ!"

আর কোন সাড়াশব্দ নাই। সুধীরবাবু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। কিছুক্ষণ পরে একটি বালক একখানি বেগুনি কামড়াইতে কামড়াইতে বাহিরে আসিয়া বলিল, "বাবা বাড়ী নেই, আপনি কেনে ডাকছ?"

"আরে, দামুর যে আদালতে যেতে হবে, সাক্ষী দিতে হবে।"

"বাবা যাবে না, একজন লুঙ্গিপরা লোক এসে মানা করে গ্যাছে।" এই বলিয়া বালকটি ছুটিয়া গলি পার হইয়া একেবারে সদর রাস্তায় পড়িয়া রাস্তার কল হইতে জল পান করিতে লাগিল। জলপান শেষ করিয়া সে ছুটিয়া আর এক দিকে চলিয়া গেল।

সুধীরকৃষ্ণ কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া বুঝিলেন যে, রহিমের এই সব কাণ্ড। সে তাঁহার সাক্ষী বিগড়াইয়া দিয়াছে। যাহা হউক, তিনি আরও বার কতক 'দামু, দামু'! বলিয়া চীৎকার করিয়া অবশেষে বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। আদালতে আসিয়া দেখিলেন যে, একজন রাজমিস্ত্রী আসিয়াছে। সে আদালতের উঠানে বসিয়া বিড়ি খাইতেছে এবং রহিমের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতেছে। সুধীরবাবু নিকট আসিতেই রহিম উঠিয়া গেল। সুধীরবাবু মিস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আর একজন কোথায় গেল। মিস্ত্রী বলিল যে, তাহার অসুখ করিয়াছে, সে আসিতে পারিল না।

সুধীরবাবুর মেজাজ ঠিক নাই। তিনি আর মিস্ত্রীর সঙ্গে বিতণ্ডা না করিয়া উকিলবাবুর সন্ধানে গেলেন। উকিলবাবুর সঙ্গে দেখা হইবামাত্র তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"একি মশায়, বেলা যে এগারটা বেজে গেছে! আপনি এত দেরী করে ফেললেন। আপনাকে আমি সাড়ে দশটার সময়ে আসতে বলেছি! হাইকোর্টে সার্কুলার বড় কড়া-কড়ি—আপনাকে কোর্টফিস্‌ দিয়ে হাজরে দিতে হবে। যান্‌, মহুরীর কাছ থেকে শীগ্‌গির হাজরে লিখিয়ে আনুন। হ্যাঁ, সাক্ষী সব এসেছে ত?"

"কোথায় সাক্ষী—একজন রাজমিস্ত্রী মাত্র এসেছে—তাও সে কি বলবে না বলবে তাতে আমার সন্দেহ আছে।"

"সে যা হয় পরে দেখা যাবে, আপনি হাজরে লিখিয়ে নিয়ে আসুন।"

সুধীরবাবু হাজিরা দাখিল করিলেন। যথাসময়ে মামলার ডাক হইল।

মাসের শেষ—মুনসেফ বা[illegible] কয়েকটি রায় লিখিতে বাকী আছে। তিনি [illegible] তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া খাস কামরায় উঠিয়া যাইবেন [illegible] মনে করিয়াছিলেন। সুধীরবাবুর মামলার হাজিরা [illegible] দেখিলেন যে, বাদীর মাত্র একজন সাক্ষী ও প্রতিব[াদীর] তিন জন সাক্ষী [illegible] মনে করিলেন, এ সামান্য ছোট [illegible] যাইবে। মোকদ্দমার ডাক হইল। সুধীরকৃষ্ণ কাঠগড়ায় যাইয়া উঠিলেন।

জবানবন্দী হইয়া গেল, কিন্তু জেরায় সুধীরবাবু ঠিক তাল রাখিতে পারিলেন না। জীবনে কখনও কাঠগড়ায় উঠেন নাই। কিছুক্ষণ পরে কোন্‌ কথার যে কি জবাব দিতেছেন, তাহা ঠিক রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার রাজমিস্ত্রী সাক্ষী পরে কাঠগড়ায় উঠিল। সে সাক্ষ্যে বলিল যে, একটি দরজা সে বসাইয়াছিল, পরদিন সে দরজা আর দেখে নাই। কিন্তু দরজা দেখিলে সে সনাক্ত করিতে পারিবে না—দরজার কোন পরিচয়ও সে দিতে পারিল না।

রহিম কাঠগড়ায় উঠিয়া হাতজোড় করিয়া একেবারে জলের মত বলিয়া গেল যে, ঐ দরজা সে নিজে প্রস্তুত করিয়াছিল—খরচ প্রভৃতি যাবতীয় বৃত্তান্ত সে মুখস্তের মত বলিয়া গেল। তাহার সাক্ষীদের একজন বলিল যে, সে একজন ছুতোর মিস্ত্রী, সে নিজে ঐ দরজা প্রস্তুত করিয়াছে। আর একজন সাক্ষী বলিল যে, সে কাঠ কিনিয়া আনিয়া দিয়াছে এবং দরজা যখন প্রস্তুত হয়, তখন সে তথায় উপস্থিত ছিল। তৃতীয় সাক্ষী বলিল যে, রহিম তাহার গোলা হইতে দ্বিতীয় সাক্ষীর দ্বারা কাঠ আনাইয়াছে। যে কাঠ ক্রয় করা হইয়াছিল, তাহা ঠিক ঐ নালিশী দরজার উপযোগী বটে।

সুধীরকৃষ্ণের উকিল সওয়ালে প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করিলেন। বর্ণনা করিবার কালে তাঁহাকে অপর পক্ষের উকিলের বিস্তর আপত্তি ও রহিমের বাধা অতিক্রম করিতে হইল। রহিমের উকিল ফৌজদারী আদালতের রায়ের সহিমোহরযুক্ত নকল দাখিল করিয়া দিলেন এবং হাকিমকে বুঝাইয়া দিলেন যে, বাদীর নালিশ সবই মিথ্যা আক্রোশমূলক এবং রহিমের সাক্ষীদের আদালতে আসিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার কোনই প্রয়োজন নাই।

মুনসেফ রায় মুলতুবী রাখিয়া খাস কামরায় উঠিয়া গেলেন। যথাকালে রায় লিখিত হইল—বাদীর মোকদ্দমা মিথ্যা, আদৌ প্রমাণ হয় নাই। বাদীর মোকদ্দমা ডিস্‌মিস হইল এবং প্রতিবাদী খরচার ডিক্রী পাইল।

সুধীরকৃষ্ণের দরজা আইনের বিচারে রহিমের হইয়া গেল।

সেলুলোজ

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

অণুবীক্ষণ যন্ত্রসাহায্যে পরীক্ষার ফলে উদ্ভিদ্‌ ও প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ জীবদেহে কোষের সন্ধান প্রাপ্ত হন। একটি বাড়ী যেরূপ কতকগুলি ঘরের সমষ্টি, সেইরূপ জীবদেহও কতকগুলি কোষের সমষ্টিমাত্র। উদ্ভিদ্‌ কোষের আবরণ "সেলুলোজ" নামক পদার্থ দ্বারা প্রস্তুত। রাসায়নিকগণ সেলুলোজ বিশ্লেষণ করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, উহাতে অঙ্গার, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন আছে ও উহা শ্বেতসার-জাতীয় পদার্থ। প্রাণিদেহের কোষাবরণ প্রোটিন (ছানা-জাতীয় পদার্থ) দ্বারা প্রস্তুত। অক্সিজেন, জীবাণু ও অন্যান্য বহুপ্রকার পদার্থ সহজেই প্রোটিনের সহিত ক্রিয়া করিতে পারে, কিন্তু সেলুলোজের সহিত সহজে ক্রিয়া করিতে পারে না। প্রোটিন সেলুলোজ অপেক্ষা নিষ্ক্রিয়। প্রোটিন জলে দ্রবীভূত হয়। কিন্তু সেলুলোজ জলে দ্রবণীয় নহে। সেলুলোজের এই আপেক্ষিক নিষ্ক্রিয়তার জন্যই ইহা নানারূপ শিল্পে ব্যবহৃত হইতেছে। সেলুলোজ মানুষের খাদ্য নহে। ইহা জীর্ণ করা মানুষের সাধ্যাতীত, কিন্তু অন্যান্য তৃণভুক্‌ জীব ইহা জীর্ণ করিতে পারে, সুতরাং ইহা তাহাদের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। মানুষের খাদ্য ব্যতীত বসন-ভূষণের জন্যও বহুপ্রকার দ্রব্যের আবশ্যক আছে, সুতরাং বুদ্ধিমান মানবজাতি সেলুলোজ হইতে নানারূপ প্রয়োজনীয় বস্তু প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতেছে।

বস্ত্রশিল্প পৃথিবীর একটি প্রধান এবং প্রাচীন শিল্প। মানব-সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্রের ব্যবহারও ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়াছে। বস্ত্র প্রধানতঃ তুলা হইতেই প্রস্তুত হয়। তুলার শতকরা ৯৫ ভাগ সেলুলোজ আছে। তুলা হইতে যন্ত্রসাহায্যে সূতা প্রস্তুত হয় ও তৎপরে বয়ন করিয়া বস্ত্র প্রস্তুত হয়। শণ ও পাটের সেলুলোজ অংশ হইতেও বস্ত্র, দড়ি ও থলে প্রস্তুত হয়। সেলুলোজ স্বভাবতঃই বেশ দৃঢ়, সুতরাং বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিবার পক্ষে উপযোগী।

সেলুলোজ হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়। কাগজ-প্রস্তুত-প্রণালী আবিষ্কারের ফলেই সমস্ত জগতে শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তার হইয়াছে। মুদ্রণের অক্ষর বহু শতাব্দী পূর্ব্বে রোমীয়গণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু মুদ্রণযোগ্য কাগজের অভাবে উহার বিশেষ প্রচলন হওয়া সম্ভব হয় নাই। কাগজ প্রস্তুত হইবার পরে মুদ্রাযন্ত্রেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে।

কাগজ-শিল্পের প্রথম অবস্থায় শণের বস্ত্র হইতে সেলুলোজ গ্রহণ করা হইত। পরে তুলা ও শণের মিশ্রণ হইতে সেলুলোজ লওয়া আরম্ভ হয়। এই প্রকারে সেলুলোজ লইতে হইলে অধিক ব্যয় হয়। এখন কাঠ, বাঁশ ও ঘাস হইতে সেলুলোজ গ্রহণ করিয়া কাগজ প্রস্তুত হইতেছে (কাগজ প্রস্তুত প্রণালী এই সংখ্যা 'বঙ্গশ্রী'তে 'ভারতের শিল্প-সংগঠন' প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে)। তুলা হইতে কাগজ প্রস্তুত করিলে উহা বেশ সাদা ও দৃঢ় হয়, কারণ তুলাতে লিগ্‌নিন্‌ নাই; সুতরাং লিগনিন অপসারণের জন্য কোন প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়ার আবশ্যক নাই। তুলা হইতে কাগজ প্রস্তুত করিতে হইলে অধিক ব্যয় হয়, সুতরাং এই কাগজ অপেক্ষাকৃত মহার্ঘ।

রাসায়নিকগণ বহু চেষ্টার ফলে সেলুলোজের সহিত কতকগুলি পদার্থের সংযোগ সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছেন। এই প্রকারে লব্ধ কতকগুলি যৌগিক পদার্থ হইতে কয়েকটি শিল্পের উদ্ভব হইয়াছে।

নাইট্রিক অম্ল ও গন্ধকাম্লের মিশ্রণের মধ্যে তুলা কিছুক্ষণ রাখিয়া পরে উহা উঠাইয়া শুকাইয়া লইলে গান্‌ কটন্‌ (gun cotton) প্রস্তুত হয়। ইহা একটি ভয়ানক বিস্ফোরক পদার্থ। সুরাসার (alchohol) ও ইথারের (ether) মিশ্রণ অথবা এসিটোনে (acetone) গান্‌ কটন্‌ দ্রবীভূত করিয়া ধূমবিহীন বারুদ প্রস্তুত হয়। নাইট্রোগ্লিসারিন (nitroglycerine) ও সামান্য ভেসলিনের (vaseline) সহিত গান্‌ কটন্‌ মিশাইলে 'করডাইট' (cordite) নামক বিস্ফোরক প্রস্তুত হয়। সুইডেনবাসী আলফ্রেড নোবেল ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে করডাইট আবিষ্কার করেন। এই আলফ্রেড



ভূমি-রাজস্ব তদন্ত

নোবেলই নোবেল পুরস্কারের জন্য প্রভূত অর্থ প্রদান করিয়া বিশ্ব-বিখ্যাত হইয়াছেন।

নাইট্রিক ও গন্ধকাম্লের মিশ্রণে তুলা ভিজাইয়া রাখিয়া গান্‌কটন্ প্রস্তুত হইবার কিছু পূর্ব্বেই তুলা উঠাইয়া লইলে পাইরক্সিলিন্ (pyroxilin) প্রস্তুত হয়। পাইরক্সিলিন্ সুরাসার ও ইথারের মিশ্রণে দ্রবীভূত হয়। এই দ্রবণকে কলোডিয়ন্ (collodion) বলে

চিকিৎসকগণ ক্ষতস্থানে অনেক সময়ে কলোডিয়নসিক্ত তূলা লাগাইয়া আবৃত করিয়া রাখেন। ইহাতে বায়ু হইতে ধূলিকণা ও জীবাণু ক্ষতস্থানে প্রবেশ করিতে পারে না।

বার্ণিশ প্রস্তুত করিবার জন্যও কলোডিয়ন ব্যবহৃত হয় এ্যালুমিনিয়ম বা ব্রোঞ্জ্ (bronze) গুঁড়া করিয়া কলোডিয়নের সহিত মিশ্রিত করিয়া লাগাইলে ধাতুর পাত-এর ন্যায় দেখায়।

ক্যান্‌ভাসের (canvas) উপর পাইরক্সিলিন প্রলেপ লাগাইয়া কৃত্রিম চর্ম্ম প্রস্তুত হয়। ইহা স্বাভাবিক চর্ম্ম অপেক্ষা দৃঢ় ও সুলভ। আজকাল কৃত্রিম চর্ম্মের জুতা, গদী, থলে ও মোটরগাড়ীর উপরের আচ্ছাদন প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে। এই সমস্ত দ্রব্যের জন্য পৃথিবীময় যে পরিমাণ চর্ম্মের আবশ্যক, তাহা পাইতে হইলে অচিরেই প্রাণি-জগৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায়। বৈজ্ঞানিকগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এ-ক্ষেত্রে জীবহত্যার কিয়ৎ পরিমাণ লাঘব হইয়াছে।

সেলুলয়েড শিল্প আধুনিক যুগের একটি বিশেষ উন্নতিশীল শিল্প। সেলুলয়েড প্রস্তুত করিবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে পাইরক্সিলিন ব্যবহৃত হয়। এলবেনী-(Albany)বাসী জন্ ওয়েস্‌লী হায়াট (John Wesley Hyatt) বিলিয়ার্ড খেলিবার বল প্রস্তুতকার্য্যে হস্তিদন্তের পরিবর্ত্তে অপর কোন দ্রব্য ব্যবহার করা যায় কি না, তাহা পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। হায়াট জানিতে পারেন যে, ইংলণ্ডে পার্কস্ (Parkes) এবং স্পীল (Spiel) পাইরক্সিলিনের সহিত কর্পূর মিশ্রিত করিয়া এক প্রকার পদার্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন, যাহা ঢালাই করা যায়। পার্কস্ ও স্পীল রেড়ীর তৈলের ভিতরে পাইরক্সিলিন ও কর্পূর মিশ্রিত করেন। এই প্রকারে প্রস্তুত পদার্থ নির্ম্মিত দ্রব্যগুলি অধিক দিন স্থায়ী হয় না। হায়াট কর্পূর ও পাইরক্সিলিন মিশ্রিত করিয়া উত্তপ্ত চাপ প্রয়োগের যন্ত্রদ্বারা চাপ দিয়া দেখিতে পান যে, এইরূপে প্রস্তুত পদার্থটি ঠাণ্ডা হইলে বেশ কঠিন ও দৃঢ় হইয়া যায় এবং উত্তপ্ত অবস্থায় নরম থাকে। এ পদার্থটিকে তিনি 'সেলুলয়েড' নামে অভিহিত করেন। আজকাল সেলুলয়েডের খেলনা, চিরুণী, সাবান রাখিবার বাক্স, ছবির ফ্রেম, কৌটা প্রভৃতি বহুপ্রকার দ্রব্য প্রত্যেক গৃহেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই দ্রব্যগুলি অত্যন্ত সুলভ ও দেখিতে অতি সুন্দর। সেলুলয়েডের দ্রব্যের দুইটী বিশেষ দোষ আছে, এইগুলিতে কর্পূরের গন্ধ থাকে ও অত্যন্ত সহজদাহ্য; সুতরাং অনেক ক্ষেত্রে সেলুলয়েডের দ্রব্যাদি ব্যবহার করা নিরাপদ নহে। বাংলাদেশে সেলুলয়েডের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার কারখানা আছে, তবে এ দেশে সম্ভবতঃ সেলুলয়েড প্রস্তুত হয় না, উহা বিদেশ হইতে আমদানী করা হয়। এ দেশে কেবল উহা গালাইয়া নানাপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

কাগজ গন্ধকাম্লে কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিলে কাগজের সেলুলোজের সহিত গন্ধকাম্লের রাসায়নিক ক্রিয়া হয় ও কাগজের উপরে সেলুলোজ সাল্‌ফেট্ (cellulose sulphate) প্রস্তুত হয়। এক্ষণে গন্ধকাম্ল হইতে ঐ কাগজ উঠাইয়া উত্তমরূপে ধুইয়া শুকাইলে কাগজখানি পার্চমেণ্টের (parchment) ন্যায় মসৃণ ও শক্ত হয়, ইহাকেই আজকাল পার্চমেণ্ট কাগজ বলা হয়। পূর্ব্বে মেষচর্ম্ম হইতে পার্চমেণ্ট প্রস্তুত হইত। এখন মেষচর্ম্ম হইতে প্রস্তুত পার্চমেণ্ট অতি অল্পই পাওয়া যায়।

সেলুলোজ হইতে কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত হইয়াছে। স্বাভাবিক রেশমে প্রোটিন থাকে। কৃত্রিম রেশমে প্রোটিন নাই। সেলুলোজকেই রাসায়নিক উপায়ে রেশমের ন্যায় উজ্জ্বল করা হয়। সুতরাং ইহাকে কৃত্রিম রেশম বলা ভ্রমাত্মক। স্বাভাবিক রেশমের সূতার আঁশ গোলাকার ও অনেকগুলি আঁশ পাশাপাশি সমান্তরাল ভাবে থাকে বলিয়া ঐ গুলির উপর আলোকপাত হইলেই ঐ আলোক সব গুলি আঁশ হইতে সমভাবে প্রতিফলিত হয়। এই কারণেই রেশম উজ্জ্বল দেখায়। তুলারও একটি আঁশ লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, উহাও উজ্জ্বল, কিন্তু উহা গোলাকার নহে এবং অনেকগুলি আঁশ একত্রে লইয়া দেখিলে দেখা যায় যে,

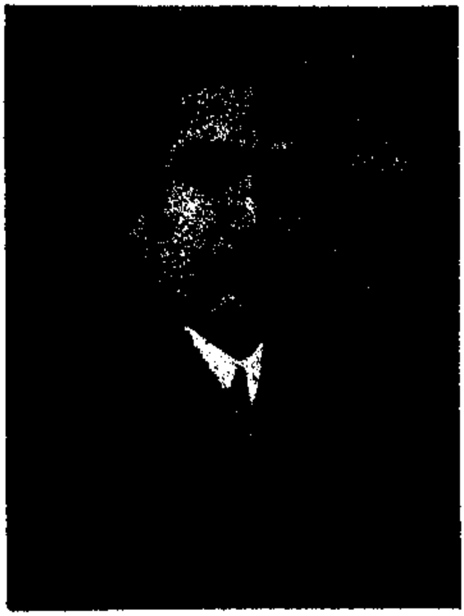
ঐ গুলি জড়ান ভাবে আছে, রেশমের ন্যায় পাশাপাশি সমান্তরাল ভাবে নাই। এইরূপ জড়ান ভাবে অবস্থান করিবার জন্যই তুলার আঁশগুলি হইতে সর্বদিকে সমভাবে আলোক প্রতিফলিত হইতে পারে না, সুতরাং উজ্জ্বল দেখায় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, তুলার আঁশগুলি গোল করিয়া উহাদিগকে পাশাপাশি সমান্তরাল ভাবে স্থাপন করিতে পারিলেই রেশমের ন্যায় উজ্জ্বল দেখাইবে। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে জন মার্সার (John Mercer) দেখিতে পান যে, জলে শতকরা ৩০ ভাগ কষ্টিক্ সোডা দ্রবীভূত করিয়া ঐ দ্রবণে তুলার আঁশ ভিজাইয়া লইলে উহা বেশ দৃঢ় ও সঙ্কুচিত হইয়া যায়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে লো (Lowe) পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, তুলার আঁশ প্রসারিত করিয়া রাখিয়া কষ্টিক সোডা দ্রবণে ভিজাইলে আঁশগুলি নরম হয় ও প্রসারণের জন্য গোলাকার প্রাপ্ত হয়। তৎপরে উহা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া শুকাইয়া লইলে বেশ দৃঢ় হয়। এই প্রকারে তুলার সমস্ত আঁশগুলি গোলাকার ও সমান্তরাল করা সম্ভব হয় না। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে সারদোনে (Chardonnet) কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতের একটি উপায় পেটেণ্ট করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি তুলা হইতে পাইরক্সিলিন প্রস্তুত করেন ও উহা ইথারের মিশ্রণে দ্রবীভূত করিয়া কলোডিয়ন প্রস্তুত করেন। তৎপরে ইহা কতকগুলি সূক্ষ্ম ছিদ্রের ভিতর দিয়া জলে ঢালিয়া দিলে ইথর ও সুরাসার জলে দ্রবীভূত হইয়া যায় ও কলোডিয়ন হইতে সূতা প্রস্তুত হয়। এই সূতা বিশেষ দৃঢ় হয় না এবং ইহা হইতে প্রস্তুত বস্ত্রাদিও অধিক দিন স্থায়ী হয় না। এই সূতাগুলি ক্যালসিয়ম সালফাইড দ্রবণের ভিতর দিয়া চালিত করিয়া লইলে সূতাগুলি দৃঢ় ও বস্ত্র প্রস্তুতের উপযোগী হয়। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ক্রস (Cross) এবং বীভান (Beevan) কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত করিবার একটি উপায় আবিষ্কার করেন। ইহাকে ভিস্কোজ প্রোসেস্ (Viscose Process) বলা হয়। তাঁহারা সেলুলোজ হইতে সেলুলোজ শালফাইট মণ্ড প্রস্তুত করেন এবং ইহাতে কষ্টিক সোডা প্রয়োগ করেন। তৎপরে কার্ব্বন ডাই-সাল্‌ফাইড (carbon-disulphide) নামক তরল পদার্থে ভিজাইয়া রাখিলে সেলুলোজ-জ্যান্‌থেট (cellulose xanthate) প্রস্তুত হয়। ইহা জলে দ্রবণীয়, সুতরাং এই মণ্ড সূক্ষ্ম ছিদ্রের ভিতর দিয়া মৃদু অম্লের ভিতর চালনা করা হয়। এইরূপ করিলে সূতা প্রস্তুত হয়। অধিকাংশ কৃত্রিম রেশমই এই উপায়ে প্রস্তুত হয়। উত্তম কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত করিবার জন্য এ্যাসেটিক এ্যান্‌হাইড্রাইড (acetic anhydride) নামক পদার্থে সেলুলোজ ভিজাইয়া রাখা হয়। ইহাতে সেলুলোজ এ্যাসিটেট (cellulose acetate) প্রস্তুত হয়। সহজে বাষ্পে পরিণত হইয়া চলিয়া যাইতে পারে, এরূপ কোন জৈব তরল পদার্থে এই সেলুলোজ এ্যাসিটেট দ্রবীভূত করা হয়। এই দ্রবণ সূক্ষ্ম ছিদ্রের ভিতর দিয়া চালিত করিলে জৈব তরল পদার্থটি বাষ্পাকারে চলিয়া যাওয়ায় সেলুলোজ এ্যাসিটেটের সূতা প্রস্তুত হয়। এই উপায়ে প্রস্তুত কৃত্রিম রেশম অন্যান্য উপায়ে প্রস্তুত রেশম অপেক্ষা অনেক দৃঢ়। অধিক ব্যয়সাপেক্ষ বলিয়া এই উপায়ে অল্পই রেশম প্রস্তুত হয়। কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত করিবার প্রায় দুই সহস্র উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্প্রতি বোম্বাই সরকার কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতকল্পে ৭১০০০ টাকা ব্যয় অনুমোদন করিয়াছেন বলিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

সেলুলোজ হইতে সুরাসার প্রস্তুত করা যায়। কাঠের গুঁড়ায় সেলুলোজ আছে। উহা লবণাম্লে ভিজাইয়া রাখিলে সেলুলোজ হইতে গ্লুকোজ (glucose) প্রস্তুত হয়। গ্লুকোজ হইতে সহজেই সুরাসার প্রস্তুত করা যায়। বৈজ্ঞানিকগণ মোটরগাড়ী চালাইবার জন্য পেট্রোলের পরিবর্ত্তে সুরাসার ব্যবহারের পরিকল্পনা করিতেছেন, কারণ তাঁহারা অনুমান করেন যে, আজকাল এত অধিক পেট্রোল ব্যয় হইতেছে যে, খনি হইতে আর বেশী দিন পেট্রোল পাওয়া সম্ভব হইবে না; তখন কাঠ হইতে সুরাসার প্রস্তুত করিয়া পেট্রোলের অভাব দূরীভূত করা যাইতে পারে।

চীনে নব-জীবনের উন্মেষ

—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বিগত জুলাই মাসে চীন-জাপান সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম কয়েক মাসের মধ্যে জাপান উত্তর-চীনে পিপিং, তিয়েনসীন ও পূর্ব্ব-চীনে সাংহাই ও নানকিং পর্য্যন্ত দখল করিয়া লইয়াছে। চীনেরা প্রতিরোধের বিপুল আয়োজন সত্বেও ক্রমশঃ পিছু হটিয়া যাইতেছিল। তখন লোকে ভাবিয়াছিল, এ বারে চীনের আর রক্ষা নাই। জাপানী বিমানপোত, ট্যাঙ্ক, মোটর-বাহিনী প্রভৃতি অত্যাধুনিক রণ-সম্ভারের সম্মুখে চীনারা কোনক্রমেই পারিয়া উঠিবে না। নানকিনের পতনের পর সেখানে জাপানীরা কি ভীষণ অত্যাচার অনাচার চালাইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণও এ দেশে প্রকাশিত হয় নাই। আমেরিকার সংবাদপত্রে ইহার বিস্তৃত বিবরণ বাহির হইয়াছিল। লোকে তখন বলাবলি করিতেছিল যে, ভালয় ভালয় চীন সরকারের জাপানের নিকট আত্মসমর্পণ করা উচিত, যদি জনসাধারণকে রক্ষা করিবার সামর্থ্য একান্তই তাহার না থাকে। ঠিক এই সময় চীনস্থ জাপানী সেনাপতি জেনারেল মাৎসুকুই ঘোষণা করিলেন যে, অতঃপর দুইটি কারণে চীনে জাপানী 'কার্য্য' (জাপান সরকার ও জাপানী নেতৃবর্গ এই সংগ্রামকে একটি 'affair' 'incident' অর্থাৎ ছোটখাট ব্যাপার বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন, যদিও এই 'ব্যাপারে' সহস্র সহস্র লোকের প্রাণহানি ঘটিতেছে) আপাততঃ কিয়ৎ দিন বন্ধ থাকিবে। প্রথমতঃ, সৈন্যেরা এত পরিশ্রান্ত যে, তাহাদের কিঞ্চিৎ বিশ্রাম দেওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয় কারণ এবং তাহাই প্রধান কারণ—এই যে, জাপান চীনের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করিতে চাহে। চীন জাপানের কার্য্যে বাদী হইয়া এতাবৎ কাল যে অন্যায় করিয়া আসিতেছে, তাহা ভাবিয়া দেখিয়া পুনরায় তাহার সঙ্গে একযোগে কার্য্য করিবে, এ কারণ জেনারেল মাৎসুকুই চীন সরকারকে সময় দিতে চাহেন। জাপানের এই 'সদভিপ্রায়ে' বিভ্রান্ত হইয়া অনেকেই ভাবিয়াছিল, চীনের পক্ষে এখন জাপানের সঙ্গে বোঝা-পড়া করাই সমীচীন। জাপানী সেনাপতির এই ঘোষণা যে আদতে সদিচ্ছা-প্রণোদিত নহে, তাহা পরবর্ত্তী কর্ম্মপ্রবাহে উপলব্ধি হইয়াছে। জাপানী গুপ্তচর বিভাগ সাতিশয় সুনিয়ন্ত্রিত ও কর্ম্মপটু। তাহাদের প্রমুখাৎ জাপানী নেতৃবর্গ ও সরকার জানিতে পারিয়াছিলেন, চীনারা তাহাদের বাধা দিবার জন্য একতা-বদ্ধ হইয়া প্রস্তুত হইতেছে। ইহারা একতাবদ্ধ হইয়া



সানইয়াৎ সেন (যৌবনে)।

প্রতিরোধ আরম্ভ করিলে বিশাল চীনকে কিছুতেই করায়ত্ত করা যাইবে না। যদি তাহাদিগকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া স্বমতে রাজী করান যায়, তাহা হইলেই তাহাদের মুখ রক্ষা হইবে।

চীনারা কিন্তু উহাতে রাজী হয় নাই। উপরন্তু জাপান একজন জার্ম্মান মধ্যস্থ মারফত যে কয়েকটি দাবী জানাইয়া তাহাদের সঙ্গে আপোষ-রফা করিতে চাহিয়াছিল, চীনের কর্ণধার মার্শ্যাল চিয়াং-কাইশেক তাহা তাচ্ছিল্যভরে

প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তখন হইতে জাপানীদের টনক নড়িয়াছে। বহির্জ্জগৎও ভাবিতে সুরু করে, বাস্তবিকই চীনাদের মধ্যে এমন কোন্ শক্তি আছে, যাহার জন্য চিয়াং-কাইশেকের এই প্রত্যাখান যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে। আরও কয়েকটি ব্যাপারে লোকের মনে নানারূপ ধোকা লাগিতেছিল। জাপান-সম্রাট্ এই সময় জাপানীদের উদ্দেশ করিয়া ঘোষণা করেন যে, চীনে তাহাদের কার্য্য সম্পন্ন হইতে বহুদিন লাগিবে, সুতরাং জাপানীরা দীর্ঘকালব্যাপী ত্যাগস্বীকারে যেন রাজী থাকে।

ইতিহাসের আরম্ভ হইতে জাপানের যে সব গুরুতর সঙ্কট দেখা দিয়াছিল, তাহা উৎরাইবার জন্য এ পর্য্যন্ত তিনটি সর্ব্বদল সম্মেলন হইয়াছিল। ইংরেজীতে ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে, 'ইম্পিরিয়াল কন্‌ফারেন্স'। এবারেও জাপ-সম্রাটের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ একটি সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। জাপানের ইতিহাসে ইহাই চতুর্থ সম্মেলন। সুতরাং ইহা দ্বারা সহজেই বুঝা যাইতেছে, চীন অধিকারকে জাপানীরা কিরূপ একটা গুরুতর ব্যাপার বলিয়া মনে করে, যদিও যত্র তত্র ইহাকে একটা তুচ্ছ কার্য্য বলিয়া প্রচার করিতেছে। ইহার পর, দুই মাস পূর্ব্ব হইতে জাপানীদের অগ্রগতি প্রতিপদে কিরূপ ব্যাহত হইতেছে, প্রতিদিনকার সংবাদপত্রে আমরা তাহা জানিতে পারিতেছি।" এখন বুঝা যাইতেছে, জাপানীরা চীনাদের শক্তির গুরুত্ব বুঝিয়াই একদিকে আপোষের দাবী পেশ করিয়াছিল, আবার অন্যদিকে সম্রাট-প্রমুখাৎ জাপানকে দীর্ঘকালব্যাপী ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হইতে বলা হইয়াছিল। বহির্জ্জগৎও চীনাদের এইরূপ সার্থক বাধা দানে যে কিঞ্চিৎ স্তম্ভিত না হইয়াছে, এমন নয়।

চীনাদের এই শক্তির উৎস কোথায়? যে শক্তি সম্বন্ধে কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্তও আমরা অজ্ঞ ছিলাম, প্রচার-মাহাত্ম্যে যাহা আমরা এতটুকুও আঁচ করিতে পারি নাই, তাহা তো আর একদিনে গজাইয়া উঠে নাই। এই শক্তি যদি জাতির অন্তরতম প্রদেশে শিকড় গাড়িয়া না থাকে, তাহা হইলে এরূপ অকস্মাৎ আবির্ভাব তো সম্ভব নয়। এ বিষয় ভাবিতে গেলেই চীনের নব জাতীয়তার কথা আসিয়া পড়ে। বিরাট চীনজাতির মধ্যে এই এক-ভ্রাতৃত্ব বা একজাতীয়ত্ববোধের উন্মেষ কবে হইতে তবে সুরু হইল?

ভারতবর্ষের মত চীন বার বার বিদেশীর নিকট হার মানিয়াছে, তাহার উপর আক্রমণ চালাইতে মোগল তাতার কেহই বাদ যায় নাই। কিন্তু সে স্বাধীন হইবার চেষ্টাও বার বার করিয়াছে, চেষ্টায় সফলও হইয়াছে। চীন শেষ বারে মাঞ্চু সম্রাটের অধীন হয়। ইহাকেও তাড়াইয়া দিতে সে দ্বিধা করে নাই। চীনের জন-নেতা ডক্টর সানইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে চীনারা গত ১৯১১ সালে মাঞ্চু সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া জয়লাভ করে ও চীন রিপাব্লিক বা সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। এই সময়ই প্রকৃত পক্ষে চীনা মহাজাতি গঠনের সূত্রপাত হয়। চীনের ইতিহাসে যাঁহারা অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, গত শতাব্দীতে পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদীরা তাহার উপরে রাষ্ট্রিক ও অর্থনীতিক হিসাবে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। মাঞ্চু সম্রাট দুর্ব্বল জনসাধারণের কল্যাণে অমনোযোগী। চীনারাও তখন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ও বহুসংখ্যক সর্দ্দার বা ওয়ার-লর্ড-এর অর্থগৃধ্নুতায় নিষ্পেষিত ও নির্য্যাতিত। মাঞ্চু সম্রাটের নিকট হইতে ছলে-বলে কলে-কৌশলে অন্যান্য রাষ্ট্র চীনে সুবিধার পর সুবিধা আদায় করিয়া লইয়াছিল। গত ১৯৩৬ সনে চীন স্বাধীন হইল বটে, কিন্তু সর্দ্দারদের স্বার্থপরতায় ও অপরাপর রাষ্ট্রের চক্রান্তে কি আর্থিক, কি রাষ্ট্রিক কোন দিক হইতেই সংহত ও সংঘবদ্ধ হইতে পারে নাই। একজন চীনা মনীষী বলিয়াছেন, চীনের তখনকার অবস্থা ছিল শার্লেমেন বা নেপোলিয়নের পতনের পর তাঁহাদের সাম্রাজ্যের অবস্থার সমতুল্য। ইহার পর বিগত মহাসমরের পর ঘটনাচক্রে তাহার বরাত ফিরিবার উপক্রম হইল। এই মহাসমরে জাপান, ব্রিটেন, ফ্রান্স,—আমেরিকা প্রমুখ মিত্রশক্তিবর্গের পক্ষে যোগদান করিয়াছিল। মিত্রশক্তিবর্গ ইউরোপে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় প্রাচ্য রক্ষার ভার পড়িয়াছিল জাপানের উপর। তখন জাপান প্রাচ্যে খুব শক্তিশালী হইয়া উঠে, তাহার ব্যবসা-বাণিজ্যও বিস্তর বাড়িয়া যায়। পাশ্চাত্য রাষ্ট্রসমূহের ন্যায় তাহারও যে চীনের উপর লোলুপ দৃষ্টি আছে, এই সময়ে চীন সরকারের নিকট তাহার 'একুশত দাবী' পেশে বুঝা

গিয়াছিল। মিত্রশক্তিবর্গ ইহাতে রাজী না হওয়ায় জাপান ইহা লইয়া আর বেশী পীড়াপীড়ি করে নাই। মহাসমর অন্তে ভার্সাইয়ে বিজয়ী ও বিজিত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে সন্ধি হয়, তাহার ফলে জাপান প্রশান্ত মহাসাগরে বিষুব-রেখার উত্তরে জার্ম্মান দ্বীপগুলির কর্ত্তৃত্ব লাভ করে। একে ইতিপূর্ব্বেই প্রাচ্যে তাহার বাণিজ্য-সম্পদ্ আশ্চর্য্য রকম বাড়িয়া গিয়াছে, তাহার উপর ভার্সাই সন্ধির দ্বারা এতটা রাজ্য পাইয়া প্রশান্ত মহাসাগরে সে অত্যন্ত প্রতাপশালী হইয়া উঠিল। ইহাতে এই অঞ্চলে বৃটিশের উপনিবেশগুলি ও মার্কিন-রাষ্ট্রে জাপানের সঙ্গে আবার নূতন করিয়া বুঝা-পড়া করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিল। ১৯২১-২২ সনে ওয়াশিংটনে পূর্ব্বেকার মিত্রশক্তিবর্গ সম্মিলিত হইয়া প্রাচ্য, তথা প্রশান্ত-মহাসাগর ও চীন সম্বন্ধে কতকগুলি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। বহু বৎসর যাবৎ জাপান ও ব্রিটেনের মধ্যে যে সন্ধি বলবৎ ছিল, ইহার ফলে তাহা বাতিল হইয়া যায়। ওয়াশিংটন সম্মেলনে যে-সব চুক্তি হইয়াছিল, তাহা বাহ্যতঃ চীনকে কেন্দ্র করিয়া হইলেও সূক্ষ্মরূপে অনুধাবন করিলে বুঝা যাইবে, প্রাচ্যে যাহাতে জাপানের শক্তি অতিমাত্রায় বাড়িয়া না যায়, তাহাতে বাধা দিবার জন্যই এ সব করা হইয়াছিল। যাহা হউক, চীনের জাতীয়তাবোধ ইহার দ্বারা পুষ্ট হইবার প্রচুর অবকাশ পাইল। চীনের স্বাধীনতা, তথা তাহার অখণ্ডতা এখানে স্বীকৃত হইল। বাণিজ্যাদি ব্যাপারে চীনের দ্বার যে একমাত্র জাপানের নিকট নহে, সকলের নিকটই উন্মুক্ত থাকিবে, ইহাও এখানে স্থির হয়।

চীন রিপাব্লিকের প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর সানইয়াৎ সেন তখনও জীবিত। ওয়াশিংটনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সম্রাজ্য-বাদীরা যে উদ্দেশ্যেই উক্তরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হউক না কেন, তিনি স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন, পুনর্গঠনের তাহাই সুবর্ণ সুযোগ। এই সুযোগ পূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করিতে তিনি জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিলেন। চীনের পূর্ব্বদিকে মধ্য-স্থলে নানকিনে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইল। কুমিণ্টাং দল শাসনভার গ্রহণ করিয়া বিরাট চীন-জাতিকে সংহত করিতে মনঃসংযোগ করিলেন। রুশিয়ায় ইতিপূর্ব্বেই সোভিয়েট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। লেনিনের নেতৃত্বে রুশগণ আত্মসংগঠনে মনোনিবেশ করে। রুশিয়া চীনের মতই বিরাট, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, দরিদ্র ও দুর্ব্বল, কাজেই আত্ম-সংগঠন কার্য্য উভয়ের সমস্যা ও পন্থা একবিধ হইলে ক্ষতি নাই, বরং এইরূপ হইলে শীঘ্রই কার্য্যকরী হইতে পারে। ডক্টর সানইয়াৎ সেন সোভিয়েট পন্থা অনুধাবন করিলেন এবং রুশ বিশেষজ্ঞ দ্বারা চীনের সংগঠন কার্য্যও আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই সময় ১৯২৫ সালে তিনি পরলোক গমন করেন। সোভিয়েট রুশিয়ার



মাদাম সানইয়াৎ সেন।

আদর্শের কথা এখন সকলেই কম-বেশী অবগত আছেন। বিশেষজ্ঞদের মারফৎ তাই তাহারা তাহা-দের আদর্শ প্রচারে সচেষ্ট ছিল। ডক্টর সানইয়াৎ সেনের মৃত্যুর পর তাঁহারই অনুগত শিষ্য ও দক্ষিণ হস্ত জেনারেল চিয়াং-কাই-শেক কুমিণ্টাঙের নেতা, তথা রাষ্ট্রের কর্ণধার নির্ব্বাচিত হন। সোভিয়েট আদর্শ লইয়া কুমিণ্টাঙে বিরোধ উপস্থিত হয়। ফলে ইহার পক্ষপাতী ব্যক্তিবর্গ কুমিণ্টাং ছাড়িয়া চলিয়া যায়। রুশিয়ার সঙ্গেও এই সময় সম্পর্ক ছিন্ন হইল।

ডক্টর সান্-ইয়াৎ-সেনের দূরদর্শিতায় জাতির সংগঠনের জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল, তাঁহার মৃত্যুর পর

এইরূপে তাহা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। ইহার পর কুমিণ্টাং বা সরকার-পন্থী ও সাম্যবাদীদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হইল। চিয়াং-কাই-শেকের হস্তে সরকারী ক্ষমতা ও শক্তি ন্যস্ত, কাজেই তিনি অবিলম্বে ইহাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতে আরম্ভ করিয়া দেন। গত ১৯২৯ সন হইতে ১৯৩৪ সন পর্য্যন্ত মোটামুটি ছয় সাত বৎসর এই কম্যুনিষ্ট দলননীতি কিরূপ তীব্র ভাবে চলিয়াছিল, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। কম্যুনিজমবাদে উদ্বুদ্ধ সহস্র সহস্র নরনারী, ছাত্রছাত্রী আদর্শের বেদীমূলে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে। অগণিত লোক নানাবিধ অত্যাচার সহ্য করিয়াছে। এমন কি জাপানীদের বিরুদ্ধেও যখন বিক্ষোভ প্রদর্শিত হইয়াছে, তখনও চিয়াং-কাই-শেক ইহাদের দলন করিতে ক্ষান্ত হন নাই।

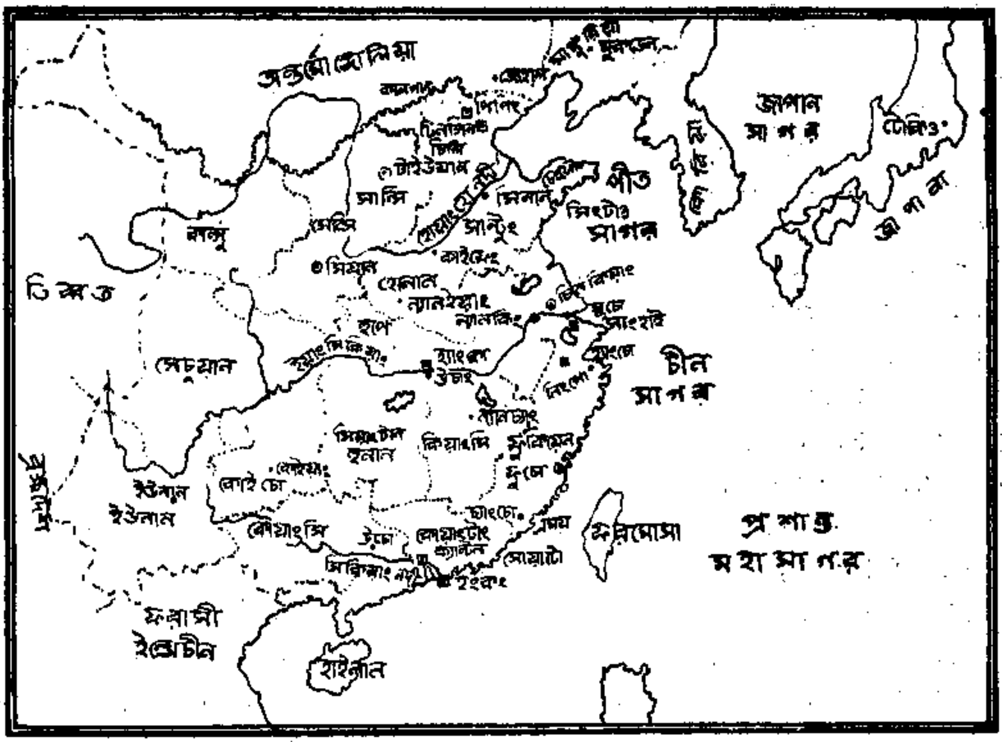
চীন-সরকারের এই কম্যুনিষ্ট দলন কার্য্য একেবারে বিফলে যায় নাই। চীনের অভ্যন্তরে পশ্চিম-প্রান্তিক প্রদেশসমূহে সরকারের প্রতিরোধকল্পে কম্যুনিষ্ট বাহিনী গঠিত হয়। তাহারা স্বতঃই সংখ্যায় অল্প, কাজেই গরিলা বা খণ্ডযুদ্ধে তাহাদিগকে সুশিক্ষিত হইতে হইয়াছে। আবার চীনা কম্যুনিষ্টগণ শুধু সরকারী বাহিনীর প্রতিরোধ কার্য্যেই লিপ্ত ছিল না, তাহারা চীনা সর্দ্দার বা 'ওয়ারলর্ড'-প্রপীড়িত জন-সমাজকে দুর্ব্বহ করভার হইতে মুক্তি দিয়াছিল। তাহাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া তুলিতে চীনা কম্যুনিষ্টরা সর্ব্বদা সচেষ্ট রহিয়াছে। তাহারাও স্বদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা চাহে। কি পাশ্চাত্ত্য, কি প্রাচ্য, কোন দেশকেই চীনের স্বার্থহানিকর কার্য্য হইতে বাধা দিতে তাহারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। পশ্চিম-প্রান্তিক চীনের জনগণও এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইতেছিল; কারণ কম্যুনিষ্টরা তাহাদের নানা সুবিধা করিয়া দিয়া ইতিপূর্ব্বেই তাহাদের চিত্তজয় করিয়া লইয়াছে। কম্যুনিষ্টদের এই নব জাতীয়তার বাণী ক্রমে দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম চীনেও সংক্রামিত হয়। চীনা সোভিয়েটের অধিনায়ক মাও-ৎসি-তুং ও সোভিয়েট বাহিনীর অধ্যক্ষ জেনারেল চু-তের কৃতিত্ব অসাধারণ। সম্প্রতি এড্‌গার শো নামক একজন সাহেবের Red Star over China নামক একখানা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ইহা পাঠে চীনা কম্যুনিষ্টদের কার্য্য-কলাপ অবগত হইতে পারিবেন।

এ দিকে আমরা চীন-সরকারের কম্যুনিষ্ট-দলন কার্য্য ও জাপান-অনুকূল মনোভাবের কথা শুনিয়া আসিতেছিলাম। বাস্তবিক পক্ষে জাপানের হঠকারিতার জন্য চিয়াং-কাই-শেক, তথা কুমিণ্টাং দলও ইহার উপর বিরূপ ছিল। কিন্তু তাহাদের মূলমন্ত্র ছিল আত্ম-সংগঠন। কারণ বিরাট চীন-জাতি সংহত ও সুগঠিত না হইলে জাপানই হউক কি অন্য কেহই হউক, কাহাকেও সার্থক প্রতিরোধ করা চলিবে না। গত সাত আট বৎসরে চীন সরকার আত্ম-রক্ষার সর্ব্ববিধ আয়োজন করিতে আরম্ভ করেন। স্থল-বাহিনী ও বিমান-বাহিনী বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে আধুনিক সজ্জায় সজ্জিত হইতে থাকে। চীনের দুর্গম অঞ্চলেও রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ সুরু হয়। জাপানীদের আক্রমণ বা বাধাদানের ভয়ে রাত্রিতে রাত্রিতে জনমজুর খাটাইয়া ক্যাণ্টন-হ্যাঙ্কো রেলপথ চীন-সরকার নির্ম্মাণ করেন। নব-চীনের রাজধানী নানকিঙের সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলের যোগসূত্র স্থাপনের জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী মোটর-রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে।

চীনাদের শিক্ষা-দীক্ষা ব্যাপারেও সরকার তৎপর। বিভিন্ন প্রদেশে বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা ও গবেষণায় এবং জাতির নব-জাগরণে এই সব প্রতিষ্ঠান কিরূপ কার্য্য করিয়াছে, তাহা ইহাদের উপর জাপানীদের আক্রোশ হইতে ইদানীং পরিষ্কারভাবেই বুঝা গিয়াছে। যেখানে জাপানীরা যাইতেছে, সর্ব্বাগ্রে তাহাদের নজর পড়িতেছে এই সব বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপর। জাপানী বোমায় এই সব শিক্ষাকেন্দ্র ছারখার হইয়া গিয়াছে। শুধু চীনারা নহে, সমগ্র বিশ্ব-বাসী এই অমূল্য জ্ঞান ভাণ্ডার হইতে আজ বঞ্চিত। মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার আয়োজনও চীন সরকার করিয়াছিলেন। চীনাদের আর্থিক, সামাজিক ও নৈতিক সর্ব্ববিধ উন্নতির দিকেই নেতৃবর্গ অবহিত। আফিংখোর বলিয়া চীনাদের দুর্নাম বিশ্বব্যাপী। আফিমের নেশা হইতে দেশবাসীকে মুক্ত করিবার জন্য সরকার কি কঠোর ব্যবস্থাই না করিয়াছেন। এই সম্পর্কে চীন সরকারের

নীতি যাহারা অমান্য করিবে, তাহাদের চরম দণ্ড মৃত্যু-দণ্ডের পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দেশের অর্থসম্পদ্ বৃদ্ধির জন্ম নানা স্থানে কলকারখানা স্থাপন, বিভিন্ন অঞ্চলের খনিজ দ্রব্য সম্বন্ধে গবেষণা, আবিষ্কার ও আহরণ, বাট্টার হার নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি অবলম্বন করিয়াছেন।

এক দিকে চীনা কম্যুনিষ্টদের এবং অন্য দিকে চীনা সরকারের—এই দুই দিক হইতেই চীনের জনসাধারণের মধ্যে সংগঠন-কার্য্য চলিয়াছিল। এতদিন এই উভয় দলের বিরোধিতার চাপে ইহার গুরুত্ব বা কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে বহির্জ্জগৎ বিশেষ কিছুই উপলব্ধি করিতে পারে নাই। আজ কিন্তু তাহা সম্যক্ বুঝা যাইতেছে। এই দুই দলে অন্তর্দ্বন্দ্বের সময়ে এক দিকে যেমন নিজেদের মধ্যে সংগঠন-কার্য্য চলিতেছিল, অন্য দিকে তেমনই ইহার সুযোগ লইয়া জাপানীরা চীনে রাজ্যবিস্তারে লাগিয়া যায়। ১৯৩১-৩২ সনে মাঞ্চুরিয়া অধিকার করিয়া মাঞ্চুকুয়ো রাজ্যপ্রতিষ্ঠা, পর বৎসর জেহোল অধিকার, ইহার পরে পরে অতিক্রান্ত উত্তর-চীনে চাহার-প্রমুখ পাঁচটি প্রদেশের উপর প্রভাব বিস্তার—এ সব বিষয় আমরা সকলেই অল্প-বিস্তর অবগত আছি। চীনা জনসাধারণ, তাহারা কম্যুনিষ্টই হউক বা সরকার-পন্থীই হউক, কখনও জাপানের এবংবিধ রাজ্যবিস্তার ভাল চক্ষে দেখে নাই। বাহ্যতঃ কিছু না করিতে পারিলেও জাপানী-দের প্রতি তাহাদের ঘৃণা তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে লাগিল। ইহাদের হঠকারিতা, ইহাদের অপকীর্তিই চীনা জাতিকে এক করিয়া তুলিতেছিল, এক জাপানী-বিতাড়ন মন্ত্রে দীক্ষিত করিতেছিল। এই ঐকমত্যের বহিঃপ্রকাশ হয় কম্যুনিষ্টদলনে প্রেরিত সরকারী সৈন্যদের দ্বারা তাহাদের সর্ব্বাধ্যক্ষ জেনারেল চিয়াং-কাইশেকের বন্দী হওয়ার ব্যাপার হইতে। উত্তর-পশ্চিম চীনে সিয়ান প্রদেশে চিয়াং-কাইশেক তাঁহারই অধীনস্থ কর্ম্মচারী চ্যাং সুয়ে লিয়াং দ্বারা ১৯৩৬ সনের ডিসেম্বর মাসে বন্দী হন। ইহার পর তাঁহার মুক্তি, চ্যাং সুয়ে লিয়াঙের অপরাধ স্বীকার, দণ্ড ও মকুব প্রভৃতি কিরূপ নাটকীয় ভাবে সম্পন্ন হয়, তাহা আশা



চীনের মানচিত্র।

করি পাঠকেরা এখনও ভুলিতে পারেন নাই। এই সময়ই সর্ব্বপ্রথম বুঝা গেল, চীনারা আর জাপানী নিগ্রহ সহ্য করিবে না, সমগ্র চীনজাতি একজোটে জাপানীদের বিরো-ধিতা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে। গত জুলাই মাসে জাপান যখন ব্যাপকভাবে চীন আক্রমণ করিল, তখনই পূর্ব্বকার আভাস কার্য্যে পরিণত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

অর্থাৎ, চীনে জাপানের অভিযান আরম্ভ হইলে যখন চীন-সরকার তাহাতে বাধা দিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন, অমনি চীনা কম্যুনিষ্ট-দল পূর্ব্ব-বিদ্বেষ ও তিক্ততা ভুলিয়া গিয়া সরকারের সঙ্গে যুক্ত হইতে সম্মত হইল। যে চিয়াং-কাইশেকের নীতির ফলে সহস্র সহস্র নর-নারী, যুবক-যুবতী, ছাত্র-ছাত্রী, কম্যুনিষ্ট সন্দেহে আত্মাহুতি দিয়াছিল বা অশেষ নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছিল, তাহারাই জাতির সঙ্কটমুহূর্ত্তে তাঁহারই পতাকাতলে আসিয়া সমবেত হইল। চীনা যুদ্ধ বাধিবার দুই মাস পরেই গত সেপ্টেম্বর মাসে কম্যুনিষ্টগণের সঙ্গে আপোষে রফা হইয়া যায়, মন্ত্রি-সভায়ও ইহাদের স্থান করিয়া দেওয়া হয়। জেনারেল চু-তের নেতৃত্বে অষ্টম রুট নামে কম্যুনিষ্ট বাহিনী সরকারী বাহিনীর ন্যায় স্বদেশ-রক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছে।

চীনের গণদেবতা আজ জাগিয়াছে। যে-সব সর্দ্দার বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া জাপানীদের সঙ্গে যোগ দিয়াছে তাহাদের উপর ইহারা নির্দ্দয়, তাহারা প্রশ্রয় পাইতেছে না, একে একে আসর হইতে সরিয়া যাইতেছে। এখন যাঁহারা চীনা-বাহিনীর কর্ণধার, তাঁহারা ইতিপূর্ব্বে বহু অগ্নি-পরীক্ষায় শোধিত হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা স্বদেশ এবং স্বজাতিগত-প্রাণ। জাপানের হুমকি, উপরোধ, অনুরোধ, প্রলোভন, কিছুই তাঁহাদিগকে অবনমিত বা কর্ত্তব্যচ্যুত করিতে পারিবে না। অষ্টম রুট বাহিনীর অধ্যক্ষ চ্যু-তের জীবন-কথা যাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন, চীনে সত্য সত্যই আজ এক-জাতীয়তার উন্মেষ হইয়াছে।

চীনা সরকারী বাহিনী ও অষ্টম রুট বাহিনী কি পদ্ধতিতে যুদ্ধ-কার্য্য চালাইতেছে, তাহার কথঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথম প্রথম সরকারী বাহিনী সম্মুখ-সমরে জাপানীদের বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছিল। খুব বীরত্বের সহিত বাধা দিলেও জাপানী অত্যাধুনিক রণ-সম্ভারের সম্মুখে তাহারা টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। তাহারা ক্রমশঃ পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। সহস্র সহস্র চীনার আত্মাহুতির মধ্যে জাপানীরা উত্তর চীনে পিপিং, তিয়েনসিন এবং পূর্ব্ব-চীনে সাংহাই হইতে নানকিং পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিল। চীন সরকার যখন দেখিলেন, তাঁহাদের বাহিনী আর জাপানীদের সঙ্গে পারিয়া উঠিতে পারিতেছে না তখন তাঁহারা অন্য পন্থা অবলম্বন করিলেন। ইতিহাস-পাঠক নেপোলিয়নের মস্কো-অভিযানের নিফলতার কথা নিশ্চয়ই অবগত আছেন। প্রবল-প্রতাপ নেপোলিয়নের আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া মস্কোর অধিবাসীরা নিরুপায় হইয়া সহরে আগুন লাগাইয়া দিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়। ফেব্রুয়ারীর প্রচণ্ড শীতে নেপালিয়ান বিরাট সৈন্য-বাহিনী লইয়া যখন মস্কো পৌঁছিলেন, তখন একখানি ঘরবাড়িও দাঁড়াইয়া ছিল না, সবই ইতিমধ্যে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল। একে তো প্রচণ্ড শীত, তার উপরে খাদ্যাভাব, এই সব প্রাকৃতিক ও আকস্মিক নানা কারণে মস্কো অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল। এই ব্যর্থতাই মনীষীদের মতে তাঁহার চরম ব্যর্থতার পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়। চীনারাও এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। যেমন যেমন পশ্চাদপসরণ করিতেছে, অমনি সব কিছুই আগুন ধরাইয়া দিয়া যাইতেছে। এক নানকিং সাংহাই অঞ্চল হইতে গত জানুয়ারীর মধ্যেই অনুমান এক কোটি ষাট লক্ষ লোক পশ্চিম-চীনে চলিয়া গিয়াছে। সেখানে না কি ইতিমধ্যে বিশ্ব-বিদ্যালয়, স্কুল, কলেজও স্থাপিত হইয়াছে। যাহা হউক, জাপানীরা যে সব অঞ্চল অধিকার করিয়াছে, তাহা এখন মরুভূমি-প্রায়, ঘর-বাড়ী, কল-কারখানা, খেত-খামার সবই লণ্ড ভণ্ড। বিখ্যাত ইংরেজ সাংবাদিক ভারনন বার্টলেট প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের জন্য চীন গিয়াছিলেন। তিনি সম্প্রতি বিলাতে ফিরিয়া গিয়া লিখিয়াছেন যে, জাপানী সৈন্যরা চীনের কতক অংশ দখল করিলেও তাহাদের রসদাদি সবই জাহাজে জাহাজে জাপান হইতে আসিতেছে, বিজিত অঞ্চলে এক মুঠা চাউলও জুটিতেছে না। বহু বিদেশী সাংবাদিক চীনে চীনাদের এইরূপ ধ্বংস-কার্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন।

তাহারা মস্কৌর অধিবাসীদের কথা হয়ত ভুলিতে বসিয়াছেন, কিন্তু চীনারা তাহা ভুলিতে পারে না। তাহারা স্বদেশের মর্য্যাদারক্ষাকল্পে যে কোন ক্ষতিকেই তুচ্ছজ্ঞান করিতেছে। চীন সরকারের এই পদ্ধতির নাম দেওয়া হইয়াছে "scorched earth" পদ্ধতি, অর্থাৎ উপরে যেমন বলা হইল, চীনা-বাহিনী যে অঞ্চল দিয়া পশ্চাদপসরণ করিবে, সে অঞ্চলের সব ছারখার করিয়া দিয়া যাইবে।

অষ্টম রুট বাহিনী কিন্তু প্রথম হইতেই অন্য পদ্ধতিতে লড়াই করিতেছে। তাহারা গরিলা বা খণ্ডযুদ্ধে সুপটু। তাই জাপানী বাহিনী যতই চীনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে, ততই তাহার পশ্চাৎ হইতে এই বাহিনী বহু দলে বিভিন্ন হইয়া গ্রামবাসীদের শিক্ষিত করিয়া তাহাদের সহযোগে ইহাদের আক্রমণ করিতেছে। পশ্চাতের রেলপথ ভাঙ্গিয়া দিয়া, মোটররাস্তা নষ্ট করিয়া রসদ ও নূতন বাহিনী চলাচলের পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। সম্প্রতি উত্তর-চীন হইতে যে-সব সংবাদ আসিতেছে, তাহাতে জানা যায়, এই বাহিনী অদ্ভুত রকম সাফল্য লাভ করিতেছে। হাজারে হাজারে জাপানী নিহত ও বন্দী হইয়াছে। ভিতরে যাহারা প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের দুর্দ্দশার অন্ত নাই। প্রকাশ, সরকারী বাহিনীরাও ইদানীং এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া লড়াই করিতেছে ও সফল হইতেছে।

চীনাদের এই জীবন-মরণ সংগ্রামে বিদেশী কোন রাষ্ট্রই তাহার সাহায্যে আসে নাই। এক মাত্র সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হইয়া সেখান হইতে চীন অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করিয়া লইতেছে। যে-সব রাষ্ট্র ডিমোক্রেসির জয় গান করিয়া বেড়ায়, বা ক্ষণে অক্ষণে রাষ্ট্রসঙ্ঘের দোহাই পাড়ে, তাহারা কেহই, রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভ্য হওয়া সত্ত্বেও, তাহাকে সাহায্য করিতে আসে নাই, আসিবে বলিয়া আশ্বাসও দেয় নাই। চীনকে বরাবর পুরাপুরি নিজ শক্তি-সামর্থ্যের উপরই নির্ভর করিয়া প্রবল জাপানের সঙ্গে যুঝিতে হইতেছে

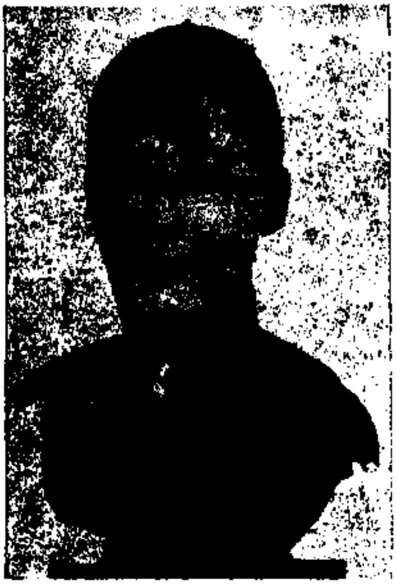
তবে চীনের এই সঙ্কট-মুহূর্ত্তে প্রকৃতি কতকটা অনুকূল বলিয়া মনে হয়। জাপানের আভ্যন্তরিক অবস্থা চীন-সংগ্রাম দীর্ঘকাল চালাইবার পক্ষে অনুকূল নহে। ইহার উপর সে বর্ত্তমানে নিজেকে 'একঘরে' করিতেছে। সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে তাহার সম্প্রীতির নমুনা গত কয়েক বৎসরে হামেশা পাওয়া গিয়াছে। একজন অভিজ্ঞ লেখক বলিয়াছেন, গত তিন বৎসরে রুশ-মাঞ্চুকুয়ো সীমান্তে অন্ততঃ চারিশত খণ্ড যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, লোকজনও হতাহত হইয়াছে। তথাপি বহির্জ্জগতে ইহা প্রকাশিত হইতে দেওয়া হয় নাই। কিছুকাল যাবৎ নৌ-বহর সম্পর্কে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেও তাহার মন-কষাকষি চলিয়াছে। তাহার বন্ধু জার্ম্মানীও ইদানীং না কি চীন-জাপান লড়াইতে তাহার উপর বিরূপ হইয়াছে, কারণ ইহার ফলে চীনে তাহার ব্যবসায়ের বিস্তর ক্ষতি হইতেছে। সম্প্রতি গৃহীত ইঙ্গ-ইটালি চুক্তিও জাপানকে কম বিচলিত করে নাই। ইদানীং চীনে চীনাদের জয়-



মার্শাল চিয়াং-কাই-শেক।

ল্যাণ্ডের বার্ত্তার বিরুদ্ধে জাপানী তরফে প্রতিবাদ হইতেছে সত্য; কিন্তু আগেকার সমস্ত ঘোষণার তুলনায় ইহা বড়ই ক্ষীণ। কেহ তো চীনাদের সাহায্যে আসিল না, আন্তর্জ্জাতিক অবস্থাই হয়ত তাহার সাহায্যে আসিবে!

নেথানিয়েল প্রেফার, ফ্রেডা আট্‌লি, ভারনন বার্টলেট প্রমুখ যে-সব মনীষী চীন-জাপান সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, চীন বিদেশীদের সাহায্য যে পায় নাই, তাহাতে ভবিষ্যতে তাহার লাভ ছাড়া ক্ষতি হইবে না। প্রথমোক্ত ব্যক্তি, নেথানিয়েল প্রেফার, ইহার কারণ স্বরূপ বলিয়াছেন,—



মাদাম চিয়াং-কাই-শেক।

"If Japan ultimately fails, then China will have emerged by its own efforts. Its initiative will have been preserved. Then will be a case of military strength and political organization. It can proceed to its own reconstruction and, having preserved national identity by its own effort, it can consolidate Sovereignty, forcing a liquidation of settlements and concessions, unequal treaties, foreign garrisons or its territory and other infringements of its soverignty. Then presumably its trials will be ended."

অর্থাৎ, "যদি জাপান শেষ পর্য্যন্ত হারিয়া যায়, তাহা হইলে চীন নিজের চেষ্টাতেই আবার দাঁড়াইয়া যাইবে। ইহার কর্ত্তৃত্বও সুরক্ষিত থাকিবে। একটি সমর-শক্তি ও রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠান-কেন্দ্র সুনির্দ্দিষ্ট হইবে। চীন সংগঠন-কার্য্যে নিজেই লাগিয়া যাইবে এবং স্ব-চেষ্টায় জাতির ঐক্যবিধান করিয়া একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিবে, ফলে বৈদেশিক সেটেলমেণ্ট ও কনসেশ্যনগুলি, অ-সম সন্ধিগুলি, ইহার ভিতরকার বিদেশী সৈন্যরক্ষণ এবং অখণ্ড কর্ত্তৃত্বের ব্যাঘাতকারী বিষয়গুলি সকলই উঠিয়া যাইবে। ইহা ধরিয়া লওয়া অসঙ্গত নয় যে, তখনই ইহার সমস্যার শেষ হইবে।"

ইতিমধ্যেই কিন্তু অন্যেরা, যাহারা বিষয়টি তলাইয়া দেখে না, নানা কথা বলিতেছে। কেহ বলিতেছে, জাপান যদি হারিয়াই যায়,তাহা হইলে চীন আর একটি সোভিয়েট রাষ্ট্রে পরিণত হইবে। আবার কেহ কেহ বলে, তখন চিয়াং-কাইশেকের ক্ষমতা এত অধিক বাড়িয়া যাইবে যে, কম্যুনিষ্ট দলন তো আরম্ভ হইবেই, সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে যোগদান করিয়া আবার চীনকে বিপদগ্রস্ত করিবে। চীনা মনীষী লিন য়ুটাং বলেন যে, ইহার কোনটিই সম্ভব হইবে না। চীনের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং বর্ত্তমান মনোভাব সকলই এই দুই পন্থারই বিরোধী। নব জাতীয়তার বন্যা চীনকে খাঁটি গণতন্ত্রের অভিমুখে লইয়া যাইবে। বর্ত্তমান সঙ্কটে স্বদেশরক্ষায় চীনাদের ঐক্যমতের কথা আলোচনা করিতে গিয়া তিনি আরও লিখিয়াছেন,—

"If, therefore, nationalism in China is already a fact, China I believe, will stage a comeback during the aftermath of this War, helped by the lesson of the war and by her own enormous vitality. I believe the nation will be electrified by this experience and will set to work with a will on measures of internal reconstruction. The most valuable gift of the war is, I believe, the lesson of discipline, which is usually not the outstanding virtue of the Chinese. Mme. Chiang will go on with her New Life Movement, which will receive through this lesson a new meaning."

লিন য়ুটাঙের মতে চীনাদের জাতীয়তার উন্মেষের ফলে আবার ইহারা স্বপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। এ বিষয়ে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা এবং নিজস্ব শক্তি তাহাকে সাহায্য করিবে। সমগ্র জাতি অভিজ্ঞতার আলোকে নিজেদের সংগঠন-কার্য্যে লাগিয়া যাইবে। বর্ত্তমান সংগ্রামের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ শিক্ষা হইল 'ডিসিপ্লিন' বা নিয়মানুবর্ত্তিতা। মাদাম চিয়াং-কাইশেকের নব জীবন প্রচেষ্টা নিয়মানুবর্ত্তিতা দ্বারা পরিশুদ্ধ হইয়া নূতন সংজ্ঞা লাভ করিবে।

দ্বিতীয় সংসার

—শ্রীবসন্তকুমার

দিন যায়, মাস কাটে। পূর্ব্বেও যেমন এখনও তেমন। নবীন খায় দায়, আপিস করে, বন্ধুদের সহিত মেশে, সেতার বাজায়। বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন নাই। সকলেই ভাবে, নবীনের মনটা ক্রমশঃই হালকা হইয়া আসিতেছে, পত্নী-বিয়োগের ধাক্কাটা সামলাইয়া লইয়াছে।

যে যেমন সিদ্ধান্ত করুক না কেন, নবীন মনে মনে জানে, লোকের চোখে ধূলা দিতেছি, কি একটা কীট অন্তর্দ্দেশ কুরিয়া কুরিয়া খাইতেছে, মৃতার মুখখানা অহরহঃ মনে মনে জাগিয়া আছে, কোথাও শান্তি নাই। পত্নীকে বাঁচাইবার জন্য কত চেষ্টা, কত সেবা না করিয়াছে, জ্বরে, গাত্রজ্বালায় রোগী বিছানায় থাকিতে পারিতেছে না, চোখে ঘুম নাই, সর্ব্বদাই ছট্‌ফট্ করিতেছে, নবীন পার্শ্বে বসিয়া পাখার বাতাস দিয়াছে, গায়ে হাত বুলাইয়াছে, যদি একটু ঘুম আসে। স্ত্রী কতবার বলিয়াছে, কর কি ? রোজ রোজ রাত জাগছ, দিনে আপিসে খেটে আসছ, ডাক্তারের বাড়ী আনাগোনা, রবিকে ভোলান, এত পারবে না, ক'রো না, আমি মরে যাব, বাঁচাতে পারবে না, নিজে বাঁচ, তুমি খাড়া থাকলে আমার রবি এ পৃথিবীতে থাকতে পারবে।

নবীনও রোখ করিয়া কতবার বলিয়াছে, তোমাকে বাঁচাব, কিছুতেই মরতে দেব না, কিন্তু বিধাতা বিমুখ, নবীনের শত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। সে যা বলিয়াছিল, কাজে তাই করিয়াছে, নবীনকে চিরদিনের জন্য ছাড়িয়া চলিয়া গেছে। মা রবির ভার লইয়াছেন, দাদা বৈঠকখানা ছাড়িয়া দিয়াছেন, বন্ধু-সমাগম হইতেছে, কিন্তু হৃদয়ের জ্বালা মিটে কই ? নবীন বিচার-বিতর্ক করিয়া মনকে বুঝাইতে চায়। যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা ঘটিয়াছে, এমন ত অনেকের হয়। কিন্তু নবীন রাত্রিকালে যখন মায়ের পাশে ঘুমের ভাণ করিয়া শুইয়া থাকে, মা দু'একবার ডাকিয়া ঘুমাইয়া পড়েন, তখন সেই পাণ্ডুর রোগক্লিষ্ট মুখখানি মনের কোণে উঁকি মারে, পরে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়া পড়ে, নবীন চক্ষু বুজিয়া সেই রূপ দেখে, লুকাইয়া কাঁদে, তাহাতে মনের ভার কতক লাঘব হয় ; লোক দেখিলে তাহার সকল শক্তি একত্র করিয়া মনের গোপন ভাব দাবিয়া চাপিয়া রাখে।

রবি নবীনকে পাইলে কত কি প্রশ্ন করে, সকল প্রশ্নের ভিতর তার মার কথাই প্রধান। নবীন সব কথার উত্তর দিতে পারে না, খেলনা বাহির করে, ছেলেদের মোটর কিনিয়া আনিবে বলে, রবি বেজার হয়, চারমাস রোগে ভুগিয়া সে খিটখিটে হইয়া গেছে, অল্পেই রাগিয়া ওঠে, কাঁদিতে সুরু করে, কিছুতে শান্ত করিতে না পারিয়া নবীন মাকে ডাকিয়া রবিকে তাঁহার কোলে দিয়া রেহাই পায়।

নবীন হাসে—শুধু বৈঠকখানায় যখন ভোলানাথ আসে। দুইমাসে ভোলানাথ নবীনের সহিত আলাপের ঘনিষ্ঠতা যথেষ্ট অর্জ্জন করিয়াছে, নবীনের বন্ধুরাও ভোলানাথকে লইয়া গানে কথায়-বার্ত্তায় আমোদ উপভোগ করে। রবিবারে নবীনের বৈঠকখানায় দুপুরের মজলিসে ভোলানাথ পালা সুরু করে, বন্ধুরা প্রহসনটাই বেশী পছন্দ করে; পরে গান-বাজনা খেলা প্রভৃতি নিয়মিত চলে। আজ রবিবার, বৈঠকখানায় একটি দুটি করিয়া জুটিতেছে। ভোলানাথ আসিল, যেন তাহারই অপেক্ষা হইতেছিল এবং ভোলানাথ জুতা রাখিয়া বসিতে না বসিতেই পালা আরম্ভ করিল।

পাঁচ জনের অনুরোধে ভোলানাথ আজ গান ধরিল—

মন কি কর তত্ত্ব তারে
ও যে উন্মত্ত আঁধার ঘরে,
ও যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত
অভাবে কি ধরতে পারে।

ভোলানাথ থামিল, পরের কলিটা মনে আসিতেছে না ; চোখ খুলিয়া বলিল—"তার পরের কথাগুলো মনে আসছে না যে ?"

হরিশ হাজির ছিল, কথা জুগাইয়া দিল,

যাবে—

ভোলানাথ হাসিয়া বলিল, "এইবার মনে পড়েছে-

পুনরায় চোখ মুদিয়া গান গাহিতে লাগিল। কাল ভোলানাথ উৎসাহ দেখাইয়া গাহিয়া থাকে, গাহিল,

অজপা ফুরায়ে এলে, নয়ন মুদে শোব যখন,
তখন আসিলে শিবে বল আর কি ফল হবে,
এ নয়ন আর দেখিবে না, এ মুখে আর
মা মা বলে আর ত বলিবে না
আর কবে দেখা—

হঠাৎ গান থামাইয়া ভোলানাথ বলিল, "এ যে আর একটা গান—"

হরিশ বলিল, "হোক গে, সুর এক। ভোলাবাবুর ওই এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখছি, যে গানই হোক্ না, ওঁর কাছে চালাকি চলবে না, ওই এক সুরে সকলকে বেরুতেই হবে, রামপ্রসাদ যেমন একরকম সুর গেয়ে বিখ্যাত হয়েছিল, ভোলাবাবুরও এ সুরটি মার্কা-মারা।"

সকলেই হাসিতে লাগিল। ভোলানাথ মনমরা হইয়া কি করিবে ঠিক করিতে লাগিল। হরিশ মিটমিটে, যখন তখন অপদস্থ করে।

নবীনের বৈঠকখানায় একখানা বাঙ্গালা খবরের কাগজ পড়িয়া থাকে, সকলেই সেখানা এক একবার পাঠ করে। ভোলানাথ কাগজখানা উঠাইয়া লইয়া পড়িতে সুরু করিল, কাগজের প্রথম পাতার বিজ্ঞাপনের কলমে চোখ বুলাইতে এক স্থানে পড়িল, 'সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই ঔষধের প্রশংসা করিয়াছেন।' ভোলানাথ নবীনকে জিজ্ঞাসা করিল, "সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ, এই প্রমুখ কোন জাত বলতে পারেন?"

হরিশ উপযাচক হইয়া বলিল, "কৈবর্ত্ত, কৈবর্ত্তদের পদবী প্রমুখ!"

ভোলানাথ দেখিল হরিশের কথায় সকলেই হাসিল।

ভোলানাথ নবীনকে বলিল, "আপনারা সকল গান-বাজনা করুন, আমি ঐ চরিতামৃত বইটা একটু পড়ি।"

বৈঠকখানার তাকে কতকগুলা বই ছিল। ভোলানাথ চরিতামৃত বইটি চিনিত, সেখানি পাড়িয়া পড়িতে লাগিল। নবীন বুঝিয়াছিল, ভোলানাথ চটিয়াছে, এখন বিরক্ত করিলে চলিবে না। নবীন সকলকে তাস খেলায় বসাইয়া দিল।

একজন জিজ্ঞাসা করিল, "ভোলাবাবু, পুস্তকখানা কি পুস্তক?"

ভোলা। চৈতন্য-চরিতামৃত।

বন্ধু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "শ্রীচৈতন্য কে ছিলেন?"

ভোলা। কৃষ্ণের সহোদর ভাই ছিলেন না?

নবীনের বন্ধুরা তাস ফেলিয়া প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিল।

সুরেশ। গান্ধারী কে ছিল, ভোলাবাবু?

ভোলা। (চিন্তা করিয়া) রাবণের ভগিনী!

দেবেন। সুভদ্রা কে?

ভোলা। (অনেক চিন্তার পর) জগন্নাথের মামী—

হরিশ। বঙ্কিমবাবু কে ছিলেন?

ভোলা। (বিন্দুমাত্র চিন্তা না করিয়া) একজন লিখিয়ে ছিলেন, অনেক ভাল ভাল পদ্য লিখে গেছেন।

হরিশ। তাঁর লেখা একখানা বইয়ের নাম করুন দেখি?

ভোলা। আমি কি পড়েছি, নাম বলব, একটা গান বলতে পারি।

হরিশ। তাই বলুন।

ভোলা। গাইতে পারব না, এমনি ছড়া করে বলি—

বিফল লো তোর এ নব যৌবন
গেল বৃথা অকারণ,
আর কবে হবে লো ধনি
সুখ সংঘটন।
সুখের সাগর শুখাইবে আর কি তোরে
নাগর লবে,
কমলকলি শুখাইবে পড়িলে-তপন।

বন্ধুরা একচোটে সকলেই বাহবা দিল, হাসির গররায় ঘর ছাইয়া গেল।

ভোলানাথ বলিল, "আমি কি জানতুম, আপিসের একজন সেদিন গানটা শিখাইয়া দিল, সেই বলে বঙ্কিমবাবু লিখেছে।"

ভোলানাথ তাকিয়া মাথায় দিয়া শয়ন করিল এবং অল্পক্ষণের ভিতর নিদ্রিত হইল।

বন্ধুরা কিছু সময়ের জন্ত ভোলানাথকে নিষ্কৃতি দিয়া খেলায় প্রবৃত্ত হইল।

ঘণ্টাখানেক ঘুমাইয়া ভোলানাথ উঠিয়া বসিল, বন্ধুদের তখনও তাস চলিতেছিল।

ভোলানাথ চুপে চুপে নবীনকে বলিল, "একখানা বই দিতে পারেন?"

নবীন। কি হবে, পড়বেন?

ভোলা। বাড়ী নিয়ে যাব।

বন্ধুদের হাতের তাস হাতে রহিল, সকলেই কান খাড়া করিয়া রহিল, ভোলানাথ কি বলে।

নবীন। কি রকম বই চাই?

ভোলা। গল্পের বই।

নবীন। আপনি পড়বেন?

ভোলা। আমি নই, বউ পড়বে।

নবীন। তিনি পড়তে চান? চেয়েছেন?

ভোলা। ভারি পড়ে, রাত্রি বারটা একটা পর্য্যন্ত জেগে পড়ে।

নবীন। বসে বসে পড়েন?

ভোলা। বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়ে, দপ্ দপ্ করে কেরাসিনের আলোটা আমার চোখে পড়ে, ঘুমুতে পারি না।

নবীন। তা হলে ও আপদ না নিয়ে যাওয়াই ভাল, কি বলেন?

ভোলা। বই পেলে কিন্তু ভারি খুসী হয়।

নবীন। তিনি শুয়ে শুয়ে পড়েন, আর আপনি জেগে বসে থাকেন?

ভোলা। না, আমিও শুই, আমাকে বলে তুমি ওদিকে মুখ ফিরিয়ে ঘুমোও, আমাকে বিরক্ত ক'রো না, অনর্থ হবে।

নবীন। কেন ছুঁলে দোষ কি?

ভোলা। কে জানে মশাই, আমার ওপর ভারি রাগ, সকল সময়েই খেঁকায়, ছচক্ষে দেখতে পারে না, বই এক খানা দিতে পারলে যদি খুসী হয়, হয়ত হাসতেও পারে।

হরিশ বলিল, "নবীন, তুমি ভোলাবাবুর বাসায় যাও না, কেন? বউ ঠাকরুণকে জিজ্ঞেস করবে, কি রকম বই পেলে তিনি ভোলাবাবুকে যত্ন করতে পারেন। বলে আসবে ভোলাবাবু বঙ্কিমবাবুর 'বিশ্বা লো তোর. এ নব-যৌবন' অভ্যাস করছেন, এদিকে চৈতন্ত-চরিতামৃত দেখেছেন, এখনও ভাল চান ত স্বামীকে বাঁধুন।"

ভোলানাথ খরদৃষ্টিতে হরিশকে দেখিতে লাগিল। নবীন উঠিয়া উপরে গেল, ভোলানাথকে বলিয়া গেল, 'বসুন ওপরে বই আছে, বেছে আনি।'

নবীন ওপরে আসিয়া দেখিল, রবীন শুইয়া আছে, মা কাছে বসিয়া পাখার বাতাস দিতেছেন।

নবীন জিজ্ঞাসা করিল, জ্বর বেড়েছে বুঝি?

মা বলিলেন, গা বেশ গরম হয়েছে, একটু আগে ছট্‌-ফট্ করছিল, তোমাকে ডাকব ভাবছিলাম।

নবীন। ওষুধ খাওয়ান হয়েছে?

মা। ওষুধ সময়মত ঠিক খাওয়ান হয়, ডাক্তারও দেখে, কিন্তু কৈ কিছু ত উপকার দেখতে পাই না।

নবীন ভোলানাথের বই-এর কথা ভুলিয়া গেল। রবীনের কাছে বসিয়া পড়িল, রবীনের গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, বড় কষ্ট হচ্ছে নয়?

রবীন ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, "হাঁ।"

মা। তুমি আফিসে থাক, টের পাও না, প্রতিদিন এই সময় জ্বর আসে, ডাক্তার কত দিন দেখলে, কত রকম ওষুধ দিলে, কিছুই করতে পারলে না। ভূপেন বললে, 'কবিরাজ দেখাও', তাও হল, কিছুতেই ওই একটু জ্বর তাড়াতে পারলে না, ছেলেকে পেড়ে ফেলেছে, কি যে হবে? আমি তাই ভাবি।

নবীন। একজন বড় ডাক্তার আনি, জ্বরের সময় একবার পরীক্ষা হোক।

মা। সময় থাকতে তাই কর, আমাদের ভাঙ্গা কপাল, ভয় হয়।

নবীন বাহিরে আসিয়া জানাইল, একজন ভাল ডাক্তার আনিয়া রবীনকে দেখাইবে, অসুখ বাড়িয়াছে।

খেলা ভাঙ্গিয়া গেল, যে যার আবাসে ফিরিল, ভোলা-নাথ বই পরে চাহিয়া লইবে ভাবিয়া চলিয়া গেল।

বৈকালে নবীন একজন খ্যাতনামা বৃদ্ধ চিকিৎসক সঙ্গে করিয়া আসিল। ডাক্তারবাবু রোগী দেখিলেন; চার মাস

আগে মা মারা গিয়াছে শুনিলেন, সেই অবধি অসুখ তাও শুনিলেন, পূর্ব্বে কি রূপ চিকিৎসা হইয়াছে, পুরান প্রেসক্রিপসানগুলি পড়িয়া আরও একবার তন্ন-তন্ন করিয়া রোগীকে দেখিলেন, শেষে বলিলেন, "রোগ এখনও শরীরের কোনও যন্ত্রের উপর চেপে বসতে পারে নি, ছেলেটির মনেরই রোগ, যদি প্রফুল্ল থাকে সামান্য ওষুধে জ্বর ছেড়ে যাবে, চেঞ্জের ব্যবস্থা করুন। এই ঘর, এই দোর সব দেখে, শুধু ওর মাকে দেখতে পায় না, এখান থেকে সরিয়ে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে নিয়ে যান, সেরে যাবে; ওই ওর প্রধান ওষুধ।"

*

নবীনের বড়ভাই ভূপেন মাকে বলিল, "আমাদের জানাশুনো লোকের মধ্যে এক আমার দাদাশ্বশুর কাশীতে আছেন। কিছুদিন আগে তাঁর কঠিন অসুখ হয়েছিল। শ্বশুর মশাই ভয় পেয়ে তাঁর ছোট মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে দেখতে গিয়েছিলেন, বুড়ো ধাক্কা সামলে গেছেন, শ্বশুর ফিরেছেন, শালীকে বাপের কাছে রেখে এসেছেন।

মা। কে? আমাদের বউমার ছোটবোন?

ভূপেন। হাঁ, নলিনী, তুমি ত তাকে দেখেছ? দাদাশ্বশুর নাতনীকে ছাড়লেন না, এখনও শরীর ভাল সারে নি।

মা। কাশীতেই কেন আমাদের পাঠিয়ে দাও না, কাশী ত ভাল জায়গা। নবীন, আমি আর রবি চলে যাই, এখন ত শীতের মুখ, পশ্চিমের হাওয়ায় রবির রোগটা সেরে যেতে পারে।

ভূপেন। কাশী এখানকার চেয়ে ঢের বেশী স্বাস্থ্যকর স্থান, আবার কলকেতার মত ডাক্তার-কবিরাজও যথেষ্ট আছে, আমার শ্বশুরকে বলে দেখি। কিন্তু দাদাশ্বশুর বুড়ো ব্যায়রামী, বোঝ না, বয়েস হয়েছে, কাশীবাস করছেন, তবে নলিনীর দ্বারা অনেক কাজ পাবে, রোগের সেবা ও অনেক রকম জানে।

মা। বিদেশ-বিভূঁই তোমার শালীকে ডাকলে পাব সেই কি কম লাভ? বিয়াইকে আমার নাম করে চিঠি লিখতে বল।

মার কথামত ভূপেন শ্বশুরমহাশয়কে কাশীতে পত্র লিখিতে কহিল। জামাইয়ের অনুরোধ জানাইয়া ভূপেনের শ্বশুর পিতাকে পত্র লিখিলেন। পত্রের জবাবে ভূপেনের দাদা-শ্বশুর লিখিয়াছেন, তিনি যে বাড়ীটিতে থাকেন, তাহার তিন তলার একখানি ঘর সম্প্রতি খালি পড়িয়া আছে, তোমার বেয়ান আসিলে ভাড়া পাওয়া যাইতে পারে, একত্রে থাকা ছাড়া আমার দ্বারা বিশেষ উপকার পাইবে না জানাইয়া রাখিও, সেইরূপ কর্ম্মঠ লোক যেন সঙ্গে আনেন। নলিনীর আগ্রহ বেশী। একা থাকে, কুটুম্ব-সাক্ষাৎ কেহ যদি আসে, কথা-বার্ত্তায় আমোদ পায় তারই জন্য মত দিতেছি, নয় ত আমি একে বৃদ্ধ তায় রোগী বলিলেও হয়. আবার রোগী জুটিলে বিপদের কথা নয় কি?

সাব্যস্ত হইল, কাশীতেই যাওয়া হইবে, পুনরায় কাশীতে সংবাদ গেল, এবার ভূপেন নিজে লিখিল, মা, ছোট ভাই ও ভাইপো অমুক দিন, অমুক ট্রেনে কাশী পৌঁছাইতেছে।

ভূপেন সাহেবকে বলিয়া নবীনের এক মাস ছুটি মঞ্জুর করাইল। সকলে যথা সময়ে বাড়ী হইতে রওনা হইল; ভূপেন হাওড়া ষ্টেশনে সকলকে রেল-গাড়ীতে বসাইয়া ফিরিয়া আসিল।

কাশীর বাসার গলির মোড়ে নলিনী বাড়ীর চাকরকে দাঁড়াইয়া থাকিতে বলিয়া দিয়াছিল, নবীনের পক্ষে নূতন দেশ হইলেও বাসা বাহির করিতে কষ্ট পাইতে হয় নাই। নবীন রবীনকে দুই হাতের উপর শুয়াইয়া মার সহিত যখন বাসার সিঁড়িতে উঠিতেছিল নলিনী ছুটিয়া আসিল। রবীন অস্থি-চর্ম্মসার নির্জ্জীবের মত হইয়া গিয়াছে, নলিনীকে দেখিয়া একদৃষ্টে তাহার মুখের উপর চাহিয়া রহিল, তাহার যা কিছু অবশিষ্ট রক্ত সবটুকু মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। রবি একটু হাসিল, নলিনী সিঁড়িতেই নবীনের নিকট হইতে রবীনকে কাড়িয়া লইল, মুখে বলিল, "ইস, কি হয়ে গেছে বাছা আমার!"

রবীন নলিনীর কাঁধে মাথা রাখিল, তাহার চোখের কোণ দিয়া দু এক ফোঁটা জল নলিনীর পিঠে পড়িতে লাগিল, নলিনী দ্রুত উপরে উঠিয়া গেল। অশ্রুবেগ সেও সামলাইতে পারে নাই, "আপনারা আসুন" বলিয়া সে

প্রথমে দুতলা, পরে তিনতলায় উঠিয়া গেল, সকলের অলক্ষ্যে অঞ্চলে নিজের চোখ দুটি মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া লইল।

তিনতলার ঘরখানা নলিনী পূর্ব্ব হইতে পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিল, বসিবার আসন, গরম দুধ, পানীয় জল, ঘরের বাহিরে এক বালতি আলাদা করা জল, এই রূপ গোটা কতক কাজ সকালে উঠিয়াই সারিয়া রাখিয়াছিল। নবীনের মার জন্ত আসন পাতা ছিল, নবীনের মা বসিলেন, নলিনী গরম দুধ রবীনের মুখে ধরিলে রবি এক চুমুকে অনেকটা খাইল। বোধ হয় ক্ষুধা পাইয়াছিল, তারপর এক একবার নলিনীর মুখের দিকে চায় ও দুধের পাত্রে মুখ দিয়া একটু একটু করিয়া সব দুধটুকু খাইয়া ফেলিল। নিশ্চল আর্ত্ত মুখের চোখ দুটি ভাষাহীন হইলেও ঘুরিয়া ফিরিয়া নলিনীর মুখ দেখিয়া বুঝাইতেছিল, তাহাকেই সে বহু দিন হইতে খুঁজিতেছিল, আজ দেখা পাইয়াছে।

নবীন বিছানা-পত্র উপরে উঠাইয়া ঘরের মধ্যে রাখিল। মা বসিয়া, একটু তফাতে নলিনী রবিকে কোলে বসাইয়া দুধ খাওয়াইয়াছে দেখিতেছিলেন। নলিনী বলিল, "একটা প্রণাম করব মা, রবির শরীর দেখে তাও ভুলে গেছি। রবির বিছানা চাই, ওকে শুইয়ে আপনাকে প্রণাম করব।"

নবীন বিছানার দড়ির বাঁধন খুলিয়া রবির ছোট বালিশ, লেপ সব কিছু বাহির করিয়া দিল। নলিনী বসিয়া বসিয়া এক হাতে বিছানা পাতিয়া রবিকে শুয়াইয়া দিল। পরে নবীনের মায়ের পায়ে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল।

মা বলিলেন, "তোমার ভরসাতে কাশীতে এসেছি। যে দিন শুনেছি তুমি এখানে এসেছ, আমার মনটা সেই দিন থেকে খালি যাই যাই করত, সেখানে থাকলে রবি কিছুতেই বাঁচত না।"

নলিনী বলিল, "রবির জন্ত আপনি ভাববেন না, আমি দেখব। কই আপনি ত আমায় আশীর্ব্বাদ করলেন না?"

নবীনের মা নলিনীর চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "তোমায় আশীর্ব্বাদ মনে মনে করেছি, মুখে বার করতে এখন বাধছে। সব তোলা রইল, ভগবান মুখ তুলে চান দেখবে, প্রাণ খুলে কত রকম আশীর্ব্বাদ তোমার মাথায় ঢেলে দেব।"

নবীন ট্রাঙ্ক খুলিয়া কাপড়-[illegible], [illegible]কোট-প্যান্ট বাহির করিয়া রাখিতেছিল, বলিল, "মা চল আগে গঙ্গা-স্নান ও বিশ্বেশ্বর [illegible], ফিরে [illegible] গুছান-গাছান করবে।

মা বলিলেন, "ধুলো-পায়ে ঠাকুর দেখতে [illegible] রবির জন্ত আমাদের [illegible] রইল না, নলিনী [illegible] ভুলিয়ে রাখতে পারবে। [illegible] [illegible] তোমার ঠাকুরদাদা কোথায়? তাঁহাকে একবার দেখা দিয়ে যাই।"

দ্বিতলে ঠাকুরদাদার ঘর নলিনী বলিয়া দিল, মাতা-পুত্রে তাঁহার কাছে আসিয়া প্রণাম করিল।

নবীনের মা বলিলেন, "আপনার আশ্রয়ে এলাম। এটি আমার ছেলে, ভূপেনের ছোট।"

নলিনীর ঠাকুরদাদা আশীর্ব্বাদ জানাইয়া বলিলেন, "ওর নাম নবীন, নবীনই বটে, ভূপেন তারার চেয়েও দেখতে ভাল। বেশ বেশ, ঠাকুর দেখতে যাচ্ছ বুঝি? যাও, শীঘ্র শীঘ্র ওগুলো সেরে ফেল, রাত্রি জেগে এসেছ, বড় কষ্ট হয়েছে, না?"

রবিকে একা পাইয়া নলিনী চাকরের মারফৎ এক কেটলি গরম জল আনাইল। ঘরের সকল জানলা-দরজা বন্ধ করিয়া রবিকে স্পঞ্জ করিল। রবির গায়ে এক পুরু ময়লা জমিয়াছিল, নলিনী নিপুণ হস্তে রবির প্রত্যেক অঙ্গটি ধোয়াইয়া, মার্জ্জনা করিয়া শুষ্ক তোয়ালের দ্বারা মুছাইয়া তাহার বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া দিল। স্নানের পর রবি অল্প অল্প ঘামিতে লাগিল, নলিনী তাহা সযত্নে মুছাইয়া ঘরের জানালা-দরজা খুলিয়া দিল।

রবি বলিল, "ঘুম পাচ্ছে।"

নলিনী রবিকে আদর করিয়া বলিল, "বেশ ত ঘুমোও না, তোমার অসুখ এই বার সেরে যাবে।"

রবি একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "তুমি থাকবে ত?"

নলিনী বলিল, "থাকব বই কি, আমার কাছেই যে এসেছ।"

রবি স্নান করিয়া স্বস্তি বোধ করিতেছিল, একটু পরে অঘোরে ঘুমাইয়া পড়িল।

এইবার নলিনী কুটুম্বের সুবিধার জন্য প্রথমে বিছানার মোটটা খুলিয়া ফেলিয়া সতরঞ্চখানা আলাদা করিয়া একটা শয্যা পাতিল, দড়ির আলনা টাঙ্গাইয়া সকল কাপড়-জামা ঝুলাইয়া ট্রাঙ্ক বন্ধ করিয়া এক পাশে সরাইয়া রাখিল। সতরঞ্চখানা বিছানার পাশেই পাতিয়া রবির পার্শ্বে আসিয়া শয়ন করিল। সদ্যআগতদিগের ঘরটি যে কতক গুছাইয়া দিয়াছে, ইহাতেই আত্মপ্রসাদ লাভ করিল।

নবীন ও নবীনের মা উভয়ে গঙ্গার উদ্দেশে বাসার বাহিরে আসিলেন, পথে স্নানার্থীদের ভীড়, নবীন মাকে লইয়া গঙ্গাতীরে আসিয়া পৌছিল। উভয়ে সুরধুনী পতিত-পাবনী গঙ্গা প্রণাম করিয়া স্নান সারিয়া ফেলিলেন। জল হইতে উঠিয়া মা ছেলেকে বলিলেন, "কেমন সব ঘাট দেখেছিস্, কি সব উঁচু উঁচু বাড়ী, এই জন্য ত বলে শিবের কাশী, এখানে এলে আর কেউ ফিরতে চায় না।

নবীন। এই সব বাড়ী পাথর দিয়ে তৈয়ারি। শুনেছি কত সব রাজা-রাজড়ারা এক একটা বাড়ী করে রেখেছে, কাশীতে এসে গঙ্গার ধারে বাস করে, রাণীরা ওই সব সিঁড়ি দিয়ে ঘর থেকে একে বারে গঙ্গায় নামে।

স্নান সমাপন করিয়া উভয়ে বিশ্বেশ্বর দর্শন করিতে গেলেন। সরু গলি, কাতারে কাতারে পুরুষ ও স্ত্রীলোক চলেছে। গলির দু'পাশে অসংখ্য দোকান-শ্রেণী, খেলনা, খাবার, কাপড়, বাসন, গন্ধতৈল যত কিছু পণ্য সদাসর্ব্বদা মানবের প্রয়োজনীয় একস্থানে এই সরু গলিটির ভিতর সমবেত হইয়াছে। মা ও ছেলে উভয়ে সকল দেখিতে দেখিতে পাথরের পথে চলিয়া বিশ্বেশ্বর মন্দিরের দ্বারে আসিয়া পৌছিলেন, ফুল বিল্বপত্র কিনিবার কালে একজন পশ্চিমা ব্রাহ্মণও জুটিয়া গেল, নবীন সব কিছু লইয়া বিশ্বেশ্বর স্মরণ করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিল। মন্দির অভ্যন্তরে অনাদি শিব-লিঙ্গ, হিন্দু শিবের মাথায় গঙ্গাজল দিতেছে, ভক্তিপূর্ব্বক মন্ত্র আওড়াইয়া ফুল বিল্বপত্র চাপাইতেছে, শিব-লিঙ্গ স্পর্শ করিতেছে, প্রণাম করিতেছে। ক্ষুদ্র গোলাকার শিবের স্থানটি অসংখ্য নর-নারীতে পূর্ণ। কাশীবাসীরা অনেকেই নিত্য আসে, নবীনের মত যাত্রীরা দলে দলে আসে, পূজা দেয়, নির্ম্মাল্য লয়, বিশ্বাস করে ধন্য হইলাম, জীবন সার্থক হইল।

নবীনের মা পূজা শেষ করিয়া যুক্ত-করে বিশ্বেশ্বরকে জানাইলেন, রবি যেন রোগমুক্ত হয়, নবীন উদাসীনের মত দিন কাটাইতেছে সেও যেন দ্বিতীয় সংসার করিয়া সুখী হয়।

বিশ্বনাথের মন্দিরের সম্মুখেই মা অন্নপূর্ণার মন্দির। উভয়ে সোনার অন্নপূর্ণা দর্শন করিলেন, বাসায় ফিরিবার কালে রবির জন্য কিছু খেলনা ক্রয় করিলেন।

নবীন ও নবীনের মা বাসার উপর তলায় আসিয়া দেখিলেন, বিস্তীর্ণ শয্যা পাতা রহিয়াছে, তাহারই মধ্যে রবি ঘুমাইতেছে, নলিনী রবির পার্শ্বে শয়ন করিয়া আছে। ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কাপড় জামা চাদর প্রভৃতি সযত্নে দড়ির আলনায় ঝুলিতেছে, ট্রাঙ্কগুলি একদিকে পর পর সাজান আছে; যাহা কিছু কলিকাতা হইতে আসিয়াছে, এমন সুন্দর ভাবে রাখা হইয়াছে, যেন তাহারা আজ নয়, কতদিন পূর্ব্বে আসিয়াছে। ঘরে প্রবেশ করিয়া নবীনের মা এদিক ওদিক সব দিকে চোখ বুলাইয়া দেখিলেন, রবির মুখখানি কত যেন সুন্দর দেখাইতেছে; এখনও বিন্দু বিন্দু ঘাম কপালে লাগিয়া আছে, মাথার চুলগুলি সুবিন্যস্ত, একটুকুও এলোমেলো নয়। তৃপ্তিতে তাঁহার ভাঙ্গা বুক পুরিয়া উঠিল, বিশ্বেশ্বরের ফুল বিল্বপত্র রবির মাথায় ঠেকাইয়া নলিনীর মাথায় ধরিলেন। নলিনী উঠিয়া বসিয়া নির্ম্মাল্য গ্রহণ করিয়া প্রণাম করিল। নবীনের মাকে বলিল, "আপনারা ওই সতরঞ্চের উপর বসুন, আমি আসছি।"

নলিনী মিছরীর সরবত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল, নীচে নামিয়া আসিয়া নেবুর রস যোগ করিয়া দুটী গেলাস পূর্ণ করিয়া দুই হাতে ধরিয়া উপরে উঠিয়া আসিল। নলিনীর মা পথ চলিয়া ক্লান্ত বোধে শুইয়া পড়িয়াছেন, নবীন পার্শ্বে বসিয়া আছে, নলিনী সরবতের গেলাস দুটি নামাইয়া রাখিল, নবীনের মা উঠিয়া বসিলেন, হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমার বড়-বউমাও এমনি যত্ন করে, বোনের বোন কি না, তাই ত বাবা বিশ্বনাথ এখানে টেনে আনলেন।"

নবীন বলিল, "তুমি যত খুসী বলতে থাক আমি থাকতে পারছি না, বড় তৃষ্ণা পেয়েছে।"

নবীন একটি গেলাস তুলিয়া পরম আগ্রহে এক নিঃশ্বাসে সবটুকু পান করিয়া নলিনীর দিকে একবার চাহিয়া দেখিল, নলিনী দাঁড়াইয়া তাহার তৃপ্তির অংশ উপভোগ করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

নলিনী এইবারে মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, "এইবার আপনি এইটুকু খেয়ে ফেলুন, শরীরটা ঠাণ্ডা হবে।"

নবীনের মা সরবত পান করিয়া শ্রান্তি দূর করিলেন।

নলিনী। বেলা হয়েছে, আমাদের বামুন ঠাকরুণ রেঁধে ঠাকুরদাদাকে খাইয়ে চলে গেছে। আপনারা চলুন, ভাত বেড়ে দিই।

নবীনের মা নলিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি খেয়েছ?"

নলিনী। আপনারা একে কুটুম্ব, তায় আজ আমাদের অতিথি, আমি সকালে ঠাকুরদাদার সঙ্গে চা ও কিছু মিষ্টি খেয়ে নিয়েছি।

নবীনের মা। নবীনকে তুমি খেতে বসিয়ে দাও, আমি তোমার সঙ্গে খাব।

নবীন নলিনীর সহিত দোতলায় নামিয়া আসিল।

কেহ কোথাও নাই, ঠাকুরদাদার নাক ডাকিতেছে। নলিনী রান্না-ঘরের শিকল খুলিয়া ভিতরে গেল। নবীন বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল।

আসন পাতিয়া গেলাসে পানীয় জল ভরিয়া নবীনকে নলিনী ডাকিল, "ঠাঁই করেছি, এসে বসুন, বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?"

নবীন মাথা নীচু করিয়া রান্না-ঘরের আসনে আসিয়া বসিল। নবীনের বড় বাধো-বাধো ঠেকিতেছে, সঙ্গে মা থাকিলে যেন ভাল হইত। কিন্তু নলিনীর সে সব বালাই নাই, সে ক্ষিপ্রহস্তে থালার উপর অন্ন-ব্যঞ্জন সাজাইয়া নবীনের সম্মুখে ধরিয়া দিয়া বলিল, "আহার করুন।"

ভাত ডাল তরকারী প্রচুর দেওয়া হইয়াছে। নবীন বলিল, "যথেষ্ট হবে, যা দিয়েছেন অর্দ্ধেকও খেতে পারব না, আপনি ওপরে যান।"

নলিনী। আপনি খান না, একটু থাকি, যদি কিছু দরকার হয়।

নবীন। কিছু দরকার হবে না, এতগুলির উপর হতেও পারে না, কেন অনর্থক কষ্ট পাবেন?

নলিনী। মিছামিছি ভয় পাচ্ছেন, লোকের খাওয়ায় দৃষ্টি দেওয়া আমার অভ্যাস নাই, তাই ভেবে বুঝি খেতে পারছেন না, ইতস্তত করছেন?

নবীন মাথা তুলিয়া নলিনীকে দেখিল, হাসিয়া বলিল, "তা হলে বসুন, বসে দেখুন কি রকম খাই।"

আবার পূর্ব্বের মত মাথা নীচু করিয়া নবীন আহার সুরু করিল; কিন্তু চোখ দুইটার দৃষ্টি কেবল ভাতের থালার চারি ধারে ঘুরিতে লাগিল।

নলিনী বসিয়া বসিয়া নবীনের আহার করা দেখিতেছিল। ডাল আরও খানিক পাতে ঢালিয়া দিলে নবীন বলিল, "অড়হরের ডাল রেঁধেছে ভাল, কিন্তু আর দরকার হত না, না দিলেও চলত।"

নলিনী। পেটটা নিজের, তার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করা উচিত নয়, ডালটা ভাতে মাখুন, ঠেলে রাখলেন কেন?

নবীনের ক্ষুধা ছিল, নলিনীর উপরোধে আরও দুটী ভাত ভাঙ্গিয়া ডালটুকু খাইয়া ফেলিল। দুই তিন রকম নিরামিষ তরকারী। খাইতে খাইতে নবীন বলিল, "পেট ভরে গেছে, খুব খাওয়া হল।"

নলিনী। সে কি? এখনও যে মাছ বাকি।

নবীন। মাছ চলবে না।

নলিনী। মেয়েরা বিধবা হলে মাছ খায় না জানি, পুরুষে খাবে না কেন? কোন্ শাস্ত্রে আছে?

নবীন। সে সব নয়, কাশীতে কি মাছ খায়?

নলিনী। খাবে না কেন? আমরা ত' খাই, ভাল পোনামাছ আপনার জন্য আনা হয়েছে।

নলিনী এক বাটী মাছের ঝোল নবীনের থালার পাশে রাখিল। অগত্যা ঝোল থালায় ঢালিয়া ভাত মাখিয়া নবীনকে খাইতে হইল।

নলিনী। আপনাদের মত না নিয়ে একটা অন্যায় কাজ করে ফেলেছি।

নবীন জিজ্ঞাসু নয়নে নলিনীর মুখের দিকে চাহিল।

খাওয়া বন্ধ করলে কিন্তু বলব না।

নবীন। আমি খাচ্ছি, কি করেছেন বলুন।

নলিনী। আপনারা চলে গেলে পর রবিকে নাইয়ে দিয়েছি।

নবীন বিস্ময়ে আহার ত্যাগ করিয়া নলিনীর প্রতি চাহিয়া রহিল।

নলিনী। খাওয়া ছাড়লে কিন্তু সবটুকু শুনতে পাবেন না।

রবি জ্বরের উপর স্নান করিয়াছে শুনিয়া নবীনের আহারে রুচি রহিল না, হাত গুটাইয়া বলিল, "স্নানের কথা শুনেই আমার ভয় হয়েছে, ভাত ভাল লাগছে না। আমি, উঠি।"

নলিনী। ভয় কি? সবটা শেষ করতে দিন, তখন ভরসা হবে।

নবীন পুনরায় দু' এক গ্রাস খাইতে সুরু করিল।

নলিনী। আমি পূর্ব্বে দু' চারটা রুগী ঘেঁটেছি, রবির পুরান জ্বর, গায়ে একপুরু ময়লা জমেছে, বুঝলাম, আপনারা কেবল ওষুধ খাইয়েছেন, আর কিছুই করেন নি। কতদিন যে বাছাকে স্পঞ্জ করা হয় নি। স্নান করিয়েছি বলে যেন ভাববেন না, রবিকে ভাল করে তেল মাখিয়ে ঘটী ঘটী ঠাণ্ডাজল ওর মাথায় ঢেলেছি। গরম জলে ঠাণ্ডাজল মিশিয়ে ঘরের দোর-জানলা বন্ধ করে রবির গায়ের যত কিছু ময়লা তুলে দিয়েছি। এটা যদি আপনারা পূর্ব্বে করতেন নিশ্চয়ই ফল পেতেন। একটু একটু জল দিয়েছি, আর মুছিয়েছি। এমনি মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত মুছেছি, শেষ শুকনো তোয়ালে দিয়ে গা মুছিয়ে জামা-প্যাণ্ট পরিয়ে যখন দোর-জানলা খুলে দিলাম, দেখলাম, রবি ঘেমে উঠেছে, তখন মনটা আমার খুব খুসী হল।

নবীন নলিনীর স্নানের বর্ণনা শুনিতে শুনিতে উঠিবার কথা ভুলিয়া এক বাটি মাছের ঝোল খাইয়া ফেলিল।

নলিনী বলিল, "দাঁড়ান কথাটা শেষ করবার আগে দই-মিষ্টি যা আমাদের গরীবের সংসারে জুটেছে দিয়ে দিই।"

নবীন বলিল, "এ যথার্থ আমার ওপর অত্যাচার করা হচ্ছে। তা হোক, দিন্ কি আছে, তার পর কি বলছিলেন শেষ করুন।"

নলিনী নবীনের পাতে একবাটি দই এবং পর পর চার রকম মিষ্টান্ন, একুনে বড় বড় আটটি ঢালিয়া দিল।

নবীন। আপনি যে আমাকে রাক্ষসের খোরাক খাওয়াচ্ছেন।

নলিনী হাসিয়া বলিল, "এই ত আপনার খাবার বয়েস, আরও কি জানেন, আমি ত' কখনও কাউকে খাওয়াতে পাই না, তাই ভারি ভাল লাগছে। আপনি সবগুলি খান, দেখবেন আমি বলছি, কোন অসুখ হবে না। তার পর যা বলছিলাম শেষ করি। একবার ঘাম মুছাই, রবি আবার ঘেমে উঠে। এক হাতে মুছাই আর এক হাতে বাতাস করি, তার পর দেখি কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। এখনও ঘুমুচ্ছে, অনেক দিন গায়ে জল পড়ে নি, আরাম বোধ করেছে; জ্বরের সময় একটা যে গায়ের জ্বালা উঠছে, আজ হয় ত আমরা জানতে পারব সেটা চলে গেছে। তা যদি হয় দেখবেন, রবি একটু একটু করে সেরে উঠবে।"

নবীন নলিনীর কথা রাখিয়া সকল মিষ্টান্নগুলি দধির সহিত আহার করিল। পুত্রের রোগমুক্তির সুসংবাদ তাহার কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিতেছিল, আহার শেষ করিয়া নবীন বলিল, "রবির মা রবিকে যেরূপ যত্ন করত নিজের চোখে দেখেছি। আমার মা বুড়ী হয়েছেন, পেরে উঠেন না। আমি বাইরে বাইরে থাকি, ঠিক যত্ন কোন দিন হয় নি, কি সূত্রে যে আপনাদের দোরে এসে পড়লুম, বুঝতে পারি না। আপনি যে রকম অনুগ্রহ করছেন, তা যে কোথাও পেতাম না, মুখে বলতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করছি না। বিপদে জড়িয়ে জড়িয়ে আমি এখন এমন যায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি, সত্য বলতে কি, রবির প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়েছি। আমার দুটী বন্ধন এখনও আছে, এক রবি অপরটি বুড়ো মা। মার ভার দাদা নেবেন। রবি চলে গেলে আমি যে কি করব—"

নবীন আর বলিতে পারিল না।—তাঁহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল, নলিনী স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া নবীনের মর্ম্মকথা শুনিতেছিল। নলিনী দেখিল, নবীনের অধর ও ওষ্ঠ দ্বয় কাঁপিতেছে।

নলিনী বলিল, "উঠুন, খাওয়া অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, হাত মুখ শুকিয়ে উঠেছে।

নবীন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "হাঁ, এই বার উঠি।"

[ক্রমশঃ

পুরোহিত

—শ্রীমতিলাল দাশ

আজকাল পৌরোহিত্যের প্রতি লোকের বিরাগ হইয়াছে—দশকর্ম্মান্বিত ক্রিয়াকাণ্ড জানেন এমন পুরোহিত দুর্লভ। মানুষের উপর পুরোহিতের এক সময় অখণ্ড প্রতাপ ছিল। কিন্তু ক্ষমতা পাইলেই মানুষ তার অপ-ব্যবহার করে, আপন প্রভাব বিস্তারের জন্য পুরোহিত অন্যায় ও ফাঁকির উপর আপন প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা করিল, তাই পুরোহিতের পদমর্য্যাদা আজ সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে।

সে কালের রাজারা পুরোহিত কেমন করিয়া নির্ব্বাচন করিতেন সেটা জানা ভাল। রাজধর্ম্ম-কৌস্তভে পুরোহিত নির্ব্বাচনের বিধি প্রভৃতি পাই। কৌতূহলপ্রদ এবং শিক্ষণীয় বলিয়া এই প্রসঙ্গটি আলোচনা করি।

যোগক্ষেমো হি রাষ্ট্রস্য রাজন্যায়ত্ত উচ্যতে।
যোগক্ষেমো হি রাজ্ঞো হি সমায়ত্তঃ পুরোহিতে।

রাজা হইলেই রাজ্য চলে না, যে রাষ্ট্র যোগ্য পুরোহিত পায়, সেই রাষ্ট্রই যোগক্ষেম। পুরোহিত প্রজাদের অদৃষ্ট ভয় দূর করে। যেখানে পুরোহিত উপযুক্ত, সেখানে সত্যই মঙ্গল হয়।

দ্বিবেদং ব্রাহ্মণং রাজা পুরোহিতমথর্ব্বণম্।
পঞ্চকালবিধানজ্ঞং বরয়েত্তং সুদর্শনম্।

পুরোহিতের অন্ততঃ দুটি বেদে অধিকার থাকা চাই। যজুর্ব্বেদ ও অথর্ব্ববেদ জানা পুরোহিতই সর্ব্বোত্তম; যজু না জানিলেও চলে, কিন্তু অথর্ব্ববেদ না জানিলে তাহাকে পুরোহিত করা চলিবে না। সুদর্শন ও পঞ্চকাল-বিধানজ্ঞ পুরোহিতকে রাজা বরণ করিবেন।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন :—

পুরোহিতঞ্চ কুর্ব্বীত দৈবজ্ঞমুদিতোদিতম্।
দণ্ডনীত্যাঞ্চ কুশলমথর্ব্বাঙ্গিরসে তথা।

সর্ব্ব দৃষ্টার্থ কর্ম্মে দান মান সৎকারের দ্বারা আত্মসম্বন্ধ করিবেন। গ্রহোৎপাত প্রশমনের জন্য দৈবজ্ঞ-বিদ্যা জানিবেন। বিদ্যানুষ্ঠান প্রভৃতিতে সমৃদ্ধ হইবেন—অর্থ-শাস্ত্রে কুশল এবং অথর্ব্ববেদে নিরূপিত শান্তি-স্বস্ত্যয়নে দক্ষ হইবেন।

পুষ্কর বলেছেন :—

অব্যঙ্গলক্ষণোপেতমনুকূলং প্রিয়ংবদম্।
অথর্ব্ববেদবিদ্বাংসং যজুর্ব্বেদবিশারদম্।
দ্বিবেদব্রাহ্মণং রাজা পুরোহিতমথর্ব্বণম্।

প্রিয়ভাষী, অনেক গুণযুক্ত পুরোহিত করিবে। যজু ও অথর্ব্ব এই দুই বেদ জানে এমন লোক পুরোহিত হওয়ার যোগ্য। যদি দ্বিবেদী না পাওয়া যায়, তবে অন্ততঃ অভিচারাদি কর্ম্মজ্ঞ ও অথর্ব্ববেদজ্ঞ পণ্ডিতকে নিযুক্ত করিবে।

পূর্ব্বে পঞ্চকালের তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণের কথা বলিয়াছি। সেই পঞ্চকাল বিদ্যা এখন বিস্তার করিয়া বলিতেছি।

নক্ষত্রকল্পো বৈতানস্তৃতীয়ঃ সংহিতাবিধিঃ।
চতুর্থঃ শিরসাকল্পঃ শান্তিকল্পস্তু পঞ্চমঃ।
পঞ্চ-কল্পবিধানজ্ঞমাচার্য্যমাপ্য ভূপতিঃ।
সর্ব্বোৎপাতপ্রশান্তাত্মা ভুনক্তি বসুধাং চিরম্।
স চ রাজ্ঞস্তথা কুর্য্যাচ্ছিত্যং কর্ম্ম সদৈব চ।
নৈমিত্তিকং তথা কাম্যং দৈবজ্ঞবচনে রতঃ।
ন ত্যাজ্যস্তু ভবেদ্রাজ্ঞা দৈবজ্ঞেন পুরোধসা।
পতিতস্তু ভবেত্ত্যাজ্যো নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
শুবৈবাপতিতৌ যাম ন ত্যাজ্যৌ তৌ মহীভুজা।
তয়োস্ত্যাগে নরেন্দ্রস্তু রাজ্যভ্রংশং বিনির্দ্দিশেৎ।
দুর্গতিং পরলোকে চ বহুকালমনশ্বরম্।

রাজা তখনই বসুধায় সুখে রাজত্ব করিতে পারেন, যখন তিনি পঞ্চকাল-বিধানজ্ঞ পুরোহিত নিযুক্ত করেন—তখন নৃপতির উৎপাতের ভয় থাকে না—গ্রহদুর্ব্বিপাক, মারীভয়, কিংবা অন্য দৈবাদি উৎপাতের প্রশমনের জন্য তাঁহার অভিচারবিদ্যা-বিশারদ পুরোহিত থাকায় রাজা প্রশান্তচিত্ত থাকেন। পঞ্চকাল-বিধানের প্রথম নক্ষত্রকল্পজ্ঞান। গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব ও ফলাফল সম্বন্ধে প্রাচীনেরা অতিশয় বিশ্বাসী ছিলেন -পুরোহিতকে তাই নক্ষত্র-বিদ্যা না জানিলে চলিত না। হোমকে বিতান বলে, পুরোহিত যজ্ঞকর্ম্মপটু হইবেন।

জ্যোতিষের মধ্যে তিনটি ভাগ ছিল—হোরা, গণিত এবং সংহিতা। এই ত্রিস্কন্ধ জ্যোতিষের ফলিত ভাগকে সংহিতা বলিত। পুরোহিত ফলিত-জ্যোতিষে পণ্ডিত হইবেন। চতুর্থ শিরঃকল্প এবং পঞ্চম শান্তিকল্প।

দেখিতেছি, দৈব উৎপাত নিবারণই পুরোহিতের প্রধান কাজ ছিল। অশুভ গ্রহ, অশুভ শকুন-রব প্রভৃতির ভয়ে রাজ্য তটস্থ থাকিত। এই কুসংস্কার দূরীকরণে পুরোহিতের প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক ছিল। পুরোহিত নানাবিধ শান্তি-স্বস্ত্যয়নে পারদর্শী হইবেন।

পুরোহিত প্রতিদিন রাজার নিত্যকর্ম্ম নিয়মিত পালনে সহায়তা করিবেন, দৈবজ্ঞের বচন শুনিয়া পুরোহিত নিত্য ও নৈমিত্তিক কাম্য কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিবেন।

পুরোহিতের নির্ব্বাচনে দৈবজ্ঞের হাত ছিল।

তেনোদ্দিষ্টৌ চ বরয়েদ্রাজা মন্ত্রিপুরোহিতৌ
তেনোদ্দিষ্টাঞ্চ বরয়েৎ মহিষীং নৃপসত্তমঃ ॥

দৈবজ্ঞ ও পুরোহিত রাজাকে ত্যাগ করিবেন না। রাজা যদি পতিত হন, তবে ত্যাগ করিবেন—তখন কোনও বিবেচনার বিষয় থাকে না। রাজাও দৈবজ্ঞ ও পুরোহিতকে ত্যাগ করিবেন না—তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিলে রাজার রাজ্যভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা এবং বহুকাল পরকালে দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে।

পুরোহিত এবং দৈবজ্ঞ সেকালের রাষ্ট্রে অতি প্রয়োজনীয় কর্ম্মী ছিলেন। বর্ত্তমানের ভাবধারা অনুসারে—এই অতিমাত্র দৈবজ্ঞ-প্রীতি কুসংস্কার বলিয়া মনে হয়।

অবশ্য প্রাচীন কালের ভাবধারা আর বর্ত্তমানের মনোভাবের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। বহুকাল ধরিয়া দৈব ও অদৃষ্টের ভূতের ভয় মানুষকে পীড়িত করিয়াছে—সে কথা বিবেচনা করিয়া এই ব্যবস্থাকে দোষযুক্ত বলিতে পারি না।

সাংবৎসরো বিরুদ্ধস্তু ত্যাজ্যো রাজ্ঞা পুরোহিতঃ।
পুরোহিতস্তথা রাজ্ঞো যথা মাতা যথা পিতা ॥
অদৃষ্টমস্তু ব্যসনং হন্যাৎ দৈবোপঘাতজম্।
ব্রাহ্মণে নিষ্কৃতিস্তস্য কুতঃ শক্যা মহীভুজা ॥
যৌ চ তৌ রাজ্ঞো বিধাংসৌ সাংবৎসরপুরোহিতৌ।
বৃত্ত্যুচ্ছেদে তয়ো রাজঃ কুলং ত্রিপুরুষং ব্রজেৎ।
নরকং বর্জ্জয়েৎ তস্মাৎ বৃত্ত্যুচ্ছেদং তয়োঃ সদা।
স্থাবরেণ বিভাগশ্চ তয়োঃ কার্য্যো বিশেষতঃ ॥
স্বামী রাজা যথা রাম তথা তৌ নাত্র সংশয়ঃ।
একস্মিংস্তু মতে রাজ্যং তয়োরেবাস্তুতঃ কথম্ ॥
স্থাবরেণার্চ্চয়েদ্রাজা বর্ত্তমানে বিশেষতঃ।
অনুরূপেণ ধর্ম্মজ্ঞৌ সাংবৎসরপুরোহিতৌ ॥
ভাবাং সদা ভার্গববংশচন্দ্র পুরোহিতেহনন্যসমেন রাজ্ঞা।
রাজ্ঞো যথা সর্ব্বজনেন ভাব্যং বিধান্ প্রভুঃ স্যাৎ পতেঃ পুরোধাঃ ॥

যেমন মা-বাপ সন্তানের কল্যাণ কামনা করেন, পুরোহিতও তেমনই করেন, তবে যদি পুরোহিত এক বর্ষ ধরিয়া রাজার বিরুদ্ধাচরণ করেন, তবে রাজা তাঁহাকে ত্যাগ করিবেন। পুরোহিত যে উপকার করেন, সে ঋণ অপরিশোধনীয়। অদৃষ্ট, ব্যসন এবং দৈবোপঘাত নিবারণ করিয়া পুরোহিত রাজাকে চিরন্তন ঋণে ঋণী করেন। রাজা কখনও দৈবজ্ঞ ও পুরোহিতের বৃত্তির উচ্ছেদ করিবেন না, করিলে তিন পুরুষ নিরয়গামী হইবেন।

রাজা স্থাবর সম্পত্তি দিয়া দৈবজ্ঞ ও পুরোহিতের পরিতুষ্টি বিধান করিবেন। রাজা অনন্যসম কিন্তু তবু পুরোহিতকে ভার্গববংশোদ্ভব মনে করিয়া পূজা করিবেন। সকল লোক যেমন রাজাকে বিধান ও প্রভু মনে করে, রাজার পুরোহিতকে তেমনই সম্মান করিবে।

শান্তিকল্পের শান্তিপ্রয়োগের কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। শান্তির পূর্ব্বে কর্ত্তা বার রাত কি সাত রাত শাকাদি আহার করিয়া ব্রহ্মচারী থাকিবে। তার পূর্ব্ব হইতে দুই মাস কি একমাস অঘমর্ষণ যুক্ত জপের প্রয়োজন। তাড়াতাড়ি থাকিলে সাত দিনেও চলে।

ষোড়শহস্ত মণ্ডপে অষ্টহস্ত বেদী প্রস্তুত করিবে। তারপর কুণ্ড, ধ্বজা প্রভৃতির ব্যবস্থা করিবে। ঐন্দ্রী মহাশান্তি যাগ করিবে, এবং সংকল্প করিয়া গণেশ পূজা, স্বস্তিবাচন আচার্য্যাদি বরণ করা হইত। তারপর সদস্য নির্ব্বাচন করিয়া সকলকে মধুপর্ক দিতে হইত। তারপর মণ্ডপ প্রতিষ্ঠা করিয়া ইন্দ্র জুষস্ব 'এই মন্ত্রে সপ্ত কুম্ভে পুণ্যনদীজল সিঞ্চন করিবে। পরে পঞ্চগব্য, পুষ্পাদি ও ফলাদিতে ব্রহ্মযাগ করিতে হইত। তারপর কুণ্ডে অগ্নিস্থাপন করিত। তারপর হোম করিতে হইত। রাত্রে বিনায়ক স্নপন হইত। চারি কোণে চারিটি মৃণ্ময় গণেশ

স্থাপন করা হইত। তারপর গণেশের পূজা করিয়া নানা প্রকার মণিমুক্তা ও মৃত্তিকা-সম্ভারপূর্ণ কুলা রাজার কপালে ছোঁয়ান হইত।

তারপর আচার্য্য শান্তিমন্ত্র পড়িতেন। অর্দ্ধরাত্রে সদ্যোক্ত গৌর সর্ষপ তৈলে সপ্তমন্বনোদ্ভব ঘৃতের দ্বারা কিংবা ডুমুরের আঠায় কুশান্তর্হিত মস্তকে মাখান হইত।

অতঃপর মাষ চূর্ণের দ্বারা উদ্বর্ত্তন করিয়া শুভ্রবসন পড়িয়া শ্বেতচন্দন মাখিয়া গৌরীর আরাধনা করিতে হইত।

"ভগবতি, ভগং মে দেহি ; ধনবতি, ধনং মে দেহি ; পুত্রবতি, পুত্রং মে দেহি ; সর্ব্ববতি, সর্ব্বান্ মে দেহি।"

অতঃপর চারিখানি নূতন কুলায় চারিটি ব্রাহ্মণের দ্বারা চারিটি বিদায়কে উপহার অর্ঘ্য দিতেন।

কুলায় শুক্ল রক্তপুষ্প, তণ্ডুল, মৎস্য, পুরোডাশ, মুগ, ভূস্তৃণমূলক সুগন্ধিপান, মরীচপান এবং সুরাপান প্রভৃতি দিয়া শূর্পকে পূর্ণ করিতে হইত। পুরোড়াশ-শক্তু, তিনটি মাছ তিনটি কোণে দেওয়া চাই-ই চাই। তারপর মন্ত্র পড়িতে হইত। পরে সকাল হইলে সূর্য্য নমস্কার করিতে হইত।

তাহার মন্ত্র—

নমস্তে অস্তু ভগবন্ শতরশ্মে তমোনুদ
জহি মে দেব দৌর্ভাগ্যং সৌভাগ্যেন মাং সংযুজ।

তারপর আচার্য্যকে দান করিতে হইত—গোমিথুন, হিরণ্য এবং বস্ত্র ; ব্রাহ্মণ সজ্জনকে ও অন্যকে যথাশক্তি দান করিতে হইত।

দ্বিতীয় দিনে ঈশান যাগ হইত। তৃতীয় দিনে গ্রহযাগ করা হইত। চতুর্থ দিনে নক্ষত্রযাগের অনুষ্ঠান হইত। পঞ্চম দিন রাত্রে নিঋতিযাগ সম্পন্ন করা হইত এবং ষষ্ঠ দিনে ঐন্দ্রী শান্তির ব্যবস্থা ছিল।

রাজ্যাভিষেকের সময়ও পুরোহিতের বিরাট কর্ত্তব্য ছিল। রাজধর্ম্ম-কৌস্তভে অভিষেকের বিশদ বর্ণনা পাই। রাজা নানাবিধ মৃত্তিকায় এবং নানা স্থান হইতে আহৃত সলিলে স্নান করিতেন।

তারপর রাজা ভদ্রাসনে গিয়া অমাত্য-বেষ্টিত হইয়া বসিতেন—তারপর শতধার স্বর্ণপাত্র হইতে রাজার উপর ঘৃত সিঞ্চন করা হইত। ইহা ব্রাহ্মণের করিতে হইত। তারপর ক্ষত্রিয় শতধার রৌপ্যপাত্রে দুধ ছড়াইতেন—তারপর বৈশ্য তাম্রপাত্রে দধি ছিটাইতেন। তারপর উপস্থিত সভ্যেরা নানা তীর্থজলে রাজাকে অভিসিঞ্চন করিতেন। তারপর কেহ ছত্র ধারণ করিত, কেহ দণ্ড ঘুরাইত, কেহ রাজ-তরবারি ধারণ করিত। শঙ্খধ্বনি ও বাদ্যের মধ্যে, সঙ্গীতমুখর আনন্দোল্লাসের মধ্যে বেদমন্ত্রে তাঁহাকে অভিষেক করা হইত। তারপর রাজা আয়নায় মুখ দেখিতেন, পাগড়ী বাঁধিতেন এবং অঙ্গ রূপায়িত করিতেন। তারপর পূজাদি শেষ করিয়া রাজা ব্যাঘ্র-চর্ম্মাবৃত শয্যায় শয়ন করিলে পুরোহিত মধুপর্ক দিতেন, রাজাও দৈবজ্ঞ ও পুরোহিতকে বিশেষ সম্মান করিতেন। তারপর তীর ধনুক দিয়া প্রণম্যদের প্রণাম করিয়া রাজা রাজপথে মিছিল বাহির করিতেন। রাজা নট ও বাদককে পুরস্কার দিতেন—জ্ঞাতি ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেন। অভিষেকের সময় বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হইত।

লক্ষ্মী-বন্দনার শেষে রাজা অপরাহ্ণে মন্ত্রী প্রভৃতি রাষ্ট্র সেবকগণকে দর্শন দিবেন। তারপর শ্বেত অশ্ব ও হস্তী আনিয়া তাহাতে উঠিয়া পুরের শোভাযাত্রা করিতেন এবং শোভাযাত্রাকালে দুহাতে ধন ছড়াইতেন। পথে মন্দির ইত্যাদি দেখিলে সেখানে পূজা করিতেন। তারপর ফিরিয়া নিজের দলের লোকগণকে গ্রাম, একশত দাসী এবং সহস্র সুবর্ণ দান করিতেন। সে রাত্রে সংযত হইয়া রাজা ভূমি-শয্যায় শয়ন করিতেন। সাংবাৎসরিক অভি-ষেক-তিথি ও মাসিক জন্ম-নক্ষত্রের দিনেও রাজা অভি-ষেকোৎসব পালন করিতেন।

সেকালের রাষ্ট্রে পুরোহিত ছিলেন অসীম ক্ষমতা-সম্পন্ন ব্যক্তি। য়ুরোপে পোপ এবং বিশপগণ এইরূপ প্রভাবসম্পন্ন ছিলেন। দেশ ও কাল মানুষের মধ্যে প্রকৃত ভেদ সৃষ্টি করে না—প্রাচীন ঐতিহ্য পড়িলে বার বার এই কথাই মনে জাগে।

কবিতা

—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র

কাজলডাঙার মাঠ পার হতে না হতে বৃষ্টি বেশ ভাল করেই চেপে এল। আজ আর উপায় নেই, সারাটা পথ ভিজতে ভিজতেই যেতে হবে। শেখরপুরের চর পর্য্যন্ত না গেলে আর কারও বাড়ী মিলবে না। কিন্তু সে তো এখনও পুরো এক মাইল। অন্যদিন ছাতাটা সঙ্গে থাকে, আজ তা'ও ফেলে এসেছি। ওষুধের বাক্স মাথায় নিয়ে সহদেব অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। ওকে বেশী ভিজতে হবে না, কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাড়ী পৌঁছুতে পারবে।

বিরাজ দত্ত অবশ্য বলেছিল, 'ডাক্তারবাবু মেঘটা একটু দেখে যান। বৃষ্টিটা খুব জোরেই আসবে বলে মনে হচ্ছে। বোধহয়, বড় বটতলাও ছাড়াতে পারবেন না।'

কিন্তু বুড়োর কাছে একবার বসলে আর রক্ষা নেই। বক্তৃতা সুরু হলে আর থামবে না। উঠে আসতে গেলে হাত ধরে টেনে বসাবে। এক বিধবা মেয়ে ছাড়া সংসারে কেউ নেই। তাও চিররুগ্না। বুড়োর কথা-বলবার মানুষের বড়ই অভাব। তাই পথ দিয়ে কাউকে যেতে দেখলেই ডাকে, 'আসুন মশাই, তামাক খেয়ে যান। সাজা তামাক—'

কিন্তু আজ সেই সাজা তামাক প্রত্যাখ্যান করে বুড়োকে ক্ষুণ্ণ করে এসেছি। নানা কারণে মনটা আজ ভাল ছিল না। বাঁড়ুজ্যেরা দু দিন ঘোরার পর আজ মাত্র একটা টাকা দিয়েছে। বললাম, 'দেখুন! এতে ওষুধের দামটাও পোষায় না, আর—দু'টাকা আমার রেট। ওর কমে পারব না।' বছরখানেক আগেও এ ভাবে বলতে পারতাম না। কিন্তু আজকাল বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছি। উত্তরে নবীন বাঁড়ুজ্যে বললেন, 'কেন? গণেশ সরকার তো এক টাকা করেই নেয়।'

'বেশ তো, গণেশ সরকারকে কল্ দিলেই পারেন।'

'তাই দেব মশাই, এর পর থেকে। সবাই তো একসঙ্গে পাশ করে বেরিয়েছেন, কিন্তু ভদ্রতাবোধ তো আর সকলের এক রকম নয়।'

একটা কঠিন কথা তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বললাম, 'তা তো নয়ই। কিন্তু এই ভদ্রতাবোধ নিয়ে গণেশ সরকারের সঙ্গেও আপনার যথেষ্ট আলোচনা হয়ে গেছে; আচ্ছা, আসি তা হলে।' টাকাটা নিয়ে আসি নি। ভদ্রলোকও আর পুনর্ব্বার বলেন নি।

শেখরপুরের চরের কাছে যখন পৌঁছুলাম, তখন কোথাও ওঠার মত আর অবস্থা ছিল না। জামা-কাপড় ভিজে ভয়ানক ভারী হয়ে গেছে। চুল থেকে জল ঝরে ঝরে পড়ছে।

বাড়ী এসে দেখি—বাক্সটা নামিয়ে রেখে সহদেব নিতান্ত নির্ব্বিকার চিত্তে কলকীতে আগুন তুলছে। বললাম, 'তুই ভাল করে ধরা, আমি কাপড় ছেড়ে আসছি।'

কিন্তু বাড়ীর মধ্যে পা বাড়াতেই হঠাৎ মায়ের উচ্চকণ্ঠ শোনা গেল, 'তুই থাম মনসা। তোর দাদাই যদি বউকে অমন আস্কারা না দিত তো তার সাধ্য কি, তোকে এই ভর সন্ধ্যাবেলা যা-নয়-তাই বলে গালাগালি করে। খাওয়া নিয়ে, পরা নিয়ে, উঠতে, বসতে, চব্বিশ ঘণ্টা তুই ওর চোখের বিষ। আর তোরও তো লজ্জা নেই। লাথি-ঝাঁটা খেয়ে এই মাটিই আঁকড়ে থাকবি। এর চেয়ে সতীনের ঘর করাও তোর ছিল ভাল। এখন যার যার নিজের বাড়ী-ঘরে যাও বাপু। চব্বিশ ঘণ্টা আমার এ-যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না।'

বুঝলাম—আজ আবার কুরুক্ষেত্র আরম্ভ হয়েছে,—বেশ। ব্যাপারটা ইদানীং প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক হয়েই দাঁড়িয়েছিল। কাণটা ইতিমধ্যে বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তেমন আর দুঃসহ মনে হয় না। ভ্রূক্ষেপ না করে সোজা বারান্দায় গিয়ে বললাম, 'মনসা। এই অবেলায় আবার শুয়ে পড়েছিস্ কেন? উঠে আমার কাপড়টা দে তো।'

মনসা উঠল না। শুধু তার গলাটা দুঃখে আর অভিমানে অনুনাসিক হয়ে উঠল, 'আমার সব তাতেই দোষ। সারা দিন দাসীবৃত্তির পর একটু শুলেও লোকের চোখ টাটাবে। বেশ। আমিই না হয় শুয়ে শুয়ে আরাম করছি, আদরের বউরাণীই বা কোন্ ঢেঁকি পাড়াচ্ছে শুনি?'

অগত্যা ভিজে কাপড়েই ঘরে গেলাম। মনোরমা 'সেরে'

করে চাল মাপছে, বললাম, 'আজ আবার তোমাদের কি হল, মনোরমা? নিত্য তিরিশ-দিন যদি তোমাদের সামান্য খুঁটিনাটি নিয়ে এমন কুরুক্ষেত্র বাধে, তা হলে বাড়ীতে আর বাস করাই চলবে না দেখছি।'

মনোরমা আমার মন্তব্যে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করে, পাকের ঘরের দিকে পা বাড়াল। চেঁচিয়ে বললাম, 'শোন!'

মনোরমা ফিরে দাঁড়াল। বললে, 'কী?'

তার শ্লেষের ভঙ্গীতে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। চীৎকার করে বললাম, 'কী? কোন্ সাহসে তুমি আমার মা ও বোনের ওপর এমন ইতরের মত ব্যবহার করছ শুনি?'

'কোন্ সাহসে?' বারান্দা থেকে মার স্নেহের কণ্ঠ উথলে উঠল, 'তুই-ই তো আদর দিয়ে দিয়ে ওকে মাথায় তুলেছিস বিশু। আমরাই না হয় দাসী বাঁদী, কিন্তু তুই তো সোয়ামী? তোর মুখের ওপরই ও কেমন চোপা করলে দেখলি তো? আর কেউ হলে ও-মুখ এক্ষণি লাথি দিয়ে গুঁড়িয়ে দিত না?'

মনোরমা বললে, 'দাও না লাথি দিয়ে ভেঙে। আদর্শ স্বামীর কাজ কর। দাঁড়িয়ে রইলে কেন? মাতৃ-আজ্ঞা তো শুনলেই!'

এই বিষাক্ত বিদ্রূপ আমাকে যেন উন্মাদ করে ফেলল—'সেই তোমার উপযুক্ত শাস্তি। দূর হয়ে যাও, দূর হয়ে যাও, আমার সামনে থেকে।' বলে তাকে হাত দিয়ে সরিয়ে দিতে যাব—তাল ঠিক না রাখতে পেরে ধাক্কাটা জোরে হয়ে গেল, মনোরমা ছিটকে গিয়ে সশব্দে বেড়ার উপর পড়ল।

*

বার-বাড়ীতে সহদেব নিশ্চিন্ত চিত্তে তখনও বসে বসে তামাক টানছে। আমাকে দেখে হুকাটা বদলে আমার হাতে দিলে। ওর পাশে বসে পড়ে বললাম, 'তুই বেশ আছিস সহদেব। জিহ্বার বিষে মানুষকে তুই দুঃসহ যন্ত্রণায় অস্থির করে তুলতে পারিস নে। মানুষের জিহ্বায় যে কি জ্বালা তাও এজন্মে তোর আর জানতে হল না।' সহদেব বোবা। কাণেও ভয়ানক কম শোনে।

এতটা আত্ম-বিস্মৃত জীবনে আর কোনদিন হই নি। এই আমার শিক্ষা-সৌজন্য, এই তো ভদ্রতা-বোধ! কয়েকটি বছরে এ সংসারের প্রত্যেকের জীবনে কি অদ্ভুত পরিবর্তনই না এনে দিয়েছে। মা, মনসা, রমা, কেউ তো এমন ছিল না। আর আমিই কি আজকের আমাকে ভাল করে চিনতে পারি? কিন্তু এর সব কিছুর জন্যই দায়ী তো একমাত্র আমিই, আমার সীমাহীন অক্ষমতা। এ তো আমার দারিদ্র্যেরই কদর্য নগ্ন রূপ। কয়েক বছর পূর্ব্বে রমার বাবা যখন বেঁচে ছিলেন, আমার ডাক্তারী পড়বার ব্যয় আর সংসার খরচের বেশীর ভাগ টাকাই তিনি বহন করতেন। কিন্তু তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে সংসারের রূপ ফিরে গেল। মনোরমার দাদারা আবিষ্কার করলেন, তাঁদের পৈতৃক সম্পত্তির অধিকাংশই তাদের বোনের আর অপদার্থ ভগ্নীপতির পিছনে অন্তর্হিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। আমাদের সঙ্গে তাঁদের আর কোন সম্পর্ক রইল না। আর এই সম্পর্ক তুলে দেবার আগে রমার বড়-দা এক দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন। ছত্রে ছত্রে তার কি দুঃসহ শ্লেষ আর কঠিন বিদ্রূপ—তার একটা অক্ষরও আমি আজ পর্যন্ত ভুলতে পারি নি।

চিঠি পড়ে রমা বলে বসল, 'চিঠিটার জবাব আর লিখে দরকার নেই। আমি সাক্ষাৎ মুখোমুখি দিয়ে আসব।' আশ্চর্য্য হয়ে বললাম, 'সে কি এর পরেও তুমি সেখানে যেতে চাও না কি? আত্মসম্মান বলে কি কিছুই নেই?' রমা হেসে বলল, 'আত্মসম্মান! হাঁ সেই আত্মসম্মান যাতে আর ক্ষুণ্ণ না হয় আমি তাই-ই করে আসব।' রমাকে কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারলেম না।

দিন দুয়ের পরেই ও ফিরে এল, মা তার খালি হাত-পা দেখে বললেন, "বৌমা সবগুলি গয়নাই একেবারে বাক্সে তুলে রেখেছ? অন্ততঃ চুড়ি আর দুল দুটো পরলে ক্ষতি ছিল কি? এগুলি তো ব্যবহার করবার জন্যই, এমন কিপ্পিন আর দুনিয়ায় দেখি নি বাপু!"

কিন্তু অচিরেই মনসা মারফৎ মা খবর পেলেন যে, তাঁর বৌমা সব অলঙ্কারগুলিই বাক্সে তুলে রেখেছেন বটে, কিন্তু সে তার নিজের বাক্সে নয়, দাদার বাক্সে।

সেই থেকে গালিগালাজ, ঝগড়া-ঝাঁটি এ বাড়ীতে চিরস্থায়ী আসন পাতল। উপলক্ষ্য সর্ব্বদা তৈরীই থাকে, তার জন্য আর ভাবতে হয় না। এক একবার ভাবি মনসাকে দেবকুমারের কাছেই পাঠিয়ে দি। আমি অনুরোধ করলে

সে হয় তো এখনও অসম্মত হয় না। লক্ষ্য করে দেখেছি, প্রাত্যহিক ঝগড়ার প্রারম্ভিক অংশটা মনসাই নেয়। এখানে থেকে থেকে ও একেবারে সেকেলে 'টিপিক্যাল' (typical) ননদ বনে গেছে। আবার ভাবি, সেখানে গিয়েও মনসা কিছুতেই সতীনের ঘর করতে পারবে না। সন্তান হয় না দেখে এবং অত্যন্ত মুখরা অপবাদ দিয়ে ওর শাশুড়ী যখন দেবকুমারকে আর একবার বিয়ে দিলেন, তখন আমি অত্যন্ত স্পর্দ্ধা করেই মনসাকে বাড়ী নিয়ে এসেছিলাম। দেবকুমার আর তার মাকে আমার যতটুকু সাধ্য ছিল, অপমান করতে সেদিন একটুও বাকী রাখি নি। দম্ভ করে বলে এসেছিলাম, আমার বোন জীবনে কোনদিনই আর ও-মুখো হবে না। আজ আবার ওকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্ম দেবকুমারকে অনুরোধ করে চিঠি লেখায় যে কত লজ্জা স্বীকার করতে হবে, তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। তাও না হয় স্বীকার করলাম। কিন্তু এ তো আমি ভাল করেই জানি, মনসা সেখানে কিছুতেই বনিয়ে থাকতে পারবে না। বরং মাঝখান থেকে আরও কেলেঙ্কারী ঘটবে।

"ভাত বাড়া হয়েছে দাদা, খেতে এস।"

মনসার গলার স্বর কোন দিনই এতটা স্নিগ্ধ শুনি নি তো! সহদেব দেখি আবার তামাক সাজছে। ওর এই একটি মাত্র দোষ, বড্ড বেশী তামাক খায়। বললাম, "এ ছিলিম পরে খাবি, চল আগে খেয়ে আসি এখন।"

রান্নাঘরের চালটা স্থানে স্থানে ছেঁদা হয়ে গেছে। আজকের অত্যন্ত বৃষ্টিতে ঘরের প্রায় সব জায়গাই ভিজে গেছে। কোন খানেই ভাল করে বসবার জো নেই। বেড়াগুলি উইয়ে খেয়ে আর কিছু রাখে নি। কতদিন ভেবেছি, নিতাই মণ্ডলকে ডেকে ঘরটা একটু সংস্কার করে নেব। কিন্তু ও দু-আনার কমে কোন খানেই কাজ করে না। আর এই কাজটুকু করতে চালাকি করে ও কতদিন লাগাবে তা ওই জানে। মনসা আজ নিজেই ভাত বেড়ে আনলে। মা এসে সামনে বসলেন। বললেন, 'মাছ ছাড়া খেতে পারিসনে, তা সকাল বেলা বের হবার আগে চিন্তামণির পুকুরটা একবার দেখে এলেই তো পারিস্। না হয় সহদেবকেও তো একবার পাঠালে হয়। নিজেরা যদি এনে নিয়ে না খেতে পার বাপু, আমি কি করব? মেয়েটাও কি ভাত খেতে পারে? বলে, তিরিশ দিন ডাল দিয়ে আর খাওয়া যায় না মা।'

কিন্তু চিন্তার পুকুরে গেলে কি হবে? ও আমাকে দেখলেই বলে, 'মাছ আজ মোটেই পাই নি ডাক্তার বাবু। বিশ্বাস না হয়'—বলি, 'তোমাকে অবিশ্বাস করব কেন চিন্তামণি। পয়সাটা না হয় আজ নগদই নিতে। তা ছাড়া আমার কাছে মাছের দাম বাবদ না হয় আনা বারো পয়সাই পাবে, কিন্তু তোমার কাছে সেই যে তোমার ছেলের ওষুধের দাম বাবদ গোটা তিনেক টাকা বাকি, তার একটা পয়সাও তো তুমি আজ পর্য্যন্ত দাও নি।" চিন্তামণি লজ্জিত কণ্ঠে বলে, 'গরীব মানুষ, দিই কেমনে ডাক্তার বাবু? কিন্তু সেই জন্মই কি আপনাকে মাছ দিচ্ছি না না কি? আপনারা গরীবের কথা মোটে পেত্যয় কন্নেন না বাবু। আপনাকে সত্যি বলছি এই মাস্তর দত্ত মশায় এসে কুড়িয়ে বাড়িয়ে সব নিয়ে গেলেন।" হয় ত সত্যই বলে। কিন্তু লোকের সহজ ভদ্রতায় বিশ্বাস করবার শক্তি আমি আজ হারিয়ে ফেলেছি, আমার মনে সংশয় সন্দেহ ছাড়া আর কিছুই স্থান পায় না। কেমন যেন একটা হীনতা-বোধ আমার মজ্জাগত হয়ে গেছে। আমার মনে হয়, আমার দৈন্যে, আমার অক্ষমতায় লোকে সর্ব্বদাই আমাকে ব্যঙ্গ করছে। প্রতিবেশীর সহজ সাদা কথার মধ্যেও আমি শ্লেষ ছাড়া আর কিছু খুঁজে পাই নে। আর সব চাইতে বিষাক্ত ওদের সহানুভূতি আর অনুকম্পা।

খেয়ে এসে শুয়ে পড়লাম। কেবলই মনে পড়তে লাগল, আজকের মত এতটা ইতরতা আর কোনদিনই করি নি। নিজের মার্জ্জিত রুচি-বোধ নিয়ে একটু গোপন দম্ভ ছিল। কিন্তু আজ সেটা নিঃশেষ হয়ে গেল। হঠাৎ মনে হল, মনোরমা এখনও আসছে না কেন। আমি জানি শারীরিক কষ্টের চেয়ে ও মনেই আঘাত পেয়েছে বেশী আমার আজকের অভূতপূর্ব্ব ব্যবহারে। কেমন যেন একটু শঙ্কা হল। তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে গেলাম।

বাড়ীর পিছনে মাটী কাটতে কাটতে একটা ছোট ডোবার মত হয়েছে। সেটাকে চারদিকের বাঁশের ঝোপ এসে বেড়ে ধরেছে, বাঁশের পাতা পচে পচে দুর্গন্ধে স্থানটা ভরে গেছে। সেখানে একটা কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বালিয়ে

মনোরমা বসে বাসন মাজছে। আমার পায়ের শব্দে পিছন ফিরে তাকাল, হেসে বললে, 'কি? দুশ্চিন্তায় ঘুম হল না না কি? ভেবেছিলে আমি বুঝি জলে ডুবে আত্মহত্যা করব? দূ-র, সে কি এই পচা ডোবায়? রামঃ, আর তা হলে তোমাদের বাসন মাজত কে? মনসা আর যাই করুক, এখানে এত রাত্রে একা একা এসে বাসন মাজতে পারত না, ওর ভয়ানক ভূতের ভয়।'

রীতিমত পণ্ডিত-জনোচিত গাম্ভীর্য্য নিয়ে বললেম, "তোমার এই অতি-ব্যঙ্গপ্রিয়তাই অক্ষমতার দুর্ঘটনায় মূল কারণ, মনে রেখ, দারিদ্র্যের সংসারে অনেক কিছুর মত শ্লেষটাও অশোভনীয়। কারণ দারিদ্র্য নিজেই একটা ব্যঙ্গ।"

"সত্যি? কিন্তু এই চাঁদনী রাতে তুমি আজ অমন বিদ্যাসাগরী গল্প আরম্ভ করলে কেন বল তো? এখানেই তো তুমি একদিন কবিতা লেখার সবচেয়ে বেশী প্রেরণা পেতে। দেখ না—পাতলা মেঘের আড়াল থেকে ম্লান চাঁদের আলো বাঁশের পাতার ফাঁকে ফাঁকে তোমাদের পচা ডোবার জলে এসে পড়েছে। তুমি কি আজ একটা কবিতা লিখবে না?'

ওর মুখ চেপে ধরে বললাম, "আর বেশী ঠাট্টা করলে ঠেলে সত্যি সত্যি জলে ফেলে দেব।" পর মুহূর্ত্তে হাতটা সরিয়ে নিয়ে বললাম, "কিন্তু এই ঠাট্টা-বিদ্রূপের আতিশয্যের অন্তরালে তুমি মনে মনে আমার অক্ষমতাকে যে অনুকম্পা কর তা আমি বেশ জানি।"

মনোরমার মুখ অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠল। সেচ্ছায় সেও দিতে পারে। বললে, "করিই তো। অক্ষমতা কি অনুকম্পনীয়ই নয়? অক্ষমতাকে কে শ্রদ্ধা করতে পারে? আর তা ছাড়া দারিদ্র্য আমার সয়, কিন্তু দারিদ্র্য নিয়ে কবিত্ব সহ্য হয় না।"

বললাম, "সে তো সত্যিই। তোমাদের নিয়ে যত বাড়াবাড়িই আমরা করি না কেন, তোমাদের মন essentially prosaic, আসলে তোমরা আমাদের চেয়ে অত্যন্ত বেশী practical."

মনোরমা নীরবে বাসনগুলি গুছিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

অজানা

—শ্রীপারুল সেন গুপ্তা

বিজন বাটের মাঝখানে আমি, বেঁধেছিনু বাসা মনোহর!
মনে ছিল আশা—অগোচর।
দূরে বনফুল অলসে হেলায়, মৃদুল-পুলকে গন্ধ বিলায়,
উছল-ছন্দে নেচে চলে যায়, অন্ধ মাতাল মধুকর
মোর মনে আশা—অগোচর।

দুয়ার খুলিয়া হেরিনু গগনে, ক্লান্তি-শীতল নিশানাথ,—
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি-পাত!
তোমার পরশে হঠাৎ কখন, টুটিবে আমার প্রভাতী স্বপন
পাছে ফিরে যাও, সেই ভয়ে মোর, জাগরণে যায় সারারাত
ঘুমভারনত আঁখি-পাত!—

প্রথম তোমারে যেদিন দেখিনু, চম্পক বনে ফুলময়—
মুকুলিত নব কিশলয়!
বন-মঞ্জরী দোলে কুন্তলে, যূথিকা বকুল লোটে পদতলে,
তোমার অঙ্গ-সৌরভে বহে, যেন পুরাতন পরিচয়!
মুকুলিত যথা কিশলয়!

সেদিন ভেবেছি স'পিব তোমারে, মোর বিজনের অবসর
ঝরিবে বকুল ঝর-ঝর্—

সেদিন ভেবেছি নবীন প্রভাতে,
দেখা দেবে যবে ফুলশর হাতে,
তোমার চরণে, আমারে মিলাব, বুক পাতি লব, তব পর,
কাটাব বিজন অবসর!

সহসা আজিকে বিজন কুঞ্জে, আনিলে নবীন জাগরণ
শিহরিল মৃদু, ঘন বন।
পথ-চাওয়া মোর হয়ে এল ক্ষীণ,
ফাগুন মদিরা বেদন বিলীন,
আসিয়াছ তুমি!—আপনি ত' যার চরণে বিকানু প্রাণমন!
এ তো নহে মোর জাগরণ!

এ কোন অজানা দরদী বন্ধু, অকারণে দিলে দরশন!
মৃদু চরণের পরশন!
তোমার অর্ঘ্য বিরচন লাগি,রাখিনি ত' ফুল,ওগো অনুরাগী,
মোর তরে তব বিপুল পুলক, কেন অকারণ বরষণ?
নব চরণের পরশন?

বিজন বাটের মাঝখানে মোর, সুরভি কুঞ্জ মনোহর!
আশা মোর আজও অগোচর।
বেতসের বুকে গোপন বীণায়, আজও পূরবীর বেদন বিলায়
অজানা ব্যথায় আজও ফিরে যায়, মিলন-মত্ত মধুকর;—
আশা মোর আজও অগোচর।

হরিহরের মৃত্যু

—শ্রীমেঘেন্দ্রলাল রায়

বিরাট রাজপ্রাসাদ সম অট্টালিকা। সুন্দর পাঠাগার, চকৎকার মেহগনি কাঠের সব আলমারী, সুন্দর ডাইনিং হল, বিস্তীর্ণ উদ্যান, স্নিগ্ধ লতায় পাতায় আচ্ছাদিত কুঞ্জ ও মনোমুগ্ধকর ম্যাগনোলিয়া পুষ্পের বীথি, মূল্যবান্ সব পাশ্চাত্ত্য প্রস্তর-মূর্ত্তি, দাস-দাসী, বেয়ারা-মালী, মোটর-গাড়ী, সবই অর্থের প্রাচুর্য্যের সাক্ষ্য দিতেছে।

গৃহকর্ত্তা হরিহর চক্রবর্ত্তী প্রৌঢ়াবস্থা অতিক্রম করিয়াছেন। জেলা কোর্ট-এ ফৌজদারী আদালতে এত বড় নামজাদা উকীল কেহ নাই। শুধু এ জেলাতে কেন, এ অঞ্চলে তাঁহার সমকক্ষ কোন ব্যবহারজীবী নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ ও বি-এল উভয় পরীক্ষাতেই সে কালে প্রথম স্থান অধিকার করেন ও স্বর্ণ-পদক প্রাপ্ত হন। পাণ্ডিত্যও অগাধ।

যে দিন হরিহর সমগ্র বারের উকীলকে বিস্মিত করিয়া বিশেষ উত্তেজনাপূর্ণ হত্যার মামলায় একাকী কলিকাতায় বিখ্যাত ব্যারিষ্টারের সুন্দর বক্তৃতাকে ম্লান করিয়া নকড়ি যে হত্যাকারী নহে, প্রমাণ করিয়া দিলেন, সেই দিন হইতে সকলেই তাঁহার গুণগ্রাহী হইয়া পড়িল, সেই দিন হইতেই তাঁহার নাম-ডাক। এমন কি কলিকাতা হইতেও তাঁহার ডাক আসিতে আরম্ভ হইল। অনেকে দুঃখ করিয়া বলিত, হরিহর বাবু যদি কলিকাতায় প্র্যাকটিস করিতেন, কত বেশী নাম হইত, অর্থও ঢের বেশী উপার্জ্জন করিতেন। মফঃস্বলে অল্প সহরে তাঁহার ফিস্ খুব কম হইলেও দৈনিক তিন শত টাকার কম নহে।

প্রায় দিন পনেরো আগের ব্যাপার। হরিহর বাহিরের ঘরে বসিয়া সিগার টানিতেছিলেন, হঠাৎ এক গৈরিক-বসনধারী সন্ন্যাসী তাঁহার ড্রইংরুমে প্রবেশ করিল। হরিহর তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কিছু সাহায্য বুঝি?" সন্ন্যাসী তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না, কহিল, "খাটী তোর ভাল ছিল নষ্ট করে ফেলেছিস, নজর তোর নীচের দিকে। বেশী দিন তোর আর নেই, যেতে হবেই, ওখানে গিয়ে কি জবাব দিবি? কে তোর উকিল হবে? কেউ না।" হরিহর ব্যঙ্গের হাসি হসিলেন, কিন্তু মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেন। সন্ন্যাসীকে বেশী পাত্তা দিলেন না। সন্ন্যাসী হরিহরের নিকট হইতে কিছু উৎসাহ না পাইয়া প্রস্থান করিল।

সেই দিনই বাথ্-রুমে স্নানের সময় হরিহর আছাড় খাইলেন। পেটে বেদনা ধরিল। সন্ধ্যার পর সোডা ও হুইস্কির পরিমাণ দ্বিগুণ করাতেও কোন ফলোদয় হইল না। বেদনা সারিল না।

কিন্তু তথাপি পরদিন কাছারী যাইতে হইল। কাছারী হইতে ফিরিয়া হাত-মুখ ধুইয়া চা খাইতে খাইতে টেবিলের উপর এক বাক্স চিঠির মধ্য হইতে কন্যার হস্তাক্ষর দেখিয়া বাছিয়া একখানি চিঠি খুলিয়া পাঠ করিলেন। চিঠি পড়িয়া চা আর ভাল করিয়া খাওয়া হইল না। দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাড়ীর মধ্যে উপরের ঘরে আসিলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে ডাকিলেন, "পরী, পরী!"

পরী আসিয়া উপস্থিত হইল।

"তোমাকে বলছি যে, গঙ্গার ধারে ঐ ছোট বাড়ীটায় যাও, এক মাস থেকে বলছি। আমার এক মাত্র মেয়ে, জামাই, তার ছেলে-পিলে কেউ আসবে না আমার বাড়ীতে —তোমার জন্য?"

পরী খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আমি থাকলে আপত্তি কি, তাকে ত আমিই মানুষ করেছি।"

হরিহর বলিলেন, "তর্ক করলে কোন লাভ হবে না পরী। তোমাকে যেতেই হবে। আমি বাড়ীটার সব ব্যবস্থা করে এসেছি, গঙ্গার ওপরেই। যদিও ছোট বাড়ী, কিন্তু সুন্দর, চমৎকার।"

পরী তর্ক করিল না। ঘর হইতে চলিয়া গেল।

কাছারী হইতে ফিরিয়া হরিহর নিত্য-নিয়মিত বাড়ীর সম্মুখে উদ্যানে পাদচারণা করিতেন। আজিও অভ্যাস-

মত বাগানে গেলেন বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে প্রথম যৌবনের কথা মনে পড়িল কী উত্তম, কী উৎসাহ লইয়া জীবন আরম্ভ করেন, বিবাহ করেন, কী উৎসাহে এই বিরাট অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

পত্নীর কথা মনে পড়িল। সুষমা অসাধারণ সুন্দরী হইলেও পল্লীবালা। স্বামীর সহিত টেবিলে খানা খাওয়া, মেমদের ন্যায় জুতা পরিয়া মোটরে স্বামীর সহিত পাউডার-রুজ মাখিয়া বেড়াইতে তাঁহার ঘোর আপত্তি ছিল। হরিহর হার মানিয়া স্ত্রীর জন্য পূজার দালান, সম্পূর্ণ আলাদা এক অন্তঃপুরের সৃষ্টি করিলেন। সেখানে খানসামার যাইবার হুকুম ছিল না।

হরিহর পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন। বাড়ীতে ড্রেসিং-গাউন পরেন। টেবিলে আহার করেন। স্ত্রীর জীবিতকালে রাত্রে স্ত্রীর অনুরোধে স্ত্রীর নিকটে আহার সমাধা করিতেন। স্ত্রীকে তিনি ভাল বাসিতেন। যখন স্ত্রী ধমক দিয়া তাঁহাকে পরিহিত কাপড় ছাড়াইয়া নিজের ঘরে গঙ্গাজলে শোধিত কাপড় পরাইতেন, তখন মুখে আপত্তি জানাইলেও হরিহর স্ত্রীর কথা মত কার্য্য করিতে পাইয়া আনন্দিত হইতেন। স্ত্রী যখন পূজা সাঙ্গ করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিতেন, তাঁহার উচ্চশির সুষমার নিষ্ঠা-পবিত্রতার কাছে নত হইয়া আসিত।

এইরূপ ভাবে জীবন কাটিতেছিল। হঠাৎ কন্যা যখন তিন বৎসরের, সুষমার কী রোগ হইল বোঝা গেল না। নানা চিকিৎসায় তাঁহার কিছু হইল না। সুষমা শিশু রমলাকে রাখিয়া জগৎ হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিলেন।

হরিহর জীবনে এই প্রথম আঘাত পাইলেন। ব্যবহার-জীবীদের মধ্যে নিজের কৃতিত্ব সপ্রমাণ করিয়া, সংসারের সব সুখের আয়োজন এমনভাবে উদ্‌যাপিত করিয়াও এ কি হইল? এই দুঃখ-কষ্টকে দমন করিবার নিমিত্ত তিনি হুইস্কি ধরিলেন। অনেকে বিবাহ করিতে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিল। হরিহর কিছুতেই বিবাহ করিলেন না।

তখন সেই শিশু-কন্যার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাঁহার এক মক্কেল এই পরী-কে আনিয়া দেয়। তাহার ত্রি-কুলে কেহ নাই, অসাধারণ সুন্দরী, বিধবা, তরুণী। সে কন্যার তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিল। তাহার পর-ই হরিহরের মনে পড়িল, পরীর প্রতি তাঁহার আকর্ষণের কাহিনী।

হরিহর বিদ্বান পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল। সে-ধারণা থাকা স্বাভাবিক। আইনে তাঁহার ন্যায় কূট তার্কিক কেহ ছিল না। সুতরাং সেকালের ব্যক্তি যেরূপ করে, নিজের ... প্রবৃত্তিকে বই-পড়া দর্শনের বুলি আওড়াইয়া সমর্থন করে—হরিহর পরীর প্রতি তাঁহার মনোভাবকে ঠিক সেইরূপ ভাবে সমর্থন করিলেন। নানা যুক্তি দিয়া বিচার করিলেন যে, পরাগ বা পরীর প্রতি যদি তিনি আকৃষ্ট হইয়াই থাকেন তো কী অন্যায় হইয়াছে?

হরিহর এই পরীকে লইয়া সুখেই জীবন কাটাইবেন ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু কন্যা ক্রমশঃ বড় হইল। কন্যার বুদ্ধি-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সম্মুখে তাঁহার পরীকে লইয়া থাকিতে অসুবিধা বোধ হইল। কন্যাকে মাতুলালয়ে পাঠাইলেন। সেই স্থানেই বিবাহ দিলেন—বিলাতফেরৎ জামায়ের সহিত। জামাতা প্রমথ বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, চরিত্রবান্। নিশ্চিন্ত হইয়া ভাবিলেন, এইবার তাঁহার শান্তি আসিবে। কিন্তু কন্যা-জামাতা বাদ সাধিল। পরীকে হরিহরের জীবন হইতে দূর করিতে তাহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিল।

প্রায় এক মাস অতীত হইয়াছে। পরী তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছে। হরিহরের শরীর খারাপ খবর পাইয়া কন্যা-জামাতা আসিয়াছে।

শরীর ভাল যাইতেছে না হরিহরের। পেটে বেদনা মাঝে মাঝেই হইতেছে। বেদনার কথা তিনি ভুলিতে চেষ্টা করিতেছেন মক্কেলের ব্রিফ-এর মধ্যে, কিন্তু তাহাও তাঁহাকে বেদনার কথা ভুলাইতে পারিতেছে না। সন্ন্যাসী বলিয়া গিয়াছে, বেশী দিন তাঁহার আর নাই। তিনি সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু মনে মনে বুঝিতেছেন, তাঁহার মৃত্যু-ভয় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

ঈশ্বর নাই, পরকাল নাই, সমাজ নাই, নীতি নাই, চরিত্র-শুদ্ধি একটা কুসংস্কার, এই সব মতামত যাহাতে

আছে, সে সব পুস্তক তাঁহার কণ্ঠস্থ, কিন্তু তবুও মৃত্যু-ভয় উপস্থিত হইয়াছে। পেটের বেদনা যদি কিছু সাংঘাতিক রোগের অগ্রদূত হয়—এ কথাও মনে হয়। মৃত্যুর পর কোথায় যাইবেন, তাহা আজকাল হরিহর প্রায়ই চিন্তা করেন।

জ্যোৎস্না রাত্রি। হরিহর গঙ্গার তীরে বেড়াইতে গিয়াছেন। এমন এখন প্রায়ই যান। জ্যোৎস্নার আলোতে গঙ্গার শোভা অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত হইয়াছে। হরিহর ভ্রমণ করিতে করিতে একাকী গঙ্গার তটে যে দিকে বিরাট শ্মশান, সেই দিকে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া জ্যোৎস্নালোকিত শ্মশানের দিকে চাহিয়া আছেন। একটি চুল্লী নিভিল আর এক চিতায় আগুন ধরাইল, চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন। হরিহর পাশ্চাত্য লজিকে পড়িয়াছিলেন "All men are mortal, John is a man, John is mortal", কিন্তু কখনও নিজেকে 'জনের' অবস্থায় কল্পনা করেন নাই; আজ তাঁহার মনে হইতেছে, একদিন তাঁহাকেও যাইতে হইবে, কিন্তু কোথায় যাইবেন? সুষমা তো অনেকদিন পূর্ব্বে নিজেকে 'জনে'র সহিত কল্পনা করিয়াছিলেন, তিনি তো হাসিতে হাসিতে স্বামীর পদধূলি মাথায় লইয়া সিঁদুরে ভূষিত হইয়া সমগ্র সহরের পুরনারীর শ্রদ্ধা লইয়া মহা-প্রস্থান করিয়াছেন। তখন কি হরিহরের মনে হয় নাই যে, তাঁহাকেও যাইতে হইবে? হয় তো হইয়াছিল, কিন্তু রঙ্গীন নেশা যে-সুখস্বপ্নের জাল বুনিয়াছিল, সেই জালের মধ্যে পরীর আবির্ভাবে তিনি স্বপ্নরাজ্যেই বাস করিতেছিলেন। সে জাল আজ ছিন্ন।

নদীর তীর ক্রমশঃ জনশূন্য হইতেছে। সান্ধ্যবিহারী একে একে সব গৃহে ফিরিতেছে। পারের খেয়া-নৌকা শেষ পাড়ি দিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

দুইটি যুবক বেড়াইয়া ফিরিতেছিল। হরিহর তাহাদের একজনকে চিনিয়া ডাকিয়া বলিলেন, "কে, পরেশ? বেড়িয়ে ফিরছ? ইনি—হ্যাঁ চিনি-তো, বেশ গান করেন—কবিও বটে। কি নাম যেন? আমারই নামের মতন, অদ্ভুত নাম না?" পরেশ হাসিয়া বলিল, "হাঁ ভজহরি।" হরিহর বলিলেন, "আমার নাম দিয়েছিলেন মামা 'হরিহর' হরিকেও কোনদিন মানি নে হরকেও না—আর ওঁর নাম ভজহরি, imperative, হরিকে ভজনা করতেই হবে—না?"

হরিহর ইদানীং কথাবার্তা এইরূপ ভাবে বলেন, ডাক্তারেরা আশঙ্কা করিতেছেন, মাথা সামান্য খারাপ হইয়াছে।

পরেশ তাহা জানিত, বলিল, "আপনি একলা খালি পায়ে এত রাত্রে শ্মশানের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছেন?" ভজহরি বলিল "আপনার মামার কিছু psychology-তে জ্ঞান ছিল, হয় নামটার সার্থকতা আছে।" হরিহর বলিলেন, "কেন?" ভজহরি বলিল, "ভূতনাথ কি না। তাই শ্মশানচারী।" হরিহর বলিলেন, "কি রকম?"

ভজহরি আবৃত্তি করিল,

"ভূতনাথ ভব ভীম বিভোলা, বিভূতিভূষণ ত্রিশূলধারী
ভুজঙ্গ ভৈরব বিশাল ভীষণ, ঈশান শঙ্কর শ্মশানচারী
বামদেব শিতিকণ্ঠ উমাপতি, ধূর্জটী পশুপতি রুদ্র পিনাকী
মহাদেব মৃড়শম্ভু বৃষবাহন, ব্যোমকেশ ত্র্যম্বক ত্রিপুরারি।
হাড় কপর্দী শিব পরমেশ্বর, মৃত্যুঞ্জয় গঙ্গাধর স্মর-হর
পঞ্চবক্ত্র হর শশাঙ্ক শেখর, কৃত্তিবাস কৈলাস বিহারী।"

হরিহর উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "কতকগুলো কষ্টকল্পনা, তাই নিয়ে আমরা বেশ আছি। মরে গেলে কোথায় যাব তা তো আজ পর্য্যন্ত কেউ বলতে পারলে না, তার। তোমরা বলতে পার?"

পরেশ ভজহরি দুইজনেই চুপ করিয়া থাকে, ইহার উত্তর কি দিবে?

পরেশ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার শরীর কেমন?"

হরিহর বলিল, "বড় বড় ডাক্তার দেখেছে, এক্স-রেও করেছে, কিন্তু পেটের বেদনা বেশ রয়েছে, আগেকার মতই।"

এই সময়ে দূরে একটি মোটরগাড়ী আসিয়া থামিল, গাড়ী হইতে একটি মহিলা ও একজন ভদ্রলোক নামিলেন।

পরেশ ও ভজহরি দেখিয়া বলিল, "আপনার বাড়ী থেকে বোধ হয়।" হরিহর চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, "রমলা ও প্রমথ আসছে বোধ হয়।" আগন্তুকদ্বয় রমলা ও প্রমথই বটে। রমলা নিকটে আসিয়া পিতার হাত ধরিল, বলিল,

"বাবা রাত হয়েছে, এখনও বাড়ী ফের নি, কত যে ভয় হচ্ছিল।"

হরিহর হাসিয়া বলিলেন, "প্রমথ, রমলা মনে করে, বাবা পাগল হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ভাবে না যে পাগল যদি হয়ই, তবে সাধারণ পাগল হবে না, যাতে পাগলা কালীর' বালা পরিয়ে দিলেই বাবা সেরে যাবে।" আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, রমলা পিতার মুখ চাপিয়া বলিল, "ও কথা ব'লো না বাবা, অমঙ্গল হবে।"

হরিহর মুখ ছাড়াইয়া বলিলেন, "প্রমথ, আমি পাগল হতে পারি, কিন্তু সেই হ্যামলেটের মত, there must be some method in my madness, লজিকে ভুল পাবে না। তর্কে আমি জিতবই।" বলিয়া রসিকতা করিয়াছেন বুঝাইবার জন্য হাসিয়া উঠিলেন।

রমলা ও প্রমথ হরিহরকে সঙ্গে করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। পরেশ ও ভজহরি দূরে দাঁড়াইয়া সব কথা-বার্ত্তা শুনিয়াছিল। ভজহরি বলিল, "পরেশ, হরিহর বাবুর অবস্থা পাবার জন্য এত লালায়িত ছিলুম, আর আজ? সত্যি দুঃখ হয়। কি মহাপ্রাণ লোক, কত জুনিয়ার উকীল সকলকেই সাহায্য করেন, তোমার এক কথাতেই আমাকে নিলেন, বেশ পয়সাই পাচ্ছি, কিন্তু ভদ্রলোককে দেখে···।"

দুইজনে কথা কহিতে কহিতে অগ্রসর হইল। কথায় কথায় পরীর কথা আসিয়া পড়িল। ভজহরি পুরাতন কাহিনী সম্পূর্ণ জানিত না। পরেশ বলিল, "হরিহরবাবু রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কন্যার শিশু অবস্থায় এই স্ত্রীলোককে রাখেন, স্ত্রী-বিয়োগের পর। তারপর বুঝতেই পারছ, এই ব্যাপার নিয়ে সহরে যে কুৎসা রটেনি তা নয়, কিন্তু যারা কুৎসা রটাল, তাদের কণ্ঠ-রোধ করতেও বেশী দেরী হয় নি ওঁর। প্রত্যেকের ছেলে, না হয় ভায়ে, না হয় জামাইকে কমিশনার বা ম্যাজিষ্ট্রেট বা জজ সাহেবকে বলে ভাল চাকুরী জুটিয়ে দিলেন। কি খাতির হে! কমিশনার সাহেবের সঙ্গে মেমের ঝগড়া হলে মিঃ চক্রবর্ত্তীর কাছে আসত বিবাদ মেটাতে।"

ভজহরি। বল কি হে!

পরেশ। তুমি জান না? প্রায় দুই বছর আগে হরিহর বাবু উধাও হয়েছিলেন তিন মাসের জন্য। কমিশনার ফার্গুসন সাহেব কেঁদে খুন।

ভজহরি। হরিহরবাবুর উধাও হলেন তো কমিশনার সাহেব কেঁদে খুন কেন?

পরেশ। মেমকে নিয়ে উধাও হয়েছিলেন মার্সাই-এ। ভারী সুন্দরী মেম।

ভজহরি। একেবারে ফরাসীদেশে? কমিশনার কিছু বললে না?

পরেশ। কি আবার বলবে? মেম যে ফিরে এসেছে তাতেই খুসী। আর বলবে কি? ইউরোপিয়ান ক্লাবে কি কম টাকাটা দিতেন হরিহরবাবু! বিলিয়ার্ডটেবল সারাতে হবে, বল-নাচের জন্য কাঠের মেঝে তৈরী করে সোডা ওয়াটারের বোতল দিয়ে ঘসে ঠিক করা, এ সব হরিহরবাবুর টাকায়; হুইস্কি, শ্যাম্পেন, দামী দামী মদ অফুরন্ত হয়ে আসে হরিহরবাবুর কৃপায়। সুন্দর দেখতে,—মস্ত Shakespearian scholar, নাচতে পারেন খুব ভাল, সোজা ব্যাপার! ওকে চটাবে সাহেবরা!

ভজহরি। আশ্চর্য্য।

পরেশ। জেলার এই রকম অবস্থা হয়েছিল যাতে যে কোন সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট বা কমিশনার মেম সাহেবকে নিয়ে এই খানে বদলী হয়ে আসতে চাই ত না, ঐ হরিহরবাবুর জন্য, মেম বিগড়ে যাবে এই ভয়ে। মেম বিগড়োতে হরিহরবাবু অদ্বিতীয়।

ভজহরি। সেই হরিহর বাবু ময়লা শার্ট গায়ে দিয়ে নগ্ন পদে শ্মশানের কাছে নির্জ্জনে তাকিয়ে আছেন চিতার দিকে?

রাত্রি হইয়াছিল, আর বেশীদূর আলোচনা অগ্রসর হইল না।

প্রায় মাসখানেক পরে একদিন প্রভাতে হরিহর শয্যা হইতে উঠিতে চেষ্টা করিতে গিয়া দেখিলেন, পা সাড়া দেয় না। কি হইল? সমস্ত রাত্রি নিঝুম অবস্থায় কাটাইয়াছেন। ডাক্তার হুইস্কি বন্ধ করিয়া দিয়াছে, স্লিপিং ড্রাফিং ঔষধের সহিত মিশাইয়া দেওয়া হয় ও মর্ফিয়া

ইন্‌জেকশন করা হয়। এক্স-রে করা হইয়াছে। কলিকাতা হইতে বড় বড় ডাক্তার আসেন, যান, মোটা মোটা ফি গ্রহণ করেন, কিন্তু কি যে হইয়াছে তাহা হরিহর জানেন না। পেটের বেদনা সমানই আছে, মুখ বিস্বাদ, যাহা ভোজন করেন, হজম হয় না।

প্রায় মাসাধিক বিছানায় শুইয়া আছেন। কখন প্রভাত হইতেছে, কখন সন্ধ্যা হইতেছে, কখন রাত্রি হইতেছে, তাহা লোক-জনের দয়াতে জানিতে পারেন। ডাক্তার অবশ্য বলিতেছে, ভাল হইবেন। হরিহর কখনও বিশ্বাস করেন, কখনও বা অবিশ্বাসের হাসি হাসেন।

প্রভাত হইয়াছে, বিছানা ছাড়িয়া এখনও উঠেন নাই দেখিয়া নিধি বেয়ারা জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, চেয়ারে বসিয়ে দেব?" হরিহর হাসিয়া বলিলেন, "আমাকে ধরে তোল্‌।" নিধির সুন্দর বলিষ্ঠ হাত যৌবনের সংস্পর্শে যেন হরিহরকে আনন্দ দান করিল। নিধি হরিহরকে ড্রেসিং-গাউন পরাইয়া দিল। নগ্ন গাত্র দেখিতে সাহস ছিল না, আয়নাতে মুখ দেখিলেন। মুখের আকৃতি সুবিধা না হইলেও ভীতিপ্রদ নহে।

রমলা আসিয়া কাছে দাঁড়াইয়া, মাথায় হাত বুলাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, একটু চা খাবে?' হরিহর বলিলেন, "হাঁ, চা খাব।" রমলা বেহারাকে চা আনিতে বলিল। হরিহরের চা খাইতে ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু মনে করিলেন, সংসারের পারিবারিক নিয়ম মানিয়া চলিতেই হইবে। চা যখন সকলে খায়, আমাকেও সেই সঙ্গে তাহাতে যোগ দিতে হইবে। চা আসিল। রমলা চা দিয়া পিতাকে বলিল, "বাবা তুমি আজ অনেক ভাল।"

প্রমথ ডাক্তারের বাড়ী যাইবে। ঔষধের পরিবর্তন করা দরকার, সিভিল সার্জ্জন বলিয়াছেন। রমলা স্বামীকে সমস্ত বুঝাইবার জন্য অন্য ঘরে চলিয়া গেল।

নিধি নিকটে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। হরিহর নিধিকে বলিলেন, "কি নিধি, দাঁড়িয়ে আছিস যে?" নিধি বলিল, "বাবা, বড় চেহারা খারাপ হয়েছে আপনার। বড়ই কষ্ট পাচ্ছেন বাবা।" হরিহর নিধিকে কাছে টানিয়া বলিলেন, "নিধি, তাই বোধহয়, আমার একটুও ভাল লাগছে না। কাল রাত্তিরে যে রকম আমার পা দুটো উঁচু করে তোর ঘাড়ের ওপর রেখেছিলি, তাই কর তো; দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আয়। তোর দিদিমণি দেখলে বকাবকি করবে।" নিধি দরজা বন্ধ করিয়া চেয়ারের উপরে বসিয়া ধীরে ধীরে হরিহরের পা-দুটী ধরিয়া নিজের ঘাড়ের উপর রাখিল। হরিহর বলিলেন, "আঃ বাঁচলাম!" নিধি বলিল, "বাবা, দিদিমণি বকাবকি করবেন কেন?" হরিহর বলিলেন, "ভাববে পাগলামী। ডাক্তার মানা করছে ও রকম করতে। আমার আরাম হয়, সেটা না কি মনের ভুল"—কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "পা নাবিয়ে দে, কে দরজা ঠেলছে।"

দরজা ঠেলিতেছিল প্রমথ। ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "সিভিল সার্জ্জন বললেন যে, আর একবার এক্স-রে করা দরকার। লিভার কি ইন্‌টেসটাইন···"

হরিহর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "প্রমথ, যা করতে হয় কর—আমাকে আর বিরক্ত কর না। আমার অন্তিম ঘনিয়ে আসছে, সেটা ডাক্তাররা কিছু ভাবছেন না, সেটা বিশেষ দরকারী কথা নয়। তাঁদের লিভার না ইন্‌টেস-টাইন···এইটেই বড় কথা, না?" প্রমথ আর কোন কথা বলিল না।

কিছুক্ষণ পরে বেয়ারা আসিয়া ষ্টেটস্‌ম্যান ও পত্র দিয়া গেল। হাজারীবাগের ছাপ দেখিয়া হরিহর পত্র খুলিলেন। নিধিকে বলিলেন, "চশমাটা দে তো নিধি।" পরাগের চিঠি, হাজারীবাগে গিয়া সে পত্র দিয়াছে। পত্রে লিখিতেছে—

> "আপনার মেয়ে আমাকে অপমান করিয়া এখানে পাঠাইয়াছে· আমি যে মাঝে মাঝে দেখি আপনাকে, তাহাও তাহার ইচ্ছা নয়। আমার দোষ কি? আমি কী করিয়াছি - দোষ যদি থাকে তো সম্পূর্ণ আপনার, আপনি বাবা, সুতরাং সব দোষ মাপ, আর আমিই যত দোষ করিয়াছি! আপনি যা ব্যবস্থা আমার করিয়াছেন, তাহাই আমার ভাল—আমার কিছু বলিবার নাই। আপনার কন্যা আপনার নামের চিঠি লইয়া পাঠ করে, আপনাকে দেয় না। নিজে অপমান করিয়া আমাকে তাহার উত্তর দেয়। সেই কারণে রামবাবু মোক্তারের কাছে পত্র দিতেছি, পত্র নিশ্চয়ই পাইবেন।"

পত্র পাঠ করিয়া নিধিকে বলিলেন, "দেশলাই নিয়ে এই চিঠিটা পুড়িয়ে ফেল তো।" নিধি তাহাই করিল। রামবাবুর সহিত পরাগের ঘনিষ্ঠতা হইতেছে দেখিয়া তিনি চিন্তিত হইলেন। অনেক অনাথা বিধবার টাকা সে আত্মসাৎ করিয়া বড় লোক হইয়াছে। মনে মনে ভাবিলেন, ঠিক সময়েই রামবাবু উপস্থিত হইয়াছেন।

রমলা আসিল সুপ্‌ লইয়া। হরিহর বলিলেন, "খুকী, আর কত কষ্ট করবি আমার জন্য?" রমলা চোখ মুছিয়া বলিল, "কিছু কষ্ট নয় বাবা।" সুপ্‌ খাওয়াইয়া রমলা নিধিকে বলিল, "খাটে সাবধানে শুইয়ে দে।" নিধি হরিহরকে ধরিয়া খাটে সন্তর্পণে শয়ন করাইল। ঘর অন্ধকার করিয়া রমলা পিতার শিয়রে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। হরিহর ডাকিলেন, "খুকী।" রমলা বলিলেন, "না বাবা, কোন কথা নয়, ঘুমোও।"

দিন পনেরো পরে সন্ধ্যার সময়, হরিহর ঘরে অর্দ্ধ-নিদ্রিত ভাবে শয়ন করিয়া আছেন। জানালার মধ্য দিয়া সন্ত সন্ত পূর্ণ চন্দ্রের আলোক আসিয়া পড়িয়াছে। কয়দিনে অবস্থা আরও খারাপ হইয়াছে। কাল রাত্রি হইতেই তিনি আর শয্যাতেও উঠিয়া বসিতে পারিতেছেন না। রমলা তাঁহারই পথ্যের ব্যবস্থা করিতে বাহিরে গিয়াছে। নিধি মাথার কাছেই আছে।

নিধিকে বলিলেন, "নিধি, ভাল করে জানলা খুলে দে। চাঁদ ভাল করে দেখি, দে জানলা খুলে দে, একবার ভাল করে দেখি।"

চাঁদ দেখিবার জন্য উঠিতে গিয়া পারিলেন না, অসহ্য যন্ত্রণাবোধ করিলেন, বলিলেন, "উঃ! উঃ! বড় যন্ত্রণা, বড় যন্ত্রণা! ডাক্তারে কিছু করতে পারছে না নিধি। পা দুটো তুলে··" নিধি তাহাই করিল। যন্ত্রণা একটু কমিলে হরিহর বলিলেন, "দেখ নিধি, জামাইবাবুর কাছে কাগজে লিখে দিয়েছি, যত দিন তুই বেঁচে থাকবি, মাসে ত্রিশ টাকা করে পাবি। কেউ আটকাতে পারবে না।"

নিধি কাঁদিয়া ফেলিল।

"কাঁদিস্ কেন, হ্যাঁ রে?" হরিহর একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া থামিয়া নিধিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ রে, মরে গেলে মানুষ কোথায় যায় জানিস?" নিধি চোখ মুছিয়া অম্লান বদনে উত্তর দিল, "হ্যাঁ বাবা, জানি। ভাল লোক স্বর্গে যায় ভগবানের কাছে, যেখানে মা গিয়েছেন।"

হরিহর খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "ভগবানকে দেখেছিস?"

নিধি উত্তর দিল, "হ্যাঁ বাবা, অনেক বার।"

নিধির কথায় এত কষ্টের মধ্যেও আবার তাঁহার হাসি আসিল। নিধি বলিল, "আগে রোজ দেখতে পেতাম, আজকাল আর রোজ দেখতে পাই না।"

হরিহর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় রোজ দেখতে পেতিস্?" নিধি বলিল, "মার পুজো হয়ে গেলে সোনার গোপালকে গড় হয়ে প্রণাম করতাম। মা বলেছিলেন, ঐ ভগবান···"

হরিহর কিছু বলিলেন না। এই সরল বিশ্বাস যদি তাঁহার থাকিত, তাই ভাবিলেন। প্রমথ ও রমলা আসিল। হরিহর বলিলেন, "বাইরে একটু গোলমাল হচ্ছিল না প্রমথ?" প্রমথ বলিল, "কয়েকজন খবর নিতে এসেছেন আপনার।" হরিহর বলিলেন, "আর খবর!"

দ্বারের নিকটে পোষা কুকুরটা করুণ চীৎকার আরম্ভ করিয়াছে। প্রমথ নিধিকে বলিল, "দেখ জ্যানি ছাড়া পেয়েছে, একেবারে এখানে আসবে।"

হরিহর বলিলেন, "আসতে দাও, আসতে দাও জ্যানীকে।"

নিধি দরজা খুলিয়া জ্যানীকে আনিল। প্রকাণ্ড গ্রেট-ডেন কুকুর, শয্যার পার্শ্বে আসিয়া করুণ মুখে প্রভুর দিকে তাকাইল, লেজ নাড়িল, আস্তে আস্তে শয্যাপার্শ্বে মেজেতে বসিল। জ্যানির চোখ হইতে জল পড়িতেছে।

হরিহরের তন্দ্রা আসিয়াছিল; হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "আর পারছি নে, গেলাম, গেলাম, উঃ উঃ গেল গেল!" রমলা মাথায় বাতাস করিতেছিল। প্রমথ নিকটেই ছিল। কি করিবে স্থির করিতে না করিতেই হরিহর অর্দ্ধোত্থিত ভাবে শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, "তোমরা দেখতে পাচ্ছ না ছায়া, ও কিসের ছায়া?"

রমলা বলিল, "ও জ্যানি শুয়ে আছে বাবা।"

হরিহর ডাকিলেন, "জ্যানি।" জ্যানি লাফাইয়া উঠিল। শীর্ণহাত দুবার তাহার মুখে বুলাইয়া বুলাইয়া বলিলেন, "জ্যানি জ্যানি গো।"

জ্যানি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিল।

হরিহর তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "খুকী, ও বুঝতে পেরেছে, আমি চলে যাব, তাই ঘর ছেড়ে যেতে চাইছে না।" মুখের কথা কথা শেষ হইল না, মাথাটা বালিশ হইতে এক পাশে পড়িয়া গেল।

রমলা 'বাবা গো' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। প্রমথ তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া একদাগ ঔষধ খাওয়াইল। খানিক নিঝুম হইয়া পড়িয়া থাকিয়া পুনর্ব্বার হরিহর চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "গেল, গেল, কে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। খুকী, প্রমথ, ধর, আমায় বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে, ওহো ওহো রক্ষা কর আমায়। প্রমথ, খুকী, ঐ-ঐ-ঐ কি ভয়ানক—এল!"

হরিহর অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, আর জ্ঞান হইল না।

মধ্য-ইউরোপের সঙ্কট

—শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

সংপ্রতি রুমানিয়ায় অক্টেভিয়াস গোগার মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত্যু কেবল অনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু নয়। এই একটি ব্যক্তির মৃত্যুতে সমগ্র ইউরোপের, বিশেষ করে মধ্য-ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তন ঘটবে। কেন, বর্ত্তমান সম্বর্ন্ধে সেই আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে গোগার জীবনের একটি চিত্র আঁকবার চেষ্টা করা হয়েছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে রুমানিয়ার রাজা ক্যারল মঁসিয়ে গোগাকে মন্ত্রিসভা গঠনের ভার দিলে দেশের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য পড়ে যায়,—শুধু রুমানিয়াই নয়, সমগ্র ইউরোপই চিন্তিত হয়ে ওঠে। গোগার দল সংখ্যা-গরিষ্ঠ ছিল না (মাত্র ৯·৭ শতকরা), তথাপি তাঁকেই প্রধান মন্ত্রী করার মধ্যে একটা কূটনীতি ছিল। মৃত্যুর পূর্ব্বেই গোগা-মন্ত্রিমণ্ডলের পতন হয়, কিন্তু ফ্যাসিষ্ট ডিক্টেটারদের চক্রান্তে সমগ্র মধ্য ও পূর্ব্ব-য়ুরোপে যে ভাঙ্গা-গড়ার খেলা চলেছে, তার ছায়া রুমানিয়ার উপর এখনও রয়েছে। সুতরাং রুমানিয়ার রাষ্ট্রনীতিতে গোগা-মন্ত্রিমণ্ডলের পতন কিংবা তাঁর মৃত্যুই শেষ কথা নয়। ঘটনার আবর্ত্তে আকস্মিক এবং অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তনের আশঙ্কা রয়েছে।

"লৌহ-বাহিনী"র (Iron Guard) ক্রমবর্দ্ধমান শক্তিতে ভীত ও বিচলিত হয়ে রাজা ক্যারল তাঁদের শক্তিকে খর্ব্ব করবার জন্ত মঁসিয়ে গোগাকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্ত আহ্বান করেন। বস্তুত 'লৌহ বাহিনী' রাজ-শক্তির পক্ষে চিন্তার কারণই হয়ে উঠেছে। তরুণ ছাত্র কড্রিনিউ এই দল প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৬ সালে জ্যাসি বিশ্ববিদ্যালয়ের হাঙ্গামার সময় ইহুদী-ছাত্রদের রক্ষা করতে গিয়ে রেক্টর ম্যানসিউ এদের গুলিতেই নিহত হন। তখন কৃষক ছাত্রদের নিয়েই এই দল গঠিত হয়েছিল। ১৯৩৩ সালে ডিউকা এই দল ভেঙ্গে দেন। তার অল্প পরেই ডিউকা নিহত হন এবং লৌহ-বাহিনীর সমস্ত নেতা গ্রেপ্তার হয়। পরে জেনারেল ক্যান্টাকুজিনো-গ্রানিসেস্কল পূর্ব্বের নীতিতেই 'All For the Fatherland' নাম দিয়ে পুরান দলটিকে পুনরুজ্জীবিত করেন। অল্পদিন থেকে এই দলের উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তারা একটা লেবার সার্ভিস খুলেছে এবং স্পেনে ফ্রাঙ্কোর সাহায্যের জন্ত সাতজন প্রধান সদস্যকেও পাঠিয়েছে। তাদের মধ্যে দুজন নিহত হলে, বুকারেস্তে যথেষ্ট সমারোহ হয়েছিল। বুকারেস্তের শ্রমিক মহলেও এদের প্রভাব ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে।

নানা সময়ে এরা রাজার কাজের তীব্র সমালোচনা করেছে। তাঁর অধিকার খর্ব্ব করবার দাবী জানিয়েছে এবং তাঁর অনেক ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধা সম্বন্ধেও প্রতিবাদ করেছে। কড্রিনিউ মুসোলিনীর মত রুমানিয়ার ডিক্টেটার হতে চান।

তাঁর প্রভাব খর্ব্ব করবার জন্ত রাজা ক্যারল গোগাকে অবলম্বন করেন। সমর, নৌ-বাহিনী, বিমান-বাহিনী ও পুলিস-বাহিনীর মন্ত্রিপদে বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিকে বসানই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।

গোগার যোগ্যতা

গোগার যোগ্যতা ছিল তাঁর অসামান্ত নিষ্ঠুরতা। ১৯২৭ সালে যখন তিনি স্বরাষ্ট্র-সচিব ছিলেন, তখন অসীম নিষ্ঠুরতার সঙ্গে একটা কয়লা-খনির ধর্ম্মঘট দমন করেছিলেন। কিন্তু সৈন্ত-বিভাগের উপর তাঁর বিশেষ প্রভাব ছিল না, বরং লৌহ-বাহিনীর প্রভাবই বেশী। রুমানিয়াতে তিনি 'ইহুদী-খাদক' (Jew-eater) নামে পরিচিত। 'প্যারিস মিডি' কাগজে তাঁর সম্বন্ধে এই রকম একটা বর্ণনা দিয়েছে,—

> "Thickset, with hair thrown back, a smooth face, bright sparkling eyes, and a chin trust defiantly forward, Octavian Goga, the "Jew-eater," has the physique of a fighter, of a man who loves and looks for battle."

নিখিল-জগৎ তুবড়ী-প্রতিযোগিতা



গান্ধীজী—…হিটলার তরবারির সাহায্যে উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিয়াছেন, কিন্তু আমি অহিংস শক্তির সাহায্যে তাহা করিতে চাহি…। (ওয়ার্ধা, ২১শে এপ্রিল)

—অর্থাৎ বেঁটে, খাটো, মোটা, মাথার চুল পিছন দিকে ফেরানো, চাঁছা-ছোলা মুখ, উজ্জ্বল চোখ, চিবুক যেন সব সময় বে-পরোয়াভাবে উদ্ধত হয়ে আছে—'ইহুদী-খাদক অক্টেভিয়ান গোগার গড়ন সমর-পিপাসু যোদ্ধার মত।

জন্ম-কথা

১৮৮১ সালে ট্রানসিলভ্যানিয়ায় তাঁর জন্ম হয়। তখন সেটা হাঙ্গেরীর অধীনে ছিল। বুডাপেষ্ট বিশ্ব বিদ্যালয়ে ম্যাগিয়ার অধ্যাপকদের কাছে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। সে সময় হাঙ্গেরীয়ানরা ট্রানসিলভ্যানিয়ার রুমানিয়ানদের "Stinking Olaks" বলে ঘৃণা করত। গোগা তাঁর অধ্যাপকদের কাছ থেকে যে শিক্ষা পেতেন, তাতে তাঁর দেশপ্রেমিক মন কেবলই বিদ্রোহ করত। তিনি ছিলেন যাকে বলে "irredentist"। বলতেন, ট্রানসিলভ্যানিয়ার লোকেরা যখন শিক্ষায় সংস্কৃতিতে, ভাবে ভাষায়, আকারে ব্যবহারে এবং জাতি হিসাবে রুমানিয়ান, তখন তা রুমানিয়ার অন্তর্ভুক্ত হওয়াই উচিত। এই মত-প্রচারের জন্যে তিনি রুমানিয়ান ছাত্রদের নিয়ে একটি দল গঠন করলেন। অচিরে এই দলের কার্য্যকলাপ রেক্টরের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে এবং তাঁকে বুডাপেষ্ট বিশ্ব-বিদ্যালয় ত্যাগ করতে হল।

সেখান থেকে তিনি গেলেন বার্লিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে। কাইজার প্রথম উইলহেলমের জার্ম্মানী তাঁকে একটা অভিনব শক্তির সন্ধান দিল। তিনি বুঝলেন, জীবন-সংগ্রামে জয়ী হতে হলে ইচ্ছা-শক্তির চেয়ে বড় আর কিছুই নেই। জার্ম্মান চিন্তা-ধারার মদ তিনি আকণ্ঠ পান করলেন।

রুমানিয়ায় তখন দুটি দল দেখা দিল। এক দল, যারা জার্ম্মান-পন্থী, তারা জবরদস্ত শাসনের পক্ষপাতী; আর এক দল, যারা ফ্রান্স পন্থী, তারা গণতন্ত্রের পক্ষে, যেখানে চিন্তার অবাধ স্বাধীনতা আছে।

চারণ-কবি গোগা

কিন্তু অকেটভিয়ান গোগাকে কেবল রাজনীতিক হিসাবে দেখলেই চলবে না। রাজনীতিতে যোগ দেবার পূর্ব্বে গোগা ছিলেন শাসন-জর্জ্জরিত রুমানিয়ার জাতীয় কবি, তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চারণ। কবিতায়, গানে, গল্পে তিনি "দুর্গন্ধ ওলাক"দের মধ্যে প্যান-রুমানীয়-ভাবধারা প্রচার করতেন, তাদের মধ্যে নতুন প্রাণ এবং নতুন প্রেরণার সৃষ্টি করতেন। চল্লিশ বৎসর ধরে এমনি করে তিনি তাদের মধ্যে উৎসাহ এবং সমর-প্রীতি য়ে এসেছেন।

ইতিমধ্যে বাধল মহাযুদ্ধ। চারণের কলম অকস্মাৎ যোদ্ধার তরবারীতে বদলে গেল। অত্যন্ত গোপনে মাঝে মাঝে বুকারেস্তে গিয়ে যাতে রুমানিয়া মিত্র-শক্তিদের সঙ্গে যোগ দেয় তার চেষ্টা করতে লাগলেন। এর থেকে এ কথা মনে করলে ভুল হবে যে, বার্লিনের প্রাক্তন ছাত্র অকস্মাৎ জার্ম্মান-বিদ্বেষী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর বিদ্বেষ ছিল, হাঙ্গেরীর উপর। তিনি চেয়েছিলেন, হাঙ্গেরীর কবল থেকে ট্রানসিলভ্যানিয়াকে মুক্ত করতে। সুতরাং মিত্র-শক্তির সঙ্গে যোগ দেওয়া ছাড়া তাঁর উপায় ছিল না

অবশেষে তাঁর চেষ্টা ফলবতী হল। ১৯১৬ সালে রুমানিয়া মিত্র-শক্তির পক্ষে মহাযুদ্ধে ঝাঁপ দিলে। অমার্জ্জনীয় রাজদ্রোহিতার অপরাধে ম্যাগিয়ার আদালতের বিচারে গুরুদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে তিনি তখন পলাতক, —মোলডাভিয়ায় অজ্ঞাত-বাস করছেন। রুমানিয়া যুদ্ধে যোগ দিতেই তিনি ত্রিশ হাজার ট্রানসিলভ্যানিয়ান নিয়ে চেক-বাহিনীর মত একটা বাহিনী তৈরি করলেন। এরা সবাই রুশ হস্তে বন্দী ছিল।

মহাযুদ্ধের পরে

মহাযুদ্ধের পরে মিত্র শক্তিপুঞ্জের জয়লাভের ফলে ট্রানসিলভ্যানিয়া হাঙ্গেরীর শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেলে। কিন্তু গোগার জীবনের গৌরবময় অধ্যায়েরও এই খানেই বোধ হয় শেষ হল। এর পর থেকে তাঁকে আমরা দেখতে পেলাম, রুমানিয়ার একান্ত প্রিয় চারণ-কবিরূপে নয়, ইহুদী-বিদ্বেষী দুরন্ত প্রতিক্রিয়াপন্থীরূপে। কেবল প্রাণ-শক্তিতে তেমন দুর্ব্বার। যে ঘৃণা এতদিন ছিল হাঙ্গেরীর শাসক-শক্তির উপর, সেই ঘৃণা আশ্রয় নিলে ইহুদীদের উপর। হয় ত এর মধ্যে কিছু জার্ম্মান প্রভাবও আছে।

হিটলারের মত গোগাও বললেন, 'ইহুদীরাই হল ঘরের শত্রু বিভীষণ'।

মহাযুদ্ধের খ্যাতিসম্পন্ন মার্শাল এভেরেস্কোর "পিপ্‌লস্ পার্টি"তে তিনি যোগ দিলেন। বিভিন্ন মন্ত্রি-সভায় মন্ত্রীও হলেন। কিন্তু তাঁর "ইহুদী-বিরোধী" কার্য্যক্রম যথেষ্ট দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে না দেখে ১৯৩২ সালে নিজেই একটা দল গঠন করলেন,—জাতীয় কৃষক দল (National Agrarian Party)। কিন্তু শীঘ্রই এই দল কোওজার খৃষ্টান লীগের (League for the Defence of Christianity) সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গেল। নাম হল, জাতীয় খৃষ্টান দল (National Christian Party)। চিহ্ন হল জার্ম্মানীর মতো "স্বস্তিক"। কার্য্যক্রম হল ইহুদী ও উদারনৈতিক-দের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং জাতীয় খৃষ্টান ডিক্টেটারী শাসন প্রবর্ত্তন। এ দিক্ দিয়ে ক্যাপ্টেন কড্রিনিউ-এর সঙ্গে তাঁর বিশেষ পার্থক্য নেই। উভয়েই হিটলারের ভক্ত এবং বহুবার বার্লিন গেছেন। তাঁর সঙ্গে লৌহ-বাহিনীর এইটুকু প্রভেদ ছিল যে, তিনি সন্ত্রাসবাদ পছন্দ করতেন না। নইলে কেউই গণতন্ত্রের পক্ষপাতী নন।

ইহুদীদের অবস্থা

জাতীয় খৃষ্টান দলের প্রধান দাবী, সরকারী চাকুরী, শিল্প ও বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের বড় বড় পদ থেকে ইহুদীদের অপসারিত করা। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেই গোগা তিনখানি বামপন্থী সংবাদপত্র থেকে ১৭০ জন ইহুদী সাংবাদিককে রেলের ফ্রি পাশ দিয়ে বহিষ্কৃত করে দিলেন। আইন হল, খাস রুমানীয় জাতির রুমানিয় নাগরিক ছাড়া আর কেউ সংবাদপত্রের সম্পাদক হতে পারবে না। ইহুদী প্রভৃতি লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোক কেবল শুধু যে সব কাগজে শ্রেফ তাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের সুখ-দুঃখের আলোচনা থাকবে, সেই সব কাগজে কাজ করতে পারবে। রাষ্ট্র-সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন কথা কইতে পারবে না। দীর্ঘ-কাল ধরে বহিঃশত্রুর প্ররোচনায় তারা জাতীয় স্বার্থের যে বিরোধিতা করে এসেছে, এ বোধ হয় তারই শাস্তি।

কিন্তু রুমানিয়ার সরকারী চাকুরীতে ইহুদী নেই বললেই চলে। সাধারণত সম্ভ্রান্ত রুমানীয় পরিবারের ছেলেরাই সরকারী চাকুরীতে যায়। ইহুদী এবং অন্যান্য লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকে ব্যবসা-বাণিজ্য করে। সুতরাং সরকারী চাকুরী থেকে ইহুদীদের সরানর প্রশ্নই ওঠে না। বড় বড় কলকারখানাতেও ইহুদীর সংখ্যা কম। কারণ, সরকারী হুকুমই আছে যে, যে-সব কারখানায় সিকির বেশী ইহুদী আছে, তাদের সরকারী কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হবে না। কিন্তু ওকালতি, ডাক্তারী এবং সংবাদপত্রে ইহুদীর সংখ্যাই বেশী। আরও মুস্কিল, শিল্প-বাণিজ্য সম্বন্ধে খাস রুমানীয় বিশেষজ্ঞ অত্যন্ত কম। সেই দিক দিয়ে লোক তৈরী করার চেষ্টা অবশ্য চলছে।

কিন্তু গোগার সব চেয়ে মুস্কিল বেধেছিল, যে সব ইহুদী যুদ্ধের পরে এসেছে তাদের নিয়ে। যুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত যারা রুমানিয়ার বাসিন্দা (domiciled) ছিল, তারা নাগরিক বলে গণ্য হবে, কিন্তু যারা যুদ্ধের পরে রুশিয়া কিংবা পোল্যাণ্ড থেকে এসেছে তারা নয়। এদের সংখ্যাই না কি ৮ লক্ষ।

ফ্যাসিষ্ট প্রভাব

গত এক বৎসর থেকেই মধ্য-ইউরোপ এবং ভূমধ্য-সাগরের উপর জার্ম্মানী ও ইটালীর বিশেষ দৃষ্টি পড়েছে। কিন্তু তার প্রতিকার সম্ভব হয় নি। ইংলণ্ড প্যালেষ্টাইনের দুশ্চিন্তায় বিব্রত, অষ্ট্রিয়ার যা হবার তাই হোক। আর কি করে মার্সাই থেকে আলজিয়ার্স যাতায়াত নিরাপদ হয়, সেই ভাবনায় ফ্রান্স ব্যাকুল, চেকো-শ্লোভাকিয়ার ভাবনাও কম না। এর উপর জাপানের আশঙ্কা তো আছেই।

ইটালী চেষ্টা করছে, যাতে মিশরে রাজা ফারুক ডিক্টেটার হয়ে বসতে পারেন। জার্ম্মানী চেষ্টা করছিল গোগার হয়ে। উভয়ের লক্ষ্যই এক।—অষ্ট্রিয়াও হিটলারের মুঠোর মধ্যে এসে পড়ল। পৃথিবীর ইতিহাসে হিটলারের অষ্ট্রিয়া-অবরোধ অভূতপূর্ব্ব। শুশনীগকে বার্লিনে ডেকে এনে হিটলার এমন ধমক দিলেন যে, অসহায় বেচারা তাঁর মনোনীত নাৎসী-নেতা জাইস্ ইনকার্টকে স্বরাষ্ট্র-সচিব নিযুক্ত না করে পারলেন না। বেচারা ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের ভরসায় তিন দিনের মাত্র সময় ভিক্ষা করেছিলেন। কিন্তু কোথায় ইংলণ্ড! মুসোলিনীর কাছে চেম্বারলেনের অবস্থাও

হিটলারের কাছে শুশনীগের অবস্থার মতই। মুসোলিনীর ভয়ে ইডেনকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করতে তিনি দ্বিধা করলেন না। ইংলণ্ডের সাধ্য কি হিটলারের হুমকির মুখে শুশনীগকে অভয় দেয়। তারপরের ঘটনা নাটকীয় পারম্পর্য্যে অগ্রসর হয়েছে। এবং আজ দানিউবের উভয় তীরবর্ত্তী সমগ্র মধ্য-ইউরোপ হিটলার ও মুসোলিনীর প্রায় করতলগত। অষ্ট্রিয়ার নাৎসি অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

মঁসিয়ে গোগার মন্ত্রিমণ্ডলের আকস্মিক পতন হল সত্য। পিছনে যখন হিটলার আছেন, তখন মঁসিয়ে টিটুলেস্কুর মন্ত্রিমণ্ডলের পতন হতেও বেশী দেরী হবে না এবং আবার নূতন হয় তো মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হবে।

এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করবার বিষয়—রুমানিয়ার রাজা ক্যারলের মনোভাব। রাজা ক্যারল মুখে ফ্রান্সের প্রতি বন্ধুত্ব প্রকাশ করে খুসী করে দিয়েছেন সত্য, রণ-সম্ভার বৃদ্ধির জন্য ফ্রান্সের কাছ থেকে কিছু ঋণেরও ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু এই হোহেনজোলার্ন নৃপতি কোনদিনই গণতন্ত্র এবং ফ্রান্সের প্রতি প্রসন্ন নন। কোন দিনই তিনি Third Reich থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেন নি। কিন্তু ফ্রান্সের পররাষ্ট্র-নীতি চিরদিন এই সত্যকে উপেক্ষা করে এসেছে। তারই ফলে জার্ম্মানী সাম্প্রদায়িকতার সুযোগ নিয়ে স্তাক্সনদের সঙ্ঘবদ্ধ ও সুগঠিত করতে পেরেছে।

ফ্রান্সের কম্যুনিষ্ট দল চীৎকার করছে বটে,—"Not a penny more to Goga…Not a penny more to the makers of pogroms and the servants of Hitler.…" কিন্তু ইংলণ্ড যেমন করে মুসোলিনীকে টাকা ধার দিচ্ছেন,ফ্রান্সও তেমনি রুমানিয়ার ফ্যাসিষ্ট দলকে দেবেন টাকা ধার—ফ্রান্সেরই বিরুদ্ধে রণ-সম্ভার সংগ্রহে সেই টাকা নিয়োজিত করবার জন্য

রুশিয়ার হাল-চাল

মধ্য-ইউরোপের এই অবস্থার কি যে পরিণতি হতে পারে, সে সম্বন্ধে রুশিয়ার চেয়ে সচেতন আর কেউ নয়। এই নিয়ে জার্ম্মানীর সঙ্গে রুশিয়ার যে-কোন মুহূর্ত্তেই যুদ্ধ বাধতে পারে। লিটভিনভ্ সেই বিপদের দিনের বন্ধু খুঁজছেন। ফ্রান্সের সঙ্গে একটা সন্ধি হয়েছে, চেকো-শ্লোভাকিয়ার সঙ্গেও। মনে হয়, হিটলারের সম্প্রতিকার বক্তৃতার উত্তরে চেকোশ্লোভাকিয়া যে বীরত্বব্যঞ্জক উত্তর দিয়েছে, তা ফ্রান্সের ভরসাতেও নয়, ইংলণ্ডের ভরসাতেও নয়,—তা কেবল রুশিয়ার ভরসাতেই। ইংলণ্ড যে-ভাবে মুসোলিনীকে তোয়াজ করছে, তাতে জার্ম্মানী চেকো-শ্লোভাকিয়া আক্রমণ করলে খুব সম্ভবত সে নিরপেক্ষ থাকবে, ফ্রান্সও ইংলণ্ডের মুখের দিকে চেয়ে কিংকর্ত্তব্য স্থির করতে পারবে না। এদের উপর কারও আর ভরসা নেই, বিশ্বাস নেই।

কিন্তু বিপদের সময় চেকোশ্লোভাকিয়াকে সাহায্য করার উপায় কি? পোলাণ্ড কখনই তার উপর দিয়ে রুশিয়াকে সৈন্য নিয়ে যেতে দেবে না। সেই কারণেই রুশিয়া রুমানিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের সময় পারস্পরিক একটা সন্ধি করার জন্য ব্যগ্র; যেমন করেছে চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে। এবং বোধহয় সেই একই কারণে জার্ম্মানীও রুমানিয়ান সরকারকে নিজের করতলগত করার জন্য ব্যগ্র।

বেসারেবিয়ার মূল্য

দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপে জার্ম্মানীর প্রভুত্ব যাতে আর না বাড়তে পায়, সেই জন্য বলকান্ রাজ্যগুলির সঙ্গে রুশিয়ার মিতালি পাকা হওয়া প্রয়োজন। নইলে বসফোরাস্ ও দার্দ্দানেলিসের উপর রুশিয়া ও তুরস্ক-এর যে প্রভাব আছে, তা ক্ষুণ্ণ হবে। বেসারেবিয়া পুনর্গঠিত হলে রুশীয় পতাকা বুলগেরিয়ার সীমান্ত পর্য্যন্ত উড়তে থাকবে। তার ফলে, রুশিয়া কেবল যে দানিউব নদীতে বাণিজ্য করারই সুযোগ পাবে তা নয়, দানিউব তীরবর্ত্তী রাজ্যগুলির উপরও আর্থিক প্রভাব বিস্তার করতে পারবে। রুশিয়ার বোধ হয় এ-ইচ্ছাও আছে যে, দানিউবের ধারে ধারে রাজনৈতিক ঘাঁটি তৈরী করে নাৎসি-নীতির বন্যা-স্রোতে বাঁধ দেবে।

রুশিয়া সম্বন্ধে রুমানিয়ার নীতিও মোটেই জটিল নয়। বর্ত্তমানে যে সন্ধি আছে, তাতে সে সন্তুষ্ট; ফ্রান্স এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার মত সেই বন্ধুত্ব আরও বাড়াতেও প্রস্তুত। কিন্তু তারই উপর ভিত্তি করে ইউরোপের রাষ্ট্র-নৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন সাধিত হোক, এটা

সে চায় না এবং তারও চেয়ে বেশী আপত্তি, কোন ছুতোতেই রুশ সৈন্যকে অস্থায়ীভাবেও রুমানিয়ার যে অংশ ১৯১৮ সাল পর্যান্ত রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেই অংশে থাকতে দিতে। কারণ সেই অংশে,—বিশেষ করে উত্তরের জেলাগুলিতে,—যথেষ্টসংখ্যক রাশিয়ান বাস করে।

সে যাই হোক, মুষ্টিমেয় একদল নাৎসি ছাড়া রুমানিয়ার জনসাধারণ রুশিয়ার সঙ্গে মিতালীরই পক্ষপাতী। অবশ্য ভয় যে একেবারে নেই তা নয়; কিন্তু কে জানে, যদি কোন গোলযোগ বাধেই, রুশিয়ার বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করবার লোকের অভাব হবে না।

রুশিয়া সম্বন্ধে ছোট আঁতাতের তিনটি রাজ্যই যে একমত তা নয়। কিন্তু তাতে বিশেষ যায় আসে না। কারণ, যুগোশ্লাভিয়া নিজে রুশিয়ার সঙ্গে কোন সন্ধি না করলেও অন্য দুটি রাজ্যকে তার সঙ্গে যে কোন সন্ধি করবার অধিকার দিয়েছে।

এদের মধ্যে মুস্কিল বেশী চেকোশ্লোভাকিয়ারই। তার বোহেমিয়া প্রদেশটি তিন দিকে জার্ম্মানী কর্তৃক বেষ্টিত। সেই কারণে সমরবিভাগ স্থির করেছেন, যদি যুদ্ধ বাধে, তা হলে তাঁরা বোহেমিয়া খালি করে মোরাভিয়ায় চলে আসবেন। এই উর্ব্বর এবং শিল্পবহুল ভূভাগ ত্যাগ করে আসা ক্ষতিকর হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু তিন দিক থেকে তিনটি বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের হাত থেকে বাঁচা সামরিক দিক্ দিয়ে মস্ত বড় লাভ। বরং রুশীয় সৈন্যের, অন্তত পক্ষে রুশ বিমান ও আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে মোরাভিয়া থেকে জার্ম্মান আক্রমণ প্রতিহত করা সহজ হবে। চেকো-শ্লোভাকিয়া যে সাহায্য রুশিয়ার কাছ থেকে প্রত্যাশা করে, মূলে সেই সাহায্য করবার কথা ছিল রুমানিয়ার। কিন্তু রুমানিয়ার সৈন্যবল স্বল্প, যন্ত্রসজ্জাও অসম্পূর্ণ। তার কাছ থেকে নামমাত্র সাহায্য ছাড়া আর কিছু পাওয়ার আশা নেই। অবশ্য রুমনিয়াকে রুশিয়ার সঙ্গে সন্ধিতে, বিশেষ করে সামরিক সন্ধিতে সম্মত করার জন্য চেকো-শ্লোভাকিয়া প্রাণপণে চেষ্টা করছে। কিন্তু তার সাফল্য নির্ভর করছে, কার হাতে রুমানিয়ার শাসনভার আসে তারই উপর। গোগার আবির্ভাবে রুশিয়া, ফ্রান্স এবং মধ্য-ইউরোপের ছোট ছোট রাজ্যগুলি সকলেই তাই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল। যদি গোগা আবার ফিরে আসতেন, তা হলে রুশিয়ার সঙ্গে সন্ধির যে বিন্দুমাত্রও আশা থাকত না, তা ধরে নেওয়া যেতে পারে। গোগা আর ফিরবেন না, কিন্তু সমস্যার জটিলতা কি তবু কমেছে? তাই মনে হয়, রুমানিয়া কি চেকোশ্লোভাকিয়া এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলই বর্ত্তমানে ইউরোপের মারাত্মক ক্ষতস্থান।

ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ

... যাহাতে অনায়াসে প্রচুর কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপত্তি হয় এবং যাহাতে শ্রমজীবিগণ অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যুতে বিলুপ্ত না হয়, তাহা করিতে পারিলে, ভারতবর্ষের ২৫ জন শ্রমজীবি এতাদৃশ পরিমাণে প্রকৃত ধনের উৎপত্তি সাধন করিতে সক্ষম হইবে যে, তাহাদের নিজেদের প্রয়োজন নির্ব্বাহ করিয়াও যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে, তদ্দ্বারা ভারতবর্ষের ঐ পাঁচ জন বুদ্ধিজীবি ও ইউনাইটেড কিংডমের সমগ্র অধিবাসীর জীবিকানির্ব্বাহ অনায়াস-সাধ্য হইবে।

ইংরাজের স্বার্থ ও ভারতবাসীর স্বার্থ যুগপৎ রক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে যে-বিদ্যার দ্বারা অনায়াসে প্রচুর কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপত্তি হয় এবং যে-বিদ্যার দ্বারা মানুষের অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু দূর করা সম্ভব হয়, তাহা যে বর্ত্তমান জগতের কাহারও জানা নাই, তাহা ইংলণ্ডের ও ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া, ঐ বিষয়ে সম্পূর্ণ ভাবে অভিমানহীন হইয়া, আমূল ভাবে নূতন ধরণের গবেষণায় প্রয়াসী হইতে হইবে।...

হরিদ্বারে কুম্ভমেলায়

সর্ব্বাধিকারী

বৈষ্ণবগণ বলেন হরিদ্বার; আবার শৈব-শাক্তগণ একে বলেন, হরদ্বার বা হরদোয়ার। কনখলে সতী পতিনিন্দা শুনে মায়িক শরীর ত্যাগ করেন বলে কেউ কেউ একে মায়াক্ষেত্র বলে থাকেন, আবার মহাতপা কপিল এখানে তপস্তামগ্ন ছিলেন বলে কপিলস্থানও এর আর এক নাম। কেদার-বদরীনারায়ণের তীর্থ-পথের দ্বার বলেই এর হরিদ্বার নাম চলন হয়ে গিয়েছে। আসলে এর নাম হচ্ছে "গঙ্গাদ্বার," কারণ ভগীরথের সাধনায় পবিত্রসলিল গঙ্গা হিমালয় পাহাড় থেকে এই খানেই প্রথমে নেমে আসেন। রূপক বাদ দিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে দেখলে সকলেই স্বীকার করবেন, এই স্থান গঙ্গাদ্বারই বটে।

হরিদ্বার ষ্টেশনে ডেরাডুন এক্সপ্রেস প্রবেশ করতেই সর্ব্বপ্রথমে নজরে পড়ল, ষ্টেসনের নবনির্ম্মিত বাড়ী। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দেই এটি তৈরী করা হয়েছে, এর আগে কি ছিল তার সন্ধান পেলাম না। পায়খানা, চাখানা, বিশ্রাম-ঘর, টিকিট ঘর, প্রায় এক মাইল ব্যাপী লোহার ছাড়দেওয়ালী—সমস্তই নূতন। এতদ্ব্যতীত মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্ম বড় বড় লোহার খাঁচা, প্রত্যেক খাঁচায় ছবি ঝুলছে, হাতী মার্কা, তালা মার্কা, ছাতা মার্কা। যাত্রীদের টিকিটের উল্টা পিঠে যে মার্কা দেওয়া, সে সেই মার্কা খাঁচায় ঢুকে বসে থাকে, ট্রেণ এলে একটি খাঁচা খুলে দেওয়া হয়, অন্য খাঁচা বন্ধ থাকে। এতে সুবিধা এই, যাত্রীরা ভুল গাড়ীতে চাপতে পায় না। এ ছাড়া স্থানে স্থানে উঁচু মাচার উপর থেকে রেডিও লাউড-স্পীকার গুরু গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করছে "দিল্লী যানেওয়ালা গাড়ী নও বাজকে দশ মিনিট পর্ ছুটে গিয়ই-ই-ই—" "লাহোর জানেবালা—"

মুহুর্মুহু ট্রেণ আসছে যাচ্ছে, তা ছাড়া মোটর ও মোটর-বাসেরও সংখ্যা নেই। সিঙ্গল-লাইন রাস্তা, নচেৎ আরও ট্রেণ আসত যেত। যাত্রীরা পথে বার হতেই পুলিশের তাড়া খেতে খেতে টাঙ্গাওয়ালা বিনা বাক্য-ব্যয়ে যাত্রীদের তুলে নিচ্ছে এবং এক আনার স্থলে দেড় টাকা ভাড়া নিচ্ছে। গেটের কাছে বন্ধুবর নিতাই হাস্যমুখে অভ্যর্থনা করতে আখস্ত হলাম, খোঁজাখুঁজি করতে হল না। পাবনার জনৈক জমিদার, তাঁর ছেলে এবং আমি টঙ্গায় উঠে হরিদ্বারের পথ ছেড়ে কনখলের রাস্তায় এলাম। দুধারের অপরিচিত বস্তুর সঙ্গে পরিচয় হতে লাগল। মায়াপুর পাম্পিং ষ্টেশনের পর বিখ্যাত ক্যানাল বা নহর, যা লেসেপ সাহেব চাবুকের জোরে এনেছিলেন। খাল কাটবার সময় পাণ্ডারা বলেছিল, মা গঙ্গা ওতে ঢুকবেন না। তাতে সাহেব না কি বলেছিলেন, "চাবুকের জোরে আমি গঙ্গাকে নিয়ে যাব।" এ খাল রুড়কীর পথে চলে গেছে। খালের জল সকল ঋতুতে সমান থাকে—যথেষ্ট গভীর। দুধারে দীর্ঘ বৃক্ষশ্রেণীতে নহরের রূপ উথলে উঠছে; কিন্তু ইংরাজের চাবুকের ঘায়ে বা ইরিগেশানের কল্যাণে ছিন্নবিচ্ছিন্না-স্রোতা ভাগীরথী পরিশীর্ণ মুখে দ্রুত ছুটে চলেছেন। এই ইরিগেশনে সাহারাণপুর জেলার জমিদারদের না কি উপকার হয়েছে। যুক্তপ্রদেশ বিভাগের মধ্যে এ দিকের জমি শ্যামল এবং শস্যপ্রসূ। নহরের ধারে বড় বড় গুঁড়ি জমা করা রয়েছে নৌকাবহর চালানোর জন্য।

বন্ধুবরের বাসভূমি "শান্তি-নিকেতন" পৌঁছে অবাক্ হয়ে যেতে হল—মনোরম স্থান। গঙ্গার অপর পারে নীল পর্ব্বত বা চণ্ডীর পাহাড়, মধ্যে নীলধারা ত্রিস্রোতা হয়ে সঙ্গম করেছেন এবং এ পারে দক্ষেশ্বর শিবের মন্দিরের লাগোয়া তপোবন-সদৃশ স্থানে শান্তি-নিকেতন। মোজেক-করা মেঝে, উদ্দি-খড়ির পঙ্খ করা দেওয়াল, বিজলী আলো ও পাখাযুক্ত ঘর, ড্রেন-পাইখানা এবং স্নানের ঘরে টিউবওয়েল—পাম্প করা কলের জল পেয়ে পুলকিত হয়ে উঠলাম। বন্ধুর এ সব সখও যেমন, তেমনই নিষ্ঠার সঙ্গে পূজা-পাঠে অনুরক্তি। বন্ধু এখানে নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী নামে পরিচিত এবং তাঁর আশ্রম "পবিত্র সংঘ" নামে অভিহিত। পবিত্র সংঘে পিতৃবন্ধু হীরেন্দ্রনাথ দত্তের স্ত্রী, শ্রীসতীশচন্দ্র বসু মল্লিকের স্ত্রী এবং আরও কয়েকটি মহিলা স্নানোদ্দেশ্যে এসেছিলেন, এ ছাড়া বেদ

বিদ্যালয়ের পরমানন্দ ব্রহ্মচারী, স্বামী পদ্মানন্দ, অগ্নিবার্ত্তা শাস্ত্রী, রামকৃষ্ণ মিশনের অবিনাশ মহারাজ, গুরুকুলের অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ সপ্ততীর্থ এবং ব্রহ্মচারী বিমলদাকে পেয়ে তৃপ্তি লাভ করিলাম।

বাড়ীর নিকটস্থ দক্ষঘাটে স্নান করলাম। জল তুহিন-শীতল, সদ্য বরফ গলে আসছে··যত গরম পড়বে তত বরফ গলে জল সাদা হয়ে যাবে···গঙ্গা এখানে ত্রি-ধারায় প্রবাহ-মানা···হাঁটু-জলে দাঁড়িয়ে স্রোতের টানে পড়ে যেতে হয়। তবে ঐ বরফ জলে স্নানের পর এমন আরাম পেলাম, যা এর পূর্ব্বে কখনও পাই নি। তার পর দক্ষেশ্বর শিব দর্শন হল। —এইটাই দক্ষ প্রজাপতির বাড়ী এবং যজ্ঞাগার। পাশেই উঁচু টিলার উপর চামুণ্ডার মন্দির। এখান থেকে এক মাইল দক্ষিণে, নহর পার হয়ে সতীকুণ্ড··· অর্থাৎ দক্ষের শিবহীন যজ্ঞে পতিনিন্দা শুনে সতী যেখানে দেহত্যাগ করেছিলেন। মন্দিরের অবস্থা অতি শোচনীয়···ভূমিসাৎ হতে বেশী দেরী নেই। সতীকুণ্ডের সরোবর অত্যন্ত নোংরা, তথাপি লোকে তাতে স্নান এবং জপ করছে···সতীকুণ্ডের পর অদূরে কন্যা-গুরুকুলের প্রকাণ্ড ইমারত তৈরী হচ্ছে···এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। সতীকুণ্ড অতি নির্জ্জন বনমধ্যে স্থাপিত হলেও অনেকের ধারণা আরও তিন মাইল দূরে মানুষের অগম্য বনে প্রকৃত সতী-কুণ্ড বর্ত্তমান।

দক্ষ-প্রজাপতি ছাগমুণ্ড পাবার পর দক্ষেশ্বরের প্রতিষ্ঠা করেন··যাত্রীগণের অবশ্য-দর্শনীয় তীর্থ এটি এবং এই ত্রিধারা সঙ্গমে স্নান অবশ্যকরণীয় বলে আমরা বাড়ীতে বসেই বিরাট মেলা দেখতে পেলাম। রাত তিনটা থেকে এখানে যাত্রী সমাগম হয় রাত নটা পর্য্যন্ত। প্রায় ১৫ দিন পর্য্যন্ত এখানে সমান ভাবে মেলা দেখেছিলাম। মেলাতে সর্ব্ব প্রথমেই চোখে পড়ল সন্ন্যাসীদের প্রকাণ্ড শরীর···বাঁয়া-তবলা হারমোনিয়াম নিয়ে বসে বহু সাধু ভীড় জমাবার চেষ্টা করছিল, কেউ তুমুল লেকচার দিয়ে দর্শক সমাগম করছিল, যার যেমন যোগ্যতা সে তাই করছে।

দ্বিতীয় দৃশ্য—পাঞ্জাবী মেয়েরা। তৎপূর্ব্বে বলে নেওয়া প্রয়োজন যে, পাঞ্জাবী পুরুষ এবং মেয়েদের আকারগত সাদৃশ্য বাঙালীর সঙ্গে যেমন, তেমন ভারতে আর কারও সঙ্গেই নেই···ভয়েল বা ক্রেপ সিল্কের শাড়ী পরিহিতা পাঞ্জাবী মেয়ে মাথার ওড়নাটি ফেলে দিয়ে, অঙ্গের ফিন্‌ফিনে পাতলা চুড়িদার বা সার্টের বদলে-যদি ব্লাউজ পরত (অবশ্য তাও আছে), তা হলে তাদের অবিকল বাঙালী বনিয়াদী বংশের মেয়ে বলে মনে হবে। তবে আমাদের মেয়েদের চেয়ে তাদের স্বাস্থ্য ঢের ভাল—আর সাধারণতঃ সকলেই সুরূপা। মুখে চোখে বুদ্ধির তীক্ষ্ণ জ্যোতিঃ—কিন্তু বিলাসিতায় তারা যে ভারতে অদ্বিতীয়া, তাতে আর বিন্দু মাত্র সন্দেহ নেই। গঙ্গার স্নানের সাজ যদি এমন হয়, না জানি নিমন্ত্রণ যাবার কাপড়-চোপড় কেমন। স্বর্ণালঙ্কার বিশেষ নেই, আছে মণিবন্ধ থেকে নিম্ন-বাহু পর্য্যন্ত হাতীর দাঁতের চওড়া চুড়ি। যোদ্ধারা যেমন তলোয়ারের চোট থেকে হাত বাঁচাতে লৌহস্ত্রাণ পরে—এও ঠিক তেমনি দেখায়; মেয়েদের ধবধবে সুপুষ্ট হাতে অতি চমৎকার মানায়···দাম প্রায় একশ থেকে দুশ টাকা। ছেলেদের বাবুয়ানিও আমাদের ছাপিয়েছে, মিহীন ধুতি, সিল্কের জামা ত সাধারণ বেশ! স্ত্রীলোক বিনা রক্ষকে অবাধে বিচরণ করছে, প্রয়োজন হলে পুরুষকে সজোরে ধাক্কা মেরে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে যাচ্ছে, রাস্তায় কচিখুকীর মত খাবার খাচ্ছে···এমন কি পথে ঠেলাঠেলি হওয়ার দরুণ কিশোরী কিশোরীতে মুষ্টিযুদ্ধও বাদ যাচ্ছে না! কিন্তু অবশেষে লজ্জা পেলাম···তাদের স্নানের দৃশ্যে! অ্যামেরিকান ন্যুডিজ্‌ম্‌ও এর কাছে লজ্জা পাবে। সঙ্কোচ না থাকা ভাল, কিন্তু মেয়েদের ব্রীড়ার যে অপূর্ব্ব মাধুরী তা এরা হারিয়েছে; এবং স্বচ্ছন্দ গতির নামে যে ভীষণ উচ্ছৃ-ঙ্খলতায় অভ্যস্ত হয়েছে। তাতে সামাজিক বন্ধনও ওরা তত স্বীকার করে না। সেই জন্য পাঞ্জাবী পুরুষ অন্য জাতির, বিশেষ বাঙালীর, শিষ্ট শান্ত মেয়ে পেলে তৎক্ষণাৎ বিয়ে করতে প্রস্তুত হয়—যেহেতু বাঙালী মেয়েরা গৃহ-কপোতী হবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। বহু বাঙালী বিবাহ তাদের ঘটেছে—এখনও ঘটছে, ফলে এক শঙ্কর জাতির স্ত্রী-পুরুষ পথে পথে দৃষ্টিগোচর হল।

কনখলে দোকানের মধ্যে কেবল খাবারের দোকান। কুটিরশিল্প তেমন কিছু নেই···কদৃশ্য দু একরকম মাটির ও কাঠের পুতুল রয়েছে। সন্ন্যাসীর দেশ, খাবার ছাড়া আর কিছু লাগেও না বোধ হয়। পথের ধারে লম্বা লম্বা কাঁকড়ি ও মেওয়ুত বিক্রয় হচ্ছে। কমলা লেবু যথেষ্ট—কিন্তু

পাতি লেবুর খুব অভাব। বাজারে সব্জির ভেতর লাউ, কুমড়া, আলু, রোগা রোগা বেগুণ, শুখনো ঢেঁড়স, কমল গোড়া ও প্রচুর পালং ও মেহেদি শাক···চৈত্র মাসের এই ফসল। ডেরাডুনের সুগন্ধি চাল ও গুজ্‌রা ঘি উপস্থিত দরে চলেছে, নইলে চাল আটসের ও ঘি ১৲ টাকা সের পাওয়া যায়। দুধ ছ আনা দর, কিন্তু উপস্থিত আট দশ আনা দরে বিক্রয়, বাতাসা ও এলাচদানার খুব চাহিদা।

বাজার ঘুরে সন্ধান করলাম সংবাদপত্র কোথায় আসে। রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে সব রকম পাওয়া যায় শুনে সেখানে উপস্থিত হলাম। মেলা উপলক্ষে প্রকাণ্ড মণ্ডপ তৈয়ারী হয়েছে, তার নীচে লাইব্রেরী—সামনে বেদীর উপর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের পুষ্পসজ্জিত আলেখ্য···তাঁর সামনে বসে মিশনের সাধুরা ভজন গাইছেন। সেখানে কুসুমকুমার ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে দেখা, তিনি হাঁসপাতাল, পাঠাগার প্রভৃতি দেখিয়ে মঠাধ্যক্ষ স্বামী মহারাজের কাছে নিয়ে গেলেন। অক্লান্তকর্ম্মী সাধুদের পরিশ্রমের উপযুক্ত ফল এই সেবাশ্রম। স্থানীয় অনেক শত্রু সত্ত্বেও "—বাঙ্গালী হাঁসপাতালের" কাছে হরিদ্বারের অধিবাসীরা উপকৃত ও ওজ্জন্য কৃতজ্ঞ। দেখে বড় গর্ব্ব হল। কি বিরাট কর্ম্মশালা! আমার চোখের সামনেই দুজন নিমোনিয়া রোগীকে ষ্ট্রেচারে করে আশ্রমের কর্ম্মীরা বহন করে আনলেন। নিমোনিয়ায় অনেকে সম্প্রতি মারা গিয়েছে শুনলাম। হিন্দু, মুসলমান, গৃহী, সন্ন্যাসী নিয়ে গত বৎসরে এঁরা ১১,৩৭৫ জনের সেবা করেছেন। এই আশ্রমে বৎসরে ২৫০০০৲ টাকা আয় ও ব্যয়। আশ্রমের বহুদূর অবধি নজর চলে, মিশনের তাঁবু দেখা গেল, মেলার ভক্তে তাতে হাজার হাজার লোকের সঙ্কুলান হয়েছে; ফ্যামিলি কোয়ার্টার্স ছাড়া, মেয়েদের একটা স্বতন্ত্র কোয়ার্টার। শত লোক কুম্ভস্নানের জন্য মঠে এসেছেন, তাঁদের বিনামূল্যে স্থান ও আহার্য্য দেওয়া হচ্ছে। এখানে কলকাতার ইণ্ডিয়ান আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ মহাশয়ের সঙ্গে দেখা, তিনি পেঁড়া ও লাড্ডু দিয়ে সমাদর করলেন। তারাবল কা বাগ ছাড়িয়ে চৈতন্য কুটীরের আখড়া, তারপর রামকৃষ্ণ মঠ। মঠ থেকে বার হয়ে উদাসীনের আখড়া, সেখানে গ্রন্থ-সাহেবের দর্শন হল। ক্রমশঃ নিরঞ্জনী ও নির্ব্বাণী আখড়া, ···আখড়ার মধ্যে শত শত সন্ন্যাসী ও তাঁদের হাতী ও উট দেখা গেল। রামকৃষ্ণ মঠ ছাড়া বাঙ্গালীদের আরও দুটি আখড়া আছে, একটি কনখলে—মহানন্দ মিশন, দ্বিতীয়টি মায়াপুর হরিদ্বারে—ভোলাগিরির আশ্রম।

মায়াপুর থেকে কনখলের রাস্তায় যত মাঠ, সব নানান ধর্ম্মীদের আড্ডা, কোথাও রেডিয়ো লাউড-স্পীকার সহযোগে সামাজিক অবস্থার বক্তৃতা হচ্ছে···কোথাও গীতার [illegible] মহাভারতের ব্যাখ্যা হচ্ছে। কোথাও গান্ধীবাদ, কোথাও সোস্যালিজম্···সর্ব্বত্র সমারোহ। ভারী মজা লাগল যে, বাঙ্গালীরা একস্থানে অষ্টপ্রহর নাম সঙ্কীর্ত্তন করছেন—সেখানেও পাঞ্জাবী স্ত্রী-পুরুষ যোগদান করে "হরে কৃষ্ণ হরে রাম" বলে প্রদক্ষিণ করছে, নৃত্য করছে—অদ্ভুত আত্ম!

রোড়ির দৃশ্য সকলের চেয়ে চিত্তাকর্ষক। খরস্রোতা জাহ্নবী দুদিকে যুক্তবেণীর ধরণে প্রবাহিতা, পারাপারের জন্য কোথাও শালের খুঁটির উপর, কোথাও ভাসমান নৌকার উপর অস্থায়ী পুল তৈরী হয়েছে—এ রকম প্রায় বারটি পুল ···তার উপর অগণ্য নরনারী কলকল নাদে দিবারাত্র যাতায়াত করছে। চতুর্দ্দিকে শালের খুঁটিতে ইলেকট্রিক বাতি ঝুলান···স্থানে স্থানে পুলিশ প্রহরী। রোড়ির ও পারে ক্রোশ ব্যেপে সন্ন্যাসীদের আস্তানা, আর এপারে মেলা। হাজার হাজার উলু ও বেনার ছপ্পর—তাইতে বিপণি। কোথাও বহুমূল্য কম্বলের, কোথাও রেশম বস্ত্রের, পাথুরে [illegible], কাঠের, তামা, পিতল, সিন্দুরের, কোথাও গীতা প্রেসের প্রকাণ্ড পুস্তকালয়···তদ্ব্যতীত ফেরিওয়ালা!. ফেরিওয়ালার কাছে জাপানী সিল্কের রুমাল ছেলে বুড়া সকলেই কিনছে। স্থানে স্থানে মিউনিসিপ্যালিটির অস্থায়ী নলকূপ—সেখানে পানীয় জল কাড়াকাড়ি চলছে। পথের ওপারে ব্লিচিং পাউডার দিয়ে মেথর অনবরত ঝাঁট দিয়ে যাচ্ছে···। দর্শ্মার বেড়ার আড়ালে মল-মূত্র ত্যাগের স্থান, কিন্তু তাতে লজ্জা রক্ষণের উপায় নাই···ব্যবস্থা সুন্দরই হয়েছে, কিন্তু এত উপায় সত্ত্বেও পথিপার্শ্বে অনেকে নিষিদ্ধ কর্ম্মে ব্যস্ত···পথচারী লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে সরে পড়তে বাধ্য।

গঙ্গার দুই কূলে চণ্ডী ও মনসার পাহাড়, সর্ব্বোচ্চ শিখরে মন্দির,···পৌঁছুতে আধ ঘণ্টা লাগে। যাত্রীরা দলে দলে উঠতে লাগল। রোড়িতে কনখলের নীলধারা থেকে বাঁধ ছাড়িয়ে সপ্তধারা পর্য্যন্ত, দশনামী ও বৈরাগীদের আস্তানা।

যদি কোন মহাত্মার দর্শন পাই ভেবে বহু ছত্রের উঁকি দিয়ে বেড়ালাম। সকলেই দীর্ঘবাহু, দীর্ঘজটা, পরণে কুশের মজবুত দড়ি ও তাতে একটু কৌপীন…হাতে কুঠার কিংবা টাঙ্গি চিমটা ও তুম্বি (কাঠের কমণ্ডলু) পাশেই রাখা আছে। সকলেই ধুনি জালিয়ে জপে মগ্ন। কেউ পিতলের ছোট ছোট দেবমূর্ত্তির আরতি করছেন, কেউ দু'দশজন ভক্তকে ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছেন। সন্ধ্যার সময় এঁরা একবার মাত্র আহার করেন। "পঙত্" পড়বার সঙ্গে সঙ্গে রব ওঠে "ওঁ ভগবতে পার্ব্বতীপতয়ে নমঃ," এই হল "ডিনার বেল" হিন্দু সন্ন্যাসীর। একটি সৌম্যদর্শন দীর্ঘ জটাধারীর কাছে আলোচনা করতে বসে জানলাম এরা বৃন্দাবনের বৈরাগী মোহান্ত অর্জ্জুন দাসের দল, সম্প্রতি দলই এক সাধু পথে প্রস্রাব করায় পুলিশে ধরে; অর্জ্জুন



ব্রহ্মকুণ্ড : হরিদ্বার।

দাস তার উদ্ধারের ব্যবস্থা না করায় সাতশত সন্ন্যাসী তাঁর আশ্রয় ত্যাগ করে আলাদা হয়েছেন। হা ঈশ্বর, এখানেও "ঠাঁই ঠাঁই"। সাধুটিকে এতক্ষণ পাঞ্জাবী ঠাউরে ছিলাম, কিন্তু কথার টানে সন্দেহ হতে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, তিনি বাঙ্গালী। ষোল বছর বয়স থেকে সন্ন্যাসীদের দলে ভিড়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন, এমন বহু বাঙ্গালী সাধু সকল সম্প্রদায়েই আছেন। এ সংবাদও তিনি দিলেন। ফিরব বলে অন্য রাস্তা ধরেছি, হঠাৎ এক নগ্নমূর্ত্তি নাগা দাঁড়িয়ে উঠে আমার পায়ে জুতা দেখে কি না জানি না, ভীষণ ভাবে হাত নাড়লেন "ভাগ ভাগ যারে গা।" রাগে পিত্তশুদ্ধ জ্বলে গেলেও নীরবে স্থান ত্যাগ করলাম, মনকে প্রবোধ দিলাম, "ত্যজ দুর্জ্জন সংসর্গং ভজ সাধু সমাগমম্।"

পর দিন "কুশাবর্ত্ত" ঘাটে মেয়েদের স্নান করাতে নিয়ে যাই। এ-ঘাটে সকলে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করেন। অতি প্রাচীন ঘাট, বহু মাছ পিণ্ড খাবার জন্যে জলে কেলি করছে। এখান থেকে সহরের স্থায়ী দোকান খুব বাড়তে আরম্ভ করে ক্রমে "হরি কি পরি" ঘাট পর্য্যন্ত এসেছে। দোকানে প্রায় সব জিনিষই কলকাতার আমদানী। অথবা কাশী-মোরাদাবাদের বাসন-কাপড়, মণিহারী দ্রব্য। "বাটা" কোম্পানীর জুতার দোকান এখানেও বিস্তৃত। রুদ্রাক্ষ পদ্ম-বীজের মালাও প্রায় কাশীর আমদানী। স্থানীয় জিনিষের মধ্যে বেতের চুপড়ি, বেতের পাখা, পাহাড়ী কাঠের বেলন এবং গঙ্গার জল নিয়ে যাবার টিনের ও তামার বোতলসদৃশ পাত্র। বৃন্দাবনী ছাপা-কাপড় ব্যতীত কাপড়ের দোকানে সব সৌখীন বিলাতী ও জাপানী মাল। দু'চারখানা লিথোগ্রাফ ছবি ও মশুরির লাঠি কিনে বিদেশীরা ধাক্কাধাক্কি করে চলেছে, ভলান্টিয়ার ফুরফুর করে বাঁশী বাজাচ্ছে, কিন্তু তাতে বেশী কেউ মনোযোগ দিচ্ছে না। রেল-কর্ম্মচারীরা অন্যান্য স্থানে বেড়াতে যাবার জন্যে সচিত্র পুস্তিকা বিলিয়ে যাত্রীদের প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করছেন। মোড়ে মোড়ে বিজ্ঞপ্তিতে লেখা "পকেটমারোঁসে হুঁসিয়ার"—লেখা দেখে সকলে বারেক পকেটে হাত বুলিয়ে নিচ্ছেন এবং তদুপরি পাঞ্জাবী গণিকারা আতর-লাগান রুমাল নাড়তে নাড়তে সাহঙ্কারে পথিমধ্যে চলা-ফেরা করছে…তাদের গর্ব্বিত গমনে মনে হয়, খুব সম্ভব কোন রাণী বা মহারাণী…অবরোধ ভেঙ্গে আধুনিকা হয়েছেন।

"হরি কি পারি" থেকে স্বেচ্ছাসেবকরা স্কাউটের মত গলায় হলদে রুমাল বেঁধে বাঁশীতে ফুঁ দিচ্ছে, অথচ আসল কাজ পুলিশেই করছে। এইবার ব্রহ্মকুণ্ড। কুণ্ডের দুই ধারে দুটি পোল। একটি কলকাতার সুরযমল নাগরমলের দান…রাজা বলদেও দাস বিড়লা যে ক্লকটাওয়ার ও মেয়েদের স্নানের জন্য মারবেলের ঘর করে দিয়েছেন…তা বাস্তবিক সুন্দর। হরি কি পারি মানে বিষ্ণুপদ-চিহ্ন। ব্রহ্মকুণ্ডের ইতিহাস…বিষ্ণুপাদ-সম্ভূতা গঙ্গা শিবের জটা থেকে মুক্তি পেয়ে ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে প্রবেশ করেন, পরে ব্রহ্মা তাঁকে মুক্তি দিতে, তিনি হরিদ্বারে এই ব্রহ্মকুণ্ডে পতিত হন। এ প্রবাদ পুরাণের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় নি, কারণ গোলকে বিষ্ণুপাদস্বেদ প্রথমে ব্রহ্মা নিজ

কমণ্ডলুতে ধরে রাখেন, পরে ভগীরথের সাধনায় গঙ্গা মর্ত্তে অবতরণ কালে মহাদেবের জটাতেই প্রথম পতিত হন, নচেৎ পৃথিবী সে ভার সইতে পারত না। মহাদেব জটা চিরে গঙ্গাকে আবার মুক্তি দেন; জটাভট্টিকা—হরিদ্বার থেকে বহু উর্দ্ধে।

ব্রহ্মকুণ্ডের ধারে অনেক দেবালয়। উপরে গঙ্গার তীরে তীরে বহুদূর অবধি রাজা-মহারাজার পাকাবাড়ী একেবারে গঙ্গাগর্ভ থেকে উঠে গেছে। সেই সব বাড়ীর এখন ৫০০৲—১০০০৲ টাকা ভাড়া। ব্রহ্মকুণ্ডের অপর পারে নহর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কম্পাউণ্ড,সেখানে কারও ঢোকবার আদেশ নেই। নহরের গোলের পশ্চাতে পাহাড়ের ধারে নীলধারা...সেই দিকে লক্ষ্য করে রেতির উপর দিয়ে আট মাইল ঘুরে সপ্তধারা। প্রায় তিন মাইল মধ্যপথে গেন-ক্যানালের মুখ... সেই খান থেকে লোহার তক্তা নামিয়ে গঙ্গার স্রোত আটকে খালের ভিতর ঢোকান হচ্ছে। দেখবার এবং শেখবার জিনিষ এখানে আছে। এই খানে বদ্ধ জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে যে রকম প্রকাণ্ড সজীব মাছ দেখলাম, তা এর পূর্ব্বে দেখিনি···একটি পাঁচ ছয় মণ। সেখান থেকে বাঁধের উপর দিয়ে সপ্তধারা, সাতটি ধারায় গঙ্গা পাহাড় থেকে যেখানে সমতল ক্ষেত্রে নামছেন। সামনে সুদূর হৃষীকেশে হিমালয়ের বুকে শুভ্র উপবীতের মত নরেন্দ্র-নগর দেখা যাচ্ছিল।

সপ্তধারা থেকে কমলদাস বাবুর কুটির। শোভাবাজার রাজাদের ঠাকুরবাড়ীর মত এর গঠন, দৈর্ঘ্যে প্রস্থেও তেমনি—সেই রকম সিংহদ্বার, নহবৎখানা। এর পর ঘোরবার পথে বিল্বকেশ্বর। রাস্তায় ছেঁায়াচে রোগের হাঁসপাতাল, শুনলাম প্রায় পঞ্চাশ জন লোক প্রত্যহ ওলাউঠায় মারা যাচ্ছে। পাহাড়ের ধারে জঙ্গলে বিল্বকেশ্বর শিবের মন্দির অতি শান্ত পবিত্র স্থান; সাধুরা পূজাপাঠে নিরত রয়েছেন। মন্দিরের গায়েই একটি শুকনো নদী। মন্দির ছাড়িয়ে বনের মধ্যে পাহাড়ের গায়ে দুটি গুম্ফা আছে, তাতে সাধু থাকেন শুনে গাছের শিকড় ধরে উঠলাম; উঠবার পথ নেই। সাধু মৌন রইলেন, অগত্যা নেমে এলাম।

বিল্বকেশ্বর থেকে ভীমগড়া এক মাইল। ভীমগড়া বা ভীমগদা শব্দের উৎপত্তির কারণ, পাণ্ডবগণ স্বর্গারোহণ কালে ভীম তাঁর হাতের গদাটি এইখানে ফেলে দিয়ে হিমালয়ে যাত্রা করেন। * গদাটি এখনও ভীমকুণ্ডে বর্ত্তমান। ভীমকুণ্ড একটি চৌবাচ্চা বিশেষ—নলের দ্বারা গঙ্গা থেকে জল আসছে, স্বাভাবিক বস্তু নয়। এখানে গুপ্ত গঙ্গা, অনন্তশয্যা, কালি, ভৈরবের মন্দির আছে। মন্দিরের পর পাহাড়ের সুড়ঙ্গ, এখান দিয়ে দেরাডুন হৃষীকেশের ডবল এঞ্জিন চলেছে। বোম্বাই যাবার পথে এ রকম বহু সুড়ঙ্গ দেখেছি,তবে এর একটু বিশেষত্ব যে, এর মধ্যদেশটা কাটা। ভীমগড়া থেকে বহু মোটর-বাস হৃষীকেশ অভিমুখে ছুটছে, ভাড়া চার আনা। নিতাই সিংহকে নিয়ে বাসে করে হৃষীকেশ



হৃষীকেশ: লছমন ঝোলা।

করেছিলাম। রাস্তায় সুসুয়া এবং সোম নামে দুটি নদী পুলের উপর দিয়ে পার হতে হয়···সোম নদী আকারে নেহাৎ ছোট নয়। সমস্ত রাস্তাটি পাহাড়ী—ঢালু হয়ে উঠছে নামছে, বরাবর পিচ দিয়ে বাঁধানো। অর্দ্ধপথে সত্যনারায়ণের চটি··· যাত্রীরা সত্যনারায়ণ এবং গরুড়জী দর্শন করল···গরুড়জীর মন্দিরের লাগোয়া ছোট ছোট চৌবাচ্চায় মেয়েরা কুণ্ড ভ্রমে স্নান করছে, নিরুদ্বেগে এবং স্বচ্ছন্দে।

* ৺ যদুনাথ সর্ব্বাধিকারীর "তীর্থভ্রমণ" গ্রন্থে লেখা আছে, "কেদারনাথের নিকটে ভীমগড়া। ভীম যেখানে স্বর্গারোহণকালে হিমের প্রতাপে পতিত হয়েছিলেন। এই জন্যই ভীমগড়া নাম।—"

সত্য নারায়ণ চটি থেকে বাইওয়ালা চট্টিতে ট্রেনের রাস্তা পাশাপাশি দেখা যাচ্ছিল। তারপরে toll barreir পার হয়ে আঁকাবাঁকা পড়ে…এর পর হিমালয়ের মূর্ত্তি গম্ভীর হয়ে উঠেছে। আরও মাইল দুই গিয়ে আমরা হৃষীকেশে কালী কমলিওয়ালার ধর্ম্মশালা ও ছত্রের তলায় উপস্থিত হলাম। মণ্ডলেশ্বর বাবা মণিরাম। কর্ম্মচারী জোশীদত্তজী—সমাদর করে ঠাণ্ডাই পান করালেন এবং কেদার-বদরী যাত্রার নক্সা দিলেন। ১০৮ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী (পরে কালি কমলিওয়ালা) ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে কেদার-বদরী তীর্থের ভীষণ পথকষ্ট দেখে এসে তা' দূর করবার সঙ্কল্প করে কলকাতায় বড়বাজারে এক পায়ে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করতেন। তাঁর অনন্যচেষ্টায় হৃষীকেশে প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র এই আশ্রম গড়ে ওঠে। আজ তাঁর কীর্ত্তি বহুদূর-



স্বর্গাশ্রম : হৃষীকেশ।

প্রসারী, হৃষীকেশ থেকে আরম্ভ করে যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, কেদার-বদরীনাথের পথে ৫৭টি সদাব্রত; ৬৫টি ধর্ম্মশালা, ৪২ 'পিয়াযু' (জলছত্র), ১২টি ঔষধালয়, ৬টি গোশালা, ৩টি পাঠশালা এবং একটি আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় এবং গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারতে অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান এটি। দরিদ্র-ভোজন বা "ভাণ্ডারা" দেখলে মন শান্ত হয়। বাসন-তৈজস অজস্র। অতিকায় হাণ্ডা, তেমনি কড়াই, তেমনি সুদর্শন চক্রের মত তাওয়াতে উপযোগী টিকড়। না দেখলে বোঝা যায় না, কত লক্ষ টাকার ব্যাপার।

হরিদ্বার থেকে হৃষীকেশ ১৪ মাইল দূর। ভরতের মন্দির ছাড়া কিছু দেখবার নেই। রামঘাটে মাছেদের ময়দার গুলি খাইয়ে আমরা পদব্রজে লছমন-ঝোলার পথ ধরলাম। পথে ও পারে ছবির মত কুটিয়া বা বাংলো—অতি চমৎকার স্বাস্থ্যকর স্থান। পাহাড়ের কোলে স্থানে স্থানে সুদৃশ্য কুটিয়া আর তার নীচে গঙ্গার স্ফটিক-স্বচ্ছ জলধারা—চেয়ে থাকতে থাকতে মন উদাস হয়ে যায়। ক্রমে লছমন-ঝোলায় পৌঁছালাম। সেতুর একটু আগে লক্ষণের মন্দির। যদুনাথ-বর্ণিত সে দড়ির সেতু নেই, এমন কি তৎপরবর্ত্তী কালের লোহার সেতুও নেই… এটি নূতন তারের ঝোলা তৈয়ারী হয়েছে।…রামকুণ্ডে, হনুমান কুণ্ডে পরিভ্রমণের পর পোল পার হয়ে এ-পারে এলাম। এ দিকে মহাবীর বিদ্যালয়ে প্রায় ৭০ জন ছাত্র সংস্কৃত ও ইংরাজী শিক্ষা করে। হৃষীকেশে মাটির ঘরে হরিজন-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আরও গঠন করবার জন্য চাঁদার খাতা ঘুরছে। কৈলাসাশ্রম এবং স্বর্গাশ্রম দুটি মনোরম লাগল। বদরীনারায়ণের পথ এইখান থেকে, কালি কমলিওয়ালার ফেরি-নৌকা বিনামূল্যে যাত্রীদের পারাপার করিয়ে দিচ্ছে। নৌকায় পার হবার সময় অসংখ্য মাছ দৌড়ুতে থাকে আহারের আশায়; সকলেই এক পয়সার আটার নেচি কিনে খাওয়ালেন। জলের নির্ম্মলতা দেখে অনেকে অঞ্জলি ভরে পান করতে লাগলেন। এইভাবে হৃষীকেশ ভ্রমণ শেষ হল।

কনখলে ফিরে এসে জোয়ালাপুর দেখতে যাই, এখানে অধিকাংশ মুসলমানের বাস, মস্ত বড় মসজিদ আছে। প্রায় সাতশ ঘর পাণ্ডারও বাস আছে। এরোড্রোম আছে, আড়াই টাকায় ফ্লাইট, একশত টাকায় বদরীনারায়ণ নিয়ে যায়। জোয়ালাপুর থেকে গুরুকুল কাংড়ী। গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয় পাঞ্জাবের গরিমা। এর প্রতিষ্ঠাতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। স্বামী দয়ানন্দ আরও বাড়িয়েছিলেন। প্রায় আধ মাইল জমির উপর ছাত্র-নিবাস, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, ব্যায়ামাগার, রসায়নাগার, পাঞ্জাবী ছেলেদের মানুষ করবার এক অপূর্ব্ব কারখানা। এরা আর্য্য-সমাজী বলে বিগ্রহ-মন্দির নেই, আছে যজ্ঞাগার। বৈদ্যনাথধামে রামকৃষ্ণ-মিশনের এই ধরণের প্রতিষ্ঠান দেখে ধারণা ছিল, বরিশালের ব্রজমোহন স্কুল ছাড়া ভারতবর্ষে এমন জিনিষ বুঝি আর নেই। গুরুকুল আমার সে ধারণা নিশ্চিহ্ন করে দিল। গুরুকুলের সেক্রেটারী পণ্ডিত দীনদয়ালু শাস্ত্রী স্বয়ং আমায় সঙ্গে করে সব দেখালেন এবং নৈশ-ভোজনের নিমন্ত্রণ করে আগত "দীক্ষান্ত-সংস্কার" বা কনভোকেশনের দিন উপস্থিত থাকতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ

জানালেন। কাজেই সে দিন উপস্থিত হলাম। ডেলিগেটের আসন দিয়ে তাঁরা আমায় সম্মানিত করিলেন। সভামণ্ডপে প্রায় দুই হাজার লোক উপস্থিত···কনভোকেশনের বক্তৃতা দেবেন ইউ. পি-র প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ। প্রথমে দ্বাদশজন ঋত্বিক হোম করলেন, বন্দেমাতরম সঙ্গীত শুনে পুলকিত হয়ে উঠলাম—গুরুকুলের সর্বাধ্যক্ষ অভয়দেব স্বামী "স্নাতক"দের (গ্রাজুয়েট) ডিপ্লোমা দিলেন। অবশ্য তারা গাউন পরেছিল। তারপর পন্থজীর গুরুগম্ভীর স্বরে বক্তৃতা হল। পরিশেষে আবার বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের পর সভার কার্য্য শেষ হল। কনভোকেশন উপলক্ষে মস্ত একজিবিশন বসে ছিল, তাতে হেয়ার কাটিং সেলুনের আধিক্য দেখে বোঝা যায়, পাঞ্জাব আর বাংলা জাতীয়তায় এক গতিকোণ লাভ করেছে। তবু গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতিরেকে, কাশী হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়, আর গুরুকুল যা করেছে···তা বাংলায় অসাধ্য হল কেন? অথচ এই গুরুকুলেই দর্শনের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক বাঙালী (সুরেন্দ্রনাথ সপ্ততীর্থ) এবং ব্যায়াম-শিক্ষকও একজন বাঙালী। পাঞ্জাবের ছেলেমেয়েরা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে শিক্ষা এবং জ্ঞানে বাংলাকে পরাস্ত করতে চলেছে। এখন ইউ. পি-তেই পাঁচটা ইউনিভার্সিটি।

ক্রমে স্নানের দিন চৈত্র-সংক্রান্তি এসে পড়ল। কুম্ভযোগের অর্থ—বৃহস্পতি কুম্ভরাশিতে যে বৎসর প্রবেশ করেন, এবং ঐ কুম্ভরাশিস্থ বৃহস্পতি মহাবিষুব সংক্রান্তিতে সঞ্চারিত হয়। সেই হয় হরিদ্বারে কুম্ভস্নানের সময়। পুরাণ বৃত্তান্ত এই,—পুরাকালে হিমালয়ের পাশে ক্ষীরোদ সাগরে (তৎকালে হিমালয়ের পাশে সাগর ছিল) দেব-দানব সমুদ্র-মন্থন করেন। ফলে ক্ষীরোদ সাগর থেকে, আকাশ-যান, হংস-বাহন, পুষ্পক রথ, ঐরাবত হস্তী, পারিজাত বৃক্ষ, বীণা ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র, নৃত্য-পটিয়সী রম্ভা, কৌস্তুভ মণি, বালচন্দ্র, মণিময় কুণ্ডল, বস্ত্র, লক্ষ্মী, সুশীলা, সুরূপা, সুমনা, সুরভি, এই পঞ্চ কামধেনু, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, লক্ষ্মী দেবী ও সর্বকর্মে দক্ষ বিশ্বকর্মা উত্থিত হন। সকলের শেষে ধন্বন্তরী আকণ্ঠ সুধাপূর্ণ একটি কুম্ভ নিয়ে উঠতে, দেবগণের ইঙ্গিতে দেবরাজ পুত্র জয়ন্ত সেটি নিয়ে পলায়ন করলে—দৈত্যেরা তাড়া করে। বারোদিন বারোরাত্রি জয়ন্ত ছুটাছুটি করে, ফলে দ্বাদশ স্থানে কুম্ভটি পতিত হয়। এই বারোটি স্থানেই কুম্ভ পর্ব্ব। তন্মধ্যে চারিটি মনুষ্যলোকে, বাকি দেবলোকে। দেবতার বারোদিনে, মানুষের বারো বৎসর। এবারকার কুম্ভে একটু বিশেষত্ব আছে—সেটা না কি ৯৬ বৎসরের মধ্যে আর হবার সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ এবারে এগারো বৎসরে কুম্ভযোগ লেগেছে, অতএব হিন্দু প্রাণপণ করে বেরিয়েছে, ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করতেই হবে। তার মধ্যে বেশীর ভাগই স্ত্রীলোক। অথচ কুম্ভমেলা বস্তুত সন্ন্যাসীদের মিলনোৎসব। তাঁরা বলেন তাঁদের উদ্দেশ্য "দরশন ও পরশন।" অনেকে মনে



হরিদ্বার: কুম্ভস্নানের শোভাযাত্রা—সম্মুখে হস্তিপৃষ্ঠে মণ্ডলেশ্বর।

করেন, শঙ্করাচার্য্যের সময় থেকে এই মিলনোৎসবের পত্তন।

স্নানের দিন মেয়েদের নিয়ে বেরিয়ে কণ্ঠাগতপ্রাণ। কনখল থেকে ভীমগড়া অবধি সমস্ত রাস্তায় যান-চলাচল বন্ধ। স্থানে স্থানে লোহার দরজা বসান হয়েছে, ভীড় বেশী হলেই পুলিশ এবং স্বেচ্ছাসেবক কটক বন্ধ করে দিচ্ছে। ব্রহ্মকুণ্ডের ধারে এসে দেখলাম, এক সুউচ্চ মাচার মধ্যে ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ কমিশনার এবং মেলা- অফিসার K. R. Malcolm I. C. S. মহোদয় কাণে বেতারের হেড ফোন লাগিয়ে বসে আছেন। একজন সামরিক ইংরাজ কর্মচারী···আর একটা যন্ত্রে

ঘন ঘন বেতার-বার্ত্তা পাঠাচ্ছেন···পথে পুলিশের হাতীর হাওদায় সেই সংবাদ ধেয়ে আসছে···সংবাদপ্রাপ্তি মাত্র গোয়া সৈনিক হাতী চালিয়ে চলে যাচ্ছেন তার ব্যবস্থা করতে। মাচার উপর তিনটি সিগন্যাল, লাল, নীল, হলদে। লাল সিগনাল পড়লেই ব্রহ্মকুণ্ডের রাস্তায় লোক চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে। চটপট ফটো তুলে নিয়ে আমরা ব্রহ্মকুণ্ডের জলে নেমে পড়লাম—ডুব দেবার স্থান মেলে না, এমন ভীড়। কুণ্ডটি প্রদক্ষিণ করতে হলে একটি সরু পথ অতিক্রম করতে হয়—তার ভিতর ঢুকে আর একটু হলে প্রাণান্ত হত। শুনেছি ওর মধ্যে একটি বৃদ্ধা সেদিন প্রাণ হারিয়েছিলেন। প্রদক্ষিণ শেষ করে দেখি লাল সিগনাল পড়ে গেছে—কাজেই ঊর্দ্ধশ্বাসে পোল পার হয়ে রোটীর উপর এসে—স্বামী কেশবানন্দজীর



হরিদ্বার : নাগা সন্ন্যাসীর স্নানযাত্রা।

আশ্রমে উপস্থিত হলাম···মেয়েদের আগেই সেখানে রেখে গিয়েছিলাম।

অনতিবিলম্বে "জমায়েৎ" এসে পৌছুল। সুসজ্জিত হাতীর স্বর্ণখচিত রূপার হাওদায় সর্ব্বপ্রথমেই মণ্ডলেশ্বর ··তাঁর পশ্চাতে দুই শত হাতীতে অন্যান্য মোহান্ত। প্রথমে "নিরঞ্জনী" সম্প্রদায়, তার পশ্চাতে "নির্ব্বাণী," তৎপরে "বৈরাগী" এবং "উদাসীন"। সর্ব্বশেষে "নির্ম্মলা" আখড়ার শোভাযাত্রা। শত শত হাতীর বহুমূল্য হাওদা ও মখমল-মণি-মুক্তাখচিত ছাতা মাথায় সন্ন্যাসী দেখলে বিস্ময়ে হতভম্ব হতে হয়। হর হর শব্দে দর্শকরা পয়সা ছুঁড়ছে, আর 'শিক্ষিত' হাতী সেগুলি কুড়িয়ে মাহুতকে তুলে দিচ্ছে। কিছু পরে উটের সারি—তাতেও বহুমূল্য সাজ···অতঃপর ঘোড়সওয়ার সাধু। পুরোভাগে ইংরাজী ব্যাণ্ড-বাদ্যের সঙ্গে একটি সাদা ঘোড়া দুই পা তুলে নাচতে নাচতে আসছিল··· সার্কাসের ঘোড়ার মত তার শিক্ষা। এর পর কৃপাণধারী সাধু তলোয়ার খেলতে খেলতে এল। কি ভয়ানক তাদের লম্ফঝম্প—আর কি ভয়ানক তাদের আকৃতি; তলোয়ারের পর বর্শা এবং ঝাণ্ডাধারীর দল, তৎপশ্চাতে ভীমকায় নাগা সন্ন্যাসী। গবর্ণমেণ্টের আদেশে সকলে অস্ত্র নিতে পায় নি, কেবল মোহান্তরা—ঝকঝকে ইস্পাতের উলঙ্গ তরবারী কাঁধে ফেলে আরক্ত নেত্রে যে রকম চাইতে চাইতে যাচ্ছিল, তাতে সভ্য-সমাজে উৎকণ্ঠা উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। এক ঘণ্টা অবিশ্রাম সাধুস্রোত বয়ে যাবার পর, বিরাম। তৎক্ষণাৎ দর্শকরা নেমে এসে তাঁদের চলে-যাওয়া পথ থেকে মুঠো মুঠো ধুলো তুলে নিল। ক্রমে নির্ব্বাণীদের বিরাট ঝাণ্ডা কাছে এসে পড়ল। এবার সাধুরা রথে আগমন করছিলেন··· দু একটি মোটরকারও war chariot গোছের তৈরী করিয়ে ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছিল—বিংশ শতাব্দীর মান রক্ষা হল তাতে। এঁদের দলেও প্রায় দুই তিন হাজার নাগা, এর পর সাত শত সন্ন্যাসিনী হর হর ধ্বনি করে এসে পড়লেন। দশ কুড়ি জন নীচজাতীয়া বাঙ্গালী বৈষ্ণবীকেও সেই দলে দেখা গেল—তবে অধিকাংশ সন্ন্যাসিনী নেপালী রমণী। রামাৎ-নিমাৎ আকালী সকল সম্প্রদায়ের স্নান-যাত্রা শেষ হতে বেলা প্রায় ছয়টা বেজে গেল। আমরা সদলবলে নীলধারার তীরে উপস্থিত হয়ে আবার সন্ধ্যা সাতটার মহাবিষুব লগ্নে স্নান করে সঙ্কল্প পাঠ করলাম "ওঁ বিষ্ণু বিষ্ণুরোম তৎসৎ ওনম্ভ বৈশাখে মাসি মেষরাশিস্থে ভাস্করে রবের্মহাবিষুব সংক্রান্ত্যাং শুক্লপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাতিথৌ, কুম্ভরাশিস্থগুরৌ কুম্ভাখ্যযোগে হরিদ্বারে মহাতীর্থে···গোত্র··· দেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকামোঃ গঙ্গায়াং স্নানমহঙ্করিষ্যে।" সপ্ততীর্থ মহাশয় বললেন—এইটাই আসল কুম্ভ-স্নান হল। স্নানের পর মনেও হল তাই। কোথায় পাণ্ডাদের পরিকল্পিত তৈলভাসিত ব্রহ্মকুণ্ড, আর কোথায় নীলধারার কাঁচের মত অগাধ পরিষ্কার জল। হল্লা নেই, ঠেলা নেই, শান্ত হিমালয়ের শ্যামকোলের নীচে পার্ব্বতীর মত তাপসী এই নদী কুলুকুলু শব্দে কত নির্ব্বেদ, কত মর্ম্মন্তুদ-ধ্বনিবাহিনী কবিতা গেয়ে চলেছে—তা' কাণ পেতে শুনতে পাওয়া যায়। এখানে পাণ্ডার পীড়ন নেই, গুণ্ডার সন্ত্রাস নেই বা আকালীর ডাণ্ডার আস্ফালন নেই। এখানে আছে বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গৌতমের বাসস্থান—নিস্তব্ধ বন, আর তার সহচরী সারী পাখীর সুমিষ্ট ঝঙ্কারের সঙ্গে গঙ্গার কলধ্বনি। নীল আকাশ, নীলপর্ব্বত, আর নীলধারার একত্র মিলন দেখে মনে একটা অনির্ব্বচনীয় রসপ্লাবন অনুভব করলাম। [আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

চিত্র-চরিত্র

মাইকেল মধুসূদন

—শ্রীঅমিত রায়

মাইকেলের জীবনে পদে পদে আকস্মিকতা ও 'আয়রণি'! যে ভাবে তিনি জীবন যাপন করিবেন ভাবিয়াছেন, ঘটনাক্রমে তার ঠিক বিপরীত ভাবে ঘটিয়াছে; এক পথে তাঁর সাধনা, অন্যপথে তার কৃতার্থতা। ইংরেজি ভাষায় কাব্যরচনা আরম্ভ, বাংলা ভাষায় তার সমাপ্তি; মুর, বায়রণ প্রথম জীবনের আদর্শ—মিল্টন, হোমারের আদর্শে তার পরিণতি। জীবনের প্রারম্ভ হইতেই তাঁর ইচ্ছা ছিল নিজেকে এমন ভাবে প্রস্তুত করিবেন, যাতে স্বদেশের বিরাট একখানা মহাকাব্য রচনা করিতে পারেন।

মাইকেলের এ ইচ্ছা কেবল ঘটনাচক্রেই সফলতা লাভ করিয়াছে; ঘটনার একচুল এদিক ওদিক হইলে মহাকাব্য কেন, কোন কাব্যই তাঁর দ্বারা লেখা সম্ভব হইয়া উঠিত না। এ-বিষয়ে মিল্টনের সঙ্গে তাঁর মিল আছে তিনি কৈশোর হইতে একখানা মহাকাব্য লিখিবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিতেছিলেন—কিন্তু ঘটনার পরিবর্ত্তনে রাজনীতির আবর্ত্তে পড়িয়া বহুকাল কাটাইয়া দিলেন; মহাকাব্যের পরিবর্ত্তে ক্রমওয়েলের রাষ্ট্র-নীতিকে সমর্থন করিয়া বাদানুবাদ রচনায় চোখের দৃষ্টিকে নষ্ট করিয়া ফেলিলেন; মিল্টন অন্ধ হইলেন; ক্রমওয়েলীয় রাষ্ট্র ধূলায় মিশিল; রাজতন্ত্র পুনরায় স্থাপিত হইলে অন্ধ, বেকার, অদৃষ্টলাঞ্ছিত কবি নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই যেন, জীবনের শেষে, জীবনের প্রারম্ভের আশাকে রূপ দিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন; আর কিছুদিন ক্রমওয়েলীয় রাষ্ট্র-তন্ত্র চলিলে 'প্যারাডাইস লষ্ট' আর লিখিতে হইত না। মাইকেলের জীবন ও কবিত্বস্পৃহা ইহার অনুরূপ।

বেলগাছিয়ার নাট্যশালায় রত্নাবলী নাটকের রিহার্সাল যখন চলিতেছে, সেই সময় যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও মধুসূদনের মধ্যে হঠাৎ অমিত্রাক্ষর ছন্দের দোষ-গুণ লইয়া এক তর্ক বাধিয়া উঠিল।

মধুসূদন বলিলেন—"অমিত্রাক্ষর যতদিন না বাংলায় প্রবর্ত্তিত হবে, ততদিন বাংলা নাটকের উন্নতির সম্ভাবনা দেখি না।"

যতীন্দ্রমোহন বলিলেন—"বাংলাতে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তনার বাধা, এ ভাষার স্বভাবের মধ্যেই আছে, কাজেই কখনো হবে বলে মনে হয় না।"

বাধা দেখিয়া মধুসূদনের সমস্ত ব্যক্তিত্ব জাগিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন—"এ পর্য্যন্ত চেষ্টা হয় নাই বলেই সম্ভব হয় নি।"

—"দেখুন না কেন, ফরাসী সাহিত্য বাংলার চেয়ে অনেক সমৃদ্ধ, যতদূর জানি তাতেও অমিত্রাক্ষর ছন্দ নাই।"

সে কথা ঠিক। সাহেব মাইকেল বলিলেন—"কিন্তু মনে রাখবেন, সংস্কৃত ভাষার দুহিতা বঙ্গভাষা; তার পক্ষে কোন কাজই দুঃসাধ্য নয়।"

"আপনি মনে রাখবেন—আমাদের শ্রেষ্ঠ কবি ঈশ্বরগুপ্ত অমিত্রাক্ষরকে ঠাট্টা করে লিখেছেন—

কবিতা কমলা কলা পাকা যেন কাঁদি,
ইচ্ছা হয় যত পাই পেট ভরে খাই।"

মধুসূদন হাসিয়া উঠিলেন—"বুড়ো ঈশ্বরগুপ্ত অমিত্রাক্ষর লিখতে পারেন নি বলে আর কেউ পারবে না, তার কি মানে আছে!"

ঈশ্বরগুপ্ত তখনকার কালের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। আজও তাঁর উল্লেখ করিবার সময়ে রসিকেরা তাঁকে অকৃত্রিম বাঙ্গালী কবি বলিয়া থাকেন। অকৃত্রিম কবি কি পদার্থ গুপ্ত-রসিকেরাই জানেন।

মাইকেল ঝোঁকের মাথায় বলিয়া ফেলিলেন—"আচ্ছা, কেউ না করে, আমি অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য লিখব।"

তার পরে যেন নিজের দুঃসাহসিকতাকে চাপা দিবার জন্য বলিতে যাইতেছিলেন—"সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের

সঙ্গে যে ভাষার নাড়ীর যোগ তার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়।"

যতীন্দ্রমোহন হাসিয়া বলিলেন, "বেশ! আপনি যদি অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য লিখতে পারেন, আমি তা নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করে দেব।"

ইহা শুনিয়া মধুসূদন আনন্দে হাততালি দিয়া বলিয়া উঠিলেন—"তা হলে ক'দিনের মধ্যেই আমার কাছে থেকে অমিত্রাক্ষরের নমুনা স্বরূপ খানিকটা কাব্যের অংশ পাবেন।"

কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যের কিয়দংশ লিখিয়া যতীন্দ্রমোহনের কাছে পাঠাইয়া দিলেন।

বলা বাহুল্য, যতীন্দ্রমোহন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়া নিজের খরচে তিলোত্তমা-সম্ভবের প্রথম সংস্করণ ছাপাইয়া দিয়াছিলেন। মাইকেল অমিত্রাক্ষর ছন্দের জন্মের ইতিহাসকে স্থায়িত্ব দিবার জন্যই যেন একখানা ছবি তোলাইয়া লইয়াছিলেন—মধুসূদন তিলোত্তমার পাণ্ডুলিপি উপহার দিতেছেন, যতীন্দ্রমোহন তাহা গ্রহণ করিতেছেন।

মধুসূদনের কাব্যের কালানুক্রমিক বিকাশ দেখাইবার চেষ্টা বৃথা। একটার পরে একটা লিখিত হইয়াছে, এ কথা বলার অপেক্ষা প্রায় সবগুলি কাব্য এক সঙ্গে লিখিত হইয়াছে, ইহাই অধিকতর সত্য।

তিলোত্তমার সঙ্গে আরম্ভ হইল ব্রজাঙ্গনা। তারপর মেঘনাদ-বধ আর কৃষ্ণকুমারী প্রায় এক সঙ্গে লেখা চলিল।

মেঘনাদ-বধ শেষ হইতে না হইতেই বীরাঙ্গনা।

বীরাঙ্গনার পরে মধুসূদনের সাহিত্যিক দম হঠাৎ ফুরাইয়া আসিল; তিনি পাণ্ডব-বিজয়, সিংহল-বিজয়, ভারত-বৃত্তান্ত নামে তিনখানা কাব্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সামান্য খানিকটার বেশী অগ্রসর হইতে পারেন নাই। সহসা কাব্যলক্ষ্মী তাঁর প্রতি বিমুখ হইলেন, আর তিনি তেমন ভাবে মুখ তুলিয়া ভক্তের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই।

•

১৮৬১ সালের যে মাসে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়ীতে একটি শিশুর জন্ম হইল। পরবর্তীকালে এই শিশুটির নামকরণ হইল রবীন্দ্রনাথ।

[২]

এই ১৮৬১ সালের মাঝামাঝি মধুসূদন লোয়ার চিৎপুর রোডের বাসা পরিত্যাগ করিয়া খিদিরপুরের ৬নং জেমস্ লেনের বাসায় উঠিয়া আসিলেন। পুলিশ কোর্টে কাজ করিবার সময়ই তিনি মাদ্রাজ হইতে পত্নী হেনরিয়েটাকে কলিকাতায় আনাইয়া লইয়াছিলেন।

এই সব সৃষ্টিমূলক সাহিত্য ছাড়া নিম্নতর শ্রেণীর সাহিত্য, কাজ মাঝে মাঝে মধুসূদনকে করিতে হইত—কিন্তু অধিকাংশ সময়েই তার ফল শুভ হয় নাই।

১৮৬১ সালে মধুসূদন দীনবন্ধুর নীলদর্পণের ইংরাজি অনুবাদ করিয়াছিলেন—ফলে পাদ্রী লং সাহেবকে জেলে যাইতে হইয়াছিল।

আর একবার কিশোরীচাঁদ মিত্রের জন্য একখানা দরখাস্ত লিখিয়া দিয়াছিলেন—অনুগ্রহপ্রার্থীর পক্ষে সে ভাষা এমন কটু হইয়াছিল—দরখাস্তের প্রার্থনার বিপরীত ফল ফলিয়াছিল।

১৮৬২ সালে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধে মধুসূদন হিন্দু-পেট্রিয়টের সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করেন—কিন্তু তাহাতেও বাধা আসিল। কর্তৃপক্ষ যথা সময়ে সম্পাদকের পারিশ্রমিক প্রেরণ করিল না -তিনি কার্য্যভার ত্যাগ করিলেন। সত্য কথা বলিতে কি, এ সব তুচ্ছ কাজে আর তাঁর মন ছিল না—মহাকাব্য রচনা—সে তো এক রকম সমাপ্ত। এখন আর এক কাজ বাকি আছে—মহাকাব্য রচনা অপেক্ষা যাহা ক্ষুদ্র নয়—ইংলণ্ডে গমন।

মহাকাব্য তো শেষ হইল—কিন্তু ইংলণ্ড কতদূর!

[৩]

অবজ্ঞাত প্রতিভার মত মর্ম্মান্তিক দৃশ্য কমই আছে। স্বভাবতঃই যে দশ জনের মধ্যে বিশিষ্ট, সে দশ জনের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, নিজের কথা কারও কর্ণগোচর করিতে পারিতেছে না—ইহার চেয়ে দুঃখের আর কি আছে?

বুভুক্ষু নেপোলিয়ান জীর্ণবস্ত্র-বাহির-হওয়া জামা গায়ে প্যারিসের পথে পথে ঘুরিতেছে। কেহ তাহাকে জানে না, আত্মপ্রকাশে সে অক্ষম, আত্মহত্যা ও যশঃ-

শিখরের দুই মেরুর মধ্যে তার চিত্ত দোদুল্যমান—এ দুঃখ কি তাঁর পরবর্ত্তী জীবনের সেণ্ট হেলেনার নির্ব্বাসনের চেয়ে কম।

শেলিকে সকলে পাগলা বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছে! বাপে-খেদানো, বিশ্ববিদ্যালয়ে খেদানো, বন্ধু-বান্ধবের দ্বারা উপেক্ষিত, পাওনাদারের দ্বারা লাঞ্ছিত যুবক কিছুতেই নিজের বিশিষ্টতা বুঝাইয়া উঠিতে পারিতেছে না। মানস-ক্ষেত্রের সব ফসল ঘরে তুলিবার আগেই মৃত্যু আসিতে পারে—অনাদৃত কীট্‌সের এই ছিল ভীতি।

ইঁহাদের তুলনায় মাইকেলকে সৌভাগ্যবান বলিতে হইবে। তাঁর কলম ধরিবার আগে হইতেই সহৃদয় বন্ধু-বান্ধবের দল প্রস্তুত ছিল; কলম ধরিবা মাত্র তাঁরা প্রশংসার ঐক্যতান সুরু করিল; এমন কি মাইকেল যদি কখনও বাঙলা কাব্য না লিখিতেন, তবু এই সম্ভাবনার ভিত্তির উপর বন্ধুরা তাঁর অনর্জ্জিত যশের স্মৃতি-স্তম্ভ খাড়া করিয়া দিত।

দেশব্যাপী নিন্দাও মস্ত একটা উত্তেজক ঔষধ—কবিকে যশঃপথে তাহা চালিত করে। কিন্তু সব চেয়ে মারাত্মক নীরবতা। নিন্দা প্রশংসার বিকার মাত্র।

প্রথমে প্রথমে মধুসূদনকে নিন্দার গ্লানি সহ্য করিতে হইয়াছে, কিন্তু কিছু কালের মধ্যেই শিক্ষিত সমাজের সম্মিলিত হাততালিতে নিন্দার কণ্ঠ ডুবিয়া গেল, তিনি এক জয়মাল্যের উপরে আর এক জয়মাল্য সংগ্রহ করিতে করিতে বঙ্গ-সরস্বতীর মানস-সরোবর হইতে বিলাতের জাহাজ-ঘাটায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সে কালের শিক্ষিত ও ধনী সম্প্রদায় মাইকেলের কাব্য ও প্রতিভা বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—পরবর্ত্তী যুগের সমালোচকদের জন্য তাঁকে রস-বোধের বাহির দরজায় দাঁড় করাইয়া রাখেন নাই। তাঁর নিতান্ত ব্যক্তিগত বন্ধু-বান্ধবের কথা ছাড়িয়া দিলেও এমন শিক্ষিত বহু লোকের নাম করা যায়, যাঁরা সম্মিলিত কণ্ঠে মাইকেলের প্রতিভাকে ঘোষণা করিয়াছিলেন।

পাইকপাড়ার ঈশ্বরচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন ও কালীপ্রসন্ন, জোড়াসাঁকোর দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ; রাজনারায়ণ বসু; কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলী, দিগম্বর মিত্র; রাজেন্দ্রলাল মিত্র; অপেক্ষাকৃত কম বয়স্কদের মধ্যে দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথমে তেমন উৎসাহ প্রকাশ করেন নাই বটে—কিন্তু শেষে তিনিও মাইকেলের জয়ধ্বনিতে যোগ দিয়াছিলেন।

[৩]

এই সময়ে জোড়াসাঁকোর কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় বঙ্গভাষার অনুশীলনের জন্য 'বিদ্যোৎসাহিনী' নামে এক সভা স্থাপন করেন। মেঘনাদ-বধ কাব্য প্রকাশিত হইলে মধুসূদনকে সংবর্দ্ধনা করিবার জন্য সভার একটি অধিবেশন হয়। বাংলা ভাষায় কাব্য লিখিয়া বাঙালী লেখকের ভাগ্যে সংবর্দ্ধনার ইহাই বোধ হয় প্রথম দৃষ্টান্ত।

১৮৬১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি বিদ্যোৎসাহিনী সভার অধিবেশন; কলিকাতার গণ্য, মান্য, শিক্ষিত সম্প্রদায় নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত; মধুসূদন সভাস্থলে উপবিষ্ট; একুশ বছর বয়সের প্রতিভাদীপ্ত যুবক, সভার পক্ষ হইতে মধুসূদনের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত মানপত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন:—

এড্রেস।—

মান্যবর শ্রীল মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় সমীপেষু।
কলিকাতা বিদ্যোৎসাহিনী সভার সবিনয় সাদর সম্ভাষণ
নিবেদনমিদং।

যে প্রকারে হউক, বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে কায়মনোবাক্যে যত্ন করাই আমাদের উচিত, কর্ত্তব্য, অভিপ্রেত ও উদ্দেশ্য। প্রায় ছয় বর্ষ অতীত হইল বিদ্যোৎসাহিনী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে এবং ইহার স্থাপনকর্ত্তা তাঁহার সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে যে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা সাধারণ সহৃদয় সমাজের অগোচর নাই। আপনি বাঙ্গালা ভাষায় যে অদ্ভুতম অশ্রুতপূর্ব্ব অমিত্রাক্ষর কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা সহৃদয় সমাজে অতীব আদৃত হইয়াছে, এমন কি আমরা পূর্ব্বে স্বপ্নেও এরূপ বিবেচনা করি নাই যে, কালে বাঙ্গালা ভাষায় এতাদৃশ কবিতা আবির্ভূত হইয়া বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। আপনি বাঙ্গালা

ভাষার আদিকবি বলিয়া পরিগণিত হইলেন, আপনি বাঙ্গালা ভাষাকে অনুত্তম অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিলেন, আপনা হইতে একটি নূতন সাহিত্য বাঙ্গালা ভাষায় আবিষ্কৃত হইল, তজ্জন্য আমরা আপনাকে সহস্র ধন্যবাদের সহিত বিদ্যোৎসাহিনী সভাসংস্থাপক প্রদত্ত রৌপ্যময় পাত্র প্রদান করিতেছি। আপনি যে অলোকসামান্য কার্য্য করিয়াছেন তৎপক্ষে এই উপহার অতীব সামান্য। পৃথিবীমণ্ডলে যতদিন যেখানে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত থাকিবেক, তদ্দেশবাসী জনগণকে চিরজীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে থাকিতে হইবেক, বঙ্গবাসিগণ অনেকে এক্ষণেও আপনার সম্পূর্ণ মূল্য বিবেচনা করিতে পারেন নাই, কিন্তু যখন তাঁহারা সমুচিতরূপে আপনার অলৌকিক কার্য্য বিবেচনায় সক্ষম হইবেন, তখন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ক্রটি করিবেন না। অদ্য আমরা যেমন আপনাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনার সহবাস লাভ করিয়া আপনা আপনি ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য হইলাম, হয়ত সেদিন তাঁহারা আপনার অদর্শনজনিত দুঃসহ শোকসাগরে নিমগ্ন হইবেন। কিন্তু যদিচ আপনি সে সময় বর্ত্তমান না থাকুন বাঙ্গালা ভাষা যতদিন পৃথিবীমণ্ডলে প্রচারিত থাকিবে ততদিন আমরা আপনার সহবাস সুখে পরিতৃপ্ত হইতে পারিব সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমরা বিনীত ভাবে প্রার্থনা করি, আপনি উত্তোরোত্তর বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে আরও যত্নবান হউন। আপনা কর্ত্তৃক যেন ভাবি বঙ্গসন্তানগণ নিজ দুঃখিনী জননীর অবিরল বিগলিত অশ্রুজল মার্জ্জনে সক্ষম হন। তাঁহাদিগের দ্বারা যেন বঙ্গভাষাকে আর ইংরেজী ভাষা সপত্নীর পদাবনত হইয়া চিরসন্তাপে কালাতিপাত করিতে না হয়। প্রত্যুত আমরা আপনাকে এই সামান্য উপহার অর্পণ উৎসবে যে এ সকল মহোদয়গণের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি ইহাতে তাঁহাদিগের নিকট চিরবাধিত রহিলাম, তাঁহারা কেবল আপনার গুণে আকৃষ্ট ও আমাদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তাঁহারা যেন জীবনের বিশেষ ভাগ গুণগ্রহণে বিনিয়োগ করেন।

বিদ্যোৎসাহিনীসভাসভ্যবর্গাণাম্

মানপত্র পাঠ শেষ হইলে একটি মূল্যবান্ সুদৃশ্য পান-পাত্র সভার পক্ষ হইতে মধুসূদনকে উপহার দেওয়া হইল।

মধুসূদনকে পান-পাত্র! ইহা কি সমাদর, না, 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র লেখকের বাস্তব পরিহাস।

মানপত্র ও পান-পাত্রের ব্যাপার শেষ হইলে মধুসূদন উত্তর দিতে উঠিলেন। তিনি বলিলেন—

বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়, আপনি আমার প্রতি যেরূপ সমাদর ও অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন ইহাতে আমি আপনার নিকট যে কি পর্য্যন্ত বাধিত হইলাম তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য।

স্বদেশের উপকার করা মানব জাতির প্রধান ধর্ম্ম। কিন্তু আমার মত ক্ষুদ্র মনুষ্য দ্বারা যে, এ দেশের তাদৃশ কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেক, ইহা একান্ত অসম্ভবনীয়। তবে গুণানুরাগী আপনারা আমাকে যে এতদূর সম্মান প্রদান করেন সে কেবল আমার সৌভাগ্য এবং আপনার সৌজন্য ও সহৃদয়তা।

বিদ্যাবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা ক্ষেত্রে জলসেচনের ন্যায়। ভগবতী বসুমতী সেই জলে যাদৃশ উর্ব্বরতরা হন, উৎসাহ প্রদানে বিদ্যাও তাদৃশী প্রকৃতি ধারণ করেন। আপনার এই বিদ্যোৎসাহিনী সভা দ্বারা এদেশের যে কত উপকার হইতেছে, তাহা আমার বলা বাহুল্য।

আমি বক্তৃতা বিষয়ে নিপুণতাবিহীন। সুতরাং আপনার এ-প্রকার সমাদর ও অনুগ্রহের যথাবিধি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশে নিতান্ত অক্ষম।—কিন্তু জগদীশ্বরের নিকট আমার এই প্রার্থনা, যেন আমি যাবজ্জীবন আপনার এবং এই সমাজিক মহোদয়গণের এইরূপ অনুগ্রহভাজন থাকি ইতি। ('সোমপ্রকাশ' ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৬১)

বক্তৃতার সময়ে মধুসূদনের কি মনে হইতেছিল জানিবার উপায় নাই—কিন্তু জ্ঞান-তরঙ্গিনী সভার * অষ্টার

* মাইকেল রচিত 'একেই কি বলে সভ্যতা' দ্রষ্টব্য।

মনে কি—এই দুই সভার মধ্যে একটা তুলনীয় ইঙ্গিত বিদ্যুতের মত খেলিয়া যায় নাই।*

মাদ্রাজ হইতে ফিরিবার পরে আর বিলাত রওনা হইবার আগে—এই সময়টাকে, এই কয়টি বৎসরকে মাইকেলের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় বলা চলে।

এর আগে এবং এর পরে মাইকেল আর্থিক অভাব অত্যন্ত রূঢ় ভাবে অনুভব করিয়াছেন, এ সময়ে আর্থিক অভাব তেমন উগ্র ভাবে দেখা দেয় নাই। চাকুরীর নির্দ্দিষ্ট আয়, পুস্তকের আয় এবং অনেক সময়ে শ্রদ্ধার দান মাইকেলের অভাব ঘুচাইতে সমর্থ ছিল। গৃহে শান্তি ছিল, গৃহের বাহিরে খ্যাতি ও সম্মান ছিল; বন্ধু-বান্ধবের প্রীতি ও সহায়তা পদে পদে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছে।

আর কাব্য-লোকে যে আত্মপ্রকাশের জন্য তিনি আবাল্য বৃথা প্রয়াস করিয়াছেন, এ সময়ে সেই স্বতঃ-উৎসারিত কাব্য-ধনে তিনি ধন্য হইয়াছেন। এই সময়ে তাঁর সমগ্র ব্যক্তিত্ব ও শক্তি একাগ্রতা লাভ করিয়া চরম অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল।

তবু কি দুঃখ তাঁর ছিল, যে জন্য তিনি মর্ম্মান্তিক শ্লোক কয়েকটি লিখিতে গেলেন—

"আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়!
তাই ভাবি মনে!
জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে ধায়
ফিরাব কেমনে?
দিন দিন আয়ু হীন, হীন-বল দিন দিন;
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না এ কি দায়।"

প্রতিভার সঙ্গেই দুঃখ ও অতৃপ্তি জড়িত থাকে; বাহিরের সুখের দ্বারা তার বিচার চলে না; প্রতিভাবান্ লোক জগতে সুখী হইতে পারে না।

মধুসূদনের জীবনীকার বলিতেছেন—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে কয়েকটি ব্রহ্ম-সঙ্গীত রচনা করিতে বলিলে তিনি এই কবিতাটি লেখেন।

কল্পনা করুন, মধুসূদন 'প্রভো' 'পিতঃ' বলিয়া ব্রহ্ম-সঙ্গীত লিখিতেছেন! কিন্তু এই অনুরোধও এমন দুঃখাত্মক নয়, যাতে এমন একটি কবিতা লিখিতে হইবে।

*বিদ্যোৎসাহিনী সভার আনুপূর্ব্ব বিবরণ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত একটী প্রবন্ধ হইতে গৃহীত হইয়াছে। সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা, বঙ্গাব্দ ১৩৩৪, ২য় সংখ্যা।

পুস্তক-পরিচয়

চোরাবালি—কবিতাসমষ্টি, শ্রীবিষ্ণু দে প্রণীত। প্রকাশক ভারতী-ভবন, ১১ কলেজ স্কোয়ার, মূল্য একটাকা বার আনা। গ্রন্থের ছাপা, বাঁধাই অনবদ্য।

বাংলা সাহিত্যে যে 'অতিআধুনিক' ফুল ফুটিয়া উঠিতেছে, বিষ্ণুবাবু সে দলের অন্যতম এবং বোধকরি মুখপাত্র। কিন্তু তাঁর মুখপাত্রতা কেবল অভিধান-গত নয়, যে যাতে তাঁর অভিজ্ঞতা প্রবাহিত সেটা সর্বসাধারণের অপরিচিত, কাজেই সাধারণ পাঠকের কাছে বিষ্ণুবাবু প্রশংসা আশা করিতে পারেন না।

এ বইয়ের একুশটি কবিতার মধ্যে পাঁচটি বন্ধুদের উদ্দেশেই বিশেষভাবে লিখিত, কবিতার উপরে তাঁদের নাম উল্লেখ করা আছে; সেইগুলিই দুরূহতম, একেবারে 'সঙ্কেতভাষায়' লেখা; কবির চিন্তারাজ্যে অনধিকারী পাঠকের বুঝিবার কোন আশা নাই—সে চেষ্টাও করি নাই।

অন্যগুলি সম্বন্ধে দু'চার কথা বলিব। বিষ্ণুবাবুর দুরূহতার অন্যতম কারণ, তিনি কবিতায় এমন সব বিদেশী idea, নাম, ইঙ্গিত, কাহিনী চালাইতে চাহিয়াছেন, যার সঙ্গে আমাদের প্রাণের যোগ আজিও স্থাপিত হয় নাই, কেবল বুদ্ধির পরিচয় ঘটিয়াছে মাত্র। আর কাব্যের প্রতিষ্ঠা যে বুদ্ধির পরিচয়ের উপরে নয়, হৃৎকমলের উপরে, এ কথা বিষ্ণুবাবুর মত সুপণ্ডিত ও গুণজ্ঞানী ব্যক্তি না জানেন এমন নয়।

এ সব কথা গদ্যে বেশ চলিত, কারণ গদ্য আমাদের বুদ্ধির সিংহদ্বারের পথিক; কবিতা অভিসারিকা—তার যাতায়াত হৃদয়ের খিড়কি দুয়ার; সব কথাই যে গদ্যে বলা চলে এমন নয়, তা হইলে সাহিত্যে প্রকাশের এত বিভিন্ন শাখার উদ্ভব হইত না, যে সব কথা কবিতায় বলিবার নয়, সেগুলিকে কবিতায় বলিতে গেলে বিপদ ঘটিবারই কথা! একথাও বিষ্ণুবাবু জানেন, তাই তিনি গতানুগতিক ছন্দে তাহা প্রকাশের চেষ্টা করেন নাই; তিনি এই

নূতন ছন্দও (কি নাম জানি না !) তাঁর ভাবের যথার্থ বাহন হইয়া উঠিয়াছে, বলিয়া মনে হয় না ; অর্থাৎ তাঁর কাব্যের আকৃতি মডার্ণ, কিন্তু কাব্যের প্রকৃতি মডার্ণ-তর।

নারী ও কবিতা স্বভাবতঃ সংরক্ষণশীল, হঠাৎ তারা যখন মডার্ণ হইবার জন্য ক্ষেপিয়া ওঠে, মডার্ণ হয় কি না জানি না, হাস্যকর নিশ্চয়ই হয়।

ব্যক্তিগত ভাব সর্বজনকে নিবেদন করিবার জন্যই শিল্পের সৃষ্টি ; সেই ভাব যদি ব্যক্তির আসর ছাড়িয়া বড় জোর দলগত হইয়া ওঠে, coterie-র কাব্য মাত্র হইয়া ওঠে, তবে আর লাভ হইল কোথায় ?

বিষ্ণুবাবু হয় তো বলিবেন, তিনি এ-জাতীয় কাব্যের pioneer ; তা যদি হয়, যদি তিনি pioneer-এর গৌরব করিতে চান, তবে তাঁকে pioneer-এর নিন্দাও সহ্য করিতে হইবে।

তৎসত্ত্বেও বিষ্ণুবাবু কবি,—সত্যকারের কবি ; তিনি বর্মের মত অক্ষর কবচে কবিহৃদয়কে ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু মাঝে মাঝে অসতর্ক মুহূর্তে তাঁর কবচকুণ্ডল খসিয়া পড়িয়া কবি-হৃদয়কে প্রকাশিত করিয়া দিয়াছে, এমন কি আমাদের মত অভিধানভীরু পাঠকেও এক একবার চকিতের জন্য অমৃতবাণীর স্বাদ পাইয়াছে। যদিচ পরমুহূর্তেই দ্বিগুণ দৃঢ়তায় বিষ্ণুবাবু আবার কবচকুণ্ডলে অনাবৃত হইয়া উঠিয়াছেন।

যখনই কবি-হৃদয় প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে, তাকে লুকাইয়া ফেলিবার এই চেষ্টা কেন ? হৃদয়কে জামার আস্তিনে ঝুলাইয়া বেড়ানো আমরা পছন্দ করি না, কিন্তু হৃদয় যদি যথাস্থানে থাকিয়া প্রকাশিত হয়, তাতে লজ্জা কিসের ? কারণটা বোধ করি শুধু ব্যক্তিগত নয়, একেবারে জাতিগত। Cynic বাঙালী আত্মপ্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক, দৈবাৎ আত্মপ্রকাশ ঘটিলে, নানা অবান্তর কথা, ছন্দোহীনতা, মডার্ণ-ইজম দ্বারা প্রাণপণে তা অস্বীকার করিতে চেষ্টা করে।

কুণ্ডল ও কবিতা কর্ণগ্রাহী—স্পর্শ করিবামাত্র কাণে লাগিয়া থাকিবে—কিছুতেই তোলা যাইবে না। কবিতার পাণ্ডিত্য থাকিতে পারে, তত্ত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু এ সব ইন্ধন মাত্র ; শিখাস্বরূপ ছন্দঃস্পন্দ বা সঙ্গীতই তার পরিণাম। বিষ্ণুবাবুর অনেক কবিতায়, এমন কি সন্ধ্যাভাষার কবিতাতেও মাঝে মাঝে এই শিখা এক একবার জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

বিষ্ণুবাবু হয় তো তাঁর কবিতা নূতন এই আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা বলি তাঁর কবিতা অত্যন্ত পুরাতন, একান্ত পুরাতন, যত পুরাতন এই পৃথিবী, এই গিরিমালা, এই নদী-মেখলা ; যত পুরাতন এই মানবহৃদয়, কারণ তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে মানবহৃদয়ের সম্পন্দন রহিয়াছে, এর চেয়ে বড় প্রশংসার ভাষা আমাদের জানা নাই।

বিষ্ণুবাবু সরল প্রকৃতির লোক ; বইয়ের প্রারম্ভে সরলার্থবোধিনী টীকাস্বরূপ সুধীন্দ্রবাবুর উকিলপাতী এক মুখবন্ধ জুড়িয়া দিয়াছেন—কিন্তু দুর্মুখের মুখ কি অত সহজে বন্ধ হয়। আশা করিয়াছিলাম বইয়ের শেষে এই বিরাট ধাঁধার উত্তর দেওয়া থাকিবে, অন্ততঃপক্ষে একখানা অভিধান পঞ্জী। এই মুখবন্ধ হইতে একটা ব্যাপার বুঝিলাম যে, শুধু বাংলা জানিলে আর বাংলা বুঝিবার উপায় নাই—সুধীন্দ্রবাবুর গ্রন্থাগারে কতরকমের অভিধান আছে জানিতে পারিলে একটা কৌতূহলের নিবৃত্তি ও অনেকগুলি সমস্যার সমাধান হইত।

সংক্রান্তি—কবিতা-সমষ্টি—শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—ভারতী-ভবন, মূল্য এক টাকা।

কিছুদিন আগে বিমলা বাবুর ছোট গল্পের একখানি বইয়ের সমালোচনা করিবার সৌভাগ্য আমাদের ঘটিয়াছিল, এখন কবিতার আলোচনা করিতে গিয়া তাঁর ছোট গল্পের কথা মনে পড়িয়া গেল। তাঁর গল্প ও কবিতার মধ্যে অল্প বয়সের ভাই-বোনের চেহারার মিল আছে।

অনাড়ম্বর স্বচ্ছতা তাঁর গল্প ও কবিতা—দুইয়েরই প্রধান লক্ষণ। আধুনিকতার মেল-ট্রেন যখন ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে ধুলা-বালি-শুকনা পাতা উড়াইয়া ছুটিয়াছে, তখন রচনাকে অনাবিল রাখিতে অনেক প্রলোভন সংবরণ করিতে হয়। বিশেষ যখন জানি, বিমলাবাবুও সুপণ্ডিত এবং আধুনিকতার ষ্টেশনে ঢুকিতে তাঁর প্ল্যাটফর্ম টিকিটের প্রয়োজন হয় না।

সত্যকথা বলিতে কি, এই আবর্জনা নাই বলিয়াই বিমলাবাবুর কবিতা উপযুক্ত সমাদর পাইবে না, তাঁকে, আধুনিকদের সবচেয়ে যে বড় ভর্ৎসনা সেকেলে অপবাদ সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

এই প্রেমের কবিতাগুলির মধ্যে একটি বিষাদময় করুণ ভাব আছে—যেন কবি প্রণয়ীকে জোর করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিবার ব্যর্থতা বুঝিয়া সে চেষ্টায় ক্ষান্ত হইয়াছেন। এই সকরুণ বিষাদ তাঁর কবিতার প্রকৃতি, তার সঙ্গে আশ্চর্যরূপে খাপ খাইয়া গিয়াছে কবিতার আকৃতি—দুইয়ে এক হইয়া গিয়াছে।

বিমলা বাবুর অধিকাংশ প্রেমের কবিতাই এইরূপ অশ্রুর জলছবিতে ধরা প্রেমের করুণস্মৃতি।

যে সব পাঠক কবিতার মধ্যে শুধু কবিতাই আশা করেন, সংক্রান্তি তাঁদের ভাল লাগিবে।

প্রকাশকদের পক্ষে যে কথাটা সবচেয়ে প্রিয় লাগিবে, বলিয়া রাখি—ছাপা, বাঁধাই উত্তম।

—প্র. না. বি.

পুষ্পচয়ন (গল্পগ্রন্থ)—শ্রীমতী পুষ্পলতা দেবী প্রণীত প্রকাশক—শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ ঘোষ বি-এল। ৫-বি, পরাণ-হাটা লেন, কলিকাতা। মূল্য—পাঁচ সিকা।

গ্রন্থকর্ত্রী বঙ্গসাহিত্যে অপরিচিতা নহেন। ইনি নিয়মিতভাবে মাসিক বসুমতীতে গল্প লিখিয়া থাকেন এবং আলোচ্য গ্রন্থের ভিতর যে কয়েকটি গল্প সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহাদের সহিত ইতিপূর্বেই আমার পরিচয় ঘটিয়াছে।

"কৈফিয়ৎ"-এর মধ্যে বলিয়াছেন—'আমার বাণীপূজার এই প্রসূনগুলি অতি সাধারণ ঘর-করণার মাঝ হইতে সংগৃহীত।' গল্পগুলি পড়িতে পড়িতে আমরা তাহা মিলাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছি। স্বীকার করিতেছি, তাঁহার গল্পগুলি সম্পূর্ণ বাস্তবমূলক, কোনটাই অবাস্তব বা কল্পিত নহে। সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার আত্মপ্রবেশ আছে বলিয়াই গল্পগুলি মনোজ্ঞ হইয়াছে।

কথা-সাহিত্যের ভিতর বর্তমান যুগে কাল্পনিকতা এবং অবাস্তবতার স্থান নাই, আধুনিক পাঠক সমাজ কাল্পনিক চরিত্রের উপর আদৌ সহানুভূতিসম্পন্ন নহেন। লেখিকার সৃষ্ট চরিত্র এবং অঙ্কিত চিত্র যে আধুনিক পাঠক সমাজকে তৃপ্তি দিবে এরূপ ভরসা আমার হইয়াছে। কিন্তু এ কথাও বলা প্রয়োজন মনে করি যে, স্থানে স্থানে সামান্য সামান্য অবাস্তবের স্পর্শ-দোষ এবং অতিশয়োক্তি ঘটিয়াছে। ইহার জন্য লেখিকাকে দোষী করা যায় না; কারণ লেখিকা অন্তঃপুরের ভিতর নিভৃতে বসিয়াই বাণী আরাধনা করিয়া থাকেন। বহির্জগতের সহিত তাঁহার খুব ঘনিষ্ঠতা হয় নাই। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বহির্জগতের সহিত যখন তাঁহার অন্তর্দৃষ্টির নিবিড় যোগসূত্র ঘটিবে, তখনই তাঁহার এই দোষটুকু সংশোধিত হইবে আশা করি। ছোট গল্পের স্থান বিস্তৃত নহে, অল্পের ভিতর সমস্ত গুছাইয়া বলিতে হয় এবং কোন ঘটনা, চিত্র বা চরিত্রকে এরূপ সংক্ষিপ্তভাবে রূপ দিতে হয়, যাহা মানুষের মনের মধ্যে একটা ছাপ দিতে পারে। কাজেই ছোট গল্প লেখা খুব সোজা নহে। আমাদের মনে হয়, লেখিকা গল্প লেখার প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

গীতাংশুক শ্রীমমতা মিত্র প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বিচিত্রা নিকেতন লিঃ, ২৭।১, ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৮+৭২ পৃষ্ঠা, মূল্য—১৲ এক টাকা।

সুন্দর একখানি কবিতার বই। লেখিকা বাঙ্গালী কবিসমাজে অপরিচিতা নহেন। তাঁহার কোন কোন কবিতা পড়িয়া আমরা যেরূপ আনন্দ পাইয়াছি, এ বইয়ের কবিতাগুলি পাঠ করিয়াও তেমনি মুগ্ধ হইয়াছি। ইহাতে ৭২টি কবিতা আছে। প্রত্যেক কবিতাটিই সমানভাবে উপভোগ্য। একটি ভাল লাগিল, আরটি লাগিল না, এমন বোধ হইল না। কবিতাগুলির ভাব, ভাষা ও ছন্দঃ সাবলীল, একটি অপরটিতে বাধিয়া গেল, এমন নয়; কোথাও কষ্টকল্পনা নাই, জোড়াতালি দিয়া ছন্দঃ মিলাইবার প্রয়াস নাই, ভাবের আবেগে কবিতার ছন্দঃ ভাষায় আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পড়ুন—

কবিতা-ফুল অর্ঘ্য হ'য়ে
পড়বে তোমার পায়ে,
গীতাংশুক যে যতন ক'রে
জড়াব ওই গায়ে।
কণ্ঠে তোমার হব গো সুর,
চিত্তে হব আবেগ মধুর,
জীবন মরণ ভুল যে আমার
জড়ায় ছন্দে তব। —পৃষ্ঠা ২

হারিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে,
তাই তো হিয়ায় সুর জেগেছে,
সমুখে মোর মিলিয়ে আসে—
বন-সরোবর। —পৃষ্ঠা [illegible]

গীতিকাব্যের [illegible] ছন্দ ও প্রসাদগুণ এমনভাবে ইহাতে পরিস্ফুট হইয়াছে যে, কেবল নামেই বইখানি 'গীতাংশুক' নয়, [illegible] ইহা গীতাংশুকই [illegible] যেন, ইহার কবিতাগুলি যেন পাঠকের গা [illegible], মনে এক অ[illegible] রসের সঞ্চার করে, প্রাণে সাড়া দেয়।

দেখুন—

কেমন ক'রে বদলে গেল
জীবন-স্রোতের ধারা,
তোমার ধ্যানে আজ্‌কে আমার
আত্মা আত্মহারা।
সকল ঠেলে দিলেম ব'লে
অন্তরে দীপ উঠল জ্ব'লে,
ভোগেতে নয়, হরষ ত্যাগে—
বুঝেছি আজ ধীরে। —পৃষ্ঠা ৭২

এরূপ কবিতায় কবিত্ব ও কবিত্বশক্তির পরিচয় আছে। উহা প্রায়ই দুর্লভ। এখন কাব্যজ্ঞের ভাষায় বলি,—

'কবিত্বং দুর্লভং তত্র শক্তিস্তত্র সুদুর্লভা।'

আলোচ্য বইয়ের কবিতাগুলি কিরূপ সুখপাঠ্য ও আস্বাদ্য তাহার একটু নমুনা দিলাম, পাঠক ভাবিয়া দেখুন।

আমরা এ বইয়ের বহুল প্রচার কামনা করি।

অন্ধের দৃষ্টি—শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। বাণী-ভবন, ১৯/এ, শম্ভুদাস লেন, বহুবাজার, কলিকাতা হইতে গ্রন্থকার-কর্তৃক প্রকাশিত। ৮+১৩৪ পৃষ্ঠা, মূল্য—১।০ পাঁচ সিকা।

একখানা গল্পের বই। মোটের উপর অপাঠ্য নয়। গল্পে গল্পত্ব না থাকিলেও কুরুচির কোন পরিচয় ইহাতে নাই। সাধারণ বাঙ্গালী পাঠককে ইহা পড়িতে দেওয়া যায়।

বইয়ের লেখক তাঁহার পূর্ব্বাভাসে বলিয়াছেন—

"ঘুমের ঘোরে, নিমীলিত নেত্রে যে প্রলাপবাক্য উচ্চারিত হয়, সেই প্রলাপবাক্য স্বপ্নের ঘোরে উচ্চারিত হ'লেও তাহাতে পরম সত্যের— 'পরমম্ পরমম্-মহেশ্বরম্ শশ্বম্ ব্রহ্মম্ (?)'-এর—অনুরণনের—শব্দাদিতের (?) কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়।" ইহা পাঠ করিয়া পাঠক কি আভাস পাইবেন, বলা যায় না।

বাঙ্গালায় বর্গী

—নিখিলনাথ রায়

মহারাষ্ট্রীয়গণের ভীষণ আক্রমণে নবাব সৈন্যগণ যেরূপ দুর্দশার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল, তাহার তুলনা জগতের ইতিহাসে অতি বিরল। যাবতীয় খাদ্যদ্রব্য অপহৃত, শিবিরাদি বিনষ্ট এবং সমস্ত ধনসম্পত্তি বিলুণ্ঠিত হওয়ায় সেই সমস্ত বীরপুরুষ মর্ম্মস্পর্শিনী যন্ত্রণায় অতিমাত্র অস্থির হইয়াছিল। তাহাদিগের হৃদয় ক্রমাগত নিরাশার প্রগাঢ় ছায়ায় আবৃত হইতেছিল। তাহারা নিদাঘের দারুণ রৌদ্র ও বৃষ্টিতে যার পর নাই কাতর হইয়া, হাহাকারে দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিত। দিবাভাগে রৌদ্র ও বৃষ্টিতে তাহারা ব্যথিত হইয়া পড়িত এবং রাত্রিকালে মেঘজনিত সূচীভেদ্য অন্ধকার তাহাদিগের হৃদয়ে বিভীষিকার সঞ্চার করিত। ভূমিতল ব্যতীত তাহাদিগের আর কোনও শয্যা ছিল না। বর্ষার মেঘমেদুর আকাশ ব্যতীত আর কিছু তাহাদের আচ্ছাদন ছিল না। তাহারা অনাহারে, অনিদ্রায় প্রেতরাজ্যের অধিবাসিগণের আকার ধারণ করিয়াছিল। বৃক্ষের পত্র, ভূমির তৃণ, এমন কি পিপীলিকাদি কীট পর্য্যন্ত তাহাদের খাদ্যদ্রব্যে পরিণত হইয়াছিল। কোথায়ও তাহারা মুষ্টিমেয় তণ্ডুলমাত্র প্রাপ্ত হয় নাই। যে গ্রামে তাহারা আহারের জন্য উপস্থিত হইয়াছে, অমনি মহারাষ্ট্রীয়গণ ভীষণ অগ্নিদাহে সেই সমস্ত গ্রাম ভস্মীভূত করিয়াছে। মহারাষ্ট্রীয়গণের ভয়ে কেহ তাহাদিগকে সামান্য তৃণমাত্র প্রদান করিতে সাহসী হয় নাই। তাহাদের সমস্ত গোলাগুলি অপহৃত হওয়ায় দূর হইতে যে শত্রুপক্ষকে বাধা প্রদান করিবে, তাহারও উপায় ছিল না। ক্রমে তাহাদের বীর্য্যহ্রাস হইয়া আসিতেছিল এবং এক এক করিয়া ধরাশায়ী হইতেছিল। যদি সত্বর কাটোয়ায় উপস্থিত হইতে না পারিত, তাহা হইলে অনাহারে ও পথশ্রমে সমস্ত নবাবসৈন্যই একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া যাইত। এই সময়ে জগন্নাথের পথে, ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু মহাজনগণ যাত্রীদিগের জন্য অনেকগুলি চৌবাচ্চা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। নবাব সৈন্যগণ রাত্রিকালে সেই সকল চৌবাচ্চার নিকটে অবস্থান করিয়া পথশ্রম দূর করিত। চৌবাচ্চাগুলির চারিপার্শ্বে অনেক বৃক্ষ রোপিত থাকায়, সৈন্য, সেনাপতি প্রভৃতি সকলে উদরপূর্ত্তি করিয়া তাহাদের পত্র ও বল্কল ভোজন করিয়া কোন প্রকারে প্রাণ রক্ষা করিত। কি সেনাপতি, কি সামান্য সৈনিক সকলেই আহারের জন্য অস্থির হইয়া উঠিত। এক সের খিচুড়ি, বা অর্দ্ধসের পচা মাংস দশ পনর জনের আহার হইত। রাত্রিতে নিদ্রার সম্ভাবনা ছিল না। কারণ মহারাষ্ট্রীয়েরা কোন্ সময়ে যে তাহাদিগকে আক্রমণ করে, তাহার স্থিরতা ছিল না। রাত্রির নিবিড় অন্ধকারেই হউক, অথবা দিবার উজ্জ্বল আলোকেই হউক, সন্ধ্যার আলোকান্ধকার মিশ্রণে হউক, অথবা প্রভাতের প্রথম আলোকসমাগমেই হউক, সেই কৃতান্তানুচরগণ যখনই সুযোগ পাইত, তৎক্ষণাৎ নবাব-সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিত। তাহারা যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল যে, নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর একটি মাত্র প্রাণীকেও মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইতে দিবে না। এই প্রকার দীর্ঘ-কালব্যাপী নিদারুণ কষ্টে নবাবের সৈন্য ও সেনাপতিগণের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিয়াছিল। তাহারা সামান্য কথায় ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিত। বিশেষতঃ মুস্তাফা খাঁ একেবারে ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়াছিলেন। তাহারা মনে করিয়াছিল যে, হয় তাহারা নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইবে, না হয় একেবারে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে। ফলতঃ এরূপ লোমহর্ষণ ব্যাপার নবাব-সৈন্যগণ কখনও অনুভব করে নাই এবং তাহারা যতদিন জীবিত ছিল, ততদিন উহার ভীষণ স্মৃতি তাহাদিগের হৃদয়পটে সমভাবে বিরাজিত ছিল। তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, মহারাষ্ট্রীয়গণের মধ্যে যদি শৃঙ্খলার অভাব না থাকিত, তাহা হইলে তাহারা সমস্ত ভারতবর্ষ করতলগত করিতে পারিত।

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ বহুকষ্টে কাটোয়ায় উপস্থিত হইয়া মনে করিয়াছিলেন যে, কাটোয়ার গঞ্জ হইতে সৈন্যগণের

আহার্য্য সংগ্রহ করিবেন। কিন্তু তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই মহারাষ্ট্রীয়েরা কাটোয়ায় উপস্থিত হইয়া যাবতীয় খাদ্যদ্রব্য লুণ্ঠন ও পথিমধ্যস্থ সমস্ত গ্রামে অগ্নিদাহ উপস্থিত করে। অনেক খাদ্যদ্রব্য তাহাতে অর্দ্ধদগ্ধ হইয়া যায়। নবাব-সৈন্যগণ উপস্থিত হইয়া সেই অর্দ্ধদগ্ধ তণ্ডুলাদির দ্বারা আপনাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে বাধ্য হয়। এই সময়ে নবাব হাজী মহম্মদ ও নওয়াজেস মহম্মদকে কাটোয়ায় উপস্থিতির বিষয় লিখিয়া পাঠান, ও সৈয়দ আহম্মদকে কতিপয় নূতন সৈন্য, খাদ্যদ্রব্য ও শিবিরাদির সহিত আসিতে বলেন। নবাব রাজধানী রক্ষার জন্যও তাঁহাদিগকে বিশিষ্টরূপ সতর্ক করিয়া দেন। তাঁহারা নবাবের পত্র পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের ভয়াবহ আক্রমণের কথা তাঁহারা সবিশেষ অবগত হইয়াছিলেন এবং তজ্জন্য সমস্ত বঙ্গভূমি যে প্রতিনিয়ত বিকম্পিত হইতেছে তাহাও তাঁহাদের অবিদিত ছিল না। তাঁহারা অনেক দিন নবাবের সংবাদ না পাইয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, নবাব বোধ হয় মহারাষ্ট্রীয়গণের হস্তে পতিত হইয়া প্রাণ-বিসর্জ্জন দিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার জীবিত থাকা ও রাজধানীর নিকটে উপস্থিতি জ্ঞাত হইয়া, তাঁহারা আনন্দে বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। নবাবের আদেশমত তাঁহারা সৈয়দ আহম্মদকে অনেকগুলি পুরাতন গোলন্দাজ সৈন্য। অপর্য্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য * ও শিবিরাদি বাসোপযোগী দ্রব্যসহ কাটোয়াভিমুখে প্রেরণ করিলেন। সৈয়দ আহম্মদ ভাগীরথী পার হইয়া কাটোয়ায় নবাবের সহিত মিলিত হইলেন। নবাব-সৈন্যগণের মধ্যে আনন্দের কোলাহল পড়িয়া গেল। তাহারা অপর্য্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য অবলোকন করিয়া আনন্দধ্বনিতে আকাশমণ্ডল বিদীর্ণ করিতে লাগিল। এইরূপে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ নূতন বলে বলীয়ান্ হইয়া শত্রুপক্ষকে বাধা প্রদান করিতে সাহসী হইলেন।

ভাস্কর পণ্ডিত আলিবর্দ্দী খাঁকে নূতন উৎসাহে উৎসাহিত দেখিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার সহিত বিবাদে লিপ্ত হইতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি অবগত হইয়াছিলেন যে, কাটোয়া প্রদেশ মুর্শিদাবাদের অতি নিকট এবং তথায় অপর্য্যাপ্ত খাদ্যসামগ্রী অনায়াসে পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং নবাব-সৈন্যদিগকে আর পূর্ব্বের ন্যায় উৎপীড়ন করার সুযোগ হইবে না। বিশেষতঃ এই সময়ে বর্ষা উপস্থিত হওয়ায়, তিনি বীরভূম প্রদেশ দিয়া স্বদেশে যাইবার ইচ্ছা করিতেছিলেন। কিন্তু মীর হাবীব এই প্রস্তাবে বাধা প্রদান করেন। ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, মীর হাবীব বন্দী হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যদিও তিনি প্রথমে পারস্য দেশজাত দ্রব্যাদি মস্তকে বহন করিয়া বিক্রয়ার্থ ভ্রমণ করিতেন এবং নিতান্ত নিরক্ষর ছিলেন, তথাপি কার্য্যদক্ষতার গুণে উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই কার্য্যদক্ষতার বলেই তিনি মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করিতে সক্ষম হন। মীর হাবীব ভাস্কর পণ্ডিতকে বলিলেন, যদি আপনার অর্থের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আলিবর্দ্দী খাঁর কাটোয়ায় অবস্থানকালে আমি মুর্শিদাবাদ লুণ্ঠন করিয়া আপনাকে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিতে পারি। ভাস্কর তাঁহার কথায় স্বীকৃত হইয়া, সহস্র অশ্বারোহী সহ মীর হাবীবকে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করিলেন। মুর্শিদাবাদে প্রাচীর কি কোন প্রকার অবরোধাদি না থাকায়, মীর হাবীব অনায়াসে নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি প্রথমতঃ ডাহাপাড়া ও মহম্মদখাঁর গঞ্জে উপনীত হইয়া অগ্নি প্রদান করেন। পরে ভাগীরথী পার হইয়া নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হন। নগরবাসিগণ মহারাষ্ট্রীয়দিগের ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। সকলেই স্ব স্ব ধনসম্পত্তি রক্ষার উপায় দেখিতে লাগিল। নওয়াজেস মহম্মদ ও হাজী মহম্মদ চেষ্টা করিয়াও তাহাদের গতিরোধ করিতে সক্ষম হন নাই। মীর হাবীব জগৎশেঠদিগের গদী লুণ্ঠন করিয়া দুই কোটি টাকা * ও অন্যান্য অনেক দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া নগরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লুণ্ঠন আরম্ভ করিলেন। যদিও জগৎশেঠদিগের দুই কোটি টাকা লুণ্ঠিত হইয়াছিল, তথাপি তাঁহারা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই। কারণ দুই কোটি টাকা শেঠদিগের নিকট অতি সামান্য মাত্র। এইরূপ

* রিয়াজুস সালাতীনে লিখিত আছে যে, হাজী আহাম্মদ সহরের সমস্ত রুটিওয়ালার দ্বারা অনেক রুটি প্রস্তুত করাইয়া কাটোয়ায় পাঠাইয়াছিলেন।

* Stewart সাহেবের মতে তিন লক্ষ মুদ্রা। কিন্তু মুতাক্ষরীণকার দুই কোটি টাকা লিখিয়াছেন বলিয়া আমরা তাহারই মত গ্রহণ করিলাম।

প্রবাদ ছিল যে, শেঠেরা ইচ্ছা করিলে সে সময়ে অর্থদ্বারা সুতীর মুখে বাঁধ বাঁধিয়া ভাগীরথীর স্রোত রোধ করিতে পারিতেন, এই সময়ে জগৎশেঠ ফতেচাঁদ জীবিত ছিলেন। এইরূপ লুণ্ঠন করিয়া মীর হাবীব আপন ভবনে উপস্থিত হইয়া স্বীয় ভ্রাতা মীর সরিফকে সঙ্গে করিয়া লন। তিনি নবাবের প্রাসাদ কিংবা নওয়াজেস মহম্মদ বা আতাউল্লার বাসভবন আক্রমণ করিতে সাহসী হন নাই। কারণ উক্ত স্থানসমূহ সৈন্য দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। কিন্তু সরফরাজ খাঁর জামাতা মুরাদ আলী খাঁ, দুর্লভরাম ও মুর্শিদাবাদের চৌতারার দারোগা মীর সুজাউদ্দীনকে বন্দী করিয়া কিরীটকোণায় উপস্থিত হন ও তথায় শিবির স্থাপন করেন। নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ মীর হাবীবের আগমন পূর্ব্ব হইতে অবগত ছিলেন, এবং ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার গতিরোধে যে সক্ষম হয় নাই, তাহা বুঝিতে পারিয়া সসৈন্যে মুর্শিদাবাদাভিমুখে যাত্রা করেন। * কিন্তু মীর মীর হাবীব এক দিনেই প্রায় বিংশতি ক্রোশ পথ অতিক্রম করায় নবাব তাঁহার আগমনের পর উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন যে, মীর হাবীব জগৎশেঠদিগের গদী ও অন্যান্য কতিপয় স্থান লুণ্ঠন করিয়া মুর্শিদাবাদ হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। অনন্তর তিনি যাবতীয় প্রজাবর্গকে সান্ত্বনা করিয়া সকলকে নির্ভয়ে থাকিতে অনুরোধ করিলেন।

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলে, ভাস্কর পণ্ডিত বর্ষাকাল উপস্থিত হওয়ায় স্বদেশ গমন করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। তিনি বীরভূম পর্য্যন্ত আগমন করিলে, মীর হাবীব উপনীত হইয়া তাঁহাকে লুণ্ঠিত অর্থাদি প্রদান করেন। তাঁহার এত শীঘ্র দেশে প্রত্যাগমনের জন্য মীর হাবীব ভাস্করকে অনুযোগ করিতে লাগিলেন এবং তজ্জন্য তিনি যে নাগপুরাধিপতি রঘুজি কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইবেন তাহাও সুস্পষ্ট রূপে উল্লেখ করিলেন। তিনি ভাস্করকে কিছু দিন কটোয়ায় শিবির-সন্নিবেশ করিতে পরামর্শ দেন। এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়েরা ভাগীরথী পার হইয়া দুই তিন বার পলাশী, দাদপুর প্রভৃতি স্থান লুণ্ঠন করিয়া * প্রজাগণের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করে এবং অশ্ব ও বলদ দ্বারা তুঁতচাষ ভক্ষণ করাইয়া রেশম ব্যবসায়ের অত্যন্ত ক্ষতি করিয়া তুলে। ভাগীরথী আতট পরিপূর্ণ হওয়ায়, তাহারা কাটোয়া হইতে পরপারে আসিতে সাহসী হয় নাই। মীর হাবীব কাটোয়া প্রদেশ হইতে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যগণের খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া দেন। তিনি জমীদারগণের সহিত ও হুগলীর অধিবাসিগণের সহিত মন্ত্রণা করিতে আরম্ভ করেন। হুগলী সেই সময়ে একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। নানাদেশীয় লোক তথায় বাণিজ্যের জন্য বসতি করিত। মীর হাবীব মীর আবুল হোসেন ও মীর আবুল কাসেম নামক দুই জন বণিকের সহিত পরামর্শ করিয়া হুগলী অধিকারের চেষ্টা করেন। আলিবর্দ্দী খাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মহম্মদ ইয়ার খাঁ হুগলীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন। মীর হাবীব একদিন রজনীযোগে হুগলীতে উপস্থিত হইয়া, নিজের নাম গোপন করিয়া ইয়ার খাঁর নিকট বিশেষ আবেদন আছে জানাইলে, ইয়ার খাঁ যেমন দুর্গদ্বার উন্মোচনের আদেশ দেন, অমনি মীর হাবীব ১৫ জন সৈন্য সহ সহসা তাঁহাকে ধৃত করিয়া বন্দী করিয়া ফেলেন।† ষড়যন্ত্রকারীরা পূর্ব্ব হইতে মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতির নিকট আবেদন করিয়াছিল এবং তাহাদের প্রার্থনানুযায়ী শেষরাও নামে এক জন কর্ম্মচারী সসৈন্যে হুগলীর নিকট লুক্কায়িত ভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন তাহারা ইয়ার খাঁকে ধৃত করিবার জন্য শেষরাওকে আহ্বান

* হলওয়েল সাহেব বলেন যে, ভাগীরথী পার হওয়ার সময়েও নবাব সৈন্যেরা যথেষ্ট বাধা পাইয়াছিল। এই সময়ে মুস্তাফা খাঁ, মীরজাফর ও জৈনুদ্দীন অত্যন্ত সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। মুতাক্ষরীণের মতে জৈনুদ্দীন তৎকালে পাটনায় ছিলেন। Holwell, Hist. Events Pt. I. chap II. P 116, 119.

* Stewart p. 284. দাদপুর বহরমপুর হইতে ৮ ক্রোশ দক্ষিণ ও পলাশীর নিকট। Holwell.

† রিয়াজুস সালাতীনে লিখিত আছে যে, তৎকালে মীর মহম্মদ রেজা খাঁ হুগলীর কৌজদার ছিলেন, ও মীর আবুল হোসেন তাঁহার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন। কিন্তু আবুল হোসেন গোপনে মীর হাবীবকে আহ্বান করিয়া পাঠান ও তিনি উপস্থিত হইলে হোসেনই দুর্গদ্বার উন্মোচন করিয়া দেন। সেই সময়ে মহম্মদ রেজা সুরাপানে বিভোর হইয়া বারবিলাসিনীদিগের নৃত্য উপভোগ করিতেছিলেন। পরে তিনি বন্দী হন।

করে। শেখরাও হুগলীতে উপস্থিত হইয়া মসনদে উপবিষ্ট হইলে, নগরবাসিগণ তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিতে লাগিল, এবং মীর হাবীবের পরামর্শক্রমে অনেক মোগল বণিকও মহারাষ্ট্রীয়দিগকে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিল। অনেকে হুগলী হইতে পলায়ন করিয়া চুঁচুড়া প্রভৃতি স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে। এইরূপে হুগলী বন্দরের রাজস্ব ও বাণিজ্যশুল্ক হইতে অনেক অর্থ প্রাপ্ত হওয়ায়, ভাস্কর পণ্ডিত কিছু দিন বাংলায় বাস করিতে ইচ্ছা করিয়া কাটোয়া তাঁহার প্রধান বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। মীর হাবীবও এই সময় হইতে তাঁহার মন্ত্রী বা দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার কার্য্যক্ষমতাগুণে তিনি কখনও কাটোয়া ও কখনও হুগলীতে কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। *

যৎকালে মহারাষ্ট্রীয়েরা বাঙ্গালার দক্ষিণ ভাগে অর্থসংগ্রহে ব্যস্ত ছিল, সেই সময় নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ মুর্শিদাবাদে অবস্থান করিয়া কি উপায়ে তাহাদিগকে দূরীভূত করিবেন সেই চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ উড়িষ্যাবিজয় হইতে এ পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বিশেষতঃ বর্ষাকাল উপস্থিত হওয়ায় তাহারা যে সহজে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পরাজিত করিতে পারিবে, সে সম্ভাবনা অল্পমাত্রই ছিল। এই সমস্ত কারণে নবাব অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। তিনি এক্ষণে মুর্শিদাবাদ ও তন্নিকটস্থ স্থানগুলি যাহাতে রক্ষা করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইলেন। তিনি মুর্শিদাবাদের নিকটস্থ আমানিগঞ্জ ও তারাকপুর † নামক স্থানে আপনার সৈন্যগণকে সমবেত করিয়া নগররক্ষার যত্ন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ভাগীরথী প্রবল হওয়ায় মহারাষ্ট্রীয়গণের পার হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। তজ্জন্য নবাব কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়েরা এই সুযোগে বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি প্রদেশ অধিকার করিয়া বালেশ্বর পর্য্যন্ত আপনাদের অধিকার বিস্তার করে। মেদিনীপুরের ফৌজদার মীর কালেন্দার দুর্গরক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা মীর মাসুম আপনার সৈন্য অপেক্ষা মহারাষ্ট্রীয়দিগের সংখ্যা অধিক জানিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করায়, উড়িষ্যা প্রদেশ অরক্ষিত অবস্থায় থাকে। পরে তাহা মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিকারভুক্ত হয়। এইরূপে উড়িষ্যা, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, রাজসাহীর অধিকাংশ এবং রাজমহল প্রদেশ প্রভৃতি গঙ্গার পশ্চিম পারস্থ যাবতীয় স্থান মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তগত হয়। কেবল মুর্শিদাবাদ সহর, গঙ্গার পূর্ব্ব-তীরস্থ ও সন্নিকটস্থ কতিপয় স্থান নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর অধিকারে থাকে। মুর্শিদাবাদের অধিবাসিগণ চিরদিন শান্তিসুখ ভোগ করিতেছিল। তাহারা এক্ষণে ভীত হইয়া নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পলায়ন আরম্ভ করিল। ঢাকা, মালদহ, রামপুর-বোয়ালিয়া প্রভৃতি স্থান মুর্শিদাবাদের সম্ভ্রান্ত লোক দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। নওয়াজেস মহম্মদ খাঁ মুর্শিদাবাদের নিকট গোদাগাড়ী নামক স্থানে আপনার ধন-সম্পত্তি ও পরিবারবর্গকে রক্ষা করিয়া পুনর্ব্বার মুর্শিদাবাদে আগমন করেন। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁরও অনেক সম্পত্তি গোদাগাড়ীতে প্রেরিত হইয়াছিল। এইরূপে কেবল মুর্শিদাবাদে নহে, বাঙ্গালার সকল স্থানের অধিবাসিগণ স্ব স্ব স্থান পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত সুরক্ষিত স্থানে পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিল। এই সম্বন্ধে হলওয়েল লিখিয়াছেন—

(In this event (Marhatta invasion) a general face of ruin succeeded. Many of the inhabitants, weavers and husbandmen fled. The arungs were in a great degree deserted, the lands untilled and the wretched fugitives who had escaped with nothing but their wives and children and whatever they could carry in their hands, though there was no safety for them until they arrived on the eastern shore of the Ganges, to which they flocked in shouts without intermission for many days together."

"The manufactures of the arungs recieved so injurious a blow at this period that they have ever since lost their original purity and estimation and probably will never recover again.")

(Holwell Hist. Events, Pt. I, Chap II. p 123-124)

এই সময়ে ভাগীরথীর পশ্চিম পার হইতে অনেক অধিবাসী ইংরাজদিগের কলিকাতায় পলায়ন করে। [ক্রমশঃ

* রিয়াজে লিখিত আছে যে, শেখরাও হুগলী হইতে কয়েকটী তোপ, গোলা, বারুদ প্রভৃতি সঙ্গে করিয়া হুগলী পরিত্যাগ করেন ও কাটোয়ায় উপস্থিত হন।

† আমানিগঞ্জ বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ ও বহরমপুরের মধ্যে। উক্ত স্থান হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ হইবে। তাড়াকপুর বহরমপুর হইতে দেড় ক্রোশ পূর্ব্বে।

সংবাদ ও মন্তব্য

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি

এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে (১লা এপ্রিল হইতে ৬ই এপ্রিল) কলিকাতায় কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির এক অধিবেশন হয়। প্রথম দিন, আসামে কোয়ালিশন মন্ত্রিমণ্ডলীর গঠন সম্ভাবনা এবং মহাকোশলে কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন সম্বন্ধে আলোচনা হয়। দ্বিতীয় দিন চারিটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তন্মধ্যে একটি :—ভারতবর্ষের স্বার্থ অনুযায়ী ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার অধিকার ভারতবর্ষের আছে। একটি প্রস্তাবে বৈদেশিক পরিস্থিতি সম্পর্কিত বিষয়ের জন্য একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। তৃতীয় দিন সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। বাংলার আইন-সভাতে অপর দলের সহিত মিলিত ভাবে কংগ্রেস দল কি প্রকারে কংগ্রেসের কার্য্যনির্দ্দেশ সফল করিতে পারে, তাহার আলোচনা হয়। চতুর্থ দিন তৃতীয় দিনের জের চলে। পঞ্চম দিন মধ্যপ্রদেশের আইন-সচিব মিঃ শরীফের পদত্যাগ সম্পর্কে আলোচনা হয়। ষষ্ঠ দিন বিহারী বাঙ্গালী সমস্যা ও হিন্দুমুসলমানের দলাদলির আলোচনা হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি।

*

সংবাদপত্রে জাঁকজমকের সহিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন ঘোষিত এবং ঐ অধিবেশনের কার্য্যাবলী প্রকাশিত হয়। লেখাপড়া-জানা ব্যক্তিরা তাহা পড়িয়া যথেষ্ট পুলকিত হন, বিহ্বল হন, উত্তেজিত হন। কিন্তু কোন কাজের হিসাব লইবার প্রবৃত্তি হইতে তাঁহাদিগের 'শিক্ষা' তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছে, সে হিসাব লইতে তাঁহারা জানেন না। এক সপ্তাহব্যাপী কলিকাতার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে যে-কাজ হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা উপরে উদ্ধৃত করিলাম। আলোচনা ও প্রস্তাব ব্যতীত ইহার মধ্যে হিসাব লইবার কিছুই নাই এবং সেই প্রস্তাব ও আলোচনাও অধিকাংশ সময়েই অত্যন্ত সামান্য বিষয়ে নিবদ্ধ। ভারতবাসী জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সুখ ও দুঃখের সহিত ঐ সকল বিষয়ের কোন যোগাযোগ নাই। দেশের স্বয়ংসিদ্ধ নেতৃবৃন্দ দিনের পর দিন এইরূপ ভাবে তাঁহাদের নেতৃত্ব বজায় রাখিয়া চলিয়াছেন এবং দিনের পর দিন ভারতবাসীর দুঃখ-সমুদ্রের তরঙ্গ উত্তাল হইতে উত্তালতর হইতেছে। ১৫ই মে তারিখে বোম্বাইএ আবার ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন বসিতেছে। আমরা পাঠকদিগকে সেই অধিবেশনের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতে অনুরোধ করিবার জন্যই গত অধিবেশনের কথা তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিলাম।

এক মাসের দাঙ্গা-হাঙ্গামা

গত প্রায় এক মাস কাল সময়ের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে, তাহার একটি মোটামুটি তালিকা (প্রকাশিত সংবাদ হইতে) নিম্নে দেওয়া হইল—(১) রেঙ্গুনে বাসের স্বত্বাধিকারী ও মোটর যান বিভাগের দাঙ্গা (২) হায়দ্রাবাদে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (৩) জব্বলপুরে কাটনীতে সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য (৪) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (৫) রাঁচীতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (৬) লাহোরের নিকট একটি ষ্টেশনে নারীহরণ সম্পর্কিত দাঙ্গা (৭) মালদার হামিদপুরে সাঁওতাল ও পুলিশের সংঘর্ষ (৮) ফরিদপুরে কৃষক-প্রজা সম্মেলনে হাঙ্গামা (৯) নাগপুরে হিন্দু সভার অধিবেশনে দাঙ্গা (১০) জেমসেদপুরে রামনবমীতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (১১) এলাহাবাদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (১২) বারাউনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (১৩) শিয়ালকোটে জাটেদের দাঙ্গা (১৪) কুম্ভকোনামে কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনের দাঙ্গা (১৫) লাহোর-এর নিকট পুলিশ ও গ্রামবাসীতে সংঘর্ষ (১৬) যুক্তপ্রদেশের এটা জিলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (১৭) সীমান্তে উপজাতিদের দাঙ্গা (১৮) পিপরান্দি (ফরিদপুর) গ্রামবাসীদের দাঙ্গা (১৯) বেরিলীতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তোড়জোড় (২০) উত্তর মালাবারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূচনা (২১) বোম্বাইএ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (২২) কোহাটের লাউট গ্রামে দুইদল মুসলমানের দাঙ্গা (২৩) রাউৎভোগে পঞ্জলা বৈশাখে হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা (২৪) খয়েরপুর জেলে হিন্দুমুসলমান কয়েদীর দাঙ্গা (২৫) একটি বোর্ষ্টাল জেলে জমাদার ও কয়েদীর দাঙ্গা (২৬) কাটলা-গ্রামবাসী ও শিকারীর দলে দাঙ্গা (২৭) লক্ষ্ণৌএ শিয়া-সুন্নীর দাঙ্গা (২৮) দিল্লীতে পুলিশ ও শিখদের সংঘর্ষ (২৯) ঢাকার সিদ্ধেশ্বরীহাট গ্রামে হিন্দু মুসলমানে বিবাদ (৩০) পন্দিচেরীতে শ্রমিক অশান্তি (৩১) লাহোরে বিবাহ-সভায় গোলমাল (৩২) তিরপুর মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে কংগ্রেসী দাঙ্গা (৩৩) জয়পুর ও শিকারের হাঙ্গামা (৩৪) লাহোর জিলার গ্রামে দাঙ্গা (৩৫) মহীশূর হাঙ্গামা (৩৬) লাহোরের গ্রামে মুসলমান দাঙ্গা (৩৭) সীমান্তে খারের খান ও নাকাগারের খানের মধ্যে আসন্ন দাঙ্গা (৩৮) যশোহরে শিমাখালি ও আড়পাড়া গ্রামের দাঙ্গা (৩৯) ফুঁড়িয়ায় মুসলমান নমঃশূদ্র দাঙ্গা (৪০) সালেম জিলায় মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে কংগ্রেসী দাঙ্গা (৪১) মে-ডেতে পুনায় সোস্যালিষ্ট ও হিন্দু যুবক সম্মেলনে দাঙ্গা (৪২) লাহোর জেলার গ্রামে জমিসংক্রান্ত দাঙ্গা (৪৩) ...জারের গ্রামে জনতা ও পুলিশে দাঙ্গা (৪৪) শাঁদগঞ্জ দাঙ্গা (৪৫) মাদুরার গ্রামে তীর্থযাত্রী ও মন্দিরের পাণ্ডায় (৪৬) চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য অঞ্চলে জুমিয়া ও আবগারী পুলিশে (৪৭) ত্রিবাঙ্কুরে কংগ্রেস মিটিংএ দাঙ্গা।

বলাই বাহুল্য, এই তালিকা সম্পূর্ণ নহে। ইহা মাত্র কলিকাতার কয়েক খানি সংবাদপত্র হইতে গৃহীত। নিশ্চয় করিয়া বলা যায়, ইহা ছাড়াও আরও অনেক দাঙ্গাহাঙ্গামা এই সময়ের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছে। এই তালিকার মধ্যে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে বিভিন্ন স্থানে মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচন উপলক্ষে এবং কংগ্রেসী মিটিং-এ দাঙ্গা। গান্ধীজীর অহিংস অভিহিত অসহযোগ আন্দোলন কি ভাবে দেশের মধ্যে বিস্তার লাভ করিতেছে, ইহা তাহারই পরিচয়। মে-ডেতে সোস্যালিষ্ট-হিন্দু দাঙ্গাও বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। দেশের মধ্যে যে-আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে (যাহাকে নবজাগ্রত দেশাত্মবোধ বলিয়া আমাদের নেতারা পুলকিত হন), সেই আন্দোলনই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে এই সকল দাঙ্গাহাঙ্গামার পশ্চাতে কার্য্য করিতেছে, অথচ কোথায় কে গবর্ণর হইবেন না হইবেন এবং কোন্ প্রদেশে কংগ্রেসের কোয়ালিশন হইবে না হইবে, গান্ধীজীপ্রমুখ সকলেই কেবল তাহাই লইয়া ব্যাপৃত।

"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

বঙ্গশ্রী

আষাঢ়—১৩৪৫

৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম খণ্ড—৬ষ্ঠ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

[শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক লিখিত]

বোম্বাই-এর মন্ত্রিসম্মেলন

আমাদের ভারতবর্ষে বর্ত্তমান সময়ে এমন একশ্রেণীর মানুষ আছেন, যাঁহারা গান্ধিজী-পরিচালিত কংগ্রেসের দ্বারা দেশের সমস্যাসমূহের সমাধান সম্পাদিত হইবে বলিয়া আশা করিতেছেন। আমাদের মতে, যতদিন পর্য্যন্ত কংগ্রেসের পরিচালনাভার প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে গান্ধিজীর মত মানুষের হাতে ন্যস্ত থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর কোন সমস্যার সমাধান হওয়া তো দূরের কথা, উহার প্রত্যেক সমস্যাই অধিকতর জটিলতাগ্রস্ত হইতে থাকিবে এবং একদিকে দেশের বেকারের সংখ্যা ও বেকারতার যন্ত্রণা যেরূপ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, সেইরূপ আবার দরিদ্রের সংখ্যা ও দারিদ্র্যের মাত্রাও বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। ইহা ছাড়া সমাজের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের প্রচ্ছন্ন ব্যভিচার, উচ্ছৃঙ্খলতা, কপটতা (insincerities), মিথ্যাবাদিতা ও কৃতঘ্নতা ক্রমশঃ হৃদয়বিদারক রূপ পরিগ্রহ করিবে।

গত অষ্টাদশবর্ষব্যাপী গান্ধিজীর নেতৃত্বকালে ভারতবাসীর অবস্থা কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পৌছিয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া চিন্তা করিলে আমাদের উপরোক্ত মতবাদের সত্যতা কথঞ্চিৎ পরিমাণে প্রমাণিত হইতে পারে। দেশের অবস্থা গত আঠার বৎসরের মধ্যে কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পৌছিয়াছে, তাহার বিশ্লেষণ করিলে যেরূপ গান্ধিজীর নেতৃত্বের অসারতা প্রতিপন্ন হইতে পারে, সেইরূপ গান্ধিজী তাঁহার বিভিন্ন পত্রিকায় এবং বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত মতবাদ প্রচার করিয়াছেন তাহার বিশ্লেষণ করিলেও আমাদের মতবাদ যে সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত, তাহা প্রতিপন্ন করা সহজসাধ্য হইতে পারে। এইরূপ আবার কংগ্রেসের দ্বারা সংগঠিত মন্ত্রিমণ্ডলের দ্বারা পরিচালিত সাতটি প্রদেশে গত এক বৎসর ধরিয়া গান্ধিজীর নির্দ্দেশানুসারে কি কি কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে অথবা সম্পাদিত হইতে চলিয়াছে, তাহার দিকে লক্ষ্য করিলেও একই সত্যের আভাষ পাওয়া যাইবে। যাঁহারা চক্ষু থাকিয়াও অন্ধ অথবা কর্ণ থাকিয়াও বধির, অথবা যাঁহারা সমাজের মধ্যে পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া জীবন-যাপন করিয়া থাকেন বলিয়া জীবিকাসংগ্রহের মূল উৎস কোথায় তৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তাঁহারা হয় ত আমাদের কথার সত্যতা কথঞ্চিৎ পরিমাণেও উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন না; কিন্তু যাঁহারা সৎ ভাবে কঠোর পরিশ্রম করিয়া জীবিকা

সংগ্রহ করিতে ব্যাকুল, তাঁহাদের অবস্থা যে উত্তরোত্তর খারাপের দিকে যাইতেছে এবং গান্ধিজীপরিচালিত কংগ্রেস গত এক বৎসরেও উহার গতি কথঞ্চিৎ পরিমাণেও পরিবর্ত্তিত করিতে সক্ষম হন নাই, তাহা অস্বীকার করা যায় না। "ফলের দ্বারা বৃক্ষের গুণাগুণ বিচার করিতে হয়", এই প্রচলিত বাক্যের কোন সত্যতা আছে বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলে, গান্ধিজী-পরিচালিত কংগ্রেসের কোন কার্য্যকেই প্রায়শঃ প্রশংসার যোগ্য বলিয়া মনে করা যায় না। ডাক্তারের প্রায় বার আনা শেষ হইয়া গিয়াছে বলিয়া গান্ধিজীর অনুচরবর্গ মনে করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু ভারতবাসীর অন্নাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়েছে এবং বিচার করিয়া দেখিলে আজও উহার কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। এক কথায়, অস্ত্রোপচার ঠিকই হইয়েছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, রোগীও মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। বোম্বাই নগরে কংগ্রেসপরিচালিত ৭টী প্রদেশের মন্ত্রিগণকে লইয়া গান্ধিজীর যে মন্ত্রণাসভা হইয়া গিয়াছে, তাহার কার্য্যাবলী বিচার করিয়া দেখিলেও আমাদের উপরোক্ত মতবাদের যুক্তিযুক্ততার সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে।

জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য যে যে অভিনয় ঐ মন্ত্রণাসভায় শুনা গিয়াছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য তিনটি; যথা—(১) টাকার বৈদেশিক মূল্যের পরিবর্ত্তন (change of rupee-ratio), (২) গ্রাম্য-ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা, (৩) কৃষকগণকে সস্তা ঋণ-প্রদানের ব্যবস্থা।

মানবসমাজের জীবিকানির্ব্বাহের মূল উৎস কোথায়, সেই মূল উৎস বর্ত্তমান সময়ে উত্তরোত্তর স্ফীত হইতেছে অথবা শুষ্ক হইয়া যাইতেছে তাহা সবিশেষরূপে জানা থাকিলে অনায়াসেই বুঝা যাইবে যে, যতদিন পর্য্যন্ত জীবিকানির্ব্বাহের মূল উৎস উত্তরোত্তর স্ফীত হইতে থাকে ততদিন পর্য্যন্ত কৃষকগণের কোন ঋণের প্রয়োজন হইতে পারে না এবং ততদিন পর্য্যন্ত টাকার বৈদেশিক মূল্যের সহিত জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার কথঞ্চিৎ সম্বন্ধ থাকিলেও থাকিতে পারে বটে, কিন্তু যখন মানবসমাজের জীবিকানির্ব্বাহের মূল উৎস উত্তরোত্তর শুষ্ক হইতে থাকে, তখন জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার সহিত টাকার বৈদেশিক মূল্যের কোন উল্লেখযোগ্য সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে না।

যাঁহারা নিরাপাশ্চাত্য মত পাশ্চাত্ত্য অর্থনীতিবিদ্‌গণের কথা অভ্যাস করিয়া থাকেন, এবং ঐ সমস্ত কথা উদ্গিরণ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, তাঁহারা আমাদের কথা কথঞ্চিৎ পরিমাণেও বুঝিতে পারিবেন বলিয়া আমরা আশা করি না।

দেশের মোট জনসংখ্যার জীবিকানির্ব্বাহের জন্য যে-পরিমাণ আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যের প্রয়োজন, যখন উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ তাহার অর্দ্ধেক হইতেও কম হইয়া থাকে, তখন ঐ উৎপন্ন শস্যের হার যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তাহা না করিতে পারিলে, কাগজ অথবা ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রা চিবাইয়া খাইয়া জীবন রক্ষা করা সম্ভবযোগ্য হয় না—এই সত্যটুকু উপলব্ধি করিতে পারিলে, আমাদের উপরোক্ত কথার যুক্তিযুক্ততা বুঝা সম্ভব হয়।

আমাদের উপরোক্ত কথার যুক্তিযুক্ততা বুঝিতে পারিলে আরও দেখা যাইবে যে, দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের অবস্থাবিশেষে টাকার বৈদেশিক মূল্যের হারের সহিত দেশস্থ ধনিকগণের আর্থিক অবস্থার তারতম্য ঘটিয়া থাকে বটে, কিন্তু উহার সহিত জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার সম্বন্ধ অতীব অকিঞ্চিৎকর।

এই অবস্থায় যাঁহারা টাকার বৈদেশিক মূল্যের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া দেশীয় জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিবার আশা পোষণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা আমাদের মতে পাশ্চাত্য অর্থনীতির বড় বড় পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিলেও করিতে পারেন বটে, কিন্তু প্রকৃত অর্থনীতির ক-খ-সম্বন্ধে অপরিজ্ঞাত।

বোম্বাই-এর মন্ত্রিসম্মেলনে, যতগুলি বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে এবং তৎসম্বন্ধে কর্মধারগণ যে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়, তাহার প্রত্যেকটি বিশ্লেষণ করিয়া ভাবিয়া দেখিলেই আমাদের উপরোক্ত মন্তব্যের প্রতিধ্বনি পাওয়া যাইবে।

বঙ্গশ্রী ও ভারতীয় কংগ্রেস

আমরা শুনিতে পাইয়াছি যে, কাহারও কাহারও মতে বঙ্গশ্রী একখানি কংগ্রেস-বিরোধী সংবাদপত্র এবং উহাতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আন্দোলন উত্থাপিত করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। যাঁহারা এবংবিধ ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা আমাদিগের মতে ধীরতার সহিত চিন্তা করিয়া বঙ্গশ্রী পাঠ করেন না। বঙ্গশ্রী এতাবৎ কি কি কথা বলিয়া আসিয়াছে তাহা ধীরতার সহিত পরিজ্ঞাত হইতে চেষ্টা করিলে দেখা যাইবে যে, দেশের মধ্যে প্রকৃত কংগ্রেস সংগঠিত না করিতে পারিলে অন্ত কোন উপায়ে দেশের ও দেশবাসীর কোন সমস্যারই সমাধান করা সম্ভবযোগ্য হইবে না, ইহা বঙ্গশ্রীর অন্যতম অভিমত। বঙ্গশ্রীর কথানুসারে, যে প্রতিষ্ঠানে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ধনী, গরীব, কৃষক, শিল্পী, বণিক্, চাকুরীয়া-নির্বিশেষে দেশের প্রত্যেকে কোনরূপ আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়া যোগদান করিতে পারেন এবং এই যোগদানের ফলে প্রত্যেকের আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক উন্নতির ব্যবস্থা সংগঠিত হইতে পারে, সেই প্রতিষ্ঠানকে প্রকৃতভাবে দেশীয় কংগ্রেস বলা যাইতে পারে।

দেশীয় কংগ্রেসের এই সংজ্ঞানুসারে যে প্রতিষ্ঠানে দেশের একজনও কোন কারণে কংগ্রেসে যোগদান করা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বাধ্য হন, অথবা দেশের যে প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিয়া একজনও কোনরূপ আর্থিক ক্ষতি অথবা কোনরূপ শারীরিক অস্বাস্থ্য অথবা কোনরূপ মানসিক অবসাদ বহন করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন, সেই প্রতিষ্ঠানকে প্রকৃত ভাবে দেশীয় কংগ্রেস বলা চলে না। বঙ্গশ্রীর মতে, প্রকৃত দেশীয় কংগ্রেস দেশের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পবিত্র প্রতিষ্ঠান এবং উহা যথাযথ ভাবে কোন দেশে বিদ্যমান থাকিলে, ঐ দেশের জনসাধারণের মধ্যে কোনরূপ আর্থিক অভাব, মানসিক অশান্তি ও অসন্তুষ্টি, অকাল-বার্দ্ধক্য এবং অকালমৃত্যু বৃদ্ধি পাইতে পারে না। ইহা ছাড়া, দেশীয় কংগ্রেস যথাযথ ভাবে দেশের মধ্যে বিদ্যমান থাকিলে, উহাতে যাঁহারা যোগদান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কোনরূপ আর্থিক অথবা শারীরিক অথবা মানসিক ক্ষতি-গ্রস্ততা বরদাস্ত করিতে হয় না।

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে যে প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস-নামে চলিতেছে, তাহাকে যে উপরোক্ত সংজ্ঞানুসারে প্রকৃত কংগ্রেস বলিয়া অভিহিত করা যায় না, ইহা বলাই বাহুল্য। একেশ্বর ঐ প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও গত ২০-২৫ বৎসর হইতে জনসাধারণের আর্থিক অভাব, মানসিক অশান্তি ও অসন্তুষ্টি, অকালবার্দ্ধক্য এবং অকালমৃত্যু উত্তরোত্তর হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়া তো দূরের কথা, উহার প্রত্যেকটি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার পর আবার ঐ প্রতিষ্ঠানে কোন গবর্ণমেণ্ট চাকুরীয়া অথবা কোন বণিক্ অথবা শিল্পী ধনিকের যোগদান করা সম্ভবযোগ্য নহে। ইহা ছাড়া, যাঁহারা পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া জীবন যাপন করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহাদের পক্ষে উহাতে যোগদান করিলে আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক ক্ষতিগ্রস্ততা স্বীকার না করিয়া উহাতে টিকিয়া থাকা সম্ভবযোগ্য নহে।

অনেকে হয় ত মনে করিবেন যে, বঙ্গশ্রীর সংজ্ঞানুসারে প্রকৃত কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে হইলে যাহা যাহা করিতে হয়, তাহা কখনও কার্য্যতঃ সম্পূর্ণ ভাবে করা সম্ভবযোগ্য নহে। উহা কল্পনাপ্রিয় লেখকের কল্পনা মাত্র। কিসের ফলে কি হয় তাহা ভাবিতে হইলে যে গভীর চিন্তা, ধীরতা ও কার্য্যাভিজ্ঞতার প্রয়োজন, তাহা আজকালকার কুশিক্ষা ও নর্ত্তন-কুর্দ্দনের ফলে অত্যন্ত বিরল হইয়া যাওয়ায়, খুব সম্ভব তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে উপরোক্ত-ভাবাপন্ন লোকের সংখ্যাই বেশী। পরন্তু, তথাকথিত শিক্ষা এতাদৃশ হীনতাপ্রাপ্ত না হইলে প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুঃখের হা-হুতাশ এত বৃদ্ধি পাইত না। যে যাহাই মনে করুন, বঙ্গশ্রীর কথা কল্পনাপ্রিয়ের কল্পনা মাত্র নহে। উহার সংজ্ঞানুযায়ী কংগ্রেস সংগঠন করা কার্য্যতঃ অসম্ভব নহে। কি করিয়া ঐ শ্রেণীর কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহাও মাসিক বঙ্গশ্রীর 'ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়'-শীর্ষক প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে।

বঙ্গশ্রীর মতে, ভারতবর্ষে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা সাধিত হইয়াছিল প্রাকৃতিক কারণে এবং প্রকৃতির হস্তক্ষেপ বিদ্যমান ছিল বলিয়াই মূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ইংরাজ ও

ভারতীয়ের মিলনে হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টানের ঐকান্তিকতায় সাধিত হইয়াছিল। ঠিক পথে পরিচালিত হইলে ঐ ভারতীয় কংগ্রেসই প্রকৃত কংগ্রেসরূপে দণ্ডায়মান হইতে পারিত এবং আজ উহার বিরুদ্ধে আমাদেরও কিছু করিবার থাকিত না।

কাজেই, বঙ্গশ্রীর বিরোধিতা অথবা বিদ্রোহ প্রকৃত কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নহে, পরন্তু বর্ত্তমান পরিচালনার বিরুদ্ধে।

কংগ্রেসের ইতিহাস লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, ইহার প্রথম ভাগে দেশীয় গবর্ণমেণ্ট যাহাতে লোকহিতকর হয়, তাহা করাই কংগ্রেসের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু, কি করিলে যে গবর্ণমেণ্ট প্রকৃত পক্ষে সম্পূর্ণভাবে লোকহিতকর হইতে পারে, তাহা তাৎকালিক পরিচালকবর্গ গবেষণা করিয়া আবিষ্কার করিতে পারেন নাই এবং উদ্দেশ্যসিদ্ধির যথাযথ পথেও কংগ্রেস পরিচালিত হয় নাই। শুধু যে ভারতীয়গণই ঐ পথ আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন নাই তাহা নহে, আধুনিক জগতের কোন দেশের কোন জাতিই, কোন্ পন্থায় যে গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বতোভাবে লোকহিতকর হইতে পারে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে সক্ষম হন নাই। আধুনিক রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞানের উৎকর্ষবিষয়ে যে কতখানি অসম্পূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে তৎসম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে পরবর্ত্তী কালে ভারতীয়গণ মনে করিতে আরম্ভ করেন যে, স্বরাজ না হইলে লোকহিতকর গবর্ণমেণ্ট হইতে পারে না এবং কংগ্রেস হইতে স্বরাজের দাবী উত্থাপিত হয়। এই স্বরাজের দাবী লইয়া (১৯০৫ সন হইতে) কংগ্রেসের ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগ আরম্ভ হইয়াছে এবং তদবধি দেশের মধ্যে দলাদলি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বঙ্গশ্রীর মতে, এই সময় হইতে কংগ্রেস বিকৃত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে এবং যে কংগ্রেসের দ্বারা একদিন ভারতীয় জনসাধারণের অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ও শান্তির অভাব দূর করিবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল, প্রধানতঃ সেই কংগ্রেসের কার্য্যের ফলে দেশের মধ্যে অর্থাভাব প্রভৃতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

এখনও জনসাধারণকে তাহাদের দুঃখ হইতে মুক্ত করিতে হইলে, যাহাতে কংগ্রেস রাহুর কবল হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় সুপথে পরিচালিত হয় তাহার প্রচেষ্টায় উদ্যত হইতে হইবে।

গান্ধিজী যে পথে কংগ্রেসকে পরিচালিত করিয়াছেন, তাহাতে দেশের মধ্যে স্ত্রীপুরুষের ব্যভিচার, অসত্যবাদিতা, চাতুরী, উচ্ছৃঙ্খলতা, অধার্ম্মিকতা, অর্থাভাব, অস্বাস্থ্য, অশান্তি, অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু বৃদ্ধি পাওয়া অবশ্যম্ভাবী।

যতদিন পর্য্যন্ত দেশের শিক্ষিত সমাজের অধিকাংশ উপরোক্ত সত্য বুঝিতে না পারিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত গান্ধিজী ও তাঁহার অনুচরবর্গ যে দেশের জনসাধারণের পক্ষে রাহুর মত অনিষ্টকর, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করা ছাড়া দেশের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর পক্ষে অন্য কোন কার্য্য থাকিতে পারে না, ইহা বঙ্গশ্রীর অভিমত।

দেশের শিক্ষিতসমাজ যে মুহূর্ত্তে গান্ধিজী ও তাঁহার অনুচরবর্গবিষয়ক উপরোক্ত সত্য প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারিয়া, দেশের কার্য্যে উদ্যত হইলে যেরূপ ফুলের মালা পাওয়া যায়, সেইরূপ আবার জুতার মালাও পাইবার আশঙ্কা থাকে, ইহা গান্ধিজীপ্রমুখ নেতৃবর্গকে স্মরণ করাইয়া দিবার প্রয়াসী হইবেন, সেই দিন আমাদের কংগ্রেস রাহুমুক্ত হইবে বলিয়া মনে করা যাইবে। যখনই কংগ্রেস রাহুমুক্ত হইবে তখনই অভিমানশূন্য প্রকৃত দেশসেবকের দেখা পাওয়া যাইবে, এবং তখনই আবার প্রকৃত কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা সাধিত হইয়া ভারতবর্ষের বিবিধ সমস্যার সমাধান হইবার আশা করা যাইবে।

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব-বিষয়ক আইনের সংস্কার সম্বন্ধে তৎসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও সঙ্ঘসমূহের কর্ত্তব্য

বঙ্গীয় অ্যাসেম্ব্লির গত অধিবেশনে প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনের কয়েকটি ধারার পরিবর্ত্তন যে অধিকাংশের ভোটের দ্বারা পরিগৃহীত হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে ঐ পরিবর্ত্তন বাঙ্গালার লাটসাহেব মঞ্জুর করিলেই যে উহা আইনরূপে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, তাহা পাঠকগণ অবগত আছেন। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব-বিষয়ক আইনের এই পরিবর্ত্তন

লইয়া দেশের মধ্যে দুইটি প্রচণ্ড বিরুদ্ধ মনোভাবের উদ্ভব হইতেছে। এক দলের মতে এই পরিবর্ত্তিত আইন পরিগৃহীত না হইলে কৃষিকার্য্যপন্থী প্রজাগণের অর্থগত সমস্যাসমূহের কোনটীরই প্রতিকার হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে। পরন্তু, ইঁহারা মনে করেন যে, ঐ পরিবর্ত্তনগুলি পরিগৃহীত হইলে প্রজাগণের দারিদ্র্য দূরীভূত হইবে। বাঙ্গালার মন্ত্রিমণ্ডলী, তাঁহাদের অনুচরবর্গ এবং কংগ্রেসপার্টির মানুষগুলি এই মতবাদের স্বপক্ষীয়। বাঙ্গালার জমীদারগণ ও ইয়োরোপীয় পার্টি ঐ মতবাদের বিরুদ্ধপক্ষীয়। জমীদার ও তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকগণের মতে, বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব-বিষয়ক আইনের প্রস্তাবিত সংস্কারসমূহ গবর্ণরের দ্বারা পরিগৃহীত হইলে মধ্য-স্বত্বাধিকারিগণের কিছু কিছু উপকার হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু শ্রমজীবী কৃষকগণের কোনই উপকার সাধিত হইবে না ; পরন্তু জমীদারগণ এই সংস্কারের ফলে সম্পূর্ণ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবেন।

এই দুইটী মতবাদের কোন্‌টী যে ঠিক, অথবা কোন্‌টী যে বে-ঠিক, তৎসম্বন্ধে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের প্রচেষ্টায় অদ্যাবধি কেহ হস্তক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। ঐ সম্বন্ধে যুক্তি-তর্কসঙ্গত কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের প্রচেষ্টায় কেহ হস্তক্ষেপ করুন আর না-ই করুন, দুই পক্ষের বিরোধের তীব্রতা যে ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

মন্ত্রিমণ্ডলের পক্ষ হইতে প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক বলিতেছেন যে, যদি গবর্ণর সাহেব অ্যাসেম্ব্লির পাশ করা ঐ পরিবর্ত্তনগুলি আইনরূপে পরিগৃহীত হওয়ার মঞ্জুরী প্রদান না করেন, তাহা হইলে তিনি সদলবলে পদত্যাগ করিবেন এবং যাহাতে ঐ মঞ্জুরী পরিশেষে প্রদত্ত হয় তজ্জন্য তিনি আইনসঙ্গত ভাবে প্রচণ্ড আন্দোলনের সৃষ্টি করিবেন।

অন্য দিকে, জমীদারগণের পক্ষ হইতে স্যার এ. এইচ. গজনভি দেশবাসিগণকে শুনাইতেছেন যে,

"We the Zeminders of Bengal, and Moslems are united as one man in our determination to fight to the last by all constitutional means the attempt of the Bengal Ministry to place the Bengal Tenancy Bill on the Statute Book"

অর্থাৎ বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব-বিষয়ক বিলটিকে আইনরূপে পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য বাংলার মন্ত্রিগণ যে প্রচেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন, বিধিসঙ্গত উপায়ে তাহার বিরোধিতা করিবার জন্য শেষ পর্য্যন্ত বাংলার জমীদার ও মুসলমানগণ সর্ব্বতোভাবে ঐক্যবদ্ধ থাকিবেন।

আমাদের মতে, বর্ত্তমান প্রজাস্বত্ববিষয়ক বিলটি আইনরূপে পরিবর্ত্তিত হইলেও কৃষক প্রজাবর্গের দুর্দ্দশা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেই থাকিবে ; আর, উহা পাশ না হইলেও প্রজাদিগের দারিদ্র্য কিঞ্চিন্মাত্রও হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে না, পরন্তু উত্তরোত্তর বাড়িতেই থাকিবে। শুধু যে প্রজাদিগের অবস্থাই ঐরূপ হইবে তাহা নহে, জমীদারদিগেরও আর্থিক দারিদ্র্য একরূপ ভাবে উভয়াবস্থাতেই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে। যে জমীদারগণ মনে করিতেছেন যে, অগ্রক্রয়াধিকার (Right of Pre-emption) ও জমীর ক্রয়-বিক্রয়ে নামপত্তনের জন্য জমীদারগণকে সেলামী দিবার পদ্ধতি বিলুপ্ত হইলে তাঁহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবেন এবং তজ্জন্য হৈ-চৈ আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারাও আমাদের মতে ভ্রান্ত। চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, জমীদার ও প্রজাগণের ধ্বংস অনেক দিন হইতেই আরম্ভ হইয়াছে এবং প্রজাস্বত্ব-বিষয়ক বিল আইনরূপে পরিবর্ত্তিত হইলেও উহা যেরূপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, ঐ বিল আইনরূপে পরিবর্ত্তিত না হইলেও উহাদের ধ্বংস ঠিক একই ভাবে বাড়িতে থাকিবে।

অগ্রক্রয়াধিকার ও সেলামী দিবার পদ্ধতি বিদ্যমান থাকিলেই যদি জমিদারদিগের পক্ষে স্ব স্ব আর্থিক প্রাচুর্য্য বজায় রাখা সম্ভব হইত, তাহা হইলে এতাবৎকাল কোন জমিদারের অবস্থায় আর্থিক অপ্রাচুর্য্য প্রবেশ লাভ করিতে পারিত না। কিন্তু, জমিদারদিগের আর্থিক অবস্থা কোথা হইতে কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার সন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, এমন একদিন ছিল, যখন বাংলার কোন জমিদারের ঘরই প্রায়শঃ দায়গ্রস্ত ছিল না। আর এক্ষণে, ঐ জমিদারগণের মধ্যে অনেকেই রাজা, মহারাজা, স্যার, সি. আই. ই প্রভৃতি উপাধিতে বিভূষিত হইয়া নিজ-

দিগকে অভিনব একটা কিছু মনে করিয়া থাকেন বটে; কিন্তু প্রায়শঃ এমন একটি খবরও পাওয়া যায় না, যে খবটী ঋণদায় হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত।

জমিদারগণের অগ্রক্রয়াধিকার এবং তাঁহাদিগকে সেলামী দিবার পদ্ধতি বিদ্যমান থাকিলেই যদি প্রজাদিগের আর্থিক অবস্থা অবনতি প্রাপ্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী হইত, অথবা অন্য পক্ষে ঐ দুটি পদ্ধতি বিলুপ্ত হইলেই যদি তাঁহাদিগের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হওয়া সহজসাধ্য হইত, তাহা হইলে ঐ দুইটি পদ্ধতি বিদ্যমান থাকিলে যেমন প্রজাগণের আর্থিক উন্নতি হওয়া সম্ভবযোগ্য হইত না, সেইরূপ আবার ঐ দুইটি পদ্ধতি বিদ্যমান না থাকিলে প্রজাগণের আর্থিক অবনতি ঘটিয়া উঠা সহজসাধ্য হইত না। অথচ, অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, এই ভারতবর্ষে জমিদারগণের অগ্রক্রয়াধিকার এবং জমীর ক্রয়-বিক্রয়ে নামপত্তনের ফি পাইবার অধিকার স্মরণাতীত কাল হইতে প্রকারান্তরে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং ঐ অধিকার থাকা সত্ত্বেও জমিদারগণ উহা সময় সময় ব্যবহার করেন নাই। ইহাও জানা যাইবে যে, এই ভারতবর্ষে এমন এক দিন ছিল, যখন জমিদারগণের উপরোক্ত অধিকার সত্ত্বেও প্রজাগণ রাজস্বরূপে উৎপন্ন শস্যের ৬ প্রদান করিয়াও একমাত্র কৃষিকার্য্য হইতেই তিন বেলা প্রচুর পরিমাণে আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারিত এবং বারমাসে তের পার্ব্বণের উৎসব প্রাণ খুলিয়া উপভোগ করিতে সমর্থ হইত; আর, এক্ষণে স্থানে স্থানে দেখা যাইবে যে, আইনতঃ জমিদারগণের অগ্রক্রয়াধিকার এবং নাম-পত্তনের ফি পাওয়ার অধিকার থাকা সত্ত্বেও কার্য্যতঃ জমিদারগণ ঐ অধিকারের ব্যবহার করেন না এবং প্রজাগণও কার্য্যতঃ ইহা জমিদারগণকে প্রদান করেন না, তথাপি যে প্রজাগণ একদিন উহা প্রদান করিয়া তিন বেলা আহারের প্রাচুর্য্য ও বারমাসে তের পার্ব্বণের উল্লাস উপভোগ করিতে পারিত, সেই প্রজাগণই এক্ষণে উহা কার্য্যতঃ প্রদান না করিয়াও সারা দিনে প্রায়শঃ একবেলার অধিক আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারে না এবং পার্ব্বণের উল্লাস উপভোগ করা তো দূরের কথা, সর্ব্বদাই আর্থিক দারিদ্র্য ও স্বাস্থ্যাভাবের জন্য মনের ক্লেশে জর্জ্জরিত হইতে বাধ্য হয়।

যখন পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে, অগ্রক্রয়াধিকার এবং নাম-পত্তনের 'ফি' পাইবার অধিকার সত্ত্বেও জমীদারগণের আর্থিক অবস্থা উত্তরোত্তর হীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ঐ দুইটী অধিকারের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও প্রজাগণ একদিন জমীদারগণকে রাজস্বরূপে উৎপন্নশস্যের ৬ ভাগ প্রদান করিয়াও আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যের প্রাচুর্য্য উপভোগ করিতে পারিত, তখন ঐ দুইটি অধিকার বিদ্যমান থাকিলেই যে জমীদারগণের আর্থিক সম্পন্নতা বিদ্যমান থাকিবে, অথবা প্রজাগণ দরিদ্র হইয়া পড়িতে বাধ্য হইবে, এমন কথা যুক্তিসঙ্গত ভাবে মনে করা চলে না। জমিদারদিগের ঐ দুইটি অধিকার বিদ্যমান থাকিলেও যদি তাঁহাদিগের পক্ষে দায়গ্রস্ত হওয়া এবং প্রজাগণের পক্ষে প্রাচুর্য্য উপভোগ করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে ইহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ দুইটি অধিকারের বিদ্যমানতার সহিত জমিদারগণের সম্পন্নাবস্থার এবং প্রজাগণের দুরবস্থার কোন-সম্পর্ক নাই।

কাযেই, এতদবস্থায় জমিদারগণের ঐ অধিকার রহিত করিয়া দিলেই যে প্রজাগণের আর্থিক প্রাচুর্য্য বৃদ্ধি পাইবে ও জমিদারগণ গরীব হইয়া পড়িবেন এবং উহা বজায় রাখিলেই যে প্রজাগণ দরিদ্র হইয়া পড়িবেন এবং জমিদারগণ আর্থিক প্রাচুর্য্য উপভোগ করিতে পারিবেন, ইহা মনে করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

যে জমিদার ও প্রজা উভয়েই একদিন আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যের প্রাচুর্য্য এবং উৎসবের উল্লাস উপভোগ করিতে পারিতেন, সেই জমিদার ও প্রজা উভয়েরই ঘরে এক্ষণে অর্থের অপ্রাচুর্য্য এবং নিরানন্দের পঙ্কিল ছায়া ক্রমশঃ দেখা যাইতেছে কেন, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, কাহারও কোন বিশেষ অধিকারের জন্য এই সর্ব্বগ্রাসী দারিদ্র্য মানবসমাজে প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছে বলিয়া যে মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা সত্য নহে। এই সর্ব্বব্যাপী দারিদ্র্যের প্রধান ও প্রথম কারণ—জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরা-শক্তির হ্রাস এবং দ্রব্যমূল্যের অসমতা। জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়াই সমাজের প্রত্যেক স্তরের মানুষের শরীর ও মন সুস্থ রাখিতে হইলে গড়পড়তা প্রত্যেক মানুষটিকে

যে খাদ্য যে পরিমাণে দিবার প্রয়োজন হয় এবং উভয়ত সমগ্র মনুষ্যসমাজের সমগ্র জনসংখ্যার নিমিত্ত যে খাদ্য ও ব্যবহার্য্য যে পরিমাণে উৎপন্ন করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা তৎপরিমাণে উৎপন্ন করা কয়েক শত বৎসর হইতে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। ফলে, মনুষ্যসমাজের কতিপয় অংশ অভাবগ্রস্ত থাকিতে বাধ্য হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহারই জন্য যে মনুষ্যসমাজে একদিন ধর্ম্ম-প্রাণতা ও সভ্যতা প্রায় সর্ব্বত্র বিদ্যমান ছিল, সেই মনুষ্যসমাজে যে সমস্ত খাদ্য খাইবেল, কোরাণ ও বেদে নিষিদ্ধ সেই সমস্ত খাদ্য মানুষ পেটের দায়ে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতারণা, চৌর্য্য ও দস্যুবৃত্তি স্থান পাইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে নোট ও ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রার বহুল প্রচারের দ্বারা দ্রব্যমূল্যের অসমতা সাধিত হইতেছে।

যাহাতে জমির স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং দ্রব্যমূল্যের অসমতা দূরীভূত হয়, তাহা না করিয়া জমিদার অথবা প্রজার কোন অধিকার লইয়া কলহ আরম্ভ করিলে জমিদার ও প্রজাগণের মধ্যে মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাইবে বটে, কিন্তু কাহারও আর্থিক অবস্থার কোনরূপ উন্নতি সাধিত হইবে না—ইহা আমাদিগের অভিমত।

জমীদার ও প্রজাগণের মধ্যে মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাইলে জমীদার ও প্রজা, এই উভয়ের কাহারও আর্থিক অবস্থাই যে কেবলমাত্র উন্নত হইবে না তাহা নহে, উভয়েরই আর্থিক অবস্থা উত্তরোত্তর হীনতা প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। কারণ, জমীর স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে এবং দ্রব্যমূল্যের সমতা যাহাতে রক্ষিত হয় তাহা করিতে হইলে, উহার জন্য যেরূপ জমিদারের সহানুভূতির প্রয়োজন হয়, সেইরূপ আবার প্রজার সহানুভূতিরও প্রয়োজন হইয়া থাকে। জমীদার না থাকিলেও মনুষ্যসমাজ সমানভাবেই চলিতে পারে বলিয়া আজকাল একটি মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে। আমাদের মতে এই মতবাদাবলম্বিগণ শিশুর মত মূঢ়। সামাজিক কোন্ ব্যবস্থায় সমাজের প্রত্যেক স্তরের মানুষের প্রত্যেকের পক্ষে প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া সম্ভবযোগ্য হইতে পারে, তাহার গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উহার জন্য কৃষকের লাভজনক কৃষি সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজনীয়। কি করিলে কৃষি, কৃষকের পক্ষে কোনরূপে লোকসানজনক না হইয়া লাভজনক হইতে পারে তাহার গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, ঐ উদ্দেশ্যে জমীর চাষ আবাদ করিবার জন্য যেরূপ কৃষকের শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজন আছে, সেইরূপ আবার কোন্ সময়ে, কোন্ শ্রেণীর জমীতে, কোন্ বীজ বপন করিলে সর্ব্বোচ্চ পরিমাণের ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট রকমের শস্য হইতে পারে, কোন্ জমি কিরূপ ভাবে রক্ষিত হইলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকপরিমাণের উৎপাদিকা শক্তি বজায় থাকিতে পারে, এবংবিধ রূপের মস্তিষ্কের পরিশ্রমের প্রয়োজন আছে। জমী ও কৃষি-সম্বন্ধীয় উপরোক্ত রূপের মস্তিষ্কের পরিশ্রম যাঁহারা করিতেন, তাঁহাদিগকেই প্রকৃত পক্ষে জমিদার বলা যাইত এবং জমীদার বলা হইত। যতদিন পর্য্যন্ত কৃষক ও জমীদার মিলিত হইয়া সমানভাবে কৃষি ও জমি-সম্বন্ধে উপরোক্ত রূপে পরিশ্রম করিতেন, ততদিন পর্য্যন্ত জমিদার ও প্রজা, এই উভয়ের কাহারও আর্থিক অপ্রাচুর্য্য ঘটে নাই। এখনও, যাহাতে সমাজ হইতে আর্থিক অপ্রাচুর্য্য সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত হয় তাহা করিতে হইলে জমিদার ও কৃষকগণকে মিলিত হইয়া সমানভাবে উপরোক্ত রকমের শারীরিক ও মস্তিষ্কের পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বর্ত্তমানে জমিদারগণ যে তাঁহাদের কর্ত্তব্যে অবহেলা আরম্ভ করিয়াছেন তাহা বলাই বাহুল্য। অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, যেদিন হইতে জমিদারগণ তাঁহাদের কর্ত্তব্যে অবহেলা আরম্ভ করিয়াছেন, সেই দিন হইতে প্রকৃত কৃষি-বিজ্ঞান মনুষ্য-সমাজ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে এবং সেই দিন হইতে জমির অবস্থা ও কৃষিকার্য্যে অবনতি ঘটিয়াছে এবং সেই দিন হইতেই মানবসমাজে আর্থিক অপ্রাচুর্য্য প্রবেশ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। একমাত্র জমিদারদিগের অবহেলায় এতখানি অপায় সম্ভবযোগ্য হইয়াছে। ইহার পর যদি আবার জমিদার ও প্রজাগণের মধ্যে অমিলন ও কলহের সুরু হয় তাহা হইলে একদিকে যেরূপ জমির উর্ব্বরাশক্তি ও লাভজনক কৃষিকার্য্যের পুনরুদ্ধার করার আশা সুদূরপরাহত হইবে, সেইরূপ আবার আর্থিক দুরবস্থাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

জমিদার ও প্রজাগণের মধ্যে যাহাতে অমিলন ও

কলহ না ঘটিতে পারে তজ্জন্য কোন্ উপায় অবলম্বিত হইতে পারে, অতঃপর আমরা তাহার বিচার করিব।

কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে জমিদার ও প্রজাগণের মধ্যে যাহাতে অমিলন বৃদ্ধি না পায় তাহা করা যাইতে পারে, উহার আবিষ্কার করিতে হইলে কেন জমিদার ও প্রজার মধ্যে কলহ ও অমিলনের সূত্র হইয়াছে সর্ব্বপ্রথমে তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

জমিদার ও প্রজাগণের মধ্যে জমি ও কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে কাহার কি কর্ত্তব্য তাহা যদি তাঁহারা যথাযথভাবে অবগত থাকিতেন এবং ঐ কর্ত্তব্যসাধনে তাঁহাদের প্রত্যেকেই তৎপর হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের মধ্যে দারিদ্র্যও দেখা দিত না এবং কোন কলহের উদ্ভব হইতে পারিত না, ইহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, কয়েক শত বৎসর আগে হইতেই জমিদারগণ তাঁহাদের কর্ত্তব্যে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াছেন এবং তাহা সত্ত্বেও প্রজাগণের ঐকান্তিক পরিশ্রমের ফলে প্রজা ও জমিদারগণের মধ্যে কিছুদিন পর্য্যন্ত তীব্রভাবে আর্থিক অভাব প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু যে দিন হইতে জমীদারগণ তাঁহাদিগের কর্ত্তব্যে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াছেন, সেই দিন হইতেই জমি ও কৃষিকার্য্য-বিষয়ে বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে জমিদার ও প্রজার মধ্যে সৌখ্যভাব শিথিলতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

তাহার পর ক্রমে ক্রমে জমি ও কৃষিকার্য্য-বিষয়ক বিশৃঙ্খলা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া কৃষকের পক্ষে লাভজনক কৃষিকার্য্য অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে এবং আর্থিক দারিদ্র্য সর্ব্বস্তরের মানুষের মধ্যে প্রায় সমানভাবে প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছে। এই আর্থিক দারিদ্র্য সত্ত্বেও বহুদিন পর্য্যন্ত কৃষকগণ অদৃষ্টের দোহাই দিয়া, কাহারও বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করিয়া, তিন বেলার স্থলে একবেলা মাত্র আহার করিয়া, অর্দ্ধনগ্নাবস্থায় তৃপ্তিলাভ করিবার জন্য প্রযত্নশীল ছিল। কিন্তু, এখন আর উহাদের অনেকেরই প্রতিদিন এক বেলার আহার পর্য্যন্ত জুটে না এবং কেহ কেহ এমন কি স্ত্রীপুত্রকে লইয়া সময় সময় অনাহারে ও অর্দ্ধাহারে দিন যাপন করিতে বাধ্য হইতেছেন। এইরূপে তাহাদিগের দারিদ্র্য ধৈর্য্যের সীমানা অতিক্রম করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

এ দিকে গভর্ণমেণ্টের গঠন কিরূপ হইলে এবং গভর্ণমেণ্ট কি পদ্ধতিতে পরিচালিত হইলে জনসাধারণের এতাদৃশ দারিদ্র্য হইতে মুক্তি পাওয়া সম্ভবযোগ্য হইতে পারে, তদ্বিষয়ক বিজ্ঞান বিলুপ্ত হওয়ায় জগতের সর্ব্বত্রই ভ্রান্তরূপে গভর্ণমেণ্টের গঠন এবং ভ্রান্তভাবে গভর্ণমেণ্টের পরিচালনার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ফলে, সর্ব্বত্রই জনসাধারণের দারিদ্র্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ভ্রান্তরূপে গভর্ণমেণ্টের গঠন এবং ভ্রান্তভাবে গভর্ণমেণ্টের পরিচালনার কার্য্য আরম্ভ হওয়ায় ফলে, যে গভর্ণমেণ্ট একমাত্র পণ্ডিত ও চরিত্রবান্ লোক না হইলে সুচারুভাবে চলিতে পারে না সেই গভর্ণমেণ্টে, মূর্খ, চরিত্রহীন ও কুচক্রী মানুষগুলিও জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব পাইয়া প্রবেশ লাভ করিতে সক্ষম হইতেছেন। ঐ মূর্খ, চরিত্রহীন ও কুচক্রী মানুষগুলি প্রায়শঃ কি করিলে কৃষকের দারিদ্র্য দূর হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে কোন গবেষণা অথবা জ্ঞান লাভ না করিয়া জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব পাইবার জন্য তাহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকেন। ইহাঁরা যখন জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে সক্ষম হন তখন তাঁহাদের উপরোক্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবার জন্য পূর্ব্বাপর চিন্তা না করিয়া সদসৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হন। এইরূপ ভাবে ঐ মূর্খ, চরিত্রহীন ও কুচক্রী প্রতিনিধিগুলি জনসাধারণের উপকারের নামে তাঁহাদের অপকার সাধিত করিতেছেন এবং তাঁহারাই প্রজাগণের বিদ্রোহী মনকে জমিদারগণের বিরুদ্ধে অধিকতর বিদ্রোহী করিয়া তুলিতেছেন। ফলে, জমিদার ও প্রজার মধ্যে কলহ প্রভৃতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

এতাদৃশ অবস্থায়, জমিদার ও কৃষকগণের মধ্যে যে অসদ্ভাব ও কলহ প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহা দূর করিয়া তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে যাহাতে প্রকৃত সখ্যভাবের সৃষ্টি হয়, তাহা করিতে হইলে—

প্রথমতঃ, যাহাতে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি পায় তাহার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে;

দ্বিতীয়তঃ, যাহাতে বিভিন্ন দ্রব্যমূল্যের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিতে হইবে,

তৃতীয়তঃ, যাহাতে জমিদারগণ পানভোজন ও নর্ত্তন-কূর্দ্দনে মত্ত না হইয়া স্ব স্ব মস্তিষ্কের উৎকর্ষসাধনে প্রবৃত্ত হন এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে জমি ও কৃষিকার্য্য-বিষয়ে স্ব স্ব দায়িত্ব কি কি তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া তৎসাধনে অবহিত হন, তাহার ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিতে হইবে;

চতুর্থতঃ, যাঁহারা বিবিধ তত্ত্ব ও সংগঠন সম্বন্ধে কার্য্যতঃ অজ্ঞ, অথবা যাঁহারা চরিত্রহীন, মিথ্যাবাদী ও কুচক্রী তাঁহারা যাহাতে জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব, জননায়কত্ব ও রাজপুরুষের দায়িত্ব লাভ না করিতে পারেন, তাহার আয়োজন করিতে হইবে।

ইহা ছাড়া, অন্যান্য অনেকগুলি ছোট ছোট ব্যবস্থার প্রয়োজনও আছে।

কি করিলে উপরোক্ত চারিটি ব্যবস্থা সাধিত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে আমরা একাধিকবার আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে তাহার পুনরুক্তি করিব না।

দেশ ও জনসাধারণের অবস্থা যেখানে আসিয়া উপনীত হইয়াছে তাহাতে উপরোক্ত চারিটি ব্যবস্থা যে, সহজসাধ্য নহে তাহা আমরা স্বীকার করি বটে, কিন্তু তথাপি আমরা বলিতে বাধ্য যে, উপরোক্ত চারিটি ব্যবস্থা যতই কৃচ্ছ্রসাধ্য হউক না কেন, উহার কোনটিই অসাধ্য নহে এবং মানুষকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে ঐ চারিটি ব্যবস্থা সাধন করিতেই হইবে, কারণ মানুষের বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা তাহার পক্ষে অধিকতর প্রিয় আর কিছু থাকিতে পারে না।

যাঁহাদের কার্য্যফলে জমিদার ও প্রজার মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে অনৈক্য ও কলহের অগ্নি অধিকতর প্রজ্বলিত হইতেছে, তাঁহাদিগের নাম করিতে হইলে আমাদিগকে নিম্নলিখিত শ্রেণীর মানুষগুলির উল্লেখ করিতে হয়:—

(১) জমীদার;

(২) প্রজা;

(৩) অ্যাসেম্ব্লি ও কাউন্সিলের সভ্য;

(৪) গভর্ণমেন্টের মন্ত্রিমণ্ডল;

(৫) ইংরাজ ও ইউরোপীয়গণ প্রভৃতি বিদেশীয়গণের মধ্যে রাষ্ট্রীয় কার্য্যে লিপ্ত মানুষগুলি (Foreign politicians)।

ইহাঁদিগের প্রত্যেককে আমরা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, যে পদ্ধতিতে মানুষের পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষের অথবা কামান্ধতার উদ্রেক হয়, সেই পদ্ধতি দ্বারা কখনও কাহারও কোন সর্ব্বাঙ্গীন হিত সাধিত হইতে পারে না, ইহা একটি চিরন্তন সত্য। মানুষের যে সর্ব্বাঙ্গীন হিত সাধিত হইতে পারে, এবং সর্ব্বাঙ্গীন হিত সাধন করিবার পদ্ধতি যে মানবসমাজে একদিন বিদ্যমান ছিল, তাহা আধুনিক সুধীসমাজের অনেকেই স্বীকার করেন না বটে, কিন্তু কোরাণ অথবা বাইবেল অথবা বেদ মনোনিবেশ সহকারে যথাযথ ভাবে অধ্যয়ন করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিলে, অনুরূপ পরিজ্ঞান প্রতিভাত হইবে। যে পদ্ধতিতে মানুষের পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষের অথবা কামান্ধতার উদ্রেক হয়, সেই পদ্ধতি যে পরিত্যাজ্য, এই সত্যটী স্বীকার করিয়া লইলে সহজেই বুঝা যাইবে যে, বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব-বিষয়ক আইনের সংস্কারের ফলে প্রজা ও জমিদারগণের মধ্যের বিদ্বেষ প্রজ্বলিত হওয়া অনিবার্য্য এবং তদনুসারে উহার প্রচেষ্টা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। কাজেই, যাঁহারা ঐ সংস্কারের স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে উত্তেজিত হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেককেই আমরা প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দারিদ্র্য দূর করিবার পক্ষে এই অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা হইতে বিরত হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

উপসংহারে আমরা বাঙ্গালার লাট সাহেবকে এবং বাংলার প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক সাহেবকে এই বিষয়ে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিতেছি।

ফজলুল হক সাহেব আমাদের শ্রদ্ধেয়। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার বিরুদ্ধবাদিগণ প্রায়শঃ ধনীর সন্তানগণের নেতৃত্বে পরিচালিত। তাঁহাদিগের পক্ষে পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের অনুকরণে দেশের মধ্যে হৈ-চৈ উত্থাপিত করা সম্ভবযোগ্য হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু দুঃখীর বেদনা ও দুঃখ দূর করিবার পন্থা আবিষ্কার করা সম্ভবযোগ্য নহে। অন্যদিকে, ফজলুল হক সাহেব দুঃখী মানুষের মধ্যে লালিত পালিত এবং প্রযত্নশীল হইলে সংস্কারগত অন্ধতা হইতে মুক্তি পাইবার উপযুক্ত। আমাদের মতে, সমস্যা সমা-

খানের প্রকৃত কার্য্য কি, তৎসম্বন্ধে সন্ধান পাওয়া যখন ক্লেশকর হয়, তখন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া ঐ কার্য্যের গবেষণায় প্রবৃত্ত হওয়া বরং ভাল, তথাপি কার্য্যের নামে চাউল আর ডাইল মিশাইয়া, তাহা পুনরায় বাছিয়া লওয়ার অকাজে প্রবৃত্ত হওয়া কোনরূপেই সঙ্গত নহে।

বাংলার লাট সাহেবকে আমরা বলিতে চাই যে, জমিদার ও প্রজা-বিষয়ক ব্যাপারগুলি একদিকে যেমন বড়ই জটিল, অন্যদিকে আবার উহা বড়ই সহজ।

ভারতের ঐশ্বর্য্যের মূল নিদান কোথায়, কোন্ কারণে ভারতবর্ষ স্মরণাতীত কাল হইতে জগতের অন্যান্য জাতির মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা কহিয়া থাকেন বটে, এবং ঐ সম্বন্ধে অনেক বিভিন্ন মতবাদও বিদ্যমান আছে বটে, কিন্তু গম্ভীরভাবে গবেষণা করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতের জমিদার ও প্রজার মিলিত কার্য্যই ভারতের ঐশ্বর্য্যের প্রধান কারণ। এই জমিদার ও প্রজাগণের মধ্যে সৎ ভাব বিদ্যমান ছিল বলিয়াই ষোড়শ শতাব্দীতে লর্ড ব্র্যাবোর্ণের দেশের মানুষগুলি যখন দারিদ্র্যাক্লিষ্ট হইয়া তৎপ্রতীকারের জন্ম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, তখন সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষে আসিবার কথা তাঁহাদের মনে পড়িয়াছিল। তখনও এই জমিদার ও প্রজাগণের মধ্যে সৎ ভাব বিদ্যমান ছিল বলিয়াই, প্রবল-প্রতাপান্বিত নবাবের বিরুদ্ধে ষড়্যন্ত্র করিয়া জমিদারগণ সামান্য বণিক্ ইংরাজের হাতে ভারতবর্ষের রাজত্ব হস্তান্তর করিতে পারিয়াছিলেন। কি করিয়া জমিদার ও প্রজাগণের মধ্যে সদ্ভাব অটুট রাখিতে হয়, কি করিলে জমি ও কৃষি-কার্য্যের অবস্থার উন্নতি সাধন করা প্রকৃতভাবে সম্ভবযোগ্য হয়, তাহা লর্ড ব্র্যাবোর্ণের দেশের মানুষগুলি অদ্যাবধি যথাযথভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই বলিয়াই, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব টলটলায়মান হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের কথা কর্কশ হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহা অতীব সত্য যে, যাঁহারা চরিত্রহীন হইয়াও বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের জননায়কত্ব লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহাদের নির্দ্দেশে গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত হইলে, কখনও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সুদৃঢ়তা অথবা প্রজাসাধারণের হিত সাধন করা সম্ভবযোগ্য হইবে না।

ভারতবর্ষের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৯০ জন, হয় বেদের, নতুবা কোরাণের, নতুবা বাইবেলের অনুশাসন মানিয়া চলিয়া থাকে। পরস্ত্রীর অথবা অনূঢ়া কন্যার সহিত অবাধে মেলা-মেশা করা অথবা তাহাদিগকে অবাধে স্পর্শ করা বেদ অথবা কোরাণ অথবা বাইবেল, এই তিনখানি ধর্ম্ম-গ্রন্থের কোনখানির অনুমোদিত নহে। এই তিন-খানির প্রত্যেকখানির অনুশাসন অনুসারে, যাঁহারা অবাধে পরস্ত্রীর সহিত অথবা অনূঢ়া কন্যার সহিত মেলামেশা করিয়া থাকেন, অথবা তাঁহাদিগের অঙ্গ স্পর্শ করেন, তাঁহারা অসচ্চরিত্রের এবং দণ্ডার্হ। ভারতবর্ষের শতকরা উপরোক্ত নব্বই জন চিরদিন ঐ অনুশাসন মানিয়া আসি-তেছে এবং যাঁহারা উহা না মানেন তাঁহাদিগকে ঘৃণার্হ বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছে। এই অনুশাসন অনুসারে গান্ধীজী-প্রমুখ আধুনিক নেতৃবর্গের অনেকেই অসচ্চরিত্রের মানুষ বলিয়া আখ্যা পাইবার উপযোগী, তদনুসারে তাঁহারা শতকরা নব্বই জনের ঘৃণাস্পদ। অসচ্চরিত্র ও ঘৃণাস্পদ হইয়াও যে উঁহারা জননায়কত্ব লাভ করিতে সক্ষম হইয়া-ছেন, ইহার একমাত্র কারণ, জনসাধারণের মোহান্ধতা এবং সাময়িক নিদ্রা। প্রকৃতির বশে অদূর ভবিষ্যতে এই নিদ্রা হইতে জনসাধারণ জাগ্রত হইবে এবং তখন যে কয়জন কাপুরুষ প্রকৃত পক্ষে অসচ্চরিত্র ও ঘৃণাস্পদ হইয়াও কুচক্রের দ্বারা তথাকথিত শ্রদ্ধা লাভ করিতে সক্ষম হইয়া-ছেন, যাঁহারা প্রকৃত পক্ষে বৈদেশিক ভাব ও আচার-সম্পন্ন হইয়াও স্বদেশী বলিয়া সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে ফুৎকারের দ্বারা নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিবে।

অসচ্চরিত্র এই কাপুরুষগণকে সময় থাকিতে গভর্ণমেণ্টের চিনিতে হইবে এবং তাঁহারা যাহাতে প্রাধান্য লাভ করিতে না পারেন, তদ্বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে। নতুবা অসচ্চরিত্রের প্রশ্রয়দানকারী বলিয়া গভর্ণমেণ্টও প্রকৃতির দণ্ডের যোগ্য হইয়া পড়িবেন।

অ্যাসেম্‌ব্লি ও কাউন্সিল হইতে প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনের ধারাগুলির যে যে পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব হইয়াছে, সেই সেই পরিবর্ত্তনগুলির শেষ মঞ্জুরী লাট সাহেবের হাতে। প্রজাতন্ত্র গভর্ণমেণ্টের (Democracy)

সাধারণ নিয়মানুসারে ঐ সমস্ত পরিবর্ত্তন যখন অ্যাসেমব্লি ও কাউন্সিলের দ্বারা মঞ্জুর হইয়াছে, তখন গভর্ণরও উহা পাশ করিতে বাধ্য, ইহা সত্য। প্রজাতন্ত্র গভর্ণমেণ্টের উপরোক্ত সাধারণ নিয়মের কারণ এই যে, যাঁহারা অ্যাসেমব্লি ও কাউন্সিলের সভ্য হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে সাধারণতঃ জনসাধারণের প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য করা হইয়া থাকে। যেখানে উঁহারা প্রকৃতভাবে জনসাধারণের প্রতিনিধি নহেন, পরন্তু উৎকোচ ও প্রলোভনের দ্বারা সাময়িক ভোট লাভ করিতে সক্ষম হন, সেইখানে যাহা অ্যাসেমব্লি ও কাউন্সিলের দ্বারা পাশ হইবে, তাহাই যে জনসাধারণের অভিপ্রেত, ইহা মনে করা চলে না।

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইনের পরিবর্ত্তনগুলি প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের অভিপ্রেত কি না, তদ্বিষয়ে নির্দ্ধারণের প্রয়োজন আছে এবং তদুদ্দেশ্যে উপায়ান্তর আবিষ্কার করিয়া পাস প্রজামণ্ডলীর অভিমত সংগ্রহ করিবার জন্য গভর্ণর বাহাদুরকে অগ্রসর হইতে আমরা অনুরোধ করিতেছি।

পুরুষ ও নারী

আজকালকার দিনের শিক্ষিতগণের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে, মনুষ্যসমাজের সৃষ্টি ও রক্ষার সামর্থ্য পুরুষ ও নারী, এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই সমানভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ইহাঁরা প্রায়শঃ পুরুষ ও নারীর সমানাধিকারের কথা কহিয়া থাকেন। গান্ধিজীও এই মতাবলম্বী। তিনি সম্প্রতি তাঁহার 'হরিজন' পত্রিকায় "Invidious and Unfair"—অর্থাৎ "বিদ্বেষোৎপাদনশীল ও অন্যায়" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। গান্ধিজীর মতে পুরুষ ও নারী, এই উভয়েই যে সমান অধিকার পাইবার উপযুক্ত, তাহা তাঁহার উপরোক্ত প্রবন্ধ হইতে পরিষ্কারভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। গান্ধিজীর এই প্রবন্ধটি একজন পত্র-লেখকের একখানি পত্রের প্রত্যুত্তরে লিখিত হইয়াছে।

[ঐ পত্রলেখক গান্ধীজীর নিকট এক পত্রে লিখিয়াছেন —]

"আমাদের মধ্যে কচ্ছ প্রদেশে এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহাদিগকে সম্মানার্হ, ন্যায়পরায়ণ, বদান্য, ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং উচ্চমনা ভদ্রলোক বলিয়া আখ্যাত করা যাইতে পারে। কিন্তু, এই ভদ্রলোকগণ প্রায়শঃ কেবলমাত্র পুত্রসন্তান লাভ করিবার উদ্দেশ্যেই একাধিকবার বিবাহ করিতে দ্বিধাবোধ করেন না। কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করিলে হিন্দুদিগের মধ্যে যে খেদ করিবার প্রথা বিদ্যমান রহিয়াছে, [তাহা আপনি অনুমোদন করেন কি না] তদ্বিষয়ে আপনার মতপ্রকাশ করিবার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করিতেছি। পুত্রসন্তান না হইলে স্বর্গে যাওয়া সম্ভব হয় না, এবংবিধ গোঁড়া অভিমত আপনিও পোষণ করেন কি?"

এই পত্রের উত্তরে গান্ধিজী বলিতেছেন—

"দুর্ভাগ্য-বশতঃ পুত্রসন্তান লাভ করিবার এতাদৃশ ঔৎসুক্য হিন্দুসমাজের প্রায় সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে। কিরূপে এই ঔৎসুক্য সমাজমধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহার সন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বর্ত্তমান কালের স্ত্রী-পুরুষের সমতার দিনে স্ত্রীজাতির বিরুদ্ধে এতাদৃশ বিদ্বেষোৎপাদনশীল পৃথক্ বুদ্ধি সময় হিসাবে ভ্রমাত্মকতার পরিচয়। (It is enough that in the present age of sex-equality this sort of invidious discrimination against the female sex is an anachronism.)

পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে আনন্দে উৎফুল্ল হওয়ার এবং কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করিলে খেদ প্রকাশ করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আমি খুঁজিয়া পাই না। পুত্র ও কন্যা উভয়ই ভগবানের দান। দুই জনেরই জীবন

ধারণ করিবার অধিকার সমান ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং সৃষ্টি রক্ষা করিবার জন্য দুই জনই সমান ভাবে প্রয়োজনীয়।

আমাদের মতে যাঁহারা মনে করেন যে, সৃষ্টি করা ও সৃষ্টি রক্ষা করার কার্য্যের জন্য স্ত্রী ও পুরুষ দুই জনই সমানভাবে প্রয়োজনীয় এবং তদনুসারে এই দুইটি জাতিই সর্ব্ববিষয়ে সমানাধিকার পাইবার উপযুক্ত, তাঁহারা ভ্রান্ত।

মানুষের সৃষ্টি ও রক্ষার জন্য স্ত্রী ও পুরুষ এই উভয়েই যে প্রয়োজনীয়, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু, উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা এবং সামর্থ্য ঠিক ঠিক সমান নহে। আপাতদৃষ্টিতে মানুষের সৃষ্টির জন্য পুরুষের যেরূপ প্রয়োজন, স্ত্রীলোকেরও ঠিক ঠিক সমান ভাবের প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু মনুষ্যসমাজ রক্ষা করিবার কার্য্যে পুরুষের পক্ষে যতখানি সামর্থ্য লাভ করা সম্ভবযোগ্য হয়, স্ত্রীলোকের পক্ষে যে ততখানি সামর্থ্য লাভ করা কখনও সম্ভবযোগ্য হয় না, তাহা একটু অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে। চোর, দস্যু, প্রবঞ্চক, অথবা হিংস্র বন্য জন্তুর হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, যে শারীরিক বলের প্রয়োজন হয়, তাহা সাধনার দ্বারা পুরুষের পক্ষে যত অধিক পরিমাণে লাভ করা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে, স্ত্রীলোকগণের পক্ষে তাহা তত অধিক পরিমাণে লাভ করা কখনও সম্ভবযোগ্য হয় না। মানুষের বিবিধ (অর্থাৎ শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিগত) বল অথবা সামর্থ্য বলিতে কি বুঝায় তদ্বিষয়ক দর্শনে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, মূলতঃ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ লইয়াই মানুষের অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রীর প্রাকৃতিক বল অথবা সামর্থ্য। পুরুষ ও নারী এই উভয়েরই ঐ পাচটী-বিষয়ক বল অথবা সামর্থ্য বিদ্যমান থাকে বটে, কিন্তু উহার কোন একটি বিষয়ে সমান ভাবে সাধনা করিলেও পুরুষ ও নারী এই উভয়ই ঠিক ঠিক সমান পরিমাণের সামর্থ্য লাভ করিতে সক্ষম হয় না।

শব্দ ও স্পর্শ-বিষয়ে সাধনানিরত হইলে পুরুষ ও নারী উভয়েই কথঞ্চিৎ অগ্রসর হইতে সক্ষম হইয়া থাকে বটে, কিন্তু এই দুইটি বিষয়ে পুরুষের পক্ষে যতদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়, নারী কখনও ততদূর অগ্রসর হইতে সক্ষম হয় না।

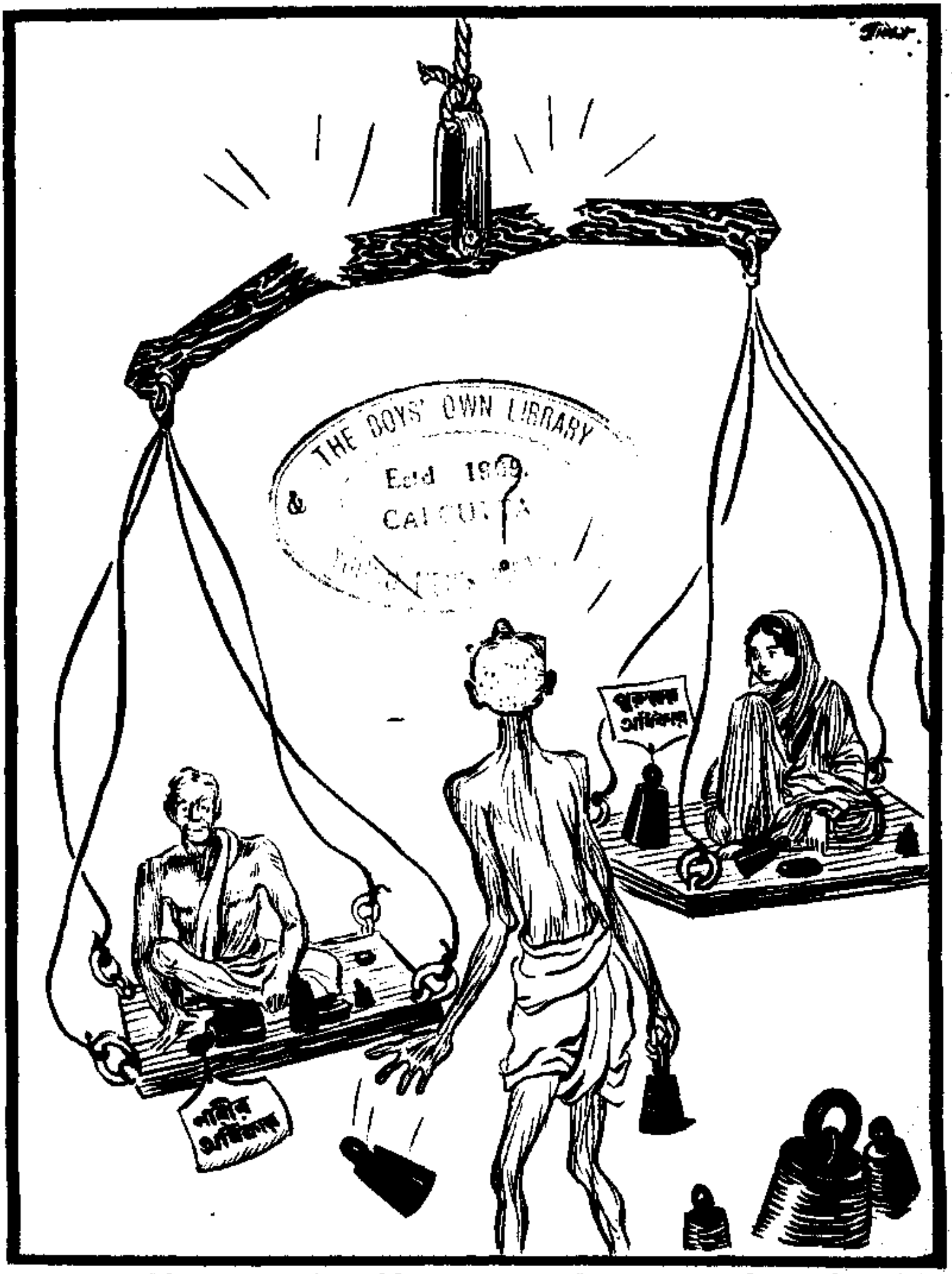
সেইরূপ আবার রূপ, রস ও গন্ধ-বিষয়ে সাধনা-নিরত হইলে পুরুষ ও নারী উভয়েই অপেক্ষাকৃত উন্নতি লাভ করিতে পারে বটে, কিন্তু এই তিনটি বিষয়ে নারীর পক্ষে যতদূর উন্নতি লাভ করা সম্ভবযোগ্য হয়, পুরুষের পক্ষে ততদূর উন্নতি লাভ করা কখনও সম্ভবযোগ্য হয় না।

শব্দ ও স্পর্শ-বিষয়ক সাধনার ফলে অব্যক্ত বিষয়ে অভিজ্ঞতালাভ করা সম্ভব হয়, আর রূপ, রস ও গন্ধ বিষয়ক সাধনার ফলে ব্যক্ত বিষয়ে নিপুণতা লাভ করিতে পারা যায়।

শব্দ ও স্পর্শ বিষয়ক সাধনায় একদিকে যেরূপ সুগায়ক ও প্রকৃত সুকবি (রবীন্দ্রনাথের মত অর্থহীন, দুর্ব্বোধ্য, চিত্তবিক্ষেপকর Mystic কবি নহে) হওয়া সম্ভবপর হয়, অন্যদিকে আবার প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী হইয়া সমাজগঠন, সমাজরক্ষা, শাস্ত্র-প্রণয়ন, আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যের উৎপত্তি প্রভৃতি বিষয়ক কার্য্যে সুনিপুণতা লাভ করা সম্ভব হয়। বাস্তব-জগৎ পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, উপরোক্ত কার্য্যগুলিতে পুরুষ যত দক্ষতা লাভ করিতে পারেন, স্ত্রীলোকগণকে যতই শেখান যাউক না কেন, তাঁহাদের পক্ষে পুরুষের মত দক্ষতা লাভ করা কখনও সম্ভবযোগ্য হয় না।

শরীরের কোন্ কোন্ অংশের কোন্ কোন্ কার্য্যের ফলে মানুষের শব্দ-সামর্থ্য ও স্পর্শ-সামর্থ্যের উদ্ভব হইয়া থাকে, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, শরীরের যে যে অংশের যে যে কার্য্যের ফলে মানুষ শব্দ ও স্পর্শ-সামর্থ্য লাভ করিয়া থাকে, সেই সেই অংশ ও সেই সেই কার্য্য পুরুষের শরীরে যেরূপ প্রকট ও ধারাল, স্ত্রীলোকের শরীরে উহা কখনও সেইরূপ প্রকট ও ধারাল হয় না।

সমানাধিকার নির্ণয়ের তুলাদণ্ড



সম্প্রতি গান্ধীজী হরিজন পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, যাহাতে দেখান হইয়াছে যে, পুরুষ ও নারী সমান অধিকার পাইবার উপযুক্ত। যে-যুক্তি দিয়া গান্ধীজী এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সেই যুক্তি-রূপ তুলাদণ্ডে মাপিয়া পুরুষের যুক্তিযুক্ত অধিকার নারীকে এবং নারীর যুক্তিযুক্ত অধিকার পুরুষকে দিয়া উভয়ের অধিকার সমান করিবার চেষ্টা করায় আর কিছু হোক বা না হোক, গান্ধীজীর যুক্তি যে যুক্তিসহ নহে, তাহা প্রমাণ হইয়া গেল।

আজকালকার দিনে এমন অনেক মানুষ আছেন, যাঁহারা মনে করেন যে, স্ত্রীলোকের মধ্যে যেরূপ সুগায়িকা হওয়া সম্ভব হয়, পুরুষগণের মধ্যে সেইরূপ সুগায়ক হওয়া সম্ভব নহে। বাস্তবজগৎ অনুসন্ধান করিলে যাহা দেখা যাইবে, তাহাতে প্রকৃত সত্য যে সম্পূর্ণ বিপরীত তাহা প্রতিভাত হইবে। প্রকৃত গীত-বিজ্ঞান তলাইয়া ভাবিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, গীতবিদ্যায় পুরুষের পক্ষে যত গভীর পারদর্শিতা লাভ করা সম্ভবযোগ্য, স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহা কখনও সম্ভব-যোগ্য নহে।

ভগবান্ পুরুষের অঙ্গ ও কার্য্য নিপুণতর শব্দ ও স্পর্শ-সামর্থ্যের উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়াই ভারতীয় ঋষিগণ তাঁহাদের সমাজতন্ত্রে সমাজ-সংগঠন, সমাজরক্ষা, শাস্ত্রপ্রণয়ন, আহার্য্য ও ব্যব-হার্য্যের উৎপত্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণা প্রভৃতি কার্য্যের দায়িত্ব পুরুষের স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়াছেন।

ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ সমস্ত কার্য্যে ব্যাস, পরাশর প্রভৃতি পুরুষগণ যাদৃশ পারদর্শিতা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, কোন স্ত্রীলোক কখনও তাদৃশ সক্ষমতার নিকটবর্ত্তী হইতে পারেন নাই।

রূপ, রস ও গন্ধ-বিষয়ক সাধনার ফলে স্বকীয় বাহ্যিক রূপ প্রভৃতি মনোহর করিবার কৌশল যেরূপ ভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, সেইরূপ আবার যে কোন বস্তুর বাহ্যিক রূপ প্রভৃতি চমকপ্রদ করিয়া যে কোন অবস্থায় কিরূপ ভাবে পরিশ্রান্ত জীবনকে শান্তিপ্রদ করিতে হয়, তাহার কৌশলে নিপুণতা লাভ করিবার সক্ষমতা অর্জ্জন করিতে পারা যায়।

শরীরের কোন্ কোন্ অংশের কোন্ কোন্ কার্য্যের ফলে মানুষের এতাদৃশ প্রসাধন-সামর্থ্যের উদ্ভব হইয়া থাকে তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, শরীরের যে যে অংশের যে যে কার্য্যের ফলে মানুষ এবংবিধ প্রসাধন-সামর্থ্য লাভ করিয়া থাকে সেই সেই অংশ ও সেই সেই কার্য্য নারীর শরীরে যেরূপ প্রকট ও ধারাল, পুরুষের শরীরে উহা কখনও সেইরূপ প্রকট ও ধারাল হয় না।

শরীরগঠন ও শরীর-বিধানের উপরোক্ত অংশ প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হউক আর না-ই হউক, স্ত্রীলোকগণ প্রসাধনের কার্য্যে এবং পরিশ্রান্ত অবস্থায় শান্তি বিতরণের কার্য্যে যে পুরুষের তুলনায় নিপুণতর তাহা বাস্তব-জগতের দিকে চাহিয়া দেখিলে অস্বীকার করা যায় না।

স্ত্রীলোকগণ স্বভাবতঃ ঐ উপরোক্ত-ক্ষমতাসম্পন্ন বলিয়া ভারতীয় ঋষিগণ তাঁহাদের সমাজতন্ত্রে সঙ্ঘগত জীবন অর্থাৎ সমাজ প্রভৃতি পরিচালনার দায়িত্ব-ভার যেরূপ পুরুষের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন, সেইরূপ ব্যক্তি-গত জীবন অর্থাৎ সংসার পরিচালনার দায়িত্বভার স্ত্রীলোকগণের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ-বিষয়ক উপরোক্ত কথা-গুলি অনুধাবন করিতে পারিলে দৈনন্দিন জীবন নির্ব্বাহের জন্য পুরুষ ও স্ত্রী এই দুই-এর যে প্রয়োজন আছে, তাহা যুক্তি-সঙ্গত-ভাবে অস্বীকার করা যায় না বটে, কিন্তু দুই-এরই প্রয়োজনীয়তা এবং সামর্থ্য যে সর্ব্বতোভাবে সমান তাহা কোন ক্রমেই বলা চলে না। যখন পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায় যে, দুই-এর প্রয়োজনীয়তা এবং সামর্থ্য সর্ব্বতোভাবে সমান নহে, তখন স্ত্রী ও পুরুষের সমান অধিকারের কথা কওয়া এতদ্বিষয়ক বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় অজ্ঞতার সাক্ষ্য বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

মানুষের রক্ষার জন্য পুরুষের প্রয়োজনীয়তা বেশী, অথবা স্ত্রীলোকের প্রয়োজনীয়তা বেশী এতদ্বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে, সঙ্ঘ-বদ্ধ সামাজিক জীবন-নির্ব্বাহে পুরুষ যেরূপ প্রয়োজনীয়, সেইরূপ আবার ব্যক্তিগত সাংসারিক জীবন নির্ব্বাহে স্ত্রীলোক সমানভাবে প্রয়োজনীয়। ইহা ছাড়া আরও মনে রাখিতে হইবে যে, সুনিয়ন্ত্রিত সামাজিক জীবন পরিরক্ষিত না হইলে কোন ব্যক্তিগত সাংসারিক জীবন শান্তি ও শৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভবযোগ্য নহে। কাজেই, ইহা স্বীকার

করিতে হইবে যে, যদিও মানুষের জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য পুরুষ ও স্ত্রী এই দুই-এরই প্রয়োজন, তথাপি পুরুষের প্রয়োজনীয়তা স্ত্রীলোকের প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষাও অধিক।

উপরোক্ত মন্তব্য শুনিয়া হয়ত আধুনিক সুন্দরীগণ আমাদের উপর খড়্গহস্ত হইবেন,কিন্তু যাহা বাস্তব সত্য তাহা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

আমাদের সুন্দরীগণ যে পুরুষের তুলনায় অধিকতর মনোহারিণী ও শান্তি-প্রদায়িনী তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই বটে,কিন্তু স্ত্রী ও পুরুষের শরীর-বিধান যথাযথভাবে পরীক্ষা করিবার সামর্থ্য অর্জ্জন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ভগবান্ পুরুষকে এমনভাবে গঠিত করিয়াছেন যে, যথাযথভাবে পরিচালিত হইতে পারিলে পুরুষগণের পক্ষে স্ত্রীলোক ছাড়াও সংযত, সুস্থ ও শৃঙ্খলিত জীবন যাপন করা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোকগণের পক্ষে পুরুষ ছাড়া সংযত, সুস্থ ও শৃঙ্খলিত জীবন যাপন করা সম্ভবযোগ্য নহে। যে মনোমুগ্ধকর রূপ, রস ও গন্ধ লইয়া স্ত্রীলোকের বৈশিষ্ট্য তাহা যখন পশুভাবাপন্ন জীবগণের আকাঙ্ক্ষা ও লুণ্ঠনের সামগ্রী হইয়া পড়ে, তখন পুরুষ না হইলে স্ত্রীলোকগণের রক্ষা পাওয়া ক্লেশসাধ্য হইয়া থাকে।

ইহারই জন্য, এক দিন স্ত্রীলোকগণ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া পুরুষকে পালনকর্ত্তা অথবা 'ভর্ত্তা'রূপে গ্রহণ করিয়া পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

স্ত্রীলোকের রূপ, রস ও গন্ধ-বিষয়ক বিজ্ঞান পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে জানা যাইবে যে, উহা যখন কোন একজন বিশিষ্ট পুরুষের আরাধনার বস্তু হয়, তখন স্ত্রীলোক দেবত্বের আধারস্থল হইয়া থাকেন এবং দুই-এর মিলনে দেবতাসদৃশ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বুদ্ধিমান্ ও বুদ্ধিমতী সন্তানের উদ্ভব হয়। আর, যে স্ত্রীলোকের ঐ রূপ, রস ও গন্ধ একাধিক পুরুষের আকাঙ্ক্ষা ও ভোগের সামগ্রী হইয়া থাকে, সেই স্ত্রীলোক পিশাচিনীবৎ হইয়া পড়েন এবং তিনি কতকগুলি বুদ্ধিহীন অসুরের মাতা হইতে থাকেন।

এক দিন মানব-সমাজের স্ত্রীলোকগণ প্রায়শঃ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া পুরুষকে পালনকর্ত্তা অথবা ভর্ত্তারূপে গ্রহণ করিয়া পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই, তাঁহারা দেবত্বের আধারস্থল হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের গর্ভজাত দেবতাসদৃশ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বুদ্ধিমান্ ও বুদ্ধিমতীগণের দ্বারা সমগ্র মানব-সমাজ পরিপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। তখন মানব-সমাজে কোন উল্লেখযোগ্য সমস্যা বিদ্যমান ছিল না এবং প্রায় প্রত্যেক মানুষ সর্ব্বতোভাবে সুখী হইতে পারিয়াছিল।

আর, আজ স্ত্রীলোকগণের রূপ, রস ও গন্ধ প্রায়শঃ একাধিক পুরুষের আকাঙ্ক্ষা ও ভোগের সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই, এখন আর স্ত্রীলোকগণ পুরুষগণের ভর্ত্তারূপী প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইতে পারেন না এবং ইহারই ফলে ইহাদের গর্ভে কতকগুলি অল্পবুদ্ধি অসুরসদৃশ মানুষের সৃষ্টি হইতেছে এবং সমগ্র মনুষ্য-সমাজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত টলটলায়মান হইয়া পড়িয়াছে।

স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষ সর্ব্ববিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল বলিয়াই, কন্যাসন্তানের তুলনায় পুত্রসন্তানের অধিকতর প্রয়োজনীয়তা ভারতীয়গণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং এখনও পর্য্যন্ত সংস্কারবলে তাঁহারা পুত্রসন্তানের আরাধনা করিয়া থাকেন এবং কোন গর্ভিণীর পুত্র না হইয়া প্রতিনিয়ত কন্যাসন্তান হইতে থাকিলে দুঃখানুভব করিয়া থাকেন।

ভারতীয় পণ্ডিতগণ ভারতীয় ঋষিগণের ভাষা বিস্মৃত হইয়াছেন বলিয়া ঋষিগণের প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান এক্ষণে বিস্মৃতির গর্ভে লুক্কায়িত হইয়াছে বটে এবং তাহার ফলে ভারতীয়গণের আচার-ব্যবহারে অনেক অমূলক গোঁড়ামি স্থান পাইয়াছে বটে, কিন্তু পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে আনন্দ লাভ করা অথবা বারংবার কন্যাসন্তান জন্ম গ্রহণ করিলে দুঃখানুভব করা যে যুক্তি-বিরুদ্ধ, ইহা কোনক্রমেই বলা চলে না।

ইয়োরোপের সামাজিক ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, শুধু ভারতবর্ষেই যে পুত্রসন্তান সম্বন্ধে

ঐরূপ ধারণা বিদ্যমান আছে তাহা নহে। কয়েক শত বৎসর আগে ইয়োরোপেও এমন এক দিন ছিল যখন ইয়োরোপীয়গণ কন্যাসন্তানের তুলনায় অধিকতর মাত্রায় পুত্রসন্তানের জন্য প্রার্থনা করিতেন এবং কয়েক সহস্র বৎসর আগে ইয়োরোপেও ভারতীয় ঋষির জ্ঞান-বিজ্ঞান সর্ব্বতোভাবে শ্রদ্ধার যোগ্য হইতে পারিয়াছিল।

ঐ জ্ঞান-বিজ্ঞান যে দিন বিস্মৃতির গর্ভে নিপতিত হইয়া বিকৃতি লাভ করিয়াছে, সেই দিন হইতে ইয়োরোপে প্রকৃত সুশিক্ষা বিনষ্ট হইয়া পড়িয়াছে এবং ইয়োরোপীয়গণ অন্নাভাবে প্রপীড়িত হইয়া নানা কারণে নানারূপ লালসার দাস হইয়া পড়িয়াছেন। যে দিন হইতে তাঁহারা অন্নাভাব-বশতঃ লালসার দাস হইয়া পড়িয়াছেন, সেই দিন হইতে তাঁহারা পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও দায়িত্ব বিস্মৃত হইয়া স্ত্রীলোকের সমানাধিকারের কথার দ্বারা তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

স্ত্রীলোকের সহিত পুরুষের চারিটী সম্বন্ধ। কখন বা স্ত্রীলোক পুরুষের মাতা, কখনও বা ভগিনী, কখনও বা পত্নী আর কখনও বা কন্যা। স্ত্রীলোক মাতাই হউন, আর ভগিনীই হউন, আর পত্নীই হউন, আর কন্যাই হউন, সর্ব্বথা যে পুরুষের রক্ষণীয়া তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে কি?

যাঁহারা আমাদের রক্ষণীয়া তাঁহাদের রক্ষার কার্য্যে ব্রতী না হইয়া তাঁহাদিগের সমানাধিকারের কথা কহিয়া পুরুষের মত স্ত্রীলোকের জীবিকার্জ্জনের ভার স্ত্রীলোকের স্কন্ধে ন্যস্ত করিবার চেষ্টা করা কি কাপুরুষোচিত নহে?

যাঁহারা এতাদৃশ কাপুরুষোচিতভাবে স্ত্রীলোকের সমানাধিকারের কথা কহিয়া থাকেন, তাঁহারা গান্ধিজী হউন, আর যে-ই হউন, আমাদের মতে মানব-সমাজের অবজ্ঞার যোগ্য।

ভারতবর্ষের গান্ধিজীটি এতাদৃশ পদার্থ হইয়াও ভারতীয়গণের মধ্যে কাহারও কাহারও শ্রদ্ধাকর্ষণ করিতে পারিতেছেন বলিয়াই, ভারতীয়গণের সমস্যা উত্তরোত্তর ঘোরাল হইয়া পড়িতেছে।

নিকৃষ্ট পাশ্চাত্যভাব-পরিপূর্ণ এতাদৃশ নেতাগুলিকে ভারতবাসী কবে চিনিবে?

যাঁহারা মুখে পাশ্চাত্য পরাধীনতা হইতে মুক্তির কথা কহিয়া থাকেন, অথচ কার্য্যতঃ পাশ্চাত্যভাবে গদগদ, তাঁহারা কোন্ শ্রেণীর জীব, ইহা নিরূপণ করিবার ভার আমরা পাঠকবর্গের হস্তে অর্পণ করিতেছি।

আবাহন

—শ্রীগৌরীশঙ্কর শর্ম্মা

হে রুদ্র, হে সত্যবন্ধু, হে দুর্দ্দম নিশ্চিত নিষ্ঠুর
যোগনিদ্রা ভাঙি তব তীব্র রোষে জাগ' এইবার,
তাণ্ডব নর্ত্তনে তব পদাঘাতে করি'দাও চুর
অন্যায়ের আধিপত্য কতকাল সহি' বল আর।
জ্বলন্ত ত্রিশূল তব লও তুলি দীর্ঘতর করে,
ভুজঙ্গ-মণ্ডিত তব জটাজাল দাও প্রসারিয়া
ডমরু বাজাও তব আষাঢ়ের মেঘমন্দ্র স্বরে,
নিমীলিত মধ্যনেত্র অগ্নিসম উঠুক জ্বলিয়া।
ধ্বংস কর ধ্বংস কর ভীমদর্পে চকিতের মাঝে,
যা' কিছু অন্যায় হেথা, অত্যাচার, মিথ্যা ব্যভিচার
এস ধর্ম্ম, এস সত্য, ক্ষমাহীন ভয়ানক সাজে
ব্যথিত আশ্রয় মাগে করযোড়ে চরণে তোমার।

কার্য্যকারণ-বাদ

—শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

জগতে কত বস্তুই আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে; কত কার্য্যই আমরা দেখিতে পাই; কিন্তু ঐ সকল বস্তু কোথা হইতে আসিল; ঐ সকল কার্য্যের কারণ কি; এই জগতের সহিত ঐ সকল বস্তুর কি সম্বন্ধ; আর, সেই কারণের সহিত ঐ সকল কার্য্যের কি সম্পর্ক, তাহা প্রায়ই বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এই কার্য্য-কারণ-ভাবের ভাবনায় মানুষ এপর্য্যন্ত যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছে, তাহা তিন প্রকারে বলা যাইতে পারে।—

(১) উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য ছিল না; সকল কারণ মিলিত হওয়ার পরক্ষণেই কার্য্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে; কার্য্য হইতে কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন, উহারা পরস্পর অভিন্ন হইতে পারে না। পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়, এই চারি প্রকার পরমাণুই পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ুময় প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড গড়িয়া তুলিয়াছে—ইহারাই দ্ব্যণুকাদিরূপে কার্য্য আরম্ভ করে, ইহারাই জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকে। অবয়ব হইতে অবয়বী দ্রব্য উৎপন্ন হয়। সূত্র হইতে বস্ত্রের উদ্ভব। অবয়ব ও অবয়বী এক বস্তু নহে। ইহারা ভিন্ন ভিন্ন বস্তু। সূত্র ও বস্ত্র এক বস্তু নহে। সূত্র বস্ত্রের উপাদান কারণ—ইহাই বস্ত্রের সহিত সূত্রের সম্বন্ধ। সূত্রগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া বস্ত্র হয় বটে, কিন্তু ঐ সূত্রগুলিই বস্ত্র নহে। সূত্রগুলি বস্ত্রের কারণ ও বস্ত্র তাহার কার্য্য। সূত্র-সমষ্টিই বস্ত্র হইতে পারে না, কেননা কার্য্য ও কারণ একই বস্তু হইলে কার্য্যনির্ম্মাণের প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। কার্য্য ও কারণ পরস্পর অভিন্ন হইলে, কারণের ন্যায় কার্য্যও, পূর্ব্বসিদ্ধ বলিয়া, কার্য্য উৎপন্ন করিবার চেষ্টা হইতে পারে না। বিশেষতঃ, কার্য্য ও কারণ যদি একই বস্তু হইত, তাহা হইলে কার্য্যের দ্বারা যাহা সিদ্ধ হইতে পারে, কারণের দ্বারাও তাহা সিদ্ধ হইতে পারিত; কিন্তু তাহা হয় না। মাটী দ্বারা জল আহরণ করা যায় না, কিন্তু ঘটের দ্বারা জল আহরণ করা যায়; বস্ত্রের দ্বারা গাত্র আচ্ছাদন করা যায়, কিন্তু সূত্রের দ্বারা আচ্ছাদন করা যায় না। সুতরাং কার্য্য ও কারণ এক বস্তু নহে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। উভয়ে এক বস্তু হইলে, মাটী ও ঘটের কার্য্য, বস্ত্র ও সূত্রের কার্য্য একই রকমের হইত। সৃষ্টির পূর্ব্বে, এমন কোনও বস্তু ছিল না যাহা প্রত্যক্ষ-দৃষ্টির বিষয় হইতে পারিত। পরমাণু হইতে দ্ব্যণুকাদিক্রমে, স্থূল হইতে হইতে এতবড় বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে। পরমাণু এত সূক্ষ্ম পদার্থ যে, তাহা প্রাকৃত চক্ষুর দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না; কাজেই সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ দৃশ্য কোনরূপ পদার্থই ছিল না, 'অসৎ' হইতেই 'সৎ'-এর সৃষ্টি হইয়াছে। সৃষ্টির পূর্ব্বে পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এই চারি প্রকার পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক্, ঈশ্বর ও অসংখ্য জীবাত্মা—এই কয়প্রকার নিত্য বস্তু বর্ত্তমান ছিল; ইহাদের কোনটিই প্রাকৃত চক্ষুর বিষয় নহে। সৃষ্টির অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে পার্থিব পরমাণু সকল পরস্পর মিলিত হয় ও ক্রমশঃ স্থূল, স্থূলতর ও স্থূলতম পৃথিবী উৎপাদন করিতে থাকে। এইরূপে অতি সূক্ষ্ম জলীয়, আগ্নেয় ও বায়বীয় পরমাণু সকল মিলিত হইয়া যথাক্রমে স্থূল, স্থূলতর ও স্থূলতম জল, অগ্নি ও বায়ু উৎপন্ন হয়। এইরূপে এই চারিপ্রকার পরমাণু সৃষ্টি আরম্ভ করে, আর, তাহাতেই এই পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ুময় প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড গড়িয়া উঠিয়াছে।

এই মত এখন জগতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাবে প্রচারিত। জড়বিজ্ঞানবাদীরা, এই মতের উপরেই স্ব স্ব আবিষ্কার প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। কাজেই, এই মত কতটা যুক্তিসঙ্গত তাহা একবার বিচার করিয়া দেখা উচিত।

একটি স্থূল কার্য্যকে ভাগ করিতে গেলে উহাকে ভাগ করিতে করিতে এমন একটা সূক্ষ্মতম ভাগে গিয়া পৌছিতে পারা যায় যে, তাহাকে আর ভাগ করা যায় না; সেই সূক্ষ্মতম ভাগের নামই পরমাণু[১]। যাহা হইতে আর

১। জালান্তরগতে ভানৌ যৎ সূক্ষ্মং দৃশ্যতে রজঃ।
ভাগস্তস্য চ ষষ্ঠো যঃ পরমাণুঃ স উচ্যতে।—বাক্যবৃত্তিঃ

সূক্ষ্মতর কিছু সম্ভব হয় না তাহাই ত পরমাণু। এই পরমাণু নিত্য পদার্থ; ইহার আর অবয়ব নাই। যাহা সাবয়ব তাহা অনিত্য। সুতরাং নিরবয়ব পরমাণু নিত্য —ইহা নিশ্চিত। এই নিরবয়ব পরমাণুর মিলন কিরূপে সম্ভব—ইহা জিজ্ঞাসার বিষয় হইতে পারে। যদি পরমাণুকে সাবয়ব বলিয়া স্বীকার করা যায়, পরমাণুর সূক্ষ্মতম অংশ আমাদের প্রাকৃত চক্ষুতে প্রত্যক্ষ করিতে পারি না বলিয়া, পরমাণুরও অবয়ব অঙ্গীকার করিতে হয়, তাহা হইলে পরমাণুর অনন্ত অবয়বধারা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। এইরূপে পরমাণুকেও অনিত্য সাবয়ব পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিলে 'অনবস্থা' দোষ ঘটে, কোথাও আর বিরাম হইতে পারে না, কিছুরই ব্যবস্থা করা যায় না; জগতে সমস্তই অব্যবস্থিত হইয়া পড়ে। যদি পরমাণু সাবয়ব হয়, পরমাণুর অবয়বধারাও যদি কোথাও বিশ্রান্ত না হয়, তাহা হইলে 'ঐ বস্তুটি বড় আর এইটি ছোট', এইরূপ ব্যবহার করা যায় না। ইহাতে সর্ব্ববাদিসিদ্ধ অনুভব ও সত্যের অপলাপ করিতে হয়। একটি অতিবড় পর্ব্বত ও একটি অতিক্ষুদ্র সর্ষপ সমান হইতে হয়।

অবয়বগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া যে বস্তু নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তাহা অবশ্যই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যে দুইটী অবয়ব মিলিত হইয়া বস্তুটি উৎপন্ন হয়, সেই অবয়ব দুইটী কোন না কোন সময়ে বিভক্ত হইবেই হইবে; আর, উহাদের বিভাগে কার্য্যদ্রব্যটীও বিনাশ পাইবে। ফলে, মৃত্তিকা, জল, অগ্নি ও বায়ুময় এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডও একদিন অতি সূক্ষ্ম ও দৃষ্টির বহির্ভূত পরমাণুপুঞ্জে পরিণত হইবে। সুতরাং সর্ষপ ও পর্ব্বতের অবয়বধারা যদি অনন্ত হয় তাহা হইলে সর্ষপটী ছোট আর পর্ব্বতটী বড়, এইরূপ বলা যায় না; দুইটীই সমান হইয়া পড়ে। অতএব, সকল কার্য্য বিভাগ করিতে করিতে এমন একটা অংশে গিয়া পড়া যায় যাহাকে নিত্য নিরবয়ব বলিয়া স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। তাহাও অনিত্য এবং সাবয়ব বলিয়া স্বীকার করিলে পর্ব্বত ও সর্ষপ তুল্যপরিমাণ হইয়া পড়ায় ঐটী বড় আর এইটি ছোট, এইরূপ বলা চলে না। এইরূপে পরমাণু যে নিত্য ও নিরবয়ব, ইহা যুক্তিসিদ্ধ। মৃত্তিকা, জল, অগ্নি ও বায়ুরূপ স্থূল ভূতগুলির উপাদান কারণ, অনন্ত, নিত্য ও অদৃশ্য পরমাণুপুঞ্জের সত্তা এইভাবে প্রমাণিত হইতে পারে। ঈশ্বরেচ্ছায় ও জীবাদৃষ্টবশতঃ সৃষ্টির অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে ঐ পরমাণু সকল পরস্পর মিলিত হইয়া সৃষ্টি আরম্ভ করে। তাহাতে স্থূল, স্থূলতর ও স্থূলতম প্রপঞ্চ গড়িয়া উঠে।

এখন আপত্তি হইতে পারে, যাহার কোনরূপ অবয়ব নাই, নিরবয়ব তেমন দুইটি পরমাণু কিরূপে মিলিত হইতে পারে? একটি নিরবয়ব পরমাণুর সহিত আর একটি নিরবয়ব পরমাণুর মিলন ত সম্পূর্ণই অসম্ভব। কারণ, 'সাবয়ব-বৃত্তি সংযোগ' সাবয়ব দ্রব্য দুইটীকেই অপেক্ষা করিয়া থাকে, নিরবয়ব দ্রব্য দুইটি পরস্পর সংযুক্ত হইতে পারে না। কাজেই, পরমাণু নিরবয়ব হইলে সংযোগের অভাবে সৃষ্টি হইতে পারে না, আর সাবয়ব হইলে মেরু ও সর্ষপের তুল্য-পরিমাণত্ব ঘটে। ইহার উত্তর অতি সহজ। আকাশ, কাল প্রভৃতি নিরবয়ব পদার্থের সহিত যেমন সাবয়ব বৃক্ষের মিলন সম্ভব, ঠিক সেইরূপ জীবের অদৃষ্ট বশতঃ ঈশ্বরের ইচ্ছায় নিরবয়ব পরমাণুর মিলনও যুক্তিসিদ্ধই হয়। এই মতের উপর নির্ভর করিয়া সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝিতে যাওয়া অসঙ্গত নহে।

(২) কার্য্য উৎপত্তির পূর্ব্বেও সূক্ষ্ম অবস্থায় কারণে বিদ্যমান থাকে, কারক-ব্যাপারে তাহা অভিব্যক্ত হয়। 'অভাব' হইতে 'ভাবে'র উৎপত্তি হইতে পারে না। যাহা তিরোহিত অবস্থায় বর্ত্তমান ছিল তাহাই আবির্ভূত হইয়া থাকে। কার্য্য ও কারণ ভিন্ন নহে। অনভিব্যক্ত বা তিরোহিত অবস্থায় কার্য্যটি কারণে বর্ত্তমান ছিল, সম্প্রতি অভিব্যক্ত বা প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র। যাহা অসৎ তাহা কখন সৎ হইতে পারে না, আবার যাহা সৎ তাহা কখনও অসৎ হয় না। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোময়ী প্রকৃতিই মহৎ (বুদ্ধি) ও অহঙ্কার প্রভৃতি ক্রমে জগৎ রূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু, 'জড়া প্রকৃতি' যাহার মোটেই চৈতন্য নাই, তাহা নিজেই কি প্রকারে অপরের সুখদুঃখ-ভোগের নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইতে পারে, ইহা বুঝিতে পারা যায় না। যদি সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হওয়াই প্রকৃতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে সৃষ্টির সময়ই তাহার প্রবৃত্তি হয় কেন? তৎপূর্ব্বে ত প্রবৃত্তি হয় না; কেননা তখন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ সমান অবস্থায় থাকায়

প্রকৃতি সৃষ্টি আরম্ভ করিতে পারে না। এইরূপে প্রকৃতির স্বভাবই যে সৃষ্টি করা তাহা বলা যায় না। বিশেষতঃ, যদি সৃষ্টি করাই প্রকৃতির স্বভাব হয়, তাহা হইলে প্রকৃতি সর্ব্বদাই সৃষ্টি করিতে থাকিবে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটির 'সাম্যাবস্থা'রূপ 'প্রধানাবস্থা' কখনও সম্ভবপর হইতে পারিবে না। কাজেই এই মতে সৃষ্টি-রহস্য বুঝিতে যাওয়া কঠিন।

(৩) স্বয়ংপ্রকাশ পরমানন্দ অদ্বিতীয় ব্রহ্মই, নিজের মায়া অবলম্বন করিয়া মিথ্যা জগৎ রূপে কল্পিত হইয়া থাকেন। রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হয়, ঠিক সেইরূপ ব্রহ্মেও জগদ্-ভ্রম হইয়া থাকে। ভ্রমবশতঃ যেমন রজ্জুতে সর্প কল্পিত হইতে পারে, ঠিক সেইরূপ মায়াবশতঃ ব্রহ্মেও জগৎ কল্পিত হইয়া থাকে। রজ্জুতে যেমন সর্পের বাস্তবিক সত্তা নাই, ঠিক তেমনি ব্রহ্মেও জগতের বাস্তবিক সত্তা নাই। জগতের সমস্তই মায়া-পরিকল্পিত; সুতরাং উহা ব্রহ্মের বিবর্ত্ত ভিন্ন আর কিছুই নহে। জগৎ মায়িক, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। এই জগৎ ও ইহার সৃষ্টিতত্ত্ব অনির্ব্বচনীয়—ইহা মায়া ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। যাহা আমরা দেখিতে পাই, কিন্তু যাহার স্বরূপ বুঝাইতে পারি না—বুঝাইতে চেষ্টা করি বটে, কিন্তু উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পাই না, তাহা 'মায়া' ভিন্ন আর কি হইতে পারে? তাহা বাস্তবিক অনির্ব্বচনীয়। তাহা 'সৎ'ও নয়, 'অসৎ'ও নয়, কিন্তু ভাবরূপ; 'সৎ' ও 'অসৎ' এই দুই শব্দের দ্বারা তাহাকে বুঝাইতে পারা যায় না। অতএব, তাহা অনির্ব্বচনীয়। যাহা 'আছে' বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, যাহার সত্যের অপলাপ করা যায় না, কিন্তু যাহার স্বরূপ বুঝান সর্ব্বথা অসম্ভব, তাহাই তো অনির্ব্বচনীয়—তাহাই তো মায়া। একটি ঐন্দ্রজালিককে এক ঘণ্টার মধ্যে বীজ হইতে গাছ গড়িয়া তুলিতে দেখিলে যেমন তাহার ঐ কার্য্যকে ইন্দ্রজাল বা মায়া ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না—কারণ, আমি নিজেই তাহার ব্যাপার বুঝিয়া উঠিতে পারি না, অন্যকে বুঝান তো দূরের কথা, অথচ ঐ কার্য্যটি 'অসৎ' বলিয়া উড়াইয়াও দেওয়া যায় না; কাজেই, অনির্ব্বচনীয়—মায়া—বলিয়া প্রকাশ করিতে বাধ্য হই; সেইরূপ যে জগৎকে আমি 'সৎ' বলিয়া বুঝি, কিন্তু বিচারের দ্বারা বুঝাইতে পারি না, তাহার তত্ত্ব যে অনির্ব্বচনীয়, ইহা স্বীকার করিতে হয়। ইহাই মায়া। সুতরাং, সৃষ্টিতত্ত্ব মায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে; ইহাকে যুক্তি-তর্কের দ্বারা বুঝাইতে পারা যায় না।

এখন দেখা যা'ক, কি ভাবে এই তিন মতের ক্রম-বিকাশ হয়।

কার্য্য যদি কারণের মধ্যে না-ই থাকে, তবে কিরূপে অকস্মাৎ কার্য্যটির সত্তা উপস্থিত হইল, ইহা বুঝা যায় না। কার্য্যের যদি কোনরূপ সত্তা স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তবে সেই সত্তার একটা কারণ থাকা চাই-ই। হয় ইহা কারণের মধ্যে কোন-না কোন আকারে ছিলই, নয় ইহা কারণ-সামগ্রীর সমবধান বা মিলন-বশতঃ উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু, ইহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে, কার্য্যটী সত্য না অসত্য? যদি অসত্য হয়, তবে ইহাকে কিরূপে কারণ-সামগ্রী হইতে ভিন্ন বস্তু বলা যাইবে এবং কিরূপেই বা ইহা অকস্মাৎ আসিয়া পড়িল? যদি বলি কারণ-সামগ্রীই সত্য, তবে কারণ-সামগ্রীর মিলনকে 'অসৎ' বলা যাইবে কিরূপে? যদি কার্য্যের কোনরূপ সত্তা স্বীকার করা যায়, তবে এ সত্তা তো পূর্ব্বে ছিল না, কিন্তু কারণ-সমবধানবশে জন্মে; অতএব উহা সম্পূর্ণ নূতন এবং কারণ হইতে ভিন্ন। অর্থাৎ যদি কারণ-সমবধানকে অসৎ বলি, তবে ইহাকে আর সৎ বলা যায় না; ইহাকে একটা আভাস মাত্র—Appearance বলিতে হয়। যদি ইহাকে সৎ বলি তবে, হয় ইহা কারণ হইতে ভিন্ন হইবে, নয় অভিন্ন হইবে। প্রথম কল্পে, সৎ বস্তুর বাহুল্য বাড়িয়া যাইবে; দ্বিতীয় কল্পে, স্বরূপতঃ কার্য্য ও কারণ অভিন্ন বা একবস্তুরূপে গণ্য হইবে; কার্য্যের সত্তাকে কেবল আভাস মাত্র গণ্য করিতে হইবে। তবেই, কারণ-সমবধানটি সদ্‌বস্তু না হইয়া, কেবল আভাস-রূপেই পরিগণিত হইবে; ইহাকে কেবল আভাসরূপেই 'সৎ' বলিতে হইবে এবং এই আভাসের মধ্যে কেবল মূল কারণটিকেই সৎ বলিয়া মনে করিতে হইবে। তাহাতে কার্য্যটী নূতনরূপে দেখা দিলেও প্রকৃতপক্ষে উহাকে উহার কারণ হইতে ভিন্ন করিয়া বুঝা যাইবে না।

আবার, যদিও নিত্য-কারণ-দ্রব্য হইতে একটা সম্পূর্ণ নূতন বস্তুর উদ্ভব স্বীকার করা যায়, তবুও—কার্য্য যখন

কারণের মধ্যে নাই, তখন বালুকা হইতে তৈল কেন উদ্ভূত হইবে না? যদি কার্য্যবস্তুটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বতঃ উৎপন্ন হয় এবং উহার, কারণে শক্তিরূপে না থাকা মানা যায়, তাহা হইলে তুল্যজাতীয় কারণ হইতে তুল্যজাতীয় কার্য্য হয়—এ কথা খাটে কই? কেননা, কারণের সঙ্গে তো কার্য্যের কোনই সম্বন্ধ নাই। তবেই, বিশেষ বিশেষ কারণের সঙ্গে, উহার বিশেষ বিশেষ কার্য্যের সম্বন্ধ আছে, মানিতেই হইবে। কার্য্য যদি কারণের মধ্যেই না থাকে তাহা হইলে কারণের সহিত সম্বন্ধে আসিবে কি প্রকারে? "ন্যায়-কন্দলী" যে বলিয়াছেন,—যাহা অনভিব্যক্ত এবং যাহা অর্থক্রিয়া-সম্পাদনে অসমর্থ তাহাকে তো 'অসৎ' বলিতেই হইবে, তাহা ঠিক নহে। কেন না, উহা শক্তি-রূপে প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত অবস্থা পাইলেই কার্য্যরূপে দেখা দিবে। আর, যদি কারণের মধ্যে কার্য্যের সত্তা না মানিয়া লওয়া যায়, তবে কারণ কেন উহাকে উৎপন্ন করিবে?

কার্য্য ও কারণের সত্তা দুইটী পৃথক্ বস্তু নহে, দুই-ই এক বস্তু, কারণেরই সত্তা কার্য্যে দেখা দেয়, কেননা, কার্য্যটী কারণেরই রূপান্তর বা পরিবর্ত্তিত অবস্থা মাত্র। কার্য্য একটা প্রতীতি—Appearance or phenomenon মাত্র নহে; উহাতে কারণেরই সত্তা নিহিত আছে। কারণটাই ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে এবং উহাই কার্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত আকারে দেখা দেয়। ক্রমিক অবস্থা-ভেদের মধ্য দিয়া কারণটাই আপনাকে লইয়া যায়, যে পর্য্যন্ত না উহা চরম অবস্থায় বা চরম পরিণামে উপস্থিত হইতেছে।

কার্য্য সত্য, কেননা উহা কারণেরই তো পরিণতি কিন্তু পরিণতির অর্থ—রূপান্তর বা আকারের ভেদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। স্বরূপ ঠিকই থাকে। কেন না, পরিণাম অর্থে যদি কারণের সম্পূর্ণ পরিণাম বলা যায়, তবে তো প্রত্যেক পরিণামকেই একটা একটা স্বতন্ত্র বস্তু বলিতে হয়, যেহেতু, প্রতি পরিণামই তো পূর্ব্ব পরিণাম হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যদি আংশিক পরিণাম হয়, বলি, তবে জ হইবে, এই অংশ কি কারণ হইতে স্বতন্ত্র, না কারণের সহিত অভিন্ন? যদি স্বতন্ত্র হয়, তাহা অসম্ভব। যদি অভিন্ন হয়, তবে সমগ্র কারণটাই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; সুতরাং কার্য্যকে কারণ হইতে একান্ত স্বতন্ত্র বস্তু বলিতে হয়। এই ভাবে এই মতকে ঠিক বুঝা যায় না। নূতন কিছু না থাকিলে, কার্য্যকে স্বতন্ত্র বা ভিন্ন বস্তু বলিব কিরূপে? নূতন যখন নয়, তখন উহাতে কারণই নূতনাকারে দেখা দেয়, বলিতে হইবে। কারণই সত্য, উহার কার্য্যাকারটী কেবল রূপভেদ মাত্র। উহাতে কারণের কোন ক্ষতি হয় নাই। কারণ নিজ স্বরূপে ঠিক থাকিয়াই পরিবর্ত্তিত হয়।

এই কার্য্য-কারণ-ভাব বুঝিবার জন্য মানুষ এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু ভাবিয়াছে, যাহা কিছু বিচার করিতে পারিয়াছে, সেই ভাবনা—সেই বিচারের সমষ্টিই 'দর্শন'। যে কার্য্য ও কারণ লইয়াই মানুষের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান; যাহার ভাবনা না ভাবিয়া মানুষ উন্নতির পথে একপা-ও অগ্রসর হইতে পারে না—যাহার তত্ত্বই মানবের সকল বিদ্যার মূল ভিত্তি—সেই কার্য্য-কারণের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে মানুষ যাহা কিছু ধরিতে পারিয়াছে, যাহা কিছু মানুষের জ্ঞান-গরিমার সমুজ্জ্বল নিদর্শন যাহা কিছু মানবের গৌরব করিবার, এক মাত্র ধরিবার বস্তু, সেই ভাবনা, সেই তত্ত্ব, সেই বস্তুই দর্শন; তাহাই দর্শন শাস্ত্র, তাহাই সকল শাস্ত্রের অপরিহার্য্য অবলম্বন। মানবের পথপ্রদর্শক বলিয়া তাহা সকল শাস্ত্রের চক্ষু-স্বরূপ। যত দিন মানুষের দর্শন-শাস্ত্রে যথার্থ জ্ঞানলাভ না হইতেছে, ততদিন তাহার পক্ষে অভ্যুদয়-বার্ত্তাও সুদূর-পরাহত। সুতরাং, অভ্যুদয় কামনা করিলে, শ্রেয়োলাভের বাসনা থাকিলে, দর্শন-শাস্ত্র অবশ্য অধ্যয়ন করিতে হয়। দর্শন-শাস্ত্রই মানুষের দর্শক; আর কার্য্য-কারণ-ভাব লইয়াই ইহার প্রতিষ্ঠা। অতএব, এই কার্য্য-কারণতত্ত্বই দর্শন-শাস্ত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য। কার্য্য কি, কারণ কি, কার্য্য ও কারণে কিরূপ সম্বন্ধ, ইহার বিচার করাই দর্শন-শাস্ত্রের প্রধান কাজ। এই কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধ বিচার করিবার জন্যই ভারতে ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত ও মীমাংসা-দর্শনের উদ্ভব।

মলবাই দেসাইন্

—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

"মারাঠার যত রাজ্য রয়েছে আনিয়া আমার পতাকাতলে,
একই হিন্দু রাজার অধীনে রাখিব শাসন-দৃপ্ত বলে।
বল্লারীরাজ চিরনিদ্রিত, রাজ্যে নেমেছে অন্ধকার,
বিধবা-রমণী রাজ্যেশ্বরী, দুর্ব্বল শুনি দুর্গ তার।"
ভাবিয়া শিবাজী চলেছে দর্পে পশ্চাতে নিয়া সৈন্যদল
মারাঠাকেশরী আসিছে শুনিয়া কাঁপে না রাণীর বক্ষতল।
মারাঠার নানা জনপদভূমি গিরি কান্তার রাজ্য লভি'
বল্লারী-পথে এসেছে শিবাজী, দিকে দিকে জাগে করুণ ছবি

ক্ষুদ্র হলেও দুর্গেশ্বরী রাণী মলবাই মারাঠা-মেয়ে,
ক্ষাত্র শোণিতে জন্ম তাঁহার, স্বাধীনতা রহে হৃদয় ছেয়ে।
রাজস্থানের দাক্ষির-মহিষী, নারকী-কুমারী, দুর্গাবতী,—
কত পদ্মিনী অন্তরে তার ফুটায় শৌর্য্য-স্বর্গ-জ্যোতি।
আর্য্যগরিমা বক্ষে নেবার উষ্ণ শোণিতধমনী বয়
স্বাধীন-স্বত্ত্ব-শক্তি-শাসিত দুর্গ তাহার বীর্য্যময়।

শিবাজী আসিছে দূর হতে তার মহাকলরব কর্ণে পশি,
রণরঙ্গিণী দুর্গেশ্বরী দাঁড়াল দুর্গে লইয়া অসি।
মারাঠা জাতির জাতীয় সূর্য্য আসিছে শুনিয়া সৈন্যগণ
ভীত কম্পিত চিত্তে কহিছে—'কেমনে জননি করিব রণ!'
উত্তরে তার উৎসাহ দিয়া রাণী মলবাই গরজি কহে,—
"দেশের জন্য হও আগুসার, তোমাদের রাণী তুচ্ছ নহে।
বীর-সন্তান তোমরা আমার—আপনারে দাও সমরে বলি,
মরণে স্বর্গ, জীবনে কীর্ত্তি লভিবে শত্রু চরণে দলি'।"
অগ্নি-গর্ভ সে বাণী শুনিয়া মারাঠা-সৈন্য ক্ষিপ্তপ্রায়,
দুর্গ রক্ষা করিতে তাহারা জীবনের মায়া ভুলিয়া যায়।
মিথ্যা মায়া ও মিথ্যা ধরণী, সত্য শুধুই মুক্তপ্রাণ,
বীরমদে আর রণমদে ওঠে মিলিত কণ্ঠে জাতীয় গান।

ভীম বিক্রমে চলেছে সমর, বিশ্বভুবন কাঁপিছে সদা
রক্ত নদীর উষ্ণধারায় নাহন করিছে পুষ্পলতা।
বন-উপবন উঠিছে শিহরি, রবি শশী তারা লুকায় মেঘে,
অসিতে অসিতে বিদ্যুত নাচে, অশ্ব ছুটেছে ঝঞ্ঝাবেগে।
চলেছে হাজার হাজার সৈন্য জিনিতে অথবা মরিতে রণে,
সাতাশ দিনের প্রতিটি প্রহর অতীত আর্ত্তনাদের সনে।

"বিপুল মোগল-বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেছি জয়োল্লাসে,
এ যে গো ভীষণ সংগ্রাম হেরি, শত্রু হাজার সৈন্য নাশে।
ধন্য রমণী রাণী মলবাই, বল্লারী-ভূমি ধন্য বটে!
বীরাঙ্গনার অমরকাব্য রহিবে উজল বিশ্বপটে।
ভবানীর সম শক্তি-রূপিণী দূর হতে তারে লক্ষ্য করি।"—
শেষের দিনের ভীষণ যুদ্ধে শিবাজী কহিছে অশ্বোপরি।
সহসা দুর্গ-প্রাচীর ভাঙিয়া পড়িল বজ্রনাদের সম,
দুর্গেশ্বরী নীরবে কহিছে—"বিফল হ'ল যে যুদ্ধ মম।"

সে দিন বরষা নেমেছে ভুবনে, রাণীর নয়নে নেমেছে জল,
ভাঙা পথ দিয়া পশিল শত্রু, দুর্গেশ্বরী হারাল বল।
শিবাজীসমীপে বন্দিনী রাণী মলবাই কহে গর্ব্বভরে,
"তোমায় আমায় নাহিক প্রভেদ, উভয়ে স্বাধীন বিশ্ব' পরে।
আমি রাজরাণী, তুমিও ভূপতি—ক্ষুদ্র হ'লেও নহিক হীন,
দুর্ব্বল ভাবি এসেছ শিবাজী আমার শক্তি করিতে লীন,
রাজধর্ম্মের রাখি' মর্য্যাদা যুদ্ধ করেছি পরাণ দিয়া,
পরাজয়-গ্লানি মাখিয়া এসেছি দগ্ধ করিয়া স্বাধীন হিয়া।
তোমার সমীপে বন্দিনী আমি, যাহা অভিরুচি কর গো তুমি
কৃপার ভিখারী নহিক তোমার যদিও হারানু রাজ্যভূমি।"

বন্দী রাণীর বাক্য শুনিয়া কহিল শিবাজী—"প্রণাম লহ,
আমার জননী জিজাবাই সম রাজ্যেশ্বরী তুমি মা রহ।
তোমার অমিত বিক্রম শুধু পেয়েছি আমার মায়ের মাঝে,
তোমার তুল্য বীরাঙ্গনার শৌর্য্যপ্রভায় বিশ্ব রাজে।"
ফুল্ল আননে রাণী মলবাই কহিল "বৎস! বিজয়ী হও,
শক্তির পূজা শিখিয়াছ তুমি বরাভয় তার আজিকে লও।
শক্তিপূজার শ্রেষ্ঠ পূজারী প্রতিদিন পাবে শক্তি নব,
হিমালয় হতে কন্যাকুমারী বিস্তৃত হোক রাজ্য তব।"
উড়িল না আর ছত্রপতির বিজয়-পতাকা দুর্গ-শিরে
বর্ষা বাদল থেমে গেল সব, আকাশের চাঁদ হাসিল ধীরে।

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার স্বভাবশোভা

—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

গত পৌষ-সংখ্যা বঙ্গশ্রীতে 'ওসলো ও বের্গেন' প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম যে, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার দুটি প্রধান প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, অর্থাৎ "অরোরা বোরিয়ালিস" ও "নৈশ-সূর্য্য" দেখা হইল না বলিয়া মনে দুঃখ থাকিল। একথা পড়িয়া স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার বন্ধুবর্গ ঐ দৃশ্যদ্বয়ের দুটি দুষ্প্রাপ্য ছবি পাঠাইয়াছেন ও জানাইয়াছেন যে, তাঁহাদের দেশের এই দুটি সৌন্দর্য্যের প্রতিলিপি "বঙ্গশ্রী"র মধ্যস্থতায় ভারতীয় পাঠকের দৃষ্টিগোচর হইলে তাঁহারা আনন্দলাভ করিবেন।



'অরোরা বোরিয়ালিস্'।

প্রথম ছবিটি অরোরা বোরিয়ালিসের। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ও ফেব্রুয়ারি-মার্চ্চ মাসের নৈশ আকাশে ক্ষণপ্রভার এই অপরূপ সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়। ঝালর বা দোদুল্যমান ঝিল্লীর আকারে এই জ্যোতি উত্তর-আকাশের বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। মৃদু-পবন-আন্দোলিত ঝালরের মত এই জ্যোতি-রাশি ঈষৎ-হিল্লোলিত কম্পমান অবস্থায় ক্ষণে ক্ষণে গতিমান হইয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া বেড়ায়, ইহার বর্ণচ্ছটাও ক্ষণে ক্ষণে বিভিন্ন দ্যুতিতে বিচ্ছুরিত হয়। সমগ্র উত্তরাকাশ এই জ্যোতির আভায় সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠে। চঞ্চল-সচল এই দীপ্তিপুঞ্জের মুহুর্মুহু অবস্থান, আকার ও বর্ণবিন্যাসের পরিবর্ত্তনে দর্শকের চিত্তে অপূর্ব্ব শোভায় ছবি প্রকটিত হয়, ঋগ্বেদের ভাষায় স্তোত্র পাঠ করিতে ইচ্ছা হয়—

"ইদং শ্রেষ্ঠং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ আগাৎ,
চিত্রঃ প্রকেতো অজনিষ্ট বিভ্বা—"।

দ্বিতীয় ছবিটি নৈশ-সূর্য্যের। রাত ১০টা ১০ মিনিট হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি ২০ মিনিট অন্তর দিগন্তলগ্ন সূর্য্যের বিভিন্ন অবস্থানের ফটো তুলিয়া সূর্য্যের চক্রবাল-পরিভ্রমণ দেখান হইয়াছে। ছবির সর্ব্ববামের সূর্য্যটি রাত ১০টা ১০ মিনিটে তোলা হইয়াছে। সেই একই প্লেটে ২০ মিনিট অন্তর তোলা পর পর ছবিগুলিতে



নৈশসূর্য্য।

সূর্য্যের অবস্থান দেখা যাইতেছে। শেষের অর্থাৎ সর্ব্বদক্ষিণের বৃক্ষান্তরালের সূর্য্যের ফটোটি রাত ১২টা ৩০ মিনিটের। এই ছবিতে স্পষ্ট হইবে, জুলাই-আগষ্টে সূর্য্য সন্ধ্যায় পশ্চিম-গগনে অস্ত না গিয়া দিক্-চক্রবাল বাহিয়া কি ভাবে আবার পরদিন প্রত্যূষে পূর্ব্ব-গগনে উদিত হয়।

নদীর বিদ্রোহ

—শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

চারটা পঁয়তাল্লিশের প্যাসেঞ্জার ট্রেনটিকে রওনা করাইয়া দিয়া নদেরচাঁদ নূতন সহকারীকে ডাকিয়া বলিল, 'আমি চললাম হে!'

নূতন সহকারী একবার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চাহিয়া বলিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

নদেরচাঁদ বলিল, 'আর বৃষ্টি হবে না, কি বল?'

নূতন সহকারী একবার জলে জলময় পৃথিবীর দিকে চাহিয়া বলিল, 'আজ্ঞে না।'

নদেরচাঁদ লাইন ধরিয়া এক মাইল দূরে নদীর উপরকার ব্রিজের দিকে হাঁটিতে লাগিল। পাঁচদিন অবিরত বৃষ্টি হইয়া আজ এই বিকালের দিকে বর্ষণ থামিয়াছে। পাঁচদিন নদীকে দেখা হয় নাই। নদেরচাঁদ ছেলেমানুষের মত ঔৎসুক্য বোধ করিতে লাগিল। আকাশে যেমন মেঘ করিয়া আছে, হয়ত আবার কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রবল ধারায় বর্ষণ সুরু হইয়া যাইবে। তা হোক। ব্রিজের একপাশে আজ চুপ চাপ বসিয়া কিছুক্ষণ নদীকে না দেখিলে সে বাঁচিবে না। পাঁচদিনের আকাশ-ভাঙ্গা বৃষ্টি না জানি নদীকে আজ কি অপরূপ রূপ দিয়াছে? দুদিকে মাঠ-ঘাট জলে ডুবিয়া গিয়াছিল, রেলের উঁচু বাঁধ ধরিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে দুপাশে চাহিয়া চাহিয়া নদেরচাঁদ নদীর বর্ষণ-পুষ্ট মূর্ত্তি কল্পনা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ত্রিশ বছর বয়সে নদীর জন্ত নদেরচাঁদের এত বেশী মায়া একটু অস্বাভাবিক। কেবল বয়সের জন্ত নয়, ছোট হোক, তুচ্ছ হোক, সে তো একটা ষ্টেশনের ষ্টেশন-মাষ্টার, দিবারাত্রি মেল, প্যাসেঞ্জার আর মাল-গাড়ীগুলির তীব্রবেগে ছুটাছুটি নিয়ন্ত্রিত করিবার দায়িত্ব যাহাদের সেও তো তাহাদেরই একজন, নদীর জন্ত এমন ভাবে পাগল হওয়া কি তার সাজে? নদেরচাঁদ সব বোঝে, নিজেকে কেবল বুঝাইতে পারে না। নিজের এই পাগলামীতে যেন আনন্দই উপভোগ করে।

অস্বাভাবিক হোক, নদীকে এভাবে ভালবাসিবার একটা কৈফিয়ৎ নদেরচাঁদ দিতে পারে। নদীর ধারে তার জন্ম হইয়াছে, নদীর ধারে সে মানুষ হইয়াছে, চিরদিন নদীকে সে ভালবাসিয়াছে। দেশের নদীটি তার হয় তো এই নদীর মত এত বড় ছিল না, কিন্তু শৈশবে, কৈশোরে, আর প্রথম যৌবনে বড়-ছোটর হিসাব কে করে? দেশের সেই ক্ষীণস্রোতা নির্জ্জীব নদীটি অসুস্থ দুর্ব্বল আত্মীয়ার মতই তার মমতা পাইয়াছিল। বড় হইয়া একবার অনাবৃষ্টির বছরে নদীর ক্ষীণ স্রোতোধারাও প্রায় শুকাইয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছে দেখিয়া সে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল; দুরারোগ্য ব্যধিতে ভুগিতে ভুগিতে পরমাত্মীয়া মরিয়া যাওয়ার উপক্রম করিলে মানুষ যেমন কাঁদে।

ব্রিজের কাছাকাছি আসিয়া প্রথমবার নদীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই নদেরচাঁদ স্তম্ভিত হইয়া গেল। পাঁচদিন আগেও বর্ষার জলে পরিপুষ্ট নদীর পঙ্কিল জলস্রোতে সে চাঞ্চল্য দেখিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে চাঞ্চল্য যেন ছিল পরিপূর্ণতার আনন্দের প্রকাশ। আজ যেন সেই নদী ক্ষেপিয়া গিয়াছে, গাঢ়তর পঙ্কিল জল ফুলিয়া ফাঁপিয়া ফেণোচ্ছ্বাসিত হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। এতক্ষণ নদেরচাঁদ একটি সঙ্কীর্ণ ক্ষীণস্রোতা নদীর কথা ভাবিতেছিল। তার চার বছরের চেনা এই নদীর মূর্ত্তিকে তাই যেন আরও বেশী ভয়ঙ্কর, আরও বেশী অপরিচিত মনে হইল।

ব্রিজের মাঝামাঝি ইট, সুরকি আর সিমেন্টে গাঁথা ধারক-স্তম্ভের শেষপ্রান্তে বসিয়া সে প্রতিদিন নদীকে দেখে। আজও সে সেইখানে গিয়া বসিল। নদীর স্রোত ব্রিজের এই দিকে ধারকস্তম্ভগুলিতে বাধা পাইয়া ফেনিল আবর্ত্ত রচনা করিতেছে। এত উঁচুতে জল উঠিয়া আসিয়াছে যে, মনে হয় ইচ্ছা করিলে বুঝি হাত বাড়াইয়া স্পর্শ করা যায়। নদেরচাঁদের ভারি আমোদ বোধ হইতে

লাগিল। পকেট খুঁজিয়া পুরাতন একটি চিঠি বাহির করিয়া সে স্রোতের মধ্যে ছুঁড়িয়া দিল। চোখের পলকে কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া গেল চিঠিখানা। উন্মত্ততার জন্যই জলপ্রবাহকে আজ তাহার জীবন্ত মনে হইতেছিল, তার সঙ্গে খেলার যোগ দিয়া চিঠিখানা যেন তাড়াতাড়ি লুকাইয়া ফেলিয়াছে।

দু'দিন ধরিয়া বাহিরের অবিশ্রান্ত বর্ষণের সঙ্গে সুর মিলাইয়া নদেরচাঁদ বৌ-কে প্রাণপণে একখানা পাঁচপৃষ্ঠা-ব্যাপী বিরহ-বেদনাপূর্ণ চিঠি লিখিয়াছে, চিঠি পকেটেই ছিল। একটু মমতা বোধ করিল বটে, কিন্তু নদীর সঙ্গে খেলা করার লোভটা সে সামলাইতে পারিল না, এক এক-খানি পাতা ছিঁড়িয়া দুমড়াইয়া মোচড়াইয়া জলে ফেলিয়া দিতে লাগিল।

তার পর নামিল বৃষ্টি, সে কি মুষল-ধারায় বর্ষণ। ঘণ্টা তিনেক বিশ্রাম করিয়া মেঘের যেন নূতন শক্তি সঞ্চিত হইয়াছে।

নদেরচাঁদ বসিয়া বসিয়া ভিজিতে লাগিল, উঠিল না। নদী হইতে একটা অশ্রুতপূর্ব শব্দ উঠিতেছিল, তার সঙ্গে বৃষ্টির ঝম্ ঝম্ শব্দ মিশিয়া হঠাৎ এমন একটা সুরের সৃষ্টি করিয়াছে যে, নদেরচাঁদের মন হইতে ছেলে-মানুষী আমোদ মিলাইয়া গেল, তার মনে হইতে লাগিল এই ভীষণ মধুর শব্দ শুনিতে শুনিতে সর্বাঙ্গ অবশ, অবসন্ন হইয়া আসিতেছে।

ক্রমে ক্রমে দিনের স্তিমিত আলো মিলাইয়া চারিদিক অন্ধকারে ছাইয়া গেল, বৃষ্টি একবার কিছুক্ষণের জন্য একটু কমিয়া আবার প্রবলবেগে বর্ষণ আরম্ভ হইল, ব্রিজের উপর দিয়া একটা ট্রেন চলিয়া যাওয়ার শব্দে আকস্মিক আঘাতে ঘুম ভাঙিয়া যাওয়ার মত একটা বেদনাদায়ক চেতনা কিছুক্ষণের জন্য নদেরচাঁদকে দিশেহারা করিয়া রাখিল, তারপর সে অতিকষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বড় ভয় করিতে লাগিল নদেরচাঁদের। হঠাৎ তাহার মনে হইয়াছে, রোষে ক্ষোভে উন্মত্ত এই নদীর আর্তনাদী জলরাশির কয়েক হাত উঁচুতে এমন নিশ্চিন্তমনে এতক্ষণ বসিয়া থাকা তাহার উচিত হয় নাই। হোক ইট, সুরকি, সিমেন্ট, পাথর, লোহালক্কড়ে গড়া ব্রিজ, যে নদী এমন ভাবে ক্ষেপিয়া যাইতে পারে তাহাকে বিশ্বাস নাই।

অন্ধকারে অতি সাবধানে লাইন ধরিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে নদেরচাঁদ ষ্টেশনের দিকে ফিরিয়া চলিল। নদীর বিদ্রোহের কারণ সে বুঝিতে পারিয়াছে। ব্রিজটা ভাঙিয়া ভাসাইয়া লইয়া, দুপাশে মানুষের হাতে গড়া বাঁধ চুরমার করিয়া, সে স্বাভাবিকগতিতে বহিয়া যাইবার পথ করিয়া লইতে চায়। কিন্তু পারিবে কি?

পারিলেও মানুষ কি তাকে রেহাই দিবে? আজ যে ব্রিজ আর বাঁধ সে ভাঙিয়া ফেলিবে, কাল মানুষ আবার সেই ব্রিজ আর বাঁধ গড়িয়া তুলিবে। তারপর এই গভীর, প্রশস্ত, জলপূর্ণ নদীর, তার দেশের সেই ক্ষীণস্রোতা নদীতে পরিণত হইতে না জানি মোটে আর কতদিন লাগিবে?

ষ্টেশনের কাছে নূতন রঙ-করা ব্রিজটির জন্য এতকাল নদেরচাঁদ গর্ব্ব অনুভব করিয়াছে। আজ তার মনে হইল কি প্রয়োজন ছিল ব্রিজের?

বোধ হয়, এই প্রশ্নের জবাব দিবার জন্যই পিছন হইতে ৭নং ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি নদেরচাঁদকে পিষিয়া দিয়া চলিয়া গেল ছোট ষ্টেশনটির দিকে, - নদেরচাঁদ চার বছর যেখানে ষ্টেশন-মাষ্টারী করিয়াছে এবং বন্দী নদীকে ভাল-বাসিয়াছে।

বঙ্গ-রমণী

—শ্রীঅপরাজিতা দেবী

[২১]

'অদ্ভুত সুখ দুগল হৃদয়ে—'

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়াছে। পথশ্রান্ত সুখেন চিলহাটিতে পঙ্কমীদের বাড়ী পৌঁছিয়া কোন দিকে না চাহিয়া বরাবর নিজেদের ঘরে গিয়া উঠিল; শিকল খুলিয়া অন্ধকারেই বিছানায় বসিল; জুতা জোড়া খুলিয়া গায়ের জামাটা খুলিয়া ফেলিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

কৃষ্ণা প্রতিপদের ঈষৎ-ক্ষীণ চাঁদ গাছপালার উপরে উঠিয়া গিয়াছে। খোলা জানালাগুলি দিয়া বসন্তের বাতাস ঘরে আনাগোনা করিতেছে। পাশের শিউলী ফুলের গন্ধে সে বাতাস ভরপুর; জ্যোৎস্নায় ঘরখানি আলো ও ছায়ায় বিচিত্র-বর্ণ।

কিছুক্ষণ শ্রান্ত অবসন্নভাবে শুইয়া থাকিয়া সুখেন পাশ ফিরিয়া বাহিরের দিকে চাহিল। সমস্তটা পথ যেন নেশার ঝোঁকে চলিয়া আসিয়াছে—বাড়ী হইতে চার-পাঁচ মাইল দূর। এতখানি পথ কি ভাবে আসিয়াছে, নিজেরই মনে নাই। অনুতাপে, ধিক্কারে পঙ্কমীর কাছে মুখ দেখাইতেও লজ্জা হইতেছে; অথচ নিজের অজ্ঞাতসারে শুধু শান্তি-লাভের আশাতেই পঙ্কমীর কাছে ছুটিয়া আসিয়াছে। পঙ্কমীর উপর সুখেনের রাগ হইল,—সে কেন সরলার মত হইল না?

সরলার মুখে কি আছে,—কেন সুখেন সরলার কোন কথা বা কোন কাজের প্রতিবাদ করিতে পারে না? সরলার সামনে সুখেনের ব্যক্তিত্ব যেন লোপ পায়। পঙ্কমীর কাছে আসিয়া যে-সব কথা সে মনে মনে গাঁথে, যে-সব কাজ করিব বলিয়া দৃঢ় সংকল্প করে, সরলার কাছে গেলেই সে সব যেন কুয়াশার মত মিলাইয়া যায়। সরলা যখন ভ্রূ তুলিয়া চাপা ঠোঁট দুখানি আরও চাপিয়া স্থির-দৃষ্টিতে সুখেনকে দেখে, তখন সুখেন আপনা হইতে মাথা নীচু করে—প্রতিবাদ তো দূরের কথা। অথচ, দূরে আসিয়া কোন কারণ খুঁজিয়া পায় না—কেন সে মূর্খ চোরের অধম হইয়া পলাইয়া আসিল? কেন সে সরলার হাত হইতে অভাগিনী পঙ্কমীর সর্বস্বটুকু কাড়িয়া লইয়া আসিল না? ধিক্ তার পৌরুষে!—ধিক্ তার জীবনে।

'একি—তুমি? এই অন্ধকারে? দাঁড়াও আলো নিয়ে আসি—'

সুখেন হাত বাড়াইয়া পঙ্কমীর উড়ন্ত আঁচলখানি ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, 'আলো থাক্, তুমি এসো'।

পঙ্কমী এত কাছে আসিয়া ঝুঁকিয়া তাহাকে দেখিতেছিল,—নিজের চিন্তায় মগ্ন সুখেন টেরও পায় নাই।

পঙ্কমী ফিরিয়া সুখেনের গায়ের উপর প্রায় ঝাঁপাইয়া পড়িল,—'আচ্ছা মানুষ তুমি। চুপি চুপি কখন এসে শুয়ে রয়েছ,—আমি তো ও-ঘরেই ছিলাম, বুঝতেও পারি নি। আজ তো তোমার আসবার কথা নয়,—শনিবার যে বলে গেলে, আর শনিবার আসবে,—আজ তো সবে বুধবার!'

সুখেন কথা বলিতে চায় না—পঙ্কমীর মিষ্ট-মধুর সুরে নিজের মনের জ্বালা জুড়াইতে চায়।

'মা বোধ হয় টের পেয়েছেন; বললেন, 'ঘরের শেকল কে যেন খুললে—' আমি জানি, তুমি আসবে না; বললাম—'কেউ না।' খানিকক্ষণ পরে ঘরের দরজা বন্ধ করবো,—চেয়ে দেখি এ-ঘরের দরজা খোলা, ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখি, তুমি—! তা এখন খাবে কি? আজ উপোস—বুঝলে? আজ উপোস—।' পঙ্কমী হাসিতে হাসিতে সুখেনের গায়ে গড়াইয়া পড়িল।

একটু পরে উঠিয়া বসিয়া বলিল, 'অন্ধকারে একা থাকবে না কি?—আলো নিয়ে আসি, ও-বাড়ীর দিদিদেরও ডেকে আনি—তোমরা কথাবার্তা বল, আমি রান্না-ঘরে যাই—'

'না, আজ আমার খাবার দরকার নেই—তুমি কাউকে ডেকো না!'

'তা হবে না, রাত-উপোসী থাকতে পাবে না—খেতেই হবে।'

'তা হলে ঘরে যা আছে তা-ই দিও—কিন্তু এখন নয়।'

'ঘরে? সে মুড়ি-মুড়কী, চিড়ে-নাড়ু—তুমি তাই খাবে না কি? জামাই-মানুষ তাই খাবে? ছি-ছি-ছি—লজ্জার কথা'—পঙ্কজী হাসিতে লাগিল।

পঙ্কজীর কথায় ও হাসিতে সুখেনের মন অনেকটা সহজ হইয়া আসিতেছে। এবার সুখেন একটু হাসিয়া বলিল, 'তা হলে উপোস করা ভিন্ন গতি কি?'

'না, এক কাজ করি—এই ঘরে লুচি ভাজব—আর বেগুন আলু। দুধ নেওয়া হয় নি আজ। তা নারকেলের সন্দেশ আছে—দাঁড়াও।'

'না পঙ্কজী, তুমি শোন।'

'পরে শুনছি',—বলিয়া পঙ্কজী ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে এক হাতে একটা লণ্ঠন ও আর এক হাতে একটা মাঝারি চাঙ্গারী আনিয়া ঘরের মেঝেতে রাখিল। তারপরে এক কলসী জল ও একটা ঘটী আনিয়া কলসীটা বারান্দায় রাখিয়া ঘটীটা ঘরে রাখিল। বলিল, 'মা দোর দিয়ে শুয়ে পড়লেন, আমি এই চাঙ্গারীতে সব এনেছি, আর যেতে হবে না—নারকেল-সন্দেশ দিয়ে এক গ্লাস জল খাও না? তার পরে লুচি ভাজব।'

চাঙ্গারীটার মধ্যে ছোট মাটির উনান ও কাঠের কুচা হইতে লুচির সমস্ত উপকরণ গুছান। দেখিয়া সুখেন বলিল, 'দুটি জিনিস ভুলে গেছ—মা ত' ঘরে দোর দিলেন, এখন উপায়?'

'কি ভুলে গেছি?'

'উনান জ্বালার দেশলাই কই?—লুচি-ভাজার খুন্তি কই?'

'ওঃ,—লণ্ঠনটা উঁচু করে কাগজ জ্বেলে নেব—আর ছুরি দিয়ে কত রান্না করা যায়—এ শুধু লুচি—দেশলাই বালিশের নীচে রেখেছিলাম একটা। ত্যাখ দেখি আছে কি না?

সুখেন দেখিয়া বলিল, 'আছে।'

পঙ্কজী রেকাবীতে দুটি বড় সন্দেশ তুলিয়া গ্লাসে জল ঢালিয়া সুখেনকে আনিয়া দিল। সুখেন বলিল, 'আরও দুটো—ওতে হবে না।'

খুশী হইয়া পঙ্কজী আর চারিটা সন্দেশ লইয়া আসিল। সুখেন বলিল, 'তুমিও খাও—'

এক সঙ্গে খাওয়া বহু দিন অভ্যাস নাই, সেই বিবাহের পর প্রথম প্রথম আচার-চাটনী, জল-খাবার এক সঙ্গে খাইত। একটু লজ্জিত ভাবে পঙ্কজী বলিল, 'আমি এখন না, তুমি আগে—আমি ক'বার খেয়েছি।'

সুখেন পঙ্কজীর হাত ধরিয়া কাছে বসাইয়া সন্দেশ ভাঙ্গিয়া তার মুখে দিল। দুই জনে মিলিয়া জলযোগ শেষ করিল। ডিবা খুলিয়া সুখেনকে পান দিতে দিতে পঙ্কজী বলিল, 'সরলার যাওয়া কবে ঠিক হল?'

সুখেন বলিল, 'দোসরা বৈশাখ।'

'তা হলে শনিবারে?—তাই তুমি বলেছিলে শনিবার আসবে? নিয়ে যাবে কে?'

'তার ভাই এসেছে—আলোটা না হয় বারান্দায় রেখে এসো পঙ্কজী! জোৎস্নাকে তাড়িয়ে দিলে একেবারে—'

'আমি লুচি ভাজবো যে—'

'না, এখন না—আগে কথাবার্ত্তা বলি, তার পর করবে।'

পঙ্কজী আলোটা কমাইয়া বারান্দায় রাখিয়া দিয়া আসিয়া বলিল, 'আচ্ছা তুমি আজ এমন ভার ভার কেন? মনে হচ্ছে যেন কি হয়েছে, বাড়ীতে সবাই ভাল আছেন ত?'

'ভালই—সবার ভাবনা ভাবছ। নিজের ভাবনা একটুও ভাবনা তুমি—না?'

'আমার আবার কিসের ভাবনা?' পঙ্কজী হাসিতে লাগিল।

'সত্যি—তোমাকে যে ঠকায়—কোন্ নরকে তার জায়গা হবে বলতে পার? তুমি জান না বোধ হয়, বুঝতেই পার না তোমার নিজের কথা—'

'এই কথা? কেন তুমি ওসব বল? আমি জানি—মা করেছেন—কিন্তু তাতেই বা কি? সরলা তোমার সংসার দেখছে—আর তোমায় বেশী করে পেয়েছি আমি—এখন আমার মনে হয় কি জান? ভগবান্ ভালর জন্যেই সব করেন—আমি তোমার সংসারে থাকলে চার দিকে ছড়িয়ে থাকতাম—সকলের উপর কর্ত্তব্য করতে হত।

আর, এখন শুধু তুমি ভিন্ন কেউ নেই—তুমি যদি পনের দিনও না আস—তাতেও কষ্ট পাব না—তোমার ভাবনায় থেকে দিন কোথা দিয়ে কেটে যায় বুঝতে পারি না।'

'তা তুমি বলতে পার। তবে শুনবে? দাদা তোমার নামের জমিটা বিক্রী করে টাকা নিয়ে আসছিলেন—আমি তাঁর কাছে থেকে নিলাম, কিন্তু সরলা কেড়ে নিলে।'

সুখেন কয়েক মিনিট চুপ করিয়া থাকিয়া ঘটনাটা বিবৃত করিল।

শুনিয়া পঞ্চমী বলিল, 'তোমারি অন্যায়। তাকে রাগান উচিত হয় নি—এ-অবস্থায় হঠাৎ বেশী রাগে ফিট হতে পারে—নিয়েছে নিক্ গে, টাকায় আমার কি দরকার? মা নগদ টাকাগুলোই তোমাদের দিয়েছিলেন, এখনও আমাদের অনেক জমি আছে—ওতে আমার আর মার যথেষ্ট হয়। দেখ না, আমরা কি খারাপ অবস্থায় থাকি? না না, তুমি আমার কথা নিয়ে কারো সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি কোরো না—ও আমার বড্ড খারাপ লাগে। আমি আর কিছু চাই নে—যদি তুমি এমনি করে মাঝে মাঝে আস—'

'তুমি যে কিছু চাও না, সেইত তোমার দোষ—কেন আমার রাশ টেনে রাখলে না তুমি, কেন আমায় ছেড়ে দিলে? আমি চিরকেলে গোঁয়ার—রাগ হলে পাগল হয়ে যাই, তুমি কেন সরলার মত হলে না, তা হলে তোমার আমার এ দশা হত না।'

পঞ্চমী একটু স্নিগ্ধ হাসিল—'তুমি ও সব কথা বলো না। দশা! যে যা চায় ভগবান্ তাকে তা দেন—সরলা সংসার চায়, আমি তোমায় চাই, তা পেয়েছি। আচ্ছা, তুমি যে বলেছিলে সরলা রওনা হয়ে গেলেই তুমি এখানে চলে আসবে—তা আজই এলে যে? সরলা রাগ করবে আরও বেশী, একেবারে এ-ছুটো দিন পরে এলেই ত বেশ হত?'

'তাই ভেবেছিলাম—ভেবেছিলাম আর অশান্তি বাড়াব না, কিন্তু রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি—তুমি একা পথে দাঁড়িয়ে রয়েছ, যেন আমাকে খুঁজছ, মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল, থাকতে পারলাম না—'

পঞ্চমী সুখে গর্বে উৎফুল্লিত হইয়া বলিল—'এই দেখলে? স্বপ্নেও আমাকেই দেখ—তবে আর সরলা রাগ করবে না কেন? আচ্ছা, সরলা ত ছ'মাসের উপর বাপের বাড়ী থাকবে, তখন রোজ আসবে?'

'আসতে পারি না পঞ্চমী—অনেকটা পথ হেঁটে আসতে হয়, সারাদিনের পরিশ্রমের পর অতটা হাঁটতে এক একদিন কষ্ট হয়। বর্ষায় নৌকা ভাসলে আমি বিকালেই চলে আসব।'

—'তা সত্যি—আমি নিজের কথাই ভাবি, তোমার সুখ-দুঃখের কথা ভাবি না—কম পথ ত নয়। আচ্ছা, এ ছ'মাস তুমি না-ই এলে—আষাঢ় মাসে এসো—সপ্তায় একটা করে চিঠি দিও, তা হলেই হবে।'

'আমি তোমার জন্যে আসি না পঞ্চমী—আমি নিজের জন্যে আসি। সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রম করি—সন্ধ্যা হতেই তোমার এই ঘরটির কথা মনে হয়, তখন মনে হয় ছুটে তোমার কাছে আসি—তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে কি না জানি না, তোমার কাছে দু'দণ্ড বসলে মনের জালা নিভে যায়। কিন্তু, কোন লাভ নেই—কোন লাভ নেই—আবার সেই কারখানায় ঢুকলেই মিস্ত্রী হয়ে পড়ি, এ আমার নিয়তি—কঠোর নিয়তি, আমার অনুতাপ করবারও অধিকার নেই - এত মহাপাপ আমি করেছি।'

নিঃশব্দে পঞ্চমী সুখেনের পিঠে মাথা রাখিল। স্বামী মনে কষ্ট পাইতেছেন, ইহা সে বুঝিতে পারে, কিন্তু এত কষ্ট কেন, তাহা তাহার বুদ্ধির অগম্য। পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদ না করিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে সুখেন একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সোজা হইয়া শুইল, বলিল, 'সুন্দর ফুলের গন্ধ—কি ফুল? যেন চেনা চেনা, অথচ ধরতে পারা যায় না।'

উৎসাহিত হইয়া পঞ্চমী বলিল, 'জানালায় ঠিক গোড়ায় গোলাপের চারা বুনেছিলাম—যত্ন জানি নে কি না—কেমন লম্বা লিকলিকে গাছ হয়েছে, কিন্তু ফুল ফোটে দিন তিন চারটে। তুমি আসবে রাত্রির বেলা, দেখবে কি করে? আর, শিউলি ফুলও দু'চারটে করে রোজ কোটে, আনবো?—'

পঞ্চমী উঠিল। জ্যোৎস্না জানালা হইতে সরিয়া গিয়াছে, কিন্তু বাহিরে চারিদিক্ জ্যোৎস্নায় প্লাবিত। চাঁদ

মাথার উপরে উঠিয়াছে—রাত্রি কত ঠিক নাই, কিন্তু চতুর্দ্দিকের নিস্তব্ধ গভীর ভাব ও শব্দশূন্যতায় মনে হয় অনেক রাত্রি।

কতকগুলি শিউলি ফুল অঞ্জলিতে লইয়া পঞ্চমী ঘরে আসিল, বলিল, 'রাত ঝাঁ ঝাঁ করছে—দোরে খিল দিই।'

ঘরে অস্পষ্ট আঁধার। আলোটা পঞ্চমী ঘরে আনিয়া দরজা বন্ধ করিল। বিছানায় আসিয়া ফুলগুলি সুখেনের বালিশে ছড়াইয়া দিতে দিতে বলিল, 'দেখ কি সুন্দর মিষ্টি গন্ধ, কিন্তু হাতে করে দেখতে গেলে ফুল যেন গলে যায়—এত নরম, যেন ছোঁয়া সইতে পারে না—'

—'তোমার মতন' বলিয়া ফেলিয়া সুখেন ভাবিল, আমার কঠোর স্পর্শে তুমিও মিলিয়ে যেতে যেতে এমনি সুগন্ধ ছড়াচ্ছ।

পঞ্চমীর খোঁপায় সেই ফুলগুলি একটি একটি করিয়া গুঁজিয়া দিতে দিতে সুখেন বলিল, 'ঠিক কালো আকাশে তারার মত দেখাচ্ছে।'

পঞ্চমী বলিল, 'তা কি হয়···আকাশের মত অত বড় আমার খোঁপাটা না কি? আকাশে ত চাঁদের আলোয় কালো নেই?'

'অমাবস্যার আকাশ,—আচ্ছা, উপমা পছন্দ হল না? তবে, মনে হচ্ছে যেন রূপোর ফুল পরেছ খোঁপায়—'

'হ্যাঁ এবার হয়েছে, পান খাবে? অনেকক্ষণ খাও নি?'

উভয়ে ডিবা খুলিয়া পান খাইতে খাইতে হাসি-গল্পে যেন ডুবিয়া গেল—গত জীবন, বর্ত্তমান জীবন, ভবিষ্যৎ জীবন তাহাদের আলোচনায় যেন জীবন্ত হইয়া জাগিয়া উঠিল। কত সুখের ছবি, আশার ছবি মুহুর্মুহু আঁকিয়া নিজেরাই মুগ্ধ হইয়া গেল। বাতাস ক্রমশঃ শীতল হইতে হইতে ঈষৎ শৈত্যের ভাব ধরিল। শেষে পশ্চিম আকাশের ঢলিয়া-পড়া চাঁদের উজ্জ্বল জ্যোৎস্না আবার ও-দিকের জানালা দিয়া ঘরে আসিয়া পড়িল। আরও খানিকক্ষণ পরে নিদ্রিত সুখেনের ও সুখেনের বাহুতে মাথা রাখিয়া সুপ্ত পঞ্চমীর সারা গায়ে ও মুখে জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িল। পঞ্চমীর সাজানো ঝুড়ি তেমনিই পড়িয়া রহিল, লুচি-ভাজা আর হইল না।

[২২]

'ভেসে গেল সেই স্রোতে সপত্নী সিন্দুরিয়া—'

পরশমণি ঘুম ভাঙ্গিয়া বারান্দায় বসিয়া অলস ভাবে তামাক-পোড়ার গুড়া দাঁতে দিতে দিতে রান্না-ঘরের দিকে বক্র কটাক্ষ করিতেছেন—বাঁশতলার দিক্ হইতে কড়ি-খেলার শব্দ ও হাসির আওয়াজ আসিতেছে—'এই যে দুই বুড়ো ঢেঁকি দিন-রাত মানে না—চব্বিশ ঘণ্টা কড়ি খেলতে বসে, ইহাতে লক্ষ্মী ছাড়েন কি না—বলুক দেখি কেউ—'

ছোট বৌয়ের আসিবার কথা আছে এ জন্ম পরশমণির মন চঞ্চল, বেলা প্রায় ডুবু-ডুবু এখনও যখন আসিল না, তবে আজ বোধ হয় না আসিতেও পারে।

রাখাল ছেলেটি ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল—'ছোট্ ঠাক্‌রোণ আস্‌তেছেন—'

পরশমণি উঠি-প'ড়ি করিয়া বাহিরে ছুটিয়া আসিলেন, ছোট-বৌ ততক্ষণ ছেলেকে মণির কোলে দিয়া নৌকা হইতে নামিয়া আঙ্গিনায় উঠিল, শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

ছেলেটিকে লইয়া কাড়াকাড়ি বাধিয়া গেল! সুন্দর ছেলেটি—গায়ের রং মায়েরই মত—দিব্য নধর-গঠন। চেহারাটি ঠিক সুখেনের—নাক, চোখ, কপাল ভ্রূ—সব মিলিয়া যায়। এর কোল হইতে ওর কোলে শিশুটি হাসি-মুখে ফিরিতে লাগিল—সেও যেন আমোদ পাইয়াছে, কান্না-কাটি নাই বেশ হাসি-খুসী

পরশমণি একবার পশ্চিম আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিয়া আর থাকিতে না পারিয়া ডাকাডাকি বাধাইয়া দিলেন—দত্ত-বাড়ীর রাখাল তাদের ডিঙ্গীখানা লইয়া আসিল—নাতিটিকে লইয়া তাহাতে চড়িয়া বসিয়া পরশমণি বকিতে বকিতে চলিলেন—'মুখপোড়া রাখাল কোন দিক্ দিয়ে যে টপ্ করে বেরিয়ে পড়লো ডিঙ্গীখান নিয়ে, টেরও পেলাম না—ছোট-বৌয়ের নৌকায় মাঝিরা উত্তর-পাড়ায় কুটুম-বাড়ী গেল নৌকা নিয়ে—নইলে সেইটায় আস্‌তে পারিতাম—বিষ্ণুও নৌকা নিয়ে গেছে হাটে—সারাটা দিন-মান বাড়ীতে আটকা পড়ে রহি—

বর্ষার দিন তাই না ? নইলে শরণ দিয়ে দু' বার করে রাঘবপুর যেতে আসতে পারে।'

রান্নাঘরের পাশে দাঁড়াইয়া সরলা ডাকিল,'দিদি—কই তোমরা ?'

'কে রে ?'—দুই যায়ে আসিয়া দেখিয়া অত্যন্ত খুশী। 'কখন এলি ? এত দেরী হল কেন' - বলিতে বলিতে দুই জনে দুই হাত ধরিয়া বারান্দায় সরলাকে পিঁড়ি পাতিয়া বসাইল, সরলা বলিল, 'থাক্ থাক্ আমায় আর তোমাদের পিঁড়ি দিতে হবে না—বড় মা না কি ?'

'আচ্ছা আজকের দিনটা তো বোস্— এর পর দু' বেলা ত তুই-ই আমাদের পিঁড়ি পেতে দিবি—ও বেলা এলি নে কেন ?'

'মা দিলেন না আসতে। মার ইচ্ছেই ছিল না এখন পাঠাবার—অঘ্রাণ মাসে পাঠাবেন বলছিলেন—তা সে সময় জল যায় শুকিয়ে—এতখানি পথ পাল্কীতে আসতে ভাল লাগে না, তাই আমিই জোর করে এলাম—আর তোমাদের না দেখে কদ্দিন থাকবো ?'

'আমাদের না দেখে, না ঠাকুরপোকে না দেখে—'

সরলা হাসিয়া বলিল, 'দুই-ই। উনি সেই খোকা হবার পর যে একবার গিয়ে দেখে এসেছিলেন—আর ত যান নি—'

বড়-বৌ, মেজ-বৌ দৃষ্টিবিনিময় করিল—সরলা তাহা দেখিয়া বলিল, 'চিলহাটি যেত বুঝি রোজ ? তা যাক্ না, কত যাবে—মা বলতেন ও সব নিয়ে গোলমাল করিস্ নি সন্নি—এই যে বাঁধন হলো এর বাঁধনে ধরা পড়তেই হবে, এ বাঁধন যার নেই, তার কোন ভরসা, কোন জোরই নেই, ও আনাগোনা দু'চার দিন—শেষে আর থাকে না।'

সরলা দিব্য মোটা-সোটা হইয়াছে, আগের চেয়েও স্বাস্থ্যটি যেন সম্পূর্ণ ও নিটোল। কথা-বার্ত্তা ও ধরণ-ধারণে যেন একটু গৃহিণীজনোচিত ভারি ভারি গর্ব্বিত ভাব। মেঝ-বৌ বলিল, 'আর দুটো মাস থেকে এলে আরও শরীর ভাল হত।'

বড়-বৌ বলিল, 'মায়ের যত্নের শরীর দেখলেই বোঝা যায়।'

'মাকে খোকার অন্ন-প্রাশনে আনবে না, বড়-দি ? সবাই কিন্তু আশা করে রয়েছে—'

বড়-বৌ বলিল, 'আসবেন বই কি—তাঁর নাতি, তিনি আসবেন না ?'

সরলা বলিল, 'তোমাদের খুব কষ্ট হত, না দিদি ? সব কাজ নিজেদের করতে হত—মার ঘরে কে রাঁধতো ? বড়-দি ত নয়ই—মেজ-দি বুঝি ?'

বড়-বৌ বলিল, 'মা বাড়ীতে খেয়েছেন না কি ? ছেলেরা পালেরা রোজ বলে যেত—রায়-বাড়ীর পিসিমার ঘরেও অনেক দিন খেয়েছেন, মাঝে মাঝে দু'একদিন বাড়ীতে নিজেই রেঁধে খেয়েছেন। মেজ-বৌকে ঘরেই যেতে দিতেন না—বলেন, 'ও সব নিয়ে থুয়ে মেয়েকে খাইয়ে দেবে।'

সরলা বলিল, 'দেখ দেখি কথা, কার না রাগ হয় ? যতই বল, মার কি যে ধরণ—মণিকে ভালবাসেন, বেলু-টাকে দেখতে পারেন না—অদ্ভুত ! নিজে রেঁধে খেতে যা ওঁর কষ্ট, তবু জিদে পড়ে তাই করেছেন। আচ্ছা, তোমাদের চিলহাটির সুন্দরী ভাল আছেন ত ?'

মেজ-বৌ একটু হাসিয়া বলিল, 'আমরা কি করে জানব বল, আমরা কি চিলহাটি গেছি না কি ?'

'যিনি গেছেন তাঁর কাছে শোন নি ?'

'সে কবে কোথায় যায় না যায়, আমরা খোঁজও রাখি নি, এবার তুই এয়েছিস্, তুই রাখিস্—'

অবজ্ঞার সহিত সরলা বলিল, 'আমি কেন—যার রাখবার সে-ই রাখবে।'

রাত্রিতে সরলা শয়নঘরে আসিয়া দেখিল, তখনও সুখেন আসে নাই। সন্ধ্যায় মশারি ফেলিয়া খোকাকে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া গিয়াছে—আলো বাড়াইয়া শিয়রে রাখিয়া সরলা বিছানায় প্রবেশ করিল, এলো-মেলো কাঁথা ক'খানি ভাঁজ করিয়া রাখিতে লাগিল।

একটু পরেই সুখেন দরজা বন্ধ করিয়া বিছানায় ঢুকিল। সরলা বলিল, 'আমি এসেছি বলে বুঝি এত দেরী করলে ?'

'তুমি এসেছ বলেই এত শীগ্গীর এলাম।'

'এই তোমার শীগ্গীর ? আমি না এলে কত রাত্রে আসতে ঘরে ?'

'তা একটা—দুটো—'

'এর কি ? এত রাত পর্য্যন্ত করতে কি ?'

সুখেন ঘুমন্ত ছেলেকে দেখিতে দেখিতে উত্তর দিল, 'রায়-বাড়ীতে তাস খেলতে বসি—'

সরলা চাপা হাসি হাসিয়া বলিল, 'অত করে দেখছ কি ? সারা বিকালটা দেখ নি না কি ? কথাবার্ত্তা কও না ? কি, মুখ নীচু করে রইলে ?'

'কৈ আর দেখেছি—কোলে কোলেই ছিল সব সময়—'

'তা চেয়ে দেখতে দোষ কি ? তা-ও দেখ নি ?'

সুখেন হাসিয়া বলিল, 'কেমন তোমার বুদ্ধি, দাদাদের কোল থেকে, মায় কোল থেকে আমি চেয়ে দেখতে পারি না কি ? লজ্জা হয় না ? আচ্ছা, জাগালে কি কাঁদবে ?' ছেলেটির হাত দু'খানি ধরিয়া সুখেন তুলিতেছিল, হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া আড়ামোড়া দিতে দিতে ছেলেটি কান্নার উপক্রম করিল—

সুখেন তাড়াতাড়ি ছাড়িয়া দিল। সরলা বলিল, 'নাও না নাও, ও কোল পেলে আর কাঁদে না, নিজের ছেলে চেয়ে দেখবে তা-ও তোমার লজ্জা ? লজ্জাবতী লতা ! মেজ বট্ঠাকুর সারাদিনই বেলুকে কোলে নিচ্ছেন বট্ঠাকুরের সামনেই, ওতে কি দোষ, না নেওয়াই অন্যায়।' দুই হাতে ছেলেটিকে তুলিয়া সরলা সুখেনের কোলে দিল, 'ওর বুঝি ইচ্ছে হয় না তোমার কোলে যেতে ?'

সুখেন ছেলেকে ভাল করিয়া দেখিতে দেখিতে বলিল, 'ও আমায় চিনেছে না কি, তাই ওর ইচ্ছা হবে ?'

'একদিনেই চিনবে না কি ? আমার মাকে এমন চিনেছিল, দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ত, আমার কোলেও থাকত না। দেখ, দেখ, তোমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে। কি নাণিক ? আর কোলে উঠেছ টের পাচ্ছ না ?'

দুইজনে ঝুঁকিয়া পড়িল। ছেলেটির চোখ একবার মায়ের মুখ ও একবার বাপের মুখের দিকে ফিরিতে লাগিল। সুখেন বলিল, 'তোমার মতন একটুও হয় নি—'

'না—তোমার মতন ঠিক—ছেলেকে মায়ের মতন হতে নেই, নাম-করা মানুষ হতে পারে না তা হলে। যত সব বড় বড় লোক, সব বাপের মত চেহারা, এও তাই হবে দেখো। বংশের ধারা উল্টে ফেলবে—একজন গণক সে-দিন দেখে বললেন, দেশের রাজার মত হবে—'

গৌরবে, আনন্দে সরলার মুখ জল-জল করিতে লাগিল। সুখেনও সন্তুষ্ট হইয়া ছেলের চিবুকে হাত দিয়া আদর করিতে লাগিল। বড়লোক না হইবে কেন ? লেখা-পড়াটা শেষ করিতে পারিলে সেও একজন বড়লোক হইত, ঐ রায়-বাড়ীর কর্ত্তাদের মত। তাহার অসম্পূর্ণতা হয়ত ভগবান্ এই শিশুকে দিয়াই সম্পূর্ণ করিয়া দিবেন।

সুখেন বলিল, 'অন্নপ্রাশন দিতে হবে অঘ্রাণে, দাদা আজই পাঁজি দেখছিলেন—কি নাম হবে ঠিক করেছ ?—তুমি এমন বিদুষী ?'

'আমি বিদুষী ? তোমাদের বাড়ী এসে বই ছুঁয়েছি কোনদিন ?'

'সেই তো তোমার বাহাদুরী। সবাই বলে, সরলা ভাল লেখা-পড়া জানে, কিন্তু কোনদিন বই হাতে করে না, আর মেজ-বৌ জানেন না কিছু, তবু ঘরে বই আঁটে না—দুপুরে পড়া-ই চাই। আমিও দেখি, প্রায়ই মেজ-বৌ তোমার কাছ থেকে মানে বুঝিয়ে নিয়ে যান।'

সরলা হাসিমুখে বলিল, 'লোকের স্বভাব নিন্দা করা—মেজদির চেয়ে আমি বড় বেশী পণ্ডিত নই, মেজদি বর্ণ-পরিচয়ের পর পাঁচ খানা বই পড়েছে, আমি পড়েছি ন খানা, নিম্ন প্রাইমারী পরীক্ষা দিয়েছিলাম, পাশও করে-ছিলাম—ওখানে মেয়েদের স্কুলের ঐ পর্য্যন্তই পড়া শেষ। মেজদির বাপের বাড়ীতে ইস্কুলই নেই, যা নিজেরা চেষ্টা করে শিখেছে।'

'কিন্তু, মেজ-বৌ বাড়ীতে স্কুল করবেন শুনেছ ?'

'কে বললে—জানিনে ত—'

'কাঞ্চনপুরের ছোট ছোট মেয়েরা অ-আ অবধি শিখতে পায় না—তাই উনি শেখাবেন। আমি ভাবছি, দাদা মাষ্টার, বৌদিও মাষ্টার হলে রান্না-বান্না করবে কে ? দাদাকেই বোধ হয় চাকরী ছেড়ে সংসারের কাজ করতে হবে—'

সরলা বলিল, 'তা যদি হয় তবে ভাল কথা, তুমি ঠাট্টা করছ কেন ? সত্যিই এত বড় গাঁ-টায় একটা মেয়েদের ইস্কুল নেই। মাষ্টার তো পাওয়া যায় না যে বাড়ীতে

শেখাবে। এক রায়-বাড়ীরা যদি ইচ্ছে করতেন ত এত দিনে ছুটো ইস্কুল হতে পারত, তা তাঁদের মেয়েরা সব বিদেশে লেখা-পড়া শেখে, কাজেই গরজ নেই। মেজদির শরীর ভাল নয়—এ কাজটা যদি করে, দু' চারটে পয়সা-কড়িও হাতে হয়—সময়টাও কাটে ভাল; মেজদির যেটুকু বিদ্যা, গাঁয়ের মেয়েদের পক্ষে ওই ঢের। পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের পাড়াগাঁয়েই বিয়ে হয়, বড়দি, আমি আমরা দুজন কাজ দেখব, মেজদি ঐ করুক। আচ্ছা কাল আমি শুনব সব মেজদির কাছে—'

'তা হলে তোমাদের ইস্কুলে তুমিই হেড-মিষ্ট্রেস হবে ?'

'না-না, ওসব আমার পোষাবে না। আমি কাজ-কর্ম্ম করে সময় পেলে ত ? এই দেখ না, এই ক'মাস ছিলাম না, মা বাড়ীতেই খান নি। তবে অবসর মত আমি মেজদিকে সাহায্য করতে পারব। চিঠি-পত্রটা লেখা, রামায়ণ-মহাভারত পড়া, কি ধান-চালের হিসাবটা রাখা, এই হলেই ঢের হবে। মেজদির একটা উপায়ও চাই যে—বড়দির ছেলে পিলে নেই, যা আছে যথেষ্ট। মেজদির কি ?'

'কেন বাপের সম্পত্তির যে অংশ পাবেন সেটা বুঝি তুচ্ছ হল ?'

'সে ঐ শুনতেই, বড় বোন, ছোট বোন সব ক'টি ছেলে-পিলে নিয়ে বাপের বাড়ী থাকে, এতগুলো লোক খেয়ে-পরে শেষে কি এমন থাকবে ? মেজ বটুঠাকুরের সংসারী বুদ্ধি মোটেই নেই—বেশ হেসে-খেলে দিন কাটাচ্ছেন, কিন্তু মেজদির ভাবনা ধরেছে—'

'মেজ-বৌ লোকটা মন্দ নয়—কিন্তু বড়-বৌ ভারি চালাক, খুব ধূর্ত্ত, না ?'

'ছি-ছি, ও কি কথা ? সব চেয়ে বড়দি ভাল। মেজ-দিও খুবই ভাল। তোমায় তাঁরা এত মেনে চলেন, এত যত্ন করেন, তবু এ সব বলছ কেন ? মার ধারা পেয়েছ বুঝি ?'

'চোখে যা দেখি তাই বলি, বড়-বৌ আজকাল বড় ফিট-ফাট, বড় সেজে গুজে থাকেন, দাদাও মিনিটে মিনিটে ডাক দিচ্ছেন, একটু বেশী রকম বাড়া-বাড়ি, তা থাকগে, আসল কথাই চাপা পড়ে গেল, এর নাম হবে কি, বললে না ?—'

একবার ছেলের দিকে চাহিয়া বাঁকা চাহনীতে সুখেনকে দেখিয়া লইয়া দর্পিত মন্দ হাসির সঙ্গে সরলা বলিল, 'মা ভানু বলে ডাকতেন, ডাক-নাম তাই থাক্, আর ভাল নাম তোমার নামের সঙ্গে মিলিয়ে সুরেন্ থাকবে ?'

'তা বেশ হবে,—ভানু, এই ভানু, তুমি ঘুমোলে না কি ? ও, তুমি যে ভানু, উঠবে সেই ভোরে কেমন না ? আচ্ছা লক্ষী ছেলে, তুমি ঘুমোও—একে শুইয়ে দাও সরলা। দিয়ে তুমিও শোও, রাত্রি বড় কম হয় নি—'

সরলা আস্তে আস্তে সুখেনের কোল হইতে ছেলেকে তুলিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল—সুখেন চাহিয়া দেখিতে দেখিতে বলিল, 'এর হাতে দুটি বালা হলে মানায় বেশ—'

আবার সরলার মুখে সেইরূপ হাসি ফুটিল, বলিল, 'অন্নপ্রাশনে দিতেই হবে, এখন আর কেন ?'

ছেলেটিকে দেখিয়া সুখেনের মায়া ধরিয়া গিয়াছে। সরলার ভাবটিও বেশ শান্ত ও নিপুণা গৃহিণীর মত। ছেলে-পিলে কোলে করা সুখেন পছন্দ করিত না। মনি, বেনুকে কোনদিন কোলে করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু, এতটুকু ছেলেটিকে দেখিয়া মনটা বড়ই খুসী হইয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে ছেলের মা'টিকেও নূতন, অভিনব লাগিতেছে। সরলার কথাগুলিও এবার বেশ সুমিষ্ট—দীর্ঘদিন পরে দেখা হইলে এই রকমই হয়। অন্যমনে সুখেন্ ভাবিতেছে—মেজ-বৌ যদি পাঠশালা করেই, তবে ভানুকে সেখানে পড়ান হইবে না—মেয়েমানুষের কাছে হাতে-খড়ি হইলে জন্মের মত বিদ্যার দফা নিকাশ হইবে; কাজের মধ্যে সময় করিয়া লইয়া সে নিজেই পড়াইবে। কিন্তু, ভানুটা বড় ছোট; তিন বছরের আগে অ-আ বুঝিতেই পারিবে না। সরলা বেশ বুদ্ধিমতী, বিদ্যাও আছে, সে-ই ভানুকে অক্ষর-পরিচয় করাইবে। তারপরে হাতে-খড়ি হইবে সুখেনের কাছে।

ভাবিতে ভাবিতে সুখেন্ বলিল, 'মতি কর্ম্মকারকে সকালবেলা ডেকে আনব—গলায় একটা হারও দিতে হবে, নইলে ভাল দেখাবে না।'

'তুমি সেই ভাবছ না কি ? এইটুকু ছেলের ভাবনাতেই সেই থেকে ডুবে রইলে ? এখনও তো অনেক দেরী—' সরলা আবার হাসিল।

'সেটী আর কই ? যে মতি কর্ম্মকার—ছ'মাসে একটা জিনিষ দেয় না ; শেষে কাজের সময় পাওয়া যাবে না।'

'হ্যাঁ গো, এত ভাবনা কারও জন্য কোন দিন ভাব নি তো, এখন ত্যাখ,—নিজের ছেলে আর পরের ছেলের কত তফাৎ। তা এখুনি তো নয় - সে সকাল বেলায় হবে এখন। একটিতেই এই।—আর দু'একটি হলে না জানি কি করবে। দেখ, আগে বট্‌ঠাকুররা কি বলেন, মা কি বলেন—আগেই নিজে ছেলের গয়না গড়াতে দিলে লোকে নিন্দে করবে না ?' তেমনি করিয়া অর্থপূর্ণ বাঁকা হাসি হাসিয়া নরলা একখানা পাতলা ছোট কাঁথার ভাঁজ খুলিয়া ছেলের গায়ে দিতেছিল,—সুখেন টানিয়া লইয়া বলিল, 'দাও, আমি দিয়ে দিচ্ছি।'

স্বামী, স্ত্রী, সন্তান—এর মধ্যে অপরের স্থান কোথায় ? পঙ্কজী এখন কি করিতেছে কে জানে। আজ সুখেনের যাইবার কথা নাই, আজ আর অপেক্ষায় বসিয়া থাকিবে না—এতক্ষণ মায়ের কাছে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

[২৩]

'কেহ বা ফুটিল, কলিকা কেহ—'

বাঁশ-ঝাড়ের তলায় গোটা তিন-চার মাদুর ও পাটী বিছাইয়া পনের-ষোলটি মেয়ে বসিয়াছে, তার মধ্যে তিন বৎসরের হইতে চৌদ্দ বৎসরের মেয়ে আছে। বেশীর ভাগ মেয়েদের হাতেই বর্ণ-পরিচয়, কারও হাতে দ্বিতীয় ভাগ। একদিকে মেজ-বৌ বসিয়া কাঁথা সেলাই করিতে করিতে পড়া বলিয়া দিতেছে।

তাদের মজলিসে একদিন কথাটা উঠিয়াছিল, শ্যামলের ধারণা, মেজ-বৌএর মত লেখাপড়া কম মেয়েই জানে। সে প্রস্তাব করিল, একটা স্কুল করিলে মেজ-বৌ পড়াইতে পারে। কাঞ্চনপুরের একটু অবস্থাপন্ন যাঁরা তাঁদের পরিবারের অনেকেই বিদেশে, যাঁরা বাড়ীতে থাকেন, তাঁদের ছেলে-মেয়েরাও থাকে বিদেশে। কাজেই গ্রামের স্কুল, পাঠশালা সম্বন্ধে উদাসীন। অথচ, কাঞ্চনপুরে যাঁরা সপরিবারে স্থায়ী অধিবাসী, তাঁদের ছেলেদের জন্য পাঠশালা এম.ই. স্কুল, হাই-স্কুল আছে যদিও, কিন্তু মেয়েরা নিরুপায়। বাপ-মায়েরাও সংসারের কাজকর্ম্ম সারিয়া মেয়েদের লেখা-পড়া শিখাইবেন, কিন্তু সে অবসর দুর্লভ।

শ্যামলের কথায় সমবয়সীদের মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়া উঠিল। একজন প্রকাশ্যেই নানা রকম ঠাট্টা আরম্ভ করিয়াছিল। কেহ বলিল, 'শ্যামল, এবার তুমি হাড়িশালে ঢুকবে কিন্তু, সেই 'সাবাস আটাশ' থিয়েটারের মত—'

আর একজন বলিল, 'না 'সাবাস আটাশ' নয়, 'তাজ্জব ব্যাপার' সেই মৃণালিনী মিত্র হাইকোর্টের উকিল—'

'সে সাবাস আটাশে।'

'না, তাজ্জব ব্যাপারে, নিজেরা কতবার প্লে করলাম সব ভুলে গেলে এরই মধ্যে ? খুব মেমারী তো ?'

হার-জিত বাজি রাখা হইল, কিন্তু বইখানা খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, কে পড়িতে লইয়াছে, এখনও ফিরাইয়া দেয় নাই।

সেজো রায় কিন্তু প্রস্তাবটিকে সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিলেন, সব গোলমাল থামাইয়া দিয়া সকলকে বুঝাইয়া, পঞ্জিকা খুলিয়া দিন দেখিয়া পাঠশালা খুলিবার দিন ও সময় ঠিক করিয়া বিষয়টাকে পাকা করিয়া ফেলিলেন। সকল বাড়ীর মেয়েরাই আসিবে, তাহাও সভায় সকলে স্বীকার করিল।

তারপরে একজন বলিল, 'স্কুল-ঘর, বেঞ্চ, টেবিল, চেয়ার।'

সেজ রায় বলিলেন, 'সে সব বাড়ী থেকেই কিছু কিছু যোগাড় হবে, এখন বাইরেই পড়া চলবে, বর্ষার আগে ঘর একখানা চাই, সে শ্যামল বৌমার সঙ্গে পরামর্শ করে যেমন সুবিধা মনে করবে, তেমনি ভাবে ঘর উঠবে। চাঁদার খাতা একটা করে ফেল, অক্ষয় আর তুমিই পাঠশালাটির ভার নেবে—'

অক্ষয় পরিহাস করিয়াই চেয়ার-টেবিলের কথা উল্লেখ করিয়াছিল, এক্ষণে নব পাঠশালাটির অধ্যক্ষপদে উন্নীত হইয়াই বিদ্রূপ ভুলিয়া গিয়া মনে মনে সোল্লাসে কার্য্য-পদ্ধতি স্থির করিতে লাগিল।

শ্যামল গৌরবে স্ফীত হইয়া ঘরে ফিরিল। কিন্তু, মেজ-বৌ লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, 'এ তুমি করলে কি ?

ছি ছি, আমি লেখা জানি নে, পড়া জানি নে, আমি কি পড়াব ? সবাই ঠাট্টা করবে না ?'

'কে ঠাট্টা করবে ? করুক দেখি, সেজ কাকাকে বলে দেব—'

'তা হলে ভাল করে লোক হাসানো হবে ; আমি পারব না।'

'সে কি মেজ-বৌ, আমার মুখ থাকবে কোথা ? তোমাকে পড়াতেই হবে, তুমি যখন চেয়ারে বসে পড়াবে, দেখে তাক লেগে যাবে সবার, শ্যামল যে-সে ঘরে বিয়ে করে নি—হ্যাঁ—'

অনেক বুঝাইয়া শ্যামল মেজ-বৌকে কতক রাজী করিল। শেষে মেজ-বৌকে আশ্বাস দিয়া কাজ আরম্ভ করাইয়া দিল, তবে চেয়ারে টেবিলে বসা একেবারেই বাতিল করা হইল। মেজ-বৌ বলিল, 'আমরা গেরস্তর বৌ, যে ভাবে সব সময় থাকি সেই ভাবেই পড়াব, শাশুড়ী, বড়-যা, পাড়ার কেউ এলেন, আমি চেয়ারে বসে থাকব না কি ? আর, বারে বারে কি উঠতেই পারা যায় ? ও সব নয়।'

নির্দ্দিষ্ট দিনে সেজ রায়ের ছোট মেয়ে কমলা সকলের আগে পড়িতে আসিল। সে এখানে মায়ের কাছেই আছে বিদেশে যায় নাই। সরলা আড়ালে থাকিয়া মেজ-বৌয়ের সাহায্য করিতে লাগিল, পাঠশালাটি প্রকৃত পক্ষে চালাইতে লাগিল সে-ই—কিন্তু ঘুণাক্ষরে কেহই টের পাইল না। নিরক্ষর মেয়েদের, অক্ষর-পরিচিতা মেয়েদের ও প্রথম দ্বিতীয় ভাগ-পড়া মেয়েদের শ্রেণী-বিভাগ করিয়া প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী, তৃতীয় শ্রেণী ইত্যাদি ঠিক করিয়া পাঠশালার প্রণালী এমন সুন্দর ভাবে তৈরী করিয়া দিল যে, মেজ-বৌয়ের ভয়-ডর দূরে গিয়া একটা নূতন আনন্দ ও উৎসাহ আসিল।

পরশমণি মনের দুঃখে সেজ রায়ের বড় বোনের কাছে পা ছড়াইয়া বসিয়া বলিতেছিলেন, 'ঠাকুরঝি, আমার কপালে কত কি যে আছে, বড়ের বৌ মাষ্টার হল—এ লজ্জা আমি সইবো কি করে ? আর বাড়ী যাব না। বৌ-মাষ্টার আমায় বলবে, 'হটে যাও বুড়ি' তার চেয়ে তোমাদের এই বারান্দায় পড়ে থাকবো—ইচ্ছে হয় দুটো খেতে দিও, না হয় না দিও—বলি সেজ-ঠাকুরপোই ও কাণ্ডটা করলে—আমি কোলে করে বিশু-শ্যামুর সঙ্গে মানুষ করেছি ওকে, ও কি না এই কাজ করলে—আমার মুখে চূণ-কালি লেপে দিলে—'

ঠাকুরঝি বাইরের কথাবার্ত্তায় বড় কাণ দেন না—কোথায় কি হইতেছে, না হইতেছে সে খোঁজও রাখেন না, ভাই, ভাই-পো, ভাই-ঝিদের লইয়া গোলমালে দিন কাটান। অবাক্ হইয়া বলিলেন, 'সে কি বউ ? মাষ্টার কিসের ?'

সেজ-বৌ বুঝাইয়া বলিল। শুনিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'তাই না কি ? তাই কমলা খেয়ে উঠেই বেণী ঝুলিয়ে তোমাদের বাড়ী যায় ? আমি দুপুর বেলা দেখে আসব ত কেমন ইস্কুল হয়েছে। বলি, সেজ-বৌ ছেলেটার কান্না শুনতে পাচ্ছ না, মা ? ঘুম ভেঙ্গে সেই থেকে মা-মা করে কাঁদছে—'

'এই তো উঠল ঠাকুরঝি—আর পারিনে ও ছেলের সঙ্গে, এক দণ্ড চোখ বুজেই উঠবে—কাঁদুক গে একটু—'

'তা বলবে বই কি—গল্প পেলে তোমাদের আর কাণ্ড-জ্ঞান থাকে না। যেমন তুমি, তেমনি মেজ-বৌ। এত কাল মেয়ের পাল পুষেছ—এবার সোনার চাঁদটুকু এসেছে, তা সইবে কেন ? ঐ পেত্নীর মতন ধাড়ী মেয়েটাকে ত দিনে দশবার করে কোলে বসাচ্ছ—তা তো কই আপত্তি করতে শুনিনে ?—'

ঠাকুরঝি অর্থাৎ কাঞ্চনপুরের পিসিমা দোক্তা তৈরী করিতে বসিয়াছিলেন। তাঁর হাতের মত সুস্বাদ দোক্তা কারও হাতে হয় না। সেজ-বৌয়ের উপর রাগ করিয়া সে সব ফেলিয়া রাখিয়া ভাইপোকে আনিতে উঠিয়া গেলেন।

সেজ বৌ বলিল, 'ছেলেটা হয়ে ঠাকুরঝির এক উপসর্গ হয়েছে দিদি, নাওয়ানো, খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো সব। কাঁথাগুলোতে দেখি ও-বেলা সাবান দিচ্ছেন, বুড়ো মানুষ হাঁপিয়ে গেছেন একবারে, তাড়াতাড়ি হাত থেকে কেড়ে নিই। রাত্রে শোবে ওঁর কাছে, পরশু দিন ওঁর অসু-

হলো, তোমার দেওর বললে, আজ খোকাকে তোমার কাছে রাখ, দিদিকে বিরক্ত করবে, ওমা সারা-রাত্তিরে ছেলের কি কান্না। উনিও জর নিয়ে উঠে পড়ে চেঁচাচ্ছেন, ও লেজ-বৌ, ও সেজ-বৌ,—শুনেছিলে বোধ হয়? বললেন, সারা রাত ঘুমোতে পারেন নি—দোর খুলে খোকাকে দিলাম, তবে শান্ত হলেন। তাই কি নিস্তার আছে? পেটে হাত দিয়ে বললেন, 'আহা, পেটটা পিঠের সঙ্গে এক হয়ে গেছে—সেজ-বৌ কেবল মেয়েদের ধরে ধরে সাতবার করে গেলাতে পারে। আবার দুধ গরম করে দিই, নিজে খাইয়ে দিলেন, তার পরে দু'জনে ঘুমোলেন, আমিও বাঁচলাম। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, রাত্তিরে আর খোকাকে আমার কাছে কোনদিন রাখবো না, তা উনি মরুন আর বাঁচুন।'

পিসিমার বাড়ী হইতে বাহির হওয়া এক পর্ব বিশেষ। এক পা করিয়া আগান—আর দু'পা পিছাইয়া সেজ-বৌকে ও বাড়ীর প্রত্যেককে একটা করিয়া উপদেশ দিয়া সাবধান করিয়া দেন। একবার ভাবিলেন, খোকাকে রাখিয়া যান, তৎক্ষণাৎ মনে হইল যে, সেজ-বৌ কাজ কি গল্প লইয়া এমন অজ্ঞান হইবে যে, ছেলেটা জলে গেল কি জঙ্গলে গেল খোঁজও করিবে না।

যা হউক, সকলকে উপদেশ-আদেশ দিয়া চারিদিক্ চাহিয়া দেখিতে দেখিতে সবে বাহিরের উঠানে পা দিয়াছেন, সেই সময় সেই সাত মেয়ের পরের প্রথম ও একমাত্র ছেলেটি, যে এতক্ষণ নিশ্চিন্ত মনে বৈঠকখানার ফরাসের উপর বসিয়া দোয়াতের কালি ঢালিয়া ঢালিয়া সাদা চাদরটি চিত্রিত করিতেছিল, পিসিমাকে দেখিতে পাইয়া ফরাস হইতে নামিয়া পড়িল এবং ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া পিসিমাকে ধরিয়া ফেলিল। সেজ রায় উপবিষ্ট হইয়া চশমা-চোখে সুখেনের ছেলের অন্ন-প্রাশন উৎসবের ফর্দ্দ করিতেছেন, দোয়াতে কলম ডুবাইতে গিয়া ব্যাপার দেখিয়া চক্ষু-স্থির। 'পাজি ছেলে, আজ তোমায় না পিটে ছাড়‌ছি নে'—পাজি ছেলে তখন পিসিমার কোলে চড়িয়া বেড়াইতে চলিয়াছে, পিসিমা আঁচল দিয়া তাহার হাতের ও মুখের কালী মুছাইতে মুছাইতে বলিলেন, 'তোমাদের কাছে ছেলে দেওয়া আর বনে-জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া একই কথা। যদি দোয়াতে চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলত? ছেলে পিলের কাছে একটু সাবধান হয়ে থাকতে জান না।'

সেজ-রায় ছেলেকে শাসন করিতে আসিয়া শাসিত হইয়া ঘরে ফিরিয়া গেলেন।

কিন্তু, সে ছেলের সঙ্গে পিসিমা পারিবেন কেন? বয়স দু'বছর পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু দেখিয়া কে তাহা বলিবে? ফুটফুটে সাদা রং, অত্যন্ত বলিষ্ঠ গঠন, এই বয়সে হাতের কিল এমন কঠিন যে, একটা খাইলে অনেকক্ষণ মনে থাকে। সে পরম আনন্দে এদিক্ ওদিক্ ঝুঁকিতে ঝুঁকিতে, গরু, বাছুর, কুকুর, বিড়াল যা সামনে পড়িতেছে তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে চলিয়াছে, আর তার তাল সামলাইতে গিয়া এক একবার পিসিমা ধরাশায়িনী হইতে হইতে বাঁচিয়া যাইতেছেন।

পথটুকু সামান্য, কিন্তু বাধা পদে পদে। রায়-বাড়ী ছাড়াইতে না ছাড়াইতে দেখা হইল সোনা সেখের সঙ্গে, সে বৃহৎ খাঁচাটার পোষা কোঁড়া পাখীটি হাতে ঝুলাইয়া লইয়া চলিয়াছে, পিসিমাকে দেখিয়া হাসিয়া দাঁড়াইল, 'পিসিমা, কোথায় যাও?—আজ যে বড় বাড়ীর বাইরে পা দিলে?'

কোথায় যাইতেছেন, দুর্দ্দান্ত ছেলের পাল্লায় পড়িয়া পিসিমা ভুলিয়া গিয়াছেন। একেবারে কোঁড়া পাখীটার দিকে হেলিয়া পড়িয়া সহর্ষে হাত দুলাইতেছে, 'দে-দে মা অ-মা দে—'

'হুঁ, মা দেবে, বাপরে বাপ, কি দুষ্টু! বাবা সোনা তুই তোর খাঁচাটা তুলে উঁচু করে ধর না একটু, পারি না কোলে রাখতে—'

সোনা সেখ খাঁচাটা উচু করিয়া ধরিয়া বলিল, 'নামিয়ে দ্যান না। পিসিমা, হাত ধরে নিয়ে যান, ও ছেলে কোলে নিয়ে পথ হাঁটা কি তোমার কাজ?—কোথায় যাবেন বলুন, আমি পৌঁছে দিয়ে যাই, এস খোকা বাবু আমার কোলে—'

খোকা বাবু পাখী দেখিতে রাজি, কিন্তু অপর কারও কোলে যাইতে নারাজ। সে সোজা হইয়া একান্ত মনো-যোগের সঙ্গে কোঁড়াটার সবটাই নিরীক্ষণ করিতে করিতে মাথা নাড়িয়া অমত জানাইল।

'ও ভয় যার কাছে যায় না, তা তোমার কাছে যাবে। দিয়েছে এক আমাকে, যা সমস্ত দিন কাজ নিয়েই আছে, ছেলের কথা একবারও মনে করে না। আমি ফেলতে পারিনে, মায়া হয় তো। তা তুমি যাচ্ছ কোথা? যাও—'

'বাড়ী যাচ্ছি পিসিমা—'

পিসিমা কয়েক পা আগাইয়া গিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, 'শোন, তোমার দুধ হয় কতখানি?'

'সের তিনেক হত, এখন আড়াই সের হয়—'

'রোজ করেছ, না বাজারে বেচ?'

'শশী রায়ের বাড়ী এক সের রোজ দিই, আর দেড় সের বাজারে বেচি—'

'তবে আমাকে এক সের করে দিও কাল সকাল থেকে। বাড়ীতে এত দুধ হয়—রোজই রাত্তিরে সন্তুর দুধ কম পড়ে। রাত্তিরে কম খেলে কি এইটুকুন ছেলে বাঁচে? দেখ দেখি, কেমন রোগা হয়ে যাচ্ছে। আগেও তোমরা দেখেছ, ছেলেদের হয়ে থাকলে তবে আমরা দুধ খেয়েছি—আর বৌদের হাতে গিন্নীপনা, বড়রা খেয়ে বাঁচলে তবে ছোট ছেলেরা পাবে। বড়রা সারা দিনই সাত রকম খাবার খাচ্ছে, এরা ত তা নয়? আমার দুবেলা দুধ লাগে না, তবু সেজ-বৌ মাথার দিব্যি দিয়ে এঁটো থালার সঙ্গে দুধের বাটিটা ঠেকিয়ে দেবেই। রাগে মনে হয়, দুধ তার মাথায় ঢেলে দি—'

সোনা সেখ সন্তুর রোগা রোগা ভাব দেখিয়া অনেক কষ্টে হাসি চাপিয়া ছিল, এবার উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, 'তা আপনি ধরে পিটিয়ে দিলেও সেজ-ঠাক্‌রুণ কথাটি কবে না।'

'ঐ তো দোষ, ওতেই সেরেছে—ও সেজ মেজ সব সমান। দশটা কথা বললাম, দশটা সে বললে—যুক্তি-বুদ্ধি বোঝা যায়, তা নয়, আমি যতই বলি—যেন কে কাকে বলছে; আসল কথা কি জান? ঐ কাল-পেঁচী মেয়েদের মানুষ করে করে মনটাও ঐ রকম ছোট হয়ে গিয়েছে, নইলে এই সোনার চাঁদের হতশ্রদ্ধা করে? তুমি কাল সকাল সকাল দুধ পাঠিয়ে দিও—আমার নিজের টাকায় রোজ করব। এতে আর কারুর হাত দেবার ক্ষমতা হবে না, বাও—বাছিলে বাড়ী—দাঁড় করিয়ে রেখেছি।'

সোনা সেখের গতিপথে সন্তু চাহিতে লাগিল। পিছন দিকে ঝুঁকিয়া-পড়া ছেলের ভারে পিসীমা মন্থরগামিনী হইয়া সুখেনদের সদরে পা দিলেন।

সুখেন ও বিশাল হাত পনের লম্বা একটা পাটের দড়ি পাক দিয়া শক্ত করিতেছিল, পিসীমাকে দেখিয়া দুইজনেই দড়িটা দুই ঘরের বারান্দার খুঁটির সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়া কাছে আসিল। এ দিকে সুখেনদের হালের দুটি প্রকাণ্ড কায় সাদা বলদ খড়-ভুষি খাইতেছে, সন্তু তাহা দেখিল, তখন সে আর এক পা পিসীমাকে নড়িতে দিল না, কোল হইতে নামিয়া পড়িতে চায়।

পিসীমার সাধ্য কি সন্তুকে রাখেন, সে তাঁহার হাত ছাড়াইয়া দৌড় দিল—'সর্ব্বনাশ করলে' বলিয়া পিসীমা ছুটিলেন। সুখেন টপ করিয়া সন্তুকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলদের কাছে গেল।

পিসীমা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বসিয়া পড়িলেন। বিশাল বলিল, 'বাড়ীর মধ্যে চলুন—এই এখানে মাটীতে কেন বসলেন?'

'না, এই বেশ বসেছি, বাড়ীতে কি সারাদিনই পাটীতে বসে থাকি?'

'না, ও অপবাদ শত্রুতেও আপনাকে দেবে না। ভোর চারটে থেকে রাত নটা অবধি এক ভাবে চলে, এখন একটু বিশ্রাম করা দরকার—শরীর ভেঙ্গে পড়ছে দিন দিন।'

পিসীমা পরম সুখী হইলেন। বলিলেন, 'জান বাবা, জন্মে অবধি বাপের বাড়ী সার করেছি, ন বছরে একবার সেই শ্বশুর-বাড়ী গিয়েছিলাম দিন দশেকের মতন, তার পরে আর না। বৌরা যতই করুক, আমার মতন মায়া হবে কেন?—তবু সেজ-বৌ আজ কাল আমায় নড়তে দেয় না—হাত থেকে বঁটি কেড়ে নেয়—জলের গেলাস কেড়ে নেয়—কেউ কিছু চাইলেও দিতে দেবে না। বলে, ওরা নিজেরা নিক, না হয় আমাদের বলুক—আপনাকে ফরমাস করবে কেন? কেন যে করে তা আমি বুঝি, ওরা যে জন্মে অবধি আমাকেই দেখছে—আমায় বলবে না কাকে বলবে? বড় কাজ না হয় পারি না, তা বলে জল টল খেতে দেওয়া, তরকারী কোটা—এ সব পারব না কেন? চিরকেলে অভ্যাস, যাত মরবে শেষে—তা ওরা বুঝবে না। সেজ-

বৌয়ের চেয়ে মেজ-বৌ আরও বাড়া—সে এলে এক পা নড়তে দেয় না।'

'তা পিসীমা, এখন আর খাটুনী না খাটাই ভাল। শরীরটা দেখুন। সেদিন অসুখের কথা শুনলাম, একবার দেখে আসব—সময়ই পেলাম না। আজ আমাদের ভাগ্যি যে এসেছেন। বছরে একবার দু'বারের বেশী ত আপনাকে বাড়ীর বার হতে দেখি নি,—তাও এই পাড়ায়।'

'সময় পাই নে, নইলে ত সবই লাগানো বাড়ী। ঠাণ্ডা এবার বেশী পড়বে, না বিশু? এখনি কেমন শীত, বাতাসে যেন কাঁপুনি ধরে'—বলিতে বলিতে পিসীমা উঠিলেন। 'ও সুখেন, দে ওকে—যাই আজ। এমনি ওর শরীরটা ভাল নেই, তায় ঠাণ্ডা বাতাসে অসুখ না করে।'

সুখেন বলিল, 'চলুন, আমি দিয়ে আসি।'

'না, আমিই নিয়ে যাই, তোদের কাজে বাধা দিলাম, তোরা কাজ কর।' বলিয়া সুখেনের কাছ হইতে সন্তুকে লইয়া ঠাণ্ডা বাঁচাইবার জন্য নিজের কাপড়ের আঁচলে তাহাকে বেশ করিয়া ঢাকিয়া ঢুকিয়া বাড়ীর দিকে চলিলেন। তখনো বেলা আছে; কিন্তু স্কুল দেখিবার কথা একেবারেই তাঁহার মনে ছিল না।

[ক্রমশঃ

জহর ব্রত

—শ্রীবিমলকান্তি সমদ্দার

অশ্বপৃষ্ঠে যুদ্ধের দূত ক্লান্ত দেহ
জানাইল আসি রাজপুত বীর নাহিক কেহ,
একা শুধু সে-ই এসেছে ফিরিয়া খবর দিতে,
এখনি শত্রু আসিবে এ পুরী আক্রমিতে।

শুনিয়া সে-কথা সবারে ডাকিয়া-কহিল রাণী,
—"মরণের ভয় করে না কখন রাজপুতানী,
হে পুরবাসিনি, আছ যারা সব সাজাও চিতা,
বীর-নারী সবে মরণেও রবে অপরাজিতা।

সাজারে কাষ্ঠ, কলসে কলসে ঢালিয়া ঘৃত
সকলে মিলিয়া লাগাল আগুন অবিচলিত,
উন্নত করি' সহস্র বাহু অগ্নিশিখা—
লিখিল মৌনী আকাশের ভালে ধ্বংসলিখা,—

পিঠে দোলে বেণী, নয়নে দীপ্তি,—কুণ্ড ঘিরে
ব্রত-পরায়ণা হাজার রমণী ফিরিছে ধীরে।
অগ্নি-শিখার অন্তর হতে তাদের সবে—
কে দিয়েছে ডাক ধ্বংস যজ্ঞ-মহোৎসবে,

ঝাঁপায়ে পড়িল শঙ্কাহরণ তাহার কোলে,
বরণ বাদ্য বাজিল কোথায় প্রলয়-রোলে
তারপরে যাহা, কে পারিবে তাহা বর্ণিবারে
হাজার কুসুম হ'ল পরিণত ভস্মসারে—

নিবিল অগ্নি, শীতল পৃথ্বী, বিজন পুরী।
ভাঙিয়া তোরণ ঢুকিল শত্রু রাজ্যারে তুরী।
দমকা হাওয়ায় উড়িল ভস্ম গগন ঘিরে,'
দাঁড়ায়ে রহিল বিজয়ী শত্রু আনত শিরে।

পাবনা-পরিচিতি

—শ্রীশচীন্দ্রমোহন সরকার

পাবনা জেলার মসজিদ ও মন্দির

বাঙ্গালার রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে পাবনা ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট। একদিন পাবনা জেলার রাজা দেবীদাস 'বার ভুঁইয়া'দের সঙ্গে তাঁহার রাজধানী 'ছাতকে' স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার কল্পনা করিয়াছিলেন; রাজা দেবীদাসের রাজকুলবধূগণ জহরব্রত করিয়া নিজেদের ধর্ম্মরক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এমনই বহু ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনা এই দেশকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। অতীত যুগের রাজন্যবর্গ পাবনার বুকে বহু চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। আজিও বহু মন্দির, মসজিদ অতীত ইতিহাসের গৌরবময় দিনের চিহ্ন বুকে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কোনটি বা ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে, কোনটি বা বর্ত্তমান রাজন্যবর্গের প্রচেষ্টায় ধ্বংসের পথ হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছে। এই সমস্ত মন্দির-মসজিদের ইতিহাস যেমন শিক্ষাপ্রদ তেমনই করুণ। এমনই কয়েকটি মসজিদ ও মন্দিরের কথা আমরা বলিব।

মক্‌দুম সাহেবের মসজিদ

পাবনা জেলার সাহাজাদপুর গ্রামে বর্ত্তমানে ঠিক নদীর ধারে একটি অতি প্রাচীন মসজিদ আছে। এই মসজিদটির গঠন-প্রণালী সাধারণ মসজিদের অনুরূপ নহে। ইহা ক্ষুদ্র ইষ্টক-নির্ম্মিত ও উপরে ১৫টি গম্বুজ-বিশিষ্ট। কিন্তু, এই মসজিদটি ২৮টি প্রস্তরস্তম্ভের উপর অবস্থিত এবং তাহার মধ্যে একটি স্তম্ভ ভিন্ন অন্যগুলি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং বহু কারুকার্য্যখচিত। অন্য স্তম্ভটির প্রস্তর লোহিত বর্ণ। প্রবাদ আছে, এই লোহিতবর্ণ প্রস্তর-স্তম্ভ স্পর্শ করিলে বন্ধ্যা নারীর সন্তান হয়, তাই বহু হিন্দু-মুসলমান নরনারী এই মসজিদ দর্শন ও স্পর্শ করিতে বহু দূর দেশ হইতে আসিয়া থাকেন। এই মসজিদের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি সমাধি দৃষ্ট হয়, ইহা মসজিদ-নির্ম্মাণকর্ত্তা মকদুম সাহেবের। প্রবাদ আছে, এখানে যাহা মানত করা যায়, তাহাই সফল হয়। এজন্য হিন্দু-মুসলমান সকলেই এখানে মানত করেন এবং এই মসজিদটিকে বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন।

অপর একটি দেওয়াল-গাত্রে এই মকদুম সাহেবের একটি হস্তের মাপ খোদিত আছে। এই অনুসারে পাবনা জেলার ইউসুফসাহী পরগণার মাপ প্রচলিত ছিল, পরে জমিদারগণ ছোট মাপ প্রচলন করিয়াছিলেন। *

মকদুম সাহেবের সমাধির পার্শ্বে তাঁহার ভাগিনেয় খেজমুর সাহেবের সমাধি বিদ্যমান আছে।

প্রতি বৎসর বাসন্তী অষ্টমী তিথিতে মসজিদ-প্রাঙ্গণে একটি মেলা বসিয়া থাকে। এই মেলার সময়ে একটি বৃহৎ শিলাখণ্ড সকলে তুলিয়া বুকে স্পর্শ করিয়া থাকে। সকলেই এই পবিত্র শিলাখণ্ড বুকে স্পর্শ করিতে চেষ্টা করায় শিলা লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায় এবং ধস্তাধস্তি আরম্ভ হয়। আমি একবার শিলাটিকে লইয়া প্রায় তিন চার শত মুসলমান ভক্তদের কাড়াকাড়ি করিয়া বুকে স্পর্শ করিতে দেখিয়াছিলাম।

শুধু তাই নয়, ঐ স্থানের স্থানীয় বড় বড় জমিদারগণ কোন উৎসব উপলক্ষে সর্ব্বপ্রথমে ঐ মকদুম সাহেবের দরগায় "সিন্নি" দিয়া তবে কোন শুভ কার্য্য আরম্ভ করেন। এখনও সকল জমিদার ও স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান ভদ্রলোকগণ এই প্রথা মানিয়া আসিতেছেন।

এখন দেখা যাক এই মক্‌দুম সাহেব কে এবং কোন সময়ের লোক ছিলেন।

বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত-লেখক লিখিয়াছেন, "লক্ষ্মণ সেনের সময়ে মক্‌দুম (মকদম) শাহ জালালউদ্দিন তাব্রেজী

* Most of the revenue-free mahals situated in Serajganj are small. Many of them are reported to be connected with the history of one Makdum Shahib whose cubit was the unit of measurement in the Pargana Yusup Shahi, until the Zaminders introduce short measures.

[Hunter's Statistical Account of Bengal Bogra & Pabna, Vol X, p. 316.]

গৌড়ে আগমন করেন। তিনি এক জন সাধু পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সৌজন্যে হিন্দুগণ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা-সম্বন্ধীয় নানা গল্প 'সেখ শুভদয়া' গ্রন্থে বিবৃত আছে। লক্ষ্মণ সেন তাঁহাকে আন্তরিক স্নেহ করিতেন এবং তাঁহার প্রতিপালনার্থ বহু ভূ-সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। এই সকল সম্পত্তি 'বাইশ হাজারি' নামে পরিচিত।" (বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত, ২৯৪ পৃষ্ঠা)

পাবনা জেলার পোতাদিয়া-নিবাসী ভবানীনাথ রায় মহাশয়-লিখিত 'হিন্দু বিজ্ঞান-সূত্র' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "মকদুম সাহেব পারস্যদেশীয় জনৈক সামান্য নরপতি। মুসলমান রাজত্বকালে তিনি বহু ধন-সম্পত্তি ও আত্মীয়-স্বজন সহ ভারতে আগমন করেন। এদেশে আসার পর তিনি সর্ব্বদা ফকিরের ন্যায় কালাতিপাত করিতেন। কালক্রমে বঙ্গের তদানীন্তন রাজধানী গৌড় নগরে উপস্থিত হন। তথায় পোতাদিয়া-নিবাসী ভুগু নন্দীর পুত্র মাধবের বংশধরগণের সহিত তাঁহার ভাগিনেয় খেজমুর সাহেবের পরিচয় হয়। উক্ত খেজমুর সাহেব সময় সময় দুর্গোৎসব উপলক্ষে পোতাদিয়া গ্রামে নৌকা বাহিয়া দেখিতে আসিতেন। ঐ গ্রামের সৌন্দর্য্য-দর্শনে প্রীত হইয়া কালে তথায় বাস করিবার অভিপ্রায়ে তিনি মাতুলের অনুমতি-ক্রমে পোতাদিয়া গ্রামে যে দীঘি খনন করেন, তাহা অদ্যাপি 'খোয়াজ দীঘি' নামে পরিচিত।

কালক্রমে মকদুম সাহেবও মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার উপলক্ষে এতদ্দেশে আগমন করতঃ এতদঞ্চলে স্থায়ী হন এবং উক্ত সাহাজাদা মকদুম সাহেব স্বীয় নামানুসারে সাহাজাদপুর গ্রাম স্থাপন-পূর্ব্বক তথায় বর্ত্তমান মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। (হিন্দুবিজ্ঞানসূত্র, ফাল্গুন, ৫ম সংখ্যা ১৩০৪ সাল, ৪১৫ পৃষ্ঠা)

মৌলবী আবদুল ওয়ালী সাহেব তাঁহার 'Antiquities and traditions of Shahazadpur' পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, ইমান সহরের অধিবাসী সাহাজাদা মকদুম সাহেব পিতার আদেশক্রমে ইসলাম ধর্ম্ম-প্রচারার্থ তদীয় ভাগিনেয়, ভগিনী ও বহু আত্মীয়বর্গকে লইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করেন। ক্রমে তাঁহারা সাহাজাদপুরের দুই মাইল দূরে পোতাদিয়া গ্রামে উপস্থিত হন। তথায় তাঁহাদের পোত অবরুদ্ধ হয়। এক দিন তাঁহারা পোত হইতে যে বোখারা-দেশীয় পারাবত উড়াইয়া দিলেন তাহার পায়ে মৃত্তিকা দেখিয়া তাঁহারা সেই দিকে পোত লইয়া চলিতে থাকেন। ক্রমে তাঁহারা সেই ভূমিতে অবতরণ করেন। তাহার স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ মকদুম সাহেব তথায় একটি মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন।

প্রবাদ, কালক্রমে হিন্দু রাজাদের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ হয়, এবং তিনি ও তদীয় ভাগিনেয়গণ নিহত হন। তাঁহার ভগিনী অপমানিত হইবার ভয়ে যে স্থানে জলাশয়ে ঝম্প প্রদান করেন তাহা আজিও 'সতীবিবির খাল' নামে পরিচিত। মকদুম সাহেবের অনুচরবর্গের মস্তক একত্র করতঃ যে স্থানে সমাধি দেওয়া হয় তাহাকে অদ্যাপি 'শিরকবর' নামে অভিহিত করা হয়।

জোড় বাঙ্গালার মন্দির

পাবনা সহরের কালাচাঁদ পাড়ায় 'জোড় বাঙ্গালা'-নামীয় একটি প্রাচীন দেব-মন্দির আছে। দুইটি "বাঙ্গালা ঘর" একত্র করিলে যাহা হয় এই মন্দিরটি তাহাই। ইহার প্রত্যেকটি মন্দিরের উপরিভাগ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি; মন্দিরটি ছোট ছোট ইষ্টক-নির্ম্মিত এবং মন্দিরগাত্রে লোহিত বর্ণ ইষ্টকের উপর নানা কারুকার্য্যখচিত এবং হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত। ইহার কারুকার্য্য ও নির্ম্মাণ-কৌশল অপূর্ব্ব। এই মন্দিরটি ক্রমে মৃত্তিকাগর্ভে চলিয়া যাইতেছে। ইহার উচ্চতা ২২ হাত ও দৈর্ঘ্য ১৬ হাত হইবে। ইহার উপর নানাবিধ বৃক্ষ জন্মিয়াছিল, কিন্তু তাহা এক্ষণে পরিষ্কৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহা ৺গোপীনাথ বিগ্রহের পূজা-মন্দির রূপে ব্যবহৃত হইত।

এই মন্দির কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা নির্ম্মিত হয়, তাহা সঠিক জানা যায় না। স্থানীয় প্রবাদ, ইহা ব্রজবল্লভ রায় ক্রোড়ী (ক্রোড়পতি) নামক জনৈক কায়স্থ ভদ্রলোক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। নবাবী আমলে ক্রোড়ী একটি উপাধি ছিল। পাবনার অনতিদূরে হিমাইতপুর গ্রামের সংলগ্ন ছাতনি গ্রাম। উক্ত ছাতনি (ছাউনি) গ্রামে মোগল সেনাপতি মানসিংহ সেনা-নিবাস স্থাপন করেন। উক্ত ব্রজবল্লভ ক্রোড়ী উক্ত সেনা-নিবাসে রসদ সরবরাহ করিতেন। একটী কর্ম্মচারীর অনু-

পরিস্থিতির সুযোগ লইয়া তিনি বহু গুপ্ত ধন-রত্নাদি ছাতনি হইতে এই জোড় বাঙ্গালায় লইয়া আসেন এবং এই ধন-রত্নাদি আনিবার জন্ত পাবনা-পদ্মা নদী হইতে ইছামতী নদীর ধার পর্য্যন্ত একটি খাল খনন করিয়াছিলেন—তাহার নাম কোদাখালীর জোলা। এই খাল আমরা দেখিয়াছি, বর্ত্তমানে ইহা পদ্মা-গর্ভে। পরে নবাব সরকার এই ধন-রত্ন অপসারণ করার কথা জানিয়া তাঁহাকে বিশেষ শাস্তি দেন। এই জোড় বাঙ্গালার পার্শ্বে যে কাণা পুকুর আছে শুনা যায়, উহাও তাঁহার নির্ম্মিত। প্রবাদ, নবাব কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইলে তাঁহার ধন-রত্ন ঐ পুকুরের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন।

কপিলেশ্বর শিব-মন্দির

তাড়াশ গ্রামে কপিলেশ্বর শিবমন্দিরটি অতি প্রাচীন ও বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত। প্রাচীনকালের আদর্শে ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টক-নির্ম্মিত ও মন্দিরগাত্রে নানাবিধ দেবদেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। পুরীতে যেমন মন্দির-গাত্রে নানাবিধ নগ্ন চিত্র অঙ্কিত আছে, তেমনি এই মন্দিরগাত্রেও নানাবিধ নগ্ন চিত্র অঙ্কিত আছে। ইহাতে দুইটি খোদিত লিপি বর্ত্তমান আছে। তাহার একটি পাঠ করিলে বুঝা যায়—

"১৫৫৬ শকাব্দে (১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে) কৃতিমান্ নারায়ণ দেব মাতার স্বর্গারোহণ-সৌকর্য্যার্থে পৃথিবীতে সোপান-স্বরূপ অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব্ব এই মন্দির শম্ভুকে দান করিয়াছিলেন।" *

প্রবাদ আছে, একদা নারায়ণ দেব বঙ্গের রাজধানী ঢাকা গমনকালে একটি দুগ্ধবতী গাভীকে এইস্থানে দুগ্ধ ক্ষরণ করিয়া একটি স্থান সিক্ত করিতে দেখেন। পরে ঢাকা হইতে সফলকাম হইয়া ফিরিলে এই স্থানে শিবমূর্ত্তি-স্থলে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া নিজ বাসভবন ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়া নিজ বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন।

ইহা ভিন্ন পাবনা জেলার নানাস্থানে ছোটখাট অনেক মন্দির ও মস্‌জিদ বর্ত্তমান আছে। তাহার সকলগুলির বিবরণ দিলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া যাইবে।

কৃষি ও উৎপন্ন দ্রব্য

পাবনা জেলার জমি মৃত্তিকার প্রকৃতি-ভেদে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। চর জমি, বিলে জমি ও উচ্চ জমি বা বরিণ জমি। চর ও বিলে জমিতে দুইবার ফসল জন্মিয়া থাকে। সাধারণতঃ চৈত্র-বৈশাখ মাসে যে জমিতে ধান বা পাট বুনান হয়, ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে তাহা উঠিয়া গেলে তাহাতেই আবার মাসকলাই, মটর ও সরিষাদি বুনান হয়। কোন কোন স্থানে আউস ও আমন ধান একসঙ্গে বুনান হয়। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে আউস ধান কাটা হইয়া গেলে তবে আমন ধান অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে কাটা হয়। আর,উচ্চজমিতে শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে 'রোপা' ধান্তের আবাদ হয়।

এই জেলার নদীর ধারের বা বিলের ধারের জমি, যাহাতে পলিমাটী পড়ে, তাহার উর্ব্বরাশক্তি অধিক। পাবনা সদর হইতে সিরাজগঞ্জ অঞ্চলের জমি বেশী উর্ব্বরা।

এই জেলার কৃষকগণ সেই মামুলি ধরণের চাষ-আবাদ করিয়া আসিতেছে। চাষ-আবাদের সময় তাহারা কেবলমাত্র ভগবানের প্রেরিত বৃষ্টির জন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকে। যেবারে বৃষ্টি হইতে দেরী হয়, সেবারে জমি চাষ করিতেও দেরী হয় এবং ধান্ত বড় হইতে হইতেই বর্ষার জল আসিয়া সমস্ত ধান জলমগ্ন করিয়া ফেলে। সারা দেশে হাহাকার পড়িয়া যায়। অনেক অনেক পল্লীতে হয়ত সামান্ত সামান্ত বাঁধ দিলেই জলের প্রথম প্রকোপ হইতে ধান্তগুলি বাঁচিতে পারে, কিন্তু তাহার চেষ্টা ইহাদের আদৌ নাই। তবে, বর্ত্তমানে স্থানে স্থানে গ্রামবাসী একত্র হইয়া এমনি বাঁধ দিবার চেষ্টা দ্বারা নিজেদের আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছে, কাজেকাজেই ফলও ভালই হইতেছে।

---

* শাকে বাজিশরাঙ্গচন্দ্রগণিতে শ্রীরামদেবাৎ পরঃ।
শ্রীনারায়ণদেব এব সুকৃতিঃ স্বর্গে ত্রিলোকোত্তরঃ।
প্রাসাদং অতিদুষ্টরো গিরিশবৎ শম্ভো দদৌ শম্ভবে।
মাতুঃ স্বর্গসুখাধিরোহণকরণে সোপানমেকং ভুবি।
—ইতি ভক্তবস্তু শকাব্দাঃ ১৫৫৬, শ্রীগোপালো ধার্মিক।

এই জেলার কৃষকগণ সাধারণতঃ গোময় সাররূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। অন্য সার একপ্রকার ব্যবহারই করে না। তবে, স্থানে স্থানে আলু প্রভৃতির চাষে এক্ষণে অন্যান্য প্রকার সারের ব্যবহার প্রচলিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

এই জেলাতে ধান সর্ব্বপ্রধান উৎপন্ন দ্রব্য এবং ইহা এই জেলার সর্ব্বত্রই আবাদ হইয়া থাকে। তৎপরেই এই জেলাতে বর্ত্তমানে পাটের আবাদ হয়। এই পাটের আবাদ এদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বে এই দেশে কার্পাস-বস্ত্রের অধিক ব্যবহার ছিল, তজ্জন্য এই জেলাতে তুলার চাষও অধিক হইত। চট, বস্তা, থলিয়া বেশী ব্যবহৃত হওয়ায়, পাটের চাষ অধিক লাভজনক দেখিয়া কৃষকগণ অধিক পাট বুনিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু, পাটের চাষের মন্দা হওয়ায় আবার ক্রমে পাটের চাষ কমিয়া গিয়াছে। পাবনার সিরাজগঞ্জ মহকুমাতে উৎকৃষ্ট পাট ও বিঘা-প্রতি বেশী পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোন কোন জমিতে বিঘাপ্রতি ৯৴ মণ পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে। পাবনার পাটকে এতদঞ্চলে, কাঁকিয়া, বোম্বাই, দেশাল, লালিতা, তোষা ও বড় পাটা নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

এই জেলাতে কলাই, মুগ, মটর, বুট ও মসুরাদি রবি শস্য আবাদ হইয়া থাকে। তবে, মুগ ও কলাই সাধারণতঃ পদ্মা ও যমুনা নদীর চরে বুনান হয়। বিলে-জমিতে মুগ মোটেই জন্মে না। বিলে-জমিতে খেসারীই সাধারণতঃ জল সরিয়া গেলে বুনান হয় ও তাহার মূল্য কম হওয়ার জন্য তাহা গরু-মহিষের খাদ্যরূপে ব্যবহার করা হয়। এই জেলাতে স্থানে স্থানে অতি সুস্বাদু 'মটর' জন্মিয়া থাকে।

তৎপর এই জেলাতে সরিষা, রাই, মসিনা, তিল জন্মিয়া থাকে এবং ইহার পরেই ধনিয়া, কৃষ্ণ-জিরা, রাঁধুনী, পেঁয়াজ, রসুন, লঙ্কা, হলুদ প্রভৃতি মসলাজাতীয় শস্যও এই জেলার কৃষি-জাত উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে প্রধান।

পূর্ব্বে এই জেলাতে মোটেই আলুর চাষ হইত না। কিন্তু, বর্ত্তমানে কৃষি শিক্ষাবিভাগ হইতে স্থানে স্থানে আলু-চাষের উপকারিতা ও আলু-চাষও যে এই জেলার মাটীতে সম্ভব, তাহা হাতে-কলমে দেখাইয়া দেওয়ায়, বহু স্থানে আলুর চাষ হইতেছে ও কৃষকগণ লাভবান্ হইতেছে।

তাহার পর ইক্ষুর চাষ। এই জেলার কৃষকগণ-মধ্যে একটি ছড়া প্রচলিত আছে যে—

> হলুদ বোনে সাহাজাদা,
> কুশুর বোনে হারামজাদা।

অর্থাৎ, হলুদ বুনানি হইবার পর আর কোন পরিশ্রম নাই। কিন্তু, কুশুর (ইক্ষু) বুনিলে শেষ পর্য্যন্ত কেবলই পরিশ্রম করিতে হয়। পূর্ব্বে এই অঞ্চলে কেহ ইক্ষুর চাষ করিতে চাহিত না। কিন্তু, পাবনার "গোপালপুর সুগার মিল" ঈশ্বরদি ষ্টেশনের নিকট প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, ইক্ষুর চাহিদা বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে ও কৃষকগণ ইক্ষু বুনান একটা লাভজনক ব্যবসায় মনে করিতেছে। বর্ত্তমানে এই জেলাতে গুড়ের দর পূর্ব্ব হইতে দ্বিগুণেরও অধিক হইয়াছে। বর্ত্তমানে কৃষকগণ সেই পূর্ব্বের 'পলি' ও 'কাজলা' কুশুরই বোনে না। তাহারা কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গবর্নমেণ্ট-প্রতিষ্ঠিত কৃষি-কেন্দ্র হইতে নানা প্রকারের ইক্ষু-চাষ আরম্ভ করিয়াছে।

কৃষি-উৎপন্ন দ্রব্যমধ্যে পরিগণিত না হইলেও এই জেলাতে "খেজুরের গুড়" বিশেষ সুন্দর ভাবে প্রস্তুত করা হয়। ঢাকা অঞ্চলের বা যশোহরের খেজুরের গুড় হইতেও পাবনা সহরের প্রস্তুত খেজুরের গুড় সুস্বাদু ও পাবনা সহর হইতে বহু স্থানে এই গুড় প্রেরিত হয়। পাবনা জেলার "গাছি"রা (যাহারা খেজুর গাছ কাটে) গাছ কাটিবার প্রথম দিনের রসে যে জিরাণ রস প্রস্তুত করিয়া থাকে, তাহাতে এমন একটি উপাদেয় সুগন্ধ থাকে যে, তাহা বাঙ্গালা দেশের মধ্যে একটি সুখাদ্য।

শিল্প

পাবনা জেলা শিল্পের হিসাবে বঙ্গের অনেক জেলা অপেক্ষা উন্নত। পাবনার বস্ত্রশিল্প অতি পুরাকাল হইতেই প্রসিদ্ধ। যদিও ঢাকাই মসলিনের মত পাবনার তাঁতের কাপড় প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই, তবুও পাবনার তন্তুবায়দের

হস্ত-চালিত "তাঁতের কাপড়"—অন্যান্ত স্থানে পাবনার কাপড় নামে প্রসিদ্ধ ও আদৃত। পাবনার উপকণ্ঠে দোগাছী গ্রামের ও সিরাজগঞ্জ অঞ্চলের 'খুল' প্রভৃতি গ্রামের কাপড় বাঙ্গালা দেশে প্রসিদ্ধ। এই সকল স্থানে ৩০০।৪০০শত ঘর তন্তুবায় বাস করিত। কিন্তু, কালক্রমে কলের কাপড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এই বস্ত্র-শিল্পের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। তবে মনে হয়, পুনরায় যেন এই 'তাঁতের কাপড়' বনেদি ঘরের লোক ব্যবহার ও আদর করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

বর্ত্তমানে পাবনাতে একটি 'কাপড়ের কল' খুব সামান্য-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার নাম "খদ্দর কটন মিল" কলটি ক্রমেই উন্নতি লাভ করিতেছে।

আজ দুই বৎসর হইল পাবনাতে বৈদ্যুতিক আলো সরবরাহ হওয়াতে পাবনার 'গেঞ্জি' শিল্পের ক্রমেই প্রসার লাভ করিতেছে। পাবনাতে ৭।৮টি বড় গেঞ্জির কল প্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্ত্তমানে পাবনাতে আরও ত্রিশটি ছোট হোসিয়ারি কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক্ষণে পাবনার গেঞ্জি-শিল্প প্রায় গৃহশিল্পরূপে উন্নতিলাভ করিয়াছে। পাবনা গোপালপুর, কালাচাঁদ পাড়ার বহু মহিলা অবসরসময়ে হাতে গেঞ্জি বুনিবার কাজ করিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতেছেন।

পাবনাতে বর্ত্তমানে 'পাঁউরুটি' শিল্পের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। এক্ষণে কলিকাতার 'কারপো' কোম্পানীর অনুরূপ কলে প্রস্তুত 'পাঁউরুটি' ভদ্রসমাজে বিশেষ আদৃত হইতেছে এবং এই সব কোম্পানীতে অধুনা সর্ব্বপ্রকার কেক, রুটি প্রভৃতি তৈয়ারী হইতেছে।

পাবনাতে বর্ত্তমানে ভদ্রলোকও চর্ম্মব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন এবং তৈয়ারী চর্ম্ম ক্রয় করিয়া জুতা প্রস্তুত করিয়া বিশেষ লাভবান্ হইতেছেন। এক্ষণে আর এই শিল্প হেয় বলিয়া কেহ মনে করেন না।

ইহা ভিন্ন পাবনাতে নানারূপ শিল্প-প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত আছে, যেমন 'তৈল-শিল্প', 'মৃৎশিল্প', 'বেত্র-শিল্প', 'চর্ম্ম-শিল্প' ইত্যাদি।

পাবনা জিলার সিরাজগঞ্জ ও কাজীপাড়াতে এক সময়ে 'কাগজ শিল্পের' প্রতিষ্ঠান ছিল। হস্ত-নির্ম্মিত কাগজ তৈয়ারী হইত এবং এই কার্য্যের জন্য উক্ত কারিগরদের বাদশাহের প্রদত্ত জায়গীর ছিল। তখনকার আমলে নবাব-সরকারের কাগজ সরবরাহ করা তাহাদের কাজ ছিল। তাহারা উক্ত শিল্পের চর্চ্চা আজও পর্য্যন্ত করিয়া আসিতেছে, কিন্তু বর্ত্তমানে কলের কাগজ দামে বিশেষ সস্তা হওয়ায়, তাহাদের এই শিল্প-সাধনা অচল হইয়া উঠিয়াছে।

রং-করা

পাবনাতে বর্ত্তমানে শিল্প-উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রং করিবার কারখানা প্রতিষ্ঠিত আছে এবং সাহাজাদপুর হইতে সাধারণ সুতাতে মুগা কাপড়ের অনুরূপ এক প্রকার রং করা হইতেছে এবং সেই সুতায় প্রস্তুত পাঞ্জাবী, সার্ট, তৈয়ারী করার উপযুক্ত ছিট সভ্য সমাজে বিশেষ আদর পাইতেছে। বর্ত্তমানে সাহাজাদপুরকে বাঙ্গালার হস্তচালিত তাঁতের কেন্দ্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

লুপ্ত শিল্প

রেশম শিল্প – পাবনা জেলার হাণ্ডিয়াল নামক গ্রামের প্রসঙ্গে অবগত হওয়া যায় যে, একমাত্র এখানেই কোম্পানী আমলের সমস্ত হিন্দুস্থানের চারি-পঞ্চমাংশ রেশম আমদানী হইত এবং পাবনার অরণকোলার নিকটবর্ত্তী 'মুর্শিদপুর' নামক স্থানে রেশমের কুঠী ছিল। কিন্তু, কালপ্রভাবে এই শিল্প-প্রতিষ্ঠান পাবনা জেলা হইতে উঠিয়া গিয়াছে। এই রেশম-শিল্প কেন উঠিয়া গেল, সে বিষয়ে পাবনার শিল্প-বিভাগ হইতে অনুসন্ধান হওয়া বাঞ্ছনীয়।

নীল-শিল্প—পাবনা জেলাতে এক কালে এই নীল-শিল্প বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল এবং এই পাবনার অধীনে প্রায় ৮০টি নীলকুঠী ছিল। সকল কুঠীই এক্ষণে ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। পদ্মা, যমুনা, বড়লাদি নদীর তীরে এই নীলকুঠীগুলি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ক্রমে, সলবা অঞ্চলের জমিদারগণের সঙ্গে নীলকরদিগের সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং তাহা ক্রমে প্রবল আকার ধারণ করে। প্রজাগণ, মজুরগণ ও ভূম্যধিকারিগণ এই আন্দোলনে যোগদান করায় ফলে, নীলকুঠীর সাহেবগণ তাহাদের কার্য্য বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হন। পাবনার কোন নিরক্ষর গ্রাম্য কবি এই ঘটনা লইয়া মুখে মুখে কবি-গান করিয়া যাহা গাহিতেন, তাহা নিম্নে তুলিয়া দিলাম।

ভ্যামরা আছে হালু সরকার করতে দেয় না নীলের কারবার,
লাঠি ধরে ভ্যামরার পচারার।
জোয়ানবিবি সন্যাসী বগুড়া জেলা যার বাড়ী
গোঁসাইদের গুরুদেব হয়।
হাবকুমার মজুমদার, বিপিনের কারপরদাজ
নাটোরের মহারাজা বড়ই সুখী তার প্রজা,
মজনবিবির দেখে করে ভয়।
রত্নবিবি হুকুম দেয় কুঠী ভাঙ্গে ভ্যামরার রায়
কুঠী ভেঙ্গে ফেল্‌ল জলে। ইত্যাদি।

যে সমস্ত পল্লীর সুসন্তানগণ বর্ত্তমানে সহরবাসী হইয়াছেন, তাঁহারা যদি সহরে থাকিয়াও তাঁহাদের পুরাতন বাসভূমি পল্লী-জননীর দিকে সহানুভূতি ও ভক্তির চক্ষে তাকান, তবে এখনও হয় ত পল্লীর মুখে আবার হাসি ফুটিবে, পল্লী-জননী সুজলা, সুফলা হইয়া বিশ্বের আনন্দ বর্দ্ধন করিবে।

পল্লী-স্মৃতি

—শ্রীকরুণা চৌধুরী

আজি আমি হেথা বসি সুদূর প্রবাসে বহুদূরে
যাপি মোর সঙ্গিহীন, দীর্ঘ দিন জনাকীর্ণ পুরে।
ক্ষুধা-ব্যাধি-জরা-জীর্ণ মানুষের বেঁচে-থাকা শব
যন্ত্রের ইঙ্গিতে যেথা চলে, ফিরে তোলে, কলরব।

বিহগের কলকণ্ঠ, প্রভাতের অরুণ কিরণ,
জাগায় না হেথা মোরে বাহি' মোর পূর্ব্ব-বাতায়ন।
বসুন্ধরা সুপ্তা যবে রৌদ্রতপ্ত অলস দুপুরে,
বাজে না হেথায় গান বনতলে সমীর নূপুরে;
পত্রের মর্ম্মরধ্বনি, চাতকের বিলাপ-কূজন
নাহি আনে স্বপ্ন চোখে; দূর হ'তে আসে অনুখন
শকট-ঘর্ঘর রব, ক্লান্ত ডাক শ্রান্ত পসারীর—
শেষ করি বেচাকেনা গৃহ-পানে পথে চলে ধীর।

উন্মুক্ত অম্বরতলে পল্লীর শ্যামল বক্ষ মাঝে
পবন-হিল্লোলে যেথা নব কিশলয়ে বাঁশী বাজে,
আজন্ম কেটেছে যার কৈশোরের আনন্দলীলায়
আজি সে হয়েছে বন্দী অদৃষ্টের পাষাণ কারায়।
ভাল নাহি লাগে তাই নগরীর চঞ্চল গুঞ্জন,
মুখরিত রাজপথ, পল্লীর মঞ্জুল বেণুবন,
শেফালি-বিছান বাট, সদা যেথা স্নিগ্ধ শান্তি রাজে
প্রাণের মিলন সেথা প্রকৃতির শ্যাম শোভা মাঝে।

বিচিত্র জগৎ

নৌকায় ইউরোপের নদীপথে

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৩২ সাল। জানুয়ারী মাস।

আমি অনেক দিন থেকেই ভাবছিলাম, ইউরোপের নদী ও খাল-পথে নৌকাযোগে বেড়াতে বার হব। আমার উপযুক্ত নৌকাও ছিল। নৌকাটির জন্মস্থান হল্যাণ্ড, নাম 'হক্', চারজন লোকে নৌকাখানায় আরামে শুতে পারে, এ বাদে রান্নাঘর, স্নানের ঘর এবং একটা ভাঁড়ার ঘরও ছিল।

এক হাজার বর্গফুট পাল ছাড়া ছোট একটা মোটরও ছিল, যার শক্তিতে 'হক্' চলবে। আমার সঙ্গে নাবিক ও খালাসী হিসেবে ছিলেন কেবল আমার স্ত্রী, কাপ্তেন আমি স্বয়ং। আগষ্ট মাসে ফ্রান্সদেশের মধ্যে দিয়ে ঘুরে রাইন নদীতে পড়বার উদ্দেশ্যে সাদাম্‌টন থেকে রওনা হই।

আমরা ১৮ ঘণ্টা ধরে ইংলিশ প্রণালী পেরে হয়ে হাভর বন্দরে পৌঁছে গেলাম।

হাভর ফ্রান্সের খুব বড় বন্দর এবং সমুদ্রের ধারে—লিভারপুল বা ফিলাডেলফিয়ার মত নদীর ধারে নয়। বন্দরে ঢুকবার কিছু পরে আমরা বুঝে নিলাম, বজরাওয়ালারা আমাদের প্রকৃত বন্ধু। বন্দরে আমাদের দেখেই ওরা আমাদের ওদেরই একজন বলে ধরে নিল এবং সর্ব্বপ্রকারে আমাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত হল।

রুঁয়ে পর্যন্ত সমুদ্র থাকায় দরুণ হাভর বন্দরে আমাদের আইনের কড়াকড়ি সহ্য করতে হল না। এখানে নানাজাতীয় ছোট-বড় জাহাজের সমাবেশ। বড় বড় আটলান্টিক-গামী জাহাজ থেকে ছোট মাছ-ধরা নৌকা পর্য্যন্ত এই বন্দরে ভেড়ে।

একদিন সকালে আমরা বন্দর ছেড়ে রওনা হলাম। পথে পড়ল হিক্ অন্তরীপ ও ফ্রান্সের সর্ব্বাপেক্ষা বড় বাতি-ঘর। কত রকমের জাহাজ যে দেখলাম এই পথে! সুইডিশ্ কাঠ-বোঝাই জাহাজ, আমেরিকান তৈল-বোঝাই জাহাজ, নানা দেশের মালবাহী জাহাজ—কত রকমের পতাকা বিভিন্ন জাহাজে।

আর একটি ক্ষুদ্র বন্দর পড়ল পথে, হারফ্লিউর—একসময়ে এইটি ছিল নর্ম্মাণ্ডির বড় বন্দর। ইংলণ্ড তখন অর্দ্ধেক ফ্রান্স শাসন করত। রাজা পঞ্চম হেন্‌রির তৈরী একটা বড় টাওয়ার এখানে এখনও আছে, নাম সেন্ট মার্টিন্‌স্ টাওয়ার।



'পাঞ্চ অ্যাণ্ড জুডী' অভিনয়ের কাঁড়ে। অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মানীতে পাঞ্চের নাম ক্যাস্পার। অভিনয়ের শেষে প্রত্যেকটি বালক ভাঁড়পুতুলকে করমর্দ্দন জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করে।

এবার সমুদ্র পথ ছেড়ে দিলাম।

মাঠের মধ্যে দিয়ে টাঙ্কারভিল্ খাল এসে পড়ছে সমুদ্রে। এই খালের মধ্যে ঢুকে আমরা কিবিউ বলে একটা ছোট সহরের কাছে সিন্ নদীতে পড়লাম।

সিন্ নদীতে তখন জোয়ার লেগেছে। হু হু করে চলল আমাদের ক্ষুদ্র নৌকা। রাতে একটা গ্রামের ধারে

নঙ্গর ফেলে রইলাম এবং পরদিন প্রাতঃকালে কদোবে-এঁ-গো বলে একটা স্থানে পৌঁছে গেলাম। এরই নিকটে সেণ্ট ফিলিবার্টের তৈরী একটি পুরাতন আমলের মঠ আছে, এ অঞ্চলে সপ্তম শতাব্দীতে স্থাপিত এই প্রাচীন মঠ একটা প্রধান দ্রষ্টব্য বস্তু।

'হক্'কে নঙ্গর ফেলে আটকে রেখে আমরা পদব্রজে মঠ দেখতে গিয়েছিলাম, ফিরে এসে দেখি ইতিমধ্যে জোয়ারের তোড়ে আমাদের তিন ইঞ্চি মোটা কাছি ছিঁড়ে নৌকা গিয়ে পড়েছে মাঝ-দরিয়ায়। একটা নঙ্গর ভাগ্যক্রমে আপনা থেকে গড়িয়ে জলে পড়াতে নৌকাখানা দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।



নাবিকবেশে আমেরিকা-ভ্রমণকারী ভিয়েনার গায়ক বাগকদল।

পরদিন আমরা রুঁয়ে পৌঁছে গেলাম। রুঁয়ে সহর নর্মাণ্ডির প্রাচীন রাজধানী, যদিও বর্তমানে তার প্রাচীন গৌরব বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু রুঁয়ে বন্দর ফ্রান্সের মধ্যে খুব বড় বন্দর। আমরা দেখলাম, আমাদের মত ক্ষুদ্র নৌকার স্থান নেই সে বন্দরে। দু'দিন ধরে আমরা শান্তিতে নঙ্গর ফেলে থাকবার ঠাঁই পেলাম না, এখান থেকে ওখানে নঙ্গর ফেলি, আবার সেখানে তাড়া খেয়ে অন্যত্র যাই—এ অবস্থায় রুঁয়ে সহরের প্রাচীন স্থাপত্য-গৌরবের যা কিছু অবশিষ্ট আছে, তা দেখবার সময় পেলাম না। ফ্রান্সের ইতিহাসে এই সহর এক অতি গৌরবময় স্থান অধিকার করে আছে। এখানে কর্ণেই জন্মগ্রহণ করেন; মিসিসিপি নদী-ভ্রমণকারী লা সাল জন্মগ্রহণ করেন; বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ফ্লবেয়ার জন্মগ্রহণ করেন।

কিন্তু রুঁয়ে সহরের নাম যে জন্য জগতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে, তার কারণ, সেণ্ট জোয়ান অব আর্ক এখানে তাঁর পার্থিব লীলা শেষ করেন।

কিন্তু, কাষ্টম-বিভাগের কর্মচারীদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করব, না ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন করব? আমাদের পক্ষে এখানে বেশীক্ষণ অবস্থান করা ক্রমেই কষ্টকর হয়ে উঠতে লাগল। প্যারিসের দিকে যাত্রা সুরু করে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম অবশেষে।

সিন্ নদীতে নৌকাযোগে ভ্রমণ খুব শান্তিপূর্ণ নয়—অনবরত নানাশ্রেণীর নৌকা, বজরা, মাল-বোঝাই পোত চতুর্দ্দিকে যাতায়াত করছে। আমাদের মত ক্ষুদ্র নৌকার পক্ষে এ-পথে যাতায়াত করা রীতিমত বিপজ্জনক। নর্ম্মাণ্ডি প্রদেশের বেশীর ভাগ অন্তর্বাণিজ্য সিন্ নদী-পথে চলে। মাঝে মাঝে আমরা নদী ছেড়ে দিয়ে আশপাশের খালে ঢুকে পড়ছিলাম।

এই সব খাল শ্যামল পল্লী-প্রান্তরের মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে অনেক দূর চলে গিয়েছে। এখানে অত নৌকার ভিড় নেই নিভৃত পল্লীপথের মত শান্ত এই খালগুলি।

খালের ধারে কোথাও বড় বড় প্রাচীন আমলের প্রসিদ্ধ গ্রাম্য ভজনালয়, মঠ—এলবিউ পার হয়ে, লেজাঁদলি পার হয়ে, আমরা গেলাম বিশালকায়, উন্নত-শীর্ষ শাতো গেইলার দেখতে। দ্বাদশ শতাব্দীতে রিচার্ড দি লায়ন-হার্ট এই সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করেন, এখনও তার গৌরব বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয় নি।

আমরা ভার্ণন ছাড়ালাম—সাঁত জারমেন্ পৌঁছে নেপোলিয়নের সময়কার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মালমাইজোঁ প্রাসাদ পরিদর্শন করলাম।

এফেল্ টাওয়ার যদিও দূর থেকে দেখা যাচ্ছে, প্যারিস সহর এখনও অনেক দূরে। প্যারিসের যত নিকটবর্ত্তী হচ্ছি, নদীর দু'ধারের দৃশ্য অতি অবসাদজনক। শুধুই কারখানা, ধোঁয়াভরা আকাশ, বড় বড় ধূসর রঙের গরীব ভাড়াটিয়া থাকবার উদ্দেশ্যে তৈরী লম্বা ধরণের বাড়ী, তার বাইরে কোন শ্রী ছাঁদ নাই।

হঠাৎ আমরা বিখ্যাত বোয়া দ বুলোঁর সুরম্য সৌন্দর্য্যের মধ্যে পৌঁছে গিয়েছি, দেখলাম। এখান থেকেই প্যারিস্ সহর সুরু হল।

কোন হোটেলে আমরা উঠি নি, উঠব না ঠিক করেই রেখেছিলাম। সুদৃশ্য মিউজিয়মের ছায়ায় নদীতে নঙ্গর ফেলে তিনটী সপ্তাহ বড়ই আনন্দে যাপন করলাম।

আমি আমার স্ত্রীকে বললাম—এই দেখ, ইউরোপ দেখবার আসল প্রণালীটা হচ্ছে ঠিক এই। আমার স্ত্রীও আমার কথায় সায় দিলেন।

শীঘ্রই কিন্তু বিপদের মুখে পড়তে হল।

আমরা যাত্রা করবার মতলব করছি, এমন সময়ে বন্যা নামল সিন নদীতে—স্রোত এমন প্রবল হয়ে উঠল যে, উজান দিকে সে স্রোত ঠেলে যাওয়া অন্ততঃ এক সপ্তাহের মধ্যে অসম্ভব।

কয়েকদিন পরে রওনা হয়ে সামান্য কিছুদূর গেলাম। বিখ্যাত নোত্রদাম গির্জ্জার নীচে আমাদের ছোট নৌকাখানা দুধারের উঁচু তীরের মধ্যে স্রোতে পড়ে ডুবে যাবার মত হয়েছিল—একখানা পুলিশ বোট অবশেষে আমাদের উদ্ধার করলে। আমরা যেচে এই বিপদ্ বরণ করে তাদের হাঙ্গামায় ফেলেছি বলে বোটের পুলিশদের কি রাগ!

প্যারিস ছেড়ে কয়েক মাইল গিয়েই আমরা সিন্ নদী ছেড়ে দিয়ে মার্ণে নদী ধরলাম।

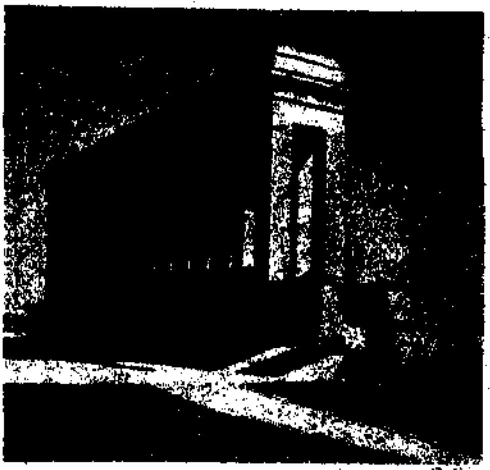
এ নদীতেও বন্যার তোড় খুব। শ্যাতো থিয়েরি পর্যান্ত আমাদের দুর্দ্দশা সমান ভাবেই রইল। এখানে গত মহাযুদ্ধে মৃত আমেরিকান সৈন্যদের উদ্দেশ্যে একটী সুন্দর স্মৃতিস্তম্ভ আছে। ১৯৩০ সালে ইউনাইটেড ষ্টেটস্ গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে এই সুবৃহৎ প্রাসাদোপম স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হয়, সামনের দিকে দুটী মূর্ত্তি, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাজ্য সৈনিকের বেশে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। আরও কিছুদূর গিয়ে আমরা মার্ণে-রাইন খালের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। এই ২৪০ মাইল লম্বা সুদীর্ঘ খাল আমাদের সারা ফ্রান্স দেশের বুকের উপর দিয়ে ভসগেস্ পর্ব্বতে উঠিয়ে ও-পারে রাইন নদীতে ছেড়ে দেবে।

যেখান থেকে মার্ণে-রাইন খালের সুরু, সেই ক্ষুদ্র ও দেশটিতে ফ্রান্সের বিখ্যাত শ্যাম্পেন মদ প্রস্তুত হয়। এপার্ণেনামক স্থানে একটা বড় শ্যাম্পেনের কারখানা দেখতে গেলাম। মাটির তলায় বড় বড় ঘরে মদের পিপে সজ্জিত করে রাখা হয়েছে।

বড় বড় সহরের রাস্তায় যেমন ট্রাফিকের ভিড়ে গাড়ী-ঘোড়া-চলাচল বন্ধ হয়ে যায় খানিক ক্ষণের জন্যে, এই সব বাণিজ্য-বহুল কর্ম্মব্যস্ত অঞ্চলে মার্ণে-রাইন খালের মত সংকীর্ণ খালেরও সেই দশা ঘটে।

শালোঁজ পৌঁছে দেখি, খাল নৌকোর ভিড়ে একদম বন্ধ। এখানটা একটা জংসন ষ্টেশনের মত, একটা শাখা এখান থেকে হল্যাণ্ড ও বেলজিয়মের দিকে গেল।

শালোঁজ পার হয়ে পল্লী-প্রান্তের দৃশ্য ক্রমে ভাল হতে লাগল। বা-লে-ডুক্ ছাড়িয়ে দুই তীরে শান্ত পল্লীগ্রাম, বেশী ভিড়, গোলমাল নেই। এই হল বিখ্যাত ডমরেমি,



মহাযুদ্ধে নিহত আমেরিকার সৈন্যদের স্মৃতিস্তম্ভ। পাশাপাশি ফ্রান্স ও আমেরিকার দুইটি সৈন্যের প্রতিমূর্ত্তি খোদাই করা আছে।

জোয়ান অফ্ আর্কের জন্মস্থান। যে গৃহে জোয়ানের জন্ম হয়েছিল, সে গৃহটা এখনও আছে, দেশদেশান্তর থেকে যাত্রীরা দেখতে আসে। ক্যাথলিকদের তো এটা একটা পুণ্য তীর্থস্থান। ডমরেমি ছাড়িয়ে লিভারডুন।

খাল এখানে সহরের নীচে দিয়ে চলে গিয়েছে। একটা টানেল দিয়ে সে অংশে প্রবেশ করতে হয়। ঘোর অন্ধকার টানেলের মধ্যে আমরা ঢুকে কোন রকমে বেয়ে চলেছি, এমন সময়ে অন্ধকারের মধ্যে একটা দ্রুতগামী মোটর-পোতের আলো দৃশ্যমান হল।

মোটর-পোতখানা একটা ভারী বজরা অর্থাৎ মালবাহী গাধাবোটের মত নৌকা। সেই অন্ধকারের মধ্যে ফরাসী ভাষায় ঐ ভারী বজরার মাঝি-মাল্লাদের বুঝিয়ে বলা

যে আমাদের ছোট নৌকা বাঁচিয়ে সাবধান হয়ে চল—সে এক ব্যাপার আর কি! প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের আশঙ্কা হচ্ছিল যে, গাধাবোটের ধাক্কা খেয়ে আমাদের বেচারী 'হক্' এই বুঝি মোচার খোলার মত ডুবে গেল!

তারা আমাদের বুঝিয়ে দিলে, তোমাদের নৌকো হটিয়ে নিয়ে টানেলের বাইরে নোঙর কর, আমরা চলে যাই, তখন তোমরা ঢুকো।

তাদের কথা শুনতে গিয়ে (না শুনেও উপায় ছিল না) আরও বিপদ্। 'হক'-এর মাস্তুল টানেলের ছাদে আটকে



রেলপথের পাশাপাশি মার্ণে-রাইন খাল। এই খালে একসময় কেবল একদিকে নৌকা যাইতে দেওয়া হয়। 'হক' নৌকাটিকে দেখা যাইতেছে।

গেল, মোটর গেল খারাপ হয়ে, পিছু দিকে হঠতে চায় না—কি দুর্ভোগ যে বাধলো সেই গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে! বহু কষ্টে সে যাত্রা উদ্ধার পাওয়া গেল।

যখন আমরা ন্যান্সি পৌঁছেছি, তখন খালের জলে বরফ জমতে আরম্ভ করেছে।

আমরা প্রাণপণে আমাদের নৌকাখানা আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলাম, খালের সমস্ত জল জমে যাওয়ার পূর্ব্বেই।

সুতরাং ন্যান্সি সহরে আমরা বেশীক্ষণ কি করে থাকি, ন্যান্সি সহরের প্রাচীন ডিউকের প্রাসাদ, পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত গির্জ্জা ইত্যাদি দেখবার সময় আদৌ পাওয়া গেল না।

শীত ক্রমেই বাড়তে লাগল।

বরফ না ভেঙে আর যেন অগ্রসর হওয়া যায় না।

হঠাৎ এক রাত্রে এমনি শীত পড়লো যে, খালের জল জমে বরফ হয়ে গেল এবং আমরা এক নির্জ্জন স্থানে আটকা পড়ে গেলাম।

এমন জায়গায় আমাদের নৌকা আটকে গেল যে, আপাততঃ খাদ্যদ্রব্যের যোগাড় করাই মুস্কিল: নিকটবর্ত্তী সহর বারো মাইল দূরে। এ অবস্থায় আমরা নিজেরাই নিজেদের রুটী গড়তে ও সেঁকতে বাধ্য হলাম। কিছু দূরে এক কৃষকের বাড়ী ছিল। তার কাছ থেকে দরদস্তুর করে তার ক্ষেতে-খামারে যা কিছু পাওয়া যায়,—ডিম, মুরগী, দুধ, শাকসব্জি ইত্যাদি কিনে নিতাম।

দেড় মাস কেটে গেল। দেড় মাসের মধ্যে আমাদের একমাত্র আমোদ ছিল, সেই কঠিন বরফের উপর স্কেটিং করে বেড়ান।

দেড় মাস পরে একদিন ঘোড়ায়-টানা বরফ ভাঙবার কল এসে খালের বরফ ভেঙে দিতে দিতে চলে গেল। আমরা মুক্তি পেয়ে নৌকা ছেড়ে দিলাম।

আমরা অনেক উপর দিয়ে চলেছি, খাল ভস্‌গেস্ পর্ব্বতের উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখান থেকে রাইন নদীর সমতলে নামতে খননকারী ইঞ্জিনিয়ারকে বহু কৌশল করতে হয়েছে।

অনেক জায়গায় দুখানা নৌকা বা বজরা পাশাপাশি যেতে পারে না। কাজেই ভস্‌গেস্ পর্ব্বতের অপর পারে নামতে বিশেষ দেরী হয়ে গেল।

অবশেষে আমরা ষ্ট্রাসবুর্গ পৌঁছে গেলাম। আমরা এক নির্জ্জন প্রান্তরে খালের মধ্যে আটকে পড়ে দেড় মাস কষ্ট পেয়েছি, তার উপর ভস্‌গেস্ পর্ব্বতের উপর নৌকা ওঠাতে ও এ-পারে নামাতে যথেষ্ট বিলম্ব হয়েছে, সুতরাং ষ্ট্রাসবুর্গে পৌঁছে আমরা তিন সপ্তাহ পূর্ণ বিশ্রাম করলাম।

ষ্ট্রাসবুর্গের বিখ্যাত গথিক প্রণালীতে নির্ম্মিত ভজনালয় প্রতিদিন দেখেও যেন আমাদের সাধ মিটত না। মধ্য-

যুগে নির্মিত এই ক্যাথিড্রালের শোভা অবর্ণনীয়। ষ্ট্রাসবুর্গ ছেড়ে যাওয়ার প্রাক্কালে বহু অভিজ্ঞ ও বৃদ্ধ নাবিকের মুখ থেকে উপদেশ পেলাম, সঙ্গে একজন পাইলট নিতে।

নদীর উজানে বিস্তর বালির চড়া ও ভাসমান সেতু আছে, সঙ্গে অভিজ্ঞ লোক না থাকলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। আমরা পাইলট নিতে রাজি হই নি, কারণ পাইলট নিযুক্ত করবার মত অর্থ আমাদের সঙ্গে ছিল না।

উত্তরদিকে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নদীতে নৌকার ভিড় বড় বাড়ল; এ যেন আবার সিন্ নদী দিয়ে যাচ্ছি। ফরাসী, জার্ম্মান, বেলজিয়ান, ডাচ সব রকমের বজরা ও নৌকা।

এর মধ্যে পেছনে-চাকাওয়ালা ছোট ষ্টীমারও আছে, একরাশ গাধাবোট টেনে নিয়ে চল্‌ছে। এই গাধাবোটের সারি কখন কখন এক মাইল লম্বা। পুরো পাল-তোলা অবস্থায় সঙ্কীর্ণ নদীর বাঁকে এই রকম গাধাবোটের সারির সঙ্গে দেখা হওয়ার মত দুর্দ্দৈব আর কি আছে!

ষ্ট্রাসবুর্গ থেকে এই নদীপথ দুধারের পাহাড়-শ্রেণীর উপর অবস্থিত দুর্গ থেকে রক্ষিত হয়ে থাকে। মধ্য-যুগে তৈরী হয়েছিল এই সব দুর্গ রাইন নদী-পথকে সুরক্ষিত করবার জন্যে, যদিও বিংশ শতাব্দীতে এদের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে এসেছে।

জার্ম্মানীর সীমান্তে অবস্থিত ম্যাক্সতে পৌঁছে গেলাম। স্বস্তিকা চিহ্ন-অঙ্কিত এক প্রকাণ্ড পতাকা উড়িয়ে কাষ্টম বিভাগের বোট এসে আমাদের পাশে ভিড়লো; তবে তারা এত অল্প সময়ের মধ্যে কাজ সেরে নিলে যে, আমাদের নৌকার বেগ কমাবার পর্য্যন্ত দরকার হল না।

ম্যাক্স থেকে স্পেয়ার পর্য্যন্ত এসে আমরা রাইন নদীর পথ কয়েকদিনের জন্য ছেড়ে দিয়ে নেকার নদী বেয়ে হয়ডেল-বার্গ গেলাম। এই অঞ্চলে কেবল বড় বড় মধ্য-যুগের প্রাসাদ, দুর্গ, গির্জ্জা, মঠ প্রভৃতির বিচিত্র সমাবেশ। যাঁরাই রাইন নদীতে নৌকা করে বেড়াবেন, তাঁরা যেন স্পেয়ার থেকে নেকার নদী-পথে হয়ডেলবার্গ পর্য্যন্ত নিশ্চয়ই যান, নতুবা তাঁদের রাইনল্যাণ্ড ভ্রমণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

আবার ফিরে এলাম রাইন নদীতে।

ওয়ার্মস্ পৌঁছে দু'একদিন বিশ্রাম করলাম। ওয়ার্মস্ বিখ্যাত হয়ে আছে ইতিহাসে, মার্টিন লুথারের জন্য। এখানে বসে তিনি সম্রাট পঞ্চম চার্লসের বিধি-নিষেধ তুচ্ছ করেছিলেন। লুথারের উদ্দেশে একটি স্মৃতিস্তম্ভ ওয়ার্মসের রাজপথে বিদ্যমান।

ওয়ার্মস্ ছাড়িয়েই রাইন নদীর উভয় তীরের দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হোল।

এইবার আমরা দ্রাক্ষা-ক্ষেত্রের দেশে ঢুকেছি। দুই তীরে খাড়া উঁচু পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে দ্রাক্ষা-ক্ষেত্র, মাঝে মাঝে মধ্য যুগের প্রাসাদ-দুর্গ।



বালকানের রূপসী রমণী। চিত্রিত গাড়ীতে করিয়া ইহারা সমগ্র বালকান ভ্রমণ করিয়া লোকের ভাগ্য গণনা করিয়া বেড়ায়।

রাইন নদীর এই অঞ্চল ঠিক যেন ছবির মত।

আমরা বিখ্যাত ওপেনহাইম্ প্রাসাদের নীচে একদিন সারারাত্রি কাটালাম। কিন্তু, মোটের ওপর বলা যেতে পারে যে, রাইন নদীতে নৌকা বেয়ে প্রমোদ-ভ্রমণে বিশেষ সুখ নেই, এত ভিড়ে ওতে কোন আনন্দ পাওয়া যায় না। দ্রাক্ষারস-বোঝাই গাধাবোটের হয় তো কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু একটু অসতর্ক হলেই একটা ভারি গাধাবোটের সঙ্গে ধাক্কা লেগে নৌকা চুরমার হয়ে যাবে যেখানে, সেখানে আমরা নৌকা সামলাই, না প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখি।

এইবার মেন্ নদী বেয়ে আমরা লুড্‌ভিগ্ খালে উঠতে আরম্ভ করলাম। এখানে আমরা যথেষ্ট অভ্যর্থনা পেয়েছিলাম নগরের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে। দলে দলে লোকে আমাদের নৌকা দেখতে এল।

রাত্রে আমরা ফ্রাঙ্কফার্টের গলিঘুঁজির মধ্যে বেড়িয়ে বেড়াতাম, আমাদের মনে হ'ত এই সহরের প্রত্যেক অন্ধ-



ব্যাভেরিয়ার কৃষক। ইহাদের অধিকাংশই লুডভিগ খালের নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য অঞ্চলে জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকে। এই লোকটি 'হক' দেখিবার পূর্ব্বে কখনও পালতোলা নৌকা দেখে নাই।

অন্ধকার গলিঘুঁজি ভূত, ডাইনি, সম্রাট্ ও সৈন্যের ভিড়ে ভর্ত্তি। কল্পলোকের ফ্রাঙ্কফার্টের সঙ্গে বাস্তব জগতের ফ্রাঙ্কফার্টের অনেকখানিই তফাৎ। ওফেনব্যাক সহরে এসেও আমরা দুদিন বিশ্রাম করি। এই সহর বিখ্যাত হয়ে আছে এই জন্যে যে, এখানে গেটে তাঁর প্রণয়িনী লিলির দেখা পেয়েছিলেন।

ওফেনব্যাক ছাড়িয়ে কিছু অগ্রসর হয়েই ডেটিন্‌জেনের রণক্ষেত্র, যেখানে ইংরেজ রাজা দ্বিতীয় জর্জ স্বয়ং ইংরেজ সৈন্য পরিচালনা করেছিলেন।

ডেটিন্‌জেন ছাড়িয়ে আমরা এক দিন বড় বিপদে পড়লাম।

রাত্রে এক জায়গায় মাঠের ধারে নোঙর করে ঘুমিয়ে ছিলাম। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি যে, আমাদের নৌকা শস্যক্ষেত্রের মধ্যে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

নদীতে বন্যার জল কখন যে সরে গিয়েছে! খামখেয়ালী পার্ব্বত্য নদীর মনের কথা আমরা কি করে জানব?

লোকজন ডেকে সে যাত্রা নৌকা ঠেলাঠেলি করে ফসলের ক্ষেত থেকে নদীগর্ভে নামান হল।

আমরা সে দিন অপরাহ্ণে ব্যাভেরিয়া প্রথম লুড্‌ভিগের প্রাসাদ-দুর্গের ছায়ায় গভীর জলে নোঙর করলাম। প্রথম লুড্‌ভিগ শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করে তাঁর এই প্রাসাদকে একটি মিউজিয়াম করে রেখে গিয়েছেন। রাজকীয় শয়নাগারের বাতায়নপথে দেখা যাচ্ছিল, তাঁর তৈরী প্রাচীন পম্পাই নগরের কাষ্টর ও পোলাক্সের মন্দিরের আদর্শে প্রস্তুত ছোট একটি মন্দির।

এইবার নদী ক্রমশঃ অতীব খরস্রোতা হয়ে উঠল। লুড্‌ভিগের দুর্গ ছাড়িয়ে কিছুদূর যেতে না যেতে আমরা বুঝলাম, এ স্রোতে গবর্ণমেণ্ট বোটের সাহায্য ভিন্ন অগ্রসর হওয়া বিপজ্জনক। এখানে নদীর স্রোতের প্রখরতার জন্যে গবর্ণমেণ্ট থেকে এই ব্যবস্থা আছে। একটা পুরাণো বড় বজরা শ্রেণীর-নৌকার পেছনে খুব মোটা ও লম্বা শেকল, বিপন্ন নৌকাকে সেই শিকলে বেঁধে ব্যামবার্গ পর্য্যন্ত পৌঁছে দেওয়াই এই চেন-বোটের কাজ।

লুডভিগের প্রাসাদের নিকট থেকে ব্যামবার্গ কম দূর নয়। এখানে নদীর দৃশ্যও বড় সুন্দর। আমাদের কিছুই করবার ছিল না। গবর্ণমেণ্ট চেন-বোটে আমাদের 'হক্' টেনে নিয়ে যাচ্ছে, সুতরাং আমরা ডেকের উপর আরামে রৌদ্রে শুয়ে উভয় তীরের দৃশ্য দেখতে দেখতে চলেছি। এই বার সত্যিই রাইন নদীর সৌন্দর্য্য যেন উপভোগ করার সুযোগ করলাম।

ঠিক বায়োস্কোপের ছবির মত একটার পর আর একটা দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে বনাবৃত শৈলশ্রেণী, গভীর খাদ, কখন বা রাই-সরিষা, যব ও তামাকের ক্ষেত, ফলের বাগান। মাঝে মাঝে আমরা প্রাচীর-বেষ্টিত মধ্যযুগে নির্ম্মিত গ্রাম ও ছোট সহর পার হয়ে যাচ্ছি। সে সব সহর

চারশো বৎসর পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ শিল্পী আলব্রেকট ডুরার যখন নৌকা করে হল্যাণ্ড ভ্রমণ করেন তখন যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে।

একটা গ্রামে দেখি মেলা বসে গিয়েছে। নদীর ধারে চাঁদোয়ার নীচে নীল ও সোনালি রং মাখান ম্যাডোনার মূর্ত্তি শান্ত-চোখে আমাদের দিকে চেয়ে আছে।

তারপর সন্ধ্যার দিকে দূর থেকে ব্যাম্‌বার্গ সহরের বিরাট ক্যাথিড্রালের চূড়া দৃষ্টিগোচর হল। সূর্য্যাস্তের অব্যবহিত পরেই আমরা ব্যাম্‌বার্গের প্রাসাদ-দুর্গের নীচে নোঙর করলাম।

দেখে মনে হয়, যেন ইউরোপের মধ্যযুগ এ সব অঞ্চলে শেষ হয় নি। ব্যামবার্গ রেলপথ থেকে দূরে, ভ্রমণকারীরা এসে এ জায়গা নষ্ট করে দেয় নি। সমস্ত সহরটা যেন মধ্যযুগের অলস কুহেলিকায় আচ্ছন্ন। মধ্যযুগের কার্পাণ মূর্ত্তি-শিল্পের কয়েকটি উৎকৃষ্ট নমুনা ব্যামবার্গ নগরে রক্ষিত আছে।

আমি তাহাদের কবি

—শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

গরীব বাপের ছেলে হয়ে যারা জন্মেছে এই মাটির বুকে,
আমি তাহাদের কবি,
চোখের জলের সাগরে সাঁতার কাটিছে যাহারা অসীম দুখে,
আঁকি তাহাদের ছবি।
আমায় তোমরা চেন বা না চেন গ্রাহ্য করি না চেনা ও জানা,
স্বার্থের কালো আকাশে ওড়াও হরষে মেলিয়া দম্ভ-ডানা,
তোমাদের দেওয়া কবি-যশ নিতে ঘৃণার আত্মা উঠিছে রুখে,
ভাগ্যের খেলা সবই,—
ক্ষুধার অন্নে বঞ্চিত যারা ধুঁকিয়া মরিছে মাটির বুকে
আমি তাহাদের কবি!

হে দয়া-বিলাসী তোমাদের দয়া বিদ্রূপ করে কাঁটার মত
গরীবের ভীরু প্রাণে,
দয়া অভিনয় দেখায়ো না আর গরীবের দল মরিবে কত,
অঙ্কুরাগ অভিমানে;
তোমরা নিয়ত শকুনীর মত মেলিয়া নিয়ত লোলুপ আঁখি,
শ্মশানের মড়া ছিঁড়িয়া খেতেছ পালকে শীতল রক্ত মাখি,'
দরদে চঞ্চু আঘাতিয়া আর বাড়ায়ো না বুকে দয়ার ক্ষত,
অসার সাম্য-গানে,
হে দয়া বিলাসী তোমাদের দয়া বিদ্রূপ করে কাঁটার মত
গরীবের ভীরু প্রাণে।

গরীব বাপের ছেলে হয়ে যারা লাঞ্ছনা আর বেদনা সহে
তোমাদের অবিচারে,
অভাবের জ্বালা আগুনের মত যাদের আত্মা নিয়ত দহে
জীবনে অভিসারে;
মৃত্যু যাদের চির-বরণীয় গুণানল চির ভস্ম-ঢাকা,
কুৎসিত কালো বিধাতার শাপ যাদের ভাগ্য-আকাশে আঁকা
মরু বালুকার তলে যাহাদের অশ্রু-নদীর ফল্গু বহে—
রহিব তাদেরি দ্বারে,
অভাবের জ্বালা আগুনের মত যাদের আত্মা নিয়ত দহে
জীবনের অভিসারে।

যাদের প্রতিভা বিদ্যুৎসম ঘন তমিস্র অন্ধরাতে
পথিকেরে দেয় ধাঁধা,
চকিতে লুকায় তিমির রন্ধ্রে, ব্যর্থ নিশ্বাস বায়ুর সাথে
বেসুরা ছন্দে বাঁধা।
আমি তাহাদের বুকের শোণিতে গৌরব-টীকা ললাটে পরি
তোমাদের পানে তীব্র ঘৃণায় ক্রূর বীভৎস ব্যঙ্গ করি।
তোমাদের বুকে পদাঘাত করি' মরিব শূন্যে ঝঞ্ঝাঘাতে
চূর্ণ করিয়া বাধা,
আমার কাব্য ভোজবাজী সম মিলাবে রিক্ত কুটিল রাতে
বেসুরা ছন্দে বাঁধা।

জীবন-চিত্র

—শ্রীবিজনবালা দেবী

দ্বিতীয় দিবস

এক্‌জিবিশন

দুই দিন পরে সুরুচির পিতা ও তাপসী আসিয়া পৌঁছিলেন। সুরুচির বড়দিও নিজের বিরাট বাহিনী লইয়া ঐ দিনই আসিয়া নিজেদের শোভাবাজারস্থ বাড়ীতে উঠিলেন।

দ্বিজেন বার-কয়েক শোভাবাজার ও ভবানীপুর যাতায়াত করিয়া সকলের এক্‌জিবিশন দেখার দিন ও সময় ঠিক করিয়া দিল।

পরদিন বেলা বারটার সময় বড়দিরা আসিয়া পড়িলেন। তাঁদের দু' খানা গাড়ী,—এদের পক্ষ হইতেও দু' খানা গাড়ী নেওয়া হইল। সুরুচির পিতা, বিশ্বকর্ম্মা, তাপসী, সুরুচি, দ্বিজেন, দ্বিজেনের বন্ধু, পূর্ণ, কমল, তেজেন ও ভুবন।

দূর হইতে প্রদর্শনীর সামনের ভিড় দেখিয়া বড়দি বলিলেন, 'সর্ব্বনাশ, এ কি কাণ্ড?'

সুরুচি বলিলেন, 'আমরা যে দিন এসেছিলাম সে দিনের চেয়ে আজ চতুর্গুণ ভিড়।'

দিদি বলিলেন, 'ছেলেপিলে হারিয়ে না যায়।'

সুরুচি বলিলেন, 'এক একজন আমরা এক একটিকে নেবো।'

একটি পাঁচ মাসের শিশু, সে মায়ের কোলে। তা ছাড়া আর কয়েকটি ছয় হইতে দশ বছরের মধ্যে। সুরুচি ও অন্য সকলে এক একজনের হাত ধরিলেন।

গেট পার হইয়া তাপসী বলিলেন, 'বাবা আর জামাই বাবু অত আগে চলে গেলেন যে?'

বড় ভগ্নীপতি বলিলেন, 'ওরা গেলেন যান, তোমরা ধীরে ধীরে চল।'

তাপসী বলিলেন, 'বাবা গোপালের শাল কিনতে ব্যস্ত হয়ে আছেন। ও-বেলা দোকানে যেতে চেয়েছিলেন, তা জামাইবাবু বল্লেন, এক্‌জিবিশনে কিনবেন।' গোপাল গৃহ-ভৃত্য।

প্রথম দিনটায় যত বিরক্তি বোধ হইয়াছিল, আজ তা হইল না; অনেক দিন পর দেখা, কথাবার্ত্তা, হাসি-গল্পের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ান, দেখা ও সমালোচনা।

শীতের বেলা পড়িয়া চলিল। পছন্দমত শাল পাওয়া গেল না। সুরুচির পিতা একটা বড় দোকানের সামনে চেয়ারে বসিয়া রহিলেন। আর সকলেও ক্ষণেক সেইখানে বিশ্রাম করিতে লাগিল।

দ্বিজেনরা এদিকে ওদিকে ঘুরিতেছিল, কাছে আসিয়া বলিল, 'বাবা, ঐ দোকানটায় ভাল শাল আছে।'

পিতা উঠিয়া পড়িলেন। বিশ্বকর্ম্মাকে বলিলেন, 'চল!'

দুইজনে সেই দোকানে গেলেন। তাপসী কহিলেন, 'বাবার সব তাড়াতাড়ি চাই। এক্‌জিবিশন তো খুব দেখলেন, কেবল শালের জন্যে ব্যস্ত! শাল পরেও নেওয়া যেতে পারতো।'

অনেকগুলি লোক দোকানের দিকে আসিতেছে,—সুরুচিরা উঠিয়া বলিলেন, 'চল ওখানে যাই—বাবা কি কিনলেন, দেখি গে'—

সেখানেও অসম্ভব ভিড়; তাপসী বলিলেন, 'অতলোক ঠেলে যাওয়া যাবে না, তার চেয়ে আমরা দেখে বেড়াই এস।'

বাঁ দিক্ ধরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সেই ভোজন-মণ্ডপটি দেখা গেল। পানাহার-রত লোকগুলির দিকে চাহিয়া বড়দি বলিলেন, 'ছেলেপিলেদের খাইয়ে আসি আয়'—

সুরুচি বলিলেন, 'জনপ্রতি এক টাকা করে লাগবে কিন্তু।'

'কেন? কি খাওয়াচ্ছে ওখানে?'

বড়দির মেজমেয়ে নির্ম্মল বলিল, 'তা হলে আমাদের টাকা পঁচিশেক খরচ হবে।'

একটি স্বেচ্ছাসেবক এইদিকে চাহিয়া হাসিমুখে কাছে আসিল। বড়দি বলিলেন, 'ভাল আছ পরেশ? অনেক দিন দেখি নি। তুমি ভলান্টিয়ার হয়েছ?'

পরেশ বলিল, 'হাঁ।' পরেশ নির্ম্মলের জ্ঞাতি-ভাই।

সুরুচি সেদিনের কথা বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া একটা হাসির ধুম পড়িল।

নির্ম্মল বলিল, 'মাসীমা, ছেলে কাঁদছে—তাড়াতাড়িতে খাইয়েও আনি নি।'

'দেখি—চায়ের ঘরে দুধ পাওয়া যেতে পারে। চল—'

সেই ষ্টলটীতে মেয়েরা নানা কাজে ব্যস্ত। তৈরী প্লেট সাজানো হইতেছে। একজন কড়ায় বেগুনী ছাড়ে, অন্যজন ঝাঝরা দ্বারা তুলিয়া লয়। একদিকে দাঁড়াইয়া একজনে চা পান করিতেছে—তাহারই কাছে আর একজন গরম বেগুনী মুখে ফেলিয়া হাঁ করিয়া আছে। পানাহার ও কাজ-কর্ম্ম সবই ক্ষিপ্রতার সহিত চলিয়াছে।

একটি হিন্দুস্থানী এক বালতি দুধ-হাতে আসিয়া দাঁড়াইল। সুরুচি ষ্টলের কাছে গিয়া বিনীত ভাবে বলিলেন, 'দেখুন, এই শিশুটির জন্যে একটু দুধ জ্বাল দিয়ে দেবেন দয়া করে? দুধ কিনে দিচ্ছি—'

একটি মেয়ে মুখ ফিরাইয়া বলিল, 'আচ্ছা দিচ্ছি।'

বেগুনী-চিবানো মেয়েটি বলিল, 'কিন্তু কিসে জ্বাল দেওয়া হবে?'

তখন কর্ম্ম-নিরতা বালিকা, তরুণী, যুবতী, প্রৌঢ়া সকলেই একবার এদিকে ওদিকে চাহিয়া দেখিল। একজন চা ঢালিতে ঢালিতে বলিল, 'ঠিক কথা, জ্বাল দেবার কিছু নেই—'

সুরুচি বলিলেন, 'হবে না তবে?'

চা-পানকারিণী নম্রভাবে বলিল, 'কি করব বলুন—অনায়াসেই দিতে পারতাম। কিন্তু, দুধ জ্বাল দেবার কোন বাসন নেই আমাদের।'

সুরুচি বলিলেন, 'তোর ছেলের অদৃষ্ট, একটু চা খাইয়ে নে—আর কি হবে!'

নির্ম্মল বলিল, 'তবে তাই দিন।'

সুরুচি বলিলেন, 'দাম কত?'

'চার আনা'—বলিয়া একটি তরুণী এক পেয়ালা চা সুরুচির হাতে দিল।

ষ্টলের সামনের বেঞ্চে বসিয়া নির্ম্মল ছেলেকে খাওয়াইতে আরম্ভ করিল।

কমল আসিয়া বলিল, 'কাকা, দাদাবাবুরা আপনাদের ডাকছেন।'

দিদি বলিলেন, 'তাঁরা কোথায়?'

'মুকুন্দ দাসের গান হচ্ছে—সেখানে দাঁড়িয়েছেন একটু। আপনারা চলুন শীগগির'—

'এর খাওয়া হোক।'

পিরীচে করিয়া একটু একটু করিয়া শিশুটি চা পান করিল। শেষে মুখ ফিরাইয়া পেয়ালা ঠেলিয়া দিল। নির্ম্মল বলিল, 'পেট ভরে গেছে—'

বাকী চা ফেলিয়া দিয়া দাম দিয়া সকলে সেখান হইতে ফিরিল। সুরুচি বলিলেন, 'পান পাওয়া যাবে না?'

দ্বিজেন বলিল, 'না না, পানটান এখানে নেই। সেদিন দেখলেন না? ওরা ডাকছেন চলুন।'

তেজেন বলিল, 'কে বললে নেই? আসুন দিদি—এই যে পান—'

ঠিক পাশেই পান-সোডা-লেমনেড বিক্রী হইতেছে—অদূরে ডাব। যার যা ইচ্ছা সে তাহাই লইল। রৌদ্রে-শ্রমে সকলেই ক্লান্ত।

কমল নিজের লেমনেডের বোতলটা ফিরাইয়া দিয়া বলিল, 'কত দেরী করলেন আর? ওঁরা রাগ করবেন নিশ্চয়। কখন ডাকতে এসেছি!'—

তেজেন বলিল, 'নিজের কাজটি উদ্ধার করে এখন তাড়াতাড়ি, বেশ লোক তো?' দ্বিজেন সোডার বোতলটি রাখিয়া বলিল, 'আমি যাই, বাবাকে বলে দিই গে যে, ওরা আসছে না।'

'এই যাচ্ছি চল্—।' যাইতে যাইতে সুরুচি বলিলেন, 'সবই তো রয়েছে, আর সেদিন আমরা কি কষ্টই পেয়েছিলাম!—না একটা পান, না একটা লেমনেড, কি ডাব—!'

তেজেন বলিল, 'এত বড় জায়গায় কিছু খুঁজে বার করা কঠিন, জানা না থাকলে বিপদ্।'

'তুই জানলি কি করে?'

তেজেন হাসিয়া বলিল, 'বাঃ, এক্‌জিবিশন সাজানোর প্রথম দিন থেকে দল বেঁধে রোজ আমরা এসে দেখেছি।'

'তাই সেদিন আমাদের সঙ্গে এলি নে? বললি কাজ আছে।'

'না—কাজ ছিল সত্যি।'

'কিন্তু তুই আর হোষ্টেলে যাস্‌নে। যে কদিন আছি—এক সঙ্গে সবাই থাকা যাক্।'

অদূরে একটা মণ্ডপের মধ্যে গান হইতেছে। ভিড়ও ভয়ানক। কমল বলিল, 'আপনারা এখানে দাঁড়ান্, আমি ডেকে আনি ওঁদের।'

একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'তাঁরা নেই ওখানে।'

'নেই? কোথা গেলেন তবে? ভিড়ে দেখতে পাস্‌ নি, ওখানেই আছেন।'

'না, এদিকে বসেছিলেন। ভাল করে দেখেছি—নেই ওখানে।'

পরেশ কিছুক্ষণ আগে নিজের কাজে গিয়াছিল। এক্ষণে এই দিকে আসিতে আসিতে কমলের কথা শুনিয়া বলিল, 'তাঁদের দেখলাম পুতুল-নাচের ওদিকে যাচ্ছেন।'

সুরুচি বলিলেন, 'চল্ সেখানেই যাই। পরেশ, তোমার কাজ কি হয়েছে?—এখন আমাদের সঙ্গে থাকতে পারবে?'

পরেশ বলিল, 'তা থাকব। আর বিশেষ কাজ নেই আমার।'

সন্ধ্যা হইল। কৃষ্ণপক্ষের আঁধার আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র-মালার ন্যায় অতি বিস্তৃত প্রদর্শনী-ভূমির উপরিভাগে অসংখ্য আলো জ্বলিয়া উঠিল।

তাপসী বলিলেন, 'দেখ দিদি, কি সুন্দর। সন্ধ্যা হতে যেন অন্য মূর্ত্তি ধরল।'

দিদি বলিলেন, 'কি সুন্দর পুতুল-নাচ দেখ, আমরা সেই একটুখানি পুতুলের নাচ দেখি, এ যে মানুষের মত বড় বড়।'

পুতুল-নাচ কে দেখে? মন উদ্বেগে ভরা, ইতস্ততঃ চাহিতে চাহিতে সুরুচি বলিলেন, 'বাবা কই?'

কমল, দ্বিজেন, তেজেন ও পরেশ ঘুরিয়া ঘুরিয়া চারিদিকে খুঁজিল, কিন্তু কোথাও তাঁহাদিগকে পাইল না।

তাপসী বলিলেন, 'কোথায় যে গেলেন। আর ভাল লাগ্‌ছে না এখন, ফিরতে পারলে বাঁচি।'

তুর্ণি বলিল, 'মা বাড়ী চলেন এবার, রাত হল কত।'

সুরুচি বলিলেন, 'যাব, কিন্তু যাই কি করে? বাবা আর তোমার বাবু যে কোথা গেলেন।'

তেজেন বলিল, 'ঐ যে আর একটা খেলা হচ্ছে, ওখানে দেখি চলুন।'

একটা আলোকিত মণ্ডপ-মধ্যে পুতুল-নাচের মতই একটা ব্যাপার হইতেছিল। রামায়ণেরই কোন দৃশ্যাভিনয়। কৌশল্যা, সুমিত্রা ও সীতা কথা বলিতেছেন। কিন্তু, প্রতিমা-গুলি যেমন সুশ্রী তেমনি সুন্দর বেশধারিণী। থিয়েটারের অভিনেত্রীদের মত জীবন্ত বলিয়া বোধ হইল।

এখানেও তাঁহাদের দেখা গেল না।

দ্বিজেন তর্জ্জন করিয়া বলিল, 'সব আপনাদের দোষ, বাবা ডাকলেন, তখন কেন এলেন না? ডাব-লেমনেড খাবার ধুম পড়ে গেল। খান না এখন?'

তেজেন বলিল, 'আর একবার দেখি, দাদা আসুন।'

'তোরা যা, আমি আর ঘুরতে পারবো না।'

'আচ্ছা থাকুন আপনি। দিদি, আপনারা যেন কোথাও যাবেন না, তা'হলে আর খুঁজে পাব না। শীতের রাত্রি, দারুণ শ্রমে দেহ ক্লান্ত, অবসন্ন। সেইখানেই বসিয়া সকলে প্রতীক্ষায় রহিল।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে কমল ও তেজেন ফিরিল। বলিল, 'না, কোথাও দেখলাম না।'

তাপসী বলিলেন, 'বোধ হয় তাঁরা বাড়ী চলে গেছেন।'

সুরুচি বলিলেন, 'না রে, সে কি সম্ভব। আমাদের ফেলে তাঁরা যাবেন? তাঁরাও এমনি করে আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছেন।'

দ্বিজেন বলিল, 'কার দোষ? এখন মজা টের পান।'

তেজেন বলিল, 'এখানে থেকে লাভ নেই আর। গেটের দিকে যাওয়া যাক্। আমাদের না পেয়ে তাঁরা গেটের কাছেও অপেক্ষা করতে পারেন,—একেবারে সময় দেখতে পাবেন বলে।'

সুরুচি গেটের দিকে চলিলেন বটে, কিন্তু মনে দৃঢ় বিশ্বাস রহিল, তাঁহারাও প্রদর্শনী-ক্ষেত্রেই তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন।

রাত্রি বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকেরা দলে দলে প্রস্থান করিতেছে। স্থানে স্থানে অত্যন্ত জনতা। দিনে সকলে ছড়াইয়া ছিল, রাত্রে জড় হইয়াছে।

নির্ম্মলের পিতা বলিলেন, 'একজিবিশনে এসে অবশেষে কর্ত্তাটিকে হারিয়ে ফেললে ?'

সুরুচি বলিলেন, 'না জামাইবাবু, ওঁর জন্যে ভাববার কিছু নেই। যখন যা ইচ্ছে খাবেন। ক্ষুধাতৃষ্ণায় কষ্ট পাবেন না। বাবা সেই এগারটায় দুটি খেয়েছেন, এ পর্য্যন্ত জল স্পর্শ করেন নি আর। কখন খাবেন—সন্ধ্যা-আহ্নিক করবেন তবে। যদি বাড়ী গিয়া থাকেন, সে খুব ভাল। কিন্তু, যদি আমাদের খুঁজতে থাকেন, তবে বাবার কষ্টের সীমা থাকবে না।'

তাপসী বলিলেন, 'আমার মনে হচ্ছে ওঁরা বাড়ীই গেছেন। আমরা এত জন একসঙ্গে, ভয়ের কারণ কিছু নেই। খুঁজে না পেয়ে ভেবেছেন, আমরা চলে গেছি। তাই ওঁরাও গেছেন।'

পিছন-দিকে একটি করুণ নারীকণ্ঠ শোনা গেল, 'দেখ বাছা, আমার দিদিমা তার সঙ্গে দুটি শিশু, একটি সাত বছরের, একটি পাঁচ বছরের, কোথাও খুঁজে পাচ্ছি নে যে ?'

তাপসী বলিলেন, 'আহা, ছেলে হারিয়ে গেছে, ভলান্টিয়ারকে কেঁদে কেঁদে বলছে দেখ কেমন করে !'

কিছু দূর গিয়া আবার আর একটা কান্নার সুর শোনা গেল, দুইজন মধ্যবয়স্কা রমণী একটি স্বেচ্ছা-সেবককে বলিতেছে, 'আমাদের বোন, দশ বছর বয়স, নাম অমিয়া, বিকেল থেকে পাচ্ছি নে।'

দিদি বলিলেন, 'আমাদের দশা অনেকেরই হয়েছে দেখছি।'

নির্ম্মলের ভাই হরেন বলিল, 'মাসীমা, আমরা এনকোয়ারী অফিসে গিয়ে বলে আসি গে যে, আমাদের এক জন বেশী বয়সের আর এক জন মাঝারি বয়সের দু'জন লোক হারিয়ে গেছে।'

নির্ম্মল বলিল, 'এনকোয়ারী অফিস্ ও-রিপোর্ট নেবে না।'

'নিশ্চয় নেবে। তারা খুঁজে বার করে দেবে।'

'পাগল হয়েছিস্ ? বয়স্ক লোক কখনও হারায় ?'

'কেন হারাবে না ? এই যে আমাদের হারিয়েছে—, সবাই মিলে খুঁজছি তবু পাচ্ছি নে ?'

সুরুচি বলিলেন, 'তুই আর জ্বালাস্ নে বাপু, এমনি জ্বলে মরছি আমরা।'

গেটের কাছে জনসমুদ্র। তবু তার মধ্যেও আশে-পাশে যথাসম্ভব সন্ধান করা হইল, কিন্তু ফল একই।

তেজেন বলিল, 'দিদি, বাইরে যাই চলুন। সবাই চলেছে যাচ্ছে, তাঁরা যদি থাকেন, তবে বোধ হয় বাবার সময়ই দেখতে পাব। আর, যদি চলে গিয়ে থাকেন, তবে ত গেছেনই। যে ভিড়, খুব সাবধানে যেতে হবে।'

ছেলে-মেয়েগুলি শীত ও ঘুমে জড়সড়। সারা দিনটা ঘুমাইয়াছে, কিন্তু এখন শ্রান্তিতে অবসন্ন।

তেজেন দলটাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া দিল। বলিল, 'কমলবাবু আগে যান, তার পরে দাদা ; পরেশ, পূর্ণ, হরেন দু'পাশে থাকুক, আমি পিছনে থাকব। দিদিরা আর ছেলে-পিলেরা মাঝখানে থাকবে। না হলে গেট পার হবার সময়ই দু'একজন এদিকে ওদিকে ছিটকে পড়তে পারে। দাদা যান আগে। আর দেরী করছেন কেন ?'

দ্বিজেন মাথা ঝাঁকিয়া বলিয়া উঠিল, 'তোর কাজ থাকে, তুই যা আগে ; আমি যেতে টেঁতে পারব না। নিজেদের বুদ্ধির দোষে বিপদ্ বাধিয়ে এখন আমাদের ওপর যত চাপ।' বলিয়া বোনদের দিকে সক্রোধে চাহিল।

তেজেন বলিল, 'সে কথা বলে কি হবে ? যখনকার কাজ তখন করতে হয়—'

'তুই কর গে যা, আমি পারব না।'

তেজেন সবার ছোট, কিন্তু ধৈর্য্য ও বুদ্ধি সব চেয়ে বেশী। সে পরেশ ও কমলকে লইয়া বৃহৎ দলটিকে ঘিরিয়া কোন মতে গেট পার করিয়া দিল।

সকলের মনে হইল, এইবার যেন ইহলীলা শেষ হইল, কেননা ভিড়ের চাপে যাঁতার আটা-পেষণের মত করিয়াই তাহারা পিষিয়া বাহির হইল।

বাহিরে আসিয়া পরিত্রাণের নিশ্বাস ফেলিয়া ডান দিকের ফুটপাথে সকলে দাঁড়াইল। ফুটপাথ প্রায় নির্জ্জন। দু'চার জন পান-সিগারেট-বিক্রেতা কেবল বসিয়া আছে।

সুরুচি বলিলেন, 'সবাই এসেছি ত ?'

কমল বলিল, 'দেখি'।'

দলের দিকে চাহিয়া সুরুচি বলিলেন, 'ভুবনকে দেখছি না।' তেজেন বলিল, 'আমার ঠিক বাঁ দিকে থাকতে বলেছিলাম তাকে, গেট পার হবার সময়ও দেখেছি যে—'

তখন দেখা গেল, ভুবন এবং পূর্ণ নাই।

দ্বিজেন গর্জ্জিয়া উঠিল, 'আপনাদের সঙ্গে যে আসে সে বোকা গাধা, আর কখনো আপনাদের সঙ্গে কোথাও যাব না, এ আমার খুব শিক্ষা হল। কোথা গেল পূর্ণ? কোথা গেল পূর্ণ? কোথা আমি তাকে খুঁজি?'

তাপসী বলিলেন, 'তোর বন্ধু হারাবে না, ভয় নেই।'

'কোথায় রইল ঠিক কি? আবার সমস্ত রাত ধরে আমাদের খুঁজবে না কি?'

—'তার যদি একটু বুদ্ধি থাকে—তবে আমাদের খুঁজবে না। সোজা বাড়ী যাবে।'

'যদি না যেতে পারে, এই ভিড়ে একা একা গাড়ী ঠিক করে?'

তাপসী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'একখানা গাড়ী ঠিক করে যে যেতে পারবে না, অমন ছেলেকে তুই এনেছিলি কেন? এখন থেকে তাকে নিয়ে ঘরে বসে থাকিস্, কোথাও বেরুস্ নে, তোর কথা শুনে বাঁচি নে।'

'ঘরে বন্ধ করব আপনাদের, চলুন না একবার আজ বাড়ী ফিরে, তার পর কোথা বেরোন আর দেখব।'

ভুবন ও পূর্ণকে কমল, তেজেন ও পরেশ খুঁজিতে আবার প্রদর্শনীর ভিতরে ঢুকিল। বাহিরে সামনের সারি সারি আলোকিত ক্রীড়া-মণ্ডপগুলির দিকে চাহিয়া তাপসী বলিলেন, 'বাবা, জামাইবাবু এর কোন একটায় ত থাকতে পারেন?'

তত রাত্রিতেও সে-গুলিতে প্রবল বাদ্যধ্বনি হইতেছে। বহু লোক যাতায়াত করিতেছিল। এদিকে প্রদর্শনী হইতে বিপুল বেগবতী নদীর স্রোতের ন্যায় জন-প্রবাহ বাহিরের দিকে ছুটিয়াছে।

সুরুচি বলিলেন, 'আমাদের ভিতরে রেখে এসে তাঁরা কি খেলা দেখছেন? কখনও না। হয় বাড়ী গেছেন, নয় ভিতরেই রয়েছেন এখনও। কিন্তু, কিছুতেই আমার মনে হচ্ছে না যে, বাড়ী গেছেন।'

তখনও সুরুচি ভিতরের দিকেই চাহিয়া রহিয়াছেন। দর্শকেরা পদব্রজে, অশ্ব-যান-মোটরে, যে যেমন সুবিধা, প্রস্থান করিতে লাগিল। ক্রমে ভিড় পাতলা হইল। পথের উপরকার যান-বাহনগুলিও সরিয়া সরিয়া পথ পরিষ্কার হইয়া আসিল।

সুরুচি বলিলেন, 'বড়দি, এবার তুমি যাও, দেখছো ছেলে-পিলের দুরবস্থা?'

দিদি বলিলেন, 'তোরা থাকবি, আমি যাই কি করে?'

'আমরা সমস্ত রাত থাকতে পারি, অসুবিধে হবে না। কিন্তু এরা যে মারা যায়? যে গতিক দেখছি, আরও কতক্ষণ আমাদের থাকতে হয়, ঠিক নেই।'

নির্ম্মলের পিতা ফুটপাথে পায়চারি করিতেছিলেন, কাছে আসিয়া বলিলেন, 'ওরা খোঁজা-খুঁজি করুক, আর একজন তোমাদের দু'বোনকে নিয়ে বাড়ী যাক্। তোমরা থেকে কি করবে?'

'না জামাইবাবু, ওদের ফেলে যাব না। সবাই শ্রান্ত, ওরা আরও বেশী। দিদি, তোমরা আর থেকো না, চলে যাও। ভয়ানক ঠাণ্ডা, ছেলে-পিলের অসুখ করলে বিপদে পড়বে শেষে। আমাদের জন্যে তোমাদের থাকবার দরকার নেই, অনর্থক সব-শুদ্ধ কষ্ট পেয়ো না।'

অগত্যা দিদি সব-শুদ্ধ গাড়ীতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। মুখ বাড়াইয়া বলিয়া গেলেন—'কাল একটা খবর দিও।'

এত বড় দলটা যেন নিমেষে খালি হইয়া গেল।

তাপসী বলিলেন, 'দিদি পান নেবে, নাও না?'

'না।'

তাপসী দ্বিজেনকে বলিলেন, 'তুই একবার ভিতরে গিয়ে একটু দেখ না?'

'আপনারা যান না? আমাকে বলা হচ্ছে! বাবা যখন ডাক্‌লেন, কেন এলেন না? ডাব-লেমনেড খাবার ধুম পড়ে গেল। খাবেন আর? এনে দেব?'

'আমরা কি জানি এই রকম হবে?'

'এই রকমই দরকার আপনাদের, বেশ হয়েছে, এখন থাকুন সমস্ত রাত এখানে।'

'কেবল আমরা থাকব কি? তুইও থাকবি।'

'আমি? আমি এই চল্‌লাম। নিজেদের কর্ম্মফল নিজেরা ভোগ করুন, আমার কি দায়?'

সুরুচি বলিলেন, 'দেরী হোক, শীগ্‌গীর হোক, বাবা আর উনি বাড়ীতে যাবেনই। কিন্তু, ভুবনটা গেল কোথা? একেবারে পাড়াগেঁয়ে লোক, সবে কলকাতা এসেছে, কেন বা আনলাম ওকে!'

দ্বিজেন বলিল, 'কেন আনলেন ? কাল খবর পাবেন, ট্রাম-চাপা পড়ে—'

'তুই থাম্, এমনি ভয়ে মরে যাচ্ছি, আর ভয় দেখাস্ নে ; পরের ছেলের প্রাণ—'

তাপসী বলিলেন, 'কমল-জেজেনরা ফিরছে না এখনও-'

দ্বিজেন বলিল, 'তাদের পেলে ত ফিরবে ? নিশ্চয় পায় নি, সাধে আপনাদের উপর রাগ ধরে ? সবাই চলে গেল, পড়ে রইলাম আমরা ! এমন দশা আর কার হয়েছে ? আবার কংগ্রেসে যাবেন পরশু দিন, পরামর্শ করা হয়েছে ! যাবেন কংগ্রেসে, নিয়ে যাব !'

তাপসী বলিলেন, 'আর শাসন করিস্ নে, প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তুলেছিস্। এমন শাসন কেউ কখনও আমাদের করে নি।'

'যেমন কাজ করেছেন, ফল পাবেন না ?'

'যা পাচ্ছি তারই তুলনা নেই। তুই আর জ্বালার উপর নুণ ছড়াস্ নে।'

দু'খানা বাস্ ভরিয়া স্বেচ্ছা-সেবিকারা চলিয়া গেল।

তাপসী বলিলেন, 'ওদের কাজ সারা হয়ে গেল আজকের মত। রাত কম হয় নি। কটা বেজেছে রে ?'

দ্বিজেন বলিল, 'কটা বেজেছে, আপনাদের জ্বালায় জানবার যো আছে ? ঘড়ী আনতে পেরেছি ? যা তাড়াতাড়ি লাগালেন আসবার সময়—'

সুরুচি বলিলেন, 'তুই সব দোষ আমাদের উপর চাপাবি। নিজের ঘড়ী ফেলে এলি—দোষ আমাদের ?'

পরেশ ও কমল ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'না তাদের পেলাম না। ভিতরে সব খুঁজেছি আগাগোড়া।'

সুরুচি বলিলেন, 'ভুবন যদি পূর্বের সঙ্গে থেকে থাকে, তবেই মঙ্গল, নইলে গুর আর আশা নেই।'

পরেশ বলিল, 'বুদ্ধি খাটিয়ে যদি বাইরে চলে না গিয়ে থাকে, তবে আমি খুঁজে পাবই, আর বাস্-ওয়ালাকে বলে বাসায়ও ঠিক পৌঁছে দেবো। আমি ত রইলামই। আর যদি নিজের বুদ্ধিতে চলে গিয়ে থাকে, তবেই বিপদ্।'

—কিন্তু জেজেন কই ?

কমল বলিল, 'একসঙ্গেই ভেতরে ঢুকলাম, কিন্তু আর দেখতে পেলাম না তাকে।'

পরেশ বলিল, 'তার জন্যে কিছু ভাবনা নেই। আপনারা এখন বাড়ী যাবেন ত ?'

কমল বলিল, 'তাই যাওয়া যাক্, অনেক রাত হয়েছে।'

সুরুচি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'একে একে সবাইকে ফেলে—?'

পরেশ বলিল, 'তা বলে কি করবেন ? আর কতক্ষণ থাকবেন ? এখন যাওয়াই উচিত। ভুবনকে আমি পেলেই পাঠিয়ে দেব'

'আচ্ছা দিও। তোমার উপর ভার রইল। তোমার কর্ম্মভোগই কি কম ? সেই দুপুর থেকে আমাদের সঙ্গে ঘুরছ, কি কুক্ষণেই এক্‌জিবিশন দেখতে এসেছিলাম। ভয়ে, ভাবনায়, হতাশে আমার হাত-পা উঠছে না।'

গাড়ী ডাকিয়া কমল, দ্বিজেন ও দুই বোন উঠিয়া বসিল। বন্ধু হারাইয়া দ্বিজেন ক্রোধে ক্ষোভে চুপ করিয়া আছে। মাঝে মাঝে এক একবার অগ্নিবর্ষী চক্ষে ভগিনীদের দেখিতেছে।

বাসার সামনে গাড়ী থামিল। বাড়ীতে ঢুকিতে মন সরে না। দারুণ দুশ্চিন্তায় চারিদিক্ যেন অন্ধকার।

উপরে উঠিতেই বাসার পাচক ব্রাহ্মণ বলিল, 'কিছু দিয়ে যান নি, ঘর সব তালা-বন্ধ। আমরা বাজার থেকে সব কিনে এনে তবে রান্না করেছি।'

চওড়া বারান্দার পরে কক্ষশ্রেণী। সুরুচিদের তিনটি ঘর তালা-বন্ধ। আর একটা ঘরের দ্বার অর্দ্ধোন্মুক্ত, সেটায় বিশ্বকর্ম্মার একজন সহকর্ম্মী আসিয়া উঠিয়াছেন। সে ঘরে আলো জ্বলিতেছে ও মৃদু কথাবার্ত্তার শব্দ আসিতেছে।

কমল বলিল, 'তালা খুলুন খুড়ী মা।'

'চাবি যে ভুবনের কাছে, সে সব শেষে ঘরে তালা দিয়ে নেমেছিল।'

দ্বিজেন বলিল, 'খুব হয়েছে, চমৎকার ! এখন থাকুন বাইরে দাঁড়িয়ে।'

তাপসী বলিলেন, 'সত্যি দুর্ভাগ্যের আজ সীমা নেই।'

কমল বলিল, 'দেখি ঐ ঘরটায় কিছু পাই যদি, তাই দিয়ে তালা ভাঙব, না হলে মিস্ত্রী ডাকতে হবে।'

কপাট ঠেলিয়া ঘরে পা দিয়াই কমল বলিয়া উঠিল, 'কাকা, দাদামশায় !'

সুরুচি বলিলেন, 'কই - কইরে ?'

'এই ঘরে'

দুই বোন গিয়া উঁকি দিয়া দেখিলেন, গায়ে গরম কাপড় জড়াইয়া পিতা শয্যায় ও বিশ্বকর্ম্মা চেয়ারে বসিয়া আছেন।

পিতা বলিলেন, 'তোদের এত রাত্রি হল ?'

তাপসী বলিলেন, 'আপনাদের খুঁজতে খুঁজতেই ত আমাদের এই দশা।'

পিতা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, 'আমাদের খুঁজেছিস্ মানে ? আমরা ছেলেমানুষ না কি ? আমরাই তোদের না পেয়ে শেষে চলে এলাম। ভাবলাম, তোদের দেখা সারা হয় নি, দেখে শুনে পরে যাবি।'

দ্বিজেন বলিল, 'বাবা ! সব দোষ দিদিদের,—আমি গিয়ে বললাম, বাবা ডাকছেন চলুন, তা ওঁরা কানেই তুললেন না। ডাব সোডা-লেমনেড খেতে আরম্ভ করলেন, গ্রাহ্যই নেই।'

তাপসী বলিলেন, 'আচ্ছা মিছে কথা বলিস্ কেন ?'

দ্বিজেন বোনদের মুখের সামনে হাত নাড়িয়া বলিল, 'মিছে কথা ?—মিছে কথা ? করেন নি দেরী ? আবার পান কিনতে আরো দেরী হল !—তখন আমার কথা খেয়াল করা হল না, এখন বলছেন মিছে কথা !—'

বিশ্বকর্ম্মা সরোষে চাহিয়া কথাবার্ত্তা শুনিতেছেন—রাগ বাড়িবার উপায় নাই।

পিতা বলিলেন, 'তোর বড়দি ?'

'বড়দিরা চলে গেছে বাসায়, ওখান থেকেই। আমরা আসবার সময় ভুবনকে হারিয়ে এলাম—'

—'বলিস্ কি ? ভুবনকে হারিয়ে এসেছিস ? সে তোদের সাথেই আগাগোড়া ছিল, হারাল কি করে ?'

দ্বিজেন বলিল, 'আমরা দিদিদের নিয়েই অস্থির !—এত রাত হলো তবু কি আসতে চায় ? এক রকম টেনেই এনেছি। ওদের নিয়েই ব্যস্ত রইলাম, সে যে কোন্ দিকে গেল দেখতে পেলাম না।'

তাপসী বলিলেন, 'তুই আমাদের আবার কি করেছিস্ ? শুধু শাসন আর ধমকানি ছাড়া আর কি যে ? সব ভেজেন, কমল, পরেশ করেছে।'

পিতা বলিলেন, 'লোকটা একটু বোকা ধরণের, পথ চিনে এতদূর আসতে পারবে বলে মনে হয় না। বাড়ীর নাম ঠিকানাও বোধ হয় জানে না।'

বিশ্বকর্ম্মা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া বলিলেন, 'ব্যাটা একেবারেই বোকা। ট্রাম-বাসের ছুটো-ছুটি দেখেই তার প্রাণ চমকে যাবে। কোথায় গাড়ী-চাপা পড়ে থাকবে—'

তাপসী ও সুরুচি সরিয়া আসিলেন। সুরুচি রুদ্ধ-দ্বার ঘরের সামনের বারান্দার রেলিংয়ে ভর দিয়া দাঁড়াইলেন। রেলিংয়ের পরেই সিঁড়ি, সেই দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'কেন আনলাম ? নিয়ে এসে তার প্রাণ নষ্ট করলাম !'—বলিতে বলিতে শঙ্কা, দুঃখ ও অনুতাপে চক্ষের জল পড়িতে লাগিল।

কমল তালা ধরিয়া টানাটানি করিয়া দেখিতেছে,—দ্বিজেন কখনও উচ্চস্বরে, কখনও মৃদুভাবে ভগিনীদ্বয়কে তর্জ্জন করিতে লাগিল।

ঠিক এমনই সময়ে একটি দীর্ঘ মূর্ত্তি সিঁড়ি দিয়া উঠিতে লাগিল, পিছনে আর একটি খর্ব্ব মূর্ত্তি। সিঁড়ির আলো জ্বালা হয় নাই—বারান্দার আলো পড়িয়াছে। দ্বিজেন বকুনি থামাইয়া ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিল, 'এই যে ভুবন !—কোথা ছিলি ব্যাটা ? আমরা ভেবে মরছি তোর জন্য,—এই যে পূর্ণ, আঃ কোথাগেছলে তুমি !'—

কমল তালা ছাড়িয়া সরিয়া আসিল। ভুবন হাসিয়া বলিল, 'এই বাবুর লগে ছিলাম, আপনারা চইল্যা আইলেন, আমাগো ভিড় দেইখা ডর লাইগা গেল—ক্যামনে আসুম কন দেহি ? শ্যাষমাশ দেখি ছোট মামাবাবু পিছন থেইকা ডাকা-ডাকি করছেন। মামাবাবু ঠিকানা কইয়া দিয়া বাস-গাড়ীতে তুইলা দিলেন, কইলেন, মোর লগে চাবি, আপনারা বেবাকে ঘরে ঢুইকবার না পাইয়া বাইরে খাড়াইয়া আছেন।'

কমল বলিল, 'নে ব্যাটা, আর দাঁত বার করে হাসতে হবে না। ঘর খোল এখন। তোর জন্যে সবাই আধমরা হয়ে গেছি আজ, ভয়, ভাবনা, শীতে, আর খুঁজতে খুঁজতে—'

সিঁড়ি দিয়া তেজেন উঠিয়া আসিল। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ঈষৎ শুষ্ক মুখ, কিন্তু সে মুখ প্রফুল্ল, সরল ও উজ্জ্বল, সমস্ত ভাবনা, উদ্বেগ, চিন্তা, ভয় নিঃশেষে দূর করিয়া, সব সমস্যার সমাধান করিয়া, সবশেষে যেন সুধা-পাত্র লইয়া উঠিয়া আসিল।

সুরুচি ও তাপসী দুইদিক্ হইতে প্রশ্ন করলেন—'এত দেরী কেন করলি তুই একা ?'

তেজেন বলিল, 'আমি একজিবিশনের ভিতর পূর্ণবাবু আর ভুবনকে খুঁজছি, কমলবাবু আর পরেশবাবু চলে এলো দূর থেকে দেখলাম, শেষে দেখি এক কোণে ভুবন আর পূর্ণবাবু ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওদের নিয়ে গেট পার হতে হতে দেখি, আপনারা ট্যাক্সিতে উঠে চলে এলেন। ভুবনের কাছে চাবি ছিল, সেই জন্যে তখনি একটা বাসে ওদের পাঠিয়ে দিলাম। আমি আর একবার বাবা, আর জামাইবাবুর খোঁজ করে দেখে এই আসছি।'

কমল বলিল, 'কাকা আর দাদামশায় সন্ধ্যার আগেই চলে এসেছেন।'

তেজেন সাগ্রহে বলিল, 'কই ?'

'ঐ ঘরে বসে রয়েছেন।'

তেজেন হাসিয়া বলিল, 'থাক্ বাঁচা গেল !'

দ্বিজেন বলিল, 'এই দুর্ভোগটা কেবল আপনাদের দুজনার জন্যে। আমি হাজার বার বললাম, তাঁরা বাড়ী চলে গেছেন, আমরা চলে যাই, চলুন। তা কেউ যদি শুনলেন আমার কথা, এখন দেখুন !—'

কমল বলিল, 'তোমার খালি চালাকি !—ও কথা কখন বলেছিলে তুমি ?

—'বলি নি ? ভুলে গেছিস্ নিশ্চয়। তোরাও দিদিদেরই মতন। বুদ্ধি-শুদ্ধি কিছু নেই, শুধু বোকার মত ঘুরতে শিখেছিস্ !'

বন্ধু সম্ভাষণান্তে দ্বিজেনের রাগ নিবিয়া গিয়াছে। কথায় এখন তেমন উষ্ণতা নাই।

তাপসী বলিলেন, 'এখন যত খুশী বল—আর কিছু বল্‌বো না।'

সুরুচি বলিলেন, 'শেষ রক্ষা করলে তেজেন ! উঃ, পরিত্রাণ পেলাম যেন ! সমস্তটা দিন আমাদের ওপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেছে !—একজিবিশনের পায়ে প্রণাম !'

জন্মাষ্টমী

—শ্রীশীতলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কুজ্ঞান আজি কংস দানবের মূর্ত্তিতে পরিপাটী,
শৃঙ্খলিত করিয়া রেখেছে সারা জগতের মা-টী।

সারা জগতের "মা-টী" রে, ভাই, গুরু পাষাণের ভারে—
পিষ্ট, ক্লিষ্ট, জর্জ্জরিত, ক্ষত বিক্ষত গা-রে !

রক্ত ঝরিছে শতধারে, ভাই, পলে পলে তনু ক্ষীণ ;
শুষ্ক হয়েছে অমৃতের ধারা, হইয়াছে রসহীন।

সরল শত সন্তান যার ব্যর্থ আয়াস ভরে—
একমুষ্টি আহারের তরে "মা-টী" কর্ষণ করে ;
মেলে না তাহার ন্যায্য আহার খেটে খেটে দিনরাত,
বলে, 'মন্দ বরাত—কি করি—কি করি,' কপালেই করে করাঘাত !

দেশের মধ্যে বিজ্ঞ যাহারা তাহাদের কাছে গিছে—
প্রতিকারের আশায় তাহারা ঘুরে মরে পিছে পিছে !
কুজ্ঞানমদে মত্ত তাহারা,—কোথা পাবে সন্ধান !
অন্ধ কভু অন্য অন্ধরে পারে না দিতে চক্ষুদান।
অমৃতভ্রমে গরল নিত্য হোথা ওরা করে পান !
হেথা কপালেরে দোষ দিয়ে এরা ক্ষুধায় রয়েছে ম্রিয়মাণ !
এদিকেতে হায় শ্যামলা সরসা মা যে আমাদের রোজ—
দানব-পীড়নে শুষ্ক সাহারা—কে লয় তাহার খোঁজ !
করে কুজ্ঞান নব নব শত যন্ত্র আবিষ্কার,—
মনে হয় এবে হবে অবসান দারুণ বুভুক্ষার !
কিন্তু কোথায় ? কোথা অবসান ? কোথা, ভাই, প্রতিকার ?
বরং নূতন যন্ত্র যন্ত্রণা-ভার বাড়ায় শতেকবার।
মুক্ত করিতে যন্ত্রণাভার, দানিতে বিজ্ঞান-নীতি,
এস—এস—ওগো নারায়ণ ! আজি অষ্টমী তিথি।
এই কৃষ্ণা রজনীর ভেদি' তমিস্রা এস গো পরমহংসে !
উদ্ধার কর "মা-টী" কে মোদের ! নাশ কুজ্ঞান কংস !

নদীয়ার কথা

—শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য্য

রাজস্ব ও অর্থনৈতিক বিবরণ

রাজস্বের বিবরণ হইতে রাজ্যের অর্থনৈতিক বিবরণ অনেকটা অনুমান করা যায়। কারণ, দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি, শৃঙ্খলা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি সর্ব্ববিধ সুখ-সচ্ছলতার সহিত তাহার রাজস্বের উন্নতি-অবনতি যে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

নদীয়ার রাজস্ব-বিবরণ পর্য্যালোচনা করিতে গিয়া দেখা যায় যে, মোগল আমল পর্য্যন্ত এখানে সুশৃঙ্খলভাবে রাজস্ব আদায়ের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাস আলোচনাপ্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এখানে কোন প্রকার শান্তিপূর্ণ স্থায়ী রাজশাসন স্থাপিত হয় নাই। দেশীয় ভূমাধিকারিগণের মধ্যে যে যখন সুযোগ পাইয়াছেন, তখনই ঊর্দ্ধতন রাজন্যবর্গের অধীনতা অস্বীকার করিয়া স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছেন। ফলে, এই সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া বিধিবদ্ধভাবে রাজস্ব সংগ্রহের কোনও নিয়মিত ব্যবস্থাই গঠিত হইতে পারে নাই। যে যখন যেমন ভাবে পারিয়াছেন, প্রয়োজনমত অর্থ আদায় করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র।

বলাই বাহুল্য, দিল্লীশ্বরগণ এখান হইতে বহুদূরে অবস্থিত থাকায়, তাঁহাদের রাজস্ব-সংক্রান্ত আইন-কানুন এতদূর পর্য্যন্ত আসিয়া প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। আইনতঃ, দিল্লীশ্বরের অধীন হইলেও রাজস্বের বিলি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে স্থানীয় রাজন্যবর্গের ক্ষমতা ও প্রয়োজনানুযায়ী সাময়িক আইনই বলবৎ ছিল।

ইতিপূর্ব্বে আকবর সাহের আমলে রাজা টোডরমল্ল একবার সমগ্র বঙ্গদেশ জরিপ-জমাবন্দী করিয়া রাজস্ব-আদায়ের সুবন্দোবস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাতে সমগ্র বঙ্গদেশ ১৯টি সরকারে বিভক্ত হইলে পর নদীয়া সপ্তগ্রাম সরকারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে এই সপ্তগ্রাম সরকারের বার্ষিক রাজস্ব ছিল ৬১,০৭,২৪,৬২০ দাম (৪০ দাম = ১ টাকা), কিন্তু টোডরমল্লের এই ব্যবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই।

১৭০৪ খৃষ্টাব্দে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ বাংলার মসনদে আরোহণ করিয়া পুনরায় বাংলার রাজস্ব-ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আনয়নের চেষ্টা করেন এবং কিয়ৎপরিমাণে সফলকামও হন। এই হিসাবে মুর্শিদকুলী খাঁই সর্ব্বপ্রথম বাংলায় নিয়মিতভাবে রাজস্ব-আদায়ের বন্দোবস্তে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, মনে হয়। * মুর্শিদকুলী খাঁ কার্য্যের সুবিধার জন্য বঙ্গদেশকে ৩৪টি বড় বড় খণ্ডে বা চাকলায় বিভক্ত করিয়া ফৌজদারী দণ্ডবিধি ও রাজস্ব-সংগ্রহবিধির কয়েকটি সীমানা (jurisdiction) নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। এই সূত্রে উখাড়া পরগণার অন্তর্ভুক্ত নদীয়ার খানিকটা অংশ মুর্শিদাবাদ চাকলার অধীনে ও বাকি অংশ সপ্তগ্রাম চাকলার অধীনে গিয়া পড়ে।

এইভাবে কিছুকাল চলিবার পর ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী সুবে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের দেওয়ানী-পদ লাভ করিলেন, কিন্তু রাজস্ব-আদায় সংক্রান্ত প্রচলিত পন্থা সহসা পরিবর্ত্তন করিতে তাঁহাদের সাহস হইল না। একার্য্যে পূর্ব্বে বিদেশী বণিক্-সম্প্রদায়ের কোনও অভিজ্ঞতাই ছিল না, তাই অকস্মাৎ বাংলার অর্থনৈতিক কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়া রাজস্ব-আদায়ের পূর্ব্বতন প্রথাই বহাল রাখিলেন বটে, কিন্তু কাজকর্ম্মে বহু প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল।

ইতিপূর্ব্বে মুসলমান শাসনাধিকারে দৈহিক-দণ্ডপ্রদান ও ভয়াবহ পীড়ন-নীতি দ্বারা অনাদায়ী রাজস্ব আদায় করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে বাকী রাজস্বের জন্য জমিদারদের হেটমুণ্ডে, ঊর্দ্ধপদে ঝুলাইয়া রাখা হইত ও বিষ্ঠা-কুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইত ও আরও অনেক প্রকার অমানুষিক অত্যাচার করা হইত বলিয়া ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্ট

---

* It was not until the advent of Murshid Kuli Khan as governor in 1704 that any real attempt was made to enforce the regular payment of land revenue.

B. D. Gazetteer, Vol. XXIV—Garrett.

সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন।* ইংরাজেরাও অগত্যা প্রথম প্রথম উক্ত দৈহিকদণ্ডপ্রদান-প্রথাই অনুসরণ করিয়া নদীয়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানের নিরীহ প্রজাবর্গকে তরবারী-আস্ফালনে মান ও প্রাণের ভয় দেখাইয়া সিপাহী দ্বারা রাজস্ব আদায় করিতে লাগিলেন। †

সমগ্র দেশ তখন রাষ্ট্রবিপ্লবে উদ্বেলিত। প্রজাবৃন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া জমিদারবর্গ সকলেই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভয়ে শঙ্কিত। আজ যাহার যাহা আছে, কাল তাহা থাকিবে কি না, রাজ-পরিবর্ত্তনের যুগসন্ধিক্ষণে তাহার কোনই নিশ্চয়তা না থাকায়, নিয়মিতরূপে রাজস্ব আদায়ের সুনিয়ন্ত্রণ তখন সম্ভব হয় নাই। কিন্তু, নবরাজ্য-গঠনে ইংরাজদের তখন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তাই অর্থ আদায় করিতে গিয়া জন-সাধারণের সুখ-দুঃখ, আর্থিক অবস্থা, নৈসর্গিক বিপৎপাত প্রভৃতি কোন দিকেই তাঁহারা নজর দিবার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। এই সময়েই 'ছিয়াত্তরের (বাঙ্গলা ১২৭৬ সাল) মন্বন্তর' নামে খ্যাত ভীষণ দুর্ভিক্ষের প্রকোপে সমস্ত দেশ জুড়িয়া হাহাকার পড়িয়া গেল। উদরান্নের জন্য লোকে সন্তান বিক্রয় করিল, বৃক্ষপত্র, এমন কি নরমাংস পর্য্যন্ত আহারে পশ্চাৎপদ হইল না। অনাহার-ক্লিষ্ট পশু ও মনুষ্যের মৃতদেহে পথঘাট পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। জানা যায়, বঙ্গদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী ইহাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু, এই দারুণ মন্বন্তরের অবস্থাতেও পূর্ব্বের হারেই রাজস্ব আদায় করিতে গিয়া দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত জনগণের দুঃখ-বেদনা যে আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, ওয়ারেণ হেষ্টিংস স্বয়ং তাহা স্বীকার করিয়াছেন। ‡

যাহা হউক, পূর্ব্ব-প্রচলিত অনিশ্চিত প্রথায় রাজস্ব সংগ্রহ করা যে দূরদর্শিতার পরিচায়ক নহে, ইংরাজদিগের তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। উক্ত প্রথার সর্ব্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি আনুপূর্ব্বিক পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে রাজস্ব-বিভাগের সদর সরকার মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হইল এবং আদায়-কার্য্যের সুবিধার জন্য প্রত্যেক জেলায় এক এক জন আদায়কারী ইংরাজ কর্ম্মচারী (collector) নিযুক্ত করা হইল।

ইতিপূর্ব্বে কিছুকাল প্রতি বৎসর নূতন করিয়া প্রকাশ্য নীলামে সর্ব্বোচ্চ মূল্যে জমিদারী স্বত্ব বা রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা বিক্রয় করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল—ফলে, জমির সহিত জমিদারের কোনই স্থায়ী সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিতে পারে নাই, বরং এই নীলামী বন্দোবস্ত-ব্যবস্থায় বহু প্রাচীন অভিজাত ঘর বিলুপ্ত হইয়া তৎস্থলে নূতন নূতন কূটবুদ্ধি-সম্পন্ন অর্থশালী ব্যক্তি সাময়িক ভাবে জমির সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া পড়িতে লাগিলেন এবং কোম্পানির অনাদায়ী রাজস্বের অঙ্কও ক্রমশঃ স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তখন ধীরে ধীরে ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া অধিকার বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, লোকবল ও অর্থবল সে সময়ে তাঁহাদের একান্ত প্রয়োজন। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাইবার নিশ্চয়তা না থাকিলে তাঁহাদের একটুও অগ্রসর হওয়া চলে না, অথচ, প্রত্যেকটি প্রজার সম্মুখীন হইয়া রাজস্ব সংগ্রহ করাও সম্ভব নহে, উপরন্তু নীলামী প্রথায় রাজস্বের পরিমাণও অনির্দ্দিষ্ট। এই সকল বিবেচনা করিয়া এদেশে কোম্পানীর বনিয়াদ পাকা করিয়া তুলিবার জন্যই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃষ্টি। ভূমি-রাজস্বই তখন গভর্ণমেণ্টের একমাত্র অবলম্বন এবং ইহা আদায় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া সে সময়ে তাঁহাদের পক্ষে যে কত প্রয়োজনীয় ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

মুসলমান আমলে সাধারণভাবে দেশের রাজস্ব কিছু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু ইংরাজ আমলের প্রথমে ইহা

*...When a district was in arrear, he (Moorsheed Cooly Khan) used to deliver over the captive Zemindar, to be tormented by every species of cruelty; as hanging up by feet, bastinadoing, setting them in the sun in summer, by stripping them naked, etc.

The History of Bengal—C. Stewart

†...A military tenure was adopted and the revenue was collected by sepoys. The Zemindar was a semi-military collector of revenue, which was realised at the point of sword, a practice adopted even by the English when they first took possession of Burdwan, Birbhum and Nadyia.

Introduction to Long's Unpublished Records—LIV

‡ That the lands had suffered unheard-of depopulation by the famine and mortality of 1769; that the collectors violently kept up their former standard, had added to the distress of the country...

Letter to the Secret Committee, W. Hastings.

ভীষণ হারে বর্দ্ধিত হয়। * উৎপন্ন ফসলের ৯/১০ অংশই তখন রাজস্ব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। জমিদার ও প্রজার থাকিত ১/১০ অংশ মাত্র এবং ইংলণ্ডে তখন ভূমিরাজস্বের হার ছিল উৎপন্ন ফসলের ১/৫ কি ১/৮ অংশ মাত্র। † বলা বাহুল্য, ইহা কোম্পানীর আমলের কথা, যখন এদেশে প্রকৃত পক্ষে ইংরাজ-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বলা যায় না।

বলা হইয়াছে যে, তৎকালে কোম্পানীর আয়ের যে যে পথ ছিল, ভূমিরাজস্বই তন্মধ্যে প্রধান, ১৭৯০-৯১ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা হইতে ২৬৮ লক্ষ টাকারও অধিক রাজস্ব আদায় হইয়াছিল। ইংরাজ আমলের প্রথম পঞ্চাশ বৎসরের রাজস্ব-বিবরণ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই বাংলার রাজস্ব হইতেই ইংরাজ কোম্পানী ভারতবর্ষের এই বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছেন। এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাই হইতে তাঁহাদের যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় হইত, তাহাতে সেইখানকার শাসনব্যয়ই সঙ্কুলান হইত না।

যাহা হউক, বাংলার এই গুরুভার রাজস্বের মোট অংশ সংগৃহীত হইত নদীয়া হইতে। সমগ্র বাংলার মধ্যে সুজলা সুফলা ও নদীবহুলা বলিয়া নদীয়ার তখন খ্যাতি ছিল। বিবিধ পণ্যবাহী নৌকা তাহার নদীপথে, হাটে-গঞ্জে, নগরে বাণিজ্য-সম্ভার বিতরণ করিয়া বেড়াইত। নদীয়ারাজের সুশাসনে রাজ্যমধ্যে শান্তি-সমৃদ্ধি বিরাজ করিত। কোম্পানী ইহাতে নদীয়া সম্বন্ধে অনেক উচ্চধারণা পোষণ করিতেন, তাই নদীয়ার রাজস্বের হার যথোপযুক্ত নির্দ্দিষ্ট করিয়াও প্রথম প্রথম কিছুতেই তাঁহারা তৃপ্ত হন নাই। ইতিপূর্ব্বে যে পরিমাণ রাজস্ব নদীয়া-রাজের দেয় ছিল, কোম্পানী বাহাদুর নদীয়ার পক্ষে তাহা একেবারেই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে করিয়াছিলেন এবং বহুপ্রকার হেয় এবং নীচ দুরভিসন্ধির ফলেই যে এই প্রকার বৎসামান্য কর ধার্য্য হইয়াছে, অর্থনীতিবিদ্ গ্রাণ্ট সাহেব তাহা স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করিয়াছিলেন।

১৭৯০ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী বার্ষিক নিলামী বন্দোবস্ত প্রথা লোপ করিয়া জমিদারবর্গের সহিত ১০ বৎসরের মেয়াদী বন্দোবস্ত-প্রথা প্রথমে প্রচলন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিন বৎসর পরেই ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে উক্ত বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হইয়া যায়।

এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে—

১। যাহাদের সহিত বন্দোবস্ত হইল, তাঁহারাই জমির প্রকৃত মালিক বলিয়া গণ্য হইলেন।

২। জমির রাজস্ব চিরদিনের মত নির্দ্দিষ্ট হারে জমিদার-দিগের সহিত বন্দোবস্ত হইল।

৩। স্থির হইল যে, সুদিন দুর্দ্দিন যাহাই আসুক উক্ত নির্দ্দিষ্ট হারের কিছু মাত্র হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিবে না।

৪। উক্ত যথা-নির্দ্দিষ্ট খাজনা সম্পূর্ণভাবে নির্দ্দিষ্ট দিবসে ও নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।

৫। অন্যথায় উক্ত খাজনা-সম্পর্কিত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ঘাটতি রাজস্ব পূরণ করা হইবে।

বলাই বাহুল্য, এই বন্দোবস্তের ফলে রাজস্ব আদায়ের অনিশ্চয়তা হইতে গবর্ণমেণ্ট একেবারেই নিশ্চিন্ত হইলেন।

মুসলমান আমলে রাজস্ব কম-বেশী যেমন হৌক, সম্পূর্ণ ভাবে তাহা কখনই আদায় হইত না এবং অনাদায়ী খাজনার জন্য জমিদারদের জমিও অকস্মাৎ বিক্রয় হইয়া যাইত না।

নব প্রথার ঠিক দিনে সম্পূর্ণ রাজস্ব জমা দিতে না পারায়, বহু জমিদারী এক দিনের ত্রুটিতে হস্তান্তরিত হইয়া যাইতে লাগিল এবং ভূমি-রাজস্বের গুরুভার বহু প্রাচীন জমিদার-বংশকে পিষিয়া ফেলিতে লাগিল।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তখন এই সুবিস্তীর্ণ নদীয়া জেলার ভূস্বামী। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে এই জেলার মোট রাজস্ব ধার্য্য ছিল ৯ লক্ষ মুদ্রা। ইহার মধ্যে-৮,৩৫,৯১২৲ টাকা নবাব সরকারে জমা দিতে হইত এবং ৬৪,৩৪৮৲ টাকা কোম্পানীর প্রাপ্য রাজস্বের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু, মীরজাফরের অঙ্গীকৃত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য টাকার নিমিত্ত, নদীয়া জেলা

* The Honourable Court of Directors have now in thier possession authentic documents, which shew that the assessment, fixed by the Mogul Government on these provinces, was light and moderate in comparision with ours.

Original minutes of the Governor General and Council of Fort William.—P. Francis.

† In England from four-fifths to seven-eights of the produce are left with the proprietors. In Bengal only one-tenth ; to this the Zemindar has a right—

F. Francis.

ইংরাজদের নিকট বন্ধক দেওয়া ছিল। এই সূত্রে পরে কৃষ্ণচন্দ্রের দেয় সমুদয় রাজস্বই ইংরাজ সরকারে জমা দিতে হইত। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, দেশের তাৎকালিক রাষ্ট্র-নৈতিক বিপ্লবের ফলে সময়ে উক্ত খাজনা রাজ-সরকারে জমা দিতে না পারায়, ইংরাজদের নিকট হইতে বহুতর লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় এবং নদীয়া রাজ্য কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া শোভাবাজারের নবকৃষ্ণদেব বাহাদুর-প্রমুখ কয়েকজন ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকটে তিন বৎসরের মেয়াদে ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু, কোম্পানী ইহাতে আশানুরূপ সুফল লাভ করিতে পারেন নাই। নবনিযুক্ত ইজারদারগণ চুক্তি-মত অর্থ যথাসময়ে জমা দিতে পারিলেনই না, উপরন্তু প্রজাবর্গের উপরে অযথা অত্যাচার-উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়া দিলেন।*

পরিশেষে কৃষ্ণচন্দ্র ইজারাদারদের সমুদয় সর্ত্তে রাজী হইয়া তাঁহার বাকী রাজস্ব কিস্তিবন্দী হারে পরিশোধ করিবার অঙ্গীকারে চুক্তিপত্র লিখিয়া দিয়া রাজ্য ফিরাইয়া পান।

ইহার পরে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ যখন সমগ্র বাংলার রাজস্ব-সংগ্রহ-প্রথার সংস্কার সাধন করিতে গিয়া জমিদারগণের সঙ্গে নূতন করিয়া মেয়াদী বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন, সেই সময়ে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার সমগ্র জমিদারী তদীয় পুত্র শিবচন্দ্রের নামে বন্দোবস্ত করাইয়া লন এবং ভবিষ্যতে তাঁহার মৃত্যুর পর অন্যান্য পুত্রের মধ্যে শিবচন্দ্রকেই তাঁহার সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করিয়া এক উইল সম্পাদন করিয়া যান। মৃত্যুর পরে ইচ্ছানুরূপ বিষয় বিভাগ করিবার ইহাই বাংলা দেশের সর্ব্বপ্রথম উইল।

যাহা হউক, ১৭৮২ খৃঃ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র দেহত্যাগ করিলে পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শিবচন্দ্র ছয় বৎসর মাত্র (১৭৮২-১৭৮৮) নদীয়ার জমিদারী পরিচালনা করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব-কালে কোম্পানী পুনরায় তাঁহার রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়াছিলেন এবং পরে মহারাজা সমুদয় বাকী বকেয়া রাজস্ব কিস্তিবন্দী ভাবে পরিশোধ করিবার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়া প্রত্যাহৃত ক্ষমতা পুনঃপ্রাপ্ত হন*। কিন্তু শিবচন্দ্র তাঁহার অঙ্গীকার শেষ পর্য্যন্ত পালন করিতে পারেন নাই বলিয়া পূর্ব্বচুক্তিমত ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞাপন-প্রচার দ্বারা নদীয়া-রাজ্যের রাজস্ব-আদায় ক্ষমতা আবার কিছু কালের জন্য রহিত করা হয়।†

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ প্রতি জেলায় রাজস্ব আদায় করিবার নিমিত্ত কালেক্টরের পদ সৃষ্টি করেন এবং নদীয়া জেলাতেই সর্ব্বপ্রথম ইংরাজ কালেক্টার বহাল করা হয়। ইঁহার নাম মিঃ রেড্‌ফারণ। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে শিবচন্দ্রের পর ঈশ্বরচন্দ্র নদীয়াধিপতি হইলেন পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী বাহাদুর রাজস্ব-আদায়ের জন্য জমিদারদিগের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলেন। নদীয়ার যে সুবৃহৎ রাজ্যে এতকাল পর্য্যন্ত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও তদ্বংশীয়গণের একাধিপত্য ছিল, বর্ত্তমান বন্দোবস্ত অনুসারে ইহা ২৬১টী স্বতন্ত্র তালুকে বিভক্ত হইয়া ২০৫ জন স্বতন্ত্র জমিদারের অধীনস্থ হইয়া পড়ে। অবশ্য, নদীয়া-রাজেরাই আদায়-কার্য্যের সুবিধার জন্য বা এককালীন কিছু অর্থ সেলামী-লাভের নিমিত্ত যৎসামান্য মুনাফায় বহু ছোট ছোট তালুকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং তালুকদারগণ এতাবৎ নদীয়া রাজসরকারেই রাজস্ব জমা দিয়া আসিতেছিলেন। এইবার কোম্পানী বাহাদুর তাঁহাদের স্বতন্ত্র জমিদার স্বীকার করিয়া কোম্পানী বরাবর খাজনা জমা দিবার অধিকার প্রদান করিলেন। ফলে, নদীয়া-রাজের রাজ্য ভাঙ্গিয়া বহুসংখ্যক জমিদারের উদ্ভব হইল; নদীয়ারাজের সহিত তাঁহাদের আর কোন সম্বন্ধ রহিল না।

এইরূপ ভাবে একটি সুবৃহৎ জমিদারী ভাঙ্গিয়া বহুসংখ্যক ছোট ছোট তালুকের সৃষ্টি করিবার মধ্যে ইংরাজদের একটি উদ্দেশ্যের আভাষ পাওয়া যায়, রাজ্যমধ্যে অর্থবলে ও

* ...A Letter by Richard Beeche.
Long's Selection of U. P. R. no. 610 etc.

* Vide, petition from Rajah of Nadia binding himself on the statement of current year being made with him to pay up the revenue list together with balance on pain of feiture of Zamindary in case of failure—
Letter No. 147, Hunter's Bengal Mss, Records.

† Advertisement forbidding any collection being made in Nadiya by the Raja or his amlah—7th. April, 1783.
Ibid—Letter no. 307

লোকবলে সহসা কেহ বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিলে রাজ্যের নিরাপত্তার দিক্ দিয়া রাজার সন্দেহের কারণ ঘটে। বিশেষতঃ, তৎকালীন রাষ্ট্রবিপ্লবের দিনে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের ভূস্বামী হিসাবে প্রভূত অর্থ ও জনবলের অধিকারিবর্গকে ইংরাজেরা প্রীতির চক্ষে না দেখিয়া পারেন নাই। যুদ্ধ-বিগ্রহের সময়ে বা বৈপ্লবিক কূট অভিসন্ধির জালে এই প্রতাপশালী জমিদারগণ নবপ্রতিষ্ঠিত কোম্পানী-রাজের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারেন বলিয়া গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ স্পষ্টই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে এই জেলার মোট রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট হয়, ১২,৫৫,৩২৫ টাকা।

অবশ্য, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সত্ত্বেও উক্ত রাজস্বের নির্দ্দিষ্ট হার একরূপ থাকে নাই। নিম্নলিখিত নানা কারণে উহার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়াছে।

১। নদীয়ার আয়তন পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অনেক হ্রাসপ্রাপ্ত। ইংরাজ আমলের সূচনায় সমগ্র প্রেসিডেন্সি বিভাগই প্রায় নদীয়া জেলা-নামে অভিহিত হইত। ক্রমশঃ, এই বিশাল পরিধি হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান আকৃতি ধারণ করিয়াছে। সুতরাং আকার পরিবর্ত্তনের জন্য রাজস্বেরও বর্ত্তমানে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

২। নদীর ভাঙ্গাগড়ায় বা অন্যান্য কারণে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বহির্ভূত অস্থায়ী বন্দোবস্তী সম্পত্তির (temporary settled states) উদ্ভব হয়। অবস্থানুযায়ী মেয়াদী হারে জমিদারদের সঙ্গে ইহা বন্দোবস্ত হয় বলিয়া রাজস্বও ইহার একরূপ থাকে না।

৩। বাধ্যতামূলক জমিক্রয়ের আইন অনুসারে (Land acquisition) বহু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী জমি রেলওয়ে বা অন্যান্য কাজের জন্য গবর্ণমেণ্ট দখল করিয়া লওয়ায়, প্রাপ্য রাজস্বের অঙ্ক কমিয়া গিয়াছে।

সুতরাং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বহাল থাকিলেও নদীয়ার রাজস্ব পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং নদীয়া-রাজের একটী জমিদারী ভাঙ্গিয়া ১৭৯৩খৃঃ যে ২৫১টি তালুকের সৃষ্টি হইয়াছিল, বৎসরের পর বৎসর ক্রমশঃই তাহার সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া চলিয়াছে। নিম্নে কয়েক বৎসরের একটা মোটামুটি তালিকা দিলাম—

বৎসর	চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তালুকের সংখ্যা	ভূমি-রাজস্বের টাকা
১৭৯৩	২৫১	১৩৫৯৯০২
১৮০০	৭৫৭	১৩৪৯৬৩০
১৮৫০	৩০৩৪	১১১৪৪৯২
১৯০৯	২২৩৪	৯০২২২৮
১৯২০	২২৪৫	৮০১১৭২
১৯৫০	২২৫০	৯৯৭৫৯৯

উল্লিখিত তালিকা হইতে দেখা যায়, ১৭৯৯-১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভূমি-রাজস্ব যাহা ছিল (১৩,৪৯,৬৩০ টাকা) তাহা ক্রমশঃ কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই রাজস্ব হ্রাস, জেলার আয়তন কমিবার জন্যই। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বনগ্রাম সবডিভিসন যশোহর জেলার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর হইতে নদীয়ার আয়তনের বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, রাজস্বের অঙ্কও প্রায় এক প্রকারই আছে।

ভূমি-রাজস্ব ছাড়াও গবর্ণমেণ্টের আরও যে অনেক প্রকার কর প্রাপ্য আছে, তাহার মধ্যে সেস-করই প্রধান। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-প্রথায় নির্দ্ধারিত ভূমি-রাজস্ব বর্দ্ধিত করিবার উপায় নাই। কিন্তু, তাহারই পরিপোষক-হিসাবে সেস ক্রমশঃই এত বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে যে, ইহার ফলে অনেক স্থলে তালুকের খাজনা অপেক্ষাও সেস অধিক হইয়া পড়িয়াছে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এই রোড-সেস-আইন পাশ হয় এবং তাহার পর হইতে এই অতিরিক্ত ক্রমবর্দ্ধমান কর প্রজার দেয় রাজস্বের হারকে যে কি পরিমাণ স্ফীত করিয়া তুলিয়াছে, তাহা নিম্নের তালিকাটি হইতে সহজেই অনুমিত হইবে।

বৎসর	সেস্ টাকা
১৯.২	১,৮৩,১৩১
১৯১৩	১,৯৩,৫৭১
১৯২০	১,৯৩,৫৫৮
১৯২৪	১,৯৫,৬৩১
১৯২৭	২,১৩,৭৩৫
১৯২৮	৩,২৩,১৩১
১৯৩০	৩,২৫,৭২৯

নদীয়ার আর্থিক অবস্থা আজ অতি শোচনীয়। ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে যাহার সমৃদ্ধির খ্যাতি সর্ব্বজনবিদিত ছিল, তাহাই আজ দরিদ্রতম জেলা বলিয়া অভিহিত। পূর্ব্বেকার ঐশ্বর্য্যের কথা আজ ইতিহাসের গল্প হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এত অল্পকালের মধ্যেই নদীয়ার এই সর্ব্বাঙ্গীন দুর্দ্দশা কেমন করিয়া ঘটিল, ভবিষ্যতে স্বতন্ত্রভাবে তাহার যথাসম্ভব আলোচনা করা যাইবে।

দ্রব্যমূল্য-গবেষণার সমস্যা

—শ্রীসুশীল রায়

বর্ত্তমানে বিজ্ঞান-জগতে পর্য্যবেক্ষণ এবং তথ্য-সংগ্রহের উদ্যম অপেক্ষা গবেষকবর্গের কল্পিত মতবাদ স্থাপন করার দিকে আগ্রহ অধিক। বিজ্ঞান-জগতের এই ঘাটতির দরুণ জ্ঞানের যে সংকীর্ণতা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা অর্থ-নীতি-ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ করা যায়। এই ক্ষেত্রে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গবেষণার যেটুকু কাজ হইতেছে, তাহা কেবলমাত্র অন্যান্য নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রতিক্রিয়া-রূপেই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও অর্থনীতির ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচনা হইবার রীতি ছিল না। অতএব, অর্থনীতির যে সকল স্বতঃসিদ্ধ প্রচলিত আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে মানিয়া লইবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে আরও সূক্ষ্ম-নজরে পুনর্ব্বিচার করা দরকার। কারণ, এই সকল তথাকথিত স্বতঃসিদ্ধ নানা ক্ষেত্রে ও নানা সময়ে অপর্য্যাপ্ত পর্য্যবেক্ষণ ও সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে এবং বিভিন্ন গবেষকের গবেষণার ফলে বিভিন্ন মতের প্রাচুর্য্য রহিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ, দ্রব্য-মূল্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের ক্ষেত্রে এইরূপ অপর্য্যাপ্ত গবেষণা ও বিভিন্ন মতের ক্রম-বর্দ্ধমান অনৈক্য ও আধিক্য বিশেষভাবে নজরে পড়ে। দ্রব্য-মূল্যের তথ্য (price-data) ইতিপূর্ব্বে আমরা সামান্য পাইয়াছি, এবং অধিক তথ্য পাইবার ও দ্রব্য-মূল্যের ইতিবৃত্ত জানিবার জন্য অর্থ-নৈতিক গবেষকবর্গের মধ্যে উৎসাহ বর্ত্তমানে বাড়িয়া যাওয়ার ফলে,বিভিন্ন দেশে দ্রব্য-মূল্যের ইতিবৃত্ত সন্ধানের বিপুল উদ্যম দেখা দিয়াছে, এমন কি, জাতীয় প্রচেষ্টার বিশেষ অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে বহু পুরাতন কালের মূল্য-সংক্রান্ত তথ্য কিরূপভাবে বিভিন্ন দেশে উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে উদ্ধার করা হইতেছে এবং সেই সঙ্গে উক্ত তথ্য লইয়া যে সমস্যার উদ্ভব হইতেছে, তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। দ্রব্য-মূল্য গণনা ও বিচারের এই পদ্ধতিকে গবেষণার একটি বিক্ষিপ্ত দিক্ বিবেচনা করিলে ভুল হইবে : অনেকের মতে ইহাই মুখ্যতঃ ধন-বিজ্ঞানের মূল শাখা।

১। মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধির ঐতিহাসিক তথ্য-সংগ্রহ

অর্থ-নীতির ছাত্রমাত্রই এই অসুবিধা ভোগ করিয়াছেন যে, পৃথিবীর আর্থিক পরিবর্ত্তনের সংবাদ জানিবার জন্য মূল্য-গণনাসংক্রান্ত বিষয়ের কোনরূপ তথ্য রক্ষা করা হয় নাই। সম্প্রতি বিভিন্ন দেশের ঐতিহাসিক গবেষকবর্গ অশেষ শ্রম স্বীকার করিয়া কিছু কিছু তথ্য অবশ্য উদ্ধার করিতেছেন। কেবলমাত্র সাত বৎসর পূর্ব্ব হইতে বিদেশে মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধির ধারাবাহিক ও নিখুঁত তথ্য সংরক্ষণ ও উদ্ধার সাধনের জন্য আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই দুরূহ কার্য্যের প্রয়োজনীয় অংশের খানিকটা কাজ যদিও ইতি-মধ্যে সাধিত হইয়াছে, তথাপি বেশির ভাগই এখনও কিছু করা হইয়া উঠে নাই।

বিদেশে কোথায় কতটা কাজ ইতিমধ্যে সাধিত হইয়াছে, এখানে তাহার সংক্ষিপ্ত একটি বিবরণ দেওয়া যায় :—

স্পেন

এখানে ডাঃ ই. জে. হ্যামিল্টন (Dr. E. J. Hamil-ton) নামক জনৈক গবেষক এই তথ্য ১৩৫১ হইতে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হিসাব দুই খণ্ড গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে; তৃতীয় খণ্ডে তাহার পর হইতে নেপোলিয়নের কাল পর্য্যন্ত থাকিবে।

পোলাণ্ড

মধ্য-যুগের শেষভাগ হইতে বিগত মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ডাঃ ফ্রান্সিস জে. বুজাক (Dr. Francis J. Bujak) নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক পোলাণ্ডের বিবিধ নগর হইতে তথ্যাবলী উদ্ধার করিয়াছেন। আট খণ্ড গ্রন্থে এই তথ্যাবলী সংরক্ষিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

অষ্ট্রিয়া

ভিয়েনার ভিয়েনা নগরের মজুরদের বেতন এবং দ্রব্য-মূল্যের ধারাবাহিক তথ্য প্রফেসর অ্যালফ্রেড এফ. প্রিব্রাম

(Prof. Alfred F. Pribram) কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা ছাড়া আরও তিন প্রকার দ্রব্যের তথ্য পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে নেপোলিয়নের আমল পর্য্যন্ত সংগৃহীত হইয়াছে।

জার্ম্মানী

ইতিপূর্ব্বে এখানে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পাইকারী দরের শতকরা হিসাব (Index-number of wholesale price) পাওয়া যাইত; ডাঃ আর্ণেষ্ট ভাগেমান (Dr. Ernst Wagemann) সেই হিসাব ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন এবং ১৭৯২ হইতে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে শতকরা হিসাব করিয়া ফেলিয়াছেন।

নেদারল্যাণ্ড্স্

প্রফেসর এন. এম. পস্থ্যাস (Prof. N. M. Posthumus) চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে নেপোলিয়নের আমল পর্য্যন্ত মজুরদের বেতন এবং দ্রব্যমূল্যের তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। আমষ্টারডম্, অ্যান্টোয়ার্প, ঘেণ্ট প্রভৃতি নগর হইতে এই তথ্যাবলী সংগৃহীত হইয়াছে।

ইংলণ্ড

এখানে স্তর উইলিয়াম বেভারিজের (Sir William Beveridge) নেতৃত্বে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মজুরদের বেতন ও দ্রব্য-মূল্যের তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। এই তথ্যাবলী চারি খণ্ড গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে ১৫৩০ হইতে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দের দ্রব্য-মূলের হিসাব লিপিবদ্ধ আছে; দ্বিতীয় খণ্ডে ১৫৩০ এর পূর্ব্বের ও পরের মজুর-বেতন-তথ্য, তৃতীয় খণ্ডে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বের দ্রব্য-মূল্যের তথ্য এবং চতুর্থ খণ্ডে সাধারণ তালিকা ও মতামত লিপিবদ্ধ আছে।

ফ্রান্স

এখানে প্রফেসর হেনরী হসারের (Prof. Henri Hauser) তত্ত্বাবধানে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে নেপোলিয়নের আমল পর্য্যন্ত। ইহার মধ্যে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের কিছু কিছু তথ্যও আছে।

আমেরিকা

পেন্সিল্ভ্যানিয়া, বোষ্টন, ওহিও, ক্যারোলিনা, নিউ-ইয়র্ক ইত্যাদি নগরের তথ্য ইতিপূর্ব্বে সংগৃহীত ও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে পেন্সিল্ভ্যানিয়ার দ্রব্যমূল্যের তথ্য ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ আছে। ইহার পর ফিলাডেল্ফিয়া সম্বন্ধে কাজ চলিবে।

দ্রব্য-মূল্য-ইতিহাস সম্পর্কে আন্তর্জ্জাতিক সমিতি (International Committee on Price History) এবং এই সঙ্ঘের সদস্যগণ মুদ্রা প্রচলিত হইবার পরের আমলের তথ্যই সংগ্রহ করিয়াছেন। বিনিময়-যুগের তথ্য সংগৃহীত হয় নাই, কারণ সে আমলে নিখুঁত-ভাবে মূল্য গণনা করা সম্ভবপর ছিল না। এই সঙ্ঘের অনুপ্রেরণায় অদ্যাবধি যতটা তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা দ্বারা ঐতিহাসিক এবং অর্থনৈতিক গবেষক উভয়েই যে গবেষণা করিতে বিস্তর সুবিধা পাইবেন, এ-কথা না বলিলেও বুঝা যায়।

২। দ্রব্য-মূল্যের সূচক-সংখ্যা-গঠন

সাধারণভাবে মূল্য-গবেষণার সূচনায় কেবলমাত্র মুদ্রার বিনিময়-মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্বন্ধেই আলোচনা হইত। পরে বিশেষ একটি দ্রব্যের মূল্য লইয়াই আলোচনা, গবেষণা ও সূচক-সংখ্যা গঠিত হইতে থাকে। কিন্তু, তখন হইতে দ্রব্যের পাইকারী দর এবং তাহার সূচক-সংখ্যা সংগ্রহের কার্য্য চলিতে থাকে। সেই সঙ্গে উক্ত দ্রব্যাদির মূল্যের সূচক-সংখ্যা যাহাতে অধিকতর সুচারুরূপে গণনা ও হিসাব করা হয়, সে-বিষয়ে নানাবিধ তৎপরতাও দেখা যায়।

অন্যান্য নানাবিধ আন্দোলনের মত এই দ্রব্যমূল্যের গবেষণায় আন্দোলনের মধ্যেও জাতীয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়; এই আন্দোলনের যে আন্তর্জ্জাতিক প্রয়োজনীয়তা আছে, সে বিষয়ে প্রথমেই আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য করিতে গেলে দ্রব্য-মূল্যের আন্তর্জ্জাতিক বিচার করা দরকার। সম্প্রতি কোন কোন সাম্রাজ্য হইতে এইরূপ গবেষণা করিবার প্রেরণা অবশ্য

পাওয়া যাইতেছে ; বিদেশের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপিতে গিয়া তাহারা সেই দেশবাসীর সহিত স্বদেশী মূল্যের তুলনা না করা আর সমীচীন জ্ঞান করিতেছে না। কারণ, বাণিজ্যের পথে এই দ্রব্য-মূল্যনিরূপণ ব্যাপারটি অবশ্যকরণীয় বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছে। কিন্তু, ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয় যে, যেখানে বহুকালাবধি বহির্বাণিজ্য চলিয়া আসিতেছে, সেখানে সেই বহিঃপ্রদেশের সঙ্গে নিজের দেশের মুদ্রা-মূল্যের তুলনা করার কোন আন্দোলন ইতিপূর্ব্বে জাগ্রত ছিল না।

ধনবিজ্ঞানের যে সকল গবেষক দ্রব্য-মূল্যের আন্তর্জ্জাতিক বিচার করিতে চান, তাঁহাদের কাছে পূর্ব্বালোচিত তথ্যাবলী সম্পূর্ণ কার্য্যকরী নয়। প্রফেসর এ. এল. বাউলী (Prof A. L. Bowley) এ-ক্ষেত্রে কিছুটা কাজ করিয়াছেন, তাঁহার সেই কার্য্য হইতে গবেষকেরা প্রকৃতপক্ষে উপকৃত হইতে পারিবেন। ইনি ১১টি বিভিন্ন দেশের দ্রব্য-মূল্যের ইনডেক্স-নাম্বার তুলনা করিয়া হিসাব করিয়াছেন। কিন্তু, ইঁহার এই কার্য্য সম্পূর্ণরূপে কার্য্যকরী নহে, বর্ত্তমানে প্রত্যেক দেশের সহিত প্রত্যেক দেশের লেন-দেন চলিতেছে, এ-ক্ষেত্রে আংশিকভাবে কাজ করিলে কিছুটা উপকার পাইলেও গবেষণা করিবার পক্ষে সম্পূর্ণ উপকার পাওয়া সম্ভব নহে। এখনও প্রত্যেকটি দেশের সহিত প্রত্যেকটি দেশের তুলনা করার কাজ অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে।

যুক্ত রাজ্যের ব্যুরো অব লেবার ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্ (U. S. Bureau of Labor Statistics) নামে মার্কিনের একটি সঙ্ঘ দ্রব্যমূল্যনিরূপণের ক্ষেত্রে যে আন্তর্জ্জাতিক বিচার করিয়াছেন, তাহাতে মূল্যের সহিত দ্রব্যাবলীর গুণ যে বিচার্য্য, তাহার পথ দেখাইয়াছেন। অর্থনীতিবিদ্ অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী ও পাকা যন্ত্রবিদ্‌রা গবেষণাকার্য্যে একত্রিত না হইলে, গুণানুযায়ী দ্রব্যমূল্যের তারতম্য সম্বন্ধে সুচারুভাবে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে সম্ভব নহে, তাহা এখন স্বীকৃত হইয়াছে।

৩। মূল্যের সহিত পরিমাণের সম্বন্ধ

যদিও অর্থ-নীতিবিশেষজ্ঞদের গবেষণা হইতে দ্রব্য-মূল্যের তথ্য অনেক পিছাইয়া পড়িয়াছিল এবং পড়িয়াছে, যদিও দিনের পর দিন গবেষণা চলিতেছিল, কিন্তু সেই অনুপাতে পূর্ব্ব হইতে তথ্যাবলী এই গবেষণা-কার্য্যের পাশাপাশি সংরক্ষিত হয় নাই, তথাপি কৃষিজাত দ্রব্যাবলীর মূল্য নিরূপণের জন্য সার্থক কাজ হইয়া আসিয়াছে। কৃষি-জাত দ্রব্যের মধ্যে অনেক প্রকার দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস-বৃদ্ধির এবং মূল্য ওঠা-নামা করিবার সীমা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, বহু খ্যাতনামা গবেষকবর্গের * কল্যাণে। কৃষি-জাত দ্রব্যাদি লইয়া অনেকটা গবেষণা হইয়াছে বটে, কিন্তু যে দ্রব্যাবলী কৃষি-জাত নহে, তাহাদের মূল্য লইয়া এরূপ গবেষণা হয় নাই, কারণ এ-কাজ করা বিশেষ শ্রম-সাধ্য। কৃষি-জাত দ্রব্যের মূল্য ধার্য্য হয় যে-সকল প্রতিক্রিয়া দ্বারা, অকৃষি-জাত দ্রব্যের মূল্য তাহা হইতে অনেক বেশী প্রতিক্রিয়া দ্বারা ধার্য্য হয়। এত গুলি প্রতিক্রিয়া লইয়া গবেষণা করা বিশেষভাবে দুরূহ, অতএব এ-ক্ষেত্রে কোন উৎসাহপূর্ণ উদ্যম এখনও দেখা যায় নাই।

সম্প্রতি অন্যান্য ক্ষেত্রে মূল্য-বিচারের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীরা মূল্য-সম্বন্ধে পুরাতন যুক্তি মানিয়া লইয়াছেন, তাঁহারা এ-কথা স্বীকার করেন যে, দ্রব্যের মূল্য কমিলে দ্রব্যের চাহিদা বাড়িয়া যায়, এবং বিক্রয় হয় বেশী ; এবং মূল্য বাড়িলে দ্রব্যের চাহিদা কমে। কিন্তু, এই ক্রিয়া আরও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিবার ভার অর্থনীতির ছাত্রগবেষকবর্গের উপর তাঁহাদের বিচার করিয়া বাহির করিতে হইবে, ক্রেতার কি-প্রকারের প্রভাবের ফলে কোন্ দ্রব্যের মূল্য কি-ভাবে নিরূপিত হয়।

৪। বিক্রয়-মূল্যের মৌলিক উপাদান

আমরা যখন কোন একটি দ্রব্যের মূল্য ধার্য্য করি, তখন আমরা সমগ্রভাবে উক্ত দ্রব্যের মূল্য নিরূপণ করিবার সময় সেই দ্রব্যটি নির্ম্মিত হইতে যত প্রকার প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হইয়াছে, তাহারই খরচ হিসাব করিয়া থাকি। যেমন একটি মাল তৈয়ারী হইয়া বাজারে আসিতে মূলধন,

* ইঁহাদের মধ্যে কয়েক জনের নাম দেওয়া যাইতেছে : Schultz, Ezekiel, 'eau, H. Working, E. J. Working, Warren ইত্যাদি।

মজুরী, সরবরাহ করিবার খরচ, কাঁচা মালের দাম, পাঠাইবার খরচ ইত্যাদির প্রয়োজন হয়, অতএব উক্ত দ্রব্যের দর ফেলিতে হইলে আমরা এই সকল প্রক্রিয়ার খরচ একত্রে যোগ করিয়া থাকি। আবার, এই প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটি, বিবিধ সময় বিবিধ রূপে চড়া দর ও কম-দর হইতে পারে ; তাহা হইলেই আমরা সেই বিশেষ দ্রব্যটির অতীত দর হইতেই মূল্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে পারিব না, যদিও দ্রব্য-মূল্যের স্বভাব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান-লাভের পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে। *

একটি দ্রব্যের প্রস্তুতি-ব্যাপারে যে সকল প্রক্রিয়ার প্রয়োজন, সংপ্রতি তাহাদিগকে বিভক্ত করিয়া গবেষণা করিবার আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে।

কতকগুলি বড় কারখানার পুরাতন দপ্তর হইতে এই বিষয়ে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যাইতেছে। উক্ত দপ্তর হইতে দেখা যায়, অমুক বৎসর সর্ব্বসমেত এতটা পরিমাণ মাল তৈয়ারী হইয়াছিল এবং তাহার মূল্য সমগ্রভাবে ছিল এত। এই 'মূল্য'কে আবার ভাঙ্গিয়া দ্রব্যের কাঁচামালের দাম এবং সেই সঙ্গে মাল-প্রস্তুতের খরচ ও ন্যায্য লভ্যাংশও বাহির করা হইয়াছে। মাল প্রস্তুত করিবার খরচও সেই সঙ্গে বাহির করা গিয়াছে। তৈয়ারী করিবার খরচকে বিভক্ত করা গিয়াছে : মজুরদের মাহিনা, ট্যাক্স, সুদ, লাভ এবং কলকজার ব্যয় ইত্যাদি নানাবিধ ভাগে। অঙ্ক কষিয়া উক্ত বিষয়গুলি বাহির করিবার সময় মালের দাম ধরা হইয়াছিল কারখানা কর্ত্তৃক ধার্য্য দরে। কিন্তু, ব্যবসায়ের মন্দার সময় যদিও সেই দাম সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় নাই, ক্রেতাদের নিকট হইতে তাহা হইতে অল্প উদ্ধার করা গিয়াছে, এই জন্য এরূপ গবেষণায় নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে।

এই সমস্ত নানাবিধ তথ্যানুসন্ধান-ক্রিয়া দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, বর্ত্তমানে অর্থনীতি ক্ষেত্রে কিছু আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। সেন্সাসের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে দ্রব্য-মূল্যের হিসাব ধারাবাহিক-ভাবে রক্ষিত হয়, ইহার জন্যও প্রচেষ্টা চলিতেছে।

৫। মূল্যের গঠন-প্রণালী

বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে দ্রব্য-মূল্যের দাম, সময় ও একটি বিস্তৃত গণ্ডীর মধ্যে কিরূপে ওঠা-নামা করিতে পারে, তাহার সম্বন্ধে নিখুঁৎ গবেষণা হইয়াছে। ঐ সময়ের মধ্যেই দ্রব্য-মূল্যকে নানা ভাবে ভাগ করিয়াও বিচার করা হইয়াছে, যথা,—যে-দ্রব্য-মূল্য স্বকীয় ভাবে চড়ে ও নামে, অন্য দ্রব্যের অনুপাতে যাহার দর নির্দ্দিষ্ট থাকে, যে দ্রব্য-মূল্য আদৌ ওঠা-নামা করে না, এবং যে দ্রব্য-মূল্য আশাতীত ভাবে চড়ে ও নামে। অর্থনীতিবিদ্‌দের ইহাও গবেষণা করিবার একটি বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্য-মূল্য ক্রমশঃই স্থিরতা লাভ করিতেছে কি না এবং সাধারণ নিয়মের জোরে, একচেটিয়া ব্যবসায়ের ফলে, ট্রেডমার্ক ইত্যাদি অন্যান্য আধুনিক ব্যবসায়িক পদ্ধতির দরুণ দ্রব্য-মূল্য ধীরে ধীরে একই স্থানে স্থির হইয়া থাকিতেছে কি না। এই প্রশ্নের উত্তর-লাভ-হেতু সাপ্তাহিক, মাসিক ও বার্ষিক হিসাবে দ্রব্য-মূল্য রক্ষিত হইতেছে।

দ্রব্যমূল্য নিরূপিত হইবার পথে কোন্ কোন্ প্রক্রিয়া কাজ করিয়া চলিয়াছে, তাহা ছাড়াও কিসের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া এই মূল্য ধার্য্য হইয়াছে ইত্যাদি বিবিধ বিষয়কে সূক্ষ্মভাগে ভাগ করিয়া ফেলাও আধুনিক অর্থনীতিবিশারদদিগের গবেষণার একটি বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোন্ কোন্ দ্রব্য মূল্যের দিক্ দিয়া একই ভাবে চলাচল করে, কি-ভাবে দ্রব্যাবলী বিভক্ত করিলে প্রত্যেকটি বিভাগের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে পার্থক্য নজরে পড়িবে, ইত্যাদি প্রশ্নের জবাব দেওয়া ধন-বিজ্ঞানবিশারদদিগের পক্ষে দুরূহ। অদ্যাবধি দ্রব্যাবলীর শ্রেণী-বিভাগের দিক্ দিয়া যেটুকু কাজ হইয়াছে, তাহাতে আর্থিক পরিবর্ত্তনের হেতু বুঝিয়া ওঠা হয়ত কিছুটা সহজ হইয়াছে, এটুকু বলা যায়। এখানে ক্যানেডিয়ান ডোমিনিয়ান্ বুরো অব ষ্ট্যাটিস্‌টিক্স (Canadian Dominion Bureau of Statistics) নামক একটি সঙ্ঘ যেটুকু কাজ করিয়াছে

---

* "বহুবিধ কারণের একত্রিত ফলে তরঙ্গের উৎপত্তি"—য়ুজেন স্লুটস্কি, কনজাংচার ইনষ্টিটিউট, ১৯২৭।

তাহার উল্লেখ করা যায়। এই সঙ্গে ক্রেতার দ্রব্য, প্রস্তুত-কারকের দ্রব্য, দ্রব্যের উৎপত্তিস্থল, দ্রব্য প্রস্তুত করিতে কি কি কাঁচা মাল প্রয়োজন হইয়াছে, ইত্যাদি ভাবে বিচার করিয়া দ্রব্যাবলীর শ্রেণী বিভাগ করিয়াছে।

ভৌগোলিক পরিস্থিতির উপরেও দ্রব্য-মূল্য নির্ভর করে। একই দ্রব্যের মূল্য একই সময় দুইটি পৃথক্ স্থানে বিভিন্ন হইয়া থাকে। এই পার্থক্য যথেষ্টভাবে নিয়মানুবর্ত্তী হইতে পারে, যাহাতে পৃথিবীর কোন্ কোন্ স্থানে দ্রব্য-মূল্যটি একই রহিয়াছে তাহা দেখাইবার জন্য সুচারুরূপে একটি রেখা আঁকিয়া ওঠা যায়। যেমন, আবহবিদ্‌রা ভূখণ্ডের কোন্ কোন্ স্থানে একই উত্তাপ তাহা দেখাইবার জন্য রেখা দ্বারা চিহ্ন দিয়া থাকেন। বিভিন্ন স্থানে কি জন্য মূল্য বিভিন্ন হয় তাহার কারণস্বরূপ বলা যায়, সে সকল স্থানের যান-বাহন খরচ, শুল্ক, প্রতিযোগিতার তীব্রতা, ইত্যাদি প্রক্রিয়া বিভিন্ন। এই সকল বিষয় ভাবিয়া দেখিলে সহজেই বুঝা যায় যে, অর্থনীতি-ক্ষেত্রে মূল্যগবেষণা ভিন্ন অন্য কোন শাখা এত প্রয়োজনীয় ও জটিল নহে।

৭। মন্তব্য

এখন আমরা সমগ্রভাবে আমাদের বক্তব্যটি একত্রিত করিতেছি। আমরা কৃষিজাত দ্রব্যাবলীর, শিল্পের জন্য কাঁচা মাল এবং সাধারণ কারখানাজাত দ্রব্যাবলীর মূল্যের তথ্য ও দপ্তর পাইতেছি। সেই অনুপাতে অন্যান্য বিষয়ের তথ্য আমরা পাই অতি সামান্য পরিমাণেই।

যদি সমস্ত দ্রব্যের মূল্য একই পদ্ধতিতে ওঠা-নামা করিত, যদি আর্থিক ও ব্যবসায়িক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মূল্য নির্দ্ধারণের প্রত্যেকটি প্রক্রিয়া একই ভাবে প্রভাব বিস্তার করিত, তাহা হইলে আমরা দ্রব্য-মূল্য-সংক্রান্ত বিষয়ের যে-সকল তথ্য পাইতেছি, তাহারা এত জটিল হইয়া দেখা দিত না। কিন্তু, এখন আমরা স্পষ্ট বুঝিতেছি যে, দ্রব্য-মূল্যের আচার-নিয়ম অতীব জটিল ও জড়িত, এবং বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও পরস্পরের সম্বন্ধহীন কারণের উপর নির্ভর করে; এখনও মূল্য-জগতে বহু অনাবিষ্কৃত স্থান রহিয়া গিয়াছে—পৃথিবীর বহু স্থানের মূল্য-ব্যবস্থার ও তাহাদের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আধুনিক সভ্যতার যুগে বিরাট অজ্ঞতা বিদ্যমান।

মিলনের সঙ্কেত

প্রকৃতি ও বিকৃতি লইয়া মানব-জীবন। প্রকৃতির ধর্ম্ম মিলন, আর বিকৃতির ধর্ম্ম অমিলন অথবা বিবাদ। যখন মানুষের মধ্যে সর্ব্বব্যাপী প্রকৃতির কার্য্য চলিতে থাকে, তখন একদিকে মানুষ যেরূপ তাহার নিজের উপর সর্ব্বতোভাবে সন্তুষ্ট হইতে পারে এবং তাহার ফলে তাহার নিজের শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হয়, সেইরূপ আবার অন্যদিকে সেই মানুষ অপর যাহাদের সংস্রবে সংশ্লিষ্ট হয়, তাহাদের প্রত্যেকের শারীরিক অস্বাস্থ্য ও মানসিক অশান্তিও ক্রমশঃই অল্পতা প্রাপ্ত হইতে থাকে। প্রধানতঃ, প্রকৃতির কার্য্যের সহায়তায় মানুষের জন্ম হইয়া থাকে এবং শৈশব অবস্থায় মানুষের মধ্যে প্রধানতঃ প্রকৃতির কার্য্যই সর্ব্বব্যাপী হইয়া থাকে। এইরূপ ভাবে আশৈশব বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত প্রকৃতির কার্য্যের সর্ব্ব-ব্যাপিত্ব যে-মানুষের মধ্যে অটুট থাকে, সেই মানুষ হৈ-চৈ-এ যোগদান করিতে পারে না এবং সর্ব্বদাই সে নিজেকে অখণ্ড বিশ্বের সামান্য মাত্র একটি অংশ মনে করিয়া সর্ব্ববিধ অভিমান ও নেতৃত্বের কবল হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা করে। এতাদৃশভাবে নিজের মধ্যে প্রকৃতির কার্য্যের সর্ব্বব্যাপিত্ব অটুট রাখা সহজসাধ্য নহে, পরন্তু সুচিন্তিত শিক্ষা ও কঠোর সাধনাসাপেক্ষ। মানুষের অবয়বের মধ্যে প্রকৃতির অস্তিত্ব বশতঃই বিকৃতির উদ্ভব হইয়া থাকে। যখন প্রকৃতি হইতে বিকৃতির উদ্ভব হইতে আরম্ভ করে, তখন সুশিক্ষার সহায়তার দ্বারা তদ্বিষয়ে জাগ্রত থাকিতে পারিলে নিজাভ্যন্তরস্থ প্রকৃতির উপর বিকৃতির প্রভুত্ব করা সম্ভব হয় না এবং তখন আর অভিমান ও নেতৃত্বাভিলাষ মানুষকে স্পর্শ করিতে পারে না। মানুষ তখন নিজের অধিকারের (Right) কথা ভুলিয়া গিয়া একমাত্র কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া জীবন-যাপন করিতে আরম্ভ করে। এতাদৃশ মানুষ অতি সহজেই কোন্ সঙ্কেতে মানুষের মধ্যে মিলন সাধিত হইতে পারে, তাহার সন্ধান পাইয়া থাকে।

যে-মানুষ সুশিক্ষা ও সাধনার দ্বারা নিজের মধ্যে প্রকৃতির কার্য্য কতখানি ও বিকৃতির কার্য্য কতখানি, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া অনুভব করিতে অক্ষম হয়, তাহার অভ্যন্তরস্থ প্রকৃতির উপর বিকৃতি প্রতিনিয়ত প্রভুত্ব করিয়া থাকে। এতাদৃশ মানুষ সর্ব্বদা অভিমান ও নানা বিষয়ক নেতৃত্বাভিলাষে জর্জ্জরিত হইয়া কর্ত্তব্য বিস্মৃত হয় এবং প্রতিনিয়ত অধিকার, অথবা Right-এর কথা ও চিন্তা লইয়া বিব্রত হয়।

মাটির কান্না

—শ্রীফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ইব্রাহিমের ক্ষেতের পাশেই লতিফের ক্ষেত।

ইব্রাহিম তার ক্ষেতখানিকে যেমন প্রাণ দিয়ে ভালবাসত—তার চেয়ে বেশী ভালবাসত তার চেয়ে তিন বছরের ছোট লতিফকে। মাঠের বুক চিরে ছোট নদীটী বয়ে গেছে দিগন্ত পার হয়ে—কালো বনানীর দিকে। সেই ছোট নদীটীর পারেই তাদের ক্ষেত দু'খানি দুটী ভাইয়ের মত গলাগলি করে রয়েছে।

নদীর এ-পারে ইব্রাহিমের ঘর। লতিফ আসে ওই ও-পারের গ্রাম থেকে। ভোরের বেলা চোখ মেলেই তাদের মনে পড়ে, ক্ষেতখানি তাদের ভোরের আলোয় হাস্‌ছে। ফসলের শিষে শিষে হাওয়ায় দোলা লেগেছে। লতিফ একখানি ছোট ভেলা নিয়ে আলো-ঝলমল নদীতে জলে ভেসে পড়ে। এ-পারে এসে দেখে, ইব্রাহিম তারই অপেক্ষা করে নদীর পারে কদমগাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লতিফ ডিঙি থেকে নেমে দৌড়ে এসে ইব্রাহিমের হাত দুটি জড়িয়ে ধরে। বলে, 'দেরি হয়েছে বুঝি আমার! 'না রে 'না!'—ইব্রাহিম হেসে বলে, 'দু'জনেই আজ দেরিতে এসেছি!—'

লতিফ ভাবত, ইব্রাহিম কেন তাকে এত ভালবাসে! তার বাপ ছিল পদ্মার জেলে। ছেলেবেলায় মাতৃহারা হয়ে সে পিতার অগাধ আদরের মধ্যেই মানুষ হচ্ছিল। পদ্মার পাড়ে গাছের ছায়ায় বাঁশী বাজিয়ে তার দিন কাটত। ভেবেছিল, সমস্ত জীবনটা এমনি করেই নদীর জলে, গাছের ছায়ায়, মাঠের মায়ায় ডুবে কেটে যাবে।

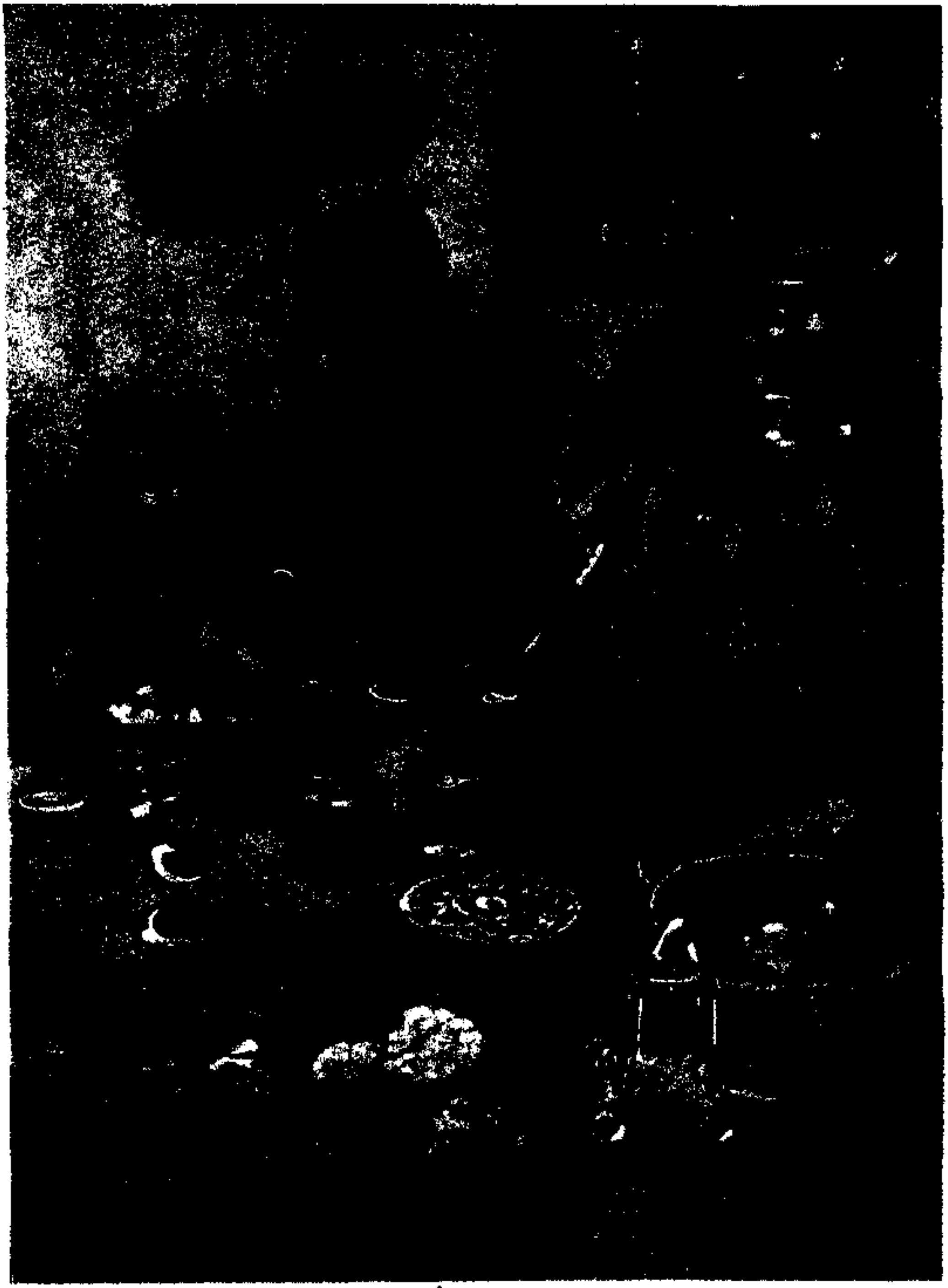
কাল-বৈশাখীর সময় একদিন তার পিতা তাদের বহুদিনের পুরোনো ডিঙিখানি বেয়ে মাছ ধরতে গেল। অনেক সময় লতিফ তার পিতার সঙ্গে মাছ ধরতে যেত, সেদিনও সে যেতে চাইল। বুড়ো জেলে বলল, 'কখন মেঘ করে ঝড় উঠবে—তোর গিয়ে দরকার নেই লতিফ!' তারপর কাল-বৈশাখী পদ্মার কূলে কূলে ঝঞ্ঝা-নাচের মৃদঙ্গ বাজিয়ে গেল। মেঘ কেটে গেল। উন্মাদিনী পদ্মা আবার শান্ত হল। ক্রুদ্ধ বাতাসের রোখ্ মিটল, কিন্তু লতিফের বুড়ো বাপ আর ঘরে ফিরল না। নিষ্ঠুরা পদ্মার অগাধ জলে সে তার পঞ্চান্ন বছরের দরিদ্র জীবন ও বুক-ভরা স্নেহ নিয়ে কোথায় হারিয়ে গেল।

অন্য গাঁয়ে লতিফের এক চাচী ছিল। দুঃখের দিনে সে লতিফকে দেখতে এল। পিতার কবর থেকে সে জোর করে লতিফকে টেনে ঘরে নিয়ে এল। বলল, 'লতিফ! খোদা যা করেছেন, তার জন্যে দুঃখু করিস্ নে। আমার ঘরে চল। আমার কেউ নেই। তোকে বুকে করে মানুষ করব!' লতিফ চাচীর কোলে মুখ লুকিয়ে অনেকক্ষণ কাঁদল! তারপর চোখের জল মুছে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'তুমি ঘরে যাও চাচী। আমার ধানের ক্ষেত আছে, কুঁড়ে আছে। এ সব ফেলে আমি কোথাও যেতে পারব না'। ছেলেবেলায় সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনার ব্যাকুলতামাখা এই কুঁড়ে ঘর ছেড়ে যেতে কিছুতেই তার মন চাইল না। চোখ মুছে কপালে চুমো খেয়ে চাচী চলে গেল। লতিফ ফিরে এল তার কুঁড়ে ঘরে।

একদিনের দেখায় ইব্রাহিম আর লতিফের ভাব হয়েছিল।

নদীর দুই তটের মধ্যে ব্যবধান থাক্‌লেও তারা যেমন চিরদিনের নিবিড় বন্ধনে বাঁধা হয়ে পরস্পরের মুখের পানে যুগযুগান্ত ধরে চেয়ে আছে, তেমনি এই নব-পরিচিত কিশোর দুজন যখন পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে দেখল, তখন তাদের মনে হল, যেন তারা কতদিনের চেনা। চির-পরিচিতকে পরিচিত করে দেবার জন্য যেন একটি বিশেষ ক্ষণ অপেক্ষা করছিল, যে ক্ষণ তার, দুজনকে এক করে দিল। বাদলের নব-মেঘমেদুর আকাশ যেমন ছায়াশীতল বনানীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, এই দুটী অচেনা মাঠের ছেলে তেমনিই বন্ধুত্ব পাতাল নিবিড়ভাবে।

ইব্রাহিম বলল, 'আমার বুড়ী মা ঘরে আছে,—তুই থাক্‌বি আমাদের সঙ্গে লতিফ? মাকে আমরা দু'জনে মা



ঘরকরণা

[শিল্পী—শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

বল্‌ব,—মাকে বলেছিলাম তোর কথা, শুনে মা কাঁদতে লাগল। বলল, তাকে তুই আনিস্ আমার কাছে।—মা ঘরে থাক্‌তে কেন সে মাঠে মাঠে একা ঘুরবে?—যাবি ভাই তুই আমাদের ঘরে?'—নিবিড় স্নেহে ইব্রাহিম লতিফের গলা জড়িয়ে ধরল দুটী বাহু দিয়ে।—ইব্রাহিমের মুখের দিকে চেয়ে লতিফ মাথা নীচু করল। ধানের ডগাগুলি সির-সির করে বাতাসে দুল্‌ছিল। গ্রাম-প্রান্তে সারি-দেওয়া সুপারি-গাছগুলি বাতাসে হেলে হেলে পড়ছে। লতিফ বলল, 'ঘর ফেলে আমি ত কোথাও যেতে পারব না ভাই'!—সে নিজেও বুঝতে পারছিল না, ঘরের ওপর কেন তার এমন অবুঝ নিবিড় টান পড়েছে।—ইব্রাহিম আর জেদ করল না। লতিফের ব্যথা আপনার হৃদয়ে অনুভব করতে পারল। তার চোখের কোণ ভিজে উঠল।—

মেঘের সমারোহ নিয়ে বর্ষা আসে।

দু'জনে তারা ক্ষেতের কাজে লেগে যায়। আকাশের ছায়া, মাটীর মায়া তার সঙ্গে এসে মিশে যায় তাদের বন্ধুত্বে,—তখন পৃথিবীটা তাদের কাছে নূতন হয়ে ওঠে। ওই গাছের সারি-দেওয়া নদীর পার ও বাঁশ-ঝাড়ে ঢাকা গ্রামখানি স্তব্ধ! -এই পৃথিবীর মধ্যেই কোন একটা গোপন স্থানে স্বর্গ লুকিয়ে থাকে!—তার অপরিমিত সুখ ও আনন্দের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে। জীবনের মধ্যে মানুষ কোন না কোন সময়ে একবার তার রুদ্ধ দ্বারে প্রবেশ করবার সুযোগ পায়। কেউ বা সেস্থানে স্থায়ী আশ্রয় গড়ে, কেউ বা দুয়ার থেকেই ফিরে আসে—তার বিগত সুখের স্মৃতিটুকু নিয়ে - সেইটুকু পাথেয় নিয়েই সে আবার সেই গোপন রহস্যময় পথের সন্ধান করে! কেউ ফিরে পায়, কেউ বা ব্যর্থ আশার আলেয়ার পিছনে ঘুরে ঘুরে সমস্ত জীবনটা কাটিয়ে দেয়।—তার পর তার দিন ফুরিয়ে গেলে একদিন কবর থেকে ডাক আসে—যে মাটী তাকে ফসলে ফুলে ছয় ঋতুর ডালি সাজিয়ে এনে স্নেহ-উপহার দেয়, সেই তার জন্য শেষের দিনে চির-স্নেহ-ভরা বুকে অনন্ত আশ্রয়-শয্যা রচনা করে দেয়।

বর্ষার সমস্ত পরিশ্রম তারা ফিরে পায় শরতের নব-ফসল-হিল্লোলিত মাটীর কাছে। মাটীর স্নেহ অগাধ! তার কাণে এতটুকু অভাবের বেদনা জানালে তার মাতৃ-হৃদয় কেঁদে ওঠে! সে বলে, 'এই যে দিচ্ছি!—তুই কাঁদিস্‌নি'। তার পরে জেগে ওঠে প্রচুর ফসল। মানুষের মুখ হাসিতে ভরে যায়। মাটীর দিকে চেয়ে সে বলে, 'মা! মা! তুই আমাদের চির জীবনের মা! তুই বন্ধুতে তারা এমনি ভাল-বাসাতেই তাদের ক্ষেতখানিকে ভালবাস্‌ত!'—

শরৎ চলে যায় হেমন্ত আসে। সোনার মাঠে বসে' গান গেয়ে গেয়ে তারা ধান কাটে!—

একদিন ভোরে লতিফ এসে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে বলল, 'আমার ঘরে একবার আসবি ইব্রাহিম! বড় বিপদে পড়েছি!'—লতিফের বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে ইব্রাহিম বলল, 'কি হয়েছে রে লতিফ?—তোর মুখ যে শুকিয়ে গিয়েছে!'—লতিফ বলল, 'ঘরে চল্। সেখানে সব বলব'। বলে সে ইব্রাহিমকে টানতে টানতে এনে ডিঙিতে তুলল। বর্ষার নদীর জল চপল শিশুর মত!—কল কল কথা করে চলেছে।—

ওপারের দিকে তাদের ডিঙা চলল!—

উঠানের ওপর চাটাইয়ে একজন বুড়ো শুয়ে রয়েছে।—তার মাথার কাছে বসে আছে একটি মেয়ে!—ঘাসে ঘাসে ভোরের শিশিরের মত তার চোখ দুটীতে জল টল টল করছে! ইব্রাহিম বুড়োর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। হলদে রঙের চোখ দুটো তার যেন একেবারে ভিতরে বসে গেছে, তার ওপরে চোখের পাতার বড় বড় কটা লোমগুলো ঝুলে পড়েছে!—মুখখানা ছাইয়ের মত পাঁশুটে রঙের। দুটী ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একটুখানি জিভ্ বেরিয়ে পড়েছে তার। ময়লা শ্যাওলা-পড়া দাঁত দিয়ে সে জিভ্‌টা কামড়ে ধরেছে।—ইব্রাহিম তার কপালে একবার হাত ঠেকাল, শীতের দিনে নদীর জলের মত তা ঠাণ্ডা!—সে চমকে উঠল, একবার মেয়েটীর মুখের দিকে চেয়ে লতিফের হাত চেপে ধরল।

পথে আসতে আসতে লতিফ তাকে ঘটনাটা বলেছিল। কাল রাতে ঝড়ের সময় ওরা এসে ওঠে এই ঘরে। অনেক দূরের গাঁয়ে যাবে। বুড়ো বলল, 'এই ঝড়ে পথ চলতে পারব না! রাতটুকু থাকব বাবা তোমার ঘরে!' লতিফ তাদের ঘরে এনে চেরাগ জেলে মাদুর বিছিয়ে দিল।

মাটীর হাঁড়িতে মুড়ি-নারিকেল ছিল তাই খেতে দিলে। খানিক রাতে ঝড় থেমে গেলে এসে দেখলে, মেয়েটা তার কাছে এসে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলছে—ওগো দেখবে, এসো বাবা কেমন করছে! লতিফ এসে দেখল, বুড়োর চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে পড়ছে চোখের কোটর থেকে, গলা থেকে ঘড়্ ঘড়্ করে আওয়াজ হচ্ছে। লতিফ মাটীর কলসী থেকে জল আনতে গেল ওকে খাওয়াতে!—এসে দেখলে আর কোন সাড়া নেই। মেয়েটা তার বুকে লুটিয়ে পড়েছে!—বলতে বলতে লতিফ চোখের জল মুছল।

দুই বন্ধুতে মিলে মাঠের ধারে বটতলায় বুড়োকে কবর দিয়ে এল। এসে দেখলে মেয়েটা মাটির ওপর লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদছে। ওরাও চোখ মুছল এই সদ্য-পিতৃহারা মেয়েটাকে যে কি বলে সান্ত্বনা দেবে, তা তারা ভেবে পেল না। লতিফের মনে পড়ল তার পিতার কথা। এমন কান্না সেও একদিন কেঁদেছিল। কচি মেয়েটার দুঃখে তার বুক ফেটে যেতে লাগল—তার কাছে এসে আস্তে আস্তে বললে, 'তোদের ঘর কোথায় বলতে পারিস মুন্নি? সেখানে তোকে রেখে আসব।' চোখ মুছে জোর জোর মাথা নেড়ে মুন্নি বলল, 'না, না, সেখানে যাব না আমি। সেখানে গেলে চাচা আমায় মেরে ফেলবে। তোমাদের দুটী পায়ে পড়ি, আমাকে সেখানে রেখে এসো না'—বলতে বলতে সে লতিফের পায়ের কাছে আছড়ে পড়ল।

মেয়েটি লতিফের ঘরেই রইল। তার লক্ষ্মীছাড়া ঘর দেখতে দেখতে যেন লক্ষ্মী-শ্রীতে ভরে' উঠল। মুন্নি ঘুঁটে দেয়, লাকড়ি চ্যালা করে, সকালবেলা ভাত রাঁধে। ভাত খেয়ে লতিফ ক্ষেতের কাজে গেলে সে তার সঙ্গে সঙ্গে শেষ বাঁশ-ঝাড় পর্য্যন্ত যায়। তার পর ঘরে ফিরে এসে দাওয়ায় বসে, চরকা কাটে। দু'বন্ধুতে ঘরে এলে তেঁতুলের সরবৎ করে তাদের খেতে দেয়। অনেক দুঃখে দুঃখী মেয়েটার মুখে হাসি দেখে ওদেরও মন আনন্দে ভরে ওঠে। মেয়েটাও দিনে দিনে তার দুঃখ ভুলে যেতে লাগল; তার কাজ হল, শুধু রেঁধে, গল্প করে ওই ছেলে দুটিকে খুশীতে রাখা।

দিন যায়। দুপুরবেলা লাঙ্গল ঠেলে ঠেলে ঘেমে উঠলে দুই বন্ধুতে এসে নিমতলায় জিরোতে বসে। ইব্রাহিম বলে, 'মুন্নি কেমন আছে রে লতিফ'? লতিফ একটু চুপ করে থেকে বলে, 'ভাল আছে। কি খাটুনিই খাটে রাত-দিন! ঘর-দোর ঝক্ ঝক্ করছে। অতটুকু মেয়ে এত খাটতেও পারে!' ইব্রাহিম বলে, 'আমার কথা শুধোয় কখনও'?—লতিফ উৎসাহিত হয়ে বলে, 'তোরই কথা সব সময়ে বলে রে ইব্রাহিম, তোকে ভারি ভালবাসে, তোর মা যদি এ কথা জানতে পারে, তা'হলে রাগ করবে, না রে ইব্রাহিম?'

ইব্রাহিম একদিন মুন্নিকে তাদের ঘরে নিয়ে গিয়েছিল; কিন্তু তার মা কি জানি কেন এই পিতৃহারা মেয়েটাকে ভাল চোখে দেখতে পারল না। বলল, 'ওকে তোদের ঘরে রাখিস্ নে লতিফ! ভাল হবে না!' লতিফ ইব্রাহিমের মাকে প্রাণ ভরে ভালবাসত। তার কথায় কখনও অমত করে না। কিন্তু, আজ মায়ের এই কথাটায় সে সায় দিতে পারল না। ক্রন্দননিরতা মুন্নিকে ঘরে ফিরিয়ে এনে উড়ুনির খুঁট দিয়ে তার চোখ মুছিয়ে দিয়ে সে বলল, 'মায়ের কথায় দুঃখ করিস্‌নে মুন্নি, ইব্রাহিম তোকে ভারি ভালবাসে—'

লতিফের কথা শুনে ইব্রাহিম কোন জবাব দিতে পারল না, চুপ করে বসে রইল। মাথার ওপর দিয়ে চিল ডেকে চলে যায়; থেকে থেকে দমকা হাওয়া এসে গাছের পাতাগুলো নিয়ে খেলা করে। ঝুপ ঝুপ করে দু'একটা নৌকা নদী বেয়ে যায় দূরের গাঁয়ের দিকে, চালের বস্তা, মাটির হাঁড়ি ও জলের কলস নিয়ে। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে থেকে পশ্চিমের আকাশ সোনার হয়ে ওঠে। লতিফ বলে, 'বেলা গেল, চল ভাই ঘরে ফিরি।' বাঁশবনের মাথার ওপর একটা ঝক্‌মকে তারা উঠে। দু'জনে নির্ব্বাক হয়ে সন্ধ্যার সেই প্রথম তারাটির দিকে চেয়ে থাকে। লতিফের মনে পড়ে এতক্ষণে মুন্নি হয়ত ঘরে বাতি জ্বেলেছে। দেশলাই জ্বেলে বাতি ধরাবার সময় তার মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—ইব্রাহিম নদীর পার পর্য্যন্ত এসে লতিফকে ডিঙিতে উঠিয়ে দিয়ে যায়।

মাঠের পথে চলেছে সে-দিন কেবলি মানুষের আনাগোনা। সারি সারি পালতোলা ডিঙি অনবরত

গাঙ পারাপার করছে। সে-দিন হাটবার। দূর-দূরান্তরের গ্রাম থেকে লোকেরা এসে তাদের সপ্তাহের বেসাতি কিনে নিয়ে যাচ্ছে। প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় নদীর পারে ছোট ছোট মাচার নীচে দোকান বসেছে। গিজ গিজ করছে সেখানে মানুষ। অন্যদিন দুপুরে বিজন নদীতটে শুধু স্রোতের জলের মিষ্টি শব্দটুকু শোনা যায়,-ছল্ ছল্ ছল্, আজ ছেলে-বুড়ো নানারকমের কণ্ঠস্বর মিশে নদীর পার ও মাঠ যেন মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে। নদীর পার দিয়ে দিয়ে শর-বনের পাশে পাশে, মাঠের চষা জমির ওপর দিয়ে দলে দলে লোক চলেছে। কারও কাঁধে ভার, কারও হাতে মাটির হাঁড়ি ও চাল-ডালের পুঁটুলি। কেউ কিনেছে দু'চারটি রঙিন কাগজের ফুল ও রং-করা মাটীর পুতুল, সে-গুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে ছেলেদের মনে করে' তাদের মুখ হাসিতে ভরে উঠেছে। পাঁচ-সাত জন মানুষ দল বেঁধে গান করতে করতে চলেছে, আকাশের মতই তাদের মুখ প্রফুল্ল, নির্ম্মল। হাটবার তাদের আনন্দের দিন—

কাগজে বাঁধা কি একটা জিনিস নিয়ে ইব্রাহিম এসে দাঁড়াল লতিফের দরজায়। আস্তে আস্তে দোর ঠেলে দেখল, দরজা ভিতর থেকে খোলা। উঁকি দিয়ে দেখল, দাওয়ার ওপর পিছন ফিরে বসে মুন্নি কি কাজ করছে। অতি সন্তর্পণে দরজা ঠেলে সে ভিতরে ঢুকল—উড়ুনির ভেতর থেকে কাগজের মোড়াটা বের করে নিল, কিন্তু দাওয়ার দিকে এগুতে পারল না। মাটীতে যেন তার পা বসে গেল। অপরাধীর মত তার বুক কাঁপতে লাগল—হঠাৎ মুন্নি দাওয়া থেকে নামল—সামনে ইব্রাহিমকে দেখে তার চোখ দুটি বিস্ময়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল—নিরালা রাতের টুকরো মেঘ জোৎস্নায় ভিজে ওঠার মত—সে বলল, 'কতক্ষণ এসেছ ভাই? লতিফ কই?' ইব্রাহিমের গলা শুকিয়ে উঠছিল, সে অস্ফুট স্বরে বলল, 'জানি না ত—তারি খোঁজেই যে আমি এসেছিলাম। মুন্নি বলল, 'হাটে গেছে, অনেকক্ষণ হল। তুমি বুঝি আজ হাটে যাও নি, ইব্রাহিম?' ইব্রাহিম বলল, 'গিয়েছিলাম, কই তাকে ত দেখলাম না সেখানে'- বলতে বলতে সে তার কাগজের মোড়কটি খুলতে লাগল। সেদিকে চেয়ে মুন্নি বলল, 'ওতে কি আছে, ভাই?' ইব্রাহিম বলল, 'কিছু না,—বলতে বলতে সে মোড়ক খুলে একখানা ডুরে শাড়ী মুন্নির হাতে দিল। মুন্নির মুখ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। শাড়ীখানি নেড়ে চেড়ে সে বলল, 'হাট থেকে কিনে আনলি বুঝি?' 'হ্যাঁ' বলে ইব্রাহিম চলে যেতে পা বাড়াল। মুন্নি বলল, 'একটু বোস্ ভাই! তালের বড়া ভেজেছি, খেয়ে যা।' ব্যস্ত হয়ে ইব্রাহিম বললে, 'না। এখন না, মুন্নি! লতিফের এত দেরি হচ্ছে কেন, দেখিগে। এর পরে এসে খাব।' বলতে বলতে সে হন্‌হন্ করে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ইব্রাহিমের ডিঙি যখন ওপারে ভিড়ল, লতিফ তখন এপারে নেমেছে। সাঁঝের আলো-ছায়ার মধ্যে তার মনে হয়েছিল যেন পাশের একটা চলতি ডিঙির ওপর ইব্রাহিমের মত একজন দাঁড়িয়ে আছে। ভাল করে চিনতে না পারায় সে তাকে ডাকল না। হাট থেকে কিনে-আনা জিনিষগুলো পুঁটলি বেঁধে নিয়ে লতিফ ডিঙি থেকে নেমে আবছা জ্যোৎস্নায় ধানের ক্ষেতের পাশের পথ দিয়ে ঘরের দিকে চললো।

মুন্নি তালের বড়া ও সরবৎ এনে লতিফকে খাইয়ে তার সঙ্গে কত গল্প করতে লাগল, কিন্তু ইব্রাহিম যে তাকে হাট থেকে কিনে এনে একখানা শাড়ী দিয়ে গেছে, এ কথা সে কিছুতেই তাকে বলতে পারল না। যতবার সে বলতে গেল ততবারই কে যেন তার মুখ চেপে ধরতে লাগল। লতিফ তার মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'কি হয়েছে রে তোর মুন্নি, আজ? অসুখ করেছে?' হেসে মুন্নি বললে, 'কই, না।'—কথাটা বলতে না পেরে তার যেন কেমন একটা যন্ত্রণা হতে লাগল। লতিফ আর তার মাঝখানের হাল্কা হাওয়াটা হঠাৎ যেন জমাট হয়ে উঠল। বেতের বাক্সের সব নীচে শাড়ীখানি রেখে দিয়েছিল তা আর বার করল না। মনটা তার দারুণ অস্বস্তিতে ভরে উঠল। আজ প্রথম সে লতিফের কাছে কথা গোপন করল।

সেদিনও ছিল হাটবার। বেলাবেলি লতিফ হাটে গিয়াছিল। আজ ইব্রাহিম ছিল তার সঙ্গে। দু'বন্ধুতে গল্প করতে করতে হাটের পসরা নিয়ে বাড়ী ফিরছিল। বাদুলে হাওয়ায় অনেকক্ষণ থেকে জলের পাশের বাঁশের

মাচা, খড়ের চাল ও খোলা দরজা কেঁপে কেঁপে উঠছিল ··অত্যন্ত ঠাণ্ডা একটা দমকা হাওয়া এসে হা হা শব্দে এদিক থেকে ওদিকে বয়ে চলে গেল। আসন্ন বর্ষণের সমারোহ করে আকাশে কাল মেঘ বিস্তৃত হয়ে পড়ছিল। সুপারি-গাছের সারি যেন ঝড়ের হাওয়ায় ভেঙ্গে পড়ছে। লতিফের বুকটা দুর দুর করে উঠল। সে ইব্রাহিমের হাত ধরে টানতে টানতে বাড়ীর দিকে চলল। হাটের পথের দিকে যে পথটি নদীর পাশ দিয়ে গিয়েছে তারা সেই পথ ধরে ছুটল।

বর্ষার সন্ধ্যায় থমথমে অন্ধকার নদীর জলে কালো ছায়া ফেলেছে। অনেক দূরে বৃষ্টি নেমেছে। বাতাসে ভেসে আসছে তার শীতলতা আর রিমি ঝিমি মৃদু শব্দ—পথের ধারে ধারে ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি বেরিয়েছে। ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি সুরু হল।

কঠিন নিয়তির মত বর্ষার বর্ষণ—তারই বিরুদ্ধে দুই বন্ধু হাত ধরা-ধরি করে ছুটেছিল—কিন্তু সে আর কতক্ষণ! অন্ধকারে কোথায় ইব্রাহিম আর কোথায় লতিফ—দু'জনের আর্ত্তস্বর শুধু দু'জনের কাণে আসে পরক্ষণেই মত্ত জল আসে রুখে—হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে কি একটা জিনিষ ঝক্‌মক্ করে উঠল···কড় কড় শব্দে বাজ পড়ল ওপারের পোড়া তাল-গাছটার ওপর। আধপোড়া গাছটা দপ দপ করে জ্বলে উঠল। সেই আলোয় ইব্রাহিম দেখল, লতিফ মাটীর ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।

ইব্রাহিমের ক্ষেতের পাশে লতিফের ক্ষেত, দুটি ভাইয়ের মত আজও গলা জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে। তাদের একখানি বাহু আজ খসে গেল গলা থেকে—ইব্রাহিমের স্নেহের নীড় থেকে লতিফ হারিয়ে গেল অজানা অচেনা কোন অসীম আকাশে। ওই ছোট্ট ক্ষেতের সবুজ ফসলের মাঝে উঠেছে একটি নূতন কবর। ভোরের সূর্য্য তার ওপরে আলো বর্ষণ করে। সন্ধ্যাতারা সেই কবরটির পানে চেয়ে নীরবে কাঁদে। বর্ষার মেঘ এসে তার ওপরে স্নেহধারা ঢেলে দিয়ে যায়। মাঠের বাতাস কেঁদে যায়,—নেই—নেই—নেই! সেই গাছের সারি-দেওয়া নদীর-পার, সেই তেঁতুলতলা, সেই ধানের ক্ষেত, আলের পথ, সবই রয়েছে; আকাশ থেকে মাটি পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোন পরিবর্ত্তন হয় নি, নেই শুধু একজন—যাকে হারিয়ে দুটি বুক ভেঙ্গে খান্ খান্ হয়ে গেছে, ক্ষেতের পাশে দাঁড়িয়ে ইব্রাহিম নিমেষহারা চোখে কবরের দিকে চেয়ে থাকত, কত কাঁদবে! অশ্রুর সাগরের কি সীমা নেই!

সন্ধ্যা হলে একটি মেয়ে সন্ধ্যার মতই হাতে বাতি নিয়ে ধীরে ধীরে আসে সেই কবরের কাছে। বাঁশ-বনের মাথার ওপর সাতটি তারা ওঠে, উদাস চোখে ইব্রাহিম সেই দিকে চেয়ে থাকে। মেয়েটি বাতিগুলি একে একে জ্বালিয়া কবর সাজায়, বন থেকে তুলে-আনা এক মুঠো সন্ধ্যা-মালতী তার ওপর ছড়িয়ে দেয়। তার হাত কাঁপে। চোখের পাতা ভারি হয়ে আসে। হঠাৎ দুহাত দিয়ে সে প্রাণপণে কবর চেপে ধরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ইব্রাহিমের পা চলে না—কোন রকমেই টানতে সে কবরের কাছে গিয়ে মুন্নিকে মাটি থেকে কোলের ওপর তুলে নিতে পারে না! তার পাদুখানি যেন ডুরে শাড়ী দিয়ে কে বেঁধে রাখে। কবরের বুকে মুখ রেখে মুন্নি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে!

সে কান্না থামে না!—কিছুতেই না!—

রাগ এবং দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র কর্ত্তব্যবুদ্ধি দ্বারা কিরূপ ভাবে কার্য্যে প্রণোদিত হইতে হয়, তাহা শিক্ষা করিতে না পারিলে, অথবা জনসাধারণকে শিখাইতে না পারিলে অন্য কোন উপায়ে যে মানুষে মানুষে ঐকান্তিক মিলন হওয়া সম্ভবপর নহে, তাহা মানুষ আজকাল বুঝিতে পারে না বটে, কিন্তু অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, বহু সহস্র বৎসর আগে ঐ কথার সত্যতা অতি পরিষ্কার ভাবে বেদ, বাইবেল ও কোরাণে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

রাজগীর, নালান্দা ও পাটলিপুত্র

—শ্রীঅবনীনাথ রায়

হাত-পা যত শীঘ্র ক্লান্ত হয় মন তত শীঘ্র হয় না। তাই খানিক চলা-ফেরার পর হাত-পা চায় বিশ্রাম কিন্তু মনের ক্ষুধা অত শীঘ্র মিটতে চায় না। পাটনায় আমাদের সেই রকম অবস্থা হয়েছিল। কয়েক দিন উপর্য্যুপরি প্রবন্ধ এবং সভাপতিদের অভিভাষণ শোনার পর শরীর যখন অতি মাত্রায় ক্লান্ত তখন প্রস্তাব এল যে রাজগীর এবং নালান্দা যদি কেউ দেখতে যেতে চান্ তবে এই সময়। সন্ধ্যার পর ট্রেণ, সেই রাত্রেই যাত্রা করতে হবে। শরীর তখন চাইছে যে, রাতটা ঘুমিয়ে বাঁচি কিন্তু মন তখন বলছে যে, আর যদি কখনও এদিকে না আসা হয়, তবে এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান দুটি দেখা হবে না। অতএব এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। শেষে মনের হল জয়। অবসাদগ্রস্ত ঝিমিয়ে-পড়া দেহটাকে টেনে তুলে ষ্টেশন অভিমুখে ছুটলাম।

কিন্তু ষ্টেশনে এসে মন এবং শরীর দুই-ই চাঙ্গা হয়ে উঠল। চারিদিকের কলধ্বনি, যাত্রীদের কর্ম্মব্যস্ততা, লাল নীল রঙের আলো, পেট্রোলের গন্ধ, একা ঘোড়ার হ্রেষা এই সব মিলিয়ে যেন এক নূতন উত্তেজনার জগতে এসে পড়লাম। উত্তেজনায় উত্তেজনার সঞ্চার হল— বিপুল উদ্যমে নিজেই লগেজ হাতে করে, অন্যের লাগেজ টেনে তুলে দিয়ে, ট্রেণে চড়ে বসলাম। বক্তিয়ারপুর জংসন ষ্টেশনে যখন পৌঁছালাম তখন রাত নটা বেজে গেছে।

আলো-ছায়াচ্ছন্ন ষ্টেশন। যেটুকু আলো ছিল তাও ট্রেণ চলে যেতে নিবিয়ে দিলে। রাজগীরে যাওয়ার ট্রেণ পরের দিন ভোর বেলা। রাত্রিটা কোথায় কাটান যায় মনে মনে ভাবছি, এমন সময় বিহার-বক্তিয়ারপুর লাইট রেলওয়ের ট্র্যাফিক ইনস্পেক্টার দেখা দিলেন। তিনি বাঙালী। আমরা এক দলে পনের বিশজন যাত্রী ছিলাম। শীতের রাত, পশ্চিমের ডিসেম্বর মাসের ঠাণ্ডা। ইনস্পেক্টার সাহেবের বোধ হয় দয়া হল। তাঁর হুকুমে লাইট রেলওয়ের প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাগুলি খুলে দিয়ে আলো জেলে দিলে। আমাদের কয়েকজনকে তিনি নিজের বাসায় নিয়ে গিয়েও স্থান দিলেন।

প্রত্যূষে উঠে ট্রেণ ধরার আগে দেখি ইনস্পেক্টার আমাদের জন্য মাছের ঝোল ভাত তৈরি করিয়েছেন।



নালান্দা মিউজিয়ামে বুদ্ধদেবের ধাতু-নির্ম্মিত দণ্ডায়মান মূর্ত্তি (অভয়ামুদ্র)।

শীতের প্রত্যূষে কলা-পাতায় প্রসারিত গরম গরম অন্ন, গাওয়া ঘি এবং মাছের ঝোলের সদ্ব্যবহার করে আমরা যখন লাইট রেলওয়ের ন্যারো গেজ ট্রেণে চড়ে বসলাম, তখন মনটা এক অপরূপ মাধুর্য্যে ভরে গেছে। মনে মনে বল-লাম, বাঙালীর উচ্ছ্বাস-প্রিয়তার নিন্দা আছে জানি, তার আতিশয্য হয়ত তার অন্য গুণকে খর্ব্বও করেছে কিন্তু তবু একান্ত বিদেশে অনাত্মীয় ইনস্পেক্টার সাহেবের অপ্রয়োজনের এই অতিথি-সৎকারকে দুর্ব্বলতা বলে কোন মতেই অনাদর করতে পারব না।

রাজগীর এই রেলের শেষ ষ্টেশন। নালান্দা পথের মধ্যে পড়ে, রাজগীর থেকে ৮ মাইল। সকালে পর পর দুইখানি ট্রেণ ছিল। তাই স্থির হল, আগে আমরা নালান্দায় নেমে নালান্দার ধ্বংসস্তূপ দেখে পরের ট্রেণে রাজগীর যাব। মাঝে ঘণ্টাখানেক সময়ের ব্যবধান।

অবশ্য, ইনস্‌পেকটার সাহেব এমন আশ্বাস দিতেও ভুললেন না যে, পরের ট্রেণখানিতে তিনি নিজেই যাবেন এবং অনাবশ্যক দ্রুত যাওয়ার বিরুদ্ধে তিনি তদারক করবেন।

নালান্দার ষ্টেশন পেরিয়ে প্রথমেই চোখে পড়ল একটি বৌদ্ধ আশ্রম। সেখানে তিব্বতদেশীয় একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু অধ্যক্ষ-রূপে আছেন। তিনি হিন্দি জানেন। কথাবার্ত্তায় জানা গেল, আশ্রম সকল যাত্রীর বিশ্রামের জন্যই উন্মুক্ত, তবে এখন বাড়ী তৈরী শেষ না হওয়ায় তাঁরা বৌদ্ধ ছাড়া অপরকে আশ্রয় দিতে পারছেন না। তাঁর পরণে বৌদ্ধ-ভিক্ষুর গৈরিক বসন।

একটা কাঁচা মাটির পথ ষ্টেশন থেকে নালান্দার সঙ্ঘারাম পর্য্যন্ত চলে গেছে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা, ধুলায় পরিপূর্ণ। তার মধ্যে দিয়েই মোটর গাড়ী চলে। আমরা একজন পথ-প্রদর্শক সঙ্গে নিয়েছিলাম, তাঁর সাহচর্য্যে আমরা অন্য পথে মাঠের উপর দিয়ে গ্রামের মধ্য দিয়ে একটু শীঘ্র সংঘারামে পৌঁছে গেলাম। গ্রামের গ্রামখানি বড় সুন্দর লাগল। গ্রামবাসীদের কেউ দাওয়ায় বসে রুটি খাচ্ছে, উঠানে গরু বাঁধা, মাঠে পরিবার ছুটোছুটি করছে। জীবনের উচ্চাভিলাষে তারা পীড়িত নয়, কোন রকমে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করাই তারা যথেষ্ট বলে মনে করে। আমাদের দিকে তারা উৎসুক নয়নে তাকিয়ে দেখতে লাগল।



নালান্দা মিউজিয়ামে রক্ষিত বোধিসত্ত্বের দণ্ডায়মান প্রস্তরমূর্ত্তি (বড় মুদ্রা)

নালান্দার ধ্বংসস্তূপ একটা দর্শনীয় ব্যাপার। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করাই যায় না যে, মৃত্তিকার গহ্বরে এমন বড় বড় প্রাসাদ লুকায়িত ছিল। প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ এই প্রাচীন-কীর্ত্তি খনন করে লোক-চক্ষুর গোচর করাতে মানুষের জ্ঞানের পরিধি বেড়ে গেছে। অনেক অবিশ্বাসীকেও এখন বিশ্বাস করতে হবে যে, প্রাচীন ভারতে নালন্দা কত বড় বিশ্ব-বিদ্যালয় ছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতে ওখানে দশহাজার ছাত্র পড়াশোনা এবং বসবাস করত। আজকালকার দিনে কল্পনাও করা যায় না যে, দশহাজার লোক একত্রে বাস করেই বা কি করে এবং তাদের খরচই বা জোগায় কে? খরচ অবশ্য রাজসরকার যোগাতেন, একশখানি গ্রামের রাজস্ব নালান্দার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ব্যয়-নির্ব্বাহ করার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। ছাত্রেরা যে ঘরে বাস করিত, যেখানে স্নান করিত তাদের শৌচের মাটির ভাঁড়গুলি পর্য্যন্ত সবই ভূগর্ভ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। ভিতরকার দেয়ালে বিভিন্ন আসনে উপবিষ্ট বৌদ্ধমূর্ত্তি প্রোথিত—সে গুলি ভারতীয় ভাস্কর্য্যের উজ্জ্বল নিদর্শন। এক জায়গায় নাগার্জ্জুনের একটি সুন্দর ধ্যানরত মূর্ত্তি দেখলাম। নাগার্জ্জুন নালান্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একজন বিশ্রুতকীর্ত্তি ছাত্র ছিলেন এবং পরে অধ্যাপক হয়েছিলেন। দুঃখের বিষয়, কোন মূর্ত্তিই অক্ষত নেই, কারুর নাক ভাঙা, কারুর একটা হাত ভাঙা ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে যখন মুসলমান-আক্রমণ হয়, তখন অনেক হিন্দুমন্দির এবং প্রাচীন হিন্দু-কীর্ত্তি পুড়িয়ে এবং ভেঙে-চুরে নষ্ট করে দেওয়া হয়। তাই উক্ত মূর্ত্তিগুলির এ-দশা হয়েছে। কিন্তু, তবু যা আছে তার থেকে প্রাচীন ভাস্কর্য্য যে উন্নতির কত উচ্চ সোপানে উঠেছিল তা বুঝতে কষ্ট হয় না। একটা অনেক ধাপবিশিষ্ট উঁচু সিঁড়ি অক্ষত অবস্থায় রয়েছে—তার উপর উঠে আমরা চারিদিকের মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। প্রদর্শক আঙুল উঁচু করে দেখিয়ে বললে, এই যে লাইন ধরে আমরা খুঁড়ে চলেছি এই দিকেই ছিল গ্রাম। আমরা আর কতটুকু খুঁড়েছি, কিন্তু যদি বরাবর ঐ দিকে খুঁড়ে যাওয়া

যায়, তবে গ্রামকে গ্রাম বেরিয়ে পড়বে, সব মাটির তলায় চাপা পড়ে আছে মাত্র।

কেন সব খুঁড়ে গ্রামকে গ্রাম বার করা হয় না গবর্ণমেণ্টকে সে প্রশ্ন করা বৃথা। সর্ব্বত্রই সেই অর্থনৈতিক সমস্যা—এই খনন-কার্য্যের টাকা যোগাবে কে? গবর্ণমেণ্ট প্রতি বছর প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের জন্য বাজেটে কিছু টাকা বরাদ্দ করেন, কিন্তু প্রদেশে প্রদেশে ভাগ-বাঁটোয়ারা হতে হতে প্রতি খনন-কার্য্যে যতটুকু এসে পৌঁছায় তা' অকিঞ্চিৎকর। রাজগীরে খনন-কার্য্যের যিনি তদারক করেন তিনি বলেছিলেন যে, গত বছর মাত্র পাঁচ শত টাকা তাঁদের কাজের জন্য নির্দ্ধারিত হয়েছে। পাঁচ শত টাকা; এর মধ্যেই তাঁদের এক বছরের মাইনে, খনন-কার্য্যে কুলির দৈনন্দিন পারিশ্রমিক প্রভৃতি আনুষঙ্গিক সমস্ত খরচ আছে। তিনি আরও দুঃখ করেছিলেন এই বলে যে, আগামী বছর বোধ হয় টাকার অভাবে তাঁদের কাজ বন্ধ করে দিতে হবে। অথচ, সামনের একটা পাহাড়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে উদ্দীপ্ত চোখে বলেছিলেন যে, ঐ পাহাড়টার নীচে কি প্রাচীন কীর্ত্তি লুকিয়ে আছে কে বলতে পারে? আমরা জীম, জরাসন্ধের যে সব কীর্ত্তি-কলাপ আবিষ্কার করেছি, তা' ত একটা পাহাড়ের নীচেই ছিল!



ভূমিকম্পে যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহা মেরামত করিবার পর নালান্দার প্রধান স্তূপের দৃশ্য।

নূতন বছরে রাজগীরের খনন-কার্য্যের জন্য বরাদ্দের অঙ্কটা কত খোঁজ পাই নি, কিন্তু এ কথা জানি যে, সে সম্বন্ধে আশান্বিত হওয়ার কোন হেতু নেই। কেবল মাত্র সরকারের উপর ভরসা ক'রে এ সব কাজ চলে না, এতে চাই দেশের সর্ব্বসাধারণের অর্থানুকূল্য। কিন্তু, আমরা বর্ত্তমান-সর্ব্বস্ব জাতি, বর্ত্তমানকে নিজের আয়ত্তে আনতেই আমাদের সমস্ত উদ্যম ব্যয়িত হয়। অতীতের গৌরব-কোন উদ্ধার করার দিকে আমাদের ঝোঁক কই?

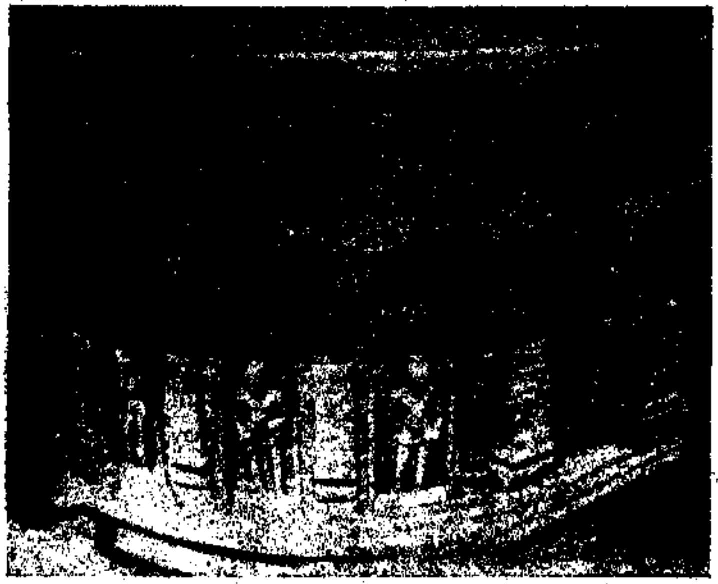
নালান্দার ধ্বংস-স্তূপ পেরিয়ে রাস্তার অপর পার্শ্বে আম্রকাননে এলাম। দুটি জায়গার মাঝখানে আছে সুরকির রাস্তা চারি দিকের দিগন্ত-বিসারী মাঠের মাঝখানে আম্রকাননটুকু যেন ছায়াচ্ছন্ন শীতল আশ্রয়। মনে পড়তে লাগল, এখানে এক কালে তথাগত বুদ্ধ বাস করেছিলেন, তাঁর শিষ্যমণ্ডলী বাস করেছিলেন, চীনা পরিব্রাজক হুয়েন সাং বাস করেছিলেন। বেশ বুঝতে পারলাম, কোন একটা স্থানের পরিচয় কেবল মাত্র তার বর্ত্তমান পারিপার্শ্বিকের উপর নির্ভর করে না, তার অতীত গৌরব ও দেখতে পারার এবং জানতে পারার জন্যে সাধনা চাই।

আম্রকাননের মাঝখানে মিউজিয়াম, তাতে নালান্দার ধ্বংসাবশেষ খুঁড়ে যে সব বৌদ্ধ মূর্ত্তি, তাম্রশাসন, মুদ্রা, জলের জালা, মাটির বাসন প্রভৃতি পাওয়া গেছে, সব সাজিয়ে কাচের আলমারিতে রাখা হয়েছে। জলের বৃহৎ জালাটা বাইরেই রাখা হয়েছে, তার এক পাশের কিছু অংশ ভেঙে গেছে। বোধ হয়, মাটির নীচ থেকে তোলার সময় এটা ঘটেছে।

নালান্দা পিছনে রেখে মাটির রাস্তা দিয়ে আবার আমরা ষ্টেশনে ফিরে এলাম। ক্ষুধার উদ্রেক হওয়ায় আমরা কিছু খোয়া ও মিষ্টি খরিদ করলুম। জিনিষ-পত্র খুব

সস্তা। বিহারের পল্লীগুলি দরিদ্র। ট্রেনে যাওয়ার সময়ে দু'পাশে দেখলাম আলুর ক্ষেত, আলু জন্মেছেও প্রচুর, কিন্তু বেচারা কৃষকেরা এর মুনাফা পাবে যৎসামান্য। মাঝখান থেকে ফ'ড়েরা (middlemen) সস্তা দরে কিনে নিয়ে গিয়ে সহরে চড়া দামে বিক্রি ক'রে নিজেরা লাভ করবে। আর একটা বস্তু চোখে পড়ল, তালের রস এবং তালের পাটালি ওখানে প্রচুর পাওয়া যায় এবং খুব সস্তা। ষ্টেশনের পাশে প্রত্যেক ময়রার দোকানেই বিক্রির জন্যে তালের পাটালি দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে এবং তালের রসও ভাঁড়ে ক'রে রক্ষিত হয়েছে।

সংখ্যা এত বেশী যে, ধর্মশালায় প্রায়ই জায়গা পাওয়া যায় না। আর একটু এগিয়ে ডান দিকে দেখতে পেলাম, বেণুবন—শাস্ত্রে যার নাম করণ্ড বেণুবন। ভগবান্ বুদ্ধের বাসস্থানের জন্ত নৃপতি বিম্বিসার এক বাঁশের কুঞ্জ তাঁকে উপহার দেন। এ সেই বাঁশের কুঞ্জ। কতকগুলি নম্র-শীর্ষ বাঁশ বায়ুবেগে আন্দোলিত হচ্ছে দেখলাম। এ বাঁশগুলি সে আমলের না হোক্, তাদের বংশধর হবে। আরও এগিয়ে একটা ফটকের মত দেখতে পেলাম। ফটক অবশ্য বর্তমান নেই, তার ধ্বংসাবশেষ আছে মাত্র। ফটক পেরিয়ে যেন প্রাচীন রাজগৃহে বা গিরিব্রজে প্রবেশ করলাম মনে হল। চারিদিক্ ঘিরে পাহাড়—মাঝখানে আমরা দাঁড়িয়ে। স্পষ্ট প্রতীতি হল যে, পাহাড় দিয়ে ঘেরা একটি প্রাচীন সহরের মাঝখানে আমরা পৌঁছেছি। উঁচু পথ দিয়ে উপরের দিকে যেতে একটা সাঁকো পার হলাম—নীচে ছোট্ট নদী। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, এখানে সরস্বতী নদী ছিল। চারিদিকে মন্দিরের মাঝখানে ব্রহ্ম-কুণ্ডের উষ্ণ-প্রস্রবণ বয়ে যাচ্ছে। মন্দিরের প্রাঙ্গণে জামা-জুতা খুলে রেখে



রাজগীরে মণিয়ার-মঠের দেয়ালের গায়ে বসান মূর্ত্তি।

ট্রেণ যখন রাজগীর পৌঁছাল তখন বেলা দশটা পেরিয়ে গেছে। চারিদিকে মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের প্রখর দীপ্তি। ষ্টেশন-মাষ্টারের জিম্মায় জিনিষপত্র রেখে আমরা ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করবার উদ্দেশ্যে হেঁটে রওনা হলাম। ষ্টেশনের আশে পাশে হাল্কা ধরণের কয়েকটি বাংলো প্যাটার্ণের বাড়ী চোখে পড়ল। গরমের সময় বাস করার জন্য রাজগীরে কেউ কেউ বাড়ী তৈরী করিয়েছেন।

উঁচু-নীচু পথ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে ডান দিকে কয়েকটি ধর্মশালা নজরে এল। শুনলাম, এখানে দর্শনার্থীর

আমরা উষ্ণ জলধারায় স্নান করতে গেলাম, পাহাড়ের পঞ্জর ভেদ করে জলের ফিনকি বেরিয়ে আসছে, কিন্তু কোথায় যে এর উৎস-মুখ তা আবিষ্কার করা গেল না। জলধারায় স্নানের পর আমরা ছোট্ট একটি পুকুরের মত ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করতে গেলাম। ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান না করলে স্নান সমাপ্ত হয় না। যদিচ নাতিশীতোষ্ণ পরিমণ্ডল, কিন্তু একেবারে হঠাৎ জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুব দেওয়া যায় না। পৈঠার উপর পা দিয়ে আস্তে আস্তে জলের মধ্যে নেমে গরমটা সইয়ে নিতে হয়। তারপর

আবদ্ধ জলে গিয়ে ডুব দেওয়া যায়। ব্রহ্মকুণ্ড নীচে বলে উপরের ধারার স্নাত যত আবর্জনা সব সেখানে এসে পড়ছে - একজন লোক ফেনার মত সেই অপরিষ্কৃত অংশ অনবরত নিষ্কাশনের পথে বের করে দিয়ে কুণ্ডের জল পরিষ্কৃত রাখতে চেষ্টা করছে। শুনলুম প্রত্যূষে যাত্রি-সমাগমের পূর্ব্বে কুণ্ডের জল এত স্বচ্ছ থাকে যে তার তলদেশ পর্য্যন্ত দেখা যায়।

স্নানের পর পাণ্ডারা চন্দন তিলক পরিয়ে দিল। উপরে উঠার সিঁড়ির পাশে ময়রার দোকান—ইচ্ছামত পুরি-কচৌরি ভাজিয়ে নেওয়া যায়। আর ছোলা ভিজে ও ভাজা এবং লঙ্কা রয়েছে অনেক—সম্ভবতঃ ওটি খুব সস্তা এবং মুখরোচক খাদ্য বলে। আমরা অকারণ কালক্ষেপ না করে মণিয়ার মঠ দেখতে গেলাম। নাগ মণি-



প্রধান স্তূপের উপর হইতে নালান্দায় আবিষ্কৃত মঠসমূহের দৃশ্য।

ভদ্রের নাম অনুসারে মনিয়ার-মঠের নামকরণ হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ভূগর্ভ থেকে খুঁড়ে এই যে বিচিত্র মঠটি



রাজগীরে পিটকোর্টের সংরক্ষিত নর্থ গেট দুইটি বুরুজ দেখা যাইতেছে।

বের করেছেন, এর স্থাপত্যের দিকে তাকালে বিস্ময়ে অবাক্ হতে হয়। এই মঠটির গায়ে প্রাগৈতিহাসিক হিন্দু যুগের, ঐতিহাসিক হিন্দু যুগের, বৌদ্ধ যুগের স্থপতি-শিল্পের নিদর্শন রয়েছে। এক একটি যুগ গত হয়েছে, আর সেই যুগের নির্ম্মিত বাস্তু মাটির নীচে চাপা পড়েছে—পরবর্ত্তী যুগে আবার সেই বাস্তুকে বনেদ ভেবে নিয়ে তার উপর বাস্তু নির্ম্মিত হয়েছে—এই ভাবে চার পাঁচটি যুগের শিল্পকলার পরিচয় একই মঠ নিজের গায়ে বহন করছে, অধুনা প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ সেই মঠটি খুঁড়ে বের করে সেই ভাবেই রেখে দিয়েছেন। কোন যুগে কতদূর অবধি

তৈরী হয়েছিল বলে তাঁরা অনুমান করেছেন, সেটা প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের খননকার্য্যের ভার যাঁর উপর আছে, তিনি আমাদের লাঠি দিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। খুব অদ্ভুত লাগল আমাদের কাছে এই মঠটি—মনে হল, এই মঠকে অবলম্বন করে বর্ত্তমান কালের পরিধি থেকে নেমে গিয়ে শুদ্ধ অতীতের জঠরে প্রবেশ করা যায়, যেখানে চারি পাশে সুন্দর তপোভূমি, মুনি-ঋষিরা হোম করছেন, কৃষ্ণসার ঘুরে বেড়াচ্ছে, গাভী নীবারকণা খুঁটে খাচ্ছে, স্বাহাকারের ঝঙ্কারে এবং ঘৃতের গিন্ধে পবিত্র এক অপূর্ব্ব যজ্ঞভূমি। হয়েছেও তাই, এই মঠের সর্ব্বনিম্ন স্তরে যজ্ঞভূমি, যজ্ঞের কুণ্ড, ঘৃতাহুতি দেওয়ার চতুর্মুখ মৃৎপাত্র, এমন কি, যজ্ঞের ভস্মাবশেষ পর্য্যন্ত পাওয়া গেছে। সত্যিই আশ্চর্য্য আমাদের এই দেশ! ধৈর্য্য ধরে সাধনা করলে এ দেশে কি পাওয়া যায় না, তাই ভাবি।

মণিয়ার মঠ থেকে আমরা খানিকটা হেঁটে পাহাড়ের আর একটা গহ্বরে পৌঁছলাম, শুনলাম, সেটা জরাসন্ধের ধনভাণ্ডার ছিল। পাহাড়ের মধ্যে একটা চৌকোণা ঘরের মত, ধনভাণ্ডারের প্রমাণস্বরূপ ঘরের দেয়ালে সোনার দাগ এখনও লেগে রয়েছে।

ফেরবার ট্রেনের আর বেশী দেরী ছিল না। বিশেষ সেখান থেকে হেঁটে ষ্টেশনে ফিরতে এক ঘণ্টা সময় লাগবে। প্যাকা বাঁধানো রাস্তা থেকে আমরা অন্য রাস্তায় গিয়ে পড়েছিলাম। সেটা পায়েচলা ছোট রাস্তা, ধূলায় বোঝাই, পাশে ছোট ছোট কাঁটা-গাছ। ক্লান্তপদে ফিরে যখন ষ্টেশনে এলাম, তখন ট্রেন ছাড়ার আর বেশী দেরী নেই। রাজগীর কুণ্ডের পরে সিলাও নামক একটা ছোট ষ্টেশন পড়লো। শুনলাম, সেখানকার খাজা খুব প্রসিদ্ধ। বারো আনা দিয়ে আমরা এক সের খাজা কিনে নিলাম। গয়েই খাজা-গজার নাম শুনেছি, কিন্তু বাস্তব খাজা খেয়ে দেখলাম, গর্ব্বের কারণ আছে বটে। যেমন নরম, তেমনি সুপক্ক, কিন্তু, তেমনি সস্তা।

বক্তিয়ারপুরে ফিরে ইন্সপেক্টার সাহেবের বাসায় নিশা-যাপনের পর যখন পাটনায় ফিরে এলাম, তখন প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের বৈঠক শেষ হয়ে গেছে। সেই হুইলার সিনেট হল রয়েছে, কিন্তু সেখানে আর লাল শালুর উপর তুলো দিয়ে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ধ্বজা ঝুলান নেই। রাস্তার ধারে বিংশ শতাব্দীর ফটক চোখে পড়ল, দেখলাম, কয়েকদিন আগে অশোকের সময়ের পাটলিপুত্রের রেলিং-এর অনুকরণে যে "অশোক-তোরণ" নির্ম্মিত হয়েছিল, তা আর সেখানে নেই। ক্যাভেণ্ডিস হোষ্টেলে প্রতিনিধি-নিবাস রচিত হয়েছিল—তার ঘরে ঘরে সাহিত্যিকদের গলাগুঞ্জন, তর্ক, আলাপ ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল, সেদিন আর তাকে চিনতে পারলাম না। তখন সেখানে ছাত্রদের ক্ষিপ্র পদধ্বনি, আশা-আকাঙ্ক্ষার উগ্র কথা, রাজনীতির কুটিল যুক্তিজাল—কয়েকদিন আগেকার শান্তরসাস্পদ শুদ্ধ পরিমণ্ডলটি অন্তর্হিত হয়েছে। চোখের সামনে দেখতে পেলাম, উদয় তাঁর কুসুমপুর নিয়ে পটভূমিকার অন্তরালে সরে গেলেন, মহারাজ অশোক তাঁর অহিংসাপূত রাজদণ্ড হাতে নিয়ে মহানগরী পাটলীপুত্রের পরিখা অতিক্রম করে অতীতের ঝাপসা কুয়াসার মধ্যে লুক্কায়িত হলেন। প্রখর রৌদ্রের তীব্র আলোকে উন্মুক্ত হল, বিংশ শতাব্দীর পাটনার নগ্ন রূপ—তার কর্ম্মব্যস্ততা, তার লোভের, কাড়াকাড়ির, হানাহানির উলঙ্গ চিত্র, বিষণ্ণ-মনে বললাম, 'এ ত আমি দেখতে চাইনি দেবতা। আমি দেখতে চেয়েছিলাম, অতীত ভারতের শান্ত রূপ। বর্ত্তমান জগতের ক্রূরতার সঙ্গে তো আমি নিত্য-পরিচিত। মনের আবেগে গঙ্গার তীরে ছুটে গেলাম। মনে মনে বললাম, 'দেবি সুরধুনি, কয়েকদিন আগে অতীত কীর্ত্তিতে বিশ্বাসপরায়ণ যে তিন জন সাহিত্যিক তোমার কূলে পদচারণা করেছিল, তাঁদের কথা কি তুমিও ভুলে গেছ?' গঙ্গার কলধ্বনির মধ্যে যেন তার উত্তর পেলাম,—

For men may come and men may go,
But I go on for ever.

'দু'একটি কথা

—শ্রীমৃণালিনী গুপ্তা

আমাদের (অর্থাৎ মেয়েদের) শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত এবং কী করিলে আমাদের জীবন সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও সুচারু রূপে অতিবাহিত করা যায়, ইহা লইয়া বহু আলোচনা হইতেছে। জানি না, ইহাতে কিছু সুফল ফলিয়াছে কি না, কিন্তু শিক্ষার আবহাওয়ায় (অর্থাৎ লেখাপড়া শিখিতে গিয়া) মেয়েদের বিবাহের বয়স অতিরিক্ত রকমে বাড়িয়া উঠিয়াছে। বিদ্যার্জ্জন করিয়া অনেক মেয়েরা শিক্ষিতাও হইতেছেন, কিন্তু বিদ্যাশেষে দেখা যায়, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 'কোর্স' মুখস্থ করিয়া তাঁহাদের না থাকে লাবণ্য, না থাকে নারীজনোচিত কমনীয় শ্রী; এম্. এ., বি. এ., পড়ার চাপে অনেকেই দেহের কমনীয়তা হারাইয়া ফেলেন। তবুও দেখা যায়, লেখাপড়া আজকাল অনেকেই করেন ও করিতেছেন, শিক্ষিতাও অনেকেই হইতেছেন, তবে সর্ব্ববিষয়ে শিক্ষিতা হন কি না জানি না, কিন্তু তবুও দেখা যায়, বর জুটিতে দেরীই হইতেছে। আমার ঠাকুরমার কাছে আগেকার কালের গল্প শুনিলে, আমার ধারণা হয়, আগেকার কালের মানুষদের জীবনযাত্রা খুবই সরল সহজভাবে কাটিয়া যাইত। এখন দিনের পর দিন নিত্য-নূতন ফ্যাশান গজাইতেছে। তখনকার দিনে সৌখীনতা বা বিলাসিতার ধার দিয়াও মেয়েরা যাইত না।

ঠাকুরমা বলেন, ঠাকুরমার বিবাহের সময়, তিনি একখানি নয়হাতি চেলী ও গায়ের একটি পিরাণ (এখন যাহা ব্লেসিজ রূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে) এবং একটি দোলাই ও সামান্য কিছু রূপার ও সোণার গহনামাত্র বিবাহের যৌতুক-স্বরূপ পাইয়াছিলেন এবং তাহাতেই তিনি অপার আনন্দে আনন্দিতা হইয়াছিলেন। আমার ঠাকুরদাদা অতি অল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়াছিলেন, আমার প্রপিতামহী অতি দুঃখে কষ্টে পুত্রকে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়াছিলেন। তিনি পুত্রের বিবাহের সময় অতি সহজেই বৈবাহিকের নিকট হইতে পণ লইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি পণ না লইয়া আমার ঠাকুরমাকে সাদরে বধূরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমার ঠাকুরমা বিশেষ সুন্দরীও ছিলেন না, কিন্তু ঠাকুরদাদা খুবই রূপবান্ বলিষ্ঠদেহ ছিলেন। তিনি দরিদ্রা মাতার পুত্র ছিলেন, কিন্তু নিজ অধ্যবসায়ে পাটনার শ্রেষ্ঠ ও প্রসিদ্ধ ডাক্তাররূপে গণ্য হইয়াছিলেন এবং মাতাকে লক্ষ টাকার অধিশ্বরী করিয়াছিলেন এবং বহু দরিদ্রকে প্রতি বৎসর বহু শীত-বস্ত্র দান করিতেন, মাতার নামে দানসত্র করিয়াছিলেন। সেই দানসত্রে বহু দরিদ্রসেবা হইত। আমার প্রপিতামহী বলিতেন, আমার ঠাকুরদাদার এই সৌভাগ্য আমার ঠাকুরমার কপালগুণেই ফলিয়াছিল; তখনকার দিনের মানুষেরা 'সুন্দরী বধূ না হইলে চলিবে না', বা মেয়ের পিতার যথোপযুক্ত টাকা আছে কি না, এবং দেনা-পাওনায় বিশেষ লাভবান্ হওয়া যায় কিরূপে, এই সব চিন্তায় কন্যার পিতাকে চিন্তিত করিয়া তুলিতেন না, তাঁহারা খুঁজিতেন সদ্বংশের কন্যা, 'ডানাকাটা পরী না হইয়া মোটামুটি দেখিতে সুশ্রী হইবে এবং সামান্য কিছু বিবাহের যৌতুক; তাই দুই এক কথাতেই পুত্রকন্যার বিবাহ হইয়া যাইত। তখন সর্ব্ববিষয়ে বিবাহে এত খরচেরও ধুমধাম ছিল না, পাঁচ-ছয় শত টাকাতেই কন্যার বিবাহ বেশ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া যাইত। এখন কন্যার বিবাহ দেওয়া গরীব বা গৃহস্থ পিতাদের কাছে বিভীষিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কন্যা যদি সুন্দরী, লেখা-পড়া, গান বাজনা-জানা শিক্ষিতা হয়, তাহা হইলে না হয় কিঞ্চিৎ কমে-সমে বিবাহ হয়, যদি তার উপর আবার কালো কিংবা সাধারণ কন্যা হয়, তাহা হইলে বরপণ দাও দুই হাজার টাকা, হাজার দুয়েকের গা-সাজানো গহনা না হইলে চলিবে না। বরাভরণ, দানসামগ্রী, ফুলশয্যা ইত্যাদিতে কোন্ না খরচ পড়িবে হাজার খানেক টাকা, তাহার উপর দাও ফার্ণিচার, খাট, ড্রেসিং টেবল, ষ্ট্যাণ্ড, আলমারী, আয়না, বুককেস ইত্যাদি। যাঁহাদের আছে টাকার জোর, (অনেকে আবার পৈতৃক বাড়ী বন্ধক দিয়াও) বৈবাহিকের মন যোগাইতে কসুর করেন না, কিন্তু যাঁহাদের টাকা নাই, বাড়ীও নাই, অথচ ঘরে আছে অনূঢ়া

কন্যা দুই-চারিটি, এমন সব কন্যার পিতারা কি করিবেন? যদিও তাঁহাদের কন্যার বিবাহ হইল, তাঁহারই মত সম-অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলের সঙ্গে, পাত্র হয় ত সামান্য মাহিনার চাকুরে, না হয় সামান্য কিছু জমিজমা আছে, যাহার আয়ে গ্রাসাচ্ছাদন কোন রকমে চলিয়া যায়। কিন্তু, তাহারাও ইহার উহার বন্ধু বান্ধব পাড়া-প্রতিবেশীর বিবাহের সময় নানা রকম পাওনা-থোওনা দেখিয়া দেখিয়া আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, বিবাহের সময় তাহারও বুঝি ওই রকমেই পাইবে। কিন্তু বিবাহ হইলে দেখা যায়, তাহার ফল ফলিয়াছে উল্টা। তাই তাহাদের নিষ্ফল আক্রোশ গিয়া পড়ে নির্দ্দোষী বধূটি ও তাহার 'চোখের চামড়া-বিহীন' গরীব অক্ষম পিতা-মাতার উপর; এবং তাহার তাল সামলাইতে হয় সেই নববধূটিকেই। তাই সদ্য বিবাহিতা নূতন বধূ শ্বশুরালয়ে পদার্পণ করিবামাত্র মহিলামহলে নানা রকমের সমালোচনা চলিতে থাকে। 'ও-বাড়ীর অপর্ণাকে তার বাবা কী সুন্দর জড়োয়ার নেকলেস্‌ট দিয়াছেন; দেখেছিস ভাই সেজ ঠাকুরঝি? নতুন ঠাকুরপোর বৌও কিন্তু বাপের বাড়ী থেকে চমৎকার মুক্তোর ব্রেসলেট জোড়া পেয়েছে, না সেজ মা? সেজ বৌদির আর্মলেটের প্যাটার্ণটা একেবারে আনকোরা নতুন কী সুন্দর মানিয়েছে সেজ বৌদি তোকে!' ইত্যাকার নানাবিধ আলোচনা সদ্য-আগত বধূটিকে শোনান হইয়া থাকে, এবং তাহার অক্ষম পিতার উপর কেহ কেহ দোষারোপও করিতে ছাড়েন না, বাড়ীর পুরুষেরাও দেখা যায় অসন্তুষ্টই হইয়াছেন।

তাহার উপর আমাদের দেশে মেয়ে-দেখার প্রথাও একটা চরম পরীক্ষা। কি শিক্ষিতা, কি অশিক্ষিতা, সে সময় মুড়ি-মিছরীর সমান দর, সে তুমি আই-এ, বি এ পাশই কর, আর নাই কর, যদি পাত্র পক্ষ আসিয়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেন—গান জান কি না? পিয়ানো বাজাইতে শিখিয়াছ কি? নানারূপ সূচিশিল্পে হাত পাকা আছে ত? আর, সেই সঙ্গে ওরিয়েণ্টাল ডান্স জানা থাকিলে আরও ভাল হয় এবং ফাও-স্বরূপ সামান্য কিছু ঘর গৃহস্থালীর কাজকর্ম জানা থাকিলেই হইল। হায়, সেকাল ও একাল! কী পরিবর্ত্তনই হইয়াছে আমাদের বাঙ্গালীদের। এদিকে দেশে ত অর্থসমস্যা ও বেকার-সমস্যায় জটিল জাল বুনিয়াছে। যে দেশে অনেক গরীব বাঙ্গালীদের ঘরে ভাতের উপর ব্যঞ্জন জুটে না, পরণের কাপড় অর্দ্ধছিন্ন, সে দেশে এরূপ বধূ-বিলাসিতা একটা হাস্যকর ব্যাপার নয় কি? তবু আমরা বাঙ্গালীরা প্রতিদিন সেই হাস্যকর ঘটনারই পুনরাবৃত্তি করিয়া যাই। বিবাহের পর কয়জন স্বামী স্ত্রীদের পিয়ানো বাজাইয়া, গান গাহিয়া দিন কাটাইবার অবসর দিতে পারেন, তা ত' জানি না, এবং কয়জনই বা স্ত্রীসহ মোটরযোগে লম্বা টুরে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারেন? আমাদের দেশে ধনীর সংখ্যা মুষ্টিমেয়; তাহার উপর এই দারুণ বেকার-সমস্যা আসিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে; গ্রাজুয়েট ছেলেরা ৩৫৲ টাকার কেরাণীগিরির জন্য প্রতিদিন অফিসে অফিসে মাথা কুটিতেছে, শত স্থানে দরখাস্ত পাঠাইয়া বিফল হইতেছে। তাহাদের সহিত আমরা মেয়েরাও আজকাল প্রতিযোগিতা করিতেছি, কিন্তু আমার বিশ্বাস, মেয়েদের স্থান ঘরের ভিতরেই ভাল, কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষদের সহিত আমাদের না দাঁড়ানই উচিত। শত-সহস্র পুরুষ-চক্ষুর মাঝখানে মেয়েদের স্বাধীনতায় ব্যাঘাত ঘটায় না কি? অনেক মহিলা লেখা-পড়া শিখিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতেছেন, অনেকের বিবাহও হইতেছে—আজ-কাল আবার ছেলেরা ধুয়া তুলিতেছে, লেখা-পড়া-জানা শিক্ষিতা মেয়ে নহিলে বিবাহ করিব না—। তাই অধিকাংশ পিতারাই মেয়েদের স্কুল-কলেজে দেন, মনে করেন, লেখা-পড়া-জানা মেয়ে, পাত্রেরা নিশ্চয়ই পছন্দ করিয়া বিবাহ করিতে চাহিবে, এবং বিবাহও হয়তো কিছু কম খরচে হইতে পারে। কিন্তু, স্কুল হইতে কন্যা ফিরিয়া আসিয়া যখন আব্দার ধরে' অমুক মেয়ে নতুন ডিজাইনের শাড়ী পড়িয়া স্কুলে আসিয়াছিল, আমার ঠিক অমনি এক খানি শাড়ী চাই—দাও জ্যাকেট, দাও ষ্ট্রাপ-লাগানো জুতা—দাও বিলাতী মেয়েদের মত স্কার্ফ—। পিতাও যথা-সাধ্য মেয়ের মনোবাসনা মিটাইয়া চলেন—নইলে ক্লাসে কন্যার মানের হানি ঘটিতে পারে। তাই যত না খরচ পড়ে লেখা-পড়ায়, তার চতুর্গুণ খরচ পড়ে এই সব ফ্যাসানের উপকরণ জোটাইতে। অথচ দেখা যায়, এই সব কন্যার পিতারা অধিকাংশই দেনাদার, মাসের প্রথমেই দেনার সুদ মিটাইতে অনেকেই জর্জ্জরিত হইয়া থাকেন—অথচ দেখ, তাঁহাদের কন্যারা দিব্য বাহারে-স্বচ্ছ সাজিয়া-গুজিয়া 'বাসে' চড়িয়া স্কুলে যাতায়াত করিতেছে।

এই সব অত্যন্ত ব্যয়-বাহুল্যই আমাদের অধঃপতনের মূল। যেখানে পাঁচ আনার খরচ সারিয়া লওয়া যায়, আমরা সেখানে পাঁচ টাকা খরচ করিয়াও মনে তৃপ্তি পাই না।

যে দেশে পুরুষদের চাকুরী জুটিতেছে না, সেখানে কয়জন নারী অর্থ আনিতে সক্ষম হইবেন, তাও একটু ভাবিয়া দেখা দরকার। তারপর আসিয়াছে পাশ্চাত্ত্য মোহের ঢেউ। তুমি খাইতে পাও আর না পাও, নূতন নূতন 'ফিল্ম' দেখা চাই-ই। সে ভাল ছবিই হ'ক, আর নাই হ'ক, দলে দলে নর-নারী ছুটিতেছে সিনেমা-মন্দিরে, অনেক ভদ্র পুরুষ ও মহিলা সিনেমায় 'প্লে'ও করিতেছেন শুনিতেছি, জানি না তাহাতে সুফল ফলিবে কি না! আমরা অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর মানুষেরা হয়ত মনে করিতেছি, যুগ-পরিবর্ত্তনে আমাদের জীবন-যাত্রার প্রণালী অনেক উন্নত হইয়াছে, কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে গেলে, আমাদের জীবনের অনেক অবনতিই ঘটিয়াছে, আমরা নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুঠারাঘাত করিতেছি। তাই আজ ক্রমশঃই আমাদের জীবন-যাত্রা জটিল পথে অগ্রসর হইতেছে। দাও মেয়েদের সেই শিক্ষা যে, তাহারা যে গৃহে বধূরূপে প্রবেশ করিবে, স্নেহে, ক্ষমায়, কর্ত্তব্যে, কর্ম্মনিষ্ঠায় সে গৃহ যেন উজ্জ্বল শান্তিময় করিয়া তুলিতে পারে, অর্থের অভাবও যদি সেখানে ঘটে, চিত্তের প্রশান্তিতে সে কালিমা যেন মুছিয়া ফেলিতে সক্ষম হয়। আমরা শুধু বিলাসিতার আধার নই, গালে ঠোঁটে 'রুজ' লেপিয়া কপালে কুঙ্কুম আঁকিয়া, স্লিপার পায়ে দিয়া দিন কাটাইলে আমাদের চলিবে না, আমাদের শিখিতে হইবে, দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করিতে; জানিতে হইবে, জীবন-সংগ্রামে যথার্থ জয়ী হওয়া যায় কিরূপে? আমরা নারী, নারীর পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আমরা যেন আমাদের জীবনপথ নির্ম্মল ও সুন্দরতর করিয়া তুলিতে পারি। *

* এই রচনাটি 'পাটনা মহিলা-মিলনী সমিতি'তে পঠিত।

দ্রব্যমূল্যের সমতা

আজকাল বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য কিরূপভাবে হ্রাস ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, কোন্ সময়ে কোন্ দ্রব্যের ক্রয় ও বিক্রয় কত মূল্যে সাধিত হয়, তাহা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, যে দ্রব্য বিক্রয়োপযোগী করিতে হয়ত একজন মানুষের পাঁচমাস পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, সেই দ্রব্য পাঁচ টাকায় বিক্রয় হইয়া থাকে, আর যে দ্রব্য একজন মানুষ তাহার এক মাসের পরিশ্রমে প্রস্তুত করিতে পারিয়াছে, সেই দ্রব্য পঁচিশ টাকায় বিকাইয়া যাইতেছে। ইহারই নাম দ্রব্যমূল্যের অসমতা (want of parity)। দ্রব্যমূল্যে সমতা (parity) বিদ্যমান থাকিলে, যে দ্রব্য একজন মানুষের পাঁচমাসের পরিশ্রমে প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা যদি পাঁচ টাকায় বিকায় তাহা হইলে যে দ্রব্য ঐ একজন মানুষের একমাসের পরিশ্রমে প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার দাম এক টাকার অধিক অথবা অল্প হওয়া সঙ্গত নহে। একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্যে অসমতার বিদ্যমানতা বশতঃ কতকগুলি অসৎ মানুষ যথোপযুক্তরূপে পরিশ্রম না করিয়া, যথোপযুক্ত পরিমাণে যোগ্যতা লাভ না করিয়া পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া সমারোহের সহিত জীবন ধারণ করিতে পারিতেছে, আর কতকগুলি মানুষ সাধক পুরুষের মত রৌদ্রে ও বৃষ্টিতে অহরহ কঠোর পরিশ্রম করিয়াও তিন বেলার স্থানে এক বেলার খাদ্য মাত্র পাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হইতেছে। দ্রব্যমূল্যের অসমতা-বশতঃ, যে মানুষগুলি আজকাল পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হইতেছেন, তাঁহারা বর্ত্তমান সমাজে বুদ্ধিজীবী বলিয়া পরিচিত এবং তাঁহারাই এক্ষণে আমাদের সমাজের কর্ণধার। বাস্তবিকপক্ষে যদি কোন বুদ্ধিজীবী মানুষ বর্ত্তমান সমাজে বিদ্যমান থাকিতেন, অথবা প্রকৃত বুদ্ধি কুত্রাপি উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিত, তাহা হইলে আমাদের মতে এই অগণিত মনুষ্যগণকে এতাদৃশ সমস্যায় বিব্রত হইতে হইত না। যে বুদ্ধির বলে অট্টালিকায় সুশোভিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু মানুষকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়, সেই বুদ্ধির সার্থকতা কোথায়? এইরূপ ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, প্রকৃত বুদ্ধি, অথবা প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞান, অথবা প্রকৃত শিক্ষা এখন আর মনুষ্য সমাজে বিদ্যমান নাই। অথচ, আধুনিক সমাজের কর্ণধারগণ কখনও বা বুদ্ধিজীবী নামে, কখনও বা জ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক নামে, কখনও বা শিক্ষিতের নামে শ্রমজীবীর কার্য্যের পারিশ্রমিক যেখানে এক টাকা, সেইখানে তাঁহাদের নিজ পারিশ্রমিক ১০ টাকা অথবা ততোধিক হারে নির্দ্ধারিত করিয়া থাকেন। এক কথায়, যাঁহারা রক্ষক, তাঁহারাই আমাদের ভক্ষক অথবা নাশক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

দীনা

—শ্রীবিভাসপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীভগবান্ যেরূপ নিখিল বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাশ্রয় তদীয় পরমা শক্তিও তদ্রূপই। লীলায় তাদৃশ চরিত্র বিকশিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ-লাভে শ্রীরাধিকা যত সুখলাভ করেন, অনন্ত জগতে বা চিন্ময়ধামে কোনস্থানে কোন ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ লাভ করিয়া সেইরূপ সুখ প্রাপ্ত হয়েন না। কারণ, শ্রীরাধিকার নিরুপাধি প্রেম অদ্বিতীয় ও অখণ্ড, সেইরূপ তাদৃশ প্রেম-আস্বাদনও অনুপম। পক্ষান্তরে, শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে শ্রীরাধিকার হৃদয়সাগরে যে দুঃখের মহা উত্তাল তরঙ্গমালা উদ্বেলিত হয়, তাদৃশ কোন ভক্তের সম্বন্ধে সম্ভাবনা করা যাইতে পারে না, কারণ তাঁহার প্রেম অসমোর্দ্ধ বলিয়া সেই প্রেম হইতে উত্থিত দুঃখও নিরুপম। এই নিগূঢ় রস-রহস্য শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তদীয় উজ্জ্বল-নীলমণি গ্রন্থে শিববাক্য উদ্ধৃত করিয়া অভিব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীরাধিকার অধিরূঢ় মহাভাবের বৈশিষ্ট্য দেখাইবার জন্য এইরূপ উক্ত হইয়াছে, যথা :—

"লোকাতীতমজাণ্ডকোটিগমপি ত্রৈকালিকং যৎ সুখম্
দুঃখঞ্চেতি পৃথগ্ যদি স্ফুটমুভে তে গচ্ছতঃ কূটতাম্।
নৈবাভাসতুলাং শিবে তদপি তৎকূটদ্বয়ং রাধিকা-
প্রেমোদ্যৎসুখদুঃখসিন্ধুভবয়োর্বিন্দোত-বিন্দোরপি ॥

—স্থায়িভাবপ্রকরণ, ১২০পৃঃ

অর্থাৎ শ্রীপার্ব্বতী কোন সময় শ্রীরাধিকার প্রেমাতিশয্যের বিক্রম-বিষয়ে শ্রীশিবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উক্ত বাক্য বলিয়াছিলেন, হে শিবে, লোকাতীত অর্থাৎ বৈকুণ্ঠের সুখ ও প্রসিদ্ধ মোক্ষসুখ ও বৈকুণ্ঠবাসী ভক্তগণের প্রেম-উৎকণ্ঠাজনিত দুঃখ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডগত ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সুখ-দুঃখ যদি একস্থানে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে রাশীকৃত হয়, তাহা হইলেও এই সুখ-দুঃখ শ্রীরাধিকার প্রেম-সাগর হইতে উত্থিত সুখদুঃখ বিন্দুর লেশাভাস সদৃশও হইবে না।

শ্রীরাধার এই দুঃখ মাথুর বিরহে পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। মোহনাখ্য মহাভাবের কয়েকটি অনুভাব উজ্জ্বল নীলমণিতে উল্লিখিত আছে। তাহার মধ্যে 'তিরশ্চামপি রোদনম্', অর্থাৎ তির্য্যক্ জাতির ক্রন্দন অন্যতম। ইহার উদাহরণ পদ্যাবলী হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—

"যাতে দ্বারবতীপুরং মধুরিপৌ তদ্বস্ত্রসংব্যানয়া
কালিন্দীতটকুঞ্জবঞ্জুল-লতামালম্ব্য সোৎকণ্ঠয়া।
উদ্গীতং গুরুবাষ্পগদ্গদগলত্তারস্বরং রাধয়া
যেনান্তর্জলচারিভির্জলচরৈরপ্যুৎকমুৎকূজিতম্।

অর্থাৎ :—

শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে দ্বারকা গমন করিলে তদীয় পরিত্যক্ত পীতাম্বর উত্তরীয়রূপে সর্ব্বাঙ্গে আবরণপূর্ব্বক শ্রীরাধা যমুনা-তীরবর্ত্তী কোন এক কুঞ্জের অশোকলতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহার পর সাতিশয় বিরহ-উৎকণ্ঠাভরে বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছিলেন। উহা শ্রবণ করিয়া মানুষের কথা দূরে থাক্, জলের গভীর নিম্নদেশে সঞ্চরণশীল মৎস্য, মকর প্রভৃতি জলচর হংসাদি সমবেদনাজ্ঞাপনচ্ছলে ক্রন্দন করিয়াছিল।

অহো, সেই বিরহ-গীতের এতাদৃশ শোকমোহজনকতা-শক্তি যে, জলচর প্রাণীও মহাশোকমগ্ন হইয়াছিল।

এই শ্লোকটি পদ্যাবলীতে অপরাজিত-নামে কোন কবি-প্রণীত বলিয়া উক্ত আছে। *

ইহা অতীব প্রাচীন সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার অবসর নাই, কারণ, ভরতমুনি-প্রণীত নাট্যশাস্ত্রের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের অভিনব-ভারতী ব্যাখ্যায় শ্রীপাদ অভিনব গুপ্তাচার্য্য এই শ্লোকটির মুখ-মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন হেমচন্দ্র-কৃত কাব্যানুশাসনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে কার্য্যহেতুক প্রবাসের উদাহরণ-স্বরূপে, রাজানক কুন্তককৃত বক্রোক্তি-

* পিটার পিটার্সন-সম্পাদিত শ্রীবল্লভদেব-সংকলিত সুভাষিতাবলী হইতে জানা যায় যে, এই অপরাজিত খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি বাল-রামায়ণ-প্রণেতা রাজশেখরের সমসাময়িক।

জীবিত গ্রন্থের দ্বিতীয় উল্লেখে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত আছে।

যাহা হোক, এই শ্লোকে 'উদ্গীত' শব্দটি প্রয়োগ করা হইয়াছে। উদ্গান বা বিরহের করুণ উচ্চ রোদনটি মনে হয় এইরূপ :—'অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ', 'অনাথবন্ধো,' 'করুণৈকসিন্ধো' ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ-পূর্ব্বক ক্রন্দন। শ্রীপাদ রাধামোহন ঠাকুর তদীয় পদামৃত-সমুদ্রের সুদূর প্রবাস-প্রসঙ্গে অর্দ্ধবাহ্য দশায় প্রলাপের উদাহরণ-স্বরূপ কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক উল্লেখ করিয়াছেন, সেখানে টীকায় উক্ত আছে :—

'শ্লোকদ্বয়ে দুঃখাবেশহেতুকবহুসম্বোধনপদবিন্যাসাৎ উচ্চৈঃস্বরেণ রোদনময়ত্বাদ্যতে।'

'অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ' শ্লোকটি সাক্ষাৎ শ্রীরাধার উক্তি—তদ্‌ভাবভাবিত রসিকাগ্রণী শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর শ্রীমুখে উহা স্ফুর্ত্তি পাইয়াছে। নিখিল বৈষ্ণবসিন্ধু নির্ম্মথিত করিয়া এক রত্নবিশেষরূপে এই শ্লোকটি উঠিয়াছে। ইহার সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে উক্ত আছে—

"এই শ্লোক কহে প্রভু তাঁর কৃত শ্লোক।
সেই শ্লোক-চন্দ্র জগৎ করেছে আলোক।
ঘষিতে ঘষিতে যৈছে মলয়জ সার
গন্ধ বাড়ে তৈছে এই শ্লোকের বিচার,
রত্নগণমধ্যে যৈছে কৌস্তুভমণি
রস কাব্য মধ্যে তৈছে এই শ্লোক গণি।
এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধা ঠাকুরাণী
তাঁর কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্রবাণী॥
কিবা গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন
ইহা আস্বাদিতে আর নাহি চৌঠাজন॥

—মধ্যলীলা, চতুর্থ পঃ

ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়, শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর কৃপাপ্রাপ্ত শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী ও শ্রীরাধাভাবাঢ্য শ্রীগৌরসুন্দর ব্যতীত এই শ্লোকের নিগূঢ় রহস্য চতুর্থ জনের বেদ্য নহে। মহাগাম্ভীর্য্যের সাগরসদৃশ শ্রীরাধা-হৃদয়ে যখন বিরহ বাড়বানল প্রজ্বলিত হয়, তখন যে জ্বালা-মালার তরঙ্গ উচ্ছলিত হয়, ইহা তাহারই আভাস মাত্র। সাধারণ মানুষের বুদ্ধি ইহাতে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় না। কেবল, শ্রীরাধিকা-কৃপায় শব্দের দ্বারা কিঞ্চিন্মাত্র অর্থবোধ করে, কিন্তু অপার অতলস্পর্শী রসগাম্ভীর্য্য স্বীয় মহিমায় অব্যাহতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে, উহা বিচলিত করিতে কাহারও শক্তি নাই।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদে এই শ্লোকের বিষয় উক্ত আছে, যথা—

'জগদ্গুরু মাধবেন্দ্র করি প্রেমদান
এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে কৈল অন্তর্দ্ধান,
এই শ্লোকে কৃষ্ণপ্রেম কৈল উপদেশ,
কৃষ্ণের বিরহে ভক্তের ভাব বিশেষ
পৃথিবীতে রোপণ করি গেলা প্রেমাঙ্কুর
সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ চৈতন্য ঠাকুর॥

ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভ-কারিত্বও মোহন ভাবের একটি অনুভাব বা কার্য্য। শ্রীরাধার মোহন ভাব-দশার উদ্রেকে প্রাকৃত বা অপ্রাকৃত নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ক্ষুব্ধ হইয়া থাকে। সেই সময় শ্রীরাধার প্রেমজনিত নিঃশ্বাসের ধূম দিকে দিকে উদ্গীর্ণ হইতে থাকে ও অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্যাদিময় বিশ্ব-সংসারও বিশেষ ভাবে সন্তপ্ত হইয়া থাকে। এই প্রেমানল হইতে উত্থিত ধূমরাশি কখনও তদীয় শরীরমধ্য হইতে সম্পূর্ণ বহির্দ্দেশে আগমন করে না। মোহন ভাবের অন্তর্বর্ত্তী একাংশ প্রেমের কিঞ্চিৎ মাত্র ধূম শ্রীরাধার নাসাযুগল হইতে বহির্গত হয়। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ও বৈকুণ্ঠ রক্ষা করিবার জন্য যোগমায়া সেই ধূমচ্ছায়াকে শ্রীরাধার শরীরমধ্যেই স্তম্ভিত করেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ আগত হইয়া ঔদাস্য প্রকাশ করিলে শ্রীরাধার অবস্থা শ্রীগোপাল-চম্পূতে এইরূপে সংক্ষেপে শ্রীপৌর্ণমাসী দেবীর উক্তি হইতে জানা যায়, যথা :—

"সূর্য্য সংক্ষেপতঃ সম্প্রত্যৌদাস্যে তব কেশব।
যদা বাষ্পায়তে রাধা ধূমায়ন্তে তদা দিশঃ। ৩৬
আশ্রয়াশত্ববিখ্যাতির্বহ্নেঃ সর্ব্বত্র লক্ষ্যতে।
প্রেমণস্তু তব গোবিন্দ সা চেন্নিজমবাপ্যতি॥৩৭

উত্তর ৩৯ পূঃ

অর্থাৎ, পৌর্ণমাসী বলিলেন, হে কৃষ্ণ, তোমার ঔদাসীন্য ভাব দেখিয়া রাধিকা যখন বাষ্প উদ্গমন করেন, তখন দশ দিক্ ধূমাচ্ছন্ন হয়, অগ্নির আশ্রয়াশত্ব (অর্থাৎ নিজের আধার কাষ্ঠাদিকে ভক্ষণ করা স্বভাব) প্রসিদ্ধ আছে। হে গোবিন্দ, তোমার প্রেমও যদি তদ্রূপ স্বীয় আধার

(শ্রীরাধাকে) দগ্ধীভূত করে, তবে ইহা সবিশেষ নিন্দাজনক ব্যাপার হইবে।

এই অবস্থায়- শ্রীরাধিকা এতাদৃশ মলিনতা প্রাপ্ত হন যে, শুভ্র তণ্ডুলসমূহের মধ্যে যে সকল অভক্ষ্য বীজ থাকে, তদ্রূপ মলিনতা তাঁহাতে দৃষ্ট হয়। সৌভাগ্যের চরম শিখরদেশে যিনি আরোহণ করেন, তখন তিনিই দীনতার অতল গভীর নিম্নতায় নিমগ্ন হন। এই দীনার একটি অলৌকিক ভাব-চিত্র শ্রীজীব গোস্বামিচরণ গোপাল-চম্পূতে কুরুক্ষেত্রে মিলনপ্রসঙ্গে সুন্দর ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। যথা—

"কৃশামলিনিমগ্নতাঃ প্রতনজীর্ণবস্ত্রাবৃতাঃ।
বিকীর্ণকচকাচিতাক্ষিমুখীঃ স পশ্যন্ প্রভুঃ।
বিঘূর্ণ্য যদুদ্ধবং ক্ষণশতং ধৃতাশ্রুস্রবা।
কদাহমিহ কঃ কথং কিমিদমেতৎ জানন্নহি॥"

—উত্তর, ২০ পৃঃ

কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে শ্রীব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের শারীরিক অবস্থা এই শ্লোকে বর্ণিত হইতেছে। তখন শ্রীরাধিকা প্রভৃতি ব্রজগোপিনীগণের শরীর সাতিশয় কৃশ হইয়াছিল। ইহাই অলঙ্কার শাস্ত্রে 'তানব'-নামে পরিভাষিত হইয়াছে। তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ মালিন্য দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহারা পুরাতন জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মুখে, নাসিকায় ও চক্ষু প্রভৃতি স্থানে আলুলায়িত অবদ্ধ রুক্ষ কেশসমূহ পতিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে এতাদৃশ অবস্থায় দর্শন-পূর্ব্বক বিঘূর্ণিত হইয়া উদ্ধবকে ধারণ করিলেন।

তারপর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের চক্ষু হইতে জলধারা পতিত হইতে লাগিল ও তিনি "এইস্থানে কখন আমি আসিয়াছি, আমি কে, কি প্রকারে অবস্থান করিতেছি ও কি হইল" ইত্যাদি কিছুই অবগত হইতে পারেন নাই।

যে সময় শ্রীউদ্ধব মহাশয় ব্রজে আগমন করিয়াছিলেন, তখন মাথুর-বিরহিণী শ্রীরাধার যে মোহদশা তিনি দেখিয়াছিলেন, তাহা শ্রীগোপাল-চম্পূতে উক্ত আছে, যথা :

"বৈবর্ণ্যাৎ ক্রশিমাবস্থাবস্বরবহিতভাবাশ্রয়া-
দুর্জ্জ্যোতিরপি যা ন সেতি মুহুরপ্যাহুঃ বভূবে যদা।
ভত্রে বাবদ্ধ লালসাবৃত্তিবশাচ্চেষ্টা বিঘটাহুত
শ্বাসাভ্যুপগন্ধনাধিকতমা ব্যক্তীতি মাধব ৫৭"

অর্থাৎ, শ্রীরাধিকার স্বর অস্বাভাবিক হইয়াছিল ও শরীর সাতিশয় কৃশ হইয়াছিল। তাঁহার হস্তপদাদির অন্য প্রকারে অবস্থান, রূপ ও বর্ণের বিপর্য্যয় হইয়াছিল। এই হেতু সকলে তাঁহাকে রাধা বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। তখন শ্রীরাধা যে নিজ শরীরে বিদ্যমান আছেন তাহা সকলে বিচার করিতে পারে নাই। কারণ, তাঁহার মুখ হইতে লালাক্ষরণ হইতেছিল, তাঁহার শারীরিক চেষ্টার হ্রাস ও শ্বাসরোধ হইয়াছিল।

এই শ্লোকেও শ্রীরাধিকার বিরহদুঃখের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীললিতমাধবের তৃতীয় অঙ্কে শ্রীরাধার মহাবিরহ-দুঃখে বৃন্দাবনের মানসী গঙ্গা ও গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের অলৌকিকী দশা বর্ণিত হইয়াছে।

বিরহজ্বরমূর্তীর্ণং প্রেক্ষ্য রাধার্তিদৈন্যং
স্ফুটমবিকলমত্যা মানসী হন্ত গঙ্গা।
অহহ রবিতুরঙ্গাজীবপুষ্পাগ্রদূর্বাঃ
শতভুজমিতিরাসীদেব গোবর্দ্ধনোঽপি।

অর্থাৎ, শ্রীরাধার বিরহাধিক্য হইতে উদ্গত দৈন্য দেখিয়া মানসী গঙ্গা সাতিশয় পরিশুষ্কা হইয়াছিল। হায়, যাহার উচ্চশৃঙ্গে উদ্গত দূর্ব্বারাশি সূর্য্যাশ্বগণের আহার্য্য ছিল, সেই গোবর্দ্ধন-গিরি শতহস্ত-পরিমিত সঙ্কুচিত হইয়াছে।

এখানে বুঝিবার বিষয় এই যে, মূল অংশিনী শক্তির মধ্যে যদি শোকজনিত বিক্ষোভ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে অন্যান্য শক্তি বর্গের মধ্যে উহা সঞ্চারিত হইবে। যেরূপ শ্রীরাসলীলায় গোপীগণের আনন্দগান নিখিলভুবনে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, 'যদ্গীতেনেদমাবৃতম্', সেইরূপ তাঁহাদের বিরহজনিত দুঃখের গীতেও বিশ্বসংসার শোকনিমগ্ন হইয়াছিল।

পৌর্ণমাসীদেবীর মুখে এই রহস্যসংবাদ ললিতমাধবে প্রাপ্ত হওয়া যায়,—

অধীশে কিশলয়ে সমস্তজগজীবলোকশোকায়ুধৌ
রাধা-সঙ্গকাকুলাকুলমনৌ চক্রে তথা ক্রন্দনম্।
যেন ক্রন্দনজৈর্বিমিশ্রিত মহাগীতিকলাবিস্তরৈঃ
হা সর্বংসহয়াপি নির্ভরমহো প্রাবিদীর্ণং ভুবা।

অর্থাৎ, পৌর্ণমাসী রথচক্রচিহ্ন দেখিতে দেখিতে গমন-পূর্ব্বক খেদের সহিত বলিলেন, শ্রীরাধা মহাদৈন্যভরে এতাদৃশ কাতর ক্রন্দন করিতেছিলেন যে, তাহা শ্রবণ করিয়া নিখিল-বিশ্ব যেন নিরাশ্রয় শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছিল। অধিক কি, যে ক্রন্দন দ্বারা সর্ব্বসহনশীলা পৃথিবীও যেন রথচক্রচিহ্নস্থলে বহুদূর ব্যাপিয়া বিদীর্ণ হইয়াছিল।

মহাবিরহে শ্রীরাধার হৃদয়-সাগরে যে মহাদৈন্যতরঙ্গ উদ্বেলিত হয়, তাহা সাধারণ মানবের ধারণার অতীত। শ্রীউদ্ধব যখন বৃন্দাবনে আগমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার হস্তে শ্রীরাধা তদীয় প্রাণবল্লভের জন্য একখানি পত্রিকা প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহা শ্রীগোপালচম্পূতে অভিব্যক্ত হইয়াছে, যথা:

> ব্রজশশধর ত্বা ব্রজগোপ্যাজ্যা ন কলঙ্কশঙ্কয়া ভবতা।
> ন শশী কলঙ্কভয়েনপ্যুজ্ঝতি শশকং স্বমাশ্রিতং জাতু ॥

অর্থাৎ, হে ব্রজশশধর, তুমি কলঙ্কভয়ে যেন সেই ব্রজরমণীগণকে পরিত্যাগ করিও না। কারণ, শশক চন্দ্রের কলঙ্কস্থানীয় হইলেও, তাঁহার আশ্রিত বলিয়া চন্দ্র উহা কখনও ত্যাগ করে না। তাৎপর্য্য এই যে, তোমার কলঙ্কস্থানীয় আমাদের তুমি যেন পরিত্যাগ করিও না, কারণ আমাদের তুমি ভিন্ন অন্য কোন আশ্রয় নাই। এই দৈন্য উক্তির মধ্যে একদিকে যেমন অলৌকিক, অপূর্ব্ব দীনতা ধ্বনিত হইয়াছে, সেইরূপ নিজেদের শ্রীকৃষ্ণৈকনিষ্ঠা প্রকাশিত হইয়াছে।

রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান সময়েও শ্রীরাধিকার মুখে দৈন্যাত্মিকা বাণী প্রকাশিত হইয়াছে, যথা:—

> 'হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ
> ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ।
> দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে
> সখে দর্শয় সন্নিধিম্' ॥

অর্থাৎ, হা নাথ, হা রমণ, হা প্রিয়তম, হা মহাভুজ! তুমি কোথায়? তুমি কোথায়? আমি তোমার দীনা দাসী; তুমি আমার নিকটে দেখা দাও, আগমন কর।

ব্রাহ্মণ

—শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ

যেদিন মোদের পূত তপোবনে,
উঠিত সামের ঝঙ্কার।
শান্ত ঋষির সমাধি ভঙ্গে,
ধ্বনিত হইত ওঙ্কার ॥

যেদিন অর্থ-অনর্থ হইতে
দূরে সরে ছিল বিপ্র।
ত্যাগের মন্ত্রে হয়ে সুদীক্ষিত
আছিলা তেজস্বী দীপ্র ॥

যজন-যাজন অধ্যয়ন আদি—
ষট্‌কর্ম্মশালী ব্রাহ্মণ।
জ্ঞানামৃত-রস লভিত, করিয়া
শাস্ত্র-জলধি মন্থন ॥

অজ্ঞান-তিমিরে অন্ধ নরগণে
জ্ঞানাঞ্জন করিয়া লিপ্ত।
উন্মীলিত চক্ষু করিলা যাহারা
হইয়া গৌরব-দীপ্ত ॥

আত্ম-সমাহিত পরার্থ-চিন্তনে
মোক্ষ-পথের পান্থ।
কত দীর্ঘ পন্থা হইল চলিতে,
না হইলা তবু ক্লান্ত ॥

পদ্ম-পত্রস্থিত বারিবিন্দুসম
জীবন অসার জানি।
কাচ বিনিময়ে লভিলা কাঞ্চন,—
ধর্ম্ম সর্ব্বস্ব মানি ॥

যে আর্য্য-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা সাধনে,
কত বাধা বিঘ্ন দলি'।
কতই ঝঞ্ঝা মস্তকে করিয়া
এক লক্ষ্যে গিয়াছে চলি ॥

রাজ-সিংহাসন চাহেনি যাহারা
পর্ণকুটীর-বাসী।
কিন্তু, রাজনীতি-শাস্ত্র বিরচিয়া—
তারাই দিয়েছিল আসি ॥

ত্যাগে ভোগে কত ব্যবধান ভবে,
তাহারি আদর্শ পন্থা।
দেখাতে যাহারা মুষ্টি-ভিক্ষাজীবী
হইলা বিষয় হন্তা ॥

হে ব্রাহ্মণ! তুমি জগতের গুরু,
আজি কোথা চলে গেছ?
কোন্ স্বর্গ হতে কোন্ অধস্তলে,
হায় রে পড়িয়া আছ

দ্বিতীয় সংসার

—শ্রীবসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী

[২]

আহার শেষ করিয়া নবীনের মা অতি কষ্টে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া তিন তলায় ঘরে আসিলেন, নবীনকে বলিলেন, 'আর নড়তে পারছি না, আমি এখন পড়াব, কাল চোপর রাত জেগে, আজ কাশীর রাস্তায় ছুটো-ছুটী ক'রে সর্ব্বাঙ্গ টাটিয়ে উঠেছে।

নবীন। তুমি শোও না, রবি ভাল আছে।

নবীনের মা বিছানার এক ধারে শুইয়া পড়িলেন, বলিলেন, 'রবিকে খাইও।'

নলিনী উপরে আসিবার জন্য পা বাড়াইয়া কি ভাবিয়া নিজ কক্ষে আবার প্রবেশ করিয়া কাপড়-জামা যাহা পরণে ছিল তাহার উপর চোখ রাখিয়া ফিরিয়া ঘুরিয়া দেখিল, ময়লা হইয়াছে অযত্ন দেখাইতেছে। ট্রাঙ্ক খুলিয়া দু'চার খানা কাপড় টানিয়া বাহির করিল, বাছিতে লাগিল কোন্‌টা সে পরিবে। বিচার করিতে বসিয়া নলিনী আপনা আপনি হাসিল, ভাবিল, এত দিন কাশীতে আছি, কোন দিন এ রকম প্রশ্ন ত মনে উদয় হয় নাই? আজ হঠাৎ মনের ভিতর এ প্রশ্ন জাগে কেন? ওই যে দিদির শাশুড়ী রয়েছেন, হীন বেশে থাকব কেন? নলিনী এক খানা সাদা মিহি শাড়ী বাছিয়া লইল, দুই খানা রঙিন শাড়ী বাহির করিয়াছিল, ট্রাঙ্কে পুরিয়া রাখিল, মনে করিল, রঙীন পরিলে ছেলে-মানুষের মত দেখাইবে, লজ্জা হয়। জামা যেটা সামনে পাওয়া যায়,তাহাই পরিবে ভাবিয়া একটা রঙিন জামা বাহির করিয়া বসিল, জামা কাপড় বদলাইয়া একবারটি মাত্র ভিজা গামছায় মুখ-চোখ পরিষ্কার করিয়া আরসির সম্মুখে তাহার কুঞ্চিত কেশগুলি, যাহা কপালের উপর দুলিতেছিল, চিরুণী চালাইয়া সব চুলগুলাকে যথাস্থানে টানিয়া রাখিয়া একটা পান মুখে পুরিয়া উপরে আসিল। নলিনী আসিয়া দেখিল, দিদির শাশুড়ী ঘুমাইতেছেন, নবীন ছেলে বেদানা ভাঙ্গিয়া রবিকে খাওয়াইতেছেন।

নলিনী দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল,—'মা ঘুমুলেন বুঝি?'

নবীন। হঁা, কাল রাত্রে গাড়ীতে ঘুমুতে পারেন নি, তাই যেমন শোয়া আর চোখ বোজা, আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন না।

নলিনী বিছানার পাশে সতরঞ্চখানায় বসিতে যাইলে, রবি নবীনকে বলিল, 'ওখানে না,—আমার কাছে ব'সতে বল।'

নবীন শয্যা ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া নলিনীকে রবির কাছে বসিতে বলিল, নলিনী বিছানার উপর যাইয়া বসিল।

নবীন বলিল,—বাইরে যাব ভাবছি, এ-বেলা যা হ'ক আপনাদের স্কন্ধে চালান গেল, পুরা এক মাস থাকতে হবে, বাজার-হাট, দোকান-পত্র সব দেখে শুনে নিই।

নলিনী। তাড়াতাড়ি কি? সে যখন হোক হবে, বসুন, এই দুপুর রোদে মানুষ বাইরে বেরোয়?

অগত্যা নবীন সতরঞ্চখানার উপরে আসিয়া বসিল।

নলিনী। পুরো একটা মাস মুখ বুজে থাকতে হয়েছিল, বাবা সঙ্গে করে এনে সেই যে এ বাড়ীখানির ভেতর পুরে দিয়ে গেলেন, এ যেন বনবাস, না পাই লোক দেখতে না পাই কারুর সঙ্গে কথা কইতে—যদি ঠাকুরদাদার কথা বলেন তিনিত আফিঙ্গ খেয়ে ভোঁ হয়ে থাকেন, তার উপর অবুঝ, আপনারা এসেছেন, বাঁচলুম না। জেলের ভেতর নাকি দোষ-টোষ ক'রলে একটা ঘরে পুরে রাখে, কাউকে দেখতে দেয় না, আমার অবস্থাও ঠিক সেই রকম হয়েছিল, ভাগ্যে আপনারা এসে পড়লেন। রবির টেম্‌প্যারেচারটা দেখেছেন, নরম্যাল?

নবীন। নরম্যাল? আশ্চর্য্য। যা কোন দিন এমন সময় হয় না।

নলিনী। দেখলেন তো, আমার চিকিৎসার গুণ।

নবীন। আপনার অনুগ্রহ।

নলিনী রবিকে জিজ্ঞাসা করিল, কেমন আছ বাবা, কোন অসুখ হয় নি তো?

রবি হাসিয়া বলিল, না।

নলিনী নবীনকে বলিল, 'কাশী বলে তাই; একদিনে আপনার সঙ্গে এতটা সহজে কথা কইতে আমার মোটেই বাধছে না, দিদি যদি আসত ঠিক এমনি করে আপনার সামনে আসতে পারতুম কি না সন্দেহ। আর পারতুম নাই বা কেন, সত্যই ত এখন খুকীটি নই, বয়েস হয়েছে, গেরস্তারী হয়েছি,—কেমন, হই নি?'

নবীন একটুমাত্র হাসিয়া বলিল, তা হয়েছেন বৈ কি।

নলিনী। ঠাট্টা করছেন বুঝি?

নবীন। মোটেই নয়।

রবি নলিনীর হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, শোও না আমার পাশে।

নলিনী রবিকে কোলে টানিল, শুয়ে যদি ঘুমিয়ে পড়ি, তুলে দেবে কে?

বলিয়া রবির পার্শ্বে পা ছড়াইয়া কুসুমের ভরে মাথা রাখিয়া অর্দ্ধ-শয়ানভাবে নবীনের দিকে মুখ রাখিয়া শয়ন করিল।

নবীনের সুগঠিত পুরুষোচিত দেহের সৌন্দর্য্য যথেষ্ট, নলিনী পূর্ব্বেও একবার দেখিয়াছিল, যদিও খুব অল্প সময়ের জন্য। আজ অতি নিকটে বহুবার নবীনকে ভাল করিয়া দেখিল, মনে মনে ধারণা করিল, নবীনের মুখ যেন পূর্ব্বাপেক্ষা মলিন দেখাইতেছে—কপালে কাল দাগ লাগিয়াছে, চক্ষুর চঞ্চলতা নাই, চক্ষু স্থির, নিষ্প্রভ। নলিনীর মনের ইচ্ছা সব কথা এক নিমিষে জানিয়া লয়, কৌশলে কারণ জানিবার চেষ্টা করিল। বলিল, আপনারা সকলে এলেন দিদিকেও যদি সঙ্গে আনতেন, তাঁরও শরীরটা সেরে যেত।

নবীন। তাঁরা এলে দাদার চলতো কি করে? সকলের তো শরীর সারাবার দরকার হয় নি, রবির জন্য দায়ে পড়ে আসা।

নলিনী। আপনার নিজের চেহারা তো বড় ভাল নয়, মুখখানা শুকনো, রক্ত একটুও নেই, ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

নবীন চুপ করিয়া রহিল, জবাব না পাইয়া নলিনী আবার বলিল,—

কেবল রবির অসুখের কারণে যদি চিন্তিত হয়ে থাকেন, সে চিন্তা দু'দিনে দূর হবে, তা ছাড়া আর যদি অন্য কারণ থাকে বলা সহজ নয়, দেখুন চেঞ্জটা সকলেরই দরকার। চিরদিন একভাবে এক জায়গায় জীবন যাপন না করে মধ্যে মধ্যে বাইরে বেরিয়ে পড়লে দেহ-মন যে কত উন্নত হয়, তা বোধ হয় কাউকে বলে দিতে হবে না, এক সপ্তাহ এখানে থাকলেই দেখতে পাবেন আপনার চেহারায় কত পরিবর্ত্তন হয়েছে।

নবীন এ কথারও জবাব দিতে পারিল না, বলিল, বাড়ীতে একখানা পত্র দিতে হবে; আপনার সম্বন্ধে বৌদিকে কি লিখব বলুন, আসবার সময় বলেছিলেন আপনার কথা যেন কিছু লিখি।

নলিনী। লিখুন না আট দিনের ভিতর কলিকাতায় যাচ্ছে, সাক্ষাতে সব বলবে।

নবীন। আপনার ভরসায় এখানে এলাম, আপনি চলে যাবেন কি রকম?

নলিনী মুখ ভার করিয়া বলিল, 'আমি বকে যাই, আপনি শুনেও শোনেন না, কথার জবাব দেন না, একটু সময়ের জন্য আপনাদের ঘরে এলে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে চান। আমার চোখ কাণ সব বজায় আছে, বুঝতে পারছি, চক্ষু-লজ্জায় পড়ে গেছেন, এ-স্থলে আমার কলিকাতায় যাওয়া ভাল।

নবীন। ভারি ভুল বুঝেছেন আপনি। যে সব কথা জানতে চাইলেন, তার জবাব দেওয়া যথার্থই আমার পক্ষে কঠিন, 'আপনি ভারি অভিমানী,' এই কথাটি শুধু বৌদিকে লিখে জানাব। একঘণ্টা কেবল এই কথাই ভাবছি, এতদিন পরে রবি যথার্থই স্নেহ-শীতল স্পর্শ লাভ করেছে, আমার দুঃখময় জীবনের চিন্তাধারার একদিক সীমানায় এসে এই বার হয়ত থেমে গেল, আপনাকে অসম্মান দেখিয়েছি, কি অবজ্ঞা করেছি যদি বুঝে থাকেন, আমায় ক্ষমা করবেন।

নবীনের আর নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি উঠিয়া বসিলেন। নবীন একটা শার্ট গায়ে চড়াইয়া রবিকে বলিল, খানিকক্ষণ

পোষ্টকার্ড কিনতে হবে। বলিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল। নবীনের মা নলিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রবির জ্বর দেখা হয়েছে? নলিনী বলিল - জ্বর হয় নি মা, নরম্যাল টেম্পারেচার।

মা বলিলেন, 'এই কথা ডাক্তারও বলেছিল, বাইরে বেরুলেই জ্বর সেরে যাবে, বাবা বিশ্বনাথের কৃপায় ওই খাওয়াই যদি শেষ যাওয়া হয়, মা-মরা ছেলেটা বেঁচে যায়।

নলিনী। আপনার ছোট ছেলেটি কি রকম, মা?'

ন-মা। কার কথা বলছ,—নবীন? কেন, সে কি বলেছে?

নলিনী। এমন কিছু বলেন নি, তবে দু' দুবার একটা কথা জিজ্ঞাসা করলাম, মোটে জবাব দিলেন না।

ন-মা। সে রকম ছেলে তো নয়, তোমার কথা হয়ত শুনতে পায় নি, কি জিজ্ঞাসা করেছিলে?

নলিনী। জানতে চেয়েছিলাম, কেন আগের চেয়ে শুকিয়ে গেছেন?

ন মা। আহা, ও কথা কি জিজ্ঞেস করে মা! তুমিত সব শুনেছ, তোমার বোন জানে, বড় বৌমা যেমন ওর পেটের কথা জানে এমন কেউ নয়। তুমি একদিনে ওকে চিনবে কেমন করে মা, যে সোনার প্রতিমে খুইয়ে নবীন আমার অমন হয়ে গেছে, সে আর কি বলব! নবীনের বয়স তখন বাইশ, বি-এ পড়ে, বিয়ে দিলুম। এই সাত বছরে দুটীতে যে কি সুখে ছিল, আমরা চোখে দেখে বুক জুড়াতাম, তোমার দিদিও আমার মত ওদের দুটীকে যে কি চক্ষে দেখেছিল, দেখা হলে জিজ্ঞেস করে দেখ। নবীন কথার জবাব দেয় না বলছ, ওর মুখের কাছে কেউ দাঁড়াতে পারত? ওরা দিন রাত সর্ব্বদাই হাসি খুসী নিয়ে থাকত। তোমার দিদি এক একবার এসে নালিশ করত, নবীনের কথায় হেসে হেসে ওর পেটে ব্যথা ধরেছে। নবীন আমার সর্ব্বক্ষণ আমোদ-আহ্লাদ নিয়ে থাকত, কখনও মুখ বুজে থাকতে পারত না; এখন ওর মুখ দেখলে দুঃখ হয়। আজ পাঁচ মাস বাছার খাওয়া উঠে গেছে, তোমার দিদি রাবড়ি খেতে ভালবাসে ব'লে আলাদা দু একটা বেশী রাঁধত, নিজে ব'সে খাওয়াত, কত বেশী খেতে পারত। এখনও তোমার দিদি তেমনি ক'রে খাওয়াবার জন্য কত সাধে, কত কাঁদে পর্য্যন্ত, বাছা খায় না, হাসে না। দুটী মাস বৌমার রোগের সেবা করেছে, বৌমার মা অসুখ শুনে নিতে পাঠালে বৌমা গেল না, আগেই কেমন বুঝতে পেরেছিল, তাই নবীনকে ছাড়তে চাইলে না।

নলিনী। আপনার ছোট বউমা কি খুব সুন্দরী ছিলেন?

ন-মা। আহা মা আমার রূপে সরস্বতী, গুণে লক্ষ্মী ছিল, সুন্দরী ব'লে সুন্দরী, তোমার গায়ের রঙের মত সোনার বর্ণ, মাথারও ঠিক তোমারি মত মানানসই ছিল।

নবীনের মা ডান হাতে নলিনীর চিবুক ধরিয়া মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন - 'তোমার এই ভাসা-ভাসা, টানা-টানা চোখ দুটির মত তারও এমনি ঢল-ঢল চোখ ছিল, এমনি টিকলো নাক, এমনি ছোট কপালটি, এমনি কাল চুলের গোছা, হাসলে এমনি তোমার মত ছোট ছোট দাঁতগুলি দেখা যেত।

নলিনী হাসিয়া ফেলিল, বলিল, 'মা আপনি বউ হারিয়ে সকলকেই সেই বউটির মত দেখছেন।

ন-মা। আমি না হয় বুড়ী হয়েছি চোখে দেখতে পাই না, কানে শুনতে পাই না, রবি হাঁ করে তোমার মুখ দেখে কেন বলত? আমি কি ওকে শিখিয়ে দিয়েছি? তুমি দুধের বাটী মুখে ধরলে এক চুমুকে সবটা খায়, তুমি কাছে বসলে গায়ে হাত বুলুলে ঘুমিয়ে পড়ে, এ সব দেখেও বুঝতে পার না?

নবীনের মা আর বলিতে পারিলেন না, গলা ধরিয়া আসিল, দুই চোখ জলে পুরিয়া উঠিল, নবীনের মা চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

নলিনী হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিল, রবির প্রসঙ্গ তাহাকে সজাগ করিয়া দিল, সত্যই ত রবি তাহাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখে, সত্যই ত তাহার কথা রাখে, নলিনী মনে মনে ভাবিল, সত্যই কি আমাকে ওর মার মত দেখতে? আমি ত আসল নই, নকল, নকলেরও ত কম আদর নয়? কেন ওই হাড়-পাঁজরা বারকরা শিশুটিকে দুই হাতে ধরিয়া বুকে চাপিতে ইচ্ছা হয়?

নলিনী ফিরিয়া ফিরিয়া রবিকে দেখিতে লাগিল, দেখিয়া দেখিয়া চোখ দুটী জলে পুরিয়া আসিল, অমনি

রবি তাহার দুইটি শীর্ণ বাহু বাড়াইয়া ধরিল, নলিনী স্নেহ-ময়ী জননীর মত রবিকে দুই হাতে তুলিয়া বুকে চাপিয়া ধরিয়া তাহার রক্তশূন্য পাণ্ডুর গণ্ডদেশে অজস্র চুম্বনরাশি আঁকিতে লাগিল; নলিনী ভাবিতেছিল, এইত মা হয়েছি, নকলে এত, না জানি সত্য সত্য মা হলে কত সুখ? পুত্র-হীনাকে শত ধিক্!

নবীন কখন গৃহে প্রবেশ করিয়াছে নলিনী টের পায় নাই। চোখে জল ভরা ছিল, দৃষ্টি পরিষ্কার ছিল না, ঝাপসা দেখিল, কে যেন ঘরে আসিল কেবল এইটুকু মাত্র বুঝিয়া তাড়াতাড়ি অঞ্চলে চোখ মুছিয়া চাহিয়া দেখিল, নবীন আসিয়াছে। আসিয়াছে বটে, কিন্তু এ দিকে তাকায় নাই। ভালই হইয়াছে, নবীন ট্রাঙ্ক খুলিয়া পকেট হইতে পোষ্ট কার্ডগুলি বাহির করিতেছে, নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, চা খাওয়ার অভ্যাস আছে ত? নবীন নলিনীর দিকে ফিরিয়া বলিল, কখন কোথাও বন্ধুদের উপরোধে এক আধবার খাই, অভ্যাস নেই।

নলিনী। ঠাকুরদা নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন, রোজ সকালে ও বৈকালে ওঁর ঘরে একটু একটু চা পান করবেন; এটাও উপরোধের সামিল ধরে নিতে পারেন।

নবীন। ঠাকুরদা পূজনীয় ব্যক্তি ডাকলেও যাব, না ডাকলেও যাব, ওখানে অভ্যাস অনভ্যাসের প্রশ্ন হবে না। আগে মা বলেছিলেন, মাত্র ওই আটটি দিনের মেয়াদের সর্ত্তটি তুলে নিলেই নবীনচন্দ্র পরমানন্দে শুধু চা কেন, অন্য কিছু আয়োজন হলেও দোষ ধরবে না।

নলিনী হাসিয়া বলিল, 'এইত আপনি বেশ সহজভাবে কথা বলতে জানেন, পূর্ব্বেও বলতেন শুনেছি, এরকম ব্যবহার পেলে আপাততঃ কাশীতেই রয়ে গেলাম।

রবি তখনও নলিনীর কোলে।

এক সপ্তাহ কাল নবীনের কাশীবাস পূর্ণ হইয়াছে, সাত দিনে রবীন্দ্রের আশাতিরিক্ত ফল ফলিয়াছে, জ্বর একেবারে ত্যাগ হইয়াছে, ক্ষুধা বাড়িয়াছে, এখন সে উঠিয়া হাঁটিতে পারে। নলিনীর সাহায্য পাইয়া রবি রোগমুক্ত হইয়াছে, এই নিস্বার্থপরতার যে দাম নাই, মাতা ও পুত্র বিশেষ ভাবে বুঝিতে পারিয়াছেন। রবি নলিনীর সহিত ছাদে বেড়ায়, নবীন জানালার মধ্য দিয়া দেখে উহারা হাসিতেছে, বানর তাড়াইতেছে, বানর এ ছাত হইতে অন্য ছাতে লাফাইয়া পলাইতেছে, রবি উচ্চ হাসি হাসিতেছে, নলিনী লাঠি তুলিয়া বানরকে ভয় দেখাইতেছে, নবীনও মৃদু মৃদু হাসিতেছে। কয়দিন একত্রে কাটাইয়া নবীন বুঝিয়াছে, নলিনী—একদিকে হাস্য-মুখরা আবার গম্ভীরা বুদ্ধি-সম্পন্না, পুত্রবতী না হইয়াও পুত্র-বৎসলা স্নেহময়ী জননীর মত সেবা-পরায়ণা, এখনকার রমণীমণ্ডলীর মধ্যে সুদুর্লভা, স্পর্শদান দিয়া মরা ছেলে বাঁচাইয়াছে।

নবীন মাকে জিজ্ঞাসা করে, কলকাতায় ফিরলে রবিকে রাখতে পারবে ত?

মা বলেন,—এ যে এক বিপদ্ গিয়ে আর এক বিপদ; নলিনীকে না পেয়ে ও এক দণ্ডও বাঁচবে না।

নবীন বলে,—উপায়?

মা বলেন, 'মধুসূদন জানেন, আমি আর ভাবতে পারি না বাপু।'

সমস্যার মীমাংসা হয় না, নিকর্ম্মা নবীন একটা সঙ্কল্প স্থির করিয়া রাখিয়াছে, কাল হইতে সে বাহিরে বাহিরে কাটাইবে, মন সর্ব্বদাই চঞ্চল, মৃতদার সে, বহ্নিমুখে পতঙ্গের মত এত ঘনিষ্ঠতা নীতি-বিগর্হিত। সকাল হইলে জামা কাপড় পরিয়া নবীন বাহিরে চলিয়া গেল, গঙ্গায় ধারে ধারে ঘাট দেখিয়া আসিয়াছে, সেই দিকে বেড়াইতে গেল। যত ঘাট, তত সাধু সন্ন্যাসীর মেলা, নবীন দেখিতে দেখিতে এক ঘাট হইতে অন্য ঘাটে চলিতে লাগিল। একস্থানে দেখিল একটি সাধু ধ্যানমগ্ন বসিয়া আছেন। নবীন সেইখানে বসিয়া পড়িল, সাধুর ধ্যান-মূর্ত্তি দেখিয়া নবীনের ভক্তি হইয়াছে, একঘণ্টা, দুই ঘণ্টা, ক্রমে তিন ঘণ্টাও কাটিয়া যায়, সাধুর ধ্যান ভাঙ্গে না। রৌদ্র প্রখর হইয়াছে, বেলা বাড়িয়াছে আর বসা যায় না, বৈকালের দিকে আসিতে হইবে। অনেক বেলা করিয়া নবীন বাসায় ফিরিল। মা ছেলেকে লইয়া তিন তলায় বসিয়া আছেন, বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন, নবীনকে পাইয়া আশ্বস্ত হইলেন এবং বলিলেন, 'এত বেলা কখনও কোনদিন হয় না, কোথায় ছিলে?'

নবীন বলিল, সাধু-মহাত্মা খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম, কাশী জায়গা খুঁজলেই মেলে।'

মার মনটা কাঁপিয়া উঠিল, ভাবিলেন, নাতি মেয়ে উঠল, এ আবার কি পেরো, ছেলে সন্ন্যাসী হবে ?

নবীনের মা নীচে নামিয়া গেলেন। নলিনী তাহার ঠাকুরদাদার কাছে বসিয়াছিল, নবীনের মা বলিলেন,—যাও তো মা একবার ওপরে, একটু মাথবার তেল নবীনকে দিও, অনেক বেলা হয়েছে।

নলিনী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এত বেলা করলেন কেন ?

—খানিক ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, কিছুত কাজ নেই।

নলিনী। দুপুর রোদে পথে পথে ঘুরে বেড়ান, নিশ্চয়ই কোনও উদ্দেশ্য ছিল।

নবীন। পথে পথে নয়, গঙ্গার তীরে।

নলিনী। কাশীর গঙ্গার তীর, সে তো শুনেছি আরও ভয়ানক স্থান।

নবীন মৃদু হাসিয়া বলিল—অনেক সাধু-মহাত্মা দেখলাম।

নলিনী। এই তো প্রমাণ হল, একটা উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছিলেন, সাধু চিনলেন ?

নবীন। একটি ধ্যানরত সন্ন্যাসীর কাছে বসেছিলাম, তিন ঘণ্টা বসে রইলাম, ধ্যান ভাঙ্গল না, বেলা বাড়ছে দেখে চলে এলাম, বৈকালে আবার যাব।

নলিনী হাসিয়া বলিল, যে কাজে এলাম, আপনার সাধু-সঙ্গ শুনে বিস্মৃত হয়েছিলাম, আপনাকে মাথবার জন্য তেল দিতে মা বলেছিলেন।

একটি কাচের ছোট বাটী তুলিয়া লইয়া নলিনী বলিল, 'অপেক্ষা করুন একটু তেল নীচে থেকে আনি।

নবীন। বাটী দিন, মাথবার তেল ঘরেই আছে।

নলিনী। সরষের তেল দিনকতক বন্ধ দিন, আমার কাছে ঠাণ্ডা তেল আছে, এখনি আনছি।

নলিনী দ্রুত নীচে নামিয়া আপন কক্ষে আসিয়া তাহার নিজের ব্যবহারের জন্য উত্তম সুবাসিত গন্ধতৈল পুরিয়া লইয়া উপরে আসিল, বলিল, 'আপনার মা বেলা বাড়ছে বলে কতই না ভাবছিলেন, তিনি ত খবর রাখেন না, লুকিয়ে লুকিয়ে আপনি ছাই মাথবার ফিকিরে রয়েছেন। নিন ব্রহ্মতালায় খুব বেশী করে তেল মাখুন, ঢুকে দিন, বায়ু বাড়লে প্রথমে ওই রকম সাধু দেখার ঝোঁক হয়, আলাপ হলেই গেরুয়া চাপলো। ভাবুন, সাধু মাহুষ প্রসাদ করে কলকেটা এগিয়ে দিলেন, ওদের দেখাদেখি আপনিও কষে টান দিলেন, আপনার কার্য্য ওখানেই শেষ হল, সুরু হলো এই বিদেশে, বাসাবাটীতে ওই বুড়ো মার—ডাক কবিরাজ, হরদম মিছরীর জল আর নেবুর রস, লেখ কলকাতায় চিঠি, ছোট-সেই তেরুল না কি বলে কি একটা জায়গায়, পার্শ্বেল যোগে লোহার বালার আগমন, কষ্ট করে ধারণ করা, অনর্থক এ সবের প্রয়োজন ত দেখছি নে।

নলিনী হাসিতে মুখ খানি রঞ্জিত করিয়া এক নিঃশ্বাসে এতগুলি কথা বলিয়া গেল, নবীন বিহ্বলের মত কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া যতক্ষণ না কথাগুলির গূঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিল, চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে হাসিতে সুরু করিল, হাতের তেল হাতেই রহিয়া গেল।

নলিনী। ওই দেখুন, হাতের তেল গায়ে লাগাতে ভুলে যাচ্ছেন, ডাকব আপনার মাকে মাথিয়ে দিতে।

তৈলের সুগন্ধে ঘরের বাতাস ভরিয়া গিয়াছে, নবীন তৈল-মর্দ্দন করিবার কালে বলিল, আপনার দিদি অনেক বেঁকা বেঁকা কথা কন বটে, কিন্তু এমনটি পারেন না, বয়সে ছোট হলেও তাঁর অপেক্ষা আপনি যে বুদ্ধিতে ও জ্ঞানে বড় এটি আমার স্বীকার করতেই হয়েছে। দেখুন সাধু-সন্ন্যাসীকে ভক্তি করাই উচিত নয় কি ?

নলিনী। করা ত আমিও বলি, কিন্তু করলেন কি ? এইত সে দিন বিশ্বেশ্বর দেখলেন, সাধুরা যাকে পূজা করেন ভক্তি করেন, আপনাদের মুখে তাঁর উপরে একটা কথাও ত শুনি নি ?

নবীন। বিশ্বনাথ একখানি পাথর, সকলে পূজা করছে, জল দিচ্ছে, আমরাও দিলাম, তিনি নিষ্ক্রিয় অচল অটল, কেমন করে ভক্তি করতে হয় শিখাতে পারেন ?

নলিনী। ভক্তি হয় নি বুঝি ?

নবীন। না হলে আসব কেন ? মনকে বুঝালাম,

ইনি সাক্ষাৎ ভগবান্, জীবের দুর্গতি দেখে দেখে পাথর হয়ে গেছেন, আমার পিতৃ-পিতামহেরা এঁকে দর্শন করে কৃতার্থ হতেন, ইনিই তাঁদের স্বর্গবাসী করেছেন; চোখ-মুখ, নাক, কাণ না থাকুক, তবুও ইনি সর্ব্বজ্ঞ।

নলিনী। এ যেন মনকে চোখ ঠারা। সত্যই আপনার ঠাকুর দেবতায় বিশ্বাস নাই।

নবীন। খুব বিশ্বাস আছে, যিনি এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা তিনি এখানকার বিশ্বেশ্বর হন বা যেই হন, তিনি যে নিয়তই গড়ছেন আর ভাঙছেন এটা খুব ঠিক, আমরা সকল সময়েই প্রত্যক্ষ করছি, মৃত্যু সকল দরজায় উঁকি মারছে, বাদ কাউকে দেয় কি? যান না একবার মণিকর্ণিকায়, দেখবেন, ওঁর কার্য্যটি সর্ব্বক্ষণই হু হু জ্বলছে, দেখলে ত এতটুকু অবিশ্বাস হবে না।

নলিনী। আপনি ভগবানের শুধু সংহার-মূর্ত্তিটিই নিচ্ছেন, তাঁর একদিক্ কেবল আপনার চোখের উপর ভাসছে; তিনি যে বহুরূপ, একরূপে তিনি রুদ্র সংহার-কর্ত্তা, অন্যরূপে বিষ্ণু পালনকর্ত্তা, ছয় ঋতু তাঁর আজ্ঞায় আসছে, চলে যাচ্ছে, সূর্য্য উত্তাপ দিচ্ছেন, মেঘ তৈরী হচ্ছে, মেঘে বৃষ্টি, বৃষ্টির জলে শস্য উৎপন্ন হচ্ছে, সংসারের জীব খেয়ে প্রাণ ধারণ করছে। জল বাতাস কোনটাকে বাদ দেবেন, সব কর্ত্তাই যে আমাদের জীবন-ধারণের উপায় পালন করছেন না? শুধু মৃত্যুটি নিয়ে ভাবলে ত চলবে না।

নবীন। যা বললেন সব মানি, অনেক কিছু যে প'ড়ে ফেলেছেন বুঝতে পারছি। ধরুন বলি দেবেন বলে ছাগল-ছানা পুষলেন, তাকে ঘাস জল দেন, আবার গায়ে হাত বুলিয়েও থাকেন, আদর করতেও ভোলেন না, কিন্তু পূজোর দিনে কি করেন? ছাগলটি পুষেছেন, আহা! গরীব বেচারী বলে কি সে রেহাই পায়? না টেনে হিঁচড়ে, সে যাবে না, তবুও তাকে হাড়িকাঠে পোরেন?

নলিনী হাসিল, বলিল, যুক্তি মন্দ নয়, মারবার জন্য পালন, ভগবানের উপর এ ধারণা কি বরাবরই পোষণ করে আসছেন, না সম্প্রতি স্ত্রী-বিয়োগ, ছেলের অসুখ ভেবে ভেবে ভেতরটা মরুভূমি করে ফেলেছেন? তর্ক রাখুন ও দিকে পায়ের তেল গায়ে শুকিয়ে উঠল, বায়ু-বৃদ্ধি ত ছিলই, এইবার পিত্ত-বৃদ্ধি হবে, সামলাবেন কি ক'রে? উঠে পড়ুন। নবীন হাসিয়া বলিল, তর্ক শেষ করুন নি। পরে বোঝা-পড়া হবে।

নলিনী নীচে যাইবার জন্য পা বাড়াইয়াছিল, ফিরিয়া বলিল, আর লাগতে আসবেন না, ঘোল খাইয়ে ছেড়ে জানবেন।

নলিনী হাসিতে হাসিতে দ্রুত নীচে নামিয়া গেল।

নলিনীকে তেল দিতে বলিয়া নবীনের মা ঠাকুর-দাদার কাছে আসিয়া বসিলেন।

বুড়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'খাওয়া হয়েছে, বসলে যে?

ন-মা। একটা কথা বলতে এসেছি, ভরসা হয় না, অভয় দেন ত বলি।

বুড়া শুইয়া ছিলেন, উঠিয়া বলিলেন, বল না, তুমি ভূপেনের মা, অত কিন্তু করছ কেন?

ন-মা। এই আপনার নাতনীর কথা বলতে এসেছি। মেয়েটি বেশ বড় সড়, আবার রবি ওকে পেয়ে বর্ত্তে গেছে, মনে করছে, মরা মা ফিরে এসেছে। আমার নবীনের জন্য ভিক্ষা চাইছি। এই দেখুন নবীন সেই সকালে বেরিয়েছিল, এত বেলায় ফিরল, সাধুদের আড্ডায় ছিল, কাশী এসে কি সন্ন্যাসী হবে?

ঠাকুরদা। তোমার বলবার আগে এ কদিন ওই কথাই ভাবছি; বললে, ভাল হল সব কথা পরিষ্কার ক'রে বলি, শোন। – নাতনীটি কলেজ-ফেরতা রূপও যথেষ্ট, তা ত দেখছ, তবু কেন বিয়ে হয় নি? দোষ ওর নয়, ওর বাপের, সে আহাম্মক দু-দুটো মেয়ের বিয়ে দিয়েছে, এটার যে পারলে না কেন? ওকে যে বাইরে ছেড়ে দিয়েছিল, অনেক বড় মানুষের মেয়েদের সঙ্গে মিশেছিল, কত বিধর্ম্মীদের মেয়ের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করেছিল, কচি মন অনেক কিছু শিখে ফেলে যাতে ওর সাহস হ'ল মা-বাপের মুখের ওপর বলতে 'বিয়ে করব না'। আরে দুটো বুক ফুলিয়ে বল্লি, ক'রবো না, জাত-কুল বাঁচে কি ক'রে? একবার দেখ দেখি, আমাদের বংশে কখন যা হয় নি তা তো হতে হয়েছে, তুমি ত সব বুঝতে পারছ? বজ্জাত গরু গলায় দড়ি বাঁধা, ছুটে বাইরে তুমি কি করবে? দড়ি ছেড়ে দেবে, না দড়ি ধরে তার পেছু পেছু ছুটবে? মনে

-সান বাঁধা গরু কত যা দৌড়ুবে দাঁড়াতে হবেই, তখন বাগিয়ে গলার ফাঁসটা জোর করে ধরে গোয়ালে এনে পুরবে, এই না ? নাতনীটির এখন ত গরুটির মত দাঁড়াবার অবস্থা হয়ে এসেছে, আর ছুটতে পারছে না। আমার এ নাতনীটিকে যদি নেবার ইচ্ছা হয়ে থাকে, বেশী গোল ক'রনা, আমার ওপর ভার দাও, এ বিয়েতে আমার খুব মত, কারণ খাসা ছেলে নবীন, বি-এ পাশ, এদিকে একশ টাকা মাইনে পায়, বয়স এমন ত বেশী হয় নি। নাতনীটী কলেজে যে দলে মিশেছিলেন তাদের মত যদি বিয়ে হয়, এখনি রাজী হয়, আমাকে সেই পথ ধ'রতে হবে, নবীনের খাওয়া হলে আমার কাছে পাঠিও, ব'ল ডেকেছি, নিশ্চিন্ত থাক, ঘটিয়ে দেবো।

নবীনের মা সন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়া গেলেন, আহারের সময় নবীনকে বলিলেন, ভূপেনের দাদা-শ্বশুর তোমায় ডেকেছেন, খাওয়া হলে দেখা করো।

আহারের পর নবীন দাদা-মহাশয়ের ঘরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আমাকে খুঁজেছিলেন ?'

নলিনী বসিয়াছিল, বুড়া বলিলেন, একটা কাজ আছে, পারত বলি।

নবীন। বলুন না, এমন কি কাজ যা পারব না।

বুড়া। একবার সারনাথ বেড়িয়ে আনতে হবে।

নলিনী আশ্চর্য্য হইয়া দাদা-মহাশয়ের মুখের উপর চাহিয়া রহিল।

বুড়া বলিল, আমার এই আদরের ছোট নাতনীটি এক মাসের ওপর আমার সেবা করছে, কাশী এসে পর্য্যন্ত কিছুই দেখে নি, ভেবেছিলাম আমি নিজে ওকে সব দেখাব, বুড়ো শরীর সেরেও সারে না, হাতে পায়ে জোর নেই, তুমি ভায়া যদি কষ্ট স্বীকার করে এই ভারটা নাও।

নলিনী অনেকদিন পরে একটা বেড়াইবার সুযোগ উপস্থিত, আহ্লাদে চোখ দুটা জ্বলিয়া উঠিল, মিষ্টস্বরে বলিল, হাঁ দাদামশাই, আমি কি বলেছি সারনাথ দেখবো ?

বুড়া বলিলেন, বলনি সত্য, দেখাও তো উচিত ? নবীনের মত একজন শিক্ষিত চরিত্রবান্ যুবক হাতে পেয়েও যদি ছেড়ে দিই, তোমার মন আমার উপর থাকবে কেন ? যাও কথা বাড়িও না, ভাল কাপড়-জামা পরগে, নবীন তুমিও তায়া তৈরী হয়ে নাও, গোধূলিয়া থেকে একখানা টঙ্গা কি একা যাওয়া আসা ভাড়া করবে, এখন বেরুলে সব দেখে সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরতে পারবে।

নবীনের বিষম বিপদ, বয়স্থা নাতনীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার বুড়া নিজ হাতে তুলিয়া দিতেছেন, বিশ্বাস তো বড় অল্প নয়, নবীন ভাবিল নলিনী যাইতে চায় লইয়া যাব, বুড়ার টাকা লইব না।

নবীন উপরতলায় আসিয়া মাকে জানাইল, সারনাথ যাইবে, দাদামশাই নলিনীকে সারনাথ দেখাবার ভার দিলেন।

মা মনে মনে বলিলেন, ধূর্ত্ত বুড়ো ! দেখি কি রকম কাজটা ঘটাতে পারে।

নবীনকে বলিলেন, যাও না দেখে এস, আর কখনও ঘটবে কি না কে বলতে পারে।

নবীন কাপড় বদলাইয়া দু'তলায় আসিল, নলিনী ট্রাঙ্ক খুলিয়া একখানি সবুজ রঙের সাড়ী ও ওই রঙের জামা প্রভৃতি বাহির করিয়া সাজিতেছিল, বেশভূষা শেষ করিয়া দাদামশাইয়ের সহিত ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, নবীন অপূর্ব্ব সাজে নলিনীর এই নয়ন-মনোহারী মূর্ত্তি দেখিয়া চমকাইয়া গেল। দাদামশাই বলিলেন, নবীন ভায়া, তোমার হাতে আমার দিদিকে সঁপে দিচ্ছি, বেড়িয়ে এস, দেখ যেন পথে ভাব ক'রে ক'লকাতার টিকিট কিনে, গাড়ী চেপে বসো না।

শুনিয়া নলিনী লজ্জা পাইল, তাহার রাঙা মুখ আরও রাঙা করিয়া দাদামশাইকে বলিল, অমন যদি কর সারনাথ যাবো না।

দাদামশাই নলিনীর মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন, যাবে বৈ কি, দিদি যাত্রা করে বেরিয়েছ, কাপড় খানিতে বেশ মানিয়েছে, না হয় বুড়োই হয়েছি দুটো রসের কথা বলতে পাব না ?

নলিনী ঘাড় বেঁকাইয়া বুড়াকে কৃত্রিম কোপ দেখাইয়া সিঁড়িতে অবতরণ সুরু করিল। [ক্রমশঃ

হরিদ্বারে কুম্ভমেলায়

—শ্রীমনুজচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী

লোকে হরিদ্বারে এসে মন্দিরে মন্দিরে ঘোরে, কোথায় পিছেভিনাথ শিব, কোথায় সূর্য্যকুণ্ড, গৌরীকুণ্ড, নির্ম্মোকেশ্বর, দক্ষেশ্বর শিব। অধুনা ঋষিকুলের বেদমাতাও দর্শনীয়। আমার মতে ও-সব কিছু না, ব্রহ্মকুণ্ডও না—সব পাণ্ডাদের ঠাট। হরিদ্বারে তীর্থের মধ্যে গঙ্গা। মাতা শৈলসুতা-সপত্নী এই হরিচরণচ্যুতা সুরধুনী। এই বিরাট লোক-সমাগমে যেন এর শান্ত শ্রী ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে বোধ হল।



লছমন ঝোলা।

এখানকার সন্ন্যাসীদের ব্যবহারও মনকে পীড়িত করল। হরিদ্বারে অধিকাংশ জমিদারী সন্ন্যাসীদের। দু' দশহাজারী থেকে লক্ষপতি দিবারাত্র টাকার থলির বসে কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী। এরা এখানে 'বিরক্ত' নামে অভিহিত, অথচ সর্ব্ব বিষয়ে অনুরক্ত। অধ্যাত্ম-সাধনার নামে জীবন আলস্যের কোলে আত্মসমর্পণ করে ভারতবর্ষের কত সহস্র লোক সন্ন্যাসীর বেশ গ্রহণ করেছে, তা এই কুম্ভমেলাতে এসে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়, ছাই মেখে চোখে জলের দাগ এঁকে কেউ স্থির হয়ে চক্ষু মুদে বসে আছেন, সামনে পয়সা দেবার পাত্র, কেউ জিমনাষ্টিকের কসরৎ দেখিয়ে মাথা মাটিতে ও পা দুটি শূন্যে তুলে দিয়ে স্থির হয়ে আছেন, সামনে পয়সার পাত্র, কেউ দরমার ঘরের মধ্যে আত্মগোপন করে ভেতর থেকে বিকট শব্দ করছেন, সামনে পয়সা দেবার পাত্র! কারও সঙ্গে আলাপ করলে তাঁকে শুনতেই হবে, "কুছ সাধু-সেবা করাও।" এঁরা হলেন মামুলি, দু' একটা টাকা পেলেই সন্তুষ্ট। মোহান্তরা দু' দশ হাজারের জন্য নানা রকম উপায় আবিষ্কার করেন। রাজা মহারাজা ভক্ত, কুম্ভমেলা সাধুদের "দর্শন ও পরশনের" মেলা, অথচ কোন সম্প্রদায়ের লোক অন্য



মণ্ডরির সাধারণ দৃশ্য : মণ্ডরি।

সম্প্রদায়ের সঙ্গে দেখা-শোনা কিছুমাত্র করেন না, আর পরশন হল—পাথর ছুঁড়ে! স্নানের পর দর্শনার্থীদের সঙ্গে সামান্য কথায় বৈরাগীরা বিবাদ করে বড় বড় পাথর ছুঁড়ে রক্তস্রোত বইয়ে দিল, পুলিশ এসে হাতে পায়ে ধরে না থামালে সে দিন কত লোকের প্রাণ যেত তা সাধুই জানেন। সাধুদের চাল-চলনে কিছু মাত্র শ্রদ্ধা জন্মায় নি; অথচ সংবাদপত্রের মতে চৌদ্দ লক্ষ লোক এই দেখতেই এসেছেন! বাঙ্গালায় লোক সবশুদ্ধ ছয় সাত হাজার, সিন্ধু, গুজরাট, ইউ-পি, মাদ্রাজ, দুই লক্ষ, বাকি সমস্ত পাঞ্জাবী। শত শত লোক স্থান না পেয়ে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে গাছতলায় পড়ে আছেন, উপরে হিমের বৃষ্টি থেকে

৫০ টাকা ভাড়া, তাঁবুর ভাড়াও তাই। লোক-পিছু শোবার জন্য পাঁচ টাকা ভাড়া, পাকা বাড়ীর ঘর একশত থেকে চারশত পর্য্যন্ত গেছে। দু' আনা সেরের দুধ এক টাকা সেরে বিক্রয় হতে দেখলাম। কাজেই, অগ্নিদেবের ক্ষুধা প্রবল হয়ে উঠল। দুবার সামান্য ভাবে এখানে ওখানে আগুন লাগলেও তৃতীয় বারে তিনি খাণ্ডব দহন সুরু করলেন। মেলার সমস্ত বাজারটা



ল্যাণ্ডোর ডিপো : মসুরি।

দাউ দাউ করে জ্বলে গেল, এক মুহূর্ত্তে লক্ষ লক্ষ টাকা নিশ্চিহ্ন। ছেলে-খেলার একটী দমকল, তাতে সেই বিরাট লেলিহান সপ্ত-জিহ্বাকে কে ঠেকাবে! মানুষ সামান্য জিনিষ নিয়ে গঙ্গার চরে দাঁড়িয়ে মধুসূদনকে ডাকতে লাগল! আর সেই ফাঁকে দুর্বৃত্তেরা লুণ্ঠন-কার্য্য সমাধা করল। স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিশের মধ্যে এই নিয়ে সংঘর্ষ বেধেছিল—বহু লোক তাইতে আহত হয়। জঙ্গল থেকে কাঠ আনতে দেয় নি বলে কে বা কাহারা আগুন ধরিয়ে দিল। দুদিন ধরে দেখতে লাগলাম পাহাড়ের কোলে দাবানল। দুজন হাতীর পায়ে প্রাণ দিল, একজন গঙ্গার স্রোতে ভেসে গেল, শত শত লোক কলেরা ও নিউমোনিয়ায় প্রাণত্যাগ করল। চোর, বাটপার, ঠগবাজের পাল্লায় পড়ে যথাসর্ব্বস্ব গেল, রেলের টিকিট পর্য্যন্ত খোয়া দিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসল, তথাপি বালবৃদ্ধ সকলেই আসছে। কেউ স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে ছয় টাকা সঙ্গে নিয়ে একাকেই এসেছেন, কেউ আত্মীয়-স্বজনকে লুকিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গেই বেরিয়ে পড়েছেন, পরিণাম ভেবে দেখবার অবসর পান নাই—তাই পরিণামও তেমনি! প্রতিদিন যাত্রীরা ষ্টেশনের রাস্তার দুধারে এক মাইল জুড়ে মাল নিয়ে বসে আছেন, বাড়ী যাবার ট্রেণ না পেয়ে কেউ কেউ রোদন করছেন, যেহেতু পাণ্ডা অতি জীবন, টাকা পেয়ে গেছে, এখন গলাধাক্কা দিচ্ছে। যার সঙ্গতি আছে, সে তবু মোটর বাসে করে দিল্লী অমৃতসর সরে পড়ছে। প্রত্যহ শত শত মোটরবাস চব্বিশ ঘণ্টা ছুটছে তবু যাত্রী ফুরায় না। পনেরই বৈশাখ পর্য্যন্ত এমনি অবস্থা দেখলাম।

বিচলিত অন্তর শান্ত করতে কয়েকদিন পরে দেরাদুন উপস্থিত হলাম। স্থানাভাব ছিল না। দেরাদুনের প্যারেড গ্রাউণ্ড, পল্টন বাজার, খিগারি রোডে সান্ধ্য-ভ্রমণের সময় বাঙ্গালীর পালিশ-করা মুখশ্রী দেখে বোঝা গেল··দেশ-ভ্রমণের 'লেক রোড' এটা। দেরাদুনে ফরেষ্ট রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউশন বা "জঙ্গল অফিস" এবং শিখদের গুরুদোয়ারা দ্রষ্টব্য। দেরাদুন হরিদ্বার থেকে আটচল্লিশ মাইল। দেরাদুন থেকে রাজপুর সাত মাইল ট্যাক্সিতে এসে হাঁটা পথে পাক-দণ্ডি দিয়ে মুসৌরি যাত্রা করি। রাজপুর থেকে দশ মাইল ঘুরে মোটরবাস মুসৌরি চলে গেছে···বাস, ঘোড়া, ডাণ্ডি সকলের ভাড়া লোক-পিছু দেড় টাকা, এবং টিহিরী রাজ্যের চুঙ্গি বা টোল দেড় টাকা! সমস্ত রাস্তাটা খাড়া চড়াই। "তারাকি সাট্টা" কিষণপুর, ছাড়িয়ে "ঝড়িপানি", এখানে



লছমন ঝোলা : হৃষীকেশ।

Half Way Hotel-এ চা পান। একজন বৃদ্ধ ইংরাজ সস্ত্রীক এটা চালান। এখানে ধনী ইংরাজ ছেলেদের "ওকগ্রোভ স্কুল" দেখলে মনে হয়, সম্রাটের ছেলেও এত সুখে থাকতে পায় না। নেপাল রাজার বাড়ীখানি বহুমূল্য। সাত মাইল চড়াই শেষ করে মুসৌরি 'মলে' পৌঁছাই। কার্টরোড থেকেই মুসৌরির দৃশ্য মনোমুগ্ধকর। মনে হল, এই দৃশ্য দেখেই লেখক যে এই স্থানে তার কল্পনা সৃষ্টি করেছিলেন।

বাজগুলি পর্য্যন্ত লাল নীল রক্ত-এ রঙীন। স্মৃতি বাজার ঢুকে মনে হয়, লণ্ডনে প্রবেশ করলাম। তবে Bengali sweets এখানে বিলাসের বস্তু, সাহেবরা অত্যন্ত খেয়ে থাকেন। একটি হোটেলে স্নান এবং আহার হল। স্নানের জন্ম চার আনা দিতে হয়। তবে, সেই তুহিন-শীতল জলে স্নানের পর আরাম আছে যেমন, তেমনি চট করে ঠাণ্ডা লাগার সম্ভাবনাও ছিল, তাই গরম জামা ছাড়ি নি। বার্লোগঞ্জে "মসি" ঝর্ণা দেখে, "কামটি ফল" দেখতে যাবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু, সেটি এখান থেকে সাত মাইল দূর এবং ফেরবার পথে অত্যন্ত চড়াই পড়বে। অগত্যা গেলাম না। এখান থেকে ল্যাণ্ডোর চার মাইল। ল্যাণ্ডোর-বাজারে জিনিষপত্র একটু সস্তা এবং যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী যাত্রীদের জন্ম একটি ধর্ম্মশালা আছে। ল্যাণ্ডোর ডিপো পার হয়ে সার্ভে-অফিসে গিয়ে সমগ্র হিমালয়ের বাঁধান নক্সা দেখি, তার নীচে লেখা Panoramic profile of the hill ranges from Landour. এখানটা সমুদ্রবক্ষ থেকে ৭৫৩৩ ফিট উঁচু। চার্ট দেখে জানলাম, নন্দাদেবী সমুদ্রবক্ষ থেকে ২৫০০০ফিট উচ্চ।

পাহাড়ের অন্তিম পথে এসে "বরফ দর্শন" হল।—এমন মহান্ দৃশ্য জীবনে এর আগে দেখি নি। হিমালয়ের "রজত-গিরিনিভং—শুভ্রমূর্ত্তিং"। নন্দাদেবীর চির-তুষার রৌদ্রে ঝলসিত হচ্ছিল···অপূর্ব্ব—উদার দৃশ্য। অতি—অতি নির্জ্জনতার রূপ। ধ্যান-রত ধূর্জটির জীবন্ত প্রতিচ্ছবি—এই হিমমণ্ডিত হিমালয়। চোখ যেন ফেরে না, মনে হল—কুম্ভে আসা সার্থক—তীর্থযাত্রা সার্থক হল!—

"কিংক্রেগ" থেকে বাসে করে নামবার সময় মনে হতে লাগল, চোদ্দ লক্ষ লোক যা পারল না···নিতাইয়ের স্বত-পক্ক মালপো যা এনে দিতে পারল না, সেই বস্তু এখন আমার মধ্যে কে ঢেলে দিল? দুঃখ-অভিমান-হতাশার মধ্যে কোথা থেকে এল ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি···? কুম্ভ-মেলাতেই বা কেন ক্ষুণ্ণ হলাম, আবার দুরন্ত গতিতে হিমালয় থেকে এঁকে বেঁকে নামতে নামতে প্রকৃতির এই অনন্ত রূপ দেখে কেনই বা আমার এত উল্লাস?—অন্তর-দেবতা যেন বলে দিলেন, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে—"।

রূপের সন্ধান

—শ্রীরাসবিহারী

নিভৃত প্রান্তর মাঝে আমি একা রূপের সন্ধানী ;
অস্তোন্মুখ অরুণের পানে চেয়ে আছি স্তিমিত নয়নে—
লাক্ষা রাগে আরক্তিম দিগন্তেতে বিদায়ের বাণী,
কোন্ শিল্পী আঁকিয়াছে ইন্দ্রায়ুধ বর্ণ আলিম্পনে।

বিস্মিত চকিত চিত্ত নৃত্য করি করিতেছে পান
সেই অপরূপ সুধা—বিচিত্র অঙ্কিত সেই ছবি।
মৌন অনুরাগে মোর মর্ম্ম-পুণ্ডরীক করে গান—
ধূসর-গোধূলি লগ্নে অস্ত যায় ধরণীর রবি।

সন্ধ্যার নূপুর-ধ্বনি শ্রুত হয় ধরণীর বুকে,
আকাশের গলে শোভে অনুপম তারকার হার।
বনানী মর্ম্মরি ওঠে, নীড়ে ফেরে বিহগেরা সুখে
ঈষৎ-স্ফুরিত হাস্যে চন্দ্র খোলে কনক দুয়ার।

চিরন্তন লীলা মাঝে হেরিতেছি অরূপ রতন
রহস্যের যবনিকা বিদারিয়া পরম বিস্ময়ে।
সৃষ্টির মাঝারে তুমি হয়ে আছ স্রষ্টা চিরন্তন,
তোমারি অরূপ রূপ প্রকাশিছ অনুপম হয়ে।

চিত্র-চরিত্র

—শ্রীঅমিত্র রায়

মাইকেল মধুসূদন

১৮৬১ সালে মধুসূদন লোয়ার চিৎপুর রোডের বাসা ছাড়িয়া খিদিরপুরের ৬নং জেমস্ লেনের বাসায় উঠিয়া আসিলেন। মাদ্রাজ হইতে তিনি একাকী আসিয়াছিলেন, পরে পুলিশ কোর্টের দোভাষীর কাজ করিবার সময়ে পত্নী হেনরিয়েটাকে কলিকাতা আনাইয়া লইয়াছিলেন।

মধুসূদন ও হেনরিয়েটার পুত্রকন্যার কথা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহার প্রথমা কন্যা শর্ম্মিষ্ঠার ১৮৫৯ সালে জন্ম, তখন শর্ম্মিষ্ঠা নাটক লেখা শেষ হইয়াছে। কন্যার নামে কবির প্রথম নাটকের স্মৃতি। দ্বিতীয় সন্তানের নাম মিল্টন্ দত্ত, বাংলা নাম মেঘনাদ; ১৮৬১ সালে মেঘনাদ-বধ রচনা হইয়াছে; পুত্রের নামের মধ্যে একাধারেই সেই কাব্যের ও মধুসূদনের মতে জগতের শ্রেষ্ঠ কবি মিল্টনের নাম জড়িত। তৃতীয় পুত্র এলবার্ট নেপোলিয়ান দত্তের জন্ম ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে; নেপোলিয়ান নামে ফরাসীদেশের ও ফরাসী সম্রাটের স্মৃতি, যে-সম্রাট্-দম্পতীকে একদা প্যারিসের রাজপথে 'জীবতু সম্রাট!' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্কুলের বালকের ন্যায় অভিবাদন করিয়াছিলেন।

মধুসূদনের পুত্র-কন্যারা কেহই দীর্ঘজীবী হয় নাই; নেপোলিয়ান দত্ত ছাড়া আর দুই জনের অল্প বয়সে মৃত্যু হয়।

নেপোলিয়ান দত্ত অহিফেন-বিভাগে চাকুরি করিতেন, চল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু ঘটে; আর শর্ম্মিষ্ঠার দ্বিতীয় বিবাহের এক পুত্র দার্জ্জিলিং জেলায় আবগারি-বিভাগে বহুদিন চাকুরী করিয়াছিলেন; মধুসূদনের জীবিত বংশধরেরা দুই জনেই আবগারি-বিভাগে কাজ করিতেন।

তাঁহার জীবনীকার লিখিতেছেন :—

"আলবার্ট দত্তকে মাইকেল মধুসূদনের একমাত্র পুত্র জানিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অহিফেন-বিভাগের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।" আবার, শর্ম্মিষ্ঠার দ্বিতীয় বিবাহের পুত্র সম্বন্ধে লিখিতেছেন, "মধুসূদনের দৌহিত্র জানিয়া বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারী বোল্টন সাহেব তাঁহাকে রাজকর্ম্মে (Superintendent of excise and salt, Darjeeling) নিযুক্ত করেন।"

ইহা কি গবর্ণমেণ্টের সহৃদয়তা, না মাইকেলের কাব্য ও জীবনের একপ্রকার সমালোচনা! তবে কি গবর্ণমেণ্টেরও রসজ্ঞান আছে, বলিতে হইবে?

মধুসূদন পুলিশ আদালতে কাজ করিবার সময়ে আইন অধ্যয়ন করিতেছিলেন, বিলাত হইতে বারিষ্টার হইয়া আসিবার ইচ্ছা কখনও তিনি পরিত্যাগ করেন নাই; কাব্যের নেশা যতই কাটিয়া যাইতে লাগিল ইচ্ছা ততই সঙ্কল্পে পরিণত হইতে থাকিল।

অবশেষে তিনি খিদিরপুরের পৈত্রিক বসতবাড়ী বাল্যবন্ধু হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিক্রয় করিয়া ও জমিদারি মহাদেব চট্টোপাধ্যায় নামে পুরাতন এক কর্ম্মচারীকে পত্তনি দিয়া বিলাত যাইবার ব্যবস্থা পাকা করিয়া ফেলিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার জীবনীকার লিখিতেছেন—

"এইরূপ স্থির হইল যে, মহাদেব মধুসূদনকে তাঁহার ইংলণ্ড-গমনের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ কিয়ৎ পরিমাণ অর্থ অগ্রিম দিবেন, এবং তাঁহার পত্নী-পুত্রাদির ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ মাসিক দেড়শত করিয়া টাকা দিবেন। মহাদেব যাহাতে নিয়মিতরূপে কার্য্য করেন, পরলোকগত রাজা দিগম্বর মিত্র তাহার প্রতিভূ-স্বরূপ হইয়াছিলেন।"

তারপরে বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে তাঁর যশের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে অনুরোধ করিয়া, বায়রণের "My Native land, good night!"-এর মত এক কবিতা লিখিয়া কবির দূর-দেশে যাইতে যেমন অনুষ্ঠান করিতে হয়, তার কিছুমাত্র ত্রুটি না করিয়া, মাইকেল—এস. এস., ক্যাণ্ডিয়া জাহাজে ১৮৬২ সালের ৯ই জুন তারিখে ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন।

রাবণের দ্বারা অপহৃতা হইবার সময়ে কবির সীতা যেমন স্বর্ণ অলঙ্কার ফেলিয়া পথের নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, কবিও তেমনি পথের ইতিহাস চিঠিতে বন্ধুদের জানাইতে জানাইতে

চলিলেন, কখনও সে চিঠির উপরের ঠিকানা off Malta, off the coast of Spain—কখনও চিঠিতে উল্লেখ, উত্তর-আফ্রিকার বন্ধুর গিরিমালার।

অবশেষে সত্যসত্যই একদিন মাইকেল জুলাই মাসের শেষে ইংলণ্ডে গিয়া পৌঁছিলেন।

মহাকাব্য লিখিত হইয়াছে; ইংলণ্ডও পদতলে! মাইকেলের জীবনে, তিনি ভাবিয়াছিলেন, অদৃষ্ট ভাবিয়াছিল কি না জানি না, যে মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত।

অবশেষে ইংলণ্ড!

লণ্ডনে গ্রেজ-ইনে মধুসূদন বারিষ্টারি শিক্ষার জন্যে ভর্ত্তি হইলেন; এতদিন পরে সমস্ত জীবনের সাধ যেন পূর্ণ হইতে চলিল, মধুসূদন দত্ত আর কবি মাত্র বলিয়া পরিচিত হইবেন না, অচিরে লোকে তাঁকে মিঃ এম. এস. ডাট, এস্কোয়ার, বারিষ্টার-আট-ল বলিয়া জানিবে।

কিন্তু, যে বিধি তাঁকে পদে পদে ব্যাহত করিয়াছে, যে পথ তাঁর নয়, সে পথে চলিতে তাঁকে বাধা দিয়াছে, সে ছাড়িবে কেন? সে-ও মধুসূদনের সঙ্গে এক জাহাজে ইংলণ্ডে আসিয়াছিল, এবার সে নিজের কাজ আরম্ভ করিল।

মহাদেব চাটুজ্জ্যে নামে যে লোকটিকে মধুসূদন সম্পত্তি পত্তনী দিয়া আসিয়াছিলেন, নিয়মিত যার টাকা দিবার কথা ছিল, মধুসূদনকে বিলাতে পাঠাইয়া, আর তাঁর স্ত্রী-পুত্রকে দেশে,—সেই মহাদেব চাটুজ্জ্যের মাহেন্দ্র-ক্ষণ উপস্থিত হইল; সে টাকা পাঠান, মধুসূদন ও তাঁর স্ত্রীপুত্রকে, বন্ধ করিল।

মহাদেব চাটুজ্জ্যেকে দোষ দেওয়া যায় না, সে কৃতী পুরুষ। পাওনাদার পাশের বাড়ীতে থাকিয়া টাকা আদায় করিতে পারে না; আর সে কিনা সাত আট হাজার মাইল দূরে! টাকা আদায় করিবে কে? ওই অসহায়া রমণী আর নাবালক পুত্র! মহাদেব চাটুজ্জ্যে এসব কথা ভাবিয়া নিশ্চয় খুব এক পেট হাসিয়া লইয়াছিল। অবশ্য, তার জামিন ছিল দিগম্বর মিত্র। লোকটি ধনী; কাজেই কি ভাবে সে কাজ করিবে মহাদেব তা জানিত। সে নিশ্চিন্ত হইয়া টাকা দেওয়া বন্ধ করিয়া দিল।

সংসারে সবচেয়ে কঠিন কাজ, পাওনা টাকা আদায় করা। ধার পাওয়া সহজ, তাতে সুদের আশা আছে, দান পাওয়া সহজ, তাতে নামের আশা আছে, কিন্তু পাওনা টাকা দিলে না আছে কৃতিত্ব, না আছে মহত্ত্ব, বড় জোর সকলে বলিবে লোকটা সাধুপ্রকৃতির। কিন্তু, মহাদেব চাটুজ্জ্যের দলের পেট তাতে ভরে না।

১৮৬৩ সালের ২রা মে হেনরিয়েটা পুত্র ও কন্যাকে লইয়া ইংলণ্ডে মধুসূদনের কাছে আসিয়া পৌঁছিলেন—দেশে না খাইতে পাইয়া তাঁরা দেশ-ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

মধুসূদনের একে খরচে স্বভাব, তাতে দেশ হইতে টাকা অনিয়মিত হইয়া উঠিয়াছিল, এমন সময়ে স্ত্রী ও সন্তানেরা আসিয়া পড়াতে তিনি বিব্রত হইয়া পড়িলেন, সেই বছরের মাঝামাঝি তাঁরা সকলে প্যারিসে চলিয়া আসিলেন—পরে ব্যয় আরো সংক্ষেপ করিবার জন্য ভার্সাই সহরে আসিয়া বাসা লইতে হইল। এখানে তাঁকে প্রায় আড়াই বছর কাল থাকিতে হইয়াছিল।

মধুসূদন ফরাসীদেশ ও সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন—এখন তিনি সশরীরে ফরাসী দেশে; সেই দেশ, সেই জাতি, সেই ভাষা ও সাহিত্য, আবহাওয়া; কিন্তু সবই কেমন লাবণ্যহীন! টাকা নাই—আসিবারও কোন লক্ষণ নাই! চিঠি নাই—লিখিলেও উত্তর পাওয়া যায় না।

সঞ্চিত যাহা ছিল, ফুরাইয়া গেল। তারপরে বন্ধক দেওয়া সুরু হইল—গৃহসজ্জা, পত্নীর আভরণ ও পুস্তক, তৈজসপত্র! এমন কি, শেষে বিদ্যোৎসাহিনী সভার সেই পান-পাত্রটাও! পানপাত্রটা বোধ হয় অনাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল! ক্রমে মধুসূদনের সুসজ্জিত গৃহ শূন্য হইয়া পড়িল। বোধহয়, দীপালোক জ্বালিবার অর্থও ছিল না—ইচ্ছা করিলে তিনি রাবণের মত বলিতে পারিতেন—

"কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা-সম রে আছিল
এ মোর সুন্দর পুরী! কিন্তু একে একে
শুকাইছে ফুল এবে নিবিছে দেউটি;
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী;

তারপরে ঋণ করা আরম্ভ হইল। ক্রমে অমোঘ নাগ-পাশে আষ্টেপৃষ্ঠে সপরিবারে বদ্ধ হইয়া নবতর লাওকুনের মত মহাকবি ভীষণ সৌন্দর্য্যে প্রতিভাত হইতে লাগিলেন।

কিন্তু, এমন করিয়া আর কতদিন চলিবে! অবশেষে মধুসূদনের নব-নবোন্মেষশালিনী মস্তিষ্কে প্রতিভার এক বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল। মুক্তির উপায় মনে পড়িল—এই উপায়টি মধুসূদনের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। সময়মত ইহা মনে না পড়িলে তাঁকে হয় তো সপরিবারে বিদেশের কারাগারে ও কবরে নিবদ্ধ থাকিতে হইত।

দেশে তাঁর বন্ধু-বান্ধবের অভাব ছিল না! তাঁদের মধ্যে অনেকে ধনী, অনেকে প্রতিপত্তিশালী। কিন্তু, চরম বিপদের সময়ে যাঁর নাম মনে আসিল তিনি ধনী নন, রাজা নন; তিনি তাঁরই মত মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর লোক; তিনি তাঁরই মত একজন সাহিত্যিক; তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। দেশে থাকিতে মধুসূদন বিদ্যাসাগরের প্রকৃত মহত্ত্ব বুঝিতে পারেন নাই; হয় তো নিজের চেয়ে তাঁকে ন্যূন মনে করিতেন, বড়জোর নিজের সমকক্ষ মনে করিতেন। এখন বুঝিতে পারিয়াছিলেন,—বিদ্যাসাগর তাঁর চেয়ে কত বড়! দেশে যে ছিল বন্ধু, বিদেশে সে গুরু-রূপে প্রতিভাত হইল।

সৃষ্টির মাঝে রয়েছে স্রষ্টা

—শ্রীবিভুদান রায় চৌধুরী

নিবিড় করিয়া ভাবিতে দিয়াছ তোমার স্থিতির বাণী,
এই পৃথিবীতে রেখেছ পাতিয়া তোমার আঁচলখানি।
দীনের কুটিরে ধনীর ভবনে,
যে'দিকে তাকাই এই ত্রিভুবনে,
যেদিকেই হেরি করেছ পূর্ণ করুণা তোমার দানি'
সৃষ্টি তোমার সফল হয়েছে তোমার আশীষ মানি'।

তবু হেরি নর প্রতিনিয়তই বিপুল ভুবন পরে,
চোখের উপরে থাকিতে দেবতা তাহারে খুঁজিয়া মরে।
আকাশে বাতাসে নাহি প্রয়োজন,
তবু তার লাগি' চলে আয়োজন,
ব্যর্থ হইয়া জীবনের শেষে শুধুই কাঁদিয়া মরে,
নিষ্ফল তার যত আয়োজন বক্ষে আঁকড়ি ধরে।

সৃষ্টির মাঝে রয়েছে স্রষ্টা বিরাট বিশ্বকায়া,
স্থলে জলে আর গগনে ভুবনে পড়িয়াছে তার ছায়া।
তাই তার লাগি' নাহি বন্ধন,
তাহারে পূজিতে নাহি ক্রন্দন,
বিদেশী পুতুল কিনিবার তরে যেমন শিশুর মায়া,
সৃষ্টির মাঝে খুঁজি না স্রষ্টা খুঁজি তার কোন কায়া।

বলি তাই তোরে সময় থাকিতে ওরে ও অবুঝ ভাই,
দেবতা তোমার নিজের ভিতরে দেখিয়াও দেখ নাই?
দেহের রক্তে চিতের কাঁপনে,
দেবতা ডাকিয়া ওঠে ক্ষণে ক্ষণে,
যেহেতু তোমার চিতে থাকিয়াও পূজা কভু পান নাই,
গুমরি উঠিছে ক্রন্দন সুরে মানস বেদনা তাই।

চলে আয় ওরে ভিখারী, খঞ্জ, আতুর, অকর্ম্মণ্য,
মেগে নিবি আয় দেবতা-আশীষ করিয়া জীবন ধন্য।
তোদেরও লাগিয়া দেবতা দাঁড়ায়ে,
রয়েছে হেথায় দু'বাহু বাড়ায়ে,
আশীষ লাগিয়া ঘুরিস দুয়ারে আশীষ নহে তো পণ্য,
আয় রে চলিয়া সুযোগ থাকিতে কর রে জীবন ধন্য।

নটরাজ রূপে দাঁড়াল দেবতা ঊর্দ্ধে দু'বাহু তুলি,'
নরে ঈশ্বরে হল' কোলাকুলি ভেদাভেদ গেল ভুলি'
সেই সে মধুর প্রীতির লগনে,'
বাঁশরী বাজিল ভুবনে গগনে,
দেবতা আসিয়া দাঁড়াল বাহিরে হৃদয়-দুয়ার খুলি'
নিয়ে গেল যত পাপের কালিমা ঊর্দ্ধে আকাশে তুলি'।

বাঙ্গালায় বর্গী

—নিখিলনাথ রায়

ইংরেজেরা মহারাষ্ট্রীয়দিগের অত্যাচার নিবারণ জন্য ১৭৪২ খৃঃ অব্দে নবাবের অনুমতিক্রমে আপনাদের ব্যয়ে সুতানুটীর উত্তর হইতে গোবিন্দপুর পর্য্যন্ত একটি পরিখা খনন আরম্ভ করেন। তিন শত ইউরোপীয় ও পাঁচ শত পাইক মাত্র উহার কার্য্যের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল। পরিখাটি অর্দ্ধ-চন্দ্রাকারে চিৎপুর হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান সার্কুলার রোডের স্থান দিয়া দক্ষিণে জানবাজার ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। তথা হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বাঁকিয়া চৌরঙ্গী রোড ও মিডলটন ষ্ট্রীটের সংযোগস্থল দিয়া হেষ্টিংস ষ্ট্রীটের নিকট নদীর সহিত মিলিত হইত। কিন্তু, এই শেষভাগ সম্পূর্ণ হয় নাই। ছয় মাসে দুই ক্রোশ পর্য্যন্ত কাটা হইলে, মহারাষ্ট্রীয়দিগের আগমনের সম্ভাবনা না থাকায় উহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকিয়া যায়। ইংরেজেরা এই সময়ে নবাবের অনুমতিক্রমে তাঁহাদের কাশিমবাজার কুঠীর চতুর্দ্দিক্ ইষ্টকপ্রাচীরে বেষ্টিত করেন।* ফরাসী ও ওলন্দাজেরা চন্দননগর ও হুগলী সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। এইরূপে সমস্ত বঙ্গদেশ মহারাষ্ট্রীয়দিগের ভয়ে বিচলিত হইলে, নবাব তাহাদিগের দমনের জন্য সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি তাহাদিগকে ১০ লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিকস্বরূপ প্রদান করেন।

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া আজিমাবাদের শাসনকর্ত্তা জৈনুদ্দীন আহম্মদ ও আবদুল আলি খাঁ নামক তাঁহার জনৈক আত্মীয়কে মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিরুদ্ধে যোগদানের জন্য লিখিয়া পাঠান। জৈনুদ্দীন নবাবের পত্র পাইয়া বিষম সমস্যায় পতিত হইলেন। তিনি ভোজপুর প্রদেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন। জৈনুদ্দীন উক্ত প্রদেশে রাজস্বের বন্দোবস্ত ও শান্তি স্থাপন করিয়া উঠিতে পারেন নাই। যাহা আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় রাখিয়া তিনি আজিমাবাদে উপস্থিত হইলেন। জৈনুদ্দীনের সৈন্যগণ অনেক দিন হইতে বেতন পায় নাই। এক্ষণে তিনি তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে তাহারা তাঁহার অনুসরণ করিতে স্বীকৃত হইবে না। তদ্ভিন্ন বিহার প্রদেশে যখন সম্পূর্ণরূপে শান্তিস্থাপন হয় নাই, তখন তিনি কোন উপযুক্ত লোকের হস্তে আজিমাবাদের শাসনভার অর্পণ না করিয়া, যাইতে সাহসী হইতে পারেন না—ইত্যাদি চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া তিনি হেদাৎ আলি খাঁ * প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ আরম্ভ করিলেন। সকলের পরামর্শে আজিমাবাদের শাসনকার্য্যের জন্য বিশেষরূপ চিন্তার কারণ ঘটিল না। কিন্তু, সমস্ত রাজস্ব আদায় না হওয়ায় সৈন্যদিগের বেতন পরিশোধ করা দুরূহ বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। অগত্যা মহাজনদিগের নিকট হইতে অবশিষ্ট অর্থ সংগ্রহ করার ব্যবস্থা হইল। বক্সী মেহেদী নেসার খাঁকে সঙ্গে লইয়া মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা জৈনুদ্দিনের আদেশে তাহাদিগের বেতন পরিশোধ করিয়া দিলেন, এবং তাহারাও তাঁহার অনুসরণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। তাহার পর জৈনুদ্দীন নিশ্চিন্তমনে আবদুল আলি খাঁ ও মেহেদী নেসার খাঁকে সঙ্গে লইয়া মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগের যাত্রার পূর্ব্বে নবাব পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে পত্র লিখিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহাদের উপস্থিতিতে যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়া আপনার সৈন্যসংখ্যাবৃদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মুস্তাফা খাঁর পঞ্চ সহস্র সৈন্য অষ্ট সহস্রে পরিণত হইল, এবং তিনি

* Orme, vol. II, p. 45 ; also Stewart, p. 258.

‡ Mutakherin, vol. I, p. 429, also 'An Enquiry', chap. II, p. 24.

* হেদাৎ আলি খাঁ সায়র উল মুতাক্ষরীণকার গোলাম হোসেনের পিতা।

§ মেহেদী নেসার খাঁ হেদাৎ আলির ভ্রাতা ও গোলাম হোসেনের পিতৃব্য।

বাবার জঙ্গ উপাধি লাভ করিয়া শিবিকা, নাগরা ইত্যাদি উপহার পাইলেন। ফকীর উল্লাবেগ খাঁ, নুর উল্লা বেগ খাঁ, মীর জাফর খাঁ, হোসেন কুলি খার ভ্রাতা হায়দর আলি খাঁ প্রভৃতি সম্মান লাভ করিয়া আপন আপন সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার আদেশ লাভ করিলেন। গোলন্দাজ সেনাপতি বাহাদুর আলি খাঁ, ও মার খাঁ, সমসের খাঁ, সর্দ্দার খাঁ প্রভৃতি আফগান সেনাপতি সৈন্য-সংখ্যা-বৃদ্ধির জন্য আদিষ্ট হইলেন। তদ্ভিন্ন কতিপয় সাময়িক হস্তীকেও সুশিক্ষিত করিবার জন্য আদেশ প্রদত্ত হইল।

অনেক দিন হইতে বাঙ্গালার রাজস্ব প্রেরিত না হওয়ায়, সম্রাট মহম্মদ সাহ রাজস্বগ্রহণের জন্য মোরাদ খাঁকে এই সময়ে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করেন। নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ এই সংবাদ অবগত হইয়া মোরাদ খাঁকে আজিমাবাদে অবস্থিতি করিতে অনুরোধ করিয়া সম্রাটের নিকট মহারাষ্ট্রীয়দিগের আক্রমণের কথা লিখিয়া পাঠাই-লেন, এবং তাঁহাদের অত্যাচারের জন্য যে, সমস্ত বঙ্গদেশে হাহাকার উপস্থিত হইয়াছে, তাহাও জ্ঞাত করাইলেন। প্রজাগণ তাহাদের লুণ্ঠনে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া দেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছে। বিশেষতঃ, নবাব তাহাদের জন্য এতদূর ব্যাকুল হইয়াছেন যে, রাজস্বসংগ্রহের অবসর পাওয়াও তাঁহার পক্ষে দুর্ঘট ইত্যাদি কারণে এতদিন রাজস্বপ্রেরণে বিলম্ব হইয়াছে। আর, তিনি মোরাদ খাঁকে মুর্শিদাবাদে আগমন না করিয়া আজিমাবাদে অবস্থিত করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, তাহাও লিখিয়া পাঠাইলেন। কারণ, মুর্শিদাবাদ আক্রমণের জন্য মহারাষ্ট্রীয়েরা বিশেষরূপে উদ্যোগ করিতেছে। এরূপ অবস্থায় তাঁহার মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক। এতদ্ভিন্ন তিনি আপনার সাহায্যের জন্য কোন উপযুক্ত সৈনিক কর্ম্মচারীকে পাঠাইতে সম্রাটের নিকট আবেদন করিয়া পাঠান। কারণ, মহারাষ্ট্রীয়েরা অধিক দিন যদি বাঙ্গালায় অবস্থান করে, এবং তাহাদিগকে বিতাড়িত করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে দিল্লির রাজকোষে বাঙ্গালা হইতে এক কপর্দ্দকও প্রেরণের আশা নাই। সম্রাট্ মহম্মদসাহ নবাবের পত্র প্রাপ্ত হইয়া আপনার দ্বিতীয় মন্ত্রিবর্গ এবং এলাহাবাদের শাসনকর্ত্তা আমীর খাঁর সহিত পরামর্শ করিয়া কোন একটি উপযুক্ত ব্যক্তিকে আলিবর্দ্দি খাঁর সাহায্যের জন্য পাঠাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সকলের পরামর্শক্রমে অযোধ্যার নবাব আবদুল মনসুর খাঁ সফদরজঙ্গকে পাঠান স্থির হইল। সম্রাট্ তাঁহাকে বাঙ্গালার নবাবের সাহায্যের জন্য অবিলম্বে যাত্রা করিতে আদেশ দিলেন। তদ্ভিন্ন পেশওয়া বালাজী বাজীরাওকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, রঘুজী ভোঁসলার লুণ্ঠনকারী সৈন্যগণ বাঙ্গালা প্রদেশ আক্রমণ করিয়া যাবতীয় অর্থ শোষণ করিতেছে এবং বাঙ্গালা যখন ভারত সাম্রাজ্যের একটি সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ, তখন তথা হইতে দিল্লীর রাজকোষে রাজস্ব না আসায় সম্রাট তাঁহাকে চৌথ-প্রদানে অক্ষম। অতএব তিনি সসৈন্যে আসিয়া যাহাতে রঘুজীকে বাঙ্গালা হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিবেন।

সম্রাট্ মহম্মদ সাহের নিকট সংবাদ পাঠাইয়া নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ বর্ষার অপগমে আপনার বিরাট অক্ষৌহিণীর সহিত দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য দ্বিগুণ উৎসাহে যাত্রা করিলেন। জৈনুদ্দীন আহম্মদ, সৈয়দ আহম্মদ এবং আবদুল আলি খাঁ তাঁহার সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইলেন। নওয়াজিস মহম্মদের উপর মুর্শিদাবাদ-রক্ষার ভার অর্পিত হইল। তিনি উপ-যুক্তরূপ সৈন্যদ্বারা মুর্শিদাবাদ রক্ষায় নিযুক্ত হইলেন নবাব কাটোয়ার নিকট উপস্থিত হইয়া ভাগীরথীতীরে শিবিরসন্নিবেশ করিলেন। ভাস্কর পণ্ডিত ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে কাটোয়ায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার কতিপয় সৈন্য পূর্ব্ব তীরে ছিল। কিন্তু, অধিকাংশ সৈন্য পশ্চিম তীরে ভাগীরথীর পার্শ্বে ও অজয় নদীকে সম্মুখে রাখিয়া কালান্তক মূর্ত্তির ন্যায় অবস্থিতি করিতেছিল। ভাস্কর মীর হাবিবের পরামর্শক্রমে নদীর মধ্যস্থলে কয়েক-খানি বজরা স্থাপন করিয়া তাহা হইতে গোলাগুলি দ্বারা আলিবর্দ্দী খাঁর পার্শ্বদেশ আক্রমণ করেন ও তাঁহাকে ভাগীরথী পার হইতে বাধা দেন। নবাব তাহাদের মনোভাব অবগত হইয়া গাঢ়ান্ধকারময় রজনীযোগে নৌ সেতুদ্বারা ভাগীরথী এবং অজয় পার হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আক্র-মণের ইচ্ছা করিলেন। অজয় হইতে ভাগীরথীর উত্তর

তীরস্থ যে ভূভাগে মহারাষ্ট্রীয়দিগের অবস্থান ছিল না, নবাব তথায় ভাগীরথী পার হইবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। তিনি বৃহৎ বৃহৎ নৌকা দ্বারা সেতু নির্ম্মাণ করিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে পার করাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।* সেতুর মধ্য হইতে দুই একখানি নৌকা স্রোতোবলে অজয়ের মুখে গমন করিতে লাগিল। মহারাষ্ট্রীয়েরা গভীর নিদ্রায় অভিভূত থাকায়, উক্ত নৌকার সংবাদ অবগত হয় নাই, অথবা তাহারা তাহাদিগকে আক্রমণ করিলে নবাবের নৌকারোহী সৈন্যগণও তাহার প্রতিকারে অসমর্থ হইত না। এই প্রকারে অনেক নৌকা অজয়ে উপস্থিত হইয়া তথায়ও সেতুনির্ম্মাণে নিযুক্ত হইল। মহারাষ্ট্রীয় শিবির হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ উজানে সেতুনির্ম্মাণ আরব্ধ হইয়া প্রভাত হওয়ার পূর্ব্বেই শেষ হইয়াছিল। *

মহারাষ্ট্রীয়েরা নবাবের এইরূপ কৌশলের কিছুমাত্র জ্ঞাত হইতে পারে নাই। সেতুনির্ম্মাণ শেষ হইলে নবাব মুস্তাফা খাঁ, সমসের খাঁ, ওমর খাঁ, রহিম খাঁ, মীরজাফর খাঁ প্রভৃতি প্রধান প্রধান সেনাপতিকে সেতু পার হইয়া মহারাষ্ট্রীয় শিবির আক্রমণের আদেশ দিলেন এবং নিজে তাহাদের পশ্চাতে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। যখন তাহারা শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিবে, তখন তিনি সেতু পার হইয়া তাহাদিগের পশ্চাৎ যোগদান করিবেন, ইহাই স্থির হইল। সৈন্যগণ সেতু পার হইতে হইতে, সেতুর মধ্যস্থলে একখানি বা দুইখানি নৌকা সৈন্যগণের ভারে অজয়ের গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া যায়, এবং রজনীর গভীর অন্ধকারে পশ্চাৎ স্থিত সৈন্যগণ এই শোচনীয় ব্যাপার অবগত না হইয়া যেমন অগ্রসর হইতেছিল অমনি একে একে স্রোতে নিপতিত হইয়া বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। এইরূপে নবাবের সৈন্যমধ্যে প্রায় সার্দ্ধ সহস্র বা তদধিক সৈন্য নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া যায়। *

তাহার পর এই দুর্ঘটনা অবগত হইয়া দ্রুতগতিতে অতিরিক্ত নৌকা আনয়ন করিয়া সেতুর পুনঃসংস্কার করা হয়। প্রভাত হইতে হইতে কেবল দুই তিন সহস্র সৈন্য মাত্র পরপারে গমন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সে সময় যদি শত্রুপক্ষ তাহাদের সংখ্যা অবগত হইতে পারিত, তাহা হইলে বিষম বিপদ্ উপস্থিত হইত। তজ্জন্য আবার কি উপায়ে আক্রমণ করা যায়, ইহার পরামর্শ হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরামর্শের পর প্রধান সেনাপতিগণ* উৎসাহসহকারে অগ্রসর হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের শিবির আক্রমণ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা সহসা এইরূপে আক্রান্ত হইয়া এবং স্বয়ং আলিবর্দ্দী খাঁ উপস্থিত হইয়াছেন জ্ঞাত হইয়া আপন আপন অশ্বে আরোহণ করিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন আরম্ভ করিল। নবাব-সৈন্যগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া ধরাশায়ী করিতে লাগিল। নবাব আপনার প্রমোদ তরণীতে অজয় পার হইয়া অন্যান্য লোকদিগকে তাহাতেই পার করিবার জন্য আদেশ দিলেন। এইরূপে অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার হস্তী, গোলাগুলি ও অধিকাংশ সৈন্য অজয়ের পরপারে উপনীত হইল। ভাস্কর পণ্ডিত সেই অবকাশে আপনার যাবতীয় সৈন্য সমবেত করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন আরম্ভ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা আপনাদিগের অশ্বে যাহা বহন করিতে পারিল, তদুপযোগী সামগ্রী লইয়া শত্রুপক্ষের সৈন্যসংখ্যা কিরূপ, অথবা তাহাদের মধ্যে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা আছে কি না, তাহার বিচার বা পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। অনেক দূর গমন করিয়া তাহারা বিশ্রামের আশায়

* এই সেতু রক্ষার জন্য যে সমস্ত গোলন্দাজ সৈন্য নিযুক্ত হয় তাহার মধ্যে ইউরোপীয়ও ছিল। (Orme, II, P, 35)

হলওয়েল সাহেব বলেন যে, ঐ সেতু মীর হাবীবের পরামর্শে মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহারা সেতু পার হইয়া পলাশী প্রভৃতি স্থানে লুণ্ঠন করিত। যৎকালে তাহারা কাটোয়ার পরপারে অবস্থিত করে, সেই সময়ে নবাব তাহাদিগের পশ্চাৎ ধাবিত হন, এবং সেতুর নিকট উভয় পক্ষের যুদ্ধ হয়। পরে নবাব সেতু পার হইয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করেন। (Holwell Hist. Event, P. P. 126—130)

যুদ্ধের সময় সেতু স্থানে স্থানে ভগ্ন হওয়ায় নবাব তাহার সংস্কার করিয়া নদী পার হন। (৩০)

মুতাক্ষরীণে লিখিত আছে যে, আলিবর্দ্দী খাঁ স্বীয় প্রমোদ তরণীতে নদী পার হইয়াছিলেন। কিন্তু, রিয়াজুস সালাতীনে লিখিত আছে যে, সেতু নির্ম্মিত হইলে, তিনি কতিপয় সর্দ্দার ও কার্যদক্ষ যুবকসহ তীরে পৌঁছিলে লোকের ভিড়ে সেতু ভাঙ্গিয়া যায়। রিয়াজের মতে ফৌজদারের নায়েব কেসওয়ার খাঁ ও বেলদারগণের চৌধুরী মানকান্ত কিপ্রহস্তে দূলামটি এবং কাঠ দ্বারা সেতুর সংস্কার করিয়াছিলেন।

একস্থানে স্থির হইয়া পশ্চাতে শত্রুপক্ষের সংখ্যা অল্প দেখিল এবং আপনাদের গতি ফিরাইল। পরে অর্দ্ধ ক্রোশ অগ্রসর হইয়া নবাব-সৈন্যের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। কিন্তু যখন শুনিল যে, নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ তাঁহার অক্ষৌহিণীর সহিত নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

মহারাষ্ট্রীয়েরা পলায়ন করিলে, নবাব তাঁহার জলমগ্ন সৈন্যদিগের সৎকারের জন্য মহারাষ্ট্রীয়দিগের পরিত্যক্ত শিবিরে অবস্থিতি করিয়া মৃতদেহ সকল যথানিয়মে সমাহিত করিতে আদেশ দিলেন। শরতের গ্রীষ্মে এবং জলমধ্যে নিঃশ্বাস রুদ্ধ হওয়ায়, তাহাদের শরীর বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। যাহা হউক, তাহাদের শবদেহ হইতে অস্ত্র-শস্ত্র ও পরিচ্ছদাদি উন্মোচন করিয়া অতি সত্বরই তাহাদিগকে ভূগর্ভস্থ করা হইল। ভাস্কর পণ্ডিত এইরূপে আক্রান্ত হইয়া পঞ্চকূট উপত্যকা দিয়া স্বীয় রাজ্যে গমন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার যে সমস্ত সৈন্য হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি অধিকার করিয়াছিল, তাহারাও সেই সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইল। *

মহারাষ্ট্রীয়েরা জঙ্গল ও কণ্টকপরিপূর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে সর্প ও বৃহৎ বৃহৎ পিপীলিকাবহুল একটি অরণ্যময় স্থানে উপস্থিত হইল। উক্ত স্থান উচ্চ বৃক্ষ ও গুল্ম দ্বারা এরূপ আচ্ছাদিত যে, দুইজন অশ্বারোহী পাশাপাশি হইয়া গমন করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। ভাস্কর পণ্ডিত এই স্থান হইতেই স্বদেশে যাইবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু, পশ্চাৎস্থিত ভীষণ শত্রুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া দুষ্কর বিবেচনায়, মীর হাবীবের পরামর্শে তিনি পুনর্ব্বার বিষ্ণুপুরের অরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া চন্দ্রকোণা দিয়া মেদিনীপুরে উপস্থিত হইলেন, এবং তথা হইতে উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা সা মাসুমকে পরাজিত করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। সা মাসুম হরিহরপুরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহার অল্পসংখ্যক সৈন্যের কথা জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। মাসুম আপনার কর্ত্তব্যপালনের জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া তাঁহার হস্তে জীবন বিসর্জ্জন দিলেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের মেদিনীপুরে উপস্থিতির কথা শুনিয়া, নবাব বর্দ্ধমান প্রদেশ অতিক্রম করিয়া শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। ভাস্কর নবাবের উপস্থিতির কথা অবগত হইয়া মেদিনীপুর হইতে বালেশ্বর-বন্দর অভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা আর একবার নবাব-সৈন্যের সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। উভয় পক্ষের অনেক সৈন্য ধরাশায়ী হয়। বিশেষতঃ, তাহাতে ভাস্কর অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে অত্যন্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া ভাস্কর আর সম্মুখীন না হইয়া একেবারে উড়িষ্যার সীমা অতিক্রম করিয়া দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হইলেন। নবাব চিল্কা হ্রদ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া, তথায় মহারাষ্ট্রীয়দিগের অবস্থিতির কোন নিদর্শন না পাওয়ায়, কটকে প্রত্যাগত হন। তথায় সা মাসুমের পরিবারবর্গকে যথোচিত সান্ত্বনা করিয়া আবদুল নবী খাঁ * নামক মুস্তাফা খাঁর পিতৃব্যকে উড়িষ্যার শাসনভার অর্পণ করেন। মুস্তাফা খাঁর অনুরোধে আবদুল নবী নবাবের নিকট হইতে তিন সহস্র অশ্বারোহী সেনাপতির সম্মান, শিবিকা, নাগরা এবং বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। নবী খাঁর সহিত যে পঞ্চ সহস্র সৈন্য ছিল, তিনি তাহা রক্ষা করিতে আদেশ প্রাপ্ত হইলেন, এবং তৎসঙ্গে কতিপয় বন্দুকধারী ও গোলন্দাজ সৈন্যও নিযুক্ত হয়। আবদুল নবী যুদ্ধ-কার্য্যেই অত্যন্ত থাকায় শাসনকার্য্যের অনুপযুক্ত ছিলেন। সেই কারণে জানকীরামের পুত্র রাজা দুর্লভরামকে তাঁহার সাহায্যের জন্য নিযুক্ত করা হইল।

যৎকালে আলিবর্দ্দী খাঁ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছিলেন, সেই সময়ে সম্রাটের আদেশানুসারে অযোধ্যার নবাব আবদুল মনসুর খাঁ দশ সহস্র বলিষ্ঠ হিন্দুস্থানী অশ্বারোহী এবং সাত সহস্র মোগল গোলন্দাজ সৈন্য-সহিত আলিবর্দ্দী খাঁর সাহায্যের জন্য বাঙ্গালায় আগমন করিতে

* রিয়াজে এই স্থানের নাম রামগড় লিখিত আছে।

* রিয়াজে মুস্তাফা খাঁর পিতৃব্য আবদুল নবীর পরিবর্ত্তে তাহার পিতৃব্যের পুত্র আবদুল রসুল খাঁর কথা লিখিত আছে।

প্রস্তুত হন। ঐ সমুদয় সৈন্তের মধ্যে অধিকাংশ নাদের শাহ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত। তিনি প্রথমতঃ তাঁহার বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক এলাহাবাদের শাসনকর্ত্তা আমীর খাঁকে এই মর্ম্মে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহার রাজ্যমধ্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত, জমীদারগণ অত্যন্ত অবাধ্য, এরূপ অবস্থায় তাঁহার স্ত্রী-পরিবারবর্গকে অযোধ্যায় পরিত্যাগ করিয়া অথবা তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া সুদূর বঙ্গদেশে গমন করা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অসুবিধাজনক। সুতরাং আমীর খাঁর রাজ্যস্থ চুণার দুর্গ যদি তিনি কিছু দিনের জন্ত প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তিনি আপন পরিবারবর্গকে তথায় রক্ষা করিয়া নিশ্চিন্তমনে বাঙ্গালা যাত্রা করিতে পারেন। আমীর খাঁ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আপনার অধীন চুণারের শাসনকর্ত্তাকে উক্ত দুর্গ আবদুল মনসুর খাঁকে প্রদানের জন্ত আদেশ দিলেন। আবদুল মনসুর খাঁ, আমীর খাঁকে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইতে দেখিয়া, নৌ সেতু দ্বারা বারাণসীধামে গঙ্গা পার হইয়া চুণারে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় আপনার একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া সপরিবারে আজিমাবাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার এইরূপ ইচ্ছা ছিল, যদি মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধ কিছু গুরুতর হইয়া উঠে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ চুণারে স্ত্রী-পরিবার প্রেরণ করিবেন। তিনি অগ্রসর হইয়া মনীর নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। আবদুল মনসুর খাঁর আগমন শ্রবণ করিয়া আজিমাবাদের শাসনকর্ত্তা জৈনুদ্দিন তাঁহার প্রতিনিধি হেদাৎ আলিকে আবদুল মনসুর খাঁর উপযুক্তরূপ সম্মানের জন্ত লিখিয়া পাঠাইলেন। আবদুল মনসুর খাঁর আগমনে আজিমাবাদস্থ যাবতীয় লোক ভয়ে অধীর হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ, তাহারা নাদের সাহের পরিত্যক্ত সৈন্তদিগের দ্বারা দিল্লীর দুরবস্থা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত ভীত হইল। হেদাৎ আলি খাঁ তাহাদিগকে অভয় প্রদান করিয়া কিরূপে আবদুল মনসুরের সহিত পরিচিত হইবেন, তাহার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। এই সময়ে সম্রাটের কর্ম্মচারী মোরাদ খাঁ আজিমাবাদে অবস্থান করায় এবং তাঁহার সহিত আবদুল মনসুর খাঁর পরিচয় থাকায়, তিনি তাঁহার দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করিলেন। মোরাদ খাঁ মনীরে গমন করিয়া হেদাৎ আলির সংবাদ ও আজিমাবাদবাসীদিগের শঙ্কার কারণ জ্ঞাত করায়, আবদুল মনসুর খাঁ হেদাৎ আলিকে নির্ভয়ে আগমন করিবার জন্ত মোরাদ খাঁকে অনুরোধ করিলেন। মোরাদ খাঁ হেদাৎ আলির নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলে, তিনি অযোধ্যাধিপতির শিবিরে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত পরিচিত হইলেন। আবদুল মনসুর খাঁ, জৈনুদ্দীনের প্রাসাদে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই সময়ে নগরস্থ যাবতীয় সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সম্মানের জন্ত যথাযোগ্য নজরাদি প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু, আবদুল মনসুর খাঁ গর্ব্বসহকারে তাঁহাদিগের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করায়, নগরবাসী সকলে যার পর নাই অসন্তুষ্ট হয়। অতঃপর তিনি পাটনার শাসনকর্ত্তার কয়েকটি হস্তী দেখিয়া উহা গ্রহণের জন্ত হেদাৎ আলিকে তাহাদের মূল্যের কথা জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু, হেদাৎ আলি এই উত্তর দেন যে, তাঁহার প্রভু ব্যবসায়ী নহেন যে, ইহাদিগকে বিক্রয় করিবেন। তবে, আপনি যখন তাঁহার বন্ধু, তখন ইচ্ছা করিলে যাহা আপনার প্রয়োজন হয়, তাহা গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু, তাঁহার বিনা আদেশে হেদাৎ আলি তাহাও করিতে অক্ষম। আবদুল মনসুর তাঁহার কথা গ্রাহ্য না করিয়া তিন-চারিটি হস্তী ও তিন-চারিটি কামান আপনার শিবিরে লইয়া যাইবার জন্ত তাঁহার সৈন্তদিগকে আদেশ দেন। আবদুল মনসুর খাঁর এইরূপ ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া হেদাৎ আলি আলিবর্দ্দী খাঁকে সমস্ত সংবাদ লিখিয়া পাঠাইলেন। এই সময়ে আলিবর্দ্দী খাঁ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বিতাড়িত করিয়া কটকে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি সম্রাটকে এই মর্ম্মে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, সম্রাটের আশীর্ব্বাদে তিনি একাকীই মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দূরীভূত করিয়াছেন। সুতরাং আবদুল মনসুর খাঁর আর মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইবার প্রয়োজন নাই, তাঁহাকে স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাগত হইতে আদেশ দিলে ভাল হয়। সম্রাট্ নবাবের পত্র পাইয়া তাঁহার এইরূপ জয়লাভে সন্তুষ্ট হইয়া আপনার পরিহিত একটি পরিচ্ছদ, শিরপেচ ও কতিপয় হীরকের অলঙ্কার উপহার প্রদান করিয়া নবাবকে অত্যন্ত সম্মানিত

করিলেন এবং তাঁহার অনুরোধানুসারে তাঁহার তিন জামাতা, আতাউল্লা খাঁ ও মুস্তফা খাঁকে যথেষ্ট সম্মানিত করিয়াছিলেন। বাদশাহ আবদুল মনসুর খাঁকে স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ দিলেন। আবদুল মনসুর খাঁ সম্রাটের আদেশ পাইয়া এবং নবাবের সাহায্যের জন্য বালাজী বাজীরাও আগমন করিতেছেন জ্ঞাত হইয়া, অতি শীঘ্রই অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বালাজীর পিতা বাজীরাও আবদুল মনসুরের শ্বশুর সদং খাঁ কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার কতিপয় সৈন্যকেও আবদুল মনসুর কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। সেই প্রতিশোধের জন্য যদি বালাজী রাও তাঁহাকে আক্রমণ করেন, এই ভয়ে তিনি আজিমাবাদ হইতে মনারে উপস্থিত হইলেন, এবং তথা হইতে নৌ-সেতু দ্বারা গঙ্গা পার হইয়া অযোধ্যা যাত্রা করেন। হেদাৎ আলি তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য মনার পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। আবদুল মনসুর খাঁর প্রতি এরূপ সম্মান প্রদর্শনের জন্য নবাব ও জৈনুদ্দীন হেদাৎ আলির উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। বিশেষতঃ, তাঁহারা সোবাদ খাঁর আজিমাবাদে আগমন-ব্যাপারে হেদাৎ আলিকে বিশেষরূপে সন্দেহ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত কারণে হেদাৎ আলির উপর বীতশ্রদ্ধ হওয়ায়, জৈনুদ্দীন স্বীয় দেওয়ান চিন্তামণি দাসকে আজিমাবাদের প্রতিনিধি-শাসনকর্ত্তা করিয়া প্রেরণ করেন। চিন্তামণি আজিমাবাদে উপস্থিত হইয়া পীড়িত হন, এবং অল্প দিন পরে প্রাণত্যাগ করায়, আজিমাবাদ কিছুদিন পর্য্যন্ত শাসনকর্ত্তাবিহীন থাকে, এই সময়ে বালাজী বাজীরাও প্রায় ৪০।৫০ সহস্র সৈন্যসহ ভীষণ জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় বিহারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বালাজী রাওয়ের বিহারে আগমন শ্রবণ করিয়া বিহারবাসিগণ অত্যন্ত ভীত ও চিন্তিত হইয়া উঠিল। সকলেই আপন আপন দ্রব্যাদি লইয়া পলায়নের চেষ্টা দেখিতে লাগিল। দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়গণের ভীষণ অত্যাচার স্মরণ করিয়া তাহাদের মধ্যে মহাকোলাহল উপস্থিত হইল। যদিও বালাজীরাও নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সাহায্যের জন্য বাঙ্গালায় আগমন করিতেছিলেন, তথাপি তাঁহার অত্যাচার-প্রিয় সৈন্যগণ যে অধিবাসিগণের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন না করিয়া ক্ষান্ত হইবে, তাহা কেহই আশা করিতে পারে নাই। সুতরাং সকলেই সুযোগ-মত পলায়ন আরম্ভ করিল। এই সময়ে আমেদ খাঁ-নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইক্সা ও গৌ নামক স্থানের জায়গীরদার ছিলেন। তিনি মহারাষ্ট্রীয়দিগের আগমন শ্রবণ করিয়া তাঁহার পিতামহ দায়ুদ খাঁর স্থাপিত দায়ুদনগরের নিকট গাওসগড়ে আপনার যথাসর্ব্বস্ব লইয়া সপরিবারে, সৈন্য ও প্রধান প্রধান ব্যবসায়ী ও অর্থশালী লোক সহ অবস্থান করিতে ছিলেন। বালাজীরাও এই সংবাদ অবগত হইয়া কতিপয় সৈন্য প্রেরণ করিয়া প্রথমতঃ দায়ুদনগরস্থ তাঁহাদের গৃহাদি ধ্বংস করিয়া তাহার ইষ্টকাদির দ্বারা গাওসগড়ের পরিখা পূরণ করিলেন। উক্ত দুর্গ অধিকৃত হইলে আমেদ খাঁ কতিপয় ব্যবসায়ীর সাহায্যে বালাজীরাও-এর সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া নিষ্কৃতিলাভ করেন। এই সংবাদে আজিমাবাদের অধিবাসিগণ অত্যন্ত অস্থিরচিত্ত হইয়া উঠিল। তাহারা দলে দলে হেদাৎ আলি খাঁর গৃহে উপস্থিত হইয়া উপায় নির্দ্দেশের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। হেদাৎ আলি স্বীয় পরিবারবর্গকে গঙ্গার অপর পারে প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং সকলকে তাহাই করিতে উপদেশ দিলেন। তিনি স্বীয় পিতা সৈয়দ আলিম উল্লাকে তাহাদের অধ্যক্ষ হইয়া গমন করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু, বৃদ্ধ আলিম উল্লা তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি সকলকে অভয় দিয়া বলিলেন যে, মহারাষ্ট্রীয়েরা কাহারও উপর অত্যাচার করিবে না। ভাগ্যক্রমে এই সময়ে গোবিন্দজী নায়ক নামে বালাজীরাও-এর জনৈক আত্মীয় বাণিজ্য-কার্য্য করিতেন। আজিমাবাদ প্রদেশে ব্যবসায়াদিতে লিপ্ত থাকায় হেদাৎ আলির সহিত তাহার বিশিষ্টরূপ আনুগত্য ছিল। হেদাৎ আলি অনেক সময়ে তাঁহার যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন। এক্ষণে বিহার প্রদেশে বালাজীরাও এর আগমন শুনিয়া, তিনি আজিমাবাদ রক্ষার জন্য কাশী পরিত্যাগ করিয়া দায়ুদনগরে বালাজীর শিবিরে উপস্থিত হইলেন, তথায় বালাজীর সহিত সাক্ষাৎকালে আপনার বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণন করিয়া, হেদাৎ আলির অনুগ্রহে তাঁহার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে তাহাও স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিলেন এবং পেশওয়াকে হেদাৎ আলির সহিত

সদ্ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিলেন। বালাজীরাও তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া চেদারং আলিকে অভয় প্রদান করিয়া এক পত্র লিখিলেন এবং যাবতীয় আজিমাবাদবাসীকে নিঃশঙ্কচিত্তে থাকিতে বলিলেন। তিনি উক্ত পত্রের সহিত দাক্ষিণাত্য হইতে আনীত অনেকগুলি বহুমূল্য দ্রব্যও উপহারস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। এইরূপে আজিমাবাদ মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। বালাজীরাও আপনার বাক্যের যাথার্থ্য প্রতিপাদনের নিমিত্ত, এবং সৈন্যদিগকে লুণ্ঠনের প্রলোভন হইতে রক্ষা করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনায় দায়ুদনগর পরিত্যাগ করিয়া আজিমাবাদের পশ্চাৎ, গয়া ও টীকারী প্রদেশ দিয়া মানভূম ও বিহার অতিক্রম করিয়া, মুঙ্গের ও ভাগলপুর প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। মুঙ্গের ও ভাগলপুরে অনেক লোকের বাস ছিল। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই গঙ্গা পার হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। এই সময়ে সরফরাজ খাঁর সেনাপতি, শিবিরের গারদ নিহত মৃত গাওস খাঁর পত্নী ভাগলপুরে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি যাবতীয় লোককে পলায়ন করিতে দেখিয়া তাহাদের পথ অনুসরণ না করিয়া আপনার পরিবারবর্গ ও ধনসম্পত্তি-রক্ষার জন্য উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি বীররমণী হইয়া স্বীয় ভবন পরিত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না, এবং যতক্ষণ শরীরে এক বিন্দু রক্ত থাকিবে, ততক্ষণ আত্মরক্ষার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। তাঁহার ভবনের চতুঃপার্শ্বে সামান্য সামান্য দুর্গ দ্বারা দৃঢ় প্রাচীর নির্মিত হইল, এবং আপনার আত্মীয় ও স্বজন কতিপয় লোককে কয়েকটি বন্দুক দিয়া বাটীর সমস্ত দ্বার বন্ধ করিয়া সেই অগণ্য মহারাষ্ট্রীয়দিগের বাধাপ্রদানের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা সমস্ত নগর লুণ্ঠন করিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র বন্দুকের শব্দ ও গুলিবর্ষণে চমকিত হইল। তাহারা নির্বিবাদে সমস্ত নগর অধিকার করিয়া সহসা এরূপে বাধা পাওয়ায় বিস্মিত হইয়া পড়িল, এবং নিকটে গমন না করিয়া দূর হইতে ইহার কারণ-অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। পেশওয়া বালাজীরাও যখন শ্রবণ করিলেন যে, একটি বিধবা বীররমণী অত্যন্ত নিঃস্ব হওয়ায় গঙ্গা পার হইতে না পারিয়া আপনার সাধ্যানুসারে স্বীয় ভবন-রক্ষার জন্য এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তখন তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া আপনার সৈন্যদিগকে উক্ত ভবন আক্রমণ করিতে নিষেধ করিলেন, এবং সেই বীররমণীকে দাক্ষিণাত্য হইতে আনীত কতিপয় কারুকার্য্যযুক্ত এক উপহার ও তাঁহাকে অভয় প্রদান করিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার যাবতীয় সৈন্য নগর পরিত্যাগ না করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার শরীর-রক্ষীদিগকে তাঁহার ভবন রক্ষার জন্য অনুমতি দিয়া সমস্ত সৈন্যসহ ভাগলপুর পরিত্যাগ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতির এইরূপ সাধু ব্যবহার যে অত্যন্ত প্রশংসনীয়, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এইরূপে যাবতীয় সেনা নগর পরিত্যাগ করিলে, রক্ষকগণ গাওস খাঁর পত্নীর প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া প্রধান অক্ষৌহিণীর সহিত মিলিত হইল। বালাজীরাও পার্ব্বত্য প্রদেশ অতিক্রম করিয়া বীরভূম প্রদেশাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। *

এদিকে ভাস্করের উত্তেজনা অনুসারে রঘুজী ভোঁসলা নিজে সৈন্য সামন্ত লইয়া মুর্শিদাবাদ আক্রমণের জন্য বাঙ্গালায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি কাটোয়া ও বর্দ্ধমানের মধ্যে শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। ভাস্করও তাঁহার সহিত আগমন করিয়া মেদিনীপুর প্রদেশে অবস্থান করেন। এইরূপে প্রবল দুইদল মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের আগমন জ্ঞাত হইয়া সমস্ত বঙ্গবাসীর হৃদয়ে অত্যন্ত আতঙ্ক উপস্থিত হইল। তাহারা উক্ত দুই দলের সংঘর্ষে যে একেবারে নিষ্পেষিত হইয়া যাইবে ইহা চিন্তা করিয়া সকলে অধীর হইয়া উঠিল। যৎকালে বালাজীরাও ভাগলপুর হইতে কিছু দূরে গঙ্গাতীরে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে নবাব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অগ্রসর হন।

* হলওয়েল সাহেব বলেন যে তিনি পার্ব্বত্যপথে বীরভূমে যাইতে বাধ্য হন নাই। কারণ, তাহাতে বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা। বিলম্ব হইলে বর্ষা উপস্থিত হইবে। সেই জন্য বালাজীরাও শিকরিগলির গিরিপথ দিয়া বাঙ্গালায় উপস্থিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি কাহালগাঁ পর্ব্বতের নিকটস্থ এক জমীদারকে বলিয়া পাঠান যে, তাহারা বিহার হইতে বাঙ্গালায় যাইবার পথ বলিয়া দিতে পারে কি না। বলিয়া দিলে তাহারা পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। উক্ত জমীদারগণ আলিবর্দ্দীর উপর সেরূপ সন্তুষ্ট ছিল না। বালাজীরাও এর প্রস্তাবে সম্মত হইতে তাহাদের অমত ছিল না। কিন্তু তাহাদের সে পথ উত্তমরূপ জানা না থাকায়, তাহারা সাহস করিতে পারে নাই। এই সময়ে কাহালগাঁ পার্ব্বত্য প্রদেশে সীতারাম রায় নামক একজন রাজপুত বাস করিত। কৃষিকার্য্য করিয়া তাহার জীবিকা-নির্ব্বাহ হইত। সে বালাজীর শিবিরে উপস্থিত হইয়া পথ দেখাইয়া দিতে প্রস্তুত হয়, এবং ৩ লক্ষ টাকা পারিতোষিক প্রার্থনা করে। বালাজীর বিপদ্ হইলে সে নিজের মস্তক দিতে অঙ্গীকার করে। বালাজী নিকটস্থ জমিদারগণের নিকট তাহার পরিচয় পাইয়া তাহাকে বিশ্বাসী বিবেচনা করিয়া তাহার পশ্চাৎ সসৈন্যে ধাবিত হন। তাহারা প্রথমে পার্ব্বত্যপথ কাহালগাঁ ও রেফিনালাড়ি মধ্যস্থ সমতল ভূভাগে উপনীত হন, পরে তথা হইতে তেলিয়াগড়ি ও রাজমহলের মধ্যস্থিত ভূভাগ অতিক্রম করিয়া বাঙ্গালার নিকটস্থ বেনিয়াগ্রাম নামক স্থানে উপনীত হন। বালাজী সৈন্যের কোনও ক্ষতি হয় নাই দেখিয়া তাহাকে তিন লক্ষের উপর টাকা পারিতোষিক প্রদান করেন। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ তাঁহারা বেনিয়াগ্রামে উপনীত হন।

(Holwell Hist. Events)

১৭ই মার্চ্চ বর্দ্ধমান প্রদেশে রঘুজী ও বালাজীরাওএর সাক্ষাৎ হয়, তাঁহারা বাঙ্গালার রাজস্ব ভাগ করিয়া লইবেন, এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

(Holwell [illegible])

মহারাষ্ট্রীয় বন্দীদিগের মধ্যে শেষ রাও নামক এক ব্যক্তিকে আলিবর্দ্দী অত্যন্ত অনুগ্রহ করিতেন। নবাব প্রথমতঃ তাঁহাকে বালাজী রাও-এর নিকট প্রেরণ করেন। পরে সমুদায় স্থিরীকৃত হইলে, ৩০শে মার্চ্চ তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইবে, এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু, নানা কারণে বিলম্ব হওয়ায় নবাব সসৈন্যে ভাগলপুরে উপস্থিত হইয়া ৩রা এপ্রিল বালাজী রাওএর সহিত সাক্ষাৎ করেন*। নবাব পেশওয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলে, পেশওয়া বালাজীরাও তাহা জ্ঞাত হইয়া কিছুদূর অগ্রসর হন, ও নবাবকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া নিজ শিবিরে আনয়ন করেন এবং উভয়ে এক মসনদে উপবিষ্ট হন। সম্ভাষণাদির পর নবাবকে উপহারাদি প্রদান করিয়া পেশওয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। তৎপর দিবস পেশওয়া নবাবের শিবিরে উপস্থিত হইলে, নবাবও অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন ও তাঁহার সহিত এক মসনদে উপবেশন করিয়া, পান ও আতর-প্রদানে তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করেন। তাহার পর নবাব নানাবিধ কারুকার্য্যযুক্ত দ্রব্য অনেকানেক স্বর্ণ-পাত্রে ন্যস্ত বহুমূল্য মণি, মাণিক্য, মুক্তার মালা এবং একটি বিশালকায় হস্তী উপঢৌকন প্রদান করিয়া পেশওয়ার সম্মান রক্ষা করিলেন। অবশেষে রঘুজীর পরাজয় সম্বন্ধে কতিপয় কথাবার্ত্তা হইলে, পেশওয়া স্বীয় শিবিরে প্রত্যাগত হন।

† তৎপরদিবস রঘুজীকে দূরীভূত করিবার জন্য, নবাব পেশওয়াকে অনুরোধ করিতে জৈনুদ্দীন আহম্মদ ও মুস্তাফা খাঁকে প্রেরণ করেন। পেশওয়া আজিমাবাদ ও অন্যান্য প্রদেশের চৌথ দাবী করায়, নবাব অগত্যা স্বীকৃত হইয়া একসঙ্গে রঘুজীকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হন। তাঁহারা ভাগীরথী পার হইয়া দুই এক দিন গমন করিলে, বালাজীরাও নবাব-সৈন্যগণের ধীরভাবে অগ্রসর হওয়া সুবিধাজনক বিবেচনা না করায়, তাহাদিগকে পশ্চাতে পরিত্যাগ করিয়া অন্য একটি পথ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। রঘুজী, পেশওয়া ও নবাব-সৈন্যের সম্মিলনের কথা অবগত হইয়া, তাঁহাদের সম্মুখীন হওয়া দুষ্কর বিবেচনায়, বাঙ্গালা দেশের পশ্চিমাঞ্চল দিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের চেষ্টা দেখিতেছিলেন। ইতিমধ্যে বালাজীরাও উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। রঘুজী বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া পার্ব্বত্য প্রদেশ দিয়া স্বীয় অধিকারে প্রস্থান করিলেন।* ভাস্করও ‡ স্বীয় প্রভুর পরাজয় অবগত হইয়া মেদিনীপুর পরিত্যাগ করিয়া উড়িষ্যা দিয়া পলায়ন করেন। বালাজীরাও সম্রাট্ মহম্মদ সাহের অনুরোধে বাঙ্গালার নবাবকে সাহায্য করিয়া তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্য অর্থের প্রার্থনা করেন, এবং তাহার অধিকাংশ প্রাপ্ত হইয়া, অবশিষ্টাংশের জন্য স্বীয় প্রতিনিধিকে অবস্থান করিতে আদেশ দিয়া দাক্ষিণাত্যাভিমুখে অগ্রসর হন। উক্ত প্রতিনিধি এক দিবস মহারাষ্ট্রীয়দিগের গৌরব ও মোগল রাজত্বের অবনতি বিষয়ে কথোপকথনচ্ছলে কতিপয় অযথা বাক্য প্রয়োগ করায়, মুস্তাফা খাঁর আদেশে তাঁহার পরিচ্ছদাদি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে অবমানিত করা হয়। তিনি ক্রোধভরে পেশওয়ার নিকট অগ্রসর হইলে, নবাব জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করেন ও একটি বহুমূল্য খেলাৎ উপহার দিয়া পেশওয়ার প্রাপ্য অর্থের সহিত তাঁহাকে বিদায় দেন।

* Orme, vol II. P, 39.

† হলওয়েল সাহেব বলেন যে, নবাব প্রথমতঃ শেষরাওকে (Sessarow) দিয়া বালাজীর সহিত সন্ধির বন্দোবস্ত করেন। তাহাতে এইরূপ কথা হয় যে, আলীবর্দ্দী কেবল বালাজীরাওকে ২ বৎসরের রাজস্বের চৌথ প্রদান করিবেন, এবং বালাজীরাও তাঁহার সহিত যোগ দিয়া রঘুজীকে বাঙ্গালা হইতে বিতাড়িত করিবেন। কিন্তু, কোন কারণে আলীবর্দ্দীর সন্দেহ হওয়ায় তিনি বালাজীরাওকে অবিশ্বাস করেন। কিন্তু, শেষরাও-এর সচ্চরিত্র বালাজীর সম্বন্ধ থাকায়, তিনি আলীবর্দ্দীকে তাঁহার সত্যবাদিতার কথা বিশ্বাস করাইয়া দেন। পলাশী ও বড়ুয়ার (Barrwah) মধ্যস্থলে উভয়ের সাক্ষাৎ হইবার কথা হয়। উভয় পক্ষ সম্মিলিত হইলে মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রস্তাব করে যে, দুই বৎসরের চৌথ স্বরূপ ২৫ লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিতে হইবে। তাহাতে আলীবর্দ্দী উত্তর দেন, গত দুই বৎসর মহারাষ্ট্রীয়েরা যাবতীয় রাজস্ব আদায় করিয়াছে। যদি রঘুজী [illegible] করিতে সাহায্য করেন, তাহা হইলে ইহাতেও তাঁহার আপত্তি নাই। বালাজীরাও ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠেন। শেষরাও মধ্যস্থ হইয়া গোলযোগ মিটাইতে চেষ্টা করিয়া রঘুজীর নিকট লোক পাঠান। রঘুজী উত্তর দেন যে, পূর্ব্বের চৌথ প্রদান না করিলে তিনি ইহাতে সম্মত নন। পরে আলিবর্দ্দী ও বালাজীর মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। তাহাতে আলীবর্দ্দী চৌথস্বরূপ ২২ লক্ষ মুদ্রা-পরিমাণ স্বর্ণ প্রদান করিতে স্বীকৃত হন এবং বালাজীরাও তাঁহার সহিত যোগ দিয়া রঘুজীকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন।

(Holwell Hist. Events, PP. 146—149)

* হলওয়েল বলেন, বালাজী বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিলে রঘুজী হাবীবকে উড়িষ্যা অধিকার করিতে আদেশ দেন। রঘুজীর সৈন্যেরা উড়িষ্যা এবং ভাগীরথীর পশ্চিমপারস্থ জুয়ান বালেশ্বর হইতে কলিকাতার নিকটস্থ থানার দুর্গ পর্য্যন্ত আপনাদের অধিকারে রাখে।

‡ Holwell সাহেবের মতে ভাস্কর ইহার পূর্ব্বেই যথার্থ সম্পৃক্ত হত হন।

গুণেন মাষ্টার

—শ্রীতারাপদ রাহা

মাত্র কয়েক মাস আগে অতনু আমাদের স্কুলে মাষ্টারী করিতে আসিয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যে সে-ই আমার সব চেয়ে বেশী অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে।

মাষ্টারী করিলেও মাষ্টারীর প্রয়োজনীয় ছাপ তাহার কোথাও নাই। বাড়ীর অবস্থা তাহার নিশ্চয়ই ভাল, সর্বাঙ্গে সচ্ছলতার চিহ্ন। সে রোজ দাড়ি কামায়, মাসে দু'বার করিয়া সেলুনে চুল কাটে, ডেন্টিষ্টের বাড়ী গিয়া ছ'মাস অন্তর দাঁত স্কেল করাইয়া আসে, সপ্তাহে তিনবার পোষাক বদলায়, সপ্তাহে তিনদিন নিয়মিত সিনেমায় যায়, বাকী তিন দিন না কি সখের টিউশনী করে, মেয়েদের গান শিখায়।

আর, যে গুণেন বাবুকে লইয়া এই কাহিনী, তাঁহার চেহারায় বৈশিষ্ট্য আছে, ব্যবহারেও বৈশিষ্ট্য আছে। একশত লোকের ভিতরে গুণেনবাবুকে চিনিয়া লইতে আপনার একটুও বেগ পাইতে হইবে না। যাঁহার পায়ে দেখিবেন চীনা বাড়ীর সস্তা অক্সফোর্ড সু যৌবনেই দুমড়াইয়া কিম্ভূত-কিমাকার হইয়া গিয়াছে, তাঁকেই প্রথমে গুণেনবাবু বলিয়া সন্দেহ করিবেন।

জুতার উপর যদি দেখেন শীর্ণ, শিরাবহুল দুখানি পায়ের স্বাভাবিক বর্ণ ঘন মলিন রোমরাজিতে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, তবে নিঃসন্দেহে বুঝিবেন, তিনিই গুণেনবাবু।

গুণেনবাবুকে চিনিয়া লইলেই তাঁহার বৈশিষ্ট্য আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। দেখিবেন, ৪৬ ইঞ্চি ধুতির এক দিক্ তাঁহার হাঁটুর উপরে উঠিয়া রহিয়াছে, কাছাটা অর্দ্ধেকের বেশী ঝুলিয়া পিছনের কোঁচা হইতে চাহিতেছে। পথে হাঁটিয়া আসিতে কোঁচার সম্মুখভাগ ধূলায় অথবা কাদায় মলিন হইয়া গিয়াছে।

গুণেনবাবুর জামার দিকে তাকাইলে দেখিবেন, জামার সেলাই ফাঁকা বা হারাণর কৌশল তাঁর সম্যক্ আয়ত্ত আছে, কিন্তু তাহা ঢাকিয়া রাখিতে নিজের হাতে সাবান দিয়া কাচা [illegible] চাদর তিনি সর্ব্বদাই ব্যবহার করিয়া থাকেন।

গুণেনবাবুর হাসিটাও একটা দেখিবার জিনিস। নেশার মধ্যে তিনি শুধু পান খান, সেই পান খাইয়া দাঁত তাঁহার সর্ব্বদাই লাল হইয়া থাকে। হাসিতে তাঁর একটুও শব্দ হয় না, কিন্তু হাসিতে গিয়া খোঁচা খোঁচা দাড়ি-পরিবেষ্টিত তাঁহার পুরাণ দু'খানি ঠোঁট প্রায় কাণ স্পর্শ করিয়া আসে, উপরে নীচে দু'টি মাড়িই সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশ করে,—তাঁহার তাম্বুল-রঞ্জিত হাস্যমুখ আপনি জীবনে ভুলিতে পারিবেন না।

তারপর গুণেনবাবুর মাথা। গুণেনবাবুর মাথায়ও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। একটা কদমফুলকে সমান করিয়া ছাঁটিয়া দিলে যেরূপ দেখায়, গুণেনবাবুর মাথার চেহারা অবিকল সেইরূপ। চুলগুলির প্রত্যেকটি যেন 'যুদ্ধং দেহি' অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে।

এ বয়সে গুণেনবাবুর মাথার অর্দ্ধেক চুল পাকিয়া যাইবার কথা, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, খুঁজিলেও তাঁহার মাথায় একটা পাকা চুল পাওয়া যাইবে না; শুধু ক্লাসে 'ব্ল্যাক বোর্ডে' 'ওয়াক' করিয়া যখন গুণেনবাবু ফিরিয়া আসেন—তখন মনে হয়, তাঁহার মাথার দশ আনা চুলেই বুঝি পাক্ ধরিয়াছে।

গুণেনবাবু কোন্ ক্লাসে পড়াইতেছেন, দূর হইতেই আপনি তাহা বুঝিতে পারিবেন। যে ক্লাসে দু'চার মিনিট অন্তর হাসির রোল উঠিতেছে, মাঝে মাঝে কুকুর বেড়াল ডাকিতেছে এবং তাহাই শাসন করিতে প্রাণপণ শক্তিতে কোন শিক্ষকপুঙ্গব বিরামহীন হুঙ্কার দিতেছেন, সে ক্লাস গুণেনবাবুর না হইয়া যায় না।

ক্লাসের সামনে আগাইয়া গেলে দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক ছেলে ক্লাসের বাহিরে আসিয়া জটলা করিতেছে। হেডমাষ্টার, ফ্লাইং ভিজিটে আসিলে গুণেন মাষ্টার কাষ্ঠের ডাণ্ডা-যুক্ত ডাষ্টার-হাতে ক্ষিপ্রমূর্ত্তিতে তাহাদের তাড়াইয়া ক্লাসে ঢুকাইয়া দেন, তারপর এক একবার ভীত চকিত দৃষ্টিতে হেডমাষ্টারের দিকে তাকাইতে থাকেন।

টিচার্স কমন রুমে একদিন মাসিকপত্রের একটি গল্প পড়িতে পড়িতে অতনু বলিয়া উঠিল, 'এ গল্পের নায়ক আমাদের গুণেন না হয়ে যায় না, একেবারে হুবহু মিলে যাচ্ছে যে!'

ব্রজবাবুর হাত হইতে খবরের কাগজ খসিয়া পড়িল, 'কি কি, কি হল ব্যাপারটা?'

নন্দবাবু পরীক্ষার খাতার বাণ্ডিল মাথায় দিয়া চাদর মুড়ি দিয়া বেঞ্চের উপর একটু কাৎ হইয়াছিলেন, সকলে মনে করিয়াছিলেন, তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন,—শুক্রবার এক ঘণ্টা পনের মিনিট টিফিন। কিন্তু, তিনি এক লাফে সোজা হইয়া বসিলেন। তারপর চোখ রগড়াইয়া বলিলেন, 'কি হল? আমাদের গুণেনবাবুকে নিয়ে কি গল্প লেখা হ'ল? পড়ুন ত অতনুবাবু শুনি, একটু জোরগলায় ভাল করে পড়বেন।'

সহসা টিচার্স কমনরুমে যেন একটা হাসির বোমা ফাটিয়া পড়িল, তাহার শব্দে সমুদ্রোচ্ছ্বাসের মত ছেলেদের আনন্দ-কোলাহলও ক্ষণেকের জন্য চাপা পড়িয়া গেল।

নিজে হাসিলাম, অতনু হাসিল, বঙ্কু, চারু, হেম, কিশোরী, অবিনাশ হাসিল, অঙ্কবরঙ্ক জিতেনবাবু, প্রভাতবাবু হাসিলেন, বৃদ্ধ অবিনাশবাবু টেকো মাথায় হাত বুলাইয়া বুলাইয়া হাসিলেন। এমন কি, যাঁহার নাম শুনিয়া সকলের হাসি, যিনি দুটী পা বেঞ্চের উপর তুলিয়া উবু হইয়া বসিয়া ঘুমে ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়িতেছিলেন, সেই গুণেনবাবুও চক্ষু দুটী বিস্ফারিত করিয়া মিটিমিটি হাসিতে লাগিলেন।

চারিদিক্ হইতে সকলেই সমস্বরে গল্পটা পড়িতে অনুরোধ করিয়া উঠিলেন। ব্রজবাবু বলিলেন, 'পড়ুন অতনুবাবু, পড়ুন, এখনও টিফিন শেষ হতে অনেক দেরী, দেখ ত হে, কটা বাজে? এখনও ৪৫ মিনিট বাকী, ঢের সময় আছে।'

গুণেনবাবু সস্মিতদৃষ্টিতে একবার আমার দিকে, একবার অতনুর দিকে তাকাইতে লাগিলেন।

অতনু পত্রিকাখানার প্রয়োজনীয় অংশে আঙ্গুল রাখিয়া বন্ধ করিয়া হাসি চাপিয়া বলিল, 'কিন্তু, গুণেনবাবু আমাদের কি খাওয়াবেন বলুন, আপনাকে নিয়ে গল্প লেখা হয়েছে, না খাওয়ালে ছাড়ছি না।'

আমি গল্পটা দেখিবার জন্য মাসিকপত্রখানা টানিয়া লইবার চেষ্টা করিলে, অতনু আমাকে চোখের ইসারা করিয়া নিজেই গল্পটা পড়িতে আরম্ভ করিল। দুই এক লাইন পড়া হইতেই বুঝিলাম, প্রেমের গল্প। ঝুঁকিয়া দেখিলাম, গল্পের নায়কের নামটা ঠিক রাখিলেও নায়িকার নামটির স্থানে অতনু অন্য নাম পড়িয়া যাইতেছে।

গুণেনবাবু মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

চারু বলিয়া উঠিল, 'গুণেনবাবুর ভেতরে ভেতরে এতও ছিল, আর অতনুই বা এত জানল কি করে?'

হেম বলিল, 'অথচ, বাইরে কেমন মানুষ, যেন ভিজে বিড়ালটি।'

ব্রজবাবু বলিলেন, 'বিয়ে যখন জীবনে করলেন না, তখন ব্যাপার একটা আছেই, এত জানা কথা।'

সুবিনয়বাবু হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, 'বিয়ে ত উনি করলেন না, কিন্তু মেয়ে ত একটি আছে, মাসে মাসে তাকে খরচ পাঠান হয়, তা বুঝি আপনারা জানেন না?'

গুণেনবাবু কাহারও কোন কথার উত্তর না দিয়া এবারও শুধু মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

অতনু মাসিকপত্রখানা ভাঁজ করিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিল, 'না তপন, ঠাট্টা নয়, গুণেনবাবুকে নিয়ে সত্যি একটা গল্প লিখে ফেল। কাল্পনিক জীবকে নিয়ে এত গল্প লিখলে, এমন একটি জীবন্ত নায়ককে নিয়ে গল্প লিখবে না?' আমি বলিলাম, 'নিশ্চয় লিখব।' গুণেনবাবুর হাসি বন্ধ হইয়া মুখখানা অন্ধকার হইয়া উঠিল, চোখের দৃষ্টিতে একটা সচকিত ভাব ফুটিয়া উঠিল।

আমার নীচের তলায় ক্লাস ছিল, টিফিন শেষ হইলে ছেলে-দের ভিড় ঠেলিয়া নীচে নামিতেছিলাম, হঠাৎ শুনিলাম—

'তপনবাবু, শুনুন।'

পিছন ফিরিয়া দেখি গুণেনবাবু ছুটিয়া আসিতেছেন। একটু দাঁড়াইলাম। গুণেনবাবু আমার পাশে আসিয়া আমার কাণের কাছে মুখ লইয়া বলিলেন, 'একটা কথা ছিল।'

আমার কাছে এমন করিয়া গোপন কথা বলিবার চেষ্টা তাঁহার আর কোন দিন দেখি নাই, আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, 'কি বলুন দেখি।'

গুণেনবাবু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, 'এই

বলছিলাম কি, আপনি—মানে—ওঁদের কথা শুনবেন না, আপনি।'

ঠিক বুঝিতে পারিলাম না, বলিলাম, 'কি কথা শুনব না, বলুন ত ?

গুপেনবাবু মুখ-চোখ রাঙা করিয়া বলিলেন, 'ওঁরা যে বলছিলেন, আমার নামে গল্প-লেখার কথা, সে কথা শুনবেন না', আপনি।'

কথাটি একটু আগেই আলোচিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু কথাটা নিতান্তই রহস্যের বলিয়া আমি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। গুপেনবাবুর এই নিষেধের কথায় প্রচ্ছন্ন অনুরোধের সুর শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। কোনরূপে হাসি চাপিয়া বলিলাম, 'কিন্তু, আমি যে লিখব বলে প্লট এর মধ্যেই ঠিক করে ফেলেছি, গুপেনবাবু।'

দেখিলাম, গুপেনবাবুর স্বাভাবিক শান্তভাব হর্ষে বিকৃত হইয়া উঠিল। তিনি আমতা-আমতা করিয়া বলিলেন, 'কিন্তু, আমায় নিয়ে কি কখনও গল্প হতে পারে? কি আছে আমার মধ্যে গল্প লিখবার মত?'

ক্লাসে যাইতে দেরী হইতেছিল, বলিলাম, 'সে আমি দেখব'খন, তার জন্যে আপনার ভাবতে হবে না, গল্প আমাদের যে কোন লোকের জীবন নিয়ে হতে পারে।'

ক্লাসের দিকে দু'পা আগাইয়াই গিয়াছিলাম, গুপেনবাবু পিছু পিছু আসিয়া বলিলেন, 'কিন্তু চেহারা ?'

—'চেহারা ?—আপনি কি মনে করেন, চেহারা আপনার একটুও খারাপ ?'

কথাটা বলিয়া আর একটুও দাঁড়াইলাম না, হাসি চাপিতে অতি দ্রুত ক্লাসে গিয়া ঢুকিলাম।

সেদিন রাত্রে গুপেনবাবুর স্বভাবের ও চেহারার খানিকটা বর্ণনা গল্পের মত লিখিয়া ফেলিলাম। পরদিন স্কুলে অতনু ও হেমকে দেখাইলে তাহারা হাসিয়াই অস্থির। বলিল, 'লিখে যাও, চমৎকার হচ্ছে। একটা উপযুক্ত নায়িকা এনে দিলেই গল্প ঠিক জমে যাবে।'

আমি বলিলাম, 'কিন্তু মিথ্যা কথা কেন লিখব,—গুপেন বাবুর সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যতটা লিখেছি, তার একটি বর্ণও মিথ্যা নয়, তা তোমরা লক্ষ্য কর নি ?'

হিমাংশু গম্ভীরদৃষ্টিতে শুধু আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অতনু কহিল, 'মিথ্যা তোমায় লিখতে হবে না, ওঁর জীবনে সত্য ঘটনাই এমনি করে ঘটিয়ে দিচ্ছি যে, তা নিয়েই তুমি দিব্যি গল্প লিখতে পারবে।'

গুপেনবাবুর সম্বন্ধে সত্যই যে একটা গল্প লিখিব—এমন একটি ভাব আমার মনে ছিল বলিয়া বোধ হয় না। শুধু বন্ধুদের মাঝে উহা লইয়া একটু আমোদ করিব, এই জন্যই দুই এক লাইন লিখিয়াছিলাম, ইহারা দেখি কথাটাকে খাঁটী সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে।

একটা সিগারেট ধরাইয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে ভাবিতে বেঞ্চের উপর কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। ঘণ্টার শব্দে জাগিয়া উঠিতেই শুনি—'কি, ঘুম হ'ল ?'

তাকাইয়া দেখি, গুপেনবাবু। আমার দিকে চাহিয়া সন্তোষের হাসি হাসিলেন।

'আপনি খুব স্লিক্‌ট্ তো !'

কথাটার তাৎপর্য্য তখন বুঝি নাই, কিন্তু একটু পরেই বুঝিলাম, চারু ও হেম গল্পটা আরম্ভ হওয়ার কথা তাঁহাকে ইহার মাঝেই জানাইয়া দিয়াছে।

পরের দিন দেখা গেল, গুপেনবাবু দাড়ি গোঁফ কামাইয়া, জুতা পালিশ করিয়া স্কুলে আসিয়াছেন।

ব্যাপারটা এমন কিছুই নয়, কিন্তু সেদিন তাহার মাঝে অনেকেই অর্থ আবিষ্কার করিলেন। চারিদিকে চাপা হাসি চলিল।

অতনুর মুখের বাঁধ নেই, সে বলিল, 'দেখুন দেখি আজ কেমন দেখাচ্ছে। থাকেন না তেমনভাবে তাই, মাষ্টারী না করে করতেন যদি সেই রেলের কাজ—তাহলে এত দিন ষ্টেশন-মাষ্টার হতে পারতেন। চেহারাও আজ কত সুন্দর থাকত,—আসল কথা, টাকাতেই সব করে কি না।'

রেলের কাজ কথাটা কি হইল ভাল বুঝিলাম না,—পাশে ব্রজবাবু ছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলাম।

ব্রজবাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, 'আপনি তা-ও জানেন না ?'

বলিলাম, 'না, আমি কতদিনই বা এখানে এসেছি, কি করে সব জানব ?'

ব্রজবাবু গুণেনবাবুর জন্য গৌরব অনুভব করিবার ভঙ্গীতে বলিলেন, 'এই দেখছেন এঁকে, এমন শান্তশিষ্ট নিরীহ ভাল মানুষটি, সন্ন্যাসীর মত থাকেন, কিন্তু চিরদিন কি আর এ রকম ছিল? যৌবনে—'

অতনু বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, 'যৌবন ওঁর এর মাঝেই গেছে না কি,—আপনি যা তা বলেন কেন?'

ব্রজবাবু বলিলেন, 'ষ্টেশন-মাষ্টারের সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বিয়ে, সাধা চাকরী—তা' ছেড়ে ভদ্রলোক ঐ যে পঁচিশ টাকার মাষ্টারী করতে এলেন, তার কারণ মশায় আমরা বুঝতে পারি না। আমরা তো মশায় অমন চাকরী পেলে বর্ত্তে যেতাম। এতদিন দেড়শো, দুইশো মাইনে হত, উপরি ছিল দেদার।'

গুণেনবাবুর দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, মুখ তিনি ক্রমেই নীচু করিতেছেন। বুঝিলাম কথাটা সত্যই।

কিন্তু, ইহার পরে গুণেনবাবু যাহা আরম্ভ করিলেন, তাহা সত্যই একপ্রকার পাগলামী। তিনি ঘন ঘন দাড়ি কামাইতে লাগিলেন, জুতায় কালি দিতে লাগিলেন। এমন কি, তাঁহার একমাত্র নেশা পানও তিনি প্রায় ছাড়িয়া দিলেন,—দাঁত তাঁহার ক্রমেই শাদা হইয়া উঠিতে লাগিল।

ক্লাসে তিনি ক্রমে অতনুর মত ষ্টাইল করিয়া পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। ছেলেরা তাঁহার নূতন রঙ্গ দেখিয়া আরও বেশী করিয়া গোলমাল আরম্ভ করিল।

একদিন ধোলাই কাপড় পরিয়া গুণেনবাবু ক্লাসে পড়াইতে গিয়াছেন, হঠাৎ ছেলেদের মধ্যে এমন হাসির রোল উঠিল যে, শব্দে হেডমাষ্টার ছুটিয়া আসিলেন। দেখা গেল, চার পাঁচটা 'চিউয়িং গাম'-এ তাঁহার সদ্য-ধৌত কাপড়খানা চেয়ারের সঙ্গে একেবারে আঁটিয়া গিয়াছে।

হেডমাষ্টারের অনুসন্ধানে দোষী বাহির হইল এবং শাস্তিও তাহারা পাইল, কিন্তু তাহাদের শাস্তি দেখিয়া গুণেনবাবু নিজেই কাঁপিয়া অস্থির; গুণেনবাবু নির্জীব লোক—প্রতিহিংসা লইয়া কবে ছেলেরা আবার কি করিয়া বসে, ঠিক কি!—হেডমাষ্টার কি তখন গুণেনবাবুকে বাঁচাইতে আসিবেন?

অগ্রহায়ণে শীত পড়িলে গুণেনবাবু জিনের কোটের উপর পুরোনো জীর্ণ একটা জার্ম্মান-উলের র‍্যাপার চাপাইয়া আসিতে আরম্ভ করিলেন। র‍্যাপারটার যে আসল রং কি ছিল, তাহা এখন আর বুঝিবার উপায় নাই।

গুণেনবাবুর ভোল পরিবর্ত্তনে বন্ধু-মহলে যে একটা ঠাট্টার বন্যা বহিত তাহার বেগ ক্রমে কমিয়া আসিতেছিল, কিন্তু, সে দিন আবার হঠাৎ এই বেশের অসঙ্গতি দেখিয়া অতনু বলিয়া উঠিল, 'এ কি গুণেনবাবু, এ কি করেছেন আপনি,—আপনার মতন এমন—'

গুণেনবাবু কিছু না বুঝিয়া অতনুর দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

'এমন শাদা কোটের উপর এমন চিরকুটে একটা র‍্যাপার মানায় না কি?—ছি,—এই কি আপনার রুচির পরিচয়!'

গুণেনবাবু আজকাল মুখ বুজিয়া হাসি অভ্যাস করিতেছেন। মুখ বুজিয়া ভদ্রতার হাসি হাসিতে গিয়া মুখখানা তাঁহার বিকৃত হইয়া গেল,—'কার কি অতনুবাবু, মাইনে যা পাই—তা ত আপনাদের অজানা নেই।'

'—ও সব চলবে না আপনার,—একটা ভাল গরম কোট আর আলোয়ান এবার করতে হ'বে আপনার।'

সেটা যে একেবারেই অসম্ভব, এই ভাব প্রকাশ করিবার জন্য গুণেনবাবু এক প্রকার অদ্ভুত হাসি হাসিতে লাগিলেন।

'ও সব কথা শুনব না আমরা,—একা মানুষ, মাইনে সামান্য হলেও সেই টাকাই বা আপনি কি করেন?—তার হিসাব দিতে হবে আপনার'—বলিয়া একরূপ হিড় হিড় করিয়াই চারু তাহাকে 'জিওগ্রাফীর' ঘরে লইয়া গেল।

আমাদের দলের সকলেই প্রায় সেখানে উপস্থিত ছিল, চারু, হেম, হিমাংশু, রবি প্রভৃতি।

গুণেনবাবু চেয়ারে বসিয়া মুখে হাত দিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন, তার পর মৃদু হাসিয়া চারুর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'আপনারা আমায় অবিশ্বাস করছেন, চারুবাবু?'

চারু একটা সিগারেট ধরাইয়া বলিল, 'অবিশ্বাস আমরা করছি না, কিন্তু আপনি হিসাব দিন।'

'দিচ্ছি'—বলিয়া গুণেনবাবু তাঁর দীনতার ইতিহাস অকপটে বর্ণনা করিয়া চলিলেন। পঁচিশ টাকা বেতনে গুণেনবাবুর অসন্তোষ নাই,—তাঁহার মতে আই-এ পাশ লোকের মাষ্টারী লাইনে পঁচিশ টাকাই ঢের। এখানে চাকুরী থেকে এ

বাজারে পনের-ষোল টাকাও আর কোথাও জুটিবে না, পঁচিশ টাকার মাষ্টারীর জন্ত বি এ পাশই কত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

গুপেনবাবুর পঁচিশ টাকা বেতন হইতে পঁচিশ আনা অর্থাৎ এক টাকা নয় আনা স্কুল কাটিয়া লয়,—প্রভিডেণ্ট ফণ্ড। উক্ত ফণ্ড হইতে মেয়ের বিবাহের সময় এক শত টাকা ধার করিয়াছিলেন, তাহা চব্বিশ মাসে শোধ দিবার কথা,—সে জন্ত চারি টাকা তিন আনা মাসে মাসে কাটা যায়—

চারু ও হেম কথাটা শুনিয়া একসঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল, 'আপনি তো বিয়ে করেন নি গুপেনবাবু, আপনার মেয়ে এল কোত্থেকে?'

হিমাংশু তাহাদের ধমক দিয়া থামাইয়া দিল, 'তোমাদের সব বিষয় নিয়েই ফাজলামী, মেয়ে ওঁর ছোট ভাইয়ের—তার মা-বাপ কেউ নেই,—ওঁকেই তাকে দেখতে হয়।'

মুহূর্তের জন্ত গুপেনবাবুর চোখ ছলছল করিয়া আসিয়াছিল, আত্মসংবরণ করিয়া তিনি দ্রুত তাঁহার হিসাব দিয়া চলিলেন—পঁচিশ টাকার পাঁচ টাকা বার আনা গেল, রহিল উনিশ টাকা চার আনা; সীট ভাড়া দুই টাকা চার আনা, রহিল সতর টাকা, মেয়ে-জামাইকে মাসে মাসে আট টাকা পাঠাইতে হয়, জামাইয়ের চাকরী হয় নাই, বাড়ীতে ভাত নাই।

কে যেন বলিয়া উঠিল, 'এমন জামাইয়ের সঙ্গে মেয়েকে বিয়ে দেওয়া কেন?'—গুপেনবাবু জানাইলেন, জামাইটি না কি ভালভাবে বি. এ. পাশ করিয়াছে। অনেক চেষ্টায় চাকুরী না জোটায় গ্রামে সামান্ত জমিজমা যা আছে, তাই দেখা-শুনা করিতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে খরচ চলে না। তবে, গ্রামে বসিয়াই নানা স্থানে চাকরীর জন্ত দরখাস্ত পাঠাইতেছে, গুপেনবাবুর বিশ্বাস, চাকুরী একদিন তাহার হইবেই তখন আর গুপেনবাবুকে তার খরচ যোগাইতে হইবে না। তারপর গুপেনবাবু আবার হিসাব দিয়া চলিলেন, রহিল নয় টাকা, হোটেলে এক বেলা ছয় পয়সা করিয়া খাইলেও মাসে ছয় টাকার কাছাকাছি পড়ে, রহিল তিন টাকা কয়েক আনা; তা—জামা কাপড় আছে, ধোপা-নাপিত আছে, দু'একখানা পোষ্টকার্ড-কেনা আছে, মোট কথা, কিছুই থাকে না।

হিসাব শুনিয়া যে কোন লোকের থামিয়া যাইবারই কথা, আর পীড়াপীড়ি করা চলে না। কিন্তু দেখিলাম, অতনু সে পাত্র নয়। সে বলিল, 'আচ্ছা দাঁড়ান,—প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের দেনা আর আপনার ক'মাস দিতে হবে?'

গুপেনবাবু হিসাব করিয়া বলিলেন, 'তিন মাস।' অতনু সোল্লাসে বলিল, 'বহুৎ আচ্ছা, সব ব্যবস্থা আপনার করে দিচ্ছি,—কোট আর আলোয়ান আপনার কিনতেই হবে।'

গুপেনবাবু প্রথম একটু আম্‌তা-আম্‌তা করিলেন, শেষ পর্য্যন্ত আপত্তি তাঁহার টিকিল না।

আমরা সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া অতনুর ব্যবস্থা শুনিলাম: চারু নিজের পকেট হইতে টাকা দিয়ে গুপেনবাবুর প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের দেনা শোধ করিয়া দিবে। গুপেনবাবু প্রভিডেণ্ট ফণ্ড হইতে আবার ত্রিশ টাকা কর্জ লইবেন। চারুর দেনা শোধ দিলে গুপেনবাবুর যাহা থাকিবে, তাহা দিয়া গুপেনবাবুর চমৎকার একটি কোট হইবে,—আর আলোয়ান, সে অতনু তাহার পেশোয়ারী বন্ধু রহমানের কাছ হইতে কিনিয়া দিবে, দাম মাসে মাসে দিলে অনায়াসে শোধ হইয়া যাইবে।

গুপেনবাবু কি যেন আপত্তি করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু অতনু বেচারীকে এক প্রকার ধমক দিয়াই থামাইয়া রাখিল।

কাকার ভয়ানক অসুখ শুনিয়া সাতদিনের ছুটি লইয়া বাড়ী গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখি, গুপেনবাবু সত্যই কাশ্মীরী গুপেন্‌-ব্রেষ্ট কোট গায় দিয়া স্কুলে আসিয়াছেন।

কোট গুপেন্‌-ব্রেষ্ট করিতে না-কি গুপেনবাবুর বিশেষ আপত্তি ছিল, কিন্তু চারুর দৌরাত্ম্যে তাঁহার আপত্তি শেষ পর্য্যন্ত টিকে নাই,—খরচা অবশ্য প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের ত্রিশের টাকায় মিটে নাই, আরও তিন টাকা বেশী পড়িয়াছে। দরজী অতনুর চেনা,—এক টাকা করিয়া তিন মাসে দিলেই না-কি চলিবে।

সুন্দর নূতন জামা পাইলে ছোট ছেলের যে অবস্থা হয়, গুপেনবাবুরও দেখিলাম সেই অবস্থা,—আনন্দে, লজ্জায় তাঁর পরিপক্ক মুখও রক্তমাভ হইয়া উঠিয়াছে। প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে নানারূপ ঠাট্টা বিদ্রূপ চলিতে লাগিল।

গুপেনবাবুর কোট লইয়া মাষ্টারদের মধ্যে চাপা হাসা-হাসিটা গুপেনবাবুর পিছনে চলিতে লাগিল বটে, কিন্তু ক্লাসে পড়াইতে গেলে গুপেনবাবুর কদম-ছাঁট মাথার নীচে, মলিন

জীর্ণ টুইলের শার্টের উপরে এই মূল্যবান্ কাশ্মীরী গুপেন-ব্রেষ্ট কোট দেখিয়া ছাত্রদের হাসি আর থামে না।

—'স্যর, এটা কোথায় পেলেন?'

'কে দিল স্যর, বলুন না স্যর?'

'চমৎকার মানিয়েছে কিন্তু গুপেন—না ভাই?'

তাহাদের মুখ বন্ধ করিতে নিরীহ গুপেনবাবু প্রাণপণ শক্তিতে পড়াইতে আরম্ভ করিলেন।

পরদিন অতসী একখানা কাশ্মীরী আলোয়ান আনিয়া গুপেনবাবুর কাঁধে ঝুলাইয়া দিল। বলিল, 'এটি গুপেনবাবুর কাশ্মীরী আলোয়ান, আমার উপর ভার দেওয়া হয়েছিল তাই আমি কিনে এনেছি, আমার চেনা এক পেশোয়ারীর কাছ থেকে,—দাম নেবে চল্লিশ টাকা। তা মাসে মাসে শোধ দিলেই হবে।'

অতসীর কথা বলিবার ধরন দেখিয়া সকলে প্রায় একসঙ্গে হাসিয়া উঠিলেন। বেচারা গুপেনবাবুর মুখখানা একেবারে কাল হইয়া উঠিল।

বাজে কথা কেহ একটিও বলে না, সে বলিল, 'গুপেনবাবু, এইবার আমাদের খাওয়ান।'

গুপেনবাবু জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিলেন।

'আপনার কি সুন্দর জামা কাপড় হ'ল, এর দামের কামনা করে আমাদের একটি দিন আপনার বাড়ীতে ডাকবেন না?'

গুপেনবাবুর চোখ ছলছল করিয়া আসিল, 'আপনি আমায় ঠাট্টা করছেন হেমবাবু, বাড়ী কোথায়? থাকি তো মেসে।'

হিমাংশু বলিয়া উঠিল, 'না, না, উনি খাওয়াবেন কেন—ওঁর ত কত টাকা খরচ হয়ে গেল। তোমরাই একদিন ওঁকে খাওয়াও না কেন? তোমাদেরও ত বন্ধু উনি।'

গুপেনবাবু আলোয়ানটি টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

গুপেনবাবুর কোট ও আলোয়ান-জয়ন্তী করিবার সংকল্পে একটা ভোজের আয়োজন করা হইল। আমাদের দলের প্রত্যেকের নিকট হইতেই কিছু কিছু চাঁদা লওয়া হইল।

[illegible] একটা বড় ঘর ভাড়া লইয়া থাকে, নিজেদের ক্লাব, [illegible] সুতরাং অভ্যর্থনা সেখানেই ভাল হইবে। গুপেনবাবুকে প্রথমে রাজী করাইতে পারা যায় নাই, শেষে আমরা সকলে তাঁহার সঙ্গে নন কো-অপারেশন করিব ভয় দেখানোতে তিনি রাজী হইয়াছেন। সর্ত্ত হইয়াছে, তিনি তাঁহার নূতন কোট ও আলোয়ান পরিয়া যাইবেন, নতুবা সে রাত্রে কেহই অন্নজল স্পর্শ করিব না।

যে রবিবারে ভোজের আয়োজন করা হইল, সেদিন অসম্ভব শীত। কলিকাতায় এমন শীত আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারি না।

অতসীর ঘরখানা সেদিন অসাধারণ সুন্দর হইয়া উঠিয়াছিল। ঘরে যেন একটিও ধূলিকণা নাই, দেয়ালের ছবিগুলি মুছিয়া ঝকঝকে করিয়া তোলা হইয়াছে। উহাদের নিজের দুইখানা টেবিল ছাড়া আরও দুইখানা কোথা হইতে যোগাড় করিয়া আনিয়াছে। চারিখানা টেবিলই সদ্য কোরা দুধের ফেনার মত সাদা কাপড়ে ঢাকা। প্রত্যেক টেবিলেই ফুল দানীতে সাজান রহিয়াছে। একটা টিপয়ে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি ধূপ জ্বলিতেছে।

[illegible] গুপেনবাবুকে লইয়া চাক যখন অতসীর ঘরে পৌঁছিল, তখন নাচ গান চলিতেছে। বসিয়া সুনন্দা মজুমদার সেতার বাজাইতেছেন।

সুনন্দার পাশে অতসী সেন,—তাঁর নৃত্যে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। ইহারা অতসীর ছাত্রী।

গুপেনবাবুকে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দেওয়া হইল। পর মুহূর্ত্তে নৃত্য ও গানে আসর সরগরম হইয়া উঠিল। বেশ বুঝিলাম, গুপেনবাবু বসিয়া বসিয়া ইহাদের রকম দেখিয়া অবাক্ হইতেছেন। এই বিরক্ত আবহাওয়ায় তাঁহার যেন শ্বাসবন্ধ হইয়া উঠিল। গুপেনবাবু ও ইহারা যে একই স্কুলে শিক্ষকতা করেন,—ইহা যেন স্বপ্নেরও অগোচর।

খাইতে রাত্রি হইল। টেবিলে খাইতে গুপেনবাবুর অস্বস্তি বোধ হইতেছিল; তাহা ছাড়া, সেখানে মনে হইল, ইহাদের কেহই যেন তাঁহার আপনার লোক নয়, তাঁহার চেনা নয়।

খাইবার সময় কেহ তাঁহার সহিত ভাল করিয়া কথা বলিবার সুযোগ পাইল না, হাসি তামাসা লইয়াই তাহারা ব্যস্ত।

খাওয়া শেষ হইলেও তাহাদের উঠিবার লক্ষণ দেখা গেল

না, বরং মনে হইতে লাগিল, এখনই ইহারা আবার গান-বাজনা আরম্ভ করিবে।

উঠিবার কথা বলিলে পাছে অভদ্রতা হয়—গুণেন বাবু তাই মুখে কিছু না বলিলেও উস্‌খুস্ করিতেছিলেন, আমি তাঁহাকে মুক্তি দিলাম। বলিলাম, 'গুণেন বাবু, রাত হয়ে যাচ্ছে, অনেক দূর যেতে হবে আপনার,—আপনি উঠতে পারেন, আমাদের যেতে এখনও দেরী আছে।'

গুণেন বাবুর বুকের উপর হইতে যেন একখানা পাথর নামিয়া গেল। মহিলা দুইজনের উদ্দেশ্যে একবার হাত উঁচু করিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন।

সোমবার স্কুলে আসিয়া গুণেন বাবুকে দেখিতে পাইলাম না।—এ পর্যান্ত তাঁহাকে স্কুল কামাই করিতে দেখি নাই,—আশ্চর্য্য হইলাম। মঙ্গলবারে শুনিলাম, তাঁহার অসুখ। বুধবার ছোট ক্লার্কের মুখে শুনিলাম—তাঁহার নিউমোনিয়া হইয়াছে। তাহার কারণও শুনিলাম, সেদিন রাত্রে অতদূর বাসা হইতে নিমন্ত্রণ খাইয়া ফিরিবার পথে পকেটে পয়সা না থাকায় হাঁটিয়াই মেসে ফিরিতেছিলেন। ফিরিবার পথে তাঁহার কোট ও আলোয়ান চুরি হইয়াছে।—ঠিক চুরি নয়, একদল ছোকরা কাড়িয়া লইয়াছে, মায় গেঞ্জিটা পর্য্যন্ত। এই শীতে খালিগায়ে তাঁহাকে বাসায় ফিরিতে হইয়াছে।

কথাটা শুনিয়া বড় কষ্ট পাইলাম, আমাদের নির্দ্দয় রসিকতার ফলে ভদ্রলোকের এই দশা হইল।

বিকালে তাঁহাকে একবার দেখিতে যাইব ঠিক করিয়াছিলাম, কিন্তু যাই যাই করিয়া কি ভাবে যে কয়েকটা দিন কাটিয়া গেল, ভাল বুঝিতেও পারিলাম না।

কয়েকদিন পরে সকাল সকাল স্নানাহার করিয়া স্কুলের পথে গুণেন বাবুর ওখানে হইয়া যাইব ঠিক করিলাম।

গুণেন বাবুর বাসার সম্মুখে গিয়া মাথায় গামছা-বাঁধা কয়েকজন লোককে দেখিয়াই ব্যাপার বুঝিয়া ফেলিলাম।

শুনিলাম—শেষ রাত্রেই নাকি হইয়া গিয়াছে।

'কি কষ্টটাই পেয়েছে মশাই,—এক ফোঁটা জল দেবার লোক ছিল না।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'রোগটা কি নিউমোনিয়াই?' একজন বলিল, 'নিউমোনিয়া হবে না?—ছেলেগুলো কি পাজী! ওঁরই স্কুলের ছেলে মশাই,—এই কাণ্ড করেছে? মনে করুন, ঝাউতলা থেকে এতটা পথ এসেছেন, খালিগায়ে শীতের রাত্রে!'

'স্কুলের ছেলে?'

'না ত কি মশায়,—আমরা কি মিছে কথা বলছি? জিনিষগুলো যে তারাই আবার লুকিয়ে ফেরৎ দিয়ে গেছে,—কিন্তু, সে আর পরবে কে, বলুন? যে পরবে সে ঐ ঐখানে'—বলিয়া লোকটা আকাশ দেখাইয়া দিল।

'তা আপনি কোত্থেকে আসছেন?'

বলিলাম—'আমিও ঐ স্কুল থেকে—আমিও ঐ স্কুলে কাজ করি—'

'ওঃ—মশায়ের নাম?'

'আমার নাম—তপন রায়।'

একটি ছেলে একপাশে বসিয়া বিড়ী টানিতেছিল, তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিল, 'আপনি তপন বাবু? আপনার নামে যে কি একখানা চিঠি লিখে রেখে গেছেন।'

গুণেন বাবুর ঘরে প্রবেশ করিতে যেন দম বন্ধ হইয়া আসে,—দুইটি ছোট ছোট জানালা—ও একটি পাঁচ ফুট উঁচু দরজা, একটা ভাপসা গন্ধে যেন পেটের ভাত উঠিয়া আসিতে চায়। ঘর-খানায় তিনটা সীট—তাহার মাঝখানে গুণেন বাবুর মৃত-দেহ একটা ময়লা চাদরে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে।

ঘরের চারিদিকে একবার দ্রুত চোখ বুলাইয়া লইলাম; ঘরে আর যাঁহারা থাকেন তাঁহারা গুণেন বাবুর চেয়েও দরিদ্র। একটা কোণে দুইটি পেরেকে লম্বিত একটি দড়ির উপর গুণেন বাবুর কোট ও আলোয়ানটি ঝুলিতেছে, সে দিকে দৃষ্টি প'ড়তেই আমার মাথা নীচু হইয়া আসিল।

ছেলেটি একটি কেরোসিন-কাঠের টেবিল দেখাইয়া দিল। টেবিলের উপর আমার নামে খামে লেখা চিঠির পাশে একখানা পোষ্টকার্ডে চিঠি দেখিয়া কৌতুহলবশতঃ সেখানাও তুলিয়া লইলাম। বাঁকা বাঁকা অক্ষরে মেয়ে-হাতের লেখা। লিখিয়াছে—কাকাবাবু, আমাদের টাকা পাঠাইতে এত দেরী করিতেছেন কেন? উনি রোজ পোষ্টাফিস্ হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাগ করেন। আপনি এতদিন কলিকাতায় আছেন, একটা চাকুরীও কি ওঁর করিয়া

দিতে পারেন না,—তাহা হইলে আপনার মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিতে হইত না।

আর দু'দিনের মধ্যে খরচ না পাঠাইলে আমাদের উপোস করিতে হইবে। শারীরিক ভাল আছি—প্রণাম জানিবেন—ইতি।

প্রণতা—

আপনার স্নেহের রেণু।

বুঝিলাম, এই মেয়েকেই তাঁহার মাসে মাসে খরচ পাঠাইতে হইত।

ইহার পর খুলিলাম নিজের চিঠি। দুর্ব্বলতায় হাতের লেখা কাঁপিয়া কাঁপিয়া গিয়াছে। গুণেন বাবু লিখিয়াছেন—

প্রিয় তপন বাবু,

আশা ছিল, আপনার সঙ্গে দেখা হইবে, কয়েকটা কথা ছিল বলিয়া যাইব, ভাগ্যে তাহা ঘটিবে কি না জানি না, যদি বাঁচি, কথাগুলি মুখেই আপনাকে বলিব, কিন্তু যদি না বাঁচি, সেই জন্য এই চিঠি লিখিয়া রাখিয়া গেলাম।

কোট আর আলোয়ান ফেরৎ পাইয়াছি, যারা লইয়াছিল তাদের আমি ক্ষমা করিয়াছি। স্কুল হইতে তাদের কোন শাস্তি দেওয়া না হয়, মৃত্যু-পথ-যাত্রীর এই বিশেষ অনুরোধ।

এ ছাড়া আপনার সঙ্গে—শুধু আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

আমি যখন আপনাদের স্কুলে মাষ্টারীতে ঢুকি, তার অনেক পূর্ব্বে একজন বড় রেলওয়ে অফিসারের একমাত্র মেয়ের সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির হইয়াছিল, কথা ছিল বি. এ. পাশ করিলেই তিনি ভাল চাকুরী জোগাড় করিয়া দিবেন। কিন্তু হঠাৎ আমার দাদা মারা যাওয়ায় বৌদি ও তাঁর একমাত্র মেয়ের ভার আমার উপর পড়িল। দাদা ছিলেন অত্যন্ত বে-হিসাবী, স্ত্রী-কন্যার জন্য এক কপর্দকও রাখিয়া যান নাই। আমার আর পড়া হইল না, যে চাকুরী পাইলাম তাহাতেই ঢুকিয়া পড়িলাম। তারপর আমার বৌদিও মারা গেলেন, আমি আমার ভাইঝি রেণুকে মানুষ করিলাম ও অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়া একটি ভাল ছেলে দেখিয়া বিবাহ দিলাম। ছেলেটি কিন্তু আজও উপার্জ্জনক্ষম হইতে পারিল না। আমার সামান্য টাকা মাহিনা হইতে আজও তাহাকে সাহায্য করিতে হয়, আপনি তাহা জানেন। রেণুর মুখ চাহিয়া কি নিদারুণ কষ্টের মধ্যে বৎসরের পর বৎসর কাটাইয়াছি, আপনি তাহাও জানেন। মাঝে মাঝে মনটা খারাপ হইয়া যাইত, ইচ্ছা করিত, জীবনের সামান্য সুখ একটু ভোগ করি, চিরজীবন পরের জন্য কষ্ট পাইয়া মরিব কেন? কিন্তু পরক্ষণেই এই চিন্তা মন হইতে দূর হইয়া যাইত। এতকাল পরে কোট আর আলোয়ান গায়ে দিয়া একটু বাবুগিরি করিবার লোভে রেণুমার সাহায্য পাঠান বন্ধ করিয়াছি। ভাবিয়াছিলাম, কয়েক মাস একটু কষ্ট ভোগ করুক, কোট ও আলোয়ানের টাকাটা শোধ হইয়া গেলে আবার টাকা পাঠাইব, কিন্তু আজ রেণুমার পত্র পাইয়া কোট ও আলোয়ান গায় দিবার সাধ আমার মিটিয়া গিয়াছে। যদি বাঁচি, আমি নিজেই জিনিষ দুটী বিক্রয় করিয়া রেণুমাকে টাকা পাঠাইয়া দিব—যদি না বাঁচি, আপনি আমার জন্য এই কাজটা করিবেন কি? স্কুল হইতে আমার যাহা পাওনা আছে, তাহাও যাহাতে রেণুমা শীঘ্র পায় সে ব্যবস্থাও দয়া করিয়া করিবেন।—ইতি।

পত্র পড়িয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।*

* বিদেশী গল্পের ছায়াবলম্বনে।

জন্ম ও মৃত্যু

—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্তোর্বৈ কস্যচিদ্ধেতোর্মৃত্যুরত্যন্ত-বিস্মৃতিঃ।
জন্মত্বাত্মতয়া পুংসঃ সর্ব্ব-ভাবেন ভূরিদ।
বিষয়স্বীকৃতিং প্রাহুর্যথা স্বপ্ন-মনোরথৌ—শ্রীমদ্ভাগবত।

ছিলে তুমি, আছ তুমি, তবু তুমি নাই।
হৃদয় ব্যতীত হেরি শূন্য সব ঠাঁই।
কেন এলে, কেন গেলে, ছিন্ন স্নেহ-ডোর;
কেমনে বুঝিব, হায়! এ রহস্য ঘোর!
সুশীল সরল, সুস্থ সবল, নিত্য-ব্যায়াম-পুষ্ট দেহ।
প্রফুল্ল-বদন, প্রোজ্জ্বল নয়ন, হৃদয় অমৃত-গেহ।
বিধবা জননীর অকূল-নিধি,—স্বামীর চরম দান,
ভ্রাতা-ভগিনীর নিবিড় স্নেহের অনুপম অবদান।

এসেছিলে তুমি, আনন্দ উথলি', সাতটী ভগ্নীর পরে,
ফুটেছিল ফুল, হেসেছিল চাঁদ, তনয়া-বহুল ঘরে।
কিন্তু সুখ ক্ষণস্থায়ী, ক্ষণ-প্রভাসম, পদ্ম-পত্রে যথা নীর,
অকালে ঝরিয়া গেল দুইটী ভগিনী—বেদনা গভীর।
অনন্তর অকস্মাৎ, হ'ল বজ্রপাত,—কুলিশ-কঠিন,
পরম আশ্রয়-স্থল, হরে নিল কাল, হ'লে পিতৃহীন।
তবু তৃপ্ত নহে যম, নিষ্ঠুর নির্ম্মম, হরিল ভগিনী আর ;
তারপর ভ্রাতৃবধূ, কক্ষচ্যুত হ'ল বিধু, ভাসিল সংসার!
অবশেষে গেলে তুমি, গৃহ এবে মরুভূমি, নিবিড় আঁধার,
জননী-হৃদয় জ্বলে তীব্র পুত্র-শোকানলে, নয়নে আসার।
বিচিত্র সৃষ্টির রীতি, রুদ্রের সংহার-নীতি, অনিত্য সংসার।
জন্মমৃত্যু কি রহস্য, মুহূর্ত্তে হৃতসর্ব্বস্ব, অদ্ভুত, অপার!
শুনিয়াছি গুরু-মুখে অমোঘ গীতার ব্যাখ্যা,
অজয় অমর হয় অব্যয় আত্মার আখ্যা।

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥"—গীতা।
জরাজীর্ণ স্থবিরের মৃত্যুই সহায়,
শিশু, যুবা, সদ্যোজাত, কেন চলে যায়?
কি উদ্দেশ্য, কি রহস্য, বুঝিব কেমনে,
কর্ম্মফল?—তাই হবে, ভাবি মনে মনে।

"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥"—গীতা।
জন্মিলে মরিতে হয়, প্রত্যক্ষ প্রত্যয়,
মরিলে জন্মিতে হয়, জাগায় সংশয়।
পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু একি বিবর্ত্তন!
কত জন্মে, কত কল্পে, হয় নিবর্ত্তন?

"অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥"—গীতা।
আদিতে থাকি অব্যক্ত, মধ্যেমাত্র ব্যক্ত, পুনরব্যক্ত নিধনে,
দুর্ভেদ্য রহস্য-জাল, মর্ম্মভেদী ইন্দ্রজাল, দুর্গম পীড়নে।

আদি অন্ত চিরস্থির, মধ্যেতে অতি অস্থির, একি কূট-লীলা,
জ্ঞানী জানে গূঢ় তত্ত্ব, অজ্ঞানীর সুপ্ত সত্ত্ব, প্রকৃতি শৃঙ্খলা।
প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসেতে, প্রতি বিপলেতে, জন্মমৃত্যু খণ্ড লয়,
দেহ ছেড়ে দেহী যায়, রুদ্ধ আত্মা মুক্তি পায়, সে মহাপ্রলয়।
প্রত্যক্ষ পরোক্ষ হয়, অমৃতে আশ্রয় লয়, মুক্তির সন্ধানে ;
স্থূল ত্যজি সূক্ষ্মে যায়, সূক্ষ্মতর দেহ পায়, গতি ঊর্দ্ধপানে
যে পারে রোধিতে শ্বাস আগম-নিগম
জয় করে জন্ম-মৃত্যু প্রকৃতি-নিয়ম।

"উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞান-চক্ষুষঃ ॥"—গীতা।
কিন্তু, জ্ঞানী কয়জন?—জ্ঞানহীন অগণন, মোহমুগ্ধ জীব,
না জানে সৃষ্টির ধর্ম্ম, না বুঝে ধ্বংসের মর্ম্ম, স্থূলেতে সজীব।
মায়া মোহ লোভ দিয়ে, রাখিয়াছে আবরিয়ে, জ্ঞানের ইন্দ্রিয়,
কেমনে বুঝিবে মূঢ়, রহস্য অতি নিগূঢ়, তত্ত্ব অতীন্দ্রিয়?
আত্মীয়-বিয়োগ হ'লে, ভাসে সদা অশ্রুজলে, বিদরে হৃদয়,
মনে করে অত্যাচার, বিধাতার অনাচার, শমন নির্দ্দয়!
কত কষ্টে, কত যত্নে, পালিত যে দেহ,
অকস্মাৎ সংজ্ঞাহীন,—বৃথা মায়া স্নেহ!
সজীব নির্জ্জীব হয়, সচল নিশ্চল,
সবল নির্ব্বল রিক্ত, বিকৃতি বিকল!
শোক তাহে অকারণ, রুদ্রদেব নিষ্করুণ, জানে সর্ব্বজন,
তবু কেন প্রাণ কাঁদে, হারাইলে হৃদি-চাঁদে, নিত্য সর্ব্বক্ষণ?
একি শুধু মিথ্যা মায়া? সত্যের নাহিক ছায়া? বৃথা শোকানল?
অথবা কর্ম্মের ফল, ধর্ম্মের শাসন-বল, রুদ্র রোষানল!
কাল-চক্রে আবর্ত্তিত, নিত্য হয় কত শত, পাপী পুণ্যবান্।
আসে যায় নানা বেশে, মুক্তি পায় অবশেষে, যারা ভাগ্যবান্।
মৃত্যু নয়, মুক্তি তব, নব অভ্যুদয়,—
অনাদি অনন্ত তুমি, হলে মৃত্যুঞ্জয়।
এসেছিলে মর্ত্ত্যধামে, গিয়াছ স্বধামে,
ঐশ্বর্য্য বিভূতি লয়ে থাক দিব্যধামে ;
অনন্ত অক্ষয় হোক্ ঐশ্বর্য্য তোমার,
অমল বিমল যথা বিভূতি হোতার।
চির জয়ী হও, সাধি' সাধন-সমর,
জন্ম-মৃত্যু জয় করি' অজর অমর।

আলোচনা

ব্যাকরণ-বিভ্রাট

পূর্ব্বে 'শক্ত' ও 'কম' সম্বন্ধে কিছু বলা হইয়াছে। এক্ষণে 'অনেক' শব্দটির ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু বলিব।

'অনেক' (=ন এক) দুই, তিন, বা তদূর্দ্ধ-সংখ্যাবাচক শব্দ, অতএব দ্বি বা বহুবচন।

ব্যাকরণকৌমুদী-সম্পাদকগণের মধ্যে প্রায় কেহই এই 'অনেক' শব্দটির উল্লেখ করেন নাই।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'সংস্কৃত-ব্যাকরণের উপক্রমণিকা'-নামক পুস্তকের ৭০-ম পৃষ্ঠায় এইমাত্র বলিয়াছেন যে, 'অনেক' শব্দ বহুবচন এবং তিন লিঙ্গেই 'সর্ব্ব' শব্দের তুল্য।

পণ্ডিত নৃসিংহরাম মুখোপাধ্যায় কাব্যসিন্ধু মহাশয়ও তাঁহার 'ব্যাকরণ-সোপান'-নামক পুস্তিকার ৮২-ম পৃষ্ঠায় উক্ত প্রকার বলিয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার ৺ভাগবতকুমার শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার 'নব্যকৌমুদী' নামক পুস্তকের ১০০-ম পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন যে, 'অনেক' শব্দ একবচন, কিন্তু বহুশ্রেণী বুঝাইলে বহুবচন, তখন সমাসভেদে সর্ব্বনাম ও অসর্ব্বনাম দুই-ই হয়।

পণ্ডিত সারদারঞ্জন রায় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত 'উপক্রমণিকা'র ৭৪-ম পৃষ্ঠায় নিম্নোক্তপ্রকার লেখা আছে—

"অনেক" শব্দ একবচনান্ত। 'ন ব্রাহ্মণঃ' এই বাক্যে সমাস করিলে 'অব্রাহ্মণঃ' এই শব্দ হইবে; ইহা একবচন, কারণ বাক্যে 'ব্রাহ্মণঃ' একবচনে আছে। 'ন বৃক্ষাঃ' এই বাক্যে 'অবৃক্ষাঃ' শব্দ বহুবচনে হইবে, কারণ বাক্যে 'বৃক্ষাঃ' বহুবচন আছে। এইরূপ 'ন একঃ' এই বাক্যে 'অনেকঃ' একবচনে হইবে। প্রমাণ, পাণিনি স্বয়ং "অনেকমন্যপদার্থে" এই সূত্রে একবচনে 'অনেকম্' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। "মনোরমা" গ্রন্থে ভট্টোজি দীক্ষিত বলেন, বহুবচন করিতে হইলে, 'অনেকশ্চ অনেকশ্চ অনেকশ্চ' এইরূপ একশেষ করা আবশ্যক।"

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'সংস্কৃত-ব্যাকরণ-প্রবেশিকা' নামক যে একখানা পুস্তক বাহির হইয়াছে, তাহার ১২০-ম পৃষ্ঠায় ১০৯নং সূত্রে যাহা আছে, নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"'এক' শব্দ সর্ব্বনাম বলিয়া তদন্ত নঞ্-তৎপুরুষ-সমাস-নিষ্পন্ন 'অনেক' শব্দও সর্ব্বনাম, উহার রূপ 'সর্ব্ব' শব্দের ন্যায়। বৈয়াকরণদের মতে এই 'অনেক' শব্দ একবচন; অনেকশ্চ চকার আদৌ (যুক্তে) বার্ণেবাণস্য খণ্ডনম্, অনেকেষাং ইত্যাদিষ্বপি যথে অনেকঃ সমাসঃ সম্ভবতি, বহুবচনেও 'অনেক' শব্দের ভূরি প্রয়োগ আছে—

বেদৈঃ অনেকৈঃ অহমেব বেদ্যঃ, ভবন্ত্যনেকে জলধেরিবোর্ম্ময়ঃ।"

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বনমালি বেদান্ততীর্থ মহাশয় তাঁহার 'ব্যাকরণসার' নামক পুস্তকে 'অনেক' শব্দটিকে একবচন বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং বহুবচনেও ইহার ভূরি প্রয়োগ আছে, এই প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন।

পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ীর মধ্যেও 'অনেক' শব্দটি একবচন হিসাবে প্রযুক্ত হইয়াছে, যথা 'অনেকমন্যপদার্থে'। (পা-২।২।২৪)।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং নৃসিংহরাম মুখোপাধ্যায়, এই পণ্ডিতদ্বয়ের মত অন্য কাহারও সঙ্গে খাপ খাইতেছে না।

পণ্ডিতপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাঁহার উপক্রমণিকার মধ্যে 'অনেক' শব্দটিকে বহুবচন বলিয়াই মাত্র ঘোষণা করিয়াছেন।

এ স্থলে বলা বাহুল্য যে, শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় এবং মুখোপাধ্যায়, এই পণ্ডিতদ্বয় আসল 'উপক্রমণিকা' দৃষ্টেই তাঁহাদের স্ব স্ব পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন, পরন্তু 'অনেক' শব্দের স্থলে ব্যাপারটা তত তলাইয়া দেখেন নাই, অথবা এ বিষয়ে তত খেয়াল করেন নাই।

'অনেক' শব্দটি নঞ্-তৎপুরুষ হিসাবে (ন এক) যখন ধরা হইবে, তখন যুক্তির দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে একবচন বলিয়াই প্রতিভাত হইবে। 'উত্তর-পদার্থপ্রধানস্তৎপুরুষঃ', এখানে উত্তরপদ (এক) একবচন; অতএব উহার প্রাধান্য বশতঃ সমস্ত শব্দটাই একবচন হইবে; উত্তর পদটা সর্ব্বনাম বিধায় সমস্ত পদটাই (অনেক) সর্ব্বনাম হইবে। কিন্তু, যখন বহুব্রীহি হিসাবে (নাস্তি একম্—একত্বং যত্র) ধরা হইবে, তখন একবচনে থাকিলেও সর্ব্বনাম হইবে না, কাজেই 'অনেকে' 'অনেকেষাং' প্রভৃতি রূপ হইতে পারিবে না।

যে স্থলে 'অনেক' শব্দটি বহুবচনে ধরা হয়, সে স্থলে একশেষ দ্বন্দ্ব হিসাবে মানিয়া লওয়া হয় বটে, কিন্তু এই প্রকার গণ্ডগোলের মধ্যে না গিয়া 'অনেক' শব্দ একবচনে ধরাই ভাল বলিয়া মনে হয়। সাধারণতঃ, 'অনেক' শব্দটা উচ্চারিত হইলেই নঞ্-তৎপুরুষের কথা আগে মনে পড়ে। একশেষ-দ্বন্দ্বটা কবি বা লেখকগণ কর্ত্তৃক বহুবচনে প্রযুক্ত স্থানগুলির সহায়করূপে (in support) রাখিলেই ভাল হয়।

বর্ণমালার অনুস্বার (ং) এবং বিসর্গের (ঃ) প্রকৃত স্থান কোথায়, এই প্রসঙ্গে সে বিষয়েও একটু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

ছেলেবেলা 'অ' 'আ' 'ক' 'খ' শিখিবার সময় পাঠশালার পণ্ডিত মহাশয় স্বর বর্ণের পর অর্থাৎ 'অ'র পর 'অং' 'অঃ' রূপে অনুস্বার বিসর্গ শিখাইয়াছেন।

আধুনিক প্রথম শিক্ষার জন্য যে সকল ছাপার পুস্তক পাওয়া যায়, তাহাদের প্রায় প্রত্যেক খানাতেই স্বরের পর অনুস্বার বিসর্গ না রাখিয়া ব্যঞ্জন অর্থাৎ 'হ' এর পরে রাখা হইয়াছে।

১৯১২ সংবতের অর্থাৎ ১২৬২ সালের বৈশাখমাসে "বর্ণপরিচয়ে"র বিজ্ঞাপনে স্বনাম-খ্যাত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন :—…"সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে অনুস্বার ও বিসর্গ স্বরবর্ণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। এই জন্য ঐ দুই বর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে পঠিত হইয়াছে…।"

এই প্রকার বলার পর "বর্ণপরিচয়ে" তথা "ব্যাকরণকৌমুদী" এবং "উপক্রমণিকা"র অনুস্বার-বিসর্গকে স্বরবর্ণের অব্যবহিত পরে না রাখিয়া ব্যঞ্জনের শেষেই রাখিয়াছেন। কিন্তু, উক্ত বর্ণ দুইটিকে ব্যঞ্জন হিসাবে ধরিলেও উহাদিগকে 'ক' 'খ' এর ন্যায় স্বরের অব্যবহিত পরেই না রাখিয়া ব্যঞ্জনের শেষে কেন রাখা হইল, তাহা কোন যুক্তিদ্বারা বুঝান হয় নাই।

"প্রাথমিক সংস্কৃত-ব্যাকরণ"-লেখক সারদারঞ্জন রায় বিদ্যাবিনোদ, উমেশচন্দ্র গুপ্ত, মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র বিদ্যারত্ন, চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, শরৎচন্দ্র ভাগবত শাস্ত্রী, ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভৃতি পণ্ডিত মহোদয়গণ তাঁহাদের স্ব স্ব পুস্তকে অনুস্বার (ং) বিসর্গ (ঃ) স্বরবর্ণের পর না রাখিয়া প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অনুসরণ করিয়াছেন।

মাহেশ্বর-সূত্রে অনুস্বার বিসর্গ নাই। সম্ভবতঃ, এই কারণেই কোন কোন আধুনিক বৈয়াকরণ লিখিয়াছেন,—"ন্ ও ম্ স্থানে অনুস্বার এবং স্ ও র্ স্থানে বিসর্গ হয় বলিয়া উহাদিগকে (ং, ঃ কে) পৃথক্ বর্ণ হিসাবে ধরা হয় নাই।"

কিন্তু, একটু বিবেচনা করিলেই উক্ত কথাটী নেহাত ভুল বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। কোন কোনও কারণে 'ই' স্থানে 'য,' 'উ' স্থানে 'ব' ইত্যাদি হয় ; কিন্তু কখনও 'ই' স্থানে একটা 'M' অথবা 'উ' স্থানে একটা 'আলেফ' হয় না,— অর্থাৎ যে কোনও নিমিত্তেই হউক, একটা বর্ণের স্থানে যে আর একটা বর্ণ হয়, সে বর্ণ-টা বর্ণমালার ভিতরেও থাকে ; নতুবা আসে কোথা হইতে ?*

সীতানাথ বসাক মহাশয় (ঢাকা) "আদর্শলিপিতে" স্বরের পর "অং" "অঃ" রূপে অনুস্বার বিসর্গ রাখিয়াছেন ; ব্যঞ্জনের শেষে রাখেন নাই।

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের পাঠ্য হিসাবে 'সংস্কৃত ব্যাকরণ-প্রবেশিকা' নামক যে একখানা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, উহার ১ম পৃষ্ঠায় আছে,—"বর্ণমালা—অ আ…ও ঔ (স্বর)। 'ং,' 'ঃ' (অযোগবাহ ব্যঞ্জন)। ক্ খ্…স্ হ্ (ব্যঞ্জন)।" এখানে 'ং' 'ঃ' কে স্বরের পরে রাখার কারণ উক্ত পুস্তকেরই তৃতীয় পৃষ্ঠায় ৩ নং সূত্রে এবং পাদটীকায় বলা হইয়াছে।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বনমালি বেদান্ততীর্থ মহোদয়ের 'ব্যাকরণসার' নামক পুস্তকের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত প্রকার আছে—

"…অনুস্বার (ং) ও বিসর্গ (ঃ), ইহারা সাধারণতঃ ব্যঞ্জন বর্ণ বলিয়া গণ্য হয়। পূর্ব্বে ইহারা অং অঃ রূপে স্বর ও ব্যঞ্জনের মধ্যে পঠিত হইত। অনুস্বার বিসর্গের ন্যায্য স্থান স্বর ব্যঞ্জনের মধ্যে। এই জন্য অভিধানে 'ক' এর পূর্ব্বে 'ং' 'ঃ' থাকে ; 'অংশ, অংসে', প্রভৃতি শব্দ 'অকথা', 'অকিঞ্চন' প্রভৃতির এবং 'পরঃশত' শব্দ 'পরকীয়' শব্দের পূর্ব্বে থাকে (শব্দার্থ-মঞ্জরী)। বৈয়াকরণেরা কোন কোন বিষয়ে (গত্ব) ইহাদের স্বর বলিয়া গণ্য করেন। এ জন্যও ইহাদিগকে স্বরের শেষে পাঠ করার প্রাচীন রীতি যুক্তিযুক্ত।"

পূজা, উপাসনায় প্রচলিত মাতৃকান্যাস এবং অন্তর্মাতৃকান্যাসেও অনুস্বার বিসর্গের স্থান স্বরের পর ব্যঞ্জনের পূর্ব্বে করা হইয়াছে ; "ললাটে ওঁ অং নমঃ। মুখবৃত্তে ওঁ আং নমঃ, … … অধোদন্তপংক্তৌ ওঁ ঔংনমঃ, ব্রহ্মরন্ধ্রে ওঁ "অং", মুখে ওঁ "অঃ" নমঃ।"

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, ব্যঞ্জনের পর অনুস্বার বিসর্গ রাখার কোন যুক্তিই পাওয়া যায় না, কিন্তু স্বরের পরে রাখার কিছু যুক্তি মিলিয়াছে।

ব্যঞ্জন বর্ণের পরে, স্বর যোগ করতঃ উহাদিগকে শিখান হয় ক, খ (=ক্+অ, খ্+অ), কিন্তু 'ং' 'ঃ' এর পরে স্বর যোগই করা চলে না ; উহাদের পূর্ব্বে স্বর অবশ্য থাকিবে, অং, অঃ ইত্যাদি।

স্বর নিজে নিজে উচ্চারিত হয় এবং ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত হইয়া তাহাদের উচ্চারণের সাহায্য করে। ব্যঞ্জন বর্ণ এবং 'ং' 'ঃ' এই দুই বর্ণ নিজে নিজে উচ্চারিত হইতে পারে না। এক্ষণে ব্যঞ্জন এবং অনুস্বার বিসর্গের মধ্যে তফাত এই দাঁড়াইল যে, ব্যঞ্জনের পূর্ব্ব ও পর এই-উভয় দিকের যে কোনও দিকেই একটা স্বর থাকিলে উচ্চারণ করা চলে (অরূপ, কারণ) ; কিন্তু অনুস্বার বিসর্গের উচ্চারণ করিতে হইলে সর্ব্বদাই উহাদের পূর্ব্বে একটি স্বরের প্রয়োজন। উহাদের পূর্ব্বে স্বর না থাকিয়া পরেমাত্র থাকিলে উচ্চারণ হয় না। অংশ, ধনুঃবি, পয়ঃশত, অন্তঃ ; কিন্তু ং আক বা ঃঈশ—?।

এই প্রকারে দেখা গেল, অনুস্বার (ং) বিসর্গ (ঃ) ব্যঞ্জন হইলেও সাধারণ ব্যঞ্জনের মত নহে। এই জন্যই উহাদিগকে বৈয়াকরণেরা 'যোগবাহ' বা 'অযোগবাহ' ব্যঞ্জন বলিয়া থাকেন। স্বরের অব্যবহিত পরে ভিন্ন উচ্চারিত হয় না বলিয়া বর্ণমালায় অনুস্বার বিসর্গের স্থান স্বরের পর ব্যঞ্জনের পূর্ব্বে করাই সমধিক সমীচীন।

শ্রীন[illegible] ভট্টাচার্য্য

* চন্দ্রবিন্দুটী কি, তবে ?—ব. স.

বিজ্ঞান-জগৎ

জীবন সৃষ্টি করা কি সম্ভব ?

—শ্রীসুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী

বহু পুরাকাল হইতেই মানুষ প্রশ্ন করিয়া আসিতেছে, জীবন সৃষ্টি করা সম্ভব কিনা? প্রশ্ন অনেকেই করিয়াছেন, কিন্তু সন্তোষজনক উত্তর কেহই দিতে পারেন নাই। এরূপ চিন্তা করাও বাতুলতা বলিয়া অনেক বৈজ্ঞানিক মনে করিয়া থাকেন।

জীবন সৃষ্টি করা সম্ভব কিনা, এই প্রশ্নের পূর্ব্বে জীবন কি, এই প্রশ্ন স্বতঃই আসিয়া পড়ে। কিন্তু এই প্রশ্নেরও কোন উত্তর নাই। বহু বৈজ্ঞানিক নানাভাবে জীবনের সংজ্ঞা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কোন সংজ্ঞাই এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে নাই। কোন সুনির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা না দিলেও জীবন বলিতে কি বুঝায় তাহার মোটামুটি একটি ধারণা সকলেরই আছে। এক কথায় বলা যাইতে পারে, যাহার ক্ষয়, বৃদ্ধি এবং বংশবিস্তার করিবার ক্ষমতা আছে তাহাতে জীবনেরও অস্তিত্ব বর্ত্তমান।

বর্ত্তমান পাশ্চাত্ত্য জীব-বিজ্ঞান যেরূপ স্তরে আসিয়াছে, তাহাতে অনেক বৈজ্ঞানিক আশা করিতেছেন,—বর্ত্তমানে না হইলেও, কিছুকাল পরে পরীক্ষাগারে জীবন সৃষ্টি করা সম্ভব হইবে। অবশ্য পাঠকেরা, আশা করি, ইহাতে ভাবিয়া বসিবেন না যে, অদূর ভবিষ্যতে কোনও বৈজ্ঞানিক-পরীক্ষাগারে সৃষ্ট মানুষ তাঁহারা দেখিতে পাইবেন। একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণুও যদি কোন বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি করিতে পারেন, তাহা হইলেই তিনি তাহা যথেষ্ট মনে করিবেন।

কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ছিল যে, সকল রোগই কোন না কোন জীবাণুর ক্রিয়ায় ঘটে, কিন্তু বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে যে, অনেক রোগ আছে, যাহারা [illegible] জীবাণুর ক্রিয়ার ফল নহে। ইনফ্যান্টাইল প্যারা[illegible], ইনফ্লুয়েঞ্জা, সর্দ্দি প্রভৃতি এই শ্রেণীর রোগ। যে অবো[illegible] এই সকল রোগ জন্মায়, তাহাদের বলা হয়—'ভীরাস' (virus)। এই ভীরাস কোন প্রকার জীবাণু নহে। অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে প্রাণশক্তির কোন প্রকাশ নাই, অথচ সুবিধাজনক অবস্থায় এই ভীরাস স্বতঃই বৃদ্ধি পাইতে পারে। এই সকল ঘটনা হইতে দেখা যায় যে, জীব ও জড়ের ব্যবধান ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে।

ভীরাসের সঙ্গে এই জাতীয় অপর একটি শ্রেণীর দ্রব্যের উল্লেখ প্রয়োজন। ইহার নাম 'এন্‌জাইম্' (enzyme) তালের রস রাখিয়া দিলে তাহা গাঁজিয়া গিয়া তাড়ী উৎপন্ন হয়, তাহা সকলেই জানেন। এই প্রক্রিয়া যে বস্তুর ক্রিয়ায় সংঘটিত হয়, তাহাকে 'এন্‌জাইম্' বলা হয়। সংস্কৃত ভাষায় এন্‌জাইম্‌কে 'কিণ্ব' বলা হয়। ইহাই অবশ্য এন্‌জাইমের একমাত্র ক্রিয়া নহে। এন্‌জাইমের সংখ্যাও বহু এবং প্রত্যেক এন্‌জাইমের ক্রিয়াও স্বতন্ত্র।

এককালে এন্‌জাইম্‌কে অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ্‌জাতীয় কোন বস্তু বলিয়া মনে করা হইত। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার ফলে দেখা যায় যে, ভীরাস এবং এনজাইম, এই দুই শ্রেণীর বস্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে একটি বিশুদ্ধ রাসায়নিক দ্রব্য। কোন মূল পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশকে বলা হয় পরমাণু; কয়েকটি পরমাণু মিলিত হইয়া একটি অণুতে পরিণত হয়। সাধারণতঃ কোন অজৈব পদার্থের একটি অণুতে অধিক সংখ্যক পরমাণু থাকে না—উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, জলেতে মাত্র তিনটি পরমাণু আছে, হাইড্রোজেনের দুইটি এবং অক্সিজেনের একটি। ভীরাস প্রভৃতির অণুতে পরমাণুর সংখ্যা কয়েক সহস্রের কম নহে, সুতরাং ইহার গঠনও অত্যন্ত জটিল। জীবদেহের প্রধান উপাদান প্রোটিন ইহা বোধ হয় সকলেই জানেন। প্রোটিন ব্যতীত জীবনের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং প্রোটিনকে জীবনের আধার বলা যাইতে পারে। ডিমের

শাদা অংশ 'অ্যালবুমীন', রক্তের লাল অংশ 'হেমোগ্লোবিন' প্রভৃতি প্রোটিন। ভীরাস, এনজাইম ও প্রোটিনের রাসায়নিক গঠন অনুরূপ এবং সকলগুলির অণুই অত্যন্ত জটিল

কোন বস্তুর রাসায়নিক গঠন জানা থাকিলে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে তাহা গড়িয়া তুলিতে পারেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ভীরাস অত্যন্ত জটিল একটি রাসায়নিক পদার্থ, এখন এই রাসায়নিক পদার্থের গঠন সঠিক জানিতে পারিলেই ভীরাস—তথা জীবন সৃষ্টি করা সম্ভব হইতে পারে। পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে ভীরাসে জীবনের কোন চিহ্ন আছে বলিয়া বোধ হয় না, সুতরাং ভীরাস জীব কি জড় এই প্রশ্নের উত্তর দিকই আলোচনা করা প্রয়োজন।

কিছুদিন পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিকেরা মনে করিতেন যে, ভীরাস ও ব্যাক্‌টিরিয়ার ক্রিয়া একই প্রকারের, কারণ দুইই রোগের জন্মদাতা, এক দেহ হইতে অন্য দেহে সংক্রামিত হইতে পারে এবং সুবিধাজনক অবস্থায় অসংখ্যগুণ বৃদ্ধি পাইতে পারে। ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভীরাস একটি মাত্র অণু কিন্তু একটি ব্যাকটিরিয়া সহস্র সহস্র বিভিন্ন অণুর সমষ্টি। ১ ইঞ্চিতে প্রায় ৫০,০০০ ব্যাকটিরিয়া পাশাপাশি রাখা যায়; সেই স্থানে আয়তন হিসাবে ২,৫০,০০০ হইতে ২৫,০০,০০০ ভীরাস অণু পাশাপাশি রাখিলে ১ ইঞ্চি স্থান অধিকার করে।

ব্যাকটিরিয়ার গঠন সকল প্রাণীর ন্যায় কোষ-মূলক। প্রত্যেক কোষটি একটি আবরণের মধ্যে খানিকটা 'প্রোটোপ্লাজম' বা জীবপঙ্ক ব্যতীত আর কিছুই নহে, সকল জীব ও উদ্ভিদের প্রধান উপকরণ প্রোটোপ্লাজম। কোষের আবরণের মধ্য দিয়া জল, খাদ্য এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অক্সিজেন ব্যাকটিরিয়া গ্রহণ করে এবং কার্ব্বন-ডাই-অক্‌সাইড প্রভৃতি ত্যাগ করে। ব্যাক্‌টিরিয়ার জৈব রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হইবার সময় তাপের সৃষ্টি হয়। ভীরস এই গুলির কিছুই করে না। ব্যাক্‌টিরিয়া বহু অণুর—এবং এই অণুর মধ্যে অধিকাংশ ভীরাসের অণুর মতই জটিল—একটি সুসংবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠীর সম্বন্ধ আবরণই জীবনের প্রকাশ। ভীরাসকে এই গোষ্ঠীর সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র অংশ মনে করা যাইতে পারে।

দেহের রোগগ্রস্ত অংশ হইতে সেই রোগের ভীরাস সম্পূর্ণভাবে পৃথক্ করিয়া দানাদার অবস্থায় পাওয়া যাইতে পারে। এই দানাগুলি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ভীরাসের সমষ্টিমাত্র। এই বিশুদ্ধ রাসায়নিক দ্রব্য আপনা আপনি কোনরূপে বৃদ্ধি পাইতে পারে না, কিন্তু কোন সুস্থ জীবের দেহে প্রবেশ করিলে সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায় এবং রোগের সৃষ্টি করে। বৈজ্ঞানিকদের বর্ত্তমান জ্ঞান অনুসারে ভীরাসের জন্ম এবং স্থিতির জন্য জীবদেহ প্রয়োজন।

কেহ কেহ মনে করেন যে, জীবদেহে কোষের ক্রিয়ায় হঠাৎ কোন একটি প্রোটিন অণু সামান্য একটু পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এইরূপে অজ্ঞাত কারণে প্রাপ্ত নূতন অণুর গঠন প্রোটিনেরই অনুরূপ, কিন্তু প্রকৃতি এক নহে। আকস্মিক ঘটনায় জাত এই অণু ভীরাসের অণু ছাড়া আর কিছুই নহে। কোষের মধ্যে একবার ভীরাসের সৃষ্টি হইলে অথবা বাহির হইতে প্রবিষ্ট হইলে ফল একই—দ্রুত-গতিতে ভীরাসের প্রসার এবং রোগের সৃষ্টি।

একটি পরীক্ষায় কয়েকটি খরগোসের কাণে নানা প্রকার জটিল রাসায়নিক দ্রব্যের প্রলেপ কিছুদিন দিবার পর উহাদের কানে 'কানসার' রোগ জন্মাইতে দেখা গেল। বৈজ্ঞানিকরা অনুমান করেন যে, রাসায়নিক উত্তেজনার ত্বকের কোন কোষের মধ্যে হঠাৎ সামান্য পরিবর্ত্তনের ফলে কোষের রাসায়নিক ক্রিয়ার কোন পরিবর্ত্তন ঘটে এবং এই পরিবর্ত্তনের ফলে প্রোটিন হইতে ভীরাস সৃষ্টি হয়। একবার ভীরাস সৃষ্টি হইলে আর রক্ষা নাই; একটি মাত্র ভীরাস অণু সমগ্র কোষের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া পুরাদমে আরও ভীরাস সৃষ্টি করিতে থাকে এবং ক্রমে দেহের অংশবিশেষে রোগ পরিস্ফুট হইয়া পড়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভীরাস বাহির হইতে জীবদেহে প্রবিষ্ট হইলে তবে রোগ দেখা দেয়। সর্দ্দিগ্রস্ত ব্যক্তির নাক হইতে ভীরাস সংগ্রহ করিয়া অন্য ব্যক্তির নাকে তাহা দিলে সর্দ্দি হইতে দেখা যায়। যেরূপ ভাবেই দেহে ভীরাসের আগমন হউক না কেন দেখা যাইতেছে যে, উহা প্রথমে একটি কোষ এবং পরে অন্য কোষ আক্রমণ করে। এখন প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে চলাচল করিবার এই ক্ষমতা জীবনের লক্ষণ কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, চলাচলের ক্ষমতা মাত্র জীবনের

লক্ষণ নহে। বহু নিষ্প্রাণ অণু দেহের এক অংশ হইতে অন্য অংশে চলাচল করে।

এ পর্যন্ত যাহা বলা হইল তাহাতে বোধ হইতে পারে যে, ভীরাসকে প্রকৃতপক্ষে জীব বলা চলে না কিন্তু সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহার বিপরীতই সত্য বলিয়া বোধ হইবে। জীবের যাহা যাহা প্রধান গুণ—বৃদ্ধি, বংশবিস্তার এবং অন্য ক্ষুদ্রতর অণুর উপর প্রভাব-বিস্তার—ঐ গুলিকে জীবনের লক্ষণ ব্যতীত আর কিছু মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। জীবের আরও একটি প্রধান গুণ, তাহা আকস্মিক এবং অজ্ঞাত কারণে সামান্যরূপ পরিবর্তিত হইতে পারে। বিবর্তনবাদে এইরূপ পরিবর্তনকে বলা হয় 'মুটেশন' (mutation); সমগ্র বিবর্তনবাদ এই মুটেশন-এর উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মুটেশনের কোন ফলে কোন ভীরাস আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের দ্বারা নূতন দ্রব্যে রূপান্তরিত হয়। বসন্ত রোগ অত্যন্ত মারাত্মক রোগ, কিন্তু বসন্তের ভীরাস গরুর দেহে প্রবিষ্ট হইলে, উহা এরূপভাবে পরিবর্তিত হয় যে, গরুর দেহ হইতে পুনরায় মনুষ্যদেহে প্রবিষ্ট হইলে বসন্তের মারাত্মকতা আর থাকে না এবং তখন মনুষ্যদেহে বসন্ত প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা সহজেই লাভ করা যায়। কেহ কেহ মনে করেন যে, ইনফ্লুয়েঞ্জা, বসন্ত প্রভৃতি রোগ সময়ে সময়ে যে অত্যন্ত তীব্রভাবে দেখা দেয়, তাহার কারণ ভীরাসের মধ্যে এই জাতীয় কোন পরিবর্তন, যাহার ফলে উহা সাধারণ অবস্থা অপেক্ষা অধিকতর মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায়। ভীরাসের যে জীবন আছে, ইহার বিরুদ্ধে আরও একটি যুক্তি দেওয়া হয় যে, পূর্বে যেখানে জীবনের অস্তিত্ব আছে, মাত্র সেই স্থান হইতেই ভীরাসের উৎপত্তি সম্ভব। এই যুক্তি মানিতে হইলে, বিজ্ঞান-জগতের লেখক অথবা পাঠকপাঠিকা কেহই জীবিত নহে বলিতে হয়।

জীবন কাহাকে বলে, জীবনের লক্ষণ কি কি, ইহার যখন কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব হয় নাই তখন কোন একটি বিশেষ বস্তু জীব কি জড় এই প্রশ্নের সমাধান অত্যন্ত দুরূহ। অধিকন্তু ভীরাস সম্পূর্ণ নূতন আবিষ্কার। জীবনের যে-সকল লক্ষণ প্রচলিত বা সর্বজনমান্য তাহা ইহার পক্ষেও যে প্রযোজ্য হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। জীব ও জড়ের সীমারেখা কোন নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নহে। ঠিক কোন মুহূর্তে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে তাহা কেহই নিশ্চিতভাবে বলিতে পারে না। জীবের মৃত্যুর পরে দেহের বহু অংশ সক্রিয় থাকে এবং উপযুক্ত প্রক্রিয়া ও পরিচর্যার ফলে দেহের অংশবিশেষ সমগ্র দেহের মৃত্যুর পরও বহুদিন বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব।

সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে বলিতে হয় যে, ভীরাস সম্পূর্ণ জীব ও সম্পূর্ণ জড়ের মাঝামাঝি কিছু। ইহাতে জীবনের অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করা চলে না। তাপ উৎপাদন এবং অক্‌সিজেন গ্রহণ ব্যতীত জীবনের সকল লক্ষণই ইহাতে বর্তমান সুতরাং বর্তমান জ্ঞানানুযায়ী ইহাকে ব্যাকটিরিয়া অপেক্ষা নিম্নতর শ্রেণীর জীব বলিয়া অভিহিত করাই সঙ্গত।

গ্রিন নামে বৈজ্ঞানিকের মতে ভীরাস জটিলতর জীবের অবশেষ এবং কাউড্রির মতে প্রোটিনের সামান্য আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনে ভীরাসের জন্ম। জীবকোষের প্রোটিন ও ভীরাসের গঠনের মধ্যে এত অল্প পার্থক্য যে অত্যন্ত সূক্ষ্ম রাসায়নিক বিশ্লেষণ ব্যতীত ইহাদের প্রভেদ বুঝা যায় না। গ্রিন এবং কাউড্রি দুই জনের মতবাদেই ধরা হইয়াছে যে, জটিলতর প্রোটিন হইতে সরলতর ভীরাস উৎপন্ন হয় কিন্তু ইহাও কল্পনা করা যাইতে পারে যে, ভীরাসের সামান্য পরিবর্তনে প্রোটিন জন্ম লাভ করে।

ভীরাস ও এনজাইম-এর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। উপযুক্ত দ্রবণে এবং অনুকূল অবস্থায় এনজাইম নানাপ্রকার জটিল অণুকে ভাঙ্গিয়া সরলতর খণ্ডে পরিণত করে। কিন্তু এনজাইমের ক্রিয়া কেবল মাত্র ভাঙ্গনেই শেষ হয় না। প্রথমে যে সকল অংশ পাওয়া গেল এনজাইম পুনরায় তাহা সংযুক্ত করিয়া নূতন নূতন দ্রব্য প্রস্তুত করে। এই প্রকার বিশ্লেষণ এবং সংশ্লেষণ ছাড়া অল্পদিন হইল দেখা গিয়াছে যে, এনজাইম অনেক রাসায়নিক দ্রব্যের সামান্য আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন সংঘটিত করিতে সমর্থ হয়। কোন একটি প্রোটিনের অণুতে বহু সহস্র পরমাণু বর্তমান; এই পরমাণুগুলি ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠী সৃষ্টি করে এবং এই প্রকার সকল গোষ্ঠীর সমবায় প্রোটিনের অণু। এই গোষ্ঠীর মধ্যে সামান্য পরিবর্তনের ফলে সমগ্র প্রোটিন অণুর প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে। অনেক সময়ে প্রোটিন অণুটি অধিকতর সক্রিয় অথবা

অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়। কোন কোন এনজাইম কোন পরমাণু বা পরমাণু-গোষ্ঠীকে এক দ্রব্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্য দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেয়। এই সকল ব্যাপার ছাড়াও এনজাইম বহু প্রকার ক্রিয়া করিতে পারে। ইহারা বহু প্রকার পরমাণুগোষ্ঠীর সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করিতে পারে এবং অধিকন্তু একই এনজাইম সেই প্রকার এনজাইম সৃষ্টি করিতে পারে। এই হিসাবে ইহার গুণ ভাইরাসের অনুরূপ।

এনজাইমের সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ধর্ম, ইহার স্বয়ংভূতা; সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় অণু হইতে ক্রিয়াশীল এনজাইম অণুর উৎপত্তি সত্যই বিস্ময়কর। এনজাইমতত্ত্ব-বিশেষজ্ঞ ডক্টর নর্থরপ মনে করেন যে, কোন কোন ভাইরাস প্রকৃতপক্ষে এনজাইম। যাঁহারা এনজাইমতত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণা করিতেছেন তাঁহারা মনে করেন যে, ইহাই প্রকৃতপক্ষে জীবনের উপাদান। বহু এনজাইমের ধর্ম দেখিয়া তাহাদের 'জীবন্ত অণু' বলা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

'জীবন্ত অণু' ও জীবন্ত কোষ, এই দুইয়ের প্রভেদ কিন্তু যথেষ্ট। একটি কোষে অসংখ্য অণু বর্ত্তমান। একটি কোষ হইতে যখন অপর একটি কোষ জন্ম লাভ করে, তখন কোষের প্রত্যেকটির অংশের প্রতিরূপও সঙ্গে সঙ্গে জন্ম পরিগ্রহ করে। জীবন্ত অণু—তাহা এনজাইমই হউক বা ভাইরাসই হউক, কেবলমাত্র সেই প্রকার অণুর সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু একটি কোষ হইতে সমগ্র পরমাণুগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়।

এনজাইমের অণু একটি বিরাট আকারের অণু, অণুবীক্ষণে যে ক্ষুদ্রতম আকার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা অপেক্ষা সামান্য ছোট; উপযুক্ত দ্রবণে রাখিলে এনজাইমের অণু এবং অনুরূপ আকারের অন্য অণু, ক্ষুদ্রতর অণু, অণুর ভগ্নাংশ বা পরমাণুকে আকর্ষণ করে। এইরূপ আকর্ষণের ফলে একটি অণুর চতুর্দ্দিকে একটি ক্ষুদ্র জগৎ গড়িয়া উঠিয়া একটি অণুগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। এই ভাবে বিভিন্ন প্রকার অণুর চতুর্দ্দিকে জটিলতর গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয় এবং পরে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সমবায়ে একটি সম্পূর্ণ কোষ নির্ম্মিত হয়। জড় অণু হইতে এইরূপে কোষ-সৃষ্টি হয়। কোষ সকল জীবের ক্ষুদ্রতম অংশ।

একটি আবরণের মধ্যে আবদ্ধ কয়েকটি আলগাভাবে সংযুক্ত এনজাইম অণুর সমবায়ে গঠিত একটি কোষ অন্য কোষের সহিত সংযুক্ত করিয়া জীব-সৃষ্টির কল্পনা করা যাইতে পারে।

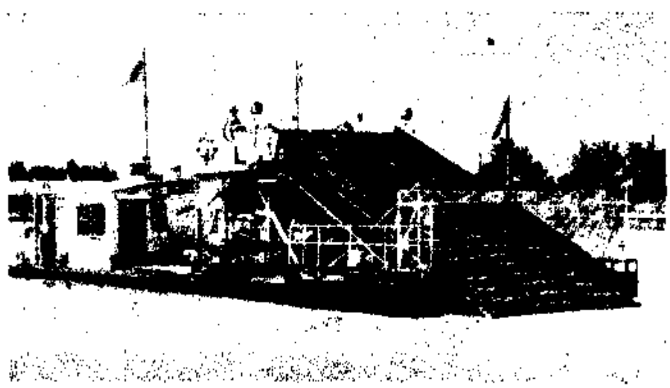
জীব ও জড়ের মধ্যে যে সীমারেখা ছিল, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকেরা তাহা আর সত্য বলিয়া মনে করেন না। কতকগুলি ইলেকট্রন, প্রোটন প্রভৃতি মিলিয়া সৃষ্টি হইল পরমাণুর, পরমাণুর সংযোগ পাওয়া গেল অণু, এই অণুর মধ্যে কতকগুলি ভাইরাস বা এনজাইম-জাতীয়। এই এনজাইম অণুর সংযোগে সৃষ্টি হইল কোষময় প্রোটিন বা জীবনের আধার। সুতরাং বর্ত্তমান মতে জীব ও জড়ের পার্থক্য প্রকৃতিগত নহে এবং উহাদের মধ্যে কোন ব্যবধান নাই, জড় হইতে ধাপে ধাপে ধীরে ধীরে জীবনের সৃষ্টি হইতেছে। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ কোষময় জীবনের ঠিক পূর্ব্ব ধাপ পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছাইয়াছেন। ইহার পরে কতদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইবে ভবিষ্যৎ কালই তাহা বলিতে পারে।

কচুরিপানা ধ্বংস করিবার উপায়

কচুরিপানার অত্যাচার বাঙালী মাত্রেরই জানা আছে। অনেকের ধারণা আছে যে, কচুরিপানা প্রধানতঃ বাংলাদেশেরই সম্পত্তি। অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার বহুস্থানে কচুরিপানার অত্যাচারে অনেক নদী এবং খাল নৌকাচলাচলের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া গিয়াছে। ইহা অষ্ট্রেলিয়া হইতে বাংলা দেশে আসিয়াছে। কচুরিপানার ফুল দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া জনৈক সাহেব অষ্ট্রেলিয়া হইতে ইহা এদেশে আনেন এবং তাহা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া কচুরিপানা এখন বাংলাদেশের সর্ব্বত্র ছাইয়া গিয়াছে। সাহেবের নাম ছিল মর্গ্যান—সেইজন্য কচুরিপানার একটি নাম 'Morgan's weed'।

কচুরিপানা ধ্বংস করিবার জন্য এদেশে নানাপ্রকার তথাকথিত বৈজ্ঞানিক উপায় চেষ্টা করা গিয়াছে, কিন্তু সোজাসুজি জল হইতে তুলিয়া ফেলা অপেক্ষা অধিকতর সুবিধাজনক কোন উপায় অদ্যাবধি সফল হয় নাই। অষ্ট্রেলিয়াতেও এই ভাবে কচুরিপানা তুলিয়া ফেলা হয় এবং পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে আর্সেনিক-ঘটিত (আর্সেনিক—সেঁকো বিষ) ঔষধ-প্রয়োগে কচুরিপানা মারিয়া ফেলা হইত। আর্সেনিক অত্যন্ত তীব্র বিষ সুতরাং যাহারা এই ঔষধ প্রয়োগ করিত তাহাদের এবং জলচর মাছের পক্ষে ইহা বিশেষ

বিপজ্জনক-বোধে আর্সেনিক প্রয়োগ বহুলাংশে বন্ধ করা হইয়াছে। অনেক চেষ্টার পর সংপ্রতি একটি কলের নৌকা-সাহায্যে কচুরিপানা তুলিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নৌকাটির নাম 'কেনী' (Kenny), দুইটি ডিজেল-ইঞ্জিন-



এই কলের নৌকার সাহায্যে কচুরিপানা ধ্বংস করা হয়।

চালিত ২৫ অশ্বক্ষমতায় মোটরে নৌকাটি চলে। নৌকাটির সামনে একটি সচল সিঁড়ির মত বস্তু আছে, ইহা জলের ২ ফুট নীচে পর্যন্ত বিস্তৃত। নৌকাটি কচুরিপানার মধ্য দিয়া চালিত করিলে ইহাতে কচুরিপানা আটকাইয়া যায় এবং সিঁড়িটি চলিতে থাকিলে আস্তে আস্তে উপরে উঠিয়া যায় এবং সেখানে একটি কলের মধ্যে সম্পূর্ণ পিষ্ট হইবার পর তাহা পুনরায় জলে ফেলিয়া দেওয়া হয়। আরও কিছুকাল দেখিয়া ইহার সাফল্য সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হইলে এই ধরণের আরও নৌকা নির্মিত হইবে এবং আর্সেনিক-প্রয়োগ একেবারে বন্ধ করা হইবে বলিয়া প্রকাশ। আমাদের দেশেও এইরূপ না হইলেও অনুরূপ কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে কিনা-চেষ্টা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

কৃত্রিম সূর্য্যালোক

মানুষ যতদিন হইতে আলোক জ্বালিতে শিখিয়াছে ততদিন হইতেই সূর্য্যালোকের অনুরূপ আলোক সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিতেছে। সাধারণ বিজলি-বাতিতে সূর্য্যালোক অপেক্ষা অধিক লাল এবং অল্প ভায়লেট আলো থাকায় হলদেটে দেখায়। কিছুদিন পূর্বে নিয়ন ল্যাম্পের (বিজ্ঞাপনে যে সকল উজ্জ্বল আলো ব্যবহৃত হয়) মত বাতির মধ্যে কার্বণ-ডাই-অক্সাইড গ্যাস পুরিয়া বিদ্যুৎ চালনা করিয়া সূর্য্যালোকের প্রায় অনুরূপ গুণসম্পন্ন আলোক পাওয়া গিয়াছে। ইহার অবশ্য কোন ব্যাপক ব্যবহার আজও আরম্ভ হয় নাই। সম্প্রতি কৃত্রিম সূর্য্যালোক সৃষ্টি করিবার আরও একটি নূতন পদ্ধতির বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। বিখ্যাত ওয়েষ্টিংহাউস কোম্পানীর তিনজন গবেষক টেলুরিয়াম বাষ্প হইতে আলোক-নির্গমনের এক ব্যবস্থা এক বৎসর চেষ্টার ফলে করিতে সমর্থ হইয়াছেন। টেলুরিয়াম ধাতব ও অধাতব পদার্থের মাঝামাঝি গুণসম্পন্ন একটি মূল পদার্থ। টেলুরিয়াম বাষ্পে অত্যধিক তাপ-প্রয়োগে আলোক বিকিরণ করিলে দেখা যায় যে, উহার বর্ণচ্ছত্র সূর্য্যালোকের বর্ণচ্ছত্রের অনেকটা অনুরূপ। এই বর্ণচ্ছত্র এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত, সাধারণ বাষ্পপূর্ণ বাতির মত কয়েকটি রেখার সমষ্টি নহে। ইংরাজি 'ইউ' অক্ষরের আকারের ন্যায় একটি উল্টান নলের মধ্যে দুইটি প্রান্তে তরল টেলুরিয়াম থাকে এবং নলটির মধ্যে নিয়ন গ্যাস দিয়া ভর্তি করা হয়। তরল টেলুরিয়ামের দুইটি 'টাংষ্টেন্'



টেলুরিয়াম বাষ্প হইতে প্রাপ্ত আলোকে তোলা ছবি।

ধাতুর তার নিমজ্জিত থাকে। এই তারের সহিত বিদ্যুতের তারের সংযোগ করা হয়। বিদ্যুৎ চালনা করিলে প্রথমে নিয়ন গ্যাসের জন্য আলো ও তাপ উৎপন্ন হয়। এই তাপে তরল টেলুরিয়াম বাষ্পে পরিণত হয় এবং উত্তপ্ত হইয়া আলো

দিতে থাকে। বাতির নলটি কাচের না হইয়া স্ফটিক বা 'কোয়ার্টজ' দ্বারা নির্ম্মিত, কারণ উচ্চ তাপে কাচ ও টেলুরিয়ামের মধ্যে রাসায়নিক সংযোগের ফলে কাচ কাল হইয়া যায়। বাতিটি উজ্জ্বল ভাবে জ্বলিবার সময়ে ১৩০০ হইতে ১৫০০ ডিগ্রী ফারেনহাইট উত্তাপ হয়। বর্ত্তমানে ইহা এখনও পরীক্ষাগারের স্তর পার হয় নাই, ভবিষ্যতে হয়ত ইহা দৈনন্দিন ব্যাপারে ব্যবহৃত হইতেও পারে। উদ্ভাবকদের মতে কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে এখন হইতেই ইহা প্রয়োজনে আসিবে।

অভ্রের নূতন ব্যবহার

অভ্র প্রধানতঃ বৈদ্যুতিক যন্ত্রে বিদ্যুতের প্রতিরোধক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সম্প্রতি দেখা গিয়াছে যে, একপ্রকার বিশেষ জাতীয় অভ্র 'ভার্মিকুলাইট' (vermiculite) উত্তপ্ত করিলে উহা আয়তনে বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। ধান হইতে খই এবং সোহাগা হইতে যেরূপ 'খই' পাওয়া যায়, সেইরূপ তাপ দিলে ইহাও বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, আয়তন প্রায় ১৬ গুণ বাড়িয়া যায়, অর্থাৎ সকল দিকে এক ইঞ্চি হইলে, তাপযোগে প্রত্যেক দিক্ প্রায় আড়াই ইঞ্চিতে পরিণত হয়। একটি মার্কিন কোম্পানী এই ভার্মিকুলাইট অভ্র বহু নূতন ব্যবহারে নিয়োগ করিতেছেন। অভ্রের গুণ বহু, ইহা আগুনে পোড়ে না, জলে নষ্ট হয় না, পোকায় কাটে না। অন্য দ্রব্যের সহিত কোন রাসায়নিক



বামে : ভার্মিকুলাইট অভ্রের স্বাভাবিক অবস্থা।
দক্ষিণে : প্রসারণের পর একই পরিমাণ অভ্রের আয়তন।

ক্রিয়া ঘটায় না এবং তদুপরি, ব্যবহারে কোন বিপদ্ বা অসুবিধা নাই, বিদ্যুতের প্রতিরোধক ও বহুকাল স্থায়ী। এই অভ্রে শতকরা প্রায় ২০ ভাগ জল থাকে। বিশেষ চুল্লিতে ২০০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট উত্তাপে উত্তপ্ত করিলে ইহার মধ্যস্থিত জলীয় অংশ বাষ্পে পরিণত হয় এবং বাষ্প নির্গমণের ফলে আয়তনে বৃদ্ধি পায়। সাধারণ অবস্থায় ইহার রং ঘোর বাদামী বা কাল। তাপযোগে প্রসারণের পূর্ব্বে ১ ঘন ফুট অভ্রের ওজন প্রায় ১০০ পাউণ্ড, কিন্তু প্রসারণের পরে ১ ঘনফুট-আয়তন অভ্রের ওজন প্রায় ৬ পাউণ্ডে দাঁড়ায়। তাপরোধক ও বিদ্যুদ্-রোধক হিসাবে ইহার বহুল ব্যবহার হইতেছে। ইহার সোনালী বর্ণের জন্য রং হিসাবে ও ওয়ালপেপারের অলঙ্কার হিসাবেও ইহা ব্যবহৃত হইতেছে।

ভবিষ্যতের জন্য

কিছুদিন পূর্ব্বে আমেরিকার অগ্‌লথর্প বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট ডক্টর থর্ণওয়েল জ্যাকবস্ প্রস্তাব করেন যে, একটি ভূপ্রোথিত রুদ্ধ প্রকোষ্ঠে বর্ত্তমান কালের সভ্যতার সকল নিদর্শন রাখিয়া উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক এবং ৮০০০ বৎসরের পূর্ব্বে উহা যেন খোলা না হয়, এরূপ নির্দ্দেশ উহার উপর একটি ফলকে লিখিয়া রাখা হউক। ৮০ শতাব্দী পরে পৃথিবীর রূপ কি প্রকার হইবে এবং মনুষ্য জাতির অবস্থাও বা কিরূপ হইবে তাহা কল্পনাতীত। বর্ত্তমানে ৬ হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার সভ্যতার প্রায় কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় না—অনেকে হয়ত এতকাল পূর্ব্বে, সভ্যতার অস্তিত্বই অস্বীকার করিবেন—ভবিষ্যৎ কালের যাহাতে এই অসুবিধা না হয়, সেই জন্য ডক্টর জ্যাকবস্ এই প্রস্তাব করেন। তাঁহার প্রস্তাব আমেরিকায় বিশেষভাবে সমর্থিত হয়। সম্প্রতি তাঁহার প্রস্তাবমত প্রকোষ্ঠ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে মরিচাহীন ইস্পাতের আধারে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের দিকে সভ্যতার যাহা কিছু নিদর্শন তাহা রাখা হইবে। এই আধারগুলি হইতে বায়ু নিষ্কাসিত করিয়া নিষ্ক্রিয় গ্যাসে পূর্ণ করা হইয়াছে। আধারগুলিতে কোনজাতীয় গ্রন্থ, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস-জাতীয় গ্রন্থ, বিশেষ কাগজে ছাপা সংবাদপত্র, সিনেমা ফিল্ম, গ্রামোফোনের রেকর্ড প্রভৃতি রক্ষিত হইয়াছে। দরজার উপরে যে ফলক থাকিবে তাহাতে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও জর্জিয়ার ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর ট্যালমেজ ও ডক্টর জ্যাকবসের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ৮১১৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইহা খুলিতে নিষেধ জানাইয়া মরিচাহীন ইস্পাত ফলকের উপর লেখা হইয়াছে। ৮১১৩ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী ও অগ্‌লথর্প বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ সম্মিলিতভাবে ইহা খুলিবেন। অবশ্য, ৬ হাজার বৎসর পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অথবা অগ্‌লথর্প বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব থাকিবে কি না বিচার্য্য।

অপর একটি মার্কিন বিশ্ব-বিদ্যালয় নৎরদাম-এ অন্য একটি ব্যাপার হইতেছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বায়োলজী বিভাগের নূতন গৃহের ভিত্তি-প্রস্তরের মধ্যে ৬টি টেষ্ট-টিউবের মধ্যে সম্পূর্ণ আবদ্ধ করিয়া ছয় প্রকার বীজাণু রাখা হইয়াছে। অনুমান, ১৫০ বা ২০০ বৎসর পরে গৃহ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে। সেই সময় পর্য্যন্ত এই বীজাণুগুলি বাঁচে কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

পিছনের হাতছানি

—শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী

কুমীরখালির বিলের মামলা এই সুদীর্ঘ নয় বৎসরেও নিষ্পত্তি হইল না। ও-পক্ষের জমিদার নৃপতি চৌধুরী বয়সে নবীন হইলেও আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানে কাহারও অপেক্ষা ছোট ছিলেন না। নৃপতি সেই প্রকৃতি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা এই দুনিয়ায় অপমান অপেক্ষা মরণকে অনেক আপন বলিয়া মনে করেন। তাই পিতার মৃত্যুর পর আজ ছয় বৎসর একাদিক্রমে মামলা চালাইয়া আসিতেছেন। যদিও বড়-তরফের সহিত লড়িবার মত তাঁহার যে সামর্থ্য নাই, এটা তার খুব ভাল করিয়াই জানা ছিল। অধিকন্তু, নৃপতির পিতা মৃত্যু-শয্যায় তাঁহাকে কাছে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—'সব যায় যাক্ নৃপতি, কিন্তু কুমীরখালিতে যেন মাথা খাটো না হয় তা দেখিস্ বাপু…'

ইহা ছাড়াও একটি সুগোপন কারণ আছে, যা হয়তো আজকাল অনেকেই জানে না। চৌধুরীদের কে না কি বড়-তরফে কিছুদিন কাজ করিয়াছিলেন। তারপর চৌধুরীদের সেই পূর্ব্বপুরুষটি কয়লার কারবারে প্রচুর ধন লাভ করেন। এদিকে কালীতলার চাটুজ্জেদের অবস্থাও ক্রমশঃ হীন হইয়া আসিতেছিল, চন্দ্রনাথ ছিলেন পাকা ব্যবসায়ী। তিনি সেই সুযোগে জলের দামে জমিদারিটি কিনিয়া লন। তাই আজও এ-পক্ষ চৌধুরীদের গোমস্তার জমিদারী বলিয়া অবজ্ঞার মুখ ফেরান। যে একদা তাঁহাদেরই বাড়ীতে গোলামী করিয়া গিয়াছে, আজ তাঁহারই সন্তানেরা সমকক্ষ হইবে—ইহা কল্পনা করিলেও রায়দের শরীরময় কে যেন শত সূঁচ বিদ্ধ করিত। ও-পক্ষেরও তাঁহাদের প্রাপ্য সম্মান রায়দের নিকট হইতে আদায় করিবার জন্য জিদ্ বাড়িয়া গিয়াছিল। আর, ইহারই জন্য কুমীরখালির বিল যাহা মজিয়া অধিকাংশই অব্য-বহার্য্য হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য রেশা-রেশি যেন আর শেষ নাই; দুই পক্ষই অকাতরে যে অর্থ ঢালিতেছেন তাহা হয়তো কুমীরখালি বিলটিকে ভরিয়া দিতে পারিত, কিন্তু এত অর্থব্যয় করিয়াও কোন পক্ষই মিটমাটের কোন কূল-কিনারা দেখিতে পারিলেন না।

পঙ্কের কাজ করা দেওয়ালে টাঙ্গান বড় ঘড়িটায় ঢং ঢং করিয়া বারোটা বাজিয়া গেল। অম্বিকাপ্রসাদ মামলার নথীপত্র গুছাইয়া উঠিয়া পড়িলেন। কাল আবার কুমীরখালি বিলের মামলার তারিখ পড়িয়াছে, তাই আজ একটু কাগজপত্রে চোখ বুলাইয়া লইলেন। এবার তিনি যে চালটি দিবেন, তাহাতে বিজয় অনিবার্য্য···একথা স্মরণ করিতেই অম্বিকাপ্রসাদের মুখময় হাসির বিজলী খেলিয়া গেল।

তিনি শয্যায় পড়িয়া বহুক্ষণ ছটফট্ করিলেন, কিন্তু ঘুম আসিল না। সমস্ত দিন ধরিয়া মামলার কূট-চিন্তায় কাটানোয় বায়ু চড়িয়া গিয়াছিল। বারান্দায় আসিয়া জলদ-গম্ভীর-স্বরে—যে স্বরে একদা শত শত প্রাণীর বুকের রক্ত শুকাইয়া হিম হইয়া যাইত,—সেই স্বরে চীৎকার করিলেন, 'যোধমল—যোধমল।'

সমস্ত সিঁড়িগুলি কাঁপাইয়া যোধমল আসিয়া কাছে দাঁড়াইতেই তিনি কহিলেন—'আরাম-কেদারাটা ছাদে বিছিয়ে দে তো রে—'

অম্বিকাপ্রসাদ আরাম কেদারাটায় আপনার ক্লান্ত দেহ এলাইয়া দিলেন। পাশে যোধমল আরও আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল, সে দিকে দৃষ্টি পড়ায় বলিলেন—'যা—আর কোন দরকার নেই।' তিনি ধীরে ধীরে আপনার কেশ বিরল মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

সে দিন বৈশাখী পূর্ণিমার কাছাকাছি কি একটা তিথি ছিল, সুন্দর রূপালী জ্যোৎস্না সমস্ত ছাদময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আকাশের বুকে শ্বেত মেঘখণ্ডগুলি হংস-বলাকার মত ভাসিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে, আর সমস্ত দিক্ ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছে একটি পরম প্রশান্তি।

মিলন-মণ্ডপের পরিণতি



[illegible]

—কিন্তু যেদিন হইতে একটি সম্প্রদায়কে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত [illegible]

যোধমল দপ্ দপ্ শব্দে সমস্ত সিঁড়ি ক'খানা মুখরিত করিয়া চলিয়া গেল। আশে-পাশের বন্ধ ঘরগুলি হইতে চামচিকার পাখার ঝটাপট্ শব্দ শুনা যায়। নীচের ঘরগুলি আজ কয়বৎসর ধরিয়াই তালাবদ্ধ। সেখানে ইঁদুরের দৌরাত্ম্যের আভাস পাওয়া যাইতেছে—অনবরত সেখান হইতে শব্দ আসিতেছে খট্ খট্···খটাখট্···এই জ্যোৎস্নাময়ী গভীর নিশীথে ইতস্ততঃ শব্দ হইতে শুনিয়া অম্বিকাপ্রসাদের বছর আটেক আগের এক সুমধুর রজনীর কথা মনে পড়িতেছে। তখনও তাঁহার অমন সোনার সংসার ছারখার হইয়া যায় নাই। আত্মীয়-বান্ধবে পরিপূর্ণ বাড়ীখানা সর্ব্বদাই গমগম করিত।

আজ যে-সব ঘর অপ্রয়োজনীয় বলিয়া তালাবদ্ধ হইয়া আছে, তাহাতেই সমস্ত পরিবারটির স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় তিনি পূজার দালানের দিকে দোতালা আর একখানা বাড়ী তুলিতেছিলেন। কিন্তু, একতলাও শেষ হয় নাই, ইহার পূর্ব্বেই বাড়ীর প্রয়োজন শেষ হইয়া আসিল, কাজেই বাড়ী ঐ পর্য্যন্তই। আজও পাহাড়ের মত স্তূপীকৃত ইঁট পড়িয়া আছে। মাঝে মাঝে বট, অশ্বত্থ গাছ মাথা তুলিয়াছে। চুণ-সুরকী সব বর্ষার জলে ধুইয়া গিয়াছে।

* * * অম্বিকাপ্রসাদ ছাদে বিছানা করিয়া শুইয়াছেন। দক্ষিণ দিক্ হইতে ঝির ঝির হাওয়া আসিতেছিল। নবনী ছানিয়া গড়া ছোট ছোট পায়ে জুতা পরিয়া খটাখট্ শব্দে সমস্ত ছাদখানাকে মুখরিত করিয়া এক পাল ছোট ছেলে-মেয়ে আসিয়া অম্বিকাপ্রসাদকে ঘিরিয়া ফেলিল। তিনি উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, '—কি রে, শালা-শালীর দল, তোদের ঘুম নেই ?' গরমের দিন, তাহারা দিনে ঘুমাইয়াছে, তাই এখনও ঘুম পায় নাই। শিশুর দল কেহ কোলে, কেহ পিঠে, কেহ বা তাঁহার হাত ধরিয়া ঝুলিতে লাগিল, কহিল—'না দাদু ঘুম পাচ্ছে না। আমরা লুকোচুরী খেলবো— তোমায় কিন্তু বুড়ী হ'তে হবে।' বলিয়াই তাঁহার সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া তাহারা এদিক্ ওদিক্ মিলাইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে কেহ সিঁড়ির মধ্য হইতে, কেহ চিলে কোঠা হইতে তাঁহাকে আসিয়া ছুঁইতে লাগিল। কেহ ছুটিতে ছুটিতে তাঁহার বিরাট ভুঁড়ীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে, কেহ কেশবিরল মাথার উপর, আচমকা হাত রাখে কেহ বা তাঁহার অঙ্গ ধরিয়া টানাটানি করে। অম্বিকাপ্রসাদ শিশুদের সঙ্গে মাতিয়া গিয়াছেন। ইহাতে ভ্রূক্ষেপও করেন না, বরং কাহাকেও ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিতে দেখিলে কেন যেন আপনা হইতে হাতখানি আগাইয়া যায়—স্পর্শ করিয়া শিশুটিকে চোরের পরিশ্রম হইতে বাঁচাইবার জন্য।

ক্ষণপরে ব্রজসুন্দরী নৈশ-ভোজন শেষ করিয়া অধর তাম্বূলরসে বিকশিত করিয়া হাতে একটি বড় পানের ডিবা লইয়া হেলিয়া দুলিয়া অম্বিকাপ্রসাদের শয্যার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি একগাল হাসিয়া কহিলেন, —'বলি, বুড়ো বয়সে আবার খোকাটি সাজছো নাকি ? এদিকে নিজের ছেলেপুলেরা ত কোনও দিন ভয়ে কাছ পর্য্যন্ত ঘেঁষতে পায় নি। আর নাতি-নাতনীরা যে কান ধরে টানাটানি কচ্ছে তা ত বেশ মুখটি বুজে সহ্য করছো। আজ তোমার জমিদারের গম্ভীরি চাল গেল কোথায় ?'

অম্বিকাপ্রসাদ একটি নাতিকে বুকের মধ্যে টানিয়া বলিলেন—'সত্যি গিন্নি, যোয়ান বয়সে স্নেহ-মায়া বলে একটা জিনিষ একেবারেই বুঝি নি। তখন জানতাম আত্ম-মর্য্যাদা, আর বুঝতাম আভিজাত্য। কিন্তু, এখন দেখছি, দুনিয়ায় স্নেহ-মায়ার মত জিনিষ দুটি নেই। এতেই মন কানায় কানায় ভরে উঠে। আচ্ছা, তুমিই বল না এমন সুন্দর মুখ দেখলে আর কি কিছু ভাল লাগে ? ইচ্ছে হয় ওদের নিয়ে কোথাও পালিয়ে যাই।' নাতিটিকে মুখে মুখ ঘষিতে ঘষিতে বলিলেন—'যাবিরে দাদু, আমার সাথে ?'

খোকা তাঁহার মুখ হইতে মুখ সরাইয়া আকুল আগ্রহে বলিল—'চল দাদু, চল আমরা পালিয়ে যাই—মন্টু, পিন্টুকে কিন্তু নিতে পারবে না, ওরা ভয়ানক পাজি।'

খোকাকে আশ্বস্ত করিয়া অম্বিকাপ্রসাদ গিন্নীর দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন—'দেখ ওর যাওয়ার কি চাড়— এক্ষুণি নিয়ে চল আর কি !'

লজ্জিত হইয়া খোকা তাঁহার বক্ষের আরও নিকটতম হইয়া তাঁহাকে নিবিড় করিয়া জাঁকড়াইয়া ধরিল। অম্বিকা-

প্রসাদ সস্নেহে তাহার পিঠে আস্তে আস্তে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন—দাদু! 'দাদু আমার—।'

দেখিতে না দেখিতে শিশুর দল ব্রজসুন্দরীকে ঘিরিয়া তাঁহার শাড়ী ধরিয়া টানাটানি সুরু করিয়া দিল। ব্রজ-সুন্দরী বলিলেন—'কি চাস্ বল না রে—।'

—'দিদি, আমাদের সঙ্গে খেল্‌বে এসো—'

—'না রে আমার এত ধকল সহি হয় না, তোদের দাদুকে বল্ সে খেল্‌বে'খন।'

তাহারা তৎক্ষণাৎ সুর বদলাইয়া কহিল—'আচ্ছা, তা হলে তুমি এখানে বসো,আমাদের বুড়া হ'তে হবে যে।'

—'তোরা ত আচ্ছা পাগল দেখছি! আমি ত বুড়ী হয়েছিই,'আমায় আর নতুন করে কি বুড়ী করবি? তার চেয়ে তোদের বুড়ো দাদুকে বুড়া কর দেখি, তা হলে বুড়োতে বুড়ীতে বনবে ভাল। এ বুড়োর সঙ্গে এখন ত আমার আর বনিবনা নেই,দেখি উনি বুড়া হলে যদি আবার আগেকার ভাব ফিরে আসে!' বলিতে বলিতে তিনি হাসিয়া ফাটিয়া পড়িলেন, সে হাসির রেশ শতধারে ভাঙ্গিয়া খান্ খান্ হইয়া দূর দিগন্তে পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনি তুলিল।* **

অম্বিকাপ্রসাদ চাহিয়া দেখিলেন, কোথায়ই বা সে শিশুর দল আর কোথায়ই বা রহস্যময়ী ব্রজসুন্দরী, যাঁহাকে লইয়া সুখে দুঃখে জীবনের তেত্রিশটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। চারিদিকে কেহ কোথাও নাই, চাঁদটা পশ্চিমের দিকে কিছুটা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। আর, মাঝে মাঝে রাত্রির স্তব্ধতা বিদীর্ণ করিয়া বসুদের বাড়ীর পাগল বধূটির খলখল্ হাসির রেশ বাতাসে বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে।

দুর্গা! দুর্গা!! গিন্নী আজ প্রায় সাত বৎসর হইল গতাসু হইয়াছেন, কিন্তু অম্বিকাপ্রসাদের চোখের সামনে তিনি যেন আজ কেমন ভাবে দেখা দিলেন! ললাটে ও সীমন্তে বড় বড় করিয়া সিন্দুর লেপা, এখনও যেন জ্বল জ্বল করিতেছে। তাঁহার পান-খাওয়া মুখের হাসি অম্বিকা-প্রসাদের চক্ষের সামনে এখনও মিলায় নাই। গিন্নী যেন এই মাত্রও এখানে ছিলেন, বোধ হয় টুকিটাকি কোন কোন কাজের জন্য এই খুব কাছাকাছিই গিয়াছেন।

* * * 'কে? কে ওখানে দাঁড়িয়ে?'—বলিতে বলিতে অম্বিকাপ্রসাদ আরামকেদারাটা হইতে উদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আলিসার উপর ভর দিয়া ওদিকে মুখ ফিরাইয়া যে দাঁড়াইয়াছিল, সে মুখ ফিরাইতেই তিনি আশ্বস্ত হইয়া আরাম-কেদারায় বসিয়া পড়িয়া বলিলেন—'ওঃ ললিতা! আয় মা, কাছে আয়।'

ললিতা কাছে আসিতে অম্বিকাপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি মা, মুখখানা অমন শুক্‌নো দেখাচ্ছে কেন? কি হয়েছে?'

ললিতা কিছুই বলিল না, মাথা নীচু করিয়া সাদা থানের আঁচলে পাক লাগাইতে লাগিল। অম্বিকা-প্রসাদের মনে মুহূর্ত্তমধ্যে বিজলী খেলিয়া গেল, তিনি বলিলেন—'ওঃ, আজ বুঝি একাদশী, একেবারে নিরম্বু উপবাস!' বলিয়া তিনি একটা বড় দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

ক্ষীণকণ্ঠে ললিতা কহিল—'না বাবা, এখন আর আমার কোন কষ্ট হয় না।

—'কষ্ট ত হবেই না মা। তোকে যখন বিয়ে দিয়ে-ছিলাম তখন তুই তের বছরেরটি। আর তোর এ বেশ হয়েছে, তাও দশ বছর হয়ে গেল। কালে সব সয়ে যায় জানি, কিন্তু মা, আমি যে আর সহ্য করতে পারছি না, যতই দিন যাচ্ছে, আমি ততই অধীর হয়ে পড়ছি।'

'—সহ্য না করা ছাড়া আর কি কোন উপায় আছে বাবা! ভগবানের হাত, এর উপর ত কারো জোর নেই—।'

'—অনেক দেখে শুনেই তোরও বিয়ে দিয়েছিলুম। ছেলেটিও ছিল যেন রাজপুত্তুর; যেমন বনেদী বংশ তেমনি স্বভাব-চরিত্র। কিন্তু মা, অমন সোনার ছেলের মধ্যেও যে কেউটে সাপ লুকিয়ে ছিল, তা কেমন করে জানবো বল্। ছ' মাস যেতে না যেতেই ত কাশের সঙ্গে রক্ত পড়তে সুরু করল। তারপর কত দেশ-বিদেশ ঘোরালাম কত চিকিৎসা করালাম, কিন্তু কিছুই হ'ল না………আর ওর বাপই কি কম করেছে, সবই বরাত মা, সবই পোড়া কপাল।'

ললিতার চক্ষু দিয়া দুই বিন্দু জল গড়াইয়া পড়িল। আঁচলে তাহা মুছিয়া বলিল—'থাক্ বাবা, থাক্ তুমি শোবে চল—রাত হয়েছে।'

'আচ্ছা মা,' বলিয়া অম্বিকাপ্রসাদ সোজা হইয়া বসিয়া কহিলেন—'এখন কেবল বার বারই একথা মনে হচ্ছে, জীবন-ভোর মামলায় যে পয়সা ঢেলেছি, তা যদি এই বাংলার বিধবাদের অবস্থা ঘোচাবার জন্য ব্যয় করতম, তা হলে বোধ হয় আজ মনে অনেকটা শান্তি পেতাম। অহর্নিশ আমার মনে যে কি আগুন জ্বলছে, তা আর তোকে কি করে বোঝাবো মা। দশ গাঁয়ে আমার দুর্দ্দান্ত প্রতাপ থাকলে কি হয়, নিজের কাছে আমি বড় ছোট, বড়ই দুর্ব্বল। এক একবার ইচ্ছে হয়, এই সব বিষয়-সম্পত্তি ছেড়ে তোকে নিয়ে এমন কোথাও যাই, যেখানে হেসে খেলে তুই দু'টো দিন কাটাতে পারিস্। কিন্তু, তা পারি কই? পূর্ব্ব-পুরুষের মানরক্ষার জন্য খালি মামলাই করছি। প্রেতের মত অহর্নিশ বিষয় আগলে বসে আছি।'

ললিতা পিতার বক্ষে হাত বুলাইয়া সজল কণ্ঠে কহিল—'বাবা, তুমি এতো উতলা হয়ো না, যতদিন তুমি আছ আমার ত কোন কষ্ট নেই।'

—'বাড়ীময় দিন-রাত হৈ-চৈ হচ্ছে সবাই আনন্দ আহ্লাদ করছে, আর তুই শুকনো মুখে ঘরের কোণে ছাদের আলসের পাশে, চিলে কোঠায় লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াস্। নিত্য দশটা খাবার হচ্ছে, নিজেরা কিছু নিচ্ছে, বাকী সব বিশটে লোকের মধ্যে বিলিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু, তোর বরাতে সেই কাঁচকলা-সেদ্ধ, আর আতপ চালের পিণ্ডি! আজ তোর মা-ও নেই ললিতা, যে তুই এক সময় মনের দুঃখ জানাতে পারিস্। অন্য সবাই নিজ নিজ আনন্দেই ব্যস্ত, তোর দুঃখ-কাহিনী শোনবার মত তাদের সময় কই? এ-যে আমি আর সহ্য করতে পারি না, মা।' বলিতে বলিতে অমন সিংহের মত পুরুষ অম্বিকাপ্রসাদের দুই চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল গাল বাহিয়া পড়িতে লাগিল।

ললিতা পিতার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া কহিল—'চল বাবা শুতে চল। মহাভারত পড়িগে চল।'

"তাই চল মা," বলিয়া অম্বিকাপ্রসাদ মাথা নীচু করিয়া কন্যার পিছু পিছু চলিলেন। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া তিনি কহিলেন—'ললিতা শোন মা, তোর মায়ের একটা কথা আজ মনে পড়েছে। তিনি বলতেন কি—' * * *

মাথা তুলিয়া সম্মুখে চাহিতেই তিনি দেখিলেন :—সমস্ত ছাদখানা জনহীন, কোথায়ও কাহারও শব্দ পাওয়া যায় না। তিনি আরাম-কেদারাটা ছাড়িয়া অনেকটা দূর চলিয়া আসিয়াছেন। সম্মুখে বৃদ্ধ নায়েব মহাশয়ের সাদা থানখানা ছাদের আলসের উপর মেলা রহিয়াছে, দক্ষিণে বাতাস তাহাকেই পৎ পৎ করিয়া উড়াইতেছে।

আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অম্বিকাপ্রসাদ ধীরে ধীরে ছাদের উপর পায়চারি করিতে লাগিলেন।

আজ পাঁচ বৎসর হইল অম্বিকাপ্রসাদের স্নেহের পুতুলীগুলি তাঁহাকে ছাড়িয়া একে একে চলিয়া গিয়াছে। মহাকালের আহ্বানে এই বৃহৎ পরিবারের কেহ সময়ের কেহ অসময়ের সুপ্রাচীন রায়-বাড়ী ছাড়িয়াছে। কেবল নিঃশেষিত বংশের শেষ সাক্ষ্য অম্বিকাপ্রসাদ আজও বাঁচিয়া আছেন এবং বালবিধবা ভগিনী হেমাঙ্গিনী বোধ হয় শেষ বারের মত পূর্ব্ব-পুরুষের ভিটায় ধূপদীপ দিবার জন্যই অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছেন। অনেকে বলেন, পুরুষানুক্রমিক পুঞ্জীভূত পাপ ও প্রজাপীড়নের জন্যই এই বংশটি আজ লোপ পাইতে বসিয়াছে। ধরিত্রী মাতা আর কত সহ্য করিবেন? সমস্ত বাড়ীটা একটা প্রেতপুরীর মত স্তব্ধ ও পূতিগন্ধময়, জোরে নিঃশ্বাস ফেলিলেও বুঝি বা শোনা যায়। দোতলার বড় ঘরখানায় অম্বিকাপ্রসাদ নিজে থাকেন, নীচে মণ্ডপের পাশের ঘরটায় থাকেন হেমাঙ্গিনী, সদর দরজার একদিকে নায়েব মহাশয় থাকেন, অন্য দিকে চাকর-বাকর ও দারোয়ানদের বসতিস্থল। বাকী বিরাট বাড়ীটার অধিকাংশই হয় বৃহৎ ভগ্নস্তূপে পরিণতি পাইয়াছে, না হয় দীর্ঘকাল ধরিয়া তালাবদ্ধ।

প্রথম প্রথম অম্বিকাপ্রসাদের বড়ই অসুবিধা হইত, শূণ্যতা পূর্ণ করিবার জন্য প্রায়ই হয় হেমাঙ্গিনীকে না হয় নায়েব মহাশয়কে ডাকিয়া খানিকক্ষণ গল্প-গুজব করিতেন। কিন্তু, এই পাঁচ বৎসরের অভ্যাসে একাকিত্বই স্বভাবে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। লোকজনের গোলমাল ভাল লাগে না,—মামলা বুঝিবার অসুবিধা হয়। আজ এই দীর্ঘ

দিন বিচ্ছেদের পর তাঁহার আপনার জনেরা কি তাঁহাকে স্মরণ করিল? মরণ-ভূমির নিকষকালো দুয়ার খুলিয়া তাহারা বুঝি বা চুপি চুপি লঘুচরণ মেলিয়া তাঁহার কাছে আসিতেছে! প্রেতপুরীর দ্বার-রক্ষক বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাই বুঝি তাহাদের এমন আগমন। তা ছাড়া পরপারে গেলেই কি সকল সম্বন্ধ চুকিয়া যায়? তাহাদের একান্ত আপনার অম্বিকাপ্রসাদ, সে কি করিয়া জনহীন পুরীতে দিন কাটায়, সে সুস্থ আছে কি শুকাইয়া গিয়াছে,—তাহাদের আদরের হেম, বালবিধবা হইয়া যাহার সমস্ত জীবনটা পুড়িয়া খাক্ হইয়া গেল—সে-ই বা কেমন করিয়া অন্ধকারে বন্ধ ঘরের চারিপাশে দিন কাটায়, তাহা জানিবার জন্য কি তাদের প্রাণ কাঁদে না? কে বলে, কাঁদে না? কাঁদে,—নিশ্চয়ই কাঁদে।

অম্বিকাপ্রসাদ ধীরে ধীরে আসিয়া আরাম-কেদারায় বসিয়া সম্মুখে প্রসারিত সুনীল আকাশের দিকে পলকহীন চোখে চাহিয়া রহিলেন। এই ত সেদিন বছর পাঁচেক আগেও তাঁহার বংশ-রক্ষার আশা ছিল। সেদিন সব গেলেও এক পুত্র ও তাহার বধূ অবশিষ্ট ছিল, কিন্তু

অম্বিকাপ্রসাদের নিজের অজ্ঞাতে বড় একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস বাহির হইয়া গেল। হঠাৎ উঠানে একটা অস্ফুট গুঞ্জন শুনিয়া তিনি উত্তর দিকের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইলেন, দেখিলেন, কি একটা লোককে কেন্দ্র করিয়া গ্রামশুদ্ধ লোক আসিয়া তাঁহার উঠানে জড় হইয়াছে। তিনি দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে আসিতেই লোক দুই পাশে বিভক্ত হইয়া তাঁহার যাইবার পথ করিয়া দিল। অম্বিকাপ্রসাদ দেখিলেন, বংশের শেষ আশা, তাঁহার পরম স্নেহের পুত্র শিবপ্রসাদের মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, জামা-কাপড়ময় তাজা রক্ত শুকাইয়া চাপ হইয়া গিয়াছে। অমন সুন্দর কান্তি, কিন্তু কে যেন সমস্ত শরীরময় এক দোয়াত কালী ঢালিয়া দিয়াছে।

অম্বিকাপ্রসাদ চীৎকার করিয়া কহিলেন—'এখানে দাঁড়িয়ে সব কি তামাসা দেখছিস্, যা শীগ্‌গির সদানন্দ ডাক্তারকে খবর দিয়ে আয়।'

কিন্তু, তাঁহার আদেশে কেহই যাইবার কোন উদ্যোগ দেখাইল না—এ ওর মুখের দিকে শুষ্কমুখে তাকাইতে লাগিল।

অম্বিকাপ্রসাদ আবার মেঘমন্দ্র স্বরে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—'ডাক্তার ডাকতে যে বললাম তা বুঝি কাণে গেল না? চাবকে পিঠের চামড়া তুলে দিতে হয়, যত সব হতচ্ছাড়া শুয়ার।

এবার দুটি চাকর ভীত হইয়া চলিয়া গেল। প্রজারা ধরাধরি করিয়া শিবপ্রসাদের দেহ ঘরে লইয়া গেল। কিন্তু, কাহাকে চিকিৎসা করিবে? পুত্রস্নেহে অন্ধ অম্বিকাপ্রসাদ হয় তো ইহা বুঝেন না, কিন্তু অন্য সকলে জানিল, রায়-বংশের শেষ প্রদীপ তৈল-সলিতা-পূর্ণ থাকিলেও আজ দমকা হাওয়ায় নিভিয়া গিয়াছে।

একটা মাসও পূর্ণ হয় নাই, শিবপ্রসাদ যে গাড়ী কিনিয়াছে। অনেক দিন হইতেই গাড়ী কিনিবার রেশুসাজ তুলিয়াছিল, কিন্তু কুমীরখালির বিলের মামলায় তহবিলে প্রায়ই টান থাকিত, কাজেই বাসনাটা বহুদিনের হইলেও পূর্ণ হইয়াছে অল্পদিন পূর্ব্বে। তার পর মরণ-দূত আসিয়া সংসার পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিলে শিবপ্রসাদের উপর তাঁহার স্নেহও বাড়িয়া গিয়াছিল। চারিদিকে এ-কূলে ও-কূলে যে দিকে তাকান যায়, কেহ নাই, দশ-বারোটি নাতি-নাতনীর পর্য্যন্ত আজ একটিও বাঁচিয়া নাই। কাজেই অনেককে প্রত্যাখ্যান করিলেও অম্বিকাপ্রসাদ শিবপ্রসাদের মুখ কালো হইতে দেন নাই—।

কিন্তু সেই মোটর গাড়ী যে এমন ভাবে শেল হইয়া বুকে বিঁধিবে তাহা কাহার জানা ছিল? সমস্ত দিন পিতা-পুত্রে মিলিয়া বৈষয়িক কাজকর্ম্ম দেখিয়াছেন। তার পর এই তো চারটার সময় ঝাউতলা হইতে আঁটি-গাঁ পর্য্যন্ত যে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তাটি গিয়াছে তাহার উপর দিয়া হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছিল।

পল্লীপথ জনশূন্য থাকে, তাই খুব জোরে গাড়ী চলিতেছিল। হঠাৎ শিবপ্রসাদ চাহিয়া দেখে, হাত কুড়ি দূরে একটি ছোট মেয়ে রাস্তা পার হইয়া ওপাশে ক্ষেতের দিকে যাইতেছে। সে কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। সহসা গাড়ীর গতি বন্ধ করায় মেয়েটি বাঁচিল, কিন্তু পথিপার্শ্বে পুরাতন একটি বটগাছের সহিত গাড়ীটির সংঘর্ষ

হওয়ায় গাড়ীর সামনের দিক্‌টা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল এবং শিবপ্রসাদের মাথাটিও ফাটিয়া একেবারে চৌচির······ফিন্‌কি দিয়া তাজা রক্ত পল্লীপথকে সিক্ত করিয়া দিল।

কিছুক্ষণপরে ডাক্তার আসিল না, প্রতিবেশী ও প্রজারা মিলিয়া শিবপ্রসাদের দেহ শেষবারের মত বাড়ীর বাহির করিয়া দিল। নীচ হইতে পুত্রবধূ ও হেমের মর্ম্মস্পর্শী ক্রন্দনরোলে গগন ছাইয়া ফেলিল। অম্বিকাপ্রসাদ অস্থির হইয়া দ্রুতপায়ে উপরে উঠিয়া আসিলেন, চৌকীর উপরে নথীপত্র সব ছড়ান রহিয়াছে, তাহাতে মন দিয়া তিনি পুত্রশোক ভুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কয়েক মিনিট কাটিয়া গেল পাগলিনীর মত আলুথালু বেশে সদ্য-পতি-বিয়োগ-বিধুরা শিবপ্রসাদের বধূ তাঁহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার দুই চক্ষুতে একবিন্দু জল নাই, কিন্তু চোখ দুটি অস্বাভাবিক রাঙা, মাথার ঘোমটা কখন খসিয়া গিয়াছে, সেদিকে খেয়াল নাই, বক্ষের কাপড় সমস্ত মেজময় লুটাইতেছে। নব আষাঢ়ের আকাশ-ভরা মেঘের মত ঘন কালো এলোচুলে অম্বিকাপ্রসাদের পা দুটী ঢাকিয়া, নথীপত্রের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া কহিল—'বাবা, আমার কি হ'বে?'

অম্বিকাপ্রসাদ কি সান্ত্বনা দিবেন? দুনিয়ায় এমন শোচনীয় শোকের সান্ত্বনার ভাষা যে নাই! বধূ বালিকা-জীবনে এই প্রথম শোক পাইয়াছে, তাই দিশেহারা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু, সে ত জানে না, এই অম্বিকাপ্রসাদেরই এমন একদিন গিয়াছে, যখন একটি নাতনীর মৃত্যুতে দিনের পর দিন একেলা একঘরে কাটাইয়াছেন। আজ শোকের পর শোক আসিয়া তাঁহার কোমল হৃদয়কে কঠিন করিয়াছে। বাহির হইতে অম্বিকাপ্রসাদের বক্ষ অত প্রশস্ত দেখাইলে কি হয়? যাঁহারা তাঁহার মনের খবর রাখেন তাঁহারা জানেন, শোকে-দুঃখে তাঁহার বুকের শেষ পাঁজরটি পর্য্যন্ত পুড়িয়া অঙ্গার হইয়া গিয়াছে।

তাঁহার মুখ দিয়া কোন কথা ফুটিল না। আকাশের তারার দিকে চাহিয়া পুত্রবধূর মাথার উপর সস্নেহে হাত বুলাইতে লাগিলেন। শোকও শেষ, সান্ত্বনাও শেষ। আর শোকও আসিবে না, সান্ত্বনাও কেহ চাহিবে না। অম্বিকাপ্রসাদের বক্ষ-পঞ্জর ভেদ করিয়া একটি সুগভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া গেল।

নীচের দিকে চোখ ফিরাইতেই তিনি দেখিলেন, তাঁহার পায়ের কাছে শায়িত পুরাতন প্রভুভক্ত কুকুর জহ্লাদের গায়ে তিনি হাত বুলাইয়া যাইতেছেন।

প্রভুর পরশ পাইয়া জহ্লাদ মৃদু মৃদু লেজটি নাড়িতেছে। অম্বিকাপ্রসাদের সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। কোন অশরীরী প্রেতাত্মা বুঝি বা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছে। বার বার একি হইতেছে? অম্বিকাপ্রসাদ হাত দিয়া চক্ষু দুটি রগড়াইলেন।

সহসা সিঁড়ির মধ্য হইতে মনে হইল যে, কতকগুলি লোকের দ্রুত আগমনধ্বনি উঠিতেছে। অম্বিকাপ্রসাদ কাণ পাতিয়া রহিলেন—সিঁড়ির ভিতর হইতে অনবরত শব্দ আসিতে লাগিল খটাখট্। সঙ্গে সঙ্গে একপাল ছেলেমেয়ে আসিয়া ছাদখানা ছাইয়া ফেলিল এবং দেখিতে না দেখিতে নিমেষমধ্যে তাহারা এদিকে ওদিকে মিলাইয়া গেল। অম্বিকাপ্রসাদ চক্ষু প্রসারিত করিয়া চাহিতেই তাঁহার পিছনে ভাঙ্গা বাড়ীর দেওয়ালের মধ্য হইতে একটি শিশু মুখ বাহির হইয়া চিৎকার করিল—'দাদু, এই যে আমি, এখানে।' অম্বিকাপ্রসাদ ঘাড় ফিরাইয়া সেদিকে তাকাইবেন, ঠিক এমন সময় সম্মুখে পুরানো ভাঙ্গা বাড়ী, বাড়ীর দেওয়ালে গজান বটগাছটার উপর হইতে একটি শিশুকণ্ঠ চীৎকার করিয়া কহিল—'দাদু, আমি আসছি, বলিয়াই সে ঝুপ করিয়া গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া দ্রুত তাঁহার দিকে আসিতে লাগিল, সমস্ত ছাদ কাঁপাইয়া ধ্বনি উঠিল খটাখট্ খটাখট্। সে শিশুটির আগমনের পূর্ব্বেই চিলে কোঠার জানালাটি আজ অকস্মাৎ পাঁচ বৎসর পরে সশব্দে খুলিয়া গেল এবং সেই নিরন্ধ্র অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া মুক্তার মত একপাটি সাদা দাঁত বাহির করিয়া আর একটি শিশু কাঁদিয়া বলিল—'কতকাল যে তোমার কোলে উঠিনে দাদু! একবার একটু কোলে নাও না!'

ছাদের ঘুল ঘুলির ফাঁক হইতে একখানা ছোট হাত বাহির করিয়া কে যেন আকুলকণ্ঠে বলিল—'দাদু, দুটো পয়সা দেও না!' আলসের ওদিক্ হইতে কে যেন ক্ষীণ

কণ্ঠে গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া কহিতেছে—'বড় ক্ষিদে পেয়েছে দাছ্, কিছু খাবার দাও না, ওঃ ক' বছর যে কিছু খাই নি।'

অম্বিকাপ্রসাদ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন—'ওরে রাখ্ রাখ্।' * * *

নিশীথ নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া অম্বিকাপ্রসাদের সে চীৎকার বহুদূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল। সে চিৎকারে নীচ হইতে সকলে উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিল। তাহারা দেখিল, অম্বিকাপ্রসাদ আরাম-কেদারাটা লইয়া ছাদের উপর মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া আছেন, চৈতন্য লোপ পাইয়াছে, সমস্ত মুখ দিয়া গেজঁলা বাহির হইতেছে।

সে রাত্রিতে ডাক্তার দেখিয়া বলিলেন—বিশেষ ভয়ের কোন কারণ নেই, বেশী মাথার খাটুনিতেই এমনি হয়েছে, সুনিদ্রার একান্ত প্রয়োজন।

পরদিন সকালে অম্বিকাপ্রসাদ চোখ মেলিয়া চাহিতেই, হেমাঙ্গিনী শিয়রে বসিয়াছিলেন। মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া উদ্বিগ্ন-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—কেমন আছ দাদা? অম্বিকাপ্রসাদ ক্ষণকাল কি যেন চিন্তা করিলেন, তারপর কহিলেন—ভাল আছি, হেম। ঐ আলমারীটা খুলে কুমীরখালির কাগজ-পত্র গুলো একবার দে তো বোন্। হেম মিনতি-ভরা চোখে কহিল—আজ থাক্ দাদা। তুমি একটু ভাল হ'য়ে নাও তারপর দেখো।

তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া বলিলেন—ছিঃ অবাধ্য হ'তে নেই, যা বলি তাই কর।

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে কাগজ-পত্র আনিয়া দিলে অম্বিকাপ্রসাদ তাহাতে কি যেন লিখিয়া কহিলেন—যোধমলকে ডাক ত একবার।

যোধমল আসিলে অম্বিকাপ্রসাদ কহিলেন—চারু ময়রার দোকান থেকে আমার নাম করে খাবার যা ভাল আছে সব নিয়ে আয়, আর দেখ, ভাল খাবার যদি না থাকে তা'হলে তৈরী করে দিতে বলিস্, কিন্তু খারাপ খাবার যেন না দেয়। অমনি আমার পালকী সাজাতে বলে দে—এখুনি বেরুতে হ'বে।

"জো হুকুম মহারাজ" বলিয়া যোধমল চলিয়া গেল। হেমের কাছে ব্যাপারটা ভাল না লাগিলেও অমন সিংহের মত দাদাকে আর কিছু বলিয়া বাধা দিতে সাহস হইল না।

ঘণ্টা দু'য়েক পরে অম্বিকাপ্রসাদ রাশীকৃত খাবার লইয়া পালকীতে উঠিয়া বসিলেন। আস্তাবলের পোলের কাছে আসিয়া বেহারারা বাঁক ধরিতেই পালকীর ভিতর হইতে তিনি বলিলেন—সহরের দিকে নয়—কালীতলার দিকে চালা। এই কালীতলা হইতেই চৌধুরীদের জমিদারীর এলাকা সুরু। গোমস্তার জমিদারী বলিয়া অবজ্ঞায় আজ পর্য্যন্ত রায়-বংশের কেহ ইহার মাটি পর্য্যন্ত মাড়ান নাই, যেন ইহার স্পর্শে সমস্ত আভিজাত্য নিমেষে চূর্ণ হইয়া যাইবে। একথা দশ গাঁয়ে সবাই জানিত। তাই পালকীর বেহারারা ও বাড়ীর দারোয়ানেরা গভীর বিস্ময়ে এ-ওর মুখের দিকে তাকাইল।

নৃপতি চৌধুরী তখন সবেমাত্র খাইয়া উঠিয়াছেন। কুমীরখালির মামলার জন্য সহরে যাইতে হইবে, তাই প্রস্তুত হইতেছেন। নৃপতির স্ত্রী তুলসীতলায় ঠাকুরের কাছে আকুল প্রার্থনা জানাইতেছিল, যেন এবার তাদের জয় হয়, না হইলে তাহার বাছারা যে পথের ভিখারী হইবে। তুলসী-মূল হইতে মাথা তুলিতেই নৃপতির স্ত্রী দেখিল রূপার চিত্র-বিচিত্র নানা কাজ-করা রায়দের সেই বহু-বিখ্যাত পালকীখানা তাহাদেরই বাড়ীর দিকে আসিতেছে।

বধূ ছুটিয়া গিয়া নৃপতিকে এ খবরটি দিল। কিন্তু, নৃপতি ইহা বিশ্বাস করিল না। পূবের সূর্য্য পশ্চিমে হয়তো কোন দিন উঠিতে পারে, কিন্তু রায়-বংশের অম্বিকা প্রসাদ যে চৌধুরী-বাড়ী আসিবেন, ইহা যে একেবারে অসম্ভব।

হঠাৎ আওয়াজ আসিল—এই থামা, থামা। নৃপতি জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিল, অম্বিকাপ্রসাদের পালকী তাহারই দুয়ারে উপস্থিত। অম্বিকাপ্রসাদ কড়া নাড়িয়া চীৎকার করিতেছেন—নৃপতি, নৃপতি বাড়ী আছ, দরজা খোল।

বধূ ভীতা হইয়া নৃপতিকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—না গো তুমি দরজা খুলো না, ওঁর নিশ্চয়ই কোন খারাপ মতলব আছে, তা না হ'লে তোমার বাড়ী এসেছেন। উনি

নিশ্চয়ই তোমাকে খুন করবেন। বলিতে বলিতে ভয়ে বধূ কাঁদিয়া ফেলিল। ওদিকে আবার ঘন-ঘন কড়া-নাড়ার শব্দ আসিতে লাগিল।

নৃপতি বধূকে প্রবোধ দিয়া বলিল—এ কি কখনো হ'তে পারে যে, উনি আমারই বাড়ী এসে দিনের বেলায় আমায় খুন করে যাবেন? আমার বাড়ীতেও তো লোক-জন আছে, ভয় কি? দেখি কি হয় লক্ষীটি, তুমি একটু পাশের ঘরে যাও তো!

বধূকে পাশের ঘরে পাঠাইয়া দিয়া নৃপতি দরজা খুলিয়া দিয়া বিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অম্বিকা-প্রসাদ ঘরে ঢুকিয়া কহিলেন—এই যে নৃপতি, ঘরেই আছ —তা বেশ বেশ, কিন্তু তোমার ছেলে-মেয়েরা কোথায়, বাবা? তাদের যে দেখছি না।

অম্বিকাপ্রসাদ আসিয়াছেন তাঁহারই বাড়ীতে এবং ব্যবহার করিতেছেন পরম আত্মীয়ের মত, নৃপতি কি যে করিবে ভাবিয়া পায় না। অস্থির হইয়া আসন আগাইয়া দিয়া কহিল—কাকা বসুন, আজ যে আমার কি ভাগ্যি···

তাহাকে বাধা দিয়া অম্বিকাপ্রসাদ বলিলেন—সে সব পরে হবে, এখন বল তোমার ছেলেপুলেরা কই?

নৃপতি নরম হইয়া বলিল—তারা এখন খাচ্ছে, আনব তাদের?

অম্বিকাপ্রসাদ অস্থির হইয়া বলিলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ শীগ্‌গির আন, যাদুদের, তাদের আমি দেখব—এঁটোমুখেই আন—দেরী করো না।

ছেলে-মেয়েরা ঘরের মধ্যে ঢুকিতেই অম্বিকাপ্রসাদ ছুটিয়া গিয়া তাহাদের জড়াইয়া ধরিলেন। তাদের সেই এঁটো-মুখে-হাতেই তিনি পরম শান্তিভরে চক্ষু দুটী বুজিয়া নিজের মুখ ঘষিতে লাগিলেন। নৃপতি দুই নয়ন বিস্ফারিত করিয়া তাকাইয়া রহিলেন। ওদিকে পরদার আড়ালে নৃপতির স্ত্রী স্নেহের এই সুগভীর অনুভূতি দেখিয়া আপনার চোখের জলের আর বাধা দিতে পারিলেন না, শ্রাবণের ধারার মত দুই চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু ঝরিতে লাগিল।

যোধমলকে ডাকিয়া অম্বিকাপ্রসাদ পালকীর মধ্য হইতে সমস্ত খাবার আনাইলেন। ছেলে-মেয়েদের হাতে হাতে খাবার দিয়া বাকী খাবার সব তাহাদের সামনে ধরিয়া কহিলেন—পেট ভরেছে দাদু! ঘাড় নাড়িয়া শিশুরা সম্মতি দেয়। অম্বিকাপ্রসাদ আবার জিজ্ঞাসা করেন—'আর একটুও খিদে নেই'? শিশুদের মুখ হইতে বাহির হয়—'না'। তিনি আবার বলিলেন—আচ্ছা, খিদে পেলে আবার দেবো'খন। তার পর অম্বিকাপ্রসাদ পকেট হইতে মুঠি মুঠি কাঁচা টাকা লইয়া শিশুদের দু' হাত ভরিয়া দিলেন। শিশুরা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করে—সব আমার?

—হ্যাঁ সব তোমার—বলিয়া অম্বিকাপ্রসাদ তাহাদের আরও নিবিড় ভাবে বক্ষমাঝে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, —দাদু, সোনার যাদুরে আমার।

খোকার মুখে মুখ ঘষিতে ঘষিতে এক বোঝা কাগজ-পত্র পকেট হইতে বাহির করিয়া নৃপতির দিকে ছুড়িয়া দিয়া অম্বিকাপ্রসাদ কহিলেন—'আমি আর মামলা করব না, নৃপতি। কুমীরখালির বিল তুমিই নিও। কাল উকিল ডেকে আমার বিষয়-সম্পত্তি সব এই সোনার যাদুদের দিয়ে যাব। দেখো বাপু, এরা যেন কষ্ট না পায়, তা' হলে মরণেও আমার মুক্তি হ'বে না। কিন্তু তোর কাছে আমার একটা ভিক্ষে আছে, আমায় বিমুখ করিস্ নে, যে ক'টা দিন আর বেঁচে আছি, তোর ছেলে-মেয়েরা যেন গিয়ে আমার বাড়ী থাকে।'

যবদ্বীপ

—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

বিরাট বারিধি-বক্ষে ঘনসন্নিবিষ্টভাবে বিরাজমান বহুসংখ্যক দ্বীপ লইয়া গঠিত মালয় দ্বীপপুঞ্জ বিশ্বের অন্যতম বিস্ময়কর দৃশ্য, সন্দেহ নাই। দ্বীপসমূহের এরূপ বিচিত্র ও বিস্তৃত সম্মিলন আর কোথাও দেখা যায় না। তত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতগণ পরীক্ষা বা পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এই সকল দ্বীপ একসময় পরস্পর, এবং এশিয়া মহাদেশের সহিত, সংযুক্ত ছিল। অতীতে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব যে, এই সকল দ্বীপের উপর প্রসারিত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যব-দ্বীপ, বালী, লম্বক প্রভৃতিতে হিন্দু-প্রাধান্যের নিদর্শন আজিও বিদ্যমান। বালী ও লম্বকের আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই এখনও বেশী।

এই দ্বীপপুঞ্জের কোন কোন দ্বীপ অতি বৃহৎ, যেমন—বোর্ণিয়ো। অষ্ট্রেলিয়া, গ্রীনল্যাণ্ড ও নিউগিনিকে বাদ দিলে ইহাই বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপ। কোন কোন দ্বীপ আবার মাত্র কয়েক শত অধিবাসীকে বুকে লইয়া বারিধি-বক্ষে বিন্দুবৎ বিরাজিত। নিদাঘ প্রধান মণ্ডলে অবস্থিত এই সকল সৌরকরোদ্ভাসিত দ্বীপমালায় উদ্ভিদ্-জীবনের অদ্ভুত উৎকর্ষ দেখা যায়। ফলভারে অবনত এবং পুষ্পপুঞ্জে পরিপূর্ণ বৃক্ষ-ব্রততীর প্রাচুর্য্যের জন্য এই সকল দ্বীপকে নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের লীলানিকেতন বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। গ্রীষ্মমণ্ডলে অবস্থিত দ্বীপসমূহের মধ্যে যবদ্বীপই সর্ব্বাপেক্ষা সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যশালী। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, অসংখ্য স্রোতস্বিনীর সঞ্জীবনী ধারায় অভিষিক্ত এই শ্যামসুন্দর দ্বীপের বুকের উপর দিয়া অগ্ন্যুদ্গারী আগ্নেয়গিরিশ্রেণী প্রসারিত রহিয়াছে। বিষুবরেখায় অবস্থানসত্ত্বেও সমুন্নত শৈলমালার জন্য স্থান-বিশেষের আবহাওয়া অত্যন্ত উপভোগ্য। যে সকল পার্ব্বত্য প্রদেশ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে আট হাজার ফিটেরও অধিক উচ্চে অবস্থিত, তথায় য়ুরোপসুলভ তরুলতাও জন্মিয়া থাকে। যবদ্বীপের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত ১২ হাজার ফিট উচ্চ। ইহা যবদ্বীপের পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত। সমতল প্রান্তর এবং উপত্যকাসমূহে ধান্য, কফিবৃক্ষ, ইক্ষু, তামাক, চা ও এই সকল দ্বীপের অন্যতম বিশিষ্ট সম্পদ্ নানাপ্রকার মশলা উৎপন্ন হইয়া থাকে। অনেকেই জানেন, প্রচুর মশলা জন্মায় বলিয়া এই সকল দ্বীপ "স্পাইস্ আইল্যাণ্ডস্" নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। যে সকল জিনিষ জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে পরম প্রয়োজনীয় তাহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় বলিয়া এখানকার ৫০ হাজার বর্গ মাইল স্থানে ১ কোটি ৮০ লক্ষ নরনারী বাস করিয়া থাকে।

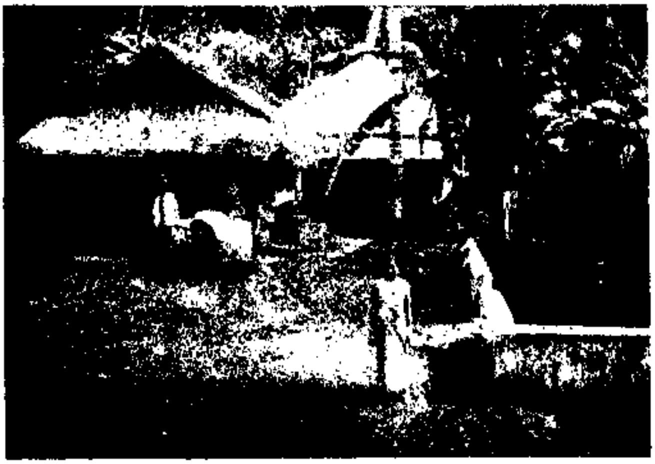
যবদ্বীপ আয়তনে প্রায় ইংলণ্ডের তুল্য। ইহার লোক-সংখ্যাও প্রায় ইংলণ্ডের সমান। আকারে ইহা "অবলং" অর্থাৎ প্রশস্ততা অপেক্ষা ইহার দৈর্ঘ্যই অধিক। পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত ইহা প্রায় ৭ শত মাইল লম্বা, অথচ ইহা ৬০ মাইলের বেশী প্রশস্ত হইবে না। দক্ষিণ উপকূল উচ্চ ও পর্ব্বতপূর্ণ। উত্তর উপকূলে সমতল ও সজল নিম্ন ভূমি প্রসারিত।

যবদ্বীপের অধিবাসীদিগের অধিকাংশই "মালয়"শ্রেণী-ভুক্ত। ইহারা এখানে সুন্দানীজ আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। সুন্দানীজদের দেহে বিশুদ্ধ মালয়-রক্ত প্রবাহিত বলিয়া মনে হয়। দ্বীপের পূর্ব্বাংশে মাদুরীজরা বাস করে। ভারতীয় সভ্যতার বা হিন্দু-প্রভাবের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী মধ্য যব-দ্বীপে বিদ্যমান আছে। এক সময় হিন্দুগণ যবদ্বীপ জয় করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই প্রদেশে বিদ্যমান। অতীতের বিস্ময়কর স্থাপত্যকীর্ত্তিসমূহ, ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব-সম্ভূত যে সমুন্নত সংস্কৃতি বা কৃষ্টির পরিচয় প্রদান করিতেছে, তাহা পিরামিড-প্রসবিনী মিশরীয় সংস্কৃতির সমকক্ষ, সে বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না।

পঞ্চদশ শতকে একদল আরব আসিয়া যবদ্বীপ আক্রমণ করে। বিজয়ী আরবদিগের প্রভাব যবদ্বীপবাসীর সামাজিক ও ধর্ম্ম-সংক্রান্ত জীবনে কিছুৎ পরিমাণ প্রভাব

বিস্তার করে। ফলে, তাহাদিগের অনেকে ইসলাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়।

মোটের উপর, যব-দ্বীপবাসীরা বিশেষ বুদ্ধিমান্ জাতি, সন্দেহ নাই। আমরা যব-দ্বীপের ভাষার মধ্যে হিন্দু-প্রভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া থাকি। এখানকার বর্ণমালার বৈচিত্র্য—উহা তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত। উচ্চতর, নিম্নতর ও সমকক্ষ—এই তিন স্তরের লোকের সহিত ত্রি-বিধ বর্ণমালার সাহায্যে আদান-প্রদান চলিয়া থাকে। সংস্কৃতের সহিত সাদৃশ্য-সম্পন্ন এক প্রকার পবিত্র বর্ণমালায় পৌরাণিক পুস্তকাবলী লিখিত।



সুন্দানীজ-কুটীর।　　— যবদ্বীপ

মালয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে শিল্পে ও সাহিত্যে যব-দ্বীপবাসী শিল্পী ও লেখকগণই উল্লেখযোগ্য। নানা প্রকার প্রয়োজনীয় ও সৌন্দর্য্যসাধক শিল্পকলায় যব-দ্বীপের অধিবাসিগণ বিশেষ দক্ষতার পরিচয় প্রদান করিয়াছে। নৌকা নির্ম্মাণ করিতে, নানা প্রকার পাত্র প্রস্তুত করিতে, চর্ম্মকে চিক্কন করিতে, বস্ত্র বুনিতে ইহারা সুনিপুণ। বস্ত্র রঞ্জিত করিতে বা উহার উপর জরির কাজ করিতেও ইহারা দক্ষ। কারুকার্য্যমণ্ডিত অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত করার ব্যাপারেও ইহাদিগের নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। জমিতে জল-সেচন-ব্যাপারেও ইহারা বিশেষ দক্ষ এবং পরিশ্রমী কৃষক। যব-দ্বীপবাসীরা সংযমী, শান্তিপ্রিয় ও সহজেই বশ্যতা স্বীকার করে বলিয়া শাসকদিগকে শাসনকার্য্য-পরিচালনায় তেমন বেগ পাইতে হয় না।

প্রায় সোয়া লক্ষ চীনা এই দ্বীপে বাস করে। ইহারা স্বদেশ হইতে স্ব স্ব পরিবারবর্গকে আনিয়া এখানে স্থায়ী বাসস্থান স্থাপনপূর্ব্বক ক্রমশঃ সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইতেছে।

যবদ্বীপে য়ুরোপীয় জাতিদিগের উপনিবেশ-স্থাপনের চেষ্টা বহু দিন হইতে আরম্ভ হয়। অন্যান্য দেশের মত এখানেও প্রথমে পর্ত্তুগীজরা আসিয়াছিল। তবে, দুঃসাহসিক পর্ত্তুগীজ নাবিকগণ দ্বীপের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করে নাই বলিয়া দেশের ধন-সম্পদ্ সম্বন্ধে তাহাদের বিশেষ কোন ধারণা ও অভিজ্ঞতা ছিল না। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে "ডাচ" ও ইংরেজগণ যব-দ্বীপে আগমন করে। যব-দ্বীপবাসীর সহিত যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া 'ডাচ'গণ ক্রমশঃ তাহাদিগের প্রাধান্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইলে, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংরেজরা যব-দ্বীপে উপ-নিবেশ-স্থাপন বা শাসন-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পরিত্যাগ করেন। যখন নেপোলিয়ন হল্যাণ্ড অধিকার করেন, তখনও যব-দ্বীপে 'ডাচ'-আধিপত্য পূর্ণরূপে প্রতি-ষ্ঠিত হয় নাই, তাহাদের পক্ষে ঐ চেষ্টা করা তখন আর সম্ভব হইল না বলিয়া যব-দ্বীপ সহজেই শ্রেষ্ঠ নৌ-শক্তি ইংরেজদিগের হস্তগত হইয়া পড়িল।

১৮১১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮১৬ পর্য্যন্ত এই দ্বীপ বৃটিশ উপনিবেশ হইয়া রহিল। ইহার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন, সার ষ্ট্যামফোর্ড র‍্যাফ্‌লস্। 'ডাচ'গণ শতাব্দীর চেষ্টায় যাহা করিতে পারে নাই, সার ষ্ট্যামফোর্ড স্বল্প সময়ের মধ্যে যব-দ্বীপের সেই উন্নতি সাধন করিলেন। মধুর ব্যবহারের দ্বারা ইনি যব-দ্বীপে সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়াছিলেন।

ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠিত ও সন্ধি সম্পাদিত হইলে ইংরেজগণ হল্যাণ্ডকে যবদ্বীপ প্রত্যর্পণ করিলেন। যব-

দ্বীপের দেশীয় নৃপতিগণ 'ডাচ' রিজেন্টের মন্ত্রণাধর্মী নিয়ন্ত্রণ অনুসারে শাসন পরিচালনা করিয়া থাকেন।

প্রথম প্রথম বিজয়ী 'ডাচ'দিগের স্বেচ্ছাচার যব-দ্বীপের অধিবাসীদিগের উন্নতির পথ রোধ করিয়াছিল। অবশ্য,



কুলীরা চা-বাগান হইতে চা লইয়া যাইতেছে। —যবদ্বীপ

সেই স্বৈরশাসনে 'ডাচ'গণ নিজেরাও বিশেষ লাভবান্ হইতে পারে নাই। জমির উপর দেশীয় কৃষকদের বিশেষ কোন অধিকার ছিল না, 'ডাচ'দিগের জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করাই ছিল তাহাদের কর্ত্তব্য। ব্যবসা-বাণিজ্যবিষয়েও তাহাদের কোনরূপ স্বাধীনতা ছিল না। সার ষ্ট্যামফোর্ড এই অবিচার বা অন্যায় ব্যবস্থা উঠাইয়া দিয়া জমির উপর কৃষকের অধিকার ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যব-দ্বীপ-বাসীকে স্বাধীনতা প্রদান করেন।

ডাচরা যব-দ্বীপ ফিরিয়া পাইয়া পুনরায় সেই অন্যায় ব্যবস্থাগুলি প্রবর্ত্তিত করে। "কালচার সিষ্টেম" নামক এক প্রকার নিয়ম প্রচলিত হইল, যাহার দ্বারা কৃষককে ডাচ শাসকদিগের হিতার্থে বা লাভের জন্য ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে হইবে, তবে তাহারা ফসলের যৎসামান্য অংশ পাইতে পারিবে। কৃষকদিগের নিকট হইতে কোন খাজানা লওয়া হইবে না, শুধু শারীরিক পরিশ্রম করিলেই তাহাদের কর্ত্তব্য শেষ হইবে। পরে এই ব্যবস্থা উঠিয়া যায় এবং খাজানা লওয়ার ব্যবস্থাই বিধিবদ্ধ হয়। অহিফেন এবং লবঙ্গ, এই দুইটি পদার্থের উপর সরকারের একচেটিয়া অধিকার। পূর্ব্বে কফির উপরেও এই প্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল, পরে সেই ব্যবস্থা উঠাইয়া দেওয়া হয়। এখন কফির চাষ অনেকেই করিয়া থাকেন।

'ডাচ'রা শাসন সম্বন্ধে যে নীতিই অনুবর্ত্তন করুক, রাস্তা, রেল-পথ প্রভৃতি প্রসারিত করিতে তাহারা কোন প্রকার কার্পণ্য বা কুণ্ঠা করে নাই। এখন ভ্রমণকারিগণ অনায়াসে সমগ্র যবদ্বীপ ভ্রমণ করিতে পারেন। যব-দ্বীপে দুই ফ্রাঙ্ক মূল্যের গুলডেন মুদ্রা প্রচলিত। গুলডেনকে সেণ্ট নামক ক্ষুদ্র মুদ্রায় বিভক্ত করা হইয়াছে।

যব-দ্বীপের রাজধানী বাটেভিয়া নগর তিনটি প্রধান বিভাগ বা পল্লীতে বিভক্ত। একটি অংশে ব্যবসা-বাণিজ্য চলিয়া থাকে; মধ্যস্থলে চীনা সহর অবস্থিত, নগরের তৃতীয়



মাছের বাজার—বাটেভিয়া, যবদ্বীপ।

অংশটিতে 'ডাচ' অফিসার ও বণিকগণ বাস করেন। নগরের প্রান্তগুলিতে বেণু-নির্ম্মিত কুটীরে সুন্দানীজরা বাস করে। ফুটপাথগুলি লাল ইটের। পথে লালবর্ণ ধূলি।

পীত, লাল, সবুজ পুষ্প ও পত্রপূর্ণ বৃক্ষবীথি মধ্যে মধ্যে বিরাজিত থাকায় পথের বর্ণ-বৈচিত্র্য বাড়াইয়া তুলিয়াছে। জাভানীজরা কার্পাস-প্রস্তুত বা রেশম-রচিত নানাবর্ণ-রঞ্জিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া পথে ঘুরিয়া বেড়ায়।

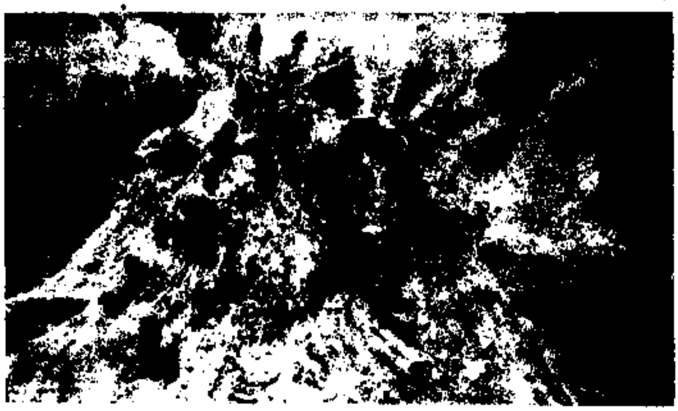
চীনারা কতকগুলি সুসজ্জিত ও সুদৃশ্য বাড়ীর অধিকারী। পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু ও কুটিল কৌশলে সিদ্ধহস্ত বলিয়া চীনারা অর্থাগমের পন্থা ভালভাবেই জানে।

অধুনা আরবরাই যবদ্বীপের প্রধান কুশীদজীবী। কাবুলীরা আমাদের দেশে আসিয়া যেরূপ মহাজনী করে, আরবরা যবদ্বীপে অনেকটা সেইরূপই করিয়া থাকে। যবদ্বীপে জাপানীরা সম্মানে ইউরোপীয়দিগের সমকক্ষ বলিয়া বিবেচিত হয়। তবে, এখানে জাপানীর সংখ্যা খুব কম।

যবদ্বীপের গ্রীষ্মাবাস বুইটেনজর্গের প্রধান দর্শনীয় সুবিশাল বোটানিকাল গার্ডেন। বৃক্ষ-বিজ্ঞানের দিক্ দিয়া ইহাই সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সুন্দরতম উদ্যান। অনেকেই জানেন, ডাচ-জাতি উদ্যান-রচনায় বিশেষ দক্ষ। এই উদ্যানে সেই দক্ষতার পূর্ণ পরাকাষ্ঠা দেখান হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বৈজ্ঞানিকবর্গের পরীক্ষার বা পর্য্যালোচনার সুবিধার জন্য এই উদ্যানের সহিত একটি পশুশালা ও গবেষণাগার সংযুক্ত করা হইয়াছে।

স্যার ষ্টামফোর্ড র‍্যাফলসের সহধর্ম্মিণীর স্মৃতিস্তম্ভ এই উদ্যানে দেখা যায়। স্যর ষ্টামফোর্ড র‍্যাফলসের নামকে একটি অপূর্ব্ব উপায়ে চিরস্মরণীয় করা হইয়াছে। পৃথিবীর পুষ্পপুঞ্জের মধ্যে যাহা বৃহত্তম বলিয়া বিবেচিত তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে র‍্যাফলেসিয়া। কিন্তু, মিঃ কার্ল-বকের মতে র‍্যাফলেসিয়া সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পুষ্প নহে। তিনি সুমাত্রা দ্বীপে ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর পুষ্প দেখিয়াছেন। ইহা পিচার-প্ল্যাণ্ট বা কলস-বৃক্ষ নামে অভিহিত। এই সকল প্রকাণ্ড পুষ্পের পাত্রাকার বিচিত্র গাত্রে এক বা দুই গ্যালন জল রক্ষিত হইতে পারে বলিয়া শোনা যায়। এক প্রকার তালজাতীয় কিন্তু তালবৃক্ষ অপেক্ষা খর্ব্বাকার তরু এই সকল দেশে জন্মায়, যাহার পত্র ও ফলকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ পত্র ও ফল বলিয়া মনে করা হয়। এক একটি ফলের ব্যাস দুই ফিটের কম নহে এবং প্রত্যেক পত্রের ব্যাস প্রায় দশ ফিট।

বোটানিকাল গার্ডেনের পার্শ্বে একটি পুষ্পোদ্যান দেখা যায়। শোনা যায়, লোককে ফুলের চাষে উৎসাহিত করিবার জন্য ডাচ কর্ত্তৃপক্ষ গাছের চারা বিনা মূল্যে দিয়া থাকেন। কয়েক সহস্র ফিট উচ্চ একটি পাহাড়ের উপর প্রতীচীসুলভ তরুলতা উৎপাদনপূর্ব্বক পরীক্ষা বা গবেষণা করা হয়।



ফুটন্ত গন্ধক।　　　　　　—যবদ্বীপ

বুইটেনজর্গের চতুর্দ্দিকের দৃশ্যকে শুধু সুন্দর নয়, বিস্ময়কর বলা চলে। সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর দৃশ্য সালাক নামক বনানী-বিমণ্ডিত-শৃঙ্গ সমুচ্চ শৈলের। ইহার উচ্চতা ৭ হাজার ফিট। আকাশ বা হাওয়ার প্রভাব এই শান্ত-সুন্দর অথচ গুরু-গম্ভীর গিরি-গাত্রে যে বর্ণ-বৈচিত্র্য রচনা করে বা বর্ণের ইন্দ্রজাল বয়ন করে, তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

যবদ্বীপের অন্যতম বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য, আগ্নেয় গিরিশ্রেণী। এই গিরি-শ্রেণীর মধ্যে প্রায় দ্বাদশটি এখনও অগ্নি উদ্গিরণ করিয়া থাকে। স্থানে স্থানে আগ্নেয়-গিরিগুলির গাত্র প্রগাঢ় সবুজ বৃক্ষ-লতায় আচ্ছাদিত হইয়া মনোরম মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। যে প্রচণ্ড প্রলয়-লীলা এই সকল

লাভা-উদ্গারী আগ্নেয়-গিরির দ্বারা এক দিন অভিনীত হইয়াছিল, তাহার নানা নিদর্শন চারিদিকে দেখা যায়। নিম্নে অগ্নি-দগ্ধ কৃষ্ণকায় তরু-তৃণ-হারা ঊষর মৃত্তিকা, ঊর্দ্ধে মেঘমালা-মণ্ডিত-মস্তক তুঙ্গশৃঙ্গরাজি, যাহারা এক দিন বহ্নি-বন্যা ও ভস্মরাশির সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস-ধারা বিস্তৃত করিত—এইরূপ দৃশ্যও দৃষ্ট হইয়া থাকে। উষ্ণ জলের কুণ্ড, গন্ধকোদ্গারী গহ্বর, মধ্যে মধ্যে মৃত্তিকা-তল হইতে বাষ্প-নির্গমণ প্রভৃতি ব্যাপার অগ্নিগর্ভ গিরিশ্রেণীর অস্তিত্বের বার্ত্তাই বিজ্ঞাপিত করে।

যবদ্বীপের একটি বিচিত্র বস্তু উপাস-বৃক্ষ। এই বিচিত্র বৃক্ষ সম্বন্ধে নানা প্রকার কাল্পনিক কাহিনী দীর্ঘকাল ধরিয়া



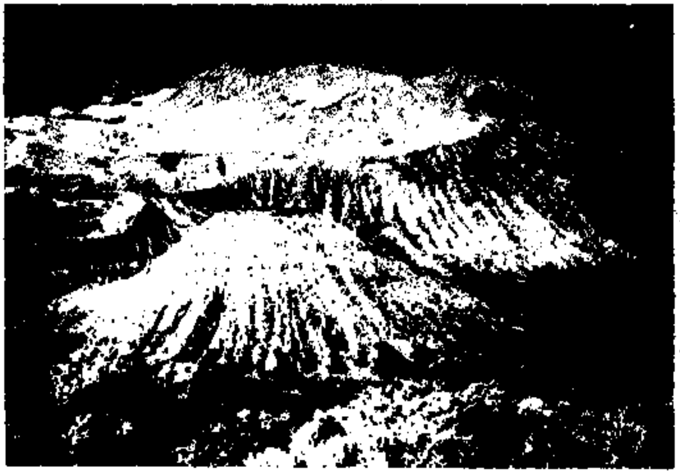
ধান্ত-বাহক। যবদ্বীপ

ইউরোপে প্রচারিত ছিল। কোন মনুষ্য বা পশুপক্ষী এই বৃক্ষের সন্নিকটে আসিলে ইহা হইতে নির্গত বিষ-বাষ্প তাহার জীবন নাশ করে বলিয়া কথিত হইত। এই সকল দেশে এমন বৃক্ষ আছে যাহার বল্কল ও পত্রাবলীর স্পর্শ প্রদাহ জন্মায়; মনে হয়, এই ব্যাপারকেই অতিরঞ্জিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত কাল্পনিকতাই প্রচার করা হয়েছে। অথবা আগ্নেয়-গিরিপ্রধান স্থানে ভূগর্ভ হইতে নির্গত বাষ্পকে ঐ বৃক্ষ হইতে বহির্গত বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। ইটালীর অন্তর্গত নেপলস্ নগরের নিকটবর্ত্তী "গ্রটো-ডেল-কেন" নামক স্থানে এইরূপ বাষ্প নির্গত হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রধানতঃ কোন্ কোন্ পদার্থ এই দ্বীপে উৎপন্ন হয় সে সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পূর্ব্বে করা হইয়াছে। যে সকল উদ্ভিদ্ গ্রীষ্মমণ্ডলে স্বভাবতঃ বা চাষের দ্বারা জন্মাইয়া থাকে এই দ্বীপে তাহাদের পূর্ণোৎকর্ষ দেখা যায়। মালয় উপদ্বীপসুলভ ফলসমূহ এখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। বিশেষতঃ, ডুরিয়ান ও ম্যাঙ্গোষ্টীন যাহাদিগকে "মালয়ান" ফলসমূহের রাজা ও রাণী বলা চলে, তাহাদের এ পূর্ণ-বিকাশ এই দ্বীপে দৃষ্ট হয়। যবদ্বীপ-সুলভ আর একটি জনপ্রিয় ফল রাম্বতান। ইহা গোলাকার এবং ইহার অভ্যন্তরে একপ্রকার অম্ল-স্বাদ সুকোমল শস্য থাকে। বাটেভিয়ার পথিপার্শ্বে এই ফলের গাছ প্রায়ই দেখা যায়। এই দ্বীপে আম্রবৃক্ষও জন্মায়। সম্ভবতঃ, ভারতবর্ষ হইতে এই বৃক্ষ যবদ্বীপে আসিয়াছিল। এখানে আনারস গাছও যথেষ্ট হয়। রেল ষ্টেশনগুলিতে যৎ-সামান্য মূল্যে আনারস কেনা যায়। একানকার সুপক্ক ও সুস্বাদু কদলীও উল্লেখযোগ্য। এখানকার বিশালকায় কাঁঠালের কথাও উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। এক একটি কাঁঠাল এত বড় যে একটি লোকের পক্ষে উহা বহন করা বিশেষ কষ্টকর। পশুপক্ষী সম্বন্ধে যবদ্বীপ সাধারণভাবে বা মোটা-মুটি অন্যান্য মালয়ান দেশের মতই। তবে, কতকগুলি বৈশিষ্ট্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কতিপয় প্রাণী এই দ্বীপে একেবারেই দৃষ্ট হয় না—যথা, হস্তী ও ওরাং-আউটাং। কতকগুলি বর্ণৈশ্বর্য্যশালী পক্ষ-যুক্ত পক্ষী পার্শ্ববর্ত্তী দ্বীপসমূহে দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু যবদ্বীপে আদৌ দেখা যায় না। আবার এমন কতিপয় পক্ষী আছে যাহা যবদ্বীপ ব্যতিরেকে অপর কোন দেশে দৃষ্ট হয় না। বর্ণ-বৈচিত্র্যে বিশেষ চিত্তাকর্ষক এক প্রকার ময়ূর ও পারাবত ইহার দৃষ্টান্ত। এই দ্বীপের পশু পক্ষী সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্য সুমাত্রা, বোর্ণিয়ো প্রভৃতি অপেক্ষা অধিক পরিস্ফুট ও বিস্তৃত, সন্দেহ নাই। ইহার কারণ, এশিয়ার বিশাল শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এই ভূ-খণ্ড যখন

দ্বীপাকারে পরিণত হইয়াছিল সুমাত্রা প্রভৃতি তখনও উহার সহিত সংলগ্ন ছিল। অর্থাৎ, এই সকল দ্বীপের মধ্যে যব-দ্বীপই (প্রাকৃতিক বিপ্লবের ফলে) সর্ব্বাগ্রে এশিয়ার অঙ্গ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছিল। যব-দ্বীপেই পিথেক্যান্থ্রোপাস নামক প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর প্রস্তরীভূত কঙ্কাল সর্ব্বপ্রথম পাওয়া গিয়াছিল। এই পিথেক্যান্থ্রোপাসকেই বাঁদর-জাতীয় জীব ও মনুষ্যের মধ্যবর্ত্তী "সংযোগ-রজ্জু" বলিয়া অভিব্যক্তি বা বিবর্ত্তবাদী বৈজ্ঞানিকগণ মনে করিয়া থাকেন।

যব-দ্বীপের বক্ষে বিরাজমান যে সকল বস্তু আমাদিগের বিস্ময় উৎপাদন করে তাহাদের মধ্যে প্রাচীন সৌধ-মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ প্রধান। এই দ্বীপের অংশবিশেষ এইরূপ ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণ। অতীতে সমুদ্ভূত, সমুন্নত সভ্যতার জলন্ত দৃষ্টান্ত সুন্দর মন্দিরাদির অবশেষ দ্বীপের কেন্দ্রস্থলেই অধিক। ভারতীয় কৃষ্টির অপূর্ব্ব সৃষ্টি এই সকল কীর্ত্তি ভারতীয় স্থপতি ও ভাস্করগণের অসাধারণ শক্তির বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে, সন্দেহ নাই। যব-দ্বীপের পৃষ্ঠে বিরাজিত বালী দ্বীপে হিন্দুপ্রভাব আজিও বিদ্যমান।



ব্রোমো, বাটক প্রভৃতি পূর্ব্ব-যবদ্বীপের আগ্নেয়গিরি।   —যবদ্বীপ

প্রাচীন মন্দিরসমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর বর্-বোদর বা বর্-বুধর আখ্যায় অভিহিত বিরাট মন্দিরটি। এই মহিম-মণ্ডিত মহান্ মন্দির দক্ষিণ উপকূলের মধ্যস্থলে দ্বীপের অভ্যন্তরভাগে দণ্ডায়মান। চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরমধ্যে ইহা সম্রাটের ন্যায় সগৌরবে দাঁড়াইয়া। দেখিলেই প্রাচীন মিশর ও কাম্বোজের আঙ্কর মনে পড়ে। আর মনে পড়ে দ্রাবিড় দেশের বিশাল গম্ভীর প্রাচীন মন্দিরগুলি ও সিরিয়ার এক্রপালিসের জুপিটর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের দৃশ্য। এই সকল মন্দির ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মের সহিত সম্পর্কের বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিতেছে।

এই মন্দির অন্ততঃপক্ষে ১২ শত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। কাম্বোজের আঙ্করের ন্যায় এই মন্দিরও অরণ্যাচ্ছন্ন হইয়া বিস্মৃতির গর্ভে তলাইয়া গিয়াছিল। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে একজন ইংরেজ অফিসার ইহা আবিষ্কার করেন।

ইহার পাদ-পীঠটির আয়তন প্রায় ৫ শত ফিট। ইহা চতুষ্কাকার। পাদপীঠ হইতে এই মন্দির ১ শত ২০ ফিট উচ্চ। সকলের উপরে গম্বুজ। গম্বুজের চতুর্দ্দিকে কয়েকটি কুপোলা। মন্দির-গাত্রের শিল্প-সৌন্দর্য্য বা কারুকার্য্য অতি সুন্দর। চাতালের ভাস্কর্য্য-সৌন্দর্য্য-ভূষিত প্রাচীরগুলির বিচিত্র চিত্র বিশেষরূপে চিত্তাকর্ষক। এই টেরাস বা চাতালগুলির আয়তন তিন মাইলের কম হইবে না। প্রাচীরগাত্রে প্রায় দেড় হাজার উৎকীর্ণ আলেখ্য-মণ্ডিত চিত্র-ফলক সংলগ্ন রহিয়াছে। বুদ্ধ-বিগ্রহের সংখ্যা প্রায় সাড়ে চারিশত হইবে। এ বিষয়ে বর্-বুধরের তুলনায় আঙ্করের মহিমা ম্লান হইয়া পড়ে।

উৎকীর্ণ আলেখ্যগুলি প্রাচীন শিল্পিগণের বিস্ময়কর দক্ষতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। কোথাও আহার ও পানরত ব্যক্তিবর্গের, কোথাও নিদ্রিত ব্যক্তির, কোথাও স্নান-রত নর-নারীর চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। ভ্রমণ, কথোপকথন, মৃগয়া, রথ-চালন, অশ্বারোহণ, ক্রীড়া, নৃত্য, যুদ্ধ, নৌকা-চালন, ক্ষেত্র-কর্ষণ, শস্য-সংগ্রহ প্রভৃতি ব্যাপারকে অনন্যসাধারণ নৈপুণ্যের সহিত অভিব্যক্ত করা

হইয়াছে। হস্তী, সিংহ, বন্ধুক, বাঁদর, কুকুর, শৃগাল, বিড়াল, ছাগল, মৎস্য, সরীসৃপ, কচ্ছপ, ময়ূর, হংস, ঘুঘু প্রভৃতি পশু-পক্ষীর প্রতিকৃতি সূক্ষ্মতার সহিত খোদিত করিয়া শিল্পি-দক্ষ আশ্চর্য্যজনক ভাস্কর্য্য-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন।

খণ্ডের পৃষ্ঠে একটি বাঁদরের চড়িবার চেষ্টার যে বিচিত্র চিত্র দৃষ্ট হয়, তাহা অতিশয় কৌতুককর। নানাপ্রকার জলযানযুক্ত সমুদ্রের দৃশ্য অনেক দেখা যায়।

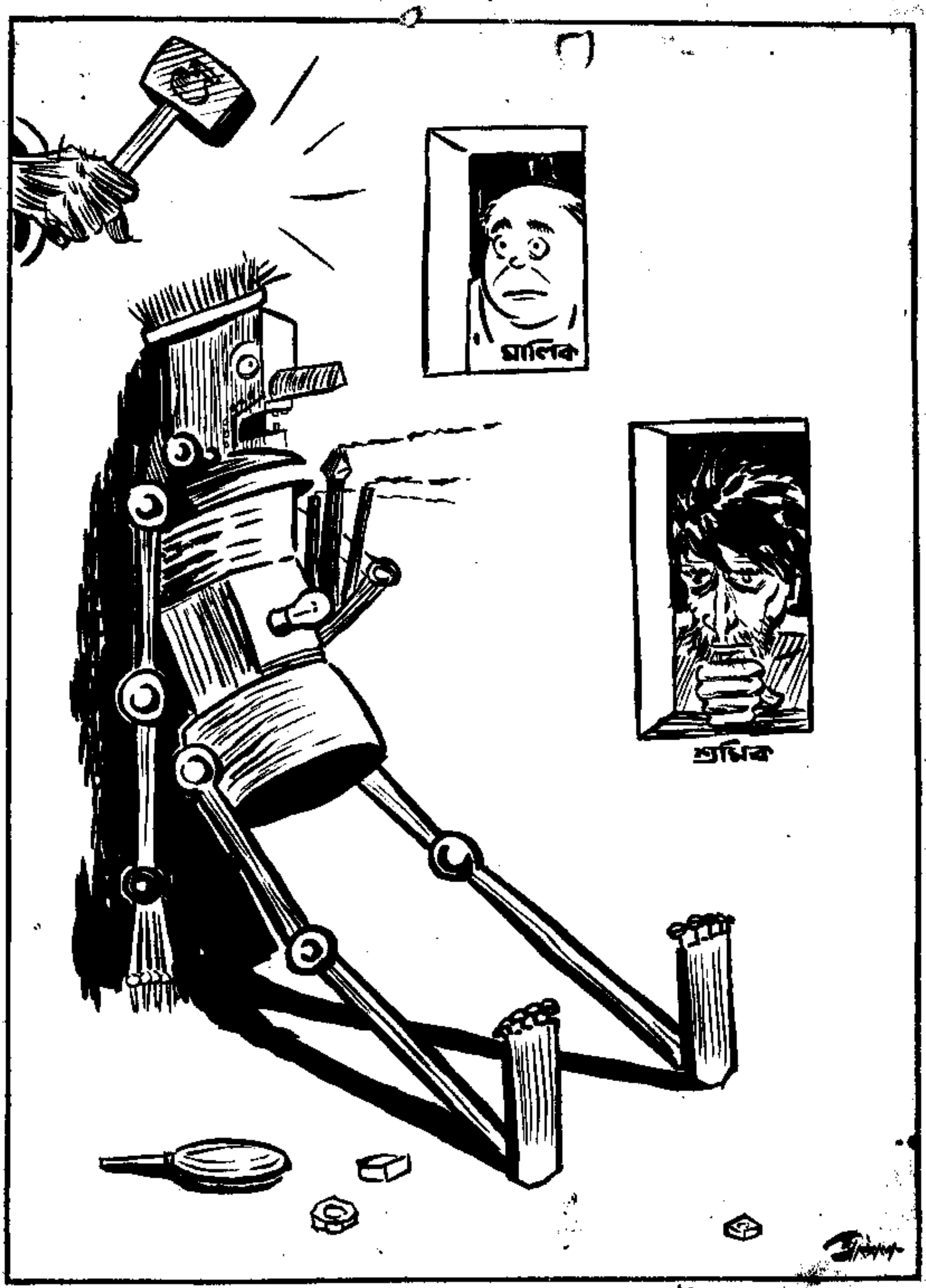
মধ্যে মধ্যে আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুচ্ছ্বাস যব-দ্বীপে লাভা-প্রবাহ বহাইয়া ও ভস্ম-রাশি ছড়াইয়া যে প্রলয়-লীলার অভিনয় করে তাহা অতিশয় ভয়ঙ্কর। সেই সকল প্রলয়-লীলার বর্ণনা শুনিলে সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠে।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে এইরূপ প্রলয়-লীলার দ্বারা যব-দ্বীপের একটি সমগ্র পর্ব্বত শুষ্ক তৃণ-খণ্ডের ন্যায় উড়িয়া গিয়াছিল। শুধু ইহাই নহে—অধিকতর বিস্ময়কর ব্যাপার, যেখানে অম্বর-চুম্বী গম্ভীর গিরিবর দাঁড়াইয়াছে, সেখানে প্রসারিত হইয়াছিল, গভীর সলিল-পূর্ণ মনোমদ হ্রদ। যেন, কোন অত্যদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক কাণ্ড। এই অগ্ন্যুচ্ছ্বাসের ফলে চল্লিশটি গ্রাম সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছিল।

যব-দ্বীপ ও সুমাত্রার মধ্যবর্ত্তী ক্রাকাতাউ নামক দ্বীপে যে প্রাকৃতিক বিপ্লব এক সময় সঙ্ঘটিত হইয়াছিল, সমগ্র পৃথিবীতে সেরূপ প্রচণ্ডতাণ্ডব প্রলয়-লীলা আর কখনও ঘটিয়াছে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। যে আগ্নেয়গিরি দীর্ঘকাল ধরিয়া সুপ্ত শিশুর মত শান্ত ছিল, সে যে সহসা ঐরূপ ভৈরব ভাব পরিগ্রহপূর্ব্বক নৃশংস ধ্বংস-লীলা আরম্ভ করিবে, তাহা কেহ কল্পনা করে নাই। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের শেষাংশে এই নিদারুণ ধ্বংস-লীলা চরম অবস্থায় উপনীত হয়। তিন দিন ধরিয়া প্রচণ্ডতম প্রাকৃতিক বিপ্লব অবিশ্রান্ত চলিতে থাকে। ক্রাকাতাউ হইতে ১ শত মাইল দূরে অবস্থিত (যবদ্বীপের) বুইটেন-জর্গ নগরের অধিবাসীরা লক্ষ লক্ষ কামানের যুগপৎ আওয়াজের মত কর্ণবধিরকর শব্দ শুনিতে পাইয়াছিল। আয়র্লণ্ডের আয়তন যতখানি ততখানি আয়তনের একটি দ্বীপ ধূম্র ও ভস্মরাশির জন্য দুই দিন ধরিয়া সূচিভেদ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। ধূম্র ও ভস্ম বায়ু-মণ্ডল অতিক্রম করিয়া ১৭ মাইল বা তদপেক্ষাও উর্দ্ধে আরোহণ করিয়াছিল বলিয়া জানা যায়। ঐ দ্বীপের কতক অংশ উড়িয়া গিয়াছিল। অবশেষে অম্বুধির উদ্দাম তরঙ্গরাজি এই প্রচণ্ড প্রলয়-লীলায় যোগ দান করিয়া যে রোমাঞ্চকর ব্যাপার আরম্ভ করিল তাহা বর্ণনাতীত। পল্লী, নগর, শস্য-ক্ষেত্র সব মুহূর্ত্তের মধ্যে মরণের বুকে বিলীন হইল।

এই প্রলয়াভিনয় কত লোককে কালের কোলে তুলিয়া দিয়াছিল তাহা নির্দ্দিষ্টভাবে বলা সহজ নহে। তবে, ৪০ হাজার লোকের কম মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই। যবদ্বীপের রাজধানী বাটেভিয়ার বন্দরে এত পিউমিস (আগ্নেয়গিরি হইতে নির্গত প্রস্তর) জমিয়াছিল যে, তাহার উপর তক্তা দিয়া বারিধি-বক্ষে বিচরণ করা যাইত। এই বিপ্লবের দ্বারা যে উচ্চ শব্দ উত্থিত হইয়াছিল তাহা সুদূর ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া এবং আরও দূরতর দেশে শোনা গিয়াছিল বলিয়া আমরা জানিতে পারি। প্রচুর ভস্ম ১২ শত মাইল দূরবর্ত্তী তাইমুর দ্বীপে পতিত হইয়াছিল। এই সকল ভস্ম সমুদ্র-সলিলে ভাসিতে ভাসিতে আফ্রিকার পূর্ব্বোপকূলে এক বৎসর পরে পৌঁছিয়াছিল। মহাসাগরের চিরচঞ্চল উচ্চ বীচিচয়ের দ্বারা বাহিত হইয়া এই সকল ভস্মের কিয়দংশ ইংলিশ চ্যানাল পর্য্যন্ত গিয়াছিল বলিয়াও কথিত হইয়া থাকে। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে ইংলণ্ডের নভোমণ্ডলে অস্তরবির রক্ত-রাগ যে-বিচিত্র দৃশ্য প্রকাশিত করিয়াছিল, অনেকে মনে করেন, এই প্রলয়-লীলার পরিণতি সূক্ষ্ম ধূলি-কণাই তাহার কারণ।

ধর্ম্মঘটের স্বরূপ



জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরা-শক্তির হ্রাস ও দ্রব্যসমূহের বিনিময়-হারের মধ্যে সমতার অভাব—এই মৌলিক-কারণ-রূপ হাতুড়ির আঘাতে যন্ত্র-দেবতা কাবু হইয়া পড়িয়াছেন। মালিক ও শ্রমিক কিন্তু ভীত ও হতাশ দৃষ্টিতে যন্ত্র-দেবতার দিকেই চাহিয়া আছেন, যদি যন্ত্র-দেবতার মধ্যস্থতায় উভয়ের মধ্যে মিলন ঘটাইয়া লোকসানীর অবস্থাটা কাটাইয়া উঠা যায়। যে-হাতুড়ীর আঘাতে যন্ত্র-দেবতা কাবু, সেদিকে উভয়ের কাহারও দৃষ্টি নাই।

পুস্তক ও পত্রিকা

নারী—পাশ্চাত্য সমাজে ও হিন্দু-সমাজে (হিন্দু সমাজগঠন-তত্ত্ব)—শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র প্রণীত। কলিকাতা, ৫৩নং কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১০+৬+৩৬৫ পৃষ্ঠা। মূল্য—৩৲ টাকা।

চমৎকার ভাব ও ভাষায় সুন্দর একখানা পড়িবার মত বই। লেখক শ্রদ্ধার পাত্র। বাংলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই একখানা বইই বাঙ্গালী চিন্তাশীল পাঠক-পাঠিকার কাছে তাঁহাকে বাঁচাইয়া রাখিবে। কলিকাতার ও মফঃস্বলের অলিতে গলিতে মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে বাংলাদেশ লেখক-লেখিকার লেখার বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে। যন্ত্র-দানবের তাণ্ডব আর কি! আলোচ্য বইখানি এরূপ বন্যায় ভাসিয়া আসে নাই, উহাতে রীতিমত চিন্তার খাদ্য আছে। আমরা আগা-গোড়া বইখানি এখনও পড়িয়া উঠিতে পারি নাই। লেখকের জোর তাগিদে যতটা পড়িতে পারিয়াছি, তাহাতে জোর কিছু বলিতে না পারিলেও এটা বলিতে পারি যে, 'সমাজতত্ত্ব' নিয়া এরূপ বই বাংলায় বড় একটা নাই। সব বিষয়ে লেখকের মতের সহিত সকল পাঠক-পাঠিকার মত মিলিবে কি না জানি না, কিন্তু একথা বলিতে পারি যে, এ সকল জটিল বিষয়ে সকলে একমত না হইলেও, লেখক গভীর চিন্তা করিয়া তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সুনিপুণভাবে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। বইখানির ছাপা, কাগজ, বাঁধাইও ভাল। আমরা লেখককে অভিনন্দিত করি ও তাঁহার এ বইয়ের বহুল প্রচার কামনা করি।

আগাগোড়া বইখানি পড়িয়া, ইহাতে যে অনেক কিছু ভাবিবার কথা আছে, সময় করিতে পারিলে সে সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল। আপাততঃ 'পুরুষ ও নারী' সম্পর্কে এই সংখ্যায় প্রকাশিত আমাদের সম্পাদকীয় আলোচনাটি মনোযোগ দিয়া পড়িয়া দেখিতে গ্রন্থের লেখককে আমরা অনুরোধ করি। তাহাতে তিনি এই সব বিষয়ে আমাদের কিরূপ মত তাহার কতকটা আভাস পাইবেন।

কশ্যপ ও সুরভি—পদ্যে লিখিত ছোট-গল্পের বই। জগদীশ গুপ্ত। কুষ্টিয়া অন্নদা সাহিত্য-ভবন হইতে চারু দেবী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৯৮ পৃঃ, মূল্য—১৷৴০।

বইখানির নাম, ছাপা, বাঁধাই, দাম, পদ্যগুলির ছন্দ, ভাষা, বর্ণনাভঙ্গী, সমস্তই রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ—প্রশংসনীয় অনুকরণ। পুস্তকের গোড়ায় 'আভাসে' লেখক নিজেই আভাষ দিয়াছেন যে, ছোটগল্পকে আরও ছোট করিয়া পদ্যে লিখিলে যা দাঁড়ায় পদ্যগুলি তাহাই, নতুবা আমি পদ্যগুলিকে গাথা-কবিতা আখ্যা দিতাম। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে এই ধরণের গাথা-কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন অথবা জগদীশ গুপ্ত আরম্ভ করেন, তাহার আদালতে গ্রাহ্য প্রমাণ জানা নাই, এই বইখানার 'আভাসে'র শেষে যে তারিখ আছে, তাহা দেখিয়া অনুমান করা যায়, রবীন্দ্রনাথই আগে হইতে জগদীশবাবুর সৃষ্টিকে মৌলিক বলিবার পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। এমন কি, জগদীশবাবু পদ্যগুলির পংক্তিতে পংক্তিতে মিল বজায় রাখিয়াও কিছুমাত্র নূতনত্ব করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়িবার সময় যেমন ক্রমাগত চিন্তার খাদ লাফাইয়া লাফাইয়া পার হইতে হয়, উদয়-সূর্য্যের দিকে চাহিয়া সূর্য্যাস্তের শোভা কল্পনা করিবার কৌশল জানিতে হয়, সহজ চিন্তার নিয়ানব্বইটি ভাগ বাদ দিয়া এক ভাগ পরিবেশন করাকে রস-রহস্যের চরম অভিব্যক্তি বলিয়া মানিয়া লইতে হয়, জগদীশবাবুর লেখা পড়িবার সময়েও এ সমস্তই দরকার হয়।

মা. ব.

কামরূপ (উপন্যাস)—শ্রীচরণদাস ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী। চক্রবর্ত্তী সাহিত্যভবন, বজবজ। মূল্য—১৲ টাকা।

শ্রীযুক্ত চরণদাস ঘোষের নাম গল্প এবং উপন্যাস-লেখক-হিসাবে বঙ্গ সাহিত্যে অজানা নহে। আলোচ্য গ্রন্থখানি 'বিচিত্রা'য় ধারাবাহিকভাবে বাহির হইয়াছিল। ঠিক উপন্যাস না বলিয়া, বরং বড় গল্পের পর্য্যায়ভুক্ত করিলে 'কামরূপে'র প্রকৃত মর্য্যাদা-রক্ষা হয়। গ্রন্থের ভাবসমষ্টি ইহার মধ্যে অব্যাহত রহিয়াছে এবং রূপক-সৌন্দর্য্য মূর্ত্ত হইয়াছে। চন্দন সন্ন্যাসী। শক্তি তাহাকে কামরূপ মন্দিরের প্রবেশপথ হইতে জয় করিয়া পিতৃরাজ্যে লইয়া গেল। এ রাজ্যের নিয়ম, কুমারীগণ পরদেশ হইতে শক্তিসম্পন্ন সুন্দর যুবকবৃন্দকে জয় করিয়া বিবাহ করিবে। লেখকের উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও এবং গতানুগতিকতার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উদ্দেশ্যে নূতন ভাবের সংমিশ্রণ সৃষ্ট হইয়া উঠিলেও দেশের যুবকবৃন্দ এ কল্পনা কোন দিন আপন করিয়া লইতে পারিবে না। গ্রন্থকারের বক্তব্য মৌলিক হইতে পারে, কিন্তু সহানুভূতি না পাইলে বক্তব্যের সার্থকতা কোথায়? লেখক রাজ্যের নিয়ম ভাঙ্গিয়া দিয়া সবার উপরে প্রেমের আসন পাতিয়াছেন। যাহাদের ভিতর বিদেশীর প্রীতি অত্যন্ত বেশী এবং যাহারা বিদেশীর সঙ্গসুখে আত্মহারা হয়েন, লেখক বিশেষরূপে তাঁহাদের সেই ভ্রম দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সুনিপুণ লিপি-চাতুর্য্যে চরণদাস বাবু 'কামরূপে'র যে রূপ দিয়াছেন, চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। কোথাও ভাবের অসংযম বা আতিশয্য নাই। ভাবের উচ্ছৃঙ্খলতা নাই। বর্ণনাভঙ্গী—ভাল। আমরা আগ্রহের সহিত গ্রন্থ পড়িয়াছি, পাঠকগণও পড়িয়া তৃপ্তি লাভ করিবেন—ইহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টা

কামিখ্যের ঠাকুর (গল্পগ্রন্থ)—শ্রীঅরবিন্দ দত্ত প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী। চক্রবর্ত্তী সাহিত্য ভবন, বজবজ। মূল্য—১৲ টাকা।

গ্রন্থকার বঙ্গসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ইঁহার লেখা বিভিন্ন সাময়িকপত্রে নিয়মিতভাবে বাহির হইয়া থাকে। আলোচ্য গ্রন্থে বাছাই করা ছয়টী গল্প সন্নিবেশিত হইয়াছে। গল্পগুলি প্রবাসী, বসুমতী, বিচিত্রা প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। ছোট গল্প লেখা সহজ নয় এবং ইহার ক্ষেত্র উপন্যাসের মত বিস্তৃত নহে। সুদক্ষ শিল্পীর অঙ্কনকুশলতায় গল্পগুলি জীবন্ত হইয়াছে—কোথাও ভাব বা ভাষায় আতিশয্য-দোষ ঘটে নাই। রস-পরিবেশনে কার্পণ্য নাই—পড়িতে পড়িতে ক্লান্তি বা নিদ্রা আসে না। প্রমাণিত হয়—গ্রন্থকার সুদক্ষ গল্পলেখক।

সমাজের উচ্চশ্রেণীর উপর অরবিন্দবাবু তীব্র কটাক্ষপাত এবং তঁাহাদের অন্তরের উপর কশাঘাত করিয়াছেন। সমাজের উচ্চশ্রেণীভুক্তগণ চিরদিন আপনাদিগকে বড় করিয়াই রাখিয়া দিয়াছেন, পদে পদে পদদলন তাঁহাদিগকে অধঃপতনের চরম সীমায় উপস্থিত করাইলেও কি ভাবে তাঁহারা স্বীয় কলঙ্ক-কালিমা নিম্নস্তরের সম্প্রদায়ের মুখে লেপন করিয়া নিজেরা সাধু হইয়া থাকিতে চাহেন ও আপনাদিগকে বড় করিয়া রাখিতে চাহেন, গ্রন্থকার তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। 'বোঝাপড়া'-শীর্ষক গল্পে ইহার জীবন্ত আলেখ্য দেখিতে পাওয়া যায়। 'ছেঁড়া জুতোর' মধ্য দিয়াও অমূল্য রত্নের সন্ধান দিতে গিয়া লেখক তাঁহার সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। নীলকণ্ঠের আপ্রাণ চেষ্টার ফল বিফল করিয়া 'জুতির মা'র পারণ কি ভাবে অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল, তাহা লইয়া 'জুতির মার মহাষ্টমী'র আখ্যান ভাল জমিয়া উঠিয়াছে।

গল্পলেখায় লেখকের যে সুনাম আছে, তাহা 'কামিখ্যের ঠাকুরে'ও অক্ষুণ্ণ রহিবে। গল্পগুলির ভিতর বাস্তবতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। যুগ-সাহিত্যে ইহারা সমাদৃত হইবে।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

[illegible]বাণু—[illegible] মাসিক [illegible], দ্বিতীয় সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৪৪,—মূল্য [illegible]—দুই আনা। বার্ষিক এক টাকা। সম্পাদক—শ্রীসু[illegible] [illegible]মণীন্দ্র বসু।

আধুনিকতা বাঙ্গালায় যে এক শ্রেণীর তরুণ-যুবকের মধ্যে দেখা দিয়াছে এই মাসিক কবিতা-পত্রখানিকে তাহাদের মুখপত্র বলা যাইতে পারে। আলোচ্য সংখ্যাখানিতে মোট নয় জন লেখকের লেখা আছে। সেই সকল লেখাকে কবিতা বলিয়া চালান হইয়াছে।

এই পত্রিকাটিতে কতকগুলি নূতন নূতন শব্দ [illegible] অভিধানে ঐ সকল শব্দ পাওয়া যায় না।

য. ভ. পা.

রূপান্তর—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৩৭৬ পৃষ্ঠা। মূল্য—২৷৹ টাকা।

প্রথম খণ্ড—সাধা - সত্যপ্রতিষ্ঠা ; দ্বিতীয় খণ্ড—সাধনা—আত্মসমর্পণ

তৃতীয় খণ্ড—সিদ্ধি--দিব্যজীবন।

প্রধানতঃ, অমিয়ার কথা, অমরের কথা ও কিরণের কথা নিয়া বই। একখানা উপন্যাস, নিছক গল্প নহে। যদিও ইহাতে উপন্যাসের উপন্যাসত্ব, গল্পের গল্পত্ব, প্রবন্ধের প্রবন্ধত্ব কোনটাই ধরা পড়ে না, তথাপি যে সকল সঙ্কেতে লেখক নরনারীর মিলন প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা কতকটা সার্থক হইয়াছে। সেখানে তত্ত্বী লোকের বা সমাজের প্রকৃত কল্যাণকর কিনা, তাহা বলা যায় না। তবে, লেখক সৎ উদ্দেশ্য নিয়াই কলম ধরিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক ইহা পড়িয়া আনন্দ পাইবেন। বইয়ের ছাপা, কাগজ, বাঁধাই ভাল। ভাষাও সুন্দর। ছাপার ভুল কিছু থাকিলেও, উপেক্ষণীয়।

সংবাদ ও মন্তব্য

দায়ী কে ?

যশোহর-খুলনা রাজনৈতিক কর্ম্মি-সম্মেলনে যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়, নরেশচন্দ্র সেন নামক একটি অল্পবয়স্ক যুবক তাহাতে গুরুতর রূপে আহত হয়। হাসপাতালে ১৭ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার তাহার মৃত্যু হয়। রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র নরেশ সেনের মৃত্যু সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য নিরপেক্ষ তদন্ত-কমিটি নিয়োগ করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং জানাইয়াছেন : কমিটীর রিপোর্ট হস্তগত হইলে আমরা স্থির করিতে পারিব, এইরূপ ঘটনা যাহাতে পুনরায় না ঘটে তাহার জন্য এবং আমাদের মধ্য হইতে উচ্ছৃঙ্খলতা চিরতরে বিদূরিত করিবার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার।

*

সুভাষচন্দ্র কি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটীর রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া "আমাদের মধ্য হইতে উচ্ছৃঙ্খলতা চিরতরে বিদূরিত করিবার" উপায় আবিষ্কার করিতে পারিবেন ? আবিষ্কার করিলে [illegible] সেই উপায় অনুসারে কাজ করিতে পারিবেন অথবা করিবেন ?

কংগ্রেসে [illegible] র যে অ[illegible] সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা [illegible] এবং আরও অসংখ্য ঘটনা [illegible] দিয়া [illegible] দেখাইয়া দিয়াছে ও দিতেছে, সেই প্রয়োজনীয়[illegible]র [illegible]র ইচ্ছারই যেখানে একান্ত অভাব, কার্যক্ষেত্রে সেখানে তদন্ত কমিটীর দ্বারা তদন্তই হয়, দুই চারিজন অপরাধী ঠিক করিয়া ঘটনার দায়িত্বও হয়ত ঘাড়ে চাপান[illegible], কিন্তু আসল দায়িত্ব কাহার তাহা [illegible]রিত হয় না। মৃত নরেশ সেনের পিতা সংবাদপত্রে একটি বিবৃতি দিয়াছেন। আমরা বিবৃতির দুই একটি লাইন এখানে উদ্ধৃত করিতেছি : 'আমার পুত্রের সকল যন্ত্রনার অবসান হইয়াছে। আমার কিছুই বলিবার নাই। শুধু রাজনীতি লইয়া [illegible]রা মারামারি খুনাখুনি করিতেছেন, [illegible] শিশুদের প্রাণ লইয়া ছিনিমিনি খেলি[illegible], [illegible]দের চৈতন্য হউক, ইহাই আমার প্রার্থনা'।

চশমার সন্ধানে

১৯শে আষাঢ় পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ইউরোপ যাত্রা করিয়াছেন। বোম্বাই নগরীতে তাঁহাকে বিদায়-জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত জনসভায় তিনি বলিয়াছেন যে, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও তাহার ঘাত-প্রতিঘাত অনুধাবন করিতে না পারিলে ভারতের প্রকৃত সমস্যা বুঝিয়া উঠা সম্ভব নহে। পণ্ডিতজী একথাও বলিয়াছেন যে, হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা পরাধীনতার প্রত্যক্ষ ফল এবং এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্যা অন্যান্য দেশেও আছে।

ইউরোপ-গমনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পণ্ডিতজী নানা স্থানে বক্তৃতা দিয়াছেন। একবার, কি কি কারণে তিনি বিলাত যাইতেছেন না, বিশদভাবে তাহাও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্বাস্থ্যের জন্য যাইতেছেন না, কারণ তাঁহার স্বাস্থ্য ভালই আছে; কন্যাকে দেখিতে যাইতেছেন না, কারণ দরকার হইলে তাঁহার কন্যাই ভারতবর্ষে আসিতে পারিতেন, ইত্যাদি। পণ্ডিতজী ইউরোপ যাইতেছেন, বিশ্ব-সমস্যা অর্থাৎ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও তাহার ঘাত-প্রতিঘাত অধ্যয়ন করিবার জন্য। নিজের চোখে ইউরোপের অবস্থা [illegible] ভারতবর্ষের প্রকৃত সমস্যা বুঝিতে চা[illegible] এই উক্তির মধ্যে কিরূপ চরম স্বীকারোক্তি রহিয়াছে, পাঠকবর্গ অবশ্যই তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। পণ্ডিতজী ভারতবর্ষের প্রকৃত সমস্যা বুঝিতে পারিতেছেন না। স্বীকারোক্তি যে সত্য, পণ্ডিতজী তাহার প্রমাণও দিয়াছেন। হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা ভারতবর্ষের পরাধীনতার প্রত্যক্ষ ফল, একথা যিনি বলিতে পারেন, ভারতবর্ষের প্রকৃত সমস্যা কিছু মাত্র বুঝিবার ক্ষমতা তাঁহার কিছুমাত্র আছে বলা চলে না। যে দৃষ্টিতে না দেখিলে ভারতবর্ষের সমস্যার স্বরূপ উপলব্ধি করা অসম্ভব, সেই দৃষ্টি পণ্ডিতজীর ছিল, এরূপ কোন প্রমাণ আজ পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট হইতে আমরা পাই নাই, ইউরোপের নিকট ধার-করা রঙীন চশমা চোখে লাগাইয়াই তিনি চিরদিন দেশের সমস্যাগুলিকে দেখিয়া আসিয়াছেন, সেই চশমার রঙ ফ্যাকাসে হইয়া আসিয়াছে বলিয়া তিনি কি নূতন একটি চশমার সন্ধানে বাহির হইয়াছেন?

ধর্ম্মঘট

জ্যৈষ্ঠ মাসে সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত ধর্ম্মঘট ও ধর্ম্মঘটের সম্ভাবনার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে : সোনাজুলী চা-বাগানের মুণ্ডা কুলীদের মধ্যে; রাণীগঞ্জে বার্ণ কোম্পানীর কারখানায়; মাদুরা মহালক্ষ্মী মিলে; লাহোরে হেলী কলেজ অব কমার্সের ছাত্রগণের মধ্যে; কুমিল্লা কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে; ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ম্যাচ ফ্যাক্টরীতে; কানপুর কাপড়ের কলসমূহে; টোণ্ডিয়ারপেটে জামাল গ্লাস ওয়ার্কসে; গঙ্গা কটন মিলে; উড়াইউর চুরুটের কারখানায়; কুমারধুবী ঈগল রোলিং মিলে; ইণ্ডিয়ান কেবল কোম্পানীতে; টিনপ্লেট কোম্পানীতে; শ্রীহট্টে সারদা ছাপাখানায়; ছিণ্ডিভামলায় জুট মিলে; মেটিয়াবুরুজস্থ কেশোরাম কটন মিলে; টিনেভেলী তুতিকোরিণ ও পেত্তাই-এর ধাতুশিল্প-কারখানায়; অমৃত-সহরে কাপড়ের কলসমূহে; করিমগঞ্জে কৃষকদের মধ্যে; গয়ায় মোটর-চালকদের মধ্যে; হিলনা অঞ্চলে কৃষি-শ্রমিকদের মধ্যে ধর্ম্মঘট এবং কলিকাতা বিদ্যুৎ-সরবরাহকোম্পানীতে, টাটা আয়রণ অ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানীতে; মধ্যপ্রদেশের কাপড়ের কলসমূহে, বিরাজ-গ্রামের মিলসমূহে; মুঙ্গেরের তামাকের কারখানায় ধর্ম্মঘটের সম্ভাবনা।

গত সংখ্যায় আমরা একমাসে বিভিন্ন স্থানের দাঙ্গা-হাঙ্গামার তালিকা দিয়াছিলাম। সেই তালিকার মত উপরোক্ত ধর্ম্মঘটের তালিকাও কলিকাতার কয়েকটি